—দীপা ত যাবেই, কিন্তু তুমিও গোড়া থেকে সঙ্গে থাকলে কত সুখী হতাম।

বিগত পূজায় গিরিডির বাগানের সে সুখস্মৃতি হাসিকে কোথায় স্রোতের তৃণের মত ভাসাইয়া নাচাইয়া লইয়া যায়।

বাড়ী ফিরিবার পথে আবার দোতলা বাসের শিটে ভাবনা—বিস্ময়-খচিত ভাবনা হাসিকে ভুলাইয়া রাখে সারা পথ—বিকাশের সঙ্গে সত্য সত্যই যদি তাহার বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে সে কি সুখী হইবে? তাহার জীবনে এমন বিবাহের অর্থ কি পরিণামই বা কি? শতবার শত প্রকারে সমস্যার দিকে সে মুখোমুখী হয়, কিন্তু সমাধান তথাপি নাগালের বাহিরেই থাকে। হঠাৎ তীক্ষ্ম চাবুকের আঘাতে হাসির বুকখানা চৌচির হইয়া যাইতে চায়, যখন মনে পড়ে—বিকাশের সঙ্গে বিবাহ কি হাসির মাতার বিবাহেরই পুনরাবৃত্তি হইবে? হাসি শিহরিয়া উঠে।

সে কি বৃহৎ পরিবারের জননী হইবে শেষে? তাহার দিন মাস-বৎসরগুলি কি চক্রাকারে একঘেয়ে নির্জীব নীরস ঘরকন্নার কর্তব্যপুঞ্জের আবর্তেই অতিবাহিত হইবে? কাটাইতে হইবে রান্নাবান্নায় ধোয়া-পোঁছায়, আর এক টাকার কাজ সারিতে দুই অথবা তিন টাকার মূল্যের?

"না, না, আমি সে ঝামেলা পোহাতে একেবারে অপারগ" নিজেকে নিজে বলে—"আমার প্রতি রক্তবিন্দু এমন বিবাহের নামে বিদ্রোহী হবে নিশ্চয়।"

আর সেই মুহূর্তে স্পন্দিত-বক্ষে সে টের পাইল তাহার অনুরাগ [illegible] লইয়া বিকাশের আঙ্গুলগুলি খেলা করিতেছে স্কন্ধদেশে।

সাধারণত বিকাশ উচ্ছ্বাসের পক্ষপাতী নয়, অপ্রয়োজনীয় কথা বলেও না একটি। কিন্তু আজ এই রাতে বাসের উপরতলা এক রকম নিরালা।

হাসি, প্রিয়তমে, আমি তোমায় না পেলে পাগল......একটা সন্দেহ যেন তাহার হৃৎপিণ্ডকে ছিন্নভিন্ন করে, তাই সে হঠাৎ বলে—হ্যাঁ, তুমি আমায় সামান্য একটুও ভালবাস, না রাণী?

সঙ্গে সঙ্গেই হাসি বলে—"awfully fond of you, Bikash-da" (তোমার চির-অনুরক্ত বিকাশ-দা) এবং এই সান্ত্বনায়ই বিকাশকে তৃপ্ত থাকিতে হইল।

শয্যার আশ্রয়ে যাইয়া হাসি মনে মনে আলোচনা করিতে থাকে—"অনুরক্ত" হওয়া কি "ভালবাসার" চেয়ে প্রকৃতই অনেকখানি বিভিন্ন। ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আর ঝাঁকে ঝাঁকে স্বপ্ন আসিয়া তাহার নিদ্রাকে রঙিন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সে স্বপ্নে বিকাশের স্থান ছিল না—এতটুকু। মন-মোহিত-করা এক পরম রূপবান যুবক মস্ত বড় মোটর গাড়ী লইয়া আসিয়া হাজির—প্রেম-নিবেদনে সে একেবারে সিনেমার দুষ্ট ধনী নায়ককেও পিছনে ফেলিয়াছে—প্রতিটি কথা তাহার যেন মধু বর্ষণ করে—হাসির বুভুক্ষু প্রাণ তাহার সহিত বিচ্ছেদ সহ্য করা দূরে থাকুক, বিচ্ছেদের কল্পনাও করিতে পারে না।

মাসাধিক কালের মধ্যেই হাসির সাক্ষাৎ মিলিল তাহারই সহিত।

(আগামীবারে সমাপ্য)

পণ্ডিত

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দৃষ্টি কেবল চাকরি পানে,
স্বার্থ-খুঁটি আঁকড়ে রয়,
কথার বেলায় চোস্ত ভারি,
কাজের বেলায় কিচ্ছু নয়;

পুঁথির প্রাকার দিয়ে ঘেরা
একটুখানি জগৎ তার!
সেই জগতের বাইরে গেলেই
চক্ষে সবই অন্ধকার!

হাত-পাগুলো শীর্ণ অতি,
রাস্তা হাঁটে—মন্দ গতি,
একটু যদি ঠাণ্ডা লাগে
অমনি কাশি সর্দি হয়।

গরীব চাষীর স্কন্ধে ব'সে
সিগারে টান মারছে ক'সে,
'অপদার্থ' বললে রোষে
আদালতের দেখায় ভয়।

বিচিত্র বার্তা

মৈত্রী নয়—অদৃষ্টের পরিহাস

কেঁচো, পোকা-মাকড় শিকারে হাতেখড়িপ্রাপ্ত মোরগ-শিশু সাপটাকে একটা নিরীহ বিরাট পোকা অনুমান করিয়া আগাইয়া আসিয়াছে। সে শুধু ভাবিতেছে এত বড় একটা বিপুলকায় শিকারকে গলাধঃকরণ করার সহজ ফিকির আবিষ্কার করা যায় কি প্রকারে, কারণ সে স্থির নিশ্চিত ধারণা করিয়া লইয়াছে যে, এটাও কেঁচোর মতই একটা গোবেচারী পোকা—শুধু আকারে বেতাকার।

যাহাকে খাদ্যে পরিণত করিবার উল্লাসে মোরগ-শিশু ব্যস্ত সে নেহাৎ কাবু বলিয়া এবং সাময়িক দৃষ্টিহীন বলিয়া মোরগ-শিশু কল্পনা-বিলাসের আহ্লাদে আটখানা হইতে পারিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার—সাপটি খোলস ছাড়িতেছে বলিয়া কাবু এবং বর্জিত খোলসের অংশ উহার চক্ষু ঢাকিয়া রহিয়াছে, নতুবা মোরগ-শিশুর এই কল্পনা কল্পনার অবকাশই ঘটিত না, মুহূর্ত্তে অতি কঠোরভাবেই উপলব্ধি করিত যে তাহার ভক্ষ্য পোকাই তাহার ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

ইংলণ্ডের অতি-আধুনিক রূপকথা

বার্লিন শহরে কোনও এক ব্যক্তি এতই অনাহার ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে যে কোনও প্রকারে ক্ষুন্নিবারণের উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে মরিয়া হইয়া মনস্থ করে যে জেলে অথবা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেই যাইবার মত অপরাধ করিবে এবং তাহা হইলেই গ্রেপ্তার হইয়া বন্দীর আহার প্রাপ্ত হইবে। এইজন্য সে প্রশস্ত এক রাজপথে অপেক্ষা করিতে থাকে, তারপর যখন দেখিতে পাইল যে হিটলারের ঝটিকাবাহিনীর এক দল ঐ পথে মার্চ্চ করিয়া আসিতেছে, তখন সে দলের নেতার পাশাপাশি যাইয়া চীৎকার করিল—"হেইল ষ্ট্যালিন!" কিন্তু কেহই তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। মিনিটখানেক পরে সে আবার চীৎকার করিল—"হেইল ষ্ট্যালিন!"—তথাপি কেহ গ্রাহ্য করিল না। বিস্ময়ান্বিত হইয়া সে আরও উচ্চস্বরে চীৎকার করিল—"হেইল ষ্ট্যালিন!" এবং যতটা সম্ভব নেতার কাছ ঘেঁসিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তবুও কেহ কিছু বলে না। সে এবার তাহার কণ্ঠস্বর যত উচ্চ করিতে পারে সেই প্রকারে আপ্রাণ শক্তিতে চেঁচাইল—"হেইল ষ্ট্যালিন!" এইবার ঝটিকাবাহিনীর নেতাটি তাহার দিকে ফিরিয়া অতি নিম্নস্বরে বলিল—"আরে আহাম্মোক অত জোরে চেঁচায় না। চতুর্থ সারিতে একটি 'নাৎসি' রহিয়াছে।"

পরাগ-রেণুর তীব্র বিষ

মিঃ গ্রীটফিল্ড নামক ভারতে প্রেরিত কোনও মিশনারীর বার বৎসর বয়স্ক পুত্র পিটার হঠাৎ সংজ্ঞা হারায় এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। তাহার মৃত্যুর কারণ কোনও সাধারণ চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞই নির্ণয় করিতে পারে না। অবশেষে একজন বিষ-বিশেষজ্ঞকে ডাকা হয়। সে আসিয়া পরীক্ষার পর আবিষ্কার করে যে, আইভি-পরাগের তীব্র বিষক্রিয়ার ফলে বালকের মৃত্যু হইয়াছে। তখন অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা যায় যে, স্থানীয় পাহারাওয়ালা একটি ঐ বালককে মৃত্যুর দিন তাহাদের বাগানের প্রাচীরের পাশে দাঁড়াইয়া একখানি ছুরির দ্বারা প্রাচীরের গায়ের আইভিলতা কাটিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে লজেন-বেরি খাইতে দেখিয়াছিল। সুতরাং অনুমান করা হয় আইভির পরাগ উহার খাদ্যের সহিত পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারই ফলে এই বিষক্রিয়া।

ইংলণ্ডের দুইটি আশ্চর্য্য ব্যাপার

'রেজিষ্ট্রার-জেনারেলের রিপোর্ট ফর ইংল্যাণ্ড এণ্ড ওয়েলস" প্রকাশিত হইবার পর দেখা যায়, যে, উক্ত রিপোর্টের অন্যতম আশ্চর্য্য ঘোষণা হইল, অজীর্ণ রোগে আক্রমণ-প্রবণ ব্যক্তিগণের তালিকা। এই তালিকায় দেখান হইয়াছে যে ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলস-য়ের হোটেল-কিপারসমূহ, চিকিৎসক-

দল, তামাক-বিক্রেতাবৃন্দ, মদ্য চোলাইয়ের কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর দল এবং পেট্রোল-ষ্টেশনের কার্য্যকারী মালিকেরাই প্রধানত অজীর্ণ রোগের কবলে পতিত হয়। এই রিপোর্টের অন্য একটি আশ্চর্য্য প্রচার-বাণী হইল আত্মহত্যা সম্বন্ধে। কেমিষ্টগণের ভিতরই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যায় আত্মহত্যার ব্যাপার সংঘটিত হয়। বস্তুত আত্মহত্যা করিবার সুযোগ সুবিধা ইহাদের হাতের কাছে যেমন রহিয়াছে এমন আর কাহারও নয়। আর ইহার বিপরীত ঘটনা দেখা যায় রেলওয়ে গার্ডদিগের ভিতর। উহাদের আত্মহত্যা করিবার সুযোগ অতি সুলভ হইলেও উহাদের ভিতর আত্মহত্যার প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা কম।

উড়ন্ত সিনেমা-গৃহ

গোর্কি প্রোপাগাণ্ডা এয়ার স্কোয়াড্রন কর্ত্তৃক এক বিচিত্র উড়োজাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। চার এঞ্জিন যুক্ত বিরাট এরোপ্লেন একখানিতে সিনেমা থিয়েটার সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চাশ জনের বসিবার মত আসন রহিয়াছে। প্রতিদিন ইহাতে 'নিউজ রীল' প্রদর্শিত হইতেছে। মস্কো শহরে এই বিচিত্র উড়ন্ত সিনেমা-গৃহ প্রতিদিন যথাসময়ে মহাশূন্যে উড়িয়া বেড়ায় এবং আকাশে উড়িয়া উড়িয়া চলচ্চিত্র দর্শনেচ্ছুগণকে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের টিকিটের বিনিময়ে অপূর্ব্ব আমোদ উপভোগের সুযোগ প্রদান করে। এই এরোপ্লেনখানির নামকরণ করা হইয়াছে প্রভ্দা (Pravda) অর্থাৎ 'সত্য'।

তাঞ্জোর-কামান

তাঞ্জোর পুরাতন দুর্গে একটি কামান, নাম তাহার "রাজগোপাল"—২৩ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং মুখটি ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া। দক্ষিণ ভারতে এত বড় কামান আর নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে এইটিকে যাদুঘরে রক্ষা করিবার যোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

তাঞ্জোর চোলরাজগণের আমলে রাজধানী ছিল। শিবাজীর বংশধরদের এক শাখা পরিশেষে এই রাজ্য শাসন করে; এবং সেই সময়ই এই কামান প্রস্তুত হয়।

তাঞ্জোর ষ্টেট ইংরেজের অধীনে আসিলে পর এই কামান রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া উহা রাজার ঐ পুরাতন দুর্গে থাকে। ক্রমে এই কামান রাজার বংশধরদের হস্তে থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেনার দায়ে ঐ কামান ৩০০ টাকায় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হয়, এবং উহাতে যে ধাতু রহিয়াছে, কামানটি পিস টুকরা করিয়া গলাইয়া সেই ধাতু নিষ্কাশন করিয়া বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হয়। এই সময় আর্কেইলজিকেল বিভাগ আসিয়া আপত্তি জানায়। সেই সূত্রেই ভারত সরকার উহা মিউজিয়ামে রক্ষার উপযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

এই প্রকারে প্রাচীন এই স্মৃতিচিহ্নটির রক্ষা হয়।

ফুটবল খেলায় অকস্মাৎ মৃত্যু

ল্যাঙ্গোলেন শহরে ফুটবল ম্যাচ খেলা হইতেছিল "লে ইউনাইটেড" বনাম "ল্যাঙ্গোলেন এফ সি"। শেষোক্ত ক্লাবের পক্ষে ডোনাণ্ড প্রাইস নামক ২২ বৎসর বয়স্ক যুবক খেলিতেছিল। সে কেইরগুইরি অঞ্চল নিবাসী। এই ক্লাবের হইয়া ইহাই তাহার প্রথম খেলা। একটি বল 'হেড' করিবার কয়েক সেকেণ্ড পরেই সে হঠাৎ এলাইয়া পড়ে এবং অগোণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খেলায় তাহার ক্ষিপ্রতা ছিল অসাধারণ। নিজ বাস অঞ্চলে সে ম্যাচ খেলিয়াছে। খেলার পূর্ব্বেও সে অটুট স্বাস্থ্যপূর্ণই ছিল এবং অসুস্থতার কোনই সংবাদ কাহাকেও বলে নাই। মৃত্যু আকস্মিক বলিয়াই সকলের বিশ্বাস।

মন্দিরে গুপ্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন

সলোমন মন্দির হইতে যে স্বর্ণপান ধনরত্ন খোয়া যায়—তাহার মত মূল্যবান সম্পদ সারা বিশ্বে আর কোথাও খোয়া যায় নাই।

নেবুচাডনেজার যখন জারুজালেম মন্দির হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫৮ সালে ইজরাইলের পবিত্র ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া নেয়, কথিত আছে সেই সকল ধনরত্ন পুরোহিতেরা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। প্রোফেট জেরেমিয়া বলেন, ঐ সকল হীরা-জহরৎ ও স্বর্ণের একাংশ অন্যত্র লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল এবং উহার সহিত ছিল আর্ক অফ দি কভনাণ্ট।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে ঐ সম্পদের অধিকার রোমানগণ কর্ত্তৃক সম্ভব হইয়াছিল যদিও আংশিকভাবে, কারণ—উহার কিছু অংশ টাইবার নদে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ৩১২ খৃঃ অব্দে কনষ্টাণ্টাইনের আক্রমণের সময় ম্যাকসেনসিয়াস ঐ সকল ধনরত্ন লইয়া পলায়নের সময় রোমের নিকটে টাইবার নদে একাংশ পতিত হয়।

আবার ইহাও বর্ণিত হয় যে, এলারিক কর্ত্তৃক রোমের ইহুদীদের পবিত্র ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইয়া গল-এ নীত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সকল ধনরত্ন কোথায় কাহার নিকট রহিয়াছে কেহ বলিতে পারে না।

ধূমপান ত্যাগে আদালতের আশ্রয়

৭৫ বৎসর বয়স্ক আর্থার ফ্রয়েড (অবসরপ্রাপ্ত হাস্যরসিক অভিনেতা) প্রত্যহ মিডলসেক্স পুলিশ কোর্টে হাজির হইতেছে এবং কোর্ট যতক্ষণ বসে, ততক্ষণ বসিয়া থাকে। তাহার উদ্দেশ্য ধূমপান অভ্যাস সংযত করা, কারণ কোর্টগৃহে কাহাকেও ধূমপান করিতে দেওয়া হয় না।

ম্যাজিষ্ট্রেট এজন্য তাহাকে একটি বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ফ্রয়েড আজিও একেবারে ধূমপান ত্যাগ করিতে পারে নাই, কিন্তু ধূমপানের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। এখনও টিফিন বা লাঞ্চের সময় ম্যাজিষ্ট্রেট উঠিয়া গেলে ফ্রয়েড বাহিরে যাইয়া ধূমপান করিয়া আসে।

সে কোর্টের মোকদ্দমাগুলি নিবিষ্টমনে শোনে এবং এই প্রকার ধূমপান হইতে মনকে অন্যদিকে ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করে।

প্রাগবাসীর জার্ম্মান-বিদ্বেষ

প্রাগের সকল রেস্তোরাঁর মেনু পূর্ব্বে জার্ম্মান, চেক, ইংলিশ ও ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে উহারা শুধু চেকভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় মেনু মুদ্রিত করে না। "হ্যাম" এবং "এগস" এই দুইটি শব্দের পরিবর্ত্তে চেকভাষার প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়। এই প্রকারে "রোষ্টবীফ" শব্দও উহাদের মেনু হইতে লোপ পাইয়াছে।

সিনেমাগুলিতে আর আমেরিকা, জার্ম্মানী, ফ্রান্স বা ইংলণ্ড হইতে প্রস্তুত ফিল্ম একটিও দেখান হয় না। জনসাধারণ চেক-ফিল্মই (নিজ দেশে প্রস্তুত ফিল্ম) মাত্র দর্শন করিবে। যে সিনেমা ইহার বিপরীত কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে সে সিনেমা-গৃহে কেহ পদার্পণ করিবে না।

ভারতেও কি এই শুভদিনের উদয় আশা করা যায় না।

ভিক্টর হিউগোর নির্ব্বাসনের গৃহ

গারনসি শহরে হটেভিল হাউসে হিউগো তাঁহার ১৪ বৎসর নির্ব্বাসন কাল কাটাইয়াছিলেন। গৃহ ও আসবাব-পত্র হিউগোর অবস্থান সময়ে যে প্রকার ছিল হুবহু সেই ভাবেই রক্ষা করা হইয়াছে। উপরতলায় যে ক্ষুদ্র কক্ষটি রহিয়াছে, সেখানে হিউগোর লিখিবার ডেস্ক রাখা আছে। সেখান হইতে সেণ্টপিটার পোর্ট (কাসল করনেটের উপর) দেখা যায় আর তাহার পশ্চাতে চ্যানেলের অপর পারে ফ্রান্সের তীর কালো একটি রেখার মত দূরদিগন্তে নজরে

গারনসি'র হটেভিল হাউসের উপরতলার কক্ষ—যেখানে ভিক্টর হিউগো নির্ব্বাসনের কালে বসিয়া বসিয়া "লে মিজারেবল" রচনা করিয়াছিলেন

পড়ে। নীচে বহু প্রকোষ্ঠে—সকলই যথাযথভাবে সংরক্ষিত। এইখানে বাসকালেই হিউগো "লে মিজারেবল" "লা হোমে কুই রিৎ" এবং "টয়লারর্স অফ দি সী" রচনা করিয়াছিলেন।

সেণ্টপিটার পোর্টের ঐতিহাসিক আভিজাত্য আছে এইজন্য যে, উহা জলদস্যু এবং বে-আইনী মদ-বিক্রেতাদের আড্ডা ছিল এককালে। আর কোনও রাজারাজড়া গোপনে দেশত্যাগ বা দেশে পদার্পণকালে এই স্থানটিকেই বাছিয়া লইয়াছে।

কাসল করনেট এইজন্য বিখ্যাত যে রাজা প্রথম চার্লস মাত্র অল্প কয়জন সহচরসহ এই দুর্গ প্রায় নয় বৎসর রক্ষা করিয়াছিলেন—জল ও স্থল হইতে আক্রান্ত হইয়াও।

লক্ষ্ণৌয়ে বামন-ত্রিমূর্ত্তি

লক্ষ্ণৌ শহরে হঠাৎ তিনটি বামনের আবির্ভাব হইয়াছে। দুই ভগ্নী এবং এক ভাই। তাহাদের মিলিত বয়স ৯৩ বৎসর এবং একুনে দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি। বামন দৈবশক্তির প্রতীক বলিয়া সহস্র সহস্র নরনারী তাহাদের পূজা করিতেছে। উহারা পুরুষানুক্রমেই বামন। উহাদের পিতামহ বামন ছিল। উহাদের পিতাও বামন, সে এখনও জীবিত রহিয়াছে। যাহাতে তাহার সন্তান-সন্ততি বামন না হয় সেজন্য সে এক দীর্ঘকায় নারীকে (৬ ফুট হইবে) বিবাহ করে। কিন্তু তাহার তিনটি সন্তানই—উপরোক্ত দুই ভগ্নী ও এক ভ্রাতা—বংশধারা প্রাপ্ত হইয়া বামন হইয়াছে। হতাশায় মাতা তাহাদের মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অভাবের পীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা মাদ্রাজের অন্তর্গত তাহাদের জন্মস্থান হইতে তীর্থযাত্রায় বাহির হয়। কোনও তীর্থস্থানে উহাদের দেখিয়া তীর্থযাত্রীরা বামন-অবতার বলিয়া শ্রদ্ধায় পূজা করিতে আরম্ভ করে। তদবধি সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া পূজার্ঘ্য পাইয়া শান্তিতে জীবন-যাপন জন্য উহারা তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছে।

শিশুর ছয় মাস নিদ্রা

চিকাগো শহরের মেরি এলেন রিয়ারডন, বয়স দুই বৎসর, হাম রোগে আক্রান্ত হইবার পর ছয় মাসকাল একই অবচেতন-ভাবে নিদ্রিত থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়াছে, অন্যান্য সেবাশুশ্রূষাও চলিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার নিদ্রা-ভঙ্গ হয় নাই। সে কাঁদেও নাই, হাসেও নাই, কোন প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন করে নাই, শব্দ করে নাই, চোখ মেলিয়া চাহে নাই।

অবশেষে ছয় মাস পরে সে হঠাৎ এক দিন চোখ মেলে কিন্তু কিছুই যেন দেখিতে পায় না, এইরূপ মনে হয়। কারণ তাহার মাতার হাত তাহার চোখের সম্মুখে ঘুরাইলেও সে চোখে পলক ফেলে না, বা দেখিবার কোনও ভাব প্রকাশ করে না।

শিশুর মাতা বলে যে, তাহার মেয়েটি ক্রমশ উন্নতিলাভ করিতেছে। এখন তাহার অসাড় হস্ত-পদে বল আসিয়াছে, একটু একটু হাত-পা নড়াইতে পারে। সুতরাং চোখের দৃষ্টিও ফিরিয়া আসিবে।

পেনির পরিবর্ত্তে লবণ

ন্যায়েসাল্যাণ্ড (আফ্রিকা)-য়ের দেশীয় অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, কারণ তাহারা 'পেনি' পছন্দ করে না—কিছুতেই উহা গ্রহণ করিবে না। কোনও জিনিষ ক্রয়ের সময় কোনও মুদ্রার ফিরতি খুচরা লইবার সময় এক পেনি অথবা দুই পেনি তাহারা লইতে একেবারেই অসম্মত হয়। বরং উহার পরিবর্ত্তে লবণ অথবা এক খণ্ড সাবান গ্রহণ করাই তাহারা পছন্দ করে বেশী রকম। নিতান্তই লবণ বা সাবান পাইবার সুবিধা না হইলে তাহারা তবু অন্য কোনও পণ্য গ্রহণ করিবে, তথাপি পেনি গ্রহণে কোন অজুহাতেই তাহাদের রাজি করান যাইবে না।

এই কারণে ন্যায়েসাল্যাণ্ডের অর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট স্যার রবার্ট বেল-য়ের উপর ভার অর্পণ করিয়াছে।

দলাই লামাকে। অপরূপ তাহার সেই কাহিনী। ফেবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার সেই অলৌকিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিল :

এই দীর্ঘ ভ্রমণেও মুসিয়োর আকৃতির বড় বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই : শুধু প্রখর সূর্যতাপে তাহার কৈশোরের সেই শ্যামল মুখখানা আরও মলিন হইয়াছে এবং তাহার কোটর-প্রবিষ্ট নয়নদ্বয় আরও অধিক বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার মুখশ্রীর অসাধারণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে : পূর্বের চেয়ে তা আরও সংযত, প্রশান্ত রূপ ধারণ করিয়াছে। এমন কি যখন সে ব্যাঘ্রসঙ্কুল নিশীথ বনানীর বুকে তাহার সেই বিপদের কথা বলিতেছিল কিংবা রক্তপিপাসু প্রস্তরময়ী দেবীর প্রীত্যর্থে নরবলি দান করিবার জন্য কাপালিকেরা যে-সব নির্জন পথে অপেক্ষা করিত, সেই সব স্থানের বিবরণ দিবার সময়ও তাহার মুখে একবারও রেখা পড়ে নাই। তাহার কণ্ঠস্বরে ইদানীং একটা শান্ত, সংযত ভাব ধ্বনিত হইত। তাহার সমস্ত গতি-চ্ছন্দতায় আর ইটালীর সেই সরলতা ছিল না।

মালয়বাসী সেই লোকটি ছিল তাহার একান্ত বশম্বদ ভৃত্য। তাহারই সাহায্যে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে শিখিয়া আসা কতিপয় অদ্ভুত খেলা সে ফেবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়াকে দেখাইল। যেমন, প্রথমে সে পর্দার অন্তরালে লুকাইল, তারপর আবার যখন তাহাকে দেখা গেল তখন সে শূন্যমার্গে দুটি বংশদণ্ডের উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া পা মুড়িয়া বসিয়া আছে। দেখিয়া ফেবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়া বিস্মিত ও শঙ্কিত হইল।..."ও কি যাদুকর নাকি?" ভ্যালেরিয়া আপন মনে ভাবিল। কিন্তু পরে যখন মুসিয়োর বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা দেওয়া ঝাঁপি হইতে কালো ফণা দোলাইয়া জিভ মেলিয়া পোষা সাপগুলি বাহির হইয়া আসিল তখন ভ্যালেরিয়া ভীষণ ভয় পাইল এবং তাড়াতাড়ি ঐ সব হিংস্র জীবগুলিকে সরাইবার জন্য মুসিয়োকে অনুরোধ করিল।

নৈশ আহারের পর মুসিয়ো একটি দীর্ঘকণ্ঠ ফ্লাস্ক হইতে সিরাজী মদ ঢালিয়া তাহার বন্ধুদের পান করিতে দিল। ঈষৎ হরিতাভ সোনালী বর্ণের সেই ঘন সুরভিত সুরাসার তাহার পেয়ালায় ঢালিবার সময় অদ্ভুতভাবে ঝলমল করিয়া উঠিল। ইহার স্বাদ ইউরোপীয় মদের মত নহে : ইহা অধিকতর মিষ্ট এবং উগ্র, প্রত্যেক চুমুকে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একটা সুখতন্দ্রা অনুভূত হয়। ফেবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়া প্রত্যেকেই এক গ্লাস করিয়া মদ পান করিবার পর সে নিজেও এক গ্লাস পান করিল। ভ্যালেরিয়ার মদের গ্লাসের উপর মাথা নোয়াইয়া সে যেন আঙুল নাড়িয়া অস্ফুটে কি বলিল। ভ্যালেরিয়া ইহা লক্ষ্য করিল ; কিন্তু সেদিন মুসিয়োর সমস্ত কার্য-কলাপেই একটা অদ্ভুতত্ব এবং নূতনত্ব ছিল, তাই সে ভাবিল : "ও কি তবে ভারতবর্ষে গিয়ে কোন নূতন ধর্মমত গ্রহণ করেছে, না ও দেশের রীতিনীতিই এ রকম?" কিছুক্ষণ পরে সে মুসিয়োকে জিজ্ঞাসা করিল : "আচ্ছা, আপনি বোধ হয় এখনও সঙ্গীতচর্চা ত্যাগ করেন-নি?" মুসিয়ো প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া তাহার ভৃত্যকে ভারতবর্ষীয় বেহালাটি আনিতে বলিল। সেই যন্ত্রটি অনেকটা আধুনিক বেহালার মতই দেখিতে, কেবল ইহাতে একটি তার কম। ইহার উপরিভাগে সাপের নীলাভ খোলস জড়ানো এবং সরু ছড়ীর অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রান্তভাগে একটি তীক্ষ্ন উজ্জ্বল হীরক সংলগ্ন ছিল।

মুসিয়ো প্রথমে তাহার বেহালায় ঝঙ্কার তুলিল করুণ রাগিণীর। তাহার মতে ইহাই অতি প্রচলিত রাগিণী, কিন্তু ইটালীবাসীর নিকট ইহা অতি অদ্ভুত, এমন কি অনেকটা বন্য সুর। সেই ধাতুময় তারের ঝঙ্কার অত্যন্ত করুণ এবং ক্ষীণ-ভাবে বাজিতে লাগিল। কিন্তু মুসিয়োর শেষ-সঙ্গীতে অকস্মাৎ সেই সুরের মাঝেই কোথা হইতে যেন আসিল কাঠিন্য, আসিল তীব্র অনুরণন। বেহালার শীর্ষ দেশে জড়িত সর্পের মত যন্ত্রের অন্তরদেশ হইতে নির্গত হইল অপূর্ব এক ঝঙ্কার। সেই রাগিণীর প্রতিটি মূর্চ্ছনায় ছিল তীব্র বহ্নিজ্বালা এবং জয়ের উল্লাস। সেই তীব্র আলোর প্রজ্বলিত শিখা নিরীক্ষণ করিয়া ফেবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়া উভয়েই শিহরিয়া উঠিল, তাহাদের নয়নাশ্রু সজল হইল ...এদিকে মুসিয়ো তাহার নত-মস্তক বেহালার সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ রাখিয়া একমনে বাজাইয়া যাইতেছিল। তাহার কপোল বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ভ্রূযুগল আসিয়া সমরেখায় ঠেকিল এবং তাহার গাম্ভীর্য এবং একাগ্রতা আরও বৃদ্ধি পাইল। যন্ত্রে সংযুক্ত সেই হীরকখণ্ড হইতে এক অদ্ভুত দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল যেন রাগিণীর দীপ্তি তাহাকেও উদ্ভাসিত করিয়াছে। অবশেষে মুসিয়ো থামিল এবং তড়িদ্গতিতে আপন স্কন্ধ বেহালা হইতে টানিয়া লইতেই— ফেবিয়ো চীৎকার করিয়া উঠিল : "একি? এ কোন রাগিণী তুমি আমাদের শোনালে।" বিস্ময়াবিষ্ট ভ্যালেরিয়ার সমস্ত মনপ্রাণ এই প্রশ্নেরই প্রতিধ্বনি তুলিল। মুসিয়ো টেবিলের উপর বেহালাটি রাখিয়া দিল তারপর কপালে আসিয়া-পড়া চুল পেছনে ঠেলিয়া দিয়া একটু স্মিতহাস্য করিয়া বলিল : "এটা? এ রাগিণী ...এ সঙ্গীত আমি শুধুমাত্র একবার শুনেছিলাম সিংহলে। তাদের মতে এ হচ্ছে সুখী ও বিজয়ী প্রেমের আনন্দ-সঙ্গীত।"

"আবার বাজাও," ফেবিয়ো অস্ফুটে কহিল।

"না এর পুনরাবৃত্তি করা সম্ভবপর নয়," মুসিয়ো জবাব দিল। "তাছাড়া রাতও কম হয়নি। এখন মিসেস ভ্যালেরিয়ার বিশ্রাম প্রয়োজন। আমারও বিশ্রাম দরকার...আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

আমরা আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সহিত যেমন ব্যবহার করি তেমনি সহজ সরলভাবেই মুসিয়ো ভ্যালেরিয়ার সহিত মেলামেশা করিল। সারাদিনে সেই ব্যবহারের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু এখন বিদায়ের সময় সে ভ্যালেরিয়ার করতল আপনার অঙ্গুলি দ্বারা নির্দয়, কঠিনভাবে চাপিয়া ধরিল। যে তীক্ষ্ন দৃষ্টি মুসিয়ো ভ্যালেরিয়ার দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহা সে তাহার অক্ষি-পল্লব না তুলিয়াই সেই দৃষ্টির প্রভাব আপনার আরক্তিম গণ্ডস্থলে অনুভব করিতেছিল নীরবে ভ্যালেরিয়া আপনার কর মুক্ত করিয়া লইল। পরে যে পথে মুসিয়ো নিষ্ক্রান্ত হইল সেই দ্বারপথে একবার দৃষ্টিপাত করিল। গতদিনে সে যে মুসিয়োকে ভয় করিত সে কথা আবার তাহার মনে পড়িল...তাহার আজিকার ব্যবহারে সে আরও আতঙ্কিত হইল। মুসিয়ো আপনার গৃহে চলিয়া গেল : স্বামী-স্ত্রীও স্ব স্ব শয়নকক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল।

—চার—

ভ্যালেরিয়া শয্যাগ্রহণ করিল কিন্তু তাহার নিদ্রা আসিল না। তাহার শোণিতধারা যেন অতি মৃদু এবং শিথিল গতিতে প্রবাহিত হইতেছে, মস্তিষ্কে যেন কিসের ক্ষীণ নিক্কণ শোনা যাইতেছে...ভ্যালেরিয়ার মনে হইল, হয়ত ইহা সেই অপরূপ সুরারই প্রতিক্রিয়া অথবা হয়ত বা মুসিয়ো বর্ণিত সেই সব বিচিত্র গল্প শুনিবার কিংবা বেহালা শুনিবার ফল।...ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে সে ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িল। রাতে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল:

তাহার মনে হইল যেন সে একটি নীচু আর্চ্চকরা ছাদওয়ালা প্রশস্ত গৃহের কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।.....কিন্তু এ ধরণের কক্ষ সে জীবনে কোন দিন দেখে নাই। সেই কক্ষের সারা দেওয়ালে সোনালী রঙ মাখান ক্ষুদ্রাকৃতি নীলবর্ণের টালি লাগান। মার্ব্বেল নির্ম্মিত আর্চ্চগুলি আলাবেষ্টার দ্বারা তৈরি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত ছিল। স্তম্ভগুলিকে অনেকটা স্বচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছিল।...চারিদিক হইতে একটা ম্লান গোলাপী বর্ণের আলো কক্ষের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহাতেই সব কিছু রহস্যময় এবং এক রঙা দেখা যাইতেছিল। দর্পণের মত মসৃণ গৃহতলে একটি ক্ষুদ্র কম্বল বিস্তৃত ছিল এবং ঐ কম্বলের উপর সোনার জরীর কাজ-করা সিল্কের উপাধান পড়িয়াছিল। কক্ষের অদৃশ্যপ্রায় কোণগুলিতে বিশালকায় বন্যজন্তুর আকৃতির ধূপদানী হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। কক্ষে কোন বাতায়ন ছিল না, অন্ধকারাচ্ছন্ন দেওয়ালের গায়ে সংস্থাপিত দ্বারে মখমলের পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। সহসা সেই পর্দ্দা অতি ধীরে একপার্শ্বে সরিয়া গেল...মুসিয়ো আসিয়া ঘরে ঢুকিল। একবার মাথা নোয়াইয়া সে আপনার বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া দিল...তারপর ধীরে ধীরে তাহার সেই রুক্ষ বাহুদ্বয় ভ্যালেরিয়ার কটিদেশ বেষ্টন করিল, মুসিয়োর উত্তপ্ত ওষ্ঠের স্পর্শে তাহার শরীরে জ্বালা ধরিয়া গেল।...ভ্যালেরিয়া উপাধানের উপর পড়িয়া গেল।...

* * *

আতঙ্কে ভ্যালেরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার ভীতিবিহ্বল ভাব কাটিতে অনেক সময় লাগিল। সে কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছে তাহা অনুধাবন করিতে না পারিয়া শয্যা হইতে অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।...তাহার সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলিয়া গেল।...ফেবিয়ো তাহার পার্শ্বেই শায়িত ছিল। সে তখনও সুপ্তিমগ্ন। চন্দ্রালোকে তাহার মুখশ্রী মৃতের মুখের মত বিবর্ণ দেখাইতেছিল...তাহা যেন মৃতের মুখের চেয়েও বেশী বিষাদ মলিন। ভ্যালেরিয়া তাহার স্বামীকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। ভ্যালেরিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ফেবিয়ো জিজ্ঞাসা করিল: "ব্যাপার কি?"

"আমি...আমি একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি—" সে অস্ফুটে কহিল। তাহার সমস্ত দেহ তখনও কাঁপিতেছিল।...

ঠিক এই সময় মুসিয়োর গৃহপ্রান্ত হইতে একটি উগ্র সুর ভাসিয়া আসিল—সেই সুরধ্বনি শুনিয়া ফেবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়া উভয়েই উপলব্ধি করিল যে, মুসিয়ো আপন বেহালায় ঝঙ্কার তুলিয়াছে—সেই বিজয়ী প্রেমের আনন্দ-সঙ্গীতের।—ফেবিয়ো বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া ভ্যালেরিয়ার দিকে চাহিল। ভ্যালেরিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ঘুরিয়া বসিল। রুদ্ধ নিশ্বাসে দুইজনেই সেই সঙ্গীত ধারার শেষ পর্য্যন্ত শুনিল। সুরের শেষ রেশটি মিলাইবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রও মেঘের অন্তরালে ঢাকা পড়িল। কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল।...নিঃশব্দে আবার উভয়ে উপাধানে মস্তক রাখিয়া শুইয়া পড়িল। একে অপরের অজ্ঞাতসারে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

—পাঁচ—

পরদিন মুসিয়ো যথাসময়ে প্রাতরাশে যোগদান করিল। তাহাকে খুব প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আসিয়াই সে সস্মিত-মুখে ভ্যালেরিয়াকে সাদর-সম্ভাষণ জানাইল। ভ্যালেরিয়া কেমন যেন জড়াইয়া জড়াইয়া ইহার জবাব দিল। কিন্তু মুসিয়োর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিল। তাহার উচ্ছ্বাস, আনন্দোজ্জ্বল মুখ, মর্ম্মভেদী কৌতূহলী দৃষ্টি দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। খানিকপর মুসিয়ো গল্প বলিতে আরম্ভ করিতেই ফেবিয়ো তাহাকে বাধা দিল।

"কাল রাতে তোমার ভাল ঘুম হয়নি বুঝি? তাই তুমি সেই গানটি বাজিয়েছিলে—না? আমরা দুজনেই কিন্তু তা শুনতে পেয়েছি।"

"তোমরা শুনেছিলে তা?" মুসিয়ো জবাব দিল, "সত্যি, আমি সে গানটি বাজিয়েছিলাম। অবশ্য তার আগেই আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি কাল রাতে।"

ভ্যালেরিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল।—"কি স্বপ্ন দেখেছিলে হে?" ফেবিয়ো প্রশ্ন করিল।

"মনে হল," ভ্যালেরিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মুসিয়ো জবাব দিল, "আমি যেন প্রাচ্যধরণে চিত্রিত আর্চ্চ করা ছাদওয়ালা একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করেছি। ঘরের ভিতর ছিল কারুকার্য্যমণ্ডিত কতিপয় স্তম্ভ। জানালা বা প্রদীপ যদিও সেখানে ছিল না তথাপি সমস্ত ঘর একটা গোলাপী আভায় আলোকিত হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল যে, সমস্ত ঘরটাই বুঝি স্বচ্ছ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ঘরের কোণে স্থাপিত চীনে-ধূপদানীগুলি হতে অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। মেঝেতে একটা ছোট্ট কম্বলের ওপর রেশমের ঝালর দেওয়া কতকগুলি উপাধান পড়েছিল। আমি পর্দ্দা ঝোলান দ্বারপথে কক্ষে প্রবেশ করলাম। ঠিক বিপরীত পথে প্রবেশ করল এক নারী যাকে আমি এক সময় ভালবাসতাম। তার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমাদের বিগতদিনের প্রণয়-স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলল,—আমি..."

মুসিয়ো থামিয়া গেল। আবার এইভাবে থামিবার মধ্যে যেন কিসের ইঙ্গিত ছিল। ভ্যালেরিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। শুধু তার মুখশ্রী পাণ্ডুরতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

"তারপর, অকস্মাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি বসে বসে ঐ গানটি বাজাতে লাগলাম।"

"কে সেই নারী?" ফেবিয়ো জিজ্ঞাসা করিল।

"সে? সে হচ্ছে জনৈক ভারতবাসীর স্ত্রী। দিল্লীতে ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।...সে আজ আর এ জগতে নেই... মরে গেছে।"

...স্বামীর কি হয়েছে?" আপনার অজ্ঞাতেই ফেবিয়ো প্রশ্ন করিল।

"শোনা যায় তারও নাকি মৃত্যু হয়েছে। এদের সঙ্গে পরে আর আমার দেখা হয়নি।"

"আশ্চর্য্য ত!" ফেবিয়ো মন্তব্য করিল। "আমার স্ত্রীও কাল রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল। অবশ্য ও-তা আমার কাছে এখনও বলেনি।"

ঠিক সেই সময় ভ্যালেরিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল। প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া মুসিয়োও চলিয়া গেল। কারণ জরুরী কাজে তাহাকে শহরে যাইতেই হইবে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর সে ফিরিতে পারিবে না।

—ছয়—

মুসিয়োর প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে ফেবিয়ো তাহার পত্নীর একখানা আলেখ্য অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতে সাধ্বী সিসিলিয়ার সমস্ত গুণাবলী ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিল। চিত্রশিল্পী-রূপে সে তখন বেশ নাম করিয়াছে। লিয়োনার্ডো দা ভিন্সির ছাত্র বিখ্যাত শিল্পী লুইগি একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ফেরারাতে আসিয়াছিল। সেই সময় সে ফেবিয়োকে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে যথাসম্ভব উপদেশ দিয়া গিয়াছিল। আলেখ্যটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, মুখের দু'এক-স্থানে আর একবার তুলির টান দিলেই হইয়া যাইবে। তাহা হইলেই আপনার কৃতিত্বের গর্ব্ব সে করিতে পারিবে।

মুসিয়ো শহরে চলিয়া যাইতেই ফেবিয়ো স্টুডিয়োতে গিয়া প্রবেশ করিল। ভ্যালেরিয়ার সেখানে অপেক্ষা করিবার কথা। কিন্তু সে সেখানে ছিল না। ডাকিয়াও তাহার কোন সাড়া সে পাইল না। একটা প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ তাহাকে পাইয়া বসিল; তাহার খোঁজে সে বাহির হইয়া পড়িল। গৃহে তাহাকে পাওয়া গেল না। ফেবিয়ো ছুটিয়া বাগানে গেল—সেখানে জনশূন্য এক সংকীর্ণ পথের মাঝে দেখা পাইল ভ্যালেরিয়ার। হাঁটুর উপর অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত রাখিয়া নতমস্তকে সে একটি বেঞ্চের উপর বসিয়াছিল। আর তাহার পশ্চাতে দেবদারুর নিবিড় অন্ধকারে এক অর্দ্ধমনুষ্য, অর্দ্ধছাগ এবং নশৃঙ্গ বন-দেবতার প্রস্তর-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। সমস্ত আননে তাহার ঈর্ষার একটা কুটিল হাসি। স্বামীকে দেখিয়া ভ্যালেরিয়া দৃশ্যত প্রফুল্ল হইল এবং তাহার উৎকণ্ঠা ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবে জানাইল যে, বিনা কারণেই অকস্মাৎ তাহার একটু মাথা ধরিয়াছিল তাই সে এখানে আসিয়া বসিয়াছে। এখন তাহা সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে এবং স্টুডিয়োতে যাইতে সে প্রস্তুত আছে। স্টুডিয়োতে আসিয়া ভ্যালেরিয়া বসিবার পর ফেবিয়ো তুলি হাতে নিল, কিন্তু আঁচড় কাটিতে পারিল না। সে যাহা চায় সেই ভাব আজ আর ভ্যালেরিয়ার আননে ছিল না। সে একটু বিরক্ত হইল। শুধু যে ভ্যালেরিয়ার মুখমণ্ডল ক্লান্ত ও পাণ্ডুর দেখাইতেছিল তাহা নহে...হ্যাঁ তাহা নহে। সেদিন ভ্যালেরিয়ার মুখশ্রীতে ছিল না একটা অনাবিল শুচিশুদ্ধ-ভাবদ্যোতনা, যা সে ভালবাসিত; যে ভাব-দ্যোতনা তাহাকে প্ররোচিত করিয়াছিল সেণ্ট্ সিসিলিয়ার আদর্শে ভ্যালেরিয়ার চিত্র অঙ্কিত করিতে। হতাশ হইয়া ফেবিয়ো তুলি রাখিয়া দিল এবং ভ্যালেরিয়ার শারীরিক অবস্থার জন্য তাহাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইবার উপদেশ দিল। চিত্রপটটি ঘুরাইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া রাখিল। আপনার বিশ্রামের কথা ভ্যালেরিয়াও স্বীকার করিল। মাথা ধরার কথা বলিয়া শয়ন-কক্ষ অভিমুখে চলিয়া গেল।

ফেবিয়ো স্টুডিয়োতেই বসিয়া রহিল। আপনার অন্তরে একটা বিচিত্র আলোড়ন সে উপলব্ধি করিল, যা তাহার নিজের নিকটও সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য। তাহারই বাড়ীতে মুসিয়োর এই অচির-প্রবাস, যার জন্য সে নিজেই দায়ী, তাহাকে অত্যন্ত ঝঞ্ঝাটে ফেলিল। ঈর্ষা হইতে যে এই ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাও নহে...ভ্যালেরিয়ার চরিত্রে কি সন্দেহ করা যায়?—কিন্তু মুসিয়োর ভিতর তাহার সেই অতি পরিচিত বন্ধুটিকেও খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যে-সব বিজাতীয়, অদ্ভুত এবং অভিনব চাল-চলন এবং ভাবধারা মুসিয়ো দূর দেশ হইতে লইয়া আসিয়াছিল এবং যাহা তাহার অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল—এবং তাহার সেই সব যাদুবিদ্যা, গান, বিচিত্র পানীয়, ঐ মূক মালয়-ভৃত্য এমন কি মুসিয়োর পরিচ্ছদ, কেশ এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের তীব্র কটুগন্ধ ফেবিয়োর মনে অনেকটা অবিশ্বাসের—হয়ত তার চেয়েও বেশী একটা শঙ্কার ভাব উদ্রেক করিতেছিল। আচ্ছা, ঐ মালয়-ভৃত্যটা টেবিলে আহার্য্য পরিবেশন করিবার সময় ফেবিয়োর দিকে অমন অসভ্যের মত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে কেন? দেখিলে মনে হয় সে ইটালীয় ভাষা বোঝে। মালয়বাসী এই ভৃত্যটির প্রসঙ্গে মুসিয়ো বলিয়াছিল যে, সে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনার রসনা বিসর্জ্জন দিয়া আজ প্রভূত শক্তির অধিকারী হইয়াছে। কি সে শক্তি? রসনার বিনিময়ে কি করিয়াই বা সে তাহা লাভ করিল? বড়ই অদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যাপার!

ফেবিয়ো তাহার পত্নীর শয়নকক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। ভ্যালেরিয়া পোষাক পরিয়াই বিছানায় শুইয়াছিল, কিন্তু ঘুমায় নাই। তাহার পদশব্দে সে চমকিয়া উঠিল কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে তাহার মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ফেবিয়ো শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ভ্যালেরিয়ার কর ধারণ করিল। ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল রাতে স্বপ্ন দেখে তুমি চমকে উঠেছিলে। আমায় সেই স্বপ্নের কথা বল না ভ্যালেরিয়া। সে কি মুসিয়োর স্বপ্নেরই মত?"

লজ্জায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "আরে, না, না! আমি দেখেছিলুম......এই একটা বিকটাকার জন্তু যেন আমাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ছিঁড়ে ফেলতে আস্‌ছে।"

"সে জন্তুটা দেখতে বোধ হয় অনেকটা মানুষের মত?"

"না, ও একটা বন্য জন্তু তুমি যা ভাব্‌ছ তা নয়।" বলিয়াই সে উপাধানে আপনার রক্তিম আনন লুকাইয়া ফেলিল। ফেবিয়ো আরও কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে পত্নীর কর আপনার ওষ্ঠে স্পর্শ করাইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সমস্ত দিনটা কাটিল একটা বিষাদাচ্ছন্ন মলিনতার ভিতর দিয়া। মনে হইতেছিল, তাহাদের মাথার উপর কি

যেন একটা ঝুলিতেছে......কিন্তু তাহা যে সঠিক কি, সেকথা কেহই বলিতে পারে না। কোন এক আসন্ন বিপদ যেন তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহারা চায় মিলন অথচ পথ তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। ফেবিয়ো একবার ছবি আঁকিতে বসিল, কিন্তু ভাল না লাগায় ফেরারার বিখ্যাত আধুনিক কবি এরিওষ্টোর কবিতা পড়িতে লাগিল, কিন্তু তাহাও যেন ভাল লাগিল না।......সান্ধ্য-ভোজনের সময় মুসিয়ো ফিরিয়া আসিল।

—সাত—

মুসিয়োকে অত্যন্ত শান্ত ও সমাহিত মনে হইল। কিছুক্ষণ গল্প চলিল, বিশেষ করিয়া তাহাদের শৈশবের বিস্মৃত দিনগুলির গল্প। কিছু কিছু রাজনৈতিক আলোচনাও হইল। রোমে গিয়া পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা যে তাহার আছে সেকথাও ফেবিয়োকে জানাইল। পরিশেষে ভ্যালেরিয়াকে সিরাজী মদ্য পান করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু সে তাহা পান করিতে অসম্মতি জানাইলে সে আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "এখন আর দরকার নেই।"

ফেবিয়ো শয্যাগ্রহণ করিয়া অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িল... একঘণ্টা পর নিদ্রাভঙ্গ হইতেই তাহার মনে হইল শয্যার অপরাংশ শূন্য পড়িয়া আছে; ভ্যালেরিয়া বিছানায় নাই। সে ঝটিতি উঠিয়া পড়িল, ঠিক সেই সময় ভ্যালেরিয়া নৈশ-পরিচ্ছদেই বাগান হইতে ঘরে ঢুকিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দ্দিক পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। উন্মীলিত নয়নে এবং শান্ত মুখাবয়বে একটা প্রচ্ছন্ন সন্ত্রাস-ভাব লইয়া ভ্যালেরিয়া বিছানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাহু মেলিয়া সে হাতড়াইতে হাতড়াইতে বিছানায় উঠিয়াই নিঃশব্দে শয়ন করিল। ফেবিয়ো প্রশ্ন করিয়াও কোন জবাব পাইল না। মনে হইল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ফেবিয়ো তাহাকে স্পর্শ করিয়াই উপলব্ধি করিল যে, ভ্যালেরিয়ার পরিধেয় বস্ত্র ও কেশগুচ্ছে সিক্ত এবং তাহার পদতলে তখনও বালি লাগিয়া রহিয়াছে। একলম্ফে শয্যাত্যাগ করিয়া ফেবিয়ো অর্দ্ধ-উন্মুক্ত দ্বারপথে বাগানে ছুটিয়া গেল। জ্যোৎস্নাধারায় তখন সমস্ত চরাচর যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে। ফেবিয়ো বালুকাময় পথে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার দৃষ্টিগোচর হইল দুইজোড়া পদচিহ্ন। ইহার মধ্যে একজোড়া আবার নগ্নপদের। সেই বালুকাময় পথটি যুঁই-বেলি আচ্ছাদিত লতাগুল্মে গিয়া শেষ হইয়াছিল। এই লতাগুল্মটি তাহাদের এবং মুসিয়োর ঘরের সন্নিকটে অবস্থিত। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ফেবিয়ো অকস্মাৎ থামিয়া গেল। একি! গত রাত্রের সেই সঙ্গীত-ঝঙ্কার আবার উঠিয়াছে। ফেবিয়ো শিহরিয়া উঠিল এবং চকিতে মুসিয়োর গৃহের নিকট উপস্থিত হইল। ......মুসিয়ো ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাহার বেহালা বাজাইতেছে। ফেবিয়ো তাহাকে সবেগে ধাক্কা দিল।

"তুমি বাগানে গিয়েছিলে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই গিয়েছিলে, ঐ যে তোমার কাপড়-চোপড় এখনও ভিজা রয়েছে।"

"না,......সেকথা আমি বলতে পারি না......বোধ হয় ......বোধ হয়, আমি বাইরে যাইনি......" স্খলিতকণ্ঠে মুসিয়ো জবাব দিল। ফেবিয়োর এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া এবং তাহাকে এমনি হঠাৎ প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুসিয়ো বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

ফেবিয়ো কঠিনভাবে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। "আবার তুমি ও গান বাজাচ্ছ কেন? আজও বুঝি তুমি আবার স্বপ্ন দেখেছ?"

মুসিয়ো ঠিক পূর্ব্বের মত বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তুলিয়া ফেবিয়োর দিকে তাকাইল, কিন্তু কোন জবাব দিল না।

"আমার কথার জবাব দেও!"

"চক্রাকার থালের মত আকাশে চাঁদ চকচক করছে....
সাপের মত নদী ঝকঝক করছে......
বন্ধুরা জেগে উঠেছে, শত্রুরা ঘুমিয়েছে—
বাজপাখীর থাবায় আটক পড়েছে মোরগছানা......
তোমরা তাকে বাঁচাও!"

মুসিয়ো অস্ফুটে একটানা বলিয়া গেল, যেন সে বাহ্য-চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ফেবিয়ো কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া মুসিয়োর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। কিছুক্ষণ কি ভাবিল......তাহার পর নিজ গৃহে ফিরিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

ভ্যালেরিয়া তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। তাহার মস্তকটি স্কন্ধের দিকে বাঁকিয়া রহিয়াছে, হস্তদ্বয় দুই পার্শ্বে অসহায়ভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অনেক চেষ্টার পর ভ্যালেরিয়ার ঘুম ভাঙ্গিল.....জাগিয়া সে ফেবিয়োকে দেখিয়াই তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

তাহাকে শান্ত করিবার জন্য ফেবিয়ো সান্ত্বনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কি হয়েছে তোমার? কোথায় তোমার বেদনা?"

মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় সে তেমনি ফেবিয়োর বুকে পড়িয়া রহিল। ক্ষণপরে ফেবিয়োর বুকে মুখ লুকাইয়া অস্ফুটে কহিল, "উঃ কি একটা ভীষণ স্বপ্ন আমি দেখেছি!"

ফেবিয়ো প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইতেই ভ্যালেরিয়া শিহরিয়া উঠিল।......উষার প্রথমালোক পড়িয়া জানালার শার্শীগুলি রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। ভ্যালেরিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর বাহুবন্ধনের মাঝে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

জোড়া-মহিষের দৌড়

ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজের (মলয় দ্বীপপুঞ্জের) মাদুরা দ্বীপে বাৎসরিক মহিষের দৌড় প্রতিযোগিতা একটি অতি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের অঙ্গ। দুই প্রকার প্রতিযোগিতায়ই পুরস্কার দেওয়ার প্রথা আছে। অতি বলিষ্ঠ ও সুশ্রী বলিয়া যে ষাঁড় জোড়া নির্ণীত হয়, তাহার জন্য পুরস্কার এবং প্রত্যেক গ্রাম হইতে প্রেরিত জোড়া জোড়া মহিষের দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভের জন্য বিশেষ পুরস্কার। প্রতি-যোগিতায় যোগদানের জন্য প্রতি গ্রামেই ষাঁড় এবং মহিষ পোষা হয় এবং সমগ্র বৎসর ধরিয়া সকল তোড়-জোড় চলে। গ্রামবাসীরা এ প্রতিযোগিতার জয়লাভের উপর সারা গ্রামের গৌরব নির্ভর করে বলিয়া মনে করে। মাদুরাবাসী মলয়-জাতিরই শাখাবিশেষ। ইহারা গুরখাদের ভোজালীর ন্যায় কথায় কথায় ক্রিস্ (কিরিস—তলোয়ার) ব্যবহার করিয়া বসে। জাত্যাভিমানের গর্ব্ব তাহাদের অশেষ এবং সামান্য একটু দুর্ব্বিনীত ব্যবহারও বরদাস্ত করে না।

মাদুরা দ্বীপের পশ্চিমে হইল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যবদ্বীপ আর দক্ষিণ-পূর্ব্বে হইল বলি। সমগ্র মলয় দ্বীপপুঞ্জের ভিতর বলিবাসীই হইল সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য এবং শিল্পে অদ্বিতীয়।

এই বাৎসরিক ব্যাপক প্রতিযোগিতায় ওলন্দাজ কর্ত্তৃ-পক্ষেরও উৎসাহ কম নয়। বস্তুত তাহারাই এই প্রতিযোগ-তার সকল নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এই প্রকার জোড়া মহিষের দৌড় যে শুষ্ক ভূমিতেই শুধু পরিচালিত করা হয় এমন নয়। কর্দ্দমময় ও সিক্ত ভূমির উপরও দৌড়ের ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের দাবী প্রতিযোগিতায় সজ্জিত জোড়া-মহিষ—গ্রামবাসীরাও আকুল অন্তরে নিজ নিজ গ্রামের যুগ্ম-প্রতিদ্বন্দ্বীর পার্শ্বে প্রতীক্ষা করে—তাহাদের সমগ্র বৎসরের কঠোর শ্রম সার্থক হইবে কি-না—তাহাদের জোড়া-মহিষ পুরস্কৃত হইবে কি-না

বলা বাহুল্য মহিষগুলি অতিশয় জলপ্রিয় বলিয়া এই প্রকার দৌড়ে জানোয়ারগুলির উৎসাহ উত্তেজনাও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের এই বীরত্বসূচক কার্য্যের গুরুত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে যেন উহারা প্রকৃতই অবহিত।

প্রথমত শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতার জন্য যে সকল ষাঁড় জোড়ায় জোড়ায় প্রদর্শিত হয়, উহাদের নানাপ্রকার সাজ-সজ্জা, শিরস্ত্রাণ, মালা প্রভৃতি অলংকার এবং শৃঙ্গাদির বিচিত্র শোভাবর্দ্ধক আভরণ—এক মহা আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্যের অব-তারণা করে। জানোয়ারগুলির অদ্ভুত সাজ-সজ্জা এবং সমগ্র দ্বীপবাসী নর-নারীর উল্লাস দৃশ্যটিকে আরও বিচিত্র করিয়া তোলে। সারা বৎসরের ভিতর এই এক উৎসব—যাহাতে সকল গ্রামেরই নর-নারী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমানভাবে যোগদান করিতে সুযোগ পায়।

দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যাহাতে বিজয়লাভ করিতে পারা যায় সেই জন্য প্রত্যেক গ্রামেই বন্য মহিষ ধরিয়া আনিয়া পোষ মানান হয় এবং নানাপ্রকারে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা হয়। গ্রামবাসীদের উৎসাহ শুধু মহিষের শিক্ষাদানেই নিঃশেষিত হয় না—তাহারা ঘরে ঘরে সারা বৎসর ব্যাপিয়া উহাদের সাজ-গোজের জিনিষগুলি নিপুণ কারিগরির সহিত নিজ হাতে গড়িতে থাকে। এই ব্যাপারে তাহাদের যে বিপুল উদ্যম তাহার পশ্চাতে অবশ্য উহাদের যুগ-যুগাগত সংস্কার। কিন্তু ইহাতে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষেরও যথেষ্ট সাহায্য রহিয়াছে, কারণ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক গ্রাম হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের এক অংশ এই প্রতিযোগিতার জন্য মহিষ সংগ্রহ ও পালনের ব্যয়স্বরূপ

নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন। এবং গবর্ণমেণ্টের এই মোটারকম সাহায্য পায় বলিয়াই গরীব গ্রামবাসীদের পক্ষে মহিষ-দৌড়ের প্রতিযোগিতায় গ্রামের তরফ হইতে যোগদান করা সম্ভব হয়।

মহিষ বা ষাঁড়ের দৌড়ের এই প্রতিযোগিতা বৎসরের ভিতর এই দ্বীপবাসীদের জীবনে সর্ব্বপ্রধান খেলা-ধূলার অনুষ্ঠান।

দৌড়ের জন্য যখন জোড়ায় জোড়ায় মহিষগুলিকে গ্রাম হইতে শোভাযাত্রা করিয়া বাহির করা হয়, তখন উহাদের সকল আভরণই অঙ্গে থাকে। আরও বিশেষত্ব এই যে উহাদিগকে লাঙ্গলের জোয়ালের ন্যায় একটি কাষ্ঠ-রথে জুতিয়া দেওয়া হয়। লাঙ্গলের মত ঐ রথের যে হেলান অংশ, তাহাতে থাকে চালকের দাঁড়াইবার ও ঠেস দিবার ব্যবস্থা।

প্রতিযোগিতার দৌড়ের সময় কিন্তু মহিষ বা ষাঁড়গুলির সকল আভরণ খুলিয়া লওয়া হয়। কারণ ঐ সকল গুরুভার সাজ-সজ্জা পরিহিত থাকিলে জানোয়ারগুলি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক দ্রুত দৌড়ের ক্ষমতা রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই জন্যই উহাদের ক্ষিপ্রকারিতা অটুট রাখিবার জন্য যতদূর সম্ভব গুরু ওজনের আভরণ পরিত্যক্ত হয়। দৌড়ের আরম্ভ হইতেই জানোয়ারগুলি অবশ্য দ্রুত দৌড়িতে সুরু করে। কিন্তু সময়ে হাঁপ ছাড়িবার জন্য উহাদের গতিবেগ হ্রাস হইয়া আসে। তখন চালককে নানা অঙ্গভঙ্গি করিয়া, চীৎকার করিয়া মহিষগুলিকে উৎসাহিত করিতে হয়। আবার দর্শকগণের তরফ হইতে যখন বিকট চীৎকার দ্বারা নিজ নিজ গ্রামের প্রতিযোগী জোড়া-মহিষকে প্রেরণা দানের চেষ্টা হয়, সেই সময় শিক্ষিত জানোয়ারগুলি তাহাদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষকগণের সদিচ্ছা যেন ইঙ্গিতেই বুঝিতে পারে এবং তাহাতে অগোণে সাড়া দিয়া দ্বিগুণ উল্লাসে দ্রুততর গতিতে আগাইয়া যাইতে থাকে। প্রতিযোগিতার উল্লাসে ঘোড়দৌড়ের বেলা যেমন চালক ও অশ্ব একপ্রাণ হইয়া বিজয়লাভের প্রয়াসে প্রবৃত্ত হয়, হুবহু তেমনি এই আশ্চর্য্য রথচালক ও তাহার বাহনদ্বয়ও যেন সম্মিলিত চেষ্টায় দিগ্বিজয়ীর গৌরব লাভ করিতে চায়। চালকের সে সময়ে খেয়াল থাকে না কোথায় রহিল তাহার পা, কোথায় রহিল আশ্রয়-কাষ্ঠ—উত্তেজনায় আপনহারা সে শুধু বাহনদ্বয়কে ক্ষিপ্রগতিতে চালিত করিতে ব্যাপৃত থাকে। কাজেই দিক্‌বিদারী হল্লা-হুল্লোড় আর আকাশব্যাপী ধূলির ঝিলমিলির ভিতর দিয়া এই জমকাল দৌড়ের প্রতিযোগিতা শেষ হয়। গ্রামবাসী যেন শ্রান্ত অবসন্ন দেহে নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যায়। আর কল্পনায় পরবর্ত্তী বৎসরের প্রতিযোগিতার রঙিন স্বপ্ন-বিলাসে মগ্ন হয়।

দৌড়ে প্রবৃত্ত হইবার সময় আর মহিষ জোড়ার আভরণাদি অঙ্গে থাকে না—চালককে দেখা যাইতেছে দুই হাত তুলিয়া পা শূন্যে ঝুলাইয়া কেবলই বাহনদ্বয়কে উৎসাহিত করিতেছে গতি ক্ষিপ্রতর করিবার জন্য

মহাবুভুক্ষা

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(জোহন বয়ার প্রণীত—এট ছাঙ্গার)

অনুবাদকদ্বয়—জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী
শিশিরচন্দ্র সেনগুপ্ত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইংলিস টুইডের এজেণ্ট হের ইউথাও জুনিয়র জুলাই মাসের এক আতপ্ত দিনে ট্রেন থেকে নামল—তারপর প্লাটফর্ম্মে নেমে চারিদিক একবার দেখে নিলে। চমৎকার দৃশ্য—এই সুন্দর উপত্যকায় তার ভগ্নী বাস করছে অনেক-দিন ধরে—এক বৎসরেরও বেশী। নির্ম্মল বাতাস, কিন্তু এতে কি তার বোনের স্বামীর কিছু উপকার হচ্ছে? 'দেখা যাক'—বলে নিখুঁত সজ্জায় এই যুবকটি রোণ্টাডের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল—মাঝে মাঝে পথ জেনে নিয়ে সে তাদের আশ্চর্য্য করে দিতে চায়। রাইংবের বাড়ীতে একটা সাংসারিক বিতর্কে এই হতভাগা স্বামী-স্ত্রীর বিষয় আলোচনা হয়েছিল—তাতে কোনও একটা বন্দোবস্ত করার কথা ঠিক হয়েছে।

এই ভদ্রলোক গোলাবাড়ীর মোড় বেঁকে হঠাৎ একটা লোককে দেখতে পেল—লোকটার গায়ে একটা সার্ট—সে একটা বাক্সে অনেক পাথর জমা করে একটা একটা করে ছুড়ছে? কে? তার কি ভুল হচ্ছে? না এই ত সেই পীয়ার হোলম—পাথর ভর্ত্তি করছে আর ছুড়ে দিচ্ছে—এর ভাব দেখে মনে হয় যেন প্রতিপদক্ষেপের জন্য সে পরস্কৃত হবে।

এই যুবকটি সেই ধরণের নয় যে এই অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করবে কিংবা সমবেদনা জানাবে—"হ্যালো—খুব যে জোর খাটছ হে—চাষবাস করতে আরম্ভ করেছ নাকি?"

পীয়ার সোজা হয়ে দাঁড়াল—তারপর ট্রাউজারে হাতের ঘাম মুছে নিলে।

"হায় ভগবান! এর একি স্বাস্থ্য।" নিজে নিজে ভাবলে—তারপর পীয়ারকে লক্ষ্য করে বলল—"তোমাকে ত বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে—আজকাল চেনাই যায় না।"

মার্লে রান্নাঘরের জানলা থেকে এদের দেখতে পেল। "আমারও বোধ হয়"—বলতে বলতে সে ছুটে বেরিয়ে এল—কতদিন আত্মীয়-স্বজনের মুখ সে দেখেনি—সাধারণ ভদ্রতা করা পর্য্যন্ত সে ভুলে গেছে—নিজের পদ মর্য্যাদা তার দরকার নেই—ভায়ের গলা সে জড়িয়ে ধরল।

ইউথাও এদের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আসেনি। তার বাক্সে এক বোতল ভাল মদ ছিল—তাই সে খাবার সময় বিতরণ করলে—আর সিনেমা থিয়েটারের গল্প ও তাদের অঙ্গভংগী নকল করতে লাগল—আর এই দুটি দারিদ্র্য-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। এখন এদের আসল দরকার হাসি আর আনন্দের ইউথাও এটা খুব ভালরকমই জানত।

কিন্তু যে সমস্ত পরিবার তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার ভার নেছে—তারা কোন পথে তাদের চালাবে এবিষয়ে স্বামী-স্ত্রী কি রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে, এ কথা সে জানে। এখনকার দিন তাদের দারিদ্র্য ও বেদনার মধ্য দিয়া কেটে যায় কিন্তু যে সাহায্য তারা পায় তা যেন বন্ধ না হয়—এই তারা আশা করে। তাদের সাহায্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে তারা না পারবে এখানে থাকতে, না তাদের সামর্থ্য থাকবে অন্য কোথায় যাবার। তারা কি করবে তখন? সুতরাং তারা যে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাবে এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

সাপারের পর ইউথাও পীয়ারের সংগে একটু বেড়াতে গেল আর মার্লে বাড়ীতে বসে রইল উৎকণ্ঠিত মনে। সে বুঝতে পেরেছে যে, এই এতক্ষণ তাদের ভাগ্যের মীমাংসা হচ্ছে।

অবশেষে তারা ফিরে এল এবং আশ্চর্য্য হাসিমুখে।

তার ভাই তাকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে কপালে চুমু খেলে—বাহুতে দুটো টোকা দিলে। তারপর ঘুমাতে গেল—মার্লে ভাইকে তার শয়নঘর দেখিয়ে দিয়ে এল—তার ইচ্ছে ছিল, সেখানে বসে ভায়ের সংগে কিছুক্ষণ গল্প করে। কিন্তু সে জানে, পীয়ার তার জন্য অপেক্ষা করছে একা এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে—"গুড নাইট, কারপেণ্টের"—বলে সে নেমে এল।

তারপর রাত্রি গভীর হলে তারা দু'জনে জানলার ধারে টেবিলে বসল পাশাপাশি।

"কি বললে?" মার্লে জিজ্ঞেস করে।

"কথাটা কি জান মার্লে,—যদি সত্যই তুমি দিন কাটাতে চাও তবে জীবনটাকে আমাদের মুখামুখী দেখে নিতে হবে।"

"পীয়ার, আমরা কি এখানে থাকতে পারব না?"

"আমার মত অকর্ম্মণ্যের সঙ্গে কি তুমি দিন কাটাতে পারবে? আগে এ কথার জবাব দাও।"

"বেশ, তার আগে আমার কথার জবাব দাও—এখানে কি থাকা চলবে?"

"চলবে। কিন্তু হয়ত বৎসরের পর বৎসর কেটে যাবে আমার সেরে উঠতে—এই আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আর পরের দয়ার ওপর বেঁচে থাক সে আমি পারব না, সে আমার অসহ্য।"

"তা হলে আমাদের কি করতে হবে পীয়ার? আমার পক্ষে টাকা উপায়ের ত কোনও পথ দেখছি না।"

'চেষ্টা আমাকেই করতে হবে"—পীয়ার জানলার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

"তুমি,—না না, পীয়ার—তা হতে পারে না—ড্রাফটস্‌-ম্যানের কাজ পর্য্যন্ত তোমায় আমি করতে দেব না—তোমার চোখের তাতে অনিষ্ট হবে জান।"

"কেন, আমি কামারের কাজ করতে পারি।"—

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মার্লে স্বামীর দিকে চেয়ে রইল, সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যই কি স্বামী তার কামার হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেললে সে। কিন্তু স্বামীকে দুর্ব্বল করে তুললে চলবে না। জোর করে সে

কথাটা প্রকাশ করলে—"হ্যাঁ, তাতে তোমার সময় কাটবে ভাল। আর দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম রাত্রে তোমার ঘুমের সাহায্য করবে।" ঠোঁট দুটো চেপে সে কান্নার বেগ রুদ্ধ করতে চেষ্টা করে।

"আর আমি যদি তাই করি, মার্লে—তবে এখানে ত আমাদের থাকা চলবে না—কারণ এত বড় বাড়ীর আমাদের কোনও দবকার নেই। আর তা'ছাড়া এখানে ত' তোমাকে কেউ সাহায্য করবার নেই?"—

"কিন্তু এ গ্রামে কি আর ছোট বাড়ী আছে?

"আছে। ওপাড়ায় একটা ছোট বাড়ী বিক্রী আছে—সামনে একটু জমি সমেত। যদি আমরা একটা শুয়োর, একটা গাভী ও কয়েকটা মুরগী রাখি—আর জমিতে যদি কিছু ধান হয়—তাহলে আমদের একেবারে সেবাসদনে গিয়ে উঠতে হবে না। ওসব কাজ আমি কিছু কিছু করতে পারব—আর মুরগীর চাষে লাভ আছে। আবার এতে আমার স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সেটা অনুকূল। তোমার কি মত?"

মার্লে কোন কথা বললে না। স্বামীর দিক থেকে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। বাহিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরণী।

"আর একটা কথা, মার্লে—তুমি কি আমার সংগে এই দারিদ্র্যের মধ্যে যেতে পারবে? আমার কোন অসুবিধা হবে না—কারণ ছেলেবেলায় জীবন আমার এমনি দুঃখেই কেটেছে। কিন্তু তোমার? আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভেবে দেখতে বলছি।" স্বর তার কেঁপে যাচ্ছে। দৃষ্টি তার অশ্রুর অন্তরালে ঝাপসা হয়ে ওঠে—মুখ সে নামিয়ে নেয়।

তারপর আবার নিঃস্তব্ধতা। "আর টাকা কোথায় যে বাড়ীটা কিনবে?"—মার্লে জিজ্ঞাসা করলে।

—"সে তোমার ভাই আমায় ধার দেবে বলেছে। কিন্তু আমি আবার তোমায় ভেবে দেখতে বলছি, মার্লে—যদি তুমি ভায়ের সংগে ব্রুসেথে গিয়ে বাস কর আমি দোষ দেব না। আর খুড়ীমা ত' তোমাকে আর ছেলে-মেয়েদের পেলে খুব খুশীই হবেন।"

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললে না। এ নিঃস্তব্ধতা ভংগ করলে মার্লে—"যদি সেই কুঁড়েতে ছোট দু'খানা ঘর থাকে তা'হলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আর তা'ছাড়া ঘর-সংসার গোছানও খুব সহজ হবে, কি বল।"

পীয়ার কোন কথা বলতে পারলে না। গলার স্বর তার ভেংগে গেছে। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে দারিদ্র্য মার্লেকে তার কাছ-ছাড়া করতে পারবে না। এ যেন তার এক পরম আবিষ্কার—কিছুক্ষণ সে আনমনে চিন্তা করতে লাগল—এ বিষয় নিয়ে।

মার্লে স্বামীর দিকে মুখ করে বসে ছিল কিন্তু দৃষ্টি তার উদাস। তার চমৎকার ভুরু আজও তেমনি মসীকৃষ্ণ কিন্তু মুখে তার যৌবনের জ্যোতি নেই—চুলে কে যেন ধূসর রং বুলিয়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। পীয়ার এবার বললে—"কিন্তু ছেলেদের বিষয়।"

মার্লে চমকে উঠল। এতদিনের ভয় আজ বুঝি রূপ নিয়েছে—"ছেলেদের—ছেলেদের কি পীয়ার?"

"আণ্ট ম্যারিট লিখেছে—তোমার ভায়ের সংগে যদি লুসিকে তার কাছে পাঠাও।"

"না, না, পীয়ার—তুমি অমন কথা বল না। আমি জানি, দিয়েছ। তুমি তাকে যেতে দিও না পীয়ার—তাকে দিয়ে দিও না। এর মানে কি জান, সে চিরদিনের জন্য পর হয়ে যাবে।"

"তা জানি—কিন্তু এতে ভাববার কথা আছে। লুইসের নিজের এ অধিকার—তুমি কি করে বলবে, না।"

মার্লে চমকে উঠল, সে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগল—"না, না, পীয়ার—তুমি অমন কথা ব'ল না। আমি জানি, তুমিও ও চাও না। এখনও আমাদের সে অবস্থা হয়নি যে, নিজেদের—না, না পীয়ার দিয়ে দিও না, বিলিয়ে দেওয়ার অবস্থা ত আমাদের আজো আসে নি"—কান্নায় সে ভেংগে পড়ল—"পীয়ার আমি তা কিছুতেই হ'তে দেব না, দেব না"—

"তোমার যা ইচ্ছে মার্লে।"—নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত ও সংযত করে পীয়ার বল্‌লে—"এবিষয়ে আমরা কাল অবধি ভাবতে পারব। প্রত্যেক জিনিষের দুটো বিভিন্ন দিক আছে। আমাদের হয়ত একদিক—কিন্তু ঐ নিরীহ লুইসের জীবন—সে কথাটা একবার ভাব দেখি মার্লে।"

পরদিন সকালে, ছেলেদের জাগবার সময় স্বামী-স্ত্রী নার্সারীতে গেল, সেখানে লুইসের শয্যার পাশে তারা দাঁড়াল। এখানে আসার পর মেয়েটি অনেক বেড়ে উঠেছে। বিছানায় নাক গুঁজে সে ঘুমোচ্ছে—তার কালো চুলে সুন্দর মুখখানা ঢাকা পড়েছে। আজো অবধি সে এখানে পিতামাতার কোলের কাছে—জগতের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায়।

"লুইস ওঠ।"—মার্লে তাকে নাড়িয়ে দিলে।

লুইস উঠে বসল—তখন ঘুমে তার দু'চোখ জড়িয়ে রয়েছে—সে আশ্চর্য্য হয়ে বাপ-মা'র মুখের দিকে চাইলে। কি ব্যাপার?

"তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে নাও। কারণ্টেন কাকার সংগে ব্রুসেথে খুড়ীমার কাছে যাবে না? কি?"—

মেয়েটি এত তাড়াতাড়ি করতে লাগল যেন এক্ষুণি বেরিয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু মা বাবার মুখের দিকে চেয়ে আনন্দের অতিশয়তা তার আর রইল না। আর ছোট ভাইবোন দু'টি পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল, তাদের দিদি বেড়াতে যাচ্ছে অনেক দূরে। লরেঞ্জ দিদিকে তার ঘোড়াটা দিয়ে দিলে আর ছোট্ট এণ্টা তার ডল পুতুলটা। আর মা এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল যেন মেয়ে ভাবে, সে বেড়াতে যাচ্ছে আবার ফিরে আস্‌বে কিছুদিনের মধ্যেই।

দুপুরের আগেই একটা ছোট ট্রাংকে লুইসের যাবতীয় জিনিষপত্র ভর্ত্তি করা হল—লুইস সবচেয়ে ভাল জামা পরে বাড়ী বাড়ী বিদায় নিতে লাগল—আদর কুড়িয়ে কুড়িয়ে। কামার বাড়ীর পেছনে যে ঘোড়াটা থাকে তার কাছে সে সবশেষে বিদায় নিতে গেল। মুজিন্ তখন খাচ্ছিল, একবার মুখ তুলে চাইলে, লুইস তাকে হাতে করে দুটি ঘাস দিলে—তারপর তার গলা জড়িয়ে ধরলে।

"আমি সব্বাইকে চিঠি লিখব।" সে জনান্তিকে বলে চল্‌ল।

তারপর ট্রেন প্লাটফরম ছেড়ে দিল ধীরে ধীরে। লুইস আর ইউথাও তাদের রুমাল ওড়াতে লাগল। বিদায়—বিদায়।

আর পীয়ার ও মার্লে দাঁড়িয়ে রইল ছোট দু'টি ছেলে-মেয়ের হাত ধরে। তখনও দূরে একখানি শাদা ধব-ধবে হাতের রুমাল-নাড়া দেখা যাচ্ছিল—তারপর ট্রেনটা ঘুরে গেল—শুধু পেছনে পড়ে রইল ধূলি ধূমাচ্ছন্ন ষ্টেশন, রেলের বিরাট শব্দের প্রতিধ্বনি আর সবচেয়ে বড় দু'টি ব্যথাতুর প্রাণ।

পেছনের এই চারিটি পথ-চাওয়া প্রাণ স্থিরভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল—তারপর অজ্ঞাতসারে তারা পরস্পরের কাছে সরে এল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বড় রাস্তা থেকে একটু দূরে একখানা একতলা বাড়ী—সামনে তিনটে জানলা—বাড়ীটার একদিকে একখানা গোয়াল ঘর আর একদিকে একটা কামারশালা। যখন কামারশালা থেকে ধোঁয়া ওঠে, প্রতিবেশীরা বলে "আজকে বোধ হয় ইঞ্জিনীয়র একটু ভাল আছে—আজকে আবার কাজে লেগেছে। আর আমাদের যদি কিছু করিয়ে নেবার থাকে ত ওকেই দিও—লিয়ার জেনার চেয়েও সস্তায় ও করে দেয়।

মার্লে আর পীয়ার বছর দুই এখানে বাস করছে। তারা একসঙ্গে জীবন কাটাচ্ছে কিন্তু একটু পার্থক্য তাদের জীবনে এসে গেছে। মার্লে এখনও স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে—হয়ত স্বামী তার সেরে উঠবে। কিন্তু পীয়ার নিজে আর কোন আস্থা রাখে না। হয়ত কখন মাথার যন্ত্রণাটা একটু কম থাকে কিন্তু শরীরের অন্য কোন একটা যন্ত্রণা তাকে কাতর করে তোলে—কিন্তু পীয়ার তা প্রকাশ করে না। সেও তার স্ত্রীর মুখের পানে চায় আর ভাবে—"মার্লের দিন দিন কত না পরিবর্ত্তন হচ্ছে। আমারই ত দোষ। আমিই তাকে নামিয়ে নিয়ে এসেছি এই অবস্থায়—আমাকেই আবার তাকে সুখী করতে হবে।" তাই নিজে সহ্য করবার শক্তি সে হারিয়েছে—এমন-কি যখন যন্ত্রণায় কান্না পায় তখনও মুখে সে হাসতে চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম এতে তার দারুণ কষ্ট হ'ত কিন্তু প্রত্যেকবার ভান করার পর পরের বারের জন্য সে প্রস্তুত হ'ত রীতিমত।

এমনি করে সে ভাগ্যকে শান্তমনে গ্রহণ করতে শিখেছে। হাস্যরস তার আরও সহজ হয়ে উঠেছে। এখন সে নিজেকে সংযত করে নিয়েছে, আর দুর্ভাগ্যের মুখের পানে চেয়ে বলতে পারে—"যদিও আমি অসহায় তুমি আমায় অশান্তি থেকে অশান্তির মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পার কিন্তু আমার এই অদৃষ্টকে উপহাস করবার শক্তি কেড়ে নেবার ক্ষমতা তোমার নেই।"

এখন দিন কত সহজে কেটে যায়—কোন আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আর ভগবানের কাছে, মানুষের কাছে তার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু যখন হাপর নিয়ে কাজ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে—তখন মুখে সন্তোষের হাসি নিয়ে সে মার্লেকে বলে—"না মার্লে, আমি ত তোমাকে বলেছি যে জল তোলার ভার আমার। বালতিটা আমাকে দাও।" "তুমি—তুমি পারবে জল তুলতে"?—"আমি পারুষ মানুষ না অন্য কিছু—স্ত্রীলোকের জন্য রান্নাঘর—সেইখানে তুমি ফিরে যাও।" এতে তার মনে শান্তি আসে—যদিও মাঝে মাঝে শিরদাঁড়া ভেঙ্গে পড়তে চায়। আর কখনও কখনও সে বলে—"আজ বড় ক্লান্ত বোধ করছি, মার্লে—আমি একটু বেশীক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকব।" তখনই স্ত্রী বোঝে—তার আবার সেই মাথার যন্ত্রণাটা সুরু হয়েছে। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাই তাকে এ বুঝতে সাহায্য করত; আর স্বামী তার সেই মাথার যন্ত্রণা আলস্যের দোহাই দিয়ে চেপে যেতে চায়।

তাদের একটা গাভী, একটা শূকর আর কতকগুলো মুরগী আছে। এদের সংখ্যাধিক্য লরেঞ্জের বাড়ীর মত অত বেশী নয় কিন্তু পীয়ার নিজেই এদের তত্ত্বাবধান করে। গত বৎসর তাদের জমিতে এত আলু হয়েছিল যে তারা কয়েক কুড়ি বিক্রী করেছিল। তারা এখন আর ডিম কেনে না—বিক্রয় করে। পীয়ার নিজে মাথায় করে বাজারে নিয়ে যায়, সেগুলো বিক্রী করে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে আনে। তাতে আর হয়েছে কি? মার্লে ত ঘর মুছতে বা রান্না করতে দ্বিধা বোধ করে না। একথা সত্য যে, একদিন তাদের দিন অনাভাবে কেটেছে কিন্তু সে সব গত-দিবসের কথা স্মরণ করে আজ আর লাভ নেই। কিন্তু মার্লে—সে আজও অনাগত দিনের সুখের স্বপ্ন দেখে। তাছাড়া তারা দু'জনে নৌকাডুবির যাত্রী—তীরের ধারে বাসা বেঁধে দিন কাটাচ্ছে—প্রকৃতির রূঢ়তা যত কঠিন হোক না কেন সেখানে!

কখন কখন এমন হ'ত যে, নূতন এ্যামেরিকান টাইপের মোয়িং মেশিন-এর কোন দোষ তার কাছে সারাতে এসেছে, তখন সে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে এক অদ্ভুত চাউনিতে চেয়ে থাকত—তারপর একটা ঢোক গিলত। যে লোকটা এক চুলের সূক্ষ্মতায় তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে—সে হয়ত আজ ক্রোরপতি।

এ দোষ সারাতে তার ইচ্ছা করত না, কিন্তু তবু সে ঘাড় গুঁজে কাজ করে চলে—মার্লের একজোড়া জুতার দরকার।

মাঝে মাঝে সে হাতুড়ীটা ফেলে দিয়ে অন্ধকার কামার-শালা থেকে বাইরে আসত মুক্ত বাতাসের ক্রোড়ে; তখন সে শুধু এই বিরাট শূন্যতায় ভরা আকাশের পানে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে। একজন লোক, তার হাতে একটা হাতুড়ী—তাকিয়ে আছে দূরে আকাশের পানে। এই যে তার প্রবৃত্তি, এটা সে পেয়েছে তার পিতামহদের কাছ হ'তে—যারা মানুষের জন্য এনেছে আগুন আর চিন্তা, তাদের অন্তর জ্বলিয়ে দিয়েছে বিদ্রোহের অগ্নি শিখায়।

পীয়ার আকাশের দিকে চায়। মেঘের দল ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে অকারণ অন্যমনস্কতায়। ওরই অন্তর দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? কিন্তু আকাশের বক্ষ আজ দেবতাবিহীন! কার বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ?

কিন্তু মানুষের প্রতি এই যে অন্যায় অবিচার? এই যে যথেচ্ছাচারিতা সেই শেষ বিচারের দিনে কে হবে তার বিচারক? কে সে? কেউ নয়।

কি? কেউ নয়? মনে করে দেখ সেই সমস্ত মার্টারদের কথা যারা অন্তরে শিশুর মত সরল হয়েও অসহ্য অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে তাদের কি ক্ষতিপূরণ হবে? দুরাশা?

কিন্তু তারা বিশ্বমানবের এক বিরাট গোষ্ঠী যারা সমগ্র ব্যথার ভার নিয়েছে নিজেদের মাথায় তুলে, যাদের আত্মা চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়ায় মিথ্যা লজ্জার কলঙ্কে—যারা সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে জীবন বলি দিয়েছে—কারণ পৃথিবীতে

মিথ্যাচারের প্রলোভনও বেশী, তার শক্তিও অধিক। সত্যতা? বিচার? কেউ কি নেই যে একদিন মৃত আত্মাকে শান্ত করবে, বিশ্বের এই গরমিল আবার শুধরে দেবে? কেউ কি নেই? না কেউ নেই।

পৃথিবী ছুটে চলেছে তার গতিপথে। ভাগ্য অন্ধ আর দেবতার মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে যায় যখন শয়তান 'জবে'র উপর অত্যাচার করে।

মূর্খ, চুপ কর, হাতুড়ী দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে থাক। যদি কোন দিন তোমার চেতনা এই বিশ্ব প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে পারে, সেই দিন বিশ্বের ভীষণতা তোমায় আঘাত করবে। মনে করে রাখ—তুমি কেবলমাত্র মেরুদণ্ডী প্রাণী আর ভুলবশত একটা আত্মার অধিকার তুমি পেয়েছ। ঘটাং ঘটাং—হাতুড়ীর মধ্য থেকে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে। জীবনটা কোন রকমে কাটিয়ে দাও। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মনে জাগছে এক আশ্চর্য ক্ষুধা, পৃথিবীর এই যত ভাগ্য-নিপীড়িত নর-নারী—তাদের সঙ্গ লাভের বাসনা—এইসব ক্ষুব্ধ অন্তরকে এক করে এক পরম বিজয়বার্তা ঘোষণা করতে—দুঃখ বা বিদ্রোহ করতে নয়। তারা করবে নিখিল প্রকৃতির [illegible]। চেয়ে দেখ ওগো অসীম পৃথিবীর নিষ্ঠুর দেবতা—আমরা তোমার নিষ্ঠুরতাকে পূজা করছি। অনুভব কর আমাদের মনের মহত্ত্বকে।

একটি মন্দির, মানুষের ক্ষুধিত আত্মার এক বিরাট বিশ্বদেউল। সেখানে মন্ত্রমন্ত্র আবৃত্তি হবে না, গীত হবে শাশ্বত মানব মনের চিরন্তন এক ভজনার সুরে—যা দেবতার অন্তর-আত্মাকে কাঁপিয়ে তুলবে। সে দিন কবে আসবে—এ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আর কত দেরী!

এক সন্ধ্যায় পীয়ার পোষ্ট অফিস থেকে একটু যেন উল্লসিত মনেই ফিরে এল—"দেখ মার্লে, ব্রুসেথ থেকে চিঠি এসেছে।"

মার্লে লরেঞ্জের দিকে তাকাল, সে ততক্ষণ তার মার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। "ব্রুসেথ থেকে? লুইস কেমন আছে?"

"এই যে চিঠি, পড়েই দেখনা।"

মার্লে এক নিশ্বাসে চিঠিটা পড়ল—তারপর লরেঞ্জের দিকে তাকাল। সেই দিন রাত্রে ছেলেরা ঘুমাতে গেল, তাদের মা আর বাবা আলোচনা করতে লাগল। মার্লে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল তার স্বামীর কথাই ঠিক। ছেলেটিকে এখানে রাখা পরম স্বার্থপরের মত কাজ হবে—কারণ একদিন সে তার পিতার খুড়ীমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারে।

সে যদি এখানে থাকে সে বড় জোর কামার হবে। কিন্তু কামারের ত আর প্রয়োজন নেই—যন্ত্রদানব মানুষের সমস্ত ক্ষুধা মিটিয়ে দিচ্ছে। আর এই পল্লীতে কি শিক্ষাই বা সে পেতে পারে? আণ্ট ম্যারিট লিখেছে, তিনি ওকে ভাল স্কুলে দেবেন।

অতএব লরেঞ্জকেও যেতে হবে।

তারপর যখন তারা লরেঞ্জকেও ট্রেনে তুলে দিয়ে এল, তখন মায়ের চোখের জলে রুমাল সিক্ত হচ্ছে—দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে গেছে। বাড়ীতে ফিরে এসে মার্লে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল—আর পীয়ার গুন্ গুন্ করতে করতে স্ত্রীর জন্য সন্ধ্যের খাবার ঠিক করতে লাগল।

"আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না তুমি কি করে হাসছ"—মার্লে ভাঙ্গা গলায় বললে, অদ্ভুত ধরণের হাসি তার ওষ্ঠে, পীয়ার উত্তর দিলে—"ওবিষয়ে যত কম ভাববে ততই ভাল।" কিন্তু পরদিন পীয়ার শুয়ে রইল বিছানায় বহুক্ষণ। মার্লে স্বামীর কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করলে।

এমনি করেই দিন কেটে যায়। পরের কাছে হাত না পেতে দারুণ কষ্টে তারা সংসার চালায়—দুজনেই পরিশ্রম করে অসাধারণ। যখন বড় রাস্তার ওপরে ওই মস্ত ডেইরীটা তৈরী হল, তখন পীয়ার প্ল্যান করে দিয়ে কিছু টাকা পেলে। মাঝে মাঝে হাত কাটা ওয়েস্ট কোট পরে পীয়ার মুদির দোকানে যায়—পিঠে তার একটা বস্তা। মাথা নীচু করে সে হাঁটে। দাড়ীতে তার রীতিমত পাক ধরেছে—সে পথ চলে—চোখ হয়ত অনিদ্রায় রক্তজবা, কিন্তু তার পদক্ষেপ লঘু আর কৌতুকপ্রিয়।

গ্রীষ্মের সময় প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে দেখত—তারা বাড়ীতে চাবী দিয়ে ছোট্ট এণ্টাকে নিয়ে পাহাড়ের ধারে বনভোজনে যাচ্ছে। তাদের মনে হয়ত গত দিনের কোন স্মৃতি ছোট্ট আগুনের কুণ্ডের পাশে বসে গরম গরম কাফি পান করা।

শরৎকালে যখন প্রকাণ্ড প্রান্তর সব হলদে রঙে মাখান হয়ে গেছে—মার্লে'র ও পীয়ারের বাগানেও তখন ধান। ছোট্ট তাদের জমি দুজনের পক্ষে স্বচ্ছল। যদি কখনও আন্দাজ মত আলু না হ'ত হয়ত তাদের অসুবিধা হ'ত কিন্তু তবু তারা থাকে ছোট্ট ঝক্‌ঝকে বাড়ীতে—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংসারে—সুখী তাদের গৃহস্থালীতে। মার্লে সারাদিন পরিশ্রম করে আবার প্রতিবেশী মেয়েদের রান্না, সেলাই-এর বিষয় শিক্ষা দেয়। কিন্তু তার একটা স্বভাব হয়েছে—বাতায়নের বাহিরে যেখানে পাহাড়ের সীমানায় উপত্যকার সীমা মিশে গিয়েছে, তার পানে চেয়ে থাকা দীর্ঘ দিন ধরে। তার কি মনে হয় আবার সুখের দিন ফিরে আসবে, তাদের এই ব্যথার রজনীর অবসান হবে—এসব কল্পনা আজ তার কাছে বিলাসে দাঁড়িয়েছে।

এমনি করেই চিরন্তন কালের স্রোত বয়ে যায়।

(ক্রমশ)

মিশরের 'ম্যাজিনি' আব্দুহু

রেজাউল করীম এম-এ বি-এল

প্রাচ্যখণ্ডের যে সব দেশ একবার ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের কবলে পতিত হইয়াছে, সেগুলিকে উদ্ধার করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য কার্য্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু প্রাচীন দেশের উপর আজ সাম্রাজ্যবাদ তাণ্ডবলীলা করিতেছে। কিন্তু কয়টি দেশ তাহার কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে? কত আন্দোলন হইতেছে, কত সংগ্রাম হইতেছে কিন্তু পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ আজ একটি দেশও পায় নাই। স্বদেশকে স্বাধীন করার বড় নিতান্ত সোজা ব্যাপারও নহে। ইহার জন্য কত ত্যাগ করিতে হয়, কত অমূল্য প্রাণ বলিদান করিতে হয়, কতশত মহাপুরুষের জীবন ব্যাপী সাধনার দরকার হয়। তবেই ত দেশ স্বাধীন হয়। মহাপুরুষের আপ্রাণ সাধনা দেশের মুক্তির একটা অপরিহার্য্য সর্ত্ত। একদিন কোন একটি সভায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিলেই দেশ স্বাধীন হয় না, দিনে দিনে, পলে পলে তিলে তিলে জীবনকে বিসর্জ্জন দিবার সাধনা করিতে হয়, দেশবাসীর জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিপ্লবের ভাব আনিতে হয়, দেশের সম্মুখে একটা মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়—তবেই দেশের বুক হইতে পরাধীনতার জগদ্দল পাথর অপসারিত হইয়া যায়। এই প্রকার অনবদ্য ও অনাবিল সাধনা ব্যতীত কোন দেশের সত্যিকারের মুক্তি হয় না। অষ্ট্রিয়ার কবল হইতে নব্য ইটালী যে মুক্তি লাভ করে তাহা একদিনের একটি বক্তৃতায় সম্ভব হয় নাই। ইটালীর মুক্তির গোড়াতে আছে মহামানব ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডির অপূর্ব্ব সাধনা। ম্যাজিনি আনিয়াছিলেন ভাবরাজ্যে বিপ্লব আর গ্যারিবল্ডি সেই বিপ্লবকে বাস্তব রাজ্যে রূপ দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে যিনি রূপ দিয়াছেন, তিনি একাধারে ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি। মহাত্মা গান্ধী ভাব রাজ্যে ও বাস্তব রাজ্যে যে বিপ্লব আনয়ন করিলেন তাহারই প্রভাবে আজ ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে। নব জাগ্রত মিশর আজ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। মিশরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত বীর কেশরী জগলুল পাশার নাম ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আজ সকলেই জগলুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু এই জগলুল যাঁহার হাতে গড়া, যাঁহার নিকট এই জগলুল প্রেরণা পাইয়াছেন, আদর্শ পাইয়াছেন এবং সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়াছেন তাঁহার নাম আজ কয়জন অবগত আছেন? মিশরের 'ম্যাজিনি' মহাত্মা মুফ্‌তি আব্দুহু সমগ্র দেশবাসীর চিন্তারাজ্যে যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, তাহারই ফলে জগলুলের উদ্ভব হইয়াছিল। মহাত্মা আব্দুহু ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে জগলুল পাশা বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন না। আজ এই মহাত্মার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সাম্রাজ্যবাদের কবলিত মিশরের অধিবাসীদের প্রাণে স্বাধীনতার উন্মাদনা জাগাইয়া দিবার জন্য আব্দুহু যে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে নিঃসন্দেহভাবে নব্য মিশরের জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রভাব মিশরের সর্ব্বত্র অনুভূত হইয়া থাকে এবং তাঁহার জীবিত অবস্থায় তিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিলেন। মিশরের অন্তঃপাতী গার্বিয়া প্রদেশের একটি নগণ্য গ্রামে ১৮৪৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আরব বংশ-সম্ভূত নহে, তাঁহারা খাঁটি মিশরীবংশ হইতে উদ্ভূত। তাঁহার পিতা কৃষিজীবী ও মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক ছিলেন। তৎকালীন বিধি অনুসারে তিনি সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন এবং একটি গ্রাম্য স্কুলে প্রেরণ করিলেন। তথাকার পাঠ সমাপ্ত হইলে আব্দুহুকে ১৮৬২ সালে তানতা নগরের আহমাদি মসজিদে পাঠার্থে প্রেরণ করিলেন। এই সময় আব্দুহু লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। আহমাদি মাদ্রাসার শিক্ষাদানের প্রণালী ছিল অতি-জঘন্য। একদিকে অনিচ্ছা আর অন্যদিকে শিক্ষাদানের জঘন্য প্রণালী—এই দুই কারণে তিনি মর্ম্মান্তিক পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। একদিন সুযোগ বুঝিয়া তিনি মাদ্রাসা হইতে পলায়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গ্রামেই বাস করিবেন, আর কোথাও যাইবেন না, এইরূপ মনস্থ করিয়া তিনি গ্রামে বিবাহ করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা তাঁহাকে পাঠাভ্যাস করিবার জন্য পুনঃপুনঃ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি ১৮৬৬ সালে কায়রোর ভুবনবিখ্যাত আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন এবং তথায় ভর্ত্তি হইয়া গেলেন। সেই সময় খেদিভ ইসমাইল পাশা আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নূতন সংস্কার করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। তাঁহারই চেষ্টার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তর্কশাস্ত্র ও দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্য যখন আন্দোলন হইতেছিল, সেই সময় আব্দুহু তথায় ভর্ত্তি হইলেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া বক্তৃতা শ্রবণ ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিলেন। আর অবসর সময় গ্রন্থাগারে বসিয়া কঠোর পরিশ্রম সহকারে নানা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং গভীর গবেষণায় নিমগ্ন হইলেন। বাল্যের সেই চঞ্চলচিত্ত মানুষ জ্ঞান বৃক্ষের আস্বাদন পাইয়া অধীর হইয়া উঠিলেন, আরও জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার বাসনা প্রবল হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হইল না, তাঁহার প্রাণ যাহা চাহিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় তিনি তাহা পাইলেন না। বস্তুত আলআজহারে যে শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হইতেছিল তাহা নানাদিক দিয়া ত্রুটিপূর্ণ; তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সত্য সন্ধানের জন্য তিনি জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বারে বারবার আঘাত করিলেন কিন্তু দেখিলেন সে পথ বন্ধ কারণ মধ্যযুগীয় নিয়ম কানুনের চাপে আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্ঞানের উৎসমূল বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

আলআজহারে অধ্যয়ন করিতে করিতেই তিনি সূফি মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, তাঁহার একজন আত্মীয় তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ দিয়া এই পথ গ্রহণ করিতে সাহায্য করেন। আব্দুহুর ধর্ম্মজীবনে এইটি একটি প্রধানতম ঘটনা, ইংরেজিতে যাহাকে বলে turning point. জ্ঞানের প্রতি তাঁহার একটা গভীর প্রেম জন্মিল। মরমী সাধকগণ যে কৃচ্ছসাধন করিয়া থাকেন, এই সময় হইতে তিনি সেইভাবে নিজের জীবন গড়িতে লাগিলেন। দিনের পর দিন উপবাস ও উপাসনা করিয়া নির্জ্জনভাবে বাস করিয়া এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। গভীর নিশীথে আত্ম সমাহিত হইয়া সাধনার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। পরিধানের মূল্যবান পোষাক পরিত্যাগ করিয়া ফকীরের বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এইভাবে সাধনার মধে এরূপভাবে মগ্ন হইয়া গেলেন যে, সর্ব্বসাধারণের সহিত মেলামেশা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। যখন তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এইভাবে প্রস্তুত হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় বিখ্যাত মনীষী ও রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। প্রবল ঝটিকার মত তিনি প্রাচ্যদেশের যেখানে গমন করিলেন সেইখানেই প্রচণ্ড বিপ্লব আনয়ন করিলেন। এই-ভাবে চারিদিকে বিপ্লবের বহ্নি জ্বালাইতে জ্বালাইতে জামালুদ্দিন সাহেব মিশরে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার মিশর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একদল নব্যযুবক তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন, নবীন সাধক আব্দুহুও চুম্বকের আকর্ষণের মত তাঁহার চরণতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেন মণি কাঞ্চনের সংযোগ হইয়া গেল। এইসব তরুণ যুবকদের সম্মুখে জামালুদ্দিন সাহেব নানা বিষয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, আইন, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের যে সব অভিনব ব্যাখ্যা তিনি দিলেন তাহাতে নবীন যুবকগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহারা এরূপ উন্নততর ভিত্তির উপর কোন বিষয় শিক্ষা করে নাই। সহজ-বুদ্ধি ও সংযুক্তির মর্য্যাদা তাহারা কখনও জানিত না। আলআজহারের শিক্ষা-প্রণালী এরূপ মুক্ত বুদ্ধির পরিবেষ্টন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। জামালুদ্দিন তাহাদিগকে পাশ্চাত্য দর্শন ও রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট করিলেন। জার্নালিজম ও বক্তৃতা দিবার প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। আর সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শের ছবি তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ প্রাচ্যদেশকে গিলিয়া খাইতেছে—প্রাচ্যকে সর্ব্বাগ্রে উদ্ধার করিতে হইবে, মুক্ত করিতে হইবে! এজন্য সমস্ত প্রাচ্যদেশকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, একদল নবীন যুবককে প্রাণ বলিদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই সময় তাঁহারই প্রভাবে মিশরে জাতীয় দল গঠিত হয়, তাহার নাম "আল্লাহিজবুল ওয়াতান।" কিভাবে দেশের বুকে বিপ্লব আনিতে হইবে ও সমাজ সংস্কার করিতে হইবে, এ বিষয়ে একটা আদর্শ উপস্থিত করিলেন। জামালুদ্দিনের প্রভাব সকলের আগে মুগ্ধ করিয়া দিল মহম্মদ আব্দুহুকে। আব্দুহু তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

জামাল আর আব্দুহু গুরু আর তাঁর শিষ্য, ইঁহাদের প্রভাব মিশরের নব্য যুবকদের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। নানাস্থানে সভা-সমিতি হইতে লাগিল, সর্ব্বত্র একই কথা, মিশরকে স্বাধীন করিতে হইবে। নব্য যুবকদের উপর জামালের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া মিশরের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুগণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং এই আপদকে বিতাড়িত করিবার জন্য খেদিভকে নির্দ্দেশ দিলেন। খেদিভ ত তাঁহাদের হাতের পুত্তলিকা সুতরাং তিনি অবিলম্বে জামালকে বিতাড়িত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। ১৮৭৯ সালে খেদিভ তাওফিক পাশা এক সরকারী আদেশ জারী করিয়া জামালকে মিশর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। জামাল বিদায় হইলেন বটে কিন্তু তিনি যে অগ্নিকণা ছড়াইয়া দিয়াছিলেন তাহা আর নির্ব্বাপিত হইল না। মহাত্মা আব্দুহু এই সময় জামালের সমুদয় আদর্শে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি জামালের সমুদয় নীতি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহারই নির্দ্দেশিত পথে মিশরের সর্ব্বত্র সংস্কার আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি ইত্যবসরে আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপ্তির উপাধি প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্য কোন সরকারী চাকরী গ্রহণ না করিয়া শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিলেন। প্রথমে আলআজহারেই শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন। যুক্তি, তর্ক ও জ্ঞান, যাহা কিছু তিনি জামালের নিকট শিখিয়াছিলেন এক্ষণে সেইগুলিই হইল তাঁহার সহায়ক, তিনি তাঁহারই ভিত্তিতে নূতন নূতন বিষয় প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পরেও তাঁহাকে গৃহ-মধ্যেও অনেক ছাত্র পড়াইতে হইত, তিনি তাহাদিগকে নানা-বিষয়ে বিশেষত রাজনীতি বিষয়ে নানারূপ বক্তৃতা দিতেন। আলআজহারের শিক্ষাদান প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইয়া কতিপয় লোক আর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, উহার নাম দারুলউলুম। পাশ্চাত্য প্রণালীতে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, কারণ এরূপ প্রণালীতে আজহারে শিক্ষা দেওয়া হইত না। আব্দুহু সাহেব ১৮৮৭ সালে এই বিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শিক্ষাদানের মধ্যে তিনি তাঁহার আদর্শ প্রচার করিতে দ্বিধা করিলেন না। একটা নূতন জাতি গঠন করা, যাহা মিশরকে করিবে স্বাধীন—আরবী সাহিত্যের উন্নতি করা, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করা—এইগুলিই হইল তাঁহার বর্ত্তমান আদর্শ। আর এই আদর্শ তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন।

এরূপ ব্যক্তি যে বিলাসপরায়ণ খেদিভের বিরাগভাজন হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। খেদিভ তাঁহাকে পদে পদে অপমানিত করিতে লাগিলেন, অবশেষে অবস্থা এমন হইল যে, তাঁহার প্রাণরক্ষা করা দায় হইল। তাঁহার গুরু জামাল

উদ্দিন ত ইতিপূর্ব্বেই মিশর হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। কিন্তু নানা কারণে আব্দুহুকে বিতাড়িত করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতিভা ছিল, বিদ্যাবত্তা ছিল, আর ছিল প্রখর লেখনী শক্তি। খেদিভ এই চিরশত্রু লেখনীকে কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন। ১৮৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খেদিভ সরকারী পত্রিকা "অলওয়াকেয়ায়ে আল-মিশরিয়া"র সম্পাদকরূপে আব্দুহুকে নিযুক্ত করিলেন। সরকারী চাকরী গ্রহণ করিয়াও তিনি তাঁহার আদর্শ ভুলিলেন না, সর্ব্বত্র মেলামেশা করিতে লাগিলেন। এই সময় মিশর কেশরী জগলুল পাশা আল-আজহারে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে জগলুল তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার আদর্শে দীক্ষিত হইলেন। পত্রিকার মধ্যবর্ত্তিতায় তিনি তাঁহার পূর্ণ প্রভাব দেশময় ছড়াইতে লাগিলেন। মিশর সরকারের নানা বিভাগে যে সব গলদ ছিল তিনি তাহা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলেন এবং সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিলেন। সংবাদপত্রের দুইটি প্রধান গুণ থাকা দরকার—উন্নত ভাষা ও সত্য সংবাদ। মিশরের পত্রিকার এই দুইটিরই অভাব ছিল। আব্দুহু এই দুইটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন এবং তাঁহার প্রভাবে উক্ত পত্রিকাটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইল। আরবী ভাষার উন্নতির জন্য পত্রিকার একটি সাহিত্যিক বিভাগ খুলিলেন, তাহাতে শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির জন্য মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। সঙ্গে সঙ্গে এমন একদল লেখক সৃষ্টি করিতে লাগিলেন যাহারা মিশরের স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করিতে প্রস্তুত হইল। ইউরোপের যা কিছু সবই অনুকরণ করিতে হইবে যদিও তিনি এই নীতির সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু তাই বলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছুই গ্রহণ করিব না, এ নীতিও তিনি পরিত্যাগ করিলেন না। ফল এই হইল যে, মিশরীয় সভ্যতার ভিত্তিতে এমন একটি শক্তিশালী জাতীয়তা ও বলিষ্ঠ মানসিকতা গঠিত হইতে লাগিল, যাহা মিশরের কোথাও পরিদৃষ্ট হইত না।

মিশরের চারিদিকে জাতীয় ভাবধারা যখন ছড়াইয়া পড়িল এবং সর্ব্বত্র খেদিভের কুকীর্ত্তির জন্য বিক্ষোভ প্রকাশিত হইতে লাগিল, ঠিক সেই সময় আরাবী পাশা মিশর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ইহাই বোধ হয় প্রথম সশস্ত্র-বিদ্রোহ। আব্দুহু এই অবস্থায় নীরব থাকিতে পারিলেন না। আরাবী পাশার এই বিদ্রোহকে লর্ড ক্রোমার জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সূচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই বিদ্রোহীদলকে আব্দুহু নানাভাবে সাহায্য করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের কর্ত্তব্যবিষয়ে নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। বিদ্রোহীদের সামরিক নেতাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করিলেন। প্রবন্ধ লিখিয়া, উৎসাহ দিয়া এবং স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তিনি বিদ্রোহীদের প্রাণে নবজীবন সঞ্চার করিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও আরাবী পাশার এই বিদ্রোহ সফল হইল না। এইভাবে যে ব্যক্তি প্রকাশ্য বিদ্রোহীদলকে সাহায্য করিতে পারেন তাঁহার পরিণাম সর্ব্বত্র যাহা হয় এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। আব্দুহু খেদিভের আদেশে বন্দী হইলেন এবং একটা নামকেওয়াস্তে বিচার প্রহসনের পর স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন (১৮৮২ সালে)। ইহার পর তিনি সিরিয়ায় আশ্রয় লইলেন, তৎপরে ১৮৮৪ সালে প্যারিসে গমন করিয়া তাঁহার গুরু জামালুদ্দিনের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া গোপনে একটি নূতন দল গঠন করিলেন। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রাচ্যজগৎকে বিশেষত প্রাচ্যের মুসলিমপ্রধান দেশসমূহকে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত করা। এই দলের নামকরণ হইল "আলউরওয়াতুল ওস্কা।" এই নামে তাঁহারা একটি পত্রিকাও প্রকাশিত করিলেন। উহাতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নানারূপ উত্তেজনাপূর্ণ ও উদার মত প্রচারিত হইতে লাগিল। আব্দুহুই তাহার পরিচালনার ভার লইলেন। গুরু শিষ্যের সহযোগিতায় উক্ত পত্রিকার মধ্যবর্ত্তিতায় এমন সব প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল যাহা মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশকে মাতাইয়া তুলিল। সুতরাং অবিলম্বে সাম্রাজ্যবাদের শ্যেন দৃষ্টি উক্ত পত্রিকার উপর পতিত হইল। মাত্র অষ্টাদশ সংখ্যার পর পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া গেল। মাত্র দেড় বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে উহা সমগ্র মুসলিম জগতের মধ্যে অপার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার পর তাঁহারা দুইজনে দুই দিকে চলিয়া গেলেন—জমাল গেলেন রুশিয়ায়, আর আব্দুহু ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে বেরুতে আশ্রয় লইলেন। এবং ১৮৮৫ সালে তিনি শিক্ষাদান ও সাহিত্য প্রচারের ব্রত অবলম্বন করিলেন।

অবশেষে ১৮৮৮ সালে খেদিভ আব্দুহুকে ক্ষমা করিলেন। সুতরাং তাঁহার মিশর প্রবেশের পথে আর কোনও বাধা রহিল না। তাঁহার নির্ব্বাসনের সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি প্রত্যক্ষভাবে অনেক কিছু শিখিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিল, তিনি বুঝিলেন ইহার কিয়দংশ স্বদেশের কাজে লাগিতে পারে। ওদিকে মুসলিম জগতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি দেখিলেন, মুসলমান সমাজ কতকগুলি অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। তিনি তাহাদের এই দুর্ব্বলতার কারণ অনুসন্ধান করিলেন এবং বেশ ভাল করিয়াই বুঝিলেন যে, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদই ইহার জন্য প্রধানত দায়ী। তারপর অশেষ সম্মান ও ভক্তির সহিত তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হইলেন। এই যুগটা তাঁহার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান যুগ—ইসলাম ও মিশরের স্বাধীনতার জন্য তিনি দেশের মনোবৃত্তি গঠনে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণগ্রাহিতায় মুগ্ধ হইয়া খেদিভ তাঁহাকে দেশীয় বিচারালয়ে প্রধান কাজী নিযুক্ত করিলেন। এই পদে দুই বৎসর নিপুণভাবে কাজ করিয়া তিনি আপিল আদালতের কাউন্সিলার নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর ১৮৮৯ সালে খেদিভ আব্বাস হিলমীর সুপারিশক্রমে মিশরের প্রধান (গ্রাণ্ড) মুফ্‌তির পদে নিযুক্ত হইলেন। ইসলামের Canon Law-র ভাষ্য করিবার ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হইল। তাঁহারই ফতোয়া শ্রেষ্ঠ দলিল ও চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল। এই পদে অবস্থিতিকালে তিনি

বিজ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে ইসলামের বহু আইনকে ব্যাপক ও উদার করিয়া তুলিলেন। মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার ও রাজকীয় ব্যাপারে তিনি স্বাধীনভাবে ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁহার নিজের মত প্রদান করিতেন। এইসব অভিনব ফতোয়ার কারণে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি মুসলিম জগতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মীয় ব্যাপারে বহুস্থান হইতে তাঁহার মত চাহিয়া পাঠান হইত। তাঁহার কঠিন কঠিন আইনের সিদ্ধান্ত তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে। তাহা প্রাচীন আরব যুগের প্রাণহীন প্রথা হইতে বিভিন্ন এবং মুক্ত বুদ্ধিসম্মত। তিনি ইসলামকে বর্ত্তমান যুগের অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই তিনটি ফতোয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বিধান দিলেন যে, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত ইসলাম বিরোধী নহে। খৃষ্টান ও ইহুদীদের দ্বারা জবাই করা পশু নিষিদ্ধ নহে এবং যে সব ব্যাঙ্কে সুদে টাকা খাটান হয় তথায় টাকা জমা দেওয়া ও সুদ গ্রহণ করা অন্যায় নহে। মিশরের প্রচলিত আইনের মধ্যে নানা প্রকার গলদ প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি সবল হস্তে তাহার সংস্কার সাধন করেন। ধর্ম্ম ও রাজনীতির সমন্বয়ের তিনি বিরোধী ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি রাজনীতিকে পৃথকভাবে আলোচনা করিতে উপদেশ দিলেন। নানা কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের কথা বিস্মৃত হন নাই। তথাকার শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নানারূপ ত্রুটি ছিল। তথায় আধুনিক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইত না, আর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল একেবারেই অবৈজ্ঞানিক! তিনি এই পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের সহিত খাপ খাওয়াইতে সচেষ্ট হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যবস্থা করিলেন। ইসলামের সংস্কার ও উহাকে বর্ত্তমানীকরণ (Modernise) করিবার দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য যে কমিটি গঠিত হইল তিনি তাহার সভাপতি হইলেন। তাঁহার অবিরাম পরিশ্রমের ফলে আলআজহারের নিয়ম কানুনের মধ্যে নানারূপ সংস্কার হইল—শাসন ব্যাপারে, শিক্ষাপদ্ধতি ব্যাপারে, ছাত্রদের বসবাসের ব্যবস্থার দিক দিয়া কতকগুলি উদার আইন প্রবর্ত্তিত হইল। যদি আজহারের কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে প্রাণপণ বাধা দিয়াছিলেন। আব্দুহু যেভাবে আজহারের সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন সেরূপ হইলে আজহার আজ একটি বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা নিকেতন হইয়া পড়িত। কিন্তু রক্ষণশীলদের বিরোধিতার কারণে তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার সংস্কারের পরিকল্পনা দেখিয়া রক্ষণশীলগণ ভীত হইয়া খেদিভের আশ্রয় লইল। খেদিভ ত ইহাই চাহিতেছিলেন, তিনিও আব্দুহুকে বাধা দিলেন। হতাশ হইয়া আব্দুহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সকল সংশ্রব ছিন্ন করিলেন। কিন্তু অন্যান্য দিকে সমাজসংস্কারের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। জনসেবা ও লোকহিতকর কয়েকটি কার্য্যের জন্য তিনি মিশরবাসীর চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিলেন। তিনি একটি লোকহিতকর সমিতি গঠিত করেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য অসময়ে লোকের সাহায্য করা। ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা দানের অর্থ লইয়া একটি ফাণ্ড গঠন করিয়া ব্যাপকভাবে ও অর্থনীতির ভিত্তিতে আর একটি সমিতি গঠন করিলেন, তাহার উদ্দেশ্য হইল নরনারায়ণের সেবা। আরবী ভাষা ও প্রাচীন বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকতা রক্ষার জন্য ও সাহিত্যিক জাগরণের জন্য তিনি Society for the Revival of Arabic Science নামক একটি সাহিত্য-সভা গঠন করিলেন। এইভাবে কাজ করিতে করিতে ১৯০৫ সালে ১১ই জুলাই এই অক্লান্তকর্ম্মা মহাপুরুষ তাঁহার পরিকল্পিত অনেক কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া দেহত্যাগ করেন।

একজন কর্ম্মী হিসাবে, ও লেখক হিসাবে আব্দুহু মিশরের মধ্যে নবজাগরণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক নানাপ্রকার প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদের কবলিত মিশরকে একটি পরিপূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। মিশর-কেশরী জগলুলপাশা তাঁহারই অনুপ্রেরণায় উদ্বোধিত হইয়াছিলেন। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, আব্দুহুর মধ্যে নেতৃত্বের গুণ ছিল। তাঁহার বিদ্যার ব্যাপকতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার বলিষ্ঠ হৃদয়ের তেজ ও চরিত্রের মহত্ত্ব সকলকে মোহিত করিয়াছিল। যে-কেহ তাঁহার সহিত পরিচিত হইত, সেই তাঁহার মহানুভবতা, দয়াপ্রবণতা, সত্যবাদিতা, সৎসাহস, স্বাধীনচিত্ততা, ক্ষিপ্রকারিতায় ও স্বদেশপ্রেমিকতায় মুগ্ধ হইয়া যাইত। যাহা করিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, তাহা সকল বাধা বিঘ্নের মধ্যে দৃঢ়তার সহিত পালন করিতেন। তিনি দেশ ও সমাজ-সেবায় নিজের প্রাণকে সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁহাকে কখনও কলুষিত করিতে পারে নাই। মিশরকে স্বাধীনতার পথে তিনি অনেকটা আগাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি না জন্মিলে হয়ত জগলুলকে আমরা পাইতাম না। ইউরোপীয় বড় বড় পণ্ডিতদের সহিত তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, ঋষিকল্প টলস্টয়ের সহিত তাঁহার পত্র বিনিময় হইত। মিশরের যে আজ নব জাগরণ সূচিত হইয়াছে, তাহার মূলে আছেন আব্দুহু। মিশরের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতিতে যে বিপ্লব হইতেছে, তাহাও তাঁহারই কল্যাণে। বর্ত্তমান মিশরের তিনি রচয়িতা, মিশরের স্বাধীনতা-স্বপ্নের তিনি বাস্তব রূপদাতা ও মানুষের প্রাণে সাহস ও শক্তি উৎপাদনের তিনি হইতেছেন মূলকেন্দ্র। এই জন্য 'ম্যাজিনির' সহিত তাঁহার তুলনা হইয়া থাকে। ম্যাজিনিকে বাদ দিয়া যেমন স্বাধীন ইটালীর কথা কল্পনা করা যাইতে পারে না, সেইরূপ মহাত্মা আব্দুহুকে বাদ দিয়া আমরা বর্ত্তমান মিশরের কথা ভাবিতে পারি না। একদিকে আদর্শবাদী ভাবদাতা আব্দুহু আর অন্যদিকে কর্ম্মী ও বাস্তববাদী জগলুল পাশা—এই উভয়ের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান মিশরের উদ্ভব হইয়াছে। শুধু মিশর নহে, সমগ্র মুসলিম জগত মহাত্মা আব্দুহুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে।

মরু ও নির্ঝর

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

(১৩)

উর্ম্মিলার প্রতি কেশরের প্রেম—সে ছিল ঘুমিয়ে চৈতালীর ভালবাসা সেই সুষুপ্তির অবকাশে অবচেতনের মাঝারে. প্রথম ঘটাল দ্বন্দ্ব।

কিন্তু চৈতালীর উপস্থিতি যখন আর রইল না উর্ম্মিলা এল এগিয়ে অবচেতন-কুহেলী কেটে গেল, কেশরের প্রেমের গতি পুন ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হ'ল।

অনুক্ষণ তার নিবিড় সাহচর্য্য, নিশিদিন কেশরকে উর্ম্মিলার প্রতিই টানতে লাগল। এবং সেই গতির বেগ এত প্রবল যে. কেশর দেহমনে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ল। অন্ধ আবেগে তার সমগ্র সত্তা উর্ম্মিলার প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠতে লাগল।

এবং বেলাতটে যেমন সাগরের ঢেউ মুহুর্মুহু আছড়ে আছড়ে পড়ে তেমনি কেশরেরও দেহের প্রতি অণু-পরমাণু উর্ম্মিলার দেহতটে নিশিদিন আছড়ে আছড়ে পড়তে চাইছে!

কাচপোকা যেমন আরশোলাকে টেনে নিয়ে বেড়ায় উর্ম্মিলাও নিজের একান্ত অজ্ঞাতে কেশরকে প্রতিনিয়ত তারই দিকে টেনে নিয়ে চলছিল!

যে প্রেম এতদিন ডিম্বকোষের মধ্যে ছিল রুদ্ধ প্রাচীরে ঘেরা এবং ছিল অচল. আজ তা কোষ হতে মুক্তি পেয়ে চলমান হয়ে তার পক্ষপুটের তাড়নায় কেশরকে দিশেহারা করে তুললে।

কিন্তু বেশী দিন কেশর উর্ম্মিলার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলে না। তার ক্ষুধিত দৃষ্টির তলে, কেশরের উগ্র কামনা শতদলের মতই উন্মাটিত হয়ে গেল।

ও জানল ও দেখল!......

একদিকে নিবিড় ব্যথা. অন্য দিকে নিবিড় লজ্জা ও অনুকম্পা নিশিদিন ওকে দোলা দিয়ে ফিরতে লাগল।

ও প্রার্থনা জানালে ঈশ্বরের কাছে,......জানালে মৃত স্বামীর উদ্দেশে!.....কেশরকে সে ভালবাসে, ওকে সে পূজো করে. ওর প্রতি আছে ওর গভীর শ্রদ্ধা!.....

এমনি করেই দিন কাটে!

না ঘুম এল না!......কেশর শয্যায় উঠে বসল. এমনি করে আর সে পারে না. ওর মনের দুকূল ভেঙে বন্যা নেমেছে!......

পাশের ঘরেই ঘুমিয়ে উর্ম্মিলা আর সিদ্ধার্থ!......

মাঝে একটি মাত্র প্রাচীরের ব্যবধান!......এত কাছে. তবু যেন যোজন পথ দূরে!

কেশর শয্যা হতে নেমে এল।

পায়ে পায়ে ও দুই ঘরের মাঝের বন্ধ কবাটটার কাছে এসে দাঁড়াল।

দরজা ভিতর হতে বন্ধ!......

ভাঙা গলায় কেশর ডাকল. উর্ম্মিলা!......উর্ম্মিলা!......

একবার দুবার তিনবার ঢাকার [illegible] কেশরের পায়ের তল হতে মাথা পর্য্যন্ত সব কাঁপছে!......

নাভিদেশ হতে একটা কুণ্ডন ধীরে ধীরে উপরে ঠেলে উঠছে!......

নাক চোখ, মুখ কান দিয়ে যেন আগুনের হলকা ছুটছে!......

সহসা এমন সময় দরজাটা খুলে গেল।

উর্ম্মিলা কেশরের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলে, একি কেশর কি হয়েছে তোমার?......

উর্ম্মিলা হাত বাড়িয়ে কেশরকে ধরলে!......

'উঃ আমি আর পারছি না উর্ম্মিলা!......এ বোঝা আর আমি বয়ে বেড়াতে পারছি না. আমায় মুক্তি দাও!......আমায় বাঁচাও!......'

'কেশর! কেশর!......'উর্ম্মিলার স্বর বুজে এল।

*   *   *

ভোরের আলো ধরণীর বুকে ভাল করে ফোটবার আগেই, কেশর উর্ম্মিলার ঘর ছেড়ে পালাল।

আর উর্ম্মিলা শয্যার লীন হয়ে ঘৃণা ও লজ্জার অতীত হয়ে চোখ বুজে পড়ে ছিল!......

(১৪)

'তোমারও কি তাই ধারণা বাবা?—

—শুধু আমার কেন সকলেরই ত' তাই ধারণা মা'—

—'তা হলে তোমারও মতে কেশরবাবু উর্ম্মিলাকে নিয়েই পালিয়েছেন!'

—'মনে হয়।—'

সকাল বেলা চা খেতে খেতে চৈতালী ও সোমেশবাবুর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। সোমেশবাবুর হাতে সেদিনকার একখানা দৈনিক খোলা কাগজের উপরেই চোখ রেখে সোমেশবাবু বললেন, 'কি জান মা. মানুষের মন এমন জিনিষ যে. সেখানে ফাঁকি চলে না। বাইরের চোখ দুটোকে অনেক সময় ঢাকা দেওয়া গেলেও. সেখানে ভুলের মাশুল কড়ায়-গণ্ডায়ই বুঝিয়ে দিতে হয়। কেশরের সঙ্গে যদি আমার পূর্ব্বে কোন পরিচয় না থাকত, যদি না তাকে এই ঘটনার আগে একটিবারও দেখতাম. তবে হয়ত অনেক কিছুই ভাবা যেত. কিন্তু আজ ত' আর তার উপায় নেই। তবে আমার মনে হয় কোথায় যেন একটু গোলমাল হয়ে গেছে; না না চৈতী কেশরকে অতটা ছোট ভাবা যায় না।—'

একথার উত্তরে চৈতালী আর বেশী কিছুই বললে না, শুধু বললে, 'হ্যাঁ বাবা তোমার সেইদিনের পরে আর কৌশিক-বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না মা দেখা হয়নি। গিয়ে দেখি দরজায় তালা বন্ধ; খোঁজ করে জানলাম কৌশিকবাবুরা নাকি চেঞ্জে গেছেন।'

'আজ ত' তোমার ব্যাঙ্ক হতে টাকা আনবার দিন না?—'

'হ্যাঁ!......কিন্তু কেন মা?—'

'চল না বাবা আমরাও কোথাও হতে ঘুরে আসি; এই কলকাতায় যেন মন আর টিকতে চাইছে না!—'

'বেশ ত' মা চল!......কিন্তু কোথায় যাবে?'

'আর কোথায় যাব?......যে কোন একদিকে গেলেই

হল; তবে আর দেরী করব না, কাল পরশুর মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব কেমন?—'

'বেশ!—'

'তুমি একটু বস বাবা; আমি গীতাকে বাজারে পাঠিয়েছিলাম, দেখি সে এল কি না।......অনেকদিন তোমার ভাল করে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে না!'

চৈতালী ধীর পদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

চৈতালীকে যেন আজকাল দেখলে আর চেনাই যায় না। এই পাঁচ-ছয় মাসে তার উপর দিয়া যেন একটা বৈশাখী ঝড় বয়ে গেছে। যেন রজনীগন্ধার বনে ঝড় বয়ে গেছে।

চৈতালীর মনের কোথায় যে ব্যথা তা সোমেশবাবুর অবিদিত ছিল না; সোমেশ একাধারে ছিল মা ও বাপ চৈতালীর কাছে!

স্ত্রীর মৃত্যুর পর এ সংসারই যেদিন সোমেশের চোখের সম্মুখে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছল। এবং সহস্র পরিজন বেষ্টিত সংসারের মাঝেও নিজেকে একাকী বলে মনে হয়েছিল, সেই সময় এই দেড় বৎসরের মেয়ে চৈতীই তার ছোট ছোট বাহু দুটি বাড়িয়ে সোমেশকে আবার সংসারের মধ্যে টেনে নিয়েছিল।

এবং সোমেশের বিরাগী মন চৈতালীর স্নেহের ধারায় শান্ত হল।

তার বহির্মুখী মন এই মেয়েকে কেন্দ্র করেই 'আবর্ত্ত' রচনা করে ফিরতে লাগল। কেশরের প্রতি চৈতালীর যে আকর্ষণ, ভালবাসা তা তার অবিদিত ছিল না, এবং যখন সে এর একটা মীমাংসা করবে বলে মনে মনে প্রায় সংকল্প করে এনেছে এমন সময় সহসা কেশর ঘটালে বিপত্তি। সোমেশ দিশেহারা হয়ে গেল।

নিশিদিন সে এই বিবর্ত্তনের মাঝ হতে মুক্তির উপায় খুঁজে ফিরতে লাগল। দূর হতে সে চৈতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখত আর অশ্রুভারে চক্ষু দুটি হয়ে উঠত পরিপূর্ণ।

বৃথাই সে রাতের পর রাত বিনিদ্রভাবে আপন শয়ন ঘরে পায়চারী করে কাটিয়ে দিতে লাগল।

তার ইচ্ছা হত তার স্নেহমাখা হাত দুটি দিয়ে চৈতালীর সকল ব্যথা, সকল বেদনা মুছে নেয়।

চৈতালী ঘুমালে কতদিন সোমেশ ওর শয্যার পাশটিতে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ নয়নে মেয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

আহা তার চৈতী; তার এত দুঃখ! আর সে নিরুপায়!......ভগবান ওকে নিরাময় কর! ...ওকে মুক্তি দাও!......

কেশরের প্রতি চৈতালীর যে প্রেম, সে যেমনি ভরাট তেমনি সম্পূর্ণ!

সমুদ্রের মতই তা বিরাট, সূর্য্যের আলোর মতই পরিষ্কার!

কেশরের বিরহ তাকে প্রথমটা খুবই করলে উতলা, কিন্তু ক্রমে কেশরকে হারানর ব্যথার পরিমাণ ম্রিয়মান হয়ে আসতে লাগল। কেশরের প্রেমে সমাধিস্থা চৈতালীর বাইরের ব্যথাটাকে করলে জয়।

কেশরকে যে ও পেলে না তার দুঃখ তখন আর ওর কাছে তত তীক্ষ্ন রইল না।

সাঁঝের আঁধারটা যখন ধরণীর বুকে ঘনিয়ে আসছে, চৈতালী, সোমেশবাবু ও গীতা গাড়ীতে চেপে হাওড়া ষ্টেশনাভিমুখে চলল।

কলকাতায় তখনই বেশ শীত পড়েছে!......

গাড়ীতে চেপে সোমেশবাবু শুধালেন, গরম জামা কাপড় নিয়েছ ত মা?' ওদিকে হয়ত বেশ শীত পড়েছে!

চৈতালী বললে, হুঁ!'

চলমান গাড়ীর খোলা জানালাটা দিয়ে চৈতালী তখন বাইরের অগণিত জনস্রোতের দিকে চেয়ে ছিল। কর্ম্ম-চঞ্চল শহর; দিকে দিকে তার সহস্র জীবনের সাড়া। কোথাও এর এতটুকু অবসরও নেই! শুধু এগিয়েই চলেছে, পিছন পানে ফিরে তাকাবারও অবসর নেই!

দোকান, মাঠ, গাড়ী, ঘোড়া, লোক, জন, ছবির পর্দ্দার মতই একে একে চৈতালীর চোখের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে!

গাড়ী বড়বাজার ছাড়িয়ে হাবড়ার পুলের উপর এসে পড়ল।

গঙ্গা বক্ষ হতে সুশীতল হাওয়া এসে চৈতালীর দেহ মন যেন জুড়িয়ে দিল। পুলের আলো গঙ্গার ঘোলাটে জলে পড়েছে!......সোনার পাতের মত তারই প্রতিবিম্ব জলের বুকে কাঁপছে—কাঁপছে!

ঢেউ আসছে; ঢেউ পড়ছে; ঢেউ ভাঙ্গছে!......

মাঝে মাঝে দু'একটা ষ্টীমার সিটি দিয়ে গঙ্গা বক্ষকে তোলপাড় করে এদিক-ওদিকে যাওয়া আসা করছে।

অদূরে একটা প্রকাণ্ড জাহাজ সহসা গম্ভীর এক হুঙ্কার দিয়ে গঙ্গা বক্ষ প্রকম্পিত করে তুলল।

গাড়ী এসে ষ্টেশনে লাগল।

মালপত্র চৈতালী ও গীতার জিম্মায় রেখে সোমেশবাবু টিকিট কাটতে গেলেন।

কর্ম্মচঞ্চল শহরের একটা টুকরো যেন এখানে ঠিকরে এসে পড়েছে। বাঙালী, হিন্দুস্থানী, উড়ে, মাদ্রাজী, ইউরোপীয়ান......সকল জাতিরই সমাবেশ; কেউই বাদ নেই!

লালকোর্ত্তা পরা কুলীগুলি মাল নিয়ে ছুটাছুটি করছে।

একটি এগার বার বৎসরের মেয়ে একটি বৃদ্ধের পিছু পিছু ঘোমটা দিয়ে চলেছে। বোধ হয় ও ওরই পুত্রবধূ!...... পিছনে একটা কুলী একটা ছোট্ট রঙচঙে ট্রাঙ্ক বয়ে নিয়ে চলেছে।

সোমেশবাবু ফিরে এলেন; চল মা!......

অনেক বাছাবাছির পর একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন কামরা পাওয়া গেল। গীতা দুটো বার্থে দুটো বিছানা পেতে দিয়ে পাশের থার্ড ক্লাশ কামরায় চলে গেল।

গাড়ীতে চৈতালীরা বাদে একটি ইংরেজ মহিলা ও একটি যুবক ও যুবতী, বোধ হয় ভাই বোন। মেয়েটির মাথায় সিন্দুর নেই।

গাড়ীর ঘণ্টা পড়ল।

প্রকাণ্ড লৌহদানব ধীরে ধীরে নড়ে উঠল। (ক্রমশ)

হিটলারের পরবর্ত্তী দিগ্বিজয়

হিটলারের এইবার আসন্ন দৃষ্টি কোন্ দিকে?—তাঁহার ভাগিনেয় এলবার্ট ফরষ্টার, যিনি ডানজিগের নাজী দলের বর্ত্তমান নেতা, তিনি বলেন—

'Danzig is Hitler's next victory.'

অর্থাৎ হিটলারের বিজয়-কেন্দ্র এইবার হইবে ডানজিগ।

১০ই অক্টোবর তারিখে ডানজিগের উক্ত নাজী-নেতা স্বীয় দলের সকল নেতাদের সম্মিলিত কংগ্রেসে নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা করেন—

"Hitler will reward the Germans of Danzig as he has rewarded and redeemed the Germans of Austria and the Sudeten Lands."

"হের হিটলার ডানজিগের জার্ম্মানগণকে ঠিক সেইভাবেই পুরস্কৃত এবং মুক্ত করিয়া দিবেন যেমন অষ্ট্রিয়ার এবং সুদেতেন অঞ্চলের জার্ম্মানদিগের রক্ষা করিয়াছেন।"

কোন সময়ে এই উদ্ধারকার্য্য আরম্ভ করা হইবে, ফরষ্টার অবশ্য তাহার সঠিক নির্দ্দেশ দেন নাই কিন্তু উক্ত উদ্ধারের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে জোরের সহিত বলিয়াছেন যে ডানজিগ অঞ্চলের ইহুদী-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নূতন প্রবল এক অভিযান অতি শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে।

এই সম্মিলিত কংগ্রেসের বৈঠকের পর যখন এই নাজী-নেতার সুস্পষ্ট ঘোষণা-বাণী শহরময় বিস্তার লাভ করিল এবং উহার সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে নানান উদ্ভট মতামত প্রচারিত হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সহস্র সহস্র ইহুদী-পরিবার ডানজিগ নগরী পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তাহারা দলে দলে যাইয়া স্থানীয় আমেরিকান লিগেশন-এ জমায়েত হইল এবং আমেরিকায় যাইবার পাশপোর্টের জন্য আবেদন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের আকুল আবেদন, আবেগময় কাকুতি-মিনতি—কিছুতেই কিছু ফল হইল না। আমেরিকান রাজদূত এই প্রকার অগণিত সংখ্যায় পাশপোর্ট প্রদান করিবার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন।

ভার্সাই চুক্তি অনুসারে ডানজিগ "ফ্রী সিটি" রূপে নির্দ্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন ভার্সাই-সন্ধির বিলোপ সাধনে আর ডানজিগ শহরের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ নাই—ইহার এখন "ফ্রী সিটি" বলিয়া যে স্বাধীনতা, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে নাজীদিগের শাসনাধীনেই ইহা অধিষ্ঠিত। নাজী-শাসনতন্ত্র এখানকার সকল সংবাদপত্রই গোপনে দমন করিয়া রাখিয়াছে, কেবল নিজেদের সমর্থক সংবাদপত্র ও মুখপত্র কয়খানাকেই প্রকাশের ও প্রচারকার্য্যের সুবিধা দান করিয়াছে। সকল রাজনৈতিক দল সম্বন্ধেই এই নীতি অনুসৃত হইতেছে। নাজী-দল ভিন্ন অন্য কোনও রাজনৈতিক দল বা সঙ্ঘকে প্রকাশ্যে কোনও আন্দোলন, সভা-সমিতি বা যে-কোনও প্রকার প্রচারকার্য্য চালাইবার সুযোগ দেওয়া হয় না। অধিকন্তু সন্দেহজনক রাজনৈতিক সমিতি অথবা ব্যক্তি-সম্বন্ধে দমন করা হইতেছে কঠোর হস্তে। নাজী-দলের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিবার উপায় নাই প্রকাশ্যে, যদি কেহ নাজী-দলের কোন কার্য্যের বিরূপ সমালোচনা করে, তবে আর তাহার লাঞ্ছনার শেষ থাকে না।

নাজীদের প্রধান দৃষ্টি ইহুদীদিগের উপর। প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর অনুরাগী বা পক্ষপাতীদের উপরও নাজী-দলের কড়া নজর রহিয়াছে। তাহাদের গঠিত কোনও সমিতি বা সঙ্ঘ প্রকাশ্যে সম্মিলিত হইতে পারে না—প্রকাশ্যে মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ গ্রহণের দমন করা হয় অতি সতর্কতার সহিত।

হের ফরষ্টার বলেন—ডানজিগ স্বেচ্ছায়ই হের হিটলার এবং তাঁহার অপরিমিত শক্তির অভিভাবকত্বের অধীনে নিজেকে স্থাপন করিয়াছে। ডানজিগ জানে, ইহাই তাহার কল্যাণের একমাত্র অপরিহার্য্য পন্থা।

ইতিমধ্যে জার্ম্মান সংবাদপত্রসমূহে ব্রিটেনের প্রতি হিটলারের সতর্কতার বাণী নানা ব্যাখ্যায় প্রবলভাবেই অবিরাম প্রতিধ্বনিত করিয়া চলিয়াছে। দি হামবুর্গার ফ্রেমডেনব্লাট বলে—হের হিটলার যে সতর্কতার বাণী দ্বারা ইংলণ্ডের প্রাণ আতঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা মিষ্টার চেম্বারলেন বা তাঁহার কেবিনেটের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু যে সকল দল মিউনিক-চুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে জটিল ও আতঙ্কময় করিয়া তুলিতে সমানভাবে চেষ্টা করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধেই হের হিটলার ঐ প্রকার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এই সকল রাজনৈতিক মণ্ডলীই ইউরোপের রাজনৈতিক সমস্যাকে চরম দুর্গতির দিকে আপ্রাণ চেষ্টায় আকর্ষণ করিতেছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের মন্ত্রিত্বের গদি অধিকার করিয়া বসিবার, যেন একবার ঐ উচ্চাসন জুড়িয়া বসিতে পারিলেই নিমেষে কৌশলে কল টিপিয়া সারা ইউরোপের ডিক্টেটারদের বিরুদ্ধে একটা নেহাৎ স্বার্থপর সংগ্রাম বাধাইয়া তুলিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু জার্ম্মানী ভিন্ন অপর দেশের সংবাদপত্রসমূহে হিটলারের এই উচ্ছ্বাসের ভিতর অন্যরূপ অভিসন্ধিরই প্রকাশ দেখিতে পাইতেছে এবং উহার ভিতর একটা দৃঢ় তাৎপর্য্যই লুক্কায়িত আছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। একখানি ফরাসী সংবাদপত্রে মাদাম টাবো লিখিয়াছেন, লণ্ডনে সকলের বিশ্বাস, হিটলার ঐ উক্তি দ্বারা বৃটেনকে হুমকি দিয়াছেন এবং পশুবলের আস্ফালনই করিয়াছেন। উহার ভিতর এমন একটা ইঙ্গিতই যেন রহিয়াছে যে, আগামী অনতিদূরে বৃটেনের সহিত উপনিবেশ সমস্যা লইয়া যে বোঝা-পড়া জার্ম্মানী করিয়া লইতে অগ্রসর হইবে, তাহারই যোগ্য মুখবন্ধ স্বরূপে সাবধানতার বাণী ইহা। অর্থাৎ চেকদের যে-প্রকার পূর্ব্বে হইতেই জানিতে দেওয়া হইয়াছে যে, 'তোমরা এই এই ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও' ইহাও বৃটেনের প্রতি সেই প্রকারেরই বিজ্ঞপ্তি যে, 'তোমাদের সময় দিলাম, মন স্থির করিয়া লও ইতিমধ্যে।'

হিটলার প্রকারান্তরে বৃটেনকে জানাইয়া দিয়াছেন, কোন্ শ্রমিক-নিয়ন্ত্রিত গবর্ণমেণ্ট বৃটেনে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার অনুমোদন প্রাপ্ত হইবে। মিউনিক-চুক্তির ফলে সারা বিশ্বের

(শেষাংশ ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মিলনান্ত ব্রহ্মচারী

(গল্প)

শ্রীরামপরায়ণ রায়

শ্রীমান চৈতন্যময় চট্টোপাধ্যায় স্বনামধন্য রায় বাহাদুর রামগতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য একমাত্র পুত্র। রায় বাহাদুরের ভাগ্য সর্ব্ব বিষয়ে সুপ্রসন্ন হইলেও সন্তান স্থানের রেখাটুকুর মধ্যে বোধ হয় অনেক কিছু কাটকুট হইয়াছিল এবং সেই জন্যই অনেক দুঃখকষ্ট সাধনার পর, অনেক মানত মানসিক তুকতাকের পর যখন শ্রীমান চৈতন্যময় মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, তখন শত শত বাধাবিঘ্ন ফাঁড়া কাটাইয়া কোন ক্রমে টিঁকিয়া গেল। এবং যখন তিলে তিলে বড় হইতে লাগিল তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের অন্ধ কাল্চার অনুসরণ না করিয়া, তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রায় বাহাদুর অনেক দুশ্চিন্তার পর একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেন। অবাধ অশাসনের ফলে শ্রীমান চৈতন্যময় যে স্বাধীনচেতা হইবে এবং গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে রুখিয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

কোনও প্রকারে পর পর সাতবারের চেষ্টায় ম্যাট্রিক জলধি ডুবিতে ডুবিতে পার হইয়া শ্রীমান কলেজে ঢুকিল। কিন্তু কলেজের বইগুলি নাকি নেহাৎ গোলামী গন্দবাহ, তাই সে সেগুলোকে অযত্নে ধূলায় ধূসর হইতে সাহায্য করিল। পরিবর্ত্তে ঝাড়িয়া মুছিয়া যত্নকে করিয়া রাখিল বড় বড় ব্যায়ামবীরদের পুস্তকাবলী আর সিনেমার লোভনীয় বিজ্ঞাপনসমূহ। ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম সোপান দেহ-গঠন সে বিষয়ে চৈতন্যময় হুঁসিয়ার। এই চৈতন্যময় আজ কলেজ টীমের ভাল খেলোয়াড়, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস সব বিষয়েই। ভাল বক্সিং লড়িতে পারে এবং কুস্তীর প্যাঁচ এবং 'মোকা' সম্বন্ধেও অজ্ঞ নয়। পাঁচ ফিট এগার ইঞ্চি হাই জাম্প এবং এগার ফিট পোল ভল্ট 'রিয়ার' করিয়া ইউনিভার্সিটির রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে।

ডিবেটিং ক্লাবে ব্যাক ব্রাস চুলটাকে মাথার সঙ্গে হাত দিয়া চাপিয়া বসাইতে বসাইতে তর্ক যখন ও জুড়িয়া বসে, তখন তাহার তোড়ে কাহাকেও প্রায় আর স্থির থাকিতে হয় না—কারণ চৈতন্যময় বলশালী হইলেও বুদ্ধিশালীও সমান। সম্মুখ তর্ক-সমরে সে নাকি এ পর্য্যন্ত পরাস্ত হয় নাই। একবার শোনা যায় একটি গার্ল ষ্টুডেন্টের কাছে নাকি সে হতবাক্ হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যের বন্ধুবর্গ বলিয়া বেড়ায় যে, সে চুপ করিয়াছিল ইচ্ছা করিয়াই, শুধু নারী জাতির প্রাপ্য সম্মান এবং শ্রদ্ধার গৌরব বাড়াইবার নিমিত্তই।

বায়োস্কোপ দেখাতেও শ্রীচৈতন্য মহা ওস্তাদ। কোন্ স্টার সপ্তাহে কত বড় করিয়া চুল ছাঁটেন নখ কাটেন এবং কতবারই বা জলকেলি করিবার নিমিত্ত সমুদ্র স্নান করিয়া থাকেন, তাহা তাহার কণ্ঠস্থ আছে। কোন্ অভিনেতা কত লক্ষ ডলার উপার্জ্জন করেন এবং কত করিয়াই বা আয়কর তাঁহাদের দিতে হয় চৈতন্যময় সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

তথাপি চৈতন্যময়ের পণ—ব্রহ্মচর্য্য। বিবাহ তাহার মতে করা উচিত নয়। শ্রীচৈতন্যদেব মহাভুল করিয়াছিল বিবাহ করিয়া, আরও ভুল করিয়াছিল সে পত্নীকে বিচ্ছেদকাতর করিয়া বিবাগী হইয়া। শ্রীমান চৈতন্যময় সে ভুল করিবে না। সে শক্তিধর, সে জগতকে দেখাইবে দেহ গঠনেই মনপ্রাণ সব বশ হয়। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য আয়ত্ত হয়। তাহার মতে খাদ্য বিচার দুর্ব্বলতা মাত্র। কেবল বিবাহ করিয়া স্বাধীনতা যদি না হারাও, তবে তুমি অসাধ্য সাধন করিতে পার। বিবাহই মানুষকে স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত করে। সে বিবাহ করিবে না। গতানুগতিকতা তাহার অসহ্য। তবুও সত্য বলিতে গেলে ইহা আমাদের বলিতেই হইবে যে, মুখে যাহাই বলুক চৈতন্যময় সিনেমা না দেখিলে মনস্থির করিতে পারে না। তাহার ব্রহ্মচর্য্যের অনেক কিছুই নির্ভর করে সিনেমা দেখিয়া দেহমন প্রকৃতিস্থ রাখার উপর।

পুরাতন নৈতিক মাপকাঠিতেই সে এখনও নর-নারীর, যুবক যুবতীর আচরণকে মাপিয়া থাকে, এমন কথা অবশ্য তাহার নিন্দুকেরা বলে। কিন্তু সে প্রাচীনের অনুকরণ নয়—উদারতার অনুকম্পা মাত্র—আধুনিক তরুণ-তরুণীর দেহ গঠনে বিফলতা তাহার নিকট উহাদের কৃপার পাত্র-পাত্রী বলিয়াই মনে হয়। তাই নারী জাতি সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোন ঔৎসুক্য নাই এবং সে নিজে কখনও না মানিলেও ইহা সকলেরই প্রায় জানা আছে যে, সেরা খেলোয়াড় ও সর্ব্বকার্য্য সুদক্ষ চৈতন্যময় যুবতী স্ত্রীলোকের সম্মুখে মুখামুখি দাঁড়াইলে সত্যই যেন কেঁচো হইয়া যায়। এই জন্য তাহাকে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ হইতে অনেক টিটকারী সহ্য করিতে হইয়াছে এবং শত চেষ্টা করিয়াও সে দূর সম্পর্কিত বৌদিদের সামনেও বেশ সপ্রতিভ হইতে পারে নাই এবং তাহাদের পাশে বসিয়া মার্লিন ডিয়েট্রিস কিম্বা রুডেট কলবার্টের প্রায়-নগ্ন ছবি দেখিতে পারে নাই। এ সকল সম্বন্ধে তাহার মতামত আলাদা এবং এখনও মা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকের সহিত সে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারে না। বন্ধু-বান্ধবদের বিবাহে সে গিয়াছে বটে এবং উপহারাদিও দিয়াছে, তবে বন্ধুর স্ত্রী বলিয়া তাহার সহিত বসিয়া গল্প করা কিংবা গান শোনা তাহার পক্ষে আজ পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই।

শ্রীমান চৈতন্যময় হঠাৎ একদিন এলবার্ট হলের সিঁড়ি দিয়া নীচে ফুটপাথে নামিয়া একলা খানিকক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার পর কি যেন ভাবিয়া একবার এ দিক ওদিক চাহিয়াই জুতা জোড়াটা ছুঁড়িয়া দিল এবং এই গদাময় চর্ম্ম-পাদুকার নিক্ষেপই যে মৃদু গুঞ্জনময় বাক্যমধুর মিলনান্ত অবতরণিকারূপে প্রতিপন্ন হইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবিয়া রাখে নাই।—

ব্যাপারটি সঙিনই দাঁড়াইয়াছিল; এলবার্ট হলে সে দিন স্বামী প্রলয়ঙ্করানন্দজী, আমেরিকা, জার্ম্মানী, স্কান-ডিনেভিয়া, কামসকাটকা, পেগু, হনলুলু, জানজীবার, নিউ-জিলাণ্ড, কলম্বো, মোম্বাসা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ঘুরিয়া আসিয়া বৈদেশিক অভিজ্ঞতা এবং ভাবধারার উপর ভিত্তি করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান

করেন এবং আমাদের শ্রীমান চৈতন্যময় এই মহা জ্ঞানী গুণী স্বামীজীর অমূল্য উপদেশ এবং ততোধিক মহার্ঘ্য বাণী শুনিবার জন্যই, দুই আনা বাসের ভাড়া খরচ করিয়া স্পন্দিত হৃদয়ে আসিয়া হাজির হইয়াছিল।

স্বামীজী, ইংরেজী, বাঙলা, হিন্দী, ফরাসী, জার্ম্মানী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় খিচুড়ি দ্বারা এক অভূতপূর্ব্ব এবং অত্যদ্ভুত বক্তৃতাবলী পরিবেশন করিয়া যান এবং সমগ্র হল ঘরটি মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনিতে ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া, ইহাই শুধু কলেজ ষ্ট্রীট পথচারীকে বিজ্ঞাপিত করিয়া দিতেছিল যে, স্বামীজীর বারতা দুর্ব্বোধ্য হইলেও, রসগ্রহণ কিংবা ভাবার্থ গ্রহণ করিবার লোকের অভাব হল-ঘরের ভিতর অন্তত তখন ছিল না।

শ্রীমান চৈতন্যের কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতা বড়ই ভাল লাগিয়াছে—বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া মোটেই নহে। স্বামীজীর নধর দেহকান্তি হইতে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছিল তাহা দেখিয়া দেহগঠনের পূজারী চৈতন্যের ভাবসমাধি হইবার উপক্রম হইল! স্বামীজীর স্বপ্নান্বেষী চক্ষুযুগল কোন সুদূরের বার্ত্তা যেন বহন করিয়া আনিতেছে। শ্রীমান চৈতন্য এক প্রকার প্রায় অভিভূত বলিলে যদি ব্রহ্মচর্য্য ক্ষুণ্ণ না হয়—তাহা হইলে তাহাই হইয়া গেল।

স্বামীজী বলিয়াছিলেন—"দেশমাতার সঙ্গে আমরা আর সংস্পর্শ রাখতে চাইনে—আর সেটা চাইনে বলেই আজ আমাদের এ দুর্গতি।"

প্রথমটা ইহার মানে সে ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তাহার পর পারিয়াছিল—অর্থাৎ জুতা পরিয়া পরিয়া মাটির উপর দিয়া নগ্নপদে চলা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি এবং "মা'টির সহিত সংস্পর্শ শূন্য হইয়া পড়াতেই আমরা চক্ষু-রোগাদি বিবিধ উপসর্গের হাত হইতে আর নিষ্কৃতি পাই না!"

চৈতন্যময় চমৎকৃত হইয়া গেল, স্বামীজীর এ গভীর রহস্যময় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার ইংগিতে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিস্বরূপ এই অদৃশ্য সেতুর উপর দিয়া এই যে ধর্ম্মের রেল গাড়ী চালাইয়া লইয়া গেলেন স্বামীজী, সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এবং ড্রাইভারের মতন, দেহ-বৈজ্ঞানিক চৈতন্যময় আর তাহাতে অভিভূত ও গদ্‌গদ্ হইয়া পড়িবে না কেন বলুন!

তাহার পর আরও কত যে উপদেশাবলী এবং দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কুহেলীময় মতবাদ বেদী হইতে প্রায় সবাসাচীর মতই অযাচিতভাবে শ্রোতৃবৃন্দের উপর বর্ষণ করিলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। স্তব্ধ বিস্ময়ে (মধ্যে মধ্যে অবশ্য করতালি ধ্বনিতে ধ্বনিত হইয়া) দুই ঘণ্টাকাল অতিক্রান্ত হইবার পর সভা ভঙ্গ হইল। শ্রোতৃবৃন্দ হল্লা করিতে করিতে কেহ বা দেলখোস কেবিনাভিমুখে ছুটিয়া চলিল; কেহ বা গোল-দীঘির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এই শুনিয়া যে, বিলাত হইতে কোন্ এক মেম সাহেব নাকি আসিয়াছেন, ঝম্পপ্রদানের কায়দা প্রদর্শন করিতে।

কিন্তু স্বামীজীর বাক্যবাণে শ্রীমান চৈতন্যের সুপ্ত চৈতন্য খোঁচা খাইয়া যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। সত্যই ত দেশের মা'টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্রব না রাখিলে কি কেহ ব্রহ্মচর্য্য অটুট রাখিতে পারে। সে ভাবিয়া দেখিল এ জন্যই নেতারা স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ায় নগ্নপদে লাঠিখেলার বিধান দিয়াছে। বাঙালীর ফুটবল খেলায় খালি-পাও বোধ হয় সে কারণেই। ব্যস্! সে প্রায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, আজ হইতে জুতা ত' সে ত্যাগ করিবেই, তাহার উপর নগ্নপদে সে কলেজ ষ্ট্রীট হইতে রাসবিহারী এভেনিউ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া স্বামীজীর বাণীর প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে।

এবং যেহেতু কোন জিনিস হইতে নিজেকে বাঁচাইতে হইলে জোর করিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইতে হয়, কিংবা সেই দ্রব্যটিকেই জোর করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়, তাই শ্রীমান চৈতন্যময় শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছিল এবং করিয়াই তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া ফেলিল।

জুতা জোড়াটি সজোরে অথচ নিঃশব্দে চলমান এক মোটর গাড়ীর আরোহিণীর সুকোমল অঙ্কে নিজের স্থান করিয়া লয়। চৈতন্যময় মোটরের আগমন অনুমান করিতে পারে নাই, কারণ মোটরটি হঠাৎ যেন কোথা হইতে আসিয়া মোড় ঘুরিয়া সজোরে তাহার সম্মুখস্থিত রাস্তায় প্রবেশ করিতেছিল। শ্রীমান চৈতন্যময় যখন ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম সোপানস্বরূপ জুতা পরিত্যাগের সংকল্প করিয়া জুতা জোড়াটি নিক্ষেপ করিয়াছিল তখন আশেপাশে কোন মোটরই ছিল না, কাজে কাজেই, শ্রীমান চৈতন্যের এ অপরাধ ইচ্ছাকৃত মোটেই নহে, তাহা কেহ বিশ্বাস না করিলে সে আদালতে হলফ করিয়াও বলিতে প্রস্তুত আছে। আরও একটা কথা, চৈতন্যময় জুতা জোড়াটি নিক্ষেপের পূর্ব্বে একবার এদিক ওদিক চাহিয়াও লইয়াছিল।

শ্রীমানের অন্তরটা একবার হায় হায় করিয়া উঠিল—সে আজ এ কি করিয়া বসিল! মানস চক্ষে তাহার প্রতিফলিত হইয়া উঠিল সহস্র সহস্র লোকের ধিক্কার এবং হয়ত বা এই জন্যই তাহাকে মানহানির অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়া না দাঁড়াইতে হয়। সংবাদপত্রের অঙ্গে বড় বড় হরফে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—রায় বাহাদুর রামগতি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ববিষয়ে যে সুদক্ষ সেই চৈতন্যময়ের আজ এ কি নিদারুণ নৈতিক অধঃপতন।

কেমন করিয়া সে লোককে বুঝাইবে যে, ব্রহ্মচর্য্য সাধনায় দীক্ষিত হইতে গিয়া সুন্দরী যুবতী ভদ্রমহিলার সুকোমল অঙ্কে জুতাজোড়াটি নিক্ষেপ করিয়াছে। বায়োস্কপের ছবির মতন এই প্রকার বিভিন্ন প্রকারের ছবি তাহার মনের দেওয়ালে প্রতিবিম্বিত হইয়া আবার অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল।

মুহূর্তের মধ্যেই এত সব সে ভাবিয়া ফেলিল। একবার ভাবিল এলবার্ট হলের সিঁড়ি দিয়া আবার উপরে পলাইয়া যায়—আবার ভাবিল,—শেষে আর ভাবিতেই পারিল না।

ব্রেক কসিয়া একটা 'খোস' শব্দ করিয়া মোটরটা একেবারে তাহার সামনেই থামিয়া পড়িল। চোখে সে এইবার সত্য সত্যই অন্ধকার দেখিল এবং মনে হইতে লাগিল তাহার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের মাঝখানে কে যেন বরফ-গোলা জল ঢালিতেছে—এমনি ঠাণ্ডা হইয়া গেছে বুকটা। আর ত মোটেই দেরী নাই, এইবার লাঞ্ছনা এবং অপমানের চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইবে আহতা-ফণিনী!

কিন্তু পথধূলি চর্চ্চিত (অবশ্য জুতার সংস্পর্শজনিত!) কোঁচড়টি ঝাড়িতে ঝাড়িতে যে আনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীটি হাসির বিজলীচমকে চৈতন্যময়কে প্রায় হাত ধরিয়া বন্দী করিয়া ফেলিলেন, তিনি আর কেহই নহেন, তাহার খুড়তুতো দাদার বিলাত-ফেরৎ স্ত্রী। অর্থাৎ, তাহার দাদার সহিত বরাবর বৎসরে একবার অন্তত বিলাত যান, আবার ফিরিয়া আসেন! মুখে গোঁজা রুমালের কোণটা দাঁত দিয়া কাটিতে কাটিতে এবং তৎসহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এই ভর সন্ধ্যার সময় গৃহস্থের কুলবালার গায়ে জুতো ছুড়ে মেরে তোমার ব্রহ্মচর্য্যের নতুন পর্ব্বের মহলা দিচ্ছিলে?

চৈতন্যময় কি বলিবে—লজ্জায় লাল হইয়া সে ভাষা হারাইয়া ফেলিয়াছে, পা দুটাও কেমন যেন আর দেহের ভার বহন করিতে পারিতেছে না। বসিয়া পড়িবে না-কি ফুটপাথে!

তাহাকে নীরব লালিমায় কম্পমান লক্ষ্য করিয়া বৌদিদি বলিয়া চলিলেন—"ঠাকুর-পোর যে বড্ড পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান হয়—এবার কেমন জব্দ!—শুড় শুড় করে ভাল ছেলেটির মত গাড়ীতে উঠে পড়—তা না হলে"—কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে চোখ দুটি পাকাইয়া এবং টানা ভ্রমর কৃষ্ণ ভ্রূ দুটি কুঁচকাইয়া বলিলেন—"পুলিশে খবর দোব।"

যাক্‌, চৈতন্যময় এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—সে একেবারে ঘামিয়া গিয়াছিল! টুনু বৌদি না হইয়া যদি অন্য কেউ হইত—নাঃ এলবার্ট হলে সে আর কোন দিন বক্তৃতা শুনিতে 'বাস' ভাড়া খরচ করিয়া আসিতেছে না, বিশেষত বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায়! কিছুতেই আর না।

বৌদিদি শ্লেষের সঙ্গে বলিয়া যান—"ঠাকুর-পো, তোমার অত বড় মাথাটা খারাপ হয় নি ত ভাই—এলবার্ট হলের লেকচারে আমিও ত ছিলুম। ভয়ঙ্কারানন্দ না প্রলয়ঙ্করানন্দ কি যে নাম ওর,—তোমার দাদার যে খুব বন্ধু—বিলেতে আমাদের ওখানেই দু মাসখানেক ছিলেন। তাঁর জুতোর বিরুদ্ধে লেকচার শোনার পরই—আমি সরে পড়ি। ওদের কি জান ভাই—যেটা ধরবেন কিম্বা যা বলবেন একেবারে শেষ পর্যন্ত গিয়ে তবে কথা। আর তোমাকেও বলি ভাই—ব্রহ্মচর্য সাধনের 'মোহড়া'স্বরূপে জুতোটা যদি ছাড়তেই হয়—তা কি আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এমন করে ছুড়ে ভদ্রমহিলাকে এমন করে আহত করতে হয়"—এবং আরও অনেক কথাই বৌদিদি গাড়ীর একপাশ-ঘেঁসা সলজ্জ দেবরটিকে শুনাইয়া যান।

শ্রীচৈতন্য উৎফুল্ল মুখে বৌদিদিকে মনে মনে শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকে।

তাহার আর সে দিন ব্রহ্মচার্য্য সাধনের বাকি কয়টি পর্ব্ব প্রতিপালন করা ঘটিয়া উঠে না। কারণ বৌদিদির অনুরোধ এবং অনুরোধ উপেক্ষা করিলে অঙ্গে হস্তক্ষেপের ভয়; পরিত্যক্ত এবং নিক্ষিপ্ত জুতাজোড়াটি না পাইয়া নূতন এক জোড়া সদ্য কিনিয়া আবার পরিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত বৌদিদির অত্যাচারে এবং পীড়াপীড়িতে গ্লোজাতে নবাগত বৈদেশিক ছবিটিও দেখিতে হইয়াছে। এবং তাহার পর হোটেলে আসিয়া চপ, কাটলেট, মামলেট ইত্যাদিও বৌদিদির পাল্লায় পড়িয়া খাইতে হইয়াছে। নইলে বৌদিদি কচি ছেলের মত তাহাকে জোর জবরদস্তিতে খাওয়াইয়া দিবেন—এমন অনুশাসনও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

বৌদিদির মোটর যখন বাড়ীর গেটের সামনে শ্রীমান চৈতন্যময়কে ছাড়িয়া, পিছনে খানিকটা ধুঁয়া ছড়াইয়া গলির রাস্তাটা পার হইয়া চলিয়া গেল—তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা।

শ্রীমান চৈতন্যের "জুতা ছোড়া"রূপ ব্রহ্মচর্য্য সাধনের প্রথম প্রক্রিয়াজনিত মানসিক উত্তেজনায় সারা দেহ মনের স্নায়ুসমূহে কেমন যেন একটা অযথা টান পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। পরিশ্রান্ত দেহভার লইয়া চৈতন্য শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল বহিরটা একেবারে রোদে ভরিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মচর্যরূপ কৃচ্ছ্র সাধনার প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ—প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ—আজ এই প্রথম তাহার ভঙ্গ হইল। ক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্য দায়ী করিল তাহার বৌদিদিকে।

খবরের কাগজের পাতাটা উল্টাইতে উল্টাইতে শ্রীমান চৈতন্যময় একটা বিজ্ঞাপনের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল—একটি অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য শ্রী-মণ্ডিত যুবা পুরুষ সুইমিং কষ্টিউম পরিয়া অনুরূপ পরিচ্ছদাবৃত একটি প্রস্ফুটিত লাবণ্যময়ী স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে এই অভিপ্রায়ে যে এখনি উহাকে দূরে ছুড়িয়া দিবে বলিয়া। যুবতীটিও হাসিতে হাসিতে যুবকের গলাটি হাত দুটি দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। এমত অবস্থায় তাহার চোখে প্রজ্ঞানানন্দ...নাদুস নুদুস ভুঁড়িভূষিত গেরুয়া ঢাকা দেহকান্তিটি ক্রীড়াচঞ্চল হাস্যোজ্জ্বল এই যুগলমূর্ত্তির সামনে কেমন যেন ম্লান এবং নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

হঠাৎ পিঠে ছোট্ট একটি কীল খাইয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখে বৌদিদি পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—"কি হচ্ছে ও ব্রহ্মচারীজী! হাঁ করে যে ছবিখানা গিলছ দেখছি। জেঠাইমার কাছে গিয়ে সব ফাঁস করে দিচ্ছি। তোমার সব ব্রহ্মচর্য্যগিরির ধাঁজধরণ বুঝে নিয়েছি। জুতো ছোড়া হয়েছিল কোন রূপসীটিকে মনে করে? ভুলে পড়ে গেল এ খাঁদামুখী.....না না, আর বলব না। রাগ কর না ভাই। কতজনে টানে পড়ে কত কান্ডই করে, তুমি না হয় জুতো.........(জিব কাটিয়া)......ক'টা দিন সবুর কর......দাঁড়াও এবার বিলেত যাবার আগেই—এই অগ্রঘানেই তোমার ব্রহ্মচর্য্যের শেষ পর্ব্ব মিলনান্ত সাধন সিদ্ধি করে দিচ্ছি।"

বৌদিদি গিয়া, শ্রীমান চৈতন্যময়ের মায়ের কাছে অর্থাৎ তাঁহার জেঠাইমার কাছে কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানা নাই—তবে, ৭ই অগ্রহায়ণের এক বিবাহ বাসরে অতি অদ্ভুত এক উপহারে বাসর ঘর ফাটিত হইবার জোগাড় হয়।

বাসর-ঘর উজ্জ্বল এবং নৃত্যমুখর করিয়া শ্রীমান চৈতন্যের টুনু বৌদি যখন বিদেশিনী নর্ত্তকীদের অনুকরণে অঙ্গবিক্ষেপ দ্বারা বাসরের চিরাচরিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন এবং বর সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে না পারিয়া অধোবদনেই থাকিতে বাধ্য হইতেছিল—যদিও বরের দুইটি ষোড়শী চতুর্দ্দশী শ্যালিকা বলিতেছিল, জামাইবাবু লজ্জা করে ত ঘোমটা দাও না, ঘোমটার ফাঁক থেকে বেমালুম খেমটা

নাচ দেখতে পাবে, অমন চোরা চাহনী দাও কেন? তখন, ঝি আনিয়া ভেলভেটে মোড়া বাক্সটি এবং উহার সংগী একখানা চিঠি হাজির করিল।

ভেলভেটে মোড়া বাক্সটি খুলিয়া ষোড়শী শ্যালিকা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল—অন্য এক সুন্দরী বাক্সশুদ্ধ তুলিয়া ধরিল সবার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য—এক পাটি আধ-ছেঁড়া স্যাণ্ডেল! ধুলোকাদা মাখা।

তখন চিঠির কথা স্মরণ হইল। চতুর্দ্দশী শ্যালিকা সেখানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িয়া গেল—

ব্রহ্মচারীজী! তোমার ব্রহ্মচর্য্যের শেষ পর্ব্বের উৎসবে (বিয়োগান্ত না মিলনান্ত, তুমিই বুঝিয়া লও) আজ আর কি উপহার দিব! শেষ পর্ব্বের যে প্রেমদূত (মেঘদূত, হংস-দূত অপেক্ষা কোনও অংশে মঞ্জুশ্রী-বিহীন নয় অথবা চটপটায়মান মধুর-গুঞ্জনে আভিজাত্য মদিরা বর্জ্জিতও নয়) সেই তোমার শ্রীচরণাশ্রিত সেবক শ্রী স্যাণ্ডেলকে তোমার হস্তেই অর্পণ করিলাম। দেখিও, আবার কোনও রূপসীর দিকে উহা তাগ করিয়া প্রেমদূতের অবমাননা করিও না। আশা রহিল উহাকে দেবতার আশিসের মত শিরে ধরিয়া মঞ্জুল ছন্দে নৃত্য করিয়া বাসর বিহারিণীদের কৌতুক উৎপাদন করিবে। আত্মপ্রসাদও লাভ করিবে। ইতি—

শ্রীমতী মোটর বিহারিণী

এলবার্ট হলের সম্মুখ, বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা।

হিটলারের পরবর্ত্তী দিগ্বিজয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উপরে যে নূতন আক্রমণ সৃষ্ট হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়েছে যে হিটলারের মন যোগাইয়া চলা সহজ ব্যাপার হইবে না। কিন্তু সহজই হউক আর কঠিনই হউক, ইংরেজকে এখনও বহুকাল, অন্তত "ব্রিটিশ এয়ার ডিফেন্স" য়ের মতে আঠারো মাস, হের হিটলারের পদলেহন করিয়া চলিতে হইবে।

"এয়ার ডিফেন্স অব বৃটেন" নামে পুস্তিকায় জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডের বিমান-বলের তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মনীর ন্যায় ঘণ্টায় ৪৪০ মাইল গতিবেগসম্পন্ন বোমাবর্ষী প্লেন (যাহাতে ৪০০০ পাউণ্ড ওজনের বোমা বোঝাই করা যায়) বৃটেনের তৈরী হইতে এখনও আঠারো মাস সময় লাগিবে। এবং সেই সময় হইতে বৎসরে ১৯০০০ মেশিন তাহাদের প্রস্তুত করিতে হইবে যদি সমর বাধিয়া যায়।

"এয়ার ডিফেন্স" আরও দুঃখের সহিত জানাইয়াছে যে, বার্সিলোনায় জার্ম্মান-বোমাবর্ষী এরোপ্লেন যে নিঃশব্দতার আশ্চর্য্য গুণে জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে, সে স্তরে পৌঁছিতে বৃটেনের এখনও বহু দেরী। ঐ এরোপ্লেনগুলি ২০,০০০ হইতে ৩০,০০০ ফুট উচ্চ দিয়া উড়িয়া আসে—কোনও শব্দই কেহ শুনিতে পায় না। সতর্কতা গ্রহণের অবকাশও থাকে না। সহসা নিম্নে নামিবে এবং কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহার পূর্ব্বে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে না—এমন কি সারা বৃটেনে যে সাউণ্ড ডিটেক্টার (শব্দ-টের পাইবার) যন্ত্রসমূহ রহিয়াছে, তাহা হইতেও কোন ইসারা পাওয়া যাইবে না। বার্সিলোনার এই বিস্ময়কর ব্যাপারে ইংরেজকে আরও আতঙ্কগ্রস্ত করিয়াছে!

এই পুস্তকে আরও প্রকাশ—জার্ম্মান উড়োজাহাজকে লণ্ডনে পৌঁছিতে মাত্র ৩৫০ মাইল আসিতে হইবে ফ্রিজিয়ান দ্বীপের ঘাঁটি হইতে এবং এই শফরে কোনও শত্রুরাজ্য অতিক্রম করিতে হইবে না। আর সেই স্থলে ইংরেজকে বার্লিনে যাইতে ৬০০ মাইলেরও অধিক অতিক্রম করিতে হইবে এবং উহার শেষ ২৭৫ মাইল অগ্রসর হইতে হইবে জার্ম্মান রাজ্যের উপর দিয়া। কাজেই ব্রিটিশ প্লেন বার্লিন পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই সে সংবাদ বার্লিনে পৌঁছিবে এবং প্রতিবিধানের ব্যবস্থা যে কত প্রকার হইবে—সে কথা আর ভাবিয়া লাভ নাই।

সুতরাং বৃটেনের অনুমান আঠারো মাস হইলেও সারা বিশ্বের বিশ্বাস, হের হিটলার বৃটেনকে নাকে দড়ি দিয়া এখনও বহুকাল ঘুরাইবে—যতদিন পর্য্যন্ত হিটলারের দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ না হয়।

পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

শ্রীসুধীরকুমার বসু

ইতালীয় বৈজ্ঞানিক ডাঃ এনরিকো ফেৰ্ম্মি এই বৎসর পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ডাঃ ফেৰ্ম্মি বর্ত্তমানে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর—

এই তরুণ বয়সেই পদার্থ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন গবেষণা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ফেৰ্ম্মি প্রথম বয়সে ইতালীতে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে জার্ম্মানীর অন্তর্গত গটিংগেনে অধ্যাপক বোর্ণের নিকট বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেন। জার্ম্মান বিজ্ঞানী সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের প্রভাবে পদার্থ-বিজ্ঞানে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেন,তাহাই হয়ত এই তরুণ বৈজ্ঞানিককে প্রতিষ্ঠার পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করিয়াছে! ইতালীয় বিজ্ঞান-সমাজে ডাঃ ফেৰ্ম্মি ইতিমধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। আজ নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া তিনি বিশ্বের দরবারেও শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হইলেন!

বিজ্ঞানিগণ তাঁহাদের গবেষণাগারে বসিয়া লোকলোচনের অন্তরালে যে সমস্ত পরীক্ষা কার্য্য পরিচালনা করেন বহির্জগৎ তাহার সন্ধান রাখিবার অবকাশ খুব কমই পাইয়া থাকে। মাঝে মাঝে দুই একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারে সারা বিশ্ব সচকিত হইয়া উঠে। ফেৰ্ম্মির প্রাথমিক গবেষণা সম্পর্কেও সেইরূপ বলা চলে। আমাদের দেশে ডাঃ মেঘনাথ সাহা প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তড়িৎ কণায় পরিণত হওয়া সম্পর্কে (Thermal Ionisation) যে সমস্ত গবেষণা করেন ডাঃ ফেৰ্ম্মিও প্রথমত সেইরূপ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সম্পর্কে তিনি সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ইউরির (Urey) সহযোগিতায় কাজ করিয়া ডাঃ সাহা প্রবর্ত্তিত মতবাদের (Theory of Thermal Ionisation) যে ভাবে পরিবর্দ্ধন করেন তাহাই তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণা বলিতে পারা যায়। মার্কিন অধ্যাপক ইউরি ১৯৩৪ সালে 'ভারী হাইড্রোজেন' আবিষ্কার করিয়া রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ডাঃ ফেৰ্ম্মি যে তাঁহার পূর্ব্বতন সহযোগীর ন্যায় সম্মান লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহা হইতে বিজ্ঞানে তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ডাঃ ফেৰ্ম্মির বিজ্ঞান সাধনার কথা আলোচনা করিতে বসিয়া এই ভাবিয়া আমরা গর্ব্ব বোধ করিতেছি যে, আমাদের দেশের দুইজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ধারা অনুসরণ করিয়াই এই ইতালীয় বৈজ্ঞানিক আজ সাফল্যের পথে জয়যাত্রা করিয়াছেন। ডাঃ মেঘনাথ সাহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অপর একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক যাঁহার গবেষণার ধারা এই ইতালীয় বৈজ্ঞানিককে পথ দেখাইয়াছে ডাঃ বসুর 'ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল মিকানিকস্' (Statistical mechanics) এ গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ফেৰ্ম্মিও তাঁহার প্রদর্শিত পথে এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। কঠোর সাধনাবলে তিনি বিজ্ঞানের এই বিভাগে যে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করেন তাহাতে শীঘ্রই জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদগণের মধ্যে তিনি স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হন। শুধু সাধনার বলে আজ তিনি তাঁহার সমপর্য্যায়ভুক্ত বহু পদার্থবিদকে পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান-সমাজের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ডাঃ ফেৰ্ম্মি বৈজ্ঞানিক ডিরাকের সহযোগিতায় যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা 'ফের্ম্মি-ডিরাক ষ্ট্যাটিষ্টিকস' নামে পরিচিত। ফেৰ্ম্মি আবিষ্কৃত এই সমস্ত তথ্যের দ্বারা পদার্থ-বিজ্ঞানের বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। ধাতুনির্ম্মিত তড়িৎদণ্ড সমূহে কি ভাবে বিদ্যুৎ পরিচালিত হয়, ডাঃ ফের্ম্মির আবিষ্কৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া মিউনিকের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সোমারফেল্ড তাহাও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আধুনিক যুগে পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে যত গবেষণা হইয়াছে অন্য কোন বিষয়ে এরূপ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বিষয়টির জটিলতায় এদিকে যেমন উহা বিশেষভাবে পদার্থবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের সন্ধানেও উহারা কম সহায়তা করিতেছে না। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্বর্গীয় লর্ড রাদারফোর্ড প্রমুখ বহু বিজ্ঞানবিদের গবেষণায় ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে কোন পদার্থের পরমাণুই উহার সমষ্টিগত শেষ অবস্থা নহে। পরমাণু আসলে একটি 'নিউক্লিয়সকে' কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নিউক্লিয়সের চতুর্দ্দিকে 'ইলেকট্রন'সমূহ সূর্য্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের ন্যায় দ্রুতগতিতে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরিতেছে। নিউক্লিয়সও আবার 'একমেবাদ্বিতীয়ম' নহে ইহাও 'প্রোটন' নামক ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কতকগুলি এককের সমষ্টিমাত্র। ঋণাত্মক ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়সের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তড়িতের সাধারণ আকর্ষণী শক্তির নিয়মানুসারে প্রত্যেক ঋণাত্মক 'ইলেকট্রন' ও প্রত্যেক ধনাত্মক 'প্রোটনের' মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় উহাদের কোনটিই বাহিরে কোন তড়িৎশক্তি প্রকাশের পথ পায় না। মোট ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িতের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান হওয়ার ফলে কাহারও বৈশিষ্ট্যই বাহিরে প্রকাশ পাইতে পারে না। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে আবার ইলেকট্রন সংখ্যায় এবং নিউক্লিয়স মধ্যস্থিত প্রোটনের সংখ্যায় বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণু মধ্যস্থিত নিউক্লিয়সকে প্রচণ্ড শক্তি সঙ্ঘাতে আক্রমণ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ করেন। তাঁহারা দেখিতে পান আলফা-রশ্মি ...

আঘাত করিলে নিউক্লিয়সের গঠনবৈচিত্র্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়; ফলে এক মৌলিক পদার্থকে অন্য পদার্থে পর্য্যন্ত রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। বিগত কয়েক বৎসর পদার্থ-বিজ্ঞানে পরমাণু মধ্যস্থিত নিউক্লিয়স সম্পর্কে (Nuclear Physics) বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এ সমস্ত তথ্যসমূহের মধ্যে ১৯৩২ সালে বৈজ্ঞানিক চ্যাডউইক যে তথ্য আবিষ্কার করেন তাহাতে পরমাণবিক বিজ্ঞানের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইলেকট্রন ও প্রোটনকে বস্তুর চরম ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ মনে করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ যখন স্থির সিদ্ধান্ত করিবার উপক্রম করিতেছিলেন সেই সময় বৈজ্ঞানিক ডাঃ জেমস চ্যাডউইক আবিষ্কার করেন, শক্তিশালী রশ্মির সাহায্যে নিউক্লিয়সকে আঘাত করিলে 'নিউট্রন' নামে এক আশ্চর্য্য গঠনের সন্ধান পাওয়া যায়—যাহা আয়তনে ও ওজনে প্রোটনের অনুরূপ হইলেও প্রোটনের ন্যায় উহাতে কোন তড়িৎসংযুক্ত থাকে না। এই গবেষণার নিমিত্ত ১৯৩৫ সালে ডাঃ জেমস চ্যাডউইক পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। চ্যাডউইকের এই যুগান্তকারী আবিষ্কার পদার্থ-বিজ্ঞানে এক নূতন গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, কোন কোন অবস্থায় নিউক্লিয়স মধ্যস্থিত প্রোটন যেমন নিউট্রনে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে—নিউট্রনও তেমনি প্রোটনে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রোটন নিউট্রনে পরিবর্ত্তিত হইলে একটি একটি করিয়া ধনাত্মক ইলেকট্রনের উদ্ভব ঘটে, তেমনি নিউট্রন প্রোটনে পরিবর্ত্তিত হইলে একটি ঋণাত্মক ইলেকট্রনের মুক্তিলাভ হয়। বহু স্বতঃকিরণবিসারী বা রেডিওএকটিভ পদার্থ হইতে হয় ধনাত্মক, না হয় ঋণাত্মক ইলেকট্রন নির্গত হইতে দেখা যায়। উপরোক্ত ঘটনাই তাহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যুরি-জোলিও দম্পতি আবিষ্কার করেন যে, রেডিও-একটিভ বা স্বতঃকিরণবিসারী গুণ কৃত্রিম উপায়েও অন্য পদার্থে আরোপিত হইতে পারে। এরূপ প্রায় এক শতটি রেডিও-একটিভ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের কোনটি বা দ্রুতগতি আলফা-কণা দ্বারা নিউক্লিয়সকে আঘাত করিয়া লাভ করা গিয়াছে, কোনটি বা আবার প্রোটন বা ডিউটারণ দ্বারা আঘাতের ফলে উদ্ভব হইয়াছে। ডাঃ ফের্ম্মি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিউট্রন, বিশেষ করিয়া মন্থরগতি নিউট্রনের সঙ্ঘাতেই এইরূপ পদার্থ-গঠনে অধিকতর ফল লাভ করা যায়। নিউট্রনে কোনরূপ তড়িৎযুক্ত না থাকিলে ইহা অনায়াসে অত্যধিক ভারী পদার্থেরও নিউক্লিয়সের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে এবং সহজে তাহাদের রূপান্তর সাধন করিতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে ইউরেনিয়ম এবং থোরিয়াম নামক দুইটি ভারী পদার্থের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। মন্থরগতি নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিয়া এই পদার্থ দুইটি হইতে কয়েকটি রেডিও-একটিভ পদার্থ প্রস্তুত করা গিয়াছে। ডাঃ ফের্ম্মির গবেষণা এই-ভাবে এক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে—যাহা দ্বারা নিউক্লিয়সের গঠন সম্পর্কিত আরও বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। নোবেল কমিটি তাঁহার এই অসামান্য আবিষ্কারের জন্যই এই বৎসর তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দানে সম্মানিত করিয়াছেন।

ডাঃ ফের্ম্মি সোডিয়ম ও ক্যালসিয়মের সূক্ষ্ম বর্ণচ্ছত্র হইতে তাহাদের নিউক্লিয়সের চুম্বকীয় আবর্ত্তন বলও (magnetic movment) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বাহিরের কোন প্ররোচনা ব্যতীত রেডিয়াম পরমাণু হইতে ইলেকট্রনসমূহ কিভাবে বিচ্ছুরিত হয়—তৎসম্পর্কে ডাঃ ফের্ম্মি যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কনডাক্টরসমূহে বিদ্যুৎ পরিচালনা সম্পর্কে বহু গবেষণা বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। পরমাণবিক বিজ্ঞানের উদ্ভবের পর হইতে ইলেকট্রন প্রভৃতি এইরূপ ব্যাপারে কিরূপ কাজ করে তৎসম্পর্কেও বহু মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। অতি আধুনিক মতবাদ অনুসারে ইলেকট্রনগুলিকে এক প্রকার নষ্ট গ্যাস (degenerate gass) বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। শক্তিকণাসমূহ নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে এরূপ মতবাদ (Quantum Theory of Energy) প্রভৃতির প্রচলনে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মিকানিক্স প্রভৃতি বিজ্ঞানের বহুক্ষেত্রে বহু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পাউলি (Pauli) বলেন কোন দুইটি ইলেকট্রনের একইরূপ চারিটি কোয়াণ্টাম-সংখ্যা থাকিতে পারে না। মৌলিক পদার্থের Periodic System এর মূলে এই তত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে। ডাঃ ফের্ম্মি তাঁহার অসামান্য প্রতিভার বলে উপরোক্ত নিয়ম গ্যাস সম্পর্কেও প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের বিভিন্ন গবেষণা অত্যন্ত প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই এবং নোবেল কমিটি একজন উপযুক্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিকেই সম্মানিত করিয়াছেন। ডাঃ ফের্ম্মির কার্য্যাবলী শুধু গবেষণাগারের গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। আমাদের দেশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যেমন একদল বিজ্ঞানসেবীকে তাঁহার অসামান্য প্রেরণাদ্বারা গড়িয়া তুলিয়াছেন; ডাঃ ফের্ম্মিও তাঁহার নিজ দেশে সেইরূপ পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় একদল কর্ম্মীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি ইতালীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর বিজ্ঞান পরিষদের (Society of Lincei) সদস্য। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিজ্ঞানীমহলে তাঁহার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব রহিয়াছেন। তাঁহার এই অসাধারণ সাফল্যে তাঁহার অগণিত বন্ধুবান্ধবের সহিত সুর মিলাইয়া আজ আমরাও এই তরুণ বৈজ্ঞানিককে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

কামাল আতাতুর্ক

মৌলবী মৈনুদ্দিন হোসেন

প্রাচ্যের গৌরব-রবি মহাবীর কামাল আতাতুর্ক আর নাই। তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে যেন এশিয়ার প্রদীপ্ত-রবি অস্তমিত হইয়া গেল। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার তাঁহার জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িল।

স্যালোনিকার একটি ক্ষুদ্র কুটিরের দ্বারে একটি বালক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। রাস্তার উপর কত লোক আসা-যাওয়া করিতেছে, আড়ম্বর সহকারে কত শোভাযাত্রা যাইতেছে, সেদিকে বালকের দৃষ্টি নাই। কখন

কামাল জননী জুবেদা

সেই পথে রাজকীয় সৈন্যবাহিনী সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করিতে করিতে সেই পথ দিয়া যাইবে, বালক সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে! একটু পরেই একদল সৈন্যবাহিনী সেই পথে দেখা দিল। বালক হর্ষোৎফুল্লনয়নে অপলক দৃষ্টিতে তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া যেন তাহার নয়নযুগল তৃপ্তি পাইতেছে না। কি হর্ষ তখন সে বালকের। আনন্দে অধীর হইয়া বিপুল উৎসাহে স্ফীত হইয়া আবার দেখিতে লাগিল এবং আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দর ইহারা, কি গৌরবময় ইহাদের জীবন! আমিও ইহাদেরই মত একজন হইব।" এই বালকই মুস্তাফা কামাল। অতি বাল্যকাল হইতেই সামরিক জীবনের প্রতি ইহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শৈশবে মানুষে যাহা কামনা করে তাহা অনেক সময় সফল হইয়া থাকে। কামালের বেলায়ও তাহাই হইল। মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের সন্তান কামাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধির লোভে পতিত না হইয়া সৈনিকের ব্রত ধারণ করিলেন এবং পরে তাহাতেই জগৎবরেণ্য হইলেন।

১৮৮০ সালে তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্যালোনিকা শহরে একটি মধ্যবিত্ত গৃহে মুস্তাফা কামাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সুলতানের অধীনে শুল্ক-বিভাগে কাজ করিতেন। রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিধবা মাতা কোনক্রমে কায়ক্লেশে পুত্রের লালনপালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার পিতামহীও জীবিত ছিলেন। তিনি প্রাচীনপন্থিনী রমণী ছিলেন এবং নব্যযুগের সভ্যতাকে ঘৃণা করিতেন। সুতরাং কামালকে প্রাচীনপন্থায় শিক্ষা দিবার জন্য প্রথমে মাদ্রাসায় ভর্ত্তি করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মানুষের অগোচরে ঘটনা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল যে, শেষ পর্যন্ত কামাল আধুনিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া গেলেন। তথায় প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি স্যালোনিকার উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। কিন্তু সেখানে অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। তিনি ছিলেন বাল্যকাল হইতেই তেজস্বী ও স্পষ্ট বক্তা। উচ্চ-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার অল্প দিন পরেই তথাকার একজন শিক্ষকের সহিত কোন বিষয়ে গোলমাল বাধায় কামাল পাঠ সমাপন করিবার বহু পূর্ব্বেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন এবং নিষ্কর্ম্মা ভাবে বসিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র দশ বৎসর।

অতি বাল্যকাল হইতে কামালের সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার বাসনা ছিল। যখনই তিনি কোন সামরিক কর্ম্মচারী দেখিতেন তখনই তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেন। একদা হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহারই একজন প্রতিবেশীর পুত্র সামরিক বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেছে। কামাল দেখিলেন—এই অবসর। গৃহে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন এবং তথাকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া

কামাল আতাতুর্ক

সামরিক কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তারপর উচ্চতর সমর-শিক্ষা পাইবার জন্য ইস্তাম্বুলে চলিয়া আসিলেন। উৎসাহী যুবক, ভাবপ্রবণ হৃদয় এবং দেশের কল্যাণ করিতে সমুদ্যত শক্তি—এই [illegible] একত্র মিলন হইলে মানুষের দুঃসাধ্য কিছুই থাকে না। কামাল ইস্তাম্বুলে আসিয়া [illegible]

কতিপয় তেজস্বী বিপ্লববাদী যুবকের আলাপ হইল। তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তিনি সর্ব্বদাই রাজনীতি চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এদিকে সুলতান আব্দুল হামিদের প্রধান দৃষ্টি ছিল—যাহাতে দেশের যুবক ও ছাত্রগণ কোনরূপে রাজনীতি চর্চ্চা করিতে না পায় এবং কেহ যেন বিপ্লবমূলক পুস্তক পড়িতে না পায়। কিন্তু কামাল ও তাঁহার সঙ্গিগণ অতি কৌশলে সরকারের চক্ষে ধূলা দিয়া অহর্নিশি রাজনীতি চর্চ্চা করিতে লাগিলেন এবং অবসর বুঝিয়া বহু বিপ্লবমূলক নিষিদ্ধ পুস্তক পড়িয়া ফেলিলেন। এইসব পুস্তক পড়িয়া কামালের বিশ্বাস হইল যে, তুরস্কের শাসন-ব্যাপারে বহু গলদ আছে এবং আশু সেগুলির সংশোধন না করিলে দেশের উন্নতি হইবে না। সেই সুকুমার বয়সের সময় তাঁহার মনে যে স্বদেশ-প্রীতির আগুন জ্বলিতেছিল তাহা কখনও নিভিয়া যায় নাই। বিপ্লববাদীদের সংস্পর্শে আসিয়া সেই আগুন আরও প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তুরস্কের শাসন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য কামাল তাঁহার সহাধ্যায়ী কতকগুলি ছাত্রকে লইয়া একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করিলেন। সেই সমিতির পক্ষ হইতে একটি সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশিত হইল। কামাল নিজেই হইলেন উহার সম্পাদক। কিন্তু গুপ্ত সমিতির কথা অধিক দিন সুলতানের অগোচর রহিল না। তিনি সমিতিকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কামাল উচ্চতর সামরিক বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করিলেন। কিন্তু চিরপোষিত আদর্শ বিস্মৃত হইলেন না। ইস্তাম্বুলের একটি নির্জ্জন অংশে একটি ক্ষুদ্র ঘর ভাড়া লইয়া তথায় কামাল তাঁহার গুপ্ত সমিতির কাজ চালাইতে লাগিলেন। কিছুদিন কাজ বেশ চলিল। দেশের চতুর্দ্দিকে বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু একজন গুপ্তচর অবশেষে তাঁহাদের সমিতির কথা সরকারের গোচর করিয়া দিল। ফলে কামাল সদলবলে কারাগারে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু চারিমাস পর মুক্ত হইলেন।

কামাল মুক্তি পাইলেন বটে কিন্তু তাঁহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের কড়া নজর রহিল। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিলেন যে, কামালই হইতেছেন সমস্ত বিপ্লবের মূল উৎস। সুতরাং এহেন বিপ্লবী যুবককে দেশান্তরিত করিতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। কামাল পাশার উপর কর্ত্তৃপক্ষের রোষ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা বাছিয়া বাছিয়া বিপদসঙ্কুল স্থানে তাঁহাকে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন বিপদজাল হইতে উদ্ধার না পান। কিন্তু অসীমসাহসী কামাল কোনদিনই বিপদবরণে কাতরতার ভাব প্রকাশ করেন নাই; বরং অনেক সময় এই সব দুর্লঙ্ঘ্য বিপদ তাঁহার জন্য—'শাপে বর' হইয়া গিয়াছে। সেই সময় সিরিয়ায় একটা প্রবল গণ্ডগোল হইতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই সেনাগণের ক্যাপ্টেনরূপে তথায় প্রেরণ করিলেন। কামাল বেশ বুঝিলেন—তাঁহাকে রাজধানী হইতে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রকার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া অম্লানবদনে সিরিয়া গমন করিলেন। এই সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও তিনি গোপনভাবে রাজধানীর বিপ্লবীদের সহিত পত্রালাপ করিতে লাগিলেন এবং সিরিয়াতে কতকগুলি বিশ্বস্ত অনুচরের সহযোগিতায় একটি 'গুপ্ত সমিতি' গঠন

চারিদিকে প্রচারকার্য্য করিতে লাগিলেন। দাবানলের মত বিপ্লবের বহ্নি দেশে ছড়াইয়া পড়িল। বেরুৎ, জাফা, জেরুজালেম প্রভৃতি নগরে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানাবিধ 'গুপ্ত সমিতি' স্থাপিত হইল। তৎপর তিনি গুপ্তভাবে পুনরায় স্যালোনিকায় প্রবেশ করিলেন এবং [illegible] বসিয়া ম্যাসিডোনিয়াতে বিপ্লব প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার কতকগুলি পূর্ব্বতন বন্ধু ও সহকর্ম্মীর সহিত আলাপ হইল। তিনি তাহাদিগকে তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শ খুলিয়া বলিলেন এবং তাঁহাদের সহযোগিতায় একটি 'গুপ্ত সমিতি' স্থাপন করিলেন। এই সমিতি পরে Society of Union and Progress অর্থাৎ ঐক্য ও উন্নতি বিধায়ক সমিতি নামে অভিহিত হইল। অতি অল্পদিনের মধ্যে এই সমিতির আদর্শ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সমিতির আন্দোলনের প্রভাবে অকর্ম্মণ্য সুলতান আব্দুল হামিদ পদচ্যুত হইলেন এবং তুরস্কে পার্লিয়ামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল (১৯০৮)। ইহাই হইতেছে কামাল পাশার জীবনের সর্ব্বপ্রথম সার্থক বিপ্লব।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে ত্রিপলি সমর বাধিয়া গেল। ইটালী তুরস্কের ত্রিপলি রাজ্যটি গ্রাস করিবার জন্য অকারণ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল। কামাল পাশা তাঁহার সমুদয় শক্তি দিয়া ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য না পাইয়া তিনি ত্রিপলি রক্ষা করিতে পারিলেন না। ফলে এই রাজ্যটি ইটালীর কবলিত হইয়া গেল। এই যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে বল্কান-সমর বাধিয়া গেল। সুতরাং কামাল অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বদেশ রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এই যুদ্ধে তুর্কি সেনাদের মধ্যে উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি দুর্নীতি প্রকাশ্যভাবে চলিতেছিল। বিলাসপরায়ণ সুলতান তাহা বন্ধ করিবার কোনই ব্যবস্থা করিলেন না। ফলে তুর্কিশক্তি দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতে লাগিল, আর দেশের পর দেশ সুলতানের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। স্বদেশবাসীর মধ্যে এই প্রকার দুর্নীতির প্রাবল্য দেখিয়া কামাল অধীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি একাকী কি করিতে পারেন? আনোয়ার পাশার আন্তরিকতার অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি কামালকে হিংসা করিতেন। সেইজন্যই এই দুই বীরপুরুষের সহায়তা বিপন্ন তুরস্ক পাইল না। সেইজন্য অতি শোচনীয়ভাবে তুরস্ক বল্কান-সমরে পরাস্ত হইল। কিন্তু কিছুদিন পর দ্বিতীয় বল্কান-সমরে কামাল পাশা অসীম সাহসে আদ্রিয়ানোপল জয় করিয়া লইলেন।

তারপর আরম্ভ হইল ইউরোপীয় মহাসমর। কামাল পাশা তুরস্কের এই যুদ্ধে যোগদানের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সুলতান তাঁহার সাবধান-বাণী অগ্রাহ্য করিয়া জার্ম্মানীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্য কামালও একদল সেনা লইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল স্থানে প্রেরিত হইলেন। দার্দ্দানেলিসের সঙ্কীর্ণ ঘাঁটিতে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে সমগ্র তুর্কিরাজ্য গ্রাস করিতে [illegible] করিত [illegible]

তুরস্কের আশা ভরসা চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইত। কিন্তু মহাবাহু কামাল পাশা মিত্রপক্ষের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়া দিলেন। কামাল বিজয়গৌরবে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু কামাল একাকী কোন দিকের তাল সামলাইবেন? তুরস্কের সর্ব্বত্রই প্রবেশ করিয়াছিল দুর্নীতি, ভীরুতা, কাপট্য ও উৎকোচপ্রবণতা। অকপট কামালের মর্ম্মবেদনা কে বুঝিবে? মহাসমরে জার্ম্মানীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের সৌভাগ্য-রবিও অস্তমিত হইতে লাগিল। হতভাগ্য সুলতান মিত্রপক্ষের বাহুবলের নিকট নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। এবং তাঁহার সমুদয় সৈন্যসহ সেনাপতিকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। সেই সময় কামাল কার্য্যব্যপদেশে আলেপ্পোতে ছিলেন। সুলতানের কাপুরুষতার প্রতিবিধান করিবার জন্য অবিলম্বে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সুলতানকে মিত্রপক্ষের হীনতাজনক সর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সুলতান তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

সুলতানের কাপুরুষতার সুবিধায় বিজয়ী মিত্রপক্ষ বীরপদভরে ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করিল এবং সুলতানকে সম্পূর্ণভাবে করতলগত করিয়া ফেলিল। তিনি মিত্রপক্ষের হস্তে পুত্তলিকাবৎ পরিচালিত হইতে লাগিলেন। কামাল তখন এই অবস্থার প্রতিকার করিবার জন্য গোপন প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে কামালের প্রেরণায় দেশের চারিদিকে যে সব গুপ্ত সভা-সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, কামাল সেগুলির মধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে স্বাধীনতার বাণী ও আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময় তিনি সৈন্যদলের ইন্সপেক্টার নিযুক্ত হইলেন। এই পদটি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইল। তিনি গোপনে গোপনে সর্ব্বত্র জাতীয় ভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইস্তাম্বুলে তখন মিত্রপক্ষীয় কর্ত্তারা সর্ব্বে সর্ব্বা! তাঁহারা কামালের গোপন প্রচারকার্য্যের বিষয় অচিরেই অবগত হইলেন এবং তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ড দিবার উদ্দেশ্যে সুলতানের ফরমানের জোরে অচিরেই কামালকে রাজধানীতে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ জারী করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কে আহ্বান করিল ও কি জন্য আহ্বান করিল, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তাই তিনি অচিরাৎ পদত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে মিত্রপক্ষের গ্রাস হইতে দেশোদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এক দুর্য্যোগপূর্ণ রজনীতে সহায়হীন ও কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় তিনি আনাটোলিয়ায় গমন করিলেন এবং তথাকার অধিবাসী-দিগকে আহ্বান করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া বহু লোক একত্র মিলিত হইয়া একটি প্রতিনিধিমূলক সমিতি গঠন করিল। এই সমুদয় প্রতিনিধি ১৯১৯ সালের শরৎকালে এরজেরুম [illegible] মিলিত হইলেন। ইহার দুইমাস পরে তাঁহারা সিভাসে একটি জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করিলেন। এই সভায় তুরস্ক উদ্ধারের জন্য ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা নির্ণীত হইল। পরিশেষে এই জাতীয় কংগ্রেস এঙ্গোরাতে স্থানান্তরিত হইয়া স্বাধীন তুর্কিরাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিল।

রাজধানী হইতে বহুদূরে অনুর্ব্বর আনাটোলিয়ার একটি জনবিরল ও অনাদৃত নগরে কামাল পাশা স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আর ওদিকে রাজধানী ইস্তাম্বুলের বুকে মিত্রপক্ষীয়গণ বিশাল সাম্রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইলেন এবং কামালের শেষ শক্তিকে বিনষ্ট করিবার জন্য গ্রীসকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ পাইয়া গ্রীস অনায়াসে স্মার্ণা প্রদেশ অধিকার করিল। এই সময় তুরস্কের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহই আশা করিতে পারে নাই যে, তুরস্ক আবার স্বাধীন হইবে, আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু দুর্দ্দশা ও হতাশার মধ্যে কামাল মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া আবার স্বদেশ উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি অপূর্ব্ব রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া মিত্রপক্ষের আশ্রিত গ্রীক সৈন্যের গতিরোধ করিলেন। তাঁহার দুর্ব্বার আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া এবং কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গ্রীকগণ এশিয়া মাইনর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই সময় সাকারিয়া নদীর তীরে বিপুল বিক্রমে কামাল গ্রীকদের সমুদয় শক্তি বিচূর্ণ করিয়া দিলেন এবং এশিয়া মাইনর অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কামাল ইস্তাম্বুলের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিত্রপক্ষীয় শক্তিনিচয় তখন [illegible]লের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহারা কামালের অপ্রত্যাশিত বিজয় দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হয়ত তাঁহারা কামালের সহিত যুদ্ধ করিতেন, কিন্তু জাতিসঙ্ঘের প্রভাবে তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কৌশলে কামালের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কামাল কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া অবিলম্বে বীরবিক্রমে ইস্তাম্বুল অধিকার করিলেন। অতঃপর কামাল যাহাতে আরও অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারেন তাহারই জন্য ইংরেজের প্রচেষ্টায় সুইজারল্যাণ্ডের লসেন নামক নগরে একটি শান্তি বৈঠকের অধিবেশন হইল। তুরস্কের প্রতিনিধিস্বরূপ মহাবীর ইসমেৎ পাশা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইসমেৎ পাশা স্বাধীন তুরস্কের পক্ষ হইয়া কয়েকটি দাবী উপস্থিত করিলেন। তন্মধ্যে তিনটি খুব প্রধান, কারণ এই তিনটি দাবী তুরস্কের সার্ব্বভৌমত্বের জন্য অপরিহার্য্য। (১) ক্যাপিচুলেশন রহিত করিতে হইবে। (২) গ্যালিপলি ও দার্দ্দানেলিস তুরস্কের পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। (৩) মোসালকে তুর্কিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। কারণ প্রকৃতির নিয়মানুসারে উহা তুর্কিরাজ্যের সীমাভুক্ত।

এইভাবে কামাল পাশার বাহুবলে তুরস্ক বিদেশীর কবল হইতে মুক্ত হইল। তিনি বরাবরই গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। দেশকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করিয়া আর রাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করিলেন না। রাজতন্ত্র, খলিফাতন্ত্র—উভয়ই রহিত করিয়া দিয়া তুরস্কে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই গণতন্ত্রের তিনিই প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

কামাল আতাতুর্কের কর্ম্মবহুল জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার মত শক্তিশালী পুরুষ

মহাসমরের পর খুব কমই দেখা দিয়াছে। তিনি যে সব সংস্কার আনয়ন করিয়াছেন, রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে ও সাহিত্যে যে সব বিপ্লব সাধন করিয়াছেন, তাহা যুদ্ধপরবর্ত্তী কোন একটা দেশে যুগপৎভাবে সম্ভব হয় নাই। এতদিন তুর্কি ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, গোঁড়ামী, ধর্ম্মান্ধতা, মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণতা তুর্কিদের জীবনযাত্রাকে এযুগের অনুপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। কামাল দৃঢ়হস্তে ধারাল কুঠার লইয়া জমাট বাঁধা প্রাচীন সংস্কার ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সমগ্র দেশকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিলেন। প্রাচীন যুগের বিষাদময় সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার জন্য তিনি ইস্তাম্বুলকে পরিত্যাগ করিয়া আঙ্গোরায় রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং নূতন রাজধানীকে নানাভাবে সুশোভিত করিলেন। বৃহৎ অট্টালিকা, বড় বড় রাস্তা, পথ-ঘাট, পার্লামেণ্ট ভবন, সিনেমা হাউস, বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতিতে আজ আঙ্গোরা শহর পরিপূর্ণ হইয়াছে। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে যে জলাময় স্থান অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহাই আজ যাদুকরের মায়াহস্তে নন্দন কাননে পরিণত হইয়াছে। বস্তুত গণতন্ত্রের উপাসক উৎপীড়িত জাতির নিকট আঙ্গোরা আজ তীর্থভূমি। রাষ্ট্রে, সমাজে ও ধর্ম্মে কামাল যে সংস্কার আনিলেন তাহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তিনি খিলাফৎ উঠাইয়া দিলেন। ধর্ম্মকে রাষ্ট্র হইতে একেবারেই পৃথক করিয়া দিলেন। আজ তুরস্কের কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম নাই। সভাপতি বা প্রধান মন্ত্রী মুসলমান, অ-মুসলমান যে কেহ হইতে পারেন। ধর্ম্মীয় আইন পরিবর্ত্তিত করিয়া কামাল পাশা ইউরোপীয় আইন গ্রহণ করিলেন। অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিয়া নারীসমাজকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিলেন। তুর্কি বর্ণমালার স্থলে ল্যাটিন বর্ণমালা প্রবর্ত্তন করিলেন। মুসলিম কালচারের মিথ্যা মোহে তিনি তুরস্কের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অবহেলার ভাব দেখাইলেন না। বরং সেই প্রাচীন তুরাণীয় সভ্যতাকে উদ্ধার করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। কামালের প্রভাবে আজিকার তুরস্ক কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেকার Sick man of Europe নহে। আজ তুরস্ক জাগ্রত, শক্তিসম্পন্ন, স্বাধীন জাতির সমস্ত মর্য্যাদায় মণ্ডিত। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি প্রভৃতিতে তুরস্ক দিন দিন জগতের মধ্যে স্থান করিয়া লইতেছে। তুরস্কের এই যে পরিবর্ত্তন—এই যে সর্ব্বাবয়বে বিপ্লব তাহা মাত্র পনের বৎসরের প্রচেষ্টায় সফল হইয়াছে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে কামাল আতাতুর্ক একটি দশবর্ষীয় পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাহা শেষ হইলে দেশের কোথাও মূর্খতা থাকিবে না, কোথাও পথ-ঘাটের অভাব হইবে না এবং শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু হায় কামাল তাহা পূর্ণ হইতে দেখিতে পাইলেন না।

কামালের প্রকৃত চরিত্রের কথা বলিতে গেলে একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, তাঁহার মধ্যে দোষ ত্রুটি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অপরিসীম স্বদেশ প্রেম, আদর্শের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা এবং বিফলতার মধ্যেও অফুরন্ত আনন্দ—এই তিনটি গুণে তাঁহার চরিত্রকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি খু- শাসাসিধেভাবে জীবন যাপন করিতেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তুরস্কের জন্য বিলাইয়া দিয়াছেন। তুরস্কের মঙ্গলের জন্য এবং গণতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য তাঁহার আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকা উচিত ছিল। কিন্তু মানুষের সাধ্য কি বিধাতার বিধান উল্টাইয়া দিতে পারে? তিনি তুরস্ককে দেখিয়াছিলেন ছিন্ন ভিন্ন, ধর্ম্মান্ধতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত, বিলাসী দুর্ব্বল এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের গ্রাসের মুখে—তাহাকে তিনি উদ্ধার করিলেন, জীবন্ত আদর্শ দিলেন, সবল করিলেন এবং একটি একতাবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে নবোত্থিত তুরস্কের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া হয়ত তিনি এক আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। নিজেরই জীবনে তাঁহার প্রাণপণ সাধনার সিদ্ধিলাভ হইতে দেখিয়া হয়ত তাঁহার মন আনন্দে গর্ব্বে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এমন সার্থক মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে?

সভা-সমিতি

গত ২৬শে কার্ত্তিক শনিবার তারিখে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বর্দ্ধমান সাহিত্য সভার একটি বিশেষ অধিবেশনে সভার সহকারী সম্পাদক উদীয়মান সাহিত্যিক সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের অকালে পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় স্থির হইল যে, সুধীরকুমারের স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় একটি রৌপ্য পদক বর্ত্তমান বর্ষে প্রদত্ত হইবে। প্রবন্ধের বিষয় "রাঢ়ের কোন গ্রামের পুরাবৃত্ত"। বর্দ্ধমান জেলার স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ১লা চৈত্র অথবা তৎপূর্ব্বে বর্দ্ধমান সাহিত্য সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাণদাপ্রসাদ মু পাধ্যায়, অ্যাডভোকেট, বর্দ্ধমান, এই ঠিকানায় পৌঁছান চা

বিশেষ অধিবেশনের অব্যবহিত পরে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মল্লিক, বি-এল, মহাশয়ের আহ্বানে সভার পঞ্চম মাসিক অধি বেশন হয়। শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র মিত্র, চন্দননগর সাধারণ পাঠা গারের প্রতিষ্ঠিতা প্রমথনাথ মিত্রের জীবনী বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীপ্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, বর্দ্ধমান সাহি সভা।

সোনা অপহরণে সোনার ফসল

(গল্প)

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

বেতগাঁ গ্রামখানি হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এমন চাঞ্চল্য এ গাঁয়ে বহুকাল কেহ দেখে নাই। গাঁয়ের মধ্যে দারোগা-বাড়ী ছিল অনেক কালের পোড়ো বাড়ী। বাড়ীর কোন পূর্ব্ব মালিক দারোগা ছিলেন। শোনা যায়, তাঁর দাপটে এককালে শুধু এ গাঁ নয় দশ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে যত গ্রাম ছিল—সবই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। তারপর, লোকে বলে, অত্যাচারের ফলেই ধর্ম্মের কল নড়িয়াছিল,—তাঁহার সন্তান-সন্ততি পর পর ম্যালেরিয়া জ্বরে মরিতে সুরু করিল। শেষটায় একটি মাত্র বংশধরে আসিয়া যখন ঠেকিল, তখন তাড়াতাড়ি পেন্সন লইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় চম্পট দিলেন। পেন্সনের সময় অনেক দিন হইয়া গিয়াছিল কিন্তু মেয়াদের পর মেয়াদ বাড়াইয়া লইতেছিলেন কয়েকটা বৎসর। সেই হইতে দারোগা-বাড়ী পোড়ো বাড়ী হইয়া রহিয়াছে। সে অনেক দিনের কথা। তারপর দুই পুরুষ গত হইয়াছে। দারোগার পৌত্ররা কেহই দেশের মাটিতে পদার্পণ করে নাই এবং গ্রামের কেহ মনে করে নাই যে, দারোগা-বাড়ীর কেহ এমন কার্য্য ভবিষ্যতেও আর করিবে।

প্রকাণ্ড জমি সম্বলিত দারোগা-বাড়ী তাই এখন ঘন বনে পরিণত। শৃগালগণের সান্ধ্য আসরের কীর্ত্তন এখানে জমে ভাল, বেতসকুঞ্জে ফণিনীর নৃত্য—অপ্সরীর নাচের মত মোহন অথচ ভীষণ—তারই তালে তালে চলিতে থাকে এবং অনেকে বলে, রাত্রি একটু গভীর হইলেই বেতালপঞ্চবিংশতিরও তাণ্ডব নৃত্য নাকি দেখা যায়। বিস্তৃত ফলের বাগানে বহুকালের অযত্নেও বিস্তর ফল ধরিয়া থাকে। সুপারী, নারিকেল, আম, কাঁঠাল গ্রামশুদ্ধ লোক ভোগ করিয়া আসিতেছে।

হঠাৎ একদিন রাজমোহন বিশ্বাসের হুকুমে ও নাছিরুদ্দিন সর্দ্দারের অনুমোদনে এ হেন দারোগা-বাড়ীর জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিতে 'জন' লাগিয়া গেল। শৃগাল সরীসৃপ উদ্বাস্তু হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বালকের দল বিরক্ত হইল,—ছুরি নুন হাতে ছুটিয়া আসিবার এমন একটি নিরালা স্থান আর থাকে না বুঝি!

দারোগার প্রপৌত্রবধূ নিস্তারিণীর বিধবা হইবার পরই কেন যে এ খেয়াল হইয়াছে যে, দেশের ভিটায় আসিয়া বসবাস করিবেন; তাহা গ্রামের লোকেরা ভাবিয়া অবাক্ হইল। কলিকাতার ধনশালিনী দেশের এই ভিটাটুকুর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না, ইহাতে গ্রামের লোক কিছু বিরক্ত হইল। কারণ, এত বড় একটা বেওয়ারিস যে বাগান তাহাদের সকলেরই ভোগ দখলে এতকাল ছিল, সেইটা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেই যেন নিস্তারিণীর এখানে আসা! তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা ভারি অন্যায়! নিস্তারিণী যেন এ বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিতে আসিতেছে! অথচ তাঁহার আগমনের জন্য খুবই ঔৎসুক্যের সঙ্গে গ্রামের লোক বাস করিলে সকলের ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে—তাহারই আলাপ আলোচনায় সারা গ্রামটা সরগরম হইয়া উঠিল।

ষ্টীমার ঘাটে নিস্তারিণীর জন্য পাল্কী গিয়াছিল। কিন্তু সেটার সংকীর্ণ আকৃতি এবং জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া রাজমোহনের দিকে তাকাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "গ্রাম কত দূর?" রাজমোহন অদূরে গ্রামটিকে প্রদর্শন করাইয়াই কহিল, "ঐতো!" "তবে চলুন না, হেঁটেই যাই" বলিয়া আট বৎসরের মেয়ে অণিমার হাত ধরিয়া পদব্রজেই চলিতে সুরু করিলেন। রাজমোহন মহা উদ্ব্যস্ত হইয়া বিস্তর বাধা দিতে চেষ্টা করিল এবং এই বলিয়া অনুনয় করিল যে, "নিন্দা" হইবে। কিন্তু নিস্তারিণী জবাব দিলেন যে, নিন্দাকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। রাজমোহন অবাক্ হইয়া ভাবিতে থাকে—নিন্দাই হইল গ্রামের একমাত্র শাসক, তাহাকে যে গ্রাহ্য করে না বলিয়া বড়াই করে, সে গ্রামে পদার্পণ করে কি ভরসায়! বস্তুত কলসী কাঁখে করিয়া যে বৌ-ঝিরা গ্রাম হইতে এই নদীতেই জল লইতে আসে সাঁঝ সকালে, তাহারা যত গরীবই হউক, জাহাজ হইতে নামিয়া গ্রামে যাইতে পদব্রজে যাইবে—একথা কেহ কল্পনা করিতে পারে না। কাঁচা গ্রামের রাস্তা দিয়া জুতা পরিয়া মাতা ও পুত্রী চলিতে থাকে এবং প্রত্যেক গৃহস্থের ঘর হইতে বিস্ময়-নেত্রের দৃষ্টি আসিয়া তাহাদের উপর নিপতিত হয়।

দারোগা পাকা বাড়ী রাখিয়া গিয়াছিলেন। দালানের স্থানে স্থানে বটগাছ গজাইয়া কিছু কিছু জখম করিয়াছে, রক ও বারান্দা হইতে শ্বেত-পাথরের টালি উঠিয়া গিয়া গ্রামের প্রতি গৃহের কোন-না কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, চামচিকা গৃহের মধ্যে পুরীষরাশি জমা করিয়াছে। গাছে, মানুষে, জন্তুতে এইরূপে ডাকাতি ও অত্যাচার করিয়া আসিতেছে বিস্তর। রাজমোহন ও নাছিরুদ্দিন কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাড়ীটাকে অনেক সংস্কার করিয়া বাসের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

নিস্তারিণী ঘর গুছাইয়া লয়। পাড়ার লোক অনেক আসিয়া জুটিয়াছে, কিন্তু তাহারা বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে বিপুল ব্যবধান রক্ষা করিয়া তাঁহার কার্য্যাবলী শুধু নিরীক্ষণ করে—কেহ কাছেও আসে না, সাহায্যও করে না। মিত্তির-গিন্নির একটু নাম আছে গাঁয়ের মধ্যে—জ্ঞান গরিমায় অগ্রণী বলিয়া। তাঁহার ভ্রাতা কলিকাতায় সওদাগরের আফিসে কাজ করেন। তিনি তথায় মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন এবং ফিরিয়া আসিয়া মেয়েমহলের মধ্যাহ্ন-অবসরকে মূল্যবান করিয়া তোলেন নানা সত্যমিথ্যা গল্পের দৌলতে। তাঁহার ১২ বৎসরের পুত্রও অনুরূপভাবে তাহার বন্ধুদিগকে চমক্ লাগাইয়া দেয়। তাঁহার অষ্টম বৎসরের কন্যা দাদার এবং মায়ের বুলি মুখস্থ করিয়া রাখে এবং অবসর বুঝিয়া তাহা কার্য্যে খাটাইয়া শ্রোতাদিগের নিকট হইতে খ্যাতি অর্জ্জন করে।

হ্যাঁ, এই মিত্তির-গিন্নি [illegible]

মহাসমরের পর খুব কমই দেখা দিয়াছে। তিনি যে সব সংস্কার আনয়ন করিয়াছেন, রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে ও সাহিত্যে যে সব বিপ্লব সাধন করিয়াছেন, তাহা যুদ্ধপরবর্ত্তী কোন একটা দেশে যুগপৎভাবে সম্ভব হয় নাই। এতদিন তুর্কি ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, গোঁড়ামী, ধর্ম্মান্ধতা, মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা তুর্কিদের জীবনযাত্রাকে এযুগের অনুপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। কামাল দৃঢ়হস্তে ধারাল কুঠার লইয়া জমাট বাঁধা প্রাচীন সংস্কার ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সমগ্র দেশকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিলেন। প্রাচীন যুগের বিষাদময় সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার জন্য তিনি ইস্তাম্বুলকে পরিত্যাগ করিয়া আঙ্গোরায় রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং নূতন রাজধানীকে নানাভাবে সুশোভিত করিলেন। বৃহৎ অট্টালিকা, বড় বড় রাস্তা, পথ-ঘাট, পার্লামেণ্ট ভবন, সিনেমা হাউস, বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতিতে আজ আঙ্গোরা শহর পরিপূর্ণ হইয়াছে। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে যে জলাময় স্থান অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহাই আজ যাদুকরের মায়াহস্তে নন্দন কাননে পরিণত হইয়াছে। বস্তুত গণতন্ত্রের উপাসক উৎপীড়িত জাতির নিকট আঙ্গোরা আজ তীর্থভূমি। রাষ্ট্রে, সমাজে ও ধর্ম্মে কামাল যে সংস্কার আনিলেন তাহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তিনি খিলাফৎ উঠাইয়া দিলেন। ধর্ম্মকে রাষ্ট্র হইতে একেবারেই পৃথক করিয়া দিলেন। আজ তুরস্কের কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম নাই। সভাপতি বা প্রধান মন্ত্রী মুসলমান, অ-মুসলমান যে কেহ হইতে পারেন। ধর্ম্মীয় আইন পরিবর্ত্তিত করিয়া কামাল পাশা ইউরোপীয় আইন গ্রহণ করিলেন। অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিয়া নারীসমাজকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিলেন। তুর্কি বর্ণমালার স্থলে লাটিন বর্ণমালা প্রবর্ত্তন করিলেন। মুসলিম কালচারের মিথ্যা মোহে তিনি তুরস্কের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অবহেলার ভাব দেখাইলেন না। বরং সেই প্রাচীন তুরাণীয় সভ্যতাকে উদ্ধার করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। কামালের প্রভাবে আজিকার তুরস্ক কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেকার Sick man of Europe নহে। আজ তুরস্ক জাগ্রত, শক্তিসম্পন্ন, স্বাধীন জাতির সমস্ত মর্য্যাদায় মণ্ডিত। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি প্রভৃতিতে তুরস্ক দিন দিন জগতের মধ্যে স্থান করিয়া লইতেছে। তুরস্কের এই যে পরিবর্ত্তন—এই যে সর্ব্ববিষয়ে বিপ্লব তাহা মাত্র পনের বৎসরের প্রচেষ্টায় সফল হইয়াছে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে কামাল আতাতুর্ক একটি দশবর্ষীয় পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাহা শেষ হইলে দেশের কোথাও মূর্খতা থাকিবে না, কোথাও পথ-ঘাটের অভাব হইবে না এবং শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু হায় কামাল তাহা পূর্ণ হইতে দেখিতে পাইলেন না।

কামালের প্রকৃত চরিত্রের কথা বলিতে গেলে একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, তাঁহার মধ্যে দোষ ত্রুটি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অপরিসীম স্বদেশ প্রেম, আদর্শের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা এবং বিফলতার মধ্যেও অফুরন্ত আনন্দ—এই তিনটি গুণে তাঁহার চরিত্রকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি খুব শানাসিধেভাবে জীবন যাপন করিতেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তুরস্কের জন্য বিলাইয়া দিয়াছেন। তুরস্কের মঙ্গলের জন্য এবং গণতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য তাঁহার আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকা উচিত ছিল। কিন্তু মানুষের সাধ্য কি বিধাতার বিধান উল্টাইয়া দিতে পারে? তিনি তুরস্ককে দেখিয়াছিলেন ছিন্নভিন্ন, ধর্ম্মান্ধতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত, বিলাসী দুর্ব্বল এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের গ্রাসের মুখে—তাহাকে তিনি উদ্ধার করিলেন, জীবন্ত আদর্শ দিলেন, সবল করিলেন এবং একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে নবোত্থিত তুরস্কের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া হয়ত তিনি একটু আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। নিজেরই জীবনে তাঁহার প্রাণপণ সাধনার সিদ্ধিলাভ হইতে দেখিয়া হয়ত তাঁহার মন আনন্দে, গর্ব্বে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এমন সার্থক মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে?

সভা-সমিতি

গত ২৬শে কার্ত্তিক শনিবার তারিখে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বর্দ্ধমান সাহিত্য সভার একটি বিশেষ অধিবেশনে সভার সহকারী সম্পাদক উদীয়মান সাহিত্যিক সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের অকালে পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় স্থির হইল যে, সুধীরকুমারের স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় একটি রৌপ্য পদক বর্ত্তমান বর্ষে প্রদত্ত হইবে। প্রবন্ধের বিষয় "রাঢ়ের কোন গ্রামের পুরাবৃত্ত"। বর্দ্ধমান জেলার স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ১লা চৈত্র অথবা তৎপূর্ব্বে বর্দ্ধমান সাহিত্য সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট, বর্দ্ধমান, এই ঠিকানায় পেঁাছান চাই।

বিশেষ অধিবেশনের অব্যবহিত পরে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মল্লিক, বি-এল, মহাশয়ের আহ্বানে সভার পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র মিত্র, চন্দননগর সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠিতা প্রমথনাথ মিত্রের জীবনী বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীপ্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা।

সোনা অপহরণে সোনার ফসল

(গল্প)

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

বেতগাঁ গ্রামখানি হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এমন চাঞ্চল্য এ গাঁয়ে বহুকাল কেহ দেখে নাই। গাঁয়ের মধ্যে দারোগা-বাড়ী ছিল অনেক কালের প'ড়ো বাড়ী। বাড়ীর কোন পূর্ব্ব মালিক দারোগা ছিলেন। শোনা যায়, তাঁর দাপটে এককালে শুধু এ গাঁ নয় দশ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে যত গ্রাম ছিল—সবই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। তারপর, লোকে বলে, অত্যাচারের ফলেই ধর্ম্মের কল নড়িয়াছিল,—তাঁহার সন্তান-সন্ততি পর পর ম্যালেরিয়া জ্বরে মরিতে সুরু করিল। শেষটায় একটি মাত্র বংশধরে আসিয়া যখন ঠেকিল, তখন তাড়াতাড়ি পেন্সন লইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় চম্পট দিলেন। পেন্সনের সময় অনেক দিন হইয়া গিয়াছিল কিন্তু মেয়াদের পর মেয়াদ বাড়াইয়া লইতেছিলেন কয়েকটা বৎসর। সেই হইতে দারোগা-বাড়ী প'ড়ো বাড়ী হইয়া রহিয়াছে। সে অনেক দিনের কথা। তারপর দুই পুরুষ গত হইয়াছে। দারোগার পৌত্ররা কেহই দেশের মাটিতে পদার্পণ করে নাই এবং গ্রামের কেহ মনে করে নাই যে, দারোগা-বাড়ীর কেহ এমন কার্য্য ভবিষ্যতেও আর করিবে।

প্রকাণ্ড জমি সম্বলিত দারোগা বাড়ী তাই এখন ঘন বনে পরিণত। শৃগালগণের সান্ধ্য আসরের কীর্ত্তন এখানে জমে ভাল, বেতসকুঞ্জে ফণিনীর নৃত্য—তরুণীর নাচের মত মোহন অথচ ভীষণ—তারই তালে তালে চলিতে থাকে এবং অনেকে বলে, রাত্রি একটু গভীর হইলেই বেতালপঞ্চবিংশতিরও তাণ্ডব নৃত্য নাকি দেখা যায়। বিস্তৃত ফলের বাগানে বহুকালের অযত্নেও বিস্তর ফল ধরিয়া থাকে। সুপারী, নারিকেল, আম, কাঁঠাল গ্রামশুদ্ধ লোক ভোগ করিয়া আসিতেছে।

হঠাৎ একদিন রাজমোহন বিশ্বাসের হুকুমে ও নাছিরুদ্দিন সর্দ্দারের অনুমোদনে এ হেন দারোগা-বাড়ীর জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিতে 'জন' লাগিয়া গেল। শৃগাল সরীসৃপ উদ্ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বালকের দল বিরক্ত হইল,— ছুরি নুন হাতে ছুটিয়া আসিবার এমন একটি নিরালা স্থান আর থাকে না বুঝি!

দারোগার প্রপৌত্রবধূ নিস্তারিণীর বিধবা হইবার পরই কেন যে এ খেয়াল হইয়াছে যে, দেশের ভিটায় আসিয়া বসবাস করিবেন; তাহা গ্রামের লোকেরা ভাবিয়া অবাক্ হইল। কলিকাতার ধনশালিনী দেশের এই ভিটাটুকুর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না, ইহাতে গ্রামের লোক কিছু বিরক্ত হইল। কারণ, এত বড় একটা বেওয়ারিস যে বাগান তাহাদের সকলেরই ভোগ দখলে এতকাল ছিল, সেইটা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেই যেন নিস্তারিণীর এখানে আসা! তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা ভারি অন্যায়! নিস্তারিণী যেন এ বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিতে আসিতেছে! অথচ তাঁহার আগমনের জন্য খুবই ঔৎসুক্যের সঙ্গে গ্রামের লোক প্রতীক্ষা করিতে রহিল। [illegible] বাস করিলে সকলের ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে—তাহা আলাপ আলোচনায় সারা গ্রামটা সরগরম হইয়া উঠিল।

ষ্টীমার ঘাটে নিস্তারিণীর জন্য পাল্কী গিয়াছি কিন্তু সেটার সংকীর্ণ আকৃতি এবং জীর্ণ অবস্থা দেখি রাজমোহনের দিকে তাকাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "গ্রাম ক দূর?" রাজমোহন অদূরে গ্রামটিকে প্রদর্শন করাইয়াই কহি "ঐতো!" "তবে চলুন না, হেঁটেই যাই" বলিয়া আট বৎসর মেয়ে অণিমার হাত ধরিয়া পদব্রজেই চলিতে সুরু করিলেন। রাজমোহন মহা উদ্ব্যস্ত হইয়া বিস্তর বাধা দিতে চেষ্টা করিল এবং এই বলিয়া অনুনয় করিল যে, "নিন্দা" হইবে। কিন্তু নিস্তারিণী জবাব দিলেন যে, নিন্দাকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। রাজমোহন অবাক্ হইয়া ভাবিতে থাকে—নিন্দাই হইল গ্রামের একমাত্র শাসক, তাহাকে যে গ্রাহ্য করে না বলিয়া বড়াই করে, সে গ্রামে পদার্পণ করে কি ভরসায়! বস্তুত কলসী কাঁখে করিয়া যে বৌ-ঝিরা গ্রাম হইতে এই নদীতেই জল লইতে আসে সাঁঝ সকালে, তাহারা যত গরীবই হউক, জাহাজ হইতে নামিয়া গ্রামে যাইতে পদরজে যাইবে—একথা কেহ কল্পনা করিতে পারে না। কাঁচা গ্রামের রাস্তা দিয়া জুতা পরিয়া মাতা ও পুত্রী চলিতে থাকে এবং প্রত্যেক গৃহস্থের ঘর হইতে বিস্ময়-নেত্রের দৃষ্টি আসিয়া তাহাদের উপর নিপতিত হয়!

দারোগা পাকা বাড়ী রাখিয়া গিয়াছিলেন। দালানের স্থানে স্থানে বটগাছ গজাইয়া কিছু কিছু জখম করিয়াছে, রক ও বারান্দা হইতে শ্বেত-পাথরের টালি উঠিয়া গিয়া গ্রামের প্রতি গৃহের কোন-না কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, চামচিকা গৃহের মধ্যে পুরীষরাশি জমা করিয়াছে। গাছে, মানুষে, জন্তুতে এইরূপে ডাকাতি ও অত্যাচার করিয়া আসিতেছে বিস্তর। রাজমোহন ও নাছিরুদ্দিন কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাড়ীটাকে অনেক সংস্কার করিয়া বাসের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

নিস্তারিণী ঘর গুছাইয়া লয়। পাড়ার লোক অনেক আসিয়া জুটিয়াছে, কিন্তু তাহারা বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে বিপুল ব্যবধান রক্ষা করিয়া তাঁহার কার্য্যাবলী শুধু নিরীক্ষণ করে—কেহ কাছেও আসে না, সাহায্যও করে না! মিত্তির-গিন্নির একটু নাম আছে গাঁয়ের মধ্যে—জ্ঞান গরিমায় অগ্রণী বলিয়া। তাঁহার ভ্রাতা কলিকাতায় সওদাগরের আফিসে কাজ করেন। তিনি তথায় মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন এবং ফিরিয়া আসিয়া মেয়েমহলের মধ্যাহ্ন-অবসরকে মূল্যবান করিয়া তোলেন নানা সত্যমিথ্যা গল্পের দৌলতে। তাঁহার ১২ বৎসরের পুত্রও অনুরূপভাবে তাহার বন্ধুদিগকে চমক্ লাগাইয়া দেয়। তাঁহার অষ্টম বৎসরের কন্যা দাদার এবং মায়ের বুলি মুখস্থ করিয়া রাখে এবং অবসর বুঝিয়া তাহা কার্য্যে খাটাইয়া শ্রোতাদিগের নিকট হইতে খ্যাতি অর্জ্জন করে।

হ্যাঁ, এই মিত্তির-গিন্নি পুত্র কন্যা লইয়া একেবারে

পশ্চাতে দাঁড়াইয়া যেন গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। ভাবখানা এই যে—ওগো নগরবাসিনী! দেখে নেও, আমাদের গ্রামের মধ্যেও বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে এমন লোক আছে।

মিত্তিরগিন্নির সঙ্গে নিস্তারিণীর পরিচয় সহজেই হইল এবং তাঁহার কন্যা টেঁপির সঙ্গে অণিমার আলাপ একেবারে ঘনিষ্ঠতায় গিয়া দাঁড়াইল। টেঁপি বলিতে লাগিল, "দাদা দেখে এসে বলেছে যে, আজকাল ইডেন গার্ডেনের চেয়ে লেক অনেক সুন্দর। তাই আমি আর ইডেনে যাই নি—লেকে গিয়েছি দু'বার। খুব সুন্দর, না ভাই?"

'দাদা' সমরেশ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছোট বোনের প্রদত্ত সম্মান সম্ভোগ করিতে থাকে, কিন্তু এই সামান্য দুটি মেয়ের আলোচনায় যোগদান করিয়া নিজের মর্যাদার হানি করিতে চায় না। চুপ করিয়া থাকে বিজ্ঞের মত।

পাশের গ্রামের একটা বিবাহ-উৎসব লইয়া বেতগাঁ গ্রামের লোক একদিন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মিত্তিরগিন্নির চাঞ্চল্যের মাত্রা একটু বেশী এই জন্য যে, এ গাঁয়ের অনেকেরই যদিও নিমন্ত্রণ হইয়াছে তথাপি মিত্তিরমশাইকে যে একটু বিশেষ সম্মানের সহিত আহ্বান করা হইয়াছে তাহা নাকি তিনি কি করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন, সেইজন্য মিত্তিরগিন্নির বিশেষ সাজে সজ্জিত হইয়া যাওয়া দরকার, কিন্তু সজ্জার সরঞ্জামেরই অভাব এবং সেইজন্যই এত উৎকণ্ঠা।

সিন্দুক ঘাঁটিয়া শাড়ী একখানি বাহির করিলেন বটে, তাহা মূল্যবান হইলেও বড় সেকেলে। কিন্তু একটু পরেই চিন্তা করিয়া বুদ্ধিমতীর মত মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে—ভালই, আজকাল কলিকাতায় পুনরায় সেকেলে ফ্যাসনই ফিরিয়া আসিতেছে তিনি দেখিয়াছেন। সেইটা পরিয়াই যাইবেন ঠিক করিলেন এবং কেহ যদি 'সেকেলে' বলিয়া কোন কথা মুখে তোলে অথবা চোখের ইসারায় বা নাকের সিঁটকানি দ্বারা ইঙ্গিত করে তবে কি কি বাক্যবাণে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিবেন তাহা শাণিত করিয়া মনের তূণমধ্যে সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু মুস্কিল বাধিল গহনা লইয়া। সোনা যে একেবারে নাই বলিলেই হয়! হাতে কয়েক গাছা চুড়ি মাত্র সম্বল। গলায় একটা কিছু না ঝুলাইলে মাথা থাকে কি করিয়া? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাইল। এত সহজে যে বুদ্ধিটা খুলিল তাহার জন্য নিজেই নিজেকে প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। নিস্তারিণীকে গিয়া বলিতেই তিনি তাঁহার লোহার সিন্দুক খুলিয়া এক ছড়া হার বাহির করিয়া মিত্তির-গিন্নিকে পরাইয়া দিলেন।

প্রসন্নমুখে তিনি বিদায় হইতেই অণিমা বিষন্ন ও বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল "মা! তুমি না বলেছিলে যে, আমি যখন বড় হব ও হারছড়া আমাকে দেবে?"

মেয়ের কথায় এক গাল হাসিয়া মাতা বলিলেন, "দূর পাগলী! আমি কি ওঁকে একেবারে দিয়ে দিলাম? উনি ফিরিয়ে দেবেন আবার।"

অণিমা তখন নিশ্চিন্ত মনে আবার আগড়ুম্ বাগড়ুম্ খেলার তালিম দিতে লাগিল একলা একলাই। এই খেলাটা সে গ্রামে আসিয়া নূতন শিখিয়াছে, তাই মাঝে মাঝে বসিয়া যায় মহড়া দিতে।

মিত্তিরগিন্নির চাঞ্চল্য এইবার গিয়া চরমে পেঁছিল। একেবারে উৎকণ্ঠা। মহা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গলার হারছড়া আয়নার সামনে রাখিয়া কাপড়টা শুধু বদলাইয়াছেন পাশের ঘরেই, এরই মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন হারছড়া নাই! ঝি-চাকরদের শাসাইয়া, বালক-বালিকাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও কিছুই কিনারা করিতে পারিতেছেন না! বাড়ীতে ইঁদুরের উৎপাত আছে—ইঁদুরের গর্ত্ত পর্য্যন্ত খুঁজিয়া যখন নিরাশ হইলেন, তখন মহা সঙ্কটে পড়িয়া গেলেন।

কিছুতেই যখন পাওয়া গেল না তখন মিত্তিরগিন্নি ছেলে-মেয়েদের বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিলেন যে, তাহারা যেন ঘুণাক্ষরেও একথা লইয়া বাহিরে আলোচনা না করে। পরে স্বামীর কাছে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন—"এখন উপায়?" মিত্তিরমশাই পত্নীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতে যাইতেছিলেন যে, পূর্ব্বেই ত তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন যে, পরের দ্রব্যে সাজ করিয়া দরকার কি? কিন্তু স্ত্রীর বর্ত্তমান অসহায় অবস্থা দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। শুধু ভাবিতে লাগিলেন।

দুই চারিদিন উৎকণ্ঠায় কাটিল। মিত্তিরগিন্নি নিস্তারিণীর বাড়ীমুখো আর হইতে পারে না। ছেলেমেয়েরা কিন্তু যায়-আসে। একদিন টেঁপি আসিয়া খবর দিল যে, পরদিন নাকি নিস্তারিণী কলিকাতায় যাইতেছেন। হঠাৎ কেন কি দরকার পড়িয়াছে। আবার পূজার সময় আসিবেন। টেঁপির মাতা খবরটা পাইয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। উৎকণ্ঠার মাত্রা কমিল কি বাড়িল তাহা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। একবার তাঁর যাওয়া দরকার, ভাবিলেন। যা হোক একটা কিছু বলা অন্ততঃ উচিত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি আর দেখাটাও করিতে পারিলেন না।

নিস্তারিণী চলিয়া যাইবার পরদিন মিত্তিরমশাই স্ত্রীকে বলিলেন "ঠিক ঐ রকম একটা হার গড়িয়ে দেওয়া উচিত, তার জন্য টাকার যোগাড় করতে হবে। আমাদের খরচ কমান দরকার এবং আয়ও বাড়াতে হবে।"

গিন্নি বিষণ্ণ মুখে জবাব দেন, "খরচ না হয় কমালাম আমি, কিন্তু আয় আবার তুমি কোত্থেকে বাড়াবে? ঐ ত ক'বিঘা জমি মাত্র সম্বল! ওতে ত আর সোনা ফলান যাবে না! যা' ফলে তাই ফলবে।"

মিত্তির বলেন, "হ্যাঁ, জমি অবিশ্যি ঐ ক' বিঘাই মাত্র, কিন্তু সময় আমার ত অনেক আছে। দাবা, পাশা, তামাক সেবনে সব সময় অতিবাহিত না করে, কোন কাজে লাগান যেতে পারে। এই সেদিন সরকারের তরফ থেকে একটা দল এসেছিল, গ্রামে কি ক'রে নারকেলের ছোব্ড়া থেকে নানা রকম জিনিষ তৈরী হতে পারে—তা ক'রে দেখিয়ে গেল। গ্রামের লোক অবিশ্যি সেটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলে; আমারও মনে ধরে নি ব্যাপারটা তখন। এখন ভাবছি—ওটাকে ধরতে হবে।"

(শেষাংশ ৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাহিত্য-সংবাদ

তারিখ পরিবর্ত্তন

(ছাত্রসংঘ পাঠাগার, হাওড়া)

প্রতিযোগিদের ইচ্ছায় আমরা রচনা ও গল্প জমা দিবার তারিখ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম। বর্ত্তমানে ৬ই ডিসেম্বর গল্প ও রচনা জমা দিবার শেষ তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নিয়ম পূর্ব্ববৎ কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়া স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পূর্ণ নাম, ধাম ও স্কুলের নামসহ সঙ্ঘ কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। ইহাতে যোগদানে কোন প্রবেশ-মূল্য নাই। পুরস্কার প্রত্যেক বিষয়ে দুইটি। সঙ্ঘ-সভ্যদের আলাদা বিশেষ পুরস্কার।

রচনা—পারিবারিক লাইব্রেরী (বাঙলায় লিখিতব্য); গল্প—এ্যাডভেঞ্চার গল্প (গল্পে অসম্ভব বা অবান্তর কিছু যেন না থাকে এবং ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী যেন না হয়।)

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুধাংশুকুমার বসু, যুগ্ম সহ-সম্পাদক। ১০৭, মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া।

রচনা প্রতিযোগিতা

আগামী ৩০শে নবেম্বর অবধি নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ের প্রতিযোগিতা হইবে। ১৮ বৎসরের নীচে যে কোন বালক কিম্বা বালিকা ইহাতে যোগদান করিতে পারিবে। যদি কেহ তাহার বিষয়টি প্রতিযোগিতায় স্থান পাইল কিনা জানিতে চাহে তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে পাঠাইতে হইবে। প্রতি বিষয়ের জন্য একটি করিয়া রৌপ্য-পদক প্রথম পুরস্কার দেওয়া হইবে। যদি সম্ভব হয় দ্বিতীয়কেও কোনরূপ পুর[স্কার] দেওয়া হইবে।

প্রতিযোগিতার বিষয়—

(১) ছোট গল্প প্রতিযোগিতা—গল্পটি যেন কোন[ক্রমে] ফুলস্কেপ কাগজের দুই পৃষ্ঠার বেশী না হয়। গ[ল্প] লিখিয়া তাহার তলায় নিজের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট[ভাবে] লিখিতে হইবে।

(২) রচনা প্রতিযোগিতা—রচনার বিষয়—"ছোট [ছেলে]মেয়েদের খেলাধূলার আবশ্যকতা।" রচনাটি ছোট হওয়া চা[ই।]

(৩) হস্তলিপি প্রতিযোগিতা—হস্তলিপি যেন কোন[ক্রমে] দশ লাইনের বেশী না হয়। যদি কোন পদ্য হইতে লেখ[া হয়] তাহা হইলে খুবই ভাল।

(৪) চিত্র প্রতিযোগিতা—চিত্রের বিষয়—"পূর্ণিমা রা[ত্রি]" চিত্রটি Black and white অথবা রঙীন, যে কোন ভা[বে] আঁকিতে পারিবে। চিত্রটি যেন কোন ক্রমেই 5"×5" [এর বেশী] না হয়।

এই সমস্ত বিষয়ের বিচারকার্য্য লাহোরস্থ "হোয়া[ইট] ষ্টার ক্লাব" কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বিচারকদের দ্বারাই সম্[পন্ন] হইবে। কোনও প্রকার নকল লওয়া হইবে না। অন্[য] বিষয় জানিবার জন্য সম্পাদকের নিকট পত্র লিখুন।

শ্রীসরলকুমার পাল, সম্পাদক। The White Star Cl[ub], 3, Lodge Road, Lahore.

সোনা অপহরণে সোনার ফসল

(৫৮ পৃষ্ঠার পর)

যা কথা তাই কাজ সুরু হইল। শুধু মিত্তিরমশাই নিজে নয়, ছেলেমেয়ে গৃহিণী সকলেই লাগিয়া গেলেন—অবসর সময়... এই কাজে,—প্রয়োজনের তাগিদেও বটে নূতনত্বের মোহেও কতকটা। উৎপন্ন দ্রব্য যাহা হইতে লাগিল তাহা নিকটস্থ 'গঞ্জে' পাঠাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থাও হইয়া গেল। প্রতি মাসেই কিছু অর্থ এই নূতন কাজের দরুন আয় ও সঞ্চয় হইতে লাগিল। পূজার কিছু পূর্ব্বেই কয়েক মাসের সঞ্চিত টাকা লইয়া মিত্তির কলিকাতায় গেলেন এবং নিস্তারিণীর গ্রামে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই অবিকল অনুরূপ একছড়া সোনার হার তৈরী করিয়া আনিলেন।

তারপর নিস্তারিণী গ্রামে ফিরিতেই মিত্তিরগিন্নি তাহা লইয়া তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন, "যাবার সময় তুমি অত তাড়াতাড়ি চলে গেলে ভাই! আমার শরীরটাও সেদিন ভাল ছিল না, আর এই হারছড়া ফিরিয়ে যে দেব—তারও সুবিধা হল না।"

নিস্তারিণী অবাক্ হইয়া মিত্তিরগিন্নির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মিত্তিরগিন্নি এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "কি—অমন করে তাকিয়ে রইলে যে? হার যে দিয়েছিলে মনে নেই নাকি?"

নিস্তারিণী বললেন, "কিন্তু সে হার ত তুমি সেই দিনই [ফিরিয়ে] দিয়েছিলাম?—সেই দিনই!"

এবার অবাক্ হইবার পালা মিত্তিরগিন্নির,—"ফিরি[য়ে] দিয়েছিলাম?—সেই দিনই!"

"হ্যাঁ, গো হ্যাঁ—এ হার আবার তুমি কোথায় পেলে?"

মিত্তিরগিন্নি সে কথার কোন জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলে[ন,] "আমি কি নিজে এসে দিয়ে গিয়েছিলাম?"

"না, আমার মেয়ের হাতে সেই দিনই পাঠিয়ে দিলে যে।"

তারপর অণিমার কাছে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল [যে,] তার হাতে মিত্তিরগিন্নি দেন নাই—সে নিজেই হারছড়া আয়[না] দেরাজের উপর হইতে উঠাইয়া আনিয়াছিল। তাহারই জি[নিস] কি না, তাই সে-ই নিয়া আসিয়াছে। ইহার জন্য যে কাহা[কেও] কিছু বলিয়া আসিতে হইবে, তাহা তাহার মাথায় আসে না[ই।]

গিন্নির প্রতি তাকাইয়া মিত্তিরমশাই প্রসন্ন মনে বলিলে[ন,] "ভালই হইয়াছে—তোমার গলায় এক গাছা সোনা ছিল, [দু]একটা হল। আর এই ধাক্কায় আমাদের একটা উপরি আ[য়ের] পথও খুলে গেল। এখন টেঁপির গয়না হবে। তার[পর] ছেলেটার বৌ এলে তারও হবে। বন্যায় বা অজন্মায় ক্ষেতে ফসলে যে-বৎসর গোলা ভর্ত্তি হবে না, সে বৎসরও সিন্দু[ক] টাকায় ভর্ত্তি থাকবে ত! তাই দিয়ে সামলান যাবে, কি বল? তাছাড়া, জমির জন্যে কোন বছরই সার কিনতে পারি না; [এ]ই টাকা থেকে কিছু ...

রঙ্গ-জগৎ

শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুত অমর মল্লিকের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের "বড় দিদি" ছবির কাজ বেশ ভালভাবেই চলিতেছে।

নিউ থিয়েটার্সের "সাথী" ও "অধিকার" এই দুইখানি বই মুক্তি-প্রতীক্ষায় আছে। 'সাথী' ছবিখানি নিউ সিনেমায় 'অধিকার' ছবিখানি চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে।

দুই নম্বর ষ্টুডিওতে "সাপুড়ে" ছবির কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। পরিচালক দেবকীকুমার বসু ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন।

শ্রীযুত নীতীন বসু 'দুষমন' ছবিখানি তুলিতেছেন। হিন্দি ভাষায়—ছবিখানি তোলা হইতেছে। ইহার বাঙলা সংস্করণ তোলা হইবে না।

পরিচালক ফণী মজুমদার "কপালকুণ্ডলা" (হিন্দি) ছবি তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় লীলা দেশাই, মতি বিবির ভূমিকায় কমলেশকুমারী এবং নবকুমারের ভূমিকায় সাজাম অভিনয় করিতেছেন।

শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া শ্রীমতী যমুনা সহ ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি একখানি ছবির কাজে হাত দিবেন বলিয়া ষ্টুডিও কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন।

* * * *

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যে সব আর্য্য নারীর সাধনা ও কৃতিত্বের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে খনা দেবীর নাম অন্যতম প্রধান হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বাঙালীর ঘরে ঘরে যাঁহার মুখের বচন আজও পর্য্যন্ত পরম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়, সেই মহীয়সী মহিলার জ্যোতিষ বিদ্যায় অলৌকিক প্রতিভার কথা, তাঁহার প্রেম, বিজয় অভিযান ও আত্মবলিদানের কাহিনী অবলম্বন করিয়া মেট্রোপলিটান পিকচার্স "খনা" ছবিখানি তুলিয়াছেন। পরিচালনা করিয়াছেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের এই প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহা আমরা ছবিখানি দেখার পর জানাইব; তবে বিষয় নির্ব্বাচন যে ভাল হইয়াছে তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

বিভিন্ন ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, ছায়া, অরুণা, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল রায়, ধীরেন মুখার্জ্জি, সমর ঘোষ, মনোরমা, কালী ঘোষ প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

"খনা" ছবির সহিত হাসির ছবি "অভিসারিকা" দেখান হইয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় ধীরেন গাঙ্গুলী, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, সত্য মুখার্জ্জি, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

বোম্বে টকিজের নূতন ছবি "বচন" শনিবার হইতে প্যারাডাইস সিনেমায় দেখান হইতেছে। দেবিকারাণী ও অশোককুমার এই ছবিতে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকায় মীরা, মমতাজ প্রভৃতি আছেন।

রাজপুত প্রণয় কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই ছবিখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। পুরাকালে বীর রাজপুতেরা কিভাবে সত্য পালন করিত, তাহারই এক করুণ কাহিনী এই ছবির আখ্যানভাগ। বোম্বে টকিজের অন্যান্য ছবির ছাঁচ এই ছবির মধ্যে পাওয়া যাইলেও ছবিখানি পরিচালনাগুণে এবং দেবিকারাণী ও অশোককুমারের অভিনয় নৈপুণ্যে মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। ছবিখানির মধ্যে সাধারণ হিন্দি ছবির মত তৃতীয় শ্রেণীর রসিকতা নাই অথবা কোন অবান্তর কিছু নাই—সেই জন্যই বাঙালীরা এই ছবিখানিকে বিশেষভাবে পছন্দ করিবেন। রাজপুতদের শৌর্য্য-বীর্য্যের যে সমস্ত দৃশ্য দেখান হইয়াছে অথবা যুদ্ধ ও দুর্গ অবরোধের যে সমস্ত দৃশ্য দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে কৃত্রিমতার কোন ছাপ

'সাথী' চিত্রে কাননবালা ও শৈলেন চৌধুরী

নায়িকা শ্যামার ভূমিকায় শ্রীমতী দেবিকারাণী অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। প্রত্যেক ছবিতে আমরা তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। নায়কের ভূমিকায় অশোককুমারের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা চলে। মালতীর ভূমিকায় মীরার অভিনয় ও নৃত্যগীত বিশেষভাবে উপভোগ্য। মোটের উপর ছবিখানি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে।

* * *

শনিবার হইতে "শ্রী" চিত্রগৃহে 'ও কে ও'-র প্রথম চিত্র "একলব্য" ও তৎসহ "রূপোর ঝুমকো" দেখান হইবে। একলব্য ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে এই ছবিখানি তোলা হইয়াছে। চিত্রগ্রহণ করিয়াছেন বীরেন দে; শব্দগ্রহণ করিয়াছেন নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ ও সুর সংযোজনা করিয়াছেন ধীরেন দাস। বিভিন্ন ভূমিকায়

'আঁধিয়ার' চিত্রে মেনকা, যমুনা ও পাহাড়ী সান্যাল।

"বড়দিদি" চিত্রে মেনকা ও মলিনা।

জহর গাঙ্গুলী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য, তুলসী চক্রবর্ত্তী, তারক বাগচী, মণি মজুমদার, বিশ্ব ঘোষ, কালী ঘোষ, জ্যোৎস্নাকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যেন রায়, যতীন চৌধুরী, শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ নন্দন, অমর ঘোষ, রেণু, রাজলক্ষ্মী, নন্দরাণী, দুর্গারাণী, নি[illegible] প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

"রূপোর ঝুমকো" ছবিখানি [illegible]চালনা করিয়াছেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপা[illegible] মিঃ এস এন দাস সুর দিয়াছেন। বি[illegible] ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সত্য মুখ[illegible] নীলু রায়, ফণী বিদ্যাবিনোদ, কা[illegible] দে, প্রফুল্ল দাস, মুরারি মুখার্জ্জি, [illegible] ভট্টাচার্য্য, প্রভাস মিত্র, যতীন চৌ[illegible] প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

খেলা-ধুলা

শ্রীব্রজরঞ্জন রায়

বাঙলার এ্যাথলীটগণ নিদ্রামগ্ন

ীত পড়িয়াছে। এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের সময়
া। দুই-তিন সপ্তাহ পর হইতে বাঙলার বিভিন্ন
অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে। কিন্তু বাঙলার এ্যাথ-
াকে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যাইতেছে না।
 পাজাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের মাঠে সকাল
ায় গমন করিলে দেখা যাইবে দলে দলে উৎসাহী
টগণ বিভিন্ন এ্যাথলেটিকসের সাফল্যের জন্য অনুশীলন
েন। বাঙলার মাঠে তাহা দেখিবার উপায় নাই।
প্রতি বৎসরের ন্যায় বাঙালী এ্যাথলীটগণ এখনও
ায় মগ্ন। এ্যাথলেটিক স্পোর্টস অনুষ্ঠান আরম্ভ
 তাঁহাদের উৎসাহ জাগে না। কোনরূপে "ফাঁকতালে"
অনুষ্ঠানে পুরস্কার লাভ করিয়াই যে তাঁহারা সন্তুষ্ট।
 তাঁহাদের প্রাণে বিশেষ আঘাত দেয় না। এ্যাংলো
ের সাফল্য তাঁহাদের সহিয়া গিয়াছে। প্রথম স্থান
াহারা দখল করিতে না পারিলেও দ্বিতীয়, তৃতীয়
াদের বাঁধা আছে। সেইজন্য পরিশ্রম করিবার
না। এতদিন এইভাবে যখন তাঁহারা চলিতে
 তখন তাঁহাদের এই বৎসর নূতন করিয়া অতিরিক্ত
রিবার কি প্রয়োজন আছে? জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি
ারা ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই সেইজন্যই তাঁহাদের
লোভাব। বাঙলা ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে, পৃথিবীর
 সম্মান অর্জ্জন করুক এই দূর সঙ্কল্প তাঁহাদের
 দিন স্থান পায় নাই, পাইবে কিনা সেই বিষয়েও
দহ আছে।

শিথিল মনোভাবের সূত্র?

া এ্যাথলীটগণের এইরূপ মনোভাব ১২ বৎসর
তে আরম্ভ হইয়াছে। তবে সেই সময় এইরূপ
 কিছুই প্রকাশ পায় নাই। তাহার অন্তরায়
একজন বাঙালী এ্যাথলীট যাঁহাদের বিশেষ
 স্পোর্টস ক্ষেত্রে বাঙালীর নাম সুপ্রতিষ্ঠ করা।
রিয়া সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কাহারও পক্ষে
 সুতরাং তাঁহাদের পক্ষেও তাহা সম্ভব হয় নাই।
 সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতার অভাব অনুভব
সকল উৎসাহী বাঙালী এ্যাথলীটগণ ধীরে ধীরে
হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহাদের দৈহিক গঠন
ল যে, তাঁহারা অল্পায়াসেই স্পোর্টসের অনেক-
র কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিতেন। তাঁহারা এই
্যক অনুষ্ঠানেই বহু পুরস্কার লাভ করিতেন।
তিষ্ঠিত ঐ আদর্শ পরবর্ত্তী বাঙালী এ্যাথলীট-
পথে চালিত করিল। স্বাভাবিক দৈহিক ক্ষমতার
াহারা ঐরূপ বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে
হা পরবর্ত্তী এ্যাথলীটগণ বুঝিলেন না, কারণ
ইবার লোক ছিলেন না। বাঙলার যাঁহারা এ্যাথ-
র্টস পরিচালনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে
কাহারও এইরূপ যোগ্যতা ছিল না যে পরবর্ত্তী বাঙালী এ্যাথ-
লীটগণের ঐ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উদীয়মান
এ্যাথলীটগণও কোনরূপ নির্দ্দেশ না পাওয়ায় বহু পুরস্কারের
লোভে প্রত্যেক স্পোর্টস অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে লাগিলেন।
স্পোর্টসের বিভিন্ন বিষয় সাফল্য লাভ করিবার জন্য যেরূপ
যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তাহা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই
তাহাদিগকে হতাশ হইতে হইল। কারণ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান
যুবক বা বালকগণ, যাহারা এ্যাথলেটিকসের একটি বা দুইটি
বিষয় লইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদের পক্ষে এই সমস্ত
বাঙালী এ্যাথলীটগণকে পরাজিত করা কঠিন হইল না।
পুরস্কার লোভী বাঙালী এ্যাথলীটগণ দুই-তিন বৎসর সাফল্য
লাভের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া শেষে ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে
অবসর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর
উৎসাহী বাঙালী এ্যাথলীটগণের বিভিন্ন স্পোর্টসের অসাফল্যের
দৃষ্টান্ত দেখিয়াই বর্ত্তমানের বাঙালী এ্যাথলীটগণ এইরূপ
নিজ্জীব হইয়া পড়িয়াছেন। স্পোর্টসের সময় উপস্থিত
হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রাণে উৎসাহ জাগিতেছে না।

উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রচারের অভাব

বাঙালী এ্যাথলীটগণের এই নিজ্জীবতা, এই ঔদাসিন্যের পূর্ণ সহায়তা করিয়াছে এ্যাথলেটিকসের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রচারের অভাব। গত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে এমন একটি বৎসরের কথা আমাদের মনে পড়ে না যে বৎসর উদীয়মান বাঙালী এ্যাথলীটগণকে স্পোর্টসের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে বা এ্যাথলীটগণ যাহাতে বিভিন্ন বিষয় উন্নতি করিবার জন্য উৎসাহিত হয় তাহার জন্য প্রচারপত্র প্রকাশিত করা হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর আমরা বিভিন্ন প্রবন্ধে শিক্ষার ও প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের, যে প্রতিষ্ঠান বাঙলার এ্যাথলেটিকসের সর্ব্বময় পরিচালকমণ্ডলী তাহার পরিচালকগণের ঔদাসিন্য। কোন্ প্রতিযোগিতা কোন্ দিন অনুষ্ঠিত হইবে এই তালিকা প্রকাশিত করিয়াই সন্তুষ্ট। শীতের প্রারম্ভে দেশবাসীকে বিশেষ করিয়া এ্যাথলীটগণকে স্পোর্টসের কথা স্মরণ করাইয়া সজাগ করিবার প্রচেষ্টা তাঁহারা কোনদিনই করেন নাই। এই বৎসরে তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতার আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্পোর্টের অনুষ্ঠানের তালিকা প্রকাশের কথা পর্য্যন্তও তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। বাঙলার এ্যাথলেটিক স্পোর্টের ভবিষ্যৎ যাহার নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ যখন নিদ্রামগ্ন তখন এ্যাথলীটগণ যে নিদ্রামগ্ন থাকিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বাঙালী এ্যাথলীটগণ বিভিন্ন বিষয় বাঙলার রেকর্ড করিয়া মনে মনে গর্ব্ব করেন ও ধারণা পোষণ করেন যে, শীঘ্রই তাঁহারা পৃথিবীর ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু তাহা যে কত অসম্ভব তাহা জানাইয়া দিবার জন্য পৃথিবীর রেকর্ড ও ভারতীয় রেকর্ডের কতকগুলি নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৮ই নবেম্বর—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভায় স্থির হয় যে, আগামী ১২ই নবেম্বর হইতে পুনরায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আন্দোলন সুরু করা হইবে এবং আগামী ২০শে নবেম্বর বাঙলার সর্ব্বত্র "নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক বন্দী দিবস" প্রতিপালিত করা হইবে। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ বন্দীদের মুক্তি সাধনকল্পে ৪৫জন সভ্য লইয়া একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

আলীপুর সেনট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা বাঙলা গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন যে, জেলে তাঁহাদের সহিত যে ব্যবহার করা হয়, তাহার প্রতিবাদে তাঁহারা ১১ই, ১২ই ও ১৩ই নবেম্বর—এই তিন দিন অনশন ধর্ম্মঘট করিবেন।

গতকল্য বোম্বাই মিল অঞ্চলে শ্রমিক জনতার উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে যে ১১জন আহত হইয়াছিল, তাহাদের একজন মারা গিয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশনাল এণ্ড কুইলন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (লিকুইডেশনে গিয়াছে) ধৃত ৪জন ডিরেক্টারের পক্ষ হইতে "হেবিয়াস কর্পাস" অনুসারে যে আবেদন পেশ করা হইয়াছিল, মাদ্রাজ হাইকোর্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। ধৃত ডিরেক্টারগণকে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করা হইবে।

হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের ৫ম ডিক্টেটার শ্রীযুক্ত ইয়েল্লা রেড্ডী ৪জন অর্গ্যানাইজিং সেক্রেটারী সহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুক্ত কিষুনলকৃষ্ণ শর্ম্মার উপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হায়দরাবাদ রাজ্য ত্যাগের জন্য নোটিশ জারী করা হইয়াছে। আর্য্যরক্ষা সঙ্ঘের তৃতীয় ডিক্টেটার শ্রীযুক্ত শংকর রাও ও দুইজন সদস্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বিহার গবর্ণমেণ্টের জেল কমিটি, জেলে অবমাননাকর সরকার সেলাম প্রথা রহিত করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলুই আসামের মন্ত্রীসংখ্যা বাড়াইয়া ৮জন হইতে ৯জন করিবার জন্য কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির অনুমতি চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট বিমলা দেবীর মামলা এলাহাবাদ হাইকোর্ট হইতে অন্য কোনও হাইকোর্টে স্থানান্তরের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ বৃটিশ পার্লামেণ্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এক বক্তৃতা করেন।

হের হিটলার মিউনিকে এক বক্তৃতা করেন। উহাতে তিনি বলেন,—"বৃটেন ও ফ্রান্সে যদি এমন রাজনীতিক থাকেন, যাঁহারা জার্ম্মানীর সহিত বন্ধুভাবে বাস করিতে চাহেন, তবে আমরা কৃতজ্ঞ হইব। বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে এখন কেবল আমাদের উপনিবেশ সমস্যার মীমাংসা হইতে বাকী; ঐ সব উপনিবেশ অন্যায়ভাবে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। জার্ম্মানী এগুলি চায়, বৃটেন ও ফ্রান্সের নি[illegible] হইতে উহার বেশী আর কিছু চায় না।"

৯ই নবেম্বর—

বাখরগঞ্জের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সম্প্রতি ভীষণ অন্নক[illegible] দেখা দিয়াছে। গত সপ্তাহে বরিশাল জেলা কৃষক সমিতি[illegible] নেতৃত্বে নাজিরপুর অঞ্চলের প্রায় এক সহস্র ক্ষুধিত কৃ[illegible] শোভাযাত্রা করিয়া পিরোজপুরের মহকুমা হাকিমের নি[illegible] উপস্থিত হইয়া তাহাদের খাওয়া পরার দাবী জানাইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ব[illegible] পরলোকগমন করিয়াছেন।

আসামের মন্ত্রীদের বেতন মাসিক ৫০০ টাকা, বা[illegible] ভাড়া বাবদ ১০০ টাকা এবং মোটর এলাউন্স বাবদ ১০০ টা[illegible] ধার্য্য হইয়াছে।

রাজকোট দরবার ও প্রজা পরিষদের প্রতিনিধিদের ম[illegible] আপোষ আলোচনা ফাঁসিয়া গিয়াছে। দরবার ১৪৪ ধারা ম[illegible] নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া যাবতীয় সভা ও শোভাযাত্রা বে-আই[illegible] ঘোষণা করিয়াছেন। প্রজা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ও প্র[illegible] ডিক্টেটার শ্রীযুক্ত ধাবর গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ডাঃ সি এল কাটিয়াল ফিন্সবারীর মেয়র নির্ব্বা[illegible] হইয়াছেন। ইংলণ্ডে ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্র[illegible] এরূপ উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইলেন।

কমন্স সভায় রাজার বক্তৃতা সম্পর্কে বিতর্ক হয়। রা[illegible] বক্তৃতায় ভারতবর্ষের উল্লেখ মাত্র নাই, ইহার উল্লেখ করিয়া [illegible] স্টাফোর্ড ক্রিপস ব্রিটিশের পররাষ্ট্র নীতির তীব্র সমালো[illegible] করেন। তিনি বলেন যে, ভারতবাসীরা স্বাধীনতার [illegible] পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং ভারতকে তুচ্ছ [illegible] উচিত হইবে না।

প্যারিসে জার্ম্মান দূতাবাসে গুলীর আঘাতে আহত [illegible]ন রথের মৃত্যু হইয়াছে।

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে উডহেড কমিশনের রিপোর্ট তৎসহ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি প্রকাশিত হইয়াছে। ব[illegible] গবর্ণমেণ্ট প্যালেষ্টাইন বাটোয়ারার পরিকল্পনা বাতিল ক[illegible] দিয়াছেন এবং প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান কল্পে ই[illegible] আরব ও বৃটিশ প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক আহ্বান হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

১০ই নবেম্বর—

আলীপুরের সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযু[illegible] এন ভৌমিকের এজলাসে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী মিস সুজাতা সরকারের (বয়স [illegible] বৎসর) মৃত্যু সম্পর্কিত মামলার শুনানী আরম্ভ হ[illegible] এই মামলায় সুজাতার গর্ভপাত করাইবার ষড়যন্ত্রের যোগে শ্রীমতী উষানলিনী ঘোষ, ডাঃ এস এন চা[illegible] ধারীন মুখার্জ্জি ও মণীন্দ্র ভট্টাচার্য্য অভিযুক্ত হইয়া[illegible]

"অমৃতবাজার পত্রিকা"র শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি [illegible] বসুমতী পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগে ক্ষ[illegible]

করিয়া হাইকোর্টে দুইটি মামলা রুজু করিয়াছিলেন। মামলা সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসা [illegible] গিয়াছে।

বোম্বাইয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী শ্রমিকদের উপর [illegible]লিশের গুলী চালনা সম্পর্কে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট একটি [illegible]ন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন।

রাজকোট রাজ্যে দমননীতির প্রতিবাদে জোর পিকেটিং [illegible]ন হয়। পুলিশ সত্যাগ্রহীদের উপর তিনবার লাঠি [illegible]য়। ফলে ৫০ জন আহত হইয়াছে।

উডহেড কমিটির রিপোর্টে প্যালেষ্টাইনের আরবদের [illegible] তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। আরব পত্রিকাসমূহ [illegible]মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগদান [illegible]লে প্যালেষ্টাইনের উপর ইহুদীদের অধিকার মানিয়া [illegible] হইবে।

লণ্ডনে আহূত প্যালেষ্টাইন বৈঠকের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে [illegible]কলম ম্যাকডোনাল্ড কমন্স সভায় একটি বিবৃতি [illegible]ছেন। উহাতে জানা যায় যে, জেরুজালেমের বর্ত্তমান [illegible]তীকে উক্ত বৈঠকে নেওয়া হইবে না।

নব্য তুরস্কের স্রষ্টা প্রেসিডেণ্ট কামাল আতাতুর্ক [illegible]লোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ [illegible] হইয়াছিল। নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত না হওয়া [illegible]ন্ত জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেণ্ট আব্দুল হালি রেন্দা [illegible]ডেন্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হের ভন রথের মৃত্যু সংবাদে ক্ষিপ্ত হইয়া জার্ম্মানী ও [illegible]য়ায় নাৎসীরা ইহুদীদের উপর অত্যাচার সুরু [illegible]য়াছে। ইহুদীদের ধর্ম্মমন্দিরগুলি পোড়াইয়া দেওয়া [illegible]য়াছে। জার্ম্মানীর সর্ব্বত্র ইহুদীদিগকে গ্রেপ্তার করা [illegible]য়াছে। ভিয়েনায় ৫ হাজার ইহুদী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

[illegible] নবেম্বর

মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্দ্ধায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

দমদম সেণ্ট্রাল জেল ও আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের প্রায় [illegible]ত রাজনৈতিক বন্দী, জেলে তাঁহাদের প্রতি যে ব্যবহার [illegible]হয়, তাহার প্রতিবাদে তিন দিনের জন্য অনশন পালন [illegible]তে আরম্ভ করিয়াছেন।

কলিকাতা মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টে- [illegible] মিঃ ননীগোপাল মজুমদার গতকল্য রাত্রে সিন্ধু প্রদেশের [illegible]জেলার অন্তর্গত জোহিতে ডাকাতদলের হস্তে নিহত [illegible]ছেন। প্রকাশ, ডাকাতদল তাঁহার ক্যাম্পে প্রবেশ করিয়া [illegible]ক ও তাঁহার তিনজন কেরাণীকে আক্রমণ করে। ইহার শ্রীযুক্ত মজুমদার মরা যান এবং তাঁহার কেরাণীগণ আহত [illegible]

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিন্ধ্যাচলে হাওয়া পরিবর্ত্তন [illegible] গিয়া হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন।

[illegible]হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের ৬ষ্ঠ ডিক্টেটর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস- [illegible]বজদার অপর পাঁচ জন সঙ্গীসহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

[illegible]টগড় রাজ্যে নূতন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা [illegible]

রাজকোটে সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের লাঠি চালনার প্রতিবাদে হরতাল প্রতিপালিত হয়। আজও পুনরায় লাঠি চালনা চলে। ফলে ৫০ জন আহত হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে কলিকাতা এলবার্ট হলের জনসভায় যুদ্ধবিরোধী দিবসের অনুষ্ঠান এবং বাঙলার গবর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণের সভাপতিত্বে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সভায় যুদ্ধবিরতি দিবসের অনুষ্ঠান হয়।

নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিশেষ অধি বেশনের উদ্বোধন হয়।

জেনারেল ইসমেত ইনোনু তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ১৪ বৎসর কাল কামাল আতাতুর্কের ঘনিষ্ঠ সহযোগিরূপে কার্য্য করিয়াছেন। গত অক্টোবর মাসে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন।

প্যারিসে জার্ম্মান দূতাবাসে জনৈক পোলিশ ইহুদীর গুলীর আঘাতে হের ভন রথের মৃত্যু হওয়ায় জার্ম্মানীর সর্ব্বত্র ইহুদী বিরোধী আন্দোলন তীব্রভাবে সুরু হইয়াছে। জার্ম্মানীর সর্ব্বত্র নাৎসীরা অত্যাচারের ধ্বংসলীলা চালা- ইতেছে। ইহুদীদের দোকানপাট লুণ্ঠিত ও ধন-সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে। অনুমান ১০ হাজার ইহুদীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মিউনিকের ইহুদী অধিবাসীদিগকে শহর ত্যাগের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

মার্কিন মহিলা সাহিত্যিক পার্ল এস বাক সাহিত্যের জন্য বর্ত্তমান বৎসরের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইটালীর বৈজ্ঞানিক ডক্টর এনরিকো ফের্ম্মি জড়বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

১২ই নবেম্বর—

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সমস্যা ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভা হয়। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক বন্দী সমস্যা সম্বন্ধে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল সরকারী ইস্তাহারে যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহার তীব্র নিন্দা করিয়া এবং অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে সমস্ত বন্দীদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন চালাইতে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য শেঠ গোবিন্দ দাস আগামী ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নাগপুর রাজনন্দগাঁও কাপড়ের কলের শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য মিঃ রুইকর, গত ২৯শে অক্টোবর হইতে অনশন করিতেছেন।

আলীগড় জেলার দাদুনের মুসলমান জমিদার নবাব মহম্মদ জান খান অকস্মাৎ তাঁহার জমিদারীর এলাকাভুক্ত শত বৎসরের প্রাচীন শিবমন্দিরে পূজার্চ্চনাকালে হিন্দুদের মন্ত্রপাঠ ও শঙ্খধ্বনি নিষেধ করিয়া হুকুম জারী করিয়াছেন। এই দমন নীতির প্রতিবাদে হিন্দুরা হরতাল পালন করিতেছে।

কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের কলিকাতা শাখার বাৎসরিক অধিবেশন হয়। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী ইহাতে সভানেত্রীত্ব করেন। কলিকাতা ছাত্রীনিবাসগুলিতে ছাত্রীদের যথাযোগ্য তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্পর্কে সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

স্নেহলতা দাস ওরফে রেবা (১৩ বৎসর) নাম্নী এক অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে তাহার পিতার উল্টাডিঙ্গিস্থিত বাড়ী হইতে অপহরণ ও তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করার অভিযোগে রেজা করিম, ওরফে রাজকুমার চৌধুরী আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্ত্তৃক একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে; স্নেহলতার জ্যেষ্ঠ ভগিনী অঞ্জলি দাস সম্পর্কিত অভিযোগে আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মানীর সর্ব্বত্র ইহুদীদিগকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার ইহুদীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহুদীদের উপর এরূপ ইচ্ছাকৃত অত্যাচার এবং কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে সহযোগিতা করায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া প্রচার সচিব ডাঃ গোয়েবলস স্বতঃস্ফূর্ত্ত জনতা দমনে পুলিশের অক্ষমতার অজুহাত প্রদর্শন করেন। পৃথিবীর ইহুদীদিগকে সতর্ক করিবার অছিলায় ডাঃ গোয়েবলস এই হুমকীও দেখান যে, জার্ম্মানীতে ইহুদী নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে বিদেশে কোন আন্দোলন চলিলে জার্ম্মানীতে ইহুদীদের উপর পুনরায় নির্য্যাতন চলিবে। তদুপরি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সরকার বিরোধী দল জার্ম্মানীতে ইহুদী নির্য্যাতন সম্পর্কে আলোচনা করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন তৎসম্পর্কে সরকার বিরোধী দলকে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, রাইখষ্ট্যাগেও ইহুদী নির্য্যাতন অপেক্ষা অধিকতর গুরুতর বিষয়ের, অর্থাৎ প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে আলোচনা চলিবে। ইহুদী রঙ্গালয়, সিনেমা, সংবাদপত্র এবং ইহুদী বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হের ভন রথের হত্যার ক্ষতিপূরণস্বরূপ জার্ম্মানীর ইহুদীদের উপর একশত কোটি মার্ক পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে।

চীনা বাহিনীর কেন্দ্রীয় ব্যূহ দক্ষিণদিকে ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কাউ রেলপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহারা ক্যাণ্টন হইতে সাত মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

১৩ই নবেম্বর—

ঢাকা আসানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের অধীন তিনটি হোষ্টেলের ১১৫জন হিন্দু ছাত্র গতকল্য হইতে অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন। পূজার ছুটির পর মেইন হোষ্টেল হইতে প্রিন্সিপ্যালের আদেশক্রমে যে ১৭ জন ছাত্রকে ফুলার হোষ্টেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাঁহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারকল্পেই ছাত্রগণ অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। ফুলার হোষ্টেলে স্থানান্তরিত হিন্দু ছাত্রগণের অভিযোগে প্রকাশ, তাহাদিগকে তথায় স্থানাভাব সংক্রান্ত এবং অন্যান্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। মেইন হোষ্টেল হইতে হিন্দুছাত্রগণকে অপসারিত করিয়া সেখানে মুসলমান ছাত্রদিগকে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকার দক্ষিণ সদর মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাশের এজলাসে ৬টি রিভলবার কার্ত্তুজ প্রাপ্তি মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। এই মামলার আসামী কাপুরিয়া লেন নিবাসী গৌরাঙ্গকিশোর বসু নামক এক যুবক।

রাজকোটে সত্যাগ্রহীদের উপর ষ্টেট কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় লাঠি চালনা করে। অদ্য পুনরায় পিকেটিং চলে। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা শ্রীযুক্তা মণিবেন প্যাটেল পিকেটিংএ যোগ দিয়াছিলেন। রাজকোটের সিভিল ষ্টেশন অঞ্চলে জনসভা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এজেন্সী কর্ত্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন।

হায়দরাবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘের চতুর্থ সত্যাগ্রহী দলের নেতা শ্রীযুক্ত হনুমন্তরাও গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

২৮নং রয়াল গাড়োয়াল বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব হাবিলদার মেজর চন্দ্রসিংহের দণ্ড মকুবের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। কংগ্রেস শোভাযাত্রার উপর গুলী চালাইতে অস্বীকার করায় কোর্ট মার্শালে ১৯৩০ সালে তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল।

পাটনায় বিহার প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন হয়। স্যার ওয়াজির হাসান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি অভিভাষণ প্রসঙ্গে ছাত্রদিগকে দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনে যোগ দিতে বলেন।

হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ভিক্ষু উত্তমকে রেঙ্গুনে এক রাস্তার পার্শ্বে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

সিংহলের ভিক্ষু শরণংকরের উপর বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী যে বহিষ্কারের আদেশ ছিল, বাঙলা গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। তিনি ১৫ই নবেম্বর সিংহল হইতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবেন।

ফ্রান্সে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। গতকল্য সারাদিনব্যাপী বৈঠকের পর মন্ত্রিসভা এই সম্পর্কে অর্থ-সচিব মঃ রেইনোর ৩৩টি বিধান অনুমোদন করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি বিধান এই যে, ফ্রান্সের ব্যাঙ্কের মজুত স্বর্ণের মূল্য এতদিন পাউণ্ড প্রতি ১১০ ফ্রাঙ্ক করিয়া হিসাব করা হইত; কিন্তু নূতন বিধান অনুযায়ী পাউণ্ড প্রতি ১৭০ ফ্রাঙ্ক করিয়া হিসাব করা হইবে। আর একটি বিধানে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য ৫ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড দাদন দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ফ্রান্স এবং উপনিবেশসমূহের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য ১০ কোটি ফ্রাঙ্ক সাহায্য অথবা ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে এবং দশ বৎসরের মধ্যে এই টাকা ফেরৎ দিলেই চলিবে। ফ্রান্সের ব্যাঙ্কে যে মজুত স্বর্ণ আছে, তাহার মূল্য পুন নির্দ্ধারণ করায় গবর্ণমেণ্টের ১৭ কোটি পাউণ্ড লাভ হইবে। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

১৪ই নবেম্বর—

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কষ্টেলো, বিচারপতি

...স এবং বিচারপতি লজকে লইয়া গঠিত স্পেশাল বেঞ্চে ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার আপীলের শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

আলীপুরের সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস এন ভৌমিকের এজলাসে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউটের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী মিস সুজাতা সরকারের (বয়স ২১ বৎসর) মৃত্যু সম্পর্কিত মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। আসামী পক্ষের কৌঁসুলী মিঃ জি গুপ্তভায়া মৃতা সুজাতা সরকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অবিনাশ সরকারকে জেরা করেন। জেরার সময় পাবলিক প্রসিকিউটর ব্যারিষ্টার মিঃ জে কে মুখার্জ্জির সহিত মিঃ জি গুপ্তভায়ার প্রবল বাক্-বিতণ্ডা হয়। পরবর্ত্তী শুনানী আগামী ২১শে নবেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

ঢেনকানল রাজ্যের অন্তর্গত কন্দরসিংহ গ্রামের অধিবাসীদের উপর গুলী চালনার ফলে দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে। ইহা লইয়া ঢেনকানল রাজ্যে সপ্তমবার গুলী চলিল।

কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভায় রবিদাস সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু রবিদাস সম্প্রদায়কে ও সমস্ত তপশীলভুক্ত জাতিকে দলে দলে কংগ্রেসের পতাকা তলে সমবেত হইতে উপদেশ দেন।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বিলাত হইতে বিমানযোগে এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

দমদম ও আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের তিন দিবসব্যাপী অনশন ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে।

রাজগঞ্জ ন্যাশনাল জুট মিলের সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করায় চটকলে ব্যাপক ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। টিটাগড়ের ৭টি চটকলে প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। জুট অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার ফলেই এইপ্রকার গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম্মঘটি শ্রমিকরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ আছে।

ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের এক দফা আলোচনা হয়। দেশীয় রাজ্যের ষ্টেট কংগ্রেস এবং বিশেষ করিয়া রাজকোটের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

... আয়কর সংশোধন বিলের ৪৯ সংখ্যক ধারাটি তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রিগণ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট তার পাঠাইয়াছেন।

মুলতান এমার্সন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ একজন হিন্দু ছাত্রের প্রতি পাঠ বন্ধের এবং অপর দুইজনের প্রতি কলেজ ত্যাগের আদেশ দেন। ইহার প্রতিবাদে উক্ত কলেজের সমস্ত হিন্দু ছাত্র—সংখ্যায় ২৫০ জন ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

বার্সিলোনার সমর-দপ্তর হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে সেগ্রে অঞ্চলে সরকার বাহিনীর অগ্রগতি এবং এব্রো রণক্ষেত্রে বিদ্রোহী বাহিনীর পরাজয় দাবী করা হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার বার্লিনে জানালা-কবাট ভাঙ্গার ক্ষতি-পূরণ বাবদ একজন ধনাঢ্য ইহুদী মহিলাকে ৫০ হাজার মার্ক এবং অপর একজন ইহুদী কল মালিককে দেড়লক্ষ মার্ক জরিমানা করা হইয়াছে। হের ভন রথের মৃত্যু সম্পর্কে জার্ম্মানীর ইহুদীদিগকে যে একশত কোটি মার্ক পাইকারী জরিমানা করা হইয়াছে, বর্ত্তমান অর্থ দণ্ডের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

ইয়াংসি নদীতে অবাধ গতিবিধির জন্য নদী খুলিয়া দিবার অনুরোধ জানাইয়া বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যে নোট দিয়াছিল, জাপ গবর্ণমেণ্ট তাহার উত্তর দিয়াছেন। জাপ গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত রাষ্ট্রসমূহের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া জানাইয়াছেন যে, শুধু সামরিক উদ্দেশ্যেই ইয়াংসিতে চলাচল সম্ভব; বাণিজ্য পোতের উপস্থিতিতে সামরিক কার্য্যের বিঘ্ন হইবে।

৬ষ্ঠ বর্ষ।   শনিবার ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ সাল. 26th November 1938

সাময়িক প্রসঙ্গ

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ—

এবার আর সংশয় নাই। বাঙলা দেশের সংবাদপত্রসমূহকে সায়েস্তা করিবার জন্য বাঙলার প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন! সরকারী রেকর্ড বিল সেদিন কলিকাতা গেজেটে ঘোষিত হইয়া গিয়াছে। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক। বাঙলা দেশেও গুরুতর রকমে সাময়িকের বিষম অবস্থা দেখা দিয়াছে, সংবাদপত্রসমূহে সরকারের গোপন কথা বাহির হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং আর দেরী করা চলে না—আইন নিতান্তই আবশ্যক! বাঙলা দেশের লোক জিজ্ঞাসা করিবে, এই বিষম অবস্থাটা কি বিপ্লব না বিদ্রোহ? বিপ্লব, বিদ্রোহ ঘটিলেও তাহা ঠাণ্ডা করিবার মত বিশেষ ব্যবস্থার অভাব ত বাঙলা সরকারের কিছুই নাই। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে দফায় দফায় আইন রহিয়াছে। প্রেস আইন রহিয়াছে, তাহার উপর আছে জরুরী ক্ষমতাসংবলিত আইন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে এমন শতঘ্নী অস্ত্র থাকিতে, আবার সরকারী রেকর্ড আইন কেন? সরকারীগুপ্ত কথা কোন দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশ না করে? প্রকাশ করাতে বরং বাহবাই পায়। জনসাধারণের নিকট মন্ত্রীরা দায়িত্ব-সম্পন্ন, সংবাদপত্রের দরবারই জনসাধারণের দরবার। বাঙলা সরকারের কোন সামরিক বা আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কিত গুপ্ত তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে বা প্রকাশিত হইতে পারে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, যে জন্য মন্ত্রিমণ্ডল এই ব্রতে ব্রতী? আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, দায়িত্ব-মূলক শাসন যাহাকে বলে, বাঙলা দেশের মন্ত্রীরা তাহার কোন নীতিকেই মানিতে চাহেন না, মানিয়া চলিতে ভয় করেন; ভয় করেন এইজন্য যে, পাছে তাঁহাদের চাকুরী খসে, পতন ঘটে, তাঁহাদের স্বরূপ উন্মুক্ত হয়। বর্ত্তমান বিলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, সংবাদপত্রের অপ্রিয় সমালোচনা এড়ান—তাহাদের মুখ বন্ধ করা। যে সব কাজ করিলে লোকের প্রিয় হওয়া যায় তাঁহারা তেমন কিছু করিবেন না, অথচ সংবাদপত্রসমূহের বাহবা পাইবেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিছুমাত্র থাকিতে ইহা সম্ভব হইতে পারে না। কারণ সংবাদপত্র সম্পাদকেরা মন্ত্রীদের কেনা গোলাম নহেন, তাই এই চক্রান্ত। তাই একেবারে সামরিক ব্যবস্থার সমান আইন। আইনের ধারা এমন যে, সরকারী কোন গুপ্ত তথ্য যদি কোন সংবাদপত্র হাবে-ভাবে, আকারে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, তাহা হইলেই এক বৎসর জেল ভোগ সঙ্গে জরিমানাও থাকিতে পারে। শুধু ইহাই নহে, আরও আছে। গুপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য জেল জরিমানা ত আছেই, তাহা ছাড়া, আইনের আর একটি ধারা অনুসারে ঐ গুপ্ত সংবাদ কোথা হইতে কোন সূত্রে পাওয়া গেল, তাহাও সম্পাদককে দিতে হইবে। যদি তিনি তাহা না দেন, তাহা হইলেও তাঁহার এক বৎসর জেল বা জেল জরিমানা হইতে পারিবে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, দেশের সেবা করাই সংবাদপত্র-সেবীদের একমাত্র ব্রত। সেই দেশের স্বার্থ, জনসাধারণের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সংবাদপত্রসেবীরা চেষ্টা করিবেনই, বিঘ্ন বিপদ যতই ঘটুক না কেন, দেশের স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া ভীরু এবং ক্রীতদাসের ন্যায় সংকীর্ণতা এবং ইতরতাকে পরোক্ষ-ভাবে প্রশ্রয় দান করার অপেক্ষা বাঙলা দেশ হইতে সংবাদপত্র-সেবা বিলুপ্ত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। মন্ত্রীরা ইহা বুঝিয়া এ কাজে অগ্রসর হইবেন। যাঁহারা আইন সভার সদস্য তাঁহাদিগকে আমরা এই কথাটা বলিতে চাই যে, এই বিলের দ্বারা শুধু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণেরই চেষ্টা হয় নাই, দায়িত্বমূলক শাসনের মূল নীতিকেই ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্যম করা হইয়াছে। স্বেচ্ছাচারের নীতিই রহিয়াছে এমন মতি-গতির মূলে। তাঁহারা কি সত্যই বাঙলা মুল্লুকে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র প্রচলিত দেখিতে চান?

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি—

গত রবিবার 'নিখিল বঙ্গ রাজনীতিক বন্দী-মুক্তি-দিবস' কলিকাতার সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইয়াছে। আন্দোলন এইবার আরম্ভ হইল, এই আন্দোলন এখন বাঙলাদেশের সর্ব্বত্র, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে চলিতে থাকিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত বাঙলা দেশের সকল রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি দান করা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই আন্দোলন চলিবে। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দানের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি দেখাইয়াছেন, আমরা সেগুলির আলোচনা বারবার তুলিতে চাহি না; কারণ যাহারা জাগিয়া ঘুমায় তাহাদিগের ঘুম ভাঙিবার উপায় ইহা নয়। সে উপায় অন্য রকম। বাঙলার মন্ত্রীদিগকে দেশের দাবী মানিতে বাধ্য করিতে হইবে। যুক্তি তাঁহারা অনেক শুনিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী সে দিক দিয়া ত্রুটী কিছুই করেন নাই। কিন্তু বাঙলার মন্ত্রীদের কথা সেই একই কথা। পুনার "সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া" বলিতে গেলে মডারেট দলেরই কাগজ। এই মডারেট দলের কাগজই বাঙলার মন্ত্রীদের যুক্তির জবাব দিয়াছেন। "সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া" এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বন্দীর সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করিয়া রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দান করার যে নীতির কথা বাঙলার মন্ত্রীরা মুখে আওড়াইয়া থাকেন, যদি সেই নীতিতেই তাঁহাদের ঐকান্তিকতা থাকিত, তাহা হইলেও এই ১৮ মাসের মধ্যে সব বন্দী মুক্তিলাভ করিত। আসল কথা হইল—মন্ত্রীদের ইহাতে আন্তরিকতা নাই, কিংবা সে বিষয়ে আন্তরিকতা দেখাইতে গেলে, তাঁহাদের মন্ত্রিগিরি বিপন্ন হইতে পারে, এই জন্যই তাঁহারা আন্তরিকতা দেখাইতেছেন না। এ বিষয়ে আন্তরিক না হইলে তাঁহাদের মন্ত্রিগিরি যে খসিয়া যাইবে, শ্বেতাঙ্গ স্বার্থসেবীদের, কিংবা তাঁহাদের সহিত স্বার্থের বাঁটোয়ারায় সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের অনুগতগণের সমর্থন সত্ত্বেও যে তাঁহারা এই বিষয়ে দেশের জনমতকে উপেক্ষা করিয়া মন্ত্রিগিরি বজায় রাখিতে পারিবেন না,এ সত্যটি তাঁহাদিগকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করাইতে হইবে এবং সে উপলব্ধি যদি তাঁহাদের না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিদায় লইতে হইবে মন্ত্রিগিরি হইতে।

আমাদের জবাব—

'বাঙলার কথা'র মারফৎ মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব মহাশয় সন্ত্রাসবাদী বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে সরকারের নীতির সমালোচকদিগের নিকট হইতে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব চাহিয়াছেন। জবাব নাকি তাঁহারা পান নাই। যে সব প্রশ্নের জবাব চাওয়া হইয়াছে তাহাদের উত্তর শত শত সভাসমিতি হইতে কতবারই না দেওয়া হইল! চিন্তাশীল সম্পাদকেরা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলার বক্ষে কুড়ি কুড়ি প্রবন্ধ লিখিয়া স্বরাষ্ট্র-সচিব মহাশয়ের প্রশ্নগুলার অসংখ্যবার জবাব দিয়াছেন। তবুও যদি মন্ত্রী মহাশয় বলেন, জবাব তিনি পান নাই—তবে বলিব, দোষ আমাদের নয়, দোষ মন্ত্রী মহাশয়ের কানের এবং আংশিকভাবে তাঁহার [illegible]। মন্ত্রী মহাশয়ের প্রথম প্রশ্ন হইল, "বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের গঠনতান্ত্রিক নীতি অনুসারে পুনরায় সন্ত্রাসবাদের প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা কি অতীতের চেয়ে অধিকতর ধ্বংসমূলক এবং সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হইবে না?"

গবর্ণমেণ্টের নীতিই যে সন্ত্রাসবাদের আসল কারণ, ইহা আমরাও স্বীকার করি। আমলাতন্ত্রের আমলে সন্ত্রাসবাদের যে প্রসার হইয়াছিল—তাহারও কারণ দেশবাসীর ন্যায্য দাবীর প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের নির্ম্মম ঔদাসীন্য এবং তদ্রূপ মনোভাবসম্পন্ন নীতি। মন্ত্রী মহাশয় কি বলিতে চাহেন—তাঁহাদের গঠনতান্ত্রিক নীতির মহিমা এমনই যে আমলাতন্ত্রের আমলে সন্ত্রাসবাদের ব্যাধির কারণ যতটা ছিল—তদপেক্ষা এক্ষণে বেশী হইয়াছে অর্থাৎ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট জনমতের প্রতি অধিকতর উপেক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন? এরূপ নীতি যদি তাঁহারা অবলম্বন না করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা যদি সত্যসত্যই দেশবাসীর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যে কথা বলিয়া থাকেন সেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, দায়িত্বমূলক শাসন যথার্থই যদি দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে—জনপ্রিয় মন্ত্রী বলিতে যাহা বুঝায় তাঁহারা যদি সত্যই তাহা হন—তবে এরূপ আশঙ্কার কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র-সচিব মহাশয় দেশের বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক রেষারেষি-বৃদ্ধির নজীর দেখাইয়াছেন। এইরূপ নজীর দেখান সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। দলের প্রভাব-বিস্তার কামনায় নিজেদের মধ্যে রেষারেষি সর্ব্বদেশেই আছে। এইরূপ রেষারেষির সঙ্গে বিপ্লববাদের কোনই সম্পর্ক নাই। তাহার মূলে "বাদ" বলিয়া একটা বস্তু নাই, সেগুলি স্থানীয় ব্যাপার মাত্র। রেষারেষির ফলে যদি দাঙ্গাহাঙ্গামা কোথায়ও হইয়া থাকে তাহার জন্য ত সাধারণ আইনই আছে। এইরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা আর বিপ্লববাদ ঠিক এক কথা নয়। সুতরাং দাঙ্গাহাঙ্গামার নজীর দেখাইয়া রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শনের কোনই মূল্য নাই।

তৃতীয় প্রশ্নে মন্ত্রী মহাশয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার নজীর দেখাইয়া আপনাদিগকে গণতান্ত্রিক প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। চক্ষুলজ্জার কণামাত্র থাকিলে মন্ত্রী মহাশয় কখনই এইরূপ প্রয়াস পাইতেন না। বাঙলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে—শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের ভোট না পাইলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সংখ্যা-গরিষ্ঠতার বড়াই করিবার আজ কোনই অধিকার থাকিত না; আর এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্রয় করিবার জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কিরূপ নির্ম্মমভাবে দেশের স্বার্থকে বলি দিয়াছেন—তাহাও আজ সর্ব্বজনবিদিত। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত কূট কৌশলের ফলে বাঙলার আইনসভায় দেশের লোকমত অভিব্যক্ত হইবার পথ যেভাবে রুদ্ধ রহিয়াছে সে কথা না-ই তুলিলাম। একমাত্র বাঙলা-কংগ্রেসই রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী করিতেছে—মন্ত্রী মহাশয়ের এরূপ কথা কি নিতান্তই ভিত্তিহীন নয়? মন্ত্রী মহাশয় কি দেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠানের নাম করিতে পারেন যাহারা রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীর বিরুদ্ধতা করিয়াছে? অথবা ইহার সমর্থন করে নাই? মন্ত্রিমণ্ডলী যে কৃষক-প্রজাদলের ঢাক পিটাইয়া থাকেন

তাহাদেরও কর্ম্মতালিকার মধ্যে কি রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী ছিল না এবং সে দাবী কি এখন নাই? রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীর জন্য আইনসভায় আপ্রাণ চেষ্টা করিব—এই প্রতিশ্রুতি দিয়াই কি প্রধান মন্ত্রী মহাশয় নির্ব্বাচনসমরে জয়লাভ করেন নাই?

চতুর্থ প্রশ্নে মন্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মান্ধতা এবং বিপ্লববাদকে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—যাহারা ধর্ম্মবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের প্রাণ লয়—তাহাদের সহিত সন্ত্রাসবাদীদের পার্থক্য কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতেছি—বিপ্লববাদী এবং ধর্ম্মান্ধ ঠিক এক পর্য্যায়ে পড়ে না। শাসনতন্ত্রের অবিমৃষ্যকারিতামূলক নীতি বিপ্লববাদকে সৃষ্টি করে। সেই নীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লববাদ দূর হয়। ধর্ম্মান্ধতার মূলে মধ্যযুগের বর্ব্বরতা। সেই বর্ব্বরতাকে উস্কাইয়া দিয়া ধর্ম্মের নামে নারকীয় অত্যাচার সকল সময় সম্ভব হয়। যাহারা মোশ্লেম রাজ্য প্রতিষ্ঠার উত্তেজনা ছড়াইয়া মানুষের মধ্যেই ধর্ম্মের মুখোস-পরা বর্ব্বরতাকে জাগাইয়া দিতেছে—তাহাদিগকে যদি বাঙলা গবর্ণমেণ্ট সংযত করিতে পারেন—তবে হত্যাকারী ধর্ম্মান্ধেরা কি কৈফিয়ৎ খাড়া করিয়া দুষ্কার্য্যের ফল এড়াইবার চেষ্টা করিবে, তাহা লইয়া বাঙলা সরকারের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হইবে না।

বাঙলার মন্ত্রীদের অবস্থা—

বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলে যুগল রত্ন বৃদ্ধি হইয়াছে। সামসুদ্দিন তমিজুদ্দিন, নাজিম-নলিনীকে কোল দিয়াছেন। কিসের বলে এ ঘটনা ঘটিল গত সপ্তাহেই আমরা ইঙ্গিত তাহার দিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে নাজিম-নলিনী চক্রের নীতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; সামসুদ্দিন এবং তমিজুদ্দিনসাহেবানই নিজেদের নীতি এবং আদর্শকে অম্লানবদনে বিসর্জ্জন দিয়া কোয়ালিশনী দলে ভিড়িয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, শুধু স্বার্থই যেখানে প্রেরণা সেখানে নীতি বা আদর্শের কোন ভিত্তি নাই, সেখানে কোন রকম সংহতি, এমন কি মতলব বাঁধা জোটও টিকিতে পারে না। বাঙলার মন্ত্রীদের নীতিতে এই আদর্শহীনতার দিকটা যতই প্রকট হইতেছে, ব্যক্তিগত নির্লজ্জ স্বার্থটা যতই নগ্ন হইতেছে, ততই এই মন্ত্রিমণ্ডলের ধ্বংসের পথও প্রশস্ত হইতেছে,—এবং মন্ত্রীরা নিজেরাই সে পথ করিতেছেন। সেদিন লক্ষ্ণৌ শহরে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রও সেই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, মন্ত্রিসভার এই বলবৃদ্ধিতে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল অধিকতর দুর্ব্বল হইয়াই পড়িয়াছে। অনেকের নিকট ইহা রহস্য বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটনার গতিতে এ সত্য প্রমাণিত হইবে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনেই খুব সম্ভব বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটিবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্যদের মধ্যে অন্তরের যোগসূত্র নাই, আছে শুধু স্বার্থের সূত্র; কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলের স্বার্থ-সন্ধিৎসার প্রতিক্রিয়া না দেখা দিয়া পারে না এবং অচিরেই তাহা দেখা দিবে। দেশের স্বার্থ, প্রজার স্বার্থ জনসাধারণের স্বার্থ, স্বাধীনতা এবং অধিকারকে উপেক্ষাজনিত বিবেকের তাড়নায় 'বিপন্ন ইসলামের' জিগীরে তাহা চাপা পড়িবে না। এ বুলির তত্ত্বকথা সকলেই বুঝিয়া লইয়াছে। স্বার্থ ব্যবসার যে আবহাওয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাকে ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে বাঙলা দেশে কোন দিক হইতে কোন উদার নীতি অনুসৃত হইবার আশা নাই। এ মন্ত্রিসভার যত সত্বর পতন হয় ততই মঙ্গল।

বাঙলার বিরুদ্ধে আন্দোলন—

বাঙলা দেশ বড় সাংঘাতিক জায়গা,—ভারতের নব জাতীয়তাবাদের জন্মস্থান এই বাঙলা। ভারতের নব জাতীয়তার মূলে সঞ্জীবনী প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে বাঙলাভাষা। বাঙালীকে খাটো করিতে হইবে, বাঙলাভাষার প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা করে। কিন্তু বাঙালী ছাড়ে নাই, জাতীয়তার প্রবল প্লাবনে সাম্রাজ্যবাদীদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। মর্লের পাকা সিদ্ধান্ত স্বদেশী আন্দোলনের জোরে কাঁচিয়া যায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরাও কূটনীতিতে দুরস্ত আছে। তাহারা নব গঠিত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে, বাঙলার কতকটা অঞ্চল, এবং আসামের মধ্যে বঙ্গভাষাভাষীদের অধ্যুষিত স্থানকে ঢুকাইয়া দেয় এবং সেই দিক হইতে বঙ্গে নব জাতীয়তাবাদ যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিয়া রাখে; পরে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কূট কৌশলে সে মতলব তাহারা আরও হাসিল করিয়া লইয়াছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ রহিত করিতে হয় কর্ত্তাদিগকে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ রহিত করিবার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বাঙলাভাষাভাষী সমস্ত জায়গাকে একটি শাসন-ব্যবস্থার অধীনে আনয়ন করা, সমগ্র বঙ্গভাষাভাষীদিগকে একটি প্রদেশে লইয়া আসা। কর্ত্তারা নব গঠিত আসাম এবং বিহার ও উড়িষ্যা এই দুই প্রদেশের মধ্যে বঙ্গভাষাভাষী খানিকটা করিয়া অঞ্চল ঢুকাইয়া প্রকারান্তরে আন্দোলনের সেই আঘাত হইতে সাম্রাজ্যবাদসুলভ স্বার্থসিদ্ধির ফিকির অবলম্বন করেন। কিন্তু বাঙালীরা পাছে ভাষার উপর জোর দিয়া প্রদেশ পুনর্গঠনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়, এই আশঙ্কা কাটাইবার জন্য গত ১৯১১ সাল হইতে প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। মানভূম জেলা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু মানভূম জেলার অধিকাংশ লোকই বাঙলাভাষাভাষী, সাঁওতালপরগণাতেও বাঙলাভাষারই প্রাধান্য—সাঁওতালপরগণার পাকুড়, জামতাড়া এবং রাজমহল—এ কয়েকটি মহকুমাতেও ত একরকম সবই বাঙলাভাষাভাষী। এই সব স্থানে বাঙলাভাষাকে চাপিয়া মারিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চলিতে থাকে। এই প্রচেষ্টা কি ভাবে চলিয়াছিল, চলিয়াছিল কি ধারা ধরিয়া সহযোগী 'বিহার হেরাল্ড' গত ১৫ই নবেম্বর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বাঙলাভাষাকে জোর করিয়া দাবাইয়া বিদ্যালয়সমূহে হিন্দীভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার ফলে শিক্ষার প্রসারের গতি রুদ্ধ হয়। কর্ত্তারা পুনরায় সাঁওতালপরগণায়

বাঙলাভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে বাধ্য হন। আমলাতন্ত্রের সে যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন নূতন শাসনতন্ত্রের যুগ; শুধু তাহাই নহে, বিহারে আজ কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত, যে কংগ্রেসের মূলনীতি এবং আদর্শ হইল সমগ্র ভারতে অখণ্ড জাতীয়তার ভাবকে উদ্বুদ্ধ করা। বাঙলার জাতীয়তাবাদের যে ভীতি আমলাতন্ত্রের ছিল, যে ভীতি তাহাদের ছিল বাঙলাভাষার সঞ্জীবনী-শক্তির সঞ্চারের মূলে, বিহার গবর্ণমেণ্টের অন্তত তাহা থাকা উচিত নহে, যদি ভারতের জাতীয়তাবাদকে দৃঢ় করাই তাঁহাদের নীতি এবং আদর্শ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা কি করিতেছেন? বর্ত্তমান বৎসরের আগষ্ট মাসে সাঁওতালপরগণা জেলা শিক্ষা কমিটির এক অধিবেশন হয়, এই অধিবেশনে সাঁওতাল পরগণার বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাঙলাভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দীকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বিহারী কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কর্ত্তাদের পরোয়ানার বলে মানভূমেও সেই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। আদম সুমারীর কাল ঘনাইয়া আসিল, ১৯৪১ সালেই আদম সুমারী হইবে, ইতিমধ্যে লোকজন নিযুক্ত হইয়াছে এবং কাজও কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। ধানবাদ মহকুমা, মানভূম জেলা এবং সাঁওতালপরগণার বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলকে কৃত্রিম উপায়ে এবং কতকটা জবরদস্তিতে এইভাবে হিন্দী ভাষা-ভাষী বলিয়া খাতায় দেখাইবার জন্যই কর্ত্তাদের এই প্রয়াস। সহযোগী 'বিহার হেরাল্ড' এই প্রয়াসের স্বরূপকে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়া এই মন্তব্য করিয়াছেন—

The indigenous people of both these areas naturally resent being made shuttle-cock of political adventure. They are promptly dubbed as wicked, and quite rightly according to the famous dictum of the Frenchman who said that the dog was wicked one because it defended itself when it was attacked.

আমরা জিজ্ঞাসা করি, বিহারী মন্ত্রীদের এই যে রাজনীতিক দুঃসাহসিক অভিযান, কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কোথায় এবং কিভাবে তাহাই তাঁহারা বলুন। বাঙালীরা ত দোষী আছেই—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট তাহারা দোষী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব পরিচালিত আমলাতন্ত্রের দৃষ্টিতে তাহারা অপরাধী। তাহাদের বড় অপরাধ হইল এই যে, তাহারা স্বদেশপ্রেমিক। তাহাদের বড় অপরাধ হইল এই যে, তাহারা মাতৃভাষাকে ভালবাসে, ভালবাসে তাহাদের মাতৃভূমিকে। বাঙালীর অপরাধ হইল এই যে, মাতৃভূমির সেবা এবং মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়াই যে জাতীয়তার সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠে জাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সুযোগ লাভ করে—ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বিহারের কংগ্রেসী সরকারও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সেই দৃষ্টিতে, আমলাতন্ত্রের সেই নজরে বাঙালীকে বিদায় করিতে চাহেন, না হইলে তাঁহাদের এই সব প্রচেষ্টা কেন? বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চলে জোর করিয়া হিন্দীভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার চেষ্টার অন্য কোন অর্থ থাকিতে পারে না। যাঁহারা এমন উদ্যমে ব্রতী হইতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তাঁহারা যে প্রাদেশিকতার মতিগতি লইয়া উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, সেই প্রাদেশিকতার দি[illegible] হইতেও ইহাতে তাঁহাদের সুবিধা হইবে না। বাঙালী আঘাত দিতে আসিলে তাহার প্রতিক্রিয়ার জন্যও প্রস্তু[illegible] থাকিতে হইবে, সে প্রতিক্রিয়ার পরিচয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার যাঁহারা তাঁহারাও কিছু কিছু জানেন।

সরকারের পোষ্যপুত্র—

পুলিশ-পূজার এক বার্ষিক ব্যাপার আছে, এই মহাপবিত্র অনুষ্ঠানটি ঘটে পুলিশদের কুচকাওয়াজের দিন। এতদিন এই পর্ব্বের পৌরোহিত্যের ভার ছিল লাটসাহেবের উপর। এবার বাঙলা দেশের স্বরাষ্ট্র-সচিব অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়া পুলিশ-প্রশস্তি পর্ব্ব নির্ব্বাহ করিয়াছেন। বাঙলা দেশের কর্ত্তাদের মতে পুলিশের শুধু গুণই আছে, দোষের তাহারা অতীত, এতাবৎ কাল ইহাই দেখিয়া আসিতেছি। স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দিনের অভিমত ও ভাব তাহা হইতে অন্যরূপ নহে। কলিকাতার পুলিশকে সম্বোধন করিয়া তিনি সেদিন বলিয়াছেন—যাঁহারা একটু উঁচু দরের লোক, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া শহরের সাধারণ লোকদের কাছে কনেষ্টবলেরা এবং পুলিশ বিভাগের অন্যান্য নিম্ন-কর্ম্মচারীরাই হইল কর্ত্তৃত্বের বিগ্রহস্বরূপ, প্রভুত্বের তাহারা অবতার। এই কথাটা পুলিশ বিভাগের প্রত্যেক সদস্যের বুঝিয়া চলা উচিত। সৌজন্য এবং বিচারবুদ্ধি হইল জগতের শ্রেষ্ঠ পুলিশদের বিশেষত্ব। কলিকাতা পুলিশেরও সেই বিশেষত্ব যে সমভাবেই থাকা উচিত, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সময় সময় বলপ্রয়োগ করা প্রয়োজন না হইতে পারে, এমন নয়, কিন্তু তেমন ক্ষেত্র খুবই বিরল। ইহা মনে করা বেজায় ভুল যে, কর্কশ ব্যবহার এবং অপরের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে বেপরোয়া হইয়া চলাই হইল পুলিশ কর্ম্মচারীদের পক্ষে দক্ষতার নিরিখ। বলাবাহুল্য, স্বরাষ্ট্র-সচিবের এই যে উপদেশ-বাণী পুলিশের প্রশস্তির উপরই ইহাতে জোর দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা শহরের কনেষ্টবল, জমাদার ইহারা নিজেদিগকে কর্ত্তৃত্বের বিগ্রহস্বরূপই মনে করে, শহরের সাধারণ লোকেরদের দিক হইতে তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। সাধারণের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করা কিংবা তাহাদের সুখ-সুবিধার সম্বন্ধে বিবেচনা করা পুলিশের পক্ষে খুব ভাল গুণ, ইহা বুঝা গেল; কিন্তু সাধারণের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন না করিলে সাধারণের সুখ-সুবিধার দিকে না তাকাইলে যে পুলিশের পক্ষে অপরাধ হয়, কর্ত্তব্যের হানি ঘটে এবং পুলিশ যে সে অপরাধের অতীত নয়, সে অপরাধ তাহাদের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ—স্বরাষ্ট্র-সচিব এই সোজা কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই। তাহারা কোন্ দিকে কাহার নিকট কর্ত্তৃত্বের অবতার—এই কথাটা শুনাইয়াই তাহাদিগকে চাঙ্গা করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা যে সাধারণের কর্তা নয়, গোলাম, এই সত্যটা তাহাদিগকে শুনাইয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন। বলপ্রয়োগ করার ক্ষেত্র খুবই বিরল, এই কথাটাই বলিয়াছেন

ন্তু এই কলিকাতা শহরেই পুলিশ যত ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ রিয়াছে, বা যেরূপ সব ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করিয়াছে, তাহার সাব ধরিলে সে বিরলত্ব যে থাকে না এবং সব ক্ষেত্রে তেমন লপ্রয়োগের সংগতি সমর্থনযোগ্য হয় না, এ সম্বন্ধে পুলিশকে তিনি শাসাইয়া বা সতর্ক করিয়া দেন নাই। দেশে রাজনীতিক চেতনা বাড়িলে সভা-সমিতি এবং শোভাযাত্রার সংখ্যাও যে বাড়িবে, স্বরাষ্ট্র-সচিব সেকথা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই রাজনীতিক চেতনার বিকাশকে বাধা দিবার প্রবৃত্তি যে পুলিশের পক্ষে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না, স্বরাষ্ট্র-সচিব সাহস করিয়া এ কথাটা বলিতে পারেন নাই। যাহারা মিছিল এবং শোভাযাত্রা করিবে, পুলিশের হুকুম তাহাদের মানিয়া চলা কর্ত্তব্য—স্বরাষ্ট্র-সচিব একঘেয়ে এই কথাই শুনাইয়াছেন কিন্তু সাধারণের ন্যায্য অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন আদেশ জারী করিবার ক্ষমতা যে পুলিশের নাই, একথাটা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই! আর হইবেই বা কেমন করিয়া! বর্দ্ধমানের দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জ্জনের ব্যাপারের স্মৃতিটা তাঁহার মন হইতেই ত এত শীঘ্র মুছিয়া যায় নাই—আগেকার অন্যসব ব্যাপারের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। ছাড়িয়াই দেওয়া গেল কলেজের ছেলেদের উপর লাঠি চালানর কৃতিত্বের কথাটা। আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি বাঙলার মন্ত্রীদিগকে কেমন অষ্টপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—স্বরাষ্ট্র-সচিবের এই একতরফা পুলিশ-প্রশস্তিই সে পক্ষে প্রমাণ। যে কোন কংগ্রেসী প্রদেশের মন্ত্রীর এই শ্রেণীর বক্তৃতার সঙ্গে এই বক্তৃতার তুলনা করিলেই প্রভেদটা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে।

পণ্ডিত জেহেরুর অভিজ্ঞতা—

পাঁচমাসকাল ইউরোপে অবস্থান করিয়া পণ্ডিত জওহর-লাল নেহেরু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই পাঁচমাসে তিনি ইউরোপের অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। স্পেনের সাধারণতন্ত্রী নেতাদের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া সেখানকার স্বদেশপ্রেমিকদের সংগ্রাম-প্রক্রিয়া তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি প্রবঞ্চনা, হিটলারের পদতলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকদের আত্মসমর্পণ—এসব ব্যাপার তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে পণ্ডিতজী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ইউরোপে গণতান্ত্রিকতার অন্তিম শ্বাস উপস্থিত হইয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইউরোপের গণতন্ত্রবিরোধী রাষ্ট্রগুলিকেই সমর্থন করিতেছে। ইংরেজের এই নীতি পণ্ডিতজীর নিকট বিস্ময়কর মনে হইয়াছে। ব্রিটিশ জাতির সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর উদার ধারণা ছিল, ইহাতে তাহা বুঝা যায়। আমাদেরও কিছু কিছু না আছে, এমন নহে; কিন্তু আমাদের সে ধারণার মূলে হইল ইংরেজ জাতির স্বার্থ-বুদ্ধি, তাহাদের স্বদেশপ্রেম এবং স্বজাতি-প্রীতি। মানবতার বৃহত্তর নীতি ইংরেজ বড় করিয়া দেখে না; আজও দেখিতেছে না, তবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতি এবং পূর্ব্ব নীতির মধ্যে তফাৎ হইল এই যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকেরা মানবতার নামে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির যে বুলি আওড়াইতেন, তাহা এতটা স্পষ্ট হইয়া কোনদিন ধরা পড়ে নাই। কূট কৌশলে উভয়ের পার্থক্য অনেকটা ঢাকা রাখা চলিত, এখন আর সে চলিতেছে না। বিশ্বধর্ম্মের দায়ে—মানবতার গরজে, ইংরেজ আগেও কোন দিন, কোনক্ষেত্রে নিজের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অপরের অধিকার স্বীকার করে নাই, এখনও বর্ত্তমানে তাহা করিবে না। পণ্ডিতজী ভারতের রাষ্ট্র-নীতিক নব জাগরণের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের পক্ষে আশা হইল সেই দিক দিয়া। ভারতের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগিতেছে। স্বৈর শাসনে সম্মূঢ় ছিল যে সব সামন্তরাজ্য জাগরণের আলোক সেখানেও গিয়া ঢুকিয়াছে। হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, রাজকোট—সমস্ত দেশীয় রাজ্যের জনগণ আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে নিজেদের অধিকারের প্রতিষ্ঠার জন্য—দুঃখ-কষ্ট, পীড়ন-নির্য্যাতন, এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করিতেছে না। আশার কথা সত্যই হইবে এই দিক দিয়া। মানবতার অধিকার প্রতিষ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয়ী এই যে সংকল্প, ইহাই শুধু আমাদের মুক্তি আনয়ন করিতে পারে। কাহারও অনুগ্রহের দানে সে বস্তু কোনদিন হয় নাই, হইতেও পারে না।

ফেরামতি কোন দিকে—

বাঙলার প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক কথায় কথায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে খোটা দিতে যান। যুক্তিবুদ্ধি বা প্রমাণের ধার তিনি ধারেন না। মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী চক্রবর্ত্তী রাজাগোপাল আচারীকে তিনি এইভাবে খোঁচা দিতে গিয়াছিলেন, উত্তরও মিলিয়াছে মুখের মত। তিনি কথায় কথায় বলেন, "আমরা যাহা করিয়াছি ভূভারতে কেহ তাহা করে নাই।" গত সোমবার 'কেশব-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান' সম্পর্কে কলিকাতার এলবার্ট হলে আহূত সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া কলিকাতার লর্ড বিশপ বা বড় পাদরীসাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছেন, আশা করি তাহা পাঠ করিয়া বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলকে আক্রমণ করিবার স্পর্দ্ধিত প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ সংযত হইবে। লর্ড বিশপ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—"সম্প্রতি মাদ্রাজে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সভায় বলিতে গিয়া আমি, শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদারভাবে অর্থ ব্যয় করেন, তাহার সঙ্গে এইরূপ ক্ষেত্রে—শিক্ষা সম্পর্কিত ঐ ধরণের কার্য্যে উদারভাবে অর্থ সাহায্যে বাঙলা সরকারের অনিচ্ছা কতদূর—তাহার তুলনা করিয়া দেখাইয়াছি। কলিকাতার লর্ড বিশপ কংগ্রেসী নহেন, কংগ্রেসকে তুষ্ট করিয়া কথা বলিবার কোন কারণই তাঁহার পক্ষে নাই। কিন্তু তফাৎ কতখানি সে জিনিষটা তাঁহারও চোখে পড়িয়াছে! বিহার আর একটি কংগ্রেসী প্রদেশ, এবং বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর যে বিশেষ রকম নেক নজর আছে, ইহাও অনেকেই জানেন। বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর বিদ্দিষ্ট বিহারের সেই কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের শিক্ষা সচিব সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি গত চারি মাসের মধ্যে ৩০ হাজার লোকের নিরক্ষরত্ব দূর করিয়াছেন। বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নিজেই শিক্ষা-সচিব, তিনি এদিকে কি করিয়াছেন,—দেশের লোক তাহা জানিতে পারে কি? কিন্তু এ প্রশ্ন নিরর্থক; কারণ

বাঙলার প্রধানমন্ত্রীই ত বলিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দলের জোট ঠিক রাখিবার জন্যই এতটা ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, অন্যদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দানের ফুরসৎ তাঁহারা পান না। ইহার পরও তাঁহাদের আন্তরিকতায় কোন্ মূর্খ অবিশ্বাস করিবে এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের চেয়েও যে তাঁহাদের কেরামতি কম এমন কথা বলিবে?

সন্তুষ্ট ভারত—

ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড সম্প্রতি বিলাতের টরকোয়ের টাউন হলে এক বড় বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার ব্রিটিশের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবাসীরাও বাদ পড়ি নাই। ভারতের কথা উল্লেখ করিয়া এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন,—"আমি ভারত-সচিব, আশা করি, আপনারা ইহা বিবেচনা না করিয়া ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে আমি যদি গোটা দুই কথা বলি, আপনারা ধৈর্য্যধারণ করিয়া তাহা শুনিবেন। কয়েক বৎসর আগে আমাদের সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক আদা-কাচকলার সম্বন্ধ ছিল তাহারাই আজ ঘনিষ্ঠ-ভাবে সেখানে আমাদের সহযোগিতা করিতেছেন। প্রদেশ-সমূহের মধ্যে পাঞ্জাব এবং বাঙলা দেশে আইন সভার নিকট দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রীরা নূতন শাসনতন্ত্র প্রবৃত্ত হইবার পর হইতে সফলতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেস-মন্ত্রীরা যাঁহারা কিছু দিন আগেও স্পষ্টভাবে আইন অমান্য করিয়া কারারুদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই এখন শাসননীতি পরিচালনা করিতেছেন এবং আইন রক্ষা করিতেছেন। সিভিল-সার্ভিসের ইংরেজ ও ভারতীয় সদস্যগণ এবং ব্রিটিশ বাহিনী যাহাদের সহযোগে মন্ত্রিদিগকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহারাই এখন মন্ত্রীদিগের অধীনে সুখে কাজ করিতেছে। ইহা কি একটা কাজের মত কাজ নয়? সম্প্রতি যে সমস্যা দেখা দিয়াছিল, তাহার পর সাধারণ্যে বক্তৃতা করিবার এই প্রথম সুযোগ ভারতের সামন্ত নৃপতিগণ যেরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতের সমস্ত নৃপতিগণ তাঁহাদের চিরাচরিত বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহাদের রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি সম্রাটের জন্য নিবেদন করিয়াছিলেন। ভারতের স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত প্রদেশ-সমূহের অন্যতম প্রদেশ পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খান ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত সংকটের মধ্য দিয়া আমাদিগকে সমর্থন করিবেন।"

ইহাকেই বলে ভাবের ঘরে চুরি। ইংরেজ রাজনীতিকেরা বরাবর এ বিষয়ে ওস্তাদ। ভারত-সচিব ভাবের ঘরে চুরি বিদ্যা ফলাইয়া জগতের লোককে আত্মম্ভরিতা উপহার দিয়াছেন। নতুবা ভারতের প্রকৃত অবস্থা কি, আমরা যেমন জানি, তিনিও কম কিছু জানেন না। বাঙলা ও পাঞ্জাবের মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা এবং শাসনকার্য্য পরিচালনে তাঁহাদের সাফল্যের ঢাক তিনি বিশেষভাবে পিটাইয়াছেন। কারণ এই দুইটি প্রদেশের উপর তাঁহাদের বিশেষ কৃপা বরাবরই আছে। এই দুইটি প্রদেশের সঙ্গে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নীতির স্বার্থ বিশেষ রকমে জড়িত রহিয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য বণ্টন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিয়া—এই দিক হইতেই তৎকালীন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ব্রিটিশ জাতিকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, বাঙলা দেশ আর পাঞ্জাবে যে ব্যবস্থা আমরা করিয়াছি, তাহাতে এই দুই প্রদেশের আইন সভায় কংগ্রেস কিছুতেই মাথা তুলিতে পারিবে না। নানা কৌশলে যে মন্ত্রীরা বাঙলা দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের সেই ভেদনীতির স্বার্থ সিদ্ধ করিতেছেন সুতরাং ভারত-সচিবের পক্ষে সেই সব মন্ত্রী-দের বাহবা না দিলে কি পদোচিত কার্য্য প্রতিপালিত হয়? স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খানের নিধিরামের সর্দারীতে সাবাস দেওয়ার তাৎপর্য্যও সেই হিসাবে। কারণ ভারত-সচিব নিজেও একথা অবশ্য নিশ্চয়ই জানেন যে, ভারতের সমর বিভাগের উপর কোন ক্ষমতা পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীর নাই। তাঁহার তরবারী লইয়া দর্প-দম্ভ পুতুলনাচের পুতুলেরই মত। নূতন শাসনতন্ত্রে মন্ত্রীদের অসহায়ত্বের কথা যিনি জানেন, তাঁহার পক্ষে উহা হাস্যকরই হইয়া পড়ে। ভারত সচিব 'দায়িত্বমূলক শাসন', 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন'—এ সব বড় বড় কথা শুনাইয়াছেন, কিন্তু ঐগুলি যে ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়, ভারতের লোকেরা তাহা জানে। ভারত-বাসীরা সে জিনিষ পাইয়া খুব খুসী হইয়াছে, ভারত-সচিব নিজেদের ব্যবসার খাতিরে বাহিরের লোককে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন, আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু তাহাতে যাহা অসত্য তাহা সত্য হয় না—সত্যকে চাপাও দেওয়া যায় না। এই সত্য প্রকট হইবার দিন সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ভারতবাসীরা বিদেশীর আরোপিত কোন শাসনতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইবে না। ভারতবাসীরা নিজেদের শাসনতন্ত্র গড়িবে নিজেরা—ইংরেজ যদি সে দাবী না মানে তবে তাহাকে প্রবলতর রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইবে। লক্ষ্ণৌয়ের বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সে কথাটা শুনাইয়া দিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রের শক্তি-সাধনা

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইল। জাতির জীবনে সময় সময় দুই একজন মহাপুরুষ প্রচণ্ড শক্তি লইয়া আবির্ভূত হন, তাঁহারা চারিদিকের অবসন্নতা ও জড়তার মধ্যে নূতন তেজ ও নূতন ভাবের সঞ্চার করেন। তাঁহাদের আন্তরিকতার বিদ্যুৎ-স্পর্শে জাতি ও সমাজ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

কেশবচন্দ্র এমন একজন অমিততেজা শক্তিধর পুরুষ ছিলেন। নূতন বাঙলাকে যাঁহারা গঠিত করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন।

কেশবচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তাঁহার সে প্রতিভা বাঙলা দেশের জাতীয় জীবনের সকল দিকেই প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার অন্তর ছিল অগ্নিময়, সে আগুন যে কোন্ দিক স্পর্শ করে নাই, সে কথা বলা দুষ্কর। সর্ব্বগ্রাসী সে আগুন জাতির সকল জীর্ণতা এবং গ্লানিকে ধ্বংস করিয়া পরিপূর্ণ মহিমায় বিচ্ছুরিত হইতে যেন নিয়ত ব্যাকুল শিখাজ্বালা বিস্তার করিত। কেশবচন্দ্রের সেই প্রতিভা জাতির জড়তা বা অবসাদ কতখানি ভাঙ্গিয়াছে, কিংবা কতখানি নূতন করিয়া গড়িয়াছে, বস্তু বিচারের দ্বারা আমাদের পক্ষে সব সময় তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। যে প্রেরণা এবং যে শক্তি কেশবচন্দ্রের এই সমস্ত বিভিন্নমুখী কর্ম্মধারার ভিতর দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে, আগে তাহাই বুঝা দরকার। তবেই কেবশচন্দ্র মানুষ হিসাবে কত বড় ছিলেন আমাদের পক্ষে তাহার কিছুটা উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে।

রাজনীতিক বলিতে যাহা বুঝায়, কেশবচন্দ্র তাহা ছিলেন না; কিন্তু 'রাজনীতি' এই পরিভাষাটির উপর আমরা কোন জোর দেই না, কেশবচন্দ্র পারিভাষিকভা ব রাজনীতিক না হইয়াও এদেশের রাজনীতিক সাধনার মূলে তিনি যে শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন, আমাদিগকে আজ তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

কেশবচন্দ্রের সমস্ত কর্ম্মোদ্যমের মূলে যে শক্তি ছিল, সে শক্তির স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর যদি দিতে হয়, তবে বলা যায়, সে জিনিষটি হইল প্রেম। সে বস্তুটি হইল শ্রদ্ধা। প্রকৃতপক্ষে প্রেম এবং শ্রদ্ধাতে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। এ দেশের সাধকেরা শ্রদ্ধা শব্দটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, বিষয়ের গুরুত্বকে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে আপনার করিবার জন্য যে লালসা জন্মে, তাহাকেই বলে শ্রদ্ধা। তাঁহাদের মতে সকল জিনিষেরই গুরুত্বের একটা দিক রহিয়াছে, এমন কি যে ধূলিকণা আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই তুচ্ছ, সেই ধুলিকণারও বিরাট, বিশাল এবং অনন্ত গুরুত্বের একটা দিক আছে, এবং সেই যে গুরুত্ব, সেই গুরুত্বের সঙ্গে আমার নিজের একটা যোগ আছে—সেই যে যোগ, সে যোগ আনন্দের যোগ, এ জিনিষটা যখন আমার উপলব্ধিতে আসে, তখনই ধূলিকণার প্রতিও আমার একটা শ্রদ্ধাবুদ্ধি জন্মে। সেই ধূলিকণার মধ্যেও আমার আনন্দাংশের উপলব্ধি হয়। আমি আপনাকে পাই। আমি তাহাকে ভালবাসি। কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল এমনই প্রেমিকের দৃষ্টি। ভক্তের দৃষ্টি। তাঁহার দৃষ্টি ছিল রস-সাধকের দৃষ্টি।

কেশবচন্দ্র তাৎকালিক বাঙলার জাতীয় জীবনের উপর প্রেমরসোপচিত এই যে শ্রদ্ধাবিন্দু, ইহার আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাবুদ্ধির অভাব—বিশেষভাবে এদেশের ধর্ম্ম, এদেশের সাহিত্য, এদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধির একটা দারুণ অভাব এ দেশের জাতীয় জীবনকে তখন অভিভূত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। এখনকার বাঙলার যুবকদের

জগন্মোহিনী দেবী (কেশবচন্দ্রের স্ত্রী)

গুরুস্বরূপে লর্ড মেকলে জোর গলায় বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষে সাহিত্য বলিতে যত কিছু আছে সে সব ওজন করিলেও ইউরোপের একটা ভাল পুস্তকালয়ের একটিমাত্র দেরাজের সমতুল্য হইতে পারে না।" ডাক্তার আলেকজেণ্ডার ডাফ ঐ সুরেই সুর মিলাইয়া বলিয়াছিলেন, "প্রাচ্যের সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিলে মুক্তা একটিও মিলিবে না।" দেশ ও জাতির প্রতি এইরূপ একটা অশ্রদ্ধার

ভাব এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাব যখন এদেশের যুবকদিগকে অন্ধ পরানুকরণে উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল, কেশবচন্দ্র সেই অশ্রদ্ধার মধ্যে শ্রদ্ধাকে প্রতিষ্ঠা করিলেন. অপ্রেমের আবহাওয়ায় প্রেমের প্রদীপ্ত শিখা জ্বালাইয়া ধরিলেন। দেখাইয়া দিলেন জাতির সম্পদ এবং সমৃদ্ধিকে। দেশাচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই বিদ্রোহের মূলে দেশ বা জাতির প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব ছিল না, বরং ছিল তাহারই বিপরীত বস্তু—প্রবল শ্রদ্ধাবুদ্ধি, প্রচণ্ড রকমের প্রেম।

এই প্রেমের তাড়নায় তাড়িত হইয়াই তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও সেই কথা বলিয়াছেন, কর্ত্তব্যবোধে তিনি কার্য্য করেন নাই। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কাজ করা এক কথা আর প্রেমের দৃষ্টিতে কাজ করা অন্য কথা। কর্ত্তব্যবোধে কাজ করার মধ্যে কৃচ্ছ্রতা থাকে, কৃত্রিমতাও কিছু পরিমাণ থাকেই, কিন্তু প্রেমিকের দৃষ্টি যে লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে দেশের জন্য, জাতির জন্য কাজ করা একটা সহজাত-সংস্কারের মত হইয়া যায়, সে অবস্থায় কাজ না করিয়া আর তিনি পারেন না। কাজের ভিতর দিয়া যে আনন্দধারা স্ফূর্ত্ত হয়, তাহারই ভিতর নিজে নিজকে নিমগ্ন রাখিতে চাহেন। কেবশচন্দ্র এই অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ভারতের পক্ষে এই জিনিষটা নূতন কিছু নয়, সাম্প্রদায়িকতার বহিরঙ্গকে ভারতের সাধকগণ কোনদিনই বড় করিয়া দেখেন নাই, প্রেম জীবনে সত্য বস্তুতে পরিণত হইলে বাহিরের এই সব আচার-বিচার এগুলির উপর জোর দেওয়া আর সম্ভবপর হয় না। প্রেমিকের দৃষ্টি পড়ে গিয়া মানুষের সত্য স্বরূপের উপর, অলৌকিক আচার-ব্যবহার তাহার দৃষ্টি হইতে মানুষকে আর পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। মানুষের মধ্যেই তাহার ব্রহ্মানুভূতি হয়; সে সকলকে আপনার করিয়া লয়। এই যে আপন করা ইহা তাহার পক্ষে কৃপা বা অনুগ্রহ নহে। ভক্তের পক্ষে তাহা হইল সেবা। কেশবচন্দ্রের বিভিন্ন কর্ম্ম-সাধনার মূলে ছিল সেই সেবারই প্রবৃত্তি। তিনি প্রেমিক ছিলেন, এই প্রেমের দৃষ্টিই এদেশের দীন দরিদ্র, এদেশের নির্য্যাতিত, নিপীড়িত, ইহাদের সেবায় তাঁহার চিত্তে ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়াছিল। স্বাধীনতা এবং সাম্যের সাধনা তিনি করিয়া গিয়াছেন কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে নয়, সেবা-ধর্ম্মের প্রেরণায়। সেবার ভিতর তিনি চরম এবং পরম আনন্দেরই সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন, সে বস্তু তাঁহার পক্ষে উপদিষ্ট ছিল না, তাহা জীবনের সত্যস্বরূপে পরিণত হইয়াছিল।

কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরে বিশ্বাস জীবন্ত ছিল। তিনি সাধক ছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম তাঁহার শেষ জীবনকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় একজন কর্ম্মী, কিরূপভাবে মহাপ্রভুর প্রচারিত রস-সাধনায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, অনেকের নিকট ইহা রহস্য বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে রহস্য কিছুই নাই। যে প্রেমিক, প্রকৃত কর্ম্মী সে-ই হইতে পারে। পরকে আপন করে তো প্রেমই; কর্ম্মের মূলে শক্তি তো নির্ভর করে এই পরকে আপন করিবার উপরই, শুধু উপদেশের জোরে পরের জন্য কাজ করা, শুধু কর্ত্তব্যবোধে পরের জন্য কাজ করা—এসব কথা অনেকটাই সূত্রগত; তেমন কর্ম্মোদ্যম প্রতিকুল অবস্থার একটা ছাড়া, দুইটা আঘাত খাইয়া শক্ত থাকিতে পারে কিনা সন্দেহ।

কেশবচন্দ্রের জীবনের জ্বলন্ত এবং জীবন্ত ভগবৎ-নিষ্ঠা আমরা আদর্শ করিতে পারি আর না পারি, যদি প্রকৃতপক্ষে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, এই যে সব বড় বড় কথা আমরা বলি, এগুলি যদি সত্যই আমরা বাস্তবে পরিণত দেখিতে চাই, তাহা হইলে, মানুষের প্রতি যে প্রেম এবং শ্রদ্ধাবুদ্ধি কেশবচন্দ্রের সমগ্র কর্ম্মোদ্যমের কেন্দ্রীভূত শক্তিস্বরূপে কার্য্য করিয়াছিল, আজ আমাদিগকেও তাহার গুরুত্বকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এবং শুধু উপলব্ধি করিলেই চলিবে না, যে সাধনায় সেই প্রেম এবং শ্রদ্ধাবুদ্ধি জীবনে সত্য হয়, তাহাই করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে ইহা যে—ভাবুকতার পথ, আবেগের পথ বলিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নয়; সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতাকে ব্যবহারিক জীবনে সত্য করিবার পক্ষে ঐ পথই বিজ্ঞানসম্মত পথ। অপরকে ভালবাসিয়া জীবনে সত্যই যদি আনন্দ না পাওয়া যায়, এবং সেই আনন্দের জন্য নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব এমন কি, জীবনকেও তুচ্ছ করা না যায়, তাহা হইলে সেমন ভালবাসার কোন মূল্য নাই। সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার সাধনা তখনই আমরা সার্থক করিয়া তুলিতে পারিব, যখন আমরা সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব এমন কি জীবনকেও তুচ্ছ করিতে সমর্থ হইব। যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োজন আছে স্বীকার করি; কিন্তু শুষ্ক যুক্তিবাদে জগতের সব সমস্যার সমাধান হয় না, কোন সংস্কার সম্ভব হয় না সে পথে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা তো আসেই না। যে শক্তির জোরে সে সব আসে, সেগুলি সম্ভব হয়—তাহার উৎস রহিয়াছে অন্তরে,—সে শক্তি স্ফুরিত হয় পরকে আপনার করিয়া উপলব্ধির ভিতর দিয়া। কেশবচন্দ্রের কর্ম্মসাধনা কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, এই বিচার আজ বড় নহে, বিপুল বাধা বিঘ্ন অন্তরায়ের ভিতর দিয়াও তিনি সেই শক্তির সাফল্যের যে সম্ভাবনাকে আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছেন তাহাই হইল বড়। যে প্রেম এবং সেবার দ্বারা তিনি আমাদের দেশ এবং জাতিকে মহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ বুঝিতে হইবে সেই প্রেমের শক্তিকে—সেবার শক্তিকে। সে শক্তির গুরুত্ব কেশবচন্দ্রের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয় নাই, হইতে পারে না। কেশবচন্দ্র তাঁহার জীবনে যে শক্তির স্বরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই শক্তিকে সর্ব্বাংশে ফলোপধায়ক করিবার দায়িত্ব সমগ্র জাতির উপর রহিয়াছে। রহিয়াছে আমরা তাঁহার দেশবাসী আমাদের উপর। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত করিতে গিয়া আমরা যেন সেই দায়িত্বের কথা বিস্মৃত না হই। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, কেশবচন্দ্র যে স্বাধীনতাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে স্বাধীনতার প্রেরণায় প্রদীপ্ত অবস্থায় তিনি বলিয়াছিলেন 'আমি নিজে কাহারও দাস থাকিতে চাহি

(শেষাংশ ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিংশ শতাব্দীর মূল-সমস্যা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দুর্ব্বার গতিতে ব'য়ে চলেছে কালের স্রোত—পুরাতনকে ভাঙতে ভাঙতে, নতুনকে তৈরী করতে করতে। সে-দিন যা ছিলো—আজ তা নেই; আজ যা আছে—কাল তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। একশো' বছরের আগের বাঙলাদেশ। সেই বাঙলার রঙ্গভূমিতে যাদের আমরা দেখতে পাই—তাদের সঙ্গে আজকের বাঙালীর দৃষ্টি-ভঙ্গিমার কত তফাৎ। টোলের সেই পড়ুয়ার দল গেলো কোথায়? সেই নিরীহ ছাত্রের দল! বগলে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কণ্ঠে কুমার-সম্ভব আর ভট্টিকাব্যের শ্লোক, হাতে খাঁকের কলম, মাথায় টিকি, পায়ে তালতলার চটি, গায়ে নামাবলী, দৃষ্টি গ্রামের চতুঃসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ! গুরুজনের সামনে সম্ভ্রমে জড়োসড়ো! আজকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আর কালিদাসের রঘুবংশ অলডাস হাক্সলি আর নুট হামসানকে স্থান ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে। টিকি প্রাচীন-যুগের প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টি ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম ক'রে স্পেনে আর চীনে আর চেকোশ্লোভাকিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, কণ্ঠ থেকে শাস্ত্রের শ্লোকের পরিবর্ত্তে উৎসারিত হ'চ্ছে 'ইনক্লাপ জিন্দাবাদ' আর 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।' ঢিলে পায়জামা প'রে আর মুখে চুরুট টানতে টানতে গুম্ফশ্মশ্রু বালকের দল ঠাকুরদার বয়সী লোকদের বোঝাবার চেষ্টা করছে—ভগবান, আত্মা, পরকাল—এ-সব গাঁজাখুরী কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেদিনের সেই কাঁচ-পোকার টিপ-পরা মেয়ের দলই বা গেলো কোথায়—যারা পায়ে মল পরতো, পুণ্যিপুকুর আর শিবপূজা করতো, শানাইয়ের করুণ কান্নার মধ্যে চোখের জল ফেলতে ফেলতে অল্পবয়সেই শ্বশুর-বাড়ী চ'লে যেত? এখনকার মেয়েদের সঙ্গে তাদের কি কোথাও মিল আছে? ট্রামে, বাসে, রাস্তায় কলেজে-পড়া যাদের দেখতে পাই—চোখে চশমা, গলায় মপচেন, হাতে ইকনমিকসের বই—তারা আর আমাদের ঠাকুরমার যুগের মেয়েরা কখনোই এক পর্য্যায়ভুক্ত নয়। কালের স্রোত দুর্ব্বারবেগে ধেয়ে চলেছে। একপারে চলেছে ভাঙনের লীলা, আর একপারে সৃষ্টির খেলা—একপারে পাড়-ভাঙ্গার ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ, আর একপারে জাগছে চরাভূমি। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কখনো নিঃশব্দে, কখনো বা সশব্দে চলেছে এই ভাঙা-গড়ার বিচিত্র নাট্যলীলা। মহাকালের রঙ্গমঞ্চে পুরাতনকে আড়াল ক'রে ক্ষণে ক্ষণে নামছে বিপ্লবের যবনিকা। সেই যবনিকা যখন উঠছে তখন দেখতে পাচ্ছি, পটের পরিবর্ত্তন ঘটেছে—যে দৃশ্য দেখেছিলাম তা আর নেই; মরুভূমির ধূসর শূন্যতা রূপান্তরিত হয়েছে কোলাহলময় জনপদে—কোলাহলময় রাজধানী পরিণত হয়েছে ভগ্ন অট্টালিকার ইষ্টকরাশিতে সমাচ্ছন্ন জনহীন শ্মশানভূমিতে! দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ সম্রাটের একাধিপত্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে রক্ত-সাগরের অতলে আর তার বিচূর্ণ স্বর্ণমুকুটের উপরে উন্মুক্ত তরবারিহস্তে হাসছে বর্ত্তমান যুগের ডিক্টেটর। শ্যামল অরণ্যকে নিঃশেষ ক'রে জেগে উঠছে যন্ত্র-দানবের আকাশচুম্বী পাষাণ-শৃঙ্গ। আকাশের নির্ম্মল-নীলিমা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালীবর্ণ ধারণ করেছে।

অর্থনীতির দিক দিয়ে এমনি একটা যুগান্তকারী পট-পরিবর্ত্তন চলেছে বাঙলাদেশের পল্লী-জীবনের রঙ্গমঞ্চে। বিংশ শতাব্দীর বুক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে তাকে একবার নিক্ষিপ্ত করা যাক ঊনবিংশ শতাব্দীর উপরে। সেখানে কি দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি—গ্রামের বুকের উপরে জেগে রয়েছে জমিদারের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বিরাট চণ্ডীমণ্ডপে মহা-সমারোহে দোল-দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান চলেছে। এই সব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত প্রজাগণ ভূরিভোজনে তৃপ্ত হ'চ্ছে। কাছারিবাড়ীতে নায়েব-গোমস্তা-বরকন্দাজ এবং প্রজাদের ভীড়। জমিদার দরিদ্র-কৃষকের আবেদন শুনছেন—আবেদন শুনে নায়েবকে আদেশ দিচ্ছেন। সেই আদেশের মধ্যে ফুটে উঠছে কখনো কোমলতা—কখনো কঠোরতা। জমিদার প্রজাদের কাছে ছিলো মা-বাপের সামিল। তারা কখনো পেতো স্নেহ, কখনো পেতো আঘাত। পেতো না শুধু আজিকার মত ঔদাসীন্য আর অবহেলা। জমিদারের সঙ্গে প্রজার একটা হৃদয়ের সম্পর্ক ছিলো। ভূম্যধিকারী প্রজার কাছ থেকে খাজনা বাবদ যা পেতেন তার অধিকাংশ তখন দিল্লী-লাহোর-কলিকাতায় সিগার-শ্যাম্পেন আর মোটরকার কিনতে নিঃশেষ হোতো না। জমিদার গ্রামেই বাস করতেন—পুকুর কাটাতেন, রাস্তাঘাট তৈরী ক'রে দিতেন, ক্রিয়াকর্ম্মে লোকজনদের পেট ভ'রে খাওয়াতেন।

প্রজার জীবনযাত্রার ছবি কেমন ছিলো? তাদের সারাজীবন কেটে যেতো গ্রামের ছায়া-সুনিবিড় বুকে। শহরের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। রেলগাড়ীতে কখনো চড়েনি—এমন লোক বিস্তর দেখা যেতো। তাঁতির মাকু-চালনার ঠক্ঠক্ শব্দে গ্রাম সদাসর্ব্বদা মুখরিত হ'য়ে থাকতো। চরকায় সুতো কেটে সেই সুতার গৃহস্বামিনীরা গ্রামের জোলা দিয়ে কাপড়-গামছা বুনিয়ে নিতো। জমিদারকে তারা বিপদে-আপদে আশ্রয় ব'লে মনে করতো। দুর্দ্দিনে তাঁর পরামর্শ নিতো, জীবনের ছোটোখাটো দুঃখের কাহিনী তাঁর কাছে এসে জানাতো। জমিদারকে তারা ভয়ও করত যেমন, ভক্তিও করতো তেমনি। প্রায় সকলেরই অল্প-বিস্তর জমি ছিলো। সেই জমিতে যে ফসল ফলতো—তা গোলায় নিয়ে তুলতো। তারা দীন হ'লেও সেই দৈন্যের মধ্যে গৃহস্থের একটা গরিমা ছিলো। পিতার এবং স্বামীর কর্ত্তব্যপালনে কোনো অবহেলা দেখা যেতো না—সে কর্ত্তব্য তারা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই সম্পন্ন করতো। গ্রামে গ্রামে তখনও মদের দোকান দেখা দেয়নি—সুতরাং জনসাধারণের জীবন দুর্নীতির কালিমা থেকে বহুল পরিমাণে মুক্ত ছিলো। পূজা-পার্ব্বণের সময় যে সব উৎসব হোতো—সেখানে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ সবাই সানন্দে যোগ দিতো। পুরুষেরা দা, কাস্তে, লাঙলের ফাল ইত্যাদি সওদা করতো, মেয়েরা সওদা করতো হাতা, খুন্তি, ধামা, কাঠের পুতুল, সংসারের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র। গ্রামের পুষ্করিণী কূলে কূলে ভরা থাকতো নির্ম্মল কালো জলে আর সেই জলে আবক্ষ ডুবিয়ে গ্রামললনা সহচরীদের কাছে সংসারের সুখ-দুঃখের কথা ব্যক্ত করতো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আঙিনাগুলি কোজাগরী

পূর্ণিমায় লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ বুকে নিয়ে হেসে উঠতো। শেষরাত্র থেকে শোনা যেতো গৃহে গৃহে ধান ভানার শব্দ। ছেলেমেয়েরা বাড়ীতেই থাকতো—পিতার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে চলতো, বাপ-মায়ে দেখে শুনে যে পাত্র-পাত্রীকে নির্ব্বাচিত করতো—ছেলেমেয়ে তারই গলায় মালা পরিয়ে দিতো—বধূরা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাকার্য্যে উদাসীন ছিলো না। লেখা-পড়া-জানা লোক নিতান্তই কম ছিলো—লোকের দৃষ্টি গ্রামের সীমানার মধ্যেই একান্তভাবে সীমাবদ্ধ ছিলো। কংগ্রেস, স্বরাজ—এ-সব কথার তখনও আবির্ভাব হয়নি। বাঁশঝাড় আর আমবাগানের ছায়ায় মাছ ধ'রে, হাল চষে, তাঁত বুনে, যাত্রা-পাঁচালি শুনে, দশপঁচিশ খেলে লোকে নিরুদ্বেগে তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতো। এই রকমের জীবনযাত্রার মধ্যে খুব গৌরব ছিলো এমন কথা বলছি না—কিন্তু শান্তি ছিলো। গৌরব ছিলো না—তার কারণ মানুষের কল্পনাশক্তি বড়ো দুর্ব্বল এবং জীবনের গণ্ডী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিলো। সবাই নিজের নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে বিব্রত থাকতো। সাম্যের এবং স্বাধীনতার আদর্শ লোকের মনে তখন আসন পাতেনি। দেশাত্মবোধের অনুভূতির সঙ্গে জনসাধারণের কোনো পরিচয় ছিলো না। বাঙালী মারাঠীকে অথবা মাদ্রাজীকে আপনার বলে ভাবতে পারতো না। অন্যান্য দেশে সহস্র সহস্র মানুষ একটা আদর্শের জন্য যখন অকাতরে জীবন বলি দিয়েছে—বাঙলার পল্লীবাসী তখন ক্ষেতে কাঁকুড় লাগিয়েছে, দুধ থেকে মাখম তুলেছে, গরুর গাড়ীর চাকা গড়িয়েছে। মানব-ইতিহাসের কলগর্জ্জনের ক্ষীণতম রেশটুকুও তার কানে এসে পৌঁছায় নি। বঙ্কিমই প্রথম বন্দে মাতরম উচ্চারণ ক'রে আমাদের চেতনাকে সারাদেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিলেন।

যাক, আলোচ্য বিষয় থেকে দূরে গিয়ে লাভ নেই। পল্লী-জীবনের রঙ্গভূমিতে আজ যে ওলোট-পালটের অভিনয় সুরু হয়েছে তারই পরিচয় দেবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। উপরে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার পল্লীজীবনের যে দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে—১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের বাঙলার পল্লীগুলিতে সে দৃশ্য নিমেষে নিমেষে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে। জমিদারদের অবস্থা হয়েছে কেমন? শক্তিহীন জরদগবের মতো—কথামালার নখ-দন্তহীন পশুরাজের মতো। কুলোর মতো চক্র আছে—কিন্তু বিষ নেই, জমিদার বলে নাম আছে—কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য নেই, প্রতাপ নেই। প্রজা খাজনা দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। গল্পে পড়েছিলাম সেই অদ্ভুত হাঁসের কথা যে রোজ একটা ক'রে সোনার ডিম পাড়তো। পরে লোভের উৎকট আতিশয্য হাঁসের স্বর্ণডিম্ব প্রসব করার ক্ষমতা চিরদিনের জন্য ঘুচিয়ে দিলো। বাঙলার কৃষকের অবস্থা হয়েছে রূপ কথার হাঁসের মতো। তার পেট চিরে ডিম বার করবার উৎকট চেষ্টা তাকে মৃত্যুর দ্বারে টেনে এনেছে। সেখান থেকে পাওয়ার আর কিছু আশা নেই। জমিদার গ্রামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে। নায়েব-গোমস্তা প্রজা ঠেঙিয়ে যা পায় তার উপরে নিজেরা ভাগ বসায় এবং অবশিষ্ট অংশ শহরে প্রভুর নৈবেদ্য-হিসাবে প্রেরণ করে। নিঃস্ব প্রজার কলিজা-পেষা অর্থ সিনেমায় আর হোটেলে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর ফুটবলের ময়দানে নিয়-মিতভাবে ব্যয়িত হয়। জমিদারের পরিত্যক্ত শাসনদণ্ড অধিকার ক'রেছে নূতন এক ধরণের জীব যাদের ইংরেজীতে বলা হয় Industrial Capitalist, পয়সাওয়ালা বড়ো বড়ো সাহেব-কোম্পানী আর মাড়োয়ারী-কোম্পানী গ্রামের মধ্যে নাসিকা প্রবেশ করিয়ে দিতে আরম্ভ ক'রেছে। এই সব বড়ো বড়ো বিদেশী আর অ-বাঙালী কোম্পানী বাঙালী জমিদারের কাছ থেকে সহস্র সহস্র বিঘা জমি দীর্ঘকালের জন্য জমা নিয়ে সেই সব জমিতে চিনির কল বানাচ্ছে আর আকের চাষ করছে। কল চালাতে গেলে কলকে নিয়মিতভাবে ইক্ষু জোগাতে হবে। কোম্পানী ইক্ষুর জন্য চাষীর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে না। চাষী যাতে লাভ বেশী হয় তাই বুনবে। সুতরাং কোম্পানীর ইক্ষু-চাষের জন্য নিজস্ব জমির প্রয়োজন আর সে জমির আয়তন বিস্তীর্ণ হওয়া চাই। কলের লাঙল দিয়ে চাষ করতে হ'লে বিস্তীর্ণ জমির দরকার—টুকরো টুকরো জমিতে কলের লাঙল চলে না। বেশী ফসল উৎপন্ন করবার জন্য কোম্পানীগুলি, এই জন্য, কলের লাঙলেরই পক্ষপাতী। পলাশীতে সাহেব কোম্পানীর জমিদারীতে বিস্তীর্ণ মাঠের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে কলের লাঙল চলছে।

এখন প্রশ্ন—জমিদার একই প্লটের শত শত বিঘা জমি মাড়োয়ারী আর সাহেব কোম্পানীকে দিচ্ছে কেমন ক'রে? সাধারণ জমি প্রজাদের মধ্যে জমিদার বিলি ক'রে দেন। কারও কুড়ি বিঘে, কারও পঁচিশ বিঘে, কারও ত্রিশ বিঘে। এই সব খণ্ড খণ্ড জমি কৃষকেরা পুরুষানুক্রমে চাষ ক'রে আসছে। জমিদার জমির খাজনা পায়। এই সব চাষীদের জমিই তাদের কাছ থেকে নিয়ে জমিদার বিদেশী কোম্পানী-গুলিকে এখন জমা দিয়ে দিচ্ছে। বিদেশী কোম্পানীকে এক সঙ্গে তিনচার হাজার বিঘে জমি জমা দেওয়ার সুবিধা অনেক। দরিদ্র চাষীর কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সমস্যা অত্যন্ত কঠিন। তার ঘটি বাটি নিলামে চড়িয়ে তবে খাজনা আদায় করতে হয়। তাতে হাঙ্গামা যথেষ্ট। মাড়োয়ারী অথবা সাহেব কোম্পানীকে জমি জমা দিলে খাজনা বাকী পড়ার কোন আশঙ্কা নেই। কলিকাতায় খাও, দাও, স্ফূর্ত্তি কর। ঠিক সময়ে কোম্পানীর খাজনার টাকা তোমার পায়ের কাছে এসে পৌঁছাবে। এ লাভ কি কম লাভ?

কিন্তু চাষী তার বাপ-পিতামহের আমল থেকে আবাদ-করা জমি মাড়োয়ারী আর সাহেব কোম্পানীকে দেবার জন্য জমিদারের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে কেন? চাষীর কাছে তার জমি কোহিনূরের চেয়েও মূল্যবান। সেই জমির খেজুর গাছ তাকে গুড় দেয়, তার আম-কাঁঠালের বাগান তাকে ফল দেয়, তার বাবলা গাছ তাকে চাকা তৈরী করবার উপাদান দেয়, জমি তার একমাত্র আশ্রয়। সাধ ক'রে কি চাষী তার জমি ছেড়ে দিচ্ছে? জমি তারা ছেড়ে দিচ্ছে বাধ্য হয়ে। ব্যাপারটা ভালো ক'রে বোঝাবার জন্য আমাদেরই এক বন্ধুর লিখিত পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। বন্ধুটি উচ্চ-শিক্ষিত এবং উকীল—দীর্ঘকাল ধ'রে অন্তরীণ ছিলেন। নদীয়া জিলার কোনো গ্রাম থেকে তিনি আমাদের কাছে লিখছেন,

"—চিনির কলের কোম্পানীরা আমাদের গ্রামের কাছে অনেকগুলো গ্রামের মাঠ পত্তনী নিচ্ছে।.........সবই

চাষীদের জমা দেওয়া জমি—একমাত্র অবলম্বন চাষের জমি। এবার বন্যায় ঐ অঞ্চলের চাষীরা সর্ব্বস্বান্ত—সেই সুযোগে জমিদার '—বাবুর এষ্টেটের কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলো গুরখা সেপাই দরওয়ান নিয়ে ঐ অঞ্চলে ক্যাম্প ফেলে সমস্ত প্রজাদের দ্বারা একরকম জোর ক'রেই বাকী খাজনার বদলে এস্তোবা লিখিয়ে নিচ্ছে। এস্তোবা লিখিয়ে খাসে এনে চিনির কোম্পানীদের পত্তনী দিয়ে চাষীদের একরকম নিঃসম্বল নিরাশ্রয় ক'রে গ্রামের থেকে উচ্ছেদ করা—এই হ'চ্ছে ওদের এখনকারের কর্ম্মপন্থার উদ্দেশ্য। চাষীরা আমাদের কাছে এসে আবেদন জানাচ্ছে—কিন্তু আমরা তাদের জন্য কতদূর কি করতে পারি—বুঝে উঠতে পারছি না।

বন্যার সাহায্য করতে এসে যে বিষয়ের সম্মুখীন হ'তে হ'লো তাতে বন্যার পীড়ন উল্লেখযোগ্য ব্যাপারই নয় ব'লে মনে হচ্ছে। ঐ ঐ জায়গায় দশবার বন্যায় যে ক্ষতি করতে পারতো তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী করছে এই চিনির কলের মালিক ও জমিদারের প্রতিনিধিরা। বন্যাসাহায্যকল্পে ঘর যে বেঁধে দেবো—কার ঘর বাধবো? কত ঘর বাঁধবো? আর কোথায়ই বা বাঁধবো? এলাকার প্রায় ষোলো আনাই তো আজ উচ্ছেদের মুখে। জমিদার ও ভাবী পত্তনিদারদের ষড়যন্ত্র যদি সফল হয় তবে তো চার-পাঁচখানা বড়ো ও কয়েকখানা ছোটো গ্রাম একেবারেই নিরাশ্রয় নিঃসম্বল হ'য়ে পড়বে।.........বেশীর ভাগ চাষীদেরই খাজনা অনাদায়ে—জমিদারের দরজায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে রয়েছে। জমিদারের পক্ষে তাই বলা সম্ভব হ'চ্ছে—অনাদায়ী খাজনা মকুব হবে যদি টিপ সই বা নাম সই ক'রে এস্তোবা দেওয়া হয়—না হলে, এইক্ষণেই বাকী খাজনা দাও। না দিলে আদালতে চলো। ভিটে মাটি ঘটি বাটি সব দিয়েও নিস্তার পাবে না।"

পত্র-লেখকের, জমিদারের, চিনির কলের মালিকের এবং হতভাগ্য গ্রামগুলির নাম এখন প্রকাশ করলাম না। পাঠক-পাঠিকাগণ এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন—চাষীরা কেন পিতৃ-পিতামহের আমলের জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে এবং কোথা থেকে মাড়োয়ারী এবং সাহেব কোম্পানীগুলি এত জমি পাচ্ছে। বাঙলা দেশের চাষীরা আমাদের চোখের সামনেই দিনে দিনে একেবারে নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল হ'য়ে যাচ্ছে—অথচ আমাদের শহুরে সমাজের খুব কম লোকেই তার খবর রাখে। খবর রাখবার প্রয়োজন মনে করিনে—মাসে মাসে ঘরে মাইনের টাকাটা এলেই যথেষ্ট। দেশ থাকলো আর গেলো—কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে জমিদারের সর্ব্বগ্রাসী রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর সেই জন্যই 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন,

"জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমিদার নামক বড়ো মানুষ কৃষক নামক ছোটো মানুষকে ভক্ষণ করে।"

তা হ'লে ঘটনাস্রোত বাঙলাদেশের পল্লীজীবনকে কোন্‌খানে নিয়ে চলেছে? নিয়ে চলেছে সেই সর্ব্বনাশের সাহারার বুকে যেখানে বাঙালী কৃষকের স্বাতন্ত্র্য ব'লে আর কিছু থাকবে না জমি হারিয়ে, ঘর হারিয়ে, সর্ব্বস্ব হারিয়ে সে চিনির কলে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দিনমজুর হবে। গ্রামের বুক থেকে দলে দলে শহরে এসে কুলী হয়ে বস্তীতে বাস করবে—তাড়ী খাবে—মাতলামী করবে—পশুতে পরিণত হবে। গ্রাম্যজীবনের রঙ্গ-মঞ্চে এই সর্ব্বনাশের পালা সুরু হয়েছে। জমিদার তার নিঃসম্বল প্রজাদের মাড়োয়ারী আর সাহেব কোম্পানীর মুখে স'পে দিয়ে শহরে আশ্রয় নিয়েছে। তার তো এতে কোনো অ-লাভ নেই। জমিদার ছিল আগে—এখন হয়েছে সুদখোর। Industrial Capitalistকে জমি ধার দিয়েছে—আর সেই জমির সুদ-স্বরূপ পাচ্ছে বছরে বছরে খাজনা। মুদিখানার মুদি যেমন ক'রে তার তেলনুন বিক্রয় করে পয়সার জন্য, ঠিক তেমনি ক'রেই জমিদার পয়সার জন্য তার জমিকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত ক'রেছে। জমিদারের কাছে জমি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে a money-making machine.

মুস্কিল হয়েছে হতভাগ্য প্রজাদের। যেটুকু জমি ছিল—চিনির কলের মালিকেরা গ্রাস করেছে। এখন তারা যাবে কোথায়? চাষীগৃহস্থ আজ পরিণত হ'তে চলেছে কলের দিন-মজুরে। তারপর যে দিন কলের মালিকও তাড়িয়ে দেবে সে দিন তারা যাবে কোথায়?

এই সব দেখে শুনেই তো বার্নার্ড শ' ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের যুক্তিকে সমর্থন ক'রে এমন জোরের সঙ্গে লিখেছেন, এই জন্যই তো মার্কসের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে—the abolition of private propertyর কথা।

তবে এ সত্য পরিষ্কার ক'রে বুঝতে পারছি—

"পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।"

বঞ্চনা দিনে দিনে সঞ্চিত হ'য়ে আকাশকে পর্য্যন্ত ছুঁতে চলেছে। এ বঞ্চনার পালা চলবে আর কত দিন? যে সমাজ-ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধ'রে মানুষের আত্ম-প্রকাশের দাবীকে উপেক্ষা ক'রে আসছে—তার পরমায়ু কখনো দীর্ঘ হতে পারে না। For any social order which fails consistently to recognise the claims of personality is built upon a foundation of sand.* আজ বাঙলাদেশের সহস্র সহস্র কৃষকের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। তাদের বেদনার পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। আর এই কৃষকদের ধৈর্য্যের বাঁধ যদি একবার ভেঙে যায় তবে বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা কি নিমেষে ধূলোয় লুটিয়ে পড়বে না? বঙ্কিমের ভাষায়, "তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?" সমস্যা সত্য সত্যই গুরুতর।

---

*Laski—A Grammar of Politics—P. 97.

চীন-জাপান সংগ্রামের নূতন পর্ব্ব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেড় বৎসর যাবত চীন-জাপান যুদ্ধ চলিতেছে। জাপানীরা ক্রমশ চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, চীনারা ক্রমশ পিছু হটিতেছে। চীনের প্রধান প্রধান শহর জাপান দখল করিয়াছে। উত্তর-চীন ও পূর্ব্বদিকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বহু অঞ্চলও এখন জাপানের অধিকারে। কিছু দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ-চীনের প্রধান **নগরী ক্যাণ্টন জাপানীরা অধিকার করিয়াছে।** চীনের নূতন **রাজধানী হ্যাঙ্কৌরও পতন হইয়াছে।** গত আঠার মাসের মধ্যে **চীন-জাপান সংগ্রামের বিস্তর চাঞ্চল্যকর সংবাদ জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক বারই মনে হইয়াছে, এই বুঝি চীন গেল।** জাপানের জনসাধারণও প্রতিবার এই ভাবিয়া আশ্বাস লাভ **করিয়াছে যে, চীন সংগ্রামের দায় হইতে তাহারাও অবিলম্বে মুক্তি পাইবে।** জাপানী সাধারণ যে যুদ্ধের ভারে বেশ কাবু **হইয়া পড়িতেছে—তাহা শুধু বিদেশীদের লেখা হইতে নয়, যখনই বিশেষ কোন জয়ের সংবাদ সেখানে প্রচারিত হয় তখন সেখানকার লোকের মনোভাব প্রত্যক্ষ করিলেও তাহা বেশ বুঝা যায়। ক্যাণ্টনের পতনের পর জাপানে কি জয়োল্লাসই না হইয়াছিল!** চীনযুদ্ধের অবসান অনতিদূরে ভাবিয়া তাহারা আশ্বস্তও **হইয়াছিল খুবই।** কিন্তু 'মরিয়া **না** মরে রাম"! চীনাদের পিকিং গিয়াছে, নানকিং গিয়াছে, সাংহাই গিয়াছে, ক্যাণ্টন, হ্যাঙ্কৌও গিয়াছে, তথাপি তাহারা ত নরম হইতেছে না! চীনের অভ্যন্তরে জাপানীরা বহু দূরে অগ্রসর হইয়াছে, চীনের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং তৈল, কয়লা, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতির খনিগুলির অধিকাংশই জাপানীরা হস্তগত করিয়াছে, তাহাদের উন্নত বৈজ্ঞানিক রণাস্ত্রের সম্মুখে চীনারা ক্রমেই হটিয়া যাইতেছে। তথাপি চীনারা জাপানীদের নিকট নতি জানাইতেছে না! চীনের প্রতিরোধক শক্তিতে সন্দিহান হইলেও বিশ্ববাসী ইহা দেখিয়া বিস্ময় মানিতেছে।

উপরে বাম দিক—জাপানের প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনো। দক্ষিণ দিকে—মার্শাল চিয়াংকাই শেক। একটি জাপানী বোমায় ঘর বাড়ী বিধ্বস্ত হইতেছে

চীন-জাপান সংগ্রাম আরম্ভ হওয়া অবধি এক দল বিশেষজ্ঞ কৃতী লেখক চীন ও জাপানের বর্ত্তমান অবস্থা ও সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তর পুস্তক-পুস্তিকা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে মিঃ নাথানিয়েল পেফার, *মিস্ ফ্রেডা আটলি, এবারকার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তা মিসেস পার্ল এস. বাক, মিস্ হ্যাগনেস স্মেডলী,* ভারনন বার্টলেট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই জাপানের প্রবলতর শক্তির কথা স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি চীন বিজয়ে ইহা কতটা কার্যকরী হইবে, সে সম্বন্ধে ইঁহারা নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। চীন বিরাট দেশ, লোকসংখ্যাও বিয়াল্লিশ কোটি। কিন্তু কোন দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আয়তনের বিশালত্ব বা জনসংখ্যার আধিক্যই ত যথেষ্ট নয়! বিশেষজ্ঞগণ প্রত্যেকেই চীনাদের ঐকমত্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহারা যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে—একতাই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান সহায় হইবে। শক্তিমান জাপানের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে যুঝিতে হইলে আর একটি জিনিষ প্রয়োজন, তাহা হইল—সংগঠন শক্তি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাতিকে সংহত ও সংগঠিত করিয়া লইতে পারিলে—শত্রু যতই প্রবল হউক, সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে না। দক্ষিণ-চীনে ক্যাণ্টনের পতনের পর অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, চীনাদের সংগঠন শক্তি বোধ হয় নিতান্ত ব্যাহত হইয়া যাইবে। কিন্তু সম্প্রতি দক্ষিণ-চীন হইতে যে-সব সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে মনে হয়, চীনারা সংগঠন-শক্তি হারায় নাই, তাহারা তাহাদের নিজস্ব রীতিতে জাপানীদের অগ্রগতিতে বাধা দিয়া উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিবে। উপরে যে কয়জন বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা প্রত্যেকেই একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা হইতেছে—চীনে জন-জাগরণ। চীনের গণ-দেবতা—সাধারণ দীন দরিদ্র চাষী-মজুর আজ জাগিয়াছে। চীনা কমিউনিষ্ট সেনানীর শিক্ষায় তাহারা আজ উদ্বুদ্ধ। জীবন যায় যাক, তথাপি স্বদেশকে পরপদলাঞ্ছিত হইতে দিব না—চীনা সাধারণের আজ এই প্রতিজ্ঞা। যাই *জাপানীরা তাহাদের বিরাট রণাস্ত্র লইয়া এক-একটি অঞ্চলে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছে, অমনি লক্ষ লক্ষ চীনা গ্রাম*-বাসী ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামার জ্বালাইয়া দিয়া চীনের অভ্যন্তর মুখে রওনা হইয়া গিয়াছে! স্বাধীনতার জন্য মন কতখানি উদ্বেলিত হইলে আজন্ম বা পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত যাবতীয় দ্রব্য জ্বালাইয়া দিয়া বা তাহার মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্ব অবস্থায় লোকে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে পারে—একবার ভাবিয়া দেখুন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রাণের ভয়ে তাহারা এইরূপে করিতেছে। এ কথা ঠিক নহে। **পল্লী-অঞ্চল**

বিধ্বস্ত করা জাপানী স্বার্থের বিরোধী। তাহারা ইহা করে নাই, করিতও না। চীনা সাধারণের এই মনোভাব চীনের কর্ণধারদের শক্তি জোগাইতেছে। তাই ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কৌর পতনের পরেও তাঁহারা দমিয়া যান নাই। আগের মতই শত্রুকে বাধা দিয়া চলিয়াছেন।

শক্তিমান শত্রুকে বাধা দিবার অন্য উপায় গরিলা যুদ্ধ। চীনারা তাহাও অবলম্বন করিয়াছে। চীনা কম্যুনিষ্টরা গরিলা যুদ্ধে বড়ই ওস্তাদ। তাহারা চীনা সাধারণকেও এই বিদ্যা শিখাইতেছে। উত্তর-চীনে জাপানীদের অগ্রগমনে চীনারা এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিয়া বহুদিন যাবৎ বাধা দিয়াছে—এখনও তাহারা শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। অগ্রগতিতে বাধা দানের বর্ত্তমান প্রয়াস লক্ষ্য করিবার বিষয়।

জাপান কিন্তু এক একটি শহরের পতনের পরই বিশ্ব-রাষ্ট্রগুলিকে নূতন করিয়া সমঝাইয়া দিতেছিল। পিকিং, সাংহাই ও নানকিঙের পতনের পর ইহাদের সম্পর্কে তাহার নীতি এক একবার বিশ্লেষণ করিয়াছে। বৈদেশিক শক্তি-বর্গ কখনও চোখ রাঙাইয়াছে, প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু শেষে সবই ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কৌর পতনের পর জাপানের অন্য রূপ দেখা গিয়াছে। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিকে সে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছে যে, চীন সম্পর্কে তাহাদের পূর্ব্বেকার নীতি অদল বদল করিতে হইবে। গত ১৯২১-

দক্ষিণ চীনের সমুদ্রতীর রক্ষাকার্য্যে চীনা স্বেচ্ছাসেবকগণ

ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কৌ পতনের পর চীনাদের আর একটি নীতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জাপানীরা চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করুক—ইহাই এখন চীনাদের কামনা। তাহারা যতই চীনের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিবে ততই স্ব-খাত সলিলে ডুবিয়া মরিবে। চীনের জনসাধারণ ত আর জাপানীদের চাহে না। তাহারা জাপানীদের চারিদিক হইতে ঘেরাও করিয়া নির্ম্মূল করিয়া দিবে। চীনাদের এই পদ্ধতি কতটা কার্য্যকরী হয় তাহা এখন বলা কঠিন। তবে গরিলা-যুদ্ধ যে ভাবে চলিতেছে, এ পদ্ধতিও অনেকটা তাহারই অঙ্গীভূত। গরিলা যুদ্ধে শিক্ষিত হইলেই তাহাদের এ পদ্ধতি সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারিবে। চীনা সাধারণ আজ শত্রু বিতাড়নে পূর্ব্বাপেক্ষাও দৃঢ়সংকল্প। তাহাদের তরফে জাপানীদের

২২ সনে ওয়াশিংটনে চীনে অবাধ বাণিজ্য বিষয়ে যে নব-শক্তি চুক্তি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, চীনের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আর প্রযুজ্য নহে। জাপান ইহা জানাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সে ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতিকে বিশেষভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, ইংয়াসি নদীর উজানে তাহাদের বাণিজ্য-পোতাদির চলাচল অতঃপর বন্ধ করা হইল। জাপানের রণপোত এখন ও-অঞ্চলে যাতায়াত করিতেছে। আর ও-অঞ্চলে এখন জাপানেরই অধিকার। ঐসব রাষ্ট্রে বাণিজ্য-পোতাদির অবাধ গতিবিধির কথা উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ প্রসঙ্গে মিঃ নাথানিয়েল পেফারের একটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'ফরেন য়্যাফেয়ার্স' নামক ত্রৈমাসিকের গত অক্টোবর সংখ্যায় তিনি এইকথাই আগে উল্লেখ করিয়া-

ছেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি চীনের বিপদে সাহায্য করিতে আসিতেছে না, তাহারা কখনও সাহায্য করিবে এরূপ ভরসাও নাই। তাহারা বরং ভাবিতেছে যে, চীন জাপানের অধিকৃত হইলেই তাহারা অধিকতর লাভবান হইবে, যদিও বর্ত্তমান সংঘর্ষের ফলে তাহারা বিস্তর ক্ষতি-গ্রস্ত হইতেছে। পেফার মহাশয় বহু তথ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের এ ধারণা খুবই ভ্রমাত্মক। কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে জাপানী নীতির কৌশলে তাহাদিগকে যেমন বিদায় লইতে হইয়াছে, চীন হইতেও সেইরূপ হাত গুটাইতে হইবে, যদি ইহা একবার জাপানের অধীন হইয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Western countries will have no place in China under Japanese control. China---

ক্যান্টনের জাপানী বোমায় বিধ্বস্ত একটি অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আহতদের উদ্ধারকার্য্যে রত

colony, protectorate, or 'independent' ally of Japan after the fashion of Manchukuo will not be quite closed to Western enterprise. A little trade may steal through the intestices left by Japan's own deficiencies in raw materials.... But no more; and much more than this Western countries could expect in the normal course if China were to remain independent, even though her independent development might not be so spectacular as might be in the first few years under Japanese domination."

পেফার মহাশয় কিছুকাল পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছেন, জাপানের বর্ত্তমান নির্দ্দেশে তাহারই আভাষ পাওয়া যাইতেছে। জাপানের অধীন হইলে চীনের দ্বার বিদেশীদের কাছে প্রায় অর্গলবদ্ধ হইবে। স্বাধীন চীনে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি বৈদেশিকগণ চীনকে সাহায্য করিতে আসিবে না। ইউরোপের মিউনিক চুক্তিতে জাপান-সরকার খুবই আশ্বস্ত হইয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে, হোমরা-চোমরা রাষ্ট্রগুলি মুখে যাহাই বলুক ইহারা ইদানীং আর পরের জন্য লড়িতে আসিবে না, স্বার্থহানি হইলেও না। তাই তাহারা চীনকে বিদেশীর নিকট 'হৃত-রাজ্য' করিয়াই ক্ষান্ত নয়, তাহারা প্রাচ্যে একটি পূর্ব্ব-এশিয়া রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের স্বপ্নও দেখিতেছে। জাপান হইবে ইহার নেতা, আর সকলে হইবে তাহার তাঁবেদার। ভারবর্ষকেও নাকি ইহার অঙ্গীভূত করিতে চায়। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের যে পুনরভিনয় জাপান করিতেছে তাহাতে তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে কেহই রাজী হইবে না।

ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কৌ পতনের পর সুতরাং সত্যসত্যই চীন-জাপান সংগ্রামে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। অস্ত্র-শস্ত্রে দুর্ব্বল চীনারা তৃতীয় নীতি অনুসরণ করিতে মনস্থ করিয়াছে। জাপানীরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তাহারা ইহাদিগকে ঘিরিয়া পিষিয়া ফেলিবে। ক্যাণ্টন ছিল চীনে বিদেশ হইতে অস্ত্রসরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। জাপানীরা ইহা দখল করিয়া মনে করিতেছে চীনের এবার আর উদ্ধার নাই। তাহারা বিদেশীদের হুঁসিয়ার হইতে বলিয়াছে। জাপান-বিরোধী কোন কার্য্য করিলে তাহাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। ফরাসীদিগকে জাপানীরা ইদানীং সম-ঝাইয়া দিয়াছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে জাপানীরা অগ্রসর হইতে থাকিলে ভারতবর্ষের সীমান্তেও হয়ত আসিয়া পড়িবে। চীন-জাপান সংগ্রামের পরিণতি কোথায় এখনও বলা কঠিন।

২২শে নবেম্বর ১৯৩৮

আলো কি ?

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল বি-এস-সি

প্রকৃতির যে সমস্ত পদার্থ আমরা সর্ব্বদাই দেখি এবং যাহা আমাদের অতীব প্রয়োজনীয়--তাহাদের মধ্যে আলো একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। কাজেই এই প্রশ্ন স্বতই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 'আলো' জিনিষটা কি? কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের যুগেও বৈজ্ঞানিকগণ একমত হইয়া ইহার কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। খৃঃ পূঃ ৫০০ শকেরও পূর্ব্বের বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন যে, কোনও উজ্জ্বল পদার্থ হইতে নিয়ত একপ্রকারের ক্ষুদ্র কণিকা বেগে বাহির হইয়া আসিয়া আমাদের চক্ষুতে আঘাত করে এবং সেই জন্যই আমরা কোনও বস্তুকে দেখিতে পাই। ইহার দুই সহস্র বৎসর পর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিউটনও ঠিক এই কথাই বলেন। নিউটনের সমসাময়িক ডাচ্ বৈজ্ঞানিক হিউগেন মত প্রকাশ করিলেন যে, "আলো" তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আলোর যে সমস্ত বিশিষ্ট গুণাগুণ (property) আছে--তিনি তাঁহার মতবাদের (wave theory) দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু "আলোক-শক্তি" যে সরল পথে গমন করে (Rectilinear Propagation of light) তাহা তিনি সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এই কারণে ঐ সময় বৈজ্ঞানিক জগতে নিউটনের অগাধ প্রতিপত্তি থাকায় তাঁহার (নিউটনের) মতবাদই ঠিক বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়া লন। এই মতবাদকে Corpuscular বা Emission theory বলা হয়। এই মতবাদীরা বলেন যে, আলো কতকগুলি ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি। কোনও উজ্জ্বল পদার্থ হইতে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকাগুলি নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে সরল পথে অতি ভীষণ বেগে ধাবিত হয় এবং যখন ইহা অক্ষিপটে (Retina) আঘাত করে ও উহার বোধ (sensation) মস্তকে (brain) যায়, তখন আমরা কোনও বস্তুকে দেখিতে পাই। তারপর নিউটন বলেন যে, আলোকরশ্মি কোনও স্বচ্ছ পদার্থের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার পথের পরিবর্ত্তন হয়, ফলে কখনও প্রতিফলন বা কখনও বক্রগমন (Reflection বা Refraction) হয়। এইখানেই নিউটনের মতবাদ সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হইল। কেননা একই আলো কোনও স্বচ্ছ পদার্থের নিকটবর্ত্তী হইলে কখনও ফিরিয়া যাইবে এবং কখনও প্রবেশ করিবে--ইহা কিরূপ ব্যাপার? যাহা হউক, তিনি 'অঙ্কশাস্ত্রানুযায়ী' দেখান যে, আলো যখন জলের ভিতর দিয়া যায় তখন তাহার বেগ বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ইহার প্রায় ২০০ শত বৎসর পর 'ফুকো' (Foucault) নামক একজন বৈজ্ঞানিক আলোর সঠিক গতি পরীক্ষা করিতে গিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে প্রমাণ করেন যে, জলে আলোর গতি কম। সুতরাং ইঁনি নিউটনের মতবাদ ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। তখন হইতে হিউগেনের মতবাদের (wave theory) দিকে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই মতবাদীরা বলেন যে, যে উৎপত্তিস্থান (Source) হইতে আলো পাওয়া যায় তাহার অণুগুলি অতি ভীষণ বেগে কম্পিত হইতে থাকে এবং এই কম্পনের ফলেই তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ইহা অক্ষিপটে আসিয়া লাগিবার ফলেই আমরা আলোকিত বস্তুটি দেখিতে পাই।

এখন কথা হইতেছে এই যে, তরঙ্গ প্রবাহের জন্য কোনও স্থিতিস্থাপক বাহনের (elastic medium) প্রয়োজন। নতুবা তরঙ্গ প্রবাহিত হইবে কি প্রকারে? "শব্দশক্তি" বায়ুতে তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং বায়ুই তাহার বাহক। যেখানে বাতাস নাই অর্থাৎ শূন্যে (vacuum) সেখানে শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু আলো শূন্যের ভিতর দিয়াও যায় এবং এই জন্যই মহাশূন্যের গ্রহ, উপগ্রহ ও তারকামণ্ডলীর আলো আমরা দেখিতে পাই কিন্তু সেখানকার শব্দ শুনিতে পাই না।

আলো যে তরঙ্গ--এই ধারণা হইবার কতকগুলি সঙ্গত কারণও ছিল। যখন দুইটি সমশ্রেণীর আলোকরশ্মি (অর্থাৎ যাহার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পন সংখ্যা এক) দুইটি বিভিন্ন স্থান (Source) হইতে উৎপন্ন হইয়া একস্থানে মিলিত হয়, তখন আমরা সে স্থান হয় অত্যুজ্জ্বল নয় একেবারে অন্ধকার দেখিতে পাই--অর্থাৎ Interference (ব্যতিকরণ) হয়। অবশ্য ইহা এত সূক্ষ্ম যে, যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না। আলো যদি তরঙ্গ না হইত তবে এইরূপ হইত না। এছাড়া বিচ্ছুরিত আলোর (Defraction) দরুন যে সমস্ত দৃশ্য দেখা যায় তাহা দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয়।

বৈজ্ঞানিকগণ আলোকে কেবল তরঙ্গ বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা যন্ত্র সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য পর্য্যন্ত মাপিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, লাল আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ·০০০৭৬ মিলিমিটার ও বেগুনে আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ·০০০৪ মিলিমিটার এবং অন্যান্যগুলির দৈর্ঘ্য ইহার মধ্যবর্ত্তী। ইহারা প্রতি সেকেণ্ডে ৪×১০১৪ হইতে ৭·৬×১০১৪ বার কম্পিত হয়। আজকাল বিভিন্ন প্রকার আলোককে (লাল, বেগুনে, Infra Red, Ultra Violet, X'ray প্রভৃতি) চিকিৎসা জগতেও কাজে লাগান হইতেছে।

বৈজ্ঞানিকগণ এই আলোকবাহনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অনাবিষ্কৃত পদার্থে পরিপূর্ণ। ইহা সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের মধ্যেই বিদ্যমান। তাঁহারা ইহার নাম দিলেন "ঈথার" (Aether) এবং স্থির করিলেন যে, এই 'ঈথার'ই হইতেছে আলোক তরঙ্গের বাহন। তাঁহাদের প্রমাণ করিবার সুবিধার্থে এই অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত 'ঈথার'কে রূপ দিলেন। এবং সুবিধামত কতকগুলি গুণাগুণ কল্পনা করিলেন।

বর্ত্তমানে অনেকে আলোর এই তরঙ্গবাদ (wave theory) সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন এবং ফলে Quantum theory'র আবির্ভাব হইয়াছে। মোটের উপর আলোর যে কি মতবাদ তাহা আমরা এক্ষণে নিশ্চিতরূপে বলিতে অক্ষম; তবে সুবিধার্থে সাধারণত wave theory ধরিয়াই কাজ করা হয়। এমন দিন ভবিষ্যতে আসিবে কিনা যখন আমরা দেখিব যে, এই

(শেষাংশ ১২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুগমানব কেশবচন্দ্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

রাজা রামমোহন রায় আজ প্রায় ১০৫ বৎসর হইল ব্রিষ্টল নগরে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইংরেজের শাসন তখন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরেজ নানারূপ দ্বিধা কাটাইয়া নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সাধনা এই দেশে রপ্তানি করিবার সঙ্কল্প সবেমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। রাজকার্য্য ও ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে যে'সব ভারতবাসী ইংরেজের সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাচীন-পন্থী সমাজপতিরা এই শ্রেষ্ঠত্ব মন দিয়া গ্রহণ করিতে পারিতে-ছিলেন না, প্রাণ খুলিয়া অস্বীকার করিবার শক্তি ও সাহসও তাঁদের ছিল না। নিজেদের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে একটা

২১ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র

শ্রেষ্ঠত্বাভিমান তাঁদের মনে ছিল, কিন্তু সেই অভিমানের শক্তি এমন ছিল না যার প্রেরণায় তাঁরা ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারেন। ইঁহারা নিজেদের টোল মক্তবে প্রাচীন কথার ও প্রথার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া যাইতেছিলেন।

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এই তিন রাজধানীর ভারত-বর্ষীয় নেতৃবর্গ ইংরেজ শাসন ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া স্ব স্ব সমাজ কোন্ কোন্ কারণে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিল না তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ চিন্তা ও কর্ম্মের পরিচয় আমরা পাই রামমোহন রায়ের জীবনে। সেই যুগে তিনিই এই ভাব, চিন্তা ও কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া দেশে বিদেশে পরিচিত। সমাজ-জীবন নানা রোগে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল এই দুর্ব্বলতার জন্যই ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান মুষ্টিমেয় পরদেশীর নিকটে নতি স্বীকার করিল—এইরূপে রোগ নির্ণয় করিয়া তৎকালীন সমাজপতিরা সমাজ-জীবনের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। সকল দেশে, সকল সময়ে এইভাবেই সমাজ-জীবনের রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। এবং ধর্ম্ম সমাজ-জীবনকে ধারণ করিয়া আছে, সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এই বিশ্বাসে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার আন্দোলন নিদান ও চিকিৎসার প্রধান ও প্রথম চেষ্টারূপে দেখা দেয়। প্রাচীন সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে কারণ প্রাচীন ধর্ম্ম দুর্ব্বল ও অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ-জীবনের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে ধর্ম্মকে ও ধর্ম্মের অনুশাসিত আচার-আচরণের সংস্কার সাধন করিতে হইবে। যে কোন দেশ বা সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ সংস্কার-প্রচেষ্টার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে জৈন ও বৌদ্ধ আন্দোলন নামে পরিচিত সংস্কার চেষ্টা, ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের সংস্কার চেষ্টা, এইরূপ একটা প্রয়োজনেই আরম্ভ হইয়াছিল। আরব-জীবনে ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যে চিন্তা ও কর্ম্মের ধারার রুদ্ধ-স্রোত মুক্ত করিয়া দেন, তার মধ্যেও এই প্রয়োজনের প্রেরণা দেখিতে পাই। মধ্য যুগে ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মের অসম্পূর্ণ-তার বিরুদ্ধে লুথার, জুইংলি প্রভৃতির বিরাট প্রতিবাদ ও আন্দো-লনের মর্ম্মস্থলে আমরা এইরূপ একটা প্রয়োজনের সাক্ষাৎ পাই। সমাজ-জীবনের চিকিৎসার প্রথম প্রক্রিয়ারূপে প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিচার বিতণ্ডা দেখা দেয়।

পূর্ব্বে ভারতে রামমোহন রায় ও পশ্চিম ভারতে দাডোবা পাণ্ডুরঙ্গ, এই দুইজন চিকিৎসকের আবির্ভাব এক সময়েই হইয়াছিল। দুই জনেই হিন্দু সমাজ-জীবনের সংস্কার সম্বন্ধে নানা প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন, যে চেষ্টা আজিও চলি-তেছে। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা ও অনুসন্ধানের ফলে রামমোহন রায় একটি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয় নাই। "Excess of civilisation"—অত্যন্ত সভ্য হইয়াই হিন্দু তাহার স্বাধীনতা হারাইয়াছে, এই তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা রামমোহন রায় করেন নাই; তাঁর জীবন-চরিত লেখকেরাও তাহা করেন নাই। সমাজের চিন্তাধারা কর্ম্ম-স্রোতের গতি-পথের পরি-বর্ত্তন প্রয়োজন, স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে ইংরেজের মতন, ইংরেজ হইতে অধিক শক্তিশালী হইতে হইবে—এই প্রেরণা একশত বৎসর পূর্ব্বে দেখা দিয়াছিল। আজিও সেই প্রেরণার তাড়নায় আমরা চলিতেছি। কোন্ পরিবর্ত্তন করিলে জাতীয়-জীবন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে, ইংরেজের মতন, ইংরেজের অপেক্ষা বেশী শক্তিলাভ করিবে, এই বিষয়ে মতভেদ আছে বলিয়া দেশে

এত দল, এত ⋯ত প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে! ইংরেজ শাসনকর্ত্তা, ইংরেজ পাদ্রী একভাবে আমাদের গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই শিক্ষার ছাঁচে পড়িয়া আমরা এক রূপ নিতেছি। আমাদের পূর্ব্বগামী দুই তিন পুরুষ এই ছাঁচের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। যে যুগে এই

সারদা দেবী (কেশবচন্দ্রের মাতা)

শিক্ষার ছাঁচের প্রবর্ত্তন হয়, সেই যুগে এই বাঙলা দেশে কয়েকজন লোক জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা আমাদের সমাজের চিন্তা ও কর্ম্ম নূতন ছাঁচে ফেলিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার কথা তুলিয়াছিলেন। ইংরেজ প্রবর্ত্তিত ছাঁচটি অদল-বদল করিবার কথা, এই দুঃসাহসের কথা, উচ্চারণ করিবার সাহস ইঁহাদের ছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, দয়ানন্দ সরস্বতী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রায় এক সময়েই এই কর্ম্মভূমিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

বিদেশী ও স্বদেশী ভাবের যে বিরোধের সূচনা হয় এই সময়ে, পরমহংসদেবের জীবনের সাধনার মধ্যে তার কোন উত্তাপের দাহ আমরা দেখিতে পাই না। বিশ্ব-রহস্যের মধ্যে বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের যে সমন্বয় আমরা দেখিতে পাই পরমহংস-দেব সাধন-জীবনে তারই অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন, তাঁর কথায় ও আচরণে আমরা এই চেষ্টারই পরিচয় পাই। আত্মা-নাত্মার বিবেকের কথা তিনি আমাদের শুনাইয়াছেন। কিন্তু স্ব-সমাজ ও পর-সমাজের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ বিদ্যমান, এবং ভারতবর্ষ যে বিরোধের রণক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে, ইহার পরিচয় আমরা রামকৃষ্ণদেবের জীবনে পাই না। আপনি শুদ্ধ হইয়া, মুক্ত হইয়া সমাজকে, বিশ্ব-জগতকে শুদ্ধ, মুক্ত কর এই শিক্ষা পাই তাঁহার কাছে।

অপর যে তিনজনের নাম করিলাম তাঁরা সকলেই এই বিরোধ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এই বিরোধ জাগাইয়া রাখিবার জন্য, এই বিরোধের সমাধানের জন্য চিন্তা-জগতে আলোড়ন তুলিয়াছিলেন, নূতন মানুষ গড়িয়া, নূতন করিয়া সমাজ গঠন করিয়া, এই বিরোধে জয়লাভ করিবার জন্য নানা উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। ইংরেজ শাসনকর্ত্তা সমাজের সংস্কারের কথা কহিয়াছেন; ইঁহারাও সমাজের সংস্কারের কথা কহিয়াছেন। ইংরেজ শাসনকর্ত্তা কহিয়াছেন, সমাজ সংস্কার করিয়া শক্তি লাভ কর, স্বাধীনতা তোমাদের লাভ হইবে; ইঁহারাও সেই কথা শুনাইয়াছেন। ইংরেজ আমাদের যে ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, ইঁহারা সেই ছাঁচ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন একটা ছাঁচের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সেই ভাঙ্গা-গড়ার কাজ আজও চলিতেছে। বিবেকানন্দ সেই কাজই করিয়া-ছেন; গান্ধীজীও তাহাই করিতেছেন।

কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষে নূতন সমাজ-ব্যবস্থাপক ও শিক্ষক-রূপে পরিচিত হইতে পারেন। রামমোহন রায় যে ভবিষ্য সমাজের কল্পনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কল্পলোক হইতে নামাইয়া দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সমাজ—"Young Bengal", "Young Bombay"—নূতন শিক্ষাদীক্ষার কৃপায় দেশের সংস্কারসমূহ পদদলিত করিয়া চলিতেছিলেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া তাঁহারা এক অদ্ভুত ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। না ইংরেজ, না ভারতবাসী—এই দুই অবস্থার মধ্যে তাঁহারা যেন ঝুলিয়া ছিলেন। ইংরেজের আচার-আচরণ নিজেদের জীবনে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা দেশের লোকের জীবনযাত্রা হইতে নিজেদের দূরে নিয়া গেলেন। আবার দেশের সভ্যতা সাধনার মধ্যে সভ্য ও ভদ্র জীবনের এমন সব পরিচয় লাভ করিলেন যে, তাহা দূরে নিক্ষেপ করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল। এই অবস্থার প্রতীকরূপে মাইকেল মধু-

দেওয়ান রামকমল সেন (কেশবচন্দ্রের পিতামহ)

সূদন দত্তকে গ্রহণ করা যায়। নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে ভারতবর্ষের যে ভবিষ্য জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছিল, তার অগ্রদূতরূপে আমরা দেখিতে পাই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুয়ের মধ্যে সেতুরূপে দাঁড়াইয়া আছেন। নূতনের প্রয়োজন তিনি অস্বীকার করেন নাই; প্রাচীনের প্রেরণা তিনি নূতনের প্রতিষ্ঠায় আনিয়া-ছিলেন। মুসলিম সাধনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। খৃষ্টীয়

সাধনার পরিচয়ের মধ্যে শাসক-সম্প্রদায়ের অহমিকার প্রমাণ সুস্পষ্ট দেখা দিয়া ইহার উপর লোকের মনে একটা বিরাগের সৃষ্টি করিতেছিল। মহর্ষি সেইজন্য একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের দুয়ারে ধর্ণা দিতে পারিলেন না। উপনিষদের মধ্যে তার স্বপক্ষের যুক্তি-প্রমাণ খুঁজিতে লাগিলেন ও তাহা খুঁজিয়া পাইলেন। এবং এই প্রমাণ এবং অভিজ্ঞতার উপরে ব্রাহ্ম সমাজের রীতি-নীতি আচার-আচরণের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

তাঁহার সাধনার প্রথম জীবনে কেশবচন্দ্র এই পরিবেষ্টনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। তবুও অনেক সময় মনে হয় যেন তিনি খৃষ্টীয় মতবাদ ও অনুশীলন তত্ত্বের মধ্যেই নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সমস্যাসমূহের উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং খৃষ্টীয় সাধক সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাহা খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম জগতের মণিকোঠায় ভারতবর্ষ যে অমূল্য সম্পদ রক্ষা করিয়া গিয়াছিল, তার সন্ধান সেই যুগের শিক্ষিত ভারতবাসী করিতে পারেন নাই; তাহা লাভ করিতে হইলে যে দুশ্চর তপস্যার প্রয়োজন, তাহা করিবার সাহস ও শক্তি আমাদের মধ্যে ছিল না; আজিও নাই। পরমহংসদেবের জীবনে সেই অনন্যসাধারণ সাধনার পরিচয় বর্ত্তমান জগৎ দেখিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাদীক্ষা সেই সাধনার পরিপোষক নয়। কেশবচন্দ্রের জীবনে ভগবৎ সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা, সেই পথে সুচালিত হইবার জন্য প্রবল আগ্রহ ও তার জন্য প্রার্থনা, নিজের ব্যক্তিত্ববোধ ধ্বংস করিয়া, নিজের কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া শিশুর মতন জগৎ-পিতা জগৎ-মাতার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা—এই সমস্তই কেশবচন্দ্রের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। এই চেষ্টায় তিনি যতদূর সাফল্যলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই পরিমাণে তিনি মহর্ষির বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এবং মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় সমাজের আদর্শ হইতে মুক্ত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা তাঁহার কথায় ও কাজের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

পরাধীন দেশে জাতি-বৈরতা দেশের মনের ও কাজের শান্তি নষ্ট করে। শাসক সম্প্রদায়ের দম্ভ ও বিজিত জাতির অপমানবোধ, এই দুই ভাবের জমিনে এই বিরোধভাব গজাইয়া উঠে। শাসক সম্প্রদায় শাসনযন্ত্রের পেষণের নীচে এই বিরোধভাব দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। বিজিত জাতির নেতৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ এই বিরোধভাব দেশের মনে জাগাইয়া রাখেন,—দেশের মধ্যে বিস্তার করিয়া দেন; কেহ কেহ ইহাকে সংযত করিয়া দেশের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে সংগঠনের খাদে বহাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্র শেষোক্ত পর্য্যায়ের সমাজনেতা। নিজের জীবনে ও নিজের সময়ে তিনি দেশী ও বিদেশী দুই শক্তির উন্মুক্ত সংগ্রামের কল্পনা করেন নাই। সমাজ-জীবনকে নীরোগ করিয়া, সমাজ-জীবনকে শক্তিমান করিয়া দিবার জন্য যে চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহা প্রবর্ত্তিত করিবার চিকিৎসকরূপে কেশবচন্দ্রকে বুঝিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের দেশে যে-সব ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই এই পর্যায়ে ফেলা যায়। যাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়াছেন, বিরোধের মধ্যে, সংগ্রামের মধ্যে জাতিকে ফেলিয়া দিয়া জাতির নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ব্যায়ামশালার, রণক্ষেত্রের কসরতের সাহায্যে জাতিকে রোগমুক্ত ও সবল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহাদের মত ও পথ ভিন্ন হইলেও, উভয় শ্রেণীর সমাজনেতাই এক উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণপাত করিয়াছিলেন। সাধন-জীবনের, হিন্দু সাধন-জীবনের ভাষা ব্যবহার করিলে বলিতে হয়, কেহ বৈষ্ণব, কেহ তান্ত্রিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দেশের মনের উপরে যে কৃষিকার্য্য চলিতেছিল, এবং এই কর্ষিত জমিতে দেশী-বিদেশী বীজ রোপণ করিয়া যে নূতন ফসল পাইবার আশায় তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায় নানা চেষ্টা করিয়া যাইতেছিলেন, সেই কার্য্যে কেশবচন্দ্র ছিলেন একজন অগ্রণী। আজিও সেই চেষ্টা চলিতেছে; আজিও দেশী-বিদেশী বীজের সংমিশ্রণে উন্নততর ফসলের আশায় সমাজনেতৃবর্গ পরিশ্রম করিতেছেন। সেই যুগে যে বীজ বপন করা হইয়াছিল এবং যে ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে দেশের লোকের শরীর-মনের অভাব সম্পূর্ণরূপে মিটে নাই। আজিও যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে এই ক্ষুধা ও প্রয়োজন মিটিবে, তার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। মনে হয়—মানুষের আকাঙ্ক্ষা মিটিবার নয়, কখনও মিটে না। সেইজন্য মানুষ চির-অসন্তুষ্ট। এবং এই অসন্তুষ্টির প্রেরণায় মানুষ যুগে যুগে নূতন নূতন সৃষ্টির সঙ্কল্প গ্রহণ করে, নূতন নূতন সৃষ্টির কল্পনায় নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখ বরণ করিয়া নেয়। ফল ও অফলের আকাঙ্ক্ষাবিরহিত হইয়া যাহারা এই নূতন নূতন সৃষ্টি-কার্য্যে নিজেদের দেহ-মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন, তাঁহারা নরকুলে ধন্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এইরূপে সৃষ্টির কার্য্যে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার সমসাময়িক ভাবপ্রবর্ত্তক ও লোকসংগঠক ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী, সৈয়দ আহাম্মদ, বঙ্কিমচন্দ্র, মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুনকার। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠে" যে "চিকিৎসকের" আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহার নির্দ্দেশে সত্যানন্দ চলিয়াছিলেন, সেইরূপ কেশবপ্রমুখ চিকিৎসকগণ দেশের দেহ-মনের নানা ব্যাধির নিদান ও ঔষধ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবস্থায় দেশের স্বাস্থ্য নানাদিকে ফিরিয়া আসিয়াছে। অব্যবস্থায় বা কুব্যবস্থায় কোন কোন দিকে স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে কি-না, তাহা বিচার করিবার সময় হয়ত এখনও আসে নাই। দেশ নষ্টস্বাস্থ্য ও নষ্টশক্তি লাভ করিয়া আপনার "স্ব"-তে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে তখন এই বিচার করা যাইতে পারে। তৎপূর্ব্বে যাঁহারা দেশের অস্বাস্থ্যে আকুল হইয়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য নিজেদের নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য। তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের কর্ম্মে প্রেরণা দিবে। এবং বর্ত্তমান যুগের সমস্যা সমাধানকল্পে আমরা যদি তাঁহাদের মত আত্মভোলা মন নিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তবেই তাঁহাদের স্মৃতির যথার্থ সম্মান করা হইবে।

(শেষাংশ ১৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সোনালী আলেয়া

(গল্প—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

তাহাদের প্রথম সাক্ষাতে এমন কিছুই ছিল না যাহাকে অনুরাগে ঊষার উদয় বলিতে পারা যায়।

পুরীর সমুদ্রের ধারের বাড়ী একখানি তাহারা অধিকার করিয়াছে। একবার মিসিস দেবের সঙ্গে মেয়েরা বাহির হয় বিকালে, তারপর দুটিতে তিনটিতে মিলিয়া ছড়াইয়া পড়ে সাগরতীরের এখানে ওখানে।

হাসি আর দীপা বালির উপরে স্যাণ্ডেলের রেখায় নানান্ বিকট মূর্ত্তি আঁকিয়া আঁকিয়া হায়রান্ হইয়া পড়ে। দীপা ছুটিয়া যায় অন্যদের দলে মিশিতে। হাসি ধপ করিয়া বসিয়া পড়ে বালির উপর।

মেয়েদের অসংযত কলহাস্য ভাসিয়া আসে হাসির কানে, কিন্তু হাসি ডুবিয়া থাকে গিরিডির বাগানের সেই শরৎ রাতের সোনালী মায়া নূতন ভাবে ধ্যান-ধারণা করিতে।

তাহার সম্মুখে প্রসারিত অনন্ত জলধির নীল স্বপনের লীলাখেলা হাসির চোখ দুটিকে বন্দী করিয়া রাখে। সারা বিশ্ব তাহার দৃষ্টি হইতে উবিয়া যায়।

কোথা হইতে যেন সুমধুর এক পুরুষ কণ্ঠ তাহার মনোবীণায় শত ঝঙ্কার তোলে—হাসি দুচোখ মেলিয়া ধরে সুমধুর ঝঙ্কারের মালিক তরুণটির মুখের উপর।

—"ক্ষমা করবেন, আমি যদি এখানে বসি আপনার আপত্তি হবে কি?"

হাসির কৌতূহল দৃষ্টি স্তব্ধ হইয়া থাকে। অপরিসীম সুন্দর-দেহ, তরুণের আয়ত নয়ন—বীরত্ব-ব্যঞ্জক নাসিকা—তাহার অপরূপ কাঁচা সোনার মত রং! এমন মনমাতান রূপ ত হাসি কাহারও দেখে নাই আগে।

—না, আপত্তি নেই। ও জায়গাটার মালিক অবশ্য আমি নই, আর কেউ। আর আমার আপত্তি থাকলেও আপনার বসবার বাধা হত না।

হাসিতে হাসিতে বলিয়া ফেলিল, প্রথমত এই কারণে যে, তাহার মনে হইতেছিল রূপকথার রাজপুত্র জীয়নকাঠির স্পর্শে রাজকন্যাকে সজীব করিয়া তুলিতে আসিয়াছে; দ্বিতীয়ত এইজন্য যে আগন্তুকের আকার-আকৃতি ও কথা বলার ভঙ্গিটি নিঃসন্দেহে তাহার নিকট লাগিয়াছে ভাল এবং এই কারণেই রহস্যময় অর্দ্ধহাসিতে মুখখানি ভরিয়া রাখিল।

—"আপনাকে বিরক্ত করলাম, মাফ করবেন।" তরুণ স্বাভাবিক মনভুলান সুরেই বলিয়া চলিল—"এখনও যেজায় রোদ, এ জায়গাটুকুতেই যা হোক তবু একটু ছায়া।"

তরুণের মুখের চোখ দুটির উজ্জ্বল যাদু হাসি নির্লিপ্ত-ভাবেই লক্ষ্য করিল দৃষ্টির বিনিময়ে এবং দীপার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ার সৌভাগ্যকে মনে-প্রাণে বরণ করিয়া লইল।

ব্যস্ততাহীন সহজভাবেই তরুণ হাসির পাশে বসিয়া পড়িল—তরুণের মার্জ্জিত রুচি ও হাবভাব এমনই সুন্দর যে ঔদ্ধত্যের লেশও কোথাও খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে না, বরং বিনয়ের অবতার বলিয়া আধুনিক এই তরুণকে তারিফ করিতে হয়।

—সাগরতীরের যাদুপরশে আপনার গায়ের রঙ্ দেখে হিংসে হয়।

—আপনি বুঝি আয়নায় মুখ দেখেন না.

দশ মিনিটের ভিতর তাহারা সকল সঙ্কোচ—সকল আড়ষ্টতা বর্জ্জন করিল। কতকালের পরিচিত বন্ধুর মতই প্রগল্ভতার সহিত কথা কহিয়া চলিল। তরুণের নাম, হাসি শুনিল,—বরেন মজুমদার, আগের দিন সন্ধ্যা বেলা পুরীতে পৌঁছিয়াছে।

—আমি উইক-এণ্ড টিকিট করে এসেছি, আমি আর আমার বোন বিজুলী। আজ, কাল, পরশুই চলে যাব। তোমরা অনেক দিন এসেছ, না?

'তোমরা' সম্বোধন এমন খাপ খাওয়াইয়া উচ্চারিত হইল যে হাসির সর্ব্বশরীরে এক তড়িত স্রোত শিহরণ তুলিল। রুদ্ধকণ্ঠকে অতি কষ্টে স্ফুরিত করিয়া সে বলিল—৭।৮ দিন হল এসেছি আমরা।

তারপর হাসির নিজের কাছেই বিস্ময় লাগে কোন সময়ে সেও যেন 'তুমি' বলিতে সুরু করিয়া দিয়াছে, আরও বিস্ময় লাগে যখন নিজের অজানিতেই সে দীপার কথা পাড়িয়া বসে এবং যে তিনটি মেয়ে চড়ুইভাতি করিতে ঐ সেদিকে গিয়াছে তাহাদের ইতিবৃত্তও বলিয়া ফেলে।

—"এ হলে ত, তুমিও দেখছি এ বেলার জন্যে আলেক্-জাণ্ডার সেলকার্ক।" তরুণ বলিতে থাকে বালির উপর পায়ের আঙুল দিয়া 'হ' অক্ষরটি লিখিতে লিখিতে।—"যদি কিছু মনে না কর একটা কথা বলি. সঙ্গী-সাথীহীন দুটি নিরালা প্রাণী আমি আর বিজুলীর উপর দয়া করে যদি আমাদের ওখানে এসে চা-খাও। হোটেলে দুখানা ঘর নিয়ে আছি আমরা। কথা কইবার ফোসর না পেয়ে দমবন্ধ হয় আর কি আমাদের। এই দশা।"

হাসি ইতস্ততঃ করিল এক নিমেষের তরে। আজকাল আর কি লোকে ফরম্যালিটি মেনে চেলে অন্ধের মত। পরিচয়—দশ বছরেও ইহার চেয়ে বেশী কি হইতে পারে শুনি? বিশেষ করিয়া পুরীর সাগরতীরে এটিকেটের বজ্র আঁটুনী কোন দিনই থাকিতে পারে না।

তরুণ ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলে—আমি জানি অজানা অচেনা হয়ে তোমায় আমন্ত্রণ করে হকচকিয়ে দিয়েছি, যদি বিশেষ আপত্তি থাকে, তবে না হয়—

—" না না, আমি খুশী হব যেতে পেলে।" হাসি উচ্চস্বরে প্রতিবাদ করে যেন—"আর ধন্যবাদ, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন।"

—কত যে সুখী হলাম, কি বলব। আমরা হোটেলেও ঢুক্‌ব না— লম্বা বারান্দায় চায়ের টেবিল পাতা আছে। চল।

হোটেলের কক্ষ দুটির সাজসজ্জা দেখিয়া হাসি একেবারে স্তম্ভিত। কি সব দামী দামী আসবাব। সিল্কের পর্দা। বাসন-কোসন—সব রূপোর। কিন্তু বিজলী কই?

বরেন মজুমদার যেন হাসির মনের কথা বুঝিয়া লইয়াছে, সে বয়কে জিজ্ঞাসা করিল—মিসি বাবা কোথা?

বয় বলিল—বাহার গিয়া। দের হোগা লোট্‌নেমে।

তা হলে আর ওর জন্যে অপেক্ষা করে ফল নেই কিছু। বয়, আমাদের খাবার দাও। বলিল বরেন যেন বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল ভগ্নীর বেয়াড়া অনুপস্থিতিতে।

হাসি যেদিকে তাকায় দুচোখ জুড়াইয়া যায়। যেমন সুরুচিপূর্ণ সব জিনিষ, তেমনই অপূর্ব্ব নিপুণতায় গুছান। রমণীয় সজ্জা—সবার চেয়ে সৌজন্যপূর্ণ প্রতিটি চলন-ভঙ্গী এই সকল সাজ-সজ্জার যে মালিক, তাহার।

হাসি প্রশংসমান দৃষ্টি মেলে ধরে—যেন প্লাকার্ডের বিজ্ঞাপনের মত মুখর সে ছাপ তার চোখে—যাহার অর্থ সম্বন্ধে কেহ ভুল করিবে না, তেমন আনাড়ীও না। বরেনের নজরে তাহা অবশ্য এড়াইয়া যায় না।

চা পান সুরু হয়। জ্যাম-মাখন রুটি নয়—এ যে রাজ-ভোগ, সব ডিশের নামও হাসি জানে না। প্রথমটা নীরবেই চা-পর্ব্ব চলিতে থাকে। দ্বিগুণ আকর্ষণের সহিত হাসি বরেন-দার নূতন ব্যক্তিত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হয়। নিশ্চয়ই বরেন-দা সুপুরুষ—শ্রদ্ধার যোগ্য—ভালবাসার......না, এত বড়লোক যে, সে কেন হাসির মত গরীবদের মেয়ের দিকে অনুকম্পা ভিন্ন অন্য কিছু প্রদর্শন করিবে।

পরিষ্কার আভিজাত্যপূর্ণ পরিপাটি-চা-ভোজের পর নিজের অকিঞ্চিৎকরতাই হাসির চোখে ফুটিয়া উঠে বেশী। তথাপি অন্তরের অন্তরে হাসি কিন্তু তাহার প্রণয়ীর এমনই একটি বিশিষ্ট আবহাওয়া কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে, বিশেষ করিয়া সেদিন সিনেমায় নায়কের সৌখীন বিলাস দেখিয়া আসা অবধি।

সমস্ত দালান ও কক্ষ এমনই একটা আভিজাত্য-সুরের রেশে ঢাকা—আর ইহারই মদিরতা হাসির অন্তরে বাহিরে যেন সোনালী প্রলেপ মাখাইয়া দিল।

"হাসি, তুমি দেবীর মত এ নিরালা হতভাগ্যের একটি দিন উজ্জ্বল করে দিলে। বাকি জীবনের পাথেয়র পক্ষে এ যথেষ্ট। শুধু একটি অনুরোধ, বিজলীটা কোথা গেল, চল না আমরা 'কার'-এ একটু বেড়িয়ে আসি। 'কার' আমরা সঙ্গেই এনেছি কলকাতা থেকে।"

হাসির তাক্ লাগিয়া যায়। তাহা হইলে কত বড় ধনী বরেন-দা, ইস্! সে বলিবে কি? বিস্ময়ের পর বিস্ময় তাহাকে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছে।

বরেন আবার বলে,—মোটর কার-এ একা একা বেড়ান একেবারে সাজা-ই বলতে হয়। যখন দয়া করে তুমি এলে চল না। নইলে আমি একা, একা কখন বেড়ান যায় না, কি বল?

—আমারও মনে হয়, একা বেড়ান কিছু নয়, ফাঁকিটাই খাটি। সরলভাবে জবাব দেয় হাসি, আর সে কুণ্ঠা করিবে কেন এমন বরেন-দার কাছে।

—আমায় রক্ষা করেছ হাসি। সমস্ত বিকেলটা একলা —ওঃ বাপ্‌রে!

—সে কি! আমি ত' ভাবি, এমন সজ্জিত কক্ষে কেউ নাকি আবার নিরালার ছোঁয়া পেতে পারে—কক্ষটাই যে একশ সাথী! আমাদের ও-বোর্ডিং হাউসটা যদি দেখতে!

তা হলে ত দেখছি ও-টায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থেকে দেখে আসতে হচ্ছে!

—তা বই কি! পা দিয়েই ঘেন্নায় নাক সিঁটকে ছুটে পালিয়ে আসবে নিশ্চয়!

—তবে তুমিও বুঝি ও-বাড়ীটাকে ঘেন্না কর?

—সত্যি কথা বলতে কি বরেন-দা, আমি ত এমন সোনা-রূপোয় মোড়া ঘরে বাস করে অভ্যস্ত নই। এই ধর না, আজ যা খেলাম, এর পরে রাতের খাবার ওখানে মুখেই রুচবে না।

বেশ ত, কার-এ একটা ট্রিপ দিয়ে ফিরে, এখানে খাওয়া সেরে একেবারে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসব'খন।

—না না, ঢের খেয়ে গেলাম, আর কত! দরকার নেই আর বরেন-দা।

-এই দেখ, আধঘণ্টায়ই তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ এখানে, আর বেশীক্ষণ থাকতে মন চাইছে না, তাই রাতের খাবার খেতেও নারাজ হচ্ছ। আর বলছ কিনা এ বাড়ীতে আবার নিরালা হয় কেমন করে? শোন লক্ষ্মীটি, ট্রিপ দেব, ঘুরে ষ্টেশন হয়ে আসব। সেখানে আইসক্রিম তখন বড্ড টাইমলি হবে। চট্ করে ফিরব। খাওয়া শেষ করব। সন্ধ্যা হতে হতে ঠিক বোর্ডিং-এ হাজির হব। ব্যস্, আর না বলতে পাবে না।

-বরেন-দা, তুমি অমন করে বল্‌লে আমি 'না' বলি কেমন করে। তোমার আইডিয়া সত্যি এডোরেব্‌ল্ (adorable) একেবারে চমৎকার!

—এডোরেব্‌ল্ আইডিয়া শুধু! কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ এ যে এডোরেব্‌ল্ হাসিরাণীর জন্যে! বলিয়াই বরেন হাসিয়া উঠিল এবং তাহার চোখে যে মায়াকাজল চক্‌মক্ করিয়া উঠিল, তাহার স্নিগ্ধতা হাসির নয়নযুগলে যুগ্ম পলক মুকুতার সৃজন করিল।

হাসির সোনালী স্বপ্ন বুঝি সফল হয়। এই বরেন-দার সংসার! কই কোথাও ত ইহার ত্রিসীমানায় নাই পিতার অশোভন খাদ্য-কৃপণতা, নাই মাতার হাড়ভাঙ্গা খাটাখাটুনী—কেমন কলের মসৃণতায় চলিয়া যাইতেছে! আহা কি সুন্দর! প্রতিটি কথা কি মধুর! প্রতি কার্য্য কি সময়োপযোগী—এমন করিয়াই বুঝি সংসারে রূপকথার রাজপুত্র বাস্তবতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। হাসির প্রাণ-মন ভরিয়া যায়—কল্পনা নয়—স্বপ্ন নয়—নিছক একটি বাঙালী পরিবার—আদর্শ পরিবার। যেমনটি লইয়া হাসি কল্পনার আলপনা দিয়াছে নিভৃতে—নিতান্তই নিজস্ব গোপনতায়, বিধাতার অদৃশ্য হস্ত যে তাহাই তাহার সম্মুখে সজীবতার আরোপে সার্থক করিয়া ধরিয়াছে বরেন মজুমদার-রূপে।

পরিপূর্ণ হৃদয়ে হাসি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে চারিদিকে -এ কি স্বপ্ন, না চলচ্চিত্র, না প্রকৃতই তাহার সৌভাগ্য অপার!

আবার বরেন-দার বড় বড় চোখদুটিতে সেই স্পন্দিত স্নিগ্ধতার ছোঁয়াচ লাগিল যখন সাঁঝের আমেজের সংগে সংগে হোটেলের সেই দালানে তাহাদের ডিনারের ব্যবস্থা হওয়ায় মুখোমুখী বসিল।

বরেনের লুব্ধ আঁখি নীরবে পান করিতেছিল হাসির অনাবিল তরুণী-সৌন্দর্যের পুঞ্জ। আর হাসি লক্ষ্য করিতেছিল বরেন-দার কুসুম-পেলব দৃষ্টি—যাহার স্নিগ্ধ মায়া হাসির প্রাণের বাতায়নে কুণ্ডলী পাকাইয়া বহিয়া আনিতেছিল শেফালী-ঝরা পদ্মে-গন্ধে ভরা শরৎ-প্রাতের শুচিশুভ্র রহস্যময় বারতা।

তুমি অবশ্য বোঝ আমি তোমায় কি ভাবে দেখ্‌ছি, বোঝ না হাসি?

কথাটার জবাব দিবার পরিবর্ত্তে হাসি তাকাইয়া থাকে ডিনারের বিচিত্র আয়োজনের দিকে একটা আবছা কৌতূহলের সহিত। হাঁ, সে জানে বই কি, বরেন তাহার বিষয়ে কি ভাবিতেছে, কিভাবে তাহাকে দেখিতেছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার হইল, কি ভাবিতেছে সে (হাসি) বরেন-দার বিষয়ে।

সহসা হাসির মনে পড়ে বিজুলীর কথা। কি যেন যাদু-মন্ত্রে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বরেনও ভগ্নীর কথা স্মরণ করে, কারণ হাসির উদ্যত প্রশ্নে বাধা দিয়া সে বলে—বিজুলীটা যে কি, সারা বিকেল হুটোপাটি করে কাটাল, তারপর কখন এসে দোরে খিল এঁটে শুয়ে পড়েছে। এমন সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করতেও সে একবার উঠে এল না শত ডাকাডাকিতে। কি যে পাগলাটে স্বভাব!

—তার জন্যে কি! আপশোষ কর না, বরেন-দা, সে হয়ত দারুণ হায়রান হয়ে গেছে। এখন ত পরিচয় হ'ল—কাল এসে না হয় ওকে পাকড়াও করা যাবে আর আজকের শোধ ভাল করে নেওয়া যাবে। মাঝে মাঝে আমারও এমনি হয় যখন মাথা ধরে, তখন হাজার চাবুক মারলেও আমি মাথা তুলতে পারিনে। সে জন্যে দুঃখু করবার কিছু নেই, আমি বল্‌ছি।

হাসি আজ দিলদরিয়া, চারিদিক তাহার রঙীন। সে কি ত্রুটি গ্রহণ করিতে পারে এমন সামান্য ব্যাপারে!

হাসি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে—হাঁ, এই হইল প্রেম, আসল অনাবিল অমল ধবল স্বর্গীয় জ্যোতি—যাহা এতকাল শুধু তাহার স্বপ্নকে রূপায়িত করিয়াই বিরাজ করিয়াছে। এই অম্লান শিখা—যাহার বিলোল জিহ্বা লক্‌লক্‌ করিয়া যেন তাহার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করিতে চাহে, তেমন বিশ্বগ্রাসী তৃষা না হইলে প্রেম কি সার্থক বা পরিপূর্ণ হইতে পারে! নহিলে বিকাশ, বিকাশের প্রতি তাহার যে মলিন নীহারিকা-প্রভার ছায়া-ঢাকা আবছা জেল্লা—তাহাকে প্রেম বলিবে কে—ও নামের যোগ্যই নয় কোনদিন।

—'তুমি বুঝতে পেরেছ, কেমন হাসি?' আবার বলে বরেন।

—'হাঁ, বরেন-দা আমি বুঝেছি।' অস্ফুটস্বরে হাসি উত্তর দেয়। বেশী কথা বলিয়া এই পরম মুহূর্ত্তটি সে ব্যর্থ করিবে কেন। বিদায়ের সময় ত আসন্ন।

—'আর, আর, আমাকে তোমার ভাল লাগে—নেহাৎ এতটুকুও—নয় কি?' বরেন যেন আবদার করে।

—তা ত তুমি জান বরেন-দা, ইউ ডার্‌লিং।

হাসি বিস্মিত হয় কেমন করিয়া সে 'ডার্‌লিং' বলিয়া ফেলিল—তবুও সে এক পলকের জন্যও দুঃখিত হয় না, কুণ্ঠিত হয় না অশোভন কিছু বলিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া। এমন সময় পার্শ্বের এক কক্ষে গ্রামোফোনের গান বাজিয়া উঠিল—

"ভাল যদি বাস হে সখা
দূরে থেক সরে সরে
দিও না দেখা।"

হাসির মন তিক্ততায় ভরিয়া উঠে এই গানে। কে যেন তাহার কানে কানে বলে—"Love laughs at time and space" (স্থান-কালের ব্যবধানকে প্রেম উপেক্ষা করে)। এই সুযোগে সে একবার আজকার বিকালের অভিযানের প্রতিটি ধাপ চুলচেরা হিসাব করিয়া দেখে।—

কি সুখেই না কাটিয়া গেল সমগ্র দিনশেষ আজ বরেন-দার প্রতিভার আলোকে। সেই যে সর্ব্বপ্রথম বিনয় মধুর সম্ভাষণ —"ক্ষমা করবেন, এখানে বসলে কি আপনার আপত্তি হবে?"—সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতে বরেন-দার মুখে একটিও বেসুরো তান —বেমিল সুর শোনে নাই হাসি বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।

সবুজ আর রূপালী লুকোচুরি-শোভিত মোটরে অভিযান ত দস্তুরমত অনাবিল বিলাস হাসির কাছে। অবিমিশ্র এমন আনন্দ হাসি জীবনে পাইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। ক্ষিপ্র-গতি যানে ভ্রমণের যে শিহরিত-কৌতুক তাহা তাহার অজানাই থাকিয়া যাইত, যদি আজ বরেন-দার সাক্ষাৎ সে না পাইত।

সময়ে তাহারা ৫০ মাইল ঘণ্টায় বেগেও মোটর হাঁকাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু বরেন এমন ওস্তাদ ড্রাইভার যে, হাসির মুহূর্ত্তের জন্যও আশংকা হয় নাই যে দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। গাড়ীতে বসিয়াই তাহারা আইসক্রীম উপভোগ করিয়াছে—সে সময় হঠাৎ বরেন চামচে চামচে হাসির মুখে তুলিয়া দিয়াছে মাখনের মত কোমল ক্রিমকালার ঐ অপূর্ব্ব খাদ্যটি।

মোটর চালাইতে চালাইতে এক একবার বরেনের কনুই, বাহু হাসির স্কন্ধ স্পর্শ করিয়াছে। দুই-এক সময় পা-দ্বারা চাপিয়া গ্যাস্ দিবার অবকাশে বরেনের পা-ও হাসির স্যাণ্ডল সহ পদের সহিত মিলিত হইয়াছে। সে যেন নিতান্তই আকস্মিক।

কিন্তু ইহাতেই প্রতিবার হাসির পা হইতে বিদ্যুত-প্রবাহ ছুটিয়া তাহার সর্ব্বাংগে রোমাঞ্চ বিস্তার করিয়াছে।

বরেন অনুনয় করিয়াছে—"তোমার কথা—সব আমায় বলনা হাসি!"

হাসি বলিয়াছে, বাড়ীর কথা, ভাইটির কথা, খুশীর কথা। তাহাদের সংসারের নিষ্করুণ দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রামের ব্যর্থতা —হাসির নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশেষ করিয়া বিলাসিতার প্রতি তাহার প্রাণের টানের আকুলতা—কোন কথাই সে বাদ দেয় নাই। তাহার কলেজ-বান্ধবী দীপা অণুর কথা সে বলিয়াছে কৌতুকের পরশে, বলে নাই শুধু প্রতিবেশীদের কথা—বিকাশ-দার কথা, বিবাহ-প্রস্তাবের সম্ভাবনার কথা।

যে কোন প্রকারেই হোক, বিকাশ-দার প্রতিকৃতি যে এই আভিজাত্য-লোলুপতার ভিতর প্রবেশ করিবার যোগ্য নয়, ইহা যেন শত-চিন্তিত সমাধানের মতই ধ্রুব সত্য বলিয়া হাসির চিত্ত-মুকুরে আজ প্রতিফলিত। শুধু তাহাই নয়, আজিকার উল্লসিত ব্যস্ততার মাপকাঠিতে বিকাশ-দা অপ্রয়োজনীয় নয় কেবল—মিথ্যার নামান্তরও। বিকাশ—স্বপ্ন-সফলতায় একটা কালো যবনিকা; বিকাশ—ভুল; অনভিজ্ঞ সবুজ প্রাণের প্রথম ভ্রান্তি। তাহার স্বপ্নের রাজপুত্র সম্বন্ধে বিশ্বাস ও নির্ভরতার দোলায়মান অবস্থায় দ্বিধাগ্রস্ত অন্তরের অসার প্রলাপ মাত্র। অবিকৃত বিশ্বাসের পরিপূর্ণ বিকাশে—অকৃত্রিম রাজপুত্রের উদয়ে—সকল কৃত্রিমতাই যে উবিয়া যাইবে কর্পূরের মত ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

সংশয়াতীত নিশ্চিতভাবেই আজ বরেন প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে যে হাসির যতকিছু, বালিকোচিত উপহসিত খোশ-খেয়ালের কল্পলোক—সব কিছুই নিরর্থক স্বপ্ন নয়, বরং বাস্তব যে দৃঢ় ভিত্তি—তাহার উপরই প্রতিষ্ঠিত। হাসির সমগ্র স্মৃতি হইতে তবে আর বিকাশ বিদায় হইয়া যাইবে না কেন—যোগ্যতরের জন্য আসন শূন্য রাখিয়া।

পরে ফিরিবার পথে বরেন বলিয়াছে নিজের কথা। ভগ্নী জুলীর কথা। বাপ-মা তাহাদের মারা যায় এক বৎসরের ব্যবধানে। সে মাত্র দুই বৎসর আগেকার কথা। সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন এ্যাডভোকেট হইবার ব্যবস্থা করিতেছে।

কথায় কথায় সংক্ষেপেই নিজের বর্ণনা করিয়া ফেলিয়াছে—গর্ব্ব বা দাম্ভিকতা প্রকাশের জন্য নয়। বাঙলার ছয়টি শহরে তাহার প্রাসাদ রহিয়াছে, মোটর গাড়ী তিনখানা, কলিকাতায় একটি ফিল্‌ম্ কোম্পানী—আরও কত কি সব কথা হাসির মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই—বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—উত্তেজনার প্রাবল্য তাহাকে অসাড় করিয়া ফেলিয়াছিল।

সে সিমলা দার্জ্জিলিং-এর আমোদের কথাও বলিয়াছে—বসেরা হোটেলের বিবরণও সবিস্তার দিয়াছে—বিকাশের সঙ্গে সেইদিন সিনেমা দেখার পর আজ হাসি এ-সকলের বিচিত্রতা অন্ততঃ কিছু বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে।

"একদিন তোমায় আমি এ-সব দেখিয়ে আনব হাসি।" আড়ম্বরে বিকাশ বলিয়াছে।

সে-সকলের তাৎপর্য্যে আত্মহারা হইলেও হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ভাণ করিয়াছে।—"আমার মনে হয় না, আর কোনদিন আমাদের সাক্ষাৎ হবে বরেন-দা।"

—এমন নিষ্ঠুর কথা তুমি বল না। একবার যখন তোমার সন্ধান পেয়েছি, তখন আর তোমায় চোখের আড় করব না। তোমায় যে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি হাসি।

—সবে ত বলতে গেলে তোমায় আমার দশ মিনিটের পরিচয় বরেন-দা।

—"সময় দিয়ে কি ভালবাসা মাপ করতে হয়।" উত্তেজনার বলে রুক্ষস্বরেই বরেন বলিল, "এক মুহূর্ত্ত আগে হয়ত আমরা পরস্পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অজ্ঞ ছিলাম। তা হলে কি হয়? প্রাণের টানের কাছে আইন-কানুন, এটিকেট—সবই মিছে—সবই তুচ্ছ।"

হাসি মনে মনে ভাবে—কি আশ্চর্য্য, আমার আইডিয়ার সঙ্গে বরেন-দার মত সবই মিলে যায়। এমন না হলে......

ইতিমধ্যে মোটর পৌঁছিয়াছে হোটেলে। ডিনারে বসিয়াই বরেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তুমি অবশ্য বোঝ, আমি তোমায় কিভাবে দেখ্‌ছি! এবারে খাওয়াটা চট্‌পট্‌ই সারতে হবে। বোর্ডিং-এ তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসব।

বোর্ডিং হাউসের নামোল্লেখে সে তাহার হাতঘড়ি দেখিল—কি সর্ব্বনাশ বরেন দা, নটা বাজে যে! আর দেরী করা হবে না মিসিস দেবের এতক্ষণে বুঝি হিষ্টিরিয়া সুরু হয়ে গেছে তার ছাত্রীদের পাংকচুয়েলিটি নিয়ে সে খুব গর্ব্ব করে—আর সে ব্যাপারে সে কড়াও কম নয়।

হাসি আর দেরী করিতে পারে না—তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া বাথরুমে চলিয়া যায়। বরেন-দার কক্ষকয়টি এই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া গিয়াছে তাহার কাছে। শাদা ধবধবে একখানি তোয়ালে লইয়া মুখ মুছিতে মুছিতে হাসি বড় কক্ষটিতে প্রবেশ করে।

বরেন তখন আগাইয়া আসিয়া বলে,—"হাসিরাণী তুমি ও-বোর্ডিংটায় আবার ফিরে যাবে এ চিন্তাই আমায় শঙ্কিত করে। তুমি যেমন ঘৃণা কর ও বাড়ীটাকে, তোমার কাছে শুনে আমারও ঘৃণা হয়। কত সুন্দর হত তোমরাও যদি সবাই এ হোটেলে থাক্‌তে—কেমন ফুর্ত্তি হত তা হলে।"

—তা যখন সম্ভব হবার নয় ছাত্রীদের ১০ টাকা স্কলার-শিপের অঙ্ক দিয়ে, তখন যেতেই হবে। তবে যা বললে, ঘেন্না, শুধু কি ঘেন্না, গা রি-রি করে ও-আস্তাবলখানা গুদোমটায় ঢুকতে। তাছাড়া......

সহসা তাহার স্মরণপথে উদিত হয়—'বিকাশ-দা যে কাল সকালে এখানে আসছে'। সে চিঠিখানাও হাসির ব্লাউজের পকেটে রহিয়াছে। বিকাশ-দাকে বলিতে হইবে—বেচারী দশ টাকা প্রাইজের পানে আশান্বিত হৃদয়ে দৃষ্টি মেলিয়া রহিয়াছে—তাহার কাছে বলিতে হইবে বৈ কি বরেন-দার সকল কথা। অবশ্য সে-কথা বিকাশের নিকট মুখরোচক হইবে না। আহা গো-বেচারী! বরেন-দার সকল ইতিহাস শুনিয়া সে আঘাত পাইবে—বিশেষ করিয়া হাসির সকল স্বপ্নের আমেজে বিকাশ-দা হয়ত হতাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু উপায় নাই। বৃথা আঘাত হাসি কাহাকেও দিতে চাহে না। তাহার খুব সতর্ক হইতে হইবে—ক্রমে ক্রমে যতদূর সম্ভব আঘাত না দিয়া ব্যাপারটা পরিষ্কার—স্বচ্ছ করিয়া ধরিতে হইবে বিকাশের চোখের সম্মুখে।

চিন্তারত বিষণ্ণ হাসির হাতদুখানি আপন হাতে চাপিয়া ধরিয়া বরেন আবার বলে,—"এখনই যদি একটা ভূমিকম্প হয়ে বোর্ডিংটা ধ্বসে যেত—আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি ও কয়েদ-খানাটাকে। হাসি, হাসি আমার। আমি কেমন করে থাক্‌ব তুমি চলে গেলে? হাসি আমার।"

কি যেন এক নূতন রেশ নূতন রাগ ফুটিয়া উঠে বরেন-দার কণ্ঠস্বরে। এই প্রথম হাসির কানে বেসুরা তান্ ঠেকে

বরেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর। এ সুর ঠিক বরেনের আব-হাওয়ার সঙ্গে যেন খাপ খায় না। কান তাহার জ্বালা করিয়া উঠে।

সকল ক্ষুদ্রতা বুকে চাপিয়া ধারকরা হাসি-রেখা ওষ্ঠে ফুটাইয়া হাসি বলে,—গম্ভীর- উৎসাহহীন—নিষ্করুণ সে সুর —এখন তবে আসি বরেন-দা।......

—সত্য সত্যই কি তুমি যাবে চলে এই রাত্তিরেই ? যেতেই হবে তোমায় ? কিছুতেই কি এখানে থাকতে পার না..... এ হোটেলে একটা রাত......

—কি বরেন-দা!......

অপমানে লাল হইয়া ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত হাসি লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করে।

বরেন গ্রাহ্য করে না হাসির সন্ত্রস্ত ভয়-কম্পিত প্রতিবাদ-তিরস্কার। হাসির হাত দুইখানি আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরে।

—"আমরা দুইজনেই দুজনকে ভালবাসি", উত্তেজনায় বরেনের কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া যায়—"ভালবাসার কাছে আর সব কিছুই তুচ্ছ। তুমি আমার, আমি......"

হাসি হাত ছাড়াইবার জন্য শত চেষ্টা করিয়াও বিফল হইল, বরেনের হস্ত যেন লোহার কবজার মত তাহার কবজিতে আঁটিয়া বসিয়াছে। ঘামে তাহার ব্লাউজ ভিজিয়া গিয়াছে, কপাল বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা স্বেদবিন্দু গড়াইয়া পড়ে। হাসি আর তাকাইতে পারে না—এই বুঝি মূর্চ্ছা যায়—বরেনের দুই চোখে একটা বিষম বুভুক্ষিত আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে যেন। না, মূর্চ্ছা যাবে না কেন, বাঁচিতে হইবে, হাসি এখনও মৃত নহে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দুপ্‌দাপ্ পদশব্দ হাসির সৌভাগ্য আনয়ন করিল, যাহা শত চেষ্টায়ও হাসি আবাহন করিতে পারিতেছিল না।

ঠক্ ঠক্ ঠক্ লাঠির শব্দ। ঝন্ ঝন্ হাতকড়ির আওয়াজ। দ্রুত পদে তিনটি পাহারাওয়ালা দারোগা সহ আসিয়া বরেনের হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল।

কি নামে তোমাকে ডাকব জানি না—বরেন, না স্বদেশ-রঞ্জন, না টমাস গ্রাণ্ট—কোন্ নামে এখানে রাজপাট বসিয়েছ হে বাবু ছোকরা ?

বাস্ ! আর শুনিতে হাসি অপেক্ষা করিল না। নাথ-রুমের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া সে হোটেল ম্যানেজারের ঘরে যাইয়া জানাইল—বরেন মজুমদার হোটেলের ভাড়াটিয়া জমিদার-বাবুকে ভুলক্রমে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, পুলিশের ভুল বুঝিয়ে দাও।

হোটেল কেরাণী জানাইল, বরেন মজুমদার নামে কোনও লোক এ হোটেলে নাই। ভগ্নীসহ এক জমিদার আসিয়াছে, তাহার নাম স্বদেশরঞ্জন রায়।

হাসির মাথায় যেন আকাশ হইতে শতবজ্র একসঙ্গে ভাঙিয়া পড়িল। চারিদিক হইতে নিবিড় কালোমেঘ ছুটিয়া আসিয়া হাসিকে কুক্ষীগত করিল।

হাসিকে অবশ্য থানায় যাইতে হয় নাই, কিন্তু পাছে যাইতে হয় সেই আতঙ্কই হাসির হাড়-মাস যেন চুষিয়া খাইয়াছে। দুই চোখের কোলে গভীর কালিমা আঁকিয়া দিয়াছে। বিকাশ-দার সান্ত্বনায় সে কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে। হাসি তাকাইতে পারে না কাহারও দিকে।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার হাসিকে দুই-চার কথা জিজ্ঞাসা করিতে হাজির হইয়াছিল, কারণ বরেন ওরফে স্বদেশরঞ্জনের সহকারিণী ফেরার। কে সে সহকারিণী সে সম্বন্ধে সন্দেহের হাওয়া যে হাসির দিকে আদপেই বহিতেছিল না পুলিশ-মহলে, এমন নয়।

কিন্তু পুলিশের বোর্ডিং হাউসে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই থানা হইতে ত্বরিত সংবাদবাহক উপস্থিত হইল—ভুবনেশ্বরের ধর্ম্মশালায় বিজলী নাম্নী এক যুবতী একক অবস্থায় বমাল গ্রেপ্তার হইয়াছে। সে স্বদেশরঞ্জনের সঙ্গিনী বলিয়া বিবৃতি দিয়াছে। সবার চেয়ে আশ্চর্য্য বিষয়, কলিকাতার দুইটি প্রসিদ্ধ চুরির হীরা জহরৎ যুবতীর নিকট পাওয়া গিয়াছে।

পুলিশ বোর্ডিং হাউস হইতে বিদায় হইয়া যাইবার পর মুহূর্ত্তাবধি যখনই বিকাশ হাসির সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করে তখনই হাসির হিষ্টিরিয়ার ফিট সুরু হয়।

এই নিদারুণ বিপর্য্যয়ে হতবুদ্ধি হইয়া মিসিস্ দেব হাসির পিতামাতাকে টেলিগ্রাম করিয়া দিল পুরী আসিবার জন্য।

ফ্যাকাশে মুখ, অশ্রু-প্রবাহে স্ফীত রক্তচক্ষু হাসি নত-মস্তকে পিতামাতার সম্মুখে দাঁড়াইল। কেহই কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না।

মিঃ সরকার কন্যা ও পত্নীকে লইয়া সেই অবস্থায়ই রাস্তায় নামিলেন। বাহিরের মুক্ত বাতাসে যাইয়া তাঁহারা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

তখন।......

—"আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা ?" হাহাকার-স্পন্দিত প্রায় অস্ফুট স্বরে হাসি বুকে দুই হাত চাপিয়া বলিয়া ফেলিল।

—"আমি তোমায় বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি—কলকাতার বাড়ী" মিঃ সরকার জবাব দিলেন। এবং দ্রুত বোর্ডিং হাউস পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া চলিলেন। তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছেন না।

ছয় বৎসর পরের কথা।

বিকাশ আজকাল ২০০৲ টাকা বেতনের বড় কর্ম্মচারী।

যে-সব অবিশ্বাসী একবাক্যে বলিয়া থাকে শান্তির সংসার উপন্যাসে লেখা থাকে, বাস্তবে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাদের উচিত একবার বিকাশবাবুর অন্দরমহলে উঁকি মারিয়া আসা।

গেলেই তাহা হইলে তাহারা প্রথম সাক্ষাৎ পাইবে দুইটি [illegible] ছেলেমেয়ে—ফুলের পাপড়ির মত হাসিখুশি।

আর তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান জননী, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে

(শেষাংশ ১১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বামী-ক্রয়ের হুজুগ

ইউরোপে দেশ-দেশ হইতে ইহুদী-বিতাড়ন ও সম্প্রতি সুদেতেন অঞ্চল হইতে চেক-নির্ব্বাসনের ফলে গৃহহারা রমণীগণ একটি করিয়া বৃটিশ-স্বামী ক্রয়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ৫০০ হইতে ৫০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত মূল্য দিয়াও নির্ব্বাসিতা রমণীরা বৃটিশ-স্বামী ক্রয় করিতেছে। স্বামীর সহিত অধিকাংশক্ষেত্রেই চুক্তি হইতেছে যে, স্বামী পরিণীতার নিকট পত্নীত্ব দাবী করিতে পারিবে না, শুধু অর্থ-বিনিময়ে নামটির অধিকার দান করিবে। এই ব্যবস্থার প্রধান কারণ এই যে, কোনও অবিবাহিতা বা বিধবা বিদেশিনী ইংলণ্ডে একাকিনী পদার্পণ করিলেও পরিত্যক্ত দেশের শাসনতন্ত্রের আক্রোশ এড়াইতে পারে না—অন্য কোনও প্রকারে শাস্তির আমলে ফেলিতে না পারিলে নানাপ্রকার কল্পিত অপরাধ আরোপ করিয়া রমণীকে অমানুষিক উৎপীড়নের কবলে নিক্ষেপ করা হয়। এই হেতু ধনবতী রমণীরা ৫০০০ পাউণ্ড দ্বারা একটি ইংরেজ বর কিনিয়া লওয়া সর্ব্বপ্রকারেই লাভজনক মনে করিতেছে. বিশেষত এই সকল বর কখনও তাহাদের চুক্তি ভঙ্গ করে না। তবে এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অধিকাংশ গৃহহীনা রমণী ইংলণ্ডে আবাস স্থাপন করিতে যায় বলিয়াই **ইংরেজ স্বামী** ক্রয় করিবার হিড়িক পড়িয়াছে বেশী রকম।

ইংলণ্ডের অশিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট

গ্রেট ব্রিটেনে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫,০০০ ম্যাজিষ্ট্রেট ; ইহার ভিতর ৯০০০ টোরি, ৪০০০ লিবারেল এবং ২০০০ শ্রমিক দলের। ইহাদের আইনের জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, কারণ ইহাদের মনোনীত করা হয় রাজনীতিক আদর্শের খাতিরে। লর্ড চ্যান্সেলার ইহাদের নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু ইহাদের গুণাগুণের বিন্দুবিসর্গও জানেন না, তিনি মাত্র প্রতি কাউণ্টীর লর্ড লেফ্‌টানেণ্টের উপদেশ অনুসরণ করেন। লর্ড লেফ্‌টানেণ্টগণ আবার নিজ নিজ রাজনীতিক দলের নির্দ্দেশ ও অনুরোধক্রমে পদপ্রার্থীকে নিযুক্ত করেন।

কোনও কোনও ম্যাজিষ্ট্রেটের বাতিক থাকে কায়িক দণ্ড দানের। কেহ কেহ আবার থাকে পুলিশের একেবারে গোঁড়া সমর্থক উন্নতির দায়ে ভারতে যেমন অহরহ নজরে পড়ে। কাজেই ফল দাঁড়ায় এই যে, অনুরূপ অপরাধের জন্য বিভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট যে সাজা দেয় তাহাতে সাদৃশ্যের নামগন্ধও থাকিতে পারে না।

'আশা'-হীরকের নিরাশার দুর্নাম

'আশা'-হীরক (Hope Diamond) পরিধান করিতেন বলিয়া সেকালের রাণী মেরী এণ্টয়নেট দুর্দ্দশার চরমে পতিত হইয়াছিলেন—এই বিশ্বাস গ্রেট ব্রিটেনে আজও লুপ্ত হয় নাই। কারণ এই হতভাগ্য রাণীর পর যে রমণীই এই 'আশা'-হীরক ধারণ করিয়াছে, সেই ভয়ানক বিপদে পতিত হইয়া পরিশেষে ঘোর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে শোচনীয়ভাবেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। মে ইয়োহে নাম্নী এক যুবতী 'আশা'-হীরকের মালিক হয়। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় মে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করে এবং লর্ড ফ্রান্সিস হোপ-এর সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই বিবাহবন্ধনের হেতুই হোপ-ডায়মণ্ড (আশা-হীরক) তাহার লাভ হয়। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই হোপ-ডায়মণ্ডের অপয়া প্রভাবে তাহাকে রিক্ত, নিঃস্ব করিয়া ফেলে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক শহরে অশেষ দৈন্য-দুর্দ্দশায় মে'র প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। 'আশা'-হীরক উহার অপরিহার্য্য প্রভাব অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছে বলিতে হইবে।

চারি রাজ্যের রাজা

বোম্বাই প্রিন্সেস ষ্ট্রীট পুলিশ চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রণছোড়দাস সুন্দরজীকে চুরির অভিযোগে হাজির করা হইলে সে বলে—সে চারিটি রাজ্যের অভিষিক্ত রাজা। এই রাজ্য কয়টি হইল—জার্ম্মানী, ইটালী, আরেবিয়া এবং ভারতবর্ষ।

চারিদিকে হাস্য বিদ্রূপাদি চলিলেও আসামী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিয়া চলিল—আজকাল অবশ্য আমি চারিটি মাত্র রাজ্যের রাজা। দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে এই শাসন-ভার দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যেন আমি সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর শাসন নিয়ন্ত্রণ করি। কারণ আমি স্বয়ং গণেশ, মহাদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। আমার সম্পদ-বিভবের অভাব নাই ১৯ কোটি টাকা আমি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ধার দিয়াছি। বরোদার গাইকোয়াড়, হাইদরাবাদের নিজাম—সকলেই আমার নিকট হইতে ধার লইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার বিরুদ্ধে যে চুরির অভিযোগ সে সম্বন্ধে তাহার কি বলিবার আছে। সে বলে উহাতে চুরির কোনও কথাই উঠিতে পারে না, যেহেতু ভারতের সকল দোকান এবং পণ্য তাহারই।

ম্যাজিষ্ট্রেট ২০ কুড়ি টাকার জামিনে উহাকে বিচার শেষ পর্য্যন্ত মুক্ত থাকিবার আদেশ দেন।

মহাদেবের পুত্র যখন ঐ জামিনের কুড়ি টাকা জমা দিতে যায়, তখন ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলে—আপনি যদি মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, আমি আপনাকে পরিচয়-পত্র দিয়া দিব।

এসিরীয়দের কীর্ত্তি

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নিনেভে হইতে দশ মাইল দূরে খোরসাবাদের যে প্রাসাদ সারগনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আকারে এতই বিশাল যে আধুনিক কোনও অট্টালিকারই তাহার সহিত তুলনা করা যায় না। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকে নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয়। এখন মাত্র ধ্বংসাবশেষই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রাসাদ ১০ লক্ষ বর্গ ফুট জুড়িয়া বিরাজিত ছিল। শহরের সমস্তর হইতে ইহা ৪৮ ফুট উচ্চ ছিল এবং প্রাসাদের প্রধান অংশের সম্মুখভাগ ছিল—৯০০ ফুট লম্বা। (বাকিংহাম প্যালেস মাত্র ৩৬০ ফুট লম্বা)। সমুদয়ে ইহাতে ৭০০ কক্ষ ছিল। প্রাসাদের অধিকাংশ দেওয়ালই ছিল ২৮ ফুট পুরু। এতগুলি কক্ষ কি কি কাজে ব্যবহার করা হইত তাহার কোনও সঠিক বর্ণনা অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।

বরফের দেশে আলুর চাষ

সোভিয়েট অনুসন্ধানকারীদের নিকট একটা জটিল সমস্যাহ উদিত হইয়াছে যে—সোভিয়েটের উত্তর অঞ্চলে মেরু-বৃত্তের ভিতর আলুর চাষ বাস্তবে পরিণত করা যায় কিনা। সাধারণ আলুর বীজ ঐ নিদারুণ শীতের তল্লাটে কার্য্যকরী হইবে না। সুতরাং এমন বীজ চাই, যাহা মেরু অঞ্চলের মত অনুরূপ আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত আলু হইতে গৃহীত। এই উদ্দেশ্যে মিঃ এল এ ভ্রেমলিং দক্ষিণ আমেরিকার নানা অংশের আলুর চাষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে এণ্ডিস পর্ব্বতের অন্তত ১৫,০০০ ফুট উচ্চভূমিতে যে আলু জন্মিয়াছে, উহা যদি খিবিনি অঞ্চলে লইয়া গিয়া চাষ করা যায়, তবে সেই গুল্মে ৬ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্য্যন্ত আবহাওয়ার প্রকোপ সহ্য করিতে পারিবে কোনই অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু উহাতে মূল-ফসল উৎপন্ন হইতে পারিবে না যদি না কৃত্রিম আলোক দ্বারা উহার শক্তিবৃদ্ধি করা হয়। উহার পরিবর্ত্তে যদি দক্ষিণ আমেরিকার ঐ বন্য আলুর সহিত ইউরোপে উৎপন্ন সাধারণ আলুর মিশ্রণে উৎপন্ন অভিনব মিশ্র বীজ দ্বারা মেরু অঞ্চলে চাষ করা যায়, তবে সুফল ফলিবে এবং তিন ডিগ্রী পর্য্যন্ত আবহাওয়ার শীতলতা বরদাস্ত করিতে পারিবে। আর কোনও প্রকার কৃত্রিম আলোক বা উত্তাপ দান প্রয়োজন হইবে না, অথচ অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম শীতের দেশের ন্যায়ই ফসল পাওয়া যাইবে।

সোভিয়েট কৃষি-বিদ্‌দিগের এই নব প্রচেষ্টা তাহাদের এক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে।

নূতন 'শার্লি টেম্পল' তৈরীর ব্যবসা

এক বৎসর পূর্ব্বে হলিউড হইতে সমগ্র দেশের নৃত্য-সঙ্ঘগুলোর নিকট এই প্রস্তাব সমাগত হয় যে নেশনাল ট্যালেণ্ট পিকসার্স কর্পোরেশনকে প্রত্যেক মেয়ে প্রতি মাসিক

মেয়ে প্রতি প্রদত্ত টাকা হইতে যত বেশী সম্ভব লাভ করিবার জন্য মেয়েদের পরণে খড়ের স্কার্ট—আহার সম্বন্ধেও ব্যবস্থা অনুরূপ

১২০ ডলার প্রদান করিলে এই করর্পোরেশন ছোট মেয়েদের যথাযোগ্য শিক্ষা-দীক্ষা দানে 'শার্লি টেম্পল'-এর অনুরূপ ফিলম ষ্টার তৈরী করিয়া দিবে। দুইশত নৃত্য একাডেমি সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ প্রদান করিয়া শিক্ষার্থীর তালিকাভুক্ত হয়। বহু পিতা-মাতা তাহাদের কন্যাদের লইয়া হাজির হইল হলিউডে ঐ কর্পোরেশনের আফিসে। তাহারা সকলেই আশা করিল উক্ত পিকসার্স কর্পোরেশন "দি জুভেনাইল ফলিজ অফ নাইনটিন থার্টিনাইন" নামক যে ফিলম্ তৈরীর বিজ্ঞাপন দিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয় তাহাদের কন্যারা অভিনয় করিবার সুযোগ পাইবে।

সভাপতির পত্নী গ্রেফ্‌তার হইবার কালে পুলিশ অফিসারের হাত কামড়াইয়া দেয় এবং মহা হৈচৈ সুরু করে

টেকসাস্-এর কোনও নৃত্য একাডেমির মহিলা-শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে সন্দিগ্ধ হইয়া পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করে। ফলে এই ব্যবসার প্রেসিডেণ্ট আই সি ওভারডর্ফ্ এবং ভাইস প্রেসিডেণ্ট এড রোজ প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট-পত্নী গ্রেপ্তারের সময় লস-এঞ্জেলস্-এর এক শাদা পোষাকের গোয়েন্দার হাতে এমনভাবে কামড়াইয়া দিয়াছে যে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করিতে হয়।

এই ব্যবসা দ্বারা প্রেসিডেণ্ট সমুদয়ে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। পুলিশ দলবলে এই পিকসার্স কর্পোরেশনের আফিসে যখন হানা দেয়, তখন শিক্ষার্থিনী বালিকারা এবং উহাদের পিতা-মাতা সকলে একেবারে দিশাহারা হইয়া যায়। প্রেসিডেণ্ট গ্রেপ্তারের পর উহাদের প্রতারণার বার্ত্তা মুখে মুখে প্রচারিত হয়।

মাসে মাসে মোটা টাকা হস্তগত করা সত্বেও প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে বালিকাদিগকে কোনও সভ্যজনোচিত পোষাক বা খাদ্যও দেওয়া হয় নাই। মেয়েদের পরিতে দেওয়া হইয়াছে খড়ের স্কার্ট এবং খাদ্য দেওয়া হইয়াছে প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক কম।

মরু ও নির্ঝর

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

(১৫)

কয়টা মাস কৌশিক পাগলের মতই দিকে দিকে ছুটা-ছুটি ক'রে বেড়াল। কিন্তু না পেল সে কেশরের সন্ধান, না পেল ঊর্ম্মিলার কোনও বার্ত্তা।

ছুটিও প্রায় ফুরিয়ে এল।

এলাহাবাদে এসে আজ প্রায় মাসখানেক হল কৌশিক ও যমুনা একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে আছে।

চৈতালী ও সোমেশবাবু তারাও আজ প্রায় দুইমাস হল এলাহাবাদে এসেছে। তাদের বাসা কৌশিকদের বাসা হ'তে খানিকটা দূরে।

স্থানীয় নব-পরিচিত কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে চৈতালীরা গেছল সেদিন পিক্‌নিকে 'কাপামো' ব্রিজে!

নদীতে বালির চরে তখন চাঁদের আলো স্বপ্নের মতই মায়াজাল বিস্তার করছিল: একটি মেয়ে গান গাইছিল আর সকলে ঘিরে তাকে বসেছিল: এমন সময় কৌশিক হাঁটিতে হাঁটিতে গানের সুরে আকৃষ্ট হ'য়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল।

সেও সেদিন ঐদিকটাতেই বেড়াতে গেছল।

প্রবাসী বাঙালীর আলাপ জমতে এতটুকুও দেরী হল না।

চৈতালী কৌশিক ও যমুনাকে কোনদিনও দেখে নি, তাই সে তাদের চিনতে পারলে না।

কিন্তু পরের দিন সোমেশবাবুর সঙ্গে চৈতালী যখন যমুনাদের ওখানে বেড়াতে এল, সোমেশবাবু কৌশিককে দেখে আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন, 'আরে এযে কৌশিক-বাবু!......আপনি এখানে!—'

কৌশিক ম্লান এক হাসি হেসে বললে, 'হ্যাঁ, আজ মাসখানেক হল এখানে বাসা নিয়েছি!—'

'যাক ভালই হল, মাঝে মাঝে আপনার এখানে এসে হানা দেওয়া যাবে!'

এর পর হ'তে প্রায়ই সোমেশবাবু ও চৈতালী এখানে আসা-যাওয়া করতে লাগল।

দু'দিনেই চৈতালী, কৌশিকের যে কোথায় ব্যথা তা অনেকটা উপলব্ধি করতে পারলে।

ম্রিয়মান, স্বল্পভাষী কৌশিক, দু'দিনেই চৈতালীর অন্তরের অনেকটাই দখল ক'রে নিল। চৈতালী সময় পেলেই ছুটে আসত কৌশিকের কাছে, তার পাশটিতে বসে তার সঙ্গে গল্প করত!

কৌশিকেরও বড় ভাল লাগত এই মেয়েটিকে!

হারান বোন ঊর্ম্মিলার মতই মেয়েটি যখন-তখন কৌশিককে 'দাদা' 'দাদা' বলে ডেকে যেন কাছে টেনে নিয়ে যেতে চাইত!

অঘ্রাণের শেষ! এখুনি এলাহাবাদে বেশ শীত পড়েছে!

আজ কয়দিন হ'তেই আকাশটা যেন থম্ থম্ করছে।

বিকালের দিকে একটা পাতলা শাল গায়ে চাপিয়ে কৌশিক একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে শুয়ে একটা ইংরেজী বই পড়ছিল।

বাঁ পাশ দিয়ে শালের খানিকটা মেঝেয় পড়ে লুটাচ্ছিল, সেদিকে খেয়াল নেই!

কে এসে পাশ হ'তে শালটা গায়ের উপর তুলে দিল, 'কে?'

চোখ তুলতেই কৌশিক দেখলে কাছেই দাঁড়িয়ে চৈতালী

মৃদু হেসে কৌশিক বললে, 'তাইত বলি, এ আমার চৈতী বোনটি ছাড়া আর কে হবে?' বাঁ হাত দিয়ে চৈতীর কটি বেষ্টন ক'রে কাছে টেনে এনে বললে, 'আজ যে আসতে এত দেরী?......'

'আজ কয়দিন হ'তে বাবার বাতের বেদনাটা একটু আবার দেখা দিয়েছে, এতক্ষণ তাকেই সেঁক দিচ্ছিলাম, কিনা? তাই একটু দেরী হ'য়ে গেল।'

'কই এ খবর ত' আমি পাই নি?—তা তিনি এখন কেমন আছেন?—'

'এখন একটু ভাল।'

'আপনার ছুটির কি হল দাদা?—'

'এখনও কোন জবাব পাইনি বটে, তবে যতদূর মনে হয়, আর Extension দেবে না।' তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস রোধ ক'রে বললে, 'আর ছুটি বাড়িয়েই বা কি হবে, তাকে এ জীবনে আর ফিরে পাব না, সে আমি ভাল করেই জানি; যে ইচ্ছা করে পালিয়ে বেড়ায়, তাকে ধরতে যাওয়ার মত মূর্খতা ত' আর কিছুই নেই। তবুও ত মন বোঝে না!'

'তারা যদি সত্যিই একদিন ফিরে এসে তোমার সামনে দাঁড়ায়, সত্যিই কি তুমি সেদিন তাদের ক্ষমা করতে পারবে? পারবে কি তাদের তুমি তোমার বুকে টেনে নিতে আগের মত ক'রে!—'

'পারব চৈতালী পারব!......প্রথমটা আমারও সত্যি বড় দুঃখ হ'য়েছিল, হ'য়েছিল লজ্জা, হ'য়েছিল অপরিমিত ঘৃণা। কিন্তু সে ভুলও আমার ভেঙ্গে গেল চৈতী, যেদিন সর্ব্বপ্রথম স্থিরচিত্তে আগাগোড়া তাদের সমস্ত কার্য্যকলাপটুকুই ভাবতে পারলাম; সেইদিন বুঝলাম মানুষকে মানুষের ঘৃণা করার মত ধৃষ্টতা বুঝি আর নেই!......বরং এর পর হ'তে তারা আমার চোখে আরও মহান্ গরীয়ান হয়েই উঠল। প্রেমের দেউলে ওরা দুটি যে ভিখারী ভাই! ওদের বিচার ত' সমাজের মাপকাঠি দিয়ে করা চলে না! আমার মাথা নত হ'য়ে এল, আমি আমার শতকোটি প্রণাম জানালাম তাদেরই উদ্দেশে, যে প্রেম তাদের এমনি করে পথের ধূলায় টেনে নিয়ে এল সকল অপমান, সকল লজ্জার বাইরে!'

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগল, 'বুঝলি দিদি, মানুষ মাত্রেই নিজেকে অত্যন্ত চালাক বা বুদ্ধিমান মনে করে থাকে এবং সেই জন্যই তার নিজের

গলদ নিজের চোখে কোনদিনও ধরা পড়ে না। তার এমনিভাবে কাউকে না বলে, না কয়ে সহসা গৃহত্যাগ করার সবটুকু দোষ একা তারই নয় বোন; আমরাই এর জন্য বেশী দায়ী! জানি না এ জীবনে আর তার দেখা পাব কিনা?......কিন্তু মরবার আগেও যদি তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তবে তার হাত দুটি ধরে শুধু এই কথাটাই বলে যাব, 'ওরে তোর দাদার অভিমান চূর্ণ হয়েছে; পারিস যদি তবে তাকে ক্ষমা করিস!'

কৌশিকের দুই চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

'এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না চৈতী;......তার গৃহ-ত্যাগের আগে চার-পাঁচ দিন পর্য্যন্ত আমি ঘৃণায় তার দিকে চোখ ফিরাই নি পর্য্যন্ত!—'

'বাবাও তাই বলেন দাদা, এর মধ্যে পাপ নেই চৈতী; যা আছে সে একটা প্রকাণ্ড ভুল!—'

'সে ত' সেইদিনই আমি বুঝেছিলাম, যেদিন সকালে আর তাকে সারাটা বাড়ীময় কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না!'

'কিন্তু তারাই বা এমনিভাবে পালিয়ে গেল কেন?—ভুল না হয় আমাদেরই হ'য়েছিল, তারা ত' জানত' এর চাইতে মিথ্যা আর কিছু হ'তে পারে না?'

'সে যে আমাদের ছেড়ে গেছে, তার জন্যে আর আমার তত দুঃখ নেই চৈতালী; এখন শুধু এইটাই আমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তারা যেখানেই থাক্ তারা সুখে থাক্!...... মঙ্গলময়ের করুণায় তাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর হ'য়ে উঠুক!......'

কি একটা কাজে এঘরে এসে চৈতালীকে দেখে যমুনা সবিস্ময়ে বললে, 'একি চৈতী, কখন এলে?—'

'অনেকক্ষণ এসেছি বৌদি; দাদার সঙ্গে গল্প করছিলাম!'

'ওকে চা করে দাও যমুনা?—' কৌশিক বললে।

চৈতী চা খাচ্ছিল, আর যমুনা, ঐ দেশীয় হিন্দুস্থানী চাকরটাকে রাত্রের রান্না সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিল, 'তোমারা রান্না ত' বাবু কুছ্ নেই খেতে পারতা!'

'কাহে মায়িজী অরহরকা ডাল উত' আচ্ছাই পাকাতা হায়!—'

এমন সময় কৌশিককে কাপড়-জামা গায়ে নীচে আসতে দেখে, যমুনা জিজ্ঞাসা করল, 'একি তুমি কোথাও বেরুবে নাকি?—'

'হ্যাঁ......যাই চৈতালীকেও পৌঁছে দিয়ে আসি, আর সেই সঙ্গে সোমেশবাবুকেও একবার দেখে আসি, তার নাকি শরীর আবার অসুস্থ হয়েছে!—'

'তাই নাকি!......তা তুমি যাও আজ দেখে এস, কাল দুপুরে আমি যাব তাকে দেখতে!—'

চা খাওয়া শেষ হ'য়ে গেছল, চৈতালী উঠে পড়ে বললে, আজ তবে আসি বৌদি, কাল পরশু বাবার শরীরটা ভাল থাকে ত' আবার আসব।—'

'এস ভাই!'

চৈতী বললে, 'চলুন দাদা!'

বাইরে বেশ শীত!......মাঝে মাঝে কন্‌কনে হাওয়া সমস্ত শরীরে কাঁপুনী জাগায়:

পথ চলতে চলতে এক সময় চৈতালী বললে, 'আমার কি মনে হয় জানেন দাদা? যে তারা আসবে; আপনার এ ডাক তারা অগ্রাহ্য করতে পারবে না, এ ডাকের সাড়া তাদের একদিন না একদিন দিতেই হবে! পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও যদি তারা চলে গিয়ে থাকে, আবার তাদের একদিন ফিরতে হবে!'

'এ দুনিয়ায় আশাই একমাত্র মানুষকে সত্যিকারের বাঁচিয়ে রেখেছে! আশা যদি না থাকত, তবে হয়ত' মানুষের আত্মহত্যার একটা মড়ক লেগে যেত!'

'কলকাতায় গিয়ে আমাদের ভুলে যাবেন না ত' দাদা?—'

'যে স্নেহের নিগড়ে বেঁধেছ বোন, তোমার দাদার এ দুটো হাতের সাধ্য কি তার সে বাঁধন এড়িয়ে যাবে! ভাগ্যে এলাহাবাদে এসেছিলাম, নইলে এ বোনটিকে পেতাম কোথায়?—'

'বটেই ত' নিজে আমরা যেচে আলাপ করলাম কিনা!—'

'কি জান বোন, ব্যথার মধ্য দিয়েই আমরা সুন্দর যা কিছু তাই লাভ করি! সত্যিকারের প্রয়োজন হ'য়েছিল বলেই ত' এমনি করে নদীর তটে ভগবান তোমায় মিলিয়ে দিলেন; নইলে কই এতদিন কলকাতায় অত কাছে থেকেও ত' তোমার দেখা পাই নি!'

বাইরের ঘরে তখনও সোমেশবাবু বসে বসে একটা মোটা ডাক্তারী বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলেন, চৈতালী ও কৌশিকের পদশব্দে মুখ তুলে চাইলেন।

'আপনাকে দেখতে এলাম, সোমেশবাবু! কেমন আছেন? ...আপনার অসুখ তা' আমায় একটা খবর দেননি পর্য্যন্ত।......'

'আসুন! আসুন, ...বসুন!...... অসুখ ত' বৃদ্ধবয়সের নিত্য সাথী!......জর্জ্জরিত এ দেহভার আর টেনে বেড়াতে পারছি না; এখন শুধু ভাবি কবে মুক্তি মিলবে; চৈতী মার একটা কিনারা হলেই নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ দুটো বুজতে পারি!'

'এইবার একটি ভাল পাত্র দেখে চৈতীর বিয়ে দিন্ না!......কেননা পরে কেশব যদি ফিরেও আসে তবুও তার হাতে আর ওকে দেওয়া চলে না!'

চৈতালী এসেই ভিতরে চলে গেছল।

'না তা চলে না, সেই জন্যই একদিন আভাসে ওর কাছে কথাটা তুলেছিলাম, কিন্তু ও কি বললে জান!'

'কি!—'

'বাবা আমার প্রতি তোমার যে স্নেহ তা কি একেবারেই শেষ হয়ে গেছে!'

তাতে আমি বললাম, 'না মা তা আমি বলছি না, আমি শুধু বলছি সে যখন এমনি করেই তোকে অপমান করে গেল!' চৈতী আমার জবাব দিলে, সে আমার মুখের দিকে

(শেষাংশ ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংবাদপত্রের দুঃসাহস

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে ইউরোপীয় মহাসমরের সূত্রপাতে যখন সাগর-তরঙ্গের মত অগণিত জার্ম্মান-সেনায় সারা বেলজিয়াম প্লাবিত হইল, তখন বেলজিয়ামের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল। কারণ বিপক্ষের দমন-নীতির প্রভাব ও তজ্জনিত লাঞ্ছনা তাহারা বরদাস্ত করিতে রাজি হইল না। জার্ম্মান গবর্ণর জেনারেলের বেলজিয়াম মুলুক অধিকারের পর প্রথম কার্য্যই হইল গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে একটি খবরের কাগজের প্রতিষ্ঠা। "ব্রুক্‌সেলোয়" নামকরণ করিয়া সরকারী অর্থ-সাহায্যে ফরাসী ভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম উহা সমরের যথার্থ ও পক্ষপাতিত্ব-বর্জ্জিত সংবাদই মুদ্রিত করিত। জার্ম্মানগণ আশা করিয়াছিল এই সংবাদপত্রে প্রচারকার্য্য চালাইয়া দেশবাসীর অন্তরে সহানুভূতি জাগ্রত করিতে সমর্থ হইবে। এবং সেই প্রকারই ব্যাপার দাঁড়াইত, যদি না প্রধান সম্পাদক ভিক্‌টর জোয়ারডেন্‌ তাহাদের এই দুরভিসন্ধির অন্তরায় হইয়া দুর্জ্জয় অধ্যবসায়ের সহিত হস্তক্ষেপ করিতেন।

এই ৭৪ বৎসর বয়স্ক সম্পাদক দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরিয়া "বেট্রিয়োট" নামক সংবাদপত্রের নিপুণ সম্পাদনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বারবার বেলজিয়মের নিরপেক্ষতার সমর্থক চুক্তিগুলির উপর বিশ্বস্ত নির্ভর এবং উহাদের দাবী সম্বন্ধে জোরগলায় প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন। সমর-সজ্জার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দেশবাসীকে নিরস্ত রাখিয়াছেন। তাহারই পরে, একটা নিষ্ঠুর "আলটিমেটাম্‌" ছাড়া, পূর্ব্বে কোন নোটিশ বা সতর্কবাণী পর্য্যন্ত না দিয়া জার্ম্মানগণ বেলজিয়ামের উপর চড়াও হইল। সম্পাদক জোয়ারডেন্‌ যে যুক্তিবাদের উপর পরম আস্থা স্থাপন করিয়া বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতার মর্য্যাদাকে উচ্চে ধরিয়াছিলেন, জার্ম্মান-আক্রমণ উহাকে নিতান্তই অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। জাতির এই চরম দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে নিজেকেও কিছুটা দায়ী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তিনি গোপনে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলেন—যাহাতে বিজেতাদের মুখপত্র 'ব্রুক্‌সেলোয়'-য়ের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। এই কার্য্যে তিনি সহায়করূপে পাইলেন তাঁহার ৩৪ বৎসর বয়স্ক আত্মীয় ইউগেন ভ্যান্‌ দোরেন্‌কে।

•সমগ্র প্রচেষ্টাটি ছিল নিতান্তই অসমসাহিকতার চূড়ান্ত—এতটা যে, ইহাকে বুদ্ধিহীনতাও বলা যাইতে পারে। ১৯১৪ সালের অক্টোবর আসিয়া পড়িল। গবর্ণর ফন্‌ বিসিং সমগ্র ব্রুসেল্‌স্‌ শহরটিকে জেলখানায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক অধিবাসীকে একখানি করিয়া নিজ নিজ ফটোগ্রাফ সম্বলিত পরিচায়ক-পত্র সঙ্গে রাখিতে হইত এবং ১৮ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক পুরুষদের প্রতিদিন "কমাণ্ডাণ্ড্র"য়ে (কম্যাণ্ডারের দপ্তরখানায়) হাজিরা দিতে হইত। সদর রাস্তাগুলিতে দিন-রাত সশস্ত্র সামরিক পুলিশ পাহারা দিত, গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দাপুলিশের ব্রিগেড্‌ এবং গুপ্তসন্ধানীদের নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কয়েক ঘণ্টার মাত্র নোটিশে যেখানে সেখানে সান্ধ্য আইন জারী করা হইত। এই আইনের বিধি যাহাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়, তাহার জন্য রাইফেল ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করা হইত না। প্রতিদিনই শোনা যাইত বিজেতাদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত "অপরাধের" তালিকা বাড়িয়া চলিয়াছে;—কোনও কিছুর ফটোগ্রাফ গ্রহণ করা ছিল অপরাধ, কোনও স্থানের নক্‌সা তৈরী করা কি দৃশ্য চিত্রিত করা ছিল অপরাধ; "লিখিত বিবৃতি, ছবি বা ফটো প্রকাশ্যে প্রচার, বিলি বা কোথাও আঁটিয়া রাখা" ছিল দারুণ অপরাধ, যদি তাহা পূর্ব্বেই "সেন্‌সার" কর্তৃক অনুমোদিত করা না হয়।—জাতীয়তামূলক সংগীত গান করা, অথবা এমন কোনও রঙিন পোষাক পরিধান করা যাহাতে বেলজিয়মের জাতীয় পতাকা কিম্বা মিত্রশক্তির কোনও জাতীয় পতাকার ইঙ্গিত প্রকাশ পায়—এই সমস্তই ছিল গুরুতর অপরাধ।

এই প্রকার যখন দেশের অবস্থা তখন জোয়ারডেন্‌ এবং ভ্যান্‌ দোরেন্‌ গোপনে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থায় উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। দূর শহরতলীর এক অখ্যাত ছাপাখানার মালিকের সহিত সংবাদপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা হয় এবং মুদ্রণের পর কাগজগুলি বিক্রেতাদের হস্তে পৌঁছাইবার বন্দোবস্ত করা হয় সুড়ঙ্গরেলপথে—পুলিশের চোখে ধূলি দিবার জন্য। ইউগেন ভ্যান দোরেন স্বয়ংই প্রথম সংখ্যার এক হাজার কাপির অর্দ্ধেক বিলি করেন। পঞ্চাশখানা করিয়া এক একটি প্যাকেট করিয়া তাঁহার ঢোলা ওভারকোটের ভিতরে ফিতাদ্বারা বাঁধিয়া কতকগুলি প্যাকেট ঝুলাইয়া লইয়া বাহির হইতেন। সেগুলির বিলি শেষ হইলে, ফিরিয়া আসিয়া আরও কতকগুলি লইয়া যাইতেন।

১৯১৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। গবর্ণর জেনারেল ফন্‌ বিসিং-য়ের দপ্তরখানার বহির্ভাগ। সশস্ত্র রক্ষিগণ টহল দিতেছে। *সুন্দরী যুবতী একটি আসিয়া মহাসুগন্ধময় খাম একখানি রক্ষীর হাতে দিল—হিজ্‌ এক্‌সেলেন্‌সির স্বয়ংয়ের হাতে দিবার জন্য, বেজায় জরুরী ব্যাপার। রক্ষীটি দয়া করিয়া হাতে দিবে কি?—হাঁ, রক্ষীটি স্বীকৃত হইল, সে দিবে। গবর্ণর জেনারেল খামটা খুলিয়া ফেলিলেন—কি আশ্চর্য্য! "লা লিবার বেলজিক্‌" সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যা!*

তখন সুরু হইল একটা চতুরতা-সংগ্রাম—যাহাতে *জার্ম্মান গোয়েন্দা-পুলিশের বড় বড় মাথা,* জার্ম্মান সামরিক পুলিশের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি এবং গবর্ণর জেনারেলের বিপুল দমন-নীতি একযোগে প্রয়োগ করা হইল বেমালুম গা-ঢাকা দিয়া এড়াইবার কাজে ঝানু এই "লিবার বেলজিক্‌" নিয়ন্তাদের বিরুদ্ধে।

"লিবার বেলজিক্‌" নামটিই জার্ম্মান কর্তৃপক্ষের বেলজিয়াম-বিজয়ের বিরুদ্ধে বিরাট একটা হুম্‌কী, তাহার উপর আবার ভ্যান্‌ দোরেন্‌ বেপরোয়া বিদ্রূপের সুরে টিপ্পনী লিখিয়া দিয়াছিলেন—

অর্থাৎ "জাতীয় প্রচার বিভাগের ইস্তাহার—রীতিমতই বিধি-বহির্ভূত, পরাধীনতায় বিমুখ।"

জোয়ারডেন্ লিখিয়াছিলেন—"লা লিবার বেলজিক্"য়ের লক্ষ্য হইল বেলজিয়ান জাতির স্বদেশ-প্রেমকে সেই শুভ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সজীব রাখা, অজানা হইলেও যে মুহূর্ত্ত এক-দিন নিশ্চিতই আসিবে, যেদিন বেলজিয়াম মুক্তির স্বর্গে বিরাজ করিবে। "লা লিবার বেলজিকে"র পণ হইল, বেল-জিয়াম এবং মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে বিজেতাদের মুখপত্র যে অহে-তুক কুৎসা ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা তাহা খণ্ডন করা।"

ইহার প্রথম উদয়ের এক মাস মধ্যে সমগ্র ব্রুসেলস্ শহরে এমন লোক একটিও রহিল না যে "লা লিবার বেলজিকে"র নাম শোনে নাই। ছয় সপ্তাহ অতীত হইলে সংবাদপত্রখানা সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং প্রচার-সংখ্যা দাঁড়াইল ৫০০০এ।

প্রচারের বাস্তব ব্যবস্থা গোড়ায় একক ভ্যান্ দোরেন্ হইতে বিস্তারলাভ করিয়া এইক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হইল কতকগুলি পরিবেশনকারী গুচ্ছে—যাহাদের সংখ্যা নিতাই বাড়িতে লাগিল এবং পরিশেষে শত শত লোক এই কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু ভ্যান্ দোরেন্ একেবারে আভ্যন্তরীণ চক্রের দুই-তিনটি অন্তরঙ্গ ব্যতীত কাহারও সংস্পর্শে আসিতেন না এবং কেহই তাঁহার দেখা পাইত না বা তাঁহাকে চিনিত না। কাজেই ঐ তিন ব্যক্তি ছাড়া তিনি অজানাই রহিলেন অপর সকলের কাছে। আবার এই কাগজের সঙ্গে জোয়ারডেনের যে কোনও যোগ আছে, ইহা ভ্যান্ দোরেন্ ভিন্ন অপর কাহারও জানা ছিল না। ইহাদের কর্ম্মপদ্ধতিতে এমনই কৌশলে গোপনতা রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল যে, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা প্রতিবেশীসমূহও মহাসমর পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই যে তাহাদের বন্ধু বা প্রতিবেশী এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাহাদের সহকর্ম্মী ছিল। এমন কি যে ব্যক্তি মহাসমরের অন্তিম সময়ে হাতেকলমে সম্পাদনের নেতৃপদে নিযুক্ত ছিল, সে পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই কোন কোন্ লোক তাহার পূর্ব্বে এ কার্য্য করিয়া গিয়াছে, অথবা কোন্ কোন্ লেখক বর্ত্তমানে প্রবন্ধাদি লিখিতেছে, যদিও নিত্য নূতন পথে তাহার নিকট প্রকাশ করিবার প্রবন্ধ যথাবিহিত নির্দ্দেশসহ আসিয়া পৌঁছিত।

স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল ফন্ বিসিং এবং জার্ম্মান গোয়েন্দাবিভাগের প্রখর দৃষ্টি এড়াইয়া যখন ক্রমাগত সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাগজ প্রকাশিত হইয়া চলিল, তখন 'লিবার বেল-জিক'য়ের নামে জার্ম্মানদের বুকে যেন "খোবার ধরা" রোগ উপস্থিত হইল। কোন না কোন উপায়ে কাগজখানা ফন্ বিসিং-য়ের টেবিলে আসিয়া উপস্থিত হইত। কখনও বা ব্রুসেলসে তাহার আবাস-গৃহের নিতান্তই অপ্রত্যাশিত স্থানে অলক্ষ্যে আবির্ভূত হইত। সেই সকল ত তবুও সহ্য করা যায় —কিন্তু এই বেয়াড়া কাগজটা তাহার অতি সাধের এবং নিরতি-শয় ব্যয়বহুল "অনুপ্রাণিত প্রচার বিভাগের" সমস্ত কার্য্যকে একেবারে বিফল করিয়া দিতেছে। কিছু একটা করিতেই হইবে—এবং তাহা যত শীঘ্র সম্ভব।

টিউটন জাতির স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ অধ্যবসায়ের সহিত সমগ্র শহরে খানাতল্লাসী করা হইল। দিনের পর দিন সন্ধানী দল অকস্মাৎ যাইয়া সংবাদপত্র বিক্রেতাদের দোকানে এবং বুকস্টলগুলিতে সমস্ত পণ্য তছনছ করিতে লাগিল। প্রতি ছাপাখানায় যাইয়া হানা দেওয়া হইতে লাগিল—অবশ্য যে সকল ছাপাখানা জার্ম্মান পুলিশের জানিত তাহাতেই।

অবস্থা সঙ্গীন। ভ্যান্ দোরেন্ বুঝিলেন, তাঁহার শহরতলীর ঐ মুদ্রাকর আর বেশী দিন আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিবে না। কাজেই তিনি আর এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় হাত দিলেন। তাঁহার নিজের বাসগৃহের পশ্চাৎ ভাগে একটা ফ্যাক্টরী খালি পড়িয়াছিল। সেই ফ্যাক্টরীর ঠিক মধ্যস্থলের বড় কারখানা ঘরটির কেন্দ্রস্থলের ১৩ ফুট লম্বা ৭ ফুট চওড়া স্থানটিকে এমনভাবে নিরন্ধ্র দেওয়াল ঘেরা করিলেন যাহাতে এই গোপন কক্ষের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না—প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়াও। এই গোপন কক্ষের বাহিরে কারখানাঘরের যে বাকি অংশ রহিল, তাহাতে পুরাতন লোহালক্কড় স্তূপাকার করিয়া রাখা হইল। এই গোপন কক্ষে তিনি ছাপাখানা বসাইলেন। দেওয়াল গাঁথার জন্য যে ইঁট আনা হইল তাহাও একসঙ্গে বেশী নয়—একবারে একখানা করিয়া। কক্ষের দেওয়ালে কোথাও ছিদ্র বা দোর জানালা রহিল না। উপরের ছাদ ফুটা করিয়া সেই পথে গমনাগমনের রাস্তা করা হইল। সেই ছাদের ফুটায় যে কাঠের ডালা তাহা আবার পুরা-তন কাঠের টুকরা, খুঁটি প্রভৃতি দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইত। এখানে নিরাপদে বৎসরখানেক কাজ চলিল।

তাঁহাদের প্রয়াসকে মহাসমারোহে স্মরণীয় করিবার জন্য ভ্যান দোরেন একটি বিশেষ সংখ্যা বাহির করিবার পরিকল্পনা করিলেন—"আমাদের বন্ধুবর ফন্ বিসিংয়ের প্রতি যোগ্য আপ্যায়ন।"

১৯১৫ সালের ১লা জুন "লা লিবার বেলজিক" ৩০নং সংখ্যা প্রকাশিত হইল—এই সংখ্যায়ই সর্ব্বপ্রথম চিত্র সন্নি-বেশিত হইল; চিত্রে সুকৌশলে দেখান হইল, ফন্ বিসিং-য়ের সাদৃশ্য রক্ষা করিয়াও এক বিকৃত মূর্ত্তি—সে যেন বসিয়া বসিয়া "লা লিবার বেলজিক্" কাগজ পড়িতেছে। ছবির নীচে লেখা হইল—"আমাদের প্রিয় গবর্ণর সরকারী মুখপত্র ও প্রচার বিভাগের মিথ্যা রটনায় বিতৃষ্ণ হইয়া "লা লিবার বেল-জিক" পত্র পড়িতেছেন সত্য-সংবাদে তৃপ্ত হইতে।" কি স্পর্দ্ধা!—একেবারে অসহ্য। গবর্ণর একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। আর ইহার ঝাল ঝাড়িতে লাগিল নগরীর অধিবাসীদের উপর সহস্র প্রকার অত্যাচার-নিপীড়নের স্বেচ্ছাচারের ভিতর দিয়া।

অবশেষে একদিন ভ্যান দোরেনের প্রধান কাগজবিলিকারী ধরা পড়িয়া গেল, অবিলম্বে তাহার প্রাণদণ্ড হইল। পুনরায় নূতন করিয়া এবং বেশী রকম সতর্কতার সহিত কাগজবিলির ব্যবস্থা করা হইল। এখন আর ভ্যান্ দোরেন্ তাঁহার অধীনস্থ

কাগজ সরবরাহকারীদের জনেজনের বাড়ী যাইতেন না; তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের সহিত পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ করিতেন;—কোনও জাঁকজমকপূর্ণ বড় দোকানে, কিম্বা হোটেলে অথবা ট্রামের জন্য প্রতীক্ষা করিবার আশ্রয়-স্থানে ছিল তাহাদের মিলনের জায়গা। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয় ছিল তিনতলা কি চারতলা বাড়ী জুড়িয়া যে বিরাট দোকানগুলি রহিয়াছে উহাদেরই লিফ্‌টের ভিতর। দোকানটির প্রবেশপথে একে অন্যের অনুসরণ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের ভিতর পরিচয়ের কোনও ইঙ্গিত বিনিময় হইত না, যেন তাঁহারা নিতান্তই অপরিচিত এইভাবে উভয়ে লিফ্‌টে আরোহণ করিতেন। দোতলায় পৌঁছিয়া ভ্যান্ দোরেন্ নামিয়া যাইতেন, তাহার পূর্ব্বে কাগজের একটি প্যাকেট অন্য সকলের অলক্ষিতে সহকারীর ওভারকোটের ভিতর চালান দিয়া যাইতেন। সহকারী হয়ত তেতলা কি চারতলা পর্য্যন্ত উঠিয়া কিছু সময় এদিক ওদিক ঘুরিয়া পরে নামিয়া যাইত।

১৯১৫ সালের শেষাশেষি কাগজবিলির ব্যবস্থা সমগ্র জার্ম্মান অধিকৃত অঞ্চলে সম্পূর্ণ হইয়া গেল। কোনও কোনও পথে এমনই কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল যে, ত্রিশ মাইল পথ ধরা না পড়িয়া অতিক্রম করিতে এক একটি লোকের সময়ে দুই দিন সময়ও লাগিয়াছে। বাহির হইতে শহরে প্রবেশ করিবার সকল রাস্তায়ই গোয়েন্দা পুলিশের প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং তাহাদের প্রতি আদেশ ছিল, যদি কেহ সঙ্গীয় কাগজের প্যাকেট খুলিয়া দেখাইতে অস্বীকার করিয়া পালাইতে চেষ্টা করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলী করিয়া মারিতে হইবে। তথাপি "লা লিবার বেলজিক্" কাগজ বিলি করিবার লোকের কোন দিন অভাব ঘটে নাই। স্বেচ্ছাসেবীরা পর্য্যন্ত এইরূপ বিপদসঙ্কুল পথযাত্রায় স্বেচ্ছায় যোগদান করিয়াছে, তাহাদের স্কার্টের ভিতর কাগজের প্যাকেট লুকাইয়া রাখিয়া। এক বাণ্ডিল কাগজের প্যাকেট না লইয়া গেলে কাগজগুলি নিজের বুকে-পিঠে জড়াইয়া, তাহার উপর জামা পরিয়া বিলি করিতে বাহির হইত। এমন কি বরফ দেওয়া মাছের ঝুড়ির ভিতর পুরু অয়েল পেপারে মোড়া কাগজের প্যাকেট লুকাইয়া ঝুড়িটির উপর "Perishable" মার্কা দিয়া রেলযোগে পার্শেলে পাঠান হইত।

এই বিলিকারীদের দলের কাহারও গ্রেফতার ও প্রাণদণ্ড—হইয়াছিল নিত্যকার ঘটনা। ১৯১৬ সালের ১৩ই এপ্রিল, ভ্যান দোরেন সবে মাত্র নৈশ আহার সমাপন করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার কন্যাগণ খবর দিল যে তাহারা দেখিতে পাইয়াছে, তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে পুলিশ দল আসিয়া জমায়েত হইতেছে। অতি তাড়াতাড়ি ভ্যান দোরেন মাত্র একটি কোট টানিয়া লইবার অবকাশ পাইলেন, পায়ে চটিজুতাই রহিল, তিনি ছুটিয়া বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে গেলেন এবং ফ্যাক্টরীর ভিতর দিয়া প্রাচীর টপকাইয়া পলায়ন করিলেন। মিসিস ভ্যান্ দোরেন্ গ্রেফতার হইলেন। এবং থানায় নানা প্রকার জবাবদিহি করিতে বাধ্য হইলেন। এই জেরা করিবার ব্যাপার ক্রমশই দীর্ঘ হইয়া চলিল, যেমন যেমন নূতন সন্দেহজনক ব্যক্তি ধৃত হইতে লাগিল। এই ষড়যন্ত্রকারীদের দলের একমাত্র সম্পাদক জোয়ারডেন পাকড়াও হইতে বাকি রহিলেন। ইহার পরই খবর পাওয়া গেল যে চোরা-আড্ডায় যে ছাপাখানা করা হইয়াছিল, তাহা জার্ম্মানরা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে এবং "লা লিবার বেলজিকে"র পরবর্ত্তী সংখ্যার পাণ্ডুলিপিও হস্তগত করিয়াছে। কাজেই সর্ব্বনাশ সম্পূর্ণই হইল।

সুদীর্ঘ আড়াই মাস কাল পর্য্যন্ত মিসিস ভ্যান্ দোরেনকে একটি সংকীর্ণ সেল-এ রাখা হইল জামিনস্বরূপ যেন তাঁহার স্বামী স্বয়ং ভ্যান্ দোরেন্ আসিয়া আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না বলিয়া রমণীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বাকি সকল বন্দীকেই "হাই ট্রিজন্" অভিযোগে দণ্ডিত করা হইল। ৪৬জনের ভিতর ৪৩জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত, কোন কোনটিকে জার্ম্মানিদের "কনসেনট্রেশন্ ক্যাম্পে" পাঠান হইল। ভ্যান্ দোরেন্ তাঁহার এক বন্ধুর গৃহে দুই বৎসরেরও অধিককাল লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুতেই সংবাদপত্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিলেন না।

১৩ই এপ্রিল তারিখে যে পুলিশের হানা 'লা লিবার বেলজিকে'র কর্ম্মীর দল ও গোপন ছাপাখানা আয়ত্তে আনিয়া উহাকে পুরাপুরি দমন করিয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছিল, তাহারই বারো দিন পরে ফন্ বিসিং তাঁহার চিঠিপত্রের সহিত "লা লিবার বেলজিকে"র নূতন ৭২নং সংখ্যাটি পাইলেন, তাহাতে লেখা আছে—"সম্পাদকের সশ্রদ্ধ সৌজন্যের সহিত।" তিনি কাগজখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন যে, ব্যাপক ধরপাকড়ের কোনও উল্লেখ অথবা যে জীবনঘাতী শেলাঘাত তাঁহার পুলিশ কাগজখানির বুকে দিয়াছে, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু বৃথা যে যে উপকরণ ব্যবহার করা হইত তাহা সবই রহিয়াছে, ভাষা সুর সবই সেই পুরাতন, এক বিন্দুও হেরফের হয় নাই—লেখকদের বিশিষ্টতার ছাপ হুবহু পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে এবং জার্ম্মানদের প্রতি বিদ্বেষ সামান্যও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। এইরূপে, যেমন সংখ্যাতীত বার ঘটিয়াছে, পূর্ব্বে এবং পরেও ঘটিয়াছে যে, যখনই জার্ম্মানগণ বিপুল উদ্যমে অভিযান চালাইয়া কতকগুলি লোককে বন্দী করিয়া ভাবিয়াছে যে তাহারা এই প্রতিষ্ঠানের যাহারা মস্তিষ্কস্বরূপ তাহাদিগকেই নির্ম্মূল করিল, অমনি এক নূতন সংখ্যা "লা লিবার বেলজিক্" সহসা দেখা দিয়া তাহাদিগকে পরিহাস করিয়াছে, এইবারও তেমনি হইল।

জোয়ারডেন নূতন এক মুদ্রাকরের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এবং ৭২ ও ৭৩নং সংখ্যার 'কপি' প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে ৭৪নং "লা লিবার বেলজিক্" সংখ্যা বাজারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ধরিয়া লইলেন—ইহা হয়ত কোন ক্ষুদ্রগুচ্ছের কার্য্য যাহারা ধর-পাকড়ের প্রভাব এড়াইয়া বাহিরে থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। এবং এইভাবেই উহাদের অস্তিত্ব তাঁহাকে জানাইয়া দিল। তিনি সামান্য সন্ধানেই জানিতে পারিলেন যে, 'এলবার্ট লে রু' নামক এক ষ্টেশনারি দোকানদার—যে শেষ পর্য্যন্ত ভ্যান্ দোরেনের

স্থানে প্রধান বিলিদার হইয়াছিল, তাহারই এ কাজ। এই সময়ে জার্ম্মান পুলিশ জোয়ারডেনের পশ্চাতে খেই ধরিয়া আগাইয়া আসিতেছিল, সে সংবাদ তিনি রাখিতেন। কাজেই এই সময়ে পুলিশের দৃষ্টির মোড় ঘুরাইবার জন্য তিনি আর কাগজ বাহির করিলেন না। এইবার 'লে রু'র দিকে পুলিশের লক্ষ্য পড়িল। তখন তাহার উপর পুলিশের যে সন্দেহ তাহা কিছুটা হালকা করিবার জন্য পর্য্যায়ক্রমে একবার জোয়ারডেন কাগজ বাহির করেন এবং পরের বার 'লে রু' বাহির করে—এই দুই দফায় কাজ চলিল।

১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে, পর পর কয়েকটি পুলিশ-খানাতল্লাসী ও ধর-পাকড় চলিল; বিশ্বাসঘাতক এক পাঠকের কারসাজিতে "লেরু"র সন্ধান পুলিশ পাইল। সে তখন তাহার ষ্টেশনারি দোকানে উপস্থিত ছিল না, পুলিশ আসিয়া তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহাকে কোনপ্রকারে সতর্ক করিয়া দিতে সমর্থ হইল। আর কি কথা আছে—৩১শে মার্চ্চের রাত্রিতে সে সারা মুল্লুক ছাড়িয়া পলাইল।

তারপর তরুণ 'এবে ভ্যানডেন হাণ্ট' কাগজখানির ভার গ্রহণ করিল। সে অতি ধীর স্থির এবং অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিল। সে ভাবিয়া লইল, "লা লিবার বেলজিক"কে জীবন্ত রাখার ব্যাপার যত কঠিনই হউক, প্রাণপাত করিয়াও সে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবে, অন্ততঃ মানুষের পক্ষে যাহা করা সম্ভব তাহা পুরোমাত্রায় করিতে সে পিছপা হইবে না—কারণ দেশের অশেষ কল্যাণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। এই দুর্জ্জয় পণ ও অটল অনুপ্রেরণার বলেই সে মহাসমরের বাকি দুই বৎসর পর্য্যন্ত এই ক্ষণভঙ্গুর সম্পাদকীয় আসনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে পারিয়াছিল।

১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে পুলিশ পুনরায় আঘাত প্রদান করিল। জার্ম্মান গোপন-সন্ধানী-চক্রের সেরা সেরা গোয়েন্দাগণ এই কাগজখানির বিরুদ্ধে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুসন্ধান চালাইয়া অবশেষে প্রায় সকল লেখক ও সংবাদপত্র সরবরাহককে গ্রেফতার করিয়া ফেলিল। এমন কি ছাপখানায় যখন কাগজ ছাপা হইতেছে, সেই সময় হানা দিয়া এক সংখ্যা কাগজের সমগ্র এডিশন বাজেয়াপ্ত করিল। এই প্রকারে "লা লিবারেল বেলজিকে"র সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীদল প্রায় সকলেই বন্দী হইল—ব্যস্, দমন এইবার, 'পূর্ণাঙ্গ ও ও শেষ।' আর এই চোরা-সংবাদপত্র প্রকাশের কোন সম্ভাবনাই নাই। জার্ম্মানীতে প্রধান প্রধান কাগজে এই সুসমাচার বড় বড় হরপে বিপুল ঘটার সহিত প্রকাশ করা হইল। ব্রুসেলসের 'কম্যান্ডাণ্টুরে' উন্মত্ত উল্লাসের সৃষ্টি হইল। এই সার্থক অভিযানের দুই দিন পরে নূতন গবর্ণর জেনারেল ফন ভেকেনহসেন গোয়েন্দাপুলিশদলকে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করে।

সে এক স্মরণীয় উৎসব। "অল হাইয়েষ্ট" অর্থাৎ স্বয়ং কেইজার এক প্রশংসাসূচক অভিনন্দন-বাণী তারযোগে জানাইলেন। তাহা সমুদয় নিমন্ত্রিতদের পাঠ করিয়া শোনান হইল। তৎপর ফন ভকেনহসেন এবং নিমন্ত্রিতগণ "লা লিবার বেলজিকে"র উচ্ছেদ সাধনের আনন্দময় স্মৃতিতে মদ্য পান (শ্যাম্পেন) করিল। ভোজ তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এক আরদালী আসিয়া সামরিক কায়দায় সেলাম করিল, এবং গবর্ণর জেনারেলের হাতে একখানি গালামোহরাঙ্কিত লেপাফা অর্পণ করিল সসম্মানে। লেপাফার উপরে বড় বড় হরপে "Urgent" (জরুরী) ছাপ মারা। অবহেলার সহিত গবর্ণর জেনারেল লেপাফা ছিঁড়িয়া লিপি বাহির করিল—ভিতর হইতে লিপির বদলে বাহির হইল এক কাপি "লা লিবার বেলজিক" ১৪৩নং সংখ্যা। গবর্ণর জেনারেলের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে কাগজখানিকে দুই হাতে কুঁচকাইয়া পুঁটলি পাকাইয়া ফেলিয়া দিল, তৎপর রাগে গস্‌গস্ করিতে করিতে নিজকক্ষে চলিয়া গেল।

তাহার নিমন্ত্রিতগণ সেই কুঁচকান কাগজখানি পাট করিয়া সকলে মিলিয়া দেখিতে উৎসুক হইল—কি সে কাগজ যাহা গবর্ণর জেনারেলের এতটা উষ্মার উদ্রেক করিয়াছে। তাহাদের প্রথমেই নজরে পড়িল—"তিন বৎসর যাবত আমাদের উচ্ছেদ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং তিন বৎসরই আমরা জীবন্ত আছি।......এবং যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে একজন জার্ম্মানও থাকিবে, আমরা তাহার বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রতিরোধ করিবই। যতদিন পর্য্যন্ত এই দেশে ন্যায় এবং বিচারের অবমাননা হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা জীবিত থাকিবই উহার প্রতিবাদ করিতে। যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা সত্য গোপন করিতে চেষ্টা করিবে,—কারাগারের রুদ্ধ প্রাচীর উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া, ততদিন আমরা জীবিত থাকিবই—আমাদের জেলদারদের মুখে সত্যের জ্যোতি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে ম্লান করিয়া দিতে।......পরিণাম যাহাই হউক না কেন, আমরা এ কার্য্যে লাগিয়াই থাকিব।"

তাহাদের অন্তর্জ্বালা বর্দ্ধিত হইল এই দেখিয়া যে তাহাদের সাধ্যমত চতুরতা সত্ত্বেও কাগজখানিতে সেই পুরাতন ছদ্মনাম এবং পুরাতন লেখকদের লিখনভঙ্গীর অভ্রান্ত সুস্পষ্ট ছাপ! এবং এই সকল লেখকদিগকে বন্দী করিয়া তাহারা কারাগারে রাখিয়াছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা ঘটিয়াছে—তাহা যদি তাহারা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইত, তবে আর তাহাদের ক্ষোভের সীমা থাকিত না কারণ, কতকগুলি লেখা সত্য সত্যই কারাগারে বসিয়া লেখা হইয়াছে এবং আহার-পাত্রের কাঠের বাঁটের ভিতর পুরিয়া বাহিরে চালান দেওয়া হইয়াছে—জার্ম্মানদের নাকের ডগার সম্মুখ দিয়া। জার্ম্মান-কারাগারে পূর্ব্বপ্রথামত প্রত্যেক কয়েদীকে একটি করিয়া হাতলওয়ালা ঝুড়ি দেওয়া হইত খাদ্যদ্রব্য বহন করিবার জন্য।

আলেয়ার মত দ্রুত অদৃশ্যমান এই সংবাদপত্রের নিয়ন্তাগণ পূর্ব্বের ন্যায়ই জার্ম্মানদের উপর বিদ্বেষ-বিষদিগ্ধ বিদ্রূপাগ্নি ঢালিয়া দিয়াছে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কোথাও গোয়েন্দাদের প্রদত্ত আঘাতের কোনও উল্লেখ মাত্র নাই। না আর—কি নিদারুণ কঠোর প্রচেষ্টায় এই সংবাদপত্রের পুনরাবির্ভাব সম্ভব করা হইয়াছে—তাহার লেশমাত্র নিদর্শন।

দিন কয়েক মাত্র পূর্ব্বে ভ্যান ডেন [illegible] এ

তাহার বিবরণ মুদ্রিত করিয়া সকল স্থানে বিলি করা হইয়াছিল। তখন দুইটি মাত্র পথ তাহার খোলা ছিল—হয় দেশত্যাগ, নয় কোনও দূর পল্লীতে গোপনে অবস্থান। সে ইহার কোনটিই গ্রহণ করিল না। সে দাড়ি-গোঁফ কামাইল না, যখন দাড়ি যথেষ্ট লম্বা হইল তখন পোষাকেরও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন করিল। এই ছদ্মবেশে সে নূতন নাম গ্রহণ করিল—মশিয়ে কোরটেড্, ব্যারিষ্টার। পরিচায়ক-পত্র জাল করিয়া (নূতন ফটোসহ) সে নূতন নামেই আনাগোনা করিতে লাগিল। এবং *এইভাবে সে মহাসমরের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইল। সময়ে তাহাকে বহু কষ্টে পতিত হইতে* হইয়াছে—অনাহারের সঙ্কট তাহার ভিতর প্রধান; কারণ সরকারী কাগজপত্রে তাহার নাম তালিকাভুক্ত ছিল না, আইনসঙ্গত ডোমিসাইলও তাহার ছিল না, কাজেই আহার্য্য-প্রাপ্তির কোনও দাবী সে করিতে পারিত না প্রকাশ্যে। কিন্তু তবু সে জীবন বিসর্জ্জন দেয় নাই, কৌশলে আহার জুটাইয়া সে সংবাদপত্র রীতিমত প্রকাশ করিয়াছে।

এইভাবেই "লা লিবার বেলজিক্" তাহার প্রারব্ধ দুঃসাহসিক সংগ্রাম চালিত করিয়া চলিয়াছে, অত্যাচারী বিজেতাদের উত্যক্ত করিতে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় নাই। জাতীয় জটিল সমস্যার সমাধান এই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিশেষভাবে নির্দ্দেশিত হইত। যখনই বেলজিয়ান সাধারণের সহিত বিপক্ষ বিজেতাদের স্বেচ্ছাচারমূলক বিরূপ সম্পর্কের কোনও সমস্যার উদয় হইত, তখনই "লা লিবার বেলজিক" তাহার ধীর স্থির বিচার-বুদ্ধির দ্বারা বেলজিয়ান জাতির ভাবী চলার পথের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিত। ইহাতে কাগজখানির গুরুত্ব অনেকখানি বর্দ্ধিত হইত, তাহার উপর এই সংবাদপত্রের পুনঃপ্রকাশে মাত্র যে নিবিড় অনুপ্রেরণা নির্য্যাতিত জাতির চিত্তে জাগরূক হইত, তাহা ত ছিলই। প্রথম সূত্রপাতের দিন হইতে মহাসমরের শেষদিন পর্য্যন্ত এই সংবাদপত্র মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছে—

"বেলজিয়ানগণ, অধীর হইও না। মাথা ঠাণ্ডা রাখ, তোমাদের মর্য্যাদা ফিরিয়া আসিবে।"

১৯১৮ সালে মহাসমরের নিবৃত্তির পরে যখন রাজা এলবার্ট তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ সেনা লইয়া স্বরাজ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন অবশ্য অনেক শ্রদ্ধেয় মূর্ত্তি ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছে। "লা লিবার বেলজিকে"র কতক কর্ম্মী অত্যাচারী *আততায়ীর হস্তে আত্মবলি দান করিয়াছে। বধ্যভূমির* পার্শ্বেই তাহাদের চিরশান্তির শয্যা রচিত হইয়াছে। জার্ম্মানদের কন্‌সেনট্রেশন্ ক্যাম্পের সমাধিক্ষেত্রে কতক মহাপ্রাণ কর্ম্মী চির নিদ্রিত। আবার অখ্যাত অজ্ঞাত কত সংবাদবাহকের মৃতদেহ সীমান্তের 'তারে' ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—গলিত শবের এখন কঙ্কাল ভিন্ন কিছু অবশিষ্ট নাই। বৃদ্ধ ভিক্‌টর জোয়ারডেনের মৃত্যু হইয়াছিল বেলজিয়ান জাতির এই বিজয়লাভের সামান্য কিছুদিন পূর্ব্বে—যে বিজয়লাভের বাণী জাতির কানে ঢালিয়া দিতে প্রবীণ সম্পাদক কখনও বিরত হন নাই।

কিন্তু "লা লিবার বেলজিক" সজীব ছিল—তাহার ২০০,০০০ প্রচার-সংখ্যা সমেত, জাতিকে গর্ব্বের সহিত স্মরণ করাইয়া দিতে যে এক বৎসর পূর্ব্বে ১৩৫নং সংখ্যায় "লা লিবার বেলজিক" এই নির্ভীক শপথ-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিল—

"আমাদের যত প্রকার ক্ষতিই হউক না কেন, আমরা শপথ করিয়া বলিতেছি, যে দিন রাজা এলবার্ট তাঁহার চিরপ্রিয় রাজধানীতে বিজয় অভিযান করিবেন, সেদিন "লা লিবার বেলজিকে"র বিশেষ সংখ্যা তাঁহার যোগ্য অভ্যর্থনায় নিরত দেখিতে পাইবেন।"

মরু ও নির্ঝর

(৯৫ পৃষ্ঠার পর)

চাইলে না বলেই যে আমিও আমার প্রেমের অপমান করব, সে আমি মরে গেলেও পারব না। একটা জীবন আমার অনায়াসেই আমি এমনি করেই কাটিয়ে যেতে পারব। আর লোকানুষ্ঠান না হলেই যে বিবাহ হল না তারই বা কি মানে আছে, যেদিন তাকে আমি আমার মন দিয়েছি, সেই দিনই ত আমাদের বিবাহ হয়ে গেছে!......তবে আবার কেন?—বলতে বলতে বৃদ্ধের চক্ষু দুটি জলভারে টল্ মল্ করে উঠ্‌ল। কৌশিকের চোখ দুটিও শুষ্ক ছিল না।

'সেই দিন হতে আমি আমার মাকে আর কোন অনুরোধ করিনি কৌশিক! সেই দিন হতেই ভেবেছি তুচ্ছ সংসারের কথা তুলে আর তার সাধনার পথে ব্যাঘাত ঘটাব না! ও যদি এতেই শান্তি পায় তবে আর আমার ক্ষোভ রেখেই বা কি লাভ!.....সত্যিকারের বড় দুঃখ সে যে আপনার মুক্তিই আপনি সংগ্রহ করে নেয়! আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন ভাবি না, ভাবি আমি মরার পর, কে ওকে দেখবে; কে ওর পাশে এসে দাঁড়াবে?—'

চৈতালী এসে ঘরে ঢুকল, হাতে ওর এক কাপ গরম চা!—

'চা খান দাদা?—'

'কৌশিক চৈতালীর হাত হতে চায়ের কাপটা নিলে!

'এখান হতে যাবার আগে, একদিন আগ্রায় যাবেন দাদা, সকলে মিলে?'

'বেশত চল!......কবে যাবে বল?—'

'পূর্ণিমার রাত দেখে যাব!......চাঁদের আলোয় তাজ আমার ভাবতেও ভাল লাগে।......তাজ ত নয় যেন প্রেমের এক বিরাট অখণ্ড স্বপ্ন!......'

সে রাত্রে বিদায় নিয়ে কৌশিক যখন রাস্তায় এসে নামল, রাত তখন প্রায় দশটা।......

বাসায় এসে দেখ্‌লে, ঠাকুর চাকর ঘুমিয়ে গেছে, শুধু জেগে বসে যমুনা। কৌশিকের ক্ষিদে তেমন ছিল না। তথাপি চারটি মুখে গুঁজে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিল।......

(ক্রমশ)

স্কুল মাষ্টার

(কথিকা)

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন তার সমস্ত আয়োজন ফুরিয়ে যায়, অথচ পথের শেষ হয় না—তখন সে জগতের উৎসব গৃহের দিকে একবার শূন্যে দৃষ্টিতে তাকায়, আবার পরপারের ঘন নীল আকাশের দিকে। দেহের মন্দিরে অর্ঘ্য দিতে নূতন অতিথি পথ ভুলেও আর আসে না—মৃত্যুর দুয়ারে করাঘাত করে, কিন্তু মৃত্যু সাড়া দেয় না। উচ্ছিষ্টের উৎসবে জীবনের শেষ গোধূলি ক্লেদাক্ত হ'য়ে উঠে। এই ত জীবন—মণীশ নিতান্ত হতাশ ভাবেই ভাবে এই জীবনের পরিসমাপ্তি কোথায়? মৃত্যু—মানব জীবনের এই একটা শেষ পরিণতির দিকে আমরা সবাই ছুটিয়া চলিয়াছি।

দারিদ্র্যের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি কাহারও নাই। এমন কি আপন পরিবারস্থ সকলের সহানুভূতিও পাওয়া যায় না। ছোট শহর ছোট তার নাম—তবুও তার চাকচিক্যের দাপটে নগরখানা যেন চাংগা হইয়া উঠিয়াছে। অনাদর ও দারিদ্র্যের মাঝেও একটা আভিজাত্যের ছাপ রহিয়াছে।

মণীশ স্কুল মাষ্টার, মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনা। ইহারই সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে তাহার যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ করিতে হয়! নিত্য একই অর্থ-চিন্তা আসিয়া তাহার মনখানাকে জীর্ণ করিয়া দিয়া যায়। পরিবারটি নেহাত ছোট নয়। বৃদ্ধ মা, ছোট দুটি ভাই, স্ত্রী ও একটি শিশু সন্তান ও তদুপরি একটি বিধবা ভগ্নী আছে। তাই নিতান্ত অনাদরের মধ্য দিয়া তার দিন অতিবাহিত হয়। দিনের গায়ে দিন গাঁথিয়া দিয়া যেমন মহাকালের মাল্য রচনা হয়, তেমনি দিনের পর দিন অভাব অভিযোগের একঘেয়ে অপযশের বোঝা মাথায় নিয়া তাহার দিন কাটাইতে হয়। কখন কেমন করিয়া পটক্ষেপণ হয়, পরিবর্ত্তন আসে, নিষ্ঠুর নিয়তি পিছনের সমস্তেরই গায়ে আঘাত দিয়া ভাংগিয়া ফেলিয়া জীবনের রথ আগাইয়া দেয় তাহা কে জানে!

সবে মাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছে, এমন সময় স্ত্রী সুরমা আসিয়া বলিল আজ আমার টাকা দিতে হবে। গয়লার দুধের দাম, ঝিয়ের মাহিনা, হাওলাতি এই প্রকার ছোটখাট কত কি...... মণীশ দুর্গা দুর্গা বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতেই স্বস্তি বচন আরম্ভ হইল। সে কোন প্রতিবাদ না করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

মণীশ ষ্টোভে জল গরম করিয়া চায়ের সরঞ্জামাদি নিজ হাতেই সমস্ত গুছাইয়া নিয়া—এক কাপ চা ও একখানা বাঙলা মাসিক পত্রিকা হাতে করিয়া আরাম কেদারায় উঠিয়া বসিয়াছে; ঠিক এমনি সময় সুরমা আবার আসিয়া উপস্থিত এবং তীব্র কণ্ঠে বলিল, আজ আমার টাকা দিতে হবে! মণীশ বলিল, এই মাস-কাবার মাত্র চারদিন, এখন টাকা কোথায় পাব। সুরমা বলিল, হ্যাঁ, চারদিন—মাস-কাবার—এই করে ত দু'মাস কেটে গেল, আর কত দিন এ ভাবে কাটাতে চাও, আমি যে আর পারিনা। মণীশ বলিল, আমিই কি আর চালাতে পারি রমা? বললে কি হবে দেখতেই ত পাও; যা দিয়ে যা করি। আচ্ছা যাক এখন, একটা কথা বলি শোন, আমার জামা কাপড়গুলি খুব ময়লা হয়ে গেছে। একটু পরিষ্কার করে দাও, কাল স্কুলে ইন্সপেক্টর আসবেন। সুরমা বলিল, এই ত খোকার দুধ গরম—ঘরদোর পরিষ্কার—তারপর রান্না—কখন কি করি। আজ ত হয় না। মণীশ কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর আপন মনে বলিতে লাগিল, ইহাই নারীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সে যাহা পাইতে চায়, তাহা না পেলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাঙালীর মধ্যবিত্ত দরিদ্র পরিবারের ইতিহাসে গ্লানিময় অক্ষরেই ইহারই কীর্ত্তি কথা লিখিত থাকে।

রবিবার। বেলা এগারটা, বর্ষার অবিরাম বৃষ্টিধারায় পথ ঘাট কর্দ্দমাক্ত, বাহির হবার যো নাই। মণীশ ভাবে জামা কাপড় পরিষ্কার হবার কোন সম্ভাবনা নেই। উদ্বিগ্ন ও হতাশায় তার মনখানা একেবারে ভাংগিয়া গিয়াছে। তবু নিতান্ত দুঃখে সে তার দিদিকে বলিল, দিদি আমার জামা কাপড় পরিষ্কার করা দরকার কাল স্কুলে ইন্সপেক্টর সাহেব—ইহা বলিতেই তাহার দিদি সহানুভূতির দরদ নিয়া বলিল, আচ্ছা সে দেখা যাবে।

মণীশের দিদি জামা ও কাপড় পরিষ্কার করিয়া বারান্দায় রেলিংয়ের উপর সযত্নে নূতন দড়ি বাঁধিয়া টানাইয়া দিয়াছিল।

রাত্রির খাওয়া দাওয়ার পর মণীশ ঘরে বসিয়া একখানা ইংরেজী নভেল পড়িতেছিল। সুরমা এসে বলিল,—এ মাসের মাহিনা হলেই আগে আমার দেনা শোধ করতে হবে। তারপর আর সব। মণীশ বলিল, তোমার দেনা ত শোধ হবার বন্দোবস্ত করলে—তারপর আর সকলের বন্দোবস্তটা কি করে হবে। সুরমা বলিল—যারা খেটে খায় তাদের উপর জুলুম করা ত চলে না। মণীশ—জুলুম কারও উপরেই চলে না রমা? এইরকম অসম্ভাবনীয়তাই আমাদের স্মরণ করে দেয় এটা সংসার। ভাই, বন্ধু সে ত শুধু বাল্যের খেলা ঘরে। মায়ের কোলে জীবনের ক্ষেত্রে তারা কোথায়? খেলাঘরের কত সত্য পদাহত হয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠে—স্বার্থসংকুচিত জীবনের ক্ষুদ্র অবসরে তা খুঁজে বেড়ান চলে না রমা। যাক্ এখন ঘুমও—তারপর তোমার দেনা আর আমার সংসার—পাকা করে সকলের বন্দোবস্ত একসংগে করব, এই বলিয়া মণীশ বিছানায় এলাইয়া পড়িল।

কেমন করিয়া বাদল রাত্রি কাটিয়া গেল—তাহার হুঁস নাই। হঠাৎ ঘুম ভাংগিতেই বাহিরে আসিয়া দুর্গা দুর্গা বলিয়া আকাশের দিকে চাহিতেই—তার মনে হ'ল—এই পৃথিবীটা কি কুৎসিত—প্রভাতের আলো যেন আজ আবছায়া ঢাকা একটা ভারাক্রান্ত বেদনায় ভরপুর। হঠাৎ রেলিংয়ের উপর চোখ পড়িতেই দেখিতে পাইল, বাদলা রাত্রির বাতাসের স্বেচ্ছাচারিতায় দড়িখানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং জামা কাপড় নীচে কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। কাহাকেও

(শেষাংশ ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্য হরিণের তত্ত্বাবধান

সমগ্র মার্কিন যুক্তরাজ্যের বন-কানন রাষ্ট্রের সুনিয়ন্ত্রণে শুধু বৃক্ষলতাদি সম্পদেই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধতর হইতেছে এমন নয়। ঐ সকল বন-কাননের সকল প্রকার জন্তু-জানোয়ার-পাখীর প্রতিও কর্তৃপক্ষের সতত সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে।

কোনও জাতীয় উদ্ভিদ যেমন সংখ্যায় সংকীর্ণ হইয়া আসিলে, রাষ্ট্র হইতে আইনদ্বারা উহার বিহিত সংরক্ষণ ও সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত হয়, তেমনই জীবজন্তুর কোনও নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী যদি খাদ্য-খাদক নীতির কবলে পড়িয়া স্বাভাবিকভাবে ক্রমশ সংখ্যায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর

এই সদ্যোজাত হরিণ-শিশুর একদিন বয়স হইয়েছে কিনা সন্দেহ; এখনও পায়ের ব্যবহার পুরাপুরি আরম্ভ হয় নাই; মানুষ কিম্বা এই নিবিড় অরণ্যের দুরন্ত জানোয়ারের ভয়ও উহার জানিত নয়

হইতে থাকে, কিম্বা কোনও নৈসর্গিক কারণে নানা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বন-কানন হইতে নিশ্চিহ্ন হইবার অবস্থায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও রাষ্ট্র তাহার যথাসাধ্য প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর হয়।

এই বিভাগের উদ্ভিদ ও জীবজন্তু যাহাতে সর্ব্বসময়ে যথাবিহিত সংরক্ষণের সাহায্য লাভ করিতে পারে, এইজন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা গঠিত মার্কিন যুক্তরাজ্যের ফরেষ্ট সার্ভিস বিভাগ রহিয়াছে। উহার অন্তর্গত আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের ভার লইয়া 'ন্যাশনাল ফরেষ্ট গেম প্রিজার্ভ' নামক বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে। উহাদের কর্ত্তব্য যেমন নিজ নিজ এলাকার বন-কাননের উদ্ভিদ সমানভাবে রক্ষা করা, তেমনি জীবজন্তুগুলিরও ক্রম বা নিঃশেষে বিলোপের প্রতিবিধান করা।

এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য অরণ্যের নির্দ্দিষ্ট অংশে যেমন কোন বৃক্ষাদি বিনা অনুমতিতে ছেদন আইনদ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়, ঠিক সেই প্রকারই জীবজন্তু শিকারও বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। শুধু তাহাই নয়—যখন কোনও বিশেষ জাতীয় জীবজন্তুর শিকারদ্বারা বিলোপের আশঙ্কা করা হয়, তখনই শুধু বনে-কাননে নয় সমগ্র মুল্লুকেই সেই জাতীয় জীবজন্তুর শিকার একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এবং জনসাধারণ সে আইন মানিয়া চলে কিনা, সেই অনুসন্ধানের জন্য গেম-প্রিজার্ভ বিভাগের রক্ষী-প্রহরী প্রভৃতি সারা অঞ্চলে গোপনে এবং প্রকাশ্যে পাহারা দিতে আরম্ভ করে।

এই প্রকার পাহারা দ্বারাও হয়ত তাহাদের উদ্দেশ্য সকল সময় সফল হয় না এবং তাহারই জন্য অভিজ্ঞ প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া যে অঞ্চলে যে প্রকারের প্রতি-বিধান তাঁহাদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক, সেই সকল ফন্দি-ফিকিরের ব্যবস্থা করা হয়।

সকল অঞ্চলের অরণ্যাদিতে সকল প্রকার জীবজন্তুই একই অনুপাতের সংখ্যায় থাকে না—আবার একই প্রকার পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবেও পড়ে না। কাজেই অবস্থানুযায়ী বিচক্ষণ ব্যবস্থা না হইলে জীবজন্তু-সম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না অথবা ইচ্ছানুরূপ নির্দ্দিষ্ট জাতির সংখ্যাবৃদ্ধিও করা যায় না। ইহার বিহিত বিধি-ব্যবস্থার জন্য চাই সুনিপুণ প্রাণিতত্ত্ব-বিশারদ, যাহারা শুধু পুঁথিগত বিদ্যায়ই বিশারদ নয়, অভিজ্ঞতাদ্বারা যাহারা বিশেষ বিশেষ স্থলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ দ্বারা সুফল দর্শাইতে পারে।

বহুকাল পূর্ব্বে দেশ পত্রিকায় আমরা কাথিয়াবাড়ের গির কানন এবং মহীশূরে ও নিজামরাজের অরণ্যগুলির পরি-চালনের কিছু কিছু কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলাম। উহাতে দেখা গিয়াছিল গির কাননে সিংহের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে, কিন্তু ব্যাঘ্রের সংখ্যা, বিশেষ করিয়া যে দুরন্ত জানোয়ারগুলিকে 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' আখ্যা দেওয়া হয়, সেইগুলি ক্রমশ বেপরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেখানে সিংহ বংশকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিকার বন্ধ করা হয়। মহীশূরের কাননেও কোন জীবজন্তু সংখ্যায় কমিয়া গেলে, কি উপায়ে উহাদের বংশবৃদ্ধির সাহায্য করা হয়—নির্দ্দিষ্ট বনের অংশ বিশেষ হইতে অংশান্তরে আনয়ন করা হয়—সহজে খাদ্য সংগ্রহের জন্য অপর্য্যাপ্ত সংখ্যা-সংযুক্ত জাতির নিকৃষ্ট জানোয়ারগুলিকে রক্ষণীয় জন্তুগুলির আয়ত্তে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়—সকল বিষয়ই আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না।

আমাদের আলোচ্য বিষয় এই প্রবন্ধে হইল—মার্কিন যুক্তরাজ্যের বন-কাননে বন্য-হরিণ সংরক্ষণের কি কি সুনিয়ম প্রচলিত, তাহারই আভাষ প্রদান করা। আমরা একটি গেম-প্রিজার্ভ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী দ্বারা তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দৃষ্টান্তস্বরূপ পিস্‌গাহ্‌ ন্যাশনাল ফরেষ্ট গেম-প্রিজার্ভটিকেই ধরা যাউক। উত্তর ক্যারোলিনা অঞ্চলের ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ কানন-প্রদেশ, কারণ এখানে নানাজাতীয় বিচিত্র হরিণ এমন রহিয়াছে, যাহা পূর্ব্বে সমগ্র মার্কিনের অন্য

বন্য হরিণ-শিশুর পক্ষে এই মনুষ্যের পানীয় অবশ্য অভ্যস্ত খাদ্য নয়, কিন্তু এক চুমুক খাওয়ার পর উহার আস্বাদ বুঝিবে এবং এই খাদ্যই পুষ্টিকারক বলিয়া এক নিঃশ্বাসে শেষ করিবে

কোথাও দেখা যাইত না। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সুযোগ্য বন-বিভাগের পরিচালনে নানা অভিনব উপায়ে হরিণ সংরক্ষণ করিয়া এই অঞ্চল হইতে দেশের সর্ব্বত্র চালান দেওয়াতে হরিণবংশ লোপের ত কোনই আশঙ্কা নাই, অধিকন্তু শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হরিণ দেশের সকল অংশে সমানভাবে বিতরণ করিয়া দেওয়াও সম্ভব হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় যে, ফুটকীওয়ালা অতি সুন্দর হরিণগুলি যেন ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। এই লইয়া একটা আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ফিডারেল গবর্ণমেণ্ট এক অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেন। উক্ত কমিটির রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া এই জাতীয় হরিণের শিকার সমগ্র পিস্‌গাহ্‌ অরণ্যে নিষিদ্ধ করা হয়। কয়েক বৎসর চলিয়া যায় কিন্তু তাহাতেও বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না।

একই অবস্থায় আরও কিছুকাল কাটিয়া যায়, বন-বিভাগ তাহাদের প্রহরার কার্য্যে কড়াকড়ি আরও বাড়াইয়া দেয়। পরিশেষে তাহাতেও আশানুরূপ উন্নতি সম্ভব না হওয়াতে ১৯৩৪ সালে হরিণ সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করা হয়—উহাদের শাবক লালন-পালনের এক বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া।

হরিণ শিশুর যোগ্য খাদ্য সরবরাহ, উহাদের সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি করিবার জন্য অভিজ্ঞ পশু-পালকসমূহকে নিযুক্ত করা হইল। পিস্‌গাহ্‌ অরণ্যের একাংশ অতি দৃঢ়ভাবে বৃক্ষ-প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও করিয়া সেখানে সকল হরিণ শিশু রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল। নিপুণ পশু-পালকদের বনে বনে ঘুরিয়া হরিণ শিশু সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হইতে লাগিল। আবার বন-বিভাগ হইতে পুরস্কার ঘোষণা করা হইল—যে কেহ একটি হরিণ শিশু আনিয়া গেম প্রিজার্ভের কর্ম্মচারীদের হস্তে প্রদান করিবে, তাহাকে নগদ চারি ডলার পারিতোষিক প্রদান করা হইবে। এই পন্থায় শীঘ্রই সন্তোষ-জনক সংখ্যায় হরিণ শিশু সংরক্ষণের জন্য সংগৃহীত হয়।

ঘেরাও স্থানটি সঙ্কীর্ণ নয়। অরণ্যের বৃক্ষ-লতাদি অটুটই রাখা হইয়াছে, কেবল কোনও হিংস্র জন্তুকে সেই অংশে

স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে যখন হরিণ-শিশু নির্দ্দিষ্ট বয়স প্রাপ্ত হয়, তখন উহাকে দূরবর্ত্তী অরণ্যে প্রেরণ করিবার জন্য মোটর ট্রাকে বোঝাই করা হয়—গন্তব্য স্থানে (অর্থাৎ যে বনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত) পৌঁছিলে, উহাকে আর বন্দী রাখা হইবে না—স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে

প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সেইজন্য জীবিত বৃক্ষের পাশে পাশে মোটা খুঁটি পুঁতিয়া ঘেরাও বেড়াটিকে ইষ্টক-প্রাচীরের ন্যায় দুর্ভেদ্য করা হইয়াছে। তথাপি প্রথম

প্রথম দলে দলে নেকড়ে, কখনও বা হায়েনা বা পিউমা আসিয়া হানা দিত। সেই সময় রক্ষীরা উহাদের গুলী করিত, কখনও আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া ও ফাঁকা আওয়াজের দ্বারা ভীতির সঞ্চার করিয়া দুরন্ত জানোয়ারগুলিকে পলাইতে বাধ্য করিত।

হরিণ শিশুগুলিকে খাইতে দেওয়া হয়—যব বা গমের চুনি সিদ্ধ করিয়া সেই মণ্ড আর অতি কচি ঘাস, পাতা প্রভৃতি। মাতৃস্তন্য ব্যতীত কিভাবে এই সকল কচি ছানাকে বাঁচাইয়া তোলা যায়—এই সমস্যা বন-বিভাগের পশু-পালক-দিগকে কম হয়রান করে নাই। গরু বা ছাগলের দুধ খাওয়াইয়া ছানাগুলিকে পালিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সুফল পাওয়া যায় নাই। গরু বা ছাগলের ব্যাধি দুধের সঙ্গে সংক্রমিত হইয়া হরিণ শিশুগুলিকে অকালে কালের কবলে প্রেরণ করিয়াছে। পরিশেষে মণ্ডের ব্যবস্থায় সে সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। বাচ্চার প্রয়োজনানুসারে এই মণ্ডে যেমন ঔষধাদি মিশ্রিত করা হয়, তেমনি নানাপ্রকার অতি পুষ্টিকর বীজাদিও মিশাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

অনেক সময় পশু-পালকগণ বন মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এমন হরিণ-ছানা ধৃত করে, যাহার বয়স হয়ত একদিনের বেশী নয়। উহারা হয়ত পায়ের ব্যবহারই ভালমত আয়ত্ত করিতে তখনও পারে নাই। উহাদের বিপদ-আপদ সম্বন্ধে কোন ধারণাই থাকিবার কথা নয়। কে শত্রু, কে মিত্র—এই সকল বাছিয়া লইবার ব্যাপারে ইহারা একেবারে জ্ঞানহীন।

কাজেই বন-বিভাগ যদি এই সকল কচি ছানার সযত্নে লালন-পালনের ভার গ্রহণ না করিত, তাহা হইলে ইহাদের একটিও যে পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হইত না, একথা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কারণ কচি ছানার শত্রু—শেয়াল, নেকড়ে, ভোঁদড়, ভাম প্রভৃতি গৃধ্নু জন্তুগুলি এই অরণ্যের যেখানে সেখানে অগণিত সংখ্যায় বাস করে।

এই প্রকারে পশু-পালনের খোঁয়াড়ে হরিণ শিশুগুলিকে পালন করিয়া নির্দ্দিষ্ট বয়স প্রাপ্ত হইলে এই কাননে এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ সকল অরণ্যে প্রেরণ করা হয়। প্রতি বৎসর আনুমানিক পাঁচ-ছয় শত হরিণ-শিশু পিসগাহ বন মধ্যস্থ পশু-পালন আগার হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়।

যে সকল অরণ্যে এই জাতীয় হরিণের সংখ্যা অত্যল্প সেই সকল অরণ্যেই এখান হইতে বাচ্চা পাঠান হইয়া থাকে, যদি দূর পথে রেল বা মোটরযোগে পাঠাইতে হয়, সেই স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ছানাগুলিকেই বাছিয়া লওয়া হয় এবং রেলে বা মোটরে দীর্ঘ যাত্রা করাইবার পূর্ব্বে ছোট ছোট মোটর ট্রাকে করিয়া উহাদের ঘুরাইয়া ঐরূপ যাত্রায় অভ্যস্ত করা হয়। গন্তব্যস্থানে বাচ্চাগুলি পৌঁছিলে আর আবদ্ধ রাখা হয় না, তখন স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার জন্য অরণ্যের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

এই প্রকারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন-বনানী পর্য্যন্ত ক্রমশ অতুল সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

স্কুল মাষ্টার

(১০১ পৃষ্ঠার পর)

কিছু না বলিয়া নীচে নামিয়া মণীশ স্বহস্তে জামা কাপড় পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া মুছিয়া আবার রেলিংয়ের উপর টাঙ্গাইয়া দিল। প্রতিদিন যেমন করিয়া সময় কাটে, তেমনি সহজ স্বাভাবিকতার মধ্যেই স্নানাহার করিয়া ঘড়ির পানে তাকাইতেই দেখিতে পাইল সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। জামা ও কাপড় অর্দ্ধশুষ্ক অবস্থায় রেলিংয়ের উপর পড়িয়া আছে। সবে মাত্র আকাশের মেঘ কাটিয়া অরুণদেব উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছেন। এমন সময় তাহার বৃদ্ধা মা ও দিদি আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। স্নেহ-করুণ কণ্ঠে মা বলিল, ভিজে জামা কাপড় পরে কি করে যাবি? মণীশ শুধু বলিল, উপায় নেই। ভগবানের দেওয়া দুঃখ যে অমৃতের আশীর্ব্বাদ ইহা মনে করিয়াই দ্বিধাহীনভাবে অর্দ্ধশুষ্ক জামা কাপড় পরিধান করিয়া ছেঁড়া ছাতাটা হাতে নিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল,—বাঙলার এই শত দুঃখ বিড়ম্বনা, অনটন দুর্দ্দশার মধ্যে জন্মিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছে সন্দেহ নাই; তাহা হইলেও তাহার ঠকিতে হয় নাই। মা ও বোনের পবিত্র স্নেহাঞ্চলের অন্তরালে শান্তরম্য গৃহকোণে বোধ হয় বাস্তবজগতের অতুল সম্পদ হইতে মূল্যবান সম্পদে সে চির সমৃদ্ধ।

বিজয়ী প্রেম-সঙ্গীত

(গল্প—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

—আট—

পরদিন অতি প্রত্যুষেই মুসিয়ো কোথায় যেন চলিয়া গেল। ভ্যালেরিয়া তাহাকে অদূরবর্ত্তী একটি মঠে লইয়া যাইবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিল। কারণ সেই মঠেই তাহার বৃদ্ধ ঋষিপ্রতিম ধর্ম্মপিতা বাস করিতেন। তাঁহার উপর ভ্যালেরিয়ার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল সুতরাং সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে। ফেবিয়োর প্রশ্নের জবাবে সে বলিল যে, গত কয়েকদিনের ঘটনা বিপর্য্যয়ে বিক্ষিপ্ত তাহার হৃদয় নিরুদ্বিগ্ন করিবার জন্য সে তাঁহার নিকট 'কনফেশন' করিবে। তাহার বিগতশ্রী মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফেবিয়ো ভ্যালেরিয়ার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিল; হয়ত শ্রদ্ধেয় লরেঞ্জো তাহাকে সময়োচিত উপদেশ দিতে এবং তাহার সন্দেহ বিদূরিত করিতে পারিবেন। চারিজন ভৃত্যের সহিত ভ্যালেরিয়া মঠের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। ফেবিয়ো বাসায়ই রহিয়া গেল। ভ্যালেরিয়ার অপেক্ষায় ফেবিয়ো বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং আপনার মনে ভ্যালেরিয়ার এই মানসিক বিপর্য্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সঙ্গে একটা নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্ক, রোষ এবং একটা অনিশ্চিত শঙ্কার ভাব তাহাকে পীড়িত করিতেছিল।......মুসিয়োর সহিত দেখা করিতে ফেবিয়ো তাহার গৃহে গেল কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ফিরে নাই। তাহাকে দেখিয়াই কিন্তু সেই মালয় দেশী ভৃত্যটি বিনীতভাবে মাথা নোয়াইয়া প্রস্তর মূর্ত্তির মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ঐ ব্রোঞ্জের মত মুখে ফুটিল একটা বিশ্রী হাসি, অবশ্য এটা ফেবিয়োরই কল্পনা।

ইতিমধ্যে ভ্যালেরিয়া তাহার ধর্ম্মপিতার নিকট সবিস্তারে সব কিছু বলিল। বলিবার সময় তাহার লজ্জা হইতে ভয়ই করিতেছিল বেশী। ধর্ম্মপিতা তাহার কথা মনোযোগের সহিত শুনিলেন, শুনিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্য তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন। কিন্তু সব শুনিয়া তাঁহার কেমন যেন মনে হইল; তিনি ভাবিলেনঃ "চারিদিকে একটা মায়াজাল বিস্তার হচ্ছে.....ব্যাপার বড় সুবিধা মনে হচ্ছে না, এটা বন্ধ করা উচিত।"......ফেবিয়োকে স্বস্তি দিবার জন্য তিনি নিজেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ী আসিলেন। ফেবিয়ো ধর্ম্মপিতাকে দেখিয়া একটু আশ্চর্যান্বিত হইল; কিন্তু তিনি তাহাকে শান্ত করিলেন। ফেবিয়োকে একলা পাইয়া ভ্যালেরিয়ার ধর্ম্মপিতা যদি সম্ভব হয় তবে তাহার আমন্ত্রিত অতিথিকে বিদায় দিবার উপদেশ দিলেন, অবশ্য ভ্যালেরিয়া স্বীকারোক্তিতে যাহা বলিয়াছিল সে-কথা কিছুই উল্লেখ করিলেন না। শুধু বলিলেন যে, তাঁহার মনে হয় এই লোকটিই তাহার গল্প, গান এবং ব্যবহার দ্বারা ভ্যালেরিয়ার কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া এই বিপদ সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার মতে ধর্ম্মে কোনদিনই মুসিয়োর বিশ্বাস ছিল না, তার উপর এতদিন অখৃষ্টান দেশসমূহে বাস করিয়া হয়ত নানাপ্রকার তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি হয়ত সে যাদুবিদ্যাও শিখিয়া আসিয়াছে, সুতরাং পুরাতন বন্ধুত্বের দাবী থাকা সত্ত্বেও সতর্কতার জন্য বর্ত্তমানে বন্ধু-বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য।

ফেবিয়ো এই শ্রদ্ধেয় তাপসের কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করিল; স্বামীর নিকট ধর্ম্মপিতার উপদেশ শুনিয়া ভ্যালেরিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। পরে পতিপত্নীর শুভেচ্ছা এবং গরীব মঠবাসীদের জন্য প্রচুর মূল্যবান উপহার লইয়া বাবা লরেঞ্জো বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

নৈশ আহারের পর মুসিয়োর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য ফেবিয়ো অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সেই আজব প্রকৃতির অতিথি তখনও ফিরিল না। পরদিনই এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করিবে ভাবিয়া তাহারা শয়ন করিতে গেল।

—নয়—

ভ্যালেরিয়া শীঘ্রই নিদ্রামগ্ন হইল, কিন্তু ফেবিয়োর ঘুম আসিল না। পূর্ব্বে যাহা কিছু সে দেখিয়াছিল, যাহা কিছু সে অনুভব করিয়াছিল এখন এই নৈশ-স্তব্ধতায় তাহা সুস্পষ্ট-রূপ ধরিয়া তাহার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে সংশয়ে আপনাকে প্রশ্ন করিল কিন্তু পূর্ব্বের মত কোন জবাব পাইল না। আচ্ছা, সত্যি কি মুসিয়ো একজন মায়াবী? সে কি সত্যি ভ্যালেরিয়াকে সম্মোহিত করিয়াছে? ভ্যালেরিয়া আজ অসুস্থ......কিন্তু কি তার ব্যাধি? হস্তের উপর মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সে যখন দুঃখের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল ঠিক সে সময় নির্মেঘ নীলাকাশে চন্দ্র উদিত হইল। তাহারই উজ্জ্বল আলো অর্দ্ধ-স্বচ্ছ বাতায়নের শাশীতে আসিয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে ভাসিয়া আসিল একটা নিশ্বাস অনেকটা মৃদু সুরভিত মলয়ের মত......ক্ষণপরে একটা ব্যাকুল আবেগ-পূর্ণ অস্ফুট ধ্বনি শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে ভ্যালেরিয়ার দেহ নড়িয়া উঠিল। সচকিত বিস্ময়ে ফেবিয়ো চাহিয়া রহিল; ভ্যালেরিয়া প্রথমত শয্যা হইতে এক পা নামাইল, তারপর আরেক পা নামাইয়া নিদ্রাচরের মত নিষ্প্রভ নয়ন উন্মীলিত করিয়া বাহু প্রসারিত অবস্থায় বাগানের দরজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফেবিয়ো এক লক্ষে অন্য দ্বারপথে শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া বারান্দা ঘুরিয়া শীঘ্র গিয়া বাগানের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।......দরজার হাতলটা ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল দরজা খুলিবার জন্য কে যেন ভিতর হইতে চাপ দিতেছে......কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও দরজা খুলিল না......একটা ভী[illegible] আর্ত্তনাদ ধ্বনিয়া উঠিল।

"মুসিয়ো নিশ্চয় শহর হ'তে ফেরে নাই," ফেবিয়ো ভাবিতে ভাবিতে মুসিয়োর ঘরের দিকে চলিল।

গিয়া কি দেখিল?

দেখিল, দুই বাহু প্রসারিত এবং নিশ্চল আঁখি দুটি বিস্ফারিত করিয়া—মুসিয়ো উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে পরি-প্লাবিত পথে অগ্রসর হইতেছে।......ফেবিয়ো দৌড়াইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল কিন্তু মুসিয়ো তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার

সংবেদনশীল আনন চন্দ্রালোকে হাসিতেছিল ঠিক সেই মালয়বাসী ভৃত্যের হাসির মত। ফেবিয়ো তাহাকে ডাকিতে উদ্যত হইয়াই থামিয়া গেল...সেই মুহূর্ত্তে তাহার বাড়ীর একটি জানালা খোলার শব্দ হইল। সে ঘুরিয়া বাড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল।...দেখিল তাহার শয়নকক্ষের বাতায়ন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং বাতায়ন-শিলার উপর পা রাখিয়া ভ্যালেরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে...এবং তাহার প্রসারিত বাহুদ্বয় যেন মুসিয়োকে অনুসন্ধান করিতেছে, আলিঙ্গনা-কাঙ্ক্ষায় তাহার সর্ব্বদেহ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

অসহ্য ক্রোধে ফেবিয়োর সর্ব্বদেহ অকস্মাৎ জ্বালা করিয়া উঠিল। "তবে রে কৃতঘ্ন শয়তান!" বলিয়া সে ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। এক হস্তে মুসিয়োর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া অপর হস্তে কোমরবন্ধ হইতে ছোরা বাহির করিয়া মুসিয়োর বক্ষে তাহা আমূলে বিদ্ধ করিয়া দিল।

মুসিয়ো মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং করতলে ক্ষতস্থান চাপিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নিজের আবাসস্থান অভিমুখে প্রস্থান করিল।......মুসিয়োকে আঘাত করিবার পর-মুহূর্ত্তে ভ্যালেরিয়াও অরুন্তুদ আর্ত্তনাদ করিয়া ছিন্নমূল ব্রততীর মত ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

ফেবিয়ো ত্বরায় ভ্যালেরিয়াকে উত্তোলন করিল। তাহাকে শয্যায় শায়িত করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিল।...

ভ্যালেরিয়া অনেকক্ষণ নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মিলিত করিল। আসন্ন মৃত্যু-ভয়বিমুক্ত ব্যক্তির মত স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস তাহার সমস্ত বক্ষ মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। আপনার বাহুদ্বয়ে স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাহার বুকে আশ্রয় লইল।

"ওগো তুমি এসেছ, তুমি?" ভ্যালেরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল। ক্রমশ তাহার বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া আসিল, মস্তক বালিশে লুটাইয়া পড়িল, স্মিতহাস্যে অস্ফুটে কহিলঃ "হে দয়াময়, বিপদের মেঘ এবার কেটে গেছে...কিন্তু আমি বড়...বড় শ্রান্ত।" বলিয়াই সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

—দশ—

ফেবিয়ো তাহার পার্শ্বে বসিয়া ভ্যালেরিয়ার পাণ্ডুর, কৃশ কিন্তু শান্ত সমাহিত আননের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অতীতের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া ভবিষ্যতে কি করা প্রয়োজন তাহাই ভাবিতে লাগিল। বর্ত্তমানে তাহার কর্ত্তব্য কি? যদি ছোরার আঘাতে সত্যি মুসিয়োর মৃত্যু হইয়া থাকে—ছোরাটা যতখানি বিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে মৃত্যু যে হইয়াছে এ বিষয়ে সে স্থির নিশ্চয়—তবে তাহার মৃত্যু কাহিনী ত চাপাইয়া রাখা যাইবে না। ব্যাপারটা ডিউকের এবং বিচারকদের নিকট বলিতে হইবে...কিন্তু কি করিয়া সে এই অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা দিবে? ফেবিয়ো নিজেই নিজের বাড়ীতে আশ্রিত বিশিষ্ট বন্ধু এবং আত্মীয়কে হত্যা করিয়াছে। লোকে হয়ত প্রশ্ন করিবে, "কেন, কিসের জন্য এই হত্যাকাণ্ড?..." কিন্তু মুসিয়োর যদি সত্যি মৃত্যু না হইয়া থাকে? অনিশ্চিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবার মত মনের জোর আর ফেবিয়োর ছিল না। ভ্যালেরিয়ার গাঢ় নিদ্রা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া সে অতি সন্তর্পণে উঠিয়া মুসিয়োর ঘরের দিকে হাঁটিতে লাগিল। সেখানে একটা অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। শুধু মাত্র একটি জানালা দিয়া ঘরের আলো দেখা যাইতেছিল। শঙ্কিত হৃদয়ে ফেবিয়ো সদর দরজা খুলিয়া ফেলিল (দরজায় তখনও রক্তমাখা আঙুলের চিহ্ন লাগিয়াছিল এবং বালুকাময় পথে রক্তের ফোঁটাগুলি কালো হইয়া উঠিয়াছিল)। অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রথম কক্ষটি অতিক্রম করিয়া দ্বারের নিকট আসিয়াই সে থামিল...সম্মুখে যে দৃশ্য সে দেখিল তাহাতে বিস্ময়ে যেন পাষাণে পরিণত হইয়া গেল।

কক্ষের মধ্যস্থলে একখানা পারস্য দেশীয় শালের উপর রেশমী ঝালর দেওয়া একটি বালিশে মাথা রাখিয়া স্কার্লেট রঙের আর একখানা শাল গায় দিয়া হাত পা ছড়াইয়া মুসিয়ো শুইয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডল মোমের মত হলদে, নয়নদ্বয় মুদ্রিত, নেত্রপুট নীল। দেহে শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন লক্ষণ নাইঃ মনে হয় যেন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পদতলে শালে গা ঢাকিয়া সেই মালয় ভৃত্য জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। তাহার বাঁ হাতে ফার্ণ জাতীয় গাছের কয়েকটি শাখা, সম্মুখে ঈষৎ ঝুঁকিয়া সে তাহার প্রভুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়াছিল। গৃহতলে প্রোথিত একটি ক্ষুদ্র মশাল হইতে হরিদ্রাভ অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল। কিন্তু শিখাটি একেবারে নিষ্কম্প, নির্ধূম। ফেবিয়োকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াও ভৃত্যটি একটুকুও নড়িল না, শুধু চোখ ঘুরাইয়া তাহাকে একবার দেখিয়া মুসিয়োর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। মাঝে মাঝে নিজের দেহ তুলিয়া সে সেই শাখাটি শূন্যে আন্দোলিত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাক্‌হীন ওষ্ঠদ্বয় ওঠানামা করিল—দেখিয়া মনে হইল যেন সে শব্দহীন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। মুসিয়ো এবং সেই ভৃত্যটির মাঝখানে মাটিতে ছোরাটি পড়িয়াছিল—যে ছোরা দিয়া ফেবিয়ো তাহার প্রিয়বন্ধুকে হত্যা করিয়াছে। ভৃত্যটি তাহার হস্তস্থিত শাখাদ্বারা রক্তাক্ত ছোরাটির উপর আঘাত করিল। কিছুক্ষণ পরে আবার আঘাত করিল। ফেবিয়ো তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া একটু নীচু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ "ওকি মরে গেছে?" ভৃত্যটি তাহার মস্তক ঈষৎ অবনত করিল এবং পরে শালের নীচ হইতে তাহার দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল। ফেবিয়ো আবার প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইতেই সে আবার তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিল। বিস্মিত ক্রুদ্ধ ফেবিয়ো নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিল।

ভ্যালেরিয়া পূর্ব্বের মত পরম শান্তিতে ঘুমাইতেছিল। ফেবিয়ো কাপড় জামা না ছাড়িয়াই করতলে মাথা রাখিয়া জানালার ধারে বসিয়া পড়িল এবং গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল। দূর গগনে ঊষার আলো ফুটিয়া উঠিল কিন্তু তাহার চিন্তার সমাপ্তি ঘটিল না। ভ্যালেরিয়া তখনও নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতেছিল।

—এগার—

ফেবিয়ো ভাবিল ভ্যালেরিয়া না জাগা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে এবং পরে তাহাকে সঙ্গে লইয়া শহরে যাইবে। হঠাৎ

কে যেন এই সময় শয়নকক্ষের দ্বারে মৃদু করাঘাত করিল। ফেবিয়ো দ্বার খুলিয়া দেখিল তাহার বৃদ্ধ খাশমুন্সী এণ্টোনিয়ো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

"মহাশয়," বৃদ্ধ বলিল, "সেই মালয় দেশবাসী ভৃত্য এসে বলল যে, সিনর মুসিয়ো অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছেন। তিনি এক্ষুণি শহরে চলে যেতে চান। ও'র মালপত্র বাঁধা-ছাঁদার জন্য তিনি আপনাকে লোক দিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। ডিনারের সময় তাঁর মালপত্র, ঘোড়া এবং কয়েকজন রক্ষী পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। আপনার কোন আপত্তি আছে এতে?"

"সেই ভৃত্যটিই তোমায় একথা বলল?" ফেবিয়ো জিজ্ঞাসা করিল। "ওতো বোবা, কি করে ও এসব বলল?"

"এই দেখুন না কাগজখানা, এতেই ও আমাদের ভাষায় সব স্পষ্ট লিখে দিয়েছে।"

"মুসিয়ো বুঝি খুব অসুস্থ?"

"হ্যাঁ তিনি অত্যন্ত পীড়িত। তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।"

'ডাক্তার ডাকা হয়নি?"

"না, ভৃত্যটি ডাক্তার ডাকতে দেয়নি।"

"সেই ভৃত্যটি নিজেই এসব লিখে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ, সেই দিয়েছে।"

ফেবিয়ো কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

"বেশ, যা হয় বন্দোবস্ত কর।"

এণ্টোনিয়ো চলিয়া গেল।

ফেবিয়ো তাহার ভৃত্যের গমন-পথের দিকে বিহ্বল হইয়া তাকাইয়া রহিল। "তবে ও মরেনি?" সে ভাবিল...কিন্তু ইহাতে আনন্দ করিবে না দুঃখ করিবে ভাবিয়া পাইল না। "সে অসুস্থ?" কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্বেই সে যে তাহার শব দেখিয়াছে!

ফেবিয়ো ভ্যালেরিয়ার শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া গেল। ভ্যালেরিয়ার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে মস্তক ঈষৎ উত্তোলন করিল। পরস্পরের ভিতর একটা গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টির বিনিময় হইল।

"সে কি মরে গেছে?" ভ্যালেরিয়া অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিল।

ফেবিয়ো চমকাইয়া উঠিল।

"কি বললে...সে মরেনি?—তুমি দেখেছ তাকে?...সে কি চলে গেছে?" ভ্যালেরিয়া প্রশ্ন করিল।

"না এখনও যায়নি, তবে আজই চলে যাবে।"

ভ্যালেরিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল।

"ওকে আর কখনো আমি দেখতে পাব না?"

"না।"

"অমন স্বপ্ন আর আমি দেখব না?"

"না।"

ভ্যালেরিয়ার ওষ্ঠে হাসি দেখা দিল।

আপনার করপল্লব স্বামীর দিকে আগাইয়া দিল।

"ওগো শুনছ, আমরা কিন্তু ওর সম্বন্ধে আর কোনদিনও আলোচনা করব না। ও চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আর এ-ঘর ছেড়ে কোথাও বেরুব না। আচ্ছা, এবার তুমি আমার দাসীকে পাঠিয়ে দাও...হ্যাঁ, একটু দাঁড়াও: এটাও তুমি নিয়ে যাও।" বলিয়া অদূরে ঝুলান একটি মুক্তাহারের প্রতি তাহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। এই হার ছড়াটিই মুসিয়ো তাহাকে দিয়াছিল। "হারটিকে এক্ষুণি একটা সুগভীর কূপে ফেলে দাও। একবার আমায় তোমার বুকে তুলে নাও—বল, আমি তোমারই আছি!......আচ্ছা, এবার তুমি যাও......ও লোকটা না যাওয়া পর্য্যন্ত আর তুমি এস না কিন্তু।"

ফেবিয়ো মুক্তার হারছড়াটি তুলিয়া লইল, মনে হইল যেন মুক্তাগুলি ঈষৎ মলিন হইয়া গিয়াছে। তারপর ভ্যালেরিয়ার অনুরোধমত সে উহা ফেলিয়া দিল। বাগানের ভিতর ইতস্তত কিছুক্ষণ পায়চারি করিল। মুসিয়োর গৃহে তখন সবকিছু বাঁধা হইতেছিল। পরে চাকরেরা মালপত্র আনিয়া ঘোড়ার উপর উঠাইল...কিন্তু তাহাদের ভিতর মুসিয়োর সেই ভৃত্যটিকে দেখা গেল না। ফেবিয়োর একবার ইচ্ছা হইল মুসিয়োর গৃহে যায়, কিন্তু কি ভাবিয়া সে থামিয়া গেল। পরক্ষণেই সে আবার সেদিক পানেই রওনা হইল। মুসিয়োর ঘরে প্রবেশ করিবার একটি গুপ্তদ্বার ছিল। সে-পথেই সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

—বারো—

মুসিয়ো কেদারার উপর হইতে উঠিয়া ভ্রমণোপযোগী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আরাম কেদারায় বসিয়াছিল। তাহার চেহারা তখনও মৃতের মত দেখাইতেছিল। তাহার নিশ্চল মস্তক চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বাহুদ্বয় জানুর উপর পড়িয়া রহিয়াছে। বক্ষস্থল তাহার স্থির-নিস্পন্দ। তাহার চেয়ারের চারিদিকে মেঝেতে বহু শুষ্ক লতাগুল্ম বিক্ষিপ্ত এবং কতকগুলি চ্যাপ্টা পাত্রে কিছু কৃষ্ণবর্ণের তরল পদার্থ ছিল এবং সেই তরল পদার্থ হইতে একটা তীব্র শ্বাসরোধী গন্ধ—অনেকটা কস্তুরীর গন্ধের মত বাহির হইতেছিল। তাম্রবর্ণের ডোরাকাটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প এই পাত্রগুলি বেষ্টন করিয়াছিল। ঠিক মুসিয়োর সম্মুখে মালয়বাসী ভৃত্যটি দণ্ডায়মান ছিল। তাহার পরিধানে একটি বিচিত্র রঙের জরীর আলখাল্লা, ব্যাঘ্রের লাঙ্গুল দ্বারা কটি বেষ্টিত এবং মস্তকে একটি উষ্ণীষাকৃতি টুপি।

সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গী করিতেছিল: একবার ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন সে প্রার্থনা করিতেছে, আবার একসময় হয়ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতেছিল; বিচিত্র ঢঙে হস্তদ্বয় আন্দোলিত করিতেছিল; তাহার হস্তচালনা, মাটিতে সজোরে পদাঘাত এবং ভ্রূকুঞ্চনের ধরণ দেখিয়া মনে হইতেছিল—সে কি যেন বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া মনে হইল, ইহার জন্য তাহাকে অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে: তাহার নিশ্বাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। ললাটে স্বেদকণা দেখা দিয়াছে। অকস্মাৎ সে একস্থানে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে হস্ত প্রসারিত করিল। ক্ষণপরে সে তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় ধীরে ধীরে বক্ষের দিকে আনিতে লাগিল—যেন সে সেই বদ্ধমুষ্টিতে রাশ টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ফেবিয়ো বিস্ময়-বিমূঢ়চিত্তে দেখিল সেই হস্ত আকর্ষণের সহিত মুসিয়োর

মস্তকও চেয়ারের পিঠ ছাড়িয়া সোজা হইয়া উঠিল।...ভৃত্যটি হাত নামাইয়া লইতেই মস্তকটি সশব্দে আবার যথাস্থানে পড়িয়া গেল। এইভাবে কিছুক্ষণ চলিল। পাত্রের সেই মসীবর্ণের তরল পদার্থ অস্ফুট শব্দ করিয়া ফুটিতে লাগিল। পাত্রগুলি হইতেই মৃদু ঠুং ঠাং শব্দ বাহির হইতে লাগিল এবং সাপগুলি পাত্রের চতুর্দ্দিকে ফণা দোলাইয়া ঘুরিতে লাগিল। তারপর সেই মালয়বাসী ভৃত্য আরেক পা অগ্রসর হইল এবং অক্ষিপল্লব উঁচুতে তুলিয়া নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিল এবং মুসিয়োকে নমস্কার করিল...মৃতের অক্ষিপল্লব কাঁপিয়া উঠিল, ঈষৎ উন্মীলিত হইল এবং তাহারই ফাঁকে সীসকের মত নিস্তেজ চোখের তারা দুটিকে দেখা গেল। মালয়বাসী সেই ভৃত্যটির মুখচোখ একটা পৈশাচিক জয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে ওষ্ঠদ্বয় উন্মুক্ত করিল, তাহার মুখগহ্বর হইতে একটা হুঙ্কার বাহির হইতে লাগিল...এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মুসিয়োর উন্মুক্ত ওষ্ঠের ফাঁকেও একটা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল—এ যেন অনেকটা সেই—অমানুষিক হুঙ্কারেরই প্রতিধ্বনি।

ফেবিয়ো আর সহ্য করিতে পারিল না; তাহার মনে হইল, সে যেন একটা পৈশাচিক ভোজবাজী দেখিতেছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

—তের—

তিনঘণ্টা পর এণ্টোনিয়ো আসিয়া সংবাদ দিল যে, সব প্রস্তুত, সিনর মুসিয়ো এখনই রওনা হইবে। মুখে কোন জবাব না দিয়া ফেবিয়ো অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে মুসিয়োর ঘর বেশ দেখা যায়। জিনিষ-পত্র সব ঘোড়ার পিঠে চাপান হইয়াছে, রক্ষীরা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এমন সময় মুসিয়োর কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল...মালয় ভৃত্যের কাঁধে ভর দিয়া মুসিয়ো বাহির হইয়া আসিল। তাহার মুখ শবের মত, হাত দুটি মৃত ব্যক্তির হাতের মত দুপাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু তবু সে চলিতেছিল...হাঁ সে এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া ঘোড়ার উপর চাপিয়া বসিয়া রাশ ধরিল। ভৃত্যটি এক লাফে পেছনে চড়িয়া বসিয়া তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিল। তারপর তাহারা যাত্রা সুরু করিল। ঘোড়াগুলি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল এবং ফেবিয়োর কক্ষের সম্মুখে আসিলে সে মুসিয়োর মুখে দুইটি শাদা চিহ্ন দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইল মুসিয়ো যেন তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে...শুধু সেই ভৃত্যই একবার হাত তুলিয়া নমস্কার করিল...অনেকটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে।

ভ্যালেরিয়া কি এসব দেখিয়াছে? তাহার জানালার খড়খড়ি ত সব বন্ধ...বোধ হয় সে উহার পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

—চৌদ্দ—

ডিনারের সময় ভ্যালেরিয়া ডাইনিং রুমে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে খুব প্রফুল্ল মনে হইলেও সে বারবার নিজের শারীরিক অবসাদের কথা বলিতেছিল। কিন্তু তখন আর তাহার সেই চাঞ্চল্য বা সচকিত ভাব এবং আতঙ্কের লক্ষণ ছিল না। মুসিয়ো চলিয়া যাইবার পরে ফেবিয়ো আবার যখন ছবি আঁকিতে বসিল তখন ভ্যালেরিয়ার মুখশ্রীতে পূর্ব্বের সেই প্রশান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল, যেন সাময়িক রাহুগ্রাস কাটাইয়া মুখচন্দ্রিমা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে...এইবার পরম নিশ্চিন্তে ফেবিয়ো ক্যানভাসের উপর তুলির আঁচড় কাটিতে লাগিল।

স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাত্রায় আবার পূর্ব্বের স্বচ্ছন্দতা ফিরিয়া আসিল। তাহাদের স্মৃতিপট হইতে মুসিয়োর নাম চিরতরে মুছিয়া গিয়াছে। ফেবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়া উভয়েই যেন তাহাদের পুরাতন বন্ধুর কোন প্রসঙ্গই না তোলা স্থির করিয়াছিল, তাহার কি যে হইল সে বিষয়েও কোন সংবাদ লইল না। মুসিয়ো যেন পৃথিবীর গর্ভে অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল! একদিন ফেবিয়ো ভাবিল তাহার ভ্যালেরিয়াকে সেই বিভীষিকাময় রাতের সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিবে, কিন্তু ভ্যালেরিয়া বোধ হয় তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়াই নিশ্বাস রুদ্ধ করিল এবং বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।...ফেবিয়ো ইহা উপলব্ধি করিল; ...ই ব্যাপারে সে আর বিপদ ডাকিয়া আনিল না।

শরতের এক সুন্দর দিনে তাহার অঙ্কিত সিসিলিয়ার ছবিখানার উপর তুলির শেষ রেখা ফেবিয়ো টানিতেছিল। ভ্যালেরিয়া অর্গানের কাছে বসিয়া রিডের উপর উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাহার আঙুল চালাইয়া যাইতেছিল।...অকস্মাৎ তাহার নিজের অজ্ঞাতে ...বাজিয়া উঠিল—মুসিয়োর সেই বিজয়ী প্রেমের আনন্দ সঙ্গীত—সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের পর আজই আবার নূতন করিয়া ভ্যালেরিয়া আপনার অন্তরে একটা নূতন জীবনের সাড়া শুনিতে পাইল।...ভ্যালেরিয়া শিহরিয়া উঠিয়াই বাজনা থামাইয়া দিল।.....

"ইহার অর্থ কি? ইহা কি তবে....."

এইখানেই লেখা শেষ হইয়া গিয়াছিল।*

* আইভান টুরগেনিভ হইতে

স্যার হেনরী ফোর্ড

শ্রীসুধীরকুমার বসু

৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬৩ সালের জুলাই মাসের এক বাদল অপরাহ্ণে আমেরিকার অন্তর্গত মিচিগানের সাধারণ এক কৃষক পরিবারে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। প্রসূতির প্রসব করাইবার নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী শহর 'ডেট্রোয়েট' হইতে যে ডাক্তারকে ডাকা হয়, বিদায় লইবার সময় তিনি গৃহস্বামীকে অভিনন্দন করিয়া জানাইয়া গেলেন, 'Well, Mr. Ford, I'm glad it's a boy and I hope he will grow up to be a useful citizen.' সেই ডাক্তারের আশা যে কিরূপ ফলবতী হইয়াছে, আজ আর তাহা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। সেই 'বালক'ই আজ পৃথিবীর সুবিখ্যাত ধনকুবের, শিল্পপতি—স্যার হেনরী ফোর্ড।

স্যার হেনরী ফোর্ড

পিতার পুরাতন আমলের কৃষিক্ষেত্রের কয়েক মাইলের মধ্যে ফোর্ডের বিরাট প্রাসাদ-সদৃশ অট্টালিকা। সেই অট্টালিকা হইতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, দূরে বহু দূরে এদিক ওদিক কত রাস্তা রেখার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে—আর তাহার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে মোটর গাড়ীর পর মোটর গাড়ী। আমেরিকার সর্ব্বত্রই আজ এরূপ মোটর চলার উপযোগী রাস্তা আর মোটরের ছড়াছড়ি। বলা বাহুল্য, এই কৃতিত্বের মূলে সেই 'বালক'—৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যিনি মার্কিন মুলুকে জন্মগ্রহণ করেন।

হেনরী ফোর্ডের আবাসভূমির নিকটে এখনও একটি কৃষিক্ষেত্র দেখা যাইবে—কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে এখনও ঐ ক্ষেত্রে তাঁহার পরিকল্পনা-অনুযায়ী কাজ চলে। কত অল্প পরিমাণ জমির মধ্যে কত রকমের ফসল ফলিতে পারে, কৃষকেরা এই ছেলেটি তাহা পরীক্ষা করিতে এখনও কসুর করেন না। একসঙ্গে কখনও হয়ত পেঁয়াজ আর কপির চাষ করাইলেন। কপি ফলিতে না ফলিতেই পেঁয়াজ উঠিল। এই ভাবে একটার পর একটার পরীক্ষা আজও তিনি এই ছোট্ট কৃষিক্ষেত্রে পরিচালনা করিতেছেন।

অদূরে আকাশের গায়ে তাঁহার বিভিন্ন কারখানার শাদা চিমনিগুলি চিক চিক করিতেছে। এই কারখানাগুলিতেই তাঁহার জীবনের স্বপ্ন বাস্তবরূপ গ্রহণ করিয়াছে। আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতের ন্যায় চিমনিগুলি যেন যন্ত্র-যুগের শেষ উদ্দেশ্যই ঘোষণা করিতেছে।

লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য মস্ত বড় এক অফিস ঘরে ফোর্ডের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু অতি অল্প সময়ই তিনি বসিয়া কাটান। তাঁহার কোম্পানীর প্রকাণ্ড 'এডমিনিষ্ট্রেশন বিল্ডিং'-এর এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখাশুনা করাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়।

চাল-চলনে ও আলাপ-আলোচনায় ফোর্ড অনেকটা দার্শনিকের মত। মার্কিনী চতুরতার ও জড়বাদের সহিত অধ্যাত্মবাদের এক অভূতপূর্ব্ব সংমিশ্রণ তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনকুবের, অথচ অর্থে তাঁহার আসক্তি নাই। যন্ত্রযুগের একজন বিশিষ্ট যান্ত্রিক তিনি, অথচ মনে-প্রাণে তিনি একজন খাঁটি ঈশ্বরবাদী ও বিশ্বাসী। বাহ্যত শিল্প সামগ্রীর প্রতি তাঁহার কোন আসক্তি পরিলক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু সুন্দর সুদৃশ্য শিল্প দ্রব্য কিংবা পুরাতন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে প্রায়ই দেখা যায়। কেহ উহাদের সৌন্দর্য্যের বিষয়ে ইঙ্গিত করিলে তিনি বলেন, সুন্দর বলিয়া উহাদের সংগ্রহ করি নাই। জিনিষগুলি কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই দেখিবার। সৌন্দর্য্যকে তিনি তত আমল দিতে চাহেন না। কাজেই সৌন্দর্য্যের বিচার এই তাঁহার অভিমত। তিনি বলেন,—

"All beauty must be functional. If a thing is beautiful, it is only so because it is useful."

দান খয়রাত করা ভাল নহে—ফোর্ড মুখে এরূপ অভিমত প্রায়ই প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রকারান্তরে তিনি ইহা করিতে কখনও বিমুখ হন না। তাঁহার কারখানায় অন্ধ, কানা, খোঁড়া সকলের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন—যে কাজের যে উপযুক্ত তাঁহাকে তাঁহার বিভিন্ন কারখানার সেই কাজেই নিযুক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, স্যার হেনরী ফোর্ড শ্রমিকদের বিরোধী, কেহ কেহ আবার তাঁহাকে শ্রমিকদের পরম বন্ধু বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন!

পুরাতন ধরণের বহু যানবাহন বর্জ্জন করিতে যে আধুনিক জগতকে শিখাইয়াছেন, পুরাতন ধরণের গাড়ীর প্রতি তাঁহার অহেতুক কৌতূহল দেখিলে কিন্তু বিস্মিত হইতে হয়। এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, যান-বাহনের ইতিহাসে ইহারা এক একটি স্তর, তাই এদের সম্বন্ধে আমার এই আগ্রহ। ভাবপ্রবণতার প্রতি তিনি কটাক্ষ করেন কিন্তু ডিয়ারবোর্নে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি

পল্লী সংগঠন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অনুরাগের কোন সামগ্রীই বাদ পড়ে নাই। এমন কোন জিনিষের সেখানে অভাব নাই—যাহাতে শিক্ষার প্রেরণা না আসে। কিঞ্চিদধিক ছয় শত বিঘা পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া এই পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। স্যার হেনরী ফোর্ড ইহার নাম দিয়াছেন, "গ্রীন্-ফিল্ড পল্লী" (Greenfield village)।

মিঃ ফোর্ড অনেকের সহিত অনেক আলোচনায় যন্ত্রযুগ, শ্রমিক সমস্যা, অর্থ সমস্যা, 'ওয়ালষ্ট্রীটের' অনাচার প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত ও কার্য্যাবলীতে সর্ব্বদাই যেন এক বিরোধ চলিতেছে। একজন সাংবাদিক তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

'A mass of contradictions, he is consistent in his inconsistency.'

সামান্য অবস্থা হইতে তিনি এত বড় হইয়াছেন,—হয়ত আগাগোড়া জীবনটাকে তিনি একটা বাঁধাধরা নিয়মের মধ্য দিয়াই টানিয়া আনিয়াছেন—এরূপ ধারণা তাঁহার সম্বন্ধে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ফোর্ড গত জুলাইতে তাঁহার জীবনের ৭৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। ফোর্ডের জীবন-সায়াহ্নে সম্প্রতি একজন সাংবাদিক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহাই জানিতে চাহিয়াছিলেন—সত্যিই তাঁহার সফলতার মূলে জীবনযাত্রা প্রণালীর কোন গূঢ় রহস্য রহিয়াছে কিনা! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে ব্যক্তি শ্রম-শিল্পের প্রত্যেকটি কাজ বাঁধাধরা 'ফরমূলায়' আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার জীবনের সেরূপ কোন আভাস মিলিল না। একান্ত সরল ভাবেই তিনি বলিলেন,—

'No, I've never laid out a system of life. Just go ahead and do the job that is one called upon to do—that is system enough. How can any one say how he will act to-morrow when he does not know, what will happen to-day?'

বস্তুত আহার বিহারে ফোর্ডের কোন পারিপাট্য বা নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। তিনি অতি অল্প পরিমাণ আহার্য্য গ্রহণ করেন—তাহাও দিনে দুইবারের অধিক নহে। আহারেরও কোন সুনির্দ্দিষ্ট সময়ও নাই। এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কোন সময় না মানিয়া বরং যে সময়ে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সে সময়ে আহার্য্য গ্রহণ করারই তিনি অধিকতর পক্ষপাতী। অনেক সময়ে তিনি কারখানায় তাঁহার সহকর্ম্মীদের সঙ্গেই একত্রে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তাঁহার শারীরিক বৈশিষ্ট্য হইতেও তাঁহার অনাড়ম্বর বাহুল্যবর্জ্জিত জীবনযাত্রার আভাস পাওয়া যায়। পাতলা গড়ন—শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেদের বাহুল্য নাই। কৃশকায় হইলেও সুদৃঢ়গঠন ও শক্তিশালী—চলাফেরায় অত্যন্ত সতেজ ও সপ্রতিভ। যখন তিনি তাঁহার 'গ্রীন্‌ফিল্ড পল্লীর এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ান, কিংবা তাঁহার বিরাট কারখানা-গৃহের এক অফিস হইতে অন্য অফিস পরিদর্শন করিতে যান কিংবা কর্ম্মীদের কার্য্যকলাপ তদারক করিবার জন্য ছুটাছুটি করেন, তখন তাঁহার চলার ভঙ্গী দেখিয়া দৃঢ় ধারণা হয় যেন এ ব্যক্তি বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত কাজ সুশৃঙ্খল-ভাবে পরিচালনা করিবার শক্তি নিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এ শক্তি অবশ্য শুধু শারীরিক শক্তি নহে! শারীরিক শক্তি অপেক্ষাও দৃঢ়তর একটা দুর্জ্জয় স্নায়বিক শক্তিই যেন তাঁহার সর্ব্ব কাজে প্রেরণা যোগাইতেছে বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ কোন রুটিন অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করার আদর্শ গ্রহণ না করিলেও সাধারণত দেখা যায়—প্রাতে আট-টা বাজিতে না বাজিতেই তিনি তাঁহার কারখানার 'এডমিনিষ্ট্রেশন বিল্ডিং'এ আসিয়া উপস্থিত হন। বিশেষ কোন বাধা না জন্মিলে কারখানার কাজের মধ্যেই সময় করিয়া তিনি তাঁহার পল্লী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াশুনারও খোঁজ করিয়া আসেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সহিত গল্প করিতে তাঁহার বড় আনন্দ হয়—এবং অনেক সময় তিনি বিদ্যালয় গৃহে অতিবাহিত করেন। অফুরন্ত কাজের মধ্যে নিজকে নিমগ্ন রাখিতে ফোর্ডের আলস্য দেখা যায় না। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার আবাস-গৃহে কমই ফিরিয়া থাকেন।

কথাবার্ত্তায় তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, গলার স্বরও তাঁহার কেমন কোমল। মাথার কোঁকড়ান শাদা চুল—উঁচু কপালের পাশে পাট করা রহিয়াছে। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের পিঙ্গল গাত্রচর্ম্মের তুলনায় চুলগুলি যেন অধিকতর শুভ্রবরণ ধারণ করিয়াছে। চিরজীবন নানা বাধাবিপত্তির আবহাওয়ার সহিত যুঝিয়া যে ব্যক্তি জয়ী হইয়াছে, মুখে চোখে তাহারই একটা সুস্পষ্ট আভাস।

আবার যদি জীবনটাকে গোড়া হইতে তাঁহাকে গড়িয়া তোলার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি যেভাবে এতাবৎ টানিয়া আসিয়াছেন, তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্নভাবে চালাইবেন কিনা, এ কথার উত্তরে স্যার হেনরী ফোর্ড বলেন, 'যে কাজ যেভাবে করিয়া আসিয়াছি, অতি অল্প ক্ষেত্রেই তাহার পরিবর্ত্তন করিতাম।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন, 'আমরা চাহিলেও তাহা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। কতকগুলি ঘটনা বা কাজ আমাদের এমনিই করিতে হয়, যাহাতে আমাদের স্বরূপ নিজের কাছে প্রকাশ পায়। এমন কি যে কাজে আমরা ভুল করি, সেই ভুলই হয়ত আমাদের পরবর্ত্তী কালের কোন সাফল্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল দেখা যাইবে।'

এই কারণেই হেনরী ফোর্ড 'ভাগ্য' বলিয়া কিছু মানিতে চাহেন না। যাহা আমরা 'দুর্ভাগ্য' বলিয়া মনে করি, তাঁহার অভিমত এই যে, ঐ দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা বিবেচনার সহিত গ্রহণ করিতে পারিলে তাহাও সুবিধায় পরিণত হইতে পারে। অল্প বয়সে তিনি একবার একটি পাত্রে জল ভরিয়া পাত্রটির মুখ ঢাকিয়া 'ষ্টোভে' চাপাইয়া দিয়া পরীক্ষা করিতে বসেন। জল উত্তপ্ত হইলে পাত্রটি ফাটিয়া গিয়া তাঁহার গায়ে আঘাত লাগে। আজ পর্য্যন্তও তাঁহার কপালে সেই আঘাতের চিহ্ন বিরাজ করিতেছে। সেই দিন তিনি যে আঘাত পান, সেই দুর্ভাগ্যের ফলেই বাষ্পের শক্তি কিরূপ তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। দুর্ঘটনায়ও তাই তিনি তেমন দুঃখিত হন না, বা দমেন না।

১৫ বৎসর বয়সে পিতার কৃষিক্ষেত্র ছাড়িয়া ফোর্ড

ডেট্রোয়েট শহরে কাজের সন্ধানে যান এবং সেখানে এক যন্ত্রপাতির দোকানে শিক্ষানবিশীতে ভর্ত্তি হন। এইখানে থাকিতেই তিনি অবসর সময়ে ঘড়ি মেরামতের কাজও শিক্ষা করেন। সে সময় ঘড়ি খুব দুর্ম্মূল্য ছিল। ঘড়ি মেরামতের কাজ করিতে করিতে তাঁহার মনে হয় যদি ঘড়ির বিভিন্ন অংশগুলি যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যাপকভাবে প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে ইহার নির্ম্মাণ ব্যয় অত্যন্ত কম করা যাইতে পারে। মোটর শিল্পে গাড়ীর বিভিন্ন অংশ নির্ম্মাণে তাঁহার তরুণ বয়সের এই অভিজ্ঞতা কম কাজ করে নাই। আজ তাঁহার বিভিন্ন কারখানায় মোটর গাড়ীর ক্ষুদ্রতর অংশটুকু পর্যন্ত যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে।

হেনরী ফোর্ড প্রথমাবধিই যে কাজে হাত দিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত তিনি আয়ত্ত করিতে ভুলেন নাই। কৃষিকাজের পক্ষে সহায়তা হইতে পারে এরূপ কোন ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া তিনি কাজে প্রবৃত্ত হন। এভাবে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন তাহার মূল্য ফোর্ড কখনও অস্বীকার করেন না।

১৮৮৮ অব্দে ২৫ বৎসর বয়সে ফোর্ড ক্লারা ব্রায়াণ্ট নামে এক সুন্দরী বালিকার পাণি-গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, ইঁহার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ফোর্ডের ধারণা এই বিবাহের পর হইতেই তাঁহার জীবনের সাফল্য সূচিত হয়। এই সময়ে তিনি 'ডেট্রোয়েট এডিসনে' ইঞ্জিনিয়ার-এর পদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় শহরে যেরূপ বৈদ্যুতিক বাতির প্রয়োজন হইত, উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান তাহাই সরবরাহ করিত। ফোর্ড এই কাজে পাঁচ বৎসরকাল নিযুক্ত ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী নানাবিধ যন্ত্রাদি নিয়া পরীক্ষা কার্য্য চালাইতেন। বিবাহের পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই তাঁহার প্রথম 'অটোমোবাইল' বাহির হইল।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, "এরূপ একটা কিছু করার বিষয় বরাবরই আমার মাথায় খেলিতেছিল, সুতরাং না করিয়া আমার উপায় ছিল না! যাহা করিব বলিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহাই আমি সমাধা করিয়াছি। আপনি আমাকে আমার জীবনযাত্রার বাঁধাধরা কোন আদর্শ ছিল কি-না জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে সব আমার কিছু ছিল না, যাহা আমি করিয়াছি—না করিয়া পারিতাম না বলিয়াই করিয়াছি মাত্র।"

বাষ্পচালিত একটি যানের পিছনে বহু দিন কাজ করিবার পর তিনি অকস্মাৎ একদিন নিকোলাস অটোর উদ্ভাবিত গ্যাস-চালিত এক ইঞ্জিনের বর্ণনা দেখিতে পান এবং ইহাতেই তাঁহার নিজের পরিকল্পনা সফল হয়। ফোর্ডের আজও বিশ্বাস এই ঘটনা তাঁহার জীবনে না আসিয়া পারিত না বলিয়াই আসিয়াছে। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস দেখিয়া অনেকেই হয়ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু তাঁহার অভিমত এই যে, 'বিশ্বাস' কথাটাকে শুধু ধর্ম্মমূলক সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নহে। তিনি বলেন,—

"Faith is not what we 'believe' but what we know. What the human race now holds on 'faith', it once held as knowledge. Faith is the very essence of knowledge. It is never lost once you have had it. A man may lose his illusions but not his faith. It is too deep a part of himself."

একটা কাজ আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহাই বরাবর করিয়া যাওয়া সংগত—এরূপ একটা ধারণা আমরা পোষণ করিয়া থাকি। এবিষয়ে হেনরী ফোর্ড বলেন, কোন বিষয় হইতে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা সম্ভবপর তাহা সঞ্চয় করিয়া মাঝে মাঝে অপর কাজে হাত দেওয়া মন্দ নহে। শুধু দেখিতে হইবে কোন কাজ আমরা অসম্পূর্ণ ফেলিয়া না যাই। আমার নিজের জীবনেও আমি এক এক উদ্ভাবনে বহু দিনসময় ক্ষেপণ করিয়া পরে উহা বাতিল করিয়া দিয়া নূতন বিষয়ে মন দিয়াছি। তাঁহার অভিমত এই যে, এক বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলেও তাহা হইতে আমাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মে তাহা আমাদের পরবর্ত্তী সাফল্যের সহায়তা করে।

অর্থ চাহিলেই সকল সময়ে অর্থ মিলে না। স্যার হেনরী ফোর্ড ইহার জন্য তেমন কোন কামনাও করেন নাই। তিনি নিজেই বলেন, অর্থ আমার কাজে By-product-এর মত আসিয়াছে মাত্র। সত্যিকারের কাজে পুরস্কার আসিবেই। অভিজ্ঞতা অর্জ্জনই জীবনের বড় কথা। ইহা অর্জ্জন করা এবং অপরকে ইহা লাভ করিতে সাহায্য করিবার নিমিত্তই আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি। বিদ্যার ন্যায় অভিজ্ঞতাও কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না।

স্যার হেনরী ফোর্ড অনেক বিষয়ে খুব চাপা ও লাজুক প্রকৃতির। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে সহজে বেশী কিছু বলিতে চাহেন না। তিনি কি ভাবেন, কিভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, এসব প্রশ্নে লোকের আগ্রহ কেন তাহাও সব সময়ে যেন বুঝিয়া উঠেন না। তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনায় তাই অনেক সময় বিস্মিত হইতে হয়। আধুনিক মোটর-যুগের প্রবর্ত্তক হেনরী ফোর্ড যেদিন তাঁহার উদ্ভাবিত প্রথম গাড়ীখানি রাস্তায় বাহির করেন, তাঁহার জীবনে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও শ্রেষ্ঠ দিন হইবে—আমাদের পক্ষে এইরূপ ধারণা করা স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপরোক্ত সাংবাদিক যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দিন কোনটি?" তিনি সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, "যেদিন মিসেস ফোর্ডের সহিত আমি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হই, তাহাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন!"

যন্ত্রযুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি ধনকুবেরের এই উত্তরে ইহাই মনে হয়, মনে প্রতিপত্তি, যশ ও অর্থের ভার আজও এই প্রবীণ শিল্পীর প্রেমিক মনটিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। *

---

* নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত মিঃ এস জে ওলফের প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

মহাবুভুক্ষা

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(জোহন বয়ার প্রণীত—গ্রেট হাঙ্গার)

অনুবাদকদ্বয়—জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী
শিশিরচন্দ্র সেনগুপ্ত

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রিয় ক্লস ব্রক্,

সম্প্রতি এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে—সেই বিষয় জানাবার জন্য তোমায় এই পত্র লিখছি, হয়ত শুনে কিছু শান্তি পাবে। ভেবে দেখলাম যে, এই দুঃখ দারিদ্র্য ভরা পৃথিবীতে মানুষ ইচ্ছা করলেই সুখ পেতে পারে, যদি সে নিজের চোখ দিয়ে পৃথিবীর দিকে চায়—অপরের অভিজ্ঞতায় একমাত্র বিশ্বাস না করে!

একথা সবাই জানে যে আমাদের জীবনে দুঃখ চরম হ'তে চরমের দিকে যাচ্ছে,—বিশেষ করে আমিই দুঃখ প্রীতির ভান করতে চাই না। বরং ঠিক তার উল্টো, দুঃখ আমাকে পীড়িত করে তুলেছে। দারিদ্র্য মানুষকে হীন করে। এর প্রভাব অত্যন্ত খারাপ—অবশ্য আমি এমন প্রভাবের কথা বলছি না—যা সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আলিঙ্গন করতে পারে। একদিন আমি ছিলাম প্রথম প্রপারের ইঞ্জিনীয়ার আর আজ আমি ছোট গ্রামের আরও ছোট কামার মাত্র। এ অভিজ্ঞতা আমাকে আঘাত করে। চোখ দুটোর জন্য আমার বই পড়া বন্ধ—ভাবতেও আমার দুঃখ হয় তবু আজ আমি এ সবে অভ্যস্ত—এ সবের মধ্যে আমি কোন সৎ বা শুভ উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি না। কতবার আমার মনে হয়েছে দৈন্যের শেষ সীমায় আমরা এসে পৌঁচেছি কিন্তু প্রত্যেক বারই দেখছি, এ একটা স্তর মাত্র। চরম দৈন্য আজও অনাগত। মাথার শিরা তোমার ছিঁড়ে যেতে চায়, তবু কাজ তোমায় করতেই হবে, প্রত্যেক খুঁটিনাটি জিনিস তুমি বাঁচাচ্ছ তবু অন্নের গ্রাসে পরের দয়ার স্বাদ। এ সব আমার ভাল লাগে না। ভবিষ্যতের যত আলোকোজ্জ্বল দিন আজ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে—সব স্বপ্ন, সব আকাঙ্ক্ষা, সব অভিমান জীবন থেকে মুছে গেছে। মনে হয় এসবের শেষে তুমি এসে দাঁড়িয়েছ। কিন্তু তা নয়। মানুষের অন্তরের আসল সত্য আজও সমুজ্জ্বল। জীবনের চরম দৈন্যের মধ্যেও কি সে মূল্যবান জিনিষ যা হারায়নি—তারই কথা জিজ্ঞাসা করছ না?

সেই কথাই তোমায় বলব।

আমাদের এই অন্ধকার জীবনে যখন একটু আলো আসছিল ঠিক সেই সময় অতিথি এল। কিছু দিন হ'ল মাথার মধ্যে যেন শান্তি পাচ্ছি, আবার আমি লাঙ্গল নিয়ে কাজ করছি—আবার ইস্পাত—এ কাউকে মুক্তি দেবে না—তুমি ত জান এর মধ্যে মানুষ কতরকমের সম্ভাবনা দেখতে পায়। মার্লে আবার যেন বাহুতে বল পেয়েছে। আমার এই স্ত্রীকে তুমি কি মনে কর? নিজেকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে, একজন দুঃখাবনত মানুষের দৈন্যের ভার হাতে যে তুলে নেয়? আজও আমি আশা করি তোমার জীবনে এমন কোন নারীর পরিচয় তুমি পাবে। একথা সত্য, যে তার চুলে পাক ধরেছে, তার মুখে বার্দ্ধক্যের ছাপ। তার দেহলতা যেন ভারাতুরা, তার হাত আর আলোকের মত রক্তাভ নেই। কিন্তু এই তার দেহের দিকে চেয়ে আমার মনে হয় যেন আমি নূতন এক সৌন্দর্য্য দেখতে পাই—ওর ঐ মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন কালের ফেলে রাখা নিদর্শন—দুঃখ এসেছে কিন্তু আমাদের বন্ধন শিথিল হয়নি। আজও যখন সে হাসে, করুণভাবে, রক্তহীন মুখে তখন আমার মনে পড়ে পুরানো কথা যখন স্বর্গ ও পৃথিবী আমাদের উপর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল, আর মার্লের উষ্ণ নিশ্বাস আমার বুকের পাশে জোরে জোরে পড়েছিল। জীবনের সুখ ও আনন্দ তাকে আজকের রূপে রূপান্তরিত করেছে। পৃথিবীর চোখে সে আজ পুরাতন, কিন্তু আমার কাছে এ আর এক আবিষ্কার।

আসল কথা এইবার বলব। দুটি ছেলে মেয়েকে পরের হাতে বিলিয়ে দিয়ে মায়ের মন কেমন হয় তা হয়ত তুমি বুঝতেও পারবে না, বিশেষ করে ছেলে মেয়ে দুটি প্রায়ই পত্র লেখে তাদের নিয়ে আসতে, মাকে তাদের মনে পড়ে—মন কেমন করে মার জন্য। কিন্তু তবু আমাদের একটি মেয়ে তখনও কাছে ছিল। এণ্টা—পাঁচ বছরের এণ্টা, তুমি যদি একবার তাকে দেখতে! তুমি যদি পিতা হ'তে এবং তোমার অশান্ত মস্তিষ্ক বড় দুটির ওপর তোমার স্নেহ সফল না হ'ত, তুমি ত চেষ্টা করে ছোট মেয়েটাকে স্নেহ প্রেমে অভিষিক্ত করে রাখতেই নয় কি। এণ্টা চমৎকার ছোট্ট নাম মনে করতে পার একটি মেয়ে মাথায় কালো কোঁকড়ান চুল, মুখ তার রোদে ঘুরে ঘুরে একটু কটা, তার মায়ের এক জোড়া চমৎকার ভুরু টানা টানা চোখের ওপর—সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত; হয়ত সে পুতুল নিয়ে খেলছে কিংবা কাঠের টুকরা খুঁজছে অথবা তার মা যখন রুটি সেঁকছে, তখন নিজের তৈরী ছোট্ট ছোট্ট কেক সে ভাজছে মা বাবার জন্যে, হয়ত বা পাখীর সাথে কথা কইছে কিংবা নাচছে, কখনও বা আপন মনে গান গাইছে—মাথায় তার কবে শোনা একটা গানের রেশ। যখন তার মা মেঝে পরিষ্কার করে, ছোট্ট এণ্টা তখন একটা নেকড়া নিয়ে চেয়ার পরিষ্কার করবে তারপর হঠাৎ চেয়ার উল্টে গিয়ে কাঁদে পড়ে যায়, তারপর কান্না, যখন তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল হঠাৎ কান্না ভুলে গিয়ে সে নাচতে নাচতে ছুটল বাহিরের দিকে, মুখে হাসি। যখন কাজ করছ কামারশালায়, দুটি ছোট পায়ের শব্দ শোনা যায়—"বাবা খাবে এস।" একটি ছোট কোমল হাত তোমায় দরজা অবধি টেনে আনবে। "আজ তুমি আমায় চান করিয়ে দেবে বাবা"—"এই যে তোমার তোয়ালে।" হয়ত যখন আলু আর দুধ আমাদের খাবার, ছোট্ট এণ্টা এমন করে বসবে যেন সে রাজার বিয়েতে নেমন্তন্ন খাচ্ছে—তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বাবাকে বলবে—"আলু আর দুধ কি চমৎকার খেতে বাবা।"

রাত্রে সে আমাদের বিছানার পাশে ছোট্ট একটা বাক্সে ঘুমুবে' কতদিন রবিন্দ্র জনীতে তার হাসিমাখা মুখের দিকে চেয়ে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় যেন তার সেই ছোট্ট হাত দিয়ে সে আমাকে দোলাচ্ছে—আর ঘুম জড়িয়ে আস্ছে আমার চোখে।

এইবার যে কথা লিখব তাই ভেবে আমার হাত কেঁপে যাচ্ছে। কিন্তু তবু আমি লিখ্‌বে কেননা এই ঘটনাই মার্লে আর আমার মনে এনেছে স্বর্গীয় শান্তি, হয়ত তুমিও তাই পাবে। আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকে একজন বেজীয়ার আর তার স্ত্রী, আমাদেরই মত গরীব তারা। নতুন বাড়ীতে আসার পরই একদিন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। লোকটা বেঁটে আর রোগা, কেট্‌লি প্যান ঝালাই ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করে।

"কি চাও তুমি?" আমার দিকে আড় চোখে চেয়ে বল্‌লে তারপর বেরিয়ে আসবার সময় শুনলাম সে আমার পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। হয়ত সে ভাবলে আমি তার রোজকার খাবার কেড়ে নিতে এসেছি। তার স্ত্রী হৃষ্ট-পুষ্ট, মোটা মেয়েমানুষ, স্বভাব চরিত্র তার অত্যন্ত খারাপ। এই ত সেদিন সে জেল থেকে এল।

এক রবিবারে আমি আমার বাগানে দাঁড়িয়ে তার একটা আপেল গাছের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলাম। একটা গাছ ঠিক আমার বেড়ার পাশে জন্মেছে, এমন কি তার একটা ডাল আমার জমির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমি সেইটা ধরে ফুল-গুলোর গন্ধ শুঁকছিলাম। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙ্গল "এই টাইগার ওর টুঁটিটা চেপে ধর ত।" সঙ্গে সঙ্গে বেজিয়ারের উলফ্ ডগটা আমার দিকে ছুটে এল, আমার গলাটা কামড়ে ধরতে। খুব বরাত ভাল যে কুকুরটা কিছু করবার আগে আমি তার কলারটা ধরে ফেললাম—তাকে টান্‌তে টান্‌তে তার মনিবের কাছে নিয়ে গেলাম।

"ফের যদি এরকম ঘটনা ঘটে তবে সৌরিফকে ডাকতে বাধ্য হব।" তারপরই পৃথিবীর সেই পুরাতন সঙ্গীতের সুরু হ'ল। লোকটি না জেনে আমার সম্বন্ধে তার যা ধারণা বলে গেল—"মুখ সামলে কথা বল ছোট লোক—এখানে এসেছ আমাদের এই মজুরদের অন্ন কেড়ে নিতে।" এরকম আরও কত কি? সে বাহু আন্দোলিত করে গর্জ্জন করতে করতে চলে গেল, আমার মনে হল সে যেন ছুরিটুরি ঐ রকম কিছু খুঁজছে আমার দিকে ছুড়ে মারবার জন্য। আমি না হেসে পারলাম না এ বিশ্বের সমরাঙ্গনে দুটি বিপুল শক্তি আজ মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে

দু'দিন পরের ঘটনা—আমি হাপরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় স্ত্রীর ভয়ার্ত্ত চীৎকার ভেসে এল। ছুটে বেরিয়ে এলাম—ব্যাপার কি? মার্লে ইতিমধ্যে বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওধারে নেমে পড়েছে—হঠাৎ দেখতে পেলুম চোখের সামনে—এণ্টা মাটিতে পড়ে আছে—তার বুকের ওপর সেই বৃহৎ জানোয়ারটা

তারপর—? মার্লে বলেছে, আমিই নাকি সেই কাপড়ের স্তূপ হ'তে আমার মেয়েকে ছিনিয়ে এনেছিলাম।

বিপদের সময় ডাক্তারেরাই নাকি শেষ আশা—যদিও তারা একটি ছোট্ট মেয়ের গলার ক্ষত খুব পরিচ্ছন্নতার সহিত ড্রেস্ করে দিতে পারে—কিন্তু সব সময়ই কি তাতে সুফল ফলে?

মার্লে কিছুতেই ডাক্তারকে যেতে দিবে না—অনুনয় বিনয় করে কেঁদে তাকে জড়িয়ে ধরে আর একবার শেষ চেষ্টা করতে বল্‌লে—যদিও কিছুই আর করবার ছিল না। অবশেষে ডাক্তার চলে গেলেন—কিন্তু তাকে কিছুতেই সান্ত্বনা দেওয়া গেল না। মেঝেতে মাথা খুঁড়ে নিজের চুল ছিঁড়ে সে ব্যথায় আত্মহারা হয়ে গেল—না কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না—বিশ্বাস সে করবে না, কিছুতেই না—এ রূঢ় সত্য মেনে নেওয়া অসম্ভব।

সেদিন রাত্রে দুটি ব্যথাতুর হৃদয় পরস্পরের পানে চেয়ে বসে রইল—অদ্ভুত তাদের চাহনি। মা এখন অনেকটা শান্ত হয়েছে। শিশুটিকে সাজিয়ে কবর দেবার জন্য প্রস্তুত করে বাহিরে নিয়ে আসা হ'ল। পিতা জানালার ধারে বসে—নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে দেখতে লাগল। তখন মে মাসের ধূসর রাত্রি।

এখন আমরা বুঝতে পারছি যে প্রত্যেক বিরাট দুঃখ আমাদের নিয়ত অস্তিত্বের উচ্চ সোপানে নিয়ে চলে। আমি এখন শেষ সীমায় উপস্থিত—এরপর আর কিছু নেই।

এখন আমি আবিষ্কার করেছি হে প্রিয়তম বন্ধু—দুঃখের এই দীর্ঘ দিনগুলি আমাকে একরূপে নয়—নানা-ভাবে পরিবর্ত্তিত করেছে—আমার মধ্যে এক সময় বহু লোকের উৎস ছিল কিন্তু আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে—তাই তারা সে উৎস ভেদ করে বিভিন্ন মুখে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে।

আমি দেখলাম রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে একটি পাগল ছুটে যাচ্ছে স্বর্গ ও পৃথিবীর দিকে মুষ্ট্যাঘাত করতে করতে—জীবনের প্রহসন নাট্যে সে আর অভিনয় করতে চায় না—নদীর দিকে সে ছুটে গেল।

তখনও সেখানে আমি নিশ্চলভাবে বসে রইলাম।

আবার দেখলাম ছাড়া পাওয়া বেঁটে ধূসর এক সন্ন্যাসী—চাবুকের তাড়নায় মাথা নত করে বল্‌ছে—"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে দেবতা। ঈশ্বর দাতা—ঈশ্বরই তা ফিরিয়ে নেবেন।" ভারী করুণ দেখতে লোকটিকে—হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারে সন্ন্যাসী হারিয়ে গেল কোথায় কে জানে!

তখনও আমি তেমনিভাবে বসে রইলাম—নিশ্চল পাথরের মত।

অস্তিত্বের উচ্চস্তরে আমি একাকী বসে রয়েছি—সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র সব একে একে নিভে গেছে—আশেপাশে চারিদিকে একটা হিম শীতল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

কিন্তু তারপর আমার নিকট সব প্রভাতী আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল, এখনও আমার কিছু করবার আছে। এখনও আমার মধ্যে একটা অপরাজেয় জ্যোতির কণা রয়েছে—যা জ্বলছে স্বতই নিজের শক্তিতে। আবার যেন আমি অস্তিত্বের প্রথম দিনে উপস্থিত হয়েছি—একটা অবিনশ্বর

আত্মা আমার মধ্যে বল্‌ছে—"আসুক আলোর আশীর্ব্বাদ"।

এই আত্মাই ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে করতে আমাকে বলীয়ান করে তুলেছে। পৃথিবীর সকল সৃষ্টির প্রতি একটা অনির্ব্বচনীয় মমতা জাগছে—তাদেরই একজন বলে আমি গর্ব্ব অনুভব করছি।

এখন আমি বুঝতে পারছি অন্ধ নিয়তি কেমন করে আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, কিন্তু তবুও এখন মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু অবশিষ্ট আছে—যাকে জয় করবার ক্ষমতা—স্বর্গে মর্ত্ত্যে কারুর নেই। আমাদের এদেহ বিলীন হয়ে যাবে—আত্মার প্রদীপ নিভে যাবে সত্য, কিন্তু আমাদের অন্তরের যে জ্যোতি-শিখা আছে সে অবিনশ্বর—সে অসীম ও সসীমের মিলনের রাখী—সে আলোকের কন্যা।

এখন আমি জানতে পেরেছি যে আমার আত্মার যা চির-দিনের না-মেটা ক্ষুধা—সে জ্ঞান নয়, যশ নয়, ধন নয়—পুরোহিত হবার বাসনাও নেই—স্বর্ণযুগের প্রকাণ্ড মহা-পুরুষও আমি হতে চাইনি—আমাদের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মহিমার মন্দির—তাই আমি গড়ব—সেই আমার শেষ লক্ষ্য। মানুষের রোজকার জীবনে সঞ্চিত পাপ পুণ্যের বিচার সে মন্দির নয়—সে মন্দির বিশ্বের যা কিছু সৌন্দর্য্য, যা কিছু ঈশ্বরের দান তারই বন্দনার নিকেতন।

আজ আমি অক্ষম। নূতন কিছু করবার ক্ষমতা আমার আজ হারিয়ে গেছে। কিন্তু তবু সেই এক জায়গায় বসে আমার মনে হ'ল যে, জয় আমারই হয়েছে লক্ষ্যে এসে একা আমিই পৌঁচেছি।

তারপর- তারপর কি ঘটল। সেবার বসন্তে ভীষণ অনা-বৃষ্টি দেখা দিল—এই উপত্যকায় এরকম প্রায়ই ঘটে। চির-দিনের সেই উত্তরে বাতাস গ্রামের চারিধারে শুষ্ক ধূলো ছড়িয়ে দিলে। একটা বৃষ্টিহীন দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি গ্রাম-বাসিগণের মনে শঙ্কা জাগিয়ে তুললে।

অবশেষে লোকেরা সাহসে ভর করে বীজ বপন করলে—কিন্তু তারপর আরম্ভ হ'ল কুয়াসার দুর্য্যোগ—বরফ পড়তে লাগল—বীজগুলো মাটির তলে জমে পচে গেল। আমার বন্ধু ব্রেজিয়ার একখানি জমিতে বার্লি বুনেছিল এখন সে সব আবার নূতন করে বুনতে হবে কিন্তু বীজ কোথায় পাওয়া যায়? দ্বারে দ্বারে সে ভিক্ষা করে ফিরলে কিন্তু সবাই তাকে বিমুখ করে তাড়িয়ে দিলে—অন্ততঃ এন্টোর যা ঘটেছে তারপর থেকে সবাই তাকে ঘৃণা করে- তাকে কেহই কিছু ধার দেবে না—তারও কেনবার টাকা নেই। রাস্তায় বের হ'লে ছেলেরা তাকে বিদ্রূপ করে—এমন কি গ্রামের কতকগুলো লোক তাকে গ্রামছাড়া করবার কথা ভাবতে লাগল।

পরের দিন রাত্রে আমি একটুও ঘুমাতে পারিনি দুটো বাজলে শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লাম। "কোথায় যাচ্ছ?" মার্লো জিজ্ঞাসা করলে। "দেখছি আমাদের আর আধ বুসেল বার্লি আছে কিনা।" আমি উত্তর দিলাম।

"বার্লি"—এত রাত্রে বার্লি দিয়ে কি হবে?

"ব্রেজিয়ারের জমিটায় বুনতে—এখনই এ কাজ করবার প্রশস্ত সময়—তাহলে কেউ জানতে পারবে না যে কাজটা আমিই করেছি"—

সে উঠে বসল—আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কি বললে—ব্রেজিয়ারের ক্ষেতে বুনবে?" "হ্যাঁ" আমি উত্তর দিলাম।—"তার মাঠ সারা গ্রীষ্ম অনাবাদিত থাকবে এতে কি কিছু উপকার হবে?"

"পীয়ার—কোথায় যাচ্ছ?"

"বললাম ত তোমাকে"—আমি বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলুম সেও পোষাক পরছে—আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই আসবে।

রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে- বাতাস আর্দ্র। প্রভাত এখনও তরল অন্ধকারের কোলে নিদ্রিত—উত্তরের হাল্কা মেঘে সোনালী ঝালর দেওয়া। বিকশিত বার্চ্চের গন্ধে বাতাস আমোদিত—ম্যাগপাই ষ্টারলিং এর ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু কোন মানব মূর্ত্তি চোখে পড়ে না। গোলাবাড়ী—গ্রামখানি-সব এখনও সুপ্তি-মগ্ন।

আমি একটা বাস্কেটে বার্লির বীজ চাপিয়ে প্রতিবেশীর বেড়া ডিঙিয়ে তার ক্ষেতে বুনতে লেগে গেলাম। বাড়ীতে জীবনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সেরিফের অফিসার এসে আগের দিন কুকুরটাকে গুলী করে মেরেছে। ব্রেজিয়ার ও তার স্ত্রী সম্ভবতঃ এখনও ঘুমোচ্ছে- স্বপ্নে তার চারিদিকের শত্রুদের স্বপ্ন দেখছে, তাদের বাড়ীতে জেলখানার ফাঁদ আঁটছে।

প্রিয় বন্ধু—এর পরও কি কোনো বলবার দরকার আছে? একবার ভেবে দেখ একজন রাজ্য বিলিয়ে দিচ্ছে—তবু তার কিছু এসে যায় না আর আর একজন এক মুষ্টি শস্য দিয়ে দিলে তার অনেক কিছু এসে যায়। এ যে তার অবশিষ্ট শেষ সম্পত্তি, এইটুকু অর্জ্জন করতে তাকে জীবন-মরণ সংগ্রাম করতে হবে। এ কি কিছু নয়? আর আমার কথা জিজ্ঞাসা করছ—ক্রাইষ্টের কথা স্মরণ করে এ কাজ আমি করিনি- অথবা আমি আমার শত্রুকে ভালবাসি বলেও নয়—আমি এ কাজ করেছি—কারণ আজ জীবনের ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আমি এক মহা দায়িত্ব অনুভব করতে পারছি। মানুষকে আজও হবে- অন্ধ বিচার বিবেচনাহীন নিয়তির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার শক্তি অর্জ্জন করতে হবে তাকে। দুঃখের কণ্টকিত পথে সব সময় মনে রাখতে হবে মানুষের দৈবী শক্তির মরণ নেই। অনন্তের আলো আজ আর একবার আমার মধ্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে: বলছে—"আসুক আলোর আশীর্ব্বাদ।"

দিনে দিনে এখন আমার নিকট পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে—মানুষ, একমাত্র মানুষই স্বর্গে মর্ত্ত্যে দেবতার সৃষ্টি করবে—বিশ্বের নিষ্প্রাণ একচ্ছত্র আধিপত্যের উপর এইখানেই তার বিজয় অভিযান। সেই জন্যই আমি আমার পরম শত্রুর ক্ষেত্রে শস্যের বীজ বপন করলাম—যাতে সেই দেবতারই আবির্ভাব হয়।

আঃ সেই মুহূর্ত্তের কথা যদি জানতে! আমার চারি-দিকের বাতাস যেন মুখর হয়ে উঠল—যে সমস্ত হতভাগ্যকে

আমি জানি, নাম শুনেছি—তাদের সঙ্গসুখ আমি যেন উপভোগ করতে লাগলাম, ক্রমশ তাদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল—এমন কি মৃতেরাও এসে যোগ দিল—যুগ যুগান্তর হ'তে দলের পর দল আসতে লাগল। লুসিও তার মধ্যে আছে—সে তার সুর বাজাচ্ছে—সকলকে নিয়ে এক মহান সঙ্গীতের সৃষ্টি করছে—জীবিত এবং মৃত—অনন্ত মানবের এই সঙ্গীত। এইত আমরা এখানে—তুমি, আমি, তোমার ভাই বোন। তোমার আর আমার ভাগ্য একই। আমরা পৃথিবীর অনুদার অসীম শক্তির নিয়মে এখানে এসেছি—আমাদের ইচ্ছামত জীবনকে চালিত করবার ক্ষমতা নেই। অন্যায় অত্যাচার, দুঃখ, রোগ, অগ্নি, রক্ত—নানাভাবে আমরা উৎপীড়িত হচ্ছি। সব চেয়ে সুখী যে তাকেও একদিন মরতে হবে। তার বাড়ীতে সে যেন অতিথি। সে একথা জানেনা কিন্তু কালকেই তাকে হয়ত চলে যেতে হতে পারে। তবুও মানব নির্ম্মম নিয়তির সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে, আনন্দ করছে। প্রকৃতির দাসত্ব করেও সে সুন্দরের সৃষ্টি করে—যন্ত্রণার মধ্যেও তার এত উদ্বৃত্ত শক্তি সঞ্চিত থাকে যে অনন্ত শূন্যে সে তার আলোক ছড়িয়ে দিচ্ছে—দৈবী মহিমায় আতপ্ত করে তুলছে দেবতাদের দেহ।

ওগো মানুষের অন্তরের দেবতা, আশ্চর্য্য তোমার মহিমা—স্বর্গের দেবতার মত তোমার মহত্ত্ব। তুমি মানুষকে গ্রাস করছ সত্য কিন্তু তার পরিবর্ত্তে অনন্ত জীবনের আশায় উদ্বোধিত করছ। অন্ধভাগ্যের প্রতিহিংসা চরিতার্থে তুমি এ বিশ্ব দৈবী মহিমায় মহিমান্বিত করে তুলছ।

যারা আজ ধূলোয় মিশে গেছে—নির্ব্বাপিত প্রদীপের শিখার মত—তারাও একদিন এই নাট্যের অভিনয় করেছে—যারা জীবনের অন্ধকারে ব্যর্থ হয়েছে আলোর সন্ধানে—তারাও। আমরা কেঁদেছি, আনন্দ করেছি, দুঃখ ও আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করেছি কিন্তু প্রত্যেকেই আমরা জ্যোতি সমুদ্রে কণা-কণা জ্যোতি সংযোজিত করেছি—প্রত্যেকেই, কালো নিগ্রো যে কবরের অন্ধকারে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে শেষ স্মৃতি চিহ্ন রেখে গেছে মানুষের মনে সে হ'তে জিনিয়সেরা যাঁরা স্বর্গচুম্বী মন্দিরের স্তম্ভ উত্তোলন করেছেন—তাঁরাও—সবাই আমরা আমাদের পার্ট অভিনয় করেছি যথাসম্ভব—দোলনার ধারে প্রার্থনারত হতভাগিনী মা আর মহাত্মারা যাদের প্রশংসাবাণী অসীম শূন্যে ঝঙ্কার তুলছে—সবাই।

ওগো মানুষের অন্তর দেবতা, তোমায় প্রণাম করি, তুমিই বিশ্বে চেতনা সঞ্চার করছ—কেন্দ্রাতিগের দিকে যাত্রায় উদ্বোধিত করছ। তুমিই সেই বন্দনা গান—যা এ বিশ্বকে মহাসঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়া দিচ্ছে—একবার নিজের দিকে তাকাও, শিরোত্তোলন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সগর্ব্বে দাঁড়াও। দুঃখ-দৈন্য তোমায় পরাভূত করতে পারে—মৃত্যু তোমায় মুছে দিতে পারে—তবুও তুমি অজেয় শাশ্বত।

হে প্রিয়তম বন্ধু—তখন আমার মনের ধারণা ঠিক এই রকম হয়েছিল। তারপর বীজ বোনা হয়ে গেলে ঘরে ফিরে এলাম—পাহাড়ের কাঁধের ওপর দিয়ে সূর্য্য তখন উঁকি মারছে। বেড়ার ধারে মার্লে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল। কপালের ওপর সে একটা রুমাল টেনে দিয়েছিল ঠিক কৃষক রমণীর মত। কাজেই তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না—কিন্তু সেও হাসছিল—যেন তার উৎপীড়িত মাতৃহৃদয় শোকের সাগর হ'তে মাথা টেনে তুলতে পেরেছে আজ, দিনের আলোর সঙ্গে সেও ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করতে লেগে যাবে।

(শেষ)

হেমন্ত-বন্দনা

কুমারী সুষমারাণী চৌধুরী

দিগ্বধূদের অঙ্গন আজি
পূর্ণ হয়েছে সোনার ধানে
হেমন্তে আজ হেমন্তরাজ
কি খুসী ছড়ায় সবার প্রাণে॥
শ্যামলা মায়ের আঁচল পবনে
দুলিছে দোদুল সুনীল গগনে,
কৃষাণীর মুখে হাসির সুষমা
উথলি' উঠিছে মধুর গানে।
দিগ্বধূদের অঙ্গন আজি
পূর্ণ হয়েছে সোনার ধানে॥

পঞ্চপ্রদীপে বন্দনা করি
হেমন্তরাজ চরণে তব।
শিশির বিন্দু ঝলমল করে
স্নিগ্ধ অমল আলোকে নব।
মা'র অপরূপ ভরা মাঠখানি—
আনিছে কাহার সুমধুর বাণী;
দিকে দিকে ওঠে বিহগ-কণ্ঠে
ধ্বনিয়া তোমার মধুর স্তব—
পঞ্চপ্রদীপে বন্দনা করি
হেমন্তরাজ চরণে তব॥

বাঙলা নাটক ও দীনবন্ধু মিত্র

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র আচার্য্য এম-এ

বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসের শতবর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল। এই শত বর্ষেই বাঙলা নাটকের উৎপত্তি ও পরিণতি। এই ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্রের দান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা এস্থলে এদেশীয় নাটকের পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। ইতঃপূর্ব্বে বাঙলার নাটক অন্য ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। আধুনিক ভারতীয় নাট্যশালা ও নাটক ইউরোপীয় আদর্শেই গঠিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে আধুনিক রঙ্গমঞ্চের অনুরূপ রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় হইত—এইরূপ আভাস প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে শুধু প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নাটক রহিয়াছে এমন নহে; নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়-দর্পণরূপ অভিনয় কলাত্মক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনার গ্রন্থও রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবদ্যোতক অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যকলা প্রভৃতির সুবিস্তৃত আলোচনা আছে; গ্রন্থগুলি অভিনয়-শাস্ত্রবিদ্‌গণের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। প্রাচীন ভারতের চৌষট্টি কলার মধ্যে নাট্যকলা অন্যতম এবং ইহা যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণের নাটক বিশ্ব-সাহিত্যের গৌরবের বস্তু রূপেই পরিগণিত হয়।

সংস্কৃত নাটকের পর প্রাকৃত নাটকের স্থান। ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ব্যবধান দূর হইতে দূরতর হইতে লাগিল; সাধারণের সহিত সংস্কৃতের যোগসূত্র বিনষ্ট হইল; সাধারণ-বোধ্য প্রাকৃত ভাষার দাবী তখন প্রবল হইয়া উঠিল। বিশেষত শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ প্রচারের জন্য লোক-শিক্ষার ব্যবস্থায় নাটক নূতন ধারায় অগ্রসর হইল। এই নূতন ধারায়ই বাঙলার 'যাত্রার' উৎপত্তি। উত্তর-ভারতের 'রামলীলা' মহারাষ্ট্রের 'ললিত' প্রভৃতি বাঙলার যাত্রারই অনুরূপ। নৃত্যগীত ও আবৃত্তির সাহায্যে অভিনয়ই যাত্রার প্রধান অবলম্বন।

কথা ও কাহিনীর মূর্ত্ত চিত্রই নাটক। নিছক প্রমোদ সাধনের জন্যই নাট্যাভিনয়ের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল এরূপ মনে হয় না; লোক-শিক্ষাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। নাটকে সমাজ ও লোক চরিত্র যেরূপভাবে প্রাণ-বন্ত হইয়া উঠে, এমন আর কোথাও হয় না। বিশেষত অভিনয় লোক-মন আকৃষ্ট করণে অদ্বিতীয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম্মের আদর্শ অভিনয়ের সাহায্যে অতি সহজেই প্রকাশ করা যায়; জনগণ যেখানে অশিক্ষিত সেখানে অভিনয়ই প্রচারের প্রধান অবলম্বন। চলচ্চিত্র প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক্ষেত্রে অভিনয়ের স্থান সর্ব্বোচ্চে ছিল, সুতরাং সাহিত্যের এইক্ষেত্রে সকল জাতিই অসামান্য সাধনা করিয়াছে। কোন জাতির কোন বিশেষ যুগের আচরণ, রীতিনীতি বা চিন্তাধারার পরিচয় পাইতে হইলে সেই জাতির সেই যুগের নাটকেই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রত্যেক জাতিরই প্রাচীন সাহিত্য ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং প্রাচীন নাটকগুলির অধিকাংশই ধর্ম্ম ও আদর্শমূলক। লোক-শিক্ষাই সেই নাটকগুলির উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; তথাপি কালিদাস অথবা ভবভূতি প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার-গণের নাটক নিছক আদর্শমূলক নহে, সেগুলি মানবতারই জয়গান করিয়াছে।

বাঙলা দেশে যাত্রা ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রচারের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিল; 'সুরথউদ্ধার', শ্রীদাম-উন্মাদ, 'সুবল-মিলন' ও 'মরুত্তযজ্ঞ' প্রভৃতি যাত্রা নাটক ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শই প্রচার করিয়াছে। পৌরাণিক আখ্যায়িকাই যাত্রার প্রধান বিষয়বস্তু। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের অনুযায়ী 'ধীরোদাত্ত' নাটকের কৌলিন্য যাত্রায় রক্ষিত না হইলেও ধর্ম্ম ও নীতির প্রচার হইতে যাত্রাকারগণ ভ্রষ্ট হন নাই। এই সকল যাত্রায় দেবতার মাহাত্ম্য, পৌরাণিক নৃপগণের কাহিনী কিংবা পাপ-পুণ্যের জয়-পরাজয় বর্ণনায় গৌণভাবে সমাজচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; মুখ্যভাবে সমাজ-জীবন বা লোক-চরিত্র তখনও কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠে নাই। সত্যই এই সকল যাত্রা লোক-মন বিশেষভাবে জয় করিয়াছিল; লোকশিক্ষায় ইহা কম কার্য্যকরী হইয়াছে বলা যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ-প্রভাবে ইংরেজী নাটকই বাঙলায় নাটক রচনা ও নাট্যশালা স্থাপনের নবপর্য্যায়ের সূচনা করে। বিলাতী রঙ্গমঞ্চের আদর্শে এখন এদেশে রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হয়; কিন্তু অভিনয়ের জন্য নাটকের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুবাদে সে অভাব সাময়িকভাবে কতকটা মিটিয়াছিল। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' ও মাইকেলের নাটকগুলি সে অভাব পূর্ণ করিতে পারে নাই; এই সময়ে বাঙলা নাটকের অভাব পরিপূরণের জন্য দীনবন্ধু লেখনী ধারণ করেন। বাঙলায় প্রকৃত নাটকের সৃষ্টি তখনও হয় নাই; প্রচলিত নাটকগুলির নাটকীয়গুণের অভাব ও অস্বাভাবিকতা বিষম-ভাবেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। এই শতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। দুই একখানা উৎকৃষ্ট নাটকের কথা ছাড়িয়া দিলে বলা যায় সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, নাটকের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। অধুনা চলচ্চিত্র, বিশেষত সবাকচিত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থার অন্যান্য কারণও আছে; লোক মনোরঞ্জনে চলচ্চিত্র অধিক আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। লোক শিক্ষায় পাশ্চাত্যে বহুক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে বাহন করা হইয়াছে; এখন প্রচারের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, বহু শত বৎসর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ জাতির অনুপ্রেরণা প্রায় নিঃশেষিত। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিপর্য্যয়ের ফলে দেশবাসী। দিক হইতে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রচারে কতকটা শৈথিল্য আসিয়াছে। অধিকন্তু মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষার বহুল প্রচার হওয়ায় আদর্শ প্রচারের দিক হইতে নাটক বা

নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজন অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। তারপর দেশের দারিদ্র্য। বর্ত্তমানে দেশী যাত্রার আদরও কমিয়া যাইতেছে। বাঙলার এমন পল্লীগ্রাম ছিল না, যেখানে পূর্ব্বে বৎসরে অন্তত দুই চারিবার যাত্রাভিনয় হইত না; বাঙলার পল্লীর দুরবস্থায় তাহাতে বিঘ্ন জন্মিতেছে। এখন সম্পন্ন গ্রাম বা পল্লীগুলিতে সখের থিয়েটারই হইয়া থাকে; আর সেরূপ সম্পন্ন পল্লীর সংখ্যা দেশে কয়টি? প্রচলিত যাত্রাও থিয়েটারের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং এদেশের সমাজ-জীবন প্রতিফলিত করে এমন জাতীয় নাটকের নিতান্ত অভাব ঘটিয়াছে।

প্রধানত দেখা যায়, রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির অধিকাংশই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক নহে। অবশ্য অভিনেয় নাটকের যে যে গুণ বাহ্যত থাকা দরকার, এই সকল নাটকের সে সকল গুণ প্রচুরভাবেই আছে। কিভাবে অজ্ঞ শ্রোতা বা দর্শকগণের মন আকর্ষণ করিতে হয়, ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারাদি রঙ্গমঞ্চে সংঘটন করাইয়া কিরূপে ইন্দ্রজাল-প্রিয় জনমন আকর্ষণ করিতে হয়, ইহা নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষগণ ভালভাবেই জানেন। সুতরাং শতবর্ষে রঙ্গমঞ্চের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার আকর্ষণ স্বভাবতই যে শিথিল হইয়া আসিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? নাটকগুলিকে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। পৌরাণিক নাটকগুলিতেই তথাকথিত রোমাঞ্চকর ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার প্রদর্শনের সুযোগ অধিক। কিন্তু শতবর্ষে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী অতি পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে; রাম কিংবা অর্জ্জুনের চরিত্রের শত শত রূপ বাঙালী রঙ্গমঞ্চে দেখিয়াছে। সীতা, সাবিত্রী বাঙালীর নিতান্ত আপনার জন হইয়া পড়িয়াছেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এমন কি মহাপ্রভু চৈতন্য পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়া এদেশে ধর্ম্ম ও পুরাণের সমুদ্রমন্থন হইয়াছে।

ঐতিহাসিক নাটকগুলিও আদর্শ কিংবা স্বাদেশিকতা প্রচারে যথেষ্ট কার্য্যকরী হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদ-প্রসাদের নাটকগুলি এস্থলে উল্লেখযোগ্য; কিন্তু এদেশের ঐতিহাসিক নাটকগুলির অধিকাংশই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কাহিনী লইয়া রচিত; সুতরাং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বিঘ্নকর বলিয়া অনেক স্থলেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। সামাজিক নাটকগুলির বিষয়ই এখন আলোচনা করা যাক।—সামাজিক নাটকের ক্ষেত্র এরূপ গণ্ডীবদ্ধ নহে; সমাজ নিত্য পরিবর্ত্তন-শীল এবং সামাজিক নাটকের বিষয়-বস্তুতে বৈচিত্র্যের অভাব কিছুতেই ঘটিতে পারে না; বাঙলার কথা-সাহিত্যে এইজন্য দ্রুত অগ্রসর সম্ভব হইয়াছে। বিশেষত আমাদের লেখকগণের দোষেই নাট্য-সাহিত্যের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে; তাহার জন্য মুখ্যত আমাদের রঙ্গমঞ্চ ও তাহার আশ্রিত নাট্যকারগণই দায়ী। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেশের লেখকগণের দোষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উল্লেখযোগ্য।—

"সকল শ্রেণীর বাঙালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙালী লেখকদিগের এখন সাধারণত বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয়, তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশ-বৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা।..........."

সুতরাং সম্পূর্ণ কল্পনার সাহায্যে অধিকাংশ নাটকেই নাট্যকারগণ আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছেন। নাট্যকারের যে প্রধান তিনটি গুণের প্রয়োজন, সেই (১) সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও (৩) সহানুভূতিগুণের অভাব আমাদের অধিকাংশ নাটকেই লক্ষিত হইয়া থাকে। রঙ্গমঞ্চই নাটকের প্রচারে সাহায্য করে; রঙ্গমঞ্চের আশ্রিত নাট্যকারগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাহিরের নাট্যকারগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই; এবং এইজন্যই অনেকে সাহিত্যের এই ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগে এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাট্যকলার পরিণতির পথে বিশেষ বাধা জন্মে নাই; কিন্তু ক্রমশ নাম ও পেশার লোভ রঙ্গমঞ্চের পরিচালকগণকে পাইয়া বসিয়াছিল, এরূপ ধারণা অমূলক নহে।

ঊনবিংশ শতকে বাঙলার নাট্যশালা ও নাট্যশিল্পের উন্নতি সাধনে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, দীনবন্ধু মিত্র তাঁহাদিগের অন্যতম। নটরাজ গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাষায় "বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।" প্রকৃতপক্ষে দীনবন্ধু আদর্শ নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'সধবার একাদশী' নাট্য-সাহিত্যে অতুলনীয়; প্রায় শতাব্দী পূর্ণ হইতে চলিল, কিন্তু আজিও ইহার তুল্য সামাজিক নাটক লিখিত হয় নাই। অবশ্য কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের রস-রচনা কিংবা 'সিম্বোলিক' নাটকের কথা এস্থলে আলোচ্য নহে। নটরাজ গিরিশচন্দ্রের বহু প্রশংসিত নাটকগুলি পর্য্যন্ত বহু দোষে দুষ্ট; এমন কি 'প্রফুল্ল' নাটকের কোন কোন চরিত্রে অস্বাভাবিকতা রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর প্রতিভার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াই তাঁহাকে "নাট্যগুরু" ও "রঙ্গালয় সম্রাট" বলিয়া সম্বোধন করিয়া শ্রদ্ধাবনতভাবে স্বরচিত 'শাস্তি কি শান্তি' তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। 'নীলদর্পণ' নাটক রচনার জন্যই প্রধানত দীনবন্ধুর নাম ভারত-বিশ্রুত। কিন্তু নাটক হিসাবে তাঁহার "সধবার একাদশী" অতুলনীয়। বাঙলার নাট্যকারগণের অনেকেই তাঁহার অনুকরণ-কারী শিষ্য। হাস্যরসে অদ্বিতীয় দীনবন্ধু তীক্ষ্ন শ্লেষেই সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। নাট্যকারের যে সকল গুণ থাকার প্রয়োজন, সে সকল গুণের প্রত্যেকটিই তাঁহার ছিল; বিশেষ করিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তি ও সৃজন-প্রতিভা তাঁহাকে বাঙলার নাট্য-সাহিত্যে অমর আসন দান করিয়া গিয়াছে। দীনবন্ধুর কবিত্ব সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন—

"বাঙালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত পুনঃ-পুন ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ-ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে, ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি

আহ্লাদপূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতরলোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত শহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্যশোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত "উনপাঁজুরে বরাখুরে" হাপ শহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডেপুটি, নীলকুঠীর দেওয়ান, আমীন, তাগাদ্‌গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর-মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙালী লেখক তেমন পারে নাই।............ দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন; সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism, তাহার উপর Idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল।"

দীনবন্ধুর হৃদয় অপূর্ব্ব সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "গরিব-দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকেও দেখি না। তাই দীনবন্ধু এমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি সর্ব্বব্যাপী।"

দীনবন্ধুর নাটকগুলির 'নীলদর্পণ' নীলকরদিগের অত্যাচারমূলক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। এই নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রচারের জন্য লং সাহেব কারারুদ্ধ হন এবং এই নাটকের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অনেককেই কর্ত্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হয়। কিন্তু নীলদর্পণের প্রচারের জন্যই এ দেশে নীলকরদিগের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য নাটকগুলি সামাজিক সমস্যামূলক এবং অধিকাংশই হাস্যরস-প্রধান। 'জামাইবারিক' 'নবীন তপস্বিনী' 'কমলে-কামিনী' ও 'লীলাবতী'—এই চারিখানি নাটকও একসময়ে বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ রঙ্গমঞ্চের অভাব পূরণের জন্য বহু নাটক লিখিয়া গিয়াছেন এবং নাটককে অভিনয়ে রূপ দিবার অতুলনীয় ক্ষমতার বলেও তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। প্রথম যুগের নাট্যকারগণের মধ্যে *জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও উল্লেখযোগ্য। ইহার পর রসরাজ অমৃতলালের নাম করিতে হয়; অমৃতলাল শ্লেষাত্মক রস-রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের নাটকেরই নাটকীয় গুণের কম বেশী অভাব ছিল। ইঁহাদের পরবর্ত্তী লেখকগণ দর্শক বা শ্রোতাকে আকর্ষণের উপাদানই নাটকে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

এইস্থলে আর এক শ্রেণীর নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙলা দেশে স্বাদেশিকতা প্রচারের ব্রত লইয়া নাটক বা যাত্রার মধ্য দিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা একদল লেখক বিংশশতাব্দীতে করিয়াছিলেন। বরিশালের মুকুন্দ দাস এইক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙলার সীমান্তের পল্লীগ্রামগুলিতে এবং আসামে পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশী যাত্রা করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার গান সত্যই অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে নবীন অনুপ্রেরণা দান করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বহুস্থলে চার-পাঁচহাজার শ্রোতা ও দর্শকের আসরে পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার স্বদেশী যাত্রা অভিনয় করিয়াছিলেন।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চের শত বর্ষের বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে সম্ভব নহে। কিন্তু এই শতবর্ষে বাঙলার নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে যে যবনিকা পড়িতেছে, তাহা সত্যই আক্ষেপের বিষয়।

একদিকে চলচ্চিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরদিকে নাটকের অভাব আমাদিগের রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে; বাঙলা উপন্যাসগুলির পর্য্যন্ত নাটকীয় সংস্করণ শেষ হইতে চলিল, ইহা অপেক্ষা বাঙলা-নাট্যসাহিত্যের দৈন্যের আর প্রকৃষ্ট উদাহরণ থাকিতে পারে না।

সোনালী আলেয়া

(৯১ পৃষ্ঠার পর)

উৎফুল্ল। অচিরেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, অফিস প্রত্যাগত গৃহকর্ত্তাকে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে—ঐ স্বাস্থ্যবতী যুবতীর দিকে এমন এক মধুর দৃষ্টি বুলাইতে যাহার মর্ম্ম-কথা কেহ ভুল করিতে পারে না।

তথাপি সত্য কথা বলিতে কি, অসীম আত্মপ্রসাদে উদ্ভাসিত এই গৃহকর্ত্তার মুখেও সময়ে এক অদ্ভুত বাক্য শুনিতে পাওয়া যায়—অর্থপূর্ণ আঁখিঠারের সহকারে—

—যদি আরো কিছু টাকা আমাদের বরাতে জুটত, হাসি......

এমন এক আলোড়নের মুহূর্ত্তে তখন সমগ্র গৃহে আবির্ভূত হইত যে, গোবেচারী স্বামীটির উপর বর্ষিত হইত মেঘমুক্ত চন্দ্রমার বিগলিত রজতধারা, পত্নীর হাস্য-স্ফুরিত সপ্রতিভ নয়নযুগল হইতে। আর সুচারু আঙুলগুলি স্বামীর চুল লইয়া খেলা করিতে থাকিত—"টাকাই সব নয়, প্রিয়তম!"

এই শিক্ষা পত্নীটির আরম্ভ হইয়াছে নিজের মায়ের কাছে আর সমাপ্ত হইয়াছে বরেন মজুমদার ওরফে স্বদেশরঞ্জন রায় নামক সোনালী আলেয়ার পশ্চাতে অনুসরণ করিতে যাইয়া খানা-ডোবায় পতনোদ্যত হইয়া।

(শেষ)

ঋণ-পরিশোধ

(গল্প)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন

(১)

শেষকালে মাধবকে জীবন দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে হইল। কাহার ঋণ এবং কিসের ঋণ এখন বলিয়া কাজ নাই।

হরিপুর গ্রামে একসময়ে রায় চৌধুরীদের গৃহে লক্ষ্মী বাঁধা পড়িয়াছে বলিয়া প্রবাদ ছিল। এখন সেই প্রবাদের কোন সার্থকতা নাই। চঞ্চলা লক্ষ্মী স্মৃতির সহস্র অবশেষ রাখিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন। বিরাট পুরীর অগণিত কক্ষতলে তাঁহার বাহকের চ্যুত-পালক খসিয়া পড়িয়াছে। ভগ্ন প্রাসাদের ইষ্টক স্তূপে বট-অশ্বত্থের ছায়া-নিবিড় মহিমা। ফুলের বাগানে উলুখড়ের বিস্তার। দীঘির জলে শেওলা-কচুরী পানার বাহুল্য।

একদিন জোয়ারের স্রোতে আসিয়া ভরিয়াছিল। এখন ভাটার স্রোতে নামিয়া গিয়াছে ধন আর জন দুইই। রায় চৌধুরীদের জলপিণ্ডের মালিক যাদব এবং মাধব দুই ভাই বর্ত্তমান থাকিয়া এই স্মরণীয় পরিবারের বিলীয়মান স্মৃতি অটুট রাখিয়াছিল।

গৃহিণীশূন্য গৃহ, অভিভাবকহীন বালক, নাবিকহীন তরণীর মত কেবল স্রোতের টানে গা ভাসাইয়া দিয়া কোন মতে কূল ধরিতে চাহিত।

বাহিরের চোখে তাহারা দুই। কিন্তু অন্তরের মাঝে তাহারা এক। যেন কায়া এবং ছায়া। পাড়ার লোকে কথায় কথায় বলিত—কলির রাম লক্ষ্মণ।

যাদব জ্যেষ্ঠ এবং মাধব কনিষ্ঠ। সংসারের ভাবনা জ্যেষ্ঠের মাথায় অপর্য্যাপ্ত আর কনিষ্ঠ নির্ভাবনায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া তাস-পাশার আড্ডা দিয়া দিনের পর দিন পার করিত। দুই ভাইএ মিলিয়া মিশিয়া রাঁধিত বাড়িত এবং খাইত। আর তাহাদের অতীত মহিমার শেষ-নিদর্শন অনুগত গোয়ালার এক অনূঢ়া মেয়ে আসিয়া বাসনপত্র মাজিয়া ঘষিয়া সুপবিত্র করিয়া দিত।

গোয়ালার মেয়ে পার্ব্বতী রোজ আসে রোজ যায়। ঝড়ের বেগে কাজ করে, আদেশের অপেক্ষা করে না। দুই ভাইএর শ্রম লাঘব করিয়া তাহার আনন্দ। অর্থের টানে নয়, রক্তের টানে নয়; এ কেবল অতীতের নুনের টানে আর তাহার প্রাণের টানে।

যাদবের অবসর বিরল। মাধবের অবসর অফুরন্ত। সে পার্ব্বতীকে নানা কাজের ফরমায়েস করে।—বাটা ভরিয়া পান দেয়, ছিলিম পুরাইয়া তামাক দে

যাদব কাজের লোক। ভাইএর দিকে নজর রাখিতে পারে না। তাহার চেষ্টা—কি করিয়া রায় চৌধুরীদের প্রণষ্ট মহিমা আবার জাগাইয়া তোলে। প্রতিদিন পাটের কলে যাইয়া সে দালালী করে। প্রথম প্রথম লাভ-লোকসান মিলিয়া রিক্ত হস্তে ঘরে ফিরিত। ক্রমে তাহার বুদ্ধির গায়ে শাণ পড়িল। লাভের অংক বাড়িতে লাগিল, লোকে বলাবলি করিল—কালে মানুষ হইবে।

ভাঁড়ারে লক্ষ্মীর পায়ের ধুলা পড়িয়াছে যদি, গৃহের লক্ষ্মী আসিবে না! পাড়ার লোকে উদ্যোগ আয়োজন করিয়া একদিন সাধ্যমত সমারোহে যাদবের অংকলক্ষ্মীকে বরণ করিয়া ঘরে আনিল।

মাধবের আনন্দ শতধারে উছলিয়া পড়িল। আর্য্যা জানকীর চরণমূলে লক্ষ্মণ যেরূপ আপনা বিকাইয়াছিল—তেমনি ধারায় মাধব বৌদিদির অলক্ত রাঙ্গা চরণের তলে আত্ম-নিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভরে কাল হরণ করিতে লাগিল। সংসারের কোন কাজে আর তাহার মাথা ঘামাইতে হইল না।

এখন পার্ব্বতীর কাজ ফুরাইয়াছে। কাজের লোক ঘরে আসিয়াছে, পাড়ার লোকের অনুকম্পা কেন? গোয়ালার মেয়ে খুশী হইয়া বিদায় লইল। এই বিদায় মাধবের বুকে বাজিল। সে আড়ালে আসিয়া বিশেষ করিয়া পার্ব্বতীকে তাহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও অপরিশোধ্য ঋণের কথা জানাইয়া দিল।

পার্ব্বতী পুলকভরে ছোটদাদার পায়ে প্রণাম করিল। হাসিভরা মুখে আর সেই উজ্জ্বল ডাগর চোখের চাহনি লইয়া কহিল—ছোটদাদা! তোমার এই অক্ষমা গরীব বোনের কথা মনে রাখিও।

একি ভুলিবার? মাধবের মনে হইল, কত আপনার জানিয়া সে এতদিন সেবা করিয়া আসিয়াছে। শেষ বিদায়ের দিনে মুঠি ভরিয়া তাহার আঁচলে কিছু বাঁধিয়া দিবার সামর্থ্য তাহার হইল না। শুধু উত্তর করিল—ভগবান তোকে সুখী করুন।

ছাড়াছাড়ি হইল। তাহার পর আর বেশীদিন কাটিল না—পার্ব্বতীর বিবাহ হইল। সে সিঁথিতে সিঁদুর লেপিয়া রাঙাশাড়ী পরিয়া শ্বশুর ঘর করিতে গেল। মাধব আর একবার আড়াল হইতে আশীর্ব্বাদ করিল—তোর হাতের লোহা অক্ষয় হউক!

(২)

যাদব পাটের কলে এবং নানা আড়তে ছুটাছুটি করিয়া কাটাইত। সকল দিন বাড়ী ফিরিতে পারিত না। মাধব তাহার বৌদিদির প্রহরী হইয়া নিশ্চিন্ত আরামে স্রোতের মত দিন-গুলি পার করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার এই নিশ্চিত আরামের উপর কুগ্রহের ছায়া পড়িল। সে ভক্ত লক্ষ্মণের মত আর্য্যার নূপুর সিঞ্জনের ছন্দে জীবনের তন্ত্রী বাঁধিয়া বেশীদিন কাটাইতে পারিল না। তাহার এই নিষ্কর্ম্মা এবং ভবঘুরে ভাব লক্ষ্য করিয়া বৌদিদি নয়নতারার নয়ন হইতে আগুনের হল্কা ছুটিল। তাহার আঁচ মাধবকে সময়ে-অসময়ে পোড়াইতে লাগিল।

একদিন হরি ঘোষের পিতৃশ্রাদ্ধের ফর্দ্দ করিতে যাইয়া পাড়ার দশজনের সঙ্গে সেও অনেক রাত করিয়া ঘরে ফিরিল। তাহার কপাল মন্দ। আসিয়া দেখে বৌদিদি দরজা বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছেন। অনেক ডাকাডাকি ঠেলাঠেলিতে ঝি আসিয়া অর্গল মুক্ত করিল। গৃহে প্রবেশ

করিয়া মাধব যোগাড়-যন্ত্র করিয়া এক ছিলিম তামাক পোড়াইয়া নীরবে শয্যাশ্রয় করিয়া রাত্রি যাপন করিল। বৌদিদির জাগিবার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইল না। আর তাঁর কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইবার সাহসও তাহার ছিল না। বাধ্য হইয়া আপন গৃহে আপনার অধিকারের মাঝে তাহাকে উপবাসে কাটাইতে হইল।

ভোলা মন। সে কোন বেদনাকে মনের কোণে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহে না। জলের বুকে আঁচড় কাটিলে যেমন চোখের পলকে বুজিয়া যায় তেমনি ধারায় সংসারের ক্ষেত্রে বেড়ার আড়ালে অনুদার নারী হৃদয়ের উদ্‌গীরিত হলাহল সে নিঃশব্দে আত্মস্থ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী নীলকণ্ঠের মত নির্ব্বিকার থাকিয়া যায়।

শূর্পণখার মত—একটা মহাসমরের ইন্ধন যোগাইতে যাইয়া নয়নতারা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এই নির্লজ্জ অবিচল পুরুষ-শক্তির মৌন মহিমায় বাহিরে আগুনের জ্বালা বিকীরণ করে না শুধু, তাহার বুকের পাঁজর ছাই করিয়া দেয়।

মাধব বৌদিদির শাসন-শৃঙ্খলার মর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে বিচক্ষণ সচেষ্ট থাকিত। তবুও মাঝে মাঝে বাহির-জগতের আহ্বান আসিয়া তাহাকে অসংযত করিয়া তুলিত। তাহার মনে হইত, একটি ক্ষুদ্র নারীর নিয়মের নাগপাশে আত্ম-সমর্পণ করিয়া পলে পলে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে এই বিরাট বিশ্বের দিকে দিকে তাহার মানবতার পরিচয় দিবার মত কত কিছু রহিয়াছে! বেশীদূরে নয়, তাহার গ্রামপ্রান্তে কত অসহায় রোগক্লিষ্ট শোক-জর্জ্জর বুভুক্ষিত নরনারী সজল নেত্রে উদ্ধে চাহিয়া বিধাতার নামে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে। তাহাদের পাশে যাইয়া সান্ত্বনার আশ্বাস দিবার মত কি তাহার কোন সম্বল নাই? বিত্ত দিয়া নয় সেবা দিয়া। তাহাদের পানে এই সবল হস্ত বিস্তার করিয়া কি সে কোন সমবেদনা জানাইতে পারে না? একটি জীবনের মাঝে যদি এই ক্ষীণ শক্তি যথার্থই কার্যকরী হইয়া উঠে তাহার মানব জন্ম সফল মানিতে পারিবে।

ভাবের আতিশয্যে আপন গৃহের গণ্ডী ছাড়াইয়া মাধব বাহিরে ছুটিয়া যাইত। কোথায় কোন জেলে পাড়ায় কি মুচি পাড়ায় মড়ক দেখা দিয়াছে, অনাহূতে সে আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। হাসপাতাল হইতে ঔষধ আনিয়া দেয়। শিয়রে বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে। স্বাস্থ্যরক্ষার সৎ উপদেশ দেয়; আবার ঝড়ের বেগে ছুটিয়া পালায়। কাঁসারী পাড়ায় আগুন লাগিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে দাবানলের মত সমস্ত পল্লী বেড়িয়া যেদিন অনলের তাণ্ডব লীলা চলিতে থাকে, লোকে কাছে ঘেঁসিতে সাহস পায় না, মাধব নির্ভয়ে জলের বালতি হাতে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করে। কর্ম্মহীনের জীবনে এইরূপ শত অকর্ম্মের কর্ম্ম আসিয়া ব্যতিব্যস্ত এবং মাতাল করিয়া তুলিত।

আর এক দিনের কথা। মিত্রদের ছোটমেয়ে রাত্রিতে মারা গিয়াছে। কিন্তু পরের দিন সকাল বেলা পার হইয়া গেলেও তাহার শ্মশানযাত্রার কোন ব্যবস্থা হইয়া উঠিল না। কুসুমের হতভাগ্য পিতা প্রমাদ গণিল। চোখের জলে ভাসিয়া কুতজ্ঞদের হাতে পায়ে ধরিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে মিনতি জানাইল। কিন্তু কোন পাষাণ গলিল না। মাধবের কানে এই খবর পৌঁছিতেই সে মুহূর্ত্তের মধ্যে আসিয়া দেখা দিল। মিত্রজাকে অভয় দিয়া কুসুমের সৎকারের সকল ভার নিজের কাঁধে তুলিয়া লইল। শ্মশানকৃত্য নিঃশেষে সমাপন করিয়া মিত্রপরিবারের ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোন অবসর না দিয়া ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিল। পথের লোকে তাহাকে ধিক্কার দিল। বিদ্রূপের হাসি হাসিল। কাঁটার মুকুটের মত তাহাই অম্লানমুখে মাধব মাথায় তুলিয়া লইল।

বাহিরের অবহেলা তাহাকে টলাইতে পারে নাই। কিন্তু অন্তঃপুরের নারী রসনার বিষে সে অস্থির হইয়া উঠিল। আজ স্নান শৌচ হইয়া যখন ক্ষুধার্ত্ত যুবক বৌদিদির দুয়ারে দাঁড়াইয়া আহার্য্য চাহিল—তখন নয়নতারা বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিল—পরের মড়া বাঁটিয়া ঘরের পিণ্ডি গিলবার প্রত্যাশা কেন? যাহাদের জন্য এত দরদ পেটের খোরাক কি তাহারা যোগাইতে পারে না? দিনরাত্র একজন মানুষের কাঁধে ভর করিয়া চলিতে লজ্জা হয় না? প্রতিদিন প্রতি কাজে নিশ্চিন্ত মনে পরের ঋণ বাড়াইয়া চলিয়াছে তাহার শোধ দিবার কি কোন উপায় আছে?

মাধবের ক্ষুব্ধচিত্ত আজ সমস্বরে ডাকিয়া কহিল—এ গৃহে তোর কোন অধিকার নাই। পরভাগ্যোপজীবীর জীবনে বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি? মৃত্যুই তাহার চরম সান্ত্বনা।

পুরুষচিত্ত জাগিয়া উঠিল। মানুষের মত তাহাকে বাঁচিতে হইবে। অযোগ্যের কোন কাজে অধিকার নাই। কেবল বঞ্চনার বোঝা বহিয়া সে এতকাল মরীচিকার পিছনে ফিরিয়াছে। আর কিছুতেই সে ভুলিবে না। অদৃষ্টের সঙ্গে এবার যোঝাযুঝি সুরু করিবে। হয় জীবন নয় মৃত্যু!

মাধব তাহার জামা কাপড় পুঁটুলি বাঁধিয়া বগলে লইয়া রুদ্র বৈশাখের এই পিঠফাটা রৌদ্রে বাড়ী ছাড়িয়া চলিল। সারা দিনের শ্রমকাতর ক্ষুৎপিপাসাতুর মাধব পিছনের শত বন্ধনের পানে আর ফিরিয়া তাকাইল না। ঘরবাড়ী বৃক্ষলতা ধূলি তৃণের বিপুল আকর্ষণ আজ দুই হাতে ঠেলিয়া চলিল। গ্রামপ্রান্তে বিজন মাঠে দাঁড়াইয়া রৌদ্রোত্তাপে ঝলসিত একখানি সোনালি মায়া আবার নূতন করিয়া বুকে বাঁধিয়া মাতৃভূমির কাছ হইতে জন্মশোধ বিদায় মাগিল। সকল দুঃখ ঠেলিয়া আজ বড় করিয়া অন্তরে বিঁধিতে লাগিল—দাদা আসিয়া যখন মাধো বলিয়া ডাকিয়া উঠিবেন, তখন কে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবে? এ জীবনে দাদা বলার সাধ কি তাহার ফুরাইয়া গেল? চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। অধিক কিছু আর মনে করিতে পারিল না। বুকের বল হারাইয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় হইল!

এই চলার পথে আর একখানি মুখ মনে পড়িল। এ [illegible] কি তাহাকে একবার দেখিতে পারে না? শোণিত [illegible] কিছু নাই বা থাকুক; বড় ছোট জাত তাহার কাছে [illegible] নহে। হৃদয়ের সম্বন্ধ এই বিশ্ব সৃষ্টির সেরা [illegible]

সে ভাবিতে শিখিয়াছে। আজ তাহার বলে পার্ব্বতীকে জীবনের চরম দুর্দ্দিনে পরিপূর্ণ আগ্রহে চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করিল। সম্ভব হইলে তাহার কাছে যাইয়া একবার দাঁড়াইবে। সাধ করিয়া কি দুঃখের পাহাড় মাথায় টানিয়া লইয়াছে তাহাকে একটিবার জানিতে দিলে এই অপ্রকাশ্য বেদনার প্রচণ্ডতা অনেকটা লঘু হইয়া যাইবে।

গ্রাম পার হইয়া পার্ব্বতীর শ্বশুরের দেশে পা দিল। অনেক খোঁজ করিয়া নিতাই গোয়ালার বাড়ী মিলিল। বিধাতা বিমুখ। পার্ব্বতী তাহার স্বামীর সঙ্গে মানভূমে কয়লার খনিতে কাজ করিতে গিয়াছে।

আশাভঙ্গের নিদারুণ অবসাদের মধ্যে তাহার মনে জাগিল এ বুঝি তাহার ভাগ্যদেবতার ইঙ্গিত। বসন্তের অগ্রদূতের মত সুদূরের কর্ম্মতটপ্রান্তে তাহাকে টানিয়া লইবার জন্য বুঝি পার্ব্বতীর অচিন্তনীয় সমাবেশ। তাহাই হইবে। পার্ব্বতীকে ধ্রুবতারা জানিয়া আবার পাড়ী যোগাইবে। দূরের আহ্বান তাহার কানে আসিয়া পশিতেছে। কোথায় কোনখানে কর্ম্মসিন্ধু কল গর্জ্জনে তাহার চেতনা ফিরাইয়া দিতেছে। সে আপনার পায়ে দাঁড়াইবে। এই সবল মাংসপেশী নিষ্পাপ শ্রমের আনন্দে পরিপূর্ণ সান্ত্বনা লাভ করিবে।

(৩)

সন্ধ্যা নামিয়াছে। যেদিকে চক্ষু যায় কেবল সুউচ্চ চিমনীর মুখে ধোঁয়া নির্গত হইতেছে। শ্যাম শোভা বর্জ্জিত অকরুণ শুষ্ক মাটি। ধূলি কঙ্করময় রাজপথ। কয়লা খাদের পর কয়লা খাদ। । ঝরিয়া ছাড়াইয়া মাধব অনেক খোঁজের পর জামাডোবার সন্ধান পাইল। এইখানে টাটা কোম্পানীর খনিতে পার্ব্বতীর স্বামী কাজ করে। নিতাই গোয়ালা বলিয়া কেহ মিলিল না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানিতে পারিল চার নম্বর খাদে নিতাই সর্দ্দার বলিয়া একজন কাজ করে। সে জাতিতে গোয়ালা কি বাউরী ঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারে না। নাম মিলিয়াছে, পার্ব্বতীর স্বামী না হইয়া যায় না। তাহাকেই খুঁজিয়া লইতে হইবে।

দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত অথচ শ্রেণীবদ্ধ ধাওরার ভিতরে বাহিরে কুলীর জটলা। স্থানে স্থানে কয়লার স্তূপে আগুন জ্বলিতেছে। বাতাসের আঘাতে রক্তজিহ্বার লকলকি ঊর্দ্ধ-দিকে কালো ধোঁয়ার ঘূর্ণিপাক। কোথায় নিতাই, কোথায় তাহার পার্ব্বতী?

জনে জনে সুধাইল নিতাই সর্দ্দারের ঘর কোনটি?

উত্তর পাইল—ঐ কোণায় ৩৪ নম্বরের ধাওরায় নিতাই সর্দ্দার বাস করে।

নম্বর দেখিয়া চিনিয়া লইবার উপায় নাই। ডাকিয়া খুঁজিয়া কত [illegible] ডিঙ্গাইয়া শেষকালে নিতাই [illegible]। পরিচয়ের পারে [illegible] কাপড় [illegible]

সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—ছোটদা! এও কি সম্ভব? তুমি এখানে?

জলে নিমজ্জিত ব্যক্তি কাষ্ঠখণ্ড ভর করিয়া যেরূপ দৃষ্টিতে ভূই মাটি তৃণের অন্তরঙ্গ মহিমার পানে একবার পরম আগ্রহে চাহিয়া দেখে তেমনি ধারায় পার্ব্বতীর সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া মাধব কহিল—পার্ব্বতী বড় দুঃখে তোর কাছে এসেছি।

পার্ব্বতীর বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়িল। তাহার ছোটদা দুঃখে পড়িয়াছে। আর তাহার সান্ত্বনার খোঁজে এতদূরে তাহার কাছে আসিয়াছে!

দীনা অক্ষমার দুয়ারে আজ নরদেবতা!

তাড়াতাড়ি বসিবার আসন পাতিয়া দিল। বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল না। মুখের পানে চাহিতেই দেখিল শ্রান্তির মালিন্যে তাহা ভরপুর। চোখের কোণ দুটি সজল।

পরিচয় পাইয়া নিতাই সর্দ্দার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। কাঙ্গালের ঘরে রাজার পায়ের ধূলা পড়িয়াছে বলিয়া অশেষ ভাগ্য মানিল।

পার্ব্বতীর নারীহৃদয় ক্ষুৎপিপাসাতুর অতিথিকে শুধু শিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট করিলে ফল নাই জানিয়া কহিল—ছোটদা! জামা কাপড় ছাড়। হাত মুখ ধুইয়া কিছু মুখে দাও। ততক্ষণে আমি তোমার রান্নার যোগাড় করিয়া দিই। উঠানে বসিয়া ডাল ভাত দুটি সিদ্ধ কর।

মাধবের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। কি আত্মিক সুর! মাতৃস্নেহের অমৃত নির্ঝর যেন পার্ব্বতীর হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। মনে হইল যে বিধাতা পার্ব্বতী সৃজন করিয়াছেন তিনি কি করিয়া নয়নতারা সৃষ্টি করিতে পারেন।

হাত মুখ ধুইয়া মাধব জলযোগে আপ্যায়িত হইল। পার্ব্বতী জ্বলন্ত কয়লা চুল্লীতে ভরিয়া নূতন হাঁড়ি বাসন কাছে আনিয়া কহিল—ছোটদা! একটু কষ্ট কর। তোমার প্রসাদ দিবার আয়োজন কর।

মাধব কহিল—পার্ব্বতী! তোকে সকলের চেয়ে আজ আপনার ভাবিয়া এতদূরে আসিয়াছি। তোর হাতের অন্ন আমার ঠেকিবে না। জাতের বালাই অনেক আগে চুকাইয়া দিয়াছি। মিছা ছুতানাতা খুঁজিয়া আর দূরে রাখিতে চাহিস না।

কথার মাঝে কি প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর! পার্ব্বতীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিল না। সকল সংশয় ভুলিয়া নিজ হাতের অন্ন ব্যঞ্জনে [illegible] সন্তানের ক্ষুধার শান্তি করিল।

ক্রমে পার্ব্বতী সক[illegible] শুনি[illegible]

ভাসাইয়া কহিল—[illegible]

করিয়া ঘর ছা[illegible]

কাছে খুলিয়[illegible]

মা[illegible]

করিয়[illegible]

শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার

শান্তির জন্য ১৯৩৮ সালের নোবেল পুরস্কার জেনেভাস্থ নানসেন অফিসকে দেওয়া হইয়াছে।

নানসেন অফিসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নানসেন অফিসের নামকরণ হইয়াছে—বিখ্যাত নরওয়েজিয়ান মেরু অভিযাত্রী পরলোকগত ডাঃ নানসেনের নামানুসারে। ১৯২১ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ডাঃ নানসেনের উপর আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পণ করেন। তখন হইতে ১৯৩০ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত আশ্রয়-

ডাঃ নানসেন
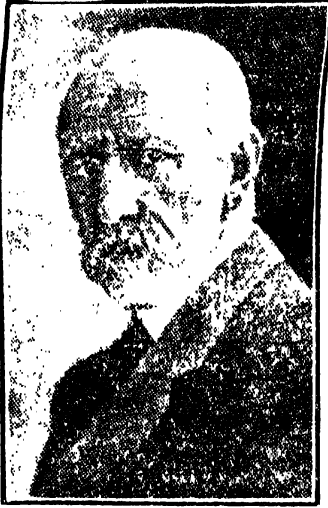
প্রার্থীদের জন্য যাহা কিছু করা হইয়াছে, তাহা সবই তাঁহার প্রেরণা ও প্রভাবের ফল। কর্মভার গ্রহণ করিবার কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল—প্রায় ৬০ বৎসর।

ডাঃ নানসেনকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, বিভিন্ন পর্য্যায়ের আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে তাহা সমভাবে খাটিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে গ্রীক ও বুলগেরিয়ানদের কথা। বল্কান-যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ এবং প্রধানত ১৯২৩-এর গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধের ফলে বহুসংখ্যক গ্রীক ও বুলগেরিয়ান স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু "আশ্রয়প্রার্থী" শব্দে ঠিক যাহা বুঝায় ইহাদিগকে ঠিক তাহা বলা চলে না। যেমন আর্ম্মেনিয়ান বা রাশিয়ান আশ্রয়প্রার্থীদের নিজস্ব বলিতে গবর্ণমেণ্ট কিংবা দেশ কিছুই ছিল না; কিন্তু ইহাদের ছিল দুইই—দেশও, গবর্ণমেণ্টও। লোজান চুক্তির অধিবাসী বিনিময় সম্পর্কিত সর্ত্তানুযায়ী কতক লোককে ক্ষুদ্র ও হৃতসর্ব্বস্ব দেশে ফিরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা সত্ত্বেও সমস্যাটির জটিলতার দরুন দুইটি বিশেষ কমিশন গঠনের প্রয়োজন হয়—একটি গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে, অপরটি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায়। গ্রীক আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য কমিশন গঠিত হয় ১৯২৩ সাল, সেপ্টেম্বর মাসে এবং ১৯৩০-এর ৩১শে ডিসেম্বর উহা উঠিয়া যায়। নিউইয়র্কের পরলোকগত চার্লস্ পি হাউল্যাণ্ড অধিকাংশ সময়ে উহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯২৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মাসে বুলগেরিয়ান কমিশন সোফিয়ায় যায়। ১৯৩২ সালের প্রথমভাগে বুলগেরিয়ান কমিশনের কার্য্য শেষ হয়। গ্রীক গবর্ণমেণ্ট ও বুলগেরিয়ান গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে চারিবার আন্তর্জাতিক ঋণ লওয়া হয় এবং তদ্দ্বারা কমিশনের কার্য্য পরিচালনার ব্যয়নির্ব্বাহ হয়। উভয় গবর্ণমেণ্টই কমিশনের উপর পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। ক্ষমতা লাভ করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্ম্মচারিগণ গ্রীক ও বুলগেরিয়ান আশ্রয়প্রার্থীদের বসবাসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলেন।

কিন্তু আর্ম্মেনিয়ান এবং রাশিয়ান আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা প্রধানত ভিন্ন ধরণের। রুশীয়-বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধের ফলে ১৯১৮ সাল হইতে ১৯২৪ সালের মধ্যে দলে দলে রাশিয়ান আশ্রয়প্রার্থী আসিতে থাকে। ইহাদের অধিকাংশ প্রথমে রাশিয়ার চতুর্দ্দিকস্থ দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা ধারণা করিয়াছিল, সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের পতন হইলেই তাহারা পুনরায় রাশিয়ায় ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, উহার পতনের আশা সুদূরপরাহত তখন তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

অটোমান শাসনাধীনে আর্ম্মেনিয়ানদের উপর দিয়া চল্লিশ বৎসরকাল ধ্বংসের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তুর্কীরা আর্ম্মেনিয়ান নিধনের নীতি পূর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মমভাবে অনুসরণ করিতে লাগিল। প্রায় আড়াই লক্ষ আর্ম্মেনিয়ান, রাশিয়ান আর্ম্মেনিয়ায় পলায়ন করিয়া মৃত্যুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করে। পলাতকদের অনেকেই যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। তুরস্ক পরাজিত হইলে মহাযুদ্ধের অবসানে মিত্রশক্তির রাষ্ট্রনীতিকগণ যে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আর্ম্মেনিয়ানদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিল এবং তাহাদের ঋণ অপরিশোধনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল তাহার কারণ মুহূর্ত্তের জন্য তখন স্বাধীন আর্ম্মেনিয়া প্রতিষ্ঠার আশা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে নব্য তুরস্ক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের অভ্যন্তরে আর্ম্মেনিয়ানদের বসবাসের সমস্ত আশা বিলুপ্ত হয়।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে ডাঃ নানসেনকে এইরূপ লোকদের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, যাহাদের কোন দেশ নাই এবং রক্ষা করিবার জন্য কোন গবর্ণমেণ্ট নাই, সুতরাং তিনি প্রথমেই প্রবৃত্ত হন এই সকল পরিচয়-পত্রবিহীন আশ্রয়প্রার্থিগণের আইনসঙ্গত মর্য্যাদা নিরূপণ করিবার কার্য্যে। পরিচয়-পত্র না থাকার দরুন আশ্রয়প্রার্থিগণ কর্ম্মের অনুসন্ধানে এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে পারিত না। তথাকথিত 'নানসেন ছাড়পত্র' তাহাদের এই বাধা দূর করে।

আইনগত মর্য্যাদা স্থির করা অপেক্ষা আশ্রয়প্রার্থীদের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় স্থির করিয়া দেওয়া বহুলাংশে কঠিন। ডাঃ নানসেন ইহাতেও সফলকাম হইলেন। তিনি বিভিন্ন দেশে আশ্রয়প্রার্থীদের কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিতে সক্ষম
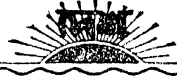
হইয়াছিলেন। প্রায় ১৩৫ হাজার রাশিয়ান চীনে যায়, ৭৫ হাজার জার্ম্মানীতে এবং কয়েক হাজার আশ্রয়প্রার্থী ব্রেজিলে বসতি স্থাপন করে। ১৪০ হাজার আর্ম্মেনিয়ান সিরিয়ায় বসবাস আরম্ভ করে এবং ৫০ হাজার আর্ম্মেনিয়ান, রাশিয়ান আর্ম্মেনিয়ায় বসতি স্থাপন করে। ফ্রান্স কর্ম্মক্ষম আশ্রয়প্রার্থীদিগকে বসবাস করিতে দিতে অনুমতি দেওয়ায় সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। ১৯২৫ সাল পর্যান্ত ফরাসীরা ৪ লক্ষ রাশিয়ান ও ৬৩ হাজার আর্ম্মেনিয়ান আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দান করে।

১৯২৮ সালে আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা প্রায় সমাধান হয়। এজন্য রাষ্ট্রসংঘ এসেম্বলী ধীরে ধীরে নানসেন অফিস তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। উহাকে যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হইবে এবং এইভাবে ১৯৩৮ সালের শেষ হইতে অফিসটি তুলিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু এসেম্বলীর এই আশা মিটিল না। কারণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেওয়ার দরুন সর্ব্বত্রই আশ্রয়প্রার্থীদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর জার্ম্মানীতে হের হিটলারের ক্ষমতালাভ এবং ইরাকে আবিসিনিয়ানদের হত্যায় নূতন করিয়া আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা দেখা দিয়াছে। আগেকার আশ্রয়প্রার্থীদের এটা সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তাহারা যে সময় আসিয়াছিল তখন সকলেই স্বদেশী তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল। ১৯২৮ সাল হইতে অর্থনৈতিক শঙ্কা দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে বেকার সমস্যাও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সর্ব্বত্রই আশ্রয়প্রার্থীরা ভার বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রায় সমস্ত দেশই বর্ত্তমানে আশ্রয়প্রার্থীদের আগমন বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। অনেক সময় আশ্রয়প্রার্থীরা দুইটী দেশের মধ্যে এরূপ অবস্থায় পড়ে যে, সম্মুখের দেশ তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে নারাজ, আবার ওদিকে পশ্চাতের দেশ হইতে তাহারা হইয়াছে বিতাড়িত। এইরূপে সংকটজনক অবস্থায় তাহারা বাধ্য হয় কোন একটা দেশের আদেশ অমান্য করিতে। ১৯৩৫ সালে ফ্রান্সে চার হাজার রাশিয়ানের বিরুদ্ধে বহিস্কারের আদেশ জারী হইয়াছিল। আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কাজ করিবার অপরাধে তাহাদের অধিকাংশই কারাগারে প্রেরিত হয়। ফলে ফরাসী কোষাগারে বেশ টান পড়ে। কেবলমাত্র গত দুই বৎসরে ফ্রান্সের কারাগারসমূহে বন্দী আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য মোট ব্যয় লাগিয়াছে বার কোটি ফ্রাঙ্ক।

১৯২৮ সাল হইতে ডাঃ নানসেন ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ সমস্ত উদ্যম নিয়োজিত করেন আশ্রয়প্রার্থীদের কর্ম্মভার লাঘব করিবার কার্য্যে। ১৯২৮ সালে ডাঃ নানসেন বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি বৈদেশিক শ্রমিকগণকে কার্য্যে নিয়োগ সম্পর্কে যে-সব বিধি নিষেধ রহিয়াছে সেগুলি প্রত্যাহার করিবার জন্য এবং আশ্রয়প্রার্থিগণকে, অন্যত্র স্থান না হওয়া পর্য্যন্ত বহিষ্কৃত না করিবার জন্য বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া কতকগুলি সুপারিশ করেন। অধিকাংশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ঐ সকল সুপারিশ গ্রহণ করেন না। ১৯৩৩ সালে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট হইতে একটি এডভাইসরী কমিশন নিযুক্ত হয়। উক্ত কমিশন যে চুক্তিপত্র রচনা করেন, মাত্র ৫টি গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া বলবৎ করিয়াছেন। এই ৫টি গবর্ণমেণ্ট হইতেছে—বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও ইটালী। কিন্তু ইঁহারাও সর্ত্তাধীনে ঐ চুক্তিপত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত চুক্তিপত্রে কেবলমাত্র রাশিয়ান ও আর্ম্মেনিয়ান আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জার্ম্মান আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যও ইহাতে সামান্য ব্যবস্থা রহিয়াছে। রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন পর্য্যায়ের আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে এই সকল ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে অসম্মত হন।

এক সময়ে মনে হইয়াছিল যে, মহাযুদ্ধের পর যেরূপ প্রবলবেগে আশ্রয়প্রার্থীরা আসিতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে পুনরায় আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩২ সালে পঁচিশ হাজার আসিরিয়ান ইরাক হইতে বহিষ্কৃত হয়। ১৯৩৩-এও এক লক্ষ পনর হাজার জার্ম্মান জার্ম্মানী হইতে বহিষ্কৃত হয়। আর্ম্মেনিয়ানদের ন্যায় আসিরিয়ানরাও মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির সহিত যোগদান করে। যুদ্ধের অবসানে কৃতজ্ঞ মিত্রশক্তি স্বাধীন আসিরিয়ান রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করেন। কিন্তু স্বাধীন আর্ম্মেনিয়া প্রতিষ্ঠার ন্যায় স্বাধীন আসিরিয়া প্রতিষ্ঠার আলোচনাও মুখের কথাই থাকিয়া যায়। আসিরিয়ানরা নবপ্রতিষ্ঠিত ইরাকে বসতি স্থাপন করে। তখন ইরাক ছিল বৃটিশ ম্যাণ্ডেটে শাসনাধীন। কিন্তু ১৯৩২ সালে ম্যাণ্ডেটের অবসান হয়। কিন্তু ইরাকী ও আসিরিয়ানদের উপর তাহার ফল হয় ভয়াবহ। বহুসংখ্যক আসিরিয়ান নিহত হয় এবং অবশিষ্ট মোসলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেইখানেই তাহারা বহুদিন অবস্থান করে এবং অবশেষে নানসেন অফিস সিরিয়ায় তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

জার্ম্মান আশ্রয়প্রার্থিগণ দুইটি ভাগে বিভক্ত। ইহাদের একদল হইতেছে জার্ম্মান ইহুদী। ইহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে ইহারা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। অপর দলে রহিয়াছে, উদারনৈতিক সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী এবং শান্তিকামী দল। রাজনৈতিক কারণে ইহাদিগকে জার্ম্মানী ছাড়িতে হইতেছে। এক লক্ষ পনর হাজার জার্ম্মান আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় এক লক্ষই ইহুদী। বাকী পনর হাজার খৃষ্টান—ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট, খৃষ্টান হইলেও নাৎসী আইন অনুসারে ইহারা পবিত্র আর্য্যবংশোদ্ভূত নয়। প্যালেষ্টাইনে যে ত্রিশ হাজার ইহুদী বসবাস করিতেছে তাহাদের ছাড়া বর্ত্তমানে প্রায় দশ হাজার রহিয়াছে ফ্রান্সে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাত হাজার এবং হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মে চার হাজার। পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপের রাজ্যগুলিতে প্রায় আঠার হাজার ইহুদী ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে কয়েক শত দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া গিয়াছে।

জার্ম্মানদেরও অর্থনৈতিক সংকটের ফলভোগ করিতে হইতেছে। তাহাদের অবস্থা আরও জটিল হইয়াছে এই জন্য যে, 'হাই কমিশন ফর রিফিউজিস কামিং ফ্রম জার্ম্মানী' নামক প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রসংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার জন্য

অবশ্য ইহা নানসেন অফিসের ন্যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের নৈতিক সহানুভূতি পায় না. কিন্তু জার্ম্মানী এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং তৎপূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব হাই কমিশনার মিঃ জেমস জি ম্যাকডোনাল্ড জার্ম্মান ইহুদীদের জন্য কার্যকলাপ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার জন্য দাবী জানাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কিছু করা হয় নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘ জার্ম্মান আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে কোন কিছু করিতে ভীত, কারণ ইহাদের জন্য কিছু করিলে হয়ত বা জার্ম্মানী আর রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান করিবে না।

এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও বহুসংখ্যক জার্ম্মান আশ্রয়-প্রার্থী কোথাও সাময়িক এবং কোথাও স্থায়ীভাবে আশ্রয়-লাভ করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া নানসেন অফিস উঠাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী কারণ তাহার ভয় সোভিয়েট রাশিয়ার শত্রু, "হোয়াইট রাশিয়ান"দের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইবে। এদিকে নানসেন অফিসের কার্যের পরিধি বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা সম্ভবত আরও জোর হইবে। স্বার্থ-হানির আশঙ্কায় পোল্যান্ড ও রুমানিয়াই এই প্রস্তাবের বিপক্ষাচরণ করিবে। এতদ্ব্যতীত যে সকল দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয়—যেমন জার্ম্মানী, সেগুলি যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক রাখিবে সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে।

১৯৩৬ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক সাহায্য কমিটি নানাসেন অফিস তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন।

উক্ত রিপোর্টে তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার; কারণ জার্ম্মানী হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বাড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কমিটি প্রস্তাব করেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যের নিমিত্ত অর্থভাণ্ডার আরও বাড়ান উচিত এবং তাঁহারা সুপারিশ করেন যে, এই কাজের জন্য একটি নোবেল পুরস্কার দেওয়া হোক।

১৯৩৮ সাল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অফিস তুলিয়া দেওয়া হইবে। তৎপরিবর্তে ভারতের খ্যাতনামা সিভিলিয়ান ও পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর (১৯৩৩-৩৮) স্যার হারবার্ট উইলিয়াম ইমরসান আশ্রয়প্রার্থীদের ব্যবস্থা সম্পর্কিত কার্য্য করিবেন। তাঁহার পদের নাম হইবে "হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস আণ্ডার দি প্রটেকসন অব লীগ অব নেশন"; এখন হইতে এই কার্যের প্রধান কার্যালয় হইবে লণ্ডন।

"নোবেল ফাউণ্ডেশনের" বিধানাবলী হইতে নিম্নে যে অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হইল তাহাতে দেখা যায় কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা সঙ্ঘকেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারেঃ—

বিচারপূর্ব্বক উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুরস্কার দেওয়ার ভার-প্রাপ্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কিংবা সমবায়ের উপরই কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা সঙ্ঘকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া যায় কি-না তাহা স্থির করিবার ভার পড়িবে।

এই তৃতীয়বার একটি প্রতিষ্ঠান শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করিল। ইহার পূর্ব্বে ১৯১০ সালে পাইয়াছে —"বার্ণ ইণ্টার ন্যাশনাল পিস ব্যুরো" এবং ১৯১৭ সালে পাইয়াছে—"কমিতে, ইন্তার নাৎসিওন্যাল ডিলা ক্রোঁয়া রুজ।"

ঋণ-পরিশোধ

(১২২ পৃষ্ঠার পর)

বজ্র ঘর্ঘরে তাহার উপর আসিয়া পড়িল। এই প্রচণ্ড বেগ সে রোধ করিতে পারিল না। মৃত্যুর রথচক্রতলে তাহার শ্রান্ত দেহখানি লুটাইয়া নীরবে পিষ্ট হইয়া গেল।

চারিদিক হইতে আর্ত্তনাদ উঠিল। হায় হায়, ধর ধর, তোল তোল, মানুষ মরিল। সর্দ্দার দৌড়াইল। মালকাটার দল ছুটিল। গাড়ীর তল হইতে অতিকষ্টে নিষ্পেষিত রক্তাক্ত দেহখানি বাহির করিল। জীবনের স্পন্দন এখনও দেহে আছে। নিঃশেষিত তৈলবিন্দু নিষ্প্রভ দীপশিখার মত স্তিমিত-দৃষ্টি-শান্ত-সমাহিত-মুখ মাধব জনতার মাঝে কাহাকে যেন খুঁজিতেছে। তাহার অভাবে কি যেন তাহার অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

কয়জনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া মাধবকে উপরে আনিল। তখন সূর্য্য পাটে বসিতেছে। এখনই ছুটির শঙ্খনাদ হইবে।

খবর পাইয়া জনতা ঠেলিয়া পার্ব্বতী আসিল। গভীর আর্ত্তনাদে আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িল। কঠিন মাটি হইতে ধীরে আহতের শির তুলিয়া তাহার কোলে রাখিল। মুমূর্ষুর গণ্ডে জলধারা দিল। মাধব অতিকষ্টে ঢোক গিলিল। তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া যেন আশ্বস্ত হইল। মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গনের মৌন মহিমা সকল যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া অতি ধীরে সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল।

ডাক্তার সঙ্গে লইয়া ম্যানেজার সাহেব আসিলেন। দর্শকের দল ব্যথার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। আর কোন আশা নাই। সাহেব সুধাইলেন—তোমার আপনার জনের নাম কি? আমরা জীবনের ক্ষতিপূরণ করিব।

সাহেবের কথা মুমূর্ষুর কানে গেল। তখনও সংজ্ঞা লোপ পায় নাই। মাধবের অসঙ্গতি বুঝিয়া পার্ব্বতী কহিল —যাদবচন্দ্র রায় চৌধুরী ইঁহার বড় ভাই হয়। মাধব হাত নাড়িল। জড়িত-কণ্ঠে শেষ কথা কহিল—নয়নতারা রায় চৌধুরাণী। সাহেব তাঁহার নোটবুকে নাম লিখিয়া লইলেন।

মাধবের ওষ্ঠ কাঁপিল। দুই চক্ষুতারকা বিস্ফারিত করিয়া অনন্ত শূন্যে চাহিয়া রহিল। আর আঁখি-পল্লব নড়িল না—সব ফুরাইয়া গেল।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্য ডুবিল। আঁধার নামিল। ছুটির শঙ্খধ্বনিতে কয়লাভূমির দিগন্ত কাঁপিল। পরিশ্রান্ত কুলীর দল সকল দিনের মত ঘরে ফিরিয়া গেল।

পুস্তক পরিচয়

বঙ্কিম প্রতিভা—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত। প্রাপ্তি-স্থান—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। পাইকপাড়া রাজবাটী হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

অনেকদিন পরে একখানা বইয়ের মত বই আমাদের হাতে পড়িল। সম্পাদক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"বঙ্কিম শত-বার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী যে সাড়া পড়িয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বাভাসস্বরূপ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে উৎসুক হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, এবং তাঁহারই পরামর্শে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-তিথিতে যে উৎসব প্রতিবৎসর পরিষদ-ভবনে হয়, সে উৎসব এ বৎসর সাহিত্য-পরিষদ আমাদের গৃহে অনুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে গত ৮ই এপ্রিল তারিখে, সম্মিলিত উদ্যোগে এখানে বঙ্কিম-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে যে যে প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটি ও অন্য আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লইয়া এই স্মৃতি-গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।"

সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ, স্যার যদুনাথ সরকার, অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীমতী সাফিয়া খাতুন, শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু, শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, বাঙলার এই সব বিশিষ্ট মনীষী এবং সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধ এবং কবিতা-কুসুমের দ্বারা বঙ্কিম-পূজার এই বরমাল্য গাঁথিয়াছেন। তাঁহার অন্তরের ভক্তি-চন্দনে এই মালা সুরভিত এবং অনুলিপ্ত। তাঁহার পূজা সার্থক হইয়াছে, আমরা অসংশয়িতচিত্তে একথা বলিতেছি।

যাঁহাদের প্রবন্ধ এবং কবিতাসমূহ সংগ্রহে বঙ্কিম-পূজার এই বৈজয়ন্তী মালা রচিত হইয়াছে, বাঙলা দেশের লোকের নিকট তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক করে না। তাঁহারা সকলেই সুপরিচিত। তাঁহাদের লেখনী-সম্পদে এ গ্রন্থ সমৃদ্ধ তো হইয়াছেই, তাহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'লেটার্স অন্ হিন্দুইজম্' এবং 'দেবী চৌধুরাণী'র ইংরেজী অনুবাদ' অপ্রকাশিত এই দুইটি ইংরেজী রচনা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে প্রকাশিত করিয়া সম্পাদক গ্রন্থের গুরু-গৌরব শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এতাবৎকাল অপ্রকাশিত এই দুইটি রচনা-সহযোগে গ্রন্থখানা জাতির সম্পদস্বরূপে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু এই সব কথা বলিলেও গ্রন্থখানার সম্বন্ধে সব কথা বলা হইল না। বিশেষত্ব অন্য দিক হইতেও আছে। সে কথাটা বলিতে হইলে একটু ভাঙিয়া বলিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সম্পাদকের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধার সম্পদ এই গ্রন্থখানাকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার এই শ্রদ্ধা-সম্পদ গ্রন্থের সৌন্দর্য্য এবং সৌষ্ঠব সম্পাদন-কৃতিত্বের মধ্যে তো আছেই, কিন্তু সেই হিসাবে যে বস্তুটা অনেকটা ছিল একান্ত, তাহারই ব্যঞ্জনা, সে জিনিষের স্পষ্টতর রূপ, বাণীরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার নিজের লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্র-নীতি' শীর্ষক প্রবন্ধের ভিতর দিয়া। শ্রদ্ধার স্বভাবই হইল এই যে, স্বরূপকে সে দেখায়। গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ঐকান্তিক এমন শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছেন বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার স্বরূপকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বঙ্কিম-সাধনায় তৎপর বলিয়াই এই প্রবন্ধটির ভিতর দিয়া সে সাধনার তাৎপর্য্যকে এতটা অকপটে, এমন অভ্রান্ত ভাষায়, এরূপ স্বচ্ছতার সহিত এবং সরল ভাবে দেশবাসীর নিকট উন্মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাধ্য এবং সাধনার সার কথা বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সে বলার মধ্যে সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই,—নাই কোনপ্রকারের আড়ষ্টতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতিক আদর্শের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সম্পাদক লিখিয়াছেন,—'রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের কাম্য এক ছাড়া দুই হইতে পারে না এবং সে কাম্য স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার অর্থ যেমন বাহিরের স্বাধীনতা, তেমনই—দেশের মধ্যে মুষ্টিমেয় জন-সংখ্যার হাত হইতে জনসাধারণের স্বাধীনতা। এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছেন।" বহিঃ-স্বাধীনতা লাভের উপায় সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ কি ছিল, সে সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সম্পাদক 'আনন্দমঠে'র এবং 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অগ্নিময় বাণীর প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' 'বাঙালীর মনুষ্যত্ব'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই সব প্রবন্ধ হইতে সে প্রেরণার অনলস্পর্শ পাঠকদের অন্তরে দিয়াছেন এবং এ দেশের অন্তঃ-স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি তাৎকালিক প্রতিবেশ-প্রভাবকে অতিক্রম করিয়াও কিরূপ সুদূরপ্রসারী ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধ হইতে তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি এই প্রশ্ন করিয়াছেন—"আর সেই একশত বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের যে তীব্র তিরস্কার,—যে স্বাধীন ভারতের গৌরবময় চিত্র আমরা পাই, তাঁহার যে অগ্নিবাণীতে আমাদের শিরায় শিরায় রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহার সমতুল্য জিনিষ আমরা কয়টি পাইয়াছি? তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠায় আমাদের দেশের আকাশ, বাতাস, নদী-জল, প্রত্যেক ধূলি-কণার প্রতি যে সর্ব্বস্বত্যাগী টানের চিহ্ন পাই, সেই আপনহারা ভালবাসার যথাযথ সম্মান না করিয়া শুধু সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আলোচনা করিলে বোধ হয় তাঁহার প্রকৃত সম্মান করা হইবে না।"

বঙ্কিচন্দ্রের বিশিষ্টতা হইল তো এইখানেই; এইখানেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র শক্তিশালী সাহিত্যিক ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে স্কটের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের মতে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙলার স্কট বলিলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয় না। সাহিত্যে সৃষ্টির দিক হইতে ক্ষমতা তাঁহার অসামান্য ছিল, কিন্তু এই কথা বলিলেই তাঁহার সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না এবং তাঁহার সম্বন্ধে যেটি প্রধান কথা—সেইটিই উহ্য থাকিয়া যায়। বঙ্কিম-

চন্দ্র শুধু স্রষ্টা ছিলেন না; তিনি ছিলেন দ্রষ্টা। দেশমাতৃকার চিন্ময়ী মূর্ত্তি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সাহিত্যিকের সাধনার উপলক্ষ্য যে রস-পদার্থ তাহা কোন দেশবিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, তাহা বিশ্বজনীন। বঙ্কিমচন্দ্র যে সে রস-রাজ্যের সন্ধান না পাইয়াছিলেন এমন নহে; কিন্তু সে অবস্থায় উঠিয়াও গীতাভাষ্যকার বঙ্কিমচন্দ্র দেশের সেবাকেই সাধ্য এবং সাধনা করিয়া লইয়াছিলেন। গীতার লোক-সংগ্রহতত্ত্বের বঙ্কিম-সাধনায় ইহাই বিশিষ্ট রূপ। এবং আমাদের মতে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। "বঙ্কিম-প্রতিভার" সম্পাদক সে কথাটা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ সমালোচনা অন্তত আমাদের পক্ষে নিতান্তই অশোভন। কারণ, এখনও যে দেশের বুকে "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" ও "তপশীলভুক্ত জাতির" কলঙ্কময় ছাপ রহিয়াছে, সে দেশে একশত বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র সব সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা আলাদা রাখেন নাই একথা বলা নিরর্থক। এবং আমরা যেখানে এই ভারতবর্ষের কোটী কোটী নিরাশ্রয়ের অন্নবস্ত্রের সংস্থান এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই সেখানে আমাদের পক্ষে বিশ্বের শ্রমিকদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করার কথা হয় তো উপহাসের মতই শোনাইবে।"

পাইকপাড়ার রাজ-পরিবার বিদ্যোৎসাহী। বাঙলাজোড়া এ খ্যাতি তাঁহাদের আছে। কুমার বিমলচন্দ্র পাইকপাড়ার সে গৌরবকে দীপ্ত করিয়া ধরিয়াছেন। "বঙ্কিম-প্রতিভা"র এই প্রসূন-চয়নের ভিতর দিয়া কুমার বিমলচন্দ্রের যে স্বদেশ-প্রেম, স্বাজাত্য-প্রীতি, নির্ভীকতা এবং স্পষ্টবাদিতা প্রকাশ পাইয়াছে, বাঙলার জমিদার-সম্প্রদায়ের মধ্যে সে জিনিষ বিরল বলা চলে। বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মনন-সম্পদে সমৃদ্ধ, সর্ব্বতো-ভাবে সুসম্পাদিত এমন নয়ন-মনো-লোভন গ্রন্থের আদর যে বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে হইবে, একথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থখানি বঙ্কিমচন্দ্রের সাধ্য ও সাধনার দিগ্দর্শনস্বরূপ। বাঙালী সে জিনিষ বুঝুন এবং উপলব্ধি করুন। ইহাই আমাদের অনুরোধ। এই গ্রন্থের পারিপাট্য সাধনের জন্য গ্রন্থের প্রকাশকও বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

বঙ্কিম-সাহিত্যে ছদ্মবেশ ও ছদ্মপরিচয়—শ্রীযতীশচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরামগোপাল ঘোষ, কাঁথি, মেদিনীপুর। মূল্য আট আনা।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী বঙ্গের সর্ব্বত্র ও বঙ্গের বাহিরে বহুস্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বঙ্কিম প্রতিভা বহুমুখী। তাঁহার সাহিত্য ও জীবনের নানা-দিক লইয়া নানাজনে আলোচনা করিতেছেন। 'দেশ' পত্রে আমরা এরূপ বহু আলোচনা-প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থাদি আশানুরূপ প্রকাশিত হয় নাই। ইংরেজীতে একখানা বঙ্কিম জীবনী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'বঙ্কিম পরিচয়'—মাত্র এই দুইখানি পুস্তকের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিয়াছি। বর্ত্তমানে এই তৃতীয় পুস্তকখানি পাইলাম, ও পাইয়া কথঞ্চিৎ আশান্বিতও হইলাম। মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত এমন একখানি পুস্তকের বহুল প্রচার ও পরিচয় বাঞ্ছনীয়। লেখক বঙ্কিম সাহিত্যের উপন্যাস-ভাগ মন্থন করিয়া এই পুস্তকখানির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। উপন্যাসগুলির নায়ক নায়িকা ও অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্র আবশ্যকতা বোধে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, ছদ্মপরিচয় দান করিয়াছে। লেখক প্রত্যেকখানি উপন্যাস হইতে তাহার বিষয়গুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহরণ করিয়াছেন। তিনি উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক ও সামাজিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপন্যাসের চরিত্রগুলি আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাও তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিম-সাহিত্যের একটি নূতন দিকের প্রতি লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে যতই আলোচনা চলিতে থাকিবে ততই ইহার নূতন নূতন দিক আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইবে। বাঙলা সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কেশবচন্দ্রের শক্তি-সাধনা

(৭৬ পৃষ্ঠার পর)

...না, অপরকেও কাহারও দাসত্ব করিতে দেখিতে চাহি না। সেই স্বাধীনতা হইতে আমরা সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত রহিয়াছি। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, কেশবচন্দ্র যে সাম্যের সাধনা করিয়া গিয়াছেন, সে সাম্য, এই অভাগা দেশে আজও কোথায়ও নাই। অতি ঘোর সাম্প্রদায়িকতা জাতিকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল করিতেছে, এবং সর্ব্বশেষে আমরা যেন এ সত্য বিস্মৃত না হই যে, কেশবচন্দ্র যে প্রেমের প্রদীপ্ত বহ্নি অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রেমের অভাবই আমাদের সকল দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ। সেই প্রেমের আগুনকে আজ জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে। দেশ ও জাতির প্রতি আমাদের এই যে গুরু দায়িত্ব ইহার প্রতিপালনে কেশবচন্দ্রের আদর্শ যদি আমাদিগকে একান্ত করিয়া তুলিতে পারে, তবেই তাঁহার শত-বার্ষিকীতে তাঁহার স্মৃতি-পূজা আমাদের সার্থক হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

রেন-বো ক্লাবের উদ্যোগে "বাঙ্গলা সাহিত্যে গার্হস্থ্য জীবন" বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে। প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে পারিতোষিক-স্বরূপ একটি "গোল্ড সেণ্টার্ড মেডেল" প্রদান করা হইবে। আগামী ১০ই ডিসেম্বর শনিবারের মধ্যে ১৮ নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, রেন-বো ক্লাবের সম্পাদকের নিকট প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

কবিতা প্রতিযোগিতা

"নির্ঝরিণী সাহিত্য সংসদের" পক্ষ হইতে প্রত্যেক স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের নিকট হইতে কবিতা আহ্বান করা হইতেছে। সকল প্রকার কবিতাই গ্রহণীয়। যাহার কবিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাকে একটি রৌপ্য-পদক প্রদান করা হইবে।

প্রবেশ-মূল্য দুই আনা মাত্র (৵০ আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলেও চলিবে)। আগামী ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে সকল কবিতাই আমাদের হাতে আসা চাই।

কবিতা পাঠাইবার ঠিকানা—১। সম্পাদক "নির্ঝরিণী সাহিত্য-সংসদ"—১নং যদু ভট্টাচার্য্য লেন, কালিঘাট, ২। শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু—"দেশবন্ধু পাঠাগার"—৬১ এ টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর।

গল্প প্রতিযোগিতা

কোঁড়কদীর হস্তলিখিত "মশাল" পত্রিকার লেখকবৃন্দের উদ্যোগে আগামী 'পৌষ-সংক্রান্তিতে একটি গল্প প্রতি-যোগিতা হইবে। তদুপলক্ষে সর্ব্বসাধারণকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করা যাইতেছে।

গল্পের বিষয় কিছু নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী না হয়। নিয়মাবলী জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন। যাঁহারা প্রতি-যোগিতায় যোগদান করিবেন তাঁহাদের লিখিত গল্প যেন ২০শে ডিসেম্বর ১৯৩৮ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হয়।

—শ্রীঅমলকুমার সান্যাল ও শ্রীআশীষকুমার লাহিড়ী, পো কোড়কদী, ফরিদপুর।

গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল

হস্তলিখিত "বিজয়ী" পত্রিকার উদ্যোগে বাঙলার উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন—"একটি গল্প"র লেখক শ্রীঅমিয়েশ মজুমদার। গৈলা, বরিশাল।

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন—"অভাগী"র লেখিকা —শ্রীমতী বেলা দাশগুপ্তা। পি ৩৬১ রসা রোড, কলিকাতা। এবং "পরিবর্ত্তনে"র লেখক শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। লাকপুর, ঢাকা

তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন—"শান্তি"র লেখিকা—শ্রীমতী শান্তি দাশগুপ্তা। কালীবাড়ী ওয়ার্ড, বরিশাল।

ইহা ব্যতীত "কেন এত নীরবতা", "মা", "চোর", "মা হারিয়ে......", "ফাঁকি", "মৌন মিলন", "বরষার গল্প" প্রভৃতি লেখাগুলিও ভাল হইয়াছে। উক্ত গল্পগুলি আমাদের "বিজয়ী"তে প্রকাশ করা হইবে। কোন গল্পই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

—"বিজয়ী" সম্পাদক—শ্রীশান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত। ১০নং দোলাইগঞ্জ ষ্টেশন রোড, ফরিদাবাদ পোঃ, ঢাকা।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ২৩শে আষাঢ় "দেশ" পত্রিকায় যে "সুষমা স্মৃতি-পদক" হাস্যকৌতুক রচনা প্রতিযোগিতা প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন কুমারী সুষমা চট্টোপাধ্যায়—টাটানগর। কোনও বিশেষ কারণবশত ফল বাহির হইতে বিলম্ব হইল।

—শ্রীপতিতপাবন পাঠক। কর্ম্ম-সচিব—"সূর্য্যালোক"।

আলো কি?

(৮৩ পৃষ্ঠার পর)

দুই মতবাদের সংমিশ্রণে এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহা কে বলিতে পারে?

অতঃপর বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তা করিলেন যে, এই আলোক তরঙ্গ কি প্রকারের। ইহা transverse না longitudinal? যে পদার্থে তরঙ্গ বাহিত হয় তাহার অণুগুলি যদি কম্পিত হইয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে যাতায়াত করে তবে তাহাকে longitudinal wave বলে—যেমন শব্দতরঙ্গ। এবং যদি অণুগুলি উপরে ও নীচে লম্বভাবে যাতায়াত করিতে থাকে তাহাকে transverse wave বলে। বৈজ্ঞানিকগণ "টুরম্যালিন" (tourmaline) নামক একপ্রকার স্ফটিকের ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি পাঠাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, আলোকতরঙ্গ transverse wave. যখন একখানা tourmaline crystal-এর ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি পাঠান যায়, তখন সেই আলোকরশ্মির গতিপথের চতুর্দ্দিকে স্ফটিককে ঘুরাইলেও আলো একই অবস্থায় দেখা যায়। যদি দুইখানা স্ফটিক একত্র রাখা যায় এবং তাহাদের অক্ষ সমান্তরাল হয় তবে আলোককে পূর্ব্ববৎ দেখা যাইবে। এখন যদি একখানাকে ঠিক রাখিয়া অপরখানাকে ঘুরান যায় তবে দেখা যাইবে যে, আস্তে আস্তে আলোর তেজ কমিয়া যাইতেছে এবং যখন স্ফটিক দুইটির অক্ষ পরস্পর সমকোণ সৃষ্টি করিবে, তখন আর কোনও আলো দেখা যাইবে না—অন্ধকার মনে হইবে। 'Tourmaline crystal'এর ধর্ম পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আলোকতরঙ্গ 'transverse' না হইলে এইরূপ সম্ভব হইত না।

এই আলোর মধ্যে যে এত রহস্য লুক্কায়িত আছে—ইহা ভাবিলে সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় এবং এই রহস্যের যিনি রচয়িতা সেই সর্ব্বশক্তিমানের প্রতি ভক্তিভরে আপনি মাথা নত হইয়া আসে।

শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরায়—খনা ও অভিসারিকা

'মেট্রোপলিটান পিকচার্সে'র ছবি 'খনা' ও 'অভিসারিকা' গত ১২ই নবেম্বর হইতে উত্তরা চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে।

'খনার' কাহিনী লিখিয়াছেন শ্রীমন্মথ রায়; প্রযোজনা করিয়াছেন মিঃ বি-এল খেমকা; পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়; আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীদ্রোণাচার্য্য; শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন এ গফুর; সুর সংযোজনা করিয়াছেন শ্রীধীরেন দাস; গান রচনা করিয়াছেন শ্রীনীহার-বিন্দু সেনগুপ্ত; নৃত্য পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীঅমর ঘোষ; দৃশ্য পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীমিত্তোল ও সম্পাদনা করিয়াছেন শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায়, বিভিন্ন ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী, ছায়া, সুশীল রায়, দেববালা, অরুণা, আঙ্গুর, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন মুখোপাধ্যায়, সমর ঘোষ, কালী ঘোষ, মনোরমা, প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে ছবিখানি তোলা হইয়াছে।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন জ্যোতির্ষার্ণব বরাহের পুত্রবধূ, সিংহল রাজকন্যা জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিনী, অশেষগুণসম্পন্না বিদুষী খনার নাম বাঙলার নরনারীর মুখে মুখে প্রচারিত। প্রত্যেক বাঙালীই খনার বচন অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাঁহার জীবন কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে ছবি তোলা হয়—সাধারণ বাঙালী বিশেষত নারী সে ছবির উৎকৃষ্টতা অথবা নিকৃষ্টতা সম্পর্কে বিচার করেন না। সেইজন্য ছবিখানি অতি সাধারণ শ্রেণীর হইলেও বাঙলা দেশে ছবিখানি ভালই চলিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

ইহা শুধু আমাদের মনে করা নয়; ইহা আমাদের বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে অনেকখানি। আজ পর্য্যন্ত বাঙলা দেশে যতগুলি ধর্ম্মমূলক, পৌরাণিক ছবি তোলা হইয়াছে—তাহার মধ্যে অধিকাংশ ছবিই নিকৃষ্ট। আর বাকী ছবিগুলিকে কোন ক্রমে অতি সাধারণ ছবির কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত ছবি দেখিবার জন্য কোন দিন দর্শকের অভাব হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা রঙ্গমঞ্চে 'খনা' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম। অভিনয়টি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছিল। সেইজনাই আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, মঞ্চ অপেক্ষা চিত্র আমাদিগকে আরও তৃপ্তি দিবে। কেননা মঞ্চের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, চিত্রে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। সাগরের ঢেউ, উদ্যান, বড় বড় সেটের দৃশ্য ছাড়া ছবিখানি হইয়াছে মঞ্চের বিস্তৃত চিত্র।

বরাহের ভূমিকায় শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরী অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। চলচ্চিত্রে অথবা রঙ্গমঞ্চে তাঁহার চেয়ে শক্তিশালী অভিনেতা অতি অল্পই আছে। খনার ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়ার অভিনয়ও আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। ইহা ছাড়া আর কোন দিক দিয়া খনা ছবিকে বিশেষ প্রশংসা করার মত আর কিছু নাই। মিহিরের ভূমিকায় সুশীল রায় অভিনয় করিয়া মিহির চরিত্রের প্রতি অমর্য্যাদাই করিয়াছেন। অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণা, দেববালা, ধীরেন মুখার্জ্জি, সমর ঘোষ ও কালী ঘোষের অভিনয় ভালই হইয়াছে। শব্দ গ্রহণ ভাল হয় নাই; ফটোগ্রাফী একরূপ চলনসই হইয়াছে। সঙ্গীত পরিচালনার প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না;

অভিসারিকা

অভিসারিকা ছবির কাহিনী লিখিয়াছেন শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী এবং পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায়—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সাবিত্রী, আশু বসু, রাজলক্ষ্মী, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশমণি, তারাপদ ভট্টাচার্য্য, মতিবালা, সত্য মুখার্জ্জি, ভবানী, নবদ্বীপ হালদার, কমলাবালা, পশুপতি সামন্ত, গোপাল প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

বড়লোকের ঘরজামাই, তাহার উপর শাশুড়ী অত্যন্ত দজ্জাল। সুতরাং, জামাই বিকাশকে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় এবং স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করার সুযোগও বড় একটা পাওয়া যায় না—অন্তত ছবিতে তাহা দেখা যায় না। সুতরাং বাহিরের প্রেমের খোঁজ করা বিকাশের পক্ষে অস্বাভাবিব নয়। এই রোমান্সের খোঁজ ও তার ফ্যাঁসাদ এই ছবির আখ্যানভাগ।

সেকালে অর্থাৎ বহুদিন পূর্ব্বে ডি জি'র হাস্যরস সঞ্চারের ক্ষমতা ছিল—এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু এখন কালেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাঁহার ক্ষমতাও নিঃশেষিত হইয়াছে। সুতরাং এখনও যদি তিনি জোর করিয়া হাস্যরস সঞ্চারের চেষ্টা করেন তাহা হইলে ছবি দেখিয়া হাস্যরসের পরিবর্ত্তে ছবির পরিচালকের প্রতি আমাদের করুণার সঞ্চার হয়। এর বেশী আর কিছু আমরা বলিতে চাহি না।

* * * * * * * *

শ্রীযুত মন্মথ রায়ের নূতন ঐতিহাসিক নাটক 'মীরকাশিম' ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নাট্যনিকেতনে আরম্ভ হইবে। শ্রীযুত সুধীর গুহ প্রযোজনা করিতেছেন এবং শ্রীযুত সতু সেন পরিচালনা করিতেছেন। চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

মীরকাশিম—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী অথবা ছবি বিশ্বাস; নাজাফ খাঁ—রবি রায়; গুরগিন্ খাঁ—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়; খোজা পিদ্রু—মণি ঘোষ; নাজামুদ্দৌলা—ভূপেন চক্রবর্ত্তী; মীরজাফর—দেবেশ্বর ভট্টাচার্য্য; ভ্যানসিটার্ট—ধীরেন চ্যাটার্জ্জি, হেষ্টিংস—জিতেন গাঙ্গুলী; আদামস—যুগল দত্ত; মেজর কর্নাক—নৃপেন চ্যাটার্জ্জি; জগৎ শেঠ—কুঞ্জ সেন; রাজবল্লভ—ননী রায়; মণি বেগম—নিরুপমা; জহরৎ উন্নিসা—চারুবালা; লতিফা বেগম—নীহারবালা।

ব্রজরঞ্জন রায়

আন্তর্জাতিক ভলিবল খেলার যে নিয়মাবলী পূর্ব্বে প্রকাশিত করা হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে এই প্রশ্ন প্রথমেই মনে উদিত হইবে যে, ভলিবল খেলায় বালক হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলে যোগদান করিতে পারে না। ভলিবল খেলা যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের মনে এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী প্রবর্ত্তকগণের মনেও এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। তাঁহারা বিশেষ আলোচনার পর ঐ প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাঁহারা ভলিবল খেলাটিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

(১) বালকদের জন্য, (২) হাইস্কুল ও কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য (৩) মাঝারি বয়স্ক বা বৃদ্ধদের জন্য, (৪) দক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য। এইরূপ চারি প্রকার নিয়মাবলী গঠন দ্বারা তাঁহারা ভলিবল খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি সহজ করিয়া দিয়াছেন। এই চারি প্রকার নিয়মাবলীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। যেটুকু নিয়মের পরিবর্ত্তন তাঁহারা করিয়াছেন, তাহা বয়স ও দৈহিক সামর্থ্যের কথা চিন্তা করিয়াই তাঁহাদিগকে করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকটি বিভাগের নিয়মাবলী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করিব।

বালকদের নিয়মাবলী

আন্তর্জাতিক ভলিবল খেলার যে নিয়মাবলী আছে সেই নিয়মে বালকগণ খেলিতে গেলেই প্রথমেই নেটের উচ্চতার জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিবেন। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে অর্থাৎ যাহাদের বয়স ১০।১২ বৎসর, আট ফুট উচ্চ নেটের উপর দিয়া বল হাতের জোরে অপর পারে প্রতিপক্ষের কোর্টে প্রেরণ করা একরূপ অসম্ভব। সেইজন্য ভলিবল প্রবর্ত্তনকারিগণ নেটের উচ্চতা বালক-খেলোয়াড়গণের উচ্চতা অনুযায়ী করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। খেলোয়াড়গণের গড়পড়তা উচ্চতা যদি চার ফুট হয়, নেটের উচ্চতা ছয় ফুট হইবে, যদি পাঁচ ফুট হয়, তবে নেটের উচ্চতা সাত ফুট এবং বালকদের উচ্চতা যদি সাড়ে তিন ফুট হয়, নেটের উচ্চতা পাঁচ ফুট হইবে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে বলের ওজন আছে সেই বল লইয়া বালকগণের পক্ষে খেলা অসম্ভব। বল তাহাদের পক্ষে ভারী হইবে ও হাতে আঘাত পাইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বলের ওজন কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা তাঁহারা দিয়াছেন। খেলিবার কোর্টের পরিমাপ সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ কিছু নির্দ্দেশ দেন নাই, তবে খেলোয়াড়গণের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করা হয়, তবে সেই অনুপাতে কোর্টের পরিমাপ বৃদ্ধি বা কমাইবার ব্যবস্থা তাঁহারা দিয়াছেন। প্রতি দলে বার জন করিয়া খেলোয়াড় লইয়া খেলা হইলে বালকগণ খেলায় খুবই উৎসাহ পাইবে বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন। পনের পয়েন্টে গেম না খেলিয়া যদি আট মিনিট খেলিবার ব্যবস্থা দেওয়া হয় তবে খুবই ভাল হয়। ঐ আট মিনিটের মধ্যে যে দল বেশী পয়েন্ট সংগ্রহ করিবে সেই দল জয়ী হইবে। ইহা ছাড়াও আর এক উপায়ে খেলাইবার কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থায় উভয় দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় একবার করিয়া সার্ভিস করিতে পারিবে। একবার সকলের সার্ভিস শেষ হ'লে পুনরায় দ্বিতীয় বার সকলে সার্ভিস করিবে। ইহার ফলে যে দলের অধিক পয়েন্ট হইবে সেই দল জয়ী হইবে। আন্তর্জাতিক নিয়মে একটি দলের একজন খেলোয়াড় সার্ভিস করিলে প্রতিপক্ষ দলের একজন উহা "রিসিভ" করিয়া উঠাইয়া দিবে। পরে ঐ দলের একজন উহা নিজ দলের একজনের মারিবার সুবিধা করিয়া দিবে অথবা অপর পক্ষের দিকে নেট অতিক্রম করিয়া যায় এইরূপভাবে বলে হাতের আঘাত দিবে। অর্থাৎ বল দলে আসিলে "রিসিভারের" পর একবার মাত্র বল পাশ করিবার অধিকার আছে। বালকদের জন্যই এই নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া দুইবার, এমন কি চারিবার পর্যন্ত বল পাশ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। এই কয়েকটি নিয়ম ছাড়া অপর সকল বিষয় আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে।

হাইস্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

হাইস্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণ অথবা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণকে আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলে ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড মাঠে খেলাইবার নির্দ্দেশ প্রবর্ত্তকগণ দিয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের মতে হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ অথবা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণই ভবিষ্যতে দক্ষ খেলোয়াড়গণের স্থান পূরণ করিবেন। তবে একটি বিষয়ের তাঁহারা পরিবর্ত্তন সমর্থন করেন, সেইটি হইল প্রতি দলে ছয়জন খেলিবার যে ব্যবস্থা দেওয়া আছে সেই স্থলে আট জন খেলিতে পারে। আট জন করিয়া প্রতি দলে খেলিলে এক নূতন অসুবিধা সৃষ্টি হইবে। একটি গেম শেষ হইতে অধিক সময় লাগিবে। এই জন্য তাঁহারা বলিয়াছেন খেলাটি অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী হইবে। এই অর্দ্ধঘণ্টা খেলা পনর মিনিট করিয়া দুই অর্দ্ধে বিভক্ত হইবে। এই দুই অর্দ্ধের মধ্যে পাঁচ মিনিট বিশ্রামের সময় থাকিবে। যদি পনের পয়েণ্টের গেম খেলা হয়, তবে খেলা দশ মিনিটের মধ্যে কিরূপে শেষ করা যায় তাহার এক ব্যবস্থা তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, প্রতি সার্ভিসেই একটি করিয়া পয়েন্ট ধরা হইবে। (টেনিস খেলার ন্যায়)। এইভাবে উভয় দলই প্রত্যেক সার্ভিসের পয়েন্ট লাভ করিবে। গেম অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হইবে। এইরূপ খেলার নিয়মের পরিবর্ত্তনের তখন প্রয়োজন হইবে না—যখন খেলোয়াড়গণ খেলায় দক্ষতা লাভ করিবেন।

ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

ছাত্রীগণ যখন দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া খেলিবেন, তখন তাঁহাদের খেলায় পাসিং সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকিবে না। তাঁহারা যতবার খুসী পাসিং করিয়া বল নেট অতিক্রম করিয়া অপরদিকে প্রেরণ করিতে পারিবেন। তবে এক খেলোয়াড়কে পর পর দুইবার বলে আঘাত করিতে দেওয়া হইবে না। সার্ভিসের সময় প্রত্যেক খেলোয়াড় যখন প্রথম সার্ভিস করিবে তখন দুইবার সার্ভিস করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন ঐ ছাত্রী সার্ভিস করিতে যাইবে, তখন সে একটিবার মাত্র সার্ভিস করিবার জন্য বল পাইবে। ছাত্রীগণের গড়পড়তা উচ্চতা যদি পাঁচ ফুটের অধিক না হয়, তবে নেটের উচ্চতা ৭ ফুট করা যাইতে পারে।

মাঝারি বয়স্ক বা প্রবীণদের জন্য

মাঠের দৈর্ঘ্যের ১০ ফুট কমাইয়া দিলেই প্রবীণগণের পক্ষে সার্ভিস করিতে বা ছুটাছুটি করিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। মাঠের দৈর্ঘ্য আরও ১০ ফুট কমাইয়া টেনিস খেলার ন্যায় ডাবলস ভলিবল খেলার ব্যবস্থা করিলে প্রবীণ ও মাঝারি বয়স্ক লোকেরা খেলায় বিশেষ উৎসাহ পাইবেন বলিয়া প্রবর্ত্তকগণ মনে করেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৫ই নবেম্বর—

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় রাজনৈতিক 'বন্দীমুক্তি কমিটির প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে এবং বিনা সর্ত্তে মুক্তির দাবী করিয়া সমগ্র বাঙলা দেশে তীব্র আন্দোলন চালাইবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

রাণীগঞ্জ কাগজ-কলে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে উক্ত কলের শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক শ্রীযুত সুকুমার ব্যানার্জ্জি লরী চাপা পড়িয়া শোচনীয়ভাবে মারা গিয়াছেন। প্রকাশ যে, কয়েকজন শ্রমিকের প্রতি শাস্তিবিধান হওয়ায় তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে কাগজ-কলের প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক গতকল্য ধর্ম্মঘট করে। অদ্য প্রাতে কলের ফটক খোলা হইতেই ধর্ম্মঘটকারীরা স্থির করে যে, কার্য্য-যোগদানেচ্ছু শ্রমিকদিগকে লরীতে করিয়া লইয়া গেলে, তাহারা সত্যাগ্রহ করিবে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীযুত সুকুমার ব্যানার্জ্জি এবং কয়েকজন ধর্ম্মঘটী লরীর সম্মুখে দাঁড়ান; ফলে তিনি চাপা পড়েন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর হইয়াছিল।

টিটাগড় মিল অঞ্চলে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সহিত যাহারা মিলে কাজ করিতেছে তাহাদের এক সংঘর্ষের ফলে ১২ জন আহত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের কালী প্রতিমা বিসর্জ্জন সমস্যা সম্পর্কে এই মর্ম্মে এক আপোষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে যে, বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা আগামীকল্য রাত্রি ৯টার পর গীতবাদ্যসহ মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইবে।

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের হোস্টেলগুলির হিন্দু ছাত্রদের যে অনশন ধর্ম্মঘট চলিতেছিল, তাহার অবসান হইয়াছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের অভিযোগ দূর করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স বাঁধ অঞ্চলের ভূমি রাজস্ব নির্দ্ধারণ প্রশ্ন সম্পর্কে বোম্বাইয়ে গমন করিয়া সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রধান মন্ত্রী ওয়ার্দ্ধা রওনা হইয়া গিয়াছেন। তিনি সিন্ধুর মন্ত্রিসমস্যা ও মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি কংগ্রেসী দলের মনোভাব সম্পর্কে মহাত্মার সহিত আলোচনা করিবেন।

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী জানান যে, পাঞ্জাবে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার প্রবর্ত্তনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে সং কোঃ আইনানুসারে ২৫ জনকে অন্তরীণ ও ১৯ জনকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। ১৮ জনকে লাহোর কেল্লায় আটক রাখা হইয়াছে এবং রাজদ্রোহের দায়ে ২৪ জন দণ্ডিত হইয়াছে।

লালা হরদয়াল কোন বে-আইনী আন্দোলনে যোগদান করিবেন না, এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি দিয়াছেন। লীগের নেতা মিঃ মহম্মদ আলী জিন্নার কন্যার বিবাহ লইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের মনোভাব অপরিবর্ত্তিত আছে।

"ইউনাইটেড প্রেস" জানিতে পারিয়াছেন যে, বড়লাট আগামী ১৩ই ডিসেম্বর দিল্লী হইতে কলিকাতা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সংশোধিত সর্ত্তনামা ১২০টি বড় বড় দেশীয় রাজ্যের নিকট পৌঁছিবে। দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজন্যবর্গ সংশোধিত সর্ত্তনামার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে ইচ্ছুক কিনা, আগামী ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে তাহা জানাইতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইতেছে।

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ কাপড়ের কলের মালিক স্যার নেসওয়াদিয়ার পুত্র মিঃ নেভিল নেসওয়াদিয়ার সহিত মুসলিম লীগের নেতা মিঃ মহম্মদআলী জিন্নার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর তিনটি বিমান দুর্ঘটনার ফলে পাঁচ ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে।

১৬ই নবেম্বর—

টিটাগড় চটকল অঞ্চলের হাঙ্গামার অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সহিত কার্য্যে যোগদানেচ্ছু শ্রমিকদের ভীষণ সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষই বে-পরোয়া লাঠিবাজী ও ছোরা মারামারি চালায়। ফলে একজন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। এ সম্পর্কে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে আয়কর আইন সংশোধন বিলের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

পাঞ্জাবের বিশিষ্ট আর্য্য-সমাজী নেতা এবং শিক্ষাব্রতী মহাত্মা হংসরাজ লাহোরে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

আসামের বিভিন্ন জেলে যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী আছেন, তাঁহাদিগকে গৌহাটী জেলে আনার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তথায় প্রধান মন্ত্রী ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শীঘ্রই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত সাক্ষাতের পর মন্ত্রিদ্বয় যদি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা সন্ত্রাসবাদে আর বিশ্বাসী নহেন এবং আইন-শৃঙ্খল মানিয়া লইতে ইচ্ছুক, তাহা হইলে সম্ভবত অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

গতকল্যকার মীমাংসার সর্ত্ত অনুযায়ী বর্দ্ধমানে কালী প্রতিমা বিসর্জ্জনের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন হয়। কিন্তু মিছিল লইয়া যাইবার কোন লাইসেন্স পাওয়া যায় না। ইহাতে হিন্দুগণ বিনা লাইসেন্সে এক বিরাট মিছিল করিয়া একখানি প্রতিমা বিসর্জ্জন দেয়। এখন আরও ১১টি প্রতিমা বিসর্জ্জন বাকী রহিয়াছে।

বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সম্মেলনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত যদুনাথ শর্ম্মা প্রমুখ চার জন কিষাণ-নেতা গয়া জেলার নওয়াদা মহকুমায় জমিদার ও প্রজাদের বিরোধ সম্পর্কে সত্যাগ্রহ করার আয়োজন করিতেছিলেন। এই সম্পর্কে স্থানীয় মহকুমা হাকিম ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত স্থান ত্যাগের আদেশ দিয়াছেন।

দিনাজপুর কৃষক সমিতির সভাপতি ডাঃ গণেন্দ্রনাথ

সরকার বিপ্লব দমন আইনে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আপীলে তিনি খালাস পাইয়াছেন।

"জার্ম্মানী হইতে গত কয়েক দিনে যে-সব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমত তাহাতে বিশেষ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে যে এই সব ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা আমি নিজেই কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।" সাংবাদিকগণের সম্মেলনে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট উপরোক্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, জার্ম্মানীর পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ অবগত হওয়ার জন্য তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বার্লিন হইতে ওয়াশিংটনে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

হাংগারীর প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ইমরেদি নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ডাঃ ইমরেদি হাংগারীতে ডিক্টেটরী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া স্বয়ং হিটলার কিংবা মুসোলিনীর ন্যায় স্বৈরাচারী ক্ষমতালাভে ইচ্ছুক।

রোমে ইংগ-ইতালীয় চুক্তি বলবৎ হওয়ার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

১৭ই নবেম্বর—

টিটাগড়ে শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে দাংগা-হাংগামার ফলে আরও দুই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। টিটাগড়ের দাংগা-হাংগামায় এ-পর্য্যন্ত তিন ব্যক্তির মৃত্যু হইল। এ সম্পর্কে মোট ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অদ্যকার দাংগা-হাংগামায় ৩৫ জনেরও অধিক লোক জখম হইয়াছে। উপদ্রুত অঞ্চলে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে।

বাঙলার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য বাঙলা সরকার "সরকারী গোপন বিল" নামে একটি বিল উপস্থিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ঐ বিলে গবর্ণর সম্মতি দিয়াছেন।

ইউরোপে পাঁচ মাস অবস্থানের পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার কন্যা ইন্দিরা নেহরু সহ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বোম্বাই-এ অ্যাপোলোবান্দরে পণ্ডিতজী বিপুল-ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ইউরোপ হইতে প্রত্যা-বর্ত্তনের পর এলাহাবাদে পৌঁছিয়াছেন এবং স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঙলার নবনিযুক্ত মন্ত্রীদ্বয় অনারেবল মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ ও অনারেবল মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ আনুগত্য ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

নিজাম সরকার স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা যেন সত্যাগ্রহীদের নির্ব্বাচিমূলে লিখিত বিতর্কমূলক কোন প্রবন্ধ প্রকাশ না করেন। গবর্ণ-মেণ্টের এই নির্দ্দেশ অমান্য করিলে জরুরী আইন অনুসারে ঐ সকল সংবাদপত্রকে অভিযুক্ত করা হইবে।

হায়দরাবাদ রাজ্যের ধুলপেট নরহত্যা মামলার রায় বাহির হইয়াছে। এই মামলায় গত এপ্রিল মাসে সাম্প্রদায়িক দাংগার সময় ধুলপেট নামক স্থানে দুইজন মুসলমানকে হত্যা করার অভিযোগে বোম্বাইয়ের "মহারাষ্ট্র" নামক সংবাদ-পত্রের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমরাও সিং এবং আরও ২৩ জন অভিযুক্ত হয়। বিচারে ২৪ জন আসামীরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছে।

১৮ই নবেম্বর—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশপ্রসাদ বাজপেয়ীর শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হইয়াছে। হৃষীকেশ লছমন-ঝোলার নিকটে তিনি খনিজ দ্রব্য সংক্রান্ত পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ঐ সময় তিনি প্রায় চারশত ফিট উঁচু হইতে পড়িয়া যান। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি যুক্ত প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক ঐ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বাঙলার মন্ত্রিসভার সদস্য বৃদ্ধির ফলে মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর পুনরায় বণ্টন হইয়াছে। নব নিযুক্ত মন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খান জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও রিফর্ম্মস এবং মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ কৃষি এবং পশু-চিকিৎসা বিভাগ পাইয়াছেন। কৃষিমন্ত্রী নবাব হবিবুল্লা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও শিল্প-বিভাগ এবং শ্রমমন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দ্দী পল্লী-পুনর্গঠন, শ্রম ও বাণিজ্য বিভাগ পাইয়াছেন। অন্যান্য মন্ত্রীদের দপ্তরের রদবদল হয় নাই।

শিখ ধর্ম্মপ্রচারক জ্ঞানী মেহের সিং রাজদ্রোহের অভি-যোগে সম্প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে তাঁহার প্রতি যে আচরণ করা হয়, তাহার প্রতিবাদে তিনি গত ১১ই নবেম্বর হইতে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে অনশন ধর্ম্মঘট করিতেছেন।

কাথিয়াবাড় রাজনৈতিক সম্মেলনের রাজকোট অধিবেশনের সভাপতি দরবার গোপালদাস দেশাই, রাজকোট রাজ্যের প্রজাদের দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে যোগ-দান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত পরামর্শ করিবার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

শান্তির জন্য এ বৎসরের নোবেল পুরস্কার জেনেভাস্থ নানসেন অফিসকে দেওয়া হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোম্বাইয়ে আজাদ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি দেশবাসিগণকে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে যত্নবান হইতে অনুরোধ জানান। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য (১) আত্মরক্ষার জন্য সামরিক শক্তি, (২) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং (৩) পররাষ্ট্র নীতির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব—এই তিনটি জিনিষ অত্যাবশ্যক।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়াছেন।

টিটাগড় চটকল অঞ্চলের অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। দাংগা-হাংগামা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ১৫২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ইস্তাম্বুলে দোলামবাগিচা প্রাসাদে কামাল আতাতুর্কের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তাঁহার শবাধারের পাশ দিয়া এক লক্ষ নরনারীর একটি মিছিল অতিক্রম করে। এই সময় এক সহস্র নরনারী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে, বহুলোক গুরুতররূপে আহত হয় এবং ১১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ওয়াশিংটনে ইংগ-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

১৯শে নবেম্বর—

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী কলিকাতায় "কামাল দিবস" প্রতিপালিত হয়। এতদুপলক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় নব্য-তুরস্কের স্রষ্টা কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত তুর্কজাতির প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

কলিকাতায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে জনসভায় মিলিত হইয়া কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ কেশবচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু লক্ষ্ণৌয়ে খদ্দর ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বসু শিল্পোন্নতির জন্য জাতীয় পরিকল্পনা এবং সোভিয়েট রুশিয়ার দৃষ্টান্তে একই সঙ্গে শিল্পোন্নতি এবং কুটীর-শিল্পের বিস্তারের আবশ্যকতার উপর বিশেষ জোর দেন।

২০শে নবেম্বর—

রাজসাহীর মহাদেবপুরে মাতাজী হাটে যাযাবরদিগের সহিত হাটের লোকজনের গুরুতর দাঙ্গার ফলে চারিজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে।

সিন্ধুর মন্ত্রিমণ্ডলী-সমস্যার সমাধান হইয়াছে। প্রধান-মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাবক্সের সহিত সর্দ্দার প্যাটেলের এইরূপ চুক্তি হইয়াছে যে, খান বাহাদুর সিন্ধুর বাঁধ অঞ্চলে পুনর কর নির্দ্ধারণ এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিবেন—অপর পক্ষে সিন্ধু পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ খান বাহাদুরের মন্ত্রিমণ্ডলীকে সমর্থন করিবেন।

কলিকাতায় "নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক বন্দী দিবস" প্রতি-পালিত হয়। এতদুপলক্ষে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু জনসভা হয়। তাহাতে অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী ও তৎসম্পর্কে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং রাজ-বন্দীদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনে যোগ দিতে জনসাধারণকে আহ্বান করা হয়।

লক্ষ্ণৌয়ে আমিনাবাদ পার্কে এক বিরাট জনসভায় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা করেন। "যদি কংগ্রেসের গণ-পরিষদের দাবী গৃহীত না হয় ও ভারতে যুক্তরাষ্ট্র চাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর প্রদত্ত সত্যাগ্রহের অস্ত্র ধারণ করিবে।"

২১শে নবেম্বর—

হিলি ষ্টেশন ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এবং হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য কারাবিধি ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ, কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের টিপসহি লইতে চাহিলে তাঁহারা দুইবার টিপসহি ও ফটো তুলিতে দিয়াছেন। তৃতীয়বার টিপসহি এবং ফটো তুলিতে দিতে তাঁহারা আপত্তি জানাইলে তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করা হয়।

হায়দরবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের নবম ডিক্টেটর শ্রীযুক্ত গোপাল রাও এবং চারিজন অর্গানাইজিং সেক্রেটারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

রাজকোটের অবস্থা ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। রাজকোটের অবস্থা আলোচনার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম ভারতীয় ষ্টেটস এজেন্সীর রেসিডেণ্ট মিঃ গিবসনকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

আসামের বড়দলুই মন্ত্রিসভাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ হকেন-হাল একখানি গোপন সার্কুলার জারী করিয়াছেন। উহাতে বড়দলুই মন্ত্রিসভা সম্পর্কে ইউরোপীয় দলের নীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ইউরোপীয় দল কিছুতেই বড়দলুই মন্ত্রিসভা সমর্থন করিতে পারে না; কারণ কংগ্রেসী দল শ্রমিক-দের মঙ্গলকর আইন প্রণয়ন করিবেন এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে ইউরোপীয়ানদের অন্যায় আধিপত্যের অবসান ঘটাইবেন। ইউরোপীয়ান দল সাদুল্লা দলেরই পক্ষপাতী, কারণ, তাঁহারা কদাপি ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে যাইবেন না,—শ্রমিকদের অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন না। সার্কুলারে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, সাদুল্লা মন্ত্রিসভার এই শ্বেতাঙ্গ-প্রীতির জন্যই ইউরোপীয় দল তাঁহাদিগকে সমর্থন করিয়াছেন। এই সার্কুলার হইতে আরও দেখা যায় যে, বড়দলুই মন্ত্রিসভার যাহাতে পতন ঘটে, তজ্জন্য একটি গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

মার্শাল চিয়াং কাইসেক হোনান প্রদেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফুঙটিকে অসময়ে হোনান প্রদেশের রাজধানী চ্যাঙসা ত্যাগ করায় এবং চ্যাঙসা নগরীতে আগুন ধরাইয়া দেওয়ার গুলী করিয়া হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছেন। চ্যাঙসায় অগ্নি-কাণ্ডের ফলে দুই সহস্রাধিক নরনারীর জীবনান্ত ঘটিয়াছে বলিয়া সকলের ধারণা।

যুগমানব কেশবচন্দ্র

(৮৬ পৃষ্ঠার পর)

কেশবচন্দ্র যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন—তখন ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে আলোড়ন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তখনও সমাজের অর্থনৈতিক ঠাট বজায় ছিল। তখনও অভাবের তাড়নায়, কর্ম্মের সন্ধানে লোকে বাপ-পিতামহের ভিটামাটি ছাড়িয়া দেশ-বিদেশে ছুটিয়া বাহির হয় নাই। সেইজন্য সেই যুগের লোকে ধীরে-সুস্থিরে নিজেদের চিন্তা-জগতের ও কর্ম্ম-জগতের সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে পারিয়াছিলেন। আজ আমাদের সমাজ-জীবন ছত্রভঙ্গ, সমাজ-বন্ধন ছিন্নভিন্ন। বাহিরের নানা প্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা আমরা অনেক বেশী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। বাহিরের নানা চিন্তা আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারায় নানাপ্রকার ঘূর্ণির সৃষ্টি করিতেছে। এই দুই যুগের মধ্যে অবস্থার যে পার্থক্য দেখা দিয়াছে, তাহাতে নেতৃত্বের কর্ম্মভার ভারী হইয়া উঠিয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু কেশবচন্দ্র প্রমুখ পূর্ব্বতন যুগের নেতৃবৃন্দ যেভাবে এই কর্ত্তব্যভার বহন করিবার জন্য নিজেদের গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সংযম ও সেই কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রয়োজন আজিও বর্ত্তমান। কেশবচন্দ্রের জন্মের শত-বার্ষিকী উৎসবের এই শিক্ষা যেন আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

চরিত্র-চিত্রণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন!

মিনার্ভা মুভীটোনের

শ্রেষ্ঠ সামাজিক আলেখ্য দেখিয়া সকলেই এই কথা বলিতেছে—

═ জে ল র ═

(Jailor)

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ

সোরাব মোদী, শরীফা, সাদেক, এরুক তারাপোরে, আবুবেকার্, লেডী কমলা, লীলা চীটনীস, শীলা।

পরিচালক ঃ **সোরাব মোদী**

প্রত্যেক শ্রেণীর দর্শকের জন্য অনবদ্য চিত্র নৈবেদ্য।

বৃহস্পতিবার ২৪শে নভেম্বর

বুকিংএর জন্য আবেদন করুন ঃ

দোসানি ফিল্ম কর্পোরেশন, ৭নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন ঃ বি, বি, ১৫০২ ও ৫৫০০ ঃঃ গ্রাম ঃ "ধুলধুল"
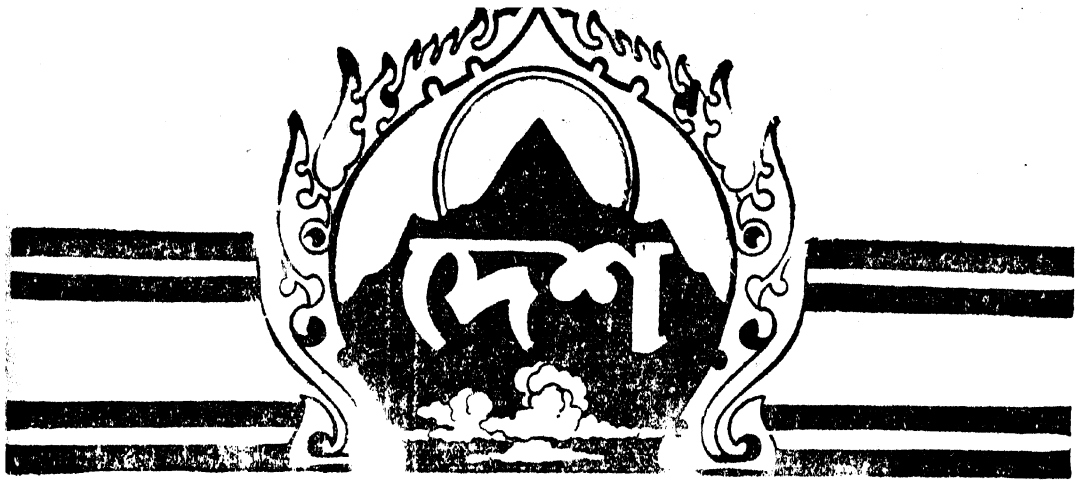
৬ষ্ঠ বর্ষ । শনিবার ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ সাল 3rd December 1938 | ৩য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাসবিহারী বসুর চিঠি—
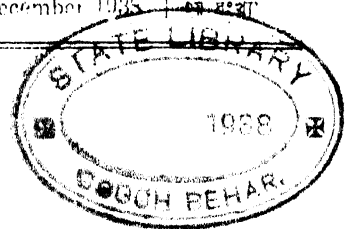
শ্রীযুত রাসবিহারী বসু বহুদিন হইতে জাপানে নির্ব্বাসিত **জীবন** যাপন করিতেছেন। তিনি বাঙলা দেশের একজন **স্বদেশ**-প্রেমিক সন্তান এবং প্রবাসে থাকিয়াও ভারতের **স্বাধী**নতার জন্য তিনি প্রাণে অত্যুলন্ত প্রেরণা পোষণ **করিয়া** আসিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে চীনে জাপানের নীতি **সমর্থন** করিয়া তিনি পুণার 'মারহাট্টা' পত্রে একখানা চিঠি **লিখেন।** এই চিঠি পরে বাঙলা দেশের সংবাদপত্রসমূহেও **প্রকাশি**ত হইয়াছে। বসু মহাশয় যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, **এই মত** আজ তাঁহার নূতন নহে। জাপানের সাম্রাজ্যবাদীরা **এই মত**বাদ বহুদিন হইতে প্রচার করিয়া আসিতেছে যে, **এশিয়ার** উদ্ধারসাধনই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। জেনারেল **আরাকী** সর্ব্বপ্রথমে এই কথা ঘোষণা করিয়া, এক সময়ে **ইউরোপের** সাম্রাজ্যবাদী মহলে কিছু চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়াছিলেন। বসু মহাশয়, সেই যুক্তির দিক হইতে চীনে জাপানের নীতি সমর্থন করিয়াছেন, শুধু সেই নীতিই সমর্থন করেন নাই, আমরা ভারতবাসী আমাদিগকেও সেই নীতি সমর্থন করিতে বলিয়াছেন। বসু মহাশয়ের প্রধান যুক্তি এই যে, ইংরেজের যাহারা শত্রু, তাহারাই ভারতবাসীদের বন্ধু। যে জাতির অধীনতার চাপে বহুদিন হইতে একটা জাতি পিষ্ট হইতেছে, সেইরূপ পরাধীন জাতির পক্ষে বিজেতৃ শক্তির বিরোধী যাহারা তাহাদের উপর একটা টান থাকা স্বাভাবিক, আমরা বুঝি। কিন্তু সে শুধু একটা আবেগমাত্র। বসু মহাশয় যে বাস্তব রাজনীতির উপর জোর দিয়াছেন, সেই বাস্তব রাজনীতির দিক হইতে ঐরূপ আবেগের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। নিজেদের পায়ে যদি জোর না থাকে, তবে পরের অধীনতা কাটান যায় না। মনিব বদল হয় মাত্র। আর একটি প্রধান কথা এই যে, জাপান যে ইংরেজের শত্রু, ইহারই বা কি প্রমাণ আছে? কে কাহার বন্ধু, কে কাহার শত্রু, মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এ বিবেচনার রাজনীতিক হিসাবে কোন মূল্য নাই, কাজে কি হইতেছে, ইহাই দেখা দরকার। বসু মহাশয় বলিয়াছেন, জার্ম্মানী, ইটালী, জাপান ইহাদিগকে চটাইয়া ভারতবাসীরা ভুল করিতেছে। তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, জাপান, জার্ম্মানী, ইটালী ইহারা ইংরেজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে ভারতবাসীকে সাহায্য করিবে; কারণ ইংরেজের সঙ্গে ইহাদের শত্রুভাব। এ শত্রুভাব, আজকালকার সাম্রাজ্যবাদীদের কাহার উপর কাহার যে নাই, ইহা বুঝিয়া উঠা দুস্কর। মনে মনে সকলেরই আছে, কারণ ইহাদের কাহারও অন্য কোন আদর্শ নাই, বা নীতি নাই, একমাত্র নীতি হইল নিজের নিজের স্বার্থ। মানবতা, মৈত্রী বা উদার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইহাদের কোন শক্তি যে অপর কোন শক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, বসু মহাশয় সত্যই কি জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় এমন ধারণা পোষণকে বাস্তব রাজনীতি বলিয়া বিশ্বাস করেন? জাপান, জার্ম্মানী, ইটালী, মনে মনে ইহারা সকলেই ইংরেজের হয়ত শত্রু, কিন্তু কাজে কি দেখিতেছি? কাজে তো দেখা যাইতেছে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতরই হইয়া উঠিতেছে। হিটলারের তো বরাবর এই ধারণা যে, ভারতের কালা আদমীরা আকাট অনার্য্য, ইংরেজ তাহাদিগকে গড়িয়া পিটিয়া কিছু মানুষ করিতেছে এবং ভারতবাসীদের চিরকাল ইংরেজেরই অধীনে রাখা উচিত। হিটলারের এই মতিগতির সঙ্গে মুসোলিনীর মনোভাবের যে কোন পার্থক্য নাই, আবিসিনিয়ার

ব্যাপারের পরও কি তাহা উপলব্ধি করিতে বাকী আছে? আর জাপানের কিরূপ মতিগতি এশিয়াবাসীদের উপর—চীনেই তো সে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে! বসু মহাশয় বলিতেছেন, চীনারা জাপানীদের অত্যাচারের মিথ্যা কথা রটাইয়া ভারতবাসীদের মন জাপানীদের উপর বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। প্রমাণস্বরূপ 'মডার্ন রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত কয়েকখানি চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, জাপানীরা যদি ঐভাবে অত্যাচার করিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহারা কি চীনাদিগকে ফটো তুলিতে সুবিধা দিয়া তবে অত্যাচার করিয়াছে? কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট সাংহাই হইতে একজন মার্কিন সাংবাদিক যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে বসু মহাশয়ের এই উক্তির জবাব রহিয়াছে। এই চিঠিতে উক্ত সংবাদপত্রসেবী লিখিয়াছেন—'আমি কিছুদিন হইতে এখানে আছি, জাপানীরা এখানে কিরূপ অত্যাচার করিতেছে এবং কেমনভাবে অত্যাচার করিতেছে আমার বেশই জানা আছে। সম্প্রতি আমি নানকিনে গৃহীত কয়েকখানা ফটো দেখিয়াছি। এগুলো জাপানী সেনারাই তুলিয়াছে। নরহত্যা এবং নারীর উপর পাশবিক অত্যাচারের এই সব ছবি, এগুলি এত ভীষণ যে, ভাষায় সে ভীষণতা ব্যক্ত করা যায় না। চীনে জাপানীরা যে নিষ্ঠুর অত্যাচার করিতেছে, ট্রয়ের পতনের পর জগতে তাহার তুলনা দেখা যায় না।'

বর্ব্বরতার নজীরের কি অভাব? বোমা ফেলিয়া নির্দোষ নর-নারীকে হত্যা করা, গ্রাম, নগর, [illegible] ধ্বংস করা, এ সব বর্ব্বরতা কম কিসে? বসু মহাশয় কি বলিতে চান যে জাপানীরা এ সব করিতেছে না? চীনাদের দেশ, চীনাদের রাজ্য, মুল্লুক চীনাদের সেখানে গিয়া জাপানীদের এই সব অত্যাচার করিবার কি অধিকার আছে? অপর দেশ গায়ের জোরে দখল করিয়া, অপর জাতিকে নিজেদের স্বার্থের জন্য শোষণ করিবার যে রাক্ষসী এবং পৈশাচী প্রবৃত্তির বিলাস-বিবর্ত্ত ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা চালাইয়াছে এবং চালাইতেছে, জাপানীরাও তাহাই করিতেছে। এ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে দস্তুর মত দোস্তী রহিয়াছে এবং এই দোস্তীই দানা বাঁধিয়াই উঠিতেছে। জাপানের উপর ভারতবাসীদের টান ছিল, —কিন্তু জাপান তাহা নিজেই নষ্ট করিয়াছে। আজ সে ভারতবাসীর বন্ধু নহে, সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ নীতির সঙ্গী হইয়া সাম্রাজ্যবাদপীড়িত ভারতবাসীদের দৃষ্টিতে সে শঙ্কনীয় হইয়া পড়িয়াছে। জাপানের বর্ব্বরোচিত বীভৎস বৃত্তি ভারতবাসীদের চিত্ত [illegible] উপর [illegible] করিয়া তুলিয়াছে। 'জাপান [illegible] [illegible] স্বদেশের [illegible] [illegible] মহাকবির এই উক্তি আজ ভারতবাসীর পক্ষে [illegible] সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতের দিকে দৃষ্টি—

শক্তিতে শক্তিতে স্বার্থের সংঘাত তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে; এরূপ ক্ষেত্রে কাহাকেও মিত্র কিংবা কাহাকেও শত্রু বলিয়া বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। সাম্রাজ্যবাদীরা [illegible] [illegible] পরিণত [illegible] [illegible] আসিয়া পড়িতেছে, আমরাই কি নিষ্কৃতি পাইব? গত ২৬শে নবেম্বর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বারাণসীতে একটি বক্তৃতায় এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—সাম্রাজ্যবাদ শুধু ইউরোপেই প্রভাব বিস্তার করে নাই, এশিয়াতেও উহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জাপান চীনকে পদদলিত করিয়াছে, এখন নজর রহিয়াছে তাহার ভারতের দিকে। ইংরেজও মনে মনে এ সত্যটি যে একেবারে না বুঝিতেছে এমন নয়। ব্রহ্ম হইতে সোজাসুজি চীনদেশের ভিতর পর্য্যন্ত এখন রেল লাইন বসিয়াছে। রেঙ্গুনে জাহাজ হইতে অস্ত্রশস্ত্র নামাইয়া ব্রহ্মের ভিতর দিয়া স্থলপথে চীনে সে সব পাঠাইবার পথ এখন খোলা। সম্প্রতি 'ষ্টানহল' নামক একখানা ব্রিটিশ জাহাজ এইরূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রেঙ্গুনে পৌঁছিয়াছে এবং সেই সব অস্ত্রশস্ত্র চীনে যাইবে। বলা বাহুল্য জাপান ইহা দেখিতেছে এবং এজন্য ইংরেজের উপর প্রেম অবশ্যই তাহার বাড়িবে না। ওদিকে ইটালী বা জার্ম্মানীও বসিয়া নাই। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবিকা মাদাম টাবু সম্প্রতি লিখিয়াছেন—"জার্ম্মানীর আপাততঃ লক্ষ্য ইউক্রেন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহার আসল লক্ষ্য হইল বাগদাদের রাস্তা, যে রাস্তা মোসুলের তেলের খনিসমূহ এবং ভারতের তোরণ-দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যেই অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং রুমেনিয়া হইয়া হামবুর্গ হইতে রেলের পথ কৃষ্ণসাগরের তীরভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। ইংরেজ কিংবা জাপান যে ইহা লক্ষ্য করিতেছে না এমন নয়, কিন্তু ইহাদের অন্তরের সেজন্য যে অপ্রেম স্বাভাবিক সেই অপ্রেমকেও সাম্রাজ্যবাদীরা আপাততঃ চাপা দিতে বাধ্য হইতেছে; বাধ্য হইতেছে রুশিয়ার ভয়ে। অন্য কারণে নয়। ইংরেজ, জার্ম্মানী, ফরাসী, ইটালী, জাপান এই শক্তিগুলোর মধ্যে মিলনের সূত্র হইল এক রুশ-ভীতি এবং সে ভীতির মূলে রহিয়াছে শোষণের নীতি। অন্য কোন হিসাবে [illegible] কোন উদারতাই নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের কর্ত্তব্য কি? শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহার মত কংগ্রেসেরই মত। তিনি বলেন [illegible] দেশকে লুণ্ঠন করার নীতি আমরা সমর্থন করিতে পারি না। যাহারা আজ চীনদেশ লুঠ করিতেছে, স্বার্থের দায়ে, তাহারা সুবিধা পাইলে আমাদের দেশও লুঠ করিতে কসুর করিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধু যদি কোন বৈদেশিক শক্তি থাকে, তবে তাহারাই যাহাদের উপর লুঠেরার দল লুণ্ঠন, নিপীড়ন চালাইতেছে কিংবা যাহারাই সেই সব নির্য্যাতিত বা নিপীড়িতদের পক্ষে যাহারা, যাহারা তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতিবিশিষ্ট। এই দিক হইতে আবিসিনিয়া লুণ্ঠনকারী ইটালী, কিংবা চীনে [illegible] জাপান, ইহুদী নির্যাতনে উন্মত্ত জার্ম্মানী ইহারা কেহই আমাদের বন্ধু হইতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গলা ভাষা—

গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ [illegible] [illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে

...ার উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ...ান ইহাতে বাড়িবার কিছু নাই; কিন্তু ইহাতে বিশ্ব-...্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিজেদিগকেই সম্মানিত করিয়াছেন। ... উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার খান বাহাদুর ...জলুল হক যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি বিষয় ...ষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশের কোন কোন মহলে এখনও যুবক বয়স রীতিমত অপরাধের সামিল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই যুবক বয়সেই শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন।" ভাইস-চ্যান্সেলার সাহেব যে সব মহলকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে এ দেশের সরকারী মহলটাকে তিনি বাদ দেন নাই বলিয়াই বিশ্বাস। কিন্তু স্পষ্টবাদিতার সহিত এ কথা ভাঙিয়া বলিলেই এক্ষেত্রে শোভন হইত বলিয়া আমরা মনে করি; কারণ, এ দেশের যুবক সম্প্রদায়ের প্রতি এ দেশের সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম কৃতিত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া নিজেদের নীতি প্রয়োগ করিয়া এ দেশের যুবকদের অন্তর হইতে স্বাধীনতা, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, স্বদেশ-প্রেমকে নিষ্পিষ্ট করিবার জন্য যে সব চেষ্টা সরকার পক্ষ হইতে হইয়াছে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় দৃঢ়তার সহিত তাহাতে বাধা দিয়াছেন। যুবকদিগকে সরকারী দাসত্বের নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিবার কোন ফিকির-ফন্দী তিনি বরদাস্ত করেন নাই। বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার সাহেব সে আদর্শ অনুসরণ করিবেন, এ আশা আমাদের সুনিশ্চিত হইত যদি তিনি খোলাখুলি কথাটা বলিতেন। বাঙলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম কৃতিত্ব। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এই কৃতিত্বকেই আমরা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া থাকি। বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার উচ্ছ্বসিত ভাষায় সেদিক হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মুখে এই প্রসঙ্গে আমরা অনেক বড় বড় কথা শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্য আমরা বাঙালী আমাদের পক্ষে গর্ব্বের বিষয় হইয়াছে। এই ভাষা ক্রমেই শক্তিশালী হইতেছে, এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার প্রক্রিয়া এখনও চলিতেছে; বঙ্গভাষার এই সমৃদ্ধি সাধনের ...হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতিত্ব আপনারা সকলেই ...ীকার করিবেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বঙ্গভাষাকে ...তর সমৃদ্ধ করিবার জন্য বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলারের ...-ভাষা-প্রীতি কিরূপ বাস্তব আকার পরিগ্রহ করে, তাঁহার ...তায় তৎসম্বন্ধে বাঙালীমাত্রেরই আগ্রহ জাগ্রত হইবে। ...কে সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলিয়া যাহারা বাঙলার ভাষা ...সাহিত্যের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিতেছে, বঙ্গবাণীর ... মধ্যযুগীয় ইতরতাকে আমদানী করিতে চাহিতেছে, ...তাহাই নহে, বঙ্গভাষার সাধনার জন্য, বঙ্গ-সাহিত্যের ...বিকাশের যাঁহারা সাধনা করিতে জীবন উৎসর্গ ...য়াছেন, যাহারা আজ সাম্প্রদায়িকতার অন্ধতায় দিক-...শূন্য হইয়া তাঁহাদিগের সাধনা এবং আদর্শকে বিকৃত ...াইতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের অনিষ্টকর উদ্যমের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার যদি কিছু সাবধানী-বাণী উচ্চারণ করিতেন, তবে ভাল হইত। কেহ কেহ বলিবেন যে, সে বিষয়টা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইত; কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না; কারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে ঐ শ্রেণীর লোকেরা বিষোদ্গার কম করে নাই এবং এখনও করিতে ছাড়িতেছে না; তাহাদের এই ভ্রান্তি দূর করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অবদানের প্রকৃত মূল্য তাহাদিগকে উপলব্ধি করান ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয়ের কর্ত্তব্য ছিল বলিয়াই আমরা মনে করি।

বাঙলার নব গঠিত মন্ত্রিমণ্ডল—

কৈফিয়তের অভাব হয় না—কথামালার নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবকের গল্প অনেকেরই স্মরণ আছে। বাঙলার নয়া মন্ত্রী মৌলবী সামসুদ্দিনও মন্ত্রিদলে ভিড়িয়া এক কৈফিয়ৎ খাড়া করিয়াছেন; কিন্তু সে কৈফিয়ৎ একেবারেই ফাঁকা। মন্ত্রীদের কৃষক ও প্রজা-প্রীতির কোন পরিচয় কিভাবে তাঁহাকে প্রেকপাশে বাঁধিল, যে মন্ত্রিমণ্ডল, দুই দিন আগেও তাঁহার মতে প্রজাস্বার্থের বিরোধী ছিল, সে মন্ত্রিমণ্ডলের নিকট হইতে নূতন কোন্ প্রতিশ্রুতি পাইয়া, কোন্ দিক হইতে প্রজাস্বার্থের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি প্রেমসাগরে গা ভাসাইলেন, কৈফিয়তে সে সব কোন কথাই নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, দিল্লী যাইবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত, তাই কৈফিয়ৎ খুঁটিনাটি করিয়া দিবার সময় করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার একথা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়; কৈফিয়ৎ দিবার কিছু থাকিলে তিনি তাহা দিতে ছাড়িতেন না, অন্তত বিরোধী-দের মুখ বন্ধ করিবার জন্য; কিন্তু বিরোধীদের মুখ বন্ধ করিবার পক্ষে কড়া কথা ছাড়া আর কিছুই তাঁহার বিবৃতিতে নাই। কড়া কথায় কি লোকে ভয় পাইবে? তারপর আর একটা কথা এই যে, মন্ত্রীর গদিতে বসিয়াই দিল্লীতে ছুটিবার জন্য তাঁহার এমন কি প্রয়োজন পড়িয়াছিল? প্রধান মন্ত্রী মহাশয়েরই না হয় কন্যার অসুখের জন্য সেখানে যাওয়া দরকার; কিন্তু সামসুদ্দিন সাহেবের নূতন উজীরী উপ-ভোগে বাদ ঘটিল কিসে? মন্ত্রিমণ্ডলের ভবিষ্যৎ চিন্তা যে এই সব চাঞ্চল্যের মূলে রহিয়াছে, ভিতরের কথা না জানিলেও বাহির হইতে তাহা অনুমান করা কঠিন হয় না। অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বাঙলার, প্রধান মন্ত্রী এতকাল যাঁহার গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষীস্বরূপ ছিলেন, আমরা শুনিতেছি, তাঁহাদের মধ্যেই নাকি মতের অমিল ঘটিয়াছে এবং এ পর্যন্ত শোনা যাইতেছে যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থ-সচিব মহাশয় পদত্যাগ করিতেছেন। নলিনীরঞ্জন পদত্যাগ করুন আর না করুন আমরা সে বিষয়কে বড় করিয়া দেখি না, আমরা ইহাই বুঝিতে পারিতেছি যে, ব্যক্তিগত যে হীন স্বার্থ বাঙলার অপদার্থ মন্ত্রিমণ্ডলকে পারিবারিক সুখ-সূত্রে বাঁধিয়াছিল, তাহার মধ্যে সঙ্ঘাত উপস্থিত হইয়াছে। বড় স্বার্থ যেখানে মূলে কিছুমাত্র নাই, সেখানে এ জিনিষ দেখা না দিয়া যায় না। হক-মন্ত্রিমণ্ডলের নূতন জুড়িদারেরা এই স্বার্থের সঙ্ঘাত বাড়াইয়াই তুলিয়াছেন এবং তাহার ফলে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল অধিকতর দুর্ব্বল

হইয়াই পড়িয়াছে; সুতরাং ডিসেম্বরের মাঝামাঝিই বাঙলায় আর একটা মন্ত্রি-সমস্যা দেখা দিতে পারে, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সেদিন এই যে উক্তি করিয়াছেন ইহার মূলে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি—

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির নিমিত্ত আন্দোলন পরিচালনা করিবার জন্য কংগ্রেস হইতে একটি নিখিল ভারতীয় কমিটি গঠিত করা হইবে, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এখনও বলিতেছি, রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির এই যে প্রশ্ন, কংগ্রেসের দিক হইতে ইহা নিখিল ভারতীয় প্রশ্ন, একটা প্রাদেশিক প্রশ্ন নয়। শুধু পাঞ্জাবে এবং বাঙলাতেই এ প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। সুতরাং পাঞ্জাব ও বাঙলা উহা লইয়া বুঝাপড়া করুক, নিখিল ভারতীয় ব্যাপারের দিক হইতে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সেজন্য মাথা ঘামান উচিত নহে, আমরা এরূপ মনে করি না। কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হন, আমাদের মতে তখনই এই প্রশ্নটির বুঝাপড়া করিয়া লওয়া উচিত ছিল। সব দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামেই স্বাধীনতার সংগ্রাম যাঁহারা পরিচালনা করেন, তাঁহারা এই সব বিষয়ের উপর জোর দিয়া থাকেন; কিন্তু কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ তাহা করেন নাই। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি লইয়া বিহারে যখন এই সমস্যাটা দেখা দিয়াছিল তখনও তাঁহারা প্রাদেশিক হিসাবে বিচ্ছিন্নভাবেই বিষয়টির সম্বন্ধে বিবেচনা করেন এবং এ পর্য্যন্ত বাঙলা ও পাঞ্জাবের রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ নিজেরা কোন গরজই কার্য্যত দেখান নাই। পক্ষান্তরে শুনিতেছি, ভারতের কোন কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এই মর্ম্মে একটি আইন করিতে চাহিতেছেন যে, রাজনীতিক অপরাধ বলিতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে-সব রাজনীতিক অপরাধ, অর্থাৎ যে-সব অপরাধের উদ্দেশ্য রাজনীতিক হইলেও হিংসামূলক হইবে না, সেই গুলিই 'রাজনীতিক অপরাধ' বলিয়া গণ্য হইবে এবং রাজনীতিক অপরাধীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকারী হইবে সেই শ্রেণীর অপরাধকারিগণই। কংগ্রেসের নীতি—অহিংস নীতি, হিংসার নীতি নহে; ইহা আমরা জানি, আমরাও হিংসার নীতির বিরোধী; কিন্তু রাজনীতিক অপরাধের সংজ্ঞা সেই দিক হইতে দেওয়া চলে না। কোন কংগ্রেসী প্রদেশের মন্ত্রীরা যদি রাজনীতিক অপরাধের এইরূপ নব ভাষ্য দান করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে বাঙলা এবং পাঞ্জাবের রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির আন্দোলনের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করা হইবে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, রাজনীতিক অপরাধ একটা ব্যাধির মত, এই ব্যাধির বীজ নিহিত থাকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিতরে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির কারণও নষ্ট হইতে পারে। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিতর দিয়া পরিপূর্ত্তি লাভ করিলেই এ ব্যাধির আশঙ্কা আর থাকে না। বাঙলার মন্ত্রীরা মুখে এই কথা বলিতেছেন যে, দেশের লোকের অধিকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন—দায়িত্বমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ শাসন-ব্যবস্থায় ঐ সব অধিকারের অভাবই বীজস্বরূপে থাকিয়া যে ব্যাধির সৃষ্টি করে এবং সেগুলির অভাবে যে ঐ ব্যাধি থাকিতে পারে না, এই সোজা কথাটা—যে কথাটা সর্ব্বদেশে, আন্তর্জ্জাতিক নীতিক হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে, তাঁহারা সে কথাটা স্বীকার করিবেন না। তাহাদের এই ভ্রান্তি ভাঙিয়া দিতে হইবে, এদিকে দায়িত্ব শুধু বাঙালীর নাই, ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনের কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসেরও রহিয়াছে। কারণ এই সব অপরাধের অনুষ্ঠানের প্রকরণ বা পথ যাহাই হউক, উদ্দেশ্য রাজনীতিক এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সহিত তাহার যোগ কোন-না-কোনভাবে আছেই।

রেলযাত্রীর অভাব-অভিযোগ—

ভারতীয় রেলওয়ে সম্মেলনের সভাপতি স্বরূপে মিঃ এ এফ হার্ভে কিভাবে রেলওয়েকে জনপ্রিয় করা যায়, তৎসম্পর্কে তাঁহার অভিভাষণে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ভারতীয় রেলপথের জনপ্রিয়তার প্রধান প্রতিবন্ধক হইল কর্ম্মচারীদের অসাধুতা ও দুর্ব্যবহার, তাহা ছাড়া রেল-কর্ম্মচারীদের মধ্যে ঘুষের লোভও দেখা যায়। জনসাধারণের এই সব অভিযোগ বড় গুরুতর অভিযোগ। হার্ভে সাহেব বলিয়াছেন যে, এই সব দুর্ব্যবহার দমনকল্পে জনসাধারণের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু সকলেই বুঝিতে পারিবেন, অভিযোগের কারণ যদি বাস্তবিকই থাকে, তাহা হইলে জনসাধারণ অভিযোগের কারণ দূর করিতে সাহায্য করিতেছে না এ কথা কোন একটা 'কৈফিয়ৎ' হয় না। তাহা ছাড়া রেল-কর্ম্মচারীদের অসাধুতা এবং দুর্ব্যবহারই যে রেলপথ লোকের অপ্রিয় হইবার একমাত্র কারণ—ইহাও বলা যায় না। প্রকৃত কারণ হইল এই যে, রেলপথ যাহাদের নিকট প্রিয় করিলে রেলপথ লোকপ্রিয় হইবে বলা চলে, রেলকর্ত্তৃপক্ষ সেই শ্রেণীর লোকদিগকে মানুষের মধ্যে গণ্য করেন না। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি রেল-কর্ত্তৃপক্ষের সেই উপেক্ষাই অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে রেল-কর্ম্মচারীদের মনে প্রেরণাস্বরূপে কার্য্য করে; তাহাদের সাহস বাড়াইয়া দেয়। মুষ্টিমেয় উচ্চ-শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য রেল-কর্ত্তৃপক্ষের যে দৃষ্টি, তাহার তুলনায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য তাহাদের ঔদাসীন্য এবং উপেক্ষা অপরিমিত। অথচ এই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে যে আয়, তাহাই রেলপথের প্রধান আয়। গাঁইটের পয়সা খরচ করিয়া সখ করিয়া রেল-ভ্রমণের নামে কেহ দুর্ভোগ ভুগিতে যাইতে চাহে না। রেলপথ যদি প্রকৃতপক্ষে লোকপ্রিয় করিতেই হয়, তাহা হইলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি রেল কর্ত্তৃপক্ষের এই ঔদাসীন্যকে আগে দূর করিতে হইবে। গরু-ভেড়ার মত গাদা বোঝাই করিয়া লোক চালান দেওয়া—অসহ্য গরমের মধ্যে রুদ্ধশ্বাসে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করান, পাখার ব্যবস্থা নাই, জলের ব্যবস্থা নাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি নাই,

নিজেদের এই যে সব কু-ব্যবস্থা এইগুলি আগে দূর করিতে হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ এই উপেক্ষা বা ঔদাসীন্যের মনোভাব পরিত্যাগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি রেল-কর্ম্মচারীদের দুর্ব্যবহারও অনেকটা কমিত হইবে এবং জনসাধারণও দুর্নীতি দমনে সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহসহকারে আগাইয়া আসিবে। প্রথম প্রয়োজন, এ দেশের যাহারা নিম্নশ্রেণীর যাত্রী, তাহাদের সম্বন্ধে রেল-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির পরিবর্ত্তন সাধন, তাহাদের পয়সাই যে পয়সা—এইটি উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা।

বাঙলায় কংগ্রেসের প্রভাব—

আগামী বৎসরের জন্য বাঙলা দেশে যাঁহারা কংগ্রেসের সদস্য হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যার একটা প্রাথমিক হিসাব বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিস হইতে বাহির হইয়াছে। পাবনা, ফরিদপুর এবং মেদিনীপুর—এই তিনটি জেলার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। এই তিনটি জেলা বাদে মোট ৪,৩০,১৬৪জন কংগ্রেসের সদস্য হইয়াছেন, গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল, ২,৫৬০০০। যে তিনটি জেলার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই, সেই তিনটি জেলায় খুব কম করিয়া ধরিলেও ৫০ হাজার কংগ্রেস সদস্য হইবেন, এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে। তাহা হইলে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪ লক্ষ ৮০ হাজারের কাছাকাছি। এই স্থলে বিশেষভাবে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তাহা এই যে, এ বৎসর মুসলমান সম্প্রদায় হইতে যত বেশীসংখ্যক কংগ্রেসের সদস্য হইয়াছেন বাঙলা দেশে তত বেশী সংখ্যক সদস্য অন্য কোনদিন হয় নাই। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রবল প্রচারকার্য্য সত্ত্বেও এবং বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাঘাই গর্জ্জন সত্ত্বেও বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কংগ্রেসের এমন প্রভাব হইতে—রাষ্ট্রীয় স্বার্থের মহত্তর আদর্শ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতেছে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কংগ্রেসকে যাহারা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া গালাগালি করে, তাহাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকেই তাহাদের সেই বক্তিকে কি ভাবে গ্রহণ করে, ইহাও বুঝা যায়। ধাপ্পাবাজী দিয়া মানুষকে ভুলাইবার দিন এখন চলিয়া গিয়াছে। যাঁহারা নিজেরা মনে করেন যে, তাঁহারাই বড় বুঝনেওয়ালা সুতরাং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য তাঁহারা ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়া যত বুলি আওড়াইবেন দেশের লোকেরা তাহাই অবিসংবাদিতচিত্তে স্বীকার করিয়া লইবে, তাঁহাদের আসল মতলবটা লোকে ধরিতে পারিবে না, তাঁহাদের সে ভ্রান্তি ইহা হইতে কতকটা দূর হইবে। তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন অন্তত অন্তরে অন্তরে এই সত্য যে, কংগ্রেসের উদার আদর্শ এবং নীতিকে পরিম্লান করিবার স্পর্দ্ধা তাঁহাদের স্বার্থান্ধ চিত্তের মূঢ়তার ব্যর্থ বিক্ষোভ মাত্র। সেবা এবং স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্য কাহাকেও টীকাটিপ্পনী দ্বারা যেমন বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হয় না, তেমনই কাহাকেও সে সম্বন্ধে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গেলেও নিজেদের মূঢ়তাকেই উন্মুক্ত করা হয়, কারণ সেবা এবং স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করিবার শক্তি মানুষের মধ্যে সর্ব্বত্র স্বাভাবিকভাবে রহিয়াছে।

প্যালেষ্টাইনে ইংরেজের নীতি—

ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সচিব ম্যাকডোনাল্ড সাহেব কমন্স সভায় সেদিন একটি বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন,—প্যালেষ্টাইনের শাসন সম্বন্ধে আমাদের যদি কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে হয়, তাহা হইলে কেবল ইহুদীদের বিষয়ই নয়, আরবদের অবস্থায় নিজদিগকে ফেলিয়া, তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। আরব বিপ্লববাদীদের কথা উল্লেখ করিয়া ম্যাকডোনাল্ড সাহেব বলেন, আরবেরা যতই বিভ্রান্ত হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে যে স্বদেশপ্রেম প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতেছে, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির সঙ্গে যেখানে বিরোধ ঘটে, সেইখানে স্বদেশপ্রেমই বড় অপরাধ দাঁড়ায়। এই অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয় বিভিন্ন রকমে, কোথায়ও স্বদেশপ্রেমিকেরা হয় খুনে, কোথায়ও হয় ডাকাত। —এইরূপ নিন্দনীয় নানা আখ্যায় তাহাদিগকে অভিহিত করিবার রেওয়াজ আছে; কিন্তু তাহাতে মূল সত্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। আদর্শ বা নীতির কোন মূল্য যাঁহার কাছে আছে, সাম্রাজ্যবাদীদের ধোঁকা তাহাদের দৃষ্টিকে অপরিচ্ছন্ন করিতে পারে না। প্যালেষ্টাইনের আরবেরা আজ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। ইউরোপীয় জাতিরা স্বদেশপ্রেমের জয়ঢাক বাজায়, অথচ তাহারাই ইহাদিগকে নিন্দা করিতে আসে! মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আধুনিক নীতিবোধের এই রহস্য উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশের প্যালেষ্টাইন সম্পর্কিত নীতির আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—প্যালেষ্টাইনের অধিবাসী হইল আরবেরা, যে হিসাবে ইংলণ্ড ইংরেজদের, ফ্রান্স ফরাসীদের, সেই হিসাবে প্যালেষ্টাইনও আরবদের। আরবদের ঘাড়ে জোর করিয়া ইহুদীদিগকে চাপাইয়া দিতে যাওয়া অন্যায় এবং নিষ্ঠুর কার্য্য। প্যালেষ্টাইনে বর্ত্তমানে যে কাণ্ড চালান হইতেছে, কোন নৈতিক বিধানের দিক হইতেই তাহা সমর্থন করা চলে না। ব্রিটিশের অভিভাবকত্বের পিছনে কোন নৈতিক যুক্তি নাই। প্যালেষ্টাইনকে ইহুদী বাসভূমিতে পরিণত করিবার জন্য তেজস্বী আরবদিগকে পিষ্ট করা মানবতার বিরুদ্ধে যে গুরুতর অপরাধ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ উপনিবেশ-সচিবের উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে, কার্য্যত তাঁহারা প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার নীতি পরিত্যাগ করিবেন না। সুতরাং স্বদেশপ্রেমিক আরবদিগকে দলন, দমন, নির্য্যাতন, নিগ্রহ ক্রিয়ারও নিবৃত্তি ঘটিবে না। ইংরেজ যে প্যাঁচের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাতে প্যালেষ্টাইনের

সমস্যার সমাধান করিবার শক্তি তাহাদের নাই। আরব স্বদেশ-প্রেমিকেরা সাম্রাজ্যবাদীদের মতে যতই উন্মার্গগামী হউক, এ সমস্যার সমাধান একমাত্র তাহাদের দৃঢ়তার উপরই নির্ভর করিতেছে।

আসামের মন্ত্রিমণ্ডল—

আসামের ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইল। শ্বেতাঙ্গ চা-কর দলের গুপ্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হইবার পর আসামের লীগওয়ালাদের স্বরূপ একেবারে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। হক মন্ত্রিমণ্ডলের মত লীগওয়ালারা এবং তাঁহাদের চাঁই স্যার মহম্মদ সাদুল্লারও আশা-ভরসা একমাত্র হইল শ্বেতাঙ্গ দল অর্থাৎ যাহাদের সহিত আসামের জনসাধারণের স্বার্থের বলিতে গেলে একপ্রকার বিরুদ্ধ সম্পর্ক। যে শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহ দলের একমাত্র অভিপ্রায় হইল এ দেশের জনসাধারণকে শোষণ করিয়া নিজেদের তুষ্টিপুষ্টি সাধন করা, হক মন্ত্রিমণ্ডলের ন্যায় স্যার সাদুল্লা এবং তাঁহার দলবল সেই শ্বেতাঙ্গদের তুষ্টিসাধন করিয়াই নিজেদের মন্ত্রিগিরি চালাইতে চাহেন। বলা বাহুল্য, শ্বেতাঙ্গেরা প্রেমের দায়ে পড়িয়া এখানে আসে নাই। তাহাদের বড় দায় হইল স্বার্থ, সুতরাং তাহাদের সমর্থন লাভ করিতে হইলে তাহাদের স্বার্থ পুষ্ট করিতে হয়। হক মন্ত্রিমণ্ডল চটকল নিয়ন্ত্রণ আইন করিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন, স্যার মহম্মদ সাদুল্লার দলবলও শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের জন্য তেমন কিছু ব্যবস্থা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, ইহা সুস্পষ্ট হইয়াই পড়িয়াছে। এক্ষেত্রে দেশের লোকের কর্তব্য কি হইবে! আসামের নব গঠিত বরদলুই মন্ত্রিমণ্ডল মাত্র দুই তিন মাস হইল কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যেই আসামের উন্নতিমূলক অনেক কর্মপ্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা শাসন ব্যবস্থার ব্যয় হ্রাস করিয়াছেন। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ন্যায় নিজেরা ৫ শত টাকা বেতন লইতেছেন: যিনি প্রধান মন্ত্রী তিনি ভ্রমণ করিতেছেন রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন এবং সত্বরই আসামের সকল রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তিদান করা হইবে। এক কথায়, বরদলুই মন্ত্রিমণ্ডল আসামের শাসন বিভাগের আমলাতান্ত্রিক আবহাওয়া একেবারে বদলাইয়া জনসেবার আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মনিব-গিরির মেজাজ ছাড়িয়া শাসকদিগকে জনসাধারণের ভৃত্যের মতি-গতিতে আনিয়াছেন। স্বাধীনতার একটা হাওয়া ইতিমধ্যেই তাঁহারা আসামে বহাইয়াছেন। বরদলুই মন্ত্রিমণ্ডলকে সত্যই এখন আসামের জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডল বলা যাইতে পারে; এরূপ ক্ষেত্রে জনকয়েক স্বার্থসন্ধী বিভীষণ দেশের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যদি নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হয় এবং তাহাদের সাহায্যে বরদলুই মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করায়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে গবর্ণরের কর্তব্য হইবে বর্তমান ব্যবস্থা পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিয়া, নূতন সাধারণ নির্ব্বাচনের সম্মুখীন হইয়া দেশের লোকের সুস্পষ্ট অভিমত গ্রহণে প্রধান-মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা। কারণ, স্যার সাদুল্লার প্রতি যে দেশের লোকের আস্থা নাই, বহুবার তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং স্যার মহম্মদ সাদুল্লা পদত্যাগ করিবার সময় সে কথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায়ও গবর্ণর যদি স্যার মহম্মদ সাদুল্লাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে আহ্বান করেন, তাহা হইলে শাসনতন্ত্রের মূল নীতি ভঙ্গ করা হইবে। আমরা আশা করি, আসামের গবর্ণর তেমন ভুল আর করিবেন না। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এই সম্পর্কে কোন্ নীতি অবলম্বন করে, দেশের লোকে সেপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে সন্দেহ নাই। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় যদি বরদলুই মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব পাশে সাহায্য করে, তাহা হইলে শুধু আসামের নহে, সমস্ত ভারতের জনমতের বিরূপতা, বিরুদ্ধতা এবং বিদ্বেষ বুদ্ধিকেই তাঁহারা উস্কাইয়া তুলিবেন। তাঁহাদের স্বার্থের দিক হইতে সত্যই তাহা তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে?

দেশের কথা

ব্যবহারিক শ্বেতসার বা ষ্টার্চ্চ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

গত কয়েকমাস যাবত "দেশ" ও অন্যান্য পত্রিকায় তণ্ডুল ও তৈল বীজ সম্বন্ধে লিখিতেছি। প্রথম শ্রেণীর তণ্ডুলের মধ্যে ধান্য, গম, ভুট্টা, যব, কোয়ার ও বাজরা পড়ে। ভোজ্য হিসাবে ইহাদের প্রত্যেকেরই ব্যবহার রহিয়াছে। তাহা ছাড়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া মানুষের কাজে লাগান হইতেছে। এই সকলের মধ্যে শ্বেতসার বা ষ্টার্চ্চ একটি।

আধুনিক সভ্যতার দিক দিয়া আমরা অনেক পিছাইয়া থাকিলেও, জগতের অন্য জাতির আজ যাহা প্রয়োজনীয় বস্তু, আমরাও তাহা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি। আমাদের দেশে চাউল, ভুট্টা প্রভৃতি প্রচুর ফসল হইলেও আমরা কাজে সুবিধা হয় বলিয়া, প্রতি বৎসর ষাট লক্ষ টাকার ষ্টার্চ্চ আমদানী করিয়া থাকি। এই আমদানী প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে: সুতরাং আমাদের একবার বিশেষ চেষ্টা করা দরকার যাহাতে আমরা নিজেদের প্রয়োজন মত ষ্টার্চ্চ তৈয়ারী করিয়া লইতে পারি।

শ্বেতসার আমাদের বহু প্রয়োজনে লাগে। ইহা হইতে ষ্টার্চ্চ সুগার, ডেকসট্রিন, আঠাল পদার্থ, সুতার বস্ত্রে রঞ্জন কার্যে সূক্ষ্ম শ্বেতসার রঙের সহিত মিলাইবার বস্তু, নানারূপ পথ্য, "পাউডার", ধোঁয়াহীন বারুদ, গ্লুকোজ (Glucose) প্রভৃতি হইয়া থাকে। কাগজ ও কার্পাস বস্ত্র শিল্পে বহুল ষ্টার্চ্চের প্রয়োজন। ইংরেজিতে Sizing বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার জন্য শ্বেতসার প্রয়োজন এবং সেই কারণেই আমদানী।

বর্ত্তমানে তণ্ডুলের রপ্তানী নয় কোটি টাকার উপর। ইহার কত অংশ ষ্টার্চ্চ তৈয়ারী হইবার জন্য যায়, তাহার স্থিরতা নাই। তবে যাহারা ভারতের তণ্ডুল আমদানী করে, তাহার অধিকাংশ স্থানেই আধুনিক কারখানা নাই। সিংহল, আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য, মরিসস্, এদেন প্রভৃতি ভারতের চাউল আমদানী করে; আবার ইংলণ্ডও লয়, কিন্তু তাহা মোট রপ্তানীর মাত্র ২%।

ভারতের ষ্টার্চ্চের আমদানী নিতান্ত কম নহে; গত তিন বৎসরের হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই আমদানী ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে:—

	হন্দর	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৬,৫৭,৭৩৪	৪১,১২,২০৬
১৯৩৬-৩৭	৬,৮০,২১১	৪৪,১৯,২৬২
১৯৩৭-৩৮	৮,৪১,৭৬২	৫৯,৪৪,১৭৮

ষ্ট্রেট্‌স সেট্‌লমেণ্টস্, নেদারলণ্ড, জার্ম্মানী, বেলজিয়ম, আমেরিকা, জাপান, জাভা, ফ্রান্স প্রভৃতি ভারতবর্ষে ষ্টার্চ্চের প্রধান বিক্রেতা। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহাদের প্রত্যেকের অংশ এইরূপঃ—

	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ষ্ট্রেটস্ সেট্‌লমেণ্টস্	১৫,৭৪	৩৫·৬
নেদারলণ্ড	১৫,৩২	৩৪·৬
জার্ম্মানী	৯,৫৭	২১·৬
বেলজিয়ম	১,০৬	২·৪

বোম্বাই প্রদেশে অধিক মাত্রায় কাপড়ের কল থাকায়, সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ষ্টার্চ্চ আমদানী হইয়া থাকে।

বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া কোনও বস্তু ব্যবহার করিতে অনেক সময় খরচ বেশী পড়িয়া যায়। সে কারণে শিল্পের দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠে না। দেশে প্রস্তুত হইয়া যদি অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার ব্যবহারও বৃদ্ধি পায়। দেশে এতগুলি শ্বেতসারপ্রধান তণ্ডুল থাকিতেও আমাদের সমস্ত ষ্টার্চ্চই আমদানী করা বস্তু। যতদূর বোঝা যায়, তাহাতে আমাদের কর্ম্মবিমুখতাই ইহার জন্য দায়ী। টাকা খরচ করিলে কারখানা করিবার মত যন্ত্রপাতি এখনই আনা সম্ভব হইতে পারে।

ষ্টার্চ্চ তৈয়ারী করিবার প্রক্রিয়া এমন কোনই গুরুতর ব্যাপার নহে। সাধারণ পাঠকের সুবিধা অনুযায়ী চাউল হইতে ষ্টার্চ্চ পাইবার বিধি বিবৃত করিতেছি। মার্টিন প্রভৃতি বিশেষজ্ঞেরা এই ব্যবস্থাই দিয়া থাকেন।

চাউল লইয়া তাহাতে ক্ষীণশক্তির সোডার জল (বা অন্য ক্ষারের জল) দিয়া ভিজাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে সমস্ত আঠাল বস্তু, নাইট্রোজেন সম্ভূত বা আমিষাংশ দ্রব হইয়া শ্বেতসারের অণুগুলিকে পরস্পর সম্বন্ধ করে। এই ভিজা চাউলকে মিহি করিয়া গুঁড়া করিবার ফলে সমস্ত শ্বেতসার অণু স্বতন্ত্র অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। তখন এইগুলিকে এক পাত্রে ফেলিয়া দেয় এবং উপর হইতে সজোরে নাড়িতে থাকে। ইহাতে শ্বেতসার কণিকা জলের সঙ্গে মিশিয়া ভাসিতে থাকে এবং তখন সমস্ত জল দুধের মত দেখিতে হয়। চাউলের অন্যান্য অংশ, যথা তণ্ডু এবং অন্যান্য উপাদান পাত্রের তলদেশে আশ্রয় লয়। কণিকাগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম হওয়ায় সহজে পাত্রের তলদেশে আসিয়া জমা হয় না, বহু সময় জলে ভাসিতে থাকে। কিন্তু এই অবস্থায় ছাড়িয়া দিলে ব্যবসায়ীর চলে না। তাহাতে সে নূতন অবস্থা আবিষ্কার করিয়াছে; কেন্দ্র-বিমুখগতি (centrifugal) প্রচণ্ড ঘূর্ণ্যমান পাত্রে শ্বেতসার-কণিকাবাহী জল স্থানান্তরিত করিলেই ঐ সকল কণিকা পাত্রের গাত্রে আসিয়া দ্রুত সংলগ্ন হইয়া যায়। বিশুদ্ধ ষ্টার্চ্চ কণিকাগুলি পাত্রের গাত্রে শীঘ্র আশ্রয় লয় বলিয়া, ঐ ষ্টার্চ্চই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেন্দ্রের সন্নিকটে অর্থাৎ পাত্রের গাত্র হইতে দূরে ভিতরের দিকে যে ষ্টার্চ্চ পাওয়া যায়, তাহা কতক পরিমাণে অবিশুদ্ধ।

পাত্র হইতে লইয়া ইহাকে শুষ্ক করা হয়। সাধারণভাবে শুষ্ক করিলেও শতকরা ১৬ হইতে ২৮ভাগ পর্য্যন্ত জল থাকিয়া যায়। এমন কি বায়ুহীন পাত্রের (vacuum pots) মধ্যে শুষ্ক করিলেও ১০ ভাগ জল থাকে। শুষ্ক ষ্টার্চ্চ বায়ু হইতে অতি দ্রুত আর্দ্রতা শোষণ করে এবং জল দিলে হঠাৎ গরম হইয়া উঠে।

গম, যব প্রভৃতি তণ্ডুলের মধ্যে ধান্য বা চাউলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্বেতসার আছে। আলুর ষ্টার্চ্চও প্রভূত পরিমাণে

(শেষাংশ ১৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাম্রাজ্যবাদ চাহি না

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসমিতি বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যন্যাল কংগ্রেস কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্তও ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক সমস্যা তথা স্বরাজ বা স্বাধীনতা আন্দোলন লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছিল। ইদানীং ইহার দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে। কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জন। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে বাহিরের জগতের সঙ্গেও যে যোগ রাখা প্রয়োজন তাহা বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র উপলব্ধি হইতেছে। বাহিরের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, তাহাদের সমস্যা ও সমাধান-প্রচেষ্টা প্রভৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ভারতবর্ষের উপরও আসিয়া পড়িতেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনই
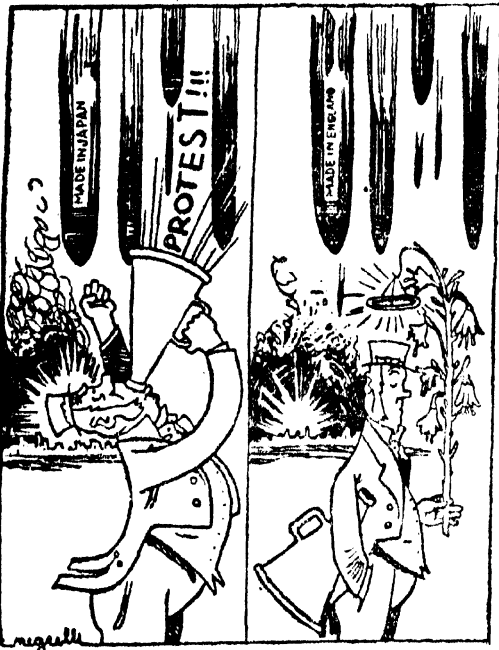
চীনে
সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ। চানে বোমাবর্ষণকে নিন্দা করা হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে বোমাবর্ষণ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই নাই।
ভারতবর্ষে

হউক আর পরাধীনই থাকুক, এ সকল সে ইচ্ছা করিলেই এড়াইতে পারিবে না, তাহাকে আবর্ত্তে পড়িতেই হইবে। আবার স্বাধীন অবস্থায় যতটা হুঁসিয়ার হইয়া চলা প্রয়োজন, পরাধীন অবস্থায় সদা জাগ্রত থাকার প্রয়োজনীয়তা তদপেক্ষা অধিক। বিশ বৎসর পূর্ব্বে জগতের যে অবস্থা ছিল এখন আর তাহা নাই, বিশ বৎসর পরেও আবার নূতন অবস্থার উদ্ভব হইবে। এই সকল কারণে নেশ্যন্যাল কংগ্রেস ঘরকুণো বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের জগতে যে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছে তাহা কি বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ সকল যুগের পক্ষেই আশাপ্রদ ও সুসমীচীন হইয়াছে। তবে এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, বহির্জ্জগত সম্বন্ধে বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থায় ভারতবর্ষ কোন্ নীতি অবলম্বন করিবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পর পর দুই বৎসর নেশ্যন্যাল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ই কংগ্রেস পর-রাষ্ট্র-নীতির আলোচনায় প্রথম মনোনিবেশ করে। কংগ্রেসের দপ্তরখানায় একটি পররাষ্ট্র-বিভাগও খোলা হইয়াছে। পণ্ডিতজীকে পররাষ্ট্র-নীতি আলোচনার প্রধান ও প্রথম উদ্যোক্তাও বলা যায়। কাজেই তিনি যে ধারায় ইহার আলোচনার সূত্রপাত করেন আজিও তাহাই প্রচলিত আছে ও প্রচারিত হইতেছে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসুও এই ধারায়ই আলোচনা চালাইতেছেন। ভারতবর্ষের, বিশেষত পরাধীন ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি কিরূপ পরিগ্রহ করিবে তাহার পূর্ব্বে কংগ্রেসের এই বিশিষ্ট ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

ভারতবর্ষ চাহে পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা। জনগণের নির্দ্দেশে তাহাদেরই কল্যাণের জন্য তাহাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ শাসিত হইবে; ইহাই হইল ডিমোক্র্যাসি বা গণ-শাসনের সত্যকার ব্যাখ্যা। ভারতবর্ষও এইরূপ একটি ডিমোক্র্যাসি হইবে। ইহাই তাহার আদর্শ। এই আদর্শ বা লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে তাহাকে দুইদিকে সংগ্রাম বা আন্দোলন চালাইতে হইবে। দেশের অভ্যন্তরে পরের হস্ত হইতে শাসন ক্ষমতা জনগণের হস্তে আনয়ন করিতে হইবে। দেশের বাহিরে যে-সব স্থলে ডিমোক্র্যাসি বা গণ-শাসন বিপন্ন তাহাদের স্বপক্ষেও আন্দোলন চালাইতে হইবে। ভারতবর্ষ যদি একটি সত্যকার স্বাধীন ডিমোক্র্যাসি হইত তাহা হইলে বলিতাম বিপন্ন ডিমোক্র্যাসিগুলির স্বপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ পরাধীনতার জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। তাহার স্বাধীনতার আদর্শে পৌঁছিতে একনিষ্ঠ সাধনা করিতেছে। কাজেই যখন অন্য কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের বিপদ সে লক্ষ্য করে তখন তাহার প্রাণ স্বতঃই উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আবিসিনিয়া একটি সত্যকার ডিমোক্র্যাসি ছিল না। তথাপি সে স্বাধীন ছিল। তাহার স্বাধীনতা বিলোপের আশঙ্কায় পরাধীন ভারতবাসীরা যে আন্দোলন জোগাইয়াছিল তাহা বাস্তবিক স্বাভাবিকই হইয়াছিল। হাবসীরা কোন্ জাতি, কোথাকার লোক, ধর্ম্ম-সমাজ-সংস্কৃতি কিরূপ, তাহারা স্বাধীন থাকিলে আমাদের কি লাভ, পরাধীন হইলেই বা কি ক্ষতি, এ-সব হিসাব করিবার অবকাশ তখন ছিল না। এইরূপ সাধারণতন্ত্রী বা গণ-তন্ত্রী স্পেনের উপর বিদ্রোহী তথা ইটালী জার্ম্মানীর আক্রোশ অত্যাচার নির্য্যাতন ভারতবর্ষ ভাল ছেলের মত মানিয়া লয় নাই। সাধারণতন্ত্রের বিপদের কথা সে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে, তাহাদের সাহায্যের চেষ্টা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। ক্ষমতালোভী বিদেশী রাষ্ট্রগুলির কারসাজি ও গোপন চাপ প্রকাশ্যে নির্ভয়ে ব্যক্ত করিয়াছে। নিকট প্রতি-বেশী বহুযুগসুহৃদ চীনরাষ্ট্রের উপর জাপানের আক্রমণেও ভারতবর্ষ কম বিচলিত হয় নাই। প্রবলের শক্তির নগ্নরূপ চীনের আকাশে বাতাসে যতই প্রকটিত হইতেছে ভারতবাসীর

মন চীনের প্রতি ততই সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্যের মত ইহার বেলায়ও পরোক্ষ সাহায্য সে করিতেছে। চীনের দুর্দ্দশার কথা চারিদিকে প্রকাশ করিতেছে। তাহার এই দুর্দ্দিনে ভারতবর্ষ চিকিৎসক ও সেবকদল চীনের রণ-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছে। প্রবলের সম্মুখে দুর্ব্বল সবাই সমান। চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ পর্ব্ব এখনও শেষ হয় নাই। এই রাষ্ট্রটির উদ্ভব যে ভাবেই হউক না কেন, নিছক প্রবলের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই বড় বড় রাষ্ট্রগুলি এক জোটে ইহার অঙ্গচ্ছেদে সহায়তা করিয়াছে। ভারতবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই দুর্ব্বল চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছে।

ভারতবর্ষের জনসমুদ্রের এই স্বাভাবিক আত্মচেতনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই যেন পণ্ডিত জওহরলাল ও সুভাষ-চন্দ্র নেশ্যন্যাল কংগ্রেসের পররাষ্ট্র-নীতির ধারা স্থির করিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষের আদর্শ বজায় রাখিতে ও শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে উহা এইখাতেই চালাইতে হইবে, উভয়েরই এই অভিমত। নেহরু মহাশয় গত ছয় মাস ইউরোপ পরিক্রমা করিয়া স্বদেশে সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন, স্পেন-সরকারের মুখপাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপদের প্রাক্কালে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানকার অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্সেও তিনি কয়েক মাস কাটাইয়াছেন। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যাহারা তাহাদের সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়াছেন, এ-সব দেশের সাধারণ লোকদের সঙ্গেও তাঁহার মিশিবার সুযোগ হইয়াছে। কাজেই এই সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র-নীতির ধারার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও করিবেন তাহা সকলেই প্রণিধান করা উচিত। তিনি বলিয়াছেন, ইউরোপে ডিমোক্র্যাসির নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে! ("Democracy is on its last legs!") কয়েকটি রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় শক্তিমান্ লোক ডিমোক্র্যাসি বা গণ-শাসনকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ ইউরোপে ডিমোক্র্যাসির অগ্নি পরীক্ষা উপস্থিত। এক্ষেত্রে পরাধীন ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য কি?

পণ্ডিত জওহরলাল এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন ভারতবর্ষ তথা জাতীয় কংগ্রেস পররাষ্ট্র-নীতির যে ধারা বাছিয়া লইয়াছে তাহাই যুক্তিযুক্ত। ভারতবর্ষ ইউরোপের উৎপীড়ক উৎপীড়িত উভয় রাষ্ট্রের নিকটই কিছুটা সম্মান লাভ করিয়াছে। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, এ দেশটি এখন আর ব্রিটিশের নিছক তাঁবেদার নহে, তাহার নিজস্ব মতবাদ আছে এবং তাহা প্রকাশ করিতে এখন আর ভয় করিয়া চলে না। ভারতীয়দের ডিমোক্র্যাসির আদর্শ বিদেশীর মনেও ছাপ দিয়াছে। বিদেশীরা, বিশেষত উৎপীড়িত নির্যাতিত যাহারা তাহারা তাহাদের নিকট বিশেষ সাহায্য প্রত্যাশা করে। স্পেন গণতন্ত্রের খাদ্যাভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষ খাদ্য দিয়া যাহাতে তাহাকে সাহায্য করিতে পারে তাহার চেষ্টা চলিতেছে।

এত কথা বলিবার পরও একটি প্রশ্ন মনে উপস্থিত হয়, এবং তাহার জবাব মূল প্রশ্নের মীমাংসার গতি নির্দ্দেশ করে। ভারতবর্ষের মূল আদর্শ বা লক্ষ্য তাহার রাজনীতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা। যাহারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, অসহায়, তাহাদের সাহায্য বা সহায়তা করিলে কি আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিব? আর তাহাদের সহায়তা করিলে প্রবল শক্তিপুঞ্জের কি বিরাগভাজন হইব না, যাহাতে আমাদের মূল প্রচেষ্টা বা আন্দোলন আরও শতগুণে কণ্টকিত হইয়া পড়িবে? রাম শ্যাম এ প্রশ্ন তুলিলে কথা ছিল না, ভারতবর্ষের মুক্তি-কামী কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিও কিছুদিন যাবৎ এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন স্পেন-গণতন্ত্রের স্বপক্ষে ফ্রান্সে বক্তৃতা দিতেছিলেন ও ইহার বিরোধী বিদ্রোহীদের এবং ইটালী ও জার্ম্মানীর নিন্দাবাদ করিতেছিলেন, তখন বর্ত্তমান বর্ষের হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুত বিনায়ক সভরকার পুণা হইতে ইহার প্রতিবাদ করেন। জাপান-প্রবাসী শ্রীযুত রাসবিহারী বসুও জাপানীদের প্রতি ভারতবাসীর বিরুদ্ধ মনোভাবের নিন্দা করিয়া একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। সভরকার মহাশয়ের ভাষণ এবং বসু মহাশয়ের বিবৃতি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, একই মনোভাব ইহার মূলে কার্য্য করিতেছে। "ব্রিটেন তোমার মিত্র নয়, শত্রু। অন্য শক্তিমানদের চটাইও না। তাহাদের যদি চটাও তাহা হইলে ব্রিটেন তাহার সুযোগ লইয়া তোমাদের চিরতরে পরাধীন করিয়া রাখিবে। আবিসিনিয়া, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া—ইহাদের দেখিয়াও তোমার চোখ ফুটিতেছে না। শেষ পর্য্যন্ত সকলেই ত সবলেরই সহায় হইল, দুর্ব্বলকে ত কেহই রক্ষা করিল না।' বসু মহাশয়ের বিবৃতিটি সম্প্রতিকার। সুতরাং তিনি জাপানকেও প্রবলদের দলে টানিয়াছেন ও চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হইতে নিরস্ত হইতে ভারতবাসীদের পরামর্শ দিয়াছেন।

সভরকার ও বসু উভয়েই মনস্বী ব্যক্তি। ভারতের মুক্তি-প্রচেষ্টায় তাঁহাদের দান অসামান্য। সুতরাং তাঁহাদের কথাও আমাদের সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সভরকার ও বসু মহাশয়ের কথার উদ্দেশ্য হইল এই যে, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যত ঘাঁটি সবই আমাদের আগলাইয়া রাখিতে হইবে। একের বিরুদ্ধে অন্যকে লাগাইয়া আমাদের কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কি বর্ত্তমান যুগে সম্ভব? জগতের প্রবল শক্তি বলিতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানী যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের কথাই সাধারণত আমাদের মনে আসে। যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ও ব্রিটেন ইদানীং ঐকমত্য বজায় রাখিয়া চলিতেছে। ইটালী, জার্ম্মানী ও জাপান অন্যের ঘাড় মটকাইয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিয়া গিয়াছে। দূরের বা নিকটের দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলির উপর ইহাদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইটালী আবিসিনিয়া লইয়াছে জার্ম্মানী চেকের অংশবিশেষ হস্তগত করিয়াছে, জাপান চীনে প্রসার

লাভ করিতেছে। ভারতবর্ষ ইহাদের বন্ধুত্ব লাভ করিবে কিরূপে? তাহা স্বাভাবিকও নয়, সম্ভবও নয়। ইহারা ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব কখনও কামনা করে না। ব্রিটেনের বন্ধুত্বই চায়। এবং ব্রিটেনকে খুশী করিবার জন্য ভারতবর্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টারও ত্রুটি করে না। জার্ম্মানীর কথাই ধরুন। হিটলার জার্ম্মান 'বেদ' "মেঁ ক্যাম্প" পুস্তকে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, ভারতবাসী ইংরেজের অধীনে থাকিয়াই মোক্ষলাভ করিবে। তাহাকে ইংরেজের অধীনেই রাখিতে হইবে। এই কিছুদিন আগেও হিটলার ভারতীয়দের নিন্দামন্দ করিতে কসুর করেন নাই। আর ইটালীর কর্ণধার মুসোলিনী? আবিসিনিয়া অভিযানকালে কৃষ্ণকায় জাতিসমূহের উপর কি অজস্র গালিই না বর্ষণ করিয়াছেন। তথাপি ভারতীয়দের প্রতি যদি বা কিছুটা নেক-নজর মাঝে মাঝে করা হয় তাহা তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য বা মুক্তির জন্য নহে। জাপান বর্ত্তমানে চীনে যে বীভৎস অত্যাচার চালাইয়াছে তাহার সম্মুখে ভারতবাসীরা তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে কিরূপে? বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে এশিয়াবাসী জাপানকে প্রাচ্যের নবারুণ বলিয়া যে অভিনন্দিত করিয়াছিল, তাহা তাহার প্রবলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তিমত্তার জন্য, প্রাচ্যবাসীর উপর শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য নহে। জাপান আজ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকেই হুবহু নকল করিয়া এশিয়াবাসীর মুণ্ডপাত করিতেছে। এ-সব সত্ত্বেও, এখনও হয়ত কেহ কেহ বলিবেন, এ ত ভাব রাজ্যের কথা। ভারতবর্ষের সুবিধা করিয়া লইতে হইলে কঠোর রাজনীতির বাস্তব প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিতে হইবে, দেখিতে হইবে এ সকলকে সাহায্য করিলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব কি-না।

ব্রিটেন ভারতবর্ষকে অধীন করিয়া রাখিয়াছে, এজন্য তাহার উপর ভারতবাসীর বিদ্বিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে যাহাকে সাহায্য করিবে তাহা কি ইহার সমগুণ-বিশিষ্ট, না বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট? ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান, ইটালিয়ান, জাপানী সকলেই সমান সাম্রাজ্যবাদী। পররাজ্য হরণ করিবার সময় ইহারা একই অস্ত্র ব্যবহার করে, একই কৌশল ইহাদের অবলম্বন। ইদানীং বরং ইহাদের অত্যাচার আরও বাড়িয়াছে। একশত কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ট্যাঙ্ক, বিমানপোত বা গ্যাস ছিল না যাহাতে দেশ, নগর, পল্লী, সহস্র সহস্র নরনারী নিমেষে উজাড় হইয়া যাইতে পারে। সবল পক্ষ দুর্ব্বলকে কখনও ক্ষমা করে নাই, বা দয়া দেখায় নাই। গত দুই শত বৎসরে ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে একবার দৃক্‌পাত করুন। এখানে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ আসিয়াছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। শেষে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে শক্তির বোঝা-পড়া হইয়া গেলে ব্রিটিশের ক্ষমতাই অক্ষুণ্ণ রহিল। স্পেনের সাম্রাজ্য হইতে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য লাভ পর্য্যন্ত এই একই ইতিহাস। দুর্ব্বলের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদীকে বিশ্বাস করা জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়ারই সামিল। ভারতবাসী কখনও ব্রিটিশকে বিশ্বাস করিয়াছে, কখনও ফরাসীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়াছে, আবার কখনও অন্যকেও কোল দিয়াছে। কিন্তু নিজেদের ঐক্যবদ্ধ ও সংহত শক্তিমান করিতে চেষ্টা করে নাই। ফলে তাহার পায়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমানে অতীত ইতিহাসেরই পুনরভিনয় হইতেছে। আবিসিনিয়াই বল, স্পেনই বল, চেকোশ্লোভাকিয়াই বল, আর চীনই বল—সর্ব্বত্রই সাম্রাজ্যবাদীরা স্বার্থ বজায় রাখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। চীনে জাপানের হস্তে ইহাদের স্বার্থ বিপন্ন বলিয়া ইদানীং কিঞ্চিৎ বেশী হৈ চৈ শোনা যাইতেছে। ভারতবাসী যেমন একের পরিবর্ত্তে অন্যকে আশ্রয় করায় স্বাধীনতা হারাইতে বাধ্য হইয়াছিল, আবিসিনিয়ার বেলাও তাহাই হইয়াছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার বেলায়ও সম্প্রতি তাহাই ঘটিয়াছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপর অতি-মাত্রায় নির্ভর না করিলে এ দুইটি দেশের ভাগ্যবিপর্য্যয় এতটা হইত না বলিয়াই মনে হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বাস করিও না, তাহাদের উপর নির্ভর করিও না—ইতিহাস আজ পরাধীন দুর্ব্বল জাতিদের ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইতিহাস শুধু নৈতিক উপদেশই দেয় না। যে-সব রাষ্ট্র আজ সবল শক্তিমান হইয়াছে তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি ও প্রচেষ্টা আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছে। কিন্তু সাবধান, শক্তিমান হও, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী হইও না, সাম্রাজ্যবাদীর অনুচর সাজিও না। সাম্রাজ্যবাদের শেষ পরিণতি হইল ফ্যাসিজম্, সুতরাং ইহা হইতেও শত হস্ত দূরে থাকিতে হইবে।

ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি কিরূপ হওয়া উচিত বর্ত্তমান আলোচনা হইতে তাহার ইঙ্গিত [illegible] পাইলাম। প্রধান কথা হইল দুর্ব্বলকে সবল, সংহত ও শক্তিমান হইতে হইবে। যাহারা সবল আছে বা সম্প্রতি সবল হইতেছে, তাহারা ভারতের পক্ষে দুর্ব্বলের সহায় হইবে না। দুর্ব্বলের বন্ধু দুর্ব্বলই। সাম্রাজ্যবাদী—সে যেই হউক না কেন তাহার সঙ্গে যোগদান করিলে দুর্ব্বলকে আরও দুর্ব্বল হইতে হইবে। ভারতবাসীকে গণতন্ত্রের আদর্শে দৃঢ় থাকিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। তাহার সংগঠন-শক্তি অসাধারণ। আত্মসংগঠনে তাহাকে মনঃসংযোগ করিতে হইবে। তাহার আত্মপ্রত্যয় এই-ভাবেই ফিরিয়া আসিবে। বিপন্নকে সাহায্য করার মধ্যে নিজের শক্তির পরিচয় আছে। জগতে যাহারা দুর্ব্বল, অসহায়, নির্য্যাতিত, নিপীড়িত তাহাদের যথোচিত সাহায্যে অগ্রসর হইতে হইবে। কোন জাতি যখন সবলের হস্তে বিপন্ন হয়, তখন তাহাকে সমষ্টিগতভাবে সাহায্য করিলে জাতির শক্তির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। স্পেন ও চীনে আজ যে ভারতবর্ষের তরফে সাহায্য প্রেরিত হইতেছে, তাহা শুধু ঐ সব দেশেরই উপকার করিবে না, তাহা ভারতবর্ষেরও যথেষ্ট কল্যাণ করিবে। সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য এক—পরজাতি নিপীড়ন। ভারতবাসীরা তাহাতে প্রাণ থাকিতে সায় দিবে না, দিতে পারে না। তাহারা সমস্বরে বলিবে, "আমরা সাম্রাজ্যবাদ চাহি না।"

২৯শে নবেম্বর, ১৯৩৮।

মার্ক্সের চোখে রাষ্ট্রের রূপ

কমিউনিস্ট আর এ্যানার্কিস্ট—এরা দু'দলেই চায় সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের কল্যাণ। এই সর্ব্বজনীন কল্যাণের আদর্শে পৌঁছাতে গেলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ-সাধন অপরিহার্য্য—এমনমত দু'দলেই পোষণ ক'রে থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের মতের প্রধান পার্থক্য হ'চ্ছে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিয়ে। কমিউনিস্টরা ব'লে থাকেন, শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শ বাস্তবের মধ্যে যতদিন রূপ না নেয় ততদিন রাষ্ট্রকে আমাদের খাড়া রাখতেই হবে। অবস্য রাষ্ট্র-তরণীর হাল থাকা চাই তাদেরই হাতে যারা হবে সর্ব্বহারাদের অকৃত্রিম প্রতিনিধি। এ্যানার্কিস্টরা রাষ্ট্রমাত্রেরই বিরোধী। ঘর-পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরিয়ে ওঠে, এ্যানার্কিস্টরা তেমনি রাষ্ট্রের নাম শুনলেই ভয় খায়। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রকে গদারূপে ব্যবহার ক'রে ধনীরা সর্ব্বহারাদের মুক্তি-প্রচেষ্টাকে বারম্বার কি নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছে—সে কথা এ্যান্যার্কিস্টরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারে না আর ভুলতে পারে না ব'লেই তারা মনে করে, সর্ব্বহারারাও রাষ্ট্রকে ব্যবহার করবে মানুষের ন্যায্য স্বাধীনতা হরণ করবার জন্য। লঙ্কায় যে যাবে সেই হবে রাবণ।

কমিউনিস্টরা এ্যানার্কিস্টদের চেয়ে অনেক বেশী প্র্যাক্টিক্যাল্। তারা কেবল যে শ্রেণীহীন সমাজকে (Classless Society) আদর্শ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ-সাধনকে সেই আদর্শে পৌঁছাবার অপরিহার্য্য পন্থা ব'লে ঘোষণা করলো, তা নয়; কেমন ক'রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ-সাধন সম্ভবপর—তারও পন্থা তারা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলো। তারা বললো, কেবল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবসান ঘটালেই আমাদের কাজ ফুরিয়ে যাবে না। যারা সর্ব্বহারা তাদের খাড়া করতে হবে একটা নূতন-ধরণের রাষ্ট্রকে আর এই নূতন রাষ্ট্রের কর্ণধার হবে সর্ব্বহারাদের প্রতিনিধিগণ। মার্ক্স এই নূতন-ধরণের রাষ্ট্রের নামকরণ করলেন The Dictorship Of The Proletariat.

এ পর্য্যন্ত ধনীরা যদি রাষ্ট্রকে সর্ব্বহারাদের দাবিয়ে রাখবার জন্য ব্যবহার ক'রে থাকে, তবে সে দোষ রাষ্ট্রের নয়—সে দোষ রাষ্ট্রের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ধনীদের। আগুন দিয়ে কেউ রাঁধে, কেউ ঘর পোড়ায়। দোষ তো আগুনের নয়, দোষ যে ঘর পোড়ায় তারই। এতকাল ধ'রে রাষ্ট্রশক্তিকে ধনীরা কোন্ কাজে লাগিয়েছে? লাগিয়েছে স্বার্থকে কায়েম এবং সর্ব্বহারাদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখবার কাজে। মার্ক্সের এবং এঞ্জেলসের ভাষায়,—

> "By the State is meant the organisation of the exploiting class for the maintenance of the extant material conditions of production, and more specially for the forcible subjugation of the exploited class, for the keeping of it within the conditions of oppression, characteristic of the extant method of production (slavery, serfdom, or wage labour as the case may be)."

"বর্ত্তমানে সম্পদ-সৃষ্টির জন্য যে সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে তাদের কায়েম রাখবার জন্য রাষ্ট্র হ'চ্ছে শোষক-শ্রেণীর হাতের যন্ত্র। সম্পদ-সৃষ্টির জন্য বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে দাসত্ব। যাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া হয় তাদের এই দাসত্বের মধ্যে জোর করে বেঁধে রাখাই হচ্ছে রাষ্ট্রের আরও প্রয়োজনীয় কাজ।"

যারা বিষয়-সম্পত্তির মালিক তারা আপনাদের স্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্য যুগে যুগে রাষ্ট্রকে ব্যবহার ক'রে এসেছে। অতি প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলো ক্রীতদাসের মালিকেরা। মধ্যযুগে অভিজাত সম্প্রদায়ের বড়ো বড়ো জায়গীরদারদের হাতে ছিলো রাষ্ট্রের হাল। বর্ত্তমান যুগে যাদের আমরা ব'লে থাকি বুর্জোয়া, তারাই রাষ্ট্রশক্তিকে মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছে কৃষক এবং শ্রমিকদের অভ্যুত্থানকে পণ্ড করবার জন্য।

আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলা দরকার। রাষ্ট্র সর্ব্বহারাদের চিরপদানত ক'রে রাখবার জন্য ধনীদের হাতে যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে—একথা বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা বুঝি, রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি হ'চ্ছে পুলিশ আর সৈনিক। জমির, খনির আর কলকারখানার মালিকেরা রাষ্ট্রের কর্ণধার রূপে পুলিশ আর সৈনিককে হুকুম করেছে জমিদারি রক্ষা করবার জন্য। পুলিশ তো গবর্ণমেণ্টের হুকুমের দাস আর গবর্ণমেণ্ট ধনীদেরই সঙ্ঘ। ইউনিফর্ম্ম-পরা পুলিশের দল গবর্ণমেণ্টের হুকুমে ছুটে গিয়েছে সর্ব্বহারাদের গ্রাম থেকে মালিকদের সম্পত্তি বাঁচাতে।

কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি ধনীদের আমলে সমাজের কল্যাণের পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি ক'রেছে ব'লে সর্ব্বহারাদের আমলেও যে সমাজের মঙ্গলের পথে বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়াবে—এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। সর্ব্বহারার দল যেদিন রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করবে সেদিন সেই শক্তিকে তারা তো ব্যবহার করবে না মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখবার জন্য। তারা রাষ্ট্রের পুলিশবাহিনীকে ব্যবহার করবে জমি, খনি, কলকারাখানাগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করবার মহান উদ্দেশ্যে। বর্ণার্ড শ'এর On The Rocks নাটকে পুলিশের কর্ত্তা Basham বলছে,—

> "The Police's blood. You landed gentlemen never do a thing yourselves: you only call us in. I have twenty thousand constables, all full of blood, to shed it in defence of whatever the Government may decide to be your property. If Sir Arthur carries his point, theyll shed it for land nationalisation. If you carry yours theyll stand by your rent collectors as usual."

"পুলিশের রক্ত। তোমরা জমিদারেরা নিজেরা একটি কাজও কর না। তোমরা শুধু আমাদের ডাকো। আমার হাতে কুড়িহাজার কনস্টেবল আছে। তাদের দেহে প্রচুর রক্ত। গবর্ণমেণ্ট যা কিছু তোমাদের সম্পত্তি ব'লে অভিহিত করবে—তাকে রক্ষা করবার জন্য সেই রক্ত ঢালতে তারা সদাই প্রস্তুত। সার আর্থার যদি সাফল্য-লাভ করে তবে তারা রক্ত ঢালবে জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করবার জন্য। আর তোমরা যদি জয়ী হও—তারা তোমাদের গোমস্তাদের সহায় হবে।"

এই সামান্য কয়েকটি লাইনের মধ্য দিয়ে শ' জমিদারের সঙ্গে **রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক এবং** রাষ্ট্রের সঙ্গে পুলিশেরই বা কি **সম্পর্ক—তা চমৎকার ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন।**

আসলে রাষ্ট্র, পুলিশ, আইন, আদালত—এই সব শব্দ **ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে** দীর্ঘকাল ধরে জড়িত থাকায় ঐ **কথাগুলি আমাদের মনের মধ্যে** আজ বিভীষিকার সঞ্চার করে। **তাই আমরা রাষ্ট্র কথাটা** শুনলে এ্যানার্কিস্টদের মতো আঁৎকে **উঠি। কিন্তু আঁৎকে উঠবার** কি আছে? দুষ্ট ঘোড়াকে গুলী **ক'রে মেরে ফেলবার কোনো মানে হয় না।** তাকে বাগ মানিয়ে **কাজে লাগাতে হবে।** যে হেতু রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহার হ'য়ে **এসেছে সমাজে একটা বিশেষ** শ্রেণীর প্রভুত্বকে কায়েম রাখবার **জন্য, সেই হেতু রাষ্ট্র** সকল সময়েই অস্পৃশ্য—এমন কথা মার্ক্স **স্বীকার করলেন না।** তিনি মজ্জায় মজ্জায় বাস্তববাদী ছিলেন **এবং আপনার ক্ষুরধার** বুদ্ধির আলোকে বুঝতে পেরে- **ছিলেন—শ্রেণীহীন** সমাজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ **দিতে গেলে শক্তি-প্রয়োগের** একান্ত প্রয়োজন আছে। শক্তি **প্রয়োগ করতে হ'লে** রাষ্ট্রকে চাই অর্থাৎ রাষ্ট্রের পুলিশ- **বাহিনীকে চাই।** ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হ'য়ে যারা দীর্ঘ- **কাল ধ'রে পরের মাথায়** কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে তারা কখনোই **স্বেচ্ছায় তাদের সম্পত্তিকে** জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হ'তে **দেবে না।** তারা প্রাণপণে বাধা দেবে—তারা সর্ব্বহারাদের **আধিপত্যের বিরুদ্ধে** বিদ্রোহ করবে। সেই বিদ্রোহকে দমন **করতে না পারলে সর্ব্বহারাদের** সৌভাগ্য-রবি চির-অন্ধকারে **অস্তমিত হবে।** দমন করবার জন্য পুলিশ চাই। যে পুলিশ দিয়ে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এতকাল সর্ব্বহারাদের দাবীকে পঙ্গু ক'রে এসেছে—সেই পুলিশবাহিনী দিয়েই সর্ব্বহারারা ব্যক্তি- গত সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করবে। যে সাপ কামড়িয়েছে—সেই সাপকে দিয়েই বিষ তোলাতে হবে। মার্ক্স তাই বললেন, পুরাতন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চিতাভস্মের উপরে নূতন রাষ্ট্র খাড়া করতে হবে আর এই নূতন রাষ্ট্রের সর্ব্ব- ময় কর্ত্তা হবে সর্ব্বহারাদের দল।

এই যে নূতন রাষ্ট্র যার নাম হোলো The Dictatorship Of The Proletariat—এর কাজ হবে কি? মার্ক্স বললেন, এর প্রথম কাজ হবে land nationalisation. যারা বড়ো বড়ো জমিদার তাদের জমি ছিনিয়ে নিয়ে সেই জমিকে সর্ব্বহারাদের রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করবে এই নবরাষ্ট্রের দুর্জ্জয় শক্তি। ছিনিয়ে-নেওয়া জমিকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ক'রে সকলের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে না। জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে থাকবে এবং শ্রমজীবী-সম্প্রদায় সমবায়-নীতি অবলম্বন ক'রে সেই জমি চাষ করবে।

এই নূতন রাষ্ট্রের দ্বিতীয় কাজ হবে—আয় যাদের অনেক তাদের উপর খুব বেশী ক'রে ইনকাম ট্যাক্স বসানো। ইনকাম ট্যাক্স বেশী দিতে হ'লে অর্থ কোথাও কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ **পাবে না**—আয়ের কিছু কিছু তারতম্য থাকলেও সে তারতম্য **কখনো উৎকট আকার ধারণ করবে না।**

এই নূতন রাষ্ট্রের তৃতীয় কাজ হবে—the abolition of the right of inheritence. আমার পিতা অথবা পিতামহ যে হেতু আমার জন্য ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমিয়ে গিয়েছেন সেই হেতু সেই টাকার উপরে আমার জন্মগত অধিকার আছে—এ হোলো বুর্জ্জোয়া সমাজের কথা। কমিউনিস্টরা যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেখানে বাঁচতে হলে সমাজের সেবা করতে হবে কর্ম্মের দ্বারা। I must pay my way by what I do. I must perform such functions as will produce the amount required for my maintenance. আমার ভরণপোষণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা আমাকে অর্জ্জন করতে হবে আমারই শ্রমের দ্বারা। লাস্কির ভাষায়, He has no right to live because another has earned what suffices for his maintenance. That alone is morally his which he gains by his personal effort. আমার ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহের মতো অর্থ যেহেতু আর একজন উপার্জ্জন ক'রে গেছেন সেই হেতু আমার বাঁচবার অধিকার আছে—এ কথা ন্যায়ের কথা নয়। আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা আমি যা অর্জ্জন করি শুধু তারই উপরে আমার ন্যায্য অধিকার আছে।

এই নবরাষ্ট্রের চতুর্থ কাজ হবে—যারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তাদের সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করা।

এই নূতন রাষ্ট্রের পঞ্চম কাজ হবে—জাতীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে টাকার লেন-দেনের অধিকার সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হাতে রাখা।

এই নবরাষ্ট্রের ষষ্ঠ কাজ হবে রেলওয়ে প্রভৃতি যান- বাহনের উপরে রাষ্ট্রের একাধিপত্য স্থাপিত করা।

এই নূতন রাষ্ট্রের সপ্তম কাজ হবে—কলকারখানাগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে এবং অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত এবং তাহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি করা।

এই নূতন রাষ্ট্রের অষ্টম কাজ হবে—প্রত্যেকটি সুস্থকায় নরনারীকে সমাজের মঙ্গলের জন্য পরিশ্রম করতে বাধ্য করা; ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কারখানায় কাজ করার প্রথা উঠিয়ে দেওয়া।

নবরাষ্ট্রের কর্ত্তব্যগুলির এই রকমের তালিকা দিয়ে মার্ক্স বলেছেন—The Dictatorship Of The Proletariat চির- কালের জন্য নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে নূতন রাষ্ট্রের কাজ ধনোৎপাদনের যন্ত্রগুলিকে অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শেষ হ'য়ে যাবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যদি না থাকে, শ্রেণীগত স্বার্থ যদি লোপ পায়—তবে আর কিসের জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব? শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধ থেকেই তো রাষ্ট্রের সৃষ্টি। যারা বিষয় সম্পত্তির মালিক—তারা সর্ব্বহারাদের গ্রাস থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষা করবার জন্যই রাষ্ট্রের মত প্রতিষ্ঠানকে খাড়া করতে বাধ্য হয়েছে। সেই ধনী আর দরিদ্র ব'লে যখন পৃথক পৃথক দুইটি শ্রেণী আর রইলো না তখন রাষ্ট্র আর কার স্বার্থ রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে? তার প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে যাবে—তার স্থান হবে মহাকালের যাদু- ঘরে অতীতের অনেক নিদর্শনের পাশে। **ইহাই মার্ক্সের অভিমত।**

আমেরিকার পত্র

শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিউ ইয়র্ক

স্বনামধন্য জার্ম্মান লেখক, এমিল লাড্উইগ (Emil Luduig) কয়েকদিন আগে প্যারিসের আমেরিকান ক্লাবে একটি বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতায় উনি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে যদিও ট্যাক্স কলেক্টর (Tax Collector) ব'লে ব্যঙ্গ ক'রেছেন, তবু আবার তাকে "defender of democracy" ব'লে প্রশংসাও ক'রেছেন। এমিল লাড্উইগের মতের সঙ্গে কত লোকের মতের মিল হবে তা জানি না; তবে একথা বোধ হয় স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, প্রকৃত ইচ্ছা থাক্‌লে ও চেষ্টা ক'রলে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, পৃথিবীর democracy রক্ষা ক'রতে হয়ত যথেষ্ট কিছু ক'রতে পারেন। ক'রবেন কি-না তা জোর ক'রে বলা যায় না। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হ'লেও তিনি এখানকার সকল লোকের নেতা নন। মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এ দেশের লোকের স্বাধীন মত প্রকাশের "জন্মগত" অধিকার আছে ব'লেই অনেক সময় এ দেশের প্রেসিডেণ্টকে সাধারণ লোকের যুক্তমতের উপর অনেক বিষয়ে নির্ভর ক'রতে হয়। এবং সকল লোককে একমত করা বড় সহজ ব্যাপার নয়; তাই সব সময়ে সব ভাল কাজ, প্রেসিডেণ্ট হ'লেও ক'রে উঠ্‌তে পারেন না।

এমিল লাড্উইগ তার বক্তৃতায় একথারও ইঙ্গিত দিয়েছেন:—

> ......To speak about Mr. Roosevelt would also be very dangerous because you know the richer part of the American people does not like him very much. You here do not suffer because his arm is not long enough to reach into your pockets, but your friends abroad suffer muchly. I am a 100 per cent admirer of Mr. Roosevelt's and had to pay for it because my book on him was terribly criticized in America by men who were not 100 per cent admirers of him."

এ দেশের ধনীরা যে রুজভেল্টকে বিষের মত "পছন্দ" করে তা না বললেও চলে। ধনীদের ধারণা যে, রুজভেল্ট যদিও সোজা-সুজি লেনিনের "চেলা" নন, তবু ঐ রকম একটা কিছু হ'তে চেষ্টা ক'রছেন। রুজভেল্টের পন্থা নিলে আমেরিকাও হয়ত এক নূতন রুশিয়া হ'য়ে প'ড়বে। তাই ট্যাক্স বাঁচাতে যেয়ে অনেক ধনী লোক আমেরিকা ছেড়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যেয়ে বাস ক'রছেন। লেখার ও বক্তৃতার পূর্ণ স্বাধীনতা এ দেশে আছে বলে এরা রুজভেল্টকে খোলা-খুলি কড়া কথা শুনাতে ভয় করে না। লাড্উইগের বই বেশী বিক্রী না হওয়ার কারণ আর কিছুই না—শুধু ধনীদের আক্রোশ! তাদের ধারণা এই যে, রুজভেল্ট এদেশের ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশ ক'রতে ব'সেছেন, ধনীদের নির্ম্মূল ক'রতে আরম্ভ করেছেন এবং অচিরে সমস্ত দেশটাকে "জাহান্নামে" পাঠাতে ছাড়বেন না।

এমিল লাড্উইগ ১৯২৮ সালে প্রথম বার আমেরিকা দর্শন করেন। ১৯৩ সালে অর্থাৎ প্রায় ১০ বৎসর পরে তিনি দ্বিতীয় বার এদেশে আসেন। এই দশ বৎসরে তিনি মনে করেন যে, আমেরিকায় একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেছে।

> "When I first visited the United Stat[es i]n 1928, I found the smallest elevator boy ru[n]ning to the ticker every hour to see whether [he h]ad won or lost something. Years later [I] found a great change. American life w[as] quieter. The great rush of the American tempo was not there any more."

কথাটি খুব অতিরঞ্জিত নয়। যারা ১৯২৮।২৯ সালে নিউইয়র্কে ছিলেন, তারাই একথার সত্যতা স্বীকার ক'রবেন। যার হাতে কয়েক শত ডলার জমেছে সেই ষ্টক মার্কেটে (Stock market) যেয়ে কিছু শেয়ার কিনেছে। আর, কয়েক শত ডলার জমান, তখনকার দিনে এ দেশে বিশেষ কষ্টকর ব্যাপারও ছিল না, বাড়ীর চাকরাণী, রাঁধুনী থেকে আরম্ভ ক'রে অফিসের কেরাণী, মুহুরী সকলেই শেয়ার কিনত। লাভ লোকসান দুই-ই হত যদিও লোকসানের ভাগই বেশী। এ দেশটা তখন ঐশ্বর্য্যের উপর ভাসত। কিন্তু যখন গতি উল্[টা] দিকে ছুটতে আরম্ভ ক'রল তখন সে গতি রোধে কে? ক[ত] আত্মহত্যা! কত হাহাকার!

আমেরিকা এই পরিবর্ত্তন থেকে—অর্থাৎ এই ভীষ[ণ] দুর্ব্বিপাক থেকে বেশ খানিকটা শিখেছে বলে অনেকের ধারণা। লাড্উইগ ব'লেছেন-

> "There is no longer any nervousness i[n] the United States either. The machine doe[s] not cause them to be nervous, beause the[y] dominate the machine. In Europe th[e] machine still dominates man."

আমেরিকা এখনও যন্ত্রদানবকে সম্পূর্ণ অধীনে আন্‌তে পারে নাই—তবে আগের চেয়ে অনেকটা এনেছে। যতদিন এরা এদের লোভ দমন ক'রতে না শিখবে, ততদিন বোধ হয় যন্ত্র-দানব এদের উপর কর্তৃত্ব করতেই থাক্‌বে। রুজভেল্ট এখানে নূতন নূতন আইন ক'রে শ্রমিকদের অবস্থার আংশিক পরি-বর্ত্তন ক'রতে চেষ্টা করছেন; অনেকগুলি ভাল আইন ইতিমধ্যে পাশও ক'রেছেন। তাই ধনীরা ভীষণ আপত্তি ক'রছে, কেননা, এই সব নূতন আইনে শ্রমিকদের উপর স্বেচ্ছানুসারে আর দাসত্ব চালান সম্ভব নয়। এতে ধনীদের স্বার্থে ক্ষতি হচ্ছে। তাদের কোটী কোটী টাকা লাভে বাধা প'ড়ছে, তাই তারা আর রুজভেল্টকে চায় না।

লাড্উইগের বক্তৃতার আর একটি কথার উল্লেখ ক'রে এ পত্রের শেষ করব।

> "Another change you have, thank Go[d] is less admiration for Europe than formerl[y] Speaking as a historian, I found the bes[t] knowledge of European history in Americ[a] and no knowledge at all of American history i[n] Europe. The great American men, Europ[e] knows, are the men whose effigies appear o[n] dollar notes. This is the reason why Frankli[n] is unknown here; his effigy appears only o[n] $ 100 notes, and they are not seen over here."

আমেরিকা শুধু যে সমসাময়িক ইউরোপের খবর রা[খে] তা বলা অবিচার, সমস্ত পৃথিবীর খবর রাখে। অতীতে[র]

(শেষাংশ ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফ্রান্সে রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কট

ফ্রান্সে রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কট ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। গত বুধবারের ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ধর্ম্মঘট ইহার প্রমাণ। মিউনিক চুক্তিতে ইংরেজ এবং ফরাসী এই দুই জাতির উপর যে অব-মাননার বোঝা চাপিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, ইংলণ্ডেও সেইজন্য চাঞ্চল্য না দেখা দিয়াছে, এমন নয়। জার্ম্মানীর নিকট নিজেদের রাষ্ট্রীয় দুর্ব্বলতার এই যে স্বীকৃতি রাজনীতিকদের শান্তিবাদ ব্যাখ্যার বুলিতে জাতির পক্ষে তাহা ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব হইতেছে না। ইংরেজ রাজনীতিক জাতির স্বার্থরক্ষার দোহাই দিয়া সে বেদনার উপর মৃদু প্রলেপ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বার্থের দৃষ্টি ইংরেজের প্রখর, ইংরেজদের মধ্যে অনেকে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছে যে, মিউনিকের চুক্তিটা স্বীকার করিয়া না নিলে যুদ্ধে নামিতে হইত এবং যুদ্ধের ঝুঁকি আরও বড় বেশী ঝুঁকি। ইংরেজের

ফ্রান্সের অর্থ-সচিব মঁসিয়ে পল রেনড কতিপয় মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিতেছেন। ইঁহারই প্রবর্ত্তিত আইন লইয়া নূতন রাষ্ট্র সঙ্কট দেখা দিয়াছে

পক্ষে যে বুঝটা বুঝিয়া লওয়া সম্ভব হইতেছে, ফরাসীদের পক্ষে তাহা সম্ভব হইতেছেনা, কারণ, জার্ম্মানীর শক্তি বৃদ্ধির অর্থ, ফ্রান্সের রাষ্ট্রগত স্বার্থ এবং স্বাধীনতার পক্ষে শঙ্কা বৃদ্ধি। এই আশঙ্কা এড়াইবার একমাত্র উপায় হইল—অস্ত্রশস্ত্র এবং সমর-সম্ভার বাড়ান। চেকোশ্লোভাকিয়া এবং রুশিয়ার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ফরাসীরা জার্ম্মানীর যে আতঙ্ক এড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, মিউনিক চুক্তি সে ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়াছে। ইহার স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপে যে ইউ-রোপের ইংলণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি রাষ্ট্র এতদিন গণতান্ত্রিক বলিয়া নিজেদের বড়াই করিত, তাহাদিগকে গণতান্ত্রিকতা ছাড়িয়া ক্রমেই ফ্যাসিষ্টপন্থী হইয়া উঠিতে হইতেছে। এবং সমাজ-তন্ত্রীদের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সে সম্প্রতি যে রাষ্ট্রনীতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার মূল কারণ রহিয়াছে এইখানে। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ দালাদিয়ের

মার্সাই বন্দরের সভায় সেইদিন কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে যেমন তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন, বহু দিনের মধ্যে ফ্রান্সের লোকেরা তেমন কথা শুনে নাই। মিউনিক চুক্তির
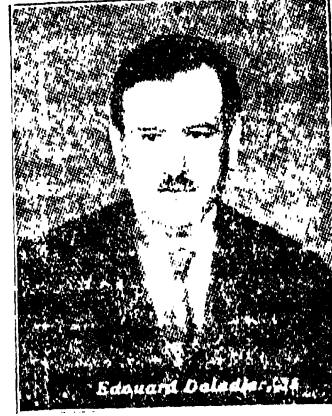
ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে দালাদিয়ের

পর হইতে পুঁজিবাদীদের স্বার্থমূলক নীতি ফ্রান্স গবর্ণমেণ্ট অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ফ্রান্সের বর্ত্তমান অর্থ-সচিব রেনডের নূতন আইনই ইহার প্রমাণ। এই আইনের বলে, দরিদ্রদের স্বার্থকে পদদলিত করিয়া ধনী এবং পুঁজিদার-দের স্বার্থকেই কায়েম করা হইয়াছে। এবং এ সত্যও শ্রম-জীবীদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, পুঁজিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থমূলক এই নূতন নীতির পিছনে ইংলণ্ডের পুঁজিদারদের চক্রান্ত রহিয়াছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী
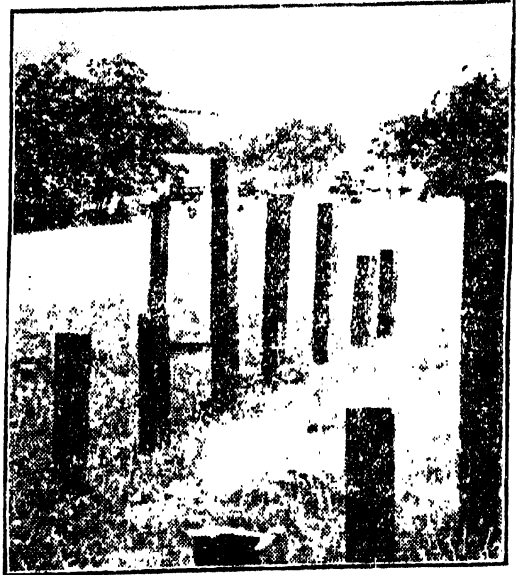
ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর সীমান্তে ফরাসীদের ভূগর্ভস্থ দুর্গশ্রেণী

চেম্বারলেন এবং দালাদিয়ের—এই দুই জনে মিলিয়া এখন ফ্যাসিষ্ট পন্থাই সার বলিয়া বুঝিয়াছেন। জার্ম্মানী এবং

ইটালীকে পুষ্ট করবার জন্য তাঁহারা চেকোশ্লোভাকিয়ার মত স্পেনকেও বলি দিবার জোগাড়ে আছেন। কিন্তু স্পেনকে ইটালী এবং জার্ম্মানীর স্বার্থের কাছে বলি দিতে যে তাহাদের প্রাণ চাহিতেছে এমন নয়, স্পেনকে বলি দেওয়ার অর্থ—ভূমধ্য-সাগরে ইংরেজের অধিকারকে বিসর্জ্জন দেওয়া এবং পূর্ব্বে শক্তিশালী জার্ম্মানী এবং দক্ষিণে স্পেনের মারফতে প্রাপ্তশক্তি ইটালী, ফ্রান্সকে এই দুই শক্তির মাঝখানে পতিত থাকা। সুতরাং ইংরেজ কি ফরাসী দুইয়েরই এদিকে সঙ্কোচ আছে; কিন্তু সে সঙ্কোচ করিলে চলিতেছে না, জার্ম্মানী চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে যেমন চোখ রাঙাইয়াছিল স্পেনের ব্যাপারে ইটালীও তেমনই চোখ রাঙাইতেছে। ইংরেজ ইটালীর আবিসিনিয়া জয় স্বীকার করিয়া লওয়াতেও সে তুষ্ট হয় নাই,

জাতির সেবার জন্য ফ্রান্সের যে সব জননী তাঁহাদের সন্তানদিগকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মানার্থ প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি মন্দির

বিদ্রোহী নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লওয়া চাই, ইটালী এবং জার্ম্মানী এই দুইয়েরই এই দাবী। কারণ তাহা হইলে জেনারেল ফ্রাঙ্কো সাধারণতন্ত্রীদিগকে বাহিরের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্পেন দখল করিয়া বসিতে সমর্থ হইবেন।

ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে মিউনিকের চুক্তির পর উভয়ত্র এই ভাবে রাষ্ট্রনীতির ধারা বদলাইয়া গিয়াছে; ফ্রান্সে এই জিনিষটা ধরা পড়িয়াছে বেশী; কারণ, ফ্রান্সের শ্রমিক-স্বার্থ সম্পর্কিত বিধানগুলি এতদিন ইংলণ্ডের চেয়ে অনেকটা বেশী সমাজতন্ত্র ঘেঁসা ছিল। জাতির স্বার্থের দোহাই দিয়া ফ্রান্সের অর্থ-সচিবও তাঁহার নূতন নীতির সঙ্গতি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বেতার যোগে ঘন ঘন বক্তৃতা করিয়া

ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, এই আইন পরিকল্পনার মধ্যে পুঁজিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিহিত নাই; কিন্তু আইনের বিধানগুলি এমনই সুস্পষ্ট এবং দণ্ডবিধি এতই কঠোর যে আইনের পুঁজিদারদের পক্ষপাতিত্বের দিকটা চাপা দিবার কোন উপায় নাই।

সামরিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানার শ্রমিকদের সম্বন্ধেই এ আইনের কড়াকড়ি বেশী। আইনের একটি বিধান এই যে সমর-সম্ভার কারখানার শ্রমিকেরা যদি অধিক কাজ করিতে রাজী না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করা চলিবে এবং তাহারা শ্রমিক-বিধানে সরকার হইতে যে-সব সুবিধা বা সাহায্য পাইতে পারিত তৎসমুদয় হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে। ফ্রান্সের জনসাধারণ প্রকৃতিতে গণতান্ত্রিক। তাহারা এমন নীতি বরদাস্ত করিয়া উঠিয়া পারিতেছে না। তাহারা দেখিতেছে, তাহাদের গবর্ণমেণ্ট দেশের গণতান্ত্রিকতার সকল সূত্রকে ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফ্রান্সের শ্রমিকেরা এই দৃঢ় সংকল্প করিয়া বসিয়াছে যে, বড় লোকদের দাসত্ব,—ফ্রান্সের 'দুই শত পরিবারের' প্রভুত্ব তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবে না। অপর পক্ষে

ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব প্রধান-মন্ত্রী শ্রমিক দলের নেতা মঁসিয়ে ব্লুম

ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্টের জঙ্গী মেজাজও শ্রমিক দলনের দিকে চড়িয়া উঠিতেছে।

১৯৩৬ সালে ফ্রান্সে যেমন ধর্ম্মঘটের ঢেউ উঠিয়াছিল আবার হয়ত সেইরূপ রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কট সেখানে দেখা দিবে। অষ্ট্রিয়ার ব্যাপারের পুনরাভিনয়—দাঙ্গাহাঙ্গামা, রক্তারক্তি এ সবও আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু ১৯৩৬ সালের যে সমস্যা তখনকার অপেক্ষা ফ্রান্সের বর্ত্তমান এই যে সমস্যা—ইহা অধিকতর জটিল এবং ইহা সুদূরপ্রসারী আকার ধারণ করিয়া উঠিতে পারে। কারণ, সমগ্র ইউরোপে ফ্যাসিষ্ট নীতি প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস চলিতেছে, তাহার প্রতিক্রিয়ার আকারেই ইহা দেখা দিবে এবং এই সংঘর্ষের পরিণতির উপর ইউরোপে শ্রেণী স্বার্থ সঙ্ঘাতের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিবে

...কক্ষণ থাকেন তবে আপনাকে মারামারি করতে ... এর মানে বাঙালীর আত্মসম্মান আছে তার উপর ...

তাও ভুলতে বসেছে, কিন্তু তাদের পূর্ব্বপুরুষের অত্যাচারের ফল তারা এখন নানাভাবে ভোগ করছে। পাশবিক অত্যাচারের ...

ভূমধ্যস্থ দুর্গে মধ্যস্থ বিদ্যুৎ-আগার

ভীষণভাবে বিপ-- ... আগাইবার উপায়ও নাই। একমাত্র ... হস্ত বাড়ান।" ইহা সুস্পষ্ট যে, ফরাসী প্রধান ... দালাদিয়ের যদি এইভাবে শ্রমিক-দলন নীতি ... বিরোধী নীতি অবলম্বন করিয়াই চলিতে থাকেন, ... তাঁহার দলেরই অনেক লোক বিরোধী দলে যোগদান করিবে। ফরাসী জাতি ইহা সার বুঝিয়া লইয়াছে যে, ফ্রান্স বর্ত্তমানে যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে কার্য্যত ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রসমূহের সহিত সায় যোগাইয়া চলা অর্থাৎ নিজের স্বাধীনতাই সে বিকাইয়া দিতেছে। ফরাসী সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে যদি সত্যই সেখানে প্রচণ্ড বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটে, তাহা হইলে গণতন্ত্রের জাগরণই তাহা সূচিত করিবে।

আমেরিকার পত্র

(১৪৭ পৃষ্ঠার পর)

ইতিহাসে এদের মন তত নাই, কিন্তু বর্ত্তমান ইতিহাসে এরা যেমন উৎসাহী এমন আর কোথাও কোনও জাতি আছে কি-না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। চীন, জাপান, ভারতবর্ষ চেকোশ্লোভাকিয়া, স্পেন বা আফ্রিকা অথবা পৃথিবীর অন্য কোনও ক্ষুদ্র কোণে যুদ্ধ হয়েছে বা মহামারী হয়েছে বা অন্য কোনও অসাধারণ ঘটনা ঘটছে অমনি আমেরিকা চায় তার সবটুকু জানতে। এদের সংবাদপত্র, এদের রেডিও, এদের গীর্জ্জা ও সভা-সমিতি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে কেমন ক'রে ভালমন্দ সব খবর সব চেয়ে আগে এনে আমেরিকার জনসাধারণের কাছে হাজির ক'রবে। করেও।

ইউরোপের উপর এদের যে শ্রদ্ধা ছিল তা যদিও এখনও যথেষ্ট আছে—তবু বিগত ঘটনাগুলিতে এদের শ্রদ্ধা অনেকটা শিথিল হ'য়ে পড়েছে। পড়াতে আশ্চর্য্য হবার কারণও নাই। ইউরোপে যে রকম "শেয়াল-কুকুরের দ্বন্দ্ব" ও বিশ্বাসঘাতকতার চরম দৃষ্টান্ত দেখা দিয়েছে তাতে যে কোথাও কোনও লোকের শ্রদ্ধা এত দীর্ঘকাল আছে, তাতেই আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

আমেরিকার বিখ্যাত ধনী মিষ্টার বার্নার্ড এম বারিক লাডউইগকে একখানা পত্র লেখেন। সে পত্রে স্বর্গীয় প্রেসিডেণ্ট উইলসনের লীগ অফ নেশানস্ সম্বন্ধে মতামত থাকায় তিনি প্রকাশ্য সভায় উহা পাঠ করেন।—

"The Lord has His own ways of doing things. If I had not been stricken I should have fought for the League of Nations and won. The world is not ready for a League of Nations, but some day a great catastrophe will threaten to engulf the world and the people who are asked to join will then join willingly. The League of Nations will become the great instrument it was intended to be."

প্রেসিডেণ্ট উইলসনের দৈব-বিশ্বাসে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু এযাবৎ যে সব তাণ্ডব নৃত্যের অভিনয় দেখা গেল ও এখনও দেখা যাচ্ছে তাতে দৈব-বিশ্বাসে ধৈর্য্য রাখা মহা মুস্কিল ব্যাপার। যারা শক্তিশালী নেতা তারাই তাদের শক্তি প্রয়োগে—দুর্ব্বলকে ধ্বংস ক'রতে ব্যস্ত, এই দেখ্ছি জগতের নিয়ম। যারা আজ মহাবন্ধু ব'লে দুর্ব্বলকে সাহায্য করতে প্রস্তুত—তারা কাল স্বার্থের জন্য দুর্ব্বলকে অনায়াসে বিসর্জ্জন দিবে নির্লজ্জ ও অকুণ্ঠিত ভাবে। সব দেশকে স্বাধীনতা দেওয়া হ'ক, সকল সাম্রাজ্যের শেষ হ'ক। তখন হয়ত সকল দেশে শান্তির লক্ষণ দেখা দিবে। তা না হলে—আজ হিটলার, কাল মুসোলিনী—তার পরে কোথায় হয়ত জাপানী বা ইংরেজ বা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা উদয় হ'য়ে "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" রেখে দেবে।

মিঃ লাডউইগের বক্তৃতার শেষ কথা কটিঃ—

"My new country, Switzerland, for having enjoyed 500 years of democracy, is the microcosm of the United States of Europe that will come after a great catastrophe."

বলা বাহুল্য যে, হিটলারের আজ্ঞায় লাডউইগ তাঁর মাতৃভূমি জার্ম্মানী থেকে তাড়িত হ'য়ে সুইজারল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর একমাত্র অপরাধ—তাঁর শিরায় ইহুদী রক্ত আছে।

...ক্ষণ থাকেন তবে আপনাকে মারামারি করতে হবেই।" এর মানে বাঙালীর আত্মসম্মান আছে, তার উপর যদি কোনরূপ অত্যাচার হয় তবে আত্মসম্মান বজায় রাখতে, জাতের সম্মান বজায় রাখতে, দেশের সম্মান বজায় রাখতে তাকে মারামারি করতে হবেই।

যখনই আমি বলি, "আপনারা প্রিটোরিয়ায় ট্রামে এবং বাসে বসতে পারেন না; বসতে চেষ্টা করেছেন কি?" সকলেই জবাব দেয় "এসব বাজে কথা রেখে দাও, ভবঘুরে হয়ে এসেছ যা আমরা সাহায্য করি তাতে সন্তুষ্ট থাক।" দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি তাদের কথায় সায় দিতে পারি না। নিকটস্থ স্থান হতে এমন একটা দুর্গন্ধ আসে যে, তাও সহ্য করতে পারি না। তাই "লকেসন" ছেড়ে দিয়ে ইউরোপীয়ান শহরেই অনেক সময় কাটাতে বাধ্য হই। ইউরোপীয়ান শহরে কয়েকটি ভারতীয় দোকান আছে। দোকানীরা প্রায়ই ভারতীয় মেমান মুসলিম। তাদের পোষাক সেই পুরাতন পাজামা, আফ্রিকার নেটিভ পর্য্যন্ত তাদেরকে কুলি বলে সম্বোধন করে। তবুও পুরাতন প্রথা ছাড়ার কোন চেষ্টা নাই। প্রিটোরিয়ার নূতন মেয়র সত্বরই নাকি তাদেরকে শহর হতে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দোকান বুয়রদের দিবার বন্দোবস্ত করবেন। ভারতীয় কংগ্রেস এবং স্থানীয় হিন্দুরা এসব মুসলিমদেরকে অনেক বুঝিয়েছেন পোষাক এবং আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করে শহরে থাকার "right" রাখতে। কিন্তু পাষাণে কর্দ্দম নাস্তি।

"ভুরট্রেকার" (VOORTRAKKER.)

একশত বৎসর পূর্ব্বে ওলন্দাজরা দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিল এবং বসবাস আরম্ভ করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন জুলু জাত রাজত্ব করত। এদের ধর্ম্ম ছিল মুসলিম। মুসলিম ধর্ম্মের "পর্দ্দা" প্রথা এরা ভালভাবেই গ্রহণ করেছিল। ওলন্দাজ নারী এবং পুরুষদের স্বাধীনভাবে পরিভ্রমণ করতে দেখে জুলুদের ধর্ম্মে আঘাত লাগে এবং যাতে ওলন্দাজরাও তাদের লোকদের পর্দ্দার আড়ালে রাখে সে জন্য জুলুরা উৎযোগী হয়। কিন্তু জুলুদের জানা ছিল না ওলন্দাজরা তাদের স্ত্রীলোকদের বেশী সম্মান করে। এই ধর্ম্মের অন্ধতা নিয়েই জুলুদের রাজা ডাঙ্গান (*Dangan*) ওলন্দাজদের সঙ্গে লড়াই সুরু করে। লড়াই অনেক দিন চলে কিন্তু ডাঙ্গান লড়াইয়ের সময় ওলন্দাজ স্ত্রীলোকদের প্রতি পাশবিক অত্যাচারত করেছিলই, উপরন্তু তাদের প্রাণেও মেরেছিল। তারই স্মৃতিচিহ্ন আজ চলছে নূতনভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায়।

একদল ওলন্দাজ কেপটাউন হতে গরুর গাড়ী নিয়ে প্রিটোরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়েছে। তারা আসবে ১৬।১২।৩৮ ইং প্রিটোরিয়াতে। তাদের মলিন বস্ত্র, তাদের শুষ্ক মুখ, তাদের ক্লান্ত শরীর প্রিটোরিয়ার শাদাজাত দেখবে এবং সেই পুরাতন অত্যাচারের কথা স্মরণ করবে। পুরুষের উপর পুরুষ যদি অত্যাচার করে, তবে লোকে সত্বর ভুলে যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার, যদি বীর জাত হয়, তবে কখনও ভুলে না, ভুলা উচিতও নয়।

জুলুদের মাঝে এখন আর পর্দ্দা নাই। মুসলিম ধর্ম্মের বান ডেকেছিল তাতে ভাটা এসেছে. অনেকে ধর্ম্ম কাকে বলে তাও ভুলতে বসেছে, কিন্তু তাদের পূর্ব্বপুরুষের অত্যাচারের ফল তারা এখন নানাভাবে ভোগ করছে। পাশবিক অত্যাচারের শাস্তি এখন ফাঁসিকাঠে ঝোলা। আরও কতকগুলি নিয়ম বিধিবন্ধ হয়েছে যা থেকে অন্য নেটিভ রেহাই পাচ্ছে। ব্রিটিশ, ইন্ডিয়ান এবং অন্যান্য জাত ১৬।১২।৩৮ তারিখে কি করবে তার এখনও কোন কিনারা করতে পারে নাই।

স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে কেউ কোনদিন রেহাই পায় নাই পাবে না এবং পেতে পারে না। সেই অত্যাচারের প্রতিশোধের জের চলে অনেকদিন। হয়ত একদিন ভারতে স্ত্রী অত্যাচারীর শাস্তি অন্য ধরণে হবে এবং যারা বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার ক'রে বাহাদুরী অর্জ্জন করছে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তার ফল ভোগ করবে। তখন হবে নূতন "ভুরট্রেকার" ভারতে। অনেক ইন্ডিয়ান আমাকে বলেছেন—বুয়রগণ এরূপ অভিনয় করে ভুল করছে। আমি তাদের বলেছি "আমরা ভারতবাসী, আমরা না করতে পারি এমন কাজ নাই; তার একমাত্র কারণ আমরা অনেকদিন পরের পদানত, অতএব কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ তা বুঝবার আমাদের শক্তি নাই।" "ভুরট্রেকার"গণ বলছে না জুলুদের দেখলেই মার। তারা বলছে—"যারা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করবে তাদের ফাঁসিকাঠে চড়াও।" স্ত্রী অবলা, তার প্রতি অত্যাচার করে যারা ধর্ম্মের প্রসারণ করে তারা বর্ব্বর, এই বর্ব্বরদের ধর্ম্ম অধর্ম্ম একই. এই বর্ব্বরদের কঠোর শাস্তি দিলে ভবিষতে আর এরূপ কাজ করবে না বলেই সকলের ধারণা।

ভারতবাসী অম্লানবদনে যেরূপ স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার দেখে আসছে, তেমনটি আর কেউ দেখে নাই। ভারতবাসী আপন মা বোনদের যেমন করে সত্বর পর করতে পারে তেমন পৃথিবীর কোন জাত কোন দিন করে উঠতে পারে নাই। তার একমাত্র কারণ হল হিন্দুদের মাঝে জাতিভেদ। এক কথায় বললাম মাত্র 'জাতিভেদ,' কিন্তু এই জাতিভেদ শব্দের যদি কেউ "থিসিস্" লিখেন তবে তা হবে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বই।

ভারতীয়ের মানসিক বিকাশও অন্যধরণের। ভারতবাসী খোসা নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ে। ওলন্দাজরা সেরূপ নয়। তারা দেখে কোথা হতে পাপের সৃষ্টি হয়। সেই গোড়া খুঁজে বের করেই তারা সেই পাপের মূলোৎপাটন করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পর্দ্দা নাই। আইন মতে কেউ পর্দ্দা রাখতে পারে না। পর্দ্দার নানা দোষ।

যে সকল দেশে পর্দ্দা প্রচলিত তাদের মাঝে এত ব্যাভিচার যে তার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এই কারণেই আফগানিস্তান, পাঞ্জাব, এমনকি বঙ্গেও পাপাচারের প্রসার হয়েছে বলেই মনে হয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় এরূপ পাপাচার নাই। ওলন্দাজ তার বংশ নির্ম্মূল করেছে। অন্য জাতি ধর্ম্মের ভ্রান্তি হয়ে যেরূপ পাপাচারের প্রশ্রয় দেয়, দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র সেরূপ পাপাচারের প্রশ্রয় দেয় না, দিবেও না। কারণ তারা আপন রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে। তাই তারা "ভুরট্রেকার" করছে যাতে আর পাপাচারের প্রশ্রয় না দেওয়া হয়।

ছায়া

(গল্প)

শ্রীমতীপুষ্প

আমি কখনও বিশ্বাস করতাম না যে, ভূত নামে কোন পদার্থ আছে এবং তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেউ কখনও আমায় বোঝাতে পারেনি। কিন্তু আমি যখন দার্জ্জিলিং পাহাড়ের কাছে স্থানীয় সরকারী ডাক্তার ছিলাম তখন এমন একটি বিচিত্র ও অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল যে, সেই থেকে আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লেগেছে; এখন ভূত সম্বন্ধে কেউ কোন ঘটনা বললে আমি আর হেসে উড়িয়ে দিই না। যা'হোক, ঘটনাটি যা বলতে চাই তাহা এইরূপঃ—

"কয়দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর একটু আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে, ঘড়ি দেখলাম বেলা প্রায় চারটে বাজে, চা খানার মোটর-বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, চা-বাগানের উদ্দেশ্যে। সেখানে চা-বাগানের কুলীদের সপ্তাহে দু'দিন তদারক করতে যেতে হয়, বারমাসই তাদের একটানা একটা কিছু লেগে থাকে।

সরকারী রাস্তা ছেড়ে ক্রমে চা-বাগানের অসমতল আঁকা বাঁকা পথে পড়লাম, ক্রমে দিনের অবসান হ'য়ে এল, পশ্চিম দিগন্তের রক্তলেখা ধীরে ধীরে কালো পাহাড়ের কোলে ম্লান হ'য়ে এল।

চলেছি,—এমন সময় প্রায়ই চলে থাকি, কখনও ভয় বড় একটা করে না। দূরে কুলীদের দু'একটা করে বস্তি দেখা গেল, সূর্য্যদেব তখন অস্ত গেছেন, বনচ্ছায়া ও পর্ব্বতের অন্ধকারে তখন ঝিল্লিরব জেগে উঠেছে।

বাইকটা পাহাড়ের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে সবেমাত্র নেমেছি, চোখে পড়ল একজন লোক ছুটতে ছুটতে এই দিকেই আসছে। আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম।

লোকটা আমার কাছে এসে থামল এবং দু'হাত জোড় ক'রে পাহাড়ী ভাষায় নিবেদন করলে, "ডাক্তার সাহেব আমার ঘরে একটিবার আসুন, এখান থেকে ঐ আমার ঘর দেখা যাচ্ছে। আমার মেয়ের বড় অসুখ।"

আমি বললাম "কি হ'য়েছে?"

লোকটি বললে—"ক'দিন ধ'রে ভারী জ্বর হয়েছে।"

লোকটি বৃদ্ধ, কিন্তু বয়েস আন্দাজ করা শক্ত, কারণ আমাদের গ্রীষ্মদেশের চেয়ে এদেশের লোক অনেক দেরীতে বুড়ো হয়।

আমি তার সঙ্গে যেতে যেতে জিজ্ঞাস করলাম—"ক'দিন জ্বর হয়েছে? এতদিন বলনি কেন?"

বৃদ্ধ হাতজোড় ক'রে জানাল, "সে অনেক কথা সাহেব, আপনি এখন একবার আমার মেয়েকে দেখে বলুন, সে বাঁচবে কিনা।"

কথা বলতে বলতে উক্ত বৃদ্ধের কুটীরে এসে পড়লাম। ঘরে মিটমিট ক'রে আলো জ্বলছে, বৃদ্ধ আগে—পিছু পিছু আমি ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। উঃ চোখের সামনে সে কি করুণ দৃশ্য! একটি অসামান্যা রূপসী পাহাড়ী নারী, বয়সে কুড়ি-বাইশের বেশী নয়, অবসন্ন হ'য়ে একটি তক্তপোষে ছেঁড়া কম্বলের উপর পড়ে আছে। তার কোলের কাছে একটি সদ্যোজাত শিশু। এই বর্ষাকালে ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির ঘর, তাতে আবার তাদের পরিধেয় বসন নাই বললেই হয়।

কাছে গিয়ে দেখলাম—মেয়েটির জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—পরীক্ষা ক'রে দেখলাম—ডবল নিউমোনিয়া, বাঁচবার আশা নাই বললেই হয়। শিশুটি কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ ও নীরোগ! বৃদ্ধ এতক্ষণ স্থির হ'য়ে বসেছিল। এইবার আমায় অধীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন দেখছেন সাহেব?"

যথাসম্ভব নিম্নস্বরে বললাম, "ভাল নয়, তোমার বাড়ীতে অপর স্ত্রীলোক কেউ নেই?"

বৃদ্ধ ম্লানকণ্ঠে জবাব দিলে—"হুজুর কেউ নেই, এই মেয়েকে আমিই তিন বছর বয়েস থেকে মানুষ করেছি। আমার স্ত্রী একে তিন বছরের রেখে মারা যায়, আর—"

আমি আর তাকে কথা বাড়াতে না দিয়ে বললাম, "কিন্তু তোমাদের প্রতিবেশিনী কাউকে ডাকা দরকার, আর কিছু গরম কাপড় ও কয়েকটা জিনিষ চাই। ঘরে একটু আগুন জেলে দাও। একটু শীগগির কর, নইলে একে বাঁচান দায় হবে।" তখন চেয়ে দেখি, বৃদ্ধ লোকটি বসে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, "এ সময় অধীর হলে চলবে না, শীগগির ওঠ, একটু দুধ দাও দিকি—ছেলেটিকে খাওয়াতে হবে। ছেলেটি কখন জন্মেছে?"

—"পরশু রাতে।"

—"বেশ, দুধ নিয়ে এস।"

বৃদ্ধ ভগ্নহৃদয়ে কোনরকমে উঠে একটি পাত্র নিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল—বোধ হয় দুধের অন্বেষণে। আমিও অস্থির হয়ে ঘরে পাইচারী করছি। তাইত, কি ক'রে এদের মাতাপুত্রকে বাঁচান যায়—অন্ন-বস্ত্রের সম্পূর্ণ অভাব! স্থির করলাম, আসছে কাল এদের হাসপাতালে দেবার বন্দোবস্ত করব কিন্তু আজকের রাতটা কি ক'রে কাটান যায়? রোগিণীর অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন।

সহসা শিশুটি কেঁদে উঠল, আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দেখলাম, শিশুর মা'র জ্ঞান আছে, কিন্তু উত্থানশক্তিরহিত। কাছেই একখানা ছেঁড়া কম্বল পড়েছিল, আমি তাই দিয়ে শিশুকে জড়িয়ে কোলে তুলে নিলাম। শিশুকে দেখে চোখে জল এসে যায়। হায়রে, এই দুঃখ-দৈন্যের মাঝে এই দেবশিশু কোথা হ'তে এল! হঠাৎ শিশুর মা ক্ষীণকণ্ঠে কি বলে উঠল। আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"কি বলছ? বেশী কষ্ট হচ্ছে কি?" সে অতি ধীরে ধীরে বলতে লাগল—

"কষ্ট না সাহেব, কষ্ট—এইবার আমার শেষ হবে, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার এই ছেলের কি হবে? আমার বুড়ো বাপকে কে দেখবে—" বলতে বলতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করে বললাম—

... ভাল হ'য়ে যাবে, কাল আমি তোমাদের এখান হতে নিয়ে যাব।"

মেয়েটির মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল—ম্লান হেসে সে আবার বললে—"সাহেব আপনি বড়ই দয়াল, আমাদের কেউ নেই, আমার এই ছেলেটির ব্যবস্থা আপনি করবেন—আর আমায় বুড়ো বাপকে কিছু একটা কাজ দিয়ে এখান থেকে নিয়ে যাবেন—এখানে রাখবেন না হুজুর।"

আমি বললাম, "তাই হবে। তুমি হাঁপাচ্ছ—এখন বেশী কথা বল না—স্থির হও।"

কিন্তু সে শুনলে না। তার দুর্বল শিথিল দুটি বাহু অতি কষ্টে তুলে হাতজোড়ের বৃথা চেষ্টা ক'রে বলে উঠল, "না হুজুর আমায় বলতে দিন—নইলে আর বলা হবে না। হ্যাঁ কি বলছিলাম, আমার বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। এখানকার লোক কি নিষ্ঠুর! আমি কিন্তু এদের কোনও ক্ষতি করিনি, আমার নিজের ক্ষতি নিজেই করেছি, তবুও এরা আমাদের এই বিপদে একটুও সাহায্য করলে না। উঃ মানুষ মানুষের উপর এত নির্দয় হতে পারে! যা'হোক সাহেব আপনি বলুন, আমার এই শিশুর ভার আপনি নেবেন?"

শিশুটি তখন ভয়ানক কাঁদতে সুরু করেছে। বৃদ্ধের এখনও দেখা নাই। আমি উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র দৃষ্টিতে কেবল বাইরের নিকষ কালো অন্ধকারের পানে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। মুখে শুধু মেয়েটিকে বললাম, "আমি বলছি তুমি সেরে উঠবে, কেন তুমি ভয় পাচ্ছ। এরকম অসুখ কত হয়।"

মেয়েটি এবার একটু দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, "সাহেব আপনার কথা মত আমি যদি ভাল হই, তবে আপনার বাড়ীতে ক্রীতদাসী হয়ে আমরা কাজ করব। আপনার ছেলেমেয়ে আছে ত?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—"হ্যাঁ।"

এমন সময় বৃদ্ধ ঘরে এসে ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "হুজুর ভারী দেরী হয়ে গেল। বহুদূরে গিয়ে তবে এই দুধ নিয়ে এসেছি। এখনি আমি গরম ক'রে এদের খাইয়ে দিচ্ছি। আপনার অনেক রাত হয়ে গেল—দয়া ক'রে আর একটু বসুন।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি বসছি, তুমি দুধ গরম ক'রে নিয়ে এস।"

বৃদ্ধ কাঠ এনে তাতে অগ্নি সংযোগ ক'রে দুধ গরম করতে বসল। সেই ছোট মাটির ঘর—একপাশে রোগী শুয়ে—তক্তপোষটা অর্দ্ধেক ঘর জুড়ে আছে, আর অর্দ্ধেকখানি ঘরে সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি আসবাবপত্তর।

ঘরে ধোঁয়া হচ্ছে দেখে আমি বৃদ্ধকে বললাম—"দেখ তুমি দুধটা বাইরে গরম কর গিয়ে। ধোঁয়ায় তোমার মেয়ের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। জানলাটা এমনি খোলা থাক।"

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সেইমত কাজ করতে উদ্যত হল। মেয়েটি ক্ষীণ করুণকণ্ঠে আমায় বললে, "সাহেব এবার বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিন। ছেলেটা বাঁচবে ত সাহেব?"

আমি তাড়াতাড়ি শিশুকে তার মা'র কোলের কাছে শুইয়ে দিয়ে বললাম, "তোমার ছেলে খুব ভাল আছে, তুমি শীগগিরই সেরে ওঠ, তা'হলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

মেয়েটি যতদূর সম্ভব ছেলেটির মুখপানে অনিমেষনয়নে চেয়ে রইল। তার দুই চোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারা বয়ে যেতে লাগল, কিন্তু তার রোগজীর্ণ মুখে কেমন যেন একটা নিশ্চিন্তের ভাব ফুটে উঠেছে—মনে হ'ল তার বড় ইচ্ছে শিশুকে কোলে তুলে নেয়। কিন্তু সে শক্তি কোথায়। আমি তার মনোভাব বুঝে খুব সন্তর্পণে শিশুকে একবার তার বুকের উপর শুইয়ে পুনরায় বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

তারপর দুধ গরম ক'রে বৃদ্ধ ব্যাকুল হয়ে বললে—"সাহেব আপনি ওদের খাইয়ে দিন।"

আমি তাদের যথাসম্ভব দুধ খাইয়ে বললাম—"দেখ আমি এবার যাই, তুমি যদি কাউকে আমার সঙ্গে দাও, তবে এখুনি কিছু ওষুধ এবং দু'খানি কম্বল পাঠিয়ে দিই। পারবে কি?"

দেখলাম বৃদ্ধের চোখে আকুলতা ফুটে উঠেছে। চোখে আবার জল আসছে। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "আচ্ছা থাক থাক আমিই না হয় কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দু'দিন আগে তুমি যদি আমায় খবর দিতে এতটা বাড়াবাড়ি হ'ত না।"

এবার বৃদ্ধ একটু শান্ত হয়ে বলে যেতে লাগল—"হুজুর দুঃখের কথা আর কেন বলেন—আজ আমার এত দুর্গতি কেন জানেন?"

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, "দেখ, আজ বেশ রাত হয়ে গেছে, আমি আর দেরী করতে পারি না, পরে শুনব।"

সে কিন্তু তবুও শুনল না—আমার সঙ্গে উঠে বললে "আচ্ছা, চলুন, আমি আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

আমি রোগিণীর দিকে চেয়ে দেখলাম, সে স্থির হয়ে শুয়ে আছে, ঘুমুচ্ছে কি জেগে আছে বোঝা যায় না। আমি দরজার চৌকাঠ পার হতেই সে ক্ষীণকণ্ঠে তার বাপকে ডাকলে।

আমিও ব্যস্ত হয়ে বৃদ্ধকে বললাম, "তুমি যাও এরা একলা আছে, দেখ ও কি বলতে চায়।"

বৃদ্ধ মেয়ের কাছে গিয়ে মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলে, সে যেন কি বললে। শুনলাম বৃদ্ধ বললে, "আচ্ছা, আচ্ছা সে আমি বলে দিচ্ছি।"

আমার কাছে এসে বললে, "আমার মেয়ে বলছে যে, সে আপনাকে যা বলেছে আপনি যেন তা ভুলে না যান। আর সে আপনাকে অনেক অনেক সেলাম জানাচ্ছে।"

আমি পুনরায় দরজার অতি নিকটে এসে তার উদ্দেশ্যে বললাম, "তুমি কিছু ভেবনা, আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখব, আর কাল আমি খুব সকাল সকাল তোমায় দেখতে আসব। তুমি এখন ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

বৃদ্ধ তবুও আমার পিছু পিছু এল—তার অসমাপ্ত কাহিনীটি সংক্ষেপে বলতে বলতে চলল—"জানেন ডাক্তার সাব, আজ আমার এত দুঃসময় কেন? এখানকার কুলীর সর্দারের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের সব ঠিক হয়। মেয়েকে আমার দেখলেন ত, সত্যই মেয়ে আমার ভারী সুন্দরী। যা'হোক বিয়ের দিন সব ঠিকঠাক হঠাৎ দেখি

মেয়ে ঝরণার চোখমুখ লাল ক'রে—কেঁদে মুখ ফুলিয়ে বসে আছে। ব্যাপারখানা কি, অনেক জিজ্ঞেস করলাম, তার মা না থাকায় আমিই একাধারে তার বাপ ও মা। অনেক আশ্বাস দেবার পর সে বললে যে, সর্দ্দারের ছেলেকে সে বিয়ে করবে না এবং অতি কষ্টে আবিষ্কার করতে পারলাম যে, আমার মেয়ে যাকে বিয়ে করতে চায় সে আমাদের চেয়ে জাতে ছোট, তবে বড় চাকরী করে এবং দেখতেও সুপুরুষ। তাকে আমি বহুবার দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে আমায় আর আমাদের সমাজে নেবে না। তা না নিক, মেয়ে ত সুখী হবে। আর বৃদ্ধ বয়সে আমি অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়লে ওরা দেখতে পারবে। এদিকে ত একরকম স্থির হল। কিন্তু সর্দ্দার জানতে পারলে প্রথমত আমার চাকরী যাবে, তা যাক, একটা পেট চলে যাবে। কিন্তু অবশেষে তারা যখন শুনল এই পাত্রের কথা, তখন সকলে স্থির করলে আমার মেয়ের নির্ব্বাচিত পাত্রটিকে মেরে এখান থেকে তাড়াবে। তাতেও যদি না শোনে তবে খুন করবে। মেয়ে ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলে। আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝে দেখুন। মেয়েকে অনেক বোঝালাম—কিন্তু তার সেই এককথা। তারপর একদিন ঝড়ের রাতে দেখলাম—অন্ধকার ঘর—দরজা খোলা, মেয়ে ঘরে নেই। ব্যাপারটা বুঝে নিলাম। সকালে উঠেই শুনলাম আমার চাকরীটি গেছে। অতি কষ্টে দিন যাচ্ছিল, ঘর ছেড়ে কোথাও যাইনি। মেয়ের অনেক খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু কোন খবরই পাইনি। তারপর যেমন ঝড়ের রাতে চলে গিয়েছিল তেমনি এক ঝড়ের রাতে ফিরে এল। তার মুখে শুনলাম—জামাইটি রেলেতেই কাজ করত এবং রেল দুর্ঘটনায় মারা পড়েছে। আত্মীয়স্বজনেরা আমার মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ একমাস হ'ল সে ফিরেছে। কিন্তু এসে অবধি একদিনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। আমার হাতে এমন পয়সা নেই যে—"

আমি বৃদ্ধকে এবার ফিরে যেতে বললাম, সে-ও চলে গেল। আমি মোটর-বাইকে চড়ে বাড়ী ফিরলাম। রাত ন'টা বেজে গেছে। স্ত্রীকে সব বললাম।

সে শুনে বললে, "আহা মেয়েটি যদি না বাঁচে, ছেলেটিকে তুমি নিয়ে এস, আমি মানুষ করব।"

আমি বললাম, "সে-ত ভাল কথা, উপস্থিত এখন দু'জনকে চা বাগানে এখনি পাঠাতে হবে, কিছু দুধ, খাবার ও গরম জামা এবং দু'খানা কম্বল নিয়ে।"

স্ত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল, বললে "তাইত এত রাতে চাকরেরা কি যেতে চাইবে? যা এদের ভূতের ভয়, জানোয়ারের চেয়ে এরা বেশী ভূতকে ভয় করে।"

যা'হোক আমি দু'জন চাকরকে (তারাও এদেশীয়—পাহাড়ী) বলে কয়ে বুঝিয়ে বকসিস্ দেবার লোভ দেখিয়ে সেই রাতে চা-বাগানে পাঠিয়ে দিলাম। সারারাত ঘুমের মাঝে এলোমেলো স্বপ্নে দেখলাম—সেই মেয়েটির রোগশীর্ণ করুণ কাতর মুখ। সে হাতজোড় ক'রে যেন বলছে, "সাহেব এদের দেখবেন!"

সকালে যখন ঘুম ভাঙল—দেখলাম বাইরে অবিরাম বৃষ্টি চলেছে, ক্রমে বেলা বেড়ে যেতে লাগল, বৃষ্টি আর থামে না।—চাকর দুটো এখনও ফেরেনি, বোধ হয় অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্যে।

স্ত্রীকে বললাম—"দেখ বৃষ্টির দেখছি আজ থামবার কোন আশাই নেই, চা বাগানে আমায় যেতেই হবে। মেয়েটির যা অবস্থা দেখে এসেছি, ভোরবেলাই যাওয়া উচিত ছিল, এইবার আমি বেরিয়ে পড়ি, এখন প্রায় ১১টা বাজে।"

স্ত্রী শুধু একবার বললে, "যেতে ত হবে কিন্তু এই ঝড়-বৃষ্টির মাঝে।"

আমি বললাম, "তা আর কি হবে।" কিন্তু মনে মনে ভাবলাম অদৃষ্ট বিরূপ হলে এমনই হয়। মেয়েটির এই অসুখ—আর আকাশও আজ ভেঙ্গে পড়েছে। যা'হোক—সব কাজ সেরে মোটরে উঠতে যাব—হরি! হরি! মোটরের ব্যাটারী খারাপ হয়ে গেছে। ষ্টার্টও ঠিক নিচ্ছে না। উঠে-পড়ে মোটর বাইক ঠিক করতে বসলাম। চাকর দুটোর দেখা নাই, বেরুতে বেলা চারটে বেজে গিয়ে পাঁচটা হ'ল।

সূর্য্যদেব আজ ক্ষোভে-দুঃখে লুকিয়ে রইলেন। বৃষ্টি চলেছে, সেই সঙ্গে হু হু শব্দে বাতাস বইছে। কি বৃষ্টি! মাঝে মাঝে বাইকটাকে থামাতে হচ্ছে। পথে এক একটা ঝরণা পড়ছে, উঃ সে কি জলের তোড়, পাহাড় প্রমাণ জল ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করতে করতে নীচে নেমে যাচ্ছে। আমি কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে প্রাণপণে আমার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে চলেছি।

এইবার চা বাগানের পথে এসে পড়লাম। কুয়াসাচ্ছন্ন পথ হলেও, চেনা পথ বলে নির্ব্বিঘ্নে চলেছি। তখন ক'টা বেজেছে ঠিক জানি না তবে আন্দাজ সন্ধ্যা সাতটা হবে। কি ঘন অন্ধকার হয়ে আসছে—পথের রেখাও যেন বিলুপ্ত হয়ে আসছে। শুধু আমার গাড়ীর আলো, তা'ছাড়া যেন সমস্তই অদৃশ্য হয়ে গেছে। মাথার উপরকার আকাশ পাহাড়ের পর পাহাড়ে আর বন-জঙ্গলে ঢেকে রয়েছে। একি! এ কোথায় এসে পড়লাম, কিছুই যে দেখা যায় না। আন্দাজে গাড়ীর বেগ কমিয়ে চললাম। হঠাৎ ভয়ে আঁৎকে উঠলাম—মোটর-বাইকের সামনে এক নারীমূর্ত্তি না?

চেঁচিয়ে বলে উঠলাম "কোন হ্যায় জলদি হট্ যাও!"

কিন্তু তার স'রে যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। যতদূর সম্ভব মোটরের আলোতে দেখা গেল স্ত্রীলোকটি পাহাড়ী আমি গাড়ীর বেগ খুব কমিয়ে দিয়ে যথাসম্ভব তাকে যাবার পথ করে দিয়ে বললাম, "এই জলদি হট, মর যায়-গা।"

কিন্তু কি আশ্চর্য! সে ঠিক তেমনি নির্ভীকভাবে মোটর বাইকের ঠিক সামনে এক লীলায়িত ভঙ্গীতে এগিয়ে আসতে লাগল। তার যেন বাধা বিপত্তির ভয় নেই যেন এ পথ তার চির পরিচিত। আমি এবার বিরক্ত হয়ে উঠলাম, একে আমি তাড়াতাড়ি করছি, এ সময় এ রকম বাধা পাওয়ায় বড় রাগ হচ্ছিল, পুনরায় ভাবলাম এই অকস্মাৎ আবির্ভূতা মেয়েটি পাগল নয়ত? নইলে এত স্পর্দ্ধা কার হবে? কিন্তু এবার আমার গাড়ী সম্পূর্ণ থামাতে হল। আমি নির্ব্বাক স্তম্ভিত-দৃষ্টিতে দেখলাম, সে এবার একেবারে গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন সে আমায় আর এক পাও এগোতে দেবে না। দুটি হাত তুলে সে স্থির হয়ে ঠিক গাড়ীর সামনে দাঁড়াল। আমার এটুকু স্পষ্টই মনে পড়ে। সেই বিচিত্র ঘটনাটি আজও আমার যেন মিথ্যা বলে ভাবতে কষ্ট হয়।

গাড়ী থামিয়ে তার কাছে যেতেই সেই রহস্যময়ী নারী নিমেষে যেন নিশীথিনীর কালো অঞ্চলের কোন গভীর গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিক ওদিক যাব, কি সর্ব্বনাশ একি! পথ ত আর নেই, এযে দেখছি কাদা জল। গাড়ীর আলো খুলে এনে দেখি, ভীষণ তোলপাড়ে ধ্বসে পড়েছে পাহাড়ের গা—আর এক পা এগুলে আমার অস্তিত্ব থাকত না।

কে এ নারী আমার জীবনদাত্রী হয়ে এসে আমায় এই বিপদ থেকে বাঁচাল—এখন উপায়, ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। একবার মনে পড়ল রুগ্নার মুখচ্ছবি। কিন্তু হায় আমি কি করব। মেয়েটির ভাগ্য বিরূপ! নইলে এমন হবে কেন! আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় হঠাৎ এই স্ত্রীলোকটি যে এল, শেষে গেলই বা কোথায়।

আলোটা নিয়ে ইতস্তত একবার দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলাম। কিন্তু কোথায়! শুধু হু-হু শব্দে বাতাস এসে আমার শরীরটাকে এক একবার দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টিও থামেনি, একই ভাবে চলেছে, কি দুর্য্যোগ।

মোটরে চড়ে স্টার্ট দিলাম, এমন সময় পেছনে যেন মানুষের গলার স্বর শ্রুত হল। ভাবলাম বোধ হয় সেই নারী—তখন মোটর ধীরে ধীরে চালাতে সুরু করেছে, কিন্তু কে কথা বললে দেখা হল না। [illegible] উঠল, "সাহেব, [illegible]" [illegible] দাঁড়ালাম—"কোন্ হ্যায়?" দেখলাম অন্ধকারের মাঝে দুটি মনুষ্যমূর্ত্তি এগিয়ে আসছে। খুব কাছে এসে দাঁড়ালে দেখলাম আমার চাকর দুটি, যাদের গতকাল চা বাগানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলাম। আমি উদ্বিগ্নকণ্ঠে তাদের জিজ্ঞেস করলাম যে, মেয়েটি কেমন আছে এবং তারা রাতে ফেরেনি কেন?

তারা ভয়ার্ত্ত জড়িতকণ্ঠে চারিদিক চেয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, "সে ত মর গিয়া হুজুর!"

"হাঁ বলিস কিরে কখন মারা গেল?"

—"আজ্ঞে আমরা পৌঁছবার একটু পরেই। তারপর বৃষ্টি আর থামে না। বেচারী বুড়ো বাপ তার মেয়ের ছেলেকে নিয়ে একেবারে পাগলের মত। আমরা তাকে মাটি দিয়ে শীঘ্র বাড়ী ফিরে আপনাকে খবর দেব—না এমন সময় সশব্দে পাহাড় ভেঙে রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়ে গেল। আমরা অতিকষ্টে ঘুরে ঘুরে বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আসছি, আলো দেখে, আন্দাজে এই দিকে এলাম।"

আমি বিস্ময়ে আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে শুধু ভাবতে ভাবতে এলাম যে, তবে কি সেই মেয়েটি আমায় আজ এই বিপদ থেকে বাঁচাল? তাই হবে নইলে এমন সময় কোথা হতে সেই নারী এসে [illegible] পেতে দাঁড়িয়েছিল! জেগে স্বপ্ন দেখলাম [illegible]

হেমন্ত

শ্রীরসময় দাশ

শিউলি ফুটার দিন গেছে আজ, ঝরেছে কাশের ফুল,
পুরাতন পাতা ঝরিয়া ঝরিয়া ঢেকেছে নিমের মূল।
জোছনার হাসি ম্লান;
কুহেলি-বিষাদে ছেয়েছে ভুবন,—শরতের অবসান।

সুমুখে চলার উৎসাহ নাই, হৃদয় বাঁধিছে নীড়,
সুখের আবেগ ক্ষীণ হয়ে আসে,—ছায়া নামে শান্তির
আপন স্মৃতির প্রায়;
অতীত জীবন ভেসে উঠে মনে শোক-ভরা সুষমায়।

দ্বারের সুমুখে পাকা ধান ক্ষেত—সোনায় সোনায় ছেয়ে,
হেমন্ত-রোদে ঝলিয়া উঠিছে,—[illegible] চেয়ে চেয়ে।
পায়খানি বহু দূরে;
এপাড়া হইতে ওগাঁয়ে গিয়েছে ধানক্ষেত ঘুরে ঘুরে।

উঁচু আল দিয়ে [illegible] বেড়াটি, ছাগল চরিছে পাশে,
[illegible] উড়িতেছে দূরে, [illegible] ঘাসে।
অদূরের নদী হতে,
গ্রামের মেয়েরা জল নিয়ে যায় শস্যক্ষেতের পথে।

[illegible] রোদে কৃষাণের দল গান গেয়ে কাটে ধান,
বরষের শ্রম সফল করেছে লক্ষ্মীর কৃপাদান।
মাঠে মাঠে ধীরে ধীরে,
কুড়ানির মেয়ে ফেলে-যাওয়া শীষ কুড়ায়ে কুড়ায়ে ফিরে

আমি চেয়ে থাকি, মনখানি মোর পড়ে থাকে ওই মাঠে,
কোঁচ-উদাস স্তব্ধ দুপুরে—আনমনে দিন কাটে।
শ্রান্ত পাখীর প্রায়,
প্রাণের ভাবনা আপনার মাঝে পাখা গুটাইতে চায়

রসিটা ফোর্বসের ভ্রমণ-কাহিনী

অনুবাদক—শ্রীব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়

সাধারণত লোকে আমায় জিজ্ঞাসা ক'রে থাকে—"কাকে আমি জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করি?"

তার উত্তরে আমি 'কামাল পাশার' নাম উল্লেখ করি, কেননা তাঁর পিছনে কোন রাজনৈতিক দল ছিল না এবং দেশের লোকের প্রগতির পথে যাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি এশিয়ায় নবতুর্কী জাতি গঠন করেন ও জাতির মধ্যে নবপ্রাণ সঞ্চার করেন। এ-ই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে আমি একটি ছোট ঘোড়ায় চড়ে' আর একটি টাট্টুতে মালপত্র বোঝাই ক'রে টানতে টানতে আনাটোলের গিরিবর্ত্ম দিয়ে রাত্রি আগমে গিরি-ছায়ায় আবৃত এক তাঁবুতে এসে হাজির হলাম। বহুলোক সেখানে, তাদের মধ্যে একজনকে দেখলাম প্যাকিং কেসের উপর বসে রাইফেল পরিষ্কার করছেন। পরে জানলাম তিনিই কামালপাশা। তিনি প্রথমে তুর্কী ভাষায়, পরে জার্ম্মান ভাষায় আমায় উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'কেন আপনি এখানে এসেছেন?' উত্তর দিতে ইতস্তত করছি দেখে তিনি বললেন—'মনে হয় আপনি মিশনারী। কেহ কিন্তু এখানে আসতে সাহস করে না।'

এই হচ্ছে—ভবিষ্যৎ ডিক্টেটরের সৈন্যদল; এখানেই (আনাটোলের পাহাড়েই) সৈন্যগঠন হয় দেশের ও দশের নামে। উপস্থিতমত যে কোন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েই তারা গ্রীক-সৈন্যকে এশিয়া-মাইনরের বাইরে বিতাড়িত করবে।

তার পরের বৎসরেই মুসোলিনীর সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম আমার দেখা হয়। তখন তিনি 'মিলানে' সম্পাদক-হিসাবে ছিলেন। আমিও ঠিক সেই শহরেই ঘটনাক্রমে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন মজুর কম্যুনিষ্টরা (সাম্যবাদীরা) ষ্টেশন ঘিরে ফেলেছে আর ফটক বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আমাদের ট্রেনখানি একেবারে ষ্টেশনে এসে থেমে গেল। কাউকেই মালপত্র নিয়ে যেতে না দেখে, একজন বৃষস্কন্ধ উজ্জ্বলচক্ষু ব্যক্তিকে আমাদের সাহায্য করতে অনুরোধ করলাম। মনে হ'ল এঁর প্রভাব সবার উপর আছে। স্মরণ হয়, তিনি কতকগুলো মজুরের কাছে আমার মালপত্র নিয়ে যাবার কথা বলেন। তিনি নিজেই তাড়া-তাড়ি মালগাড়ীর দরজা খুলে দিলেন এবং আমার মালপত্র উদ্ধার করলেন। তারপর তিনি যখন শুনলেন যে, আমি সাহারার মধ্যস্থ কাফ্রার ওয়েসিস আবিষ্কার করতে মনস্থ করেছি, তখন তিনি আমার সঙ্গে আলাপ সুরু ক'রে দিলেন। তিনি পরে বললেন—'চা পান করিয়ে এর পুরস্কার দিব।' আমি তাঁকে বললাম—'সারনোবিওতে নির্ব্বাসিত রাজা ফিসুলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি,—মক্কার শেরিফ্ রাজা হুসেনের এই পুত্র—সেনুর্সির রাজপুত্রের কাছে যাবার জন্য আমায় একখানা পরিচয়পত্র দিবেন এবং তাঁর আদেশক্রমে উত্তর-আফ্রিকার এই অদ্ভুত, অপরিজ্ঞাত রাজধানীতে আমি আরব-নারীর পোষাক প'রে সারা জায়গা ভ্রমণ করতে পারব।' বেনিটো মুসোলিনী হাসলেন না। তিনি এ-মাত্র বললেন—'এ এমন কিছু খারাপ নয়, কিন্তু আপনি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলুন। আপনার জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে কি পেলেন, তাই বলুন।'

খানিকক্ষণ উভয়ে চুপচাপ থাকবার পর—তিনি পুনরায় বললেন—'আচ্ছা বেশ, আপনি সবচেয়ে কি বেশী ভালবাসেন?'

উত্তরে বললাম—'আমার এখনও যৌবনাবস্থা,—আমি দুঃখ সাঁত্রে যেতে চাই।'

মুসোলিনী উত্তর শুনে বললেন—'কি মূর্খতা!' পলকহীন চক্ষে একদৃষ্টে তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন এবং পরে বললেন,—'আপনি একলা থাকতে ভালবাসেন?'

বছর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে হরেকরকম ব্যাপার ঘট্‌তে লাগল। আমি এখন ঠিক হলপ্ ক'রে বলতে পারি না, কখন আমি বড্ড ভয় পাই। তবে জীবনের উত্তেজনাপূর্ণ ও আনন্দ-জনক মুহূর্ত্তগুলো এখনও স্মরণ হয়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তুর্কী ও কুর্দীরা আরারত পর্ব্বতে যুদ্ধ করছিল। ঠিক সেই সময় আমি পারশ্যের ও তুর্কী-কুর্দী-স্থানের প্রান্ত-পর্ব্বত দিয়ে বিনা ছাড়পত্রে অভিযান করবার মনস্থ করি। আমার সন্দেহ হয়, টাব্রিজস্থিত শাহের জেনারেল সব জানত, কিন্তু লণ্ডন ও আঙ্গোরা হ'লে সহজে ছাড়ত না আমায়। সেই সময় এই অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রান্ত দিয়ে যাবার জন্য খুব সামান্য জিনিষপত্র নিয়েছিলাম।

পর্ব্বতের পাদদেশে শান্তিপূর্ণ খৃষ্টীয় নেষ্টোরিয়ান গ্রামে জুয়াচোরগুলো তাদের মালপত্র (বিনা ছাড়পত্রে) লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর তারা ফন্দি ক'রে—দক্ষিণে লুট হচ্ছে, এরূপ গুজব তোলে। সেইদিকে পারশ্যের রক্ষকরা (city-guard) ছুটল। যখন তারা অনেক দূরে চলে গেল—ঠিক সেই সুযোগে একদল জুয়াচোর বারটা কি কুড়িটা খচ্চরে চ'ড়ে সেই দিনের রাতেই আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে কাছাকাছি গিরিবর্ত্ম দিয়ে স'রে পড়ল।

প্রথমে একটু বেগ পেতে হ'ল—এরূপ একটা দলের সঙ্গে আমায় নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করতে। তারা টাকা রোজগার করতে বেরিয়েছে। ছাড়পত্রের যেমন তারা গ্রাহ্য করে না, মানুষের প্রাণকেও তারা তার চেয়েও বেশী অগ্রাহ্য করে। আমার সেইজন্য নেষ্টোরিয়ার উঁচু দেওয়াল-দেওয়া মেটে-ঘরে খুব অসুবিধায় থাকতে হয়েছিল। রাতে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকেই সারি হ'য়ে মেঝেতে শুতে হয়। কম্বলে তারা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে পরস্পরে চেপে শুয়েছিল বেশী গরম লাগবার জন্যে। প্রাতে তাদের আবার কাপড়-চোপড় টেনে নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে বেগ পেতে হ'য়েছিল, কেন না কম্বলের মধ্যে মুরগী ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের বাচ্ছা সবই আশ্রয় নিয়েছিল।

একদিন রাতে যখন আমি বুট পরে' প'রে ক্লান্ত হ'য়ে ক্ষুণ্ণ মনে সারির শেষপ্রান্তে শুয়েছিলাম, ঠিক তখনই সাবধান-বাণী হ'ল—'এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা যাত্রা করব।'

একটু পরেই আমরা ঘোড়ায় চড়ে বাহির হলাম, সকলের সামনেই শস্যে বোঝাই উটের দল চলল,—এই শস্যের মধ্যে রাইফেল এবং আলুর থলিতে বারুদ লুকান ছিল।

রাতভোর আমরা চড়াই উঠলাম। পথ একেবারেই আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি, জন্তু-জানোয়ারের দলে আমার সম্মুখভাগ

আঁধারে আচ্ছন্ন ছিল। আমরা অহেতুক থামিনি বা একটিও কথা বলিনি। মাঝে মাঝে মালপত্র পিছলিয়ে পড়ে যেতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে লোকজন তা' ঠিক ক'রে যথাস্থানে রেখে দিচ্ছিল।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রান্তদেশ অতিক্রম ক'রে যাই এবং ঘণ্টাখানেক পরে আমরা একখানা মেটে বাড়ীতে এসে হাজির হই। এইখানে আমরা সকলে চা-রুটি খাই। বেশ ভালই লাগল। আর আমি সঙ্গের কিসমিস, ডিম ও ... উদরস্থ করি। খেয়েই আমরা আবার অগ্রসর হই, কিন্তু ভয়ের কারণ পেরিয়ে গেছে। আমরা উপস্থিত তুর্কীস্তানে, তবে উত্তর-পশ্চিমের বেশী দূরে নয়; সেখানকার আরারাত পর্ব্বতে এসাম-বে কতকগুলি দেশভক্তকে নিয়ে গভর্ণমেণ্টের ... সৈন্যদল ঠেকিয়ে রেখেছে,--তাই এসাম-বের শক্তিশৌর্য্য চারদিকে গল্পের মত ছড়িয়ে পড়ছে। যখন তিনদিন ... আমরা সেই পর্ব্বতে এসে পৌঁছলাম--দেখলাম যে তুর্কীরা আরারাতের দুইধারে লুকিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কুর্দীরা তাদের ভান হ্রদের কাছে তাড়িয়ে দিয়েছিল; গ্রামের লোকদের কাছে এরূপ গল্প শুনা যায় যে ...র স্ত্রীলোক ও আহতের চাবুক মেরে একসঙ্গে বাণ্ডিল ক'রে হ্রদের মধ্যে ফেলে দিয়ে এর ভীষণ প্রতিশোধ নেয়!

আমি এরূপ কোন বর্ব্বরতা স্বচক্ষে দেখি নাই ... যখন অধিক রাতে আমরা আরারাতে পৌঁছিলাম সেই সময় বাড়ীর সারির পাশ দিয়ে যেতে যেতে অসংখ্য মৃতদেহ আমাদের নজরে পড়ে। তুর্কীদের চলে যাবার আগে গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হ'তে হয়েছিল। আমাদের সঙ্গের বন্দুকগুলি অবাবহৃতই ছিল। মাঝে মাঝে গ্রাম থেকে রাইফেলের গুলী আসছিল, আর দূরে থেকে গ্রামের মেটে কুটীরগুলি ছায়ার মতই মনে হচ্ছিল।

সেই রাতে আমি কুর্দীদের বাড়ীর মেজেতে ঘুমিয়েছি ... বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা উনুনের কাছে সবচেয়ে দামী ...পে মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল; আর পুরুষেরা কার্তুজের বেল্টের ও রাইফেলের উপর মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছিল। ভোরেই এক সর্দ্দার আমার কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে বললে--'নিকটেই যুদ্ধ হচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে না বসতেই রাইফেলের আওয়াজ শুনলাম এবং বুঝলাম--এ খুব কাছে নয়।

কিছুদিন আমি পাহাড়েই রইলাম। তখন হৃদয়ঙ্গম করলাম কুর্দীরা উদার ও অতিথি-সংকারক তাদের সাহসও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তারা একেবারে আকাট মূর্খ; তাদের এরূপ অদ্ভুত বিশ্বাস যে সম্মুখ-যুদ্ধে জীবন দিলেই ঐ রক্তের উপর সত্বর ঘাস গজায়।

পরিশেষে একদল কুর্দী অভিযানকারীর সঙ্গে দক্ষিণ দি... চলল..., তারা ভান হ্রদের পূর্ব্বদিকে তুর্কীদের দেখতে পেলেই অতর্কিতভাবে মেরে ফেলবার প্রস্তাব ক'রে ... সবে উৎসাহ দান করতে লাগল। আমি জাহাজে চড়ে ইরাণের প্রান্তদেশে ফিরে যাবার মনস্থ করি কিন্তু ছয়দিনের দিন আমরা সরাসরি তুর্কীপ্রান্তে পৌঁছি এবং সেখানে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে বাধ্য হই। দুইজন আহত পাহাড়ীকে ও একটি অকেজো ঘোড়াকে ত্যাগ ক'রে আমি ই...কের পার্ব্বত্যঅঞ্চলে উপস্থিত হই এবং কতিপয় পলাতক আসিরিয়ানের আশ্রয়ে থাকি। অবশেষে সিরিয়ায় পৌঁছি ও সেখান থেকে ট্রেনযোগে ইউরোপ যাত্রা করি।

এরূপ প্রত্যেক সাফল্যের মধ্যে প্রায় সকল পর্য্যটকের মত আমাকেও বহুবার নানা ব্যাপারে অকৃতকার্য্য হতে হয়েছে। যেমন মক্কায় তীর্থযাত্রা করতে গিয়ে আমাকে বড়ই অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল।

মিশরের ছাড়পত্র জোগাড় ক'রে জুলাই মাসের এক গরম রাতে সুয়েজ ও ইসমেলিয়ার মধ্যবর্ত্তী রেলগাড়ীর অন্ধকার কামরায় ঢুকে আগেকার বহুভ্রমণে ব্যবহৃত পুরাতন শিঠ খাদিজা নামটি আবার গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ ইংরেজ রমণী-বেশে উঁচু হিলওয়ালা জুতো প'রে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলাম এবং কালো বোরখায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে, হিলহীন চটি প'রে চোখে সুর্ম্মা টেনে ও মুখে ঘোমটা দিয়ে শিঠ খাদিজা নাম্নী একটি মিশরীয় নারী সেজে বেরিয়ে এলাম। এইরূপে ...আমার অভিযানের আরম্ভ হয়, আর নৌকা ডুবিতে হয় এর পরিণতি।

একদল কষ্টসহিষ্ণু তীর্থযাত্রীর সঙ্গে আমিও লোহিত সাগরের ষ্টীমারে বেরিয়ে পড়লাম। ডেকে চার ফুট চওড়া ... তিনদিন তিনরাত্রি আমায় কেবল বসে কাটাতে হয়েছিল। সেই ফাঁকা জায়গাটিতে মাত্র দুপুরবেলায় ছায়া পড়ত। আমার এই গোপনযাত্রা জেডার বাইরে এসে পরিসমাপ্ত হয়। আমাদের নৌকো যাদের নড়বার ক্ষমতা ছিল, তারা ফাঁকা ঘাউ-এ ক'রে কোলাহলহীন দ্বীপের দিকে পাড়ি দিয়েছিল। সেখানে মুসলমান পাণ্ডারা নিয়ে আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। তারপর এক ডাক্তার চাকরের ন্যায় প্রত্যেক যাত্রীকে পরীক্ষা ক'রে চলে যায়। সেই সময়, রোগীদেরকে আত্মীয়েরা ধরে খাড়া ক'রে দেয় এবং মৃত ব্যক্তিকে পর্যন্ত তার বন্ধুরা জীবিত বলে চালিয়ে দেয়। পু...র আমরা নৌকায় চড়ে মক্কার বন্দর জেডার দিকে ভরা-দুপুরে জ্বলন্ত-রোদে পুড়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। পরের চার ঘণ্টা- তিন পেনি মূল্য নির্দ্ধারণ করতে, যাত্রী ও মাঝির মধ্যে তর্কবিতর্কেই কেটে গেল। আমার পরিচারিকা 'বাহিয়া' আমাকে উঁচু-ঘরের মিশরীয় নারী ভেবে আমার হ'য়ে তার সঙ্গে দর কষাকষি আরম্ভ করেছিল। তার জেদ মাঝিদের এত উত্তেজিত করেছিল যে, শেষে সে ... কোরাণ দিয়ে শপথ গ্রহণ করে--'খৃষ্টানের কাছ থেকে ভাড়াই নেবে না'। এতে সমস্ত যাত্রীরা অত্যন্ত অপমানিত-বোধ ক'রে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিবাদ করে। তারপর সে হঠাৎ জোয়ারের মুখে বিপজ্জনকভাবে নৌকা চালিয়ে দিল। শেষে নৌকাটি ভীষণ ধাক্কা খেয়ে বন্দরের মুখেই বালুতে আটকে গেল। সেখানে আমরা রৌদ্রে পুড়তে লাগলাম--যতক্ষণ-না একটা ছোট নৌকা এসে আমাদের উদ্ধার করল। যখন সকল যাত্রী একসঙ্গে তাদের মাল-পত্র নিয়ে তার উপর লাফিয়ে উঠবার উপক্রম করছিল, তখন আমাদের নৌকা টাল সামলাতে না পেরে উল্টে গেল।

(শেষাংশ ১৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস)

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

(১)

বিস্মৃত শৈশবে স্নেহের সম্পর্ক চুকাইয়া সে পরগৃহের কৃপা-প্রত্যাশী। হয়ত কোন দয়াবান ভূস্বামী তাহার অসহায় অবস্থার মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর কল্পনা করিয়া আপন বিস্তীর্ণ অট্টালিকার স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়াতলে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং হয়ত বা কোন করুণাময়ী মায়ের স্নেহধারা এই একান্ত নিঃসহায় অনাথ বালকের ক্লিষ্ট মুখচ্ছবিতে মমতা বিগলিত হইয়া সযত্ন লালনপালনে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু অতীতের সে স্পর্শ আলো—কঠিন কৈশোরের সম্মুখ হইতে তেমনই নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। বিস্মৃত স্বপ্নের মত তাহা শুধু মাঝে মাঝে সুখরেশ ধ্বনিত করিয়া তোলে এবং কঠোরতর বর্ত্তমান মায়া-মমতাহীন রূঢ়স্বরে, শুধু তাড়নার প্রহারে সমস্ত ইন্দ্রিয় জর্জ্জর করিয়া দেয়। বিশ্রামের অবসর মিলে না,—কর্ম্মেরও ফাঁক নাই। একমুঠো অন্ন, একখানি পরিধেয় ও মাথা রাখিবার একটু ঠাঁই,—তাহার মূল্য বুঝি এমনই স্নেহ-সম্পর্ক-হীন—কঠিন—নীরস!

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে সহসা একদিন, সুকোমল প্রভাত-রশ্মি ফুটিয়া উঠিল ও এই বৃহৎ সংসারের বাতায়ন দিয়া সেই বিচ্ছুরিত রেখা শুধু অধিবাসীদেরই বিস্ময় সম্ভ্রমকে আকর্ষণ করিয়া লইল না, সেই সঙ্গে—জড়-মূকেও বিশ্ব প্রকৃতির তৃপ্তি-স্পর্শ বুলাইয়া চেতনা আনিয়া দিল।

মহামায়া—এই বাড়ীরই মেয়ে। সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে স্বামী-গৃহে বসতি করেন। তাঁহারা জমিদার—, বিষয় সম্পত্তি যেমন প্রচুর—,বিত্তও তেমনই বিপুল। কিন্তু ভোগ করিবার জন্য কোন ভবিষ্যৎ বংশধর তাঁহাদের গৃহে পদার্পণ করে নাই। তাঁহাদের পুত্রকন্যা ছিল না। মহামায়া দুই চারি বৎসর অন্তর কখনও কখনও পিত্রালয়ে পদার্পণ করিতেন। সেই সময়ে এ সংসারের প্রাণীগুলির সম্ভ্রমভক্তি অকারণ বিনয়ের কোমলতা-মণ্ডিত হইয়া তাঁহার তুষ্টি সাধনের জন্য এমনভাবে পায়ে পায়ে ফিরিত যে, দেখিলে সংসারের রূঢ়-অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে হয়। কিন্তু যাহার ভাগ্যে লাঞ্ছনার পাঠ লেখা,—তাহার ব্যতি-ক্রম কিছুমাত্র হইত না। বরং মর্য্যাদাময়ীর আগমনে তাহার দৃষ্টি-বিচ্যুতি তীক্ষ্ণ নয়নের অগ্রে সহস্রবার ধরা পড়িত ও কটু তিরস্কার দিবারাত্র অনর্গলপ্রবাহে চলিত। অবিরত তিরস্কারে তাহার হাত পা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আড়ষ্ট হইয়া আসিত। সে কাজ করিত যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত।

সেদিন মহামায়া দেবীর জন্য মাণিক তৈল আনিতে গিয়া সহসা সিঁড়িতে পড়িয়া গেল। তৈলের শিশি ভাঙ্গিয়া গেল,—সৌরভে সারা বাড়ী ভরিয়া উঠিল। তাহার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছিল, কিন্তু সেদিকে সে লক্ষ্য করিল না। সভয়ে চারি-দিকে চাহিয়া—ভাঙ্গা কাচের টুকরাগুলি কুড়াইতে লাগিল। বড় বৌ বারান্দায় মাদুরের উপর বসিয়া মহামায়ার সঙ্গে খোশ গল্প করিতেছিলেন। এই অনাসৃষ্টি কাণ্ডে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "নিষ্কর্ম্মার ধাড়ি! দেখলে একবার আক্কেলটা?" সঙ্গে সঙ্গে দুই কর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া—হতভাগ্যকে শাস্তি দিবার জন্য তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মহামায়া বড় বৌয়ের হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তা যাক্‌গে—বৌ, ছেলেমানুষ—ভেঙেছে—ভাঙ্গুক। আহা! দেখ দেখি বাছার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে—!" বলিতে বলিতে তিনি ছেলেটির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বড় বৌ সবিস্ময়ে ননন্দার পানে চাহিয়া কহিলেন, "ঠাকুর-ঝির দরদ দেখে আর বাঁচিনে। ওসব ছোটলোকের দশাই ওই।"

মহামায়ার শান্তমুখ ম্লানতর উদ্বেগে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। বড় বধূর পানে চাহিয়া তিনি মৃদুস্বরেই উত্তর দিলেন, "কিন্তু ছোটলোকও যে মানুষ, ভাই। তাদেরও আঘাত লাগে।" বলিয়া ছেলেটির হাত হইতে কাচের টুকরাগুলি লইয়া এক পাশে রাখিয়া দিলেন ও সস্নেহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি—খোকা? বল,—ভয় কি?" ছেলেটি মাটির পানে চাহিয়া শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল, "মাণিক।" মহামায়া তেমনই স্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মাণিক! বাঃ—বেশ নাম! দেখি বাবা,—তোমার মুখখানা—? লজ্জা কি, ভয় কি,—তোল? আহা হা—কপালে কাচ ফুটে কেটে গেছে যে।" বলিয়া আপন দামী ঢাকাই শাড়ীখানার আঁচল দিয়া পরম স্নেহে হত-ভাগ্যের ক্ষত মুখখানি মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

ভয়বিহ্বল মাণিক থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে এই অযাচিত স্নেহস্পর্শ সহ্য করিতে পারিল না। নূতন লাঞ্ছনার ভয়ে ক্ষণকাল মুহ্যমান থাকিয়া সহসা এক সময় মহামায়ার অঞ্চল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল।

বড় বৌ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'জন্তু—জন্তু! ওরা আদরের বোঝে কি?"

মহামায়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা ঠিক। এতদূর নেমে গেছে যে, আঘাত পেলে ওরা প্রাণভরে কাঁদতেও জানে না।"

বড় বৌ বলিলেন, "তা ঠাকুর-ঝি ওটার জন্যে তোমার দরদ—"

বাধা দিয়া মহামায়া বলিয়া উঠিলেন, "যাক ওসব কথা। আচ্ছা বৌ, ও কি ছোট বেলা থেকেই আমাদের সংসারে আছে?"

বড় বৌ বলিলেন, "কেন, এর আগে তুমি ওকে দেখনি?"

মহামায়া বলিলেন, "না। মার শ্রাদ্ধের সময় যেবার আসি—মনটা ভাল ছিল না, অত লক্ষ্য করিনি। তারপর, আট বছর বাদে এই এসেছি। পুরোপুরি আট বছর—না বৌ?"

বড় বৌ ঘাড় দোলাইয়া বলিলেন, "ওমা তা আর হবে না—? মা কি আজ মারা গেছেন—? দেখতে দেখতে একটা যুগ হয়ে গেল।"

মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি জাত, বৌ?"

বড় বৌ তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলেন, "আমাদেরই স্বজাত—তাইত ঠাকুর পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন।"

মহামায়া সাগ্রহে বড় বৌয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বড় বৌ বলিতে লাগিলেন, "হতভাগা ছেলের বোধ হয় গণ্ডে জন্ম। জন্মেই মাকে খেলে, ছ'মাসেরটি রেখে বাপ মিন্সেও মারা গেল। ঠাকুর ওকে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন—তারপর এইখানেই খেয়ে দেয়ে মানুষ মনুষ্য হয়ে উঠল। মানুষ আর হয়ে উঠল ছাই, একটা আস্ত জন্তু। কোন কাজে নেই। ছোটলোকের দশাই ওই।"

"তা হোক ছোটলোক ও বোধ হয় নয়,—অন্তত তোমরা ওকে যতখানি মনে কর।"

ননন্দার স্বরে বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া বড় বৌ আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

মহামায়া সুরেশের ঘরে আসিয়া বলিলেন, "দাদা—একটা কথা আছে।"

সুরেশ মুখ তুলিয়া চাহিতেই বলিলেন, "ওই মাণিকটাকে আমি চাই!"

সুরেশ সবিস্ময়ে বলিলেন, "ওই হতভাগাটাকে তোর কি দরকার, মায়া?"

মহামায়া বলিলেন, "আমি ওকে মানুষ ক'রব।"

সুরেশ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "পাগল! ওই ছোটলোকটাকে—"

ক্রোধে আরক্ত হইয়া অকস্মাৎ মহামায়া তীব্র কণ্ঠে কহিলেন "ছি! তোমার কাছে আমি এ গাল প্রত্যাশা করিনি। তোমরা সকলে মিলেই না ওকে এমন ক'রে তুলেছ? ছোট কচি ছেলে—দিনরাত্রি গাল দিয়ে,—লাথি ঝাঁটা মেরে—ওকে পশুর অধম ক'রে তুলেছ! ছোটলোক? কেন, ওকি জাতিতে আমাদের চেয়ে ছোট? পয়সায় বুঝি ভদ্রলোক ছোটলোক বিচার করা যায়, দাদা?"

সুরেশ মহামায়ার ক্রোধে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "—তা নয়—তা নয়। তা বেশত,—তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে—"

মহামায়া বলিলেন, "আমিও বলছি দাদা, ওকে মানুষ ক'রে তুলব, আর একদিন তোমাদের কাছেই এনে দেখাব যে,—আচার-ব্যবহারে ও কারো চেয়ে খাটো নয়। এই জগতের মাঝে ওরও একটা স্থান আছে,—মূল্য আছে।"

বলিয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সুরেশ খানিকক্ষণ এই খামখেয়ালী ভগিনীর বিচিত্র আচরণে অতি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরক্ষণেই একটা নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া ইজি চেয়ারটায় শুইয়া পড়িয়া আপন মনে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

বড় বৌ কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে হাসিতে দেখিয়া বলিলেন, "ওমা, একি কাণ্ড! আপন মনে হাসছ কেন গা? ঠাকুরঝি কিছু বলেছে বুঝি?"

সুরেশ বলিলেন, "হ্যাঁ, পাগলী মাণিকটাকে নিয়ে যেতে চায়। বলে, ওকে ভদ্রঘরের মত লেখাপড়া শেখাব,—মানুষ ক'রব।" বলিয়া এত বড় অসম্ভব কল্পনার কথায় আর একবার নিঃশব্দে হাসিলেন।

বড় বৌ নিঃশব্দে গালে হাত রাখিয়া তেমনই মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "কত ঢংই জানেন রাধা! আমরি রে মরি! যাই হোক, ছোঁড়াটাকে দেবে নাকি?"

সুরেশ বলিলেন, "তা দিতে হবে বৈকি। জানত ওর গোঁ, যা ধরবে—"

বড় বৌ মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "যাই বল বাপু, পয়সায় সব শোভা পাচ্ছে। নৈলে আমাদের ঘরে হ'লে—" বলিয়া অসমাপ্ত কথায় মুখে একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া বিরক্তিভরে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

তিনদিন পরে মহামায়া মাণিককে লইয়া পিত্রালয় ত্যাগ করিলেন।

(২)

কিন্তু যাহার নির্য্যাতনে মহামায়ার শুষ্কবুকে অকস্মাৎ মাতৃস্নেহ উদ্বেল করুণায় উছলিয়া উঠিল,—গোল বাধিল তাহাকে লইয়া। বংশমর্য্যাদা বা জাতিভেদের বালাই বড় একটা না থাকিলেও,—অযাচিত স্নেহ সে নিঃশঙ্কে উপভোগ করিতে পারিল না। মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া বা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অতুল আনন্দ-শিহরণের পরিবর্তে দাস-সুলভ অভ্যস্ত-কর্ম্মের জন্য তাহার দুইটি হাত চঞ্চল হইয়া উঠে। কোল হইতে নামিয়া পায়ের তলাটিতে বসিতেই সে ভালবাসে এবং মহামায়ার মিনতির অপেক্ষা আদেশের মূল্যটুকুই তাহার কাছে তৃপ্তিকর। কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বার বার তার মাতৃ-করুণা ও সন্তান-সোহাগের মধ্যে ছায়া বিস্তার করিতে থাকে।

তবু মহামায়া উচ্ছ্বসিত আনন্দের ... আপন সিক্ত স্নেহ ... উঁহার সকল ... মুছিয়া দিতে চাহেন। ভাবেন, আহা শৈশবে যে মাতৃহারা ... তার মত দুর্ভাগা বুঝি জগতে কেহ নাই। হৃদয়ের সরস দিকটা যার অকারণ লাঞ্ছনার আঘাতে এমনই পাষাণ-শিলায় বজ্রকঠোর হইয়া গিয়াছে, না জানি সে কত বড় অভিশাপের ফলে। এই ঐশ্বর্য্যশালিনী তৃপ্তিময়ী রমণীর কোন চেতনা পাছেই বুঝি তাহার প্রবেশাধিকার নাই। সে যেন মরুর মরুভূমিতে চৈত্রবায়ু বিক্ষিপ্ত বালু সমুদ্রের শোভাহীন তরঙ্গ।

স্কুলের ছুটী হইলে মাণিক বাড়ী আসিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসে এবং নিঃশব্দে আপন পাঠে মনোনিবেশ করে। যেন স্নেহের অনুশাসনে তাহার সকল কর্ম্মই ভাসিয়া গিয়া শুধু এইটুকু কর্ত্তব্যের সৃষ্টি করিয়াছে ও ইহারই অন্তরালে বসিয়া সে সহস্র ত্রুটি সারিয়া লইতে চাহে।

মহামায়া কিন্তু ঘড়ির কাঁটা সম্বন্ধে খুবই সচেতন। মাণিকের নিঃশব্দে আগমন ও পাঠে মনোনিবেশ তাঁহার লক্ষ্যের সীমা পার হইতে পারে না। মধুরস্বরে ডাকেন, "মাণিক।"

মাণিক উত্তর দেয়, "আজ্ঞে।"

অমনই মহামায়া শাসনের স্বরে বলেন, "আবার।"

মাণিক তাড়াতাড়ি আপনার ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ঘাড় নীচু করিয়া কোন রকমে বলিয়া ফেলে, "মা।"

মহামায়া তাহার সঙ্কোচ দেখিয়া অতি বেদনায় হাসিয়া ফেলেন, বলেন, "আয় বাবা,—খাবি আয়।"

সেদিন স্কুলে ফুটবল খেলার জন্য চাঁদা আদায় হইতেছিল। প্রবোধ ছিল ক্লাবের সেক্রেটারী। সে মাণিকের সম্মুখে চাঁদার খাতাখানি খুলিয়া কহিল, "নে—সই কর।"

মাণিক কলম হাতে লইয়া ইতস্তত করিতে লাগিল। কোন্ অঙ্ক ফেলিয়া সে সই করিবে? আপনি ত এক করুণাময়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া সভ্য-সমাজের একজন হইবার আশায় লেখা-পড়া শিখিতেছে। অনাথ বালকের এই কুণ্ঠাকে প্রতিনিয়ত লজ্জা-নম্র করিয়া তিনি অযাচিত করুণায় দুই কর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। জানে সে দান কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে, ন্যায় বা অন্যায় কিছুতেই তাহা প্রতিহত হইবে না। স্বতঃ-উৎসারিত স্নেহস্পর্শে তাহা স্নিগ্ধ—উদার, তথাপি—

তাহার ইতস্তত দেখিয়া চপল অধীর কণ্ঠে কহিল, 'আরে—টপ্ ক'রে সইটা ক'রে ফেল না রে। তোর আবার ভাবনা কি,—লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।"

মাণিকের সারা মুখ গভীর লজ্জা ও অপমানে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কম্পিত করে এক টাকা চাঁদা সই করিতেই প্রবোধ বলিয়া উঠিল, "ওকি, মোটে এক টাকা! উঁহু, তা হবে না। অতুল যে অতুল—সেও দু'টাকা সই করেছে,—আর তোর ত আজ বাদে কাল—না, না কমসে কম পাঁচটা টাকা চাই—ই—চাই।" চারিদিক হইতে বিদ্রূপধ্বনি ও অনবরত তাগাদার জ্বালায় বিব্রত হইয়া মাণিক পাঁচ টাকাই সই করিয়া দিল।

অমনই সকলে সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"থ্রি চিয়ার্স ফর—হিপ্ হিপ্ হুররে—হিপ্—হিপ্—"

ম্লানমুখে গৃহে আসিয়া মাণিক ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া কথাটা পাড়া যায়? কোনখান হইতে—কি সূত্রে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিবে—তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না।

এমন সময় মহামায়া তাহাকে ডাকিলেন, মুখ হাত ধুইয়া সে জলযোগ করিতে বসিল।

মহামায়া তাহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে রে, মুখ অত শুক্‌নো কেন?"

মাণিক ভাবিল, এই ত কথার সূত্র মিলিয়াছে, এইবার বলিয়া ফেলি। কিন্তু দারুণ কুণ্ঠা আসিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিল। বলি বলি করিয়া সে বলিতে পারিল না।

মহামায়া পুনরায় প্রশ্ন করিলে মাণিক কোন মতে জানাইল, তাহার মাথা ধরিয়া শরীরটা কেমন খারাপ হইয়াছে।

মহামায়া শশব্যস্তে মাণিকের কপালে হাতখানা রাখিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিলেন, "ইস—তাইত, কপালটা যে ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করছে। যা—এক্ষুণি বিছানায় শুয়ে পড়গে যা। আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

মাণিকের মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। হয়ত মনে মনে বলিল, "জানি না—মার স্নেহ কি? হয়ত এমনই আকুলতা ও মঙ্গল কামনায় ভরা। ভিজা হাতে শুষ্ক কপাল স্পর্শ করিলে এই অহেতুকী আশঙ্কার উদয় যে হইবে তাহা ত মুহূর্ত্তের তরেও ভাবেন না। অলীক বিপদের কল্পনায় ব্যাকুল অন্তরাত্মা নিয়ত উন্মুখ হইয়াই আছে। এইত মা।"

ধীরে ধীরে তাহার নয়ন বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। কুণ্ঠা, সঙ্কোচ ভাসিয়া গেল, অশ্রুরুদ্ধস্বরে সে ডাকিল, "মা।"

মাণিকের মাথাটা আপনার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া মহামায়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "কি বাবা?"

কয়েক মুহূর্ত্ত অসহ্য সুখে কাটিয়া গেল,—মাণিক মুখ তুলিল না। মহামায়াও আর প্রশ্ন করিয়া সে নীরবতা ভাঙ্গিলেন না। ধীরে ধীরে তাহার মাথার উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এই পরম মুহূর্ত্তকে ভাষা দিয়া মূল্যবান করা যায় না,— অনুভবই ইহার সম্পদ।

মাণিককে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মহামায়া বহুক্ষণ অবধি এই সম্পদ ভোগ করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মাণিক মুখ তুলিয়া বলিল, "আজ ইস্কুলে পাঁচ টাকা চাঁদা সই করেছি, মা—বল খেলার জন্য।"

তাহার স্বরে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না, এ যেন মায়ের কাছে সন্তানের সহজ প্রার্থনা মাত্র।

মহামায়া মাণিককে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিলেন, "কালই দিয়ে দিস। আর দেখ বাবা, আমার নাম ক'রে ও'র কাছে খরচটা লিখিয়ে দিয়ে আয়। না থাক, আমিই ব'লব'খন।"

"না-মা আমিই যাচ্ছি," বলিয়া মাণিক বাহিরের ঘরে আসিয়া ডাকিল, "মেসোমশাই?

শাদা ফরাসের উপর গোটা দুই ধবধবে তাকিয়া তাহারই একটিতে ঠেস দিয়া একজন চশমা পরা প্রৌঢ় পরম মনোযোগের সহিত হিসাবের খাতায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি লিখিয়া যাইতেছিলেন।

মাণিকের ডাকে তিনি মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে, কি চাই?"

ইনি মহামায়ার স্বামী। এ সংসারে যে ইঁহার কোন স্থান আছে এমন কেহ মনে করে না। এই বাহিরের ঘরটিতে বসিয়া আপন মনে দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখিয়া যান, জমিদারীর কাগজপত্র দেখেন। মাসিক, দৈনিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি সংবাদপত্র...দর্শন বিজ্ঞানের তথ্য ও লঘু উপন্যাসের চটুল কাহিনী তাঁহার আগ্রহকে সমানভাবেই উদ্দীপ্ত করিয়া রাখে। রাত্রিতে পাশার আড্ডা বেশ জমিয়া উঠে। সারা দিনের পরিশ্রমের পর ঐটুকু মাত্র অবসর।

বিপুল বিত্ত সম্পত্তি সত্ত্বেও খেয়ালবশে প্রথম যৌবনে কোথায় বেশ একটা মোটা মাহিনার চাকুরী নাকি তাঁহার জুটিয়াছিল। কিন্তু সেখানকার জল-হাওয়া সহ্য না হওয়ায় একপক্ষের মধ্যেই তাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "এই রতনদীঘির জল-হাওয়া ছেলেবেলা থেকে এমন অভ্যেস হ'য়ে গেছে যে, আর কোথাও থাকা সহ্য হয় না।"

বন্ধুরা বলিত, "ও সব বাজে কথা। ঘরে তরুণী ভার্য্যা—" তিনিও হাসিয়া উত্তর দিতেন, "আরে ও-ত একটা কম লোকসান নয়রে ভাই। সময় ত জলের মত বয়েই চলেছে, যৌবনের অপচয়, বসন্ত কোনদিন যে হঠাৎই ঝরে যাবে—

(শেষাংশ ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি-প্রেরণার উৎস সন্ধানে

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কারণ ব্যতিরেকে যে কার্য্য হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সৃষ্টি একটি কার্য্য সুতরাং ইহার মূলেও কারণের অস্তিত্ব অপরিহার্য্য। এই সৃষ্টির মূল কারণ হইতেছে বিক্ষোভ। বিক্ষোভের উৎপত্তি বৈষম্যে। সাম্যাবস্থায় বিক্ষোভ জন্মিতে পারে না এবং বিক্ষোভ না জন্মিলে সৃষ্টি হইতে পারে না; সুতরাং বৈষম্যই সকল সৃষ্টির আদি কারণ। কি বিজ্ঞানবিদ্, কি দার্শনিক সকলেই সৃষ্টির এই মূল তত্ত্বটি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

সাংখ্যদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, বিশ্বসৃষ্টির আদিতে, অনাদি ও স্বয়ম্ভু, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক জড়প্রকৃতির প্রতি—অনাদি, সচেতন, গুণাতীত, উদাসীন ও অকর্ত্তা পুরুষের ঈক্ষণের (দৃষ্টিপাতের) ফলে যখনই তাহার মধ্যস্থিত গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতিজনিত একটা বিক্ষোভ জাগিয়া উঠিল, তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

জড়-জগতেই হউক অথবা প্রাণি-জগতেই হউক, সৃষ্টিমাত্রেরই মূলে কোথাও সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি এবং তজ্জনিত বিক্ষোভ ঘটিয়াছিল বুঝিতে হইবে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক মানবকে তখনই আমরা স্রষ্টারূপে দেখি, যখন তাঁহার মধ্যস্থিত এই গুণত্রয়ের কোনও গুণের হ্রাস এবং কোনও গুণের বৃদ্ধি হেতু সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিয়া অন্তরে তাঁহার একটা বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্রষ্টা ছিলেন; নব্য-বঙ্গ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা তাঁহারই সৃষ্টি। এই সৃষ্টির প্রেরণা তাঁহাতে কেমন করিয়া আসিল ও কোথা হইতে আসিল তাহাই দেখিতে হইবে। সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাঁহার মধ্যস্থিত সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতিজনিত একটা বিক্ষোভ জাগিয়াছিল এবং এই বিক্ষোভই যে তাঁহার সমস্ত সৃষ্টির মূলে প্রেরণা, ইহা বলা যাইতে পারে। এখন এই বিক্ষোভ তাঁহাতে কেন জাগিল—কে জাগাইল?

তিনি স্ব-সৃষ্ট যে ভাষা ও সাহিত্য অবলম্বন করিয়া নব্য-বঙ্গ সৃষ্টিরূপ অনন্যসাধ্য মহোত্তম কার্য্যসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম-অভিব্যক্তির ধারাটি অভিনিবেশসহকারে অনুধাবন করিলে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, হৃতসর্ব্বস্বা শ্মশানচারিণী দেশমাতৃকার নগ্নিকা কালিকামূর্ত্তি তাঁহার অন্তরে অনন্যানুভূত অসহনীয় একটা বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। শুদ্ধমাত্র দেশমাতৃকার বর্ত্তমান কালিকামূর্ত্তিই নহে, তাঁহার অতীত-গৌরব বিগত দিনের জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি এবং অনাগত ভবিষ্যতের দক্ষিণে কমলা ও বামে বাণী-পরিশোভিতা দশপ্রহরণধারিণী দুর্গামূর্ত্তিও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর তৃতীয় নেত্রের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এইজন্যই দেশমাতৃকার কালিকামূর্ত্তি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে যে দুঃসহ বেদনা সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা অসহায় ক্রন্দনেই পরিসমাপ্তিলাভ করে নাই। বিগতগৌরব অতীতের যে জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই তাঁহার মনে আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিয়া দেশমাতৃকার বর্ত্তমান নগ্নিকা কালিকামূর্ত্তিকে ভবিষ্যতের সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিমণ্ডিতা দশভুজা দুর্গামূর্ত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার দুর্ব্বার প্রেরণা দান করিয়াছিল। কিন্তু সমগ্র বাঙালীজাতির মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দেশজননীর এই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের রূপটিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া, অন্তরে তাহার একটা অদম্য বিক্ষোভ যদি জাগাইয়া তোলা না যায়, তবে এই দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? তাই তিনি আপন দুঃসহ অন্তর্ব্বেদনা সমগ্র জাতির জীবনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সময় বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময় পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙালী-সমাজ ইউরোপীয় সভ্যতার নির্ব্বিচার অন্ধ অনুকরণে বল্গাবিহীন অশ্বের মত দিগ্‌ভ্রান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন বাঙলার জাতীয় জীবনের অবলুপ্ত এই হয়মুখে সর্ব্বপ্রথম রশ্মি-সংলগ্ন করিতে পারিলে তবেই তাহাকে একটা স্থির লক্ষ্যের পথে পরিচালনা সম্ভব হইবে। মাতৃভাষারূপ বল্গা-হস্তে তাই তিনি আপনার সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত শক্তি লইয়া বাঙালী-জাতির সারথ্য গ্রহণ করিবার জন্য অকুতোভয় বীরের মত সমুন্নত শিরে সর্ব্বব্যাপী বিশৃঙ্খলতার মাঝে নামিয়া আসিলেন।

বাঙালীর জাতীয় জীবন পরিচালনা করিবার নিমিত্ত বাঙলার মাতৃভাষাকেই যে কেন তিনি বল্গারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত অভিমত হইতে সুস্পষ্ট হইবে—

"সমস্ত দেশের লোক ইংরেজী বুঝে না, কখনও বুঝিবে না, সুতরাং বাঙলায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা বাঙালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। যে কথা সমস্ত দেশের লোক বুঝে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোনও উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙালীরা বাঙলা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙালীর উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই। ভাষার বিভিন্নতার ফলে এক্ষণে আমাদের ভিতর উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তার কিছুমাত্র নাই এবং এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। এই সমুদয় কারণে সুশিক্ষিত বাঙালীর উক্তি বাঙলা ভাষাতেই হওয়া কর্ত্তব্য।"

উপদেশের দ্বারা নহে, সূক্ষ্মবিচারসমন্বিত যুক্তিতর্কের দ্বারাও নহে—সর্ব্বজনমনোহারী রস-সাহিত্য সৃষ্টি দ্বারাই প্রথমে তিনি বাঙালীকে আপন ঘরের দিকে আকৃষ্ট করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। এমন কি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী, যাঁহারা এতদিন একান্ত অবহেলাভরে স্বীয় মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাও এখন ভক্ত-সন্তানের মত শ্রদ্ধাঞ্জলি করপুটে বঙ্গবাণীর অঙ্গনদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন বাঙালী ধীরে ধীরে আত্মস্থ হইতেছে, তখন তিনি

রস-সাহিত্যের মধ্যেই 'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' —এমন তিনখানি উপন্যাস রচনা করিলেন, যাহার মধ্য দিয় বাঙালী জাতির হৃদয়ে, দেশমাতৃকার দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিল।

এইবার রস-রচনা বন্ধ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারকের মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। বাঙালীকে একটা আদর্শ জাতিতে পরিণত করিবার জন্য তিনি তাঁহার অতুল্য পাণ্ডিত্য, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও ক্ষুরধার তীক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি একেবারে নিঃশেষে নিয়োজিত করিলেন। দেশমাতৃকার অতীতের জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তির সহিত পরিচয়সাধন করাইয়া বাঙালীর আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত তিনি বাঙলার অতীত-ইতিহাস উদ্ধার করিতে বসিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনে অতীত-ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"বাঙলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখন মানুষ হইবে না। বাঙালী মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা করে না, চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।"

শুধু ইতিহাসই নহে দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি সমাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি, এমন কোন বিষয়বস্তুই বাঙলা দেশে নাই, যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আপন ঋণ অস্বীকার করিতে পারে। তিনি স্বহস্তে সমস্ত বিষয়ের সূত্রপাত এবং বহুবিষয়ের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

এ সকলই তিনি করিয়া গিয়াছেন হৃতসর্ব্বস্বা নগ্নিকা শ্মশানচারিণী দেশমাতৃকার কালিকামূর্ত্তিকে দশপ্রহরণধারিণী দক্ষিণে কমলা ও বামে বাণী-পরিশোভিতা সিংহবাহিনী রাজ-রাজেশ্বরী দুর্গামূর্ত্তিতে পরিণত করিবার জন্যই। ইহা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্ম-বোধের আদর্শ শুদ্ধমাত্র রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার অসীমতায় সীমা-বদ্ধ নহে। দশপ্রহরণধারিণী যে দুর্গামূর্ত্তিকে তিনি দেশমাতৃকার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন সেই দুর্গামূর্ত্তি শুদ্ধমাত্র শক্তিরই প্রতীক নহেন, তাঁহার দক্ষিণে কমলা ও বামে বাণী শোভা পাইতেছেন—

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।"

শুদ্ধমাত্র বাহুবলের উপর বঙ্কিমচন্দ্র আপন মাতৃভূমির প্রতিষ্ঠা চাহেন নাই। স্বদেশ-জননীকে তিনি শিল্প-বাণিজ্য ধন-সম্পদে অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী-বিমণ্ডিতা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্বেত-শতদলবাসিনী জননী বাণীর আবাস নিকেতন সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বমানবের তীর্থভূমিতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সমস্ত নহে, বিশ্বের সহিত এই দুর্গামূর্ত্তিতে বিরাজিত দেশমাতার যে সম্বন্ধ থাকিবে তাহা এই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অমর জাতীয়-সঙ্গীত-মন্ত্রের শেষ পংক্তিতে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—

"ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।"

দেশপ্রীতির সহিত এই যে সার্ব্বলৌকিক প্রীতি, সমস্ত বিশ্বের সহিত এই যে যোগ—ইহা প্রেমের যোগ, মঙ্গল ও কল্যাণের যোগ পূর্ণ-মানবধর্ম্মের যোগ। ইহা লোভ-হিংস্র জাতিসমূহের পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত চুক্তিপত্র-স্বাক্ষরিত বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক যোগ নহে।

ইউরোপের পেট্রিয়টিজম-এর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই দেশাত্মবোধের মূলত বহু পার্থক্য বিদ্যমান। 'পরসমাজের কাড়িয়া নিজ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি করিব'—ইহাই ইউরোপের 'পেট্রিয়টিজম'। এই পেট্রিয়টিজম-এর আদর্শ হইতেছে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং ইহার জন্য তাহারা জীবনকেও তুচ্ছ করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু আনন্দমঠের দেশসেবক "তোমার পণ কি?" ইহার উত্তরে যখন বলিয়াছিল "আমার পণ জীবন-সর্ব্বস্ব" তখন প্রত্যুত্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল "জীবন তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে।" দেশসেবক যখন আবার বলিল 'আর কি আছে, আর কি দিব?" তখন উত্তর হইয়াছিল 'ভক্তি'।

এই ভক্তিই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-পূজার প্রধান উপচার। ভক্তির মধ্যে সকাম আত্মপ্রতিষ্ঠার উম্মাদনা নাই, ইহা ধীর স্থির ফলাকাঙ্ক্ষা নিস্পৃহ নিষ্কাম সেবাধর্ম্মের মধ্যে আত্মবিলোপের সাধনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আদর্শ সমগ্র বাঙালী জাতির আদর্শ হউক। ঋষি বঙ্কিমের সাধনা সফল হউক। 'বন্দে মাতরম্'

প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টি

(বড় গল্প)

শ্রীকালীপদ ঘটক

গাঁয়ের নাট্যামোদী ছোকরারা মিলে বহুকষ্টে দলটা যখন খাড়া ক'রেই ফেললে তখন ওসম্বন্ধে আর নীরব থাকাটা কোন কাজের কথাই নয়।

বিজয়পুরের স্বনামধন্য মাতব্বর শম্ভু চক্কোত্তি শেষে যেচে গিয়ে যাত্রা পার্টির কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ ক'রতে রাজী হ'য়ে গেল। ছেলে ছোকরার দলে এই প্রৌঢ় নেতাটির আবির্ভাব আদৌ বাঞ্ছনীয় কিনা সে বিষয়ে পার্টির মেম্বারদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও প্রকাশ্যে ও-প্রসঙ্গের আলোচনা করতে কেউ সাহস ক'রলে না। কেউ কেউ ভাবলে এ হয়ত তার নিছক একটা পরিহাস মাত্র, কিন্তু শম্ভুশরণ যখন পালাগানের পুঁথি খুলে' রীতিমত 'পার্ট' বিলির 'লিষ্ট' ক'রতে বসে গেল তখন আর কা'রও সন্দেহ থাকল না যে, সত্যি সত্যিই সে কায়েমীভাবে দলপতির আসন গেড়ে বসল। বিরুদ্ধবাদী কয়েকজন মেম্বার মনে মনে প্রমাদ গণলে ও বাদবাকী উদ্যোক্তারা সব তাল ঠুকে' বললে,—আর আমাদের পায় কে!

তা শম্ভুশরণ সব দিক দিয়েই লোক খুব পাকা। মামলা-মোকদ্দমার বুদ্ধি যোগাতে, লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে' হরিসংকীর্ত্তনের চাঁদা আদায় ক'রতে, গাঁয়ের ইতর সাধারণের সালিশী ক'রে গোপনে গোপনে টাকাটা সিকেটা ট্যাঁকস্থ ক'রতে এবং এমন আরও অনেক কাজে ও-তল্লাটে তার সমকক্ষ ছিল না বড় একটা কেউ। অবশ্য এমন কথাও কেউ কেউ আবার ব'লে থাকে যে, গ্রামবাসীদের সযত্ন পালিত নধর ছাগনন্দন-গুলি মাঝে মাঝে শম্ভুশরণের রসনা তৃপ্তি সাধন ক'রতে অতি সন্তর্পণে রাতারাতি নাকি মোক্ষ লাভ ক'রে থাকে; কিন্তু তার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ নাই।

মোটের উপর শম্ভুশরণের মত একজন মুরুব্বিকে দলে পাওয়া যে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, একথা স্বীকার ক'রতেই হবে। আখড়া ঘরে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল।

একটি ছোকরা হঠাৎ গললগ্নীকৃতবাসে 'এক্টো' ক'রার ভঙ্গিতে চক্কোত্তি সমীপে নিবেদন ক'রলে—কিন্তু খুড়ো, অধীনদের উপর এই সুদয়াটুকু শেষ পর্যন্ত যেন—

শম্ভুশরণ তা'র ভঙ্গিমে দেখে হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে,—বাঃ—এই যে বেশ হচ্ছে হে, ওর নাম কি—বয়স্যের পার্টটা আমাদের রামদাসকেই দিয়ে দাও। না, কি বল বাবাজী! হাঁ—ওর নাম কি, ঝাঁ ক'রে একটা বিড়ি খাওয়াও দেখি।

রামদাস শম্ভুশরণের মুখে একটা বিড়ি গুঁজে' দিয়ে চকমকি ঠুকতে ঠুকতে বললে,— তা হ'লে রামের পার্টটা খুড়ো তোমাকেই নিতে হচ্ছে।

শম্ভুশরণ ধূমপান ক'রতে ক'রতে বললে—রামের পার্টে ত বোধহয় জুড়ির গান নাই, তবে আর মিছেমিছি ও পার্টটা,—হাঁ, তবে কালোয়াতি গান-টান যদি কিছু থাকে আমাকে লিখে' দিয়ো, কোনরকমে চালিয়ে দেওয়া যাবে। মহিন্দোঠাকুর যখন দল খোলে তখন শশীকাকা আর আমি,—তোমরা তখন জন্মাওনি বাবাজী, সন ১৩১৩ সালের কথা বলছি,—শশীকাকা আর আমি ছিলাম ডাইনে আর বাঁয়ে। জুড়ির গানে ওর নাম কি—আসর একদম মাৎ হয়ে যেত। শশীকাকা দি'ত রাগরাগিণী খাড়া করে, আর ছেলেজুড়ির তরফ থেকে আমি তার বাঁটোয়ারা, আড়িদুনী মায় চৌদুনী তক শেষ ক'রে তুড়ি দিয়ে গানটাকে দিতুম ঘর ঢুকিয়ে। সে কি গানের জমক বাবাজী, ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছুটে যেত। কর্ণবধ না কি একটা পালার—ওর নাম কি সেই যে সেই গানটা—

এই পর্যন্ত বলে' শম্ভুশরণ উরুদেশে তাল ঠুকতে ঠুকতে গানটা হঠাৎ ধরেই ফেললে,—"ভবে আমি ধন্য হ'লাম দেখবে সবে কুরুসেনা—"

গান ক্রমে উদারা মুদারা তারা ছাপিয়ে শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণপটহকে রীতিমত বিপর্যস্ত ক'রে তুললে। এমন সময় কণ্ঠিধারী পানুমোড়ল গঙ্গামৃত্তিকাচর্চ্চিত কালো কুচকুচে শ্রীঅঙ্গের পুরোভাগে অনাবৃত ভুঁড়ি দুলিয়ে তামাক খেতে খেতে আখড়া ঘরে এসে হাজির হ'ল। শম্ভু-শরণকে দেখেই সে বলে' উঠল,—ওই মামাঠাকুর যে,—পাতোপেন্নাম হই।

শম্ভুশরণ গান ছেড়ে' হঠাৎ লাফিয়ে উঠল,—আরে পানু ভাগ্নে না কি! এস এস—বাবাজীবন এস।

ভাগ্নেকে একটা চাটাই দে'রে, বস বাবাজী, বস! ওর নাম কি—আমাদের সেই সাবিকের যাত্রার দল তোমার মনে পড়ে পানু?

পানুমোড়ল দন্ত-বিরল মুখখানিতে একটু হাসির আমেজ ছড়িয়ে বললে,—ওই দেখ দেখি, এ ত সিদিনের কথা। আমাদের হাবির মা যে-বছর রাগ ক'রে রাতারাতি বাপের-ঘর পালায় লোগন্দকে' ঠিক দিন দুই তিন থাকতে, সেই বছরই ত মহিন্দোঠাকুর হাটতলাতে 'বস্তহরণ' পালা খুলে! 'লোমি' পুজোর রাত, 'লুকজন' সব গেহে গেহে ক'রছে, আসরের চারকুণে চার চারটে মগ জ্বলা। সেই বারেই ত নিমেই ঠাকুর ভীমের বক্তিমে ক'রতে ক'রতে তিন তিনটে লণ্ঠন ভাঙ্গে। হরিশ চক্কোত্তি দুর্যোধন, ইন্দে তাঁতী যুধিষ্ঠির, আর 'বাইরাখাল' ছিল লাচুনি,—তুমিও তখন লবকুশ না কি সাজতে যে গো!

—লবকুশ না, বৃষকেতু। আচ্ছা তোমার সেই জায়গাটা মনে পড়ে পানু ভাগ্নে?—সেই আমি যখন বৃষকেতু সেজে' বাগালে ধোবার গলা ধরে আধ আধ সুরে গান ধরতাম—"আর কেন মা বিদায় দে' তোর পান কুমারে—"

পানুমোড়লের দিকে কল্কেটা বাড়িয়ে দিয়ে শম্ভুশরণ আধ আধ সুরে গানটা হঠাৎ ধরেই' ফেললে,—"ও-ও আ-র কেন মা—বিদায় দে' তোর—"

পানুমোড়ল গানের রসাস্বাদন ক'রতে ক'রতে বললে,—আহা হা—গো-বিন্দহে! আর নয়না ভুম কিবে কাপ সাজত মামাঠাকুর, অষ্টাঙ্গে তালাইছে'ড়া বেঁধে!—"জুতো পাটটো হারাই গেল ডাল খাব কিসে—"আহা—সে কি লগন গো, হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যেত। সে রামও নাই, সে অযিদ্যেও নাই। হরি হে, তুমিই সত্যি! আজ তবে উঠি মামাঠাকুর! এ'ড়ে বাছুরটা কাল থেকে বাড়ী ঢোকেনি, খোঁয়াড়ে মোয়াড়ে কেউ ভ'রে দিলে নাকি দেখে' আসি।

—আচ্ছা তা হলে এস। এই বলে শম্ভুশরণ নিবিষ্ট চিত্তে 'লিষ্টের' খাতাখানা ফের টেনে নিয়ে বসল। পানুমোড়ল আখড়া ঘরের বারান্দা ছেড়ে' রাস্তায় নেমেছে এমন সময় শম্ভুশরণ পিছন থেকে ডাক দিলে,—পানু-ভাগ্নে গেলে না কি?

পানুমোড়ল ফিরে' এসে জিজ্ঞেস করলে,—কিছু বলছ না কি মামাঠাকুর?

শম্ভুশরণ বললে,—হাঁ—কথাটা তা হ'লে শুনেই যাও। ওই যে তোমার এ'ড়ে বাছুর না কি বলছিলে না, তাই পিছু ডাকলাম; বস—বস। ওর নাম কি এ'ড়েটো তোমার খোঁয়াড়েই পড়েছে। কাল ঠিক সন্ধ্যের আগে চড়কমারা থেকে বাড়ী ফিরছিলাম, পছিপাড়ায় এসে দেখছি বাবাজী, রতো চাষা এ'ড়েটাকে তোমার, গামছায় বেঁধে হেট্ হেট্ ক'রে ঠেঙ্গাতে ঠেঙ্গাতে খোঁয়াড় বাগে টেনে' নিয়ে যাচ্ছে।

পানুমোড়ল রাগে হঠাৎ গর্জ্জে উঠল,—এাঁ—বল কি মামাঠাকুর আমার এ'ড়ের গায়ে হাত তোলে বেটা রতো?

শম্ভুশরণ কথাটা লুফে' নিয়ে বললে,—আমিও ত সেই কথাই বললাম বাবাজী! বলি—এ যে আমাদের পানু-ভাগ্নের এ'ড়েরে, অমন ক'রে ঠেঙ্গাচ্ছিস কেন? রতো কি বললে জান? বলে,—শালার এ'ড়েরই একদিন—কি আমারই একদিন। তোমার এ'ড়েটা না কি ওর আখবাড়ী ঢুকে' ডগা ভেঙ্গেছিল। তা না হয় আখের দুটো ডগাই ভেঙ্গেছিল তা বলে কি গো-হত্যে করবি রে বেটা চাষা! আমি বেশ ক'রে দু'চার কথা শুনিয়ে দিলাম বেটাকে। রতো গিয়ে এ'ড়েটাকে শেষে খোঁয়াড় মুন্সীর জিম্মে ক'রে দিলে।

পানুমোড়ল রাগে গিস্ গিস্ ক'রতে ক'রতে বললে,—বেশ,—তাতে না হয় আমার পাঁচগণ্ডা পয়সা যেত যেতই, কিন্তু আমার এ'ড়েকে ওর মারবার কি এক্তার আছে বল দেখি!

শম্ভুশরণ খোঁয়াড়বাসী এ'ড়ের দুঃখে সবিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে বললে,—সে কি মার পানু-ভাগ্নে, বেউড় বাঁশের লাঠি দিয়ে অষ্টাঙ্গ ছুলে' দিলে।

পানুমোড়ল ক্ষেপে উঠল—দেখদেখি—দেখদেখি শালার কাণ্ড! থানায় আমি ওর নামে একটা ডাইরী ক'রে দিয়ে আসি, তারপর বেটাকে—

শম্ভুশরণ বাধা দিয়ে বললে,—সে সব এখন পরে হবে। তুমি এক কাজ কর দেখি, গাঁয়ের পাঁচজন ভদ্রলোককে নিয়ে ওর আখবাড়ীটা একবার তদন্ত করে এস। কি এমন খেসারত করেছে যার জন্যে এ'ড়েটাকে—ওর নাম কি সাক্ষী সাবুদ সবই আমি যোগাড় ক'রে দিব, সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। বেটাকে ছ'শ ছিয়ানব্বই ধারায় যদি না ফেলে দিই—তবে শম্ভুশরণ আমার নাম নয়। অবৈধ পশু নির্যাতন,—হুঁ হুঁ ভাগ্নে, একি সহজ ব্যাপার! যাও যাও আখবাড়ীটা একবার দেখে এস।

পানুমোড়ল রাগে গিস্ গিস্ ক'রতে ক'রতে আখড়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শম্ভুশরণ বিশেষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে যাত্রাপার্টির ছোকরাদের দিকে চেয়ে বললে,—বৌনিটা তা' হলে আজই হয়ে যাক, কি বল সব? এই ধর পানুমোড়ল পঁচিশ, আর রতো চাষা নাই নাই ক'রে পনের, একুনে এই চল্লিশটে টাকা যাত্রা ফণ্ডে তোমরা আজই জমা করে নাও না। সালিশ না মেনে বেটাদের উপায় আছে!

এই ব'লে শম্ভুশরণ হো হো ক'রে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকুটি ছোকরা আনন্দের আতিশয্যে অধীর হয়ে উঠল। চল্লিশ চল্লিশটে টাকা, একি সোজা কথা! রীতিমত একখানা রাজপোষাকের দাম, মায় বাবরী চুল আর ভীমের গদা সমেত।

শম্ভুশরণ জিজ্ঞেস ক'রলে,—যাত্রা ফণ্ডে এ পর্য্যন্ত আদায় হ'ল কত?

রামদাস হারমোনিয়মের বাক্সের ভিতর থেকে চাঁদার খাতাটি বের ক'রে শম্ভুশরণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—আদায় বেশী পেলে কোথায়। নগদ বস্তে এক'শ তিরিশ আর চাষাপাড়া থেকে পাওয়া গেছে মণ পঁচিশেক ধান। আরও শতখানেক টাকা না হ'লে ত পোষাক কেনা চলে না দেখছি।

শম্ভুশরণ আশ্বাস দিয়ে বললে,—আচ্ছা সে সব ব্যবস্থা হচ্ছে, খুব ক'রে তোরা আখড়া দে' দেখি। ওর নাম কি—দোলের সময় গাইতে যেতে হবে ফুলডাঙ্গা দেউলী। বায়না আমি যেমন ক'রে হোক যোগাড় করে দেব। সাজ-পোষাক এখন ভাড়া করেই চলুক, পুরো টাকাটা হাতে এলেই—খরিদ করে আনা যাবে। না—কি বল সব?

কারও কিছু বলবার মত তখন আর অবস্থা নাই। দোলের সময় যাত্রাপার্টি বাইরে বেরুবে শুনে' ছোকরারা সব নাচতে লাগল। কেউ কেউ বা লম্ফঝম্প সহকারে বীররসের পার্টগুলি আবৃত্তি ক'রতে ক'রতে অস্থাভাবে রীতিমত মুষ্টিযুদ্ধে সুরু করে দিল। ইতিমধ্যে দুটি দশ বার বছরের ছেলে পায়ে ঘুঙ্গুর বেঁধে কোমর দুলিয়ে মিহি-সুরে গান ধরে' দিয়েছে,—'প্রাণে প্রাণ মিলবে যখন প্রাণ হবে খাস্তা'......

শম্ভুশরণ ঝাঁ করে বাঁয়া তবলাটা টেনে নিয়ে ঠেকাটার বোল আওড়াতে আওড়াতে হেঁড়ে গলায় সাবাস ছাড়তে লাগল।

রামদাস আনন্দাতিশয্যে শম্ভুশরণের গলা জড়িয়ে ধরলে,—দোহাই খুড়ো, অভাগাদের পায়ে ঠেল না। আজ থেকে দলবল সব তোমার।

বলা বাহুল্য, সেই দিন থেকে যাত্রাপার্টির চেহারা গেল পালটে। হাটতলার চণ্ডেশ্বর শিবের নামে যাত্রাপার্টির

নাম রাখা হয়েছিল 'চণ্ডেশ্বর নাট্যসঙ্ঘ'। শম্ভুশরণের স্বর্গীয়া ব্রাহ্মণীর নাম অনুসারে নূতন করে নাম দেওয়া হয়—'প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টি'। সেইদিন থেকে পুরোন আখড়া ঘরটি ছেড়ে যাত্রাপার্টির আড্ডা বসল গিয়ে শম্ভুশরণের বৈঠকখানায়। টাকা কড়ির হিসাবপত্রাদি ছেলে ছোকরাদের হাতে ফেলে রাখা মোটেই নিরাপদ নয় তাই শম্ভুশরণ চাঁদার খাতা ও ফণ্ডের টাকাকড়িগুলি যত্ন ক'রে নিজের জিম্মায় রেখে দিলে।

(২)

নূতন আড্ডায় যাত্রার দল উঠে যাওয়ার পর গোলমাল বাধল মাণিককে নিয়ে। মাণিক মুখুটি ছিল যাত্রার দলের অর্দ্ধেকটা অঙ্গ, কারণ সংগীত ও নৃত্যবিভাগের সম্পূর্ণভার তারই উপর। ছেলেজুড়িদের গান শেখাতে হারমোনিয়ামের গৎ বাজিয়ে সংগত ক'রতে, রকমারি নাচের 'ফিগার' দিতে মাণিক ছিল একমাত্র 'রিংমাণ্টার'। ছেলেবেলায় মাণিক নাকি গিরিশ সিং-এর 'কালীয়দমনে' বছর দেড়েক কাটিয়ে এসেছে। বর্ত্তমানে সে গাঁয়ের মধ্যে একটি ছোটখাট ওস্তাদ বিশেষ।

এ হেন মাণিক মুখুটি যখন প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টির সঙ্গে অহিংস অসহযোগ ঘোষণা ক'রে বসল তখন উদ্যোক্তাদের দুশ্চিন্তার আর অবধি রইল না। দলটা তা' হ'লে টেঁকে কেমন ক'রে।

মাণিকের এই যাত্রাপার্টি বর্জনের মূলে বিশেষ একটি হেতু আছে। বছর দুই আগে থেকে শম্ভুশরণের আগে-পক্ষের মেয়ে ফুলকুমারী ওরফে ফুলির সঙ্গে মাণিকের বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা হ'য়ে আছে। মাঝে একবার দিন পর্য্যন্ত স্থির হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু চক্কোত্তি মশায়ের দ্বিতীয়পক্ষ হঠাৎ একটি মৃত সন্তান প্রসব করায় কিছু দিনের জন্য শুভকার্য্য স্থগিত থাকে। তারপর থেকে হচ্ছে হবে ক'রেই আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে, যথাসত্বর চারহাত এক হয়ে যাবার আশু সম্ভাবনা বর্ত্তমান।

পাশাপাশি ভিন্‌গাঁয়ে শম্ভু চক্কোত্তির কতকগুলি যজমানের বাস। মাণিক গিয়ে মাঝে মাঝে তাদের পূজোপার্ব্বণটা সেরে দিয়ে আসে, কারণ তা'র হবুশ্বশুর নিতান্ত একলা মানুষ; বিশেষত দ্বিতীয় সংসার পাতবার পর থেকেই তাঁর যজমান বাড়ী যাওয়া প্রায় উঠে গেছে, মাণিককেই এখন ও কাজগুলো চালিয়ে দিতে হয়। শম্ভুশরণের ক্ষেত্রজাত লাউ-কুমড়া, ঝিঙ্গে-কাঁকুড় ও পুঁই ডাঁটার আস্বাদন মুখুটি গিন্নির সুপরিচিত হ'য়ে উঠেছে। তিনিও মাঝে মাঝে হবু-বৈবাহিককে নিমন্ত্রণাদি ক'রে যথারীতি আদর আপ্যায়িত ক'রে থাকেন।

ছেলের বিদ্যে মাইনর পাশ, মেয়েটিও গাঁয়ের পাঠশালে একআধটু লিখতে পড়তে শিখেছে। ছেলের বয়েস একুশ মেয়ে পড়েছে ষোলয়।

শম্ভুশরণ মেয়ের দায়ে এক রকম নিশ্চিন্ত; মুখুটি-গিন্নি ছেলের বিয়ের দিন গুনছে।

আর মাণিক? ফুলকুমারীকে সে ভালবাসে। ফুলকুমারীও একদিন পাড়ার কোন্ মেয়ের কাছে নাকি খুলেই বলেছে,—মাণিক ছাড়া অপর কাউকে সে বিয়েই ক'রবে না।

চক্কোত্তি ও মুখুটি পরিবারের মধ্যে ব্যাপার যখন ঠিক এমনি ধারা সেই সময় গাঁয়ের ছোকরারা সব অন্নপূর্ণা পূজো উপলক্ষে অন্যগ্রামে একটি বড় দলের যাত্রা শুনে' এসে সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজস্ব একটি দল খোলবার জন্যে উঠে পড়ে' লেগে গেল। মাণিক মুখুটি দিলে একখানা হারমোনিয়াম, পঞ্চু সরকার খরিদ ক'রে ফেললে বেহালা। বনমালী সেন হাজির ক'রলে তবলা বাঁয়া, রামদাস চাটুজ্যে পোষাক বাবদ টাকা পঁচিশেক ধরে দিলে। রামা, শ্যামা, যদো, মধোও যথাসাধ্য সাহায্য ক'রতে কার্পণ্য ক'রলে না; গাঁয়ে থেকেও উঠল কিছু চাঁদা। চণ্ডেশ্বর নাট্যসঙ্ঘের এই হ'ল গোড়াপত্তন।

দলের চাঁই রামদাস চাটুজ্যের খেতে শুতে সময় নাই। পঞ্চু সরকার রোজ অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরে' পিসিমার গালাগাল খেয়ে হদ্দ হয়, বনমালী সেনের মুদীখানার দোকানটি হরদম প্রায় বন্ধ থাকে। কয়েকটি অপরিণত বয়স্ক বালক অত্যধিক নাট্যানুরাগের ফলে দুই একদিন অভিভাবকের কাছ থেকে রূক্ষভাষণ, কর্ণমর্দ্দন ও চপেটাঘাত থেকে আরম্ভ ক'রে কুকুর-তাড়া লগুড়াঘাতের আস্বাদন পর্য্যন্ত লাভ করেছে, কিন্তু তথাপি তারা চণ্ডেশ্বর নাট্যসংঘ ছাড়ে নি।

মাণিক সর্ব্বদা আখড়া ঘরে বসে বসে ঐক্যতান ও নাচ-গানের পরিকল্পনা নিয়েই উদ্বাস্ত মুখে তার হরদম লেগেই আছে,—সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি,—রাম দুই তিন, রাম দুই তিন।

এই ভাবে যাত্রার আখড়া জমে উঠেছে অভিনয় রজনীও আগত প্রায়, আরও কিঞ্চিৎ অর্থাগম হলেই সাজপোষাক এসে পড়ে আর কি! ঠিক এমন সময়ে শম্ভুশরণ গিয়ে যাত্রা-পার্টির কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করে এবং চণ্ডেশ্বর নাট্য-সঙ্ঘ' হঠাৎ 'প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টি'তে' পরিণত হয়।

শম্ভুশরণের মত একজন মুরুব্বিকে পেয়ে পার্টির মেম্বরেরা সব দ্বিগুণ উৎসাহে মেতে উঠেছে, কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থায় মাণিক একটু মুসড়ে গেল। নূতন আখড়াটি হল গিয়ে তার হবু শ্বশুরের বৈঠকখানা, যাত্রাপার্টির পরিচালক তার হবু শ্বশুর নিজে। তার উপর যখন শুনলে শম্ভুশরণ স্বয়ং দৈত্যরাজের পার্ট নিয়েছে, তখন মাণিক একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ল। মাণিকের পক্ষে শম্ভুশরণের বাড়ী গিয়ে আখড়া দেওয়া কোন রকমেই সম্ভবপর নয়, অন্তত মাণিকের তাই ধারণা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা যাত্রাপার্টির মেম্বরেরা সব একে একে শম্ভুশরণের বৈঠকখানায় এসে হাজির হল, তাদের হাঁক ডাকে আখড়া ঘর হয়ে উঠল সরগরম। শম্ভুশরণ থেলো হুঁকোয় টান দিতে দিতে শৃঙ্গবিহীন দামড়ার মত ছেলে ছোকরাদের মাঝখানে আসন গেড়ে বসল। তারপর

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে,—ওর নাম কি—পুঁথি খোল হে, প্রথম অংক থেকেই সুরু ক'রে দাও।

রামদাস বললে,—খুড়া, কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। মাণিক এখানে আসতে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।

শম্ভুশরণ জিজ্ঞেস ক'রলে,—কেন বল্‌ দেখি?

রামদাস বললে,—কি জানি খুড়া, কি যে ওর মতলব তা ওই জানে। সম্ভবত তোমার সামনে এসে আখড়া দিতে লজ্জা করছে।

শম্ভুশরণ হো হো ক'রে হেসে উঠল, তারপর বলল,—এই কথা! আচ্ছা আমি ওকে ধরে নিয়ে আসছি।

এই বলে' শম্ভুশরণ তামাক খেতে খেতে আখড়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলে দেখা গেল—মাণিককে সে সত্য সত্যই ধরে এনেছে। মাণিক এসে ছোকরাদের মাঝখানে এক জায়গায় বসে পড়ল। পঞ্চু তার পিঠে একটা চিমটি কেটে চাপা গলায় বলল,—কি বাবা, শ্বশুরের ডাক আর এড়াতে পারলে না? কেমন, আসতে হল ত!

মাণিক একটু মুচকি হেসে স্বরলিপির খাতাখানা খুলে বসল। শম্ভুশরণ বলল,—গানটানগুলা বেশ ভাল ক'রে সেধে নাও বাবাজী, লাজলজ্জার এতে কিছু নাই। কথায় বলে—'ন বিদ্যা সংগীতোপরি'।

রামদাস বললে,—ঠিক কথা!

শম্ভুশরণ বলে যেতে লাগল,—সাবিকের দলে শশী-কাকা আর আমি বরাবর এক সংগেই গানবাজনা করেছি, চুনকালি মেখে সং সেজেছি। এমন কি বেদে বেদেনীর নাচ পর্যন্ত বাদ যায় নি, শশীকাকা বেদে আর আমি সাজতুম বেদেনী। গান ছিল—'বাবু নাটাগড়ের মাঠ নাম হাউড়ে—' ও সব আমার শশীকাকার কাছেই শেখা কি না!

স্বর্গীয় শশী চক্কোত্তি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। শম্ভু-শরণ কথায় কথায় তাঁর নজির উল্লেখ করে থাকে। সে যাই হোক সেদিন থেকে সেই যে মাণিকের লজ্জা গেল ভেঙে—ত আজও গেল কালও গেল। তারপর থেকে মাণিককে আর ডাকতে হয় না, নিজেই সে আর পাঁচজনকে ডেকে-হেঁকে যথাসময়ে আখড়ায় এসে হাজির হয়।

(ক্রমশ)

রসিটা ফোর্বসের ভ্রমণ-কাহিনী

(১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

আমাকে নিয়ে প্রায় বারজন মহিলা জলে পড়ে গেল। এতে ততটা বেশী আসে যায়নি, কারণ এখানে তিন ফুট মাত্র জল ছিল; কিন্তু দুটো নৌকার মাঝখানে একটা কাঠের খিল থাকাতে আমি ভেবেছিলাম—'ডুবে যাব;' কিন্তু সংগে সংগে একটি লজ্জাকর ও অপমানজনক ঘটনা ঘটে গেল। দয়া-পরবশ হ'য়ে কোন একজন উপর থেকে আমার হাতটা ধরে ফেললে এবং একটা ঝাঁকানি দিয়ে একেবারে নৌকায় তুলে ফেললে; আর এই ঝাঁকানিতে আমার বোর্‌খা একেবারে ছিঁড়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য ভাবতে পারিনি, কেন প্রত্যেকে আমার দিকে ভয়বিস্মিতভাবে চেয়ে রয়েছে। শেষে বুঝলাম যে, পরের অনুকৃত তীর্থযাত্রার পোষাক আমার নষ্ট হ'য়ে গেছে। ঘোমটা, বোর্‌খা ও উপরের আচ্ছাদন প্রভৃতি যা দিয়ে নিজের সত্তাকে ঢেকে রেখেছিলাম সে সমস্তই বন্দরে ভাসতে লাগল! আমার ফরসা শাদা মুখের উপর কোঁকড়ান চুল থাকায় এবং লম্বা হাতওলা তুলোর গেঞ্জি প'রে থাকায় একেবারে আমাকে ইউরোপীয় দেখাচ্ছিল। ঠিক এই সংগীন মুহূর্তে এক পরিচিতের মুখের দিকে 'হাঁ' ক'রে চেয়েছিলাম,—তিনি হচ্ছেন আমার কায়রোর পরিচিত রাজা হুসেনের দেওয়ান আব্দুল খেলেক। যাত্রীদের নৌকা উল্টে যেতে দেখেই তিনি ঘটনাস্থলে আরোহীদের অবশিষ্ট একজনের আহ্বানে তাকে উদ্ধার করতে আসেন। স্মরণ হয়, আমার আঘাতের প্রথম বেগ সামলোবার পর এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে উত্তমরূপে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঠান্ডা হবার পর তিনি বললেন—'এই ইংরেজ জাতির মহৎ অন্তঃকরণ আছে, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি মোটেই নেই। আর এই জাতটা জগত শাসন করে, কেন-না কেহই তাদের অপরস্থানের অপমান, পরাজয় অথবা দোষ-ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে সমর্থ হয় না।' আমি মনে করি,—আমাদের জাতের এটা একটা যথাযোগ্য সমালোচনা। *

* The Strand Magazine, May, 1938 হইতে।

মলয় টিনখনিতে ব্রঞ্জমূর্ত্তি

এইচ জি কোয়ারিচ ওয়েলস্ এম-এ, পি-এইচ-ডি

মলয় ষ্টেট্স্-য়ের অন্তর্গত কেডা ও পেরাকে প্রাচীন ভারতীয় কীর্ত্তিকলাপের স্মৃতির যে অনুসন্ধান-কার্য্য আমি গ্রেটার ইণ্ডিয়া রিসার্চ্চ কমিটির পক্ষ হইতে পরিচালিত করিতেছি সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্টসমূহের অর্থ-ব্যয়ে—ইহাতে

মলয় দেশের টিনখনিতে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের বুদ্ধমূর্ত্তি—অবিকল ভারতীয় গুপ্তযুগের শিল্প-প্রতীক—ইপো নামক স্থানের নিকটস্থ খনি হইতে উত্তোলিত (১৮ ইঞ্চি উচ্চ)

বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার নূতন ক্ষেত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই সকল স্থানের খনন দ্বারা নূতন করিয়া যে লুপ্ত রত্ন উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার যথাবিহিত বিবরণ প্রকাশের জন্য সকল ব্যবস্থা করিতে স্বভাবতই আরও বহুকাল কাটিয়া যাইবে; তবে এক পর্য্যায়ের প্রাপ্ত সম্পদ রহিয়াছে, যাহা শিল্প-প্রিয় সাধারণের নিকট অগোণে উপস্থাপিত করা উচিত। টিনখনিগুলি হইতে সময়ে সময়ে যে ব্রঞ্জের বুদ্ধমূর্ত্তি উত্তোলিত হইয়াছে, তাহার কথাই বলিতেছি। মলয় উপদ্বীপের পশ্চিম অংশস্থ যে পর্ব্বতশ্রেণী তাহার পাদদেশে যে অপ্রশস্ত সুদীর্ঘ ফালির মত ভূভাগ রহিয়াছে, তাহাকেই উক্ত টিনখনির অঞ্চল বলা চলে। কারণ, পেরাক নদীর অগণিত শাখা ঐ সকল পর্ব্বত হইতে নিম্নমুখে প্রবাহিত হইয়া এই সকল অঞ্চলে টিন-সম্বলিত পলি সঞ্চিত করিয়া থাকে। প্রাচীন ভারতীয় অভিযানকারীদের আদিম উপনিবেশের পক্ষে এই উপত্যকাসমূহ সর্ব্বপ্রকারেই ছিল রমণীয় ও যথাযোগ্য। বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবেও এই সকল স্থান ছিল সুবিধাজনক। কিন্তু হায়! শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সকল খরস্রোতা নদী বাহিত পলি এবং খনি হইতে ধাতুজ পদার্থাদির উত্তোলনের ব্যাপারের পরিণামে যে পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চিত মৃত্তিকা বর্ষায় ধৌত হইয়া নামিয়াছে তাহা ঐ পলির সহিত যুক্ত হইয়া এই অঞ্চলের সকল পল্লী, সকল জনপদ ভূপ্রোথিত করিয়া ফেলিয়াছে। পলি ও সঞ্চিত মৃত্তিকা এতটা পুরু হইয়া এই সুদীর্ঘকাল সারা মুল্লুক আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে যে সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রচেষ্টার গভীর বাস্তবপক্ষে ইহা অতীতে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। প্রধানত অভিজ্ঞ প্রবীণ খনিবিদ্যাবিশারদগণের সাহচর্য্য ও পরামর্শের গুণেই আমরা এই বিলুপ্ত জনপদসমূহের অতীত
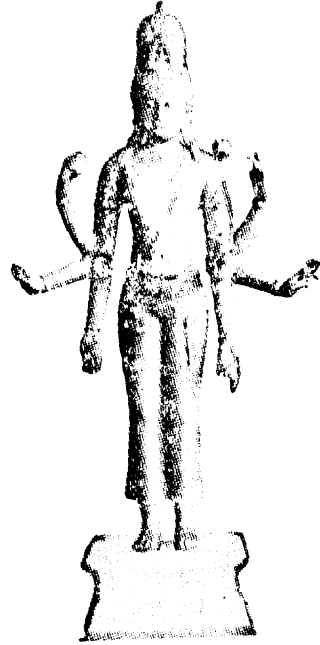
দক্ষিণ পেরাকে খনি মধ্য হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি—ইহাও ব্রঞ্জে প্রস্তুত এবং ইহাই সাক্ষ্যদান করে যে, ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে মলয় উপদ্বীপে মহাযান বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল

সংস্কৃতির সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সর্ব্বপ্রথম এই জাতীয় যে লুপ্তরত্ন পাওয়া যায় তাহা পেরাক যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এইটি নিখুঁত ভারতীয় গুপ্তযুগের শিল্পকলার

নিদর্শন—একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি ব্রঞ্জের প্রস্তুত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন ইপো নামক স্থানের দক্ষিণে একটি খনির অভ্যন্তরে চুয়ান জল জমিয়া উঠে, সেই সময়ে ঐ জল সেঁচিয়া ফেলিবার সঙ্গে এই মূর্ত্তিটি পাওয়া যায়। এই অতি সুন্দর মূর্ত্তিটি এবং এই ধাঁজের আর একটি—যাহা বর্ত্তমান শতকের প্রথমভাগে এই স্থানের কাছাকাছি কোনও

ইপোর নিকটে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি—ইহাও ব্রঞ্জে তৈরী স্থানীয় লোকেরা ইহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি মনে করিয়া ফুল-মালায় সজ্জিত করিয়া রক্ষা করিতেছে
(৯ ইঞ্চি উচ্চ)

জায়গায় পাওয়া গিয়াছিল এবং যাহা আবহাওয়ার দারুণ প্রভাবে অনেকাংশে জীর্ণ বলিয়া মনে হয়—এই দুইটি মূর্ত্তির অবস্থিতি হইতে ইহাই ধারণা হয় যে, আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীতে এই অঞ্চলে হীনযান বৌদ্ধমতের প্রাদুর্ভাব ছিল। কেডা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেও হীনযান মতের প্রচারের অনুকূলেই প্রমাণ উপস্থিত হয়।

অপর যে তিনটি ব্রঞ্জমূর্ত্তি এই সঙ্গে প্রদর্শিত হইল উহাদের বৈশিষ্ট্য এতটা প্রাচীন না হইলেও সহস্রাধিক বৎসরের যে পুরাতন, ইহাতে সন্দেহ নাই। এইগুলি মহাযান বৌদ্ধ-মতের বিশিষ্ট প্রতীক। এই কারণে ইহা ধরিয়া লইলে প্রমাদ করা হইবে না যে, অষ্টম কিম্বা নবম শতাব্দীতে এই অঞ্চলে মহাযান বৌদ্ধমতই ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং ইহাও অসম্ভব নয় যে সমগ্র মালয় উপদ্বীপ ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্বীপ-গুলির কোনও কোনও স্থলে ঐ সময় হইতে দীর্ঘকাল মহাযান মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

অষ্টভুজবিশিষ্ট অনিন্দ্যসুন্দর অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিটি অধুনা পেরাক মিউজিয়ামের সংগ্রহের ভিতর স্থান পাইয়াছে। দক্ষিণ পেরাক প্রদেশের বিদোরের নিকট কোনও খনির খনন কালে বিগত বৎসরে এইটি উত্তোলিত করা হয়। পদ্মাসনে উপবিষ্ট যে ক্ষুদ্রাকার অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি নানা কারুকার্য্য খচিত, এইটি পাওয়া গিয়াছে অল্প কিছুকাল পূর্ব্বে। ইপো নামক স্থান হইতে কয়েক মাইল উত্তরে একটি উন্মুক্ত খনিতে এই মূর্ত্তিটির আবিষ্কার হইয়াছে। এই খনিটি বহুকাল পরিত্যক্ত এবং ইহাতে আর সুড়ঙ্গ-গলিপথ নাই, অগভীর বলিয়া সকল সুড়ঙ্গই কাটিয়া উন্মুক্ত করা হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটি ভারতবর্ষে উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। তবে উহার ফটোগ্রাফ পূর্ব্বেই গ্রহণ করা হইয়াছিল।

ব্রঞ্জের দণ্ডায়মান অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। এই মূর্ত্তি উক্ত ইপো জেলায় আমি দেখিতে পাইয়াছি—শুনিতে পাইলাম ইহা নাকি ঐ উন্মুক্ত খনির ভিতরই পাওয়া গিয়াছে বিগত ১৯০৮ সালে। একজন ভারতীয় রবার-ব্যবসায়ী এই মূর্ত্তিটির মালিক। সে কিন্তু এই মূর্ত্তিটিকে অবলোকিতেশ্বর

চতুর্ভুজ অবলোকিতেশ্বর ব্রঞ্জমূর্ত্তি ; ১১ ইঞ্চি উচ্চ ; কোনও ভারতীয় ব্যবসায়ীর নিকট রহিয়াছে—সে এইটিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া সমাদরে রক্ষা করিতেছে

বলিয়া চিনিতে পারে নাই—তাহার ধারণা এইটি একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি। এবং সেই রকম দৃঢ় ধারণার বশেই সে এই মূর্ত্তিটিকে অতি শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত মহা যত্নে রক্ষা করিতেছে। সে বলে যে এই মূর্ত্তি তাহার হস্তগত হইবার পর হইতে তাহার ব্যবসায় অশেষ লাভ হইতেছে—নানা সম্পদ-সমৃদ্ধি সে অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে এই দেবমূর্ত্তির কৃপায়, সুতরাং বর্ত্তমান

মুহূর্ত্তে সে এই মূর্ত্তি হস্তচ্যুত করিয়া পেরাক মিউজিয়ামে অর্পণ করিবে, এমন কথাও সে মনে আনিতে পারে না। তথাপি আমার মনে হয় এমন প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন সম্পদ সাধারণের খোশখেয়ালের খাতিরে গবেষণার সাহায্য হইতে দূরে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়, তাহারই নিজ দেশের প্রাচীনকালের সংস্কৃতির কত মূল্যবান তথ্য ইহা হইতে উদ্ধার হইতে পারে, ইহা মনে রাখিয়া মূর্ত্তিটি গবেষণার জন্য কোনও যাদুঘরে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। আশা করা যায় এখন এই ধারণা পোষণ করিলেও ঐ ব্যক্তি হয়ত পরে মনোবাসনা পরিবর্ত্তন করিতে পারে। পেরাক হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্রঞ্জ মূর্ত্তির ভিতর এই মহাযান মত-সম্ভূত মূর্ত্তি কয়টি অবশ্য সংখ্যায় নিতান্তই অল্প, *কিন্তু আরও যে সকল ব্রঞ্জ মূর্ত্তি উদ্ধার করা হইয়াছে তাহার ধাতব উপাদানের স্বরূপ বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের নিকট অজানিত। এইগুলি এবং ইহাদের সহিত ধরা যায় দক্ষিণ* শ্যামের ছায়া নামক স্থানে প্রাপ্ত আনুমানিক সমসাময়িক যুগের মূর্ত্তিগুলি—ইহাদের গঠন যে মনোরম ব্রঞ্জের সাহায্যে তাহারও সঠিক মিশ্রণ কৌশল আজিও উদঘাটিত হয় নাই।

সে যাহাই হউক এই সকল অভিনব আবিষ্কার হইতে আমরা কিছুতেই একথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, অষ্টম ও নবম শতকের সংস্কৃতিগত ইতিহাসে প্রভূতরূপেই গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করিবার গর্ব্ব করিতে পারে—মলয় উপদ্বীপ, এ পর্য্যন্ত যেরূপ উচ্চ ধারণা আমরা পোষণ করিয়া আসিতেছি ইহার সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষাও অনেকগুণে বেশী। ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই যে, এই সকল প্রাচীন নিদর্শনের সহিত যব ও বলি দ্বীপের সমসাময়িক শিল্পকলার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া এই সকল মলয় দেশে প্রাপ্ত ব্রঞ্জ-মূর্ত্তিকে যবদ্বীপ হইতে ধার করা ভারতীয় শিল্পকলা বলিয়া নির্দ্দেশ দান করিলে নিতান্তই ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি করা হইবে। বরং ইহা নির্ভুল সিদ্ধান্তের পরিচায়ক হইবে যদি ইহাকে বৃহত্তর ভারতের সংস্কৃতির মহাযানীয় তরঙ্গের অভিব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া যায়—সে প্রতীক মলয় উপদ্বীপেই প্রাপ্ত হউক অথবা দ্বীপপুঞ্জের কোথাও উদ্ধারপ্রাপ্তই হউক। কারণ ইহা আজ সর্ব্ববাদিসম্মত যে পালরাজগণের আমলে বঙ্গদেশ হইতে এই মহাযানীয় সংস্কৃতি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ব্যাপকভাবেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

আজ এই অনুসন্ধানের অর্দ্ধপথে পেরাকের এই সকল দীর্ঘকাল বিলুপ্ত নগরসমূহের পরিচয় প্রদানের প্রচেষ্টা *নিতান্তই অবিমৃষ্যকারিতা হইবে। ইহার যুক্তিপূর্ণ প্রামাণিক সুসমাধানের জন্য আমাদিগকে আরও প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে —নূতন কোনও জিনিষ পাওয়া যায় কিনা এই উদ্দেশ্যে—বিশেষ করিয়া সে-যুগের কোনও অনুশাসন লিপি।*

পরিশেষে সমগ্র মলয় উপদ্বীপে খনি-ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিরেক্টরগণ কিম্বা ম্যানেজারগণের নিকট আমাদের অনুরোধ—তাঁহারা যদি তাঁহাদের এলাকার ভিতরে কোথাও প্রাচীন নিদর্শনমূলক কোনও মূর্ত্তি কিম্বা অনুশাসন অথবা অন্য কোনও প্রকার পুরাতন জিনিষ পান, তবে তাঁহারা যেন কোনও মলয়-যাদুঘরে সেই সংবাদ প্রেরণ করিতে না ভুলেন। তাহা হইলেই সেই সকল পদার্থ যাদুঘরের হস্তে অর্পিত না হইলেও উহাদের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিবার সুযোগ অন্তত পাওয়া যাইবে। এবং সেই ফটোগ্রাফই আমাদের বর্ত্তমান গবেষণার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইতে পারিবে।

—"হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" (১৩-১১-৩৮)

মনে পড়ে

শ্রীশক্তিকুমার রায়চৌধুরী

মনে পড়ে সেই এক জ্যোৎস্না-ধোওয়া রাত।
কিশোরী বালার মত উস্রীনদী হাসে,—
সে-দিন জীবনে বুঝি এসেছে দৈবাৎ,
আবার চলিয়া গেছে দূরে পরবাসে।
দুই তীরে শাল আর মহুয়ার বনে
রজনীর অশ্রু ঝরে ধরণীর বুকে।
বিজন কুটীর মাঝে বাসর শয়নে
আসিলে প্রথম তুমি নম্র নতমুখে।

কাব্যের কল্পনারাজ্যে তুমি ছিলে রাণী
স্বপ্নের উদ্যানে ছিলে অনাঘ্রাত ফুল;
শুনেছি নির্জ্জনে তব শব্দহীন বাণী;
বাস্তবে নামিয়া এসে করেছ কি-ভুল?
দূরাতে আমারে যদি আলেয়ার মত,
কখনো দিতে না ধরা সেই ভালো হ'ত।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

শোভে তব কীর্ত্তি-স্তম্ভ, কাল-সিন্ধু তীরে
অক্ষয়-মর্ম্মরে গড়া, অজেয়, অমর।
ডুবাইতে চাহে সিন্ধু বিস্মৃতির নীরে
ঠেকি পাদ দেশে তা'র কাঁপে থর থর॥

হে বঙ্কিম! তব 'বন্দেমাতরম্' গান
ধ্বনিয়াছে ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে;
মৃত ভারতেরে পুন দানিয়াছে প্রাণ
হে স্রষ্টা! সুবঙ্গ আজি ধন্য তব বরে॥

করিল সম্রাট তোমা আপনি ভারতী
আঁকিয়া তোমার ভালে দীপ্ত রাজ-টীকা।
পঞ্চ রত্ন-দীপে করি তোমার আরতি
লিখিল তোমার ভালে অমরত্ব-লিখা॥
দিশি দিশি বিচ্ছুরিত তব যশঃ-ভাতি
তমোহা, হে ঋষি! তব জ্ঞান-দীপ-শিখা।

ব্যর্থ জীবন

(গল্প)

শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার

পাশের বাড়ীর গণ্ডগোলে ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাড়ীর বড়বৌ চীৎকার ক'রে ছোটজা'কে শাসন করছে, —"আজই আলাদা হাঁড়ী চাপাওগে যেখানে পার; দুধকলা দিয়ে সাপ আর আমি পুষতে পারব না। আমারই খাবেন, আমারই মুখ হাসাবেন। তোমার কি? তুমি ত লজ্জার মাথা খেয়েছ।"

ছোট বৌ-এর বয়স বছর আঠার হবে, বিয়ে হ'য়েছে এখনও পুরো এক বছর হয়নি। স্বামী অর্দ্ধশিক্ষিত—পনের টাকা মাইনেয় ঢাকায় কি একটা দোকানে কাজ করে। বছরে দু'বার দেশে আসে পাঁচ সাত দিনের জন্য। কোন মাসে পাঁচটা টাকা সংসারে পাঠায়,—কোন মাসে তা-ও পারে না। বাপ গরীব বলেই এ সংসারে এই ছোট বৌ-এর বিয়ে। শাঁখা-সিঁদুরেই দেওয়া-থোওয়ার পালা শেষ হয়েছিল বিয়ের সময়ে।

বড়বৌ পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে। বাপ শিক্ষিত ছেলে দেখে নিখিলেশের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর আড়ি ঘটল—জামাই পাড়াগাঁয়ের একটা স্কুল-মাষ্টারী ক'রে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে চললেন। কৈশোরে কুমারীজীবনে ভবিষ্যতের যে রঙীন ছবি বড়বৌ মনে মনে এঁকেছিল, বাপের এক ভুলে তা চুরমার হ'য়ে গেল। আর কল্পনার এই শোচনীয় পরিণতিতে নিষ্ফল আক্রোশে সে সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। মনের হ'ল অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। নিজের জীবন তার যখন ব্যর্থ হ'ল তখন সমস্ত পৃথিবীর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের ওপর তীব্র ঘৃণা এবং ক্রোধ জন্মাল। মনের যেটুকু সরসতা তবু বাকী ছিল, তা-ও শুকিয়ে গেল ভগবানের অভিশাপে—পুত্রহীনতায়, এখন তার গড়ার চেয়ে ভাঙায়ই আনন্দ, ভালবাসার চেয়ে আঘাত করতে পারলেই তৃপ্তি।

স্বামী নিখিলেশ দুর্ব্বলপ্রকৃতির লোক—স্ত্রীকে সব সময়ে সমীহ ক'রে চলতেন, সব সময়ে ম্রিয়মাণ থাকতেন। স্ত্রীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ ফুটে একটা কথা বলতে পারতেন না। বাপ-মা বেঁচে থাকতেই তিনি বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা-ও বুঝে গিয়েছিলেন যে নববধূ বিবাহিত-জীবন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি এবং বধূর মনোভাবের প্রকাশ তাঁদেরও কিছু কিছু সহ্য ক'রে যেতে হয়েছে।

চারু এ সংসারে সকলের ছোট। ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারটা নিয়মমত খেটে যায় এবং সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকে বড়বৌ-এর উদ্যতরোষ কখন কোন্ দিক থেকে কিভাবে এসে আক্রমণ করে। কতদিন আমার এই জানালাটা দিয়ে চেয়ে দেখেছি, ম্লান অশ্রুসজল দুটি বড় বড় কালো চোখ আঁচলে মুছে নিঃশব্দে সে গৃহকাজ করে যাচ্ছে। আর আমার অলক্ষ্যে অন্তরের অনেকখানি সশ্রদ্ধ সহানুভূতি গিয়ে পড়েছে ওই অতি সহিষ্ণু মৌনচারিণীর ওপর।

আজকের সকালের গোলমালটার ওপর আমি অত লক্ষ্য না দিলেও পারতাম,—এ-রকম ত রোজই চলে সকাল থেকে সন্ধ্যা। কিন্তু ওই গোলমালটার মধ্যে আমার নামটা শুনে আমার কৌতূহল হ'ল। নিখিলেশবাবুর পাশের এই বাড়ীতে আমি আছি প্রায় দেড় বছর। নিখিলেশবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করার ইচ্ছা প্রথম প্রথম ছিল কিন্তু দেখলাম ভদ্রলোক তেমন আলাপী নয়। বোধ হয় তিনি ভেবেছেন যে আলাপ হ'লেই মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যাব, আর গিয়ে দেখব তাঁর স্ত্রীর উগ্রচণ্ডী মূর্ত্তি। এই লজ্জায়ই বোধ হয় নিখিলেশ-বাবু আলাপ করতে চাননি। যাক যা বলছিলাম তাই বলি। কড়াইয়ে-ঝিনুকে গলায় বড়বৌ যা' বলে যাচ্ছে তার সারমর্ম্ম এই যে আমি নাকি আমার জানালাটা দিয়ে সব সময়ে চারুর দিকে চেয়ে থাকি আর চারু থাকে আমার দিকে চেয়ে। আমাদের পত্রবিনিময়-ও নাকি স্বচক্ষে সে দেখেছে।

পাড়ার কৌতূহলী মেয়েছেলের দল এমন রসাল খবর শুনে স্থির থাকতে পারেনি—এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। একজন বর্ষীয়সী গিন্নি গোছের স্ত্রীলোক হাত-মুখ নেড়ে বললে—"বল কি বড়বৌমা, গেরস্তর বৌ-ঝি এমন-ও [illegible]? এ ভিটেয় ত এমন কোনদিন হয়নি। এমন বংশের মুখে কালি দিলে! ছি ছি ছি!"

কিন্তু যা'র উদ্দেশ্যে এত ছি ছি, চেয়ে দেখি আজ আর সে অন্যদিনের মত তেমন ম্লান জলভরা চোখে গৃহকাজে যোগ দিতে পারেনি। আজ তার সব সহ্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। মেঝের ওপরে এককোণে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে শুয়ে আছে। নিজের মুখে নিজের কাল্পনিক অপরাধ কবুল করিয়ে নেবার জন্যে বড়বৌ বলছে "কেমন সত্যি কিনা বল। বল দশজনে শুনুক বল আমি মিথ্যে বলেছি নাকি? নবাবের মেয়ের মুখে কথাই বেরুচ্ছে না! কি লজ্জা, ম'রে যাই! বাপের বাড়ীর পথ এই বন্ধ হ'ল। আর যেতে দেব ভেবেছ?" দৌড়ে গিয়ে কোথা থেকে একটা বঁটি হাতে করে এনে বলতে লাগল—"এখনও বল তোমরা চিঠি লেখালেখি করেছ কি-না?"

প্রশান্ত স্পষ্ট স্বরে, তাতে কান্নার সুর মোটেই ছিল না, চারু [illegible]—হ্যাঁ।

মুহূর্ত্তের জন্য বড়বৌ-ও নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে জয়ের উৎকট আনন্দে মেয়েদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে [illegible] লাগল,—"বুঝলেন ত, এই নিয়ে আমার সংসার করতে হয়। আপনারা ভাবেন দিনরাত ভাল মানুষের মেয়ের সঙ্গে আমি খিটিমিটি করি, দেখতে পারিনে।' তারপরে চারুর দিকে ফিরে—"গলায় দড়িও জোটে না নাকি? আজ-ই বেরোও আমার সংসার থেকে।"

এর পরে প্রায়ই শুনতাম চারুর চরিত্রের এই কল্পিত কলঙ্কের কথা সালঙ্কারে পাড়ার মেয়েদের বড়বৌ শোনাচ্ছে। আর ওই মৌন বধূটি নির্ব্বিকার ভাবে একটি প্রত্যুত্তর না দিয়ে দোষক্ষালনের লেশমাত্র চেষ্টা না ক'রে দিনের পর দিন গৃহকাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে

আমি ভাবতাম, আমি ওকে এই মিথ্যা অপমানের হাত

(শেষাংশ ১৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আদিম কালের কীট

আদিম কালে অর্থাৎ যে যুগে নির্জ্জন নিরালা ধরাপৃষ্ঠে প্রথম জীবজন্তের আবির্ভাব হয়, সেই সময় কীট ও সরীসৃপই সর্ব্বপ্রথম সৃষ্ট হয় এবং সেইগুলি আকারে যেমন বিরাট ছিল, আকৃতিতেও তেমনই ছিল অদ্ভুত।

বিরাট বিশাল সরীসৃপগুলি বিবর্ত্তনের ফলে কোন্ কালে পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে নূতন নূতন জীব। এই প্রকারে লক্ষ কোটি বৎসরের একাধিক অদলবদলের প্রভাবে বর্ত্তমান জন্তু-জানোয়ারের দলের আবির্ভাব হইয়াছে।

কিন্তু এখনও পৃথিবীতে এমন স্থান বহু রহিয়াছে যেখানে সময়ে সময়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তু পোকা-মাকড় দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায়। সে কথা পরে বলিব।

আমরা যাহাকে আধুনিক বলি, এমন জীবজন্তুও দুই একটি আছে যাহা সেকেলে হইয়া গিয়াছে। বন্য কুকুর এমনই একটি।

বন্য কুকুর অনেক দেশ হইতেই আজকাল লোপ পাইয়া গিয়াছে। কিন্তু একসময়ে পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলের বন-বনানীতে দলে দলে বন্য কুকুর চরিয়া বেড়াইত। কিছুকাল পূর্ব্বেও কোন কোন দেশে অপর্য্যাপ্ত বন্য কুকুরের প্রাদুর্ভাবে নানা প্রকার প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া এবং তুরস্ক হইতে বন্য কুকুর বিতাড়নের ফিকির-ফন্দির কৌতুককর পারিপার্শ্বিক বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে (এখন অবশ্য ইস্তাম্বুলে রাজধানী নাই, আঙ্কারায় প্রচুর সমৃদ্ধির সহিত নূতন কায়দায় আধুনিক ফ্যাসানে নব রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে) নগরে বন্য-কুকুরের হানা পথিকদিগকে বিপন্ন করিতে থাকে। অধিবাসীরা নিজেরা হস্তক্ষেপ করিয়া বন্য কুকুরের উৎপাত কিছুটা লাঘব করিলেও, একেবারে নগর হইতে বিদূরিত করিতে পারিল না। তখন তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি বন্য কুকুরের সংহারের নিদর্শনস্বরূপে উহাদের ল্যাজ আনিয়া সরকারে হাজির করিতে পারিবে, তাহাদিগকে প্রতি ল্যাজ পিছু নির্দ্দিষ্ট হারে পারিতোষিক দেওয়া হইবে। অল্পকাল মধ্যেই প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যায় ল্যাজ উপস্থিত হইতে লাগিল এবং আনয়নকারীদের প্রতিশ্রুতি মত অর্থও পুরস্কার দান করা হইতে থাকিল। কিন্তু কিছুকাল গত হইলেও লক্ষ্য করা গেল যে বন্য কুকুরের সংখ্যা কমিয়া যায় নাই এবং উহাদের আক্রমণও বিরল হয় নাই। কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্যে ইহাই মাত্র সকলে বিস্ময়ের সহিত অবধারণ করিল যে, এখন আর লম্বা ল্যাজওয়ালা বন্য কুকুর কোথাও দৃষ্ট হয় না—যেখানে যখন কুকুরগুলি চড়াও হয় উহাদের ল্যাজ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই দেখা যায়। তখন আর তুরস্ক সরকার ল্যাজের পুরস্কার দিয়া প্রতারিত না হইয়া—বন্য কুকুর বধের জন্য শিকারী নিযুক্ত করিল এবং অল্পদিন মধ্যেই সকল বন্য কুকুর দেশ হইতে নিশ্চিহ্ন হইল। কতকগুলিকে ধৃত করিয়া পশুপালন আগারে রাখিয়া শিক্ষা-দানের চেষ্টা হইতে লাগিল।

অষ্ট্রেলিয়ান বন্য কুকুর বিতাড়নের ব্যাপার আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার মেষপালকগণ প্রতিনিয়ত গবর্ণমেণ্টের নিকট বন্য কুকুরের বিষম উৎপাতের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে থাকে। পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত এই সমস্যার আলোচনা হয়, পরিণামে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। বলা হয় বন্য কুকুর হত্যা না করিয়া জীবন্ত বন্দী করিয়া আনিয়া সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট যে প্রদান করিবে সে উচ্চহারে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে। অগণিত সংখ্যায় বন্য কুকুর গ্রেপ্তার হইয়া গবর্ণমেণ্টের পশুপালন আগার ভর্ত্তি হইতে থাকিল, কিন্তু মেষপালকগণের দুর্ভাগ্য—তাহাদের মেষপালের উপর সমানভাবেই বন্য কুকুরের আক্রমণ চলিতে থাকে। ফলে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তখন জানিতে পারা যায় যে, সারা মুলুকে বন্য কুকুর ধরিয়া তাহার পালনের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। উহারা প্রচুর সংখ্যায় বন্য কুকুর বিক্রয় করে এবং এই কুকুর সস্তা দামে কিনিয়া একদল লোক উচ্চহারে পুরস্কার লাভ করিতেছে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে। এই গোপন তথ্য আবিষ্কারের পর হইতে অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্টকে আর বেগ পাইতে হয় নাই বন্য কুকুর নির্ম্মূল করিতে।

এই প্রকারে প্রকৃতির বিবর্ত্তনের খেলা [illegible] মানুষের প্রচেষ্টাতেও অনেক [illegible] এ পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

তথাপি আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে, মানুষের শত চেষ্টায়ও কোনও অবাঞ্ছিত জীবকে বিলুপ্ত করা যায় নাই, আর শত চেষ্টায়ও বিলুপ্তপ্রায় জীবকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নাই।

এশিয়ার বন্য কুকুরের ব্যাপার ধরিলে, এখনও কোনও কোনও জনবিরল বনাঞ্চলে এই বন্য কুকুর বিনা বিঘ্নে বিরাজ করিতেছে দেখা যায়। চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশের সীমান্ত প্রদেশে বনপূর্ণ পার্ব্বত্যভূমিতে বন্য কুকুর রহিয়াছে এবং পদব্রজে ভ্রমণকারীদের প্রধান আততায়ীস্বরূপে সে তল্লাটের পথঘাট বিপদসংকুল করিয়া তুলিয়াছে।

পোকা-মাকড়ের বেলা দেখা যায়—উহাদের অভ্যুদয়-তিরোধানে মানুষের কারসাজি প্রায় নাই বলিলেই হয়। খাদ্য-খাদক সম্পর্ক—যাহার উপর সমগ্র জীব-জগতের জীবন যাপন নির্ভর করে—তাহারই প্রভাবে এক এক কালে এক এক প্রকার পোকা-মাকড় অপর্য্যাপ্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং অন্য একটি ধ্বংসের কবলে পতিত হইয়াছে।

ভারতে আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি—বঙ্গদেশে যে আকারের টিকটিকি, শুঁয়াপোকা, কাঁকড়া বিছা, তেঁতুলে বিছা, কেন্নুই প্রভৃতি হামেশা দেখিতে পাই, যুক্তপ্রদেশ-

অযোধ্যা কিম্বা মধ্যপ্রদেশ-বেরার অঞ্চলে ঐ সকল কীটই তুলনায় অতি বৃহৎ আকারের।

অনুরূপ দৃষ্টান্ত আফ্রিকায়, নিউজীল্যাণ্ডে, অষ্ট্রেলিয়ায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচুর দেখা যাইবে। ঐ সকল দেশের বন-কাননে যে সকল পোকা-মাকড় দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর প্রায় অন্য সকল দেশ অপেক্ষাই বৃহৎ। বিশেষ করিয়া আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার এই ব্যাপারে বিশেষত্ব অশেষ। এই সকল দেশের অভ্যন্তরে নিবিড় অরণ্যে এমন অনেক কীট-পতঙ্গ সময় সময় পাওয়া যায়, যেগুলিকে প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সুদূর অতীত যুগের বলিয়া সন্দেহ করেন। ইহারা নিশ্চয়ই নৈসর্গিক প্রভাবের আওতায় বিবর্ত্তনের সুদূরে প্রসারী আইন-কানুনের বেড়াজাল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অনেক স্থলে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট ভূমিভাগের গণ্ডীর ভিতরে বিবর্ত্তনের কোন চিহ্নই দেখা যায় না—তাহা যেমন জীব-জগত সম্বন্ধে সত্য, তেমনই উদ্ভিদ-জগত সম্বন্ধেও তুল্যরূপেই সত্য। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার নির্জ্জন পার্ব্বত্যস্থানে যে শিবমন্দির উড়োজাহাজ হইতে দৃশ্যমান হয় এবং পরে সৌভাগ্যবশেই আবিষ্কৃত হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে যে উদ্ভিদ-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নাকি আধুনিক যুগের নয়—কোন্ প্রাচীনযুগের বিবর্ত্তনহীন সত্তারই অক্ষুণ্ণ নিদর্শন। সেই শিবমন্দিরের চারি পাশে এমন সব জন্তু-জানোয়ার পাওয়া গিয়াছে, যাহারা মানুষের ভয়ে ভীতও নয় আর আকারে প্রকারে সেই স্মরণাতীত প্রাচীন যুগেরই সুস্পষ্ট ছাপ বহন করিতেছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় এক প্রকার শুঁয়োপোকা পাওয়া গিয়াছে, যাহা আকারে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। সারা গায়ের শুঁয়াগুলিও আকারের অনুপাতে লম্বা লম্বা। শুঁয়াগুলি মানুষ কিংবা অন্য জীবজন্তুর নিকট যতটা আতঙ্কেরই হউক না কেন, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, শুঁয়াগুলি উহাদের কোমল দেহকে অরণ্যের পারিপার্শ্বিক বাধা-বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে। এমন কি সময়ে ধূলি, শিশির প্রভৃতির সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখে। এই জাতীয় শুঁয়াপোকা প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে পেরিপেটাস্ শ্রেণীর অন্তর্গত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পেরিপেটাসের আবিষ্কারের পর অন্যান্য দেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ দেশে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহার ফলে নিউজীল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে এই পাঁচ ইঞ্চি লম্বা পেরিপেটাস আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আদিম যুগের পোকা-মাকড়, সরীসৃপ ছিল অতি অদ্ভুত—আকারেও উহা ছিল যেমন বিশাল, বিরাট, আকৃতির ডৌলেও ছিল তেমনই বিকট। এবং এ কথাও সত্য যে, সেই সকল সরীসৃপ এবং পোকা-মাকড়ের অধিকাংশই হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তথাপি দুই একটি জাতি দৈবাং কোথাও কোথাও অবিকৃত রহিয়া গিয়াছে। আর তাহারই একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই—এই পেরিপেটাস শুঁয়াপোকার পাঁচ ইঞ্চি আকারে।

পেরিপেটাস নাম দ্বারা পণ্ডিতগণ কি বিশেষত্ব ইহার উপর আরোপ করিয়াছেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। জীব-জন্তুর ভিতর প্রধান দুইটি বিভাগ হইল—মেরুদণ্ডযুক্ত এবং মেরুদণ্ডহীন। মেরুদণ্ডহীনের ভিতর প্রায় সবগুলি অস্থিবর্জ্জিত জীব স্থান পাইয়াছে। অস্থিবর্জ্জিত জীবগুলির ভিতর আবার বহু শাখাজাতি রহিয়াছে। তাহার একটি প্রধান শাখা হইল—Arthropoda অর্থাৎ যে অস্থিহীন জীবগুলির দেহ পর পর কয়েকটি অংশ জুড়িয়া গঠিত; অংশগুলি এমনভাবে সংলগ্ন যে, সর্ব্বাগ্রভাগের অংশের মাংস-পেশীগুলির আকুঞ্চন প্রসারণের বেগে অন্য অন্য অংশগুলিতে অনুরূপ ক্রিয়াশক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে সমগ্র জীবটি গতিশীল হইতে পারে। আরথ্রোপোডা শ্রেণীর আবার প্রধান দুইটি শাখা আছে—উহার একটি হইল জলকে নিশ্বাসরূপে গ্রহণক্ষম (water-breathers), অপর জাতি হইল বায়ু নিশ্বাসগ্রহণক্ষম (air-breathers) এখন পেরিপেটাস হইল আরথ্রোপোডা স্তবকের অন্তর্গত একটি শাখাজাতি। এবং পেরিপেটাসের বিবর্ত্তনের ফলে শত শত ভোল বদলাইবার পর দেখা দিয়াছে আধুনিক পোকা-পতঙ্গ, অর্থাৎ insects, চিংড়িমাছ, কাঁকড়া-বিছা (বিচ্ছু), কাঁকড়া এবং মাকড়সা, প্রভৃতি। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক মতবাদ হইতে পেরিপেটাসকে এই সকল পতঙ্গাদির সর্ব্বাদিপুরুষ বলা যাইতে পারে।

পেরিপেটাস শ্রেণীর আরও একটি বিশেষ গুণ ছিল, তাহা হইল শিকার বাগে পাইলে উহাকে কাবু করিবার জন্য উহাদের মুখের লালা পিচকারীর জলের মত ছুড়িয়া দিবার ক্ষমতা। উহারই প্রকার ভেদ অধুনা মাকড়সার লালা-স্রাবে সূতা তৈরীর মধ্যে কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।

বস্তুত জীব-জন্তুর যে লালা দ্বারা শিকার বা বিপক্ষকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা—ইহাকে উহাদের আদিম যুগোচিত আত্মরক্ষার অস্ত্র বলা যাইতে পারে। প্রাচীনকালে মেরুদণ্ডওয়ালা জন্তু-জানোয়ারের ভিতরও এই অস্ত্রের মালিক ছিল কোন কোনটি। স্কাঙ্ক (Skunk) নামে একটি ভোঁদড় শ্রেণীর ক্ষুদ্র জন্তু ছিল, যাহা বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে এক প্রকার তীব্র লালা তোড়ের সহিত বর্ষণ করিত। সে লালা এত তীব্র যে, আক্রমণকারী কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত।

এখনও একশ্রেণীর স্কাঙ্ক আমেরিকায় রহিয়াছে, যাহার বিশেষত্ব এই যে সাপের বিষও উহাকে কাবু করিতে পারে না।

শোনা যায় খট্টাশেরও লালাস্রাব করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, বৃহৎ বৃহৎ জানোয়ার কর্ত্তৃক চড়াও হইলে এবং পলায়নের পথ রুদ্ধ দেখিলে এমন দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ করে যে, তাহাতে তেমন দুরন্ত জানোয়ারও অভিভূত হইয়া পড়ে।

[illegible] সেই সুযোগে খড়াংশ বেমালুম সারিয়া পড়ে দুষমনকে এড়াইয়া।

কিন্তু সত্যিকার লালাস্রাবের ব্যাপারে ওস্তাদ হইল 'পিঁপড়েখেকো' (Ant-eater) জানোয়ারটি। উহার জিহ্বাটিও অসাধারণ লম্বা আর তাহা আঠার মত লালায় জবজবে থাকে—সেই জীবের লালায় একবার ঠেকিলে পিপীলিকাদের আর পলায়নের শক্তি থাকে না। পিঁপড়ে-খেকো একবার জিভ ঠেকাইয়া ২০১২৫টি পিঁপড়াকে বন্দী করিয়া আনিয়া সাবাড় করে।

ব্যাঙেরও পোকা-মাকড়ই খাদ্য। উহারাও জিভের লালার সাহায্যেই পোকা-মাকড় বাগাইয়া আনে। আর পাঠক-পাঠিকাগণ নিজ নিজ গৃহে টিকটিকির আহার গ্রহণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। দেওয়ালের এককোণে চুপ করিয়া থাকিয়া পোকা-মাকড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করে। পোকা ছোট অর্থাৎ একেবারে ক্ষুদে হইলে ছুটিয়া যায় এবং কিছুদূরে হইতে জিভ বাহির করিয়া ক্ষুদে পোকাটিকে পাকড়াও করে। উহাদেরও জিভের লালা এই প্রকার শিকার সন্ধানে সাহায্য করে অসীম।

প্রাণিতত্ত্ববিদ পন্ডিতগণ অনুমান করেন যে, আদিম যুগে যেকালে বিরাট সরীসৃপ মাত্র দেখা দিয়াছে (যাহার [illegible] [illegible] বর্তমান [illegible]-ঘোড়া বাঘ-ভালুক প্রভৃতি আমরা দেখিতে পাই) তাহার পূর্ব্বেই এই সকল পেরিপেটাস পৃথিবীতে ছিল। অর্থাৎ অন্য কথায় বলিতে গেলে বর্ত্তমানে যে সরীসৃপ শ্রেণী আমরা দেখিতে পাই, উহাদের আবির্ভাবের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পেরিপেটাস জাতি ধরাপৃষ্ঠে বিরাজ করিয়াছে। পেরিপেটাসের সেইকালে শুঁয়া ছিল অতি ঘনসন্নিবিষ্ট—স্পর্শে কতকটা মখমলের মতই মসৃণ। সেকালে পেরিপেটাস সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া ছিল অগণিত সংখ্যায়। কীট-পতঙ্গের ভিতর উহারাই ছিল প্রধান। আজিকার মত সামান্য কয়টি অরণ্যে গুটিকয়েক মাত্র করিয়া ছিল না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনটি পেরিপেটাস পাওয়া গেলে পরে তিনটিকে অতি যত্নে কেপটাউন শহরে আনয়ন করা হয়। সেখানে 'শেপার্ডস বুশ ষ্টুডিওতে গ্যামন্ট ব্রিটিশ ফিলম কোং ঐ তিনটির ফিলম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক চলচিত্রের জন্য। উহাদের গতিভঙ্গী, উহাদের লালাস্রাব, উহাদের শেওলা প্রভৃতি আহার সমস্তই চলচিত্রে তোলা হইয়াছে। প্রথমতঃ এই গুলিকে গুটিপোকা বলিয়া ভুল করা হইয়াছিল। বিশেষ পর্যবেক্ষণে পন্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, ইহা সেই আদিম যুগের পেরিপেটাস।

অবিশ্বাসী

(১৬১ পৃষ্ঠার পর)

টেরও পাব না। তখন শূন্য পুঁজি নিয়ে অন্ধকারে কি হাত-ড়াব বল দেখি, ভাই।'

সকলে হো—হো—করিয়া হাসিয়া বলিত 'অপদার্থ।"

তিনিও হাসিয়া বলিতেন "ঠিক বলেছ—। তোমাদের পদার্থগুলো এই অপদার্থের অকর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে বেশ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে। সে জন্য আমায় মাঝে মাঝে ধন্যবাদ দিয়ো হে।"

সেই অবধি তিনি হিসাব লিখিতেন। মাসের পর মাস খরচ হয়ত বাড়িয়াই চলিত তথাপি তাঁহার হিসাব লেখার বিরাম ছিল না। ব্যয়সঙ্কোচ বা অন্য কিছুর জন্য যে হিসাব রাখিতেন তাহা নহে, এ মাসের অঙ্কের সঙ্গে গত মাসের খরচের অঙ্কটা যে কতখানি পৃথক সে খেয়ালও তাঁহার ছিল না, শুধু, কাগজ কালি ও কলমের সাহায্যে অঙ্কপাত করিয়া চলিতেন।

মহামায়া যদি বলিতেন, "মিছামিছি এ ভূতের খাটনী খেটে লাভ?" অমনই তিনি হাসিয়া উত্তর দিতেন "কি জান, এক সময়ে না এক সময়ে এটা উপকারে আসবে। সব লিখে রাখা ভাল।"

সেই হিসাব-নিকাশের অনাগত দিনটি কিন্তু আজও পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। তাঁহার লেখারও বিরাম ছিল না।

মাণিক একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "পাঁচ টাকা খরচ—"

তৎক্ষণাৎ তিনি খাতায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন, "গুঃ খোদ—মাণিক—পাঁচ টাকা—কিশের দরুন?"

মাণিক বলিল, "আজ্ঞে, ফুটবলের চাঁদা।"

তিনি লিখিলেন "ফুটবলের চাঁদা।" একবারও জিজ্ঞাসা করিলেন না, এ বাজে খরচ কেন?

লেখা শেষ হইলে বলিলেন "আর কিছু আছে?"

"না।" বলিয়া মাণিক কক্ষ ত্যাগ করিল।

(ক্রমশ)

অমৃত ও নির্বাণ

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

—১৭—

উর্ম্মিলা বললে, 'আমার পাপের সঙ্গে সিদ্ধার্থকে আর জড়াতে পারব না কেশর! ও আমার কাছ হতে দূরে দূরে থাক, সেই ভাল। এ পাপের স্পর্শে এলে ও হয়ত শুকিয়ে যাবে!—'

বেশ, তোমার যা খুশী তাই ক'র! এতটুকু দুধের শিশু ও ওকে যদি তুমি এমনি করেই বঞ্চিত করতে চাও ক'র! তোমার সন্তান ও, আমার অধিকারই বা কতটুকু!'

মিছে তুমি আমার উপর অভিমান করছ কেশর! আমার কিছুই ত' তোমার কাছে গোপন নেই; তোমারই দেওয়া সিদ্ধার্থ নাম ওর সার্থক হয়ে উঠুক তাই আমি চাই। আমায় ক্ষমা ক'র কেশর!'

কেশর ধীরে ধীরে ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল, আর একটী কথাও বললে না।

কেশরের গমন পথের দিকে তাকিয়ে উর্ম্মিলার চক্ষু দু'টি জলে ভরে উঠ্‌ল। 'ওগো জানি গো জানি ব্যথা তোমার কোথায়; কিন্তু আমি নিরুপায়, আমায় ক্ষমা ক'র।'

ভগবতী খোকাকে নিয়ে এল; খোকা বড় কাঁদছে।

লেড়কাকো একটু মাই দে মাইজী!......রোতা হায়।

ক্রন্দনরত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে উর্ম্মিলার মাতৃ-হৃদয় দুলে উঠ্‌ল, তার নিজের অজ্ঞাতেই তার দু'হাত শিশুর দিকে ছুটে যেতে চাইলে, চাইলে তাকে বক্ষে তুলে নিতে, আদরে সোহাগে গলিয়ে দিতে; কিন্তু না, তাকে কঠোর হতে হবে; তাকে দূরে সরে আসতে হবে। কঠিনকণ্ঠে উর্ম্মিলা বললে, 'এইত' একটু আগে দুধ খাওয়ান হয়েছে!......নিয়ে যাও, বাইরে একটু ঘোর গিয়ে, আপনিই শান্ত হবে'খন!'

ভগবতী খোকাকে নিয়ে চলে গেল।

উর্ম্মিলা ক্রমে কঠোর হ'তে কঠোরতর হ'তে লাগল।

তার নারী হৃদয়ের যাবতীয় কোমল স্নেহের বাঁধন একে একে নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

মাঝে মাঝে সমগ্র সঙ্কল্প, সমগ্র কঠোরতা মাতৃহৃদয়ের স্নেহের বন্যায় ভেসে যেত; কিন্তু আবার দ্বিগুণ উৎসাহে বুক বাঁধত উর্ম্মিলা!

কিন্তু কেশরের সমগ্র অন্তরাত্মা এক এক সময় উর্ম্মিলার প্রতি একান্ত বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌তে চাইত, তার ইচ্ছা হ'ত, সে চীৎকার করে বলে, উর্ম্মিলা আমিও মানুষ!......তুমি সকল কিছুরই সীমা অতিক্রম করে চলেছ, কিন্তু পরক্ষণেই একটা প্রবল অভিমানের ঝাপ্‌টা তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেত!

উর্ম্মিলা নিজ হাতে আপন বুকের পাশটি হতে সিদ্ধার্থের বিছানাটা তুলে ভগবতীর ঘরে পাঠিয়ে দিল।

কেশর আগাগোড়াই সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে, কিন্তু একটি কথাও বললে না, সে মনে মনে সঙ্কল্পই এ'টেছিল, উর্ম্মিলার কোন কাজেই আর সে তিলমাত্র বাধা তুলবে না।

কিন্তু গভীর রাত্রে কেশরের পাশে শুয়ে উর্ম্মিলা যখন শয্যায় বৃথাই ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল, একবার এপাশ, আবার ওপাশ করতে লাগল, তখনও চোখ বুজেই ও নীরবে পড়ে রইল।

এক সময় উর্ম্মিলা শয্যার উপর উঠে বসল। তারপর পায়ে পায়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেল এবং যেখানে ভগবতীর কোলের কাছটিতে শুয়ে খোকা অঘোরে ঘুমাচ্ছিল, সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

প্রদীপের আলো খোকার ঘুমন্ত মুখময় লুটিয়ে পড়েছে। নির্নিমেষ নয়নে উর্ম্মিলা তাকিয়ে রইল খোকার মুখের দিকে। দু'হাত বাড়িয়ে খোকাকে সমগ্র মাতৃহৃদয় বুকে তুলে নিতে চায়,......কিন্তু উর্ম্মিলা হাত টেনে নেয়; চোখের জলে বুক ভেসে যায়! গভীর স্নেহে ছেলের কপালে একটি চুম্বন দিয়ে উর্ম্মিলা ঘর হতে আবার বেরিয়ে আসে।

উর্ম্মিলা অন্ধকারে বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে এসে দাঁড়াল। রাত্রির আকাশ একাকী জাগে, শিয়রে জ্বলে তার তারার প্রদীপ। নিশীথের মুখ চোরা হাওয়া নীরবেই আনা-গোনা করে ফেরে।

সামনে বিশাল মাঠ গা এলিয়ে ঝিমায়।

গভীর প্রার্থনায় উর্ম্মিলার সর্ব্বশরীর নুয়ে আসে, হে ঈশ্বর আমায় মুক্তি দাও প্রভু!......এ বোঝা আর যে আমি বইতে পারি না প্রভু!......

অশ্রুধারায় উর্ম্মিলার গণ্ড ভেসে যেতে লাগল।

....

কেশর এসে গভীর স্নেহে ডাকে, 'ঘরে চল উর্ম্মিলা!......'

উর্ম্মিলাকে একপ্রকার বুকে করেই কেশর ঘরে নিয়ে এল।

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল!......

এক সময় কেশর দেখলে উর্ম্মিলা ঘুমিয়ে পড়েছে।

গভীর স্নেহে উর্ম্মিলার মাথায় একটি চুম্বন এ'কে দিয়ে কেশর শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাতের আঁধার তরল হয়ে আসছে! কেশর এসে বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

কেশর একদিন উর্ম্মিলাকে ডেকে বললে, 'আর এমনি করে দিনের পর দিন বসে থাকতে পারি না উর্ম্মিলা, একটা কাজের চেষ্টা দেখি!'

উর্ম্মিলা বললে, 'বেশ্ ত'!'

মাসখানেকের মধ্যেই পাঞ্জাব ইউনিভারসিটিতে কেশর একটা চাকুরী জুটিয়ে নিল। এবং উর্ম্মিলা সিদ্ধার্থকে নিয়ে কার্য্যস্থলে চলে এল। এখানে এসে কেশর সিদ্ধার্থের জন্য একজন ক্রিশ্চান নার্স রেখে দিলে।

নার্সটির নাম মালতী!

মালতীর বয়স প্রায় ৩০।৩২।

খুব নম্র ধীর, মুখে কথাটি নেই।

সিদ্ধার্থ এখন বেশ হাঁটতে শিখেছে; ভারী তড়্‌বড়ে মাথা ভর্ত্তি কোঁকড়া চুল, মুখের দু'পাশ হ'তে গাল দু'টিকে ঢেকে দিয়েছে।

অসমপদক্ষেপে দিন রাতই এঘর ওঘর ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়।

এমন দুষ্টু, মালতী একেবারে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যায়!

বলে, 'না মা খোকার সঙ্গে আর পারি না।'

কেশরের বাসাটা খুব বড় না হলেও নেহাৎ ছোটটি নয়। বাড়ীর সামনে একটা ছোটখাটো ফুলের বাগান। তাতে দেশী-বিদেশী নানা ফুলের গাছ, একজন মালীও আছে, সে-ই সব দেখাশুনা করে।

বাইরে একটা ছোট বারান্দা,......বারান্দার পরই সংলগ্ন কেশরের অফিসঘর ও লাইব্রেরী!......

ঊর্ম্মিলা বললে, হ্যাঁ, ওর যখন মাত্র দুই মাস বয়স তখন ওর মা মারা যায়, সেই সময় বাবু ওকে নিয়ে আসেন!......এনে আমার হাতে তুলে দেন,......সেই হতেই ওকে মানুষ করছি।'

'আর ওর বাবা?—'

'তিনি ওর—শুনেছি, জন্মের আগেই নাকি স্বর্গে যান!—'

'সংসারে বুঝি ওর আপনার জন আর কেউই নেই!—'

ঊর্ম্মিলা অনামনস্ক হয়ে গেল। এলোমেলোভাবে জবাব দেয়, 'হয়ত আছে, কিন্তু পরের বোঝা বইতে কয়জন চায় মালতী?'

খোকা মালতীর পাশেই ঘুমোচ্ছিল, সেই দিকে চেয়ে ঊর্ম্মিলার বুকখানা তোলপাড় করতে লাগল।

ধীরে ধীরে ওঘর হতে উঠে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

* * * * *

এমনি করেই সিদ্ধার্থ, কেশর ও ঊর্ম্মিলার দিন কাটে!

কেশরকে ডাকে সে 'বাপি' আর ঊর্ম্মিলাকে ডাকে, 'মণি! আর মালতীকেও একদিন ডাকতে শিখলে 'মালতী'!

গভীর রাত্রে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল কেশরের,—ওঘরে খোকা কাঁদছে।

ওপাশের খাটে ঊর্ম্মিলাও শুয়েছিল, বোধ হয় ঘুমিয়েই আছে। ওকে আর জাগালে না, কেশর পায়ে পায়ে উঠে খোকা যে ঘরে শুত, সেই ঘরে গিয়ে হাজির হল। মালতীকে শুধালে, 'কি হয়েছে ওর—মালতী, ও কাঁদছে কেন?'

কেশরকে দেখে খোকা 'বাপি' বলে দু'হাত বাড়িয়ে দিলে।

কেশর খোকাকে বুকে তুলে নিল।

অন্ধকারে বারান্দায় ঘুরে ঘুরে কেশর খোকাকে ঘুম পাড়াতে লাগল।

ফুঁপাতে ফুঁপাতে খোকা এক সময় কেশরের বুকেই আবার ঘুমিয়ে পড়লে।

খোকাকে আবার ওর শয্যায় শুইয়ে দিয়ে ঘরে এসে দেখলে ঊর্ম্মিলা একইভাবে ঘুমুচ্ছে। একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে কেশর আপন শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে স্নান করতে যাওয়ার সময় কেশর শুনলে, ঊর্ম্মিলা মালতীকে জিজ্ঞেস করছে, 'কাল রাতে খোকা অত কাঁদছিল কেন মালতী?'

'হ্যাঁ মা বড় কাঁদছিল, শেষে বাবু উঠে এসে কোলে নেন্ তবে শান্ত হয়!'

'হুঁ! তা আমি জানি!

ও—ঊর্ম্মিলা তখন জেগেই ছিল; ইচ্ছা করেই কিছু শুনেও শোনেনি! কেশর অনেকক্ষণ স্নান ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অবশেষে একসময় ধীরে ধীরে স্নানঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

—১৮—

পাশের বাড়ীর মিথিলেশবাবুর স্ত্রী শর্ম্মিষ্ঠার সঙ্গে ঊর্ম্মিলার আলাপ হয়েছিল।

মিথিলেশবাবুও এখানকার কলেজের একজন প্রফেসর। শর্ম্মিষ্ঠা ঊর্ম্মিলার চাইতে কিছু বড়।

সংসারে এক বুড়ী শাশুড়ী ও স্বামী ভিন্ন আর তৃতীয় প্রাণী নেই। শর্ম্মিষ্ঠাই নিজে একদিন যেচে এসে ঊর্ম্মিলার সঙ্গে আলাপ করে গেছল।

শর্ম্মিষ্ঠা বলত, 'দেখ ঊর্ম্মিলা, তোর এই কুড়ানো খোকাটাকে আমার ভারী ভাল লাগে! একেত' তুই কুড়িয়েই পেয়েছিস, দেনা আমায় দিয়ে ভাই!......'

ঊর্ম্মিলা হাসত, 'তাই দিয়ে যাব শর্ম্মিষ্ঠা। আমার মরবার পর তুই ওকে নিস্, আহা অভাগা জন্মাবধি মা'র স্নেহ পেলে না! ওকে তুই মা'র ভালবাসা দিস শর্ম্মিষ্ঠা!...... পৃথিবীতে যে সন্তান মা কেমন—তা জানলে না, তার মত দুঃখী বুঝি আর কেউ নেই!—আমি ত' ওকে কিছুই দিতে পারলাম না!—' শেষের দিকে ঊর্ম্মিলার কণ্ঠস্বর অশ্রুর চাপে বুজে গেল। ও অন্যদিকে মুখ ফিরাল, পাছে অন্য কেউ দেখে ফেলে—ওর চোখে জল।

'কিন্তু হোক্‌গে পরের ছেলে—তাই বলে, মেয়েমানুষ হ'য়ে কেমন করে, কোন প্রাণে যে তুই ওকে একটি দিনের তরেও বুকে নিলিনা, একথাটা আমি কিছুতেই বুঝি না!'

ঊর্ম্মিলার বুকের মধ্যে যেন কেমন করতে থাকে; ওর সর্ব্বশরীর এক গভীর উত্তেজনায় বারংবার শিউরে ওঠে, অবাধ্য অশ্রু ছাপিয়ে যেতে চায় ওর চোখের তট,......সর্ব্বহারা ব্যথিত মাতৃত্ব ওর বুকের মাঝে ঝড় তোলে, ও আর্ত্তস্বরে বললে, 'ওসব কথা থাক্ ভাই, তুই অন্য কথা বল। কি হবে—আমার নয় তাকে দু'দিনের তরে শিকল দিয়ে বেঁধে! আজ বাদে কাল যখন ও আমার শিকল কেটে পালাবে তখন সে দুঃখ রাখব আমি কোথায়?—তার চাইতে থাক্‌না কেন দূরের জিনিষ দূরেই!'

এর পরে কিন্তু আর শর্ম্মিষ্ঠা অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলে না।

'হ্যাঁ ভাই, আমিই ত' রোজ রোজ তোর বাড়ীতে আসি; তুই একটি দিনও ত' আমাদের বাড়ীতে গেলি না?......এবার একদিন না গেলে, আমি কিন্তু কিছুতেই আর আসছি না! মা রোজই বলেন, "হ্যাঁ বৌমা, তুমি ত' প্রায়ই তোমার বন্ধুর বাড়ী যাও, কত তার গল্প কর; তা কই সে ত' একদিন এখানে এল না; বল না তাকে একদিন বেড়াতে আসতে!'

'মাকে আমার প্রণাম দিস্ ভাই! সংসারের নানা কাজে সময় মোটেই পাই না!'

'কি এমন তোর সংসারের কাজ শুনি? ভারি ত' তিনটি মাত্র প্রাণী! আমি হ'লে পৃথিবীময় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াবারও সময় পেতাম রে!' সহসা ঊর্ম্মিলার সিঁথির দিকে দৃষ্টি পড়ায় শর্ম্মিষ্ঠা বিস্ময়ে বলে উঠ্লে, 'ওকি রে, সিঁথি যে একেবারে শাদা!......এয়োস্ত্রী মনুষ—স্বামীর অকল্যাণ হয়! কই ভাই সিন্দুরের কৌটা তোর,......সিন্দুর দিয়ে দিই!—'

'না ভাই, মাথায় সিন্দুর দেওয়া উনি তেমন পছন্দ করেন না!......বলেন, 'কি মাথাটাকে অপরিষ্কার করে রেখেছ?'—'

'ওমা এয়োস্ত্রী মানুষ, সিন্দুর মাথায় দেবে, তা অপরিষ্কার!......বাবা বলতেন, মেয়েমানুষের সব চাইতে বড় গয়না মাথার সিন্দুর আর হাতের নোয়া।' কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে গেল। শর্ম্মিষ্ঠা উঠে বললে, 'বাসায় যাই ভাই আমার কর্ত্তাটির আবার আসবার সময় হল কিনা, কিন্তু মনে থাকে যেন—কাল পরশু আমাদের বাসায় একটিবার পায়ের ধুলো ফেলতে হবে. কোন ওজর-আপত্তিই কিন্তু শুনব না!"

ঊর্ম্মিলা কোন জবাবই দিল না, শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

বিরাট এক অভিমানের বোঝা বুকে বয়েই একদিন ঊর্ম্মিলা কেশরের হাত ধরে ঘর ছেড়ে পথের মাঝে এসে দাঁড়ালে। সেদিন ভাবী সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কাটা যতটা তার চোখে পড়েছিল, ততটা কিন্তু তার পর্ব্বোন অভিমানের সীমা রেখাটা!

তারপর একদিন সেই সন্তান যখন বুক জুড়ে এল তখন ও বোঝেনি—ওর ভুলের রেখাটা কতদূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে।

বুঝতে পারলে সেদিনই প্রথম, যেদিন এক রাত্রে নিজের ভুলের মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হল! এবং সেই দিনই ঘটল ওর অভিমানের মৃত্যু! ভোরের আলোয় যখন ও চোখ মেলে চাইলে, ও দেখলে—ও একা! একেবারে নিঃস্ব, কেউ নেই ওর! সেদিন যা ও অনায়াসেই অবহেলা করে ছেড়ে এসেছিল, আজ তারই তরে ওর অন্তর বৃথাই কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগল! এবং গুটিপোকা যেমন অন্যের অলক্ষ্যে নিজেকে জগতের কাছ হতে গুটিয়ে নেয়, ঊর্ম্মিলাও তেমনি আপনাকে অন্যের চোখের ওপর হতে গুটিয়ে নিতে আরম্ভ করলে। তাইত সে কারও সঙ্গে মিশত না, কারও সঙ্গেই কইত না একটি কথা! ও ভাবত—যে মুহূর্ত্তে ওর চারপাশের আড়াল ভেঙ্গে যাবে, সেই মুহূর্ত্তের লজ্জা অপমানের হাত হতে কেমন করে ও নিজেকে বাঁচাবে?—সে ঘৃণার বোঝা ও কেমন করে বইবে?......

তারপর কেশর!

—একটা বিরাট সম্ভাবনার ও ঘটিয়েছে অপমৃত্যু; এ ব্যথা ওর কম ছিল না। তিলে তিলে কেশরের প্রতি ওর ভালবাসা জমতে জমতে একদিন ওর সমগ্র অন্তর-আকাশকে ভরিয়ে তুললে।

—ও ভালবাসলে কেশরকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে!

একদিকে কেশরের প্রতি গভীর ভালবাসা, অন্যদিকে সন্তানের ব্যর্থ মাতৃত্ব নিশিদিন ওকে দুদিক হতে টানতে লাগল!

(ক্রমশ)

ব্যর্থ জীবন

(১৭১ পৃষ্ঠার পর)

থেকে বাঁচাতে পারি কিনা। কিন্তু উপায় কিছু খুঁজে পেতাম না।

তারপরে একদিন রাত প্রায় এগারটা বাজে। নিখিলেশবাবুদের বাড়ীর আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। আমি শুয়ে শুয়ে একটা মাসিক কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছি। খোলা দরজাটা দিয়ে রাত্রির হাওয়া এসে মশারীটা কাঁপাচ্ছিল। আমি ওই অপমানক্লিষ্টা মেয়েটির কথা ভাবছিলাম। কে এসে ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঢুকল। দেখি,— চারু; সারা দেহ একটা শাদা চাদরে ঢাকা। বিস্মিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম।

—"আপনি?" বিস্ময়ে আমি প্রায় কথা বলতে পারছিলাম না। "আপনি?—এত রাত্রিতে?"

দাঁড়িয়ে থেকেই বললে—"হ্যাঁ, আমি। আচ্ছা, আপনার কি রোজ রোজ এই মজা দেখতে ভাল লাগে নাকি? কালই এ-বাড়ী থেকে আপনি চলে যান। আমার অনুরোধ, চলে যান। অপমানের মাত্রা আর বাড়াবেন না।"

অস্ফুটভাবে বললাম—"কিন্তু এ ত' মিথ্যে অনুযোগ! আপনি বা আমি ত' কোন অন্যায়—"

—"মিথ্যে হলে'ও এ যে-অপমান সে আমাদের সহ্য করার শক্তি নেই। আপনাদের কথা আলাদা। আমার অনুরোধ, আপনি চলে যান এখান থেকে। বলুন যাবেন,— কালই যাবেন?"

সম্মতি দিলাম। আমার সেই উপায় নিজে এসে উপস্থিত।

পরের দিন সকালে একটা গরুর গাড়ীতে আমার মালপত্র বোঝাই ক'রে যাত্রা করলাম। হঠাৎ দেখি একটা জানালায় দাঁড়িয়ে চারু আমার যাওয়ার পালা দেখছে।

বড়বৌ-এর দৃষ্টি পড়ে গেল। অর্থপূর্ণভাবে হেসে চারুকে জিজ্ঞেস করলে—"উনি চলে যাচ্ছেন নাকি?"

ক্রোধে চারুর মুখ লাল হ'য়ে উঠল এবং জানালা ছেড়ে দ্রুতপদে সে চলে গেল আর বড়বৌ-এর হাসির শব্দ আমার কানে এসে বাজতে লাগল।

জাপানে আমোদ-প্রমোদ বন্ধ

যতদিন জাপানী সেনা চীনে যুদ্ধলিপ্ত থাকিবে, ততদিন জাপানীদের পক্ষে উচিত হইবে না—অধিক মাত্রায় নৃত্য-গীতাদি বিলাসে নিমগ্ন থাকা। এই জন্য পুলিশ চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে নৃত্য-মজলিশ নিম্নতম সংখ্যায় নিবদ্ধ রাখা যায়—যদি না একেবারে বন্ধ করা সম্ভব হয়। বীর যোদ্ধাগণ চীনে হতাহত হইতে থাকিবে আর সমগ্র জাতি আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিবে, ইহা শোভন নয়।

পুলিশের নির্দ্দেশে আটটি "ড্যান্স ষ্টুডিও" একেবারে তালাবন্ধ করা হইয়াছে এবং সাধারণের নৃত্য-স্থলের জলসা অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অধিবাসীদের গৃহে গৃহে যে "ড্যান্স পার্টি" তাহারও সংখ্যা কমাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এই বিশেষ বিধির দ্বারা যে—নিজ নিজ পল্লীর থানায় এই প্রকার নৃত্য-পার্টির বিষয় রেজেষ্ট্রীকৃত করিয়া উহার অনুমোতি-পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত কেহ নিজগৃহেও নৃত্যাদির পার্টি বসাইতে পারিবে না।

মৃত্যু-রশ্মির আবিষ্কার

হাঙ্গেরীর সীগেড অঞ্চলের দুইটি তরুণ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া বহু বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে প্রদর্শন করিয়াছে যে, ঐ যন্ত্র হইতে অতিশয় শক্তিশালী প্রখর রশ্মি উৎপন্ন করা যায়।

এই রশ্মির বৈজ্ঞানিক বিশেষ নাম ডি ডি এক্স (DDX)। ইহার সাহায্যে অর্দ্ধ মিনিটে জল ফুটাইয়া উচ্চতম তাপে পৌঁছান যায়। চারি গজ দূর হইতেও এই রশ্মির প্রভাবে গ্যাস-বার্নার প্রজ্বলিত হয়। যে কোনও শক্তির মোটর-যন্ত্র নিমেষে নিষ্ক্রিয় হয়। ক্ষুদ্র জানোয়ারদের স্পর্শমাত্র মৃত্যু আনয়ন করিতে পারে।

এই আবিষ্কারকদ্বয়কে আরও গবেষণা চালাইতে অর্থ ও উৎসাহ দান করা হইতেছে। তাহাদের বিশ্বাস তাহারা এই যন্ত্রকে এতদূর শক্তিশালী করিতে পারিবে যে, ছয় কিলোমিটার পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী যে কোন পদার্থের উপর উহা প্রয়োগ করা যাইবে।

বিবাহে বাধা

মালয় রাজ্যের অন্তর্গত ট্রেঙ্গানুর বর্ত্তমান সুলতানের ভ্রাতা প্রিন্স মামুদ এক ইংরেজ-কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ট্রেঙ্গানু ও মলয় অঞ্চলের অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যের ব্রিটিশ ক্রাউন এজেন্টস্ এইরূপ বিবাহ ভাল নজরে দেখে না। এই ব্রিটিশ ক্রাউন এজেন্টস্‌ই এই সকল রাজারাজড়ার তালুক-মুলুকের উপরিস্থ মালিক। অপরদিকে সুলতানের অগণিত সভাষদগণ নিজেদের বংশমর্য্যাদার গর্ব্বে এইরূপ বিবাহ সমর্থন করে না।

দশ বৎসর বয়স কালে প্রিন্স মামুদ ইংলণ্ডে আগমন করে এবং এক শিক্ষকের অধীনে লেখাপড়া করে। ইহার জন্য সাপ্তাহিক ছয় পাউণ্ড সাহায্য নিজ রাজ্য হইতে আসে। দশ বৎসর কাল ইংলণ্ডে থাকিয়া পোষাক-পরিচ্ছদে এবং হাব-ভাবে প্রিন্স মামুদ ব্রিটিশ বনিয়া গিয়াছে। তাই সে ভাবিয়াছিল, তাহার ইংরেজকুমারী বিবাহে কোন আপত্তি হইবে না—মলয়রাজ্যের বাধা ইংলণ্ডে কার্য্যকরী হইবে না। অক্সফোর্ডের কোনও দর্জ্জীর কন্যা জয়েস ব্রেৎকাউয়ের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রিন্সের বয়স ২০ বৎসর, জয়েসের বয়সও ২০ বৎসর।

জয়েসের পিতা এইরূপ ঘনিষ্ঠতায় অমত প্রকাশ করে না এবং প্রিন্স বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহাতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু যখন প্রিন্স এই প্রণয়িনীকে প্লাটিনামে হীরা-বসান একটি আংটি উপহার দেয় এবং তাহাদের বাগ্‌দানের বার্ত্তা প্রকাশ করে, তখন ব্রিটিশ ক্রাউন এজেণ্টস্ আর ট্রেঙ্গানু সুলতানের দরবারে টেলিগ্রাম আদান-প্রদান হইতে থাকে।

পরিশেষে সুলতান প্রিন্সকে দেশে ফিরিতে আদেশ করেন। প্রিন্স সরলমনে রওনা হয়, কিন্তু জাহাজে থাকাকালীন প্রণয়িনীর নিকট হইতে টেলিফোন কল পাইবার পর তাহার হুঁস হয় যে, দেশে ফিরিলে তাহাকে হয়ত গ্রেপ্তার করা হইবে নতুবা নজরবন্দী রাখা হইবে। সুতরাং মার্সাইলে প্রিন্স জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যায়।

কিন্তু সুলতান এবং উপনিবেশ আফিসের বিরোধিতার দরুন জয়েসের পিতাও অসম্মত হয়। প্রিন্স মামুদ এখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। সে এক রেস্তোঁরা মালিকের শরণাপন্ন হইয়াছে। সে যে কোনও চাকরী জুটাইয়া খরচ চালাইতে প্রবৃত্ত, কারণ তাহার যে পৈতৃক সম্পত্তি, আগামী মে মাসের পূর্ব্বে তাহাতে তাহার অধিকার জন্মিবে না। কাজেই সে সুলতানের নিকট চিঠি লিখিয়াছে—ইংরেজকুমারী সে বিবাহ করিবে, যেহেতু আচার-নীতিতে সে ইংরেজ হইয়া গিয়াছে; মলয়দেশীয় কনে সে পছন্দ করে না। প্রিন্স বন্ধুমহলে বলিয়া বেড়ায়, নিজের সম্পত্তি হাতে পাইলে জয়েসকে বিবাহ করিতে কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। সে জানে জয়েসের পিতামাতা তাহাকে পছন্দ করে।

মহাত্মা গান্ধীর তৈরী স্যাণ্ডেল

স্যর রাজা আলী যখন দক্ষিণ আফ্রিকার ইণ্ডিয়ান এজেণ্ট-জেনারেল-এর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন জেনারেল স্মাটস্ তাঁহাকে একজোড়া স্যাণ্ডেল উপহার দেন।

এই স্যাণ্ডেল জোড়া জেনারেল স্মাটসের নিকট ২৫ বৎসর যাবৎ রহিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে আন্দোলন আরম্ভ করিলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, সেই সময় এই স্যাণ্ডেল জোড়া নির্ম্মাণ করেন। পরে কারাগার হইতে মুক্তি পাইলে, তিনি জেনারেল স্মাটস্‌কে এই স্যাণ্ডেল জোড়া উপহার দেন।

পৃথিবীর সর্ব্বদীর্ঘ নামের মালিক

হংকং শহরে কিছুদিন পূর্ব্বে এক অভিজাত তুং বংশের প্রভূত বিত্তশালী কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার সকল

সম্পদ পরিজনদিগের ভিতর অংশ করিয়া বিভাগ করিয়া দিয়াছেন 'উইল' দ্বারা। উক্ত উইলের 'প্রোবেট' গ্রহণের জন্য যখন আবেদন করা হয়—তখন উইলকারীর সুদীর্ঘ নামে বিচারক ও উকিলগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যায়। আবেদনকারীদের পক্ষের উকিল নামটি আবৃত্তি করেন অবশ্য স্মৃতি হইতে নহে—লিখিত কাগজ পাঠ করিয়া। নামটি এইরূপ—উওং কুন্ ইয়াইউ চিউ ইয়ান সুই উং ইয়াইন ইয়ঙ্গ ইয়াউন্ লেই কুউওং ইউন্ চিক্ সিন্ উয়াং ফুক সিন তুং।

এত দীর্ঘ নাম হইবার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী বংশের যে সকল সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, সেই বংশের প্রত্যেক'টির বিশেষ বিশেষ বংশ-প্রতীক নাম ও আখ্যা তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, নতুবা সেই সম্পত্তির মালিক বলিয়া তিনি সাব্যস্ত হইতে পারিতেন না।

জীবন্ত ডার্ট-বোর্ড

আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে জুয়াখেলার তীর ত্যাগ্ করিবার বোর্ড বলিয়া ভ্রম হয়, প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন নিষ্প্রাণ

অচঞ্চল বোর্ড ইহা নয়। প্রতিটি তীরই (Dart) একেবারে জীবন্ত এবং কোমল। লণ্ডনের "উইমেন্স্ লীগ অফ হেল্থ্ য়্যাণ্ড বিউটি"র তরুণীগণ তাহাদের অপূর্ব্ব কসরৎ প্রদর্শন করিতেছে।

এই প্রদর্শনী নেহাৎ একটা উত্তেজনাহীন শ্রমমাত্র নয়। কারণ দেহগঠনে অপরূপ সামঞ্জস্য-লীলা যে কয়টি তরুণীর অনিন্দ্যসুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহারা সকলেই পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে। সেই জন্যই মীমাংসা-কমিটির সম্মুখে এই সমবেত ক্রীড়া প্রদর্শন।

পিঠমোড়া বাঁধা অবস্থায় আত্মহত্যা

লণ্ডনের রেডিও বিভাগ হইতে ধাঁধা ঘোষণা করা হয়—পিঠমোড়া করিয়া হাত বাঁধা অবস্থায় কি করিয়া ফাঁসি দ্বারা আত্মহত্যা করা সম্ভব, যে সমাধান করিতে পারিবে সে পুরস্কার পাইবে।

কোনও ব্যাঙ্কের টাইপিষ্ট একটি যুবতীকে পরদিন পিঠমোড়া করিয়া হাত বাঁধা অবস্থায় নিজকক্ষে মৃত পাওয়া গিয়াছে। শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইয়াছে ডাক্তারগণ বলে। সুতরাং পুলিশের অভিমত এই যুবতী রেডিওর ধাঁধার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই প্রয়াসেই আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু কি কৌশলে উহা সম্ভব তাহা বলিয়া যাইতে পারে নাই।

রেডিও বিভাগ উহাকে পুরস্কার দিবে কি?

শব্দ-নিরোধক কাচ

'ফেনা'-কাচ ("Foam" glass) প্রস্তুত হইয়া বিজ্ঞানের নব দিগ্বিজয় ঘোষণা করিতেছে। মার্কিনের ওহিও অঞ্চলের নেওয়ার্ক শহরে গেমিস শেলটার এই ফেনা কাচ তৈরী করিয়াছে আওয়েন্স-ইলিনয়াস গ্লাস কোম্পানীর ল্যাবরেটরীতে। এই জাতীয় কাচকে যে কোন আকারের ব্লকে ঢালাই করা যায়, যে কোন রঙে রঙান যায়—সেজন্য কোনও কক্ষের ভিতরের বা বাহিরের শোভন কারুকার্যরূপে ব্যবহার করা যায়।

ফেনা-কাচ কোটি কোটি বায়ুপূর্ণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোমকূপের ন্যায় ছিদ্রে (pores) পরিপূর্ণ—দেখিতে কতকটা স্পঞ্জের উপরিভাগের ন্যায়। যখন এই কাচ বাহিরের শব্দ নিরোধ করিবার জন্য কক্ষ-প্রাচীরের বাহির পিঠে সংলগ্ন হয়, তখন কাচের সছিদ্র পিঠ থাকে উন্মুক্ত। এই সকল ছিদ্রপথে বাহিরের সকল প্রকার শব্দ-তরঙ্গ প্রবেশ করিয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ছিদ্রে বন্দী হয় এবং তথা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া ছিদ্রান্তরে ক্ষীণস্রোতে ঘুরিতে থাকে—এবং এইভাবেই ক্রমশ ক্ষীণ হইতে হইতে একেবারে লোপ পায়—কক্ষ-প্রাচীরে আর প্রবেশ করিতে পারে না।

জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা

নানাপ্রকারে শিকার-বিলাসটিকে ইংলণ্ডে আইন-কানুনের

ফাঁদ ফেলিয়া খর্ব্ব করা হইয়াছে। তাই শিকার-বিলাসী ব্রিষ্টলে অধিবাসীরা র‍্যাবিট শিকারের পরিবর্ত্তে ধৃত র‍্যাবিটকে অনুসরণের খেলাধূলো প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। স্থানবিশেষে যেমন উৎসাহের সহিত কুকুর দৌড় অনুষ্ঠিত হয়, এখানেও তেমনি র‍্যাবিট অনুসরণ দ্বারা প্রচুর আমোদ ও কৌতুকের সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। কিন্তু এখানেও জীবজন্তু-সংরক্ষণ সমিতি এক নূতন বিধান বিধিবন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, শ্রান্ত-ক্লান্ত নিজ্জীব র‍্যাবিটকে এই প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করা অপরাধের মধ্যে সাব্যস্ত হইবে।

ব্রিষ্টলের পনর জন ভদ্রলোক কতকগুলি র‍্যাবিট ধরিয়া আনিয়া এক মাঠে ছাড়িয়া দেয় এবং একটি গ্রে-হাউন্ডকে র‍্যাবিটগুলির পশ্চাৎ ধাওয়া করিতে লেলাইয়া দিয়া কৌতুক দেখিতে থাকে। অকস্মাৎ রিভলবারের আওয়াজ হয়, সঙ্গে সঙ্গে একদল ডিটেক্‌টিভ ঐ পনর জন দর্শককে ঘেরাও করিয়া ফেলে। তাহাদের নাম-ঠিকানা টুকিয়া লইয়া যায়। পরদিন তাহাদের নামে শমন বাহির হয় এই অভিযোগে যে, তাহারা র‍্যাবিটগুলিকে অহেতু ক্লেশ দান করিয়াছে।

বিচারকালে জীবজন্তু-সংরক্ষণ সমিতির প্রধান ইন্সপেক্টার বলেন—র‍্যাবিটগুলিকে থলিয়ায় ভর্ত্তি করিয়া এবং মাইকেলের হাতলের সঙ্গে ঝুলাইয়া ঐ মাঠে নেওয়া হইয়াছে। একটা থলিয়ায় ১৬টি পর্য্যন্ত পুরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যখন ঐ গুলিকে মাঠে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন ভয়ে উহারা হকচকাইয়া গিয়াছে, প্রাণহীন অসাড়ের মত উহারা এলাইয়া পড়িয়াছিল এবং কোথায় ঝোপঝাড় আশ্রয়ের স্থান সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই উহাদের থাকিবার কথা নয়। কতকগুলিকে ঘাড়ে ধরিয়া থলিয়া হইতে বাহির করিয়া গ্রে-হাউন্ডের নাকের ডগায় নাচাইয়া নাচাইয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে অধিকাংশগুলি মাঠের এক স্থানে জড়াজড়ি করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, এক পাও নড়ে নাই; আর হাউন্ডগুলি একলাফে আসিয়া উহাদের জীবনান্ত করিয়াছে। যেগুলি কিছুটা ছুটিয়া গিয়াছে, সেগুলিও এতটা আতঙ্কগ্রস্ত ছিল যে, কিছুতেই স্বাভাবিক দৌড়ের বেগ আয়ত্ত করিতে পারে নাই—ঐগুলিও অগোণে হাউন্ডের কামড়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার।

ম্যাজিষ্ট্রেট চারজনকে ছয় হইতে তিন সপ্তাহের কারাদণ্ড, নয়জনকে দুই পাউণ্ড হইতে দশ শিলিং পর্যন্ত জরিমানার আদেশ দিয়াছেন। বাকী দুইজন নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে।

পত্নী বনাম বাঁশি

আমার পত্নী জেন ওরোস্কি আমার বাঁশিটি লইয়া আমার আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছে, আমি তাহার ঋণের জন্য দায়ী নহি।

—জন ওরোস্কি, মিউজিশিয়ান

নিউ ইয়র্কের একখানি সংবাদপত্রে মিঃ ওরোস্কি এই বিজ্ঞাপন দিয়াছে এবং বলে তাহার স্ত্রী এই তৃতীয়বার তাহার বাঁশি চুরি করিয়াছে। এই বাঁশি তাহার কোনও কাজে আসিবে না, কিন্তু সে এই বাঁশিটিকে ঘৃণা করে। সে অতি ঈর্ষার চক্ষে দেখে আমার বাঁশি বাজান, বিশেষ করিয়া মূর্ত্তিমান বাঁশিটিকে। সে যখনই আমার বাঁশিটি চুরি করিয়া পলায়, তখন টাকাকড়ি কি পোষাক-আষাক কিছুই সঙ্গে নেয় না। তাহার সকল জিনিষ বাড়ীতেই রাখিয়া যায়, সঙ্গে লইয়া যায় শুধু তাহার দুই চোখের বিষ—আমার বাঁশিটি।

'ডি-এস-ও' এবং 'লিজিয়ন অফ অনার' বর্জ্জন

জেনারেল রুডল্‌ফ্‌ মেডেক্‌ প্রাগের ওয়ার মিউজিয়ামের বর্ত্তমান ডিরেক্টার এক সময়ে চেক্‌ সমর-বিভাগের প্রবীণ যোদ্ধা ছিলেন। ব্রিটিশ প্রদত্ত সম্মান-প্রতীক ডি এস ও (D S O) এবং ফরাসীদের অর্পিত লিজিয়ন অফ্‌ অনার (Legion of Honour) বর্জ্জন করিয়া কিং জর্জ্জ এবং প্রেসিডেন্ট লেব্রুর নিকট উপরি উক্ত সম্মান-প্রতীক ফেরত দিয়া লিখিয়াছেন—

আমার বিবেক ও কর্ত্তব্যের অনুশাসনে আর আমি এই সকল সম্মান-প্রতীক বহন করিতে পারি না, যেহেতু আমাদের চরম দুর্দ্দশা ও নিতান্ত প্রয়োজনের সময়ে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে আমাদের হতাশ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

মার্কিনের মহিলা প্রেসিডেন্ট(?)

আমেরিকান উইমেন্‌স্‌ ক্লাবসমূহ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সদাকর্ম্মপর পত্নী ইলিনর আগামী ১৯৪০ সালের নির্ব্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থী হউন।

এই প্রস্তাবের সমর্থকগণ বলেন যে, মার্কিন্‌ কন্‌ষ্টিটিউশন্‌ অনুসারে মহিলার প্রেসিডেন্ট হইবার কোন বাধাই নাই। বহু মহিলা ওয়াশিংটনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত; এমন কি মিস ফ্রান্‌সেস পার্কিন্‌স্‌ নামক একটি মহিলা কেবিনেট মিনিষ্টার হইয়াছেন।

তাঁহারা আরও বলেন—(১) মিসিস্‌ রুজভেল্টের সহায়তা ব্যতীত তাঁহার স্বামী কখনই প্রেসিডেন্ট-পদের গুরুভার বহন করিতে পারিতেন না।

(২) মার্কিন যুক্তরাজ্যের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৫৮জন হইল নারী। সুতরাং প্রেসিডেন্ট পদে নারীর দাবী আগে বিবেচিত হওয়া উচিত।

চির স্বামী-অনুরক্তা মিসিস্‌ রুজভেল্ট তাঁহার সাংবাদিকের কর্ত্তব্য লইয়াই সদাব্যস্ত, তিনি এই প্রস্তাবের বিষয়ে কোন মনোযোগ এখনও দেন নাই।

লবণ তৈরীর দ্বিতীয় প্রথা

সাধারণত লবণাক্ত জলকে ফুটাইয়া লবণ বাহির করা হয়। এই প্রথাই অধিকাংশ দেশে প্রচলিত। কিন্তু লবণাক্ত জলকে জমাট করিয়া বরফে পরিণত করিলেও বর্জ্জিত লবণ পরিত্যক্ত থাকে। কারণ শুধু জলটাই বরফে পরিণত হয়। এই উপায়ে সুয়েডেন দেশের সর্ব্বত্র লবণ তৈরী হয়। তাহার কারণ আর কিছুই নয় সেই দেশে এই বরফ জমান কাজের জন্য যে হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি প্রয়োজন হয়, তাহা অতিশয় সস্তা। ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্যই এই উপায়ে লবণ প্রস্তুত করা সে দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত। অপর পক্ষে উত্তাপের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ, কয়লা, কয়লা-গ্যাস, কিম্বা বৈদ্যুতিক শক্তি সে দেশে ব্যয়বহুল।

(গল্প)

শ্রীপ্রেমরঞ্জন সেন

কার্ত্তিকের মাঝামাঝি, কালীপূজোর পর হইতেই সেবার সুরু হইয়াছে বেজায় শীত—একেবারে হাড় ভাঙ্গা। গরীব জামা-ভূষা—শীত-গ্রীষ্ম—বর্ষাকে যাহারা ভয় খায় না একটুও—তাহারাও অত্যন্ত কাবু হইয়া পড়িয়াছে এবার। সূতার চাদর ছেঁড়া আবরণে আর তাহাদের শীত নিবারণ হয় না মোটেই।

পৌষ শেষ হইয়া গিয়াছে; মাঘের সবেমাত্র সুরু।

এক সকালবেলা। ঈষৎ কুয়াশার জাল কাটিয়া গিয়াছে; শীতের সূর্য্য তাহার আরামদায়ক কিরণ লইয়া অনেকখানি আগাইয়া আসিয়াছে। ওসমানের একমাত্র ছেলে গফুর তাহাদের হাজিয়া-মজিয়া যাওয়া পুকুরের পাড়ে একটি কুলগাছের নীচে বসিয়া রোদ পোহাইতেছিল; বয়স তাহার পাঁচ, ছয় বছর; —ম্যালেরিয়ায় নিঃশোষিত, শুকনা, হাড় বেরন গায়ে জড়ান ছিল একখানি ময়লা জীর্ণ কাঁথা। পুকুরের পাশে বসিয়া রহিয়াছিল তাহার বড় বোন আমিনা;—কোলে তাহার মাস দশেকের একটি কচি বোন।

বাসি ভাত খাইয়া উঠিয়া তামাকু সেবনের মানসে ওসমান আসিয়া দাওয়ায় ভাঙা পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল; এবং তামাক রাখিবার জায়গা টিনের কৌটাটিতে তামাক না পাইয়া হাঁক ছাড়িল, "ওরে আমিনা, তামুক নাই?"

অদূরবর্ত্তী পুকুরের পাড় হইতে উত্তর দিল আমিনা,—"না গো বা'জান ঘরে আর তামুক নাই!"

এদিকে হাড়-কাঁপান শীত, তাহার উপর বাসিভাত খাইয়া শরীরে উপস্থিত হইয়াছে বেজায় কাঁপুনি; আবার ভাত খাইয়া উঠার পর তামাক খাইবার আরামটিও নষ্ট হইয়া গেল;—মনে মনে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল ওসমান। কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ ঝাঁজাল কণ্ঠে কহিল সে,—"তোর জহের চাচার কাছে থাইকা এক ছিলিম লইয়া আয়গা।"

শীতের সকালে রোদ পোহাইবার আরামটুকু ত্যাগ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা থাকিলেও কোন আপত্তি না করিয়া আমিনা তাহার কচি বোনটিকে লইয়া ধীরে ধীরে জহের চাচার বাড়ীর উদ্দেশে চলিয়া গেল।

আজ কাজলাকাঠির হাট। প্রায় ক্রোশখানেক দূরে কাজলাকাঠির হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল ওসমান। কাদা-গোবরে মাখান, বাঁশের চিকণ বাখারীতে তৈরী একটি বাজরাতে কতকগুলো খড় বিছাইয়া অতি সন্তর্পণে রাখিল দুইটি বড় বড় দইয়ের হাঁড়ি; এবং তাহার পাশে কয়েকটি হাঁসের ডিম রাখিতে রাখিতে ঘরের ভিতর কর্ম্মরতা স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল সে,—"আলের খালি-বোতলগুলা দাও।

আমিনার মা ওসমানের চাওয়া জিনিষগুলো দুয়ার গোড়ায় রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"বুঝলানি, পোলার লাইগা একটা কমলা আইনো, রোজ কাইন্দা খুন হয়; সেদিনকা অছিগো বাড়ীর আদলাকে খাইতে দেইখা, ওই যে জিদ্ ধরছে—"

ওসমান রাগিয়া উঠিল—"হ, বড় মাইনষের ছাওয়াল না, কমলা না অইলে অইবো ক্যান।"

একথার কোন জবাব দিল না আমিনার মা, শুধু বিষাদ-মাখা দৃষ্টি তুলিয়া ওসমানের দিকে তাকাইল। ওসমান আর বেশী কিছু না বলিয়া ক্রুদ্ধ মনে শিশি-বোতলগুলো চারি-ধারে সাজাইয়া লইয়া বাজরা মাথায় রওনা হইল হাটের উদ্দেশে।

গফুর পুকুরের ভিতর কলমী-লতার উপর বসিয়া থাকা একটি বকতে তাক করিয়া মাটির ঢিল ছুড়িতে চেষ্টা করিতে-ছিল এতক্ষণ। সহসা মাঠের ভিতর দৃষ্টি পড়ায় ওসমানকে দেখিতে পাইয়া কমলা নেবুর কথা মনে হওয়ায় চেঁচাইয়া উঠিল সে,—"বা'জান গো, ও বা'জান, আমার লাইগা একটা কমলা আইনো; বুঝলানি—" সমস্ত রাগ যেন উবিয়া গিয়াছে ওসমানের, সেও চেঁচাইয়া উত্তর দিল,—"হ, আনমু নে।"

কাজলাকাঠির হাট মিলিয়া থাকে খুব সকালেই; তাই একটু বেশী বেলা হইয়াছিল বলিয়া জোরে জোরে পা চালাইয়া আঁকা-বাঁকা মেঠোপথ বাহিয়া চলিতে লাগিল সে। কিন্তু কিছুদূর আগাইয়া আসিলে পর, অছিমদ্দিদের উলুখড়ের ক্ষেতের পাশ-দিয়া চলিয়া-আসা পায়ে-চলার পথে সহসা তাহার দেখা হইল রহমতের সঙ্গে।

রহমৎ কোন আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ীতে বেড়াইতে চলিয়াছে বোধহয়;—মাথায় পরিপাটি করিয়া আঁচড়ান বাবরি-কাটা চুলগুলির উপর পরিয়াছে ফুল-কাটা তাজ; প্রায় হাঁটু-অবধি তুলিয়া-পরা অর্দ্ধময়লা কাপড়ের উপর খুব পরিষ্কার একটি টুইলের সার্ট,—তাহার উপর জড়াইয়াছে একটি কালো তেলসিটে সূতার চাদর; বাঁ হাতে বহুদিনকার পুরাণ, কালি-বিহীন, তালি-দেওয়া একজোড়া ডার্ব্বি সু ও একটি পুঁটুলীতে বাঁধা কয়েকটি কমলালেবু; ডান হাতে তেল-মাখান মসৃণ একগাছি বাঁশের লাঠি।

ওসমানকে দেখিতে পাইয়া রহমতই প্রথম সেলাম জানাইয়া হাসিমুখে বলিল,—"কি মিঞা, আটে চইল্যা নাকি।"

ওসমান রহমতকে ফিরতি আদাব জানাইয়া উত্তর দিল,—"হ, খাঁ সাইব, আটে চইল্যাম—" তারপর একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল: "যাইবেন কৈ?"

মুখে হাসির রেখা টানিয়া জবাব দিল রহমত,—"যাইমু বিবিগো বাড়ী—" কিন্তু সহসা মুখখানিকে মলিন, বিমর্ষ করিয়া দুঃখভরা স্বরে বলিল সে,—"যাইয়া অইচে পর থাইকা বিবির খুব অসুখ মিঞা; অখন এইখানে আইতে চায়; কি করুম, অসুখ না সাইল্লে তো আর আনা যাইবো না; তাই এক-বার দেইখা আইগা; যাইতে কইয়া দিছে—"

তারপর অল্প একটু থামিয়া আবার বলিল,—"আচ্ছা, অখন যাই মিঞা, যাইতে অইবে অনেকদূর; আবার বেলা-বেলিই ফিরবার চাই; তুমি তো যাইবা এদিক সোজা"—এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই পায়ে-চলা মেঠো-পথে পা বাড়াইয়া দিল রহমত।

ওসমান কিন্তু একপাও নড়িল না সেখান হইতে; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহমতের পানে তাকাইয়া রহিল একদৃষ্টিতে। তারপর যখন সে দূরে মোড় ঘুরিয়া, মাঠের পাশে কেয়া-বেত

বনের আড়ালে মিলাইয়া গেল, তখন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ওসমান আপন পথে চলিতে সুরু করিল। মন তাহার তখন নানা চিন্তার ভারে অবনত; ভাবিতে ভাবিতে চলিল সেঃ এই ত রহমত; তাহারি মত গরীব ছিল সে,—কোনরকমে হয়ত এক সন্ধ্যা খাইয়া অথবা উপবাস করিয়া কাটাইত মাত্র। আজ কয় বছর পর পর তাহার জমিতে ভাল ফসল হওয়ায় কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার অবস্থার; তাহার দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন মোড় ঘুরিয়া আজ চলিয়াছে স্বচ্ছলতার দিকে। আর নিজের অবস্থা?—অনাহারে, উপবাসে, কোনরকমে, কষ্টে-সৃষ্টে জীবনের অচল বোঝাটিকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিতেছে মাত্র; জায়গা-জমি প্রায় কিছুই নাই দেনার দায়ে সবই চলিয়া গিয়াছে; নিত্য নিত্য মহাজনের খাতায় অঙ্কের ঘর কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে......আর ভাবিতে পারে না ওসমান, অসহ্য দুঃখে তাহার চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিতে চাহিল।...রহমতের মেয়ে বিবির অসুখ আজ সে তাহাকে দেখিতে যাইতেছে কতকগুলো কমলালেবু লইয়া; আর তাহার একমাত্র ছেলে গফুর—ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে; জীবনের দীপও হয়ত তাহার প্রায় নিবু নিবু হইয়া আসিয়াছে বেশীদিন হয়ত আর বাঁচিবেও না। কিন্তু তাহার ছেলের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবসর কোথায় ?—সংসারের নানারূপ অভাব-অভিযোগ দুঃখকষ্টের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধাকে মিটাইতেই ত তাহার সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতে হয়। আজ সে এতই নিঃস্ব দরিদ্র যে, চিকিৎসা করা ত দূরের কথা, সামান্য একটা কমলালেবু কিনিয়াও গফুরের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে না। নাঃ আজকে সে, সাংসারিক অন্য সব জিনিষ কিনিতে পারুক অথবা না-ই পারুক, কয়েকটি কমলালেবু কিনিয়া গফুরের হাতে দিয়া তাহার সাধ পূর্ণ করিবেই করিবে, নিশ্চয়ই করিবে। সংসারের অভাব ত নিত্যই রহিয়াছে—জীবন-ভর যুদ্ধ করিয়াও সে এই অভাব-শত্রুকে তাড়াইতে পারিবে না, তিলমাত্রও হটাইতে পারিবে না।

ওসমান নানারকম দুশ্চিন্তা-ক্লিষ্ট মনে আস্তে আস্তে চলিয়া চলিয়া হাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রাম্য হাট হইলেও এই হাটটি খুব সকালেই মিলিয়া থাকে এবং জমেও খুব—দশ-বার গাঁয়ের ভিতর ইহার জোড়া মেলা ভার।

ওসমানের পৌঁছিতে অনেক দেরী হইয়াছিল; হাট তখন পুরা জমিয়াছে। সে হাটের ভিতর ঢুকিয়া কিছুদূর আগাইয়া আসিতেই তাহাদের গাঁয়ের নাসিরকে দেখিতে পাইল,—কতকগুলো মূলা বিক্রী করিতে বসিয়াছে সে। ওসমান তাহার নিকট আসিয়া হাসি-মাখা মুখে ডাকিল,—"আটে আইছো মিঞা"—তারপর মাথার বাজরাটি তাহার পাশে রাখিয়া বসিয়া পড়িল সেখানে।

জমিদার-গোমস্তা পঞ্চুবাবু এটা-ওটা দর করিতেছিলেন খুব গম্ভীর চালে এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত গো-বেচারীর মত ধামা লইয়া ঘুরিতেছিল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, বাপ-মা-হারা গণেশ। সহসা ওসমানের দিকে দৃষ্টি পড়ায় পঞ্চুবাবু হাঁকিলেন,—"কিরে, ওসমান নাকি? কি এনেছিস্ রে?"

গোমস্তা-বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহাকে?—ওসমান নিতান্ত সরমে মরিয়া গেল যেন। মুখে সলজ্জ হাসি টানিয়া মাথা প্রায় নীচু করিয়া দইয়ের হাঁড়ি দুইটি দেখাইল সে,—"এই, কত্তা, আপনাগো দয়ায়—"

পঞ্চুবাবু এতক্ষণে লোলুপ-দৃষ্টিতে আগাইয়া আসিয়া দইয়ের হাঁড়ি দুইটি গ্রাস করিয়াছেন,—"বাঃ, বেড়ে দই এনেছিস্ ত, কত বল দেখি?—"

সহসা আবার ডিমগুলোর উপর নজর পড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই ডিমগুলোও তোর নাকি রে?"

ওসমান সলজ্জ-হাসি-মুখে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল,—"হ, কত্তা"

পঞ্চুবাবু তাঁহার পিছনে দাঁড়ান ভ্রাতুষ্পুত্র গণেশকে ডাকিলেন,—"এই হারামজাদা, শূয়োর গেলি কোথা? ডিমগুলো তুলে নে—!" তারপর ওসমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ওরে ধামার ভিতর হাঁড়িগুলোকে ভাল ক'রে বসিয়ে দে' দেখি, ও আবার যেমনি হাবা ছেলে, অর্দ্ধেক হয়ত ফেলেই দিবে—" এই বলিয়া অদূরে একটি বড় কাঁচ কুমড়া দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেলেন সেদিকে।

দইয়ের হাঁড়িগুলো ঠিকভাবে ধামার ভিতর বসাইয়া দিয়া ওসমানও পয়সার জন্য পঞ্চুবাবুর পিছু পিছু কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; লজ্জায় কিংবা ভয়ে জানি না, মুখ ফুটিয়া সে কিছুই চাহিতে পারিল না তাঁহার নিকট।

সওদা করা শেষ হইয়া গিয়াছে; বাসার দিকে রওনা হইলেন পঞ্চুবাবু। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়াও যখন ওসমান তাহার পয়সা পাইল না তখন একরকম মরিয়া হইয়াই যেন বলিল সে,—"কত্তা, আমার পয়সা কয়ডা—"

"ও, তোর পয়সা?" গম্ভীরভাবে বলিলেন পঞ্চুবাবু, "তা' পৌষে কিস্তিতে খাজনা দিয়ে তোর কিছু বাকী ছিল না?—এই ন' আনা, কি দশ আনা! যাক্, এই পয়সা ক'টা তাই থেকে কেটে নিস; আর যা' বাকী থাকে থাকুক্,—তা' পরে দিয়ে দিস এক সময়.....সেজন্য এখন তোকে কোন ভাবতে হবে না! আমি তোকে দাখলে দে' দেব 'খন; তুই কালকে গিয়ে দাখলে নিয়ে আসিস, বুঝলি—" তারপর নিজেকে তাদের পরম-হিতৈষী, অত্যন্ত দয়ালু প্রমাণ করিবার জন্য মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া আবার বলিলেন,—"তা' বুঝলি কিনা, আমি যতদিন রয়েছি, তোদের আর কোন ভাবতে হবে না; আমিই সব—" এই বলিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে জোরে হাঁটিবার হুকুম দিয়া নিজে বড় বড় পা ফেলিয়া আগাইয়া চলিলেন।

ওসমান নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল;—বুকের পাঁজরগুলো তখন তাহার অব্যক্ত ব্যথায় টন্‌টন্ করিতেছিল; অশ্রুতে চোখ দুইটি প্রায় ঝাপসা হইয়া আসিল.....

গ্রামের কাঁচা সড়কটি বাহিয়া পঞ্চুবাবু ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তখন অনেকদূর চলিয়া গিয়াছেন।—

খবরের কাগজের অফিস

শ্রীরঙীন গুপ্ত

খবরের কাগজের অফিস। কাজ চলেছে দিন রাত। এক দল আসে আর এক দল যায়। দৈনিক, অর্দ্ধসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক সবই বেরুচ্ছে। ডিপার্টমেণ্টের শেষ নেই—বিজ্ঞাপন, এজেন্সি, ষ্টোর, একাউণ্ট্স্—এ গেল অফিস। পাশেই কলকারখানায় কাজ চলছে দিন রাত।

জেনারেল ম্যানেজারের ডিপার্টমেণ্টের পাশেই টেলিফোনের কাছে বসে আছে একটি ছেলে, তার মুখ দেখে বোঝবার জো নেই কি খবর সে শুনছে। তিনটে লাইন—নটা এক্সটেনশন্। প্রত্যেক বিভাগে একটা করে লাইন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এত বড় অফিসের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের চেষ্টায়। কাজ সে করে যাচ্ছে। ঘণ্টা বেজে উঠল—হ্যালো, হ্যাঁ কাকে চাই? সম্পাদককে? আচ্ছা দিচ্ছি ধরুন। । আবার ঘণ্টা বাজে—এবার ভেতর থেকে, "হ্যালো"—"exchange"। দিল exchangeকে। আবার ঘণ্টা বেজে ওঠে—হ্যাঁ, কে মারা গেছেন? ডাঃ বসু? কানেক্শন্ দিচ্ছি ধরুন। দিল রিপোর্টারের ঘরে। মারা গেছে, কিম্বা accident, ভয়ানক দরকার—এমনি সব খবর সে দিনের ভেতর হাজার বার পায়। নূতনত্ব তার কাছে কিছু নেই। মাসের শেষে মাইনে পায় কাজ করে যায়। নইলে সখ করে কে আর আট ঘণ্টা ধরে 'হ্যালো, হ্যালো' করে আর কানে ঢুক্তে দেয় ভোঁ ভোঁ টুং টুং টুং ঘণ্টা।

জেনারেল ম্যানেজারের ডিপার্টমেণ্ট—সবাই এসে প্রথমে সেই ঘরেই ঢোকে "হ্যাঁ দেখুন, বিজ্ঞাপনটা দিতে হবে।" "ঐ কোণে সিঁড়ি দোতলায়—দোতলায় যান", "আপনার কাকে চাই?" ম্যানেজারকে কি দরকার? "personal" একটু বসুন, তিনি ব্যস্ত। ডাকবিলির সময় হল। । চিঠি এল শ' পাঁচেক—বক্স নং, বিজ্ঞাপন, সম্পাদক, আরও সব বিভাগের নামে। চিঠি চলল ভাগ হয়ে সব ডিপার্টমেণ্টে। পড়তে পড়তে চোখ জ্বালা করতে থাকে—মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এমনি সব লেখা আর ভাষা। কোন এজেণ্ট হয়ত লিখেছে—"টাকার জন্য ভাবিবেন না—সহসাই পাঠাইয়া দিব।" তিনি ত সহসা পাঠিয়েই খালাস, কিন্তু চিঠির মর্ম্মকথা যারা উদ্ধার করবে, তাদের যে প্রাণ ওষ্ঠাগত সহসাই হয়। কেউ লিখেছেন, ইংরেজী হরপে, কিন্তু ইংরেজী, বাঙলা না উর্দ্দু? হিব্রুও হতে পারে। সব ভাষাই চিঠিগুলোর প্রায় এ রকমের। কিন্তু এসব গা-সওয়া হয়ে যায়—নইলে চলবে না। কেউ হয়ত এসে দেখা করতে (এবার যিনি উত্তর দিচ্ছেন তিনি ৪।৫ বছর এসে কাজ করছেন) ভারিক্কি গলায়—"কাকে চাই?" ম্যানেজারের সঙ্গে একটু বিশেষ দরকার। "এখন হবে না—ঘণ্টাখানেক বসতে হবে।" মনে হয় যেন স্বত্বাধিকারী তিনিই। কিন্তু সুট পরা কিম্বা শাদা চামড়া দেখলে শ্রদ্ধা অথবা সম্ভ্রম বেড়ে ওঠে—"Whom do you want to see please?" "The manager." "Please go in." কি মোলায়েম সুর! কি খাতির! এমনি চলে।

ষ্টোর—সব জায়গা থেকেই অর্ডার আসে—এটা চাই—"নেই—কাল পাবে", আচ্ছা দিচ্ছি, একটু দাঁড়াও—ওরে শিবনাথ, কাগজের রীলগুলো এসেছে—গুনে নিও। "রেট কার্ড ফুরিয়ে গেছে ছাপতে দাও"। আরও কত কি। কালি, কলম, ছুরি থেকে কাগজ, মেটাল টাইপ, কেরোসিন তেল সব কিছুই পাবেন এই ষ্টোরে।

নিউজ এডিটার-এর ডিপার্টমেণ্ট। খবর আসছে সব জায়গা থেকে। সাব এডিটাররা এডিট করছেন, তরজমা করছেন, কোনটাকে কেটে-ছেঁটে, কোনটা বাড়িয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কম্পোজিটারদের কাছে। আবার আসে কবিতা, গল্প আর প্রবন্ধ। সবুজ কাগজে লাল কালি দিয়ে লেখা প্রেমের কবিতা, উদ্ভট প্রবন্ধ আর জীবন কেবল রোমান্স আলেয়ার চমকে ভর্ত্তি—এই নিয়ে লেখা গল্প। মনে হয় সমস্ত বাঙালী নরনারীই কবিতা আর গল্প লিখতে সুরু করেছে। সমস্তই প্রায় বাদ দিতে হয়; কিন্তু তা বলে যা বেরোয় সবই যে খুব ভাল তা নয়। কারণ এখানেও পৃষ্ঠপোষকতা আছে—দলাদলি আছে—লেখকের নামডাকের মোহ আছে। কাজেই এমন লেখাও বার হয় যা দেখলে গা রি রি করে ওঠে। কিন্তু সে যাই হোক, সময়মত ঠিকই বেরিয়ে আসছে, দৈনিক, অর্দ্ধসাপ্তাহিক।

বিজ্ঞাপন বিভাগ সদাই ব্যস্ত, বিজ্ঞাপন চাই-ই; না হ'লে কাগজ চলতে পারে না। অন্তত ৮ পেজ চাই-ই। "রেট কম হবে না। এত হাজার সারকুলেশন বুঝে দেখুন।" ছুটছে এজেণ্ট দলে দলে—বিজ্ঞাপন চাই-ই।

এ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্ট—টাকা জমা নেবার আর দেবার মালিক এরাই—"হবে না মশাই আজকে, পাঁচটা বেজে গেছে, কাল আবার আসবেন।" মাসের প্রথমে মাইনে দেওয়া হবে। 'কই মাইনেটা দেবেন?' "না না, আজকে নয় ব্যাঙ্ক বন্ধ"—মুখের চেহারা ও বলার ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন ভিক্ষে করতে গেছে—এ হল যারা অল্প মাইনে পায় তাদের বেলা। কিন্তু মোটা যাঁরা পান তাঁরা ঠিক মাস পয়লা পুরো মাইনে পাচ্ছেন। শুধু পাওয়া নয় তাঁদের ক্যাশ ঘরে পদার্পণও করতে হয় না—ক্যাশিয়ার বা একাউণ্টেণ্ট খাতাপত্র টাকার থলি নিয়ে হোমরা-চোমরাদের ঘরে যেয়ে সময় হবে কিনা জিজ্ঞেস করে খাতায় একটা সই করিয়ে নেয়। টাকা গুনে দেয়। "উ এতগুলো পাঁচ টাকার নোট কেন?" "আবার টাকা আনেননি দশটা?" এ রকমের অনুযোগও শুনতে হয়।

মেশিন রুম—পাতার পর পাতা কম্পোজ হচ্ছে। সীসার হরফে সাজান পাতার ছাপ তোলা হচ্ছে ফ্লং-এ। সে ফ্লং থেকে আবার সীসার প্লেট ঢালাই হচ্ছে। রোটারি মেশিনে না হ'লে ছাপা হতে পারে না। সমস্ত ঠিক করে ষোল পাতা কুড়ি পাতা একসঙ্গে রোটারীতে ছাপান হ'ল—ছাপা সুরু হ'ল—ভাঁজ হয়ে বেরিয়ে আসছে ঘণ্টায় ১৬,০০০, যেমন খবরের কাগজ খদ্দেররা পাবেন হাতে। আশ্চর্য্য লাগে দেখতে।

খবরের কাগজের অফিস, জাতির সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যাদের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মনে হয় তারা নিজেরা সেটা অনুভব করে না পুরোপুরি।

বছরে ছদিন ছুটি—যন্ত্রযুগে মানুষও যন্ত্রে পরিণত

হয়েছে। তার মনে সাধারণ মানুষের ছোট-খাট সুখ দুঃখ হয়ত দোলা দেয় না আর। বিশ্রামের প্রয়োজনও হয়ত তাদের নেই।

নিষ্পেষিত দুর্ভাগাদের কাহিনী বুকে নিয়ে কাগজ বেরিয়ে আসে জগতের সামনে—সবাইকে বলে "এর প্রতিকার কর।" কিন্তু খবরের কাগজে যারা কাজ করে তারা এ শ্রেণীরও বাইরে। যন্ত্র—রোটারির সুইচে হাত দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার বলছে "খবরদার, খবরদার" অর্থাৎ কল চলল হুঁসিয়ার হও। এখানকার মানুষগুলোও যেন যন্ত্রেরই অংশ বনে গেছে। সত্যিকারের সর্ব্বহারা তারাই। বছরে এক মাসের ছুটি পাবার কথা। দরখাস্ত এরা করে কিন্তু এও জানে এক মাস পুরা মাই-নেতে ছুটি তারা পাবে না এবং এত নিরীহ, ভীরু জীব এরা যে এ নিয়ে হৈ-চৈ করবার মতন শক্তিও এদের নেই। কি জানি—যদি চাকরী নিয়েই টানাটানি পড়ে শেষে। এরা অপেক্ষা করে সেই দিনের যেদিন দরখাস্ত নিয়ে বড়বাবুর কাছে যেতে হবে না—যেদিন আসবে বিরাট মুক্তির ডাক চির অন্ধকার তার আকাশখানি ফুঁড়ে।

নববর্ষ—সবাই আশা করে আছে মাইনে বাড়বে।। কিন্ত এখানেও সেই চিরন্তন প্রথা—সুপারিশ চাই। কাজের দাম এমনি পাবে না—কর্ত্তাদের খোসামুদি করে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে তোমার মূল্য কত।

খবরের কাগজের অফিস। এখানেও যথেষ্ট দলাদলি রয়েছে আগেই বলেছি। কে কার নামে লাগিয়ে একটুখানি পজিশন করে নেবে মালিকদের কাছে। ধাপ্পা দেবার চেষ্টাও আছে।

খবরের কাগজের অফিস। একের দোষে অন্যে শাস্তি পায়—একের কাজের বাহাদুরি অন্য একজন নেয়—কাজ করলে শুধু হবে না—যে যত জোর গলায় চেঁচাতে পারবে তারই তত কর্ম্মপটুতার ঢাক বেজে উঠবে। সে গুণ তার থাকুক আর নাই থাকুক।

এরি মাঝে কয়েকটি ছেলে আছে—তারা ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখে। বাস্তব জগতের ঘাত প্রতিঘাতের এত কাছে থেকেও তারা ভাবে, একদিন তারা এমনিভাবেই মস্ত বড় মানুষ বনে যাবে। নানারকম খবর আসছে, তার ভেতর মনে থেকে যায় শুধু সেই রাজকন্যার কথা যে হোটেলের এক ওয়েটারকে বিয়ে করতে পালিয়ে এল রাজ্য ছেড়ে। রূপকথার রাজপুত্র হয়ে তারাও স্বপ্ন দেখে যে অচিন দেশে রাজকন্যা তাদের সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠে গলায় পরিয়ে দেবে মালা। এরা করে যায় "honest labour"; কিন্তু ঝোপ বুঝে কোপ মারতে না পারলে যে এদেরও বরাতে মিলবে অষ্টরম্ভা—তা ভাববার অবকাশ এদের তারাভরা আকাশে এখনও দেখা দেয়নি।

খবরের কাগজের অফিস—খবর এল কোন বড় লোকের খুব সাংঘাতিক অসুখ। সঙ্গে সঙ্গে বই খাতা নিয়ে ছুটাছুটি সুরু হল একদলের। ফোন চলল। রিপোর্টার ছুটল মোটর নিয়ে—খবর চাই! জন্ম থেকে এ পর্য্যন্ত যা কিছু তার আছে সু-কু যা-ই হোক রঙিন করা চাই। ছবি এল—সঙ্গে সঙ্গে গেল ব্লক তৈরী হতে। তার পরেই ছাপা হয়ে বেরিয়ে পড়ল বাজারে স্পেশ্যাল—এক পয়সা।

মোহনবাগানের খেলা। কাগজ কমপ্লিট—সব তৈরী শুধু খেলার খবরের জন্যে জায়গা রয়েছে—মফঃস্বলে খবর যাওয়া চাই। এল ফোন চলল রোটারি—ঘণ্টায় ১৬,০০০ হাজার কাগজ বেরিয়ে এল।

বৃষ্টি, বাদল, ঝড়, ঝঞ্ঝা, দাঙ্গা, ভূমিকম্প, প্রলয় যা হোক না কেন—খবরের কাগজের অফিস খোলা। কাজ সেখানে চলছে দিন রাত সমানে।। কারণ, মানুষ না খেয়ে থাকতে পারে কিন্তু খবরের কাগজ না পড়ে মানুষ বাঁচে কি করে!

গোধূলি

শ্রীজ্যোতিন্ময় চৌধুরী

আজিকে পড়িল মনে একটি পুরানো কথা
একটি আধেক ভোলা হাসি,—
সাঁঝের আঁধারে যেন দীঘির কাজল জলে
একটি কমল উঠে ভাসি'!
গোধূলি আকাশে বুঝি অতীতের তারাগুলি
ফুটিয়া উঠিবে একে একে!
ভেবেছি ভুলেছি যারে তাহারি চরণরেখা
মরমে রাখিয়া দিবে এঁকে

সে বুঝি পরাণে আসি হাসিবে করুণ হাস
নীরবে চাহিবে মুখে মম,
ভুলিয়া ছিলাম বলি' আঁখিতে কহিবে শুধু,
'আমারে ভুলিবে প্রিয়তম?'
বিস্মৃত স্বপন হেন স্মৃতির দুয়ারে আসি
মরমে করিবে হানাহানি,—
ধূসর গোধূলি মোর নিশিতে হইবে লীন
রঙীন করিবে স্মৃতিখানি॥

প্রত্যাবর্ত্তন

(গল্প)

লেখিকা—পার্ল এস্ বাক্

অনুবাদক—শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

"The streets of the City are straight and true,
But they lead not home, as the brook will do."

চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল গ্রাম-প্রান্তরের পানে অলস দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মনকে সে প্রবোধ দিতে পর্য্যন্ত পারছিল না এই বলে যে, অযোগ্যতার জন্যে তার চাকুরি গেছে। অযোগ্যতার জন্যে তার চাকুরি গেলে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারত। নিজের ওপরে দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে তা'হলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারত। কারণ, নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার ক'রে নেবার মত সততা ও সাহস তার আছে। তাতে সে ভয় পায় না। আর সত্যিই ত, প্রখর মস্তিষ্ক তার নাও হ'তে পারে,—হাতের কাজ দ্রুতগতি সে না ক'রে উঠতেও পারে। তা যদি হ'ত ত সে অনায়াসেই মেনে নিতে পারত এবং কষ্ট হ'ত না কিছুমাত্র। কিংবা এমনও যদি হ'ত যে, তার চেয়ে কোন' যোগ্যতর ব্যক্তিকে তার জায়গায় বহাল করা হ'য়েছে, তাহলে সে খুশীই হ'ত। আর তা'তে খুশী হবার মত সাহস ও মহত্ত্ব তার মধ্যে সত্যিই আছে।

কিন্তু এ কি অদ্ভুত পরাজয়! যার জন্যে নিজেকে কিছুমাত্র দোষ দেওয়া যায় না, কোথাও কিছুমাত্র সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য ব্যয় ক'রে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করতে করতে হঠাৎ যদি একদিন মানুষ শোনে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বড়ই দুর্দ্দিন দেখা দিয়েছে এবং কোম্পানী সে কারণেই গুটিয়ে ফেলা হবে, তা'হলে তার কেমন লাগে? ছ'মাস পূর্ব্বে কোম্পানী তাকে সেই কথাই জানিয়ে দিয়েছে। তার পরও যদি মানুষ আর দশ জায়গায় কাজের সন্ধান করতে গিয়ে শোনে, "তুমি যে খুবই যোগ্য ব্যক্তি তা'ত তোমার সার্টিফিকেট দেখেই আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমরা যে কোনই লোক নিচ্ছি না এখন—"; এর পরেও কি মানুষ বাঁচতে পারে নাকি! তা'হলে যোগ্যতা, উৎসাহ-উদ্যম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মূল্য রইল কোথায়, যদি অসংবরণীয় দৈবই মানুষের জীবনকে এভাবে ব্যর্থ ক'রে দেবে? জীবনে কিছুরই তা'হলে কোন' প্রয়োজন নেই দেখা যাচ্ছে।

ট্রেনের কামরায় ব'সে সে উত্তেজনায় রীতিমত ছট্‌ফট্ করতে লাগল, আর মন-মরা হ'য়ে ভাবতে লাগল যে, আর আধ-ঘণ্টার মধ্যেই হয়ত ট্রেন্ তার গন্তব্য স্থান ছোট ষ্টেশনটিতে গিয়ে লাগবে। তার পিতা হয়ত সেই পুরান ফোর্ডখানা নিয়ে ষ্টেশনে এসে তার জন্যে অপেক্ষা করবেন। তারপরে সেই ফোর্ডে চেপে গ্রাম্যপথ দিয়ে প্রায় মাইল ছয়েক গেলে তবে নিজেদের খামার-বাড়ীতে তারা পৌঁছিবে।

কিন্তু নিজেদের এই গ্রাম্য খামার-বাড়ীকে একদিন সে কি ঘৃণাই না করত! আট বছর আগে সে প্রায় মনস্থই করেছিল যে, আর কখনও সে সেখানে বাস করতে ফি র যাবে না, এক-আধবার হয়ত লোক-জনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেও যেতে পারে, কিন্তু বাসের জন্যে আর কখনই না। শহরে নিজের জীবনের উন্নতির একটা সুন্দর সূচনা সে দেখতে পেয়েছিল, উন্নতির প্রশস্ত পথ সে উন্মুক্ত দেখেছিল। আর কি ভালই যে সে-জীবন তার লাগত—এখন যে তা কত ভাল ব'লে তার মনে হচ্ছে, তা আর ব'লে প্রকাশ করা যায় না! কি চমৎকার সে-জীবন! একঘেয়েমি ব'লে কিছু নেই, সব সময়ই একটা না একটা কিছু নূতন জিনিষ নিয়ে মেতে ওঠবার সম্ভাবনা, উত্তেজনা আর উচ্ছ্বাসময় জীবন। তার ওপরে আবার স্যালি! স্যালি আর সে পাশাপাশি অফিসেই কাজ করত। স্যালির চাকুরি তার আগেই অবশ্য গেছিল। কিন্তু যখন তাদের দু'জনারই চাকুরি ছিল তখন কি আনন্দেই না তাদের দিন কেটেছে। সবকিছু তারা একসঙ্গে করতে ভালবাসত। এক-জনকে বাদ দিয়ে আর একজনার তখন চলতই না। সে-সব কি সুখের দিনই না তাদের কেটেছে! সে স্যালিকে তখন বিয়ে করবার জন্যে একেবারে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল, কিন্তু স্যালি বাধা দিয়েছিল, যেহেতু, চাকুরির স্থিরতা কিছু নেই। স্যালির বিচক্ষণতার প্রশংসা করতেই হয়।

সে বলেছিল, "বিয়ে এখন আমাদের হওয়াই উচিত—স্যালি। এখন আমরা অনায়াসেই আমাদের খরচ চালাতে পারব।

স্যালি তার উত্তরে ধীরভাবেই ব'লেছিল, "না জন, কিছু-কাল আমাদের অপেক্ষা করাই উচিত। দিনকাল যা পড়েছে কোন চাকুরিতেই এখন আর বিশ্বাস করা যায় না। আজ আছে ত কাল নেই, এইত কাজের হাল আজকাল। তোমার একটা পাকা কাজ কিছু জুটলেই আমি আসব। তুমি যেখানেই থাক আমি যাব।"

তার কিছুদিন পরেই জনেরও চাকুরিতে জবাব হ'য়ে গেল। আট মাসের মধ্যে স্যালির সঙ্গে আর তার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। স্যালি যেখানে আছে সেখানে গিয়ে দেখা করতেও জনের আর সাহসে কুলাল না। হাতে যে সামান্য সম্বল তার আছে তা শেষ ক'রে ফেলে স্যালিকে দেখতে যাওয়াও ঠিক হবে না। কি জানি, সবে ত দুর্দ্দিনের সূরু, এর শেষ যে কোথায়, তা কে জানে। ভয়ে তাই জন্ আর দেখা করতেই গেল না। একটু একটু ক'রে হাতের সম্বল তার ফুরিয়ে আসতে লাগল। শেষে খাওয়াই হয়ত একদিন জুটবে না—এই দুর্ভাবনাই তার দেখা দিল। যদিও এমন দুর্দ্দিন সে আগে স্বপ্নে কখন ভাবতে পারেনি। নিজেকে নিতান্ত বিপন্ন মনে ক'রেই সে গাঁয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। নইলে হয়ত অন্নাভাবেই তাকে একদিন মারা পড়তে হত। সাহস ক'রে তাই আর সে শহরে থাকতে পারল না। নিজের বাড়ীতে আর যাই হক অন্নাভাবে তার মরতে হবে না ঠিকই।

চাকুরি যখন ছিল তখন আরও টাকা-পয়সা জমান তার উচিত ছিল। কিন্তু জমান সম্ভব হ'ত কেমন ক'রে? স্যালি চমৎকার নাচ জানত, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখতে ভালবাসত,

আর সে নিজেও ত এসব অত্যন্ত ভালবাসত। কাজেই খরচের কি হিসাব রাখা সম্ভব? খরচ না ক'রে কি পারা যায় নাকি আবার? আহা! কি আনন্দের দিনই না দু'জনার কেটেছে! থিয়েটারের হলে পাশাপাশি দু'জনে ব'সে পরস্পরের হাত ধ'রে থাকার মধ্যে সে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ! সে-সব স্মরণ করতেও দেহ তার রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। আবার সে সুদিন যে কবে আসবে, তা কে জানে।

সহসা ট্রেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। এখানেই তার নামতে হবে। কিন্তু গ্রামকে সে কি ঘৃণাই একদিন করত! এখন উঠে দাঁড়াতেও তাই মন তার আর চাইছে না। না, সে এখানে কিছুতেই নামবে না। যেখানে হ'ক, অন্যকোথাও সে চ'লে যাবে, এখানে যদি কেউ তাকে না দেখে ফেলে ত সে কিছুতেই নামবে না। মুহূর্ত্তের জন্য এই দুশ্চিন্তায় মন তার কাতর হ'য়ে রইল। তারপরেই সহসা তার চোখে পড়ল, তার মা আর বাবা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারই জন্যে। মা'র চোখে-মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কা উপ্‌চে পড়ছে। আর তা'ত হবারই কথা। কেননা, জীবনে ষ্টেশনে কারও জন্যে হয়ত আর তিনি আসেন নি। জীবনে এ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়ত এই তাঁর প্রথম। কাজেই শঙ্কা ও উদ্বেগ খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। সে আরও লক্ষ্য করল যে, তার বাবা ও মা আগের চাইতে অনেক বেশী বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন। মা'র গ্রাম্য সেকেলে উঁচু কালো টুপির আড়ালে মুখ দেখাচ্ছে যেন আগের চাইতে অনেক বেশী শাদা ও শীর্ণ। বাবার মুখের পানে চেয়েও সে দেখল, সেখানেও শীর্ণতার রেখা জেগেছে, বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েছে, কিন্তু মুখে কি চমৎকার প্রশান্তি বর্ত্তমান।

মুহূর্ত্তে সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা এক হাতে তুলে নিল। ট্রেন থেকে ছিট্‌কে যেন নেমে গেল। নেমেই মাকে জড়িয়ে ধরল হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিকতা ও আনন্দ ঢেলে দিয়ে। আহা! মা তার কতটুকু মানুষ, আর কি পাত্‌লা!

একথা তার মনে হ'তেই পারে, কেন না এতকাল একমাত্র স্যালিকেই সে এভাবে মনের আনন্দে জড়িয়ে ধ'রেছে, আর তাকে দেখতেই সে অভ্যস্ত। স্যালি যেমন লম্বা, তেমন সবল সুস্থ তার গড়ন

তারপরে সে হাত বাড়িয়ে বাবার মস্ত সুদৃঢ় হাতখানা ধ'রে হাস্য ক'রে উঠল কতকটা নিজের অপূর্ব্ব অনুভূতিতে অপ্রতিভ হ'য়েই যেন এবং নিজেকে সপ্রতিভ ক'রে তোলবার জন্যেই ব'লে উঠল "সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে শেষে ফিরে এলাম, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন ক'রে নয়, অর্থাৎ বিনাদোষে চাকরি খুইয়ে।"

পিতা বললেন, "তা'তে কিই বা আসে যায় জন্। ঘরে কি তোমার খোরাকের অভাব? হাল চষলেই ত সোনার ফসল।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উজ্জ্বল নীল চক্ষু দু'টি জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলতে লাগল। তিনি পুত্রের হাত এমনভাবে ধ'রে রইলেন যেন তা আর ছাড়তে তিনি চান না।

তারপরেই তারা সকলে মিলে এসে তাদের পুরান ফোর্ড-খানায় চেপে বসল। এতদিনের পর মিলন, তবু বিশেষ কিছুই যেন কারও আর বলার নেই। শেষে জন্ নিজেদের গোলাবাড়ীর কথাই জিজ্ঞেস করল।

পিতা আনন্দের সঙ্গেই বললেন, "নগদ কিছুই এ থেকে আসে না বটে, কিন্তু মাথার 'পরে আমাদের ছাদ রয়েছে, জমিতে আলু আর অন্যান্য নানা ফসল ফলছে, খড় হ'চ্ছে, গোয়ালে সবল সুস্থ গরু রয়েছে, আবার কি চাই শুনি?"

সে বলল, "যা দিনকাল পড়েছে তা'তে মাথার 'পরে ছাদ থাকাটাই খুব বড় কথা।"

পিতা ধীরে ধীরে বললেন, "আর জমি থাকলে সব চেয়ে যা সুবিধার কথা জন্, সে হ'চ্ছে এই যে, মাসের শেষে মুদির পাওনার তাগিদ নিয়ে বিল এসে হাজির হয় না।"

একথা শুনে মা মৃদু হাসির মধ্য দিয়ে সমস্ত উল্লাস জ্ঞাপন ক'রে বললেন, "মজার কথা শোন' ও'র! বুড়া হ'ল, এখনও রসিকতা গেল না।"

পিতা বললেন, "আরও যা সুবিধার কথা, এখান থেকে তাড়িয়ে দেবার ভয় নেই একেবারেই। দিব্যি চাষ কর, খাও দাও। তুমি এখন থেকে চাষ-আবাদেই মন দাও জন্। আমাদের দু'জনার যথেষ্ট কাজ করবার মত এখন জমি হ'য়েছে। ইচ্ছে করলে আমি এখন তোমাকেই ছেড়ে দিতে পারি জমি। অথবা তুমি একটু একটু ক'রে জমি কিনেও নিতে পার নিজের জন্যে।"

সে তাড়াতাড়ি বলল, "আমি ত এখনও ঠিক করিনি বাবা যে, চিরদিন আমি জমির কাজেই লেগে থাকব।"

দেখতে দেখতে তারা বাড়ীতে এসে পৌঁছিল। কিন্তু বাড়ীর আবহাওয়া যে এখনও তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে আছে তা সে ভাবতেই পারেনি। একদিন সে এই ঘর-বাড়ীকেই ত ঘৃণা করতে সুরু করেছিল। প্রথম তারুণ্যে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর কতকগুলো এল্‌ম্ গাছের মধ্যে তাদের এই অপরিচ্ছন্ন অতি সাধারণ বাড়ীকে সে কি বিশ্রীই না দেখত! চোখের সামনে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত গ্রাম করুণ নিষ্প্রাণ যত সব গ্রাম, কেবল ধু ধু করে মাঠ, কোথাও দ্বিতীয় জন-প্রাণীর বা গৃহের আভাস নেই! বিশ্রী বিশ্রীই তার লাগত এসব। কিন্তু আজকের বসন্তের এই প্রভাতে কি শান্তিময় ব'লেই না তার বোধ হ'চ্ছে! চমৎকার লাগছে তার এ-সবই।

একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে সে তার ব্যাগটা রাখল। পিতা যথাস্থানে গাড়ীখানা তুলে রাখলেন। তারপরে যে-ঘরে দশজনে ব'সে গল্প-গুজব করে সেই ঘরে গিয়ে সে বসল। এখনও সে-ঘরের অবস্থা ঠিক আগের মতই যেন আছে। কোন পরিবর্ত্তনই তার চোখে পড়ল না। শুধু মনে হ'ল, সেই সব পুরান জিনিষের 'পরেই যেন একটি দরদী হাতের সেবা-যত্ন অঙ্কিত হ'য়ে রয়েছে। সেই আগের মতনই সব রয়েছে, কিন্তু আগেকার নির্জ্জনতা সে কিছুতেই মনে আনতে পারল না। খুব নির্জ্জন ব'লে যদিও তার বোধ হ'তে লাগল, তবু প্রাণের সাড়া সর্ব্বত্র যেন বর্ত্তমান।

সহসা দেহে ও মনে তার জাগল অপরিসীম অবসাদ। সে উঠে দাঁড়াল এবং মা'র খোঁজে রান্নাঘরের দিকেই চ'লে গেল।

মা'র কাছে গিয়ে একটু লজ্জিত হ'য়েই সে বলল, "মা,

আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে অবসাদ আর ক্লান্তিতে। ট্রেনে ভারি কষ্ট গেছে। এই বেলা দশটার সময় ঘুমুতে বিশ্রী লাগছে, কিন্তু একটু গড়িয়ে না নিলে কিছুই ভাল লাগছে না। বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়ার পরে দেখা যাবে বাবার কতদূর সাহায্য আমি করতে পারি। আমি কুড়েমি ক'রে দিন কাটাতে চাই না এখানে।"

মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ছেলের কথায় সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ফিরে চাইলেন! তারপরে বললেন, "হ্যাঁ, এখুনি শুয়ে পড়গে'। আর তা না হ'লে ক্লান্তি দেহের কাটবে না কিছুতেই।"

সে সোজা ওপরে উঠে গেল এবং সাজ-সজ্জা কোনরকমে ছেড়ে নিজের পুরাতন বিছানায় দেহভার এলিয়ে দিল। চোখ বোজার সঙ্গে-সঙ্গেই ভুলে গেল নিজের পরাজয়, ভুলে গেল শহরের জন্যে প্রাণ-কাঁদা, ভুলে গেল স্যালিহীন নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ। শুধু তার চারপাশে জেগে রইল সুনিবিড় স্তব্ধতা—বিরাট, অপরিবর্ত্তনশীল ও প্রশান্তিময়। আর তারই মধ্যে নিজের সত্তাকে সে ডুবিয়ে ফেলল, হারিয়ে ফেলল। গভীর নিদ্রায় সে মগ্ন হ'ল।

গ্রামের মায়া তাকে আজ আচ্ছন্ন করল, তার সুখ-দুঃখ ভুলিয়ে রাখল। একদিন প্রথম তারুণ্যে গ্রামের এই সর্ব্বগ্রাসী নিস্তব্ধতা তার অসহ্য বোধ হ'য়েছিল। কিছুতেই সে এখানে চিরদিন থাকা বরদাস্ত করতে পারেনি। সারাদিন মাঠে চাষ করা, তারপরে শস্য নিড়ান, তারপরে কলে ধান ভাঙ্গা—এইসব হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মধ্যে দিনাতিপাত, আর সেই সঙ্গে নিজের মস্তিষ্ককে অব্যবহারে পঙ্গু ক'রে তোলা যে কি দুর্ব্বহ জীবন ব'লেই তার মনে হ'ত তখন। সে চাইত তখন নিজের মানসিক পূর্ণ বিকাশ, চাইত বুদ্ধি-চাতুর্য্যের কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে, আর সেই সব কাজ করতেই সে চাইত যা করলে পরে দশজনের মধ্যে সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। নগণ্য চাষা হিসাবে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন পৌরুষই নেই ব'লে সে মনে করত। মাঠে চাষ-আবাদ নিয়ে প'ড়ে থাকা মানেই একটা জানোয়ারের জীবন যাপন করা শুধু। শুধুই খেটে যাওয়া নিজের দেহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। এ চিন্তা অসহ্য ছিল তখন তার কাছে।

কিন্তু আজ সে চিন্তা ক'রে বেশ বুঝতে পারছে যে, এত-দিন শহরে যে জীবন সে যাপন করেছে তাও ত সেই দেহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই শুধু। কই, মানুষের মধ্যে এতদিন সে ত কোন বৈশিষ্ট্যই অর্জ্জন করতে পারেনি। কেউ ত তাকে সাধারণের ঊর্দ্ধে কখনও ভাবতে পারেনি। সেখানে ভিড়ের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সে ত এক রকম হারিয়েই ফেলেছিল। আর যেই বিপদ এল অমনি সে দেখল যে সেখানে তার স্থান পর্য্যন্ত নেই। কিন্তু এখানে স্থানচ্যুত হবার ভয় একেবারেই নেই। আর যাই হোক না কেন, জমি থেকে বিতাড়িত হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। সে যে কত বড় শান্তি ও সুখের কথা, তা এখন সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পারছে। এই সুখ ও শান্তির মাঝে অনায়াসেই সে তার পরাজয়কে বিসর্জ্জন দিতে পারে, সব কিছু ভুলে থাকতে পারে। গ্রাম যে এত শান্তিময় তা সে হয়ত কোনদিনই জানতে পারত না, যদি না জীবনে এমনি অতর্কিতে আসত তার অপ্রত্যাশিত আঘাত। কাজেই সমস্ত কিছু ভুলে সে নিজের সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উদ্যম জমির পিছনেই ব্যয় করতে মেতে উঠল। আর তা'তেই মনে হল যেন রয়েছে তার জীবনের চরম সার্থকতা।

তারপরে একদিন বসন্তকালের প্রত্যূষে মাঠে কাজ করতে করতে সহসা সে আবিষ্কার ক'রে ফেলল যে, শহরে এতদিন গভীর চিন্তাও ত কোন বিষয়ে কিছু সে করেনি। রোজ সকালে সে খবরের কাগজ পড়েছে, রাজনীতিক্ষেত্রের জোরাল জোরাল কেচ্ছা জেনেছে, থিয়েটার বায়স্কোপের খবরাখবর রেখেছে। শুধুই এসব সে জেনেছে, আর জানতেই শুধু সে ছিল ব্যস্ত, কিন্তু কখনও ত এসব নিয়ে স্বাধীনভাবে সে কোন চিন্তা করেনি। আর চিন্তা করবার সময়ই বা ছিল তার কোথায়? একথা মনে হ'তেই সে একেবারে চমকে উঠল। তাই ত শহরে থাকতে একথা ত একবারও তার মনে হয়নি। আশ্চর্য্য কিন্তু!

সে উদার বিস্তৃত মাঠের পানে বিস্মিত দুটি চোখ তুলে চেয়ে রইল। মে মাস। আকাশ শাদা আর নীলে ছোবান—ধূসর পাহাড়ের গায়ে আলো আর ছায়ার লুকোচুরি খেলা। আকাশ বাতাস শান্ত সমাহিত—শুধু একটি পাখীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'চ্ছে গ্রীষ্মের আগমনী সঙ্গীত। আজ এসব ভাবতেও তার চমৎকার লাগছে! আর সত্যিই ত, এর আগে কখনই ত সে এসব ভেবে দেখেনি। সত্যি, এই হ'ল নিভৃতে ব'সে চিন্তা করবার মত স্থান। চিন্তা সেখানেই একমাত্র সম্ভব যেখানে হাজার রকম গোলমাল নেই, যেখানে বহুপ্রকারের উত্তেজনা নেই, যেখানে মন সদা বিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে না বহু কিছুর মধ্যে। গ্রামেই শুধু মন শান্তি পেতে পারে, প্রয়োজন হ'লে সুদূর-বিসর্পী চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে।

এখানে দেহের বিশ্রামও সম্ভব। কিন্তু শহরে থাকতে সারাদিনের খাটুনির পর সমস্ত শরীর তার অস্বস্তিতে রী রী করেছে, বেদনায় জর্জ্জর হয়েছে। তারপরে অফিস থেকে বেরিয়ে নানাপ্রকারের কৃত্রিম আনন্দ আহরণ ক'রে দেহের অশান্তি ভুলতে হ'ত। সে শান্তির মধ্যে ছিল অসম্ভব কৃত্রিমতা। সেখানে জীবন ছিল ভরপুর কৃত্রিমতায় ছাওয়া। আর এখানকার পবিত্র আলো-বাতাসের মধ্যে দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রেও তার দেহে যেন প্রাণের জোয়ার জেগেই থাকে। অফুরন্ত অঢেল স্বাস্থ্যবান ব'লে নিজেকে এখানে তার মনে হয়। সর্ব্বদাই কাজ রয়েছে হাতে, একটার পর আর একটা কাজ, ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করা থেকে বীজ বপন, তারপরে শস্য কাটা, তারপরে কতপ্রকারের যে চাষ তার কি আর শেষ আছে। কাজের শেষ নেই, বিশ্রামের জন্যে অনুযোগ নেই। সব কাজই শেষ পর্য্যন্ত মানুষ ও পশুর আহার্য্য প্রসব করে। আর তা'তেই মানুষ ও পশুর জীবন রক্ষা পায়। এই ত সত্যকার কাজ। মুহূর্ত্তে সে জীবনকে ঠিক সুরে বেজে উঠতে দেখে। জীবনের আনন্দ ছন্দ ও সুর সব সে এই মাঠের মাঝেই গ্রামের কোলে খুঁজে পায়। চমৎকার লাগে তার এ জীবন!

কিন্তু স্যালি? স্যালিকে কি এখানে আসতে লেখা যায়?

স্যালির কথা মনে হ'লেই তার মনে হয়, একসঙ্গে তারা দু'জনে যখন নাচত তখন স্যালির দেহে ছন্দ-সুর যেভাবে ধ্বনিত হ'ত অপরূপ হ'য়ে, সেই অপরূপত্বের কথা! কি চমৎকার নৃত্যই না স্যালি করত! স্যালির অপরূপ দেহ-ভঙ্গিমা আজও তাকে মুগ্ধ ক'রে তোলে! কি সুখেই না তারা দু'জনে একসঙ্গে নৃত্য করেছে! স্যালি অপরূপ একেবারে!

রাত্রের আহারাদির পর তারা তিনজনে—অর্থাৎ পিতা, মাতা ও পুত্র বসেছে এক জায়গায় একটু গল্পগুজব করবার জন্যে। খুব সামান্যই কথা-বার্ত্তা চলছে তাদের মধ্যে এবং খুব শান্তভাবেই। বেশী সময়ই তাদের কাটছে নীরবে। এখানে এসে সে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছে যে, মানুষের মধ্যে ব'সেও মানুষে বেশ নীরবে সময় কাটাতে পারে এবং তা'তে কোন' কষ্টই তার হয় না। নীরবতা ভেঙ্গে দেওয়া আর না-ভাঙ্গা যেন এখানে একই কথা। অবশেষে পিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চতুর্দ্দিক একবার দেখে নিয়ে শু'তে যাই।" ব'লে তিনি একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তারা তাঁর ধীর পদবিক্ষেপ শুনতে লাগল ঘরের চারপাশে।

মা আর সে সেখানে ব'সেই রইল। সে মা'কে একা দেখে তাঁর মুখের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকাল। স্যালির কথাই সে তখন ভাবছিল, কাজেই দৃষ্টি তার সলজ্জ হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু স্যালির সঙ্গে তার মা'র চেহারার কোন' সাদৃশ্যই নেই।

সে বলল, "মা, এখানে তোমার জীবনটা খুব দুঃখেই কেটেছে নিশ্চয়?"

মা বললেন "তাই কি তোমার মনে হয় জন? কিন্তু না, দুঃখ-কষ্ট মানুষে যাকে বলে তা আমি কোনদিনই জানি না জন। আমি এখানে প্রথম আসি আমার উনিশ বছর বয়সে, তোমার বাবার বয়স তখন বাইশ। অবশ্য খাটতে ত আমাদের দু'জনকে হয়েছেই। মানুষকে বাঁচতে হ'লে খাটতে ত হবেই। আর এ খাটুনি ত সামান্যই, কিন্তু খাটলে পরে ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকা যায়।"

সে বলল, "কিন্তু জীবনে তেমন মজা উপভোগ করলে না ত কিছুই।"

মা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি রকম মজা উপভোগ করার কথা তুমি বলছ জন?"

সে মুহূর্ত্তের জন্য একটু চিন্তা করল। তাইত, সে যে মজার কথা বলতে চায় তার সঙ্গে তার মায়ের হয়ত একেবারেই পরিচয় নেই। কাজেই একটু সংকোচের সঙ্গে সে বলল, "আমি সেই মজার কথা বলছি মা—অর্থাৎ কিনা—মেয়েরা যে-সব মজা উপভোগ করতে ভালবাসে—অর্থাৎ থিয়েটার, নাচ-গান এইসব—ভাল পোষাক পরিচ্ছদ—"

মৃদু উপহাসের সঙ্গে মা বললেন, "ও—সেই সব! আমি একবার এক শো'তে গিয়েছিলাম জন্। কিন্তু সে-সব হ'ল যত কৃত্রিম জিনিষ। সে-সব ত আর সত্যি নয়। যেই জানতে পারলাম যে, একজনার মাথা থেকে এই সব বেরিয়েছে, অমনি আর তার মধ্যে আমি কোন' আনন্দই খুঁজে পেলাম না। কিন্তু সত্যিকার আনন্দ আমি খুঁজে পেয়েছি আমাদের জীবনে। সে ওসবের ভেতর নয় জন, নিজেদের কাজের মধ্যে। তোমার বাবা মাঠে কাজ করতেন আর আমি ঘরে। এইভাবে দু'জনে দু'দিক সাম্‌লে আমরা চালিয়েছি আমাদের ছোট সংসার—দু'জনার সংসার। আর তা'তেই ত সত্যিকার আনন্দ পেয়েছি জন। আমার অবসর সময়ে আমি মাঠে গিয়ে তোমার বাবার কাজে সাহায্য ক'রেছি কত সময়। কিন্তু তিনি যদি কোন' অফিসে কাজ করতেন তা'হলে আমি ত তাঁকে সে কাজে কোন সাহায্য করতে পারতাম না। এ আমাদের চমৎকার জীবন কেটেছে জন্। আমাদের ক্ষেত কখনও আমাদের হতাশ করেনি, এক ফসল না ফললে আর এক ফসল ফলবেই, কাজেই অভাবে কখনও আমাদের পড়তেই হয়নি। নিজ বাড়ীতে চিরদিন নিশ্চিন্তে বসবাস করেছি, কাউকে কখনও ভয় ক'রে চলতে হয়নি। নিঃশঙ্ক আনন্দময় জীবন চিরদিন কাটিয়েছি। এই ত সুখের জীবন জন্। এর চেয়ে শান্তিময় জীবন আর কিছু আমি ভাবতেই পারি না জন্। একেই আমি সত্যিকার জীবন ব'লে মনে করি জন। ক্ষেত—আর ক্ষেতে যা কিছু জন্মায় তার চেয়ে সত্য আর কিছুই হ'তে পারে না।"

সে বলল "হুঁ, তা ঠিক। কিন্তু মা, তুমি কি সত্যিই এ জীবনে সুখী? তুমি কি এ চাইতে মা যে, তোমার মেয়ে থাকলে সে তোমারই মত জীবন কাটাত ফের?"

মা বিস্ময়ের হাসি হেসে বললেন, "তুমি কি বলছ জন! সত্যিই আমার এ জীবন চমৎকার একেবারে! নিত্য নূতন কাজ। ক্ষেতের কাজ, গৃহের কাজ, তারপর সন্তান লালন-পালন। কত কি আনন্দের ও সুখের কাজ। স্বামী ও সন্তানদের সেবা, তাদের পরিচর্য্যা, কতকিছু; নিজেকে সব ব্যাপৃত রাখবার কত আয়োজন। ওদিকে খাওয়া-দাওয়ার অভাব নেই, কিছুই—ক্ষেতেই ফলছে সব বারোমাস। এর বেশী মানুষ চায় আবার কি! কোন মেয়েই এর বেশী কিছু আর কামনা করতে পারে না জন্। জীবনের যা কিছু প্রয়োজনীয়, আর ভাল, তা বেছে নিয়ে বাকী খারাপ জিনিষগুলো বাদ দিলে পরে মানুষের জীবন সুখেরই হয় জন্। নইলে দেখা দেয় অশান্তি আর দুর্ভাবনা। জীবন তা'তে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে।"

সত্যি, জীবন তাতে অতিষ্ঠ—দুর্ব্বহই হ'য়ে ওঠে। আর জীবনের সত্যিকার প্রয়োজন হ'ল, ভালবাসা, সুনিশ্চিত কাজ এবং উপভোগের জন্য যথেষ্ট অবসর। এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার মায়ের মুখের পানে বিশ্লেষণকারী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। স্যালির ষাট বছর বয়সে এরকম মুখের চেহারা হ'লে তার কেমন লাগবে? স্যালির মুখে পড়বে ঐ রকম গৃহের ছাপ, অমনি রূঢ় হবে তার হাতের চেহারা, আর অমন সুন্দর দেহ যাবে অমনি বেঁকে। সে কেমন হবে? আর তেষট্টি বছর বয়সে তার চেহারা যদি হয় তার পিতার চেহারার মত ত সেই বা কেমন হবে? সারা দেহে তার পড়বে জমিতে খাটার ছাপ। ......হ্যাঁ, তাই বেশ হবে। মুখে তা'হলে জাগবে তার পিতারই মত অপার প্রশান্তি, চোখ দুটি হবে উজ্জ্বল নীল। সে খুশীই হবে যদি বার্দ্ধক্যে তার নিজের ও স্যালির সর্বকিছু

(শেষাংশ ২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরলোকে মৌলানা সৌকত আলি

গত ২৭শে নবেম্বর ৯-৩০ মিনিটের সময় মৌলানা সৌকত আলী নয়াদিল্লীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্ব্বে হইতে তিনি ব্রন্‌ক্রাইটিস রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

তাঁহার মৃত্যু একান্ত আকস্মিক। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও তিনি আত্মীয় স্বজনের নিকট ২।৩খানা চিঠি লিখিলেন এবং ২।১জন বন্ধুর সহিত আলোচনা করেন। অনুমান ৯ ঘটিকার সময় তিনি বাহিরে আঙিনায় রৌদ্রে গিয়া বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার লোক আসার অপেক্ষায় কিছুক্ষণ শুইয়া থাকেন; কিন্তু তিনি আর উঠেন নাই। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়াই তাঁহার মৃত্যু ঘটে বলিয়া মনে হয়।
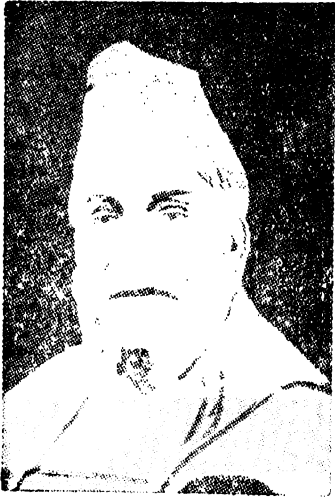
মৌলানা সৌকত আলী

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ রামপুর রাজ্যে মৌলানা সৌকত আলীর জন্ম হয়। আলীগড়ের এম-এ ও কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন। পাঠ্যাবস্থায় খেলাধূলায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি কলেজের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন।

মৌলানা সৌকত আলী সরকারী আবগারী বিভাগে ১৭ বৎসর চাকুরী করিয়া ১৯১১ সালে চাকুরীতে ইস্তফা দেন এবং দেশসেবায় নিযুক্ত হন। মুসলমানের পবিত্র দেশ আরব ও তুরস্ক রক্ষার্থে যে "আঞ্জুমান খুদ্দাম কাবা" সমিতি গঠিত হয়, তিনিই উহার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ১৯১১ ও ১৯১২ সালের ত্রিপলী ও বল্কান যুদ্ধের ফলে ভারতের সর্ব্বত্র যে মুসলমান আন্দোলন হয়, তিনিই তাহার মূল। তিনি কিছুকাল আগা খাঁর সেক্রেটারী ছিলেন এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে ৩০ লক্ষ টাকা সংগ্রহে আগা খাঁকে সাহায্য করিয়াছেন।

গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার ছোট ভাই মৌলানা মহম্মদ আলীর সহিত গ্রেপ্তার হইয়া মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত হিন্দোয়ারায় অন্তরীণ ছিলেন।

যুদ্ধ শেষে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি অমৃতসর কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি সেই সময় কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটি গঠন করেন। করাচীতে পুনরায় তাঁহার ভাইয়ের সহিত রাজদ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া তিনি ২ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে মৌলানা এবং তাঁহার ভাই স্বাধীনতার প্রস্তাব আনয়ন করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা করেন। কারণ ঐ রিপোর্ট স্বাধীনতা প্রস্তাবের বিরোধী এবং উহাতে অনিচ্ছুক মুসলমানদের উপর যৌথ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে মৌলানা এবং তাঁহার ভ্রাতা মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং লাহোরের স্বাধীনতা প্রস্তাব অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মহাত্মা গান্ধী আলী ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে লিখেনঃ—"এই নির্ভীক দুইটি ভাই দেশকে ভালবাসে, কিন্তু তাঁহারা প্রথমে মুসলমান, পরে অন্য সব, ভারতে ইসলামের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করায় তাঁহাদের সহিত অপর কোন দুইজন মুসলমানের তুলনা হয় না।"

১৯২৭ সালের নবেম্বর মাসে মৌলানা সৌকত আলী এবং তাঁহার ভ্রাতা অপরাপর জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের সহিত কলিকাতায় নিখিল ভারত ঐক্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। ঐ সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে একটি চুক্তি হয়। উহা সম্ভব না হওয়ায় তাঁহারা উভয় ভ্রাতা ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম এবং দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাঁহাদেরই চেষ্টায় মুসলমান, অনুন্নত সম্প্রদায়, ভারতীয় খৃষ্টান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ চুক্তি হয়। গোলটেবিল বৈঠকের পরে মৌলানা সৌকত আলি নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য মুসলমানদের পক্ষ হইতে মহাত্মাজীর সহিত দিল্লীতে দেখা করেন। কিন্তু ঐ আলোচনা ব্যর্থ হয়। ঐ সময়ই মৌলানার সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষিত হইলে পর মৌলানা এলাহাবাদ ঐক্য সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯১৬ সালের বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলনে তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। সুলতান ইবনসৌদের উদ্যোগে মক্কায় ঐ সম্মেলন আহূত হয়। জেরুজালেমে ১৯৩২ সালের দ্বিতীয় বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেন। ১৯৩৩ সালে তাঁহাকে আমেরিকায় আমন্ত্রিত করা হয়। মিঃ টি কে শেরোয়ানীর মৃত্যুর পর তিনি উপনির্ব্বাচনে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত হন এবং মুসলিম লীগের একজন নেতা বলিয়া গণ্য হন। কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার কাজকর্ম্ম

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাইতেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র কন্যার মৃত্যু হওয়ায় তিনি বিশেষ শোকাভিভূত হন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, এক ভ্রাতা এবং দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

মহাযুদ্ধের পর তুরস্ক দুর্ব্বল, সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ; খলিফা ও সম্রাট ইংরেজ ও ফরাসীর কৃপার পাত্র। আরবের মেসোপোটেমিয়া, হেজাজ, ট্রান্সজর্ডানিয়া, প্যালেষ্টাইন ইংরেজের করতলগত, সিরিয়ায় ফ্রান্সের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় মুসলমানগণ ইহাকে ইসলামের অতি দুর্দ্দিন বলিয়া মনে করিলেন এবং ইসলামের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের কল্পনা করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে ভারতে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ১৯১৭ সালের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধের পর যে শাসনসংস্কার দেওয়া হইল, তাহা জাতীয়তাবাদীরা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ ও পাঞ্জাবের সামরিক আইনের অত্যাচারে হিন্দু-মুসলমান একত্রে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। ভারতের সেই দুর্দ্দিনে রাজনৈতিক আন্দোলনের শিখরে আসিয়া দাঁড়াইলেন মহাত্মা গান্ধী। সশস্ত্র বিদ্রোহ অসম্ভব নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনও নিষ্ফল—নেতারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়; গান্ধী বলিলেন,—অহিংস অসহযোগই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অবনত করিবার একমাত্র অস্ত্র। হিন্দু-মুসলমান নেতারা একত্র মিলিত হইয়া গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বরাজ ও খিলাফৎ আন্দোলন প্রবল করিয়া তুলিলেন। জাতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভা এক নবরূপান্তরে আত্মপ্রকাশ করিল—এই ইতিহাসে—অভিনব, অভূতপূর্ব্ব আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর পার্শ্বে আলীভ্রাতৃদ্বয়। মৌলানা সৌকত আলী খিলাফৎ কমিটি ও কংগ্রেস কমিটি গঠনে এবং প্রচারকার্য্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। [illegible] শীর্ণদেহ গান্ধীর পার্শ্বে দুঃসাহসী উগ্র [illegible] মৌলানা সৌকত আলী সেদিনের এক দৃশ্য ছিল। সেই আন্দোলনে —হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিচলিত হইলেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯২১ সালে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রথম ভারতব্যাপী এই অহিংস বিক্ষোভ আত্মত্যাগ, কারাভীতিহীন স্পর্দ্ধা দেখিয়া [illegible] ও বিভ্রান্ত হইলেন। তাঁহারা আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, সৈন্য দলে গান্ধীজীর অহিংস মতবাদও সংক্রমিত হইতে পারে। সৈন্য দলকে পদত্যাগ করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব করাচী সম্মেলনে গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাব উপস্থিত ও সমর্থন করার অপরাধে আলীভ্রাতৃদ্বয় এবং আরও ছয়জন নেতা দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ভারতের প্রতি পল্লী নগরে সহস্র সহস্র সভায় ঐ প্রস্তাবটি পঠিত ও গৃহীত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের নেতারূপে কার্য্য করার পর আলীভ্রাতৃদ্বয় নানা পারিপার্শ্বিক কারণে বিশেষভাবে উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রাবল্যে ধীরে ধীরে কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মৌলানা সাহেব লাহোরে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে মতভেদ নিবন্ধন কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়া যান। বৃহত্তর জাতীয় সমস্যার পরিবর্ত্তে ভারতীয় মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সমস্যাই ইহার পর হইতে তাঁহার নিকট মুখ্য হইয়া উঠে। [illegible] কালক্রমে বৃটিশ বিরোধিতাও শিথিল হইয়া বিলুপ্ত হয় এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বাজেয়াপ্ত পেনসন ফিরাইয়া [illegible] অবশেষে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করিয়া মিঃ জিন্নার নেতৃত্ব বরণ করেন। যে নূতন কংগ্রেসের সৃষ্টি তিনি [illegible] করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক স্থান পরিবর্ত্তনের [illegible] সেই কংগ্রেসের বিরোধিতাও তিনি করিয়াছেন। তথাপি রূপান্তরিত কংগ্রেসের অন্যতম স্রষ্টা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক সাহসী নেতারূপে ভারতের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় থাকিবেন। ভারতে অনেক রাজনৈতিক নেতা পরিণত বয়সে উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিবর্ত্তে [illegible] সাম্প্রদায়িকতাবাদী হইয়াছেন। ভারতের জলবায়ু, রাজনৈতিক আবহাওয়া ও বৃটিশ কূটনীতি—এ সমস্ত মিলিয়া যে [illegible] পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাহার [illegible] হইতে অন্যান্য অনেকের মত মৌলানা সৌকত আলীও পরিত্রাণ পান নাই। তবে তিনি সুবিধাবাদী ছিলেন না; দেশ ও সমাজসেবা, সর্ব্বোপরি হিন্দু মুসলমানের স্থায়ী [illegible] ও মিলন সর্ব্বদাই তাঁহার কাম্য ছিল। আমাদের দেশের [illegible] সকল প্রাচীনপন্থী সমসাময়িক কংগ্রেস ও লীগ নেতা [illegible] [illegible] মিলনে বিশ্বাস করেন মৌলানা সৌকত আলী [illegible] [illegible] অতএব তাঁহার অভাবে লীগ-কংগ্রেস দুই [illegible] আপোষের [illegible] ক্ষতি হইল।

অদ্য আমরা তাঁহাকে রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়া না দেখিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন সাহসী সেনাপতি রূপেই অধিকতর উজ্জ্বলভাবে দেখিতেছি। তাঁহার আত্মত্যাগ, দুঃখবরণ, অসামান্য কর্ম্মদক্ষতা ও সংগঠন কৌশল, সাফল্য ও দৃঢ়তা—তাঁহার সহকর্ম্মী এবং কংগ্রেস ও লীগের [illegible] অনাগামী দীর্ঘকাল বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। অদ্য তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মৌলানা সৌকত আলীর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ শোক-কাতরচিত্তে তাঁহার বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিবে। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন বিশিষ্ট জননায়ক ও জাতীয় সংগ্রামের সাহসী যোদ্ধা হারাইল।

পুস্তক পরিচয়

ডি ভ্যালেরা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। আর্য্য পাবলিশিং কোং, ২২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ ১২০। দাম পাঁচ সিকা।

জীবনী সাহিত্যে নৃপেন্দ্রবাবু সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার রচনা যে রসাল ও সাধারণের মনোজ্ঞ, পুস্তকগুলির একাধিক সংস্করণই তাহার প্রমাণ। আলোচ্য পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। সংস্করণ না বলিয়া দ্বিতীয় মুদ্রণই বলা সমীচীন। এখানিতে ১৯২২ সনে মাইকেল কলিন্সের হত্যা পর্য্যন্ত ঘটনা বর্ণিত আছে। ইহার পর ষোল বৎসর অতীত হইয়াছে। ডি ভ্যালেরা এই সময়ের মধ্যে আয়ার্লণ্ডে বিস্তর পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে এই বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হইলে বর্ত্তমানের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইত। তথাপি লেখক অনবদ্য ভাষায় আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত ডি ভ্যালেরা ও তৎকালীন আয়ার্লণ্ড সম্বন্ধে যে সব তথ্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা আজিকার পাঠককেও মুগ্ধ করিবে। ডি ভ্যালেরা ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন প্রচেষ্টা পরাধীন দুর্গতদের প্রাণে প্রতিনিয়ত শক্তি সঞ্চার করিবে। পুস্তকখানির ছাপা বাঁধাই উত্তম। যুবকগণ ইহা পাঠে উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হইবেন।

রাশিয়ার রূপান্তর—শ্রীসুকুমার মিত্র প্রণীত। প্রগতি পাবলিশিং হাউস, ৯১এ, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা। দাম আট আনা।

সোভিয়েট রুশিয়া জগতের চিন্তা ও কর্ম্মধারায় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। এই দেশটির কথা জানিতে বালকবৃদ্ধ সকলেই উৎসুক। ইহার আদর্শ কি, কর্ম্মপদ্ধতি কি, নিজ আদর্শে কতটা সাফল্যলাভ করিয়াছে এই সব প্রশ্ন মনে উদয় হইলেও দরিদ্র, প্রপীড়িত জনসমাজ স্বাভাবিক ভাবেই যেন তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। সাম্যবাদ নিঃস্ব অসহায়দের প্রাণে আশার সঞ্চার করিবেই। লোকে সবিশেষ না জানিয়াও যাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে তাহার আদর্শ ও কর্ম্মে যে লোভনীয় কিছু নিহিত আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুকুমারবাবু সহজ সরল ভাষায় এই বিষয়টিই সাধারণ পাঠকের সম্মুখে ধরাইয়া দিয়াছেন। কি আদর্শে সোভিয়েট রুশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে কি কি পন্থা বা পরিকল্পনা অবলম্বন করিয়াছেন পুস্তকখানিতে তাহা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। কার্ল মার্কসের জীবন কথা, মার্কসবাদ ও লেনিন, সোভিয়েট শাসনতন্ত্র, বোলশেভিক বিপ্লবের পর, পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য প্রভৃতি অধ্যায়গুলিতে পাঠক সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

স্বামীজীর শক্তিমন্ত্র, সেবাধর্ম্ম ও স্বদেশ-প্রেম—শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ এম-এ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। জলপাইগুড়িতে লেখকের নিকট প্রাপ্তব্য।

স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বিনী বাণী হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করে। সুপ্ত মনুষ্যত্বকে সিংহ বিক্রমে জাগায়। লেখক সেই প্রেরণার স্পর্শ তাঁহার দেশবাসীর অন্তরে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ব্যবহারিক শ্বেতসার বা ষ্টার্চ্চ

(১৪১ পৃষ্ঠার পর)

ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহা চাউলের ষ্টার্চ্চের মত অনেক বিষয়েই উপযোগী নহে। আলু ষ্টার্চ্চের নাম ফারিনা (Farina) এবং ঐ নামেই ভারতবর্ষে উহার আমদানী আছে। ভিন্ন ভিন্ন তণ্ডুলে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ষ্টার্চ্চ আছে। চাউলে শতকরা ৭৬ হইতে ৮০ ভাগ, গমে ৬৫ হইতে ৭০, ভুট্টায় ৬৮ হইতে ৭০, বার্লিতে ৫৮ হইতে ৬৪ এবং আলুতে মাত্র ২০ ভাগ শ্বেতসার আছে।

আমাদের দেশে আর এক আকারে ষ্টার্চ্চ আমদানী হয়; তাহাকে ইংরেজীতে Dextrin বা British gum বলে। শুষ্ক ষ্টার্চ্চ ১৪৯° হইতে ২০৪° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে ডেক্সট্রিনে পরিণত হয়। সাধারণত ষ্টার্চ্চ জলে দ্রব হয় না; এমন কি সুরাসার বা ইথারেরও ইহার উপর ক্রিয়া নাই। কিন্তু ডেক্সট্রিন শীতল জলে দ্রব হয় এবং সেইহেতু ইহা হইতে আঠা প্রস্তুত হয় এবং কার্পাস প্রভৃতি শিল্পে লাগে। মোটামুটি শ্বেতসার হইতে, নানা প্রকারের হইলেও কয়েকটি সাধারণ ব্যবহার সকলগুলির মধ্যেই আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আবার প্রত্যেকের কিছু কিছু বিশেষত্ব রহিয়া গিয়াছে। ফারিনা বা আলুর শ্বেতসারের কথা বলা হইয়াছে। চাউল, গম, যব ও ভুট্টার ষ্টার্চ্চের নানারকম গুণের জন্য নানারকম বিলাতী পথ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। চাউল হইতে "British Cornflour", গম হইতে Macaroni, Vermicelli, Italian paste, Shreaded wheat, Force, Grape nuts প্রভৃতি, ভুট্টা হইতে Meizena, Maizeka, Maize-meal, Meblia rice, Homiry, Mush, Tortillas, Polenta প্রভৃতি বড় বড় নামে বিক্রীত হয়। ভুট্টায় শ্বেতসার হইতে যৌগিকরবার প্রস্তুত হইতেছে। যবের শ্বেতসার জগতের বিয়ার (beer) দান করে এবং মল্ট (malt) বা অঙ্কুরোদ্গত যব, এখন পথ্য হইতে আরম্ভ করিয়া নানাপ্রকার অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারে লাগিতেছে। আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে, এই সকল বিষয়ে আমরা মোটেই মন দিই না। আম্বালা শহর ভারতের প্রধান ষ্টার্চ্চের কারখানার জন্য সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতা

রাণীগঞ্জ পেপার মিল শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক, সংগঠন পত্রিকার ও সংগঠনের কর্ম্মীদের বন্ধু ও সহকর্ম্মী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিস্বরূপ সংগঠন পাবলিশিং হাউস "ভারতের শ্রমিক সমস্যা" শীর্ষক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্য-পদক ঘোষণা করিয়াছেন। প্রবন্ধ ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে সংগঠনের সম্পাদকদ্বয়ের মধ্যে যে কোন এক-জনের নামে নিম্নঠিকানায় প্রেরিতব্য।

—শ্রীক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী, শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র, যুগ্ম-সম্পাদক, সংগঠন পাবলিশিং হাউস, পুরুলিয়া, মানভুম।

নিখিল বঙ্গ বাঙলা কবিতা প্রতিযোগিতা

ঝিকারগাছা নবীন সমিতির সাহিত্য বিভাগের পরি-চালনায় একটি নিখিল বঙ্গ বাঙলা কবিতা প্রতিযোগিতা পরি-চালিত হইতেছে। এই প্রতিযোগিতায় বাঙলার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা যোগদান করিতে পারিবেন। কবিতাটি 'শরৎকাল' সম্বন্ধে লিখিত হইবে। কবিতাটির নাম হইবে 'শরৎ'। কবিতাটি ত্রিশ পংক্তির উপরে হইবে না।

যাঁহার কবিতাটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাকে একখানি রৌপ্য-পদক উপহার দেওয়া হইবে। প্রতি-যোগিতায় যোগদান করিবার জন্য কোনরূপ প্রবেশমূল্য দিতে হইবে না। শাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে খুব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রতি-যোগিতায় প্রবেশের শেষ তারিখ আগামী ১৯৩৯ সালের ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত।

—*শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ও গোপীমোহন ঘোষ, সাহিত্য বিভাগ,* ঝিকারগাছা নবীন সমিতি, পোঃ ঝিকারগাছা, জেলা যশোহর।

রচনা প্রতিযোগিতা

শিবপুর সাহিত্য চক্রের উদ্যোগে বাঙলার সমগ্র স্কুল ও কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি বাঙলা ভাষায় রচনা প্রতিযোগিতা হইবে। বিষয়ঃ—"ভারতের রাষ্ট্রনীতিক গতি।" ১ম পুরস্কার একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত কাপ, ২য় পুরস্কার একটি রৌপ্য-পদক, ৩য় পুরস্কার একটি রৌপ্য-পদক। রচনা সংক্ষিপ্ত হইবে এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিত না হইলে গ্রাহ্য হইবে না। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৬শে ডিসেম্বর। প্রতি-যোগিগণকে নিজের ও বিদ্যালয়ের নাম বাড়ীর ঠিকানাসহ পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাক মাশুল দিলে ফেরৎ দেওয়া যাইবে।

—শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, শিবপুর সাহিত্য-চক্র, ৪৮৬।১, সারকুলার রোড, শিবপুর, হাওড়া।

কবিতা প্রতিযোগিতা

আগামী ২৪শে ডিসেম্বর 'রূপলেখা' সাহিত্য-মন্দিরের উদ্যোগে একটি কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙলার নবীন ও প্রবীণ লেখক-লেখিকা নিজ ইচ্ছামত কবিতা পাঠাইতে পারেন। বিষয়-বস্তু আমরা উল্লেখ করিলাম না। যাঁহারা এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ উপহার স্বরূপ দেওয়া হইবে। যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তিনি পাইবেন,—

(১) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রণীত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'শিশু', (২) বঙ্গের খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার প্রণীত দুইখানি কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে "বিস্মরণী" ও "স্বপন-পসারী"। যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তিনি পাইবেন,—(১) সুকবি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'সবহারাদের গান।' (২) বঙ্গের প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস প্রণীত 'চণ্ডীদাস পদাবলী।' কবিতাটি নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবিজনকুমার রায় (সম্পাদক) বড়িসা, 'রূপলেখা সাহিত্য-মন্দির।' (মাঝের হাটী) ২৪ পরগণা।

গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বাণী বিতান সাহিত্য শাখার উদ্যোগে গল্প এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে একটি করিয়া রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। উপযুক্ত গল্প এবং প্রবন্ধ পাইলে দুইটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

প্রবন্ধ বিভাগঃ—নিম্নলিখিত যে কোন একটি বিষয় লইয়া বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে। (ক) আধুনিক সাহিত্যের ধারা (খ) রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী যুগে কাব্যের গতি ও প্রকৃতি (গ) কুটীর-শিল্পে বাঙলার স্থান।

ছোট গল্প লিখিতে হইবে বাঙালীর সামাজিক জীবন লইয়া। গল্প এবং প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ গল্প এবং প্রবন্ধের নির্ব্বাচন করিবেন। ফলাফল ডিসেম্বরের মধ্যেই প্রকাশ করা হইবে। আগামী ২৮শে অগ্রহায়ণের মধ্যে (১৪ই ডিসেম্বর) নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সম্পাদক 'বাণী-বিতান' ৬।৪।সি ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউসন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

গল্প প্রতিযোগিতা

গল্প, সংবাদপত্রে প্রকাশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছান আবশ্যক। ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায়, ৫।৬ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক লিখিত এবং আধুনিক সুরুচিসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কমিটি কর্ত্তৃক বিবেচিত প্রথম স্থান অধিকার-কারীকে "সুনীতি-স্মৃতি রৌপ্য-পদক" উপহার দেওয়া হইবে।

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ ২৯১নং বাগমারী রোড। শ্রীনীতীশ সেনগুপ্ত, ২০৭নং বাগমারী রোড, সুহৃদ-সঙ্ঘ মাণিকতলা।

ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

গল্প একসারসাইজ খাতার ২০ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না। কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রীরাই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। প্রথম স্থান অধিকারীকে একটি রৌপ্য-পদক দেওয়া হইবে। গল্প ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরি-ষ্কারভাবে লিখিয়া ৩০শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে নিম্ন ঠিকানায়

পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ডাক টিকিট দেওয়া থাকলে গল্প ফেরৎ পাঠান যাইবে। ইতি—

শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীশান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ফরিদপুর। ঠিকানা—শ্রীশান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, C/o শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আলিপুর, ফরিদপুর।

ছবি প্রতিযোগিতা

ছবি, সংবাদপত্রে প্রকাশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছান আবশ্যক। বিষয়ঃ—"প্রাকৃতিক দৃশ্য।" সাধারণ ড্রইং কাগজে রঙীন হওয়া আবশ্যক। সাইজ—৬"×৪২"। কমিটি কর্ত্তৃক বিবেচিত প্রথম স্থান অধিকারকারীর নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে এবং একটি রৌপ্য-পদক উপহার দেওয়া হইবে।

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ, ২৪১নং বাগমারী রোড। শ্রীনীতীশ সেনগুপ্ত, ২৩৭নং বাগমারী রোড, সুহৃদ-সঙ্ঘ মাণিকতলা।

গল্প, প্রবন্ধ ও চিত্র প্রতিযোগিতা

বাণী বিতান সাহিত্য শাখার উদ্যোগে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে একটি করিয়া রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। উপযুক্ত প্রবন্ধ এবং গল্প পাইলে দুইটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ-বিভাগ—নিম্নলিখিত যে কোন একটি বিষয় লইয়া বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে। (ক) আধুনিক সাহিত্যের ধারা। (খ) রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী যুগে কাব্যের গতি ও প্রকৃতি। (গ) কুটীর শিল্পে বাঙলার স্থান। ছোট গল্প রচনা করিতে হইবে বাঙালীর সামাজিক জীবন লইয়া এবং চিত্র যে কোন বিষয় লইয়া অঙ্কিত করিলেই হইবে। গল্প এবং প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ প্রবন্ধাদির নির্ব্বাচন করিবেন। আগামী ২৮শে অগ্রহায়ণের (১৪ই ডিসেম্বর) মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প-সহ পাঠাইতে হইবে। কর্ম্মসচিব 'বাণী বিতান' ৬।৪সি ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"আলো" সাহিত্যচক্র

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা

আমাদের প্রথম প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলি বিতরিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় একটি 'পপুলার' ভোটের আয়োজন করা হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতার বিষয়ঃ বাঙলার সব চেয়ে বেশী জনপ্রিয় ১৫জন লেখকের (সব যুগের) নাম (জনপ্রিয়তানুসারে)। পুরস্কারঃ ২০৲ টাকা নগদ ও কমলা-স্মৃতি পদক। যোগদানের শেষ তারিখঃ ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮।

খামের উপর প্রতিযোগিতার নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে। যাঁহারা চক্রের সভ্য তাঁহাদের ভোটপত্রে সভ্য নম্বর উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। এই প্রতিযোগিতায় সর্ব্বসাধারণ যোগদান করিতে পারিবেন। অনুসন্ধানের জন্য ডাক ব্যয় প্রতিযোগীকে বহন করিতে হইবে।

ভোটপত্র আমাদের যে কোন কার্য্যকেন্দ্রে পাঠাইলেই চলিবে। লিখুনঃ—প্রতিযোগিতা সম্পাদক (বাঙলার কার্য্যকেন্দ্র) ৩৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা; (বৃহত্তর বাঙলার কার্য্যকেন্দ্র) বাঘাসুরা, শ্রীহট্ট। আমাদের তৃতীয় প্রতিযোগিতা হইবে বঙ্কিম শত-বার্ষিকী প্রতিযোগিতা। বিশদ বিবরণ পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। শ্রীগোপাল ভৌমিক বি-এ, প্রতিযোগিতা সম্পাদক, "আলো" সাহিত্যচক্র।

রচনা প্রতিযোগিতা

ঢাকা জিলা ছাত্র সমিতির অফিস সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত 'প্রবন্ধ' প্রতিযোগিতার জন্য ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়াছেনঃ—

১। "বর্ত্তমান যুগে ছাত্রদের কর্ত্তব্য"—কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য। রচনা দুই হাজার শব্দের অধিক হইবে না।

২। "সাম্প্রদায়িকতা ও ছাত্র সমাজ"—কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য। রচনা তিন হাজার শব্দের অধিক হইবে না।

কোন প্রকার প্রবেশ মূল্য লাগিবে না। রচনাসমূহ সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক অমিতাভ সেন ১৪নং ষ্টেশন রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

তারিখ পরিবর্ত্তন

(কাশুন্দিয়া শরৎ-স্মৃতি সঙ্ঘ)

৪নং নস্করপাড়া লেন হাওড়াস্থ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে কবিসার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথের "বন্দীবীর" (বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণের নিমিত্ত) এবং "দেবতার গ্রাস" (সর্ব্বসাধারণের জন্য) আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ২৭শে নবেম্বর হইবার কথা ছিল। কিন্তু কতিপয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং বহু প্রতিযোগী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উক্ত সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উক্ত দিবস স্থগিত রাখিয়া আগামী মাসের সুবিধা মত তারিখে নির্দ্ধারিত করিবে। তারিখ প্রতিযোগিগণকে পত্র দ্বারা যথা সময়ে বিজ্ঞাপিত করা হইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক। ৯৪নং কাশুন্দিয়া রোড, হাওড়া।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ২৮শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর) "দেশ" পত্রিকায় যে দুইটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

(১) "বঙ্গে দুর্গোৎসব" প্রবন্ধে বজবজ, ২৪-পরগণা হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু বি-এ প্রথম পুরস্কার একটি স্বর্ণ পদক ও উলুবেড়িয়া, হাওড়া হইতে শ্রীরামপ্রসাদ দে এম-এ, পি-এইচ-ডি দ্বিতীয় পুরস্কারস্বরূপ একটি রৌপ্য পদক পাইয়াছেন।

(২) "আধুনিক বাঙালীর অবস্থা" প্রবন্ধে স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ, কলিকাতা হইতে শ্রীসন্তোষকুমার কর্ম্মকার একটি স্বর্ণ পদক ও হিনু, রাঁচী হইতে শ্রীবিশ্বরঞ্জন দাশ একটি রৌপ্য পদক পাইয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ দাস, সম্পাদক "পল্লীকুটীর", গ্রাঃ—দুর্গাপুর, পোঃ-বিষ্ণুপুর, ২৪-পরগণা।

"একলব্য" ও "রূপোর ঝুমকো"

'শ্রী' চিত্রগৃহে ১৯শে নবেম্বর হইতে ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টসের 'একলব্য' ও 'রূপোর ঝুমকো" ছবি দুইখানি দেখান হইতেছে।

'একলব্য' ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত হরিপদ সোম লিখিত গল্প অবলম্বনে তিনিই চিত্রনাট্য রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন

'সাথী' চিত্রে শ্রীমতী কাননবালা

ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য, অমর ঘোষ, কালীপদ ঘোষ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, তারক বাগচি, রেণুকা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

ছবিখানি অতি সাধারণ। বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার মত কিছুই এই ছবির মধ্যে নাই এবং জ্যোতিষবাবু এই ছবির মধ্য দিয়া বাঙলা চিত্রশিল্পকে কোন একটি দিক দিয়াও সমৃদ্ধ করিতে পারেন নাই। তবে একটি সুখের কথা এই যে, তিনি ছবিখানির মধ্যে রাবিশ ঢুকাইয়া ছবিখানিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই—বরং একলব্য চরিত্রকে কতকটা ঠিকভাবে দেখাইবার চেষ্টাই করিয়াছেন।

একলব্যের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, বিপাশার ভূমিকায় রেণুকা ও দ্রোণাচার্য্যের ভূমিকায় অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রথম শ্রেণীর না হইলেও আমাদের বেশ ভালই লাগিয়াছে। ব্যাধ রমণী একলব্যের মাতার মুখে বাঙলা গান আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না; কিন্তু আমাদের সমর্থন করা বা না-করার উপর পরিচালকের কিছু যায় আসে না; কারণ, রাজলক্ষ্মী যখন গায়িকা তখন যে-ভূমিকাই তিনি গ্রহণ করুন না কেন, গান তাঁহাকে গাহিতেই হইবে; তা সে শোভনই হউক বা অশোভনই হউক! ছবির ফটোগ্রাফী ও রেকর্ডিং মন্দ হয় নাই।

"রূপোর ঝুমকো" ছবিখানিও পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়; আখ্যানভাগ লিখিয়াছেন শ্রীযুত গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সত্য মুখার্জ্জি, নীলু রায়, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, কার্ত্তিক দে, প্রভাস মিত্র, প্রফুল্ল দাস, পারুলবালা, কমলা, কমলকুমারী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

ছবিখানি আমাদের একেবারেই ভাল লাগে নাই এবং অনেক চেষ্টা করিয়াও ছবিখানিকে প্রশংসা করিবার একটি দিকও আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না; সুতরাং এই ছবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলাই ভাল।

* * * * * * *

নিউথিয়েটার্সের নূতন ছবি "সাথী" আগামী ৩রা ডিসেম্বর হইতে 'নিউ সিনেমা' ও 'চিত্রায়' আরম্ভ হইবে। শ্রীযুত ফণী মজুমদার 'সাথী' ছবির কাহিনী লিখিয়াছেন ও পরিচালনা করিয়াছেন। চিত্রগ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুত দিলীপ গুপ্ত ও শ্রীযুত সুধীশ ঘটক; শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুত লোকেন বসু; সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত রাইচাঁদ বড়াল; সম্পাদনা করিয়াছেন শ্রীযুত কালী রাহা এবং সঙ্গীত

শ্রীমতী সাধনা বসু। আগামী ৩রা ডিসেম্বর হইতে ফার্ষ্ট এম্পায়ারে "রূপকথা" নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিবেন

রচনা করিয়াছেন শ্রীযুত অজয় ভট্টাচার্য্য। সম্পূর্ণ চরিত্র-লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ভুলুয়া—সায়গল; মঞ্জু—কাননবালা; ত্রিলোকনাথ—অমর মল্লিক; অমরচাঁদ—শৈলেন চৌধুরী; ভুলুয়া (ছোট)—সুবীর; মঞ্জু (ছোট)—রেখা; পিয়ারী—কমলা; নবু—বোকেন চট্টো-

পাধ্যায়; সংগীত শিক্ষক—অহি সান্যাল; কবি—নরেশ বসু; মধু—পরেশ চট্টোপাধ্যায়; রেডিও ম্যানেজার—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়; থিয়েটার-ম্যানেজার—নির্ম্মল ব্যানার্জ্জি; নৃত্য শিক্ষক—ব্রজ পাল। এতদ্ভিন্ন সত্য মুখার্জ্জি; বিনয় গোস্বামী, শৈলেন পাল, পূর্ণিমা, সুকুমার পাল, সুধীর মিত্র, কেষ্ট দাস, খগেন পাঠক, শ্যাম লাহা প্রভৃতিও আছেন।

* * *

আগামী ৩রা ডিসেম্বর হইতে ফার্ষ্ট এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে বিখ্যাত 'সি এ পি' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নূতন নাটক "রূপকথা" অভিনীত হইবে। শ্রীযুত মন্মথ রায় এই নাটকখানি লিখিয়াছেন। শ্রীযুত মধু বসু প্রযোজনা করিয়াছেন।

ভারতে রূপকথার অনেক কাল্পনিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাহারই একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া—এই নাটকখানি লেখা হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিলাম যে, শ্রীযুত মন্মথ রায় ও শ্রীযুত মধু বসু নাকি এই নাটকের মধ্য দিয়া এমন কয়েকটি জিনিষ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যাহা একেবারে অভিনব। শ্রীযুত অজয় ভট্টাচার্য্য গান দিয়াছেন এবং সুর দিয়াছেন প্রথিতযশা সুরশিল্পী শ্রীযুত তিমিরবরণ, শ্রীমতী সাধনা বসু, শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুত মধু বসু প্রভৃতি 'সি এ পি' সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ ইহাতে অভিনয় করিবেন।

* * * * *

গত রবিবার ২৭শে নবেম্বর রঙমহল রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুত বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নাটক "মেঘমুক্তির" পঞ্চাশৎ অভিনয় রজনী উপলক্ষে "সুবর্ণ জয়ন্তী" উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছেন।

"মেঘমুক্তি" নাটকখানি শ্রীযুত বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের প্রথম নাটক। সুতরাং কেবলমাত্র সাফল্যমণ্ডিত নাটকের জন্যই নহে, শ্রীযুত ভট্টাচার্য্যের প্রথম নাটক হিসাবে এইখানি যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে তজ্জন্য আমরা নাট্যকার শ্রীযুত ভট্টাচার্য্যকে অভিনন্দিত করিতেছি।

পঞ্চাশৎ রজনীর অভিনয় আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। সেই রাত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রাণঢালা অভিনয় আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছি।

* * * *

"নটী" নামে একখানি বাঙলা সবাক চিত্র তুলিবার জন্য কলিকাতায় সম্প্রতি একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুত অনাথ মুখার্জ্জি ছবিখানি পরিচালনা করিবেন এবং শ্রীযুত হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় প্রযোজনা করিবেন।

শ্রীমতী আরতি দেবী লিখিত একটি কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিখানি তোলা হইবে। শ্রীযুত অলোক গাঙ্গুলী চিত্রনাট্য লিখিতেছেন। শিল্পী ও তাঁহার মডেলকে কেন্দ্র করিয়া ইহার আখ্যানভাগ। ক্যালকাটা সিনেটোন নিউজ কোম্পানী ছবিখানি দেখাইবার ভার লইয়াছেন।

* * * *

পরিচালক ফণী বর্ম্মা রাধাফিল্মের হইয়া পৌরাণিক ছবি "জনক নন্দিনী" তোলার কাজে ব্যস্ত আছেন। অহীন্দ্র চৌধুরী, গীতা, সুশীল রায়, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন দাস প্রভৃতি এই ছবিতে অভিনয় করিতেছেন।

* * * *

ফিল্ম করপোরেশন তাঁহাদের টালিগঞ্জের ষ্টুডিওতে "দি রাইজ" নামক একখানি হিন্দি ছবি তুলিতেছেন। পরিচালনা করিতেছেন—শ্রীযুত রণজিৎ সেন। বিভিন্ন ভূমিকায় মুজামিল,রমলা, বিজয়কুমার, মহম্মদ হাদি, দেববালা, ললিতকুমার প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

ফিল্ম করপোরেশন তাঁহাদের আর একটি ইউনিটে শীঘ্রই একখানি বাঙলা ছবি তোলা আরম্ভ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

* * * *

আগামী ২৪শে ডিসেম্বর হইতে চিত্রায় নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি "অধিকার" আরম্ভ হইবে। শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন; চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন ইউসুফ মুলজী; শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন অতুল চ্যাটার্জ্জি এবং সংগীত পরিচালনা করিয়াছেন তিমিরবরণ। বিভিন্ন ভূমিকায়—প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনা মেনকা, পাহাড়ী সান্যাল, ইন্দু মুখার্জ্জি, শৈলেন চৌধুরী, চিত্রলেখা, মণ্টু মুখার্জ্জি, প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

* * * * *

ইন্দ্র মুভিটোনের হইয়া পরিচালক শ্রীযুত চারু রায় "পথিক" ছবি তুলিতেছেন। শীলা হালদার, রমলা, চন্দ্রিকা, মনোরমা, রাজলক্ষ্মী, সুহাসিনী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এই ছবিতে অভিনয় করিতেছেন।

* * * * *

"বেঙ্গল পিকচার্স" নামে সম্প্রতি একটি চিত্র-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের হইয়া বাঙলা ও হিন্দি ছবি পরিচালনা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

গত সপ্তাহ হইতে বোম্বাইর পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত দুইটি খেলার শেষ মীমাংসা হইয়াছে। একটি খেলায় ইউরোপীয় দল অপ্রত্যাশিতভাবে পাশী দলকে ১৮ রাণে পরাজিত করিয়াছে। অপর খেলায় হিন্দু দল অবশিষ্ট দলকে এক ইনিংস ও ১৬ রাণে পরাজিত করিয়াছে। পাশী দল অধিনায়কের পরিচালনার দোষে পরাজিত হইয়াছেন। পাশী দলের তরুণ খেলোয়াড় খোটের ব্যাটিং ও অভিজ্ঞ পলসেটিয়ার বোলিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় দলের ফিলপটব্রুকসের ১৪৩ রাণ ও মারের বোলিং-সাফল্য জয়লাভে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে।

হিন্দু দলের জয়লাভ আনিয়াছে অমরনাথ, মার্চেন্ট ও জয়ের ব্যাটিং ও সি এস নাইডুর বোলিং-সাফল্য। অমরনাথের নিজস্ব ২৪১ রাণ ব্যাটিংয়ের নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। অবশিষ্ট দলের পক্ষে করাচীর খেলোয়াড় হ্যারিস ব্যাটিং ও বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইউরোপীয় বনাম পাশী দল

ইউরোপীয় দলঃ—এইচ এল মারে (অধিনায়ক), আর এফ এইচ ফিলপটব্রুকস, সি টি অর্টন, জে ই টিউ, আর সি সামারহেজ, সি ই ইন্ডার, আর এফ মস, এ এফ ওয়েলসলী, জি ডি চেটউড, কে এস ডবলিউ উইলসন, পি এম ডাউসন।

পাশী দলঃ—বি কে কালাপেশী (অধিনায়ক), ডি আর হাভেওয়ালা, এন এফ ক্যাণ্টিনওয়ালা, এস এন পলসেটিয়া, এস এইচ এম কোলা, সি আইবরা, জে ডি জামসেজী, জে বি খোট, এম প্যাটেল, এফ কে নরীম্যান, কে আর মেহেরমজী।

হিন্দু বনাম অবশিষ্ট দল

হিন্দু দলঃ—মেজর সি কে নাইডু (অধিনায়ক), অমর সিং, অমরনাথ, বিনু মানকড়, এল পি জয়, আর নিম্বলকার, সি এস নাইডু, এস ব্যানার্জ্জি, কার্ত্তিক বসু, ডি হিন্দেলকার, বিজয় মার্চেন্ট।

অবশিষ্ট দলঃ—এ এস ডিমেলো (অধিনায়ক), সি গনশেলভ, জে হ্যারিস, ভাস্কর, পি ফার্নেণ্ডিজ, পি এ ডিভয়নী, জি পেরেরা, এম কোহেন, ডি হাজারী, ম্যাককার্থী **ও ই শ'।**

প্রথম দিনের খেলা

হিন্দুদল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করেন। অবশিষ্ট দলের হ্যারিস ও ডিমেলোর বোলিং ভাল হওয়ায় রাণ উঠা খুবই কঠিন হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ৪ উইকেটে হিন্দু দলের ৮৯ রাণ হয়। মেজর নাইডু ১৬ রাণ, কার্ত্তিক বসু ২১, হিন্দেলকার ১ রাণ, বিনু মানকড় ৩২ রাণ করিয়া আউট হন। ইহাদের পর অমরনাথ ও বিজয় মার্চেন্ট খেলা আরম্ভ করেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর খেলা আরম্ভ করিয়া উভয়ে পিটাইয়া রাণ তুলিতে আরম্ভ করেন। অমরনাথ ৭০ মিনিটে ৫০ রাণ ও বিজয় মার্চেন্ট ১০৪ মিনিটে ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। ইহার পর অমরনাথ বেপরোয়াভাবে প্রতি বলে রাণ করিতে থাকেন। অমরনাথ ১৩২ মিনিট খেলিয়া নিজস্ব শতরাণ পূর্ণ করেন। উক্ত রাণ-সংখ্যার মধ্যে ১২টি বাউণ্ডারী করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় হিন্দু দলের ৪ উইকেটে ২৭৪ রাণ হয়। অমরনাথ ১২০ রাণ ও মার্চেন্ট ৭১ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিজয় মার্চেন্ট হাতে পায়ে খিল ধরায় খেলায় যোগদান করিতে পারেন না। জয় অমরনাথের সহিত যোগদান করেন। দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৪ উইকেটে ৩৩৬ রাণ হয়। অমরনাথ ১৩৯ রাণ ও জয় ৪২ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা

দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করিয়াই জয় ও অমরনাথ সমানে পিটাইয়া খেলিতে থাকেন। জয় ১০০ মিনিটে নিজস্ব শতরাণ পূর্ণ করেন। ইহার পর ৩০২ মিনিট খেলিয়া অমরনাথ নিজস্ব ২০০ রাণ পূর্ণ করেন। দর্শকগণ অমরনাথ ও জয়কে মাল্যভূষিত করেন। ১০৩ রাণ করিয়া জয় আউট হন। ভারতীয় দলের ৪৭১ রাণ হয়। অমর সিং খেলায় যোগদান করিয়া ৬ রাণ করিবার পর আউট হন। ভারতীয় দলের তখন ৬ উইকেটে ৪৯২ রাণ হয়। সি এস নাইডু খেলায় যোগদান করিবার পর অমরনাথ নিজস্ব ২৪১ রাণ করিয়া আউট হন। তিনি ৩৫৭ মিনিট খেলিয়া ও ২৬টি বাউণ্ডারী করিয়া আউট হন। নিম্বলকার খেলায় যোগদান করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় হিন্দু দলের ৭ উইকেটে ৫৬০ রাণ হয়। সি এস নাইডু ৪২ রাণ ও নিম্বলকার ৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। মেজর নাইডু ইনিংস ডিক্লেয়াড করেন।

অবশিষ্ট দলের খেলা

অবশিষ্ট দল খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ৬ উইকেটে ২০৯ রাণ করেন। ভাস্কর ৮৮ রাণ ও ম্যাককার্থী ৩৭ রাণ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। হ্যারিস ৪২ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনের খেলা

তৃতীয় দিনের অবশিষ্ট দল ৩৪৯ রাণ করিয়া ইনিংস শেষ করে। হ্যারিস ১০০ রাণ ও শ' ৫৩ রাণ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১২ রাণের জন্য অবশিষ্ট দল ফলো অন হইতে অব্যাহতি পান না। পুনরায় তাঁহারা খেলা আরম্ভ করেন। গনশেলভ ও হাজারী দলের মোড় ফিরাইবার চেষ্টা করেন। চা পানের সময় অবশিষ্ট দলের ৭ উইকেটে ১৭০ রাণ হয়। কিন্তু ইহার পর পতন আরম্ভ হয়। পর পর দুইজন রাণ আউট হন। অবশিষ্ট দলের দ্বিতীয় ইনিংস

১৯৫ রাণে শেষ হয়। হিন্দু দল এক ইনিংস ও ১৬ রাণে জয়ী হন। খেলার ফলাফলঃ--

হিন্দু দল

প্রথম ইনিংসঃ—৭ উইকেটে ৫৬০ রাণ

(অমরনাথ ২৪১, এল পি জয় ১০৩, বিনু মানকড় ৩২, সি এস নাইডু ৪২ নট আউট, কার্ত্তিক বসু ২৯, বিজয় মার্চ্চেণ্ট ৭১ রাণ (অপরাজিত); হ্যারিস ১৩৪ রাণে ৪টি, ডিমেলো ৭৬ রাণে ১টি, হাজারী ৯৪ রাণে ১টি ও ডিভয়নী ২৪ রাণে ১টি উইকেট পান)।

অবশিষ্ট দল

প্রথম ইনিংসঃ—৩৪৯ রাণ

(ভাস্কর ৪৮, হ্যারিস ১০০, ই শ' ৫৩, নায়ককাথী ৩৭, অমরসিং ৮৩ রাণে ৩টি, সি এস নাইডু ৯৯ রাণে ৫টি, সি কে নাইডু ৮২ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন)।

দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৯৫ রাণ

(হাজারী ৪৪, হ্যারিস ৪৮, পি ক্যার্ণেডিজ ২১, লেসলেভ ৩৫, এস ব্যানার্জ্জি ২১ রাণে ২টি, সি এস নাইডু ৫৩ রাণে ৪টি, সি কে নাইডু ৩৫ রাণে ১টি, নিম্বলকার ৩৫ রাণে ১টি উইকেট পান)।

কলিকাতায় আন্তর্জ্জাতিক ক্রিকেট খেলা

সম্প্রতি ইডেন উদ্যানে ভারতীয় ও ইউরোপীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের মধ্যে এক আন্তর্জ্জাতিক ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। খেলাটি তিনদিনব্যাপী হয় ও শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। ভারতীয় দল অল্পের জন্য জয়লাভে বঞ্চিত হইয়াছে।

এই খেলাটি বন্দোবস্ত করেন বাঙলা ও আসাম ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালকগণ। তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আগামী রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য বাঙলার খেলোয়াড়গণ বাছাই করা। ইউরোপীয় দলটি অধিকাংশ প্রবীণ খেলোয়াড় দ্বারা ও ভারতীয় দলটি অধিকাংশ তরুণ উৎসাহী ভারতীয় খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। সেইজন্য ভারতীয় দল ইউরোপীয় দলের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই খেলায় নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি ও জব্বরের শতাধিক রাণ ও টি ভট্টাচার্য্যের বোলিং-সাফল্য বেঙ্গল জিমখানার পরিচালকগণের মনে ভরসা আনিয়াছে যে, বাঙলা দেশে উচ্চাঙ্গের ক্রিকেট খেলোয়াড়ের অভাব শীঘ্রই দূর হইবে।

সাইকেল-চালনা কি শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম ?

জানকী দাস, লাহোর।

(অষ্ট্রেলিয়ার অর্দ্ধ-মাইল সাইকেল রেকর্ড হোল্ডার)

শরীর সম্বন্ধে পূর্ণ যোগ্যতা তাহাকেই বলা যায়, যে শারীরিক ও মানসিক পটুতার মালিক হইলে লোকে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে নাগরিকের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার গ্রহণক্ষম হয় এবং যে কোন অবস্থায়ই পতিত হউক না কেন, সে তাহার কর্ত্তব্য সুসম্পাদিত করিতে সমর্থ হয়। শরীর ও মনের এই পূর্ণাঙ্গ স্ফূরণ ও স্থৈর্য্যরক্ষা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সম্ভবপর হয় ব্যায়ামচর্চ্চাদ্বারা। এবং তাহারই পরিণামে লোকে যেমন আত্মতৃপ্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনই শ্রমসাধ্য কার্য্য-সাধনে প্রচুর শক্তিলাভ করে। কিন্তু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত বা শ্রান্তি যেমন অনুভূতি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা তাহার প্রতিবিধান করি, ঠিক তেমনভাবে কিন্তু ব্যায়ামস্পৃহা আমাদের দেহে বিকার উপস্থিত করিতে পারে না; এবং এই যন্ত্র-যুগে ব্যায়ামের ক্ষুধা-নিবারণে আমাদের কতকটা কৃত্রিমতার সহায়তাই গ্রহণ করিতে হয়, যাহা আমাদিগকে আদিম প্রাকৃতিকতা হইতে দূরে—বহুদূরে লইয়া যায়।

বাস্তবতার দিক হইতে, ব্যায়াম কম-বেশী একটা সুচিন্তিত প্রয়াস যাহার সাহায্যে উচ্চতম পরিমাণে অক্সিজেন সঞ্চয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অবয়বে রক্ত-সঞ্চালন দ্রুত করিয়া দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন সম্ভব হয় এবং যাহা জীবন-প্রদীপকে উজ্জ্বলতর প্রভায় প্রজ্জ্বলিত হইতে মুহুর্মুহু ইন্ধন জোগাইতে পারে।

এমন বিফল তর্ক করিয়া কোনই লাভ নাই যে নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম একটিই (যাহার যাহাতে রুচি) পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কসরৎ, যদি না সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামকারীর বয়স, শরীর গঠন, পেশা, সামাজিক অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা ও অভিরুচি প্রভৃতি বিচার করিয়া পুরুষ ও নারীর ভেদাভেদ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া যোগ্য ব্যায়াম মনোনয়ন করি।

শরীর-গঠনের সুসামঞ্জস্য এবং অক্ষুণ্ণতা রক্ষার জন্য আমরা সেই ব্যায়ামটিকেই শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ বলিব, যাহা আমরা মনে-প্রাণে উপভোগ করিতে পারি, যাহা আমাদিগকে অবকাশ বা আরামের তৃপ্তির সহিত দৈহিক উন্নতির পথে চালিত করিতে পারে। মোটকথা ব্যায়ামটির এমন শক্তি থাকা দরকার যাহা দ্বারা আমাদের খেলাধূলার আকাঙ্ক্ষা—আমাদের শ্রম-স্পৃহা যথাযোগ্যরূপেই তৃপ্ত করিবে।

শরীর গঠন বা ব্যায়াম-চর্চ্চার যে কোনও পদ্ধতি অনুসরণ করা যাউক না কেন, এবং স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্য লইয়া যত অধিক অধ্যবসায় ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের সহিতই উহা পরিচালিত করা হউক না কেন, উহার প্রধান অসুবিধা হইল একঘেয়েমি। আমাদের কৌতূহল শান্ত করিবার—আবেগের প্রতি সুবিচার করিবার তেমন কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না ব্যায়াম ব্যবস্থায়—ফলে উহাদের যে আত্মপ্রসাদ বা আরামের অনুভূতি প্রদানের ক্ষমতা তাহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় না, যদিও বা হয়, তাহা নিদারুণ বিদ্রোহের ভাব কোন প্রকারে চাপা দিয়া—কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেস্থলে একেবারে গণ্ডীবদ্ধ হয় স্বয়ং-আরোপিত অপরিহার্য্য নিয়মানুবর্ত্তিতার উপর, যাহার একমাত্র নির্দ্দেশ অঙ্গবিশেষকে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বার চালনা করা।

কিন্তু সাইকেল-চালনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসার বিস্তীর্ণ। এমন কি, সাইকেল-চালনার নৈপুণ্য সর্ব্বপ্রকার আয়ত্ত হইলেও, সমতা-রক্ষা (balance) যখন অনায়াস-লভ্য সহজাত অভ্যাসে দাঁড়ায়, তখনও রাস্তার গঠন-পার্থক্য, উহার চড়াই উৎরাই, বায়ুর প্রভাব, সাইকেলের গতি পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা, —এই সমস্তই প্রতিনিয়ত উৎসাহ দান করিতে থাকে এবং

সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে বাধ্য করিয়া একঘেয়েমি বর্জ্জন করিতে সাহায্য করে এবং আরাম-অবকাশের সুযোগও সৃষ্টি করে।

অধিকন্তু সাইকেল চালকের 'খেলার মাঠ' সারা দেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অবশ্য পথহীন নিতান্ত দুর্গম স্থান ব্যতীত। বন-বনানীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, জনবিরল পথের সুযোগ, মনোমুগ্ধকর নিরালা পল্লী, উচ্চ পর্ব্বতের ক্রোড়ে বস্তির ঘনবিন্যাস অথবা 'মৃদুকলনাদিনী স্রোতস্বতীর স্বপ্নময় তীরবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল, বিহগকুলের কলকাকলী, উন্মুক্ত সুনীল আকাশ—পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিবার সুযোগ তাহারই। পথশ্রান্ত পথিক তাহার ক্লান্ত দেহভার বহন করিয়া চলে আর ঈর্ষ্যার দৃষ্টিতে তাকায় সাইকেল-চালকের প্রফুল্ল আননের দিকে। মোটর-আরোহী তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যায় সত্য, কিন্তু সে ব্যক্তিকে তৃপ্ত থাকিতে হয় চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক মাধুরিমার অঞ্চল-প্রান্ত মাত্র নিরীক্ষণ করিয়া।

দেহগঠনের দিক হইতে সাইকেল-চালনা, পদ ও নিম্নাঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাংসপেশীর সার্থক নিয়োগের সহায়ক। নিম্নাঙ্গের মাংসপেশীর পর্যায়ক্রমে দৃঢ়করণ ও শিথিলতা সম্পাদনে আহার্য্য জীর্ণ করিতে যেমন সাহায্য করে, তেমনই যন্ত্রগুলির ক্রিয়া নিয়মিত করে; দ্বিতীয়ত ব্যক্তিবিশেষের দেহ-গঠনের অনুযায়ী বসিবার আসন ও হাতল নিয়ন্ত্রণে দোষ-ত্রুটি না থাকিলে ফুসফুসের শক্তিরও উন্নতি করিতে পারে। উন্মুক্ত বায়ুতে প্রচুর শ্বাসপ্রশ্বাসের সুযোগ পাওয়ায় অক্সিজেন দীপ্তিত হয় পূর্ণমাত্রায় এবং শ্রমজনিত ক্ষিপ্র রক্ত সঞ্চালনের ফলে সকল প্রধান ইন্দ্রিয়েরই সক্রিয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—সঙ্গে সঙ্গে দূষিত পদার্থ বিদূরিত হয়।

অন্যান্য ব্যায়াম অপেক্ষা ইহার প্রধান সুযোগ-সুবিধা এই যে—প্রথমত সচল বায়ুপ্রবাহের ভিতর দিয়া সমগ্র দেহ যে দ্রুতগতিতে নীত হয় এই বিশিষ্টতা অন্য কোনও ব্যায়ামে এত দীর্ঘ সময় পাওয়া সম্ভব নয়। মুখমণ্ডল ও হস্তপদে বায়ুর যে শ্রান্তিহর হিল্লোল তাহার প্রভাব আশ্চর্য্যরকম দূরপ্রসারী। উন্মুক্ত বায়ুতে যাতায়াত এবং সাইকেলের অভ্যস্ত গতির আবেশ এমন একটা পুলক-শিহরণে সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত করে, যাহার তুলনায় কায়িক শ্রমটুকু নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, ইহা চালকের মন-মেজাজের সহিত খাপ খাইতে পারে চরম, কারণ সে ইচ্ছা হইলে যেমন হালকাভাবে সাইকেল চালাইতে পারে তেমনই কঠোর শ্রমের সহিতও চালাইতে পারে যে মুহূর্ত্তে খুশী। অন্য ব্যায়ামে যেখানে শ্রমের মাত্রা নির্দ্ধারিত, পদ্ধতি একঘেয়ে, সাইকেল-চালক সেখানে স্বাধীন সে পরিশ্রম করে কিন্তু উহার কঠোরতা অনুভব করে না। একঘেয়েমি নাই, শ্রমকাতরতা নাই।

এথলেটিকসের দিকে দৃষ্টি দিলে কি দেখিতে পাই? উহার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্পোর্ট 'বিশ্ব অলিম্পিক' তাহার একটি বিষয়েরই নিবিড় পরিচয় করা যাউক। যে কেহ ইহার সংবাদ রাখেন, তিনিই জানেন ইহার যে প্রধান বিষয় দৌড়—তাহাতে কি পরিমাণ বেগ পাইতে হয়—কত বড় ঝক্কি ঘাড়ে লইতে হয় প্রতিযোগীকে। দৌড়-নিরত এথলীট আর চলন্ত সাইক্লিস্ট—দুইয়ের মুখচ্ছবির যদি ফটো তোলা যায় নিমেষ-নিয়ন্ত্রণযোগ্য (instantenious) ক্যামেরায়, তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে কি নিদারুণ একটা ক্লিষ্টতার ছাপ দৌড়দারের মুখখানিতে। আর দৌড় শেষ করিবার মুখে, বিশেষ করিয়া দীর্ঘ দৌড়, যখন প্রতিযোগীরা ফিতায় আসিয়া বুক ঠেকায়, তখন কতজন নিস্পন্দ হইয়া এলাইয়া পড়ে, কতজন বেহুঁস হইয়া যায়, তাহা দেখিতে অবশ্য কাহারও আর বাকী নাই। কিন্তু সাইকেল চালনা বিশেষভাবে যোগ্য। এবং এই কথা স্বীকার সালের অলিম্পিক ম্যারাথন দৌড়ে ডোরাণ্ডার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করুন। দৌড়ের পরিসমাপ্তির আর কয় ফুট মাত্র বাকী, প্রথম স্থান তাহারই হয় হয়, এমন সময় হঠাৎ সে ক্লান্তির আতিশয্যে অসাড় হইয়া পড়িল—পরাজয়ের কালিমা হইল তাহার এমন কঠোর শ্রমের পুরস্কার।

সারা বিশ্বের চিকিৎসকগণ এই বিষয়ে একমত যে, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুসমঞ্জস-দেহ-গঠন সৌন্দর্য্য স্থায়ী করিতে সাইকেল-চালনা বিশেষভাবে যোগ্য। এবং এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত দৈহিক যোগ্যতা ঐ দুইটিকে অর্জ্জন ভিন্ন অসম্ভব। সুগঠিত দেহের যোগ্যতা জাতির ভিতর ব্যাপক করিবার উদ্দেশ্যে যে ৩০০০ হাজার বিটিশ চিকিৎসক সুপারিশ করিয়াছিলেন সাইকেল-চালনাকে উচ্চ স্থান দান করিতে, তাঁহাদের একজন বলিয়াছেন—

আমি মনে করি, সাধারণ ব্যায়ামের সুযোগ ছাড়াও সাইকেল-চালনায় যে সৌন্দর্য্য-বোধ উদ্দীপক ও মানসিক উন্নতিসাধনের শক্তি রহিয়াছে, উহাই উহার প্রধান সার্থকতা। এইজনাই ইহার একটা অবধারিত মূল্য রহিয়াছে যাহা আধ্যাত্মিকতার মতই পবিত্র। ক্ষিপ্রতার প্রতি যে শাশ্বত একটা তৃষা যাহাকে রোগলক্ষণও বলা যায়—তাহার বিরুদ্ধে ইহা প্রতিবাদ-স্বরূপ, এবং প্রতিষেধকও।

——

সাপ্তাহিক সংবাদ

২২শে নবেম্বর—

হাইলাকান্দীতে আসাম পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত **রবীন্দ্রনাথ আদিত্য, ডাঃ** ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট **কংগ্রেস-কর্ম্মী** রায়সাহেব হরকিশোর চক্রবর্ত্তীর গৃহে যাইবার **সময় পথিমধ্যে** ভীষণভাবে প্রহৃত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, **হাইলাকান্দীতে** এক জনসভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত **হয় যে, উক্ত** রায়সাহেবের পুত্র এবং আসাম পরিষদের সদস্য **শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র** চক্রবর্ত্তীকে কংগ্রেস দলে যোগ দিতে অনুরোধ **করা হউক;** অন্যথা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলা হউক। **এই প্রস্তাবের মর্ম্ম** শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তীকে জানাইবার জন্য **তাঁহারা তাঁহার** বাড়ীতে যাইতেছিলেন। এই সম্পর্কে রায়**সাহেব হরকিশোর** চক্রবর্ত্তী, হরিশ চক্রবর্ত্তী এবং অন্যান্য **কয়েকজনকে গ্রেপ্তার** করা হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের হিন্দুগণ শোভাযাত্রা ও বাদ্যভাণ্ড সহকারে **কৃষ্ণসাগর পুষ্করিণীতে** ১১ খানি কালীপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ কালীপ্রতিমাসহ মিছিল করার লাইসেন্স দিয়াছিলেন। শোভাযাত্রায় ২০ হাজার লোক যোগ দিয়াছিল।

ওয়ার্দ্ধায় গান্ধীজী চকে এক বিরাট জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—"বৈদেশিক রাজ্যগুলি বেকারদের জন্য আহার ও কাজের সংস্থান করিয়াছে। ইংলণ্ডে অনুমান ২০ লক্ষ বেকারকে মাসিক ৫০ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করা হইতেছে। তথাপি তাহারা সন্তুষ্ট নহে। আর ভারতবর্ষে ঐ পরিমাণ টাকা বাবুদের ও কেরাণীদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে আছে, তথাপি গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থাই করেন না।"

পণ্ডিতজী গত দুই দিন দুইবার মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি-গতি সম্পর্কে মহাত্মাজীকে তাঁহার অভিমত জানান।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু লক্ষ্ণৌ জেলে যাইয়া রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রপতির সহিত বন্দীদের পৌনে এক ঘণ্টাকাল কথাবার্ত্তা হয়।

লক্ষ্ণৌ-এ সাংবাদিকগণের নিকট রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের স্বায়ত্তশাসনাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জ্জন আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তিনি আরও বলেন যে, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল রাজকোটের প্রজাদের আন্দোলন যে ভাবে সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেসের দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত নীতির সহিত অসামঞ্জস্যের কিছুই নাই; কেননা, হরিপুর কংগ্রেসে ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকেও দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনে যোগদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলা মুসলীম লীগের সদস্যগণ উক্ত লীগের সেক্রেটারী মৌলবী গোলাম মুর্ত্তাজা সাহেবের [illegible]মত কাজ করেন না বলিয়া মৌলবী নুর্[illegible]সাহেব নাকি পদত্যাগ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, বর্দ্ধমান জেলা হিন্দুসভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার মিত্রও সদস্যগণের সহিত মতবিরোধের ফলে পদত্যাগ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে পিকেটিং অভিযোগে আটজন স্বেচ্ছাসেবিকা ৫০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৬ সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মহীশূর গণ-আন্দোলন সমিতির এক সভায় অবিলম্বে মহীশূর রাজ্যে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তনের দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

চুংকিং-এর এক সংবাদে প্রকাশ যে, পিপিং, সাংহাই, নানকিং, ক্যাণ্টন ও হ্যাঙ্কাও অধিকার করবার ফলে জাপানীরা 'চীনের নবগঠিত কেন্দ্রীয় সরকার' নামে একটি তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবে। পিপিং, নানকিং-এর তাঁবেদার রাষ্ট্রও নবগঠিত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আমেরিকা সেণ্টলুসিয়ায় আট মাইল ব্যাপী স্থান ধ্বসিয়া যাওয়ায় দেড়শত লোকের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হইয়াছে।

কমন্স সভায় আলোচনাকালে মিঃ নোয়েল বেকার জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের ইহুদী বিরোধী নীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের সম্বন্ধে অবিলম্বে একটা সাধারণ নীতি অবলম্বনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমেত বিভিন্ন জাতি মিলিয়া একটা সম্মিলিত চেষ্টা করা হউক। মিঃ নোয়েল বেকারের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২৩শে নবেম্বর—

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত নোয়াপাড়া নিবাসী মুক্ত রাজবন্দী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন দেব ১৩ই নবেম্বর হইতে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি গত ডিসেম্বর মাসে মুক্তি লাভ করেন। তাঁহার বিধবা মাতা ও পাঁচটি ভাই-ভগিনী আছেন। কিন্তু পরিবারে উপার্জ্জনশীল কোন লোক নাই। ইহাতে অর্থাভাবে নিরুপায় হইয়া তিনি অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

গয়ার যাত্রীদের উপর পাণ্ডাদের অনাচার অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহে ও সভা সমিতিতে এই বিষয় আলোচিত হওয়ায় পাণ্ডাদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে এবং অনেক পাণ্ডাই এখন গত ১৯২৪ সালের চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

হায়দরাবাদে দমননীতির প্রতিবাদে নিজাম সরকারের একমাত্র হিন্দু মন্ত্রী রাজা শ্যামরাজ রাজবন্ত বাহাদুর পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, প্রধানমন্ত্রী স্যার আকবর হায়দরী নিজেও দমননীতির বিরোধী এবং তিনিও একবার পদত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন।

সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশের সীমা কতদূর, নামী প্রেসের কিপারের জামিন বাজেয়াপ্ত মামলায় লাহোর হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের রায়ে তাহার আলোচনা হইয়াছে। নামী প্রেসে

মন্দ্রিত 'বীরভারত' পত্রিকায় হিসার জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কিত এক রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় এই মামলার উদ্ভব হয়। বিচারপতিগণ বাজেয়াপ্তের আদেশ বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন সমালোচনা ভিন্ন শুধু দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশিত হইলে তাহা প্রেস আইনে পড়ে না।

বগুড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আক্কেলপুর কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলায় কংগ্রেস অফিস নির্ম্মাণ লইয়া বিরোধ সম্পর্কে ১১ জন কংগ্রেস-কর্ম্মীকে অভিযুক্ত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেককে ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যে সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত কুলী কাজ করে, তাহাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ সমস্ত কুলীদের নিয়োগকর্ত্তা লেবার কণ্ট্রাক্টার সম্প্রতি ২৮ জন কুলীকে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করিয়া তাহাদের স্থলে কয়েকজন নূতন কুলী নিয়োগ করিয়াছেন। ইহার ফলেই নাকি ঐ কুলীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু লক্ষ্ণৌ-এ সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট যুদ্ধ বাধিলে কংগ্রেস কি নীতি অবলম্বন করিবে তাহা বর্ণনা করিয়া নিম্নোক্ত উক্তি করেন,—"যুদ্ধ বাধিলে কংগ্রেস কি কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিবে, তাহা নির্দ্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা কঠিন; তবে ইহা ঠিক যে, কংগ্রেসের যুদ্ধ বিরোধী কর্ম্মপন্থা সম্পূর্ণ অহিংস ধরণের হইবে। যুদ্ধ বাধিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে আমরা কেবলমাত্র অসম্মতিই জ্ঞাপন করিতে পারি। আবার ভারতীয়দের পক্ষ হইতে কেহ কেহ বৃটিশ সরকারকে সহায়তা করিতে যত্নবান হইলে অহিংসভাবে আমরা তাহাতে বাধাও দিতে পারি।"

রাজনন্দগাঁও দরবার শ্রমিক-নেতা শ্রীযুক্ত রুইকর ও তদীয় পত্নীর উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত রাজ্যে প্রবেশ করিতে বারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে রাজ্যে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে, এই অজুহাতে নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে।

হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ইমরেদী পদত্যাগ করিয়াছেন।

গণতন্ত্রী স্পেনের অধিবাসীদের জন্য খাদ্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেশবাসীর নিকট এক আবেদন জানাইয়াছেন।

'ফায়নাফেল' (ডি' ভ্যালেরার পার্টি) সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ ডি' ভ্যালেরা ঘোষণা করেন যে, আয়র্ল্যাণ্ডে গণতন্ত্র ঘোষণা করার পক্ষে আইনতঃ কোন বাধা নাই।

২৪শে নভেম্বর—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু লক্ষ্ণৌ হইতে লাহোরে গিয়াছেন। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে পাঞ্জাবে ইহাই তাঁহার প্রথম পদার্পণ।

লাহোর সাংবাদিকদের নিকটে রাষ্ট্রপতি এক বিবৃতি দেন। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বাঙলার মন্ত্রিসভার পতন দুই দিন আগেই হউক, পরেই হউক—অনিবার্য। তিনি আরও বলেন যে, নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইলে একজন মুসলমানই প্রধানমন্ত্রী হইবেন এবং ওয়ার্কিং কমিটি নির্দ্দেশ দিলে কংগ্রেসীরাও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া রাষ্ট্রপতি বলেন যে, কংগ্রেস-বিরোধী মন্ত্রিমণ্ডলী অপেক্ষা কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন ভাল—আসামের দৃষ্টান্তই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মহম্মদ মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী এম-এল-এ প্রমুখ নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য উক্ত সমিতির সম্পাদক মিঃ সামসুদ্দীন আমেদের নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন। উহাতে মৌলবী সামসুদ্দীন আমেদের অবৈধ ও অন্যায়ভাবে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে বিবেচনার জন্য সমিতির এক জরুরী সভা আহ্বান করিবার অনুরোধ করা হইয়াছে এবং তাঁহার সমিতির সম্পাদক পদ ও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ দাবী করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত দেখা করিয়া ৪৫ মিনিটকাল তাঁহাদের সহিত আলাপ করেন। বন্দিগণ রাষ্ট্রপতিকে জানান যে, তাঁহারা হিংস নীতি বর্জ্জন করিয়াছেন এবং মুক্তি পাইলে তাঁহারা কংগ্রেস কর্ম্মপন্থাই গ্রহণ করিবেন।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে স্মৃতি পূজার অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতার নাগরিকগণ কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে ও এলবার্ট হলের জনসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

টালীগঞ্জ চারুমার্কেটে চব্বিশ পরগণা জেলা যুব-সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রতুল গাঙ্গুলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

প্রভাতী টেক্সটাইল মিলসের ভিত্তি স্থাপন উৎসব পানিহাটিতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্ল রায় ভিত্তি স্থাপন করেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রমিককর্ম্মী কমরেড ফণী ঘোষ ও অপর ১৫ জন শ্রমিকের উপর ১৪৪ ধারা জারী করিয়া খিদিরপুরের কয়েকটি এলাকার মধ্যে সভা ও শোভাযাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ঈদের নমাজ উপলক্ষে কলিকাতা গড়ের মাঠে এ বৎসর দুইটি বিভিন্ন স্থানে জমায়েত হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ইমামতীর বিরুদ্ধে কলিকাতা মুসলিম লীগ ও খিলাফৎ কমিটি যে আন্দোলন চালাইতেছিল, তাহার ফলেই এই বৎসর দুইটি জমায়েৎ হইল। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ না ঘটে, তজ্জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কোনটিতেই ইমামতী করেন নাই।

পেশোয়ার হইতে ৩০ মাইল দূরে নওসেরা ক্যাম্পে জনৈক নিহত শাস্ত্রীর গুলীর আঘাতে তিনজন বৃটিশ অফিসার এবং একজন মুসলমান সিপাহী নিহত হইয়াছে।

প্যারিসে ইঙ্গ-ফরাসী বৈঠকের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। বৃটেনের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন ও পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফাক্স এই আলোচনায় যোগদান করেন। বৈঠকে প্রস্তাবিত ফরাসী-জার্ম্মান অনাক্রমণাত্মক চুক্তির বিষয় আলোচিত হয়। মিঃ চেম্বারলেন এই আলোচনায় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। অতঃপর ইঙ্গ-ফরাসী সামরিক সহযোগিতার বিষয়ও আলোচিত হয়। এই সময় প্রধানমন্ত্রী মঃ দালাদিয়ের ফ্রান্সের মনোভাব বিশ্লেষণ করেন এবং মিঃ চেম্বারলেন তাহার উত্তর দেন।

হংকং-এর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ যে, দুই হাজার জাপানী সৈন্য হংকং-এর পশ্চিমে নামতাউ-এর নিকটবর্ত্তী তাইপিংসিন-এ অবতরণ করিয়া এখন সীমান্তস্থিত গ্রাম সুমচুন অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ওদিকে জাপানীরা শেকুলাং-এর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া হংকং-এর সীমান্তের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

২৫শে নবেম্বর—

আসামের গোলাঘাটের মিকির পাহাড় নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত শ্রীযুত খোরাসিং টেরাং এম-এল-এ এবং দক্ষিণ মঙ্গলদই কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত শ্রীযুত পুরন্দর শর্ম্মা এম-এল-এ—এই দুইজন স্যার সাদুল্লার সম্মিলিত দলত্যাগ করিয়া কংগ্রেস কোয়ালিশন দলে যোগদান করিয়াছেন।

পুরুলিয়া হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে বলরামপুর ষ্টেশনের নিকট দিন দুপুরে এক দুঃসাহসিক মেল ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

ছাপরার চিনপুরে একটি চাঞ্চল্যকর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, একজন বাণার নোটব্যাগ লইয়া যাইবার সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, উক্ত বাণারকে সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

শ্রীহট্টে সারদা মেমোরিয়াল হলে আসাম প্রাদেশিক জমিয়েৎ-উল-উলেমার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে প্রদেশের নানাস্থান হইতে প্রায় ত্রিশত প্রতিনিধি এবং বহু দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন। আসামের মুসলমানদের উপর মুসলিম লীগের প্রভাব যে কত কম, ইহা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

বোম্বাই শহরে জোর গুজব যে, দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট লাভের যে সকল আন্দোলন চলিতেছে তাহা ধ্বংস করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শীঘ্রই কতকগুলি অর্ডিন্যান্স জারী হইবার সম্ভাবনা আছে।

ঢেনকানল প্রজামণ্ডলের প্রথম ডিক্টেটর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী মহাপাত্র গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেট কংগ্রেসের সভ্য মিস মাসকারিণ রাজদ্রোহকর বক্তৃতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

মিশরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী এবং ওয়াফদ দলের নেতা নাহাস পাশা কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে যোগদানের জন্য ভারতে আসিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু জলপাইগুড়িতে এক বিরাট জনসভায় বিপুল জয়ধ্বনির ভিতর ঘোষণা করেন যে, ভারতের উপর জোর করিয়া যদি যুক্তরাষ্ট্র চাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী এবং ভারতবাসী ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই সংগ্রামের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই দায়ী হইবেন।

গতকল্য শিলচরে ঈদ-জমায়েতে কংগ্রেসী সদস্য মৌলবী গোলাম সবীর খাঁ নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে স্থানীয় মুসলিম লীগ সেক্রেটারী উকিল মুকুবীর আলি প্রমুখ চারি ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বিনা লাইসেন্সে একখানি কালীপ্রতিমা শোভাযাত্রা সহকারে বিসর্জ্জন দেওয়ায় শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার মিত্র প্রমুখ বর্দ্ধমানের ৬ জন হিন্দু নেতা অভিযুক্ত হইয়াছেন।

লালগোলার মহারাজা স্যার যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র কুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় ৬০ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার বয়স প্রায় একশত বৎসর।

আমেরিকার হলিউডের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে দাবানল জ্বলিয়া একটি বিশাল প্রমোদ ভবন এবং দুইশত বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে।

২৬শে নবেম্বর—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ডি লিট উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে ৩৯৮ মাইল দূরে মোরবাণীর নিকট ফ্রন্টিয়ার মেল লাইনচ্যুত হয়। ইহার ফলে বি বি সি আই রেলের চীফ মেডিক্যাল অফিসার লেঃ কঃ এস এ উইলকিনসন নিহত হইয়াছেন।

মহালক্ষ্মী মিলের ধর্ম্মঘট সম্পর্কিত মামলায় মাদুরার সাব-ম্যাজিষ্ট্রেট পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুক্ত মথুরাম পিল্লেকে জামিন মুচলেকা দেওয়ার নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত মেথার জামিন মুচলেকা দিতে অস্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভার সমাজতন্ত্রী দল বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজনন্দগাঁও রাজ্যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে।

মহীশূর ষ্টেট কংগ্রেসের উদ্যোগে মহীশূরের সর্ব্বত্র বিদুরাশ্বত্থ দিবস প্রতিপালিত হয়।

হরিজন পত্রিকার অদ্যকার সংখ্যায় জার্ম্মানীর ইহুদীদের সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে মহাত্মাজী নির্য্যাতিত ইহুদীগণকে অহিংস নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

বঙ্গীয় চটকল মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে কলিকাতায় বাঙলার বিভিন্ন চটকলের শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে চটকল সাধারণ ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্যারিসে ইঙ্গ-ফরাসী বৈঠকের অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

২৭শে নবেম্বর—

মৌলানা সৌকতআলী ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়া দিল্লীতে পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। মৌলানা সৌকতআলী খেলাফৎ আন্দোলনের নেতা ছিলেন এবং গত অসহযোগ আন্দোলনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু পাঞ্জাবে সফর করিতেছেন। পাঞ্জাবের অধিবাসিগণ রাষ্ট্রপতিকে রাজকীয় আড়ম্বরে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে।

উড়িষ্যার ঢেনকানল ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে উড়িষ্যার সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ চৌধুরী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগামী বৈঠকে ঢেনকানল সম্পর্কে আলোচনা হইবার সম্ভাবনা আছে।

সীমান্তের উপজাতীয় দস্যুরা পুনরায় আর একটি লুঠ করিয়াছে। ১২ জন আরোহী অপহৃত হইয়াছে। বান্নু শহরে উপজাতীয় লস্করদের সমাবেশের সংবাদে শহরবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লকলেজ ইউনিয়নের উদ্যোগে গতকল্য ও অদ্য ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে এক বিতর্কের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিতর্কের বিষয় ছিল,—"ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের কোন যুদ্ধে যোগ দেওয়া উচিত হইবে না।" কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার উভয় দিনই বিতর্ক সভার সভাপতিত্ব করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমারী কে গুপ্তা প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং মিঃ মজহর আলী (পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই বিতর্কে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিজয়ী হওয়ায় আশুতোষ পদক ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়।

২৮শে নবেম্বর—

হায়দরাবাদের ৪র্থ ডিক্টেটর একারেন্ডী ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও একশত টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় আরও এক মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

রাজকোটের বিভিন্ন গ্রামে ৮০ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। রাজকোটের একটি সভায় বক্তৃতা করায় বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন বক্সী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

হায়দরাবাদের ঔরঙ্গাবাদ কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রগণকে "বন্দেমাতরম" সংগীত করিতে নিষেধ করায় তথায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষও অনুরূপ আদেশ জারী করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

ভারত সরকার মৌলানা ওবেদুল্লাকে ভারত প্রবেশের অনুমতি দিয়াছেন। রাজনৈতিক কারণে তাঁহাকে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল।

ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজের একখানি ডাকবাহী বিমানপোত মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত হ্যাবানিয়া হ্রদে অবতরণ করিতে গিয়া বিধ্বস্ত হইয়াছে। উক্ত বিমানের ৪ জন কর্ম্মচারী নিখোঁজ ও দুইজন কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে।

কালসিয়া রাজ্যের একশতজন রাজনৈতিক বন্দী তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থায় এবং কাপড়-চোপড় সরবরাহের দাবী পূরণ না করার প্রতিবাদে গত ২৫শে নবেম্বর হইতে অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন।

ফ্রান্সে বিষম সংকট দেখা দিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক বিধানগুলির প্রতিবাদকল্পে সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান আগামী ৩০শে নবেম্বর ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছেন। এই ধর্ম্মঘটে ৪০ লক্ষ শ্রমিক যোগদান করিবে। ধর্ম্মঘট ঘোষিত হইলে ফ্রান্সে ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, রেলওয়ে, ট্রাম, বাস, সংবাদপত্র ইত্যাদি বন্ধ হইয়া যাইবে। একদিকে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদল ধর্ম্মঘট সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং অপর দিকে গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মঘট ব্যর্থ করার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছেন।

প্রত্যাবর্ত্তন

(১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

তার পিতা ও মাতার মতই দেখতে হয়। তার পিতা ও মাতা সুখী, তাঁদের এই সরল জীবনযাত্রাতেই তাঁরা সুখী, মাটির প্রকৃত দানে তাঁরা পরিতৃপ্ত, প্রকৃতির দান জল-বায়ু-আকাশ পেয়েই তাঁরা মুগ্ধ, জীবনে তাঁরা সুখী। চিরদিন স্বামী-স্ত্রী তাঁরা কাছাকাছি থেকে পরস্পরের সাহায্য পেয়েছেন। স্যামি আর সেও ত তাই চায় জীবনে—এই পেলেই ত জীবনে যথেষ্ট। এর বেশী কিই বা তাদের চাই? কালই সে স্যামিকে এখানে আসতে লিখে দেবে। সে তাকে জানাবে যে, পাকা কায়েমী কাজ তার এতদিনে জুটেছে, খোয়া যাবার আর কোন ভয়ই নেই। শঙ্কা এতদিনে তার ঘুচেছে।

এমন সময় তার পিতা সেখানে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর জ্বলন্ত লণ্ঠন।

মা বললেন, "সব ঠিক আছে ত?"

বৃদ্ধ শান্তভাবেই বললেন, "সব ঠিক আছে।"

—সমাপ্ত—

৬ষ্ঠ বর্ষ । শনিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ সাল 10th December 1938 [৪র্থ সংখ্যা

ব্রজেন্দ্রনাথ

মহামনীষী স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল গত ৩রা ডিসেম্বর নিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু বাঙ্গলার হেন, শুধু ভারতের নহেন, কিংবা শুধু প্রাচ্য ভূখণ্ডেরও নেহন, র্ত্তমান জগতের জ্ঞানিগণ-সমাজের অন্যতম বরেণ্য পুরুষ ছলেন। যে সব শক্তিশালী মহামানবের জ্ঞান-গরিমায় বর্ত্তমান গত উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। নন্যসাধারণ প্রতিভার তিনি অধিকারী ছিলেন, অপরিসীম ল তাঁহার পাণ্ডিত্য। হিমালয়ের বিরাটত্ব—বিশালতা মন মানুষকে স্তব্ধ করে, তেমনই ব্রজেন্দ্রনাথের প্রখর াণ্ডিত্য এবং জ্ঞান-গরিমা মানুষকে স্তব্ধ করিত। এক কথায় তনি ছিলেন সর্ব্ববিদ্যাবেত্তা—সর্ব্বার্থতত্ত্ববিৎ।

ভারতের প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছিলেন, জানিয়াছি, আমরা সই পুরাণ পুরুষকে জানিয়াছি, যাঁহাকে জানিলে সকলই না হইয়া যায়, আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি। ব্রজেন্দ্রনাথ সেই ত্ত্বকে অবগত হইয়াছিলেন এবং সকল পূর্ণতার সেই যে স্বরূপ াঁহার উপলব্ধির আনন্দে নিজকে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। শুধু াহাই নহে, পাশ্চাত্য জগত ভারতের জ্ঞান-গরিমার মহত্ত্বকে রিতে পারে নাই, ব্রজেন্দ্রনাথ নিজের প্রতিভাদীপ্ত পাণ্ডিত্যে শ্চাত্য জগতকে ভারতের এই পরমার্থ তত্ত্বের তাৎপর্য্য পলব্ধি করাইয়াছিলেন। বাঙলার নিজস্ব বৈষ্ণব-সাধনা, ীমন্মহাপ্রভু যে সাধনা প্রবর্ত্তিত করেন, পাশ্চাত্য জগত তাহাকে র করা জিনিষ মনে করিত, ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহাদের এই ভ্রান্তি র করেন। তিনি দেখাইয়া দেন যে, সমগ্র ইউরোপ এমন কি, গতের অন্যান্য স্থানে যেদিন সে রসতত্ত্বের বিকাশ হয় নাই, সদিন, জগতের সেই অন্ধতম যুগে ভারতের সাধকগণ সে াধনার তত্ত্বার্থকে সম্যক্ দর্শন করিয়াছিলেন। বেদান্তের পরই সে সাধনার ভিত্তি। সে সাধনা শুধু একটা ভাবুকতাই য়, নহে শুধু মনন-বিলাস। ব্যবহারিক জগতকে সে সাধনা স্বীকার করে নাই এবং ইউরোপ যদি তাহার বর্ত্তমান সমস্যা গটাইয়া উঠিতে সত্যই চায়, তবে সেই সাধনা তাহাকে বাস্তবের াথে প্রকৃত সাহায্য করিতে পারে।

ব্রজেন্দ্রনাথ ভারতের জ্ঞান-গরিমাকে প্রদীপ্ত করিয়া ধরিয়াছিলেন, এবং তিনি বুঝাইয়াছিলেন জগতকে বাঙলার এই যে বৈষ্ণব-সাধনার মূলে বিশ্বজনীন যে পরম সত্য রহিয়াছে সেই বস্তুকে। ইউরোপের জ্ঞানিগণ তাঁহার সে সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ভারতের জ্ঞান-সাধনার আলোকে তিনি পাশ্চাত্যের গণ্ডীবদ্ধ জ্ঞান-সীমার পরিধিকে বাড়াইয়া দিয়াছেন। বেদান্ত-সাধনার সাধক ব্রজেন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব রসতত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ ব্রজেন্দ্রনাথ এইভাবে স্বদেশ-প্রেম এবং দেশ-নিষ্ঠার ভিতর দিয়া বিশ্বের সেবায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ কোন্ শাস্ত্র যে জানিতেন না, কোন্ বিদ্যা যে তাঁহার অধিগত ছিল না, ইহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। তাঁহার কাছে সমস্ত শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব যেন জলের মত পরিষ্কার হইয়া যাইত এবং সরল ও সহজ ভাষায় তিনি সব বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, এই জন্য তাঁহাকে চলন্ত বিশ্বকোষ বলা হইত। ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে বলা কথা শুনিয়া কত জনে বড় বড় পণ্ডিত হইয়া গিয়াছেন এবং জ্ঞানিগণ মাঝে বরণীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন; বাঙলা দেশে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জগতের যত বড় বড় জ্ঞানী গুণী—যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে গিয়াছেন, তিনিই তাঁহার পাণ্ডিত্যে বিস্মিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এবং জগতের অনেক বড় বড় জ্ঞানী পুরুষ ব্রজেন্দ্রনাথকে নিজেদের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ ঋষিদেরই ন্যায় সত্যদ্রষ্টা। তিনি ভারতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত সত্যকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই দ্রষ্টা তিনি ছিলেন এবং স্রষ্টাও ছিলেন। যাঁহাদের সাধনার ফলে বর্ত্তমান ভারতের সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি তাঁহাদের ছিলেন একজন অগ্রণী। তাঁহার সেই সাধনার ব্যবহারিক দিকটা প্রকট না হইলেও, নবীন ভারতের মূলে তাঁহার সে সাধনা প্রাণরূপে বা তত্ত্বরূপে যে অনেকখানি রহিয়াছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। আত্ম-

জ্ঞান ব্যতীত আত্মপ্রত্যয় জন্মে না। ব্রজেন্দ্রনাথ জাতিকে সেই আত্মজ্ঞানের পথ ধরাইয়াছেন। আত্মপ্রত্যয় তিনি জাগাইয়াছেন জাতির ভিতর। এই দিক হইতে ব্রজেন্দ্রনাথের সাধনার রাজ-নীতিক একটা দিকও রহিয়াছে।

দার্শনিকতার গূঢ় রসের রসজ্ঞ হইয়াও ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যবহারিক জগত হইতে বিচ্যুত ছিলেন না। তাঁহার যে দার্শনিক সাধনা তাহা বস্তুজগত হইতে ব্যতিরিক্ত ছিল না, বস্তুজগৎকে লইয়াই ছিল। যে আত্মবিদ্যার তিনি সাধক ছিলেন, সে আত্ম-বিদ্যা আত্মবিলোপ নহে, আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিতে অপরের জিনিষ কাড়িয়া লওয়া নয়। ইউরোপে আত্ম-প্রতিষ্ঠার নামে যে পশুলীলা চলিতেছে তাহা নয়। অপরকে আপনার করিয়া লওয়া। বহির্জগতকে বাদ দিয়া সে জিনিষের অস্তিত্ব নাই, এ আনন্দের উপভোগ নাই। উপনিষদ এই পরম তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন, ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা নিত্য সত্য যে জ্ঞান তাহাতে তাঁহার চিত্ত নিসিক্ত থাকিলেও এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের প্রাণ-স্পন্দনের সঙ্গে তাঁহার চিত্তের সংযোগ ছিল। তিনি রাজনীতিক না হইলেও তাঁহার রাজ-নীতি-জ্ঞান সামান্য ছিল না। মহীশূরের নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র-বিধান তাঁহারই মনন-শীলতার ফলস্বরূপ। ইহাতে তাঁহার গভীর রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রজেন্দ্রনাথ জগদ্বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ছিলেন, তিনি অসাধারণ গণিতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার চিত্তবিনোদন হইত উচ্চ গণিতের দুরূহ বিষয় লইয়া। তিনি একজন বড় ভাষাবিদ্ ছিলেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত সাহিত্যরস-রসিক। তিনি কবি ছিলেন, কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন।

ক্ষান্তি, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা এবং মানশূন্যতা, জ্ঞানীর যে সব লক্ষণ—ব্রজেন্দ্রনাথ বলিতে গেলে ছিলেন তাহার মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হইত, তাঁহার অমায়িকতা ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি যে এত বড় একজন পণ্ডিত, ঘুণাক্ষরেও এ বিচার তাঁহার চিত্তভূমিকে স্পৃষ্ট করিতে পারিত না। এমন অনহঙ্কৃত স্বচ্ছ হৃদয়ের জ্ঞানের বিকাশ হয়। রাগ-দ্বেষযুক্ত মনের অবস্থায় সহজ বস্তুর চিন্তা হয় না, বস্তুর স্বরূপ ধরা যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেও এই কথাই বলিতেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ পূর্ণতার সাধক ছিলেন। পূর্ণস্বরূপ হইতে আমাদের উদ্ভব হইয়াছে এবং পূর্ণতাই আমাদের স্বরূপ, উপনিষদের ঋষিদের এই সত্য ব্রজেন্দ্রনাথ জীবনে সব দিক হইতে সার্থক করিয়া তুলিতে সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন, পূর্ণত্বলাভের পিপাসাই আমার জীবনের সকল কর্ম্মোদ্যমকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যিনি ভূমা, যিনি পূর্ণ আমরা তাঁহাকেই চাই, অল্পে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। পূর্ণতালাভের যে অধিকার আমাদের রহিয়াছে, সেই পূর্ণত্বকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ আজ আমাদের ভিতরে নাই, বাঙলার তিনি ছিলেন গর্ব্ব। তাঁহাকে আমরা এতদিন যেমন করিয়া নিজেদের মধ্যে পাইয়াছিলাম, ঠিক তেমন করিয়া আর পাইব না। কিন্তু যে আত্মসাধনার আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, আত্মপ্রত্যয়ের যে উজ্জ্বল বর্ত্তিকা ভারতের পরাধীনতার এই দুর্যোগময়ী রজনীতে তিনি জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে পথ দেখাইবে; শুধু আধ্যাত্মিক নহে, ব্যবহারিক-ভাবেও পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করিবে যে পূর্ণতার জন্য "নর-দেব চির রাত্র-দিন তপোমগ্ন।" ব্রজেন্দ্র-নাথের সাধনা ব্যর্থ হইবার নয়। সেই তপস্যার প্রভাবে তিনি অমরত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সরকারী যুব-কল্যাণ আন্দোলন

সরকারী যুব-কল্যাণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, সরকারের প্রচার বিভাগের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ হইয়াছে। প্রতিবাদে বলা হইয়াছে, যাঁহারা সরকারী যুব-আন্দোলনের নিন্দা করিয়া থাকেন, আসলে তাঁহারা যুবকদের কল্যাণ চাহেন না। যুবকদের কল্যাণ বলিতে সরকার পক্ষ ঠিক কি বুঝিয়া থাকেন আমরা তাহা জানি না। আদর্শ যুবকের বৈশিষ্ট্য বলিতে যদি তাঁহারা একটী পেশীবহুল দেহ এবং সেই দেহের মধ্যে একটী পোষ-মানা প্রাণ বুঝিয়া থাকেন—তবে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের মতের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমরা যৌবনের আদর্শ বলিতে কেবল পেশীর বাহুল্য বুঝি না। আমরা আদর্শ যুবক বলিতে এমন যুবক বুঝিয়া থাকি—যাহাদের ইস্পাতের মত কঠিন দেহের মধ্যে থাকিবে বজ্রের মত অবিচলিত নির্ভীক মন। ... মন বড় হয় না ... মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না। যুবকেরা শুধু বলিষ্ঠ দেহই চাহে না। মনেরও তাহারা বিকাশ চায়। তাহারা চায় উচ্চ আদর্শের অনুপ্রেরণা, চায় তাহারা তেমন আদর্শের জীবন্ত উদ্দীপনা। তাহারা চায় উন্মুক্ত আকাশতলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে যে সর-কারের আদর্শের একান্তই বিরোধ, যে সরকার জনমত উপেক্ষা করিতেই উন্মুখ, চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে সরকার আমল দিতে চাহেন না, সে সরকারের আওতার মধ্যে পড়িলে যুবক-দের মনোধর্ম্মের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয় না। তেমন আওতার মধ্যে বিদেশী ওস্তাদের ওস্তাদী তাহাদের চিত্ত-বৃত্তিকে অভিভূতই করে, আনন্দের পথে বাড়িবার সুযোগ দেয় না। তাহারা দাস-মনোভাবসম্পন্ন হয়, সংকীর্ণচেতা হয়, ভীরু হয়, সর্ব্বতোভাবে গোলাম গড়িয়া উঠে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সরকারপক্ষ আমাদের দেশের যুবকদের

ল্যাণের কথা যতই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করুন—তাঁহারা আমাদের যুবকদের মধ্যে নির্ভীকতার প্রসার আদৌ দেখিতে চাহেন না। অন্তরীণ, বহিষ্কার, রুটমার্চ্চ, সন্ধ্যাআইন, হাউস সিস্টেম, গোয়েন্দাগিরির নিখুঁত ব্যবস্থা এই বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে কখনোও সাহসী নৈতিক মেরুদণ্ড বিশিষ্ট মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে না। মুষ্টিমেয় বিপথগামী যুবকের দুষ্কার্য্যের জন্য কত যে যুবকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দমননীতির বিষাক্ত নিশ্বাসে চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে—তাহার সংখ্যা নাই। আজ লর্ড ব্র্যাবোর্ণ এবং মেজর জেনারেল লিণ্ডসে যুবকদের হিতার্থী সাজিয়া তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া নিবারণ, শরীর-চর্চ্চা, পাঠাগার ও ক্লাব স্থাপনের জন্য উপদেশ দিতেছেন। আমরা জানি বহু যুবক সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে ঐ সকল কার্য্য করিতে গিয়াই পুলিশের বিষ নজরে পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সরকারপক্ষ হইতে যুব-কল্যাণ আন্দোলন চালান হইতেছে তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে—যুবকদিগকে স্বাধীনতা আন্দোলন হইতে দূরে রাখা। এইরূপ আন্দোলন কখনও যুবকদের নৈতিক অথবা আত্মিক কল্যাণের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে না—যে আদর্শ সহজভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে, তাহাদের মনকে উদার এবং উন্নত করিতে পারে তেমন আদর্শ ইহাতে নাই। দেশাত্মবোধের অনুভূতিকে যাহা ম্লান করিবার চেষ্টা করে তাহার নৈতিক মূল্য একেবারেই নাই। সরকারপক্ষ হইতে যুব-আন্দোলনের উপরে যতই মূল্য আরোপের চেষ্টা হউক না— দেশের লোক ইহার স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।

বঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—

যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোবিন্দবল্লভ পন্থ সেদিন বলিয়াছেন—'আমরা সংবাদপত্রকে সহযোগী বলিয়া মনে করি। আমরা আশা করি ,সংবাদপত্রের সহায়তায় আমরা সুষ্ঠুভাবে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইব। সংবাদপত্রের সহিত দুইপ্রকার ব্যবহার করা চলে, একপ্রকার ব্যবহার সহযোগিতা করা, অন্য ব্যবহার দমন করা। আমরা সহযোগিতার পথই গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মতে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার প্রকৃত বাসনা থাকিলে, ইহা ভিন্ন পন্থা নাই। আমরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই সংবাদপত্রের উপর আরোপিত সমস্ত নিষেধাদেশ প্রত্যাহার করিয়াছি।' কংগ্রেসী একজন প্রধান মন্ত্রী সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁহার নীতির এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বাঙলাদেশে কি দেখিতেছি? যুক্তপ্রদেশের সরকার সংবাদপত্রের উপর হইতে সকল নিষেধবিধি প্রত্যাহার করিয়াছেন আর বাঙলাদেশে সে সব নিষেধ বিধান শুধু যে বজায় আছে এমনই নহে, অযথারকম অপপ্রয়োগও হইতেছে। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট চাহেন—সংবাদপত্রের সহযোগিতা এবং সেজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তাঁহার কাম্য; কিন্তু বাঙলার মন্ত্রীরা দমন করিতে চাহেন সংবাদপত্রগুলিকে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণেই তাঁহাদের ঐকান্তিকতা। তাঁহাদের এই দিককার ঐকান্তিকতা এবং তাহার ফলে সংবাদপত্র দমন নীতির অপপ্রয়োগের পর পর দুইটি প্রমাণ কয়েক মাসের মধ্যেই পাওয়া গেল—'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নামে রাজদ্রোহ প্রচারের মামলায়। সরকারী ১২৪(ক) ধারা কেমন ব্যাপক, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু হক-সরকারের সংবাদপত্র দমনের আগ্রহটা এমনই উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে যে, ঔদ্ধত্যে অন্ধ হইয়া তাঁহারা ১২৪(ক) ধারার সেই বেড়াজালেরও গণ্ডীর বাহিরে গিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে সায়েস্তা করিতে চাহিতেছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মামলার রায়ে হাইকোর্টের বিচারপতিরা এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, মেদিনীপুর জেলে রাজবন্দীদের পীড়ন করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল, কষ্ট কল্পনা করিয়াও তাহা রাজদ্রোহ প্রচারের গণ্ডীর মধ্যে ফেলা যায় না। মিঃ বার্টলী বলেন—"যদি কাহারো বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে জমাদারদের এবং সম্ভবত জেলখানার কারাকুঠরী নির্ম্মাতাদের বিরুদ্ধে, কোন প্রকারেই উহা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নয়।" নীতির দিক হইতে এই কথার তাৎপর্য্য ইহাই দাঁড়ায় যে, সরকারী কোন কর্ম্মচারীর কার্য্যের সমালোচনা, তাহা যতই কঠোর হউক না, এবং সে কর্ম্মচারী যতই উচ্চ হউক না কেন, তিনি মন্ত্রীই হউন, আর জেলখানার জমাদারই হউন, তাঁহার উপর আক্রমণ রাজদ্রোহ আইনের আমলে পড়ে না। সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যের সমালোচনা, সরকারী নীতির সমালোচনা করিবার যে অধিকার সংবাদপত্রের আছে, হক মন্ত্রিমণ্ডল তাহা দলন করিবার জন্য অধীর এবং উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার ফলেই এই শ্রেণীর হাস্যকর রাজদ্রোহ মামলার পত্তন এবং নির্দ্দোষ সম্পাদকের হয়রানী, অর্থক্লেশ ও যাতনা, লাঞ্ছনা। মন্ত্রীদের এই বিবেকান্ধ মূঢ়তার কাছে সংবাদপত্র সম্পাদকেরা নিশ্চয়ই আত্মমর্য্যাদা বিক্রয় করিবেন না; পক্ষান্তরে এই সব কার্য্যে মন্ত্রিমণ্ডলের স্বেচ্ছাচারের স্বরূপই উন্মুক্ত হইবে।

সাদুল্লা দলের শিক্ষা—

স্যার মহম্মদ সাদুল্লার দলবল আসামের শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যোগ দিয়া বড়দলুই মন্ত্রিমণ্ডলকে ভাঙ্গিবার জন্য যত সরফরাজী ফলাইয়াছিলেন, সব ঠাণ্ডা হইয়াছে। কথা ছিল, ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠক আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা অনাস্থা প্রস্তাব আনিবেন এবং আসামের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার একেবারে তাঁহাদের হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে সাহস তাঁহাদের কুলায় নাই। বাজে বোল-চাল দিয়া নিজেদের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে—বিপন্ন ইসলামের বুজরুকীতে কিছুই কুলায় নাই। বাঙলায় যেমন বিশ্বাসঘাতকের অভাব নাই, আসামেও তেমনই বিশ্বাসঘাতক না আছে এমন নয়, নিজের পদ-মান প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের স্বার্থকে বিকাইয়া দেয়, এমন লোক সেখানেও আছে, কিন্তু তাহাদের যত চক্রান্ত সব ব্যর্থ

হইয়াছে। আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের ভোটের ফলে দেখা গিয়াছে, ৫২ জন সদস্য কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে এবং ৪৬ জন বিরুদ্ধে। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এই কয়েক মাসের মধ্যেই আসামে কিরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, ইহাই তাহার স্পষ্ট পরিচয়। শ্বেতাঙ্গদলের সমর্থনের জন্য যাঁহারা চটকল নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি আইন করিয়া দেশের স্বার্থকে বিকাইয়া দিতেছেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজেদের সমালোচকদের মুখ বন্ধ করিয়া মন্ত্রিগিরি অটুট রাখিতে যাঁহারা ব্যস্ত আছেন এবং কথায় কথায় কাজ হাসিল করিবার জন্য বিপন্ন ইসলামের জিগির তুলিতেছেন, আশা করি, ঘরের কাছে আসামে স্যার মহম্মদ সাদুল্লার দলের এই দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা হইবে।

পরলোকে নৃপেন্দ্রমোহন গুহ—

'আনন্দবাজার' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের বাণিজ্য-সম্পাদক নৃপেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় গত ১৯শে অগ্রহায়ণ সোমবার কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন গত পূজার সময় হইতে নৃপেন্দ্রবাবু দুরন্ত টাইফয়েড রোগে ভুগিতেছিলেন, মৃত্যুর সময় নিউ-মোনিয়ার লক্ষণও দেখা দিয়াছিল। 'দেশের' পাঠকদের নিকট নৃপেন্দ্রমোহন অপরিচিত নহেন। তিনি নিয়মিতভাবে 'দেশে' লিখিতেন। অর্থনীতি শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; দুরূহ বিষয়ও তিনি প্রাঞ্জলভাবে সকলের বোধগম্য করিয়া লিখিতে পারিতেন। তিনি দেশ-প্রেমিক ছিলেন। কৃতী সাংবাদিকের দক্ষতার তিনি অধিকারী ছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিষয়-বিশ্লেষণ বুদ্ধি, অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম্ম গ্রহণ করা প্রভৃতি যে সব গুণ সুযোগ্য সম্পাদকের পক্ষে আবশ্যক, নৃপেন্দ্রমোহনের লেখায় তৎ-সমুদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি আমাদের সহকর্ম্মী ছিলেন, সঙ্গী ছিলেন, দৈনন্দিন ব্যাপারে বন্ধু ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা স্বজনের বিয়োগ ব্যথা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি। তাঁহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না, ভগবান তাঁহাদিগের চিত্তে সান্ত্বনা দান করুন।

যুদ্ধের কত দেরী—

উত্তরে যে ধাপ্পাবাজীর জোরে চেকোশ্লোভাকিয়া হিটলারের করগত হইয়াছে, দক্ষিণে মুসোলিনীও সেই রকম ধাপ্পাবাজীতে টিউনিস দখল করিবার চেষ্টায় আছেন। ১৮৮১ সাল হইতে টিউনিসের উপর ইটালীর নজর ছিল। ইটালী যে ভাবে আবিসিনিয়া দখল করিয়াছে, আলজিরিয়া হইতে ফরাসীরা গিয়া সেইভাবে টিউনিস দখল করিয়াছিল। ১৯১২ সালে ইটালী ত্রিপোলী অধিকার করে। এই ত্রিপোলী এখন ইটালীর বড় রাজ্য লিবিয়া। লিবিয়ার সীমানায়ই টিউনিস অবস্থিত। টিউনিসে ফরাসী অধিবাসীর সংখ্যা ১ লক্ষের কিছু উপরে, এবং ইটালীয়ান অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষের কিছু কম। সুতরাং এই দিক হইতে চেকোশ্লো-ভাকিয়ার জার্ম্মানদের অশান্তি সৃষ্টি করিবার যেমন সুবিধা ছিল, ইটালীরও টিউনিসে অশান্তি সৃষ্টি করিবার সেইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু অশান্তি দেখাও দিয়াছে। জার্ম্মানী, এমন কি জাপানও নাকি ইটালীর এই দাবীর পিছনে রহিয়াছে এই ব্যাপার লইয়া ইউরোপে একটা নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং মিউনিক চুক্তি বুঝি চুলায় গেল, অনেকে এইরূপ মনে করিতেছেন। ইটালীর সরকারী পক্ষ অবশ্য বলিতেছেন, ঐ সব আন্দোলনে আমরা নাই; কিন্তু ডিক্টেটরী দেশের অবস্থা যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা এ কথায় বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, ব্যাপার অনেক দূর গড়াইবে। জার্ম্মানীও যেমন উপনিবেশগুলির দাবী করিবে, সেইরূপ ইটালীও ভূমধ্যসাগরে নিজেদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা চাহিবে। রুশিয়াকে একঘরে করিয়া ইংরেজ এবং ফরাসী ফ্যাসিষ্টদের যে কুলাল-চক্রের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে—তাহা হইতে সহজে তাহাদের উদ্ধার নাই। জার্ম্মানী এবং ইটালী তাহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া যতটা পারে আদায় করিয়া লইবে, অন্যপক্ষে ইহারা তলে তলে সবল হইয়া ফ্যাসিষ্ট চক্র কাটাইয়া উঠিবার যেমন চেষ্টায় থাকিবেন, তেমনি ফ্যাসিষ্টপন্থীরাও বসিয়া থাকিবে না। ইংরেজ এবং ফরাসী জার্ম্মানী ও ইটালীর শান্তিপ্রিয়তায় যতটা বিশ্বাস করেন, ফ্যাসিষ্টবাদীরা ইংরেজ বা ফরাসীকে তেমন বিশ্বাস করে না, প্যালেষ্টাইনের ব্যাপার সম্পর্কে ইংরেজদের উপর জার্ম্মানদের রক্তচক্ষু এবং টিউনিসের সম্পর্কে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইটালীর রাষ্ট্রসভায় উত্তেজনা—এ সব হইতেই তাহা ভাল বুঝা যায়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব সেদিন এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"ব্রিটেনকে এরূপ শক্তিশালী করিতে হইবে যাহাতে সমগ্র বিশ্ব বুঝিতে পারে যে, আমাদের শান্তিপ্রচেষ্টার চেষ্টা যুদ্ধ-ভীতির জন্য নয়; পক্ষান্তরে যুদ্ধের প্রতি ঘৃণাবশতই আমরা শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি।" ইংরেজের এই তথাকথিত যুদ্ধ-ঘৃণার মূলী-ভূত মনস্তত্ত্ব—আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য থাকিলেও হিটলার এবং মুসোলিনীর কাছে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, এই হিসাবেই তাঁহারা তত্ত্বদর্শী পুরুষ।

প্রশংসার অধিকারী কাহারা?

গত সিপাহী-বিদ্রোহের সময় দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বাদ্‌লী-কি-সরাই নামক স্থানে বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে লড়াই করিয়া গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স সেনাদলের ২২ জন গোরা এবং একজন সেনানী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্থানটি এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল; সম্প্রতি ঐ স্থানটি আবিষ্কৃত হয় এবং ঐ স্থানের উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয় হয়। গত ১লা ডিসেম্বর ভারতের জঙ্গীলাট এই স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন। এই সম্পর্কে ভারতসরকারের কার্য্যের নিন্দা করিয়া শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং

...তসরকারের কার্য্য যে অসঙ্গত হইয়াছে, পরিষদে এই ...মত ব্যক্ত করেন। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এমন প্রস্তাব ... হওয়া সত্যই একটি অভিনব ব্যাপার মনে হইবে। এই ...র প্রস্তাব তোলাই এ যাবত অসম্ভব ব্যাপার ছিল, এক্ষেত্রেও ... যে সসম্ভব না হইত এমন নয়। বড়লাট ঐ প্রস্তাব নামঞ্জুর ...য়া হুকুমনামা জারী করিয়াছিলেন; কিন্তু সে হুকুম পরিষদ ...নে পেঁছিবার পূর্ব্বেই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়া যায়। এই ...তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ যে কথা বলিয়াছেন, ...মরাও তাহার সমর্থন করি। মৃতের স্মৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা ...র্শনের ইচ্ছা আমাদের নাই। ইংরেজ কবির ভাষায় ইহা ...শ্যই অস্বীকার করা চলে না যে, তাহারা 'somebody else's ...ar' তাহারা কাহারও না কাহারও প্রিয় ছিল, এবং যাহাদের ...হারা প্রিয় ছিল, তাহারা তাহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ...র্শনও করিতে পারে। ভারত-সরকারের সমর-বিভাগের ...ক্রেটারী সেই কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ...মাদের আপত্তি সে দিক হইতে নয়। আমাদের প্রধান আপত্তি ...ইল—ভারত-সরকারের এই ব্যাপারের সঙ্গে নিজদিগকে জড়িত ...রায় এবং ঐ স্মৃতিস্তম্ভের শিলা-লিপি লইয়া। ১৮৫৭ ...লের রাষ্ট্রবিপ্লব যে সেনাবিদ্রোহ নহে, উহা ভারতবাসীদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, একথা এখন আর কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না; সুতরাং সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাহারা যোগ দিয়া ছিল, তাহারা সাধারণ সেনা-বিদ্রোহী নয়। শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, সিপাহীদের অপরাধ এই যে, তাহারা যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল, সেই সংগ্রামে তাহারা সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। যদি তাহাদের উদ্যম সাফল্য লাভ করিত, তাহা হইলে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাহসী যোদ্ধা বলিয়াই তাহারা খ্যাতিলাভ করিত এবং সকলেরই পূজা পাইত। আজও ভারতবর্ষ পরাধীন, সুতরাং স্বাধীনতার জন্য এই সংগ্রামকারীরা, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেমন সাধারণ্যে পূজিত হয়, ভারতে সেরূপ পূজা পাইতেছে না। কিন্তু তাই বলিয়া জাতির নামে বা জাতির গবর্ণমেণ্টের নামে তাহাদিগকে নিন্দা করিবার অধিকারও গবর্ণমেণ্টের নাই। তাহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, তাহারাই যে বীর এমন নয়, যাহারা পরাজিত হইয়াছিল তাহাদের বীরত্বকে—ঐতিহাসিক সত্যের দিক হইতে এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-সাধনার আদর্শের দিক হইতে অধিকতর সম্মান দিতে হয়। শ্রীযুত আনের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি, বিদেশীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তখন যাহারা বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহাদিগকে নিন্দা করা এক সময় চলিত, কিন্তু ভারতের অবস্থার এখন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভারতবাসী বিদেশী ঐতিহাসিকদের প্রচারিত গ্লানিকে এখন আর স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নয়।

মতিগতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক—

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত প্রকাশ আর একটা কথা তুলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এইরূপ শোনা যায় যে, দিল্লীর কুনী দরওয়াজা নামক স্থানে এদেশের শত শত লোককে প্রতিদিন কামানের মুখে বাঁধিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইত, সেই সব ব্যক্তির স্মৃতির জন্য কেহ যদি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে ব্যাঘাত দিবেন কি? প্রশ্নটি সম্পূর্ণরূপেই সঙ্গত। সেরূপ ক্ষেত্রে সম্মতি দেওয়া ত' দূরের কথা গবর্ণমেণ্ট সকল রকমেই বাধা দিবেন। মোস্লেম লীগের পক্ষ হইতে মৌলবী গোলাম ভিকনেয়াজ এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'যে সব ইংরেজ এদেশে তাহাদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের নিন্দা আমি করি না; কিন্তু নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে সব ভারতবাসী সংগ্রাম করিয়াছিল তাহাদিগকে নিন্দা করিবার কি অধিকার থাকিতে পারে? এই স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতবাসীদের জনমতের প্রতি উপেক্ষার ভাবই প্রদর্শিত হইয়াছে।' আমরাও এই উক্তি সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। এই ধরণের ব্যাপার হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শত বৎসর পূর্ব্বেকার আক্রোশের ভাবটি একদল ইংরেজ এখনও বিস্মৃত হইতে পারিতেছে না এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতেই বর্ত্তমান ভারতকে তাহারা বিচার করিতে চায়। জঙ্গীলাট এমন ব্যাপারের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া সরকারী ছাপ এই ব্যাপারে দিয়াছেন, ভারতবাসীদের সব চেয়ে বড় আপত্তি হইল এইখানে।

অতীতের বিচার—

ভারত গবর্ণমেণ্টের সমর বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ওগিলভি অতীতের অপ্রীতিকর স্মৃতিকে চাপা দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। খুবই ভাল কথা; কিন্তু এই ধরণের স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করাতে এবং খাড়া থাকিতে দেওয়াতে অতীতের সেই অপ্রীতিকর স্মৃতিই জাগাইয়া রাখা হয় না কি? আমরা এইদিক হইতে এই ধরণের নূতন স্মৃতি খাড়া করিবার ত' বিরোধী বটেই তাহা ছাড়া যে সব স্মৃতির কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই, অধিকন্তু একটা বিদ্বেষভাবেরই প্ররোচক সেগুলি খাড়া রাখারও আমরা বিরোধী। মাদ্রাজের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট সিপাহী বিদ্রোহের আমলের জাঁদরেল জবরদস্ত জেনারেল নীলের মূর্ত্তি অপসারিত করিয়া এইদিক হইতে জনমতের সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। মোপলা-বিদ্রোহ সম্পর্কিত এই ধরণের একটি স্মৃতির বিরুদ্ধেও সেখানে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, আশা করা যায় এক্ষেত্রেও মাদ্রাজের মন্ত্রিমণ্ডল জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ইতস্তত করিবেন না; কিন্তু বাঙলার হক সরকার কি করিতেছেন? যে অন্ধকূপ হত্যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত, এদেশবাসীর পক্ষে সেই গ্লানিকর স্মৃতি আজও বাঙলাদেশের বুকে খাড়া রহিয়াছে। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের পক্ষে নিতান্তই গ্লানিকর সেই যে স্মৃতি তাহাকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর বাঙলাদেশকে বুকে করিয়া না রাখিলেই কি চলিবে না? মৃতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে আপত্তি নাই, কিন্তু একটা নিতান্ত ভিত্তিহীন গ্লানিকে বিগ্রহ করিয়া জাতির বুকে চাপাইয়া রাখিবার কি সার্থকতাই বা থাকিতে পারে!

শুধু জাতির মনে বিজেতৃ জাতির প্রতি অপ্রীতির ভাবই উদ্দীপিত রাখিতেই উহা সাহায্য করে। দেশের লোকের মনে স্বদেশ-প্রেম, স্বাধীনতার প্রেরণা এগুলি যতই বৃদ্ধি হয়, ততই এই সব স্মৃতির অবমাননাকর স্বরূপটা তাহাদের নিকট উন্মুক্ত হয়, আঘাত তত বেশী বাজে। ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, জেতৃ-বিজিত এই যে একটা বিরোধের ভাব ইহাকে দূর করিতে হইলে ঐ সব স্মৃতি অপসারিত করাই উচিত।

গলদ কোথায়—

অধ্যাপক শ্রীযুত কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানা পাঠাইয়াছেনঃ—

"মহাশয়,—ঘটনাক্রমে একদিন আমি কোন খাবারের দোকানে প্রবেশ করি এবং কিছু খাবার চাই। পরিবেশনকারী কিছু খাবার দেয়। খাওয়া শেষ হলে এক গ্লাস জল চাইলাম; সে জল না দিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। আবার নিকট আসিলে পুনরায় জল চাই; এবারও সে অন্যদিকে চলিয়া যায়। তাহাকে ভাল করিয়া ডাকিয়া বলিলাম, "তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাওনা? আমাকে এক গ্লাস জল দাও।" উত্তরে সে বলে, "জল ক্যায়া,—পানি বোল।" লক্ষ্য করিলাম সে অ-বাঙালী এবং দোকানের মালিক যে দূরে বাক্সের কাছে বসিয়াছিল সেও অ-বাঙলী। আমি বলিলাম, "পানি না বললে জল দেবে না?" অগত্যা সে এক গ্লাস জল আনিয়া দিল; এবং বলিল সে বাঙলা বোঝে না। আমি বললাম, "বাঙলা তুমি বোঝ না—জলকে যে পানি বলতে হবে এ উপদেশ কি করে দিলে? বাঙলা তুমি ভালই বোঝ; না বোঝার ভাণ কর মাত্র। বাঙলা-দেশে এসেছ বাঙলা শিখ।" সে তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর করিল, "ক্যায়া বাঙলা, বাঙলা শিখনেকো কৈ জরুরত নেই।"

সে ঠিকই বলিয়াছে—বাঙলা শিখিবার কোন প্রয়োজন নাই কেন না বাঙলা দেশে বাঙালীরা অ-বাঙালীর সহিত হিন্দী বলে; এবং হিন্দী জানে বলিয়া গর্ব্বও অনুভব করে। চিন্তা করিয়া দেখে না যে ইহার ফল কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে। যদি কোন বাঙালী বাঙলার বাহিরে যায় তবে তাহাকে সেই প্রদেশের ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে; কেহ অনুগ্রহ করিয়া অতিথির ভাষা ব্যবহার করিবে না। তাহাকে কষ্ট করিয়াই হউক আর সহজেই হউক, সেই প্রদেশের ভাষা শিখিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম একমাত্র বাঙলা দেশ; কারণ বাঙালীর অতিথি-প্রীতির সুনাম আছে জানিয়া অ-বাঙালীরা বাঙলা শিখিবার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। তাহারা জানে বাঙালী এমন অতিথি-বৎসল যে, তাহার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও অতিথি-সৎকারে কুণ্ঠিত হইবে না। এই অতিথি-বাৎসল্যের সুযোগ লইতে কোনও প্রদেশের লোকই কুণ্ঠাবোধ করেন না; বরং গৃহস্বামীর ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন।

সেদিনও একজন অ-বাঙালী ভদ্রলোক বাঙলায় আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, বাঙালী যদি এখনও সচেষ্ট না হয় তবে শীঘ্রই সে ইহুদী দশা প্রাপ্ত হইবে। বাস্তবিকই এই ভাবে উদাসীন হইলে বাঙালী যে ইহুদী হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। যদি বল বাঙালীর উচিত শুধু বাঙলা ব্যবহার করা—অমনি প্রাদেশিকতার প্রচার হইতেছে বলিয়া অন্যান্য প্রদেশে হুলুস্থূল পড়িয়া যাইবে; এবং বাঙলা তথা বাঙালীকে কোণঠাসা করিবার জন্য আরও জোরে স্বদেশ প্রেমিকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইবেন। বাঙালীর যত স্বার্থ আছে বলি দাও, নাম হইবে জাতীয়তা বা বিশ্বপ্রেমিকতা। যদি বল বাঙালীর ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে—তবে তাহার নাম হইবে ঘোর প্রাদেশিকতা। নিজের ঘরে বসিয়া কথা বলিবার অধিকারও বাঙালীর নাই। নিজের দেশেও আজ সে বিদেশী। ইহুদী হইবার আর বাকী কি? কুলী, মজুর ও আরদালী হইতে আরম্ভ করিয়া পাহারাওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, বাসের টিকিটওয়ালা—এমন কি ঘরে ঠাকুর চাকরের সহিত পর্য্যন্ত বাঙলা ভাষা ব্যবহার করা চলে না। ঠাকুর, চাকরের সহিতও যদি হিন্দী বলিতে হয় তবে ইহার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে আজ আমাদের এমন অবস্থা। বাঙলার বুকে দাঁড়াইয়া একটা অ-বাঙালী দোকানের চাকর একজন বাঙালী ভদ্রলোককে বলিতে সাহস পায়—ক্যায়া বাঙলা—আবার উপদেশ দেয় পানি বোল। প্রশ্রয়ের মাত্রা কতখানি হইলে এমন অবস্থা হয়, একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? একটি যুবক হিন্দী না-বলা নীতি হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে। সে বলে, আমি কাহারও প্রদেশে যাই নাই। আমার বাঙলা দেশে যে আসিয়াছে সে তার নিজের স্বার্থের জন্যই আসিয়াছে—আমার বা আমার দেশবাসীর কাহারও উপকার করিতে আসে নাই। সে ইংরেজী না জানে বাঙলা শিখিয়া লউক—আমার কি দায় পড়িয়াছে হিন্দী শিখিতে? এজন্য তাহাকে অপরিণামদর্শী বন্ধুদের টিটকারী সহ্য করিতে হইয়াছে অনেক—এমন কি অফিসে আরদালীর সহিত হিন্দী বলিতে সহকর্ম্মী দ্বারা উপদিষ্ট হওয়ায় উত্তেজনাও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। সহ-কর্ম্মী বলে, অফিসের মালিক বাঙালী হইয়াও বেয়ারা আরদালীর সহিত হিন্দী বলে। উত্তরে যুবক বলে—তিনি প্রয়োজন বোধ করেন বলেন। আমি প্রয়োজন বোধ করি না—বলিবও না। বন্ধু বলে—আপনি চাকরী করেন......। যুবক উত্তেজিত হয় এবং বলে—মালিক যদি একান্তই আমাকে হিন্দী বলিতে বাধ্য করেন তবে সেই মুহূর্ত্তেই চাকুরী ছাড়িয়া দিব। তাহাকে দুঃসাহসী না সৎসাহসী বলিবেন? আপনারা কি বলিবেন জানি না, আমি কিন্তু বলিব—বীর।"

দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে জাতীয় মর্য্যাদাবুদ্ধি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেই জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা। বিদেশী বুলি কপচান—এই জিনিষটাকেই আমরা মর্য্যাদার বিষয় বুঝিয়া লইয়াছি। মাতৃভাষার প্রতি মর্য্যাদা-বুদ্ধির দৈন্য এদেশের তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে কত বেশী তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা নিজেরা যদি নিজেদের ভাষাকে মর্য্যাদা দিতে না শিখি, তবে অপরেও মর্য্যাদা দিবে না। তাহাদের দোষ নয়—দোষ আমাদের। মাতৃভাষার প্রতি এই মর্য্যাদা-বুদ্ধি ভারতের অন্যান্য সব প্রদেশেই প্রবল আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে এবং মনে হয়, এই মর্য্যাদা-বুদ্ধিকে ভিত্তি

রিয়া তাহাদের মধ্যে জাতিগত একটা সংহতি যেভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে, তাহার জোরে তাহারা, রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনা আনিয়াছিল এদেশে যে বাঙালী জাতি—সেই বাঙালী জাতিকেও ছাড়াইয়া যাইবে। হিন্দীওয়ালারা এই দিক হইতে ক্রমেই আগাইয়া চলিয়াছে; অন্যান্য প্রদেশও পিছাইয়া নাই। সেদিন মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে এই সম্পর্কে যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, অনেকে সংবাদপত্রে তাহা পাঠ করেন। সকলেই এই জিদ ধরেন যে, প্রধান মন্ত্রীকে তেলেগু ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। আমাদের মধ্যে এ জিনিষ কোথায়? যাঁহারা মাতৃভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তাঁহাদের উচিত মাতৃভাষায় মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। এদেশের আইনসভায়, এই দেশের আদালতে, যদি আমরা বিদেশী ভাষার আশ্রয় গ্রহণ না করি, তাহা হইলে মাতৃভাষার মর্যাদা এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির রাষ্ট্রীয় মর্যাদাও বৃদ্ধি পাইবে। প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে বিদেশী ভাষার প্রতি ভ্রান্ত মর্যাদা-বুদ্ধির পরিবর্ত্তন, উচ্ছেদ করা আবশ্যক আগে দাস-মনোবৃত্তিকে।

জাতীয়তা ও ভাষা—

জাতীয়তার সাধনার সঙ্গে মাতৃভাষার সাধনার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে—আমরা বরাবরই ইহা বলিয়া আসিতেছি। এই হিসাবে সাহিত্যিক যিনি তিনি বড় রাজনীতিক। সম্প্রতি 'আয়ার রাষ্ট্রের' প্রধান মন্ত্রীস্বরূপে ডি ভ্যালেরা এই সত্যটির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। আয়র্লণ্ডকে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং ইংরেজী ভাষাকে এদেশের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আইরিশ জাতীয়তার সাধকগণ মাতৃভাষার সাধনার প্রভাব দক্ষিণ আয়র্লণ্ডে বিদেশীদের এই ভেদ নীতিকে বিচূর্ণ করিয়াছেন। উত্তর আয়র্লণ্ডে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ঘাঁটি আরও শক্ত, সেজন্য বিদেশী ভাষার প্রভাব এখনও সেখানে রহিয়াছে। নিখিল আয়র্লণ্ড রাষ্ট্র-বুদ্ধির প্রধান অন্তরায় হইল ইহাই। আয়র্লণ্ডকে গেলিক ভাষাভাষী দেশে পরিণত করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। দীর্ঘদিন পরাধীন দেশের পক্ষে মাতৃভাষার প্রভাব এমনভাবে প্রতিষ্ঠা অবশ্য সহজ কাজ নয়, কিন্তু সহজ না হইলেও স্বাধীনতার উপাসকদিগকে তাহা করিতে হইবে। ডি ভ্যালেরা একথা পর্য্যন্তও বলেন যে, রাষ্ট্রতন্ত্রের দিক হইতে উত্তর এবং দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের একত্বসাধন কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখা চলিলেও ভাষা এবং সাহিত্যের দিক হইতে যে সাধনা, সে সাধনাকে স্থগিত রাখা যাইতে পারে না। কারণ, বিদেশীর প্রভুত্বের প্রধান স্থান হইল জাতির চিন্তাধারায় এবং এ পক্ষে বিদেশীদের নিজেদের ভাষাই হইল প্রধান বাহন। জাতিকে যদি স্বাধীন করিতে হয় তবে চিন্তার কেন্দ্রে বিদেশীদের প্রভুত্ব-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠার মূল সূত্রকে ছিন্ন করিতে হইবে। এ বিষয়ে কিছুমাত্র আপোষ-নিষ্পত্তি চলে না। ইংরেজী সংবাদপত্র-সমূহ ডি ভ্যালেরার এই উক্তির উপর টিপ্পনি কাটিয়া বলিতেছে, মাতৃভাষা ব্যবহারের উপর লোকটার একটা অন্ধ উন্মাদনা রহিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাঁহারা ডি ভ্যালেরাকে এই দোষ দিতেছে, সেই ইংরেজদের মাতৃভাষার উপর অনুরাগ কোন অংশে কম নয়। যে জিনিষকে তাহারা নিজেদের পক্ষে গুণ মনে করে, নিজেদের জাতির স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে ইহা বুঝিয়া তাহারা সেই জিনিষই অপরের দোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে ইতস্তত করে না, আর আমরা এত বোকা যে, তাহাদের সেই বুঝই সার বুঝিয়া লইয়া পরের বুলি কপচাইয়া নিজেদের পাণ্ডিত্যের বাহাদুরী ফলাইতে যাই।

বিদেশী পোষাকের মোহ—

স্বদেশ-প্রেম অন্তরের জিনিষ, পোষাক-পরিচ্ছদের উপর তাহা নির্ভর করে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু একজন একনিষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমিক, বিদেশ পরিভ্রমণের কালে কেন বিদেশী পোষাক পরিধান করেন, সম্প্রতি একজন সাংবাদিক পণ্ডিতজীকে এই প্রশ্ন করেন। পণ্ডিতজী ইহার দুইটি কারণ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, ইউরোপের আবহাওয়ার পক্ষে ইউরোপীয় পরিচ্ছদই সর্ম্মাধিক উপযুক্ত, তাহা ছাড়া, ইউরোপে ভারতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিলে সেখানে সকলের নজর সেইদিকে পড়ে—লোকের একটা দর্শনীয় পদার্থের সামিল হইয়া পড়িতে হয় এবং তাহাতে চলাফেরার এবং কাজকর্ম্মের অসুবিধা ঘটে। পণ্ডিতজী যে কথা বলিয়াছেন, তাহার মূল্য আছে, ইহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু আমরা ইহা চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি যে, এশিয়ার এই প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ার মধ্যেও কোন ইউরোপীয় এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে না। পরলোগত উডরফ সাহেব বলিতেন, যে সব ভারতবাসী সাহেবী পোষাক পরিয়া সাহেব বনিতে যায়, শ্বেতাঙ্গেরা তাহাদিগকে ঘৃণার চোখেই দেখিয়া থাকে। ইউরোপীয় আবহাওয়ার ভীষণ অসুবিধা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী ইউরোপে গিয়া এদেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করেন নাই। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ধুতি-চাদর ছাড়া সাহেবী পোষাক পরিতেন না, স্যার সুরেন্দ্রনাথও কোন দিন শরীরে হ্যাট-কোট চড়ান নাই। দেশীয় পোষাক ছাড়িয়া বিদেশী পোষাক অঙ্গ-সংস্পর্শে গেলেই যে দেশ-প্রেম ক্ষুন্ন হয় সেই স্বদেশ-প্রেম নেহাৎ-ই ঠুনকো, ইহা আমরাও মনে করি; কিন্তু যাহারা নিজেদের পোষাকের নিরিখেই সভ্যাসভ্য বিচার করে, এবং যাহার অঙ্গে নিজেদের পোষাক দেখে না, তাহাদিগকেই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, আচারে বিচারে, এমন কি, আইন করিয়াও পরিচ্ছদগত এই বিবেকবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের সেই ইতরতার প্রতিবাদে এবং স্বদেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যও আবহাওয়া প্রভৃতির প্রতিকূলতা-জনিত কিছু অসুবিধা সহ্য করিয়াও যিনি স্বদেশ-প্রেমিক তাঁহার পক্ষে পরিচ্ছদে দেশীয় বিশিষ্টতা যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া চলা উচিত—আমাদের অগণিত দেশবাসী যাহাদের অর্থ-সামর্থ্য নাই এবং যাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ বিদেশীদের দৃষ্টিতে হেয়—তাহারা যে আমাদের আপনার, তাহাদের সকলের সঙ্গে আমাদের যে অন্তরের একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ-সূত্র রহিয়াছে, ইউরোপের প্রভুত্বপর সাম্রাজ্যবাদীদিগকে এই সত্য উপলব্ধি করাইবার আবশ্যকতা এখনও রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

পরলোকে নৃপেন্দ্রমোহন

'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দেশ' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' বাণিজ্য-সম্পাদক

গত ৬ই ডিসেম্বর রাত্রি আড়াইটার সময় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দেশ' এবং 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' বাণিজ্য-সম্পাদক নৃপেন্দ্রমোহন গুহের মৃত্যু হইয়াছে।

তিনি দুই মাসকাল ফুসফুসের স্ফোটকে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মাতা, পত্নী, তিন ভ্রাতা, দুই পুত্র এবং দুই কন্যা বর্ত্তমান।

নৃপেনবাবু ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত আউটসাহী গ্রামে বিখ্যাত গুহ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে গৃহে এবং পরে তিনি আউটসাহী রাধানাথ হাইস্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৩ সালে তিনি গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ঐ কলেজ হইতে আই-এ এবং ইংরেজী ১৯১৭ সালে ইতিহাসে অনার্সসহ বি-এ পাশ করেন। শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বিশেষ দক্ষতার দরুণ তিনি বি-এ পরীক্ষায় সুবর্ণ পদক লাভ করেন।

অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম-এ পড়েন এবং ইংরেজী ১৯১৯ সালে এম-এ পাশ করেন।

এম-এ পাশ করার পর তিনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। সে সময় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। তিনি অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যের জন্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন।

নাগপুর কংগ্রেসের পর নূতন বিধান অনুসারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠনের সময় তিনি রংপুর হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য হন এবং গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তনে কাজ করিতে থাকেন।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসহযোগ নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে কর্ম্মী এবং নেতাদের মধ্যে ইতরবিশেষ করায় তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ণধারবর্গের সহিত প্রবল মতভেদ হওয়ায় নৃপেনবাবুকে রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

অতঃপর তিনি কমার্সিয়েল গেজেট পত্রিকায় চাকুরী গ্রহণ করেন এবং বিশেষ দক্ষতা সহকারে ইংরেজী ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করেন।

১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিনি বীমার কার্য্য করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী জার্ণেল নামে একখানি অর্থনীতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' বাণিজ্য-সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। 'দেশ' পত্রিকায় বাণিজ্য বিষয়ক নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি 'দেশের' গৌরবের বস্তু ছিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কলিকাতার খেলোয়াড় মহলে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ডাকনাম ছিল মাণিক এবং তিনি খেলোয়াড়দের নিকট মাণিকবাবু নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজে খুব ভাল খেলিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু খেলায় ছিল তাঁহার অপরিসীম উৎসাহ।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি উক্ত ক্লাবের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হন এবং ১৯৩২ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত ক্লাবের হিসাব রক্ষকের কার্য্য করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের একজন প্রধানতম উদ্যোগী সদস্য ছিলেন। ক্লাবের গঠন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার কাগজ-পত্র তিনি রচনা করেন। এজন্য ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁহার নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী।

নৃপেনবাবু অতি ধীর, স্থির অমায়িক, সদালাপী এবং বন্ধুবৎসল ছিলেন। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু কেহ তাঁহাকে সেই পাণ্ডিত্যের দম্ভ করিতে দেখে নাই।

অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব তাঁহার মৃত্যুতে আজ শোকসন্তপ্ত, 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'দেশ' ক্ষতিগ্রস্ত, এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হওয়া দুঃসাধ্য।

ভারতের পণ্য—শণ (SANN HEMP)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভারতবর্ষে শণের ব্যবহার বহুদিনের। অনেকে মনে করেন, যখন তুলার বস্ত্র সম্যক পরিচয়লাভ করে নাই, তখন হইতে শণের বিষয় লোকে অবগত ছিল। বর্ত্তমানে ভারতে যে জাতীয় শণ দেখা যায়, তাহা এই দেশেই প্রথম জন্মলাভ করিয়াছে। অপরাপর দেশে নানাপ্রকার শণ প্রচলিত হইয়াছে। এবং তাহার চাষও এই দেশে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছে; ফলে, একই দেশে নানারকম শণের আবির্ভাব হইয়াছে।

বিদেশী বণিকের হিসাবে ১৭৭৪ সালের পূর্ব্বে ভারতীয় শণের উল্লেখ নাই। আয়রনসাইড নামে ভদ্রলোক শণবৃক্ষের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, উক্ত বৃক্ষের ছাল হইতে নানারূপ রজ্জু, প্যাকিং কাপড়, জাল প্রভৃতি তৈয়ারী হয় এবং পুরাতন হইলে ইহা হইতে দেশের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জগতের বাজারে নানা নামে শণের প্রচলন আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রধানত দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়; (১) গাঁজা-ভাঙ-সিদ্ধি গাছ—Cannabis Sativa or True Hemp; (২) শণ, ফুল শণ, ভাগা শণ, চুণ পাট ইত্যাদি—Crofalaria Juncea or Sann Hemp. ইহা ছাড়া শিশল—Agave sisalana এবং বিমলিপটম পাট—Hibiscus Cannabinus or Deccan Sann এবং অন্যান্য নামে শণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানিলা, মরিসস্, "ধনুর্গুণ" বা bowstring ইত্যাদি নামেও পণ্যের বাজারে শণের পরিচয় আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শণ ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি, কোথাও হইতে বীজ আমদানী করিয়া চাষ করিতে হয় নাই। ভারতের নানাস্থানে ইহা আপনা হইতেই জন্মলাভ করে। বর্ত্তমানে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মদ্র প্রভৃতি স্থানে প্রচুর চাষ হয়। মদ্রের মধ্যে গোদাবরী, তিনেভেলী ও কৃষ্ণা জেলা এবং করদ রাজ্য হায়দরাবাদ—এই কয়স্থান মিলিয়া প্রায় দুই লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়। যুক্তপ্রদেশেও জমির পরিমাণ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। বাঙলা, পঞ্চনদ ও বিহার—সমস্ত প্রদেশ মিলিয়াও মদ্রের সহিত সমান হয় না।

বর্ষার প্রারম্ভে জমিতে খুব ঘন করিয়া বীজ ছড়াইয়া দিয়া ভাদ্র-আশ্বিনে চাষ উঠাইয়া লওয়া হয়। ইহাই প্রধান চাষ, ইহা ছাড়া প্রায় সকল সময়েই চাষ করিতে পারা যায়; চার পাঁচ মাসের মধ্যে গাছ পুষ্ট হইয়া উঠে। শণ গাছ কেবল যে চাষীকে তন্তু দান করে তাহা নহে, ইহাতে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। গো-জাতীয় পশুদিগের খাদ্যেও ইহার ব্যবহার আছে। পাটের ন্যায় জলে ভিজাইয়া বৃক্ষকাণ্ড হইতে তন্তু পৃথক করা হয়।

পৃথিবীর বহুস্থানেই শণ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ক্যানাবিস স্যাটাইভা বা ভাঙ-শণ ছাড়া অন্য শণের হিসাব রাখা হয় না। ভারতবর্ষের রপ্তানি অধিকাংশই ফুল-শণ বা Crofalaria juncea, সেই সঙ্গে অবশ্য অন্য শণেরও রপ্তানি আছে; কিন্তু তাহার পরিমাণ মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। বর্ত্তমানে রপ্তানির পরিমাণ ৮ লক্ষ ৩০ হাজার হন্দর এবং মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা। বাঙলার চাষের জমির পরিমাণ জানা নাই, কিন্তু এই রপ্তানির অধিকাংশই বাঙলা বন্দর হইতে চলিয়া যায়। আমাদের দেশে খুব সামান্য পরিমাণ অসংস্কৃত বা কাঁচা শণের আমদানী আছে। প্রবন্ধের শেষভাগে সমস্ত অঙ্ক দেওয়া হইল।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানির শণের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। বাঙলায় ঐরূপ নাম,—বেনারস (কাশী), গ্রীন (সবুজ) বা রায়গড় এবং বাঙলা; বোম্বাই প্রদেশে,—পিলিভিট্, মধ্যপ্রদেশ, দেওগড় এবং গুলবর্গা; আর মদ্রে,—কচ্চিকিনাড়া (cocanada), গোপালপুর, ওয়ারাঙ্গাল ও উত্তর গোদাবরী (Upper Godavari) নামে পরিচিত।

কতক পরিমাণ শণ রপ্তানির পূর্ব্বে কারখানায় চিরুণী দ্বারা "আঁচড়াইয়া" (hackled or combed) দেওয়া হয়। তাহাতে অনেক শণ বাদ পড়ে। কিন্তু ঐ মিহি শণের বিশেষ ব্যবহার আছে এবং উচ্চ দরে বিক্রীত হয়।

বোম্বাই ও মদ্র মিলিত হইয়া যত রপ্তানি হয়, বর্ত্তমানে একা বাঙলার রপ্তানি তাহার পাঁচগুণ। বেলজিয়ম ও যুক্তরাজ্য আমাদের প্রধান খরিদ্দার; প্রত্যেকেরই অংশ কুড়ি লক্ষ টাকার উপর। অর্থাৎ মোট ৭৫ লক্ষ টাকার মালের রপ্তানির উক্ত দুই দেশ ৪১ লক্ষ টাকার মাল লইয়া থাকে। জার্ম্মানী, ফরাসী, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি অপরাপর অনেক দেশই ভারতের খরিদ্দার। আমদানী শণের মধ্যে ফিলিপাইন হইতে মানিলা শণই প্রধান।

পাট অপেক্ষা সমধিক দৃঢ় হওয়ায় এবং পাট অপেক্ষা জল বা আর্দ্রতা সহনক্ষমতা বেশী থাকায়, শণ পাট অপেক্ষা মূল্যবান এবং অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় কার্য্যে লাগিয়া থাকে। দড়ি-দড়া, সূক্ষ্ম সুতালী, জালের দড়ি বা সুতা, ক্যানভাস কার্পেট প্রভৃতি কার্য্যে শণের বিশেষ প্রয়োজন। সূক্ষ্ম শণ জাহাজ নির্ম্মাণের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অব্যবহার্য্য শণ কাগজের কলে চলিয়া যায় এবং শক্ত কাগজ তৈয়ারী করিতে লাগিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বলিয়া রাখা প্রয়োজন। এই শণ তিসি তন্তু (flax) হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; প্রচলিত ভাষায় তাহাকেও শণ বলা হইয়া থাকে। রুশ গণতন্ত্র তিসি-তন্তু এবং ভাঙ-তন্তু চাষে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

শণের রপ্তানি

পাঁচ বৎসর গড়ে	হাজার হন্দর	হাজার টাকা
১৯০৯-১০—১৯১৩-১৪	৫০৯	৭৮,২৭
১৯১৪-১৫—১৯১৮-১৯	৫৬১	১,১৭,৮৭
১৯১৯-২০—১৯২৩-২৪	৪৫৫	৯০,৪৪
১৯২৪-২৫—১৯২৮-২৯	৫৫৬	১,১৬,৬৩

তাহার পর হইতে রপ্তানি ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্যেরও ভীষণ তারতম্য লক্ষিত হয়। তুলনামূলক তিন বৎসরের হিসাব দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে ১৯১৯ হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ ৫৫ হন্দরের মূল্য ৯০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। ১৯২৯-৩০ সালে প্রায় সমপরিমাণ (৪,৩৫ হাজার হন্দর) শণের দাম ৬৮ লক্ষ টাকা হয় এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার হন্দরের দাম ৩১ লক্ষ টাকা হইয়া যায়।

(২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বগুলায় কি দেখিলাম

ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত

নদীয়ার মামজোয়ান থেকে আমাদের জনৈক বন্ধু জানালেন, হাঁসখালি থানার সন্নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামের অধিবাসীরা অত্যন্ত বিপন্ন। বিপদের কারণ, দর্শনার চিনির কলের কর্ত্তৃপক্ষের স্বার্থ আর স্থানীয় জমিদারদের স্বার্থ একত্র মিলিত হ'য়ে চাষীদের একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করবার উপক্রম করেছে।

ব্যাপারটা কি—ভালো ক'রে জানবার জন্য বিগত ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা থেকে রওনা হলাম। বিকাল বেলায় ট্রেণ বগুলা ষ্টেশনে আমাদের পৌঁছে দিলো। গ্রামের মধ্যে গিয়ে শুনলাম, নিকটেই এক আমবাগানে উৎপীড়িত প্রজাদের সভা বসেছে। সভায় গিয়ে প্রজাদের অভিযোগের যে বিবরণ শুনলাম তার মর্ম্ম হ'চ্ছে, দীর্ঘকাল ধ'রে কৃষকেরা যে সব জমিতে চাষ ক'রে আসছিল—সেগুলিকে তাদের অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দর্শনার চিনির কলের মালিকদের কাছে দিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। যে রবিশস্য তারা সৃষ্টি করেছে নিজেদের ক্ষেতে নিজেদেরই পরিশ্রমে, তাদের দলিত মথিত ক'রে চলছে গর্জ্জমান কলের লাঙল। সূর্য্যাস্তের ম্লান আলোয় আম্রকাননে সমবেত সেই সর্ব্বস্বান্ত কৃষকদের পানে চেয়ে কেবলই মনে হ'তে লাগলো, এরা তো মানুষ নয়—এরা সব এক একটি জীবন্ত নর-কঙ্কাল! মুখে-চোখে নৈরাশ্যের ঘনীভূত ছায়া! সামনে অনাহার! যা কিছু ছিলো—সর্ব্বগ্রাসী বন্যা পূর্ব্বেই রাক্ষসীর মতো নিষ্ঠুর হস্তে আত্মসাৎ করেছে। ঘর—সে না-থাকারই মধ্যে। ঘরের কঙ্কাল শুধু দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা চাল আর জীর্ণ দেয়াল নিয়ে। থাকবার মধ্যে ছিলো জমি। ভাঙা ঘরের দাওয়ায় ব'সে ব'সে চাষী দেখেছে তার ক্ষুধাতুর পুত্র-কন্যার মলিন মুখচ্ছবি! আউড়িতে ধান নেই, গোয়ালে গরু নেই, কুটীরের আনাচে-কানাচে যে কুক্কুটগুলি চরে বেড়াতো বন্যা-রাক্ষসীর কৃপায় তারো পর্য্যন্ত অদৃশ্য হয়েছে! থাকার মধ্যে আছে মাটির কয়েকটি তৈজসপত্র আর শীর্ণ দক্ষিণ হস্তখানি। ছেলেমেয়েরা খাবে কি? পত্নীর অঙ্গের কাপড় জুটবে কোথা থেকে? সন্ধ্যার অন্ধকারে সর্ব্বনাশের করাল মূর্ত্তি দেখে চাষী বারম্বার শিউরে উঠেছে! তার বুকের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে দীর্ঘশ্বাস! নয়নপ্রান্তে দেখা দিয়েছে অশ্রুজল! অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন দিগন্ত! সেখানে আলোকের একটি রশ্মিও নেই! তবে কি অনাহারে সপরিবারে মৃত্যু অবধারিত!

মাভৈঃ। চাষীর কানে কানে আশা বললো, ভয় কি? বন্যা সব নিয়েছে, জমি তো নিতে পারে নি। জমি তো নেয়-ই নি, বরং তার উপরে রেখে গিয়েছে প্রচুর পলি! সেই পলির উপরে ছড়িয়ে দাও ছোলা, ছড়িয়ে দাও কলাই, ছড়িয়ে দাও মুগ। মাঠে মাঠে সোনা ফলবে। ভাঙা ঘর আবার নতুন হবে, গৃহিনীর গায়ে চিরেতন-পেড়ে সাড়ী উঠবে, গৃহপ্রাঙ্গণ কুক্কুটশাবকে ভ'রে যাবে, ছেলে-মেয়েরা মনের আনন্দে খেলে বেড়াবে, শূন্য-গোলায় মা-লক্ষ্মী আবার আসন পাতবে।

কানে আশার বাণী শুনে চাষীর বুক উৎসাহে ভ'রে উঠেছে—ভবিষ্যৎ নবারুণরাগে রঞ্জিত হয়ে দেখা দিয়েছে। নিষ্ঠুর বন্যার একি পরিহাস! একহাতে সে দস্যুর মতো কেড়েছে, আর একহাতে সে রাজার মতো দিয়েছে! কেড়েছে ঘর, কেড়েছে গবাদি গৃহ-পালিত পশু-পক্ষী, কেড়েছে শস্য। কিন্তু মাঠে মাঠে ঢেলে দিয়েছে প্রচুর আশীর্ব্বাদ। সে আশীর্ব্বাদ পলিমাটি যা শূন্য মাঠে সোনা ফলায়। চাষী বুক-ভরা আশা নিয়ে পলিমাটির উপরে ছড়িয়ে দিয়েছে বীজ! এই বীজ একদিন রবিশস্যের ঐশ্বর্য্যসম্ভারে রূপান্তরিত হ'য়ে তার ক্ষুধাতুর পুত্রকন্যার মলিন মুখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ফিরিয়ে আনবে, তার গৃহিনীর ম্লান ওষ্ঠে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তুলবে! আল্লা! আল্লা! নিরাশ্রয়ের তুমিই শুধু আশ্রয়!

মাটির অন্ধকারে লুকানো বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে আলোয় দেখা দিতে লাগলো! ধরণীর শ্যামল আশীর্ব্বাদ! বিধাতার অপরিমেয় করুণা! রাত্রির অন্ধকার কেটে যায়! প্রভাতের আলোয় চাষী দেখে, ছোলার চারাগুলি সতেজ-শ্যামল দেহ নিয়ে দিনে দিনে বেড়ে উঠছে! দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়! চাষীর সমস্ত আনন্দ এই চারাগুলির মধ্যে। এই চারাগুলির উপর নির্ভর করছে তার জীবন-মৃত্যু!

অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হোলো! ভাগ্য নিষ্ঠুর আঘাতে চাষীর সমস্ত স্বপ্নকে ধূলায় লুটিয়ে দিলো। মাঠ থেকে বাড়ীতে ফিরে এসে সে দেখলো জমিদারের পেয়াদা তার প্রতীক্ষায় ব'সে আছে। ব্যাপার কি? এখনই কাছারিতে যেতে হবে। কেন? প্রয়োজন আছে। নাকে মুখে দুটো গুঁজে চাষী বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে বরকন্দাজের পিছু পিছু চলে। বাড়ী যখন ফিরে এলো তখন সে একেবারে নিঃস্ব। বাকী খাজনার দায়ে জমিটুকু চিরকালের জন্য তার হাত থেকে চলে গেছে। জমিদারের কাছারিতে সে কাগজে টিপসই দিয়ে এসেছে। না দিলে তার যে ভিটে পর্য্যন্ত থাকে না। বাকী খাজনার নালিশে তার উঠানের ধান-ভানা ঢেঁকিটা পর্য্যন্ত নীলাম হ'য়ে যায়!

সন্ধ্যার অন্ধকারে ব'সে চাষী কি ভাবে? ভাবছে তার বিচূর্ণ আশা-আকাঙ্খার কথা! কোথায় গেল তার বাপ-পিতামহের আমলের জমিটুকু? কত গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে, কত বর্ষার বর্ষণ-মুখর প্রভাতে, কত হেমন্তের বিষণ্ন অপরাহ্নে, কত শীতের শিশির-সিক্ত প্রত্যূষে সে হলমুখে বিদীর্ণ করেছে তার জমিটুকু, বাউলের সুরে গান গাইতে গাইতে তুলেছে তার ক্ষেতের আগাছা। দ্বিপ্রহরে পরিশ্রান্ত হ'য়ে বাবলা গাছটির তলায় সে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে বসেছে আর ঘর থেকে ভাত নিয়ে এসে স্ত্রী তাকে খাইয়েছে! অঘ্রাণের সায়াহ্নে সোনার ধানে গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মাঠ থেকে ঘরের আঙিনায় সে ফিরে গেছে!

তার চির-আদরের ক্ষেতটুকু আজ গেল কোথায়? আজ সকালেও তো সে মাঠে গিয়ে ছোলার চারাগুলিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে! দেখে দেখে তার চোখের পিপাসা মেটে নি! কোন্ নির্ম্মম ভাগ্য-দেবতার অদৃশ্য মায়াদণ্ডস্পর্শে তার চিরদিনের জমিটুকু এমন অকস্মাৎ হস্তচ্যুত হ'য়ে গেল! এখন থেকে সে খাবে কি? জমি যখন চ'লে গেল তখন আর

কিসের ভরসায় সে গ্রামের বক্ষ আঁকড়ে প'ড়ে থাকবে? কিন্তু গ্রাম ছেড়ে সে যাবেই বা কোথায়? পথে? কলের মজুর হবে? সেখানে যে তাড়ীর আড্ডা, মাতালের চীৎকার, লম্পটের লোলুপ দৃষ্টি, কাবুলীওয়ালার কর্কশ কণ্ঠ! সেখানে স্ত্রী ও কন্যার আব্রু থাকবে কেমন ক'রে?

অন্ধকার! অন্ধকার! দিগন্তব্যাপী অন্ধকার! নদীগর্ভে অদৃশ্য হ'য়ে যাবার পূর্ব্বে নিমজ্জমান ব্যক্তির মুখে যে অপরিমেয় নৈরাশ্যের ছায়া ঘনিয়ে আসে, সেই ছায়া দেখলাম বগুলার আম্রকাননে সমবেত চাষীদের নিষ্প্রভ মুখমণ্ডলে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—সভাও ভেঙে গেল। ভাবতে ভাবতে সঙ্গীদের সঙ্গে আস্তানায় ফিরে এলাম।

পরের দিন ৪ঠা ডিসেম্বর। সকাল বেলায় গ্রামবাসীদের অবস্থা আরও সঠিকভাবে জানবার জন্য বগুলার সন্নিকটবর্ত্তী মুড়াগাছায় গেলাম। যাবার পথে দূর থেকে শুনতে পেলাম ট্র্যাক্টরের গুরু-গর্জ্জন। ট্র্যাক্টর হচ্ছে কলের লাঙল। কাছে গিয়ে দেখলাম দারুণ কোলাহলে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে কলের লাঙল বিদীর্ণ করছে বসুন্ধরার বক্ষ। যারা মাঠে রয়েছে তাদের সবাই পশ্চিমা। মনে হোলো রিপ্ ভ্যান উইংকিলের মতো ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখের সামনে যেন নতুন রাজ্য দেখছি। এই কি আমার চির-পরিচিত বাঙলা দেশ? বাঙলাই যদি হবে তবে মাঠে বাঙালী কৃষক কই? সেই লাঙল কই? বলদ কই? বাঙালী কৃষকের কণ্ঠে সেই আকুল-করা বাউলের সুর কই? মাথার উপরে জেগে আছে সোনার বাঙলার চির-নির্ম্মল আকাশ! কিন্তু আকাশের সেই স্নিগ্ধ নীরবতা কোথায়? ট্র্যাক্টরের কর্ণবিদারী গর্জ্জন শ্যামলবনানীপরিবৃত প্রান্তরের মধুর নীরবতাকে ভেঙে চুরমার ক'রে দিচ্ছে। সেই গর্জ্জন শুনে সন্ত্রস্ত কপোত-দম্পতী গান বন্ধ ক'রে দিয়েছে—ফিঙে মাঠ ছেড়ে পালিয়েছে। বগুলার মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাই মনে হ'তে লাগল—চণ্ডিদাসের আর বিদ্যাপতির, বঙ্কিমচন্দ্রের আর মধুসূদনের, হেমচন্দ্রের আর রবীন্দ্রনাথের বাঙলা পর্দ্দার ছবির মতো যেন মিলিয়ে যাচ্ছে আর যে বাঙলা চোখের সামনে জেগে উঠছে সে কবির বাঙলা নয়, অর্থ-লোলুপ ধনকুবেরের বাঙলা। সেই বাঙলায় অবাঙালী আর বিদেশী ধনপতিরা যন্ত্র-দানবকে সহায় ক'রে বাঙলার পল্লীগুলিতে একচ্ছত্র আধিপতিরূপে বিরাজ করছে, শ্যামল অরণ্যগুলি তাদের বনফুলের ঐশ্বর্য্য আর পাখীদের কাকলি নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে, সরল কৃষকেরা জমিজমা হারিয়ে শহরের কলকারখানায় দিন-মজুরে পরিণত হচ্ছে এবং পুরাকালের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারগণের বংশধরেরা জমিকে মিলের মালিকদের কাছে জমা দিয়ে সাধারণ সুদ-খোরের পর্য্যায়ে নেমে গিয়েছে। আমার চোখের সামনে অতীত দেখা দিলো তার নীলকর সাহেব আর নীলকুঠিগুলি নিয়ে। সে-দিনও বাঙলার পল্লীগুলি বিদেশী কোম্পানীর ধনলিপ্সার নাগপাশে আবদ্ধ হ'য়ে, বোধ হয়, আজিকার মতোই পরিত্রাহি ডাক ছেড়েছিলো।

বগুলা থেকে হাঁসখালি যাওয়ার রাস্তার পাশে মুড়াগাছা গ্রাম। রাস্তা ছেড়ে মাঠে পড়লাম গ্রামের ভিতরে ঢুকবার জন্য। এক জায়গায় দেখি, বিদেশী কোম্পানীর কলের লাঙল রবিশস্যগুলিকে নিষ্পেষিত ক'রে মাঠের মধ্যে ইতস্তত মাতালের মতো যাতায়াত ক'রছে। যে দুর্ভাগা কৃষকের রবিশস্য এমন নির্দ্দয়ভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তার অন্তহীন বেদনার কথা ভেবে মন বিচলিত হয়ে উঠলো। নিষ্পেষিত গাছগুলির সঙ্গে হতভাগ্য চাষীর কত যে আশা নির্ম্মূল হ'য়ে গেছে! অন্যান্য মাঠেও রবিশস্যের একই দুর্দ্দশা অবলোকন ক'রলাম।

মাঠ থেকে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করা গেল। দুর্ভাগা কৃষকদের মুখে আর একবার শুনলাম তাদের দুর্ভাগ্যের করুণ কাহিনী। আমাদের দেখে তারা যেন অকূলে কূল খুঁজে পেলো। তাদের জীবনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এত যে সর্ব্বনাশ ঘটে যাচ্ছে, কেউ তো তার খোঁজ খবর নিতে আসে না! যারা শিক্ষিত তারা শহরে তাদের স্বার্থের মধ্যে নিমগ্ন হ'য়ে আছে! তাদের প্রতি-গ্রাসের অন্ন আসছে যেখান থেকে—সেখানকার কোনো সংবাদ রাখা তারা প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য করে না! পিতৃপিতামহের সহস্র-স্মৃতি-বিজড়িত পল্লীমায়ের বুক থেকে বিতাড়িত হয়ে কোন্ অকূলে তারা ভেসে যাচ্ছে! কেউ তো তাদের দিকে বন্ধুর হস্ত প্রসারিত করছে না! নিমজ্জমান ব্যক্তি যে আকুল আগ্রহে ভাসমান কাষ্ঠ-খণ্ডকে আঁকড়ে ধরে—সেই আগ্রহ নিয়ে তারা আমাদের চৌদিকে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদের কোটরগত চক্ষুর ব্যথা-ভরা দৃষ্টিতে একটা ছলোছলো অসহায় ভাব।

যেমন ক'রেই হউক এদের বাঁচাতে হবে। না বাঁচাতে পারি একসঙ্গে অকূলে ভেসে যাবো। কিন্তু সব আগে প্রয়োজন এদের মধ্যে থেকে এদেরই হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। কর্ম্মীর অভাব হবে না—কিন্তু তারা যেখানে থাকবে সে আশ্রয় কোথায়? গ্রামের মাঝে জঙ্গলে-ঢাকা একটা পুরানো বাড়ী ছিলো। গ্রামবাসীরা সেই বাড়ীটা কর্ম্মীদের থাকার জন্য দিতে চাইলো। আমরা বললাম জঙ্গল এখনই পরিষ্কার করতে হবে। বাড়ী থেকে হাতিয়ার নিয়ে এসো। দেখতে দেখতে গ্রামের ছেলে-বুড়ো—সবাই দা, কুড়ুল, কোদাল ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হোলো। আমাদের চারণ-দলের যিনি সর্দ্দার তিনিই সর্ব্বপ্রথম জঙ্গলের গায়ে দায়ের আঘাত করলেন। তারপর আরম্ভ হ'য়ে গেলো বন আর আগাছার উপর গ্রামবাসীদের প্রবল আক্রমণ। সে কি উৎসাহ! বড়ো বড়ো ডাল দায়ের আঘাতে মড় মড় ক'রে ভেঙে পড়তে লাগলো। মাঠের আগাছায় ছোটো ছোটো গর্ত্তগুলি ভরে উঠলো। ঘরের ঝুল আর আবর্জ্জনা পরিষ্কার হ'য়ে গেলো! জলের ঘড়া এলো, ঝাঁটা এলো, ঝুল ঝাড়বার মই এলো! কৃষকদের দারুণ দুর্দ্দিনে যারা বিপন্নদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের জন্য সব কিছু করতে পারে তারা! জঙ্গল এবং আবর্জ্জনা থেকে মুক্ত গৃহখানি আমাদের সামনে নতুন মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হ'য়ে উঠলো! ঘণ্টা খানেকের বেশী সময় লাগলো না।

কি অদম্য শক্তি এখনও পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে অনশনক্লিষ্ট পল্লীবাসীদের শীর্ণদেহের মজ্জায় মজ্জায়! এই শক্তিকে যদি

(শেষাংশ ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের জীবন-কথা

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৬৪ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল শীলের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা মহেন্দ্রবাবু কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে, বিভিন্ন ভাষায় ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কমতের শিষ্য ছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৮ সালে জেনারেল এসেমব্লীজ ইনষ্টিটিউশনে (বর্ত্তমান স্কটিশচার্চ্চ কলেজে) ভর্ত্তি হন। তথায় নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্ত্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি অধ্যক্ষ উইলিয়ম হ্যাচেটের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৩ সালে বি-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পান এবং জি এ ইন-ষ্টিটিউশনে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উক্ত ইনষ্টিটিউশনের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। এত অল্প বয়সে ফেলো নির্ব্বাচিত হওয়া অত্যন্ত গৌরবের বিষয় ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সালে দর্শনশাস্ত্রের এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বৎসরেই তিনি সিটি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহাকে প্রথম হইতে অনার্স শ্রেণীতে পড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ১৮৮৫-৮৭ সালে নাগপুর মরিস কলেজে, ১৮৮৭-৯৬ সালে বহরমপুর কলেজে এবং ১৮৯৬-১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষের পদে কাজ করেন।

১৮৯৯ সালে রোমে প্রাচ্যতত্ত্ব বিদ্যার যে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন হইয়াছিল, তিনি উহার ভারতীয় শাখার উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

তিনি তথায় 'সত্যের পরীক্ষা' বৈষ্ণব মত ও খৃষ্টধর্ম্ম সম্পর্কে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঋষি ব্রজেন্দ্র উক্ত সম্মেলনের সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কিত শাখায় "ব্যবহার শাস্ত্র এবং সমাজ বিজ্ঞানের উদ্ভাবকরূপে হিন্দু" সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

১৯০৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধান প্রণয়নের জন্য যে সিমলা কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল, তিনি উক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯০৫-৬ সালে তিনি ইংলণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯১১ সালে লণ্ডনে আন্তর্জ্জাতিক নৃতত্ত্ব সম্মেলনে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্যার ব্রজেন্দ্র ১৯১২ সালে পুনরায় ইউরোপ ভ্রমণ করেন।

১৯১৩-১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিং জর্জ্জ দি ফিপ্‌থ্‌ অধ্যাপকের পদে কাজ করেন। তিনি ১৯১৩-১৪ সালে পুনরায় ইউরোপ ভ্রমণ করেন।

তিনি ১৯১৭ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। ঋষি ব্রজেন্দ্র ১৯২১ সালে 'বিশ্ব-ভারতীর' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উদ্বোধনী অভিভাষণ পাঠ করেন।
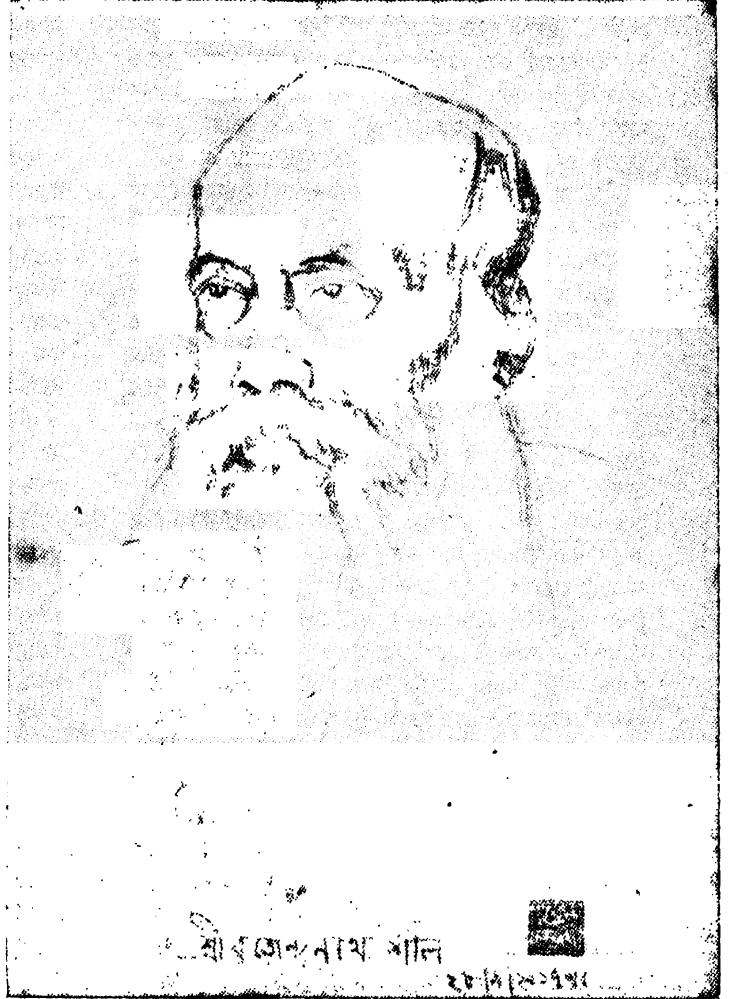
আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

জন্ম—৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ সাল

মৃত্যু—৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৮ সাল

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯২২-২৩ সালে মহীশূরে শাসন সংস্কার কমিটির সভাপতির পদে কাজ করিয়াছিলেন এবং তিনি শাসন-তন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য ১৯২৩ সালে মহীশূরের মহারাজা তাঁহাকে 'রাজতন্ত্র প্রবীণ' উপাধি দিয়াছিলেন।

তিনি ১৯২৪ সালে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্প সম্পর্কিত

মহীশূর কমিটির সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯২৫-২৬ সালে মহীশূর শাসন পরিষদের অতিরিক্ত সদস্যের পদে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯২৬ সালেই মহীশূর সরকারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই বৎসরই তিনি 'নাইট' হন।

তিনি ১৯৩৩ সালে রামমোহন রায় শতবার্ষিকী ও ১৯৩৭ সালে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে নিখিল বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলন হইয়াছিল, উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের উদ্যোগে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথের দ্বি-সপ্ততিতম জন্ম-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় জয়গোপাল রক্ষিতের কন্যা ইন্দুমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। স্যার ব্রজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ শীল বোম্বাইয়ে ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন; দ্বিতীয় পুত্র পাঠদশায় ইংলণ্ডে পরলোকগমন করেন; কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ শীল ভারত সরকারের অধীনে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে চাকুরী করেন।

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী সরযূবালা সেন একজন বিখ্যাত গ্রন্থ-কর্ত্রী।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের প্রণীত গ্রন্থাদি

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেনঃ—মেমোয়র্স অন দি কো-এফিসিয়েন্টস অফ নাম্বার (১৮৯১-৯২), কলিকাতা রিভিউ-এ প্রকাশিত সাহিত্যের নব্য ভাবধারা, নিউ রোমান্টিক মুভমেণ্টস ইন লিটারেচার শীর্ষক প্রবন্ধমালা (১৮৮৯), ট্রিটিজ অন বৈষ্ণবিজম এণ্ড ক্রিশ্চিয়ানীটি (১৮৯৯), নিউ এসেজ ইন ক্রিটিসিজম (১৯০৩), হিন্দু-রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস (এই গ্রন্থ তিনি আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের সহযোগিতায় ১৯০৬ সালে রচনা করেন), প্রাচীন হিন্দুগণের বিজ্ঞানচর্চ্চা (১৯১৫), অঙ্কশাস্ত্রে গবেষণামূলক পুস্তিকাবলী, দি কোয়েষ্ট এবং সলিটিউড ও কবিতাবলী (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৭)।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের অদম্য জ্ঞান-পিপাসা

জরা ও বার্দ্ধক্যের ভারে নুইয়া পড়িলেও আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মনীষী মনের চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহাকে দর্শন ও চিন্তাজগতের অগ্রগতির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতে সক্ষম হয় নাই। জ্ঞানলাভের পিপাসা তাঁহার ছিল অদম্য এবং দর্শন ও জগতের অন্যান্য চিন্তাধারা সম্পর্কিত নূতন গ্রন্থাদির সহিত তিনি পরিচিত থাকিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন, তাঁহারাই তাঁহাকে ঐগুলি পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

ডাঃ এস সি সেনগুপ্তের (ইনি ঐ একই বাটীতে বাস করেন) ১১ বৎসরের একটি পুত্র আচার্য্য শীলকে প্রত্যহ সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া শুনাইত।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের আত্ম-জীবনী

আচার্য্য স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনী লেখা (ইংরেজীতে) সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন; ইহা বর্ত্তমানে ছাপা হইতেছে। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে এই আত্মজীবনী কেমনভাবে লেখা হইত তৎসম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক গল্পাদি আছে।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্র ও কবি রবীন্দ্রনাথ

আত্মজীবনী লিখিবার সময় শেষের দিকে আচার্য্য শীলের দুই তিনবার পক্ষাঘাত হয়; ইহাতে লেখার কার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন হইত। এই বিঘ্ন কথঞ্চিৎ দূর করিতে তিনি এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতেন। প্রকাশ, এই সময় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সর্ব্বদা একটি পেন্সিল ও একটি নোট বই থাকিত। তাঁহার মনে সময় সময় ভাবের উদ্রেক হইত। ঐ ভাবঘোরে তিনি পেন্সিল দিয়া

পার্শ্বস্থ নোট বইয়ে পি, এ, এইরূপ একটি বা দুইটি মাত্র অক্ষর লিখিয়া রাখিতেন। পরদিন তাঁহার সহকারী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আচার্য্য শীল তাঁহার নোট বইয়ে কি কি অক্ষর লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিতেন। লেখক উহা পাঠ করিলে ঐ একটি বা দুইটি অক্ষরের সাহায্যে তিনি ঐগুলি লিখিবার সময় মনে যে সব ভাব উপস্থিত হইয়াছিল সেইগুলি অনর্গল বলিয়া যাইতেন এবং লেখক উহা লিপিবদ্ধ করিতেন।

লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জ্জন জীবন যাপন করিতে তিনি ভালবাসিতেন। কিন্তু জগতের ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের জ্ঞানপিপাসু ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আচার্য্য শীলকে তাঁহার এই নির্জ্জন বাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতেন এবং দর্শন-শাস্ত্রাদি সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহার সারগর্ভ চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতেন।

তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা ও সরল জীবনযাপন করিতেন কিন্তু একটি কার্য্যে এই মনীষী বিশেষ আনন্দ পাইতেন, তাহা হইতেছে দুঃখী ও দরিদ্রদের মধ্যে ভিক্ষা বিতরণ। প্রতি রবিবার তাঁহার বাটীর সম্মুখে ভিক্ষুকদের একটি ক্ষুদ্র দল জমা হইত এবং আচার্য্য শীলের সম্মুখে তাহাদের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষা বিতরণ করা হইত এবং তিনি গভীর আনন্দ উপভোগ করিতেন।

প্রত্যহ আচার্য্য শীল মাত্র দুইবার তাঁহার নির্জ্জন কক্ষ হইতে বাহির হইতেন, একবার হইতেছে প্রাতে এবং অপরবার হইতেছে সন্ধ্যায়। এই দুই সময় তিনি তাঁহার নিজের গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে যাইতেন।

অবসর গ্রহণের পর আচার্য্য শীল প্রথমে কিছুদিন তাঁহার কন্যার সহিত কলিকাতায়, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত বোম্বাইএ বাস করেন। ইহার পরে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য কলিকাতায় আসেন। প্রথমে দক্ষিণ কলিকাতায় একটি ফ্লাটে বাস করিতে থাকেন। পরে ৭৮-বি ল্যান্সডাউন রোডস্থ বাটীতে একটি ঘর লইয়া বাস করেন। এই কক্ষটিতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি একরূপ নির্জ্জন-বাস করিতেন বলিলেই হয়।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে কবিবর রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছিলেন:—

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্দ্ধে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখর শ্রেণী; যেথায় গহন গুহা হ'তে
সমুদ্রবাহিনী বার্ত্তা চলিছে প্রান্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি' যেথা মায়া কুহেলিকা
ভেদি' উঠে মুক্ত দৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোহরে লিপি, যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্ত্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা, যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি মর্ত্তধরণীর দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্ত্য রাজ্যের জাগরণ
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া—শোন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ—
তমিস্রের পার হ'তে তেজোময়, যেথায় মানুষ—
শুনে দেববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,
দিক্ সীমাপ্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমাঝারের তপোবনে
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ যুগান্তরে ধ্যানের গগনে
গূঢ় হতে উদ্ঘাটিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে—
নিত্য সুন্দরের আমন্ত্রণ! সেথাকার শুভ আলো
বরমাল্যরূপে তব সমুদার ললাটে বুলালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি।

মোরে তুমি মানো বন্ধু বলি
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্ব্বাদ, বিদায়কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর॥

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীসুধাকণা চক্রবর্ত্তী

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাণবান্ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম শত-বার্ষিকী যজ্ঞবেদীমূলে আজ সকলের পশ্চাতে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলী দিতে আসিয়াছি।

বঙ্গমাতার কোন এক অখ্যাত পল্লীক্রোড়ে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তিনি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও জীবনব্যাপী সাধনার বলে সমগ্র জাতির সাভিনন্দ নমস্কার আকর্ষণ করিতেছেন!

নানাক্ষেত্রে লব্ধাধিকার তাঁহার শক্তি ও সাধনার কথা স্মরণ করিয়া দেশবাসী বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে তাঁহাকে "সাহিত্য-যুগ-প্রবর্ত্তক", "সাহিত্য-সম্রাট" প্রভৃতি আখ্যা দিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেছেন না। শ্রদ্ধাঞ্জলীহস্তে তাঁহার স্মৃতি-তীর্থে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে স্মরণে আসে তাঁহার সেই ধ্যানদীপ্ত ঋষি-মূর্ত্তি,—যে মূর্ত্তিতে তিনি অর্দ্ধশতাব্দীরও পূর্ব্বে "বন্দে মাতরমের" উদাত্ত সঙ্গীতে তরুণ-বঙ্গকে বিস্ময় বিচলিতচিত্তে ও অননুভূতপর্ব্ব আনন্দে জাগ্রত করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে সেই দৈবী সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে কতবার আত্মবিস্মৃত ভারত দেশাত্মবোধে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। যুগে যুগে সেই ধ্বনি দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে কত বীর হৃদয়ে উন্মাদনা উদ্দীপ্ত করিবে কে বলিতে পারে? শাসন-সীমা-রেখা-অঙ্কিত বঙ্গ যদি বিলুপ্তও হইয়া যায়, তবু বাঙালী বঙ্কিমের এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া জাতিকে যে অমোঘ-মন্ত্র দান করিয়াছে, তাহার শক্তিতেই বঙ্গের বাহিরেও তরুণ-বঙ্গ চিরজীবিত থাকিবে।

যে ঋষি-দৃষ্টিতে বঙ্কিম 'বন্দে মাতরমে'র এই অমর মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তাঁহার সাহিত্য সাধনার অঙ্গাঙ্গী যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গ-সাহিত্যের যে যুগের সহিত বঙ্কিমের নাম অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত, সে যুগের গোড়াপত্তন বঙ্কিমের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল মনীষীর হস্তে ইহা একটি স্পষ্টরূপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বঙ্কিমই প্রধান। এই মহাশিল্পীর হাতে গড়া রূপের নব নবচ্ছটা, নূতন নূতন আদর্শে এখনও দিকে দিকে প্রকাশ পাইতেছে। কিসের বলে তাঁহার হাতে সাহিত্য মূর্ত্ত হইয়া উঠিল? ইহা কি তাঁহার শুধু প্রতিভার বল? অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে পাশ্চাত্যের তদানীন্তন উদ্দীপনাময় আলোকের সহিত প্রাথমিক সংস্পর্শের ফল? মনে হয় এই প্রশ্নের সদুত্তর বঙ্কিম নিজেই তাঁহার "আনন্দমঠের" উপক্রমণিকাতে দিয়া রাখিয়াছেন—সেই উত্তর তাঁহারই ভাষায় শ্রবণ করি—"সেই অনন্ত শূন্যারণ্য মধ্যে, নিশীথের সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল,—আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?......কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল; আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্য কণ্ঠে ধ্বনিত হইল -আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?" এইরূপে তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল "তোমার পণ কি?" প্রত্যুত্তরে বলিল—"পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।" প্রতিশব্দ হইল—"জীবন তুচ্ছ! সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" আর কি আছে? আর কি দিব? তখন উত্তর হইল "ভক্তি"। মনে হয় বঙ্কিম যখন তাঁর প্রতিভা পণ করিয়া সাহিত্য সাধনারূপ মনস্কামনা পূর্ণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রাণে এই বাণী লাভ করিলেন যে, শুধু প্রতিভা নয়, শুধু শক্তি নয়—চাই ভক্তি! সেই ভক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি বা তাঁহার নিকট ভারতী আর ভারত এক হইয়া গেল। ভারতীর প্রতি ভক্তি হইতে তাঁহার প্রাণে মানব-জীবনের প্রতি, দেশবাসীর প্রতি—গভীর শ্রদ্ধা উদিত হইল—এক কথায় তাঁহার মধ্যে গভীর দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইল। স্বদেশকে তিনি নূতন আলোকে দেখিতে পাইলেন। অতীত গৌরবময় হইল, মাতার অতীত মূর্ত্তি "সর্ব্বালঙ্কার পরিভূষিতা, হাস্যময়ী, সুন্দরী, বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী হইল।" সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানের কালিমা গাঢ়তররূপে প্রতিভাত হইল, সেই দেশাত্মবোধের দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া দেখিলেন—"বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে কত বড় বিরাট বিশ্ব-জীবন, কত আলো, কত হাওয়া, কত মৈত্রী, কত সংগ্রাম, কত সংঘর্ষ, কত অনুসন্ধিৎসা, কত কর্ম্মোন্মাদনা!" সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল—"ভারতীয় জীবনের বেদনাময় পার্থক্য—তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, কত শত বন্ধনে বাঁধা রহিয়াছে আমাদের কর্ম্মজীবন, কত অপমান পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে আমাদের জাতীয় জীবনে, কত গ্লানি সঞ্চিত হইয়াছে আমাদের ধর্ম্মে।" শুধু প্রতিভার তীব্র আলোকে তিনি এই সকল দেখেন নাই, তাঁহার নয়নে ছিল ভক্তির স্নিগ্ধ আলোক, প্রাণে ছিল অনুরাগের আবেগময়ী প্রেরণা; তাই বর্ত্তমান আবদ্ধ জীবন দেখিয়া তাঁহার মধ্যে আসিল জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের সেবা দ্বারা দেশমাতৃকাকে নূতন রূপ দিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা। তাই তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে দেখিতে পাই দুই প্রধান বিশেষত্ব—মানবতার মহান্ আদর্শের স্ফুরণ ও পৌরুষের অনুপ্রাণন। তাই আজ পঞ্চাশৎ বৎসর পরেও তাঁহার অমৃত-নিঃস্যন্দিনী রচনার ভিতর সেই তেজোময় পুরুষকে আমরা জীবন্ত, মূর্ত্ত দেখিতেছি! স্বদেশকে ভালবাসিতে, পরাধীনতার নাগপাশের বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে, দেশের কলঙ্ক কালিমা অপনোদন করিতে, স্বদেশের গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে, দেশের মুক্তি কামনায় সকলকে উদ্দীপিত করিতে এমন একখানি বলিষ্ঠ পুরুষ-প্রাণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে বুঝি বা আর দ্বিতীয় নাই! তাঁহার রস-সৃষ্টির বিচার-বিশ্লেষণ অনেক হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা হউক। আমাদের শুধু মনে হয়, সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে তাঁহার রচনার মধ্যে সেই দীপক রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়াছে যাহা দ্বারা নিদ্রিত-পাষাণ-বঙ্গে প্রাণসঞ্চার হইল, তরুণ-বঙ্গ দেশাত্মবোধের অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনমুক্ত অনাবিল ভাষার অপরূপ রসাস্বাদনে বাঙালীর শুষ্কপ্রায় প্রাণ আবার মধুর হইল। এইখানেই বঙ্কিম-সৃষ্টির অভি-

নবত্ব। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ভারতীর প্রতি ভক্তির আহবানে বঙ্কিমের মধ্যে যে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিল, তাহার মধ্যে তিনি পাইলেন দেশের সকল স্তরের নবনারীর প্রতি অপরিসীম সশ্রদ্ধ মমত্ব।

তাঁহার সৃষ্ট কত নায়ক-নায়িকার জীবন-কাহিনীর মধ্য দিয়া এই মমত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কত নির্য্যাতিত নারীর দুঃখ, বেদনা তাঁহার সহৃদয় অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। তাই বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি নারীকে কত বিচিত্র রূপে সাজাইয়াছেন। কত মূক ললনার প্রাণের অব্যক্ত বেদনা, কত দৌর্ব্বল্যাহতা অভাগিনীর জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি তাঁহার দরদী তুলিকার স্পর্শে আমাদিগের নিকট মর্ম্মস্পর্শী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। "বিষবৃক্ষে" অভাগিনী "কুন্দের" ক্ষুধাতুর প্রাণের সরল প্রেমকে সমাজ বিধানের বৃহত্তর লাঞ্ছনা ও অপমান হইতে মুক্তিদানের জন্য তাঁহাকে বিষ দান করিতে হইল! দৈববিপাকে বঞ্চিতা কুন্দের জীবনের এই নিষ্ঠুর যবনিকাপাতে মহাপ্রাণ বঙ্কিমের ব্যথাতুরচিত্তে যে করুণ ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা শুনিয়া বঙ্গের উদাসীন বক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠুক—ইহাই কি তাঁহার অন্তরের কামনা ছিল না? কিন্তু বঙ্কিম শুধু নারী চরিত্রের এই দুর্ব্বল দিকটাই দেখেন নাই, অবলা নারীর মধ্যে যে একটা সবল, সতেজ দিকও আছে, তাহাও তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই জন্যই দেখিতে পাই তিনি ভ্রমরকে দিয়া বলাইতেছেন—"যদি আমি সতী হই, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে। যদি একথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা।" ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়জন লেখক অবমানিতা নারীর এই দৃপ্ত তেজ ও নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাসের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিয়াছেন? লাঞ্ছিতা নারী চরিত্রের বীরত্ব এমনভাবে চিত্রিত করিতে কয়জন কবি সমর্থ হইয়াছেন? আজকাল রস বিশ্লেষণের জন্য "আর্টের" খাতিরেই "আর্ট" রূপ একটি নূতন মাপকাঠি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মাপকাঠি হস্তে অনেক সাহিত্যিক এই অভিযোগ করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র রস-সৃষ্টির সহিত নীতি উপদেশের সংমিশ্রণ করিয়া সাহিত্যের রস-মাধুর্য্যকে অনেক পরিমাণে ক্ষুন্ন করিয়াছেন, কেন না রস-সৃষ্টিতে আদর্শবাদ ও নীতিবাদের স্থান সঙ্কীর্ণ। কিন্তু প্রকৃত রস-সৃষ্টি আমরা কাহাকে বলিব? ধর্ম্ম ও নীতি বহির্ভূত শিল্প কি মানুষকে বিশুদ্ধ রসাস্বাদন করাইতে পারে? আর্ট-এর খাতিরেই আর্ট, এই মতবাদের মূলে রহিয়াছে এই ধারণা যে, মানুষের ভিতরে একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব, একটা বিপুল দ্বিত্ব—একটি তাহার অন্তর পুরুষ—ব্যক্তি সত্তার স্বাতন্ত্র্য—আর একটি সামাজিক জীবনের বন্ধনানুভূতি। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সভ্য সমাজে হইয়া আসিতেছে অন্তর পুরুষটিরই নিষ্পেষণ। সামাজিক অনুশাসন হইতে মুক্ত করিয়া অন্তর পুরুষের স্বাভাবিক পরিস্ফুরণ দেখানই প্রকৃত আর্ট অথবা রস-সৃষ্টি। কিন্তু এইখানে আমরা ভুলিয়া যাই, মানুষের অন্তর পুরুষ ইতর প্রাণীর অন্তর পুরুষ নহে। তাহার ব্যক্তিসত্তা শুধু শারীরিক জীবনের সত্তা নহে। মানুষেরই জীবনে আসে আদর্শের আলোক ও তাহার অনুসরণের মহান্ প্রয়াস। ইহাই মানব জীবনের চিরন্তন সত্য, চিরন্তন শিব—আর ইহারই মধ্যে তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য এই জন্যই বঙ্কিম বলিয়াছেন, সাহিত্য—'সত্য, শিব ও সুন্দর' —এই তিনেরই উপাসক! ধর্ম্ম ও নীতি-বিবর্জ্জিত রসের সৃষ্টি ও সেই রস পান জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া তুলে। কিন্তু "আর্টিষ্ট" বঙ্কিমের মনের অন্তরালে ছিল মনুষ্যত্ব বিকাশের, সৌন্দর্য্য সৃষ্টির গোপন প্রেরণা। তাই তাঁহার বহু সামাজিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রে আদর্শবাদের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তর পুরুষের আদি প্রকৃতির—অর্থাৎ প্রবৃত্তিকুলের সাবলীল গতি ও তাহার নিয়ন্ত্রণের বেদনার প্রতি বঙ্কিম উদাসীন ছিলেন না, বরং এই সকল তিনি তাঁহার মোহন তুলিকাতে মোহনীয় করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষের অন্তর-সংগ্রাম সত্য,—আদি প্রকৃতির অবাধ গতির চিত্র সুন্দর, কিন্তু ততোধিক সত্য জীবনের আদর্শ, ততোধিক সুন্দর আদর্শের অনুসরণ,—মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু নীতিবাদের গুরুত্বে তাঁহার রচনা ভারাক্রান্ত হয় নাই কোথাও। নিজের জীবন অন্যের অসহনীয় হয় নাই কখনও; বরং পরম হাস্যরসিক পুরুষ ও বন্ধুজনের পরম আকর্ষণের কেন্দ্র ছিলেন তিনি। এই জন্য একদিকে যেমন বাঙলার খাঁটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মদাতা ছিলেন তিনি, অপর দিকে সুরুচিপূর্ণ ও সুমার্জ্জিত ব্যঙ্গ-কৌতুক ও হাস্যরসাত্মক রচনার পথ-প্রদর্শকও তিনি। গভীর বিষয়ের সরল ও সরস আলোচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। 'কৃষ্ণচরিত্র', 'অনুশীলন', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' শিক্ষিত বাঙালী সমাজকে নূতন আলোক দান করিয়াছে ও সাহিত্যের স্থায়ী অনবদ্য ভূষণ হইয়া রহিয়াছে। এই সর্ব্বতোমুখী সাহিত্য সাধনার প্রেরণা জোগাইয়াছে—পূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি—তাঁহার দেশাত্মানুভূতি। দেশমাতৃকার ভবিষ্যৎ মহিমময়ী যে মূর্ত্তি তিনি "আনন্দমঠে" ব্রহ্মচারীর দিব্য-দৃষ্টিতে দেখাইয়াছেন, তাহা কি জাতিকে সম্মুখের দিকে আকৃষ্ট করিতেছে না? তাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

"হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে, নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগ সাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চির চলমান স্রোতে জাগাইতে প্রাণ অভিনব—
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্ত্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গ ভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।'

* পাটনা বঙ্কিম শত-বার্ষিকীতে পঠিত.

প্রজানেতাদের ডিগ্‌বাজী

রেজাউল করীম এম্‌-এ বি-এল
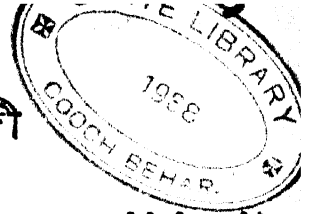
একজন ইউরোপীয় কূটনীতিজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহার উদীয়মান সন্তানকে উপদেশ ছলে বলিয়াছিলেন, "বৎস, তুমি যদি পার্লামেন্টে প্রবেশ কর তবে প্রথম প্রথম বামপন্থী দলে যোগ দিবে, চোখা চোখা বক্তৃতা করিবে, তাহার পর দেখিবে, সম্মান ও মর্য্যাদায় তুমি দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিবে। তখন তুমিই দল-গঠন করিতে পারিবে, তুমিই নেতা হইবে, চাই কি তুমিই প্রধান মন্ত্রীত্ব পাইতে পারিবে।" বাঙলার নূতনতম মন্ত্রীদ্বয় মৌলবী তমিজুদ্দিন ও মৌলবী শামসুদ্দিনের আচরণ দেখিয়া উক্ত ইউরোপীয়ান পণ্ডিতের কথাই মনে পড়িল। আজ তাঁহারা বাহাল তবিয়তে ও খোশ-মেজাজে মন্ত্রিত্বের আরামপূর্ণ গদীতে উপবেশন করিলেন। দলত্যাগী ও বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া অনেকে হয় ত তাঁহাদিগকে নিন্দা করিবে, কিন্তু তাহাতে মন্ত্রীযুগলের কিছু আসে যায় না। চিরপোষিত কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা মনে মনে এমন একটা আত্মপ্রসাদ পাইতেছেন, যাহার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের শত ধিক্কারকে অবলীলাক্রমে হজম করিতে পারিবেন। তাঁহারা যাহা পাইলেন তাহা বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার—না বামপন্থীদের দলে যোগ দেওয়ার পুরস্কার, সে বিচার-ভার দেশবাসীর উপর।

বর্ত্তমান প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলীর মতের ও আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারিয়া মৌলবী নওশের আলি সাহেব যে আড়াই হাজার মসনদে পদাঘাত করিয়া সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিলেন, সেই পরিত্যক্ত পদে বামপন্থী দলের এই দুইজন ধুরন্ধর নেতা অক্ষত বিবেকে ও আনন্দিত মনে সমারূঢ় হইলেন। হক্‌-নলিনী-নাজিম যৌথ কোম্পানীর সহিত বৎসরাধিক সংশ্লিষ্ট থাকিয়া মৌলবী নওশের আলি সাহেবের শেষের দিকে চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। আর বামপন্থীদলের সহিত থাকিয়াও মৌলবী তমিজুদ্দিন-শামসুদ্দিন সাহেবদ্বয় শেষের দিকে এমন একটা ডিগ্‌বাজী খাইলেন যাহার জন্য আজ দেশবাসী তাঁহাদের উপর সমস্ত শ্রদ্ধা হারাইল। নির্লোভ নওশের আলি সাহেবের দৃঢ়তা দেখিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল। যাহারা কোন দিনই তাঁহার রাজনীতিক মতবাদ ও আদর্শ সমর্থন করেন না, তাঁহারাও বুঝিলেন যে, হ্যাঁ, একটা লোকের মত লোক বটে এই নওশের আলি, যিনি নিজের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের জন্য মন্ত্রিত্বের গদিতে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। আর এই নূতন মন্ত্রীদ্বয়? ইঁহাদের কথা আর কি বলিব! ইঁহাদের লম্বা মুখের লম্বা বড় বড় বুলি প্রজার জন্য মায়া-কান্না, দর্পদম্ভপূর্ণ আস্ফালন, গরম গরম বক্তৃতা—এসব যে মন্ত্রিত্বের গদী দখল করিবার জন্য একটা কৌশলমাত্র তাহা সরলহৃদয় দেশবাসী ও ততোধিক সরল প্রজাকুল ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। সরকারী নজরে বড় হইবার বা বড় বড় পদ লাভ করিবার এই ত উপযুক্ত পথ। উপরে বর্ণিত ইউরোপীয় কূটনীতিজ্ঞের বর্ণিত পন্থাই ত স্বার্থপর আত্মসর্ব্বস্ব ও উচ্চ পদলোভী ব্যক্তিদের চিরাচরিত পন্থা। তাঁহারা এই পন্থা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে বড় হইতে পারেন না, এবং সে পথ তাঁহাদের জানাও নাই। তাই তাঁহারা প্রথমে যোগ দেন বামপন্থীদের সঙ্গে, দু-একটা চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষকে তাক লাগাইয়া দেন। যাহারা নীতিগত আদর্শ হিসাবে বামপন্থায় বিশ্বাসী তাহারা মনে করে, এই লোকটি দলে আসাতে দলের শক্তি বৃদ্ধি হইল, ইহার যোগ্যতায় তাহাদের বুকে বল আসিল। আর ইঁহারা যে পক্ষকে ত্যাগ করেন তাঁহারা মনে করেন এ আবার কি আপদ ঘটাইতে লাগিল! তখন দক্ষিণ-পন্থিগণ ইঁহাদিগের তোয়াজ আরম্ভ করেন, সন্তুষ্ট করিবার জন্য চর পাঠাইতে থাকেন, এবং শেষ-পর্য্যন্ত একটা উচ্চ পদের আশাও দিয়া থাকেন। তারপর কিছু দিন চলে দর কষাকষি, কতকটা বাজারের শাক-মাছ-কচুর মত—অবশেষে একটা কিছু স্থির হইয়া যায়। তখন ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরিয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা দাঁও ভাগ্যে জুটিয়া যায়। এইভাবে স্বার্থপর দলত্যাগীরা বামপন্থীদের দলে ভিড়িয়া গিয়া, কিছুদিন কিঞ্চিৎ কসরৎ দেখাইয়া অবশেষে স্ব স্ব স্থানে অধিকতর সুবিধা লইয়া অধিষ্ঠিত হন। ইউরোপে—যেখানে রাজনৈতিক আদর্শটা উচ্চ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেইখানেই যখন এই রূপ জঘন্য নীতি অবলম্বিত হয় তখন এদেশে, যেখানে দিন-দুপুরে ধর্ম্মের বেসাতি চলে, সেখানে যে ইহা অনায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে চলিতে থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! এই জঘন্য নীতি প্রচলিত আছে বলিয়াই উক্ত মৌলবীদ্বয় ন্যায়, নীতি ও আদর্শের মাথায় পদাঘাত করিয়া হঠাৎ প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী-দলে ভিড়িয়া গেলেন। আর ইঁহাদের আদর্শ অপরকেও যে ঐ পন্থা অনুসরণ করিতে প্ররোচিত করিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অন্যায়-পন্থা সব সময় অমঙ্গলের কারণ এবং সৎ উদ্দেশ্যেও অন্যায়-পন্থা অবলম্বন করিলে, তাহার শেষ ফল ভাল হয় না।

মনের গোপন কোণে ব্যক্তিগত স্বার্থের আশা পোষণ করিয়া মানুষ কেমন করিয়া উচ্চনীতি ও আদর্শের দোহাই দিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিলাম—উক্ত মৌলবী-দ্বয়ের মধ্যে। যখন প্রথমে মৌলবী সামসুদ্দিন সাহেব, হক মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে 'প্রতিক্রিয়াশীল ও জমিদার প্রভাবিত', এই অভিযোগ দিয়া উহা হইতে সরিয়া আসিলেন, সেদিন কে জানিত যে, তিনি এই মন্ত্রিমণ্ডলেই একটি আসন লাভের আশা গোপনে পোষণ করেন? উহার কিছুদিন পর একই রূপ অভিযোগ দিয়া মৌলবী তমিজুদ্দিন সাহেবও কোয়ালিশন দল পরিত্যাগ করেন। দেশের নিপীড়িত প্রজাকুল মনে করিল, ইঁহারা প্রজার স্বার্থের জন্যই এইভাবে মন্ত্রী-বিরোধী দলের শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। উদ্দেশ্য—এই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিত্ব ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে প্রকৃত প্রজাদলের মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা। কিন্তু যখন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব টিকিল না, তখন হইতেই এই দুই ভদ্রলোক একটু একটু সুর বদলাইতে আরম্ভ করিলেন। সুযোগ বুঝিয়া চর আসিয়া কানে কানে কত গোপন-কথা কহিয়া গেল, দলের অন্যান্য লোকগণ তার একটুও টের পাইলেন না।

এদিকে দলের সদস্যদের মন বুঝাইবার জন্য উপরে উপরে আপোষের কথাবার্ত্তাও হইতে লাগিল। উভয় পক্ষ হইতে সর্ত্ত রচিত হইল। আসা-যাওয়া, কানা-ঘুষা, কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা, আপোষ-নিষ্পত্তি প্রভৃতি লইয়া বাজার সরগরম হইয়া উঠিল। উপরে এই সব, কিন্তু তলে তলে অন্য ব্যবস্থা। তারপর হঠাৎ শুনা গেল, সব আলোচনা ফাঁসিয়া গেল, যে যার স্থানে চলিয়া আসিলেন। দেশবাসী মনে করিল—অমন প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীদের সহিত প্রকৃত প্রজা-দরদীদের কোনরূপ আপোষ হইতে পারে না, তাই এই আপোষের কথাবার্ত্তা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু এসব হইল উপরের দিক, ভিতরের কথা ত কেহ জানিত না! যেমন কানাঘুষা থামিয়া গেল, বাজার ঠাণ্ডা হইয়া গেল এবং মন্ত্রিত্বের অদল-বদলের কথা কেহ আর ভাবিয়াও দেখিল না, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পাকা খেলোয়াড় হক সাহেব এক বাজিতে কিস্তিমাৎ করিয়া মৌলবী তমিজুদ্দিন ও সামসুদ্দিনকে মন্ত্রিত্বে ভিড়াইয়া লইলেন। আর ইঁহারা এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, দলের নেতা হইয়াও দলের সদস্যদের সহিত পরামর্শ করিবার অবসর পাইলেন না। যে মহান্ আদর্শের জন্য ইঁহারা হক সাহেবের সংস্রব ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহার কোনরূপ কূল-কিনারা না করিয়াই হক-নলিনী-নাজিমের নিকট বিনা সর্ত্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। অতঃপর যদি বলি, তাঁহাদের কোয়ালিশন দল ত্যাগ ও বামপন্থীদলে যোগদান—উভয় কার্য্যই উদ্দেশ্যমূলক, তবে তাহা কি নিতান্ত ভুল হইবে? মাননীয় —উদ্দিন মন্ত্রীদ্বয় প্রজাদল ত ত্যাগ করিলেন, কিন্তু যে অদর্শের জন্য তাঁহারা প্রজাদলে অসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল? হক সাহেব কি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছেন? হক সাহেবের দল ত্যাগ করিবার সময় আমরা মিঃ তমিজুদ্দিন ও মিঃ সামসুদ্দিনের মুখে অনেক বড় বড় কথাই শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সেগুলির একটাও সুরাহা না করিয়া তাঁহারা কোন্ নীতির দোহাই দিয়া প্রজার চির-বৈরীদের দলে ভিড়িতে গেলেন? তাঁহাদের যদি বিবেক বলিয়া কোন বস্তু থাকিত, তবে এরূপ নির্লজ্জ ভাবে হক সাহেবের দলে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেন না। হায়, তাঁহাদের মূল দাবীর একটা অক্ষর পর্য্যন্ত হক-সরকারকে স্বীকার করাইতে পারেন নাই, অথচ মাথা নীচু করিয়া সুড়সুড় করিয়া তাঁহাদের দলে আত্ম-সত্ত্বা বিসর্জ্জন করিলেন। দেশের কোটি কোটি প্রজা তাঁহাদের নিকট 'ফরিয়াদ' করিতেছে—কি হইল—বিনা-করে সর্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের, কি হইল—পাটের নিম্নতম দর নির্দ্ধারণের, কি হইল—কর-ভার পীড়িত প্রজাগণের কর হ্রাসের ব্যবস্থা, কি হইল—মন্ত্রীদের বেতন হ্রাসের দাবী?—উদ্দিন সাহেব-দ্বয় যে দাবী করিয়াছিলেন,—বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর জমিদার ও পুঁজিপতিদের সংখ্যা কমাইতে হইবে এবং প্রজা-দলের মধ্য হইতে অধিকাংশ মন্ত্রী লইতে হইবে —সে দাবী আজ কোন অতলে তলাইয়া গেল? প্রস্তাবিত ভূমি-কমিশনের চেয়ারম্যানের কথা লইয়াই ত মৌলবী তমিজুদ্দিন সাহেব বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছিলেন। ইউরোপীয়ানকে বাদ দিয়া দেশীয় লোককে নিয়োগ করিবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া কোন্ মুখে তিনি হক-সরকারের নিকট দাসখতে নাম লিখাইলেন? রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীকে তাঁহারা কিরূপ আগ্রহের সহিত না সমর্থন করিয়াছিলেন! সে দাবী পূরণের কি প্রতিশ্রুতি তাঁহারা হক সাহেবের নিকট পাইলেন? একটি নয় দুইটি নয়—তাঁহাদের বহু দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে, পদদলিত হইয়াছে—আর তাঁহারা এই উপেক্ষা ও অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া অক্ষত বিবেকে হক সাহেবের হুজুরে হাজির হইলেন। বিবেকের অস্তিত্ব যদি তাঁহাদের মধ্যে থাকে, তবে তাঁহারা গদীতে বসিয়া স্বস্তি পাইবেন না। মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াও তাঁহারা আজ বিজয়ী বীর নহেন। পরাজয়ের গ্লানি তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে দীপ্যমান। আদর্শকে বলিদান করিয়া যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে এবং তাহারই জন্য ন্যায়-নীতির শিরে পদাঘাত করে, আপাত দৃষ্টিতে তাহারা যতই সুবিধা পাউক পরাজয় তাহাদেরই—জীবন-সংগ্রামে ইহারাই পরাভূত হইয়া সহজ পন্থায় কোন-রূপে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকে মাত্র।—উদ্দিন মন্ত্রী-দ্বয়কে ধন্যবাদ দিবার কিছুই নাই—অভিনন্দন করিবার কিছু নাই—ন্যায়-নীতি ও আদর্শ পরিত্যাগের জন্য দেশবাসী তাঁহাদিগকে দিবে ধিক্কার। সামান্য রৌপ্য মুদ্রার জন্য যাঁহারা দল ত্যাগ করিয়াছেন, তালপাতার ছায়া স্বরূপ মন্ত্রিত্ব পদের জন্য যাঁহারা আদর্শ বলি দিয়াছেন—দেশ তাঁহাদিগকে বুঝিয়া রাখিবে, চিনিয়া রাখিবে। এমন দিন আসিবে যখন এই কার্য্যের জন্য দেশবাসীর নিকট তাঁহারা সমুচিত প্রতিদান পাইবেন।

অন্তরাস্থাগ

(গল্প)

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

নীলার যে কি হয়েছে, নিজেই সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। চারিদিকে এত আলো, এত বাতাস, কত ছন্দ কিন্তু সব কিছু যেন অবসাদে ভরিয়া উঠিয়াছে, ঝরা ফুলের মত সব যেন ম্রিয়মাণ, ক্লান্ত।

নীলা নিজেই বুঝিতে পারে না এ তার হইল কি! কেন অকারণে চারিদিক এমন রূপ-রসহীন হইয়া একটা প্রকান্ড অভিশাপের মত কুৎসিত চিন্তার গ্লানিময় দৈন্য তাহাকে সাপের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে।

চীৎকার করিয়া তাহার বলিতে ইচ্ছা করে—না—না—না এমনতর অহেতুক কল্পনা, এমনতর মিথ্যা অভিব্যক্তি হইতে আমি মুক্তি চাই।

তবু সে পারে না।

বসিয়া বসিয়া ভাবে।

ভোরের আকাশে পূবালী রোদের স্বর্ণালোকে সব কিছু যখন রাঙা হইয়া উঠে, দিগ্‌বলয়ে অসীম সীমা রেখায় যখন মুক্ত আলোকের গুঞ্জন বন্যার মত সব কিছু ভাসাইয়া দেয়, টানিয়া লয় আপন কোলে, তখন নীলার ঘুম ভাঙ্গে। আগে ত সে দেরী করিয়াই উঠিত। কিন্তু এখন যেন রাতে ভাল করিয়া ঘুমই হয় না—সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায় একটা দুঃস্বপ্নের মহাপ্রাকারের মাঝ দিয়া, জলস্রোতের মত মনের অসংখ্য কেন্দ্রে বিভীষিকার তরঙ্গ আপন হইতেই একটা বেসুর সুরে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। একেবারে চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠে এক সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি।......ঘুমন্ত স্বামীকে সে জোরে আঁকড়াইয়া ধরে।

তারপর সমস্ত দিনটাও তাহার কাটিয়া যায় মহাশূন্যের মাঝ দিয়া। কি যেন সে হারাইয়া ফেলিতেছে। না—কিছুই তার ভাল লাগে না। সমস্ত কিছুই যেন বিবর্ণ বিস্বাদ। অমাবস্যা রাতের তীব্র অন্ধকারে পৃথিবীর সমস্ত উচ্ছ্বাস, সমস্ত লাবণ্য যেন নিরুদ্দেশের যাত্রাপথে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গিয়াছে।

কলেজ যাইতেও তার আর ভাল লাগে না। একদিন বাসের দেরী হইলে যে ট্রামে করিয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইত না—সেই নীলা আজ হইয়া গেল কি? ক'দিন পরেই ত পরীক্ষা—কত পড়াই ত বাকী! কিন্তু তবু বই লইয়া বসিতে নীলার আর এখন ইচ্ছা করে না। বসিলেও পড়িতে ভাল লাগে না।

কতবার সে মন হইতে সমস্ত দুর্ব্বল চিন্তাকে বিসর্জ্জন দিতে চাহিয়াছে; পুঁথির ভিতর মনঃসংযোগে এত যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা সবই একটা ভৌতিক হাস্যের মত মিথ্যা, কিন্তু ষড়যন্ত্রময়। অক্ষরের মাঝে মাঝে একটা দুরন্ত আর্ত্তনাদ যেন অকস্মাৎ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়—কালো কালো গুটি গুটি অক্ষরগুলি ধীরে ধীরে জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠে; সেখানে দেখা দেয় দুইটি হিংস্র চোখের কুটিল চাহনি। সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি—রাঙা বসন; কপালে লাল চন্দনের ফোটা; হাতে প্রকান্ড একটা কমণ্ডলু—আর লতান পাহাড়ী লতা গাছ......

নীলা মনে মনে চীৎকার করিয়া উঠে। পুঁথি বন্ধ করিয়া রাখে। আসিয়া দাঁড়ায় জানালার কাছে। এখান হইতে নীচের ফুলের বাগানটা দেখা যায়—রজনী-গন্ধার গাছে শ্বেত-শুভ্র পুষ্প-স্তবক বোঁটা বাহির করিয়া ফুলে ফুলে একাকার হইয়া উঠিয়াছে, নূতন চন্দ্র-মল্লিকার গাছে এবারে কি অজস্রই ফুল!

না! কিছুই যেন ভাল লাগে না।

স্বামীর চোখেই সে ধরা পড়িল আগে। কোর্ট হইতে ফিরিতে না ফিরিতে নীলা আগাইয়া যাইত—নিজের হাতেই খুলিয়া দিত জামা; ফ্যান না চালাইয়া পাখা হাতে কাছে আসিয়া বসিত; ছোট্ট খুকীর মত উচ্ছ্বাসে আর প্রাবল্যে স্বামীকে সে ডুবাইয়া দিত নিজের অন্তরের ছায়া-শীতল মণিকোঠায়। কিন্তু কৈ! অজিত—অবাক হইয়া যায়, এখন যেন নীলা আর বড় একটা কাছেই আসে না। দূরে দূরে থাকে—ভয়ে ভয়ে কাছে আসে—ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে কি যেন তার উদ্বেগ। কৈ গেল তার জলকল্লোলের মত অপূর্ব্ব সেই লীলায়িত খুশীর তরঙ্গ; অজিত অবাক হইয়া ভাবে; কি হইল নীলার! প্রথম প্রথম মনে হইয়াছিল পরীক্ষার চিন্তাতেই বুঝি ক্ষণিকের জন্য চিন্তান্বিত, কিন্তু তাও ত নয়—বই লইয়াও ত বড় একটা বসে না।

তবে?

সেদিন অজিত কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে বসিয়া অনেকক্ষণ সময় কাটাইয়া দিল, নীলা তখনও আসিল না। অজিত কয়েকবার নীলার নাম লইয়াই ডাকিল। কিন্তু উত্তর দিল তাদের ভৃত্য—বৌ-রাণী ছাদের উপর আছে।

আরও কিছুক্ষণ গেল।

কি ভাবিয়া অজিতও চুপে চুপে ছাদের উপরে আসিল। নীলা এক দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকাইয়া আছে। স্বামীর আগমনের দিকে তাহার খেয়ালও হইল না। মহানগরের চারিদিক রাতের শোভাযাত্রায় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে—পশ্চিমাকাশে অস্তরবির বিদায়োন্মুখ মহিমময় অপূর্ব্ব শ্রী।

নীলার দৃষ্টি যেন সেই মহাপ্রান্তরের দিকে—

অজিত আসিয়া চুপে চুপে কাছে দাঁড়াইল। আদর করিয়া নীলার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল, নীলা—!

নীলা সচকিত ভঙ্গিতে বনহরিণীর মত শ্রান্ত চোখে ফিরিয়া তাকাইল। স্বামী। স্বামী তার সম্মুখে। কিন্তু কি যেন একটা ভয়ানক বিসর্পিল অন্ধকার ধীরে ধীরে নীলার সম্মুখে নামিয়া আসিতেছে!

অজিত অবাক হইয়া গেলঃ কি হয়েছে তোমার?

নীলা চেষ্টা করিয়া হাসিল। হাসিয়া বলিলঃ কিছুই হয়নি। অজিত নীলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইল। নীলার সমুদ্রের ঢেউ-এর মত নিবিড় সুন্দর ঘনকৃষ্ণ অলক-গুচ্ছ রুক্ষ হইয়া গিয়াছে—হাত দিয়া সেগুলি দোলাইতে দোলাইতে অজিত বলিলঃ সেই ভাল। কিছু না হয়ে থাকে

করছ—তাতে রাজা হওয়া মুস্কিল। দিল্লী যাবার বাতিক এখন ছাড়।

মলয় নিতান্তই ছোট ছেলের মত আরম্ভ করিয়া দিলঃ এই একটিবার মাত্র যাব। আর কোনদিন যদি যাই—কিছুতেই নয়। কিন্তু অত সাজ-গোজ ক'রে যাচ্ছ কোথায়?

সিনেমায়। যাবে?

মলয় সিনেমার একটি পোকা বিশেষ। বলিলঃ না বৌদি ও-সব তাল আর এখন তুল না। ক'টা দিনের মধ্যেই বইগুলি একটু দেখতে হ'বে। এক একটা সাবজেক্ট আঠারোটা বই—

বৌদি বললেনঃ তা'হলে ভাল করে পড়।

মলয় বলিলঃ কিন্তু টাকা দুটা আজই পেলে ভাল হ'ত।

বৌদি হাসিয়া বলিলঃ সেদিন ত নিলে যাবার আগে। কিসের টাকা আবার?

মলয় ভারিক্কিভাবে বলিলঃ বাঃ সিনেমায় নিয়ে যেতে চাচ্ছ—আমার খরচ কোন্ আর দু'টাকার কম হ'বে। সেটা দাও!

বৌদি হাসিয়া বলিলেনঃ নিও।

মলয় খুশী হইয়া বৌদির পায়ের ধুলো নিলঃ গুড্ বৌদি।

বৌদি ঠাকুরপোর ব্যবহারে আর্দ্র ভঙ্গিতে মনে মনে হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তারপর যথা-সময়ে সিনেমায় চলিয়া গেল।

কিন্তু সিনেমায় না গেলেই বুঝি ছিল ভাল। হয়ত মনের দুর্ব্বল রেখাগুলি আবার চঞ্চল হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইত না। কিন্তু কে জানিবে যে, সিনেমার পর্দ্দার যে অহেতুক ছবি তাহাকেই আবার নীলা মূল্য দিবে অত বেশী করিয়া! এক রাজকুমার এক সন্ন্যাসীর কোপে কেমন করিয়া তাহার রাজ্য-পাট, জন-পরিজন সব-কিছু হারাইয়া ফেলে। এমনি একটা কাহিনী লইয়া গল্প; তাহাকে যে কেন এত মূল্য দিতে হইবে—ইহা নীলাও ভাবিয়া পায়নি। নীলা আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। চারিদিকে আবার জাগিয়া উঠিল সেই তীব্র চিন্তার আঁকাবাঁকা অজস্রতা। সিনেমা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাতে সেদিন এক বিন্দু ঘুমও তাহার হয় নাই! চারিদিক হইতে সন্ন্যাসীর দল যেন নামিয়া আসিয়াছে—লাল,—শুধু লাল রং! রক্তের মত গাঢ় লাল রং।

ভয়ে সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরে।

অজিত বলেঃ কি? কি হয়েছে?

নীলা ভীত কণ্ঠে বলেঃ আমি ভয় পাচ্ছি।

অজিত ঘুমের ঘোরে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেঃ ও কিছু না। স্বপ্ন।—ঘুমাও।

নীলা চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে চেষ্টা করে।

কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। নীলা জোর করিয়া স্নান করে—খায় দায়—আলাপ পরিচয় করে। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন বিমনা হইয়া উঠে। কি যেন ভয়ঙ্কর কিছু হইয়াছে, ইহা তাহার বুঝিতে কষ্ট হয় না—কিন্তু সত্যিই যে কি হইয়াছে, বুঝিতে পারে না। কিছুই যেন ভাল লাগে না! শুধু ভাল লাগে—আপন মনে বসিয়া বসিয়া সেই-সব মিথ্যা আশঙ্কাকর চিন্তা করিতে।

মাথাটা মাঝে মাঝে ধরে। কোনদিনই ত ধরিত না!

বুকটা যেন মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠে; এমন ত তার কোন-দিনই হইত না।

সত্যি নীলা কয়েকদিনের মধ্যেই অন্য মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিবেই এ ধারণা তার মনে অকারণে একেবারে জাঁকিয়া বসিয়াছে।

অজিত ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। কি একটা মকদ্দমার বিষয় সরে-জামিনে তদারক করিতে তাহাকে এক গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে শীতের ভিতর পুকুরে স্নান করিয়া একটু সর্দ্দি লইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

নীলা আর এখন তাহার কাছেই আসে না। তবু সে খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিলঃ এ কি হয়ে গেছে তোমার চেহারা?

নীলা কথা বলিল না।

অজিত বলিলঃ তাহ'লে ঠাকুরকে বল, আদা দিয়ে এক কাপ চা করে দিক।

নীলা প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকাইল।

অজিত হাসিয়া বলিল—যেখানে থাকতে হয়েছিল সে-ঘরটার মাঝে চারদিক হতে রাতে হু হু করে শীতের বাতাস ঢুক্‌ত। আর স্নানও করেছি কদিন পুকুরে—সর্দ্দি হয়ে গেছে।

এ ধরণের তুচ্ছ বিষয় নীলা কেয়ার করিত না। কিন্তু আজ তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ইহা ত সে জানিতই।

নীলা চুপে চুপে ছাদের চিলে-কুঠরীতে আসিয়া বসিল। মাথাটা যেন নীলার কেমন ঘুরিতেছে। 'ব্রেনে'র মধ্যে এক-খানা রেলগাড়ী যেন পথ কাঁপাইয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে রাত্রি নামিয়া আসিয়াছে। তারায় তারাময় আকাশ।

রাত বোধ হয় অনেক হইয়া গিয়াছে।

চিলে-কুঠরী হইতে নামিয়া নীলা আবার নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। শায়িত স্বামীর দিকে তাকাইয়া মনে মনে একটু বিজ্ঞতার হাসি হাসিল। মাথাটা যেন নীলার দেহ হইতে এখনই পড়িয়া যাইবে। কিছুই সে আর স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পারিতেছে না—শুধু যেন সন্ন্যাসীর দল ভিড় করিয়া আসিয়াছে। সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক সন্ন্যাসী! সে যেন বলিয়া উঠিলঃ আগামী ফাল্গুনে পূর্ণিমা তিথিতে তোর স্বামীর একটা মস্ত ফাঁড়া আছে। জীবন-মরণ সমস্যা।

সমস্ত পৃথিবীটা যেন কাঁপিতেছে! ইস কত আগুন! কিসের আগুন? আগ্নেয়গিরি জ্বলিয়া উঠিল নাকি! না—ভূমিকম্প? নীলা বুঝিতে পারে না। চিন্তা করিবার মত শক্তি তাহার আর নাই। কাল-বৈশাখীর বাতাস যেন ঝড়ের মাঝে সব কিছু টানিয়া লইয়াছে। চারিদিকে শুধু নীল সমুদ্রের চঞ্চল গতি-তরঙ্গ। দুইদিকে অসীম জলরাশি।

বারে বারেই বেখাপ্পা লাগছে—কিছুতেই মিলিয়ে গেল না। চপলার সংগে ঝগড়া এখন নিত্যনৈমিত্তিকতার মধ্যে এসে পড়েছে, না-হওয়াই হয়েছে অস্বাভাবিক। তার কি! তখন সহারামবাবুকে কি পাওয়া যাবে?

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া পণ্ডিতরা বলেন, কিন্তু চপলা-বিরাজমোহন অধ্যায় ঠিক তার উলটা। লঘু আরম্ভ বহু ক্রিয়া। কারণ থাকে নগণ্য। বিরাজ দোষে চপলাকে, চপলা ঘুরিয়ে দেয় ওর ঘাড়ে। এ অবিশ্যি ঝগড়ার ইজ্জত। কথা কাটাকাটির মধ্যে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে দোষ ওদের মেজাজের।

আর কত সয়?—বলে দু'জনেই।

মোটেই সয় না কারুর। গলদ সেইখানেই।

সহরামের কথার পর থেকে দু'দিন ছুটি গেছে—অমন হয়ে থাকে। এ নিয়ম সার্ব্বভৌম। ঝড়ের পর প্রকৃতিতে আসে এক অভিমানী মৌনতা, সাগরের উদ্দাম-উদ্বেলতা দম নেয় ধ্যান-মৌন নির্লিপ্ততায়।

শান্তমণি নিজের মনে সান্ত্বনা দিয়েছে—সহারামের ভয়ে আর মুখ ফুটছে না। উ, কি আনন্দ! কি গর্ব্ব! সহারাম বিজয়ী! মূলে যে রয়েছে শান্তমণি নিজে।

ভোরবেলা চা দিতে দিতে শান্তমণি হেসে বললে—দেখছ সেদিনকার পর কেমন সভ্য হয়ে গেছে!

—থাকলেই ভাল, সহারাম উত্তর দেয়। অসহ্য না হলে আর কার দায় পড়েছে।

হঠাৎ এ নিশ্চিন্ত স্বস্তি ভেংগে বিরাজমোহনের গর্জ্জন বেজে উঠল—হারামজাদী, তুই বেরো আমার ঘর থেকে।

সহারাম, শান্ত দুজনে বেরিয়ে এল দাওয়ায়। নীরব দ্রষ্টা।—বিরাজমোহন বলেই ক্ষান্ত হয়নি ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে টেনে বার করে নিয়ে এসেছে একেবারে। যে কথা সেই কাজ।

—আমি কি জানি, ওখানে গিয়ে ঢেলে ফেলবে!

—ফের জবাব! সেরে রাখতে পারলে না! যত আনব হারামজাদী কিছু ফেলে দেবে, কিছু খাবে ইঁদুরে, বাকী নর্দ্দমায়!

—হাঁ এনে ত ঘর ভর্ত্তি করে রাখছেন।

—ফের মুখে মুখে জবাব। দেখবি চোখ বুজলে কি দশা হয় তোর, ছাই কুড়িয়ে খেতে হবে।

—তোমার হাতে যখন পড়েছি, তখন যতদিন না খাচ্ছি সেইই বরাত!

—আর জুটল ত না—ভেংচি কেটে বিরাজমোহন বলে।

—না হলে আমি আইবুড়ো থাকতাম জন্মকাল আর কি!

রাগের মাথায় খোঁচা খুব জোরে দিতে হয় না। ধৈর্য্যচ্যুতি অকারণেই ঘটে, তারপর সামান্য কারণও হল। কথায় বলে কি যেন?—সোনায় সোহাগা!

ধাক্কা দিয়ে বিরাজমোহন সত্যি বার করতে চায়, সদর অবধি নিয়ে এল। সহারামবাবু নীরবে সব লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। নিজের আন্দাজ এত তাড়াতাড়ি মিথ্যে হল দেখে শান্ত কিছুটা দমে গিয়ে জিজ্ঞাসু বিস্ময়ে স্বামীর পানে চেয়ে রইল। অন্যদিন হলে সহারাম বিরাজমোহনকে প্রবোধ দিতেন, কিন্তু আজ—না!

হলে কি হবে নীরব দ্রষ্টা, অভ্যস্ত বিরাজমোহন স্বভাব ছাড়তে পারে না। সদর গোড়ায় এসেই নীরব সহারামকে লক্ষ্য করে উড়াভাবে বলে যেতে লাগল—দেখুন ত, দেখছেন এ দু'দিন আমি কিছু বলেছি! তা এ হারামজাদীর এমনি স্বভাব, এমন লগ্নে জন্ম কিছুতেই সুস্থ থাকতে দেবে না। চাকরী-বাকরী নেই টো টো করে কোনমতে মাসের তেল নুন জোগাড় করে রাখব, দু'দিনে ফেলে নষ্ট করে খালাস্। ভোরবেলা তেল এনেছি আধসের, দেখুন গিয়ে তার এক তোলা যদি আছে। তা আবার তেড়ে কথা! বেরো হারামজাদী!

অন্যদিন হলে সহারাম বলত—পড়েই যখন গেছে চেঁচামেচি করে আর কি লাভ?

ওপর থেকে বাড়ীওয়ালী বলে উঠল—বৌটাও দজ্জাল কম নয়, জানিস্ টানাটানির সংসার.........!

বিরাজমোহন বলে যেতে লাগল—কত আর সয় বলুন্। বল্লাম ভাতটা রেঁধে দে, তাড়াতাড়ি বেরুব।

আমার সময় হলে ত দেব!—চপলা বলে।

সময় তোমার আর হবে না কোন দিন, বদমায়েস্—দেখুন, দেখুন সবে উনুনে আঁচ দিতে চলেছে।

মেয়েটা অমন করে হাতের কাছে কাঁদলে পারে কেউ।

আমার কাছ থেকে টেনে নিয়ে এসে মারলি, এত বড় সাহস!

মারব না ওই ত হয়েছে আমার যত জ্বালা। ওকে শেষ করতে পারলে—

কথা শেষ করতে না দিয়েই বিরাজমোহন রুখে—শেষ তোমায় আজ করব, তুই বেরো আমার বাড়ী থেকে, এনে দেব, চারটি রেঁধে সময় মত দিতে পারবেন না, এমন স্ত্রীতে আমার কাজ নেই!

—বলেই এমন ধাক্কা মারলে, ছিটকে চৌকাঠে পড়ে—'মাগো!' চীৎকার করে বসে পড়ল।

বিরাজমোহনের কণ্ঠস্বরে গলিতে দু' দশজন লোক জমা হয়েছে। নারী-নিগ্রহে তার ভেতরকার একজনের শিভাল্‌রী লাফিয়ে উঠল। এমন রাস্তা-শিভাল্‌রী কলকাতার শহুরে-জীবনে সুদুর্লভ নয়।

আবার কেঁদে লোক জড় করা হচ্ছে! তোর কোন দাদা আজ বাঁচাবে রে—রোষকষায়িত নেত্রে বিরাজমোহন যেমনি ছুটে এগুল, রাস্তার একজন চট্ করে এগিয়ে এসে খপ্ করে ওর হাতখানা ধরে রাস্তায় টেনে বার করল।

মারুন্ মশাই দু'ঘা! রাসকেলটাকে ভাল করে দু'ঘা!

শুধু প্রস্তাব নয় সংগে সংগেই কার্য্য শেষ। বিরাজমোহনের ঘাড়ে পিঠে বেশ দু'চারটে জমে গেল।

এমন অসভ্যপানা কোথায় শিখেছেন মশাই?

বিরাজমোহন অবাঞ্ছিত বিচারকের উক্তি শুনে থমকে গেল। পরে বললে—আমার স্ত্রীকে আমি মারি বা যা করি

(শেষাংশ ২৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পল্লী-গীতিকায় রাষ্ট্রপতি দিব্যের আভাস

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

বাঙলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে অদ্যাপি শত শত গাথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সমস্ত পল্লী-গাথার ভিতর প্রাচীন বাঙলার শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী অন্তর্নিহিত আছে। অনুসন্ধান করিলে পল্লী-গীতিকাগুলি হইতে বাঙলার ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপাদান পাওয়া যাইতে পারে।

উত্তর-বঙ্গের পল্লী অঞ্চল হইতে যে সব পল্লী-গীতিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাদের কয়েকটিতে মহারাজ দিব্য ও রাজা ভীমের কীর্ত্তি-কাহিনীর আভাস পাওয়া যায়।

(১)

সমগ্র দিবসের কর্ম্মাবসানে পল্লীর মা-বোনেরা যখন সন্ধ্যায় অবকাশ পাইতেন তখন তাঁহারা সহজ সুরে ছড়া গাহিতেন। এই সকল ছড়া পল্লীতে "সাঁজের ছড়া" নামে সুপরিচিত। অদ্যাপি উত্তর বঙ্গের পল্লী অঞ্চলের মেয়েরা এই জাতীয় ছড়া গাহিয়া থাকেন। আলোচ্য ছড়াটি সাঁজের ছড়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রাজসাহী জেলার জনৈকা মাহিষ্য ভদ্রমহিলার নিকট হইতে সংগৃহীত।

> ঘুঘু মলো ঝালের পিঠলি খায়্যা,
> সেই ঘুঘুকে নিয়া গেল দিবনগর দিয়া।
> দিবনগরের দুইটা মেয়ে জলে নেমেছে,
> ঝাড়া হিনি চুলগাছি মটর বেঁধেছে।
> পরণে আছে উল্টা শাড়ী মেঘ লাগ্যাছে,
> যাব আমি আপন শ্বশুরবাড়ী জোর শিঙ্গা বাজে।
> দুই দুয়ারে দুটি বউ লক্ষ্মী পূজা করে,
> দুই দুয়ারে দুটি কবুতর মক্ মক্ করে।
> বাপ হয়ে কাপড় দেয় পাখা ঢাকিয়া,
> মা হয়ে জল দেয় ষষ্ঠী সাজিয়া।

"দিবনগর" শব্দটি দিব্যনগরের অপভ্রংশ। উত্তর-বঙ্গের কোথাও দিব্যনগর অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই স্থানটি খুব প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল বলিয়াই হয়ত পল্লী-কবি গীতিকার মধ্যে স্থানটির উল্লেখ করিয়াছেন। দিবনগর রাজা দিব্য বা ভীমের প্রাচীন কীর্ত্তিরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

(২)

ভাদ্রমাসে "চাপর ষষ্ঠী" ব্রতকথার অনুষ্ঠানে উত্তর-বঙ্গের মাহিষ্য মহিলারা কলার ঠোঙ্গায় নৌকা তৈয়ার করেন। তাঁহারা লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি ফুল দিয়া ইহাকে সুসজ্জিত করেন এবং ইহার উপরে আতপ চাউল, ডাল, কলা, নারিকেল প্রভৃতি স্থাপন করেন। সজ্জিত ঠোঙা-নৌকার পূজা শেষ হইলে তাঁহারা নদী, বিল বা দীঘিতে ভাসাইয়া দেন। নৌকাটি ভাসাইয়া দিবার সময় তাঁহারা নিম্নলিখিত ছড়াটি ব্যবহার করেন—

> "ডোঙা যায় ভেসে।
> পুত আসে হেসে।।"

বিরাট নামক স্থানের প্রতিপত্তিশালী সামন্তরাজ দিব্য তৃতীয় বিগ্রহপালের 'নৌকাধ্যক্ষ' বা নৌ-সেনাপতি ছিলেন। দিব্যের 'ভীমা' 'পদ্মপুত্র', 'গম্বরা' প্রভৃতি রণপোতসমূহ তিক্ত অলাবুর ন্যায় যুদ্ধার্থ গঙ্গা করতোয়া বক্ষ সর্ব্বদা পরিশোভিত রাখিত। তাঁহার রাজ্য মধ্যে 'নাবতাক্ষেণী' বা পোত-নির্ম্মাণ স্থান ছিল। * সুতরাং উপরোক্ত চাপর ষষ্ঠী ব্রতকথা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, রাজা দিব্য বর্ষার ভরা ভাদ্রে যখন নৌ-সেনা লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতেন, তখন তাঁহার পরিবারের মহিলারা ও পুত্র-কন্যাগণ দিব্যের বিজয় মঙ্গলার্থে বিদায় অভিষেক করিতেন এবং এই ঘটনা চির-স্মরণীয় করিবার জন্যই দিব্যবংশীয় মাহিষ্য † মহিলারা অদ্যাবধি এই মঙ্গল-ব্রত উদ্যাপন করিতেছেন। পরবর্ত্তী-কালে এই ব্রতকথা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য মহিলাবৃন্দের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছে এবং অদ্যাপি তাঁহারাও এই ব্রত পালন করিতেছেন।

(৩)

উত্তর-বঙ্গের পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট ছেলেরা বিশেষত রাখাল বালকেরা নানা প্রকার ছড়া গান গাহিয়া থাকে। আলোচ্য পল্লী-গাথাটি এই জাতীয় ছড়া এবং রাজসাহী জেলা হইতে সংগৃহীত।

> বক্সী জোলার মায়ে কাঁদেরে— ১
> বক্সী আমার পুত। ২
> শকুনে খুঁচিয়া মারিল ৩
> চৌদ্দ বিঘা তুষ।। ৪
> হোঁকা নেওরে তামাক নেওরে ৫
> খুঁদিত্ তোল আগুন। ৬
> সরকারী খানা কাড়িয়া নেও ৭
> মারিব শকুন।। ৮
> বাড়ীর তাল চামারী খুলু ৯
> তারা বড় ধনী, ১০
> চুরি কর্‌্যা দিল পুকুর ১১
> হেঁটু খানেক পানী। ১২
> গরুর খানা বাছুর খানা ১৩
> ব্যাঙে কর্‌ল খানা। ১৪
> সরদার কর্ত্তা শুনতে পালো ১৫
> কর্‌ল জরিমানা।। ১৬

নিরক্ষর পল্লী-কবি এই কবিতায় তৎকালীন পল্লীর পরিস্থিতির কথা চিত্রিত করিয়াছেন। কবির বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, রাজপক্ষ হইতে দেশের উপর অবিচার চলিতেছে। অবিচার এতই বাড়িয়াছে যে, মা পুত্র-কন্যার জন্য ক্রন্দন করিতেছেন (১—২ লাইন), রাজার কর্ম্মচারী চর, অনুচরেরা ক্ষেতের শস্যাদি বিনষ্ট করিতেছে (৩—৪ লাইন); 'শকুন' শব্দ কবি রাজকর্ম্মচারী, চর, অনুচরবর্গের

*ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও এখন সর্ব্বজন বিদিত।

† "একাদশ শতাব্দীতে বাঙলায় রাজ নির্ব্বাচন" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

সমষ্টি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, দুষ্ট লোকেরা দস্যুতা করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেছে ও পুকুর পুষ্করিণী কাটিতেছে (৯—১২ লাইন; অসততায় উপার্জ্জিত অর্থে জলাশয় প্রতিষ্ঠার কারণ কবি কটাক্ষপাত করিয়াছেন), গৃহের যাবতীয় দ্রব্যাদি বিনষ্ট হইতেছে (১৩—১৪ লাইন; কবি ব্যাঙের ভিতর দিয়া বর্ণনা করিতেছেন)। এইরূপে অত্যাচার এত বাড়িয়া গেল যে, রাজ্যের কৃষক প্রজাবৃন্দ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কর্ম্মচারিগণকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছে (৫—৮ লাইন) এবং বিভিন্ন দলের সর্দ্দারবৃন্দের নায়কও এই অভিযানে যোগদান করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন (১৫—১৬ লাইন)।

পল্লী-কবির এই বর্ণনার সহিত "একাদশ শতাব্দীতে বাঙলায় রাজনির্ব্বাচন" ব্যাপার তুলনা করা যাউক। প্রবল-শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রিগণের নিকট স্বয়ং সম্রাট [illegible] সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। ষড়রিপু পূজারত মহীপালের ইহা অসহ্য হইল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রিবর্গের ক্ষমতা বিলোপের চেষ্টা করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রিবর্গ একে একে তিরস্কৃত ও বহিষ্কৃত হইলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিলেন। অনুভবাদীর দলে রাজসভা পরিপূর্ণ হইল। পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের অহিংসা মন্ত্রের ব্যভিচার ঘটিতে লাগিল। ভোগ-বিলাস-বাসনার বহুকালের রুদ্ধ স্রোত পুনরায় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। বর্দ্ধিত করদানে অস্বীকৃত প্রজা বন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। হিন্দুর উপর অকথ্য অত্যাচার হইতে লাগিল। কোথাও দেব-দেবীর মন্দির চূর্ণ হইল, কোথাও অভ্যন্তরস্থ বিগ্রহ স্থানচ্যুত হইলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শিক্ষাদাতৃগণ লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। অকারণ বা সামান্য কারণেই কোন কোন সামন্তরাজ্য ও পার্শ্ববর্ত্তী মিত্ররাজ্য আক্রান্ত হইল। উচ্ছৃংখল সৈন্যের পরিভ্রমণে প্রজার সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। রাজকুমার শূরপাল ও রামপালকে ভবিষ্যৎ কণ্টক মনে করিয়া তাঁহাদের প্রাণ বিনাশার্থ মহীপাল গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিলেন। এইরূপ পাশববৃত্তি প্রভাবে চতুর্দ্দিকে অশান্তি উপদ্রব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বঙ্গভূমিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সর্ব্বত্র রাজার প্রতিকূলে ঘোরতর সমালোচনা চলিতে লাগিল। সামন্ত নরপতিগণ একত্রীভূত হইতে লাগিলেন। রাজনীতি বিশারদ বীরবর দিব্য দেখিলেন হিন্দু ধর্ম্ম বিপন্ন হইয়াছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও যথেষ্ট বিকৃতি ঘটিয়াছে। এক দিকে ধর্ম্ম ও দেশ, অন্যদিকে দুষ্কার্যরত সম্রাট। যখন দেখিলেন বঙ্গের এই 'অনন্ত সামন্ত চক্র' 'বরেন্দ্রের সমগ্র প্রজাপুঞ্জ' তাঁহার নেতৃত্বে রাজশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মহারাজ দিব্য উত্তরোত্তর 'ধর্ম্মযুদ্ধে' জয়ী হইতে লাগিলেন। দিব্য পরিচালিত বঙ্গ সৈন্য জয়লাভ করিল।

অতএব আমরা অনুমান করিতে পারি যে, কবি একাদশ শতাব্দীর বাঙলায় রাজনির্ব্বাচন সম্বন্ধেই এই কবিতাটি সহজ, সরল গ্রাম্যভাষায় রচনা করিয়াছেন। আমরা একজন নিরক্ষর পল্লী-কবির নিকট হইতে ইহার চেয়ে অধিক কি আশা করিতে পারি?

দেবা ন জানন্তি

(২২১ পৃষ্ঠার পর)

তার জন্য—শেষ করতে না করতেই বিরাজমোহনের হাতে এমন চাপ পড়ল, উ বলে আর্ত্তনাদ করে বিরাজমোহন মাথা গুঁজে এলিয়ে পড়ল। সঙ্গেই নারীকণ্ঠের ঝঙ্কার—নেহাৎ মোলায়েমও নয়।

আমার স্বামী আমাকে মেরেই ফেলুক্, যাই করুক্, ডিঙরের ধাড়ী হতচ্ছাড়াদের কি? যত সব অসভ্য—চেঁচিয়ে বলে চপলা রুখে দাঁড়াল। স্তম্ভিত সবাই বিস্ময়ে, চেয়ে রইল চপলার পানে। চোখে জল আছে, কপাল ফুলে উঠেছে চৌকাঠে ঘা লেগে অথচ ক্রোধে দীপ্ত। কথাটা হজম্ করতে দু'এক মিনিট সময় লাগল সবার। আবার গলাছেড়ে চপলা বল্‌লে—মুখপোড়াদের কিছু গায়ে লেগেছে যে এসেছেন শাসন করতে!

—গায়ে লেগেছে আপনারই—পাশে কে বলে উঠ্‌ল!

কিন্তু সাহস নিভে গেল সবার—একেবারে। বিরাজমোহনের হাত ছেড়ে দিয়ে—স্বামীর বিপদে নির্য্যাতিতা ক্রন্দসী নারীর এ সহসা সহধর্ম্মিণীত্ববোধ সবাইকে একেবারে দমিয়ে দিলে। তারা একে একে বিদায় নিলে।

যাবার সময় বলে গেল—যান্ মশাই, এবার গিয়ে ভাল করে দু'ঘা লাগাবেন। দরদ দেখেছ! নে বাবা চল, মারুক্, আমাদের কি?

বিরাজমোহন স্ত্রীর প্রতি নীরব আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে কলতলায় গেল—হাতটা মচ্‌কে গেছে, জল রগ্‌ড়াতে।

মেয়েটা কেঁদে খুন হচ্ছে বাড়ীওয়ালী হেঁকে হুঁস করিয়ে দিলে। স্বপ্নোত্থিতের মত চপলা চঞ্চল চরণে সন্তানের আকর্ষণে আগুয়ান হয়।

সেদিনকার দু-দিনের ধূমায়িত রোষের এমনি করে এল পরিসমাপ্তি।

কেমন দেখ্‌লে, তুমি ত বলেছিলে গিয়ে ধরতে. কি হত?—সহারাম বলে!

বাবা, খুরে খুরে নমস্কার।

অতর্কিতে যুক্তহাত দু'খানা কপালে উঠে যায়!

প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টি

(বড় গল্প—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকালীপদ ঘটক

দিনের পর দিন প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টির মহলা চলতে থাকে পুরোদমে। বীররস ও রণবাদ্যের ঠেলায় লোকের কান একদম ঝালাপালা। এক একদিন দৈত্যরাজের হুংকার ও সমবেত দৈত্যসৈন্যের—"জয় দৈত্যরাজের জয়" ইত্যাদি শব্দ নিদ্রিত গ্রামবাসীদের চমকিত প্রকম্পিত ক'রে তোলে। কেউ কেউ বিরক্ত হ'য়ে বলে,—শম্ভু চক্কোত্তির বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরল নাকি, যত সব নেশাখুরি কাণ্ড। কেউ কেউ বা সগর্ব্বে তারিফ করে,—দলটা এবার রীতিমত জাঁকল।

যথাসময়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢোল সহরত ক'রে প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টির প্রথম অভিনয় রজনী ঘোষণা করা হ'ল। যাত্রাপার্টির চাঁদার খাতায় জমে' উঠেছিল তিন শ' টাকার উপর, তাই দিয়ে কতকগুলি সাজপোষাক খরিদ ক'রে এনে দলটা সম্প্রতি খোলা যেতে পারত। কিন্তু 'আয় আখের' বিশেষভাবে বিবেচনা না ক'রে টাকাগুলি হঠাৎ খরচ ক'রে ফেলা সম্বন্ধে শম্ভুশরণ পার্টির মেম্বারদের সঙ্গে কোন রকমেই একমত হতে পারলে না। মেম্বারেরা মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হ'লেও কমিটিতে শম্ভুশরণের প্রস্তাবই শেষ পর্য্যন্ত পাকা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রামদাস ছুটল সাজ ভাড়ার বায়না দিতে, মাণিক বেরুল বচ্চশীওয়ালার খোঁজে। পঞ্চু সরকার ও বনমালী প্রমুখ উদ্যোক্তারা অপরাপর অপ্রধান মেম্বারদের নিয়ে আসর সাজাতে লেগে গেল। প্রবেশপথের সামনে বড় বড় অক্ষরে একটি হ্যাণ্ডবিল লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হ'লঃ—

স্বাগতম্

প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টির শুভ উদ্বোধনে পদার্পণ করিয়া ধন্য হউন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যেন আহারাদি সারিয়া উপস্থিত হইবেন, নতুবা স্থানাভাব ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। বিশদ বিবরণের জন্য পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই, আমাদের আড্ডায় গিয়া খোঁজ লইলেই সব জানিতে পারিবেন। ইতি—

অনাহারী ম্যানেজার
শ্রীশম্ভুশরণ চক্রবর্ত্তী

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী ছোট ছোট গ্রামগুলি ভেঙে দলে দলে শ্রোতারা সব 'গাওনা' শ্রবণেচ্ছায় সমবেত হ'তে লাগল। বিজয়পুরের আবালবৃদ্ধবনিতা সময় থাকতে চট-চাটাই পেতে আসরের আশে-পাশে বসে পড়ল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের যায়গা নাই। হাটতলা যেন থৈ থৈ ক'রতে লাগল।

ঐক্যতান বাদনের পর যথারীতি অভিনয় আরম্ভ হ'ল। দর্শকের হাততালি ও চীৎকারের চোটে আসর শুদ্ধ ভেঙে পড়ে আর কি!

সাজ ঘরে তিন ছিলিম গাঁজা উড়িয়ে দৈত্যরাজ-বেশী শম্ভুশরণ এসে আসরে নামল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল,—এই যে—এই যে দলপতি স্বয়ং।

কে একটি ছোকরা শ্রোতৃবর্গের মাঝখান থেকে হঠাৎ বলে উঠল,—শিংভাঙা কাঁদুলির প্রবেশ।

দৈত্যরাজ সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠল—গেল হারামজাদা!

সেনাপতি রামদাস ব্যাপারটা সামলে নেবার জন্য তাড়াতাড়ি পার্ট ধরে দিলে,—

কারে ভয় দৈত্যরাজ!
দেবাসুরে বাধিলে সমর—

শম্ভুশরণ রামদাসকে একটা ধমক দিয়ে বললে,—আ থাম্‌না রে বাপু, দেখছিস না কে শিংভাঙা নাকি বলছে!

এই গোলমালে যাত্রা পাছে আর অধিক দূর অগ্রসর না হয় এই ভেবে দূতবেশী নেপথ্যচারী জগন্নাথ মুদী চঞ্চল হ'য়ে উঠল। গোটা পালার মধ্যে মাত্র এক নম্বর পার্ট, তাও বুঝি মাঠে মারা যায়। তাড়াতাড়ি এই সুযোগে সে ছুটে এসে সংবাদ দিলে;—

মহারাজ! মহারাজ!

দৈত্যরাজ বেশী শম্ভুশরণ জগন্নাথের উপর খাপ্পা হ'য়ে উঠল,—

বলিস কিরে বেটা,
প্রথম অঙ্ক না হইতে শেষ
দেবসৈন্য আসিবে কিরূপে?
ভাগ্ বেটা ভাগ্, ভাল ক'রে খাতা দেখে আয়।

শ্রোতারা সব হো হো ক'রে হেসে উঠল।

দৈত্যরাজ ও সেনাপতির মধ্যে শচীহরণের পরামর্শ সুরু হ'তেই বিবেকবেশী মাণিক এসে গান ধরলে,—

ও তুই পাতিস না ও ফাঁদ।
বামন হ'য়ে ধরতে চাস্ রে আকাশের ঐ চাঁদ।

মাণিকের গানে চারিদিক থেকে বাহবা পড়ে গেল। সমঝদার শ্রোতারা সব একবাক্যে স্বীকার ক'রলে,—হাঁ ছোকরার খবরদারি আছে!

বনমালী সেন ও অবনী ঠাকুর মাঝে একবার মামা-ভাগ্নের সঙ দিয়ে আসরটা আর একটু জমিয়ে দিয়ে এল।

শম্ভুশরণ এই ফাঁকে পুরো একটি বোতল সাবাড় ক'রে ফেলেছে। পালার শেষধারে এতখানি সে মাতাল হয়ে পড়ল যে, বাকি অংশটুকু তার দ্বারা আর অভিনয় করা কোন মতেই সম্ভবপর হ'য়ে উঠল না। শেষে অন্য একটি ছোকরাকে দৈত্যরাজ সাজিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে লড়াই ক'রতে পাঠান হল।

শম্ভুশরণ সাজঘরের মাঝখানে গড়াগড়ি দিয়ে রীতিমত মাতলামি সুরু ক'রে দিলে।

রামদাস একটা ধমক দিয়ে বললে,—শম্ভু খুড়ো, কি হচ্ছে ও সব? আচ্ছা বেহায়া মানুষ যা হোক!

শম্ভুশরণ অস্পষ্ট ভাষায় টানা সুরে বলে যেতে লাগল,—বাপ রামদাসরে, দু' এক পাত্তর খাওয়াতে পার বাপধন? তোমাদের উর্ব্বশীকে একবার ডেকে দাওনা চাঁদ, একটু প্রেমালাপ করি। এই বলে' সে সখীবেশী একটি ছেলের হাত ধ'রে টানতে টানতে বেতালা সুরে গান ধরে দিলে,—

'ফুটল যদি কুসুম-কলি অলি কেন চায় না ফিরে'—

ছেলেটি কোন রকমে তার হাত ছাড়িয়ে প্রাণপণে দিলে সেখান থেকে দৌড়। পঞ্চু এক ঘড়া জল এনে শম্ভুশরণের মাথায় ঢালতে লাগল, বনমালী সেন তাড়াতাড়ি যোগাড় ক'রে নিয়ে এল একখানা পাখা।

ওদিকে দেবাসুরে লড়াই লেগেছে। 'জয় দৈত্যরাজের জয়'—শুনেই ইন্দ্র-বেশী পঞ্চু সরকার জলের ঘড়া ফেলে' বজ্র-হাতে সাজঘর থেকে ছুটে বেরুলে। শচী-বেশী মাণিক এসে পোষাক ছাড়তে ছাড়তে বনমালীকে দেখে বললে,—এখনও তুই বসে' আছিস যে যা' যা'—দৈত্যসেনাপতির ছিন্নমুণ্ড নিয়ে শীগগির যা।

ছিন্নমুণ্ডের কথা বনমালীর মনেই ছিল না। তাড়াতাড়ি শচীর শাড়ীটাকে কোন রকমে গুটিয়ে নিয়ে একটা বাবরি চুল পরিয়ে দিয়ে বনমালী দৈত্যসেনাপতির নিধনবার্ত্তা ঘোষণা ক'রতে ছুটল। এমন সময় শ্রোতৃবর্গের চীৎকার ও হল্লার শব্দে আসরের চারিদিকে হঠাৎ একটা হুলস্থূলে পড়ে গেল।

ছিন্নমুণ্ড নিয়ে বনমালী গিয়ে দেখে—আসর একেবারে অন্ধকার। দেবাসুরে লড়াই ক'রতে ক'রতে ডে-লাইটের কাঁচটা ফেলেছে ভেঙে। অতএব সেদিনকার মত এইখানেই হয় যবনিকা পতন।

প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টির প্রথম অভিনয় রজনীর কেলেঙ্কারি নিয়ে গাঁ শুদ্ধ হৈ চৈ পড়ে গেল। কেউ বললে বেটারা সব বিলকুল মাতাল, কেউ কেউ বা দলের দিকে একটু সুর টেনে বললে,—না, গেয়েছে বেশ ভালই, তলোয়ার লেগে আলোটা হঠাৎ ভেঙে না গেলে শেষধারটা আরও জমে উঠত, আখড়ায় আমাদের দেখা আছে কিনা!

প্রথম দিন যা-ই হোক, দ্বিতীয় দিন কিন্তু গান জমে গেল ভীষণ! মা বাগ্বাদিনীর অশেষ করুণা বলতে হবে! সেদিন "সীতাহরণ" পালায় অপহৃতা সীতার বিলাপধ্বনি শুনে আসর শুদ্ধ লোক কেঁদে আকুল! রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমানের ভূমিকায় অবতীর্ণ তিনজন অভিনেতাকে শ্রোতৃবর্গের তরফ থেকে পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত করা হল! সুর্পনখার ভূমিকায় মাণিকের লীলায়িত নৃত্যভঙ্গিমা দর্শকদের করে তুলল রীতিমত উদ্বেল! রাবণের মৃত্যুদৃশ্যে চারিদিক থেকে পড়তে লাগল ঘন ঘন করতালি! অভিনয়ান্তে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একবাক্যে স্বীকার করে গেল, হ্যাঁ, একটা দলের মত দল হয়েছে বটে।

শম্ভুশরণ সাজঘরে গিয়ে যাত্রা-পার্টির মেম্বারদের কাছে বুক ফুলিয়ে বললে,—কেমন এবার হল ত!

সেদিন অবশ্য চক্কোত্তি পুঙ্গবকে কোন ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতে দেওয়া হয় নাই।

দোলের সময় তিন দিনের বায়না ধরে দলবল একদিন গো-শকটযোগে রাতারাতি রওনা হয়ে গেল কুলডাঙ্গা দেউলি, কিন্তু ফিরল তারা দিন পনের পরে! পাশাপাশি আরও কয়েকটি গাঁয়েও দু'এক আসর ক'রে গেয়ে আসতে হয়েছে। বিজয়পুরের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে প্রসন্নময়ী অপেরা পার্টির ছোকরারা এসে গাঁয়ে ঢুকল।

যাত্রা-পার্টির মেম্বারদের প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে ও কয়-দিনে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় তিনশ' টাকার উপর। ফণ্ডের খাতায় একুন দাঁড়াল নগদ ছ'শো পঞ্চাশ।

টাকাটা আর জমিয়ে রেখে কোন লাভ নাই। মেম্বারদের উপর্য্যুপরি অনুরোধ ও অনুযোগের পর শম্ভুশরণ সত্যিই একদিন সাজ কিনতে বেরিয়ে পড়ল রাণীগঞ্জের পথে। রামদাস ও পঞ্চু সরকার বার বার করে তাকে বলে দিলে ক্ল্যারিওনেট বাঁশীটা যেন 'বি-সার্প' দেখে নেওয়া হয়, আর জমকালো ঝকঝকে অর্গ্যাণ্ডির পোষাক।

দলপতি শম্ভুশরণ টাকার থলি কোমরে বেঁধে দুর্গা বলে গো-শকটে চড়ে ব'সল।

যাত্রা-পার্টির ছোকরাদের সেদিন কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা! চকচকে নূতন পোষাক পরে এইবার তারা আসরে নামবে, একি কম গর্ব্বের কথা!

তিনদিন পরে শম্ভুশরণ বাড়ী ফিরল। ছোকরারা সব তাড়াতাড়ি ছুটে এল যাত্রা-পার্টির সাজ-পোষাক দেখতে-ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে অর্গ্যাণ্ডির পোষাক, 'বি-সার্পে'র ক্ল্যারিওনেট বাঁশী। কিন্তু কোথায় সাজ, কোথায় পোষাক,—ক্ল্যারিওনেট বাঁশীই বা কই? টিন—শুধু টিন।

শম্ভুশরণের মতে রাণীগঞ্জ শহর নাকি আস্ত একটি চোরের আড্ডা। দোকানদারেরা সব সাজ-পোষাকের দাম হেঁকে দিল ডবল। তাই বর্ত্তমানে পোষাক কেনা স্থগিত রেখে শম্ভুশরণ গাড়ী চারেক টিন খরিদ ক'রে নিয়ে এসেছে—ঘর ছাদন করা করোগেটের টিন।

প্রসন্নময়ীর ভক্তবৃন্দ হেনো-নেমনে জ্বলে উঠল। বড় ঘরখানার খড়ের চাল ভেঙে টিন পিটিয়ে দেবার ইচ্ছে শম্ভু-শরণের বরাবরই ছিল, শুধু অর্থাভাব বশতই এতাবৎকাল পেরে উঠেনি। যাত্রা ফণ্ডের টাকা থেকেই ঘর-ছাদনের ব্যবস্থাটা সম্প্রতি করা হয়েছে; অবশ্য ও হাওলাতী টাকা হপ্তাখানেকের মধ্যে ফেরৎ দিতে শম্ভুশরণ রাজী।

কিন্তু এক সপ্তাহের যায়গায় তিন সপ্তাহকাল উপর্য্যু-পরি তাগাদা দিয়েও যখন শম্ভুশরণের কাছ থেকে পাই পয়সা আদায় হ'ল না, তখন ছোকরারা সব রীতিমত মরিয়া হয়ে উঠিল। গাঁয়ের লোক বললে,—পাগল হয়েছে, আবার তোমা-দের টাকা দেবে ওই পাজী ব্যাটা শম্ভো! জোচ্চুরি করে বেটার জনম গেল।

শম্ভুশরণের চালে দিড়িম-দাড়িম শব্দে টিন পেটান হচ্ছে। সেই শব্দ যাত্রা-পার্টির ছোকরাদের কানে মুগুরের মত এসে বাজতে লাগল। ছুটল তারা সদলবলে গচ্ছিত টাকার মীমাংসা ক'রতে। আজ একটা হেস্তনেস্ত ক'রে তবে অন্য কথা!

রামদাস সদর দরজার বাইরে থেকে ডাক দিলে,—শম্ভু খুড়ো!

শম্ভুশরণ বাড়ইদের সঙ্গে চালে উঠে বল্টু আঁটছিল, রামদাসের ডাক শুনে ঘাম মুছতে মুছতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বললে,—এই যে তোমরা সকলেই দেখছি, তারপর—কি খবর বল ত রামদাস বাবাজী!

রামদাস একটু কড়া সুরে বললে,—যাত্রাপার্টির গচ্ছিত টাকাটা আজ আমরা তোমার কাছ থেকে পেতে চাই।

শম্ভুশরণ জিজ্ঞেস ক'রলে,—আজই? এত তাড়াতাড়ি কেন বল দেখি?

পণ্ডু সরকার জবাব দিলে,—সে কৈফিয়ৎ আমরা দিতে আসিনি, টাকাটা আজ দেওয়া হচ্ছে কি-না—তাই জানতে চাই।

অবনী ঠাকুর ঝাঁজাল গলায় বলে উঠল,—তোমার মত লোকের সঙ্গে যাত্রাপার্টির কোন সম্বন্ধ আমরা রাখতে চাই না।

শম্ভুশরণ গম্ভীরভাবে ভ্রূ-কুঁচকে বললে,—তোমরা যে বড় লম্বা লম্বা কথা বলছ হে, বলি ব্যাপার কি বল দেখি?

বনমালী সেন একটু ভদ্রভাবে জবাব দিলে,—আজ্ঞে আপনিই ত বলাচ্ছেন। যাত্রাপার্টির টাকা ভেঙ্গে টিন খরিদ করে আনবার কথা ত আপনার সঙ্গে ছিল না।

রামদাস বললে,—ও সব ফাঁকির চাল আর চলবে না, খুড়ো! সাড়ে ছ'টি-শো টাকা এখন মানে মানে ফেলে দাও, নইলে গলায় গামছা বেঁধে টাকা আদায় করব।

শম্ভুশরণ গর্জ্জে উঠল,—কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! টাকাকড়ি আমি কারো ধারি না যা—আইন-আদালত খোলা আছে।

এই বলে শম্ভুশরণ সদর দরজা বন্ধ করে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ল।

রামদাস লাফিয়ে গিয়ে দরজার উপর মারলে এক ধাক্কা,—তবে রে হারামজাদা পাজী, লাঠির চোটে মাথার খুলি ভেঙ্গে দিব বেটা জানিস?

অবনী ঠাকুরের হঠাৎ বীররস জেগে উঠল, দু-হাত দিয়ে মুঠি পাকিয়ে শূন্যে ঘুঁষি তুলে চীৎকার করে বললে,—বধিব বধিব আজি শম্ভুরে বধিব।

পণ্ডু সরকার বৈঠকখানার চালা থেকে একটা খুঁটি ছাড়িয়ে নিয়ে দরজায় ঘা দিতে দিতে বললে,—গদাঘাতে চূর্ণিব শালারে, বেরোও শালা একবার বাড়ী থেকে।

নরমপন্থী বনমালী সেনেরও রক্ত গরম হয়ে উঠেছে, বললে,—লাগাও, বেটাকে 'কুস্তি বেড়ে' করে দাও, তারপর দেখা যাবে।

শম্ভুশরণ ভিতর থেকে হুঙ্কার করে উঠল,—যাই বেটাদের—থাম্, গায়ে কত জোর হয়েছে একবার দেখে নিচ্ছি।

শম্ভুশরণের দ্বিতীয় পক্ষ তাড়াতাড়ি কর্ত্তাকে ধরে ফেললে,—ওগো না—না, বেরিয়ো না, ওরা সব গুন্ডা।

দেখতে দেখতে শম্ভুশরণের সদর দরজার সামনে রীতিমত ভীড় জমে গেল। শেষে গাঁয়ের পাঁচজন ভদ্রলোক মিলে বহুকষ্টে প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টির উত্তেজিত মেম্বারদের শান্ত করে। যাবার সময় ছোকরারা সব বলে গেল শম্ভু চক্কোত্তিকে জেল না খাটিয়ে তারা কিছুতেই ছাড়বে না।

(৩)

শম্ভুশরণের বাপের আমল থেকে হাটতলার ভূপতি চাটুয্যেদের সঙ্গে ওদের বিবাদ চলে আসছে। যাত্রাপার্টির এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে শেষ পর্য্যন্ত নীরব থাকতে পারলে না। ভগ্নোদ্যম মেম্বারদের সে আশ্বাস দিয়ে বললে,—কোন চিন্তা নাই,—যত টাকা লাগে আমি দিব, লাগাও তোমরা নূতন করে দল।

অতঃপর প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টির সতীপ্রসন্নকে ভুলে যেতে মেম্বারদের একটি দিনও সময় লাগল না, নাট্যানুরাগী ছোকরাদের নব প্রচেষ্টায় 'চণ্ডেশ্বর নাট্য-সঙ্ঘে'র বিজয়-বাদ্য আবার বেজে উঠল।

শম্ভুশরণের দ্বিতীয় পক্ষ ক্ষুদুমণি সেদিন নদী থেকে জল নিয়ে ফিরে এসে কর্ত্তাকে জিজ্ঞেস করলে,—হ্যাগা—শুনেছ, গুণ্ডাগুলা নাকি আবার দল ক'রছে?

শম্ভুশরণ মাতব্বরী চালে জবাব দিলে,—তুই পাগল হয়েছিস ক্ষুদু, দেখনা ওদল কদিন টেকে! ভূপতি চাটুয্যেকে যদি আমি জব্দ করে না দি'ত শম্ভুশরণ আমার নাম নয়। বেটা আমার উপর টেক্কা মারতে যায়!

শম্ভুশরণ সন্ধ্যাবেলায় মাণিককে ডেকে প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টির আবার গোড়া থেকে পত্তন করবার জন্যে পরামর্শ সুরু করে দিলে। গাঁয়ের লোককে সে দেখিয়ে দিতে চায় যে, শম্ভু চক্কোত্তি আর ভূপতি চাটুয্যের মধ্যে তফাৎ এখন ঢের।

কতকগুলো অনভিজ্ঞ নিরক্ষর লোককে ধরে এনে প্রসন্নময়ী অপেরা পার্টিতে ভর্ত্তি করা হ'ল। সখী সাজবার জন্যে ভদ্রসন্তানের অভাব ঘটায় শম্ভুশরণ শেষ পর্য্যন্ত দুলেপাড়া, বাগদিপাড়া থেকে জন দশ বারো ছেলে যোগাড় করে নিয়ে এল তাদের নাচ-গান শেখাতে। দলটাকে যেমন করে হোক খাড়া রাখতেই হবে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গৌরাঙ্গ-ভক্ত পানুমোড়ল মালা জপতে জপতে ভূপতি চাটুয্যের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ভূপতি তখন রামদাস ও পণ্ডু সরকারের সঙ্গে যাত্রাপার্টির আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত, পানুমোড়ল ভক্তিভরে মাথা নুইয়ে ব্রাহ্মণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রাত-প্রণাম নিবেদন করলে। ভূপতি চাটুয্যে পানুমোড়লকে দেখে বলে উঠল,—এই যে মোড়ল জ্যাঠা ঠিক সময়েই এসে পড়েছে দেখছি। এদের সঙ্গে এতক্ষণ মামলার কথাই হচ্ছিল। আসছে মাসেই তা হলে দায়ের করে দেওয়া যাক—কি বল?

পানুমোড়ল সায় দিয়ে বললে,—তার আর কথা আছে। আদ্ধেক খরচা আমি যখন দিব বলেছি, তখন হালের গরু বেচেও দিব, মোদ্দা শম্ভু চক্কোত্তিকে যেমন করে হোক জব্দ করা চাই। কি বিষমঘাতী লোক বাবাজী! এঁড়ের মামলায় সাক্ষী দিব বলে ও-ই ত আমাকে ধরে বেঁধে মামলা করালে! শেষে রতোর কাছে টাকা খেয়ে হাকিমের সামনে ডাহা মিছে কথা বলে এল। নইলে কি এ মামলায় আমার হারবার কথা। গৌরাঙ্গ হে, তুমিই এর দমন দিয় ঠাকুর!

রামদাস সান্ত্বনা দিয়ে বললে, আমরা ওকে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি দেখ না। সাধারণের টাকা ভাঙ্গা কি সহজ কথা।

ডুগডুগি পিটিয়ে যেদিন ঘটী-বাটী কোরক করব, সেইদিন বাছাধন টের পাবে—কত ধানে কত চাল হয়।

পানুমোড়ল মালার থলিটি একবার কপালে ঠেকিয়ে খুশী হয়ে বললে, গোবিন্দ হে তুমিই ভরসা! বেঁচে থাক বাপধন—বেঁচে থাক। আমি বলছিলাম কি—সেই সঙ্গেই একটা চিটিং কেস করে দিলে হয় না?

পঞ্চু বললে,—চিটিং ত চিটিং—ব্যাটার ভিটে-মাটী শুদ্ধ চিচিং ফাঁক করে দিব।

পানু মোড়লকে বিদেয় করে সকলে মিলে' আখড়ায় গিয়ে হাজির হ'ল। নাটকের প্রথম অঙ্ক ও প্রথম দৃশ্যের মহলা মাত্র সুরু হয়েছে, এমন সময় রতো চাষা এসে বাইরে থেকে ভূপতি চাটুয্যেকে ডাক দিলে,—দাদাঠাকুর রইছোন গো! ইদিকে এক-বার এসোন ত!

ভূপতি চাটুজ্যে আখড়া ঘরের বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলে, কিরে রতো, খবর কি?

রতিলাল হতাশভাবে বললে—এঁড়ের মামলায় ত আমার সর্ব্বনাশ ঘটে গেল দাদাঠাকুর। মামলা-খরচার জন্যে বড় বিটিটোর হার বাঁদো রেখে কুড়ি-ডেড়েক টাকা নিয়েছিলোম শম্ভু ঠাকুরের কাছ থেকে। তার মধ্যে উনোকেই দিই এক কুড়ি টাকা—উনোর পরিবারের লেগে ফাঁদি গড়াতে। লইলে আমাকে এঁড়ের মামলায় জেহল খাটাবে বলেছিল।

ভূপতি চাটুজ্যে রেগে বললে,—জেল খাটাবার মালিক বুঝি শম্ভুচক্কোত্তি, আহাম্মক চাষা কোথাকার!

রতিলাল কপাল ঠুকে বললে,—কি করি দাদাঠাকুর! জানের দায়ে তখন দিয়ে ফেললোম, কিন্তু কিছুতেই আর আদায় করতে লাচ্ছি, সিকি সুদ ধরাটি দিয়েও না। বলে,—কুন্ বাক্সে রেখেছি এখন খুঁজে পাওয়া যেছে নাই। শদাবদি টাকার গয়না গো, কি হবেক বলদেখি দাদাঠাকুর!

ভূপতিচাটুজ্যে বললে,—হার তোকে আর ও ফেরু দিয়েছে!

রতিলাল ভীতকণ্ঠে বলে উঠল,—এ্যাঁ—বল কি দাদাঠাকুর! আসছে মাসে যে আমার জামাই আসছে বিটি লিতে; এখন আমি বিটি বিদেয় করি কেমন করে বল দেখি! দোহাই দাদাঠাকুর, এর একটা কিনেরা তোমাদিগকে করে দিতে হবে।

ভূপতি চাটুয্যে একটু ভেবে বললে,—আচ্ছা তুই এখন যা, কাল একবার দেখা করিস—ভেবে চিন্তে দেখা যাবে।

রতিলাল ভক্তিভরে দাদাঠাকুরের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সেদিনকার মত কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বাড়ী ফিরল।

(ক্রমশ)

শরৎ সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য

(২২৭ পৃষ্ঠার পর)

হোক, তার বিকাশ শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই দ্বন্দ বিজয়ার চরিত্রে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে তারই বিক্ষুব্ধ উচ্ছ্বাসে প্রায় সমস্ত উপন্যাসটি ভরা। বিজয়ার মধ্যে আমরা দেখি—তিলে তিলে একটা জয়ের চেষ্টা, কিন্তু সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে একদিকে বাইরের বিলাস ও রাসবিহারী, অপরদিকে অন্তরের দ্বিধা ও সঙ্কোচ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবার জন্যই লেখক কৌশলে মাইক্রোসকোপ প্রভৃতির অবতারণা করেছেন। এখানে বহির্দ্বন্দই প্রবল। আবার রমা ও ষোড়শীর চরিত্রে পাই জয়ের আশা বা চেষ্টা নয়—সে জিত, তাকে অধিকার করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা—তার সঙ্গে অন্তরের সুর মেলাবার চেষ্টা। কিন্তু নানা বাধা এই মিলনের অন্তরায় হয়ে পড়ছে।

দেহ

শ্রীপ্রজেশকুমার রায়

কিছুই দেহের মতো নয়—
উষ্ণ স্বাস্থ্যদীপ্ত দেহ;
আনন্দের দিব্যধাম সেই,
স্বর্গ সে-ই এই মর্ত্ত্যে—
স্বর্গ নয়, আর কোথা' নয়।

কিছুই দেহের মতো নয়—
দীপ্তদেহ; আত্মার সে
দীপ্ত অগ্নিশিখা,
কেন্দ্র বিশ্বচেতনার—
দেহাতীত কিছু নয়, নয়।

কিছুই দেহের মত নয়—
দেহ-পূজা শ্রেষ্ঠ পূজা;
দেহ হ'তে পূজ্য কিছু নয়,—
পাপ দেহ-অবহেলা—
তার চেয়ে পাপ কিছু নয়।

পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন নিদর্শন

—প্যালেস্টাইন—

চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্যালেস্টাইনে যে "সকল সমৃদ্ধ জনপদ উহাদের কীর্ত্তিসৌধ সহ বিরাজ করিত" এবং সারা বিশ্বের, বিশেষ করিয়া পশ্চিম এশিয়ার, এক অতি গৌরবময় ইতিহাসের অধ্যায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল তাহারই ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত ও উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় ১৯২৫ সালে। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউশন হইতে এক অভিযান প্রেরিত হয় এবং প্রকাণ্ড বড় একটা ঢিবির সন্ধান প্রাপ্ত হয়।

বহুকাল হইতেই আর্ম্মাগেডন নগরীর নাম ডাক, উহার অতুল ঐশ্বর্য্য, উহার নৃপতিদের জাঁকজমক—প্রবাদের মত এই সকল কাহিনী ইউরোপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্যালেস্টাইনের এই মহা আড়ম্বরপূর্ণ জনপদের নানা অতিরঞ্জিত বর্ণনা ইউরোপকে প্রলুব্ধ করিলেও, উহা যে ঠিক কোথায় ছিল তাহার আবিষ্কার কাহারও দ্বারা সম্ভবপর হয় নাই ১৯২৫ সালের পূর্ব্বে—যখন চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান পরিচালিত হয় প্যালেস্টাইন অঞ্চলে।

এই অভিযানকারী দল প্রকাণ্ড ঐ ঢিবিটির সন্ধান পাইয়া অদম্য উৎসাহে খনন কার্য্য আরম্ভ করে। খনন চলিতে থাকে আর ক্রমে ক্রমে নগরের পর নগর আবিষ্কৃত ও বহু স্মৃতিচিহ্ন উদ্ঘাটিত হইতে থাকে। একে একে কুড়িটি নগরের অর্দ্ধভগ্ন গণ্ডী তাহাদের কোদালের মুখে আত্মপ্রকাশ করে। এক-যুগকাল খননের পরে বিগত বসন্তকালে অভিযানকারী দল একেবারে নিম্নতম ভিত্তি ভূমিতে যাইয়া ঠেকিয়াছে। বহুবার এই প্রকারে তাহারা ভাবিয়া লইয়াছে, তাহাদের খনন কার্য্যের এইবারে পরিসমাপ্তি হইল, এই স্থানে আর কোনও নিদর্শন মিলিবে না, কিন্তু কোথায় নিম্নস্তরে কোথাও-বা ডাইনে-বাঁয়ে নূতন খেই পাইয়া আবার খনন-কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইয়াছে।

স্তরে স্তরে খনন কার্য্য চালাইয়া বিগত বসন্তকালে যে নিম্নতম গহনে পৌঁছান সম্ভব হইয়াছে—ইহাতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে আর্ম্মাগেডন শহর—রাজা সলোমনের কীর্ত্তি-কলাপের অপূর্ব্ব সাক্ষ্যস্থল। বাইবেলের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাই হইল প্যালেস্টাইনের ধর্ম্মযুদ্ধের কুরুক্ষেত্র প্রান্তর—যেখানে সৎ ও অসতের শাশ্বত সংগ্রাম সর্ব্বকালে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং সর্ব্বকালে নিয়ন্ত্রিত হইবেও বলিয়া বাইবেল অনুরাগিগণ বিশ্বাস করে।

এই সর্ব্বনিম্নস্তর অর্থাৎ আর্ম্মাগেডন নগর ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বেকার নির্ম্মিত বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। ইহার উপরি উপরি যে স্তরে যে শহরের ধ্বংস-কীর্ত্তির আভাস মিলিয়াছে, সেই সেই স্তর ঐ অনুপাতেই তৎ-পরবর্ত্তী, তাহারও প্রমাণ প্রত্যক্ষরূপেই পাওয়া গিয়াছে—উহাদের উপরিতন অবস্থান ছাড়াও।

বাস্তবপক্ষে আর্ম্মাগেডন নগর একটি গুরুত্বপূর্ণ গিরিবর্ত্ম-মুখ অবরোধ করিয়াই যেন সুদৃঢ় কেল্লার আকারে বর্ত্তমান ছিল। পশ্চিম এশিয়ার ইহা যে ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী এক বিশ্ববিশ্রুত রণাঙ্গন ছিল, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও ইহার জীবনে একটানা সমরোদ্যমই অবিরাম আশ্রয় লাভ করে নাই—ইহারও শান্তির অবকাশ ছিল সময়ে এবং সেই শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় আর্ম্মাগেডনের সমৃদ্ধি ছিল অপরিসীম।

এক সময়ে ভারতে গোলকুণ্ডা, যেমন সমগ্র বিশ্বের হীরক-বাজার ছিল, দিল্লী ছিল হস্তী-দন্ত ও অন্যান্য নানা শিল্পের মূলে উৎস এবং পৃথিবীর সকল অঞ্চলের বণিকজাতি আসিয়া ভিড় জমাইত এই সকল ভুবন বিখ্যাত নগরীগুলিতে, তেমনই এক অতি ঘনঘটাপূর্ণ কোলাহলময় নগরীর আভিজাত্য আয়ত্ত ছিল আর্ম্মাগেডনের। ইহার গলিতে গলিতে সে কি জনতা ছিল পথচারী বণিক দলের—কোন্ দেশ হইতে না আসিত বাণিজ্যিক অভিযানকারীর দল পশ্চিম এশিয়ার এই মহাসমৃদ্ধ বিশ্ব-বাজারে?—মিশর, বেবিলন, জেরুজালেম, পারস্য, ভারত আর যে-সব অঞ্চলের অধিবাসী তখনকার দিনে মানুষ বলিয়া গর্ব্ব করিত।
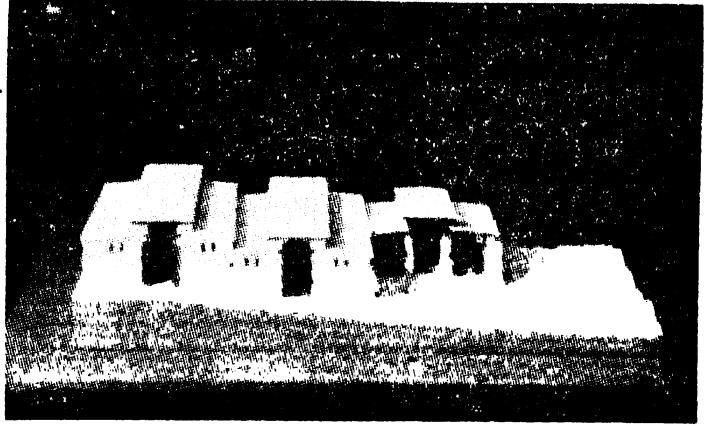
রাজা সলোমনের অশ্বশালা যেমনটি ছিল—প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বহু গবেষণার পর ঐ কালের স্থপতি-রীতি অনুসরণ করিয়া তাহারই নকল তৈরী করিয়াছিল; এই মডেলটি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউট যাদুঘরে সংরক্ষিত রহিয়াছে—কারণ প্যালেস্টাইনের এই সকল আবিষ্কার এই প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধানের ফলেই সম্ভব হইয়াছে

এই বিপুল-বিভব-প্রতীক আর্ম্মাগেডনের যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তারলাভ করিয়াছিল রাজা সলোমনের অমানুষিক কীর্ত্তি-গাথায়। সলোমনের রাজ-দরবারের স্তম্ভ ত ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর বীরত্ব-গাথার মতই জনশ্রুতিতে এখনও ঝঙ্কৃত হয়। এই প্রসিদ্ধ নগরীতেই ছিল রাজা সলোমনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—তাহার বিরাট বিশাল অশ্বশালা, যাহাতে অন্যূন ৪৫০টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অশ্বদল রক্ষা করা হইত। সেকালের

এমন একটি মহা প্রতাপান্বিত রাজা—বিশেষ করিয়া এশিয়ার জমকালো পারিপার্শ্বিক—তাহার পক্ষে শোভন হইত যদি ৪৫০ অশ্বের পরিবর্ত্তে ৪৫০ রাণীর জন্য নিখুঁত সৌন্দর্য্যের জেনানামহল গড়িয়া তোলা হইত। সেকালের নৃপতিদের

রাজা সলোমনের আর্ম্মাগেডেন শহরের বিরাট অশ্বশালার ধ্বংসাবশেষে—৪৫০টি অশ্ব রাখিবার স্থান ইহাতে ছিল। পর পর নিম্নে প্রাপ্ত শহরসমূহের ইহাই সর্ব্বনিম্ন স্তর —এই প্রকারে কুড়িটি শহর উদ্ঘাটিত হইয়াছে

অন্যদিকে যেমন আড়ম্বর যেমন বিলাসিতা অথবা বীরত্বের অভিব্যক্তি থাকুক না কেন, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গৌরব ছিল তাহাদের মহিষী-সংখ্যায়। কিন্তু রাজা সলোমনের বেলা যে সে খ্যাতিকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া অশ্বশালার অভিনব বিলাসিতায় প্রসিদ্ধির প্রসার সৃষ্টি করিয়াছিল, ইহা হইতেই বুঝা যায় গতানুগতিকের ছাপ তাহার অঙ্গে কোনই রেখাপাত করিতে পারে নাই। এবং এই হেতুই রাজা সলোমনের অমানুষিক বীরত্ব-গাথা এমনভাবে লোকচিত্তে স্থান পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই যে বিরাট স্তূপ অভিযানকারীদল প্যালেষ্টাইনে খনন করে, ইহার অষ্টম স্তরের নিদর্শনে যখন তাহাদের খনিত পৌঁছাইল, সেই সময় মিলিল হীরাজহরতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই হিসাবে যে প্যালেষ্টাইনের অন্য কোনও অঞ্চলে এই প্রকার কেন, ইহার নিকটতম সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট মূল্যবান কোন প্রকার জহরতও আর পাওয়া যায় নাই। বহু জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, বলিতে গেলে একেবারে পুঞ্জ পুঞ্জ যাহা স্বর্ণ, গজদন্ত প্রভৃতিতে প্রস্তুত। হীরক, নীলা, মুক্তা প্রভৃতিরও তাহাতে অভাব ছিল না কিছুমাত্র। বিজলীপ্রভা (electrum) ছিল সে যুগের বিশেষত্ব—তাহাও এই সংগ্রহের ভিতর অপর্য্যাপ্তরূপেই স্থান পাইয়াছে। এত মূল্যবান প্রস্তরাদি সংগ্রহ, বিশেষ করিয়া গজদন্ত সংগ্রহ, আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হয়।

পন্ডিতেরা মনে করেন, এই যে আইভরি (Ivory) ইহা আমাদের নিকট এখন গজদন্ত সমতুল্য মনে হইলেও, ইহা ঠিক হস্তীর দন্ত নয়। প্রাচীনকালে বিশেষত ইউরোপে এবং তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে এক জাতীয় অতিকায় (mammoth) জীব ছিল যাহা ১৩ ফুট উচ্চ ছিল স্কন্ধের কাছে। সারা গায়ে ছিল লম্বা লম্বা লালপানা বাদামী পশম। ইহাদের অতি দীর্ঘ এক জোড়া, কোন কোনটির দুই জোড়া করিয়া বক্র দন্ত থাকিত চোয়াল হইতে আলম্বিত। এই ম্যামথের দন্তই ঐ সকল আইভরি—নহিলে বর্ত্তমানে যে হস্তী আমরা দেখিতে পাই, উহা সেকালের জীব নয়। পন্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, বিবর্ত্তনের ফলে ঐ ম্যামথ হইতেই আমাদের হস্তীর উদ্ভব হইয়াছে। সেই হিসাবে ম্যামথ আমাদের অধুনা পরিচিত হস্তীর আদিপুরুষ।

তবে একটি কথা হইল, ইউরোপে যে ম্যামথ আদিম যুগে দেখা যাইত, তাহা কিন্তু খৃষ্ট জন্মের ১০,০০০ বৎসর পূর্ব্বেই ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা যখন বর্ত্তমানে হস্তী দেখিতে পাই, তখন ম্যামথ লোপ পাইলেও শ্রেণী হিসাবে বিবর্ত্তিত এমন এক জাতীয় বিরাট জীব অবশ্য ছিল, যাহাকে আমরা ম্যামথ এবং হস্তীর মধ্যপন্থী বলিতে পারি। তবে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত রুশিয়ার মেরুবর্ত্তে এবং সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব্বাংশে ম্যামথ না পাওয়া গেলেও বিরাট বক্র দন্ত পাওয়া গিয়াছে বহু, যাহা গজদন্তের সহিত গুণাগুণে সমান। তৎপর আবার বরফাচ্ছাদিত ম্যামথের মৃতদেহ অটুট অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে রুশিয়ায় মাঝে মাঝে—যাহার আকার আকৃতিতে সকলের তাক্ লাগিয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, গজদন্ত নির্ম্মিত যে-সকল সামগ্রী ঐ অষ্টম স্তরে পাওয়া গিয়াছে তাহা হালের যে-কোনও গজদন্ত অপেক্ষা মনোহারিত্বে হীন নহে, মূল্যে ত নহেই। কত ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ প্রকারে খোদিত এবং বিশিষ্ট চিহ্ন প্রভৃতি অঙ্কিত গজদন্তের দন্ড পাওয়া গিয়াছে, যাহা এই সুদীর্ঘকালের ভূপ্রোথিত অবস্থায় নানা প্রকার ধাতব পদার্থের সংশ্রবে থাকিয়াও কিছুমাত্র বিকার প্রাপ্ত হয় নাই।
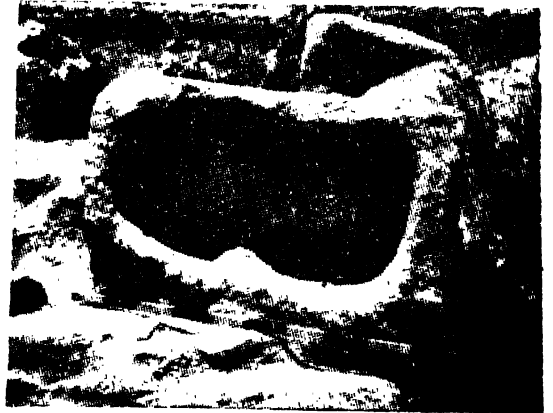
রাজা সলোমনের অশ্বাগারের সংলগ্ন অশ্বগণকে খাদ্যদানের প্রস্তরনির্ম্মিত আধার—চতুষ্পার্শ্বই প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং সম্মার্জ্জন করা কি পরিষ্কার রাখার সুন্দর কৌশল সমন্বিত

নিম্নের কয়েকটি স্তরে যে বিশাল বিশাল অট্টালিকা-সমূহের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে তাহা সমস্তই প্রস্তর ও পোড়ামাটির ইষ্টকে প্রস্তুত এবং উহার উপরে অদ্ভুত এক প্রকার আস্তরে জমাটবাঁধা। এই আস্তরের উপাদান আজিও

সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই। আস্তরের মসৃণতা ও প্রস্তরের মসৃণতা প্রায় সমান—ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তর পর্য্যবেক্ষণ না করিলে কোন্‌টি প্রস্তর কোন্‌টি আস্তর, উদ্ধার করা দায়।

রাজা সলোমনের যে বিরাট অশ্বশালা খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহার ছাদ অবশ্য নাই। কিন্তু প্রকোষ্ঠগুলি, প্রবেশদ্বারসমূহ সকলই স্পষ্ট বুঝিবার মত অবস্থায় বিদ্যমান। এই অশ্বশালার পার্শ্বে একটি অভিনব খাদ্যাধার পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে এই অশ্বশালার গুরুত্ব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। খাদ্যাধার বলিলে ইহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না, ইহা একটি প্রস্তর-পুষ্করিণী বলিলেই বরং ঠিক হয়। যেখানে ৪৫০টি অশ্ব একযোগে খড়-বিচালী প্রভৃতির জাব গ্রহণ করিতে পারে, সে পাত্রটির আকার কি হইতে পারে, একবার কল্পনা করিলে কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। ছোট-খাট একটি পাহাড়কে কাটিয়া অগভীর কূপে পরিণত করিলে যে আকার হয়, কতকটা সেই প্রকার। অথচ ইহার চতুষ্পার্শ্ব, ইহার তলদেশ সকলই প্রস্তরে আচ্ছাদিত।

পর পর নিম্নস্থ কুড়িটি শহরের অট্টালিকার আকার তুলনা করিলে অবশ্য অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীগুলিই বিশালতর হইবে। এবং ইঁটকের দেখাও সেইগুলিতেই মিলিবে। পরবর্ত্তী এই সকল অট্টালিকার ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইল রাজপ্রাসাদগুলি—মনে হয় এইখানেই পরবর্ত্তী রাজ্যশাসক নৃপতিগণ বসবাস করিতেন। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০০ কিম্বা সেই সময়ের কাছাকাছি কালে মিশরের ফেরাওগণের অধীন যে সকল অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজা এই অঞ্চল শাসন করিতেন, তাঁহাদেরই এই সকল বিরাট প্রাসাদ। এই প্রাসাদ কেন্দ্রস্থলের বিশাল প্রাঙ্গণের চারিদিক বেষ্টন করিয়া নির্ম্মিত—অগণিত কক্ষ রহিয়াছে সমুদয় প্রাসাদটিতে এবং প্রতি কক্ষই অতি উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত ও নানাপ্রকার চিত্রে শোভিত।

ঊনবিংশ স্তরে পাওয়া গিয়াছে বৃহৎ একটি গোলাকার বেদী—যাহা প্যালেষ্টাইনের সেকালে ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই ব্যবহৃত হইত।

প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ শুধু এইসকল ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন নিদর্শন সকল আবিষ্কার করিয়া এবং আসবাব-পত্র যাদুঘরে সংরক্ষিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা সেকালের ভাস্কর্য্য ও স্থপতির সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং সমসাময়িক ইতি-হাস আলোচনা দ্বারা সলোমনের অশ্বশালা কিরূপ ছিল, যতদূর সম্ভব তাহার সমর্থনযোগ্য আকৃতি নির্দ্ধারিত করিয়া একটি মডেল অশ্বশালা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন। উহা চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

—মেসোপোটেমিয়া—

আধুনিক মানব, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের ৩০০০।৪০০০ বৎসর আগেকার পূর্ব্বপুরুষগণকে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে হীনই ভাবিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে—বাস্তব আরাম-বিলাস, সূক্ষ্ম শিল্পচারুতা প্রভৃতিতে তাহারা পূর্ব্ব-বর্ত্তীদিগের অপেক্ষা বহু অগ্রসর। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এইরূপ ধারণাই বলবৎ ছিল যে, আদিম সভ্যতা অর্থাৎ প্রাচীন যে জীবনধারাকে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির নামটা অন্তত দেওয়া যায়, তাহা ৩৫০০ বৎসরের বেশী পুরাতন হইবে না।

কিন্তু বিগত দশ বৎসরে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ফলে ঐ ধারণা আর কিছুতেই সত্য বলিয়া জ্ঞান করা যায় না। ৬০০০ বৎসরের প্রাচীন এমন

মেসোপোটেমিয়ায় তেপেগুয়ারা হইতে ৩০০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে খাফাজে নামক স্থানে খননকালে প্রাপ্ত, অন্যূন ৫০০০ বৎসরের পুরাতন কোনও সুমেরীয় উচ্চপদস্থ পুরোহিত-প্রবরের প্রস্তর-মূর্ত্তি—এ শ্রেণীর সুন্দর ভাস্কর্য্য-প্রতীক সারা মেসোপোটেমিয়ায় আর পাওয়া যায় নাই

জিনিষও উদ্ধার করা হইয়াছে, যাহা নাকি শিল্প-গরিমায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিতে গেলে, যখন আমরা বিবেচনা করি—কি অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির সুযোগ তাহাদের কালে ছিল এবং চারুকলা সম্বন্ধেও কি আদর্শ তাহাদের হইতে পারে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে।

এই সময়ের দুইটি মিলিত অভিযানকারী দলের প্রচেষ্টাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকান স্কুল অব্ ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ এবং ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম অব্ দি ইউনিভার্সিটি অফ পেনসেলভেনিয়া—দুই দুইটি প্রতিষ্ঠান হইতে যে অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালিত হয় তাহার ফলেই মেসোপোটেমিয়ায় সুমেরীয় সভ্যতার অতি প্রাচীন নিদর্শনসকল উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এত প্রাচীনকালের ধ্বংসস্তূপ ও নানাবিধ সামগ্রী মেসোপোটেমিয়ায় আর অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের খনন কার্য্যে আবিষ্কৃত বা সংগৃহীত হয় নাই।

সুমেরীয় কুস্তীগীরদ্বয়—একটি ব্রঞ্জ নির্ম্মিত 'ভাস' (vas)-য়ের অধোদেশে কুস্তীরত দুই মূর্ত্তি প্রমাণ করিতেছে যে, সুমেরীয়গণও ছে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ অনুমান করেন মন্দিরের বেদীমূলে ইহা পাওয়া গিয়া কুস্তী পারদর্শী ছিল; যেহেতু কোনও সেকালে সুমেরীয়দের ভিতর কুস্তী ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল

এখানেও প্যালেষ্টাইনের ন্যায় স্তরে স্তরে একটির নীচে অন্যটি এরূপভাবে বহু বিভিন্ন সভ্যতার প্রতীক নানা শহর খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত খননের ফলে পর পর ১৩টি শহরের সংস্থান উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহার সর্ব্বনিম্ন তিনটি স্তর যে প্যালেষ্টাইনের আর্ম্মাগেডন শহর অপেক্ষাও প্রাচীন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে-ভাবে ভূ-প্রোথিত প্রস্তরীভূত কঙ্কালের অবস্থান হইতে, কোন্ যুগের প্রাণী ঐটি—নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, সেই হিসাবেও ১০ অপেক্ষা নিম্নস্তরের শহর বলিয়া ঐগুলি প্রাচীনতর। তাহা ছাড়া এমন কতকগুলি নিদর্শন এই সকল স্তর হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে যে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, ঐগুলি অন্তত ৬০০০ বৎসরের পুরাতন। সাধারণ বুদ্ধিতেও ইহা ধারণা করা যায় যে, যে সামগ্রী যত বেশী মৃত্তিকা-নিম্ন হইতে উত্তোলিত, উহা তত বেশী প্রাচীন। কারণ নদীস্রোতে যে পলিমাটি পড়ে, বন্যার প্রকোপে পর্ব্বতাদি হইতে যে মাটি ধৌত হইয়া আসিয়া জমায়েত হয়—তাহারই ফলে এই সকল নগরপল্লী ক্রমে ক্রমে ভূপ্রোথিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম প্রথম পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগের নিকট উহার অবস্থান জানিত থাকিলেও, সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে এবং নিতান্ত জনবিরল প্রান্তরে পরিণত হইয়া পড়িলে—সে স্মৃতি ক্রমশ লোপ পাইতে থাকে। অবশেষে উহার পরিচয় অথবা সঠিক স্থান-নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া যাওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

স্তর-নিম্নতা ভিন্ন ত্রয়োদশ স্তর পর্য্যন্ত খননের পর অভিযানকারী দুই দল যে পূর্ব্বকথিত প্রাচীন নিদর্শন প্রাপ্ত হয়, তাহার ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে তেপেগুয়োরা তল্লাটে প্রাপ্ত দুর্গপ্রাকারে গণ্ডীবদ্ধ জনপদ যাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রস্তর ভাস্কর্য্য ও স্থপতির ছাপ। ইহাকে তাই ৬০০০ হাজার বৎসরের প্রাচীন বলিয়া ধরিলে প্রমাদ করা হইবে না। বস্তুত যতদূর জানা যায়—ইহাই সর্ব্বাদি নাগরিক সভ্যতা, কারণ পূর্ব্বেকার কোনও নগর এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে মহেঞ্জোদারো কিম্বা অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চলে এখনও যে সকল খননকার্য্য চলিতেছে, তাহাদের সঠিক সময়-নির্দ্দেশ সম্ভব হইলে পরে জানা যাইবে—সুমেরীয় প্রস্তর যুগের যে দুর্গ-নগর এখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ভারতীয় ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তি প্রাচীনতর কিনা। প্রস্তর-যুগে নগর-গঠনের কৃতিত্বই অতি বিরল, তাহার উপর আবার প্রাকার-বেষ্টিত এবং সুদৃঢ় দুর্গ-সম্বলিত শহরের পরিকল্পনা, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমগ্র শহর-প্রাকারের বহির্ভাগে বেষ্টিত পরিখা নির্ম্মাণ প্রভৃতি নিতান্তই অপরিসীম প্রতিভার পরিচায়ক। প্রাচীন সুমেরিয়ানদিগের সে প্রতিভা ছিল, তাহাদের স্থপতি-কারুকার্য্যেও সেই প্রস্তর-যুগের পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় কারিগরি ছিল। তেপেগুয়ারার খনিত হইতে যে দুর্গ-সম্বলিত নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই সুমেরিয়ান সভ্যতার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। নগরের প্রতিষ্ঠা সুমেরীয়গণের কৃতিত্ব বলিয়া ধরিয়া লইলেও, কোন কোন

পণ্ডিতের মতে, আদিম যাযাবর মানব—মূল আর্য্য-উৎস হইতে দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, উহাদের এড়ুক-সমাধির গঠন সাদৃশ্য অনুসরণ করিলে ইহাই লক্ষিত হয় যে, একদল ভারত হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়াছিল এবং যেখানে এখন বসতি স্থাপন করিয়াছে, সেখানেই ঐ প্রকার এড়ুক-সমাধি প্রস্তর গড়িয়াছে; এবং ইহাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি কতকটা সুমেরিয়ানদিগের ন্যায়ই ছিল। এড়ুক-সমাধি পশ্চিমভারত হইতে পারস্য, মেসোপোটেমিয়া, আরব প্রভৃতি পার হইয়া মিশরে পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। ইহা হইতে ঐ সব পণ্ডিতগণ মনে করেন, সুমেরীয়গণ ভারতীয় আর্য্য-উৎসেরই শাখা এবং ভারতীয় তৎকালীন সভ্যতা-সংস্কৃতিরই প্রকাশ উহাদের কার্য্যকলাপ। অবশ্য এ বিষয়ে নানা মত প্রচারিত। এমনও কেহ কেহ বলেন যে, ঐ প্রস্তর-যুগে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব এশিয়ার বহু বহু দূরে প্রান্তস্থ জাতিতেও প্রসার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং সুমেরিয়ানগণ যে উৎসেরই প্রতীক হউক, উহারা ভারতীয় সংস্কৃতির কাছেই ঋণী উহাদের কৃতিত্বের জন্য।

সে যাহা হউক ৬০০০ বৎসরের পুরাতন যে শহর-দুর্গ তেপেগোরাল উদ্ঘাটিত হইয়াছে, উহা যে সুমেরীয় সভ্যতার প্রতীক এবং উহা যে সর্ব্বাদি নগর-প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রয়াস তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই!

শুধু এই শহর-দুর্গ আবিষ্কারই অভিযানকারীদের একমাত্র সুমেরীয় নিদর্শন প্রাপ্তি নয়। বিগত বৎসরে তেপেগোরা হইতে অনূন ৩০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে খাফাজে নামক স্থানে এই যুগে অভিযানকারী দল এমন কতকগুলি ভাস্কর্য্য-নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছে খননের ফলে যাহাকে ৫০০০ বৎসর কিম্বা তাহা অপেক্ষাও বেশী বৎসরের প্রাচীন কারিগরি বলিয়া মনে হয় এবং যাহাতে নিখুঁত সুমেরীয় শিল্পাচারই অনুসৃত হইয়াছে আগাগোড়া। উহার ভিতর একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, উহার মত উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্যের নিদর্শন সমগ্র মেসোপোটেমিয়ায় আর পাওয়া যায় নাই একটিও। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য-নিপুণতার প্রতীকটি সেকালের কোনও সুমেরীয় উচ্চপদস্থ যাজক বা পুরোহিতের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়! সেকালের যাজকদের ন্যায় মুণ্ডিত মস্তক, ধর্ম্মচর্য্যার বিশিষ্ট ঘাগরা প্রভৃতি হইতে মূর্ত্তিটিকে সমুন্নত পুরোহিত পদবীর এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির স্মারক বলিয়া অনুমান করা একেবারে নিরর্থক নয়।

আর একটি সুমেরীয় সভ্যতার প্রতীক বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। এইটি একটি অভিনব গঠনের "ভাস্" (vas)- ইহার শিরোভাগ অবশ্য "ভাস্", কিন্তু ভাস্‌টি যাহার উপর অবস্থিত সেই ভিত্তিটিতে রহিয়াছে পরস্পর কুস্তীরত দুইটি মূর্ত্তি। সেই ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও কুস্তী প্রচলিত ছিল এবং অধুনা যেমনভাবে উহা অনুষ্ঠিত হয়, ঐ মূর্ত্তি দুইটি দেখিয়া ইহা মনে হয় না যে, সেকালেও কুস্তীর নিয়ম-কানুন একালে অনুষ্ঠিত কুস্তী-প্রতিযোগিতা হইতে একেবারেই পৃথক ছিল। তথাপি ইহাই এই প্রতীকটির বিশিষ্টতার শেষ নয়। কারণ ঐটিকে খননকালে উদ্ধার করা হয় কোন মন্দিরের বেদীমূল হইতে। কাজেই একথা ধারণা করা একেবারেই অসঙ্গত হইবে না যে, সেকালের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে এই প্রকার কুস্তী-প্রতিযোগিতার কোন-না-কোনপ্রকার সংযোগ ছিল। এমনও হইতে পারে যে, সেই সুদূর অতীতেও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎসবাংশের অঙ্গস্বরূপ এইপ্রকার কুস্তী-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। আবার এই প্রকারও হইতে পারে যে, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মল্লগণ শুধু কৌতুকের জন্য নয় প্রকৃত প্রস্তাবে কুস্তী-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বীরত্বের প্রতীক ইষ্টদেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিত।

ভারতের স্থানে স্থানে আধুনিক কালেও যেমন দেবদাসীগণ দেবতার মনোরঞ্জনে নৃত্য-গীত প্রভৃতি দ্বারা আরতি করিয়া থাকে, সেই প্রকারে পরস্পর কুস্তীরত হইয়া বীর্য্যবান দেবতার সন্তোষ বিধান একেবারেই অযৌক্তিক মনে হয় না। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমানকালে দেশ-বিশেষে বৌদ্ধলামাগণের 'শয়তান-নৃত্য' (Devil Dance), মুসলমানগণের মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে লাঠি, তরবারি, ছোরা প্রভৃতি খেলা এবং হিন্দুগণের চড়ক প্রভৃতি পর্ব্বে নানা ক্রীড়া-প্রদর্শন যেমন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হয়—ইহার প্রতি সুবিচার করিলে একথা বলিতেই হইবে যে প্রাচীন সুমেরীয়গণের ভিতর যদি কুস্তী-প্রতিযোগিতা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, তবে তাহা তেমন কিছু অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নয়। যে জাতির ভিতর যথেষ্ট বীরত্ব-প্রতিভার উদ্ভব, যে জাতি দৈহিক বলের পূজারী—প্রবল বিপক্ষের আক্রমণ হইতে নিজ দেশরক্ষায় দুর্গ-প্রাকারের প্রথম প্রতিষ্ঠা যাহাদের কৃতিত্ব বলিয়া অনুমিত হয়—সেই প্রকার যোদ্ধা জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর এই প্রকার বীরত্বব্যঞ্জক অভিব্যক্তি থাকাটাই বরং স্বাভাবিক এবং সর্ব্বপ্রকারে সমর্থনযোগ্য। কাজেই আমাদের বর্ত্তমানকালের মতই যে কুস্তী সুমেরীয়দিগের জানিত ছিল এবং তাহাদের উৎসাহান্বিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাহা প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে এই 'ভাস্'টির পাদদেশ। আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহা প্রস্তর-খোদিত নয়, ব্রঞ্জে প্রস্তুত।

কুস্তীরত মূর্ত্তি দুইটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই নজরে পড়ে উহাদের দৃঢ়ভাবে মৃত্তিকা সংলগ্ন পদ। দুইটি মূর্ত্তিরই উভয় পদ অটলভাবে মৃত্তিকায় ভর করিয়া আছে—যাহা আজিকার কুস্তী-প্রতিযোগিতায়ও কুস্তীগীরদের প্রথম ও প্রধান কায়দা নিজ নিজ স্থান গ্রহণের। দ্বিতীয়ত কুস্তীকালে সামান্য ল্যাঙ্গোট বা জাঙ্গিয়ামাত্র পরিধান আজিকার দুনিয়ায়ও প্রকৃষ্ট রীতি। মূর্ত্তি দুইটির পরণেও সেই সরু ফালি—যাহা কোমর বেষ্টন করিয়া আছে। সর্ব্বোপরি লক্ষ্য করিবার বিষয় কুস্তির প্রথাটি। যে কোমর ধরিবার প্যাঁচ পরস্পর অনুসরণ করিতেছে বিপক্ষকে আয়ত্তে আনিবার জন্য, ঐ কৌশলও হুবহু আজিকার দুনিয়ায় ব্যবহৃত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, সুমেরীয়গণ শুধু যে কুস্তীর সকল কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিল এমন নয়, শিল্পেও অসাধারণ উন্নতিসাধন করিয়াছিল।

প্রান্তরের মাঝে

(গল্প)

লেখক—ম্যাক্সিম গোর্কী

অনুবাদক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী

পেরেকফ্ শহর আমরা পিছনে ফেলিয়া আসিলাম—নেকড়ের মত ক্ষুধার্ত্ত আর সমস্ত পৃথিবীটার উপর বিরূপ হইয়া। সামান্য কিছু টাকা-পয়সা রোজগার করিবার জন্য, নিদেনপক্ষে চুরি করিয়াও খাদ্যসামগ্রী কিছু সংগ্রহ করিবার জন্য গত বারো ঘণ্টা ধরিয়া আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, কিন্তু এর কোনটাই যখন সম্ভব হইল না আমরা স্থির করিলাম এ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইব। কোথায় যাইব? এ বিষয়ে আমরা একমত যে, সকল অবস্থাতেই আমাদের আগাইয়া চলিতে হইবে। জীবনের যে পথে আমরা এতকাল পরিভ্রমণ করিয়াছি সে পথে চলিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যদিও আমাদের এ সংকল্প ভাষায় প্রকাশ পাইল না, তথাপি আমাদের বুভুক্ষু চোখের অচঞ্চল দৃষ্টিপাতে তা স্পষ্ট লেখা ছিল।

আমরা ছিলাম তিনজন; অল্প দিন হইল আমাদের পরিচয় হইয়াছে; হারসন্ অঞ্চলে ডনিপার. নদীর তীরে আমাদের দেখা।

আমাদের একজন এক রেলওয়ে ব্যাটেলিয়নের ভূতপূর্ব্ব সৈনিক, পোল্যাণ্ডের একটি শাখা-রেলপথের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবেও সে কিছুদিন চাকরী করিয়াছিল। তাহার মাথার চুলগুলি লালচে রং-এর, চোখ-দুটি ধূসর ও বৈরাগ্য মাখা, দেহ সুগঠিত ও পেশীবহুল। সে জার্ম্মান ভাষায় কথা বলিতে পারিত এবং জেলের বন্দী-জীবন সম্বন্ধে তাহার ছিল ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

আমাদের মত লোকেরা নিজেদের অতীত জীবন সম্বন্ধে কথা বলিতে নানা কারণে ভালবাসে না; তাই বাহ্যত পরস্পরকে বিশ্বাস না করিয়া আমাদের উপায় ছিল না, সেই সঙ্গে অন্তরের দিক দিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই ছিল একান্ত আত্মবিশ্বাসের অভাব।

যখন আমাদের দ্বিতীয় সঙ্গীটি,—নাতিদীর্ঘ, বিশুষ্ক চেহারা তাহার, পাতলা ঠোঁট-দুটি সদাই যেন দৃঢ়-নিবদ্ধ,—যখন সে বলিত যে, সে এক সময় মস্কো ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল, আমরা তাহার কথা সত্য বলিয়াই ধরিয়া লইতাম। সে ছাত্রই হোক, স্পাই বা চোরই হোক আমাদের তাহাতে কিই বা যায় আসে! পরিচয়ের সময় সে ছিল আমাদেরই সমতুল্য—এইটাই যথেষ্ট। ক্ষুধার যাতনা তাহাকে আমাদের মতই ভোগ করিতে হইত, শহরে যাইলে পুলিশের কড়া নজর-বন্দীর মধ্যে তাহাকে থাকিতে হইত, আর গ্রামে আসিলে চাষীরা তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত।

সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোকদের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে আবদ্ধ করিতে দুর্ভাগ্যের মত বন্ধনসূত্র আর নাই এবং এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম যে নিজেদের দুর্ভাগা বলিয়া মনে করিবার অধিকারটুকু অন্তত আমাদের আছে।

তৃতীয় ব্যক্তিটি ছিলাম আমি। আবাল্য অভ্যস্ত বিনয়-নম্র স্বভাবের দরুণ আমি আমার সদ্গুণের কথা বলিতে বিরত থাকিব এবং অপরে যাহাতে আমাকে নির্ব্বোধ না ভাবে সেই জন্য নিজের অসদ্গুণের কথাও উল্লেখ করিব না। কিন্তু আমার চরিত্র সম্বন্ধে যাহাতে সাধারণ একটা ধারণা করা যায় সেই জন্য শুধু এইটুকু বলিব যে, অপর সকল লোকের তুলনায় নিজেকে আমি একটু উঁচুই ভাবি এবং মরণাবধি এ ধারণাটুকু আমার অব্যাহত থাকিবে।

পেরেকফ্ ছাড়িয়া আমরা অগ্রসর হইয়া চলিলাম। লক্ষ্য আমাদের প্রান্তরে ভ্রাম্যমাণ মেষপালকদের সাক্ষাৎলাভ করা; তাহাদের কাছে একখণ্ড রুটি চাহিলে পথচারী আগন্তুককে তাহারা কখনও বিমুখ করে না।

সৈনিক আর আমি পাশাপাশি চলিয়াছি। আর 'ষ্টুডেণ্ট' আসিতেছে আমাদের পিছনে পিছনে। অঙ্গে তাহার একটী হাতকাটা মির্জ্জাই; মুণ্ডিত মাথার উপরিভাগটা যেখানে কৌণিক আকারে সরু হইয়া আসিয়াছে সেখানে শোভা পাইতেছে প্রশস্ত কানা-বিশিষ্ট এক টুপির জীর্ণাবশেষ; বিচিত্র বর্ণের তালি দেওয়া এক ধূসর পায়জামায় তাহার পা-দুটি মণ্ডিত; রাস্তার ধার হইতে সংগৃহীত এক পুরাতন বুটের কর্ত্তিতাংশ তাহার পায়ে, ইহার নাম দিয়াছে সে স্যাণ্ডাল এবং তাহার কোটের ছিন্ন আস্তরগুলি অসংখ্য ফালির আকারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পায়ে পায়ে ধূলিজাল সৃষ্টি করিয়া সে চলিয়াছে নীরবে, তাহার সবুজাভ, ক্ষুদ্র চোখ মাঝে মাঝে ক্ষণিক দীপ্তিতে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। সৈনিকের পরিধানে এক স্থূলে কার্পাস নির্ম্মিত সার্ট, তাহার উপর এক গরম ওয়েষ্ট-কোট; মাথায় তাহার অনির্দ্দেশ্য বর্ণের এক মিলিটারী টুপি—সামরিক কায়দায় "কপালের দক্ষিণ দিকে অল্প একটু আনত;" পা-দুটিকে ঘিরিয়া স্থূলে, ঢিলা পায়জামা এবং খালি পায়েই সে হাঁটিয়া চলিতেছে।

আমিও ছিলাম খালি পায়ে।

গ্রীষ্মকালীন নির্ম্মেঘ প্রতপ্ত আকাশের নীচে আমাদের চারিপাশ ঘেরিয়া অবারিত উদারতায় এক বিরাট, গোলাকৃতি কালিমাময় থালার মত পড়িয়া রহিয়াছে ঐ ধূ ধূ প্রান্তর। প্রশস্ত ফিতার মত রৌদ্রদগ্ধ, ধূলিধূসর পথ তাহারই বুক চিরিয়া বিসর্পিল গতিতে দূরে উধাও হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ভূমিসংলগ্ন কর্ত্তিত ফসলের স্থূলে ঝাড়গুলি সৈনিকের ক্ষৌরকর্ম্মবঞ্চিত মুখের মত দেখায়।

সৈনিক মোটা কর্কশ গলায় গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে:

"......ধন্য হোক তোমার পবিত্র স্যাবাথ......"

সৈন্যদলে চাকরী করিবার সময় সামরিক ভজনালয়ে কিছুদিন তাহাকে গায়কের কাজ করিতে হইয়াছিল, তাই বহু স্তব-স্তুতি তাহার কণ্ঠস্থ ছিল, এবং যখনই আমাদের আলাপ-আলোচনা বন্ধ থাকিত সে স্থান-কাল ভুলিয়া সেগুলির অপপ্রয়োগ করিয়া আমাদের নীরবতা ভরিয়া তুলিত।

দূরে দিকচক্রবাল-নেমির গায়ে কি যেন ধূমল ও গোলাপীর মৃদু রেখায় ভাসিয়া উঠিল।

"মনে হয় ওটা ক্রিমিয়ান পর্ব্বতমালা।" স্টুডেন্ট বলিল শুষ্ক কণ্ঠে।

"পর্ব্বতমালা!" সৈনিক বলিয়া উঠিল। "এত শীঘ্র পাহাড় দেখবার আশা করো না, বন্ধু! দেখছ না ওটা মেঘ?......"

সে মাটির উপর খানিকটা নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "যদি কা'রও সঙ্গে দেখা হ'য়ে যেত! জনপ্রাণী নেই এখানে!......শীতের দিনে ভালুকগুলো যেমন নিজেদের থাবা চেটেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে তেমনি হাত চাটা ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় নেই।"

"আমি ত' তোমাদের বললাম যে, লোকালয়ের দিকে একবার চেষ্টা করে দেখ," উপদেশ দেওয়ার মত করিয়া 'স্টুডেন্ট' কহিল।

"তুমি বললে! কথা বলতে জান না ত' লেখাপড়া শিখেছ কিসের জন্যে? এদিকে লোকালয় একটাও দেখতে পাচ্ছ? কোন্ দিকে যে লোকের বসতি তা ঈশ্বরই জানেন!"

'স্টুডেন্ট' কোন কথা না বলিয়া নীরবে আপনার ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। সূর্য্য পাটে বসিয়াছে, তাহারই বিলীয়মান শেষ আভায় দিগন্তে জাগিয়াছে অনির্ব্বচনীয় বর্ণসমারোহ। এক প্রকার লবণাক্ত সোঁদা গন্ধ মাটি হইতে উদ্গত হইতেছে। সেই শুষ্ক, সুস্বাদ গন্ধে আমাদের ক্ষুধা আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

পাকস্থলীর মধ্যে এক প্রকার দংশন-যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এই নামহীন, দুঃসহ যাতনা যেন আমাদের শরীরের পেশীগুলি হইতে সকল শক্তি নিষ্কাশন করিয়া লইয়া সেগুলিকে অসাড় করিয়া তোলে। এক অপ্রীতিকর, কটু আস্বাদে মুখের ভিতরটি ভরিয়া গিয়াছে, কণ্ঠনালী বিশুষ্ক, মাথা ঘুরিতেছে, এবং চোখের সম্মুখে অসংখ্য কালো বিন্দু নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কখন এই সকল বিন্দু ধূমায়মান উত্তপ্ত মাংসখণ্ডের মত দেখায়, কখনও বা রুটির টুকরার আকার ধারণ করে, এবং সেইসঙ্গে ইহাদের এক একটি বিশিষ্ট সুঘ্রাণ মনে পড়িয়া গিয়া পাকস্থলী এক তীব্র বেদনায় মোচড় দিয়া উঠে।

যাই হোক, পরস্পরের কাছে নিজেদের অনুভূতির কথা জ্ঞাপন করিতে করিতে আমরা চলিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথ অতিক্রম করিয়া। দৃষ্টি সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে, প্রান্তরের কোন সুদূরতম কোণে যদি কোন মেষপালের ছায়াময় আভাস ভাসিয়া ওঠে; অথবা কোন কৃষকের বাজারগামী ফল-বোঝাই গাড়ীর চক্রশব্দ যদি শুনিতে পাওয়া যায় তাহারই আশায় উৎকর্ণ হইয়া আছি।

কিন্তু পরিত্যক্ত প্রান্তরের স্পন্দহীন নীরবতা ভাঙ্গিয়া কোন দিকে কোন সাড়াই জাগে না।

এই অশুভ দিনটির পূর্ব্বদিনে আমরা খাইয়াছিলাম কিছু যবের রুটি এবং পাঁচটি তরমুজ। কিন্তু দীর্ঘ চল্লিশ মাইল হাঁটিবার পক্ষে এ খাদ্য অতি সামান্যই, তাই পথক্লান্ত শরীরে পেরেকফ্-এর বাজারের মধ্যে কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিবার পরই ক্ষুধার প্রচণ্ড যাতনা আমাদের জাগাইয়া তুলিল।

'স্টুডেন্ট' ঠিকই বলিয়াছিল যে, ঘুমাইয়া কাজ নাই, বরং রাত্রির সুষুপ্তির সুযোগ লইয়া আমাদের কাজ হাঁসিল করা যাক...। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করা সম্ভ্রান্ত সমাজে নিষিদ্ধ, তাই আমাদের ঐ জল্পনা-কল্পনার বিষয় আমি আর বলিলাম না। আমি জানি এই সভ্যতা-সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষের দিনে মানুষের চিত্ত কোমল ও স্পর্শকাতর হইয়া উঠিতেছে, এবং মানুষকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিবার সময়ও সৌজন্য এবং সময়োপযোগী অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়াই এই নৈতিক উন্নতি অবলোকন করিয়াছি, এবং সকল কিছুই যে এ পৃথিবীতে স্ফূর্ত্তি ও পূর্ণতা লাভ করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। সরাবখানা, তস্করের আড্ডা এবং কারাগারের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা হইতেই সমাজের এ অগ্রগতি বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

এইভাবে মুখের লালা ঘন ঘন গলধঃকরণ করিতে করিতে এবং উদরস্থ যন্ত্রণা ভুলিবার চেষ্টায় বিশ্রম্ভালাপ করিতে করিতে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম রশ্মির নীচ দিয়া নিস্তব্ধ প্রান্তর একের পর এক পার হইয়া চলিলাম। মনের মধ্যে অস্পষ্ট এক আশা জাগিয়া আছে, কিছু একটা উপায় হয়ত মিলিয়া যাইবে। আমাদের সামনে সূর্য্যদেব আপনার রঙে রাঙিয়া উঠিয়া দীপ্যমান অগ্নিগোলকের মত নরম মেঘ-অন্তরালে ধীরে ধীরে আত্মগোপন করিতেছে। আমাদের পিছনে কুয়াসার এক নীলাভ আস্তরণ প্রান্তরের বুক হইতে আকাশের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়া দিগন্তের পরিধিকে সংকীর্ণতর করিয়া ফেলিতেছে।

'রাত্রের আগুনের জন্যে যা কিছু পাও এইবেলা সংগ্রহ ক'রে নাও ভাই," সৈনিক পথ হইতে একখণ্ড কাঠ কুড়াইয়া লইয়া কহিল, "ঘাস, গাছের ডাল-পালা যা পাও তুলে নাও! রাতটা ত' আমাদের মাঠের মধ্যেই কাটাতে হবে......হিমও খুব পড়বে।"

আমরা এখানে ওখানে ছড়াইয়া পড়া শুষ্ক ঘাস এবং অন্যান্য যাহা কিছু দাহ্য বস্তু পাইলাম সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখনই কিছু কুড়াইবার জন্য মাটির দিকে নত হই, তখনই এক প্রচণ্ড ইচ্ছা পাইয়া বসে যে, মাটিতে এখনই অচল অনড় হইয়া শুইয়া পড়ি এবং যত পারি ঐ কাল মাটি অজস্র পরিমাণে ভক্ষণ করি, তারপর চোখ মুদ্রিত করিয়া নিদ্রাগত হই। এ নিদ্রা যদি চিরনিদ্রা হয় তাহাতেও কিছু যায় আসে নাঃ কেবল যতক্ষণ চিবাইতে পারা যায় ততক্ষণ ঐ মাটি ভক্ষণ করিয়া চলা এবং অনুভব করা যে, ঐ মাটির স্থূল, ঈষৎ তপ্ত পিণ্ড মুখ হইতে ধীরে ধীরে শুষ্ক নীরস গলার ভিতর দিয়া নামিয়া গিয়া ক্ষুধার্ত্ত, যন্ত্রণাকাতর পাকস্থলীর মধ্যে স্থান লাভ করিতেছে।

"যদি গাছের কিছু শিকড়ও পেতাম..." সৈনিক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল।

"চিবাইবার মত শিকড় পাওয়া যেতে পারে খুঁজলে......"

কিন্তু ঐ হলচালিত কালো মাটির মধ্যে শিকড় একটিও

ছিল না। দক্ষিণের রাত্রি শীঘ্রই আসিয়া পড়িল; অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখা মিলাইতে না মিলাইতে নীল নভে একটি দুটি করিয়া নক্ষত্র আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল, এবং আমাদের চারিধারে অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়া প্রান্তরের অবারিত বিস্তার ও আমাদের দৃষ্টির মাঝে এক যবনিকা টানিয়া দিল.....

'ষ্টুডেণ্ট' অনুচ্চকণ্ঠে ফিস ফিস করিয়া কহিল, "ভাই, একটা লোক ওখানে শুয়ে, বাঁ-ধারে......"

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সৈনিক বলিল, "লোক? তা' এখানে ও শুয়ে আছে কেন?"

"কেন শুয়ে আছে তা তুমি ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। আমার মনে হয় ওর কাছে রুটি-টুটি কিছু আছে, তাই ও আর লোকালয়ের দিকে না গিয়ে এইখানেই আশ্রয় নিয়েছে....." 'ষ্টুডেণ্ট' মন্তব্য করিল।

সৈনিক সশব্দে গলা ঝাড়িয়া লইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে মাটির উপর খানিক নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়া কহিলঃ

"চল, ওর কাছে যাওয়া যাক!"

প্রায় একশত গজ দূরে রাস্তার বামধার ঘেঁসিয়া যে কৃষ্ণকায় পদার্থটা পড়িয়া রহিয়াছে তাহা যে মানুষ ইহা কেবল তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি 'ষ্টুডেণ্ট'-ই বুঝিতে পারিয়াছিল। হলোৎক্ষিপ্ত বড় বড় মাটির চাঙড়ের উপর দিয়া যথা সম্ভব দ্রুত হাঁটিয়া আমরা তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম। খাদ্য-প্রাপ্তির নবজাত আশা আমাদের ক্ষুধার যন্ত্রণাকে দ্বিগুণিত করিয়াছে। আমরা তাহার একান্ত নিকটে আসিয়া পড়িলাম, কিন্তু তথাপি লোকটির কাছ হইতে একটুও সাড়া-শব্দ আসিল না।

"ওটা বোধ হয় মানুষ নয়!" সৈনিক খেদোক্তি করিল। আমরাও তাহাই ভাবিতেছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আমাদের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া পদার্থটা নড়িয়া উঠিল এবং মাটির উপর তাহার শরীর উত্তোলিত করিতেই আমরা দেখিলাম একটি লোক জানুর উপর ভর দিয়া, দুই হস্ত আমাদের দিকে প্রসারিত করিয়া আছে। এবং সে কম্পিত, কর্কশ কণ্ঠে বলিতেছেঃ

"কাছে এস না বলছি—গুলী করব!"

পারিপার্শ্বিক নীরবতা ভেদ করিয়া সশব্দে একটি গুলী বাহির হইয়া গেল।

যেন এক সামরিক কঠোর আদেশ আমাদের গতিহীন করিয়া দিল এবং এই দুর্বিনীত সম্ভাষণে হতবুদ্ধি হইয়া কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের মুখ দিয়া একটা কথাও সরিল না।

"গোল্লায় যাক্ হতভাগা জন্তুটা!" সৈনিক নিম্নস্বরে কহিল।

"পিস্তল রয়েছে লোকটার হাতে..." বিষণ্ণভাবে 'ষ্টুডেণ্ট' কহিল।

"ওহে!" সৈনিক বলিয়া উঠিল।

কিন্তু উহার কাছ হইতে কোন উত্তরই আসিল না, যেমন দৃঢ়ভঙ্গিতে সে পিস্তল উদ্যত করিয়া বসিয়াছিল তেমনিই বসিয়া রহিল।

"ওহে শোন! তোমার গায়ে আমরা হাতটি দেব না... রুটি বা অন্য কিছু যদি তোমার কাছে থাকে ত' দাও; ভগবানের দোহাই, ভাই!...গোল্লায় যাও, হতভাগা পাজি!"

শেষের মধুর সম্ভাষণটি উচ্চারিত হইল অনুচ্চস্বরে।

কিন্তু লোকটির মৌনতা ভাঙিল না।

"শুনতে পাচ্ছ না?" সৈনিক ক্রোধে, হতাশায় কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল। "খাবার মত খানিকটা রুটি দাও। তোমার কাছে আমরা যেতে চাই না; ঐখান থেকেই ছুঁড়ে দাও..."

"আচ্ছা ভাল কথা..." লোকটির কাছ হইতে সংক্ষিপ্ত জবাব আসিল।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরিবর্ত্তে যদি দাক্ষিণ্য ও আতিথেয়তার মধুরতম বাক্যটি তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইত, তাহাও বোধ করি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিত না, এমনি তখন আমাদের মনের অবস্থা।

"আমাদেরকে ভয় করবার কিছু নেই," সৈনিক মুখে আপ্যায়নের হাসি টানিয়া আনিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল; "আমরা সবাই খুব শান্তিপ্রিয় লোক...রুশিয়া থেকে খুবানের দিকে পায়ে হেঁটেই চলেছি...। রাস্তায় আমাদের টাকা-পয়সা সব নিঃশেষ হ'য়ে গেল...বাধ্য হ'য়ে তাই সঙ্গে যা কিছু ছিল বিক্রী ক'রে দিতে হয়েছে...। দু'দিন হ'ল আমরা না খেয়ে আছি।"

"ধর!" লোকটি সম্মুখের দিকে একটি হাত সঞ্চালিত করিয়া কহিল। খানিকটা কালো পদার্থ তাহার হাত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া অদূরে কর্ষিত জমির উপর পড়িল। 'ষ্টুডেণ্ট' তাহা সংগ্রহ করিতে ছুটিয়া গেল।

"নাও, আরও নাও! ব্যস, এই শেষ; আমার কাছে আর নেই......"

'ষ্টুডেণ্ট' জিনিষগুলি কুড়াইয়া আনিলে দেখা গেল সেগুলি প্রায় চার পাউণ্ড পরিমাণ গমের বাসি রুটি। তাহা যেমন শক্ত, মৃত্তিকালিপ্ত হইয়া তেমনি মলিন হইয়া উঠিয়াছে।

"এই—এই—এই!" সৈনিক গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ বিতরণ করিয়া দিল। "দাঁড়াও—ঠিক সমান হ'ল না। আর পণ্ডিত, শোন, তোমার ভাগ থেকে কিছুটা ছিঁড়ে নিতে হবে, না হলে ওর যে কম প'ড়ে যায়।"

'ষ্টুডেণ্ট' আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাহার অংশ হইতে যৎসামান্য ছিঁড়িয়া আমাকে দিল। আমি সেটুকু মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে চিবাইতে লাগিলাম; চোয়ালের দ্রুতগতি রোধ করা যায় না—রুটি ত ছার, সে যে পাথর পর্য্যন্ত চিবাইয়া গুঁড়া করিয়া দিতে প্রস্তুত। কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া একটু একটু করিয়া চর্ব্বিত সামগ্রী নামিয়া যাওয়ার পরিতৃপ্তিটুকু সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া উপভোগ করি। উষ্ণতা আর অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যরসে ভরপুর হইয়া গ্রাসের পর গ্রাস দাহ্যমান পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং মনে হয় তৎক্ষণাৎ তাহা মেদ-রক্তে পরিণত হইতেছে। এক অভূতপূর্ব্ব সজীব আনন্দ সমস্ত হৃদয়কে অভিষিক্ত করিয়া দেয়, এবং উদর একটু একটু করিয়া পূর্ণ হইয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রার আবিলতা আসিয়া সমস্ত শরীরকে আবিষ্ট

করিয়া ফেলে। নিরবচ্ছিন্ন অনশনের দীর্ঘ দিনগুলির কথা আমি ভুলিয়া যাই, ভুলিয়া যাই যে, আমার সঙ্গীরাও অনুরূপ পরিতোষে নিবিষ্টমনে আস্বাদন করিতেছে। কিন্তু হস্তস্থিত শেষ টুকরাটুকু মুখে তুলিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝিতে পারি ক্ষুধার বেগ এখনও মন্দীভূত হয় নাই।

"শয়তানটার কাছে এখনও অনেক রুটি আছে, আর মাংসও কিছু আছে বোধ হয়"......সৈনিক আমার সম্মুখে মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া পেটের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে চুপি চুপি কহিল।

"মাংস নিশ্চয়ই আছে ওর কাছে; রুটিতে মাংসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল......অন্তত আরও কিছু রুটি ত আছেই"......'ষ্টুডেণ্ট' কহিল। তারপর মৃদু স্বরে বলিলঃ "রিভলবারটা আছে, না হ'লে..."

"লোকটা কে বলত?"

"আমাদের মতই কোন লোক বোধ হয়..."

"কুকুর!" সৈনিকের কণ্ঠস্বরে বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিল।

আমরা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিয়া যেদিকে আমাদের খাদ্যদাতা পিস্তল হস্তে বসিয়াছিল সেইদিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। তাহার কাছ হইতে কোনরূপ সাড়াশব্দ বা প্রাণের লক্ষণ পাওয়া যাইতেছিল না।

রাত্রি তাহার অন্ধকার শক্তি দিয়া আমাদের পরিবৃত করিয়া ফেলিল। সমগ্র প্রান্তরের উপর বিরাজ করিতে লাগিল এক নিথর অখণ্ড নীরবতা; সে নীরবতায় আমরা আমাদের নিশ্বাস পতনের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতেছিলাম। মাঝে মাঝে কোন অনির্দ্দেশ্য স্থানে প্রান্তরবাসী মূষিককুল কিচ কিচ শব্দে ডাকিয়া উঠে। আর ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ—আকাশের ঐ দীপ্যমান জীবন্ত ফুলগুলি—আমাদের মাথার উপর স্নিগ্ধ করুণ জ্যোৎস্না ঢালে...। আমরা রহিয়াছি ক্ষুধার্ত্ত।

আমার বলিতে ত লজ্জা নাই, বরং গর্ব্বই আছে যে, ঐ অনন্যসাধারণ রাত্রিটিতে আমার সঙ্গীদের চেয়ে কোন দিক দিয়া আমি ভালও ছিলাম না, মন্দও ছিলাম না। আমি তাহাদের কাছে প্রস্তাব করিলাম যে, সাহস অবলম্বন করিয়া আমাদের উচিৎ লোকটির দিকে অগ্রসর হওয়া এবং কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া উহার কাছে যাহা কিছু খাদ্য-সামগ্রী পাওয়া যায় সকলই উদরসাৎ করা। যদি সে গুলী করিবার চেষ্টা করে তবে আমাদের একজনই আহত হইবে, এবং এমনও সম্ভব যে, ঐ আঘাত একেবারেই মারাত্মক হইবে না।

সৈনিক একলম্ফে খাড়া হইয়া উঠিয়া কহিলঃ "এস!"

অপেক্ষাকৃত মন্থরতার সহিত 'ষ্টুডেণ্ট' উঠিল।

আমরা প্রায় এক রকম ছুটিয়াই অগ্রসর হইলাম, 'ষ্টুডেণ্ট' আমাদের পিছনে পিছনে ভয়ে ভয়ে গুঁড়ি মারিয়া আসিতে লাগিল।

"কমরেড!" সৈনিক তাহাকে চাপা গলায় ভর্ৎসনা করিল।

এক ক্রোধাত্মক গুঞ্জন শ্রুত হইল, তাহার পরই এক ঝলক আগুন ছড়াইয়া পিস্তলের একটি গুলী বাহির হইয়া গেল।

"ফসকে গেছে!" সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সৈনিক এক লাফে লোকটির উপর গিয়া পড়িল। "শয়তান, এইবার কি......"

'ষ্টুডেণ্ট' উহার ঝুলিটি হস্তগত করিতে ছুটিয়া গেল।

"শয়তান" এতক্ষণ নতজানু হইয়া বসিয়াছিল, এইবার মাটিতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া দুই হাত উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

এই আচরণে বিস্মিত হইয়া সৈনিক বলিয়া উঠিল, "কি হ'ল হে ...' তারপর লোকটির লম্বিত শরীরে পদাঘাত করিবার ভঙ্গিতে একটি পা উঁচু করিয়া কহিল, "কি, ব্যাপার কি? কান্না পেল? পিস্তল চালাতে গিয়ে নিজেই ঘায়েল হয়েছ বুঝি?"

"এখানে রুটি, মাংস, কেক...বিস্তর রয়েছে!" 'ষ্টুডেণ্টের হর্ষোৎফুল্ল চীৎকার শোনা গেল।

"মর তুমি কেঁদে মর!...এস ভাই, খাওয়া যাক!" সৈনিক বলিল।

আমি লোকটির হাত হইতে পিস্তলটি ছিনাইয়া লইলাম। তাহার রোদন থামিয়া গেছে এবং সে শুইয়া আছে নিস্পন্দ হইয়া। পিস্তলটিতে দেখি আর একটি মাত্র কার্টরিজ রহিয়াছে।

আবার আমরা নিবিষ্ট মনে নিঃশব্দে খাইতে লাগিলাম। লোকটিও নীরব, এতটুকু নড়াচড়া করিতেছে না। আমরা আর তাহার দিকে মনোযোগ দিলাম না।

"সত্যিই তোমরা কি শুধু খাবারই চাইছিলে?" সহসা এক কম্পিত ভগ্নস্বর শ্রুত হইল।

আমরা চমকিয়া উঠিলাম। 'ষ্টুডেণ্ট' বিষম খাইল, এবং নত হইয়া নিদারুণভাবে কাসিতে আরম্ভ করিল।

সৈনিক চর্ব্বন করিতে করিতে লোকটিকে গালাগালি দিতে লাগিল।

"কুকুর! চেঁচিয়ে উঠল দেখ না!...তুমি কি মনে কর তোমার চামড়া আমরা খুলে নিতে চেয়েছিলাম। কি কাজে লাগতে পারে তোমার ও চামড়া? গোল্লায় যাও তুমি! যমের দক্ষিণ দুয়ার খোলা আছে তোমার জন্যে......"

সে খাইতে খাইতে এই সকল কটূক্তি উচ্চারণ করিতেছিল, তাই মুখ হইতে বাহির হইবার সময় ঐগুলি তাহাদের তীব্রতা এবং স্পষ্টতা হারাইয়া ফেলিতেছিল।

"আমাদের খাওয়াটা শেষ হ'তে দাও, তারপর তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করছি," 'ষ্টুডেণ্ট' বিদ্বেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিল।

তারপর হঠাৎ এক সময় রাত্রির নীরবতা ভাঙ্গিয়া আর্ত্তকণ্ঠের এক করুণ বিলাপ আমাদের ভীত, সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

"কেমন করে ভাই জানব বল? গুলী ছুড়লাম...সে তো ভয়ে। কেভি এ্যাফন থেকে আসছি আমি...হা ভগবান! সন্ধ্যার সময় জ্বর এল। দুর্ভাগ্য আমার!—এই জ্বরের ভয়েই আমি এ্যাফন্ ছেড়ে পালিয়ে আসছি......এ্যাফন্-এ চাকরী করি......ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ......বাড়ীতে স্ত্রী আছে ......দুটি ছোট ছোট মেয়ে আছে......তিন বছরের বেশী হ'ল

তাদের আমি দেখিনি......আমার যা আছে সব তোমরা খেতে পার, ভাই......"

"তোমার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা আমরা রাখি না," 'ষ্টুডেণ্ট' কহিল।

"হা ভগবান! আমি যদি আগে বুঝতে পারতাম তোমরা এমন শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক, তা'হলে কি আর গুলী করি। তোমরা ত জান এই মাঠগুলো কি সাংঘাতিক...আমার কি দোষ ভাই, বল?"

কম্পিত, ভীরুস্বরে বিলাপ করিতে করিতে সে এই কথাগুলি বলিয়া যায়।

"কি রকম লোক! কে'দে কে'দেই সারা হ'ল!" সৈনিক অবজ্ঞাভরে কহিল।

"আমার মনে হয় ওর কাছে কিছু টাকা-পয়সাও আছে।" 'ষ্টুডেণ্ট' হঠাৎ বলিয়া বসিল।

সৈনিক তাহার চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া 'ষ্টুডেণ্টের' দিকে চাহিয়া মৃদু একটু হাসিল।

"আচ্ছা, বন্ধু......এইবার খানিকটা আগুন জেবলে শুয়ে পড়া যাক্।"

"আর ও লোকটা?" 'ষ্টুডেণ্ট' জিজ্ঞাসা করিল।

"চুলোয় যাক্ ও! কি করব ও'কে নিয়ে, আগুনে রোষ্ট' ক'রে কাবাব বানাবো?"

"ও'কে 'রোষ্ট' করাই উচিৎ।" 'ষ্টুডেণ্ট' তাহার সরু মাথাটি সঞ্চালন করিয়া কহিল।

অদূরে আমরা আমাদের সংগৃহীত ঘাস ও ডাল-পালাগুলি ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, সেগুলি এখন লইয়া আসিয়া আগুন জ্বালিয়া তাহার চারিপাশ ঘিরিয়া বসিলাম। প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা সুখকর, মৃদু উত্তাপ বিকীরণ করিয়া আমাদের চারিপাশের কিছুটা স্থান আলোকিত করিয়া তুলিল। তন্দ্রালুতা আসিয়া সমস্ত শরীরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, যদিও আর একবার খাইতে পারার মত ক্ষুধা তখন আমাদের যথেষ্টই ছিল।

"ভাই!" মিস্ত্রী আমাদের সম্বোধন করিল। চার-পাঁচ হাত দূরে সে শুইয়াছিল এবং সময় সময় মনে হইতেছিল, সে অস্ফুট স্বরে কি যেন স্বগতোক্তি করিতেছে।

"হ্যাঁ বল?" সৈনিক উত্তর দিল।

"তোমাদের কাছে কি যেতে পারি......ঐ আগুনের পাশে? মরণ ত আমার এসেই পড়েছে......হাড়গুলো যেন গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে......হা ভগবান! বাড়ী যাওয়া আর আমার হ'ল না, হ'ল না........."

"এস, গড়িয়ে গড়িয়ে এখানে।" 'ষ্টুডেণ্ট' বলিল।

পাছে তাহার কোন একটি হাত বা পা অঙ্গচ্যুত হইয়া যায়—ইহারই ভয়ে যেন সে ভীত, এমনিভাবে অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়া সে অগ্নিকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার চেহারা লম্বা এবং নিরতিশয় শীর্ণ; সমস্ত শরীরে মাংস বলিয়া যেন কিছুই নাই—পঞ্জরগুলো—বুঝি একটি একটি করিয়া গোণা যায়, এবং তাহার ঘোলাটে আয়ত চোখে রোগের সমস্ত দহন-জ্বালা নিদারুণ বীভৎসতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুখাবয়ব অজস্র কুঞ্চনে ভরিয়া গিয়া কুৎসিৎ রূপ ধারণ করিয়াছে এবং অগ্নিকুণ্ডের লোহিত আলোকেও সে মুখের মৃতবৎ পীতাভ রং সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তাহার কম্পমান শরীরের এই শোচনীয় অবস্থা আমাদের মনে এক অবজ্ঞা মিশ্রিত দয়ার উদ্রেক করে। অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপে সে তাহার দীর্ঘ হাতদুখানি প্রসারিত করিয়া দিল এবং উভয় হাতের অস্থিসম্বল আঙ্গুলগুলো একত্র সন্নিবেশিত করিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিল।

সৈনিক তাহাকে পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শরীরের এ অবস্থায় পায়ে হে'টে যাবার কি দরকার ছিল? না, এমনি কঞ্জুষ তুমি যে গাড়ী ভাড়ায় একটি পয়সাও খরচ করতে চাও না?"

"সবাই বললে তোমার জলপথে গিয়ে কাজ নেই, বরং ক্রিমিয়া হ'য়ে যাও—মেঠো হাওয়ায় তোমার শরীরের উপকার হ'বে। কিন্তু আর ত আমার চলবার সামর্থ্য নেই......আমি এবার মরতে বসেছি! এই মাঠের মাঝে একলা আমায় সহায়-সম্বলহীন হ'য়ে মরতে হ'বে।......পশু-পক্ষীতে আমার দেহ ছি'ড়ে ছি'ড়ে খাবে, কেউ জানতেও পারবে না আমার কি হ'ল......। আমার স্ত্রী......আমার মেয়েরা......আমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে......আমি যে তা'দের চিঠি লিখে জানিয়েছি, আমি যাচ্ছি......আমার হাড়গোড় সব এই মাঠের মাঝে বৃষ্টিতে পড়ে ভিজবে......হা ভগবান, হায়রে বরাত!"

দলচ্যুত আহত নেকড়ের নিঃসহায় চীৎকারের মত সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

"চুপ্ কর বলছি!" সৈনিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া সরোষে তাহাকে শাসাইল। "চীৎকার ক'রে মরছ কেন? মানুষকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না? যদি নিশ্চয় জান যে মরবে তবে তা' নিয়ে অত সোরগোল করছ কেন?......কি কাজে তুমি লাগতে পার বল ত? স্থির হ'য়ে থাক!"

"ওর মাথায় এক ঘা বসিয়ে দাও।" 'ষ্টুডেণ্ট' প্রস্তাব করিল।

"নাও, এইবার ঘুমান যাক্," আমি কহিলাম। "আর দেখ মিস্ত্রী, তুমি যদি আগুনের কাছে থাকতে চাও, ঐ এক-ঘেয়ে কান্না তোমায় থামাতে হ'বে, না হ'লে......"

"শুনতে পাচ্ছ?" সৈনিক তাহাকে সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিল। "শেষ কথা আমাদের শুনে রেখে দাও! তুমি কি মনে কর, যেহেতু তুমি খানকতক রুটি ছুড়ে দিয়েছিলে, আর বুলেট চালিয়েছিলে, সেইজন্যে তোমার ওপর আমাদের দয়া হবে? নিপাত যাও তুমি! অন্য লোক হ'লে এতক্ষণ তোমায়......"

সৈনিক নীরব হইয়া গিয়া মাটিতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

'ষ্টুডেণ্ট' ইতিপূর্ব্বেই শুইয়া পড়িয়াছে। আমিও এইবার মাটির উপর ক্লান্ত, তন্দ্রাতুর শরীর বিছাইয়া দিলাম। ভর্ৎসিত ছুতার মিস্ত্রী গুটিসুটি মারিয়া আগুনের আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া ইহার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। আমি তাহার ডান দিকে শুইয়াছিলাম এবং তাহার দন্তের

ঠকঠক্ শব্দ হইতে বুঝিতে পারিতেছিলাম, তাহার শরীরের রোগজনিত কম্পন অগ্নির উত্তাপেও উপশমিত হয় নাই। সৈনিক দুই হাতের উপর মাথাটি ন্যস্ত করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।

"কেমন রাত বলত? এত তারা......আর এই মৃদু উত্তাপ........" কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর সে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল। "আকাশটাকে দেখাচ্ছে ঠিক একখানা চাঁদোয়ার মত। এই ভ্রাম্যমাণ জীবন আমি ভালবাসি, বন্ধু। জানি এ জীবনে অনাহার আর শীত ভোগের বিড়ম্বনা কত, কিন্তু কি মুক্ত আর স্বচ্ছন্দ।......তোমার মাথার ওপর শাসন চালাবার কেহই নেই......তোমার ভাগ্যের তুমিই নিয়ামক......। তুমি যদি নিজেকে টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে চাও, তা'তেও তোমায় কেহ বাধা দিবে না......। এই ভাল......। এ ক'দিন আমি কতই না ক্ষুধার্ত্ত আর দুষ্কর্ম্মের প্রতি আসক্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এখন, এই ত আমি শুয়ে শুয়ে গ্লানিহীন মনে আকাশের দিকে চেয়ে আছি......। তারা-রা চোখের ইসারায় যেন আমায় বলছেঃ 'তাতে কিছু আসে যায় না, লাকুটিন; ঘুরে বেড়াও এই পৃথিবীর বুকে, জেনে নাও যা কিছু জানবার আছে এখানে, এবং বশ্যতা স্বীকার কর না কাহার কাছে।' ......আর অন্তর আমার শান্তি লাভ করে। ......আর মিস্ত্রী, তোমার কি মনে হয়? তোমার ওপর কঠিন ব্যবহার করেছি বলে রাগ কর না,—কিছু ভয় নেই তোমার।......তোমার রুটিগুলো সব খেয়ে ফেলেছি বটে, কিন্তু কোন অনিষ্ট করবার ইচ্ছে আমাদের ছিল না—আমাদের খাবার কিছুই ছিল না, অথচ তোমার ছিল, তাই তোমারটা আমরা খেয়েছি......। আর বর্ব্বরের মত তুমি আমাদের উপর গুলী চালালে......। তুমি জান না কি, বুলেট কত সাংঘাতিক জিনিষ? আমার বড় রাগ হয়েছিল তোমার উপর। তুমি নিজে থেকেই যদি না পড়ে যেতে তোমার ঐ বেয়াদবির জন্য আমি তোমায় শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম। আর রুটির কথা যদি বল—পেরেকফ্ শহরে গিয়ে তুমি তা' কিনে নিতে পারবে। আমি জানি তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে......। কত দিন থেকে তুমি জ্বরে ভুগছ?"

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সৈনিকের ভারী কণ্ঠস্বর এবং রোগ-ক্লিষ্ট মিস্ত্রীর কম্পিত গলার ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসিয়া বাজিতেছিল। রাত্রি আরও তিমিরাচ্ছন্ন এবং গাঢ়তর হইয়া পৃথিবীকে নিবিড়তম প্রেমে জড়াইয়া ধরিতেছিল এবং প্রান্তরের তাজা বাতাস কি এক অনির্দ্দেশ্য সুবাস মাখিয়া নাকের মধ্যে পশিয়া মনপ্রাণ প্রসন্ন আনন্দে ভড়াইয়া দিতেছিল!

কুণ্ডের অগ্নি এক অনতিপ্রখর, কোমল আলো এবং মধুর, হৃদ্য উত্তাপ বিকীরণ করিতেছিল......চোখ আপনি মুদ্রিত হইয়া আসে এবং সেই অর্দ্ধসুপ্তির মধ্যে কি যেন স্নিগ্ধ এবং শুচিস্মিত চোখের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়।

"এই, ওঠ, শীঘ্র ওঠ! আমাদের যেতে হবে!"

চমকিয়া উঠিয়া আমি চোখ খুলিলাম এবং সৈনিক হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেই লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

"দেরী কর না! চল!"

তাহার মুখ গম্ভীর এবং শঙ্কিত উদ্বেগের ছাপ তাহাতে সুপরিস্ফুট। চারিদিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম। নবোদিত সূর্য্যের রক্ত-আলো আসিয়া পড়িয়াছে মিস্ত্রীর স্পন্দহীন, নীল মুখের উপর। তাহার মুখগহ্বর উন্মুক্ত, দীপ্তিহীন চোখদুটি নিদারুণ বিভীষিকায় কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বুকের উপরকার জামা কে যেন মোচড়াইয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। 'ষ্টুডেণ্ট'-কে কোন দিকে দেখা যাইতেছে না।

"কি দেখা হয়েছে ত'? এখন সরে পড় এখান থেকে!" সৈনিক আমার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া কহিল।

"ও মরে গেছে নাকি?" প্রভাতের শৈত্যে কাঁপিয়া উঠিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম।

"হ্যাঁ, মরেছে বই কি। কেউ যদি তোমার গলা টিপে ধরে তোমার না ম'রে আর উপায় কি বল!"

"তা'হলে কি......'ষ্টুডেণ্ট'-ই......?" আমি বলিয়া উঠিলাম।

"না হ'লে আর কে? তুমি না আমি? হ্যাঁ, পণ্ডিত তার কাজ বেশ ভালভাবেই হাঁসিল ক'রে গেছে, আর আমাদের ফেলে গেছে বিপদের মধ্যে। কাল এ সন্দেহ একবারও যদি আমার মনে জাগত 'ষ্টুডেণ্ট'-কে আমি শেষ ক'রে ছাড়তাম। এই একটি ঘুষিতেই তার লীলাখেলা আমি সাঙ্গ করতাম। তার মত পাষণ্ড মরলে পৃথিবীর একটু ভার কমত! বুঝতে পারছ সে কি করেছে? আমাদের সতর্ক হ'তে হবে—মাঠের মাঝে আমাদের কেউ না দেখে। মিস্ত্রী হয়ত আজই লোকের চোখে পড়বে, আর সবাই বুঝতে পারবে গলা টিপে হত্যা ক'রে সর্ব্বস্ব তার কেড়ে-কুড়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদের মত ভবঘুরেরই তখন খোঁজ পড়বে, আর আমাদের কাছে সন্তোষ-জনক উত্তর চাওয়া হ'বে কোথায় আমরা যাব আর আগের রাতটাই বা কোথায় কাটিয়েছি। আমাদেরকেই তারা ধরবে, যদিও তোমার আমার এতে কোন হাত নেই......এই পিস্তলটা কিন্তু আমি জামার তলায় রেখে দিয়েছি। বেশ জিনিষটা!"

"ওটা বরং তুমি ফেলে দাও।" আমি পরামর্শ দিলাম।

"ফেলে দেব?" চিন্তামগ্ন হইয়া সে বলিল। "বেশ দামী জিনিষ......আর আমরা ধরা নাও পড়তে পারি। না, এ আমি ফেলে দেব না। কেই বা জানবে যে মিস্ত্রির পকেটে পিস্তল থাকত? ফেলে এ আমি দিচ্ছি না......এর দাম অন্তত তিন রুবল হবে, আর একটি কার্টিজও রয়েছে এর মধ্যে। 'ষ্টুডেণ্ট'-এর মগজের ভিতর দিয়ে এই গুলীটা চালিয়ে দিতে পারলে আমি কি খুসীই হ'তাম! পাজী কুকুর! কত টাকা নিয়ে যে স'রে পড়েছে শুয়োরটা, তা' কেই বা জানে!"

"আর ঐ ছোট ছোট মেয়ে দুটার কি হবে?" অনিশ্চিৎ কণ্ঠে আমি কহিলাম।

"মেয়ে? কোন্ মেয়ে? ও, ঐ মিস্ত্রীর! তারা বড় হ'য়ে বিয়ে-থাওয়া করবে। এ ব্যাপারে তাদের আর কিই বা করবার

(শেষাংশ ২৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মৃত্তিকা-ভক্ষণ

মৃত্তিকা-ভক্ষণ কম বেশী দুনিয়ার সকল অঞ্চলের অধিবাসীদেরই ভিতর অত্যাশ্চর্য্যভাবে ব্যাপক বিস্তার লাভ করিয়াছে। অবশ্য, গুণাগুণ-নির্ব্বিশেষে সকল প্রকার মৃত্তিকাই ভক্ষণ করা হয় না অথবা নিয়ম নয়; শুধু সেই সকল মৃত্তিকাই মানুষকে ভক্ষণ করিতে দেখা যায়, যেগুলির বিশেষ বিশেষ রূপরসগন্ধের জন্য মানুষের নিকট লোভনীয় মনে হয়—যেমন, হালকা মনোমুগ্ধকর রং, মৃদু সোঁদা গন্ধ, কোমলতা, নমনীয়তা আর আস্বাদ প্রভৃতি। স্বাদ গ্রহণের দিক হইতে ভক্ষণীয় মৃত্তিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী বলিতে হইবে সেই মৃত্তিকা যাহার ভিতর কোন-না-কোন প্রকার জৈব পদার্থ মিশ্রিত থাকিবে সিলিকা-মিশ্র আকারে অর্থাৎ 'ডাইয়েটম' ভক্ষক (বা diatomaceous) মৃত্তিকা যাহাকে বিজ্ঞানের ভাষায় নাম দেওয়া হয় কিয়েসেলগুর (Kieselguhr)। এই মাটি অতি হালকা অথচ বালির ন্যায় সছিদ্র (porous) কতকটা খড়িমাটি অথবা বালির পিণ্ডের মতই গুণাগুণে। জলজ জীবাণু (বা diatoms) প্রভৃতির সহস্র সহস্র শ্রেণী ডাঙায় নিক্ষিপ্ত হইয়া সিলিকায় পরিণত হইয়া যে মাটির সহিত মিলিত হইয়া থাকে, সেই মাটিরই উপরোক্ত বিশিষ্টতা অর্জ্জন সম্ভব হয়। আবার কয়েক প্রকার মৃত্তিকা আছে, যাহা ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এই সকল মাটির অতি সরু দানা হয়, ওজনে বিশেষ ভারী হয় না, আর সর্ব্বদাই কাদাপানা দেখায়। ইহার কয়েকটি শ্রেণীতে লৌহ সাধারণত মিশ্রিত থাকে।

রুশিয়াতে কিছুকাল পূর্ব্বে কেহ রক্তবমন করিলে তাহাকে কতকটা মাটি খাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইত। অবশ্য এই বিশ্বাস বলবৎ ছিল সাধারণ লোকের ভিতর, বিশেষ করিয়া শ্রমিকদের মধ্যে। তাহারা মনে করিত মাতা বসুন্ধরা (mother earth) যাহা হইতে আমাদের শরীর গঠিত, তাহার ন্যায় উপকারী মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না; শিশুর নিকট যেমন মাতৃস্তন্য, মৃত্তিকাও তেমনি সকল মানুষের নিকট। ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিছু না থাকিলেও রুশিয়ানগণ এই মাটি খাওয়ার প্রথা বহুদিন অনুসরণ করিয়াছে।

আদিমকালের মানুষের পক্ষে তাহার চারিদিকের সব কিছুকে পরোখ করিয়া কোনটি আহারের উপযুক্ত নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা-ভক্ষণ একেবারেই অস্বাভাবিক নয়; কারণ প্রথমত মানুষ প্রকৃতিদত্ত এবং অনায়াসলভ্য পদার্থ-দ্বারাই ক্ষুধা নিবারণে চেষ্টিত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য বা বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কাজেই মাটি, কাদা, ভিজা-মাটি প্রভৃতি ভক্ষণ করা মানুষের পক্ষে লবণ, লঙ্কা, দারুচিনির ন্যায় বৃক্ষত্বক, পোকামাকড়, সাপ, বানর অথবা লতা-পাতা প্রভৃতির স্বাদ গ্রহণ করা অপেক্ষা কোন অংশেই অযৌক্তিক ব্যাপার নয়।

পুষ্টিকর সুস্বাদু আহার্য্য যাহা আমরা শত শত বৎসর যাবৎ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তাহার তুলনায় অবশ্য মাটি সমতুল্য বলকারক অথবা নির্ভরযোগ্য দৈনন্দিনের খাদ্যসামগ্রী বলিয়া কোন দেশেই ব্যবহৃত হয় নাই, আজিও হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—ইহাতে অজৈব পদার্থ মাত্রই রহিয়াছে এবং স্বভাবতই উহা জীর্ণ হইবার নহে। প্রাচীনকালে সখের-খাদ্যরূপে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে, যেমন মুখে সুগন্ধ আনিবার জন্য এখন বটিকা বিশেষ ব্যবহার করা হয়; এবং একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দুর্ভিক্ষের সময় সকল যুগে সকল দেশেই খাদ্যের অভাবে লোকে মাটি খাইয়াছে, এবং বর্ত্তমানেও দুর্ভিক্ষের নিপীড়নে দিশাহারা হইয়া মাটি খাইয়া থাকে। বস্তুত অনশনক্লিষ্ট নরনারী আর কিছু না পাইয়া যে মাটি খায়—তাহার প্রধান হেতু হইল, ইহা দ্বারা পাকস্থলী পূর্ণ হয় এবং ভরপেট খাওয়ার যে তৃপ্তি তাহার কিছুটা অন্তত অনুভব করে।

মৃত্তিকা মশলার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেও দেখা যায়, আহার্য্যে উহার সোঁদা গন্ধ আনয়ন করিবার জন্যও দেওয়া হয়, অবশ্য যে জাতির নিকট উহার গন্ধ তৃপ্তিকর, তাহাদের পক্ষেই ইহা সম্ভব। অনেক দেশে রুশিয়ার ন্যায় বিশেষ বিশেষ রোগে ইহার ব্যবস্থা আছে, আবার এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে মৃত্তিকাই প্রধান উপচার এবং তাহা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে আস্বাদন একেবারে পুণ্যাচরণের সেরা।

ইহাই হইল অবিকৃত মাটি-কাদার স্বাভাবিক ব্যবহার। ইহা ছাড়া মাটির পরিবর্ত্তিত রূপ বা পরোক্ষ ব্যবহারও রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া ঔষধরূপে। নির্দ্দিষ্ট কোনও রোগে অথবা ব্যাপক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে মাটির ব্যবস্থা রহিয়াছে—তবে অবিকৃত অবস্থায় নহে। যেমন আমাদের দেশে পাত-খোলা বা পোড়া মাটি খাইবার রেওয়াজ দেখা যায় কোন কোও রমণীমহলে।

কোনও সমগ্র জাতিতে কিম্বা সমগ্র দেশে কোনও কালেই আবশ্যিকভাবে মৃত্তিকা-ভক্ষণ (Geophagy) প্রচলিত ছিল না, এখনও নাই; কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে সারা পৃথিবী জুড়িয়াই মৃত্তিকা-ভক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা আবহাওয়া, জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, সংস্কৃতি-সূচক ভূভাগ—কোনও কিছুরই উপর নির্ভর করে না। উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র বলিয়াও কোন সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, যাহাদের ভিতর এই প্রথা প্রচলিত—সংস্কৃতির স্তরবিশেষকেও এ জন্য দায়ী করা যায় না—ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, ইহা শুধু রুচি ও পরম্পরার উপরই বরং নির্ভর করে বেশী। ইউরোপ আমেরিকার সুসভ্য জাতিদের অভিজাত-মহলে যেমন বিরল হইলেও ইহার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাইবে, তেমনই বন্য বর্ব্বরদের ভিতরেও দেখিতে পাওয়া যাইবে। হয়ত একই পরিবারের হইয়াও এক ব্যক্তি ইহা ভক্ষণ করে, কিন্তু পরিবারের অন্য সকলে ইহার দিকে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এমন কি মৃত্তিকা-ভক্ষণকারীকে তাহার ঐ বদভ্যাস পরিত্যাগ করিতেও উপদেশ দেয়। এককথায় বলিতে গেলে ইহার ব্যবহার নিতান্তই ব্যক্তিগত।

পাঞ্জাবে দেখা যায়, পোড়া মাটি বিস্কুটের মত নারীমহল ছাড়িয়া কোন কোন পুরুষদের নিকটও আকর্ষণীয় সামগ্রী বলিয়া গৃহীত হয়। সময়ে বড়লোকদেরও এ অভ্যাস দেখা যায়। কাজেই সেখানেও গরীবদের অভাবের সংসারে অপূর্ণ আহারের পরিপূরকমাত্র বলা যায় না।

স্থলে শ্রমিক কেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরাও সময়ে এই অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে। তখন চা বা মাদক দ্রব্যের মতই ইহা একটা নেশার স্থানে জুড়িয়া বসে। এইরূপে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের ভিতর পোড়া মাটি খাইবার প্রথা প্রবেশ করিয়াছে; ইহাতে হিন্দু, মুসলমান কিম্বা অন্য কোনও ধর্ম্ম অন্তরায় ঘটায় না। ব্যাপকভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের তালিকায় না পড়িলেও ভারতের কোন ধর্ম্মই ইহাকে নিষিদ্ধ খাদ্য বলিয়া অবধারিত করে নাই।

প্রত্যহ অত্যধিক পরিমাণ মৃত্তিকা-ভক্ষণ যে স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্তই অনিষ্টকর এবং দীর্ঘকাল সেবনে যে মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করিতে পারে, ইহা কাহারও কাহারও মত। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর কোনও চৈনিক লেখক পর্য্যন্ত একথা প্রচার করিয়া তাহার দেশবাসীকে এই বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। তবে সাধারণত যেমন স্বল্পমাত্রায় এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে দেখা যায়, তাহাতে প্রাণনাশের যে নিশ্চিত আশঙ্কা রহিয়াছে, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। নিয়মিত না খাইয়া মাঝে মাঝে খাইলে অথবা অন্য খাদ্যের সহিত নামমাত্র প্রক্ষেপে মৃত্তিকা মশলারূপে ব্যবহার করিলে অবশ্য তাহা হইতে কোন কোনও অনিষ্ট হইবার কথাও নয়।

ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেশ—এমন বিস্তৃত বলিয়াই এখানে স্থানে স্থানে যে মৃত্তিকা-খাদকের সংখ্যা পাওয়া যায়, একুনে তাহা অপর কোনও এক দেশ অপেক্ষা বেশী। এবং মৃত্তিকা-ভক্ষণের এমন দীর্ঘকালের ইতিহাস অন্য কোনও দেশে পাওয়া যাইবে না, সেই কারণেই ব্যক্তিবিশেষে উহা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া রমণীমহলে, এমনই মনে হয়; তবে বর্ত্তমান রমণী-সমাজে মৃত্তিকা-ভক্ষণের পূর্ব্ব-সমাদর আর নাই। পূর্ব্বের ন্যায় ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেও আর দেখা যায় না। তবে ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে মৃত্তিকা-ভক্ষণের ফলাফল সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সময় সময় পাওয়া যায়—তাহাতেও সামঞ্জস্য নাই কিছুমাত্র।

একটি অনুসন্ধানকারিণী পাশ্চাত্য মহিলা ভারতীয় নারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, যে-সকল নারী নিয়মিতও পোড়া মাটি ভক্ষণ করে, তাহারাও কোনও অস্বস্তি বা রোগ ঐ কারণে অনুভব করে না। অথচ মহীশূর হইতে অন্য এক ব্যক্তি জানাইতেছেন যে, যে নারী একবার মাটি খাওয়া অভ্যাস করে, সে কদাচিৎ তাহা ত্যাগ করিতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল মৃত্তিকা-সেবনের ফলে তাহাদের মৃত্যু হয়।

চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, মৃত্তিকা-খাদক ক্রিমি হইতে অহরহ কষ্টভোগ করিবেই। তবে মৃত্তিকা-ভক্ষণ দ্বারা সকল সময়েই ক্রিমি উৎপন্ন হয় কি-না, অথবা প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণের পরিণামফল স্বরূপে মাত্র উহার উদ্ভব—এই সমস্যা অদ্যাবধি মীমাংসিত হয় নাই। অধিকাংশ চিকিৎসকের মতে মৃত্তিকা-ভক্ষণ হইতে দুর্ব্বলতা এবং তৎসহ পাকাশয়িক অস্বস্তি বোধ হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা-ভক্ষণ প্রকাশ্যে কেহই করে না। যাহারা ইহাতে অভ্যস্ত, পাছে অপর কেহ উহা দেখিয়া নিন্দা করে, অথবা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করে, এই আশঙ্কায় তাহারা গোপনেই এই আহার সমাধা করে অধিকাংশ স্থলে। কাজেই অন্য খাদ্যের মত ইহা খাইতে দেখা যায় না বড় একটা। জিজ্ঞাসা করিলেও সহজে কেহ এই অভ্যাসের কথা স্বীকার করে না।

কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি মৃত্তিকা-ভক্ষণের যুক্তিস্বরূপে ইহাই উপস্থিত করেন যে, খাদ্যে ধাতব পদার্থের স্বল্পতা পরিপূরিত করিবার জন্য এই মাটি খাইবার ব্যবস্থা, হুবহু যে প্রয়োজনীয়তা হইতে লবণ গ্রহণ করা মানুষের অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই মতবাদ সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায় না। প্রথমত যে মৃত্তিকা মানুষে খায়, তাহাতে লবণ থাকে না, বা এত অল্প পরিমাণে থাকে যে, তাহাতে লবণ খাওয়ার উদ্দেশ্য, সাধিত হইতে পারে না কিছুতেই। দ্বিতীয়ত, উহাই যদি সত্য হইত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে, যে মুল্লুকে লবণের যত অভাব সে মুল্লুকের লোকেরাই মাটি খায় বেশী এবং দেশে লবণের আবিষ্কারের বা আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে মাটি খাওয়া বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু ইহা ত প্রকৃত অবস্থা নহে। কোনও স্থানেই নর-নারী নির্ব্বিশেষে সমানভাবে মাটি খায় না একটা সমগ্র জাতিতে কিম্বা এমন কি একটা পরিবারেও। অথচ লবণের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইলে সকলেরই সমান প্রয়োজন থাকিত। আবার এমনও দেখা যায় নাই যে, মাটি না খাওয়ায় কাহারও স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

আমেরিকার ইরোকুইয়োস জাতির নিকট লবণ খাদ্যরূপে পরিচিত ছিল না—কিন্তু তাহা বলিয়া লবণের পরিবর্ত্তে মাটি তাহারা ব্যবহার করে নাই। লতাপাতা দ্বারা লবণের কার্য্য সারিতে চাহিয়াছে।

কালিফোর্ণিয়ার পামা জাতি তাহাদের নিত্যকার খাদ্যের আটা-ময়দার সহিত মাটি মিশ্রিত করিয়া লয়। পাশ্চাত্যে এই সত্য প্রথমত বিশ্বাস করা হইত না। পোড়া মাটি মাঝে মধ্যে দু-একটু খাওয়া ভিন্ন কেহ যে নিয়মিতভাবে মাটিমিশান খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে—ইহা রূপকথার মতই শোনায়। কিন্তু যখন আবার জানা গেল যে, সুদূর সার্ডিনিয়ায় (সারা আমেরিকা মুল্লুকের বাহিরে) অনুরূপ প্রথা প্রচলিত, তখন সন্দেহ করিবার কিছুই রহিল না এই কারণে যে, আমেরিকার পামা জাতির সহিত সার্ডিনিয়াবাসীদের কোনও ঐতিহাসিক সংস্রব কাহারও বিদিত নয়, সম্ভবও নয়। সুতরাং এই অভ্যাস যে রুচি ও শরীর গঠনের উপর নির্ভর করে, একথা মানিতে হয়।

এই প্রকারে যখন শোনা যায় যে, হাজার হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুই সম্প্রদায় বা দুই দল লোক একইভাবে মাটিকে পছন্দ করে মশলারূপে ব্যবহার করিতে, কিম্বা পছন্দ করে উহার সুঘ্রাণ, অথবা শরীরের পক্ষে উপকারী বলিয়া মনে করে এবং আহারে তৃপ্তিকর অনুভব করে, তখন ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি না যে, দুই দল লোকই উন্মাদ এবং তাহাদের এইরূপ আচরণের পশ্চাতে কোনও শারীরিক সুফলই লক্ষিত হয় নাই।

ইউরোপ আমেরিকায় বালক-বালিকাদের ভিতর যে একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে মৃত্তিকা-বিশেষ আহার করিবার, এবং সমগ্র বিশ্বের এতগুলি লোকের এই যে

...রণ লোভ ইহার প্রতি, ইহাকে একটা দুর্দ্দম রোগ-লক্ষণ ... যায় না; বরং তাহাদের আহার্য্যের অসম্পূর্ণতাই বলিতে ...বে, অথবা খাদ্যে ধাতব উপাদানের স্বল্পতাও কতক ...মাণে দায়ী হইতে পারে। কোনও বিজ্ঞ চিকিৎসক ...য়াছেন যে, আমেরিকার এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া ...হ দুইবার করিয়া দুই চামচ শাদা বালি খাইত এবং ...ত ইহাতে তাহার শরীর ও মন দুই-ই সর্ব্বপ্রকারে সুস্থ ...কে। কিন্তু পরে তাহার অন্ত্রের সারকোমা (Sarcoma) ...গ উৎপন্ন হয় এবং অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু ...ল-ভক্ষণের জন্যই যে এই রোগ জন্মিয়াছে, এমন স্থির ...ধান্ত চিকিৎসক করিতে পারেন নাই।

যাহারা মাটিই আহার করে, তাহারা অবশ্য ইহার গুণ ...বন্ধে নানা অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ...গ্রহণযোগ্য নহে। উহার গুণ সম্বন্ধে বেশী কিছু ...ন উহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। ঠিক যেমন ...কিৎসক ভিন্ন অন্যাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কেন সে ...ণ খায় এবং কেন এক সময়ে কম ও এক সময়ে বেশী ...ণ খায়, তবে তাহার সঠিক উত্তর সে কিছুই দিতে পারে ...। তেমনি মাটি খাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া নানা প্রকার উত্তরই পাওয়া যায়। কেহ বলে মাটি খাওয়া তাহাদের পক্ষে বলকারক, পাকস্থলী ঠাণ্ডা রাখে এবং হজমশক্তি বাড়ায়। কেহ বলে তাহারা মাটি খায় শুধু উহার গন্ধ ও স্বাদের জন্য, কেন না দেখিলেই জিভে জল আসে এবং খাওয়ায় একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় চমৎকার। আবার কেহ উহার রং দেখিয়াই আকৃষ্ট হয়।

অনেক জাতি এমন দেখা যায় যাহারা প্রচুর পরিমাণে রঙিন বা শাদা মাটি ব্যবহার করে অঙ্গে লেপন করিতে, কিন্তু খাইতে অভ্যস্ত নয় একেবারেই। বিশেষ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে অথবা নিত্য পূজা-আহ্নিক করিবার যথাযোগ্য সাজ-সজ্জা রূপে।

মেক্সিকোতে প্রাচীনকালে কোনও পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে মৃত্তিকা-ভক্ষণ ছিল পুণ্য ব্রত। মলয় দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন জাতির ভিতর দেবতার উদ্দেশে ধরণা দেওয়া এবং উহা সার্থক করিবার জন্য মৃত্তিকা-ভক্ষণ এখনও প্রচলিত। ব্রহ্ম দেশের চিনদের ভিতরও অনুরূপ অনুষ্ঠান বর্ত্তমান। বার্ব্বাডোজ দ্বীপের নিগ্রোদের ভিতর শপথ পরিপূরণে মৃত্তিকা-ভক্ষণ রীতিতে পর্য্যবসিত।

চীন দেশে এই ধারণা বহুকাল প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, পূর্ব্বকথিত ডাইয়েটোমেসিয়াস্ মৃত্তিকার দৈবশক্তি রহিয়াছে এবং উহা জরামরণবর্জ্জিত দেবতা ও দানবদিগের খাদ্য। যদি কোথাও কোনও নর-নারী ঐ প্রকার মাটি হঠাৎ প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে তাহা মহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিত।*

* চিকাগোর ফিল্ড মিউজিয়াম অফ্ ন্যাচারেল হিস্টরী কর্ত্তৃক "Geophagy" প্রবন্ধ অবলম্বনে।

প্রান্তরের মাঝে

(২৪৬ পৃষ্ঠার পর)

আছে, বল! কিন্তু আর দেরী নয় ভাই, চল এখান থেকে...... কোন্ দিকে যাওয়া যায় বল ত?"

"জানি না......আমার কাছে সব দিকই সমান।"

"আমার কাছেও তাই, যেদিকে হোক্ গেলেই হ'ল। আচ্ছা চল, দক্ষিণ দিকেই যাওয়া যাক্—সমুদ্র আছে ওধারটায়।"

দক্ষিণ দিকেই আমরা চলিলাম।

পথের মাঝে আমি একবার ফিরিয়া চাহিলাম। কিছু-দূরে কৃষ্ণবর্ণ একটি ছোট স্তূপ প্রান্তরের উপর জাগিয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের কিরণজাল আপতিত হইয়াছে তাহার উপর।

"দেখছ বুঝি ও উঠে দাঁড়িয়েছে কি না? ভয় নেই, ও আমাদের পিছন পিছন ছুটে আসবে না। পণ্ডিত তার কাজে খুঁত রাখে নি......। হ্যাঁ, কমরেড বটে! বেশ খেলাই আমাদের সঙ্গে খেলে গেল! আর ভাই'—মানুষ দিন দিন কি খারাপই হ'য়ে যাচ্ছে! সৈনিক বিষণ্ণভাবে বলিল।

জনহীন, নিস্তব্ধ প্রান্তর বাল সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে বিধৌত করিয়া দূরদিগন্তে যেখানে আকাশের তটপ্রান্তে গিয়া মিশিয়াছে, সেখানকার দৃশ্য এমনিই গরিমাময় এবং প্রশান্ত যে প্রসন্ন নীল গগনের নীচে এই মুক্ত প্রান্তরের বিপুল বিস্তৃতির মাঝে সকল দুষ্কৃতি, সকল নির্ম্মমতার অনুষ্ঠান অস্থানোচিত ও অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়।

আমার সঙ্গী অত্যন্ত সুলভ মূল্যের কিছু তামাক হইতে একটি সিগারেট পাকাইয়া লইতে লইতে কহিল, "একটু ধূমপান করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"আজকে যে আমরা কোথায় থাকব, কি খাব, এ এক সমস্যা।"

হাসপাতালে আমার পাশের বিছানার লোকটি এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাহার গল্প শেষ করিল। তারপর সে কহিলঃ

"ঐ সৈনিকের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হ'য়ে গিছল। সে একজন নিঃসম্বল ভবঘুরে, সহৃদয়, আর খুব কাজের লোক। তার ওপর আমার খুব শ্রদ্ধা ছিল। আমরা এক-সঙ্গে এশিয়া-মাইনর পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি......"

"সেই ছুতোর-মিস্ত্রীর কথা কখন ভাব না?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"যা ভাবি সে ত তোমায় বললাম......"

"তার চেয়ে বেশী কিছু নয়?"

সে হাসিল।

"কি আর ভাবব? আমার এই অবস্থার জন্যে যেমন তোমাকে দায়ী করা যায় না, তেমনি তারও অপমৃত্যুর ব্যাপারে আমারও কিছুমাত্র দোষ নেই। কোন দুষ্কার্য্যের জন্যই কেহই দায়ী নয়, যদিও আমরা সবাই এক একটি পশু।"

মরু ও নির্ঝর

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

(১৯)

জ্যোৎস্না-বিধৌত তাজ দর্শন করে ফেরবার পথে চৈতালী কৌশিককে বললে,—'সত্যি এমনটি কিন্তু আর আমি কোন-দিনও দেখিনি! শাজাহান সত্যিই প্রেমের দেউলে সন্ন্যাসী ছিলেন! ভালবাসা যে কি তা সত্যিই শাজাহান জানতেন।'

তারপর অল্প একটু থেমে আবার বললে,—'আচ্ছা, সত্যি......লোকে যে বলে প্রকৃত ভালবাসা, সে শুধু বিলিয়েই খালাস, বিনিময়ে সে কিছুই চায় না...এটাও কি সত্যি?'

'সত্যিই তাই বোন!...ভালবাসার পিছনে যদি প্রতিদান কিছু পাবার বাসনাই রইল, তবে সে ভালবাসার মূল্য আর কতটুকুই বা রইল। তখন ত ভালবাসা হ'ল সেই বাসনারই একটা বাহ্যিক আবরণ মাত্র!...সে যেন নেহাৎই বাজারের পণ্য—মূল্য দিয়ে কেনবার সামগ্রী।'

বাড়ীতে ফিরে কৌশিক দেখলে কলকাতা হ'তে ছুটির দর-খাস্ত মঞ্জুর হয়ে এসেছে। কাগজটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে যমুনার দিকে চেয়ে কৌশিক বললে, 'তোমার মনের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল যমুনা!...ছুটি মিলেছে! এই নাও!'

'ভালই হ'ল তোমার শরীর যেমন দিন দিন খারাপ হ'চ্ছে আর দিন কতক এখানে কাটালে যদি একটু উন্নতি হয়!—

স্ত্রীর কথায় স্নিগ্ধ স্বরে কৌশিক বললে, 'ওটা তোমার মনের ভ্রান্ত একটা ধারণা মাত্র যমুনা, কেননা তুমি জান, দেহ আমার সুস্থই; সেখানে এতটুকু রোগও নেই! মিথ্যে এ দেহটাকে টানাটানি করে শুধু একে শ্রান্তই করে তোলা হবে।'

'রোগ যে তোমার দেহে নয় মনে তা আমিও জানি গো জানি! কিন্তু আমার প্রতিও ত তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে!'—শেষের দিকে যমুনার স্বর অশ্রুভারে রুদ্ধ হয়ে এল।

'এ কথা কেন তুমি বলছ যমুনা?...'

'কিসের জন্য এমনি করে নিজেকে তুমি ক্ষয় করছ শুনি?...যে তোমার মান-সম্ভ্রম দু-পায়ে দলে অনায়াসে চলে যেতে পারলে, তার জন্য আবার ক্ষোভ কিসের!—'

'ও কথা থাক যমুনা! এখন তার স্মৃতিটুকুই মাত্র অব-শিষ্ট আছে তাই থাক!—'

কৌশিক যেন কতকটা দ্রুতপদেই ঘর হতে বের হয়ে গেল! তার ক্রম-অপসৃয়মান দেহের দিকে তাকিয়ে যমুনার দুই চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল।

পরের দিন কৌশিকের দুটি পা ধরে যমুনা কেঁদে ফেললে, 'আমি তোমার পায়ে এমন কি অপরাধ করেছি যে, তুমি এমনি করে আমার কাছ হতে দূরে দূরে সরে যাচ্ছ?...'

গভীর স্নেহে পায়ের তল হতে যমুনাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কৌশিক বললে, 'ছি ছি তুমি কি পাগল হলে যমুনা?...আমি বুঝতে পেরেছি অন্যায় আমারই, আমায় তুমি ক্ষমা কর!...'

যমুনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কৌশিকের বুকের মাঝে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। এতদিনকার অবরুদ্ধ অভিমান সহসা আজ মুক্তির পথ পেয়ে শত ধারায় বইতে লাগল! কৌশিক শুধু নিবিড় স্নেহে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাতে লাগল। 'চুপ কর; চুপ কর যমুনা!...'

ঊর্ম্মিলার গৃহত্যাগের পর হতে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে অদৃশ্যভাবে দ্বন্দ্বের যে প্রাচীর গড়ে উঠছিল, আজ তা চোখের জলে আবার সমতল হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে যমুনা শান্ত হল!

পরের দিন চৈতালী এসেছিল কৌশিকদের ওখানে বেড়াতে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে কৌশিক পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে, চেয়ারের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান চৈতালীকে দুই হাতে বেষ্টন করে ওর সঙ্গে গল্প করছিল।

'ছুটিটা তা'হলে এইখানেই থাকবেন ত' দাদা?—'

'হ্যাঁ!...আর এক মাসের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে ইচ্ছা করে না, আরও আমার চৈতী বোনটি যখন এখানে রয়েছে! কিন্তু ছুটি না-মঞ্জুর হলেই ভাল হত, এইভাবে কর্ম্মহীন জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে!'

'আমার কিন্তু কাজ হতে ছুটিই বেশী ভাল লাগে, তেমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন নেই; ইচ্ছা মতন যা খুশী তাই করা যায়!—'

'অনেকটা তাই বটে, তবু ঐ একটানা বিশ্রামের ভিতর কেমন যেন একটা মৃত্যুর মতই জড়তা আছে!...'

আরও দু-একটা কথার পর কৌশিক বললে, 'অনেক দিন তোমার গান শুনি না চৈতী, একটা গান গাও!—'

চৈতী গাইলে,—

'বৈরাগ যোগ কঠিন উধ
হাম্ না করা বাহো!—'

গান শেষ হলে কৌশিক বললে, 'তবে কেন তুমি যৌবনে যোগিনী সেজেছ চৈতী?'

চৈতালী কৌশিকের কথায় হেসে ফেললে, বড় ম্রিয়মাণ, বড় ব্যথার সে হাসিটুকু!

'বৈরাগ যোগ বড়ই কঠিন দাদা!...ও আমি চাইও না ও আমি পারবও না। আমি সংসারের মাঝেই আমার সকল আপনার জনকে নিয়ে থাকতে চাই! আমি তাদের সুখে হাসতে চাই....আবার তাদের দুঃখে তাদের হয়েই কাঁদতে চাই!'

'তাই যদি কাঁদবি বোন, তবে তার আয়োজন কই ভাই?—'

'কেন দাদা সবই ত আমার আছে; তোমার মত দাদা আছে, বৌদি আছে, টু টু বংশী আছে, তবে আমার অভাব কোথায়! সত্যিই দুঃখ আমার হয়েছিল দাদা যখন প্রথম জানতে পারলাম, সে আমার ফেলে পালিয়েছে। অভিমানের সেদিন আমার অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ আমার দুঃখও নেই, অভিমানও নেই। বাইরের বাঁধনে তাকে বাঁধতে চেয়ে-

...লাম তাই সে পালিয়ে গেল, আজ সে অন্তরে আমার বাঁধা ...ড়েছে। আজ সে আমার! এবং শুধু একা আমারই!—'

'তোমার জীবনটা যে এমনি করে সে ব্যর্থ করে দিয়ে গেল, ...র জন্যও কি সে দোষী নয়?'

'আমরা সংসারের স্থূল দিকটা এবং তার সঙ্গে ...শ্লিষ্ট সুখ দুঃখ নিয়েই টানাটানি করে মরি; এবং ...তিনিয়ত আমাদের নালিশেরও অন্ত থাকে না! কিন্তু ...র যে আরও একটা দিক আছে, তা আমাদের ...জরেই আসে না! দুঃখকে দুঃখ বলে আমরা কাঁদি বলেই ত ...ঃখটা আমাদের আরও আঁকড়ে ধরে। কিন্তু সুখই বল আর ...ঃখই বল সবই কি আমাদের মনগড়া নয়! যে জিনিষটা ...নিত্য তার জন্য কেন আমরা হা-হুতাশ করি বলত, যেটা ...ল ছিল না, আজ আছে আবার হয়ত কাল থাকবে না তার-...ন্য শোক আর যারই হোক বুদ্ধিমানের শোভা পায় না!'

দুহাতে চৈতীকে বুকের কাছে টেনে এনে কৌশিক বললে, '... দিকটা ত' কোনদিনই এমন করে আমার চোখে পড়েনি ...দি!...তোমায় পেয়ে তোমার কথা শুনে আজ মনে হচ্ছে নিজেকে এতদিন কি এক মহাভুলের মাঝেই টেনে নিয়ে বেড়িয়েছি!—'

সহসা নতজানু হ'য়ে কৌশিকের পায়ের ধুলো নিয়ে গভীর স্বরে চৈতালী বললে,...'আমাকে তুমি তোমার ঊর্ম্মিলাই মনে কর দাদা!—' চৈতালী ধীর পদবিক্ষেপে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল। আর কৌশিক চেয়ার হ'তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বারে বারে চোখের জলে এই কথাটাই বলতে লাগল, ঊর্ম্মিলার জন্য আর আমার কোন দুঃখ নেই। এই শুধু প্রার্থনা করি তার দুঃখই যেন তার মুক্তির পথ করে দেয়!— আর আমার অভিমান নেই, আর আমার ক্ষোভ নেই!...

সে রাত্রে বহুদিন বাদে কৌশিক গভীরভাবে নিদ্রা গেল!

(২০)

প্রভাতে সিদ্ধার্থ দুই হাতে এসে ঊর্ম্মিলাকে জড়িয়ে ধরলে।

পুত্রের মাথায় একখানি হাত রেখে ঊর্ম্মিলা ছেলেকে শুধাল, 'কি হ'য়েছে?'

'রাত্রে একা একা ওঘরে শুতে আমার বড় ভয় হয় মণি!—'

'ভয়!...কিসের ভয়!...এই ঘরেই ত' আমরা থাকি!— তুমি ত ভীতু নও, ভয় কি তোমার করা সাজে?...পৃথিবীতে বড় হয়ে কত কাজ তোমায় করতে হবে,...সে সব কত কঠিন, কত শক্ত। কানাইলালের কথা ভুলে গেছ? সে রাত্রে একা একা শ্মশানে গেছ্‌ল! এ পৃথিবীতে যত সব মিথ্যা!... ভুল আছে, তা থেকেই ত' তোমারই আবার নূতন করে তৈরী করতে হবে,...সেই তুমি একা একা শুতে ভয় পাও, লোকে শুনলে বলবে কি ছি!—'

মাতা ও পুত্রের কথার মাঝে কেশর ঘরে এসে প্রবেশ করলে; একবার সিদ্ধার্থ ও একবার ঊর্ম্মিলার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধাল, 'কি বলছে ও?'

পুত্রের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ঊর্ম্মিলা বললে, 'ওর একা একা ও ঘরে শুতে ভয় করে!...'

কেশর বলতে যাচ্ছিল, ভয় ত করবেই! কতই বা বয়স, মাত্র ছয় বৎসর ত', ওর কি দোষ! কিন্তু ঊর্ম্মিলার মুখের দিকে চেয়ে ও চুপ করে গেল।

সিদ্ধার্থ ঘর ছেড়ে চলে গেল। ছয় বৎসরের ছেলে কি বুঝল তা সেই জানে, তবে এইটুকু সে জেনে গেল, তার ভয় হওয়া উচিত নয়!—

অনেক দিন হতেই কেশর লক্ষ্য করছিল, ঊর্ম্মিলার দেহে ভাঙ্গন ধরেছে! জলাভাবে দারুণ গ্রীষ্মে যেমন লতা শুকিয়ে যায়, ঊর্ম্মিলাও তেমনি যেন দিনের পর দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল।

ডাক্তার এল, ঔষধপত্রেরও ব্যবস্থা হ'ল; কিন্তু ঊর্ম্মিলার কোন উন্নতিই দেখা গেল না!

কেশর মনে মনে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগল!

ঊর্ম্মিলার দিকে আজকাল যেন আর তাকান যায় না। ঊর্ম্মিলার সারা দেহ ব্যেপে যেন এক গৌরিক আভা নেমে এল!

ঊর্ম্মিলার দিকে চাইলেই কেশরের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে।

কেশর ঊর্ম্মিলাকে একদিন বললে, 'জানি তুমি চলে যাবে,...কিন্তু কেন যে তুমি এমনি করে তোমার অপমৃত্যু ঘটালে, তা তুমিই জান!—কেনই বা তুমি এলে, আবার কেনই বা এমনি করে চলে যাচ্ছ তা তুমিই জান।'

'আশীর্ব্বাদ কর কেশর, সেদিন যেন আমার সত্যিই এসে থাকে!—আর এ মিথ্যে বোঝা টেনে নিয়ে বেড়াতে আমি পারছি না!—'

কেশর ঊর্ম্মিলার কাছ হতে পালিয়ে গেল।

সত্যি সত্যিই ঊর্ম্মিলার দিন শেষ হয়ে এসেছিল।

কেশর ঠিকই অনুমান করেছিল, সে তার অপমৃত্যু নিজেই টেনে আনছিল। নিশিদিন ভিতরে ভিতরে যে ক্ষয়ের উগ্র বাসনা—সেইটাই হয়েছিল তার কারণ! ক্রমে চলৎশক্তিহীন হয়ে ঊর্ম্মিলা শয্যায় আশ্রয় নিল।

যে সন্তানকে ও চিরদিন নিষ্ঠুরভাবে দূরেই ঠেলে দিয়ে এসেছে, আজ যেন মৃত্যু মুহূর্ত্তে ও সেই সন্তানকেই নিবিড় স্নেহে দুহাতে নিজের বক্ষে টেনে আনতে চাইছিল।

তার বিফল মাতৃত্ব আজ মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়ে যেন বিফলতার বেদনায় অহরহ জর্জ্জরিত হতে লাগল!

প্রায়ই ও ছেলেকে নিজের শয্যার পাশটিতে ডেকে আনত!...

নির্নিমেষ নয়নে ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে! এলোমেলো কত কথাই যে বলে ঐটুকু ছেলের সঙ্গে!

যে বাসনার ও একদিন নিজ হাতে গলা টিপে অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল, আজ সেই অতৃপ্ত বাসনার ছায়াই তার ওর সমগ্র অন্তরাকাশ আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। ও তিলে তিলে পলে পলে, সন্তানকে বুকের কাছটিতে টেনে আনতে লাগল।

কেশর সবই দেখল, সবই বুঝল; এবং যেদিন নিজ হাতে ঊর্ম্মিলা একান্ত নিষ্ঠুরের মতই ছেলেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, সেদিন যেমন নীরবেই ছিল, একটি কথাও বলেনি, আজও

তেমনি নীরবেই রইল, একটি কথাও বললে না; শুধু আড়ালে গিয়ে অশ্রু গোপন করলে। এবং কেশরেরই চোখের সামনে দিনের পর দিন ঊর্ম্মিলার বুভুক্ষিত মাতৃত্ব সন্তান স্নেহের প্রাচুর্য্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল। কেশর ক্রমেই ভীত হয়ে পড়তে লাগল, ঊর্ম্মিলার বেগবান মনের ধারার শেষটুকু ভেবে!...যে জিনিষ এতদিন বাঁধা পথে চলে আসছিল, সহসা আজ যদি সে অন্য পথে চলতে আরম্ভ করে, তবে তার সমাপ্তি যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা কে জানে?...

ক্রমে এমন হ'ল যে, একটি মুহূর্ত্ত ছেলেকে না দেখলে ঊর্ম্মিলা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠত, বলত, 'খোকা! খোকা কই, খোকাকে ডাক; তাকে ডেকে দাও!' ছেলেও যে জিনিষের আস্বাদ এতদিন পায়নি আজ তার প্রাচুর্য্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছিল। একটি মুহূর্ত্তও সে ঐ শয্যাটির পাশ ছেড়ে নড়তে চাইত না!

বিকালের দিকে মেঘে মেঘে আকাশ গেছল ছেয়ে, মায়ের বুকের কোলটিতে শুয়ে সিদ্ধার্থ ঊর্ম্মিলার সঙ্গে গল্প করছিল, আর ঊর্ম্মিলা গভীর স্নেহে পুত্রের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

'আচ্ছা মণি; আমার যে মা তাকে তুমি দেখেছ?—'

'হ্যাঁ বাবা দেখেছি বৈকি!—'

'আমাকে সে খুব ভালবাসত না?—'

'হ্যাঁ বাবা! সে যে তোমার মা?—'

'তোমার চাইতেও, বাপীর চাইতেও!—'

'হ্যাঁ বাবা আমার চাই'তেও...'বিপুল আবেগে ঊর্ম্মিলা সন্তানকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে কান্নার ভারে ভেঙ্গে পড়ল!

চোখের জল ছোট ছোট হাত দুটি দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে ছেলে বললে, 'কে'দ না মণি! কে'দ না!...আর আমার মার কথা তোমার কাছে বলব না!—'

ঊর্ম্মিলার ক্রন্দনের বেগ আরও বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠল!

রাত্রি আর বড় বেশী নেই!...........

কেশরের হাতদুটি ধরে ঊর্ম্মিলা বললে, 'এ জীবন আমার শেষ হ'ল কেশর!...আর অবশিষ্ট কিছুই নেই!...এ জন্মের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে আমি যাচ্ছি, আসছে জন্মে যেন তোমায় পুরাপুরিভাবেই পাই, এমনি করে যেন অপূর্ণতার ব্যথা আর না ভোগ করতে হয়!—যা কিছু আমার পাপ! যত কিছু আমার কলঙ্ক এ জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সবই শেষ হয়ে যায়, কিছুই যেন অবশিষ্ট না থাকে! যদি কোন দিন দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয় তবে তাকে বলো, ঊর্ম্মিলার দুঃখের শেষ হয়েছে। তবে মনের সকল দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। ঊর্ম্মিলার জন্য যেন সে আর দুঃখ না করে, অশ্রু যেন না ফেলে! আর তোমায় কি বলব কেশর! তোমায় বলবার আমার কিছুই আর নেই! আমি জানি কিছুই তোমায় আমি দিতে পারিনি!...তোমার প্রতি আমার দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব কোনদিনও কাটল না! যাবার বেলায় তোমায় আর আমি অপমান করব না কেশর...পার ত আমায় ভলবার চেষ্টা করো!...আর দাদাকে একটা সংবাদ দিও, তাকে জানিও তুমি আমার বিবাহিত স্বামী!...আমাদের মধ্যে কোন পাপ নেই!...'

একবার ইচ্ছা হ'ল কেশর বলে, আজ তুমিই যখন চললে জানাবার মত প্রয়োজনও ত' সব সেইখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে!

ঊর্ম্মিলার দুই চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল!...

কেশরেরও চোখের কোল বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

'তুমি কাঁদছ কেশর?...কে'দ না?...আমার ছেলে রইল ওকে দে'খ!—'ওকে গড়ে তু'ল তোমার মত করে!...ও আমার ছেলে, এ দুঃখ যেন ওকে কোনদিনও না পেতে হয়!...'

একটু থেমে আবার বললে 'খোকাকে ডাক, কেশর!—'

* * *

গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, কেশর ঊর্ম্মিলার ছেলের শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল।

গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে, 'খোকা! খোকা!...'

সিদ্ধার্থের ঘুম ভেঙ্গে গেল, 'কে বাপী!—'

'হ্যাঁ বাবা চল, তোমার মা তোমায় ডাকছেন,...তার কাছে চল!'

'আমার মা?—কোথায় বাপি?—'

'ওই ঘরে চল!—'

কেশরের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থ এসে ঊর্ম্মিলার শয়নকক্ষে প্রবেশ করল।

'কই বাপি? আমার মা?—'

'ঐ যে তোমার মা বাবা!...যাও মার কাছে যাও,—'কেশর ঊর্ম্মিলাকে দেখিয়ে দিলে।

সিদ্ধার্থ যেন বিস্মিতই হয়ে গেছে;...ঐ তার মা?...

'যাও বাবা মার কাছে যাও!—'

সিদ্ধার্থ এগিয়ে গেল।

ঊর্ম্মিলা ভাঙ্গা গলায় ডাকলে, 'খোকা?—'

'মাকে চুমু দাও একটা বাবা?—'

ছোট ছোট হাতদুটি দিয়ে ঊর্ম্মিলার গলাটি আঁকড়ে তার তপ্ত ললাটে একটি গভীর চুম্বন এ'কে দিল!

বড় বড় দুটি অশ্রুর ফোঁটা ঊর্ম্মিলার চোখের কোল দুটি বেয়ে নেমে এল। 'কই মাকে ডাকলে না খোকা?—' সিদ্ধার্থ ডাকলে, 'মা?—'ঊর্ম্মিলার অক্ষম দুর্ব্বল দুটি হাত কাঁপতে কাঁপতে খোকাকে বুকের কাছে টেনে নিল!

গভীর স্নেহে ঊর্ম্মিলার মৃত্যু-শীতল কপালের উপর একটি প্রগাঢ় চুম্বন দিয়ে ধীরে ধীরে একটা ভারী চাদরে কেশর ঊর্ম্মিলার আপাদ মস্তক ঢেকে দিল।

খোকা শুধালে, 'মাকে ঢেকে দিলে কেন বাপি?—'

রুদ্ধস্বরে কেশর জবাব দিল 'তোমার মা ঘুমাচ্ছে!...'

তারপর ধীরে ধীরে সিদ্ধার্থের হাত ধরে ঘর হতে বেরিয়ে এল!...

অতি সন্তর্পণে দরজাটি পিছন হতে ভেজিয়ে দিল।

—শেষ—

ঘোড়ার আশ্চর্য্য ক্ষমতা

ঘোড়াটির নাম কিট্—ইহার মালিক গ্লষ্টারশায়ারের এশচার্চ্চের স্নো-ফার্ম্মের স্বত্বাধিকারী মিঃ ওয়ার্নার। তাঁহার ডেয়ারী আছে; প্রত্যহ বাড়ী বাড়ী দুধের পাত্র বিলি করিতে হয়। কিট গাড়ী বোঝাই দুধের পাত্র টানিয়া লইয়া যায় এবং কোন্ কোন্ বাড়ীতে বিলি করিতে হইবে, তাহা উহার চেনা আছে বলিয়া প্রতি বাড়ীর ফটকে যাইয়া থামে। সঙ্গে কোন লোক থাকিবার দরকার হয় না। গাড়ীতে দুধ বোঝাই দিয়া ঘোড়াটিকে গাড়ীতে জুতিয়া মালিক ছাড়িয়া দেয়, কোনও

রাস্তায় যখনই ভীড় বেশী হয় এবং দ্রুতবেগে লরী আসিতে থাকে, ঘোড়াটা এমন হিসাব করিয়া রাস্তার মাঝে দুধের গাড়ী লইয়া থামিয়া থাকে যেন কোনও লরীর সঙ্গে সংঘর্ষ না হয়; এ পর্য্যন্ত উহার পাঁচ বৎসরের চাকুরীতে সে কখনও কোনও প্রকার দুর্ঘটনায় পতিত হয় নাই

গাড়ীতে দুধের পাত্র সব বোঝাই করা হইল কি-না—ঘাড় বাঁকাইয়া তাহাই লক্ষ্য করিতেছে; বোঝাই হইলেই বিলি করিবার জন্য চলিতে সুরু করিবে

গাড়োয়ান ব্যতীত ঘোড়া নিজে নিজেই গাড়ী টানিয়া ডেয়ারীর দুধ বিলি করে।

রাস্তায় কি ভাবে চলিতে হয় তাহা কিটের বেশ জানা আছে। সাইন পোষ্টের আলোর নির্দ্দেশে কখন থামিতে হয়, কখন চলিতে হয়, তাহাও শিখিয়া লইয়াছে। রাস্তায় এত ভিড়ের ভিতরও কোন দিন সে দুর্ঘটনায় পড়ে না। কোন্ সময়ে কি ভাবে রাস্তা পার হইতে হয়, তাহার কৌশল সে আশ্চর্য্য রকম আয়ত্ত করিয়াছে।

মিঃ ওয়ার্নার বলেন—ঘোড়াটি আমার অনেক সময় ও শ্রম বাঁচাইয়া দিয়াছে। গাড়ীর চালক রাখিবার ব্যয় হইতেও আমায় রেহাই দিয়াছে। উহার একবারের বোঝা বিলি শেষ হইলে, গাড়ীখানি লইয়া বামদিকের ফুটপাথ ঘেঁসিয়া গাড়ীর আশ্রয় স্থলে অপেক্ষা করে। পুনরায় মোটর-লরী যাইয়া উহাকে দ্বিতীয় বারের দুধপাত্র দিয়া আসে। তাহা বিলি করিয়া এবং ক্রেতাদের খালি দুধপাত্র লইয়া ডেয়ারীতে ফিরিয়া আসে।

ভূতপূর্ব্ব রক্ষীর জংগী-আবহাওয়া

সাইরিল রিডলি শিল্ড (৫৬), ঠিকানা আলবালি ষ্ট্রীট, সেণ্ট প্যাঙ্করাস—পুলিশ-আদালতে অভিযুক্ত হয়। অভিযোগ, সে—ইংলণ্ডের যত প্রকার ফৌজ আছে, তাহাদের একটি করিয়া পোষাক (uniform) সংগ্রহ করিয়া আপন কক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। সে বলে, পোষাকগুলি কিনিয়াছে বন্ধু-সৈনিকদের নিকট হইতে। কিন্তু এই সকল সরকারী পোষাক রাখা যে বে-আইনী, তাহা সে জানে না।

পুলিশ বলে, এ লোকটির মস্তিষ্ক বিকৃত নয়। ঐ পোষাক পরিধান করিয়া কাহাকেও প্রতারণা করার কোন ঘটনাও পুলিশের জানা নাই। সে চিরজীবন তকমা-আঁটা পোষাকে রহিয়াছে; বোধ হয় এখন সেই আবহাওয়া হইতে বিচ্যুত হইয়া সে অভাব অনুভব করে, তাহারই জন্য এই সংগ্রাম।

১০ পাউণ্ড ১৩ শিলিং জরিমানা দিয়া শিল্ড অব্যাহতি পাইয়াছে।

প্রণয়ীর উদ্ধারে জীবন-পণ

গুস্তেফ্ কেলারম্যান নামক এক জার্ম্মান তরুণ মিস মিলড্রেড ব্যাটেন নাম্নী এক ইংরেজ-তরুণী [illegible] হয়, যখন ফরাসীদেশের তরফ হইতে গোয়েন্দার কার্য্যে

মিলড্রেড জার্ম্মানীতে যায়। তাহাদের বাগ্দান হয় এবং বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া আইনানুযায়ী নোটিশ পেশ করা হয়।

সহসা নাজি-পুলিশের হস্তে গ্রেফতার হয়—অভিযোগ, কোনও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত গোপন-সন্ধানীকে সাহায্য-দান। বার্লিনের মোয়বিট কয়েদখানায় তাহাকে আবদ্ধ রাখা হয়। তাহার দণ্ড যে চরম হইবে ইহা ত অবধারিত। নাজি-দপ্তরের আদেশে প্রাণদণ্ডের দিনও স্থির হয়।

কিন্তু প্রাণদণ্ড-দানের পূর্ব্বদিন তিনটি লোক—দুইটি 'জেস্তাপো'-পোষাকে এবং একজন অফিসারের বিশিষ্ট সাজে—আসিয়া জেলখানায় দণ্ডিত কেলারম্যানকে লইয়া যাইবার শিল-মোহরাঙ্কিত আদেশ-পত্র উপস্থিত করিল—পিওপলস ট্রিবিউন্যালের প্রেসিডেন্টের সহিত ইহার একবার শেষ-সাক্ষাৎ প্রয়োজন বলিয়া।

'জেস্তাপো'-পোষাকের লোক দুইটি কয়েদীকে হাতকড়ি পরাইয়া সতর্কতার সহিত লইয়া চলিল। অফিসার বলিয়া গেল, সন্ধ্যায় কয়েদীকে ফিরাইয়া দিয়া যাইবে। জেলখানার গবর্ণরের ইহাতে স্বীকৃত না হইয়া উপায় নাই, কারণ উপরওয়ালার আদেশ।

কিন্তু সন্ধ্যার পরও যখন কয়েদী ফিরিল না, তখন তাহাদের সন্দেহ হয়। তাহারা ট্রিবিউন্যালে ফোন করে। সেখান হইতে জবাব দেওয়া হয়—এখানে কোন কয়েদী নাই, আর এমন কোন আদেশও দেওয়া হয় নাই।

তখন জেলখানার সকলের সন্দেহ হয় অফিসারটি পুরুষ নহে, হাবভাবে যেন রমণীই বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

গোয়েন্দা পুলিশ সন্দেহ করে ঐটি আর কেহ নহে কেলারম্যানের প্রণয়িনী ইংরেজ-মহিলা মিস মিলড্রেড ব্যাটেন। এখন নাজি-পুলিশ এই চারিজনের সন্ধানেই ফিরিতেছে।

এপেণ্ডিসাইটিস দমনে তাড়ি

কলম্বো জেনারেল হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সার্জ্জন ডাঃ এস সি পাল টিনেভেলি ডিষ্ট্রিক্ট মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের বিশেষ সভায় বক্তৃতাদানকালে এপেণ্ডিসাইটিস রোগ সম্বন্ধে বলেন যে, তাঁহার অভিজ্ঞতায় তিনি জানিতে পারিয়াছেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে টাটকা তাড়ি ব্যবহার করিলে এই রোগ আরোগ্য করা যায়। সুতরাং এই বিষয় লইয়া গবেষণা হওয়া উচিত। তাঁহার বিশ্বাস তাড়ির যে ফেনা বা গাঁজলা (yeast) থাকে, তাহাতে ভিটামিন 'বি' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাতে রোগীর দেহে প্রতিরোধ-শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং এই জন্য এইপ্রকার আরোগ্য সম্ভব হয়।

পৃথিবীর প্রখরতম আলোক

চিকাগো শহরের কলগেট-পামলিভ-পিট বিল্ডিং-য়ের শীর্ষদেশে যে আলোকটি স্থাপিত, উহা ২০ লক্ষ বাতি-শক্তির প্রতীক। সাধারণত এই বাতিটি সর্ব্বদা ঘূর্ণ্যমান থাকে, কিন্তু অধুনা এই উচ্চ-শক্তিতে উন্নীত করিবার পর পরীক্ষার জন্য উহাকে স্থিতিশীল করা হয়। একটি উড়োজাহাজ দ্বারা বাতিটির আলোক-শক্তি পরীক্ষা করা হয়। চিকাগো শহর হইতে ১৭ মাইল দূরে যখন উড়োজাহাজখানি ছিল, সেই সময় উহার আরোহিগণ এই বাতির আলোকে উড়োজাহাজে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে সক্ষম হইয়াছে। উড়োজাহাজের পাইলটগণ বলিয়া থাকে যে, সাধারণত ১০০ মাইল দূর হইতে এই আলোকটি দেখিতে পাওয়া যায়। এবং সময়ে কোন কোন পাইলট ১৪০ মাইল দূর হইতেও এই আলোক পরিষ্কার দেখিতে পাইয়াছে। আলোকটির এক গজের ভিতর চতুর্দ্দিকে এমন শক্তিশালী আলোক বিচ্ছুরিত হয়, যাহা পৃথিবীতে পতিত দ্বিপ্রহরের সূর্য্যালোক অপেক্ষা ২০,০০০ গুণ অধিক উজ্জ্বল। আর পূর্ণিমার চন্দ্রের উজ্জ্বলতার আটশত কোটি গুণ।

ইংলণ্ডের আতঙ্কের সপ্তাহ

ইংলণ্ডের খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কিত দুইটি প্রতিষ্ঠান অতি-দ্রুত দেশের ১৫০০ খাদ্য-সমিতি ও আমদানী-রপ্তানী কারক প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্মেলনে একত্রিত হইয়া খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। যদি চেক সমস্যা লইয়া মহাসমরের উদয় হইত তাহা হইলে তাহারা পিছনে পড়িয়া থাকিত না। পাঁচ কোটি 'ফরম' এবং 'রেশন কার্ড' বিলির জন্য প্রস্তুত করাও ছিল।

ইংলণ্ডের বহুলোক একেবারে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মহাসমর আর এড়ান গেল না। বিশেষত উইমেন্স্ অক্জিলিয়ারি টেরিটোরিয়েল সার্ভিস নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় উহাদের আতঙ্ক বর্দ্ধিত হয়। কারণ, নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, শান্তি সময়ে এই প্রতিষ্ঠান টেরিটোরিয়েল এসোসিয়েশনের ন্যায় পরিচালিত হইবে এবং সমর আসন্ন হইলে উহাদিগকে পুরোপুরি বেতন দেওয়া হইবে।

আতঙ্ক এতটা প্রসার লাভ করে যে, অসংখ্য পরিবার তাহাদের পল্লীগ্রামের আবাসের বোমা-নিরোধক কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর একদল খাদ্য-সামগ্রীর অভাব-অনটনের আশঙ্কায় প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করিতে থাকে। আবার অনেক হুঁসিয়ার লোক টিনে-পোরা খাদ্য এবং যে সকল জিনিষ দীর্ঘকাল টাট্কা রাখা যায়, সেই জাতীয় খাদ্য-সামগ্রী কিনিয়া কিনিয়া পুঞ্জ করে। দোকানদারদের সহিত চুক্তি থাকে, ব্যবহারে না লাগিলে সপ্তাহ মধ্যে ফেরত দিয়া মূল্য ফেরত লওয়া হইবে।

লণ্ডন শহরের সীমার ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ডেভন, কর্ণওয়াল পর্য্যন্ত অঞ্চলের বাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া মাত্র তাহা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কোন কোনও স্থলে বিক্রয়ের মূল্য দেওয়া হইয়া গিয়াছে। কোনও স্থলে আবার চেক দেওয়ার পর ব্যাঙ্ককে চেকের টাকা অর্পণ না করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, অনেকে বায়না-পত্র বাতিল করিয়াছে, অনেকে ক্ষতিপূরণ দিয়া এখন লেন-দেন বন্ধ করিতেছে।

রেস্তোঁরা, হোটেলসমূহের চার্জ্জ দ্বিগুণ বাড়িয়া যায় মফঃস্বলের শহরে। ডেভনশায়ারে জনপ্রতি সপ্তাহে খাওয়া-থাকার চার্জ্জ ১৫ গিনি পর্য্যন্ত চাওয়া হইয়াছে। পাঁচ কামরার বাড়ীর সপ্তাহে সাত হইতে দশ গিনি পর্য্যন্ত ভাড়া দাবী করা হইয়াছে।

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩

সময় বেশ দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল।

মাণিক আপন আশ্চর্য্য মেধা বলে ক্লাসের পর ক্লাস অতিক্রম করিয়া এইবার প্রবেশিকা দিবে। স্কুলের মধ্যে সে ভাল ছেলে আখ্যা পাইয়াছে এবং পড়াতেও সে সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে।

মধ্যে মহামায়ার দূর সম্পর্কিত এক ননদ আসিয়া কিছুদিন এখানে ছিলেন এবং মাণিকের প্রতি বেশ একটু ঈর্ষা মিশ্রিত অসন্তোষ লইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কালে এই ছন্নছাড়া বালকটাই এই বিপুল ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। যদিও পোষ্য লওয়ার কোন সঠিক সংবাদ তিনি পান নাই, তথাপি আপন স্বতসিদ্ধ অনুমানের দ্বারা এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। থাকিবার মধ্যে ছিল এক দুহিতা। দরিদ্র হইলেও ভাল ঘরেই তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন ও গুটি কয়েক নাতি-নাতনীও তাঁহার অক্ষয় স্বর্গের দুয়ারে বাতি দিবার কল্পনাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল উহাদেরই একটিকে আনিয়া মহামায়ার পোষ্যপুত্ররূপে বহাল করিয়া দিবেন। কিন্তু পোষ্য লইতে মহামায়ার অসম্মতি বুঝিয়া এযাবৎ কথাটা পাড়িতে পারেন নাই। এবার মাণিকের আদর দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল—এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়াই হউক তাঁহার নাতির আসন এখানে প্রতিষ্ঠা করিবেনই করিবেন। মাসখানেক পরেই বড় নাতিটিকে লইয়া তিনি মহামায়ার সংসারে আসিয়া দর্শন দিলেন।

নাতির নাম মদনগোপাল। বয়সে মাণিকের অপেক্ষা বছর দুয়েকের বড়ই হইবে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে—পাকসিটে দেহের সঙ্গে বুদ্ধিটুকুও চক্রাকারে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পাঠে বৈরাগ্য, খেলায় প্রবল উৎসাহ, কর্ম্মে আলস্য ও ভোজনে পটুত্ব —এই কয়টি ছিল তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব। সর্ব্বোপরি দিদিমার সৎশিক্ষায় বাবুয়ানীটুকুও বেশ কায়দাদুরস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহামায়া এসব লক্ষ্য করিলেও দুদিনের অভ্যাগত বলিয়া বিশেষ কিছু বলিলেন না।

মদন তিন দিন লক্ষ্য করিল, ঠাকুর মাণিকের পাতেই মাছের মুড়া, দইয়ের সর ও ক্ষীর আর দুধটুকু ঢালিয়া দিত, 'এটা খাও' 'ওটা খাও' বলিয়া অনুরোধ করিত—আর তাহাকে বেগার টালা গোছ একখানা থালায় তরকারী হইতে মাছ পর্য্যন্ত দিয়া হেঁসেলের কোণে এমনভাবে নির্বিষ্ট চিত্ত হইয়া পড়িত যে, ডাকিলেও তাহার সাড়া মিলিত না। তিন দিনের দিন রাত্রিতে সে দিদিমাকে সব কথা জানাইল।

ফলে চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে মাণিক স্কুলে যাইবার জন্য ঠাকুরকে ভাত বাড়িতে বলিলে—ক্ষান্তকালী আর একখানা থালা হাতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, মদনগোপালকেও এই সঙ্গে ভাত দাও—খেয়ে নিক।" বলিয়া একখানা পিঁড়ি পাতিয়া উভয়ের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

ঠাকুর থালা সাজাইয়া উভয়ের সম্মুখে রাখিলে ক্ষান্তকালী উঁকি মারিয়া মদনের থালায় মাছের টুকরা ও মাণিকের থালায় মুড়া দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তোমার কেমন বিবেচনা, ঠাকুর! দাদাবাবুকে রোজ রোজ এক কুচি মাছ—যেন কোথাকার কে? কেন, ওকি মুড়ো খেতে জানে না?

মহামায়া উপরের বারান্দায় একটা জামা রৌদ্রে শুকাইতে দিতেছিলেন। ক্ষান্তকালীর কথা শুনিয়া বলিলেন, "কি গা—ঠাকুর ঝি?"

ক্ষান্তকালী মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "ও কিছু নয়—বৌ, আমার মদনগোপাল রুই মাছের মুড়ো খেতে বড় ভালবাসে কিনা,— তাই বলছিলুম। তা ঠাকুর—"

মহামায়া ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বাবুর জন্য যদি মুড়ো রেখে থাক ত মদনকে দাও, ঠাকুর। আর দেখ, কাল থেকে জনাকে বলে দিও রোজ গোটাদুই মাছ যেন বেশী ধরিয়ে আনা হয়। অন্ততঃ মদন যে কয়দিন থাকে, দুবেলা ওর পাতে যেন মুড়ো পড়ে।"

ঠাকুর বলিল, "আচ্ছা।"

মদন খুশী হইয়া দিদিমাকে চক্ষুর ইঙ্গিত করিল। তিনি কিন্তু গম্ভীর মুখে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

বাহিরের ঘরে তাকিয়া ঠেস দিয়া সুরেনবাবু বটতলার একখানা উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন ও আপন মনে হাসিতেছিলেন। ক্ষান্তকালী সেইখানে ঢুকিয়া কোন ভূমিকা না করিয়া একেবারে মরিয়া হইয়া কহিলেন, "ভাল না লাগে, চলে যাব— এ ত' সোজা কথা। তার জন্য দিবা-রাত্রির খোঁটা দেওয়া কেন শুনি?"

সুরেনবাবুর মৃদুহাস্য ওষ্ঠপ্রান্তে মিলাইল। আশ্চর্য্যে ক্ষান্তকালীর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল, দিদি?"

ক্ষান্তকালী বলিলেন, "তুমি যে মেনিমুখো ভাই—নৈলে বৌয়ের সাধ্য কি আমার কথার উপর কথা কয়! ওই তিনকুল খেকো ছোঁড়া—ও হ'ল আপনার জন, আর আমার মদনগোপাল হ'ল পর?"

সুরেনবাবু তথাপি কিছু বুঝিলেন না। নিতান্ত অন্যমনস্কের মত প্রশ্ন করিলেন, "মদনগোপাল কে?"

ক্ষান্তকালী ক্রন্দনের সুরে বলিলেন, "তাইত' বলছিলাম —তুমিই যদি সব খোঁজ রাখবে ত' আমার এ দশা কেন হবে? মদন—মদন—আমার সত্যবালার বড় ছেলে। ওই যে তোমার সাম্নে দিয়ে যায় আসে—দেখতে পাও না?"

আপন ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্য সুরেনবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওঃ, হ্যাঁ—দেখেছি বটে। ফরসা মত—মোটাসোটা—"

ক্ষান্তকালী মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "পোড়াকপাল

আমার। সে ত' তোমাদের তিনকুল থেকো আদুরে দুলাল—মাণিক। আমার মদনগোপালের চেহারা অমন খোদার খাসি পায়া নয়। আর হবেই বা কোত্থেকে? বাছা সেই পাড়াগাঁয়ে—বারো মাস ভোগে ম্যালোয়ারীতে। রোগে রোগে কি আর বার বৃদ্ধি আছে—? তার ওপর সাত সত্তুরের চোখে চোখে সলতেটি হ'য়ে গেছে।—তাই ত ভাবনু—রয়েছে ভেয়ের বাড়ী—থেকেই আসি বছরকতক। বাছারও শরীর সেরে উঠবে, ছেলেপুলে পেয়ে তোমাদেরও মনটা থাকবে ভাল।—তা বো'য়ের যে-রকম ভাবগতিক দেখছি—" বলিয়া সহসা চুপ করিয়া ভায়ের মনোভাব বুঝিবার জন্য সেদিকে চাহিলেন। চাহিয়া যাহা দেখিলেন—তাহাতে অন্তরটি আরও জ্বলিয়া উঠিল। এত সাধের কাহিনীকে অগ্রাহ্য করিয়া অপদার্থ ভাইটা কিনা—গভীর মনোযোগের সঙ্গে পুস্তকখানি মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়াছে! হয়ত প্রথম হইতেই তাঁহার কথার একবিন্দুও শোনে নাই!

অসহ্য রোষে তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। পরে সহসা রোদনের উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিলেন, "কালই আমায় যদি পাঠিয়ে না দাও ত' তোমার অতি বড় দিব্যি রইল'—।"

সুরেনবাবু পুনরায় সবিস্ময়ে তাঁহার রোদনক্ষুব্ধ মুখের পানে চাহিয়া বিহ্বলের মত বলিলেন, "তা এতে কাঁদবার কি আছে, দিদি। কালই যেয়ো। গাড়ীর জন্য দারোয়ানকে বলে দেব—"

ক্ষান্তকালী উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বেশ—গো—বেশ!" তারপর তিনি সবেগে অন্দরাভিমুখে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সুরেনবাবু কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির মত সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় অসমাপ্ত কাহিনীর শেষ করিতে পুস্তকখানি নিশ্চিন্তমনে মুখের উপর তুলিয়া ধরিলেন।

পরদিন প্রাতে ক্ষান্তকালী মহামায়াকে বলিলেন, "মদনগোপালকেও ইস্কুলে ভর্ত্তি না ক'রে দিলে নয়, বৌ। ছেলেটা বসে বসে মাটি হ'য়ে যাচ্ছে।"

মহামায়া বলিলেন, "তা বেশ ত'। তবে কটাদিনের জন্য আর টানা পড়েন কেন, ঠাকুর ঝি।"

ক্ষান্তকালী ঈষৎ বেগের সহিত বলিলেন, "কটা দিন—কটা দিন করছ' কেন বৌ? একে ত' ভুগে ভুগে ছোঁড়াটার অস্থিচর্ম্ম-সার হয়েছে, এখন ও মুখো হ'লে কি আর প্রাণে বাঁচবে? যে যাই বলুক—দু'বছর এখন সে পোড়া দেশে ওকে পাঠাচ্ছি না। এতে মেয়েই রাগ করুক, আর জামাই না খেতে দিক। সত্যিই ত' জেনে শুনে—ছোঁড়াটাকে যমের মুখে তুলে দিতে পারি না!"

মহামায়া বলিলেন, "তবে মাণিককে ব'লে দেব'খন—তার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দেবে। মদন কোন্ ক্লাসে পড়ে?'

ক্ষান্ত বলিলেন, "কে জানে দিদি—কেলাস ফেলাসের কথা। পড়ে ত' একগাদা বই—দশ জোয়ানের বোঝা! তুমিই ওকে ডেকে কেন জিজ্ঞেস কর না।" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "ওরে ও মদনগোপাল!"

কোন উত্তর আসিল না।

বারকতক ডাকিয়া ক্ষান্তকালী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, হাঁকিলেন, "অ মদন—মদন—, ওরে হতভাগা মদনা রে—"

বহুদূর হইতে উত্তর আসিল, "যাই—ই—ই—"

ক্রুদ্ধ ক্ষান্তকালী তাহাকে দেখিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন—মহামায়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়া মদনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি বই পড়েছ বাবা?"—

মদনের কণ্ঠে সরস্বতী বসিয়া গেল, "চারুপাঠ—১ম ভাগ, Firstbook, বেজায় রগড়, জোড়াখুন, ঘরের ঢেঁকি, ভূগোল, শুভঙ্করী, ডাকিনী বিদ্যা"—

অকস্মাৎ মহামায়ার গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া মদন থামিয়া গেল।

ক্ষান্তকালী পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন, "আরও কত বই আছে—সব নাম কর।"

মহামায়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "থাক।"

মদন ভয়ে ভয়ে আড় চোখে দিদিমার পানে চাহিল।

মহামায়া গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "অনেক বিদ্যে সঞ্চয় করেছ—দেখছি বাবা। তা মাণিকের স্কুলে ত' কুলোবে না,—তোমায় আলাদা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দেব। ঠাকুর ঝি,—কাল আমার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ো"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মদন দিদিমার পানে চাহিয়া কহিল, "আমার বয়ে গেছে ইস্কুলে যাবার জন্যে? তারি জন্যে এখানে এসেছি কিনা?"

ক্ষান্তকালী নয়নের ইঙ্গিতে তাহাকে শাসন করিয়া চুপি চুপি কহিলেন, "ঢেঁকিরাম, লেখাপড়া না শিখলে অমনি আদর করবে?"

মদন মুখ বিকৃতি করিয়া কহিল, "নাঃ,—করবে না? ওর ছেলেপিলে আছে নাকি—? আমিই ত সব পাব।"

ক্ষান্তকালী চুপি চুপি তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "চুপ—চুপ, মুখ্যু কোথাকার! উনি পাবেন? মুখে বাসি উনুনের ছাই তুলে দেবে। হতভাগা,—দেখছ না, মাণিক রয়েছে।"

রাগিলে মদনের জ্ঞান থাকিত না,—আপন পর বাছিত না। যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিত। সে-ও মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, "তুই থাম বুড়ি—"

তারপর যাহা বলিল—তাহা নিম্নস্তরের অধিবাসীরাও সচরাচর ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করে।

যাহাই হউক, রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া ক্ষান্তকালী আর এক প্রস্ত আদর সোহাগ দিয়া মদনকে বুঝাইতে লাগিলেন।

ফলে পরদিন প্রাতঃকালে লক্ষ্মী ছেলেটির মত মদনগোপাল স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইল।

ক্ষান্তকালী উদ্দেশে হরির লুট মানত করিয়া অঞ্চলে একটা গ্রন্থি বাঁধিয়া রাখিলেন। (ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

বিশ্ব বৈতালিক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, বি-এ প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থখানিতে ১৩০টি গীতি কবিতা আছে। কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা বাস্তবিকই আনন্দলাভ করিয়াছি। লেখক লিখিয়াছেন—"কাব্যের বাণী হৃদয়ের মন্দির পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে কেবলমাত্র ভগবত অনুভূতির সুখকে শেষ সীমা বলে মেনে নিতে আমি রাজী নই। কাব্য প্রেরণার সহৃদয়তায় হৃদয়ের উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে গিয়ে জ্ঞানময় সৌন্দর্য্যের চির-মঙ্গলময় দেবতাকে আমি চাক্ষুস দেখতে চাই—তাতেই আমার আনন্দ। সহজ সত্যের জ্ঞানময় সরস সুন্দর ছন্দোবন্ধ বাঙ্ময় বিকাশই কাব্য। তাই কাব্য-সাধনায় আর জ্ঞানযোগে শব্দগত পার্থক্য থাকিলেও অর্থগত বৈষম্য নেই।" কবিতাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় কবি নিজে সত্যই সেই চিন্ময় রসকে উপলব্ধি করিয়াছেন—যে চিন্ময় রস অব্যয়জ্ঞানে অখিল অমৃতের আকার ধরিয়া উঠে। কবির দৃষ্টিতে এ বিশ্ব আনন্দময় হইয়া গিয়াছে এবং আনন্দময় রসঘন-বিগ্রহ স্বরূপ যিনি তাঁহাকে তিনি আপনার করিয়া পাইয়াছেন—তাঁহার গীতিগ্রন্থখানি সেই পাওয়ারই ব্যক্ত রূপ। যাঁহারা প্রকৃত রস-রসিক তাঁহারা কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবেন, পরিচয় পাইবেন সকল সংবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যিনি বিশ্ব-লীলাতে আস্বাদিত হইতে চাহিয়াছেন তাঁহার।

সভা-সমিতি

হাওড়া, ৫নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি, পাঠচক্র

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর, রবিবার অপরাহ্নে উক্ত পাঠচক্রের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। চক্রের প্রথম অধিবেশনটি আশাতীতরূপে সাফল্য লাভ করিয়াছে। বহু ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দূর্ব্বার সঙ্ঘ

গত ২৭শে নবেম্বর দূর্ব্বার সঙ্ঘের একাদশ অধিবেশন ৭৬, ল্যান্সডাউন রোডে হয়। কবি হেমচন্দ্র বাগচী সভাপতিত্ব করেন। সম্পাদক জগত দাস পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন।

সভায় সন্তোষ ঘোষ ও সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছোট গল্প, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধাংশু সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবিতা পাঠ করেন। পঠিত বিষয়গুলি সভায় আলোচিত হয় ও বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

সভাপতি কবি হেমচন্দ্র বাগচী তাঁহার অভিভাষণে কাব্যে প্রেমের অমরত্ব বর্ণনা করেন।

বগুলায় কি দেখিলাম

(২১৩ পৃষ্ঠার পর)

জাগিয়ে তোলা যায়—জঙ্গলে-ঢাকা গ্রামগুলির চেহারা বদলে দিতে কতক্ষণ লাগে! কিন্তু শক্তিকে জাগাবে যারা—সেই মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত যুবকেরা গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তকের মধ্যে ডুবে আছে! তাদের মগজে থিসিস লেখার চিন্তা, দৃষ্টি কেবল চাকুরির উপরে নিবদ্ধ!

আমাদের জাতীয় জীবনে শীতের যে নৈরাশ্য পুঞ্জীভূত হ'য়ে রয়েছে—তাকে নূতন আশার বসন্তে রূপান্তরিত করতে হ'লে সব আগে প্রয়োজন অশিক্ষিত জন-সাধারণের আর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তাকে ঘুচিয়ে দেওয়া। এ ব্যবধান যতদিন আমরা ঘুচিয়ে দিতে না পারছি ততদিন আমাদের দেশব্যাপী শ্মশানে নব-জীবনের আবির্ভাব অসম্ভব। চাষীর দেহে আজও উদ্যম আছে কিন্তু মগজে উহাদের জ্ঞানের আলো নেই। আমাদের মগজে জ্ঞানের আলো আছে কিন্তু হাত দু'খানিকে ব্যবহার না ক'রে ক'রে তাদের অকেজো ক'রে ফেলেছি। আমরা হ'য়ে গেছি চিড়িয়াখানার ক্যাঙারুর মতো। আজ আমাদের মগজের জ্ঞানকে সঞ্চারিত করতে হবে—যারা অজ্ঞতার অন্ধকারে মগ্ন হ'য়ে আছে তাদের মগজের মধ্যে। পক্ষান্তরে জনসাধারণের মধ্যে কায়িক পরিশ্রম করবার যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতার অধিকারী হ'তে হবে আমাদের। আমরা যদি পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারি—জাতিকে রূপান্তরিত করতে কতক্ষণ!

গ্রামের জনসাধারণের পাশে আমরা তো যাইনি তাদের দুঃখ-সুখের ভাগী হ'য়ে। যদি যেতাম দেখতে পেতাম, তারাও তাদের চেতনাকে অতি সহজে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিতে পারে সকলের মধ্যে। মুড়াগাছা গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করতে করতে জনসাধারণের অন্তরে প্রচ্ছন্ন দেশাত্মবোধের এই দিকটা সহসা আবিষ্কার করলাম একটা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে। খুব জোরের সঙ্গে বন-কাটার পালা চলেছে। সহসা শুনলাম একজনের পায়ের বুড়ো আঙুল কাটা গিয়েছে। গিয়ে দেখলাম, সত্যই তাই। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ছিলো সব চেয়ে উৎসাহী, তারই এই দুর্ঘটনা। ছেঁড়া রুমাল দিয়ে আঙুলটা চেপে ধরলাম। লোকটির কণ্ঠ থেকে কোনো আর্ত্তনাদ শোনা গেল না। সে কেবল বললে, 'আল্লা, আমার যা হয় হোক, দেশের যেন মঙ্গল হয়।' অশিক্ষিত চাষীর মুখে এই বাক্য শুনে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম!

জনসাধারণের মনের এই সাহস আর উদারতাই তো গণতন্ত্রের পরম আশ্রয়। তাদের উপরেই তো আমাদের নির্ভর করতে হবে। জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত-সমাজের প্রাণের যোগ যে দিন স্থাপিত হবে—সেইদিনই সুরু হবে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা।

বগুলার সমস্যা অচিরে সারা বাঙ্গলার সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে। এই সমস্যার সমাধান হবে জনসাধারণের অন্তর্নিহিত শৌর্য্যকে জাগিয়ে তোলার পথে এবং শৌর্য্যের এই জাগরণ একান্তভাবে নির্ভর করছে মধ্যবিত্ত-সমাজের শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে গ্রামের জনসাধারণের মিলনের উপরে।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রবন্ধ, আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা

আগামী পৌষ মাসের মধ্যভাগে "ক্ষিতীশ স্মৃতি পাঠাগারের" চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এখানে প্রবন্ধ, আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় নাম, ঠিকানা ও বয়স ইত্যাদি নিম্নোক্ত যে কোনও ঠিকানায় পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর। সমস্ত বিষয়ে বিচারকগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। (১) শ্রীসরোজেশ বিশ্বাস, সম্পাদক, ক্ষিতীশ স্মৃতি পাঠাগার, "সুখনীড়" রামপুরা, বেনারস; (২) শ্রীযুক্তা উষাময়ী সেন, "নারী-শিক্ষা মন্দির", ১৯৭নং রামাপুরা, বেনারস।

বিষয় সূচীঃ—প্রবন্ধ ছোটদেরঃ এক হাজার শব্দের অনধিক—(১) আমার প্রিয় সখ (Hobby), (২) সেবা-ধর্ম্ম, (৩) আমার জীবনের স্মরণীয় দিন, (৪) আমি যদি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হইতাম, (৫) আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, (৬) ফেরিওয়ালা।

প্রবন্ধ বড়দেরঃ তিন হাজার শব্দের অনধিক—(১) নারী চরিত্রে "শরৎ" প্রতিভা, (২) প্রণয় ও পরিণয়, (৩) হিন্দু বাঙালীর ভবিষ্যৎ, (৪) নারী ঘরে ও বাইরে, (৫) চাটু কলা (Art of flattery), (৬) বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বাঙলা উপন্যাস।

আবৃত্তির বিষয়ঃ—ছোটদেরঃ (১) "ভারত তীর্থ"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) আমি যখন বড় হব—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৩) লিচু-চুরি—কাজি নজরুল, (৪) "ব্রাহ্মণ"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১ বৎসরের নিম্নের বালকবালিকাগণ ইচ্ছামত বিষয় নির্ব্বাচন করিতে পারে।

আবৃত্তির বিষয়ঃ—বড়দেরঃ (১) "দেবতার গ্রাস"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) "স্বর্গ হইতে বিদায়"—ঐ, (৩) "কালিদাস"—ঐ, (৪) "বিদ্রোহী"—কাজি নজরুল।

কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত প্রতিযোগিতা শুধু মেয়েদের জন্য—সময় পাঁচ মিনিটের অনধিক; কণ্ঠ সংগীতের সহিত হারমোনিয়াম ব্যবহার করিলে শতকরা ২৫ নম্বর কাটা যাইবে। তবলা রাখিতে পারেন।

জয়ন্তী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

নদীয়া শান্তিপুরস্থিত বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের কার্য্যকাল ৩০শ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় আগামী মাঘী পূর্ণিমায় পরিষদের জয়ন্তী উৎসব হইবে। বাঙলার সমস্ত জেলায় পরিষদের প্রতি কেন্দ্রে এই উৎসব নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইবে। এই উপলক্ষে পরিষদ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেবা সম্বন্ধে তিনটি রচনার জন্য ঘোষণা করিতেছেন। প্রত্যেক রচনায় প্রথম স্থানাধিকারী রৌপ্য পদক এবং বিচারে উপযুক্ত প্রবন্ধগুলির লেখকগণ পরিষদ হইতে "সাহিত্যবিনোদ" এবং লেখিকারা "সাহিত্যকুশলা" উপাধি পাইবেন। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে স্ত্রী, পুরুষ সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, হিন্দী, অসমীয়া এই কয়টি ভাষার যে কোনটিতে প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ২২শে পৌষ (ইং ৭ই জানুয়ারী) তারিখের মধ্যে সম্পাদকের নিকট পৌঁছান আবশ্যক। বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনা ডাক টিকিট-সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র কাব্যসাংখ্যতীর্থ, এম-এ, এম-এল-এ, অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন সাধারণ সম্পাদক বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ, শান্তিপুর নদীয়া।

সংগীত আবৃত্তি ও কবিতা প্রতিযোগিতা

আগামী ১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর, ৩৮), শনিবার নিখিল-বঙ্গ সাধনা মন্দির আশ্রমের (বড়িষাঃ ২৪-পরগণা) তরুণ ব্যায়ামবীর ও কবি নিমাইরতন মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ-বার্ষিক মৃত্যু স্মৃতি তিথি উপলক্ষে কবিতা, আবৃত্তি ও সংগীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতা গৃহীত হইবে। যাঁহারা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে চান—তাঁহাদের ২৮শে অগ্রহায়ণের মধ্যে (১৫ই ডিসেম্বর) নাম, ধাম ও ঠিকানা পাঠাইতে হইবে এবং উক্ত তারিখ কবিতা পাঠাইবার শেষ তারিখ বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহাতে স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে যোগদান করিতে পারিবেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিগণকে একটি করিয়া রৌপ্য পদক দেওয়া যাইবে। সাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে ধর্ম্মতলা হইতে ৩এ বাসে উঠিলে প্রতিযোগিতার স্থলে পৌঁছিয়া দিবে। বিশেষ বিবরণের জন্য আশ্রম সম্পাদককে এক আনার ডাক টিকিট-সহ পত্র লিখুন।

আবৃত্তি—(১) "যৌবন দেব কই?"—স্বর্গত কবি নিমাইরতন রচিত (ছেলেদের জন্য) আশ্রমে পাওয়া যাইবে।

(২) "তুমি ঘৃণাভরে পায়ে ঠেলে যাও—" (মেয়েদের জন্য)—স্বর্গত কবি নিমাইরতন।

কবিতা—কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই, মৌলিক হইলে চলিবে।

সংগীত—ভজন-কীর্ত্তন—স্বর্গত কবির রচিত গাহিতে হইবে।

শ্রীসত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক, নিখিল-বঙ্গ সাধনা-মন্দির আশ্রম। পোঃ বড়িষাঃ২৪-পরগণা।

সালকিয়া টুরিষ্ট পার্টি ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল

১। প্রথম হইয়াছেন—শ্রীসতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় C/o শ্রীসুধীরকুমার মুখার্জ্জী, পোঃ ঢাকুরিয়া, ২৪-পরগণা। গল্পের নাম—"দূরের মায়া"।

২। দ্বিতীয় হইয়াছেন—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মিত্র, C/o শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭।ই মহিশূর রোড, কালিঘাট, কলিকাতা। গল্পের নাম—"বেদনা"।

৩। তৃতীয় হইয়াছেন—শ্রীঅলোকনাথ রায় চৌধুরী, ১৪৪নং হরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর। গল্পের নাম—"হোপ্‌লেস্"।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সেক্রেটারী সঃ টুঃ পাঃ।

রঙ্গজগৎ
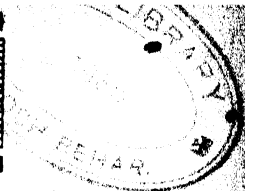
থিয়েটার ও সিনেমা সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট হইতে যে সমস্ত অভাব-অভিযোগ আমরা পাই এখানে তাহার একটু আলোচনা করিতেছি।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অভিযোগ যাহা আমরা পাই, তাহা হইতেছে সিনেমায় 'গুণ্ডার' প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে। প্রতি মাসে অন্তত ৩।৪ খানি অভিযোগ আমরা পাই। সমস্ত অভিযোগ-গুলিই উত্তর-কলিকাতার চিত্রগৃহ সম্বন্ধে।

প্রকৃতপক্ষে এই 'গুণ্ডা'দলের অত্যাচার দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, যে সমস্ত দর্শক ছবি দেখিতে যান তাঁহারা যে সেই সমস্ত চিত্রগৃহের পৃষ্ঠপোষক তাহা অনেক সময় সিনেমার কর্তৃপক্ষ ভুলিয়া যান। তাহা না হইলে, দিনের পর দিন এই যে অত্যাচার তাঁহাদের উপর চলে, ইহা তাঁহারা নিজের চোখে দেখিয়া কি করিয়া সহ্য করেন? জনসাধারণের মাথার উপর চড়িয়া তাঁহাদিগকে ধাক্কা মারিয়া, নিষ্পেষিত করিয়া এই গুণ্ডার দল যে কি ভাবে টিকিট ক্রয় করে তাহা প্রত্যহ সকালে উত্তর-কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া যে কেহ যাইবেন—দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সিনেমার মালিকদের তাহা নজরে পড়ে না! যদি পড়িত, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন না কোন ব্যবস্থা করিতেন।

এই ত' গেল প্রত্যহ সকালে টিকিট কেনার ব্যাপার। প্রত্যহ অপরাহ্নে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'গুণ্ডার' দল প্রত্যেক চিত্র-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের হাতে চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটের তাড়া এবং তাহারা সেইগুলি হাতে লইয়া দর হাঁকিতেছে। যে সমস্ত লোক সকালের ভীড়ের চাপ ও গুণ্ডার হাতে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও টিকিট কিনিতে পারেন নাই অথবা যাঁহারা ভীড়ের চাপ ও গুণ্ডার হাতের লাঞ্ছনা এড়াইবার জন্য টিকিট কিনিতে আসেন নাই তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া সাড়ে চার আনার টিকিট ছয় আনা হইতে নয় আনা দিয়া কিনিয়া এবং নয় আনার টিকিট এক টাকা দিয়া কিনিয়া সিনেমা দেখিতে হয়। লোকের উপর রাহাজানি করিয়া এই যে ব্যবসা এই সমস্ত গুণ্ডার দল চালাইতেছে, তাহার কি কোন প্রতীকার নাই? চিত্রগৃহের মালিকেরা কি ইচ্ছা করিলে তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারেন না? যেখানে এক সঙ্গে ২ খানার বেশী টিকিট বিক্রয় হয় না, সেখানে এক একজন গুণ্ডা ১০।১৫ খানি করিয়া টিকিট পায় কি করিয়া? শুধু একজন গুণ্ডাকে যে দেখা যায় তাহা নহে, এই রকম অন্তত ৮।১০ জন গুণ্ডা এইভাবে টিকিট বিক্রয় করে।

চিত্রগৃহের মালিকেরা হয়ত বলিবেন, জনসাধারণে যদি গুণ্ডাদের নিকট হইতে টিকিট না কেনে তাহা হইলেই ত' গুণ্ডারা জব্দ হয়। তাহা ত' জনসাধারণ করে না বরং গুণ্ডাদের নিকট হইতে টিকিট কিনিয়া তাহারা আরও গুণ্ডামির প্রশ্রয় দেয়; সুতরাং অপরাধী তাহারাই। গুণ্ডারা জব্দ যে হয় তাহা আমরাও জানি, কিন্তু এ যেন নিজেদের অপরাধ অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দোষ স্খালনের চেষ্টা। কারণ কার্য্যত তাহা অনেক সময় সম্ভবপর নহে; কেন যে নহে তাহা আমরা এখানে আলোচনা করিব।

প্রথমত সিনেমা দেখা অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে একটা মোহ ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং সাজগোজ করিয়া সিনেমা দেখার জন্য বাহির হইয়া টিকিট না পাইলে ফিরিয়া আসিব, গুণ্ডাদের নিকট হইতে টিকিট কিনিব না, এই রকম মনের বল অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। শুধু তাহাই নহে, একদিন ফিরিয়া আসিলে দ্বিতীয় দিন পাওয়া যাইবে এ নিশ্চয়তা যদি থাকিত তবে অনেকেই হয়ত তাহা করিতেন। কিন্তু সে নিশ্চয়তা যখন নাই তখন সর্ব্বসাধারণের সিনেমা বর্জ্জন করাই তাহার একমাত্র উপায়। কর্তৃপক্ষ কি তাহাই চাহেন?

দ্বিতীয়ত চিত্রগৃহের মালিকেরা জানাইলেন যে, তাঁহারা মনে করেন, অপরাহ্নে চিত্রপ্রদর্শনীর পূর্ব্বে টিকিট বিক্রয় না করিয়া পূর্ব্ব হইতে টিকিট বিক্রয় করিলে জনসাধারণের সুবিধা হইবে এবং তদনুসারে তাঁহারা সকালে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে এই হইল যে, স্কুল কলেজের ছাত্র অথবা যাঁহারা চাকুরী করেন তাঁহাদের পক্ষে সকালে সিনেমায় যাইয়া টিকিট কেনা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িল। তারপর কিছু দূর হইতে যাঁহারা ছবি দেখিতে আসেন, তাঁহাদের সকালে আবার বাস অথবা ট্রাম ভাড়া দিয়া সাড়ে চারি আনা অথবা নয় আনার টিকিট কিনিতে আসা এক প্রকার অসম্ভব। এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও যাঁহারা টিকিট কিনিতে আসেন তাঁহারা আবার গুণ্ডার অত্যাচারে অনেক সময় টিকিট কিনিতে পারেন না। সুতরাং অপরাহ্নে তাঁহারা যখন ছবি দেখিতে আসেন তখন গুণ্ডাদের নিকট হইতে বেশী দামে টিকিট কেনা ছাড়া তাঁহাদের অন্য উপায় থাকে না এবং যে উপায় আছে তাহা হইতেছে সিনেমা বর্জ্জন করা। তারপর দূর অঞ্চল হইতে বাস অথবা ট্রাম ভাড়া খরচ করিয়া যাঁহারা ছবি দেখিতে আসিয়া টিকিট পান না, তাঁহারা গুণ্ডাদের নিকট হইতে টিকিট না কিনিয়া পুনরায় খরচ করিয়া ফিরিয়া যাইবেন অন্য এক দিনের জন্য এবং সেইদিনও হয়ত খরচ করিয়া আসিয়া তাঁহারা টিকিট পাইবেন না—এ আশা কর্তৃপক্ষ কি করিয়া যে করেন: কি করিয়াই বা যে বলেন তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না।

সিনেমার মালিকেরা হয়ত আমাদের বলিবেন যে তাঁহারা কি করিতে পারেন? আমরা জানি যে অনেক সিনেমা এই বিষয়ে মাথা ঘামাইতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই যাহাতে এই দুর্নীতি বন্ধ হইতে পারে। এই সম্বন্ধে আমরা দুই একটি প্রস্তাব করিতে পারি এবং তাহা করিলে কর্তৃপক্ষ সুফল পাইবেন বলিয়া আমরা মনে করি।

প্রথমত অনেকে মনে করেন গুণ্ডারা সিনেমার সমস্ত কর্ম্মচারীদের সঙ্গে খাতির রাখিয়া চলে

এবং আমাদের অনুমান যে অনেক সময় হয়ত বা তাহারাই গুন্ডাদের টিকিট দিতে সাহায্য করে। এ আমাদের অনুমান মাত্র। সেই জন্য সিনেমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন এই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং ভিতর হইতে কোন গুন্ডা যাহাতে টিকিট না পায় (অবশ্য হয়ত পায় না) অথবা গুন্ডাদের নিকট যেন টিকিট বিক্রয় না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখেন।

দ্বিতীয়ত মেট্রো এবং অন্য কতকগুলি সিনেমার যেমন প্রদর্শনীর অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে টিকিট বিক্রয় হয়—তাঁহারাও যেন সেই রকম ব্যবস্থা করেন। টিকিট কেনার পর প্রত্যেককেই চিত্রগৃহের ভিতর যাইতে হইবে এবং ছবি আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহারা আর বাহির হইতে পারিবেন না। যাঁহারা একের অধিক টিকিট কিনিবেন তাঁহারা প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করার সময় তাঁহাদের স্ব স্ব লোক ডাকিয়া লইবেন এবং তাঁহাদের লইয়া প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে যাইবেন।

তৃতীয়ত সিনেমার মালিকদের যখন দর্শকদের উপরই নির্ভর করিতে হয় তখন তাঁহারা দর্শকদের সুখ সুবিধার জন্য কিছু বেশী খরচ করিবেন এ আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি। সেইজন্য আমাদের প্রস্তাব এই যে প্রত্যহ টিকিট ঘর খোলার সময় তাঁহারা যেন টিকিট ঘরের সম্মুখে একজন কনেষ্টবল রাখার ব্যবস্থা করেন। কনেষ্টবল গুন্ডাদের টিকিট ঘরের নিকট যাইতে দিবে না, কোন গুন্ডাকে জনসাধারণের মাথার উপর চড়িতে দিবে না, ভীড় সংযত করিবে এবং সকলকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাইবে।

চতুর্থত যে সমস্ত গুন্ডা প্রদর্শনীর পূর্ব্বে টিকিট বেশী দামে বিক্রয় করে তাহাদের নিকট হইতে টিকিট কাড়িয়া লওয়া; তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করাঃ আবশ্যক হইলে তাহাদের দণ্ড দান প্রভৃতি ব্যবস্থা তাঁহাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। গুন্ডারা সিনেমার চারিধারেই থাকে; এবং জনসাধারণ যখন তাহাদের দেখিতে পায় তখন ইচ্ছা করিলে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে কর্ত্তৃপক্ষও তাহাদিগকে দেখিতে পাইবেন।

এখন এই সমস্ত অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা যায় কিনা তাহা সিনেমার মালিকগণকে আমরা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। যদি সমস্ত সিনেমার মালিকেরা, বিশেষভাবে যাঁহাদের সিনেমায় এই ব্যাপার ঘটে তাঁহারা যদি সম্মিলিতভাবে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অবশ্যই ইহাতে সুফল ফলিবে।

ভারতের পণ—শণ

(২১১ পৃষ্ঠার পর)

১৯২৯-৩০ সাল হইতে রপ্তানির হ্রাস ও বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯৩১-৩২ সালে সর্ব্বাপেক্ষা কম রপ্তানি হইয়াছিল। পরে বাড়িতে থাকে, কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ সালের পূর্ব্বে ঐ বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

	হাজার হন্দর	হাজার টাকা
১৯২৯-৩০	৪৩৫	৬৮,৩৩
১৯৩০-৩১	২৯৩	৩৯,৩০
১৯৩১-৩২	২২৪	২৬,৯০
১৯৩২-৩৩	২৮১	৩২,১৬
১৯৩৩-৩৪	৩৮৮	৩৬,০৯
১৯৩৪-৩৫	৪৩৭	৩৯,০৩
১৯৩৫-৩৬	৬৪৩	৬০,৩৪
১৯৩৬-৩৭	৭৬৯	৬৯,২৭
১৯৩৭-৩৮	৮৩৩	৭৪,৫০

ক্রেতার নাম ও অংশ

	হাজার হন্দর	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
বেলজিয়ম	২,২৭	২০,৮৭	২৮·০
যুক্তরাজ্য	২,৩১	২০,২০	২৭·১
জার্ম্মানী	১,০৯	৯,৪৩	১২·৬
ফরাসী	৪৬	৪,৬৭	৬·২
গ্রীস	৫১	৪,৪০	৫·৯
ইটালী	৪৮	৪,২৬	৫·৬
অপরাপর	—	—	—

প্রদেশ হিসাবে রপ্তানির অংশ

	হাজার হন্দর	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
বাঙলা	৭,১৩	৬১,৩৫	৮২·২
মদ্র	৬৯	৭.৪১	৯·৯
বোম্বাই	৪৮	৫.৭৫	৭·৭

ইহা ছাড়া শণদ্রব্যজাত দ্রব্যাদি, স্বল্পমূল্যের হইলেও, রপ্তানি আছে, এবং তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছেঃ—

১৯৩৫-৩৬	৫,৪২৫ টাকা
১৯৩৬-৩৭	৫,৬২৩ "
১৯৩৭-৩৮	৫৭,৬০৬ "

আমদানী করা শণের একমাত্র বিক্রেতা ফিলিপাইন। ইহা ফুল-শণ কি ভাঙ-শণ তাহার সম্বন্ধে স্থিরভাবে কিছু বলা যায় না।

আমদানী শণ

	হন্দর	টাকা
১৯৩৫-৩৬	২৩,৮৫০	৩,১৮,৪৯৭
১৯৩৬-৩৭	৩৪,৭০৬	৫,৮৩,২০৪
১৯৩৭-৩৮	৪৫,৮২৭	৮,২৩,১৬৩

আমদানী দ্রব্যাদি

১৯৩৫-৩৬	৮২,৭৩২ টাকা
১৯৩৬-৩৭	১,১৯,০১৪ "
১৯৩৭-৩৮	৭৪,৬৩১ "

ভাঙ-শণ, শিশল, দাক্ষিণাত্য (Deccan) শণ বা সিমুলিপটম পাট প্রভৃতি নানা শণ সম্বন্ধে পর প্রবন্ধে সমস্ত কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সম্প্রতি রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের প্রথম খেলায় বাঙলা ও আসাম দল এক ইনিংসে ও ১৮৫ রাণে প্রতিপক্ষ বিহার দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছে। রণজি প্রতিযোগিতায় এই পর্য্যন্ত বিহার দল যতবার বাঙলা ও আসাম দলের সহিত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে, ততবারই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং বাঙলা ও আসাম দলের এই সাফল্যে আশ্চর্য্য হইবার বা উল্লাস করিবার মত কিছুই নাই। উল্লাস করা উচিত নহে এইজন্যই যে, এইবারের বিহার দলকে একটি চতুর্থশ্রেণীর ক্রিকেট দল ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যে স্থান দেওয়া যায় না। এই দলের ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—সকল বিষয়েই নিম্নস্তরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অতএব এই দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া বাঙলা ও আসাম দলের খেলোয়াড়গণ যদি মনে মনে ধারণা করেন যে, তাঁহারা ক্রিকেট খেলায় অভাবনীয় উন্নতি করিয়াছেন, তাহা হইলে মস্তবড় ভুল করিবেন। তাঁহাদের প্রকৃত শক্তি পরীক্ষা এই খেলায় হয় না।

উভয় দলের খেলোয়াড়গণ

বাঙলা দলঃ—জে এন ব্যানার্জ্জি (অধিনায়ক), কে ভট্টাচার্য্য, কে রায়, টি ভট্টাচার্য্য, এম দত্ত, বি মিত্র, নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি, এ জব্বর, এম ডবলিউ বেহরেন্ড, জি এফ কার্টার, পি এন মিলার।

বিহার দলঃ—কে ডি নারোজী (অধিনায়ক), এ চৌধুরী, এল এস কোয়েলহো, জি পার্ক, বিজয় সেন, বি কাপাদিয়া, এস চক্রবর্ত্তী, এম সেনগুপ্ত, ডি খাম্বাটা ও এস কোটস।

খেলার ফলাফল

বিহারঃ—প্রথম ইনিংস ১০৫ রাণ (বি সেন ২০, এস কে রায় ১৯, কে ডি নরোজী ৩৫ রাণ নট আউট। জে এন ব্যানার্জ্জি ৩২ রাণে ৪টি, বি মিত্র ৩৩ রাণে ২টি, কে ভট্টাচার্য্য ২৫ রাণে ৩টি, টি ভট্টাচার্য্য ৪ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন)।

বাঙলা ও আসামঃ—প্রথম ইনিংস (৩ উইঃ) ৩৬৬ রাণ। এস ডবলিউ বেহরেন্ড ৩৫, পি মিলার ৩৫, এ জব্বর ১০৮, এন চ্যাটার্জ্জি ১৪১ রাণ আউট। ডি খাম্বাটা ৮০ রাণে ২টি, এম সেনগুপ্ত ২৭ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন)।

বিহারঃ—দ্বিতীয় ইনিংস ৭৬ রাণ (কোয়েলহো ১০, বি সেন ১৪, কে নারোজী ১৩। এস দত্ত ১১ রাণে ৪টি, কে ভট্টাচার্য্য ১৮ রাণে ৪টি, টি ভট্টাচার্য্য ১১ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন)।

(বিহার এক ইনিংস ১৮৫ রাণে পরাজিত হইয়াছে)।
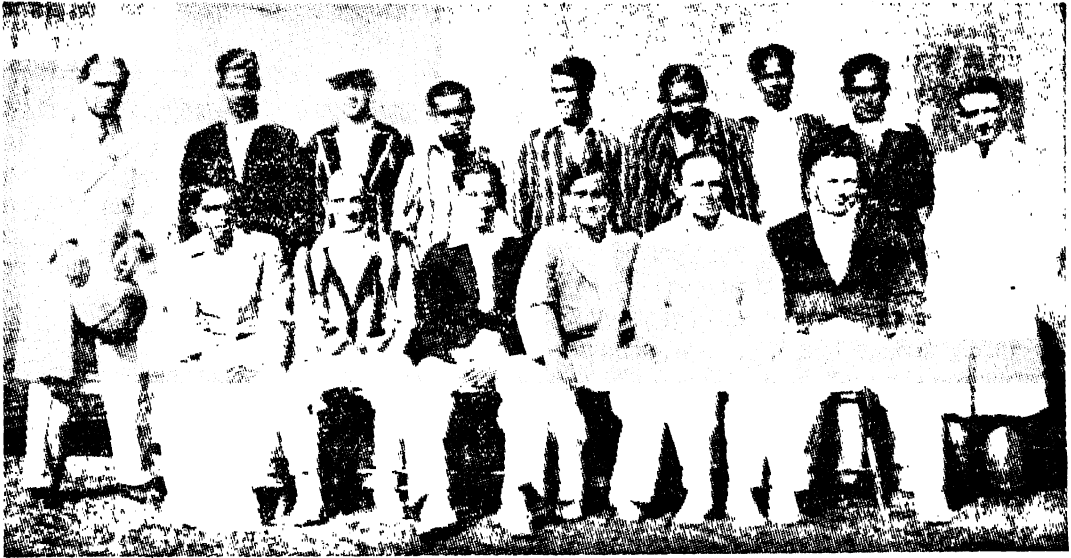
রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিহার দলের বিপক্ষে বাঙলা ও আসাম দলের খেলোয়াড়গণ

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

গত ৫ই ডিসেম্বর বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। মুসলীম দল দ্বিতীয় বৎসরেও এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়াছে। হিন্দু দল ফাইনালে ৬ উইকেটে পরাজিত। মুসলীম দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয়।

মুসলীম দলের সাফল্যের কারণ

মুসলীম দলের খেলোয়াড়গণের একতা ও একাগ্রতাই এই সাফল্য আনয়ন করিয়াছে। কি ফিল্ডিং, কি ব্যাটিং কোন বিভাগেই খেলোয়াড়গণের শৈথিল্য দেখা যায় নাই। প্রত্যেক খেলোয়াড় দলগত-স্বার্থের কথা স্মরণ করিয়া নিজ নিজ নৈপুণ্য প্রদর্শনে প্রাণপাত যত্ন করিয়াছেন। আন্তরিক ইচ্ছা যেখানে প্রবল সেখানে সাফল্য আসিবেই। এইজন্য নিশারের বোলিংএ পূর্ব্ববর্ত্তী খেলাগুলি সাফল্যমণ্ডিত না

হইলেও এই খেলায় বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। সৈয়দ আমেদ ও আমীর ইলাহির ব্যাটিং ও বোলিং খুবই সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। এইজন্যই মুসলীম দল জয়লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

নাইডু ভ্রাতৃদ্বয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য

হিন্দু দলের সকল খেলোয়াড়ের মধ্যে নাইডু ভ্রাতৃদ্বয় অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যকরী বোলিং ও দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের কথা পেণ্টাঙ্গুলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। দলের সকল খেলোয়াড় যখন ভীত, সন্ত্রস্ত, নাইডু ভ্রাতৃদ্বয় তখন অচল অটল। হিন্দু দলের প্রথম ও দ্বিতীয় দুই ইনিংসেই তাঁহারা ব্যাটিং ও বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

হিন্দু দল পরাজিত হইয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় শেষ-খেলোয়াড় পর্য্যন্ত যেরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন সেইরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে ইতিপূর্ব্বে পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট খেলায় কখনও দৃষ্ট হয় নাই। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় যেরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই দৃঢ়তা যদি তাঁহারা প্রথম ইনিংসেও প্রদর্শন করিতেন তবে মুসলীম দলের পক্ষে পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় জয়লাভ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে সুতরাং আশানুযায়ী ফলাফল দেখিবার কল্পনা করাই ভুল।

উভয় দলের খেলোয়াড়গণ

মুসলিম দলঃ—উজীর আলী (অধিনায়ক), মুস্তাক আলী, এস এম কাদ্রি, কে ইব্রাহিম, নাজির আলী, আব্বাস খাঁ, সৈয়দ আমেদ, মহম্মদ নিশার, সাহাবুদ্দিন, আমীর ইলাহি ও মুবারক আলী।

হিন্দু দলঃ—মেজর নাইডু (অধিনায়ক), সি এস নাইডু, অমর সিং, এস ব্যানার্জ্জি, ডি হিন্দেলকার, বিয়ু মানকড়, পৃথ্বিরাজ, এন পি জয়, পি জে চুরী, নিম্বলকার ও রোশনলাল।

খেলার ফলাফলঃ—

হিন্দু দলঃ—প্রথম ইনিংস ৬৯ রাণ (মেজর নাইডু ২৫, সি এস নাইডু ১০, এস ব্যানার্জ্জি নট আউট ১৪ রাণ। নিশার ২০ রাণে ৫টি, সৈয়দ আমেদ ১২ রাণে ৪টি ও সাহাবুদ্দিন ১৪ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন)।

মুসলীম দলঃ—প্রথম ইনিংস ৩৪০ রাণ (মুস্তাক আলী ২৭, কাদ্রি ৬৫, উজীর আলী ৩০, সৈয়দ আমেদ ৭৬, আমীর ইলাহি ৯৬। সি এস নাইডু ১০৯ রাণে ৭টি, মেজর নাইডু ৮৭ রাণে ৩টি উইকেট পাইয়াছেন)।

হিন্দু দলঃ— দ্বিতীয় ইনিংস ৩৭৭ রাণ (মানকড় ৩২, মেজর নাইডু ৬৬, জয় ৪৩, সি এস নাইডু ৭৫, পৃথিবরাজ ৬৫, নিম্বলকার ২৩, চুরী ১৯ নট আউট। নিশার ১০৬ রাণে ২টি, আমীর ইলাহি ১২৫ রাণে ৫টি, মুবারক আলী ৩৬ রাণে ১টি ও সাহাবুদ্দিন ৫৪ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন)।

মুসলীম দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস (৪ উইঃ) ১০৭ রাণ (মুস্তাক আলী ২২, নাজীর আলী ৪৪ নট আউট। অমর সিং ৪৭ রাণে ২টি, সি এস নাইডু ২৭ রাণে ১টি, মেজর নাইডু ২৪ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন)।

(হিন্দু দল ৬ উইকেটে পরাজিত)।

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে মুসলীম দল ৯৭ রাণে ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করে। এই খেলায় উভয় দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপীয় দল পরাজিত হইলেও শেষ সময়ে ব্যাটিংয়ে অসাধারণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে সামারহেজ ও ডাউসনের খেলা উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসে সামারহেজ ও ডাউসনের খেলা উল্লেখযোগ্য।

মুস্তাক আলী ও উজীর আলী

এই খেলায় মুস্তাক আলীর প্রথম ইনিংসে ১৫৭ রাণ বোম্বাই ক্রীড়ামোদিগণের প্রাণে অনেকদিন জাগরূক রহিবে। দলের সকল খেলোয়াড় যখন একের পর এক অল্প রাণে বিদায় গ্রহণ করিতেছে মুস্তাক আলী তখনও বিচলিত না হইয়া খেলিয়াছেন। ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে মুস্তাক আলী যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন সেইরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন, এইরূপ খেলোয়াড় ভারতে বিরল।

উজীর আলীর খেলা যে একেবারে পড়িয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ তিনি দ্বিতীয় ইনিংসে ১১২ রাণ করিয়াছেন। এই দিনকার খেলায় তিনি পূর্ব্ব নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

উভয় দলের খেলোয়াড়গণ

মুসলীম দলঃ—উজীর আলী (অধিনায়ক) এস এম কাদ্রি, মুস্তাক আলী, আব্বাস খাঁ, নাজির আলী, দিলওয়ার হোসেন, আমীর ইলাহি, সৈয়দ আমেদ, ইব্রাহিম, মুবারক আলী, নিশার।

ইউরোপীয় দলঃ—এইচ এল মারে (অধিনায়ক) সি ই ইণ্ডার, সামারহেজ, ডাউসন, টিউ, ওয়েন্সলী, মস, ফিলপট-ব্রুকস, কিড, উইলসান, অর্টন।

খেলার ফলাফলঃ—

মুসলীম প্রথম ইনিংস ২৪৬ রাণ (মুস্তাক আলী ১৫৭, কাদ্রি ৩৫, আমীর ইলাহি ২৩ নট আউট। অর্টন ৫১ রাণে ৭টি, ওয়েন্সলী ৮৪ রাণে ২টি, ডাউসন ৪০ রাণে ১টি উইকেট পান)।

ইউরোপীয়ান প্রথম ইনিংস ১৭২ রাণ (সামারহেজ ৩১, ওয়েন্সলী ৫০, কিড ১৯। মুবারক আলী ২৯ রাণে ৪টি, আমীর ইলাহি ৫৭ রাণে ৩টি, নাজির আলী ১৯ রাণে ১টি, নিশার ৩৯ রাণে ১টি উইকেট পান)।

মুসলীম দ্বিতীয় ইনিংস ২৭২ রাণ (মুস্তাক আলী ২৮, উজীর আলী ১১২, নাজির আলী ৪৭, ইব্রাহিম ৩২। মারে ৬৪ রাণে ২টি, ডাউসন ৫৪ রাণে ২টি, অর্টন ৮১ রাণে ২টি, ওয়েন্সলী ৫৯ রাণে ৪টি উইকেট পান)।

ইউরোপীয়ান দ্বিতীয় ইনিংস ২৪৯ রাণ (সামারহেজ ৫৪, ডাউসন ৫০, টিউ ৪৩, উইলসান ৩৪। সৈয়দ আমেদ ৪৮ রাণে ৪টি, আমীর ইলাহি ৮২ রাণে ৫টি, মুবারক আলী ৪২ রাণে ১টি উইকেট পান)।

(ইউরোপীয় দল ৯৭ রাণে পরাজিত)।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৯শে নবেম্বর—

যশোহরে রাজনৈতিক সম্মেলনে হাঙ্গামার ফলে নিহত নরেশচন্দ্র সেনের মৃত্যু সম্পর্কিত মামলায় যশোহর জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রায় এবং অপর তিন ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪।৩৪ ধারা (অনিচ্ছাকৃত হত্যা) এবং ১৪৭ ধারা (দাঙ্গা) অনুযায়ী সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারে তাঁহারা খালাস পাইয়াছেন।

হাওড়া জেলার ওদণ্ড নামক গ্রামে এক নৃশংস ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এই ডাকাতির ফলে উক্ত গ্রামের একটি যুবক নিহত হইয়াছে। যুবকের পীড়িত বৃদ্ধ পিতা এই আকস্মিক আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ঘটনার পরদিন মারা গিয়াছেন।

হায়দরাবাদ রাজ্যের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের প্রার্থনাগৃহে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গাহিবার অপরাধে প্রায় একশত হিন্দুছাত্র কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে ছাত্রাবাস ত্যাগ করিয়া যাইতে বলা হইয়াছে।

রাজনন্দগাঁও-এর কর্ত্তৃপক্ষ রাজনৈতিক সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহা অমান্য করিবার উদ্দেশ্যে ষ্টেট কংগ্রেস সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত দুইদল সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইয়াছে; প্রত্যেক দলে তিনজন করিয়া সত্যাগ্রহী ছিলেন।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ঢেনকানল রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

মাননীয় স্যার সাদিলাল স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ার দরুন্ প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর চারি বৎসরকাল তিনি এই পদে কাজ করিতে-ছিলেন।

বোম্বাই সরকার গ্রামাঞ্চলে দুইশত ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহারা গ্রামের গরীব অধিবাসীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিবেন।

দিল্লীতে ভারতের কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রী-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

ভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত লক্ষ্মৌয়ের বিদ্যান্ত হাই-স্কুলকে তাঁহার সমগ্র গোপালভিলার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এই সম্পত্তির মূল্যে এক লক্ষ টাকা হইবে।

প্যালেষ্টাইনে হাইফার দক্ষিণে আরবদের সহিত বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে ২৬ জন আরব নিহত হইয়াছে।

৩০শে নবেম্বর—

জুট অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে বঙ্গায় চটকল মজদুর ইউনিয়ন ব্যাপক ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত করায় নৈহাটী, রাজগঞ্জ প্রভৃতি চটকলের শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্ম-ঘটকারী শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার হইবে। নৈহাটীতে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে।

বাঙলা দেশে আগামী বৎসরের জন্য সংগৃহীত কংগ্রেস সভ্যের মোট সংখ্যা ৪ লক্ষ ৯১ হাজার ১ শত ৩৬ জন হইয়াছে।

রংপুর মিউনিসিপ্যালিটি নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থিগণ মোট ১২টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহারা ১১টি আসন অধিকার করিয়াছেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের আরও তিনজন মুসলমান সদস্য কংগ্রেসী কোয়ালিশন দলে যোগদান করিয়াছেন। ইহাতে কংগ্রেসী কোয়ালিশন দলের আরও শক্তি বৃদ্ধি হইল।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের একবিংশতিতম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর অশীতিতম জন্মোৎসব বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্যার নীলরতন সরকার এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

রাজকোটের প্রজা আন্দোলন সম্পর্কে আপোষ-নিষ্পত্তির আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। রাজকোটের দেওয়ান স্যার প্যাট্রিক কডেল ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে ভবনগরের দেওয়ান মিঃ অনন্তরায় পট্টনির মধ্যস্থতায় আপোষ-আলোচনা চলে। অনন্তরায় পট্টনি এ বিষয়ে মহাত্মার সহিত দেখা করিয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন—সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া মহাত্মা রাজকোট প্রজা আন্দোলন সম্পর্কে আপোষ-নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার আদর্শ অবলম্বনে রচিত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সর্ত্তে আপোষ-প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন। রাজকোটের দেওয়ান মহাত্মার রচিত উক্ত আপোষ-প্রস্তাব গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের জন্য হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রাবাসের হিন্দুছাত্রদিগকে বিতাড়িত করিয়াছেন—ইহার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হিন্দুছাত্রেরা একযোগে ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

রুমানিয়ার ফ্যাসিষ্ট আয়রন্ গার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন দলপতি ক্যাপ্টেন কডরেনুকে কারাগার হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করার সময় গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

ফ্রান্সে ব্যাপক ধর্ম্মঘটের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। প্যারিসে ৪৯৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৮(জনকে কাজকর্ম্মে বাধা দিতে চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেপ্তা করা হইয়াছে। নানাস্থানে ধর্ম্মঘটীদের সহিত রক্ষীদলে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক মঃ জুহো দাবী করেন যে, অদ্য প্রাতঃকালে প্যারিসে দুই ঘণ্টার জন্য যান-বাহন চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল এবং সরকারী কারখানাসমূহে মজুরগণ অবস্থান ধর্ম্মঘট করে। মঃ জুহো আরও দাবী করেন যে, খনির কার্য্য সম্পূর্ণ বন্ধ রহিয়াছে এবং ডকের সমস্ত শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে

১লা ডিসেম্বর—

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলই কর্তৃক গবর্ণরের নিকট সদস্যদের নাম দাখিলের পরই আসাম ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনে সরকার-বিরোধী দল মন্ত্রিসভার পাঁচজন সদস্যের বিরুদ্ধে ৫৬টি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দাখিল করিয়াছিলেন এবং অদ্যকার মুলতুবী অধিবেশনে তৎসম্পর্কে আলোচনার দিন ধার্য্য হইয়াছিল। সেজন্য বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। কোয়ালিশন দলের ৫৫ জন এবং অপর পক্ষে ইউনাইটেড পার্টির ৪৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া সরকার-বিরোধী দল তাহা উত্থাপন করেন নাই। সরকার-বিরোধী দলের নেতা স্যার সাদুল্লা পরিষদকে জানান যে, তাঁহারা পরে পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই একটি নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

গত ২রা মার্চ্চ তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় মেদিনীপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা সম্পর্কিত এক সংবাদ প্রকাশের দরুন অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে কে বিশ্বাস রাজদ্রোহের অভিযোগে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ছয় মাস এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইলে বিচারপতি মিঃ বার্টলি এবং বিচারপতি মিঃ হেণ্ডারসন উক্ত দণ্ড নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দী হরেন্দ্রনাথ মুন্সীর মৃত্যু সম্পর্কে কলিকাতা এলবার্ট হলের এক জনসভায় শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন ('আনন্দবাজার পত্রিকা'র ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা'র জেনারেল ম্যানেজার) যে বক্তৃতা করেন, তাহা রাজদ্রোহমূলক হইয়াছে—এই অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্ত শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেনকে চার মাস সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ২৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আপীলে হাইকোর্ট উক্ত দণ্ড হ্রাস করিয়া এক হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন:—"আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে আমাদের চরম সিদ্ধান্ত জানাইবার এবং জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পরিপূরণের জন্য একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিবার শুভ মুহূর্ত্ত প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পূরণ করিতেই হইবে। কিন্তু এই সময় কোনক্রমেই সুদীর্ঘ হইতে পারে না—হয় ত এক মাস, কিম্বা দুই মাস—বড় জোর ছয় মাস সময় দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের দাবী যদি উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে ভারত হইতে বৈদেশিক শাসন সমূলে উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বত্র সুনিয়ন্ত্রিত গণ-আন্দোলনের জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত থাকিব এবং যাহাতে শাসন ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে আমাদের হাতে আসে তজ্জন্য শাসনতন্ত্র বিকল করিতে প্রয়াস পাইব।"

ভূতপূর্ব্ব কৃষক-নেতা মঃ রুডলফ বেরানের নেতৃত্বে চেকোশ্লোভাকিয়ায় নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। মঃ স্বালকোভস্কি পররাষ্ট্র সচিবই থাকিবেন। জেনারেল সিরোভি দেশরক্ষা সচিব হইয়াছেন।

২রা ডিসেম্বর—

'বোম্বে ক্রনিকেল্' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধি মিঃ সুন্দর কাবাদী এবং লক্ষ্ণৌয়ের "নেশন্যাল হেরাল্ড" পত্রিকার প্রতিনিধি মিঃ ফিরোজ গান্ধী সংবাদপত্রে ব্যাপক ধর্ম্মঘটের বিবরণের জন্য প্যারিসে গমন করিলে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। পররাষ্ট্র সচিব মঃ সারাউতের আদেশক্রমে তাহাদিগকে প্যারিস হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

অদ্য শেষ রাত্রে ৪টা ১০ মিনিটের সময় ভারতের ঋষিকল্প জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতার ল্যান্সডাউন রোডস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার আপীলের শুনানীর সমালোচনা করিয়া "রাণী-সন্ন্যাসী লড়াই" শীর্ষক একখানি ইস্তাহার প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হন। হাইকোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চ আসামীর উপর তিন মাস দেওয়ানী ফাটকের আদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ডব্লিউ আর ইলিয়ট বিদায় গ্রহণ করায় মিঃ জে এম দত্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙালী এই পদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

আউন্ধের রাজকুমার ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। আউন্ধ দেশীয় রাজ্যের জন্য শাসন-সংস্কারের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে মহাত্মাজীর সহিত রাজকুমারের আলোচনা হয়।

মধ্যপ্রদেশ মোটর স্পিরিট ও মোটর তেল আইন সংক্রান্ত মামলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে রায় দিয়াছেন। বিচারপতিগণ এই রায় দিয়াছেন যে, মধ্যপ্রাদেশিক আইন-সভা মোটর স্পিরিট ও মোটরের তেল বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া যে বিল প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা প্রাদেশিক আইন-সভার ক্ষমতা বহির্ভূত কার্য্য হয় নাই। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কোন পণ্যের উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করুন বা না করুন, প্রাদেশিক গর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এলাকার মধ্যে সেই পণ্যের খুচরা বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিতে পারিবেন।

জুট অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে হাওড়া, ব্যারাকপুর মহকুমার বিভিন্ন চটকলের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ক্রমেই বিস্তারলাভ করিতেছে। শাঁকরাইল থানায় ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে, ধর্ম্মঘট সম্পর্কে কয়েকজন শ্রমিক কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে সরকার বিরোধী দল ১৪টি

মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্পীকার ৬টি মুলতুবী প্রস্তাব বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন। সময় অভাবে অপরগুলিও বাতিল হইয়া যায়।

মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত রাজা গোপালাচারী মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে মালাবার মন্দির প্রবেশ বিল পেশ করেন। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সিপাহী যুদ্ধের সময় গর্ডন হাইল্যান্ডের সেনাদলের নিহত একজন কর্ম্মচারী ও ২২ জন সৈনিকের স্মৃতিরক্ষার্থ যে মর্ম্মরফলক দিল্লী হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বাদলী-কী-সরাই নামক স্থানের গোরস্থানে স্থাপিত হইয়াছে, প্রধান সেনাপতি তাহার আবরণ মোচন উপলক্ষে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে এবং মর্ম্মর ফলকে খোদিত লিপিতে নিহত ব্যক্তিদের সহিত যে-সকল ভারতবাসী যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে "বিদ্রোহী" বলিয়া বর্ণনা করায় ভারতের অবমাননা করিয়াছে এবং ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারিত হইবে বলিয়া কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ গবর্ণমেন্টের নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে অদ্য কেন্দ্রীয় পরিষদে যে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বিনা ডিভিসনে পাশ হইয়াছে। কংগ্রেস জাতীয় দল এবং মুসলিম লীগ দল প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

হায়দরাবাদে সেনাপতি বাপাত ও ২২ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ব্রিটিশ ভারত হইতে কেহ যাহাতে হায়দরাবাদ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিবশত স্বেচ্ছায় উহাতে যোগদান করিতে না পারে, তজ্জন্য হায়দরাবাদ রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী ষ্টেশনসমূহে পুলিশ কড়া নজর রাখিতেছে।

হায়দরাবাদের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ষ্টেট কংগ্রেসের একাদশ ডিক্টেটার শ্রীযুক্ত রামরেড্ডী ও তাঁহার ৪ জন সহকর্ম্মীকে মুক্তি দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রেড্ডী নিজাম পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসী সত্যাগ্রহীদের নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদনে স্বাক্ষর লইবার জন্য পুলিশ তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে লাঠিদ্বারা প্রহার করিয়াছে এবং অকথ্য নির্য্যাতন করিয়াছে।

৩রা ডিসেম্বর—

হুগলী জেলার বড়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিনিধি ও দর্শক —মোট প্রায় ১০ হাজার লোক সম্মেলনে যোগদান করেন।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ চৌধুরী ও অপর এগারজন ঢেনকানল রাজ্যে সত্যাগ্রহ চালাইবার উদ্দেশ্যে মেরামেণ্ডালী ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিলে তাঁহাদের উপর ১৪৪ ধারা জারী হয়। ঐ আদেশ অমান্য করিলে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সীমান্ত পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য মিঞা জাফর শা স্বীয় দল এবং দলপতির অনুমোদন সাপেক্ষে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সদস্য পদে ইস্তফা দিয়াছেন।

মর্দ্দাণের উকীল মিঃ সমিজুল খাঁ কংগ্রেসের টিকিটে সীমান্ত পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সম্প্রতি প্রকাশ্য-ভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবার অভিযোগে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহার কংগ্রেসের সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ফ্রান্সে সাধারণ ধর্ম্মঘটের আদেশ দেওয়ায় এবং তাহাতে অংশ গ্রহণ করায় দালাদিয়ের গবর্ণমেণ্ট প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত নেতৃবৃন্দ ও মজুরগণের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ফরাসী ট্রেড ইউনিয়নের প্রবীণ নেতা মঃ জুয়োকে 'ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স'এর রিজেণ্টের পদ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পাদক-গণকে সরকারী রেলওয়ে বোর্ড হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

৪ঠা ডিসেম্বর—

মহাত্মা গান্ধী হরিজন পত্রিকায় দেশীয় রাজ্য ও প্রজাবৃন্দ শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে মহাত্মাজী লিখিয়াছেন যে, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এই পর্য্যন্ত কংগ্রেস যে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল, তিনিই উক্ত নীতির জন্য দায়ী। দেশীয় রাজ্যে যে প্রকার অন্যায় অবিচার চলিতেছে, এই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে আর কংগ্রেসের নিরপেক্ষ নীতি সমর্থন করা অসম্ভব হইবে। যদি কংগ্রেস মনে করেন যে, দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা করিবেন।

দিল্লীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের একদিন ব্যাপী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ বাধিলে ব্রিটেনকে সাহায্য করা হইবে বলিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় স্যার সেকেন্দার হায়াত খাঁ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া এই অধিবেশনে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। স্যার সেকেন্দার হায়াত খাঁ এই প্রস্তাবের একটি জোরালো উত্তর দিলে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হয়।

কানপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তিনটি মাত্র অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র শহরে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। ইহাতে শহরে চাঞ্চল্যকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

করাচীতে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্সের সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। রাষ্ট্র-পতি বসু সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশনে সিন্ধুর মন্ত্রিসংকট সম্পর্কে আলোচনা হইবে। সিন্ধুর গবর্ণরের সহিত প্রধান মন্ত্রীর অদ্য যে আলোচনা হইয়াছে তৎসম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। গবর্ণর কর-ধার্য্য প্রস্তাব সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্সের সহিত এক-মত হইতে পারেন নাই।

জার্ম্মানীতে ইহুদী দলন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বার্লিনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, থিয়েটার, বায়স্কোপ, খেলার মাঠ প্রভৃতি স্থানে জার্ম্মানীর ইহুদীগণের অবাধ গতিবিধি নিষিদ্ধ করিয়া আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, ইহুদী নর-নারী যখন পথে বাহির হইবে তখন তাঁহাদিগকে পীত বর্ণের ব্যাজ ধারণ করিবার জন্য বাধ্য করিতে শীঘ্রই এক আদেশ জারী করা হইবে। জার্ম্মান গুপ্ত পুলিশ

বিভাগের প্রধান কর্ত্তা যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহাতে ইহুদীগণকে সর্ব্বপ্রকার মোটর চালাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, অতঃপর জার্ম্মান ইহুদীরা আর মোটর গাড়ী কিম্বা সাইকেল রাখিতে পারিবেন না।

প্যালেষ্টাইনের ২৫জন আরব নেতা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইহারা ৪৫টি গ্রাম এবং ৭০ হাজার আরবের পক্ষ হইতে কার্য্য করিতেছেন।

৫ই ডিসেম্বর—

'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে'র বাণিজ্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রমোহন গুহ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দুই মাসকাল ফুসফুসের স্ফোটকে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর হইয়াছিল।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে সরকার-বিরেধী দলের পরাজয় ঘটে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর (কংগ্রেস কোয়ালিশন) আসামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাহিয়ানার একটা সর্ব্বনিম্ন হার স্থির করিয়া দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিলে শ্রীযুক্ত কর প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে চাহেন। সরকার-বিরোধী দল প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে দিতে অস্বীকার করেন এবং ডিভিসন দাবী করেন। কংগ্রেস দলের পক্ষে ৫২ ভোট এবং বিরোধী দলের পক্ষে ৪৬ ভোট হয়।

রাজকোট প্রজা-পরিষদ বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে।

উড়িষ্যা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহীকে ঢেনকানল সত্যাগ্রহ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহাকে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

হাওড়ার অন্তর্গত রাজগঞ্জের ন্যাশনাল জুট মিলের শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সহিত মিলের কাজে যোগদানেচ্ছু শ্রমিকদের ও মিলের দারোয়ানদের এক সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে প্রায় ২৫জন শ্রমিক আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১২জনকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়; তন্মধ্যে দুইজন শ্রমিকের অবস্থা গুরুতর বলিয়া প্রকাশ। এই দাঙ্গা সম্পর্কে উভয় পক্ষের ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নৈহাটী চটকলে ধর্ম্মঘট করার চেষ্টা করায় গত ১লা ডিসেম্বর যে ১৩ জন ধর্ম্মঘটী শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহাদিগেক বিচারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডিত করা হইয়াছে।

নৈহাটী ও টিটাগড় অঞ্চলে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ফলে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। জগদ্দলে সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

হাওড়ার মহকুমা হাকিম হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার এলাকা মধ্যে দুই মাসকাল প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া বঙ্গীয় চটকল মজদুর সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জ্জির উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চন্দ অবিলম্বে সমুদয় রাজনৈতিক কয়েদীকে মুক্তি দিবার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে প্রধান মন্ত্রী বড়দলই ঘোষণা করেন যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিবার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী বিশেষ ব্যগ্র। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু সিন্ধুর বিভিন্ন অঞ্চল সফর করিতেছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে জনসভায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

মাদ্রিদ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, বিদ্রোহীদের ১১টি বিমানপোত ভ্যালেন্সিয়ার পশ্চিম ও উত্তর দিকস্থ চারিটি শহরে বোমা বর্ষণ করে। ফলে, ১১ জন নিহত ও ২২ জন আহত হইয়াছে।

টোকিও হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, গত ৩রা ডিসেম্বর জাপানীরা ক্রমান্বয়ে তিনবার চুংসেংএ বিমান আক্রমণ চালায় এবং সেখানকার সমর-বিভাগীয় কার্য্যালয়গুলির উপর প্রচণ্ডভাবে বোমা বর্ষণ করে। ইহার ফলে, রুশিয়ার সহিত চীনের সংযোগকারী রাস্তা গুরুতর বিপন্ন হইবে বলিয়া জাপানীরা দাবী করিতেছে।

ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য জার্ম্মানীর পররাষ্ট্র-সচিব হের ভন রিবেনট্রপের প্যারিস যাত্রার প্রাক্কালে ইটালী ফ্রান্সের নিকট এক নূতন দাবী উত্থাপন করিয়াছে। পুরাতন ইতিহাস ঘাঁটিয়া ইটালী ফরাসী টিউনিসিয়ার উপর তাহার অধিকার প্রমাণের চেষ্টা করিতেছে এবং ফ্রান্সের সহিত কোন রকম মিটমাটের পূর্ব্বে এই নূতন ভূমধ্যসাগরীয় সমস্যা সমাধান করিয়া লইবার জন্য জিদ ধরিয়াছে। এদিকে জার্ম্মানী আবার ইটালীর দাবী সমর্থন করিয়াছে। জাপানও ইটালীর উৎসাহে ইন্ধন যোগাইতেছে। ফলে ইউরোপীয় পরিস্থিতি পুনরায় জটিল হইয়া উঠিয়াছে। বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মানী—এই চারিটি ধনিক শক্তিকে একত্রিত করিবার যে সুখস্বপ্ন মিঃ চেম্বারলেন দেখিতেছেন, তাহা আবার ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইটালীর নব-প্রেমিক ব্রিটেনের মনোভাব স্পষ্ট কিছু জানা যাইতেছে না। তবে মনে হয়, টিউনিসিয়ার ইটালীয় অধিবাসীগণকে ব্যাপক অধিকার দানে সম্ভবত আপত্তি করিবে না; কিন্তু ইটালী যদি ফ্রান্সের রাজ্যে ভাগ বসাইতে চায়, তাহা হইলে ফ্রান্সের পক্ষ লইয়া বিরোধিতা করিবে। টিউনিসীয়গণ জানাইয়াছে যে, তাহারা ফ্রান্সের প্রতি আনুগত্যে অটল থাকিবে। কর্সিকা সম্বন্ধেও ইটালীর দাবী আছে। কিন্তু কর্সিকানগণ ইটালীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিযুক্ত আন্তর্জ্জাতিক সামরিক কমিশনের বিবৃতিতে প্রকাশ, আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ হাজারের অধিক বিদেশী স্বেচ্ছাসৈন্য গণতন্ত্রী স্পেনের কাটালান অঞ্চল ত্যাগ করিবে।

নূতন

যদি সরেস কাপড়
চান, এ মার্কার
খোঁজ করুন

এ দুটো গুণের জন্য মহালক্ষ্মী বিখ্যাত। মিহি অথচ শক্ত সূতো আমাদের বহু অভিজ্ঞতার ফল। বিচিত্র হরেক রকম পাড়—আমাদের বৈশিষ্ট্য। এবার থেকে ধুতি কিম্বা শাড়ী কেনবার সময় মহালক্ষ্মীর 'পদ্ম মার্কা' দেখে নেবেন।

মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টস্ : এচ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ। ১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

MCK 4.

আর্ট জুয়েলারী হোম

৫৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন—(৫৬৩২) বড়বাজার

একমাত্র গিনি সোনার অলঙ্কার ও চাঁদির বাসন নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা

বিবাহ ও অন্নপ্রাশনে প্রিয়জনকে উপহার দিবার মত কমমূল্যের আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার তৈয়ারী মজুত থাকে বা অর্ডার দিলে যথা সময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়। পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা তৈয়ারী করিয়া দিই।

আমাদের অলঙ্কার ব্যবহারান্তে ফেরৎ দিলে পানমরা বাদ না দিয়া সোনার মূল্য সময়োচিত ফেরৎ দিই।

ভারত পতাকা করণ ফ্লাওয়ার

শিশুর খাদ্য — রোগীর পথ্য

এস, কে, দাস

১৬-বি, ঠাকুর ক্যাসল স্ট্রীট, কলিকাতা

দেখুন ডাক্তারবাবু, অন্য কোন রোগই নেই,··· অথচ সব সময়েই খুব ক্লান্ত মনে হয়।

বুঝেছি অবনীবাবু, আপনার রোগ প্রত্যুষের দুর্ব্বলতা। অর্থাৎ রাত্রির ঘুমে সচরাচর দিনের যে প্রণষ্ট জীবনী শক্তি পূরণ হয়, তা আপনার হচ্ছে না। রোজ শোবার আগে এক পেয়ালা "হরলিক্স" ব্যবহার করুন। এতে আপনি নূতন জীবনীশক্তি পাবেন।

সেই থেকে হরলিক্স প্রতিরাতে

বাঃ খেতে ত বেশ দেখছি, যদি ভাল করে মেশান হয়।

ছ মাস পর

আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি অবনীবাবু। আপনার কাজে খুশী হ'য়ে কোম্পানী আপনাকে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যানেজার করেছে।

চিন্তা। এত দিনে দুশ্চিন্তার অবসান হ'ল। কী চমৎকার জিনিষই না হরলিক্স।

অল্প মূল্যে বিশেষ সুযোগ!

মিক্সারের মধ্যে তৈরী করিলে হরলিক্স আরও সুস্বাদু হয়। হরলিক্সের মোড়কের উপরের চাকতি সহ আট আনার (বড় মিক্সারের জন্য) বা চারি আনার (ছোট মিক্সারের জন্য) ডাক টিকিট পোঃ বক্স ২২২৯ কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠান।
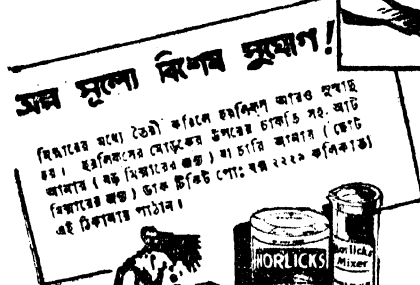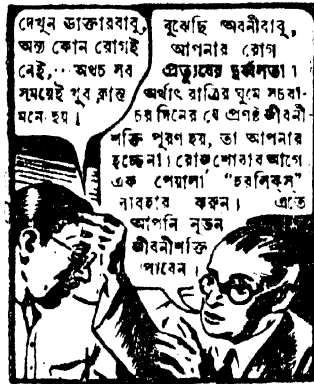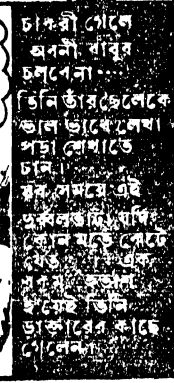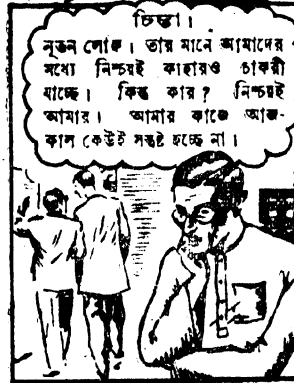
ব্যবহার করুন; রাতে ঘুম হবে আর ঘুম থেকে জাগবেন সারা-দিনের কাজের উপযোগী পর্য্যাপ্ত শক্তি নিয়ে।

৬ষ্ঠ বর্ষ। শনিবার ১লা পৌষ ১৩৪৫ সাল. 17th December 1938 [৮ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সামন্ত রাজ্যে গণ-আন্দোলন—

যুগের গতিকে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্র শাসন এ যুগে আর চলিবে না। যুগের হাওয়া ভারতের সামন্ত রাজ্যসমূহেও প্রবেশ করিয়াছে এবং সামন্তরাজ্যের অধিবাসীরাও শাসনব্যাপারে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী সামন্ত রাজ্যসমূহের শাসকদিগকে যুগের গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাসনাধিকার সম্প্রসারণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা কেহ হাতে পাইলে সহজে ছাড়িতে চায় না। ভারতের সামন্ত নৃপতিরাও তাহা সহজে ছাড়িতে চাহিতেছেন না, পক্ষান্তরে প্রবল দমননীতি অবলম্বন করিয়া প্রজাদের আন্দোলন পিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উড়িষ্যার কতকগুলি দেশীয় রাজ্য, ঢেনকানল, তালচের প্রভৃতিতে এবং হায়দরাবাদে ও রাজকোটে প্রকাশ্য দমননীতি চলিতেছে। জেল, জরিমানা এমন কি গুলী পর্যন্ত কয়েক জায়গায় চলিয়াছে। মানুষ কি অবস্থায় পড়িলে ভিটামাটির মায়া ছাড়িয়া বাহির হইতে পারে, সকলেই অনুমান করিতে পারেন। স্পেনে এবং চীনে এখন যে মহামারী কাণ্ড চলিতেছে তবু সেখানকার লোকেরা প্রাণের মায়ার জন্য ঘরবাড়ী ছাড়িতে পারিতেছে না; কিন্তু সামন্ত্য রাজ্যে কোথায় কোথায়ও এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, প্রজারা ঘরবাড়ী ছাড়িতে বাধ্য হইতেছে। উড়িষ্যার তালচের রাজ্য হইতে কয়েক হাজার অধিবাসী ব্রিটিশ ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে; হায়দরাবাদ সম্বন্ধেও শুনা যাইতেছে যে, সেখানকার বহু প্রজা ব্রিটিশ ভারতে আসিতে চাহিতেছে। রাজকোট রাজ্যে প্রজাদের অধিকার-প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেল এবং আমেদাবাদের কোটিপতি ব্যবসায়ী আম্বালাল সারাভাইয়ের কন্যা শ্রীমতী মৃদুলা বেন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। স্বাধীনতার সাধনা কোন স্থানেই সহজ নয়, ইহা আমরা জানি। দীর্ঘ পরাধীনতায় অভিভূত ভারতেও **তাহা সহজ হইবে না। সাধক যাঁহারা তাঁহাদিগকে দুঃখকষ্ট** বরণ করিয়া লইতে হইবেই। **কিন্তু একথা সত্য যে, তাঁহাদের** এই সাধনায় জয় সুনিশ্চিত। স্বেচ্ছাচারের শক্তি যতই উগ্র হউক না কেন, স্বাধীনতার আন্দোলনকে প্রতিহত করিতে সক্ষম হয় না; ভারতেও হইবে না। ভারতের সামন্ত রাজারা যদি ইহা বুঝিতে না পারেন এবং তাহার গতিকে রুদ্ধ করিতে চাহেন, তাঁহারা নিজেদের সর্ব্বনাশ **নিজেরাই ডাকিয়া** আনিবেন।

গান্ধীজী ও কমিউনিষ্ট দল—

কংগ্রেসের কোন কমিউনিষ্ট সদস্যের সহিত মহাত্মা গান্ধীর সম্প্রতি কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা হয়। আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল হিংসা এবং অহিংসা। কমিউনিষ্টদের পক্ষ হইতে উক্ত সদস্য বলেন,—"এ দেশে যদি কোন জন-আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হয়, তবে সে ক্ষমতা কংগ্রেসেরই আছে, আমরা সেই দিক হইতেই কংগ্রেসে যোগদান করিতেছি। যদি আমরা জনগণের অন্তরের সঙ্গে যোগদান না করিয়া চলিতে চাই, আমাদের ঠাঁই মিলিবে না। আমরা নীতি সম্পর্কে বিশেষ কোন একটা সংস্কারবদ্ধ নই। আমাদের মতলব যেমনই হউক না কেন, আমরা কি করি, তাহা ধর্ত্তব্য। আমরা হিংসা চাহি না। এ কথা সত্য যে, অহিংসাকে আমাদের দলের নীতি স্বরূপে গ্রহণ করি নাই। সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায় অহিংস থাকিতে হইবে, আমরা এরূপ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ নহি; কিন্তু আপাতত আমরা হিংসার কোন প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং আমাদের নীতিতে কংগ্রেসের নীতিতে আপাতত কোন পার্থক্য নাই। আমাদের দলের উপর সরকারী নিষেধ বিধি বলবৎ থাকিতে আমাদিগকে বর্ত্তমানে বাধ্য হইয়া গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্বরূপে কাজ করিতে হইতেছে। যদি ঐ নিষেধবিধি প্রত্যাহার করা হয়, গোপনীয়তার প্রয়োজনও চলিয়া যাইবে। আমরা আর সকলকে শুধু এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা যদি ভবিষ্যতে অহিংসার নীতিকে পরিত্যাগ **করি তাহা হইলে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিব।" রাজ-**

নীতির কারবার বর্ত্তমান বাস্তবকে লইয়া, ভারতের কম্যুনিষ্টগণ বর্ত্তমানের মত অহিংস নীতিকে গ্রহণ করিতেছেন এবং তাঁহারা বলিতেছেন যে, কংগ্রেসের নীতিকেই তাঁহারা সমর্থন করিবেন, এরূপ ক্ষেত্রে যে বিরোধ শুধু মনের ভাবগত, কার্য্যগত নয়, বাস্তবের ক্ষেত্রে তাহার উপর জোর দেওয়াই রাজনীতিজ্ঞতার দিক হইতে আমরা উপযুক্ত মনে করি। রাজনীতিতে কোন বিশেষ একটা নীতি যে চিরন্তন হইতে পারে না, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

জাতীয় সঙ্গীতের মর্য্যাদা রক্ষা—

"যায় যাবে জীবন চলে—"বন্দেমাতরম্" ব'লে—" হায়দরাবাদের ছাত্রদের এই বীরোচিত সঙ্কল্পকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। হায়দরাবাদ সামন্ত রাজ্য সেখানকার শাসন স্বেচ্ছাচার শাসন। সেই স্বেচ্ছাচারিতা ন্যায়-নীতি এবং জাতি ও মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে বুকের পাটা লইয়া আজ সেখানকার ছাত্রেরা দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের এই সাহস, এই শৌর্য্য আওরঙ্গবাদ, ওয়ারঙ্গবাল, মহবুবনগর—এ সব জায়গার ছেলেরাও বাদের শুধু ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, গুলবার্গ, আওরঙ্গবাদ, ওয়ারঙ্গবাল, মহবুবনগর—এ সব জায়গার ছেলের আজ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভবিষ্যতের ভাবনা তাহাদের দৃষ্টিকে কার্পণ্যক্লিষ্ট করে নাই,—যাহা ঘটে ঘটুক, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার, তবু মনুষ্যত্বের অধিকার ছাড়িব না। ছাড়িব না জাতির মর্য্যাদা। শিক্ষার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। হায়দরাবাদের নিজাম-সরকার হুকুম জারী করিয়াছেন, ছাত্রদিগকে তাঁহারা সরকারী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণ্ডীর মধ্যে "বন্দেমাতরম্" গাহিতে দিবেন না। না দিবার মূলে যুক্তি কি? ঐ সঙ্গীতে আপত্তিকর জিনিষ কি আছে? নিজাম-সরকার বলিতেছেন—'প্রকৃতপক্ষে ঐ সঙ্গীতের ভাষার মধ্যে আপত্তিকর কিছু না থাকিতে পারে,' কিন্তু তবু বন্ধ করিতে হইবে। কারণ কি? মোসলেম লীগের চাঁইয়েরা উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া, নিজেদের মতলব হাসিল করিবার জন্য ঐ সঙ্গীতকে তাহারা সাম্প্রদায়িকতার ছোপ দিতে চাহিতেছে বলিয়া, আর মধ্যযুগীয় অসংস্কৃত মনোবুদ্ধিবিশিষ্ট মুসলমান ছাত্র লীগওয়ালাদের সেই চাপে পড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাই কি? ধর্ম্মের কথা আমরা তুলিতে চাই না, কিন্তু তর্কের খাতিরে আমাদিগকে একটা কথা বলিতে হইতেছে তাহা এই যে, হিন্দুদের পক্ষে কোনটি উপাসনা সঙ্গীত হইবে না হইবে, তাহা কি নিজাম-সরকারের কাছে আইন পাশ করিয়া লইতে হইবে? বর্ত্তমানে যুবক সম্প্রদায়ের বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে এমন কেহ যদি থাকে যে, "বন্দেমাতরম্"—এই ধ্বনি শুনিলে তাহার মাথা গরম হইয়া উঠে—আমরা তাহার অসংস্কৃত মনোবৃত্তির জন্য দুঃখ করিব, বলিব নূতন যুগের উদার আলোক সে পায় নাই; কিন্তু হায়দরাবাদের নিজাম-সরকারেরও [illegible] একান্তই অভাব এই সব ব্যবহারে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। হায়দরাবাদের ছাত্রদের এই যে সংগ্রাম, ইহা মূলগত ভাবে মানুষের অধিকারের সংগ্রাম, স্বেচ্ছাচার নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, গণতান্ত্রিকতার পক্ষে সংগ্রাম। আমরা জানি, এ সাধনা মহৎ এবং যে কোন মহৎ সিদ্ধিই পরম প্রয়াস ছাড়া লাভ হয় না। সেই পরম প্রয়াসের প্রবৃত্তির জাগরণ ছাত্রদের মধ্যে দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি এবং আমরা জানি এ সংগ্রাম জয়যুক্ত হইবেই। মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার পথে ত্যাগের যে আনন্দ সাধককে সঞ্জীবিত শক্তি দান করে, এ দেশের ছাত্রদের মধ্যে সেই আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক। তাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের হিসাব-কিতাব, তুচ্ছতা এবং সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা এবং জাতীয় মর্য্যাদাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলুক।

ইংরেজের গোলামগিরির গর্ব্ব—

লণ্ডনের ফ্রেণ্ডস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি বা ভারত-বন্ধু সমিতি সম্প্রতি এক সভা করিয়া কানাডাতে স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের কর্ম্মতৎপরতার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রচারকার্য্যকে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লণ্ডনপ্রবাসী ভারতবাসীদের মধ্যে স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের কার্য্যে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। স্যার ফিরোজ খাঁ নুন ইংরেজের পক্ষে কানাডাতে গিয়া প্রচারকার্য্য চালাইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। পয়সায় সবই করে। মহামান্য আগা খানই যদি ইংরেজের পয়সা পকেটে পুরিয়া ইংরেজের পক্ষে প্রচারকার্য্য চালাইতে পারেন, তবে ইংরেজের অধীন চাকুরে, বলিতে গেলে ইংরেজের গোলাম, স্যার ফিরোজ খাঁ নুন সাহেব ত সে কাজ করিবেনই। আমেরিকায় ভারতবাসীরা ইংরেজের প্রভুত্বের প্রশংসা করে না, নিজেরা অধীন, পরপদানত এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শোষিত—এই ধরণের সব কথা বলে, স্যার ফিরোজের ইহা দেখিয়া বুকে বড় ব্যথা লাগিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের রয়াল এম্পায়ার সোসাইটিতে এক খানার মজলিসে তিনি সে কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'মনে করুন, আপনি কানাডায় গিয়া যদি বলেন যে, আপনারা পরপদদলিত জাতি, আপনারা ক্রীতদাসতুল্য, আপনাদের পা শৃঙ্খলাবদ্ধ, আপনাদের কোন স্বাধীনতাই নাই, তাহা হইলে আপনি কি আশা করেন যে, আপনাদের উপর জগতের কাহারও কিছুমাত্র শ্রদ্ধাবুদ্ধি থাকিবে? পক্ষান্তরে আপনি যদি বলেন যে, কানাডাবাসীদের ন্যায়ই আপনারাও স্বাধীন জাতি, তাহা হইলে কানাডাবাসীদের দৃষ্টিতে কি আপনাদের দেশ এবং জাতির মর্য্যাদা বাড়িবে না?' যুক্তি একেবারে পরিষ্কার! কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, কানাডার লোকগুলির মাথাতেও মস্তিষ্ক বলিয়া পদার্থটা আছে। যে প্রকৃতপক্ষে পরাধীন, প্রকৃতপক্ষে নিজের দেশে নিজেদের রাষ্ট্র-পরিচালন কার্য্যে যাহাদের কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই, বলিতে গেলে বিদেশীরাই যাহাদের ভাগ্যনিয়ন্তা, তাহারা যদি নিজেদের সেই গোলামের অবস্থার জন্য গর্ব্ব করে, তবে স্বাধীনতার

প্রতি মর্য্যাদাবুদ্ধিবিশিষ্ট কোন জাতি তাহাকে শ্রদ্ধা ত করিবেই না, বরং অধিকতর ঘৃণার চোখে দেখিবে। স্বাধীন না হইলেও স্বাধীনতার জন্য বেদনাবুদ্ধি মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, এবং সেই বেদনা স্বাধীন জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। অধীনতার বগলেস গলায় আঁটিয়া দেমাক ফলাইতে গেলে শক্তিমানের ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা ব্যতীত অদৃষ্টে অন্য কিছু লভ্য হয় না। স্যার ফিরোজের ন্যায় দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন যাঁহারা তাঁহারা সে গর্ব্ব ফলাইতে পারেন, কিন্তু পরাধীনতার বেদনা যাহাদের বুকে তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মনে ঐ ধরণের গর্ব্বকারীদের প্রতি অশ্রদ্ধা যে উগ্র হইয়া উঠিবে, ইহাও স্বাভাবিক।

নির্লজ্জতার মাত্রা—

মিস মেয়ো ভারতের বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য্য করিয়াছিলেন, স্যার ফিরোজ খাঁ নুন, নিজে ভারতবাসী হইয়া এবং ভারতবাসীদের নুন খাইয়া সে প্রচারকার্য্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ইংরেজের প্রেম-মহিমায় বিভোর হইয়া তিনি কানাডাবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—'প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে ইংরেজদের দান, অর্থাৎ তজ্জন্য ভারতবাসীদিগকে কোন প্রকার রাজনীতিক আন্দোলন করিতে হয় নাই। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ ভারতবর্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে গড়িয়া তুলিবার সুসংকল্পিত উদ্দেশ্য লইয়া চলিয়াছে।' ধামা-ধরা লোকের অভাব এ পোড়া দেশে নাই, আমরা ভালই জানি। কিন্তু নির্লজ্জতারও একটা মাত্রা থাকা উচিত। ভারতবাসীরা বর্ত্তমানে যতটুকু রাজনীতিক অধিকার পাইয়াছে, সেজন্য তাহাদিগকে আন্দোলন করিতে হয় নাই—জালিয়ানওয়ালাবাগ, আইন-অমান্য আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, সহস্র সহস্র লোকের কারাবরণ, বেত্রাঘাত, নির্য্যাতন, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী সুদীর্ঘ সংগ্রাম, এ সবই মিথ্যা বা ভ্রান্তি, এ কথা স্যার ফিরোজ খাঁ নুন সাহেব বলিলেই কি লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে? ইংরেজেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে ভারতবাসীরা অসভ্য ছিল, নিরক্ষর ছিল, এমন কথা রটাইলেই বিদেশে জাতির গৌরব বাড়িবে? স্যার ফিরোজ খাঁ নুন সাহেব কি ইহাই বলিতে চাহেন? তিনি কানাডার এক বক্তৃতায় বলেন—ভারতে আমরা কানাডার মতই ঔপনিবেশিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করিতেছি। কানাডারই মত ভারতের এগারটি প্রদেশে আমরা পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাইয়াছি। স্যার ফিরোজের যে আনুরক্তি সত্যকে এমনভাবে বিকৃত করিতে পারে, তাহা যে মিস মেয়োর কেরামতির চেয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বেশী বাহাদুরী পাইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? এই ধরণের ব্যক্তিদের তাহাতেই তুষ্টি, তাহাতেই পুষ্টি!

নোগুচির আদর্শবাদ-

জাপ-কবি নোগুচির আর একখানা চিঠি আসিয়াছে! এবার আর রবীন্দ্রনাথের নিকট চিঠি লিখেন নাই, চিঠিখানা লিখিয়াছেন আমাদের নিকট। এই চিঠির সম্বন্ধেও আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, এ চিঠিও তিনি না লিখিলেই ভাল করিতেন। কারণ, একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইতেছে যে, এই চিঠিতে তিনি এমন কোন যুক্তি উপস্থিত করিতে পারেন নাই, যাহাতে আমাদের চীনে জাপান যে-সব অত্যাচার করিতেছে, সেগুলি সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে পারে। পক্ষান্তরে এই চিঠিতে তাঁহার নিজের কার্য্য সমর্থনের নিমিত্ত যে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের যে উচ্চ ধারণা ছিল তাহাই অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

নোগুচি লিখিয়াছেন—"ডাক্তার ঠাকুর তাঁহার প্রথম উত্তরে একজন ফরাসী লেখকের উল্লেখ করিয়াছিলেন, যিনি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা করিয়াছিলেন। ডাক্তার ঠাকুর নিশ্চয়ই রোমা রোঁলার কথা বলিয়াছেন। আমি ইহার জন্য সামান্য যে ঈর্ষান্বিত নহি, তাহা নহে, কারণ, রোঁলা এমন অবস্থার মধ্যে ছিলেন, যাহাতে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেও জেনেভা হ্রদের তীরে তিনি নিরাপদ স্থান পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু আমার দেশ যখন আমাকে ত্যাগ করিবে, তখন পৃথিবীর কোন্ স্থানে আমি যাইব! আমার জন্য কোন জেনেভা নাই, যেখানে আমি নিরপরাধ ছেলেদের লইয়া যাইতে পারি, আমি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার দেশের লোকদের বিরুদ্ধাচরণ করি, তাহা হইলে তাহাদিগকে সম্ভবত অনশনে থাকিতে হইবে। তাহা ছাড়া আমার দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমানে রণক্ষেত্রে সংগ্রাম করিতেছে, দেশের প্রতি তাহাদের যে অনুরাগ তাহাতে সাড়া দেওয়াও উচিত বলিয়া আমার বিশ্বাস।" বলা বাহুল্য, কবি নোগুচি এই সব যুক্তিতে মানবতা এবং তৎসম্পর্কিত উদার আদর্শকে এড়াইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন এবং শুধু তাহাই নহে, রোমা রোঁলাও যে সেইরূপ কার্পণ্যবুদ্ধিসম্পন্ন এই বলিয়া তাঁহার উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। রোমা রোঁলা স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য আমাদের যুক্তি—তর্ক দেখান প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা শুধু এই কথাটা বলিতে চাই যে, নিজের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অটুট রাখিবার প্রবৃত্তির দিক হইতে যে বস্তুকে সমর্থন করিতে হয়, সে বস্তু জগতে কোন দিন বড় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। মানবতার মহান্ আদর্শের সাধনায় ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে উপেক্ষা করিয়া যুগে যুগে 'কবি বজ্ররবে গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে গিয়াছেন সঙ্কট যাত্রায়'—বিধাতার সেই শ্রেষ্ঠ দানকে কবি নোগুচি যদি মর্য্যাদা দিতে পারিতেন, তবেই আমরা তাঁহার প্রকৃত বীরত্ব এবং মনুষ্যত্বের জয়গান করিতাম, তাঁহার আত্মত্যাগের সেই ছন্দ মানবের মনোমন্দিরে অনাহত ঝঙ্কার তুলিত।

কু-প্রচেষ্টার অবসান—

স্যার মহম্মদ সাদুল্লার দলবলকে শিখণ্ডীস্বরূপে দাঁড় করাইয়া আসামের শ্বেতাঙ্গ চা-ব্যবসায়ীর দল সেখানে নিজে-

দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার যে কু-প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিল, তাহার অবসান হইয়াছে। বড়দলুই মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিবার জন্য যাঁহারা আস্ফালন করিতেছিলেন, তাঁহাদের থোতা মুখ ভোঁতা হইয়াছে। এই অনাস্থ প্রস্তাব আনিতে গিয়া আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের শ্বেতাঙ্গ দলের সর্দ্দার হকেনহাল সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বরূপ উন্মুক্ত হইয়াছে। হকেন হাল সাহেবের এবং তাঁহাদের দলবলের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রোশের কারণটা কি—এবার তাহা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। হকেনহাল সাহেবের কথার মর্ম্ম এই যে, বৎসরাধিক কাল হইতে কংগ্রেস ব্যবস্থা-পরিষদে, সংবাদপত্রে এবং জনসাধারণের মধ্যে আসামের শ্বেতাঙ্গ চা-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইতেছে, সুতরাং এমন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা তাঁহারা আসামে ঘটিতে দিবেন না। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, কংগ্রেসের নীতি কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, তবে একথা সত্য যে, কংগ্রেসের নীতি দেশের পতিত, শোষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িতের পক্ষে। আসামের ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তথাকার চা-বাগানের কুলীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার উদ্দেশ্যে দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। একটি প্রস্তাবের সে-সময় উদ্দেশ্য ছিল, কুলীদিগকে গতিবিধির স্বাধীনতা দান করা, অপরটিতে চা-বাগানের কুলীদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিতে দাবী করা হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব-পরিচালিত সাদুল্লা মন্ত্রি-সভার চক্রান্তক্রমে এই দুই প্রস্তাবের কোনটিই পরিষদের আলোচ্য বিষয়ীভূত হইতে পারে নাই। এখন বড়দলুই মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামের মন্ত্রি-মণ্ডলের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থ-ব্যবসার খতম হইল, সুতরাং আশা করি, ঐ দুইটি প্রস্তাব আসামের ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত হইবে। শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহদের শঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে, এই দিক দিয়া। কিন্তু আমাদের কথা এই যে, হকেনহাল এবং তাঁহার দলবল যে কথা বলিয়াছেন যদি তাহাই সত্য হয়, অর্থাৎ আসামের চা-বাগানের কুলীদের দুঃখকষ্ট কিছুই না থাকে, তাহা হইলে কংগ্রেসের উপস্থাপিত এই দুইটি প্রস্তাবে তাঁহাদের আশঙ্কার কারণ কি থাকিতে পারে? কুলীদের আর্থিক অবস্থা যদি ভালই হয়, এবং তাহাদের প্রতি কোনরূপে অবিচার যদি সত্যই না করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার দাবীতে আপত্তি করিবার কারণ কি থাকিতে পারে এবং কুলীদিগকে চা-বাগানের মধ্যে বদ্ধ না রাখিয়া তাহাদের চলাফেরার স্বাধীনতা দিতেই বা কি আপত্তি থাকে? প্রকৃতপক্ষে আসল অবস্থা ও তেমন নয়। আজকালকার এই দিনে মাসিক পাঁচ টাকা কি বড় জোর ছয় টাকা যাহাদের আয় তাহারা যে সত্য সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, নেহাৎ যাহার মাথা খারাপ হইয়াছে, সে ছাড়া কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না। আসামের চা-বাগানের কুলীদের দুঃখ-কষ্টের অবধি নাই। শ্বেতাঙ্গ চা-করের দল যাহাই বলুক, দেশের লোকের পক্ষে এমন কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চা-বাগিচার যাঁহারা মালিক, সেই শ্বেতাঙ্গেরা লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিয়া ভুঁড়ি মোটা করিতেছে, অথচ যাহারা নিজেদের গায়ের রক্ত জল করিয়া দিয়া তাহাদের ভুঁড়ি এইভাবে মোটা করিতেছে, তাহারা থাকিবে ক্রীতদাসেরই মত অবস্থায়,—দেশের লোকে আর ইহা বরদাস্ত করিবে না। এই যে অন্যায়, এই যে কুব্যবস্থা—এদেশের লোকের অজ্ঞতা এবং উপেক্ষার সুযোগ লইয়া এদেশের লোককে শোষণ করিবার বিদেশীদের এই যে পিপাসা, তাহার বিলোপ সাধন করিতে হইবে। ন্যায়ের দিক হইতে ইহার প্রয়োজন, ধর্ম্মের দিক হইতে ইহার প্রয়োজন, মানবতার দিক হইতে ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহার মূলে সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি কোন প্রকার রাজনীতিক বিদ্বেষ নাই। আসামের চা-বাগিচার সাহেবেরা যদি তাঁহাদের দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দ্বারা কলুষিত না করিতেন তাহা হইলে এই সত্যটি তাঁহারাও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেন এবং আসামের চা-করদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর এই যে সব অভিযোগ—সে গুলির ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করিবার জন্য নিজেরাই ভিতরের অবস্থা তদন্ত করিয়া দেখিতে দেশবাসীকে আহ্বান করিতেন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহদের ঘটে সহজে সে সুবুদ্ধির উদয় হয় না, হইবার নয়। তাহারা কূটচালের পথে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করিবার ফিকিরেই থাকে। এ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। এক্ষেত্রে বড়দলুই মন্ত্রি-মণ্ডলের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। তাঁহারা আসামের রাজনীতিক বন্দীদের সকলকে মুক্তি দিতেছেন, তাঁহারা আসমে জন-সাধারণের স্বাধীনতার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, সেই-রূপ অবিলম্বে আসামের চা-বাগিচার কুলীদের প্রতি অত্যাচার এবং অবিচার যাহাতে দূর হয়, সেজন্য ব্যবস্থা অবিলম্বে করা তাঁহাদের উচিত।

বাঙালী-বিহারী প্রশ্ন—

মাসের পর মাস গড়াইয়া আসিয়াছে, এ পর্য্যন্তও বাঙালী-বিহারী প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইল না। কথা ছিল, ওয়ার্কিং কমিটির সম্প্রতি যে অধিবেশন ওয়ার্দ্ধায় হইয়া গেল, সেই অধিবেশনে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে; কিন্তু বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ অসুস্থতার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাঁহার অনুপস্থিতিতে ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করা সমীচীন মনে করেন নাই। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে যেরূপ মতিগতি লইয়া চলিতেছেন, তাহাতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, তাঁহারা এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। ইহা না করিবার পক্ষে কি কারণ থাকিতে পারে, আমরা বুঝিতে অপারগ। এই বিতর্ককে ভিত্তি করিয়া উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরোধের ভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতে জাতীয় সংহতি যে কংগ্রেসের সাধ্য ও সাধনা, সে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য ছিল, যথাসম্ভব সত্বর, উভয় প্রদেশের মধ্যে এই অপ্রিয়কর ভাব দূর করা। বিহারের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর

যে সব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার সম্বন্ধে সমস্ত বাঙালী সমাজের আপত্তি, ওয়ার্কিং কমিটি এ প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত যদি সেগুলি স্থগিত রাখিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে না হয়, এইভাবে কালক্ষয়ের পক্ষে কিছু যুক্তি থাকিত ; কিন্তু বিহারের মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের নীতি ধরিয়া সমভাবেই চলিতেছেন। দুই তিন মাস পূর্ব্বেও তাঁহারা বাঙালীদিগকে যাহাতে বিহারের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেহ চাকুরী না দেয়, সেজন্য নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই অপ্রীতির ভাবকে বাড়িতে দেওয়ার মূলে কোন্ যুক্তি আছে—আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত এ সম্বন্ধে আমাদের মতের মিল নাই। একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ওয়ার্কিং কমিটির কি মত হইবে তাহাও আমরা জানি না কিন্তু আমাদের যে-সব অভিযোগ, সেগুলি সঙ্গত অভিযোগ ; কংগ্রেস কমিটির উচিত, সে অভিযোগের বিচার করা। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর যে ভার ন্যস্ত করা হইয়াছিল, তিনি তাঁহার যুক্তি মত তাহার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বিচারসিদ্ধ মতামত বা বক্তব্য রহিয়াছে তাঁহারই রিপোর্টে, সুতরাং বিষয়টির মীমাংসা করিতে হইলে তাঁহার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক, এরূপ সিদ্ধান্ত আমরা অযৌক্তিক বলিয়াই মনে করি।

রাজনীতি কেন চাই

ভারতের অন্তরের জিনিষ হইল, অধ্যাত্ম সাধনা। সুতরাং সেই অধ্যাত্ম তত্ত্ব লইয়াই ভারতবাসীরা থাকুক, রাজনীতির মত ব্যবহারিক বাজে জিনিসের কি দরকার তাহাদের—আমাদের হিতৈষী বন্ধুদের নিকট হইতে এই ধরণের উপদেশ আমরা অনেক সময় পাই। ডাক্তার মীস্ একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত, তিনি তিন বৎসর কাল এদেশে থাকিয়া এদেশের সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। যাইবার সময় ডাক্তার মীস্ এই দুঃখ করিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা বড়ই রাজনীতিক হইয়া উঠিতেছে। রাজনীতি জিনিষটা অনেকের কাছে খুব উঁচু-দরের জিনিষ নয়, ইহা আমরাও অনেকে বুঝি ; কিন্তু উপায় কি ? রাজনীতি ছাড়া, আমরা যে অবস্থায় এখন আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহাতে আমাদের কাছে কোন উঁচু জিনিসেরই কিছুমাত্র মূল্য নাই। যে জাতি স্বাধীন নহে, তাহার সভ্যতা, তাহার সংস্কৃতি, তাহার আধ্যাত্মিকতা—এক কথায় তাহার মনোধর্ম্ম বিকাশের সুযোগ কোথায় ? পরাধীনতার আওতা এমনি যে, তাহাতে কোন বড় জিনিষই বাড়িয়া উঠিতে পারে না। ভারতবাসীরা যতদিন পর্য্যন্ত নিজেরা স্বাধীন হইতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিশ্বের নিকট তাহাদের সভ্যতা বা সংস্কৃতির কোন অবদানই উপযুক্ত মর্য্যাদায় গৃহীত হইবে না এবং গৃহীত হইবার যোগ্য বলিয়াও বিবেচিত হইবে না। সুতরাং ভারতের সভ্যতা, ভারতের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ-বুদ্ধি যাঁহারই জন্মিবে তাঁহাকে আগে রাজনীতিক হইতে হইবে—ইচ্ছা না থাকিলেও হইতে হইবে, অবস্থার চক্রে পড়িয়া হইতে হইবে। যে ভীরু, যে কাপুরুষ—দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-বুদ্ধি যাহার নাই, অধ্যাত্ম সাধনা বা সভ্যতা-সংস্কৃতির ফাঁকা কথা আওড়াইয়া ভাবের ঘরে চুরি-বিদ্যা ফলান শুধু তাহার পক্ষেই সম্ভব। ভারতের সভ্যতা এবং ভারতের সংস্কৃতির সাধনারও বর্ত্তমান রূপ এই দিক হইতেই রাজনীতিক না হইয়া পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আলডোস হাক্সলী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা মিঃ আলডোস হাক্সলীকে ১৯৩৯ সালের জন্য নির্ম্মলেন্দু ঘোষ লেকচারার নিযুক্ত করিয়াছেন। হাক্সলী আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার লেখার আদর সর্ব্বত্র। স্বার্থ-সংঘাত বিক্ষুব্ধ বর্ত্তমান জগতে মানবের জীবনের সমস্যার সমাধান পথে তিনি নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টির সঙ্গে ভারতের অধ্যাত্মদর্শনের নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে। তিনি গীতার উপদিষ্ট অনাসক্ত যোগকে আদর্শস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই দিক হইতে মহাত্মা গান্ধীর সাধনার বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত, এবং জগদ্বিখ্যাত সুসাহিত্যিককে নিয়োগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে সম্মানিতই করিলেন। তাঁহার এই নিয়োগে বাঙালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। এই নিয়োগ ভারতের অধ্যাত্মসম্পদের সৌন্দর্য্যকে পাশ্চাত্য জগতের নিকট উন্মুক্ত করিবার সহায় হইবে।

বাঙলায় ব্যঙ্গচিত্র সাধনা—

কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট চারুশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করিতেছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, ব্যঙ্গচিত্র এই প্রদর্শনীর একটি প্রধান অঙ্গ হইবে। বাঙলা দেশে যাহাতে ব্যঙ্গচিত্র সাধনা গড়িয়া উঠে, সেজন্য তাঁহারা এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দান করিবেন। উদ্যোক্তাগণ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, ইউরোপ এবং আমেরিকায় সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রগুলিতে যে ধরণের ব্যঙ্গচিত্র থাকে, ভারতবর্ষে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরাও তাঁহাদের এই উক্তি সর্ব্বাংশে সমর্থন করি। ভারতবর্ষে ব্যঙ্গচিত্রকার না আছেন এমন নহে, দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রের ব্যঙ্গচিত্রকার শঙ্করের নাম করিতে পারি। শঙ্করের ব্যঙ্গচিত্র আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার শিল্প-প্রতিভা পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের চেয়ে কোন অংশে কম নহে। বাঙলা দেশেও ব্যঙ্গচিত্রকার কয়েকজন না আছেন এমন নয়। স্বর্গীয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এখনও ব্যঙ্গচিত্রকার আছেন বাঙলাদেশে ; কিন্তু সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্রগুলিতে প্রধানত রাজনীতি সম্পর্কিত ব্যঙ্গচিত্রই প্রকাশিত হইয়া থাকে। একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইতেছে যে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই সাধনা বাঙলা দেশে এখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার অনেকগুলি কারণ

১৯৩৫-৩৬	৩,২২০
১৯৩৬-৩৭	৪,০৪১
১৯৩৭-৩৮	১১,৭০০

আমদানী করা শণ-তন্তুর দাম বেশী নহে, কিন্তু তন্তুজাত দ্রব্যাদি প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকার আসে। ইহার মধ্যে ক্যাম্বিস বা ক্যানভাসই বেশী অর্থাৎ এগার লক্ষ টাকার। সূতা সূতালী, কাপড়, থলে প্রভৃতি মিলিয়া বাকী এগার লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৩৫-৩৬	—	১৭,৯২,৮৬৭	টাকা
১৯৩৬-৩৭	—	১০,০১,৯৫৩	"
১৯৩৭-৩৮	—	২২,৪৬,৯৯৩	"

আমাদের দেশে নানা রকম তন্তু জন্মিয়া থাকে এবং চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে আরও উন্নতি করা সম্ভব এবং প্রয়োজন। ইহাতে যে কেবল বাহির হইতে অর্থ আনা সম্ভব হইবে তাহা নহে; এত টাকার মালের আমদানী বন্ধ করা সম্ভব হইবে।

তিসি-তন্তুর উৎপাদনে পৃথিবীতে রূশ-গণতন্ত্রের স্থান প্রধান; অপরাপর কয়েকটি দেশের নাম ও উৎপন্ন তন্তুর পরিমাণ দেওয়া হইল—

রূশ গণতন্ত্র	৫,৪৪,০০০	টন
পোলাণ্ড	৩৭,৮০০	টন
জার্ম্মানী	৩৪,০০০	টন
লিথুয়ানিয়া	৩১,০০০	টন
বেলজিয়ম	২৩,৫০০	টন
ল্যাটভিয়া	২৩,০০০	টন

ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশেও তিসি তন্তু উৎপাদিত হইয়া থাকে। একা রূশের অংশ শতকরা ৭০ ভাগ।

শিশল-শণ (Sisal hemp)

শিশল বা শিশল শণ যথারীতি উৎপন্ন করিতে পারিলে ভারতের বিশেষ মঙ্গল। অনেক জমিতে অন্য চাষ না হইলেও শিশল হওয়া সম্ভব। মেক্সিকো, পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা টাঙ্গানাইকা, যব প্রভৃতি দেশে উৎকৃষ্ট শিশল জন্মে। ভারতবর্ষে বোম্বাই, শ্রীহট্ট, ত্রিহুটে প্রভৃতি স্থানে শিশল চাষের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু যে জাতীয় বৃক্ষ উৎকৃষ্ট তন্তুদান করিতে পারে মনে হয় তাহার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। এই সকল স্থান অপেক্ষা মহীশূরে চাষ ভালই হইতেছে এবং সেখানে উৎপন্ন তন্তুর পরিমাণও নিতান্ত কম নহে। পতিত জমিতে এই চাষ হইতে পারে, সুতরাং সে দিক দিয়া আবার বিশেষ সুবিধা আছে। বর্ত্তমানে রেল লাইনের ধারে ধারে বহু শিশল গাছ দেখিতে পাওয়া যায় এবং যতদূর মনে হয় তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ সকল পাতা অযত্নে নষ্ট হইয়া যায়।

নির্ভর

চন্দ্রমা দেবী

তুমি, ছল কোরে মোরে চেয়েছ ভুলাতে—
তাই ভান্ করে আমি ভুলেছি,
তুমি, আড়ে আড়ে থেকে আমারে যে চাও
আমি, বারে বারে তাই জেনেছি

শত স্নেহ ডোরে বেঁধেছি হৃদয়
ভুল করে সে তো ভুলিবার নয়,
ওগো: বুকে এঁকে রেখে মূরতি তোমার
আঁখি দিয়ে ফাঁকি দিয়েছি।

ভুলিয়া আমারে রহিতে যে পার
মানিনে সে কথা মানিনে,
তুমি বুঝি ভাবো সুগোপন স্নেহ
জানিনে কো আমি জানিনে?

প্রিয়ার নয়নে, জননীর মুখে
যে ভাষা ফুটিয়া উঠে চুপে চুপে,
তোমারি সে ছায়া সহস্ররূপে
চিনিনে কি আমি চিনিনে?

চলিতে একাকী আঁধারে যখন
পথ-রেখা যায় হারায়ে,
তোমারে স্মরিয়া কাঁদি যে তখন
তোমা পানে বাহু বাড়ায়ে।

জানি সাথে সাথে আছ অনিবার
ওগো চিরসাথী দয়িত আমার
সব যদি যায়, জানি তুমি রবে
দিতে আঁখি ধার মুছায়ে।

দুই হাত ভরি দিয়াছ খেলনা
দিন গেল তাই খেলিতে,
এ জীবনে সখা মেলেনি সময়
তোমা পানে আঁখি মেলিতে।

তবু নিশিদিন অন্তর তলে
তোমারে চেয়েছি প্রতি পলে পলে
ওগো, অন্তরযামী! আজি আঁখি-জলে
সে কথা হবে কি বলিতে?

জানি জানি যবে, বেলা শেষ হবে
খেলা যাবে যবে ভাঙিয়া
জীবনের পারে—গোধূলি নামিবে
সোনার বরণে রাঙিয়া,

তখন ঘুচিবে সব ব্যবধান,
সব লুকোচুরি হবে অবসান,
তোমারি চরণে মিলাবে হৃদয়
সুদূর সরণী বাহিয়া।

সাম্যবাদী বঙ্কিম

বঙ্কিম এ দেশে সাম্যবাদের অগ্রদূত। কার্ল মার্ক্সের মতো তিনি দেখেছিলেন জগৎ জুড়ে রয়েছে দুটো দল। একটা দলে রয়েছে কোটি কোটি নরনারী যারা জানে না পেট ভরে খাওয়া বলে কাকে। এদের না আছে ভালো ঘর-বাড়ী, না আছে শীত-নিবারণের উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ। দ্বিতীয় দলে রয়েছে লক্ষ্মীঠাকরুণের সেই সব মুষ্টিমেয় বরপুত্র যাদের কাছে দারিদ্র্যের দুঃখ একেবারেই অজ্ঞাত। এই উভয় দলের অবস্থার মধ্যে যে বৈষম্য, তা সত্য সত্যই অসহনীয়। একদিকে মুষ্টিমেয় ধন-কুবেরের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর এবং আর একদিকে সংখ্যাহীন মানব-মানবীর দুঃসহ দারিদ্র্য—এই উভয়ের মধ্যে মারাত্মক বৈষম্য বঙ্কিমের চোখে অত্যন্ত উগ্র হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো। বঙ্কিমের 'সাম্য' প্রবন্ধে আছে,

> "যতক্ষণ জমীদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিল সাসীপ্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী-কন্যার গৌর-কান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল পুত্র সহিত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময় সন্ধ্যা বেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত লূনে লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে, তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে গোয়ালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে। যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়তো চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস।"

নিঃস্ব চাষী ও ধন-কুবের জমীদার—এই উভয়ের সম্পর্ককে বঙ্কিম কি চোখে দেখেছিলেন, তার পরিচয় সাম্য প্রবন্ধের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। সাম্যের যে পরিচ্ছেদটি থেকে উপরের অংশটুকু উদ্ধৃত হয়েছে সেই পরিচ্ছেদেরই অন্যত্র রয়েছে,

> 'চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কর্জ্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমতাবস্থায় যতশীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।"

এমন কথা প্রবীণদের কণ্ঠে শোনা যায়—বঙ্কিম 'সাম্য' প্রবন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করেছেন সেগুলি তাঁর প্রকৃত মত নয়। তিনি পরিণত বয়সে সাম্য-প্রবন্ধটিকে প্রত্যাহার করেছিলেন। এ কথা যদি সত্যও হয় তবুও বঙ্কিম যে মনে প্রাণে সাম্যবাদী ছিলেন—এমন কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। দেশের পাঠক-পাঠিকাগণকে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি পাঠ করবার জন্য একবার অনুরোধ করি। সাম্য প্রবন্ধে জমীদার ও কৃষক—এতদুভয়ের সম্পর্ক যে ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, 'বঙ্গদেশের কৃষকে' সে ভাষা আরও বিষ উদ্গীর্ণ করেছে। বঙ্কিম লিখছেন

> "জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুকে ভক্ষণ করে, রোহিতাদি বৃহৎ মৎস সফরীদিগকে ভক্ষণ করে, জমীদার নামক বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন তাহা অপেক্ষা হৃদয়-শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশীর উপর টাকার রাশী ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।"

সাম্য প্রবন্ধটিকে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ-বয়সে প্রত্যাহার করেছিলেন—এ কথা সত্য হলেও 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ থেকে যে অংশ উপরে উদ্ধৃত করা গেল—সে অংশকে কোথাও তিনি প্রত্যাহার করেছেন—এমন কথা আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। আমার বেশ মনে আছে—কিছুকাল আগে ডাঃ কালিদাস নাগ 'হরিজন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্যবাদীরূপে তিনি চিত্রিত করেন। বঙ্কিম যে সাম্যবাদী ছিলেন—একথা প্রতিপন্ন করবার জন্য ডাঃ নাগ 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির উপরে বিশেষ জোর দেন। সাম্য প্রবন্ধকে যদি কেউ অস্বীকারও করেন, তবুও বঙ্কিম যে সাম্যবাদী ছিলেন—একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের কোন কোন অংশ সাম্যের দুইটি পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে—একথা সত্য; কিন্তু সেই অংশগুলিকে বর্জ্জন করলেও এমন অনেক কথা 'বঙ্গদেশের কৃষকে' রয়েছে যার মুকুরে বঙ্কিমের সাম্যবাদীরূপকে আমরা নিঃসংশয়ে আবিষ্কার করতে পারি। বঙ্কিম যে জমীদার-সম্প্রদায়কে কৃষকদের শত্রু ব'লে মনে করতেন—এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। দেশের পক্ষে জমীদারী প্রয়োজনীয় অথবা উপকারী—এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ বিশ্বাস করতেন না। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের শেষ পরিচ্ছেদে আছে,

> "পাঁচ-সাতশত টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর

ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে—ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে?...দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙাল, আজ পাঁচ-সাতজন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না, সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই।......

আমরা দেখাইলাম যে, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাঁহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই।"

"ধন গোময়ের মত, একস্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্ব্বরতা-জনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়।"

বঙ্গদেশের কৃষকে বঙ্কিম এই অর্থনৈতিক সাম্যের বাণী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের শিখরে সমাসীন যারা, তারা কেন স্বেচ্ছায় সম্পদের উপরে সবাইকে ভাগ বসাতে দেবে? মানুষ ত' স্বেচ্ছায় তার স্বার্থকে ত্যাগ করে না। মার্ক্সবাদীরা ব'লে থাকেন, সামাজিক সম্পদের উপরে সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত। সেই সম্পদকে সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দিতে ধনীরা যখন একান্তই নারাজ—তখন বঞ্চিত সর্ব্বহারাদের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে সম্পদকে মুষ্টিমেয় মানুষের অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সকলের মধ্যে তাকে বণ্টন ক'রে দেওয়া। এই যে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপার—একে এ্যানার্কিষ্ট আর মার্ক্সবাদীরা ব'লে থাকেন expropriation. বঙ্কিমচন্দ্র মার্ক্সবাদী ছিলেন, না এ্যানার্কিষ্ট ছিলেন—তা অবশ্য জানিনে। বোধ হয় পুরোপুরি কোনটাই ছিলেন না। কিন্তু expropriation-এর ব্যাপারটাকে বঙ্কিম যে অধর্ম্ম ব'লে মনে করতেন না—এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ। কমলাকান্তের দপ্তরে অনশনক্লিষ্টা মার্জ্জারী কমলাকান্তকে বলছে,

"এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয় তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচবার অধিকার আছে জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে—এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাঁচতে গেলে খাওয়া-পরার উপরে দস্তুরমত অধিকার চাই—এ বিশ্বাসও বঙ্কিমের মনে অবিচলিত ছিল। কোটি কোটি মানুষকে অন্নবস্ত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখা যে অন্যায়ের চরম—এ বিশ্বাসও কি বঙ্কিম মনের মধ্যে পোষণ করতেন না? সর্ব্বোপরি তিনি বিশ্বাস করতেন, ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যদি স্বার্থপর ধন-কুবেরদের অনিচ্ছুক হস্ত থেকে সম্পদ জোর ক'রে ছিনিয়ে নেয় —তার মধ্যে অধর্ম্মের বিন্দুবিসর্গও থাকতে পারে না—কারণ বঙ্কিমের ভাষায়, 'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।' সত্যিকারের অধার্ম্মিক যদি কেউ হয় তবে সে চোর নয়। আর কেউ। মার্জ্জারী কমলাকান্তকে বলছে,

"খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে —চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে—কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়—চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?"

বঙ্কিম কেবল যৌন প্রবৃত্তির উন্দামতা, কুক্কুরজাতীয় পলিটিক্স আর সাহেব সাজবার হীন অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে আঘাত দিয়ে ক্ষান্ত থাকেন নি। ধনবৈষম্যকেও তিনি যথেষ্ট আঘাত দিয়েছেন। আর আঘাত দিয়েছেন কখন? যখন মার্ক্সবাদের কথা এদেশে এসে পৌঁছায় নি, সোস্যালিজম কমিউনিজম ইত্যাদি ইজমের কথা এদেশে কেউ জানত না, জওহরলাল আর গান্ধী ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত ছিলেন। যারা সাম্যবাদী তাদের লক্ষ্য হচ্ছে—সকলের কল্যাণ। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিরাট লক্ষ্যের বেদীমূলে আপনার প্রতিভাকে নিবেদন করেছিলেন। দেশের মঙ্গল বলতে তিনি মুষ্টিমেয় বুর্জ্জোয়াদের মঙ্গল বুঝতেন না, বুঝতেন দেশের আপামর জনসাধারণের মঙ্গল।

"দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন?...... যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

বঙ্কিম এ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে। তখনও বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠ থেকে উৎসারিত দরিদ্র-নারায়ণের সেবার মন্ত্র ভারতের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত ক'রে তোলে নি। এদেশের নিরন্ন জনসাধারণের মঙ্গল আর স্বরাজ যে একই কথা—এ বাণী ঘোষণা করবার জন্য ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তখনও গান্ধীর আবির্ভাব হয় নি। ভারতবর্ষ তখন মৌন বিজন বনানীর মত। সেই

(শেষাংশ ২৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চীন-জাপান সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি কবে?

জগতের সর্ব্বত্র আজ শক্তির মহড়া চলিয়াছে। কাহার শক্তির বহর কত অতীত যুগের অনুসৃত উপায়েই আজিও তাহা পরিমাপ করা হইতেছে। শক্তিমানে শক্তিমানে সংঘর্ষ বাধিলেই শক্তির যথার্থ পরিমাপ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা খুব কমই হইয়াছে। দুর্ব্বলের ঘাড় মটকাইয়াই নিজ শক্তি বাড়াইতে ব্যস্ত। সবল ও দুর্ব্বলের মধ্যে সংঘর্ষ স্মরণাতীত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ সংঘর্ষের সীমা-সংখ্যা নাই। আজিও এই সংঘর্ষ পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে। সবলে সবলে যত সংঘর্ষ আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে তাহার হিসাব

চীনের অষ্টম রুট বাহিনীর একাংশ। ইহারা কম্যুনিষ্ট

আছে। ইতিহাস তাহার বর্ণনায় পঞ্চমুখ। এই সবলে সবলে সংঘর্ষ বাধিলেই তাহা যথার্থ সংগ্রাম পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। বিগত মহাসমর তাই নাকি জগতে একটা ভাবী প্রলয়ের সূচনা করিয়াছিল! আজকাল কি যুদ্ধ হইতেছে না? হইতেছে, কিন্তু তাহা মহাসমর নহে। সবল দুর্ব্বলের ঘাড় ভাঙিয়া নিজ শক্তি বাড়াইয়া লইতেছে। পৃথিবীতে সবল শুধু একটি জাতি নয়। আবার একটি মহাদেশেও তাহা সীমাবদ্ধ নহে। জগতের বিভিন্ন অংশে শক্তিমান জাতিগুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে। দুর্ব্বলের উপর তাহাদের কোপ সর্ব্বত্রই সমান। এ হিসাবে সবল জাতিগুলি সমগোত্রীয়, কেহ কাহারও ব্যভিচারে বড় একটা উচ্চ-বাচ্য করে না। নিজেদের স্বার্থটুকু বজায় রহিলেই হইল, এই যা। সবল জাতি বা রাষ্ট্র যখন দুর্ব্বলের **উপর অত্যাচার সুরু করিয়া দেয় তখন সে সবল** ভ্রাতাদের এই বলিয়া আশ্বাস দেয় যে, তাহার হস্তে তাহাদের স্বার্থহানি ঘটিবে না। দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারের সময় ইহারা সাধারণত এই নীতিই মানিয়া চলে। একবার কার্য্য হাসিল হইলে অবশ্য তাহারা এই নীতিতে দৃঢ় থাকে না; যদি দৃঢ়ই থাকিত তাহা হইলে মহাসমর সংঘটিত হইত না নিশ্চয়।

চীন-জাপান সংঘর্ষের কথাই ধরুন। জাপান সবল, চীন দুর্ব্বল। এখানেও সবল দুর্ব্বলের ঘাড়ে চাপিয়াছে। সবল শক্তিগুলির নিকট এ যেন সার্কাসে অভিনয়। জাপানরূপী সিংহ চীনরূপী মেষের ঘাড়ে চাপিয়াছে। বিদেশীরা পাশে দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিতেছে। সিংহ-মেষে যে খেলা হইতেছে না, একে অন্যের ঘাড় মটকাইবার জোর চেষ্টা করিতেছে সেদিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই। এ লড়াইয়ে তাহাদের যে কিছু কিছু স্বার্থহানিও হইতেছে তাহা যেন দেখিয়াও দেখিতেছে না। অভিনয় দর্শনের আনন্দ হইতে তাহারা নিজেদিগকে বঞ্চিত না করিতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই যে দুর্ব্বলের বিরুদ্ধে সবলের অভিযান ইহার পরিসমাপ্তি হইবে কবে?

জগতে ক্রমশই পট পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ আফ্রিকায়, কাল ইউরোপে, পরশু এশিয়ায়—জগতের সর্ব্বত্রই ঐ ব্যাপার ঘটিতেছে। দুর্ব্বলের সহায় কি কেহই হইবে না? ন্যায় নীতি ধর্ম্ম—এ সব কি শুধু দুর্ব্বলের কথা? শক্তিমানের পক্ষে কি ইহাদের আবশ্যক নাই? মনস্বী ব্যক্তিগণ ন্যায় নীতি

ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আজ যাহারা সবল এবং যাহারা দুর্ব্বল, উভয় শ্রেণীর মধ্যেই মনস্বিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও সৌহৃদ্য স্থাপনে তাঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা কি আজ শুধু ইতিহাসের বিষয়বস্তুই হইয়া থাকিবে? তাঁহাদের বাণী কি আজ গ্রন্থ মধ্যেই নির্ব্বাসিত থাকিয়া পোকামাকড়ের ভক্ষ্য বস্তু হইবে? সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সমানাধিকার এ সব কথার সনাতন ব্যাখ্যা কি আর বর্ত্তমানে চলিতে পারে না? অথবা শক্তিমানের অভিধানে ইতিমধ্যেই এ সব কথা বোধ হয় নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে। বোধ হয় বা বলি কেন, বাস্তবিক নূতন ব্যাখ্যা ইদানীং শোনা যাইতেছে। ইংরেজিতে একটি প্রবচন আছে, "রাজহংসের পক্ষে যাহা উপাদেয় খাদ্য, রাজহংসীর পক্ষে তাহা নয়।" সবল দুর্ব্বলের বেলায়ও এই প্রবচন প্রযোজ্য হইতেছে। সবল দুর্ব্বল, সাদা কাল, সভ্য অসভ্য—এ সব ভেদাভেদ ত চিরকালের। কাজেই একের পক্ষে যাহা সত্য, অন্যের পক্ষে তাহা সত্য না-ও হইতে পারে। তাই সবল জাতিরা বলিতেছে, সবলের মধ্যেই সাম্য বজায় রাখিতে হইবে, দুর্ব্বল কি কখনও সবলের সমান অধিকার দাবি করিতে পারে? এ যে বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার স্পর্দ্ধা! মানুষে মানুষে ভেদবৈষম্য দূরীকরণের আশায় যে সব মনীষী ঐ সব কথা আবিষ্কার করিয়াছিলেন আজিকার ব্যাখ্যা শুনিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই মর্ম্মাহত হইতেন। জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে সত্য, মানুষ আগের চেয়ে পূর্ণতর হইতেছেও বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে ভেদবুদ্ধি অতি দ্রুতই যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুযোগ লইতে পারিয়াছে সে আগাইয়া চলিয়াছে, যে সুযোগ লইতে পারে নাই সে পিছনেই পড়িয়া আছে। আগেকার মানুষটি পিছনের মানুষটিকে টানিয়া তুলিতে শেখে নাই, তাহাকে দাবাইয়া রাখিতেই শিখিয়াছে। কাজেই ভেদবুদ্ধি যে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

এ ভেদবুদ্ধির কি অবসান হইতেই পারে না? মানুষ আশায় বাঁচিয়া থাকে। সে আশা করে যে, ভেদবুদ্ধির অবসান একদিন না একদিন হইবেই। সর্ব্বত্রই চিন্তা আগে, কর্ম্ম পরে। জগতের এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। পূর্ব্বে যুগে যাঁহারা সাম্যের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মারাত্মকরূপ তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই। আজিকার মনীষীরা এ বিষয়ে অধিকতর ওয়াকিবহাল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুমহান উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কি উপায়ে ইহার আত্মঘাতী রূপটি বদলাইয়া ফেলা যায় তাঁহারা সে বিষয় ভাবিতেছেন। বিজ্ঞানের ভীষণ আত্মঘাতী রূপটি দেখিয়া মনুষ্য সমাজ বর্ত্তমানে নিরতিশয় আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে রেহাই পাইবার জন্য কখনও সংবদ্ধ, কখনও অসংবদ্ধভাবে নানা রূপ চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবীতে মানুষ আত্মরক্ষার জন্য গর্ত্ত খুঁড়িয়া আশ্রয় খুঁজিতেছে, অন্য কোন লোকে যদি মনুষ্য থাকে তাহা হইলে তাহারা ইহা দেখিয়া নিশ্চয়ই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না। সামান্য ভূমিখণ্ডের জন্য, একটা জিদ বজায় রাখিবার জন্য, বা সামান্য কোন লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য মানুষে মানুষে বিজ্ঞান সহায়ে পরস্পরকে উজাড় করিয়া দিতেছে, ইহা দেখিয়া কে না হাসিবে? কিন্তু হইতেছে তাহাই। যে বিজ্ঞানের আরাধনায় যথেষ্ট অর্থ ব্যয় ও ত্যাগ স্বীকার করা হইয়াছে তাহাই বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া করাল মূর্ত্তিতে নরমুণ্ড আকাঙ্ক্ষা করিতেছে! ইহার প্রতিকার মানসে কি কোন চেষ্টা হইবে না? আজ সর্ব্বত্রই এক প্রশ্ন—সমূহ বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় কি? পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-ভঞ্জন করিতে সকলই যদি উজাড় হইয়া গেল তাহা হইলে সে বিবাদ-ভঞ্জনে কি প্রয়োজন?

বিজ্ঞানের এই আত্মঘাতী রূপ গত দেড় বৎসর যাবৎ পূর্ব্ব এশিয়ায় যেরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে জগতে এমন বোধ হয় কোথাও হয় নাই। বিশাল ভূখণ্ডব্যাপী ইহার লীলা আর কেহ কোথাও দেখে নাই। আবিসিনিয়ায় দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সে কয়েকদিন মাত্র। স্পেনে দেখা যাইতেছে, কিন্তু ইহার তুলনায় তাহা এমন কিছু নয়। চীনে প্রকটিত রূপটি অনন্যসাধারণ। এই বীভৎস রূপটি চীনবাসীকে এই বলিয়া শাসাইতেছে যে, হয় আত্মসমর্পণ কর, নচেৎ তোমাকে নির্মূল করিয়া ফেলিব। দেখিতেছ না, আমি যে যে ভূখণ্ড দিয়া গমন করিয়াছি তাহা উজাড় করিয়া দিয়াছি। নর-নারী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তরু-লতা আজ মরিয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। নদ-নদী আজ কূলে-উপকূলে আছড়াইয়া মরিতেছে। হাওয়া বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে। কিসের আশায় এখনও আমায় এড়াইয়া চলিতেছ?' যাঁহারা বিজ্ঞানকে কল্যাণের আকর বলিয়া সেবা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কি কখনও ভাবিয়াছিলেন, জগতে ধ্বংস কার্য্যেই ইহার পূর্ণ আত্মবিকাশ হইবে?

শুধু জাপানীদের কথা বলিতেছি না, জগতের শক্তিমান জাতি মাত্রেই আজ বিজ্ঞানের এই বীভৎস রূপটির সাধনা করিতেছে। দেশ-বিদেশে তাহাদের অত্যাচারের বহর, তাহাদের এবম্বিধ সাধনার সিদ্ধিরই ক্রম ঘোষণা করিতেছে। জাপানীরা আকাশ হইতে মর্ত্ত্যে বোমা ফেলিয়া শত সহস্র নরনারী ও অগণিত মনুষ্যেতর জীবের মৃত্যু ঘটাইয়াছে। আকাশ হইতে বোমাবর্ষণ চীনেই হউক, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেই হউক, প্যালেস্টাইনেই হউক, স্পেন আবিসিনিয়া বা অন্য যে কোন স্থানেই হউক না কেন—তাহা একই পর্য্যায়ের। পররাজ্য হরণে, দমনে বা শাসনে শাসকজাতি বিজ্ঞানের এই বীভৎস রূপটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

আমরা আসল বিষয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, আসল প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে এ সব কথা আসিয়াই পড়িবে। চীনে জাপানের অভিযান—তাহার ব্যাখ্যা দুর্ব্বলের উপর সবলের লোভ বা কোপের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। আর অধুনাতন বীভৎসতার উৎস মিলিবে বিজ্ঞানের মারমুখী রূপকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির পূর্ণ প্রয়োগ চেষ্টার মধ্যে। জগতের কোন মনীষীই জাপানের এই দুষ্কার্য্যকে সমর্থন করেন নাই। জাপানেও চিন্তাশীল লোক রহিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের কেহ কেহ ইহাকে সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এই প্রসঙ্গে জাপানী কবি ইয়েন নোগুচির কথাই প্রথম আমাদের মনে আসে।

তিনি গত ১৯৩৬ সালে ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন. এবং রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও বহু ভারতীয় মনীষী ও প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। সম্প্রতি চীন-জাপান সংঘর্ষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সংগে তিনি পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতবাসীরা চীনের বিপদে যে তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল ও আক্রমণকারী জাপানের প্রতি বিরূপ তাহার সমালোচনা করিয়া তিনি উভয়কেই পত্র লিখিয়াছেন। এই সকল পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, কবি নোগুচি চীনে জাপানের বর্ত্তমান অভিযানকে ও যতকিছু অত্যাচার অবিচার হইয়াছে, সে সবকেই সমর্থন করিতেছেন, আর তিনি যে ইহা সমর্থন করিতে পারিয়াছেন এজন্য গর্ব্বিতও! হায়, অন্ধ স্বজাতিপ্রেম মানুষকে কতখানি নীচে নামাইয়া দিতে পারে!

বিজ্ঞানের এই বীভৎস প্রকাশ হইতে মনুষ্য সমাজ কিরূপে রেহাই পাইতে পারে মনীষিগণ সে বিষয় চিন্তা করিতেছেন বলিয়াছি। চীনের বক্ষে যেন নব নব উপায়গুলির পরীক্ষাও চলিয়াছে! চীনের অস্ত্রবল সামান্য। তাহার বন্দরগুলি একে একে জাপানের কুক্ষিগত। অস্ত্র আমদানীর পথ বর্ত্তমানে প্রায় রুদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম চীনে সোভিয়েট রুশিয়া হইতে কিছু আসিতেছে, আর ব্রহ্ম চীনের ভিতরকার নবনির্ম্মিত পথে কিঞ্চিৎ যাতায়াত করিতেছে। রেংগুনের বন্দরে যে কিছু রণসম্ভার পৌঁছিয়াছে তাহা জাঁকালভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ওদিকে জাপান অস্ত্রবলে দুর্জ্জয়। তাহার আমদানী রপ্তানির সকল দুয়ার উন্মুক্ত। বিদেশ হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সেখানে আমদানী হইতেছে। যাহারা ন্যায় নীতি ধর্ম্মের বাড়া বাড়া বুলি উচ্চারণ করিতেছে এমন সব লোকও জাপানকে অস্ত্রশস্ত্র যোগাইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মাঝে মাঝে জাপানকে হুমকি দেখায়। চীনাদের উপর নৃশংস অত্যাচারের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশ, জাপান বিদেশ হইতে যত রণসম্ভার আমদানী করিতেছে তাহার একটি প্রধান অংশ আমদানী করিতেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে। অন্যান্য দেশ হইতেও যে আসিতেছে তাহা ত বলাই বাহুল্য। এই সব দেখিয়াই চীনা প্রতিনিধি রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদের গত অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটা প্রস্তাব আনিতে চাহিয়াছিলেন যে, সঙ্ঘের রাষ্ট্রসভ্যগণ যেন জাপানকে অস্ত্রশস্ত্র যোগান হইতে বিরত থাকেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই ফলোদয় হয় নাই। জাপানকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় আগের মত বা তাহার চেয়েও বেশীই চলিয়াছে।

উভয় পক্ষের যখন এইরূপ বিসদৃশ অবস্থা তখন জাপানের বিরুদ্ধে চীনের পারিয়া উঠা কিরূপে সম্ভব? তাই দেখি, যখন চীনে এক একটি শহর—তাহা ছোটই হউক আর বড়ই হউক—ধূলিসাৎ হয় তখনই রব উঠিতে থাকে চীন গেল চীন গেল। লোকে বিশ্বাসই করিতে পারে না চীন কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে। ইতিহাসের নজীরও তাহাদের সম্মুখে। দেশ আকারে বিরাট হউক বা জনসংখ্যায় বিশাল হউক, দুর্ব্বল হইলে প্রবলের হস্তে তাহাকে আত্মসমর্পণই করিতে হইয়াছে যুগে যুগে। চীন দুর্ব্বল। কাজেই সে রেহাই পাইবে কিরূপে?

চীনারাই এ প্রশ্নের জবাব দিতেছে। চীন-জাপান সংঘর্ষের সংবাদ আমরা প্রত্যহই পাই না। মাঝে মাঝে সংবাদ আসে। ইহার অর্থ কি? জাপানীরা বোমা বর্ষণ দ্বারা জনপ্রান্তর উজাড় করিয়া দিলেও চীনাদের কবলে আনিতে পারে নাই। তাহাদের শাসন কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ আপোষের কথা শোনা যাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আপোষের কথা প্রকাশ হইবা মাত্র চীনারা তাহার প্রতিবাদ করিতেছে, তাহাদের দেখাদেখি জাপানেও তাহার প্রতিবাদ করা হয়। তবে কে আপোষের কথাবার্ত্তা চালাইয়া থাকে? জাপানীরা কতকগুলি প্রধান প্রধান শহর অধিকার করিয়াছে। সেখানকার চীনা ব্যবসায়ীদের হাত করিয়া তাহাদের দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা চালু করিতে চাহিতেছে। কিন্তু এই সব চীনা সওদাগর ত আর চীনা জনসাধারণ নয়। তাই তাহাদের প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই লোপ পাইতেছে। সত্যকার জাপানী শাসন ঐ সব অঞ্চলেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, চীনের অভ্যন্তরে ত দূরের কথা। মাঝে মাঝে যে আপোষ নিষ্পত্তির কথা শ্রুতিগোচর হয় তাহা এই সব চীনা ব্যবসায়ীদের সংগে জাপানীদের। কাজেই ইহার গুরুত্ব কতখানি তাহা সহজেই অনুমেয়।

সাধারণের ধারণা অন্তত সংবাদ সরবরাহকারীদের প্রচারিত সংবাদে এইরূপ ধারণাই হয় যে, চীনারা শত চেষ্টা সত্ত্বেও জাপানীদের সংগে কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছে না। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। চীনের দুর্ব্বলতার কথা আজ আর কাহারও অবিদিত নই। কিন্তু সে যে কোন কোন বিষয়ে সবলও হইতেছে এ কথা যেন আমরা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না বা বুঝিতে চাহি না। চীনারা আজ একতাবদ্ধ হইয়াছে। একতাই শক্তি— এ ত বহু পুরাতন ও বহু পরীক্ষিত প্রবচন। চীনারা আজ দেশের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এক হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। স্বার্থপর ব্যক্তিরা প্রচার করিয়াছিল, চীনা সাম্যবাদীরা মুখে চিয়াংকাইশেকের বশ্যতা স্বীকার করিলেও মনেপ্রাণে চীনকে একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করিতেই চেষ্টা করিতেছে। এই দল সম্প্রতি স্বীয় সভায় চিয়াংকাইশেকের নেতৃত্বে তাহাদের অটল আস্থা ঘোষণা করিয়াছেন, আর ঐ সকল কথা যে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য শত্রুদের চাল তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। সাম্যবাদী ও জাতীয়দল একযোগে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতেছে। দুর্ব্বল জাতিরা তথা চীনারাও বিজ্ঞানের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে চাহে। কিন্তু তাহারা ইহার বীভৎস রূপের উপাসক নহে। তাহারা ইহাকে ঘৃণা করে, ইহার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে চেষ্টা করে। চীনে আজ সত্য সত্যই ইহার পরীক্ষা চলিয়াছে। তুমি যতই মারমুখী হও না কেন, বিজ্ঞানকে নিজের ভৃত্য করিয়া যতই অত্যাচার চালাও না, ধরাকে সরা জ্ঞান কর না, জাতি যখন এক ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে তখন বিজ্ঞানের বিষ দাঁত বিষ বিচ্ছুরিত করিবার পূর্ব্বেই ভাঙিয়া যায়। চীনারা আজ এই সত্যের পরীক্ষা করিতেছে। তাহারা এক হইয়া নিজেদের যাহা কিছু সম্পদ আছে তাহারই সাহায্যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতেছে। চীনারা আক্রান্ত শহর ছাড়িয়া যাইতেছে, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পিছু

(শেষাংশ ৩২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীনিকেতনের পণ্য-বিপণি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(কলিকাতায় শ্রীনিকেতনের শিল্পজাত দ্রব্যের বিপণি উদ্বোধন উপলক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথের বাণী)

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হোলো শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্য চর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।

কর্ম উপলক্ষে বাঙলা পল্লীগ্রামের নিকটপরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কী রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে, অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশংকাই প্রবল।

একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মতো একটা আত্ম-বিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্রসংসদের সভাপতি পদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তখন-কার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলাম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্র-রঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হোলো। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করে-ছিলুম কবি-কল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম। তার ইতিহাসের লিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায় নি। সে কথার আলোচনা এখন থাক।

আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনী-বাহন কবিকে আকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিদ্রের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরথ।

খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না কিন্তু বীজবপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয় নি।

বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা, সে থাকে মাটির নিচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না ব'লেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনী সন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়? যাই হোক অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করি নি। করলে তার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হোত।

কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মসূচী আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না। বোধ করি আরম্ভের এই অনির্দিষ্টতাই কবিস্বভাবসুলভ। সৃষ্টির আরম্ভ মাত্রই অব্যক্তের প্রান্তে। অচেতন থেকে চেতন লোকে অভিব্যক্তিই সৃষ্টির স্বভাব। নির্মাণ কার্যের স্বভাব অন্য রকম। প্ল্যান থেকেই তার আরম্ভ, আর বরাবর সে প্ল্যানের গা ঘেঁষে চলে। একটু এদিক ওদিক করলেই কানে ধরে তাকে সায়েস্তা করা হয়। যেখানে প্রাণশক্তির লীলা সেখানে আমি বিশ্বাস করি স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে। আমার পল্লীর কাজ সেই পথে চলেছে, তাতে সময় লাগে বেশি কিন্তু শিকড় নামে গভীরে।

প্ল্যান ছিল না বটে, কিন্তু দুটো একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা ব্যাখ্যা করে বলি। আমার 'সাধনা' যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা জানেন রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্লেখ পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতি-বেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্য বিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরি-পরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃ-স্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ উৎসেরও সেই দশা।

সেই জন্য যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না, একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে সকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দ প্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি করে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়, তাদের গৌরব এই যে, অন্যশক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানাদিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এইরূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোন গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোন একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তাহলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে এ আমি বিক্রি করব না। এই যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ যার দাম সকল দামের বেশি একে অকেজো বলে উপেক্ষা করব না কি? এই আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তা হলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। যে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ প্রকাশে যে অপটু, মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করিনি কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘ্যতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে মনে করিনি। আমরা জানি যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চচূড়ায় উঠেছিল। তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাটকলার সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেকে আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ করে দেখেন। তাঁদের মনে যে পরিমাণ দয়া সে পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। স্বচ্ছলতার পরিমাণে সংস্কৃতির পরিমাণ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজনদরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বণ্টন করা বণিগ্‌বৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়। আমাদের অর্থসামর্থ্যের অভাববশত আমার ইচ্ছাকে কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত করতে পারিনি—তা ছাড়া যাঁরা কর্ম করেন তাঁদেরও মনোবৃত্তিকে ঠিক মতে তৈরি করতে সময় লাগবে। তার পূর্বে হয়তো আমারও সময়ের অবসান হবে, আমি কেবল আমার ইচ্ছা জানিয়ে যেতে পারি।

যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারি, তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। একথা মনে রাখা উচিত—সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।

আজকের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের একটিমাত্র বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হোলো। এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে। চারিদিকের গ্রামের সহযোগিতার মধ্যে একে পরিব্যাপ্ত করতে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সময় লেগেছে, আরও লাগবে। তার কারণ আমাদের কাজ কারখানা ঘরের নয়, জীবনের ক্ষেত্রে এর অভ্যর্থনা। অর্থ না হলে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেই আমরা আশা করি। এই সকল শিল্পকাজ আপনি উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে।

সবশেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য। কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই বলে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। একথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখ এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কিনা। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তা হলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।

অমলিন কটিবাস

শ্রীজ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

পণ্ডিত জওহরলালকে যে প্রশ্ন করা হ'য়েছে, তা পড়েই মনে হ'ল যে দেশসেবা ও দেশপ্রেম বৃত্তিগুলোকে আমরা কোন্ চোখে দেখতে আরম্ভ ক'রেছি। মহৎ মনদের বৃহৎ ত্যাগ, সত্যকার দেশসেবাকে আমরা ভুলে গিয়ে ক্ষুদ্র জিনিসের উপর বড় বড় চোখ মেলে তাকেই প্রকাণ্ড করে ধরে প্রকৃত মহত্ত্বকে প্রতিদিন কি রকমভাবে আঘাত কর্‌ছি, অপমানিত কর্‌ছি।

মহাত্মা গান্ধী যে উদ্দেশ্য নিয়ে কটিবাস পরিধান করলেন তা ভুলে গিয়ে এবং সে উদ্দেশ্যকে সফল করবার চেষ্টা বিন্দুমাত্রও না ক'রে কে ধুতির বদলে পাৎলুন পর্‌ল আর কে গান্ধীটুপী মাথায় দিল না আর কে টেবিল-চেয়ারে ব'সে ডাল-ভাত বা রুটির পরিবর্ত্তে সুপ বা পুডিং খেল এবং এইজন্যই প্রকৃত দেশসেবার পর্য্যায়ে সে উঠ্‌তে পার্‌ল না বলে ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ছি আর গণ্ডগোল পাকাচ্ছি। ডাল-ভাতের বদলে রোষ্ট যদি কাঁটা চামচে খাই, তা হ'লে দেশের যতটা মহা অনিষ্ট না ঘটবে, ধুতির বদলে পাৎলুন যদি প'রি তা হ'লে দেশসেবার যত না ক্ষতি হবে, তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীতে এখনও সেই পরিবর্ত্তন আনতে পারিনি বলে—যা আমার দেশকে বিদেশীয় স্বাধীন জাতির নাসিকাকুঞ্চন থেকে বাঁচিয়ে আনবে। আজও আমরা বুঝলাম না যে, বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মানবের কটিবাস পরিধান এইজন্য নয় যে তুমি,আমি, রাম, শ্যাম, যদু সবাই মিলে কটিবাস প'রব বা সুভাষ, জওহর থেকে আরম্ভ ক'রে কংগ্রেসী এম-এল-এ'রা পর্য্যন্ত সবাই মিলে শাম্বমূর্ত্তি মূর্ত্তি ধারণ করবেন। কিন্তু তার মানে এই যে, অখিল ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক যারা কটিবাসই পরিধান করে, তাদের ঐ স্বল্প বসনই হবে শুভ্র, অমলিন একরাশ মল্লিকা ফুলের মত শোভন ও সুন্দর। উচ্চরবে ঐ কটিবাস প্রতিদিন এই-ই ঘোষণা কর্‌ছে যে, মৌন মূকদের, সর্ব্বহারাদের পরিচ্ছন্ন থাকতে, পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসতে শেখাও, তাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবোধকে জাগ্রত কর।

বেশীদিনের কথা নয়, মজদুর ভাইদের এক সভায় গিয়েছিলাম; সারাদিন তাদের নোংরা বস্তীগুলির ক্লেদাক্ত পথে ঘুরেছি, যে আবর্জ্জনা, যে ময়লাকে তারা একটু চেষ্টা বা একটু শ্রম দ্বারা দূর করতে পারে, সুন্দরকে ও সুস্বাস্থ্যকে নিকটে আনতে পারে, সেদিকে নারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি, শিশু-সন্তানগণের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলোচনা করেছি, তারপর সভায় এসেছি। সভা বসবার আগে একটি মজদুর ভাই সভার মেঝেয় নিষ্ঠীবন ত্যাগ করলেন, তারপর আর একটি সেই পথানুসরণ করবার সময় যা ব'লে উঠলেন তার ভাবার্থ এই,—"এই ত আমরা কেমন শক্তিমান হ'য়েছি—এই এত বড় সভায় এই সমস্ত বড় বড় সাহেবানদের সামনে ব'সে কেমন থুতু ফেলছি—মিলের ভিতর কি এ রকম করতে পারতাম? অমনি ধনিক প্রবরেরা চেঁচিয়ে উঠবেন—কে এমন নোংরা ক'রল? দেওয়ালে, প্রাচীরে নানা ভাষায় দেখ সেখানে ইস্তাহার লেখা 'থুক মৎ ফেঁকনা'—কেন বাপু! থুতু যদি আমি ফেলিই তা হ'লে তোমার কোন গুড়ে বালি পড়ল যে এত চেঁচাচেঁচি।"

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমরা যারা আপনাদের ডেকে এনেছি সভায়, উপদেশ দিচ্ছি সভা করতে, একত্রিত হ'তে, সেই সব বড় বড় সাহেবান যদি আপনাদেরকে একত্রিত হবার যায়গায়, শক্তি-সঞ্চয় করার স্থানে কি ভাবে চল্‌তে, বস্‌তে, বস্‌তে, ব্যবহার কর্‌তে হয়—না বলে দিয়ে থাকি এবং দিই তা হ'লে আমাদের অপরাধের সীমা থাকে না। আমাদের সামনে এই যে মেঝেতে, আপনাদের পাশেই যে আপনাদের কেহ কেহ থুতু ফেলছেন, এমন যায়গায় যেখানে আপনার একটি ভাই বা বোন কি আপনাদের সন্তান এসে বসবে বা যা মাড়িয়ে যাবে, সেটা যে আপনারা কিছু ভাল কাজ করেন নি, বরং মানুষের প্রতি মানুষের সহৃদয় ব্যবহারের দিক থেকে, স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে, সহজ শোভন শালীনতার দিক থেকে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ কাজ করেছেন একথা যদি আমরা আপনাদের না জানাই ত দেশের কাছে, আপনাদের কাছে এবং সর্ব্বোপরি ভবিষ্যৎ বংশীয়ের কাছে আমি অপরাধী হব। যে ধনিক আপনাদের থুতু ফেলতে বারণ করেছেন, তিনি আপনার মতই সহস্র মজুরের মঙ্গলের জন্যই বারণ করেছেন, তাই তাঁকে আমাদের নমস্কার জানাই।" শিশুর মত সরল এই মজদুর দলকে আমরা যদি পরিচ্ছন্নতা শেখাই ত মিস মেয়োর দলের সাধ্য থাকে না একথা বলতে যে, আমরা এ দেশবাসীরা শূকরেরও অধমভাবে নোংরা যায়গায় নোংরা হ'য়ে বাস করি। কিন্তু সে পথ দেখাই কয়জনা? সেই দিকে চক্ষু খোলাতে চেষ্টা করি কে?

শুধু ধনিকের কর্ত্তব্য পালনের ত্রুটির দিকেই শ্রমিকের চোখ ফেরাবার কথা আমাদের নয়, শ্রমিকের আপনার প্রতি কর্ত্তব্যপালনের ত্রুটি সম্বন্ধেও তাকে সচেতন ক'রে দেওয়ার কর্ত্তব্য আমাদের-ই।

শরীর থেকে অনিষ্টকর যা কিছু আমরা ত্যাগ করি—তা অস্বাস্থ্য আনে, তা অসুন্দর, তা ন্যক্কারজনক এবং অস্বস্তিকর, তাই তাকে সকল লোকের চক্ষুর সম্মুখে ফেলে রাখা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ, মানুষের উপযুক্ত কাজ নয়, এ কথা আমরা আজও চাষা-ভূষা, শ্রমিক গ্রামবাসীদের শেখাতে পারিনি—শহরবাসীদেরও না, এমন কি সেরা শহর কলকাতার অধিবাসীদেরও না। তাই আজ গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও দেখি সকালবেলায় রেলপথে যেতে যেতে জানালা দিয়ে বহিঃপ্রকৃতির প্রভাত শোভা দেখতে যাওয়া বিড়ম্বনা। নবপ্রাণ-সঞ্চারক স্নিগ্ধ বায়ু সেবনার্থ অশান্ত নীল সমুদ্রতটেও সুস্থচিত্তে বেড়াবার যো নাই—মানুষই মানুষের এই আনন্দ উপভোগের পথটিকে ন্যক্কারজনক দেহত্যক্ত পদার্থে আবিল ও অপবিত্র ক'রে রেখেছে। কলিকাতায় একদিন চার নম্বর ওয়ার্ডে প্রাতঃপরিদর্শনের সময় পথে ভ্রমণ করতে করতে উচ্চ গালিরবে আকৃষ্ট হ'য়ে দেখেছিলাম, সদ্য গঙ্গাস্নান ফেরতা এক প্রৌঢ়ের দেহে পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর ছাদ থেকে একটি অল্পবয়সী মাতা

ছাঁর শিশুসন্তানত্যক্ত মল নিক্ষেপ ক'রে কাজ সেরে বসে আছেন। অথচ তরুণীটির পরিপাটি ক'রে চুল বাঁধা, শাড়ী-জামাও সুরুচিসম্মত।—তাঁরও এই অসুন্দর অশোভন ব্যবহার দেখে আমি বিস্মিত হ'য়েছিলাম—কিন্তু দুর্ভাগা আমাদের এই দেশের তরুণ-তরুণীদেরও বিষয় ভাবতে গেলে দেখি—'শহরে কি উনি একা—চতুর্দ্দিকে যায় দেখা এই মত কত অভব্যতা, উনি শুধু মাত্র একজন—এ দেশেতে অসংখ্য জনতা।'

শহরে সৌধে সৌধে ড্রেন্, পায়খানা আছে—সেপ্টিক ট্যাঙ্ক, মলশোধকেরও ব্যবহার কিছু কিছু যায়গায় চলেছে, তবু রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগ, মল ও অন্যান্য আবর্জ্জনা নিক্ষেপ এবং উঁচু থেকে বা দূরে থেকে নিক্ষেপ, খাটা পায়খানার ব্যবহার এ সব চলছেই। যে গ্রামে কংগ্রেস বা পল্লীসংস্কার সমিতির সভা হ'য়ে গেল, সে গ্রামের গ্রামবাসীরাও আজও পথে, ঘাটে, পুকুরে, যেখানে-সেখানে নিষ্ঠীবন, পানের পিচ, মলমূত্রাদি ত্যাগ করছে—ভয় নাই, লজ্জা নাই, শিক্ষা ও সুরুচিজ্ঞান নাই। কিন্তু অজ্ঞানতিমিরান্ধের চোখে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা প্রয়োগ করার কাজ যাঁদের সেই সব দেশসেবকবৃন্দের, মানব-হিতব্রতিবৃন্দের শলাকা-প্রয়োগ-সম্ভব-বাধা দেশমানবকে দিতে এ ইতস্ততঃ ভাব কেন বা এ অলসতা বা এ বিমূঢ়তা কেন? ইনকিলাব জিন্দাবাদ ব'লে চেঁচিয়ে মরছি, কিন্তু জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় এই সমস্ত কাজে ইনকিলাব বে, জিন্দাবাদ দূরে থাকুক, আনতেও যে সমর্থ হলাম না। গ্রামে গ্রামে গাড্ডা খোঁড়া আজও হয়নি—ভবিষ্যৎ বংশীয়ের জন্য জমিকে সারবান আজও ক'রে তুলছি না। যে শুচিতার দোহাই দিয়ে শৌচ-ক্রিয়ার পর স্নান করছি, কাপড় ছাড়ছি, সেই শুচিতাকে পদে পদে অবমানিত ক'রে দশের বমনোদ্রেকের সহায়তা ক'রে, দশের চলার পথকে পঙ্কিল করছি, অস্বাস্থ্যকর ক'রে তুলছি আজও কেন?

শুদ্ধ অমলিন তোমার ঐ কটিবাস, তোমার ব্রতনিষ্ঠা, ক্লেশবরণ কি দিল আমাদের? আর কি দিল তোমাদের অহোরাত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম, তোমাদের বিশ্ববাসীকে চমকিত ক'রে জয়যাত্রার পথে বজ্ররবে উচ্চারিত বাণী 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'?

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে যারা সর্ব্বহারা হ'য়ে চলে—তাদের দাও নবজীবনযাত্রা প্রণালী—শিখাও তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিখাও অমলিন স্বাস্থ্যের মূল্য। রাশিয়ার নোংরা অশিক্ষিত চাষী-মজুর যদি পরিচ্ছন্নতাকে ভাল-বেসেছে, জীবনে বরণ ক'রে আনতে পেরেছে—তবে শোভন-সুন্দরকে যারা বহুযুগ আগেই জীবনে বরণ ক'রেছিল, কিন্তু আজ যারা তাকে মরণকাঠির স্পর্শ দিয়ে সুপ্ত রেখেছে তারা আবার জীয়নকাঠি ছোঁয়াতে পারবে না কেন? ডেকে তাই বল—না হয় এদেশের ঋষির ভাষায় বল—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত!

সাম্যবাদী বঙ্কিম

(২৭৬ পৃষ্ঠার পর)

বনানীর তিমিরাচ্ছন্ন বুকে গণ-মঙ্গলের প্রভাতজ্যোতি নিয়ে এল সাম্যবাদী বঙ্কিমের অনন্যসাধারণ প্রতিভা।

বঙ্কিম একদিকে যেমন কষাঘাত করলেন শ্রেণীর প্রতি শ্রেণীর (Capitalism) অত্যাচারকে, আর একদিকে তেমনি আঘাত হানলেন জাতির উপরে জাতির আধিপত্যকে (Imperialism)। জাতি কর্ত্তৃক জাতির স্বাধীনতা হরণকে তিনি সোজা ভাষায় চৌর্য্য বলেছেন। সাধারণ ছিঁচকে চোর আর সাম্রাজ্যবাদী বড় চোরের মধ্যে পার্থক্য যে খুব অল্পই—একথা বোঝাতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন—"কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর।" "বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism"—বঙ্কিমের কাছে এই ছিল স্বদেশপ্রেমের সরল অর্থ। কমলাকান্তের জবানবন্দীতে কমলাকান্ত চোরকে গরু ছেড়ে দেবার জন্য প্রসন্ন গোয়ালিনীকে যে কারণ দেখিয়েছে—তা পাঠ করলে দেখা যাবে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব কিরূপ ছিল। কমলাকান্ত বলছে,

"পূর্ব্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, 'বৎস! গোপস্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপরে মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।' এই হল ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার International Law. যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্য। সেকেন্দর হইতে রণজিৎসিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of conquest যদি একটা Right হয়, তবে Right of theft কি একটা Right নয়?"

সাম্রাজ্যবাদকে এমনি তীব্র ভাষায় বঙ্কিম আক্রমণ করে-ছিলেন। তিনি যে কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছিলেন তার মূলে ছিল স্বদেশরক্ষার প্রেরণা আর এই স্বদেশরক্ষা বলতে তিনি বুঝে-ছিলেন শৌর্য্যের দ্বারা চৌর্য্যের অবসান। যা ন্যায়—তারই পূজায় বঙ্কিম আপনাকে উৎসর্গ করেছিলেন আর সেই জন্যই বৈষম্যকে কোনক্ষেত্রেই তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। যেমন রাজনীতির এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে—তেমনি স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তিনি উড্ডীন করতে চেয়েছিলেন সমানা-ধিকারবাদের জয়নিশান। সেই সাম্যবাদের অগ্রদূতের চরণ-কমলে দীনভক্তের শতসহস্র প্রণাম নিবেদন ক'রে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করি।

জাল-দলিল

সেকালের জালিয়াৎগণ নাকি দলিলের লিখিত অংশের কৌশলে পরিবর্ত্তনে তেমন নিপুণতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এবং তাঁহাদের অসতর্ক জালিয়াতি অবশ্য তাঁহাদের কালে কেহ ধরা দূরে থাকুক সন্দেহও করিতে পারে নাই। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে রঞ্জন-রশ্মিযোগে ঐ প্রকার দলিলের ফটোগ্রাফ গ্রহণে বুঝিতে পারা গিয়াছিল—মূল দলিলের কি কি অংশ পরে অদলবদল করা হইয়াছে। ইংরেজী 'আট'কে 'তিন' করা, কি 'তিন'কে 'আট' করা, 'সানডে'কে 'মানডে' করা হইয়া পরিবর্ত্তিত দলিল-অনুসারেই কার্য্য হইয়াছে, অথচ আজ হয়ত ৫০ কি ১০০ বৎসর পরে ধরা পড়িল, মূল দলিল যখন সম্পাদিত হইয়াছিল তখন উহার আকার ছিল অন্য প্রকার, উহার উপর জালিয়াৎদের বিচিত্র করসাজিতে দলিলের উদ্দেশ্য নূতন পথে চালিত করা সম্ভব হইয়াছে। এতদিন পরে ঐ দলিলের জালিয়াতি উদ্ধারে লাভ হয়ত প্রত্যক্ষ কিছুই

এই ইংরেজী অংক '7'কে '9' করা হইয়াছে; কিন্তু আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি এই জালিয়াতী সুস্পষ্টরূপে ধরিয়া ফেলিয়াছে; কালো কালির বিভিন্ন উপাদান বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে—তখন ঐ রশ্মির প্রভাবে উহাদের ভিতর যে বিভিন্ন বিকিরণ-তরঙ্গের উদ্ভব হয়, তাহার ফলে কালির রংয়ের জেল্লাও বিভিন্ন প্রকার গভীরতা প্রাপ্ত হয়; তাই চিত্রে পরবর্ত্তী অদল-বদলের অংশ গভীর ও আদি লেখা হালকা দেখা যাইতেছে।

হয় নাই, কিন্তু জালিয়াৎদের কাজটি যে পূর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ হইয়াছে এই আবিষ্কারের ফলে—একথা অস্বীকার করা যায় না।

বর্ত্তমানে ভাওয়াল সন্ন্যাসী-কুমারের যে মামলা হাইকোর্টে চলিতেছে, তাহাতে যেন এই রকমই একটা রহস্য উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও দিতে পারে মনে হইতেছে। মিউনিসিপ্যাল রেইনফল রেকর্ডের রেডিওগ্রাফিক এনলার্জমেণ্ট লইয়া গবেষণার জন্য ডাঃ গলষ্টন (রেডিওলজিষ্টের) সাহায্য আহূত হইয়াছে। ইহাতেও যদি উপযুক্ত ফল না পাওয়া যায় তবে বিলাত পাঠান হইবে উদ্ধারের জন্য। উভয় পক্ষ ইহাতে স্বীকৃত। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে কি ফল ফলে দেখিবার কৌতূহল এখানে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে জালিয়াতি সম্বন্ধে এমন ব্যাপক অনুসন্ধান সম্ভব হইয়াছে যে, মূলের যে কোনও পরিবর্ত্তন ধরিয়া ফেলা যেন সহজ হইয়াছে। ক্লিপ, রিবন প্রভৃতি যাহাতে দলিল গাঁথা হয়, তাহার নির্ম্মাণের সন-তারিখ বাহির করা শক্ত নয়। বিশেষ করিয়া এই প্রকারের জালিয়াতি 'উইলে'ই করা হয় বলিয়া, এইটি খুব গুরুত্বসম্পন্ন ঃ

একটি উইলে তারিখ দেখা গেল ১৮৯৮ সালের, কিন্তু অনুসন্ধানে বাহির হইল উহার মুদ্রিত ফরম ১৯২১ সালের পূর্ব্বে ছাপা নয়। যে ক্লিপ গাঁথা তাঁহার আবিষ্কার ১৯০৫ সালের পূর্ব্বে হয় নাই। উইলে টাইপরাইটার সাহায্যে শূন্য স্থান পূর্ণিত—টাইপরাইটার ১৯২৮ সালের পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। যে ছাপাখানার নাম অঙ্কিত তাহা ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত। যে রাস্তার ঠিকানা টেষ্টেটরের দেওয়া হইয়াছে, তাহা ১৯০২ সালের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয় নাই। সে টেষ্টেটরও এই অঞ্চলে বাস করিতে আসে নাই ১৯০০ সালের পূর্ব্বে। বলা বাহুল্য তাঁহার স্বাক্ষরটাই জাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

আজকাল জালিয়াৎগণ যে ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় তাহা হইল কালি!

বহুপ্রকার কালি বাজারে আছে, তাহার ভিতর, কাল, নীলাভ কাল, রক্তিম-কাল—নানাপ্রকার রংয়ের ভাঁজ আছে। প্রায় কালিই ১০।১১ বৎসর পরে কতকটা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে—ধারের দিকে হলদপানা আভা উঁকি মারে। এই প্রকারে কালির বিশ্লিষ্ট হইবার স্তরভেদে বিশেষজ্ঞগণ ঐ লেখার বয়স নির্দ্ধারণ করিতে পারে। কিন্তু জালিয়াৎগণ এবিষয়ে অজ্ঞ, কালির সদ্য রং মিলাইয়া তাহারা কাজ সারে। কিন্তু পরে কি পার্থক্য দাঁড়াইবে অথবা ultra-violet রশ্মির প্রভাবে উহার তখনই কি প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইতে পারে, তাহাও তাহাদের জানা নাই!

সঙ্গীয় চিত্রে দেখা যাইবে—ইংরেজী 'সাত'য়ের ফিগারটিকে 'নয়' করা হইয়াছে। যে কালিদ্বারা সাতের সংখ্যার শির মিলান হইয়াছে তাহা গভীরতর হইয়া পৃথকত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে, শাদা চোখে যাহা আজও ধরা পড়ে নাই। এখানেও ultra-violet ল্যাম্পের রশ্মি জালিয়াতি ধরিয়া ফেলিয়াছে—কালির রঙের হের-ফেরে।

আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে কালির প্রত্যেক পৃথক উপাদান স্বতন্ত্র বিকিরণ-তরঙ্গ উদ্ভাবিত করে। এই কারণে কোনটা দেখায় কাল, কোনটা দেখায় ঘিয়ে রং, কোনটা শাদা, কোনটা হালকা কাল, নীল, বেগুনে, সবুজ প্রভৃতি—উহাদের বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে। উপরোক্ত চিত্রের যে কালির রংয়ের পার্থক্য তাহার কারণও ইহাই। কালির লেখা তুলিবার যে ফিকির জালিয়াৎগণ কাজে লাগায় তাহাতে অক্জেলিক বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকে। ইহাতে কাগজ-পৃষ্ঠের সমস্ত জমাট কালি বিদূরিত হয় না—কাগজের অভ্যন্তরে কিছু না কিছু থাকিয়া যায়—যাহা চোখে দেখা যায় না। ultra-violet রশ্মি ঐ লুক্কায়িত কালিকে দৃশ্যমান করিয়া তোলে।

ইহার পর কাগজের বিভিন্নতা, লেখার ধাঁজ-ধরণে পার্থক্য প্রভৃতিও শাদা চোখ অপেক্ষা আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে আরও নিখুঁতভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। ইহা ছাড়াও নানাপ্রকার কৌশল দিনের দিন উদ্ভাবিত হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমানে জাল দলিল ধরিয়া ফেলা যেন কতকটা সহজ হইয়াছে বলিতে হইবে।

সত্যসিন্ধুর আত্মহত্যা

(গল্প)

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

রাগিলে নাকি মানুষের জ্ঞান থাকে না, মুখ দিয়া যা-তা বাহির হয়।

তাই সত্যসিন্ধুবাবু সেদিন যখন রাগিয়া ভাত না খাইয়া অফিসে চলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় গৃহিণীকে দাঁত খিচাইয়া বলিয়া গেলেন, এই শেষ, তোমার ওই শাঁখা সিঁদুরের অহঙ্কার আজ ঘোচাব, তবে আমি বাপের ব্যাটা! তখন কালীতারা তাঁহাকে বাধা দিলেন না বা হাতে-পায়ে ধরিয়া থাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন না; বরং ঝাঁজাল-কণ্ঠে উত্তর করিলেন, মরতে পার না, তাহলে ত বুঝি আপদ বালাই গেছে, শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হই; যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এ শাঁখাটুকু আমি কোন মতে তোমায় দিতে পারব না।

সত্যসিন্ধুবাবু বাহির হইতে সব কথাগুলি শুনিলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর রি রি করিতে লাগিল। মেয়েমানুষ --নিজের সহধর্ম্মিণী তার এতদূর স্পর্দ্ধা! তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজ সত্যিসত্যি আর বাড়ী ফিরব না। 'লেকের' জলে আত্মহত্যা করব।

বলা বাহুল্য এ রকম প্রতিজ্ঞা তিনি আরও অনেকবার করিয়াছেন, কিন্তু কখনই ঠিকমত পালন করিতে পারেন নাই। গৃহিণীর কথা, ছাগল, গরু বাড়ীর পুঁই-মাচাটির পর্য্যন্ত কথা মনে পড়িয়া তাঁহার আর মরা হয় নাই।

বস্তুত শনিবার হইলেই তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীতে এই রকম কলহের সৃষ্টি হইত। স্বামী না খাইয়া অফিস চলিয়া যাইতেন, স্ত্রীও না খাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িতেন। আবার অনেক রাত্রে সত্যসিন্ধুবাবু চুপি চুপি আসিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিতেন, ঘাট হ'য়েছে আর কখনও আত্মহত্যার কথা মুখে আনব না। তারপর দুজনে মিলিয়া রান্নাঘরে যাইয়া সকালবেলাকার কড়কড়ে ভাত হাঁড়ি হইতে বাড়িয়া পরমানন্দে ভক্ষণ করিতেন। এইভাবে আজ বিশ বৎসর চলিয়া আসি-তেছে; রেসের দিন হইলেই তিনি গৃহিণীর নিকট হইতে গহনা চান, টাকা চান, বলেন রাত্রে তোমায় তিনগুণ ফেরৎ দিব— এখন একখানা গহনা দাও, কাল তোমায় 'হ্যামিলটনে'র বাড়ী থেকে তিনখানা গহনা গড়িয়ে দেব।

আবার রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া হাতজোড় করিয়া বলেন, আজ একটুর জন্যে মাইরি ফসকে গেল, আসছে শনিবার তোমায় একেবারে রাজা ক'রে দেব, সুদে আসলে ফিরিয়ে দেব।

এইভাবে একখানি একখানি করিয়া সমস্ত অলঙ্কার ঘুচিতে ঘুচিতে কালীতারার ওই শাঁখাটুকুতে ঠেকিয়াছে। বড়লোকের মেয়ে, বিবাহের সময় প্রচুর অলংকার ও টাকা লইয়া ঘর করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামী দেবতার কৃপায় এখন সে ঘরও নাই, টাকাকড়িও নাই—সব গিয়াছে। অন্ধকার গলির মধ্যে খোলার ঘরে তাঁহাদের এখন দিন কাটে। তাই সধবার প্রথম ও শেষ লক্ষণ, শাঁখাজোড়াটি যখন সত্যসিন্ধুবাবু কালী-তারার নিকট চাহিয়া বসিলেন তখন তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, দুকথা শুনাইয়া দিলেন।

গৃহিণীর কথায় বোধ হয় আজ তাঁহার মনে খুবই ব্যথা লাগিয়াছিল। তাই রাত্রি বারোটার সময় সত্যিসত্যিই সত্য-সিন্ধুবাবু বাড়ী না ফিরিয়া ধীরে ধীরে 'লেকের' ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শনিবার। অমাবস্যার রাত্রি। 'লেকের' আলো সব নিভিয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে গাঢ়, জমাট অন্ধকার। নিস্তব্ধ, জনহীন পথ। কদাচিৎ দুই একটি পাখীর ঝটপট শব্দ অন্ধ-কারকে সচকিত করিয়া দিয়া গাছের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছিল। সত্যসিন্ধুবাবু একবার চারিপাশে চাহিয়া লইলেন তারপর ধীরে ধীরে পা-দুটি জলে ডুবাইলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে কে যেন ঢিব্ ঢিব্ করিয়া হাতুড়ি পিটাইতেছিল; হাত-পা তাঁহার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তিনি সাঁতার জানিতেন না, তবুও বীরের মত আরও একটু জলে নামিয়া গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর উঠিয়া আসিয়া একেবারে আমগাছের নীচে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, আর একটু বেশী রাত্রি হউক।

বসিয়া বসিয়া তাঁহার কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। এই 'লেকে'র জলে কত লোক সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। কত শান্তি তাহারা পাইয়াছে ইহার শীতল জলে। এই-ত সেদিন একটি যুবকের মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিল, আবার আর একদিন যুবক-যুবতীর লাশ উঠিল একত্রে। জলের মধ্য হইতে সেই সব আত্মা তাঁহাকে যেন ডাকিতে লাগিল 'আয়' 'আয়' বলিয়া। তিনি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগি-লেন।

সমস্ত দিন অনাহারে দেহ ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহার উপর আবার এই দুর্ভাবনা। 'লেকের' শীতল হাওয়ায় শীঘ্রই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সত্যসিন্ধুবাবু দেখিলেন, সেই স্থির কালো জলে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। সাঁতার জানেন না, বিস্তর হাত-পা ছুড়িয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করি-তেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। ক্রমশই গভীর অতলে তলা-ইয়া যাইতেছেন।

কোথায় যাইবেন? অন্ধকার—চারিদিকে শুধু গাঢ় জমাট অন্ধকার। পথ জানা নাই, জিজ্ঞাসা করিবার লোক পর্য্যন্ত কেহ নাই। অন্ধের মত হাতড়াইতে হাতড়াইতে তিনি একটি সিঁড়ি দেখিতে পাইলেন। অগণিত ধাপ ও অসম্ভব দীর্ঘ সিঁড়ি সোজা চলিয়া গিয়াছে কোন অদৃশ্য অলক্ষ্যে। হাত-পা ব্যথায় টাটাইয়া উঠিল তবুও পথ ফুরায় না। শেষে তিনি একটি জ্বলন্ত (উজ্জ্বল নয়) দরজার কাছে গিয়া হাজির হইলেন।

বিরাট দেহ এক ভোজপুরী দারোয়ান সেখানে দাঁড়াইয়া খইনী টিপিতেছিল। সত্যসিন্ধুবাবু ভিতরে ঢুকিতে চাহিলে সে বলিল,কোন কেস হ্যায় '

তিনি বলিলেন—আত্মহত্যা।

সে বলিল, এ 'সিভিল' হ্যায়। ফৌজদারী ডিপার্টমেণ্ট যাইয়ে। সত্যসিন্ধুবাবু বলিলেন, আমি পথ নেহি' চিনতা হ্যায়,—একটু যাতলে দাওনা পাঁড়েজী।

পাঁড়েজী বলিল, ওই যে ঘণ্টা বাজতা হ্যায়, আউর এক আদমী ফুকারতা হ্যায় উধার যাইয়ে।

সত্যসিন্ধুবাবু বলিলেন—ধন্যবাদ হ্যায়। পাঁড়েজী সেলাম ঠুকিয়া বলিল—কুছ বকশিস মিলি।

তিনি বলিলেন, বহুৎ গরীব হ্যায়, মাপ কর পাঁড়ে।

তারপর যেদিকে ঘণ্টা বাজিতেছিল সেখানে গিয়া হাজির হইলেন। সামনেই দরজা তাহাতে লেখা 'ফৌজদারী কোর্ট' আত্মহত্যা' বিভাগ। আর একটু এগিয়ে যেতেই কয়েকজন উকিল আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল জিতিয়ে দেব, কত দেবেন ফুরান্ করুন।

আর একজন বলিল, আমার কাছে আসুন বে-ওজর খালাস করে দেব।

আর একজন বলিল, ন'সিকি দেবেন। কোর্ট ফি, ষ্ট্যাম্প ফি মায় আমার ফি—সবসমেত। এখানে ঠকবার কোন ভয় নেই।

তার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া প্রথম উকিল বলিল, আজ্ঞে ওর কথা শুনবেন না। এক টাকা বার আনায় সব করে দেব আমি। আসুন—এদিকে আসুন, নাম কি বলুন ত—।

সত্যসিন্ধুবাবু অবাক হইয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, উকিলরা কি মরিয়াও আবার উকিল হয়—এখানে আসিয়াও নিস্তার নাই। এখানেও কি সেই বেকার সমস্যা?

শেষে দরদস্তুর করিয়া ঠিক হইল আঠারো আনা। তারপর সত্যসিন্ধুবাবু ভয়ে ভয়ে উকিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জিতিয়ে দিতে পারবেন ত?

উকিলবাবু বলিলেন, নিশ্চয়ই, কোন ভয় নেই—আমার 'কেস' Ninetynine Percent Successful (শতকরা নিরানব্বইটা জয়লাভ করে) আমার নাম শোনেন নি? 'লেট' অমরেন্দ্রনাথ পাল এম-এ, এম-এস-সি, বি-এল।

—আজ্ঞে কি করে শুনব, এখানে ত এর আগে কখনও আসিনি; তা ছাড়া কি জানেন আমার কোন সাক্ষী-টাক্ষী নেই।

—সাক্ষী নেই? তার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আমাদের কাছে সাক্ষীও ভাড়া পাওয়া যায় (অবশ্য আপনাদের সুবিধার জন্যই এ-সবের ব্যবস্থা করা)।

সত্যসিন্ধুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ভাড়া! সাক্ষী আবার ভাড়া পাওয়া যায় নাকি!

উকিলবাবু বলিলেন, কিচ্ছু ভাববেন না, টাকা পেলে (আঙ্গুলে বাজাইবার ভঙ্গীতে দেখাইয়া) আমরা দিনকে রাত, আর রাতকে দিন ক'রে দিতে পারি। তারপর হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া একটু দন্ত বিকশিত করিলেন।

সত্যসিন্ধুবাবু তাঁহার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত ও হতভম্ব হইয়া গেলেন। তারপর কাগজপত্র লইয়া উকিলবাবুর পিছু পিছু পেস্কারের কাছে গেলেন।

পেস্কারবাবু খুব গম্ভীর ও বিরক্তিকর মুখে হাত বাড়াইয়া কাগজপত্রগুলি লইলেন এবং এমনভাবে তাহার নীচে হাত পাতিয়া রহিলেন যে, সত্যসিন্ধুবাবু তাহার অর্থই বুঝিতে পারিলেন না। তখন উকিলবাবু তাঁর কানে কানে বলিলেন, দিন পেস্কারবাবুকে কিছু।

সত্যসিন্ধুবাবু চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, কেন ও'কে দিতে যাব মশায়? আমি কি এখানে দানসত্র খুলেছি? উনি আমার কি করবেন?

উকিলবাবু তাড়াতাড়ি অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, আরে মশায় বলেন কি আপনি? চুপ চুপ চুপ ও'রাই ত হলেন আমাদের মা-বাপ...কোর্টের মালিক ...হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা!

সত্যসিন্ধুবাবু অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ট্যাঁক হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, মানুষের অভ্যাস মরিলেও যায় না। ছি এখানে মানুষে আসে?

তখন উকিলবাবু বলিলেন, আপনি ততক্ষণ গ্যালারীতে গিয়ে বসুন, আপনার নাম ডাকলেই এসে হাজির হব আমি।

সত্যসিন্ধুবাবু ভয়ে ভয়ে ঘরের মধ্যে যাইয়া ঢুকিলেন এবং রীতিমত ভড়কাইয়া গেলেন। এখানেও ঠিক যথাযথ কোর্ট বসিয়াছে। বিচারকের আসনে স্বয়ং যমরাজ হাতে ন্যায়দণ্ড, পাশে চিত্রগুপ্ত বিরাট খাতা লইয়া বসিয়া আছেন। তারপর উকিল, আর্দ্দালী সব ঠিক ঠিক। সত্যসিন্ধুবাবু বসিয়া বসিয়া কেস শুনিতে লাগিলেন।

আর্দ্দালী হাঁকিল—গোবর্দ্ধন রায়, হা-জি-র। একটি ছিপ্‌ছিপে ছোকরা—ভাল করিয়া এখন গোঁফ উঠে নাই, আসিয়া হাজির হইল। পরণে একখানি পাতলা ধুতি তাহার মধ্য হইতে 'হাফপ্যাণ্ট' দেখা যাইতেছে। আদ্দির পাঞ্জাবীর ভিতর দিয়া গলেকাটা গেঞ্জি উঁকি মারিতেছে। চোখে 'রীমলেস' চশমা, মাথায় বব-করা ঝাঁকড়া চুল।

প্রশ্ন হইল—নাম?

মিহিসুরে সে বলিল, শ্রীগোবর্দ্ধন রায়।

—পেশা?

—ছাত্র, আই-এ ফার্ষ্ট ইয়ার।

—বয়স?

—সতেরো বছর, তিন মাস, সাত দিন।

—মৃত্যু কিসে?

—আত্মহত্যায়।

—কোথায়?

—ঢাকুরিয়া লেকে।

—কারণ?

এইবার গোবর্দ্ধন রায় একটু ইতস্তত করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

গম্ভীর কণ্ঠে বিচারক বলিলেন, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়াছেন, মিথ্যা বলিবেন না। বরং সত্য বলিলে সুফল ফলিতে পারে। নচেৎ ওই দেখুন, ওইখানে চিরকাল থাকিতে হইবে।

সরসর করিয়া একটা বিরাট দরজা খুলিয়া গেল আর তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল নরকের বীভৎস দৃশ্য! মর্ম্মভেদী

অভাগী

(ছোট গল্প)

শ্রীসারদারঞ্জন সর্ব্বজ্ঞ

বেলা তখনও পড়ে নাই। রতন মাঠ হইতে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল—সাধনের মা ঘরে আছিস্?

রুক্মিণী তখন গোয়ালের ভিতর গরুর জন্য খড় কাটিতেছিল। ভিতর হইতে উত্তর দিল—আজ এত সকালে ফিরলে যে বড়?

রতন ততক্ষণ গোয়ালঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখে হাসি ধরে না। কহিল,—পুরান বাড়ীর কায়েত খুড়ী এসেছে। আজ বার বছর পর নিধু খুড়োর ভিটেয় সন্ধ্যে জ্বলবে!

রুক্মিণীও হাসিল,—এসেছেন তা' ভালই হ'ল। গাঁয়ের লোক গাঁয়ে ফিরে এল, কিন্তু এ খবরটা দিতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে না এলেও চলত।

"বাঃ রে! এখুনি ওদের বাড়ী যেতে হবে যে!—পোড়ো-বাড়ী, ওতে কি ওই বুড়ী একা একা ঢুকতে পারবে, না সাহস করবে? ওঁরা ওই বেলতলার দাঁড়িয়ে আছে। সাধন কাটা ধান ক'টা নিয়ে আসবেখন। তুমি এরই মধ্যে কিছু খাবার যোগাড় করে সাধনের সঙ্গে ও বাড়ীতে এস।"—এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া রতন ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল। ....

বার বছর বয়সের রতন যেদিন পিতৃহীন হইল আপনার বলিবার মত এক মা ছাড়া আর কেহ রহিল না; বাপ চিরকাল সিপাহীর খাতায় নাম রাখিয়াই বড় হইয়াছিল। যেদিন যাদবচন্দ্র সিঁথিতে সিন্দুর পরা এক পনের বছরের মেয়েকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে ঢুকিল আর অনাথা মেয়েটির পরিচয় দিল নিজের বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া, সেদিন হইতেই তার গ্রামের লোকের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। অন্যান্য দশজনের তুলনায় তাহার অবস্থা স্বচ্ছলই ছিল। সিপাহীগিরির রোজগার—তা' ছাড়া সামান্য কিছু জমির ফসল, ইহাতেই তাহার বেশ স্বচ্ছন্দে দিন কাটিত।

গ্রামের লোক তাহাকে একঘরে করিলেও সে কাহারও নিকট মাথা নোয়াইল না। অন্যের সহানুভূতি ব্যতিরেকেও তাহার বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটিত না। তাই যখন সে চোখ বুঝিল, রতন সত্যই নিরাশ্রয় হইল। রতনের বাড়ীর দু'খানা বাড়ীর পরেই রামকান্তের বাড়ী। তাহারা দুই ভাই—কনিষ্ঠ নিধিকান্ত। অবস্থা এক কথায় ভাল। যাদব-চন্দ্রের জীবদ্দশায় গ্রামের দশজনের মত এ পরিবারের সহিত তাহারও কোন বনিবনাও ছিল না; তবু, রতন যখন সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িল, রামকান্ত দয়াপরবশ হইয়া এই অনাথ বালকটিকে কোলে টানিয়া লইল। রতন ও তাহার মায়ের তত্ত্বাবধানের ভার সে সাগ্রহে আপনার স্কন্ধে লইল। উহাদের জমি-জমার দ্বারা সামান্য চলিত; বাকী সব রামকান্ত নিজে ব্যবস্থা করিত। সমাজ—অবশ্য তাহাকে ক্ষমা করিল না। তাহারা দুই ভাইও একঘরে হইল।

কালক্রমে রতন বড় হইল। রামকান্তেরও মাথার চুল পাকিল। বৃদ্ধ রামকান্ত ও বিধবা মায়ের শত নিষেধ সত্ত্বেও রতন সিপাহীর খাতায় নাম লেখাইল। প্রায়ই তাহার কাটিত সদরে, মাঝে মাঝে আসিয়া মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিত।

সংসারে যেমন রীতি। একদিন রুক্মিণীর হাত ধরিয়া আসিয়া রতন মাকে প্রণাম করিল! মায়ের বুকে এক নূতন আনন্দ। দেখিতে দেখিতে অসহায় রতন নিজেই নিজের সহায় হইয়া দাঁড়াইল। তাহার গৃহের আজ নূতন শ্রী। কয়েক বৎসর না কাটিতেই সাধন আসিয়া সুপ্ত গৃহকে হাসিমুখর করিল। আমাদের এ কাহিনী মধুরতর হইত, যদি না এক নূতন মহামারী আসিয়া সমগ্র বাঙলা ছাইয়া ফেলিত।

প্লেগের করাল মূর্ত্তিতে সমস্ত বাঙলা সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিল। গ্রামকে গ্রাম, দেশকে দেশ শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল। কবিরাজ নিদানে ইহার চিকিৎসা খুঁজিয়া পাইল না, হেকিম নির্ব্বাক রহিল। শবের গন্ধে ও শোকার্ত্তের হাহাকারে আকাশ-বাতাস পরিপূরিত হইল।

রতন তখন সরকারের কাজে রাজধানীতে। বাড়ী ফিরিবার অনুমতি সে পাইল না। চারিদিক-হইতে মহামারীর খবর আসিল, নিজের গৃহের কোন খবর তার কানে পৌঁছিল না। ছয় মাস পরে যখন সে দেশে ফিরিল, মহামারী তখন দেশত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তার করাল-বিভীষিকা বাঙলার প্রতি ঘরে মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে।

চোরের মত সশঙ্কচিত্তে আঙিনায় প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিল না। কি জানি কেন রতনের বুক কাঁপিয়া উঠিল। পা টলিতে লাগিল। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রে সঞ্চিত করিয়া ডাকিল—'মা'। এই ডাকে যাঁর কর্ণে মধু সিঞ্চিত হইত, তিনি তখন কোন লোকে তাহা কে বলিবে।.....

গ্রাম হইতে সর্ব্বপ্রথম রতনের মা বিদায় লইয়াছেন। রুক্মিণী ও সাধনকে রতন সুস্থ অবস্থায়ই ফিরিয়া পাইল। পর পর গ্রামের সব খবরই সে শুনিল। বৃদ্ধ রামকান্ত তাহারই মায়ের শুশ্রূষা করিতে আসিয়া রোগের বীজাণু নিজ বাটীতে লইয়া যান। ফলে তিনি নিজে, ভাই নিধিকান্ত, স্ত্রী ও দুই পুত্র—এই পাঁচটি প্রাণী পর পর ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে। সংসারে রহিল শুধু নিধিকান্তের স্ত্রী আর রামকান্তের দুই বৎসরের এক শিশু কন্যা।

রতনকে দেখিয়া কায়েত খুড়ী আছাড়িয়া পড়িলেন। রতন আনুপূর্ব্বিক তাঁহার কাছে পুনরায় সব শুনিল।...... তারপর একদিন রামকান্তের অনাথা মেয়েটিকে লইয়া কায়েত খুড়ী নিজে পিতৃগৃহে চলিলেন। রতন হাজার বার নিষেধ করিল, পায়ে ধরিয়া সাধিল—তবু তিনি রহিলেন না। সেই-দিন হইতে রামকান্তের বাড়ী, নিধু খুড়োর বাড়ী অন্ধকার হইল।

আজ দীর্ঘ বার বৎসর পর কায়েত খুড়ী আবার গাঁয়ে ফিরিয়াছেন সঙ্গে সেই দু'বৎসরের রাখালী, আজ যৌবনে পা' দিয়াছে। রতন তাই এত ব্যস্ত হইয়া সেই পরিত্যক্ত বাড়ীর সংস্কার করিতে [illegible]য়াছে

র[illegible]নু [illegible]ঠের কাজ [illegible] অবসর [illegible]। ক[illegible]

কিন্তু তাহার বিরাম নাই। কায়েত খুড়ীর বাড়ীর ভিতর অসংখ্য আগাছা সব বিদায় হইল। জীর্ণ খড়ের ছাউনি নূতন হইল। পুকুরের পানা পাড়ে উঠিল। অশে-পাশের গাছগুলির পুরান ডাল-পালা সব কাঠের ঘরে স্থান পাইল। তুলসীতলায় রতন নূতন করিয়া মাটির মঞ্চ তৈয়ার করিল। —রতনের কাজের অন্ত নাই। কিসে কায়েত খুড়ীর সুবিধা হইবে, কিসে তার মুখে একটু হাসি ফোটে তারই চেষ্টায় রতনের দিন কাটে। পরাণের ক্ষেতের—কড়াই শাক, নটে শাক, হরিচরণের কাছ থেকে সিম, বেগুন,—যার ক্ষেতের যে ফসল ভাল, কায়েত খুড়ীর জন্য তাই কিনিয়া আনে সে।

রাখালী 'রতনদা' 'রতনদা করিয়া পাগল, যেন কত-কালের হৃতসম্পত্তি সে ফিরিয়া পাইয়াছে। রতনকে রাত্রিতে ঐ বাড়ীতেই থাকিতে হয়, বারান্দায় পড়িয়া থাকে সে। আর যতক্ষণ রাখালী না ঘুমাইয়া পড়ে, ততক্ষণ সে তার সিপাহী-জীবনের হাজার রকম গল্প শোনায়। কখনও অবাক হইয়া রাখালী বলে, রতনদা', তুমি তা'হলে ডাকাত, কত লোককে খুন করেছ বল ত? রতন হাসিয়া উত্তর করে—ডাকাত বলে ডাকাত, আমরা ডাকাতি করি—দুষমনদের সংগে—যারা রাজার শত্তুর, দশের শত্তুর!

রতন কায়েত খুড়ীর সংসারে জমিয়া গেল। সাধন বাইরের কাজ করে, রুক্মিণী ঘর সামাল দেয়।

একদিন কায়েত খুড়ী সাধন আর তার মাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। রুক্মিণী সাধনকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে এমন সময় কায়েত খুড়ী তার হাতদু'টি ধরিয়া কহিলেন —দ্যাখ্, সাধনের মা—আমার রাখালীকে তুই তোর কোলে তুলে নিবি। রুক্মিণী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া একবার চাহিল, তারপর ঘোমটাটা আরও নামাইয়া দিল। রতন কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, সাধনের মা সংকেতে তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

কায়েত খুড়ী রতনকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন—আজ বার বছর পর এই প্রয়োজনেই ত এসেছি ভাই, আমার রাখালীকে তোর ঘরের মা লক্ষ্মী করে দিয়ে এবার আমি চোখ বুজি।

রতনের বাড়ীতে আজ মহাধূম। আত্মীয় কুটুম্ব তার খুব কম; বাড়ী ছোট তাই গম গম করিতেছে। কায়েত খুড়ী রাখালীকে লইয়া রতনের একখানা ঘর অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। পাশের গাঁয়ের মাণিকের মত সানাইদার কেউ নেই, তাই গত সন্ধ্যা হইতে সে সানাই'র কসরৎ সুরু করিয়াছে। রতনকে খুঁজিয়া পাওয়া দায়। কখন এখানে কখন ওখানে। 'ওটা হয়নি এখনও,—কখন হবে?' 'কই ময়রা ভাইদের কতদূর?' 'তাইত ঘোষের পো কি দইয়ের কথা ভুলেই গেল?' 'এই যাঃ, কালু খুড়োকে বুঝি বলাই হয় নি?'—রতনের মুখ, হাত, পা' সমানে চলিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। চারিদিকে বাতি ও মশাল জ্বলিয়া উঠিল। সন্ধ্যা লগ্নে বিবাহ। রতন অতিথি-অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করিতে করিতে হঠাৎ বাড়ীর বাহির হইল। কই পুরোহিত ঠাকুর তখনও আসিয়া পৌঁছান নাই। মদন জ্যেঠাকে সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া রতন নিজেই এক ক্রোশ পথ ভাঙিয়া পুরোহিতের উদ্দেশ্যে চলিল।......

এদিকে সম্প্রদানের সমস্ত প্রস্তুত। রতনের পুরোহিত লইয়া আসিতে যা বিলম্ব। কালু খুড়ো, মদন জ্যেঠা, হরিহর দত্ত, সবাই পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মহাশয় দর্শন দিলেন। কায়েত খুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—রতনের সাথে দেখা হয় নি ঠাকুর? 'না' বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন। রতন আসিল না। বাড়ীশুদ্ধ সকলেই মহা উদ্বিগ্ন হইল। লগ্ন উত্তীর্ণ প্রায়।

"কায়েত খুড়ী?" —আতঙ্কের গলা শুনিয়া কায়েত খুড়ী কেন সভাশুদ্ধ সবাই চমকিয়া উঠিল। রতন সকলকে অতিক্রম করিয়া কায়েত খুড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রতনের মুখ দেখিয়া সকলে শঙ্কিত হইল।—'আমাদের বড় ভয় হচ্ছে রতন, কি হ'য়েছে শীগগির বল?' কায়েত খুড়ী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

রতন গুরুগম্ভীরস্বরে কহিল—আবার লড়াই বেধেছে দুষমনদের সংগে। সরকারের লোক এসেছে রাজার অনুরোধ নিয়ে, দেশের নামে ডেকেছে সব্বাইকে। তারপর সমবেত সকলের দিকে চাহিয়া কহিল—আপনারা আমাকে মাপ করবেন। আমরা দু'পুরুষ রাজার খেয়ে মানুষ, রাজার চাকর, দেশের গোলাম। আজ ডাক পড়েছে, দুষমনদের সংগে লড়াই। আমায় আজ এক্ষুণি যেতে হবে, তবে গিয়ে সবার আগে প্রথম দলে ভিড়তে পাব। আপনারা এ বিয়ের ব্যবস্থা দেখুন। কাল যেন সাধন সদরে যাত্রা করে। —বলিয়া রতন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বিবাহের সমস্ত কোলাহল এক নিমেষে যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।

রুক্মিণী সব শুনিয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দুই চোখ ফুলিয়া গিয়াছে। বহুবার সে স্বামীকে নিজ হাতে সাজাইয়া দিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়াছে; আজ—কি জানি কেন সে অস্থির হইয়া পড়িল। রতন সস্নেহে সেই মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—ছিঃ এত কাঁদে! —কত দুষমনকে যমের কাছে পাঠিয়েছি, কত লড়াইতে গিয়েছি, লড়াই জিতে বাড়ী ফিরেছি,—এখনও সিন্ধুকে কত পদক আছে দেখ দিকি! ভয় কিসের?

রুক্মিণী কহিল—জানি না কেন, এবার সত্যিই তোমায় ছেড়ে দিতে ভয় হচ্ছে! কোথায় ঘরে আমার লক্ষ্মী আসবে, না—?

"তোমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরেই আসবে রুকি! তুমি চট্ ক'রে আমায় পদকগুলো পরিয়ে দাও ত?......"

নগরে তখন বিরাট তোলপাড় সুরু হইয়াছে। রাজার আহ্বান, দেশের আহ্বান, দেবতার আহ্বান কেহ উপেক্ষা করিল না। স্বদেশপ্রাণ যুবক বিলাস ত্যাগ করিল, প্রৌঢ় সংসার ভুলিল। কাতারে কাতারে লোক আসিয়া রাজপতাকার নীচে সমবেত হইল।

তারপর একদিন পাখীর প্রথম ডাকের সংগে সংগে "জয় মা ভবানী" রবে দশদিক কাঁপাইয়া সেকালের বীর সন্তান সব অত্যাচারী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে বীরদর্পে যাত্রা করিল।

(শেষাংশ ৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্কিম প্রতিভা

শ্রীমতী অমলা মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র রস-সাহিত্যের স্রষ্টা ও অনুপমেয় কথাশিল্পী হিসাবেই আমাদের নিকট আদৃত নহেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার সমন্বয় করিয়া যে জাতীয় আদর্শবাদ তিনি তাঁহার অমর লেখনীমুখে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই জাতীয়তাবাদের প্রথম উপাসক, দেশাত্মবোধ উদ্বোধনের প্রধান পুরোহিতরূপে তাঁহার নাম সাহিত্য-জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পরিবর্ত্তনশীল যুগধর্ম্মের প্রভাবে আজ বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে সাম্যবাদের বাণী অনেকের নিকটেই অজানিত নহে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেশের দুর্দ্দশায় মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া এই মহাপুরুষ শ্রেণীগত বৈষম্যই যে সকল অনর্থের মূল—এ কথা মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন ও "সাম্যের" বাণী উচ্চারণ করিয়া স্বদেশবাসীকে জাগ্রত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আজ হয়ত তাঁহার প্রচারিত আদর্শ-বাদ হইতে আমরা অনেক অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি, তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় দেশের মুক্তি সম্ভবপর না হইয়া অন্য পন্থার আশ্রয় লইতে হইতেছে, কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার কল্পিত অতীতের সেই আদর্শবাদের মধ্যে বর্ত্তমানের এ সাম্যবাদের বীজ নিহিত ছিল এবং স্বপ্নময় আদর্শবাদ এখন বাস্তব জীবনোপযোগী কর্ম্মময় সাম্যবাদের সাধনায় পূর্ণতা লাভ করিতে চাহিতেছে।

যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তাশীলতার সহিত তিনি ভারতবর্ষের অবনতির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার নানা বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে পাইয়া থাকি। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় শ্রেণীগত বৈষম্য যে আমাদের অধঃপতনের মূল, এ তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার একটি প্রবন্ধ (সাম্য) হইতে উল্লেখ করিতেছি:—"সামাজিক বৈষম্য নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ।..........যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা সংশোধিত না হইলে মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি হইবে না।" —সমাজের শীর্ষস্থানীয় রূপে যাঁহারা এই বৈষম্যের জন্য দায়ী, তাঁহাদের তিনি বারম্বার সতর্ক করিয়া দিতে চাহিয়াছেন ও ইহার প্রতিকারার্থ অবহিত হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক প্রবন্ধে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"দেশের মঙ্গল? কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু আমি কি দেশ? দেশের অধিকাংশের যেখানে মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সহস্র লোকের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জন কৃষক, ইহাদের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে তুলুক, আমি তুলিব না।" ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি কি আমরা এই যুগে শিল্প-প্রধান দেশবাসী সাম্যবাদীর (Strechy) মুখে শুনিতেছি না?—"ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য কোথায়? শতকরা দশ ভাগের এক ভাগ লোকেই তাহার অধিকারী, বাকী নয় ভাগ শ্রমজীবীর অবস্থায় ত ইহাতে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—।" রাষ্ট্রীয় উন্নতি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে যে আমাদের এইসকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিকার করিতে হইবে, এ কথা সেই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহাপুরুষ দেশবাসীকে বহু পূর্ব্বেই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির আশা যে সুদূরপরাহতই রহিয়া যাইবে। এই কারণেই তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, বরং তাহাদের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনায় তাঁহার লেখনী তীব্র ভাষায় মুখর হইয়া উঠিত। ইহাদের দেশবাসীর সুখ-দুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য, তাহাদিগকে শিক্ষাদানে বিমুখতা, মাতৃভাষা চর্চ্চায় অবহেলা তাঁহাকে পীড়া দিত। ইহারই প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনায় লিখিয়াছেন—"প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতর উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ, দরিদ্রদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন, দরিদ্রেরা ধনবান ও কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সকলে তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না—তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না।"

দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র অধিকার লাভের জন্য ভিক্ষা বা গলাবাজি করিলেই যে দেশ উদ্ধার হইবে না, একথাও তিনি তথাকথিত স্বদেশ-হিতৈষীদিগকে বহুবার শুনাইয়াছেন। "লোকশিক্ষা" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন অশিক্ষিতকে ডাকিয়া বুঝাইলেই লোকে শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সহিত না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিত অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।" —অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, আজ আমরা তাহাই অনুসরণ করিয়া বিহারে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্রতী হইয়াছি। শিক্ষিত সম্প্রদায় এতদিনে যদি বঙ্কিমের উপদেশের মূল্য বুঝিয়া থাকেন, আশা করি আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।

বঙ্কিমের আদর্শবাদের ভিত্তি মানব-প্রেম তথা ভগবৎ-প্রেম—এই মূল মন্ত্রের উপর স্থাপিত। জাতীয়তাবাদের আদর্শকে তিনি উচ্চস্তরে তুলিয়া ধর্ম্মের স্থান দিয়াছিলেন; ধর্ম্মে মতির ন্যায় আদর্শবাদে অচল বিশ্বাস, তিনি দেশের উন্নতির পথে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

(শেষাংশ ৩০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টি

(বড় গল্প—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকালীপদ ঘটক

মাণিক দেখলে প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টির কোন আশা-ভরসা নেই। শম্ভুশরণ যতই চেষ্টা করুক চণ্ডেশ্বর নাট্য-সঙ্ঘের সঙ্গে বর্ত্তমানে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করা তার ধৃষ্টতা মাত্র!

মাণিক মহা সমস্যায় পড়ল। মন তার পড়ে আছে চণ্ডেশ্বর নাট্য-সঙ্ঘে। কিন্তু তার ভাবী শ্বশুর শম্ভুশরণ পাছে ক্ষুন্ন হয়, এই আশঙ্কায় সে বন্ধু-বান্ধবদের শত অনুরোধ, শত অনুযোগ সত্ত্বেও প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টি ছেড়ে যেতে পারে নি। কিন্তু দোষ ত শম্ভুশরণেরই, যাত্রা-পার্টির টাকা ভেঙ্গে সেই ত আজ এই দুটো দলের সৃষ্টি ক'রেছে। সত্যিই ত, কি ভয়ানক লোক! এ রকম লোকের সঙ্গে মাণিকের কোন সম্বন্ধ রাখাই উচিত নয়।

সঙ্গে সঙ্গে ফুলকুমারীর কথা মাণিকের মনে ভেসে ওঠে। মাণিক ভাবে—তাই ত! কিন্তু—না, যেমন ক'রে হোক শম্ভুশরণের আড্ডা তাকে ছাড়তেই হবে!

শেষ পর্য্যন্ত মাণিক একদিন সত্যিসত্যিই প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টি থেকে স'রে পড়ল। মাণিককে পেয়ে চণ্ডেশ্বর নাট্য-সঙ্ঘের উৎসাহ গেল দ্বিগুণতর বেড়ে।

চণ্ডেশ্বর নাট্য-সঙ্ঘে মাণিকের যোগদানের কথা যথা-সময়ে শম্ভুশরণের কর্ণগোচর হ'ল। কথাটা শুনে' অবধি শম্ভুশরণ রাগে গস্ গস্ করতে লাগল। মাণিক যে এমন-ধারা তা'র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে চিরশত্রু, ভূপতি চাটুয্যের দলে চলে যাবে—তা' সে কোনদিন ধারণাই করতে পারে নি।

শম্ভুশরণের মাথায় যেন ভূত চেপে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টির বর্ত্তমান বীর অভিনেতা তার প্রিয় যজমান মাখন পালকে পাঠিয়ে দিলে কুলেকুঁড়ির পটল মাষ্টারকে যেমন ক'রে হোক ধ'রে আনবার জন্যে,—যত টাকা লাগে।

পটল মাষ্টার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ যাত্রা-বিশারদ। নাচ-গান ও অভিনয় শিক্ষা দিতে পল্লী অঞ্চলে তা'র জুড়িদার খুব কমই ছিল। ঢোল, তবলা, হার্ম্মোনিয়ম থেকে আরম্ভ করে খোল, খঞ্জনী পর্য্যন্ত সব কিছুতেই তার দখল ছিল সমান।

এহেন পটল মাষ্টার এসে যখন প্রসন্নময়ী অপেরাপার্টির আখড়া খুলে জেঁকে বসল, তখন চণ্ডেশ্বর নাট্য-সঙ্ঘের মেম্বারদের মানসিক অবস্থা হ'য়ে উঠল সঙ্গিন।

গাঁয়ের লোক সব বলাবলি ক'রতে লাগল,—শম্ভু-চক্কোত্তির সঙ্গে টেক্কা মারা কি সহজ কথা বাবা, লাও এবারে ঠেলা সামলাও।

এই হুজুগে চণ্ডেশ্বর নাট্য-সঙ্ঘের জন দুই তিন অপ্রধান অভিনেতা প্রসন্নময়ীর পুণ্যস্মৃতি সংরক্ষণকল্পে আবার গিয়ে হাজির হ'ল শম্ভুশরণের আড্ডায়!

চণ্ডেশ্বর পক্ষেরও তৎপরতার অভাব দেখা গেল না। নন্দন মোড়লের গো-গাড়ী চড়ে রামদাস আর পঞ্চু সরকার রাতারাতি রওনা হ'য়ে গেল ওস্তাদ আনতে। পরদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই চণ্ডীপুরের অমর মাষ্টারকে নিয়ে তা'রা বুক ফুলিয়ে এসে গাঁয়ে ঢুকল। এবার কিন্তু সত্য সত্যই—'দেবাসুরে বাধল সমর।'

কয়েকদিন পর দু'জন অপরিচিত ভদ্রলোক ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে প্রচণ্ড রৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে এসে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শম্ভুশরণের বাড়ী ঢুকল। গাঁয়ের লোক ভাবলে হয়ত বেহালাদার কিম্বা তানপুরাওয়ালা কেউ হবে। পরে জানা গেল,—ভসকাজুড়ি থেকে ফুলকুমারীকে ওরা দেখতে এসেছে। পরদিন শম্ভুশরণের বাগ্‌দত্তা কন্যার নূতন ক'রে আবার আশীর্ব্বাদ পর্ব্ব সমাধা হ'য়ে গেল। আসছে শাওনে বিয়ে।

মুখুটি পরিবারের সঙ্গে শম্ভুশরণের দীর্ঘদিনব্যাপী ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধটুকু এই খানেই হ'ল খতম!

মাণিকের মন ক্রমশ চঞ্চল হ'য়ে উঠল। একদিন সে গোপনে একখানা চিঠি লিখে সদু গয়লানীর হাত দিয়ে ফুলকুমারীর কাছে পাঠিয়ে দিলে। মাণিক জানতে চায়—ফুলকুমারীর বিয়ের যেখানে সম্বন্ধ হচ্ছে, সেখানে গিয়ে সত্যিই সে সুখী হ'তে পারবে কিনা।

তিন দিন পরে সদু গয়লানীর সাক্ষাৎ মিলল। ফুল-কুমারী বড় বড় অক্ষরে জবাব লিখেছে,—'তুমি আর আমাকে চিঠি-পত্র লিখ না।'

মাণিক আজকাল নিয়মিতভাবে যাত্রার আখড়ায় যায় বটে, কিন্তু আগেকার মত কাজকর্ম্মে তার মন বসে না। নূতন ক'রে সে মাছ ধরার নেশা ধরেছে, সারা বিকেল তালপুকুরে ছিপ ফেলে বসে থাকে।

সেদিন মাণিক যখন উপর্য্যুপরি ফাঁকা 'ঘাই' মারতে মারতে ক্লান্ত হ'য়ে ছিপ গুটিয়ে দিলে, তখন প্রায় সন্ধ্যা। পুকুর পাড়ের দুর্ভেদ্য বাবলার বন ও আঁকড়ের ঝোপ ভেদ করে পথে এসে দাঁড়াতেই দূর থেকে মাণিকের চোখে পড়ল—ফুলকুমারী নদী থেকে জল ভরে বাড়ী ফিরছে। পরণে তার দেশী তাঁতের জামরঙা শাড়ী, সন্ধ্যার সোনালী আভায় মুখখানি চিক্ চিক্ করছে।

মাণিক একটা আমগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল, তার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে ফুলকুমারীর সেই চিঠিখানা,—'তুমি আর আমাকে চিঠিপত্র লিখ না'। আজ মুখোমুখী ওর মনের ভাবটা জেনে নিতে ক্ষতি কি,—এ সুযোগ হয় ত আর নাও আসতে পারে।

মাণিক চোরের মত রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। ফুলকুমারী কাছে আসতেই মাণিক পিছন থেকে ডাক দিলে,—ফুলি.

ফুলকুমারী চমকে উঠল, পিছন ফিরে চেয়ে দেখে রাস্তার ধারে ছিপ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে মাণিক—একদৃষ্টে ওরই দিকে চেয়ে।

ফুলকুমারী তাড়াতাড়ি চারিদিক একবার দেখে নিলে

দেখলে কেউ কোথাও নাই। আবার সে ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে পা বাড়ালে।

মাণিক একটু এগিয়ে গিয়ে বললে,—যাসনে—দাঁড়া, তোর সংগে একটা কথা আছে।

ফুলকুমারী একটু ইতস্তত ক'রে থমকে দাঁড়াল। মাণিক বললে,—সত্যিই আমাকে ছেড়ে যাবি ফুলি, মনে তোর এতটুকু কষ্ট হবে না?

ফুলকুমারীর মুখ-চোখ রাঙা হ'য়ে উঠল। কোন রকমে ভাঙা গলায় সে জবাব দিলে,—এ পাড়ার যাত্রার দল ছেড়ে যেতে তোমার ত কই কোন কষ্টই হয় নি।

মাণিক একটু বিব্রত হ'য়ে বললে,—সে অনেক কথা ফুলি, তুই ঠিক বুঝতে পারবি না। কিন্তু আমি যে—

ফুলকুমারী বাধা দিয়ে বললে,—থাক্—ও সব কথা শুনতে চাই না, তুমি আর এমনভাবে আমার পিছনে লেগ না।

এই বলে' তাড়াতাড়ি সে কয়েক পা' এগিয়ে যেতেই মাণিক তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল,—আমায় ক্ষমা কর ফুলি, আমি আর কোনদিন—

পিছন থেকে হঠাৎ গম্ভীর গলায় কে হাঁক দিলে,—মাণকে!

মাণিক আর ফুলকুমারী দু'জনেই চমকে উঠল। চেয়ে দেখে—কোত্থেকে একবোঝা কুমড়োর ডাঁটা হাতে ঝুলিয়ে ষষ্ঠীতলার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে শম্ভুশরণ স্বয়ং।

মাণিক ঘেমে' উঠল। জলভরা পিতলের কলসীটা কোমর থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়ে' ফুলকুমারীর পায়ের দু'টো আংগুল গেল থেঁতলে, অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সেইখানেই সে বসে পড়ল। মাণিক তাড়াতাড়ি কলসীটা সরিয়ে দিয়ে ফুলকুমারীর বাঁ পা'টা চেপে ধরতেই শম্ভুশরণ গর্জ্জে উঠল,—খবর্দার, হারামজাদা কোথাকার!

মাণিকের গায়ে গুনে কে যেন একশ' ঘা চাবুক কষে' দিলে। ফুলকুমারী কোন রকমে বাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। শম্ভুশরণ তীব্র দৃষ্টিতে মাণিকের দিকে চেয়ে বললে,—ফের যদি কখনও এমনধারা দেখি, একটি চড়ে তোমার ভবলীলা শেষ করে দিব সেইদিন। হারামজাদা—নচ্ছার, পাজী কোথাকার!

মাণিকের রক্ত গরম হ'য়ে উঠল,—হাতের ছিপটা সে শক্ত ক'রে ধ'রে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে বললে,—খবরদার, ছোটলোকের মত কথা বলবেন না।

শম্ভুশরণ আরও খানিক এগিয়ে গিয়ে বললে,— কি! দেখবি তবে মজাটা একবার,—দিব পুলিশে খবর দিয়ে? একেবারে দু'টি মাস কোঙা পিষিয়ে ছেড়ে দিব,—হ্যাঁ!

মাণিক অধৈর্য্য হ'য়ে উঠল। দৃঢ়কণ্ঠে সে জবাব দিলে—কিন্তু আমি একা যাব না, সেই সংগে আপনার মেয়েকেও গিয়ে আদালতে দাঁড়াতে হবে।

রামধন ঘড়ই ক্ষেত তদন্ত ক'রে বাড়ী ফিরছিল। ষষ্ঠীতলার মোড়ে এসে হঠাৎ সে শম্ভুশরণকে জিজ্ঞাসা করলে,—কি হল কি খুড়োঠাকুর?

শম্ভুশরণ রামধনকে দেখে বলে উঠল,—এই দেখ না যত সব ই'য়ে। ভারী একটা যাত্রার আখড়া খুলেছে—তার আবার পসার! আমিও কিন্তু বলে রাখছি রামু, ভূপতে চাটুয্যের দলকে যদি ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে না পারি—ত আমার নামে তোরা কুকুর পুষে রাখিস। দিব এমন রাগরাগিণী খাড়া ক'রে—

রামধন ঘড়ই শম্ভুশরণের মুখের দিকে চেয়ে কি রকমের রাগরাগিণীটা সে খাড়া করতে পারে— তাই কতকটা অনুমান করবার চেষ্টা করছিল। শম্ভুশরণ হঠাৎ সুর পাল্টে বলে উঠল—হ্যাঁ—ভাল কথা, তোদের বাড়ীতে রামঝিঙের বীজ আছে রামু? দিতে পারিস গণ্ডা কতক?

রামধন ঘড়ই ঘাড় নেড়ে জানালে রামঝিঙের বীজ তাদের আছে এবং গণ্ডা কতক দিতেও তার কোন আপত্তি নাই।

শম্ভুশরণ খুশী হ'য়ে বললে,—চল্ ত—চল্ ত বাবা, বীজ ক'টা এই সময় নিয়েই যাই; বেগুন বাড়ীর ধারে-পাশে কতকগুলো পুঁতে দেওয়া যাবে।

রামধন ঘড়ই-য়ের সংগে চাষ-বাসের গল্প ক'রতে ক'রতে শম্ভুশরণ প্রস্থান ক'রলে। মাণিক সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। কি সাংঘাতিক লোক এই শম্ভুশরণ। মানুষ যে এত নীচ হ'তে পারে, এ রকম ধূর্ত্ত হ'তে পারে, বিজয়পুরের শম্ভু চক্কোত্তিকে না দেখলে তা' বিশ্বাস ক'রবার উপায় নাই।

চণ্ডেশ্বর নাট্য-সংঘের মেম্বার মাণিক মুখুটির সংগে কথা কওয়ার অপরাধে ফুলকুমারীকে সেদিন সারা রাত্রি ছোট একটা ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখা হয়। সদু গয়লানী বহু কষ্টে এ সংবাদটুকু সংগ্রহ করে যথাসময়ে মাণিকের কাছে পৌঁছে দিলে, মাণিকের মনের মধ্যে কে যেন উপর্য্যুপরি হাতুড়ির ঘা দিতে লাগল।

(৪)

'চণ্ডেশ্বর' ও 'প্রসন্নময়ী'কে কেন্দ্র ক'রে অমর মাষ্টার ও পটল মাষ্টারের কর্ম্মতৎপরতার অন্ত নাই। উভয় পার্টির মেম্বারগণ নিজ নিজ দলের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্যে উদগ্রীব হ'য়ে আছে। পরস্পর-বিরোধী দল দু'টির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের আলোচনা শেষ পর্য্যন্ত আন্দোলনে পরিণত হ'য়েছে। কেউ কেউ বলে,—চণ্ডেশ্বর জিতবে, কেউ কেউ বা প্রসন্নময়ীর কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে বাজী ধ'রে বসে' আছে।

চণ্ডেশ্বর নাট্য-সংঘ যখন সারা গাঁয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে যাত্রাভিনয়ের দিন, তারিখ জানিয়ে দিলে, শম্ভুশরণ তখনও ভাল রকম প্রস্তুত হ'তে পারে নি। অবশ্য চড়কমারা নিবাসী বর্দ্ধিষ্ণু যজমান-পুত্র মাখন পালের ঘাড় ভেংগে তিনশ' টাকার সাজ-পোষাক ইতিপূর্ব্বেই খরিদ করা হ'য়ে গেছে, এবং পালাগানের বই দু'খানিও একরকম তৈরী, কিন্তু মেয়ের বিয়ের ধান্দায় কয়েকদিন যাবত শম্ভুশরণ একটু ব্যস্ত ছিল বলে' যাত্রাভিনয়ের কোন আয়োজনই এ পর্য্যন্ত করা হয় নি।

ওদিকে 'চণ্ডেশ্বরকে' আগে আসর ছেড়ে দিলে 'প্রসন্ন-

ময়ীর' নাকি মাথা হে'ট হবে, তাই প্রসন্ন-ভক্ত মুখপাত্রগণ জিদ্ ধ'রে বসল রীতিমত পাল্লা দিয়ে ওই তারিখেই ওদের 'গাওনা' করা চাই। শম্ভুশরণের সভাপতিত্বে বৈঠকখানা ঘরে তুমুল একটা আলোচনার ঝড় ব'য়ে গেল। মাখন পাল ও পটল মাষ্টার বুক ফুলিয়ে বললে,—কা চিন্তা মরণে রণে!

পরদিন সকাল বেলায় ভূপতি চাটুয্যে, পঞ্চু সরকার ও রামদাস প্রমুখ চণ্ডেশ্বর পার্টির কর্ম্মি-সঙ্ঘ হাটতলার সমস্তটা জুড়ে' সদর্পে সামিয়ানা খাড়া ক'রে দিলে। শম্ভুশরণ লোকজন নিয়ে বেরুল ধরমতলায় খুঁটি পুঁততে। সাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মাখন পালের ডান হাতের এক পর্দ্দা চামড়া ছি'ড়ে গেল, কিন্তু তবু তার ভ্রূক্ষেপ নাই। সেনাপতির পার্ট করা কি সোজা কথা। পটল মাষ্টার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আসরের চারধারে চারটে বাঁশ গাড়িয়ে বাখারী দিয়ে সেটা ঘিরে দিলে। আসর কোন রকমেই খাট করা চলবে না, কারণ বারটি ছেলে সখী সেজে এক সঙ্গে ওর মধ্যে নেচে বেড়াবে। চণ্ডেশ্বরের নাচুনী মোটে আটটি। চণ্ডেশ্বর ও প্রসন্নময়ীর আসরের বন্দোবস্ত হ'তে লাগল পুরাদমে। সন্ধ্যার সময় যাত্রা জোড়া হবে।

সেই দিনই বেলা নয়টার সময় ভস্‌কাজুড়ি থেকে দু'টি লোক ফুলকুমারীর গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এসে শম্ভুশরণের বাড়ী ঢুকল। আগামী কাল গায়ে হলুদ, তারপর দিন বিয়ে।

শম্ভুশরণ মেয়ের বিয়েতে বেশী কিছু আড়ম্বর করতে চায় না। বা'র থেকে বাজে কতকগুলো লোকজন ডেকে এনে অযথা একটা হৈ চৈ করাও তার ইচ্ছে নয়। অবশ্য ক্ষুদুর্মণি আত্মীয়স্বজনদের বাড়ী বাড়ী গাড়ী পাঠিয়ে তাদের নিমন্ত্রণ দিয়ে আনবার জন্যে যথেষ্ট অনুরোধ করেছিল। কিন্তু মহাজনবাক্য লঙ্ঘন করবার মানুষ শম্ভু চক্কোত্তি নয়; কথায় আছে,—স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী। বরে-বামুনে কোন রকমে কাজ সারা নিয়ে কথা।

এ বিষয়ে ভস্‌কাজুড়ির হবু-বৈবাহিক অধিকারী মশায় শম্ভুশরণের সঙ্গে গোড়া থেকেই একমত। মৃতদার পাত্রটিকে পুনরায় কৃতদার ক'রতে পারলেই তিনি খুশী।

শম্ভুশরণ পাত্র চাক্ষুষ ক'রতে গিয়ে জেনে এসেছে— —অধিকারী মশায় আঁটালোক, মেয়েটার ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। দুই বেহাইয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ আর্থিক আদান-প্রদানও নাকি ইতিপূর্ব্বেই হ'য়ে গেছে, কিন্তু আদানটা যে কোন্ তরফ থেকে সে সম্বন্ধে সঠিক খবর এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

পাড়ার মেয়েরা 'আইবুড়-ভাতের' তত্ত্ব দেখতে ছুটে এল। পথে-ঘাটে এর মধ্যে আলোচনা সুরু হ'য়ে গিয়েছে। কেউ বলে পাত্রটি নাকি তিন ছেলের বাপ, কেউ বলে আগের পক্ষের বৌটা নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। এমনি সব আরও কত কি!

ভস্‌কাজুড়ির লোক দু'টার জন্যে কতকগুলো মুড়ি-মুড়কি বের' করে দিয়ে ফুলকুমারী উপর কোঠায় গিয়ে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। সকাল থেকেই শরীরটা তার ভাল নাই। দারুণ একটা অস্বস্তি থেকে থেকে তার মনের মধ্যে যেন ঘুরপাক খাচ্ছে।

ফুলকুমারী ভাবতে থাকে,—কেন ওই লোক দু'টা যা'তা কতকগুলো জিনিষ-পত্তর ঘাড়ে ক'রে মিছামিছি তাকে জ্বালাতন করতে এল। আইবুড়-ভাত ফুলকুমারীকে যেন খেতেই হবে। তার চেয়ে তার আইবুড়ো থাকা যে অনেক ভাল! কোথাকার কে তার ঠিক নাই,—

ফুলকুমারী ছট্‌ফট্ করতে থাকে। তা'র মনে হ'তে লাগল দেওয়ালে মাথা ঠুকে জীবনটাকে ওইখানেই শেষ করে দেয়। পরশুদিন তার বিয়ে। ঢাক ঢোল পিটিয়ে পাল্কী চড়ে' বর আসবে,—টোপর মাথায় দোজপক্ষের বর। ফুলকুমারীকে তারই গলায় মালা দিতে হবে। কিন্তু কেন,— কেন তার উপর এমনভাবে জুলুম করা হচ্ছে! মাণিক ছাড়া সংসারে আর কারও সঙ্গে যে তার বিয়ে হবার উপায় নাই।

ফুলকুমারী বালিশে মুখ গুঁজে বেশ খানিকটা কে'দে নিলে, তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। যেমন ক'রে হোক এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে, আর কিছু ক'রতে না পারুক, অন্তত মরণটা ত তার নিজের হাতে।

নীচের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে ফুলকুমারী চিঠি লিখতে বসল।

চণ্ডেশ্বর নাট্য-সঙ্ঘের যাত্রার আয়োজন যখন সমাপ্ত-প্রায় মাণিক সেই সময় খবর পাঠালে, সেদিন তার পক্ষে আসরে নামা সম্ভবপর হবে না, হঠাৎ তার 'কলিক পেন' জেগেছে—ভয়ানক ব্যথা।

ভূপতি চাটুয্যে নিজে গিয়ে দেখে এল, মাণিক একেবারে শয্যাশায়ী। অগত্যা যাত্রা পার্টির অপর একটি ছোকরাকে দিয়ে মাণিকের পার্টটি কোন রকমে চালিয়ে দিবার ব্যবস্থা করা হ'ল। অমর মাষ্টার নিজে উপস্থিত আছেন, সুতরাং 'কনসার্ট পার্টি' ও গানের জন্য চিন্তা নাই।

সন্ধ্যার পর আসর দু'টিতে আলো জ্বলে উঠল। উভয় পক্ষের অভিনেতৃবর্গ তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে থেকে নিজের নিজের সাজঘরে এসে হাজির হয়েছে। 'জুড়েন বাদ্যের' পর গৌর-চন্দ্রিকা ও তৎপরে প্রোগ্রাম বিলি চুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডেশ্বর নাট্য-সঙ্ঘের 'ডানসিং পার্টি' সাগর-নাচ নাচতে নাচতে আসরে ঢুকল। হাটতলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত ক'রে শ্রোতৃমণ্ডলী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল,— হরি হরি হরিবোল, বো-ল্।

ধরমতলায় সবেমাত্র প্রসন্নময়ীর প্রথম সঙ্গত সুরু হয়েছে। হাটতলার জয়ধ্বনি শুনে' শম্ভুশরণ ক্ষেপে উঠল, —বললে,—হতভাগাদের এখন পর্য্যন্ত রঙ মাথাই শেষ হ'ল না!

তাড়াতাড়ি আসর থেকে সাজঘরে গিয়ে দেখে—পঞ্চম অঙ্কের অভিনেতা এখন থেকে প্রথম অঙ্কের অভিনেতাদের সঙ্গে সাজ-পোষাক নিয়ে কাড়াকাড়ি সুরু করে দিয়েছে। নাচওয়ালীর পোষাক প'রেছে পরিচারিকা, সেনাপতির তাজ চড়েছে দুর্ভিক্ষপীড়িত নাগরিকের মাথায়

মাখন পাল বীর-পোষাক পরেই রঙ মাখতে বসেছিল, উঠে দেখে তার খাপ শুদ্ধ ঝক্‌ঝকে তলোয়ারখানা নিয়ে ইতিমধ্যে কে স'রে পড়েছে। 'রাণী' নিজের বাড়ী থেকে বৌয়ের অনেক গালাগালি খেয়ে বহু কষ্টে একখানা লাল রঙের বেনারসী শাড়ী যোগাড় করে এনেছিল, প্রতিহারী কোন্ ফাঁকে সেটাকে গুটিয়ে সুটিয়ে মস্তবড় এক পাগ্ বেঁধে বসে আছে। লাল পাগটার উপর নজর পড়তেই উক্ত বেনারসী শাড়ীর অধিকারিণীর স্বামী গোঁপ চাঁচা বন্ধ রেখে প্রতিহারীকে হঠাৎ তেড়ে গেল,—খোল বেটা—খোল। এমন সময় বিড়ি ধরাতে গিয়ে নারদমুনির দাড়িতে হঠাৎ আগুন ধরে গেছে। চারদিক থেকে রব উঠল,—জল ঢেলে দাও, জল ঢেলে দাও। বেচারী বহুকষ্টে জ্বলন্ত দাড়িতে নামাবলী চাপা দিয়ে অগ্নিদেবের হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পায়।

শম্ভুশরণ হাটতলার জয়ধ্বনি সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছেলেগুলোকে সখী সাজিয়ে সাজঘর থেকে বের ক'রে দিলে।

পটল মাষ্টার যে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে পারে—তার প্রমাণ সত্বর সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। নাচনীদের নাচে-গানে সুরে, ভঙ্গিমায় আসর গেল এক চটকে জমে'।

হাটতলার হাততালির শব্দ ধরমতলা থেকে শোনা যাচ্ছে, পটল মাষ্টারের 'ফুলুট-বাঁশীর' সুর ধরমতলা থেকে ভেসে গিয়ে হাটতলার শ্রোতাদের করে তুলতে লাগল চঞ্চল। এদিকে শম্ভুশরণ ও তার সহকারীদের তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি ও খবরদারির অন্ত নেই, ওদিকে চণ্ডেশ্বর পক্ষের কয়েকজন 'ভলান্টিয়ার' আসরের চারিপাশে বীরবিক্রমে গোলমাল থামিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে দু'-একজন মাতব্বর ব্যক্তিও লাঠি হাতে খাড়া পাহারা দিচ্ছেন।

বিজয়পুর গ্রামখানাকে তোলপাড় ক'রে দু'টি দলের সমুদ্র মন্থন চলতে লাগল,—'প্রসন্নময়ী' বনাম 'চণ্ডেশ্বর'।

গাঁয়ের লোকসব বেলা থাকতেই চট-চাটাই পেতে বসে পড়েছিল, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি থেকেও রবাহুত অসংখ্য শ্রোতার সমাগম হয়েছে।

হাটতলায় ঐতিহাসিক পালা ধরেছে—'পঞ্চনদ', ধরমতলায় পৌরাণিক পুঁথি—'প্রহ্লাদ-চরিত্র' কিন্তু একসঙ্গে দু'টি দলের যাত্রা আরম্ভ হওয়ায় শ্রোতাদের অবস্থা কতকটা 'বাঁশবনে ডোম কানা'র মত হ'য়ে উঠল। হাটতলার কতকগুলি লোক পঞ্চনদের খানিকটা দেখেই ধরমতলায় এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়; ধরমতলার শ্রোতৃবর্গ তাদের ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে নূতন কিছু দর্শনেচ্ছায় হাটতলার দিকে ধাওয়া করে। কেউ বলে—চণ্ডেশ্বর গাইছে ভাল, কেউ বলে—প্রসন্নময়ীর ডান্সিং পার্টি অপরাজেয়। ভূপতি চাটুয্যের 'সুলতান মামুদ' ও শম্ভুশরণের 'হিরণ্যকশিপু' সমঝদার শ্রোতাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রামদাসের দুর্জ্জয় পাল অতুলনীয়। চণ্ডেশ্বরের তরঙ্গপাল ও প্রসন্নময়ীর প্রহ্লাদ প্রায় উনিশ-বিশ, কিন্তু পঞ্চু সরকারের নেয়ামত খাঁর সঙ্গে মাখন পালের দৈত্যসেনাপতির তুলনা করাই চলে না;—মাখ্‌নাবেটা একদম চাষা। তবে হ্যাঁ—হরে-দরে দুই পক্ষই প্রায় তুল্য-মূল্য বলা যেতে পারে। কিন্তু অমর মাষ্টারের যা গলা—

এমন সময় ত্রিশূলধারী পটল মাষ্টার ডমরু বাজাতে বাজাতে নটরাজ বেশে আসরে নামল। ডমরুর তালে তালে সুরু হ'ল নটরাজের নৃত্য। সে কি নাচ। এই লাফ ত এই লাফ। এই মুহূর্ত্তে ধীর শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি প্রশান্ত দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধপানে চেয়ে আছে, পর মুহূর্ত্তে কোন অজ্ঞাত সঙ্কেতে সর্ব্বাঙ্গ তার থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। ঘূর্ণিত লোচনে ভয়ঙ্কর ভয়াল দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রতে ক'রতে ঘন ঘন হাত-পা ছুঁড়ে—ত্রিশূল ঘুরিয়ে—ডমরু পিটিয়ে নটরাজ তাণ্ডব লম্ফে চতুর্দ্দিকে পরিক্রম ক'রতে লাগল। দর্শকদের বাহবা ও হাততালির চোটে আসরের ছাউনি শুদ্ধ ভেঙ্গে পড়ে আর কি!

কতকগুলি অমনোযোগী চঞ্চল শ্রোতা আসরের চারিদিকে এতক্ষণ শুধু হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছিল, নটরাজ নৃত্য দেখে সেই যে তারা ঠেলাঠেলি ক'রে শান্তভাবে বসে পড়ল—আর তাদের লাঠি মেরে ওঠায় কে।

নামকরা 'ডানসিং-মাষ্টার' হিসাবে পটল মাষ্টার পল্লী-অঞ্চলে সুবিদিত, কিন্তু তার এতাদৃশ অমানুষিক লম্ফ-পটুতার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আর কোনদিন পাওয়া যায় নাই।

পরবর্ত্তী দৃশ্যে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কয়াধুর কোল থেকে হরিভক্ত প্রহ্লাদকে ছিনিয়ে নিয়ে তপ্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ করতে ছুটল; শ্রোতার দল হাঁ ক'রে এক দৃষ্টে সেই-দিকে চেয়ে আছে।

চণ্ডেশ্বরের 'এক্টার পার্টি' এক একটি ধুরন্ধর বিশেষ, সুতরাং প্রথম থেকেই আসরটাকে তারা জাঁকিয়ে রেখেছে। বিশেষত অমর মাষ্টারের বড় বড় তালের গান ও রকমারি যন্ত্র-সঙ্গীতে ঐতিহাসিক নাটকের গাম্ভীর্য্য বেড়ে উঠেছে শতগুণ।

গজনী-সম্রাট সুলতান মামুদের সেনাপতি নেয়ামত খাঁ গুজরাট আক্রমণ করেছে। দেশদ্রোহী দুর্জ্জয় পাল ও তার অধীনস্থ সৈন্যদের উদ্যত অস্ত্র নিরস্ত্র গুজরাট-রাজ সোমেশ্বর সিংহের মাথার উপর। নেয়ামত খাঁ দুর্জ্জয় পালকে লক্ষ্য ক'রে দূর থেকে গর্জ্জে উঠল—সাবধান!

তারপর?

দর্শকগণের অপলক দৃষ্টি নাটকের চমকপ্রদ দৃশ্যের উপর নিবদ্ধ,—এবার কিন্তু একটা কিছু না ঘটে আর যায় না। ওরই মধ্যে কেউ কেউ আবার বলাবলি করছে,—দুর্জ্জয় পালের তলোয়ারখানা কি রকম চক্ চক্ করছে দেখেছ? কেউ বা বলে,—নেয়ামতের দাড়িগুলি বেশ!

(আগামীবারে সমাপ্য)

ওলিম্পিয়া যাদুঘর

বিশ্ববিখ্যাত ওলিম্পিয়া

গ্রীসের মনোহর শ্যামল শান্তির নিরালা কোণে—পিলো-পোনেসাস প্রদেশে—যেখানে নিবিড় বৃক্ষছায়ায় আর লতা-বিতানে বন্য-পুষ্পের হাস্য-সৌরভের ছড়াছড়ি সেই স্থান-টিতেই অবস্থিত ওলিম্পিয়া—দেবতার পদরজে যাহা পবিত্র, যুগে যুগে ভক্তিনত মানবের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে যাহা চর্চ্চিত। প্রসিদ্ধ ডেলফি মন্দিরের পারিপার্শ্বিক যেমন অনুজ্জ্বলতায় ম্লান-মধুর, এমন কি উষর রুক্ষ নগ্নতায় সে প্রান্তর অসীম মহান, তেমনিই উহা রজতশুভ্র পবিত্রতা ও অজানিত আতঙ্কের মোহে মন-প্রাণকে অভিভূত করে; কিন্তু ছায়াবীথি-ঢাকা ওলিম্পিয়ার পল্লীদৃশ্য দৈব আশিসের গভীর প্রশান্তিতে মানবাত্মাকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দেয়—যাহার পরশে মানব যাহা কিছু মহত্তম যাহা কিছু উদারতম, তাহারই আস্বাদ পায়; ওলি-ম্পিয়া চির-প্রফুল্ল মনকে যেন স্বপ্নের আবেগে বহন করিয়া নেয় কোন্ পৌরা-ণিক রাজ্যের উল্লসিত স্বর্গে। ওলিম্পিয়ার সবুজতায় কোথাও পাওয়া যাইবে না সু-উচ্চ আকাশচুম্বী পর্ব্বত-শিখর, না পাওয়া যাইবে রসাতলের মত তলহীন গভীর খাদ, উহার আশপাশে না আছে অনন্ত উন্মুক্ত প্রসার, না আছে তুষার-স্রোতের প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি। ওলিম্পিয়ার পল্লীশ্রীর যদি তুলনামূলক পরিমাপ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে—আদিম সাহিত্যিক আভিজাত্যের সমন্বিত আড়ম্বরপূর্ণ প্রকাশ এবং আধু-নিক নিরলঙ্কার সরল ধারণাধারার মাঝা-মাঝি সোনালী মধ্য মাধুরিমা ইহা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই উপত্যকা তিন-দিকেই ঢিবিপানা অনুচ্চ পর্ব্বতমালায় ঘেরা; এই অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী প্রাকৃতিক অবরোধের মতই ওলিম্পিয়াকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যেন বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে,—উন্নতশির হইতে ভ্রূভঙ্গী দ্বারা ভীতি উৎপাদনের জন্য নহে, হিমশীতল আবেষ্টনে সারা মুল্লুকটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার জন্যও নহে। কেবলমাত্র উন্মুক্ত হইল পশ্চিম দিক—যেদিকে জুড়িয়া বসিয়াছে অসীম অনন্ত জলধি এবং যেদিকে মাত্র দিগ্বলয়-রেখা ওলিম্পিয়াবাসীর নয়নমনোরঞ্জন করে; আর এই পশ্চিম দিগন্তের শীকর-সিক্ত মধুর-মন্দ-মারুত বৃক্ষের শিরে শিরে শিহরণ জাগাইয়া লতাপল্লবে লীলায়িত মর্ম্মরে খেলিয়া বেড়ায়—যখন আতপ্ত গ্রীষ্মের অগ্নিশ্বাস সমগ্র ওলিম্পিয়া উপত্যকার উপর দিয়া তাহার আগ্নেয় রথ পরিচালিত করিয়া দিক ঝলসাইয়া দেয়, তখন ঐ শীতল সাগর-কণবাহী মৃদুল পশ্চিম-প্রবাহ শ্রান্তি-ক্লান্তি হরণ করিয়া তৃপ্তির প্রলেপ মাখাইয়া দেয়—সারা রাজ্যে নবশক্তি নব-উদ্যমের সঞ্চার করে।

ডেলোস্ (Delos) নামক স্থানে প্রাপ্ত মোজেইক—ফরাসীদের পরিচালিত খননে উদ্ধারপ্রাপ্ত

শ্যামল দীপ্তিপূর্ণ এই জাঁকাল উপত্যকার স্বপনলোক বিদীর্ণ করিয়া কুল কুল নাদে প্রবাহিত গ্রীক-পুরাণ-বিশ্রুত মহীয়ান নদ য়্যালফিউস্—সাগরে পৌঁছিবার আগ্রহে ত্বরা-ন্বিত। কথিত আছে এই নদের সাগর-সঙ্গম আপাত যেখানে বলিয়া ভ্রম হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে সেস্থানেই উহার স্রোতোধারা

নিস্তব্ধ হইয়া যায় নাই। ঝিরিঝির নীলাম্বুরাশিতে মিলিয়াই উহা গা এলাইয়া দেয় নাই—সাগরতল আশ্রয় করিয়া সিসিলি দ্বীপ পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছাইয়াছে। তাহারও কারণ গ্রীক-পুরাণে উল্লিখিত আছে। য়্যালফিউস্ নদের প্রণয়িনী য়্যারিথিউসা অপ্সরা, প্রণয় প্রত্যাখ্যাত দেবতার শাপে নির্ঝরিণীতে পরিণত হয়। এই প্রণয়িনীর অনুসন্ধানেই য়্যালফিউস্ নদ সমুদ্রগর্ভ অবলম্বন করিয়া দিকে দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সিসিলিতে উপস্থিত হয় এবং প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ পাইয়া সেইখানেই নিশ্চল হইয়া নির্ঝরিণীর সহিত প্রেম-মিলনে আবদ্ধ হয়।

ক্লেডিউস নামে ছোট একটি নদ ফোবি পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া য়্যালফিউসের সহিত মিলিত হইয়াছে- এইখানেই শ্রদ্ধা-সম্মানের প্রতীক উপাসনামন্দির অবস্থিত এবং এইখানেই ক্লেডিউস একেবারে সমকোণ গঠিত করিয়াছে য়্যালফিউস নদের স্রোতোধারার সহিত। আর ইহারই উৰ্দ্ধদেশে ক্রোনোস নামক ঝুমড়া পাহাড়—পৃথিবীর একটি সেরা দেবস্থান—দেবতার আবাস বলিয়া যাহা উৎসর্গীকৃত। এই ক্রোনোস-শৃঙ্গ যেন চারিপাশের মনুষ্য-গঠিত পীঠস্থানগুলির তত্ত্বাবধান করিবার জন্যই গ্রীবা উচ্চ করিয়া নিষ্পলক নেত্রপাত করিতেছে।

সীরন্ধ্র নীরবতা এবং পূর্ণ শান্তি যাহা আত্মাকে তৃপ্ত নির্লিপ্ত করিয়া বিরাজ করে, চির-আনন্দময় এই অঞ্চলটিকে তাহা সদা মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—মনে হয় সমগ্র বিশ্ব হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া পার্থিব অমরাবতীতে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। এমনই এক বিস্ময়চকিত গম্ভীর আবহাওয়ায়, নিরন্তর নিবিড় নীলিমাময় সুনীল-চন্দ্রাতপতলে, সৌর-করোজ্জ্বল অতুল প্রভান্বিত দিবসে প্রাচীন গ্রীকগণ শরীর-চর্চ্চায় ব্যাপৃত হইত দেহগঠনকে অপরূপ সামঞ্জস্যমণ্ডিত করিবার প্রয়াসে; অর্থ-পারিতোষিকের লোভে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রগামী হইত না—গর্ব্বিত পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল তাহাদের একমাত্র সফলতার সুযশ অর্জ্জন করা—বন্য জলপাই-শাখার মুকুট আহরণ করা—যাহার সমতুল্য সম্মান প্রাচীন গ্রীসে আর জানিত ছিল না।

আজিও ওলিম্পিক-দর্শকেরাও নিজেদের সেই একই শান্ত সমাহিত গাম্ভীর্য্যে নিমজ্জিত অনুভব করে, যখন তাহারা ঐ মূল ধ্বংস-স্তূপের ভিতর বিচরণ করিতে থাকে; এই ধ্বংস-স্তূপ আজিও এমন এক অপূর্ব্ব আলোক-বন্যায় পরিস্নাত যাহা নাকি যুগে যুগে প্রাচীন ওলিম্পিয়ার শুচি-শুভ্র নামযশ অমর করিয়া রাখিয়াছে। আবার যখন অগণিত তারকা-খচিত অঞ্চলখানি বিস্তার করিয়া নিশাসুন্দরী পবিত্র 'আলটিস'য়ের উপর মায়ার ঝিলমিলি টানিয়া দেয়, তীর্থযাত্রী তখন এক অপার্থিব পুলকে মহাশূন্যের পুণ্যময় লোকে ভাসিয়া বেড়ায়—অন্তরে তাহার ভরপুর থাকে তৃপ্ত প্রশান্ত—যাহা শুধু মাটির ধরার সসীমতার গণ্ডীর ভিতর অসীমের চরণে প্রেমার্ঘ্য দানেই লাভ করা যাইতে পারে—যাহা শুধু ইষ্টদেবের নিকট 'মানসিক' শোধের কর্ত্তব্য পালনেই লভ্য হইতে পারে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রত্যেক নর বা নারীও আপন আপন অন্তরে প্রেরণা অনুভব করে— এই বিখ্যাত দেবীর পবিত্র বেদীমূলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে।

ওলিম্পিয়ার জিউস্-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে উদ্ঘাটিত—উক্ত মন্দিরের আভ্যন্তরীণ প্রাচীন-শিরে ছাদের নিম্নে অন্যান্য কারুকার্য্যের সহিত সন্নিবিষ্ট একটি মুখচ্ছবি

সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগ্নীত্রয়—ইউফ্রোসাইনি, য়্যাগলাইয়া, থ্যালিয়া—এথেন্সের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত

যাদুঘর

যাদুঘরের প্রসার হিসাবে ওলিম্পিয়া যাদুঘর বৃহত্তম না হইলেও অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব ইহার এইজন্য যে, ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে এমন কয়েকটি সুদূর অতীতের প্রাচীনত্ব-প্রতীক, যাহাকে সিদ্ধহস্ত শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর মূলসৃষ্টি বলিয়া জগতের লোক আজিও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। ইহার সংগ্রহের ভিতর যে সকল ভাস্কর্য্য-নিদর্শন সংরক্ষিত, উহাতে যেমন

দুষ্প্রাপ্য মূর্ত্তি-গুচ্ছ রহিয়াছে, তেমনিই স্থান পাইয়াছে একক মূর্ত্তিগুলি; আর প্রাচীন শিল্পের এই যে অপরূপ স্মারক, উহা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট যুগেরই মাত্র নহে—বিভিন্ন কালের এবং বিভিন্ন কলার নিদর্শনই ইহার ভিতর মিলিবে। স্থপতি মূল্যের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন হইল ওলিম্পিয়ায় প্রাপ্ত অননুকরণীয় সংগ্রহ—কাদামাটি এবং মর্ম্মর প্রস্তরের কারিগরির ভগ্ন খণ্ডসমূহ। ব্রঞ্জ নির্ম্মিত অগণিত যে মানতের দ্রব্যসমূহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—কি পদ্ধতিতে কি নিয়মে সেই প্রাচীনকালে পূজারতি বিধান করা হইত। আর যে সকল শিলালিপি উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা হইতে যেমন প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষভাবেই মিলিয়াছে, তেমনিই খেলাধূলোর বিশেষ বিশেষ উৎসবের পরিচয় লাভ করা গিয়াছে ব্যাপকভাবে।

মিউজিয়ামের ঠিক মধ্যস্থলের বড় হলঘরটিতে রাখা হইয়াছে জিউস-মন্দিরের জমাট প্লাস্টারের কারুকার্য্য। বারখানি টালিতে প্লাস্টারের জমাট কারিগরি—মহাবীর হারকিউলিসের যে বারটি আশ্চর্য্য বীরত্ব-নিদর্শন, তাহাই এই বারখানি টালিতে প্রদর্শিত। কথিত আছে জিউস-মন্দিরের আভ্যন্তরীণ দেওয়ালে—ঠিক ছাদের নিম্নে চারিদিকে ঘুরাইয়া বসান ছিল এই প্রকার কারুকার্য্যখচিত টালি। তাহারই বারখানি উদ্ধার হইয়াছে—তাহাই এই যাদুঘরে রক্ষিত। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অবস্থায় রহিয়াছে তিনটি দৃশ্য—একটি, হারকিউলিসের অসীম সাহসে স্টিমফ্যালান পাখীগুলিকে এথেনস এ আনা, দ্বিতীয়টি হইল এজিয়ান অশ্বশালা সংস্কার এবং তৃতীয়টি হইল হেসপেরাইডিস-এর আপেল গ্রহণ। গ্রীক-শিল্পের প্লাস্টারের কারিগরির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল এই তৃতীয়টি—যেমন দৃশ্যের বাহারে তেমনি কারুকার্য্যের নিপুণতায়। এই হলঘরেই রক্ষিত আছে ছোট ছোট খোদিত মূর্ত্তির বিখ্যাত গুচ্ছ, যাহা জিউস-মন্দিরের দ্বার দুইটির উপরিভাগ সুশোভিত করিয়া বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রকাশ। পূর্ব্ব দ্বারের শিরোশোভা ছিল যে খোদাই কাজের অপূর্ব্ব নিদর্শন—উহাতে প্রদর্শিত রহিয়াছে রথ (chariot) দৌড়ের প্রতিযোগিতার তোড়জোড়; প্রতিযোগিতাটি হইয়াছিল গ্রীক পুরাণোক্ত ওইনোমসের সহিত পলোপসের। এক রথে ছিল ওইনোমস ও তাহার পত্নী স্টেরপ এবং অপরটিতে ছিল পলোপস ও তাহার স্ত্রী হিপোডামেলা; কিন্তু দেবরাজ জিউস তাহাদেরই মধ্যস্থলে উপস্থিত, অদৃশ্যভাবে, অথচ তাহারা কেহই দেবরাজকে দেখিতে পাইতেছে না, তাঁহার আগমনও টের পাইতেছে না কোন প্রকারে। চারিদিকে কার্য্যরত লোক-লস্কর; কিন্তু শিল্পী অতি সুকৌশলে পরিচ্ছদ ও হাবভাবের পার্থক্যে মূল মূর্ত্তি কয়টি এমন নিপুণতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে, দৃশ্যে অগণিত মূর্ত্তি থাকিলেও, মূল পাঁচটি মূর্ত্তি সকলের আগে নজরে পড়ে। আরও বিশেষত্ব এই যে, লোক-লস্করগণের চেহারা সাধারণভাবে মানবোচিত আবহাওয়ায় গঠিত—তাহাতেই সমগ্র দৃশ্যটিতে একটা স্বাভাবিকত্বের ছাপ সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।

পূর্ব্বদ্বারের এই শিরোশোভার ঠিক বিপরীত ভাবই লক্ষিত হইবে পশ্চিমদ্বারের কারিগরির বেলা, কারণ পূর্ব্বদ্বারের এই তোড়জোড়ের অংকনে অধিকাংশ মূর্ত্তিতেই নিশ্চল আরামে উপবিষ্ট অবস্থাই আরোপ করা হইয়াছে, ধাবমান বা ক্রিয়াশীল দেখাইবার প্রয়াস করা হয় নাই। পশ্চিমদ্বারের শিরোশোভার মূর্ত্তিগুলিকে শুধুই যে ক্রিয়াচঞ্চল গড়া হইয়াছে, এমন নয়—তাহাদের অবয়বে একটা অপরিসীম ক্রোধের উত্তেজনা ফুটিয়া উঠিয়াছে; কারণ, দৃশ্যটিতে দেখান হইয়াছে যে, লেফিথস্-এর কন্যাদের হরণরত নরহয়াসুরদের সহিত লেফিথস্ এবং থিসিউসের মহাযুদ্ধ। (নরহয়াসুর বা centaur, গ্রীক-পুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে যে অর্দ্ধ নর এবং অর্দ্ধ অশ্বের আকারে এক জাতীয় অসুর, অতি দুর্দ্দান্ত ছিল প্রাচীনকালে।) রাজা পিরিথাসের বিবাহ রজনীতে অসুরগণ অত্যধিক মদ্য পান করিয়া এই কন্যাদের হরণ করিতে উদ্যত হয়। এখানেও দেবতার আবির্ভাব রহিয়াছে—এপোলো, আইন ও শৃঙ্খলার দেবতা এই যুদ্ধরতদের মাঝখানে হস্ত প্রসারিত করিয়া কঠোর আদেশে উভয়পক্ষকে ক্ষান্ত হইতে বলিতেছেন। এই দেবমূর্ত্তির জাঁকাল রাজসিকতা এবং পারিপার্শ্বিকে সামঞ্জস্য রক্ষার নিপুণতা, যে সৌভাগ্যবান একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি আর বাকি জীবনে এই অপার্থিব লীলাভঙ্গিমা ভুলিতে পারিবেন না। বিশেষ করিয়া গ্রীক আর্টের অধুনালুপ্ত আদিম আভিজাত্যের যুগ হইতে শিল্পী ফিডিয়াসের যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালের একটা সমগ্র ধারণা তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত থাকিবে। গ্রীসের সুদূর অতীতের লুপ্ত শিল্পচারুতার সেই যে নিদর্শন-বিরল যুগ তাহা হইতে পূর্ণ বিশুদ্ধ রুচির যে পৌরাণিক কারুকার্য্য—যাহার নিদর্শন এই মিউজিয়ামে রক্ষিত, এই সুদীর্ঘকালের গ্রীসীয় আর্টের পরিচয় এক কথায় বলিতে গেলে, এই মিউজিয়ামে রহিয়াছে।

এই বিরাট হলঘরটির এক প্রান্তে রহিয়াছে আর একটি অপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যাহা খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকে নির্ম্মিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা হইল শিল্পী পিয়োনিয়াসের 'নাইকি' অর্থাৎ বিজয়-লক্ষ্মী মূর্ত্তি। এইটি জিউস-মন্দিরের সম্মুখভাগে ছিল বলিয়া বর্ণিত। এই সুঠাম দেবীপ্রতিমা যেন নীলাকাশ হইতে শূন্যে ভর করিয়া নামিয়া আসিতেছেন ধরাতলে এই ভাবেই শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত। বিরাট পক্ষ দুইটি দেবীর পশ্চাতে রহিয়াছে—দেবী যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন পদার্পণ করিবার জন্য। পরবর্ত্তীকালে, এমন কি, অধুনাও বিজয়লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আঁকিবার এবং নূতন পরিকল্পনা করিবার প্রয়াস বহু হইয়াছে, কিন্তু শিল্পী পিয়োনিয়াসের এই পরিকল্পনাকে আজ পর্য্যন্ত কেহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

একখানি ঘরে বিশেষ করিয়া একটিমাত্র দেবমূর্ত্তি; মূর্ত্তিটি দেবতা হারমেস (Hermes) য়ের। ইনি গ্রীক-পুরাণে দেবদূত বলিয়া খ্যাত; দৈববলে ইনি চারুকলা, গো-মেষপালক এবং চোরগণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে নিপুণ শিল্পী প্রাকসিটেলিস এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। দেহ গঠনে অপূর্ব্ব নমনীয়তা, আর মসৃণতা ও চাকচিক্যের বাহাদুরী একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—হস্তগঠিত মূর্ত্তিতে এমন 'ফিনিশ' (finish) আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। দেবতাটির

দেবমূর্ত্তি গঠনে তুলনামূলক নিদর্শন ওলিম্পিয়ার এই সংগ্রহের পর অতি অল্পই দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে গ্রীসের এথেনস শহরের ন্যাশনেল মিউজিয়ামে রক্ষিত সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীত্রয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দেবীভগ্নীত্রয়ে নিখিল সৌন্দর্য্যরাশি একত্রীভূত বলিয়া গ্রীকগণ বিশ্বাস করিয়া থাকে—অন্তত প্রাচীনকালে করিত। এই তিন ভগ্নীর নাম যথাক্রমে—ইউফোসাইনি, য়্যাগলাইয়া, থ্যালিয়া। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রতীক বলিয়া এই ত্রিদেবী-মূর্ত্তি সারা গ্রীসে বিখ্যাত।

প্লাষ্টারের কার্য্যে গ্রীকগণ যে অপরিসীম দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে, সে যুগে তাহার তুলনা ত ছিলই না, আজিও তাহার সমকক্ষ উচ্চস্তরের কারিগরি খুব কমই মিলিয়া থাকে। আজ মানুষ আর সকল কার্য্যের জন্য শুধু হস্তের উপর নির্ভর করে না, তথাপি প্রাচীন গ্রীকগণের হস্তখোদিত কি হস্তগঠিত মূর্ত্তির সহিত তুলনায় আধুনিক অনেক কারিগরিই নিকৃষ্ট মনে হয়। বিশেষ করিয়া যে পৌরাণিক অপরূপ ভিত্তির উপর গ্রীক শিল্প-চারুতা গঠিত, যে পবিত্র অতিমানবের স্মৃতি-সমূহ ইহার সহিত জড়িত—তাহার সমক্ষেত্র গঠন আজিকার দুনিয়ায় অসম্ভব।

বুক্ষে ঠেস দেওয়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, তাহার ছোট্ট সদাপ্রফুল্ল মুখখানি, তাহার স্বপ্নময় দৃষ্টি-স্নিগ্ধতা—দর্শকের মনের দেওয়ালে একটা জোরাল রেখাপাত করে—দর্শক মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকে—দৃষ্টি ফিরাইতে পারে না দীর্ঘকাল। দেবমূর্ত্তি গঠনে কতদূর আকর্ষণ সৃষ্টি করা যায় তাহার আশ্চর্য্য নিদর্শন হইল এই হারমেস মূর্ত্তি। শিল্পী প্রাক-সিটেলিসের ইহা অপূর্ব্ব সাফল্য—শুধুই যে চারুকলার অভূত-পূর্ব্ব জয়যাত্রা ইহা ঘোষিত করিতেছে এমন নহে, ইহার আরও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে—যাহাকে আর্টের অতীত বলিলেও বলা যাইতে পারে। দেবমূর্ত্তিকে মানবাকারে আনয়ন করিবার প্রয়াসে অতিমানবের বিশেষত্ব তাহাতে আরোপ করা যেমন পরিকল্পনা শক্তির পরিচায়ক, তেমনই প্রকাশ-ভঙ্গীর অভিনবত্ব সৃষ্টিরও নিদর্শন। এই উভয় শক্তিতেই প্রাকসিটেলিস ছিলেন অদ্বিতীয়।

স্মরণাতীত যুগের যাহা কিছু নিদর্শন রহিয়াছে, তাহার ভিতর উল্লেখযোগ্য বলিতে হইবে বিরাট একটি মুণ্ড। এই মুণ্ডটি হেরা নাম্নী দেবীর বলিয়া অভিহিত হয়, সম্ভবত দেবীর যে প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে তাহার সহিত সাদৃশ্যের জন্যই এই নামকরণ।

ইন্দ্রস্তব

[ঋগ্বেদ—প্রথম মণ্ডল ৪র্থ সূক্ত হইতে]

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য এম-এ বি-টি

দোহক যেমন দোহন লাগিয়া ডাকে তার গাভীটিরে,
যজ্ঞ-কুশল লাগি সুতসোম ইন্দ্রেরে ডাকি ধীরে!
ধীরে ওঠে গান আকাশ ভেদিয়া বহ্নির শিখা সম,
শোভন-কর্ম্মা ইন্দ্রেরে ডাকি, দূর হ'য়ে যাক্ তমঃ,
হে ইন্দ্র সোমপায়ি!
অভিষব-পাশে এস, এস ত্বরা সোম হেথা হোক্ স্থায়ী!
তুমি ধনবান্, দেবের দেবতা, ডাকি তোমা এক মন,
তোমারে প্রসাদি,—কুটিরে মোদের দান করো ধেনুধন।
ইন্দ্রের জয় গাহি,
বহ্নি-যজ্ঞে হোক্ আহ্বান, মানবক, ভয় নাহি।
তোমারে ঘেরিয়া বিরাজে নিত্য ধার্ম্মিক সজ্জন,
তাদের প্রান্তে আমাদেরও যেন একটু থাকে আসন!
তাহাদের সাথে মোরা মানবক, তোমারে জানিতে চাই
তোমার পরশ তাহাদের সাথে আমরাও যেন পাই!
গাহি ইন্দ্রের জয়!
ইন্দ্রের স্তব-জ্যোতিতে হউক্ প্রভাত জ্যোতির্ম্ময়।
মোরা ঋত্বিক, মোরা সাগ্নিক, সুতসোম উপাসক,
নিন্দুক যারা তারা থাক দূরে তারা নহে মানবক।

হে শত্রুঘ্ন! শত্রুরে হানো তীব্র বজ্রাঘাত!
অরি যেন করে মোদের মাথায় আশিস-বৃষ্টিপাত।
মিত্রপক্ষ ঢালিয়া বক্ষ দেয় যেন আশ্রয়!
তোমার প্রসাদ-লব্ধ শান্তি হউক হে অক্ষয়।
এই সোমরস ব্যাপ্তিমন্ত, যজ্ঞের সম্পদ,
ইন্দ্রের সখা, সকল কর্ম্মে কুশল-পরিচ্ছদ;
মানবক লভে নব আনন্দ চিত্তে অতুল সুখ,
যজ্ঞ ব্যাপিয়া ইন্দ্র জাগেন, পাতি দাও তাহে বুক।
মনে পড়ে এই সোমপান করি ভয়াল বৃত্রাসুরে,
হে শতক্রতু! বজ্র-আঘাতে পাঠাইলে যমপুরে।
দিকে দিকে জ্বলে বজ্র-অগ্নি, কম্পিত ত্রিভুবন,
তোমার প্রসাদে লভিয়াছে ত্রাণ অমর যোদ্ধৃগণ।
তুমি বীর, তব ভালে জয়টিকা, গাহিব তোমার জয়,
পরম ধনের লাগিয়া হউক এ অন্ন অক্ষয়!
ধন রক্ষক, সুমহান্ তিনি, কর্ম্ম-সিদ্ধি দাতা,
অভিষব-সখা ইন্দ্রের জয়, গাও, গাও উদ্গাতা।
ইন্দ্রের জয় গাহি!
বহ্নি যজ্ঞে জাগেন ইন্দ্র, মানবক, ভয় নাহি।

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

—আরম্ভ—

(১)

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও নদীতীর পরিব্যাপ্ত হয় নাই। অদূরে গ্রামপ্রান্ত হইতে তরল অন্ধকারের অস্পষ্ট রেখা ধীরে ধীরে মাঠের বুকে ছায়া ফেলিতেছিল।

কলসী ভরিয়া রেণু একবার শঙ্কিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কেহ কোথাও নাই। জনশূন্য নদীতীরে গোধূলি-ম্লান আলোকে সে একা।

গ্রামে ঘন ঘন সন্ধ্যা-বন্দনার শঙ্খধ্বনি উঠিতেছে,—ধূসর ধূলা উড়াইয়া ধেনুকুল বৃহৎক্ষণ—গ্রামের পথে চলিয়া গিয়াছে। আকাশের সীমন্তে উজ্জ্বল টিপের মত ভাস্বর—বৃহৎ নক্ষত্রটি প্রতিদিনকার মতই জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতেই সে দেখিল, কে একজন ছিপ হাতে দাঁড়াইয়া আছে। সে যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।

অস্পষ্ট অন্ধকারে সেই দীর্ঘায়ত মূর্ত্তি—রেণু চিনিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি! যা ভয় হয়েছিল আমার।"

যুবক বলিল, "এত দেরী হ'ল কেন?"

রেণু বলিল, "আজ বিকেলে হঠাৎ মা'র জ্বর এসেছে। তাঁকে ওষুধ খাইয়ে—ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে—মনে হ'ল—খাবার জল ত নেই। কলসী নিয়ে—ছুট্—ছুট্। এসে দেখি ঘাটে কেউ নেই। তুমি যে এখনও দাঁড়িয়ে আছ, মাণিক-দা?"

মাণিক বলিল, "সারাদিন ছিপ হাতে নদীর ধারে বসেছিলাম, মাছ ত' পেলাম না। উঠছি,—এমন সময় তুমি এলে। ভাবলাম—একা হয়ত ভয় পাবে, তাই দাঁড়িয়ে গেলাম।"

রেণু হাসিয়া বলিল, "পূজোর ছুটিটা মাছ ধরেই কাটাচ্ছ?"

মাণিক বলিল, "হাঁ—একরকম তা বৈ কি।"

রেণু বলিল, "বাঃ, নিজের পড়াশুনা নেই বুঝি? আচ্ছা মাণিক-দা,—সেখানে থাকতে তোমার মন কেমন করে না?" কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

মাণিক ছিপটাকে একবার নাড়িয়া বলিল, "ক'রলেই বা উপায় কি। কোন একটা মহৎ কিছু পাবার জন্য দুঃখ কষ্ট অনেক সইতে হয়। এই বিদ্যা অর্জ্জনও তপস্যা, যেমন সেকালের মুনি-ঋষিরা ক'রতেন।"

রেণু বলিল, "তবে এ তপস্যা তোমাদেরই একচেটে। আমাদের তপস্যা এই—নদী থেকে জল টানা, বাসন মাজা, ঘর-কন্নার কাজ-কর্ম্ম করা, না?"

ম্লান অন্ধকারে মাণিক রেণুর মুখের পানে চাহিয়াও বুঝিতে পারিল না, সে রহস্য করিতেছে কি না?

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল, "তা কেন,—শিক্ষার অধিকার সকলের সমান।"

রেণু বলিল, "তবে সে অধিকার কারও বা শাস্ত্রসম্মত, কারও বা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। যেটা তোমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক,—সেটা আমাদের পক্ষে বাহুল্য মাত্র।"

মাণিক বুঝিল,—পল্লীগ্রামের নিরক্ষরা অনভিজ্ঞা মেয়ের কথা ইহা নহে। পিতা উহার দরিদ্র হইলেও—বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি ডিগ্রিই আহরণ করিয়াছিলেন। হয়ত কন্যাকে সেই জ্ঞানরাজ্যের বিদ্যামণির জ্যোতির সন্ধান কিছু কিছু দিয়া থাকিবেন। তাই অধিকারবাদের এই সমস্যা—ইহার বালিকা মনেও ছায়াপাত করিয়াছে।

সবিস্ময়ে মাণিক বলিল, "তুমি খবরের কাগজ খুব পড় বুঝি?"

রেণু হাসিল। গ্রীবা হেলাইয়া উত্তর দিল, "বাবা ইংরেজী কাগজ প'ড়ে আমায় বাঙলায় মানে বুঝিয়ে দেন।"

মাণিক বলিল, "ও। তা তুমি কেন স্কুলে ভর্ত্তি হও না?"

রেণু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, "দূর, তা কি হয়। তা'হলে এই পাড়াগাঁয়ে আমাকে আর তিষ্ঠুতে হবে না।"

মাণিক অল্প উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তা'হলে মিছে ভয়ে এই অন্ধ-সংস্কার মনে পুষে রাখা ভাল নয়—। তোমার বাবা শিক্ষিত হ'য়ে—"

রেণুর মুখের হাসি নিবিয়া গেল—। মুখ ফিরাইয়া শুষ্ক স্বরেই সে বলিল, "আমরা যে গরীব!"

মাণিক বলিল, "তাতে কি—। মনের প্রসারতা আছে যাঁদের—"

রেণু ম্লান-দৃষ্টিতে মাণিকের পানে চাহিয়া বলিল "আমরা শহর দেখিনি ব'লে আপনার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনিও আমার কথা বুঝতে পারছেন না—পাড়াগাঁকে জানেন না ব'লে।"

মাণিক বলিল, "তুমি জান—ষোলটা বছর এই পাড়াগাঁয়ে কাটিয়েছি—আজই না হয় বছর দুই ক'লকাতায় গেছি। কিন্তু পাড়াগাঁকে জানতে আমার আর বাকী নেই।"

রেণু মৃদুস্বরে বলিল, "বাস ক'রলেই কি জানা হ'ল। বাবার আলমারী ভর্ত্তি বইগুলোর পানে চেয়ে এই কথাটাই আমার বার বার মনে হয়।"

মাণিকের চোখের সম্মুখ হইতে রেণু যেন ভারী একটা পরদা অকস্মাৎ খসাইয়া দিল।—হতবুদ্ধির মত হইয়া মাণিক বলিল, "সত্যিই জানবার আরও কিছু আছে নাকি?"

রেণু বলিল, "বাবা বলেন,—গাছ-পালা, নদী-মাঠ, আকাশ এগুলো দেখতে খুব ভাল হ'লেও—বাইরের দেখা ছাড়া আর কিছু নয়। এই গাছের ছায়ায় ঢাকা কুঁড়েঘরের মধ্যেও দেখবার অনেক কিছুই আছে। ঐ ধানের শীষগুলির নীচেয় মাটিতেও—অনেক লেখা আছে। কে-ই বা তা দেখে—আর কে-ই বা তা পাঁচজনকে দেখায়।"

মাণিক চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।—

রেণু বলিল, "...আসি তা'হলে—কথায় কথায় বাড়ীর কাছে এসে পড়েছি।"

মাণিক কোন কথা না বলিয়া অন্য পথ ধরিল।

মাণিককে ফিরিতে দেখিয়া মহামায়া উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "হাঁ-রে, এত রাত হ'ল যে? রাত-বিরেতে খালি পায়ে—"

মাণিক বলিল, "রেণু নদীতে জল আনতে গিয়ে একা পড়েছিল, তাই এগিয়ে দিয়ে এলাম। আচ্ছা মা, রেণুর বাবা কাজ-কর্ম্ম করেন না কেন? ওদের বোধ হয় খুব কষ্ট,— না?"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "ওদের কষ্ট কি তুই দূর করবি —মাণিক?"

মাণিক লজ্জিত হইয়া কহিল, "ধেৎ। তাই বলছি নাকি আমি?"

তাহার লজ্জা দেখিয়া মহামায়া কৌতুক অনুভব করিলেন। কিছুক্ষণ হাসিবার পর স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "সত্যিই ওদের দুঃখ-কষ্টের সংসার। রেণুর বাবা সওদাগরী অফিসে মোটা মাইনেয় কি কাজ ক'রতেন। কিন্তু স্বদেশীর হ্যাঙ্গামায় প'ড়ে, কি খেয়াল হ'ল, হঠাৎ দিলেন কাজ ছেড়ে। বলেন চাষ ক'রব— খেটে খাব।"

মাণিক বলিল, "সে ত' ভাল কথা, মা!"

মহামায়া বলিলেন, "কিন্তু চাষবাস হিসেব ক'রে ক'টা লোক করতে পারে? ওতে হাড়ভাঙ্গা মেহন্নত আছে কিন্তু পয়সা কম। তাই লোকের ধৈর্য্য থাকে না। রেণুর বাপের ধৈর্য্য ছিল —মনও শক্ত ছিল। কিন্তু হ'লে হবে কি?—বিধাতার মার। সেবার বছরখানেক ম্যালেরিয়ায় ভুগে—দেহও যেমন জরাজীর্ণ হ'য়ে প'ড়ল লোকসানও তেমনি—সামলে উঠতে পারলেন না। যখন সেরে উঠলেন,—দেখলেন, হাতে বল নেই, মুখে তুলবার অন্নও মেলে না।"

—"তারপর?"

"তারপর বাধ্য হ'য়ে জমিজমা ভাগে দিয়ে দিলেন। তাতে যা পান মাত্র আট মাস চলে। বাকী ক'মাস কষ্ট।"

মাণিক বলিল, "এখন ত' সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন,—আবার চাষবাস করুন না?"

মহামায়া বলিলেন, "তাই ত' ব'লছিলাম—ভারি একগুঁয়ে লোক। বলেন, প্রথমে যখন বাধা বিপত্তি এসেছে—তখন ও-কাজে সুবিধে হবে না। উনি টাকা ধার দিতে চেয়েছিলেন—নেন নি।"

একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মাণিক বলিল, "আমাদের বাঙলা-দেশের লোক,—আর বাঙলাই বা বলি কেন,—ভারতবর্ষের লোক ভারি অদৃষ্টবাদী। তারা উদ্যমের উপর মোটেই বিশ্বাস রাখে না।"

মহামায়া বলিলেন, "অদৃষ্ট কি কেউ কখন খণ্ডাতে পারে, বাবা?"

মাণিক কণ্ঠে জোর দিয়া বলিল, "পারে—খুব পারে। সব দেশেই পারে—কেবল এ দেশে নয়। মা, এ-ও বোধ হয় শতবর্ষাধিক অধীন মনোবৃত্তির ফল।"

মহামায়া মাণিকের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিলেন। সেই মাণিক—সরল—বাক্‌হীন—অসহায় ভীরু শিশু!...সেদিন অতি কষ্টে তাহার মুখ হইতে —কত সাধ্যসাধনাতেই না 'মা' কথাটি বাহির করিতে হইত। আজ সে কুণ্ঠা-সঙ্কোচ—বয়সের সঙ্গে তাহার নাই সত্য;—সে আজ শুধু কথাই বলে না—তর্কও করে। এবং সে তর্কে যুক্তির দৃঢ়তাও যেন প্রকাশ পায়। তথাপি মাণিক বালক!—

মাণিকের সর্ব্বাঙ্গে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া মহামায়া বলিলেন, "তুই ছেলেমানুষ—ও-সব কি বুঝবি? আয়, খাবি আয়।"

মা'র দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া—মাণিকের আর তর্ক প্রবৃত্তি রহিল না। যুক্তি মহামায়ার হৃদয় স্পর্শ করে না—। তিনি স্নেহকে উচ্চে বসাইয়া—আর সব বৃত্তিগুলিকে তাহারই শাসন-চ্ছায়াতলে অবনত শির করিয়া দিয়াছেন। মা'র এই পরম দুর্ব্বলতাটুকুকে উপভোগ করিতে মাণিকের ভারি ভাল লাগে। শীত প্রত্যূষে সঙ্কুচিতকায় কিরণটুকুর মতই কোমল—সুকুমার—এবং দীর্ঘসূত্রতার আবরণে মণ্ডিত হইলেও—তেমনই রমণীয়!

(২)

পরদিন প্রাতঃকালে মাণিক আসিয়া রেণুদের বহির্ব্বাটিতে —রেণুর পিতার নাম ধরিয়া ডাকিল।

উত্তর আসিল, "বাড়ী নাই।"

সে একটু বিস্মিত হইল। এত ভোরে তিনি প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়াছেন? একটু ইতস্তত করিয়া কোন্ দিকে তাহার সন্ধানে যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় কক্ষান্তরে যাহা শুনিতে পাইল তাহাতে তাহার শ্রদ্ধানত চিত্ত দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

কক্ষান্তরে মোটাগলায় কে বলিতেছিল, "বোধ হয় মধু কৈবর্ত্ত তাগাদায় এসেছিল। বেশ বলেছিস মিনি। একবার উঁকি মেরে দেখ দেখি মা, লোকটা আছে না চলে গেছে? পুকুর থেকে মুখটা ধুয়ে আসি।"

মাণিক দারুণ বিরক্তি লইয়া চলিয়া যাইতেছিল।—

মেনকা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া—মাণিককে দেখিয়া—চীৎকার করিয়া বলিল, "ওযে মাণিকবাবু,—বাবা—।"

রেণুর বাবা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "ওরে—ডাক—ডাক" বলিতে বলিতে শিথিলবস্ত্র কোমরে জড়াইয়া অবিন্যস্ত কাছা একহাতে ধরিয়া, জানালার ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিলেন, "—মাণিকবাবু, ও মাণিকবাবু—"

মাণিকের ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না

যে ব্যক্তি একদিন স্বদেশ জননীকে ভালবাসিয়া গোলামীর মায়া-মোহের শৃঙ্খল কাটিয়া শ্রম-শ্রী-সম্পন্না ভূমি-লক্ষ্মীর কঠিন কোলকেই সাগ্রহে ও সমাদরে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন,— আজ অভাবের তীব্র তাড়নায় সেই মহতের এ কি অধঃপতন! স্বেচ্ছাবৃত দুঃখ-দারিদ্র্য—কি নিমেষের নিঃশেষিত সঞ্চয়ের সঙ্গে—সমস্ত শক্তি সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে; তাঁহার অদৃষ্টাকাশে মন-দৌর্ব্বল্যে যে বিষ উৎসারিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন ব্যাপ্ত করিয়া গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে বিশ্বের লোককেও সেই বিড়ম্বনার বাগুরায় আবদ্ধ করিয়া তিনি সেই তীব্র হলাহল পান করাইয়া দিতে চান! এমনই বিচিত্র মানুষ ও এমনই হীন তার প্রবৃত্তি!—

ফিরিবার ইচ্ছা না থাকিলেও সেই সনির্ব্বন্ধ আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারিল না।

বৃদ্ধ অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। আপন ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আমি মোটেই বুঝতে পারিনি যে তুমি এসেছ। এমন সৌভাগ্যের কথা কি ভাবতেই পারা যায়? তারপর—কলেজের পড়াশুনা কেমন চলছে—? 'প্রেসিডেন্সি' বুঝি—? বেশ—বেশ। তা কি মনে ক'রে—এই ভোর বেলায়?"

মাণিকের মনে হইল, জমিদারের অযাচিত সাহায্যকে একদা এই ব্যক্তিই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন! তখন ইঁহার অন্তরে নির্ব্বাপিতপ্রায় আত্ম-চেতনার যে রশ্মিটুকু জ্বলিতেছিল,—সতর্ক অনুসন্ধানেও আজ তাহা মিলিবে না।

সংসার মানুষকে এমনই করিয়া বাঁধে এবং তাহার অন্তরের বোধশক্তি দুঃখ-দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া—অন্তরের মাঝেই মরণলাভ করে।

সত্যই প্রয়োজন কিছু ছিল না। শুধু শ্রুত কাহিনীর উদ্দীপ্ত কৌতূহলটুকু চরিতার্থ করা।

কিয়ংক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল, "আর চাষবাস করেন না কেন,—চৌধুরী মশাই?"

বৃদ্ধ শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, "বুড়ো হয়েছি—পেরে উঠি না।"

মাণিক বিরক্তি চাপিতে পারিল না—। ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে আঘাত দিয়া কহিল, "একথা আপনার মুখে মানায় না। সব জেনেশুনেই ত' একদিন চাকরী ছেড়ে দেশে এসে বসেছিলেন?"

বৃদ্ধ অতিমাত্রায় লজ্জিত হইয়া নিবন্ত হুঁকাটায় প্রবলবেগে টান মারিয়া কাশিয়া উঠিলেন এবং সে কাশির বেগ এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, বাধ্য হইয়া মাণিক আর প্রশ্ন করিতে সাহসী হইল না।

বেগটা একটু কমিলে তিনি হুঁকা রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। ছোট মেয়ে মিনিকে বলিলেন, "তোর দিদিকে ব'লে আয় ত' মা—দু কাপ চা তৈরী করতে। বস, বাবা, বস। আমি পুকুরঘাট থেকে মুখটা ধুয়ে আসি।" বলিয়া অপর পক্ষের সম্মতির অপেক্ষামাত্র না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মিনি ডাকিল, "দিদি—।"

দিদি অন্তরালে—অদূরেই বোধ কাঁর কোন কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল। দ্বার ঠেলিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল, "প্রাতঃকালের অতিথি,—শুধু এক কাপ চায়ের প্রত্যাশী!"

মাণিক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না,—বাড়ী গিয়েই খাব।"

রেণু বলিল, "কেন, এখানে ত' হচ্ছে।" বলিয়া ব্যথিত দৃষ্টিতে মাণিকের পানে চাহিয়া রহিল।

মাণিক কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া রেণু বলিল, "তবে অসুবিধে হ'তে পারে।"

মাণিক বলিল, "কিসের অসুবিধে?"

রেণু বলিল, "বাড়ীর চা—আর এখানকার চায়ে আকাশ পাতাল তফাৎ। না চিনি, না দুধ,—শুধু পাতা সেদ্ধ।"

মাণিক লজ্জিত হইয়া বলিল, "না, না, সে কথা আমি বলিনি। আচ্ছা তুমি চা তৈরী কর, বসলাম।" বলিয়া বসিল।

রেণু বলিল, "না, আপনি বাড়ী গিয়েই খাবেন, মিছি মিছি কষ্ট কেন?"

মাণিক দুঃখিত হইয়া বলিল, "কিন্তু এখানে না খেলে সত্যিই কষ্ট পাব। যাও, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

রেণু হাসিতে হাসিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিতেই মহামায়া বলিলেন, "ধন্যি ছেলে বাবা, কোথায় ছিলি এত বেলা পর্য্যন্ত? ভদ্রলোক ব'সে ব'সে ফিরে গেলেন।"

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "কে মা?"

মহামায়া বলিলেন, "জামগাঁ থেকে তোকে দেখতে এসে-ছিলেন যে।"

মাণিক হাসিতে হাসিতে বলিল, "বল কি মা, আমি কি এমনই একটা দেখবার জিনিষ যে, জামগাঁ থেকে লোক এসেছিল দেখতে! আহা, তিনি চ'লে গেলেন!"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "যদি তিনি ভবিষ্যতে তোর শ্বশুরই হন—তখন আর এ ঠাট্টা তামাসা চলবে না। যত বুঝি বুড়ো মাকে নিয়ে?"

মাণিক একটা কপট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক বাচা গেছে। বিয়ের সম্বন্ধ! আচ্ছা মা, তুমি তোমার বয়স নিয়ে এত বাড়াবাড়ি ক'রছ কেন বলত? আমি ত' তোমায় ঠিক তেমনটি দেখছি—যেমন ছেলেবেলায় দেখেছিলাম।" বলিয়া পরম স্নেহভরে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "খিদে পেয়েছে, —খাবার দেবে চল।"

মহামায়া উৎফুল্লস্বরে বলিলেন, "ছেলের কাছে মা কোন-দিন বুড়ো হয় না, না রে? ছাড়—ছাড়—।"

রাত্রিতে মহামায়া সুরেনবাবুকে বলিলেন, "মাণিক কি বলে জান?"

সুরেনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না।"

মহামায়া বলিলেন, "বলে,—সে বিয়ে করবে না। আগে পড়াশুনো শেষ হোক—তারপর—ও-সব কথা তুল'।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "ঠিকই বলে। যাকে বলে—প্রাজ্ঞের মত কথা।"

কৃত্রিম কোপে মহামায়া বলিলেন, "তোমার কি একটা আলাদা মত নেই? চিরকালটা একভাবেই গেল!"

সুরেনবাবু বলিলেন, "সে তুমিই ভাল বলতে পার। আগে এক একবার স্বতন্ত্র হবার ইচ্ছে হত বটে কিন্তু বয়সের রজ্জু তখন বড়ই শক্ত ছিল। এখন সে বন্ধন শিথিল হ'য়ে এলেও মতটা কোথায় যেন নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে। খুঁজতে গেলেই দেখি বাঁধনও নেই,—স্বাতন্ত্র্যও নেই। এ কি জান? গাছের কলম বাঁধা আর কি?"

মহামায়া মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "নাও হেঁয়ালী রাখ। এখন কি করা উচিত—একটা যুক্তি পরামর্শ দাও দেখি।"

সুরেনবাবু বলিলেন "আমি ত' জানি পরামর্শটা চাইবার

(শেষাংশ ৩১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাচীন রোমে জন্তু-জানোয়ার

জর্জ্জ জেমিসন এম-এ, এফ-জেড-এস (ম্যাঞ্চেষ্টার জুওলজিক্যাল গার্ডেন হইতে অবসরপ্রাপ্ত)

—পোষা জানোয়ারের শিক্ষা—

প্রাচীন রোমানগণ আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রকাশ্য সভায় সমবেত দর্শক হইত, যেখানে বন্য জন্তু-জনোয়ারদের লড়াই চলিত, চলিত নির্ম্মম ঘাত-প্রতিঘাত, নিষ্ঠুর নিপীড়ন আর হত্যা। শুধু লড়াই নয় প্রাচীন রোমানগণ জীব-জন্তুর নির্য্যাতন ও হত্যা দর্শন করিতেও আমোদ উপভোগ করিত। তাহা হইলেও কিন্তু এমন প্রমাণ বহু রহিয়াছে যে তাহারা জন্তু-জানোয়ার পোষণ করার ব্যাপারে পশ্চাৎপদ ছিল না আজিকার কোন সুসভ্য জাতি হইতে; আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল পোষা জন্তু-জানোয়ারদের লড়াই চালাইয়া তাহাদের মর্ম্মান্তিক যাতনা বা হত্যার দৃশ্যে কৌতুক অনুভব করিতে কখনই অগ্রসর হইত না। উহাদের লড়াইয়ের প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইতে দিত না।

প্রাচীন রোমানগণ পশুহত্যার অভিনব এবং একেবারে নাটকীয় প্রচেষ্টা উদ্ভাবন করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য গৃহপালিত ও শিক্ষিত বন্যপশু হত্যা না করিয়া উহাদের দ্বারা নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করা হইতে থাকে। এই শেষোক্ত প্রদর্শনীই এক সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে অশেষ। কিন্তু যে-কালে জন্তু-জানোয়ারের লড়াই দ্বারা নিষ্ঠুর হত্যা প্রকাশ্য ক্রীড়াঙ্গনে পরিচালিত হইত সেই সময়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর মৃত্যুর যন্ত্রণা বৃদ্ধির জন্য প্রকাশ্য স্থানে এই সকল হিংস্র পশুর সম্মুখে প্রদান করা হইত; সময়ে দর্শকগণের বিশেষ কৌতুক উৎপাদনের নিমিত্ত গ্রীক-পুরাণের কোনও আখ্যায়িকা অনুসারে মঞ্চ সাজাইয়া এবং দণ্ডিত আসামীকে সেইপ্রকার নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দুরন্ত জানোয়ারগুলির মুখে নিক্ষেপ করা হইত।

মাউণ্ট এটনা হইতে বন্দীকৃত কোন এক দস্যুকে হত্যা করিবার লোমহর্ষণ কাহিনী এইরূপঃ—ক্রীড়া-কৌতুকের বেষ্টিত অঙ্গনে একটি কৃত্রিম পর্ব্বত তৈরী করা হইল। চারিদিকে ঝোপঝাড় বনবাদাড়; দস্যুকে সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে খাড়া করা হইল। পর্ব্বতের পাদদেশে বিরাট একটি খাঁচায় কতকগুলি সিংহ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু। সহসা পর্ব্বতশিখর হইতে লোকটাকে গড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার দ্বারটি উত্তোলিত হইল, যেমন লোকটি গড়াইয়া খাঁচার ভিতরে গেল, অমনি দ্বারটি বন্ধ হইয়া গেল। তখন দুরন্ত পশুগুলির যে নির্ম্মম আক্রমণ তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দর্শকগণের মনস্তুষ্টির জন্য এই যে আয়োজন, ইহা ঘটিয়াছিল অগষ্টাসের রাজত্ব-কালে।

অগষ্টাসের পরে কিছুকাল পর্যন্ত অনুরূপ আমোদ উপভোগ এবং ইহা অপেক্ষা বিচিত্রতর ফন্দি-ফিকির দ্বারা কৌতুক অনুভব ব্যাপকভাবেই প্রচলিত হয়। নিত্য নূতন উপায় আবিষ্কার করা হইতে থাকে দর্শকগণের মনোরঞ্জনের জন্য।

এই প্রকার নিষ্ঠুর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা লোপ পাইয়া গিয়াছিল রাজা ট্রজানের আমলে, যখন ড্যাকিয়া বিজয়ের উৎসবাঙ্গরূপে রোমের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় লড়াইয়ের ক্রীড়া কৌতুকের জন্য রক্ষিত ১১,০০০ জানোয়ার একসঙ্গে প্রদর্শনীর অঙ্গনে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া পরস্পর মারামারিতে হত্যা করা হয়। সেই ব্যাপক নিষ্ঠুর হত্যাকার্য্য বোধ হয় রাজপুরুষদের কঠিন হৃদয়েও রেখাপাত করিয়াছিল অথবা পুনরায় এতগুলি বন্য-জন্তু সংগ্রহ বোধহয় বিপুল অর্থ ও শ্রমের ব্যাপার ছিল—যে কারণেই হউক পশুদের লড়াই আর প্রকাশ্য সভায় ব্যাপকভাবে চলে নাই এই ঘটনার পর।

ইহার পর হইতে রেওয়াজ নূতন পথেই চলিল। রোমক সাম্রাজ্যের ক্রম-উন্নত সংস্কৃতি ধারাই ইহার জন্য দায়ী হইয়া থাকিবে। বন্যজন্তু ধৃত করিয়া উহাকে পোষ মানান, উহাকে বিচিত্র শিক্ষায় শিক্ষিত করা—এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হইতে লাগিল; এবং অভিজাত বংশের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল—কে কত বেশী সংখ্যায় বন্যজন্তুকে শিক্ষিত ও নিরীহ করিয়া তুলিতে পারে—তাহার উপর।

সম্রাটগণ এবং রাজ্যের যত ধনিক সম্প্রদায় নিজ নিজ পশু-আগার গড়িয়া তুলিল—যেখানে বিদেশ হইতে আনীত বন্যপশুর শিক্ষাদান পরিচালিত হইত নিপুণ রক্ষকের হস্তে। ফ্যাশান হইয়া উঠিল পোষা সিংহ কিম্বা ভালুক সংগ্রহ করিয়া রাখিবার। ক্রমে খৃষ্টাব্দ প্রথম শতকের শেষ পাদে এমনও দেখা যাইতে লাগিল যে বিদেশের প্রসিদ্ধ পাখীও আনিয়া পোষা হইতেছে। সেই সময় ইতালীর যে কোনও পশুপালকের গোলাবাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যাইত—ময়ূর ফ্লামিঙ্গো গিনি ফাউল এবং ফেজেণ্ট পাখী অতি সমাদরে পোষা হইতেছে। পশ্চিম ইউরোপে যে বিড়াল গৃহপালিত পশুর গণ্ডীর ভিতর অভ্যর্থিত হইল, তাহা নিশ্চয়ই রোমক প্রাধান্যের যুগে। ইহার পূর্ব্বে বিড়াল পুষিবার বার্ত্তা পাওয়া যায় না—অন্তত সাধারণের ভিতর সে রেওয়াজ প্রবেশ করে নাই, ইহা অবধারিত।

গ্রীকগণ আফ্রিকার সহিত নিবিড় সংস্পর্শে আসিয়া এক-জাতীয় বেগুনী রংয়ের পাখী নিজদেশে আমদানী করিল, যাহার নাম তাহারা দিল গ্যালিনিউল (Gallinule)। এই পাখী কতকটা আমাদের দেশের বেলেহাঁসের মত চেহারায়, কিন্তু হালচালে একেবারে পানকৌড়ীর দোসর। গ্রীকগণ অবশ্য পাখীটির চটকদার রংয়েই লুব্ধ হইয়াছিল এবং উহার এই সৌন্দর্য্যের জন্যই বহু অর্থব্যয়ে আমদানী করিয়া পুষিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। গ্রীকগণ লক্ষ্য করিয়াছিল—পাখীটির খাইবার সময় কেহ তাহা দেখে ইহা পাখীটি পছন্দ করিত না, থাবায় খাবার ধরিয়া নানা ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহারও নজরে না পড়ে এইভাবে সহসা এক সময়ে তাহা গিলিয়া ফেলিত। আর বিশেষ করিয়া আশ্চর্য ছিল ইহার জলে জলে দীর্ঘকাল শফর চালাইবার পরও ডাঙায় আসিয়া ধূলো-বালিতে গড়াগড়ি দিয়া স্নান করা। গ্রীকগণ এই পাখী পোষার এক অদ্ভুত হেতু বর্ণনা করিত। তাহা এই যে, যদি মালিকের

পত্নী ব্যভিচারিণী হইত, তাহা হইলে পাখীটি আত্মহত্যা করিত। এই কারণেই গ্রীসের সেকালের বহু সন্দিগ্ধচিত্ত স্বামী এই পাখী পুষিত—কেবল পত্নীদের উপর নজর রাখিবার জন্য কিংবা উঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতা টের পাইবার জন্য। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, পাখীটি ছিল অতি লাজুক প্রকৃতির, অপরিচিতের মূর্ত্তি বরদাস্ত করিতে পারিত না সেইজন্য যখন কোনও অজানা অচেনা ব্যক্তি উঁহার নিকটে আসিত তখন আতঙ্কে অনেক সময় লুকাইবার চেষ্টায় আপন দেহে নানা প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইত। এই অদ্ভুত ব্যাপার হইতেই উপরোক্ত কাহিনীর উদ্ভব হইয়া থাকিবে।

—শিক্ষিত সিংহ—

খৃষ্টপূর্ব্বে চতুর্থ শতকে গ্রীসে পোষ মানান এবং শিক্ষিত সিংহ রাজপথে নাচাইয়া খেলা দেখাইয়া এক দল লোক প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। পরবর্ত্তী শতকে ঐতিহাসিক থেপেরিটাস বর্ণনা করিয়াছেন যে, আরটেমিস সম্রাটের অভ্যর্থনার জন্য যে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে শত শত 'বন্য-পশু' স্থান পাইয়াছিল এবং উঁহাদের ভিতর ছিল প্রকাণ্ড একটি 'সিংহী।' সুতরাং এইকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রাচীনগণ আধুনিকদের অপেক্ষা বন্যপশুর শিক্ষাদানে কম নিপুণ ছিল না।

ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, দ্বিতীয় টলেমি গ্রীকদিগকে এমন সকল জন্তু-জানোয়ার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহা তাহারা জীবনে আর দেখে নাই। এই গুলির ভিতর ছিল শিম্পাঞ্জী। একটি মস্ত বড় সাপ নীল নদের জলাভূমি হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখান হইয়াছিল—দৈর্ঘ্যে উহা ছিল ৪৫ ফুট।

মিশরে এক সময়ে বন্য হস্তী পোষ মানাইয়া সমর-শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা হইয়াছিল। এথিওপিয়ার বনাঞ্চল হইতে হস্তী ধৃত করিয়া আনিয়া সমরে ব্যবহার করা হইতে থাকে; কিন্তু এই প্রয়াস বিশেষ সফল হয় নাই। এথিওপিয়ার অধিবাসিগণ পুষিবার জন্য হাতী শিকার করিত না। উহারা খাদের সাহায্যে কিম্বা তীরধনু দ্বারা হস্তীকে হত্যা করিত—হাতীর দাঁত, চামড়া প্রভৃতির জন্য।

হাতী কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় না। তাই মনে হয় টলেমি রাজবংশের খেয়ালে যে হাতী সংগ্রহ করা হইয়াছিল সংগ্রামের কার্য্যে নিয়োগ করিতে, উঁহাদের বয়স নিশ্চয়ই কম ছিল; কারণ সমুদ্রপথে প্রেরণ করিবার যোগ্য এবং শিক্ষাদানের পক্ষে যোগ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক হাতীই হইয়া থাকে। পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হাতী সহজে পোষ মানে না, এমন কি এইরূপ শিক্ষাদানকালে নিতান্ত দুরন্তপনা দ্বারা আত্মঘাতী হয়। মিশরের আবহাওয়ায় অবশ্য হাতী পোষা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না, কিন্তু নিপুণ শিক্ষকের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। কারণ আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ দান করেন যে, সদয় ব্যবহার দ্বারাই একমাত্র হস্তীকে বশ করা যায়। উহাকে প্রহার করিলে কিম্বা কোনও দণ্ড দান করিলে উহা কখনই পোষ মানে না। সুতরাং মনে হয় সেকালে নির্দ্দয় ব্যবহারে হাতীকে বাগ মানানের চেষ্টা হইয়াছিল, কেননা টলেমি রাজবংশের সংগৃহীত হাতীগুলি ২০ বৎসর বয়স পাইবার বহু পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এবং প্রতি বৎসর নূতন করিয়া হস্তী-সংগ্রহ প্রয়োজন হইত। কিন্তু তাহাতেও প্রচুর সংখ্যায় শিক্ষিত করা ঘটিয়া উঠিত না।

এই প্রকারে পঞ্চাশ বৎসরের হস্তী-সংগ্রহ ও শিক্ষাদানের পর মাত্র ৭৩টি জন্তুকে সমর-কার্য্যের উপযোগী করিয়া তোলা গিয়াছিল। রাফিয়া রণক্ষেত্রে যখন মিশরের ও পারশ্যের সেনা মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেখা গেল পারশ্যের পক্ষে ১০২টি হাতী সারিবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু মিশরের পক্ষে অর্দ্ধ শিক্ষিত ৭৩টি মাত্র। মিশর পক্ষীয় হাতীর ভিতর মাত্র ৪।৫টি ছিল আকারে বড় ঐগুলি বিষম তোড়ে বিপক্ষের উপর চড়াও হইল; কিন্তু বাকিগুলি ছিল পারশ্যের হাতী অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র, সেই জন্য উহারা পারশ্যের বৃহৎ বৃহৎ হস্তীর আকৃতি দেখিয়াই পলায়নপর হইল। এই প্রকারে পিছু হটিতে যাইয়া বহু স্বপক্ষীয় সেনা বিনাশ করিল, ফলে উঁহাদের অধিকাংশ নিজ সেনাদের হস্তে আহত হইল। একুনে ষোলটি হাতী হত হইল, প্রায় পঞ্চাশটি পারশ্যের সেনার হস্তে বন্দী হইল। পারশ্যের হাতীর মাত্র পাঁচটি নিহত হইল। তথাপি যুদ্ধে মিশরেরই জয় হইল। কিন্তু ইহার পর হইতে সমরোদ্যমে হস্তীর সংগ্রহ বন্ধ হইয়া গেল। টলেমি রাজবংশ আর সমরে হস্তীর সাহায্য গ্রহণ করে নাই।

—গ্লাডিয়েটর ও ষাঁড়ের লড়াই—

অগষ্টাসের শাসনকালে হাতীর দ্বন্দ্বযুদ্ধও প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক প্লিনি লিখিয়াছেন,—যে সময়ে দড়ির উপর দিয়া হাতীকে হাঁটান কল্পনার অতীত ছিল, সেই সময়ে হাতী দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র শূন্যে নিক্ষেপ ও হাতীর লড়াই ছিল রোমক সাম্রাজ্যে অতি সাধারণ ব্যাপার।

ইহার পর নেরোর রাজত্ব সময়ে আরও নূতন প্রকার নিষ্ঠুরতার কৌশল আবিষ্কৃত হয়। অগষ্টাসের আমলের পশুযুদ্ধ ত নেরোর আদেশে চলিতই উপরন্তু উটের দৌড় ছিল এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এক একখানি গাড়ীতে চারিটি উট জুতিয়া দেওয়া হইত, এই প্রকারের বহু শকটের দৌড় পরিচালিত করা হইত। ইহাতে অবশ্য তেমন নিষ্ঠুরতার ব্যাপার কিছু থাকিত না, যদি না প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটিয়া অন্তত কতকগুলি উটকে অপটু করিয়া ফেলিত। কিন্তু উত্তেজনার চরম উপস্থিত হইত যখন নেরোর আদেশে অশ্বারোহী প্রেইটোরিয়ান গার্ড দলকে এক যোগে ৪০০ শত ভল্লুক এবং ৩০০ শত সিংহের সম্মুখীন হইতে হইত। ইহার পর ছিল ষাঁড়ের লড়াই। আর হাতীর দলকে প্রতিবারেই দৃশ্য শেষ করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত অথবা যখন দেখা যাইত গ্লাডিয়েটারগণ অতি সহজে দুরন্ত জানোয়ারগুলির কবলে প্রাণ হারাইয়াছে। নেরোর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য উদ্ভাবন ছিল জলযুদ্ধ। একটি কৃত্রিম হ্রদে নানাপ্রকার ভীষণ জলজন্তু অগণিত সংখ্যায় রাখা হইত। ছোট ছোট নৌকায় কয়েকজন করিয়া যোদ্ধাকে আরোহী করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হইত। সেই সময় জলজন্তুর সহিত মানুষের লড়াই চলিত। লড়াই বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না, কারণ জলজন্তুদের দাপটে নৌকা

মুহূর্ত্তে কূপোকাৎ হইত, তখন চলিত মানুষ-শিকার বাগাইবার জন্য জলজন্তুদের পরস্পর আড়াআড়ি।

প্লিনি ষাঁড়ের লড়াই সম্বন্ধে আরও বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন যে, মানুষের সঙ্গে লড়াইতে প্রবৃত্ত হইয়া ষাঁড়গুলি আশ্চর্য্য রকম শিক্ষার পরিচয় দিয়াছে। আদেশ মাত্র লড়াইতে যোগদান করিয়াছে, পুনরায় আদেশ শ্রবণে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াছে, প্রতিদ্বন্দ্বী-মানবকে বিনা বাধায় উহাদের শিং ধরিতে এবং তুলার বস্তার ন্যায় শূন্যে নিক্ষেপ করিতে দিয়াছে। আবার কখনও বা অপর ষাঁড়-টানা গাড়ীতে চলন্ত অবস্থায় চালকের আসনে লাফাইয়া চড়িয়া বসিয়াছে। কিন্তু এই যে পালিত ষাঁড়ের খেলা ইহা সম্রাট নেরোর শাসনকালে কিনা সঠিক বলা যায় না।

ষাঁড়ের লড়াই (Bull fighting) অর্থে দুইটি ষাঁড়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ নহে। হয় একটি মানুষ, একটি ষাঁড় অথবা কতকগুলি মানুষ কতকগুলি ষাঁড়ের সহিত যুদ্ধরত অবস্থাকেই ষাঁড়ের লড়াই বলা হয়। পরবর্ত্তী কালে স্পেনে যে 'বুল-বেটিং' প্রচলিত হয়, তাহাতে একটি ষাঁড়ের বিরুদ্ধে অশ্বারোহী কতিপয় যোদ্ধা বর্শা হাতে চড়াও হয় এবং ষাঁড়টিকে হত্যা করে। স্পেনের এই 'খেলাধুলা'ও যে রোমানদিগের অনুকরণে গৃহীত, ইহা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র।

'সেনেকার পত্র' সম্রাট নেরোর শাসনকালেই লিখিত হইয়াছিল। ঐ সকল পত্রের একস্থানে সেনেকা লিখিয়াছেন,—কোনও প্রদর্শনীর প্রাতঃকালের প্রথম দর্শনীয় ব্যাপার ছিল ষাঁড় আর ভল্লুকের লড়াই ; ভল্লুকটিকে ষাঁড়ের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইত, বদ্ধ অবস্থায় যে হুটোপাটি চলিত তাহাতে এক সময়ে যে কোন একটি কাবু হইয়া প্রাণ হারাইত ; তখন পশুরক্ষকগণ বিজেতা জানোয়ারটিকে হত্যা করিত। আবার এই পত্রসমূহে এমন আভাসও পাওয়া যায় যে, শিক্ষিত পশু লইয়া শিক্ষকগণ নানা খেলা দেখাইত। সিংহ-রক্ষক সিংহের মুখের ভিতর নিজহস্ত প্রবেশ করাইয়া দিত, ব্যাঘ্র-শিক্ষাদাতা ব্যাঘ্রের মুখে চুম্বন দিত এবং এক বলিষ্ঠকায় বামন নিগ্রো হাতীকে আদেশ করিত—অমনি হাতী হাঁটু গাড়িয়া বসিত কিম্বা এক পা তুলিয়া হাঁটিত।

দণ্ডিত আসামীদের প্রাণনাশের নিমিত্ত ভল্লুক ব্যবহার করা হইত। একটি অপরাধীকে দস্যুর ভূমিকায় অনুকরণ করিতে হয় এবং তাহারই পরিণামে একটি ক্রুশে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া ভল্লুক লেলাইয়া দেওয়া হয়। একস্থানে পর্ব্বত ঝরণা বনজঙ্গল প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের ন্যায় সাজাইয়া, তাহাতে পৌরাণিক কাহিনীর ওরফিউসকে ঝরণার পাশে বসাইয়া দেওয়া হয়। তৎপর পর্ব্বত পার্শ্বের খাঁচা হইতে দুরন্ত পশু পাখীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়—কারণ ওরফিউস্ বেশধারী লোকটি একটি দণ্ডিত অপরাধী। ভালুক রুখিয়া আসিয়া ওরফিউসকে হত্যা করিলে দৃশ্য প্রদর্শন সমাপ্ত হয়।

মারশিয়ালের একটি ক্ষুদ্র কবিতা হইতে জানা যায় ধাবমান ষাঁড়ের পিঠে নৃত্যরত বালকগণের দৃশ্য। অন্য একটিতে হাতীর হুকুম তামিল করিবার বিষয় বর্ণিত আছে। আরও বর্ণিত আছে বিভিন্ন বন্য জন্তুগুলিকে ঘোড়ার মত গাড়ীতে জোতা হইয়াছে—সেই তালিকায় বাঘ, চিতাবাঘ, শূকর, ভালুক, বাইসন এমন কি কৃষ্ণসার পর্য্যন্ত রহিয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ আশ্চর্য্যবোধ করেন এই জন্য যে, কৃষ্ণসারের পোষ মানাইবার কাজ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, এই কার্য্য যে সম্ভব করিয়াছে, সে সাধারণ নগণ্য শিক্ষক নয়।

মারশিয়াল একটি দৃশ্যে অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন একটি সিংহ খরগোসকে মুখে করিয়া তুলিয়া ধরিল আবার নামাইয়া দিল, কিন্তু খরগোসকে কোন প্রকারে আঘাত দিল না। অবশ্য শিক্ষাদাতার নৈপুণ্য ইহাতে খুব, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ শিক্ষকের কৌশলও কম দায়ী নয় এই ব্যাপারের জন্য। সিংহকে খরগোস লইয়া খেলা দেখাইবার পূর্ব্বে এই ক্রীড়াঙ্গনেরই অপর পার্শ্বে একটি ষাঁড় হত্যা করিতে দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্কিম প্রতিভা

(২৯৫ পৃষ্ঠার পর)

তাঁহার এ ধর্ম্ম সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না ; স্বদেশ-প্রীতি ও মানব প্রীতির মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার স্থান নাই বলিয়াই তাঁহার আদর্শবাদ তাঁহাকে বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দেশাত্মবোধ স্বার্থরহিত ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইলে তাহার সহিত আন্তর্জাতিকতার কোন বিরোধ হইতে পারে না। অনেকে তাঁহার নামে প্রাদেশিকতার অপবাদ দিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, এ ধারণা নির্ভুল নহে। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইহা জানিয়াও যেমন হিন্দু মূর্ত্তি-বিশেষের পূজা করিয়া থাকে, তেমনি ভারতভূমির প্রতীক রূপেই বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট পূজা পাইয়াছে। সে যুগের বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইতেছে দেখিয়া তিনি যে বাঙ্গলার অতীত গৌরবের কাহিনী স্মরণ করাইয়া তাহাদের আত্ম-প্রত্যয়শীল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার সে চেষ্টাকে কি প্রাদেশিকতা বলিব? বাঙ্গলা তাঁহার মাতৃভাষা ছিল, আজীবন তাহারই সাধনায় ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গবাণীর এই একনিষ্ঠ পূজারীর কণ্ঠের উদাত্ত বাণী "বন্দে মাতরম" আজ কি ভারতের কোটি কোটি কণ্ঠে মাতৃভূমির জয়গান রূপে ধ্বনিত হইতেছে না?

* পাটনায় বঙ্কিম শতবার্ষিকী সভায় বক্তৃতা।

সমাধান

(উপন্যাস)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন

(১)

আসাম প্রদেশের একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম,—নাম রামপুর। শহর হইতে আগত পাকা রাজপথের অনতিদূরে, ছোট্ট এক টুক্‌রা শালবনের আড়ালে, গ্রামখানি যেন উঁকি দেয়। কয়েক ঘর সাধারণ কৃষকই গ্রামের অধিবাসী।

ভাদ্র মাস, প্রাতঃকাল। সারারাত্রি অশ্রান্ত বারি-বর্ষণের পর মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, বেশ ঝিকিমিকি রৌদ্র উঠিয়াছে। বর্ষণ-ধৌত বৃক্ষশিরে রৌদ্ররশ্মির লুকোচুরি খেলা চিত্তে চমক জাগায়।

একখানি মোটর গাড়ী শহরের দিক হইতে আসিয়া রামপুরের নিকটে রাজপথে থামিল। গাড়ীতে তিনজন আরোহী। সম্মুখের আসনে দুইজন ভদ্র-যুবক, এবং পশ্চাতের আসনে একটি বালক-ভৃত্য। যুবকদ্বয়ের শিকারীর বেশ;—মাথায় শোলা-হ্যাট, গায়ে খাকি সার্ট, পরণে খাকি শর্ট এবং পায়ে খাকি পট্টি ও ব্রাউন বুট। ভূপেন স্বয়ং গাড়ী চালাইতেছিলেন, বাল্যবন্ধু ও প্রতিবেশী বিজয় তাঁহার বামপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা নামিয়া পড়িলেন, বালকটিকে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া পাহারা দিবার আদেশ দিয়া, বন্দুক-হস্তে দুই বন্ধু শালবনের মধ্য দিয়া আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য-পথে গ্রামের অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

রামপুর গ্রামে অনেকগুলি অশ্বত্থ গাছ আছে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে অশ্বত্থ গাছের ফল পাকে, প্রাতে ও বৈকালে, বিশেষত বৃষ্টির পর রৌদ্র উঠিলে, ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য হরিতাল পাখী আসিয়া একপ্রকার সুমিষ্ট কূঁই কূঁই শব্দের সহিত লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া ঐ সুপক্ক ফল খাইতে থাকে। আজ রবিবার। রাত্রের বৃষ্টির পর প্রভাতে সুন্দর রৌদ্রোদয় হওয়ায় সকলপ্রকার অনুকূল আবহাওয়া পাইয়া যুবকদ্বয় আজ হরিতাল শিকারে আসিয়াছেন।

বন্দুকের শব্দে গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। ভূপেন গ্রামের একদিকে এবং বিজয় অপর দিকে যাইয়া অনেকগুলি হরিতাল সংগ্রহ করিলেন। গ্রামের কয়েকটি উলঙ্গ বালক-বালিকা আসিয়া জুটিল। তাহারা আহত পক্ষী ধরিয়া দিয়া এবং পত্রবহুল শাখা-প্রশাখায় লুক্কায়িত পাখীর সন্ধান দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। ক্রমে ভূপেন গ্রামের এক প্রান্তে আসিয়া পড়িলেন।

তথায়, একস্থানে, একখানি পাট ক্ষেতের আলির উপর একটি বড় অশ্বত্থ গাছ আছে। ক্ষেতের ছায়া অপসারণ জন্য ক্ষেত্রস্বামী ঐ গাছের শাখা-প্রশাখা কাটিয়া ছাঁটিয়া বৃক্ষমূলে স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত, ডাল-পালা কাটিয়া ফেলার জন্য ক্ষেতে রৌদ্র ও আলো পড়িয়া পাটের ফলন ভাল হইবে। দ্বিতীয়ত, কর্ত্তিত ডালগুলি শুষ্ক হইলে জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করা যাইবে। ক্ষেত্রস্বামীর প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এবং ক্ষেতের পাটগুলি পাঁচ ছয় হাত দীর্ঘ ও বেশ সুপুষ্ট সতেজ হইয়াছে। তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেও আর অধিক দিন বিলম্ব হইবে না। ডালগুলি প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে।

বিজয়ের বন্দুকের শব্দে পলায়নপর দুইটি সুন্দর হরিতাল আসিয়া ভূপেনের সম্মুখে ঐ শাখাহীন বৃক্ষের শীর্ষস্থানে পাশাপাশি বসিয়া পড়িল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ভূপেন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পক্ষী দুইটি,—একটি মৃত ও অপরটি আহত অবস্থায়, সেই ডালপালার স্তূপের উপর পড়িয়া গেল। ভূপেন তাড়াতাড়ি বন্দুক মাটিতে রাখিয়া স্তূপের উপর আরোহণ করিলেন, এবং সম্মুখেই মৃত পক্ষীটি পাইয়া হস্তগত করিলেন। তারপর, একটু অনুসন্ধান করিতেই দেখিতে পাইলেন, অপর পক্ষীটি ডালপালার ফাঁকে খানিকটা নীচের দিকে পড়িয়া আছে। ভূপেন সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। দুই চারি পদ যাইতেই তাঁহার পদভরে তথাকার কতকগুলি অর্দ্ধশুষ্ক ডালপালা মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল, এবং একখানি পা সেই ভাঙ্গাপথে অনেকটা ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িল। ভূপেন পা-খানি টানিয়া তুলিতে না তুলিতেই পদনিম্নে একটা ভীষণ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনিতে পাইলেন, এবং দেখিলেন, সেই শাখা-স্তূপের নিম্নদেশ হইতে একটি প্রকাণ্ড গোক্ষুর সাপ তাঁহার সেই পায়ের উপর ছোবল মারিল।

ভূপেনের দেহের সমস্ত রক্ত বিদ্যুদ্বেগে হৃৎপিণ্ডে ছুটিয়া আসিল। ভূপেন অস্বাভাবিক বিকৃতস্বরে বিকট চীৎকার করিতে করিতে পা-খানি টানিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু পদবিক্ষেপ ঠিক রাখিতে না পারিয়া পুনরায় পড়িয়া গেলেন। মৃত্যু সুনিশ্চিত ও আসন্ন বুঝিয়া ভয়ে তাঁহার বাক্‌রোধ ও সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি ঐ স্তূপের উপরেই পড়িয়া রহিলেন। স্তূপের অভ্যন্তরে থাকিয়া সাপটা তখনও ভীষণ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিতেছিল।

ভূপেনের সঙ্গে যে কয়েকটি বালকবালিকা ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘটনাটা দেখিয়াছিল। "বাবুকে সাপে কাটিয়াছে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহারা বিভিন্ন দিকে পলাইয়া গেল।

একটি শ্যামাঙ্গী কিশোরী, বয়স অনুমান পঞ্চদশ বৎসর,—শ্রমপুষ্ট নিটোল দেহ,—পরিধানে হাঁটুর নিম্ন পর্য্যন্ত একখানি মোটা কাপড়, এবং স্বচ্ছন্দ স্বাধীনভাবে সুগোল বাহুদ্বয়কে বাহিরে রাখিয়া বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ অপর একখণ্ড বস্ত্রে দৃঢ় আবদ্ধ,—নাক-মুখ-চক্ষুতে এবং গঠন ও গমন-ভঙ্গীতে দেদীপ্যমান পরিপূর্ণ নিখুঁত স্বাস্থ্য ও আসন্ন যৌবনোদ্গম চিহ্ন,—মাথায় এক বোঝা সদ্য-কর্ত্তিত নধর ঘাস এবং হাতে একখানি কাস্তে লইয়া, সেইদিকে আসিতেছিল। চীৎকার ও কলরব শুনিয়া, এবং পলায়নপর একটি বালকের

মুখে সর্পাঘাতের সংবাদ অবগত হইয়া, মেয়েটি বন্য হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া আসিল, এবং মাথার ঘাস ও হাতের কাস্তে ফেলিয়া দিয়া সেই স্তূপের উপর উঠিয়া পড়িল।

মেয়েটি ভূপেনের সমীপবর্ত্তী হইতেই সাপটা পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও চকিতে নামিয়া পড়িল। তারপর, অতি সন্তর্পণে, সেই শব্দের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া, ধীর লঘু পদে পুনর্ব্বার সে ভূপেনের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দ্দূরে যাইতেই সাপটা তাহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। তাহার প্রতীতি হইল, দুই-তিনটি ভগ্ন শাখার চাপে সাপটা যেন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কোন প্রকারে মেয়েটি ভূপেনের নিকট পৌঁছিল এবং তাঁহার মৃতকল্প অচেতন দেহের মাথার দিকটা তুলিয়া ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে সেই স্তূপ হইতে নামাইয়া আনিল। ভূপেনের সর্পাঘাতের সংবাদ পাইয়া ঠিক সেই সময় বিজয় ছুটিয়া আসিলেন। ভয়ে তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। তাঁহার ধারণা হইল, ভূপেন জীবিত নাই। তিনি তাড়াতাড়ি ভূপেনের সংজ্ঞাহীন দেহের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন, এবং তদুপরি হস্তার্পণ করিয়া আকুলভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মেয়েটি বলিল,—"ওকি বাবু! এখন কাঁদলে কি হবে? এঁকে ধরুন, একটা যা হয় চেষ্টা-বেষ্টা করুন; তারপর, যদি কাঁদতে হয় পরে কাঁদবেন।"

বিজয় সজল চোখে বলিলেন,—"আর কি চেষ্টা করা যাবে? সবই ত শেষ দেখ্‌ছি।" বলিয়া তিনি পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন।

"আচ্ছা মরদ যা'হোক" বলিয়া মেয়েটি ভূপেনের ঘাড়ের নীচে একখানি হাত এবং পিঠের নীচে আর একখানি হাত দিতে দিতে বিজয়কে বেশ একটা সহজ সতেজ অবশ্য পালনীয় আদেশের স্বরে বলিল,—"ধরুন আপনি পায়ের দিকটা। ঐ কলা গাছের আড়ালে আমাদের ঘর। আগে সেইখানে নিয়ে যাই চলুন। তারপর কাঁদবেন।"

মেয়েটির অপূর্ব্ব বাক্যে ও ব্যবহারে বিজয় হঠাৎ কেমন যেন হতভম্ব এবং পর মুহূর্ত্তেই নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং ত্রস্তে সার্টের হাতায় চক্ষু মুছিয়া মেয়েটির আদেশ পালনে নিযুক্ত হইলেন।

ভূপেন বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট স্থূলদেহ বলিষ্ঠ যুবক। বিজয়ের মনে হইল, ভূপেনকে বহন করিতে মেয়েটির বিস্তর ক্লেশ হইতেছে। তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। দাঁতে দাঁত চাপিয়া, মনের জোরে দেহের শক্তি বাড়াইয়া মেয়েটি যেন অতি কষ্টে মাথার দিকটা বহন করিতেছে। কিন্তু তাঁহার নিজের বাহিত অংশটাই যে ক্রমে নামিয়া পড়িতেছে, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না। বিজয় একবার বলিলেন,—"তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি নামিয়ে দাও এবং গ্রাম থেকে দু'একজন লোক ডাক। টাকাকড়ি যা চায়, দেওয়া যাবে।"

মেয়েটি বিজয়ের ভীতি-পাণ্ডু মুখের দিকে চাহিয়া চকিতে মুচকি হাসিয়া, তাচ্ছিল্য মিশ্রিত দৃঢ়স্বরে বলিল,—"আর বাহাদুরীতে কাজ নেই। এই কাছেই ঘর। আপনি ঠিকভাবে ধরুন।"

গ্রামের কয়েকটি ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যে আসিয়া পুনরায় তাহাদের সঙ্গ ধরিয়াছিল।

অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনার দক্ষিণ সীমানায় কয়েক সারি কদলী বৃক্ষ এবং তাহার পরই ভিতরের দিকে ফল-পুষ্পে শোভিত একটি ডালিম গাছ ও একটি পেয়ারা গাছ।

আঙ্গিনার উত্তরে, বারান্দাযুক্ত একখানি সাধারণ দো-চালা দীর্ঘ খড়ো ঘর, পূবে আর একখানি ছোট ঘর এবং পশ্চিমে একখানি একচালা। বড় ঘরের পূর্ব্বপ্রান্তে ঐ ঘরের সহিত সংলগ্ন আর একখানি ছোট একচালা আছে। তথায় একখানি সাধারণ দেশী তাঁত ও তাহার কতক সরঞ্জাম রহিয়াছে।

কদলী বৃক্ষ শ্রেণীর ফাঁক দিয়া এবং ডালিম গাছ দক্ষিণে ও পেয়ারা গাছ বামে রাখিয়া উত্তরমুখী হইয়া আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে হয়।

বিজয় এবং সেই মেয়েটি ভূপেনকে বহন করিয়া আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। মেয়েটির আদেশে একটি বালক ঘর হইতে একখানা মাদুর ও একটি বালিশ আনিয়া বারান্দায় বিছাইয়া দিল। ভূপেনের অচেতন দেহখানি তাঁহারা তদুপরি স্থাপন করিলেন।

ভূপেনকে রাখিয়াই মেয়েটি তড়িৎগতিতে ঘর হইতে মহিষের একটা শিঙ বাহির করিল এবং তাহার অগ্রভাগে ওষ্ঠ সংযোগ করিয়া অতি তীক্ষ্ণ ও চমকপ্রদ একটি অপূর্ব্ব ধ্বনি উত্থিত করিল। বিজয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বোধ হইল সেই সুতীক্ষ্ণ শব্দ যেন অবাধগতিতে বহু দূরে পর্য্যন্ত চলিয়া গেল,—তাহা যেন কোথাও আর শেষ হইবে না।

(ক্রমশ)

অভাগী

(২৯৪ পৃষ্ঠার পর)

তারপর?—যাহা ঘটিয়া থাকে, রাজা শত্রুদলন করিয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল সমগ্র নগরী পতাকা ও দীপমালায় সুসজ্জিত হইল। রাজধানী উৎসবে মাতিল, চতুর্দ্দিকে আনন্দের প্রবাহ ছুটিল। শুধু,—

শুধু রাজ্যের এক প্রান্তে এক ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র কুটীরের অঙ্গনে এক প্রৌঢ়া রমণী আর এক উদ্ভিন্নযৌবনা বালিকা কাহাদের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় অঙ্গন অশ্রুপ্লাবিত করিতেছে! দিন যায়, রাত্রি আসে, রাত্রি যায়, প্রভাত আসে, কিন্তু কই, এই স্তব্ধ কুটীরে কেউ ত ফিরিল না। যাহাদের প্রতীক্ষায় এই দুই নারী পলে পলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে, —তাহারা হয়ত মরজগতের আকর্ষণ হইতে বহু বহুদূরে মহাযাত্রার মহাপথে চলিয়া গিয়াছে।

শূন্য মন্দির

শ্রীশান্ত দাশ গুপ্তা

পত্রালাপ

১

ঢাকা হইতে
২৭শে এপ্রিল

প্রিয় ইলা,

অনেকদিন তোমার কোন চিঠি পাইনি। শুনলাম নাকি কোন স্কুলে তুমি মিস্ট্রেস হয়েছ। ব্যাপার কি ভাই? যে তুমি বলতে চাকুরী ত কাজের পথে বাধা এবং অত ক্ষুদ্র গণ্ডিতে তুমি কিছুতেই ধরা দেবে না—সেই তুমি আজ ৪০, টাকা মাইনেতে সন্তুষ্ট। কেন তোমার সহকর্ম্মীরা সব হাউই হয়ে গেল নাকি উড়ে?—অথবা আমার মত সবাই ডুব দিয়েছে। জানিও সব খোলাখুলি ভাবে। এখানে সকল ভাল। আজ উঠবো এক্ষুণি—অনেক কাজ রয়েছে। ভালবাসা নিও।

তোমার রাণু।

২

শিলং হইতে
৬ই মে

প্রিয় রাণু,

তোমার চিঠি পেয়েছি আজ সকালে। আমার অন্ধকার জীবনে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপমালা তোমাদের পত্রাবলী। জীবনে অনেক ভুল করেছি—তাই ছোট ছোট মেয়েদের গান শিখাবার ভার নিয়েছি—যদি তাতে একটু শান্তি পাই। আমার পরিবর্ত্তনে আমি নিজেই আশ্চর্য্য। মনে হয়, অতীতের দিনগুলি স্বপ্ন—আবার ভাবি বর্ত্তমানই বুঝি স্বপ্ন। সত্যি—এর কোনটা যদি স্বপ্ন হ'ত ত বেঁচে যেতাম। মাষ্টারি নিয়েছি—তাও যেমন সত্যি, ২৫, টাকা পেয়ে লিখতে হয় ৪০, টাকা তাও তেমন সত্যি। কিন্তু এর কোনটা সত্যি বল? দুটোই যে কত বড় মিথ্যে ভাবতেও দুঃখ হয়। মনে হয়, অনেকখানি ছোট হয়ে গেছি। যাক, নিজের কাঁদুনি গাইলাম অনেকখানি—স্বার্থপর কিনা তাই। তুমি ঘর-সংসারের কথা একটু লিখ। একদম শুষ্ক চিঠি লিখে আমায় আরও নীরস কর না। আমি হাঁপিয়ে মরছি যেন। তোমার খোকা খুকুদের কলরব যেন শুনতে পাই তোমার চিঠির ভিতর দিয়ে: এ আমার বড় সাধ রইল। নিয়মমত লিখ কিন্তু। আমার আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা নিও। তোমাদের জীবন শুভময় হোক।

তোমারই ইলা।

৩

ঢাকা হইতে
১৫ই মে

প্রিয় ইলা,

তোর চিঠি পেয়েছি বটে, তবে যা জানতে চেয়েছি তা এড়িয়ে চলেছিস কেন? একটা হেঁয়ালি দিয়ে ঘেরা যেন তোর চিঠিখানি। বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে এসেছি তা বুঝলি না। তুই ত জানিস তোকে কত ভালবাসি আমরা। তোর এমন কি হ'ল যাতে চিঠিটাও সরল হয় না তোর? আমাদের এখানে একটা মাষ্টারিপদ শূন্য আছে—তুই যদি দরখাস্ত করে এখানে আসিস, তবে কিন্তু বেশ হয়। মাইনেও পাবি বেশী তাছাড়া থাকবও খুব কাছাকাছি। ছেলেমেয়েরাও তোকে দেখবার জন্য আকুল। তুই এলে তোর উপর বড় মেয়েটার ভার দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব—তোর মত করে তাকে গড়ে তুলবি। মনে ভাবিস না যেন যে আমার একার মতে এ সম্ভব হবে কিনা! তা চলবে ভাই। আমি যা বলি তাই হয়। আর মা হয়ে কি মেয়েকে ভাসিয়ে দেব? এমন কাঁচা নই। তাই ত তোকে চাইছি। এখানে এলে অনেক সাথী পাবি—তার উপর আমরাও ত আছি। ভালবাসা নিস। আজ আসি ভাই।

তোর রাণু।

৪

শিলং হইতে
১৭ই জুন

ভাই রাণু,

অনেকদিন পরে তোর চিঠির উত্তর দিচ্ছি। তুই কি রাগ করেছিস? কিন্তু আমি যে জীবনে বড় দুঃখ পেয়েছি—তুই রাগ করে সে যন্ত্রণা আর যেন বাড়িয়ে তুলিস না। মাষ্টারি করতে তোদের ওখানে গেলাম না কেন তা সহজেই সব শুনে বুঝতে পারবি। অনেক দ্বিধা, অনেক দ্বন্দ্বের পর স্থির করেছি, কাউকে জানিয়ে যাব আমার মনের কথা। আর তুই বিনা শুনবেই বা কে? তাই তোরই কাছে আবার এসেছি এবং শেষ এই আসা। একটা গল্প বলি শোন—

"স্বর্গরাজ্যে এক কুমারী মেয়ে শিব ঠাকুরের পূজা করত, আর পূজা শেষ হ'লে প্রত্যেক দিনই আরাধ্য দেবতাকে জানাত—"প্রভু—আমার যা কামনা, তুমি ত জেনেছ—এই ত আমার সার্থকতা।" অন্য দেবতারা সব বুঝলেও পবিত্র কুমারী-হৃদয়ে কি লহরী উঠে—তা যেন বুঝত না। তারপর—

সেই মেয়েটি ভালবাসত এক দেবতায়। অন্যান্য মেয়েদের মত তার কামনা ছিল না। তার ছিল গভীর প্রেম। আর তার দেবতার চরিত্রও ছিল নির্ম্মল স্বচ্ছ। পুরুষের যা প্রধান কাম্য তা যেন ছিল না এই দেবতার মধ্যে, তাইত সেই দেববালা ভালবাসত তার দেবতাকে—তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র আকর্ষণ করেছিল ওর শ্রদ্ধা। কিন্তু দেবতা ত—পাষাণ নয়—দেবতার মন টলল—নারীকে ও পূর্ণভাবে চাইল—টেনে নিতে চাইলে ওকে সংসারের পঙ্কের ভিতর—আবিলতার মধ্যে। পঙ্ক ছাড়া আর কি—যাকে ভালবাসি তাকে পাওয়াটাই বড় কথা নয়। বড় হ'ল ভালবাসার—পূজোর—পূর্ণতা। নারী উঠল চমকে; ভাবল—যাকে ভালবাসি—সেও এমন নিষ্ঠুর হতে পারে?

পূজোর মন্দিরে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল ও শিবের পায়। হায় দেবতা, পূজার বেদীতলে পূজারিণীকে চাইলে দুপায়ে থেঁতলে দিতে—কিন্তু নারীত্ব উঠল জেগে। ভাবল, সে ত এমন চায়নি। এযে সাধারণ জীবন। এ ত ওর কাম্য নয়। সেই থেকে পূজারিণী একা রইল শূন্য মন্দিরে আর দেবতা চলে গেলে বাইরে—কি জানি কিসের সন্ধানে।

রাণু, আমার জীবনই ত এই। যাকে পূজো করতাম—আমার সকল কাজে যে ছিল সাথী—সে আজ দূরে চলে গেছে। সে যেতে চায়নি—আমি তাকে দু'হাতে ঠেলে বিদায় দিয়েছি। বল ত ভাই এত আবিলতার ভিতর আমি তাকে কি করে প্রতিষ্ঠা করি? সে যে আমারই দেবতা। আমাকে ত তুই জানিস্—বল ত একটুও ভুল করেছি নাকি? যদি ভুলই করিনি তবে এত ব্যথা কেন? আমার হৃদয়-মন্দির এত শূন্য কেন? হয় ত নিজেকে বাঁচাতে পারব না—সেই ভেবে এতদূর চলে এসেছি গোপনে। আজ তাঁকে যতই এড়াতে চাই—সে যেন অলক্ষিতে আমায় ততই আঁকড়ে ধরে। পুরান ক্ষত নূতন করে ব্যথা দিচ্ছে যে আজ। জানতে পেলাম—সব কিছু আমার নামে সেবাশ্রমে দান করেছেন তিনি।

সেই বোঝাই আজ আমি বইতে সেখানে চললাম। কিন্তু এইবার ক্ষমতা যে নেই এতটুকু। চেয়ে তিনি যা পাননি,—আজ ত্যাগের ভিতর দিয়ে তাই জয় করে নিলেন—আজ আমি পরাজিতা। কি ভুলই না বুঝেছিলাম ওঁকে? তিনি ভেসে যাননি পঙ্কিল স্রোতে—সার্থক জীবন ওঁর। তিনি মানুষ, মানুষ হয়েই আছেন। কিন্তু আমার মন্দির শূন্যই রইল। আজ আমার আমিত্ব বিলাতে চাই দেবতার চরণে, কিন্তু তিনি চলে গেলেন বিজেতার গৌরব নিয়ে—আমাকে কি জানিয়ে গেলেন শুনবি—একটু হেসে তিনি আমাকে বললেন—"তুমি এমনভাবে নিজেকে ধ্বংস কর না। নিজের সত্তাকে বিকশিত করে তোল। তোমাকে চিনতে পেরে অপমান করার হাত থেকে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছি। তুমি সেই অপমান চেও না"—

নিজেকে 'বড়' মনে করার শাস্তি আজ পাচ্ছি। আজ কেবলই মনে পড়ছে—"ওগো পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল"—

কামনা বাসনা ধুয়ে আবার প্রতিষ্ঠিত করব মন্দিরে আমার দেবতাকে। আমার খোঁজ করিস নি ভাই। বেঁচে আছি, থাকবও। ভালবাসা নিস্। বিদায়—

—তোর ইলা'

আবগাসী

(৩০৬ পৃষ্ঠার পর)

অধিকার আমারই একচেটে। যাক, বিষয়টা গুরুতর—তাহলে মনোযোগ সহকারে শুনতে হ'ল।—বল।"

মহামায়া বলিলেন, "মাণিকের বিয়ের কি করছ'?"

সুরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "যখন ফুল ফুটবে—'

মহামায়া সরোষে বলিলেন, "তুমি মেয়েমানুষেরও অধম!"

সুরেনবাবু অম্লানবদনে বলিলেন, "ঠিক বলেছ। নৈলে তোমার যুক্তি কোন কালে কাটিয়ে উঠতে পারি না কেন?"

ক্রুদ্ধা মহামায়া কিছুক্ষণ কোন কথা কহিলেন না।

সুরেনবাবু তাঁহার কাঁধের উপর একখানা হাত রাখিয়া কোমলস্বরে কহিলেন, "রাগ করলে, মায়া? তবে সত্যি কথাটা শোন,—এখন ওর বিয়ে দিয়ে কাজ নেই।"

—"কেন?"

সুরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আগে লেখাপড়া শেষ হোক—সংসার চিনুক. তারপর সাধ-আহ্লাদ ক'র। নৈলে আমারই মত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বাইরের তাকিয়া আশ্রয় ক'রতে হবে—ওকে।"

মহামায়া উৎফুল্ল কোপ-কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন, "আপনার মত জগত দেখ কেন?" বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সুরেনবাবু হাঁকিলেন, "আহা-হা—শুনে যাও—শুনে যাও। ওরও একটা ভাল উত্তর আছে।"

অতঃপর বিবাহ প্রসংগ চাপা পড়িল।

গ্রামগাঁয়ের ভদ্রলোক আসিলে মহামায়া বলিয়া পাঠাইলেন,—বিদ্যাশিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি পুত্রের বিবাহ দিবেন না।

হয়ত গৃহকর্ত্তার অমূল্য উপদেশটুকু তাঁহার অন্তরের অন্তরালে গভীর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল।

(ক্রমশ)

বর্ত্তমান জার্ম্মান-সাম্রাজ্য

কেইজারের অধীনে জার্ম্মানী ছিল ২০৮, ৮৩০ বর্গ-মাইল বিস্তৃত—লোকসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ, ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে। ইহার ইস্পাত-সম্পদ ছিল সমগ্র ব্রিটেনের দ্বিগুণ। খনিজ লোহ ছিল ইউরোপের ভিতর জার্ম্মানীরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কয়লায় জার্ম্মানীর ছিল দ্বিতীয় স্থান—ব্রিটেন প্রথম স্থান অধিকার করিত।

মহাসমরের সমাপ্তিতে ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্ম্মান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দাঁড়াইল ১৮৬, ৬২৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৫ কোটি ৯৮ লক্ষে সীমাবদ্ধ রহিল। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে তাহার স্থান রহিল না, খনিজ লোহের অর্দ্ধেকের অধিক সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইল, কয়লাও পূর্ব্বের তুলনায় অর্দ্ধেকে দাঁড়াইল।

বর্ত্তমানে হিটলার রাইখের সীমা প্রসারিত করিয়া ২১৫,০০০ বর্গমাইলে পরিণত করিয়াছে—মহাসমরের পূর্ব্বের রাজ্য অপেক্ষাও বৃহৎ। লোকসংখ্যা পৌঁছিয়াছে ৮ কোটিতে। খনিজ লোহ এবং কয়লা সম্পদ মহাসমরের পূর্ব্ব অপেক্ষাও অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া কতকগুলি নূতন শিল্পপ্রধান অঞ্চল করায়ত্ত হইয়াছে।

উপনিবেশগুলি ফিরিয়া পাইলে যে জার্ম্মানীর অবস্থা হিটলারের "মেইন ক্যাম্প" (My Struggle)-য়ের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি।

ওয়েল্‌স্‌-য়ের প্রেমদূত—'চামচ'

দক্ষিণ ওয়েল্‌স্‌-এ তরুণ-তরুণীতে পরিচয়ের পর বন্ধুত্ব হইলে নিয়ম ছিল, তাহারা কাঠের তৈরী 'প্রেম-চামচ' (love-spoon) কিনিয়া হোটেলে লইয়া যাইবে খাইবার সময়। উভয়েই পৃথক চামচ কিনিয়া ব্যবহার করিবার নিয়ম। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য ইচ্ছা করিয়া কেহ কেহ চামচ লইয়া যাইত না, যেন বন্ধু বা বান্ধবীর সহিত এক চামচেই আহার করিবার সুযোগ পায়। যদি এইভাবে এক চামচ ব্যবহারে সমর্থ হইত, তাহা হইলেই ধরিয়া লওয়া হইত এই-বার তাহাদের বাগদান সমর্থিত হইল। পরে ইহা হইতেই রীতি দাঁড়ায়, যখন কোনও তরুণ প্রণয়িনীর নিকট বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিবে তখন তরুণের একখানি 'প্রেম-চামচ' উপহার দিতে হইবে তরুণীকে। এই রীতিকে "স্পুনিং" (Spooning) নাম দান করা হইয়াছে এবং এই কারণেই 'স্পুনিং' এবং 'বাগদান' সেখানে সমার্থসূচক হইয়া পড়িয়াছে।

কারডিফ শহরে পুনরায় সেই রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। টাইপিস্ট, শপগার্লস কার্যস্থল হইতে ছুটি পাইয়া এখন 'প্রেম-চামচে'র দোকানে ভিড় করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ঘোড়ার মেজাজের ব্যবসা

লিমারিক শহরের কিলমারনক কোং ঘোড়া বিক্রেতা। সহসা একদিন পুলিশ আসিয়া উক্ত কোম্পানীর দুইটি সেলসম্যানকে গ্রেপ্তার করিয়া নেয়। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। অভিযোগে বলা হয়, একটি ঘোড়াকে এক মাসের ভিতর ৪০ বার হস্তান্তর করিয়া উহারা প্রচুর টাকা বঞ্চনা করিয়া লইয়াছে। কি উপায়ে উহা সম্ভব হইল, একটি সিভিক গার্ড তাহার বর্ণনায় বলে,—ঘোড়াটিকে বিক্রয়ের পূর্ব্বে এমন ঔষধ খাওয়ান হয়, যাহার ফল সদ্য সদ্য ফলে না। ক্রয়কারী ব্যক্তি সস্তায় পাইল ভাবিয়া ঘোড়া লইয়া নিজ বাড়ীতে উপস্থিত হইবার কিছু পরেই ঘোড়ার মেজাজ পরিবর্ত্তিত হয় এবং এমন হুটোপাটি ও চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে যে, নূতন মালিক উহাকে তখন যে দাম পায় তাহাতেই বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। সেলস্‌ম্যানদ্বয়ের এজেন্ট, ঘোড়াটি বিক্রয় হইলেই ক্রেতার আবাসের সন্ধান রাখে এবং সময়মত হাজির হইয়া নগণ্য মূল্যে উহা কিনিয়া আনে। এই প্রকারে উহারা একই ঘোড়া ৪০ বার বিক্রয় করিয়া মোটা টাকা লাভ করিয়াছে।

বিচারে সেলস্‌ম্যানদ্বয়ের এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে। কথায় আছে—পেটে খাইলে পিঠে সয়।

জাপানী ছাত্রদের বিলাসিতা নিরোধ

জাপানের প্রধান প্রধান শহরের স্কুল-কলেজ-পল্লীর ৩০০ মিটারের ভিতরে যে সকল টি-রুম, কাফে এবং আমোদ-প্রমোদ স্থান রহিয়াছে, ঐ সকলের ভিতর ১৫ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক কোনও ওয়েট্রেস নিযুক্ত রাখা যাইবে না। বিগত সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই আদেশ জারী করা হইয়াছে।

উচ্চ পুলিশ অফিসার মিঃ জিরো ফুজিতা এই অঞ্চলের ৮৮টি ওয়েট্রেসকে ওয়াসেদা থানায় ডাকাইয়া আনিয়া এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, দেশ যে অশান্তির ভিতর পতিত, এই সময়ে সকলেরই কিছু কিছু ত্যাগ করা উচিত দেশের জন্য। এই ওয়েট্রেসদেরও দেশের আশা-ভরসা ছাত্রদের কল্যাণের জন্য বর্ত্তমান চাকুরী ছাড়িয়া অন্যত্র চাকুরী গ্রহণ করিতে হইবে।

মিঃ ফুজিতা আরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, যে সকল কাফে, রেস্তোঁরা প্রভৃতিতে ছাত্র-ছাত্রীগণ যাতায়াত করে, সেখানকার সাজসজ্জা এবং জাঁকজমক দূর করিতে হইবে যেন ছাত্রদের নিকট ঐ সব স্থান আর লোভনীয় মনে না হয়।

গ্রামোফোন, আরাম-কেদারা এবং জমকালো টেবিল ও ওয়েট্রেসদের পোষাকের ভড়ং—সমস্ত বর্জ্জন করিতে হইবে।

গবর্ণরদের আলু-তোলা প্রতিযোগিতা

মার্কিন যুক্তরাজ্যের দুইটি ষ্টেট—মেইন (Main) এবং ইডাহো (Idaho) আলুর চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। মেইনের গবর্ণর লিউইস ব্যারোজ, ইডাহোর গবর্ণর বর্জিলা ইলার্ককে আলু তুলিবার প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে এবং এই আহ্বান গৃহীত হয়।

হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে দুই গবর্ণর ঝুড়ি হাতে লইয়া আলুর ক্ষেত হইতে চট্‌পট্‌ আলু তুলিয়া নিজ নিজ নৈপুণ্য প্রদর্শনে ব্যাপৃত হয়।

পাঁচ মিনিট এই পাল্লা চলিবার পর দেখা যায়, গবর্ণর ব্যারোজ তুলিয়াছেন ২০১টি, আর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তুলিয়াছেন ১৯৭টি—প্রতিযোগিতার নির্দ্দিষ্ট পাঁচ মিনিট সময়ে।

হাঙ্গর কি শুধুই অপকারী ?

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল, হাঙ্গর জীবটি হইতে মানুষের কোনও উপকারই সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যায়, হাঙ্গর হইতেও আমরা প্রচুর উপকার পাই। হাঙ্গরের দেহের অতি সামান্য অংশই অকেজো বলিয়া বর্জ্জিত হয়। ইহার ফোড়ের প্রায় আড়াই পাউন্ড অংশ (১০ ফুট লম্বা হাঙ্গরের) খাদ্যে পরিণত করা হয়। উহার ১৫০ হইতে ২০০টি পর্য্যন্ত দাঁত নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। উহার সমগ্র ওজনের পাঁচভাগের একভাগ আন্দাজ পাওয়া যায় তেল। কমবেশী ৮৫ ইঞ্চি লম্বা চামড়া কাজে লাগান হয়। সমগ্র ওজনের এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া যায় উহার মাংস—যাহা শুষ্ক, লবণাক্ত করিয়া খাদ্যরূপে বিক্রয় করা হয়। হাঙ্গর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান যে জিনিষটি পাওয়া যায়—তাহা হইল ইহার লিভারের তেল। ইহা ঔষধরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। জাপান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সেদেশে সম্প্রতি এক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে হাঙ্গর তেলকে কল-কবজায় মাখাইবার লুব্রিকেণ্টে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছে। এমন কি শূন্য ডিগ্রি অপেক্ষাও নিম্নে ৪৫ ডিগ্রি অবধি পৌঁছিলেও এই তেলের কোনও বিকার ঘটে না। হাঙ্গর তেলের (শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর) প্রধান ব্যবহার জাপানে চলিতেছে ইস্পাত প্রস্তুতকরণে—বিশেষ করিয়া ইস্পাতকে সংশোধন করিতে।

প্লাষ্টারের তৈরী ছাপার হরপ

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ছাপার জন্য যে হরপ ব্যবহার করা হয় তাহা সীসা এবং টিন প্রভৃতি মিশ্রিত ধাতুতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু জার্ম্মানীর কোনও হরপ-নির্ম্মাতা প্লাষ্টারের তৈরী হরপ বাহির করিয়াছে—এই প্লাষ্টার কৃত্রিম রজন হইতে প্রস্তুত (Polystyrol synthetic resin)। এই প্লাষ্টারের হরপকে সীসার হরপের ন্যায় ব্যবহারান্তে পুনরায় গলাইয়া নূতন করিয়া হরপ ঢালাই করা যায়। সীসার সহিত তুলনায় এই নূতন পদার্থের নানা প্রকার সুবিধা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে প্রধান হইল হরপের কার্য্যে ব্যাপৃত কর্ম্মচারীদের স্বাস্থ্য। সীসক বিষের প্রভাব স্বাস্থ্যের পক্ষে নানা প্রকারেই হানিকর। সীসক-ধূম, সীসাচূর্ণ এবং হাতে সীসা হইতে যে দাগ লাগে—সকলই স্বাস্থ্যের অনিষ্টকারক। রজন-প্লাষ্টারে সেই অনিষ্টকারিতার কোনও সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়ত ইহার ওজন অতি হাল্কা। সেইজন্য অতি অল্পব্যয়ে বহুদূর স্থানেও প্রেরণ করা যায়। সর্ব্বোপরি রজন-প্লাষ্টারের মূল্য মিশ্র সীসক অপেক্ষাও কম। সুতরাং রজন-প্লাষ্টারের হরপের ব্যবহার যে শীঘ্রই জনপ্রিয়তা লাভ করিবে ইহা আশা করা যাইতে পারে।

(ফ্রাঙ্কফোর্টের আমেরিকান কনসালেট জেনারেলের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত)।

সেয়ানা চোরের কৌশল

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন চোরের কৌশলকে পরাজয় করিবার নানা প্রকার দুর্ভেদ্য লোহার সিন্ধুকে তৈরী হইতেছে, উহার তালায় বিবিধ সতর্কীকরণের যন্ত্র, চোরকে জব্দ করিবার ফন্দি-ফিকির সংযুক্ত হইতেছে, তেমনই আবার চোরেরাও উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিতেছে সেই সকল বাধা-বিঘ্ন নিরাপদে উত্তীর্ণ হইতে।

মার্কিনের উইসকনসিন্ অঞ্চলে ক্যালডারস্ শহরে ক্যালডারস্ এলিভেটার কোং-তে রাত্রিযোগে চোর প্রবেশ করে। একটি সিন্ধুকের তালা খুলিবার কার্য্যে নিরত হইলে—তালা-সংলগ্ন যন্ত্র হইতে কান্না-গ্যাস উৎপন্ন হইয়া চোরদিগকে নাকাল করে। উহারা দারুণ অশ্রুসিক্ত অবস্থায় কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া রাস্তায় যাইয়া সুস্থ হয়। কিন্তু উহাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অধ্যবসায় অতি তীব্র, তাই দলবলে জুটিয়া ফায়ার ব্রিগেডের গুদাম ঘরের দোর ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া গ্যাস-মুখোস চুরি করিয়া আনিল। সেই মুখোস ব্যবহার করিয়া উহারা অনায়াসে সিন্ধুক ভাঙ্গার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিল এবং ৪০০ ডলার নগদ ও ২৪০০ ডলারের হস্তান্তর অযোগ্য ষ্টক লইয়া পলায়ন করিল।

নামের বদলে নম্বর (?)

বাসগৃহের নামকরণ নাকি নিতান্তই অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক—এই প্রকার মন্তব্য মাঝে মাঝে শোনা যায়। তাহাই যদি আইন করা সঙ্গত হয় তবে মানুষেরই বা নামকরণের প্রয়োজনীয়তা কি থাকিতে পারে? বাড়ীগুলির ন্যায় উহাদের মালিক বা দখলকারদেরও ত নামের বদলে নম্বর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়াই উচিত। প্রথম পরিচয়কালে ৫৬০৭২ বাবু, কি শ্রীমতী ৮২৩৯৯, অথবা কুমারী ৯৯৯৯৯—বেশ ত গালভরা মুখবন্ধ করা যাইবে। প্রেম নিবেদনেও কিছু বেগ পাইতে হইবে না—প্রিয়তম ৪৯ অথবা ডারলিং ৮০,০০০ কোনক্রমেই কান ঝালাপালা করিবে না, অবশ্য অভ্যস্ত হইয়া গেলে। তারপর ঊনষাট হাজার-দা, ২৫৬৯৭-ভাই ব্যবহার করিয়া জিহ্বার আড় ভাঙ্গায় মুস্কিল হইবে না কিছুই। তবে আদরের পেয়ারের ডাকে যেমন নৃপেন্দ্রকে নেপু, সুরমাকে রমু প্রভৃতি সাঁটে সারা যায়, তারই অনুকরণে কুমারী ৯৯৯৯৯কে বেমালুম 'নিরু' করা যাইবে, ২৫৬৯৭কে না হয় 'পঁশু'ই করা গেল, কিন্তু ঊনষাট হাজারকে করা যাইবে কি? আর হাজার ছাড়াইয়া লাখের কোঠায় পড়িলে, তখনই বা বাগ মানান যাইবে কি উপায়ে? বাঙলায় যেমন সমস্যার অনটন দেখা যায়—তাহাতে এই গবেষণায় একটা গোলটেবিল বৈঠক বসাইলে অনেকেরই একটা সুযোগ মিলে।

টোকিয়োতে নগ্ন মূর্ত্তির নিরোধে পুলিশের ব্যবস্থা

নগ্নতার বিরুদ্ধে জাপানী পুলিশ অতি কঠোর প্রতিবিধান আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের সেই অভিযান বর্ত্তমানে অন্য কোনও কেন্দ্র না পাইয়া নগ্ন-প্রতিমূর্ত্তির উপর নিপাতিত হইয়াছে।

টোকিয়োর ব্যবসা-ক্ষেত্রের জনপ্রিয় এক রেস্তোঁরায় অতি প্রকাশ্যস্থানে প্লাষ্টারের তৈরী একটি ভেনাস মূর্ত্তি ছিল নগ্ন।

পুলিশ উহার অঙ্গে অসংখ্য শাদা ফুট্‌কিওয়ালা নীল রঙের পরিচ্ছদ পরাইয়া দিয়াছে।—কারণ জাপানে সাধারণের নৈতিক স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার ভার পুলিশের উপর।

মিঃ কুরোদা (বিখ্যাত শিল্পী) যখন একটি নগ্ন মূর্ত্তি শিল্প প্রদর্শনীতে উপস্থিত করেন, তখন পুলিশ মূর্ত্তিটির নিম্নাঙ্গ আবৃত করিয়া দেয়।

টোকিয়োর হিরাওকা রেস্তোঁরা হইতে দুইটি নগ্ন মূর্ত্তি এবং অপরাপর হোটেলে যে সকল নগ্ন-প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—সকলই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া গিয়াছে।

পদদ্বারা চা-তৈরী

হোরেস লাইনহ্যাম—বয়স ২৯ বৎসর, নিবাস ডার্টফোর্ড শায়ারের স্টোন্‌ শহরে। সে এক পায়ের সাহায্যে চিঠি লিখে এবং অন্য পায়ের দুই আঙ্গুলে জ্বলন্ত সিগারেটটি ধরিয়া ধূমপান করে। কৌতুক প্রদর্শনের জন্য নয়, জন্মাবধি তাহার দুইটি বাহুর একটিও নাই।

অপরে যেমন হাতঘড়ি পরে কব্জিতে তেমন সে পরে তাহার ডান পায়ের গোড়ালীর উপরে। ঐ পায়ের তৃতীয় আঙ্গুলে রহিয়াছে একটি আংটি পরান।

সে বলে—হাতের অভাব আমি অনুভব করি না। দুটি হাত থাকিলে মুস্কিলেই পড়িতাম, হাত দিয়া না পা দিয়া কাজ করিব এই সমস্যায় বোধ হয় আমার কাজই নষ্ট হইত।

আমার চিত্রাঙ্কনে বড় সখ—পা দ্বারা ছবি আঁকিতে আমার কোনও অসুবিধা হয় না।

কথা কয়টি বলিয়া সে তাহার শ্রোতাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল, বাঁ পা দিয়া ওয়েষ্ট কোটের ডান পকেট হইতে দিয়েশলাই

বাক্স বাহির করিয়া এবং একটি কাঠি জ্বালিয়া মুখের সিগারেটটি ধরাইয়া।

হোরেসের ছোট ভাই খাবার খাইতে আসিলে হোরেস পায়ের সাহায্যে চা করিয়া দেয়, পা দিয়া কেটলী ধরিয়া কাপে চা ঢালিয়া দিতে পারে। পায়ে তাহার এত শক্তি যে আঙ্গুল দিয়া করাত আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঠ চিরিতে পারে।

অভ্যাগতের সম্মুখে হাই তুলিলে বিচিত্র ক্ষিপ্রতার সহিত পা দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিতে পারে।

কাহারও সহিত করমর্দ্দনের কালে সে পা তুলিয়া ধরে, যাহারা তাহাকে জানে তাহারা তাহাঁর পায়ের সহিতই নিজ করমর্দ্দন করে। এক পায়ে খাড়া থাকিতে সে এতটা অভ্যস্ত যে এরূপ পা দিয়া করমর্দ্দনের কার্য্য করিতে সে আর এখন একটুও হেলিয়া দুলিয়া পড়ে না।

তাহার একমাত্র আক্ষেপ কেহ তাহাকে চাকুরীতে বাহাল করে না, নতুবা এতদিনে কোন কালে সে একটি বিবাহ করিয়া ফেলিত।

প্রাচীন চীনে দাসত্ব-প্রথার বিলোপ

দাসত্ব-প্রথার বিলোপ সাধনের গর্ব্বে ইংরেজগণ আত্ম-হারা। কিন্তু চিকাগো ফিল্ড মিউজিয়াম হইতে অধ্যাপক মার্টিন উইলবার জানাইতেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮ সালে চীনের এক মন্ত্রী বক্তৃতাকালে বলেন,—

"গবর্ণমেণ্টের ক্রীতদাস সংখ্যা এক লক্ষ, উহারা নিশ্চিন্ত আমোদে খেলাধূলা করিয়া সময় কাটায়, সময়ে চুরি-ডাকাতিও করে, কিন্তু নিরীহ চীনবাসীদের শ্রমার্জ্জিত আয়ের অংশ প্রদান করিতে হয়, এই সকল অলস অকর্ম্মণ্য জীবন রক্ষায়। ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল হইত যদি ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া সরকারী তোষাখানা হইতে অপটুদের খাদ্য সরবরাহ করা হইত এবং কর্ম্মঠদের শ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত।"

অধ্যাপক আরও বলেন—৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ওয়াং মাং চীনের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি দাসত্ব-প্রথা তুলিয়া দিতে চেষ্টা করেন। কতকদিন পর্য্যন্ত চীনদেশে ক্রীতদাস লোপ পায়। কিন্তু রাজকীয় পার্শ্বচর ও সভাষদ-গণ গোপনে গোপনে ক্রীতদাস রাখিতে থাকে। এবং সকলে এক মত হইয়া ২৩ খৃষ্টাব্দে ওয়াং মাং রাজবংশকে নির্ম্মূলে হত্যা করে'

জলধারা

(গল্প)

শ্রীকৃষ্ণানন্দ গুপ্ত

তার নাম ছিল জলধারা। ছোট্ট মেয়েটি, বেশ ফর্সা, গোল-গাল চেহারা, রক্তাভ ঠোঁট; মনে হ'ত বসন্ত যেন তার প্রথম ফুল প্রকৃতিদেবীকে উপহার দিয়েছে।

জলধারার পিতা ছিলেন কাছারির নাজির। অন্য জায়গা থেকে বদলি হ'য়ে মহরৌণীতে তিনি আমাদের বাড়ীতে প্রথমে নামেন। সঙ্গে ছিল তাঁর স্ত্রী, কিন্তু তাঁর কোলে কে ছিল তা আমি তখন দেখি নাই। তাঁকে আমি অন্দরে পাঠিয়ে দিলাম আর নাজির বাবুর বিশ্রামের জন্য নিজের বৈঠকখানা খালি করে দিলাম। নাজিরবাবুর আহারের পর আমি বাড়ীর ভিতরে গেলাম। ভিতরে গিয়ে দেখি আমার স্ত্রীর কোলে একটি ছোট মেয়ে খেলা করছে। আমাকে দেখে মেয়েটি একটু সংকুচিত হ'ল। আমি তাকে কোলে করতে হাত বাড়ালাম কিন্তু সে আমার স্ত্রীর অঞ্চলে মুখ লুকোল। আমি হাসতে হাসতে বললাম—"তুমি ত এক ঘণ্টার মধ্যে এর সঙ্গে বেশ ভাব ক'রে নিয়েছ।"

আমার স্ত্রী বললে—"তুমি জান না যে আমি এর ছোটবউ হই, ঠিক নয় জলধারা ?"

জলধারা আস্তে আস্তে বললে—"হুঁ"।

আমি আবার বললাম—"তুমি এ সম্বন্ধ কোথা থেকে বার করলে ?"

আমার স্ত্রী জলধারাকে দেখতে দেখতে বললে—"এ কথাটা জলধারাকে জিজ্ঞেস কর।"

আমি জলধারাকে জিজ্ঞেস করলাম—"খুকী এ তোমার কে হয় ?"

সে উত্তর দিল—"ছোট বউ।"

"আর আমি তোমার কে ?"

আমার স্ত্রী তার চিবুকে হাত রেখে বললে—"বলতো, দাদা।"

জলধারা আমার দিকে মুখ ক'রে বললে—"দাদা", আর চট্‌পট্ তার মুখ ফিরিয়ে নিলে। আমি তাকে কোলে নেবার ইচ্ছায় আবার বললাম—"জলধারা, মিঠাই খাবে ?" কিন্তু মাথা নেড়ে সে বললে—"না।" আর তাকে কিছু না ব'লে খেতে গেলাম।

আমার বাড়ীর পাশেই নাজিরবাবুর থাকবার বাড়ী পাওয়া গেল। দিনের বেলা নাজিরবাবু কাছারি গেলে তাঁর স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে আসতেন, আর জলধারা সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ীতে থাকত, মুখ তার সর্ব্বদাই হাসি মাখা। সন্ধ্যার সময় যখন তার মা বাড়ী যেতেন তখন বলতেন—"জলধারা, ঘর চল্।" তখন সে উঃ উঃ করতে করতে আমার স্ত্রীর কাপড় ধ'রত, অগত্যা তিনি তাকে রেখে যেতেন। রাতে যখন জলধারার খিদে লাগত, তখন সে আমাদের ঘরে নিজের মাকে খুঁজত, আমরা তখন তাকে ঘরে পাঠিয়ে দিতাম।

একদিনের কথা। আমি খাচ্ছিলাম, পাশে জলধারা ব'সে খেলছিল। আমি বললাম—"জলধারা রুটি খাবে ?" একথা শুনতেই সে তার ছোট বউয়ের কাছে পালিয়ে গেল। আমি খেয়ে বাইরে চলে গেলাম, কিছু পরে ভিতরে গিয়ে দেখলাম জলধারা আমার স্ত্রীর কোলে ব'সে দুধ-ভাত খাচ্ছে। তার মুখের চারিধারে দুধ লেগেছিল আর দু'একটি ভাত তার পেটের উপর পড়েছিল। আমি অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিলাম আর সেও খাওয়া বন্ধ ক'রে আমাকে দেখছিল। আমার স্ত্রী এক মুঠো ভাত হাতে নিয়ে বললে—"লাও", সে হাঁ করলে। কিছু ভাত মুখ থেকে নীচে প'ড়ল আর কিছু তার মুখের মধ্যেই থাকল। সেগুলি চিবাইতে চিবাইতে সে আমাকে দেখতে লাগল।

আমি স্ত্রীকে বললাম—"জলধারাকে তোমার কোলে দেখে ঈর্ষ্যা হয়।"

"কেন ?"

"ও আমার কাছে আসে না।"

"তুমি কি ছোট ছেলেকে নিয়ে খেলতে পার ? তুমি একে কোলে নাও যেন একটা পুঁটুলি। সেদিন বেচারীকে কোলে নিয়ে এমন রগড়ালে যে সে কেঁদে উঠল, আমার কাছে কাঁদা ত দূরে কথা ঘরে যাবার নামও করে না।"

আমি বললাম—"কি জলধারা, ঠিক ত ?"

সে কথা বললে না; তার বড় বড় চোখ দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল, আমি সেখান থেকে চলে এলাম।

(২)

একদিন আমার স্ত্রী জলধারাকে কোলে ক'রে উঠানে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময়ে আমি সেখানে গেলাম, জলধারার হাতে একটি হুঁকা ছিল, আমি হাত বাড়িয়ে বললাম—"জলধারা, হুঁকাটি আমায় দাও" সে তাড়াতাড়ি আমার স্ত্রীর কাঁধে মিশে রইল। আমি আবার বললাম—"দাও"। এবার সে হুঁকাটি নিজের বুকের কাছে রেখে "উঁ...উঁ..." ক'রতে লাগল।

আমার স্ত্রী বলল—"তোমার সঙ্গে যখন কথা বলে না তখন কেন এর সঙ্গে লাগতে এস ?"

একথা শুনে আমি জলধারার গালে আস্তে আস্তে আঘাত করলাম। আমার স্ত্রী তাকে বুকের মধ্যে লুকোতে লুকোতে বললে—"জানি না বাপু, কি রকম লোক তুমি; মিছামিছি একে মারলে।"

আমি বললাম—"তা কি হ'য়েছে ?'

সে একথার কোন উত্তর না দিয়ে জলধারার গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—"আমার মেয়েকে মেরেছে তুমিও একে মার"। জলধারা সাহস ক'রে আমাকে মারবার জন্য হাত বাড়াল, কিন্তু আমি পিছনে সরে গেলাম। আমার স্ত্রী তার পক্ষ নিয়ে বলল—"আর ওকে যে মারলে, তাতে বুঝি কিছু হ'ল না ?"

আমি বললাম—"বেশী কর যদি তোমাকেও মারব।" জলধারার দিকে তাকিয়ে বললাম—"কি জলধারা মারব ?" সে আমার কথা শুনে একবার আমার দিকে আর একবার আমার

স্ত্রীর দিকে তাকাতে লাগল। আমি আস্তে আস্তে আমার স্ত্রীর মাথা ছুঁয়ে দিলাম। এটুকুতেই জলধারার চোখে একসঙ্গে ভয়, ক্রোধ আর মমতার সঞ্চার হ'ল। প্রথমে সে আমাকে দেখল, তারপর নিজের দুটি ছোট হাত দিয়ে তার ছোট বউয়ের মাথা ঢাকল। সে হাসতে লাগল। আমি সত্যই তার গালে আস্তে আঘাত করলাম।

"......উঁ...উঁ...দেখতো, জলধারা এ আমাকে মারলে।" আমার স্ত্রী একথা বলতেই সে একেবারে কেঁদে সারা। তার চোখ থেকে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগল। আমি কত বুঝালাম, আমার স্ত্রী কত বুঝাল, কিন্তু অনেক কষ্টের পর তার চোখের জল থামল।

প্রতিদিনের মত সন্ধ্যার সময় নাজিরবাবু আমার কাছে এসেছেন, কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও ছিলেন। একথা সেকথার পর জলধারার কথা উঠল। আমি বললাম—"জলধারা ত প্রায় সারাদিন আমাদের ঘরে থাকে।" নাজিরবাবু বললেন—"এজন্য আমি আপনাকে, বিশেষ ক'রে আপনার স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। যখন জলধারা আগ্রায় ছিল তখন তার কাকীমার সঙ্গে খুব ভাব ছিল, একদণ্ডের জন্যও সে তার কাছছাড়া হ'ত না। যেদিন আমরা আগ্রা ত্যাগ করলাম, সেদিন সে সারা পথ কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল। এখানে যখন আমার স্ত্রী আপনার স্ত্রীকে দেখলে তখন আমার স্ত্রী জলধারাকে চুপ করাবার জন্যে বললে —'দ্যাখ জলধারা ওই তোর ছোট বউ।'—সেই দিন থেকে জলধারা আপনার স্ত্রীকে নিজের কাকীমা মনে করে।"

তাঁর কথা শুনে আমার এক বন্ধু বলে উঠলেন—"আপনার স্ত্রীর সঙ্গে জলধারার কাকীমার অনেক মিল আছে, তা না হ'লে ছোট মেয়ে এ রকম ভুল করবে না।"

আমি বললাম—"একথা জলধারাকে জিজ্ঞেস করব।" এ সময় জলধারা নিজের ঘর হ'তে বা'র হচ্ছিল। নাজিরবাবু চীৎকার ক'রে বললেন—"এখানে এস জলধারা, দেখ এঁরা তোমায় ডাকছেন।" আমিও তাকে ডাকলাম—"জলধারা, এখানে এস।" সে এল কিন্তু আমার কাছে নয়, তার পিতার কাছে। সে এসে তার পিতার পায়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে লাগল। নাজিরবাবু বললেন—"ও'র কাছে যাও।" আমি হাত বাড়িয়ে বললাম—"এস।" কিন্তু সে নিজের জায়গা থেকে নড়ল না। তার পিতা বললেন—"যাবে না?" এবার সে মুখ নীচু ক'রে বললে —"আমি যাব না, এ একদিন ছোট বউকে মেরেছিল।" তার কথায় সকলে হেসে উঠল, আমারও হাসি এল. আমার এক বন্ধু তাকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা খুকী, কবে মেরেছিল?" —"আজ"। "কোথায় মেরেছিল?" "এখানে, ও মেরেছিল।" ব'লে সে তার হাত গালের উপর রেখে মারবার ঢং ব'লে দিলে। তার এই সরলতায় সকলে হেসে উঠল।

কিন্তু বেশী দিন নাজির বাবুর সহিত আমার থাকা হ'ল না। কারণ আমার এখানকার কাজ শেষ হওয়ায় আমাকে ঝাঁসী যেতে হ'ল। আমার জিনিষপত্র আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য একটি গাড়ী রেখেছিলাম। আমরা সেদিন উভয়ে নাজিরবাবুর বাড়ীতে আহারাদি করেছিলাম, কিছু বিশ্রামের পর যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। গাড়োয়ানকে গাড়ী ঠিক করতে ব'লে জলধারাকে তার ছোট-বউকে ডাকবার জন্য বললাম। সে দৌড়ে বাড়ীর ভিতর গেল। কিছু পরে বাড়ীর ভিতরে কাঁদার আওয়াজ শুনা গেল। গাড়োয়ান গাড়ী ঠিক করেছে। নাজিরবাবুর স্ত্রী বাহির দরজা পর্যান্ত আমার স্ত্রীর সহিত এলেন। এসময়ে দুজনের চোখের জল শুকিয়ে এসেছিল, কিন্তু জলধারা এখনও আমার স্ত্রীর কোলে কাঁদছিল। আমার স্ত্রী জলধারাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠল আর গাড়ী ছেড়ে দিল। নাজিরবাবু কিছুদূর আমার সহিত এলেন, এসময়ে আমাদের অনেক কথা হ'ল। জলধারাও গাড়ীর ভিতরে তার ছোট বউয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। আমি বললাম—"জলধারা তোমার বাড়ী যাবে না?"

"না, আমি ত আমার ছোট বউয়ের সঙ্গে যাব।" আমার স্ত্রীর শিখান মত সে একথা আস্তে আস্তে বললে।

আমি আবার বললাম—"আমি তোমায় নিয়ে যাব না।"

সে বললে—"তোমার সঙ্গে যাচ্ছে কে?"

আমি চুপ করলাম। নাজিরবাবু কথায় কথায় অনেক দূর এসেছিলেন। এজন্য আমি বললাম—"আর মিছামিছি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, এবার আসুন।"

"বেশ" ব'লে তিনি জলধারাকে ডাকলেন। আমি আমার স্ত্রীকে আস্তে আস্তে বলতে শুনলাম—"বল যাবে না।"

আমি তার কথা শুনতে পাইনি এইভাবে গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাতে ব'লে জলধারাকে বললাম—"জলধারা তোমার বাবা যাচ্ছেন, এখন একলা থাকবে।" সে তাড়াতাড়ি বাহির হ'য়ে এল ও তার বাবার কোলে চলে গেল। তিনি তাকে চুমা খেয়ে বললেন—"ছোট বউ দু'তিন দিন মধ্যেই ফিরে আসবে; তখন তুমি আর আমি দুজনে তার সঙ্গে যাব।" নাজিরবাবু চলে গেলেন, আমিও গাড়ীর ভিতরে গিয়ে বসলাম, সে সময়ে আমার স্ত্রী কাঁদছিল।

(৪)

আমার ঝাঁসিতে থাকা অনেক দিন স্থায়ী হ'য়ে গেল। নাজিরবাবুর পত্র আসত, তার প্রত্যেকটিতে লেখা থাকত—'জলধারা ছোট বউয়ের জন্য খুব কাঁদে।' প'ড়ে বুকটা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বা'র হ'ত, চোখে আপনা আপনি জল আসত। আমি এ সকল চিঠি প'ড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম, ভাবতাম উনি কি জানেন না! কিন্তু তিনি কি ক'রে জানবেন? আমি ত তাঁকে এ সম্বন্ধে কিছু লিখি নাই। হঠাৎ একদিন নাজির বাবুর পত্র পেলাম; তাতে লেখা আছে যে, তাঁরা বদলী হ'য়ে ঝাঁসিতে আসছেন। প'ড়ে খুব আনন্দিত হতে পারলাম না। এর পরে লেখা ছিল—'জলধারা যেদিন থেকে জেনেছে যে ঝাঁসিতে গিয়ে ছোট বউয়ের সঙ্গে দেখা হবে, সেদিন হ'তে সে খাওয়া-দাওয়া একরূপ ভুলেই গিয়েছে।' আমি পত্রটি প'ড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। জলধারার মায়ের সঙ্গে জানি না আর কারও কথা মনে হ'ত কি না!

নাজিরবাবু ঝাঁসি আসছেন, তাঁর স্ত্রী আমার ঘরে আসবেন। জলধারা মায়ের কোল হ'তে নেমেই "ছোট বউ"

(শেষাংশ ৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাণাঘাট সাহিত্যসংসদে রবিবাসরের অধিবেশনে অভিভাষণ

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

স্বাগত, হে রবিবাসরের সভাবৃন্দ! এই ক্ষুদ্র রাণাঘাটের ক্ষুদ্রতর সাহিত্য-সংসদের পক্ষ হইতে আজ আমি আপনাদের সাদের ও সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করি। আপনাদের ন্যায় মনীষাসম্পন্ন সাহিত্য মহারথিবৃন্দের মিলনানুষ্ঠানে যে বিমল আনন্দ, অসীম প্রীতি ও দুর্লভ জ্ঞানলাভ করিব, তাহারই আশায় প্রণোদিত হইয়া 'উদ্বাহুরিব বামনঃ' এই দুঃসাহসিক কার্যে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের না আছে শক্তি-সামর্থ্য, না আছে বিত্ত সম্পদ। ভরসা মাত্র আপনাদের ন্যায় সুধিবৃন্দের মহানুভবতা ও আপনাদের প্রতি আমাদের অন্তরের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আজ ন্যায়দর্শনের ঐতিহাসিক ভূমি নদীয়ার ঊষর বক্ষে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের এই লীলাভূমি, যেখানে তিনি প্রেম-ভক্তির রস-প্লাবন আনিয়া বাঙ্গলা ভাষাসাহিত্যের তটে পদাবলীর এক অভিনব তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, যাহার আস্বাদনে সমগ্র বঙ্গদেশের তটভূমি প্লাবিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, সেই পুণ্য-ভূমি নদীয়ার এক ক্ষুদ্র নগরে আজ আপনাদের সাদরে আহ্বান করিতেছি।

অপ্রাপ্তির আকুলতায় অধীর, বিরহে জর্জর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই দিব্যোন্মাদ আসমুদ্র হিমাচল প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কাননে বসন্তাগমে যেমন কোমল তরুলতা মুঞ্জরিত হয়, অগণিত বিহগ কলকণ্ঠে তাহার বন্দনাগীতি উদ্গীত হইয়া উঠে, শ্রীচৈতন্যের পদস্পর্শে বাঙ্গালীর জীবনেও তেমনই বসন্ত দেখা দিয়াছিল। রাধাপ্রেমের অদ্ভুত মাধুরিমা আস্বাদনে সেই অপ্রাকৃত প্রেমের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বাঙ্গালী হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙালী চক্ষু মেলিয়া দেখিল 'নয়নে দরবিগলিত-ধারা অমৃতকণ্ঠে উচ্চ হরিকীর্ত্তন, হেম গৌরতনু ধূলিধূসরিত, বিশ্বের নরনারীর জন্য আলিঙ্গনোদ্যত প্রসারিত বাহু।' সেই অপূর্ব্ব ভুবনমনোহর মধুররূপে বাঙালী ভুলিল।

মহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ পূর্বে রাণাঘাটের পাঁচ মাইল পূর্বে ফুলিয়ায় আবির্ভূত হইলেন আর এক মহাপুরুষ। পাঁচশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই মহপুরুষ যে অপূর্ব্ব সামগ্রী বাঙালীকে দান করিয়া গিয়াছেন, আজও তাহার তুলনা মিলেনা। কালের কষ্টি পাথরে সেই স্বর্ণের বিশুদ্ধি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট অনবদ্য সাহিত্য আজ প্রতি বাঙালীর গৃহে বিরাজ করিতেছে। তিনি বাঙলা সাহিত্যের আদি কবি কৃত্তিবাস।

মাঘ মাসে, রবিবার, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এক বিখ্যাত পণ্ডিত-বংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতৃদেব বনমালী ওঝা ও জননী মালিনী দেবী। কৃত্তিবাসের পূর্ব পুরুষ নরসিংহ ওঝা ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের মহারাজ দনুজের রাজত্বকালে গঙ্গাতীরে বাস করিবার নিমিত্ত এই ফুলিয়া গ্রামে আগমন করেন। তৎকালে এই গ্রামে বহু মালাকরের বাস ছিল। তজ্জন্য ইহার নাম হইয়াছিল—ফুলিয়া। তখন ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত দিয়া গঙ্গানদী প্রবাহিত ছিল।

কৃত্তিবাসের ছয় সহোদর ছিল। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে উত্তর দেশে, গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া তিনি গুরু আনন্দাচার্য্যের গৃহে বিদ্যালাভার্থ গমন করিলেন। পরে কৃতবিদ্য কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজসভা নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের নূপুর নিক্কণে ও সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত বিদূষকগণের হাস্য-পরিহাসে মুখরিত। কৃত্তিবাস পাঁচটি শ্লোক রচনা করিয়া গৌড়েশ্বরের চিত্ত বিনোদন করিলেন। মহারাজ কহিলেন—কি প্রার্থনা তোমার, তরুণ কবি?

কবিবর কহিলেন—আমি অর্থের অভিলাষী নহি। আপনি যে আমার গৌরব করিলেন, ইহাই অমি শ্লাঘার বস্তু বলিয়া মনে করি।

উত্তর শ্রবণে গৌড়েশ্বর প্রীত হইলেন, সভাসদগণ তাঁহাকে চন্দন চর্চ্চিত করিল, পৌরজনেরা প্রশংসা করিল।

মহারাজ কৃত্তিবাসকে সরল বাঙলা পদ্যে একখানি রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করিলেন। এই রাজাদেশের ফলেই বাঙালী 'কৃত্তিবাস রামায়ণ' সুধাপান করিয়া ধন্য হইল। কৃত্তিবাস তখন ত্রিংশ বর্ষীয় যুবক।

এই রামায়ণখানি বাঙলা ভাষায় একখানি মহাকাব্য। ইহার পূর্বে অথবা তাঁহারই সময়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছিলেন মাত্র। কোন বৃহৎ কাব্য রচিত হয় নাই। এই জন্যই কৃত্তিবাস বাঙলার আদি কবি।

কৃত্তিবাস জ্যোতিষশাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন। রামায়ণ রচয়িতা বলিয়াই তাঁহার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তিনি 'শিবরামের যুদ্ধ', 'রুক্মাঙ্গদের একাদশী', 'যোগাদ্যার বন্দনা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিপঞ্চাশৎ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহাবসান হয়।

বহু জনাকীর্ণ ফুলিয়া এক্ষণে পরিত্যক্ত, বৃক্ষ-লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত, ব্যাঘ্রাদি সেবিত, অরণ্যপ্রায়। কালের বশে ভাগীরথীও সেখান হইতে অপসৃতা হইয়াছেন। কিন্তু এই ফুলিয়া বঙ্গভাষাভাষী মাত্রেরই তীর্থভূমি।

গীত গোবিন্দের কবি জয়দেব অজয়তীরে কেন্দুবিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেও, নবদ্বীপাধিপতি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্নরূপে শোভা পাইতেন।

নদীয়ার গুণগ্রাহী ও আশ্রিতবৎসল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা অলংকৃত করিয়া ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বহু কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাজা ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্বকবিত্বশক্তি দেখিয়া তাঁহাকে গুণাকর উপাধি দান করেন। রাজার আদেশেই তিনি 'অন্নদা মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।

"আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর,
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।"

ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে অসুস্থ হইয়া পড়েন। মহারাজ তাঁহার রোগমুক্তির নিমিত্ত অশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ৪২ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

দেশের সেই প্রাচীন অন্ধতমসার মধ্যে বাঙলা সাহিত্যে

গগনে রক্তরাগরেখায়, অরুণোদয়ে বঙ্গবাণীর চরণ তলে শ্বেত-শতদল প্রথম বিকসিত হইয়াছিল এই নদীয়ায়।

প্রসিদ্ধ স্বভাব-কবি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাসস্থান ছিল রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে। তিনি খাঁটী বাঙালী কবি ছিলেন। বঙ্গাব্দ ১২৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথম বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্র। প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত উদ্ধারে ঈশ্বরচন্দ্রই অগ্রণী হন। বাঙালীদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম সাহিত্য-রচনার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করেন এবং বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন।

তিনি নব্য বাঙলার সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর গুরু। সে যুগে তিনি বাঙালীর দেশাত্মবোধকে কবিতায় যে দ্যোতনা দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বাঙলার সুপ্রভাতে নবজীবনের নূতন স্পন্দন সম্ভব হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' অস্তমিত হইয়াছে, কিন্তু সেই রবিকরোদ্ভাসিত ধরণী বক্ষে তিনি যে জীবনীশক্তির বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাব এখনও সুস্পষ্ট।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, শ্যামাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মনীষী সাহিত্যিকগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া নদীয়া ধন্য হইয়াছে। নদীয়ার প্রিয় কবি, স্বদেশ প্রেমের মূর্ত্ত-প্রতীক দ্বিজেন্দ্রলাল বেদনা-করুণ-হাস্যরসে, সঙ্গীতে, নাটক রচনায় দীপ্ত প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

নদীয়ায় যে সমস্ত মনীষী ভাষা-জননীর কম্বুকণ্ঠে অপূর্ব মণিরত্নহার পরাইয়াছেন, অক্ষয়কুমার সরকার তাঁহাদের মধ্যে এক উজ্জ্বল রত্নের সমাবেশ করিয়াছেন। শান্তিপুর নিবাসী মোজাম্মেল হক ও কুষ্টিয়া নিবাসী 'বিষাদ সিন্ধু' প্রণেতা মীর মোসারফ হোসেনের নামও উল্লেখযোগ্য।

এই ক্ষুদ্র নগরীতেই কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনা করেন।

বাঙলাভাষায় প্রথম জীবন-চরিতকার, পণ্ডিত কালীময় ঘটকের নিবাসও এই নগরীতেই ছিল। বেলা, পরিমল প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থপ্রণেতা, কবিবর গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ও নদীয়া কাহিনী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ঐতিহাসিক, রায় কুমুদনাথ মল্লিক বাহাদুর আজ ইহ জগতে নাই। বাঙলা সাহিত্যে তাঁহাদের দান অল্প নহে।

নদীয়াবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় মধ্যাহ্নগগনকে দীপ্ত, ভাস্বর ও মহিমান্বিত করিয়া আছেন, যাঁহারা ভাষা-জননীর মণি কোঠায় একের পর এক দীপ জ্বালিয়া তাহা জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছেন—আমাদের পরম সৌভাগ্য, তাঁহাদেরই অন্যতম আজ রবিবাসরের মিলনানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিতেছেন। আজীবন সাহিত্য-সেবী আমাদের পরম গৌরবস্থল রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য ও সুখ লাভ করুন ইহাই কামনা।

কবিবর শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিগণের সুমধুর বীণারব আমাদের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল ও স্থানীয় ঔপন্যাসিক শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য প্রভৃতি এখনও ভাষাজননীর কাব্য-কুঞ্জে কুসুমচয়নে বিরত হন নাই; মাণিকবাবু করুণরসের অবতারণায় বাঙলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কমলার বরপুত্র, মহাপ্রাণ রাণাঘাট সাহিত্য-সংসদের প্রাণ-স্বরূপ বিখ্যাত পালচৌধুরী বংশের গুণান্বিত বংশধর বরেন্দ্রনাথ—যিনি আজ বাণীর প্রিয় সেবকগণের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার বংশ-প্রতিষ্ঠাতা একটি মাত্র অর্দ্ধমুদ্রা সম্বল করিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোটি কোটি মুদ্রা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, যিনি মাদ্রাজ প্রদেশের দুর্ভিক্ষে অকাতরে লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন, যাঁহার সত্যবাদিতায় তদানীন্তন দস্যুও বিমুগ্ধ হইয়া সংশয়ের অবকাশ পাইত না সেই প্রাতঃ-স্মরণীয় পুণ্যশ্লোক কৃষ্ণকান্ত কৃষ্ণপান্তির পূত কীর্ত্তি-গাথার কথঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে আজিকার নিবেদ্য অপূর্ণাঙ্গই রহিয়া যাইবে।

নিঃস্ব সহস্রপান্তির তিন পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও নিধিরাম। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র কুশাগ্রধী হইয়াও অর্থাভাবে শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যে পিতার সহিত রাণাঘাটের তিন ক্রোশ পূর্বে গাংনাপুরে হাটে পান বিক্রয়ার্থ গমন করিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত কৃষ্ণচন্দ্র অন্যান্য গ্রামের সাতটি হাটে পণ্য বিক্রয়ার্থ গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে চাউল, ছোলা, মটর, যব প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ে আপন আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে প্রয়াসী হইলেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে ছোলা দুষ্প্রাপ্য হইল। ব্যবসায়িগণ ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছোলা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন রেলপথ আরম্ভ হয় নাই। জনৈক ব্যবসায়ী যে ঘাটে কৃষ্ণচন্দ্র স্নান করিতেছিলেন সেই ঘাটে নৌকাযোগে আগমন করিলেন। সৌভাগ্য তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল! কৃষ্ণচন্দ্র সেই মহাজনের সহিত ছোলা সংগ্রহের ব্যাপারের ব্যবস্থা করিলেন। সেই সময় আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের মোহান্ত গঙ্গারাম তাঁহার বহু পরিমাণ কীট-দষ্ট ছোলা বিক্রয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সমুদয় ছোলা অতি অল্পমূল্যে ক্রয় করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ-চন্দ্রের শুভাদৃষ্টে মোহান্তের ছোলা বিশেষ নষ্ট হয় নাই। ফলে পান্তি মহাশয়ের এই ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ হইল ৭৭৫০৲ টাকা। এইরূপে তাঁহার সততা ও অধ্যবসায়ে ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

ক্রমে ব্যবসায়ে তিনি কলিকাতায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মহারাজ তাঁহাদিগকে মূল সূত্র। ক্রমে তিনি কলিকাতায় একজন প্রধান ব্যবসায়ী হইয়া উঠিলেন। এইবার তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র জমিদারী ক্রয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না।

কৃষ্ণনগরের মহারাজ শিবচন্দ্র তাঁহাদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মহারাজ তাঁহাদিগকে 'চৌধুরী' উপাধি দান করিলেন। এই সময় মারকুইস অফ হেষ্টিংস মফঃস্বল পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া রাণাঘাটে আগমন করেন। কৃষ্ণপান্তির ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে 'রাজা' উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণনগর-রাজ প্রদত্ত 'পাল চৌধুরী' উপাধিই তাঁহার দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া সবিনয়ে "রাজা" উপাধি প্রত্যাখ্যান করিলেন। তৎকালে তাঁহাদের ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয় নয় লক্ষ মুদ্রা।

যে গৃহে আজিকার এই মিলনানুষ্ঠান সম্পন্ন হইতেছে, পূর্বে প্রতি সন্ধ্যায় এই গৃহ নর্ত্তকীর নূপুর নিক্কণে ও সংগীতের মাধুরিমায় ঝংকৃত হইত। শ্রোতৃবর্গ প্রতি সন্ধ্যায় নানাবিধ রসনা পরিতৃপ্তিকর আহার্যে পরিতৃপ্ত হইতেন।

এই গৃহে কোন যাচকের প্রার্থনাই অপূর্ণ রহিত না। কৃষ্ণচন্দ্র বহু ব্যক্তিকে জমিদারী ক্রয়ে মুক্ত হস্তে সাহায্য করিয়া বহু জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের বংশধরগণই এই প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করিতেছেন।

স্বাগত হে সুধিবৃন্দ, আজিকার বাগ্দেবীর কুঞ্জবিতানে পিকগণের কুহরণ শ্রবণ মানসে আমরা সমবেত হইয়াছি। পাল চৌধুরী বংশের পূর্ব্ব গৌরব ও বিত্ত-বৈভব বিদ্যমান থাকিলে আজ আপনাদের যোগ্য আতিথ্যের ত্রুটি হইত না। তাই হে বাণীমানস তনয়গণ আপনাদের যোগ্য সপর্য্যায়ে আজিকার এই অনিচ্ছাকৃত শত সহস্র ত্রুটিবিচ্যুতি আপনারা ক্ষমা সুন্দর চক্ষে দেখিবেন, ইহাই সাঞ্জলি প্রার্থনা। "ওঁ শম্।"

জলধারা

(৩১৮ পৃষ্ঠার পর)

"ছোট বউ" ব'লে চীৎকার করতে করতে ঘরের ভিতর দৌড়াবে। তখন জলধারার মাকেই বা কি বলব আর জলধারাকেই বা কি বলব। আমি নাজিরবাবুকে এ পত্রের কোন উত্তর দিই নাই। ঘর বন্ধ ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়াতে গেলাম। প্রায় দশ দিন পরে ফিরে এলাম। ঝাঁসি এসে একদিন নাজিরবাবুর সংগে দেখা করবার জন্য সন্ধ্যার সময় বেরুলাম। রাস্তায় নানা রকম যানের ভীড়; কয়েক বার তাদের সামনে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। আমি ভাবছিলাম—"নাজিরবাবুর সংগে দেখা হ'লে কি বলব? তিনি আমাকে বলবেন, তুমি আমাকে খবরও দাওনি। কিন্তু তাঁকে খবর দিয়ে আমি কি করতাম?" এমন সময় রাস্তায় খেলা রত একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম; আমি সেখানেই দাঁড়ালাম। কে? জলধারা! তার সারা মুখে ধুলো, চুলগুলি সব উস্কো-খুস্কো। আমি তাকে চিনতে পারছিলাম না, কিন্তু সে জলধারাই বটে। ইচ্ছা না হ'লেও তার দিকে এগিয়ে গেলাম, তাকে কোলে তুলে নিলাম। সে আশ্চর্য্য হ'য়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম—"জলধারা আমাকে চিনতে পার?"

"হাঁ" ব'লে সে মুখ নীচু করলে, দরজা খোলা ছিল। তাকে নিয়ে আমি বাড়ীর ভিতরে গেলাম।

"চিনতে পার না?"

"হাঁ, তুমি ওখানে থাক।"

"কোথায়?"

"ওখানে, যেখানে ছোট বউ আছে।"

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি কবে এলে?"

"কাল।"

"তোমার বাবা কোথায় গিয়েছেন?"

"ছোট বউকে খুঁজতে।"

"বেশ চল, আমি তোমাকে ছোট বউয়ের কাছে নিয়ে যাই।"

"ছোট বউ, ছোট বউ কোথা?"

"আমার বাড়ীতে—"

আমার কথা শেষ হবার আগেই সে আমার কোল হ'তে নেমে ঘরের ভিতরে গেল; নিজের মাকে চীৎকার ক'রে বললে —"মা আমি ছোট বউয়ের কাছে যাব, আমায় কাপড় পরিয়ে দাও।"

সহসা আমি আত্মস্থ হ'লাম, আমি জলধারাকে কি বলেছি? তাকে ছোট বউয়ের কাছে নিয়ে যাব!

কি বলেছি? ঠিকানা নাই। আমি তার মাকে বলতে শুনলাম—"এখন কার সংগে যাবি? পরে আমার সংগে যাবি।"

আমার মাথা ঘুরে গেল। জলধারার মা ছোট বউয়ের কাছে যাবে! কোথায়? সে জায়গার খোঁজ ত আমিই করছি।

জলধারা বললে—"দাদার সংগে যাব", শুনে আমার চোখ জলে ভ'রে এল। আমি ওখানে আর থাকতে পারলাম না। চুপ ক'রে বাইরে চলে এলাম। *

* শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র কর্ত্তৃক মূল হিন্দী হইতে অনূদিত।

পুস্তক পরিচর্য্যা

সুরহারা বাঁশী—শ্রীঅমিয়া সেন প্রণীত। আর্য্য পাবলিশিং কোং, ২২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

উপন্যাস। 'দেশ' পত্রে 'যে শাখে ফোটে না ফুল'—এই নামে এখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনই পাঠক-পাঠিকাদের মনে ইহা বেশ একটা সাড়া দিয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীমতী অমিয়া সেন অল্পদিন হইল সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এ হিসাবে তিনি নবীন লেখিকা হইলেও গ্রন্থখানির সরল বর্ণনাভঙ্গী ও সহজ চরিত্র-চিত্রণ তাঁহাকে প্রবীণের মর্য্যাদা দান করিবে। একটি বর্দ্ধিষ্ণু বাঙালী পরিবারের মান-অভিমান, দুঃখ-কষ্ট-অনুতাপের কাহিনী। রাজেশ্বরীর দুই পুত্র—বনবীর ও সৌম্য। বনবীর বড় চাক্‌রী করিয়া সংসারের 'শ্রী' দান করিয়াছে। স্ত্রী মাধবী বন্ধ্যা। এজন্য তাহার অনাদর হইতেছিল খুবই। মাতার ইচ্ছা—পুত্রের আবার বিবাহ দেন। এই প্রস্তাবে বনবীর ও রাজেশ্বরীর মধ্যে এমন মনোমালিন্য ঘটে যে, বনবীর তাহাদের সংসার ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করিতে থাকে। মাধবী ও বনবীর আলাদা হইয়া গেলে রাজেশ্বরী বড়ই বিপদে পড়িলেন। কারণ তাঁহাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই বনবীরকে কেন্দ্র করিয়া। যে কনে'র সঙ্গে বনবীরের বিবাহ দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, সৌম্যের সঙ্গে তিনি তাহার বিবাহ দিয়াছেন। নানাস্থানে চাকরীর খোঁজ করিয়া শেষে সৌম্য দশ টাকা মাহিনার একটি টাইপিষ্টের কাজ জোটায়। একবার বনবীরের আপিস হইতে সে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসে। এজন্য পিতামাতার ইচ্ছা সত্ত্বেও কখনও বনবীরের নূতন বাড়ীতে সে যায় নাই। সৌম্যের একটি পুত্র-সন্তানও হইয়াছে। রাজেশ্বরী যখন মৃত্যুশয্যায় তখন বনবীর একদিন একখানা পত্র পায় এবং মাধবীর সঙ্গে পূর্ব্ব বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। রাজেশ্বরীর দুরারোগ্য ব্যাধি ও গৃহের দৈন্য দশা দেখিয়া তাহারা বড়ই অভিভূত হইয়া পড়ে; নূতন বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া এখানেই তাহারা অতঃপর বাস করিতে থাকে, কিন্তু রাজেশ্বরী আর বাঁচিলেন না। সৌম্যের পুত্রকে পাইয়া বনবীর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। ওদিকে মাধবী ক্রমশ কঙ্কালসার হইয়া পড়িল। শেষে যখন ডাক্তারকে দেখাইয়া জানা গেল তাহার থাইসিস্ হইয়াছে, তখন তাহার প্রায় শেষ অবস্থা। বনবীর মাধবীকে লইয়া পুরী রওনা হইল। সৌম্যদের পরে যাইবার কথা রহিল। এইখানেই উপন্যাসখানির ছেদ পড়িয়াছে। এখানি পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকারাও তৃপ্তিলাভ করিবেন নিশ্চয়। উপন্যাসখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই উত্তম।

ময়মনসিংহের কৃতীসন্তান—প্রথম খণ্ড। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। সৌরভ আফিস, ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত।

মজুমদার মহাশয় একজন কৃতী সাহিত্যিক। তিনি এই পুস্তকে, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, আনন্দমোহন বসু, হরচন্দ্র চৌধুরী, মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, সাহিত্যসেবী কেদারনাথ মজুমদার ও মার্কিন সাধারণতন্ত্রের প্রথম বাঙালী ঔপনিবেশিক অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয়ের—ময়মনসিংহের গৌরবস্বরূপ এই কয়েকজন যশস্বী এবং কৃতী পুরুষের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা সুন্দর, সরস। কৃতী পুরুষদের এই সব কথা জানিলে চিত্ত উন্নত হয়—আশা জাগে, আনন্দ বাড়ে। ঘরে ঘরে এমন পুস্তকের আদর হওয়া উচিত। ছেলে-মেয়েদের হাতে দিবার মত এ বই। ছাপা, বাঁধাই চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে এবং পুস্তকখানি কয়েকখানা হাফটোন চিত্র শোভিত। আমরা এ পুস্তকের অন্যান্য খণ্ডগুলি দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিলাম।

শ্রীভাগবত আচার্য্যের লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীহরিদাস ঘোষাল বিরচিত। মূল্য ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—পোষ্ট আলমবাজার, পাঠবাড়ী, ২৪ পরগণা।

ভাগবত আচার্য্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল রঘুনাথ উপাধ্যায়। মহাপ্রভু ইঁহার মুখ হইতে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া ইঁহাকে ভাগবত আচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে ভাগবত আচার্য্য এই নামটি পাওয়া যায়; কিন্তু কোন জীবনী বর্ণিত হয় নাই। শ্রীযুত হরিদাস ঘোষাল মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্যে একজন সুপণ্ডিত সাধক এবং ভক্ত। তিনি নিজে বিশেষভাবে তথ্যানুসন্ধানের দ্বারা পরম ভাগবত ভাগবতাচার্য্যের জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সুললিত এবং মধুর। রসগ্রাহী ব্যক্তি মাত্রেই এই সাধু বৈষ্ণবের জীবনী পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

চীন-জাপান সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি কবে?

(২৭৯ পৃষ্ঠার পর)

হটিতেছে এ সব কথা সবই সত্য, কিন্তু তাহারা অবনামত বা অবদমিত হয় নাই। বিশাল চীন এখনও তাহাদেরই।

চীন-জাপান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কবে হইবে তাহা লইয়া নানা জনে জল্পনা করিতেছেন। এই যুদ্ধ যখনই পরিসমাপ্ত হউক না কেন, ইহার ফলে বিজ্ঞান পরিশুদ্ধ হইয়া নিজ শাশ্বত কল্যাণময়রূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিবে ইহা আমরা আশা করিতে পারি; গ্যাস, বোমা আবিসিনিয়াকে ঘায়েল করিয়াছে, এখানে বিজ্ঞানের বীভৎস রূপেরই জয়। চীনে তাহা হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। আবিসিনিয়া ও চীন এবং জাপান ও ইটালীতে ঢের তফাৎ। চীনে জাপানের পরাভব মানে বিজ্ঞানের বীভৎস মারমুখী রূপের পরাভব!

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রবন্ধ ও গল্প প্রতিযোগিতা

সাধনা সমিতির (৩নং নীলকমল চক্রবর্ত্তী লেন, শিবপুর, হাওড়া) উদ্যোগে 'পাথেয়' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বাহির হইয়াছে। সেই পত্রিকার পরিচালক-সঙ্ঘ একটি ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছে।

১। ছোট গল্প প্রতিযোগিতা—যে কোন বিষয় লইয়া (সর্ব্বসাধারণের জন্য)—প্রথম পুরস্কার একটি কাপ। লেখা ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচ পাতার বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২। প্রবন্ধ (কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)। বিষয়—(ক) বাঙলাদেশে ব্যায়াম চর্চ্চা অথবা (খ) বর্ত্তমান শিক্ষা ও তাহার ত্রুটি। পুরস্কার—একটি কাপ। প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশী হইলে আর একটি করিয়া পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

সাধনা সমিতির ঠিকানায় অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাইবেন। পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর।

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত,
সম্পাদক—(সাধনা সমিতি ও পাথেয়)
৪৫নং ধর্ম্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া।

কবিতা প্রতিযোগিতা

ইংরেজী ছোট কবিতার 'কবিতায়' অনুবাদ প্রতিযোগিতার বিষয়। অনূদিত কবিতা ৩৬ লাইনের অধিক হইলে চলিবে না। প্রতিযোগিতার কবিতার সহিত মূল ইংরেজী কবিতাটিও প্রেরিতব্য। প্রতিযোগীদের সংখ্যা অনুসারে একটি বা ততোধিক পুরস্কার দেওয়া হইবে। বাঙলায় এবং বাঙলার বাহিরে তরুণ সাহিত্যিকগণকে আমরা প্রতিযোগীরূপে পাইব আশা করি। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর যোগদানের শেষ দিন। অনুবাদ করিবার বিষয় ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্য হইতেই বাছিয়া লইতে হইবে। অনুবাদকালে কবিতার 'ভাব' বিকৃত না করিয়া বাক্যাংশ পরিবর্ত্তন করা চলিবে, কিন্তু একেবারে 'ছায়া অবলম্বনে' হইলে চলিবে না। বিস্তারিত জানিতে হইলে নিম্নঠিকানায় উপযুক্ত ডাক টিকিট-সহ পত্র ব্যবহার করুন।

শ্রীবিশ্বনন্দন দাশ, সম্পাদক, 'রক্তদল সাহিত্য-সংসদ', সি ১১৪নং হিনু, রাঁচি।

রচনা প্রতিযোগিতা

(ডাঃ বিভূতিভূষণ স্মৃতি পুরস্কার)

বাঙলায় রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। বিষয়—"যুদ্ধ না শান্তি?" রচনা ফুলস্কেপ কাগজের ৫ পৃষ্ঠার অধিক না হয়। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, সহ-সম্পাদক, সাহিত্য বিভাগ রাজপুর সাধারণ সম্মিলনী, পোঃ আঃ সোনারপুর, রাজপুর।

রচনা প্রতিযোগিতা

সুবার্ব্বন্ রিডিং ক্লাবের উদ্যোগে বাঙলার সমগ্র স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি বাঙলাভাষায় রচনা প্রতিযোগিতা হইবে। বিষয়—হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার। রচনায় দেড় হাজারের অধিক শ[illegible] [illegible]কিবে না। ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে লিখি[illegible] ১৯৩৯ সালের ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাকে একটি রৌপ্য পদক উপহার দেওয়া হইবে।

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, সুবার্ব্বন্ রিডিং ক্লাব, ৩৩নং তালপুকুর রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা।

রচনা প্রতিযোগিতা

প্রথম পুরস্কার—"মধুস্মৃতি" পদক

সূর্য্যালোক পত্রিকার পক্ষ হইতে উক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করা যাইতেছে।

বিষয়—"বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র ও জাতির নবজাগরণ"। সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। রচনা ফুলস্কেপ সাইজ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে। রচনা কোনমতেই ২০০ লাইনের বেশী হইবে না। প্রথমকে "মধুস্মৃতি" রৌপ্য পদক উপহার দেওয়া হইবে। ২০শে পৌষ প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ। নির্ব্বাচন বিষয়ে বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

রচনাদি পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীপতিতপাবন পাঠক, কর্ম্মসচিব, "সূর্য্যালোক", ৪৭নং এ সি ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীট, পোঃ বালী, হাওড়া।

গল্প প্রতিযোগিতা

ছাত্র-ছাত্রী সমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক "অর্ঘ্য" পত্রিকার উদ্যোগে একটি গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। রচনাটি ২।৩ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক লিখিত এবং আধুনিক সুরুচিসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্কুলের নাম ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহিসহ পাঠাইবেন।

প্রথম স্থান অধিকারীকে একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রেরিত গল্পের কপি রাখিয়া পাঠাইবেন।

রচনা ২৩শে পৌষের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাক টিকিট দেওয়া থাকিলে ফলাফল জানান হইবে।

শ্রীসমরেন্দ্র মজুমদার, সম্পাদক; শ্রীসুনীল ঘোষ, সহ-সম্পাদক, কালনা পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

রচনা প্রতিযোগিত.

রচনার বিষয়—নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের যে কোন একজনের সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ—

(১) নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, (ঢাকা), (২) স্যার আব্দুল রহিম, (কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট), (৩) নওয়াব সামছুল হুদা, (৪) ওয়াজেদ আলী খান পনি, করটিয়া (৫) ডাঃ আব্দুল্লাহ আল্‌মামুন সারওয়ার্দ্দী, (৬) মিঃ এ কে ফজলুল হক, (৭) এস খোদা বখ্‌স, (৮) ব্যারিষ্টার এ রসুল, (৯) শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, (১০) স্যার জগদীশ বসু, (১১) রামজে ম্যাক-ডোনাল্ড, (১২) সিনর মুসোলিনী, (১৩) হের হিটলার।

নিয়মাবলী—(১) বাঙলা, ইংরেজী বা উর্দ্দু যে কোন ভাষায় রচনা লিখিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আগামী **১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৯)** মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

(২) প্রত্যেকের জীবনী সম্বন্ধে যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তাহাকে এক একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(৩) যিনি একাধিক জীবনী সম্বন্ধে রচনা লিখিবেন, তাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইলে প্রত্যেক রচনার জন্য এক একটি রৌপ্য পদক ছাড়া তাঁহাকে অতিরিক্ত একটি স্বর্ণ পদক দেওয়া হইবে।

(৪) ফুলস্কেপ কাগজের ১ পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। রচনা ৪০ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না।

(৫) প্রত্যেকের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও কার্য্যাবলী বংশ, জন্ম ও বাল্য এবং ছাত্রজীবনের কথা উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) ছাত্র, শিক্ষক বা অন্য যে কোন সমাজের কেহ রচনা প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন।

(৭) রচনার সঙ্গে যাঁহার সম্বন্ধে রচনা তাঁহার ফটো বা ব্লক পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়।

আনোয়ার হোসেন, চন্দনপুরা, পোঃ চট্টগ্রাম।

রচনা প্রতিযোগিতা

"শিবপুর এসোসিয়েশনের" উদ্যোগে একটি রচনা প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। রচনার বিষয়—(১) বাঙলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। (২) জাতিগঠনে নারীর স্থান। প্রথম রচনাটিতে সকলেই যোগদান করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়টি কেবলমাত্র মহিলাদিগের জন্য। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৯।

রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—সম্পাদক (সাহিত্য বিভাগ), শিবপুর এসোসিয়েশন, ১৩৪নং শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া।

রচনা প্রতিযোগিতা

(বিবেকানন্দ পাঠাগার,—কিশোরগঞ্জ)

কিশোরগঞ্জ, নগুয়া গ্রামস্থিত "বিবেকানন্দ পাঠাগারের" উদ্যোগে আগামী ১২ই জানুয়ারী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে বাঙলা ভাষায় নিম্ন-লিখিত রচনাগুলি আহ্বান করা যাইতেছে ঃ—

রচনার বিষয় ও অধিকার—(১) "বিবেকানন্দ ও তাঁহার স্বদেশপ্রীতি।" (সপ্তম হইতে দশম মানের ছাত্রদের জন্য)—সাত পৃষ্ঠার অধিক নহে। (২) "আমি বড় হ'ব।" (তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ মানের ছাত্রদের জন্য)—পাঁচ পৃষ্ঠার অধিক নহে। (৩) "বর্ত্তমান ভারত ও নারীর কর্ত্তব্য।" (ছাত্রীদের জন্য)—ছয় পৃষ্ঠার অধিক নহে। (৪) "পাঠাগারের উন্নতির পথ।" (সর্ব্ব-সাধারণের জন্য)—আট পৃষ্ঠার অধিক নহে।

নিয়মাবলী ঃ—রচনা ফুলস্কেপ এক-চতুর্থাংশ কাগজে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে। রচনায় জাতিবিদ্বেষ-মূলক বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ। রচনা নিজের ভাষায় লিখিত না হইলে পুরস্কারের জন্য নির্ব্বাচিত হইবে না। রচনা যে রচয়িতা নিজেই লিখিয়াছেন তাহার প্রমাণ জন্য স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর দস্তখত ও সীলমোহর দিতে হইবে। রচনার উপর রচয়িতার নাম, শ্রেণী, স্কুল ও পোষ্ট অফিসের নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় দুইটি করিয়া পুরস্কার। প্রথম পুরস্কার রৌপ্য পদক ও দ্বিতীয় পুরস্কার পুস্তকাদি। কেবল ৪নং প্রতিযোগিতায় একটি পুরস্কার। রচনা ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরিতব্য ঃ—

নিবেদক—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়, সম্পাদক, বিবেকানন্দ পাঠাগার, নগুয়া, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

হাওড়া টাউন হলে সাহিত্যিক সম্মেলন

আগামী ১৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় হাওড়া টাউন হলে ওয়েষ্ট এণ্ড ক্লাব, শিশু বৈঠকের উদ্যোগে একটি 'সাহিত্যিক সম্মেলনের' আয়োজন হইয়াছে। কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দিত করা হইবে। স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস সভাপতিত্বপদে বৃত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-কুমার রায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ ঐ সাহিত্য-বাসরে সমাবিষ্ট হইবেন। গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও অন্যান্য রুচিসঙ্গত আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত বার-এট-ল মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। 'নিখিল বঙ্গ ছোট গল্প প্রতিযোগিতার' পারি-তোষিকাদি ঐ দিবস প্রদত্ত হইবে স্থির হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, শিশু বৈঠক, ওয়েষ্ট য়েণ্ড ক্লাব, হাওড়া।

গল্প প্রতিযোগিতা

একমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদিগকে আমরা এই প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিতেছি। প্রতিযোগীরা নিজ ইচ্ছামত যে কোন বিষয়ে আধুনিক সুরুচিসম্পন্ন গল্প পাঠাইতে পারিবেন। গল্প এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া অনাবশ্যক। প্রতিযোগিতায় যে দুই জন প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদিগকে দুইটি "শরৎ-স্মৃতি" রৌপ্য-পদক দেওয়া হইবে। ১৭ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে গল্প ফেরৎ পাঠান হইবে।

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ঘোষ, শ্রীসুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পোঃ ব্রাহ্মণদী, ভায়া যদরপুর, ফরিদপুর।

তারিখ পরিবর্ত্তন

ইতিপূর্ব্বে 'দেশে' 'রূপলেখা সাহিত্য মন্দিরের' উদ্যোগে যে একটি কবিতা প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার তারিখ পরিবর্ত্তন করিতে আমরা বাধ্য হইলাম। ১০ই ডিসেম্বরের পরিবর্ত্তে ৫ই জানুয়ারী কবিতা পাঠাইবার শেষ তারিখ ধার্য্য করা হইল।

শ্রীবিজনকুমার রায়, সম্পাদক, রূপলেখা সাহিত্য মন্দির, বড়িশা পোঃ, (মাঝের হাটি), ২৪ পরগণা।

নিউসিনেমা ও চিত্রায়—সাথী

"সাথী"—নিউ থিয়েটার্সের ছবি; কাহিনী ও পরিচালনা—ফণী মজুমদার; চিত্রশিল্পী—দিলীপ গুপ্ত ও সুধীশ ঘটক; শব্দযন্ত্রী—লোকেন বসু; সংগীত পরিচালনা—রাইচাঁদ বড়াল; সম্পাদক—কালী রাহা; দৃশ্য-সজ্জা—সৌরেন সেন, অনাথ মৈত্র; কথা—মণি দত্ত; গান—অজয় ভট্টাচার্য বিভিন্ন ভূমিকায়—সায়গল, কাননবালা, অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, সুধীর, রেখা, কমলা, বোকেন চট্টোপাধ্যায়, অহি সান্যাল, নরেশ বসু, পরেশ চট্টোপাধ্যায়, ভানু ব্যানার্জ্জি, নির্ম্মল ব্যানার্জ্জি, ব্রজ পাল, সত্য মুখার্জ্জি, বিনয় গোস্বামী, শৈলেন পাল, পূর্ণিমা, শ্যাম লাহা, খগেন পাঠক প্রভৃতি। গত ৩রা ডিসেম্বর শনিবার হইতে চিত্রায় দেখান হইতেছে।

বালক ভুলুয়া গ্রাণ্ড ট্রাভেলিং থিয়েটারে চাকুরী করিত। সংসারে তাহার কেহই আপনার বলিতে ছিল না। একদিন থিয়েটারে সে এক কাণ্ড করিয়া পলায়ন করে। রাস্তা দিয়া সে সময় দমকল যাইতেছিল—সে একটি দমকলের পিছনে উঠিয়া পড়ে। দমকল আসিয়া থামিল জগত্তারিণী হোমের সম্মুখে। জগত্তারিণী হোমে আগুন লাগিয়াছিল। হোমের বালিকা মঞ্জুকে দমকলের লোকেরা উদ্ধার করে। মঞ্জু বাহিরে আসিলে ভুলুয়ার সহিত তাহার দেখা হয়। ভুলুয়া ও মঞ্জু পথে বাহির হইয়া পড়ে। তাহারা রাস্তায় রাস্তায় নাচিয়া গান গাহিয়া পয়সা রোজগার করিত। এইভাবে বহু দিন অতিবাহিত হইয়াছে। ভুলুয়া ও মঞ্জু বড় হইয়াছে—তাহারা কলিকাতায় আসিয়াছে থিয়েটারে চাকুরী করার জন্য। রূপের জন্য মঞ্জুর চাকুরী মিলিল কিন্তু ভুলুয়ার চাকুরী মিলিল না। মঞ্জু ভালভাবে জীবন যাপন করিতে চাহিল কিন্তু ত্রিলোকনাথ ও অমরচাঁদ তাহাকে দিবা-রাত্র প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। এদিকে অর্থ উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর বাহিরের স্বভাবে পরিবর্ত্তন আসিল এবং তাহার সহিত ভুলুয়ার মন কষাকষি আরম্ভ হইল। ভুলুয়া অবশেষে সত্যসত্যই একদিন মঞ্জুকে ছাড়িয়া গেল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের প্রেম তাহাদের মিলন ঘটাইয়া দিল।

বাঙলা দেশের যে সমস্ত পরিচালক আজ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রথম ছবি যেরূপ হইয়াছিল পরিচালক ফণী মজুমদারের প্রথম ছবি "সাথী" তাহা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হয় নাই। ছবিখানি যে আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহা নহে তবে ছবির মধ্যে পরিচালক শ্রীযুক্ত মজুমদার কয়েকস্থানে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা

দেখিয়া ভবিষ্যতে একদিন তাঁহাকে আমরা প্রথম শ্রেণীর পরিচালকরূপে দেখিবার আশা করিতে পারি।

দর্শকগণ যাহাতে উপভোগ করিতে পারে সেইভাবে চিত্রের লঘু ও হাস্যরসের দিকটাই তিনি বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমরা হয়ত তাহা পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারিতাম যদি না তিনি এই দৃশ্যগুলিকে

অযথা লম্বা করিয়া একঘেয়ে করিয়া তুলিতেন। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একই রকমের রস পরিবেশনের ফলে ছবিখানি বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠিয়াছে।

ছবিখানি তত ভাল না লাগার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে কাহিনী বলিয়া এই ছবির মধ্যে বিশেষ কিছু নাই। যে[illegible] আছে তাহার মধ্যে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত নাই, ঘটনা বৈচিত্র্য নাই এবং কোন বাঁধুনী নাই। ছবির আরম্ভ হইতে বিরামের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দর্শকের উপভোগ্য অনেক কিছু জিনিস থাকার জন্য ছবিখানি আমাদের বেশ ভালই লাগিতেছিল কিন্তু মূল কাহিনী আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানি একেবারে ঝুলিয়া পড়িল।

সংগীত পরিচালনা ও গান এই ছবির অপূর্ব্ব সম্পদ। শ্রী[illegible] রাইচাঁদ বড়ালের সংগীত পরিচালনা; অজয় ভট্টাচার্য্যের রচনা এবং কাননবালা ও সায়গলের গান ছবিখানির মর্য্যাদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীমতী কাননবালা ও সায়গলের গানগুলি—বিশেষ করিয়া সায়গলের রেডিওর গানটি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে।

শ্রীমতী কাননবালা মঞ্জুর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় স্থানে স্থানে নিখুঁত হইলেও অধিকাংশ স্থানে তিনি অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। ভুলুয়ার ভূমিকায় সায়গলের অভিনয় আমাদের একেবারেই ভাল লাগে নাই। যাঁহারা নায়ক নির্ব্বাচন করেন তাঁহারা কেন যে বুঝিতে পারেন না যে নায়কের উপর ছবির ভাল-মন্দ অনেকখানি নির্ভর করে—তাহার কোন যুক্তি আমরা পাইলাম না। বাক্যে অথবা অভিনয় ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা যাঁহার নাই তিনি যে নায়ক সাজিয়া কেবলমাত্র ছবিখানিকে নষ্ট করেন তাহা নহে তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয়ও খারাপ হইয়া যায়। গান দেওয়াই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে সায়গলকে ত যে কোন একটা অপ্রধান ভূমিকা দিলেই চলিত। ভুলুয়া (ছোট), মঞ্জু (ছোট) ও মধুর ভূমিকায় যথাক্রমে সুধীর, রেখা ও পরেশ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। অপর কাহারও অভিনয় আমাদের ভাল লাগে নাই।

ছবির দৃশ্যপট বেশ সুন্দর। ফটোগ্রাফী সাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত। শব্দ-গ্রহণ ভালই হইয়াছে। সম্পাদনা সম্বন্ধে কিছুই প্রশংসার নাই। ছবির মধ্যে অনেক অসংগতি থাকিলেও একটি নিতান্ত চোখে পড়ে। তাহা হইতেছে ঝড়ের দৃশ্যটি। মঞ্জু ও অমরচাঁদ মোটরে যাত্রা করিবার পর হঠাৎ ঝড় উঠে এবং ভুলুয়াকে প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় থামিয়া যায়। দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি পরিচালকের ইঙ্গিতে চলিতেছে।

* * * * *

ফাষ্ট এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে "মার্কাস কলিজ" নামক একটি সম্প্রদায় আগামী ২৩শে ডিসেম্বর হইতে নৃত্যকলা দেখাইবেন। আমরা জানিতে পারিলাম এত বড় নৃত্য সম্প্রদায় নাকি আজ পর্য্যন্ত ভারতে আসে নাই।

গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মিঃ এ বি মার্কাস এবং তাঁহার সম্প্রদায় ইউরোপ আমেরিকায় নৃত্যকলা দেখাইতেছেন। তাঁহার 'কোরাস' দল ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং হলিউডের কয়েকখানি ছবিতেও তাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার দলের যে সমস্ত শিল্পী কলিকাতায় আসিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই হলিউডের কোন না কোন ছবিতে অভিনয় করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ে শতাধিক সুন্দরী নর্ত্তকী আছেন; তাঁহাদিগকে আমেরিকার নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাইতে তাঁহারা নৃত্যগীত প্রভৃতি দেখাইয়া আসিয়াছেন এবং সেখানে বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন। এই সঙ্গে ঐ সম্প্রদায়ের একটি সুন্দরী অভিনেত্রীর চিত্র প্রকাশিত হইল।

* * * *

আগামী ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার হইতে নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে নূতন নাটক 'মীরকাশিম' অভিনীত হইবে। শ্রীযুত মন্মথ রায় এই নাটকখানি লিখিয়াছেন। মঞ্চের উপর ইতিহাসকে সঠিকভাবে রূপ দিবার জন্য মীরকাশিম যখন বাঙলার নবাব, সেই সময়ের সমস্ত ইতিহাস হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া নাটকখানি লেখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতু সেন পরিচালনা করিতেছেন এবং শ্রীযুত সুধীর গুহ প্রযোজনা করিতেছেন। সংগীত রচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র রায়; সুর দিয়াছেন শ্রীযুত অমর বসু এবং নৃত্য পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীমতী নীহারবালা। বিভিন্ন ভূমিকায় নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, অমল ব্যানার্জ্জি, ফণী গাঙ্গুলী, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, মণি ঘোষ, রবি রায়, জিতেন গাঙ্গুলী, শিবকালী চাটার্জ্জি, কুঞ্জ সেন, নীহারবালা, চারুবালা, দুর্গারাণী, শেফালিকা প্রভৃতি অভিনয় করিবেন।

* * * * *

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ভূতপূর্ব্ব মিনার্ভা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নূতন পৌরাণিক নাটক "বাসুদেব" অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছে। আগামী ১৭ই ডিসেম্বর, শনিবার এই নূতন নাটকের উদ্বোধন হইবে। শ্রীযুত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকখানি লিখিয়াছেন এবং শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রযোজনা করিতেছেন। দৃশ্যপট পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীযুত পরেশ বসু (পটলবাবু); সুর সংযোজনা করিয়াছেন অন্ধগায়ক শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং নৃত্য পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীযুত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায়—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, রণজিৎ রায়, বঙ্কিম দত্ত, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লবাবু, সুশীলবাবু, কামাখ্যাবাবু, গোপালবাবু, সনৎবাবু, লাইট, রাজলক্ষ্মী, রাধারাণী, বেলারাণী প্রভৃতি অভিনয় করিবে।

আদর্শ নর ও নারায়ণের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প। যিনি পুরুষোত্তম তিনিই নারায়ণ এবং নররূপে নারায়ণের পূজা করিলে যে অন্যায় হয় না, তাহাই এই নাটকে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

* * * * * *

শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া নিউথিয়েটার্সের হইয়া "রজতজয়ন্তী" নামক একখানি ছবি তোলার ব্যবস্থা করিতেছেন।

গামী জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতে ছবি তোলার জ আরম্ভ হইবে।

* * * * *

ফিল্ম করপোরেশনের "দি রাইজ" নামক হিন্দি ছবি রচালনা করিতেছেন শ্রীযুত রণজিৎ সেন। বিভিন্ন মকায় ছায়া, মজামিল, রমলা, দেববালা, ললিতকুমার, নন্দশোর, মাধব শুক্লা, বিজয়কুমার প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

* * * * * * *

সিনেমা বনাম দর্শক

লণ্ডনের কোনও প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সিনেমা সম্বন্ধে মাঠারটি প্রশ্ন মুদ্রিত করিয়া তাহার উত্তর আহ্বান করে দশ-বিদেশের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট হইতে। "কে আপনার প্রিয় তারকা?" বা "একদিনে দুইটি বড় চিত্র দেখিতে ভালবাসেন কিনা?"—এই প্রকারের সাধারণ প্রশ্ন নয়।

তাহাদের প্রশ্ন ছিল নিতান্তই স্বতন্ত্র, তাই উত্তরগুলিও একটু অসাধারণ বই কি!

২০,০০০ উত্তর হস্তগত হইবার পর উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয় নিশ্চিতভাবে তাহারা উদ্ধার করিয়াছে:-

(১) শতকরা ৪৪জন দর্শক সপ্তাহে দুইবার সিনেমা দেখিয়া থাকে। শতকরা ৩৮জন দেখে একবার মাত্র। শতকরা পনরজন দেখে সপ্তাহে তিনবার। শতকরা তিনজন দেখে সপ্তাহে চার দিন।

(২) শতকরা ৩৪টি যুগল সিনেমা দেখার সময় হাতে হাত মিলাইয়া বসে। আবার শতকরা ১২টি যুগল ইহাপেক্ষাও অন্তরঙ্গতার আচরণে সংকোচ বোধ করে না।

(৩) নিজ নিজ প্রণয়-ব্যাপারে শতকরা মাত্র ৬টি নর-নারী সিনেমায়-দেখা প্রণয়-নিবেদনের অনুকরণ করে। শতকরা ২৯ জন নর-নারী সিনেমা-তারকাদের প্রেমমুগ্ধ হয়।

(৪) একটি প্রশ্ন ছিল—আপনার চেহারা কি সিনেমা-তারকার মত দেখিতে?—২০,০০০ পাঠক-পাঠিকার ভিতর মাত্র ২৬জন স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা আকার-আকৃতিতে কোন না কোন সিনেমা-তারকার মত।

(৫) শতকরা ৬৩জন জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা সিনেমার গল্পটিতে শান্তিসুখময় পরিসমাপ্তি দেখিতে ভালবাসেন। তাঁহারা কিছুতেই করুণ মর্ম্মান্তিক পরিণতি বরদাস্ত করিতে পারেন না।

(৬) আবার ইহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, একশতজনের ভিতর ৫৯জন নর-নারী তেমন চিত্রই পছন্দ করেন বেশী, যাহার কোন-না কোন দৃশ্যের অভিব্যক্তিতে ফুটিয়া উঠে—প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার প্রেরণা।

(৭) শুদ্ধ উপসংহারের লোভনীয় মোহ লইয়াই সকল দর্শক আকুল থাকেন না; শতকরা ৫১জন চিত্রের বিষয়-বস্তুতে খুঁটিনাটির দিকে প্রখর দৃষ্টি দান করেন; এবং কোথাও সামান্য মাত্র অসামঞ্জস্য চোখে ঠেকিলেও তাঁহারা বিরক্ত হন বেজায়: পয়সা খরচ ব্যর্থ মনে করেন।

(৮) দম্পতি সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ধরা দিয়াছে সংবাদপত্রের বিশ্লেষণে—

স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে সিনেমায় গেলে অনেক পত্নীই ইচ্ছা করেন যে, স্বামী তাঁহার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া নেন আদর-সোহাগে, অথবা গায়ে গা ঠেকাইয়া নিবিড়তার আবেশে তৃপ্ত করেন।

অনেক দম্পতি জানাইয়াছেন, তাঁহারা সিনেমায় কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতার রহস্যময় গাঢ়তা প্রকাশে বিমুখ; কারণ পশ্চাতের দর্শকদের অসুবিধা বা অস্বস্তি উৎপাদন তাঁহাদের মনঃপুত নয়।

(৯) সিনেমা শিল্পের গর্ব্বের বিষয় এই যে, প্রতি একশতটি দর্শকের ভিতর ৪৮জন নর-নারী সিনেমায় যোগদানের আকুল পিয়াস পোষণ করেন।

(১০) শতকরা আঠারজন নর-নারী ইচ্ছা করেন, পারিবারিক সখের নাটক অভিনয়ের ন্যায় প্রতি পরিবারের সুযোগ হয় আপন আপন ফিল্মে তুলিবার কেবলমাত্র আত্মজন লইয়া। এই আঠারজনের ভিতর বিবাহিত তরুণীর সংখ্যা অধিক।

ইহা ছাড়াও কতকগুলি অভিমত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, যাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত।

প্রথম—১৮ বৎসরের অবিবাহিতা তরুণী।

তিনি মনে করেন, তাঁহার চেহারা সিনেমা-তারকার মত নয় আদপেই। কিন্তু তাঁহার ফটো হইতে দেখা যায়, তিনি যেন প্রসিদ্ধ তারকা ভিভিয়েন লেই'য়ের নীরবভাষিকা রূপোরাতি—অভিব্যক্তির জ্বলন্ত-শিখা যেন স্তব্ধ হইয়া আছে আঁখি দুটিতে ও ওষ্ঠপ্রান্তে।

তিনি তাঁহার তরুণ বন্ধুটির সহিত সপ্তাহে একবার মাত্র সিনেমায় যান। সিনেমায় প্রকাশ্য অনুরাগ প্রদর্শনের তিনি পক্ষপাতিনী নহেন। প্রেম নিবেদনে মৌলিকতা তাঁহার লক্ষ্য—কিন্তু সিনেমায় তাহা পাওয়া যায় না। সিনেমা-তারকাদের পোষাকের ফ্যাশান গ্রহণ করিবার মত, কিন্তু তাঁহার পক্ষে উহা নিতান্তই আয়ত্তের বাহিরে ব্যয় বাহুল্যের জন্য।

দ্বিতীয়—২১ বৎসর বয়স্ক যুবক।

অনুরক্ত-যুগলের পরস্পর আকর্ষণ বর্দ্ধিত হয় সিনেমা দেখায়, এমন বিশ্বাসের দাস তিনি নহেন।

একবার তিনি সিনেমা অভিনেত্রী এলিস ফে'র প্রেমে মুগ্ধ হইবার পথে আগাইয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় বাস্তব প্রেম-প্রতিমার সহিত। তখনই ভুল ধরা পড়ে। এই প্রণয়িনীর চোখ দুটি দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন—'এলিস ফে ছিল তাঁহার অন্ধকার আকাশে আলেয়া মাত্র।

এ পর্য্যন্ত এমন চিত্ররূপ তাঁহার চোখে পড়ে নাই যাহা দেখিয়া মানুষ অশ্রু-সায়রে ভাসিতে পারে সত্য সত্যই। তথাপি তিনি চিত্ররূপায়নের আনন্দময় পরিণতিই দেখিতে চাহেন। তবে হাস্য-কৌতুক তাঁহার প্রিয় খুব।

তৃতীয়—বিবাহিত তরুণী—বয়স ২৩ বৎসর।

(শেষাংশ ৩৩৪ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

সম্মিলিত ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন

সম্প্রতি বোম্বাইর শিবাজী পার্কে সমর্থ ব্যায়ামশালার উদ্যোগে কয়েক শত বালক ও কয়েক শত বালিকা সম্মিলিতভাবে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে। বোম্বাইর জনসাধারণ এই অনুষ্ঠান দেখিয়া বিশেষভাবে ব্যায়াম কৌশল বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ লাভ করিয়াছেন। এইরূপ অনুষ্ঠান যাহাতে বৎসরের মধ্যে তিন চারিবার অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য অনেকেই উদ্গ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। সমর্থ ব্যায়ামশালার পরিচালকগণকে অনেকেই নাকি অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং সেই অর্থ সাহায্য যখন সমর্থ ব্যায়ামশালা লাভ করিতেছে, তখন ঐরূপ সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনী শীঘ্রই যে বোম্বাইতে ঘন ঘন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙলায় যে, এই বিষয় ভারতের সকল প্রদেশ হইতে অগ্রণী হইয়াও অর্থাভাব বশত এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বাঙলার বিভিন্ন স্থানেও এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। এমন সহস্র সহস্র বালক-বালিকাকে সারা বাঙলা হইতে আনাইয়া একত্র করিয়া এক বিরাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা—তাহাও সম্ভব হইতেছে না। নিখিল বঙ্গ ফেডারেশন অফ্ এসোসিয়েশন এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে সারা বাঙলার ব্যায়াম-ব্রতী বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীকে একত্রিত করিবার সুযোগ পাইতেছে না।

এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যাঁহারা, তাঁহারা ইহাকে বৈদেশিক প্রথার অনুকরণে কাজ হইতেছে বলিয়া উপেক্ষা করেন। এমন কি তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ঐ সমস্ত বৈদেশিক জাতি, যাঁহারা এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বাধীন সুতরাং তাঁহাদের উহা মানায়। আমাদের মত পরাধীন জাতির এইরূপ কার্য্যে কোনই সার্থকতা নাই। কিন্তু আমরা বলি ইহার সার্থকতা আছে। ইহার উপকারিতা আছে। এইরূপ অনুষ্ঠান ছাড়া পরাধীন জাতির প্রাণে সজীবতা আনা সম্ভব হইবে না। উৎসাহী ব্যায়াম কুশলী বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীগণের একই ছন্দে, একই তালে ব্যায়াম—পরাধীন জাতির মনে কর্ম্মক্ষমতা, সঙ্ঘবদ্ধতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। দৈন্যের নিপীড়নে নিষ্পেষিত জাতির অন্তরে আশার আলোকসম্পাত করিবে। জাতিকে নব আশা, নব উৎসাহে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে।

বাঙলা যখন সম্মিলিত ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনের প্রথম পথ-প্রদর্শক, তখন সেই বাঙলা দেশ এই বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের পশ্চাতে যদি পড়িয়া থাকে, ইহা কোন বাঙালীর কাম্য হইতে পারে না।

সমর্থ ব্যায়ামশালার উদ্যোগে বোম্বাই শিবাজী পার্কে ৮০০ শত বালিকা ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিতেছে

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অধীনস্থ বিভিন্ন স্পোর্টস প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে যে নিয়মে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, এই বৎসরেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। জুনিয়ার, ইণ্টারমিডিয়েট, সিনিয়ার প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি পর পর অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার ব্যবস্থা তাঁহারা করেন নাই। সিনিয়ার স্পোর্টস প্রতিযোগিতাগুলি যাহাতে প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় তাহার দিকেই তাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। জুনিয়ার ও ইণ্টারমিডিয়েট প্রতিযোগিতাগুলি তালিকার মধ্যস্থলে স্থান পাইয়াছে এবং তাহার পরই সিনিয়ার স্পোর্টের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তাঁহারা তালিকাস্থ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস অর্থাৎ যে অনুষ্ঠানটি বাঙলার শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা, তাহা তালিকার সর্ব্বপ্রথমে স্থান পাইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা তাঁহারা যে বাঙলার নব উৎসাহী এ্যাথলেটিকগণকে পর পর জুনিয়ার, ইণ্টারমিডিয়েট, সিনিয়ার স্পোর্টে যোগদান করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিলেন, ইহা তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় কেন যে তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে স্থান পাইল না, ইহা আমাদের ধারণাতীত। গত কয়েক বৎসর হইতেই আমরা এইদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি এবং সেইজন্য এইবার তালিকা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, পুনর্ব্বার আমাদের এই বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে না। কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হইল না।

নিম্নে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের [illegible] স্পোর্টস অনুষ্ঠানের তালিকা প্রকাশিত হইল।—

ডিসেম্বর—১৮ই শিশিরকুমার ইনস্ কর্ত্তৃক পরিচালিত ১০ মাইল ভ্রমণ (সাধারণের)।

জানুয়ারী—৭ই সিটি এ্যাথলেটিক স্পোর্টস (সাধারণের)।
১২ই, ১৩ই, ১৪ই, বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস (সাধারণের)
২১শে ই বি আর স্পোর্টস
২২শে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব স্পোর্টস (সাধারণের)
২৮শে বেঙ্গল এ্যাথলেটিক স্পোর্টস (সাধারণের)

ফেব্রুয়ারী—৪ঠা ইণ্টার কলেজিয়েট স্পোর্টস (মেয়েদের)
৪ঠা মোহনবাগান ক্লাব স্পোর্টস (সাধারণের)
৫ই শক্তি সঙ্ঘ স্পোর্টস (ভারতীয় স্কুল বালকদের)
১১ই ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস
১২ই স্যার গুরুদাস ইনস স্পোর্টস (ছোটদের জুনিয়ার)
১২ই ক্রাউন স্পোর্টস (ইণ্টারমিডিয়েট)
১৮ই ক্যালকাটা এ্যাথলেটিক স্পোর্টস (কেবল ভারতীয়দের জন্য)
১৯শে ইউনিয়ন ক্লাব স্পোর্ট (ইণ্টারমিডিয়েট)
১৯শে জোড়াবাগান ক্লাব স্পোর্টস (সাধারণের)
২৫শে আনন্দ মেলা স্পোর্টস (কেবল মেয়েদের জন্য)
২৬শে জাতীয় যুব সঙ্ঘ স্পোর্টস (বালিকাদের)

পুঃ—"সাধারণ" লিখিত সকল স্পোর্টস সিনিয়ার বলিয়া গণ্য হইবে।

সমর্থ ব্যায়ামশালার উদ্যোগে বোম্বাই শিবাজী পার্কে বালকগণ ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিতেছে

সাপ্তাহিক সংবাদ

৬ই ডিসেম্বর—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত মোহনলাল শকসেনার প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব জানাইয়াছেন যে, দিল্লী জেলের তিন আইনের বন্দিগণকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইবে না। বন্দীদের নামঃ—ভবানী সহায় (১৯৩২ সালের ২৫শে এপ্রিল হইতে আটক); গঙ্গাধর বৈশম্পায়ন (১৯৩৩ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে আটক) এবং জওলাপ্রসাদ শর্ম্মা, ওরফে ভগবান দাস (১৯৩৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে আটক)।

রাজকোট দরবারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে শ্রীযুক্তা মণিবেন প্যাটেল (সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা) গ্রেপ্তার হইয়াছেন। রাজকোটে এতাবৎ ১,৪৫০জন সত্যাগ্রহী ধৃত হইয়াছেন।

শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জ্জি এম এল এ ১৪৪ ধারা অমান্য করার অভিযোগে রাজগঞ্জে ধৃত হইয়াছেন। পরে তাঁহাকে এক শত টাকার জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে

রাণীগঞ্জের শ্রমিক কর্ম্মী কমরেড সুকুমার ব্যানার্জ্জির মৃত্যু সম্পর্কে শ্রীযুত বিনয়কুমার চৌধুরী রাণীগঞ্জ পেপার মিলসের মিঃ ব্রাউন ও মিঃ জে সি লো'র বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির ৩০২ এবং ৩০৪ ধারা অনুসারে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন। বিবাদী ঐ মামলা মহকুমা হাকিমের এজলাস হইতে অপর কোন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে স্থানান্তরিত করার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখস্ত করিয়াছেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে সরকার বিরোধী দলের পক্ষ হইতে ৫টি অনাস্থা প্রস্তাব পেস করা হয়। স্পীকার মহাশয়, আগামী বৃহস্পতিবার (৮ই ডিসেম্বর) প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রী-বেতন বিল পাস হইয়াছে। উহাতে আসামের মন্ত্রীদের বেতন মাসিক ৫০০, টাকা ও ভাতা মাসিক ১০০, টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

চীনের কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের ব্রহ্মস্থিত এজেন্ট সাউথ-ওয়েষ্টার্ণ ট্রান্সপোর্টেশান কোম্পানী মারফতে ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া চীনের সহিত পৃথিবীর যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। উক্ত কোম্পানী রেঙ্গুনে একটি অফিস খুলিয়াছেন এবং উক্ত অফিসে বহু চীনা কেরাণী দিবা-রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। চীনারা যথাসম্ভব সত্বর একটি রেল লাইন নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে ব্রহ্মদেশের রেল লাইনের সহিত সংযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

প্যারিসে ফরাসী-জার্ম্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। জার্ম্মান পররাষ্ট্র সচিব হেরফন রিবেনট্রপ ও ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মঃ বনে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় রাষ্ট্র প্রথমত পারস্পরিক শান্তি ও মৈত্রী রক্ষায় প্রতিশ্রুত হয়। দ্বিতীয়ত উভয় রাষ্ট্র ইহা স্বীকার করিয়া লয় যে, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে স্ব স্ব এলাকা সম্পর্কিত কোন সমস্যা অমীমাংসিত রহিল না; তৃতীয়ত যদি কোনক্ষেত্রে স্ব স্ব এলাকা সম্পর্কিত সমস্যার সহিত আন্তর্জ্জাতিক সংকটের সম্ভাবনা জড়িত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উভয় রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিবেন।

৭ই ডিসেম্বর—

হিন্দু-মুসলমান আপোষ-নিষ্পত্তি প্রচেষ্টা সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং যুক্তপ্রদেশের মুসলিম লীগের সভাপতি নবাব ইসমাইলের মধ্যে বৈঠক হয়। এই বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যোগদান করিয়াছিলেন। প্রকাশ যে, মিঃ জিন্না এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মীমাংসার পক্ষপাতী এবং ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাস্তবতার ভাব লইয়া পুনরায় সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হইবার চেষ্টা হইতে পারে।

গত হরিপুর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দরবার গোপালদাস দেশাই রাজকোট সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল রাজকোটের সমস্যা সম্পর্কে রাজকোটের বিশিষ্ট নেতা রসিকলাল পারেলকে এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, আপাতত পলিটিক্যাল এজেণ্টকে উত্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই, তবে এজেণ্ট যদি এই আন্দোলনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে কংগ্রেস আন্দোলনের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে এবং রাজকোটের সমস্যাকে একটা নিখিল ভারতীয় সমস্যায় পরিণত করা হইবে।

হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে সেনাপতি বাপাত ২ বৎসর সশ্রম করাদণ্ড ও দুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বিনা লাইসেন্সে টোটা রাখিবার অভিযোগে ঢাকার গৌরাঙ্গকিশোর বসু দক্ষিণ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে

মহামান্য আগা খাঁ বিমানপোতে করাচী পৌঁছিয়াছেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

কমন্স সভায় মিঃ নোয়েল বেকার এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, কোন উপনিবেশ কিংবা ম্যাণ্ডেট শাসিত প্রদেশ যেন তত্রাকার অধিবাসীদের বিনা সম্মতিতে হস্তান্তরিত করা না হয়। প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৮ই ডিসেম্বর—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতায় ২১০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শ্রীনিকেতনের কুটীর শিল্পজাত পণ্য দ্রব্যের স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

পাঁচ বৎসরের একটি বালককে হত্যার অভিযোগে রাজসাহীর দায়রা জজ, কাদু মোল্লা নামক এক ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের এক অধ্যায় হইতে রচিত "সীজ অব লক্ষ্ণৌ" (লক্ষ্ণৌ অবরোধ) নামক যে ছায়া-চিত্রটির প্রযোজনা বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে, অদ্য তৎসম্পর্কে কমন্স সভায় স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর এক বিবৃতি দেন। উহাতে তিনি এই সাফাই দিয়াছেন যে, এইরূপ চিত্র প্রদর্শনের ফলে বৃটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে আয়কর বিলের চতুর্থ ধারাটি পাশ হইয়া গিয়াছে।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে লীগ-শ্বেতাঙ্গ দল কর্ত্তৃক বড়দলই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত প্রস্তাব ৫৪-৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। দেওয়ান আলী রেজা নিরপেক্ষ ছিলেন।

অদ্য বেলা দুইটার সময় মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা-প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। মিঃ মকবুলে হোসেন চৌধুরী সমগ্র মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব আনয়ন করেন, যদিও শ্বেতাঙ্গ দলপতি হকেনহালই উহার নায়ক ছিলেন। উক্ত প্রস্তাবের আলোচনা কালে মন্ত্রিমণ্ডলের বিরোধী দলের মধ্যে মিঃ হকেনহাল ও ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী বক্তৃতা করেন। মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলই একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ওজস্বিনী বক্তৃতায় তাহার উত্তর দেন এবং কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রি-মণ্ডল এ পর্যন্ত যে সকল জনহিতকর কাজ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করেন। উক্ত অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় বিরোধী দল অবশিষ্ট চারিটি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই।

আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা আসামের নয়জন রাজ-নৈতিক বন্দীকেই মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিয়াছেন। এই আদেশ গবর্ণরের অনুমোদন সাপেক্ষ।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশ সফর শেষ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

দিল্লী শিবমন্দির সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত ৭৪জন স্বেচ্ছাসেবককে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, শ্রীযুত ধরমবীর ত্যাগী ও শ্রীযুত দুনীচাঁদ বিল্লিকে শাস্তি দান করায় কারা-কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারের প্রতিবাদে উপরোক্ত দণ্ডিত স্বেচ্ছাসেবক দল ধর্ম্মঘট করিয়াছে। প্রকাশ, শ্রীযুত ধরমবীরকে দাণ্ডাবেড়ী দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রীযুত দুনীচাঁদকে নির্জ্জন কক্ষে রাখা হইয়াছে।

লর্ড সভায় প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বিতর্ক হয়। ঐ সময় লর্ড স্নেল গবর্ণমেণ্টের প্যালেষ্টাইন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে যে পরস্পর বিরোধী ও উদ্দেশ্য বিহীন নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহা ব্রিটিশ উপনিবেশের ইতিহাসে দুর্ল্লভ।

প্যালেষ্টাইনে ব্রিটিশ সৈন্য দল বিদ্রোহীদের একটি আদালতে অতর্কিতে হানা দেয়। সেই সময় আদালতের কাজ চলিতেছিল। সৈন্যেরা দুই জন বিচারকসহ বহু লোককে গ্রেপ্তার করে এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সৈন্যদের হস্তগত হইয়াছে।

৯ই ডিসেম্বর—

সহকারী ভারত সচিব লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল মুরহেড কলিকাতায় আসিয়াছেন। মিঃ মুরহেডের আমন্ত্রণক্রমে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু লাট-প্রাসাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথায় গবর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ কংগ্রেস সভাপতির সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জন্য ওয়ার্দ্ধা রওনা হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নবকুমার দত্ত কংগ্রেস প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া আসামের কংগ্রেস কোয়ালিশন দলে যোগদান করিয়াছেন। ইনি আসাম পরিষদের অন্যতম বিরোধী দল ইউনাইটেড পিপলস পার্টির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে বর্ত্তমান অধিবেশন শেষ হইয়াছে। পরিষদে প্রশ্নোত্তরের পর খান সাহেব সৈয়দুর রহমান এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য ভূমি রাজস্ব যে পারিমাণে রেহাই দিয়াছেন তাহা অপর্যাপ্ত ও অসন্তোষজনক। বিরোধী দলের উক্ত প্রস্তাব ৩৪-৫৪ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

রাজকোটে সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি চালনার ফলে বহু সত্যাগ্রহী আহত হইয়াছে। রাজ্যের সমুদয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে, ছাত্রেরা কেহ প্রজা-আন্দোলনে যোগদান করিলে তাহাকে রাষ্টিকেট করা হইবে এবং তাহার ফ্রি ষ্টুডেণ্টসিপ কাটা যাইবে।

হায়দরাবাদে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত প্রসঙ্গে গুলবার্গা কলেজের যে সকল হিন্দু ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, তাঁহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ বিতাড়িত ছাত্রের সংখ্যা তিন শত হইবে।

আউন্ধ রাজ্যের দায়িত্বশীল শাসন সংস্কারের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য আউন্ধের রাজা শ্রীমন্ত বালা সাহেব ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

টিটাগড়ে শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত শিশির রায়, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখার্জ্জি, মিঃ আবদুর রহমান খাঁ, শ্রীযুক্ত শচীন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নিখিল চৌধুরী—এই ছয়জন শ্রমিক নেতা ধৃত হইয়াছেন।

আসামের সাদুল্লা মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যতম সদস্য শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা সামশুল উলেমা আবু নাসার মহম্মদ

ওয়াহেদের কতিপয় আত্মীয় ও শ্রীহট্ট জেলার বালাগঞ্জের সাব-রেজিষ্ট্রার আবদুল আলির বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগে শ্রীহট্টের একষ্ট্রা এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার মিঃ গাউন্দের এজলাসে যে মামলা দায়ের ছিল, আসাম সরকারের নির্দ্দেশে তাহা প্রত্যাহৃত হয়। মামলা প্রত্যাহারের আদেশের প্রতিবাদে ফরিয়াদী দেবেন্দ্রকুমার রায় কলিকাতা হাইকোর্টে দরখাস্ত করিলে যে রুল জারী হইয়াছিল, অদ্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি বার্টলী ও বিচারপতি হেন্ডারসনকে লইয়া গঠিত স্পেশ্যাল বেঞ্চে তাহার শুনানী শেষ হইয়াছে। বিচারপতিগণ আসাম সরকার কর্তৃক মামলা প্রত্যাহারের আদেশ বাতিল করিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা চালাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

লর্ড বলডুইন লণ্ডনে এক বেতার বক্তৃতায় জার্ম্মানীর নির্য্যাতিত ইহুদীদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আবেদন করিয়াছেন। ইহুদী আশ্রয়প্রার্থীদের বসবাসের জন্য কি করা সম্ভব, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পৃথিবীর সমস্ত গবর্ণমেণ্টকে সম্মিলিত হইয়া আলোচনা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া বলডুইন সরাসরিভাবে জার্ম্মানীর নিকট এক আবেদন জানাইয়াছেন।

১০ই ডিসেম্বর—

শিলংয়ে আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলই "আনন্দবাজার পত্রিকা" ও "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে"র আসাম শাখা কার্য্যালয়ের উদ্বোধন করেন। আসাম ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস, আসাম ব্যবস্থা পরিষদের বহু কংগ্রেসী সদস্য, উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে"র সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ প্রায় পাঁচশত বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলই এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুত মাখনলাল সেন বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহার পরিচালিত সংবাদপত্র দুইখানি কংগ্রেসের কার্য্যে সহায়তা করিবে।

বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্টারী পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু গবর্ণমেণ্ট হাউসে বাঙলার লাট লর্ড ব্রাবোর্ণ এবং সহকারী ভারত সচিব কর্ণেল মুরহেডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। প্রকাশ, এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার মিঃ অলডোস হাক্সলিকে ১৯৩৯ সালের জন্য ষ্টিফেনস্ নির্ম্মলেন্দু ঘোষ লেকচারার পদে নিয়োগ করিয়াছেন। মিঃ হাক্সলি কয়েকটি বক্তৃতা করিবেন; বক্তৃতায় তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনা করিবেন।

ঢেনকানল রাজ্যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়— রাজ্যের সমস্ত আদালত বন্ধ দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে রাজ্যের অভ্যন্তরভাগে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা হইয়াছে। ঢেনকানল স্কুল ও অপরাপর দালানগুলি সত্যাগ্রহীদিগকে রাখিবার জেল হিসাবে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে খালি করিয়া রাখা হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুর প্রজা আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি দিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার 'হরিজন' পত্রিকায় "কিরূপে খাদি জনপ্রিয় করা যায়" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে মহাত্মাজী খাদি ও পল্লী শিল্পের তত্ত্বাবধানের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন।

মিশরে আশ্রয় গ্রহণকারী আরব নেতারা গ্র্যাণ্ড মুফতীকে লণ্ডনে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কিত বৈঠকে প্রতিনিধি মনোনীত করার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরুর রাজধানী লিমায় নিখিল আমেরিকান শান্তি সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন আরম্ভ হয়। উহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সচিব মিঃ কর্ডেল হাল এক জোর বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আমেরিকান গোলার্দ্ধকে রক্ষার জন্য সম্মিলিত আমেরিকান ফ্রণ্ট গঠনের আবশ্যকতা বর্ণনা করেন এবং আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহকে সুদৃঢ় ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য অনুরোধ জানান।

মেমেলের জার্ম্মান অধিবাসীদিগকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে লিথুনিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে। জার্ম্মানদের সুদূরপ্রসারী দাবী সম্পর্কে যে সব সুযোগ-সুবিধা দিবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তাহা শেষ পর্যন্ত মেমেলে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সংশোধিত আকারে পরিণত হইবে। এরূপ জানা গিয়াছে যে জার্ম্মানী ও লিথুনিয়ার মধ্যে এই সম্পর্কে একটা রফা হইলে মেমেল চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী শক্তিবর্গকে (গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও জাপান) শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনে সম্মতি দিতে অনুরোধ করা হইবে। লিথুনিয়ার জার্ম্মান দূত ডাঃ জেখালিন কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ গ্রহণের জন্য বার্লিন গিয়াছেন।

১১ই ডিসেম্বর—

রাজকোট সত্যাগ্রহ সম্পর্কে শ্রীমতী মৃদুলা সরাভাই গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সর্দ্দার প্যাটেলের কন্যা শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেলের গ্রেপ্তারের পরে শ্রীমতী মৃদুলা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

দিল্লীতে শিবমন্দির সত্যাগ্রহ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামভরসালালের স্ত্রী সমেত ৮ জন স্বেচ্ছাসেবিকা এবং সাতজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামভরসালাল (আগ্রা জেলা হিন্দু সভার সম্পাদক) শিবমন্দির আন্দোলন উপলক্ষে মৃত্যুপণে অনশন করায়, পুলিশ তাঁহাকে কোনও অজ্ঞাত স্থানে লইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে হিন্দুদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। দিল্লী সহরে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে ওয়ার্দ্ধায়

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, আচার্য্য কৃপালনী, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও, হরেকৃষ্ণ মহাতাব, জয়রামদাস দৌলতরাম ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। খাঁ আবদুল গফুর খাঁ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শেঠ যমুনালাল বাজাজ এই বৈঠকে যোগ দিতে পারিবেন না।

প্রারম্ভে কংগ্রেস সভাপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে গত অধিবেশনের পর যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বিবৃত করেন। অতঃপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা দেন। তিনি ইউরোপ সফরের সময় যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা কমিটিকে জানান। অতঃপর কমিটিতে কতকগুলি মামুলী বিষয়ের আলোচনা হয়।

কমিটি বাঙালী-বিহারী সমস্যা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের রিপোর্ট এবং মিঃ আসফআলীর বান্নু সম্পর্কিত রিপোর্ট আলোচনা করেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। দেশীয় রাজ্যসমূহের অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা চলিয়াছিল। বিষয়টি মহাত্মাজীর বিবেচনার্থ প্রেরিত হইয়াছে। আসামে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিষ্ঠায় কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ঘোষণা করেন যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন হইবে।

১২ই ডিসেম্বর—

বাঙলার কংগ্রেস সদস্যগণের সংশোধিত চরম তালিকা এলাহাবাদে কংগ্রেসের হেড কোয়ার্টারে প্রেরিত হইয়াছে। বাঙলা ও সুরমা ভ্যালীতে এ বৎসর মোট কংগ্রেস সদস্য হইয়াছেন ৪,৮৬,৯৬৮জন। তন্মধ্যে গ্রামাঞ্চলের সদস্য সংখ্যাই ৩,৬৬,৮৮৫জন। অবশিষ্ট ১,২০,০৮৩জন সহরাঞ্চলের সদস্য। এ বৎসর মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস সদস্য সংখ্যায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। দার্জ্জিলিং জেলায় এ বৎসর সর্ব্বপ্রথম জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইয়াছে। উহাতে ২,৯৬৯জন সদস্য সংগৃহীত হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেট কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যা মিস মাসকারেন রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটিতে পুনরায় বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যা ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা উঠে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—এই সিদ্ধান্ত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুমোদন সাপেক্ষ। সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও সীমান্ত সরকারের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ দেখা গিয়াছে। ঐ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট নিজ বক্তব্য জ্ঞাপনের জন্য সীমান্ত কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ গোলাম মহম্মদ খান ওয়ার্দ্ধায় গিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করেন। ওয়ার্কিং কমিটি গুরুতর বিষয়গুলি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর সহিত পরামর্শ করিয়া আগামীকল্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু সেবাগ্রাম গিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। আগামী কংগ্রেসের তারিখ, আগামী কংগ্রেসের আয়োজন ও মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ সরীফের আবেদন সম্পর্কে মহাত্মার সহিত তাঁহার আলোচনা হয়। মিঃ সরীফের আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা চূড়ান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যপ্রদেশে কোন মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগ করা হইবে না।

মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ সরীফকে পুনর্নিয়োগের বিষয়ে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ আগামীকল্য বিবেচনা করিবেন। মিঃ সরীফ সেবাগ্রামে গিয়া মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং পুনর্নিয়োগের আবেদনের পক্ষে যুক্তি দেখাইয়াছেন।

মিঃ নরীম্যান সম্বন্ধে কংগ্রেস যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহারের জন্য বোম্বাইয়ের ৫ হাজার নর-নারীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদন ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস সভাপতির নিকট দাখিল করা হইয়াছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের তারিখ চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হইয়াছে। মহাত্মা তাঁহার সীমান্ত সফর একপক্ষকাল স্থগিত রাখিতে সম্মত হইয়াছেন, এজন্য আগামী ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন ১০ই, ১১ই ও ১২ই মার্চ্চ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন ৭ই, ৮ই ও ৯ই মার্চ্চ হইবে—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন তৎপূর্ব্বে বসিবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের বিশেষ অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। গত ১০ই ডিসেম্বর আয়কর বিলের দফাওয়ারী আলোচনা শেষ হইবার পর, অর্থ-সচিব স্যার জেমস গ্রীগের অসুস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিতিতে মিঃ সিংহ তৃতীয় দফা আলোচনার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই তাহা সমর্থন করেন। অদ্য তৃতীয় দফা আলোচনা শেষ হয় এবং মিঃ সিংহের প্রস্তাব বিনা ডিভিসনে পাশ হয়।

ডাঃ দেশমুখের হিন্দু নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদ বিলটি জনমত সংগ্রহার্থ প্রচার করিবার প্রস্তাব পাস হয় এবং গমের উপর আমদানী শুল্ক প্রবর্ত্তনের বিলটি বিনা ডিভিসনে গৃহীত হয়। দিল্লীর শিব-মন্দির সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত মুলতুবী প্রস্তাব না-মঞ্জুর হয়।

ব্যারিষ্টার ও প্রথম ভারতীয় কিংস কৌঁসুলী (কে সি) পণ্ডিত ভগবান দাস দুবে ফ্রান্সে মারা গিয়াছেন।

মেমেল পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। মেমেল জার্ম্মানরা ২৯টি আসনের মধ্যে ২৪টি আসন অধিকার করিয়াছে। এই নির্ব্বাচন জার্ম্মানী কর্ত্তৃক মেমেল গ্রাসের প্রথম ধাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

চিঠিপত্র

ভাষার স্বাজাত্য মর্য্যাদা

সবিনয় নিবেদন—

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, এই সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকায় সাময়িক প্রসঙ্গের 'গলদ কোথায়' শীর্ষক আলোচনাটি পড়িয়া খুব সুখী হইলাম। আপনি বেশ বলিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার সব কথা বলা হয় নাই। আপনি কেবল হিন্দীর কথাই বলিয়াছিলেন। হিন্দী ছাড়া আরও ত ভাষা আছে। আমি ইংরেজীর কথাই বলিতেছি। হিন্দী কেবল অ-বাঙালীদের সঙ্গেই চলে।' কিন্তু ইংরেজী যে বাঙালীদের সঙ্গেও চলিতেছে। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর কথা ছাড়িয়া দিলাম। তাঁহারা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলেন তাহা ইংরেজও বুঝিবে না, বাঙালীও বুঝিবে না। ইহা তাঁহাদেরই ভাষা এবং তাঁহারাই ইহা বুঝেন। কিন্তু অতি সাধারণ বাঙালীও দেখি কোন রকমে গোটা কয়েক ইংরেজী কথা সংগ্রহ করিতে পারিলে স্থানে অস্থানে তাহা প্রয়োগ করিতে ছাড়েন না। লেখার বেলাতেও এই। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর ত চিঠিপত্র লেখা ইংরেজী ছাড়া হয়-ই না। যাঁহারা ইংরেজীর কোন ধারই ধারেন না, তাঁহারাও বাঙলা চিঠির গোড়ায় ইংরেজী অক্ষরে 'মাই ডিয়ার—' লিখিয়া চিঠি সুরু করেন। সবচেয়ে মজা এই যে, যে লোকটার ইংরেজী বিদ্যা ইংরেজী অ... পরিচয়েই শেষ সেও ইংরেজীতে নহিলে নাম সহি করিবে না। ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিবেন না? বাঙলাদেশে বসিয়া কাহারও সঙ্গে বাঙলা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলিব না, ইংরেজীতেও না, হিন্দীতেও না, তা সে যেই হউক; এই না হওয়া উচিত? বাঙলার বাহিরে গিয়া হিন্দী বল, বিলাতে গেলে ইংরেজী বল, তাহাতে আপত্তি নাই। এমন কি বাঙলাদেশেই বাঙলা-না-জানা কোন অ-বাঙালী অতিথি আসিলে তাহার সহিত হিন্দী বা ইংরেজী যাহা খুশী বল, তাহাতেও আপত্তি করিতেছি না! কিন্তু বছরের পর বছর ধরিয়া যাহারা বাঙলাদেশে বাস করিতেছে এবং যাহারা বাঙলা শিখিবার জন্য এতটুকুও পরিশ্রম করিবে না, হয়ত বা বাঙলা শেখা অপমান বলিয়াই মনে করিবে, তাহাদেরও মন জোগাইবার জন্য আমাকে হিন্দী বা ইংরেজী বলিতে হইবে, ইহা কোনক্রমেই হওয়া উচিত নয়। বাঙালী এবং বাঙালীর মধ্যে হিন্দী বা ইংরেজী ব্যবহারের কোন প্রশ্নই উঠে না।

বিনীত—

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য,

শিমুলতলা (মুঙ্গের)।

লেখকের সহিত এ বিষয়ে আমাদের মতদ্বৈধ নাই।

সম্পাদক 'দেশ'।

৬ষ্ঠ বর্ষ দেশ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় 'প্রান্তরের মাঝে" অনুবাদটি অনবধানতাবশত পুনরায় মুদ্রিত হওয়ায় আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক, দেশ
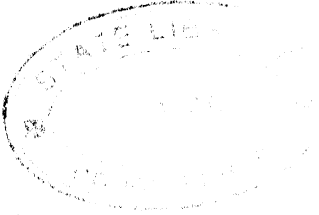
রঙ্গ-জগৎ

(৩২৭ পৃষ্ঠার পর)

তাঁহার প্রিয় একটি সিনেমা-তারকা আছে। কিন্তু তাঁহার স্বামী যে তারকাটির মত (ফিল্মে দেখান) তাঁহাকে নাটকীয় মরম-বাণী শুনাইবেন, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না মোটেই। অথচ মনের গহনে তৃষা রহিয়াছে, প্রেম-বেদীর প্রতিষ্ঠিতা দেবী হইবার।

মিলনান্ত চিত্র-রূপায়ন তাঁহার মনের মত। তথাপি যদি যথাযোগ্য দৃশ্যের নিখুঁত করুণ ব্যঞ্জনা তাঁহার নয়ন-যুগলকে আর্দ্র করিতে পারে, যদি আবেগময় স্পন্দন একটা তুলিতে পারে বুকের আকুলতার ভিতর দিয়া, তবে তিনি সে ক্রন্দন-মায়া উপভোগই করেন, অবশ্য যদি মন-মেজাজ প্রকৃতিস্থ থাকে।

চতুর্থ—১৯ বৎসরের তরুণ।

একা ফিল্ম দেখিতে যায়। নায়ক-নায়িকার দুঃখে কাঁদিতে ভাল লাগে, কিন্তু শেষাংশ যদি উল্লাস-উল্লোল না হয় তবে নিরুৎসাহের তরঙ্গ তাহাকে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত দোলা দেয়। খুঁটিনাটিতে ভুল তাহার মন্দ লাগে না। নায়কের পোষাক অনুকরণ করিতে তাহার ইচ্ছা হয়। সামাজিক চিত্রের যে নায়িকা-চরিত্র ধ্রুবতারার মত আকাশ-কোণ উজ্জ্বল করে অভিনেত্রীর রূপ-কঙ্কাল ছাপাইয়া, সেই মানসী প্রতিমার উদ্দেশ্যে সে প্রেমার্ঘ্য অর্পণ করে নিরালায়।

৬ষ্ঠ বর্ষ | শনিবার | ১৬ই পৌষ ১৩৪৫ সাল | 31st December 1938 | ৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

জাতির শক্তির সাহিত্য—

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাঙালীদের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতির ভাবকে সুদৃঢ় করা। এবার গৌহাটি অধিবেশনে এই বিষয়টির উপর জোর পড়িয়াছে দেখিয়া ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, বাঙালী জাতির মধ্যে জীবনীশক্তি ক্ষীণ তো হয়-ই নাই বরং উত্তরোত্তর আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন সাহিত্য-শাখা-সমিতির সভাপতিদের অভিভাষণে ঐ একই সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। মূল সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"বাঙালী আজ নিজ বাসভূমে পরবাসী। বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাপর প্রান্ত আজ রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের চক্রান্তে ভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে বঙ্গ ভাষাভাষী যাঁহারা অদৃষ্টচক্রে আসাম এবং বিহার প্রদেশে থাকিয়াও বিদেশী বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সংস্কৃতি বজায় রাখিবার জন্য সুখে-দুঃখে একতাবদ্ধ হওয়া এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া এবং বিহারী ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিয়া চলা। প্রবাসী বাঙ্গালী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাহার প্রতিভা এবং অধ্যবসায়ের বলে নব যুগের উদ্বোধন করিয়াছে; যুগপৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার এবং স্বাদেশিকতার বার্ত্তা বহন করিয়াছে। আজ অন্যান্য প্রদেশ তাহাদের ঋণ ভুলিতে পারে; প্রাদেশিকতার ভেদবুদ্ধি আজ স্বাজাত্যবোধের নামে হজম পাইতে পারে। কিন্তু বাঙালীর ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতবর্ষের অখণ্ড-রূপের বাঙালীই প্রথম পূজারী।" সভানেত্রী এই সঙ্গে একথাও বলিতে পারিতেন যে, বাঙলার সাহিত্যসেবকগণই এই পূজার প্রধান প্রবর্ত্তক। ভারতের নব জাতীয়তার তাঁহারাই অগ্রদূত। ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-যজ্ঞের তাঁহারাই হোতা। ভারতের স্বাধীনতার জন্য বেদনা বাণীমূর্ত্তি ধরিয়া উঠে প্রথমে বাঙালী কবিরই বীণায়, বাঙালী সাহিত্যিকের স্বর-ঝঙ্কার লহরীতে। প্রাদেশিকতার কোন আন্দোলনেই বাঙালীর এ গৌরব ম্লান হইবার নয়—ভারতের রাষ্ট্রীয় চেতনা যতই পরিস্ফুট হইতে থাকিবে ততই বাঙলার ত্যাগব্রতী নিষ্কাম বাণী-সাধকদের মহিমায় দিক্‌মণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বাঙালীর মায়ের পায়ে মাথা নোয়াইতে হইবে ভারতের সকল প্রদেশের নরনারীকে।

বাঙলার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—

বাঙলার সংস্কৃতির বিশিষ্টতা এই যে, ভারতের অখণ্ডতার অনুভূতির সঙ্গে তাহা নিজের যোগ রাখিয়া চলিয়াছে। প্রাদেশিকতার কোন গণ্ডীকে সে স্বীকার করে নাই। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সারগর্ভ এবং সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যের রস-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই তিনি শুধু করেন নাই, বঙ্গ-সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গীতিও তাহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলা এবং আসামের সংস্কৃতি কিরূপভাবে সম্মিলিত হইয়া একাত্মতা-লাভে সার্থক হইয়াছিল। তিনি সে কথা বলিয়াছেন। সমাজ-বিজ্ঞান সভার সভাপতি স্বরূপে রায় বাহাদুর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এই বিষয়টি আরও ভাঙ্গিয়া বলা হইয়াছে। তিনি তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার-ভাগে বলেন,—"ভারতবাসী প্রত্যেক জাতির ও সমাজের স্ব স্ব সুর বা বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও তাহাদিগকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সমান অধিকার প্রদান করিয়া মৌলিক আদর্শের দিকে পরিচালিত করা সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত পন্থা এবং প্রকৃষ্ট রাজনীতি। আমাদের প্রাদেশিক দেশনেতারাও ইহা স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব প্রান্তে উপনিবিষ্ট স্বদেশী-প্রবাসী বিভিন্ন জাতির ও তাহাদের ভাষার ও সংস্কৃতির উন্নতিতে বাধা প্রদান না করিয়া যদি যথাশক্তি উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা ভারত-সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে আবার একদিন ভারতের বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার মধ্যে মহান্ মৌলিক

ঐক্য সংস্থাপিত হইবে। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ছন্দ বা সুরের সমন্বয়ে ভারতমাতা আবার তাঁহার পূর্ণ-গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন।" আমরা এমন আদর্শের সমর্থন করি এবং আমাদের বিশ্বাস যে, নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং মাতৃভাষার সাধনার ভিতর দিয়াই বাঙালী জাত নিখিল ভারতের একীভূত শক্তিকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতে পারে। অতীত যুগের কথা তুলিবার আবশ্যকতা নাই; আধুনিক যুগে যাঁহারা বাঙলার সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের সেবায় আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই অবদান সমগ্র ভারতকেই সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইঁহারা শুধু বাঙলার কেন—সমগ্র ভারতের নব-জীবনের প্রবর্ত্তক। বাঙলার জাতীয়তার সঙ্গে নিখিল ভারতের জাতীয়তার অনুভূতি, বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে নিখিল ভারতের সংস্কৃতির—এই যে সংযোগ ইহা অবিচ্ছিন্নভাবেই চলিয়া আসিয়াছে এবং কোন দিন তাহা ছিন্ন হইবে না।

প্রগতি-সাহিত্যের আবহাওয়া

কলিকাতা শহরে নিখিল ভারত প্রগতি সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, সাহিত্য কাহারও ফরমাইস মত গড়া যায় না। যে সকল গুণ বা ধর্ম্ম প্রকৃত সাহিত্য গড়িবার পক্ষে অনুকূল সমাজ বা রাষ্ট্রে সেগুলি বাড়িবার উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারা যায় মাত্র। সাহিত্যিকদের এই অধিবেশনে সেই দিকে বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে শ্রীযুত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে কয়েকটি সুচিন্তিত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—'নৈতিক অধোগতি ব্যাপারটা কি, আমরা ভারতবাসী তাহা জানি; অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ব্রিটিশের অস্ত্রবলের প্রত্যেক সাফল্যে ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড ক্রমেই বেশী করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।' যত গলদ ত এইখানেই। সেনগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন, উন্নতির রথ যাহাতে ঠেলিয়া আগাইয়া লওয়া যায়, সেজন্য আমাদিগকে উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। এই উপায় উদ্ভাবন করার অর্থই জাতির স্বাধীনতার জন্য উপায় উদ্ভাবন। স্বাধীনতার জন্য ব্রতী হওয়া। দেশাচার, সংস্কার প্রভৃতি এ-সব উন্নতির পক্ষে অন্তরায় অনেক আছে, আমরা সে সবই স্বীকার করি; কিন্তু সব চেয়ে বড় অন্তরায় হইল, বিদেশীর অধীনতা। এই অধীনতা কৃত্রিম একটা আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া অবাধ মুক্ত বাতাস এদেশে বহিতে দিতেছে না। প্রত্যেক যুগের এক একটা বাণী আছে, এবং সে বাণীকে অপৌরুষেয় বাণী বলা যাইতে পারে। সে বাণী এদেশে বিস্তৃত হইতে পারিতেছে না, তাহা রসরূপে ধরিয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছে না এদেশে। বিদেশীর প্রভুত্ব স্বার্থের বেষ্টনে দিক আগুলিয়া রাখিয়াছে। এই অধীনতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে, ভারতভূমিতেও আমরা তুরস্ক, জাপান—এ-সব দেশেরই মত নব সৃষ্টির বিপুল আলোড়ন প্রত্যক্ষ করিতাম। দেশাচার এবং সংস্কারগত যত অন্তরায়—ধ্বসিয়া পড়িত সে-সব এদেশেও। এদেশের জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট এবং দৈন্যকে যে আমরা তীব্রভাবে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারিতেছি না, তাহাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি যে অনেকটা উপরভাসা রকমেই থাকিয়া যাইতেছে, বিদেশীর শাসনের কৌশলে সৃষ্ট কূপমণ্ডূক মনোবৃত্তিই রহিয়াছে ইহার মূলে। এই কারণেই সমাজ গতানুগতিক ধর্ম্মী বলিয়া মনে হইতেছে। সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ এদেশে নাই। প্রকৃতপক্ষে এদেশের সমাজ সচেতন নহে। আজ সাহিত্য বিশ্ব-চেতনার প্রেরণায় সমাজের মধ্যে প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করিতে পারে না। অবশ্য সে-ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সাহিত্যের দৃষ্টিতে দেশ, কাল বা পাত্রের বিচার নাই, তাহা যে নাই, আমরা একথা স্বীকার করি; কিন্তু মানবতার বিচার আছে ত? সাহিত্যিক যদি সেই মানবতার রসে নিজের চিত্তকে সিক্ত করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে এদেশের জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট এবং দৈন্যের বেদনা সংযোগ তাঁহার সৃষ্টির মধ্য দিয়া সমাজে সঞ্চারিত হইবেই। প্রগতি সাহিত্যের গুণ এবং ধর্ম্ম—আমরা বুঝি এই বেদনাকে। পরের দেশ হইতে ধার করা কতকগুলি কথা আওড়ান কিংবা গল্প, উপন্যাস বা কবিতার মধ্যে সেইগুলির গোটাকত বাছিয়া বাছিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া এক কথা, আর মানবের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা-লাঞ্ছনার আত্যন্তিক অনুভূতিতে অন্তর হইতে রস-ধারার স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ অন্য কথা। প্রগতিগিরি ফলাইবার একটা বাতিক এদেশে দেখা দিয়াছে—দেশের লোকের দুঃখ-কষ্ট, কিংবা তাহাদের দুর্দ্দশার জন্য আন্তরিক অনুভূতি ইহাদের নাই, আছে শুধু উপদেষ্টা সাজিবার—অনেকটা ফোঁপর দালালী করিবার শুধু একটা লঘুতা। আমরা জানি, সাহিত্যে এ-সব জিনিষ কোনদিনই স্থায়ী হইতে পারে না। এদেশের জনসাধারণের—পতিত অবস্থার জন্য প্রকৃত বেদনা যাঁহার অন্তরে জাগিবে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভও তাঁহার অন্তঃকরণে উগ্র হইয়া উঠিবে, ইহাই স্বাভাবিক। প্রগতি-সাহিত্যের এই যে বর্ত্তমান কালোপযোগী বিশিষ্ট লক্ষণ, বাংলা-সাহিত্যে আমরা তাহারই বিকাশ দেখিতে চাই। নিখিল ভারত প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে ভারতের স্বাধীনতা দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ভারতের পরাধীনতার জন্য বেদনা শুধু রাজনীতিক যাঁহারা তাঁহাদেরই নয়, সে বেদনা যাঁহারা সাহিত্যিক তাঁহাদেরও। এদেশের জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট, গ্লানি-লাঞ্ছনার মূলে বিদেশীর পরাধীনতা এতখানি বাস্তব হইয়া রহিয়াছে যে কবি বা সাহিত্যিক তাহাতে অনপেক্ষ থাকিতে পারেন না। তাঁহারা যদি সত্যই সাহিত্যধর্ম্মী হন, তাহা হইলে যে বেদনা গোর্কির লেখার ভিতর দিয়া, যে বেদনা রোমা রোলাঁর লেখার ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছে, সেই বেদনা তাঁহাদের লেখাতেও বিচ্ছুরিত হইবে এবং ভাঙ্গিয়া ফেলিতে শক্তি জাগিবে কঠোর ও নির্ম্মম হস্তে সেই সমস্ত অনাচার অবিচারকে যেগুলি মনুষ্যত্বকে ক্লিষ্ট এবং পিষ্ট করিতেছে সমাজ ব্যবস্থায় এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। মানুষের সেই বেদনার অনুভূতি যাঁহার মধ্যে জাগে নাই, তাঁহার সাহিত্য-সাধনা শুধু বিলাসিতা মাত্র। তাঁহার কবিতা শুধু মনের বিকার।

রাষ্ট্রীয় জাগরণে নারী—

গত সপ্তাহে কলিকাতা শহরে নিখিল বঙ্গ মহিলা সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গেল। সম্মেলনের অভি-নেত্রীস্বরূপে শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন। বাঙলার নারী-সমাজ আজ আর ঘুমাইয়া নাই। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহারা আগাইয়া আসিতেছেন। বিগত অসহযোগ আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় সাধনায় নারী-মহিমার দীপ্তি-দ্যুতি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জাতির জননীস্বরূপিণী তাঁহারাই। তাঁহাদের মধ্যে শক্তি না জাগিলে জাতির স্বাধীনতা, জাতির মুক্তি কোন দিক হইতেই সার্থক হইতে পারে না। বিগত সম্মেলনে কংগ্রেসের মহিলা সদস্যগণ সমবেত হইয়া নিজেদের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-প্রণালী লইয়া জাতির মুক্তি-সাধনায় কাজ করিবার উপায় সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিয়াছেন। এদিকে অনেক কাজ করিবার আছে। পরিবারের প্রাণস্বরূপিণী হইলেন তাঁহারা। পরিবারের সমষ্টি লইয়াই সমাজ, জাতি এবং দেশ। প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণাকে বাঙলার নারী নিজ মহিমায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলুন। দেশের জন্য, জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকারের উদ্দীপনা তাঁহারা সঞ্চারিত করুন জাতির মধ্যে। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন যে, রাজনীতি নারীদের জন্য নয়, আমরা তাঁহাদের মত সমর্থন করি না। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, রাজ-নীতিক ভাবধারার বড় রকমের প্লাবন যখনই ঘটিয়াছে নারী তাহাতে শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন। এ দেশের নারী-সমাজেও এপক্ষে ব্যতিক্রম ঘটে নাই। লক্ষ্মীবাই, অহল্যা-বাই এদেশেরই নারী—রাণীভবানী এই বাঙলা দেশেরই মেয়ে। বাঙলা দেশের নারী সন্তানকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বর্ম্ম-চর্ম্ম পরাইয়া রণাঙ্গনে যেদিন পাঠাইতেন, সেদিনের কথা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইলেও বাঙলার নারী যে বৃহত্তর মানব-ধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য—মানব-সেবার মহোচ্চ-ব্রতের প্রেরণায় নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তানকে পথের বাহির করিয়া দিয়াছেন—সে নজীর রহিয়াছে—নদীয়ায়। সেই শক্তি যদি পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহা হইলে জাতির মুক্তি, জাতির স্বাধীনতার সাধনায় ত্যাগের বহ্নিজ্বালার বিচিত্র বিকাশও এই বাঙলায় ঘটিবে; কিছু যে ঘটে নাই সে কথাই-বা কেমন করিয়া বলি? পুত্রহারা মাতা, ভাইহারা ভগিনী, স্বামীহারা সতীর নেত্রনীর বাঙলার বুককে কি কম সিক্ত করিয়াছে? সে অশ্রু কি ব্যর্থ হইবে? ব্যর্থ হইতে পারে না। নিখিল বঙ্গ নারী-জাগরণের এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া সেই শক্তিকেই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের ভবিষ্যৎ—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সেদিন বোম্বাইয়ের সাংবাদিকদের বৈঠকে বলিয়াছেন—"হক মন্ত্রিমণ্ডল সম্পর্কে বলা যায়, বাঙলার কংগ্রেসসেবী মাত্রেই ইহার বিরুদ্ধবাদী। প্রকৃত [illegible] মণ্ডল পূর্ব্বের তুলনায় যথেষ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের অধিবেশনকালে হক মন্ত্রিমণ্ডলের পতন না ঘটিলে আমি বিস্মিত হইব।" বাঙলার সুখী পরিবারের ভিতরের অবস্থা যে, ততটা সুখকর নহে, এ প্রমাণ নানাদিক হইতেই পাওয়া যাইতেছে। অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার ওয়ার্দ্ধা যাওয়ার কৈফিয়তে মহাত্মাজীর সাক্ষাতের নিষ্কাম আনন্দ উপভোগের অজুহাত যতই দেখান না কেন, সাধারণে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিবে না এবং তাঁহার মত প্রকৃতির লোকের যে দলগত চক্রান্তে বা তৎসম্পর্কিত গুপ্ত-নীতির প্রয়োগ-পটুতার ইতিমধ্যে অভক্তি জাগিয়া গিয়াছে, এ কথাটা আশার কথা হইলেও আস্থার কথা নয়, ইহা অনেকেই বলিবেন। সেদিন পাটনা শহরে মোশলেম লীগওয়ালাদের এক সভায় কলিকাতার মৌলানা জান মহম্মদ নলিনীরঞ্জনের ওয়ার্দ্ধা যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক অথবা বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের তরফ হইতে এবং তাঁহাদের সম্মতি লইয়াই ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মাজীর সঙ্গে আলোচনা চালাইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ছলে-বলে বাঙলার হক মন্ত্রিমণ্ডলকে কায়েম করিতে কৌশল প্রয়োগ করাই ছিল অর্থসচিবের ওয়ার্দ্ধা যাত্রার নিষ্কাম উদ্দেশ্যের একমাত্র কামনা এবং সেই কামনা সিদ্ধ করিবার জন্য— যিনি সকল ঘটে আছেন কোঁপর-দালালী করিতে, যিনি বাঙলা দেশের না হইলেও বাঙলা দেশের সর্দ্দারী করিতে যিনি উদ্গ্রীব—সেই বিড়লা-জীর উপর তিনি ভর করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি—নলিনীরঞ্জনের চাল ধরিয়া ফেলিয়াছেন। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের অবস্থা যদি সুখেরই হইত, তবে অবশ্যই এই ধরণের ছুটাছুটির দায় দেখা দিত না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সামসুদ্দিন এবং তমিজুদ্দিন এই দুই সাহেবকে দলে জুটাইয়াও বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। সেদিন নিখিল বঙ্গ কৃষক সমিতির সভায় এই দাবী করা হইয়াছে যে, বাঙলা দেশের জেলা বোর্ড প্রভৃতির নির্ব্বাচনে মনোনয়ন প্রথা রহিত করিতে হইবে। কৃষকদের উপর কোন কর ধার্য্য না করিয়া বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং প্রত্যেক মন্ত্রীর বেতন এক হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। যদি মন্ত্রিমণ্ডল এই সব দাবী না রাখেন, তবে মৌলবী সামসুদ্দিন সাহেবকে মন্ত্রিগিরি ছাড়িয়া আসিতে হইবে। এ সব কাজে কতটা হইবে সবই জানা আছে—বরাবরকার যে চাল ইহাও সেই চাল—সহাইয়া সহাইয়া হাতে আনার কায়দা। কিন্তু কৃষক দলের স্বার্থ যাহার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত, সেই পাটের দর এবং চটকল নিয়ন্ত্রণ আইনের কি হইল? সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই নাই যে। সে দিকে কিছু করিতে গেলে শ্বেতাঙ্গ স্বার্থসেবীর দল বিগড়াইয়া যাইবে, অথচ তাঁহারাই যে মন্ত্রীদের পিছনে প্রধান প্যালা! দেশের লোকের দুর্দ্দশা লইয়া মন্ত্রিগিরির এই যে ব্যবসা, ইহা আর কত দিন চলিবে?

অভিযোগ কোথায়—

কংগ্রেসী প্রদেশসমূহে মুসলমানদের উপর ঘোরতর রকমের অবিচার হইতেছে, মোস্লেম লীগের চাঁইয়ের দলের মুখে এই চীৎকার আমরা অনেক শুনিয়াছি। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের বাঘাই ডাকও এই সম্পর্কে অনেক শোনা গিয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, তামামই ফাঁকা। নিখিল ভারত মুশ্লীম লীগ এই সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি বলিতেছেন, 'বন্দে মাতরম', 'জাতীয় পতাকা' এবং 'গো-রক্ষা', এই তিনটিই হইল মুসলমানদের উপর অবিচারের প্রধান কারণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সবচেয়ে বড় অভিযোগ যে অর্থনৈতিক অসুবিধার অভিযোগ, তাহার কোন ভিত্তিই নাই। ঐ তিনটি অভিযোগের সংগে অর্থনীতির কোন সম্পর্কই নাই। আর সকলেই জানেন, ঐ যে তিনটি অভিযোগ, তাহাও নিতান্তই মনগড়া। বিরোধ একরকম না একরকমে পাকাইয়া না রাখিলে মোড়লী চলে না; সেই জন্যই মোস্লেম লীগের দল নিজেরা কৃত্রিমভাবে ঐ কয়েকটি বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া কংগ্রেসের সংগে একটা বিরোধের ভাব জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। 'বন্দে মাতরম' এই সংগীতের সংগে সাম্প্রদায়িকভাবে হিন্দু ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই এবং যদি কিছু থাকে, তবে ধর্ম্মের সেই যে সাম্প্রদায়িকতা তাহার অস্বীকৃতির দিক হইতেই আছে। সাম্প্রদায়িকতার উপর আঘাতই আছে ঐ সংগীতে,—আমরা এ কথা অনেকবার বলিয়াছি এবং মুসলমান সমাজের মধ্যেও যাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহারাও অনেকে সেই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু, তবু অজ্ঞের দল যদি অনর্থ, কদর্থ করে, এই আশঙ্কায় কংগ্রেসের কর্ত্তারা আমাদের মতে নিতান্তই অযৌক্তিকভাবে ভারতের ঐ যে জাতীয় সংগীত তাহার অংগচ্ছেদ পর্য্যন্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন। তবুও ন্যাকামির শেষ নাই! জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে আমাদের মত সুস্পষ্ট। কংগ্রেসের জাতীয় পতাকাতে সাম্প্রদায়িকতার কোন ছাপ নাই; মোস্লেম লীগ-ওয়ালারা এই পতাকার বিরুদ্ধে হুজুগ তুলিয়াছেন কিছুদিন হইল। তাহার আগে অসহযোগ আন্দোলনের সময় পর্য্যন্ত কোন মুসলমান ঐ পতাকার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। আজ যাঁহারা লীগের দলের চাঁই তাঁহারাই একদিন ঐ পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। গো-রক্ষা সম্বন্ধে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টসমূহ, এমন কোন বিধি-বিধান করেন নাই, যাহাতে মুসলমানদের অভিযোগের কারণ থাকিতে পারে। যদি তাহাই করিবেন, তাহা হইলে কমিটির এই আপশোষ করিবার কারণ নিশ্চয়ই থাকিত না যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা আলেম, সেই উলেমারা সবই কংগ্রেসের পক্ষে। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাসী যাঁহারা, যাঁহারা পণ্ডিত ধর্ম্মহানির যথার্থ কারণ যদি কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বে থাকিত, তবে তাঁহারা কিছুতেই কংগ্রেসের সমর্থক হইতেন না। কংগ্রেসের গণ-আন্দোলন মুশ্লীম লীগ কমিটিকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তুলিবার কথাই! মুসলমান সমাজ যদি তাঁহাদের হুকুমেই উঠিত-বসিত, তবে এমন উদ্বেগ নিশ্চয়ই দেখা যাইত না। প্রকৃতপক্ষে ভারতের মুসলমান সমাজ, লীগওয়ালাদের স্বরূপ বুঝিয়া লইয়াছে; মুশ্লীম লীগ কমিটির রিপোর্টেই দেখা যাইতেছে—ইহার স্বীকৃতি।

চাই কি ঝগড়া?

পাটনায় নিখিল ভারতীয় মোস্লেম লীগের অধিবেশন হইয়া গেল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিস্বরূপে মিঃ সৈয়দ আবদুল আজিজ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা এবং দেশের লোকের আর্থিক উন্নতির জন্য যেটুকু দরকার মুসলমানেরা সেটুকু জাতীয়তাই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। জন্মভূমি বা মাতৃভূমিকে লইয়া তাহারা বাড়াবাড়ি করিতে চায় না, রুটির সম্বন্ধেও তাহাদের ঐ কথা, তাহারা এগুলিকে বিগ্রহের মত পূজা করিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমন বুঝিবেন না যে, নিজেদের দেশের উপর মুসমানদের ভালবাসা কোন অংশে কম কিংবা দেশে অর্থনীতিক সমস্যার সমাধানে তাহাদের আগ্রহ কোন অংশে কম। আজিজ সাহেবের নিজের কথা হইতেই দেখা যাইতেছে, তাঁহারা দেশের স্বাধীনতাও চাহেন, আর্থিক সমস্যার সমাধানও করিতে চান। এ দেশের যাঁহারা জাতীয়তাবাদী, তাহা হইলে তাঁহাদের সংগে আদর্শের পার্থক্য বস্তুত থাকে তাঁহাদের কিসে? পার্থক্য না থাকিলেও একটা পার্থক্য সৃষ্টি করিতে হইবে, ঝগড়া করিবার কোন কিছু না থাকিলেও ঝগড়ার জন্য কতকগুলো নেহাৎ ফাঁকা কথার ফ্যাকড়া তুলিতে হইবে—তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে দেখা যায় ইহাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা বুঝেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় জাতির ঐক্য বা সংহতি ব্যতীত দেশের স্বাধীনতা কিংবা দেশের লোকের আর্থিক সমস্যার সমাধান এ দুইয়ের কোনটিই সম্ভব নয়। দেশের স্বাধীনতা কিংবা দেশের লোকের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিকতা যদি তাঁহাদের একান্ত হইত, তাহা হইলে সংহতি এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাও তাঁহারা উপলব্ধি করিতেন; কিন্তু মোস্লেম লীগের চাঁইদের কাছে সে জিনিষটা বড় নয়—বড় হইল বিরোধের ভাবটা জাঁকাইয়া তোলা; কারণ তাহা না হইলে তাঁহাদের নেতাগিরির ব্যবসা চলে না। ভূতপূর্ব্ব মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উডরো উইলসন তাঁহার 'ষ্টেট' নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তৃত্বে মুশ্লীম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ হইল ভেদ-নীতিতে। লীগের চাঁইরেরা সাম্রাজ্যবাদীদের সেই স্বার্থেরই সকল দিক হইতে বিশ্বস্ততা সহকারে সেবা করিতেছেন; কিন্তু দেশের লোকে তাঁহাদের এই ব্যবসার গুমর ধরিয়া ফেলিয়াছে।

বাঙালী-বিহারী সমস্যা—

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙালী-বিহারী সম্মেলন সম্বন্ধে যে-সব সুপারিশ করেন, সেগুলি আমরা সমর্থন করিতে পারি নাই। আমাদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিও সেগুলি সমর্থন করিতে পারিবেন না, কারণ সেগুলি সুস্পষ্টভাবেই কংগ্রেসের আদর্শ এবং মূল নীতির বিরোধী

ছিল। আমরা জানিতে পারিলাম যে, ওয়ার্কিং কমিটি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের কতকগুলি সুপারিশের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং সেগুলির সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। পাঠকবর্গ অবগত আছেন, রাজেন্দ্রবাবু তাঁহার রিপোর্টে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বিহার গবর্ণমেণ্ট বিহারীদিগকে নিজেদের কারখানায় চাকুরী দিবার জন্য আইন করিয়া কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ দিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু নৈতিক চাপ দিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টের এই নৈতিক চাপের অর্থ কি—অনেকেই বুঝিবেন। ওয়ার্কিং কমিটি এই নৈতিক চাপ দিবার প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কোন প্রদেশের লোককে, কে কোন চাকুরীতে লইবে—না লইবে, সেজন্য কোন রকমের চাপ দেওয়া চলিবে না—আইনের চাপ, কি নৈতিক চাপ। রাজেন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, দশ বৎসর বিহারে বাস না করিলে কেহ বিহারের বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হইবে না। ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিহারেই যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদের উপর আর এই দশ বৎসরকাল বিহার-বাসের বিধান প্রযুক্ত হইবে না। বিহারে জন্মিলেই সে বিহারের বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হইবে। যাঁহারা অন্য প্রদেশ হইতে বিহারে গিয়াছেন, তাঁহাদেরই ক্ষেত্রে শুধু দশ বৎসরকাল বিহারে থাকিবার বিধান খাটিবে। বিহারের বাঙালীদের ছেলে-মেয়েরা যাহাতে বাঙলা ভাষা শিক্ষার আরও ভাল সুবিধা পায়, ওয়ার্কিং কমিটি নাকি তেমন ব্যবস্থা করিতেও পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ছোটখাটো অন্য রকমের অন্যান্য কয়েকটি পরিবর্ত্তনেরও নাকি প্রস্তাব করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পাকা কথা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই, তবে মোটামুটি এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, বিহার-সরকারের প্রবর্ত্তিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙালী পক্ষের যে-সব অভিযোগ, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেগুলিকে যতটা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং বিহার-সরকার সেগুলিকে যতটা সমর্থনযোগ্য বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটি তেমন দৃষ্টিতে সমস্যাটি দেখিতে পারেন নাই। বিহারের কয়খানা তথাকথিত কংগ্রেসীদলের মুখপত্র, বাঙালীদের অভিযোগ অযৌক্তিক বলিয়া ক্রমাগত আর্ত্তনাদ তুলিলেও অভিযোগের কারণ যে সত্যই রহিয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটি তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের সিদ্ধান্তকে তাঁহারা সর্ব্বাংশে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। ওয়ার্কিং কমিটি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা উভয় পক্ষেরই সন্তোষজনক হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার, সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইলে আমরা তাহা বলিব। কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রকাশে যে, কত বিলম্ব হইবে তাহাই বা কে বলিবে, কারণ, ব্যাপার আবার রাজেন্দ্রবাবুর উপরই গিয়া পড়িয়াছে।

এশিয়া—এশিয়াবাসীর জন্য—

কথাটা শুনিলে কোন্ এশিয়াবাসীর মন-প্রাণ নাচিয়া না সব সময় না হইলেও মনের অবচেতন-স্তরে সব সময়ই এমন একটা ঘৃণার ভাব আমাদের আছে এবং তাহা থাকা স্বাভাবিক। জাপান এই ধুয়া তুলিয়াছে যে, এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য; কিন্তু ইউরোপীয় জাতিদের অধীনতার যে কারণে আমাদের অন্তর ঐ কথায় আনন্দের সঙ্গে সাড়া দেয়। সেই অধীনতা জাপান আসিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপাইতে যে চেষ্টার কসুর করিবে না, এই বোধের সঙ্গে সঙ্গেই জাপানের প্রতিও আমাদের মন বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে। চীনে জাপানীদের কাণ্ডে এদিক হইতে আমাদের চোখ উন্মুক্ত হইয়াছে। জাপ-গবর্ণমেণ্টের সদস্য তাকাওকা কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেন। এই দেখা-সাক্ষাতের সময় ঐ কথাটা উঠিয়াছিল, মহাত্মাজীর উক্তি হইতেই তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। মহাত্মাজী তাকাওকাকে বলেন,—'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য—এই নীতি আমি সমর্থন করিতে পারি না। এশিয়া কূপমণ্ডূক হইয়া থাকিতে পারে না। বিশ্ব-জগতের নিকট এশিয়ার বাণী আছে।" মহাত্মাজী ভাবের দিক হইতে কথাটা বলিয়াছেন। রাজনীতি হইতে উহা উঁচু-দরের কথা। কিন্তু আমাদের এই বিশ্বাস যে, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ভিন্ন এশিয়ার কোন বাণীই বিশ্ব-জগতে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না। খৃষ্টও এশিয়ায় জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু সেই খৃষ্ট আজ যদি এশিয়াবাসীর মত প্রকট দেহে ইউরোপে হাজির হন, তাহা হইলে ইউরোপের লোকেরাই তাঁহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। এশিয়ার বাণী বাস্তবরূপে বিশ্ব-সভ্যতায় কিছু পরিমাণ সার্থক হইতে পারে, এশিয়ার প্রত্যেক দেশ যদি স্বাধীন হয় তবে; কিন্তু সে কথার অর্থ ইহা নহে যে, এশিয়ারই একটা জাতি আসিয়া অপর জাতির ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে—আর শাসনের নামে তাহাকে শোষণ করিয়া ইউরোপের সঙ্গে গুণ্ডামীতে টেক্কা দিবার ফিকিরে থাকিবে। অধীনতার রূপে বদলাইলেও ক্রিয়া সমানই হয়। ইউরোপীয় প্রভুত্বের প্রকৃতি লইয়া জাপান যদি এশিয়া জুড়িতে বসে, তবে পার্থক্য হইল কোন্ দিক হইতে?

সত্যাগ্রহের জয়—

তিনমাস পূর্ব্বে রাজকোট রাজ্যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। এতদিনে এই সত্যাগ্রহে প্রজা পক্ষের জয় হইয়াছে। রাজকোটে ঠাকুর সাহেব সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সেখানে দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করা হইবে—এই ঘোষণা করিয়াছেন। রাজকোট দরবার হইতে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দান করা হইয়াছে এবং যাহাদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করা হইয়াছিল তাহাদিগকে তাহা ফেরৎ দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের এই চৈতন্যোদয়ে আমরা সুখী হইয়াছি; কিন্তু এজন্য ধন্যবাদভাজন প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করিয়া বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন—সেই দুঃখব্রতী সত্যাগ্রহীর দল। তাঁহারা দুঃখ-কষ্ট বরণে অগ্রসর না হইলে ঠাকুর সাহেবের আজ যে শুভবুদ্ধির বিকাশ আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার বিকাশ ঘটিত না। অধিকার যে হাতে পায় সে সহজে তাহা ছাড়ে না

দেওয়া ভুল। অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করিতে হয় নিজেদের শক্তির জোরে। রাজকোটের সত্যাগ্রহীরা সেই শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সেখানকার রাষ্ট্রাধিকারীরা দেখিয়াছেন যে, মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারমূলক প্রভুত্বের দিন এখন আর নাই। সভ্য রাষ্ট্রের বর্ত্তমান আদর্শ হইল জনগণের দ্বারা শাসন—জনগণকে শাসন নয়। ভারতের অন্যান্য যে সমস্ত নৃপতির ঐ সম্বন্ধে চৈতন্যোদয় ঘটে নাই—রাজকোটের এই ব্যাপারে আমাদের মনে এই আশা জাগিয়াছে যে, চৈতন্যোদয় তাহাদেরও ঘটিবে; সেজন্য প্রজাপক্ষ হইতে হয়ত আরও একটু বেশী দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পশীলতা দেখাইতে হইবে। স্বাধীনতার সম্বিৎ যদি জাগে তবে আর তাহা লুপ্ত হয় না - প্রতিকূলতা যত জোরই হউক না—সহস্রশীর্ষ পুরুষের জাগরণে স্বেচ্ছাচারের শেষ চিহ্ন ভারত হইতে বিলুপ্ত হইবে, এ সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহই নাই।

ইংরেজী নববর্ষ—

ইংরেজী নববর্ষ আসিল। নববর্ষের উপাধি বণ্টনের আশায় ঊর্দ্ধমুখ হইয়া যাঁহারা চাতকের মত অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের কাহার অদৃষ্টে কি ছিটে ফোঁটা জুটিবে কে জানে! আশা করা যায়, আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব সংঘাত সহ্য করিয়া তাঁহাদের প্রাণ-বিহঙ্গ এই কয়টা দিন কাটাইতে পারিবে। তোড়জোড় চারিদিক হইতে যে আন্দাজ পাকিয়া উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয় শান্তির জন্য যে স্বস্ত্যয়ন বড়দিনে সুরু হইয়াছে, নূতন বর্ষে তাহার সুফল দেখা দিতে আরম্ভ করিবে। কলিকাতার বড় পাদরী সেদিন বেতারযোগে শান্তির জন্য সেই স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষে এই ওয়াজ করিয়াছেন যে, যুদ্ধ যেজন্য বাধে, সেই পাপ প্রবৃত্তির অভাবাত্মক অবস্থাই লাভ করাতেই শান্তি। খৃষ্টধর্ম্মের তথাকথিত উপাসকের দল এই অবস্থা লাভের দিকে যে আন্দাজ আগাইয়া যাইতেছেন, তাহাতে সপ্ত স্বর্গের দ্বার এক সঙ্গে খোলা রাখা দরকার হইয়া পড়িতেছে নিশ্চয়। বড় পাদরী সাহেব যে জাতির পক্ষ হইতে এদেশে সেই শান্তির ব্রত প্রচার করিতেছেন, সে জাতি এদিক দিয়া কতটা আগাইয়া গিয়াছে? যে পাপ-প্রবৃত্তির ফলে যুদ্ধ ঘটে—সে প্রবৃত্তির চর্চ্চাটা যদি তাঁহারা বন্ধ করিত তাহা হইলে কৃষ্ণাঙ্গ জাতির বোঝা বহনের গুরুভার ভগবান সেই বেচারীদের উপর চাপাইয়া তাহাদিগকে নিতান্তই যে নাজেহালটা করিতেছেন, অন্ততঃ সে অবস্থাটা হইতে তাহারা রেহাই পাইত। কিন্তু নেহাৎ তাহাদের অদৃষ্টের দোষ। সে পাপ-প্রবৃত্তিকে তাহারা ছাড়িতে পারে নাই, এবং শান্তির জন্য মুখে যত বুলিই আওড়াক সেজন্য তাহাদের গরজে যে আন্তরিকতা আছে, এমনও বুঝা যাইতেছে না। বরং আগে যাঁহাদের মুখে সময় সময় যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা শুনিতাম, আজ তাঁহাদেরও মুখে এমন কথা শুনা যাইতেছে যে, সমর-সজ্জা করাই শান্তিকে সুনিশ্চিত করিবার একমাত্র উপায়। সমর-সজ্জা করার অর্থ অবশ্যই যে পাপ-প্রবৃত্তির ফলে যুদ্ধ ঘটে তাহার অভাবাত্মক মানসিক অবস্থার জন্য সাধনা নয়। ইংরেজ যতদিন পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য-স্বার্থ-শোষণের মনোবৃত্তি না ছাড়িবে, ততদিন পর্য্যন্ত বড় পাদরী যাহাকে পাপ বলিয়াছেন, সেই পাপের পথ হইতে ধর্ম্মের পথ ধরিবার সাধ্য তাহার নাই। এই সাম্রাজ্য-স্বার্থই আবার অপর শক্তির অন্তরে ঈর্ষার উদ্রেক করিয়া জগতের শান্তিকে বিক্ষুব্ধ করিবে। এ দেশের কালা আদমীদিগকে ধর্ম্মের তত্ত্বকথা না শুনাইয়া ইঁহারা যদি নিজেদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদিগকে কার্য্যত ধর্ম্মের পথে ফিরাইতে চেষ্টা করেন, তবেই ভাল হয়।

পরের দোষ-গুণ বিচার—

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা মুসলমান সমাজের উপর অত্যাচার, অবিচার হইতেছে, এই অভিযোগ যে কত ভিত্তিহীন, মোস্লেম লীগের নিজেদের নিযুক্ত কমিটির রিপোর্টই সে পক্ষে প্রমাণ। সেই রিপোর্টেই দেখা যাইতেছে, অভিযোগ বিলকুল খোয়াব! কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অভিনয়ের কমতি নাই। মোস্লেম লীগের মণ্ডলী মধ্যে বীররসের অভিনয়ে যিনি বড় ওস্তাদ তিনি অর্থাৎ মৌলবী ফজলুল হক সাহেব আস্ফালন করিয়া বলিয়াছেন, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার হইতেছে, যে মুহূর্ত্তে তাহার বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবে, সেই মুহূর্ত্তে—আমি মন্ত্রীগিরিতে জবাব দিয়া ফকিরী লইয়া তার্কে-মোলাৎ-এ ভিড়িব। হক সাহেব নিজেও জানেন, কারণ যখন নাই তখন কার্য্যও ঘটিবে না, বিপন্ন মোস্লেম রক্ষার বাহাদুরীটা যদি ফাঁকতালে পাওয়া যায়; মন্ত্রীগিরি কায়েম রাখিবার পক্ষে আখেরে তাহাতে কাজ দিবে। কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে হক সাহেবের এই ফাঁকা হুমকীতে বিপন্ন ইসলামের বাতিকওয়ালারাই দুই-একজন ভুলিবে; কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহারা ভুলিবেন না। হক সাহেবের নিজের মুখের আপশোষেই দেখা যাইতেছে যে, বাঙলা দেশের মুসলমান সমাজের মধ্যে ঐ ধরণের ধাপ্পাবাজী আর চলিতেছে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, অন্য প্রদেশে মোস্লেম লীগের যেমন প্রভাব, বাঙলা দেশে তেমন নাই। সেই যে বাঙলা দেশ, সেই বাঙলা দেশের কংগ্রেসওয়ালা যাঁহারা, তাঁহারাই না হয় হক সাহেবের সুখী পরিবারের মুলোকে বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; কিন্তু নেহাৎ যাঁহারা বাস্তববাদী—রাজনীতিক দলাদলির সঙ্গে যাঁহাদের সম্পর্ক নাই, বিধি-বিধান লইয়াই যাঁহাদের কারবার, সেই আইন-ব্যবসায়ীরা নিখিল বঙ্গ এবং আসামের ব্যবহারাজীবেরা তাঁহাদের সম্মেলনে সেদিন সমবেত হইয়া হক মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। হক মন্ত্রিমণ্ডল কিভাবে ক্রমাগত ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, দমন-নীতিমূলক যে সব জরুরী ব্যবস্থা বাঙলা দেশকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে দাবী করিয়াছেন। যেখানে বাঘ পড়ে নাই, সেখানে বাঘ পড়িয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া দুই-একদিন বাজে লোক জমান যাইতে পারে, কিন্তু বেশী দিন সে ধাপ্পাবাজী চলে না। পরের চোখে কুটা দেখাইবার জন্য কোমর না বাঁধিয়া হক সাহেব নিজের চিন্তা করুন; নিজেদের চোখে যে কড়িকাঠ ঢুকিয়া রহিয়াছে।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভানেত্রীর অভিভাষণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কামাখ্যা দর্শনে সিয়াছিলাম। গৌহাটির সহিত সেই মার প্রথম পরিচয়। সেবারে আমার ান স্নেহাস্পদ আমাকে তাঁহাদের হিত্যিক, সামাজিক কর্ম্মপ্রতিষ্ঠার দর্শনস্বরূপ বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-ুলি দেখিয়া যাইবার জন্য এখানে কয়েক ন থাকিতে অনুরোধ করেন। তখন াঁহাকে আমি বলিয়াছিলাম যে, এবারে ার সুবিধা হইয়া উঠিল না; বারান্তরে াসিলে দেখিয়া যাইব। সে সুযোগ ় এত শীঘ্র আসিবে তাহা তখন ভাবি াই। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ভানেত্রীরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান দিয়াছেন তাহার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। প্রচলিত রীতিতে অযোগ্যতার জন্য কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে চাহি না। যাঁহারা এই সম্মেলনে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমার শ্রদ্ধা এবং স্নেহভাজন। মা বলিয়া তাঁহারা ডাকিয়াছেন, তাঁহাদের স্নেহের সম্মান রক্ষা করিতে রোগশোকজীর্ণ দেহ-মন লইয়া আসিয়াছি। সন্তানের নিকট নিজ যোগ্যতা-অযোগ্যতার তর্ক তুলিয়া তাঁহাদিগকে লজ্জায় ফেলিতে ইচ্ছুক নহি। আমার বক্তব্য আমি সংক্ষেপে বলিবারই চেষ্টা করিব। আজ বক্তার আসন অপেক্ষা শ্রোতার আসনের প্রতিই আমার লোভ বেশী। নূতন কিছু শুনাইবার আশা অপেক্ষা নূতন কিছু শুনিবার আশাই আমার অধিক। তথাপি আমাকে কিছু বলিতে হইবে।

সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। জগতের ইতিহাসে দেখা গিয়া থাকে যে জাতির উন্নতির সহিত জাতীয় সাহিত্যের জাগরন অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। যে-জাতি যখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সাহিত্য-গগনেও এক নবদিবসের সূচনা দেখা দিয়াছে। সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইটালীয়, ইংরাজী, ফরাসী রুশ, জর্ম্মণ সকল সাহিত্য হইতেই এ-কথার যথার্থ্য সপ্রমাণ হয়। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে পাশ্চমের ভাবধারার সহিত সংস্পর্শের ফলে যখন পাশ্চাত্য ভাষা এবং সাহিত্য-সমূহের প্রভাব এতদ্দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে অনুসৃত হয়, তখন বাঙালীই তাহা প্রথম গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু নিজ জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া তাহা করে নাই। পাশ্চাত্য ভাব এবং সাহিত্য-রস বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যকে প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবান্বিত করিলেও তাহাকে নিজ সত্তা বিবর্জ্জিত ও সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিতে পারে নাই। যে সকল সাহিত্যিক মহাপুরুষ বিগত শতাব্দীতে তাঁহাদের অমূল্য দানের ফলে বঙ্গজননীকে সাহিত্যিক সম্পদে সুসমৃদ্ধা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা এখানে বিশদভাবে বলিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এতই পরিচিত সে সকল নাম—বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠক তাহা কখনও বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হইতে দিবেন না।

বাঙালীর প্রাণের ধর্ম্ম

সাহিত্যসেবা বাঙালীর প্রাণের ধর্ম্ম। বাঙালী যখন যেখানে থাকে সাহিত্যসেবা ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। আজ তাই দেখি সুদূর লণ্ডন নগরে বসিয়াও শ্বেতদ্বীপ-প্রবাসী বঙ্গজননীর সন্তানগণ সাহিত্যার্চ্চনা করিতেছেন। ব্রহ্মদেশ ত কাছের কথা। বিগত মহাসমরেও তেমনই দেখিয়াছি যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরে বাঙালী যুবকগণ একদিকে বাংলার জাতীয় মহাপূজা,—দেবী সারদার এবং অপর দিকে বাগ্দেবীর,—শুধু মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িয়াই নহে, রীতিমত-ভাবে সাহিত্য আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চ্চার দ্বারা—আরাধনা করিতেছেন। বাঙালীর স্বাধীন চিত্তবৃত্তির নিদর্শন তাহার এই সাহিত্য-সম্মেলন। আমাদের প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন তাহার অন্যতম বিকাশ মাত্র। আজ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, গুজরাটি সাহিত্য সম্মেলন, মারাঠা সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতি হইতে দেখা যায়; তাহা যে আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অনুসরণ বা অনুকরণ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কথা মনে ভাবিয়া আমাদের শুধু আত্মতৃপ্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। এদিক দিয়াও আমাদের একটি গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। 'আদান-প্রদান' সমাজধর্ম্মের একটি প্রধানতম অংশ। তাঁহারা আমাদের ভাব গ্রহণ করিতেছেন, ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ আমাদেরও তাঁহাদের বিশিষ্ট ভাবধারার সহিত সুপরিচিত হইবার জন্য যথেষ্ট সচেতন হওয়া আবশ্যক। এই একমাত্র উপায়েই সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তবৃত্তি একমুখীন হইবার সম্ভাবনা।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হইতেছে যাহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বাঙালীরা বৎসরে একবার সম্মিলিত হইয়া নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, অভাব-অভিযোগ প্রকাশ এবং তাহা নিরাকরণের জন্য চেষ্টিত হইতে পারেন। প্রধানতঃ সাহিত্যকেই কেন্দ্র করিয়া এই সব আলোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আরও একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। ইহার আরও একটি উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। প্রবাসী বাঙালীকে ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের বাংলা ভারতবর্ষেরই এক অংশ মাত্র; বাংলা সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের এক বিকাশ। বাঙালীর সাহিত্যসাধনা শুধু তাহার নিজের জন্য নহে; সমগ্র ভারত-বর্ষের ইষ্টানিষ্টের সঙ্গে তাহার গুরুতর দায়িত্ব আছে। সুতরাং প্রবাসী বাঙালীকে ক্ষুদ্র অহঙ্কার এবং স্বার্থচিন্তা বিসর্জ্জন দিতে হইবে; তাহাকে অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ চিত্তে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে। যখন যে-প্রদেশে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে, সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তাঁহাদের নূতন নূতন গবেষণা, নবসাহিত্যের পরিচয় গ্রহণ, কোন নূতন কিছুর সন্ধান পাইলে তাহা বঙ্গসাহিত্যে পরিগ্রহণ চেষ্টা করিতে হইবে। সুধু সাহিত্যিক প্রচেষ্টা কেন, তাঁহাদের রীতি-নীতি, সামাজিক আচার-পদ্ধতিতে আমাদের সমাজ মধ্যে গ্রহণযোগ্য কিছু দেখিলে তাহা পরিগ্রহণে যত্নবান হইতে হইবে।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে এইখানেই হইল মূলগত প্রভেদ। নতুবা একই সাহিত্য সম্মেলন বৎসরে দুইবার দুইস্থানে করার কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

আসামে, বিশেষ করিয়া গৌহাটীতে, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন শুনিলেই কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। বঙ্গদেশের সহিত আসামের নানা দিক দিয়া যেরূপ নিবিড় সংযোগ তাহাতে বাঙালীর পক্ষে আসাম বা গৌহাটীকে প্রবাস বলিয়া সহজে মনে করা সম্ভব নহে। বাঙালী কামরূপকে চিরদিন তাহার ঘরের তীর্থ বলিয়া জানে। বর্ত্তমান উত্তর-বঙ্গের কতকাংশ প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক যুগে আমরা দেখিতে পাই কামরূপের ভাস্কর-বর্ম্মা বঙ্গদেশের কতকাংশেরও আধিপত্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে পালবংশীয় রামপাল বরেন্দ্র এবং কামরূপের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের দুর্ব্বলতার ফলে সাম্রাজ্যের পতনজনিত অশান্তির মধ্যে তাঁহাদেরই সেনানায়ক কামরূপবিজয়ী বৈদ্যদেব তথায় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। আসামের সহিত বাঙ্গলার ধর্ম্মের দিক দিয়াও বরাবরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। আসাম দেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করদেব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের মন্ত্রশিষ্য না হইলেও তাঁহার নিকট যে প্রেমভক্তি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং চৈতন্যপ্রেম যে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। শ্রীমাধবদেব এবং হরিদেব ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীশঙ্করদেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবধর্ম্ম গুরুগণও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মতই আচণ্ডালে জ্ঞানীমূর্খে হরিপ্রেম বিলাইতে মাতোয়ারা ছিলেন। তাই আমি বলি যে আচারে-ব্যবহারে, ভাষায় এবং ধর্ম্মে অসমীয়া এবং বাঙালীর ভেদ এতই নগণ্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উভয়ের অভিন্নতা এতই সুস্পষ্ট যে, রাজনৈতিক কারণে আমাদের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রাদেশিকতার ব্যবধান সৃষ্টি করিলেও আমরা নিজেরা তাহা স্বীকার করিয়া লইতে লজ্জা পাই তবে এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবাদের কোন মূল্য নাই। বাঙালী আজ নিজ বাসভূমে পরবাসী। বঙ্গদেশের পূর্ব্বাপর প্রান্ত আজ রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের চক্রান্তে ভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে বঙ্গভাষাভাষী যাঁহারা অদৃষ্টচক্রে আসামে এবং বিহারে স্বদেশে থাকিয়াও বিদেশী বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সংস্কৃতি বজায় রাখিবার জন্য সুখে দুঃখে একতাবদ্ধ হওয়া এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া এবং বিহারী ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিয়া চলা। প্রবাসী বাঙালী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাহার প্রতিভা এবং অধ্যবসায়ের বলে নবযুগের উদ্বোধন করিয়াছে; যুগপৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার এবং স্বাদেশিকতার বার্ত্তা বহন করিয়াছে। আজ অন্যান্য প্রদেশ তাহাদের ঋণ ভুলিতে পারে; প্রাদেশিকতার ভেদবুদ্ধি আজ স্বাজাত্যবোধের নামে পূজা পাইতে পারে; কিন্তু বাঙালীর ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতবর্ষের অখণ্ডরূপের বাঙালীই প্রথম পূজারী। মহাত্মা ৺ভূদেব-লিখিত পূজামন্ত্রে তাহার এই পূর্ণ রূপটী আমরা দেখিতে পাই,—

মাতর্নমামি ভবতীংহি সতীদেহরূপাং
মাতর্নমামি বসুধাতল পুণ্যতীর্থং।
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতাম্বুরাশিং
মাতর্নমামি হিমগৌরকিরীট ভূষাং॥

সুতরাং দেশমাতৃকার মঙ্গলের জন্য বাঙালীকে স্বার্থত্যাগ এবং আত্মত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিগত অধিবেশনের পর এই বৎসরকালের মধ্যে বঙ্গভারতীর যে সকল একনিষ্ঠ সেবক এবং দেশের যে সকল সুসন্তান আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা প্রয়োজন। আজীবন জ্ঞানের এবং কর্ম্মের ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়া যাঁহারা সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য শোক করিবার কিছু নাই। বাহ্যতঃ আমরা তাঁহাদের হারাইয়াছি বটে, কিন্তু স্মৃতির দ্বারা আমরা যেন সদাই তাঁহাদের অনুভব করিতে পারি। তাঁহাদের কৃত কার্য্যাবলী যেন আমাদিগকে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রেরণা জোগায়। আমাদের অপূরণীয় ক্ষতির কথা ভাবিয়া আমরা শোক করি, তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করিব।

পরলোকগত সাহিত্যিকগণের নাম করিতে বসিয়া প্রথমেই মনে পড়ে ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। পাটনা অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই ২রা মাঘ তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে অপরিসীম ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে আমার গুরুতর মতের পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ শক্তি, প্রতিভা এবং সহৃদয়তা আমি বরাবরই স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুশয্যাতেই আমি "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় এক প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে আমার অভিমত জানাইয়াছিলাম। তাঁহার "বড়দিদি" আমারই বিশেষ চেষ্টায় মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী "ভারতী"তে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

পাটনা অধিবেশনের কিছু পূর্ব্বেই আমরা হারাইয়াছি প্রবীণ সাহিত্যিক আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺যতীন্দ্রমোহন সিংহকে। তাঁহার লিখিত উপন্যাস-সমূহ, বিশেষতঃ "ধ্রুবতারা," "অনুপমা" এবং "উড়িষ্যার চিত্র" এককালে বঙ্গসাহিত্যে নূতনত্ব আনয়ন করিয়াছিল এবং সাহিত্যামোদীদিগকে আনন্দ প্রদানে সমর্থ হইয়াছিল। সাহিত্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে বহু কটুকাটব্য সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যাহা তিনি কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিলেন তাহা হইতে ভয়ে নিরস্ত হন নাই। তাঁহার "সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা" গ্রন্থকে আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত হইবে না। তাঁহার ঐ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর অনেকেরই এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার ফল বহু পরিমাণে ফলিয়াছে দেখা যায়।

প্রবীণ সাহিত্যিক ৺হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ৭ই বৈশাখ লোকান্তর প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি এককালে পাঠকসমাজে সুপ্রচলিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রচার", অক্ষয়চন্দ্রের "নবজীবন" এবং পুরাতন "ভারতী" পত্রেও তিনি নিয়মিতভাবে লিখিতেন।

৯ই বৈশাখ প্রবীণ সাহিত্যিক ৺বনোয়ারীলাল গোস্বামী পরলোকগমন করিয়াছেন। "মুর্শিদাবাদ হিতৈষী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাদিবস হইতে দীর্ঘ ৪৫ বৎসরকাল তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু সংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং কবিতা গ্রন্থ আছে। তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতা এককালে পাঠকসমাজে অত্যন্ত সমাদৃত হইত।

৺কুমুদনাথ মল্লিকও ঐ দিনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার "নদীয়া কাহিনী" বঙ্গসাহিত্যে এক সমৃদ্ধ দান।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ প্রেসিডেণ্ট স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ১২ই বৈশাখ দেহরক্ষা করিয়াছেন। প্রথম বয়সে তিনি এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। পূর্ত্তবিদ্যা বিষয়ে তাঁহার লিখিত কয়েকখানি বাংলা বই আছে। সংস্কৃত রামায়ণের

নুবাদ এবং দেবী ভাগবতের ইংরাজী বাদও তিনি করিয়াছিলেন।

াট্যকার 'ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শে শ্রাবণ পরলোকগমন করিয়াছেন। ার রচিত নাটক এবং প্রহসনসমূহ 'কাল রঙ্গামোদীগণকে আনন্দ রণ করিয়াছে।

৩২শে শ্রাবণ 'রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর ্যু হইয়াছে। তিনি অনেকগুলি ন্যাস, গল্প ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া- লেন। নাটোর এবং কলিকাতা হইতে নেকগুলি মাসিক পত্র তিনি বিশেষ ্যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

২৪শে আশ্বিন আমরা বঙ্গসাহিত্যের ৌরব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব 'নগেন্দ্রনাথ সুকে হারাইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে ামাদের যে ক্ষতি হইল তাহা একরূপ ্পূরণীয়। "বিশ্বকোষ" প্রকাশ তাঁহার ীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি; যখন তিনি এই ুরুভার কর্ত্তব্য স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করেন খন তিনি বালকমাত্র বলিলেও অত্যুক্তি য় না। "হিন্দী বিশ্বকোষ"এর জন্য হন্দীভাষী জগৎ তাঁহার নিকট চিরদিন ৃতজ্ঞ থাকিবে। সম্প্রতি তিনি "বিশ্ব- কোষ" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য রোগশোকজীর্ণ দেহমন লইয়া সাতিশয় পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাঁহার অবর্ত্ত- মানে কার্য্যটি যাহাতে পণ্ড না হয় তাহা দেখা বাঙালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এ বৎসর আমরা আরও একজন সাহিত্যিককে হারাইয়াছি—ইতিহাস সাহিত্যে যাঁহার দান নিতান্ত অল্প নয়। তিনি এই প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন এবং আজ আমরা যেখানে সমবেত হইয়াছি, সেই গৌহাটী নগরের সহিত তিনি দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "কামরূপ অনুশাসনাবলী" গ্রন্থখানি মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সারাজীবনের পরিশ্রমের ফল। ইংরাজীতে পুস্তকটি সম্পাদন করিলে সমগ্র পৃথিবী তাঁহার পরিচয় পাইত বটে, কিন্তু তথাচ তিনি বইখানি বাংলাতেই লিখিয়াছিলেন। প্রাচীন আদর্শের ব্রাহ্মণ-পাণ্ডিতকে নামের মোহ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পঞ্চম প্রেসিডেণ্ট স্বামী শুদ্ধানন্দ কার্ত্তিক মাসে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর "উদ্বোধন" মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং স্বামী বিবেকা- নন্দের সমস্ত ইংরাজী গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি আমরা আরও একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিককে নিতান্ত শোচনীয়ভাবে হারাইয়াছি। তাঁহার কথা বলিতে গেলে আজিও শোকে কণ্ঠ- রোধ হইয়া আসে। তিনি আমার পুত্র শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরম প্রিয়- বন্ধু স্নেহাস্পদ শ্রীননীগোপাল মজুম- দার। গত বৎসর এই সময় পাটনা অধি- বেশনের ইতিহাস শাখার সভাপতিরূপে প্রদত্ত তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণের কথা বোধ হয় এখানে উপস্থিত অনেকেরই স্মরণ হইবে। নিতান্ত অল্প বয়সে তিনি যে প্রকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া- ছিলেন তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাঁহাকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্ব- প্রধান পদে এবং প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত দেখিবার আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল সে আশা অপূর্ণই রাখিল।

বিগত এক বৎসকালের মধ্যে আমরা যেসব সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিকে হারাইয়াছি তাঁহাদের সকলকার নাম বিশদভাবে প্রদান করা সম্ভব নহে। নিম্নে কয়েকজনের নাম করিলাম। ইহা হইতে কেহ যেন তাঁহাদের বা যাঁহাদের নাম করা হইল না তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অভাব মনে না করেন।—

সাহিত্যসেবক এবং সাহিত্যবন্ধু রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

লেডী যাদুমতি মুখোপাধ্যায়।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ।

সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌরীমাতা।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ। ইঁহার রচিত দার্শনিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—"মৈত্রী উপ- নিষদের বাংলা অনুবাদ", "ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধনা", "মহাপুরুষ প্রসঙ্গ", "সংস্কার ও সংরক্ষণ"।

শ্রীনাথ চন্দ—"ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর", "ভক্তিযোগ" প্রভৃতির লেখক।

কবিরাজ শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়— "রসজলনিধি" গ্রন্থ রচনা করেন। আয়ু- র্ব্বেদ-শাস্ত্রে ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহার রচিত "কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস" বঙ্গ- সাহিত্যে এক উৎকৃষ্ট জীবনী গ্রন্থ।

ডাঃ সতীশচন্দ্র বাগচী—দীর্ঘকাল কলিকাতা আইন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বহুসংখ্যক আইনের গ্রন্থ ছাড়া বাংলা ভাষাতে ফরাসী সাহিত্য হইতে অনুবাদ করিয়া গল্পপুস্তক লিখিয়াছিলেন।

পরিশেষে আর একটি নাম করা আমার বিশেষ কর্ত্তব্য। তিনি আমার মাতৃদেবী স্বর্গীয়া 'প্রসন্নসুন্দরী দেবী। শিলং, গৌহাটি এবং কামাখ্যার অধিবাসী কেহ কেহ হয়ত তাঁহার কথা জানেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৎসরাধিক কাল তিনি শিলংয়ে বাস করিয়াছিলেন। সে সময় অনেকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়া- ছিল এবং কয়েকবার তিনি গৌহাটি এবং কামাখ্যায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এবং তাঁহার বহুতর পরিচিতের মধ্যে অনেকে হয়ত জানেন না যে, তাঁহার সাহিত্য সাধনা নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না। তাঁহার শ্বশুর মহাত্মা 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রবর্ত্তিত "এডুকেশন গেজেট" পত্রে বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার নানা বিষয়ক প্রবন্ধাদি কখনও বিনা নামে কখনও "হিন্দুনারী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা ঐগুলি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন কি সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টির সহিত তিনি কি সামা- জিক, কি সাহিত্যিক, কি ধর্ম্মনৈতিক সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং নির্ভীক সরলতার সহিত সকল বিষয়ে নিজ অভিমত প্রকাশ করিতে পারিতেন। পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন তাঁহার জীবনে ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য সকল বিষয়ের মত সাহিত্য সাধনাতেও যশোলিপ্সার অনাগ্রহ তাঁহাকে চিরদিনই অন্তরালে রাখিয়া গিয়াছে। আমাদের বহু চেষ্টাতেও নাম প্রকাশ করেন নাই। এডুকেশন গেজেটে তাঁহার দুইখানি উপ- ন্যাস "রাণী" এবং "গাঁয়ের 'পাঁচ" ধারা বাহিকভাবে বাহির হইয়াছে। শীঘ্রই তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য সাময়িক পত্রে তাঁহার কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

এবৎসর দেশের সর্ব্বত্র শতবার্ষিকী এবং জয়ন্তী উৎসব চলিয়াছে। আমরা যে আমাদের মৃত গণ্যমান্য বরেণ্য ব্যক্তিবৃন্দের স্মৃতির পূজা করিতে শিখিতেছি তাহা খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। প্রায়শঃই দেখা গিয়া থাকে আমরা জীব- দ্দশায় গুণীকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিই না এবং মৃত্যুর পরে তাঁহার স্মৃতির সমুচিত সমাদর প্রদর্শনে কার্পণ্য করিয়া থাকি। সুতরাং বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকজন মনীষী সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভূদেব সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করা ঘটিয়া উঠে নাই। তবে এক্ষণে মনে হইতেছে যে, এ যাবৎ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আমরা যে কর্ত্তব্যচ্যুতি করিয়াছি, অতঃপর তাহা সংশোধনে যত্ন- পরায়ণ হইব।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আমরা রামমোহন শতবার্ষিকী করিয়াছিলাম। তাহার পর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী হইল। বঙ্কিম শতবার্ষিকী, হেমচন্দ্র

শতবার্ষিকী, কেশবচন্দ্র শতবার্ষিকী এ বৎসরের অন্যতম প্রধান ঘটনা। 'সম্ভাবশতক" এর কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্মশতবার্ষিকী তাঁহার নিজগ্রাম সেনহাটীতে হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বীরসিংহ গ্রামে এবং মেদিনীপুর সহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা মহাসমারোহ সহকারে হইয়াছে। তাহার ফলে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি ভাল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি মেদিনীপুর সহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সৌধ এবং তৎসংলগ্ন উদ্যানাদি নির্ম্মাণ জন্য গবর্ণমেণ্ট নামমাত্র খাজনায় ৮ বিঘা জমি দিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসব যে কেবল সভাসমিতি, বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, প্রাচ্যনৃত্য এবং প্রবন্ধ পাঠে পরিসমাপ্ত হয় নাই তাহা অতীব সুখের বিষয়। তাঁহার গ্রন্থাবলীর এক অভিনব সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করিতেছেন। কাঁঠালপাড়ায় তাঁহার বাসভবনের অধিকার তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সাহিত্য-পরিষৎকে প্রদান করিয়াছেন। পরিষৎ তাহার জীর্ণসংস্কার করিয়া রক্ষা করিবেন। তন্মধ্যে বঙ্কিমের স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্যরাজি এবং তাঁহার গ্রন্থসমূহের সংগ্রহ সংরক্ষিত হইবে। এইরূপে ইংলণ্ডের ষ্ট্রাটফোর্ড অন-এভনস্থ মহাকবি সেক্সপীয়র-মিউজিয়মের সহিত তাহা তুলনীয় হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "বঙ্কিম পরিচয়" নামে তাঁহার রচনার একটি চয়নিকা প্রকাশ করিয়াছেন; যদিও আমি এখানে বলিতে বাধ্য যে তাহা বঙ্কিমের স্মৃতির উপযুক্ত হয় নাই। শুনিয়াছি তাঁহারা বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহাতে পারদর্শী ব্যক্তিবৃন্দকে পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থাও হইবে।

বঙ্কিম শতবার্ষিকী উপলক্ষে "আনন্দমঠ" সর্ব্বত্র বিশেষভাবে উল্লিখিত হইতেছে এবং বঙ্কিমকে স্বাদেশিকতা ও দেশভক্তি মন্ত্রের ঋষি বলা হইতেছে। ইহা যে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের কল্যাণের প্রতি কথা-সাহিত্যিকের দানের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়। বৈজ্ঞানিক আমাদের দেন তাঁহার উদ্ভাবিত নব নব যন্ত্র, যাহা স্থূলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু কথা-সাহিত্যিক প্রদান করেন তাঁহার অভিনব ভাবরাশি। এক হিসাবে তাঁহাকে ঐতিহাসিক অপেক্ষা উচ্চে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেন সমসাময়িক বা অতীত ঘটনাসমূহের ধারাবাহিক বিবরণ। কিন্তু একজন বড় সাহিত্যিক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাহাই করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি পঞ্চাশ বৎসরের পরের ইতিহাস পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে যাহা দেখিতে পায় না উচ্চ শ্রেণীর লেখক বা কবির চিত্তে তাহা প্রতিভাত হয়।

কিন্তু এই স্বাদেশিকতা এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বঙ্কিম কোথা হইতে পাইয়াছিলেন সেই কথাটাই সুধু বলা হয় নাই। শাস্ত্রে বলে—"শিব ভূত্বা শিবমর্চ্চয়েৎ।" সত্যদ্রষ্টার পরিচয় দিতে হইলে পরিচয়দানকারীর সত্যদৃষ্টি থাকা আবশ্যক। দুইটী তড়িতভরা মেঘ সন্নিকটবর্ত্তী হইলে পরস্পর হইতে বিদ্যুতাকর্ষণ করা অনিবার্য্য। ভূদেবের সহিত যে বঙ্কিমের বিশেষরূপ সংস্পর্শ ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্য। উঁহাদের দুইজনের পরস্পর সংস্পর্শে উক্ত তড়িতশক্তির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। চিন্তাশীল, দূরদর্শী, সমাজহিতৈষী মহাপুরুষের পবিত্র চিত্তের প্রতিচ্ছায়া সমপ্রকৃতিক মহাত্মার চিত্তমুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়। ইহারই ফলে আমরা "পুষ্পাঞ্জলি" এবং "আনন্দমঠ" লাভ করিয়াছি। এই দুইখানি গ্রন্থ পাশাপাশি রাখিয়া যদি কেহ পাঠ করেন তাহা হইলে আমার এই কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বাহুল্যভয়ে এখানে এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না। ইতিপূর্ব্বে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মেলনের নবম অধিবেশনে একবার এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলাম। কেহ যদি ইচ্ছা করেন ১৩৩৮ সালের কার্ত্তিক মাসের "বিচিত্রা"য় তাহা দেখিতে পারেন। এখানে তাহার একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি—

"ব্রাহ্মণেরা * * * একটি সোপান পরম্পরা দ্বারা কতদূর নামিলেন। পথটী ঘোর অন্ধকারাবৃত। কিয়দ্দূর গমন করিলে একটি দীপালোক দৃষ্ট হইল। পরে একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে গিয়া দেখিলেন, শবাসনা পাষাণময়ী কালিকামূর্ত্তির সমক্ষে একজন ব্রাহ্মণ একটি প্রদীপহস্তে দণ্ডায়মান আছেন। দীপধারী কহিল, 'ইনি মহারাজ শিবাজীর প্রতিষ্ঠাপিতা মহাদেবী করালী'।"

—পুষ্পাঞ্জলি, নবম অধ্যায়।

"ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন, মহেন্দ্র পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "দেখ, মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল "কালী!"

—আনন্দমঠ, একাদশ পরিচ্ছেদ।

মা যা ছিলেন এবং মা যা হইবেন এই দুইটি দৃষ্টান্তেও আমরা ঠিক এইরূপই সাদৃশ্য দেখিতে পাইব।

সাহিত্য শব্দটীর দুই প্রকার অর্থ আছে। তন্মধ্যে একটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, অপরটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি মিলাইয়া যে ব্যাপক "বাঙ্ময়" অর্থে সাহিত্য শব্দটী ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে তৎ তৎ বিষয়ের সাধনায় নিযুক্ত সুযোগ্য এবং সুপণ্ডিত সুধিগণের আলোচনা আপনারা শুনিবেন। সাহিত্যের অর্থ যেখানে রস-রচনা, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ আমি সেই সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিব। প্রথমেই, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য সমাজের নিছক প্রতিবিম্ব নয়, উহা সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। বাস্তবের সহিত কল্পনার মিলন যখন সুন্দর ও সুসমঞ্জস হয় তখনই তাহা সুসাহিত্য হইয়া দাঁড়ায়। সমসাময়িক সমাজের সুখ-দুঃখের ছবি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা সাহিত্যিকের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও তাহাই তাহার চরম কর্ত্তব্য নহে। যাহা হয় নাই অথচ হইতে পারিত, যাহা হইলে ভালো হইত, যাহা পূর্ব্বে হইয়াছে অথবা ভবিষ্যতে হইতে পারে—এ সমস্তই সাহিত্যিকের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে বহির্জগতের নানা প্রতিকূলতার সংঘর্ষে যে সমস্ত কামনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যায়, সাহিত্যের কল্পলোকে কল্পনার মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে তাহারা যে কেবল নবজীবনই লাভ করে তাহা নহে, একের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ দেশকালনিরপেক্ষ হইয়া শতসহস্রের হাসি অশ্রুর অভিষেকে অমরত্ব লাভ করে। রুচিভেদে সমাজের মহত্তম এবং দীনতম কামনাও সাহিত্যে স্থান পায়। এক দেশের সমাজ অন্য দেশের সমাজের বিচারক হয়। ভবিষ্যতের সমাজ অতীতের সমাজকে বিচার করে। ফলে তাহার শিক্ষা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ অথবা ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিয়া থাকে। সাহিত্যিক যদি সমাজের প্রকৃতই হিতকামী হন তাহা হইলে বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ভাষায় এবং ভাবে তাঁহার সংযত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নূতনত্বের নামে ঔদ্ধত্য, রুচিবিকৃতি এবং মুদ্রাদোষের প্রচলন করিয়া দিনকতক হাততালি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সাহিত্যের আদর্শ লইয়া বিস্তর মতভেদ

আছে এবং তাহা থাকা খুবই স্বাভাবিক। মানুষই যখন সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা তখন ভিন্ন রুচি এবং ভিন্ন আদর্শ সাহিত্যে স্থান পাইতে বাধ্য। এতভিন্ন দেশকাল এবং ধর্ম্মগত আদর্শভেদও সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এই ভেদবুদ্ধি সাহিত্যক্ষেত্রের নিম্নস্তরের কথা অথবা অনধিকারীর অনধিকারচর্চ্চার কথা। সাহিত্যে যাহা মহত্তম সৃষ্টি তাহা দেশ-কালজাতিধর্ম্মনিরপেক্ষ। এই সাহিত্য বস্তুতান্ত্রিক হউক অথবা ভাবতান্ত্রিক হউক, যদি তাহা একাধারে হিতকর এবং মনোহারী হয় তবেই তাহা সার্থক। আদর্শ উচ্চ রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। মনোহর সাহিত্য যদি মানবসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তবে তাহা অবাঞ্ছনীয়; কারণ এ কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে একাধারে মানুষের কল্যাণ এবং আনন্দবিধানের জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি;—সাহিত্যের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নাই।

গৃহবিচ্ছেদে ক্ষোভ

অতঃপর একটি গভীর দুঃখের কথা বলিতে চাই। বাংলা ভাষা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈননির্বিশেষে বাঙালী মাত্রেরই ভাষা। প্রাচীন যুগ হইতেই ইহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বাঙালীর দান আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার একটি অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নামে কিছুকাল হইতে পৃথক একটি সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাহার কারণ বুঝা কঠিন। চাকুরীর ক্ষেত্রে এবং আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের ক্ষেত্রে দলাদলি আছে। ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিকতার আক্রমণ আছে; ঘরে অবাঙালীর বাণিজ্যগত প্রতিযোগিতা আছে। অধীনতার দুঃখ, অন্নাভাবের দুঃখ, অশিক্ষা এবং বিকৃত শিক্ষার দুঃখ বাঙালীর নিত্যসহচর। দুঃখেরও যেমন অন্ত নাই, ভেদবুদ্ধিরও তেমনি পার দেখা যায় না। কিন্তু সাহিত্যে—যেখানে জাতিভেদ না থাকায় সকলের সমান অধিকার, সেখানে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আসে কেন? বাংলা ভাষা সংস্কৃতমূলক, তাহাতে হিন্দুর দান এবং অধিকার মুসলমানের অপেক্ষা অধিকতর; সেই জন্যই কি তাহা বর্জ্জনীয় হইল? ধর্ম্ম পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যে দেশের এবং জাতির প্রাচীন সংস্কৃতিও সমূলে বিসর্জ্জন দিতে হইবে একথা আজ কোন দেশের কোন সভ্য সমাজই স্বীকার করেন না। ইউরোপ প্রাচীন গ্রীক এবং লাটিন কৃষ্টি ও সাহিত্য লইয়া আজিও গর্ব্ব বোধ করে। কামাল আতাতুর্ক আরবীর নাগপাশ হইতে তুর্কী ভাষাকে মুক্তি দান করিয়াছেন। রেজা শাহ পহ্লবী প্রাগ্-মুসলমানযুগীয় ইরাণের গৌরবোজ্জ্বল দিন সম্বন্ধে জাতিকে সচেতন করিয়া তুলিতেছেন। যবদ্বীপের মুসলমান এখনও রামায়ণ মহাভারতের অভিনয় দেখাইয়া বিশ্ববাসীকে বিমুগ্ধ করিতেছে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তি চিরদিন সম্মানের আসন পাইয়াছেন এবং চিরদিনই পাইবেন। অধ্যাপক মহম্মদ সহিদুল্লা, হুমায়ুন কবীর এবং কুদরৎ-ই-খোদা প্রমুখ কৃতবিদ্য সুসাহিত্যিকগণ বঙ্গীয় এবং প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়াছেন আমরা চক্ষের সমক্ষেই দেখিতে পাইতেছি। লোকপ্রসিদ্ধ লেখক মুসলমান কবিগণের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কবি-রুদ্দিন মল্লিক, কবি নজরুল ইসলাম, কবি জসিমউদ্দিন চিরদিনই জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল বাঙালীরই একান্ত আপনার জন বলিয়া বিবেচিত হইবেন; এক্ষেত্রে সময়ের প্রভাব স্বীকার করিয়া এবং যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে এই ভাঙনের পথরোধ করিতে হইবে। আরব, পারস্য বা তুরস্কের মুসলমান যখন খাঁটি আরবী, ফরাসী বা তুর্কী ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জিত হন না, তখন বাঙালী মুসলমানের পক্ষে তাঁহার স্বদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃতমূলক বাংলা ভাষা ব্যবহারে লজ্জানুভব করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। দেশের প্রাচীন ইতিহাস এবং পুরাতন সংস্কৃতি লইয়া অন্যান্য সুসভ্য জাতির ন্যায় তাঁহাদেরও গৌরব বোধ করা কর্ত্তব্য হইবে। আমরা হিন্দুই হই অথবা মুসলমানই হই সাহিত্যক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রযত্নে সংকীর্ণতা পরিহার করিতে না পারিলে অন্যান্য সকল বিষয়েরই মত আমাদের সাহিত্যের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সহস্র বর্ষের সাধনার ফলে আজ বঙ্গসাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে যে আসন পরিগ্রহণ করিয়াছে তাহা ধ্বংস করা খুবই সহজ, কিন্তু একটা বড় জিনিষ গড়া অনেক পরিশ্রমের কাজ। বিশ্ববরেণ্য ভাষা-জননীকে যাঁহারা খণ্ডিত করিয়া তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে বাধা দেওয়া জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর অবশ্যকর্ত্তব্য—আশা করি ইহাতে আপনাদের কাহারও মতদ্বৈধ হইবে না।

বিদায়ের পূর্ব্বে আমার পক্ষ হইতে আর একটি কথা বলিবার আছে। ষষ্টি বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে ঋষিকল্প মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "পুষ্পাঞ্জলি" গ্রন্থে (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) কামাখ্যা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমি আপনাদিগকে একবার শুনাইতে চাই।—

অনন্তর বৃদ্ধ কহিলেন—"আমরা এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান মহাতীর্থসীমায় উপনীত হইলাম। ইহা সর্ব্বফলপ্রদ কামাখ্যা-ক্ষেত্র। এই তীর্থ কাশী প্রয়াগাদির ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নহে। এখানে লক্ষ্মীসেবিত পুরুষদিগের এবং যশোলিপ্সু ক্রিয়াশালী ব্যক্তিদিগের সমাগম নাই। ইহা মন্ত্র-সাধন করিবার তীর্থ। সচেতন মন্ত্রে দীক্ষিত বীর পুরুষেরাই এই তীর্থের প্রকৃত অধিকারী; প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মহামতিরাই ইহার যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ। ফলশ্রুতিরূপ খণ্ডলড্ডুক প্রদর্শন দ্বারা শিশুবৎ অবোধ যে সাধকদিগকে ধর্ম্মচর্চ্চায় প্রলোভিত করিতে হয় তাহারা এই তীর্থের অধিকারী নহে। এখানকার উপাসনা একান্ত নিষ্কাম।"

মধ্যবয়ার জিজ্ঞাসু নয়নদ্বয় বৃদ্ধের মুখমণ্ডলের প্রতি উন্নমিত হইল।

বৃদ্ধ কহিতে লাগিলেন—"তীর্থের নাম কামাখ্যা—কিন্তু উপাসনা নিতান্ত নিষ্কাম—ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছ? কিন্তু ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। মুক্তি নিমিত্ত যে কামনা, তাহাও কামনা। কোন কামনা করিব না, এই কামনাও কামনা। সুতরাং কোন পদার্থই কামাখ্যার অনধিকৃত নহে। এই তীর্থের মহাত্ম্য অতি গূঢ় বিষয়। অন্যান্য তীর্থের জলবিন্দু অথবা মৃৎকণিকা স্পর্শ করিলে নানা শুভ ফল ফলিত হয়, ব্রহ্মহত্যাদির পাতক দূর হয়, কোটিশঃ পূর্ব্বপুরুষের বৈকুণ্ঠাদিতে বাস হয়। কামাখ্যার বিষয়ে ওরূপ ফলশ্রুতি নাই। এখানে অতি কঠোর তপস্যা করিতে হয়; ইষ্টমন্ত্রের মানস জপ করিতে হয়; বিভীষিকার উপদ্রবজাল উত্তীর্ণ হইতে হয়; নানাপ্রকার অনুষ্ঠান অতি সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ করিতে হয়; এক জন্ম, দশ জন্ম, শত জন্ম প্রতীক্ষা করিতে হয়। ফল কি হয়, বলা যায় না। এখানকার উপাসনা একান্ত নিষ্কাম।"

মধ্যবয়া আগ্রহাতিশয়প্রপূরিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন কোন বীর-পুরুষ এই মহাদেবীর সাধন করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ করাইয়া শ্রুতিযুগল পবিত্র করুন।"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন—"কামাখ্যাসিদ্ধদিগের নাম থাকিতে পারে না। অসম্পূর্ণ আংশিক পদার্থেরই

(শেষাংশ ৪১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

স্বাগতম্! বঙ্গের সুধীবৃন্দ স্বাগতম্! বাংলা-মায়ের সন্তানগণ, আপনারা সুস্বাগত এই "কামাখ্যা মহাপীঠে।"

পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বাংলা-মায়ের সন্তানগণ আজ মাতৃভাষার সাধন-বেদীতে সম্মিলিত,—সার্থক হউক আপনাদের অশেষ শ্রম, সার্থক হউক আপনাদের সম্মেলন।

আমাদের এই বার্ষিক সম্মেলনের সার্থকতা নানাবিধ; কিন্তু আমার মনে হয়, এই সম্মেলনের আসল সার্থকতা সম্মেলনের—মেলামেশায়, ভাববিনিময়ে, আলাপ-পরিচয়ে।

প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আপনারা সকলে সম্যক উপলব্ধি করেন,—সেই জন্যই প্রতিবৎসর কত অর্থ ব্যয় করিয়া, অশেষবিধ শারীরিক ক্লেশ বরণ করিয়া, নানা প্রকার আবশ্যক আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া দূর দেশান্তরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যাতায়াত করেন। সাহিত্যসেবার জন্য আপনাদের এই আত্মত্যাগের মূলে যে প্রেরণা রহিয়াছে সেই প্রেরণার মূল্যই প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সার্থকতার মাপকাঠি। ইংরেজী শিক্ষা বঙ্গদেশেই সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃতি লাভ করে। তজ্জন্যই আজ পর্যন্ত বাঙালী সমগ্রভারতে ছড়াইয়া আছে। পেশোয়ার হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বাঙালী পুরুষানুক্রমে প্রায় ২০০ বৎসর বসবাস করিতেছে। ইঁহাদের মাতৃভাষার সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হয়, এবং কালের গতিতে মাতৃভাষার প্রতি ইঁহারা শ্রদ্ধাহীন হন, ইহা কখনই কাহারও কাম্য হইতে পারে না। এইখানেই আমাদের এই বার্ষিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা। এই সম্মেলনের মূল সুদৃঢ় হইলে এবং বৎসরের কয়েকটি দিনে পর্য্যবসিত না হইয়া স্থায়ীভাবে বৎসর ব্যাপিয়া ইহার কার্য্য পরিচালিত হইলে, এই সম্মেলনের অঙ্কুর মহান শক্তিশালী মহীরুহের কলেবর ধারণ করিবে ও ইহার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া আমরা পরম শান্তি ও শক্তি লাভ করিব।

বড়দিনের অবকাশ সর্ব্বত্রই উৎসবে পরিণত হইয়াছে। আজ ষোল বৎসর যাবৎ আপনারা যে সাহিত্য-ও শিল্প-আলোচনাকে এই ইন্দ্রিয়-ভোগ্য উৎসবের উপরে স্থান দিয়াছেন ইহা আমি একটি বড় রকমের রুচি পরিবর্ত্তন মনে করি।

তার চেয়েও বড় পরিবর্ত্তনের যবনিকা উত্তোলিত হইল আজ আমাদের চোখের সম্মুখে। বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত প্রবাসী বাঙালী এত দিন এই সম্মেলন
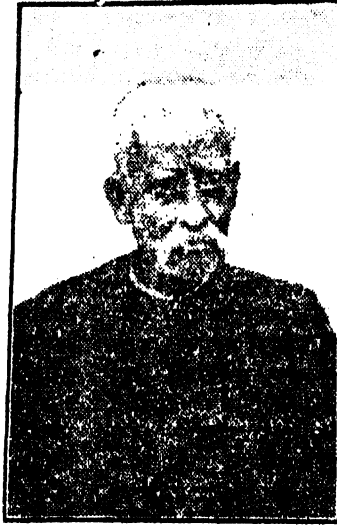
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনের সৌভাগ্য উপভোগ করিয়াছেন। আজ প্রথম পূর্ব্বের পালা। বাংলা দেশের পূর্ব্বে অবস্থিত প্রবাসিগণ বহুকাল বাঙালীর দৃষ্টি গোচরীভূত হন নাই। বাঙালীর তীর্থ ছিল কাশীধাম; মথুরা বৃন্দাবন; স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙালীর গন্তব্যস্থান ছিল বেহার, যুক্তপ্রদেশ, একেবারে শিমলা ও মুসৌরী শৈল পর্য্যন্ত। মহাপীঠ কামাখ্যার পবিত্র তীর্থের কথা শিলং পর্ব্বতের মনোরম নয়নমোহন দৃশ্যের কথা খুব কম বাঙালীই জানিতেন—বিশালকায় ব্রহ্মপুত্র নদের সন্ধান খুব কম বাঙালীই রাখিতেন। কালের গতি যে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা আমাদের সৌভাগ্য। পশ্চিম আমাদের অগ্রণী হইয়াছেন। ইহাতে আমাদের ক্ষোভ নাই। পশ্চিমই আজ সর্ব্বত্র জয়ী। পশ্চিম পৃথিবীর জ্ঞান ও নিয়মানুবর্ত্তিতার সম্মুখে পূর্ব্ব-ভূলোক আজ মন্ত্রস্তব্ধ—পরাজিত। এমন কি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল উদিত হন পূর্ব্বগগনে, কিন্তু গন্তব্যস্থান তাহার পশ্চিমে।

বাংলার পূর্ব্বে অবস্থিত প্রবাসী বাঙালীগণ আজ আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই অভাজনকে আমন্ত্রণের মুখপাত্র করিয়া তাঁহারা কতদূর সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমি জানি না। মুখপাত্র যতই অযোগ্য হউন না কেন নিমন্ত্রণের স্থানটি নিতান্ত অযোগ্য স্থান নয়, ইহা আমি কিঞ্চিৎ স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি।

যে দেশে আজ আপনারা সমবেত উহার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ধারা আছে এবং তজ্জন্যই উহার সংস্কৃতির মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এদেশের সংস্কৃতির ও ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, স্মরণাতীত কাল হইতে এদেশের নৃপতিগণ আর্য্য অনার্য্যের সম্মিলনসাধন করিয়াছেন। বিভিন্ন জীবন-পদ্ধতি অবলম্বী বিভিন্ন জাতির অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটাইয়াছেন; শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে ব্যবধান এদেশে বিলীন হইয়া আসিয়াছে, এদেশের সত্ত্বাধিকারগণ আহোম ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিকে হিন্দুধর্ম্মের বেষ্টনীর মধ্যে স্থান করিয়া দিয়াছেন; এই আহোমগণ ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিগণ কালক্রমে অসমীয় ভাষাও সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন; ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্ব্ব পর্য্যন্ত এই উপত্যকা প্রথমে তুর্কী পরে মুঘল শক্তিকে প্রতিহত করিয়াছে।

এই বৈচিত্র্যময় নয়নমনোহর প্রকৃতির লীলাভূমিতে, আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর পবিত্র ক্ষেত্রে বঙ্গের সুধীবৃন্দ আজ সমাগত। আমাদের অতিথিসেবার আয়োজন যতই অকিঞ্চন হউক না কেন, আপনারা যদি মনে করেন যে, আপনাদিগকে একটি অযোগ্য স্থানে আহ্বান করি নাই তাহা হইলে কৃতার্থ হইব। দেশমাহাত্ম্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘুচিয়া যায়; অতএব আপনাদের সমীপে আমার ঐকান্তিক মিনতি এই যে, আপনারা জগন্মাতার এই মহাতীর্থে আমাদের অযোগ্যতা ভুলিয়া যাইবেন।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইংরেজ রাজ্য বিস্তৃত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে আসাম ও বঙ্গদেশে যাতায়াত ও আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। আহোম-নৃপতি শিবসিংহ ও তাঁহার পুণ্যশ্লোকা মহিষী রাণী ফুলেশ্বরী শান্তিপুরের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সাধক কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার সংগৃহীত পদ্ধতি অনুসারে আজিও শ্রীশ্রীকামাখ্যা মাতার অর্চ্চনা নির্ব্বাহ হইতেছে। মহারাজ রুদ্রসিংহের সময়ে বহু স্থপতি, শিল্পী ও কারিগর দূর দেশান্তর হইতে এদেশে আনীত হইত। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের ও পরবর্ত্তী আহোম রাজ্যের সহিত বঙ্গদেশের প্রান্তীয় রাজ্যসমূহের নানাপ্রকার আদান-প্রদানের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। আসাম হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রেরিত একজন রাজদূত ত্রিপুরা রাজ্যের একখানা ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই ত্রিপুরা বুরঞ্জী ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে

লিখিত। সম্প্রতি রায় বাহাদুর ডাঃ সূর্য্যকুমার ভূঞা মহোদয় লণ্ডনের British Museum হইতে হস্তলিখিত পুঁথি আনিয়া অতিশয় যোগ্যতার সহিত উহার সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, সেই সুদূর অতীতেও উভয় প্রদেশের রাজ্যসমূহের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের নানাবিধ ব্যবস্থা ছিল। আসামের একমাত্র করদ রাজ্য মণিপুরে সেই সুদূর অতীতে বাঙালী গোস্বামিগণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন; আবার কামরূপের গোস্বামিগণের শিষ্যবৃন্দ আজও কোচবেহার ও রংপুরে বিদ্যমান।

বর্ত্তমান যুগেও বাঙালীগণ নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করেন নাই। এ দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের পশ্চাতে বাঙালীর উদ্যম নিতান্ত কম নয়। গবেষণা-মন্দির, ধর্ম্মমন্দির, পাঠাগার, শিশুপাঠাগার, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি স্থাপনে বাঙালীর যত্ন ও সামর্থ্য বরাবরই নিয়োজিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোয়ালপাড়ার ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী, মাণিক শিশু পাঠাগার, গৌহাটীর কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি, কামরূপ মন্দির সমিতি, সনাতন ধর্ম্মসভা, পানবাজার Girls School, ডিব্রুগড়ের Poor Asylum উল্লেখযোগ্য।

আজও বাঙালী বালক ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য পরিচালনের দুর্লঙ্ঘনীয় পার্ব্বত্য দেশে অকাতরে আত্মদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত উভয় প্রদেশের সহযোগিতার একটা উজ্জ্বল দিক হইতেছে গবেষণার দিক। এ বিষয়ে বাঙালীর চেষ্টা নিতান্ত নগণ্য নহে। স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "কামরূপ শাসনাবলী" কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ক অমূল্য গ্রন্থ; ৺নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের কামরূপের সামাজিক ইতিহাস উভয় প্রদেশের বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত; ডাঃ রাধা গোবিন্দ বসাক এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়ের History of Noth-Eastern India এবং শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, পি-আর-এস মহাশয়ের North-Eastern Frontier Policy of the Moghals ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। ইহা ব্যতীত বাংলার মাসিক ও দৈনিক পত্রাদিতে আসামবিষয়ক অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি বহুদিন যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে।

ইংরেজ-পূর্ব্বযুগে আসাম-বঙ্গে যেরূপ আদান-প্রদান ছিল আজও সেই স্রোত বিলীন হয় নাই, তাই আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্যে;—বিনীত নিবেদন, যেন আত্মশ্লাঘার দোষ আরোপ না করেন।

সাহিত্য জগতের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা

এই বর্ষে কবি-সার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথের অষ্টসপ্ততি বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় তিনি সমগ্র পৃথিবীর সুধীমণ্ডলী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছেন। এই অভিনন্দনে বঙ্গভাষা, বাংলা দেশ—সমগ্রভারত অভিনন্দিত হইয়াছে। ভারতভাগ্যবিধাতা যেন কবিবরকে আরও দীর্ঘকাল মানব-কল্যাণ-সাধনের সুযোগ দেন।

এই বর্ষে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বঙ্কিম জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। "বন্দে মাতরমে"র ঋষির, বাংলা ভাষার নবযুগের প্রবর্ত্তকের প্রভাব ক্রমশঃ ব্যাপক হইবেই। বাংলার বঙ্কিম, আজ ভারতের তুমি।

এই বর্ষে হেমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবও সম্পন্ন হইয়াছে। হেমচন্দ্রের ওজস্বী ভাব ও ভাষা আজও বাঙালীর চিত্ত উদ্বেলিত করে এবং বহুযুগ ধরিয়া করিবে।

এই বর্ষে কেশবচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয় জীবন গঠনে ও বঙ্গসাহিত্য বিস্তারকল্পে জগদ্বিখ্যাত বাগ্মী, "সুলভ সমাচারে"র প্রতিষ্ঠাতার দান স্মরণীয় হইবে।

স্বভাবকবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ও সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের শতবার্ষিকীও আলোচ্য বর্ষে পড়িয়াছে। সদ্ভাবশতকের কবি চিরদিন আমার ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তিগণের চিত্তবিনোদন করিবেন। ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত কৃষ্ণদাস পালের অমর কীর্ত্তি দিন দিন আরও উজ্জ্বল হইবে।

বিশিষ্ট মনীষিগণের মৃত্যু

বঙ্গবাণীর মন্দিরে মৃত্যুর করাল ছায়া সম্প্রতি নির্ম্মমভাবে পতিত হইয়াছে। ৺জগদীশচন্দ্র, ৺শরৎচন্দ্র, ৺পদ্মনাথ, ৺হেরম্বচন্দ্র, ৺নগেন্দ্রনাথ, ৺অপূর্ব্বচন্দ্র, ৺ব্রজেন্দ্রনাথ, ৺ননীগোপাল, ৺চারুচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় মনীষীকে আমরা হারাইয়াছি। যাঁহারা দেশ-মাতৃকাকে বিশ্বের সভায় সম্মানিত স্থান দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের বিষয় কিছু বলিবার যোগ্যতা আমার নাই; তথাপি কর্ত্তব্য প্রেরণায় আজ এই সভামণ্ড হইতে সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করিব।

স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র ছিলেন বিশ্ব-বিশ্রুত কীর্ত্তিমান বৈজ্ঞানিক। আইনষ্টাইনের ভাষায় "A monument should be erected in recognition of human achievement so great as that of Bose."

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ কথাশিল্পী—যাঁহার প্রাণবন্ত লেখা বিচিত্র মানবচরিত্রের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছে এবং আজও যাঁহার গ্রন্থাদি ইংরেজী, ইতালীয় ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইতেছে।

স্বর্গীয় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সরস্বতী মহাশয়ের জন্য শোক আমাদের ব্যক্তিগত। সম্পদ হইবে, ইহা কেবল আমারই মত নহে, মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়দ্বয় অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের জন্য শোক আমাদের ব্যক্তিগত। তিনিই ছিলেন গৌহাটী পরিষদ শাখার প্রথম সভাপতি। তাঁহার গ্রন্থ "কামরূপ শাসনাবলী" সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থখানি সমগ্র উত্তর-ভারতের ইতিহাসের বহু লুপ্ত তথ্যের উদ্ধারে অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। স্যার যদুনাথ সরকার ও রায় বাহাদুর কনকলাল বড়ুয়া উভয়েই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এমন একখানি গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখিত না হওয়ায় ইহার সমাদরের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ইহাই হইল ৺বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

৺অপূর্ব্বচন্দ্র ছিলেন এই প্রদেশের এক জন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। কেম্ব্রিজে ইংরেজী জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি আত্মতৃপ্তি পান নাই। তাই তিনি "ভারতীয় জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" নামক বাংলা গ্রন্থ লিখিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

হেরম্বচন্দ্র ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী পাশ্চাত্য মনীষিগণের সুগভীর গবেষণার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিচয় দিয়া বাঙালীর মর্য্যাদা ভারতের বাহিরে বিস্তারে তিনি সহায়তা করিয়াছেন।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কয়েক দিন পূর্ব্বেও আমাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয়ী প্রতিভার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির, হিমালয়সদৃশ বিশাল পাণ্ডিত্যের প্রতি বিশ্বজগৎ চিরদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবে।

৺ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের আততায়ীর হস্তে অকালমৃত্যুতে বাংলা তথা সমগ্রভারত মুহ্যমান। ভারতীয় সভ্যতার তিমিরাচ্ছন্ন যুগের রহস্য উদ্ঘাটনে ৺রাখাল দাস ও ৺ননীগোপালের দান বিশ্ববিশ্রুত।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বেও আমাদের মধ্যে ছিলেন। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার দান সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

চিত্রগুপ্তের এই নির্ম্মম খতিয়ান বঙ্গের বাণীকুঞ্জেই নিঃশেষ হয় নাই—অসমীয়া সাহিত্যের নবযুগের প্রবর্ত্তক লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া—যিনি একাধারে কথাশিল্পী, কবি ও সাংবাদিক ছিলেন, তিনি আলোচ্য বর্ষে পরলোকগমন করায় অসমীয়া সাহিত্য সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের গতি

আমি প্রগতিবিহীন প্রাচীনপন্থী। আধুনিক অতি আধুনিক কোন কিছুই উপলব্ধি করিবার অন্তর্দৃষ্টি আমার নাই। সাহিত্যের যেসব প্রথিতনামা কর্ণধার দয়া করিয়া এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা বঙ্গভাষায় ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং গতি পরিণতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাঁহারা এই সম্মেলনেও বহু অমূল্য প্রবন্ধাদি পাঠ করিবেন; অতএব আমার ন্যায় অভাজনের ভাষা ও সাহিত্য আলোচনাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া নিষ্ফল ধৃষ্টতা মাত্র। অনধিকারচর্চ্চার বয়স আমি বহুপূর্ব্বে অতিক্রম করিয়াছি।

সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইলেও আমার জীবনের সায়াহ্নে, যখন পরপারের আহ্বান আমার কর্ণে আসিয়া পোঁছিয়াছে, এই মহতী সভার সম্মুখে এই মুমূর্ষুর অন্তিমকথা দুই একটি নিবেদন করিব।

কে একজন কবে একটি বড় কথা বলিয়াছেন, "সাহিত্যের জন্ম হয় নির্জ্জনে, কিন্তু জন্মমাত্রই হয় জনতার দিকে তাহার স্বাভাবিক গতি।' কথাটি খুব খাঁটি। মানবচিত্তকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা সাহিত্যের অসাধারণ; এই ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে সমাজের অকল্যাণ অপরিহার্য্য। আমি আজ জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের নিকট ঐকান্তিক নিবেদন করিতেছি, আপনারা যেন এই অকল্যাণের হাত হইতে সমাজের রক্ষা করেন। বঙ্গজননীর প্রতিভাবান সন্তানগণ! অশীতিপর বৃদ্ধের এই শেষ নিবেদন। মনে রাখিবেন প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মধ্যে ভেদরেখা, নরনারীর মধ্যে প্রকৃতিভেদ, পাপপুণ্যের প্রভাব—এগুলি মানুষের কল্পিত স্বপ্নলোকের কথা নহে, এগুলি প্রাচীনদের কুসংস্কার নহে, এর পিছনে বিশ্বনিয়ন্তার ইঙ্গিত ও অভিপ্রায় বিদ্যমান। আপনারা দেখিবেন যেন সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজমন ভোগোন্মুখ হইয়া না উঠে; আর্টের মুখোস পরিয়া উচ্ছৃংখলা যেন সমাজে আদৃত না হয়; অনুকরণ ও অনুবাদ যেন মৌলিকতার দাবী না করে; লালসা যেন প্রেমের স্থলাভিষিক্ত না হয়; পাপীর চরিত্র অংকনে পাপ যেন লোভনীয় না হয়; পুণ্যবান লাঞ্ছিত হইলেও, সেই লাঞ্ছনাই যেন সমাজের মুকুটরূপে শোভা পায়।

বাংলা সাহিত্যের প্রভাব আজ বহুদূর বিস্তৃত। ভারতের সর্ব্বত্র এবং পৃথিবীর বহুস্থানে বাংলা সাহিত্যের শক্তি মানব মনের উপর কার্য্য করিতেছে। অতএব এই সাহিত্যের সেবকগণের দায়িত্ব অতি মহান্। তারপর আবার, বাঙালী আজ কাশ্মীর হইতে সিংহল, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বসবাস করিতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত বাঙালীগণের দায়িত্বও কম নয়। ঐ ঐ প্রদেশের ইতিহাসের, কৃষ্টির, সমাজগঠন ব্যবস্থার যেটুকু প্রাণ তাহাকে সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙালী সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। ইহার ফলে এক দিকে যেমন বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে, অন্য দিকে ভারতীয়গণের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা বাড়িবে। এই শ্রদ্ধার ও সহানুভূতির জাগরণের সংগে সংগে কবির স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইবে।

> হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে
> জাগোরে ধীরে—
> এই ভারতের মহামানবের
> সাগর তীরে।

উপসংহারে আমি পুনরায় আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক, তজ্জন্য পুনরায় মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

"বন্দেমাতরম্"

মূল সভানেত্রীর অভিভাষণ

(৪১১ পৃষ্ঠার পর)

নামকরণ হয় এবং নাম থাকে! বেদ এবং তন্ত্রশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের নাম কি? তাঁহারা ব্রহ্মত্ব এবং শিবত্ব লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের নাম ব্রহ্মা এবং শিব। পুরাণ শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের নাম কি? তাঁহারা সকলেই জ্ঞানপ্রচারকর্ত্তা। অতএব সকলেই বেদব্যাস। মহাবিদ্যাগণের পূজাপদ্ধতি প্রকাশক বিজিতেন্দ্রিয় মহাত্মাদিগের নাম কি? তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন; অতএব সকলেই বশিষ্ঠ। নাম রাখিবার কামনা থাকিলে কি নিষ্কাম উপাসনা হয়? এখানকার সাধনপ্রকরণ নিতান্ত গুহ্য। ইষ্টসাধন করিব—সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হয়—হউক, শরীর যায়—যাউক, নাম ডুবে—ডুবুক, এমত প্রতিজ্ঞারূঢ় বীরপুরুষেরাই এই মহাসাধনে রত হইতে পারেন। ইহা সাক্ষাৎ শক্তিসাধন"—(পুষ্পাঞ্জলি, পৃ-৭৬—৭৯)

এই নিষ্কাম উপাসনা, এই জীবনপণে শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে আমরা আজ সৌভাগ্যক্রমে সম্মিলিত হইয়াছি। দেশপ্রাণ মহাপুরুষবর্ণিত এই কামাখ্যার শিক্ষা আমাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে পরিগ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্য সাধনা যেন নিষ্কাম এবং যশোলিপ্সাশূন্য হয়। সাহিত্যসৃষ্টির জন্য আমাদের প্রচেষ্টা যেন আন্তরিক এবং আমাদের অধ্যবসায় যেন জীবনব্যাপী হয়। সাংসারিক সুখসুবিধার প্রলোভন, রাজনৈতিক বা ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকতার দণ্ডভীতি যেন আমাদিগকে বিচলিত করিতে না পারে। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণপ্রদ তাহা যেন আমরা নির্ভয়ে গ্রহণ এবং পরিবেষণ করিতে পারি। আপনাদের সকলের পক্ষ হইতে এবং আমার নিজের পক্ষ হইতে ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

লড়ায়ের শেষ কোথায়

আকাশের চিহ্নহীন পথে গর্জ্জমান এরোপ্লেন চলেছে দিক থেকে দিগন্তরে। রেডিয়ো কত দূরে থেকে মানুষের বাণী বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে মানুষের কানে। বৈজ্ঞানিকের কল্পনাশক্তির বিপুলতা সত্য সত্যই চমকপ্রদ। বিজ্ঞানকে সহায় ক'রে মানুষ নিত্য-নূতন কত না অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাচ্ছে! ধন্য তার মগজের ক্ষমতা! কিন্তু বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর এত আশীর্ব্বাদ কুড়িয়েও আমরা যে জগতে বাস করছি—সে একটা অভিশপ্ত, ভয়ার্ত্ত, কদর্য্য জগত।

এই জগতকে এমন ছন্দোহীন আসুরিক ক'রে তুলেছে মানুষের উদ্দাম লোভ। পৃথিবীতে আগে আগে যত যুদ্ধ বেধেছে তার মূলে ছিলো হয় জাতি-বিদ্বেষ, নয় তো এক ধর্ম্মের সংগে আর এক ধর্ম্মের বিরোধ। মুসলমানদের সংগে খৃষ্টানেরা দুই শত বৎসর ধ'রে লড়াই করেছে। প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের সংগে ক্যাথলিকদের লোমহর্ষণ বিরোধের ইতিহাস পৃথিবী আজও ভুলে যায় নি।

এখনকার লড়ায়ের মূলে জাতি-বিদ্বেষ অথবা ধর্ম্ম-বিদ্বেষ নয়। আজকাল যে সব লড়াই বাধছে তার মূলে র'য়েছে অর্থনৈতিক কারণ। লোক-সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। দেশে যে খাদ্য উৎপন্ন হয়—তাতে আর দেশবাসীর কুলায় না। লোক-সমস্যার এবং খাদ্য-সমস্যার সমাধানের উপায় কি? লাগাও যুদ্ধ। ঝাঁপিয়ে পড়ো আবিসিনিয়ার অথবা চীনের ঘাড়ের উপর। পদানত দেশের রক্ত শোষণ কর। তাকে পরিণত কর উপনিবেশে, লোক-সমস্যার সমাধান হবে—খাদ্য-সমস্যা ঘুচে যাবে। ইটালি-আবিসিনিয়ার অথবা চীন-জাপানের লড়ায়ের মূলে হ'চ্ছে এই অর্থনৈতিক সমস্যা। এই অর্থনৈতিক সমস্যার যতক্ষণ সমাধান করতে না পারছি আমরা—ততক্ষণ গীর্জ্জাঘরে অহিংসার হাজার জয়গান করলেও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

লোক-সংখ্যা পৃথিবীতে দিন দিন বেড়ে চলেছে ব'লে আমাদের ভীত হবার কোনোই কারণ নেই। ম্যালথাস লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি এবং খাদ্যাভাবের অংগাংগী সম্পর্ক দেখিয়ে আমাদের মনে যে আতঙ্ক সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন—বাস্তবিকই সে আশঙ্কা অমূলক। বিজ্ঞানের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ম্যালথাসের মনে আসেনি। আজ আমরা ভালো ক'রেই জানি—বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে কত অল্পায়াসে কত বেশী ফসল ফলানো এখন সম্ভব হ'য়ে উঠেছে। লোক-সংখ্যা যদি তিনগুণ বৃদ্ধি পায় তবুও অন্নাভাবে মানুষের ম'রে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই। জগতের বিভিন্ন দেশগুলি যদি পরস্পরের সংগে বন্ধুর মতো বসবাস করে, খাদ্যের অভাবে একটি লোকও শুকিয়ে মরবে না। আমাদের অপরিসীম দুর্ভাগ্যবশতঃই লোকে এখনও ম্যালথাসের থিওরীকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এবং ভাবে, লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি খাদ্যাভাবকে দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর ক'রে তুলবে।

রাজ্যলোলুপের দল যদি আপন আপন দেশে অধিকতর সম্পদ-সৃষ্টির কাজে অর্থ ব্যয় করতো তবে আজ যুদ্ধ-দানবের তাণ্ডবনৃত্যে জগত এমন ক'রে মুহুর্মুহু কেঁপে উঠতো না। কিন্তু যে টাকা ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিলো দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির মঙ্গলজনক কাজে—সে টাকার আজ নিদারুণ অপব্যয় ঘটছে কামান আর বন্দুক তৈরী ক'রে যমের খাদ্য যোগাতে গিয়ে। জাপানের কথা লিখতে গিয়ে শ্রীযুক্ত কাগাওয়া লিখছেন—

"লোকে বলে জাপানে লোক-সংখ্যা দেশের আয়তনের অনুপাতে অত্যন্ত বেশী। একদিক দিয়ে একথা সত্য—আর একদিক দিয়ে একথা সত্য নয়। জাপান পর্ব্বতময় দেশ। দেশের শতকরা পঁচাশী ভাগ চাষের অযোগ্য।...... এই রকম একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে যে ভাবে খাদ্য-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব—জাপানকে সেই ভাবেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এমন গাছ পাহাড়ের ঢালুদেশে লাগানো দরকার যার ফল খেয়ে হাঁস-মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী প্রচুর ডিম পাড়তে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে যেমন ছাগীর সংখ্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা আছে—জাপানেও সেরকম ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'তে পারে। ছাগীরা পাহাড়ে আগাছা খেয়ে দিব্যি দুধ দিতে পারে—গোরু তেমন পারে না। ছাগ-পালনের দ্বারা জাপানীদের পক্ষে দুগ্ধ-সমস্যার সমাধান করা আদৌ কঠিন নয়।"

তারপরেই কাগাওয়া মন্তব্য করছেন,

"If we could only put into such undertaking the money which we are now using for armaments! Japanese soldiers are not familiar with such matters of economics. They wish to rattle swords. This is really a serious situation in the Orient."

এই যে লড়ায়ের সমস্যা আজ প্রাচ্যে এমন উৎকট আকার ধারণ ক'রেছে—এর সমাধানের পথ শুধু একটিই আর এই পথটি হোলো—টাকা অস্ত্র তৈরীর জন্য ব্যয় না ক'রে দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা। খাদ্যের অভাবের জন্য মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এ আশঙ্কা সত্য সত্যই অমূলক। মানবজাতিকে আজ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলবার উপক্রম ক'রেছে মানুষের লোভ। মানুষ আজ বিলাস-বস্তুর কাঙাল হ'য়ে উঠেছে—অর্থের জন্য তার লালসার আজ অন্ত নেই। এই দুরন্ত অর্থ-লালসাই ইটালিকে প্ররোচিত করেছে আবিসিনিয়ার রক্তপান করতে। এই উদ্দাম অর্থ-লিপ্সাই রয়েছে জাপান কর্তৃক চীন-আক্রমণের মূলে। লোক-সংখ্যার আধিক্য, খাদ্যের অনটন—এসব কথা হোলো লোভের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে ঢাকা দেবার মুখোস মাত্র। কাগাওয়া বলছেন—

Humanity starves because it is too short-sighted to try to establish a new economic policy based upon mutual love.

আসল কথা—যে আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীবোধ হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হ'লে জাতি জাতির সংগে মিলে মিশে ব্যবসা-বাণিজ্য অবাধে

(শেষাংশ ৪৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাছের আঁইশ ও চামড়ায় তৈরী স্যাণ্ডেল

জার্ম্মানীতে সব রকমের কাঁচামালেই একটা ধরকাট সুরু হইয়াছে। যাহাতে বিদেশ হইতে কোনপ্রকার কাঁচামাল না কিনিয়া দেশের জিনিষ হইতেই সকল চাহিদা মিটান যায়,

তাহারই ব্যবস্থা হইতেছে। সেইজন্য কৃত্রিম (Synthetic) পদার্থ দ্বারা চামড়ার চাহিদা মিটাইবার চেষ্টায় মাছের আঁইশ ও চামড়ার দ্বারা স্যাণ্ডেল তৈরী হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় এই প্রকার স্যাণ্ডেল টেঁকসই হয় নাই তেমন, পশুর চামড়ার স্যাণ্ডেলের সঙ্গে সে ব্যাপারে এই মাছের আঁইশের শিলপারের তুলনাই হইতে পারে না। তথাপি যাহাতে মাছের আঁইশ ও চামড়া প্রচুর পরিমাণে দেশে পাওয়া যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মানীতে গত কয়েক বৎসরের ভিতর আপন 'ফিশারী' গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কাজেই মাছের চামড়া বা আঁইশের জন্য জার্ম্মানীকে আর অন্যদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না। এই প্রকার সকল বিভাগেই কৃত্রিম উপাদানের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে—শিল্প-কারখানায় তাহা ব্যবহার করিবার জন্য আইনদ্বারা বাধ্য করা হইতেছে।

বিড়ালের দোস্ত ইঁদুর

ওয়েলস-য়ের এবারক্রাবের ইণ্টার-ন্যাশনেল কলিয়ারীতে একটি বিড়াল উহার বাচ্চার সহিত একটি ইঁদুর-ছানা আনিয়া পালন করিতেছে। বিড়ালটার কতকগুলি বাচ্চা জন্মায় কিন্তু একে একে জলে ডুবিয়া অধিকাংশই মারা যায়। এই সময় বিড়ালটা গুদাম ঘরের এক কোণে ইঁদুরের আড্ডা আবিষ্কার করে। সাতটা ইঁদুরকে মারিয়া ফেলিয়া বিড়াল একদিন একটা ইঁদুর-ছানা লইয়া আইসে এবং আপন বাচ্চাগুলির সাথী করিয়া দেয়। সেই অবধি ইঁদুর-ছানাটি বিড়াল ছানাগুলির প্রিয় দোস্ত বনিয়া গিয়াছে। বিড়াল যেখানে যে খাবার পায় বাচ্চাদের আনিয়া দেয়—ইঁদুর ছানাও সেই আহার্য্যের অংশ পায়। আশ্চর্য্য, এই বিড়াল-ছানাগুলি কোনদিন ইঁদুর-ছানাটির কোন অনিষ্ট করে না—বিড়ালটিও উহাকে আক্রমণ করে না।

হাস্য-রসিক গর্দ্দভ

সার্কাস মালিক ফ্রেডারিক ক্যারের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ আনীত হয়, জীব-জন্তুর নিষ্ঠুরতার জন্য। সাক্ষী বলে, গাধাটিকে যখন ক্যারে শিক্ষা দিতে থাকে, তখন দাঁত বাহির করিয়া গাধাটা ক্যারেকে চারিবার রুখিয়া আসিয়া মঞ্চের বাহিরে তাড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয় অভিযোগ, যে চাবুক ক্যারে ব্যবহার করিয়াছে জানোয়ারটাকে পরিচালিত করিতে, তাহাতে লোহার তার লাগান ছিল ডগায়।

উত্তরে সার্কাস মালিক বলে—তার-লাগান গাধাকে মারিবার জন্য নয়, উহাতে গাজর গাঁথিয়া উহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য। আর প্রথম অভিযোগের উত্তরে সে বলে—গাধা যে দাঁত বাহির করিয়াছে, তাহা কামড়াইবার জন্য নয়, আমার শিক্ষিত গাধাটি হাস্য-রসিক, সে তখন হাস্য করিতেছিল।

অদ্ভুত উপাদানের দড়ি

দড়িটির ব্যাস (diameter) দশ ইঞ্চি। শণের তৈরী দড়ি-দড়া অপেক্ষা ইহা কোন প্রকারেই হীন নহে। যেমন মজবুত তেমনি জল-হাওয়ার প্রকোপ বরদাস্ত করিবার মত শক্তপোক্ত। সেলুলোজ (Cellulose) হইতে সূক্ষ্ম তন্তু প্রস্তুত করিয়া উহার ২,১০০ পাল্টায় এই মোটা দড়িটি তৈরী হইয়াছে। ইহাও জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কার। তাঁহাদের দড়াদড়ির প্রয়োজনীয় শণ ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশ
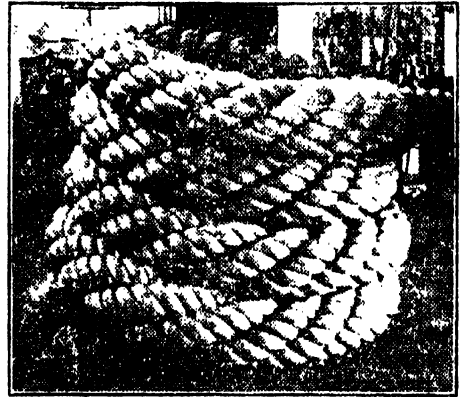
হইতে ক্রয় করিতে হয়। এই বিদেশ হইতে আমদানী করা শণের চাহিদা যাহাতে ন্যূনতম পরিমাণে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখা যায়, এই উদ্দেশ্যেই জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণের এই প্রয়াস, এবং তাঁহাদের গবেষণা ও প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইয়াছে। এইবারে বিদেশ হইতে আর তাঁহাদের শণ আমদানী করিতে হইবে না। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে-কোন প্রকারেই ব্যবহার করা হউক না কেন, এই সেলুলোজ দড়ি শণের তৈরী দড়ি অপেক্ষা টেঁকসই কম হইবে না।

হত্যাকারীর চক্ষুর সার্থকতা

হত্যাকারী জন ডিয়ারিং-এর প্রাণদণ্ড হয় মার্কিনের সল্টলেক সিটিতে। ইলেকট্রিক চেয়ারে প্রাণ বিয়োগের পর, তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া বরফে সংরক্ষিত অবস্থায় উড়ো জাহাজযোগে পাঠান হয় সানফ্রানসিসকো শহরে। সেখানে ২৭ বৎসর বয়স্ক কোনও জন্মান্ধ ব্যক্তির চোখে, উৎপাটিত-চক্ষু হইতে টিস্যু লইয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। ফলে জন্মান্ধ এখন দৃষ্টি শক্তি পাইয়াছে।

ইলেকট্রিক চেয়ারে প্রাণ বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে ডিয়ারিংকে জানান হয়, তাহার চক্ষু দ্বারা অন্ধের চিকিৎসা করা হইবে।

তখন হত্যাকারী ডিয়ারিং বলে—আমার চোখ যদি কোনও দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমার জীবিত কাল ব্যর্থ হইয়াছে, এমন কথা মনে করিবার কোনই হেতু থাকিবে না আমার।

চিকিৎসকগণ বলেন, জন্মান্ধের চক্ষুতে এখন পড়িবার শক্তিও ক্রমশ আসিবে।

পুলিশের চোখে ধূলি দিবার নূতন ফন্দী

পোরচেস্টার রোড, বেয়েসওয়াটার, লণ্ডন।

রাস্তার মাঝখানে থামান একখানি মোটর গাড়ী। ভিতরে তরুণ-তরুণী আলিঙ্গনাবদ্ধ। যে দেখে, সে-ই আপন মনে বলে—'অনুরাগের সোনালী স্বপ্ন', আর চলিয়া যায় নিজের ধান্দায়।

রাত্রির পাহারাওয়ালা উহাদের দিকে তাকাইয়া বোধ হয় আপন তরুণ বয়সের এমনই একটি দৃশ্যের ধ্যান-ধারণায় বেহুঁস হইয়া পড়িল।

কারণ তৃতীয় এক ব্যক্তি কোথা হইতে আসিয়া গাড়ীর সম্মুখস্থ ফুটপাথে দাঁড়াইল। হেয়ার ড্রেসার সেই সপ প্রামরিজের দোকানের কাচের শো-উইণ্ডোতে ফুটা করিয়া বহুমূল্য ট্রফি কয়টি বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানি সচল হইল—তৃতীয় ব্যক্তিকে তরুণী গাড়ীতে উঠিতে সাহায্য করিল। পাহারাওয়ালা একটি আঙ্গুলে নাড়িবার অবকাশও পাইল না। গাড়ী বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পলাইল।

জানালায় ছিল হেয়ার-ড্রেসার্স প্রদর্শনীতে প্রাপ্ত বহুমূল্য 'কাপ' প্রভৃতি ট্রফি। কিন্তু মদনোৎসবের কারসাজিতে পাহারাওয়ালা কোন্ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল, তাই নেহাৎ মাটির ধরার বাস্তব এ রাহাজানি অবাধেই সাধিত হইল মাত্র অর্দ্ধ মিনিটের অবকাশের ভিতর। এক নিমেষ আগেও কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই—মদন-দেবতার পূজারী-পূজারিণীর সার্থক অভিনয় পথচারীদের নিছক আমোদ সৃষ্টির জন্য নয়।

রোগীর 'ধার-করা' শক্তি

দন্ত-চিকিৎসকের নিকট রোগী আসিল। একটি অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। কিন্তু ডাক্তার হতাশ হইল—সংজ্ঞা-হরক মাদক-দ্রব্য ব্যবহারমাত্র রোগী যেন কোথা হইতে অপরিমেয় শক্তির অধিকারী হইয়া অঘটন ঘটাইতে আরম্ভ করে।

প্রথম অস্ত্রোপচার চেষ্টা বিফল হইল—অস্ত্রোপচার টেবিলে শায়িত অবস্থায় ক্লোরোফরম প্রদান করা হইলে রোগী মাথা টেবিলে রাখিয়া পা দুইটা জানালায় ঠেকাইল।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় রোগী টেবিল ছাড়িয়া মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

তৃতীয় বারে ক্লোরোফরম প্রদানকারী ডাক্তারের হাতঘড়ির ব্যাণ্ড কামড়াইয়া দুইটুকরা করিল—উক্ত ডাক্তার এমন রোগীকে আর মাদক প্রদানে স্বীকৃত হইল না।

চতুর্থ দফায় যে লোহার শিকল দিয়া টেবিলের সঙ্গে তাহাকে বাঁধা হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

পঞ্চম বারের প্রয়াসে দন্ত-চিকিৎসককে এমনই ভাবে কামড়াইয়া খিমচাইয়া দিল যে, চিকিৎসককে চার দিন শয্যাগত থাকিতে হইল। পঞ্চমবারে চারজন জোয়ান পুরুষ নার্স রাখা হইয়াছিল, কিন্তু যে কেহ রোগীকে ধরে, সে-ই কামড়-আঁচড়ে আতিষ্ঠ হয়।

দন্ত-চিকিৎসক বলে—এনেস্থেটিক দেওয়ামাত্র রোগী যেন 'ধার-করা' শক্তি বলে বলীয়ান হয় এবং অমানুষিক কাণ্ড বাধাইয়া তোলে।

রোগীটি লণ্ডনের এক ব্যবসাদার, নাম মিঃ এ প্রেস্টন জোন্স। অবশেষে রোগীকে অস্ত্রোপচার করিবার ব্যবস্থা হইল—রোগীর স্ত্রীর পরামর্শমত। মহিলাটি একাই রোগীকে শান্ত রাখিল, অস্ত্রোপচার বিনা বাধায় শেষ হইল।

রোগী বলে, আমি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বহু ডাক্তারের নিকট গিয়াছি, কিন্তু কেহই প্রথম অস্ত্রোপচারের বিফল চেষ্টার পর আমায় চিকিৎসা করিতে রাজি হয় নাই।

আমি বেহুঁস হইলে কেন এমন পরিবর্ত্তন হয়, কেহই তাহার কারণ উদ্ধার করিতে পারে না। বেহুঁস অবস্থায় আমার আচরণের কথা শুনিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আরও বিপদের কথা, আমার কন্যাটিও ঠিক এই প্রকার হইয়াছে, যদিও আমার স্ত্রী সেরূপ নয়। আমার স্ত্রী ছিল নার্স। বিবাহের পূর্ব্বে আমার যখন অসুখ হয়, তখন সে ভিন্ন অন্য কোন নার্স আমার সেবা-শুশ্রূষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

একজন বিখ্যাত চিকিৎসক বলেন—লোকটি অতি অমায়িক, একটি মাছিরও অনিষ্ট করিবে না সজ্ঞানে, কিন্তু এনেস্থেটিক দিলেই সে যে উন্মাদ হইয়া যায়! কেন এমন হয়—আমি তাহা বুঝি না।

ফুটবলের মহিলা-শিক্ষক

মহিলা-শিক্ষক মিস্ ডি কেসি, ব্রডফোর্ড স্কুলে বালকদের ফুটবল খেলা শিক্ষা দেয়। সমগ্র ব্রিটেনে বোধ হয় এই একটিমাত্র মহিলা শিক্ষক, বালকদের ফুটবল খেলা শিখায়। মিস্ কেসি বলে, সে ছয় বৎসর যাবত বালকদের এই খেলা শিখাইতেছে এবং ১৩২টি বালক তাহার শিক্ষায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে।

মিস কেসির শিক্ষা-পদ্ধতির অভিনবত্ব এই যে, সে প্রথমত ব্ল্যাক-বোর্ডের সাহায্যে খেলাটির সূক্ষ্ম বিষয় বুঝাইয়া থাকে এবং কি প্রকারভাবে গতি-নিয়ন্ত্রণ করিলে গোল স্কোর করা সম্ভব, তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।

ইহার পর মাঠে যাইয়া প্রকৃত খেলায় সেই সকল উপদেশ অনুযায়ী চলিতে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

অনেক মেয়েকেও সে শিক্ষা দিয়াছে—বিশেষ করিয়া ফুটবল খেলোয়াড় বালকগণের ভগ্নীদের। তাহারাও যেভাবে উন্নতি করিতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে মহিলা টিমের উপযুক্ত খেলোয়াড় তাহারা হইবে।

আপন কবরে পুষ্প-বৃষ্টি

৬০ বৎসর বয়স্ক মরগ্যান এণ্ডরুজ গ্ল্যামরগ্যান শায়ারে নেলসন শহরের ল্যান্‌ফ্যাবোন গীর্জা প্রাঙ্গনে তাহার নিজ নামাঙ্কিত কবর সপ্তাহে দুইবার ফুল দিয়া সাজাইত এবং সমাধি-প্রস্তর পরিষ্কার করিত। ঐ কবরে অবশ্য শব ছিল না। তাহার মাতা জীবিত-কালেই দুইটি পাশাপাশি কবর-স্থান মূল্যে দিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল এই জন্য যে, তাহার কবরের পাশেই যেন তাহার পুত্রকে কবরিত করা হইতে পারে। তাই মাতার মৃত্যুর পর যখন কবর দেওয়া হয়, তখনই পুত্রেরও শূন্য সমাধি-প্রস্তর নামাঙ্কিত করিয়া রাখা হয় এবং মরগ্যান এণ্ডরুজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আপন সমাধি উজ্জ্বল রাখিয়াছে—মাজিয়া ঘষিয়া এবং পুষ্পে সজ্জিত করিয়া।

এব্রাহাম লিঙ্কনের স্বপ্ন

আততায়ীর হস্তে মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে এব্রাহাম লিঙ্কন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নের বৃত্তান্ত তিনি তাঁহার পত্নীকে এবং ওয়ার্ডহিল ল্যামন নামক বন্ধুকে জানান। তিনি বলেন—"হোয়াইট হাউসের কক্ষ হইতে কক্ষে আমি আনাগোনা করি, কিন্তু কোথাও জনমানবের সাড়া পাই না। হঠাৎ মৃদুক্রন্দনের শব্দ আমার কানে ভাসিয়া আসে, যখন আমি অন্য ঘর অতিক্রম করিয়া 'ইষ্টরুম'-য়ে পৌঁছি। আমার সম্মুখে আমি দেখিতে পাই, শাদা চাদরে ঢাকা এক শব —এখনই তাহা কফিনে আবদ্ধ করা হইবে। শবের চারিদিকে সশস্ত্র রক্ষীদল পাহারা দিতেছে আর জনতা একটু দূরে হইতে শবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছে। কতক লোক কাঁদিতেছে, কেহ-বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছে।

একটি সৈনিককে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হোয়াইট হাউসে মারা গেল কে?"

উত্তর হইল—প্রেসিডেন্ট আততায়ীর হস্তে নিহত।

সেই মুহূর্ত্তে জনতা হইতে গভীর শোকোচ্ছ্বাস উত্থিত হইল, আর আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে রাত্রে আর আমার ঘুম হইল না! স্বপ্ন হইলেও তাহার পর হইতে বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতেছি।

রাক্ষস বনাম রাজকন্যা

সকল দেশের রূপকথায়ই রাক্ষস-রাক্ষসী দৈত্য-দানবের অত্যাচার হইতে রাজকন্যার উদ্ধারের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। ইংলণ্ডে কিং আর্থারের রাউণ্ড টেবল নাইটগণ ত এই প্রকার কুমারী-কন্যার মুক্তিদানে সিদ্ধহস্ত ছিল।

এইবার ইংলণ্ডে বিপরীত ধারা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। প্রগতির পাদক্ষেপে দুনিয়ার চাকা অনেকটা ঘুরিয়া গিয়াছে, তাই এখন কুমারী-কন্যার আক্রোশ হইতে রাক্ষসকে বাঁচান দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

সকলেরই স্মরণ আছে লক্ নেসের রাক্ষসের উদয় হয় ১৯৩৩ সালে। সমগ্র হাইল্যাণ্ডস্-এ উহার নামকরণ হইয়াছে নেসি (Nessie)। কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার আকার-আকৃতির সঠিক সন্ধান আজ অবধি পাওয়া যায় নাই।

মেফেয়ার-অভিনেত্রী মেরিয়ন ষ্টার্লিং (বয়স ২৩ বৎসর) এই রাক্ষসটির সন্ধানের জন্য ৫০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া একদল সন্ধানী-কর্ম্মী এবং জাল, টেঁটা প্রভৃতি প্রভূত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু স্যার মারডক্ ম্যাকডোনাল্ড ইন্‌ভারনেস্ শায়ারের ন্যাশনেল লেবার এম-পি অভিনেত্রীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, "নেসি"-র স্বাধীনতা বিলোপ করা যাইবে না। সুতরাং ২০ জন সহচর-সহচরীসহ কুমারী মেরিয়ন ষ্টার্লিং আর রাক্ষসের আবিষ্কারের যথেচ্ছাচার কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই।

কাল নারী-প্রগতির তীব্রালোকে চঞ্চল, তাহার উপর স্থান রাউণ্ড টেবল নাইটদের লীলাক্ষেত্র ইংলণ্ড—কাজেই এবার কুমারীর আক্রোশ হইতে রাক্ষসকে রক্ষা করিতে হইল।

ইংলণ্ডে নিরামিষ আহার

শরীর-গঠন-বিশেষজ্ঞ স্যার লিওনার্ড হিল বলেন,—মানুষের খাদ্য-পরিমাণ যে ৩৪০০ ক্যালরি ধার্য্য হইয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নয়—খাদ্যের স্বাদ-গন্ধ প্রভৃতির লোভ এবং বেশী পরিমাণ ভিটামিন ও ধাতুজ পদার্থ গ্রহণের মোহ মাত্র। কারণ মাংস, রুটি, মাখন আর চিনি—এই যে মনোনীত তালিকা, ইহা বহু ভ্রান্তিপূর্ণ এবং ক্যালরি ও প্রোটিন পরিমাণে বহু হ্রাস করিয়াও কেবল টাটকা ফল ও শাকসব্জীর অতি সামান্য মাত্রা হইতেই পূর্ব্বোক্ত তালিকা অপেক্ষা বেশী উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বাকিংহাম শায়ারের নিরামিষাশী দম্পতি এবং তাহাদের নয় বৎসর বয়স্ক পুত্র ক্রিষ্টোফারের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি বনমধ্যে কুটীরে ইহারা বাস করে। প্রতি প্রাতে (শীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতে) ইহারা ঘুম হইতে অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই ঠাণ্ডা জলে স্নান করে। তৎপর দশ মাইল পথ হাঁটিয়া আসে। এই সময় তাহারা একখণ্ড করিয়া আনারস খায়। বালকের আনারস খণ্ড ৬ আউন্স মাত্র। দ্বিপ্রহরে খায়—বাড়ীতে তৈরী ময়দার রুটি, পিঁয়াজ, দুধ, পনির এবং স্পিনা শাক সিদ্ধ। বালকটিকে সমুদয়ে এই সময়ে দশ আউন্স পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় বালককে দেওয়া হয়—২টি আপেল, একটি কমলা নেবু, ২টি টমেটো এবং সামান্য আইস-ক্রীম—সমুদয়ে ১২ আউন্সের বেশী নয়। সপ্তাহে একবার মাত্র উহাকে চা, কেক ও স্যাণ্ডউইচ খাইতে দেওয়া হয়।

এই অতি সামান্য ওজনের খাদ্য গ্রহণ করিলেও বালকের ওজন তাহার দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ফুট প্রতি এক ষ্টোন এবং শরীরের কোথাও অতিরিক্ত বা অবাঞ্ছিত মাংসপিণ্ড নাই এক আউন্স পরিমাণও। অথচ সাধারণ মৎস্য-মাংস-ডিম্ব প্রভৃতি ভোজী অন্য বালক-বালিকা অপেক্ষা দৈহিক ক্ষমতায় ক্রিষ্টোফার কোন অংশে হীন নহে।

বিফ্-বেকন-ডিম-মাখনের দেশে এই আবিষ্কার বিশ্বাস করিবে কয়জন?

জরা ও মৃত্যু

(গল্প)

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

বলদ লাঙল টানে তাই মানুষের অন্ন জুটে। গরু কৃষকের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এই গরুই যখন তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া লাঙল টানিয়া টানিয়া অকালে জীবনের শেষ-প্রান্তে আসিয়া পড়ে, তখন আর তাহার কোন মূল্যই থাকে না। সে বসিয়া বসিয়া খাইবে ঝিমাইবে, লাঙল টানিবে না—এ ক্ষতি অসহ্য—তাই তখন তাহার স্থান হয় গো-হাটায়—তারপর কসাইখানায়—সেখানে সে তাহার শেষ রক্ত কয়েকবিন্দু ঢালিয়া দিয়া ঋণমুক্ত হয়।

অবস্থা বিশেষে মানুষেরও কখনও কখনও ঠিক এমনি হয়—তখন তাহার বাঁচিয়া থাকা যে সংসারের নিকট শুধু নিরর্থক তাহাই নয়—সে হয় অপরের বোঝা—গলগ্রহ।

একদিন বৈশাখ মাসের শেষ-বেলার দিকে দুই-একটা আম-কাঁঠাল গাছের ছায়ায় একখানা চটের থলের উপরে বসিয়া বৃদ্ধ নিতাই দাস ঝিমাইতেছিল, আর নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি দিগন্ত-প্রসারী রৌদ্র-মুগ্ধ মাঠের উপরে মেলিয়া কি যেন ভাবিয়া চলিয়াছিল।

—প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে বয়স তখন তাহার কুড়ি, একদিন সে তাহাদের গ্রাম কাঞ্চনপুর হইতে—মাইল দুই দূরে রূপ-নগরের কাছারীতে তাহার পিতার সহিত গিয়া প্রথম মুহুরী-গিরিতে প্রবেশ করিল। তাহার পিতা ছিলেন জমিদারের পুরাতন কর্ম্মচারী। কাঞ্চনপুরে তখন ছিল ধনে-জনে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধগ্রাম। বিশ বৎসর তখন তাহার বয়স—সে এক জীবনের মহা সন্ধিক্ষণ! —যৌবন তখন তাহার দেহে আসিয়া সাড়া দিয়াছে—প্রশস্ত বুক—সুগঠিত মাংসল বাহু—বুকে অমিত বল ও সাহস। এই বয়সেই তাহার প্রথম সংসার প্রবেশ—প্রথমে বিবাহ—তারপর কার্য্য গ্রহণ। ষাট বৎসর পূর্ব্বের কত দিনের কত সুখ-স্মৃতির টুকরা এখনও তাহার মনে জাগিয়া উঠে। কিন্তু নিতাই দাস বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না—ইহা কি তাহারই জীবনে ঘটিয়াছিল?—না কোন গল্পে শুনিয়াছে; না ইহা তাহার পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী—জাতিস্মরের মত দুই-একটি টুকরা তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে?—আশী বৎসরের বৃদ্ধ, ষাট বৎসর পূর্ব্বের নিজের জীবনেতিহাসের পাতা উল্টাইয়া নিজেই চমকাইয়া উঠে—ষাট বৎসর পূর্ব্বে সে কি এমনি করিয়া নাচিয়া, হাসিয়া, জীবনে ভরপুর হইয়া বাঁচিয়া ছিল? কিন্তু তাহাই যদি সত্য— তবে, কবে কেমন করিয়া তাহার এমন সুগঠিত দেহ—বজ্রের মত বাহু গেল এমনি বিকৃত হইয়া? দেহ কুব্জ হইয়া উন্নত মস্তক দুই হাঁটুর কাছাকাছি নামিয়া আসিয়াছে, দেহের চর্ম্ম হইয়াছে লোল,—তাহার ভিতরে মাংসের অস্তিত্বই বুঝি আর নাই—শুকনা হাড় খট্‌খট্‌ করিতেছে, দৃষ্টি-শক্তি হইয়াছে অত্যন্ত ক্ষীণ, সমস্ত মুখ-মণ্ডল দন্তহীন হইয়া একান্ত বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছে—আজ সে নিজের মূর্ত্তি দেখিলে নিজেই বোধ হয় ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিবে। প্রথম যৌবনের এই সুখ-স্মৃতি।—তারপর বয়স তাহার বাড়িয়া চলিল,—পুত্র-কন্যার দল আসিল একে একে—চল্লিশ বৎসরে সে পরিপূর্ণ সংসারী—স্বচ্ছল গৃহস্থ।

তারপর আর এক অধ্যায়—আরও কুড়ি বৎসর পরে, সে এক স্মরণীয় দিন। যে দিনের স্মৃতি, তাহার বুকে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া আছে—তাহার ত্রিশ বৎসরের একমাত্র পুত্র সে-দিন মৃত্যুশয্যায়। পুত্রের অবস্থা একান্ত উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে—বৃদ্ধ পিতা তাহারই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে—"হে হরিঠাকুর, দয়া কর—দয়া কর—পায়ে রাখ।" কিন্তু হরিঠাকুরের কানে সে আকুল ক্রন্দন পৌঁছাইল না! আশা যখন আর কিছুই রহিল না—তখন নিতাই দাসের প্রার্থনার বিষয় বদলাইয়া গেল—"হে ঠাকুর যদি দয়া না-ই কর, তবে আগে আমাকে নাও তারপর তোমার মনে যা আছে ক'র।" কিন্তু কোন আবেদন-নিবেদনই এই ধরণীর পরপারে, কি এপারে, ঊর্দ্ধে কি নিম্নে—কোন কল্প-লোকেই কাহারও প্রাণে এতটুকু বাজিল না—ষাট বৎসরের বৃদ্ধের সম্মুখে তাহার একমাত্র পুত্র ধীরে ধীরে মরিয়া গেল।

কিন্তু নিষ্ঠুর ভগবান তাহার স্নেহের ধন কাড়িয়া লইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—মুখের অন্নও কাড়িয়া লইলেন। সারা জীবন উপার্জ্জন করিয়া নিতাই দাস যে জমি-জমা করিয়াছিল—দুরন্ত পদ্মা তাহা এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত গ্রাস করিয়া বসিল। উপার্জ্জনক্ষম পুত্র গেল— সারা জীবনের উপার্জ্জিত সম্পত্তি গেল—রহিল ষাট বৎসরের বৃদ্ধের জরা-জীর্ণ দেহ, আর পুত্র-বধূ, পৌত্র-পৌত্রী লইয়া গুটিকয়েক পোষ্য।

তবু দুঃখে-কষ্টে দিন এক প্রকারে কাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু একই অভিনয় বারে বারে অভিনীত হইতে লাগিল—দশ বৎসর পরে আবার তাহার পনর বৎসরের পৌত্রটি হঠাৎ একদিন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। এত দিনে আবিষ্কৃত হইল বৃদ্ধ নিতাই দাসের সংসর্গ বড় 'পয়মন্ত' নহে—সে তাহার বংশের কাহাকেও জ্যান্ত রাখিয়া মরিবে না, গ্রামের লোকে সকলে একবাক্যে একথা স্বীকার করিল। সুতরাং পুত্রবধূটী উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশিষ্ট পুত্র ও কন্যাটির জীবন রক্ষার জন্যই নিতাই দাসকে একা ফেলিয়া ভাইয়ের বাড়ী পলাইয়া গেল। কিন্তু এত দিনেও যখন আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু আসিল না,—তখন তো বাঁচিতেই হইবে—ক্ষুধা হইলে আহার করিতে হইবে—রোগে ঔষধ দিতে হইবে—শীত-গ্রীষ্ম হইতে জীর্ণ শরীরখানি রক্ষা করিতে হইবে! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃদ্ধ তাই তাহার এই কন্যার বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছে। সে আজ দশ বৎসরের কথা। সে 'পয়মন্ত' নহে, সে অর্থহীন, সামর্থ্যহীন—কাজেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান, অপবাদ সমস্তই নির্ব্বিকারচিত্তে সহ্য করিয়া জামাই-মেয়ের অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া যাইতেছে—তাহা না করিলে যে জীবন রক্ষা হয় না!

বেলা এতক্ষণ একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ অতীতের এই চিন্তাতেই মশগুল ছিল, এমন সময় তাহার ছোট নাতিটি, পিঠের দিক হইতে আসিয়া ছোট্ট হাত দু'খানি দিয়া বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল—"দাদু।" বৃদ্ধ তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—"কি দাদু?"

কিন্তু ছেলেটি কোন জবাব না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহার দাদুর লম্বা পাকা দাড়ির মধ্যে হাত দু'খানি ডুবাইয়া দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

হঠাৎ পিছন হইতে তীব্রস্বরে কে ডাকিয়া উঠিল—"মণি—আয় শীগ্‌গির—নেমে আয়।" ছেলেটি দুই একবার ইতস্তত করিয়া ভয়ে ভয়ে দাদুর কোল হইতে নামিয়া মায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। ষোড়শী ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইল।

—"বলেছি ত আমার ছেলের কোনদিন তুমি গায়ে হাত দিও না—ছুঁয়োনা—নিজের বংশের সবগুলোর মাথা খেয়েছ ত—এখন আর আমার গুলোর উপরে নজর কেন? আপদ ম'লেও বাঁচি।" বলিতে বলিতে নিতাই দাসের কন্যা, পুত্র লইয়া বাড়ীর ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিতাই দাস সেই তখন হইতেই ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়াছিল।—ইহা হয়ত সত্যই-মণিকে কাছে টানিয়া আনা তাহার হয়ত ঠিক হয় নাই—যদি মণির কোন অমঙ্গল হয়!

(২)

হরিশ চক্রবর্তী প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন—পূজা-আহ্নিক না করিয়া জলস্পর্শ করেন না—গেরুয়া আর নামাবলী ধারণ করেন, সুতরাং তিনি ধার্ম্মিক ব্যক্তি। সেদিন নিতাই দাস তাঁহাকে কাছে পাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল—তাহাকে একটা ব্যবস্থা দিতে হইবে—কিসে তাহার পাপ ক্ষয় হয়—কিসে তাহার মৃত্যু হয়। হরিশ চক্রবর্ত্তী মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তাই ত দাসের পো, তুমি ঠিকই ব'লেছ—পাপক্ষয় না হলে ত এ সংসার থেকে যাবার উপায় নাই—এই যে বারটা মাস হাঁফানিতে ভুগছ—শীতকালে ত মনে করি এবার আর তুমি ফিরবে না, কিন্তু বেঁচে ত ওঠ—এত যে কষ্ট তবু ত মরতে পারছ না। এর কারণ ঐ একটি—পাপক্ষয় হওয়া চাই। আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার ভগবান এখান থেকেই করেন কি না!—তা এক কাজ কর—একটা প্রাচিত্তির কর, যদি ম'রতে হয় ম'রবে—আর ভাল হ'তে হয় ভালই হ'বে!"

—"আর ভাল হ'তে চাইনে ঠাকুর—মরণই আমার ভাল। তবে তাই দয়া ক'রে আমায় করে দাও—কিন্তু কেউ যেন টের না পায়—খুব গোপনে ক'রতে হবে।"

হরিশ বলিলেন—"সে আমি ক'রে দেব, কিন্তু গোটা পাঁচেক টাকা যে চাই।"

—"টাকা আমি দেব ঠাকুর কিন্তু দে'খ কেউ যেন না জানে।"

হরিশ সম্মতি জানাইয়া বিদায় লইলেন।

নিতাই দাস টাকা দিবে, স্বীকার করিল বটে, কিন্তু হাতে তাহার একটি পয়সাও নাই। সম্বলের মধ্যে একটি বহুপুরাতন ভাঙ্গা আংটী—সেইটা বিক্রয় করিয়া যাহা মিলিবে তাহাই তাহার ভরসা। নিতান্ত দুঃখের দিনেও দুই একশ টাকা সে হাতে রাখিয়াছিল—কিছুতেই খরচ করে নাই, কিন্তু এখানে আসিবার পর সে সবই মেয়ে জামাইয়ের হাতে পড়িয়াছে। তাহার একটি পয়সাও সে আর ফিরিয়া পাইবে না। পরের দিন হরিশ ঠাকুরকে সে সেই ভাঙ্গা আংটীর টুকরাটুকু হাতে দিয়া বলিল—"এটা বিক্রি করে যা পাও তাই দিয়েই কাজটা সেরে দিতে হবে ঠাকুর—আমার আর কিছুই নাই—ওটা অনেক কালের জিনিষ—বড় ভাল সোনা।"

হরিশ আংটীটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিলেন—"ভাল সোনা কি বলছ দাসের পো? রঙ্‌ত একেবারে পেতলের মত—আচ্ছা দেখি কি করতে পারি!"

এমন সময় পিছন হইতে ষোড়শীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"বলি কানের মাথা কি একেবারেই খেয়েছ? এই যে এতক্ষণ ধরে ডাকছি—তা নবাব সিরাজদ্দৌলার কানেই গেল না—বলি গিলতে হবে না? নাও এখন ওঠ—আমার হয়েছে যত ঘাটের মড়া নিয়ে মরণ!"

ষোড়শীর সাড়া পাইয়াই হরিশ আংটীটি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিয়া বলিল—"কি দিদি, ভাল ত? এই পথে যাচ্ছিলাম জেঠামশাই ডেকে বল্লেন—আমাকে একটু মহাভারত পড়ে শুনিয়ো ত বাপু—আমি বল্‌ছি কাল্‌কে এসে পড়ে শুনাব।"

ষোড়শী বলিল—"ইস্‌, কি আমার ধর্ম্মপুত্তুর—ওসবে মতি হবে ওনার?—কেবল তিন সন্ধ্যে গেলা চাই। তা যদি হ'ত তাহলে আর একে একে সাত গুষ্টির মাথা চিবিয়ে খেয়ে এমন ঠুঁটো-জগন্নাথ হ'য়ে বসে থাক্‌ত না!"

হরিশ বলিল—"সে ত ঠিকই দিদি—তবু কাল একটু দিয়ে যাব এসে শুনিয়ে। আচ্ছা আসি এখন"—বলিয়াই হরিশ দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়া গেল।

পরের দিন বিকালবেলা হরিশ একখানি মহাভারত হাতে করিয়া, নিতাই দাসের সেই আমগাছ তলায় আসিয়া দর্শন দিলেন।

নিতাই দাস জিজ্ঞাসা করিল—"সোনাটুকু বিক্রি হ'য়েছে ঠাকুর?"

হরিশ মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—"নাঃ ও কি সোনা দাসের পো—একেবারে পেতল! মধু কামারকে অনেক ব'লে কয়ে তবে তিন টাকায় নিতে রাজি করিয়েছি।"

—"মোটে তিন টাকা?"

—"তবে কি? সেই কি দিতে চায়—আর দেবেই বা কেন বাপু—যে তোমার সোনা!"

—"কিন্তু, তা ত ছিল না ঠাকুর,—কামার ঠকায় নি ত?"

—"আমাকে ঠকাবে? তার পরকালের ভয় নেই? যাক্‌ আরও গোটা দুই টাকা চাই—আমি এদিকে সব যোগাড় করি।"

—"টাকা ত আর নাই ঠাকুর!"

—"আরে টাকা নাই, কি বল—তোমার জামাই এতবড় মোক্তার—দুটো টাকা চাইলে দেবে না? নাও বাপু আমি এখন উঠি—শেষে তোমার মেয়ে যদি টের পায় আমার সুদ্ধ 'প্রাচিত্তির' করে ছাড়বে। তা হ'লে টাকা দুটা কাল একবার এসে নিয়ে যাব।"

হরিশ চলিয়া গেলেন—নিতাই দাস বসিয়া বসিয়া

ভাবিতে লাগিল--আংটীটির দাম তিন টাকার বেশী হইল না? কিন্তু এককালে বোধহয় উহার দাম যাচাই করিয়া আট দশ টাকাও হইয়াছিল--এমনই তাহার মনে পড়ে। আর আজ আংটীটি তাহার এমন পেতল হইয়া গেল কেমন করিয়া? তবে কি হরিশই--? এই চিন্তা মনে আসিতেই তাহার সারা দেহ রিরি করিয়া উঠিল--এ হইতেই পারে না--হরিশ চক্কোত্তি, গেরুয়া পরে--নামাবলী গায়ে দেয়--ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করে--ধার্ম্মিক ব্যক্তি! ইহা হয়ত তাহারই মনের ভুল--কিম্বা সোনার দামই গিয়াছে একেবারে কমিয়া--এমনি একটা কিছু হইবে।

পরের দিন বিকালবেলা নিতাই দাসের বড় নাতিটি সাজ গোজ করিয়া নিকটবর্ত্তী শহরে যাইতেছিল আড্ডা দিতে; নিতাই দাস পিছন হইতে তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল--"কিরণদাদা--এদিকে আয় ভাই, একটা কথা শুনে যা।"

কিরণ নিতান্ত অপ্রসন্ন চিত্তে বৃদ্ধের নিকটে আসিয়া হাত-ঘড়িটি দেখিয়া বলিল--"কি বলবে শীগ্‌গির বল--আমার এখুনি যেতে হবে।"

বৃদ্ধ দুই একবার ঢোক গিলিয়া বলিল--"আমাকে দু'টা টাকা দিবি দাদা!"

--"টাকা?--আমি কোথায় টাকা পাব? আমি কি রোজগার করি? চেয়ো মামার কাছে।" বলিয়াই আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। নিকটবর্ত্তী মহকুমা শহরে নিতাই দাসের জামাতা নিবারণ মোক্তারী করে। কিন্তু জামাতার নিকট চাহিলে যে টাকা মিলিবে--তাহারও নিশ্চয়তা নাই--আর হয়ত জবাব-দিহি করিতে গিয়া সকল কথা প্রকাশ হইয়া যাইবে। কাজেই নিতাই দাস সে ইচ্ছা ত্যাগ করিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় নিবারণ আদালত হইতে বাড়ীতে আসিয়া গায়ের জামাটি খুলিয়া রাখিয়া হাত মুখ ধুইতে গিয়াছে--এই অবসরে নিতাই দাস কখন ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া নিবারণের জামার পকেট হইতে দুইটি টাকা তুলিয়া লইয়া কোমরে গুঁজিতেছিল, কিন্তু পিছন হইতে ষোড়শী সকল ব্যাপারই দেখিতেছিল--নিতাই দাস, একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গেল। ষোড়শী সোর-গোল করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল।

--'এমনি কাল সাপ কেউ দুধ কলা দিয়ে পোষে? চোরের ধাড়ী--তাই ত বলি আমার টাকা পয়সা সব যায় কোথায়? সেদিন অমন চকচকে দুয়ানিটে চালের বাতায় গুঁজে রাখলাম--পরের দিন আর নাই! পুজোর আগে একটা আস্ত আধুলি খুঁজে পেলাম না।--এ সবই ঐ বুড়া শয়তানের কাজ।"

নিবারণ সব শুনিয়া বলিল--"যা হবার হয়েছে--এখন চুপ কর।"

ষোড়শী ঝঙ্কার দিয়া বলিল--"তুমি থাম দেখি--'মার পোড়ে না পোড়ে মাসির'--আমি আজ অল্পে ছাড়ছি না। বলিয়া বৃদ্ধ নিতাই দাসকে টানিয়া লইয়া তাহার ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিল।

নিতাই দাস এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও বলে নাই--এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে নাই--এখন নিজের বিছানায় পড়িয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল--ঠিক করিল--আর প্রায়শ্চিত্তে দরকার নাই--কাল হরিশ ঠাকুরকে দিয়া একটু আফিং কিনাইয়া আনিবে--এর চেয়ে সেও ভাল।

(৩)

রাগের মাথায় যত লোক আত্মহত্যা করিতে চায় তাহার সিকিও যদি আত্মহত্যা করিতে পারিত তাহা হইলে পৃথিবীতে আত্মহত্যার সংখ্যা অনেকগুণে বাড়িয়া যাইত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অনেকেরই সংকল্প ঠিক থাকে না--তাই না রক্ষা! নিতাই দাসেরও তাই আর পরের দিন আফিং কেনা হইল না--মনের উত্তেজনা কমিলে সমস্ত দুঃখ অপমানই ক্রমে ক্রমে হজম হইয়া গেল--দিন আবার তেমনিই গতানুগতিক-ভাবে কাটিতে লাগিল। বৈশাখ শেষ হইয়া জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ হইয়াছে--এই কয়দিনে বৈশাখের খর রৌদ্র--খরতর হইয়াছে --কিন্তু আজ দুই দিন হইল নিতাই দাসের সেই আমগাছের ছায়া শূন্য পড়িয়া আছে। দুই দিন হইতে নিতাই দাসের প্রবল জ্বর হইতেছে--উঠিবার সামর্থ্য নাই--সমস্ত দিন বিছানায়ই পড়িয়া থাকে।

সেদিন বিকালবেলা কিরণ নিতাই দাসের ঘরের পাশ দিয়া যাইতেছিল; নিতাই দাস তাহাকে ডাকিল--"কিরণ দাদা।"

কিরণ ঘরে ঢুকিয়া বলিল--"কেন দাদু? তোমার কি জ্বর হ'য়েছে?"

নিতাই দাস বলিল--"হাঁ দাদু, একটু ওষুধ এনে দাও না--বুকের এইখানটায় নিশ্বাস নিতে বড্ড বেদনা করছে।"

কিরণ নিতাই দাসের গায়ে হাত দিয়া বলিল--"ইস্ তাই ত জ্বর ত খুব হয়েছে--যাই উমেশ ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিই--পরে ওষুধ এনে দেব।"

কিরণের মা পিছন হইতে বলিয়া উঠিল--"কিরে কিরণ?"

কিরণ বলিল--"দাদুর বড্ড জ্বর হ'য়েছে মা!"

--"তা'ও বুঝলাম, কিন্তু ডাক্তার কি হবে? ওষুধ? মরতে যে বসেছে তা'ও ওষুধ চাই--এত যে বয়স হ'ল, সক্‌কলের মাথা চিবিয়ে চিবিয়ে খেলে তবু বাঁচতে সাধ যায়! যা কিরণ তোর কাজে যা--ওর কথা শুনিস নে।"

কিরণ তাহার কাজে চলিয়া গেল--না আসিল একফোঁটা ঔষধ, না আসিল সারাদিনের মধ্যে আর কেহ তাহার তত্ত্ব লইতে। বুকের সেই বেদনাটা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল--নিশ্বাস লইতে, কাসিতে, পাশ ফিরিয়া শুইতে, সারা বুকখানা যেন ফাটিয়া দুইখানা হইয়া যায়! জ্বরে সমস্ত শরীর যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে! এমন ত তাহার কোন দিনই হয় নাই! নিতাই দাসের মনে হইতে লাগিল--এই বাড়ী-ঘর গাছ-পালা--এই পৃথিবী যেন তাহার চোখের সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর আলো আর যেন তেমন উজ্জ্বল নয়--অন্ধকার যেন চারিদিক

(শেষাংশ ৪৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

(গৌহাটী অধিবেশন)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

গৌহাটীতে **প্রবাসী** বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে আপনারা আমাকে সাহিত্য শাখার সভাপতি করিয়াছেন, এইজন্য আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

মনে রাখিবেন—একজন টোলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আপনারা সভাপতি পদে বসাইয়াছেন, ইহার জন্য টোলের সাহিত্যের অর্থাৎ সেকেলে সংস্কৃত সাহিত্যের কথাই বেশীর ভাগ আপনাদিগকে কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করাইতেই হইবে। ইচ্ছা থাক বা না-ই থাক, তাহাতে বড় একটা কিছু আসে যায় না। সে ভাবনাও এখন না করাই ভাল; কারণ, 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন' ইহা হইল মহাজনের পদ।

প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যে এমন একটি সুর আছে, যে সুরের ঝঙ্কার সেই ভাষাভাষীর হৃদয়-তন্ত্রীতেই বাজিয়া থাকে, অন্য ভাষা-ভাষীর হৃদয়-তন্ত্রীতে তাহা বাজে না। এই যে বৈশিষ্ট্য ইহা প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম। এই সুর বা এই বৈশিষ্ট্য বাঙ্গলা সাহিত্যে যাহা আছে, তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বুঝাইবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সে কথা না-ই বা তোলা গেল কিন্তু যে ভাষা অন্য একটি ভাষার শব্দাবলী হইতে অধিকাংশ নিজের শব্দাবলীকে সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় গ্রহণ না করিয়া জন্মলাভ করে না, বা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, সেই ভাষার সাহিত্যের সুর বা বৈশিষ্ট্য যে সেই মৌলিক ভাষার সাহিত্যের সুর বা বৈশিষ্ট্য হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না, ইহা কিন্তু অধিকাংশ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মানিয়া থাকেন। এই কারণে বাঙ্গলা সাহিত্যের সুরের উপর সংস্কৃত সাহিত্যের সুরের প্রভাব যে খুব বেশী, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের লক্ষণ এবং তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক, তাহা করিবার পূর্ব্বে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি? তাহা লইয়া যে মতভেদ আমাদের সাহিত্য সমালোচকগণের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই অগ্রে দেখা যাক।

সাহিত্যের অর্থাৎ গদ্য-পদ্যাত্মক কাব্যের উদ্দেশ্য যে রসসৃষ্টি, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই, কিন্তু সেই রসসৃষ্টি যদি সমাজের নৈতিক চরিত্রগঠনের অনুকূল না হয় প্রত্যুত প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে সেই রসসৃষ্টির জন্য সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত কিনা এই লইয়া আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য সমালোচকবৃন্দ বিলক্ষণ হট্টগোল বাধাইয়া বসিয়াছেন। সাহিত্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য যে রসসৃষ্টি এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ না থাকিলেও রসসৃষ্টি যে কিসের জন্য তাহা লইয়া কিন্তু বিলক্ষণ মতভেদ আছে। এক পক্ষ বলেন, রস বলিলে যখন লোকোত্তর আনন্দের আস্বাদই বুঝায়, তখন রসসৃষ্টির পরিণাম কি তাহা লইয়া মাথা ঘামানোর কোন

আবশ্যকতা নাই; সুখের আস্বাদের জন্যই এ সংসারে সাধন সামগ্রীর আবশ্যকতা। সুখাস্বাদ আবার কাহার জন্য হইবে এ প্রকার জিজ্ঞাসা কোন বিবেচক ব্যক্তির মনে উঠিত হইবে কেন? কাব্য বা সাহিত্য যে রচনা করে বা যে অনুশীলন করে, উভয়েই তাহারা রসাস্বাদ অর্থাৎ অলৌকিক সুখবিশেষের আস্বাদ করে; সেই আস্বাদই মানবের মুখ্য প্রয়োজন। যেটা মুখ্য প্রয়োজন, তাহা আবার অন্য কোন্ প্রয়োজনের জন্য হইবে? তাহাই যদি হয়, তবে তাহার মুখ্য প্রয়োজনত্বই বা সিদ্ধ হইবে কেন?

নববসন্তের শিশিরসিক্ত উষার স্নিগ্ধ আলোকে মলয়মারুতান্দোলিত বিকসিত মাধবীকুঞ্জে বসিয়া সহকার-মঞ্জরীর রসাস্বাদে কষায়কণ্ঠ কোকিল কেন কুহুকুহু রবে দিগন্ত মাতায়? ইহার একমাত্র উত্তর যে, সে তাহাতে সুখ পায়। শরতের মেঘমুক্ত আকাশে অমলধবল জ্যোৎস্নায় দিগদিগন্ত যখন ধবলিত হইয়া উঠে, তখন ফুল্ল শেফালিকা-বনের উপর উড়িতে উড়িতে পাপিয়া কলকাকলীর সুধা-লহরী দিগদিগন্তে ছড়াইয়া দেয়। তখন সেই গান তাহার প্রাণে যে আনন্দ সঞ্চার করে, তাহার জন্যই ত সে গাহিয়া থাকে, সে আনন্দের পরিণাম কি—সে ভাবনা কি তাহার মনে উঠে? কোকিলের কুহুস্বরে, পাপিয়ার সুধাবিনিন্দিত কলকাকলীতে তোমার বা আমার যে আনন্দের আস্বাদ হয়, তাহার পরিণাম কি? শুনিবার সময় তোমার বা আমার মনে কি কখনও এরূপ চিন্তার উদয় হয় অথবা উদয় হইবার কোন আবশ্যকতা আছে কি? কোকিলের ন্যায়, পাপিয়ার ন্যায় কবি গাহিয়া যায়; সেই গানেই তার আনন্দ, আমরা সে গান শুনিয়া সুখ পাইয়া থাকি, সেই আনন্দ—আস্বাদপর্য্যবসায়ী, সেই আনন্দ তো আর কিছুরই অপেক্ষা করে না, করাও তো উচিত নহে।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশে বা সাধনার প্রভাবে, যাহার হৃদয়ে কবিপ্রতিভা জাগিয়া উঠে, তাহার ব্যঞ্জনাপ্রবণ শব্দ রচনাতে যে সকল অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাদের স্বভাবই এই যে, তাহারা সহৃদয়-গণের মানস-দর্পণে এমন এক অলৌকিক জগতের প্রতিবিম্ব জাগাইয়া দেয়, যে জগতে—প্রাকৃত জগতের আছে সকলই, কিন্তু নাই সেখানে দুঃখ—নাই সেখানে আত্মম্ভরিতা, নাই সেখানে মানবের চিরাভ্যস্ত দ্বেষ-হিংসা-অসূয়া ও ঈর্ষা প্রভৃতি আসুরভাবের মর্ম্মচ্ছেদী তীব্র কশাঘাত।

সেই মধুর অলৌকিক অথচ সহৃদয়মাত্রসম্বেদ্য আস্বাদময় কবিসৃষ্ট ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিয়া মানব-সমাজের পরিণাম কি হইবে? তাহাতে মানব-সমাজে গরল উঠিবে বা অমৃত ফলিবে—এই ভাবনা প্রতিভাবান কবির হৃদয়ে উঠে না, রসাস্বাদনিরত সহৃদয়বৃন্দেরও অন্তঃকরণে স্থান পায় না। সুতরাং কবির বা সহৃদয়-বৃন্দের এই নিষ্প্রয়োজন ভাবনায় মাথা ঘামাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। ইহাই হইল বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য সমালোচকগণের মধ্যে অধিকাংশেরই স্থিরসিদ্ধান্ত, সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচক প্রাচীন আচার্য্যগণের নিকট এই সিদ্ধান্ত যে একেবারে অপরিচিত ছিল, তাহাও বলা যায় না; প্রত্যুত, এই সিদ্ধান্ত তাঁহারা যে ভাল করিয়া জানিতেন, তাহারও সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিক আচার্য্য ধ্বনিকারই বলিয়াছেন যে:—

"বাচ্যানাং বাচকানাং চ যদৌচিত্যেন যোজনম্।
রসাদিবিষয়েণৈতৎ কর্ম্ম মুখ্যং মহাকবেঃ॥"

রসভাবাদির সমুচিতভাবে অর্থ ও শব্দের যে যোজনা, তাহাই মহাকবিগণের মুখ্যকর্ম্ম।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর আলঙ্কারিক আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন এই শ্লোকটির টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন যে:—

"অয়মেব হি মহাকবেমুখ্যো ব্যাপারো যদ্রসাদীনেব মুখ্যতয়া কাব্যার্থীকৃত্য তদ্ব্যক্ত্যনুগুণত্বেন শব্দানামর্থানাং চ উপনিবন্ধনম্।"

ইহাই মহাকবির প্রধান কার্য্য যে, তিনি রস-ভাব প্রভৃতিকেই কাব্যের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য—ইহা স্থির করিয়া, এরূপ শব্দ ও অর্থের বিনিয়োজনা করিবেন, যাহা দ্বারা সেই রস ও ভাব প্রভৃতির অভিব্যঞ্জনা হইতে পারে।

রস-ভাব প্রভৃতির উচিতভাবে অভিব্যঞ্জনা করিতে পারিলেই কবির কাব্যরচনা সাফল্যলাভ করে অন্যথা নহে, এই কথা প্রাচীন আলঙ্কারিক-গণ নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এই রস-ভাব প্রভৃতির যাথার্থ স্বরূপ কি—তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, তাঁহাদের এই প্রকার উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। এইজন্য তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে আবশ্যক।

"রসের" স্বরূপ বর্ণনা

প্রথম রস বলিলে সংস্কৃত সাহিত্যে কি বুঝা যায়, তাহাই দেখা যাক্।

রস শব্দটি 'রস' ধাতু হইতে উৎপন্ন **হইয়াছে, 'রস' ধাতুর অর্থ আস্বাদ বা অনুভূতি ঃ—**

"স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ
রস ইত্যুচ্যতে।"

কাব্যের দ্বারা যে অর্থসমূহ প্রকাশিত হয়, তাহাদের সম্মেলনে আত্মাতে—বা আত্মস্বরূপে যে আনন্দ সমুদিত হয়, তাহারই স্বাদ অর্থাৎ অনুভূতি, অভিব্যক্তি—তাহাই 'রস' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

এই উক্তির মর্ম্মার্থ কি, তাহা বুঝিবার জন্য একটা উদাহরণের আবশ্যকতা আছে। মনে করুন, আমরা কয়েকজন মিলিয়া রঙ্গশালায় অভিনয় দেখিতে যাইতেছি। আমাদের মধ্যে কেহ অধ্যাপক, কেহ উকিল, কেহ বা কেরাণী, আবার কেহ বা হয়ত দোকানদার, কেহ বা দালাল। রঙ্গশালায় প্রবেশের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা প্রত্যেকেই আপনার আপনার ব্যক্তিগত জীবনের অভ্যস্ত ভাবনায় বিভোর ছিলাম, রঙ্গশালায় প্রবেশ করিবার পর সেই আমাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব-জড়িত ভাবনা-ধারা হঠাৎ যেন প্রতিরুদ্ধ হইল, আলোকমালাশোভিত বিশাল রঙ্গশালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য—কিশোর, তরুণ, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলপ্রকার বয়সের লোকই তাহার মধ্যে আছে। অধিকাংশ লোকই অধিকাংশ লোককে চিনে না, দেখিয়া চিনিবার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই। অগ্রে, পৃষ্ঠে, পার্শ্বে সারি দিয়া কাতারে কাতারে তারা সব বসিয়া রহিয়াছে, সকলেরই দৃষ্টি সমগ্রেত আলোকমালা-ঝলসিত রঙ্গমঞ্চের যবনিকার উপর নিপতিত, সকলেই ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছে—কখন সে যবনিকা উত্তোলিত হইবে ও অভিনয়ের আরম্ভ হইবে। শ্রুতিমনোহর নানা বাদ্যের কনসার্ট বাজিতেছে, বিরাট দর্শকগণ নীরব ও স্থির হইয়া আসনে বসিয়া অভিনয় দেখিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

এমন সময় ঘণ্টাধ্বনি হইল, কনসার্ট থামিল, সম্মুখের যবনিকা অপসারিত হইল, অভিনয় আরম্ভ হইল; উপযুক্ত শিক্ষা ও অভ্যাসের বশে যাহারা অভিনয়-কার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের কেহ রাম সাজিয়াছে, কেহ সীতা সাজিয়াছে, কেহ বা লক্ষ্মণের ভূমিকা লইয়াছে। ক্রমে অভিনয় জমিয়া উঠিতেছে, এ সময়ে আমাদের অর্থাৎ অভিনয়-দর্শকগণের মনের অবস্থা যে কিরূপ হইতেছে, তাহাও দেখা যাক।

রঙ্গশালায় প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমাদের যে পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের অভিমান ছিল অর্থাৎ আমি অমুকের পুত্র, অমুক আমার পুত্র, আমি অমুকের পৌত্র, সে আমার পত্নী, অমুক আমার শত্রু, আমি তাহার শত্রু এই প্রকার সাংসারিক ব্যবহারের মূলীভূত যত কিছু ব্যক্তিগত অভিমান, অভিনয় জমিয়া উঠা হইতেই তাহা সকলই হঠাৎ বিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে অভিনয় করিতেছে—সে আমা হইতে পৃথক বা আমি তাহা হইতে পৃথক্ সে জ্ঞানও নাই। সে আমার কেহ বা আমি তাহার কেহ, এইরূপে জ্ঞানও নাই, সে রামাদি হইতে ভিন্ন, এরূপ জ্ঞান যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহাও নাই—অথচ আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি ভাবিতেছি—এ জ্ঞানও লুপ্ত হয় নাই। আমা হইতে পৃথক দ্রষ্টা বা শ্রোতা আর কেহ যে রঙ্গশালায় আছে, তাহা মনে হইতেছে না, সকল শ্রোতার, সকল দর্শকের যত কর্ণ, যত নয়ন, যত মন, সব যেন এক হইয়া পড়িয়াছে। ইহা অথচ পরস্পর ভেদজ্ঞান বা পরস্পর অভেদজ্ঞান নহে, পরস্পর সাদৃশ্য-জ্ঞানও নহে—এই প্রকার জ্ঞান-প্রমাজ্ঞানের বা ভ্রান্তিজ্ঞানের দলে প্রবিষ্ট নহে, অথচ প্রত্যেক সহৃদয় দর্শকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ইহা যে একপ্রকার বিলক্ষণ অনুভূতি, তাহার অপলাপ করা অসম্ভব।

এই প্রকার যে তৎকালীন অবস্থা ইহাকেই আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন সাধারণীকৃতি। তাই সাহিত্য দর্পণকার বলিয়াছেন ঃ—

"ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না
সাধারণীকৃতিঃ।"

কবি-প্রতিভার সৃষ্টি বিভাব প্রভৃতির পরিণতি স্বরূপে এক বিলক্ষণ ব্যাপার হইয়া থাকে। সেই ব্যাপারের নাম সাধারণীকৃতি (অর্থাৎ অসাধারণ ব্যক্তিনিচয়কে সাধারণরূপে পরিণত করা)।

তাহাতে কি হয় তাহাই বুঝাইতে গিয়া আবার তিনিই বলিতেছেন ঃ—

"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"

কবির ভাষায় অভিব্যক্ত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের আস্বাদের সময় ইহা পরের বা পরের নহে, আমার বা আমার নহে, এই প্রকার কোন পরিচ্ছেদও বিদ্যমান থাকে না।

এইখানে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী বা ব্যভিচারী এই শব্দ কয়টি পারিভাষিক; সুতরাং এই কয়টি পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহাও বুঝিতে হইবে। নাট্যসূত্রের মহর্ষি ভরত বলিয়াছেন ঃ—

"বিভাবানুভাব ব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।"

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর সংযোগে স্থায়ী ভাব রসরূপে পরিণত হয়। স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর সহিত মিলিত হইলে রসরূপে পরিণত হয়। এই কথাটি বুঝিতে হইলে স্থায়ী ভাব কাহাকে বলে, তাহাই অগ্রে জানা আবশ্যক; তাই স্থায়ী ভাবের কথা অগ্রে বলি।

মানুষের মনের মধ্যে যতপ্রকার বৃত্তি আছে, তাহারাই ভাব শব্দের অর্থ অনুরাগ বা ভালবাসা, কামনা, ক্রোধ, উৎসাহ, চিন্তা, উদ্বেগ, বিষাদ, বৈরাগ্য, শান্তি, ধৈর্য্য, দৈন্য ও অবসাদ প্রভৃতি মনোবৃত্তি নিচয়; যেহেতু রসকে আস্বাদ্য করিয়া থাকে, এই কারণে তাহারা ভাব শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি প্রধান বা স্বতন্ত্র, আর কতকগুলি অপ্রধান বা ভাবান্তরের অধীন। যেগুলি প্রধান বা স্বতন্ত্র, তাহারাই স্থায়ী ভাব; আর যাহারা সেই স্থায়ী ভাব বিশেষের অধীন, তাহারা সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

কোন ব্যক্তি যদি কাহাকে ভালবাসে, তবে সে যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে পাইবার জন্য বা তাহাকে দেখিবার জন্য তাহার কামনা হয়, কেমনে পাওয়া যাইবে বা দেখা যাইবে, সেজন্য চিন্তা আসে, চেষ্টা করিয়াও দেখিতে না পাইলে বিষাদ উদিত হয়, হঠাৎ পাইলে বা দেখিলে হর্ষ বা উল্লাস হয়, ভালবাসার পাত্র যদি অপর কাহাকে ভালবাসিয়াছে এই প্রকার মনে হয়, তবে ঈর্ষ্যা বা অসূয়া হয়, কিন্তু কোন কারণে যদি সেই ভালবাসাই নিবৃত্ত হয়, তখন আর কামনা বা চিন্তা, বিষাদ, আবেগ, দৈন্য, উৎকণ্ঠা, ঈর্ষ্যা বা অসূয়া প্রভৃতি আর মনে উদয় হয় না। এই কারণে অনুরাগ বা রতি অথবা ভালবাসাকে একটি স্থায়ী ভাব বলা যায় এবং দৈন্য, উৎকণ্ঠা প্রভৃতিকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলা যায়। বিভাব প্রভৃতির স্বরূপ কি তাহার পরিচয়-প্রসঙ্গে এইরূপ বলা হইয়া থাকে ঃ—

"কারণান্যথ কার্য্যাণি সহকারীণি যান্যপি।
বিভাবা অনুভাবাশ্চ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ॥"
—সাহিত্য-দর্পণ।

স্থায়ী ভাবের কারণ, কার্য্য ও সহকারীকে যথাক্রমে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী বলা যায়। অনুরাগরূপ স্থায়ী ভাব যাহার প্রতি হয়, তাহাকে আলম্বন বিভাব বলা যায়। অনুরাগ উৎপন্ন হইবার পর আলম্বন বিভাবের চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা অথবা মলয়-মারুত, কুহুরব ও জ্যোৎস্না প্রভৃতির দ্বারা তাহা পুষ্টিলাভ করে বলিয়া ইহারা উদ্দীপন বিভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। হৃদয়ে অনুরাগ হইলে যে সকল আকার-ইঙ্গিত, পত্র-প্রেরণ বা দূতী নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা আলম্বনকে সেই অনুরাগের সূচনা করা হয়, তাহার নাম অনুভাব। অনুভাব দুই প্রকার—সামান্য অনুভাব এবং সাত্ত্বিক অনুভাব। সামান্য অনুভাব ইচ্ছাসাধ্য, কিন্তু সাত্ত্বিক অনুভাব ইচ্ছাসাধ্য নহে; অনুরাগের তীব্রতা বশতঃ মানসিক একপ্রকার বিকার হয়, যাহাকে আলঙ্কারিকগণ সত্ত্ব শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করেন। এই সত্ত্ব হইতে অনিচ্ছাকৃত যে সকল কার্য্য দেহে প্রকাশ পায়, তাহাদিগকেই সাত্ত্বিক অনুভাব বলা যায়। যেমন স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, দৈহিক বর্ণের বিপর্য্যয়, অশ্রুপাত ও মূর্চ্ছা। এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব। অনুরাগরূপ স্থায়ী ভাব যে অন্তঃকরণে উদিত হয়, তাহাতে অনুরাগের সহচারীরূপে যে সকল চিন্তা, গ্লানি, বিষাদ, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহারাই সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অনুরাগ যেমন স্থায়ী ভাব, সেইরূপ উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আটটি মনোবৃত্তিকেও আলঙ্কারিকগণ রস বিশেষের স্থায়ী ভাব বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। ইহাদেরও পৃথক্ পৃথক্ আলম্বন, উদ্দীপন, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব আছে। বিস্তার ভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল না। এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা যাক্।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অভিনয় দেখিতে দেখিতে সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাধারণীকৃতি নামে যে অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হয়, তাহার পরই রসাস্বাদ হইতে আরম্ভ করে, এই রসাস্বাদের স্বরূপ কি, এইবার তাহাই দেখা যাক্।

কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট তাঁহার আচার্য্য অভিনব গুপ্তের মতকে অবলম্বন করিয়া যে রসতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ তাৎপর্য্য এইরূপ ঃ—

নাট্যশালায় বাহিরে বা কাব্যানুশীলন বা

করিবার সময়ে যাহারা ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষ প্রভৃতি দেখিয়া কোন তরুণ বা তরুণী কোন তরুণী বা তরুণের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে পারে এবং বহুবার বুঝিয়া বুঝিয়া যাহাদের এই প্রকার বুঝিবার অভ্যাস বেশ জমিয়া বসিয়াছে, তাহারা যখন নাট্যশালায় প্রবেশ করিয়া অভিনয় দর্শন করে অথবা বেশ মন দিয়া কাব্যের পাঠ ও অনুশীলন করে, তখন তাহাদের নিকট কবিবর্ণিত অনুরাগ ও তাহার কারণ, কার্য্য ও সহকারী বস্তুনিচয় একপ্রকার অলৌকিক আকারে আকারিত হইয়া উঠে।

কবির প্রতিভাবলে কল্পিত লৌকিক এই সকল কার্য্য, কারণ ও সহকারী—কবিভাষায় প্রকাশিত হইলে আলম্বন, উদ্দীপন ও সঞ্চারী হইয়া পড়ে। সহৃদয়ের মানসবৃত্তিতে তাহারা যখন যুগপৎ সমুদ্ভাসিত হয়, তখন তাহাদের প্রত্যেকটিই স্থায়ী ভাবকে অর্থাৎ অনুরাগ প্রভৃতি প্রধান বৃত্তিকে জাগাইয়া তুলে, তখন যে আস্বাদ সমুদিত হয়, তাহা আলম্বনাদির প্রাতিস্বিক আস্বাদ নহে, কিন্তু, আলম্বনাদির এবং স্থায়ীর সম্মিলিত আস্বাদ, মিশ্রি, মরিচ-চূর্ণ, লেবুর রস, কর্পূর ও কুঙ্কুম প্রভৃতির সমুচিত মিলনে যে সরবৎ প্রস্তুত হয়, তাহার নাম প্রপানক রস। সেই প্রপানক রসের আস্বাদ মিশ্রি প্রভৃতির প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ নহে, অথচ প্রত্যেক বস্তুই সে আস্বাদের বিষয় হয়, তেমনিই ঐ সম্মিলিত বিভাবাদির আস্বাদ—প্রত্যেকের পৃথক আস্বাদ নহে, কিন্তু সকলের যুগপৎ আস্বাদ। অথচ প্রত্যেকটিই এই আস্বাদের বিষয়, প্রপানক রসের বিচিত্র আস্বাদের ন্যায় এই আস্বাদ অনির্ব্বচনীয়; এই আস্বাদকালে সহৃদয়গণের শত্রু, মিত্র বা উদাসীনের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, দেহেন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধজনিত পরিমিত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয় না। বিস্ময়ময়, উল্লাসময় আবরণশূন্য, চিন্ময় বিরাট সত্তায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিশিয়া যেন এক অখণ্ড আনন্দময় হইয়া উঠে—সকল ক্ষুদ্রতা ভাসিয়া যায়, অভিমান, অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা, মলিনতা—সব দূরে হইয়া যায়। নাট্যশালায় সমবেত দর্শকমাত্রেরই মন যেন এক হইয়া যায়। দক্ষ অভিনেতার একটি ভ্রূকুটিতে, একটি কটাক্ষে বা একটি অঙ্গুলীসঞ্চালনে, একটি মাত্র করুণোক্তিতে—সকল দর্শকেরই বুক কাঁপিয়া উঠে, বিভিন্ন জাতীয় ভাবের স্রোত উথলিয়া পড়ে, নয়নে জলধারা বহিতে আরম্ভ করে ও সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, সে বুকের কাঁপুনিতে, সে ভাবস্রোতের উদ্বেলতায়, সে নিরন্তর অশ্রুধারায়, সে অস্বাভাবিক রোমাঞ্চের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে যে অহমিকা-স্পর্শশূন্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পরম্পরা সঞ্চারিত হয়, তাহা অতুলনীয়, অবর্ণনীয় ও অলৌকিক। প্রত্যেক দর্শকের অন্তর্নিহিত ঐহিক, জন্মান্তরীণ লক্ষ লক্ষ বাসনা যেন জীবন্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, অপার অনন্ত অতলস্পর্শ আনন্দময় রসামৃত-জলধির উপরে ক্রীড়ানশীল চন্দ্রকরোজ্জ্বল লহরীমালার ন্যায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। এই রসতত্ত্বেরই পরিচয়প্রসঙ্গে মম্মটভট্ট বলিয়াছেন :—

"পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ অন্যৎ সর্ব্বমিব তিরোদধদ্ ব্রহ্মাস্বাদমিব অনুভাবয়ন্ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ।"

এই শৃঙ্গার প্রভৃতি রস যখন আবির্ভূত হয়, তখন মনে হয় ইহা যেন নয়নের সম্মুখে স্ফুরিত হইতেছে; যেন মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা ছাড়া সংসারের সকল বস্তুকেই যেন তিরোহিত করিয়াছে। নির্ব্বিকল্প সমাধিরত যোগিজনের আস্বাদ্য ব্রহ্মানন্দকে যেন ইহা অনুভূতির বিষয় করাইয়া দিতেছে। অলৌকিক চমৎকারই ইহার যেন বিলাস! এই হইল সংস্কৃত আলঙ্কারিক আচার্য্যগণের বর্ণিত রসের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ।

প্রকৃত কবি

এই রস সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য যাঁহার বাণীতে আছে, তিনিই প্রকৃত কবি, এই শোক-তাপ-জরা-মরণ-ব্যাধিসঙ্কুল সংসারে তিনিই যথার্থ অমর। তাঁহার ভারতীতে যে সৃষ্টিশক্তি নিহিত আছে, তাহা জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিতেও সম্ভবপর নহে।

তাই মম্মটভট্ট স্বকৃত কাব্যপ্রকাশে যথার্থই বলিয়াছেন—

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্য-
পরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতিমাদধতী ভারতী-
কবের্জয়তি।।"

কবি-ভারতীর জয় হউক; কারণ, কবি-ভারতীর যে সৃষ্টি, তাহা নয় প্রকার রসে রমণীয়া; প্রজাপতির সৃষ্টিতে মাত্র ছয়টী রস আছে এবং সেই ষড়্বিধ রসের প্রত্যেকটী মধুর নহে। প্রজাপতির সৃষ্টিতে সুখ থাকিলেও দুঃখও আছে, মোহও আছে, কিন্তু কবি সৃষ্টিতে আনন্দই আছে; দুঃখও নাই, মোহও নাই। বিধাতা সৃষ্টি করিতে উপাদান, নিমিত্ত ও সহকারী এই ত্রিবিধ কারণের অপেক্ষা করিয়া থাকেন, কবি তাহার কোনটীরই অপেক্ষা করেন না—বিধাতার সৃষ্টিতে পরতন্ত্রতা আছে, কবির সৃষ্টিতে তাহা নাই।

রসসৃষ্টির জন্যই সাহিত্য। সেই রসের আস্বাদনে যদি মানবের নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, সামাজিক জীবনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতার দাবানল জ্বলিয়া উঠে—তাহার জন্য কবির কোন দায়িত্ব নাই, মলয়-মারুত-হিল্লোলে, শারদীয় অমলধবল চন্দ্রিকায়, বসন্ত-কোকিলের কুহুধ্বনিতে, পাপিয়ার কল-কাকলীতে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, রোগবিশেষাক্রান্ত কোন কোন হতভাগ্যের পীড়ার বৃদ্ধি হয় বলিয়া কেহ কি মলয়-মারুতকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করে? শারদ চন্দ্রমাকে জ্যোৎস্না-সারবর্ষণে বিমুখ করিতে পারে? কোকিল পাপিয়া ও ভ্রমরের দলকে তাড়া দিয়া উড়াইয়া দেশছাড়া করিতে চাহে? আর তাহাও কি সম্ভবপর? কখনই নহে—তেমনি রসসৃষ্টিপরায়ণ কবিভারতী ব্যক্তিবিশেষের নৈতিকচরিত্রের অপকর্ষ সাধন করিতে পারে বলিয়া কবির লেখনী-চালনাকে রুদ্ধ করা বা কবিকে দ্বীপান্তরিত করিবার বাসনা—কখনও উচিত নহে, সম্ভবপরও নহে।

আমাদের বাঙ্গালাভাষার সাহিত্য-সমালোচকগণের মধ্যে অনেক চিন্তাশীল সহৃদয় ব্যক্তির মতে এই প্রকারেরই, শুধু তাহাই নহে—ইঁহাদের এই মতানুযায়ী তরুণ সাহিত্যসেবকের সংখ্যাও উত্তরোত্তর যে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাঁহাদের চিন্তা-স্রোতের ধারাকে অন্যদিকের নূতন খাতে ফিরাইবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমার নাই, তাহাও যে না বুঝি তাহাও নহে, তথাপি আমাদের দেশে আর একদল বিভিন্ন মতাবলম্বী চিন্তাশীল সাহিত্য-সমালোচক আছেন, যাঁহারা রসসৃষ্টির দ্বারা সামাজিক, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষবিধানকেই কবিপ্রতিভার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত—এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই প্রকারের মত এ ভারতে নূতন নহে—হাজার বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ স্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, এইরূপ মনে করিয়া আমি তাহাই করিতে চাহি। আশা করি তাহাতে আপনারা কৃপা করিয়া একটু অবধান দিতে বিমুখ হইবেন না।

ভারতীয় সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে—মানবজন্মের সাফল্য সম্পাদন; মানবজন্মের সাফল্য সম্পাদন হয় কিসে? ধন, জন, বল ও ঐশ্বর্য্যের অর্জ্জন দ্বারা ঐন্দ্রিয়িক সুখভোগের উপরই মানবজন্মের সাফল্য নির্ভর করে—এইরূপ ধারণা ভারতীয় সভ্যতার প্রবর্ত্তক ঋষিগণের ছিল না—বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজনিত সুখের অচিরস্থায়িতা, পরিণামবিরসতা ও অশান্তিপর্য্যবসায়িতা ভাল করিয়া তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা, যে সুখে অচিরস্থায়িতা নাই, পরিণামবিরসতা নাই, অশান্তিপর্য্যবসায়িতাও সম্ভবপর নহে, সেই সুখ যাহাতে মানবের পক্ষে সুলভ হয়, তাহারই জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারের সাধনায় নিরত ছিলেন। সেই সাধনার প্রভাবে তাঁহারা সেই সুখের আস্বাদ নিজেরা করিয়াছিলেন; জগতের সকল মানবকে সেই আস্বাদের ভাগী করিবার জন্যই ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি তাঁহারা করিয়াছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার মূল লক্ষ্য হইল তাদৃশ সুখ। সেই সুখের আস্বাদের উপরই মানবজন্মের সাফল্য নির্ভর করিয়া থাকে,—এই বিশ্বাস যাহার নাই, তাহার পক্ষে ভারতীয় সাহিত্য বা সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন বিড়ম্বনামাত্র।

এই মানব-জন্মসাফল্যরূপ যে সুখ, তাহাকেই সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাই গীতাতে—ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যে দেখিতে পাই—

"অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।।"

অভ্যাসবশতঃ যাহাতে আসক্তি হয়, যাহা হইলে সকল দুঃখের অন্ত হয়, যাহা প্রথমাবস্থায় যেন বিষ বলিয়া মনে হয়, পরে কিন্তু অমৃতোপম, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। আত্মার এবং মনের প্রসাদ অর্থাৎ

নৈর্ম্মল্য হইতেই সেই সাত্ত্বিক সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুধু কি তাহাই—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি ন চাল্যতে॥"

যাহা লাভ করিতে পারিলে তাহা হইতে অন্য কোন লাভকে অধিক বলিয়া মনে হয় না, যাহাতে স্থিতি পাইলে ভীষণ দুঃখেও অন্তঃকরণে ব্যাকুলতা আসিতে পারে না, (তাহাই সাত্ত্বিক সুখ)।

যে সুখে তৃষ্ণা বাড়ে না অথচ চিত্তের মালিন্য দূর হয় ও প্রসাদ বা প্রসন্নতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সুখই ভারতীয় সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য; ভারতীয় সভ্যতার সুকুমার উপকরণ সংস্কৃত সাহিত্যেরও উদ্দেশ্য সেই সুখ, যাহাকে শাস্ত্রকারগণ সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাব্য সমাজ শরীরের মহাব্যাধিরূপ উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় দিবার জন্য নহে কিন্তু, তাহা রসাস্বাদরূপ সুখের সঞ্চারণ দ্বারা এ সংসারে সর্ব্বানর্থকারী অবিবেকরূপ দূরপনেয় মহাব্যাধির প্রশমন করিয়া থাকে, ইহাই হইল সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচক প্রাচীন আচার্য্যগণের স্থিরসিদ্ধান্ত। এই বক্রোক্তি জীবিতের বৃত্তিগ্রন্থে স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে, যথা—

"কটুকৌষধবচ্ছাস্ত্রমবিদ্যাব্যাধিনাশকম্।
আহ্লাদামৃতবৎ কাব্যমবিবেকগদাপহম্॥"

অন্য শাস্ত্র সকল কটু ঔষধের ন্যায় অজ্ঞানরূপ ব্যাধির বিনাশ করে, কিন্তু কাব্য অমৃতের ন্যায় আনন্দদায়ক অথচ অবিবেকের নাশক হয়।

আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যও ধ্বন্যালোকে বলিয়াছেন—

"অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা॥"

অনৌচিত্য ব্যতিরেকে রসভঙ্গের অন্য কারণ নাই, প্রসিদ্ধ ঔচিত্য রক্ষা করিয়া যে কাব্য রচনা হইয়া থাকে, তাহাই রসাস্বাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট উপনিষৎ হইয়া থাকে।

এই শ্লোকে 'ঔচিত্য' শব্দটীর প্রতি বিশেষ প্রণিধান করিতে হইবে। বিশুদ্ধ রসের আস্বাদের যাহা অনুকূল, তাহা লোক প্রসিদ্ধ হওয়া চাই এবং সামাজিক সংস্থিতির প্রতিকূল না হওয়া চাই। কল্পনা দ্বারা কবির মানসনেত্রে যে সকল বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব প্রতিভাসিত হইয়া কবির ভাষায় প্রতিফলিত হইবে, তাহা দ্বারা যদি সহৃদয় সামাজিকের এইরূপ মনে হয় যে, ইহা অনুচিত হইয়াছে, তাহা হইলে রসপ্রতীতি পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপে আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যই দেখাইয়াছেন, যেমন মহাকবি কালিদাসের কুমার-সম্ভবের অষ্টম নবম সর্গ, এই অংশে সর্ব্বেশ্বর শঙ্কর ও ত্রিজগজ্জননী পার্ব্বতীরও পরিণয়ের পর সম্ভোগ-শৃঙ্গার বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উচিত হয় নাই। কারণ, সামাজিক মাত্রেই যেমন নিজ জনকজননীর সম্ভোগ-শৃঙ্গারের বর্ণন শুনিতে চাহে না এবং শুনিলে লজ্জা বা সংকোচ বোধ করে বলিয়া, তাহাতে তাহার রসাস্বাদ হয় না; জগতের পিতা ও মাতা, মহাদেব ও পার্ব্বতীর তাদৃশ সম্ভোগ-বর্ণন শিষ্ট সামাজিকের নিকট তেমনিই বৈরস্যাবহ হইয়া থাকে।

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের রসবিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনৌচিত্য পরিহারের এইরূপ অনেক উপদেশ আছে, তাহার প্রতি ঔদাসীন্য বা বিদ্বেষ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গ সাহিত্য সমালোচকগণের মধ্যে যে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূলে নহে, প্রত্যুত প্রতিকূল। বাঙ্গালা সাহিত্যই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনের অসাধারণ উপাদান, ইহার বিশুদ্ধিরক্ষার উপর আমাদের জাতীয় জীবনের বিশুদ্ধি ঐকান্তিকভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইষ্টমন্ত্রের মত সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, ভুলিলে চলিবে না- ইহাই আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন।

উপসংহার

উপসংহার কালে—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের গৌহাটিতে যে ষোড়শ অধিবেশন হইতেছে, সে বিষয়ে আমার দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে; তাহা এই—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বঙ্গদেশের বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীর ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার প্রথম অধিবেশন বারাণসী ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়, সেই অধিবেশনে এ যুগের বাঙ্গলা সাহিত্য-তরীর কর্ণধার, বঙ্গজননীর বড় গৌরবের, বড় আদরের সন্তান, বর্ত্তমান যুগের কবিকুলশিরোমণি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। আমার ন্যায় অকিঞ্চন ব্রাহ্মণের স্কন্ধে উহার অভ্যর্থনা সমিতির পৌরোহিত্য করিবার গুরুভার অর্পিত হয়। পরে তীর্থরাজ প্রয়াগে এবং মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুরে উহার যে দুইটী অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতেও মূল পৌরোহিত্য করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল, আর অদ্য আসামের রাজধানী গৌহাটীতে সেই সম্মেলনে সাহিত্যশাখার অধিবেশনে পৌরোহিত্যের কার্য্য করিবার জন্য আমি আসিয়াছি। কিন্তু, এই অধিবেশনে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভে আমি যে আনন্দ, গৌরব ও আশা অনুভব করিতেছি, তাহা আমার জীবনে অতুলনীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই আমার মনে হয়। কেন যে হয়, তাহাও বলি—আসাম প্রদেশ—ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে আজ বাঙ্গলা হইতে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত হইলেও, এমন এক সময় ছিল—যখন বাঙ্গালা ও আসাম একই প্রদেশ, একই জাতির জন্মভূমি বলিয়া পরিগণিত হইত, এবং তাহাতে বাঙ্গালী ও আসামী উভয়েই গৌরব অনুভব করিত।

বাঙ্গালার তান্ত্রিক সাধনার প্রধানতম আচার্য্য পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও সর্ব্বানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণ এই কামরূপেই কামাখ্যামহাপীঠে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কামরূপের প্রেমের ঠাকুর শ্রীশঙ্করদেব আর বাঙ্গালার প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হইয়া, প্রেমভক্তিই যে মানব জীবনের চরম বা পঞ্চম পুরুষার্থ, তাহা প্রথমে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমময় লীলাবলীর নিত্যবিলাসক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনধামে এই পতিতপাবন প্রেমের ঠাকুরদ্বয় প্রায় একই সময়ে উপস্থিত থাকিয়া নামসংকীর্ত্তনময় মহাযজ্ঞে প্রেম-ভক্তির বন্যায় বৃন্দাবন ভাসাইয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালীর ও আসামীর ভাষা ও লিপির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ভেদ ছিল না, ভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য এখনকার ন্যায় তখন কোন রাজনৈতিক কারণের সৃষ্টিও হয় নাই। ইহার কোন আবশ্যকতাও তখন কোন বাঙ্গালীর বা কোন আসামীর মনে ক্ষণকালের জন্য উদিতও হইত না। বাঙ্গালার কৃষ্টি ও আসামের কৃষ্টি তখন একই ছিল। আমার বিশ্বাস, এখনও তাহা একই আছে। এই ঐক্য বাঙ্গালীর ও আসামীর সমুন্নত জাতীয় জীবন গঠনের উৎকৃষ্টতম উপাদান—ইহাই আমার মনে হয়। তাই বলি, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন আসামে আসিয়া আজ দীর্ঘ প্রবাসের মর্ম্মবেদনা ভুলিয়াছে। আশা করি, মর্ম্মবেদনার এই ক্ষণিক বিস্মৃতি আমাদের মধ্যে শাশ্বতী হইবে, তাহার ফলে পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালীর ও আসামীর জাতীয় ভাবের প্রবাহ আবার একই খাত দিয়া বহিতে আরম্ভ করিবে; বাঙ্গালী ও আসামী আবার এক হইবে। এক হইয়া—নবজীবন লাভ করিয়া—নববলে বলীয়ান্ হইয়া—নবোদ্বুদ্ধ ভারতে জাতীয় ভাবের জাগরণকে পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করিতে সমর্থ হইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

সমাধান

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন

(৪)

তিন মাস পরে। আসাম ট্রাঙ্ক-রোডের এক ইন্‌সপেক্সন্ বাংলোর সম্মুখে রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহরে একটি বৃক্ষমূলে শিবু রন্ধন করিতেছিল। সুখন ও দুলালী নিকটে বসিয়াছিল।

বাংলোর বৃদ্ধ চৌকীদার আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং শিবুর অভিবাদনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া শিবুর সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। বৃদ্ধ বড় ভাল লোক। শিবুর মুখে সে শুনিল ছেলে-মেয়ে দুটির কথা। দুঃখে ও সমবেদনায় বৃদ্ধের মন আর্দ্র হইল। বৃদ্ধ তাহার ঘর হইতে কয়েকটি পাকা কলা ও এক ঘটি দুধ আনিয়া দিল; এবং একটি কলা সুখনের হাতে ও আর একটি দুলালীর হাতে দিয়া দুলালীকে কোলে তুলিয়া লইল। দুলালী প্রথমে কোলে যাইতে একটু আপত্তি করিয়াছিল,—মুখখানা একটু "কাঁচুমাচু" করিয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে নাচাইয়া দোলাইয়া লুফিয়া ও নানারূপ হাস্যোদ্দীপক মুখভঙ্গী করিয়া এমন একটা সহজ সরল আনন্দপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে দুলালী না হাসিয়া পারিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই বৃদ্ধ দুলালীকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া লইল। বৃদ্ধ নাকি ঠিক এইরূপ একটি নাত্‌নিকে দেশে ছাড়িয়া আসিয়াছে।

বৃদ্ধ শিবুকে বলিল,—"তোমার যখন কোথাও আশ্রয় নেই তখন এক কাজ কর। আমাদের ওভারসিয়ার বাবুর একজন চাকরের দরকার;—যদি থাক, আমি বাবুকে বলি।"

বেদনাকাতর একটি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া শিবু বলিল,—"ছেলে-মেয়ে দুটা সঙ্গে থাক্‌তে কে আমায় চাকর রাখবে দাদা?"

"আচ্ছা দেখি, দাঁড়াও" বলিয়া বৃদ্ধ বাংলোর হাতার বাহিরে ওভারসিয়ার বাবুর বাসার দিকে চলিয়া গেল।

ওভারসিয়ার দেবেন বাবু তখন মধ্যাহ্ন আহারান্তে তন্দ্রালস দেহে একটু গড়াইয়া লইতেছিলেন, এবং পত্নী কমলা নিকটে বসিয়া শিশুপুত্র পাঁচুকে দুগ্ধপান করাইতেছিলেন। পাঁচুর বয়স এই দেড় বৎসর। সুন্দর হৃষ্ট-পুষ্ট ছেলেটি; কিন্তু বড় দুষ্টু। হাত-পা ছুড়িয়া, নানারূপ চীৎকার করিয়া, পাঁচু দুগ্ধপানে ঘোর বিদ্রোহাচরণ করিতেছিল, এবং কমলাও ছড়া কাটিয়া লাল পাখী ডাকিয়া, চাঁদ ধরিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বহু চেষ্টায় দুগ্ধপান করাইতেছিলেন। খাওয়ান প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় পাঁচুর চঞ্চল পায়ের আঘাতে স্বল্পাবশেষ দুগ্ধটুকু পড়িয়া গেল। "কি দস্যি ছেলেরে বাবা" বলিয়া স্নেহমাখা বিরক্তির সহিত ছেলের পৃষ্ঠদেশে ছোট্ট একটি কিল মারিয়া কমলা ছেলেকে বসাইয়া দিলেন। বিজয়-গর্ব্বে পাঁচু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। "হাসি দেখনা আবার,—দুষ্টু ছেলে!" বলিয়া স্নেহময়ী মাতা পুত্রকে পুনরায় কোলে তুলিয়া লইলেন এবং প্রাণঢালা স্নেহে মুখচুম্বন করিয়া, মুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

বৃদ্ধ দেওশরণ আসিয়া বলিল,—"মাইজি! চাকর খুঁজছিলেন,—একজন পাওয়া যায়, রাখবেন?"

কমলা বলিলেন,—"কই বাবা! পেলে ত বাঁচি। থাকে যদি, দেওনা ঠিক করে।"

—"কিন্তু সঙ্গে দুটা বাচ্চা আছে;—একটা ছেলে, আর একটি ছোট্ট মেয়ে। বড় দুঃখে পড়েছে। চা-বাগানে সর্দ্দার ছিল; সেখানে বৌটা মারা গেছে। সেই থেকে তিন মাস ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়ী ঘর কোথাও কিছু নেই। যদি রাখেন, ছেলে-মেয়ে দুটাকেও অবিশ্যি খেতে দিতে হবে; তবে মাইনে নিশ্চয়ই কম করে দিলে চল্‌বে!"

ওভারসিয়ার বাবু গা মোড়া দিয়া চক্ষু মেলিলেন। তন্দ্রার মধ্যেই কথাটা তাঁহার কর্ণগত হইয়াছিল। চাকর অভাবে কমলার ভয়ানক খাটুনি পড়িয়াছে। রান্না-বান্না বাসন মাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের ছোট বড় সমুদায় কাজ-কর্ম্মই তাঁহার একাকী করিতে হয়। তার উপর খোকার কাজ। অত্যধিক পরিশ্রমে কমলার শরীর সুস্থ থাকিতেছে না; এবং পাঁচুরও ঠিকমত যত্ন হইতেছে না। অথচ একটা ভাল চাকরও পাওয়া যাইতেছে না। দুই একটি হাই তুলিয়া তিনি বলিলেন,—"বাগানের কুলী বল্‌ছ, সে আবার কেমন হবে কে জানে। চোর হবে না ত?"

দেওশরণ বলিল,—"চেনা লোক তো নয় বাবু, তবে সঙ্গে দুটা বাচ্চা থাক্‌তে চুরি করে পালাবে কোথায়?"

কথাটা কমলার মনে ধরিল; বলিলেন,—"আচ্ছা, একবার ডাক না লোকটাকে;—দেখাই যাক্, কেমন লোক।"

দেওশরণ হৃষ্টচিত্তে আসিয়া শিবুকে সংবাদ দিল। শিবু মাইজি ডাকিতেছেন শুনিয়া, জিনিষ-পত্রগুলি সেই বৃক্ষমূলেই গুছাইয়া রাখিয়া, ছেলের হাত ধরিয়া ও মেয়ে কোলে লইয়া দেওশরণের অনুসরণ করিল!

কমলা দুর্গারাণীর সমবয়স্কা। বর্ণে এবং আকৃতিতেও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। দুলালী তাঁহাকে দেখিয়াই 'ম্মা' 'ম্মা' বলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। এইরূপ আকস্মিক ব্যাপারের জন্য শিবু প্রস্তুত ছিল না। সে বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। মাতৃহীন শিশুর মা সম্বোধন শ্রবণে তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। কমলার মাতৃ-হৃদয়েও একটু টান পড়িল। তিনি বলিলেন,—"বাঃ, বেশ টুকটুকে মেয়েটি ত! —এত অল্প বয়সেই মা হারিয়ে বসেছে!" তাঁহার নয়ন-পল্লবও আর্দ্র হইয়া উঠিল।

দুই চারিটি প্রশ্নের পর বেতন সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় শিবু জোড়-হস্তে ও কাতরভাবে বলিল,—"আমাকে একটু আশ্রয় দান করুন; আমার ছেলে-মেয়ে দুটি বাঁচুক। বেতন সম্বন্ধে আমি কিছুই বল্‌তে চাই না। আপনারা দয়া করে যা দেবেন, তা'তেই আমি রাজি। আমি কেবলমাত্র এই মা-মরা ছেলে-মেয়ে দুটির একটু আশ্রয় চাই।"

স্বামীর সম্মতি আদায় করিয়া কমলা শিবুকে চাকরিতে বহাল করিলেন।

ক্রমে সাতটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে

দেবেন বাবু কয়েকবার বিভিন্ন স্থানে বদলি হইয়া সম্প্রতি ট্রাঙ্ক রোডের কাজেই 'সিমুলগাছি' নামক স্থানে নূতন আগমন করিয়াছেন। কমলার আরও একটি ছেলে হইয়াছে; বয়স এই তিন বৎসর। সুখনের ও দুলালীর জন্য শিবুর এখন আর বিশেষ উৎকণ্ঠা নাই। সুখন ত্রয়োদশ এবং দুলালী নবম বর্ষে উপনীত হইয়াছে। ঘর সংসারের অধিকাংশ কাজ এখন তাহারাই সম্পন্ন করে, এবং শিবুকে বিশ্রাম অবসর দিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকে। বাবুর তামাক সাজা, জুতো ব্রাশ করা, সাইকেল ও বন্দুক পরিষ্কার করা ইত্যাদি এখন সুখনের কাজ; আর মাইজির যত ফাই-ফরমাস, সব দুলালীর কাজ। দেবেন বাবু ইতিমধ্যে শিবুর জিম্মায় যথাসর্ব্বস্ব রাখিয়া কয়েকবার সপরিবারে দেশে গিয়াছিলেন,—সামান্য একগাছি তৃণেরও অপচয় হয় নাই।

পাঁচুর সঙ্গে সঙ্গে সুখনের এবং দুলালীরও অক্ষর পরিচয় আরম্ভ হইয়াছিল। শিক্ষার প্রতি দুলালীর প্রবল আকর্ষণ দেখিয়া দেবেন বাবু বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় দুলালীই সর্ব্বাগ্রে শ্লেট পেন্‌সিল বই ইত্যাদি লইয়া বসিত এবং স্বীয় উদাহরণ দ্বারা পাঁচু ও সুখনকে বসাইত; আবার পাঠাবসানে সমস্ত জিনিষ যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিত। পড়ার দিকে সুখনের তেমন মন ছিল না। যুক্ত-অক্ষরের গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে সে পথ হারাইয়া ফেলিল। পাঁচু এবং দুলালী ততক্ষণে অনেকটা পথ অগ্রসর হইয়া গেল।

দা, কুঠার, খন্তা, কোদালি ইত্যাদি লইয়া শ্রমসাধ্য কাজ করিতেই সুখনের আন্তরিক উৎসাহ। স্থিরভাবে বসিয়া কোন কাজ করিতে কিম্বা আলস্যে সময় ক্ষেপণ করিতে সে পারিত না।

কমলার রন্ধনাদি কার্য্যে দুলালীই ক্রমে প্রধানা সাহায্যকারিণী হইয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বদা সে তাহার মাইজির পিছনে ছায়ার মতন ফিরিত, এবং যখন যাহা আবশ্যক হাতে হাতে জোগাইয়া দিত। এইরূপে সাধারণ পাকপ্রণালীও তাহার অনেকটা আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। বৈকালিক জলখাবার মাঝে মাঝে সে-ই প্রস্তুত করিত।

জনৈকা আসামীয়া মহিলার নিকট কমলা অতি সুন্দর সুতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে শিখিয়াছিলেন, এবং অবসর সময়ে মাঝে মাঝে তাঁত লইয়া বসিতেন। দুলালী এই বিদ্যাটুকু উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লইল।

সুখনের অনুকরণে শিবুকে সে "বাবুয়া" বলিয়া সম্বোধন করিত। দুলালী জানিত, শিবুই তাহার পিতা এবং সুখন তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। সময় সময় একখানি স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তির অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ঈষৎ একটু ছায়া তাহার মনের কোণে উঁকি মারিত। শিবু বলিত,—"ঐ পবিত্র স্মৃতিটুকু তোমার মায়ের।" দুলালী বিষাদে নীরব হইত; আর শিব একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অন্তরের পুঞ্জীভূত প্রচ্ছন্ন বেদনার একটা তপ্ত আবেগ মোচন করিয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিত।

পিতৃ-মাতৃহীনা পরের শিশু-কন্যাকে আশৈশব আপন জ্ঞানে লালন-পালন করিলেও দুলালী যে প্রকৃতপক্ষে তাহার নহে, ইহা সে আর কল্পনাও করিতে পারিত না; এবং দুলালী নিজে যাহাতে কোন দিন তাহার প্রকৃত জীবন-বৃত্তান্ত ঘুণাক্ষরেও জানিতে না পারে, তজ্জন্য সে সর্ব্বক্ষণ সচকিত থাকিত।

এইভাবে আরও তিন বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় দেবেন বাবুর বদলির সংবাদ আসিল। দুই জিলা ডিঙ্গাইয়া যে একটি ক্ষুদ্র স্থানে এইবার তাঁহাকে যাইতে হইবে তাহার নাম 'চাকদোয়া'। নাম শুনিয়াই শিবু ভড়্‌কাইয়া গেল। ঐ স্থান 'সোনাপেটিয়া' বাগিচা হইতে মাত্র দেড় ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। সেইদিন, সারাটি রাত্র নিদ্রিতা দুলালীকে অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া রাখিয়া শিবু স্থির করিল, সে আর বাবুর সহিত যাইবে না। তাহার ভয় হইল, বাগিচার এত নিকটে গেলে, পূর্ব্ব পরিচিত সকলের সহিত আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, এবং দুলালীর পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন যদি তাহার কোন আত্মীয় বা দাবীদার আসিয়া উপস্থিত হয়? শিবু বড় অস্থির বোধ করিল। প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইলে কি জানি দুলালীও বা তাহাকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিয়া অবহেলা ভরে সরিয়া দাঁড়ায়! হায়রে দুলালী! শিবু যে তোকে কত যত্নে কত স্নেহে কতখানি আত্মত্যাগের দ্বারা, আপন পুত্র সুখনকে অবহেলা করিয়াও তোর আসন উচ্চে প্রতিষ্ঠা করিয়া কি ভাবে এতটা বড় করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কি একবারও তখন তোর বিবেচনায় আসিবে? সে স্থির করিল, দেবেন বাবুর সঙ্গে ত সে যাইবেই না, অধিকন্তু দেবেন বাবুরা চলিয়া গেলেই সেও পুত্র-কন্যাসহ অন্যত্র গমন করিবে। পলাতক আসামীর ন্যায় একটা সশঙ্ক অস্থিরতা শিবুকে পাইয়া বসিল।

পরদিবস অপরাহ্ণ সময়ে অবসর বুঝিয়া শিবু ম্লানমুখে মাইজির নিকট নিবেদন করিল,—এবার তাহারা আর সঙ্গে যাইবে না।

কমলা চমকিত হইলেন। শিবু-সুখন-দুলালীকে বাদ দিয়া তাঁহাদের যে চলিতে পারে, ইহা তিনি ধারণাও করিতে পারিলেন না। হঠাৎ শিবুর কি হইল? বলিলেন,—"কেন শিবু! হঠাৎ এমন কথা বল্‌ছ কেন?"

শিবু অধোবদনে অত্যন্ত কাতরভাবে বলিতে লাগিল,—"ভেবে দেখলাম মাইজি, ছেলে-মেয়ে দু'টা ক্রমে বড় হচ্ছে; আর এভাবে থাকা উচিত নয়। কোথাও খানিকটা জমি নিয়ে চাষ-বাস ক'রব ভাব্‌ছি। আপনাদের দয়া কোন দিনই ভুলতে পার্‌ব না। সেই অসময়ে আপনারা পায়ে স্থান না দিলে ছেলে-মেয়ে দু'টাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারতাম না। আজ আপনাদের সেই আশ্রয় ছেড়ে দিতে আমার প্রাণে যে কি—" শিবু আর বলিতে পারিল না; কাঁদিয়া ফেলিল। কত কৃতজ্ঞতাই না সেই অশ্রুপ্রবাহে উছলিয়া পড়িতেছে। কমলাও উদ্যত অশ্রু রোধ করিতে গৃহমধ্যে সরিয়া গেলেন।

রাত্রে আহারান্তে দেবেনবাবু ও কমলার সহিত শিবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইল পরিশেষে শিবুর কর্ম্মত্যাগই মঞ্জুর হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ভূপেনের সর্পাঘাত ইহার তিন বৎসর পরের ঘটনা।

(৫)

শিঙা ধ্বনির সুতীক্ষ্ম প্রবল শব্দে ভূপেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। নয়ন মেলিয়া নিজকে সম্পূর্ণ অপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে শয্যাগত দেখিয়া, এবং পার্শ্বে বিজয়কে ম্লানমুখে উপবিষ্ট, ও পদপ্রান্তে একটি অপরিচিতা কিশোরীকে তাঁহার পা' লইয়া টানাটানি করিতে দেখিয়া, তিনি কেমন যেন বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন! কিন্তু পরে মুহূর্তেই, সেই সর্পদংশন ব্যাপার মনে পড়ায় পুনরায় তাঁহার হৃদকম্প উপস্থিত হইল। শুষ্ক কণ্ঠে "ভাই বিজয়" বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন। বিজয় উঠিতে দিলেন না,—ধরিয়া শোওয়াইয়া দিলেন।

এদিকে দুলালী ভূপেনের উভয় পায়ের বুট এবং পট্টি ও মুজা ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া ফেলিয়া বিশেষ ভাবে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু দংশনের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। তখন, ঘাড় উঁচু করিয়া ভূপেনের মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"কোন্ খানটায় কামড়েছে বাবু? কোন্ পায়ে?"

ভূপেন অস্পষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন,—"আমার ঠিক মনে নেই।"

—"কোন জায়গা খুব জ্বলছে কি?"

—"না, তেমন ত কিছু টের পাচ্ছি না।"

—"হরি হরি, তাই বলুন! কামড় ত আপনার পায়ে মোটেই লাগেনি! ভয়েই এত!" দুলালী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিজয় তাড়াতাড়ি আসিয়া একখানির পর আর একখানি পা লইয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল। ভূপেন নিজেও চট্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বেশ করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলেন। কিন্তু কোন প্রকার দংশন-চিহ্ন কুত্রাপি দৃষ্ট হইল না। উহাদের কান্ড দেখিয়া দুলালী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

"একটু জল খাব" বলিয়া ভূপেন বিজয়কে জড়াইয়া ধরিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। বিজয়ের মুখে হাসি এবং চক্ষে জল দেখা দিল।

—"কিন্তু আমিও যে হতভাগা সাপটাকে দেখতে পেয়েছি! বাব্বারে বাবা,—মনে হলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।" বলার সংগে সংগে দুলালীর সর্ব্বাংগ শিহরিয়া উঠিল।

এক দৌড়ে দুলালী পাকশালা হইতে এক বাটি ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও একবাটি ঠান্ডা জল আনিল। বিজয় ভূপেনকে ধরিয়া বসাইলেন। দুলালী, স্নেহময়ী ছোট বোনটির মতন কাছে বসিয়া দুধের বাটি মুখে তুলিয়া ধরিল।

দুলালী এতক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া একখানি জুতার অগ্রভাগে দুইটি সুস্পষ্ট দন্তচিহ্ন আবিষ্কার করিল। বলিল,—"নারায়ণ আপনাকে খুব বাঁচিয়েছেন বাবু! আর একটু হলেই—" বলিয়া বাক্য শেষ না করিয়া দুলালী যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিল।

ঠিক এই সময়, "কি রে দুলালী,—কি হয়েছে?" বলিয়া সুখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়াইয়া আসিল।

নাড়িয়া, কখন হাসিয়া কখন গম্ভীর হইয়া, কখন বা চক্ষু দু'টি কপালে তুলিয়া, বর্ণনার সামঞ্জস্যে বিবিধ প্রকারের অংগভংগী ও মুখভংগী করিয়া বলিতে লাগিল,—"দাদা গো দাদা! কি বলব ভাই তোকে! ঘাস নিয়ে আসছি:—বন্দুকের শব্দে ত বুঝতেই পেরেছি যে আজ আবার বাবুরা শিকারে এসেছেন। পাঁচ সাতটা ছেলে-মেয়ে "সাপে কেটেছে" "সাপে কেটেছে" বলে চেঁচিয়ে পালাচ্ছে।

"বাবুকে এখানেই নিয়ে এলাম। এখন কি করি? জানি তোদের কষ্ট হবে,—খুবই চটবি তোরা: তা বলে কি করব ভাই? দিলাম শিঙা বাজিয়ে। হ্যাঁ ভাই, বড্ড ছুটেছিস্ বুঝি? একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছিস যে? বোস্ এখন একটু চুপ করে; একটু ঠান্ডা হ'। বাবুয়া কি করছে?"

সুখন বারান্দার এক প্রান্তে উঠিয়া বসিতে বসিতে বলিল, "বাবুয়া হাল খুলে দিয়ে গরু নিয়ে আসছে। আমায় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলে। একবারই ত ফুঁক দিয়েছিস?" তারপর শয্যাশায়ী ভূপেনের দিকে দৃষ্টি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি সাপে কেটেছেরে? কোন্ খানটায় কামড়েছে?"

দুলালী আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"শোন না মজা! বাবু ত অজ্ঞান,—ভাবলাম যাঃ, মরেই গেল বুঝি। ওমা, জুতো-টুতো খুলে দেখি, কোথায়ও দাগ নেই। বল্লুম,—কোন্‌খানে কামড়েছে বাবু? বাবু বল্লেন, খেয়াল নেই। জিজ্ঞেস করলাম,—জ্বলছে কি কোন জায়গা? বললেন,—না, তেমন ত কিছু টের পাচ্ছি না। তারপর খুঁজে খুঁজে দেখি বাবুর ঐ জুতোটার উপরে—" বলিয়াই তাড়াতাড়ি ভূপেনের এক পাটি জুতা লইয়া অংগুলী নির্দ্দেশে তাহার অগ্রভাগ দেখাইয়া বলিতে লাগিল,—"এই দ্যাখ দাদা, জুতোটার ডগায় কেমন পরিষ্কার ছোবলের দাগ। বাবুর কিন্তু ভয়েই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। কি ভাগ্যি, সামলে গেছেন!"

ভূপেনের বড় লজ্জা হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং দাঁড়াইতে চেষ্টা করিয়াই আবার পড়িয়া গেলেন; বলিলেন,—"মাথাটা ভয়ানক ঘুরছে বিজয়! আর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে। আরও একটু শুয়ে থাকি।" ক্ষণকাল পরে আবার বলিলেন,—"এখন বাড়ী যাই কেমন করে? তুই ত আর গাড়ী চালাতে শিখলি না। আমিও যে আজ পারব এমন ত মনে হয় না। কি করা যায় বল ত? বাড়ীতে একটা খবর দিতে পারলেও হ'ত।"

বিজয় বলিলেন,—"খবর দিলে তার পরিণাম কি হবে, তাও একবার ভেবে দেখিস্। বাড়ীতে একটা তুমুল হৈ-চৈ পড়ে যাবে এবং নিশ্চয়ই তোর মা পর্য্যন্ত এসে পড়বেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি যেন একটা গভীর চিন্তার মধ্যে কথা হারাইয়া ফেলিলেন। খানিকক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—'আর খানিকটা দেখ না কেন? সত্যিই ত আর কিছু হয় নি! একটা সাংঘাতিক ভয়ই না হয় পেয়েছিস! আরও খানিকটা বিশ্রাম কর, বেশ করে মনে জোর আন, তারপর আস্তে আস্তে তুই-ই চালিয়ে যেতে পারবি।"

দুলালী তাড়াতাড়ি সুখনের সম্মুখে গেল এবং [illegible]

একটা খুঁটি ধরিয়া ভূপেন দণ্ডায়মান হইল। বলিল,—"পারব বলেই ত মনে হচ্ছে; কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। তা হোক। মাথাটা খুব ঘুরছে; আর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে।"

দুলালী ইতিমধ্যে বাহিরে গিয়াছিল। দুইটি বন্দুক এবং কয়েকটি মৃত হরিতাল লইয়া ফিরিয়া আসিল। হরিতাল-গুলি বারান্দায় রাখিয়া সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞের ন্যায় অতি অনায়াসে বন্দুক দুইটি খুলিয়া পরীক্ষা করিল এবং একটি বন্দুক হইতে একটি শূন্যগর্ভ ও একটি পূর্ণগর্ভ কার্ত্তুজ বাহির করিয়া লইল। তারপর বন্দুক দুইটি বেড়ার গায়ে হেলান দিয়া রাখিয়া অব্যবহৃত কার্ত্তুজটি বাবুদের নিকট বিছানার উপর ফেলিয়া দিল।

বিজয়ের গা টিপিয়া ভূপেন বলিলেন,—"এই আশ্চর্য্যময়ী মেয়েটি কে ভাই? অনায়াসে বন্দুকটা খুলে ফেললে!" দুলালী সরিয়া যাইতে যাইতে একটু মুচকি হাসিল মাত্র।

বিজয় বলিলেন,—"তুই আর এ কি দেখাচ্ছিস ভূপেন! তোর ঐ সাড়ে দু'মণ ওজনের প্রকাণ্ড দেহটাকে নিয়ে ও যা করেছে,—যে ভাবে তোকে টেনে নামিয়েছে এবং বয়ে এনেছে, আর সেই সঙ্গে আমাকেও যে রকম ধমকেছে আর ঠাট্টা করেছে, তা তোকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না। আমিও সেই থেকে ভাবছি, মেয়েটি কে? ভদ্রঘরের মেয়ে নয়, তা ত দেখতেই পাচ্ছি।"

বাধা দিয়া ভূপেন বলিলেন,—"কিন্তু চাষার মেয়েও ত বলা যায় না। চাষার ঘরে কি এমন সহজ সরল স্বচ্ছন্দ চাল-চলন, এমন অদ্ভুত শিক্ষা দেখেছিস কখন? চাষা ভদ্রের উপরেও দেখছি একটা স্থান আছে। মেয়েটি সেই স্তরের।"

দুলালীর আহ্বানে সুখন পাকশালায় গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া ভূপেন ও বিজয়কে বলিল,—"আপনারা ত আর এখন বাড়ী ফিরতে পারবেন না। আপনাদের দুটি রান্নার জোগাড় করে দেব?"

ভূপেন ইংরেজিতে বিজয়কে বলিলেন,—"Don't let go this opportunity", অর্থাৎ এ সুযোগ হারিও না।

বিজয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সুখন দুলালীকে সংবাদ দিল। দুলালী কোমরে কাপড় জড়াইয়া লাগিয়া গেল। কয়েকখানি বাসন, ঘটি, বাটি, কড়াই, হাতা ইত্যাদি লইয়া সে আঙ্গিনার এক কোণে কূপের নিকট যাইয়া মাজিয়া-ঘষিয়া তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার করিয়া আনিল এবং বারান্দার এক প্রান্তে একটি অস্থায়ী উনান প্রস্তুত করিয়া খানিকটা স্থান গোময়লিপ্ত করিল। তারপর দুইখানি মোটা কাপড় ও গামছা এবং এক বালতি জল ও একটি ঘটি লইয়া একটু আড়ালে গেল

অল্পক্ষণ পরে সদ্যস্নাতা দুলালী কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চট্ করিয়া ভূপেনের ও বিজয়ের পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা মুগ্ধ বিস্ময়ে একে অপরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। এদিকে কালো চুলের গুচ্ছ পিঠের উপর দোলাইয়া হইল। মশলা বাটিয়া, চাউল ধুইয়া, একে একে সব আনিয়া সেই সদ্য প্রস্তুত উনানের নিকট সাজাইয়া রাখিল। এক বালতি জল এবং একটি ঘটিও রাখিল। সুখন এক বোঝা শুষ্ক জ্বালানী কাষ্ঠ রাখিয়া, কয়েকটি হরিতাল ছাড়াইয়া কুটিয়া ধুইয়া দিল। দুলালী পুনরায় সেই মাংসখণ্ডগুলি স্বহস্তে সযত্নে ধৌত করিয়া রাখিল। তারপর বাবুদের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—"আপনারা স্নান করবেন?"

ভূপেন বলিলেন,—"স্নান আর করব না; মাথা ধুয়ে, হাত পা মুছে নিয়েই আজকের মতন চালিয়ে দেব।"

—"আমি নাইবো" বলিয়া বিজয় গাত্রোত্থান করিলেন। তারপর দুলালীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কোন রকম একখানা কাপড় বা গামছা আমায় দিতে পার?—স্নান করে পরব।"

দুলালী আনকোরা নূতন তাঁতে বোনা দুইখানি ছোট ধুতি ও একখানি নূতন গামছা আনিয়া একটি পিঁড়ীর উপর স্থাপন করিল।

ভূপেন বলিলেন,—"এ যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এসে পড়েছি, কিছুরই অভাব নেই।"

দুলালী মৃদু হাসিল মাত্র; বলিল,—"গরম জলে নাইবেন? আপনিও কিন্তু স্নান করলেই বোধ হয় অনেকটা ভাল বোধ করতেন।"

"তবে তাই হোক; তোমার উপদেশ লঙ্ঘন করব না" বলিয়া ভূপেন উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"গরম জলের কোন দরকার নেই; ঠাণ্ডা জলই ভাল।"

সুখন তেল আনিয়া দিল এবং জল তুলিয়া দিল। বাবুরা স্নান করিলেন। ইংরেজীতে তাঁহারা কিছু কথাবার্ত্তা ও হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। ভূপেন বলিলেন,—"এখন যাও বিজয়! সর্পাঘাতে মৃত বন্ধুর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়া যে সকল সুখ-শ্রাব্য বিদ্রূপ তিরস্কার লাভ করিয়াছিলে, রন্ধনের পারদর্শিতা দেখাইয়া যদি সেই রকম আর একটু কিছু আদায় করিয়া দেখাইতে পার, তাহা হইলে অদ্যই আমি তোমাকে একটা বিশিষ্ট রকমের পুরস্কার দিব।"

বিজয় নিঃশব্দে একটু হাসিলেন মাত্র।

ইতিমধ্যে দুলালী সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া উনানে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। তাহার আহ্বানে বিজয় উনানের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কি করতে হবে?"

দুলালী বলিল,—"আগে মাংসটাই রান্না করুন; তারপর চাল ক'টা ফুটিয়ে নিলেই হবে।"

দুষ্টুমি মাখা চাপা হাসির সহিত বিজয় বলিলেন,—"রাঁধব ত ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধি বাৎলে দেও,—তবে ত রাঁধব।"

দুলালী বলিল,—"ঐ কড়াটাতেই মাংস চাপিয়ে দিন। তারপর মাংস হয়ে গেলে, বাটিতে ঢেলে নিয়ে, কড়া বের করে দেবেন,—আমি আবার মেজে দিব।"

বলামাত্রই সবগুলি মাংস কটাহ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বিজয় তন্মধ্যে সেরখানেক জল ঢালিয়া দিলেন এবং কড়াইটা উনানের উপরে স্থাপন করিয়া [illegible]

"ওকি করছেন?" বলিয়া দুলালী চমকিয়া উঠিল এবং বিজয়কেও চমকাইয়া দিল।

কড়াইটা পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দুলালীর মুখের উপর অপ্রতিভ-দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া, বিজয় কহিলেন,—"কেন? মাংসটা চাপিয়ে দি?"

কৌতুক বিস্ময়ে দুলালী প্রশ্ন করিল,—"কি করে রাঁধবেন শুনি?"

বিজ্ঞের মতন গম্ভীরভাবে বিজয় বলিলেন,—"কেন? সবাই যেমন করে। বেশ যখন সেদ্ধ হবে, তখন তেল, নুন, মশলা দিয়ে ঘেঁটে-ঘুটে নামিয়ে নেব!" দৃষ্টি তাঁহার তখনও দুলালীর মুখের উপরেই স্থাপিত ছিল। উভয়ের দিকে চাহিয়া ভূপেন প্রবল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

স্বচ্ছ শুভ্র বিন্দু পরিমিত একটু পবিত্র হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে আনিয়া দুলালী বলিল,—"তবেই হয়েছে! এতো আপনার কাজ নয় দেখছি!"

সুখন নিকটে আঙিনায় দাঁড়াইয়াছিল। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলে নাই; কিন্তু আর না বলিয়া পারিল না; বলিল,—"বাবুরা কি বাড়ীতে রাঁধেন নাকি? তোর যেমন কথা! জানবেন কি করে?"

ঝঙ্কারের সহিত হাসি মিশাইয়া দুলালী কহিল,—"তুই আর হাসাস-নে দাদা! বাবুরা চিরদিনই যখন খেয়ে এসেছেন, এবং শেষের দিন পর্য্যন্তও যখন খেয়েই যেতে হবে, তখন প্রতি দিনের এই সবচেয়ে বেশী দরকারী সহজ কাজটার জন্য মেয়েদের কাছে একেবারে সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে পরাধীন হয়ে না থাকলে কি বাবুদের বাবুগিরি কমে যায় নাকি?" তারপর ভূপেনের দিকে চাহিয়া পুনরায় তেমনই শুভ্র স্বচ্ছ পবিত্র হাসির সহিত প্রশ্ন করিল,—"আপনার বোধ হয় সাপের বিষ এতক্ষণে অনেকটা নেমে গেছে; আপনি পারবেন একটু ফুটিয়ে নিতে?"

বড় বড় চক্ষু দুটি কপালে তুলিয়া ভূপেন বলিলেন,— "আরে বাপরে! বিজয় তবু উনানের সামনে বসতে পেরেছে। আমি হলে এতক্ষণে, কাপড়েই আগুন ধরিয়ে দিতুম।"

তখন বিজয়ের দিকে চাহিয়া দুলালী বলিল,—"তবে আর উপায় কি বলুন। আপনারই রাঁধতে হবে। আচ্ছা, কড়াটা একবার এদিকে দিন্ ত আমার কাছে।

দুলালী মাংসখণ্ডগুলি তুলিয়া আবার সেই বাটিতে রাখিল এবং কড়া পরিষ্কার করিয়া উনানের উপর বসাইয়া দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তারপর, কড়া তপ্ত হইলে, হাত বাড়াইয়া খানিকটা তৈল ঢালিয়া দিল এবং মাংসে লবণ ও মশলা মাখিয়া রাখিল। শেষে তৈল পাকিয়া আসিলে বলিল,— "এখন কড়াতে মাংস ঢেলে দিন।"

বলামাত্রই বিজয় আদেশ পালন করিলেন। মাংস ঢালিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তপ্ত তৈল আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। "গেছিরে বাবা" বলিয়া বিজয় তিন লম্ফে যাইয়া ভূপেনের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন এবং দগ্ধ স্থানে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

ভূপেন ভয়ানক হাসিয়া উঠিলেন এবং বিজয়কেও হাসাইয়া তুলিলেন। দুলালীরও প্রবল হাসি পাইয়াছিল। অতি কষ্টে উদ্যত হাসি চাপিয়া রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি এক থাবা গোময় আনিয়া দগ্ধস্থানে প্রলেপ লাগাইয়া দিল। তারপর হাত ধুইয়া আসিয়া, সেই যৎসামান্য রন্ধনোপকরণের দিকে চাহিয়া, একটা খুঁটি ধরিয়া, প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটা যেন জটিল দুঃস্বপ্নের মধ্যে সে পথ হারাইয়াছে। হঠাৎ দুইটি বড় বড় মুক্তার দানা তাহার উভয় গণ্ড বাহিয়া পড়িতেই সে সচকিত হইয়া উঠিল। বাম করপৃষ্ঠে নেত্র মার্জ্জনা করিয়া সুখনকে বলিল,—"দাদা! তুই এ সব নিয়ে যা। মাংস ফেলে দিয়ে কড়াটা কূয়ো তলায় রেখে দে। আমি চট্ করে চারটি মুড়ি ভেজে দি। দুধ কলা আর মুড়ি খেয়েই বাবুদের এ বেলা কাটাতে হবে।" মুখখানি তাহার বড়ই গম্ভীর এবং বেদনাকাতর।

ভূপেন বলিলেন,—"মাংস ফেলে দেবে কেন? আমাদের যদি মুড়ির ব্যবস্থা হয়, বেশ ত তাই-ই হোক্; মাংসটা রান্না ঘরে নিয়ে যাও,—তোমরা খাবে।"

দুলালীর কথায় সুখন অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু ভূপেনের কথায় আবার থমকিয়া দাঁড়াইল। কাহার কথা শুনিতে হইবে ঠিক বুঝিতে পারিল না। সুতরাং দ্বিতীয় আদেশের জন্য একবার ভূপেনের ও একবার দুলালীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিতে লাগিল।

দুলালী বিষাদ-মাখা কোমল কণ্ঠে বলিল,—"তা' কি হয় দাদা! অতিথি-নারায়ণের সেবার জিনিষ মুখের সামনে থেকে নিয়ে তুই খাবি?" পুনরায় তাহার নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু টল টল করিয়া উঠিল।

সুখন কড়াটা নামাইয়া লইল।

গাঢ়স্বরে ভূপেন কহিলেন,—"রাখ ত কড়াটা সুখন! আচ্ছা দুলালী,—তুমি এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? তোমাদের জাতটা কি বলত?" উত্তরের জন্য নিস্পলকনেত্রে তিনি দুলালীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দুলালী চক্ষু নামাইয়া, দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল,—"জাতের খবর ত জানি না বাবু! আমাদের কোন জাতটাত নেই। শুধু এইটুকু জানি যে, আমরাও মানুষ;— কিন্তু গরীব এবং চাষা।"

—"আচ্ছা, তুমি যে নারায়ণের কথা বলছিলে, সেই নারায়ণের জাতটা কি বলতে পার?"

ব্যথিত বিষন্ন মুখখানি একটু তুলিয়া ভূপেনের দিকে চাহিয়া দুলালী বলিল,—"নারায়ণের কি জাত থাকে বাবু? নারায়ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান;—তাঁর জাত নেই।"

সুখন হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—"জাত থাকবে না কেন? নারায়ণ ত কেষ্ট ঠাকুর! তিনি ত গয়লা।"

একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল। এতক্ষণের বিষন্নতা হঠাৎ কাটিয়া গেল। সুখন লজ্জা পাইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

ভূপেন বলিলেন,—"নারায়ণের যখন জাত নেই এবং তোমারও যখন জাত নেই, তখন তোমরা এক জাত নও কি?

(শেষাংশ ৪৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কামরূপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

গোহাটী আসামের সর্ব্বপ্রধান সহর। ইহা এখন আসামের রাজধানী না হইলেও বিভিন্ন দিক দিয়া ইহার প্রাধান্য আসামে এখনও বর্ত্তমান। ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিলেও বলিতে হয়, গোহাটীর ইতি-হাসই প্রকৃতপক্ষে আসামের ইতিহাস। এইরূপ বিভিন্ন কারণে গোহাটীর সহিত বাঙ্গলা সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠতা রহিয়া গিয়াছে। ভাষার দিক দিয়াও বাঙ্গলা ও আসামীর মধ্যে মিল খুব বেশী। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের নৈসর্গিক ও ঐতিহাসিক সম্পদ-সমৃদ্ধ

কামাখ্যামন্দির ও সৌভাগ্যকুণ্ড

বাঙ্গলার সঙ্গে গোহাটীর যোগসূত্র খুব নিবিড়। কামাখ্যা তান্ত্রিক সাধনার সিদ্ধ পীঠস্থান। বহু বাঙ্গালী সাধক এই মহাপুণ্য তীর্থে সাধনা করিয়া সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। এখনও প্রতি বৎসর বাঙ্গলা হইতে সহস্র সহস্র পুণ্যকামী নরনারী এই মহাপুণ্য-ক্ষেত্র দর্শন করিতে [illegible] দেখার বহু

এই সহরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মে-লনের স্থান নির্ব্বাচন সব দিক দিয়াই সঙ্গত ও শোভন হইয়াছে। নিম্নে গোহাটী তথা কামরূপের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল:—

প্রকৃতির লীলা-নিকেতন আসাম ব্রিটিশ-ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত প্রদেশ। মণিপুর রাজ্য উত্তরে হিমালয়, উত্তর-পূর্ব্বে মিশামি পর্ব্বত, পূর্ব্বে নাগা ও খামতি-জাতি-অধ্যুষিত পর্ব্বতমালা ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে ত্রিপুরা, ময়মন-সিংহ, রঙ্গপুর, কোচবিহার রাজ্য এবং জলপাইগুড়ী জেলা। এই প্রদেশের পরিমাণ ফল ৬৭,৩৩৪ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ৯,২৪৭,৮৫৭।

আসাম প্রদেশ মূলতঃ তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত—সুরমা বা বরাক উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বা প্রকৃত আসাম এবং কাছাড়ের পূর্ব্বে মণিপুর ও দক্ষিণে লুসাইদিগের দেশ পর্ব্বতময়।

ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা-ভূমি ৪৫০×৫০ মাইল বিস্তৃত। এই বিভাগই প্রকৃত আসাম বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন কামরূপ রাজ্য এই বিভাগে অবস্থিত ছিল। ব্রহ্মপুত্র-নদ তাহার বিপুল জলরাশি লইয়া এই ভূভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উত্তরে হিমালয়ের বহু শাখা স্রোত এবং দক্ষিণে আসাম শৈলমালার অববাহিকা দিয়া প্রবাহিত শাখা-নদী ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়া উহার কলেবর ও স্রোত বৃদ্ধি করিয়াছে।

আসাম প্রদেশ বর্ত্তমানে তেরটি জেলায় বিভক্তঃ—গোয়ালপাড়া, কামরূপ বা গোহাটি, দরঙ্গ, লখিমপুর, শিবসাগর, নওগাঁ, গারো পাহাড়, খাসী ও জয়ন্তী-গিরি, নাগা পাহাড়, শ্রীহট্ট, কাছাড়, লুসাই ও মণিপুর রাজ্য।

আসামের মধ্যে কামরূপ জেলাই সর্ব্বপ্রধান। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৩৬৩১ বর্গ মাইল। এই জেলার প্রধান নগর গোহাটি। বড়পেটা, দিবাঙ্গগিরি পলাশবাড়ী, হাজো, কামাখ্যা প্রভৃতি আরও অনেকগুলি সহর এই জেলাতে আছে।

ভারতের প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানে রামায়ণে ও মহাভারতে এবং তন্ত্রাদি গ্রন্থে আসামের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তখন এই স্থান আসাম নামে পরিচিত ছিল না। অতি প্রাচীন সাহিত্যে প্রাগজ্যোতিষপুর নামক যে রাজ্যের উল্লেখ আছে, পরে তাহাই কামরূপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রামায়ণ ও মহা-ভারতে এই দুইটি নামেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাগ্ জ্যোতিষপুরই যে পরবর্ত্তী-কালে কামরূপ নামে পরিচয় লাভ করে—সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ প্রায় একমত। অবশ্য এই রাজ্যের সীমার মাঝে মাঝে অদল বদল হইত। রামায়ণ ও মহাভারত

যায়—তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহা সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহা পার্ব্বত্যময় প্রদেশ ছিল। রামায়ণে আরও আছে যে, প্রাগজ্যোতিষপুর—বরাহ নামক এক স্বর্ণচূড় পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পর্ব্বত ছিল ৬০ মাইল বিস্তৃত। সুগভীর সমুদ্রের উপর এই পর্ব্বত দাঁড়াইয়া ছিল। মহাভারতে প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তকে 'শৈলালয়' (পর্ব্বতবাসী) বলা হইয়াছে। তাহাতে আরও আছে যে তাহার সৈন্যদলের মধ্যে—কিরাত, চীনা ও সমুদ্রোপকূলবাসী লোক ছিল। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, রামায়ণে আসাম পর্ব্বতমালা বরাহ পর্ব্বত নামে এবং এই পর্ব্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত নিম্ন, জলময় ভূমিই সাগর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা আরও অনুমান করেন যে, অতি প্রাচীনকালে ব্রহ্মপুত্র নদীর দ্বারা এই স্থানের সহিত বঙ্গোপসাগরের বোধ হয় সংযোগ ছিল। ঐতিহাসিকেরা আরও মনে করেন যে, চীনা বলিতে বিশেষভাবে তিব্বতী ও ভুটানীদের বুঝাইত। শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার জলা ভূমিতে যে সমস্ত লোকের বাস ছিল, তাহাদিগকে সমুদ্রোপকূলবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। পার্জ্জিটার অনুমান করিয়াছেন যে, মহাভারতের যুদ্ধের সময় বর্ত্তমান আসামের অধিকাংশ স্থান, জলপাইগুড়ী, কোচবিহার, রংপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, পাবনার কতকাংশ এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্বে নেপালের কতকাংশ প্রাগ্‌ জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরূপও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাগ্‌ জ্যোতিষ রাজ্য পশ্চিমে বিদেহ (মিথিলা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কালিকা পুরাণ ও যোগিণীতন্ত্রে দানব ও অসুর উপাধিধারী কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। প্রাগ্‌ জ্যোতিষপুরে (বর্ত্তমান গৌহাটী) রাজা নরক রাজত্ব করিতেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ছিলেন এবং নরকাসুর নামে খ্যাত ছিলেন। করতোয়া হইতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত ভূ-ভাগ তাহার শাসনাধীনে ছিল। তিনি ঘটককে পরাজিত ও নিহত করিয়া প্রাগ্‌ জ্যোতিষপুরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণ আনাইয়া নগরে বসবাস করাইয়াছিলেন। তিনি বিদর্ভ রাজকন্যা মায়াকে বিবাহ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। তিনি ভূমিসূত বলিয়া ও তাঁহার বংশ 'ভৌম' বলিয়া পরিচিত হয়। তাহার পুত্র ভগদত্ত বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি দুর্য্যোধনের মিত্র ছিলেন। তিনি স্বীয় অধীনস্থ চীন ও কিরাত সৈন্য লইয়া কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে কৌরব পক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যুদ্ধে ভগদত্ত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এই বংশে ১৯ জন রাজা রাজত্ব করেন। শেষ দুই রাজার নাম সুবাহু ও সুপারুয়া। সুবাহু সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং সুপারুয়া মন্ত্রী হস্তে নিহত হন। কালিদাসের রঘুবংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, রঘু দিগ্বিজয় কালে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) পার হইয়া প্রাগ্‌ জ্যোতিষরাজকে কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, কালিদাসের সময়েও প্রাগ্‌ জ্যোতিষ রাজা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

পৌরাণিক ইতিবৃত্তে যে ভাবে আসামের রাজগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে,—তাহা হইতে এই রাজ্যের পূর্ণ ইতিহাস বা অপর রাজাদের সহিত তাহাদের পরস্পরের রাজনৈতিক সম্বন্ধ কি ছিল, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। নিধনপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, রাজা নরকের পুত্র ভগদত্ত ও তৎপুত্র বজ্রদত্তের বংশে তিন সহস্র বৎসর পরে পুষ্যবর্ম্মা (২৭৫-৩০০ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পুত্র সমুদ্রবর্ম্মণ (৩০০-৩৫০ খৃঃ) প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার ঔরসে দত্তা দেবীর গর্ভে বলবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। এই বলবর্ম্মাকে উত্তর ভারতপতি সমুদ্রগুপ্ত পরাভূত করেন।

বলবর্ম্মার রত্নাবতী নাম্নী মহিষীর গর্ভে কল্যাণবর্ম্মা, গন্ধর্ব্ববতীর গর্ভে গণপতি এবং যজ্ঞবতীর গর্ভে মহেন্দ্রবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। মহেন্দ্রবর্ম্মার পুত্র নারায়ণবর্ম্মা অতঃপর রাজা হন। নারায়ণের পুত্র মহাভূতবর্ম্মা। মহাভূতের পুত্র চন্দ্রমুখ। চন্দ্রমুখের পুত্র স্থিতবর্ম্মা, তাহার পুত্র সুস্থিতবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। উক্ত রাজ বংশধরগণ যে বলশালী ও যোদ্ধা ছিলেন শিলালিপিতে তাহার প্রমাণ আছে।

সুস্থিত বর্ম্মার দুই পুত্র। সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মা ও ভাস্কর বর্ম্মা। সুস্থিত বর্ম্মার মৃত্যুর পর তদীয় দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভাস্কর বর্ম্মা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজা ভাস্কর বর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনকে গৌর বিজয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

৬৩৭ খৃষ্টাব্দ চীন পরিব্রাজক য়ুয়ান চুয়াং নালন্দা পরিদর্শনে আসেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া কুমার ভাস্কর বর্ম্মা তাঁহাকে কামরূপে আসিতে বৌদ্ধ ছিলেন না বলিয়া য়ুয়ান চুয়াং প্রথমে কামরূপে যাইতে সম্মত হন নাই পরে শীলভদ্রের অনুরোধে তিনি কামরূপে যান। চীন পরিব্রাজক লিখিয়াছেন, কুমার ভাস্কর বর্ম্মা বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান না হইলেও শ্রমণদিগের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং অনেক পণ্ডিত তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন।

৬৪৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের উদ্যোগে কনোজ নগরে যে ধর্ম্ম-সভা হয়, তাহাতে আমন্ত্রিত হইয়া রাজা ভাস্কর বর্ম্মা চীন পরিব্রাজককে সঙ্গে লইয়া কনোজে যান। কুমার ভাস্কর বর্ম্মা যে পূর্ব্ব ভারতের অধিপতি ছিলেন তাহা চীন পরিব্রাজকদের লিখিত বিবরণ ও ভারতীয় তাম্রশাসনাদি হইতে জানা যায়। চীনগ্রন্থে ভাস্করবর্ম্মা প্রাচ্য ভারতের সম্রাট বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন।

ভাস্কর বর্ম্মার পর কে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। আনুমাণিক ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর বর্ম্মার মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিক মিঃ কে এল বড়ুয়া অনুমান করেন যে, রাজা ভাস্কর বর্ম্মা অবিবাহিত ছিলেন; কাজেই তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরই ঐ রাজবংশের রাজত্বকাল শেষ হয়। শালস্তম্ভ নামক এক ব্যক্তি তাহার উত্তরাধিকারীকে অপসারিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

একখানা তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, শালস্তম্ভের পর যথাক্রমে বিজয়, পালক, কুমার, বজ্রদেব, শ্রীহর্ষদেব ও বালবর্ম্মণ রাজত্ব করেন। শ্রীহর্ষদেব যে কেবল প্রসিদ্ধ ভারত-সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের নামই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; বর্ত্তমান আসাম, বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা প্রদেশ এবং সম্ভবতঃ যুক্ত প্রদেশের পূর্ব্বাংশ এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরাংশ লইয়া তিনি তাহার বিস্তৃত রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন ওড্র (উড়িষ্যা) জয় করিয়া শ্রীহর্ষদেব তাঁহার ক্ষেমঙ্কর দেব নামক একজন আত্মীয়কে উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

ভগদত্তের বংশের অন্যতম শাখার মহারাজ প্রলম্ব প্রাগজ্যোতিষের রাজা হন। তিনি মহাবলশালী ও যোদ্ধা ছিলেন তাঁহার পুত্র হর্জ্জর বর্ম্মদেব পালরাজ জয়পালের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া সদ্ভাবে রাজ্য শাসন করেন। হর্জ্জরের

জয়মালদেব রাজা হন। জয়মালের পুত্র বলবর্ম্মা এই বংশের শেষ রাজা।

শালস্তম্ভের বংশে একবিংশ পুরুষে ত্যাগসিংহের অভ্যুদয় হয়। বলবর্ম্মার মৃত্যুর পর তিনি প্রাগজ্যোতিষের রাজা হন।

তাঁহার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে অমাত্যগণ নরকাসুর বংশীয় ব্রহ্মপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। এই বংশের রাজা ইন্দ্রপাল একজন প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। ইনিই রাজা মাণিকচন্দ্রের মহিষী ময়নামতীর ভগিনী বনমালাকে বিবাহ করেন। এই বংশের অন্য শাখার মহারাজ ধর্ম্মপাল বর্ত্তমান গৌহাটীর পশ্চিমে কামরূপপুর বা কাণ্ডুর নগরে রাজধানী স্থাপন করেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আসাম ব্রিটিশ শাসনের অধীন করিয়া লওয়া হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আসাম প্রদেশ বাঙ্গলার ছোট লাটের শাসনাধীনে ছিল। ঐ বর্ষে আসাম শাসনের ভার একজন স্বতন্ত্র চীফ কমিশনারের হস্তে অর্পিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করিয়া 'পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসাম' নামক এক নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। বামফিল্ড ফুলার উহার প্রথম লেপ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর হন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের ফলে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আসামকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিয়া চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে রাখা হয়। ১৯২১ সালে আসাম শাসনের ভার একজন গবর্ণরের উপর অর্পণ করা হয়। ১৯৩৭ সালে আসামে নূতন ভারত-শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। সম্প্রতি আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রি-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে।

আসামের শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা কংগ্রেসের বিভাগ অনুসারে বাঙ্গলার সহিত সংযুক্ত। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক শাসনের সুবিধার জন্য এখনও তাহা আসামের মধ্যেই রহিয়াছে।

উমানন্দ

তৎপরে কামরূপে দাসবংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের আদি পুরুষ মঙ্গলদাস।

তৎপর কিছুদিন কোচরাজ বংশ কামরূপে রাজত্ব করেন। কোচরাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালে বিখ্যাত মহাপুরুষ শঙ্করদেব আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন।

কোচ বংশের পর অহোমদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অহোমরা শ্যামরাজ্য হইতে আসিয়া খৃষ্টীয় একাদশ শতকে আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করে। গর্ব্বিত শ্যামরাজ আপনাকে 'অহম' বা 'আসম' ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা বলিয়া পরিচিত করেন।

অহোমরাজ গদাধর সিংহ উমানন্দে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার সময় বৈষ্ণবধর্ম্ম খুব প্রবল হইয়া উঠিলে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাব নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। অহোমরাজ শিব সিংহের ——— আসামে যায়।

গৌহাটীর কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান

গৌহাটির চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি প্রাচীন দেবমন্দির বিদ্যমান। এইগুলি হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এই জন্যই গৌহাটিকে Temple Town of Assam অর্থাৎ দেবালয়পুরী নাম দিয়াছেন। নিম্নে গৌহাটীর কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

কামাখ্যামন্দির

বর্ত্তমান গৌহাটী সহরের দুই মাইল পশ্চিমে নীলাচল পর্ব্বতের শিখরদেশে কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী কামাখ্যা দেবীর মন্দির অবস্থিত। এই পর্ব্বত ব্রহ্মপুত্র নদের তীর হইতে খাড়াভাবে প্রায় ৭৫০ ফুট উচ্চ। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা ইহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ইহা ৫১তম মহা-পীঠের অন্যতম। হিন্দু জনসাধারণের বিশ্বাস, এই কামাখ্যা মন্দিরই তান্ত্রিক-সাধনার সিদ্ধ পীঠ।

সর্ব্বপ্রথম রাজা নরকাসুর নীলাচলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কালক্রমে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে কোচরাজ বিশ্ব-সিংহ কর্ত্তৃক তাহা পুনরায় নির্ম্মিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় তাহা ধ্বংস করে। অতঃপর রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলারায় আবার কামাখ্যা মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অনেকেই মনে করেন যে, বর্ত্তমান মন্দিরটি তাঁহারই নির্ম্মিত।

উমানন্দ

ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যস্থলে অবস্থিত উমানন্দ দ্বীপকে ইংরেজগণ 'পিকক আয়ল্যাণ্ড' নাম দিয়াছেন। পর্ব্বতময় এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির প্রাকৃতিক সম্পদ অতুলনীয়। প্রবাদ আছে যে, উমাকে আনন্দ দান করবার জন্য মহাদেব এস্থলে যোগিনীতন্ত্রের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া-ছিলেন। হিন্দু সাধারণের বিশ্বাস, এই পবিত্র তীর্থস্থান একবার মাত্র দর্শন করিলে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে রাজা শিবসিংহ এই দ্বীপে অবস্থিত মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

অশ্বক্রান্ত মন্দির

ব্রহ্মপুত্র নদের অপর তীরে অশ্ব-ক্রান্তের মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, বর্ত্তমান সদীয়ার নিকট বিদর্ভ নামক রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজ-কন্যা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ এই অশ্বক্রান্তে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই স্থানের পর্ব্বত গাত্রে কয়েকটি গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের অশ্বের খুরের আঘাতে এই গর্ত্তগুলি হইয়াছে।

বশিষ্ঠ মন্দির

সহরের নয় মাইল দূরে দক্ষিণে বশিষ্ঠ দেবের মন্দির অবস্থিত। ঐ স্থানের নাম বশিষ্ঠাশ্রম। প্রবাদ আছে, ভগবান্ বশিষ্টদেব কিছুকাল ঐ স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা পরম রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে অবস্থিত। ইহার পাদদেশ দিয়া ললিতা, কান্তা ও সন্ধ্যা নামক তিনটি ক্ষুদ্র গিরিনদী বহিয়া যাইতেছে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজে-শ্বর সিংহ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন।

(শেষাংশ ৪৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রেয়সীর পিতা

(গল্প)

নিমাই বন্দোপাধ্যায

প্রেয়সীর পিতা—

নিবিড় এবং নধর একটি ভুঁড়ি-প্রথম দর্শনে প্রকাণ্ড জালা বলিয়া ভ্রম হওয়াও অসম্ভব নয়,—গভীরতা অবিশ্যি মাপিবার প্রয়াস কেউ পায় নাই, তবে স্থলে একটি রোম-রেখা বক্ষস্থলের মধ্যদেশ হইতে সোজাসুজি নীচে নামিয়া গিয়াছে নাভিদেশ পর্য্যন্ত এবং মানাইয়াছেও সুন্দর। ঠিক মনে হয় যেন অনন্ত সমুদ্র মধ্যে সরলাকৃতি একটা প্রবালের দ্বীপ মাথা উঁচাইয়া রহিয়াছে,—চারিদিকে অসীম থৈ থৈ জলরাশি।

কিন্তু ইহাই ইতি নয়। মার্জ্জারবৎ সম্পূর্ণ গোলাকার মুখখানা উপর হইতে যেন তারিফ দেয়—আমিই-বা কম কিসে? প্রকাণ্ড একখানা মুখ—বর্ত্তুলাকার ভাসমান চোখ দুইটি অক্ষিগহ্বর হইতে যেন সর্ব্বদা ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়, এমনই তার অবিরাম প্রয়াস। মাথাজোড়া বিরাট এক ইন্দ্রলুপ্ত —পশ্চাৎভাগে রোমবৎ কয়েকগাছা চুল নিদর্শন রাখিয়াছে যে কোনকালে দলে তাহারা ভারীই ছিল,—চিরকালই এমন পেটেণ্ট লেপাপোঁছা নয়। মোটমাট দিব্যি গোলগাল চেহারা।

কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ সে-দিন অমন মূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইলাম। প্রীত হইলাম কি না বলিয়া লাভ নাই, তবে খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে প্রণাম একটা সারিয়া ফেলিলাম,—জলদমন্দ্র-রবে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া ফেলিলেন,—কল্যাণ অস্তু কল্যাণ!

প্রেয়সী অদূরে আসিয়া দাঁড়াইতে কিঞ্চিৎ ভরসা পাইলাম, হাতের বইগুলা তাহাকে দিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বলিলাম,—"দশটার ট্রেনে এসেছেন বুঝি—বরিশাল এক্সপ্রেসে? তা বিশেষ কষ্ট হয় নি ত পথে,—কিন্তু আমাকে জানালেই ত পারতেন—ষ্টেশনে......"

নিবিড় এবং মনোনিবেশ সহকারে এতক্ষণ হুঁকারত ছিলেন তিনি, বাধা পাইয়া মুখ উঠাইয়া বলিলেন, "না না, সে কিছু না,—হেঁ হেঁ বুঝলে কিনা বাবাজী, বাকী ত আর কিছুই রাখি নি,—সে বর্দারিই বল আর লছমনঝোলাই বল, সবই এ বান্দাধনের চোখে দেখা। কাজেই, ওরে সরি, ক'লকেটা একটু ব'দলে দে ত মা, একেবারে ছাই হ'য়ে গেছে—"

প্রেয়সী অন্তত আমার সমুখে এমন অনুজ্ঞা পালনের প্রত্যাশা করেন নাই, নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া ভৃত্যের স্মরণা-পন্ন হইলেন।

প্রেয়সীর পিতা ততক্ষণ বলিয়া চলিয়াছেনঃ "হেঁ হেঁ, তা বুঝলে কিনা বাবাজী, ভাবলাম গঙ্গা-দর্শন হয়নি অনেক-দিন, স্নানটা একবার সেরে যাই! তা আমার কথা ত জান?—একবার মনে করলেই ব্যস! আর ওসব পত্তর-ফত্তর, বুঝলে কি না বাবাজী, আমি কোনদিনই ভাল মনে করি নে,—অনর্থক পয়সা নষ্ট বৈ ত নয়? কাল যখন যাচ্ছিই তখন আর—তা ছাড়া আসতেই বা কষ্ট কি শুনি? একটা রিক্স চেপে বসলেই ব্যস! নইলে ত আবার গাড়ী করতে হ'ত। আমাকে একাই টেনে আনতে ব্যাটা হিমসিম, আর তুমিই বল দিকিন, হেঁ হেঁ শত হ'লেও ব্যাটা মানুষ ত—"

বুঝিলাম এ বাক্যস্রোত সহজে থামিবার নয়, ওদিক ফিরিয়া বলিলাম,—"এই রেল-ষ্টীমারের ঝঞ্ঝাট, ও'র খাওয়া-টাওয়া ঠিক মত হ'য়েছে ত? বুড়ো মানুষ, রাত্রে হয় ত ভাল ঘুমই হয় নি,—শোবার জায়গা ক'রে দিলে না কেন?"

ঈষৎ হাসিয়া প্রেয়সী বলিলেন,—"হুঁ!"

প্রেয়সীর পিতা একেবারে হা হা করিয়া উঠিলেন "বল কি বাবাজী! একেবারে ভূরিভোজন যা'কে বলে! সে কত আর বলব তোমায়—ও ক'লকে এনেছ বুঝি? বেশ বেশ, তা বুঝলে কি না বাবাজী, ষ্টীমারে কাল বেশ নাক ডাকিয়েছি, তবুও বুঝলে কিনা, তুমি একটা কলেজের পেরেস্কার বুঝতেই ত পার,—"

সবই ত বুঝিলাম, কিন্তু প্রফেসর হইতে পেরেস্কার পদে প্রমোশন হইল কবে, সেটাই হইল সবচেয়ে দুর্ব্বোধ্য বিষয়। প্রেয়সী মুখ টিপিয়া হাসেন, বলেন, "কই, মুখ-হাত ধুয়ে নিতে হবে না বুঝি—চা যে ওদিকে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল!"

বলিলাম, "আন তোমার চা।"

কিন্তু প্রেয়সীর পিতা এত সহজেই দামবার পাত্র নন, পুনরায় বুঝাইতে সুরু করিলেন, "তারপরে বুঝলে কি না বাবাজী, কোন শালাকে বিশ্বেস নেই! এই ত কাল ষ্টীমারের কথাই বলি। সবে ঘুম আসছে,—হঠাৎ আচমকা চোখ মেলে দেখি এক ব্যাটা চুপি চুপি পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে' ঠিক পাশের জায়গাটিতে নিজের বিছানা গাড়ল। আমি ত, বুঝলে কি না বাবাজী, কম হুঁসিয়ার নই, চোখ পিট্ পিট্ ক'রে সব লক্ষ্য ক'রছি। দেখলে কি হবে ভদ্রলোক, ওটা আদতে চোর তাতে সন্দেহ নেই। দেখি আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বিছানা ঠিক ক'রছে—মতলবটা ছিল আমার ছাতাটা হাত করার আর কি!"

প্রেয়সী এবার অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "রাখ বাবা তোমার গল্প! সবাই ঠকিয়ে ঠকিয়ে তোমাকে ফতুর ক'রছে, কিন্তু মুখে কিছুই স্বীকার ক'রবে না তুমি,—বরং গাইবে ঠিক উল্টাটি!"

তাচ্ছিল্যসূচক একটা শব্দ করিয়া প্রেয়সীর পিতা বলিলেন, "হুঃ! এ শর্ম্মাকে ঠকাবেন এমন লোক ভূ-ভারতে জন্মে নি আজ পর্য্যন্ত! তারপরে যা বলছিলাম, বুঝলে কিনা বাবাজী, শুয়েও নিশ্চিন্ত নেই, ব্যাটা আড়চোখে আমার দিকে খালি তাকাচ্ছে যেন কত বড় একটা সঙ হ'লাম আমি। আদতে, বুঝলে কি না বাবাজী, তাহার মতলবখানা ছিল অন্য-রকম। তবে সুবিধা পায় নি,—এই যা কথা! শেষটা আমারও চেপে গেল বেজায় রোখ,—দাঁড়াও বাপু, তোমার উপরও এক-হাত না নিয়ে ছাড়ছিনে।"

প্রেয়সী নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, পরে বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, আমাদের গঙ্গারামপুরের মীনুর বুঝি গত বছর ছেলে

হ'ল? ব'লল কত ওর শ্বশুরবাড়ীর কথা! মস্ত বড়লোক বুঝি তারা? কিন্তু ও'র স্বামীই বুঝি এই অনেকদিন পরে ফিরল?"

প্রেয়সীর পিতা একেবারে ঝাঁজাইয়া উঠিলেন এবার: "ফিরবে না নিশ্চয়ই ফিরবে! একশ'বার অমন ফিরবে! বিয়ে ঠিক করবার আগে কত ক'রলাম—তা সে কথা কি আর মতিলাল কানে তোলে? বরং উল্টা নেমন্তন্নই ক'রল না আমাকে! ঠিক হ'য়েছে—জামাইটা একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ—জামসেদপুর না কোথায় চাকরী করে ব'লে ধরাকে যেন সরাই জ্ঞান করে। অতবড় ঢেঙ্গা হ'য়েছে, তবু দিন-রাত্তির একটা পায়জামা প'রে থাকা চাই! মাগো, আমি ত হেসেই বাঁচিনে। আবার শুনেছি মীনুকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'বে—বাড়ী ঠিক করা হ'য়েছে। তা সে যাই করুক না কেন মেয়েটার কপালে যে দুঃখু আছে—এ আমি ঠিক ব'লে দিলাম। আমাকে কিনা একবার ডেকেই জিজ্ঞেস করল না,—একটা মুখের নেমন্তন্ন না পর্যান্ত!"

প্রেয়সীর অবস্থা অবর্ণনীয়। কথার মোড় ঘুরাইয়া এতবড় চালটাও শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ? কোন্ দিক সামলাইবেন ঠিক করিতে না পাইয়া ঝড়ের মুখে দিশেহারা নাবিকের মত হইয়াছে তাঁর অবস্থাটা! আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "হুঁ!"

শ্রোতার মনোযোগে বক্তা এবার দ্বিগুণ উৎসাহিত হইলেন, বলিলেন.—"তারপরে, বুঝলে কি না বাবাজী, একেবারে টাকের উপর টেক্কা যা'কে বলে! শিয়রধারে একটা মাটির হাঁড়ী—ভেতরে নিশ্চয়ই রসগোল্লা বা অন্য কিছু,—কাগজ মুড়িয়ে সন্তর্পণে রেখেছেন একেবারে আমার নাকের সোজাসুজি! আমিও ভাবলাম: রসো, পরের জিনিষে নজর দেওয়া তোমার বা'র ক'রছি। তারপরে যেমনি পাশ ফিরে' চোখ বুজেছেন, অমনি কাগজ ফুটা ক'রে বেমালুম সুরু ক'রে দিলাম। ব্যাটা কুম্ভকর্ণ, বুঝলে কি না বাবাজী, একটুও টের পেল না। ছানার জিলিপি আর রসগোল্লা মিলে' সের দুই চালিয়েছি—দিব্যি লাগল! রাতের খাওয়াটা, বলতে কি, ওখানেই সারলাম!"

একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম, "সর্ব্বনাশ, টের পায় নি ত শেষে?"

হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া প্রেয়সীর পিতা খানিকক্ষণ হাসিয়া লইলেন, বলিলেন, "এত কাঁচা কাজ এ শর্ম্মার নয়, বুঝলে বাবাজী? হুঁকার সরঞ্জাম বরাবরই থাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে—জানই ত, ও জিনিষটা না হ'লে একদম নিরুপায়! ক'রলামও তাই.—সের দুই পরিমাণ কাঁচা টিকে কাগজের ফুটা দিয়ে ছেড়ে' দিলাম,—শব্দও হ'লনা ভিতরে রস ছিল—ও দিকে ওজনটাও রইল ঠিক—ব্যস! তারপরে, আরেকটা কাগজ মুড়ে ঠিক মত রেখে' সেই যে পাশ ফিরে নাক ডাকান সুরু ক'রলাম তা থামল গিয়ে একেবারে খুলনার ঘাটে এসে......হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ......"

প্রেয়সীর পিতা তুমুল অট্টহাসি করিয়া উঠিলেন।

রাত্রে প্রেয়সী বলিলেন, "আমার বাবা মস্ত সাহিত্যিক।"

—"ভারী গল্প লেখেন। এই দেখ না বিকেলে কতগুলো গল্প দিব্যি বানিয়ে বানিয়ে ব'লে ফেললেন। পার তোমরা কখন ও রকম বলতে?"

স্বীকার করিলাম—"না!"

"কেমন দিব্যি প্রহসন বল দেখি?" প্রেয়সী উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, "তুমিও ত সাহিত্যিক, পার কখন ওরকম? একটা গল্প লিখতে হ'লে দশটা সিগারেট পুড়িয়ে কড়িকাঠ গুনে' আকাশ-পাতাল ভাববে, তবে প্লট আসবে। আর বাবার দেখ দেখিনি? তুমি বুঝি ভেবেছ ওটা সত্যি?"

বলিলাম—"হুঁ"

—"হুঁ"—প্রেয়সী চটিয়া উঠিলেন; "কখখনো না। আমার বাবা পরের হাঁড়ির রসগোল্লা সরাবেন, শেষটা এই তোমার বিশ্বাস হ'ল?"

এবার বলিলাম, "ও ঠিক!"

কিন্তু তবুও তিনি ঠিক হইতে চান না। উত্তেজিত স্বরে বলেন, "আমার বাবাকে জান না তাই, নইলে যেও ত একবার গঙ্গারামপুর, জিজ্ঞেস কর ত সেখানকার কোন লোককে! —বলবে দেখ ক'ত তাঁর কথা! আমাদের গ্রামে বুঝি রসগোল্লার দোকান নেই? দোকানটা টিঁকে আছে ত আমাদেরই জন্যে! আশু মুখুজ্জ্যের নাম ত শুনেছ? আমার বাবার খাওয়ার কাছে তিনি ত একেবারে খোকা! বাবা বাজি রেখে' একবার সাড়ে ছ'সের মিহিদানা খেয়েছিলেন, জান?"

চক্ষের উপর মুহূর্ত্তে ভাসিয়া উঠিল সেই দিব্য নধর ভুঁড়িটি, মুখে শুধু বলিলাম, "হুঁ!"

কয়েকদিন পরের কথা।

প্রেয়সী মুখখানা বিষণ্ণ করিয়া আসিয়া বলেন, "কপালই মন্দ, নইলে—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "বাঃ এর মধ্যেই! এই ত পরশু না নেকলেস আনলাম সরকারের দোকান থেকে?"

ঝাঁজাইয়া উঠিলেন তিনি: "রাখ তোমার ঠাট্টা, ভারী ত তবু—"

বলিলাম, "তবে কি? পছন্দসই হয় নি—বল কি প্যাটার্নের কি আনব?"

এবার তিনি প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, বলিলাম "কি হ'য়েছে বলই না ছাই! খালি কাজের ক্ষতি হ'চ্ছে। এত-গুলো খাতা,—সামনে মোটে দু'দিন, এর ভেতরই আবার ফেরৎ দিতে হবে।"

প্রেয়সী মুখভার করিয়া বলিলেন, "হবে আবার কি,—আমারই কপাল! বাবা বাজারে গিয়েছিলেন,—পকেট থেকে একশ টাকা শুদ্ধ ব্যাগ উধাও! ব্যবসা ক'রবেন ঠিক ক'রে এসেছিলেন,—একেবারে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল তাঁর, সঙ্গে টাকা নেই যে চালিয়ে দেবেন।"

ইঙ্গিতটা বুঝিলাম। বলিলাম, "তাতে হ'য়েছে কি? তুমিই দাও না হয় চালিয়ে,—ঐ সুটকেসটার ভেতরে টাকা র'য়েছে। আর, একটু সাবধান হ'য়ে চলতে বল,—এটা ত গঙ্গারামপুর নয়, গুণ্ডা আর গাঁটকাটা যে পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র!"

প্রেয়সী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি,—অবাক্ কাণ্ড!

পোর্টিকো পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। সামনে হলঘরের পর্দ্দাটা ছিঁড়িয়া মাটিতে লুটান,—ভিতরে। দৃশ্য আরও ভয়াবহ! যতদূর দেখা যায়,—পালে পালে ছোট বড় দাড়ি-ওয়ালা ছাগল,—কার্পেট বিছান মেঝেটা নোংরার একশেষ করিয়া রাখিয়াছে। মস্ত সোফাগুলি ভরিয়া যেন ছাগলছানাদের রাজত্ব,—নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করিবার মত অমন প্রশস্ত স্থান যে আর নাই একথা বেশ বুঝিয়াছে তাহারা। উপবেশনের ভঙ্গিতে কুণ্ঠার যদি এতটুকু লেশমাত্র থাকে!

একটা ধাড়ী ছাগল দেখিলাম দিব্যি বেপরোয়া। পুরু শোফার উপর দাঁড়াইয়া সামনের পা দুইটা তুলিয়া দিয়াছে গোল পাথরের টেবিলটার উপরে,—রূপার ফুলদানিটা লইয়াছে কায়দা করিয়া, পাতাসমেত ফুলগুলা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে ব্যস্ত সে। ওপাশে এককোণে পাতাসমেত কয়েকখানা কাঁঠাল গাছের ডাল,—পরম অভিনিবেশ সহকারে ছাগযূথ তাহার সদ্ব্যবহারে নিয়োজিত।

রাগে দুঃখে দিশাহারাভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকিলাম, "রামটহল!" ত্বরিতপদে রামটহল আসিয়া উপস্থিত, নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল,—"বাবু, হাম ক্যা করি? মাজি আউর বাবুলোক বোলতা হৈহাম।"—

আর শুনিবার প্রয়োজন নাই,—ধৈর্য্যও ছিল না। একেবারে রণমূর্ত্তি হইয়া উপরে উঠিয়া আসিতে দেখি প্রেয়সী তার পিতৃদেবের লম্বোদরী মার্কা ছিটের জামায় বোতাম পরাইতেছেন। একটু রুক্ষভাবেই বলিলাম, "কিন্তু তোমারই বা কেমন আক্কেল? ওকে কোথায় পাঠালে, ওদিকে যত রাজ্যের ছাগল-পাঁঠা মিলে হলঘরটাকে যে একেবারে সর্ব্বনাশ করলে, সেদিকে একটুও দৃষ্টি নেই। কার ছাগল আসুক, আজ যদি প্রসিকিউট না করি ত"—

বিস্মিতভাবে প্রেয়সী বলিলেন, "সে কি, তুমি কাকে প্রসিকিউট ক'রবে? ওগুলো যে বাবা আজ কিনে আনলে?

—মানে?

—মানে আবার কি? আমাদের বাড়ীর কত লোকজন—চাকর-বাকরের ত অন্ত নেই? তারা ওগুলো চরাবে।

—শেষে? কসাইখানা বুঝি? না হাতিশালে হাতী আর ছাগশালে ছাগল?

প্রেয়সী এবার রীতিমত অভিমান করিয়া বসিলেন, বলিলেন, "হ্যাঁ, আমাদের ত আর খেয়ে কাজ নেই, ছাগল কেটে বিক্রী করব! বাবাকে তুমি অমনিই মনে কর। কালকেই চ'লে যেতে ব'লব,—এখানে অপমানিত হবার কোনও দরকার নেই। নিজের বিষয়সম্পত্তি পরে লুটে' খাচ্ছে—দুদিনের জন্য গঙ্গাস্নান ক'রতে এসেছেন বৈত নয়?

অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "না না সে কি ছিঃ, আমাকে কি মনে কর বল দেখি? খালি জিজ্ঞেস ক'র্‌ছিলাম ওগুলো দিয়ে"—

—"হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু! আমাদের গঙ্গারামপুরের বাড়ীতে জায়গার ত আর অভাব নেই,—রাখাল-মালীও যথেষ্ট! তারা ওগুলো চরাবে। দু'বছর পরে বাচ্চা হ'লে কত লাভ বল দেখি? এটাকে তুমি যা তা বলতে চাও? তুমি আর কত মাইনে পাও, মোটে ত সাড়ে তিন'শ, বাবা হিসেব করে দেখেছেন দু'বছর পরে বাচ্চা আর ডিম মিলে"—

"ডিম!" আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "তোমাদের গঙ্গারামপুরে ছাগলেও বুঝি ডিম পাড়ে?"

এবার ও পক্ষের মুখ বিকৃত করিবার পালা, বলিলেন, "রাখ ন্যাকামি, পাশের ঘরে হাঁস দেখনি বুঝি? তাছাড়া মুরগীও ত"—

দি আইডিয়া! মনে মনে কি ভাবিলাম বলিয়া লাভ নাই, মুখে শুধু বলিলাম,—চমৎকার!

প্রেয়সী প্রীত হইলেন দেখিলাম। সেদিন রাত্রে গবেষণামূলক সাহিত্য-নীতি সম্বন্ধে curtain lecture শুনিয়াছি, আজ আবার অর্থনীতি-প্রসঙ্গ শুনিবার প্রতীক্ষায় থাকিতে হইল।

মাসখানেক ধরিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া প্রচুর পুণ্যলাভান্তে প্রেয়সীর পিতা একদা অকস্মাৎ উধাও হইলেন।

প্রচুর আনন্দ লাভ করিলাম আমি তবু মুখ কাঁচু মাচু করিয়া কহিলাম, "তাই ত রাত নটার কম নয়, সেই সকালে বেরিয়েছেন, অথচ,"—

প্রেয়সী আঁচলে চোখ ঢাকিলেন, আমি ফোন লইয়া সমস্ত কলিকাতা খোঁজাখুঁজি সুরু করিলাম। দুই-তিন দিন পূর্ব্বে হাঁস-মুরগী-ছাগল প্রভৃতি যথাযথভাবে চালান দেওয়া হইয়াছে। খরচটা আমারই,—কেন না গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন তিনি এবং তাঁহার ধারণায় তীর্থ এবং অর্থ এ শব্দ দুইটা নাকি নিতান্ত প্রতিকূল ক্রিয়ামূলক।

সন্দেহ হইল—গঙ্গারামপুর! প্রেয়সী বলিলেন, "আমার কপাল! বাবা নিশ্চয়ই সন্ন্যেসী হ'য়ে বেরিয়ে গেছেন। ক'দিন ধ'রে খালি উড়ু উড়ু ভাব লক্ষ্য ক'রেছি আমি, নইলে,—"

তবু একবার শেষচেষ্টা করিলাম! অগ্রিম মূল্য দিয়া তার করিলাম গঙ্গারামপুরে,—উত্তর আসিল : ভাল, আশিস জানিও!

আশিস জানিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম, বলিলাম, "কি খাওয়াচ্ছ এবার?"

উৎফুল্ল হইয়া প্রেয়সী ক্যাশবাক্‌স খুলিলেন, অকস্মাৎ কি বিভীষিকা দেখিয়া বলিলেন,—সর্ব্বনাশ!

—"বটে? ব্যাপার কি?"

মাথায় হাত দিয়া প্রেয়সী মেঝের উপর ধসিয়া পড়িলেন, "আমার সাড়ে চারশ টাকার নোট আগাগোড়া উধাও,—একখানাও নেই!"

বাক্‌স, সুটকেস্ সব তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল,—চাকর, ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া উড়ে মালীটা পর্য্যন্ত কেহই বাদ গেল না,—কিন্তু বৃথাহি কেবলম্!

আমি বলিলাম, "পুলিশে খবর দিচ্ছি,—"

(শেষাংশ ৪৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বৃদ্ধ পিতামহ

(গল্প)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

তাঁহার কুঞ্চিত কেশরাজি তুষারের মত শুভ্র; খনির প্রাণান্ত পরিশ্রমে দীর্ঘাকার দেহখানি ধনুকের মত বাঁকিয়া গেছে; ম্লান ও নিস্প্রভ নয়নদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট—তাহাতে পূর্ব্বেকার প্রদীপ্ত দীপ্তির সামান্যতম আভাস হয়ত এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাঁহাকে সকলেই 'বৃদ্ধ পিতামহ' বলিয়া ডাকে।

শাসন-বিভাগের মতে—তিনি হত্যাকারী। তাঁহার কোন এক বণিক বন্ধুকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তিনি হত্যা করিয়াছেন—তাই, ন্যায় ও নীতির রক্ষাকল্পে তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। অপরাপর নির্ব্বাসিতেরা তাহা কিন্তু বিশ্বাস করে না। তাহাদের ধারণা—বোরিলফের দ্বারা হত্যা করা সম্ভবই নয়। তাহারা বলে—"যারা বিচার করে, তাদের কি বুদ্ধি আছে—না, দৃষ্টি আছে! কে দাগী কি ক'রে তারা চিনবে?"

জেলখানার ঘরটির এক প্রান্ত হইতে একটি কয়েদী তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি ঘুরাইয়া বলিয়া উঠে—"তাইত! এই দেখ না—আমাকেই ওরা মিছিমিছি এখানে পাঠালে। কেন আমায় নির্ব্বাসিত করা হবে, তার কারণ যখন জানতে চাইলাম, বললে—চুপ কর বেওকুফ, তুই বিদ্রোহী!"

ধীরভাবে তাহার কথাগুলি শুনিয়া বোরিলফ তাঁহার শীর্ণ হাত উপরের দিকে আন্দোলিত করিয়া বলেন,—"ওপরে একজন আছেন, যিনি সব দেখছেন। কি সত্য, কি মিথ্যা—ওঁর সব জানা।"

তিনি থামিয়া যান। কিন্তু অস্থির মতি যুবকেরা সহজে থামে না।

বোরিলফের যখন মনে পড়ে—তাঁহার পত্নীও তাঁহাকে বিশ্বাস করেন না তখন তাঁহার বক্ষে কে যেন আমূল ছুরিকা বসাইয়া দেয়। বিদ্যুৎ দীপ্তির মত তাঁহার চোখের সমক্ষে ভাসিয়া উঠে—ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার অতীতের এক স্মরণীয় ছায়াময় অন্ধকার।

......অপরিসর অন্ধকার হাজত ঘরে তিনি বন্দী। মিসিস বোরিলফ তাঁহার সহিত দেখা করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। শীতকাল। চিবুকটি ডান হাতের উপর রাখিয়া স্তব্ধ বোরিলফ বসিয়া। এমন সময় তাঁহার স্ত্রী আসিলেন, সঙ্গে ছেলে মেয়ে ও বক্ষে একটি শিশু।

......কথার অনর্গল প্রবাহ—যে কথা শেষ হইতে চাহে না! অন্তরের নিরুদ্ধ যত মৌন বেদনা—তাহা যেন এক মুহূর্ত্তে একসঙ্গে সব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া বুকের বোঝাটাকে লঘু করিয়া ফেলিতে হইবে—"সম্রাট আমাদের নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছি।" অভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার স্ত্রীর স্পন্দিত দেহ ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে।

একসময় তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা, তুমি যে খুন মুহূর্ত্তের মধ্যে বোরিলফের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠে। সমগ্র অন্তর মথিত করিয়া বাহিরের জগতে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে। কেহই কোন কথা বলিতে পারে না। ঠিক সেই সময় প্রহরীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"আর সময় নেই।"

বিদায়-ক্ষণে বোরিলফের হৃৎপিণ্ড যেন উৎপাটিত হইয়া আসিতে চাহে। কোলের শিশুটির আরক্ত কপোলে কয়েকটি উত্তপ্ত চুম্বনরেখা আঁকিয়া দিয়া তিনি স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—"কঠিন শাস্তিই আমার প্রাপ্য, আর তাই আমি চাই!"

তারপর সাইবেরিয়ার তুষারময় বক্ষে একে একে ছাব্বিশটি শীতকাল কাটিয়া গেছে। নির্জ্জন কারাগৃহে শীতের সুতীক্ষ্ণ দন্তরাজি তাঁহার অস্থি ও মজ্জার আর কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই। লিক্‌লিকে চাবুকের সপাসপ আঘাতে আর কয়েদীদের আকুল আর্ত্ত চীৎকারে এখানকার ভারাক্রান্ত বায়ুমণ্ডল তাঁহার কানে কানে অনেক কথাই বলিয়া যায়। তিনি চাহিয়া থাকেন দুর্গত কয়েদীদের দিকে—তাহাদের বুভুক্ষু দৃষ্টি নেকড়েবাঘের দৃষ্টির মত লুব্ধ ও কুটিল।

নূতন অপরাধীরা শাস্তিভোগ করিতে আসে। পুরাতন পাপীরা তাহাদের অভিনন্দন জানায়; অভ্যর্থনা করে, ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া বিব্রত করিয়া তোলে। জিজ্ঞাসা করে—"জারের অত্যাচার এখনো তেমনি অবাধে চলেছে নাকি? এবৎসর দেশে কি রকম ফসল হ'ল"......আরও অনেক কথা!

সময় কাটিয়া যায়।

সেদিন শীত বেশী পড়িয়াছে। তাহারা সবাই জড়ো হইয়া বসিয়াছে—শীতজর্জ্জর শরীরগুলিকে একটু উত্তপ্ত করিতে কিছু কাঠও সংগ্রহ হইয়াছে। আগুন জ্বলিতেছে।

একজন নূতন অপরাধী, বয়স অনুমান ষাট বছর—উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"আমাকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়েছে ওরা শুধু শুধু; ছেলের শ্লেজের ঘোড়াটাকে বাড়ীতে এনে সবেমাত্র বেঁধেছি—এমন সময় একটা মোটা গোছের সিপাই এসে ধরলে আমার ঘাড়, বললে—এই-ও ডাকাত! আমি বললুম—বা, এ ঘোড়া যে আমার! তারা কিছুই শুনতে চাইলে না। আমায় এখানে পাঠিয়ে দিলে।"

পেট্রোভিচ টানিয়া টানিয়া একটু হাসিল।

ঘরের প্রান্তদেশ হইতে মোটা কয়েদীটা জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কোথা থেকে আসছ?"

"সীজনী থেকে!, আমার নাম পেট্রোভিচ। বাবার নাম"......

অদম্য ঔৎসুক্যভরে বোরিলফ তাঁহাকে থামাইয়া দেন—"তুমি সীজনীর বণিক বোরিলফের সন্তানদের কোন সংবাদ রাখ?"

"রাখি বইকি, তারা তাদের পিতৃব্যবসাই চালাচ্ছে, যদিও তাদের বাপ এখানে।" কথা বলিতে বলিতে পেট্রোভিচ কেমন যেন অন্যমনা হইয়া যায়। বোরিলফের অপরাপর প্রশ্ন—

'ছেলেরা কেমন আছে, সংসার কেমন চলছে,"—সে সব তাহার কানেও ঢোকে না।

তাহার গোঁফের আড়াল হইতে একটা সশ্লেষ হাসির রেখা বাহির হইয়া আসে—"আচ্ছা পিতামহ, ওরা তোমাকে এখানে পাঠাল কেন?"

নিরুত্তর বোরিলফের বক্ষস্থল মথিত করিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে। অপর সকলে এই অন্যায় নির্য্যাতনের প্রতিবাদ করে। সেই প্রতিবাদ পেট্রোভিচের মুখে এক পোঁচ নিবিড় কালিমা মাখাইয়া দেয়। সে বলে—"ছুরি কিন্তু তোমার মাথার কাছেই থলিতে পাওয়া গিছল!"

বোরিলফের কোটর প্রবিষ্ট নিষ্প্রভ নয়নদ্বয় শুধু জ্বলিয়া উঠে, আর শোনা যায় পেট্রোভিচের আকস্মিক অসংলগ্ন উচ্চস্বর—"আমার শোনা কথা, আমি হয়ত কিছু জানি না।......"

দিনের পর দিন......

পুরাতন অতীত বোরিলফের চোখে স্বপ্নের মত ভাসিয়া উঠে। কোলের শিশুটি যেন তাহার কচি পেলব বাহু দুটি মেলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে, শোনা যায় তাহার ডাক বেশ সুস্পষ্টরূপে—"বা—বা"......বৃদ্ধের বিশুষ্ক লোল কপোল বাহিয়া কয়েক ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। নিষ্প্রভ নয়নে প্রতিশোধের লেলিহ ক্ষুধা যেন বহ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠে। বিনিদ্র যামিনী বৃদ্ধকে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অতিবাহিত করিতে হয়।

......সহসা একটা শব্দ—ঠুকঠুক! ঠুকঠুক!

বোরিলফ কান পাতিয়া শব্দটা শোনেন, তারপর শব্দটা যেদিক হইতে আসিতেছে, ধীরে ধীরে সেদিকে আগাইয়া যান; স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেন—সহসা পেট্রোভিচ দেওয়ালের একটা গর্ত্ত হইতে বাহির হয়। কারাপ্রাচীরে সে গর্ত্ত করিয়াছে।

"তুমি যদি চুপ করে থাক পিতামহ, আমি পালাবার সময় তোমাকেও নিয়ে যাব!" অপরাধীর মত পেট্রোভিচ বলে। তারপর একপদ অগ্রসর হইয়া অনুনয় করিয়া বলে—"কিন্তু তুমি যদি বলে দাও, ওরা আমাকে চাবুক মেরে মেরে ফেলবে।"

সেই ঘনান্ধকারেও বোরিলফের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে। তিনি বলেন—"ওরকমভাবে মুক্তি আমি চাইনা। আমায় যদি খুন করেও ফেল তাহ'লেও আমি বলে দেব; আর তুমি ত আমায় অনেকদিন আগেই খুন করেছ!"

ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত পেট্রোভিচ বোরিলফের প্রতিহিংসা-পরায়ণ শাণিত চক্ষুদুটির দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার পর শাসাইয়া উঠে—"খবরদার, যদি একটা কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরোয় ত দেখবে—তোমাকে সদ্য সদ্য আমি এই গর্ত্তেতেই গোর দেব!"

কয়েদীদের সারবন্দী দাঁড় করাইয়া কারাধ্যক্ষ এক এক করিয়া প্রশ্ন করেন—"কে এ-কাজ করেছে?"

কেহই কিছু বলে না। সকলেই জানে—বলিলেই পেট্রোভিচকে উহারা রেহাই দিবে না। চাবুকের ঘায়েই হতভাগার ইহলীলা শেষ হইবে।

কারাধ্যক্ষ বোরিলফকে প্রশ্ন করেন—"এই বদমাস বুড়ো, তুই হাঁ করে কি ভাবছিস? বল তুই, কে এ কাজ করেছে?"

দুর্দ্দমনীয় প্রতিশোধস্পৃহায় বোরিলফের কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু দুটিতে আগুন জ্বলিয়া উঠে। তিনি একবার পেট্রোভিচের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া দেখেন—তাহার চোখ হইতে যেন দুইটি ধারায় অজস্র মিনতি ঝরিয়া পড়িতেছে......বোরিলফের অধরোষ্ঠ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। সহসা তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া বলেন—"না না, আমি কিছু বলব না। কিছুতেই না। আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করুন। আমি কিছু জানি না।"

বোরিলফের একশ বেতের হুকুম হইয়া যায়।

কে যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পায়ের কাছে আসিয়া বসে। ডাকে—"পিতামহ!"

একি, এযে পেট্রোভিচের কণ্ঠস্বর! বোরিলফের অর্দ্ধ-অবচেতন, আঘাতজর্জ্জর অসাড় শরীর চঞ্চল হইয়া উঠে। পেট্রোভিচ বলে—"আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতামহ! তোমার বণিকবন্ধুর হত্যাকারী আমিই। আমি তোমাকেও হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পেরে উঠিনি। বাইরে তখন রীতিমত গোলমাল আরম্ভ হয়ে গিছল। নিরুপায় হয়ে তোমার থলিতে ছুরীটি রেখে আমি পালিয়ে যাই—জানলার পথে।"

স্থির বোরিলফ নিঃশব্দে তাহার কথাগুলি শুনিয়া যান।

"আমি মুক্তকণ্ঠে আমার অপরাধ স্বীকার করব পিতামহ তুমি মার্জ্জনাভিক্ষা পাবে। তারপর দেশে তুমি তোমার সন্তানদের কাছে ফিরে যেও।"

অনুতপ্ত পেট্রোভিচের উষ্ণ অশ্রুজল বোরিলফের পদদ্বয় সিক্ত করিয়া দেয়। কাঁদিতে কাঁদিতে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে সে বলে, —"আমি মহাপাতকী, ভগবানের নামে তুমি আমায় মাফ ক'র!"

উত্থানশক্তিরহিত বোরিলফ প্রাণপণ প্রয়াসে উঠিয়া বসিয়া পেট্রোভিচকে আলিঙ্গন করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলেন—"ঈশ্বর যেন তোমায় সত্য সত্যই মাফ করেন।" তিনি আর বসিতে পারেন না। তাঁহার চোখের সামনে বিশ্ব তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছে।......

কারাগার হইতে বোরিলফের মুক্তির আদেশ সত্যসত্যই আসিয়া পৌঁছায়, কিন্তু তিনি তখন তাহার চেয়ে বৃহত্তর কারাগারের নির্ম্মমতা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। *

---

*রুশীয় গল্পের অনুবাদ।

শিল্পীর রস-সৃজন

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

চোখের খুব কাছথেকে কোনকিছুকেই আমরা ঠিকভাবে দেখতে পাই না। কোন জিনিষ ঠিকভাবে দেখতে হ'লে চোখের কাছথেকে প্রয়োজন মাফিক দূরে রেখে দেখতে হবে। দেশের ভিতরে থাকার অতি নৈকট্যই বোধ হয় অপ্রবাসী আমাদের চোখে সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে দেশের ও জাতির সুন্দর ও সুসম্বদ্ধ রূপ ফুটিয়ে তুলছে না। প্রবাসী আপনারা দেশের বাইরে এবং দূরে থাকেন, দেশের দিকেই আপনাদের মন পড়ে থাকে, প্রিয় আপনাদের কাছ থেকে দূরে আছেন তাই আপনারা অহরহ তাঁর কথাই ধ্যান করছেন। ভাবুক, রসিক, সমজদার হবার সুযোগ আপনাদেরই বেশী আছে। অপ্রবাসী দেশের ভিতরে আমরা নিজেদের বাইরে প্রকাশ করতেই ব্যস্ত, অপ্রবাসী আমাদের কত যুগের সঞ্চিত ঐশ্বর্য্যরাজির দিকে নজর বা টান একেবারে নেই বললেই চলে—বিশ্বের দরবারে বিখ্যাত হবার ঝোঁকই বেশী।

আমরা পটুয়া, আমরা শিল্পী, আমরা দরকারী নই, আমরা অন্নবস্ত্রের মত দরকারী নই, আমরা বড়লোকের ফ্যাশন, পণ্ডিতের কোটেশন,—ভিতরে শিল্পীদিগকে বাতিল করেছে। ভিতরে, স্বরাজ আন্দোলনের মত খবরের কাগজে শিল্প ও শিল্পী নিয়ে খুব জোর আন্দোলন চলেছে, বই পড়া ছটফটে সমালোচকরা সব শুধু লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জনের লোভে শিল্পালোচনা ও সমালোচনা করছেন; অতীতের গৌরবগান ও আধুনিক শিল্পের অধঃপতন ব্যাখ্যানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে সব আলাপ আলোচনা। কোন কোন আর্ট পণ্ডিত আদিমযুগের শিল্প শিশুর সহজ হাত পা ছোঁড়ার উচ্ছ্বাস দেখে এমনই মুগ্ধ যে আধুনিক অক্ষম শিল্পীর আঁকা সে যুগের চিত্ররীতির ব্যর্থ অনুকরণকে শ্রেষ্ঠ রসসৃজন মনে করছেন। দেশের ভিতরে থেকে দেশকে দেখতে পাবার আমাদের অনেক অসুবিধা। আপনারা বাইরে থাকার বিরহে ভাবনয়নে, ধ্যাননেত্রে দেশকে দেখতে শিখেছেন, প্রবাসী আপনারা রসিক। আপনাদের প্রণাম করি।

আমরা শিল্পী, মন, কোণ ও বনেই বেশীক্ষণ স্বভাবের তাড়নায় বাস করি, সভা সমিতিতে বড় অভ্যস্ত নই। রূপ দেখতে অভ্যস্ত মন ও চোখ এমনি মনোনিবেশ করে কাজে লেগে যায় যে, কথা বলার বড় অবসর থাকে না, তাই খুব ফলাও করে বলবার কৌশলও আয়ত্তের মধ্যে নেই। কথা বলে হয়ত মনের সব ভাব প্রকাশ করতে পারব না—রসিক আপনারা আপনাদের সহানুভূতি ও ভাব দিয়ে আমার অক্ষমতা পূরণ করে নেবেন—এই আমার প্রার্থনা।

প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিতেরা বলেন,—শিল্প, সাহিত্য, কাব্য ও ধর্ম্মকে অবলম্বন করে মানুষের শ্রেষ্ঠ বাসনা বা আনন্দ প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের দেশের ঋষিরা এঁকেই বললেন ভগবান বা রস। সংগীত বা কাব্যে ইনি সুরে ও ছন্দে প্রকাশিত হন। নৃত্যকলায় ছন্দে, লয়ে ও তালে এঁর প্রকাশ—আর চিত্রশিল্পে ইনি রং ও রেখায় মূর্ত্ত হন। বিভিন্ন দেশে মানুষ বিভিন্ন জল হাওয়ায় ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে বলে স্থান ও কালের প্রভাবে এক এক দেশের ধর্ম্ম, সাহিত্য, সংগীত, চিত্র ও নৃত্যকলার বাহ্যিকরূপে ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। বাঙ্গালী বাঙলা ভাষায় কথা কয়, কাব্য লেখে, গান গায়, ছবি আঁকে এইটিই স্বাভাবিক। ইউরোপীয়, চীনা বা জাপানী বা অন্য যে কোন দেশী ঢঙে ছবি আঁকলে বাঙ্গালী শিল্পীর ছবি শিল্পপদবাচ্য হবে না। যে পদ্ধতির মূল দেশের মাটিতে নেই, আপনার রক্তে নেই সেই রীতি বা ভাষাকে হজম করে রসসৃজন করা সম্ভব নয়। কোন ভাষা, রীতি বা প্রকরণকে রূপরস সৃজনক্ষম হয়ে উঠতে যুগযুগান্তের সাধনা প্রয়োজন। একমুখী সাধনা হওয়া চাই। যে যুগ, যে দেশ, যে কাল তার শিল্পীদের একাগ্র সাধনার অনুকূল নিশ্চিন্ত অবকাশ ও অবসর দান করতে পেরেছে যত বেশী, শিল্পীদের কাছ থেকেই সেই দেশ, সেই যুগ, সেই কাল ততই অলৌকিক রূপ সৃজন লাভ করেছে—ইতিহাস তার সাক্ষী।

আধুনিককালের সমালোচকগণ নব্য বাঙ্গলার শিল্পিগণের কাজের মধ্যে অস্থিরতার চিহ্ন দেখে অভিযোগ করেন কিন্তু আধুনিক প্রতিভাবান শিল্পিগণের নিশ্চিন্ত হয়ে একমনে কাজ করবার সুযোগ কোথায়? অজন্তার শিল্পীরা নিশ্চয় ছবির বাণ্ডিল ঘাড়ে করে অন্ন অর্জ্জন করতে বড়লোকের বাড়ী বাড়ী বৃথা ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হতেন না, সে আমলে নিশ্চয় দক্ষশিল্পীদের কিঞ্চিৎ মাসমাইনে দিয়ে আর্ট স্কুলের যাঁতাকলে বেঁধে রাখা হত না। ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি রাজপুত, কি মোগলযুগে শিল্পীদের স্থান বিশেষ উচ্চে ছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের শিল্প ছিল ধর্ম্মের বাহন, সাধারণের সঙ্গে শিল্পের ছিল ভক্তির যোগ। মোগল যুগে শিল্প ছিল ধর্ম্মের প্রতিভূ, আল্লার প্রতীক, সম্রাটের সহচর,—কলালক্ষ্মী ছিলেন সম্রাজ্ঞী। আর আধুনিক কালে শিল্পের সহিত সমাজের যোগ বিশেষ সম্মানের নয়। স্বৈরিণীর ন্যায় একালের শিল্পীকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেরসিক ধনবানের দ্বারস্থ হতে হয়, আধুনিক ধর্ম্ম-মন্দিরে মহাপুরুষের ব্রোমাইড ফটোর সম্মুখে ঘণ্টা নড়ে। কমার্শিয়াল আর্ট বলে কোন কথা ছিল না, আর এখন কমার্শিয়াল না হলে আর্টের থাকা চলছে না। অনুকরণ যে শিল্প নয় এ কথা আজকের প্রায় সবাই আমরা ভুলতে বসেছি।

সাহেবেরা নিজেদের শিল্পিগণকে নিয়ে গৌরব করে, শিল্প ও শিল্পী নিয়ে আলাপ আলোচনা করে, সরকারী ও বেসরকারী শিল্পের সংগ্রহশালা সেদেশে অনেক, রসের সঙ্গে রসিকের যোগাযোগ আছে। তারই খবর সংবাদপত্র ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা কিছু কিছু পাচ্ছি ও তারই উপর নির্ভর করে অত্যন্ত ভাষাভাষা-ভাবে শিল্পালোচনা করছি। আমাদের সামাজিক জীবনের সহিত শিল্প ও শিল্পিগণের এখন পর্য্যন্ত ভাবের ও ভালবাসার যোগাযোগ হয়নি। শিল্পীর সঙ্গে, শিল্পের সঙ্গে রসিকের যোগ যেখানে জল ও মাটীর মত স্বাভাবিক, সেইখানে শিল্প হয়ে উঠে বড়—জীবন হয় সার্থক। মরুভূমিতে আকাশের জল নেই, সমুদ্রের জল পৌঁচচ্ছে না, শিল্পের বীজ সেখানে নিষ্ফলা। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পালোচনা করতে গিয়ে আক্ষেপ করে বললেন "আকাশ বর্ষণে প্রবৃত্ত হল, পাত্র নেই জলকে ধরার কিম্বা ধূলা উড়ে আকাশের কাছে রস চাইলে উপর থেকে তপ্ত বাতাস ছাড়া আর কিছু এল না—এ হালে পৃথিবী নিষ্ফলা অপ্রফুল্লা রইল।"

আদিম কাল থেকেই প্রবৃত্তির বশে মানুষ শিল্প সৃজন করে চলেছে। প্রত্যেক কালেই মানুষের অবস্থা ও অভিজ্ঞতার ছাপ শিল্প সৃজনের মধ্যে ধরা থেকে যাচ্ছে। আদিম কালের শিশু-মানুষের অভিজ্ঞতা কম তাই তাদের শিল্প অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল, এখানে ওখানে একটু আধটু রং ও এলোমেলো রেখার টানে আদিম মানুষের প্রবৃত্তির আবেগেই শুধু সরস হয়ে উঠেছে। সব দেশের শিশু যেমন একই রকমের, সেই রকম সব দেশের আদিম শিল্প এক রকমে রচিত। ছেলেদের আধ আধ কথা হেলে দুলে চলা কিছু প্রকাশ না করেও যেমন সহজ ও সরল, আবেগের জোরেই আমাদের সুখী করে তোলে, আদিম যুগের শিল্পেও বস্তুর বা অভিজ্ঞতার একটা পরিপূর্ণ ও আদর্শ রূপ আমাদের চোখে ফুটে না উঠলেও ছবি লেখার প্রবৃত্তির একটা প্রবল আবেগের প্রভাবেই কাঁচা হাতের এলোমেলো টান ও চড়া রংয়ের অপটু প্রলেপ রসিককে আনন্দ দেয়। শিশুর সামাজিকতা নেই, আদিম শিল্পও তাই সমাজ বা ধর্ম্মের কোন ধার ধারেনা। জীবনের ও শিল্পের যৌবন অবস্থায় একই প্রবৃত্তি থেকে

জন্ম হলেও বিভিন্ন **প্রাকৃতিক**, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের প্রভাব, আদর্শ ও অভিজ্ঞতার একটা **সম্পূর্ণ** রূপ শিল্পে বর্ত্তমান থাকে। তাই এদেশের শিল্প ভাল ওদেশের চেয়ে, ওদেশের শিল্প এদেশের অপেক্ষা নিরেশ, এরূপ সমাধান বেশী ক্ষেত্রেই শিল্পশিক্ষার্থীর পক্ষে বিপজ্জনক।

শিশু বড় হয়, তার মন হয়, সে দেখে আর ভাবে, সামাজিক হয়, নিয়মের নিগড়ে নিজেকে বাঁধে, ভালবাসে, পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করে বেঁচে থাকতে চায়। বড় হলে মানুষের মনে নানা স্বপ্ন, নানা বাধা, নানা দ্বন্দ্ব, নানা বৈষম্য। যৌবনে তাই শিল্প প্রকাশ করলে জীবনের আদর্শরূপ, শিল্প হয়ে উঠল কাব্য, গান, বন্দনা, জীবনসমস্যা সমাধানের সংকেত। প্রণয়ের গাঁটছড়া বাঁধা রং রেখা, নৃত্যের চেতনা হিল্লোল নিয়ে উজ্জ্বলা ও অলঙ্কারভূষিত জীবনবল্লভ মূর্ত্ত হয়ে উঠলেন। যৌবনে শিল্প হল সামাজিক শিক্ষা ও ধর্ম্মের বাহন, শিল্পী কবি হলেন, সত্যদ্রষ্টা ঋষি। সমাজের তেত্রিশ কোটি মানুষের আদর্শরূপ, তেত্রিশ কোটি দেবতার রূপের পরিকল্পনায় ব্যক্ত হল। ঋষির জ্ঞান ও ধ্যানে পাওয়া জীবনের এ আনন্দময় রূপ সকলকে দান করে এই জগৎকে স্বর্গ ও মানুষকে দেবতা করবার বাসনা, শিল্পী, কবি ও ঋষিদের ভারতবর্ষ চিরকালই করে আসছে। আমাদের চিরযৌবনা কমলালক্ষ্মী এই স্বপ্নই দেখাচ্ছেন বারবার। অজন্তা, ইলোরা, বাগ সাঁচী, অমরাবতী, তক্ষশীলা, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, নালন্দা, দক্ষিণ ও উত্তরভারতের হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের বিহার ও মন্দিরসব, মোগলবাদশাদের রাজপ্রাসাদ ও স্মৃতিমন্দিরসব শ্রদ্ধাবান ও সহৃদয় দর্শককে স্বর্গের স্বপ্নে বিভোর করবে, আনন্দের সাগরে ডুবিয়ে দেবে। অজন্তার ছবি, প্রাচীন রাজপুত রাগিণী, জয়পুরী, কাঙ্ড়া বা মুঘল চিত্র, তিব্বতীতংকা, নেপালের পট, বাঙ্গলার পালরাজাদের আমলের ছবি সবই শিল্পের যৌবন অবস্থার প্রকাশ। ওস্তাদ শিল্পী আর রসিক সমঝদারের সমবেত সাধনার পাওয়া, এই বিবাদ, দ্বন্দ্ব, বৈষম্যভরা জন্ম-মৃত্যুর নিগড়ে বাঁধা জগৎকে দান করেছে একটা সাম্যের সংকেত, মুক্তির ও আনন্দের ইসারা, ভাবেভরা জীবন্ত রসে সরস অমরতার ইঙ্গিত। এই ভাবে শিল্পীদের সঙ্গে রসিকের মিলনে সমাজ হয়ে উঠেছে সুন্দর, জীবন হয়ে উঠেছে সার্থক। সাজাহানের মত রসিক সমঝদার পাশে থেকে অভয় ও উৎসাহ না দিলে শিল্পীদের হাত থেকে তাজমহল কিছুতেই বেরুত না। আধুনিক শিল্পীদের কাজ সেইদরের যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আধুনিক শিল্পীরা যাতে আরামে বেঁচে থাকতে পারে, নিশ্চিন্ত হয়ে একাগ্র সাধনায় নিমগ্ন হতে পারে তার ব্যবস্থা সমাজকে আগে করতে হবে, শিল্পীকে স্নেহ করতে হবে, সম্মান করতে হবে। বর্ত্তমান বাঙ্গলার শিল্প ও শিল্পিগণের অবস্থার বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শিল্প-রসিক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, "শিল্পের তালি একহাতে বাজে না। অতি বড় দরদী সমঝদার সমাজ না থাকিলে শিল্পের ফুল ফোটে না। আজ আমাদের বাঙ্গলার শিল্পের গাছে ফুল যদি বিরল ও মলিন হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যথাযোগ্য সার ও জলের অভাব হইয়াছে। সমালোচকের ধমকে গাছে ফুল ফোটে না। বর্ত্তমান কালে কবে কোন দিনে বাঙ্গালী বাঙ্গলার শিল্পকে, বাঙ্গলার শিল্পীকে আদর করিয়াছে, আহার দিয়াছে, সম্মান দিয়াছে, —তাহার মনের রসের খোরাক যোগাইয়াছে, কবে তাহার উপর বড় দাবী করিয়াছে। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী শিল্পীর বরাতে টাকাটা সিকেটার চেয়ে লাথি ঝাঁটাই (More kicks than ha'pennies) মিলিয়াছে বেশী।"

সভ্য মানুষ, সামাজিক জীব তাই প্রবৃত্তি থেকে জন্ম হলেও সমাজের মনোবৃত্তির প্রভাব শিল্পের কাজের উপর ছাপ ফেলছে চিরকাল। এই সত্য মনে রেখে শিল্পচর্চ্চা করলে শিল্পের প্রাণের বা ছন্দের খবর আমরা পাব। এই প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "কবির জীবন, সাহিত্যিকের জীবন স্ব স্ব প্রবৃত্তি নিয়ে একলা নেই—এরা বহির্জগতে থেকেও নানা সমাজধর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা, দেশ, কাল, ধর্ম্ম ও মর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবে বর্ত্তমান রয়েছে। তার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘিরে নিয়ে চলছে তাকে বন্দীর মত। দেশ, কাল, পাত্র এ সমস্তই গণ্ডি দিচ্ছে শিল্পীর মনোবৃত্তি সমস্তকে, এই হল স্বভাবের নিয়ম। যেখানে এর অভাব সেইখানেই শিল্পের ধারা হয় একটা অবস্থায় জড়বৎ রয়েছে, নয়ত বদ্ধ জলের মত আস্তে আস্তে মরছে—উজ্জীবনী শক্তির স্পর্শের অভাবে।"

"জলপ্রপাত মরুভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলার রাস্তা না পেয়ে যদি বালির উপর ছড়িয়ে পড়ল ত' শুকিয়ে মর'ল, আর যেখানে দেশ তাকে বুক পেতে ধারণ করে বইয়ে নিয়ে চলল দুই তটের মধ্য দিয়ে সেখানে নদনদীর স্রোত বইল! এইভাবে জনসাধারণের প্রবৃত্তি এক এক সময়ে এক এক রসের ধারাকে কখন বইয়েছে কখন বয়ে চলার বাধাও দিয়েছে।"

শিল্পের উপর সমাজের উত্থানপতনের প্রভাব

নদীর ন্যায় জীবনেরও জোয়ার-ভাঁটা খেলে, জীবন কখন ছোট কখন বড়, কালো সাদা আলো আঁধারে ভরা। সমাজের রূপও তাই, কখন উন্নত কখন অবনত। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর কিছুদিন বাঙ্গলা তথা ভারত সমাজের ভাঁটা পড়ার যুগ। মোগলদের হাত থেকে রাজত্ব যাওয়া ও ইংরাজদের হাতে আসার মধ্যে এমন একটা ওলট পালট হয়ে গেল যে বোলে বোঝান অসম্ভব, এদেশীয় সমাজ তার ঐতিহ্য ও আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। মোগলদের শেষের দিকে আলস্য ও অব্যবস্থায় সামাজিক জীবনের নাড়ী এতই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, শিক্ষার অভাবে মানুষ এমনই অন্ধ হয়ে উঠল, রাষ্ট্রবিপ্লবে এমনই দিশেহারা হয়ে পড়ল যে, তার পরের দেড়শত বছর পশ্চিমদিকে চেয়ে সূর্য্যোদয়ের বিফল প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিলে। নিজেদের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কুসংস্কার বলে ত্যাগ করে, আচারে ব্যবহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, ভাব ভঙ্গীতে, ভাষায় সাহিত্যে, শিল্পে ও সঙ্গীতে ইংরাজের অনুকরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করলে। এই অনুকরণের যুগে শিল্প ও সাহিত্য সৃজন একেবারেই নাই। মানুষের জীবনের ন্যায় জাতির জীবনেও দুর্দ্দিনের পর সুদিন আসে। এই নিয়মে, কালের প্রভাবে কিছুদিনের মধ্যেই আবার জীবনে, সাহিত্যে, মানুষের কর্ম্মে ও চিন্তায় ইংরাজানুকৃতির প্রবল প্রতিক্রিয়া সুরু হল। সরল, নির্দ্দম্ভ ও আদর্শ জীবন নিয়ে জন্ম নিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস, সাহিত্যে আদর্শ সৃজন করলেন ঋষি বঙ্কিম, জীবনে আদর্শরূপ দেখালেন শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ। ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প স্বভাবে ফিরে এল, জাতির নব জাগরণ হল সুরু।

অবনীন্দ্রনাথ এলেন, ছবি আঁকলেন ভারতীয় রীতিতে, প্রতিভার সত্য ও রসদৃষ্টি দিয়ে, দেখালেন জীবনের সুন্দররূপ, বললেন, "দেশের মাটীর উপর দাঁড়াও, দেশকে ভালবাস, অনুকরণ ও ভাণ ত্যাগ কর, তোমার ভাণ্ডার অনেক দিনের অনেক ধনে ভরা,—পূর্ব্বদিকে চাও, সূর্য্যোদয় দেখতে পাবে—ঐ বড় বড় ফ্রেমে আঁটা অয়েল-পেণ্টিং ছবি নয়, ছবির নকল—আমাদের মনের কথা ওতে প্রকাশ পাচ্ছে না।" এই বলে ঋষি অবনীন্দ্রনাথ আমাদের তালালাগান ভাঁড়ার-ঘরের চাবি খুলে দিলেন, প্রাচীন ওস্তাদ শিল্পীদের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু এদেশের বিলাতী অনুকরণে আঁকা ছবি ও মূর্ত্তি দেখতে অভ্যস্ত প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকই তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। সেকালের কতিপয় বিদেশী শিল্পরসিক ছাড়া এদেশের কারুর কাছ থেকে তিনি সহানুভূতি লাভ করেননি। শিল্পী ও কবিরা সময়ের চেয়ে আগে চলেন, তাই সাময়িক মতামত শিল্প বিচারের মাপকাঠি নয়, এই সত্য প্রমাণ করে কিছুদিন বাদে ফ্রান্সের শিল্পকেন্দ্রের সমালোচকগণ অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সাহেব লোকদের বাহবা পাবার পর এদেশের তৎকালীন মাতব্বরদের ওবিষয় নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করার সাহস ও উৎসাহ অনেক কমে গেল ও ক্রমশঃ সাময়িক পত্রাদিতে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর চিত্রসম্ভার প্রকাশিত হতে লাগল। সাহেবদের দেখাদেখি এদেশের ধনী লোকেরাও ভাল লাগুক আর না লাগুক ঐ জাতীয় চিত্র কিনতে সুরু করলেন। শিল্পকে যাঁরা ভালবাসেন, শিল্পীদের যাঁরা শ্রদ্ধা করেন, উৎসাহ দেন এমন রসিকমণ্ডলী দেশের মধ্যে গড়ে উঠা সময় ও সাধনা সাপেক্ষ। শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ শিল্পের ভাল মন্দ বিচারে উপযুক্ত সময় ও মন এখনো দিতে পারেন নি। সেইজন্য শিল্পী ও রসিকের মিলিত আবেগে যে শিল্প সৃষ্টি হয়, একা শিল্পীর সাধনায় ততটা নাও হতে পারে। আধুনিক শিল্পীদের কাজে যদি কোন দুর্ব্বলতা থাকে তার ন্যায়সঙ্গত কারণ এই।

অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর এদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী প্রাচীন শিল্প নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন ও করছেন এবং তাতে করে দেশের অনেক কিছু খাঁটী ইতিহাসও পাচ্ছি সন্দেহ নেই কিন্তু আধুনিক শিল্পীরা যাদের

কাজের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাদের কাজ নিয়ে আলোচনা করার উপযুক্ত লোকের একান্ত অভাব। শিল্পী আঁকবে ছবি, গড়বে মূর্ত্তি, করবে বাড়ীঘর ও আসবাব পত্রের পরিকল্পনা, কিন্তু তার ভালমন্দ বিচার করার, সেগুলিকে জীবনে ব্যবহার করার লোকের বিশেষ প্রয়োজন। যে দেশে ভাবুক ও কর্ম্মীর একত্র সমাবেশ সেইদেশের জীবন সুস্থ ও সুন্দর। যেখানে বক্তা ও শ্রোতা মিলিত, সুন্দর সেখানেই বিরাজ করেন। অরসিকে রস নিবেদন নিষ্ফল।

রসোপলব্ধির ক্ষমতা

অশিক্ষিত ও অনভ্যস্ত কান যেমন ওস্তাদের গান উপভোগ করতে পারে না, অশিক্ষিত ও অপরিণত মনের যেমন কবির কাব্য-বোধ সম্ভব নয়, অশিক্ষিত চোখও তেমনি ছবি বা মূর্ত্তির রস বা রূপের মাধুরীর কোন স্বাদই পায় না তা সে শিল্প সম্বন্ধে যত মোটা মোটা বইই পড়া থাক্। কোন কিছু জানবার বোঝবার সহজ উপায় হল তার সংগে পরিচয় করা, একদিনের পরিচয়ে হবে না, ভাব হয়ে বন্ধুত্ব হওয়া চাই। অনেক দিনের জানা-শুনা না হলে কোন কিছুর সংগে আসল পরিচয় হতে পারে না। অনেক লেখাপড়া করে, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদিতে জ্ঞান হলে মন ধীর স্থির হলে, তবে সুকাব্যের রসাস্বাদন হলেও হতে পারে। ইংরাজী কবিতা পড়ে রসগ্রহণ করতে হলে বা বিলাতী ছবির ঠিক ঠিক সমঝদার হতে গেলে, সে দেশের মানুষের ভাষা, তাদের দৃষ্টিভংগী, তাদের চেহারা ও মনের গঠন ইত্যাদির সংগে বিশেষ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এদেশের মূর্ত্তি বা চিত্রশিল্পকে উপভোগ করতে গেলে মাসিকের পাতায় তার ঝাপসা প্রতিলিপি থেকে একবার দেখে নিলেই হবে না। অনেক দিনের পরিচয় না হলে কোন কিছুই আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে না। প্রাচীনকালে তাই সর্ব্বসাধারণের শিল্পবোধ জাগিয়ে তুলে, বুদ্ধিবৃত্তিকে ধারাল করবার জন্য রূপশিল্পকে ধর্ম্মের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। নিত্য পূজা-পাঠের মধ্য দিয়ে আদর্শের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে রূপদৃষ্টি লাভ করে মানুষ যাতে করে রসিক হয়ে উঠে, সে যুগের বুদ্ধিমান সমাজকর্ত্তাদের সে দিকে নজর ছিল। রূপশিল্পকে অবলম্বন করেই সে যুগের মানুষের উচ্চাভিলাষ, আদর্শ বা ভগবান, মন্দিরের রত্নবেদিকায় বিরাজিত। বর্ত্তমান কালেও আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পীদের অক্লান্ত সাধনায় অনেক ভাল জিনিষ গড়া হয়েছে, অনেক ভাল ছবি আঁকা হয়েছে কিন্তু সেগুলিকে উপভোগ করে দৃষ্টিকে শুদ্ধ করবার ইচ্ছা এখনও জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। নামী শিল্পীদের কাজ বেশীর ভাগ লোকই আমরা বুঝতে পারি না, ভাল লাগা ত পরের কথা। শিশু অবস্থা থেকে অক্ষর পরিচয়ের পরই সাহিত্য ও কাব্যের সংগে আমাদের পরিচয় হয় এবং অনেক দিন ধরে অনেক আলাপ আলোচনা ও পড়াশুনা করে সাহিত্যের ভাল মন্দ আমরা বুঝতে শিখেছি তাই জাতির ভবিষ্যৎ, শিশুদের পাঠ্যতালিকায় বিশেষ বিচারের সহিত সুলিখিত পুস্তকই স্থান পায় কিন্তু চিত্রের বা মূর্ত্তির বেলায় হয় তার উল্টো। শোনা আছে ছেলেরা ছবি ভালবাসে তাই শিশু-পাঠ্য পুস্তকে অনেক ছবি দিতে হবে কিন্তু ভালমন্দের বিচার নেই। জাতিকে শিক্ষিত করবার ভার ভাগ্যচক্রে যাঁদের উপর অর্পিত হয়েছে বাল্যকাল থেকেই তাঁরা দেশী বা বিদেশী কোন প্রকারের সঠিক শিল্পরীতির সংগে পরিচয় হবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি, সেই কারণেই কদর্য্য ও অশ্লীল চিত্র নির্ব্বিচারে শিশু-পাঠ্য পুস্তকে স্থান পায়,—সেই কারণেই সাধারণ উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের পরিণত বয়সে রূপশিল্প সম্বন্ধে সম্বন্ধে শিশুসুলভ অজ্ঞতা প্রকাশ পায় এবং বর্ত্তমান সামাজিক ও জাতীয় জীবনের রূপ বিচ্ছিন্ন ও অসুন্দর।

শিশু অবস্থা থেকে শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর দিয়ে জাতীয় শিল্প ও শিল্পিগণের সংগে সমাজের যোগ স্থাপনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত শিল্প নিয়ে আমরা যতই বাহ্যিক আন্দোলন করি না কেন, রূপে রসে রচা সামাজিক সাম্য, একটী আনন্দময় সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। জাতীয় ঢঙে আঁকা ছবি ও মূর্ত্তি মাসিকে ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হচ্ছে, এখানে ওখানে শিল্পী ও শিল্পামোদীরা মিলে প্রদর্শনীও খুলেছেন কিন্তু দেশের কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত বেশীর ভাগের সংগেই শিল্পীদের কাজের সঠিক পরিচয় হয়নি তার প্রমাণ দিকে দিকে ছড়ান রয়েছে। শিক্ষিত ধনী বাঙ্গালীরা অনেকে নূতন বাড়ী তৈয়ারী করছেন কিন্তু দেশী শিল্পের কোন ছাপ তাতে নেই, আশপাশের আকাশ বাতাস, গাছপাতা, মাঠময়দানের সংগে তার কোন সঙ্গতি নেই। বাড়ী তৈরী হচ্ছে আধুনিক আমেরিকান কায়দায়। ঘরের ভিতরের আসবাব সব ভিক্টোরিয়া আমলের ইংলন্ডের অনুকরণে কিম্বা অন্য কোন রকম বিদেশী ঢঙের। ঠিক দেশী ধরণের ছবি ও আসবাব খুব কম ঘরেই দেখা যায়—দেশের আধুনিক পন্ডিতেরা মিলে ঠিক করলেন উনবিংশ শতাব্দীর কোন এক দেশভক্ত পন্ডিতের স্মৃতিমন্দির তৈরী হবে, উদ্দেশ্য হল তাঁর দেশের লোককে তাঁর আদর্শের সংগে পরিচিত করা, সেখানেও দেখি বিলাতী কন্‌ট্রাক্টারের পরিকল্পনায় সিনেমা বাড়ীর মত এক বাড়ী তৈরী হল। দেশের সংস্কৃতি, দেশের ঐতিহ্য, দেশের রূপ-শিল্পের সংগে শিক্ষিত সাধারণের এখনও সঠিক পরিচয় হয়নি। তাই আবার বলি, আজকের শিশুদের সংগে শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর দিয়ে যদি আমরা জাতীয় শিল্প ও শিল্পীর যোগাযোগ স্থাপনা করতে পারি, শিক্ষা কেন্দ্রের পাশে পাশে যদি আমরা সক্রিয় শিল্পশালা খুলে দিতে পারি, তাহলেই ভবিষ্যতের আমরা দেশের শিল্পের সংগে, শিল্পীদের সংগে ঠিকভাবে পরিচিত হয়ে সমাজকে শ্রীসম্পন্ন করে তুলতে সক্ষম হব।

আমি দেশী চালে ছবি আঁকি শুনলে অনেক বিশিষ্ট বয়স্থ ভদ্রলোক, "বলুনত মশাই ঐ হাত পা বাঁকা ছবিগুলো কি! অবনীন্দ্র, নন্দলালের ছবি বুঝিয়ে দিন"—ইত্যাদি প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্ন থেকেই আমি বুঝি তাঁরা এত বড় হয়ে, জ্ঞানী ও পন্ডিত হয়েও ভালমন্দ বিচারের বোধ লাভ করেননি—চোখ ফোটেনি তাঁদের। যে কোন ধূর্ত্ত ব্যবসাদার বিজ্ঞাপনের জোরে তাঁদের মন ভুলিয়ে ভাল জিনিষ বলে খেলো জিনিষ গছাতে পারে। ছেলেবেলা থেকে ভাল জিনিষের সংগে পরিচয় থাকলে এ বিভ্রাট আর ঘটে না, ছেলেবেলা থেকে ভাল ছবি দেখ্তে দেখ্তে ভাল মূর্ত্তি ঘাঁটতে ঘাঁটতে, ভাবতে ভাবতে তবেই শিল্পদৃষ্টি হয়। আজকের সমাজে যাঁরা বিত্তশালী-মাতব্বর, যাঁরা দেশসেবক, যাঁরা কর্ম্মী, যাঁরা স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেন ও সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করার উচ্চাভিলাষ অন্তরে পোষণ করেন, এককথায় বর্ত্তমান বঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ, নানা অবশ্যম্ভাবী কারণে প্রাচীন বা আধুনিক কি দেশী বা বিদেশী কোন প্রকার রূপশিল্পের চর্চ্চা করে চোখকে মার্জ্জিত করতে পারেননি বলেই বর্ত্তমানে জাতীয় শিল্প আমাদের দেশে অনাদৃত এবং ভবিষ্যত ভারতের সামাজিক রূপের পরিকল্পনা সর্ব্বসাধারণের নিকট অস্পষ্ট। বর্ত্তমানে কর্ম্মী সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করলেও দরবারে সে কর্ম্ম শ্রীছাঁদের স্পর্শবর্জ্জিত একপেশে ও ক্ষণভংগুর হতে বাধ্য।

মন আর শরীর, সদর আর অন্দর, এই দুই নিয়ে জীবন, এই দুই নিয়ে ঘর। শরীরকে পুষ্ট করে আহার, বিহার প্রভৃতি সব কাজ, আর মনের পুষ্টির জন্য চাই ধ্যান, ধারণা, সাধন, ভজন, পূজা, পাঠ, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, মূর্ত্তি-গড়া প্রভৃতি শিল্প কর্ম্ম। তাই জাতিকে শিক্ষিত করে তোলবার ভার যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের এই দুই দিকেই নজর দিতে হবে। বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও সাধনা করে জড়কে আয়ত্তের মধ্যে এনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া, ব্যক্তি ও সমাজের শরীরকে সুস্থ ও সবল করে তোলা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শিল্পের চর্চ্চা করে মনকে সবল, সুস্থ, সুন্দর ও ক্রিয়াশীল করে তোলা। আধুনিক বাঙ্গলার যথার্থ শিক্ষিত সন্তান ধ্যানী, জ্ঞানী, পন্ডিত ও রসিক আশুতোষ, ভবিষ্যতের বাঙ্গলাকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তারই প্রেরণায়, বাঙ্গালীর চোখ ফোটাবার উদ্দেশ্যে শিল্প ও শিল্পিগণের সংগে শিক্ষার্থীদের একটী শ্রদ্ধার ও স্নেহের সম্বন্ধ সৃজনের জন্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পাধ্যক্ষের পদে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পের জন্ম ও মৃত্যুর সন তারিখ মুখস্থ করা, পুঁথি পড়া কোন দুর্দ্ধর্ষ পন্ডিতকে প্রতিষ্ঠিত না করে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একরকম জোর করেই বসিয়ে দিয়েছিলেন। লতান আংগুলের কাহিনী বা গল্প শোনবার আগ্রহ তখন দেশের ছেলে বুড়ো কারুরই জাগেনি, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে সহৃদয় শ্রোতা একমাত্র আশুতোষ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কেউ ছিলোনা বল্লেই চলে। আশুতোষের শিল্পের প্রতি এই সহানুভূতি, শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা বাঙ্গলা সাহিত্যকে এক অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দান করেছে। রূপ ও রস-শিল্পের এমন সরল ও সুন্দর ব্যাখ্যান, ছবি, মূর্ত্তি কেমন করে দেখতে হয়, কি

দেখতে হয়, আজকের আমাদের শিল্পের সঙ্গে বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন দেশের শিল্পের কি মিল, কি তফাৎ, রস কি, সৌন্দর্য্য কি, এই সব কথা, মায়ের মুখের কথা ছেলের কাছে যেমন সহজ ও সরল, তেমনি প্রাঞ্জল ভাষায়, পৃথিবীর আর কোন দেশের সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে কি না সন্দেহ। চাওয়া বড় না হলে পাওয়া বড় হয় না। আশুতোষের চাওয়া বড় ছিল, ভালবেসে শ্রদ্ধাভরে শিল্পীর কাছে রসের কথা, রূপের কথা শুনতে চেয়েছিলেন, বাঙলা দেশ বড় জিনিষ, ভাল জিনিষ, লাভ করেছে। বাঙলা ভাষায় শিল্পালোচনার চিরস্থায়ী ভিত্ত পত্তন করেছে এই বক্তৃতাগুলি। শিক্ষার্থীদের উপকারার্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সম্প্রতি আর একটি সু-খবর প্রকাশিত হয়েছে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় ও আন্দোলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভারতবর্ষের রূপ-শিল্পকে পাঠ্য তালিকায় স্থান দিয়েছেন— নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পচর্চ্চার যে ধারা প্রবর্ত্তন করেছেন সেই ধারা অবলম্বন করে আজকের শিল্পীদের বেশ কিছুদিন নির্ভাবনায় ও নিশ্চিন্তে সাধনার অবসর ও অবকাশ সমাজের সুধীমণ্ডলী যদি দিতে পারেন, তবেই আধুনিক ভারতবর্ষের জাতীয় শিল্প ঠিকভাবে গড়ে উঠবে। যদি আমাদের আজকের প্রতিভাবান শিল্পীদের অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যবসাদারের ফরমাজ খেটে চলতে হয় পেটের দায়ে, দেশের শিক্ষিত চিন্তাশীল কর্ম্মীরা যদি আধুনিক শিল্প ও শিল্পীদের অভয় ও নিশ্চিন্ত সাধনার অবকাশ না দেন, তা হলে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক উচ্চাভিলাষ এখনও সত্য হয়ে উঠেনি বুঝতে হবে।

ওস্তাদের হাতের কাজের মুখে কথা বলে ব্যাখ্যা করা যায় না—কথা থামলে, মন স্থির হলে হাত আর মনের মিতালিতে রূপ গড়ে উঠে। কথা বলে যে ভাব প্রকাশ করা যায় না, রং ও রেখার ভাষায় রূপে তাই প্রকাশ পায়। রূপ ও রস জগতের সব কিছুতেই ছড়িয়ে রয়েছে। রূপদক্ষ শিল্পীর কাছে জীবনের ও জগতের সব কিছুই সুন্দর। শিল্পকলায় তাই বিষয়বস্তুর চেয়ে রূপের প্রকাশই হল বড়। রূপের এই প্রকাশ, এই সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করতে হলে, ঠিক ঠিক বুঝতে হলে চোখ তৈরী করতে হবে, রূপসৃজনের ভাষা শিখতে হবে, রূপের সান্নিধ্যে এসে। বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে রূপের স্বাদ পাওয়া অসম্ভব।

শিল্পীর দৃষ্টি

গৌরাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা, যুবতী, স্ত্রীলোকেই যে কেবল সুন্দর, বর্ষার নীল মেঘের পাশে উড়ন্ত বকের সারি, পাহাড়, সমুদ্র, গোলাপফুল ইত্যাদি বিশিষ্ট কতকগুলি জিনিষের মধ্যে কেবল সৌন্দর্য্য আছে বেশীর ভাগ লোকের এই ধারণা। কিন্তু রূপদক্ষ শিল্পীর চোখে জগতের সব কিছুই—ভাঙ্গা হাঁড়ি, শুকনো গাছের গুঁড়ি, ঝরাপাতা, নরকঙ্কাল, ঝোড়ো দাঁড়কাক, সাধারণ লোকে যে গুলিকে তুচ্ছ ও অসুন্দর বলে চোখ ফেরাবে, সেগুলিও সুন্দর এবং এগুলিও রূপদক্ষের ও রূপ রস সৃজনের উপলক্ষ বা বিষয় হতে পারে। রেগে বিরক্ত হয়ে অনেক সময় আমরা বলে থাকি অমুকের মুখখানা বানরের মত বিশ্রী—আবার নিজেদের প্রিয়জনকে ভালবাসার মুহূর্ত্তে চন্দ্রবদনও বলে ফেলি। সাধারণের সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যতার ধারণা চাঁদে বানরেই প্রকাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু চীন দেশের ওস্তাদের আঁকা (Monkey in the moon-light) চাঁদের আলোয় বানর বসে একখানি ছবি, একদা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। গোলপাতার চালে বসে মুখপোড়া হনুমান গা চুলকাচ্ছে আর আকাশে রয়েছেন পূর্ণিমার চাঁদ—শিল্পীর রূপ দর্শনে চাঁদে আর বানরে কিছুই ভেদ নেই, ওস্তাদের কারু-কৌশলে দুইই হয়ে উঠেছে অপূর্ব্ব সুন্দর। এই রূপ বা সৌন্দর্য্য জিনিষটা কি তা বোলে বোঝান যায় না— "যারে বাজে সেই বোঝে"।

রূপ সৃজনে ভাব বড় একটা কথা—তোমাতে আমাতে ভাব, দেখা হলেই আনন্দ আর যদি হয় আড়ি তাহলেই বিরক্তি। কার সঙ্গে কার ভাব আর কার সঙ্গে কার আড়ি, এ যেমন দুজনের ব্যবহার থেকে বুদ্ধিমান বুঝে নেন তেমনি চক্ষুষ্মান রসিক কোন ছবি বা মূর্ত্তি দেখলেই তার রেখা টানা, রং লাগান বা ছেনি চালনার কৌশল দেখেই বুঝে নিতে পারেন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর বিষয় বস্তুর উপকরণ প্রকরণাদির ভাব আছে কি না। শিল্পীর সঙ্গে তাহার বিষয় বস্তু ও উপকরণ প্রকরণাদির ভাব থাকলেই রূপ সৃজন সার্থক হয়। চোখ দেখে আর মন ভাবে, এইভাবে চোখ আর মনকে ঠিক ঠিক মিলিয়ে দেখতে পারলে রূপ-দৃষ্টি লাভ হয়, রসিক হওয়া যায়। দেখতে পেলেই অপরকে দেখান যায় না। তাই রূপ-স্রষ্টা ও রূপ-রসিকের সাধনা এক নয়। রসিকের চোখ আর মন মিললেই কাজ হল কিন্তু রূপস্রষ্টা শিল্পীর চোখ, মন ও হাতের মিল চাই। রূপ সৃজনের সব রকমের কৌশল যতক্ষণ বা আয়ত্তের মধ্যে আসছে ততক্ষণ, বিষয় বস্তু, চোখ ও মন এই তিনের মিলনে যে আনন্দ ও রস তার খবর শিল্পে ফুটে উঠবে না।

সৌন্দর্য্য সকলেরই ভাল লাগে, সকলেই সুন্দর হতে চায় তাই শিল্প ও শিল্পীরা সাধারণের সম্পত্তি। সর্ব্বসাধারণের স্নেহ ও শুভ-ইচ্ছায় শিল্পের সাধনা এগিয়ে চলে, সমাজকে সুন্দর ও জীবনকে উৎসবময় করে তোলে। কালপ্রভাবে জাতি হিসাবে আজকের আমরা দুর্ব্বল ও হতশ্রী, মানুষে মানুষে মিল নেই, সমাজ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা নেই। ভবিষ্যতে আমাদের সবল ও সুন্দর হয়ে উঠতে হবে— সমাজে সাম্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হবে, তাই সাম্য, শ্রী ও শৃঙ্খলার পূজারী শিল্পীদের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করলে, নির্ব্বিঘ্ন সাধনার সুযোগ না দিলে জাতির অগ্রগতি বাধা পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

রূপের ও রসের জগতে আজকের বাঙালী আমরা এত অল্পদিন হল প্রবেশ করেছি যে এর মধ্যে আধুনিক শিল্প ও শিল্পিগণের কাজের বিচার বা হিসাব করবার সময় হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। শুধু এইটুকু আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি যে, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের প্রেরণায় দেশে ও বিদেশে বহু শক্তিমান শিল্পী প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে শিল্প সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আপনাদের স্নেহ, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছায় তাঁদের সাধনা সার্থক হয়ে উঠুক, রূপের সান্নিধ্যে এসে সমাজের সকলের রূপদৃষ্টি লাভ হোক, রূপানন্দ শিক্ষিত সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠুক, আধুনিক শিল্পী ও রসিকের মিলিত সাধনায় গড়ে উঠা ভবিষ্যৎ বাঙলা সমাজের সুন্দর ও স্বাভাবিক রূপ জগত-সমস্যার সমাধান করুক— এই আমার প্রার্থনা।

রসিকেভ্য নমঃ।*

---

*প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে শিল্পকলা শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মাণিকের পত্র পাইয়া মহামায়ার মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। বড় মুখ করিয়াই যে তিনি রেণুর মা'কে অভয় দিয়াছেন! তাঁহার এই বিশ্বাস দৃঢ়তরই ছিল,—মাণিক কখনও কোন দিন তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করিবে না। ইহা যে তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

সেই মাণিক,—কুণ্ঠায় নত—লজ্জায় নম্র—ভীরু মুখচোরা ছেলেটি,—যাহার মুখ হইতে 'মা' ডাক শুনিবার জন্য মহামায়া কত সাধ্য-সাধনাই-না করিয়াছেন। যদি বা সে ডাকিয়াছে,—লজ্জায় মুখখানি রাঙ্গা করিয়া—মাটির পানে চাহিয়া—কুণ্ঠায় এতটুকু হইয়া গিয়া! কিন্তু কি মধুর সেই কুণ্ঠিত অর্দ্ধস্ফুট 'মা' ডাক! মহামায়া শ্রবণময় হইয়া তাহা শুনিয়া ধন্য হইয়াছেন।

তারপর সামান্য ঘটনা উপলক্ষ্যে একদিন কুণ্ঠা কাটিয়া গিয়াছিল। স্নেহবারি-পুষ্ট স্পর্শশস্যকে তৃণের মত শ্যামলশ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়াই সেদিন সে 'মা' নামের বুকভরা তৃপ্তি বিলাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। মুখের ভাষা সেদিন ফুটিতে পারে নাই। অন্তরের নীরব মুহূর্ত্তে সর্ব্বময় হইয়া সে ডাকের স্পর্শে অননুভূত পুলক-প্রবাহধারা বহাইয়া দিয়াছিল। মা এবং ছেলের মধ্যে বৃথা সংকোচ কাটিয়া গিয়াছিল।

মহামায়ার সন্তান-স্নেহ-পিপাসু অন্তরে এতটুকু 'পর' 'পর' ভাব ত ছিল না! পেটের ছেলে থাকিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু বহুদিনের বঞ্চিত ক্ষুধিত হৃদয়—অনাথ বালকের অসহায় ম্লান নিপীড়িত মুখখানি দেখিয়া মায়ায় গলিয়া গিয়াছিল। মা তিনি,—মায়ের মতই স্নেহ-সুকোমল বাহু বাড়াইয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলেন।

সেই মাণিক লিখিয়াছে,—"ক্ষমা করিও মা, বিবাহ এখন করিব না। আমার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করিয়া—"

হারে অবোধ সন্তান! কিসের অভাব তোর? জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা?—সে কি ক্ষুদ্র বিবাহের ভর সহিতে পারে না?

অর্থের জন্যই যদি বিদ্যাশিক্ষা তোর চরম কাম্য হয় ত—কেন বৃথা এই ভূতের খাটুনি খাটিতেছিস? আর বিদ্যার জন্য যদি বিদ্যাশিক্ষা হয়,—সারাজীবন ঘরে বসিয়া এই চর্চ্চা কর না; কেহ ত অন্তরায় হইবে না! ভাবিতে ভাবিতে মহামায়া ঈষৎ হাসিলেন।

তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যে জ্ঞানটুকু পাইয়াছিলেন—তাহা জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না!

সুরেনবাবুর কথা আলাদা। কিন্তু, আর সকলের ইচ্ছাই কি যৌবনকালের মধুর স্বপ্নে রঙ্গীন হইয়া উঠে? সেখানে চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ ও দখিনা বাতাস বহিলেও,—কর্ম্ম-জগতের কোলাহল কি একেবারে ওই নিরীহ প্রকৃতি মানুষটির বোবা উদামের মত,—নিঃশেষ হইয়া যায়? না, তা যায় না। সকলেই ত—সুরেনবাবু নহেন।

মাণিক অবুঝ—ছেলে মানুষ। হয়ত কলিকাতার পাঁচজন সহপাঠীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অতিষ্ঠ হইয়া এমন পত্র লিখিয়াছে! মহামায়া শুনিয়াছেন, কলেজ-হোস্টেলগুলিতে যাহারা বাস করে,—তাহদের অধিকাংশ ছেলেই মনে মনে আপনাকে দ্বিতীয় ভীষ্মদেব কল্পনা করিয়া বিবাহে অসম্মতি দিয়া থাকে। কার্য্যকালে সে প্রতিজ্ঞা টেঁকে কি না—বলা যায় না। কিন্তু কণ্ঠের স্বর অন্তত হোস্টেলে থাকিতে কিছুমাত্র নরম পর্দ্দায় নামিয়া আসে না। মায়ের মনে কষ্ট দিয়া কি যে লাভ হয় তাহাদের, কে জানে?

স্বাধীন হইয়া মনোমত পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করাও অনেকের মত। অনেকে করেও—; মাঝে মাঝে সংবাদ-পত্রে মহামায়া সে ঘটনা পড়িয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছেন। কিন্তু মাণিক কি ভাবিয়া বিবাহে অসম্মতি জানাইল—?

সেইদিনই মহামায়া মাণিককে আর একখানি পত্র দিলেন এবং সত্বর বাটী আসিতে অনুরোধ করিলেন।

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পত্রের উত্তর আসিল না, মাণিকও ফিরিল না! মহামায়া চিন্তিত হইলেন। মায়ের মন তাঁহার—মন্দটাই মনে করিয়া আকুল হইয়া উঠিল।

সুরেনবাবুকে বলিলেন, "একবার কলকাতায় গিয়ে ছোঁড়াটার খোঁজ-খবর নিয়ে এস। আজ এক সপ্তাহ তার কোন চিঠি পাই নি।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "এগজামিনের তাড়ায় হয়ত সময় ক'রে উঠতে পারে নি।"

মহামায়া বলিলেন, "যাই হোক, তুমি যাও। যদি দেখ সে ভাল আছে, তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস। কোন ওজর-আপত্তি তার শুনো না।"

তিনদিন পরে সুরেনবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

ব্যগ্রস্বরে মহামায়া বলিলেন, "মাণিক কই?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "সে কলকাতায় নেই। মেসের ছেলেদের কাছে শুনলাম, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হ'য়ে—নুন তৈরী করতে গেছে।"

আকুলস্বরে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়-কোথায়?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "তা তারা ঠিক বলতে পারলে না। খুব সম্ভব বাঙলায় সে নেই।"

অশ্রু আর বাধা মানিল না, দুটি গণ্ড প্লাবিত করিয়া দিল। রুদ্ধকণ্ঠে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে ফিরবে?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "কি ক'রে ব'লব বল? ছ'মাসও হ'তে পারে,—দু'বছরও হ'তে পারে।"

শুষ্কমুখে মহামায়া বলিলেন, "হ্যাঁগা—সেখানে ভয় ভীত নেই ত?"

হাসিয়া সুরেনবাবু বলিলেন, "ভয় ভীত তাদের অন্তরে নেই, কিন্তু আমাদের শাদা চোখে অভয়ের এতটুকু ছায়ামাত্র

দেখতে পাই না! যদি সে সুস্থ শরীরে ফিরে আসে, জানবে তার অক্ষয় পরমায়ু।"

মহামায়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তবে কি হবে?—তাকে যেমন ক'রে পার আমার কোলে ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "তোমাদের চেয়ে মিষ্টি কোলের লোভে সে এগিয়েছে। তাদের দৃষ্টি, তাদের আশা—আর এতটুকু জমির ওপর—চেয়ে নেই, মায়া। মিছে কেন মায়ার রজ্জু নিয়ে সে দুষ্টকে বাঁধবার চেষ্টা ক'রছ? সে ফিরবে না।"

কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া মহামায়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সংবাদটা চাপা রহিল না।

ক্ষান্তকালী শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন ও সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, "আহা—হা মরে যাইরে! হাতে ক'রে মানুষ করা ছোঁড়াটা এমন দাগাও দিয়ে গেল গা? আহা—হা!"

কয়েক ফোঁটা জলও তাঁহার চোখের কোণ দিয়া ঝরিয়া পড়িল। আঁচলে আর্দ্র চক্ষু মুছিতে মুছিতে ধরা গলায় বলিলেন, "শত্তুর গো শত্তুর! নৈলে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ ক'রলে, শেষকালে কি না—না বলে—না কয়ে দে দৌড়! কলির ধর্ম্ম আর বলে কাকে? তোমরা বাপু যতই কর—আর যাই বল—ও আমি সেই কালেই জান্‌তাম। রক্তের টান,—সে যে আলাদা জিনিষ! কৈ আমার মদন ত একদিনও—'

মহামায়ার এই সমবেদনা মাখা কথাগুলি ভাল লাগিতেছিল না। তাঁহার হৃদয়ের উৎসারিত বেদনা—অন্যে কি বুঝিবে তাহার মূল্য? উহারা দরদহীন। যে সমবেদনাটুকু দিবে তাহাতে উপহাসের বক্রোক্তিটুকু তাঁহার প্রাণকে তীক্ষ্ন কণ্টকের মত বিঁধিয়া ক্ষতবিক্ষত করিবে মাত্র। জ্বালা তাহাতে একটুও কমিবে না।

রোদনস্ফীত মুখ তুলিয়া তিনি বলিলেন, "ঠাকুর ঝি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—এখান থেকে যাও। আমি যে আর সইতে পারি না।" বলিয়া মুখ ঢাকিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্ষান্তকালী অলক্ষ্যে মুখ বাঁকাইয়া মনে মনে কহিলেন, "মরণ! আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে! তবু যদি পেটের ছেলে হ'ত!"

প্রকাশ্যে সদুঃখে বলিলেন, "আহা—, নাড়ীর যে কোন ওষুধ নেই গা। ও পোড়ুনি অমনি ক'রেই বুকখানাকে ফাঁক ক'রে দেয়।—তা কেঁদে আর কি ক'রবে, বউ? শত্তুর না হ'লে কেউ এমন ক'রে দাগা দিতে পারে না।"

মহামায়ার আর সহ্য হইল না। মুখ না তুলিয়াই তীব্র-স্বরে বলিলেন, "কে শত্রু—কে বন্ধু আমি ভাল ক'রেই জানি, ঠাকুর ঝি। দোহাই তোমার—তুমি যাও। আমায় একটু একলা থাকতে দাও।"

ক্ষান্তকালী বলিলেন, "তা থাক দিদি, থাক। আচ্ছা এমন পোড়া যেন অতি বড় শত্তুরেরও না হয়! হাঁ, আসি দিদি।"

পরে মনে মনে কহিলেন, "ঢং দেখে আর বাঁচিনে! বলে,—'বাপ পিতেমোর নাম গেল—হিদে জোলার নাতি!' কোথাকার কে—ছেলেটা আমড়া ভাতে দে। পোড়াকপাল!" বলিয়া আর একবার তীব্র কটাক্ষে ভূমিলগ্না মহামায়ার পানে চাহিয়া অপ্রসন্নমুখে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বৈকালে পুকুরঘাটে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কথাটা তুলিলেন। রেণুর মা'র উপর তাঁহার আক্রোশটা ছিল কিছু বেশী। কারণ, কন্যা দেখিয়া পছন্দ হওয়ার পর—মদনের সহিত রেণুর বিবাহটা যখন প্রায় পাকাপাকি হইয়া আসিয়াছিল, তখন মহামায়া কি একটা আপত্তি তুলিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিয়াছিলেন। ক্ষান্তকালী সেই সময় শুনিয়াছিলেন, এ বিবাহে নাকি রেণুর মা'র মত ছিল না। শুনিয়া অবধি ঐ চালচুলাহীন দেমাকে রমণীর উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন। সকাল, সন্ধ্যা, বৈকাল যখনই ইহার দেখা পাইতেন, তখনই খুব খানিকটা মনের ঝাল মিটাইয়া লইতেন।

বিমলাকে পুকুরঘাটে আসিতে দেখিয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "যারা আমার মদনগোপালের হিংসেয় ফেটে মরে, তারা এবার দেখুক ভাল ছেলের আচরণটা! কথায় বলে, 'যার সঙ্গে ঘর করিনি—সে বড় ঘরুণী, যার হাতে খাইনি—সে বড় রাঁধুনি। আপনার মায়ে যা করে না, তার চেয়েও যত্ন-আত্তি ক'রে চাকরকে এনে বসালে রাজগদিতে। ওমা, খাইয়ে পরিয়ে যেই বড় ক'রে তুললে অমনি দে ছুট! ভাল ছেলে!—কালেজে পড়ছে!—বিয়ে হচ্ছে! সাত ঝাঁটা মারি অমন ভালর মাথায়—।"

রেণুর মা সমস্ত শুনিয়া কোন কথা কহিলেন না। ম্লানমুখে গা ধুইয়া কলসী ভরিয়া উঠিয়া গেলেন।

ক্ষান্তকালী সমাগত মহিলাদের পানে চাহিয়া বলিলেন, "দেখলে, দেখলে—ঠ্যাকার? কথা গেরাহ্যির মধ্যে এল না! ভাল, ভাল, আজ না বুঝিস—বুঝবি এর পরে। তখন ওই দোপড়া মেয়ে নিয়ে লোকের দোর দোর ঘুরে বেড়াবি। অত অংখার ভাল নয় লো,—অত অংখার ভাল নয়। বলে, "অতি বাড় বেড়ো না—ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে, অতি হেঁট হ'য়ো না—ছাগলে মুড়োবে।"

ঘরের দাওয়ায় কলসী নামাইয়া বিমলা দ্রুতপদে জমিদার বাড়ী গেল।

গিয়া শুনিল,—মহামায়া এই সংবাদ শুনিয়া অবধি সেই যে ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়াছেন, সন্ধ্যা হইয়া গেল, খিল খুলেন নাই, জলস্পর্শও করেন নাই।

বিমলা বুঝিল,—এ ব্যথার ঔষধ জগতে নাই

মহামায়ার কক্ষদ্বারে আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে বিমলা ডাকিল, "দিদি?"

ভিতর হইতে রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর আসিল, "কে?"

—"আমি বিমলা—দোর খোল।"

মহামায়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

বিমলা ঘরে ঢুকিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "যা শুনছি, সত্যি দিদি?"

মহামায়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন,—সত্য।

ক্ষণকাল কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না, ব্যথাভরা দৃষ্টিতে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল।

অকস্মাৎ মহামায়া উচ্ছ্বসিত রোদনে ভাঙিয়া পড়িয়া বিমলার দুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,

"বিমলা, সে হতভাগা আমায় কতখানি দাগা দিয়ে গেল—তা যদি স্বপ্নেও একবার ভাবত! তোর কাছে আমি যে আজ মুখ তুলে কথা কইতে পারছি না, বোন।"

বিমলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "সেজন্য তুমি এতটুকু কুণ্ঠিত হয়ো না দিদি। আমাদেরই অদৃষ্ট! রেণুর বরাতে সুখ নেই—"

মহামায়া আকুলস্বরে বলিলেন, "না, না বোন—তোমার দোষ কি? আমি নিজের ওজন না বুঝে যেমন কথা দিয়েছিলাম, তেমনি ফল হাতে হাতে পেলাম।"

বিমলা স্থির শান্ত মহামায়ার এমন বিচলিত ভাব জন্মাবধি দেখেন নাই। আপদে-বিপদে সকলে এই বুদ্ধিমতী ধৈর্য্যশীলা নারীর নিকটে পরামর্শ লইতে আসিত। জনশ্রুতি, বিপুল জমিদারীর আয়-ব্যয়ের সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশও মহামায়ার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইত না। অনেক বড় বড় জটিল বিষয়ের মীমাংসা—তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধি-কৌশলে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইত।

বিমলা মহামায়ার একখানি হাত ধরিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "তোমায় বোঝাব আমার এত বড় ক্ষমতা নেই—দিদি। কিন্তু বুঝে দেখ,—দৈবের উপর মানুষের কি হাত?"

মহামায়া কোন কথা কহিলেন না।

বিমলা বলিতে লাগিল, "মানুষের সব আশা যদি সফল হ'ত ত পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট থাকত না।"

মহামায়া হতাশাব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, "সব জানি বোন, কিন্তু রেণুর দশা কি হবে? কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলাম না?"

বিমলা বলিল, "সেজন্য কেন দুঃখ করছ, দিদি। রেণুর অদৃষ্ট! তার বরাতের লেখন কোন গরীবের ঘরে—পাতার কুঁড়েয়—"

মহামায়া বাধা দিয়া বলিলেন, "সেজন্য নয়। বিমলা, একটা সত্যি কথা বলবে? সেদিন আমায় জানিয়েছিলে, রেণু মাণিককে ভালবাসে। সত্যি এ কথা?"

বিমলা একটু থামিয়া বলিল, "রেণুর ভাবগতিকে তাই মনে হ'য়েছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে ঠিক ক'রে কিছুই বলতে পারি না।"

মহামায়া উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুখ যেন বারেকের তরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঈষৎ বেগের সহিত তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর করুন, তোমার অনুমান যেন মিথ্যা হয়। সে হতভাগার নাম কেউ যেন মুখে না আনে। তবে শোন বিমলা, আগে ভাল ক'রে তার মন বোঝ, তারপর আমায় এসে ব'লো—আমি তার ব্যবস্থা ক'রব।"

বিমলা বলিল, "তা বলব। কিন্তু দিদি,—তোমার পায়ের তলায় ওকে ফেলে দিতে পারলাম না,—এই দুঃখ আমার রয়ে গেল।"

মহামায়ার দুটি চক্ষু সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আমিই ওকে লক্ষ্মীর আসনে বসাব, বিমলা।"

বলিতে যাইতেছিলেন, মদনকে আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিব। পরক্ষণেই মনে পড়িল—এতটুকু ছোটবেলা হইতে মানুষ করিয়া যে সুবোধ ছেলে এক মুহূর্ত্তে পর হইয়া গেল, তাঁহার আদর, শাসন, স্নেহ, মমতা কোনও কিছুর ধারই ধারিল না—আবার জীবনের অপরাহ্নে আর একটি নূতন প্রাণীর শাসনভার কোন সাহসে আপনার হাতে তুলিয়া লইবেন?

মাণিকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা মায়ের সঙ্গে ছেলেরও থাকে না। মহামায়া মনে-প্রাণে জানেন—তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। অথচ লোকের কাছে তাহাই হইয়া গেল—হীন অকৃতজ্ঞতা। কি এমন মহত্তর লক্ষ্য, যাহার টানে সে এমন বুকভরা ভালবাসা পদতলে দলিয়া গেল? কিসের এমন তীব্র টান?

অকস্মাৎ ম্লানমুখে থামিয়া গিয়া মহামায়া ঘাড় হেঁট করিলেন।

বিমলা সমস্তই বুঝিল। বুঝিয়া কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে মহামায়ার পানে চাহিয়া বলিল, "তুমি যদি ওর ভার নাও দিদি, সে ওর পরম সৌভাগ্য।"

মহামায়া বলিলেন, "ভার আমি নিতে পারি বিমলা, কিন্তু বুকে আমার সাহস নেই। জোর ক'রে কোন কথা দিতে পারি না।" একটু থামিয়া বলিলেন, "তোমার রেণুর নামে সমস্ত বিষয় লিখে দেব, প্রলোভন নয়, বিমলা! আমার ঘরের লক্ষ্মীকে আমি লক্ষ্মীর মত ক'রেই আনতে চাই।"

বিমলা শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "তোমার আশীর্ব্বাদে আমার রেণুর অভাব কিছু নেই—জানি। কিন্তু দিদি, মাণিক যেদিন ফিরে আসবে—"

মহামায়া কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, "আসে আসুক। আমার বাড়ীতে তার জায়গা নেই।"

বিমলা বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিলেন। সে মুখে তখন অগ্নিদীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বিমলা শঙ্কিত হইয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে তার ত পাতান সম্বন্ধ নয় দিদি? অন্যে হয়ত তাই ভাববে, আমি ত জানি—"

মহামায়া হাসিয়া উঠিলেন। নিরস শুষ্ক হাসি। বলিলেন, "কে বলে পাতান সম্পর্ক নয়? আমি ত তাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধরিনি, বিমলা? না, না, তুমি কিছুই জান না। আমার কাছে তার নাম আর ক'র না। তার যা খুশী—সে তাই করুক।"

বিমলা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "যাই বল দিদি, —আমি জানি তোমাদের দুজনের কি সম্পর্ক। আসল মেকি ধরবার চোখ দুটো ত এখনও হারাই নি। সত্যিই সে হতভাগা। তার জন্য একটু ঠাঁই এ বাড়ীতে রেখ, দিদি।"

কঠিনস্বরে মহামায়া বলিলেন, "বিমলা,—বিষচারা আমি মন থেকে উপড়ে ফেলব। তুমি আর কখনও ওকথা ব'ল না। তুমি কিন্তু কালই আমায় কথা দেবে। আমি শীগগির কাজ শেষ করতে চাই।"

বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কক্ষত্যাগ করিল।

সেইদিন রাত্রিতে মহামায়া সুরেনবাবুকে বলিলেন, "কাল সকালেই একখানা দানপত্রের খসড়া ক'রে এনে দেবে?"

সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

মহামায়া বলিলেন, "আমার ইচ্ছে হ'য়েছে। দেবোত্তর বিষয় রেখে—তুমি যে সব সম্পত্তি আমায় দিয়েছ, তার সবই উইল ক'রে দেব।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "বেশ।"

মহামায়া অসহিষ্ণুকণ্ঠে কহিলেন, "বেশ! কাকে উইল ক'রব, কি বৃত্তান্ত—কিছুই জিজ্ঞাসা ক'রলে না ত'?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "জানা কথা আর জিজ্ঞেস ক'রে ফল কি।"

ঈষৎ বেগের সহিত মহামায়া বলিলেন, "যা ভাবছ—তা নয়। আমি বিষয়ের এক কাণাকড়িও মাণিককে দেব না।"

সুরেনবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সে ছাড়া আবার কে সুপাত্র জুটল?"

মহামায়া বলিলেন, "দেবার লোক মেলে না বটে, নেবার লোক অনেক আছে। মদন আছে।"

সুরেনবাবু শান্তস্বরে বলিলেন, "ছি, মায়া!"

এই ক্ষুদ্র কথার আঘাতে মহামায়ার সারাচিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিল। অতি কষ্টে অশ্রু চাপিয়া তিনি রূঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, "ছি কেন? আমার ইচ্ছে, আমার বিষয় আমি বিলিয়ে দিতে পারি।"

শান্তস্বরে সুরেনবাবু বলিলেন, "তা পার। কিন্তু তোমায় অতটা নির্ব্বোধ ভাবতে আমার ইচ্ছে হয় না। মাণিককে তুমি ভালবাস এবং আমার বিশ্বাস, সে ভালবাসা তুমি অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত কর নি।"

অকস্মাৎ মহামায়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, "মাণিক—মাণিক—মাণিক! সে ছাড়া দুনিয়ায় কি কোন যোগ্য পাত্র নেই? যে বেইমান এমন ভালবাসা দু'পায়ে থে'তলে চলে যেতে পারলে তা'র তরে আমার একটুও স্নেহ নেই—জেন। তুমি কালই উইল ক'রে আনবে কি না?"

স্নিগ্ধস্বরে সুরেনবাবু বলিলেন, "ভালবাসা অত সহজে মুছে ফেলা যায় না,—মায়া। তোমার রাগের মধ্য দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার মন সেই ছোঁড়াটাকেই নিয়ত কামনা করছে। এই যে অভিমান, এ-ও কি ভালবাসার একটা রূপ নয়? অকৃতজ্ঞ ব'লছ কাকে? আজ দেশ জুড়ে মায়ের ছেলে—মায়ের কোল ছেড়ে—বিষয় ঐশ্বর্য্য ফেলে যেখানে ছুটেছে—সে শুধু তার একারই তীর্থ নয়। সে তীর্থ আমাদের প্রত্যেকের—সকলের। সে তীর্থযাত্রার গৌরব—তাদেরও—আমাদেরও। মায়া, অনেক মা হাসিমুখে প্রাণ-প্রিয়তম পুত্রকে এই তীর্থ-পথে এগিয়ে দিয়ে গেছেন।"

মহামায়ার অবাধ্য নয়ন আর প্রবোধ মানিল না। ক্রোধের আবরণে কতক্ষণ আর উচ্ছ্বসিত দুরন্ত স্নেহকে লুকাইয়া রাখা যায়?

কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন, "আমি রেণুর মাকে কথা দিয়েছি—তার মেয়েকে গৃহলক্ষ্মী করে আনব। রেণু অনেক দিন কুমারীকাল ছাড়িয়েছে। আর তা'কে রাখা যায় না। ভেবেছি,—মদনের নামে সমস্ত বিষয় লেখাপড়া ক'রে দিয়ে, তা'কে আমার ঘরের লক্ষ্মী ক'রে আনব।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "বেশ, ভাল কথা। বিষয় তুমি লিখে দাও, কিন্তু মদনের নামে দিও না। রেণুকে যদি স্থায়ী গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাতে চাও ত, তারই নামে সব লেখাপড়া ক'রে দিও আমি তার সাক্ষী থাকব।"

মহামায়া বলিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ। এ কথাটা আমার মনেই হয় নি। সেই ভাল, রেণুর নামেই বিষয় থাক। মাণিকের নামে যেন একবিন্দুও না থাকে।"

সুরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "যে বড় সম্পত্তি পেয়েছে, ছোট বিষয় হাতছাড়া হ'লে তার কিছু আসে যায় না।"

মহামায়া বলিলেন, "মাণিক আবার সম্পত্তি পেলে কোথায়?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "এ কথা তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর,—উত্তর পাবে।"

মহামায়া ক্রোধের সহিত বলিলেন, "তোমার ঠাট্টা ভাল লাগে না। জান, আমি তার মুখ দর্শন ক'রতে চাই না।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "বাইরের দেখাশোনা শেষ হয়েছে বলেই ত' বলছি, তার চেয়ে বড় সম্পত্তি আর কেউ পায় নি। সে যে সম্পত্তি পেয়েছে, তা দানপত্র ক'রে বারবার হাত ফেরৎ করা চলে না, বাকী-বকেয়ার ভয়ও তার নেই, মায়া।"

মহামায়া রাগ করিয়া আর কোন কথা কহিলেন না।

তিন চারিদিনের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি রেণুর নামে রেজেষ্ট্রী হইয়া গেল।

পনের দিনের মধ্যে রেণু আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর আসনখানি দখল করিয়া বসিল। (ক্রমশঃ)

কামরূপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(৪৩৩ পৃষ্ঠার পর)

রুদ্রেশ্বর মন্দির

গৌহাটীর নিকটে রুদ্রেশ্বর নামক একটি শিব মন্দির আছে। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে আসামের রাজা রুদ্রসিংহ গৌহাটীতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহারই স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার পুত্র রাজা শিবসিংহ এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন।

হয়গ্রীব মন্দির

গৌহাটী হইতে ১৫ মাইল দূরে হাজো নামক স্থানে হয়গ্রীব মাধবের মন্দির বিদ্যমান।

পোয়ামক্কা

হয়গ্রীব মাধবের মন্দিরের নিকটেই পোয়ামক্কা নামক একটি স্থান আছে। সেখানে পুরাতন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, মক্কায় গেলে মুসলমানদের যে পরিমাণ পুণ্য হয়, এই স্থান দর্শন করিলে তাহার এক চতুর্থাংশ পুণ্য হয়। এই জন্যই এই স্থানটির নাম পোয়ামক্কা হইয়াছে।

গৌহাটী সহরের মধ্যস্থলেও উগ্রতর, ছত্রকর, নবগ্রহ প্রভৃতি কয়েকটি মন্দির আছে।

"বহগ বিহু" উৎসব

শারদীয়া পূজায় সারা বাংগলায় আনন্দের সাড়া জাগে—শত দুঃখ-দুর্দ্দশা জড়িত বাংগালীও দুর্গোৎসবে যোগদান করিয়া ক্ষীণ হাসিরেখা ফুটাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ একটি ব্যাপক উৎসব হইল আসামীদের "বহগ বিহু" অর্থাৎ বসন্তোৎসব। তাই বলিয়া দুর্গোৎসব যে আসামে অনুষ্ঠিত হয় না, এমন নয়; বরং উৎসবের জমকালো ঘনঘটায় দুর্গোৎসব "বহগ বিহু"কে অনেকাংশেই ম্লান করিয়া দেয়। তথাপি বসন্তোৎসবে সমগ্র আসামের পল্লীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত হাস্য-কৌতুকে আনন্দ-বিলাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। পল্লীর স্নিগ্ধ ছায়াবীথিতলে দলে দলে বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী বিচিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সমবেত হয়। তরুণ প্রাণের সহজ অভিব্যক্তিতে যে অপরূপ নৃত্য-গীতের উদ্ভব হয়, বসন্তের আবাহনে—তাহা প্রকৃতই মনোরম। গান তাহাদের নূতন করিয়া রচনা করিতে হয় না। প্রত্যেক পরিবারেই চিরাচরিত স্মরণাতীত কাল হইতে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত কতকগুলি গান আছে।

এই উৎসবে ধনী-নির্ধনের কোনও প্রভেদ নাই। ধনী সন্তান যেমন আনন্দে বিপুল সজ্জায় প্রান্তরের উন্মুক্ত বায়ুতে আসিয়া দাঁড়ায়, তেমনি নিঃস্ব কৃষক তাহার দীন উৎসব-পরিচ্ছদে অঙ্গ ঢাকিয়া এ অনুষ্ঠানে যোগদান করে। এমন ব্যাপক সর্ব্বজনীন উৎসব আসামে আর নাই।*

*এই প্রবন্ধ মিঃ কে এল বড়ুয়ার "Early History of Kamrup" ও নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ) হইতে সংকলিত হইয়াছে।

জরা ও মৃত্যু

(৪২১ পৃষ্ঠার পর)

হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। এ সে কোথায় যাইতেছে? ইহাই কি মৃত্যু? আতঙ্কে নিতাই দাস তাহার বালিশ বিছানা আঁকড়াইয়া ধরিল—না সে মরিতে পারিবে না—এই পৃথিবীর আলো বাতাস ছাড়িয়া—অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারিবে না!

আজ সন্ধ্যা হইতে, পাশের বারোয়ারীতলায় যাত্রাগান হইবে। সূর্য্য ডুবিলেই এবাড়ীর সবাই গিয়া গানের আসরে উপস্থিত হইল। বাড়ীর প্রহরী রহিল নিতাই দাস। ষোড়শী গান শুনিতে যাইবার আগে সবগুলি ঘরে তালাবন্ধ করিয়া নিতাই দাসের ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিয়া বলিল—"বাবা, আমরা গান শুনতে গেলাম—আমরা না আসা পর্যন্ত জেগে থেক—আর মাঝে মাঝে বাইরে এসে সব ঘরগুলো দেখে যেও।"

জ্বরের ঘোরে নিতাই দাস অচৈতন্যের মত পড়িয়াছিল—কোন কথাই বলিল না। ষোড়শী নিশ্চিন্ত মনে গান শুনিতে গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—বারোয়ারীতলায় এতক্ষণ যাত্রা আরম্ভ হইয়া গেল আর কি! অক্ষয় ডাক্তার সাজ-গোজ করিয়া তাহার ডিস্পেনসারী হইতে বাহির হইতেছিল—এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল—"ডাক্তারবাবু!"

ডাক্তার ফিরিয়া দেখে—বৃদ্ধ নিতাই দাস তাহার ডিস্পেনসারীর সিঁড়ির নীচে বসিয়া কাঁপিতেছে।

অক্ষয় নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল।

—"একটু ওষুধ ডাক্তারবাবু—এইখানটায় বড্ড বেদনা।"

ডাক্তার হাত দেখিয়া, বুক দেখিয়া বলিল—"ইস্ এ যে একেবারে 'ডবল নিউমোনিয়া'! আপনি কেন এই নিয়ে উঠে এসেছেন বলুন ত?—যে 'হার্ট উইক'! আচ্ছা দিচ্ছি ওষুধ।" বলিয়া তাড়াতাড়ি কোনপ্রকারে একখানা 'প্রেস্‌কৃপশান' লিখিয়া 'কম্পাউন্ডার'কে ঔষধ দিতে বলিয়া—ডাক্তার চলিয়া গেল। তাহার লক্ষ্মণের পার্ট—এখনই গিয়া রঙ্ মাখিতে হইবে—যাত্রা এতক্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল বুঝি!

'কম্পাউন্ডার' কোন প্রকারে ঔষধ কয়টি মিশাইয়া, নিতাই দাসকে হাত ধরিয়া পথে নামাইয়া দিয়া যাত্রা শুনিতে গেল। গান শুনিয়া রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া নিতাই দাসকে আর কেহ খোঁজ করিল না। পরের দিন সারা গ্রামময় সাড়া পড়িয়া গেল—নিবারণ মোক্তারের শ্বশুর নিতাই দাস রাস্তার খাদে পড়িয়া মরিয়া আছে। গ্রামের লোক তামাসা দেখিতে আসিল। খাদ হইতে তুলিলে দেখা গেল—নিতাই দাস দুই হাতের মুঠায় তখনও ঔষধের শিশিটি শক্ত করিয়া ধরিয়া আছে।

দ্বিতীয় মিউনিক?

মিঃ নেভিল চেম্বারলেন লর্ড হালিফাক্সকে সঙ্গে লইয়া আগামী ১১ই জানুয়ারী রোমে যাইতেছেন, রয়টার এই সংবাদ চারিদিকে প্রচার করিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার আশায় চেম্বারলেন মহোদয় কয়েকবার জার্ম্মানী গিয়াছিলেন। শেষবারে মিউনিকে বসিয়া তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের যে অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার কথা লোকে আদৌ ভুলিতে পারিতেছে না। যদি বাস্তবিকই শান্তি প্রতিষ্ঠা হইত বা হইবার সম্ভাবনা হইত তবেই ত লোকে আশ্বস্ত হইতে পারিত। কিন্তু তাহা আদবে হয় নাই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিশেষত যাহারা আয়তনে ও শক্তিতে ছোট তাহাদের আতঙ্ক অতিমাত্রায় বাড়িয়াই গিয়াছে। এখন তাহাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ, হয় প্রবল প্রতাপান্বিত জার্ম্মানীর তাঁবেদার হও নচেৎ আত্মসত্তা লোপ কর। 'মিউনিক' এই কথাটিও এখন সাধারণের মনে কেমন আশঙ্কার উদ্রেক করে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন মিউনিকে গিয়া চেকোশ্লো[ভাকিয়ার] অঙ্গহানি করিয়া যেমন জার্ম্মানীকে মধ্য ইউরোপে প্রবল করিয়া দিয়াছেন এবার রোমে গিয়াও তিনি ইটালীকে অধিকতর শক্তিমান হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া না দেন! এরূপ একটি গুরুতর আশঙ্কা উপস্থিত হইবার কারণও জুটিয়াছে। মধ্য ইউরোপে চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গহানি ঘটাইয়া জার্ম্মানীকে বড় করা হইয়াছে। ভূমধ্যসাগর তীরে ফরাসী রাজ্য টিউনিস ইটালীকে দিবার ব্যবস্থা করাইয়া তাহাকেও হয়ত অপ্রতিহত করিয়া তোলার চেষ্টা হইবে। এবার ফ্রান্সের রাজ্য কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থা হইবে। ব্রিটেন ফ্রান্সের বন্ধু, আপদে বিপদে উভয়েই উভয়ের সহায়। কিন্তু দুইটি বিষয়ে বন্ধু ফ্রান্সের সমূহ ক্ষতি দেখিয়াও ব্রিটেন উচ্চ-বাচ্য করিতেছে না। এই দুইটি হইল যথাক্রমে স্পেন এবং টিউনিস বা টিউনিসিয়া। এই জন্য লোকে আগামী চেম্বারলেন-মুসোলিনী সাক্ষাৎকারের ফল ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতেছে। হয়ত বা রোমে মিউনিক চুক্তির মত আর একটি চুক্তি হইয়া যাইবে।

ইটালীতে কিন্তু টিউনিস-গ্রাস অভিযান সুরু হওয়া অবধি ফ্রান্স কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে। ফরাসীরা ইটালীকে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও ছাড়িয়া দিবে না। যদি দরকার হয়, সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও তাহারা উহাতে বাধা দান করিবে। ফ্রান্সের দৃঢ় মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই বোধহয় মুসোলিনী সরকারী ঘোষণায় টিউনিসের কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। তবে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, তিনি গত ১৯৩৫ সালের ফ্রাঙ্কো-ইটালিয়ান চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই চুক্তির একটি প্রধান সর্ত্ত ছিল উত্তর আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ টিউনিসিয়া সম্পর্কে। সুতরাং সরকারী ঘোষণায় টিউনিসের উল্লেখ না থাকিলেও ইহাই যে ইদানীং মুসোলিনীর লক্ষ্যীভূত হইয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। এই দুইটি দেশে যখন এই রকম মনোমালিন্য উপস্থিত ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর রোম গমন প্রস্তাব স্বতঃই সাধারণের মনে সন্দেহ উদ্রেক করিবে।

টিউনিসের গুরুত্ব সম্বন্ধে জানিতে কৌতূহল হওয়া বর্ত্তমান ক্ষেত্রে স্বাভাবিকই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আর একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। আমাদের সর্ব্বপ্রথম এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে, বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সকলেরই এক রা। তাহারা সকলেই কম বেশী সাম্রাজ্যবাদী। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা অজুহাতে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গা

টিউনিসিয়ায় ফরাসী সৈন্যরা কুচ-কাওয়াজ করিতেছে

তাহাদের অভ্যাস। যে সব রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল তাহাদের লইয়াই ইহাদের খেলা। মিউনিক চুক্তির কথা ত আমরা ভুলিতে পারি নাই। বড় বড় রাষ্ট্রগুলি চেকোশ্লোভাকিয়াকে অংশ-বিশেষ ছাড়িয়া দিতে বলিলে সে তাহা করিতে বাধ্য হইল নহিলে তাহার অস্তিত্বই যে বিপন্ন হইত। ফ্রান্সকে কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার পর্য্যায়ে ফেলা সঙ্গত নয়। তবে সে এখন চারিদিকে যেমন ফাসিষ্ট শক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়া পড়িতেছে তাহাতে তাহাকেও হয়ত কিছু উপনিবেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হইবে। ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলি লইয়া সাম্রাজ্যবাদীরা ছিনিমিনি খেলে নিশ্চয়। ইহারা কিন্তু আবার নিজ নিজ সুবিধা মত অপর বন্ধুদের ঘাড়ে হাত বুলাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিতেও সুপটু। ফ্রাঙ্কো-ইটালিয়ান চুক্তি, ইঙ্গ-জার্ম্মান নৌ-চুক্তি, রোম-বার্লিন আঁতাত এবং সর্ব্বশেষ ইঙ্গ-ইটালি চুক্তি—এ সকলই তাহার এক একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাম্রাজ্যবাদীদের এই সব কারসাজি জানিয়া রাখা পরাধীন দুর্ব্বল জাতিদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই সব

না জানিতে পারিলে নিজেদের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

এখন আসল কথায় আসা যাক। টিউনিস উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের একটি তাঁবেদার রাজ্য। এটিকে উপনিবেশ বলা চলে। কারণ এখানে নামে মাত্র একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা আছেন। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে আফ্রিকার এক একটি অংশ আত্মসাৎ করিয়াছে, ইহাও সেইভাবে আত্মসাৎ করা হইয়াছে। এ-রাজ্যটি প্রায় তিন শত বৎসর যাবৎ তুরস্কের অধীন ছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইহার উপর ইউরোপীয়দের দৃষ্টি পড়ে এবং ক্রমশ ইহা ইংরেজদের আওতায় আসে। ১৮৭৮ সনে বার্লিন কংগ্রেসে ইংরেজরা ইহাকে ফরাসীদের হস্তে ছাড়িয়া দেয়। তাহারা ইহা নিঃস্বার্থভাবে দেয় নাই। রুশিয়া তখন ব্রিটেনের পক্ষে জুজু। তাহার ভূমধ্যসাগরে আগমন ঠেকাইবার জন্য সাইপ্রাস দ্বীপ ব্রিটেনের দরকার হয়। ফরাসীকে টিউনিস ছাড়িয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে এই উদ্দেশ্যে সাইপ্রাস গ্রহণ করে। ১৮৮১ সন হইতে টিউনিস কার্য্যত ফরাসীদের হাতে আসে। ফরাসীরা এখানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের সংখ্যা সমগ্র দেশে বর্ত্তমানে প্রায় সওয়া লক্ষ, মোট বিদেশী অধিবাসীদের অর্দ্ধেক। ইটালিয়ানদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। প্রধান শহর টিউনিসে কিন্তু ফরাসীদের অপেক্ষা ইটালিয়ানদের সংখ্যাই বেশী। স্থানীয় অধিবাসীরা মুসলমান। তাহারা সংখ্যায় পঁচিশ লক্ষের উপর। কৃষি, শিল্প ও ধাতু দ্রব্যে এ দেশটি সমৃদ্ধ। কাজেই বিদেশীদের লোভ ইহার উপর বরাবরই আছে।

টিউনিস তুরস্কের অধীন একটি রাজ্য ছিল, এইমাত্র বলিয়াছি। তুরস্ক কিন্তু বহু দিন পর্য্যন্ত ইহার উপর দাবী বজায় রাখিয়াছিল। শেষে ১৯২০ সনে সেভার্স সন্ধিতে এই দাবী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। টিউনিস ১৮৮১ সনে হইতে কার্য্যত ফরাসীর অধীন হইলেও স্থানীয় অধিবাসীরা কখনও একেবারে ইহার নিকট নতি জানায় নাই। মুসলমান অধিবাসীরা বরাবর নিজেদের শিক্ষা সংস্কৃতিকে ফরাসী শিক্ষা সংস্কৃতির সমপদস্থই মনে করিয়াছে এবং তাহাই আঁকড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের এই কার্য্যে সহায় হইয়াছে বিদেশীদের মধ্যে প্রধানত ইটালিয়ানরা। কারণ ইটালিয়ানরাও পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলিতে পারে নাই। টিউনিস নগরীই প্রাচীন কার্থেজ। প্রাচীন যুগের রোমানগণ কার্থেজকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের শাসন আফ্রিকায় চালাইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে যদিও ফরাসী ইটালিয়ান প্রভুত্ব দুই-ই সমান, তথাপি ফরাসীদের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিবার জন্য ইটালিয়ানদেরই সাহায্য ইহারা লইয়াছে। ফরাসীরা ইহা বুঝিয়া বরাবর ইটালিয়ানদেরও খুশী রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ১৮৯৬ সন হইতে ১৯৩৫ সন পর্য্যন্ত টিউনিস সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে বিবিধ চুক্তিই ইহার প্রমাণ। স্থানীয় অধিবাসীদের খুশী রাখিবার জন্য ফরাসীরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে কতকটা সুবিধা দান করিয়াছে। "Post War World" নামক পুস্তকে টিউনিস সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা তাহার বর্ত্তমান অবস্থার উপর বিশেষ আলোকপাত করিবে। ইহা হইতে কিয়দংশ এখানে দেওয়া হইল,—

> Until 1914 French Colonization had proceeded smoothly, but during and after the war the Egyptian Nationalist Movement found an echo among the Tunisians. In 1920 they demanded universal suffrage and equal rights with Frenchmen. The French were in a difficult postition; they had 54,000 settlers in Tunis and did not dare to come to blows with the natives, particularly because there were no less than 85,000 Italians in the colony and Italy was waiting to make France's misrule in Tunis an excuse for intervention. So France hastened to meet the Nationalists half way, setting up Economic Councils (in 1922) through which natives could co-operate with Frenchmen ......

১৯৩৫ সনে ইটালীর সঙ্গে নূতনভাবে চুক্তিবদ্ধ হইয়া ফ্রান্স টিউনিস সম্পর্কে কতটা নিশ্চিন্ত হয়। ফ্রান্স ও ইটালি পরস্পরের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই উক্ত চুক্তিতে যে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ইউরোপে জার্ম্মানীর প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা লোপের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা তখন ইটালি ও ফ্রান্সের সমান স্বার্থ ছিল। আবার ইটালি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য আবিসিনিয়ার দিকেও নজর দিতে তখন সুরু করিয়াছে। তাহার পক্ষে ফ্রান্সকে হাতে রাখা তখন একান্ত প্রয়োজন। ফরাসী রাজ্য টিউনিসে ইটালিয়ানরা স্থানীয় অধিবাসীদের আন্দোলনে সাহায্য করিয়া ফরাসী সরকারকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সকল কারণে ফ্রান্স ও ইটালির মধ্যে ১৯৩৫ সনের ৭ই জানুয়ারী রোমে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইদানীং মুসোলিনী যে চুক্তিপত্র অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা ইহাই।

যে অবস্থায় পড়িয়া এই দুইটি রাষ্ট্র চুক্তিবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিল, এখন তাহার আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইটালি এখন আবিসিনিয়ার অবিসংবাদিত মালিক, যে জার্ম্মানীকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য ১৯৩৫ সনে উভয়েই সচেষ্ট ছিল, সেই জার্ম্মানীর সঙ্গে ইটালির এখন খুবই আঁতাত। ইংরেজের ভয়ও এখন আর তাহার নাই। কারণ বৃটিশ ধুরন্ধরগণ তাহার সঙ্গে নিয়ত মিলনের জন্য লালায়িত। স্পেনের আন্তর্বিপ্লবে ফ্রাঙ্কোর পক্ষ সমর্থন করায় সেখানে তাহার প্রতিপত্তি ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই সে এখন আর ফ্রান্সের সাহায্যের প্রত্যাশী নহে। টিউনিসে ফরাসী প্রাধান্য স্বীকার করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ এখন আর সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। সেখানে তাহার নিজের প্রাধান্য বিস্তারই এখন আবশ্যক মনে করিতেছে। এই সব কারণে এ সময় চেম্বারলেন-হালিফাক্স কোম্পানীর রোম গমন লোকের মনে কেমন ধোকা লাগাইয়া দিয়াছে।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতির অভিভাষণ

ডাঃ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতি নির্ব্বাচন করে আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন সে জন্য আপনাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি: কিন্তু প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কোন শাখার নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা যে আমার নাই তা আমি জানি। তার প্রধান কারণ আমি, প্রবাসী নই, এখনো যে দেশকে বাঙ্গলাদেশ বলা হয় আমি সেই দেশেই বাস করি। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমি সাহিত্যিক নই। আমি লেখক বটে, কিন্তু তাই বলে সাহিত্য রচনা করবার দাবী করতে পারি না, কারণ অল্পদিন পূর্ব্বেই একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক লিখেছেন—"বাংলা সাহিত্য এখন যতদূর এগিয়েছে তাতে যে কোনো ব্যক্তি ছাপার অক্ষরে কিছু লিখলেই তাকে সাহিত্যিক বলে স্বীকার করা সাজে না।" কথাটি কঠিন হলেও যে সত্য তাতে সন্দেহ নাই। তার কারণই বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য যে বিপুল আকার ধারণ করেছে তাতে সে সাহিত্যকে আলোচনা করতে হলে সাহিত্যকে আর ব্যাপক অর্থে নেওয়া চলে না। সেখানে সত্যকার সাহিত্যকে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি হতে পৃথক করে দেখা উচিত। তবে অন্য ব্যবসায়ী যদি তাঁর লেখায় সাহিত্যোচিত রসসৃষ্টি করতে সমর্থ হন তাহলে তিনি সাহিত্যিকের পদমর্য্যাদা যে পেতে পারেন তাতে সন্দেহ নাই।

'বৃহত্তর বঙ্গের' প্রকৃত অর্থ কেউ জানলেও এ পর্য্যন্ত তা ব্যক্ত করেন নি। অথচ এ শাখার অধিবেশন অনেকবার হয়ে গেছে। যদি প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাস অংকন করা এ শাখার উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ শাখার পৃথক প্রয়োজন ছিল না, সাহিত্য শাখাতেই সে কাজ চলতে পারত। আর যদি বাংলাদেশের বাইরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকলাপের ইতিহাস উদ্ধার করা এ শাখার উদ্দেশ্য হয় তাহলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে যে বাংলাদেশের সীমানার কোথায় শেষ? বর্ত্তমানকালে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সীমা নির্দ্দেশ করা হয়েছে তা যে বাংলাদেশের প্রকৃত রূপ নয় তা আমরা সকলেই জানি। মানভূম, সিংহভূম ও পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চল বিহারের অন্তর্গত হলেও সেগুলি যে বাংলাদেশের অংশ তা কাউকে নূতন করে বলতে হবে না। মানভূমে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১২ লক্ষের উপর আর হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র ৩ লক্ষ, সিংভূমের বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ, আর হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র ৮১০০০। পূর্ণিয়ায় বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ আসামে সুর্ম্মা উপত্যকায় বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ২৯ লক্ষ, আর আসামী ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজার। আসাম উপত্যকায় আসামী ভাষাভাষীর সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১৯ লক্ষ, আর বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ১১ লক্ষ। সুতরাং যে সব স্থানে বাঙ্গালী ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা ৬০ জনের উপর সে সব স্থান যে বাংলাদেশের অংশ তা বলাই বাহুল্য। কৃত্রিম

সীমারেখা টেনে বাংলাদেশের পক্ষচ্ছেদ করে সে সব স্থান অন্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেও সে সব স্থানকে আমরা বাংলাদেশ বলব।

এই প্রাকৃত বাংলাদেশের বাইরে ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙ্গালীর কোন স্থান আছে কিনা তা নির্দ্ধারণ করাই হয়ত আমাদের এ শাখার প্রধান কার্য্য। এ হিসাবনিকাশের প্রয়োজন ছিল না, কারণ ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার পরিণতি খণ্ডশঃ আলোচনা করা যায় না। বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক বিষবৃক্ষ রোপণ করবার পূর্ব্বে কৃত্রিম সীমারেখা টেনে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে পৃথক্ করে দেখা হত না, এবং সেই কারণে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানে কোন প্রদেশের সাহিত্যরসিকদের কোন কুণ্ঠা বা ক্ষোভের কারণ ঘটেনি। কিন্তু কিছুদিন থেকে অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালী বিদ্বেষ যে শুধু স্বার্থান্বেষীদের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে তা নয়, যাঁরা সাহিত্যিক তাঁরাও তাঁদের সাহিত্যের দুর্দ্দশার জন্য বাঙ্গালীকে দায়ী করেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি' প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের দুরবস্থার জন্য বাঙ্গালীকে দোষী সাব্যস্ত করছেন। এ সম্পর্কে লেখকের নিজের কথা উদ্ধৃত করে দেওয়া ভাল—

"With the advent of the British a large number of Bengalis came into the province, seeking employment. Their education and acquaintance with the methods of British administration made them more suited for employment in the new Government. Those people found it difficult to transact the business of the Govt. in the vernacular of the country while their false pride prevented them from acquiring a knowledge of it. It was their interest therefor to represent the Assamese language as a corrupt form of their own vernacular with a view to get it replaced by Bengali if possible".

সম্প্রতি বোম্বাই হতে প্রকাশিত পি ই এন পত্রিকায় উড়িষ্যা দেশের জনৈক সাহিত্যিকের লেখাতেও ঐ কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়—

"The Oriyas became so demoralised and disheartened due partly to the political turmoil of the country and partly to the visitations of floods and famines, especially the notorious famine of 1866, that their artistic spirit and love for literature flagged. The Zemindars of Orissa passed into the hands of relations ofthe Bengali employees of the East India Company and Oriya authors and poets received no encouragement from these alien landlords. Not only did the latter do practically nothing for the improvement of Oriya language or literature but some of them even tried to stamp out the Oriya language.

The setting up of Orissa as a separate province has instilled new asporation in the minds of the Oriyas."

সমস্ত আসামে বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ আর অসমীয়া ভাষা মাত্র ১৯ লক্ষ লোকের মাতৃভাষা। সুতরাং ৪০ লক্ষ বাঙ্গালী যে বাংলাদেশ হতে ইংরাজের পতাকা বহন করে এ প্রদেশে এসেছিল সে কথা যে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা' আপনারা বিচার করবেন।

বাংলার সংস্কৃতির প্রভাব

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সাহিত্য প্রাচীনতম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হতে যে চর্য্যাপদ বা বৌদ্ধগান উদ্ধার করেন সেইগুলিই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। এসব পদগুলি যে সব সিদ্ধাচার্য্য রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণ, সরহ, ভুসুকু, কুক্কুরী প্রায় সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। পদগুলি রচিত হয় খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে ঐ দশম একাদশ যুগের কোন নিদর্শন নাই। এই যুগে এবং এর পরেও কিছুকাল ধরে অন্যান্য প্রদেশে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল যে ভাষাকে অবলম্বন করে তার নাম অপভ্রংশ বা অবহট্ট। সে যুগে এ ভাষা কথ্য ভাষা ছিল না। এ ছিল একটা সাহিত্যের কৃত্রিম বাহন। কাহ্নু, সরহ প্রভৃতি আচার্য্যদের রচনা এ ভাষাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এই বাঙ্গালী আচার্য্যদের হাতে সাহিত্য প্রাণহীন প্রাকৃত ও অবহট্ট হতে প্রথম মুক্তিলাভ করল এবং কথ্য ভাষাকে অবলম্বন করে দিন দিন নূতন পথে অগ্রসর হতে লাগল।

বাঙ্গালী আচার্য্যদের রচিত এই অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা পদাবলীর প্রভাবই যে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। হিন্দী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে কবীরের পদাবলী। এই পদাবলীর মধ্যে বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য্যদের ভাব ও ভাষা যে বহু পরিমাণে রয়েছে তা তুলনামূলক বিচার করলে সহজেই ধরা পড়বে।

রামানন্দের সঙ্গে কবীরের সম্বন্ধ কতটা তা' আমরা জানি না, তবে কবীরের রচিত যে

সব পদ সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নাথ ও সহজ সম্প্রদায়ের সাধন-মার্গের সংগে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। এ সব সম্প্রদায়ের সাধনার প্রধান অংগ হচ্ছে হঠযোগ, কায়া হচ্ছে সহজজ্ঞান। কবীরের সাধনাও তাই। তা ছাড়া কবীরের রচিত পদের ভিতর ঐ সব সাহিত্যের ভাষা ও ভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। ঐ সব সম্প্রদায়ের সাহিত্যেই প্রথম দোঁহা বা দ্বিপথা ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। কবীরের বেশীর ভাগ রচনাতেই এই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙ্গালী সহজসিদ্ধ তিল্লোপাদের রচিত—

তু মরই জহি পবণ তঁহি লীণো হোই নিরাস।
সঅসংবেঅণ তত্তফল, স কহিজ্জই কীস॥

আর কবীরের রচিত—

জহাঁ ন চীড়ী' চড়ি সকই রাই ন ঠহরাই
মন পবন কা গমি নহীঁ' তহাঁ পহুঁচে জাই।

এই দুই দোঁহার মধ্যে যে শুধু ছন্দেরই মিল রয়েছে তা নয় ভাবেরও মিল আছে। উভয়েই মনোপবনের গতিবিরহিত সহজ সমাধির কথা বলেছেন। কিন্তু ভাষা ও ভাবে এর চেয়ে গূঢ় সম্বন্ধ সিদ্ধসাধক সরহপাদ ও কবীরের কথার ভিতর। সরহপাদ বলছেন যে সদ্গুরু হতে হলে নিজেকে আগে জানা চাই, যতক্ষণ নিজেকে জানতে না পারছ ততক্ষণ শিষ্য করো না, অন্ধ অন্ধকে চালিত করলে দুজনেই কূপে পড়ে—

জাব ন অপ্পা জাণিজ্জই তাব ন সিস্স করেই।
অন্ধ অন্ধ কড্ঢব তিম বেন্ন বি কূব পড়েই।

কবীর ও অসদ্গুরুর সম্পর্কে অনুরূপ ভাষায় বলছেন—

জাকা গুরুজী অন্ধেলা, চেলা খরা নিরন্ধ।
অন্ধে অন্ধা ঠেলিয় দুন্যূ কূপ পড়ংত।

সহজসিদ্ধদের আর একজন গুণ্ডরীপাদ ষটচক্র বা সাধারণ অবস্থায় মনোপবনের অভেদ্য স্থান সম্বন্ধে বলছেন—

সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল।

অর্থাৎ শ্বাসের ঘরে যে তালা দেওয়া রয়েছে তাকে ভাঙ্গতে হবে। আর কবীর ঐ কথাই আরও স্পষ্ট করে অনুরূপ ভাষায় বলেছেন—

ষটচক্র কি কনক কোঠরী বস্তভাব হৈ সোই।
তালা কুংচী কুলফকে লাগে উঘড়ত
বার ন হোই॥

পূর্ব্বসিদ্ধদের রচনা ও কবীরে রচনার ভিতর ভাষা ও ভাবের ঐক্য ছাড়া কবীর নিজের মুখেও তাঁদের গুরু বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর রচনায় গুরু রামানন্দের নাম ক্বচিৎ পাওয়া যায়, কিন্তু সিদ্ধ গোরখনাথ, ভর্তৃহরি ও গোপীচাঁদের উল্লেখ অনেক বেশী পাওয়া যায়।—'অবধূ গোরষনাথ জানী'—'গোরষ ভরথরী গোপীচংদা, তব মন সেঁ মিলি করৈ' অনংদা'—

পূর্ব্বসিদ্ধদের ও কবীরের রচনার ভিতর আর একটা বড় ঐক্য আছে সাংকেতিক শব্দের ব্যবহারে। দু'একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে—

পূর্ব্বসিদ্ধেরা মনোপবনকে 'মূষিক' বলেন, কারণ আঁধার ঘরে মূষিকের ব্যবহার দ; সে চুরি করে খায়। মনোপবনের সাধা-অবস্থা চঞ্চল। যখন সাধক যোগস্থ হন তখন সে পবন স্থিরীকৃত হয়ে দেহের ভিতরের ষট্চক্র ভেদ করে সহস্রারে অমৃত পান করে। তাই পূর্ব্বসিদ্ধেরা যেমন বলেছেন—

নিসি অন্ধারী মুসা অচারা
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ অহারা।

কবীরও তেমনি বলেছেন—

মনরে জাগত রহিয়ে ভাই
গাফিল হোই বসতি মতি খোবৈ
চোর মুসৈ ঘর জাই॥

প্রাচীন সিদ্ধ বীণাপাদ যখন ধ্যানস্থ হয়ে তন্ত্রীবাদন করেন তখন তাঁর বীণের তন্ত্রী হচ্ছে সূর্য্য চন্দ্র অর্থাৎ দেহের ভিতরকার দুই নাড়ী, ইড়া ও পিংগলা, সে তন্ত্রীর দণ্ডী অবধূতী বা মধ্যমা নাড়ী সুষুম্না যা হতে অনাহত শব্দ উৎপন্ন হয়। তখন সেই অনাহত রুণুরুণু শব্দ চিত্ত-গগনে প্রতিধ্বনিত হয়—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অনহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী।
বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণ॥

কবীরও এই সমস্ত কথা অনুরূপ সাংকেতিক ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—

জংত্রী জংত্র অনুপম বাজৈ, তাকা শব্দ
গগনমে গাজৈ।
সুরকী নালি সুরতি কা তুংবা সংগুরু
সাজ বনায়া।

এ থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কবীর যে শুধু বাঙ্গালী সিদ্ধদের প্রচলিত সহজধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা নয় তাঁর রচনা ভংগী, ছন্দ, পারিভাষিক ও সাংকেতিক শব্দের ব্যবহার, প্রভৃতি বহু পরিমাণে সেই সিদ্ধদের রচনা হতে গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি চণ্ডীদাসের বাণীর প্রতিধ্বনি কবীরের মধ্যে পাওয়া যায়—অথচ চণ্ডীদাস ছিলেন কবীরের অল্পদিন পূর্ব্বেকার লোক! চণ্ডীদাস বলেছেন—

সহজ সহজ সবাই কহয়ে সহজ জানিবে কে?
তিমির অন্ধকার, যে হয়েছে পার, সহজ
জানিবে সে।

আর কবীরের—

সহজ সহজ সবকো কহৈ সহজ ন চীন্হৈ
কোই।
জিন্হ সহজৈ' বিষিয়া তজী, সহজ কহীজৈ
সোই।

এই যুগের কিছু পরেই ব্রজবুলির প্রচলন হয়। ব্রজবুলির উপাদান কি তা এখনো সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নি। মথুরা অঞ্চলের ব্রজভাষা অথবা মৈথিল বিদ্যাপতি রচিত পদাবলীর ভাষাকে অবলম্বন করে এই ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ত্তমানে স্থির করা অসম্ভব তার কারণ ব্রজভাষার রচিত কোন প্রাচীন পদাবলী এখনো আবিষ্কৃত হয় নি এবং বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদাবলী কতদূর তার প্রাচীনরূপ রক্ষা করেছে তাও অনিশ্চিত। বিদ্যাপতি প্রথমে যে ভাষায় লেখেন তা হচ্ছে অপভ্রংশ বা অবহট্ট। এই ভাষার রচিত কীর্ত্তিলতার মধ্যে ভাষা ও ছন্দ প্রাচীন সিদ্ধদের রচিত দোহার অনুরূপ। বিদ্যাপতির রচিত পদাবলীর মধ্যে দু' একটি পদও এই অবহট্ট ভাষায় রচিত। অবহট্ট ভাষায় রচনা গীত করা হত না, তার বিষয়বস্তু লোকপ্রিয় ছিল না, অথচ পদাবলী ছিল জনপ্রিয় এবং সেগুলি গীত হত বলেই প্রাচীন পুঁথির অভাবে তার প্রাচীন রূপ সম্বন্ধে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ব্রজবুলির উপাদান কি ত জানলেও একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এ ভাষার সৃষ্টি ও প্রচলন হয়েছিল বাঙ্গালী কবিদের হাতে। সব চাইতে প্রাচীন ব্রজবুলি পদ বাঙ্গালী কবি যশোরাজ খাঁর রচিত। তিনি ছিলেন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের লোক। উড়িষ্যার রামানন্দ রায়ের ব্রজবুলী পদ এর কিছু পরেই রচিত হয়। রামনন্দ রায় চৈতন্যদেবের সংগে সাক্ষাতের পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক যে নাটক লেখেন তার ভাষা, ছন্দ ও ভাব সমস্তই জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণ করে—

উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্ট হবে—

বিদলিত সরসিজ দল চয় শয়নে।
বারিত সকল সখিজন নয়নে॥
বলতি মনো মম সত্বর রচনে।
পূরয় কামমিমং শশী-বদনে॥

অথবা

মঞ্জুতর-গঞ্জেদলি কুঞ্জমতি-ভীষণম।
মন্দ মরুদন্তর-গ-গন্ধকৃত দূষণম্॥
সকলমেতদপীরিতম॥—

তাঁর রচিত ব্রজবুলী পদও বাঙ্গালী পদকর্ত্তাদের রচনা হতে অভিন্ন নয়।

পহিলহি রাগ নয়ন ভংগ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥

আসামের শংকরদেব ষোড়শ শতকের শেষভাগের লোক। তাঁর রচনার মধ্যে যে সমস্ত ব্রজবুলী পদ আছে তা পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী পদকর্ত্তাদের পদ হতে পৃথক নয়—

মানিনী মাই নয়ন পংকর জরে বারি।
ফোকারয় শ্বাস হ্রাস ভেল দেহ।
ঘন ঘন দেখু অন্ধিয়ারি।
সতিনীক উদয়ে হৃদয়ে দহে আনি।
অধিক মিলন মন তাপ
ধিক অব জীবন যৌবন মোহে।
অভাগিনী করত বিলাপ॥

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হতে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত নেপালে যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছিল তার মধ্যে সংগীতাংশ এই ভাষায় রচিত।

অধিন অপন পহু অহর্নিশি লাস।
শয়ন ভোজন কত রচিত সুবাস।
নিজমন পুরিলহু রতিসুখ আস।
নয়নতরংগ মৃগমদ বাস।
বিবিধ রমন দিন রজনি সমান।
অধর অরুনসম অমিঞ নিধান॥

সুতরাং যখন সব চাইতে প্রাচীন ব্রজবুলী পদের রচয়িতা হচ্ছেন বাঙ্গালী এবং সে ভাষায় রচিত পদাবলীর রচয়িতাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন বাঙ্গালী তখন একথা নির্ভয়েই বলা চলে যে, এই ভাষার সৃষ্টিও হয়েছিল বাঙ্গালীর হাতে। সে ভাষা কৃত্রিম হলেও প্রায় সমগ্র প্রাচ্য ভারতের কবিদের আকৃষ্ট করেছিল এবং তা অবলম্বন করে তাঁরা যে পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিলেন তা আজও আমাদের মনকে মুগ্ধ করে।

নেপালে বাংগলা ভাষা

প্রাচীন বাংলা চর্য্যাপদ ও ব্রজবুলীর প্রভাব প্রাদেশিক সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করেছে তাতে সন্দেহ নাই। নেপালে ব্রজবুলীর অনুকরণে রচিত কাব্য সাহিত্যের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সে প্রদেশে এক সময়ে বাংগলা গদ্যেরও প্রচলন ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রচিত একখানি নেপালী নাটকের পুঁথি আমি দেখেছি। এ নাটকের নাম গোপীচন্দ্র নাটক। নাটকের গানগুলি ব্রজবুলীর ঢঙে লিখিত, আর গদ্যাংশ বাংগালা গদ্যের অনুকরণে রচিত। রচয়িতা নিজে বাংগালী ছিলেন না বলে সে বাংলা ভাষায় স্থানীয় ভাষার কিছু প্রভাব আছে। এই গদ্যের কিছু নমুনা দিলেই সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে—

রাজা—অহে উদনা পদুমো আমার বচন সুনো।
উ, প—অহে মহারাজেশ্বর আজ্ঞা করো।
রা—এতাদৃশ বংগদেশের অধিপতি গোপীচন্দ্র রাজা আমি আছি।
উ, প—অহে প্রভু আমার বচন অবধান করো।
রা—অহে উদনা পদুমো কহো।......অহে উদনা পদুমো এথা থাকিয়া কার্য্য না আছে, আমার দর্শন নিমিত্ত বিস্তর লোক আসিবে সভা করিতে যায়বো চস।

উড়িষ্যা প্রদেশের প্রথম ভক্ত কবি রামানন্দ রায়ের রচনার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়েছি। তিনি জয়দেবের অনুসরণেই তাঁর গীতিনাট্য লেখেন, ব্রজবুলীর ঢঙে পদও রচনা করেন। চৈতন্যদেব উড়িষ্যার সঙ্গে বাংগালা দেশের যে যোগসূত্র স্থাপিত করেন সে প্রভাব হতে উড়িষ্যার অধিবাসীরা আজও মুক্ত হতে পারে নাই, উড়িয়া সাহিত্যের সূচনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা বহু পরিমাণে ধরা যায়।

পরবর্ত্তীকালে উড়িয়া সাহিত্য কি পরিমাণে বাংগালী ও বাংলা সাহিত্যের সহায়তা পেয়েছে তা 'প্রবাসী' পত্রিকায় বন্ধুবর প্রিয়রঞ্জন সেনই স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর কথা উদ্ধৃত করলেই চলবে—"কিন্তু উড়িষ্যায় বাসমাত্রে কিম্বা রাজকার্য্য সম্পাদনেই বাংগালীর শক্তি ও সাধনা পর্য্যবসিত হয় নাই। উড়িষ্যার সাহিত্যভাণ্ডারে সে বিবিধ রত্ন সম্ভার আহরণ করিয়া আনিয়া দিয়াছে। উড়িষ্যার সাহিত্য সম্পদ সাধ্যমত সমৃদ্ধ করিয়াছে। আধুনিক উড়িয়া সাহিত্য যে তিনটি বাণীসাধকের কীর্ত্তি তাঁহারা তিনজনেই ওড়িয়া বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের একজন মহারাষ্ট্রীয় বংশসম্ভূত, ওড়িয়া সাহিত্যের ভক্ত কবি মধুসূদন রাও, আর একজন বাংগালী রাধানাথ রায়। রাধানাথের উপর ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রভাব পড়িয়াছিল, অন্ততঃ তাঁহারই উপদেশে রাধানাথ বাংগলা কবিতা ছাড়িয়া ওড়িয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন প্রমাণ আছে। পুরাতন বংগদর্শনের ফাইল খুঁজিলে অন্যতম সাহিত্যিক সূত্রধর ফকিরমোহন সেনাপতি মহাশয়ের বাংগলা লেখাও পাওয়া যাইবে।......ওড়িয়া সাহিত্যে পশ্চাত্য প্রভাবের কতখানি * বাংগলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাও এই সংগে অনুসন্ধেয়। প্রবীন নাটাকার শ্রীযুক্ত রামশংকর রায় উড়িয়া প্রবাসী বাংগালী; সুতরাং আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের উপর বাংগালীর ছাপ রহিয়া গিয়াছে।"

আসামে বাংগলা ভাষা

আধুনিক অসমীয় ভাষা বহুদিন স্বাতন্ত্র্য লাভ করলেও তা যে আধুনিক বাংলা ভাষার সহোদরা এ কথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করেন না। দুই ভাষার মধ্যে এই নিকট সম্বন্ধ ছিল বলেই প্রাচীন অসমীয় সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের প্রভাব হতে মুক্ত নয়। শংকরদেব প্রাচীন অসমীয় সাহিত্যের প্রধান লেখক। তিনি ১৪৪৯ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী অসমীয় সাহিত্যের যে সমস্ত নমুনা প্রকাশিত হয়েছে তার ভাব ভাষা ও ছন্দ বিচার করলে একথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে, সে সাহিত্য বাংগালী ও আসামী উভয়েরই সম্পদ। এই যুগের মাধবকন্দলী হাতে দু' একটী কবিতা উদ্ধৃত করে আপনাদের শোনাই—

যত মনোহর মন্দার কুসুম
পারিজাত তথা আছে।
স্থল অভিনব কুসুমে পল্লব
দেখি ভাল গাছে গাছে।
বসন্তে মিলল আরাবে কোকিল
বহয় মলয় বায়।
ভ্রমরা গুঞ্জরি চিত চুরি করি
কোকিলে ভেজিল রায়।

রামায়ণের অসমীয়া অনুবাদ হতে—

দণ্ড ছত্র পতাকা বিচিত্র নৃত্যগীত।
সুগন্ধ শীতল বাতে প্রমোদিত চিত্ত॥
নানাবিধ চিত্রথান আতি বিতোপম (?)।
দেখি সুগ্রীবের উল্লসিয়া গেল মন॥

শংকরদেবের রচনায় ব্রজবুলীর প্রভাবের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। ব্রজবুলী ছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনার ভাষায় অসমীয় ভাষার স্বতন্ত্ররূপ ধরা পড়ে সত্য, কিন্তু তাঁর রচিত গ্রন্থের সংগে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। তাঁর রচিত 'ভাগবত' হতে দু' এক ছত্র উদ্ধৃত করলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে—

দিব্যগন্ধ ধূপ দীপ পুষ্প যে চন্দন।
দিল দিব্য বিভূষণ অমূল্য রতন॥
দিয়া পঞ্চামৃতে সতী করাইল ভোজন।
দিলা নানাবিধ মধুপান উপায়ন॥

অথবা—

তুমি সে ঈশ্বর আত্ম প্রিয়তর
তোমাকে তেজে যিজনে
মিছা ধন জন সুখর কারণ
আনক ভজন যতনে।
যেন মূঢ় জনে অমৃতক তাজি
যাচি মরে বিষ খায়।
হরি হরি সিতো সেঁহি নর ভৈল
আত্মঘাতী সমুদায়।

এই সাহিত্য সম্পদ যে সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক নয় এবং তা অসমীয় ও বাংগলা উভয় সাহিত্যের সম্পদ হিসাবে গণ্য হতে পারে তা নির্ভয়ে বলা চলে।

সব চাইতে বেশী ইউরোপীয় প্রভাব পেয়েছে বলে বাংগালীকে দোষ দেওয়া চলে বটে কিন্তু বাংলা সাহিত্য সেই প্রভাবে পরিপুষ্টি লাভ করেছে এবং ভারতীয় সাহিত্যে নিত্য নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে বাংগলা সাহিত্যে যা কিছু নূতন সৃষ্টি হয়েছে, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেরই প্রধান গ্রন্থাবলী অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এবং সে সমস্ত অনুবাদ অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করেছে।

কোন যুগেই বাংগালী রক্ষণশীলতার পরিচয় দেয়নি। অতি প্রাচীনকাল হতেই সে জন্য উত্তরাপথের লোকেরা বাংগালীকে তিরস্কার করেছে। বাংগলার বিশাল নদনদীর মত বাংগালীর চিত্ত সমস্ত বন্ধকেই অগ্রাহ্য করেছে, এবং সেই কারণেই বাংগালী সাহিত্য জগতে প্রতিযুগে নূতন সৃষ্টি করতে পেরেছে। এ দৃষ্টির প্রভাবেই নানা প্রদেশের সাহিত্য প্রাদেশিক তার গণ্ডী অতিক্রম করেছিল এবং এমন একটি ভারতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল যা সমস্ত প্রদেশের লোকের চিত্তকে মুগ্ধ করতে পারত। কিন্তু প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য লাভের মোহে আমরা সাহিত্য জগতে সেই ঐক্য লাভের পথ রুদ্ধ করতে বসেছি।

কোন প্রদেশ ও তার ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করলে যে সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করে একথা মনে করবার কারণ নাই। নূতন সৃষ্টির প্রেরণা থাকলেই সাহিত্য তার গন্তব্য পথের সন্ধান পায়। বিখ্যাত ফরাসী কবি মিস্ত্রাল তার কাব্য গ্রন্থ অপ্রচলিত প্রাদেশিক ভাষায় রচনা করেও সমস্ত ফরাসীজাতির চিত্তকে মুগ্ধ করেছিলেন। অপরপক্ষে শাতোব্রিয়াঁ ও রেনাঁ, তাঁদের মাতৃভাষা ব্রেটন বর্জ্জন করে সাহিত্য রচনা করেছিলেন ফরাসী ভাষায়। শোনা যায় বিখ্যাত জার্ম্মাণ কবি গেটে তাঁর মহাকাব্য প্রথমে ফরাসী ভাষায় রচনা করতে চেয়েছিলেন। আমাদের দেশেও প্রাচীন কবিরা মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে শিক্ষার ভাষা সংস্কৃতে কাব্যগ্রন্থ রচনা করে অমর হয়ে রয়েছেন। সাহিত্য ও সভ্যতার সংগঠনে স্বাতন্ত্র্য লাভ করবার চেষ্টা যে ব্যর্থ চেষ্টা একথা যে কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করলেই বোঝা যায়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সে চেষ্টা বরং ভবিষ্যৎ অমঙ্গল সূচনা করে।

প্রবাসী বাংগালী নিজেদের গণ্ডী অতিক্রম করে প্রবাসে স্থানীয় সভ্যতার উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন না বলে অভিযোগ করা হয়। এ অভিযোগ কতদূর সত্য তা প্রবাসী বাংগালীই বলতে পারেন। অপরপক্ষে বাংগলাদেশে অন্যান্য প্রদেশের প্রবাসী লোকেরা যে নিজেদের গণ্ডী অতিক্রম করেন না তা আমরা সকলেই জানি। প্রবাসে বসবাস করবার সময় যে কোন জাতিই সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করেন, এবং নিজেদের গণ্ডী অতিক্রম করেন না, শুধু আত্মরক্ষার প্রয়োজনবশতঃ। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় সে প্রয়োজন দূরীভূত হলে ব্যবধানও নষ্ট হয়।

এ সত্ত্বেও যে বাংগালী অন্যান্য প্রদেশ হতে বহু রত্ন সংগ্রহ করে নিজেদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে তা বাংগলাদেশের সংগীতের নূতন ধারা হতে স্পষ্ট বোঝা যায়। বাংগালী

(শেষাংশে ৪৬৪ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

পৃথিবীর কয়েক সহস্র বৎসরের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলে মেলার একটি বিশেষ চারিত্রিক লক্ষণের উপর সকলেরই দৃষ্টি পড়ে। সকল দেশের সকল মেলাতেই এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়। মেলার ধর্ম্মনৈতিক ভিত্তির কথা বলিতেছি। খৃষ্টপূর্ব্ব শতকে প্রাচীন গ্রীসে মেলার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, খৃঃ পূঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে গ্রীসে চারিটি বিরাট মেলার উল্লেখ দেখা যায়। অলিম্পিক প্রভৃতি এই সকল মেলা। ডেলফির ডায়না দেবী ও গ্রীসের অন্যান্য জাতীয় দেব-দেবীর উৎসব উপলক্ষেই মেলা অনুষ্ঠিত হইত। শত সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ নর-নারী গ্রীসের বিভিন্ন গ্রাম ও নগরী হইতে এই সকল মেলায় সমবেত হইত। কেবল গ্রীস নহে বৃহত্তর গ্রীসের বিভিন্ন জনপদ—এশিয়ার উপকূল হইতে ও ভূমধ্যসাগরীয় নানা দ্বীপ হইতে বহুলোক এই সকল মেলায় উপস্থিত হইত। যেখানে এত বিভিন্ন জাতীয় বিপুল জন-সমাগম হয় সেখানে নানা দেশীয় শিল্পজাত, কৃষিজাত দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া চতুর ব্যবসায়ীরা সমবেত হয়। কখনও তাহাদের নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ উৎসবমত্ত যুবক-যুবতী, শিশু-বৃদ্ধ সকলেই উৎসবের আনন্দ-হিল্লোলে অনেক সময় অনেক সখের জিনিষ কিনিয়া ফেলে। উৎসবের দিনে মানুষের ভবিষ্যৎ চিন্তা একটু কম থাকে। যে জাতীয় লোক মেলায় সমবেত হয় তাহাদের চারিত্রিক লক্ষণ অনেকটা বে-হিসাবী গোছের, কাজেই মেলায় উপস্থিত হইয়া তাহারা অনেক সময়—অন্য সময়ে হিসাব করিয়া খরচ করিলে যাহা খরচ করিত, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করিয়া ফেলে। ধর্ম্মোৎসবে মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে ত একথা সাধারণ জ্ঞানেই প্রধানত তাহার সখের জিনিষের শ্রেণীতে পড়ে।

ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দী মেলার যুগ। এই সময় ইউরোপের অনগ্রসর আর্থিক জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব ছিল অপরিমেয়। পাদ্রী ও বিশপেরা ছিলেন সমাজের অধিপতি, তাঁহাদেরই নেতৃত্বে বহুস্থানে খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীদের শেষ ভোজ প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া অনেক বড় বড় মেলা বসিত।

প্রাচীন ভারতবর্ষেও মেলার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। তীর্থস্নান উপলক্ষে বহুলোক একত্র সমবেত হইলে অনেক সময় মেলা আরম্ভ হইত। প্রাচীনকালে কোন কোন রাজাও যে এই প্রকার মেলা প্রবর্ত্তন করিতেন তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হর্ষবর্দ্ধনের প্রয়াগের পঞ্চ-বার্ষিকী মেলার কথা উল্লেখ করা যায়। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ করিয়া মেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের উপর যে আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া যাইত, তাহা আজিও বৈশাখী পূর্ণিমায় বৌদ্ধ মেলা দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। আমাদের দেশে চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় এখনও অনেক বৌদ্ধ বাস করে। প্রতি বৎসর ভগবান তথাগতের পবিত্র জন্মদিনে এখনও সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া কপিলাবস্তুর সেই রাজর্ষিকে অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দেয়।

হিন্দুদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কত ক্ষুদ্র বৃহৎ গঙ্গা স্নান, মন্দির প্রতিষ্ঠা, সাধু-সন্ন্যাসী ও পাল-পার্ব্বণাদি উপলক্ষ করিয়া যে হিন্দুরা মেলায় সমবেত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

মেলার সৃষ্টি ধর্ম্মনৈতিক দিক হইতে হইলেও ইহার অর্থনৈতিক দিক কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। অল্পদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্তও ইহা আমাদের আর্থিক-জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বর্ত্তমানেও বহু স্থলে ইহার বিলীয়মান প্রভাব পল্লীর জনসাধারণের উপর সুপরিস্ফুট। দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত যান-বাহনাদির সুব্যবস্থা, নূতন নূতন পথের সৃষ্টি এবং ক্রমবর্দ্ধমান বাজার ও হাটের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মেলার প্রভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া আসিতেছে।

মেলার স্থায়িত্ব হাট-বাজারের মত নহে, উৎসবের আনন্দ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক মেলা উঠিয়া যায়। কোন কোন মেলা একদিনের অধিক থাকে না, আবার অনেক মেলা একমাস বা ততোধিক কাল ধরিয়া চলিতে থাকে। মেলার প্রধান কারণ ও প্রকৃতি অর্থনৈতিক। মেলার স্থায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আর্থিক কারণের উপর নির্ভর করে। যেখানে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ক্রেতা পাওয়া যায় সেইখানেই মেলা বসে। এবং এই আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্ভূত পণ্যের চাহিদার উপরই মেলা কত দিন থাকিবে তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই আর্থিক স্বচ্ছলতা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বে পর্যন্তই মেলার আবশ্যকতা থাকে। এই রেখা অতিক্রম করিলে অর্থাৎ আর্থিক স্বচ্ছলতা আবার অধিক হইলেও মেলার প্রয়োজন হয় না। কলিকাতার অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা ভাল অথচ এখানে মেলার প্রয়োজন নাই, (আবার নিতান্ত দুর্গত পল্লী-অঞ্চলেও অনেক স্থলে মেলা বসে না) কাজেই দেখা যাইতেছে যে, নাগরিকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা মেলার প্রয়োজনীয় স্বচ্ছলতার সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া এমন এক স্তরে পৌঁছিয়াছে যেখানে তাহাদের "সখের জিনিষের" জন্য মেলা প্রয়োজন হয় না— মিউনিসিপ্যাল মার্কে-টের মত বাজার সর্ব্বদা খোলা রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের দুর্গত কৃষকদের "মিউনিসিপ্যাল মার্কেটগুলিই" মেলা। তাহাদের চাহিদা সামান্য ও সাময়িক।

চাহিদার এই সামান্যতার উপরেই মেলায় উপস্থিত পণ্যের প্রকৃতি ও গুণাগুণ নির্ভর করে এবং এই সাময়িক চাহিদার জন্যই মেলার স্থায়িত্বের ইতর-বিশেষ হয়। মেলায় চাহিদা সাময়িক—এই জন্য কোন মেলাই অধিক দিন স্থায়ী হইতে দেখা যায় না। আর লোকের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চাহিদাও পৌনঃপুনিক (Recurring) হইতে থাকে, কাজেই বাস্তব সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মেলাগুলি ধ্বংস হইয়া স্থায়ী হাট-বাজারে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

মেলায় বহু প্রকার জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্য আমদানী হয়। বহুদূর হইতে ব্যবসায়ীরা অনেক সুন্দর সুন্দর শিল্প-জাত সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য মেলায় আমদানী করে। কৃষিজাত নানা জিনিষ অবশ্য মেলায় আসে, কিন্তু শিল্পজাত সামগ্রীর সংখ্যাই অধিক। পল্লী অঞ্চলে সাধারণ গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, শস্য, মাছ, তরকারী, লবণ, তৈল প্রভৃতি স্থানীয় হাট-বাজার হইতেই সরবরাহ হয়। হাট-বাজারের

পণ্যগুলি সাধারণত অধিক পৌনঃপুনিক অভাব মোচনের জন্য, কিন্তু মেলায় সমাগত পণ্যরাজি সাময়িক অভাব নিবারণ করে। অবশ্য পল্লীবাসীর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষও অনেক সময় মেলায় আসে—নানাপ্রকার ফলমূল, ডাল, কলাই প্রচুর পরিমাণে আসিলেও সমাগত পণ্যসমূহের এক গরিষ্ঠ অংশ দরিদ্র জনসাধারণের বিলাস-দ্রব্য। বিলাস-দ্রব্য অর্থে ধনীদের বিলাস-দ্রব্য বলা হইতেছে না। ধনীদের বিলাস-দ্রব্য মোটর গাড়ী। কিন্তু ছেলেমেয়ের জন্য দু'পয়সার মাটীর পুতুলই দরিদ্র কৃষকের বিলাস-দ্রব্য। সাধারণের বিলাস সামগ্রী বলিতে আমরা নানা প্রকার খেলনা, রঙীন শাড়ী, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পিগণের নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য বুঝিব। বেতের বাক্স ঝুড়ি প্রভৃতি কাঠের বাক্স, পট, শাঁখা চুড়ি প্রভৃতি সামগ্রীই মেলার প্রধান সমাগত পণ্য। অনেক স্থলে মেলায় যাত্রাগান, সার্কাস এবং নানা প্রকার রং-তামাসা দেখাইয়া চতুর লোকেরা পয়সা রোজগার করে। অধিকাংশ মেলায়ই কোথায়ও গোপনে কোথায়ও প্রকাশ্যে জুয়াখেলার ব্যবস্থা থাকে। ইহার ভালমন্দ বিচার করা হইতেছে না। শহরে ঘোড়দৌড়ে বাজি রাখিয়া অথবা বেহালায় গ্রেহাউন্ড রেসিং-এ যাইয়া লোকে যে আনন্দ পায়, ইহারাও এই সকল জুয়া খেলিয়া ঐ প্রকার মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়া থাকে।

পল্লী অঞ্চলে অনেক দেব মন্দিরের প্রাঙ্গণে অথবা অনেক বৃক্ষ দেবতার সম্মুখে বৈশাখ ও কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে অথবা ঐরূপে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে মেলা বসিতে দেখা যায়। এই প্রকার মেলার বিশেষত্ব এই যে, উহাতে পুরুষ অপেক্ষা মহিলা যাত্রীর ভিড়ই অধিক হইয়া থাকে। পুণ্যলোভাতুরা রমণীগণ দেবতার জন্য মিষ্টান্ন ভোগ ও নানা প্রকার উপহার উৎসর্গ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই প্রকার মেলার পণ্য সাধারণত মেয়েদের মনোরঞ্জনের জিনিষ—নানা প্রকার গৃহস্থালির সৌখীন জিনিষ, রকমারি খুঁচি, ডালা, চুপড়ী, খাবার, পট, শাঁখা, চুড়ি প্রভৃতির দোকানই এই প্রকার মেলায় অধিক দেখা যায়।

কেবল বাঙলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে খুব বড় বড় মেলা এখনও বসে। পুরীর রথের মেলা, কুম্ভ মেলা, হরিহর ছত্রের মেলা, গঙ্গাসাগরের মেলা ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত কত ছোট বড় মেলা যে সমগ্র দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের মধ্যে হরিহর ছত্রের মেলা ও কুম্ভ মেলা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রায় সকল প্রকার জিনিষই এই সকল মেলায় উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্রতম সূঁচ হইতে বৃহত্তম হস্তী পর্য্যন্ত—সকল প্রকার জিনিষই হরিহর ছত্রের মেলায় পাওয়া যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মধ্য ইংলণ্ডে ও ফরাসী দেশের শ্যাম্পেন প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ অনেক মেলা বসিত। শ্যাম্পেনে বৎসরে ছয়টি বৃহৎ মেলা বসিত এবং প্রত্যেকটি ছয় সপ্তাহের অধিক কাল স্থায়ী হইত। এই সকল মেলায় ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল—ইটালী, ইংলণ্ড, ফ্লাণ্ডার্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি হইতে ব্যবসায়ী ও যাত্রীরা উপস্থিত হইত। সমগ্র ইউরোপে যে কয়টি আন্তর্জাতিক মেলা বসিত উহাদের মধ্যে রুশিয়ার নিঝনী নোভোগোরোডের মেলাও সুবিখ্যাত। অতি অল্প দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই মেলায় বিস্তর জনসমাগম হইত। খেলনার জন্য প্রসিদ্ধ জার্ম্মানীর লাইপজিগের মেলায় এখনও সারা বিশ্বের খেলনা-বিক্রেতাগণ পণ্য-সংগ্রহে উপস্থিত হয়। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও উত্তর-ফ্রান্স হইতে মৌমাছির ডিম বা ছানা বিক্রয়ার্থ এই মেলায় আনা হয় প্রচুর।

লক্ষ্য করিলে মেলার আর একটি বিশেষত্ব ধরা পড়ে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মেলার ধ্বংস হয়। আমরা যতই বাস্তব সভ্যতা আয়ত্ত করিতেছি ততই মেলা ধীরে ধীরে আমাদের আর্থিক জীবন হইতে বিদায় লইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর—এমন কি কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের পল্লী জীবনে মেলা যত প্রয়োজনীয় ও সংখ্যায় যত অধিক ছিল, আজ আর তাহা নাই। আগামী পনর কুড়ি বৎসরের মধ্যে ইহা পল্লী-জীবন হইতে একেবারে বিদায় লইবে। কিন্তু সমাজের এই অবস্থায় আর এক ধরণের প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়—ইহাদিগকে "ফ্যান্সিফেয়ার" অথবা সৌখীন মেলা বলা চলে। এ অবস্থায় ইহার অর্থনৈতিক দিক পরিবর্ত্তিত হইয়া কতকটা বিলাস-ব্যসন চরিতার্থের উপায়ে পরিণত হয়। আমাদের দেশে এই অবস্থা আসিবার অনেক বিলম্ব আছে মনে হয়।

এইবার মেলায় ব্যয়িত ক্রয়-শক্তি-সমষ্টির কথা ধরা যাউক। হাট-বাজার প্রভৃতিতে মোট যে পরিমাণ ক্রয়-শক্তি ব্যয়িত হয় মেলায় তাহা অপেক্ষা অনেক কম অর্থ ব্যয় হয়। হাট-বাজার ও মেলার ক্রয়-শক্তির অনুপাত নির্ণয় করা কঠিন, তবে একদিক হইতে এদিকে একটু অগ্রসর হওয়া যায়। মেলা ; প্রদর্শনী (Exhibition) ও সৌখীন মেলা (Fancy fair) নহে। যে সমাজে ব্যাপক সেখানকার অর্থনৈতিক নিয়মানুসারে লোকেরা হাট-বাজার হইতে দৈনন্দিন সাংসারিক জিনিষপত্র ক্রয় করে এবং মেলা ইত্যাদি হইতে "সখের" জিনিষ ক্রয় করে। অতএব সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, জনসাধারণের পৌনঃপুনিক অভাবের তুলনায় অপৌনঃপুনিক অভাবের অনুপাত অনুসারে হাট-বাজারের সহিত মেলার ক্রয়শক্তির অনুপাত নির্ণীত হইবে। বলা যাইতে পারে যে, দরিদ্র জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যই যখন সংগ্রহ হয় না তখন আর তাহাদের অপৌনঃপুনিক পণ্য কিনিবার সামর্থ্য কোথায়। কিন্তু পৌনঃপুনিক কথাটি আপেক্ষিক। দশটাকা মাহিয়ানার চাকরের নিকট যাহা অপৌনঃপুনিক একশত টাকা মাহিনা কেরাণীর নিকট তাহা অবশ্য অপ্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় খরচের উপর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইতেই সাধারণে রাষ্ট্রকে কর দেয়। ইহাকে করদান ক্ষমতা (Taxable capacity) বলে। মেলাগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, সাধারণের প্রয়োজনীয় খরচের উদ্বৃত্ত কত সামান্য এবং তাহাদের করদান ক্ষমতা কত কম।

লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের সখের জিনিস-পত্রের উপর খরচ বাড়িয়া যাইবে। কারণ, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন অনেকটা সুনির্দ্দিষ্ট, কিন্তু সুখ (comfort) ও বিলাসের (luxury) উপকরণ অবস্থার উন্নতির সহিত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এইপ্রকার উন্নতির পর আর মেলা থাকিবে না। তখন প্রত্যেক অঞ্চলেই স্থায়ী বাজারের সৃষ্টি হইয়া যাইবে। কারণ, এই সময় চাহিদা আর সামান্য অথবা সাময়িক থাকে না, ব্যাপক ও নিয়মিত চাহিদার জন্য স্থায়ী

দোকান-পাটের দরকার হয়। এখানে একটি কৌতুকোদ্দীপক লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে আমাদের পল্লী অঞ্চলের হাট-বাজার ও মেলাগুলির ঘনত্ব লক্ষ্য করা। বাঙলার প্রায় সর্ব্বত্রই বসতি মাইলে ২৫০ জন-এর অধিক; কাজেই আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে মাইল প্রতি একাধিক বাজার হাট হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে অনেক স্থলে এখন চার-পাঁচ মাইলের মধ্যেও ভাল বাজার মিলে না।

বিভিন্ন পল্লীর ভিতর যোগসূত্র রক্ষার দিক হইতেও মেলাগুলি অনেক কাজ করে। গ্রামের লোকেরা কোন সময় গো-যানে, পদব্রজে ও সুযোগ থাকিলে, রেল, মোটর, নৌকা, ষ্টীমার প্রভৃতিতে মেলায় সমবেত হইয়া নূতন নূতন লোক ও ভাবধারার সহিত পরিচিত হয়। এই উপলক্ষে যান-বাহনাদির ব্যয়ও নগণ্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অল্পদিন পূর্ব্বের চূড়ামণি যোগের কথা উল্লেখ করা যায়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যলোভাতুর নরনারীর নিকট হইতে রেল-ষ্টীমার কোম্পানী বেশ কিছু লাভ করিয়াছে। পুণ্য-স্নানে মোক্ষলাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও আনন্দ সঞ্চয় পল্লীবাসীর দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত ও উদার করে। এদিক হইতেও ইহার প্রয়োজন যথেষ্ট।

মেলাগুলির ধর্ম্মনৈতিক ভিত্তির উপর বিশেষ জোর না দিয়া যদি ইহার বৈজ্ঞানিক আর্থিক ভিত্তির উপর মনোযোগ দিয়া ইহাকে দৃঢ়তর ও কল্যাণকর করিবার চেষ্টা করা হয় তবে অনেকটা আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এইভাবে বিবেচনার সহিত অগ্রসর হইতে পারিলে ইহা দ্বারা জাতি-গঠনমূলক অনেক ভাল ভাল কাজ করিয়া লওয়া যায়।

আমরা যে শ্রেণীর মেলা আলোচনা করিতেছি, প্রদর্শনীর সহিত ইহাদের পার্থক্য সুপরিস্ফুট। প্রদর্শনীগুলি আমাদের জাগ্রত আর্থিক চিন্তাপ্রসূত, কিন্তু যে ধরণের মেলাগুলির আলোচনা করিতেছি সেগুলি মানুষের আদিম ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিরই স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপ এবং তাহারই সহিত অবচেতন আর্থিক চিন্তার ধারা মিশিয়া মধ্যযুগীয় মেলাগুলির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মনৈতিক ভিত্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া যখন পরিপূর্ণ জাগ্রত আর্থিক বুদ্ধিদ্বারা মেলাগুলিকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় তখনই সেগুলিকে প্রদর্শনী বলা চলে। এইপ্রকার প্রদর্শনী নিয়ন্ত্রিত করিয়া যত অধিক পরিমাণে সেগুলিকে জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করা যায় ততই তাহা জাতির পক্ষে মঙ্গলদায়ক। প্রদর্শনীর সহিত মেলার আর একটি পার্থক্য হইতেছে পণ্যের শ্রেণীবিভাগ লইয়া। প্রদর্শনীগুলি নাগরিক, মেলা প্রধানত গ্রাম্য; প্রদর্শনীর আমদানী পণ্য উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ব্যবহারোপযোগী। দরিদ্রেরা সেখানে না ক্রেতা না বিক্রেতা; মেলা পূর্ণত দরিদ্রের, শতকরা নব্বই জন গ্রামলোকের আর্থিক অবস্থার সহিত মেলার নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। গ্রাম্য মেলায় সমাগত পণ্যরাজী দরিদ্রের ক্রয়-শক্তিকে পরাস্ত করিয়া যায় না, তাহাদের বিলাস সামগ্রী, তাহাদের ক্রয়শক্তির মতই সামান্য ও ধনীর নিকট তুচ্ছ। কিন্তু এ সকল ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা দরিদ্র জনসাধারণ যে তৃপ্তি (satisfaction) পায় তাহা বোধ হয় ধনীর তৃপ্তির তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। অতএব দরিদ্র জনসাধারণের এই সকল অভাব ও তাহার পূরণের উপায় কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে।

আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম ইহাদ্বারা আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। বর্ত্তমান আর্থিক কাঠামোর বদলের দিনে মেলাগুলিকে যদি কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর রূপে দেওয়া যায় তবে দেশের আর্থিক চিন্তাধারা ও উৎপাদন প্রথা অনেকটা আয়ত্তে আনা সম্ভব হইতে পারে। ধর্ম্মোৎসব বা উৎসবের সময় মানুষের মন অনেকটা চিন্তা-বিমুক্ত থাকে, কাজেই এই সময়ের ছাপ নরনারীর মনের উপর দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই সুযোগে মেলায় বিনা পয়সায় ছায়া-চিত্র, বক্তৃতা, রেডিও প্রভৃতির সাহায্যে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির প্রসার, কুসংস্কার বর্জ্জন প্রভৃতি শিক্ষা দিতে পারিলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে মেলাগুলির মধ্য দিয়া প্রচারকার্য্য চালাইতে হইলে যথেষ্ট বিবেচনা ও কৌশলের প্রয়োজন। পল্লীর লোক দরিদ্র, পয়সা খরচ করিয়া তাহারা প্রদর্শনীতে যাইতে পারে না, এইজন্য আনন্দ কৌতুকের মধ্য দিয়া শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তাহাদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। আর ইহার প্রধান অবলম্বন হইল এই মেলাগুলি।

লড়ায়ের শেষ কোথায়

(৪১৫ পৃষ্ঠার পর)

চালাতে পারে—সেই মৈত্রীবোধ আমাদের হৃদয়ে আজও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমাজের মঙ্গলের জন্য যে টাকা ব্যয় করা উচিত—আমরা অন্ধের মতো সেটাকে ব্যয় করছি কামান-বন্দুকের পিছনে মানুষ মারবার জন্য। অর্থনীতিকে আজও আমরা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরে দাঁড় করাতে পারিনি। আমাদের পাদ্রী আর পুরোহিতেরা আধ্যাত্মিকতাকে ধ্যান-ধারণার রাজ্যে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। অর্থ-নৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের বোধকে জাগ্রত ক'রে তুলবার একান্ত প্রয়োজন আছে—এ বোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। শয়তান তাই বাণিজ্যের নামে দস্যুতা করছে—দেশপ্রেমের নামে অন্য দেশের সম্পদকে লুটে নিচ্ছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যকে যতক্ষণ আমরা স্বীকার না করছি, ততক্ষণ যুদ্ধকে পৃথিবী থেকে অপসারিত করা অসম্ভব।

পুস্তক পরিচয়

Beware of the Cobweb ("বিওয়্যার অফ্ দি কব্‌ওয়েব")—শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত। ৫৫, জয়মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

ভারতবর্ষ, বিশেষ করিয়া বাঙলার রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ও সমস্যার কথা পুস্তকখানিতে বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজনীতিক গতি ও ধারা বাঙলার হিন্দুদের কিরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে ইহা পাঠে তাহাও জানা যাইবে। নানা তথ্যও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মানুষের ধর্ম্ম ও মাংসাহার—শ্রীধরণীকুমার সিংহ। শ্রীসন্নতি পুস্তকালয় (প্রচার বিভাগ) ২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পুস্তিকাখানায় নিরামিষাহারের পক্ষ সমর্থন করা হইয়াছে এবং ভিটামিনযুক্ত নিরামিষ দ্রব্যের একটি তালিকা দেওয়া আছে।

গোপ জাতির নব জাগরণ—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় লিখিত। মুসাপুর বিবেকানন্দ সমিতি হইতে তুলসীচরণ যাদব কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকখানিতে গোপজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। লেখা ভাল, যুক্তি-কৌশল সুন্দর এবং অকাট্য। মূল্য ৵০ দুই আনা।

ভারতবর্ষ—পৌষ সংখ্যা। ডাক্তার আশুতোষ শাস্ত্রী লিখিত 'দর্শনের নিরুক্ত', দিলীপকুমারের 'হয়ে ওঠা', ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের লিখিত 'প্রাচীন ভারতীয় সৌধ-শিল্প', শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের 'জাপানী কবিতায় জোনাকি', পৌষ সংখ্যার ভারতবর্ষকে প্রবন্ধ-গৌরবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। 'অঙ্গার গ্যাস', 'ভারতীয় সঙ্গীত', 'ডাকঘর', 'ইংরেজী অভিধানে বাঙলা শব্দ' তথ্যপূর্ণ অথচ কৌতূহলোদ্দীপক রচনা। 'মুমূর্ষু পৃথিবী', 'মায়া প্রজাপতি' ক্রমশ চলিতেছে। ছোট গল্পের মধ্যে বনফুলের 'শ্রীধরের উত্তরাধিকারী', ভাস্করের লিখিত 'মডার্ণ ফুলশয্যা', 'ডিফিসিট বাজেট'ও উল্লেখযোগ্য। ভ্রমণকাহিনী দুইটি চিত্তাকর্ষক এবং বহু চিত্রে সুশোভিত।

সাহিত্য-সংবাদ

গল্প ও ছবি প্রতিযোগিতা

সুহৃদ সঙ্ঘ, বাগবাজার অনুষ্ঠিত "গল্প ও ছবি প্রতিযোগিতা"র শেষ তারিখ আগামী ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৯ সাল ধার্য্য করা হইল। প্রতিযোগিগণের নিকট অনুরোধ, তাঁহারা যেন উক্ত তারিখের মধ্যে তাঁহাদের গল্প বা ছবি প্রেরণ করেন।

১। শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, যুগ্ম-সম্পাদক সুহৃদ-সঙ্ঘ, ২৪১ নং বাগবাজার রোড। ২। শ্রীনীতীশ সেনগুপ্ত সম্পাদক, "প্রীতি", ২৩৭ নং বাগবাজার রোড।

ঠিকানা সংশোধন

বিগত ৫ম সংখ্যা 'দেশ'-এ সাহিত্য-সংবাদ প্রসঙ্গে ৩২৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে শ্রীপ্রমোদকুমার ঘোষ ও শ্রীসুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ঠিকানা 'পোঃ ব্রাহ্মণদী ভায়া যদরপুর, ফরিদপুর' স্থলে 'পোঃ ব্রাহ্মণদী ভায়া সদরপুর, ফরিদপুর' হইবে।

নিখিল বঙ্গীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

"বর্ত্তমান সমাজে নারীর স্থান" বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন, তাঁহাকে "পাঁচথুপী" বাণী মন্দিরের পক্ষ হইতে রাধাগোবিন্দ রায় সুবর্ণ স্মৃতি-পদক বিতরণ করা হইবে। আগামী ১৯৩৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পাদক "বাণী মন্দির" পাঁচথুপী পোঃ (মুর্শিদাবাদ) ঠিকানায় রেজিষ্টারীযোগে প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে। শ্রীসুনীলমোহন ঘোষ—সম্পাদক।

তারিখ পরিবর্ত্তন

শিবপুর তরুণ সমাজের সাহিত্য বিভাগ হইতে ৫ম বর্ষ ৪৯ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় নিখিল ভারত বাঙলা কবিতা প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং কবিতা পাঠাইবার শেষ তারিখ ছিল ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৮। প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ কবিতা পাঠাইবার শেষ তারিখ ধার্য্য করা হইল।

—শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, শিবপুর তরুণ সমাজ, ১৫৪, শিবপুর রোড, হাওড়া।

বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতির অভিভাষণ

(৪৫৬ পৃষ্ঠার পর)

যে অন্যান্য প্রাদেশিক সভ্যতা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞা করে—এ অভিযোগও সম্পূর্ণ মিথ্যা। অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের কোন নূতন প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাঙ্গালীর চোখ এড়িয়ে যায় না। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে যে সৃষ্টি প্রাদেশিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে ওঠে তাকে [illegible] করবার প্রয়োজনীয়তা কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না, সে নিজগুণে সকলকেই উদ্বুদ্ধ করে, সে প্রভাব হতে বাঙ্গালীও বাদ যায় না।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রবাসী বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার মনে হয় যে, ক্রমশঃ বর্দ্ধমান প্রাদেশিক মনোভবের দ্বারা প্রবাসী বাঙ্গালীর বিচলিত হবার কোন কারণ ঘটেনি। সাহিত্য বা শিল্পে যে সৃষ্টি সত্য এবং যা দেশ ও কালকে অতিক্রম করে ওঠে তা কোন প্রদেশেরই নিজস্ব বস্তু নয়। সুতরাং আমরা যদি এক্ষেত্রেও সেই সত্যনিষ্ঠা নিয়ে চলি তাহলে প্রবাসে আত্মরক্ষার জন্য পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন হবে না। বরং আমাদের সেই নিষ্ঠা পরিশেষে প্রাদেশিকতা দোষকে দূরীভূত করে সাহিত্য ও শিল্প জগতে যে ঐক্য আনবে তার দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষ [illegible]

নিউ থিয়েটার্সের নবতম বাঙলা ছবি "অধিকার" আগামী ১৪ই জানুয়ারী চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের অধিবাসীদের সকলেরই সমাজের কাছে সমান অধিকার আছে কিনা— "অধিকার" ছবির কাহিনীতে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। ছবিখানা পরিচালনা করিয়াছেন প্রমথেশ বড়ুয়া; তিমিরবরণ এই ছবির সুর-শিল্পী। অভিনয় করিয়াছেন প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনা, মেনকা, পাহাড়ী সান্ন্যাল, চিত্রলেখা, পঙ্কজ মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী ইত্যাদি।

নীতীন বসুর পরিচালনায় হিন্দী ছবি "দুষমনের" কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলিয়াছে। সম্প্রতি এই ছবির জন্য এক "স্বাস্থ্য-নিবাসের" দৃশ্য তোলা হইয়াছে। ঐ দৃশ্যে অভিনয় করিয়াছেন সায়গল, নাজাম, পৃথিবরাজ এবং লীলা দেশাই।

অমর মল্লিকের পরিচালনায় "বড়দিদি" ছবি তোলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। দেবকী বসুর পরিচালিত "সাপুড়ে" ছবিতে সুর বাঁধিতে সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল বর্ত্তমানে বিশেষ ব্যস্ত। "সাপুড়ে"র হিন্দী এবং বাঙলা উভয় সংস্করণ তোলা হইবে। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাইবে কাননবালা, পাহাড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, পৃথ্বীরাজ, মেনকা, কৃষ্ণচন্দ্র, নবাব, শ্যাম-লাহা, অহি সান্ন্যাল ইত্যাদিকে। তরুণ পরিচালক ফণী মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা"কে হিন্দুস্থানী চিত্ররূপ দিতেছেন। লীলা দেশাইকে নাম ভূমিকায়, নাজামকে নবকুমার বেশে এবং কমলেশকুমারীকে মতিবিবির চরিত্রে দেখা যাইবে।

* * *

আমেরিকা হইতে সদ্য আগত মার্কাস ফলিজ শুক্রবার, ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ফার্ষ্ট এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছেন। শুনা যায় যে, মার্কাস অভিনেতৃ সম্প্রদায় মার্কিন মুলুকে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ সুনামের সহিত অভিনয় করিয়া আসিতেছেন।

নৃত্য-গীতপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যের অবতারণা করিয়া দর্শককে আনন্দ দেওয়াই এই সম্প্রদায়ের বিশেষ কৃতিত্ব।

* * * * *

চৌরঙ্গী অঞ্চলের প্লাজা সিনেমা নববর্ষের প্রারম্ভেই হস্তান্তর হইবে বলিয়া প্রকাশ। এবং আরও প্রকাশ যে, অতঃপর প্লাজা সিনেমাতে নূতন ছবি মুক্তিলাভ করিবে। এতাবৎ উক্ত চিত্রগৃহে পুরান ছবিই দেখান হইত। নূতন

ব্যবস্থাপনায় টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের নূতন হাস্য-গীতি-মুখর ছবি "থ্রি ব্লাইণ্ড মাইস" আগামী রবিবার, ১লা জানুয়ারী হইতে প্রদর্শন আরম্ভ হইবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন জোয়েল ম্যাক্রিয়া এবং লরেটা ইয়ং।

* * * *

"মজদুর-কি-বেটী" চিত্রে শ্রীমতী রতন বাই

বোম্বাইয়ের প্রকাশ পিকচার্সের সমাজ সমস্যামূলক ছবি "পূর্ণিমা" গত বৃহস্পতিবার দিন চিৎপুরের সিটি সিনেমাতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ইহাতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন সরদার বানু। ছবির কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে এক পতিতা নারীকে কেন্দ্র করিয়া।

ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীর নূতন চিত্র "মজদুর-কি-বেটী" বর্ত্তমানে রূপবাণী সিনেমায় দেখান হইতেছে। পথিক এবং পথচারী ধার্ম্মিকের মনে করুণার উদ্রেক করিয়া এক দল ভিখারী কেমন কৌশলে ব্যবসা চালায় তাহা সুন্দভাবে এই ছবিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমতী রতনবাঈ ছবির নায়িকা এবং অন্যান্য ভূমিকায় হাফেসজী এবং জামসেদজী অভিনয় করিয়াছেন।

ফিনল্যান্ডের ব্যায়াম সাধনা সফল হইল

১৯৪০ সালের বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভার ফিনল্যান্ডের উপর অর্পিত হইয়াছে। ফিনল্যান্ডের অধিবাসিগণের আজ আনন্দের সীমা নাই। ঘরে ঘরে আজ উৎসব দেখা দিয়াছে। সকল শ্রেণীর, সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছে। এই বিরাট অনুষ্ঠানের সকল ব্যবস্থা করা—কিরূপে এই দুই বৎসরের মধ্যে সম্ভব হইবে, এই চিন্তা, এই উৎকণ্ঠা তাহাদের মনে স্থান পাইতেছে না। তাহারা ঈশ্বরের উপর পূর্ণ আস্থা রাখিয়া যেন কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইবেই—ইহা যেন তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বের সকল জাতির ব্যায়ামবীরগণের আপ্যায়িত করিবার অধিকার তাহারা লাভ করিয়াছে; ইহাই যে তাহাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়! বিশ্বের সকল জাতি আজ ফিনল্যান্ডকে ব্যায়াম-জগতে সম্মান দান করিয়াছে, ইহাই পরম গৌরবের বিষয়। ৪০ বৎসর ধরিয়া তাহারা শত বাধা, শত নির্য্যাতনের মধ্যেও ইহার জন্যই সাধনায় লিপ্ত ছিল।

"নির্য্যাতন" শব্দটি অনেকের নিকট অসঙ্গত মনে হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই ফিনল্যান্ডের অধিবাসিগণকে ব্যায়াম বিষয়ে উন্নতি করিতে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। ফিনল্যান্ডের ব্যায়াম-ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহা জানিতে পারা যায়।

ফিনল্যান্ডের ব্যায়াম-ইতিহাস

প্রাচীনকালে ফিনল্যান্ডে খেলা-ধূলা বা ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রচলন ছিল। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে ফিনল্যান্ডের অধিবাসিগণ খেলা বা ব্যায়াম-চর্চ্চা করিত, ইহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ফিনল্যান্ডের অধিবাসিগণ যে সকল খেলা-ধূলা বা ব্যায়াম-চর্চ্চা করিয়া থাকে, তাহার অস্তিত্ব ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল না। ফিনল্যান্ডের জাতীয় ইতিহাসের সহিত ব্যায়াম-চর্চ্চার ইতিহাস বিশেষভাবে জড়িত। সুতরাং ব্যায়াম-ইতিহাস আলোচনা করিলে জাতীয় ইতিহাসকে বাদ দেওয়া যায় না। ফিনল্যান্ড পূর্ব্বে সুইডেন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৬০০ বৎসর সুইডেনের সহিত জড়িত থাকিবার পর সর্ব্বপ্রথম ১৫৮১ সালে ফিনল্যান্ড স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ১৮০৯ সালে পুনরায় রুশিয়ার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাশিয়ার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। রুশিয়ার জার হঠাৎ দয়াপরবশ হইয়া ফিনল্যান্ডকে স্বায়ত্ত-শাসন দান করেন। ফিনল্যান্ডের পরিচালকমণ্ডলী তখন দেশের বাণিজ্য, শিক্ষা, দীক্ষা বিষয়ে উন্নতি করিবার জন্য চেষ্টা করেন। অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা, দীক্ষা, বাণিজ্য, সকল বিষয়ে ফিনল্যান্ডের অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই উন্নতি রুশিয়ার রাষ্ট্র-পরিচালকগণকে বিচলিত করে। তাঁহারা ফিনল্যান্ডকে রুশিয়ার আচার, রীতি-নীতিতে পরিচালিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইহার ফলে ফিনল্যান্ড অধিবাসিগণকে অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। ফিনল্যান্ডের প্রথায় গঠিত সৈন্য-বাহিনী তাঁহারা ভাঙ্গিয়া, রাশিয়ান প্রথায় সৈন্য-বাহিনী গঠন করিলেন। এই সময়ের ফিনিশ সৈন্যগণ বৈদেশিক খেলা-ধূলা ও সুইডিস ব্যায়াম-চর্চ্চার কিছু কিছু কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সৈন্য-বাহিনী হইতে বিতাড়িত হইয়া দেশে গিয়া বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট ব্যায়ামাগার স্থাপন করিলেন। ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই ফিনল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রায় একশতটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া দেখা গেল। এই সময় ব্যায়ামাগারে যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ব্যায়াম-কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার জন্য কয়েকজন উৎসাহী ফিনিস সৈনিক একত্র মিলিত হইয়া ফিনিস জিমন্যাষ্টিকস ও এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন গঠন করিলেন। ১৯০০ সালে ফিনল্যান্ডের সকল ব্যায়ামাগার ও ক্লাব এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগদান করিলেন। ইহা রাশিয়ান গবর্ণমেণ্টের চক্ষে ভাল লাগিল না। তাঁহারা বিপ্লবের ধোঁয়া দেখিতে পাইলেন। ফলে হইল এই যে, ফিনিশ জিমন্যাষ্টিক ও এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন রাশিয়ান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। এসোসিয়েশনের পরিচালকগণকে রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী করা হইল। কয়েকজন কারাবরণ করিলেন ও কয়েকজন গোপনে এই এসোসিয়েশনের কার্য্য করিতে লাগিলেন। এসোসিয়েশন বে-আইনী হইয়া বন্ধ রহিল, কিন্তু ফিনল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে ব্যায়ামাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্পোর্টস অনুষ্ঠানের সংখ্যাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। রাশিয়ান গবর্ণমেণ্টের চতুর গুপ্তচরগণও এসোসিয়েশনের কার্য্য বন্ধ করিতে পারিলেন না। ১৯০৪ সালে রাশিয়ান গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল ফিনল্যান্ডের অধিবাসিগণকে মুক্ত বায়ু সেবনের সুবিধা দান করিল। এসোসিয়েশনের উপর যে আইন জারী করা হইয়াছিল, তাহা উঠিয়া গেল। এমন কি, ১৯০৬ সালে রাশিয়ান গবর্ণমেণ্ট ফিনিশ জিমন্যাষ্টিক ও এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের নিয়মাবলী অনুমোদন করিলেন। এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ পূর্ণ উদ্যমে কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন। ব্যায়ামাগারসমূহে নিয়মিতভাবে ফিনল্যান্ডের উৎসাহী বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীগণকে এ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন বিষয় ও সুইডিস ব্যায়াম-প্রথা শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল।

বিশ্বঅলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদান

১৯০৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে যোগদানে ফিনিশ এথলীটগণকে রুশ পতাকা বহন করিতে বাধ্য হয়। ১৯১২ সালে ষ্টকহম অলিম্পিকে উহারা নিজ দেশের পতাকা বহন করে। রুশসরকার রুষ্ট হয়। ১৯১৪ সালে অলিম্পিক কমিটিতে ফিনিশদের নিন্দামূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯১৭ সালে বলশেভিকগণ প্রবর্ত্তিত রাশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইলে ফিনিশ এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। ইহার ফলস্বরূপে ফিনল্যান্ডের অধিবাসিগণ মুক্ত জাতি হন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২০শে ডিসেম্বর—

রাজকোট রাজ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে দরবার গোপালদাস দেশাই গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে রাজকোটে হরতাল পালিত হইতেছে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়ার টালা পার্কে ২২ বৎসরের একটি যুবতীর মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। যুবতীটির দেহ, হস্তপদ ও মুখ তাহার পরিধানের শাড়ী দিয়া বাঁধা অবস্থায় ছিল এবং তাহার তলপেটে গভীর ক্ষত দেখা যায়। এই সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

রেঙ্গুনে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রত্যেক সরকারী দপ্তরখানার সমস্ত প্রবেশপথে বসিয়া পিকেটিং করিতেছে। পুলিশের লাঠি চার্জ্জের ফলে শতাধিক ছাত্র আহত হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র-সচিব ক্লিভল্যাণ্ডের ইহুদী সমিতিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে "ফ্যাসিজমকে" তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন,—"বর্ত্তমান যুগের এক-নায়কত্বশীল রাষ্ট্রের অবস্থার সহিত যদি মধ্যযুগের অবস্থার তুলনা করা হয়, তাহা হইলে মধ্যযুগকে অবমাননা করা হইবে। এই সব রাষ্ট্রের সহিত প্রকৃত তুলনা করিতে হইলে তোমাদিগকে আদিম বর্ব্বর যুগের সন্ধান করিতে হইবে।"

কমন্স সভায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির নিন্দা করিয়া শ্রমিক দল কর্ত্তৃক আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ৩৪০—১৪৩ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

'সানডে টাইমস'-এর বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, একটি স্বাধীন ইউক্রেনিয়ান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বার্লিনে জোর আন্দোলন চলিতেছে। উক্ত সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন যে, রুথেনিয়া, পোল্যাণ্ড এবং রুশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড এবং রুমানিয়ার কিয়দংশ লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত হইবে।

'ফ্র্যাঙ্কফুর্টার জাইতুং' নামক একটি জার্ম্মান পত্রিকা বৃটেনকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, টিউনিস লইয়া যদি ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে জার্ম্মানী ইটালীর সহিত যোগ দিবে।

জার-সমর্থক সমরনায়ক জেনারেল ডেনিকাইন প্যারিসে একটি চাঞ্চল্যকর বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, হের হিটলার জার সমর্থক সমরনায়কগণের সাহায্যে শুধু ইউক্রেন নয়, পরন্তু জর্জ্জিয়া জয় করিয়া মধ্য এশিয়া পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তারের সংকল্প করিয়াছেন।

২১ ডিসেম্বর—

রাজকোটে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে দরবার গোপালদাস দেশাইয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা ভক্তিবাঈ দেশাই গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পরলোকগত ডাঃ এম এ আন্সারীর পত্নী বেগম আন্সারী দিল্লীতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

লাহোর ষ্টেশনে এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে দুইজন ভারতীয় সৈন্য সামান্য আহত হইয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের উদ্যোগ-আয়োজন জোর চলিতেছে। সভাপতি সম্বর্দ্ধনার জন্য নূতন এবং চমকপ্রদ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হইবে। ৫২টি সুসজ্জিত হস্তী সভাপতির রথ টানিবে। গত ফৈজপুর এবং হরিপুর কংগ্রেসে ঘোড়ার পরিবর্ত্তে বলদ দিয়া সভাপতির রথ টানাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

"হিন্দু যুবকগণ, দৃঢ় হও এবং তোমাদের 'বন্দে মাতরম' সংগীত গাহিবার অধিকার সাব্যস্ত কর।"—হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর নিজাম রাজ্যের হিন্দু যুবকদের নিকট উপরোক্তরূপ বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক চীনকে ঋণ দান সম্পর্কে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে 'কোকুমিনসিম্বুন' নামক একখানি জাপানী সংবাদপত্র নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন—"এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত নিদর্শন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিতে হইবে।"

২২শে ডিসেম্বর—

কেন্দ্রীয় পরিষদের সীমান্তের সদস্য এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা খাঁ আবদুল কোয়াম মীরাট জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "মুশ্লিম লীগের অনেক নেতাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এজেণ্ট। অশিক্ষিত জনগণের চোখে ধূলা দিয়া তাঁহারাই ভারতবর্ষে ইসলাম বিপন্নের মিথ্যা ধুয়া তুলিয়াছিলেন। কংগ্রেস ইসলামের বিপদের কারণ নহে। একমাত্র ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদ—বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই ইসলাম ধর্ম্মের পতনের জন্য দায়ী।"

মুক্তাগাছার স্বনামধন্য জমিদার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল।

রেঙ্গুনে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া গবর্ণর ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীরা যে কোন অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কাশীতে ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। মালব্যজী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—"ভারতের স্বাধীনতার সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ভারত যে এখনও এক সুদূর দেশের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা ভারতের পক্ষে অতীব কলঙ্কের বিষয়। অপর সব কিছু ভুলিয়া আমাদের এখন সকল উৎসাহ উদ্যম স্বাধীনতা অর্জ্জন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করা দরকার।"

লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিলের অধিবেশন হয়। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৯৩৫ সালে টিউনিস ও উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল, ইতালী সরকার তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্র হওয়ার

ফ্রাঙ্কো অধিকৃত স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে, তথায় বে-সামরিক অধিবাসীদের সাহায্যে ফ্রাঙ্কোর সৈন্যেরা বিদ্রোহ করে এবং ইতালীয়ান, জার্ম্মান ও মুর সৈন্যদের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। ইহার ফলে দুই সহস্র বন্দীকে মেসিনগান দাগিয়া হত্যা করা হয়।

জার্ম্মানীর রাজবন্দী পিটার ফরষ্টার গত মে মাসে জার্ম্মানীর এক বন্দিনিবাস হইতে পলায়ন করে এবং পলায়ন করিবার সময় একজন রক্ষীকে হত্যা করে। ভেইমার কারাগারে কুঠার দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করা হইয়াছে।

মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ আইকসের বক্তৃতা সম্পর্কে সরকারীভাবে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য জার্ম্মানী যে দাবী জানাইয়াছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে।

২৩শে ডিসেম্বর—

রাজকোট সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে দরবার গোপালদাস দেশাই একমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

রাজকোটের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়া প্রজা প্রতিনিধিব সভাপতি শ্রীযুক্ত পোপতলাল আনন্দ কলিকাতায় বড়লাটের নিকট তার করিয়াছেন।

ওয়ার্দ্ধার নির্দ্দেশ অনুযায়ী হায়দরাবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখা হইয়াছে।

কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া সংগঠন সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ বলেন যে, কংগ্রেসকে সকল দিক দিয়া শক্তিশালী করিয়া তোলাই এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী এক সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। উহাতে তিনি বলেন,—"পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ইহা লাভের জন্য আমরা অনেক দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি—আরও বহু দুঃখ-কষ্ট আমাদের মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। আপনারা সকলে পরস্পরের সহযোগিতায় অধিকতর শক্তিশালী হইয়া দুঃখিনী দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করিবার ব্রত গ্রহণ করুন।

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ দমদম থানার এলাকার পাতিপুকুরস্থিত পোড়ো বাগানবাড়ীতে এবং ঘাড়ভাঙ্গার খালের জলের মধ্যে দুইটি মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

চীনা মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, চীনাবাহিনী ক্যাণ্টনের ৩০ মাইল পূর্ব্বদিকবর্ত্তী সেচংচেং আক্রমণ করিয়াছে। জাপানীরা ক্যাণ্টন হইতে সৈন্য আমদানী করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু চীনারা বাধা দিতেছে। চীনারা এই দাবী করিতেছে যে, তিন দিনব্যাপী সংগ্রামের পর তাহারা সাংহাইয়ের পূর্ব্বদিকবর্ত্তী ন্যানহুয়েই সহর দখল করিয়াছে।

মার্কিণ স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ আইকস-এর বক্তৃতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে জার্ম্মান সরকারী মহল কোনরূপ মন্তব্য করিতে রাজী নন। তবে 'রয়টার' জানিতে পারিয়াছেন যে, জার্ম্মান পররাষ্ট্র বিভাগ মার্কিন গবর্ণমেণ্টের উত্তরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং পররাষ্ট্র দপ্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে।

২৪শে ডিসেম্বর—

বাঙলায় কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু বোম্বাই-এ সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত পুনরায় আলোচনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি বসু সহসা তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-সূচী বাতিল করিয়া ওয়ার্দ্ধায় যাত্রা স্থির করিয়াছেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পরিচালনায় এলাহাবাদে যুক্ত-প্রদেশের জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসের মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা হয়। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর সকল কার্য্যই যাহাতে বিশেষভাবে মুসলমান জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে, সেজন্য উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যেই নাকি এই আলোচনা হয়।

দমদম থানার এলাকায় পাতিপুকুরস্থিত পোড়ো বাগানবাড়ীতে এবং ঘাড়ভাঙ্গার খালের জলে প্রাপ্ত মৃতদেহ দুইটির সনাক্ত হইয়াছে। সনাক্ত হওয়ার পর জানা গিয়াছে যে, মৃত যুবক দুইটির বাসস্থান কলিকাতায় এবং উভয়েই বাঙ্গালী হিন্দু।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম রাও জয়াকরকে প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির সদস্যপদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে এবং তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

গৌহাটীতে নিখিল ভারত মেডিকেল লাইসেন্সিয়েট সম্মেলনে ঊনত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং ডি ডি বেঙ্কাপ্পা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড ক্রেগাভন ও মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ৩৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিগণকে আইরিশ গণতান্ত্রিক বাহিনীর লোক বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। আইরিশ জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে আইরিশ গণতান্ত্রিক বাহিনী উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

"ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান"-এর বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মানী ক্রমশ এক আভ্যন্তরীণ সংকটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি লিখিতেছেন যে, নাৎসী শাসনের প্রতি অধিকাংশ জার্ম্মানের শ্রদ্ধা নাই; এবং বহু জার্ম্মান বাহিরে নাৎসী হইলেও ভিতরে ভিতরে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদদাতা আরও লিখিয়াছেন যে, আগামী বৎসরের প্রারম্ভে সামরিক উদ্যমের জন্য জার্ম্মানী প্রস্তুত হইতেছে।

মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার 'হরিজন' পত্রিকায় মাদক দ্রব্য বর্জ্জন

ব্যবস্থা আরও দ্রুততর করার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই কার্য্যের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি শহর অঞ্চলে নূতন কর ধার্য্য করার এবং যে স্থলে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করা সম্ভব নয়, তথায় ভারত সরকারের নিকট হইতে বিনাসুদে ঋণ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আগামী বর্ষের রাষ্ট্রপতির পদে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নির্ব্বাচিত হন—কংগ্রেস উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষ ইহা ইচ্ছা করেন। কারণ মুসলিম লীগের সহিত কংগ্রেসের আপোষ-আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র নীতি গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ করিতেছেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন আসন্ন বলিয়া উহাকে সম্মিলিতভাবে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সহযোগিতা লাভের জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ উদ্‌গ্রীব। এই হেতু এই সময় মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করা হইলে জাতীয় সংগ্রামের জন্য মুসলমানদের সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া, জুট অর্ডিন্যান্সের নিন্দা করিয়া যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আসন্ন সংগ্রামে যোগ দিতে মহিলা-দিগকে আহ্বান করিয়া, আগামী কংগ্রেসের সভাপতিত্বে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর পুনর্নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিয়া সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৫শে ডিসেম্বর—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে, ভাষার ভিত্তিতে যেন বাঙলা দেশের সীমা নির্দ্দেশ করা হয় এবং বাঙলার সন্নিকটস্থ বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি যেন বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কলিকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয়। অধিবেশনের সভাপতিমণ্ডলের সভ্যগণ ও কয়েকজন প্রতিনিধি ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের প্রগতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রগতিশীল লেখকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব কি, তৎসম্পর্কও আলোচনা হয়।

শুলাপুরে নিখিল ভারত আর্য্য সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুত এম এস আণে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামে নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

টিটাগড় চটকল ধর্ম্মঘটের নেতা এবং বঙ্গীয় চটকল মজদুর ইউনিয়নের টিটাগড় থানায় কর্ম্মকর্ত্তা কমরেড রামবলক সিং, রামসুন্দর এবং লক্ষ্মীনারায়ণকে গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইহা ছাড়া পুলিশ আরও বহু ধর্ম্মঘটী শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর—

তিন মাস পূর্ব্বে রাজকোটে যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার অবসান হইয়াছে। সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও ঠাকুর সাহেবের মধ্যে আলোচনার ফলে উক্ত রাজ্যে শীঘ্রই দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে। মহাত্মা গান্ধী মীমাংসার যে সকল মূল সর্ত্তের খসড়া করিয়াছিলেন এবং বোম্বাইয়ে সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও দেওয়ান স্যার প্যাট্রিক ক্যাডালের মধ্যে যাহা আলোচিত হইয়াছিল, ঠাকুর সাহেব কর্ত্তৃক মোটামুটিভাবে তাহা গৃহীত হইয়াছে। সংগ্রামের অবসান হওয়ায় রাজকোটের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের সাংবাদিকদের বৈঠকে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু বাঙলা দেশে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, বঙ্গীয় আইন পরিষদের অধিবেশনকালে হক মন্ত্রিসভার পতন না ঘটিলে তিনি বিস্মিত হইবেন। বাঙলার কংগ্রেসীরা যদি মনে করেন যে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে কংগ্রেসের কাজে সুবিধা হইবে, তাহা হইলে এই বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন চাওয়া হইবে। এই সম্পর্কে চরম দায়িত্ব ওয়ার্কিং কমিটির পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির। তাহা হইলেও এ বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি কোন কিছু সিদ্ধান্তের পূর্ব্বে বাঙলার কংগ্রেসীদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করিবেন।

ময়মনসিংহে নিখিল বঙ্গ ও আসাম আইনজীবী সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মৌলবী আস্রাফউদ্দীন আহম্মদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্র সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে।

পাটনায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ২৬শ অধিবেশন আরম্ভ হয়। মিঃ জিন্না সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুত নরেশচন্দ্র সরকার যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল।

চিঠিপত্র

মহাশয়,—প্রবাসী বাঙালীদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের যে অত্যাচার কথায় ও কাজে হইতেছে তাহার সীমা নাই। বিগত ২৩শে নবেম্বর তারিখে মাননীয় শ্রীসম্পূর্ণানন্দের কানপুরে একটি বিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে মন্ত্রী মহাশয়ের কিরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আপনারা বিচার করিবেন। সেই বিষয় নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। (২৩-১১-৩৮ তারিখের "লিডার" দ্রষ্টব্য)।

শিক্ষামন্ত্রী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, কথা বলিবার সময় "মিশ্রভাষা" প্রয়োগ করা অন্যায়। মিশ্রভাষার উদাহরণ তিনি এইরূপ দিয়াছেন—"Bengalees মে Outward Simplicity তো বহুত হ্যায়, মগর Inward Sincerity, বিলকুল নহি।" তিনি বলেন যে, এই কথাটি তাঁহার কলেজের অধ্যাপক Mulvany প্রায়ই ছাত্রদের বলিতেন।

উক্ত অধ্যাপক মহাশয় সৌভাগ্যক্রমে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, তিনি এইভাবে কখনই বলিতেন না। শিক্ষা-মন্ত্রী মহাশয় অনেকটা নিজের ক্যারামতও খাটাইয়াছেন। "Bengalees মে" কথাগুলি বাদ দিতে হইবে এবং "Simplicity" স্থানে "affability" বসাইতে হইবে। অধ্যাপক মহাশয় এইরূপে পরিবর্ত্তিত আকারে ঐ কথাগুলি প্রায়ই ছাত্রদের বলিতেন, কিন্তু তাহাও আবার বাঙালীর বিরুদ্ধে নয়। তিনি বলিতেন যে, দুই বঙ্গদেশীয়ের মধ্যে এইরূপ বার্ত্তালাপ হইতেছিল, তদানীন্তন বাঙলার লাটের বিষয়। অধ্যাপক মহাশয়ের কথায় বাঙালীর অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ নাই।

এখন ইহা বেশ সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, মন্ত্রী মহাশয় উপরোক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের একজন মেধাবী ও ধীশক্তি সম্পন্ন ছাত্র। তাহা না হইলে এতকালেও তিনি নিজের গুরুবাক্য ভুলেন নাই! তাঁহার ঠিক ঠিক ভাষা পর্য্যন্ত মনে আছে! আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি কি উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য "Bengalees মে" বাক্যগুলি যোগ করিলেন ও অধ্যাপক মহাশয় যে বাক্য প্রসঙ্গে উহার প্রয়োগ করিতেন তাহা অপ্রকাশ রাখিলেন? আবার অধ্যাপক Mulvany-র নাম সংযোগ করিলেন—তিনি এখনও জীবিত আছেন।

মন্ত্রীবাহাদুরকে এইটুকু জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি আর কোনও দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাইলেন না?

শিক্ষামন্ত্রীর পদ সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ। তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই যে, এইরূপ উদাহরণে, তাঁহার বালক শ্রোতাদের মনের উপর কিরূপ ভাবের ছায়াপাত করিবে? তাঁহার এই বক্তৃতার প্রতিবাদ করায় তিনি জানাইয়াছেন যে, উহা রসিকতা (humour) মাত্র। তিনি কি বুঝেন না যে বালকদের তাঁহার এই গুরুত্বপূর্ণ রসিকতা বুঝিবার ক্ষমতা আছে কি না? যদি তিনি বালকদের মনস্তত্ত্ব না বুঝিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকাই বিড়ম্বনা—অবসর লওয়াই কর্ত্তব্য।

বাঙালী বিতাড়ন তীব্র হইতে তীব্রতর আকার ধারণ করিতেছে। বাঙালী পশ্চিমবাসীদের কি যে পাকাধানে মই দিয়াছে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর।

যে ব্যক্তি এক জাতির সহিত অন্য জাতির বিদ্বেষ ভাব ও দ্বন্দ্ব ঘটায় তাহাকে ধিক্, কিন্তু শত সহস্র ধিক তাহাদের যাহারা মুখে একতার বুলি আওড়ায় কিন্তু কার্য্যে করে অন্যরূপ। সেই দশা হইয়াছে বিহার এবং সংযুক্ত প্রান্তের মন্ত্রীদের। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার বিষময় ফল কি হইতে পারে তাহা যদি আমাদের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা না বুঝেন তাহা হইলে তাঁহাদের কোন ভাষায় ধিক্কার দিব খুঁজিয়া পাই না।

মাননীয় শ্রীসম্পূর্ণানন্দ দুঃখ প্রকাশ দূরের কথা আবার নিজের দোষের সাফাই গাহিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—রসিকতা বলিয়া ও বাঙালীদের রহস্যবোধের শিক্ষা দিয়া। রহস্য বা রসিকতা কাহাকে বলে তাহা বাঙালীরা মন্ত্রী মহাশয়ের চেয়ে বেশীই জানে। তাঁহার ঐরূপ জ্ঞান বাঙালীদের বিতরণ না করিলেই ভাল! এইরূপ বাঙালীদের অপমানসূচক কথায় তাঁহাদের অসন্তুষ্ট বা বিক্ষুব্ধ হওয়া কি সঙ্গত নয়?

বিনীত—শ্রীমতিলাল বাপুলি, বি-এস-সি, এল-এল-বি
১১২নং কেদার ঘাট কাশীধাম। ২৩-১২-৩৮

সভা-সমিতি

হাওড়া টাউন হলে সাহিত্যিক সম্মেলন

গত ২রা পৌষ, রবিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় হাওড়া টাউন হলে ওয়েষ্ট য়েণ্ড ক্লাব শিশু-বৈঠকের উদ্যোগে একটি সাহিত্য-বাসরে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দন করা হয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাশ মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, বার-এট-ল মহাশয় সমাবিষ্ট ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বিভূতিবাবুর রচনা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্তা তৃপ্তি সেনের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত হরিসুখ গুপ্তের 'ম্যাণ্ডোলিন', শ্রীযুক্ত সুখেন্দু গোস্বামীর গান (নিউ থিয়েটার্সের সৌজন্যে), শ্রীযুক্ত ঋষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত, অধ্যাপক রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কীর্ত্তন (মাথুর), শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি (রেডিয়োর সৌজন্যে), শ্রীমং রমণীমোহন ঘোষালের হাস্য-কৌতুক সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে বিশেষভাবে তৃপ্তি দান করে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বিভূতিবাবুর সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনান্তে তাঁহার স্বরচিত একটি ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ করেন। সমবেত ব্যক্তিদের বক্তৃতাদির পর বিভূতিবাবু উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া একটি মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা প্রদান করেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার ২২শে পৌষ, ১৩৪৫ সাল, 7th January 1939 [৮ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ছাত্র আন্দোলনের শক্তি—

ডাক্তার কে এম আসরফের সভাপতিত্বে কলিকাতা শহরে নিখিল ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল। জলের গতি নীচুর দিক হইতে উঁচুর দিকে ফিরান যেমন অস্বাভাবিক, তেমনই ছাত্রদের বা তরুণদের মনোবৃত্তিকে স্বাধীনতার বিরোধী করিয়া তোলাও অসম্ভব। তরুণদের মধ্যে স্বাধীনতার যে প্রবৃত্তি স্বতস্ফুরিত হয়, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়া থাকে। আজ যে তরুণ, আজ যে ছাত্র কাল সে হয়ত জাতির নেতা, যোদ্ধা এবং রক্ষক। স্কুল-কলেজের ভিতর পুরিয়া ছাত্রদিগের স্বাধীনতার পরিপোষক স্বাভাবিকী বল-ক্রিয়া রুদ্ধ করিবার জন্য যেখানে বিধি-ব্যবস্থা আঁটা হয়, সেখানে স্কুল-কলেজ ছাত্রদের পক্ষে হয় কারাগার; আর তরুণ-দের যে স্বাধীনতার প্রবৃত্তিতে সকল শিক্ষা গ্রহণের শক্তি নিহিত থাকে, তাহাকেই ক্ষুণ্ণ করিয়া যে জিনিস তাহাদিগকে দেওয়া হয়, তাহা শিক্ষা বলা চলে না, প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় কুশিক্ষা। তাহার অপেক্ষা অশিক্ষাও ভাল। বাঙলা দেশের বড় গর্ব্বের বিষয় এই যে, এখানে তরুণদের এই স্বাধীনতার পরি-পোষক মনোবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য যত চেষ্টা হইয়াছে, তত চেষ্টা বোধ হয়, ভারতের আর কোন প্রদেশেই হয় নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখানকার তরুণেরা স্বাধীনতার জয়ধ্বজা বহন করিয়াছে; সারা ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে ইহারাই সহস্র রকমের দুঃখ-কষ্ট বরণের ভিতর দিয়া সহস্র প্রতিকূলতার আঘাত সহ্য করিয়া। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় নিখিল ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে বাঙলার তরুণদের এই বিশিষ্ট শক্তির কথাই উল্লেখ করিয়া বলেন,—"এইখানেই ছাত্র আন্দোলন জন্মলাভ করে। যে ভূমির উপর আজ আমরা সমবেত হইয়াছি, ইহা প্রাচীন গৌরব স্মৃতি বিজড়িত। লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্তের স্মৃতি অঙ্গে মাখিয়া ইহা পবিত্র। তাঁহারা আপনাদের হাতে স্বাধীনতার যে মশাল দিয়া গিয়াছেন, গর্ব্বের সহিত — [illegible]।"

স্বাধীনতা চাই সকলের আগে—তরুণের তরুণত্বের মূলে রহিয়াছে এই পিপাসা। এই পিপাসাই তরুণকে বড় করে, শিক্ষিত করে। সর্ব্বত্র দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে তরুণেরা সেই পিপাসায় প্ররোচিত হইয়া উচ্চতর জগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, পশুত্বকে নির্জ্জিত করিয়া মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিতেছে. ছাত্র সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত অমিয় দাশ-গুপ্ত তাঁহার অভিভাষণে উদ্দীপনাময়ী ভাষায় সে কথা বলেন। তিনি বলিয়াছেন, স্পেনের ছাত্রেরা কি করিতেছে, চীনের ছাত্রেরা দেশের জন্য, জাতির জন্য কি করিতেছে? ভারতের ছাত্র-সমাজ কি ঘুমাইয়া থাকিবে? স্বাধীনতার জয়পতাকা তাহারা উর্দ্ধে তুলিয়া আগাইয়া যাইবে না? যাঁহারা বলেন, না, ছাত্রেরা কেবল বই-কেতাব লইয়া থাকুক—দেশ চুলায় যাউক, সমাজ চুলায় যাউক, শ্রীযুক্ত অমিয় দাশগুপ্ত সুতীব্র ভাষায় দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের তেমন উপদেশের মূলীভূত উদ্দেশ্য কি। যে গুণ, যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ছাত্রেরা শিক্ষা পায়—শিক্ষিত হয়, তাঁহাদের মতলব হইল, গোড়াকার সেই জিনিষই ধ্বংস করা। ছাত্র-সমাজকে নিজের ইতর স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক যন্ত্রে পরিণত করা।

বাঙলা সরকার ও ছাত্র আন্দোলন—

বাঙলা সরকারের যুব কল্যাণ সাধনের একটা কর্ম্মপ্রণালী আছে, আমরা দেখাইতে ত্রুটি করি নাই, এই যুব কল্যাণ সাধনের প্রকৃতি কি! নিখিল ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি ডাক্তার আসরফ তাঁহার অভিভাষণে বর্ত্তমান বাঙলা সরকারের যুব-আন্দোলন সম্পর্কিত মনস্তত্ত্বটা ভাল রকমে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ার মূলে রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রেরণা, সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত। তাহারা সেইভাবে আমাদের গণতান্ত্রিকতাকে ধ্বংস করিতে চায়, আমাদের জাতীয়তার অনুভূতিকে বিনষ্ট করিতে চায়। হক মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে বাঙলা দেশে সাম্প্রদায়িকতার ভাব উত্তরোত্তর উস্কাইয়া তুলিবারই চেষ্টা হইতেছে। এই কলিকাতা শহরে একাধিকবার এই সম্পর্কে বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা

প্রস্তাব আনয়ন করার সময় কলিকাতা শহরে লজ্জাকর ব্যাপার সব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এমন ব্যাপারের যে পুনরভিনয় হইবে না, এ-কথা এখনও নিশ্চিত বলা যায় না। ডাক্তার আসরফ বাঙলার হক মন্ত্রিমণ্ডলের মনস্তত্ত্বটা ব্যাখ্যা করিয়া ভাল করিয়াছেন। আমরা আশা করি, 'বিপন্ন ইসলামে'র ধ্বয়া তুলিয়া ছাত্র-সমাজের সর্ব্বজনীন উদার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া যাহারা নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির ফিকিরে আছে, মুসলমান তরুণেরা তাহাদের ফন্দীতে প্রবঞ্চিত হইবে না।

ছাত্র সম্প্রদায় ও জওহরলালজী—

পণ্ডিত জওহরলালজীকে আমরা কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় নিজেদের মধ্যে পাইয়াছিলাম। তিনি এখানে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। নিখিল ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন,—"ছাত্রদের মধ্যে একটি মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন, আর একটা হিন্দু ছাত্র ফেডারেশন—এইরূপ কথার মত অদ্ভুত কোন কথা যে হইতে পারে, তাহা আমি কল্পনাই করিতে পারি না। কোন ফ্যাক্টরীতে হিন্দু শ্রমিক ইউনিয়ন ও মুসলিম শ্রমিক ইউনিয়নের কথা বলা যেমন অদ্ভুত, ছাত্রদের মধ্যেও তেমনই 'হিন্দু ছাত্র ফেডারেশন' ও 'মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের' কথা বলা অদ্ভুত।"

জওহরলালজী বলেন,—'আপনাদিগকে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে—ছাত্রসমাজ কোনক্রমেই কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকার করিবে না।' বাঙলার ছাত্র সম্প্রদায় চিরদিনই বৃহত্তর আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার যুক্তি-বুদ্ধির মূলে রহিয়াছে, হীন স্বার্থ। কতকগুলি লোক নিজেদের হীন স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্য জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং সাহিত্য—এই যে বৃহত্তর আদর্শের ক্ষেত্র,এ গুলির মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতাকে ঢুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। তরুণের বলিষ্ঠ অন্তঃকরণ কোনদিনই স্বার্থসন্ধীদের বিষয়-বিচারের এই হীন দৃষ্টিকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে তাহাদের তরুণত্বই নষ্ট হয় এবং মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার সকল সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। তাহাদের অন্তঃকরণ হিসাবী-বুদ্ধির ভারে হয় সংকীর্ণ, তাহাদের চিত্তবৃত্তি হয় জড়তাগ্রস্ত। ছাত্রদিগকে আজ শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে—এই সব চক্রীদের বিরুদ্ধে, যদি তাহারা সত্যই মানুষ হইতে চায়। এই তরুণ বয়সেই যদি তাহারা অনুদার মনোবৃত্তিগ্রস্ত হয়, অপরের স্বার্থসিদ্ধ করিবার যন্ত্রস্বরূপে তাহারা নিজেরা পরিণত হইবে না, এই সংকল্প-বুদ্ধিতে যদি তাহারা সচেতন না হয়, তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামে অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া বড় হইবে তাহারা কেমন করিয়া? এবং সেই যোগ্যতা অর্জ্জন করাইতো শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। 'ধর্ম্ম গেল' এই ভ্রিগীর ছাড়িয়া যাহারা বাঙলা দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সর্ব্বনাশ করিয়া নিজেদের কোলে কেবল ঝোল টানিবার চেষ্টায় আছে, বাঙলার ছাত্র-সমাজের কর্ত্তব্য তাহাদের সম্বন্ধে সচেতন থাকা। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের হীন চক্রান্ত যাহাতে ব্যর্থ হয়, সেজন্য নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করাও ছাত্রসমাজের কর্ত্তব্য। পাপ হইতে দূরে থাকাই চরিত্রনিষ্ঠার ধর্ম্ম নয়, পাপের গতিরুদ্ধ করাতেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। আমরা বাঙলা দেশের তরুণদের মধ্যে এই বলিষ্ঠ মানবধর্ম্মের সাধনা দেখিতে চাই। যদি তাহাদের তরুণ চিত্তবৃত্তিই এদিকে সাড়া না দেয়, সাড়া দিবে কি স্বার্থচিন্তায় যাহাদের হাড়ে হাড়ে হিসাবী-বুদ্ধির পাকে পাকে জীর্ণতার ঘুণ ধরিয়া গিয়াছে, তাহাদের?

হায়দরাবাদে ছাত্র আন্দোলন—

নিখিল ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন সামন্ত-রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে কংগ্রেসকে এই অনুরোধও করা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন এই আন্দোলন সম্পর্কে নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করিয়া প্রজাপক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের একটা কথা বলিবার আছে; তাহা এই যে, প্রস্তাবটি যখন ছাত্রদের পক্ষ হইতে করা হইতেছে, তখন হায়দরাবাদের ব্যাপার সম্বন্ধেই এই প্রস্তাব বিশেষভাবে জোর দেওয়া উচিত ছিল; কারণ হায়দরাবাদে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সহিত ছাত্রদের বিশেষভাবে সম্পর্ক রহিয়াছে। হায়দরাবাদের সেই সংগ্রামকে ভারতে মানবের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য ছাত্র-সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলা যাইতে পারে। ছাত্রদের সম্পর্কিত এত বড় একটা ব্যাপারে নিখিল ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের সকল সামন্ত-রাজ্যের নামে গোলে হরিবোল দেওয়া উচিত হয় নাই। হায়দরাবাদ রাজ্যের ৮০৫ জন ছাত্র আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য স্কুল কলেজ হইতে বিতাড়িত। মানুষের অধিকার হইতে মানুষকে বঞ্চিত করিবার নীতিগত অন্যায়ের দিক হইতেও কোন দেশের তরুণদের পক্ষে ইহা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়! তাই দাঁড়াইয়াছে হায়দরাবাদের ছাত্রেরা বীরের মত মাথা উঁচু করিয়া। ছাত্রদের এই যে স্বদেশপ্রেম—মানবের অধিকারগত এই যে নীতি-নিষ্ঠা ভারতের বর্ত্তমান কোন আন্দোলনে এমনভাবে আর কোথাও প্রকট দেখা যাইতেছে না। নিখিল ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের উচিত ছিল হায়দরাবাদের তাহাদের সতীর্থদের অন্তরে সাহস সঞ্চার করা, তাহাদের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করা—আমরা এখনও আশা করিতেছি, ছাত্র-সমাজ এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবে না।

বাঙলার মন্ত্রীদের সমস্যা—

বুড়া বয়সে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকের উপর দিয়া ঝড়ের উপর ঝড় বহিয়া যাইতেছে। এই সেদিনও একটা ঝড় বহিয়া গেল। মৌলবী সামসুদ্দীন এবং মৌলবী তমিজুদ্দীন যাঁহারা এতকাল করিলেন তাঁহার বিরুদ্ধতা তিনি তাঁহাদিগকে দিলেন মন্ত্রীগিরি, অথচ সেই মন্ত্রীগিরি অথবা কোন একটা মোটা বেতনের কোন চাকুরীর গন্ধে গন্ধে যাহারা তাঁহার কোয়ালিশন দলের কানাচ ধরিয়া ঘুরিল, তাহাদের দিকে তিনি ফিরিয়া তাকাইলেন না। অভিমান ত হইবারই কথা—

আক্রোশও অসম্ভব নয়; কারণ স্বার্থই যে এখানে একমাত্র সাধ্য ও সাধনা। মৌলবী ফজলুল চালে দুরস্ত আছেন। তিনি 'বিপন্ন এসলামী ফুঁক মন্ত্র আওড়াইয়া এই ঝড়ের তোড়ও ঠেকাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু এই কেরামতির দৌড় কতটা, এ বিষয়ে সকলেরই সন্দেহ আছে। বিপন্ন এসলামকে রক্ষা করিবার চরম ব্রত সার করিয়াছে যে কোয়ালিশন দল, 'বিপন্ন এসলাম' রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যই যদি নূতন জোড়া মন্ত্রী নিয়োগের মূলে ছিল, তবে একান্ত অন্তরঙ্গ দলের আড়ালে সে কাজটা করার প্রয়োজনীয়তা ছিল কি? বিপন্ন এসলামকে রক্ষার কাজে কোয়ালিশনী দল কি ত্রুটি করিল কোন দিন? সুতরাং 'বিপন্ন এসলামের' বুজরুকী অন্য জায়গায় খাটিলেও ঐ বিদ্যায় যাহারা বিশেষজ্ঞ তাহাদের মনকে বুঝ দেওয়া চলে না। কোন বুঝেই কোয়ালিশনী দলের কলিজা ঠাণ্ডা হইতেছে না—জের কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে ঠিক নাই। মোটের উপর, হক সাহেবের সুখী পরিবারের সুখ-সিন্ধু এখন বিন্দু আকারে পদ্মপত্রে জলের মত টলমল করিতেছে, আর একটা ঝড় উঠিলেই গড়াইয়া পড়িতে একটুও আটক নাই। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সেদিন হক মন্ত্রিমণ্ডলের পতনের সম্ভাবনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলিয়াছেন, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি তক বাঙলা দেশে কংগ্রেসীদের লইয়া মিশ্র মন্ত্রিমণ্ডল গঠন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে, যত সত্বর প্রগতিবিরোধী এই মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটে, আমরা তাহাই দেশের পক্ষে কল্যাণকর মনে করি।

বাঙলার দাবী—

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যে দুইটি প্রস্তাব সমস্ত বাঙালী সমাজের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একটি প্রস্তাবে বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য দাবী করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, কোন একটি ভাষাকে কেহ জোর করিয়া শক্তি দিতে পারে না, যদি সে ভাষার নিজের মধ্যে শক্তি না থাকে এবং ভাষার সেই যে নিজস্ব শক্তি, ভাষা বা সাহিত্যের যাঁহারা সাধক, শুধু তাঁহাদের ত্যাগ এবং তপস্যার প্রভাবেই সৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্যই বেদ বলিয়াছেন, যজ্ঞ হইতেই বাণীর উদ্ভব। বাঙলা ভাষা বর্ত্তমানে যে ভারতের সব চেয়ে শক্তিশালী ভাষা—এ-কথা সব দেশের সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাঙলা ভাষার সেই যে শক্তি, তাহা বলিতে সে ভাষার কতকগুলি বিশেষ গুণ বা ধর্ম্মই বুঝায়। এবং সেই সব গুণ বা ধর্ম্ম আছে বলিয়াই বাঙলা ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এই দাবীর গুরুত্বকে অস্বীকার কেহ করিতে পারিবেন না। অপর একটি প্রস্তাব এই মর্ম্মে করা হইয়াছে যে, বাঙালীপ্রধান প্রদেশসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়া করা হউক। বাঙালীর ছেলেমেয়েদিগকে উর্দ্দু বা হিন্দীর মারফতে শিক্ষার [illegible] যদি করিতে হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যে শিক্ষার বাহন করা উচিত—এ-কথা এতটা সর্ব্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্ত যে, ইহার যৌক্তিকতা আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হয় না। বাঙালীরা যে প্রদেশেই থাকুক, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভের যে সুযোগ তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার ন্যায়ত কাহারও নাই, তাহা শুধু যে অনুচিত ইহাই নহে, তেমন ব্যবস্থা দস্তুরমত অত্যাচার, অবিচার এবং প্রকৃতপক্ষে পীড়ন। প্রকৃত প্রস্তাবে একটা সম্প্রদায়কে, যাহারা মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহাদের চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষায় পিছনে ফেলিয়া রাখিবার ইহাই একরূপ কৌশল, ইহা পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা বোর্ড নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে হিন্দী বা উর্দুই শিক্ষার বাহন হইবে। পরীক্ষায় ইংরেজী ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর হিন্দী বা উর্দ্দুতেই দিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই এমন প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি। সম্প্রতি কাশীর বাঙালী সমিতি যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের নিকট এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, ইহার ফলে প্রবাসী বাঙালীদের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দী ও উর্দ্দু উভয় ভাষাকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে, অথচ যে ভাষা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা, যে ভাষা ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের মাতৃভাষা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সেই ভাষাকে স্বীকার এখনও পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। বাঙলা ভাষাও সাহিত্যের শিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীদের মুখে আমরা এই ধরণের কথা শুনিতেছি বটে, কিন্তু তাঁহারা বাঙলাভাষার গুরুত্ব এবং মর্য্যাদা যে অন্তরের সহিত স্বীকার করিয়া লইতে চাহিতেছেন না, তাঁহাদের কার্য্য হইতে আমাদের মনে এমন একটা ধারণা থাকিয়াই যাইতেছে। আমরা ইহার পরিবর্ত্তন দেখিতে চাই।

বিজ্ঞতার বস্তুতত্ত্ব—

গিলবার্ট মারে উদারনীতিকদের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া একস্থলে বলিয়াছেন, 'বিজ্ঞতা বলিতে আমরা নিজের নিজের স্বার্থকেই যেন বড় বলিয়া না বুঝি এবং অপরের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন বা নির্লিপ্ত থাকিয়া উপদেশ দিতে না যাই। যদি আমরা বুঝি যে, স্বার্থত্যাগ করা দরকার, তবে সকলের আগে নিজেরাই যেন সে ত্যাগ স্বীকার করিতে আগাইয়া যাই।' আমাদের দেশের তথাকথিত উদারনীতিকদের অতিবুদ্ধি কিন্তু স্বার্থের এই পাক ছাড়িয়া উঠিতে নারাজ। ত্যাগ-স্বীকারের কথা শুনিলেই জোঁকের গায়ে চূণ লাগার মত তাঁহারা অতিবুদ্ধিতে আপনাদিগকে গুটাইয়া লইয়া থাকেন। এই দৃশ্য আগাগোড়া উপভোগ করিয়া আসিতেছি। এবারকার উদারনীতিক সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন মিঃ পি এন সপ্রু। যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর নিন্দা তিনি করিয়াছেন; এমন কি অনেক কংগ্রেসীদের চেয়ে জোরাল ভাষায় করিয়াছেন এবং

জাতির তৈয়ারী শাসনতন্ত্র আরোপিত করার ব্যাপার অতি অন্যায়। ভারতের সম্বন্ধে তাহাই হইতেছে। এই যে অন্যায়, ইহার প্রতিকারের উপায় কি? এই প্রশ্নেই উদারনীতিক পুঙ্গবদের আতঙ্ক ঘটে। সপ্রু সাহেব তাঁহার অভিভাষণে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, "বসু মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রণালী যদিই দেশের লোকের উপর জোর করিয়া চাপান হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস ব্যাপকভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।" এই কথা বলিয়াই উদারনীতিক সপ্রু আর্ত্তস্বরে বলিয়াছেন—"তবেই তো ভয়ানক বিপদের কথা!" বিপদের কথা তো বটেই! সেখানে যে স্বার্থকে ছাড়িতে হয়, দুঃখ, কষ্ট, যাতনা-লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইতে হয়; সুতরাং বুদ্ধির ঢেঁকী উদারনীতিকদের কথা—ওপথে যেওনা যাদু হুথুমথুমোর ভয়! এই ভয়ই যাহাদিগকে জরদ্গব করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মুখে তবে আর বড় বড় কথা কেন—প্রচণ্ড শক্তি গড়িয়া তুলিব, যে শক্তি জগতে কেহই বাধা দিতে পারিবে না, এ-সব গফ্‌ফানি কেন? বিলাতের উদারনীতিক দলের অন্যতম নেতা গিলবার্ট মারের কথাতেই তাঁহাদিগকে বলিতে ইচ্ছা হয়—"Never to defend your brother against wrong if the wrong-doer uses force, seems to me to be a denial not only of liberality but of civilization itself. অর্থাৎ আপনাদের ভ্রাতার বিরুদ্ধে কেহ যদি অন্যায় করিবার জন্য বলপ্রয়োগ করে, তবে সেক্ষেত্রে তাহাকে রক্ষা না করা শুধু যে উদারনীতিকতা বিরোধী ইহাই নয়, উহাকে সভ্যতারও বিরোধী পর্য্যন্ত বলিতে হয়।" ভারতের উদারনীতিক প্রভুরা ব্রিটিশ সিংহের দুয়ারে বাৎসরিক আবেদন-নিবেদন ব্যক্ত করিয়া নিজের নিজের ধাঁধাঁয় স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, দেশের জন্য, দেশের লোকের জন্য বেদনা যাহাদের বুকে জাগিয়াছে, তাহারা দেবতার হাত হইতে দুঃখের দারুণ দীপ গ্রহণ করিবার জন্যই আগাইয়া আছে। সেই দীপ—আলোক যাহার চলিয়াছে রুদ্ধ করি দেশের আঁধার ধ্রুব-তারকার মতো!

রাণী গুইদালোর মুক্তি—

আসামের নাগা পাহাড়ের মধ্যেও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বাণী পৌঁছে এবং রাণী গুইদালোকে চঞ্চল করিয়া তোলে। গুইদালো অপর কয়েকজন নাগার সঙ্গে ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হন। তিনি আজ সাত বৎসর হইল জেলে আছেন। এই পোড়া বাঙলা দেশ আর পাঞ্জাব অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বাধীন এই দুই প্রদেশ ছাড়া ভারতের অন্য সব প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীরাই মুক্তিলাভ করিয়াছেন; আসামের রাজনৈতিক বন্দীরাও বড়দলুই মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আর কারাগারে রুদ্ধ নাই; কিন্তু রাণী গুইদালো মণিপুর দরবারের বিচারে দণ্ডিতা, এজন্য আসাম সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারেন নাই, কিন্তু মুক্তি দিবার জন্য সুপারিশ ভারত সচিবের নিকট করিয়াছেন। আসামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে তরুণবয়স্কা গ্রহণ করিয়াছেন যে,—স্বাধীনতার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিতা নাগা পাহাড়ের রাণী গুইদালোকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দান করা হউক। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহার মুক্তি সম্পর্কে অযথা বিলম্ব করিতেছেন। আমরা যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে এইরূপ আশা হইতেছে যে, রাণী গুইদালোকে সত্বরই মুক্তিদান করা হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আসাম পরিভ্রমণের পর এই নাগা বীর-বালিকার মুক্তির জন্য আন্দোলন করিবার দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে আকৃষ্ট করেন। এ সম্বন্ধে আমরাও অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। আসাম সরকার এ সম্বন্ধে যখন উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন গুইদালোর মুক্তি সুনিশ্চিত বলিয়াই আমরা বুঝিয়াছিলাম। তাঁহাকে সত্বরই মুক্তি দেওয়া হইবে, এই সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

মহাত্মা গান্ধীর দান—

মানবতার আদর্শ, চিত্তের উদারতা—এইগুলিই যদি সমাজে বড় বলিয়া গণ্য হয়, মানুষ সে স্তরে যদি অন্তত কিছুটা পরিমাণও উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ এবং নিখিল ভারতীয় খৃষ্টান সম্মেলন—এই দুইয়ের কোনটির সভাপতির অভিভাষণ লোকের কাছে ভাল লাগিবে, সে কথা ভাঙ্গিয়া বলা দরকার আছে, মনে হয় না। নিখিল ভারতীয় খৃষ্টান সম্মেলনের সভাপতি স্বরূপে ডাক্তার হরেন্দ্রচন্দ্র মুখুজ্যে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, মহত্তর আদর্শের দীপ্তি, ঔদার্য্যের অনুভূতি, দেশপ্রেমের তীব্রতা এবং গাঢ়তায় তাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। গত ১লা জানুয়ারী ডাক্তার মুখুজ্যে মাদ্রাজের ভারতীয় খৃষ্টানদের এক সভায় 'অহিংসা এবং খৃষ্টানধর্ম্ম' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জগতের-বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি এবং মানুষের মনোধর্ম্ম সম্পর্কে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধীর অবদান কি? এ সম্বন্ধে ডাক্তার মুখুজ্যে বলেন যে, উহার রাজনীতিক মূল্য যাহাই থাকুক না কেন এই মূল্য ভারতের দিক হইতে সব চেয়ে বেশী যে, মহাত্মাজী ভারতবাসীদের ভয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। নিজেরা দুর্ব্বল, নিজেরা হীন, এই যে দাস-মনোবৃত্তি, এমন একটা যে কুসংস্কার জাতিকে এতদিন অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, মহাত্মা গান্ধী তাহা হইতে ভারতবাসীদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। অভয়ত্বে প্রতিষ্ঠা রাজনীতিক সাফল্যেরই যে শুধু মূলীভূত কারণ ইহা নয়, আধ্যাত্মিক সাধনারও উহাই মূলীভূত কারণ। মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক সাধনায় পরিণত করিয়াছেন। পশুত্বকে ঝাড়িয়া ফেলার অবশ্যম্ভাবী ফল শুধু রাজনীতিক স্বাধীনতাই নয়, আধ্যাত্মিক মুক্তিরও সেই পথ। বর্ত্তমানে ভারতের যে অবস্থা, তাহাতে এই দুই সাধনার পথে কোনটিকে ছাড়া কোনটির চলে না।

জিন্নাই মুক্তির নমুনা—

ইহার ব্যস্তরূপ সব ক্ষেত্রে সমান হয় না, তবে গলাবাজি ... গালাগালি এই যুক্তিরই একটা রূপ। জিন্নাসাহেব এই যুক্তিতেই গান্ধীজীকে আক্রমণ করিয়াছেন, কারণ অন্য কোন দিকে সুবিধা হয় নাই। গান্ধীজী সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদপত্র-সেবী মিঃ হাডসনের নিকট এই কথা বলেন যে, হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের সত্বরই সমাধান হইবে বলিয়া তিনি আশা করিতেছেন, এই প্রশ্নের সমাধানে যতটা দেরী হইবে বলিয়া লোকে মনে করে, তাঁহার বিশ্বাস যে ততটা দেরী হইবে না। জিন্না সাহেব চটিয়া গিয়াছেন এই কথায়! চটিবার কারণ তো আছেই; কারণ যাহার কল্যাণে তাঁহাদের শ্রেণীর লোকের নেতাগিরি, সেই হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নেরই যদি সমাধান হইয়া যায়, তাহা হইলে ...বসা চলিবে কিসে? পণ্ডিত জওহরলালের একটা উক্তিও জিন্না সাহেবের উত্তেজনার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন যে, মুসলিম লীগওয়ালারা কংগ্রেসীদিগকে যে সব অভিযোগে আক্রমণ করিয়াছে, সেগুলি একেবারেই ভিত্তিহীন। জিন্না সাহেব বলিতেছেন—ভিত্তিহীন, এত বড় কথা! লীগ-ওয়ালারা লীগের প্রকাশ্য সভায় এ সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছে, সেগুলি যদি খবরের কাগজে প্রকাশ পাইত, তবে দেখিতেন জওহরলালজী যে অভিযোগগুলি কেমন জবর! জীব বিশেষের সর্ব্বভুকত্ব সম্বন্ধে একটা প্রবচন আছে, সেই প্রবচনে মানুষেরও মানসিক বিকৃতির একটা অবস্থায় যাহা খুশী তাহাই বলিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। বোধ হয় সেই দিক হইতে লীগওয়ালাদের সব কথার গুরুত্ব দেওয়া চলে না বুঝিয়াই খবরের কাগজওয়ালারা তাহা দিতে পারে নাই; কোনও বুদ্ধিমান মানুষই দিতে পারে না। লীগওয়ালাদের পাটনাই প্রলাপের যে কিছু পরিচয় খবরের কাগজের মারফতে পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই ইহা বুঝা গিয়াছে। আর ততদূর যাইবারই বা প্রয়োজন কি? কংগ্রেসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য মুসলিম লীগ হইতে যে কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল সেই কমিটি নিজেরা যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ কিছুই তাঁহাদের নাই। গোটা কতক ফাঁকা কথার আশ্রয় লইয়া—কেবল, "বন্দেমাতরম্", জাতীয় পতাকা, এইগুলি আওড়াইয়া একটা কৃত্রিম অভিযোগের কারণ তাহারা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন মাত্র। সুতরাং লাঠির যুক্তি অবলম্বন ছাড়া—গায়ে পড়িয়া গালাগালিজ করা ছাড়া লীগওয়ালাদের ব্যবসায় চালাইবার উপযুক্ত হাওয়া বজায় রাখিবার অন্য কৌশল কোথায়?

চেম্বারলেনের রোম যাত্রা—

আগামী ১১ই জানুয়ারী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব রোমে যাইতেছেন। মিউনিকের কীর্ত্তির পর জগতের বুকে শান্তির আবার কি জয়ধ্বজা উড়িবে, এই যাত্রার ফলে এজন্য অনেকেই এ ব্যাপারে উৎসুক আছেন। ইটালী টিউনিস চাই বলিয়া রব তুলিয়াছে। চেক জাতির স্বাধীনতার সর্ব্বনাশ করিয়া ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিউনিকে যে মহাকীর্ত্তি ... টিউনিস ইটালীকে দিয়া সেই কীর্ত্তি উজ্জ্বলতর করিবেন? চেম্বারলেন সাহেব সেদিন অর্থাৎ ১৯শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, ইংরেজ কিংবা ফরাসী কাহারও কোন রাজ্য ইটালীকে দিবার সম্পর্কে তিনি কোন কথা-বার্ত্তা রোমে গিয়া চালাইবেন না। ফরাসী গবর্ণমেণ্টও তার-স্বরে বলিতেছেন, তাঁহাদের সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও তাঁহারা ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন! ইতিমধ্যে শুনা গিয়াছিল যে, ফরাসীকে অসন্তুষ্ট না করিয়া দোস্ত মুসোলিনীর সন্তুষ্টির জন্য চেম্বারলেন সাহেব নিজেরাই ত্যাগ স্বীকার করিবেন, অর্থাৎ ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডটা টিউনিসের পরিবর্ত্তস্বরূপে দিয়া মুসোলিনীকে ঠাণ্ডা করা যায় কিনা দেখিবেন, কিন্তু সে গুড়ে অনেক দিন আগে বালি পড়িয়াছে। মুসোলিনী আগেই কথা দিয়া রাখিয়াছেন যে, মরুভূমি যোগাড় করিতে তাঁহার কোন গরজ পড়ে নাই। ইহার পরে এমন কথাও উঠে যে, তবে ফরাসীরা যাহাতে সোমালীল্যাণ্ডের তাহাদের অধিকৃত জায়গাটা মুসোলিনীকে দক্ষিণা স্বরূপে দেয়, সেজন্য চেম্বার-লেনের চেষ্টা হইবে; কিন্তু চেম্বারলেন সাহেব সেদিন নিজেই বলিয়াছেন যে, ঐ কথার কোন ভিত্তি নাই! তবে উদ্দেশ্যটা কি যেজন্য চেম্বারলেন সাহেবের এই ঐতিহাসিক আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন অভিযান! ইটালীর রাষ্ট্রনৈতিক দাবী হইতে সমুদ্ভূত কোন সংকট সম্ভাবনা কাটাইবার গরজ কি চেম্বারলেন সাহেবের এই রোমযাত্রার মূলে নাই, একেবারেই নিষ্কাম প্রীতি-সম্মেলন? রাজনীতিকেরা এমন কথা বিশ্বাস করেন না। জার্ম্মানী যেমন একটা ফ্যাকড়া তুলিয়াছিল, যাহার ফলে চেম্বারলেন সাহেবকে মিউনিকে ছুটিতে হইয়াছিল, ইটালীও অনুরূপ কোন ফ্যাকড়া তুলিয়াছে যে জন্য তাঁহাকে এবার রোমে যাইতে হইতেছে। ইংরেজও কোন রাজ্য ছাড়িবে না, তবে মুসোলিনীর মনের ক্ষোভ মিটিবে কিসে? বিশেষজ্ঞেরা এই রহস্য উদ্ঘাটনে একেবারে উদাসীন থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন, প্রত্যক্ষভাবে ফরাসীদিগকে কোন রাজ্যও না ছাড়িতে হয়, অথচ মুসোলিনীর মন রক্ষাও চলে, এমন একটা কৌশল অবলম্বিত হইবে এবং সে কৌশল হইল স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে স্বাধীন যোদ্ধৃশক্তির সম্মান দান করা এবং সেই উপায়ে স্পেনে মুসোলিনীর প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা, ভূমধ্যসাগর তটে ইটালীর অখণ্ড প্রতাপকে পাকা করা। চেকো-শ্লোভাকিয়ায় হিটলারের কব্জীর জোর বাড়াইয়া এক দিক হইতে ফরাসীর বিপদ যেমন বাড়ান হইতেছে, আবার অন্য দিক হইতে ইটালীর জোর বাড়াইয়াও তাহাকে বিপন্ন করা হইবে—অন্তরঙ্গ বন্ধু ফরাসীদের এই বিপদে ইংরেজের বিপদও যে না আছে তাহা নয়; কিন্তু উপায় কি? ফ্যাসিষ্টরা যে যুদ্ধের জন্য ঢাল-তরোয়াল শাণাইয়াই রহিয়াছে; সুতরাং সোজা পথ শান্তি দেবীর সেবা করা, চাই কি সে সেবার পুরস্কারস্বরূপে নোবেল প্রাইজও মিলিতে পারে?

ভারতে বিজ্ঞান-সাধনা—

ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সুপ্রসিদ্ধ

ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ দুঃখ-দারিদ্র্য, বেকার সমস্যায় অভিভূত, এই সমস্যার সমাধান করিবার একমাত্র উপায় হইল আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাপকভাবে শিল্প সংগঠন এবং শিল্পোন্নতি সাধন করা। আমাদিগকে যদি আজ জাতি হিসাবে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পের প্রসার করিতেই হইবে। কথাটা নূতন কিছুই নয়, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহাও কিছুদিন হইতে এই কথাটাই বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিতেছেন। জগতের সব দেশেই এই দিক হইতে সাড়া পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু জগতের অন্য সব দেশ, আর ভারতবর্ষ সমান নয়। জগতের উন্নতিশীল জাতিরা স্বাধীন, আর ভারতবর্ষ পরাধীন। জগতের অধিকাংশ সভ্য জাতি বর্ত্তমানে শোষক পর্য্যায়ভুক্ত, আর ভারতবর্ষ শোষক হওয়া ত দূরের কথা, নিজের যাহা আছে, তাহার পোষক হইবারও পুরোপুরি অধিকারী নয়। অসীম প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হইয়াও ভারতবাসীরা আজ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট; ইহার কারণ হইল এই যে, ভারতভূমি শোষিত, ভারতবাসীরা পরাধীন। ভারত গবর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে ভারতের শিল্পোন্নতির কথা বলিয়া থাকেন বটে; কিন্তু এ পর্যান্ত এদিকে তাঁহারা উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। যদি গবর্ণমেণ্টের তেমন উপেক্ষাই না থাকিত, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকভাবে শিল্পোন্নতি সাধনের পথে ভারতবর্ষ আজ রুশিয়াকেও ছাড়াইয়া যাইত; কারণ এদিক হইতে প্রাকৃতিক সম্পদে ভারতবর্ষ রুশিয়া হইতে হীন নহে। আসল কথা হইতেছে এই যে, ভারতের স্বাধীনতা নাই। কিছুদিন হইল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির উদ্দেশ্য—আধুনিক উপায়ে দেশে শিল্প-গঠন ও শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করা। ডাক্তার ঘোষ এই আশা করিয়াছেন যে, ঐ কমিটির কার্য্য যদি সুপরিচালিত হয়, তবে উহার ফলে এদেশের শিল্প-জগতে যুগান্তর ঘটিবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব দেশবাসীর হাতে না আসিলে এদিকে ষোল আনা ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। সব দেশে গবর্ণমেণ্টই এই বিষয়ে উদ্যোগী। অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্ট এই সব কাজের জন্য কেমন মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন অধ্যাপক ঘোষ তাহা দেখাইয়াছেন। এক গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প-সাধনা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য ১২ হাজার রসায়ন-শাস্ত্রের গ্রাজুয়েট নিযুক্ত রহিয়াছে। অন্য সব বিভাগে গবেষকদের সংখ্যা ইহা অপেক্ষাও অধিক। আমেরিকা এবং রুশিয়া এই দিকে অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অবিরত সাধনার ফলে জগত এইভাবে বর্ত্তমানকালের সমস্যার সমাধান করিয়া লইতেছে; কিন্তু আমরা স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলিতেছি। মনে করিতেছি অন্য গতি আর নাই। যদি বাঁচিতে হয়, তবে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং সকলের আগে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করিতে হইবে, নহিলে কোন সমস্যারই সমাধান হইবার উপায় নাই। এ তুকতাকের কর্ম্ম নয় —দরকার আমূল সংস্কারের।

পাটের ভবিষ্যৎ—

গত ৩রা জানুয়ারী বড়লাট লর্ড লিনলিথগো কলিকাতার টালীগঞ্জে কেন্দ্রীয় পাট কমিটির রসায়নাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে গিয়া বলেন—এই ব্যবসার উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠা, যত কিছু সব নির্ভর করিতেছে, চাষীদের অবস্থার উন্নতির উপর। চাষীরা যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন মালের ভাল দাম পায় সেদিকে সব সময় দৃষ্টি রাখিতে হইবে। খুবই ভাল কথা; কিন্তু দৃষ্টি রাখিবে কে? ১৯৩৬ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কেন্দ্রীয় পাট কমিটি স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু এই দুই বৎসরে বাঙলার পাট-চাষী যাহারা, উৎপন্ন পণ্যের দর পাইবার দিক হইতে তাহাদের কি লাভ হইয়াছে? বাঙলার গবর্ণমেণ্ট লর্ড ব্র্যাবোর্ণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বাঙলা দেশের মন্ত্রীরাও কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ইহার কোন জবাব দিতে পারেন কি? বঙ্গীয় চট-কল নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হইবার পর মিলওয়ালাদের সুবিধা হইয়াছে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই; পাট হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন রকমের মালের দর শতকরা ৮ হইতে ১১ টাকা আন্দাজ বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু কৃষকদের ঘরে পয়সা বেশী যে যাইবার কোন সম্ভাবনা আছে, এমন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। মিলওয়ালাদের চাহিদা কমিয়াছে, কলে উৎপন্ন মাল নির্দিষ্ট বাঁধা পড়াতে বাজারে টান নাই, সুতরাং দরও চড়িবার সম্ভাবনা নাই। চটকল নিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বারা শেতাঙ্গ কলওয়ালাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন বাঙলার মন্ত্রীরা, কিন্তু কৃষক এবং শ্রমিক দুইয়েরই ভাত মারা গিয়াছে।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(১)

জীবনের বাহিরের দিকগুলি সহজেই বুঝা যায়; তাহাদের নিয়ম, তাহাদের স্বাভাবিক গতি, তাহাদের ব্যবহারিক উপযোগিতা আমাদের হাতের কাছেই রহিয়াছে, আমরা খুবই সুবিধা ও ক্ষিপ্রতার সহিত সেগুলিকে ধরিতে পারি, কাজে লাগাইতে পারি। কিন্তু তাহারা আমাদিগকে বেশী দূরে লইয়া যাইতে পারে না। দৈনন্দিন কর্ম্মময় বাহ্যিক জীবনের পক্ষে তাহারাই যথেষ্ট; কিন্তু তাহারা জীবনের গভীর সমস্যা সকলের সমাধান করে না। অন্যপক্ষে জীবনের গভীরতম জিনিষসকলের, তাহার শক্তিময় রহস্য-সকলের, তাহার মহান নিগূঢ় সর্ব্ব-নিয়ামক নীতিসকলের জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে অতিশয় কঠিন। আমরা এমন কোনও ওলনদড়ি পাই নাই যাহা দ্বারা এই সকল গভীরতার মাপ করা যাইতে পারে; সে-সব আমাদের নিকট এক অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট জগৎ, এক গভীর অজ্ঞেয় বস্তু, মানুষের মন তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইতে চায়, বাহিরের সহজ দীপ্তিসকলের আলোড়ন ও ফেন লইয়াই খেলা করিতে চায়। অথচ যদি আমরা জীবনকে বুঝিতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে এই সকল গভীরতার জ্ঞান লাভ করিতেই হইবে; উপরিভাগে আমরা প্রকৃতির শুধু গৌণ নীতিগুলি, ব্যবহারিক উপবিধিগুলিই দেখিতে পাই, তাহাদের সাহায্যে আমরা সাময়িক বাধাবিঘ্ন সকল অতিক্রম করিতে পারি—এবং প্রকৃতির বিরামহীন পরিবর্ত্তন সকল কেন ঘটিতেছে তাহা না বুঝিয়া কার্য্যকরীভাবে তাহাদিগকে ব্যবস্থিত করিতে পারি।

মানবজাতি নিজের সামাজিক ও সমষ্টিজীবন কোন্ শক্তিতে চালিত হইতেছে এবং কোন্ লক্ষ্যের দিকে চালিত হইতেছে এ-সম্বন্ধে যত অজ্ঞান ও অবুঝ এমন আর কোন বিষয়েই নহে। সমাজ বিজ্ঞান হইতে আমরা সাহায্য পাই না, কারণ অতীতে কি ঘটিয়াছে, কোন্ বাহ্যিক পরিস্থিতির মধ্যে সমাজ সকল টিকিয়া আছে ইহা শুধু তাহারই ইতিহাস দেয়। —ইতিহাস আমাদিগকে কোন শিক্ষাই দেয় না; ইহা ঘটনা ও ব্যক্তি সকলের বিশৃংখল প্রবাহ অথবা পরিবর্ত্তনশীল প্রতিষ্ঠান সকলের সিনেমাতুল্য দৃশ্যপট। এই সব পরিবর্ত্তনের এবং কালস্রোতে মানবজীবনের এই অবিরাম অগ্রগতির প্রকৃত অর্থ কি তাহা আমরা ধরিতে পারি না। প্রচলিত বা পুনঃপুন সংঘটিত ব্যাপার সকল, অনায়াসলব্ধ সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহ, আংশিক অপূর্ণ চিন্তাধারা—এইগুলিই আমরা ধরিতে পারি। প্রজাতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র, সমষ্টিবাদ ও ব্যষ্টিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ, ষ্টেট ও কমিউন, ধনিকতন্ত্র ও শ্রমিক এইসব লইয়া আমরা বাদানুবাদ করি, অপর্য্যাপ্ত তথ্যের উপর সাধারণ সিদ্ধান্ত সকল দাঁড় করাই, কোন বিশেষ তন্ত্রকেই চরম বলিয়া আজ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করি, আবার কালই তাহাকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হই; কোন বিশেষ মতবাদ ও আগ্রহপূর্ণ উদ্দীপনাকে আমরা সমর্থন করি, তাহার জয় শীঘ্রই নিরাশায় পরিণত হয়, তখন আমরা সেটিকে পরিত্যাগ করিয়া আবার অন্য কিছুকে বরণ করি, হয়ত যেটিকে ধ্বংস করিতে এককালে প্রয়াস করিয়াছি, সেইটিকেই আবার ফিরাইয়া আনিতে চাই। এক সমগ্র শতাব্দী ধরিয়া মানবজাতি স্বাধীনতার জন্য উৎকণ্ঠ হইল, যুদ্ধ করিল, শ্রম, অশ্রু ও রক্তের তিক্ত মূল্য দিয়া তাহাকে অর্জ্জন করিল, যে শতাব্দীকে উহার জন্য সংগ্রাম করিতে হয় নাই, অমনি উহাকে উপভোগ করিতেছে, সে সেটিকে বালসুলভ ভ্রান্তি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং তাহার নিকট যে জিনিষের মূল্য কমিয়া গিয়াছে তাহা দিয়া আবার কোন নূতন জিনিষ ক্রয় করিতে ব্যগ্র হইল। আর এইসব যে ঘটে তাহার কারণ, আমাদের সমষ্টিজীবন সম্বন্ধে আমাদের সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মধারা হইতেছে অগভীর ও বাহ্যিক; তাহা সুদৃঢ়, গভীর ও সম্পূর্ণ জ্ঞানের সন্ধান করে না, তাহার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে না। ইহা হইতে আমরা কি শিক্ষা পাইতেছি? মানবজীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা, ইহার অনুসৃত আদর্শ সকল যে ব্যর্থ বা অসার তাহা নহে, তবে ইহার সত্য নীতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আরও বিস্তৃততর, উদারতর, অধিকতর ধৈর্য্যশীল অনুসন্ধান প্রয়োজন।

আজ মানবজাতির মিলনের আদর্শ অল্পাধিক অস্পষ্টভাবে আমাদের চেতনার সম্মুখভাগে আসিতেছে। মানবচিন্তায় কোন আদর্শের আবির্ভাব সকল সময়েই প্রকৃতির কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্যের নিদর্শন, কিন্তু সকল সময়েই তাহা সিদ্ধিলাভ অভিপ্রায়ের নিদর্শন নহে; কোন কোন সময়ে প্রকৃতি শুধু একটা প্রয়াস করিতে চায়, সাময়িকভাবে ব্যর্থ হওয়াই সে প্রয়াসের ভবিতব্য। কারণ প্রকৃতি তাহার কর্ম্মধারায় ধীর ও সহিষ্ণু। সে ভাবসকলকে গ্রহণ করে, অর্দ্ধসমাপ্ত করে, তাহার পর পথের ধারে ফেলিয়া যায়, কোন ভবিষ্যৎ যুগে যোগ্যতর অবস্থায় আবার তাহাকে তুলিয়া লইতে যায়। —সে তাহার চিন্তাশীল যন্ত্র মানবজাতিকে প্রলুব্ধ করে, পরীক্ষা করিয়া দেখে যে তাহার পরিকল্পিত সমন্বয়ের জন্য মানুষ কতখানি প্রস্তুত হইয়াছে; সে মানুষকে চেষ্টা করিতে ও বিফল হইতে সুযোগ দেয়, প্ররোচিত করে যেন মানুষ শিক্ষালাভ করিতে পারে, ভবিষ্যতে আরও ভালরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে। তথাপি আদর্শটি যখন চেতনার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন নিশ্চয়ই সেইদিকে চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে এবং ভবিষ্যতের নির্ণায়ক শক্তি সকলের মধ্যে মানবীয় ঐক্যের এই আদর্শটি বিশেষ স্থান অধিকার করিবে বলিয়াই মনে হইতেছে; কারণ আমাদের যুগের মানসিক ও ভৌতিক অবস্থা-নিচয় ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে, বিশেষত বিজ্ঞানের আবিষ্কার সকল আমাদের পৃথিবীকে এত সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে যে ইহার বৃহত্তম রাজ্যসকলও একটি মাত্র দেশের বিভিন্ন প্রদেশ অপেক্ষা আর বেশী কিছু বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু এই যে ভৌতিক পরিস্থিতি জিনিষটি ইহাই আদর্শটিকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে; কারণ যদি ভৌতিক পরিস্থিতি মহান পরিবর্ত্তনের অনুকূল হয়, কিন্তু মানুষের হৃদয় ও মন তাহার জন্য প্রস্তুত না হয়—বিশেষত হৃদয় প্রস্তুত না হয়—তাহা হইলে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ইহা ধরিয়াই

লওয়া যায়, অবশ্য যদি না মানুষ যথাসময়ে বিজ্ঞ হইয়া উঠে এবং বাহ্যিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের পরিবর্ত্তনও স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষের বুদ্ধি জড়—বিজ্ঞানের প্রভাবে এমন যন্ত্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, সম্ভবত উহা যে বিপ্লব সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা প্রধানত বা কেবলমাত্র যান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা, সামাজিক ও রাজনীতিক পরিবর্ত্তনের দ্বারাই সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবে। অথচ সামাজিক বা রাজনীতিক কৌশলের দ্বারা, অন্তত কেবলমাত্র বা প্রধানত ইহাদের দ্বারা মানবজাতির ঐক্য স্থায়ীভাবে বা ফলপ্রসূভাবে সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, বৃহত্তর সামাজিক বা রাজনীতিক ঐক্য হইলেই যে তাহা কল্যাণকর হইবে এমন কোন কথা নাই, উহা শ্রেষ্ঠতর, সমৃদ্ধতর, অধিকতর সুখশালী ও শক্তিময় ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের কতখানি সহায় ও কাঠামো হইবে তাহা বিবেচনা করিয়াই উহার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত মানবজাতির যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংঘটিত বৃহদাকার মানবমণ্ডলীগুলি সমৃদ্ধ ও শক্তিময় মানবজীবনের অনুকূল নহে। বরং ইহাই মনে হয় যে, সমষ্টি-জীবন যখন অল্প আয়তনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় এবং সরলভাবে সংগঠিত হয় তখনই তাহা অধিকতর নিরুদ্বিগ্ন, সুখদ, বৈচিত্র্যময় ও সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

মানবজাতির অতীত যতখানি আমাদের জানা আছে যদি আমরা বিবেচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানবজীবনের যে সকল প্রগাঢ়তম যুগে, যে সকল ক্ষেত্রে উহা সমৃদ্ধতমভাবে জীবনযাপন করিয়াছে এবং অতীব মূল্যবান সম্পদসমূহ রাখিয়া গিয়াছে, সেইগুলি হইতেছে ঠিক সেই সকল যুগ ও দেশ যেখানে মানবজাতি নিজেকে ছোট ছোট স্বাধীন কেন্দ্রে সংবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে সকল কেন্দ্র পরস্পরের সহিত অন্তরঙ্গভাবে আদান প্রদান করিয়াছে, কিন্তু মিশ্রিত হইয়া এক ঐক্য গড়িয়া উঠে নাই। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা তাহার তিনভাগের দুইভাগই মানব ইতিহাসের এইরূপ তিনটি শ্রেষ্ঠ যুগ হইতে পাইয়াছে —ইস্রাইল নামে অভিহিত জাতিসঙ্ঘের এবং পরে ক্ষুদ্র ইহুদীজাতির ধর্ম্মজীবন, ক্ষুদ্র গ্রীভ নগরতন্ত্রগুলির বহুমুখী জীবন এবং তদ্রূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ মধ্যযুগীয় ইতালীর সুকুমার-শিল্পচর্চ্চা ও মানসিক অনুশীলনের জীবন।—আর এশিয়া ভূভাগেও কোন যুগই ভারতের বীরযুগের ন্যায় এত শক্তিতে সমৃদ্ধ, এত গৌরবময় এবং এত উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী সম্পদসমূহের স্রষ্টা ছিল না—সে যুগে ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আধুনিক একটি জিলা অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল না। ভারতের আশ্চর্য্যতম কীর্ত্তি সকল, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্কর ও স্থায়ী সৃষ্টি, যাহা রক্ষা করিতে প্রয়োজন হইলে আমাদের পক্ষে আর সব কিছুকেই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকা উচিত, সে সব এই যুগেরই। তাহার নীচেই যে শ্রেষ্ঠ যুগ তাহা আসিয়াছিল আরও পরে—পল্লব, পাণ্ড্য, চোল, চের প্রভৃতি বৃহত্তর জাতি ও রাজ্যের যুগ। কিন্তু তখনও সেগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতি ও রাজ্য; ইহাদের সহিত তুলনায় ভারত তাহার চতুঃসীমার মধ্যে উত্থিত ও পতিত বৃহত্তর সাম্রাজ্যগুলি হইতে, মুঘল, গুপ্ত বা মৌর্য্য সাম্রাজ্য হইতে যাহা পাইয়াছিল তাহা অতি সামান্য, তাহারা শুধু দিয়াছিল রাজনীতিক ও শাসনবিষয়ক সংগঠন এবং কথঞ্চিৎ স্থায়ী কীর্ত্তি, তাহাও সকল সময়ে প্রথম শ্রেণীর ছিল না; এইগুলি ছাড়া তাহাদের অবদান নগণ্যই।—

তথাপি এই যে ক্ষুদ্র নগরতন্ত্র বা প্রাদেশিক কৃষ্টি, এই ব্যবস্থায় এমন একটি দোষ সর্ব্বদাই ছিল যাহার জন্য বৃহত্তর সংবিধান গড়িয়া তুলিবার প্রবৃত্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। দোষটি হইতেছে ক্ষুদ্র সঙ্ঘসকলের স্বভাবসিদ্ধ অস্থায়িত্ব, অনেক সময়ে বিশৃঙ্খলা এবং বিশেষত বৃহত্তর সংবিধানের (ব্যাপক বৈষয়িক সুখ সমৃদ্ধি বিধানে যাহাদের হয়ত' যথেষ্ট সামর্থ্য নাই) আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার অক্ষমতা। সেইজন্য সমষ্টি-জীবনের এই প্রাচীনতর রূপ অন্তর্হিত হইতে থাকে এবং তাহার পরিবর্ত্তে অধিজাতি (nation), রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য সকলের অভ্যুত্থান হয়।

আর এখানে আমরা প্রথমেই লক্ষ্য করি যে, ক্ষুদ্রতর অধিজাতি সঙ্ঘগুলিই সমৃদ্ধতম জীবনের বিকাশ করিয়াছে, বিরাট রাষ্ট্র বা অতিকায় সাম্রাজ্যগুলি নহে। সমষ্টি-জীবন অতি বিস্তৃত পরিধির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে প্রগাঢ়তা ও সৃজন শক্তি হারাইয়া ফেলে বলিয়াই মনে হয়। ইউরোপ জীবনের পরিচয় দিয়াছে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, নেদারলেণ্ডে, স্পেনে, ইতালীতে, জার্ম্মানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিতে,—তাহার আধুনিক সমস্ত সভ্যতা ও প্রগতি ঐ সকল স্থানেই বিকাশলাভ করিয়াছে, হোলী রোমক সাম্রাজ্য (The Holy Roman Empire) বা রুশ সাম্রাজ্যের বিরাট আয়তনের মধ্যে নহে। ইউরোপের বহু অধিজাতির যে প্রগাঢ় জীবন ও কর্ম্ম, পরস্পর পরস্পরের উপর সমৃদ্ধভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিয়াছে, ইহার সহিত এশিয়ার বিরাট জনমণ্ডলীর তুলনা করিলেও আমরা এই সত্যটি দেখিতে পাই,—এশিয়ার সুদীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তার যুগ সকল—যখনকার বৃহৎ যুদ্ধ ও বিপ্লবগুলিকেও মনে হয় ক্ষুদ্র, সাময়িক এবং সাধারণত নিষ্ফল অবান্তর ঘটনামাত্র, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহার স্বপ্নবিলাস, ক্রমশ বেশী বেশী বিচ্ছিন্নতার দিকে তাহার প্রবৃত্তি এবং শেষ পর্য্যন্ত একেবারে অচলায়তন হইয়া পড়া ঐ সত্যেরই পরিচয় দিতেছে।

দ্বিতীয়ত আমরা লক্ষ্য করি, অধিজাতি ও রাষ্ট্র সকলের এই সংগঠনে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্কর জীবনের বিকাশ করিয়াছে তাহারা লণ্ডন, প্যারিস, রোম প্রভৃতি কেন্দ্র বা শহরে জীবনীশক্তিকে কৃত্রিমভাবে কেন্দ্রীভূত করিয়াই উহা করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই কৌশলের দ্বারা প্রকৃত বৃহত্তর সংগঠন ও অধিকতর পূর্ণ ঐক্যের সুবিধালাভ করিয়াও তাহার আদ্যকালীন নগরতন্ত্র ও ক্ষুদ্র রাজ্যে অল্প আয়তনে এবং নিবিড়-

(শেষাংশ ৪৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্ষ

একটি বৎসর অতীত হইল। নূতন বৎসরে আমরা পদার্পণ করিলাম। সকলেই নূতনের অভিনন্দনে ব্যস্ত। নূতন সব কিছুই প্রাণে কেমন একটা উৎসাহ উদ্দীপনা জাগাইয়া দেয়। নূতনকে অভিনন্দন আমরাও করিতেছি। আমোদ-প্রমোদ, আহার-বিহার, খেলা-ধূলা সকলই যেন নূতন ভাবে চলিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। মানুষ ত সৃষ্টিছাড়া জীব নয়, এ-সবে তাহার আনন্দ হইবেই।

কিন্তু এই আনন্দ ক্ষণিক, না স্থায়ী? স্থায়ী করিতে হইলে যতখানি ক্লেশ স্বীকার প্রয়োজন, তাহাতে কি আমরা সম্মত? এক বৎসরে জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি তাহার হিসাব নিকাশ আমরা কয়জনে করিয়া থাকি? যে নেশ্যন্যাল কংগ্রেস ভরতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া লড়িতেছে এক শ্রেণীর লোক তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করাইবার চেষ্টা করিতেছে। জাতির ঐক্য, সংহতি জাতিকে সবল করে, জাতি সবল হইলেই স্বাধীনতা অটুট রাখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যেখানে গৃহ-বিবাদ প্রবল, স্বাধীন হইলেও তাহা ছারে-খারে যায়, পরাধীন দেশের কথা কোন্ ছার।

ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদ গ্রাস করিয়াছে। এখান হইতে সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়িত করিতে হইলে জাতীয় সংহতি আবশ্যক একথা যেমনি সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে, জাতীয় ঐক্য সাধনকল্পে সাম্রাজ্যবাদ নিম্মূর্ল করাও প্রয়োজন। কিন্তু একথা আমরা শিক্ষিত লোকেরা কয়জনে মনে রাখিয়া চলিতেছি? পরস্পরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মাতিয়া, খাওয়া-খাওয়ি করিয়া নিজেদের শক্তিক্ষয়ই করিতেছি, অথচ পরাধীন যাহারা —নিজেদের মুক্তি সাধনে ঐক্যই তাহাদের একমাত্র শক্তি। আমরা ব্রিটিশের পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতেছি, আর এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি যে, আমরা কি সুখেই না আছি! এরূপ কথাও বলিতে শোনা যায়, 'যদি কোন বিদেশীর অধীনে থাকিতে হয় তাহা হইলে যেন ব্রিটিশের অধীনেই থাকি!' যাঁহারা রাজনীতিক কারণে ব্রিটিশের হস্তে নানারূপ দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও মুখেও এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তখন ভাবি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কি যাদুই না জানে! যে-ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিবার জন্য কারাবরণ পর্য্যন্ত করিল তাহার মুখেও এই কথা? কাজেই সাধু সাবধান, এরূপ যাদুর হাত হইতে প্রথমেই আমাদের মুক্তিলাভ প্রয়োজন। ভারতের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতারা তাই এই কথা অহর্নিশি দিকে দিকে ঘোষণা করিতেছেন।

আপাতত মনে হইবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় আমরা নিরাপদেই আছি, পৃথিবীর কোথাও অনর্থ ঘটিলে আমাদের বিশেষ ভাবনা করিবার কিছুই নাই। গত কয়েক বৎসরে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ—এই তিনটি মহাদেশে কত বোমা ফাটিয়াছে, কত নরনারী নিধন হইয়াছে, যুগযুগ সঞ্চিত কত ধনসম্পদ শিল্প ছাই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষতিই ত হয় নাই! আমরা সভ্যতার যত কিছু অবদান সবই আয়ত্ত করিতেছি, ভোগ করিতেছি। বিজলী বাতি, রেডিও, সিনেমা, মোটরকার সব কিছুই ত আমাদের ঘরের দুয়ারে। অন্যান্য দেশ যখন পরস্পরের গলা কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে আমরা তখন নিরাপদজনিত নিশ্চেষ্টতার মধ্যে থাকিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছি, আর নিজেদের পরস্পরের নিন্দায় ও কটুবাক্যে মুখর হইয়া উঠিতেছি!

কিন্তু সত্যই কি আমরা নিরাপদে আছি? অনাবিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছি? কেহ হয়ত বলিবেন, নববর্ষের আনন্দের দিনে, সার্কাস, সিনেমা ও খেলা-ধূলার দিনে বেরসিকের মত এ প্রশ্ন কেন। কিন্তু উপায় নাই। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ যে, এ আনন্দের দিনেও সে বিষয়েও সকলকে সজাগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা অনেকেই জানি না যে, ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিবার কি আয়োজনই না চলিয়াছে। আমাদের নিকট প্রাচ্য প্রতীচ্য দুই দিক্‌কার সাম্রাজ্যবাদই সমান। দুই দিক্‌কার সাম্রাজ্যবাদই একটি টাকার যেন এপিঠ-ওপিঠ। ইহার কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি লইব, সে প্রশ্ন আসেই না। কেননা আমরা সাম্রাজ্যবাদের গোড়াই নিম্মূর্ল করিতে চাই। যাক্ সে কথা। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জালে কিরূপে বিজড়িত হইয়া পড়িতেছি তাহাই দেখিতে হইবে।

আগেই বলিয়াছি, আমরা আপাতরম্য, চাকচিক্যময় যা কিছু সবই পাইতেছি। কিন্তু এ পাওয়াই পাওয়া নয়। বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রগত স্বাধীনতা লাভ না ঘটিলে সবই ভূয়া বলিয়া গণ্য হইয়া যায়। কারণ রাষ্ট্রের শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা একেবারে এক হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি প্রধান যাদু এই যে, ইহা অধীনস্থদের অনায়াসে ভুলাইয়া রাখিতে পারে। চারিদিকে যখন অকাণ্ড-কুকাণ্ড ঘটিতে থাকে তখনও আমরা ব্রিটিশের অঞ্চল ধরিয়া থাকি আর ভাবি, আমরা বেশ নিরাপদেই আছি!

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়াই প্রধানত গড়িয়া উঠিয়াছে। যখন ফল ভোগ করিবার সময় তখন কি ব্রিটেন ইহাকে হাতছাড়া করিতে পারে? কাজেই ইদানীং তাহার পররাষ্ট্র নীতি ভারতবর্ষের দিকে নজর রাখিয়াই পরিচালিত হইতেছে। এ কথাটি সহসা আপনারা হয়ত বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। ইউরোপের কোথায় গোল বাধিল বা সুদূর প্রাচ্যের কোথায় একখানা ব্রিটিশ রণতরী ঘায়েল হইল বা জাহাজডুবি হইল তাহাতে ব্রিটেন ত নিজ ইচ্ছামতই পন্থা অবলম্বন করিবে, ভারতবর্ষের দিকে তাহার নজর রাখিতে হইবে কেন?

একটি কথা আছে, পুনরুক্তিবশত হয়ত মামুলি ঠেকবে। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেও বিদেশীদের ধারণা ছিল, এখনও আছে যে ভারতবর্ষ একটি 'স্বর্ণখনি'। কিন্তু এই কারণেই শুধু ইহা বিদেশীদের কাম্যবস্তু নয়। ভারতবর্ষ ব্রিটিশের শক্তিকেন্দ্র, ইহাকে তাহার হাতছাড়া করাইতে পারিলে তাহার শক্তিও হ্রাস পাইয়া যাইবে। এ যে শুধু অন্যান্য বিদেশীদের

ধারণা তাহা নয়, স্বয়ং ব্রিটিশেরও এই ধারণা। আর এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাহার পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হইতেছে। আজকাল ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-সচিব হইলেন লর্ড হালিফাক্স, ভারতবর্ষের একজন ভূতপূর্ব্ব বড়লাট, তখন তাঁহার নাম ছিল লর্ড আরউইন। তিনি এই গদি লাভ করিয়াছেন এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু ইতি-মধ্যেই ব্রিটেনের পররাষ্ট্র নীতি ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের যোগ্য সহকারী হইয়া পড়িয়াছেন।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। গত বৎসরের কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ্য করিলেই আমাদের আলোচ্য বিষয় পরিষ্কার বুঝা যাইবে। ব্রিটিশ সরকার কিছুকাল যাবৎ মুসোলিনী ও হিটলারের তোয়াজ করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এতদিন গণ-তন্ত্রের আঁধার গলিতে হাতড়াইয়া অবশেষে বাস্তব রাজনীতির সরল রাজবর্ত্মে আসিয়া পা বাড়াইয়াছেন। কোথায় রাষ্ট্রসংঘ, সমষ্টিগত নির্ব্বিঘ্নতা, কোথায় গণতন্ত্র—বাস্তব রাজনীতির কশাঘাতে সবই বানচাল হইয়া গেল। ব্রিটিশ সরকার এই বাস্তব রাজনীতির মহিমা কিরূপে বুঝিতে পারিলেন?

বৎসর দুই পূর্ব্বে জার্ম্মানী ও জাপানের মধ্যে 'এ্যান্টি কমিণ্টার্ন প্যাক্ট' বা সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধী একটি চুক্তি সংঘটিত হয়। ইহার পূর্ব্বেই জার্ম্মানী ও ইটালীর মধ্যে একটি চুক্তি হইয়া গিয়াছিল। ইটালীও কিছুদিন পূর্ব্বে জাপ-জার্ম্মান চুক্তিতে নিজ সম্মতি জানায়। জাপান, জার্ম্মানী ও ইটালী—এই ত্রয়ীর মূল লক্ষ্য বলিয়া কথিত হইল সোভিয়েট রুশিয়া, কিন্তু ইহাদের আরও লক্ষ্য যে ছিল বা আছে অল্পদিন পরেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। নিজ নিজ অঞ্চলে প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তিনে ইহাতে সম্মত। আবার কেহ বাধা দিতে আসিলে তিনে মিলিয়াই তাহার প্রতিরোধ করিবে এইরূপ একটা বোঝাপড়াও হইয়াছিল। চুক্তিবদ্ধ হইবার পর হইতে জাপান পূর্ব্ব এশিয়ায় (আপাতত চীনে), জার্ম্মানী পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপে আর ইটালী ভূমধ্য-সাগরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়াকে শত-হস্ত দূরে রাখিবার জন্য ব্রিটেন এতকাল যাহাদের সাহায্য করিয়া আসিয়াছে তাহারা আজ একি মারাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হইল? কিন্তু উপায় নাই। ব্রিটেন তাই 'রিয়াল পলিটিক্স' বা বাস্তব রাজনীতির মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

ব্রিটিশ সরকার দেখিলেন জাপান, জার্ম্মানী বা ইটালী যে-কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গেলেই তাহাকে বিপাকে পড়িতে হইবে। তাঁহার রাজ্য-সাম্রাজ্য বড়, কাঁচামালের আড়ত বহু, ধন-বল, জন-বল অসামান্য, ইহাদের যে-কোন একটির পক্ষে তাঁহার শক্তি ত অপরিসীমই, তিনটি যদি পাশাপাশিও অবস্থিত হইত তাহা হইলেও তাঁহার ক্ষমতা অপর্য্যাপ্তই থাকিয়া যাইত। কিন্তু ব্যাপার যে সেরূপ নহে। মধ্য ইউরোপে জার্ম্মানীকে ঠেকাইতে হইবে, দক্ষিণ ইউরোপ তথা ভূমধ্য-সাগরে ইটালীকে ঠেকাইতে হইবে, আবার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানকে ঠেকাইতে হইবে। ব্রিটেন তাই বাস্তব রাজনীতির দিকে নজর ঢালিয়া দিয়াছে। গত বৎসরের আরম্ভেই সে ইটালীর সঙ্গে মিতালী করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। ইটালী গ্যাস-বোমার সাহায্যে আবিসিনিয়া জয় করিয়া বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, স্পেনের অন্ত-র্বিপ্লবে বিদ্রোহী দলকে ধন, জন ও অস্ত্র দিয়া গণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। অপরাপর রাষ্ট্রের শত অনুরোধেও সে নিরস্ত হয় নাই। এ হেন ইটালীর সঙ্গেও ব্রিটিশের মিত্রতা করিতে হইবে! তদানীন্তন পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এণ্টনী ইডেন এই প্রস্তাবে কিছুতেই সায় দিতে পারিলেন না, তাঁহাকে গদি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল। তিনি যে তখন বাস্তব রাজনীতিতে তেমন দক্ষ হইয়া উঠিতে পারেন নাই! প্রস্তাবিত ইঙ্গ-ইটালী চুক্তির প্রধান সর্ত্ত কি ছিল? আগে স্পেন হইতে ইটালীয় সৈন্য সকল সরাইয়া লইতে হইবে, তাহা হইলেই ব্রিটেন ইটালীর নূতন সাম্রাজ্য আবিসিনিয়া তাহার অধীন বলিয়া স্বীকার করিবে ও তাহাকে মোটারকম ঋণ দান করিবে। বহুদিন অতীত হইলেও ইটালীর পক্ষে সর্ত্ত একরকম অপূর্ণই থাকিয়া গেল। ব্রিটেন কিন্তু তাহার আবিসিনিয়া বিজয় স্বীকার করিতে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে! ইহাকেই ত বলে বাস্তব রাজনীতি! এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা লইয়াই বোধ হয় আগামী ১১ই জানুয়ারী লর্ড হালিফাক্স সমভিব্যাহারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন রোমে মুসোলিনী ভেটিতে গমন করিবেন। প্রকাশ, এবার তিনি মুসোলিনীর আবিসিনিয়া বিজয় স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না, তিনি উহার কাছাকাছি কিছু রাজ্যও নাকি তাঁহাকে দিয়া দিবেন!

ব্রিটিশ ধুরন্ধরগণ 'বাস্তব রাজনীতি'র খেলা জার্ম্মানী-চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কেও দেখাইয়াছেন বা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। ব্রিটেন জার্ম্মানীর প্রতি আগে হইতেই সদয় ছিল। একদিকে জার্ম্মানী রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া একে একে ভের্সাই সন্ধির সর্ত্তগুলি ভঙ্গ করিতে লাগিল, অন্যদিকে ভের্সাই সন্ধির অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ব্রিটেন তাহার সঙ্গে মিতালী করিতে আরম্ভ করিল। ইঙ্গ-জার্ম্মান নৌ-চুক্তির কথা এখনও আমরা ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু এবারে গত সেপ্টেম্বরে যে ব্যাপার ঘটিল জার্ম্মান-দরদী ব্রিটিশগণ তাহার জন্য আদবে প্রস্তুত ছিলেন না। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জার্ম্মানগণ স্বাতন্ত্র্য দাবি করিলে হিটলার হুমকী দিলেন ঐ অংশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, নহিলে যুদ্ধ অবধারিত। চেম্বারলেন জার্ম্মানী ছুটিলেন, নিজে তাঁহার হুমকী মানিয়া লইলেন, চেক রাষ্ট্রকে ইহা মানিয়া লইতে প্যাঁকেপ্রকারে রাজী করাইলেন! ব্রিটেনের 'বাস্তব রাজনীতি'র মহিমা চেকোশ্লোভাকিয়া হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া লইয়াছে। ব্রিটিশরা এই 'বাস্তব রাজনীতি'র ইদানীং এতটা ভক্ত হইয়া পড়িল কেন?

সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, শক্তিকেন্দ্র ভারত-বর্ষকে হাতে রাখিতেই ব্রিটিশকে এই 'বাস্তব রাজনীতি'র উপাসক হইতে হইয়াছে। ভূমধ্যসাগরের পথ সুগম ও নিরাপদ রাখিবার জন্য তাহাকে ইটালীর তোয়াজ করিতে হইতেছে, এবং নর্থ সী বা জার্ম্মান সাগরে যাহাতে জার্ম্মানী আসিয়া

না পড়ে সেজন্য জার্ম্মানীকে খুশী রাখিতে হইতেছে। স্পেনে বা মধ্য ইউরোপে ইহুদের প্রভাব বিস্তার করিতে দিতেও ব্রিটেন বর্ত্তমানে রাজী। তাহার প্রধান ভয় জাপান। পাছে জাপান চটিয়া যায়, বা তাহার ব্রিটিশ-বিরোধী কার্য্যে এই দুই রাষ্ট্রকে সহায়রূপে পায়—এই আশঙ্কায় জার্ম্মানীর হিটলার ও ইটালীর মুসোলিনীকে স্বপক্ষে রাখিতে তাহার আপ্রাণ চেষ্টা লক্ষ্য করি। চীন জাপান লড়াইয়ে জাপান ব্রিটিশের কম ক্ষতি করে নাই। এ সত্ত্বেও কিন্তু ব্রিটেন চীনকে সাহায্য করিয়া জাপানকে চটাইতে ভরসা পাইতেছে না। ইদানীং যে ব্রিটেন চীনকে কিছু টাকা ধার দিয়াছে তাহা অবশ্য দিয়াছে এইজন্য যে, ইটালী-জার্ম্মানী এখন আর এই সামান্য জিনিষ লইয়া তাহার বিরুধে জাপানের হইয়া লড়িতে আসিবে না। 'বাস্তব রাজনীতি' ইংরেজকে এইটুকু আশ্বস্ত করিয়াছে বলিতে হইবে!

ভারতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালিত হইতেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার কথাই ধরুন। এই রাষ্ট্রটি লইয়া ব্রিটেন যদি যুদ্ধে নামিত তাহা হইলে ফ্রান্স ও রুশিয়ার সাহায্য পাইলেও জার্ম্মানী, ইটালী, জাপান তাহার বিরুদ্ধে যাইত। জার্ম্মান সাগরে, ভূমধ্যসাগরে ও প্রশান্ত মহাসাগরে তাহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হইত। একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, চীনে জাপান লড়াইয়ে লিপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিরাট নৌ-বাহিনী সবটাই এখনও মজুতই আছে। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলে এই বিরাট নৌ-শক্তি প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিত নিঃসন্দেহ। ব্রিটেন এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে কখনও রাজী হইতে পারে না, কারণ ভারতবর্ষ তাহার যে চাই-ই।

এখন প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষকে কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাহন হইয়াই থাকিতে হইবে? ব্রিটিশের ইচ্ছা তাহাই এবং এইজন্যই সে ইউরোপে আটঘাট বাঁধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবিসিনিয়া বিজয় স্বীকার, স্পেনের বিদ্রোহী দলের প্রাধান্য দান, চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ ও পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানীর অগ্রগতি এবং পূর্ব্ব এশিয়ায় চীনের উপর জাপানের নির্ম্মম অভিযান—এ সকলই ব্রিটেন কমবেশী মানিয়া লইতেছে, কারণ সে এখন 'বাস্তব রাজনীতি'র ভক্ত। ভারত সাম্রাজ্য তাহার হাতে রাখিতে হইলে এরূপ না হইয়া উপায় নাই। ভারতবাসী আত্মকলহে ব্যাপৃত। সে কি ঐক্যবদ্ধ হইয়া সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইবে না? এজন্য সচেষ্ট হইবার ইহাই যে উপযুক্ত সময়।

৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৯।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

(৪৭৮ পৃষ্ঠার পর)

ভাবে ঘনীভূত কর্ম্মিষ্ঠতায় ফলপ্রসূ কেন্দ্রীকরণের যে শক্তি ছিল—যে শক্তি বৃহত্তর সংগঠনের সুবিধা সকলের ন্যায় সমানভাবেই মূল্যবান—তাহাও কতক পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই সুবিধার মূল্যস্বরূপ সংবিধানটির বাকী অংশকে জিলা, মফস্বলের শহর ও গ্রামকে অবসাদপূর্ণ, ক্ষুদ্র, তন্দ্রালু জীবনযাপন করিতে হইয়াছে, তাহার সহিত প্রধান শহরের প্রগাঢ় জীবনের বৈসাদৃশ্য বিস্ময়জনক।

দেশের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐক্য সংবিধানের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হইতেছে রোমক সাম্রাজ্য এবং উহার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সেখানে পূর্ণভাবেই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। সুবিধা হইতেছে প্রশংসনীয় সংগঠন, শান্তি, ব্যাপক নির্ব্বিঘ্নতা, শৃঙ্খলা এবং বৈষয়িক সুখ-সম্পদ; অসুবিধা হইতেছে এই যে, ব্যক্তি, শহর ও প্রদেশ তাহাদের স্বাধীন জীবন বিসর্জ্জন দেয় এবং একটা যন্ত্রের প্রাণহীন অংশ হইয়া পড়ে; জীবন তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্য, সমৃদ্ধি, বহুমুখীনতা, স্বাধীনতা, এবং সৃষ্টি করিবার বিজয়ী প্রেরণা হারাইয়া ফেলে। সংবিধানটি মহান ও গৌরবময়, কিন্তু ব্যষ্টির জীবন খর্ব্ব হয়, অভিভূত ও আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে; এবং কালক্রমে ব্যষ্টির ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতার দ্বারা বৃহৎ সংবিধানটিও নিজের মহান্ রক্ষণশীল সজীবতা ধীরে ধীরে হারাইয়া ফেলে এবং ক্রমবর্দ্ধমান শ্লথতার ফলে ধ্বংস মুখে পতিত হয়। এমন কি বাহ্যত কাঠামোটি অক্ষত ও অটুট আছে মনে হইলেও ভিতরে ভিতরে তাহা জীর্ণ হইয়া উঠে এবং বাহির হইতে প্রথম আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ হয়। এইরূপ সংবিধান, এইরূপ সব যুগ রক্ষণের পক্ষে সাতিশয় উপযোগী, যেমন রোমক সাম্রাজ্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমৃদ্ধ শতাব্দী সকলের সম্পদগুলিকে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা জীবন ও জীবনের বিকাশকে ব্যাহত করে।

তাহা হইলেই আমরা পাইতেছি, আজকাল কেহ কেহ মানবজাতির সামাজিক, শাসনমূলক ও রাজনীতিক ঐক্যের যে স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সংসাধিত হইলে তাহার ফলাফল কি হইতে পারে। এক অতি বিরাট সংবিধান আবশ্যক হইবে, তাহার চাপে ব্যষ্টিগত ও দেশগত উভয় প্রকার জীবনই বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ ও সূর্য্যালোক হইতে বঞ্চিত উদ্ভিদের ন্যায় প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া পিষ্ট ও খর্ব্ব হইয়া যাইবে, এবং মানবজাতির পক্ষে ইহার অর্থ হইবে, প্রথম প্রথম হয়ত পরিতৃপ্ত ও উৎসাহজনক কর্ম্মিষ্ঠতার স্ফুরণ, তাহার পর আসিবে কেবল রক্ষণশীলতার এক সুদীর্ঘ যুগ, ক্রমবর্দ্ধমান শ্লথতা ও নির্জ্জীবতা এবং শেষ পর্য্যন্ত ধ্বংস!

অথচ মানবজাতির ঐক্য সাধন যে প্রকৃতির কার্য্যক্রমের অন্তর্গত এবং একদিন সংসাধিত হইবেই তাহা সুস্পষ্ট। কেবল তাহার জন্য প্রয়োজন অন্যরূপ বিধান এবং এমন সকল সতর্কতার ব্যবস্থা যাহা মানবজাতির জীবনীশক্তির মূলগুলিকে অক্ষত রাখিবে।* (ক্রমশ)

* মূল ইংরেজী 'The Ideal of Human Unity' হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

গান্ধী কি বুর্জ্জোয়া ?

১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসে করাচীতে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তার প্রথমেই আছে,

> "This Congress is of opinion that to enable the masses to appreciate what "Swaraj," as conceived by the Congress, will mean to them, it is desirable to state the position of the Congress in a manner easily understood by them. In order to end the and exploitation of the masses, political freedom must include real economic freedom of the starving millions."

এর বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়,

> "কংগ্রেসের পরিকল্পিত স্বরাজের প্রতি জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা জাগাতে হ'লে স্বরাজের অর্থ তারা যাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এমনভাবে তার ব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয়। কংগ্রেস এই মতই পোষণ করে। জনসাধারণকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হ'লে কেবল রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার পর্য্যাপ্ত নয়। অনশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য অর্থনৈতিক অধিকারেরও ব্যবস্থা চাই।"

করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনে মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে প্রস্তাবটি যিনি পেশ করেছিলেন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মুখে—তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। প্রস্তাবটি যদি ভালো ক'রে বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে, কংগ্রেস স্বরাজ বলতে যা মনে করে—তা কেবল রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি নয়। ইংরেজেরা শাসন-দন্ড পরিত্যাগ করিলেই জাতির ভাগ্য-গগনে স্বরাজ-সূর্য্যের উদয় হবে—এমন ঘটনা নাও ঘটতে পারে। বিদেশী আমলাতন্ত্রের সিংহাসনে যদি প্রতিষ্ঠিত হয় স্বদেশী-মার্কা আমলাতন্ত্র, তবে স্বরাজের মুখোস প'রে সুরু হবে স্বরাজের প্রহসন। এখন যেমন বিলাতী বণিকদের স্বার্থকে ধ্রুবতারা ক'রে পরিচালিত হ'চ্ছে রাষ্ট্রের অর্ণবযান, বিদেশী শাসনের অবসানের পরে তেমনি যদি ভারতীয় ধন-কুবেরদের স্বার্থ-রক্ষাই হ'য়ে ওঠে নূতন রাষ্ট্রের মুখ্য লক্ষ্য—তবে স্বরাজের আমরা দেখা পাবো না—পুরাতনেরই জাবর কাটতে থাকবো। স্বাধীনতার যে লড়াই তার লক্ষ্য তো কেবল ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা নয়, তার একটা প্রকান্ড লক্ষ্য হ'চ্ছে জনসাধারণকে জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাঁচানো। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাঁচাতে হ'লে তাদের মুক্ত করতে হবে শোষণের হাত থেকে। তা করতে হ'লে ক্ষুধাতুর জনসাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সঙ্গে দিতে হবে অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্যের উপরে অধিকার। অর্থনীতির দিক দিয়ে কোন মানুষ কোনো মানুষের বন্দ হ'য়ে থাকবে না। করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে মৌলিক অধিকারগুলির প্রস্তাব গান্ধীই এনেছিলেন আর এই প্রস্তাবের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে জনসাধারণকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করবার কথা—in order to end the exploitation of the masses......অধিকারগুলির কথা একে একে পাঠ করবার পরে গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারি মূল্যবান একটি কথা বলেছেন। কথাটা হচ্ছে, "Our main qestion and concern will be that of the poor people."

কোন মানুষ দরিদ্রের বন্ধু না ধনীর বন্ধু—এর বিচার করবো আমরা কিসের কষ্টি-পাথরে? সেই মানুষটির বাণীর কষ্টি-পাথরে না তার জীবনের কষ্টি-পাথরে? অনেকে বলবেন, বাণীর কষ্টি-পাথরে। মানুষ বক্তৃতায় বা লেখায় যে মত প্রচার করে সেই মতের মুকুরে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে আমরা বলি, মানুষটী কমিউনিস্ট, এ্যানার্কিস্ট, মডারেট, উদারপন্থী অথবা এই রকমের একটা কিছু। মতবাদের কষ্টি-পাথরে আমরা যদি গান্ধীজীর বিচার করি তবে দেখতে পাবো—দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গলকেই তিনি কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য করতে চেয়েছেন। জনসাধারণকে তিনি শোষণের হাত থেকে মুক্ত দেখতে চান আর সেই জন্যই তিনি কেবল political democracyতে সন্তুষ্ট নন। তিনি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সঙ্গে চানthe real economic freedom of the starving millions.

যদি কেউ বলেন, কোনো মানুষ বুর্জ্জোয়া কি বুর্জ্জোয়া নয়—সে বিচার হওয়া উচিত তার আচরণের কষ্টি-পাথরে—তবে বলবো—এদিক দিয়েও গান্ধীকে ধনীদের পর্য্যায়ে ফেলবার কোনো উপায় নেই। অপরিগ্রহ তাঁর জীবনের একটি মূল মন্ত্র। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে কিছু নেই। তাঁর ব্যাঙ্কে জমানো টাকা নেই, তাঁর নিজের বাড়ী নেই, গাড়ী নেই, বিষয়-সম্পত্তি নেই। অনেকে সম্পত্তি নিজের নামে না ক'রে স্ত্রীর নামে করে। কস্তুরীবাই একবার নিজের জন্য আলাদা ক'রে কিছু টাকা বাক্সে রেখেছিলেন। এ কথা জানতে পেরে গান্ধীজী জগতের সামনে তাঁকে কিরকম ভাবে লজ্জিত করেছিলেন—সে কথা ইয়ং ইন্ডিয়ার কল্যাণে জানতে কারও বাকী নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাণীর কষ্টি-পাথরে অথবা জীবনের কষ্টি-পাথরে—যে কোন কষ্টি-পাথরেই আমরা গান্ধীজীকে যাচাই করি না কেন, তাঁকে বুর্জ্জোয়ার পর্য্যায়ে কোনো ক্রমেই আমরা ফেলতে পারিনে।

কমিউনিস্ট বন্ধুরা বলবেন, গান্ধীজী নিজে বুর্জ্জোয়া না হ'তে পারেন, কিন্তু বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর বিলোপ তিনি কামনা করেন না। তিনি চান, বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব সমাজে অক্ষুণ্ণ থাকুক—তবে ভক্ষক হিসাবে নয়, রক্ষক হিসাবে। একথা সত্য কোনো কোনো জায়গায় গান্ধীজী trusteeshipএর কথা বলেছেন। Trusteeshipএ বিশ্বাস করা, অবশ্যই, কঠিন। বিষয়-সম্পত্তির উপরে যোলো আনা অধিকার থাকবে আমার—কিন্তু সমাজের সমস্ত মানুষের মঙ্গলের জন্য সম্পদকে সর্ব্বদার জন্য ব্যবহার করবো—এরকম আদর্শ-নিষ্ঠা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরল। সাধারণ মানুষ স্বার্থকে স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করতে চায় না—মরবার আগেও

টাকার থলি বুকে আঁকড়ে রাখতে চায়। মানুষের এই স্বার্থপরতাই কি বারে বারে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে বিপ্লবের নটরাজকে ডেকে আনলো না? সম্পদ একদিকে পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে—আর একদিকে অসংখ্য মানুষের দারিদ্র্য হয়ে উঠেছে তীব্র থেকে তীব্রতর। অবশেষে লক্ষ লক্ষ অনাহারক্লিষ্ট নর-নারীর দারিদ্র্যের বেদনা সহ্য করবার সীমাকে অতিক্রম করেছে—আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে বিপ্লবের সর্ব্বধ্বংসী দাবানল। মুষ্টিমেয় মানুষ সমাজের অছি হ'য়ে বিষয়-সম্পত্তিকে যদি ব্যবহার করতো জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তবে ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের অথবা রুষ বিপ্লবের মতো বিপ্লব কোনদিনই ঘটতে পারতো না।

কিন্তু গান্ধীজীর অতি আধুনিক লেখা প'ড়ে আমাদের মনে পরিষ্কার ধারণা হয়েছে—জমি, খনি, কলকারখানা প্রভৃতি ধনোৎপাদনের উপায়গুলিকে তিনি ব্যক্তিবিশেষের অথবা দলবিশেষের হাতে রাখতে চান না। Trusteeshipএর থিয়োরীর মধ্যে শোষণ নেই বটে—কিন্তু ধনোৎপাদনের যন্ত্রগুলির উপরে মুষ্টিমেয় মানুষের ষোল আনা অধিকার আছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ই তারিখে 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজীর Accumulating Evidence শীর্ষক একটী লেখা আছে। জমিদারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকর্ম্মীরা অনেক জায়গায় অযথা যে বিষ উদ্গীরণ করছে তার প্রতিবাদ ক'রে এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

> "In saying this I do not wish to suggest that the land does not belong to the worker on it. I endorse the socialist theory of possession."

এর বাংলা করলে দাঁড়ায়

> "জমিদারদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের আচরণের ও উক্তির প্রতিবাদ করতে গিয়ে জমি কৃষকের নয়—একথা আমি কিন্তু বলছিনে। সমাজের সম্পদের উপরে কার কতখানি অধিকার থাকা উচিত—এ বিষয়ে সোস্যালিষ্টদের যে মত, আমারও সেই মত।"

গত ডিসেম্বর মাসের ১০ই তারিখের 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজীর সহিত কয়েকজন কমিউনিস্টের কথোপকথনের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিবরণটি পাঠ করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সম্পর্কে গান্ধীজী কমিউনিস্টদের সঙ্গে একমত। এই কথোপকথনের মধ্যে trusteeshipএর নাম-গন্ধও নেই। গান্ধীজী বলেছেন,

> "Contrariwise, I know socialists and communists who will not hurt a fly but who believe in the universal ownership of instruments of production. I rank myself as one among them."

এর বাংলা অনুবাদ হ'চ্ছে,

> "পক্ষান্তরে আমি এমন অনেক সোস্যালিস্ট আর কমিউনিস্টকে জানি যাঁরা একটি মাছি মারতেও নারাজ—কিন্তু ধনোৎপাদনের উপায়গুলি যে সর্ব্বসাধারণের হওয়া উচিত—এই সত্যে তাঁরা বিশ্বাস করেন। আমি নিজেকে এ'দের দলেরই একজন ব'লে মনে করি।"

এই উক্তির মধ্যে গান্ধীজীর যথার্থ পরিচয় আমরা খুঁজে পাই। Real economic freedom of the starving millions কেমন ক'রে সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে তার একটা কাঠামো দেওয়া হয়েছে করাচী কংগ্রেসের মৌলিক অধিকারগুলির তালিকায়। সেখানে চাষীদের খাজনা বহুলপরিমাণে কমানোর কথা আছে, শ্রমিকদের বহু অধিকারের কথা আছে, এমন কি মৌলিক অধিকারগুলির ঊনবিংশ দফায় Control by the State of key industries and ownership of mineral resourcesএর কথাও আছে—কিন্তু universal ownership of instruments of productionএর কথা নেই। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের বক্তৃতায় গান্ধীজী রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ধনীদের বিষয়-সম্পত্তির উপরে হস্তক্ষেপ করবার প্রয়োজনের কথা বলেছেন, সেখানেও expropriationএর আভাস আছে—কিন্তু বিলাতের বক্তৃতাগুলির মধ্যেও universal ownership of instruments of productionএর উল্লেখ নেই। জমি, খনি, কলকারখানার উপরে সমাজের সর্ব্বসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত—একথা গত ১৭ই সেপ্টেম্বরের হরিজনে স্পষ্ট ক'রে এবং ১০ই ডিসেম্বরের হরিজনে আরও স্পষ্ট ক'রে গান্ধীজী সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করলেন।

কমিউনিস্টদের সঙ্গে গান্ধীজীর তফাৎ Classless Society নিয়েও নয়, private propertyর abolition নিয়েও নয়। মার্ক্সবাদীদের মতোই তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। মার্ক্সবাদীদের মতোই তিনি direct actionএর দ্বারা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদে বিশ্বাসী। তবে তাঁর direct action হ'চ্ছে Civil Disobedience. মার্ক্সের সঙ্গে গান্ধীর দৃষ্টি-ভঙ্গিমার প্রধান পার্থক্য, বোধ হয়, দু' জায়গায়। মার্ক্স রাষ্ট্রের উচ্ছেদ চেয়েছেন সশস্ত্র বিপ্লবের পথে। গান্ধীও বিপ্লবে বিশ্বাসী—কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবে নয়। আর একটা জায়গায় গান্ধীর সঙ্গে মার্ক্সের মতের তফাৎ। মার্ক্স শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত dictatorshipএ বিশ্বাসী—গান্ধীজী বিশ্বাস করেন গণতন্ত্রের নীতিতে। রাষ্ট্র কর্ত্তৃক শক্তি-প্রয়োগ যত কম হয় ততই মঙ্গল—এই হ'চ্ছে গান্ধীর মত এবং এখানে কমিউনিস্টদের চেয়ে এ্যানার্কিস্টদের সঙ্গেই তাঁর মতের অধিকতর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপরে একথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে গান্ধীজী দরিদ্রের অকৃত্রিম বন্ধু, তিনি তাঁদের মুক্তি চান ধনতন্ত্রের নাগপাশ থেকে, কমিউনিস্টরা সর্ব্বহারাদের কল্যাণ যতখানি কামনা করেন—গান্ধীজীও তাদের কল্যাণ ততখানিই কামনা ক'রে থাকেন, সর্ব্বোপরি কমিউনিস্ট এবং এ্যানার্কিস্টরা যেমন ধনোৎপাদনের যন্ত্রগুলির উপরে সর্ব্বসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক—গান্ধীজী তেমনি জমি, খনি, কলকারখানাকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করতে ইচ্ছুক। কথা নিয়ে কি মারামারি করবার দিন আছে? কাজের ক্ষেত্রে হাত মেলাও।

পরলোকে অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু

বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু গত ১লা জানুয়ারী, রবিবার রাত্রিতে ইটালী সাউথ রোডস্থ স্বীয় ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বসু গত এক মাস যাবৎ পৃষ্ঠ ব্রণে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন।

অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু বর্দ্ধমান জিলার বেড়ুগ্রাম নামক গ্রামে ১২৬০ সালের ১৪ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় জানকীপ্রসাদ বসু বাল্যেই পুত্র গিরিশচন্দ্রের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন এবং তাঁহাকে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ইংরেজী পড়াইতে থাকেন। গিরিশচন্দ্র বাল্যেই তীক্ষ্ণধী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দশ বৎসর বয়সে তাঁহাকে হুগলীতে তাঁহার জ্যেঠা মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখানেই গিরিশচন্দ্র তাঁহার জ্যেঠিমার স্নেহ ও প্রীতি এবং পিতা-মাতার মহান চরিত্রের প্রভাবে নিজ চরিত্রকে সুন্দরভাবে গঠন করিয়া তোলেন। গিরিশচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে এফ-এ ও বি-এ পাশ করেন। বি-এ-তে তিনি সকল বিষয়ে বিশেষতঃ বোটানীতে (উদ্ভিদ্ বিদ্যা) ভাল নম্বর পাইয়া পাশ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রখর মেধা-শক্তির পরিচয় পাইয়া শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর মিঃ উডরো তাঁহাকে ১৮৭৬ সালে কটক রাভেনশ কলেজের সায়েন্সের লেকচারার নিযুক্ত করেন, সেখানে তিনি ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত কাজ করেন। তৎপর তদানীন্তন স্কুল ইন্সপেক্টর মনীষী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুমোদনক্রমে তিনি কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইবার জন্য সরকারী বৃত্তি লইয়া বিলাত যান এবং ১৮৮৪ সালে কৃষি কলেজ হইতে প্রথম স্থান লাভ করিয়া শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কৃষি বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার সময় ১৮৮২ সালে ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটীর ডিপ্লোমা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৫০ পাউণ্ড পুরস্কারলাভ করেন এবং সেই হইতেই সোসাইটির আজীবন সভ্য মনোনীত হন।

গিরিশচন্দ্র সেই বৎসরই হাইল্যাণ্ড এগ্রিকালচার রৌক্ষার ফেলোসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত সোসাইটীর আজীবন সভ্য মনোনীত হন। ১৮৮৩ সালে কৃষি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক মিঃ কিনচ্ এফ-সি-এসের অনুমোদনক্রমে গিরিশচন্দ্র কেমিক্যাল সোসাইটি অফ ইংলণ্ডের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। বিলাতের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ই জুলাই কালিকাতায় আসিয়া পেঁছেন। অতঃপর শীঘ্র কোনও সরকারী চাকুরীলাভ করিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহার কৃষি কলেজের সহাধ্যায়ী ভূপালচন্দ্র বসুর সহায়তায় ১৮৮৫ সালে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্প কিছুদিন পরেই অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন; কিন্তু স্কুলের স্বার্থের দিকে চাহিয়া তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন নাই।

অল্প দিনের মধ্যে স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং প্রথমবার যে সকল ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল তাহাদের ফল অতি চমৎকার হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ১৮৮৭ সালে এফ-এ শ্রেণী খোলা হয় ও পরে বি-এ, এম-এ ও বি-এল ক্লাশ খোলা হয়. বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় তখন কলেজে ভারী আর্থিক দুরবস্থা উপস্থিত হয়। অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র তখন নিজে টাকা দিয়া কলেজ চালান। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি বরাবরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৯০৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন এবং ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যাপারে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া অল্পদিন পরেই অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র দুইখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিষয়ে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা ছাত্র সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল।

১৯৩২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রগণ অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। তদুপলক্ষে তাঁহাকে নিম্নলিখিত মানপত্র প্রদান করা হইয়াছিলঃ—

"বাঙালীর চিত্তলোকে জ্ঞানের দীপালি-উৎসব জাগিয়ে তোলার সোনার স্বপনকে রূপায়িত ক'র্‌বার ব্যাকুল বাসনায় সিন্ধুপারের সারস্বতযজ্ঞভূমির হোমকুণ্ড থেকে নচিকেতার মতন তুমি বহ্নি নিয়ে এসেছিলে—সে আজ অর্দ্ধশতাব্দীর কথা। বাঙলার তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপ্রতিষ্ঠান এই বিশ্রুতনামা বঙ্গবাসী কলেজ তোমার সেই তপস্যার অখণ্ড ফল, তোমার উজ্জ্বল মহিমার শাশ্বত-বৈজয়ন্তী। কত বাধা, কত বিপর্য্যয়, দুর্লঙ্ঘ্য গিরির মতন তোমার পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, চিরন্তন আশাবাদী তুমি, দুর্দ্দম দুর্নিবার তোমার ইচ্ছাশক্তি; নিষ্কম্পবক্ষে, দৃপ্তপদপাতে তুমি তার সম্মুখীন হ'য়েছ। তোমার জীবনপণ সাধনার রুদ্র ধারাবেগে সকল বাধাবিপর্য্যয় চূর্ণ হ'য়ে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে। তুমি সিদ্ধিলাভ ক'রেছ। হে বীরাচারী শক্তিসাধক, হে বিদ্যাদানৈকব্রত জ্ঞাননিষ্ঠ বশিষ্ঠকল্প মহাপুরুষ, তোমার এই অশীতিতম জন্মতিথি উৎসবে আজ আমরা শ্রদ্ধানতচিত্তে তোমাকে অভিবাদন করি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সেই অরুণ বাঙলার বিকৃত তারুণ্যের আবর্ত্ত থেকে যে চারিত্রশক্তিতে আপনাকে তুমি নির্ম্মুক্ত রেখেছিলে এবং যার প্রভাবে আজও তুমি দেহে-মনে-প্রাণে শুদ্ধ আদর্শ বাঙালী, সেই শক্তিকে আমরা নম্রতশিরে শ্রদ্ধা করি।

প্রথম যৌবনে কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই একদিন যে উদগ্র আত্মসম্মানবোধ শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃপক্ষীয়ের তীব্র প্রতিবাদে তোমাকে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিল, অনতিকাল পরে ইউরোপ-যাত্রাপথে সিন্ধুবক্ষে আর একদিন যে ব্যক্তিত্বাভিমান পাশ্চাত্য জাতীয়ের দম্ভ-গর্ব্ব ঔদ্ধত্যের নির্ভীক নিষ্কম্প প্রতিবাদে তোমাকে অনুপ্রাণিত ক'রেছিল এবং এই অশীতিবর্ষ বয়সেও যা' তোমাকে তুঙ্গশৃঙ্গ অচলের মতন উন্নত অটল এবং মহীয়ান্ ক'রে রেখেছে, সেই চিরস্বতন্ত্র, বাঙালীদুর্লভ, তেজো-ভূয়িষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে বিস্ময় পুলকিত আমরা আমাদের আন্তরিকতম শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

জাতীয় ভাষা, তথা সাহিত্যের অনুশীলন হ'তে যে অন্ধ মূঢ়তা বাঙালীকে বঞ্চিত ক'রে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজাতীয় ভাষার সার্ব্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল, সেই দৃঢ়মূল ব্যাপক, বর্ষীয়ান্ মূঢ়তার প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে যে শক্তিমান্, নিঃশঙ্ক, অন্যায়-অসত্যের পরিপন্থী মনস্বীরা সফল সাধনা ক'রেছিলেন, তুমি তাঁদের অন্যতম। বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তোমার বহুবর্ষব্যাপী সম্পর্কের ইতিহাস অসত্যের বিরোধিতায় সমুজ্জ্বল—বাঙালী তা জানে। এদেশের গৌরবময় জাতীয় প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘকাল আপনাকে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রেখে পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের নিত্যনবসিদ্ধি বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পবিত্র সংকল্প নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে মাতৃভাষায় পরিভাষা রচনা ক'রে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের গ্রন্থপ্রণয়নে তুমি বাঙলার জ্ঞান-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন ক'রেছ।

শুধু তাই নয়; এদেশের তরুজগতের অনুপম বিচিত্র সৌন্দর্য্য, তথা বিপুল মহিমার সঙ্গে পাশ্চাত্য জাতির পরিচয়-সূত্র রচনার উদ্দেশ্যে অদম্য অধ্যবসায়ে তুমি ইংরাজী ভাষায় অতুলনীয় উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রেছ। তোমার কাছে এ দেশবাসীর ঋণ পরিশোধের অতীত। হে দেশাত্মবোধী, সত্যাগ্রাহী কর্ম্মযোগিন্, আমরা শ্রদ্ধানতচিত্তে তোমাকে অভিবাদন করি।

প্রভুত্বের সুদূরগগনচারী হ'য়েও বন্ধুত্বের স্নিগ্ধ কর মৃদুবিহারী সকলের ওপর তুমি সহজেই প্রসারিত কর। হে অসাধারণ সাধারণ মহাপুরুষ, তোমাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করি।

তোমার প্রেমদিগ্ধমনের কল্যাণ-কামনা শুধু মানুষেই পরিসমাপ্ত হয় নাই, অন্তশ্চেতন তরু-জগৎকেও পরিব্যাপ্ত ক'রেছে। তাই, স্নেহমুগ্ধ মানুষের স্মিত-দীপ্ত নয়নের আলোর মুকুট তোমার গৌরবোন্নত শিরে দেদীপ্যমান; আর, বনভুবনের চিরশ্যাম, চিররসনিষিক্ত, চিরসুরভিমধুর মর্ম্মের ঐকান্তিক মর্ম্মরাশীর্ব্বাদে তোমার চিত্তে অটুট তারুণ্যের লীলা, তোমার পরমায়ু অক্ষয়বটের পরমায়ু। হে পর-প্রেমিক, আমরা তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি, আনন্দমেদুর সম্রতচিত্তে অভিবাদন করি।"

বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, দেশবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। জীবনের ব্রত সমাপন করিয়া পরিণত বয়সেই তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে দেশ ও সমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

গিরিশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আমলে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া সেখানকার উচ্চ উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি উচ্চপদ লাভ এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, সে সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ভিন্ন ধাতুতে গড়া ছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত পালনের জন্য তিনি সরকারী চাকুরীর প্রলোভন ত্যাগ করিয়া প্রায় রিক্তহস্তে প্রথমে বঙ্গবাসী স্কুল, পরে বঙ্গবাসী কলেজ স্থাপন করেন। এই স্কুল ও কলেজ রক্ষা ও উহার উন্নতি বিধানের জন্য তাঁহাকে কিরূপ প্রবল বাধা-বিঘ্নের মধ্যে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত। গিরিশচন্দ্র এই সব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখে যে কখনই বিচলিত হন নাই, সকল অবস্থাতেই প্রশান্ত ধৈর্য্য ও দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। তাঁহার সেই অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী বিরাট সাধনার ফলে বঙ্গবাসী কলেজ ও স্কুল, আজ বাঙলা দেশের অন্যতম উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষায়তন, ছাত্র সংখ্যা ও অধ্যাপনার গৌরবে ইহার ইতিহাস সমুজ্জ্বল।

বাঙলা দেশের শিক্ষা বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য, তাহার বিধি-নিয়ম যেন তাঁহার নখদর্পণে ছিল। ১৯০৬ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ বিশ বৎসর-কাল তিনি একাদিক্রমে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার তীক্ষ্ণধী বিচার শক্তি এবং মত-স্বাতন্ত্র্য দ্বারা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষের সঙ্গে অনেক সময়েই তাঁহার মতভেদ হইত, কিন্তু স্যার আশুতোষের তাঁহার মতের প্রতি খুব শ্রদ্ধা ছিল, বহু ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার সাহায্যও লইতেন।

কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকরূপে তাঁহার খ্যাতি, প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, সময়নিষ্ঠা ও নিয়মানু-বর্ত্তিতা ছাত্র মহলে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। অন্য দিকে ছাত্রদের প্রতি তাঁহার ছিল গভীর ও আন্তরিক ভালবাসা। প্রাচীন কালের গুরুদের মতই তিনি তাহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। দরিদ্র ছাত্রদের তিনি ছিলেন বন্ধু, প্রায়ই তিনি বলিতেন, তাঁহার কলেজ দরিদ্রদের কলেজ। কত ছাত্রকে যে তিনি নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশেষত একটি বিষয়ে নির্ভীক, তেজস্বী, কর্ত্তব্যে কঠোর ছাত্রবন্ধু অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ কেহ বাঙলা দেশে ছিল না। যাহারা কোন কলেজে আশ্রয় পাইত না, এমন বহু মুক্ত রাজবন্দী ছাত্রকে তিনি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া লইতেন। রাজনৈতিক কারণে লাঞ্ছিত কোন কোন অধ্যাপককেও তিনি তাঁহার কলেজে যোগ্যতা বিচার করিয়া সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই গুণে তিনি চিরকাল বাঙলার ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

তরুণ বয়স হইতেই গিরিশচন্দ্রের মনে দেশানুরাগ প্রবল ছিল। সর্ব্বদাই তিনি ছিলেন জাতীয় ভাবের ভাবুক। যে কালে বিলাত হইতে ফিরিয়া যুবকেরা সাহেব সাজিত এবং ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি করিত, সেই কালে কয়েক বৎসর বিলাতে বাস করিয়াও বিজাতীয় ভাবের ছায়া তাঁহার মনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অধুনা দুষ্প্রাপ্য তাঁহার "বিলাতের পত্র" নামক দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থে তাঁহার দেশানুরাগ ও জাতীয় ভাবের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। বিলাত হইতে ফিরিয়া গিরিশচন্দ্র আহার, ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদে খাঁটি বাঙালীই রহিয়া গেলেন এবং এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শই তিনি চিরজীবন অনুসরণ করিয়াছেন।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল এবং আজীবন নানাভাবে উহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। উদ্ভিদ বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং ঐ বিদ্যা সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ বাঙলায় লিখিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিষদের সহিত তিনি বহু বৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং উহার কার্য্যে সহায়তা করিতেন। মাতৃ-ভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত—স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশু-তোষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষীদের ন্যায় তাঁহারও এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহাদের চেষ্টায় বাঙলা ভাষার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ন্যায় তিনিও কলেজের উচ্চ শ্রেণীতেও বাঙলা ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান অধ্যাপনা করিতেন।

প্রাচীন ভারতে যাঁহারা অন্তত দশ সহস্র ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতেন, তাঁহা-দিগকে বলা হইত 'কুলপতি' আধুনিক-কালে গিরিশচন্দ্র শিক্ষাজগতে সত্যই ছিলেন কুলপতি। বাঙলার ছাত্রেরা তিন পুরুষ তাঁহার নিকট পড়িয়াছে, অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া তিনি শিক্ষা বিস্তার কল্পে অক্লান্তভাবে সাধনা করিয়াছেন। সুতরাং এই দিক দিয়া তিনি আধুনিক বাঙলার জাতি গঠয়িতা-দের অন্যতম। আমরা এই শিক্ষাব্রতী মনীষী সাধকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। গিরিশ-চন্দ্র সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গৌরবময় স্মৃতি বাঙালী-জাতির চিত্তে চিরদিন সমুজ্জ্বল হইয়া রহিবে।

বিচিত্র মনোব্যাধি

সে অনেকদিনের কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট জেমস্ এ গারফিল্ড বোষ্টন নগরে যাইবেন বলিয়া 'হোয়াইট হাউস' হইতে ট্রেন্ ধরিবার জন্য সবেমাত্র ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সহসা সমাগত দর্শকদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্টের দিকে ছুটিয়া আসিতে দেখা গেল। পরক্ষণেই রিভলবারের দুইটি আওয়াজ হইল এবং দেখিতে না দেখিতে প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডয়মান ষ্টেট সেক্রেটারী জেমস্ জি ব্লেনের কোলের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

হত্যাকারীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হইল। হত্যাকারীর নাম চার্লস জে গিটো। ধরা পড়িবামাত্র সে বলিল, "রাজনৈতিক প্রয়োজনে দৈবাদেশে আমি ইঁহাকে হত্যা করিয়াছি।"

তদন্তক্রমে গিটোর যে পরিচয় মিলিল, তাহাতে জানা যায়, গৃহহীন, কপর্দ্দকহীন বিবিধ রোগগ্রস্ত এই লোকটি জীবনে সাফল্য কাহাকে বলে জানে নাই; তবু সে নিজকে যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে ছাড়িত না। তাহার ধারণা রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার অসামান্য প্রভাবই গারফিল্ডকে সামান্য অবস্থা হইতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হইতে সহায়তা করিয়াছে। জন কতক নিগ্রোর সমক্ষে গিটো একবার নির্ব্বাচন উপলক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিল—তাহার রাজনীতিক কার্য্যাবলীর পরিচয়ে ইহার অধিক আর কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? গিটো মনে করিত তাহার এ কাজের পুরস্কারস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের দরবারে তাহাকে বড় রকমের একটা চাকুরী গারফিল্ডের দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যখন সে দেখিতে পাইল, প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড তাহার 'বিশ্বাস' রক্ষা করিলেন না, তখন তাহার ধারণা হইল গারফিল্ডকে প্রেসিডেণ্ট পদ হইতে অপসারণ করাই উচিত হইবে এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণও তাহাতে সাধিত হইবে। এই ধারণাই গিটোকে উপরোক্ত দুষ্কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছে।

'বৃদ্ধ্যুন্মাদ' (Paranoid) বলিতে যাহা বুঝায়, গিটোর চরিত্রে আমরা তাহার লক্ষণসমূহ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। প্রথমত, তাহার অসঙ্গত অহমিকা বোধ, যাহার ফলে সে নিজেকে একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে করিত। দ্বিতীয়ত, তাহার অমূলক সন্দেহ—যাহাতে তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন।

বৃদ্ধ্যুন্মাদনার (Paranoid tendencies) কারণ বিশ্লেষণ করিলে আপাতদৃষ্টিতে 'অহমিকাবোধ' ও 'সন্দেহ'—এই দুইটিই এরূপ মানসিক বিকারের অনুকূলক্ষেত্র বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায়, জীবনে সাফল্য অর্জ্জন করিতে অসমর্থ হইলে, তাহার যথার্থ কারণ যদি কেহ সহজভাবে স্বীকার করিয়া লইতে অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইতেই এরূপ বুদ্ধি-বিকৃতির উদ্ভব হইয়া থাকে।

কি কারণে কখন মানুষের মনে কি ভাব উদিত হয়, তাহা অবশ্য দুজ্ঞেয়, তবু যে সমস্ত বিভিন্ন অবস্থা মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া মানসিক স্থৈর্য্য বা বিকার সংঘটিত করিতে পারে, তাহার কয়েকটি স্তর বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। মনের এই বিভিন্ন অবস্থাগুলির ক্রম-বিকাশ উপলব্ধি করাও বিশেষ কঠিন নহে। আমরা প্রায় সকলেই এই ধরণের মানসিক অবস্থার ভিতর দিয়াই জীবন আরম্ভ করিয়া থাকি। তবে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের সাধারণ বুদ্ধি (Common Sense) আমাদিগকে এই স্তরের শেষ-ধাপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে নিরস্ত করে।

বৃদ্ধ্যুন্মাদ ব্যক্তির বুদ্ধি বিকৃতি যেভাবে পর্য্যায়ক্রমে অগ্রসর হয়, নিম্নলিখিতভাবে তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে:—

১। প্রত্যেক ব্যক্তিই সংসারে সাফল্য কামনা করেন। মান প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা বা সংসারে 'কেউকেটা' হওয়ার আশা সকলেই পোষণ করিয়া থাকেন।

২। রামের যাহা পাওয়া বা হওয়া উচিত ছিল বলিয়া রাম মনে করিতেছে, কোনও কারণে জীবনে হয়ত তাহার সে সাধ পূর্ণ হইল না।

৩। ফলে, একটা অসন্তোষ, মনস্তাপ, দুর্ব্বলতা—এমন কি একটা দারুণ লজ্জার ভাবও তাহার মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক।

৪। বলা বাহুল্য, এরূপ মানসিক অবস্থা যখন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে, তখন কোন-না-কোনও অজুহাতে সে মন হইতে এইভাব অপসারণ করিবার প্রয়াস পায়।

৫। ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলিয়া সমস্ত ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার মত ঔদাসীন্য হয়ত তাহার নাই। নিজের অক্ষমতা বা ত্রুটির জন্যই যে সে অকৃতকার্য্য হইতেছে ইহা মানিয়া লওয়ার মত সুদৃঢ় চরিত্রবলেরও হয়ত সে অধিকারী নহে। সুতরাং নিজের ব্যর্থতার সমস্ত দোষটাই সে তখন হয় অপরের উপরে কিংবা তাহার পরিপার্শ্বিক অবস্থার উপর চাপাইতে চেষ্টা করে। 'অকৃতকার্য্যতাই যে তাহার সত্যিকারের প্রাপ্য' একথা সহজভাবে স্বীকার করিয়া লইতে যতই সে অপারগ হয়, অপর কেহ নিশ্চয়ই তাহার স্বার্থে বাদ সাধিতেছে এরূপ একটা ধারণা ততই তাহার মনে বদ্ধমূল হইতে থাকে।

৬। মনের মধ্যে এই ধারণা একবার বদ্ধমূল হইলে সে ইহাই ধরিয়া লয় যে, তাহার বিরোধী পক্ষ নিশ্চয়ই তাহার হিংসা করিতেছে কিংবা তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেছে। সে নিজে একটা 'কেউকেটা' না হইলে অপরে তাহার প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষের ভাবই বা পোষণ করিবে কেন? এই প্রকার মনোভাব হইতে ক্রমে তাহার নিজের সম্পর্কে উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা জন্মিতে থাকে। ক্রমে তাহার দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, সে সমাজের যথার্থই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। জীবনে যতই সে ব্যর্থকাম হয় ততই তাহার মনে হইতে থাকে, অপর কাহারও বিরোধিতার ফলেই এরূপ ঘটিতেছে। নিজের স্বার্থলাভে যতই সে বাধা পাইতেছে বলিয়া মনে করে, ততই

তাহার নিজের সম্পর্কেও অধিকতর উচ্চতর ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

৭। এইরূপে যে অহমিকাবোধ জন্মে, তাহা তাহার নিজের অকৃতকার্য্যতাজনিত অস্বস্তির খানিকটা লাঘব করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অপরের বিরোধিতা সম্পর্কে তাহার মনে একটা ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে থাকে।

৮। উপরোক্ত মনোভাবসমূহ যখন কোন ব্যক্তির মনের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন তাহার সাধারণ বুদ্ধি ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া আসে এবং তাহার বদ্ধোন্মাদের (Paranoid) সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরূপ বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার অত্যধিক 'অহমিকাবোধ' বা 'সন্দেহ' প্রকট হইবে, তাহা অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরেই অধিকতর নির্ভর করে। স্বভাবত আশাবাদী লোকের বদ্ধোন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহার মনে নিজের সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণা বা অহমিকার ভাবই বেশী পরিলক্ষিত হয়। এরূপ অহমিকার দৃষ্টান্ত মেণ্টাল হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়ত উত্তর করিবে, —"আমাকে আর রাম বলে ডাকবেন না, আমি এখন আর রাম নই—আমার ডবল প্রমোশন হইয়াছে; আমি স্বয়ং ভগবান হইয়া গিয়াছি।" আবার স্বভাবতই নিরাশাবাদী যাহারা, তাহাদের 'বদ্ধোন্মাদনা' উপস্থিত হইলে, অন্যে তাহাদের বিরোধিতা করিতেছে এরূপ ভাবই তাহাদের মধ্যে প্রবল হইতে থাকে এবং তাহাদের মনের মধ্যে নানাভাবে ইহারই প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। এরূপ বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির অনেক সময় ধারণা হয়, তাহার বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়াই কোন দিক দিয়া সে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এরূপ 'বদ্ধোন্মাদের' আক্রোশ বহুলোকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইলে উহা সেরূপ বিপজ্জনক হয় না বটে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ তাহার বিরোধিতা করিতেছে, তাই সে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না—এরূপ ধারণা কোন বদ্ধোন্মাদের মনে বদ্ধমূল হইলে খুন, জখম বা ডাকাতি করাও তাহার পক্ষে মোটেই বিচিত্র নহে। গিটোর দৃষ্টান্তে বদ্ধোন্মাদ ব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্যই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

উপরে বুদ্ধি-বিকৃতির বিভিন্ন পর্য্যায়ের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, অবশ্য পুরাদস্তুর বদ্ধোন্মাদ লোকের মধ্যেই তাহার সমস্ত লক্ষণ বিশেষভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সুবিখ্যাত জার্ম্মান মনোবিজ্ঞান-বিশ্লেষক এমিল ক্রেপেলিন (Emil Krapelin) সর্ব্বপ্রথম বদ্ধোন্মাদনাকে (Paranoia) একপ্রকার মানসিক ব্যাধি বলিয়া উল্লেখ করেন। সম্প্রতি ইহার বিভিন্ন লক্ষণ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া যে তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইহার কতকগুলি লক্ষণ তথাকথিত ভাল মানুষের মধ্যেও অল্প-বিস্তর পরিলক্ষিত হয় এবং ইহাকে ব্যাধি বলিয়া উল্লেখ করিলে উহা খুব সাধারণ ব্যাধি বলা যাইতে পারে। Dimentia Praecox এরূপ বদ্ধোন্মাদনার মূল কারণ এবং অনেকের মধ্যেই ইহার লক্ষণ অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভাল মানুষের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিই অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকট হইলে তাহাই 'পাগলামি' বলিয়া প্রতিভাত হয়। সে পর্য্যায়ে না পড়িলেও অনেক ভাল মানুষের মধ্যেও বদ্ধোন্মাদের (Paranoid) কতকগুলি লক্ষণ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়।

অহমিকা ও সন্দেহ এই দুইটি বদ্ধোন্মাদের প্রধান লক্ষণ এবং জগতের বিভিন্ন ব্যক্তির চরিত্রে ইহা অল্পবিস্তর প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। এমন যে বীর নেপোলিয়ন, তাহারও সব সময়ে মনে হইত যেন শত্রুরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। এজন্য তিনি নিঃসন্দেহে কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। ঔরঙ্গজেবের অমূলক সন্দেহের বিষয় ভারত-ইতিহাসের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। আধুনিক ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রেও বহু কর্ম্মীর সন্ধান পাওয়া যায়, যাহারা নিজের সম্পর্কে অসঙ্গত অহমিকা পোষণ করেন। কেহ-না-কেহ তাহাদের বিরোধিতা করিতেছে কিংবা পুলিশ পিছন লইয়াছে—এরূপ সন্দেহ ইহাদের মধ্যে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে শুধু নিছক পাগলে বা সমাজের হতচ্ছাড়াদের মধ্যেই 'বদ্ধোন্মাদ' মিলিবে না; বিভিন্ন সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেও বুদ্ধি-বিকারের কোন কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ এ সম্পর্কে যে সমস্ত লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অনেকটা এইরূপঃ—

১। অত্যধিক অহমিকা, আত্মম্ভরিতা ও অপরের প্রতি ঘৃণার ভাব।

২। অপরে নিজের বিষয়ে কি বলে বা কি মনে করে তৎসম্পর্কে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন বা উদ্বেগ।

৩। একগুঁয়েমি ও পক্ষপাতিত্বে সেরা, নিজের প্রচারে উন্মুখ এবং নিজে যাহা বুঝি তাহাই ভাল এরূপ মনোভাব।

৪। অতিমাত্রায় একরোখা স্বভাব। বিতর্কমূলক বিষয়ে সহজভাবে যোগদানে অক্ষমতা। ভালভাবে কোন প্রকার আপোষ-নিষ্পত্তি গ্রহণে পর্য্যন্ত অনিচ্ছার ভাব।

৫। অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধচিত্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। অপরের সামান্য ত্রুটি পর্য্যন্ত মনে করিয়া রাখা ও আক্রোশ পোষণ করিবার ভাব। ক্ষমার লেশ নাই, ঝগড়া-ঝাঁটিতে বিশেষ পটু।

৬। সর্ব্বদাই পরের দোষ-ত্রুটি ধরিতে সচেষ্ট। কোন প্রকার উদারতা নাই বা কিছুতেই সন্তোষ নাই। ভর্ৎসনা রাগারাগি ও অভিযোগ করিতে ওস্তাদ।

৭। 'পান হইতে চুণ খসিলেই' উত্তেজিত হইয়া উঠেন। নিজের অভাব-অভিযোগ অত্যধিক বড় করিয়া দেখিতে ও তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতে অভ্যস্ত। সর্ব্বদাই যেন কোন বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন এরূপভাবে।

অবশ্য সকলের মধ্যেই উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণ সমানভাবে দৃষ্ট হয় না। তবে আমাদের অনেকের মধ্যেই উপরোক্ত কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে।

উপরে যে সমস্ত লক্ষণের বিষয় উল্লেখ করা হইল, মাত্রা না ছাড়াইলে উহার যে অনেকগুলিই আবার সদ্‌গুণ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই সমস্ত গুণের অধিকারিগণ জগতে বিশেষ

প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেও সমর্থ হন। সুতরাং উপরোক্ত লক্ষণের কোন কোনটি কাহারও মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যিনি দুর্ব্বলচিত্ত, তাঁহার পক্ষে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী। একরোখা-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক আবার অনেক কিছুই করিতে পারেন। মনের জোর না থাকিলে নিজের বা অপরের অধিকার প্রতিষ্ঠা বা রক্ষা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং যে সমাজে উপরোক্ত লক্ষণসমূহের ভাল গুণগুলির অধিকারী ব্যক্তির সংখ্যা বেশী, তাহারা অনেক বিষয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে তাহারাই লড়িতে পারে বেশী,—তাই দেখা যায় উপরোক্ত কোন কোন চরিত্রের ব্যক্তিরাই প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুঝিয়া জগতে নূতন ইতিহাস রচনা করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের লক্ষণগুলি যেমন অহমিকা, অমূলক সন্দেহ, প্রতিহিংসার ভাব কাহাকেও পাইয়া বসিলে তিনি সমাজ ও জাতির পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠেন। ইহাদের কাহাকেও বা দেখা যাইবে, কাল্পনিক বা সামান্য অভিযোগের প্রতীকার-কল্পে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইতেছেন। কেহ বা অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের স্বার্থ রক্ষার্থ অভিনব পথ অবলম্বন করিতেছেন। একজনের বিপক্ষে অপরকে উস্কাইয়া দিয়া, একের অভিযোগ অপরকে বলিয়া নানাভাবে ইহারা দলাদলি ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। এরূপ ধরণের লোকের সংখ্যা সংসারে খুব বিরল নহে। অথচ ইহাদের মন অসুস্থ বলিয়া আমাদের কখনও সন্দেহ পর্য্যন্ত হয় না।

কি ভাবে 'বুদ্ধ্যুন্মাদে'র লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। যেরূপ মনোভাব বুদ্ধির এরূপ উন্মাদনা আনয়ন করিতে পারে, তাহার বিবিধ কারণ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কম বেশী প্রায়ই উপস্থিত হয়; ইহা যাহাতে আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রত্যেকেরই নিজের সম্পর্কে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

নিজের সম্পর্কে ছোট ধারণা অনেক সময় মানুষের অল্প বয়স হইতেই দেখা দিয়া থাকে। যখন প্রতি পদে বালক-বালিকারা নিজেদের দুর্ব্বলতা ও অনেক বিষয়ে পরনির্ভরশীলতা উপলব্ধি করিত পারে, তখন হইতেই নিজেদের সম্পর্কে এ ধারণার উদ্ভব হয়। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু করিতে গিয়া যখন পদে পদে অকৃতকার্য্য হয় তখন নানা সমস্যার উদ্ভব ঘটে। যদি কেহ নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন থাকে, তাহার দ্বারা কি হওয়া সম্ভবপর আর কিই-বা সম্ভবপর নহে, ইহা ঠিক বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মানসিক স্থৈর্য্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমিয়া যায়। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিলে কোন ব্যক্তি তাহার সাধ্যাতীত কাজে যেমন হাত দিতে রাজি হইবে না, তেমনি অকৃতকার্য্যতার জন্য মনস্তাপ, অসন্তোষ, লজ্জা বা ঘৃণার ভাবও তাহার মনে কম আসিবে। নিজের গুণাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকিলে অন্যদিকে 'অহমিকাবোধ' জাগিবার সম্ভাবনাও কম থাকে। বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য থাকিলেও উপরোক্ত মনোভাব জন্মাইতে পারে না।

নিজের অকৃতকার্য্যতার জন্য অপরের উপর দোষ চাপাইবার অভ্যাস যাহাতে না জন্মায় কিংবা অপরের প্রতি অমূলক সন্দেহ না আসে, তাহার প্রতিও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। 'অমুকে বুঝি আমাকে দেখিয়া হাসিল', 'আমার পোষাক, আমার কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল' এরূপ ধারণা যখনই মনে হইবে, তখন বুঝিতে হইবে অমূলক সন্দেহের বীজ মনের মধ্যে রোপিত হইতেছে। নিজের অকৃতকার্য্যতা খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার জন্য কাহাকেও দোষারোপ করা বা তজ্জন্য অপরকে সন্দেহ করার ভাব যাহাতে মনে না জাগে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অসংগত 'অহমিকাবোধ' ও অমূলক 'সন্দেহ' মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে যে ভাবে আচ্ছন্ন করে এমন আর কিছুতে করে না। সুতরাং এই দুইটি ভাব মনে যাহাতে স্থান না পায়, তজ্জন্য জীবনের প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া আবশ্যক;

চারণের গান

ভীরু আছে—তাই গর্ব্বে দুলিছে
অত্যাচারীর জয়-নিশান।
ক্লৈব্য রয়েছে—অন্যায় তাই
নিঃস্বের করে রক্ত পান॥

দুঃখের ভয়ে কাঁপে সদাই—
মানুষ আজিকে বন্দী তাই-
জীবনেরে বড়ো ভালোবাসি ব'লে
শয়তান এত শয়তান॥

গগন-বিদারী বজ্রকণ্ঠে
গর্জ্জিয়া বলো—'রে অন্যায়,
মরে যাবো তবু মস্তক কভু
নত করিব না তোমার পায়'

দেখিবে নূতন অরুণোদয়
রাঙিয়া তুলিবে দিগ্বলয়—
মৃত্যুর পাশ ছিন্ন করিয়া
জাগিয়া উঠিবে বিজয়ী প্রাণ॥

শূন্য-মন্দিরে

(গল্প)

শ্রীআশা মুখা

বন্ধুদের নিয়মিত আড্ডা সুকুমারের বাড়ীতেই বসে, যেহেতু সে বড়লোকের ছেলে এবং অভিভাবকহীন। অভিভাবিকা আছেন, মা। তাঁর শাসন অন্দর ডিঙিয়ে সদরের বৈঠকখানায় পৌঁছতে পারে না, সুকুমারের সেখানে একাধিপত্য।

সন্ধ্যার দেরী আছে, কিন্তু আকাশব্যাপী ঘন কালো মেঘ দিনের সব আলোটুকু ঢেকে দেওয়ায় অসময়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। একে একে বন্ধুরা সবাই এসে গেছে, বৃষ্টি যে আসবে সেটা সবাই অনুমান করেছিল। কিন্তু এত শীঘ্র তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউ, তাই হঠাৎ সজোরে বৃষ্টি এসে পড়াতে জানলার শার্সী বন্ধ করার ব্যস্ততা লেগে গেল। ইতিমধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ওয়াটার-প্রুফ জড়িয়ে দরজা ঠেলে যিনি ঘরে প্রবেশ করলেন তাঁকে দেখে সকলে একসঙ্গে আনন্দধ্বনি ক'রে উঠল,—আজকের বাদল সন্ধ্যা তাহলে বৃথা যাবে না—গল্পের রাজা যখন এসে গেছেন। আগন্তুক ধীরে সুস্থে বসলেন এবং তারপরে ভৃত্যের আনীত তোয়ালে দ্বারা সজোরে হাত পা মুছতে লাগলেন, যাতে করে বৃষ্টির জল কণামাত্র তাঁর অঙ্গে লেগে থেকে সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি না ঘটায় তার জন্যেই এই সাবধানতা।—রমেন, অভয়, কিশোর, সুকুমার প্রভৃতি তাঁকে ঘিরে বসল—গল্প বলতে হবে।

একটু মৃদু হেসে আগন্তুক বললেন, 'তা ত' বুঝলাম, কিন্তু কি গল্প বলব, কোন ঘটনাই আজ মনে আসছে না।'

বলে রাখা ভাল আগন্তুকের নাম সত্যপ্রসাদ রায়, প্রৌঢ়ত্বের প্রথম অবস্থা, আর্থিক অবনতির জন্যে অবিবাহিত, (এ কথা তিনি নিজেই বলেন)। সব রকম গুণের মধ্যে একটি প্রধানতম গুণ, গল্প বলতে পারা। এমন হৃদয়গ্রাহী ক'রে উজ্জ্বলভাবে তিনি গল্পের রূপ দেন যে, কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর শ্রোতারা ভুলে যায় বাস্তব জগতের কথা সম্পূর্ণরূপে। তাঁর গল্পেরও বৈশিষ্ট্য আছে। সব গল্পই বাস্তব ঘটনা এবং সেগুলো কোনটা তাঁর নিজের সঙ্গে জড়িত, কোনটা প্রত্যক্ষ দর্শন। অবশ্য ছেলেরা বিশ্বাস করে না, কিন্তু মনে মনে, বাইরে স্বীকার করে, নইলে সত্যপ্রসাদ চটে যান।

সত্যপ্রসাদকে গল্পের জন্যে বেশী অনুরোধ করতে হয় না, বার দুই বললেই তিনি আরম্ভ করে দেন। বলবার জন্যে যেন উন্মুখ হ'য়ে আছে। এই জন্যে ছেলেরা আরও বিশ্বাস করে না। ওদের মনের ভাব যে, একটা লোকের জীবনে এত ঘটনার সমাবেশ কখনও হ'তে পারে না। অবকাশ সময়ে সত্যপ্রসাদ মনে মনে গল্প তৈরী করেন এবং সেইজন্যেই বলবামাত্র তাঁর গল্প আরম্ভ হয় সাবলীল গতিতে, কোথাও তার বাধা নেই, একবারও ভাবতে হয় না। এমনি একটা কথা কে যেন একবার বলেছিল। সত্যপ্রসাদ তার উত্তর দেন, 'যখন আমার মত বয়স হবে তখন একবার ভেবে দেখ। আশ্চর্য্য হবে যে, কি করে তোমার জীবনে এত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ এবং অসংখ্য লোকের আগমন হল। তবে [illegible] হ'তে পারে, কারণ তোমাদের প্রত্যেকের আছে

এতই ব্যস্ত থাকবে যে লক্ষ্য করবার সময়ও থাকবে না। প্রতিদিন কত নতুন কত অদ্ভুত ঘটনা তোমার চারপাশে ঘটে যাচ্ছে। আজ যার সঙ্গে আলাপ হ'ল—কাল তাকে বেমালুম ভুলে গিয়ে ভাববে কি করে অল্প আয়ে বাজারটা সারা যায় বা যাদের অর্থের অভাব নেই তারা দেখবে কোন নতুন বই মেট্রোয় খুলল। আমার ত শুধু নিজেকে নিয়ে কারবার, সিনেমার সখও নেই, তাই আছে প্রচুর অবসর এবং সেইজন্যে মনে রাখতে পারি আশেপাশের সব ঘটনা। এমন কি যার সঙ্গে একদিন কিছুক্ষণের আলাপ, তাকেও মনে রাখতে পারি; অবশ্য এর জন্য আমার স্মৃতিশক্তিও সাহায্য করে সাধারণের থেকে বেশী পরিমাণে। যখন যার কথা মনে পড়ে, অমনি তার সঙ্গে আমার নিজের খুঁটিনাটি সহস্র কথা ঘটনা মনে পড়ে যায়, বায়োস্কোপের ছবির মত সেগুলো আমার মনের মধ্যে সাজান থাকে, তাই ওলট-পালট হয়ে যায় না।'

এহেন সত্যপ্রসাদ আজ যখন বললেন, কি বলব, কোন ঘটনা মনে আসছে না, তখন সুকুমার প্রভৃতি রীতিমত বিস্মিত হল। এমন অভাবনীয় কথা ওরা সত্যপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয় হ'বার পর কোনদিন শোনেনি। রমেন বললে, 'আপনার জীবনের সব ঘটনা ফুরিয়ে গেল না কি?' সত্যপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সে কথা আমি বলিনি, জান, জীবনে ঘটনা কখনও ফুরায় না, প্রতিদিন একটা না একটা নতুন ঘটনা ঘটবেই। আমি বলছি যে, আজ আমার একটি বিশেষ ঘটনা ছাড়া আর কিছুই মনে আসছে না, সেই বিশেষ ঘটনা তোমাদের কখনও বলব না ভেবেছিলাম। কেন না, আমি জানি যে, মনে মনে তোমরা আমার কাছে শোনা কথাগুলো গল্প হিসেবেই ধর, সেগুলো যে বাস্তবিক আমার বাস্তব জগতের, সে কথা তোমরা বিশ্বাস কর না। আজ যে কথা আমার সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে, পাছে সেটাকেও তোমরা মনে কর যে, বাদলদিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আসর জমান একটা করুণ কাহিনীর সৃষ্টি করছি, তা'হলে বাস্তবিক আমি কষ্ট পাব, সেই জন্যেই বলতে চাইছি না।' সুকুমার বললে, 'আপনার সত্যবাদিতার ওপর আমার অন্ততঃ গভীর বিশ্বাস আছে; যে সত্য ব্যাপারটাকে বলতে চাইছেন না আমাদের উপহাসের ভয়ে, সেটাকে আমরা মিথ্যে করে ধরব না কিছুতেই।'

রমেন বললে, 'আমরা কৌতুকপ্রিয় হ'তে পারি, কিন্তু যেটা সত্যই আপনার সারা মন জুড়ে রয়েছে এবং বেদনার সৃষ্টি করছে, সেই প্রকৃত ব্যাপারটাকে তুচ্ছ গল্প ভেবে উড়িয়ে দেব এত হৃদয়হীন নই।'

একটু চুপ করে থেকে সত্যপ্রসাদ বললেন, 'তা'হলে বলি শোন, যার কথা বলব সে তোমাদেরই একজন ছিল। আমি আবার বলছি, আমার আজকের কাহিনী তোমরা গল্পের দলে ফেল না। গল্পের করুণ কাহিনীও মনে আঘাত দেয়, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্যে, যখনি মনে পড়ে যায়, 'এ ত সব বাজে কথা', তখনি সব ব্যথা দূর হয়ে যায়। যেমন বায়োস্কোপ দেখতে

আবার তখনি লজ্জিত হয়ে ভাবে, অপ্রকৃত কাল্পনিক ঘটনার জন্যে চোখের জল ফেলা কি হাস্যকর! তারপরে চোখের জল মুছে নির্ম্মমভাবে বিশ্লেষণ করতে বসে, কি রকম হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল সেই দৃশ্যটা, বাস্তব জগতের করুণ কাহিনী শুনে বা দেখে সে রকম হয় না। আমার এ কাহিনী শুনবার পরে যদি তোমাদের কেহ মনে সামান্য বেদনা বোধ কর, তা'হলে সেজন্যে লজ্জিত হবার কিছু নেই বা তাড়াতাড়ি তাকে দূর করবারও প্রয়োজন নেই, এইটে তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ।'

আবার একটু নিস্তব্ধ থেকে সত্যপ্রসাদ আরম্ভ করলেন, 'তোমরা ত' জান যে, সংসারে আমার নিজের কেউ নেই, কিন্তু একজন ছিল—তাকে একান্ত আপনার মনে করেই জানতাম। আমার মা খুব ছোট বেলায় মারা যান, বাবা সেই থেকে সংসারের প্রতি উদাসীন হন, অবশ্য আমার প্রতি নয়; আমার ওপর কর্ত্তব্য ছাড়াও তাঁর গভীর স্নেহ ছিল। তাঁর কাছে থেকে সংসারের প্রতি আমারও আপনা থেকে কেমন করে অনাসক্তি জন্মে যায়, সেইজন্য বিয়ে করা আর হ'য়ে ওঠেনি অবশ্য অর্থের অভাবও ছিল। বাবা কলকাতায় চাকরী করতেন, একখানা বাড়ী করেছিলেন, সেইখানাই আমার একমাত্র সম্বল। বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমার বয়স বাইশ বছর। বাবা চাকরী করতেন, বাড়ীখানা ভাড়া দেন নি কেন তা জানি না, কিন্তু বাবা মারা যাবার পর আমি স্থির করলাম বাড়ীখানা ভাড়া দিতে হবে নইলে হাতে নগদ সামান্য ক'টা টাকা ফুরোলে আর কিছু সম্বল নেই, আশ্রয়ের আগে আহার চাই। ঠিক করলাম ভাড়া দেব, 'টু লেট' লিখে বাইরে টাঙিয়ে দিলাম। হঠাৎ একদিন দেখি এক গাড়ী লোকজন বিছানাপত্তর ছেলেপুলে এসে হাজির, মনে করলাম ভাড়াটে, কিন্তু গাড়ী থেকে যে বর্ষীয়সী মহিলাটি নামলেন তিনি আমাকে দেখেই কেঁদে ফেললেন এবং তারপর মা বাবার জন্যে শোকপ্রকাশ। যাহোক শেষে বুঝলাম তিনি সম্পর্কে আমার মাসীমা হন, বাবা নেই সুতরাং আমাকে কে দেখবে তাই তিনি এসেছেন আমার বিয়ে দিয়ে তবে যাবেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি বরাবরই রয়ে গেছেন, বোধ হয় আমার বিয়ে না হওয়ার জন্যে। এমনি করে এতদিন অদৃশ্য থেকে আমার সম্পর্ক হিসাবে নিকটতর আত্মীয়-আত্মীয়া আমাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে এসে নিজেরাই প্রতিষ্ঠিত হ'লেন কায়েমীভাবে। একদিন দেখি 'টু লেট' কাগজখানা আর ঝুলছেনা। যাকগে কি খাব আর কিসের দ্বারা খাব এই ছিল ভাবনা, শেষে বাবার অফিসে পঁয়তাল্লিশ টাকায় একটা চাকরী জুটে গেল। তেতলায় দু'খানা ঘর, সেই দু'খানাই আমার নিজস্ব, একখানার আমি থাকি আর একখানায় আমার রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর ইত্যাদি এবং বহুদিনের চাকর অক্ষয়ের শোবার ঘর। যাহোক অক্ষয় আর পঁয়তাল্লিশ টাকা এতেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম, বলতে গেলে বেশ সুখেই ছিলাম। আমার নিজের দিক দিয়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল না সেইজন্য অভাবেরও সৃষ্টি হয় নি। এমনি করেই কয়েক বছর কেটে গেল, বয়স হ'ল ছত্রিশ, ততদিনে সবাই জেনেছে আমি বিয়ে করব না এবং এ বাড়ীর ওপর আমার চেয়ে তাঁদের অধিকার বেশী। তেতলার ঘরে থাকি আর আগে এসেছেন, দোতলা তাঁদের, একতলার বাসিন্দারা সেজন্য ঈর্ষান্বিত অথচ উপায় নেই যেহেতু তাঁরা বোকামী করে দেরী করে ফেলেছেন। যখনি বাড়ী থাকি শুনি, গোলমাল, ঝগড়া, ছেলে-মেয়েদের দৌরাত্ম্য, একটু বয়স্ক ছেলেদের বায়োস্কোপের গান, তাদের মায়েদের অতিরিক্ত চেঁচানর ফলে কর্কশ কণ্ঠ, পরশ্রী-কাতরতা। তোমরা হয় ত ভাবছ কেন আমি এ-সব সহ্য করি, এত আমার ইচ্ছাকৃত ; ইচ্ছে করলেই এদের তাড়িয়ে দিতে পারি। সত্যিই পারি, একবার মুখ ফুটে অক্ষয়কে বললেই সব ব্যবস্থা হয়। আর আমার নিজেরও বাইশ-তেইশ বছরে যে সঙ্কোচ বা চক্ষুলজ্জা ছিল এখন তা নেই। কিন্তু এই কয়বছর ওদের দেখে আসছি, ওদের সঙ্গ এড়িয়েছি, সকলের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ওদের মধুর আত্মীয়তা স্থাপন করবার চেষ্টা, প্রাণপণে আমাকে আপনার করে নেবার চেষ্টা, সব পরিহার করে নিজেকে তেতলার ঘরটিতে সীমাবদ্ধ করেছি ; কিন্তু তবুও ওদের অভাব, প্রয়োজনানুসারে যথেষ্ট অল্প আয়, সংসারের অনাটনের কথা, সাবধান সহকারে চুপি চুপি বলা সবই কানে আসে। ওদের দৈন্য যে কতখানি সেটা অনুভব করেছি, তাই ভাবি আমার নিজের যখন প্রয়োজন নেই তখন ওদের যদি ক্ষুদ্র সাহায্যটুকু করতে পারি, বাড়ী ভাড়ার টাকাটা বাঁচান, তাতে ক্ষতি কি? গোলমাল চেঁচামেচি, এ-সব ত ভাড়া দিলেও সইতে হ'ত। যাহোক এতগুলো কথা যে বললাম তার কারণ যার কথা বলব তার সঙ্গে পরিচয় এদের মধ্য দিয়েই। একদিন রবিবার সকালবেলা প্রায় দশটা হবে, নীচে নামছিলাম কি প্রয়োজনে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনলাম কাকে লক্ষ্য করে আমার এক মেসো বলছেন, 'ও-সব হবে না বাপু, তোমার বাবার যেমন আক্কেল বিবেচনা কিছু নেই, নিজে আছি পরের বাড়ীতে তোমাকে আবার জায়গা দেব কোথা থেকে?' আমার মাসীমা বললেন, শুনলাম 'এ সেই আপনি খেতে ঠাঁই পায়না শঙ্করাকে ডাক। কলকাতায় একটা লোকের খাওয়া পরায় কত খরচ পড়ে জান? কি বলে তোমার বাবা পাঠালেন।'

নেমে দেখি বারান্দায় রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি রোগা সুশ্রী ছেলে মাথা নীচু করে, পায়ের কাছে একটা সুটকেশ। আমাকে দাঁড়াতে দেখে মেসো এবং মাসীমা তাঁদের বিরক্ত কর্কশ-কণ্ঠ যথাসম্ভব কোমল করে বললেন, 'এস বাবা'। দেখা হলে সবাই এমনি অভ্যর্থনা করে সেইজন্য সেদিকে মন না দিয়ে ছেলেটিকে দেখলাম, কেমন একটা মমতা বোধ হ'ল, বললাম—কোনদিন একে দেখিনি? মেসোমশাই উত্তর দিলেন 'কোথা থেকে দেখবে বাবা, এই ত এসেছে এখানে থাকবে খাবে পড়াশুনো করবে। আমি কি করে পারি বল দিকি, অল্প মাইনেয় কলকাতায় সংসার চালান যে কি কষ্টকর। দাদা আমার ভাবছেন ভাই বুঝি কল্‌কাতায় লাট সাহেবের কাছে চাকরী করে মোটা মাইনে পায় তাই ছেলেকে পাঠিয়েছেন নিশ্চিন্ত হয়ে।'

আর শুনতে ভাল লা[illegible] ।'দের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই সেই পাকে প্রকারে অভাব [illegible]র কথা পাড়েন কেন যে তাও জানি, আমি যাতে দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের উঠিয়ে না দিই। ছেলেটিকে বললাম, থাকবে ত' এখন, চল আমার ঘরে গল্প

মেসোমশাই এবং মাসীমা বিস্ময়ে হতবাক, ছেলেটিও তাই, তবে আমার অনুসরণ করে ওপরে এল।

তার কাছে সব শুনলাম, এইবার আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ছে। এতদিন ওরবাবা কলকাতায় চাকরী করতেন পিতা-পুত্র একসঙ্গে মেসে থাকতেন, সম্প্রতি পিতা পেন্সন নিয়ে দেশে গেছেন এবং টাকার পরিমাণ অর্দ্ধেক হ্রাস হওয়ায় ছেলের মেসে থাকার খরচ আর দিতে পারছেন না। ছেলেটি টিউশানি ক'রে যে কটা টাকা পায় তাতে পড়ার খরচ চলে যায়, অতএব আহার এবং বাসস্থানের জন্য এখানে আসা, কিন্তু কাকা কাকীমা যে সব বাক্য বর্ষণ করলেন তাতে এখানকার আশ্রয় সম্বন্ধে আশা করা দুরাশা।

আগেই বলেছি, প্রথম দর্শনেই ছেলেটির প্রতি কেমন মমতা বোধ করছিলাম, বললাম 'যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে আমার এই ঘরে থাকতে পার এবং অসুবিধা বোধ না করলে খাওয়াটাও আমার সঙ্গে সারতে পার। অসুবিধে বলছি এই জন্যে যে, আমার খাওয়া তত ভাল নয়, একমাত্র ভরসা অক্ষয়, সে যা পারে রাঁধে, তার ওপর মাছ মাংস খাই না। হ্যাঁ ছেলেটির নাম বলতে ভুলে গেছি নাম হচ্ছে ললিত। ললিত কিছুক্ষণ কোন কথা বললে না, বোধহয় তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আসলরূপ কখনও দেখে থাকবে, এ হচ্ছে তাই, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যতটুকু বুঝতে পার নীরবতার মধ্যে—।

ললিত থেকে গেল আমার কাছে, এর জন্যে বাড়ীর কেউ সন্তুষ্ট হয়নি, এমন কি ললিতের কাকা থাকতে এবং খেতে দেওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেলেও না। ললিতের উপর সবাই ঈর্ষান্বিত, কেননা সে আমার প্রিয়পাত্র, আমার যে ঘরে, আমি নীচের কাউকে ঢুকতে দিই না, সে ঘরে ললিতের শুধু অবাধগতি নয়—অর্দ্ধেক অংশ।

এক বছর পরে ললিতের চেহারা ফিরে গেল, শীর্ণ ললিত কান্তিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল, এ অবশ্য অক্ষয়ের গুণে। ললিতের নম্র বিনীত স্বভাবের জন্য অক্ষয় তাকে ভালবাসলে শীঘ্রই এবং সেইজন্যে সে খাওয়ার যত্ন নিতেই ললিতের শ্রী বর্দ্ধিত হ'ল। ললিত পড়ে, আমি চাকরী করি, দুজনে যখন একসঙ্গে মিলিত হই, গল্প করি, সাহিত্য আলোচনা করি, আমার সঙ্গীবর্জ্জিত নীরস ঘরের আবহাওয়া আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। একদিন ললিতের অনুপস্থিতিতে টেবিলের কাছে বসে কি লিখছিলাম, দেখি একখানা খাতা পড়ে, অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্টাতে একটা কবিতা পড়ল চোখে। কবিতাটি ভাল লাগল, শব্দের আড়ম্বর নেই, ছন্দের স্বাভাবিক গতি, মাসিক পত্রিকায় পড়া অনেক কবিতার চেয়ে ভাল, ইতিমধ্যে ললিত এসে হাজির, প্রথমে আমার উপরে খুব একচোট রাগ তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগল আপনার?'

বললাম 'ভালই লেগেছে।'

'সত্যি বলছেন?'

ললিত তাড়াতাড়ি বললে 'আমি কি তাই বলছি, আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বাড়িয়ে বলছেন না ত?'

বললাম 'যদিও তা বলা উচিত কিন্তু এ ক্ষেত্রে যথার্থই আমার ভাল লেগেছে।'

আনন্দোজ্জ্বল মুখে ললিত বললে 'তাহলে কোন মাসিক পত্রে দিলে নেবে না?'

বললাম 'নিতে পারে।' না নেওয়ার সম্ভাবনা বেশী, সে কথা বলে ওর প্রথম উদ্যম ভেঙে দিতে ইচ্ছে হ'ল না। দিন কয়েক পরে ম্লান মুখে ললিত বললে 'নিলে না, ফিরিয়ে দিলে, বললে বড্ড কাঁচা লেখা।'

বললাম 'কাগজ ত একটা নয় আরও অনেক আছে।'

ও বললে 'আছে বটে, কিন্তু কবিতা নিয়ে সকলের কাছে ফেরী করে বেড়াতে ইচ্ছে করে না, এবার থেকে নিজের জন্যেই কেবল লিখব, আর আপনাকে শোনাব, একটু থেমে বললে 'না নিক, কিন্তু নতুন লেখকের লেখা সর্ব্বাগ্রে নেব বলে লোভ দেখায় কেন?'

বললাম 'ওটা একটা রীতি, নইলে সব কাগজের সম্পাদকই হাঁ করে বসে থাকে নামকরা লেখকের লেখার জন্যে, তারা যদি তাড়াতাড়িতে যা তা একটা গল্প লিখে দেয়, তাও সাগ্রহে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপাবে, ও নিয়ে তুমি মন খারাপ ক'র না।'

অবশ্য এর পরে ললিতের কতকগুলো কবিতা প্রকাশ হ'য়েছিল—বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায়, সেই সব কবিতাগুলো একত্র করে বই ছাপাবার একটা অদম্য ইচ্ছা তার মনে জেগেছিল, কত সন্ধ্যা সে শুধু এই বিষয় নিয়েই কাটিয়েছে। বইয়ের নাম কি হবে, প্রচ্ছদপট হবে কি রকম, আমাকে উৎসর্গ করবে সে লেখাটা কি রকম ভাবের হ'লে ভাল হয় ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত কবিতার বই ছাপা হ'ল না, যখনই মনে করে ছাপাব তখনই টাকার অভাব।

ললিতের মধ্যে ছিল প্রচুর প্রাণশক্তি। ইদানীং স্বাস্থ্যও ছিল ভাল, মানসিক প্রফুল্লতাও ছিল যথেষ্ট, আমার ঘরটাকে নানা রকমে সাজিয়ে তার তৃপ্তি হ'ত না, কোথায় কি আসবাব থাকলে মানাত—তার ফর্দ্দ ক'রত। শেষ পর্য্যন্ত আমার একটা ইজিচেয়ার ছাড়া আর কিছুই কেনা হ'য়ে ওঠেনি, আমার মত এত অল্পে সে তৃপ্ত হ'ত না, প্রায়ই ব'লত, এ বাঁচা নয় সত্যদাদা, এত অল্পের মধ্য দিয়ে সারাজীবন অতিবাহিত করা অপমানকর, অতৃপ্তিকর। এতে করে মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায় না, ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে ছোট হয়ে যায়। আমার সঙ্গে মিলত না, আমি বলতাম 'অভাবকে সৃষ্টি আমরা নিজেরা করি, সেইসঙ্গে অশান্তিও বাড়ে, যে রকমে হ'ক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এবং আনন্দে কাটানই সকলের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।'

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে ললিত বলত 'না, না, মনের সব আকাঙ্ক্ষা পিষে ফেলা মানে উপায়হীনতা, ভোগ করবার ইচ্ছে রয়েছে প্রচুর অথচ পারছি না, এর মধ্যে আছে নিজের অকর্ম্মণ্যতা, লজ্জা। যেমন ক'রে হ'ক ভোগের আয়োজন করতে হবে মনের বাসনা পূরণ করতে হবে—তারপর যদি

অনাসক্তি আসে সে হ'ল স্বতন্ত্র কথা। যে ভিখিরী সে ত্যাগ করেই আছে কেন না বিলাস বাসনা চরিতার্থ করবার ক্ষমতা তার কণামাত্রও নেই; ভোগ করতে না পারার নাম ভোগ ত্যাগ করা নয়।'

ললিতকে তোমাদের এই আসরে আনবার জন্যে কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার কাছে তোমাদের প্রায় সকলের অবস্থা তার চেয়ে ভাল জেনে সে আসতে রাজী হয়নি পাছে কোনদিন তার আত্মসম্মানে ঘা লাগে, আমার কাছে সে আনন্দেই ছিল, কিন্তু তবু সে পরাশ্রয়ে আছে—এ কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারেনি।

কিন্তু তাই বলে সর্ব্বদা সে নিজের অবস্থার জন্য অসন্তুষ্ট ছিল না, ওর মনে কেমন একটা ধারণা ছিল, ভবিষ্যৎ জীবনে ও সুখী হবেই, সাড়ম্বরে জীবন কাটাবে, যা কিছু বাসনা চরিতার্থ করবে। ওর কথার ভাবে মনে হ'ত ওর জন্য যেন একটা বড় চাকরী অপেক্ষা করছে, বি-এ পাশ করবামাত্র সেটা পেয়ে যাবে। তারপর দেখাবে জীবনকে কি করে উপভোগ করতে হয়। বর্ত্তমান জীবনের প্রতি ওর খুব বিরক্তি ছিল না, ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি ছিল অগাধ আশা, হয়ত সবায়েরই তাই থাকে।

এমনি করে আর এক বছর কাটল, বি-এ পরীক্ষা দিয়ে ললিত দেশে গেল। সেদিন রাত্তিরে শুয়ে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল, যখনি ললিত ছুটিতে বাড়ীতে যেত এইরকম লাগত, আমার একক জীবনে ও মায়ার সৃষ্টি করেছিল। পরীক্ষার ফল বেরোবার কিছুদিন পরে ললিত এল, ললিতকে দেখেই মনে হ'ল একটা গভীর আনন্দের সংবাদ বহন করে এনেছে। হাসি-মুখে বললে, 'সুখবর আছে'।

'কি?' আমারও কৌতূহল হ'ল।

ললিত তেমনি হাসিমুখে বললে, 'বি-এ পাশ করার পর কি হয় আন্দাজ করতে পারেন?'

বললাম, 'কি, চাকরী হয়েছে বুঝি?'

হাসতে হাসতে ললিত বললে, 'বি-এর পর আবার বিয়ে, ডবল বিয়ে।'

প্রথমে বিশ্বাস হ'ল না, বললাম, 'সত্যি?'

'সত্যি নাত কি, বাবা সব ঠিক করে ফেলেছেন পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে. মেয়েটি ভাল আমি দেখেছি, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

খবরটা শুনে আমার কিন্তু আনন্দ হ'ল না, হয়ত বা নিজে বিয়ে করিনি বলে ভাবলাম, এখন আর্থিক অবস্থা প্রতিকূল; এর মধ্যে আবার সংসারের বোঝা বৃদ্ধি করা কি বোকামী না? বাইরে কিছু বললাম না, মনে করলাম, ওর মাথার ওপরে আছেন ওর বাবা, তাঁর ভাবনা আমি কেন মিছে ভাবতে যাই। আর তা ছাড়া বাঙ্গালী ঘরের সব ছেলেরাই ত বিয়ে করছে, কেউ বা পাশ করেই, কেউ বা সামান্য একটা টাকার চাকরী পেয়েই। দুঃখ নিরানন্দ চিরকাল থাকবেই, যে সংসারে প্রবেশ করবার পথে আনন্দ ছাপিয়ে উঠ্‌ছে, আবার একদিন সেই সংসার ত্যাগ করতে পারলে বাঁচা যায় একথাও শোনা যাবে, কিন্তু এখন থেকে সে সব

বিয়েতে আমি যাইনি, কারণ বিয়ে ওদের দেশে থেকেই হবে, আমার ছুটি ছিল না। দ্বিতীয়ত আমার মত অলস লোকের দ্বারা দূরে যাওয়া পোষায় না। বললাম, 'তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে এবং করাও উচিত কিন্তু আমার ছুটি নেই, আর তা ছাড়া বেশী গোলমাল আমার সয় না। বিয়ে এবং বৌভাত এই দুই নিমন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য প্রচুর খাওয়া এবং বউ দেখা, প্রথমটা আমার হজম হয় না, দ্বিতীয়টা বিয়ের গোলমাল চুকে গেলে নিরিবিলি সেরে আসব।

বিস্তর পিড়াপীড়ির পর ললিত দুঃখিত হয়ে চলে গেল। সেদিন বারবার থেকে থেকে কেবল এই কথাই মনে হল, ইচ্ছে করে গুরুভারের দায়িত্ব নিয়ে এমনি করে এরা নিজেদের অমূল্য জীবন নষ্ট করে। এই যে প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ আনন্দে দীপ্তমান ললিত, এই ললিত এর পরে সংসারের নানারকম ছোট বড় ভাবনায় নিস্তেজ ম্লান হয়ে মুষড়ে যাবে। দেখছি কিনা বেশীর ভাগই তাই হয়।

একমাস পরে ললিত ফিরে এল, এবার চাকরীর উদ্দেশ্যে। আমার কাছেই থাকে, কবিতা লেখে, শ্বশুরবাড়ী যায়, চাকরীও খোঁজে। শ্বশুরবাড়ী ক'লকাতাতেই, বিয়ের জন্যে বুঝি সব দেশে গিয়েছিলেন আবার সব ফিরে এসেছেন। ললিত একদিন আমাকে নিয়ে গেল বউ দেখাতে। যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনার পর ললিতের বউ এসে প্রণাম করলে, সাধারণ সুশ্রী মেয়েটি, চোখ দুটি উজ্জ্বল, লাজুক। বড় ভাল লাগল, নাম শুনলাম, সরযু। একঘণ্টার পরিচয়ে সরযু আমাকে একযুগের পরিচিত করে নিলে; বাড়ীতে এসে কেবল মনে হল, সরযুর কথা। ললিত এখন তেমনি আছে, চাকরী না হওয়ার জন্যে এখন দুঃখবোধ করেনি। মনে দুরন্ত আশা ঐশ্বর্য্যের দিন নিকটতর হয়ে আসছে।

এমনি সময়ে চিঠি এল ললিতের বাবার, সরযুকে নিয়ে দেশে যাবার জন্যে লিখেছেন। সরযুকে নিয়ে ললিত দেশে গেল। আবার আমার একক জীবন, অবসর সময় ওদের দুজনের কথা মনে পড়ে। ওদের তরুণ হৃদয় ভবিষ্যতের সুখের আশায় উজ্জ্বল, বর্ত্তমানের আনন্দে দীপ্ত। এখন ওদের মনে নেই কোন চিন্তা কোন গ্লানি, আশেপাশের ছোটখাট কথা নিয়ে তুমুল কলহ করা, পরের ভাল না দেখতে পেরে ঈর্ষাকাতর হয়ে পরচর্চ্চা করা, প্রত্যেক লোককে অবিশ্বাস সন্দেহের চোখে দেখা সে সব ওদের তরুণ মনকে এখন স্পর্শ করেনি। কুটিলতা নীচতা এখন দূরে আছে, এখন কেবল নিজেদের নিয়েই ওরা কল্পনার আনন্দে বিভোর।

প্রায় মাস দেড়েক পরে আবার একদিন ললিত এসে হাজির। মলিন মুখ, সর্ব্বাবয়বে বিষণ্ণতা বিরাজ করছে, দেখলেই আন্দাজ করে নেওয়া যায় যে, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল, সরযুর কিছু হয়নি ত। নিজের ওপর যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সর্ব্ব মায়া-বন্ধন মুক্ত বলে, এক মুহূর্ত্তে তা উড়ে গেল। একটু বিশ্রাম নেবার পর ধীরে ধীরে ললিত বললে, আজ পনের দিন হ'ল, মাত্র তিনদিনের আড়াআড়িতে বাবা মা উভয়েই গত হয়েছেন কলেরাতে আক্রান্ত হয়ে। গ্রামের অবস্থা

সরযূকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে। সরযূকে তার পিত্রালয়ে রেখে সে বরাবর এখানে আসছে। মুখ দিয়ে কোন সান্ত্বনার ভাষা বেরল না। নিজের ওবিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তাই জানি একমাত্র দীর্ঘসময় ছাড়া আর কেউ সান্ত্বনা নিতে পারে না। ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল কাটবে তবে আপনা থেকে আঘাতের ক্ষত শুকিয়ে আসবে। বললাম, 'আমাকে একটা খবর দিলে পারতে'।

ললিত বললে, 'মনে করেছিলাম দেব, তারপর ভাবলাম, মাসের শেষে ত আপনার হাতে কিছুই থাকে না মিছেমিছি বিব্রত হয়ে উঠবেন'।

বললাম, 'এবার কি করবে ঠিক করেছ?"

অত্যন্ত ম্লান হেসে ললিত বললে, 'সবাই যা করে অর্থাৎ চাকরী, এখন আর আগের মত বেশী মাইনের আশা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, যেমন করে হোক যোগাড় করতেই হবে, যা মাইনে পাই তাতেই। কেননা, আমার জন্যে যদিও আহার এবং আশ্রয় ঠিক করা আছে আপনার কাছে, কিন্তু সরযূকে বেশীদিন বাপের বাড়ী ফেলে রাখা যেতে পারে না।' যে ললিতের মুখ সর্ব্বদা উজ্জ্বল হাসিতে মুখর থাকত, তার ম্লান হাসিটা বড় লাগল, শুধু শোক নয় অভাবের অভিযোগ এখন থেকেই অনুভব করতে হচ্ছে, আর কাউকে এভার দেবারও উপায় নেই।

এবারে আর কবিতা লেখা নয়, সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত চেষ্টা চাকরীর জন্যে। পরিপুষ্ট দেহ আবার শীর্ণতর হয়ে উঠ্‌ল। চাকরীর জন্য চেষ্টা আমিও করছি সাধ্যমত কিন্তু যোগাড় আর হয়ে উঠ্‌ছে না। ললিতের দুশ্চিন্তার লাঘব আমি কিছুতেই করতে পারি না। ললিতকে খেতে দিতে পারি, শোবার জায়গা দিতে পারি, কিন্তু ওর যে সংসার হয়েছে—স্ত্রী এবং ভাবী সন্তানের জন্যে চাই অর্থ, সে আমি কোথা থেকে দেব? ললিতের ঘাড়ে যে দায়িত্বভার এবং তার জন্য যে চিন্তা তার অংশ আমার নেবার ক্ষমতা নেই। পূর্ব্বের দিন আর নেই, যখন ললিত শুধু নিজেই ছিল, কারোর দায়িত্ব ছিল না। তখন ছুটির দিন কাটত কাব্যচর্চ্চায়, এখন আর তা হয় না, রাত্তিরে শোবার পর হাসি গল্পের পাট উঠে গেছে, যদিও বা হয় তা আগের মত সহজ সরল নয়। ললিত বোধ হয় এখন শুয়ে শুয়ে ভাবে কবে তার এই দুর্দ্দশার শেষ হবে।

তিনচার মাস পরে একদিন ললিতের মুখে পুরান হাসি দেখতে পেলাম, ত্রিশ টাকার একটি চাকরী হয়েছে, টিউশানি করে পায় দশ টাকা, এই চল্লিশ টাকা নিয়ে ও কলকাতায় বাসা করবে।

ললিত অবশ্য কিছু বললে না, এমনিতেই আমার ওপর এত কৃতজ্ঞ যে বোধ হয় কৃতজ্ঞতার বোঝা আর ভারী করতে চায় না।

আমার মনে হ'ল, আমার বাড়ীতে যদি ললিতকে থাকতে দিতে পারতাম, তা'হলে ওর বাড়ীভাড়ার টাকাটা বেঁচে যেত। কিন্তু কাকে বলব দুখানা ঘর ছেড়ে দিতে? সকলেই যুক্তি দেখালে, ঘর ছাড়লে কি করে তাদের চলে; অনুনয়, আমার উদারতার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত। অবশ্য এসবের জন্য নয়, যে জন্য বেশী জোর করতে পারলাম না সে হচ্ছে এদের যথার্থ দারিদ্র্য। ললিতের মত, বুঝি বা তার চেয়েও এরা অসহায়, ললিতের সংসার তবু এখন সঙ্কীর্ণ, বৃদ্ধি পায় নি, এদের সংসার অপর্য্যাপ্ত।

সরযূর শীঘ্র সন্তান হবে সেইজন্য বাসা করা হল না। ক'মাস পরে ললিত বাসা করলে, আমার বাড়ী থেকে খানিকটা দূরে। যেদিন ও সরযূকে নিয়ে এল, তারপর দিনই রাত্রিবেলায় আমার নিমন্ত্রণ হল। বিকেলবেলা ওদের বাড়ী গেলাম. দোতলায় একটা মাঝারি ঘর, পাশে ছোট একখানা রান্নাঘর, সামনে একটু খোলা ছাদ, লাইট আছে। ঘরটাকে ইতিমধ্যে ওরা বেশ সুন্দর করে সাজিয়েছে, ললিতকে বেশ প্রফুল্ল মনে হ'ল, বললে, 'মাইনে বাড়লে আর একটা ঘর নেব, সেটাকে ড্রইংরুম করব, এটা হবে বেডরুম। আপাতত একটাতেই সব। এই দেখুন না, ফর্দ্দ করেছি কি কি কিনতে হবে, ক্রমে ক্রমে সুবিধামত একটা একটা কিনে ফেলব।' ফর্দ্দ দেখলাম, বিলাসের উপকরণ কিছুই বাদ যায়নি তাতে, মনে মনে প্রার্থনা করলাম, ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন। ললিত ও সরযূ উভয়ে মিলে আমাকে আদরে যত্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। কি করে যে আমাকে যত্ন করবে, কি করলে আমি খুশী হই, এই নিয়ে ওদের ভাবনা। সরযূ রেঁধেছিল অনেক, আর খাবার সময় তার কি অনুরোধ বেশী খাওয়ার জন্য, অবশেষে আসবার সময় প্রতিশ্রুতি আদায় করলে, প্রত্যহ যদি না পারি ত একদিন অন্তর আসতেই হবে।

আমার গল্পটা যদি এখানে শেষ করতে পারতাম, তা'হলে আমি ত সুখী হতামই, তোমরাও ভাবতে পারতে যে, এক প্রকৃত সুখী দম্পতি ছিল। বছর দুই ললিতের বেশ ভাল রকম কাটল, ঘরে নতুন আসবাবপত্রেরও কিছু আমদানী হ'ল, যদিও আর একটা ঘর ভাড়া আর নেওয়া হয়ে ওঠেনি। ললিতের মাইনে কিছু বেড়েছিল। ললিত পূর্ব্বের মতই বর্ত্তমান জীবনের প্রতি সুখী ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি আশান্বিত ছিল। ওর মনে এখন দৃঢ় ধারণা, উত্তরোত্তর ওর সুদিন আসছে। আমি প্রায়ই ওদের বাড়ী যেতাম, ওদের সেই ঘর নীল আলো জ্বালা, সর্ব্বত্র সরযূর কোমল হাতের পরিচ্ছন্নতার ছাপ, এখন যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে। বলতে ভুলে গেছি, ললিত আবার কবিতা লেখা আরম্ভ করেছিল। সরযূ মোটামুটি লেখাপড়া জানত, আমরা তিনজনে কবিতা পড়তাম, হাসি গল্পে বেশ চমৎকার আমাদের সময় কেটে যেত। কবিতাগুলো একত্র করে বই ছাপাবার ইচ্ছে ললিতের এখন আছে কিন্তু টাকায় কুলোয় না। এই সময় সরযূর আবার একটি সন্তান হ'ল। যখন বাসা করা হয়নি সেই সময় ক'মাসের মাইনের কিছু টাকা ললিতের জমান ছিল। প্রথম ছেলেটির আবার অসুখ করল, এই দুই ব্যাপারে সে টাকাগুলোর সবই প্রায় খরচ হ'য়ে গেল, মাইনেও আর বাড়ল না।

ললিত আবার যেন নিস্তেজ হ'য়ে এল, সরযূর মুখের হাসি তেমনি অম্লান, কিন্তু শরীর দিন দিন শীর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে। একদিন বললাম, 'ললিত, যদি কিছু মনে না কর, তা'হলে আমি বলি কি আমার ত সব টাকা ঠিক প্রয়োজনে খরচ হয় না, বাজে খরচও কিছু আছে, সেগুলি যদি কমাই মাসে গোটা পনের টাকা

বাঁচে, সেটা যদি তুমি নাও। ধার হিসেবেই না হয় নিয়ো, এর পরে দিয়ে দিয়ো।

ললিত ম্লান হেসে বললে, 'আপনার ওপর ত জুলুম আছেই, আর কত করব? আমার অভাব বাড়ছেই, কমবে কি যাবে সে আশা আর তত নেই। আপনারও কিছুই নেই, এর পরে সময় অসময় ত আছে।' সরযূ দৃঢ়স্বরে বললে, 'না আপনার কাছ থেকে কিছু নেওয়া চলবে না, কি এমন আমাদের কষ্ট, দুবেলা ত খেতে পাচ্ছি এখন, কিন্তু আপনার যদি ঈশ্বর না করুন কোন অসুখ করে, দু'তিন মাস অফিসে না যেতে পারেন তখন? তার চেয়ে যদি আমার কথা শোনেন ত বলি বাজে খরচ কমিয়ে ও-টাকাটা আপনি জমা রাখুন।'

আর বেশী বলতে পারলাম না, সরযূকে আমি চিনেছি, আমার নীচের তলার অধিবাসিনীদের মত দারিদ্র্য নিয়ে লোকের কাছে কাঁদুনি গাইতে ভালবাসে না, আত্ম-সম্মান তার প্রখর।

তা'ছাড়া একথাটাও এতদিন ভাবিনি, আজ ভাবলাম ভাল করে, সত্যিই ত, আমার যদি অসময় হয় কে দেখবে? নীচের লোকদের ত আমি ভাল করেই জানি। সেই থেকে টাকাটা জমাই করতাম। ললিতের দিন কোনরকমেই চলে, পূর্ব্বের অকুণ্ঠিত উচ্ছ্বসিত সহজ আনন্দও নেই, আবার দিনরাত অভাবের তাড়নায় বিষণ্ণ হয়ে মুষড়েও থাকে না। এখন আমি গেলে তিনজনে মিলে কিছুক্ষণের জন্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু এও বেশী দিন চল্‌ল না। ললিতের হঠাৎ শরীর খারাপ হ'ল, মাঝে মাঝে জ্বর হয়, কাশি ইত্যাদি, ডাক্তার বল্‌লে বিশ্রাম নিন্ নইলে খারাপ হতে পারে। সরযূ কান্নাকাটি করে টিউশানি ছাড়িয়ে দিল, দশটাকা আয় কমে গেল, কাজেই ললিতকে ও-ঘর ছেড়ে দিয়ে আরও কম টাকায় অন্য বাড়ীতে নীচের ঘরে উঠে যেতে হ'ল। ওদের প্রথম আনন্দের দিনের আসবাব-পত্র সজ্জিত, তিনজনের মিলিত কতদিনের হাস্য-পরিহাস মুখরিত সেই ঘরখানার জন্য আমারি মন কেমন করত, —তা'হলে ওদের কথাটা ভেবে দ্যাখ।

এ বাড়ীতে আসার দিনকয়েক পরে, একদিন আমি গেছি। ললিত সেইমাত্র অফিস থেকে এল, সরযূ পাশের ঘরে চা করতে গেছে, ললিত একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বললে, 'দেখুন আশ্চর্য্য, আর আমার মনে ঐশ্বর্য্যের জন্য আগ্রহ বা আশা নেই, মনে হচ্ছে অনায়াসেই এই ঘরখানায় জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি। সময়টা ত নির্দ্দিষ্ট করা হয়ে গেছে, বাজারে যাওয়া, অফিস করা, রাতে একটু পড়া, দু'বেলা খাওয়া আর ঘুমান। এর মধ্যে আর কি প্রয়োজন অন্য কিছুর?'

এ কথাগুলো শুনে আমার অত্যন্ত কষ্ট লাগল, এতদিনে ললিত বুঝেছে, আশা করলেই তা সফল হয় না। ওকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, 'ঐশ্বর্য্য ত সব নয় ললিত, আমার চিরকাল এক মত যে, চাই শান্তি, চাই মানসিক স্বচ্ছন্দতা। তোমার অবস্থাকে আমি হিংসে করি, কারণ এত অভাবের মধ্যেও তোমার শান্তির অভাব নেই।'

ললিত পূর্ব্বের মতই দৃঢ়স্বরে বললে, 'না, না, অর্থ নইলে অভাবের তাড়নায় শান্তি দূরে চলে যায়।'

এইবার ললিত অত্যন্ত মুষড়ে পড়ল, ওর মনের অবস্থা হল বিষণ্ণ এবং উৎসাহহীন, প্রায়ই আমাকে বলত, 'যদি বেশী টাকার মাইনের একটা চাকরী পেতাম, তা'হলে জীবনটাকে একবার উপভোগ করে নেওয়া যেত।'

অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগে ললিতের স্বাস্থ্যভঙ্গ হল, তারপরে একদিন অফিস থেকে এসে শয্যাগ্রহণ করলে। এতদিন শরীর খারাপ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্রাম নেয়নি, এবার না নিয়ে উপায় নেই। ডাক্তার এসে দেখে বলে গেল,—চেঞ্জে যান, এখনও ভাল হবার আশা আছে। চেঞ্জে যাওয়া দূরে থাক, মাস গেলে সবই খরচ আছে, নিজের ওষুধ আছে অথচ মাইনে আসবে না ভেবে রোগশয্যায় ললিত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। অবশেষে আবার একদিন সাহায্য করবার প্রস্তাব করলাম, বললাম, 'আমার নিজের ত কেউ আপনার বলতে নেই তোমরা ছাড়া, সেই তোমাদেরই অসময়ে যদি আমার সামান্য টাকা কোন কাজে না লাগে তা'হলে সেটাকার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা কি!' এবারে সরযূ আপত্তি করলে না। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে প্রায় একমাস আমি এদিকে আসিনি; সেই সময় প্রত্যহ বিকেলবেলা কাটত ললিতের রোগশয্যার পাশে। ললিতের অসুখ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল, ললিত অত্যন্ত অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কেবল বলত, 'ভোগ করবার এত ইচ্ছা, অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সব ত্যাগ করে অতৃপ্ত হৃদয়ে আমাকে চলে যেতে হবে, এই কি ঈশ্বরের বিচার?' কখনও কখনও ম্লান হেসে বলত, 'অন্তত কবিতার বইটাও যদি ছাপাতে পারতাম।' কোন আশাই পূর্ণ হল না, চিকিৎসা যতটা প্রয়োজন কিছুই হল না। ধীরে ধীরে ললিতের জীবনী-শক্তি হ্রাস হয়ে এল। ললিত নিজে বুঝতে পেরেছিল, তাই তাকে বৃথা আশা দিতেও সাহস হ'ত না। সরযূর সেবার কথা আর কি বলব? এই জিনিষটা এখনও আমাদের মেয়েদের মধ্যে আছে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে অদ্ভুতভাবে সেবা করা।

অবশেষে একদিন, তখন বিকেলবেলা, সূর্য্য তখনও অস্ত যায়নি, ম্লান হ'য়ে আসা সূর্য্যের শেষ রশ্মি জানলার গায়ে একটু লেগেছিল। মেঘহীন গভীর নীল আকাশের পশ্চিম দিক অপূর্ব্ব লাল আভায় রঞ্জিত, ললিত একটু হেসে বললে, 'এবারের মতন সব আশা অপূর্ণ রইল, আপনার কাছে কৃতজ্ঞতার কথা বলে অপমান করব না। যদি যাই মাঝে মাঝে সরযূকে দেখবেন। আর—আর—যদি খোকা বড় হয়, আমার চিরকাল প্রার্থনা করে আসা ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অধিকারী হয়, বাঁচবার মত করে বাঁচে, তা'হলে আমার বইখানা ছাপাতে বলবেন।' কথাগুলো বলে সে হাঁপাতে লাগল, তারপর পাশে সরযূর দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল, শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ বুজল।

শেষ সময়ে সরযূর বাপের বাড়ী থেকে সব এসেছিলেন, সেইজন্যে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় কেবল মনে হচ্ছিল, বারান্দায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ান সেদিনের সকালবেলার সুশ্রী ললিতের কথা। ঘরে এসেও বসতে

(শেষাংশ ৫০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মানব সমাজের উৎপত্তি ও অভ্যুদয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রায়বাহাদুর শ্রীশরৎচন্দ্র রায়

প্রত্ন-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড়জাতি

এই দ্রাবিড়-পূর্ব্ব সমাজের গৌরব যখন উচ্চতম সীমায় উঠিয়াছিল তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া "রণধারা বাহি, জয়গান গাহি, উন্মাদ কলরবে' আবির্ভূত হইল বর্ত্তমান "দ্রাবিড়ী" জাতিদের পূর্ব্বজেরা। প্রাচীন ভারতে ইহাদের পরবর্ত্তী নর্ডিক আর্য্যেরা ইহাদের নাম দিয়াছিলেন "অসুর"। "দৈত্য", "দানব" প্রভৃতি আখ্যায়ও এই পরাক্রান্ত জাতি অভিহিত হইত। ইহারা ইউরোপের মেডিটেরানিয়ান জাতির পূর্ব্বজদের জ্ঞাতি বলিয়া ইহাদিগকে হয়তো Indo-Mediterranean' নাম দেওয়া যাইতে পারে। ভারতে প্রবেশ করিয়া ইহাদের কয়েক দল পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিল; অনেকস্থলে দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতির সহিত সংমিশ্রিত হইল।

ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশ উহাদের একটি কেন্দ্র হইয়াছিল এবং সেখানে উহাদের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

পুরাকালে বর্ত্তমান আসাম প্রান্তেও উহাদের উপনিবেশ ও প্রভুত্ব স্থাপনের কিম্বদন্তী আছে। মহিরাঙ্গ দানব, হাটক অসুর ও তাহার বংশধর সম্বর অসুর, রত্ন অসুর, নরক অসুর প্রভৃতির নাম জনশ্রুতিতে সুবিদিত।

উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতে ইহাদের কোনো কোনো দল উপনিবিষ্ট হইলেও গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীর সুজলা সুফলা উপত্যকাগুলি মুণ্ডা প্রভৃতি দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতিদের অধিকৃত থাকায় এই প্রোটো-দ্রাভিডিয়ান্ অসুর জাতির অধিকাংশ দল ক্রমে বিন্ধ্যাগিরি অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে গেল ও ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিল। ইহারাই বর্ত্তমান তামিল, তেলেগু, মালায়ালি প্রভৃতি জাতিদের পূর্ব্ব-পুরুষ।

সকলেই জানেন যে, দক্ষিণ ভারতে ইহাদের স্থাপিত অন্ধ্র, রাণ্টিক (রাষ্ট্রকুট) চের, চোল বা কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য প্রবল ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এবং সমুদ্র পথে মিশর প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সহিত ইহাদের বাণিজ্য চলিত। সভ্যতার উন্নতির সহিত শ্রেণী বিভাগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। দ্রাবিড় সমাজের শ্রেণী বিভাগে সর্ব্বোচ্চে ছিল 'মাল্লের' বা রাজা, তারপর পর্য্যায় অনুসারে 'বল্লাল' বা সামন্ত রাজা, তারপর 'বেল্লাল' বা ক্ষেত্রস্বামী বা কৃষক, তারপর 'বণিক' বা ব্যবসায়ী। এইসব শ্রেণী ছিল উচ্চ বা 'মেলোর'; তারপর শ্রমজীবী বা "বিনইবলার", আর সর্ব্বনিম্নে দাস-জাতি বা "আদি-ওর"। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার বহু বিভাগ ছিল। উচ্চনীচ ভেদ-প্রবণতা (separatism) দ্রাবিড় জাতির মধ্যে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল ও উহাদের অস্পৃশ্যতা-বোধ ক্রমে ভারতের বর্ত্তমান অনমনীয় বংশগত 'জাতিভেদ' প্রথায় পরিণত হইল। সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতির মধ্যে 'হটযোগের' প্রবল হইয়াছিল। পরিশেষে ইহারা যখন আর্য্য-নর্ডিক জাতির সংস্পর্শে আসিল তখন দেখিল আর্য্যেরা শুচি-প্রবণতার জন্য অপরিচ্ছন্ন দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতিদের সংস্পর্শ বর্জ্জনের প্রচেষ্টা করিতেন। তাহাতে দ্রাবিড়দের বাহ্য-শুচি-বোধ আরও উত্তেজিত হইল।

পার্জিটার সাহেব পুরাণাদির গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই 'মানব' বা দ্রাবিড় জাতি হইতে অযোধ্যার ইক্ষাকু রাজ বংশ, বিদেহের জনক রাজার বংশ, বৈশালীর বৈশালক বংশ, অনার্ত্ত (গুজরাট) দেশের কুশস্থালির সর্য্যাত বংশ এবং মাহিষ্মতীর করুষ বংশ, ও আরও কয়েকটি রাজবংশ উদ্ভূত হইয়াছিল। শেষে এই দ্রাবিড়-'মানব' বা পৌরব শাখার প্রাচীন-বংশ-গুলির মধ্যে কেবল পান্ড্য, চোল, চের বা কেরল বংশ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল; আর সকলেই 'ঐল' বা 'আর্য্য'-নার্ডিকদের কবলিত বা অধীনস্থ হইয়াছিল। ক্রমে ভারতের সকল জাতির উচ্চতর বংশগুলি 'ঐল' বা 'আর্য্য' জাতির সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কোনো কোনো স্থলে আর্য্য-শোণিতের সংমিশ্রণও ঘটিয়াছিল।

এই দ্রাবিড় বা অসুর জাতিই সম্ভবতঃ ভারতে প্রথম তাম্র ও পরে লৌহ গালায় ও তাহাতে অস্ত্র অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করে, মৃৎপাত্র পোড়াইয়া নানা আকারের বাসনপত্র প্রস্তুত করে, ইষ্টক পোড়াইয়া [illegible] প্রস্তুত করে; মৃত ব্যক্তির জন্য প্রস্তরের কবর ও স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে, জল-যাত্রার জন্য অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করে ও জলসেচনের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি করে। ভারতে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন সম্ভবতঃ ইহারাই প্রবর্ত্তন করে। সর্প পূজা, লিঙ্গ পূজা ও মাতৃ পূজাও হয়ত এই জাতিরই প্রবর্ত্তিত; তবে ইহা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিল; আর ধরিত্রীমাতার পূজা দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতির মধ্যেও বিশেষভাবে প্রচলিত আছে।

সাহিত্য ও সুকুমার কলার অনুশীলনে দ্রাবিড় জাতি সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের এ বিষয়ে উৎকর্ষ প্রাচীনকাল হইতে বিশ্রুত। ময়াসুরের ন্যায় স্থপতি প্রাচীন ভারতে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল বলিয়া উল্লেখ নাই। ইহাদের সঙ্ঘ-শক্তি ও কর্ম্ম-শক্তি প্রবল; তামিল জাতির বাস্তবের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তেলেগু জাতির ভাব প্রবণতা উল্লেখযোগ্য।

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, 'নারিকেল', 'মীন', 'খীরা' 'কালা', 'কাণা', 'খোকা', 'খুকি', 'গোটা' (সমস্ত), নোলা (জিহ্বা) প্রভৃতি বহু শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত।

সকলেই জানেন যে, সম্ভবতঃ এই 'অসুর' জাতিরই একটি অপেক্ষাকৃত উদ্যমশীল ও ভাগ্যবান শাখা সিন্ধুনদের উপত্যকায় উপ-নিবিষ্ট হইয়া বিশেষ অনুকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর প্রভাবে ও নানাজাতির সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শের সুবিধা লাভ করিয়া ক্রমে তুলিয়াছিল ও জগতের তৎকালীন সভ্য জাতিদের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। মহেঞ্জো-দারো ও হারাপ্পায় প্রাগৈতিহাসিক 'অসুর' সভ্যতার বহুমুখী প্রতিভা ও ঐশ্বর্য্যের যে সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে লিঙ্গপূজা, সর্পপূজা, বৃক্ষ দেবতার পূজা, মাতৃকাপূজা ও যোগ-সাধন প্রভৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

কালক্রমে আনুমানিক পাঁচ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের সেই বিপুল সভ্যতাও ইতিহাসের রঙ্গস্থলী হইতে বিলুপ্ত হইল, সামান্য চিহ্নমাত্র রাখিয়া। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতার ন্যায় উত্তর ভারতের এই অসুর সভ্যতার মূলসুর ছিল রজস্তমোগুণাত্মক।

মঙ্গলীয় জাতি

প্রাচীনকাল হইতে অলক্ষিতে ধীরে ধীরে তরঙ্গাকারে কয়েকটি পীতাভ মঙ্গোলীয় জাতি ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের কেন্দ্র আসামে। এখানে আছে 'বোড়ো' শাখা; ও গারো, কাচারি, রাভা, কোচ, টিপ্রা, লালুং, 'হাজোং'; 'তাই' শাখার খামটি, শান ও আহোম; কুকি-চীন শাখার প্রাচীন ও নূতন কুকি, ও মাইথি বা মণিপুরী; কাচিন বা সিংফো শাখা; মনখেমর শাখার খাসি ও সিংটেঙ্গ; ভোটচীন (Tibeto-Burman) শাখার আবর, মিরি, আকা, ডাফলা ও মিসমি এবং বিভিন্ন নাগা জাতি (আও, রেঙ্গমা, সেমা, লোহটা, ইত্যাদি)।

নেপালের লিম্বু জাতি এবং নেপাল ও সিকিমের রোঙ্গপা বা লেপচা জাতি মিশ্র মঙ্গোলীয়ান জাতি।

এই জাতিগুলি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিলেও সমাজ ব্যবস্থায়, সংস্কৃতিতে, রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারে ইহারা অধিকাংশই হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে।

আসামের হিন্দুদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বঙ্গদেশ হইতে বহুকাল পূর্ব্বে আসিয়াছিল। আসামে এইরূপ বহু পরিবারে কালে মোঙ্গলীয় শোণিতের অল্পাধিক সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজ-ভুক্ত আসামের আদিম অধিবাসী। তৃতীয়তঃ, বাঙ্গলা দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে সমাগত ও আসামে উপনিবিষ্ট বহু পরিবার।

রাজা ভাস্কর বর্ম্মার নিধানপুর তাম্র-শাসন হইতে জানা যায় যে, প্রায় দেড় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মহ[illegible]ত বর্ম্মার রাজত্বকালে (খৃঃ ৪৯০-৫২০), অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবার রাজার নিকট লাখ-রাজ ভূমি পাইয়া আসামে বসবাস করেন। আর দেশজ আদিম নিবাসী কতকগুলি পরিবার হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। O'Malley সাহেব লিখিয়াছেন, যে মণিপুর-বাসী অনেক ব্রাহ্মণের বিবাহ ক্ষত্রিয় রমণীর সহিত হইয়া থাকে।

ভারত সমাজ ও সভ্যতায় মঙ্গোলিয়ান জাতির প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালী প্রভৃতি 'আনব' বা আল্পাইন জাতি

দ্রাবিড় জাতির ভারতে আগমনের পরে এবং নর্ডিক আর্যজাতির আগমনের বহুপূর্ব্বে, মধ্য এসিয়ার পার্ব্বত্য অধিত্যকা হইতে পামীর গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া শ্বেতাঙ্গ 'আল্পাইন' জাতির একটি শাখা একাধিক দলে ভারত-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। ইহারাই বাঙ্গালী, গুজরাটি, মারহাট্টি প্রভৃতি কয়েকটি জাতির পূর্ব্বজ।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইল স্যার হারবার্ট রিজলি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী জাতি দ্রাবিড় ও মোঙ্গালীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এই মত অধুনা সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী জাতি ও উহাদের জ্ঞাতি গুজরাটি, মাহরাট্টি প্রভৃতি জাতি মূলতঃ আল্পাইন বংশোদ্ভূত। শ্বেতাঙ্গ আল্পাইন জাতির এই ভারতীয় শাখা, ভারতে কৃষ্ণত্বক দ্রাবিড়পূর্ব্ব ও কৃষ্ণাভ বা ধূসরবর্ণ (brown) দ্রাবিড় জাতির সহিত অল্পাধিক সংমিশ্রণ সত্ত্বেও ইহাদের শোণিতের মূল-ধারা আল্পাইনই রহিয়াছে। আর তাহাদের মধ্যে উচ্চতর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য শ্রেণীগুলি হয়তো কোথায়ও কোথাও সামান্য আর্যশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীতে কোথায়ও কোথায়ও সামান্য মোঙ্গোলিয়ান রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকিতে পারে।

ইউরোপের ফরাসী, ইটালীয়ান, আলবেনিয়ান, এবং রুষ ও জারমানের কতক অংশ এবং মধ্য এসিয়ায় ওয়াখি, শিঘনি, রোসনানি, ইসকাশানি, খোটানি ও পাকফো জাতিরাও আল্পাইন জাতি ভুক্ত।

পুরাণোল্লিখিত বংশানুক্রমগুলির সমীকরণ করিয়া পারজিটার সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এককালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, সোবীর, মদ্র, বহ্লীক ও শিবি এই দেশগুলি 'আনব' জাতির অধিকৃত ছিল। নৃতত্ত্বের সিদ্ধান্তের সহিত এই পৌরাণিক সিদ্ধান্তের বিশেষ সঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

বাঙ্গালী জাতির শ্বেতাঙ্গ 'আল্পাইন' কুলজি সমর্থনকল্পে আর একটি তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) 'বঙ্গ' শব্দের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা এইরূপঃ "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানী মানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের -পাদানান্য অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি।" অর্থাৎ, "বঙ্গ, বগধ, ও চের প্রমুখ ত্রিবিধ প্রজা সম্ভূতি লাভ করিয়া বিহঙ্গস্বরূপে সূর্য্যাভিমুখে গিয়াছিল।"

এই শ্লোকে 'বঙ্গ' প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদিগকে 'পক্ষী' বলা হইয়াছে। 'মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যখন আর্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে পাঞ্জাবে উপনীত হন, তখন বাঙ্গলা সভ্য ছিল। আর্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদে উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গলার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।"

কিন্তু আমার মনে হয়, এই "পক্ষী" আখ্যা প্রদানের অধিকতর সমীচীন কারণ আছে।

আল্পাইন জাতিদের মধ্যে আলবেনিয়ানরা সেদিন পর্যন্তও জাতীয়তা লাভ করে নাই, শ্রেণী পর্যায়ভুক্ত (tribal stageএ) ছিল। এখনও অন্যান্য পাশ্চাত্য আল্পাইন জাতিদের অপেক্ষা ইহারা পশ্চাৎপদ; এখনও উহারা প্রাচীন-রীতিনীতি কিছু রক্ষা করিয়া চলে। উহারা "Shkypetars" বা "ঈগলপক্ষীর জাতি" বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। তাহাদের দেশকেও "ঈগলপক্ষীর দেশ" (the Land of the Eagle) বলা হয়। Mr. M. E. Durham তাঁহার "Some Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans" নামক পুস্তকে (১৬ পৃঃ) তাহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "It is noteworthy that even to-day a large proportion of the people . . . identify themselves with birds, and a mass of traditional ballads shows that the custom is ancient." ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে আজ পর্যন্ত এই জাতির অধিকাংশ (আলবেনিয়ান) লোক আপনাদিগকে পক্ষীর সহিত অভিন্ন মনে করে এবং তাহাদের বহু লোকসঙ্গীত হইতে বুঝা যায় যে ইহা তাহাদের প্রাচীন প্রথা।" এই তথ্য হইতে এই অনুমান কি অসঙ্গত হইবে যে ভারতের বৈদিক যুগে বাঙ্গালীরাও তাহাদের জ্ঞাতি আলবেনিয়ানদের মতো আপনাদিগকে "পক্ষী" তুল্য মনে করিত, কিম্বা হয়তো "পক্ষী" অঙ্কিত জাতীয় পতাকা ব্যবহার করিত? এই অনুমানের সমর্থক আর একটি তথ্য এই যে, বাঙ্গালীদের জ্ঞাতি মাহরাট্টা প্রভৃতি জাতির একটি গোষ্ঠির নাম (clan name) "গড়ুরে", অর্থাৎ "গড়ুর পক্ষী"; অপর একটি গোষ্ঠির পদবী "বহিরে", অর্থাৎ শ্যেনপক্ষী (hawk) (B. A. Gupte, "The Bombay Kayastha Prabhus," ২৯ পৃঃ)। রায় বাহাদুর গুপ্তে স্বয়ং জাতিতে মহরাট্টা প্রভু কায়স্থ ছিলেন। তিনি এই 'গড়ুরে' আখ্যার ব্যখায় বলিয়াছেন যে, 'গরুড়ে' গোষ্ঠি তাহাদের গোষ্ঠি-পতাকায় গড়ুর পক্ষীর চিত্র অঙ্কিত করে। এই সম্পর্কে ইহা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য যে, প্রত্যেক আলবেনিয়ান গোষ্ঠি ("tribal group")কে অমুক "bairakh" বা পতাকা এবং প্রত্যেক গোষ্ঠি-পতিকে 'bairakhtar' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন রোমক সাম্রাজের ঈগলপক্ষী অঙ্কিত পতাকাও উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুর "গড়ুরধ্বজ" নামের কথাও স্বতঃই মনে আসে। হয়তো এ অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন না হইতে পারে যে, "বিষ্ণু"ই বাঙ্গালী প্রভৃতি ভারতীয় আল্পাইন জাতির আদি দেবতা এবং হয়তো শিব "শিশ্নদেবাঃ" অসুর বা দ্রাবিড় জাতির আদি দেবতা; ও ব্রহ্মা নর্ডিক হিন্দু জাতির আদি-দেবতা ছিলেন; এবং পরে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী হিন্দুধর্ম্মে এই তিন দেবতা একমেবাদ্বিতীয়ং ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া খ্যাত হন।

ভ্রমণ ও বসবাসে বিভিন্ন দেশের ও জাতির সংস্পর্শে ও অল্পাধিক সংমিশ্রণে বাঙ্গালী প্রভৃতি জাতির সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হইতেছিল।

কোনও কোনও 'আল্পাইন' দল হিমালয়ের পাদদেশ ধরিয়া হিমালয় এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পারব্যাপ্ত হইয়াছিল। পারজিটার সাহেব পুরাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত বাদ দিয়া কোনো কোনো "আনব"-দল সিন্ধু, সোবীর, কৈকেয়, মদ্র, বহ্লীক, শিবি এবং আম্বষ্ঠ প্রদেশও অধিকার করিয়াছিল।

সুজলা সুফলা বাঙ্গলাদেশে জীবিকা অর্জ্জন সহজসাধ্য হওয়ায়, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনও অনায়াস-সাধ্য হইয়াছিল বাঙ্গলাদেশে আগত ভাবপ্রবণ, কল্পনাশীল, মেধাবী ও কর্ম্মঠ আল্পাইন সঙ্ঘগুলি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গলার এক বিশিষ্ট সভ্যতা লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় বড় বড় খাঁটি আর্য্য রাজগণ, এমন কি যাঁহারা ভারত-বংশীয় বলিয়া আপনাদিগকে গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ...যখন লোকে লোহার ব্যবসায় জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা নানাদেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত, সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম' নৌকা। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত তার নাম 'বালাম'। 'বালাম' বলিয়া কোনও ভাষায় কথা আছে কিনা জানি না। কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাঙ্গলার প্রাচীন বন্দর। অশোকের সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গলার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজসকল নানা দেশে যাইত।"

বাঙ্গলাদেশের সম্বন্ধে মহাভারতাদির সব কথা কতদূর প্রামাণ্য বলা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ আর্য্যদের পরিত্যাজ্য ছিল। পরে বৌদ্ধ প্রচারকগণের বঙ্গে আগমনকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। বৌদ্ধ ও জৈন প্রচারকগণের আগমনের পর হইতে গণতন্ত্রবাদী বাঙ্গালী সমাজ অনুকূল উপাদান সংগ্রহ ও সমীকরণ করিবার সুযোগ পাইয়া উন্নতির পথে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইল।

সাম্রাজ্য-স্থাপনে বাঙ্গালী জাতি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নাই বটে; কিন্তু সংস্কৃতিতে বাঙ্গালী ক্রমে ভারতে অগ্রণী হইয়াছে। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, শান্তরক্ষিত, অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতি বাঙ্গালী পণ্ডিতদের খ্যাতি সুবিদিত। বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যাদির চর্চ্চা করিতেন; পরে প্রাকৃত ভাষায়। প্রাকৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ "গৌড়ী রীতি" উদ্ভাবন বাঙ্গালীর কৃতিত্বের একটি পরিচয়।

পরে বরেন্দ্রভূমিতে পাল রাজবংশের অভ্যুদয়ে বাঙ্গালী জাতির বহুমুখী প্রতিভা আরো বিকশিত হইতে লাগিল। নবদ্বীপের "নব্য-ন্যায়", ও "গৌড়-মগধ" রীতির ভাস্কর্য্য যাহা বরেন্দ্রভূমিতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং

বাঙ্গালীর সমীকরণশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি, ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। সামান্য গৃহকর্ম্মেও আমোদ-প্রমোদেও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়; যেমন আলিপনা, পট-অঙ্কন, কাঁথা সেলাই; সুক্তো, ডাল্না, ঘণ্টো রন্ধন; সন্দেশ রসোগোল্লা, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রতকথা, কবির গান, যাত্রা প্রভৃতি।

সমাজের আত্মা বা সুর সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ-গুরুদের প্রভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যের সৃষ্টি হইল ও উত্তরোত্তর তাহা সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। বাঙ্গলাদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাবের পর তন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে। পরে শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রভাবে বৈষ্ণবীয় ভক্তিধর্ম্মের প্লাবন আসে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষার পরোক্ষ প্রভাবে বেদান্ত ধর্ম্ম ও বেদান্ত মতের উপর বাঙ্গালীর পক্ষপাতিত্ব লক্ষিত হয়। সমীকরণ-শীল বাঙ্গালী জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য করিবার পক্ষপাতী। এই এক শতাব্দীর মধ্যে ধর্ম্মক্ষেত্রে, সাহিত্য ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে, রাজনীতি ও অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যত অধিক মনীষাসম্পন্ন লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, ভারতে আর কোনো প্রদেশে এত হয় নাই।

উদারতা বাঙ্গালী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। যদিও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও আন্তপ্রাদেশিক ঈর্ষা দেখা যায়, বাঙ্গালী এই প্রাদেশিক ভাব হইতে সাধারণতঃ মুক্ত।

বাঙ্গালী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-প্রিয়

কিন্তু যদিও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলে, স্বাধীন চিন্তা, নব নব ধর্ম্মমত, নূতন বৈজ্ঞানিক মত, যন্ত্রাদি উদ্ভাবন ইত্যাদি নানা বিষয়ে বাঙ্গালীর প্রতিভা দেদীপ্যমান, তবু পরিতাপের বিষয় এই যে, যৌথকর্ম্মক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালীর যৌথ-পরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহার জন্য আংশিকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বর্ত্তমান চাকুরী-জীবিকা দায়ী। আর সম্ভবতঃ জীমূত-বাহন প্রণীত বাঙ্গালীর দায়ভাগ আইনও যৌথ-পরিবারের পরিবর্ত্তে পারিবারিক স্বাতন্ত্র্যের পোষকতা করিতেছে। সম্প্রতি এই সামাজিক আইনকে রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা আরও পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সে যাহা হউক, বিষ্ণু ও কালীর সাধক বাঙ্গালী-জীবনের মূলসুর সত্ত্ব মিশ্রিত রাজসিক। যে সকল জাতিরই নিম্নস্তরে তামসিক গুণের অল্পবিস্তর আধিক্য দেখা যায়; তাহাও বাঙ্গালী সমাজে অপেক্ষাকৃত কম; বস্তুতঃ সকল হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীদের পক্ষেই একথা খাটে। সকল হিন্দু সমাজেরই ভিত্তি সত্ত্বগুণে, কোনো সমাজে সেই মূল সুরের ঝঙ্কার সর্ব্বাধিক পরিস্ফুট; কোনো সমাজে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ; কোনো সমাজে বা অস্পষ্ট ও লুপ্তপ্রায়। তথাপি ইহা মগ্নচৈতন্য হইতে বিলুপ্ত হয় না।

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য একশ্রেণীর উপন্যাসাদি লেখকদের অনু-করণে বাস্তবতার কদর্য্য নগ্নমূর্ত্তি কখনো কখনো চিত্রিত হইতে দেখা যায়। ইহা বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের ও সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের মূল সুরের বিরোধী। সুতরাং এই শ্রেণীর সাহিত্য এ সব সমাজের অনিষ্টকর হইবে বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ যেমন জাতীয় ও সামাজিক আদর্শই সর্ব্বত্র সাহিত্য ও সুকুমার-কলাকে প্রভাবান্বিত করে ও তাহার ছন্দ ও সুরকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি সাহিত্য ও সুকুমার-কলাও আবার জাতি ও সমাজের আদর্শকে অলক্ষিতে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। তবে ভরসা এই যে, সাত্ত্বিক ভাব হিন্দু সমাজের মজ্জায় এরূপ প্রগাঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে যে, এরূপ সাহিত্য ভারতে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা অল্প। যে সাহিত্য সত্য, শিব, ও সুন্দরের প্রকাশ করিবে, ভারতের ও বাঙ্গলার জীবনের সুরের সহিত কেবল তাহারই সঙ্গতি হইবে, সমাজ-জীবনের যথার্থ প্রকাশ ও স্ফুরণ তাহা দ্বারাই হইতে পারে।

"ঐল" বা ভারতের নর্ডিক-আর্য্য জাতি

যখন দ্রাবিড়-পূর্ব্ব, দ্রাবিড় ও আল্পাইন জাতীর পরস্পর সংমিশ্রণে বহু জাতি ও বর্ণ-সঙ্কর ভারতের বিভিন্ন ভাগে, স্ব স্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সমাজ লইয়া বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে দ্বন্দ্ব, কলহ, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া দিন যাপন করিতেছিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে সবিতৃদেবের বরেণ্য ভর্গে ধ্যানপরায়ণ চিত্তে উদ্গীত বেদ-গাথায় গগন ধ্বনিত করিয়া একটি প্রতিভাবান্ মহাশক্তিশালী, বিশিষ্ট ধীশক্তিসম্পন্ন, অপূর্ব্ব কল্পনাশীল অথচ কর্ম্মপরায়ণ জাতি ভারত-রঙ্গস্থলীতে আবির্ভূত হইল।

এই নর্ডিক আর্য্যজাতির আদি আবাস-ভূমি ও ভারত-আগমনের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। সে যাহা হউক, ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে, উত্তর-ভারতে অধিকার-স্থাপনকল্পে 'অসুর'দের সহিত দীর্ঘকাল এই নবাগত জাতি সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। এই 'অসুর' সংজ্ঞায় প্রধানতঃ পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধ দ্রাবিড় জাতিদিগকেই সূচিত করিত; তবে সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতিদের কোনো কোনো উন্নততর শাখার যোদ্ধারাও দ্রাবিড়-অসুরদের সহিত সম্মিলিত হইয়া 'আর্য্য' নর্ডিকদের গতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। অবশেষে আগন্তুকেরাই জয়ী হইল। তাহাদের দ্বারাই হউক কিম্বা নৈসর্গিক বিপর্য্যয়েই হউক, সিন্ধু-উপত্যকাবাসী 'অসুরেরা' যে গৌরবময় সভ্যতা-সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা লুপ্ত হইয়া গেল, সামান্য কিছু বাস্তব নিদর্শন রাখিয়া।

এই বেদবাহী আর্য্যজাতি বাস্তব সভ্যতায় 'অসুর'দের ন্যায় সমৃদ্ধ ছিল না, কিন্তু সংস্কৃতিতে, ভাষা-গৌরবে, প্রতিভায়, কল্পনা-শক্তিতে, আদর্শ-প্রবণতায়, ও আধ্যাত্মিকতায় সর্ব্বাধিক গরীয়ান ছিল।

যখন পরস্পর যুদ্ধ ও বিরোধ প্রশমিত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইল, ও কিছুদিন পরস্পরের সংস্রব, সাহচর্য্য ও অল্পাধিক সংমিশ্রণ ও আদান-প্রদান চলিতে লাগিল, তখন আসুরিক বল ও বাস্তব সভ্যতার উপর মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতা প্রাধান্য লাভ করিল। দ্রাবিড়-অসুরেরা ক্রমে নার্ডিকআর্য্যদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। অসুর-সভ্যতা ও পরে আল্পাইন সভ্যতা ও আর্য্য-সভ্যতার সমবায়ে ও আর্য্য গুরুদের নেতৃত্বে এক বিশাল হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সমাজে পরিণত হইল। বৈদিক হোম-যজ্ঞাদির সঙ্গে বৈদিক-পূর্ব্ব পূজাদি সংমিশ্রিত হইল। অসুরাদি অনার্য্যের ধর্ম্ম—মার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মে স্থান পাইল। ভারতের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতির ক্রিয়াকর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তর ও অধিকার-ভেদ অনুসারে বিবিধ শ্রেণীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব নির্দ্ধারিত হইল। তখন এই স্তর-বিভাগ অনমনীয় ছিল না। এইরূপ স্তর-বিভাগ ও অধিকার-ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া সমাজ-সংস্কারের ও সকল শ্রেণীর ক্রমো-ন্নতির পথ সুগম করা হইল।

পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় হিন্দু সমাজের স্তর-বিভাগ ধনগত নয়, ইহা গুণগত। ত্যাগ, শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণ্যের গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুণানুসারে প্রাচীনকালে এক বর্ণ হইতে নিম্নতর বর্ণে অবনমিত ও উচ্চতর বর্ণে উন্নীত হওয়ার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও হিন্দু মত

যে নানাবিধ নৈসর্গিক ও সামাজিক শক্তির প্রভাবে সমাজের পরিপুষ্টি হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে তাহা প্রধানতঃ চারিটি:—

(১) প্রাকৃতিক আবেষ্টনী natural environment);

(২) বংশানুক্রম ও পূর্ব্বপুরুষাগত সংস্কার (heredity, বা hereditary tendencies);

(৩) সামাজিক আবেষ্টনী (social environment), যেমন, জাতীয় ঐতিহ্য, পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা,

(৪) অপরাপর জাতির ও সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শ ও সংমিশ্রণ (contact of cultures and races).

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বহুযুগ পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে প্রত্যেক মানবের ও সমাজের দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা সমাজ-বিজ্ঞানের এই মূল তত্ত্বেরই জ্ঞাপক। আর উক্ত চারিটি শক্তি ছাড়া মহাপুরুষদের প্রভাব সমাজের নবজীবন প্রদানের পক্ষে যে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী এই তথ্য হিন্দু ঋষিরাই প্রথমে বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ।
অভ্যুত্থানধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

(৪ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক)

ব্যষ্টিজীবনের ও সমষ্টিজীবনের উৎকর্ষ সাধনের পন্থাস্বরূপ প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্যরূপে তাঁহারা যে পঞ্চ-মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহার ভিত্তি সমাজতত্ত্বের এই মৌলিক তথ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বরং হিন্দু ঋষিদের এই সম্বন্ধে ধারণা আরও গভীর,

ব্যাপক ও বিশাল ছিল। আর হিন্দু ঋষিরা কেবল সামাজিক মনস্তত্ত্বের তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া তৃপ্ত হন নাই; জ্ঞানলব্ধ তথ্য ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ দ্বারা ব্যষ্টিজীবনের ও সমষ্টিজীবনের উৎকর্ষ সাধনোপযোগী বিধিনিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, হিন্দুশাস্ত্রে দেবঋণ প্রভৃতির ও পঞ্চ-মহাযজ্ঞের ধারণা এবং ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে উদ্ভূতোৎপন্ন বিভিন্ন বর্ণের কল্পনা, হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞানের মূলসূত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

হিন্দুর দেবযজ্ঞের উদ্দেশ্য বিশ্বের ও বিশ্ব-জীবের নিয়ামক প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সহিত যজমানের বা যজমান-সংঘের আত্মসমীকরণ ও ঐক্যতান স্থাপন। তাই 'স্বাহা' এই আত্ম-যোজক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হবির্দানের বিধি, দেবতাদের সহিত কিম্বা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভাষায় প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সহিত—ঐক্যতান স্থাপনের উদ্দেশ্যে। আদিত্য, বসু, ও রুদ্রাদি দেবতারা বিশ্বনিয়ামক নৈসর্গিক শক্তিরূপে ভগবৎ-শক্তিরই প্রতীক।

পিতৃযজ্ঞে,—পিতৃগণের প্রদত্ত দেহ ও দেহা-শ্রিত গুণাবলীর (heredityর) অধিকারী যজমান, 'স্বধা' মন্ত্রে পিতৃগণের সহিত স্বীয় একত্বের ধ্যান ও উপলব্ধি করেন; ও আত্মানু-সৃতির (self-perpetuationএর) কামনা করিয়া তর্পণ করেন।

ঋষিযজ্ঞের উদ্দেশ্য মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ, শিক্ষা-গুরু ও দীক্ষাগুরু ও অন্যান্য জ্ঞানদাতাদের সহিত স্বাধ্যায় ও মন্ত্রজপ ও ধ্যানদ্বারা অখণ্ড জ্ঞানের নিত্য সান্নিধ্য লাভ। ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নির্ণীত সামাজিক আবেষ্টনীর (social environmentএর) অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহা অতিক্রম করিয়া যায়, সামাজিক আবেষ্টনীর ধারণাকে আরও ব্যাপকতা প্রদান করে। সমাজের উপর মহাপুরুষদের প্রভাবের গুরুত্ব পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সম্প্রতি স্বীকার করিতেছেন।

নৃযজ্ঞে আতিথেয়তা ও প্রীতি দ্বারা শ্রদ্ধা-পরায়ণ হইয়া সমাজের সহিত ও বিশ্বমানবের সহিত একত্ব-উপলব্ধি করিবার বিধি। বিশ্ব-মানবের ও বিভিন্ন মানব-সমাজের সহিত সংস্পর্শ এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাহাদের প্রভাব ব্যষ্টি-জীবন ও সমাজজীবনকে প্রভাবান্বিত করে বলিয়াই নৃযজ্ঞের প্রবর্ত্তন।

বিশ্বমানবের সহিত সম্বন্ধের এই ধারণা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 'contact of races and culturesএর বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির পরস্পরের আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণের" ধারণা অপেক্ষাও অধিকতর ব্যাপক ও মহান।

আর ভূতযজ্ঞের ধারণা ও অনুষ্ঠান হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য। ভূতযজ্ঞের উদ্দেশ্য—আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত জীবের সহিত মানবের বিচিত্র সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শন ও পবিত্র দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতের সেবা। হিন্দু সমাজনীতি মতে, এইরূপে ক্রমিক আত্মপ্রসারের দ্বারা বিশ্ব-মানবের ও পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হওয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের উৎকর্ষেরই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

যে ভারতে নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ মানবজীবনের পঞ্চ-মহাযজ্ঞের মধ্যে পরিগণিত হয়, ও যে দেশে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মন্ত্রের প্রচলন আছে, সেখানে জাতীয়তার (nationalism-এর) অভাব হইতে পারে না। অবস্থা বিপর্য্যয়ে কয়েক শতাব্দী অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় কেবল মগ্নচৈতন্যে বর্ত্তমান ছিল মাত্র। বর্ত্তমানে অবস্থার পরিবর্ত্তনে ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আবার জাগ্রত হইতেছে। কিন্তু উহাকে 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে।

এই প্রসঙ্গে জাতীয়তার (Nationalism) সম্বন্ধে ঋষিতুল্য স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"ইয়ুরোপীয় সমাজের সহিত তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয় ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই মনে করেন, তাঁহারা ঐ ভাবের তত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। জাতীয় ভাবটি মনুষ্য-হৃদয়ের খুব উচ্চ ভাব বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বোচ্চ ভাব নহে। জাতীয় ভাব একটি মিশ্র পদার্থ। ইহাতে ভাল এবং মন্দ, প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্ততা দুই-ই আছে। কোন ভাবের সহিত তুলনায় ইহা অতি উদার ভাব; আবার কোন ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ভাব। জাতীয় ভাব সম্বন্ধে আমাদিগের বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, ঐ ভাবটি অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব আছে—উহা মনুষ্যের হৃদয়োন্নতি সোপানে একটি উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়: (১) নিজের প্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ, (৩) বন্ধুবান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ প্রদেশ-বাসীর প্রতি অনুরাগ,—এই পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে, (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায়, প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্য্যায়ক্রমে ইহার উপরে, (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ। অগস্ট কোমটির মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ, বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব-নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্য্য ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন,—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে, আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন। ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাবের স্থান পাইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর যে জাতীয় ভাব সেটি আবৃত হইয়া আছে। সম্প্রতি এই আবরণের মোচন হইতেছে।"

কিন্তু আজ আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমানে কোনো কোনো প্রান্তীয় সরকার মুখে ভারতীয় জাতীয়তার (Indian nationalismএর) গর্ব্ব করিলেও কার্য্যতঃ প্রান্তীয় জাতীয়তা [illegible] ভাবের উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কোথাও কোথাও দেশজ এবং উপনিবিষ্ট (native and domiciled) জাতিদের সম্পর্কে প্রভেদমূলক নীতির প্রবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

উপসংহার

সমাজ-বিজ্ঞানের যথাযথ অনুশীলনে এই শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি হয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে ঐক্যতান, সমাজ-জীবনে ঐক্যতান, বিশ্বমানবের ঐক্যতান,—ইহাই বিশ্ব-লীলা রহস্যের উদ্দেশ্য—ইহাই সম্ভবতঃ হইবে বিশ্বনাট্যের শেষ অঙ্ক,—মানবজগতের বিধিনির্দ্দিষ্ট পরিণাম।

বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি বিশ্ব-প্রাণের আত্ম-প্রকাশের বিভিন্ন ধারা বা ছন্দ। প্রাচীন ভারত-সভ্যতা আর্য্য, দ্রাবিড়, আল্পাইন, মোঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির সমাবেশ ও সংযোগে গঠিত হইয়া পার্থক্য-সমন্বিত এক মহান্ একত্বে গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

যেমন বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মূল সূত্রে আছে বাঙ্গালীর আদর্শ-প্রবণতা, কল্পনা-শক্তি ও সহৃদয়তা, উদারতা ও সমীকরণশীলতা, স্বভাব-প্রীতি, শান্তিপ্রবণতা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা; মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতির মূল সূত্র মাহরাট্টার অদম্য সাহস, কর্ম্মপরায়ণতা, ও স্বদেশপ্রীতি, গুজরাটের সংস্কৃতির মূলে কর্ম্মপরায়ণতা, কার্য্য-করী বুদ্ধি ও চতুরতা; অন্ধ্রের তেলেগু জাতির ভাব-প্রবণতা ও দাক্ষিণাত্যের তামিল জাতির কার্য্যকুশলতা ও বাস্তবতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তেমনি সমগ্র প্রাচীন ভারত-সভ্যতার মূল-সূত্র ছিল আধ্যাত্মিকতা, পরার্থে আত্মত্যাগ, সম্মিলন-প্রবণতা, পরার্থ-পরায়ণতা ও বিশ্ব-প্রেম। এই আধ্যাত্মিক আদর্শই ভারতের বিভিন্ন সংস্থিতি ও জাতিকে এক যোগসূত্রে যুক্ত করিয়াছিল। ইহাই ভারত-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। আর সেই সংস্কৃতির মূলীভূত আধ্যাত্মিকতার, ও পরার্থপরতার পোষণ ও বর্দ্ধনের উপায়-স্বরূপই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতবাসী কালক্রমে ও অবস্থা বিপর্য্যয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ অর্দ্ধবিস্মৃত হইয়া বংশগত অনমনীয় জাতিভেদের পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে।

কালক্রমে প্রতিকূল ঘটনাবলীর ও ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে আর্য্যসভ্যতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র শ্লথ হইয়া এবং অনৈক্য ও বিভেদ বা বিচ্ছেদ-প্রবণতা (separatism) উদ্ভূত হইয়া ভারতকে অধঃপাতিত করিয়াছিল। পুরুষপরম্পরাগত অনেক আচার ও বিধি-নিষেধ অবস্থার পরিবর্ত্তনে, বর্ত্তমান অবস্থার ও কালের অনুপযোগী, সুতরাং অর্থহীন ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কঠিন শৃঙ্খল হইতে সমাজকে মুক্ত করিতে হইবে, এবং আত্মসংযম, ত্যাগ, ফলেচ্ছাহীন কর্ম্ম, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি যে অন্তরের সম্পদ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

অধুনা ভগবৎ-বিধানে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে ও ভারত-সন্তানগণ তাঁহাদের অর্দ্ধ-লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। [illegible]

জন্য এখন প্রয়োজন ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত পন্থার অনুসরণ। ভারতের সমাজনেতাদের ও রাষ্ট্রনেতাদের কর্ত্তব্য বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যীভূত, সুচিন্তিত সামাজিক ব্যবস্থা ও কার্য্যপদ্ধতি (programme) নির্দ্ধারণ করা ও অবিচলিতচিত্তে সেই পথে অগ্রসর হওয়া ও ভারত-সমাজকে চালিত করা। তাহা হইলেই ভারত আবার জগৎ-সভ্যতার জয়যাত্রায় অগ্রণী হইতে পারিবে।

অন্যান্য দেশের সমাজ-সংগঠনের সহিত ভারতের সমাজ-সংগঠনের মৌলিক প্রভেদ এই যে, অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মূলতঃ সমজাতীয়। কেবল ভারতেই বিভিন্ন জাতির বা বর্ণের অনন্যপূর্ব্ব একত্র সমাবেশ হইয়াছে। আর একমাত্র আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশে কতকটা এইরূপ বিভিন্ন জাতির একত্র পীত, কৃষ্ণ বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও বিরোধ বিরল নহে। অপর পক্ষে, ভারতের প্রাচীন ঋষিরা তাঁহাদের উদারতা, সম্মিলন-প্রবণতা, সমীকরণশীলতা, সর্ব্বজনীন প্রীতি ও একাত্মানুভূতির প্রণোদনে ভারতে উপনিবিষ্ট প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়া একটি বিরাট, বিচিত্র ঐশ্বর্য্যশালী ভারত-সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সংযোগ ও সামঞ্জস্য যান্ত্রিক সংমিশ্রণ (mechanical compound) নহে; ভাব-সামঞ্জস্যে, ধর্ম্ম-সামঞ্জস্যে ও আদর্শের একত্বে অচ্ছেদ্য মানসিক বা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগ, psychic and cultural union.

সমাজ-সংগঠনে স্তরবিন্যাস অনিবার্য্য। অন্যত্র এই স্তর বিনিবেশের উচ্চনীচ পারম্পর্য্য প্রধানতঃ বৈশ্যশক্তির বা ধনের তারতম্য কিম্বা ক্ষাত্রশক্তি বা শৌর্য্যবীর্য্যের তারতম্যের উপর অধিষ্ঠিত; কেবল ভারতেই উহা ত্যাগ ও ব্রাহ্মণ্য বা সত্ত্বগুণের তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের বিভিন্ন সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি, ব্যবহারিক কর্ম্মপ্রণালী, আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, আহার-বিহার, বিভিন্ন প্রদেশের ও জাতির প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনের ও ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের প্রভাবে অসংখ্য রূপ ধারণ করিলেও, এই বিরাট হিন্দু সমাজের আদর্শ বা মূল সুর আত্মসংযম, আত্মত্যাগ, অনাসক্তি, তিতিক্ষা, সন্তোষ ও শান্তি। বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর মধ্যেও এই একই মূল সুর।

সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা হইতে এই অনুভূতি আসে যে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি বিরাট পুরুষের আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন রূপ, সুর বা ছন্দ। এই ছন্দ হারাইয়া ভারতবাসী এখন ছন্ন-ছাড়া হইয়াছে। আবার সেই ছন্দের বা সুরের পুনরুদ্ধারের জন্য ভারত সন্তানদের প্রাণপণ সাধনার প্রয়োজন; সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ভারতবাসী প্রত্যেক জাতির ও সমাজের স্ব স্ব সুর বা বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়া ও তাহাদিগকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক – – অধিকার প্রদান করিয়া হিন্দু সমাজের মৌলিক আদর্শের দিকে পরিচালিত করা সমাজ বিজ্ঞান সম্মত পন্থা এবং প্রকৃষ্ট রাজনীতি। আমাদের প্রাদেশিক দেশ-নেতারাও ইহা স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব প্রান্তে উপনিবিষ্ট স্বদেশী প্রবাসী বিভিন্ন জাতির ও তাহাদের ভাষার ও সংস্কৃতির উন্নতিতে বাধা প্রদান না করিয়া যদি যথাশক্তি উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা ভারত সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে আবার একদিন ভারতের বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার মধ্যে মহান মৌলিক ঐক্য সংস্থাপিত হইবে। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ছন্দ বা সুরের সমন্বয়ে ভারতমাতা আবার তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। তখন মাহরাট্টার রুদ্রবীণা ও শঙ্খ-নিনাদ, পাঞ্জাবীর জয়ভেরীর গম্ভীর নির্ঘোষ, বাঙ্গালীর ও অসমীর। হিন্দুর বংশীধ্বনি মধুর নিক্কন, হিন্দুস্থানীর করতালের ঝনৎকার, দ্রাবিড়ীয় তানপুরার করুণ সুর আর আসাম, ছোটনাগপুর ও মধ্য-প্রদেশের আদিম নিবাসীদের মৃদঙ্গের উল্লাস-ব্যঞ্জক ধ্বনি, প্রভৃতির সম্মিলিত একতান বাদ্যে ভারত ভূমি আবার মুখরিত হইবে। তখনই বহুত্বের মধ্যে একত্বের পরিচয়ে ভারতে একজাতীয়ত্বের যথার্থ অনুভূতি আসিবে। আর সেই এক তানের আত্মা-স্বরূপ সকল রাগিণীর মূর্চ্ছণা স্বরূপ ভারত-মাতার মহা-ওঙ্কার ধ্বনি ভারতে ও জগতে নিরন্তর ধ্বনিত ও শ্রুত হইবে' সেই ধ্যান-মন্ত্রে "কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্ব-জাতি",—আর তখনই সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে—

"বিপুলে গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজিবে বিশ্ব-বাজনা,
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,
বিস্মৃত হবে আপনা।"

সমাজ বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

ওপার ও এপার

শ্রীশক্তিকুমার রায় চৌধুরী

পথের সঞ্চয় বহি জীবনের স্রোতটুকু চলিয়াছে খুঁজিতে আত্মারে,
ছোট ছোট ঢেউগুলি পরস্পর কহে কথা শব্দহীন বেদনার সুরে—
শাল আর তালীকুঞ্জ, মর্ম্মরিত ঝাউঝাড় দেখা যায় দূর পরপারে,
নারিকেল-ছায়া ঢাকা একখানি শান্তনীড়,—দেওদার বন আরো দূরে।
পাহাড়ের চূড়া দু'টি, দিগন্তে সোনালী সন্ধ্যা, নভোতটে পথিক-বলাকা,—
দুলায়ে ধানের শীষ বহি'ছে অলস বায়ু, জোনাকীরা নেভে আর জ্বলে;
জলহারা একখানি নীলমেঘ ভেসে যায়—ওড়ে তা'র রেশমের পাখা;—
উপল-আকীর্ণ পথ মৌরীক্ষেত পাশে রেখে ঢেকে গেছে সবুজ আঁচলে।
খেয়াপার হ'য়ে যাওয়া যাত্রীর পায়ের চিহ্ন পড়িয়াছে পথের ধূলায়,
মাঝে মাঝে দেখা যায় দু'একটি অতি ছোট ভীরুক্রান্ত জড়িত চরণ;
মঞ্জীরের মৃদুরেশ চুলের ধূপের গন্ধ ধীরে ধীরে বাতাসে মিলায়;
আলোছায়া দুইজনে বসে আছে মুখোমুখী—স্নেহমুগ্ধ প্রণয়-গুঞ্জন।
ও-পারের নীলাকাশ ছুঁয়ে আছে এ-পারের কালিঢালা জীর্ণ শাড়ীখানি,
এ-পারের কালোজল চুমে আসে ও-পারের ভাঙ্গাচোরা পুরাতন পাড়;
গোধূলির ফসলেতে ও-পার ভরিয়া নেছে সঞ্চয়ের ডালা তা'র জানি;—
এ-পারের ম্লানমুখে গুণ্ঠন টানিয়া দেছে একখানি ঘনিষ্ঠ আঁধার।
স্রোতে স্রোতে ভেসে-আসা ও-পারের ফুল যদি স্মরণের রেণু ব'য়ে আনে,

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

(৬)

ছয়মাস পরে।

মাণিক একখানি সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে এক জায়গায় দেখিল লেখা রহিয়াছে,—

মাণিক বাবা, একবার ফিরিয়া এস। তোমা বিহনে তোমার মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শয্যা লইয়াছেন। পীড়া সাংঘাতিক। তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যদি একবার না এস ত সারাজীবন ধরিয়া অনুতাপ করিতে হইবে। যেখানে যে অবস্থায় আছ শীঘ্র চলিয়া আসিবে। ইতি—

মাণিকের মনটা মুহূর্ত্তে দুলিয়া উঠিল। মা আজ তাহার জনাই শয্যাশায়ী। মরণের প্রতীক্ষায় তাহারই আশাপথ চাহিয়া আছেন!

মনে পড়িল, একদা দাস-জীবনের অন্ধ তমোরাত্রি অপসারিত করিয়া যিনি প্রথম মুক্তির আলোক-ঊষায় তাহার চক্ষুদুটিতে জাগরণের রশ্মিপাত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার মা। যিনি ভালবাসা দিয়া তাহার লুপ্ত মনুষ্যত্বের জ্ঞানোন্মেষ করিয়াছেন, তাঁহার স্নেহের তুলনা পৃথিবীতে নাই। যে মনুষ্যত্ব আজ বৃহৎ সাগরে আসিয়া দুঃখ দুর্দ্দশায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—তাহা ত তাঁহারই দান। হইতে পারে সেই ভালবাসা মায়ার গণ্ডী ঘেরা, কিন্তু বিশাল মুক্ত পৃথিবীর স্পর্শ কামনা সেই মমতার রজ্জুতলেই প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

এক মা হইতে সে অন্য মাকে চিনিয়াছে।

তথাপি সে ফিরিবে কোন্ মুখে? মা' ত সকলের ঘরেই আছেন। স্নেহ ভালবাসাও সকলে ভোগ করিয়াছে—অপর্য্যাপ্ত। ঐশ্বর্য্যও কাহারও কাহারও এমন প্রচুর আছে যে, সুখতরঙ্গে গা ভাসাইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাম্যফল আহরণ করিয়া, অনাবিল অবিচ্ছিন্ন হাসির ধারায় সারা জীবনটাকে মগ্ন করিয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে। তবু তাহারা সব ত্যাগ করিয়াছে কেন? কেন দুর্য্যোগের মেঘ মাথায় বহিয়া সম্মুখের অন্ধকার দুর্ভেদ্য জানিয়া, হাসিমুখে দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া পথের সন্ধানে ছুটিয়া আসিয়াছে?

আসিয়াছে একটিমাত্র লক্ষ্যের সন্ধানে।

সে লক্ষ্যের মধ্যে মায়া-মমতা—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—আলো-অন্ধকার ও দুঃখ-কষ্টের একই মূল্য। সে লক্ষ্যের মধ্যে মানবীয় কোনপ্রকার দুর্ব্বলতার স্থান নাই।

জননী মৃত্যুশয্যায়। কোন্ অকরুণ মমতাকে এমনই দৃঢ় করে নিষ্পেষিত করিয়া এই সংবাদে অবিচল থাকিতে পারে? হউক গৃহের গণ্ডীর চেয়ে ইহার পরিধি সুদূর বিস্তৃত,—গৃহ-সুখের তুলনায় এই সুখের তুলনা করা হয়ত চলেই না, তথাপি অন্তরস্থিত মায়াময় মানুষটিই বার বার দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছে,—চল, ফিরিয়া চল। এই বিস্তীর্ণ ভারতের এক অতি ক্ষুদ্র গ্রামের সঙ্কীর্ণতম কক্ষে নির্ব্বাণোন্মুখ যে স্নেহ-দীপ জ্বলিতে জ্বলিতে স্তিমিতপ্রায় হইয়া আসিতেছে, তাঁহার আয়ুশিখাটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার ভার তোমার। যদি সে শিখা আর না-ই জ্বলে, তথাপি শেষ তৈলবিন্দু ঢালিতে কার্পণ্য করিলে—অকৃতজ্ঞতার পাপে আকণ্ঠ ডুবিয়া সারা জীবন ধরিয়া অনুতাপ করিতে হইবে।

যে উপহাস করে করুক, ফিরিতে তাহাকে হইবেই।

এক ১৬।১৭ বৎসরের কিশোর মাণিককে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিল, "মাণিক-দা, কি ভাবছেন?"

মাণিক মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "খবর কি মণ্টু?"

মণ্টু আনন্দে বলিতে লাগিল, "কাল যে আমাদের এখান থেকে তাঁবু তুলতে হবে। মণি-দা বলছিলেন, এখনও যাদের মনে ভয় আছে, তারা ফিরে যাক।"

মাণিকের মুখখানি মুহূর্ত্তে পাংশু হইয়া গেল।

নতমুখে সে বলিল, "মণ্টু, সকলের মনের জোর ত সমান নয়। ঘর থেকে জেদের বশে বেরিয়ে পড়া এক, এবং দিনে দিনে সেই পিছনের টানকে জয় ক'রে এগিয়ে চলা আর।"

মণ্টু হাসিয়া বলিল, "যারা ফেরে ফিরুক। আমাদের এ দলে অন্তত এমন কেউ দুর্ব্বল প্রাণ নেই, কি বলেন, মাণিক-দা?"

এই বালকের এত বড় সরল বিশ্বাসের প্রত্যুত্তরে কথা বলিতে গিয়া মাণিকের স্বর কাঁপিয়া গেল। মনে হইল, ভীরুতারই নামান্তর—এই মমতা। কিন্তু মা তাহার মৃত্যু-শয্যায়। এই অভিযানে যত গৌরবই নিহিত থাকুক, যদি জয়ের উল্লাসে কোন দিন সে গৃহের অঙ্গনে ফিরিয়া আসে, তবে তার সারা অন্তরে বৃশ্চিক জ্বালায় এই কথাই কি অনুক্ষণ পীড়া দিবে না,—ওরে অকৃতজ্ঞ এমনই করিয়া কি স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়? তোর বিয়োগ-বেদনায়ই না আজ একটি স্নেহ-মঙ্গলময় হৃদয়—এমনই অকালে শুকাইয়া গেল?

যত অগৌরব তাহার নামের চারিদিকে কলঙ্কের কুয়াসা রচনা করে করুক, অন্তর যেন কোনদিন অমনুষ্যত্বের অপমান জ্বালায় জর্জ্জরিত না হইয়া উঠে।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "মণ্টু, সবাই ত তোমার মত নির্ভীক নয়। —আমি বোধ হয় ফিরে যাব।"

ছেলেটি কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক্ হইয়া মাণিকের পানে চাহিয়া রহিল। পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনাকে যে না জানে মাণিক-দা, তাকে ও-কথা ব'লে বোঝাবেন। তারা ভয় খাবে।"

মাণিক তাহার হাত ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "সত্যি মণ্টু, আমার মত হতভাগা আর কেউ নেই। আমার মা মৃত্যু-শয্যায়—আমায় ফিরতেই হবে।"

ছেলেটি কাগজখানি পড়িয়া ম্লান ছল ছল নয়নে কহিল, "কিন্তু মাণিক-দা—"

মাণিক বলিল, "এর মধ্যে কিন্তু নেই ভাই, আমায় যেতেই হবে। মনে আছে মণ্টু, যখন এখানে আসি—তখন প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম, পিছনের কোন আকর্ষণেই পা টলবে না—

কাঁপবে না? কিন্তু দুর্ব্বল আমি, সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না।"

মন্টু অশ্রু ছল ছল দৃষ্টিতে কহিল, "না মাণিক-দা—তুমি ফিরে যাও। সবাই হয়ত তোমায় দোষ দেবে, তোমার কথা নিয়ে ঠাট্টা ক'রবে, কিন্তু আমি মনে মনে তোমায় প্রশংসা করব।"

মাণিক ম্লান হাসিয়া বলিল, "কেন মন্টু,—সবাই যা করবে তাইত ঠিক। তুমি কেন তা ক'রবে না?"

এইবার মন্টু আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহার নয়ন হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। বাষ্পাচ্ছন্নকণ্ঠে সে বলিল, "আমি যে ব্যথা পেয়েছি, মাণিক-দা। যখন ঘর ছাড়ি,—মা তখন বিছানায় পড়ে। প্রতিজ্ঞার কথা মনে হওয়ায়—হাসিমুখে তা অগ্রাহ্য ক'রে চলে এসেছিলাম। পাঁচ দিন পরে খবর এল—তিনি নেই। মাণিক-দা, তিনি আমায় পার্থিব বন্ধন থেকে এমনি অনায়াসে মুক্তি দিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু সে ব্যথা সারা জীবন ধরে বইতে হবে আমাকে। আমার কেবলই মনে হয়,—আমি ঘর না ছাড়লে তিনি হয়ত আরও কিছুদিন বাঁচতেন।"

মাণিক তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "চুপ কর ভাই—চুপ কর।"

তারপর দুইজনে মিলিয়া কাপ্তেন মণিভূষণের নিকটে গেল।

মাণিক তাহার সঙ্কল্প জানাইতেই মণিভূষণ সাশ্চর্য্যে বলিল, "তুমি ফিরে যাবে, মাণিক? —না, না,—দুদিন বাদে যে তোমায় কাপ্তেন হ'তে হবে এই দলের!"

মাণিক অস্ফুটস্বরে কহিল, "কি ক'রব—আমি দুর্ব্বল।"

মাথা নাড়িয়া মণিভূষণ বলিল, "এখন তোমার মনের অবস্থা খুবই খারাপ দেখছি। যাও,—যাও,—খেয়ালের বশে হঠাৎ কিছু ক'রে ব'স না।"

মাণিক স্থিরস্বরে বলিল, "খেয়াল নয়—আমি যাবই—।"

মণিভূষণ তীব্রদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল, "যাবেই? জান আমাদের পণ?"

মাণিক কাতরস্বরে বলিল, "কিছু মনে করবেন না—আমার যাওয়া চাই-ই।"

মণিভূষণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ছি! ছি! মেয়েমানুষেরও অধম তুমি তা জানতাম না!"

মাণিক কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মণিভূষণ মন্টুর পানে চাহিয়া বলিল, "এই বাঙলার লোক! আজও ঘরের টান কাটিয়ে উঠ্‌তে পারলে না! এদের নিয়ে এসব কাজে নামা মানে কাজটিকে পণ্ড করা।"

মন্টু কোন উত্তর দিল না।

একটা বড় জংশনে গাড়ী বদল করিয়া মাণিক ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীখানি ছোট, কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। মাণিক দুই তিন দ্বারে ঠেলা খাইয়া মধ্যম শ্রেণীতে আসিয়া উঠিল। কক্ষটি তৃতীয় শ্রেণীর মত আকণ্ঠ বোঝাই নহে, কষ্টে সৃষ্টে এতটুকু বসিবার স্থান মিলিল। কোনপ্রকারে বসিয়া সে পরিচিত কাহাকেও দেখিবার আশায় চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, এমন সময় তাহার পশ্চাতের বেঞ্চি হইতে কে বলিল, "মাণিকবাবু যে! কোত্থেকে আসছেন?"

মাণিক ফিরিয়া দেখিল,—রেণুর পিতা।

সে ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "আসছি অনেক দূর থেকে। আমাদের বাড়ীর খবর বলতে পারেন?"

তিনি বলিলেন, "খবর ভাল নয়। গিন্নি মা'র অসুখটা শক্তই হয়েছে—এ যাত্রা রক্ষা পান কি না সন্দেহ।"

মাণিক শুষ্কমুখে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে—তাঁর?"

তিনি বলিলেন, "ডাক্তারে এখনও ঠিক ধরতে পারেনি। হার্ট ডিজিজ, ভেবে ভেবে—এই রোগটি বাধিয়েছেন।"

মাণিকের মুখের উপর সপাং করিয়া কে যেন এক ঘা চাবুক কষাইয়া দিল। ওরে নির্ব্বোধ—ওরে মূর্খ—নারী হত্যাকারী,—এমনই করিয়া কি স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়?

নতমুখে সে বসিয়া রহিল,—আর কোন প্রশ্ন করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না।

রেণুর পিতা বলিলেন, "মুখখানা বড় শুকনা দেখছি। শরীর ভাল নেই বুঝি? তারপর, ও-দিকের খবর কি?"

মাণিক সংক্ষেপে সমস্ত বলিল।

রেণুর পিতা বলিলেন, "হাঁ, ভাল কথা। সুরেন সেদিন আমার কাছে এসেছিল তোমার ঠিকানা জানতে। রেণু নাকি তাকে ব'লে দিয়েছিল খবর জানবার জন্যে।"

মাণিক বলিল, "রেণু ভাল আছে? খুড়ীমা—মা—সব ভাল আছেন?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ—সবাই ভাল আছে। আর কেনই বা না থাকবে? মাকে যে গিন্নিমা নিজের চরণের ছায়ায় রেখেছেন, ঘরের লক্ষ্মী ক'রেছেন। আহা বাবা! তোমার ওপর আমাদের বড় আশা ছিল!" বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন

মাণিক তাঁহার কথার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিল না। বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। ভাবিল, আপনার খেয়ালে বৃদ্ধ কি সব বকিয়া যাইতেছেন!

এ-সব বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর তাহার ছিল না। মহামায়ার রোগ-পাণ্ডুর মুখখানি কল্পনা করিয়া মন তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

গাড়ী আসিয়া পরিচিত ষ্টেশনে থামিল। মাণিক কম্পিত চরণে গেটের বাহিরে আসিল। ষ্টেশনের বাহিরে মাঠের বুক চিরিয়া সরু পথটি পূর্ব্বের মতই বক্রগতিতে গ্রাম-প্রান্তের বন-রেখায় গিয়া মিশিয়াছে। পোয়া মাইল পথ—ধু-ধু মাঠ। বৎসরান্তে একবার মাত্র এই আউশ ধানের জমিগুলি আবাদ হয়। সেই কয় মাসই যা একটু শ্যামলিমা ইহার সারা অঙ্গে শোভা বিস্তার করে; বাকী মাস—নীরস মরুভূমির মতই শূন্য প্রান্তর রুক্ষতায় খাঁ খাঁ করিতে থাকে। মাঠের শেষে ঘন তরুশ্রেণীর সবুজ প্রাচীর। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়—উহার শাখা-পল্লবের অন্তরালে অতি সন্তর্পণে সে গোপন করিয়া রাখিয়াছে সেই অমূল্য পল্লী-শ্রী সম্পদ—গ্রামের মানুষ, গৃহ কুটীর, ক্ষেত বাগিচা ও সরল সহজ সুন্দর জীবনের শান্ত

ধারাটুকু; দূর হইতে হয়ত এমনই মনে হয়। ধানে ভরা মাঠকে মনে হয় সবুজ গালিচা বিছান' সুখাসন, নদীর তরঙ্গকে রজত-রেখা এবং পর্ব্বত-চূড়ার হিমানীমণ্ডিত সৌন্দর্য্যকে স্বর্গের সুষমা। কিন্তু নয়নের দৃষ্টি যখন অন্তরের দৃষ্টির সঙ্গে শুভ-সাক্ষাৎ করে না তখনই গালিচার নীচের কঠিন মাটির ডেলা আত্মপ্রকাশ করে,—জলের তরঙ্গ প্রাণে ভয় জাগাইয়া তুলে এবং হিমগিরির তুষার-শ্রী গলিয়া মিলাইয়া যায়।

ঐ বন-প্রান্তের মাথায় চৌধুরীদের উন্নতশীর্ষ মন্দিরচূড়া দেখা যাইতেছে। তার পাশে কয়েকটা তালগাছের মাথা চক্রাকারে রহিয়া তাহাদের খিড়কীর পুকুরের কথা মনে করাইয়া দিতেছে। জেলেপাড়া হইতে অস্পষ্ট কলরবও ভাসিয়া আসিতেছে যেন।

যাইবার কালে যেমনটি দেখিয়াছিল ঠিক তেমনিই আছে। কেবল মনের তারে উল্লাসের সেই সুমধুর সুর তেমন করিয়া বাজিতেছে না।

বাহিরের ঘরে সুরেনবাবু পূর্ব্বের মতই সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। মাণিক অপরাধীর মত কুণ্ঠিত চরণে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

তিনি মাণিকের হাত দুখানি ধরিয়া কিছুমাত্র বিস্ময়ের ভাব না দেখাইয়া বলিলেন, "এস, ভাল ত?"

মাণিকের চক্ষু শুষ্ক ছিল না। কোন মতে ঘাড় নাড়িয়া কথার উত্তর দিয়া সে ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন করিল, "মা কেমন আছেন?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আজ একটু ভাল। মায়ের মন কিনা, তুমি যে আসবে তা সে যেন মনে মনে জানতে পেরেছে। এস, দেখবে এস।"

মহামায়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিলেন। মাণিক ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া ডাকিল, "মা।"

আরক্ত চক্ষু মেলিয়া মহামায়া মাণিককে দেখিলেন। অসহ্য আনন্দ আবেগে তাঁহার দুটি চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দুখানি ব্যাকুল শীর্ণ বাহু বাড়াইয়া তাহাকে আপনার উত্তপ্ত বুকের উপর টানিয়া লইয়া বাষ্প-গদ-গদ কণ্ঠে বলিলেন, "মাণিক, বাবা আমার।"

দুজনের নয়ন হইতে অবিরল ধারে জলধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কেহ কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

(৭)

কথাটা মুহূর্ত্তমধ্যে বাড়ীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল।

ক্ষান্তকালী দ্রুতপদে আসিয়া রোগীর কক্ষদ্বারে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মা ও ছেলে পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নীরবে পড়িয়া আছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

মহামায়াকে ডাকিতে তাঁহার সাহস হইল না, ফিরিয়া গেলেন।

মদনকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাণুকে যে ফিরে এল রে!"

মদন তাচ্ছিল্যভরে কহিল, "এলই বা! সে গুড়ে বালি।"

ক্ষান্তকালী ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, "উইল বদলাতে কতক্ষণ? শুনেছি নাকি উইল বদলাবে।"

মদনের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু সে দমিল না। সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "এ ত' আর আমার নামে বিষয় নয় যে বদলাবে?"

ক্ষান্তকালী কহিলেন, "তা হোক তক্কে তক্কে থাকিস। কদিন থেকে বলছি, একটু কাছে কাছে থাক, এটা খাও ওটা খাও ব'লে ন্যাওটাপনা দেখা, হ'ল বা একটু পাখাখানা ধরলি, তা নয়, কেবল উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিস! এখন যদি ফসকায় ত' তোর দোষেই যাবে, হতভাগা।"

মদন মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, "হ্যাঁ—যাবে! গেলেই হ'ল আর কি? আমার ও-সব আত্মতাই ভাল লাগে না। রোগীর ঘরে গিয়ে মুখে মুখে 'মা' 'মা' ক'রে প'ড়ে থাকা—মরে গেলেও আমা দ্বারা হবে না। আমার বাবা ফূর্ত্তির প্রাণ গড়ের মাঠ।"

ক্ষান্তকালী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, রেণুকে এদিকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিলেন।

ক্ষান্তকালীকে দেখিয়া রেণু দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হইল না।

ক্ষান্তকালী তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "এস, মা এস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?" বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মদন রেণুকে ডাকিয়া বলিল, "একবার ওঘরে গিয়ে দেখে এস ত মাণিক কি করছে?"

রেণু মাণিকের আগমন সংবাদ পায় নাই। বিস্মিত হইয়া মদনের পানে চাহিল।

মদন বলিল, "হাঁ ক'রে চেয়ে কি দেখছ? মাণিক যে এইমাত্র ফিরে এসেছে—শোন নি?"

রেণু মাথা নাড়িয়া জানাইল,—সে শোনে নাই।

মদন তাড়াতাড়ি কহিল, "বেশ, শুনলে ত? যাও—দেখগে। এক ফিস্‌ফিসিনি লাগিয়ে আবার উইল না ব'দলে দেয়? ওটার যে নাকে কান্না!"

রেণু পূর্ণদৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, "ছি! ও কথা ব'ল না। মাণিক-দা তেমন নয়।"

মদনের ক্রোধ হইল। স্ত্রীর প্রখর দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ কন্ঠে বলিল, "না, তেমন হবেন কেন? তাই—না চাল, না চুলা, পথে কুড়ান ছেলে উড়ে এসে জুড়ে ব'সেছিলেন জমিদার বাড়ী! কিসের লোভে শুনি?"

রেণুর ইচ্ছা হইল বলে, আপনার সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়া অন্যের পানে চাহিয়া বিচার করিও না। পৃথিবীতে টাকা-কড়ির অপেক্ষা মূল্যবান সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ কথা লইয়া বাদানুবাদ করিয়া কোন ফল নাই। অনর্থক একটা অপ্রীতিকর কলহের সৃষ্টি হইবে মাত্র।

মনের ভাব চাপিয়া সে ধীরস্বরে বলিল, "মা আপনার ছেলের মতই ক'রে মাণিক-দাকে বুকে তুলে এনেছিলেন, মাণিক-দাও তাঁহাকে আপনার মায়ের মতই ভালবাসেন।"

চক্ষু মিট মিট করিয়া বক্র চাপা হাসি হাসিয়া মদন বলিল, "তার মানেটা বোঝ? কচু! মাণুকে জানে ওর ছেলে পুলে কেউ নেই, আদর সোহাগ দেখালে একদিন না একদিন এত বড়

বিষয়টা হাতে পেয়ে যাবে, তাই। নৈলে ব'য়ে গেছে ওর খোসামোদ করতে! ছোট্ট একটা ছেলে আপন পর চেনে, আর ও চেনে না? ন্যাকা আর কি!"

এ কথার উত্তর দিতে হইলে—অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করিতে হয়। রেণু সে পথ দিয়া গেল না। তেমনই মৃদুকণ্ঠে কহিল, "যাই হোক, মা তবু শেষ সময়ে একটু শান্তি পাবেন।"

মদন উত্তর না দিয়া তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক হাসি হাসিল। পরে পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া কহিল, "এই বেলা যাও, নৈলে ভোগা দিয়ে সব হাতিয়ে নেবে। একবার উইলে আঁচড় কাটলে, মা ছেলের সম্বন্ধ সারা জীবন ধরে বুঝলে, কান্না ছাড়া কোন ফল হবে না।"

বার বার এই অভদ্র ইঙ্গিত! রেণুর মুখ উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কি বিষয়ের লোভে মহামায়ার মন যোগাইয়া চলিতেছে? না-ই বা হইল তাহার টাকাকড়ি জমি-জমা? সে সব ত' তাহার কোন কালে ছিল না। আর ন্যায়ত ধর্ম্মত এ বিষয় মাণিকেরই প্রাপ্য। দারুণ অভিমান ও জিদের বশেই না মহামায়া রেণুকে সমস্ত সম্পত্তি লেখাপড়া করিয়া দিয়াছেন? রেণু ত ভুলিতে পারে না, কাহার সম্পত্তি কে অন্যায় করিয়া ভোগ করিতেছে! তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। যদি মহামায়া পূর্ব্ব স্নেহবশে সে সম্পত্তি তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করেন—তাহাতে রেণুর এতটুকু ক্ষোভ বা দুঃখ নাই। রেণুর মন এমন নীচ নহে যে, সম্পত্তির লোভে মহামায়ার স্নেহদ্বার আগলাইয়া সতর্ক প্রহরীর মত বসিয়া রহিবে!

মনটা তাহার নিমেষে কঠিন হইয়া উঠিল। কহিল, "আমি এখন সেখানে যাব না।"

"—কেন?"

"মাণিক-দা র'য়েছেন, তুমি বল্লে।"

কর্কশকণ্ঠে মদন বলিল, "মাণিক ত তোমার ভাসুর নয়, আর এমন নয় যে তার সঙ্গে তুমি কথা কও না। ওঃ, বুঝেছি, বুঝেছি, মাণিক বিষয় পেলে তোমার আহ্লাদ হয়—তাই তুমি যাবে না।"

রেণু ধীরস্বরে বলিল, "যদি আহ্লাদ হয়, সে কিছু অন্যায় নয়। বিষয় ত তাঁরই প্রাপ্য।"

মদনের আর হিতাহিত জ্ঞান রহিল না। ক্রোধে চীৎকার করিয়া কহিল, "এ সব ঢং আমি ঢের বুঝতে পারি গো—ঢের বুঝতে পারি। বলে জন্ম গেল ছেলে খেতে আজকে বলে ডান!"

রেণু মনে মনে উষ্ণ হইয়া বলিল, "কি বুঝেছ?"

মদন উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "ওর সব নাটুকেপনা কা'রও বুঝতে বাকী থাকে না। মাণিকের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হ'য়েছিল—তাই এত দরদ! আমি মাঝখান থেকে এসে সে সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছি কিনা—!"

এই অভদ্র উক্তিতে রেণুরও ধৈর্য্য রহিল না। সে তীব্র-স্বরে কহিল, "যার যেমন মন সে তেমন বুঝবে বৈ কি? কিন্তু এটাও জেন'—আর মুখের পানে চেয়ে একটা কথা বলবার সাহসও তোমার নেই—তাকে আড়ালে নিন্দে ক'রলেই খাটো করা যায় না।" বলিয়া আর সেখানে দাঁড়াইল না।

মূর্খের মত জবাব পাইয়া মদন প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পরে রেণুর গমন-পথের পানে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "দেখা যাবে কা'র তেজ কত দিন। আমারও নাম মদন শর্ম্মা। তোমার ও তেজ যদি না ভাঙ্গতে পারি ত—"

* * * *

দুজনে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল।

মাণিক বাহিরে আসিতেছিল—কি একটা প্রয়োজনে। মৃদুস্বরে বলিল, "ভাল আছ মাণিক-দা?"

মাণিক অবাক্ হইয়া রেণুর বধূবেশের পানে চাহিয়া কোন উত্তরই দিতে পারিল না।

রেণু ম্লান হাসিয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে আমার নতুন সম্পর্ক হ'য়েছে যদিও—তবু তোমায় আমি দাদা ব'লেই ডাকব।"

মাণিকের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। শুষ্কস্বরে কহিল, "কি সম্পর্ক?"

রেণু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "তুমি সম্পর্কে আমার—" বলিতে বলিতে সে সহসা থামিয়া গিয়া প্রশ্ন করিল, "মা কেমন আছেন?"

"ঘুমুচ্ছেন।" বলিয়া মাণিক অগ্রসর হইল।

রেণু একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "একটা কথা।"

মাণিক ফিরিয়া দাঁড়াইল।

যে কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল রেণু বোধ হয় তাহা বলিতে পারিল না। তথাপি সহজ স্বরে সে কহিল, "সমস্ত দিন উপোস ক'রে এসেছ, জল খাবে চল।"

মাণিকের সারা চিত্ত দুলিয়া উঠিল।

মনে পড়িল সেই একদিন চা খাওয়ার কথায় রেণুর অভিমান! কেমন ক্ষুদ্র অথচ মিষ্ট সেই অভিমানটুকু! মনে পড়িল, একদা ইহাকে ঘেরিয়া হাসি তামাসার আলাপ আলো-চনায় কিসের যেন এতটুকু প্রত্যাশা নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল। সে প্রত্যাশার বর্ণ ছিল না, গন্ধ ছিল না। অবসর যাপনোপ-যোগী আশাই হয়ত ছিল। কিন্তু আজ মনে হইতেছে, এই যে স্নিগ্ধ দরদভরা অনুরোধ—ইহা বর্ণে গন্ধে অনুপম। কে জানে—ইহা নারীর নিজস্ব সম্পত্তি কি না?

রেণু আজ নূতন সম্পর্কের বিচিত্র বন্ধন লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, রেণু আজ এই গৃহের গৃহলক্ষ্মী। অভুক্তকে আহার পানীয়ে পরিতৃপ্ত দেওয়াই তাহার ধর্ম্ম। তাই মিনতি করিতেছে—অভুক্ত তুমি, কিছু গ্রহণ করিবে চল।

তবু মাণিকের মনে হইল, কর্ত্তব্যের উপরেও এই অনু-রোধে এমন কিছু মাখান আছে, যাহা পূর্ব্বের নিঃসম্পর্কের ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকুই জাগাইয়া দেয়।

আরক্তমুখে সে কহিল, "স্নানটা সেরে আসি।" বলিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

মহামায়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। রেণুকে তিনি হেসে হেসে ডাকিলেন।

সে নিকটে আসিলে ক্রন্দনস্বরে বলিলেন, "মাণিক ফিরে এসেছে রেণু। ভেবেছিলাম তার জায়গা এখানে নেই, কিন্তু মা, চিতায় না উঠলে তাকে এই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার ক্ষমতা আমার নেই।" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রেণু নতমুখে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

মহামায়া তাহার একখানি হাত টানিয়া বুকের উপর রাখিয়া অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "এখানটা যে আজ বড় জ্বলে যাচ্ছে, মা। বাইরের সম্পদ দিয়ে তোর ওপর যে অবিচার করেছি তার জ্বালাই যে আমায় সর্ব্বক্ষণ পুড়িয়ে মারছে। উঃ!"

রেণুর দু'চোখ বহিয়া ধারা নামিল। কহিল, "কেন মা আপনি কাঁদছেন? আপনার স্নেহে আমার কোন দুঃখ নেই। শুধু আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার মান সম্ভ্রম বজায় রাখতে পারি।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মহামায়া বলিলেন, "তা তুই পারবি—পারবি মা। আমি ভুল বুঝে তোকে এখানে আনি নি।"

রেণু বলিল, "আমার একটা কথা আছে মা। মাণিক-দা যখন ফিরেছেন—"

মহামায়া বাধা দিয়া বলিলেন, "তা হয় না রেণু, আমি যে মিথ্যাবাদী হব।"

রেণু তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, "না না, মা আপনি মিথ্যাবাদী হবেন না—আমি বলছি।"

মহামায়া তাহার মাথার মধ্যে শীর্ণ অঙ্গুলি চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "পাগলী মা, তোর মতে কি জগতটা এত সোজা রে!......মরবার সময় ও কথা আর তুলিস নে। আমায় শান্তিতে মরতে দে।"

রেণু কাঁদিতে লাগিল।

মহামায়া বলিলেন, "আমি বলছি এতে তোর কোন অপরাধ নেই। চুপ কর্। ছি! আবার কাঁদে! আচ্ছা মা এদিকে আয় একটু সরে আয় ত। আমার কাছে লুকোস নি—সত্যি বলবি—তুই কি যথার্থই সুখী হয়েছিস মা?"

রেণু তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "হয়েছি বৈ কি মা।"

মহামায়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রেণুর মাথায় হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি এই সুখ তোর অটুট হোক—অক্ষয় হোক। কোন কিছুর প্রলোভন যেন তোর জীবনে ছায়া ফেলতে না পারে।"

* * * *

কিছুতেই কিছু হইল না। বড় বড় ডাক্তারের প্রাণপণ চিকিৎসা, রেণুর সেবা, মাণিকের স্নেহ ভালবাসা—কিছুতেই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না।

একদিন প্রভাতে স্বামীর পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া—মাণিক রেণুকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া মহামায়া লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। বাড়ীময় ক্রন্দনের রোল উঠিল। (ক্রমশ)

শূন্য-মন্দিরে

(৪৯৪ পৃষ্ঠার পর)

পারলাম না। চারিদিকে ললিতের চিহ্ন পরিস্ফুট, বাইরে বেরিয়ে গেলাম, গভীর রাত্রে তবে বাড়ী ঢুকলাম।

এতক্ষণ পরে সত্যপ্রসাদ থামলেন। ঘরের বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছে, একসঙ্গে সকলের মনে জাগছে, একটি অল্প-বয়স্ক সুশ্রী যুবক—তার অপরিতৃপ্ত জীবন, আশা আকাঙ্ক্ষার অবসান, দুঃখ নিষ্ফলতায় পরিপূর্ণ হয়ে স্ত্রী সন্তান ফেলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে যাওয়া। টাকার অভাবে চিকিৎসা হয়নি, সাধের কবিতার বই ছাপা হয়নি; সুকুমার ভাবলে, এই টাকা নিয়ে সে একরকম ছিনিমিনি খেলেছে, বন্ধুদের পার্টি দেওয়া, সিনেমা যাওয়া, ছুটিতে ছুটিতে বিদেশ ভ্রমণ, নানারকম পোষাক, এক-কথায় টাকার চরম অপব্যয়, আর তাদেরই একজন সামান্য টাকার অভাবে দুশ্চিন্তায় ঝরে গেল। কেন এমন হয়?

সত্যপ্রসাদ আবার ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন, 'ললিত মারা যাবার পর আর সরযূর সঙ্গে দেখা করিনি। হয়ত এখন অন্য বেশে সজ্জিত হয়েছে, মুখে নেই অম্লান হাসি, সেই জন্যে আর যাইনি।

আজ দুপুরবেলা খাওয়ার পর বসে আছি, সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম, আমার তেতলার ঘরে ললিত ছাড়া বড় কেউ আসে না। ঘরে ঢুকল যে মেয়েটি, তাকে যদি কোনকালে না চিনতাম তা'হলে ভাল হত। সরযূ আমাকে প্রণাম করে আমার কাছে দাঁড়াল। কি কথা বলব, আমার মনে হ'ল আমি নিজেই হয়ত আত্মসংবরণ করতে পারব না। সরযূই প্রথমে কথা বললে, নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, ওর এক দাদা পশ্চিমে চাকরী পেয়ে যাচ্ছেন। স্ত্রীর শরীর তত ভাল নয় তাই সরযূকেও নিয়ে যাচ্ছেন। সরযূর নিজের সংসার নেই যখন, তখন অন্যের সংসারে সাহায্য করতে হবে বৈকি। সরযূ বললে, আমি যেন তাকে ভুলে না যাই, মাঝে মাঝে যেন মনে করে চিঠি দিই।

মনে মনে বললাম, আমি ত প্রতিনিয়ত তোমাদের ভুলতে চাচ্ছি, তোমরা দিচ্ছ কই? দীর্ঘ সময়ের সুযোগ নিয়ে, গল্পে হাস্যে উচ্ছ্বসিত আনন্দে আদরে যত্নে তোমরা যে আমার মনের মধ্যে চারিদিক জুড়ে শেকড় গেড়েছ, সেখান থেকে তোমাদের নির্ম্মূল করি—সাধ্য কি?

সরযূ আবার প্রণাম করে ধীরে ধীরে চলে গেল, সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে একবার আমার দিকে তাকাল, দুই চোখে অশ্রু টলটল করছে। ওর স্বামীর সংসারে আমাকেই সব চেয়ে আপনার বলে জেনেছিল, তাই বোধ হয়, আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে কষ্ট হয়েছিল, পুরান দিনের কথা তীব্রভাবে মনে পড়েছিল, হয়ত সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় চোখে সব ঝাপসা দেখেছিল। সরযূ চলে গেলে মনটা কি রকম হয়ে গেল, বাড়ীতে মুহূর্ত্তও থাকতে পারলাম না তোমাদের এখানে চলে এলাম।

সত্যপ্রসাদ চুপ করলেন। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, সদ্য মেঘমুক্ত তৃতীয়া শুক্লরাতের চাঁদের মৃদু জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত।

সমাধান

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন

(৬)

সান্ধ্যভ্রমণান্তে ভূপেন আপন প্রকোষ্ঠে আসিয়া নিকটবর্ত্তী অপর কক্ষে ভগ্নীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ডাকিলেন,—"কনক! একটু চা দিবি রে?"

"কে? দাদা এলে? আজ ভীষণ ঝগড়া হবে তোমার সঙ্গে —হ্যাঁ" বলিতে বলিতেই কনক ছুটিয়া আসিল। "কি আশ্চর্য্য লোক তুমি দাদা! এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা!—এমন একটা অদ্ভুত গল্প!—কিছু বলনি তুমি? পিক্‌নিক্ খেয়েছিলে তোমরা সেদিন,—না? আসছেন মা এক্ষুণি,—দেখে নিও মজাটা।" বলিয়াই হাঁকিল,—"মা,—ও মা!"

—"আঃ, জ্বালাতন করে তুললি যে বাপু! কি হয়েছে শুনি?"

—"কি আর হবে? সাপে কাটা বাবুকে বেহুলা বাঁচিয়ে তুললে, ভেলা না ভাসিয়ে! আর কি হবে কচু!"

ব্রহ্মময়ী দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতা-ভগ্নীর স্নেহের কলহ দেখিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"ভূপেন! আমরা সেই মেয়েটিকে কাল দেখতে যাব স্থির করেছি। বিজয় যাবে, আর তার বোন প্রফুল্ল যাবে। তার মা যেতে পারবেন না, কাল তাঁর উপোস; নইলে তাঁকেও বলেছিলাম। আর এদিকে আমি যাব, কনক যাবে, তুই যাবি, আর একটা চাকরও যাবে। ড্রাইভারকে গাড়ী ঠিক ক'রে রাখতে বলেছি। তবু তুই নিজে একবার দেখেশুনে রাখিস। ভোরেই চা খেয়ে বেরুব।"

উভয় বাহুর দ্বারা মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া একান্ত আব্দারের সহিত কনক বলিল,—"আর আমার সেই কথাটা বলছ না যে? সে কিন্তু হতেই হবে। দাদাদের ফাঁকি দেওয়া পিক্‌নিকের জায়গায় আমাদের একটা সত্যিকার পিক্‌নিক্ করতেই হবে।"

—"সে-টার কি সুবিধে হবে মা? কোথায় কার বাড়ীতে ব'সে রান্না,—খাওয়া; সে সব শিকারী ছেলেদেরই সাজে। বরং বেশী ক'রে খাবার-টাবার নিয়ে যেও,—গল্পে-গল্পে একটু বেলা হলেও কষ্ট হবে না।"

—"না মা, আমি তা কিছুতেই শুনব না। বিজয়দা'র মুখে আমি সব শুনেছি। বিজয়দা' বল্লেন, তাদের ঘর-বাড়ী অনেক ভদ্রলোকের বাড়ীর চেয়েও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আর সেই মেয়েটির তারিফ ত বিজয়দা'র মুখে ধরেই না। শুনে অবধি এমন ইচ্ছে হচ্ছে তাকে দেখবার জন্য! হ্যাঁ দাদা, তুমিই বলনা, সেখানে রান্না ক'রে খাওয়া চলে না কি?"

দুলালীর সেই নারায়ণ-সেবার পবিত্র ছবিখনা ভূপেনের চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। হাসি তামাসার স্থলে গভীর শ্রদ্ধা আসিয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। তিনি বলিলেন,—"কি বলব কনক! অনেক জায়গায় বেড়িয়েছি,—মায়ের আশীর্ব্বাদে অনেক তীর্থস্থানও দেখেছি, কিন্তু আমার মনে হয়, এমন একটা শুচি-শুভ্র পবিত্রতা আমি এ পর্য্যন্ত আর কোথায়ও দেখিনি। সেখানে গিয়ে যদি কেউ স্বহস্তে রান্না [illegible] তাদের মহিমা একটুও ম্লান হবে না, কিন্তু যে কুণ্ঠাবোধ করবে দেবতার দিকে সে নিশ্চয়ই পিছন ফিরে থাকবে।"

কনক আনন্দিত হইল। "দাঁড়াও দাদা, তোমার চা আনি, আর অমনি বিজয়দা'কেও ডেকে পাঠাই", বলিয়া সে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া গেল।

ব্রহ্মময়ী নিকটে আসিয়া পুত্রের মস্তকে হাত বুলাইয়া স্নেহ-গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—"ভগবান তোকে সেদিন বড়ই রক্ষা করেছেন ভূপেন! আজ বিজয়দের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে যা সব শুনে এলাম তাতে তোর মায়ের প্রাণে যে কি ভীষণ ঝড়-তুফান বইছে, তা' তুই আন্দাজও করতে পারবি নে। আর আমি তোকে ও-রকম বনে-জঙ্গলে শিকারে যেতে দেব না।"

প্রশান্ত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিয়া ভূপেন কহিলেন,—"তোমার আশীর্ব্বাদ থাকতে তোমার ছেলের কিছুই হবে না মা! তোমারই আশীর্ব্বাদ সেদিন সেই কৃষক-কন্যার বেশে তোমার ছেলেকে রক্ষা করেছিল। নইলে, আমি ত ম'রেই গিয়েছিলাম। কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, আমার মায়ের আশীর্ব্বাদ মূর্ত্তিমতী হয়ে সেদিন আমাকে রক্ষা করেছে।" বলিয়া মায়ের দিকে শ্রদ্ধাসিক্ত চোখে চাহিয়া রহিল সে অপলকে—সে আকুতিভরা দৃষ্টি মায়ের চোখেও স্নেহবিন্দুর সৃষ্টি করিল।

রাত্রে কনকের ভাল ঘুম হইল না;—ভয়, পাছে উঠিতে অধিক বেলা হইয়া পড়ে। ভগ্ননিদ্রার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার ঘড়ি দেখিয়া, ভোর চারিটার সময় সে উঠিয়া পড়িল, এবং মা'কে ডাকিয়া দাদার ঘুম ভাঙ্গাইয়া বিষম হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়া দিল। বিজয় প্রফুল্লকেও সে ডাকিয়া পাঠাইল। ভূপেন ঘড়ি দেখিলেন এবং অত্যধিক অস্থিরতার জন্য কনককে একটা ধমক দিয়া আরও ঘণ্টাখানেক গড়াইয়া লইলেন।

বিজয় ও প্রফুল্ল আসিলে এবং দাদা গাত্রোত্থান করিলে, কনক আর এক দফা তাড়াহুড়া দিয়া চা প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেল।

একখানি টুরিং-কারে কতটুকুই-বা স্থান! ব্রহ্মময়ীর বেশ একটু স্থূল দেহ, এবং কনকও যে বয়সকালে মায়ের নাম রাখিতে পারিবে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় এখন হইতেই সে দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তথাপি, পিছনের সিটে বিজয় ও প্রফুল্ল এবং তাঁহারা দুইজন সম্মুখে এক রাজ্য লটবহর লইয়া কোনপ্রকারে আসন গ্রহণ করিলেন। সম্মুখের সিটে ড্রাইভার মধু ও চাকর ভজুয়াকে লইয়া ভূপেন বসিলেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী রওয়ানা হইল।

শহরের বাহিরে, শালবনের মধ্য দিয়া, ঢেউয়ের মতন উঁচু-নীচু সুন্দর পাকা রাস্তাটি। স্বচ্ছন্দ গতিতে গাড়ী চলিতে লাগিল, আর ততোধিক স্বচ্ছন্দগতিতে কনক ও প্রফুল্লের হাস্য-কৌতুক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

গাড়ী রাখিয়া সকলে যখন দুলালীদের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলেন তখন বাড়ীতে কেহই নাই। ভূপেন কয়েক-

বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়াও দুলালীর বা সুখনের সাড়া পাইলেন না। কৌতূহলবশে কয়েকটি বালক-বালিকা আসিয়া পড়িল। তাহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, গ্রামের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে দুলালী কোনও একটা বিলে মাছ ধরিতে গিয়াছে,—ফিরিতে অনেক বেলা হইবে; আর সুখন ও তার বাবা কিছু দূরে তাদের ক্ষেতে কাজ করিতে গিয়াছে,—ফিরিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইবে।

সকলে বড় বিমর্ষ হইলেন। অভিমানে কনকের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। কনক বলিল,—"আমি তখনই জানি, আমাদের ভয়ানক দেরী হয়ে যাচ্ছে।—দাদার ঘুমই ভাঙ্গে না!"

বিজয় বলিলেন,—"আচ্ছা, তোমরা একটু বিশ্রাম কর; আমি এখুনি একটা বিহিত করছি।" তারপর সমাগত বালকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়টিকে ধরিয়া কহিলেন,—"ওহে ছোকরা, সুখনদের ক্ষেতটা আমায় একবার দেখিয়ে দিতে পার?" বিনা বাক্যব্যয়ে ছেলেটি তাহাকে লইয়া চলিল।

শহরের সেই বাবুরা মেয়েদের লইয়া তাহাদের কুটিরে বেড়াইতে আসিয়াছেন শুনিয়া শিবু তৎক্ষণাৎ দুলালীর অনু-সন্ধানে সুখনকে দ্রুত পাঠাইয়া দিল এবং বিনীতভাবে বিজয়কে কহিল,—"গরু নিয়ে যেতে আমার একটু দেরি হ'য়ে পড়বে বাবু! আপনি এগিয়ে যান,—মা'দের একটু বসতে বলুন গিয়ে,—আমি আস্‌ছি।"

বিজয় তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন।

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধঘণ্টাকাল মধ্যে কয়েকটি মৎস্য ও এক-খানি 'পলো' লইয়া ঘর্ম্মাক্ত দেহে সুখন ছুটিয়া আসিল, এবং দুইখানা কাপড় ও গামছা লইয়া বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, দুইখানি ময়লা ভিজা কাপড় হস্তে সদ্যস্নাতা দুলালী আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল।

কাপড় দুইখানি বেড়ার গায়ে রাখিয়া দুলালী শান্ত, নম্র, লঘুপদে আসিয়া গলায় বস্ত্রাঞ্চল জড়াইয়া ব্রহ্মময়ীর পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তারপর কৌতুকময়ী কনককে সম্মুখে পাইয়া তাহাকেও প্রণাম করিতে উদ্যত হইল। কনক খপ্ করিয়া তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—"ও কি ভাই! আমি বড়, না তুমি বড়? আমায় আবার কেউ প্রণাম করে নাকি!" বলিয়াই খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রফুল্ল স-রবে এবং বিজয় ও ভূপেন নীরবে সেই হাসিতে যোগ-দান করিল। দুলালীও হাসিয়া ফেলিল।

দুলালী তাড়াতাড়ি সুখনকে লইয়া ঘর হইতে দুইখানা 'চারপয়' বাহির করিল এবং চাটাই কম্বল ও কাপড় বিছাইয়া সকলের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। একখানি ছোট্ট পিঁড়ি পাইয়া ব্রহ্মময়ী খুঁটি হেলান দিয়া পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিলেন। তিনি আর উঠিলেন না; বলিলেন,—"থাক মা! এই বেশ আছি। ছেলেরা বসুক। তুমি এস মা, আমার কাছে বস।"

দুলালী তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া পড়িল; এবং তিনি মায়ের আদরে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই। একই নীরব আনন্দানুভূতি উভয়েই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন।

একটু পরে কনক বলিয়া উঠিল,—"হ্যাঁ এমনি বোবার মত

চুপ ক'রে বসে থাকতেই এসেছি কিনা আজ! আয় ত প্রফুল্ল, এস ত ভাই দুলালী, আমরা একটু ঘুরে-টুরে দেখি।" বলিয়া এক হস্তে প্রফুল্লকে অপর হস্তে দুলালীকে আকর্ষণ করিয়া উঠানে নামিয়া পড়িল।

—"এই বন-জঙ্গলের মধ্যে কি আর দেখ্‌বে ভাই? তা' ছাড়া, ওঁকে একলা রেখে—" বলিয়া দুলালী মৃদু আপত্তি প্রকাশ করিল।

ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"আচ্ছা, এস তোমরা একটু বেড়িয়ে;—আমি ততক্ষণে আরও খানিকটা বিশ্রাম করি। কিন্তু খুব সাবধানে যেও;—বেশী দূরে যেও না; আর সাপ-টাপ দেখে চ'ল।"

মেয়েরা ততক্ষণে কদলী বৃক্ষশ্রেণীর বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। চলিতে চলিতে কনক উত্তর দিল,—"সাপের ভয় নেই মা! সাপের রোজাকেই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।" তিনজনের একটা খুব কলহাস্য শুনা গেল।

গ্রামের মধ্যে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া, ফিরিবার পথে দুলালীর হাতে একটি সুমিষ্ট চাপ দিয়া কনক বলিল,—"বড্ড রাগ হচ্ছিল ভাই তোমার উপর। কি ব'লে তুমি আমায় গড় ক'রতে যাচ্ছিলে বল ত?—আচ্ছা, বল ত তোমার বয়েস কত?"

—"এই ভাদ্র মাসে আমি পনেরয় পা' দিয়েছি।"

—"আর আমার হ'ল-গে এই আশ্বিন মাসে বার পূর্ণ হবে। এখন বল ত কে কার বড়? তোমায় শোধ দিচ্ছি দাঁড়াও।" বলিয়াই দুষ্টু চঞ্চল কনক টপ্ করিয়া দুলালীর পায়ে করস্পর্শ করিয়া ফেলিল এবং হাতখানা মাথায় ছোঁয়াইতে গেল।

দুলালী তৎক্ষণাৎ দৃঢ়ভাবে কনকের সেই হাতখানি ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল,—"ও-কি ভাই! ছিঃ—ও-সব কি? আমি কোথাকার কে একটা সামান্য চাষার মেয়ে, আর তুমি কত বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা! এতে আমারই অকল্যাণ হবে যে।" বলিয়া জোর করিয়া আপনার ভিজা চুলের দ্বারা কনকের সেই হাতখানা বেশ করিয়া মুছিয়া দিল।

চোখে-মুখে এক ঝলক দুষ্টুমি আনিয়া, হাত নাড়িয়া এবং মাথা দোলাইয়া কনক বলিল,—"আমি আবার নেব।"

দুলালী বলিল,—"না ভাই, তা'হলে আমার ভয়ানক দুঃখ হবে। আজ তোমরা নিজে থেকে দয়া ক'রে এসে আমাকে যে অসীম আনন্দ দিচ্ছ, এমন আনন্দ আমি আমার জীবনে খুব কমই পেয়েছি। কিন্তু তুমি যদি ও-রকম পাগলামি কর, তা'হলে আমার সব আনন্দ সব ফুর্ত্তি উবে যাবে।"

—"তবে এস একটা আপোষ করি। যখন ঠিক হ'য়ে গেল যে, তুমি আমার চেয়ে তিন বছরের বড়, তখন আমি তোমায় 'দিদি' ব'লে ডাকব, আর তুমি আমায় নাম ধরে ডাকবে। আর শুধু ডাক্‌লেই হবে না;—আমাকে তোমার ছোট বোনটির মতন দেখবে।" বলিয়া কনক দুলালীকে বাহুবন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়া মিনতিপূর্ণ আব্দারের সহিত বলিল,—"হ্যাঁ দিদি! বলনা আমার প্রার্থনা মঞ্জুর?"

কি আশ্চর্য্যময়ী এই মেয়েটি! কি সুন্দর সরল প্রাণ! দুলালীর [illegible]

কি তৃপ্তি! কি শান্তি! দুলালী কহিল,—"আচ্ছা বোন! তোমার কথাই মঞ্জুর। চতুর্দ্দিকের ঐ শালবন, দূরের ঐ ধান ক্ষেত, আর উপরের ঐ সূর্য্যদেব সাক্ষী রইলেন,—আজ, থেকে তুমি আমার 'ছোট বোন', আর আমি তোমার 'দিদি'।" পরক্ষণেই একটু গম্ভীর হইয়া পুনরায় কহিল,—"জানিনা তোমার আত্মীয় অভিভাবকেরা কি মনে করবেন। কিন্তু আমি ত ভাই তোমাকে চিনতাম না এবং ডাকিও নি। নারায়ণ তোমাকে আজ এই বনের মধ্যে এনে এ মধুর সম্পর্কটি সৃষ্টি ক'রে দিলেন। অসুবিধা হয়,—মুখের 'দিদি' ডাক ছেড়ে দিও, কিন্তু অন্তরের ডাক অক্ষুণ্ণ রেখ।" বলিয়া কনকের চিবুকস্পর্শে চুম্বন করিল। তারপর বলিল,—"তোমার নামটি কি ভাই?"

দুলালীর মধুমাখা কথাগুলি শুনিতে শুনিতে কনক কেমন যেন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। মৃদুস্বরে বলিল,—"কনক।"

দুলালী হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তোমার নাম কনক? তবেই হয়েছে আর কোন ভয় নেই। তোমাকে স্থানচ্যুত করা অসম্ভব;—উল্টালেও কনক, পাল্টালেও কনক।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে উভয় হস্ত উল্টা-পাল্টা করিয়া দেহ দোলাইয়া এমন একটা হাস্যোদ্দীপক অভিনয় প্রদর্শন করিল যে তিনজনেই খুব হাসিয়া উঠিল।

প্রফুল্ল কহিল,—"আচ্ছা ভাই কনকের দিদি! আমার তবে তুমি কে হলে?"

—"আমি আজ একেবারে দিলদরিয়া;—যে যা চাও, পাবে; দিদি বলতে চাও, তাতেও রাজি,—দাসী বলতে চাও, তাতেও রাজি।"

—"ধেৎ, তা কেন? তুমি আমারও দিদি।"

—"আচ্ছা, তবে আমি তোমারও দিদি।" সকলে আবার এক চোট হাসিয়া লইল।

এমন সময় দেখা গেল বিজয় একটা বড় কড়া ও একটা পিতলের হাঁড়ি লইয়া এবং তৎপশ্চাতে আর একজন লোক মাথায় একটা ডালা ও হাতে একটা সুটকেস লইয়া দুলালীদের বাড়ীর দিকে যাইতেছে। দুলালী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"ও কে ভাই?"

প্রফুল্ল উত্তর দিল,—"চেন না ওঁকে? ও যে আমার দাদা গো, আর সেই সুবাদে অমনি তোমারও দাদা। সেই যে,—যাঁর পা পুড়িয়ে গোবরের লেপ দিয়েছিলে!"

বাধা দিয়া, এবং উভয় হস্তের আকর্ষণে দুলালীর মুখখানা নিজের দিকে ফিরাইয়া লইয়া, প্রবল উৎসাহের সহিত কনক বলিল,—"আজ আমাদের কি হবে জান দিদি? আজ আর সন্ধ্যের আগে নামছি না। আজ এইখানে, তোমাদের বাড়ীতে বসে আমাদের বনভোজন হবে। সব আমরা নিয়ে এসেছি।"

—"তাই নাকি? তবে ত ভাই আর বাইরে থাকা চলে না। সব জোগাড় করিগে চল।"

কনক হঠাৎ তাহার আকর্ণ-আয়ত সুন্দর বড় বড় চক্ষু দু'টি দুলালীর চক্ষের উপর স্থাপন করিয়া, ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—"কক্ষণ যাব না আমি তোমাদের ঘরে। আমি এতক্ষণ ধ'রে কতবার 'দিদি' ব'লে ডাকলাম, কিন্তু তুমি একটিবারও আমার নাম ধরে ডাকলে না!"

পরম স্নেহে কনককে পুনরায় বক্ষনিবদ্ধ করিয়া দুলালী বলিল,—"কনক, আমার ছোট বোন কনক! আমার পাগলী বোন কনক!"

সন্ধ্যার দিকে গাড়ীতে বসিয়া ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"মেয়েটাকে এই বনের মধ্যে রেখে যেতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে বিজয়। এমন চমৎকার মেয়ে আমি কখন দেখিনি। কি সুন্দর স্বভাব, কি সুন্দর আদব-কায়দা,—আক্কেল!"

ইহার পর সারাটা পথ তিনি গম্ভীর হইয়াই রহিলেন। কনকের কলকণ্ঠও নীরব। প্রফুল্ল কয়েকবার কথা আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু কনকের সাড়া পায় নাই। বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিলে ব্রহ্মময়ীর হুঁস হইল। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া তিনি নামিয়া আসিলেন।

(৭)

কনকের পিতা আশুবাবু প্রবল মুষ্ট্যাঘাতে উপরওয়ালা সাহেবকে ভদ্রতা শিক্ষা দিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাসিক তিনশত টাকা বেতনের সব্ ইঞ্জিনিয়ারের চাকরিটি হারাইতে হইয়াছিল। পত্নী ব্রহ্মময়ী দুর্ভাবনায় পড়িয়াছিলেন; কিন্তু সিংহ-পুরুষ আশুবাবু বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। আর দাসত্ব করিবেন না স্থির করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে কণ্ট্রাক্টরী আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দর কর্ম্মনৈপুণ্য, অসাধারণ পরিশ্রম এবং কুলী-মজুর-শ্রমিকদের প্রতি স্নেহময় সদ্ব্যবহার মা লক্ষ্মীর প্রসন্নতা আকর্ষণ করিল। প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। এই সময়ে কনকের জন্ম। ভূপেন তখন পঞ্চম বর্ষীয় বালক।

এইমাত্র টেলিগ্রাম আসিয়াছে, ভূপেন পুণা কৃষি-বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, বাড়ীতে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে। কনকের উদ্দাম আমোদ-আহ্লাদ সমস্ত বাড়ীখানা মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। আশুবাবু প্রায় দেড় মাস হইল একটি বৃহৎ লৌহসেতু নির্ম্মাণ সংক্রান্ত কার্য্যব্যপদেশে মফঃস্বলে গিয়াছেন। প্রত্যাগমনের সময় হইয়াছে, কিন্তু ফিরিতেছেন না। তাঁহার অনুপস্থিতি সকলের প্রাণে আঘাত দিতেছে। এমন সময় দূরে মোটর সাইকেলের শব্দ শুনা গেল।

"ঐ যে বাবা আসছেন" বলিয়া কনক ছুটিয়া রাস্তায় গেল। সাইকেল ধরিবার জন্য মধুও বাহিরে আসিল।

মাটিতে পা দেওয়া মাত্র কনক আশুবাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"দাদার পাশের টেলিগ্রাম এসেছে বাবা!—একেবারে ফার্ষ্ট।"

অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়া আশুবাবু কহিলেন,—"সত্যি নাকি! কখন এল?"

"এই ত, একটু আগেই এসেছে।" পিতাকে লইয়া নাচিতে নাচিতে কনক ঘরে আসিল।

ব্রহ্মময়ী কার্য্যান্তরে ছিলেন। স্বামীর আগমন অবগত হইয়া তিনি তাড়াতাড়ি আসিলেন। এবং পাখা লইয়া বাতাস দিতে আরম্ভ করিলেন। ভৃত্য তামাক সাজিয়া গড়গড়ার নল বাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

কনক তাড়াতাড়ি আশুবাবুর পদ প্রান্তে বসিয়া পড়িল এবং জুতা খুলিতে আরম্ভ করিল। আশুবাবু তামাক টানিতে টানিতে মেয়ের মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

জুতা খুলিয়া দিয়াই কনক আশুবাবুর হাঁটু দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া মুখ উ'চু করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দুষ্টুমির ভঙ্গীতে বলিল,—"কিন্তু বাবা! আমি যে এতবড় একটা সুসংবাদ সকলের আগে তোমাকে দিলাম,—তা কৈ,—বক্‌সীস্ দিলে না?"

"আচ্ছা, এই নেও বক্‌সীস্" বলিয়া আশুবাবু কন্যাকে আবার কোলে টানিয়া লইলেন এবং ললাটে একটি স্নেহমাখা পবিত্র চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

রাত্রে আশুবাবু আহারে বসিয়াছেন। ব্রহ্মময়ী সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতেছেন। কনক এক বাটি পক্ষী-মাংস আনিয়া সযত্নে থালার নিকটে রাখিল।

"তোমার খাওয়া হয়েছে কনক?"

"না বাবা, এখনও খাই নি; তোমার খাওয়া হলে খাব।"

"তবে এস তুমি আমার সঙ্গে।" স্নেহময় পিতা বাম হাতখানি কন্যার দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

ব্রহ্মময়ী মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইলেন; কহিলেন,—"না না, ও আবার কেন? তুমি খাও,—ও পরে আমার সঙ্গেই খাবে এখন।"

আশুবাবু হাত গুটাইয়া মুখ তুলিয়া পত্নীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া, তিরস্কারপূর্ণ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিতে যাইয়াই হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন,—"তোমাকে একবার বনবাস থেকে ঘুরিয়ে আন্‌তেই হবে দেখছি! এত বড় একটা তৃপ্তির স্বাদ তোমার অজানা থেকে গেল?"

"আচ্ছা বস্—কনক বস্; যা'—হাত ধুয়ে আয়; নেও, তুমি আর হাত গুটিয়ে থেক না। এক কালে আমাদেরও বাপ ছিল কিন্তু।" বলিয়া ব্রহ্মময়ী মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

কনক পিতার কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া গেল। ব্রহ্মময়ী আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না।

আশুবাবু বলিলেন,—"আমার কিন্তু ছিল না গিন্নি! এমন শৈশবেই বাপ মা হারিয়েছিলাম যে"—তাঁহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল; তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ব্রহ্মময়ী অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন।

কনক হঠাৎ কথাবার্ত্তার গতি ফিরাইয়া দিল। বলিল,—"এদিকে যে কত কি কাণ্ড হয়ে গ্যাছে বাবা, তুমি ত এখনও তার কিছুই শুনতে পাওনি।"

"কি কাণ্ড হয়েছে মা?" পিতা কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন।

কনক খাওয়া ভুলিয়া গেল। ভূপেনের সর্পাঘাত হইতে আরম্ভ করিয়া দুলালীদের বাড়ীতে পিকনিক খাওয়ার এবং দুলালীর সহিত তাহার পাতান সম্পর্কের বিবরণ বিবিধ ভঙ্গীতে চোখে মুখে কথা বলিয়া সে বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিল। ব্রহ্মময়ীও মাঝে মাঝে দুই চারি কথা যোগ দিয়া সমর্থন করিতে লাগিলেন। বিস্ময়-বিমুগ্ধ আশুবাবু কখন কন্যার দিকে এবং কখন পত্নীর দিকে চাহিয়া কাহিনীটি মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন, বর্ণন শেষ হইলে তিনি বলিলেন,—"এমন আশ্চর্য্য মেয়ে ত কখন দেখিনি! আমারও যে একবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

—"যাবে বাবা একদিন? আমি জোর করে বল্‌তে পারি, একবার দেখ্‌লে, তাকেও তুমি ঠিক আমার মতন ভাল না বেসে পারবে না। মা ত রোজই তার জন্য দুঃখ করেন।"

"আচ্ছা, খাও ত তুমি আগে;—তারপর যাওয়ার পরামর্শ করা যাবে।"

—"জান বাবা! দাদার বন্দুক খুলে কার্ত্তুজ বের করে দিয়েছিল; আর এমন চমৎকার মাংস রান্না করে খাইয়েছিল, যে দাদা বলেন, আমাদের বাড়ীতেও নাকি অমন ভাল রান্না হয় না।"

ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"মোটের উপর, এমন ধীর স্থির কর্ম্মঠ স্বাস্থ্যবতী আক্কেল-পছন্দ-যুক্ত লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে আমি ত আর দেখিনি।"

কনকের উৎসাহ বাড়িয়া গেল—"আরও শোন বাবা! এমন এক একটা চমৎকার কথা বলে, আর এমন সুন্দর কাপড় বুনতে পারে, সে আর তোমায় কি বল্‌ব!"

—"সত্যি না কি মা? তুমি যে অবাক করে দিচ্ছ! তুমি বেশ পেট ভরে খেয়ে নেও দিকি;—তারপর চল, কাল সকালেই না হয় একবার বেড়িয়ে আসা যাবে। ঐ রাস্তায় আমার একটা কাজও আছে।"

একচালায় আঙ্গিনার দিকে পিছন দিয়া বসিয়া আপন মনে তাঁত বুনিতেছিল একটি যুবতী, আর এক কিশোরী পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া উভয় হস্তে হঠাৎ তাহার চক্ষু দুইটি চাপিয়া ধরিল। অতর্কিত আক্রমণে যুবতী চমকিয়া উঠিল; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই চক্ষু-আবরণকারী সুগোল হাত দু'খানি ধরিয়া হাসিয়া ফেলিল; বলিল,—"আমার পাগলী বোন।"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া কনক দুলালীর গলা জড়াইয়া ধরিল এবং অপরিসীম আনন্দের সহিত বলিল,—"আজ কে এসেছেন জান দিদি?—আজ আমার বাবা তোমায় দেখ্‌তে এসেছেন।"

"বাবা এসেছেন! কই রে?" বলিয়াই দুলালী উঠিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি বসন সংযত করিয়া লইল।

দুলালী আশুবাবুর পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আশুবাবু উপবেশন করিলেন, এবং ঠিক পিতার ন্যায় স্নেহভরে হাত বাড়াইয়া "এস ত মা তুমি আমার কাছে" বলিয়া তাহাকে কোলের নিকট টানিয়া লইলেন।

পাগলী কনক হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। দুলালী লজ্জায়, সংকোচে ও সম্ভ্রমে জড়সড় হইয়া পড়িল এবং নত-শিরে মাটির দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল। আশুবাবু তাহার চিবুকখানি একটু তুলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার বাবা আর তোমার দাদা কোথায় মা?"

শান্ত সংযত বিনয়-নম্র মৃদুস্বরে দুলালী উত্তর দিল,—"তাঁরা ক্ষেতের কাজে গ্যাছেন।"

"কখন ফিরবেন?"

"দুপুর গড়িয়ে গেলে ফিরবেন।"

"তুমিই বুঝি তাঁদের জন্য রান্না করে রাখবে?"

মস্তকের মৃদু সঞ্চালন দ্বারা দুলালী জানাইল, সে-ই রাঁধিয়া রাখিবে।

"তুমি এখন কি করছিলে মা?"

কনক আবার নাচিয়া উঠিল—"দিদি এখন কি করছিল জান বাবা?—তাঁত বুনছিল। কি চমৎকার কাপড় বুনতে জানে দিদি! সুতোও নিজে কেটে নেয়। আমার এমন ইচ্ছে করে যে, আমিও দিদির মতন কাপড় বুনতে শিখি!" দুলালী লজ্জায় আরও একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

"তোমার মা নেই, দেখতে পাচ্ছি মা!" কণ্ঠ বড় বিষাদ-মাখা।

"আমার খুব শিশু বয়সেই মা মারা গ্যাছেন; মা'কে আমার মনেই পড়ে না।"

"আমারও ঠিক তোমারই মতন বরাত মা! আমিও খুবই ছেলেবেলায় মা হারিয়েছি। মায়ের স্নেহ, মায়ের আদর, এমন কি মায়ের মুখখানি পর্য্যন্ত আমার মনে পড়ে না। তোমার তবু বাবা আছেন; আমি কিন্তু অতি শৈশবে বাবাকেও হারিয়েছি। বাবারও কোন স্মৃতি আমার মনে পড়ে না।" আশুবাবুর স্বর ধরিয়া আসিল। কনক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দুলালী হেঁট মুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

একটু পরে আশুবাবু আত্মসংবরণ করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার বাবাকে আর দাদাকে একবার সংবাদ দিতে পার মা? তাঁদের সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাওয়া ত ভদ্রতা হবে না। না হয় চল আমরাই গিয়ে দেখা করে আসি।'

মাথা না তুলিয়াই হাসিমুখে দুলালী উত্তর দিল,—"জল-কাদা ভেঙ্গে আপনারা সেখানে যেতে পারবেন না। আপনারা একটু বসুন, আমি গিয়ে তাঁদের ডেকে নিয়ে আসি।"

"তাঁরা কত দূরে আছেন?"

"বেশী দূরে নয়; —এখান থেকে ঐ পাকা সড়ক যতটা হবে, তার তিন গুণ, কি জোর চার গুণ হ'তে পারে।"

"বল কি মা? তা' হলে যে প্রায় মাইল খানেক হবে! তুমি একা যাবে কি ক'রে?"

কথা বলিতে বলিতে দুলালীর সঙ্কোচ ক্রমে কমিতেছিল, এবং নত মস্তকও ক্রমে জাগিতেছিল। এইবার মুখ তুলিয়া সে আশুবাবুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, —"আমি ত মাঝে মাঝে প্রায়ই যাই।"

"তোমার ভয় করে না?"

"দু' একদিন এক আধটা বুনো শুয়োর বেরিয়ে পড়লে একটু ভয় হয়; তা ছাড়া হয় না।"

"অ্যাঁ—বুনো শুয়োর বেরয়? সে অবস্থায় পড়লে কি কর?"

"[illegible] পালিয়ে যাই।"

"সামনে পড়ে না কোনদিন?"

"একদিন খুব সামনে পড়েছিল।"

"কি করলে তুমি তখন?"

"তখন আর পালাবার উপায় ছিল না। হাতের কাছেই একটা শাল গাছ ছিল। তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে পড়ি।" বলিয়াই লজ্জা পাইয়া দুলালী আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

এই সময় "বড় জল তেষ্টা পাচ্ছে" বলিয়া কনক গা মোড়া দিয়া উঠিল।

আদরিণী মেয়ের পিপাসার কথায় আশুবাবু একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন; বলিলেন,—"চা খাবে মা? গাড়ীতে ফ্লাস্কে চা আছে। আচ্ছা চল তবে আজকের মতন ওঠাই যাক, আর একদিন এসে ও'দের সঙ্গে দেখা করা যাবে।" বলিয়া দুলালীকে ছাড়িয়া দিয়া তিনি উঠিবার উপক্রম করিলেন।

আশুবাবুর বাহুবন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াই দুলালী কনকের কাছে গেল এবং আদরের সহিত তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া বলিল,—"সে দিনের খানিকটা চা আমাদের ঘরে আছে; খাবে? তৈরী করে দেব?"

কনক উত্তর দিবার পুর্ব্বেই আশুবাবু বলিলেন,—"তবে আর কি? ফ্ল্যাস্কের চা অপেক্ষা টাট্‌কা চা শতগুণে ভাল। তা তোমার এই বুড়া ছেলেটিকেও বরং একটু দিও।"

দুলালী চা করিতে করিতে বলিল,—"কনক! তোমার গরীব দিদির ঘরে খুব টাট্‌কা মুড়ি আছে। আজই ভোরে তৈরি করেছি। খাবে চারটি?"

"নিশ্চয়ই খাব।" বলিয়া কনক আগ্রহভরে নাচিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিল,—"বাবা! মুড়ি খাবে? খুব টাট্‌কা মুড়ি।"

লবণ ও কাঁচা লঙ্কা এবং গ্রাম্যঘানির বিশুদ্ধ তৈল মাখিয়া এক বাটি মুড়ি ও এক গ্লাস জল কনকের হাত দিয়া আশুবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিয়া দুলালী কনককে আর এক বাটি দিল। তারপর জল ফুটিয়া উঠিলে গ্লাস ও বাটির সাহায্যে দুই বাটি চা শর্করা অভাবে গৃহজাত পরিষ্কার ইক্ষু গুড় ও টাট্‌কা দুগ্ধ সহযোগে প্রস্তুত করিয়া দিল। আশুবাবু পরম তৃপ্তির সহিত মুড়ি খাইতেছিলেন। রুমালের সাহায্যে বাটি ধরিয়া এক চুমুক চা পান করিয়াই কত যেন আরাম পাইলেন এইভাবে "আঃ" করিয়া উঠিলেন; এবং আর এক চুমুক খাইয়া বলিলেন,—"বেশ ত বানিয়েছ মা!"

চোখে-মুখে এক ঝলক দুষ্টামি আনিয়া কনক কহিল,—"বল ত বাবা, চায়ে নূতনত্ব কিছু টের পাচ্ছ?"

পরীক্ষার্থে পুনরায় এক চুমুক পান করিয়া আশুবাবু বলিলেন,—"কই মা, কিছু ত টের পাচ্ছি না? আমার মুখে ত খুব ভালই লাগছে।"

কনক দুলালীর দিকে কটাক্ষ হানিয়া বলিল,—"জান দিদি! বাবা কিন্তু গুড়ের গন্ধটাও টের পায় নি।"

"গুড়? তাই নাকি?" বলিয়া পুনরায় আর এক চুমুকের স্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, তুমি বলে দেবার পর

এখন একটু টের পাচ্ছি বটে; গড়ের নামে যে রকম বিদ্বেষ মনে ছিল, এখন ত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।"

দুলালীকে সম্বোধন করিয়া আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি যে খেলে না মা?"

মৃদু হাসিয়া দুলালী বলিল,—"আমরা চা খাই না। সেদিন কনকরা বেড়াতে এসেছিলেন;—যাবার সময় ঐ চা-টুকু ফেলে গিয়েছিলেন; আমি তুলে রেখেছিলাম। দাদা একদিন খেতে চেয়েছিলেন, বাবা খেতে দিলেন না।"

এই কথায় দুলালীর পিতা ও ভ্রাতার কথা পুনরায় আশুবাবুর মনে পড়িল। তিনি বলিলেন,—"তোমার বাবার এবং দাদার সঙ্গে দেখা করার কি উপায় করা যায় বল ত?"

"আপনারা একটু বসুন, আমি ডেকে আনি।"

"না মা, তা' হবে না। তোমার নিজের কাজে তুমি যখন যাও, যাবে; কিন্তু আমার কাজে আমি তোমায় একাকী জঙ্গল-পথে বাঘ-শুয়োর-সাপের রাস্তায় যেতে দেব না।"

কনক বলিল,—"তুমি নাকি কি রকম শিঙে বাজিয়ে ডাকতে জান দিদি?"

—"জানি বটে, কিন্তু তা' হলে তারা খুব কষ্ট পাবে। ওটা হ'চ্ছে আমাদের বিপদের সঙ্কেত; —খুব বিপদে পড়লে তবেই ওতে ফুঁ'ক দিতে হয়।"

আশুবাবুর কথাটার মর্ম্মগ্রহণ করিতে বেগ পাইতে হইল না। পাহাড়িয়া জাতি এইরকম সঙ্কেতে দল-বল জড় করে।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে দুলালীর মুখের দিকে চাহিয়া আশুবাবু বলিলেন,—"না না, তা' হলে তুমি এখন বাজিও না।"

এমন সময় দেখা গেল, একটি লোক একটা লাঙ্গল কাঁধে করিয়া তাহাদের বাড়ীর নিকট দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইতেছে। দুলালী তাহাকে দেখিয়াই ছুটিয়া গেল এবং কহিল,—"পাতু দা', ক্ষেতে যাচ্ছ? বাবাকে আর দাদাকে এক্ষুণি একবার পাঠিয়ে দিও দাদা! শহর থেকে একজন বাবু এসে বসে আছেন,—বিশেষ দরকার।"

"আচ্ছা" বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল।

আশুবাবু উঠিয়া একটু পায়চারি আরম্ভ করিলেন। দুলালীর এবং কনকের সহিত গল্প করিতে করিতে তিনি দুলালীর তাঁতশালায় উপস্থিত হইলেন। অতি সাধারণ অনুন্নত শ্রেণীর একটা তাঁত। আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন,—"রোজ কতটুকু ক'রে বুনতে পার মা?"

দুলালী বলিল,—"যে দিন হাতে অন্য কাজ কম থাকে, আর বেশীক্ষণ বসতে পারি, সে দিন তিন হাত সাড়ে তিন হাত পর্য্যন্ত বোনা হয়; কিন্তু সাধারণত আট-দশ দিনের কমে একখানা কাপড় নামে না।"

ক্রমে এদিক ওদিক দেখিয়া তাঁহারা বড় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঘরখানায় তিনটি কামরা; মধ্যের কুঠরীটি অপেক্ষাকৃত বড়; এক পার্শ্বে একখানি খাটিয়ার উপর সামান্য শয্যার উপকরণ বেশ পাট করিয়া জড়ান রহিয়াছে। দুলালী বলিল,—উহা তাহার পিতার শয্যা। এক কোণে ছোট্ট একটি ধানের ভাঁড়ার; —তাঁহার পার্শ্বে কয়েকটা ছোট-বড় মৃৎপাত্র, একটা খালি টিন, একটা উদুখল, দুইখানি কোদালি, একখানা কুঠার এবং আরও কতকগুলি জিনিস-পত্র রহিয়াছে পূবে ও পশ্চিমে অন্য দুইটি কামরা,—মধ্যে বাঁশের দরজা; ঘরের বাহির না হইয়াও এই দরজা খুলিয়া প্রত্যেক কামরায় যাতায়াত করা চলে। মাঝের কামরা হইতে আশুবাবুরা পূবের কামরায় আসিলেন। এখানেও একখানি খাটিয়ার উপর পূর্ব্বোক্তরূপে সামান্য শয্যা ভাঁজ করা ছিল, এবং আরও কতক টুকিটাকি জিনিস-পত্র ছিল। দুলালী বলিল,—"এই খানে আমি থাকি, আর ও পাশের ঐ কামরায় দাদা থাকেন।" আশুবাবু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, গোময়লিপ্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসই বেশ সযত্নে সুবিন্যস্ত।

কথা প্রসঙ্গে আশুবাবু দুলালীদের ঘর-সংসারের অনেক তথ্য জানিয়া লইলেন। এমন সময় প্রায় সর্ব্বাঙ্গে জল-কাদা মাখিয়া শিবু ও সুখন আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দুলালীর মুখে পরিচয় পাইয়া শিবু যুক্তকরে ও সুখন সাষ্টাঙ্গে আশুবাবুকে অভিবাদন করিল।

দুলালী তাড়াতাড়ি কাপড়-গামছা বাহির করিয়া কূপ হইতে জল তুলিয়া দিল, এবং তাহার আহ্বানে শিবু ও সুখন দ্রুত স্নান ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইল।

তারপর সকলে মিলিয়া পুনরায় কিছুক্ষণ নানাবিষয়ে গল্প-গুজব করিবার পর আশুবাবু বলিলেন,—"দেখ শিবনাথ! আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।"

"সে কি বাবু! অনুরোধ কেন? আজ্ঞা করুন" বলিয়া হাসিমুখে জিব কাটিয়া শিবু হাতজোড় করিল।

"না না, তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ভাই! তোমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়ায় আমি বড়ই খুশী হয়েছি। তা' কথাটা কি জান? আর কয়েকদিন পরে—এই আসছে মাসের ৭ই তারিখ, মঙ্গলবার কনকের জন্মদিন। সেইদিন কনকের এই দিদিটিকে নিয়ে তোমরা যদি আমাদের বাড়ীতে যাও, তা হলে কনকের জন্মোৎসবটা বড়ই আনন্দময় হবে। আমি সকাল বেলা গাড়ী পাঠিয়ে দেব।"—

দুলালীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি বল মা, যাবে?"

দুলালী একবার পিতার দিকে, একবার আশুবাবুর দিকে চাহিতে লাগিল। কনক দুইহাতে দুলালীর একখানা হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিল,—"হাঁ দিদি, বল না, যাবে?"

দুলালী কনকের হাতে ছোট্ট একটু চিমটি কাটিয়া থামিতে ইঙ্গিত করিল এবং সম্মতির আকাঙ্ক্ষায় পিতার মুখের দিকে চাহিল।

শিবু বলিল,—"আপনারা যে রকম দয়ার চোখে দেখছেন," —বলিয়া কনকের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আর আমার এই ছোট্ট মা'টি যে রকম কুটুম্বিতার সৃষ্টি করেছেন, তাতে যাব না বা যেতে পারব না, এসব কথা বলা আর একেবারেই সাজে না।"

ইহার পর পিতাপুত্রী আর দেরী করিল না।

(ক্রমশঃ)

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ

ডাঃ নীলরতন ধর

২৯শে ডিসেম্বর ডাঃ নীলরতন ধর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতের জাতীয়-জীবন সংগঠনে বিজ্ঞান কিভাবে সহায়তা করিতে পারে, ডাঃ ধর তাঁহার অভিভাষণে তাহাই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বহু বিষয়েই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগদ্বারা জাতির জীবনে নূতন প্রাণ সঞ্চার করা যাইতে পারে। কারিগরী শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এই বিষয়ে যথাযথ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলে তাহা দ্বারা এদেশে ব্যাপক শ্রম-শিল্পের প্রসার সাধন করা সম্ভবপর। এই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে কারিগরী শিক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। বর্ত্তমানে দুই একটি বিশ্ববিদ্যালয়কেও এইরূপে শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করা যাইতে পারে। বিভিন্ন ফলিত বিজ্ঞানে কিংবা যেরূপ আবিষ্কার ব্যবহারিক কাজে লাগিতে পারে এরূপ বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ইতালী, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে বহু টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কারিগরী শিক্ষায় উচ্চতর পদবী সম্মানও দান করা হয়। ভারতবর্ষেও এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

যদিও কৃষি ভারতের প্রধান শিল্প, তথাপি এ পর্যন্ত এদেশে কৃষি-শিক্ষার নিমিত্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব নাই। ডাঃ ধর ভারতবর্ষে কৃষি-শিক্ষার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইলেই কৃষির উন্নতি হইবে, ফসলের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। এদেশে মাথাপিছু এক একরের তিন-চতুর্থাংশ জমির বেশী কাহারও ভাগে পড়ে না, অথচ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংলণ্ডে প্রত্যেক ব্যক্তি ২½ একর জমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারেন। সুতরাং ভারতের জনসাধারণ অর্দ্ধাশন বা অনশনে থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! এ দেশের জনসংখ্যাও যেভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা কম আশঙ্কার কথা নহে। যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি না করা হয় এবং অধিকতর জমি আবাদ করার ব্যবস্থা না হয়, অনশনে ও অর্দ্ধাশনে দিনাতিপাত করাই যে এ দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষি গবেষণা এবং কৃষির উন্নতির সুষ্ঠু ব্যবস্থার নিমিত্ত তাই স্বতন্ত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন করা বিশেষ প্রয়োজন।

পুষ্টিকর খাদ্য সমস্যা সমাধানে আজ জগদ্ব্যাপী বিজ্ঞানের জয়যাত্রা চলিয়াছে। আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে খাদ্য-রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এ বিষয়ে আজও বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের 'জাতীয় খাদ্য' কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য আজ পর্য্যন্ত তাহাও নির্ণীত হইল না। বলা বাহুল্য যে, ইংরেজ বা ফরাসীদের মত আহার্য্য আমাদের জাতীয় আহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ ভারতবাসীরা অধিকাংশই নিরামিষাশী ও দরিদ্র। কিরূপ খাদ্য আমাদের জাতীয় খাদ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, ভারতীয় বিজ্ঞানসেবিগণ যাহাতে নির্ণয় করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতে আহার্য্য-দ্রব্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত। 'ঋণংকৃত্বা ঘৃতং-পিবেৎ' ইহা মহর্ষি চার্ব্বাকের বাণী। আজ আমরা সেই সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়াছি; আমাদের আহার্য্য দ্রব্যও সন্তোষজনক হইতেছে না।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে সাধারণ অবস্থার পার্থক্য কমই পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে যে পার্থক্য রহিয়াছে, বিভিন্ন প্রদেশবাসী বা বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তির মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের দ্বারা তাহাও বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভবপর। ডাঃ ধর বলেন, যুক্তপ্রদেশ বিহার বা আসাম প্রবাসী বাঙ্গালীগণ ঐ প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে ছেলে বা মেয়ের বিবাহ দিতে পারেন; গুজরাটিদের সহিত মহারাষ্ট্রদের বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হইতে পারে। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর কাশ্মিরীগণের ও ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে আপত্তি করা ঠিক নহে। 'নেহরু' বা 'সাপ্রু' পরিবারের সংস্কৃতি ও বিচার-বুদ্ধি ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক-দিগের মধ্যে বিস্তার লাভ করা আবশ্যক। যদি এইরূপ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রদেশে প্রদেশে বা জাতিতে জাতিতে যে হিংসা-দ্বেষ রহিয়াছে, তাহা অন্তর্হিত হইবে, এবং ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ এক মহা জাতিতে পরিণত হইবে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা সংস্কৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে এরূপ বৈবাহিক সম্পর্কে কোন বাধা নাই ও এরূপ অনেক বিবাহের ফল শুভ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পার্থক্য সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া ডাঃ ধর বলেন, পাশ্চাত্যগণ অধিকতর করিৎ-কর্ম্মা। ঐ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বিজ্ঞানের বিভিন্নক্ষেত্রে 'থিয়োরেটিক্যাল' গবেষণায় মনোনিবেশ করিলেও সঙ্গে সঙ্গে সেই অধিকার অধিকতর কাজে আসিতে পারে, তৎপ্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। নার্ণষ্ট, হেবার, বেয়ার, ব্যাঙ্ক্রফট প্রভৃতি অধ্যাপকগণ 'থিয়োরেটিক্যাল' গবেষণায় খ্যাতি অর্জ্জন করিলেও প্রথম শ্রেণীর বহুবিধ ব্যবহারিক আবিষ্কারের সহিতও তাঁহাদের নাম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপকগণেরও এরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া প্রয়োজন। বাস্তবতা নিয়েই জীবনে কারবার করিতে হয়, সুতরাং তাহা ভুলিলে চলিবে না। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-প্রণালী এই দিক দিয়া নিখুঁত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কাজের উপর ইহাতে যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, ফলে, এই শিক্ষায় কাজও অধিক পাওয়া যাইবে। এই প্রণালীতে সর্ব্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ ইহাই শিক্ষায় কার্য্যকর ফল আনয়ন করিবে। এই শিক্ষায় ভারতীয়গণকে যেরূপ কর্ম্মঠ করিয়া তুলিবে তেমনি ইহাদিগকে দেশের ও সমাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবে। শিক্ষার এই পাকা বনিয়াদের উপর কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা পরে অনায়াসেই প্রসার লাভ করিবে।

ভুল

(গল্প)

শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার

স্ত্রী শ্রীমতী অপর্ণা দেবীকে শ্যামবাজারে তার বাপের বাড়ীতে রেখে দেশে গিয়েছিলাম একটা জমির বিলি ব্যবস্থা করতে। ফেরার পথে একটা ছোট ষ্টেশনে ষ্টীমার থেকে নেমেছি কিছু ফলটল কেনার জন্য, হঠাৎ তীর থেকে আমার নাম ধরে কে ডাকল। চেয়ে দেখি, প্রিয়লাল, কলেজে একসঙ্গে পড়েছি চার বছর। তার পরে দেখা নেই অনেকদিন। আমাকে বললে, "কি আছে সঙ্গে নামিয়ে নিয়ে আয়। আমাদের গ্রাম এটা। এখানেই থাকি।"

—কি করিস আজকাল?

—সে সব হবে এখন, চল।

সুটকেসটা নামিয়ে এনে ওর সঙ্গে চললাম। একটা হাটের কাছ দিয়ে চলেছি। হাট ভেঙে গেছে এখন। সন্ধ্যা ভাল করে হয়নি, গ্রাম এরই মধ্যে নিস্তব্ধ। দু'-একটা দোকানঘরে আলো জ্বলেছে। একটা দোকানে ভীষণ গণ্ডগোল, মারামারি হওয়ার যোগাড় তাস খেলায় অসাধুতা নিয়ে। আলো নেই আমাদের সঙ্গে, কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে না কিছু; পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি হবে বোধ হয়, চাঁদ উঠেছে গোল হয়ে। বাবলা পাতার ফাঁক দিয়ে পথের উপর এসে আলো পড়েছে।

প্রিয়লাল কলেজে পড়ার সময় কবিতা লিখত কলেজ ম্যাগাজিনে, সাপ্তাহিক এবং মাসিক কাগজে। কলেজ ম্যাগাজিনের ও ছিল এডিটর। সাব-এডিটর ছিল একটি মেয়ে—ওর সহপাঠিনী। এই সূত্রে ওর সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেল ওই মেয়েটির—সিপ্রা নাম। প্রিয়লালের বাপ-মা বেঁচে ছিলেন না। দূর সম্পর্কীয় এক কাকা অভিভাবক হয়ে বিয়ে দিলেন। সে এক রোমান্টিক ব্যাপার! প্রিয়লাল বি-এ পাস ক'রল সেইবার, কিন্তু সিপ্রার কি অসুখ হ'ল,—এগজামিন দিল না সে।

তার পরে নেহাৎ মামুলী কথা। প্রিয়লাল তার গ্রামের ইস্কুলের একটা মাষ্টারী পেয়ে গ্রামেই রয়ে গেছে। তিন বছর পরে ওর সঙ্গে আজ যখন হঠাৎ দেখা হ'ল, তখন বেশ একটা আগ্রহ হ'ল ওদের জীবনযাত্রা দেখার জন্যে।

চলতে চলতে প্রিয়লালকে বললাম,—আচ্ছা প্রিয়লাল তুমি কবিতা লেখ আজকাল?

প্রিয়লাল কথা না বলে হাঁটতে লাগল।

আবার ডাকলাম,—প্রিয়লাল।

মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—না—হ্যাঁ, লিখি।

ছোট ঘর, টিনের সেড্। প্রিয়লাল আস্তে আস্তে ডাকতে লাগল,—সিপ্রা, সিপ্রা!

অনেক ডাকাডাকির পর ঘুমভাঙ্গা ঝাঁঝাল গলায় জবাব এল,—আর পারিনে বাপু!—এই দিচ্ছি খুলে।

প্রিয়লাল চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আর আমিও বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে গেলাম।

সিপ্রা দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিয়লাল আস্তে আস্তে তার কাছে বললে, "সমরেশ এসেছে, আমাদের ক্লাশমেট সমরেশ ব্যানার্জ্জী, এ ধরণের ব্যবহারটা একটু থামাও। লজ্জা পাবে।"

চমকে উঠে সিপ্রা বললে—কই? ততক্ষণ দরজার নেপথ্য থেকে আমার আবির্ভাব হয়েছে। বললাম,—ভাল আছেন? আপনাদের সঙ্গে দেখা নেই প্রায় তিন বছর হবে। কি বল প্রিয়লাল, তিন বছর হবে না?

—বেশী ছাড়া কম নয়। প্রিয়লাল উত্তর দিল।

সিপ্রা বলল—কি করছেন এখন?

—আপনার সঙ্গে কথা বলছি।

হেসে বললে—আপনার সেই কলেজ-লাইফ এখনও আপনাকে ঘিরে আছে।

-আমার কলেজ লাইফের খবর আপনি কি জানেন! তা' জানে প্রিয়লাল। আপনি ত' ক্লাশে কোন কথাই বড় একটা বলতেন না। আমি ত' ভেবেই পাইনে, এত নিস্তব্ধতার ফাঁকেও এই হতভাগা প্রিয়লালের বরাতটা খুলে গেল কি ক'রে।

চুপ করে হাসতে লাগল সিপ্রা।

—কি করেন বললেন না ত!

এম-এ দেওয়ার পরেই রিপন কলেজ থেকে একটা অফার পেয়ে গেলাম, ওখানেই আছি।

কোথায় থাকিস সমর?—প্রিয়লাল জিজ্ঞেস ক'রল।

—নিউ ইণ্ডিয়ান হোটেল।

সিপ্রা বললে—হোটেল কেন?

—কারণ, সেটা আর অন্য কিছু নয়।

প্রিয়লাল জবাব দিলে আমার হ'য়ে,—সমরেশ বিয়ে করেনি।

—বিয়ে করেন নি!

—না। কেন, কোন অপরাধ করেছি কি?

আসল কথা, বিয়ে যে করেছি, সে খবর প্রিয়লালের কাছে বলিনি।

একটু হেসে সিপ্রা চুপ ক'রে রইল।

বললাম—প্রিয়লালের যখন স্ত্রী তখন আপনাকে বৌদি বলেই ডাকব। আপনাদের বিয়ে আমরা এত ধুমধাম করে দিলাম আর আপনারা আমাদের ভুলেও স্মরণ করেন না, দিব্যি নিরিবিলিতে অজ্ঞাতবাস ক'রছেন,—এ নিতান্ত অন্যায়।

সিপ্রা হঠাৎ উঠে বলল—আপনারা গল্প করুন। আমি আপনাদের খাবার যোগাড় দেখিগে। সিপ্রা চলে গেলে প্রিয়লালকে জিজ্ঞেস করলাম,—ব্যাপারটা কি বল ত প্রিয়লাল?

একটু চুপ করে থেকে প্রিয়লাল বললে,—দু'দিন থাক, নিজের চোখেই দেখবে।

—না, কি হয়েছে বল।

প্রিয়লাল আবার খানিকটা চুপ করে থেকে বললে,—"দরজা খোলার সময়ে সিপ্রার গলার আওয়াজে যে নতুন সিপ্রার পরিচয় পেয়ে তুমি বিস্মিত হয়েছিলে, ওই হচ্ছে

প্রতিদিনকার সিপ্রা। আর এইমাত্র যে-সিপ্রা হাসিমুখে কথ বলে আলাপ ক'রে গেল, এ হচ্ছে কলেজের সিপ্রা দেবী —আমার জীবনে ওর মৃত্যু হয়েছে বিয়ে হওয়ার বছর খানেক পরেই। শুধু তোকে দেখেই ওর কলেজ-লাইফের মনখানি ও এক মুহূর্ত্তেই ফিরে পেয়েছে।"

—ঠিক বুঝলাম না, প্রিয়লাল।

—বুঝলি না?—দারিদ্র্যম্। চল্লিশ টাকা পাই মাস কাবারে,—পঁচিশ টাকা মাষ্টারীতে, আর পনের টাকা ছেলে পড়িয়ে। এতে সাধারণভাবে পাড়াগাঁয়ে দু'জনের বেশ চলে যেতে পারে, কিন্তু কলেজে-পড়া সিপ্রা দেবীর কলেজ-জীবনের স্বপ্নসাধ মেটান চলে না। বড় ভুল করেছিলাম ভাই সমর, তখন বুঝিনি রিক্তহাতে ভালবাসার কোন মানে হয় না।

(২)

রাত্রিতে গরমে ঘুম ভেঙে গেল। মনে করলাম বারান্দায় একটু পায়চারি করে আবার এসে শোব। বেরোতেই দেখি সিপ্রা একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে বারান্দায় বসে আছে। একবার ভাবলাম ডাকি, কিন্তু ডাকলাম না, আস্তে আস্তে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আমাকে দেখে ওর কলেজের কুমারী-জীবনের কথা মনে পড়ে গেছে। অথচ আমার সঙ্গে ওর কোনদিন আলাপ ছিল না। প্রিয়লাল বলেছে, বিয়ের পর বছরখানেকের মধ্যেই ওর পরিবর্ত্তন এসেছে। বোধ হয় এ দীর্ঘকাল ওর এই রকম নিদ্রাহীন রাত্রি কাটে। ভাগ্যের বিধান ও মেনে নিতে পারে নি। ওর জন্যে আমার দুঃখ হ'তে লাগল—ঘৃণা নয়। আর বেচারা প্রিয়লাল? জীবনের প্রারম্ভে মস্ত একটা ভুল করেছে, জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ওকে সেই ভুলের বোঝা টানতে হবে। উপায় নেই, পরিত্রাণ নেই।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙল 'ঠাকুরপো' ডাকে। সিপ্রা স্নান করে এসেছে, আলগা চুল পিঠের ওপরে এলিয়ে দেওয়া। বেলা হয়েছে অনেক।

—"ওঠ, ঠাকুরপো, কত ঘুমুতে যে পার।"

মেয়েরা অল্প সময়েই অনাত্মীয়কে আত্মীয় করে নিতে পারে।

বললাম—তা' না ডাকলে আরও এক-আধ ঘণ্টা পারতাম, সে শক্তি আছে।

—সে বুঝতে বাকী নেই। উঠে মুখ ধুয়ে এস, কুটনা করছি বসে রান্নাঘরে, গল্প করবে এস।

—প্রিয়লাল কই?

এতক্ষণ ঘরেই ছিলেন। তোমাকে ডাকতে নিষেধ করলেন। বললেন, আটটার আগে নাকি ঘুমই ভাঙেনা তোমার। এইমাত্র ট্যুইশানিতে বেরিয়ে গেলেন। এস, আমি চললাম।

হাতমুখ ধুয়ে এসে অপর্ণার কাছে একটা চিঠি দিলাম। লিখলাম তিন-চার দিন এখানে থাকব, সে যেন এর মধ্যে কোন চিঠি না দেয়। তার পরে বসলাম এসে রান্নাঘরে। সিপ্রা কুটনা কাটছে।

মেটেদের। কি মনে হয় জান ঠাকুরপো, কলেজের দিনগুলো যদি না ফুরাত কোন দিন! যদি ধরে রাখতে পারতাম তাদের!

—ঠিক বলেছেন। তারপর খবরের কথা যদি বলেন, সে জানি খুব কম লোকেরই। খবর জানি নিজের, প্রিয়লালের, সিপ্রা দেবীর, আর জানি—

—আমাদের খবর কি জান তুমি?

—এইবার মুস্কিলে ফেললেন বৌদি। আপনাদের খবর জানি বিয়ে হয়ে গেছে, আর এইখানে নিরালায় দুজনে নীড় বেঁধেছেন আর ত' কিছু—

ম্লান হেসে সিপ্রা বললে,—আর তোমার খবর?

আমার খবর ত' জানেন, কাল বলেছি। আরও দুই একজনের খবর জানি। মিস মৈত্র,—সেই যে একটা বারোহাত কাপড় প'রে ক্লাশে এসে ধোপার পুঁটুলীর মত বসে থাকত—হেনা মৈত্র, তা'র বিয়ে হ'য়ে গেল কয়েকমাস আগে, পেপারে দেখলাম। স্বামী হিষ্টরি অব্ এনসেণ্ট্ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার-এর রিসার্চ স্কলার। স্বামীটি স্ত্রীকে নিয়ে চলল জার্ম্মানীতে রিসার্চ করার জন্যে ষ্টেট্ স্কলারসিপ পেয়ে। আর আপনাদের শাড়ীদের দলের দু'-একজন,—কমলা ঘোষ, মিনতি সরকার এরা ত পলিটিক্সে ভিড়ে গেল। আজ হাওড়া জুট-মিল ষ্ট্রাইকে লেকচার দিচ্ছে, কাল চ'লল বম্বে উইভারস্ এসোসিয়েশনের ডেলিগেট হয়ে, পরশু দিন এলাহাবাদে পিকেটিং করতে,—এই করছে তারা। কিন্তু একটা কথা বৌদি, আপনারা ত' ক্লাশে সব সজীব কি নিজ্জীব পদার্থ বোঝা যেত না। আপনারা বাইরে এসেই হঠাৎ কেউ পলিটিক্সে, কেউ স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে মেতে উঠতে পারলেন কি ক'রে? হঠাৎ এতটা জীবনী-শক্তি বা কোত্থেকে এল?

আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে নত মুখে উত্তর দিল সিপ্রা—কেন, আমি ত' ও-দলের বাইরে!

একটু থতমত খেয়ে বললাম,—আপনার কথা আলাদা।

—কেন, আলাদা কেন? জানেন ঠাকুরপো, আঘাত না পেলেই প্রাণশক্তি বেড়ে চলে, আর ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

বললাম—আমি ঠিক বুঝতে না পারলেও কিছু কিছু আন্দাজ করেছি বৌদি। আপনাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি।

সিপ্রা চুপ।

—কথা বলুন।

সিপ্রা চুপ করে রইল।

—কিন্তু শুধু দারিদ্র্যের জন্যে আপনারা মুষড়ে পড়বেন বৌদি? আপনাদের যে ভাবে মিলন হয়েছে, বাঙলা দেশে এরকম খুব কম হয় বলেই এর বৈশিষ্ট্য বেশী। আর দারিদ্র্য খুব আর কি? এ-রকম অবস্থায় অনেক শিক্ষিত মেয়েকে আমি আনন্দে দিন কাটাতে দেখেছি। আপনাদের কথা যে সগর্ব্বে লোকের কাছে গল্প করে বেড়িয়েছি বৌদি।

—কিন্তু তা'দের কল্পনা আমার মত বিরাট ছিল না ঠাকুরপো। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমার নিজের আঁকা যে-জীবন আমার চোখের সামনে ভাস'ত, তার কাছে আমাদের

—কিন্তু মুখ না ঢাকাই কি ঠিক নয়? প্রিয়লালের মত স্বামী কম মেয়েরই হয়।

—ঠাকুরপো, কি যে ঠিক, আর কি যে ঠিক নয়, প্রশ্ন ত' তা' নয়। প্রশ্ন এই যে, এই শেষে দাঁড়াল, আর তাই হ'ল না। ওই কমলা, মিনতি, হেনার কথা যখন ভাবি—

—এ আপনার ভুল বৌদি। হুজুগটাই সব আর শান্তি কিছুই নয়? বাইরে থেকে তাদের জীবনের খোলসটাই দেখলেন, তাদের অন্তরটা দেখলেন না? কে জানে, ব্যক্তিগত জীবনে কা'র কতটুকু দাবী ভাগ্যের কাছে মিটল, কা'র মিটল না।

সিপ্রা কুটনা করতে লাগল নতমুখে। আমি বাইরে চলে এলাম। প্রিয়লাল ট্যুইশানি করে ফিরল, তারপরে স্নান করে খেয়ে বেরিয়ে গেল ইস্কুলে।

এই দুঃসহ পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিশ্বাস ফেলার মত প্রচুর জায়গা নাই। সংসারে দু'টি প্রাণী—স্বামী-স্ত্রী। নিঃশব্দ ব্যবধানের মধ্যে তাদের বাস। প্রয়োজনের দাবী ছাড়া তারা কথা বলে না। দু'জনের মনের মধ্যে একই ধিক্কার—'ছি, ছি, কি ভুল করেছি!' একজন তার মনের ও শিক্ষার বিপুল বলে স্বামিত্বের অধিকার বিসর্জন দিয়ে চলে, আর একজন সমাজের সুশৃঙ্খল নিয়মকে মনে মনে অভিশাপ দেয়।

ছাত্র-জীবনে যে সিপ্রা আমার পরিচয়ের আড়ালে ছিল, সে যে হঠাৎ এমনভাবে তা'র জীবন-যাপনের সব রহস্যাবরণের বাধা ঠেলে নিজেকে কি কারণে ব্যক্ত করবে; কত বড় আঘাতে যে এই বিপুল বাধাটা ভেঙে যাবে, তা' অনুমান করা কঠিন নয়। উপবাসী, অতৃপ্ত ও আহত যে বিদ্রোহী মন নিঃশব্দে গুমরে মরছিল সে তার সব শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে সমাজ-হীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসভ্য বর্ব্বর চিত্তের মত।

প্রিয়লাল ছাত্র-জীবনে ছবি আঁকত, মাসিক-সাপ্তাহিক কাগজে কবিতা লিখত। কবিসুলভ শান্ত সমাহিত মন নিয়ে সে এসেছিল। কোন রকম হুজুগ-ঝঞ্ঝাট ও সযত্নে এড়িয়ে চলত। আর সিপ্রা ছিল এই কবিটির কাব্যমুগ্ধা পাঠিকা। আজকের এই পরিবর্ত্তন যা'র চোখে পড়বে, এদের জীবনে সে প্রিয়লাল আর সে সিপ্রার মৃত্যু স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে তা'র কাছে।

এদের এখানে তিনদিন আছি। এতেই মন ভারী হয়ে উঠেছে। রাত্রিতে প্রিয়লাল তার ঘরে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছে। সিপ্রা কাজ করছে রান্নাঘরে। আমি প্রিয়লালের পাশে বসে আছি। বললাম,—কাল সকালে যাব প্রিয়লাল, আর থাকতে ইচ্ছে হয় না।

—আর দু'একদিন থাক না, তোমার ছুটি ত ফুরায়-নি।

—ফুরায়-নি, কিন্তু আমার আর ভাল লাগছে না।

—সিপ্রা দুঃখিত হবে। সম্ভব হ'লে আর দু'একটা দিন থেকে যাও।

এই প্রিয়লালের মত মানুষ জীবনে আর একটিও চোখে পড়'ল না। এতটা শান্ত না হ'লে বোধ হয় ওর জীবনটা এ রকম হ'ত না। কিন্তু ওর এই শান্ত নির্লিপ্ত ভাবটাকে দুর্ব্বলতা ভেবে ওকে ছোট করে দেখতে পারি-নি। ও এত বিরাট যে, সিপ্রার মত সাধারণ মেয়ে ওর নাগাল পায় না।

আমার যাওয়ার কথা প্রিয়লালের সামনেই সিপ্রাকে ডেকে বললাম। ও 'যাও'-ও বললে না, 'থাক'-ও বললে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুকাল, তারপরে চলে গেল। প্রিয়লাল ম্লান হেসে বললে—দেখলে ত'

আমি চুপ করে রইলাম।

পরের দিন বেলা আটটা বাজে। আমি বসে চা খাচ্ছি, রওনা হ'ব একটু পরেই, সিপ্রা ছুটে এল পাগলের মত ঘরের মধ্যে। হাতে একটা এনভেলপে চিঠি—আমার নামে। চিঠির ওপরের বাঁকা হাতের লেখা দেখেই বুঝলাম, শ্রীমতী চিঠি না লেখার আদেশ পালন করেনি।

সিপ্রার চোখ লাল, চুল রুক্ষ, মুখে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে আমার দিকে আর চেঁচিয়ে বলে উঠল পাগলের মত,—"আপনি বিবাহিত!" থরথর ক'রে ও কাঁপছে। চেয়ে দেখি, আমার চিঠি খোলা।

—আপনি আমার চিঠি খুলেছেন বৌদি?

—হ্যাঁ খুলেছি। আপনি বলেন নি কেন আগে যে, আপনি বিয়ে করেছেন?

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম,—তাতে কি হয়েছে বৌদি? শুধু রহস্যের জন্যই বলি নি। তাতে কি দোষ হয়েছে?

গণ্ডগোল শুনে প্রিয়লাল এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, সস্নেহ প্রশান্ত গম্ভীর গলায় ডাকল,—সিপ্রা।

ঘর থেকে চোরের মত সিপ্রা বেরিয়ে গেল। প্রিয়লাল এসে আমার হাত ধরে বললে,—কিছু মনে করিসনে ভাই।

যেন সিপ্রার কোন অপরাধ নেই, সে যে ওর অপ্রিয় তা স্বপ্নেও ভাবেনি, সব দোষ-ই যেন ওর এইভাবে ও সিপ্রার দুর্ব্বলতার জন্যে তার হয়ে ক্ষমা চাইল।

প্রিয়লাল আমার স্যুটকেসটা হাতে ক'রে চ'লল আমাকে ষ্টীমারে তুলে দিতে।

আবার সেই হাটের কাছ দিয়ে পথ। বেচাকেনা আরম্ভ হয়ে গেছে। নানা লোকের গণ্ডগোল চেঁচামেচি একটি বিরাট গুঞ্জনের রূপ ধরে কানে এসে লাগছে। আমরা নিঃশব্দে চলেছি সারাপথ।

কে একজন ভদ্রলোক প্রিয়লালকে দেখে বললে—নমস্কার মাষ্টার মশাই।

প্রিয়লাল থামল না। নিঃশব্দে ডান হাতের স্যুটকেসটা নমস্কারের ভঙ্গীতে একটু তুলে ধরে আবার চুপ করে আমার সঙ্গে এগিয়ে চল'ল।

ষ্টীমারে উঠলাম। স্যুটকেসটা আমার হাতে দিয়ে প্রিয়লাল বললে,—"চিঠি দিস ভাই। দেখলি ত আমাদের জীবন-যাত্রা!" বলে একটু হাসল।

কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না আমি। ষ্টীমার ছেড়ে দিল।

নাম-সংক্ষেপ

শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

'নামরহস্য', 'নামসমস্যা' নামে বহু প্রবন্ধ বাহির হইয়া মানুষের নামকরণে এক হাস্যকর সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছে। জাগতিক পরিবর্ত্তনে যেমন রুচি, প্রবৃত্তি, আহার, পরিচ্ছদ, চলন-ধরণ সর্ব্বদিকে পুরাতনের সংস্পর্শ দূরে হইয়া নূতনের স্পর্শ লাগিয়াছে, আমাদের নামকরণেও তেমনি পরিবর্ত্তনের স্রোত লাগিয়াছে। এই পুরাতনের বিদায়-পালার সুর মৃদু মৃদু বাজিয়া নূতনের সাদর-সম্ভাষণের আয়োজন চলিয়াছে এবং তাহারই সঙ্গে নাম-প্রকরণে একদিকে পুরাতনের ছাপ যাইয়াও যাইতেছে না ও অন্যদিকে নূতনের আসন প্রতিষ্ঠিত হইবার দ্রুত প্রচেষ্টা চলিতেছে। নাম-পরিবর্ত্তনের ইহাই লক্ষ্য করিবার যে, আধুনিক নাম-প্রকরণে নামদাতা ও নামধারীর সম্মিলিত মনঃপূতিক্রমে নামগুলি ক্রমাগতই দুর্ব্বল, কৃশকায় হইয়া আশ্চর্য্যরূপে সংক্ষিপ্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে।

সভ্যতার চরম-সোপানে উঠিয়া নাম-সংক্ষেপে মানুষের এত আগ্রহ হইল কেন? কেহ কেহ বলেন, নামের সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায়; মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিবিধ উপাধির সংযোগে নাম কেবল দীর্ঘ করা হয়। কেহ বা বলিতেছেন, পারিপার্শ্বিক বিষয়-বস্তু হইতে নিজেকে বিশিষ্ট করিয়া বুঝানই যখন নামের উদ্দেশ্য, তখন আড়ম্বরবহুল সুদীর্ঘ নামের ত প্রয়োজন নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এতদিন পরে তাঁহার নামের আদি অক্ষর 'শ্রী' শব্দ তুলিয়া দিয়াছেন। সুসাহিত্যিক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্প্রতি পরলোকগত) নিজ নামের আমূল সংস্কার করিয়া লোকসমাজে চারু বন্দ্যোঃ-রূপে পরিচিত হইয়াছেন। সাহিত্যের আসনে যাঁহারা নিজেদের আসন পাতিয়া সশ্রদ্ধ পূজা পাইতেছেন, যাঁহারা নূতনের অগ্রণী—আদর্শের স্রষ্টা, তাঁহাদের নামকরণের এই পথ-নির্দ্দেশ অনেকে মানিয়া লইতে পারিতেছে না। তাঁহারা এই যে পথ দেখাইলেন, তাহাতে অন্তত সাহিত্যিক সমাজে ত নামের অঙ্গহানি সুরু হইয়া ক্রমে ক্রমে জনসমাজে শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হইতে চলিল। জগৎ যখন এক সুরে —এক ধরণ চায় না, যখন পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহাকে বহুরূপী সাজ সাজিতেই হইবে, তখন নামকরণেও নূতনত্ব চাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি অঙ্গহানি করিয়াই নূতনত্ব সৃষ্টি করিতে হইবে?

'উমাকান্ত', 'হরিপদ', 'বিজনবিহারী', 'বিজয়লাল', 'ঊর্ম্মিমালা', 'ফুলরাণী', 'মালতীমণি', নামগুলি আমরা আজ 'উমা,' 'হরি,' 'বিজন,' 'বিজয়,' 'ঊর্ম্মি,' 'ফুল,' 'মালতী' নামেই ডাকিতে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। ইহাতে একদিকে যেমন বাহ্যিক বিকৃতি ঘটিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘনাইয়া আসিতেছে। এই আভ্যন্তরীণ বিপ্লব শব্দার্থের বিকৃতিতে। উমাকান্ত বলিয়া আমরা বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম মহেশ্বরকে, কিন্তু ঘটিল তাহার বিপরীত। ঊর্ম্মিমালা বলিয়া যাহাকে তরঙ্গের হাররূপে বর্ণনা করিলাম, 'মালা' শব্দলোপে সে সৌন্দর্য্যে ব্যাঘাত ঘটিল। ইহা ছাড়া 'ফুলরাণীর' স্থলে [illegible] বিরোধ ঘটিল। দ্বিতীয়ত 'শ্রী' যোগে যদি সংস্কৃত শব্দের অর্থ হিসাবে সৌন্দর্য্যবিশিষ্টই বুঝায়, তাহাতেই বা কি দোষ? যদি গোঁফ-দাড়ি কামাইয়া, ফ্যান্সি ধুতি পরিয়া, পাতলা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া নিজেকে সুন্দর ও সুষ্ঠু, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করিতেই সচেষ্ট হইয়া থাকি, তবে নাম-সৌন্দর্য্য কোন্ দোষ করিল? তবে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, সুন্দর সাজিয়া সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করিলেও তাহা ত মুখ ফুটিয়া বলিতে হয় না, কিন্তু নামোল্লেখের সময় নিজমুখে নিজেকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বলিয়া জাহির করিতে লজ্জিত হইবারই ত কথা। বাস্তবিকপক্ষে, আমার মতে 'শ্রী'র অর্থ সৌন্দর্য্য হইলেও 'শ্রী' ব্যবহারে দোষ হয় না। আমার নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' প্রয়োগে উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইল। কোন কর্ম্ম বা অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ঈশ্বরের নাম করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও করুণা ভিক্ষা করিতে হয়, তাই নামের পূর্ব্বেও 'শ্রী' যোগে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানই সম্পন্ন করা হইল। উপরন্তু নিজেকে সৌন্দর্য্যশালী বলা অর্থ নিজেকে জীবিত ও সবল-সুস্থ বলা। সুতরাং নিজের সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞাপন নিজের মুখে না দিয়া আমরা এইরূপে এই লজ্জাকর অপবাদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। 'শ্রী' শব্দের অর্থ প্রধানত 'জীবিত' বলিয়া আমাদের একরূপ ধারণা হইয়া গিয়াছে, তাই মৃতব্যক্তির নামের সঙ্গে 'শ্রী' শব্দের যোগ দেখা যায় না। তৃতীয়ত, উপাধির কথা। বংশ-তালিকার উজ্জ্বল অভিব্যক্তি উপাধির মধ্যে নিহিত। সমাজ, ধর্ম্ম ও শ্রেণী-বিভাগের দিক দিয়া উপাধির সম্পূর্ণ সংহার না করিয়া অনেকটা পরিহার করিয়াও আমরা যে স্বার্থত্যাগের নিদর্শন দেখাইতে প্রয়াস পাইতেছি, তাহা বস্তুতই অনুচিত অনাচার। অন্যান্য প্রদেশের নাম শুনিয়া আমরা দেখি, সে নামে শুধু নিজের নাম নহে, তাহাতে পিতার পরিচয়ের সঙ্গে বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে মহাত্মা মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর নাম উল্লেখযোগ্য। আমরা উপাধি যদি বা রাখি, তাহাও আবার ইংরেজীতে লিখিবার সময় বিকৃত করিয়া লিখি বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, রায়, বসু উপাধিগুলি ব্যানার্জ্জী, চ্যাটার্জ্জী, রে, বোসে চলতি হইয়া পড়িয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থ সমাজের বন্দনীয় ব্যক্তি, মুখোপাধ্যায়ের অর্থ সমাজের মুখ্য বা প্রধান ব্যক্তি। এইরূপে জাতি ও শ্রেণীবিভাগের ফলে যে সমুদয় উপাধি প্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেগুলির প্রত্যেকের ভিতরে বিশেষ অর্থের ইঙ্গিত রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে উপাধিগুলি মুছিতে মুছিতে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, আর নাম আশ্চর্য্য রকম সংক্ষিপ্ত করায় প্রকৃত অর্থ ব্যাহত ও বিকৃত হইতেছে। চিরাচরিত বংশানুক্রমিক প্রথা-পদ্ধতিতে শিথিলতা দেখা দিয়াছে।

অনেকে হয়ত আপত্তি করিয়া বসিবেন, কেন? ডাক-নামেও ত অর্থ-বিকৃত হইতেছে। সময় বাঁচাইবার জন্য, ভ্যাঙচাইবার জন্য, আদর করিবার জন্য, মিহিকণ্ঠে মোলায়েম সুরে রহস্য করিবার জন্য অনেক সময়ে অবস্থাবিশেষে এমনি অনেক কারণে আসল নামটি বিকলাঙ্গ হইয়া ডাক-নামের

পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। 'সৌদামিনী' দীর্ঘ নামটিকে অল্প সময়ে আদর করিয়া ডাকিবার জন্য বলিতে হয় 'সদু,' 'গজেন্দ্রকে' আদর ও বিদ্রূপ উভয় ভাবটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ডাকিতে হইলে আমরা বলিয়া বসি 'গজু'। এমনিভাবে 'কানাইলাল' 'কানু', 'নীলিমা' 'লিনা,' 'ব্রজরাণী' 'রাণী,' 'বুদ্ধদেব' 'বুধো' এমনি ক্ষুদ্র অর্থহীন সংক্ষিপ্ত ডাক-নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বেশী করিয়া সম্মান দেখাইবার জন্য 'মুখোপাধ্যায়' বা 'ভট্টাচার্য্য' মহাশয়কে আমরা ডাকিতে বাধ্য হইব 'মুখুয্যে ম'শায়' বা 'ভট্‌চায মশায়।' উপহাস বা রঙ্গ করিবার জন্য আমরা বলিয়া থাকি 'মুখুয্-ঠাকুর' বা 'ভন্ড ঠাকুর।' ডাক-নামের বা আটপৌরে নামের এই যথেচ্ছাচার বিকৃতিতে ও বিবর্ত্তনে কোন দোষ নাই, কারণ ডাক-নাম ডাকিবার জন্য, জনসমাজে পরিচিত বা লিপিবদ্ধ করিয়া চিরস্মরণীয় হইবার জন্য নহে।

নামের যাহাতে অর্থ থাকে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সকলেই সৌন্দর্য্য চায়, তাই অনেককে মাতাপিতৃপ্রদত্ত নামে দুঃখ করিতে দেখিয়াছি। যিনি দেশসেবায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে বা সাহিত্য-সাধনায় সুনাম অর্জ্জন করিলেন, দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়া মহৎ ব্যক্তি হইয়া বসিলেন, লোকে যদি তাঁহাকে 'গবুরাম' বা 'ঘণ্টারাম' এহেন শ্রুতিকটু অপ্রীতিকর নামে ডাকিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার দুঃখিত হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিকও নয়, অন্যায়ও নয়। নামের ভিতর অর্থ ও সঙ্গতি, রুচি ও 'কাল্‌চার', সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিহিত থাকা বাঞ্ছনীয়। গরুর নাম 'মঙ্গলা', বিড়ালের নাম 'পুসী', হরিণের নাম 'শারী', বানরের নাম 'লালী', কুকুরের নাম 'বাঘা' রাখা সঙ্গত হয় বটে, কিন্তু মানুষের প্রতি এ নামগুলি প্রয়োগ করায় নির্ব্বুদ্ধিতা ও রুচিহীনতার পরিচায়ক হইবে। নামের অর্থ থাকিলেই চলে না, সঙ্গতি থাকাও দরকার। লোষ্ট্র, ইষ্টক, কুষ্মাণ্ড, বার্ত্তাকু বলিয়া অর্থযুক্ত বিশিষ্ট পদার্থ আছে, তাই বলিয়া মানুষের সভ্যতা-সূচক নামকরণে এগুলির দাবী থাকিতে পারে না। যাহা সুন্দর, যাহা জ্যোতির্ম্ময়, যাহা সুবাসিত, শীতল, মাহাত্ম্য-বিকাশক ও ঔদার্য্য-পরিচায়ক তাহাই অর্থ, সঙ্গতি ও সংস্কৃতির বিচারে আমাদের নামকরণে প্রযুক্ত হইবার অধিকার রাখে।

অনেক নামে অর্থ নাই সত্য, কিন্তু সে নামগুলি এমন সঙ্গত ও মার্জ্জিত যে, তাহাতে অর্থহীনতার কোন দোষ ধরা পড়ে না। শ্রী, উপাধি ও 'পদ', 'চন্দ্র', 'কান্ত', 'লাল', 'গোপাল', 'চরণ,' 'দাস,' 'প্রসন্ন,' 'বিহারী' প্রভৃতি নামের মধ্যপদগুলির বিলোপে যেমন নাম-সংক্ষেপের আন্দোলন চলিয়াছে, তেমনি আসল নামটিও ক্রমেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে। সভ্যতা ও ভব্যতার অনুরোধে 'সৌদামিনী,' 'পূর্ণশশী,' 'মৃণালিনী', 'ক্ষেমঙ্করী', 'নিস্তারিণী', 'ঘনশ্যাম', 'রামলোচন' নাম উঠাইয়া 'ছায়া,' 'মায়া,' 'কায়া,' 'ছবি,' 'গীতা,' 'রেবা,' 'রেখা' প্রভৃতির নামের ছড়াছড়ি পড়িয়াছে। চারি বা ততোধিক অক্ষর-যুক্ত নামগুলি আজ 'সেকেলে' বলিয়া অনাদৃত। দুই বা পারতপক্ষে তিন-অক্ষরের নামের দামই আজ বেশী। বুঝিতে পারি না সেকালের 'বাসবদত্তা,' 'তিলোত্তমা,' 'চিত্রাঙ্গদা,' 'উর্ম্মিলা,' 'মেনকা' নামের এত অনাদর হইল কেন। কয়েকদিন পূর্ব্বেও নামকরণে হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর নামের ছড়াছড়ি ছিল। আজিকার নামকরণে দেব-দেবীর নামের স্থান সঙ্কুচিত। 'জনার্দ্দন', 'গোবর্দ্ধন', 'কামাখ্যাপ্রসাদ', 'পার্ব্বতী', 'সরস্বতী', 'জগদ্ধাত্রী', সুভদ্রা' নাম আমাদের কানে মধু-বর্ষণ করিতে পারিতেছে না। দুই অক্ষরের নাম হইলেও দেব-দেবীর গন্ধে বা স্পর্শে 'সীতা', 'উমা', 'লক্ষ্মী' প্রভৃতি চলিত নামগুলি যোগ্য আদর পাইতেছে না। 'প্রকাশ', 'অসীম,' 'পূর্ণ,' 'হেম,' 'বেলি,' 'ইলা,' 'ইভা,' 'নীলা' এমনি ধরণের অভিনব মুদ্র, যথেচ্ছাকৃত শব্দগুলিই যেন নাম-করণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। সভ্যতার বিচিত্র বিলাসে ও অদ্ভুত রুচিতে নামগুলি প্রাচীনতার সুদৃঢ় বেড়াজাল পার হইয়া নূতনের কাঁচা ভিত্তিতে আসিতেই মধ্যপথে নামের জটিলতা লঘু হইতে হইতে আজ দুই অক্ষরের জালে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ভয় হইতেছে কালস্রোতে দুই অক্ষর এক অক্ষরে রূপান্তরিত হইয়া একেবারে বিলীন হইয়া যায় বুঝি। হয়ত একদিন একবাক্যে বলা হইবে, নামকরণ অলীক কল্পনা, বর্ব্বরতার পরিচায়ক; মানুষের পক্ষে 'মানুষ' নামই যথেষ্ট, নামের জালে তাহাকে বাঁধা পড়িতে হইবে কেন? আর সব হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু মানুষ যেন নামহীন হইয়া কেবল 'মানুষ' এই অনুদাত্ত উদার নামেই শুধু পরিচিত না হয়।

রত্নাকর

(গল্প)

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

ডিস্‌পেপসিয়ায় ভুগে ভুগে শরীরটা ভেঙে পড়েছিল। তাই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও ডাক্তারের পরামর্শে কিছু দিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে পুরীর সমুদ্র তীরে এসে বাস করছিলাম।

বাসাটি বেশ পছন্দসই হয়েছিল। চারিদিকে বেশী লোকজনের বাস নেই। সুন্দর নির্জ্জন। সামনের অসীম সমুদ্রের নীল ঢেউগুলি আমার চোখের উপর নেচে নেচে যাওয়া-আসা করত। সেই দিককার বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আমি দিনরাত একমনে তাদের সেই খেলা দেখতাম আর সব ভুলে যেতাম। পরে যখন আমার একমাত্র সঙ্গী রাধু এসে ডাকত, "বাবু, খাবার সময় হয়েছে" তখন আমার চমক ভাঙ্গত। একটা নিশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াতাম।

কিছু দিনের মধ্যেই শরীরটা একটু একটু করে সেরে আসছিল। সমুদ্রের সেই অপার্থিব মধুর দৃশ্য আর সঙ্গে সঙ্গে দেহের উন্নতি অনুভব করে সময় বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল। সকাল বিকেল দুবেলা সমুদ্রের কিনারায় খুব খানিকটা বেড়িয়ে আসতাম। শুধু আমি নই। আমার মত অনেকেই যেত। তাদের মধ্যে দু'চার জনের সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। তাঁরা মাঝে মাঝে আমার বাসায় এসে চা পান করে আমায় ধন্য করতেন। অবশ্য আমাকেও নিমন্ত্রণ করতে ভুলতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে কেউ-ই আমার মনে একটিও দাগ কাটতে পারেন না। পেরেছিল খালি একজন—তার সঙ্গে আমার কিন্তু এ পর্য্যন্ত আলাপ হয় নি।

রোজই বেড়াতে গিয়ে দেখতাম সেই লোকটিকে ঠিক এক জায়গায়ই স্থাণুর মত বসে থাকতে সমুদ্রের দিকে চেয়ে। অন্য কোন দিকে তার দৃষ্টি যেত না। বয়স তার প্রায় চল্লিশের উপর, ছিন্ন মলিন একমাত্র বসন। মুখময় দাড়ি-গোঁফ। মাথার চুলও বোধ হয় বহুকাল ছাঁটা হয়নি। লক্ষ্য করলে আর একটা জিনিষ নজরে পড়ত, তার মুখের উপর একটা বিষাদের ছায়া। বহুকাল হ'তে অল্প অল্প করে সেটা এখন যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। সবাই বলত ওটা পাগল। আমার মনে একটা খট্‌কা লাগত। সে যে কখন এসে সেখানে বসত, কখনই বা উঠে যেত— কোথায়ই বা সে থাকত, তা এ পর্য্যন্ত আমি জানতে পারিনি। কতদিন তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য তার ঠিক পাশে গিয়ে হাজির হয়েছি, কিন্তু সে যেন সমাধিস্থ তাই কোনদিন তার সে ধ্যান ভাঙতে সাহস হয়নি।

এমনি করে রোজ তাকে দেখে দেখে তার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ক্রমশ যতই বাড়ছিল, তার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছাটা ততই অধিকতর প্রবল হয়ে উঠছিল। খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে সেদিন তাই রাত্রি শেষ না হতেই বেরিয়ে পড়লাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখলাম সে নাই, বুঝলাম এখনও আসে নি। অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেশীক্ষণ নয়—একটু পরেই দেখলাম সে ধীরপদে সেইদিকেই আসছে। নিকটে এসে সে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল—তার ঠোঁটের কোণে অতি করুণ একটু হাসি ফুটে উঠল, তার পরেই ব্যস্! আমি যখন মনে মনে তার সেই হাসিটুকু বিশ্লেষণ করছিলাম, সেই সময় সে আমাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই সেখানে বসে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববৎ ধ্যানমগ্ন! বেগতিক দেখে আমিও ধীরে ধীরে সেখান হতে সরে পড়লাম।

বেশীদূরে গেলাম না, ভাবলাম আজ এই আপনহারা লোকটির শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করব তাই খানিক দূরে আমিও বসে পড়লাম।

বেলা ক্রমে বাড়তে লাগল। সূর্য্যের তেজ প্রখর হয়ে উঠে বালুকাময় তীরভূমিকে ক্রমশ উত্তপ্ত করে তুলতে লাগল। বায়ুসেবীরা বহুক্ষণ হল যে যার কুটীরে ফিরে গেছে। কেবল আমি সেই সমাধিমগ্ন লোকটির কাছ হতে খানিক তফাতে বসে কেমন করে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গগুলি একটির পর একটি এসে তীর-ভূমির বুকে আছাড় খেয়ে আর্ত্তনাদ করে ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছিল—তাই দেখছিলাম।

ক্রমে এগারটা বেজে গেল। উত্তপ্ত বালুকা রাশির উপর বসে অঙ্গে ফোস্কা পড়বার উপক্রম হ'ল। প্রাতঃকালীন চাটুকু পর্যন্ত আজ আমার ভাগ্যে জোটে নি। তাই ক্ষুধায় পেটের নাড়ীগুলো মাঝে মাঝে কিল্‌বিল্ করে উঠছিল। বিরক্ত হয়ে পড়লাম, সেখানে আরও অপেক্ষা করে একটা পাগলের গতিবিধি লক্ষ্য করা অসম্ভব এবং প্রয়োজনহীন ভেবে বাসায় ফিরে যাব ভাবছিলাম, এমন সময় দেখলাম রাধু আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। তার সঙ্গে ফিরে গেলাম।

পরদিন খুব ভোরে উঠে সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে বাড়ী হতে বার হচ্ছি, এমন সময় দেখি সেই লোকটি আমার বাসার সম্মুখে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনে যেতেই সে বেশ ভদ্রভাবেই একটু হেসে হাত তুলে আমাকে নমস্কার করলে। আমি তার ব্যবহারে এতই আশ্চর্য্য হয়েছিলাম যে, নির্ব্বাক হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কয়েক সেকেন্ড পরে বিস্ময়ের ঝোঁকটা একটু কাটতে জিজ্ঞাসা করলাম, "বন্ধু, আজ এখানে যে?"

আমার কাছে এতখানি দরদ পেয়ে সে একটু প্রীত মনেই বললে, "চলুন, বেড়াতে যাবেন না? আসুন।" আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে চলতে সুরু করল, আমিও নির্ব্বাকভাবে তার অনুসরণ করলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সে বললে, "বসবেন কি?" আমি নিঃশব্দে তার পাশে বসে পড়ে বললাম, "বন্ধু, আমি তোমায় রোজই দেখি। তোমার বাড়ী কোথায়? বাড়ীতে আর কে আছে? এখানেই বা রোজ এমনিভাবে বসে থাক কেন?"

একসঙ্গে আমার মুখে এতগুলি প্রশ্ন শুনে সে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে সে আমাকেই উল্টে প্রশ্ন করলে আমার কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, "আপনি আমায় বন্ধু বলেছেন তাই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, আচ্ছা বলুন ত;

সমুদ্রের নাম ত রত্নাকর। শুনেছি সে পরের কোন জিনিষ কখনও নেয় না, ফিরিয়ে দেয় একথা কি সত্যি?"

কি উত্তর দেব ঠিক ভেবে পেলাম না, মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "পূর্ব্বাপর যখন কথাটা চলে আসছে, তখন অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকতে পারে না।"

একথা শুনে সে আমার মুখের পানে চেয়ে দেখল, আশার আনন্দে চোখ দু'টো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরক্ষণেই নিরাশার অন্ধকারে তার মুখ ঢেকে গেল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ছাড়ল। বুঝলাম কথাটা তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল না। সে-কথা চাপা দিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, "বন্ধু আমার কথার যে একটাও উত্তর দিলে না?" সে বললে "দেখুন, আমি বিক্ষিপ্ত ধূমকেতু। আমার থাকবার, খাবার—আমায় দেখবার মালিক এখন একমাত্র জগন্নাথজী।" "তোমার খাবার ব্যবস্থা কি তবে—" "হাঁ কোন কোন দিন জগন্নাথজীর প্রসাদ পাই।" "আর অন্যদিন?" "অন্য দিন খাবার সময় পাই না।"

সময় পাই না কথাটা শুনে একটু আশ্চর্য্য হলাম, সমস্ত দিন যার এক স্থানে চুপ করে বসে থাকাই একমাত্র কাজ, তার আবার জীবন ধারণের জন্য দুটি কিছু খাবারও সময়ের অভাব। এর চেয়ে আশ্চর্য্য কথা আর কি থাকতে পারে? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল হাঁ, কথাটা মিথ্যা নাও হতে পারে, তবে সময়ের অভাব নয়, ধ্যানমগ্ন নবলব্ধ তাপস বন্ধুটির বোধ হয় সর্বদিন খাওয়ার কথা মনে থাকে না। বাঃ, চমৎকার অতি সুন্দর মহিমময়! ধন্য এর সাধনা—কিন্তু কিসের? সহানুভূতিতে মন ভরে গেল, মুখে বললাম, "বন্ধু, তুমি যদি কিছু মনে না কর—যদি আমার মত তুমিও আমাকে ঠিক বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পার তবে আজ হতে দুই বন্ধুতে একসঙ্গে বাস করতে হবে।"

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে সে কি দেখল সে-ই জানে, তারপর বললে, "এর জন্য আপনাকে অনেকখানি অসুবিধা ভোগ করতে হবে জানবেন," আমি বললাম, "তা আমি পূর্ব্বেই জানি—"

তারপর হতে দুই বন্ধুতে একত্রে বাস করতে লাগলাম। কি জানি কেন তার সাহচর্য্য আমার বেশ ভাল লাগত। একটি কক্ষে তার বাসস্থান নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলাম, সেই ঘরেই সে রাত্রে শয়ন করত। কখন কত রাত্রে এসে যে সে শয্যা গ্রহণ করত তা সর্বদিন জানতে পারতাম না। অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে তার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে রাধু আর আমি দুজনেই ঘুমিয়ে পড়তাম, দিবসেও বন্ধুটিকে তার তপস্থান হতে ডেকে আনতে হত। রাধু এতে যথেষ্ট বিরক্ত হত, আমি যে কেন এই সমস্ত অসুবিধাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছি তা সে বুঝতে পারত না। আমি তাকে বুঝিয়ে রাখতাম—"আহা দেখ রাধু, এই সব গরীব দুঃখী লোককে যদি আমরা না দেখি তবে তারা বাঁচে কিসে?" রাধুর কিন্তু কথাটা পছন্দ হত না, বলত "গরীব-দুঃখী আরও অনেক আছে বাবু।" এই বলে সে আর সেখানে দাঁড়াত না। আমিও কি বলে তাকে বোঝাব ভেবে পেতাম না।

আমার বন্ধুটি রোজ ভোরে আমায় ঘুম ভাঙিয়ে দিত। তারপর খেয়ে দুজনে বেড়াতে যেতাম, কিন্তু ফিরবার সময় আমাকে একা ফিরতে হত, বন্ধু সেখানে তপস্যায় নিরত হত। সন্ধ্যায়ও ঠিক তাই, এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু একটু হাসত। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন সে বললে, "আচ্ছা আপনাকে একদিন সব শোনাব।"

সেদিন দুপুরের পর হতেই কালবোশেখী তার রুদ্রমূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল, সমস্ত দিগন্তব্যাপী কালোয়-কালো! সুনীল নরনারায়ণ শান্ত সমুদ্রও যেন সেদিন হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল! অন্ধকার দুনিয়াটাকে সে যেন আজ নিজে ভৈরব সাজে অত্যুচ্চ তরঙ্গ বিস্তার করে গ্রাস করতে উদ্যত! তার সে মূর্ত্তি দেখে জগৎ ভীত—সন্ত্রস্ত! প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ—ঘন ঘন বজ্রপাতের কড়্কড় শব্দ, আকাশ-ব্যাপী ঘনান্ধকার মেঘমালা—সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ রাশি সব মিলে সেদিন যেন প্রকৃতির উদ্দাম-তাণ্ডব নর্ত্তন আরম্ভ করেছিল!

সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে আমরা দুটি বন্ধুতে বসে নির্ব্বাক বিস্ময়ে বাহির বিশ্বের সেই মহাপ্রলয় অনুভব করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে আমার বন্ধুটি বললে, "এবার আমায় যেতে হবে।" কথাটার মর্ম্ম সম্যক উপলব্ধি করতে না পেরে তার মুখ পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললাম, "কোথায়?" "যেখানে রোজ যাই!"

হঠাৎ সে চলে যেতে উদ্যত দেখে তার হাতটা ধরে টেনে বসিয়ে বললাম, "পাগল নাকি! এই দুর্য্যোগে মানুষ বেরয়!" একটু হেসে সে বললে, "কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে। কিসের মায়া—কিসের একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আমায় এই সমস্ত দুর্য্যোগ অগ্রাহ্য করে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।" "তা হ'ক, আজ এই ক্ষিপ্ত প্রকৃতির মধ্যে আমি তোমায় ছেড়ে দিতে পারব না বন্ধু। আমাকে তাহলে মিত্রদ্রোহী হতে হবে।" এই বলে ধীরে ধীরে আমি তার হাতখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

হতাশ হয়ে বন্ধু বললে, "তবে ঐ দিককার জানালাটা খুলে দিই, সমুদ্র আমাকে দেখতেই হবে, বিশেষ করে আজকের মত এইরকম দেখবার সুযোগ আর হয়ত মিলবে না।"

বাধা দিলাম না। সেদিককার জানালাটা খুলে দিতেই শীতল জলকণা সমেত ঝড় প্রচণ্ড বেগে কক্ষ মধ্যে ঢুকে সমস্ত জিনিষপত্র ওলট-পালট করতে লাগল। প্রায় আধ ঘণ্টা খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখার পর এক সময় বন্ধু বললে, "আমার কাহিনীটুকু শুনবেন?" শরীরের সমস্ত আগ্রহ একত্রিত করে একটি ছোট উত্তর দিলাম—"হাঁ।"

"তবে শুনুন, ওঃ দেখেছেন কি সুন্দর—কি ভয়ানক দুর্য্যোগ! আপনাকে বলে যাই, বলবার বোধ হয় আর সুযোগ মিলবে না।" এই বলে বন্ধুবর তার অতীত ইতিহাস আরম্ভ করল।

"অবস্থা আমাদের নিতান্ত মন্দ ছিল না। বাবার ছোট-

খাট একটু জমিদারী আর তেজারতি করবার ছিল। দু'টি ভাইয়ের মধ্যে আমিই ছিলাম জ্যেষ্ঠ। লেখাপড়াও শিখেছিলাম। কোথায় আমাদের বাড়ী ছিল, বা আমার পিতার নাম কি, একথা জানবার আগ্রহ করবেন না। আমি তা বলব না। আজ বিশ বছর হ'ল আমি এখানে এইভাবে সকলের অজ্ঞাতে আছি। এইভাবেই শেষ পর্য্যন্ত কাটাতে চাই। শেষ হতেও বড় বেশী বিলম্ব নাই, আমি তা বুঝতে পারছি।

"যাক তারপর শুনুন। আমাদের পাড়াতেই ছিল যূথীদের বাড়ী, যূথিকা। ঠিক যুঁই ফুলের মতই শুভ্র নির্ম্মল ছিল সে, ছেলেবেলা হতেই একসঙ্গে খেলাধুলা, পাঠশালায় পড়া ইত্যাদি করেছি, তাকে ছাড়া আমি একদণ্ডও থাকতে পারতাম না। সে-ও না। বাসার বকুনী অগ্রাহ্য করে সমস্ত দুপুর বেলা ঘুরে ঘুরে তাকে কত পেয়ারা, কুল, কাঁচা আম পেড়ে খাইয়েছি। আমি গাছে উঠে পাড়তাম। সে তলায় থেকে কুড়াত, এতটুকু মেয়ে সে—কিন্তু তার কি বুদ্ধি! আর আমাকে এমনি ভয় আর ভক্তি করত যে, আঁচলে করে কুল বা আম কুড়িয়ে রাখত বটে, কিন্তু যতক্ষণ না আমি নেমে এসে নিজ হাতে তাকে দিই ততক্ষণ একটাও খেত না। কোনদিন হয়ত বাবার বকুনীর চোটে গাছ হতে নেমে ভাল ছেলের মত গিয়ে পড়তে বসতাম—সন্ধ্যাবেলা গিয়ে দেখতাম কি জানেন? সবগুলি আম সে কুড়িয়ে রেখে দিয়েছে।

"তাদের বাড়ীর পাশে প্রকাণ্ড বকুল গাছটার তলায় যে ছোট ছোট ফুল তলায় ছড়িয়ে পড়ে থাকত ভোরে উঠে তার কাজ ছিল সেগুলি কুড়িয়ে মালাগাঁথা। আমিও কোন কোন দিন যেতাম। তারপর সন্ধ্যাবেলা দু'জনে সেই মালা দিয়ে দুজনাকে সাজাতাম।

"সব চেয়ে তাকে ভাল লাগত বেশী যখন সে রাগ করত। রাগলে তাকে এত বেশী মানাত যে, আমি তার সেই অন্ধকার মুখ দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারতাম না।

"ক্রমশ দুজনেই বড় হলাম। আমি গ্রামের স্কুল ছেড়ে শহরে পড়তে এলাম, আর সে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম শিখতে লাগল। সে ঠিক নিয়মিতভাবে আমার কাছে চিঠি লিখত। তাতে কত আবদার, কত বেদনা জড়িত থাকত। নানা রকম কাচের পুতুল, জাপানী খেলনা, বল, রঙিগন সুতা, উল্ এই রকম কত কি জিনিষ শহর হ'তে কিনে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হ'ত, সব সময় সব নিয়ে যেতে পারতাম না, তাতে সে কি অভিমান! তাতে আমি হেসে বলতাম, 'পোড়ারমুখী, এত জিনিষ আনলাম, আর একটা আনতে ভুল হয়ে গেছে বলে অমনি রাগ, ওরে সব কি মনে থাকে?'

"সে ঝঙ্কার দিয়ে বলত 'কেন থাকবে না। আমার চিঠিতে কি লেখা থাকে না।' হার মানতে হত, বলতাম, 'আচ্ছা ঘাট হয়েছে। এর পর বছর দেখিস সব নিয়ে আসব', ব্যস্, এইটুকুতেই সব রাগ জল হয়ে যেত। কোন কোন বার আবদার ধরত তাকে শুদ্ধ শহর দেখাতে নিয়ে আসতে। আমিও তাকে আশা দিয়েছিলাম। কিন্তু সুযোগ হয়নি। তার কারণ বাবা ছিলেন আমার বিরুদ্ধে।

"কথাটা খুলেই বলি। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যূথীকে পত্নীরূপে পাবার আশা করে আসছিলাম। যূথীর বাবারও তেমন অমত ছিল না। কিন্তু তারা ছিল গরীব। দেনা-পাওনাতে গরমিল হওয়ায় আমার বাবা অন্যত্র আমার সম্বন্ধ স্থির করলেন। আমি ঘোরতর আপত্তি জানালাম। তাতে বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে নানারূপ ভয় দেখালেন। কিন্তু আমি তাতেও বিচলিত না হওয়াতে তিনি আমায় বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁর আশা ছিল এবার আমি মত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হব। কিন্তু তা হয়-নি।

"যূথীর সঙ্গে দেখা করে বিদায় চাইলাম, তাকে জানালাম যে, আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তাতে সে কি উত্তর দিলে জানেন? বললে, 'যদি আমায় তুমি কখনও ভালবেসে থাক তবে আমায় ফেলে রেখে তুমি যেতে পাবে না। তুমি যেখানেই যাও, যেমনভাবে থাক, আমি সব সময়েই তোমার সঙ্গে থাকব'।

"তাই একদিন তাকে বিবাহ করে আমি জন্মের মত জন্মভূমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। নানা জায়গায় ঘুরে অবশেষে এই পুরীতে এসে বাসা বাঁধলাম, সুখী কপোত দম্পতির মত দুজনে নিরুপদ্রবে বাস করছিলাম। কিন্তু কার অভিশাপে জানি না, আমাদের সে সুখে বাজ পড়ল নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে।

"আমাদের বিবাহ হয়েছিল পরস্পরের অঙ্গুরী বদল করে। এই দেখুন সেই নিদর্শন।" এই বলে সে আমাকে অতি যত্নে পরণের কাপড়ের খুঁট হতে খুলে দেখালে একটি আংটি তাতে খোদিত আছে 'যূথিকা'।

একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'তারপর?"

একটু শুষ্ক হাসি হেসে সে বললে, "তারপর একদিন দুজনে খেয়াল করে নৌকায় চড়ে সমুদ্রে বেড়াতে বার হলাম। অতি কুক্ষণে আমরা যাত্রা করেছিলাম। উচ্ছ্বসিত আনন্দে বিভোর হয়ে দুজনে উপকূল ছাড়িয়ে কতদূর চলে গেছলাম জানি না। সহসা আকাশের এক কোণে এক খণ্ড মেঘ উঠে দেখতে দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে ফেললে। তারপর, ওঃ—সে কি ভীষণ দুর্য্যোগ! সেই হতে আজ বিশ বছর ধরে আমি এখানে সেরূপ দুর্য্যোগ দেখি নি। আমাদের দু'টি ক্ষুদ্র প্রাণকে গ্রাস করবার জন্য মহাসমুদ্রের সে কি প্রবল ইচ্ছা! তার ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে আমরা বেশীক্ষণ যুদ্ধ করতে পারলাম না। হঠাৎ একটা ঘূর্ণী ঝড় এসে আমাদের নৌকা উল্টে দিলে। যূথী আর্ত্তনাদ করে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর কি হল কিছু জানি না। জ্ঞান হলে দেখলাম আমি সমুদ্রতীরে বালুর উপর পড়ে রয়েছি। ঝড়-বৃষ্টির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সুনীল নির্ম্মল নক্ষত্রখচিত জ্যোৎস্নাময় আকাশতলে আমি সম্পূর্ণ একা পড়ে আছি।

"তারপর হতে তাকে অনেক খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও পাইনি। রত্নাকর আমার সে ক্ষুদ্র রত্নটির লোভ বুঝি এখনও ছাড়তে পারে নি। তাই আজ বিশ বছর ধরে আমি সমুদ্র-তীরে বসে তার কাছে প্রার্থনা করছি—আশা রত্নাকর তাকে ফিরিয়ে দেব।" বন্ধু নীরব হল।

বাহিরে তখনও সেইরূপ দুর্য্যোগ চলছিল। কনবার

(শেষাংশ ৫২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাচীন রোমের ক্রীড়ামঞ্চে পশু-পক্ষী

জীবজন্তুর লড়াই এবং পরিণামে উহাদের যন্ত্রণাপূর্ণ নিষ্ঠুর প্রাণত্যাগ বা হত্যা প্রদর্শন দ্বারা যে আমোদ-প্রমোদের সৃষ্টি করা হইত প্রাচীন রোমে, তাহার প্রদর্শন-স্থান নির্দিষ্ট ছিল ক্রীড়ামঞ্চে, যাহার নাম দেওয়া হইত এম্ফিথিয়েটার (amphitheatre); মধ্যস্থলের উন্মুক্ত স্থানটিকে গোলাকারে বেষ্টন করিয়া ছিল বসিবার আসন, এক সারির ঊর্দ্ধে অন্য সারি। কোথাও পাহাড়ের প্রস্তর-গাত্র খোদিত করিয়া গেলারীর মত এই আসন প্রস্তুত হইত যেমন ওলিম্পিয়ার এম্ফিথিয়েটারে। মধ্যস্থলের উন্মুক্ত স্থানটির নাম দেওয়া হইত এরিনা (arena), উহা বালিদ্বারা আবৃত রাখা হইত; কারণ গ্লাডিয়েটারগণ যখন জানোয়ারগুলির সহিত লড়াই করিবে তখন বিশেষ অসুবিধা না হয়। অনেক কুস্তীর আখড়ায় এই প্রকারে প্রতিযোগিতার স্থল বালি দ্বারা অবৃত করা হয়। এই এরিনায় মানুষে-জানোয়ারে, জানোয়ারে জানোয়ারে কত প্রকার লড়াই-ই না হইত প্রাচীন রোমে! আবার পরবর্ত্তীকালে যে পালিত শিক্ষিত বন্যজন্তুর ক্রীড়া প্রদর্শন করা হইত, তাহাও অধিকাংশ সময়ে এই ক্রীড়ামঞ্চের এরিনায়। যে-সকল দুরন্ত জন্তু জানোয়ার দ্বারা লড়াই করান হইত, সেইগুলিকে আসন বেষ্টনের নিম্নে সুড়ঙ্গবৎ গুহায় রাখা হইত। ঐ গুহার মুখ এরিনা-পার্শ্বে ছিল; ঐ গুহামুখ দৃঢ়বদ্ধ দ্বারে আচ্ছাদিত থাকিত, কেবল প্রদর্শনীর সময় খোলা হইত—জানোয়ারগুলিকে এরিনায় আনিবার জন্য।

"প্রাচীন রোমে জন্তু-জানোয়ার" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা মার্শিয়ালের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে প্রাচীন রোমানগণের জন্তু-জানোয়ার হত্যার নিষ্ঠুরতাই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বিবৃতির ভিতর প্রাচীন রোমানগণের বন্য-পশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কতক আভাষ পাওয়া যায়। মার্শিয়াল এমনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, একই খাঁচায় একটি মেষের সহিত একটি সিংহ নির্বিবাদে বাস করিতেছে। বিভিন্ন আহারস্থান হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, সামান্য মাত্রও বিরোধের ভাব তাহাদের ভিতর নাই। আবার একথাও তিনি বলিতে ছাড়েন নাই যে, হঠাৎ একটি নিরীহ শিক্ষিত সিংহ ক্ষেপিয়া উঠিয়া এরিনায় রুখিয়া দাঁড়ায় এবং রক্তসিক্ত এরিনার বালিরাশি ঘাঁটিয়া আলুগা করিবার কাজে নিরত বালকদের দুইটিকে আঁচড়ে কামড়ে মারিয়া ফেলে।

মার্শিয়াল এমন দৃষ্টান্তের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে—এম্ফিথিয়েটারের আসনে দলে দলে দর্শক উপস্থিত,—প্রদর্শনী আরম্ভ হইল। এরিনায় একটি মাত্র মানুষকে স্তম্ভের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে; বন্য অশিক্ষিত দুর্দ্দান্ত জানোয়ারগুলিকে এরিনায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু জন্তুগুলি কিছুতেই মানুষটির উপর চড়াও হইতেছে না। এরিনার অপরিচিত আব-হাওয়া, দর্শকদিগের হল্লা এবং নেহাৎ অবিশ্বাস্য একটি শিকার—জানোয়ারগুলির প্রাণে আতঙ্কেরই সৃষ্টি করে; পলায়নে অক্ষম দৃঢ়রূপে আবদ্ধ মানুষটিকে লক্ষ্য করিয়াও উহারা আক্রমণ করিতে ভরসা পায় না। তখন ঐ দণ্ডিত ব্যক্তিকে আদেশ করা হয় এমন ভাবে হস্তপদ চালনা ও চীৎকার করিতে যাহাতে জানোয়ারগুলি উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে।

মার্কাস অরেলিয়াসের পুত্র সম্রাট কোমোডাস্ রাজ্য-শাসন ব্যাপারে কোনই ধার ধারিতেন না; তিনি লিপ্ত থাকিতেন খেলা-ধুলা লইয়া, বিশেষ করিয়া এম্ফিথিয়েটারের বন্যপশু প্রদর্শনী ও লড়াই লইয়া। তিনি নিজেও জন্তু-জানোয়ারের সহিত লড়াই করিয়া উহাদের নিধন করিতে ওস্তাদ ছিলেন—নিজস্ব ক্রীড়া-মঞ্চেও এবং প্রকাশ্য এম্ফিথিয়েটারে জনগণের সমক্ষেও। এবং পশু হত্যার এই নিপুণতার জন্য তিনি নিজেই নিজের নামকরণ করিয়াছিলেন—রোমান হারকিউলিস্।

তিনি দেশবিদেশ হইতে আনীত দুষ্প্রাপ্য জন্তু-জানোয়ার দ্বারা রোমের রাজকীয় পশুশালা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ডিও তাঁহার রাজসভায় অবস্থান করিয়া সম্রাটের শিকার-বিলাস প্রত্যক্ষ করিতেন; তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, সম্রাট হাতী, হিপোপটেমাস, গণ্ডার, বাঘ, জিরাফ প্রভৃতি হত্যা করিয়াছেন এবং একদিনে ১০০টি ভল্লুক নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঐতিহাসিক হেরোডিয়ানের মতে সম্রাট অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তীর দ্বারা অষ্ট্রিচ (Ostrich) বা উট পাখী-গুলির মস্তকচ্ছেদন করিতেন, আর মুণ্ডহীন দেহটা কিছুদূর পর্যান্ত তীব্রবেগে ছুটিয়া যাইত, যেন উহার কোনই অনিষ্ট হয় নাই।

পোষা পাখী

সেই অতীত যুগেও রোমানগণ ষ্টারলিং পাখী পুষিত এবং উহাকে নানা কথা শিখাইত। ষ্টেটিয়াস বলেন, পাখী-গুলির অদ্ভুত শক্তি ছিল, উহারা যে শব্দ শুনিত তাহাই মুখস্থ করিয়া রাখিত এবং সময়ান্তরে স্মরণ করিয়া উচ্চারণ করিত। প্লিনি বলেন, প্রাচীন রোমানগণ পাখীদিগকে গ্রীক এবং লাটিন শব্দ ও বাক্য মুখস্থ করাইত।

কিন্তু ষ্টারলিং অপেক্ষাও 'পাই'-পাখীর আদর ছিল বেশী —কারণ উহারা যে কোনও বাক্য স্পষ্টতররূপে উচ্চারণ করিতে পারিত। প্লিনি বলেন, 'পাই'গুলি উহাদের বাক্য-উচ্চারণে আনন্দ অনুভব করিত এবং স্মরণ করিয়া নূতন নূতন কথা বলিতে যে বিপুল চেষ্টা করিত, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইত। প্লিনি আরও বলেন যে, এই প্রকারে ভুলিয়া যাওয়া কথা স্মরণ করিবার প্রয়াসের শ্রমে কত 'পাই' পাখী মৃত্যু বরণ করিয়াছে। উহাদের ত্রুটি এই যে, পুনঃ পুনঃ না আওড়াইলে বা উহাদের স্মরণ করাইয়া না দিলে অধিক-দিন উহারা শেখা কথা মনে রাখিতে পারে না। আবার এমনও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, যে-কথা উহারা শত চেষ্টায়ও মনে আনিতে পারিতেছে না, সে-কথাটি যদি বলিয়া দেওয়া যায়, তবে উহারা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠে। 'পাই' পাখীর উচ্চারণ পরিষ্কার হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে যে তোতা পাখী মানুষের মতই স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে সে প্রকারের তোতা পাখী রোমানদিগের অজানিতই ছিল।

কাক এবং দাঁড়কাকও সেকালে রোমান সাম্রাজ্যে পোষা হইত তোতার মত কথা শিখাইবার জন্য। কথিত আছে, যখন একটেভিয়ান বিদ্রোহী এণ্টনিকে পরাস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিল, তখন এক ব্যক্তি তাহার নিকট একটি কাক

বিক্রয় করিল। ওক্‌টেভিয়্যান কাকটি ক্রয় করিল ২০,০০০ সেস্টার্স (অর্থাৎ প্রায় ১৩৫ পাউন্ড) মূল্যে। কারণ কাকটি বলিতে শিখিয়াছিল—"Ave Caesar victor imperator." কিন্তু বিক্রেতার এক বিশ্বাসঘাতক বন্ধু তখন জানাইল যে, উহার আর একটি শিক্ষিত কাক রহিয়াছে, সেটিকে আনিতে বলা হউক। সেই কাকটি আনা হইলে দেখা গেল, সেটি বলে—একেবারে এণ্টনীর গুণগান—"Ave victor imperator Antoni." বিক্রেতা প্রকৃত ব্যবসায়ীর মত দুটি পাখীর মুখে দুই প্রকার কথা দিয়াছিল। যে-ই যুদ্ধে জয়ী হউক, সেই পাখী লইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিতে পারিবে। ব্যবসা-বুদ্ধিই এখন তাহার কাল হইল, কারণ তাহার প্রাপ্ত মূল্য হইতে অর্দ্ধেক ঐ বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর হস্তে দিতে সে বাধ্য হইল।

ওক্‌টেভিয়্যানের পাখীক্রয় সম্বন্ধে আর একটি কৌতুক-কর কাহিনী প্রচলিত আছে। ঐ কাকটি ছাড়া ওক্‌টেভিয়্যান আরও একটি পাই এবং ষ্টারলিং কিনিয়াছিল, ঐগুলিও তাহারই স্তুতিবাদ আওড়াইত। লোভে পড়িয়া এক মুচীও একটি কাক কিনিয়া উহাকে অনুরূপ সম্রাটের স্তুতিবাদ শিখাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু পাখীটি কিছুতেই শিখিতে পারে না। অবশেষে বিশেষ বিরক্ত হইয়া মুচী বলিতে থাকে, "শ্রম ও টাকাকড়ি বৃথায় গেছে", সেদিন হইতে পাখীটি ঠিক ঠিক অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে। পরে তাহাকে সম্রাটের প্রশংসাবাণী শিখান হয় এবং তাহাই ক্রমাগত আওড়াইতে বাধ্য করা হয়। পাখীটি আবার মাঝে মাঝে মুচীর নিকট হইতে প্রথম শেখা "শ্রম ও টাকাকড়ি বৃথা গেছে" কথাটি না উচ্চারণ করিয়া পারে না।

একদিন সম্রাট এই পথে যাইবার সময় পাখীটির মুখে নিজ গুণ-গান শুনিতে পায়। কিন্তু সম্রাট বলে যে, এমন বন্দনা গাহিবার পাখী তাহার ঢের রহিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তেই পাখীটি বলিয়া উঠে—"শ্রম ও টাকাকড়ি বৃথা গেছে।" সম্রাট হাসিয়া ঐ পাখীটিকেও ক্রয় করিয়া লয়।

সেকালের আর একটি কাকের ইতিহাস অতি চমকপ্রদ। কচি-ছানা একটি ক্যাস্টর মন্দিরের ছাদ হইতে আসিয়া রাস্তার অপর পারের এক মুচীর দোকানে ঠাঁই লয়। মুচী দয়াপরবশ হইয়া উহাকে প্রত্যহ কিছু খাবার দিতে থাকে। আশ্চর্য্য দেখা যায় এই, যখন কাকের ছানাটি কথা বলিতে সমর্থ হইল, তখন প্রত্যহ প্রাতে একবার 'ফোরামে' গমন করে এবং যেখানে বক্তার মঞ্চ, দি রোষ্ট্রা (The Rostra) সেখানে বসিয়া সম্রাট টিবেরিয়াস, তাহার পোষ্যপুত্র ও পুত্রকে অভিবাদন জানায়; তাহার পর যে-ই নিকটে আসুক, তাহাকেই প্রণতি জানায়। কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া আবার ফিরিয়া আসে মুচীর দোকানে। বছরের পর বছর পাখীটি এইভাবে প্রত্যহ প্রাতঃকালে অভিবাদন জানায়। একদিন দৈবক্রমে অন্য এক মুচীর দোকানের মালিক পাখীটিকে মারিয়া ফেলে।

পাখীটির হত্যায় রোমের এই অঞ্চলের লোকেরা এতটা উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, হত্যাকারী মুচীটিকে নিজ দোকান বন্ধ করিয়া পলাইতে হয়। কিন্তু তাহাতেও সে নিস্তার পায় না। সে যেখানে যায়, সেইখানেই এই অঞ্চলের লোকেরা অনুসরণ করে এবং পরিশেষে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। এই প্রকারে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া পাড়ার লোকেরা পাখীটির সমাধির ব্যবস্থা করে—সেই পাখীর শবানুগমনে যোগদান করিতে মহা ভীড় হইয়াছিল, কারণ সেই পল্লীর একটি নর-নারীও অনুপস্থিত থাকে নাই।

—পাঠরত বেবুন—

মিশরে টলেমি রাজবংশের শাসনকালে বেবুনগুলিকে অক্ষর শিক্ষা দেওয়া হইত এবং নৃত্য করিতে, বাঁশি বা বীণ বাজাইতেও শিখান হইত। সম্ভবত প্রথম টলেমির রাজত্ব-কালে শিক্ষিত বানর লইয়া বাজিকরগণ ইটালীতে যাইত খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে। পম্পিয়াই শহরের যে-সকল ফ্রেস্‌কো-চিত্র সংরক্ষিত তাহার ভিতর দেখা যায়—বানরের খেলা দেখান হইতেছে, এমন দৃশ্যও অঙ্কিত রহিয়াছে। প্লিনি নিজে না দেখিলেও তিনি বলেন, তিনি শুনিয়াছেন যে, এমন শিক্ষিত বানর সেই যুগে নানা স্থানে ছিল, যেগুলি ছকের উপর ঘুঁটি বসাইয়া চেকার্স (checkers) খেলিয়া থাকে। রোমের একটি লাঙ্গুলহীন বানর বা এপ্ (ape)-য়ের বিষয়ে জুভ্যানেল বলেন—রোমের বুলেভার্ড-য়ে গেলে সকল সময়ই দেখা যাইত, একটি এপ্ সৈনিকের মত শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া এবং ঢাল একটি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কখনও উহাকে একটি ছাগলের পিঠে চড়ান হইত সওয়ার হইবার কৌশল শিখাইবার জন্য; আবার কখনও উহাকে বর্শা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুড়িয়া ফেলিতে শিক্ষা-দান করা হইত। এইল্যান বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বানরকে রথ চালাইতে দেখিয়াছেন। এই বানরও লাঙ্গুল-হীন এপ্ এবং আফ্রিকার উত্তরাংশস্থ বারবারি প্রদেশ হইতে আনীত। কারণ বারবারি এপ্ যেমন মানুষের অনুকরণ করিতে পারে নিখুঁত এমন আর কোনও বানর-জাতি নহে।

রোমান সাম্রাজ্যে বিড়ালকে গৃহপালিত পশুরূপে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অধিবাসিগণ গৃহের ইঁদুর নির্ম্মূলে করিবার জন্য খুদে ভোঁদড় বা বেজি এবং কখনও মেরু-বিড়াল আনিয়া পুষিত। বিড়ালকে গৃহপালিত করিবার পরে আর ইঁদুর মারিবার জন্য অন্য কোনও জানোয়ারকে আনিতে হয় নাই। গ্রীসেও ঠিক এইভাবেই বিড়াল গৃহপালিত হয় এবং তাহার পূর্ব্বে মেরু-বিড়াল, বেজি প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

এ-কথা বোধ হয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রোমান সাম্রাজ্যে ডরমাউসকে পুষিবার কথা কিন্তু কোনও ঐতি-হাসিকই উল্লেখ করেন নাই, অথচ প্রাচীন রোমানদিগের ডর-মাউস ছিল অতি প্রিয় খাদ্য। ডরমাউস ঠিক ইঁদুর নয়, গেছো-ইঁদুর বলিলে কতকটা কাছাকাছি হয়, কারণ—কাঠ-বিড়ালী এবং ইঁদুর এই দুইয়ের মাঝামাঝি এক জাতীয় ক্ষুদ্র জন্তু হইল ডরমাউস। এমিয়েনাস মারকেলিনাস যে বিদ্রূপাত্মক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, রোমক অভিজাত-বংশীয়দের কথাবার্ত্তায় অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রকাশের, তাহাতে জানিতে পারা যায় রোমানগণের লোভনীয় খাদ্য ছিল

ডরমাউসের মাংস। ডরমাউসের মাংস মধুতে ডুবাইয়া পোস্তদানা উপরে ছড়াইয়া পরিবেশন করা হইত বলিয়া মনে হয়। এমিয়েনাস বলিয়াছেন—খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের রোমক হোমরা-চোমরাদের আলাপ ছিল কি বিরক্তিকর! উহারা যেন নিজ নিজ খাদ্যের মাছ, পাখী, ডরমাউস প্রভৃতির আকার-আকৃতি ওজনাদি ব্যতীত বলিবার মত আকর্ষণীয় বস্তু আর কিছুই পায় না।

শিকার সম্বন্ধে একটি কবিতায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় চিতাবাঘ বন্দী করিবার কৌশলের। উহাতে বর্ণিত আছে যে, আফ্রিকায় চিতাবাঘ ধরিবার কায়দা হইল বনমধ্যে কতকগুলি গর্ত্ত করিয়া উহাতে জল দেখা দিলে, ঐ জলের সহিত অতি কড়া মদ ও অন্য তীব্র মাদক-দ্রব্য মিশাইয়া রাখা হয়। চিতা জলপান করিতে আসিয়া ঐ মদ-মিশ্রিত জল পান করিয়া বেহুঁস হইয়া পড়ে। আবার কাহারও অভিমত, মাদক-দ্রব্যের প্রতি জানোয়ারদের স্বাভাবিক টান রহিয়াছে, সুতরাং একবার মদের আস্বাদ পাইয়া নেশার বশে পুনঃপুন ঐ গর্ত্ত খুঁজিতে থাকে এবং না পাইয়া এমন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়ে যে, সেই অবস্থায় মদ কেহ দিলে অনায়াসে তাহার হস্তে বন্ধন গ্রহণ করে।

তবে এই উপায়ে চিতাবাঘ ধৃত করিবার কথা ভারতে কিম্বা এশিয়ার অন্য মুলুকে কখনও শোনা যায় না। জলের গর্ত্তে মদ মিশাইয়া ধরা যায় ছোট ছোট মাংসাশী জানোয়ার যেমন ভোঁদড়, খট্টাশ প্রভৃতি।

এই ডরমাউস প্রসঙ্গে আর একটি অদ্ভুত প্রথার কথা উল্লেখ না করিলে রোমানদের সে-কালের মেজাজের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। জীব-হত্যা যখন রোমকদিগকে আর কৌতুক প্রদান করিত না, পরিবর্ত্তে জীব-জন্তুগুলির খেলাই তাহাদের আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত হইল, তখন ক্রীড়ামঞ্চে না হইলেও ধনিকদিগের গৃহে অভ্যাগতদের মনোরঞ্জনে ইঁদুরের দৌড় প্রদর্শিত হইত। লোভনীয় খাদ্য সম্মুখে ধরিয়া উহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া দৌড়ে প্রবৃত্ত করা হইত। দৌড়শেষে বিজয়ীদিগকে অধিক খাদ্য দেওয়া হইত। এই প্রকারে চমৎকার কৌতুক সৃষ্টি ছিল সে-কালের রোমকদিগের একটা খোশ-খেয়াল।

সম্রাট ট্রেজানের আমলে যে ব্যাপক হত্যা অনুষ্ঠিত হয় ১১,০০০ জন্তু-জানোয়ারের, তাহার পর হইতেই পশু-হত্যা যেন আর সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বেই সে-কথা বলা হইয়াছে, "প্রাচীন রোমের জন্তু-জানোয়ার" প্রবন্ধে। তবে এই প্রথা ক্রমবিলোপের প্রধান এক কারণ যে, অর্থের অস্বচ্ছলতা তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিরাট রোমান সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি যখন নিম্নগামী হইতে লাগিল, অর্থ-বিভবের তেমন প্রাচুর্য্য আর রহিল না, তখন বহু ব্যয়ে বিদেশ হইতে জন্তু-জানোয়ার আমদানী করিবার ব্যাপকতাও ক্রমশ হ্রাস পাইতে লাগিল। কাজে কাজেই এরিনাতে পশু-হত্যা-প্রদর্শনও দিনের পর দিন কমিয়া আসিল। ইতিমধ্যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচারিত হইল; উহার প্রভাব যদিও এরিনার পশু-হত্যার একেবারে পরিসমাপ্তি আনিতে পারিল না, তথাপি রোমানদের নিষ্ঠুর আমোদ-প্রমোদে একটা মাত্রা টানিয়া দিতে সমর্থ হইল। তখন হিংস্র জন্তু ভিন্ন অন্য জন্তুগুলিকে আর বড় এরিনায় দেখা যাইত না এবং যোদ্ধা গ্লাডিয়েটরের সংখ্যাও হ্রাস প্রাপ্ত হইল।

খৃষ্টাব্দের চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে শেষে এমন দাঁড়াইল যে, পশু-হত্যার পরিবর্ত্তে লোকে পশুর খেলা দেখিতেই আগ্রহান্বিত হইল বেশী। তাই পশুর খেলার যে হাস্য-কৌতুকময় দিক, তাহাই উদ্ভাবিত হইল এবং তাহাই জনপ্রিয় হইয়া পড়িল। বন্য পশু অপেক্ষা শিক্ষিত, পালিত পশুর কৌশলবাগুড়া দর্শনে জনগণ আকৃষ্ট হইতে লাগিল, গ্লাডিয়েটরের পশু-যুদ্ধে মৃত্যু—এই দৃশ্যের উপর সকলের বিতৃষ্ণা জন্মিল। এই সময়ে যে সকল দণ্ডিত অপরাধীকে এম্ফিথিয়েটারের এরিনায় বন্য দুরন্ত জানোয়ারগুলির মুখে আগাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল, তাহাদিগকে আর বাঁধিয়া ত রাখাই হইত না, বরং জনগণের ব্যাপক আগ্রহে তাহাদিগের হস্তেও আত্মরক্ষার অস্ত্র প্রদান করা হইতে লাগিল, যদিও সর্ব্বাঙ্গ তাহাদের অনাবৃতই থাকিত, কোন প্রকার বর্ম্ম পরিধান করিতে দেওয়া হইত না—গ্লাডিয়েটরদের ন্যায়। রোমানদিগের আমোদ-প্রমোদের মোড় আরও ঘুরিয়া গেল—তখন আর কোন অপরাধীকে হিংস্র জন্তুর সম্মুখে নিক্ষেপ করা হইত না, এমন কি গ্লাডিয়েটরদল নিয়োগও পরিত্যক্ত হইল।

সেই সময় হইতে চলিল জানোয়ারে জানোয়ারে লড়াই। তাহাই এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহ এবং ভল্লুকের সঙ্গে লড়াই করিতে ষাঁড়ের দলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, যেমন করা হইত পূর্ব্বে অন্যপ্রকারে। এমনও ব্যাপার এরিনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিংহ এবং ঘোড়ার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে—সিংহটা ঘোড়ার চাঁটে কাবু হইয়া যুদ্ধ পরিহার করিয়া দূরে কোণে পলায়ন করে। এখনও সাহসী গ্লাডিয়েটর, সিংহ, ভল্লুক অথবা চিতা বাঘের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়, কিন্তু এমন বর্ম্মাচ্ছাদিত ও সতর্ক ব্যবস্থার সহিত যেন কোনও প্রকারে প্রাণ হানি না হয়। আবার লোহার ঝুড়িতে মানুষ বসাইয়া তাহা অকস্মাৎ এরিনায় নামাইয়া দেওয়া হয় এবং পর মুহূর্ত্তেই টানিয়া তুলিয়া নেওয়া হয়, যেন জানোয়ার-গুলি মানুষদের কোনও অনিষ্ট করিতে না পারে।

আর একটি কৌশল আজকাল উদ্ভাবিত হইয়াছে— উহা হইল লৌহ-গোলক (canistrum)। ইহাকে নিরাপদই বলা যায়—সঙ্গে সঙ্গে অশেষ কৌতুককরও বটে। লোহার ফাঁপা মস্ত বড় একটা বল—সারা গায়ে চালুনীর মত ছ্যাঁদা। উহার ভিতরে একটি মানুষকে প্রবেশ করান হয়; অবশ্য যে-সে লোক উহার ভিতর প্রবেশ করিতে কিম্বা অবস্থান করিতে পারে না। সার্কাস পার্টিতে যে-সকল ব্যায়ামবীর অস্থিহীনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নানা প্রকারে দেহকে অদ্ভুতভাবে বক্র করিয়া দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করে, সেই প্রকারের অস্থিহীনবৎ লোক ঐ লৌহ-গোলকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তৎপর গোলকটিকে দৃঢ়রূপে আঁটিয়া দেওয়া হয় যেন কোন অবস্থাতেই খুলিয়া না যায়। সেই অবস্থায়

মনুষ্যসহ গোলকটি এরিনায় জন্তুগুলির মাঝে ফেলিয়া দেওয়া হয়। গোলক মধ্য হইতে মানুষটি জানোয়ারদের সুড়সুড়ি দিতে থাকে, আর জানোয়ারগুলি রুখিয়া উঠিয়া গোলকটির উপর থাবা মারে। গোলক গড়াইয়া কিছুদূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসে আপন গতির প্রতিক্রিয়ায়—জানোয়ারগুলি ইহাকে অদ্ভুত দুষমন ভাবিয়া কোনটা ভয়ে কাঁচুমাচু হয়, কোনটা দ্বিগুণ গর্জ্জনে চড়াও হয় গোলকের উপর। কিন্তু গোলককে কাবু করিতে পারে না, গোলক পূর্ব্ববৎ একবার পশ্চাতে একবার সম্মুখে আনাগোনা করিতে থাকে। সেই সময় জানোয়ারগুলির নিষ্ফল আক্রোশ, উহাদের হতাশাব্যঞ্জক করুণ আর্ত্তনাদ, কোনটির কানফাটা সিংহনাদ—দর্শকদের হাস্য ও কৌতুকের উদ্রেক করে।

আধুনিক এই সকল হাস্য-কৌতুকের কৌশলে অবশ্য প্রাণহানির সম্ভাবনা নাই, সে ঝক্কি পুরোপুরিই বারিত হইয়াছে; তথাপি কোনও প্রকার অনিষ্টেরই যে আশংকা লোপ পাইয়াছে, এমন কথা বলা কিছুতেই চলে না। লোহার ঝুড়ি লোহার গোলক, গ্লাডিয়েটরের বর্ম্মাচ্ছাদন প্রভৃতি ভেদ করিয়াও আঁচড় লাগা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে এই কথা ঠিক যে, সামান্য একটা আঁচড় বা কামড় দ্বারা আহত হওয়া ছাড়া একেবারে প্রাণ হারাইবার কোনই আশংকা আর নাই। এখন সর্ব্বাগ্রে সকলেরই দৃষ্টি—যে শিক্ষক বা যোদ্ধা এরিনায় পশুদের মধ্যে অবতরণ করে, তাহার নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থা হইয়াছে কি না। এরিনার চারিদিকে কিছু ব্যবধানেই একটি করিয়া লোহার দ্বার আছে, ঐ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দুই ব্যক্তি দুই পাল্লা ধরিয়া আছে। যখনই কোনও যোদ্ধা পশুর সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া কিম্বা শ্রমে ক্লান্ত হইয়া পলায়নপর হইবে, তখনই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ দ্বার-রক্ষকগণ ইঙ্গিত করিবে, যোদ্ধা সে দ্বারে প্রবেশ করা মাত্র দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, অনুসরণকারী পশু আর প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সুতরাং প্রাচীন রোমের ন্যায় এখনও এম্ফিথিয়েটারের এরিনায় পশু-যুদ্ধ প্রচলিত, তবে বর্ত্তমানে প্রধান পরিবর্ত্তন এই যে, ইহাতে হত্যার কোনই স্থান নাই আর।

রত্নাকর

(৫২৩ পৃষ্ঠার পর)

কিছুমাত্র লক্ষণ নাই, বরং উত্তরোত্তর বাড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে জলের ছাঁট এসে ঘরের মেঝেতে জল দাঁড়িয়ে গেছে। এ সমস্ত দেখেও আমার চেয়ার ছেড়ে উঠতে আদৌ ইচ্ছা হচ্ছিল না। তখন কেবল ভাবছিলাম এই কাহিনীটা—যে হারিয়ে গেছে—মৃত্যুর কোলে যে চিরদিনের জন্য শান্তিলাভ করেছে তাকে ফিরে পাবার জন্য যে আজ বিশ বছর ধরে এই লোকটা সমস্ত জীবন ব্যর্থ করে বসে আছে—একি ভালবাসা—না পাগলামি!

হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি দ্বিগুণ জোরে আরম্ভ হ'ল। জানালাটা খুলে রাখা এবার অসম্ভব বলে উঠে বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বন্ধুবর লাফিয়ে উঠে আমাকে বাধা দিলে, "থামুন, থামুন,—হয়ে এসেছে—হ্যাঁ ঠিক, ঠিক এই রকম, দেখেছেন আপনি কখনও এই রকম দুর্য্যোগ! বাহবা বাহবা!" আনন্দে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। আমি তার এই ভাব বিপর্যায়ের কারণ কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খোলা জানালা দিয়ে বাহিরের ঘোর অন্ধকারের পানে খানিকক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবার সে বলে উঠল "ঐ ঐ-সে আসছে। হ্যাঁ নিশ্চয়। জানেন, আজ বিশ বছর ধরে আমি এইরূপ একটা দুর্য্যোগের প্রতীক্ষা করছিলাম। আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে। এমনি দুর্যোগে তাকে রত্নাকর আমার কাছ হ'তে ছিনিয়ে নিয়েছিল, আজ আবার সেই রকম ভাবেই তাকে ফিরিয়ে দেবে।"

ক্রমশ সে অধীর হয়ে উঠল।

"না আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। সে আবার আমায় খুঁজবে।" এই বলে সে আমার হাত হতে নিজেকে জোর করে মুক্ত করে নিয়ে অতি দ্রুতবেগে বাহিরের অন্ধকারে মিশে গেল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে ধরে রাখতে পারলাম না।

* * *

প্রায় শেষরাত্রে ঝড়-বৃষ্টি কমতে আলো আর রাধুকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুকে খুঁজতে বার হলাম। অনেক কষ্টের পর সমুদ্রের কিনারায় এক স্থানে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় পাওয়া গেল। কিন্তু—ওকি! সে আঁকড়ে ধরে আছে কি! ভাল করে আলো নিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি শীর্ণা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ! ডাকলাম "বন্ধু!" আমার ডাকে সে চোখ মেলে চেয়ে দেখল। আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললাম, "এমনি করেই নিজে মৃত্যু বরণ করলে বন্ধু!"

বন্ধু একটু হাসল—অতি করুণ কিন্তু মধুর। একটু পরে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বললে, "এই যূথিকা। আগের মত সবই ঠিক আছে, কেবল রোগা আর দেখছি গলায় এই মাদুলীটা, কেন জানি না, দেখবেন ত। আমি আজ এর দেহটা পেয়েছি। এখন এর আত্মাকে খুঁজতে চললাম। আমার আর কোন দুঃখ নাই।" সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন দীপ নিভে গেল।

খানিক পরে নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে দেখলাম সত্যিই স্ত্রীলোকটির গলায় একটি মাদুলী। সেটা নিয়ে ভেঙ্গে ফেললাম। পাওয়া গেল এক টুকরা কাগজ, তাতে লেখাঃ—"আমি যূথিকা। কোথায় এতকাল ছিলাম জানি না। সেখানে ছিলাম বন্দিনী। আজ অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি। ওগো—তুমি কোথায় আজ! রত্নাকরের গর্ভে তোমায় হারিয়ে ছিলাম, সেইখানেই আজ খুঁজতে চললাম!"

সারাবিশ্বের বয়োবৃদ্ধ

সারাবিশ্বের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির নাম সেনাউ (Senau)। সে বাস করে বেচুয়ানাল্যাণ্ড-য়ে। এই ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লণ্ডনের কোনও মিশনারী, ও বেচুয়ানাল্যাণ্ডের প্রধান সর্দ্দার (Paramount Chief) ৎশেকেদি (Tshekedi) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের বিশেষজ্ঞ সদস্যগণ গিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি দ্বারা রেডিওযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা। সে তাহার প্রথম জীবনের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বর্ণনা করিয়াছে—সদস্যগণ সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে। বিবরণ লণ্ডনে পৌঁছিলে ব্রড্‌কাষ্ট করা হইবে।

হাতীর বার্ষিক তীর্থযাত্রা

দক্ষিণ আফ্রিকায় জ্যাম্বেজীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী বনাঞ্চলে যে হস্তিযূথ চরিয়া বেড়াইত—তাহাই ছিল পৃথিবীর সর্ব্ব-বৃহৎ হস্তী। এখন সেখানে এই হস্তীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে পাইতে একেবারে ডজনখানেকে দাঁড়াইয়াছে। এখানকার প্রবীণ মোরদ হাতীর উচ্চতা হয় সাড়ে বার ফুট—দৈর্ঘ্য ২২ ফুট কিম্বা ২২ ফুট ৬ ইঞ্চি।

এই অঞ্চলের কাঠুরিয়াগণ বলিয়া থাকে যে, এই হাতীর দল প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে আওরান্ড অরণ্যের অভ্যন্তরস্থ উন্মুক্ত স্থানটিতে আসিয়া জমায়েত হয়। বৎসরের পর বৎসর ঠিক একই পথে এবং মনে হয় যেন একই তিথিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পর ২।৩ দিন এখানে থাকিয়া আবার দলে দলে ফিরিয়া যায় অরণ্যের নিবিড় অংশের যেস্থানে যাহাদের বাস।

ইহারা বর্ত্তমানে মানুষের বন্দুকের গুলিকে এতটা ভয় করে যে, মানুষ দেখিলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। ইহাদের একটি সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দেখা যায় কোনও গাছের শিকড় উদ্ধারে। যে জাতীয় গাছের শিকড় উহাদের প্রিয়, সেই বৃক্ষটি যদি বৃহৎ হয় এবং একক কোন হস্তী সেই বৃক্ষ উপড়াইতে না পারে, তাহা হইলে ৩।৪টিতে মিলিয়া একসঙ্গে সেই গাছটিকে ভূমি-শায়িত করে এবং মনের সুখে উহার শিকড় দ্বারা ভোজ লাগাইতে থাকে।

বড়দিনের সজীব উপহার

বড়দিনের সময় পাশ্চাত্যে ছোট বড় সকলেই খৃষ্টমাস উপহার পাইতে আশা করে। ছোটরা ত আশার কুহকে খাটের পাশে বড় বড় মোজা, থলিয়া প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখে—কারণ তাহাদের নিদ্রিত অবস্থায় সান্টা ক্লজ আসিয়া ঐ মোজা বা থলিয়া পূর্ণ করিয়া উপহার দিয়া যাইবে—ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। বড়দের সে আশা নাই—নির্ভর করিতে হয় আত্মজন বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির উপর। এবার সন্তানহীন নর-নারী নিজেদের উপহারের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়াছে। চিলড্রেন য়্যাডপ্শন্ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী বলিতেছেন—এবার বহু সন্তানহীনকে বড়দিনে জীবন্ত শিশু উপহার দেওয়া হইবে। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে যে সব আবেদন আসিয়াছে, তাহাদের আশা পূর্ণ করিতে পারা যায় নাই, কারণ অন্ততঃ দুই সপ্তাহ সময় না পাওয়া গেলে শিশু-সন্তান পোষ্য রাখার আইনসঙ্গত ব্যবস্থা করা যায় না। তথাপি যাহাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। কচিদের ছুটা-ছুটিতে পদক্ষেপের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে তাহাদের বড়দিন উৎসব মুখরিত হইবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহারা আজীবন পোষণ করিয়া আসিয়াছে, তাহা এইবারে সফল হইল।

মানবের আদিম নিবাস মধ্য-আফ্রিকা

প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ য়্যালোন্‌জ পণ্ড্ নিউইয়র্ক শহর হইতে নূতন এক মতবাদ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বাদি মানবের উদ্ভব হইয়াছিল মধ্য-আফ্রিকায় এবং প্রথম নর-নারীযুগল সাহারা অতিক্রম করিয়া ইউরোপে যাইয়া হাজির হইয়াছিল।

মিঃ পণ্ড বলেন, এই অভিমতের সমর্থনে প্রচুর নজির তাঁহার আছে। সাহারার বুকে এমন সকল প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র তিনি পাইয়াছেন, যাহা নাকি ৫০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয়ত সাহারা বর্ত্তমানে মরুভূমি হইলেও, এক সময়ে উহা ছিল মনুষ্য-বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী। এতটা নিম্নে এই সকল অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে যে, উহাই মনুষ্যবাসের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তাঁহার অভিমত—জিব্রালটারের পথে মানুষ মধ্যআফ্রিকা হইতে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে আসিয়াছে এবং নীলনদ ও এশিয়ামাইনরের পথে এশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। মধ্য-আফ্রিকা হইতে শফরের ফলে বারবেরি রাজ্যে উর্ব্বরা ভূমি ও প্রচুর খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া ঐস্থানে বাস-স্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

কিন্তু সে কোন্ যুগে—ইহা লইয়া বিতর্ক চলিবে এখনও বহুকাল!

অন্ধদের জন্য সিনেমা

লিভারপুল সিনেমায় ৯০০ শত নরনারী সিনেমা উপভোগ করিয়াছে, কিন্তু দেখে নাই কিছুই, শুনিয়াছে আগাগোড়া, কারণ এই নরশত—অন্ধ।

পূর্ব্বে সিনেমার গানই তাহারা শুনিত, অভিনয়ের অনেক অংশই তাহাদের অজ্ঞাত থাকিত। কিন্তু অন্ধদের জন্যই একটি চিত্র তৈরী হইয়াছে—'ষ্টার অফ দি সার্কাস' নামে। এই চিত্র দেখিয়া তাহারা চিত্রের বিষয়-বস্তু আগাগোড়া বুঝিয়াছে এবং সমগ্র আখ্যান পরস্পর আওড়াইয়াছে। এমন কি, নায়ক-নায়িকা কোন অংশ আবৃত্তির সময় কি প্রকার অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত নিখুঁতরূপে ধরিতে পারিয়াছে। প্রথম কিছুক্ষণ অখণ্ড মনোযোগের সহিত নীরবে তাহারা শুনিয়া গিয়াছে। যেমন গল্পের খেই ঠিক মত বুঝিতে পারিয়াছে, অমনি হাততালি দিয়া, বাহবা দিয়া এবং পা নাচাইয়া উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে!

সাহিত্য-সংবাদ

চিত্রে ও লেখায় পুরস্কার

সুদূরে আসাম-প্রবাসী বাঙ্গালী তরুণদের পরিচালিত হস্তলিখিত মাসিক—"সচিত্র পথিক" সমগ্র বাঙ্গালীর নিকট চিত্রে ও লেখায় সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে। প্রতি তিন মাসের বিচারে যে যে চিত্রকর ও লেখক প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, সংসদ হইতে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য পুরস্কৃত করা হইবে। নীচের ঠিকানায় পত্রাদি লিখিয়া বিস্তারিত বিষয় অবগত হউন। উপযুক্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে কোন উত্তরই দেওয়া হয় না। ইতি, বিনীত—শ্রীরমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক—"প্রবাসী সাহিত্য-সংসদ"; নগেনগঞ্জ; বোকাজান পোঃ অঃ—আপার আসাম। অথবা—শ্রীজীবনকৃষ্ণ মণ্ডল, সহ-সম্পাদক; ডিমাপুর পোঃ অঃ; আপার আসাম।

বাৎসরিক সাহিত্য-প্রতিযোগিতা

বরাহনগর হস্তলিখিত দীপ্তি পত্রিকার বাৎসরিক সাহিত্য-প্রতিযোগিতা সংখ্যা আগামী মাঘ মাসের সারস্বত সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গলা ভাষায় নিম্নোক্ত যে কোন রচনা আগামী ২৯শে পৌষ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় গৃহীত হইবে।

সাধারণ বয়স্কদের জন্যঃ—(১) জাতীয়তায় প্রগতির প্রভাব (ফুলস্কেপ পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে)। ২০ বৎসরের কম বয়স্কদের জন্যঃ—(২) যে কোন শিক্ষামূলক প্রবন্ধ (ফুলস্কেপ পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে)। (৩) যে কোন গল্প (ফুলস্কেপ ৩ পৃষ্ঠার মধ্যে)। (৪) যে কোন কবিতা (২৫ পংক্তির মধ্যে)। (৫) যে কোন রঙ্গীন ছবি (৬"×৯" ইঞ্চির মধ্যে)। (৬) এমেচার ফটো।

প্রথমোক্ত নির্দ্দিষ্ট বিষয়টিতে দুইটি এবং অপরগুলিতে একটি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। কোন প্রতিযোগী দুইটি বিষয়ে যোগদান করিতে পারিবেন না। লেখকাদির পুরা নাম, ঠিকানা ইত্যাদি আবশ্যক।

সম্পাদক—শ্রীকালিদাস দত্ত, ২৪, প্রামাণিক ঘাট রোড, পোঃ—বরাহনগর।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

উত্তরপাড়া যুক্ত সমিতির পক্ষ হইতে নিম্ন বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করা যাইতেছে।

বিষয়ঃ—(১) সুকবি শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য সমালোচনা। (২) আধুনিক শিক্ষা ও তাহার অর্থনৈতিক মূল্য। দুইটির উভয়ই অথবা যে কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। রচনা ফুলস্কেপ কাগজের আট পৃষ্ঠার অনধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতি বিষয়েই প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারিগণকে একটি করিয়া রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। রচনা ১৮ই জানুয়ারীর মধ্যে নিম্ন যে কোন ঠিকানায় প্রেরিতব্য। (১) শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, শিক্ষক বি কে পালস্ ইনষ্টিটিউশন, পোঃ বাজে শিবপুর, হাওড়া। (২) শ্রীপশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৯, শিবতলা ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

"বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা ও তাহার ত্রুটি" বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য নারায়ণগঞ্জ মহিলা সাহিত্য সমিতি স্থানীয় মেয়েদের আহ্বান করিয়াছেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে যাহারা প্রথম হইতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে তাহাদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হইবে। আগামী ১৫ই জানুয়ারী "সিরকোর বালিকা বিদ্যালয়ে" দ্বিপ্রহর ১২টা হইতে ১-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার প্রতিযোগিতা হইবে। অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য আগামী ১২ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে প্রার্থিগণকে নারায়ণগঞ্জ উকিলপাড়ায় পারুলবালা দাশগুপ্তা বি-এ এবং সরযূ দাস বি-এ'র নিকট আবেদন করিতে হইবে।

রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

(কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদিগের জন্য)

রচনার বিষয়—ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ও তাহার সংস্কার। আবৃত্তি প্রতিযোগিগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত আনুমানিক ৪০ হইতে ১০০ পঙ্‌ক্তির যে কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিবেন। রচনার খাতা এবং আবৃত্তি প্রতিযোগীদিগের নাম ও কবিতার একখানি নকল প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ মহাশয়ের স্বাক্ষর সম্বলিত হইয়া আগামী ১৬ই জানুয়ারীর মধ্যে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পৌঁছান চাই। প্রতিযোগিতা আগামী ২০শে জানুয়ারী শ্রীরামপুর কাশী ডাক্তার লেনস্থ 'ভারত ভূমি ব্যায়াম সমিতির' প্রাঙ্গণে হইবে।

রচনা প্রতিযোগিতার ১ম পুরস্কার—চারি টাকা মূল্যের পুস্তক ও একখানি রৌপ্যপদক। ২য় পুরস্কার—দুই টাকা মূল্যের পুস্তক ও একখানি রৌপ্যপদক। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ১ম পুরস্কার—গোপালচন্দ্র দে মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ, দুই টাকা মূল্যের পুস্তক ও একখানি রৌপ্যপদক। ২য় পুরস্কার—একখানি রৌপ্যপদক। শ্রীকান্তিকচন্দ্র সেন, সম্পাদক, নবীন পাঠাগার, দোল্তে লেন, শ্রীরামপুর।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

হাওড়া সঙ্ঘ পাঠাগার, ছাত্র বিভাগ পরিচালিত হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক "জয়যাত্রা" পত্রিকার সম্পাদক সঙ্ঘের উদ্যোগে আগামী জানুয়ারী মাসে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন হইয়াছে। প্রবন্ধের বিষয় "জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব"। সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। প্রতিযোগীদের স্ব স্ব প্রবন্ধ নিজ নিজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের বা প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পরিচয়পত্রসহ আগামী ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছান চাই। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীকে বিনয়-স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ ও নগদ পাঁচ টাকা এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। স্বাঃ শ্রীপরিতোষ বসু, সম্পাদক, 'জয়যাত্রা', ৩৭নং নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া।

তীর্ণ হন—এইচ এল সোনী (অধিনায়ক), এস এল আর সোহানী, সোহনলাল, ডব্লিউ মিচেলমুর ও যুধিষ্ঠির সিং। ফ্রান্স ও নিউজিল্যান্ড পক্ষে অবতীর্ণ হন—এ সি ষ্টেডম্যান ও সি ই ম্যালফ্রয় (নিউজিল্যান্ড), এ গেটে ও এম ডুপ্লে (ফ্রান্স)।

ত্রিশ বৎসরের অদম্য খেলা

একুশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্ব-ইংল্যান্ড টিমে ফুটবল খেলিয়াছিল স্যাম চেড্জয় (Sam Chedgzoy)—উহাই তাহার প্রথম খেলা সর্ব্বোচ্চ দলে। কিন্তু উহা তাহার জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ম্যাচ্ খেলা নয়। ফুটবল খেলায় কৃতিত্ব সে অর্জ্জন করিয়াছিল তাহার পূর্ব্বেই। ইংলন্ডের ঝানু রাইট উইংগারদের অন্যতম সে—এই সত্য সে প্রমাণিত করিয়াছে একাধিকবার। তাহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সে বিস্তার করিয়াছে তাহার অসীম সাহসের ভিতর দিয়া। অথচ জীবনে কখনও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

ইংলন্ডে এমন দিনও ছিল, যখন কর্ণার কিক্-এ ছিল একটা অবিসম্বাদিত অসম্পূর্ণতা—সেই প্রাচীন নিয়মের পরিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ অজুহাত সৃষ্টি করিয়াছিল স্যাম—যেদিন সে কর্ণার কিক হইতে বল ড্রিবল্ করিয়া একেবারে গোলে ঢুকিয়া গেল।......'ফুটবল'য়ের আইন প্রবর্ত্তকগণ বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিল তাহাদের নিয়ম-গঠনের ত্রুটি; ব্যস্, কর্ণার-কিকের আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল।

এই স্যাম সাব্যস্ত করিল তাহার খেলার যুগ পার হইয়া গিয়াছে, তাই দুই বৎসর পূর্ব্বে সে কানাডায় চলিয়া যায়। কিন্তু স্যাম নিজে যাহাই ভাবিয়া থাকুক না কেন, ফুটবল তাহাকে রেহাই দিতে চাহিল না। স্কট্ল্যান্ড ফুটবল দল কানাডায় গেল—স্যামকে খেলিতে হইল ঐ দলের বিরুদ্ধে তাহার সেই পুরাতন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ রাইট উইংগে।

এখন স্যাম সর্ব্ব-কানাডার মনোনীত রাইট উইং এবং এইবার ফুটবল খেলায় যোগদান করিয়া সে তাহার ফুটবল খেলার জীবনের ত্রিশ বৎসর পূর্ণ করিল। কানাডার ক্রীড়া-পরিচালকগণ স্যামকে কোনও প্রকারে ক্ষিপ্রতাহীন অথবা বয়সের দরুন অসুবিধাগ্রস্ত বা নিপুণতা-চ্যুত মনে করেন না। বরং কোনও প্রকার নিদারুণ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত না হইয়া যে এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর তাহার ফুটবলের ষ্টাইল ও ক্ষিপ্রতা অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে স্যাম—সেজন্য তাহার সতর্কতা ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যের তারিফ করা হইয়া থাকে খেলোয়াড় মহলে।

আজীবন খঞ্জতার প্রতিরোধ

কিন্তু স্যামের মত অজানিতেই সৌভাগ্য সকলকে অনুসরণ করে না। সৌভাগ্যের তরঙ্গ বিপুল দোলায় কাহাকেও বা পথের ধূলায় গড়াইয়া দেয়। একটা রহস্যময় আতঙ্ক একটা 'ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স' কাহারও কাহারও সৌভাগ্য-চকিত চঞ্চল মনকে কাবু করিয়া বসে।

উহারই দৃষ্টান্ত হইল ২০ বৎসর বয়স্ক আর্নষ্ট টিল বর্ত্তমানে স্কটিশ লীগ ফুটবলের উদীয়মান হাফ-ব্যাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। দুই মাস পূর্ব্বে তাহাকে দলভুক্ত করিবার জন্য 'হার্টস', 'হ্যামিলটন একাডেমিকেলস' প্রভৃতি ইংলন্ডীয় ক্লাবসমূহ উঠিয়া পড়িয়া লাগে। বর্ত্তমানে সে 'রেইথ রোভার্স' দলের শ্রেষ্ঠ রাইট হাফ-ব্যাক।

অথচ এক বৎসর পূর্ব্বে উনিশ বৎসর বয়সে এবং ক্রীড়া-নৈপুণ্যের নিখুঁত পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও সে একদিন অতি সামান্য একটি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া খেলার মাঠ হইতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া যায়। বাল্যকালের সেই যে তাহার ছিল রহস্যময় আতঙ্ক পায়ে কি যেন একটা অব্যক্ত অসুস্থতার, তাহাই তখন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া এক বিভীষিকার করাল মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কে যেন অনুক্ষণ তাহার গোপন কানে বলিতে লাগিল—"আর্নষ্ট তোর খেলার পালা এবারে শেষ হয়ে গেল। আর তুই তোর অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতা, তোর আয়ত্ত নিপুণতা কিছুতেই ফিরিয়ে পাবি নে।" অযোগ্যতার আতঙ্কের এই যে গূঢ়ৈষণা—ইহা একেবারে বাস্তব রূপায়নের সহিত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল তাহার পরবর্ত্তী সকল খেলায়। দৈনন্দিন জীবনে তাহার পায়ে কোনও ব্যথা-বেদনা বা কোনপ্রকার অপটুতার আমেজ সে আবিষ্কার করিতে পারিত না, কিন্তু খেলার মাঠে উপস্থিত হইলেই এই আতঙ্ক তাহার মনকে নিবিড়ভাবে আক্রমণ করিত যে—বুঝি তাহার পূর্ব্ব নৈপুণ্য আর নাই। এই দৃঢ়সঙ্কল্পের অভাবে—ইচ্ছাশক্তির শিথিলতায় প্রকৃতই তাহাকে খোঁড়াইতে হইত প্রথম বল স্পর্শ করিবার পর হইতে।

পর পর কয়েকটি খেলায় এই প্রকার হতাশ হইবার পর ক্লাব ম্যানেজার অতি বুদ্ধিমত্তার সহিত আর্নষ্টকে সুযোগ্য চিকিৎসকের ব্যবস্থাধীন করিয়া দিল। এই চিকিৎসকের প্রখর মনোবিকলন ক্ষমতায় এবং আর্নষ্টের ফুটবল খেলার প্রতি আকর্ষণের আতিশয্যে সে অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, তাহার পায়ে আর কোনও খুঁত নাই—ব্যস, অবলীলাক্রমে সেই মুহূর্ত্তে হইতেই মনে তাহার দৃঢ় সংস্কার উপস্থিত হইল যে, সে পূর্ব্ব নৈপুণ্য ফিরিয়া পাইয়াছে।

সেইদিন হইতে তাহার খেলায়ও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল। এখন সে উদীয়মান হাফ-ব্যাক খেলোয়াড়—আর যেভাবে সে উন্নতি করিতেছে, তাহাতে পরবর্ত্তী বৎসরে তাহার সমকক্ষ হাফ-ব্যাক সারা ব্রিটেনে অতি অল্পই থাকিবে।

তাহার খেলার কৃতিত্ব দেখে আর চিকিৎসক ও ম্যানেজার চোখে চোখে কথা বলে; কারণ চিকিৎসা ও ঔষধ তাহারা খেলোয়াড়টির দেহের জন্য ব্যবস্থা করে নাই—করিয়াছে উহার মনের জন্য।......

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৭শে ডিসেম্বর—

কলিকাতায় ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রা অনুশীলন সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল রাও বাহাদুর কে এন দীক্ষিত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

রয়টারের ২৫শে ডিসেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিখ্যাত চেক লেখক কারেল কাপেক ৪৮ বৎসর বয়সে প্রাগে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় অধুনা প্রচলিত Robot (যন্ত্রমানব) শব্দটি তাঁহারই পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন মিরাটে আরম্ভ হয়। ডাঃ জর্জ্জ ডা সিলভা এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

গৌহাটীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন আসামের প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বরদলুই। সম্মেলনের মূল সভার নেতৃত্ব করেন শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী।

বেরীলিতে বেকার সুগার মিলের জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী কলের ভারতীয় কর্ম্মচারীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করায় শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট চালাইতেছে। মিলকর্ত্তৃপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে এই বিরোধ মিটাইবার জন্য যুক্তপ্রদেশের লেবার অফিসার যে আপোষ আলোচনা চালাইয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

টিটাগড় চটকল ধর্ম্মঘটের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিলকর্ত্তৃপক্ষ পুরান মিল চালু করিবার জন্য বাহির হইতে লোক আমদানী করিলে তাহাদের সহিত ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের দাঙ্গা হয়। পুলিশ ৫০জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। প্রায় সব মিলের কাজ এখনও বন্ধ আছে।

এলাহাবাদে নিখিল ভারত দর্শন সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। দীনবন্ধু এন্ডরুজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অন্ধ্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পশ্চিম কৃষ্ণ জেলা কংগ্রেস কমিটির ৩৫ হাজার প্রাথমিক সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন। সভাপতির এই নির্দ্দেশের প্রতিবাদে সমিতিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাহারা ঐ সকল প্রাথমিক সদস্য লইয়াই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসে যাইয়া সত্যাগ্রহ করিবেন।

কলিকাতায় নিখিল ভারত স্বায়ত্ত-শাসন সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত এস সত্যমূর্ত্তি সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীযুক্ত কে এফ নরীম্যানের সভাপতিত্বে আগ্রায় অল ইণ্ডিয়া মোটর ট্রান্সপোর্ট কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

বোম্বাইনগরীতে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন বোম্বাইর প্রধান মন্ত্রী বি জি খের। স্যার ভিটি বিজয় রাঘবাচারী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।

এলাহাবাদের "লীডার পত্রিকা"র বার্ত্তা সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহাপিত্রম নাবার শ্রীমতী লক্ষ্মী তামতা নাম্নী এক হরিজন কন্যার পাণিগ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করায় স্থানীয় সংবাদপত্র-সেবীমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, শ্রীমতী তামতা একজন বিশিষ্ট গ্র্যাজুয়েট এবং ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা।

২৮শে ডিসেম্বর—

রয়টারের খবরে প্রকাশ চুং কিং হইতে মার্শাল চিয়াং কাইশেক ঘোষণা করিয়াছেন যে, ২২শে ডিসেম্বর তারিখে জাপ প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব সর্ত্ত দিয়াছেন, চীন তাহা কোন প্রকারে মানিয়া লইতে সম্মত হইবে না।

ইউনাইটেড প্রেসের এক খবরে প্রকাশ যে, সিন্ধু পরিষদের মুসলিম লীগ দল আগামী ৯ই জানুয়ারী আল্লা বক্স মন্ত্রি-মণ্ডলীর বিরুদ্ধে ৪টি অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিবেন।

নাগপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বিংশতিতম অধিবেশন হয়। অধিবেশনে উপস্থিত বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত টি জে কেদার, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত জি ভি দেশমুখ এবং মধ্যপ্রদেশ পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শ্রীযুক্তা অনুসূয়াবাঈ কালের নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ খারে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের সহিত মঞ্চোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। সভাপতি মিঃ ভি ডি সাভরকার তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, হিন্দুরাই ভারতীয় জাতি—মুসলমান সম্প্রদায় মাত্র।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ও দেশীয় রাজ্যসমূহের বহু দর্শক সম্মেলনে যোগদান করেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, রাজকুমারী অমৃতকুমারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের বাহিরের দশজন বিশিষ্ট দর্শক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক অফিসের মিস আগা খাঁ হ্যারিসন এবং মাদাম ওয়াজেল হ্যাগ, আন্তর্জ্জাতিক মহিলা সঙ্ঘের শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ কমিটির সভানেত্রী মিস এ ডিগনাম প্রভৃতি ছিলেন। আগামী ১লা জানুয়ারী সম্মেলনের মূল অধিবেশন শেষ হইবে।

হাওড়ায় রামরাজাতলা ও বেতর লাইনের (৫২ ও ৫৪নং রুটের) বাস-ধর্ম্মঘট পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে। এপর্য্যন্ত ৮জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইহারা সকলে জামিনে খালাস আছে।

মধ্য-ভারতের সীতামৌ রাজ্যের রাজা ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে তাঁহার রাজ্যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবে। ২১জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রজা-পরিষদ গঠিত হইবে এবং শাসন-কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি শাসন সমিতি গঠিত হইবে। প্রজা-পরিষদে ছয়জন সরকারী, দুইজন বে-সরকারী মনোনীত এবং ১৩জন নির্ব্বাচিত সদস্য থাকিবেন। যুবরাজ রঘুবীর সিং শাসন সমিতির সভাপতি হইবেন। বার্ষিক আয়-ব্যয়ও প্রজা-পরিষদে উত্থাপিত হইবে।

ফ্রান্সের উপনিবেশ সচিবের নিকট হইতে ফরাসী ভারতের গবর্ণর গত মঙ্গলবার এই মর্ম্মে এক তার পাইয়াছেন যে, "পুনরাদেশ পর্য্যন্ত মুন্ড কর স্থগিত রাখুন।" এই খবর পাইবার পর ফরাসী ভারতের বহু বিদেশী নাগরিক আপাতত আশ্বস্ত হইয়াছেন।

১৯৩২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত এক আদেশে রাজসাহী জিলার 'দেশবন্ধু কল্যাণ সমিতি' ও 'দীপক সঙ্ঘ'কে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের গেজেটে প্রকাশিত এক আদেশে পূর্ব্ব আদেশ বাতিল করা হইয়াছে।

১৯৩২ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত এক আদেশে ঢাকা, টঙ্গিবাড়ী থানার অন্তর্গত বাহেরক গ্রামের 'বাহেরক সত্যাশ্রম' বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের গেজেটে ঐ আদেশও বাতিল করা হইয়াছে।

সীতাপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, দুইজন কনেষ্টবল সীতাপুর হইতে ডাক লইয়া কমলপুর যাওয়ার পথে একদল সশস্ত্র ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ডাকাতগণ কনেষ্টবলদিগকে জখম করিয়া তাহাদের বন্দুক ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে।

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের ২৮শ অধিবেশনে পণ্ডিত শিবশর্ম্মা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন।

এলাহাবাদ জেলার নবাবগঞ্জ পরগণার প্রায় বিশ হাজার কৃষক কৃষাণ-জমিদার বিরোধের ফলে চাষাবাদ বন্ধ করিয়াছে। জেলা কংগ্রেস কমিটি এই আন্দোলন চালনা করিতেছেন।

২৯শে ডিসেম্বর—

ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে নিখিল ভারত কৃষ্টি সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাঃ মুল্কুরাজ আনন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং "কৃষ্টিতে সংকট" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

নাগপুরে নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন ডাঃ জ্ঞানচাঁদের সভাপতিত্বে হয়। অভিভাষণে সভাপতি মহাশয় টাকার মূল্য সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাবের নিন্দা করেন।

গিরিডিয়া অভ্র-শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পট্টনায়ককে দণ্ডবিধির ১০৭, ১১৭ এবং ১১৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৪ঠা জানুয়ারী তাঁহার বিচার হইবে।

বোম্বাইর এক সংবাদে প্রকাশ, জয়পুরে প্রজামণ্ডল সম্মেলনে যোগদান করিতে যাইবার সময় শেঠ যমুনালাল বাজাজের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া জানান হইয়াছে যে, তিনি জয়পুর রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

৩০শে ডিসেম্বর—

মাদ্রাজে নিখিল ভারত খৃষ্টান সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি ডাঃ এইচ সি মুখার্জ্জি তাঁহার অভিভাষণে খৃষ্টানদিগকে বিশেষভাবে কংগ্রেসে যোগদান করিতে বলেন।

বোম্বাই নগরীতে জাতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘের বিংশ অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুত পি এন সপ্রু যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার প্রতি কংগ্রেসের মনোভাবের সমালোচনা করেন।

শেঠ যমুনালাল বাজাজ জয়পুর রাজ্যে প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁহার উপর নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, যদি নিষেধাজ্ঞা তাঁহাকে অমান্য করিতে হয় এবং তজ্জন্য কোন সংকট ঘটে তবে জয়পুর সরকারই তাহার জন্য দায়ী হইবেন।

হিন্দু মহাসভার নাগপুর অধিবেশন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আগামী অধিবেশন বাঙলায় হইবে। এই অধিবেশনে যে ১২টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে দুইটি প্রস্তাব আছে। মহাসভা যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি কংগ্রেসের অধিবেশন-স্থান বিষ্ণুদত্ত নগর কালচুরী কলাপদ্ধতিতে সজ্জিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ত্রিপুরী-চিত্রকলার নিদর্শন—কালচুরী কলা-পদ্ধতিতে চিত্রাংকন ও রূপসজ্জা সম্পন্ন করা হইবে। তিনটি প্রবেশ-দ্বার এইরূপভাবে অঙ্কিত ও নির্ম্মিত করা হইবে যাহাতে দর্শকগণ ত্রিপুরীর চিত্রকলার প্রাচীন গৌরবের আভাষ উপলব্ধি করিতে পারে। কংগ্রেস নগরের দীপ্তস্তম্ভগুলি প্রাচীন কলা-পদ্ধতিতে গঠিত করা হইবে।

৩১শে ডিসেম্বর—

শিলচরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বড়খাই চা-বাগানের শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জের স্বরূপ প্রায় চল্লিশজন নেতৃস্থানীয় ধর্ম্মঘটী শ্রমিককে আর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে না বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় রাজনীতিক মহল ইহার ফলে একটা সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে বলিয়া আশংকা করিতেছেন।

বেরিলীর এক খবরে প্রকাশ যে, বাধন ও টারপেনটাই কলের কার্য্য কর্ত্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়া দিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যে পূর্ব্বাভাষ দেওয়া হইয়াছিল তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে; আজ সকালে কর্ত্তৃপক্ষ কলের কার্য্য বন্ধ রাখিবেন বলিয়া নোটিশ বোর্ডে নোটিশ মারিয়া দিয়াছেন। ওয়েষ্টার্ন ইণ্ডিয়া দিয়াশলাই কারখানায় ধর্ম্মঘটের অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। পিকেটিং অবিরাম চলিতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগ জাপানের নিকট এক নোটে জানাইয়া দিয়াছেন যে, চীনে নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য জাপানের চেষ্টাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানিয়া লইবে না।

নয়াদিল্লী হইতে জানা যাইতেছে যে, শেঠ যমুনালাল বাজাজ তাঁহার প্রতি জয়পুর রাজ্যে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিবার জন্য ৩রা জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে দিল্লী হইতে বাদ্দোলী যাত্রা করিবেন। গান্ধীজী আগামীকল্য ওয়ার্দ্ধা হইতে রওনা হইয়া ২রা জানুয়ারী বাদ্দোলী পৌঁছিবেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ২৯শে পৌষ, ১৩৪৫ সাল, 14th January 1939 [৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শরৎচন্দ্র স্মৃতি-বার্ষিকী—

আগামী ১লা মাঘ হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুর গ্রামে পরলোকগত সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে জেলা-বোর্ডের উদ্যোগে ও দেবানন্দপুর পল্লী-সেবক সমিতির সহযোগিতায় শরৎচন্দ্র ও কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের মর্ম্মর স্মৃতি-ফলক স্থাপিত হইবে। দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্রের জন্ম-স্থান, এই হিসাবে বাঙালীর নিকট ঐ স্থান পুণ্যভূমিরূপে পরিগণিত হইবে, তাহা ছাড়া এই দেবানন্দপুরের সহিত 'অমৃত-ভাষী' ভারতচন্দ্রের স্মৃতিও বিজড়িত রহিয়াছে। ভারতচন্দ্র কিছুকাল এই দেবানন্দপুরে বাস করিয়া এই স্থানকে বাঙালী জাতির দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক গুরুত্ব-মর্য্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন। হুগলী জেলা বোর্ড এবং দেবানন্দপুর পল্লী-সেবক সমিতি বাঙালীর এই দুইজন বরপুত্রের স্মৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। অবশ্য, ভারতচন্দ্র কিম্বা শরৎচন্দ্রের ন্যায় যাঁহারা সাহিত্যিক এবং কবি তাঁহাদের পক্ষে স্মৃতিরক্ষার আর কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদের যে সাহিত্য-সম্পদ জাতিকে তাঁহারা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবে। নশ্বর পদার্থের উপরই কালের প্রভাব খাটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই যে সৃষ্টি, সে সৃষ্টির উপর কালের প্রভাব নাই। নিজেদের সেই দেশ এবং কালের অতীত মহিমায় মর্য্যাদা-সম্পন্ন সৃষ্টির প্রভাবেই কবি এবং সাহিত্যিক জীবিত থাকেন। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমারের সৃষ্টির রস যখন আমরা আস্বাদন করি, তখন কালের ধারণা আমাদের কাছে থাকে না; বর্ত্তমানের মধ্যেই আমরা সেই সব কবি এবং সাহিত্যিককে একান্ত এবং জীবন্ত করিয়া পাই। ভারতচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রও সেই হিসাবেই আমাদের কাছে বাঁচিয়া আছেন এবং থাকিবেন; তথাপি জাতির দিক হইতে একটা কর্ত্তব্য আছে। যাঁহারা বড় হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বড় বলিয়া বুঝিবার ভিতর দিয়া আমরা নিজদিগকে বড় করিয়া পাই। আমাদের বড়ত্বের দিকটা আমাদের মধ্যে উন্মুক্ত হয়। এই যে অনুভূতি, মানুষের পক্ষে ইহার উপযোগিতা আছে সকল দিক হইতে, সমাজের দিক হইতে, জাতীয় জীবনের দিক হইতে। এই জন্যই এই শ্রেণীর শ্রদ্ধার আয়োজন যাঁহারা করেন, তাঁহারা জাতির ধন্যবাদ-ভাজন। আমরা আশা করি, দেবানন্দপুরের এই আয়োজন সর্ব্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। বাঙালী-বঙ্গবাণীর এই দুই বরপুত্রের স্মৃতিপূজার ভিতর দিয়া নিজেদের বৃহত্ত্বের অনুভূতি লাভ করিয়া দেশের জন্য, জাতির জন্য, নিজের মাতৃভাষার প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের জন্য বৃহত্তর কর্ম্ম-প্রেরণায় প্রণোদিত হইবে।

পরলোকে শিবরতন মিত্র—

এই সেদিন আমরা চারুচন্দ্রকে হারাইয়াছি, বীরভূমের স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শিবরতন মিত্র মহাশয়ও গত ৫ই জানুয়ারী পরলোকগমন করিয়াছেন। একনিষ্ঠ সাহিত্যিক বলিতে যাহা বুঝায় মিত্র মহাশয় তেমন একজন সাহিত্যিক ছিলেন। নিভৃত জীবনের তিনি কতকটা পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার শিউড়ীর বাসভবনের বিরাট পুস্তকালয়ে বসিয়া তিনি এক-মনে বাণীর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা এবং পুঁথি সংগ্রহ তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'রতন লাইব্রেরী'তে বঙ্গ ভাষার প্রাচীন ও অপ্রকাশিত সহস্রাধিক পুঁথি এবং দুই সহস্রাধিক মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত আছে। স্যার আশুতোষ একদিন তাঁহার এই বিরাট সংগ্রহে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পুঁথিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু মিত্র মহাশয় বলেন যে, পুঁথিগুলির ভিতরই বলিতে গেলে তাঁহার জীবন, তিনি ঐগুলি ছাড়িতে পারেন না। মিত্র মহাশয় বীরভূম ও বর্দ্ধমান অনুসন্ধান সমিতি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য এবং বীরভূম সাহিত্য পরি-ষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার রচিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক', বাঙলা ভাষার একটি মূল্যবান সম্পদ। এই পুস্তকে দুই সহস্রাধিক প্রাচীন বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের রচনার আদর্শসহ জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, মিত্র

...র এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। যদি এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইত, তাহা হইলে জাতির একটি গর্ব্বের বিষয় হইত। এই গ্রন্থের ভিতর মিত্র মহাশয়ের প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসা, রসানুগ্রহণের ক্ষমতা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, তিনি "দূর্ব্বা", "তপোবন", "চিন্ময়ী", "বঙ্গ সাহিত্য", "বীরভূমের ইতিবৃত্ত" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং উজ্জ্বল চন্দ্রিকা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। শিশু-সাহিত্যে তাঁহার পাকা হাত ছিল এবং শিশু-মনস্তত্ত্বের আলোচনা ভালবাসিতেন। তাঁহার 'সাঁঝের কথা', 'কল্পকথা' 'শিশির কথা' প্রভৃতি রচনাগুলি শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বঙ্গবাণীর এই নিষ্ঠাবান সাধকের স্মৃতিতে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মুসোলিনী ও চেম্বারলেন—

চেম্বারলেন ও মুসোলিনীর সাক্ষাৎ হইয়া গেল। ফল কি হইল—ইউরোপের সমস্যা কি মিটিল? ইউরোপের সংবাদ-পত্রসমূহ সমস্বরে বলিতেছে, এই মিলনের ফলে হয় একটা মিটমাট হইবে নতুবা ইউরোপের শক্তিবর্গের মধ্যে পাকা রকমে ভেদ ঘটিয়া যাইবে। তাঁহারা বলেন, টিউনিস, সুয়েজ এবং জিবুতীর সম্বন্ধে ইটালীর যে দাবী, ইংরেজেরা যদি সে সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে একটা মিটমাটের সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে। কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, ইটালী এবং জার্ম্মানীর আর্থিক সুবিধামূলক কোন নূতন চুক্তিতে বদ্ধ হইয়া ইংরেজ এই সমস্যা মিটাইতে চেষ্টা করিবে। বহু জল্পনা-কল্পনার মূলীভূত এই সাক্ষাৎকার তো হইয়া গেল। চেম্বারলেন মুসোলিনীর একজন প্রেমপরায়ণ দোস্ত, সুতরাং রোমে তাঁহাকে অভ্যর্থনারও ত্রুটি কোনদিক হইতে হয় নাই। দুই পক্ষ হইতেই শান্তির বুলি যথেষ্ট আওড়ান হইয়াছে, কিন্তু মিটমাটের অন্তর্নিহিত আসল উদ্দেশ্য কি এবং তাহার সাফল্য কতদূর হইল, তাহা এখনও বলা দুষ্কর। তবে একথা আন্তর্জ্জাতিক সকলেই একরকম স্বীকার করিতেছেন যে, এই আলোচনার ফল যদি সফল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইংরেজ এবং ফরাসী উভয় পক্ষেরই ক্ষতি, অসাফল্যেই বরং লাভের সম্ভাবনা আছে; কারণ, আলোচনার মূলে বিভিন্ন শক্তির পরস্পরের মধ্যে মনের মিল নাই, আছে নিছক স্বার্থের হিসাব এবং মুসোলিনী ইটালীর সেই স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিবেন। জার্ম্মানীর যে চাল মিউনিকের ভিতর দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে সার্থক হইতে চলিয়াছে, মুসোলিনীও এই আলোচনাকে সেই উদ্দেশ্যে সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বার্থের টান যেখানে এমন তীব্র, উপর ভাসা আলোচনায় সেখানে তরঙ্গ বিক্ষোভের আতঙ্ক এড়াইবার উপায় নাই। সুতরাং আপন বাঁচাইবার নীতিই একমাত্র নীতি—সভ্য শক্তিরা কৃপা করিয়া যে কখন কাহার ঘাড়ে পড়িবে, তাহার যখন কিছুই নিশ্চয়তা নাই, তখন তলোয়ার শাণাইয়া রাখাই একমাত্র উপায়। শান্তির আলোচনা চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সেই দিকে বেশী নজর দিতেছে, সুতরাং রোমের এই আলোচনার ফলে যাহাই হউক—আলোচনা যে সফল হয় নাই, ইংরেজ মনে-প্রাণে তাহা ধরিয়া লইয়াই কাজ করিবে।

আসামে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—

আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলই সম্প্রতি কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহের দলের সহিত যোগদানে মোশ্লেম লীগের দল আসামে অন্ধকারের যে যুগ পত্তন করিবার চেষ্টায় ছিল, বড়দলই মহাশয়ের চেষ্টায় তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে আশার আলোকের রেখা ফুটিয়াছে। বড়দলই মহাশয় এখানে আসিয়া আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের নীতি জয়যুক্ত হইবেই, বাধা-বিঘ্ন যতই থাকুক না কেন, চাই শুধু একটু আন্তরিকতা। মুশ্লীম লীগ এবং চা-ব্যবসায়ী শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের চক্রান্ত সত্ত্বেও আসামে কংগ্রেসের মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আসামের পার্ব্বত্য জাতিরা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাতেই তাহাদের দুঃখ-কষ্ট দূর হইতে পারে, নতুবা পরের শোষণের বেড়াজাল হইতে মুক্ত হইবার অন্য পথ নাই। আমরা আশা করি, আসামের প্রধান মন্ত্রীর এই অনুপ্রেরণায় বাঙলার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করিবে। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিকে অবলম্বন করিয়া স্বার্থান্ধের দল বাঙলা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাকে আজ সংমূঢ় করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার দায়ে এদেশের গরীবদের স্বার্থহানির দ্বারা শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের তুষ্টি ও পুষ্টি করিয়া তাহারা নিতান্ত নির্লজ্জভাবে কৃষক এবং প্রজা ইহাদের স্বার্থরক্ষার দোহাই দিতেছে। যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতি দেশের সকলের দ্বারা নিন্দিত, তাহারা সেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা কলিকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া সুরেন্দ্রনাথের আদর্শকে আজ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বকে বিদ্যার ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ করিয়া সেখানেও সাম্প্রদায়িকতাকে বড় করিবে; আইনের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বুঝা গিয়াছে যে, সে উদ্যম হইতে তাহারা এখনও বিরত হয় নাই। আসাম জাগিল, বুঝিল মোশ্লেম লীগওয়ালা এবং শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের মিলনের মূলীভূত চক্রান্তের স্বরূপ। বাঙলা কি জাগিবে না? বুঝিবে না পাটের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিবার বিরুদ্ধে বাঙলার মন্ত্রীর দল যে সব বাজে যুক্তি আওড়াইতেছেন; যে যুক্তি সেদিন আমরা বগুড়াতেও শুনিয়াছি, তাহার মূলে কি? দেশের লোকের স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশীদের স্বার্থসেবার এই ব্যবসায় বাঙলায় আর কতদিন চলিবে? বিপন্ন ইসলামের বুজরুকীর জোরে নিজেদের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠাকে কায়েম রাখিবার কারসাজীতে দেশের লোকে কত দিন ভুলিবে? এই দিক হইতে বাঙলার কংগ্রেসকর্ম্মীদের বড় কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

আন্তরিকতার সহিত তাঁহারা যদি আজ কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সাফল্য অনিবার্য্য—আসামের প্রধান মন্ত্রীর এই উদ্দীপনাময়ী বাণী বাঙলার যুবকে কর্ম্মপ্রেরণাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলুক।

বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান—

বিহারের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট বাঙলা ভাষাকে চাপিয়া মারিবার জন্য কিরূপে চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সহযোগী 'বিহার হেরাল্ড' সংবাদ দিয়াছেন যে, আগামী লোকগণনার সময় মানভূম জেলার ধানবাদ মহকুমা এবং সাঁওতাল পরগণার কতকগুলি জায়গার অধিবাসীকে হিন্দী ভাষাভাষী করিয়া ফেলাইবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৩১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ধানবাদ মহকুমার লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৫ লক্ষ। সমগ্র মানভূম জেলার লোকসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ; ইহার মধ্যে শতকরা ৬৭ জনেরও বেশী বাঙলা ভাষাভাষী, ১৭ জন হিন্দীভাষী এবং ১৩ জন সাঁওতালী ভাষী। সাঁওতাল মহকুমার মধ্যে পাঁকুড়, জামতাড়া ও রাজমহলের ভাষা প্রধানত বাঙলা বলা যাইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই আন্দোলন নূতন নহে। ১৯১৪ সাল হইতে ধানবাদে বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হয়। সাঁওতাল পরগণার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার মিঃ ই এস হোর্ণেল তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন,—১৯১৪ সালে ধানবাদের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লুবী বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে সেখানে যে অভিযান আরম্ভ করেন, সেই নীতিই জামতাড়া এবং পাঁকুড় মহকুমায় পরে অনুসৃত হইতে থাকে। অথচ মিঃ হোর্ণেলের মতে ধানবাদের প্রধান ভাষাই বাঙলা। তিনি বলিয়াছেন,—১৯২১ সালের আদম সুমারীর সময় সেখানে বাঙলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানে এমন লোক গণনাকালে কচিৎ দেখা গিয়াছে। কিন্তু এ-সব যুক্তি টিকে নাই। মানভূম জেলার লোকদিগকে হিন্দী ভাষাভাষী করিবার জন্য বিদ্যালয়ে হিন্দীকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ণিয়া জেলা-স্কুলে মোট ৫৮২ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৫০ জন অ-বাঙালী। এমন জায়গাতেও হিন্দীকে জোর করিয়া ছাত্রদের মাতৃভাষা করা চাই। কারণ কি? ভয়টা কোথায়? কংগ্রেস ভাষা হিসাবে প্রদেশ বিভাগ নীতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মানভূম জেলা, সাঁওতাল পরগণা এবং পূর্ণিয়ায় বাঙলা ভাষাভাষী প্রধান বলিয়া কংগ্রেসের সেই নীতি অনুসারে পাছে বিহার হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, এই জন্যই বিহার সরকারের এই আতঙ্ক। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে সরকার নিজদিগকে কংগ্রেসী বলিয়া অভিহিত করেন, এই উপায় কি তাঁহাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে তাঁহারা প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তিকেই বাড়াইয়া দিতেছেন। এবং তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বাঙলার দিক হইতেও ইহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

রণপুর রাজ্যের ব্যাপার—

গত ৫ই জানুয়ারী উড়িষ্যার অন্তর্গত রণপুর রাজ্যে একটি ভীষণ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। ঐদিন উড়িষ্যার সামন্ত রাজ্যসমূহের পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর আর এল বাজালগেট উন্মত্ত জনতার আক্রমণে নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদে সকলেই মর্ম্মাহত হইবে এবং এমন নিষ্ঠুর কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিবে সকলেই। কংগ্রেস অহিংস নীতির সমর্থক; এমন সব ব্যাপারে—সামন্ত রাজ্যসমূহের ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। প্রজা আন্দোলনের শক্তি ইহাতে কমে ছাড়া বাড়ে না। এমন ঘটনা নিতান্ত শোচনীয়; কিন্তু খুঁজিয়া দেখা উচিত, এমন শোচনীয় ঘটনা ঘটিল কেন? সামন্ত রাজ্যের প্রজারা স্বৈরশাসনের দুর্ভোগ অনেক সহ্য করিয়াছে, আর তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারে না। রণপুরের প্রজারা অন্য কিছু চাহে নাই, চাহিয়াছিল—তাহাদের যে সব অভিযোগ, সেগুলির প্রতীকার। কিন্তু পরিবর্ত্তে দমন নীতিই আরম্ভ হয়। প্রজামণ্ডল প্রজাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন চালাইতেছিল, সেজন্য প্রজামণ্ডল বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। লোকজনকে গ্রেপ্তার করা হইতে থাকে এবং চারিদিকে খানাতল্লাসী চলে। যাহারা নিজেদের অভিযোগ রাজাকে জানাইবে, এই উদ্দেশ্যেই রাজপ্রাসাদের দিকে যাইতেছিল; তাহারা যে রাজপ্রাসাদ জবর-দখল করিতে গিয়াছিল বা রাজপ্রাসাদ লুঠ করা তাহাদের অভিপ্রায় ছিল, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। মেজর বাজালগেটের আচরণ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি নিজেও প্রজাদলকে দেখিয়া তেমন কিছু কল্পনা করেন নাই। যদি অবস্থা তেমনই গুরুতর মনে করিতেন, প্রজারা ততটা মারমুখো হইয়াছে—যদি তিনি বুঝিতেন, তাহা হইলে কিছুতেই বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে যাইতেন না। ব্যাপারটা হঠাৎ শোচনীয় আকার ধারণ করে। প্রকাশ, জনতার মধ্য হইতে একজন মেজরকে আঘাত করিবার জন্য লাঠি তোলে এবং তিনি আত্মরক্ষার জন্য গুলী চালান, গুলীতে একজন লোক মারা যায়। ইহাতে জনতা আরও উত্তেজিত হয়, ঐ ব্যাপারে মেজর আর একটি গুলী ছুড়েন, তাহাতে আর একজন লোকও মারা যায়। জনতার মনস্তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন; তাঁহারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পলিটিক্যাল এজেণ্ট সুবিবেচিতভাবে কাজ করেন নাই। যুক্তি-তর্কের সাহায্যে জনতাকে বুঝানই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তবে গুলী চালান উচিত হয় নাই। যদি তিনি পরে বুঝিয়াই থাকেন যে, গুলী চালানোতে কাজ হয় নাই, তবে তখন আর উত্তেজিত জনতার সম্মুখে ঐভাবে থাকা তাঁহার উচিত হয় নাই। উত্তেজিত জনতা বুঝিয়া-সুঝিয়া কাজ করে না। তাহাদের উন্মত্ততার ফলে নিষ্ঠুর কাণ্ড ঘটিল,—মেজরের গুলীতেও মারা গেল দুইজন। দুঃখকর এই ব্যাপার। আমরা মনে করি, রণপুর রাজ্যের নীতিই মূলত এজন্য দায়ী। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যের প্রজারা দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির নয়। তাহারা তাহাদের অভাব-অভিযোগের কারণকে একান্ত করিয়া বুঝিয়াছিল, রণপুর দরবার যদি রাজকোটের মত প্রজাদের সেই সব অভাব-অভিযোগ প্রতীকারে আগ্রহের ভাব ব্যক্ত করিতেন, তাহা হইলে এমন শোচনীয় কাণ্ড ঘটিত না। তিনটি অমূল্য জীবন নষ্ট হইত না। যাহাদের জীবন গিয়াছে, তাহাদিগকে আর ফিরিয়া

পাওয়া যাইবে না; কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে এমন ব্যাপার না ঘটে, তাহাই করা দরকার এবং সেজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—সামন্ত নৃপতিগণের স্বৈরাচারমূলক নীতির পরিবর্ত্তন সাধন; প্রজারাও যে মানুষ এবং মানুষের অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখার ফল যে বিষময় হইতে পারে, ইহা উপলব্ধি করা।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের স্বদেশ-প্রেম—

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ সি ই গিবন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীকে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা যাহাতে অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসের সদস্য হন, এজন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। মিঃ গিবন এই সম্পর্কে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করিয়া সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলিতেছেন, এ্যালো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তার অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে এবং ভারতে বৃহত্তর যে জাতীয়তার তরঙ্গ বহিতেছে, তাহার পুষ্টিসাধন করিতে হইবে। মিঃ গিবন এ সম্বন্ধে আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে বলিয়াছেন, ইংরেজদের নকল করিয়া এবং ভারতবাসীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আমরা যে নিজেদের বড়ত্বের একটা ভড়ং বজায় রাখিতে চাই, তাহা একেবারেই ভুয়া। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এইরূপ মতি-গতি লইয়া চলেন, তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেম নাই, এমন কি নিজেদের মধ্যে যাহারা গরীব তাহাদের প্রতিও তাঁহাদের প্রাণের টান নাই। ইহার ফলে, কি ইংরেজ—কি ভারতবাসী, কাহারাও আমাদিগকে প্রীতির চোখে দেখিতে পারেন না। মিঃ গিবন তাঁহার স্বজাতীয়-দিগকে রাজনীতির প্রতি উদাসীনতা পরিত্যাগ করিয়া সমাজ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এ্যালো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের অন্যতম সদস্য মিঃ মনরো কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় মহাত্মাজী তাঁহাকে মাইকেল মধুসূদনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলেন। এই প্রসঙ্গে সেই কথা আমাদের মনে হইল। ইংরেজের মর্কট-বৃত্তি করিয়া যে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় বড় হইতে পারিবেন না; এই দেশেরই তাঁহারা সন্তান এবং এই দেশবাসীকে আপনার করিয়া লইয়া থাকার মধ্যেই যে তাঁহাদের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে, মিঃ গিবন সাহেবের এই উদ্যমের ফলে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি এই অনুভূতি জাগিয়া থাকে, তবে দেশের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। কংগ্রেসের দ্বার সকল সম্প্রদায়ের জন্যই উন্মুক্ত। আমরা আশা করি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বাটানগরে গুলী—

কিছুদিন হইতে বাটানগরে জুতার কারখানায় ধর্ম্মঘট চলিতেছিল। গত সোমবার সকাল বেলা এই সম্পর্কে পুলিশ গুলী চালায়। গুলী চালনার ফলে, ছয়জন ধর্ম্মঘটকারী জখম হয় এবং পুলিশের লাঠি-চালনার ফলে, কতকগুলি ধর্ম্মঘটকারী অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে। এ দেশে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে গুলী-চালনা একরকম আনুষঙ্গিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুলিশের পক্ষ হইতে একটি বিবৃতি বাহির হইয়াছে; এমন বিবৃতিতে যে ধরণের মামুলী কথা থাকে, তাহাই আছে। কিন্তু কথা হইতেছে, সত্যই গুলী-চালনার প্রয়োজন ছিল কি? একজন ম্যাজিষ্ট্রেট এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছেন, সরকারী ইস্তাহারে এই কথা জানান হইয়াছে, কিন্তু আমরা এই ধরণের তদন্তে সন্তুষ্ট নহি। পুলিশের গুলী-চালনা একটা ছেলে-খেলার ব্যাপার নয়—বে-সরকারীভাবে উহার তদন্ত হওয়া উচিত। আর একটা কথা এই যে, বাটানগরের এই ধর্ম্ম-ঘটের আপোষ-নিষ্পত্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য বাটা কোম্পানীর কারখানার কয়েকজন প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদের পক্ষের ৬ জনকে লইয়া আলীপুরে একটি বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈঠকে বাঙলা সরকারের সহকারী শ্রম-কমিশনারও ছিলেন। বৈঠকের ফলে, শ্রমিকদের সম্বন্ধে সুবিধা কি করার প্রস্তাব হয়, জানা যায় না; কিন্তু ইহার পর ১৪৪ ধারা জারী করিয়া—শ্রমিকদের তরফের সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়। বাটা-নগর বজবজে; কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নহে। শ্রমিক-মন্ত্রী এই ধর্ম্মঘটের মীমাংসার জন্য কি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রমিক-প্রীতি কোন আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তিনি জানাইবেন কি? ব্যাপারটা যখন আকস্মিক নয়, তখন তাহা এতটা গড়াইয়া শোচনীয় আকার ধারণ করিল কেমন করিয়া? বাঙলার মন্ত্রীদের কেরামতির পরিচয় নয় নিশ্চয়ই।

বাঙালীর দুর্ব্বলতা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিয়োগ বোর্ড', ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথম বক্তৃতা দিয়াছেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি এই বক্তৃতায় বলেন,—'উদ্যম ও ব্যবসায়ী-বৃত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্যলাভ করিতে হইলে এই দুইটি প্রধান গুণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দুইটি গুণেরই বাঙালী চরিত্রে অভাব ঘটিয়াছে। অপরপক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বাস্তবতার পরিবর্ত্তে বাঙালীরা আদর্শবাদের অতি বেশী ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী চরিত্রে যে ভাব-প্রবণতার দিকটা আছে, উহা বাঙালীকে কোন এক বিষয়ে আজীবন কর্ম্ম ও সাধনা করার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙালীর মধ্যে ধৈর্য্য গুণের অভাব, কোন কার্য্য করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার ফল লাভ করিতে সে ব্যস্ত। জনসাধারণের দৃষ্টির বাহিরে নিভৃত জীবন লইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকা অপেক্ষা হৈ-চৈ করার কার্য্যই তাহাকে অধিক আকৃষ্ট করে। তাড়াতাড়ি করিয়া সে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চায়। তাই যে কার্য্য সাধন করিতে বহুদিনের ঐকান্তিক সাধনা প্রয়োজন সেই কার্য্য বাঙালীকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। আচার্য্য রায় বাঙালীর জীবন সমস্যার

আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সুগভীর প্রেমের দৃষ্টি প্রভাবেই তিনি বাঙালীর এই মনোধর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সকল সাধনার সাফল্যের মূলে রহিয়াছে নিষ্ঠা। যে আদর্শবাদের ভিত্তি এই নিষ্ঠায় পাকা হয় না, তেমন আদর্শবাদের কোন মূল্য নাই। আচার্য্য রায় আবেগভরে বলিয়াছেন,—'বাঙালীরা বহু মহৎ গুণের অধিকারী এবং নিজেকে বাঙালী বলিয়া আমি গর্ব্ব অনুভব করি; কিন্তু একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাঙালী অত্যন্ত অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা হইতেছে জীবিকা-উপার্জ্জনের বিদ্যায়।' সহজ জীবিকা অর্জ্জনের অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা বাঙালীর এই ভাবপ্রবণতার মূলে বলিয়া আমাদের মনে হয়। আধুনিক জীবন-সংগ্রামের বাস্তব সমস্যা তাহার এই প্রকৃতিকে শক্ত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে আমরা মনে করি। বাঙালীর এখন দরকার শক্ত মানুষের। তেমন মানুষ যাহাতে সমাজের চারিদিকে জাগে, এমন চিন্তার ধারায় বাঙলার সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙালীর আদর্শবাদ আজ যদি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে বাঙালী জাতিকে পিষ্ট হইয়া নিশ্চিহ্ন হইতে হইবে, ইহা বুঝিয়া চলিবার সময় আসিয়াছে।

নোগুচির 'নেকড়ে বাঘ'—

জাপ কবি নোগুচি আর এক চিঠি পাঠাইয়াছেন এবং সেই চিঠিও খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছে। এই চিঠিতেও তিনি রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া বক্রোক্তি করিতে কসুর করেন নাই; কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁহার সেই আক্রমণে রবীন্দ্রনাথের মহনীয়তাই প্রকারান্তরে পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি নোগুচি বলিতেছেন, "আমরা এশিয়ায় নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিতে চাই। কোন কোন ভারতবাসী আমাদের এ কথায় পরিহাস করেন এবং প্রাচ্যদেশবাসীর জন্মগত অধিকারকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে জাপানই একমাত্র স্বাধীন দেশ; এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি পশ্চিমাদের লুটতরাজে উৎসন্ন গিয়াছে। চিয়াং কাইসেক পশ্চিমা নেকড়ে বাঘদের ঘাবল খাইয়াও মজা পাইতেছেন। কিন্তু জাপান আজ এশিয়াকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিতেছে।" কবি নোগুচির কথায় পাশ্চাত্য জাতিদের প্রতি একটা ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই বিদ্বেষের ভাবকেই প্রাচ্য দেশবাসীদের প্রতি পাকা প্রেম বলিয়া মানিয়া লইয়া আমরা ভারতবাসীরা চীনদেশে জাপানীদের কার্য্যের বাহবা দিতে পারি না। লক্ষ লক্ষ নির্দ্দোষ নরনারীকে উড়োজাহাজ হইতে বোমা ফেলিয়া হত্যা করিয়া যাহারা মজা পায়, তাহাদের সঙ্গে রামায়ণ এবং মহাভারতের আদর্শ-ভারতীয় বীরদের তুলনা করিতে যাওয়া আমরা নির্লজ্জ রকমের ধৃষ্টতা মনে করি। যুদ্ধও বিশেষক্ষেত্রে ধর্ম্ম, অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু নির্দ্দোষ এবং অসহায় সহস্র সহস্র নারী এবং শিশুকে হত্যা করিয়া যাহাদের অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহারা প্রাচ্যই হউক, আর প্রতীচ্যই হউক, বুদ্ধের জন্মস্থান এই ভারতভূমির সঙ্গে তাহাদের সত্যকার অন্তরের যোগ থাকিতে পারে না। চীনের সহিত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিগত সকল যোগও যে জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের মদান্ধতার ফলে ছিন্ন হইতে বসিয়াছে, সে কথাও স্বীকার করিতে হয়।

ভারতের ঐক্য—

ভারতবাসীদের মধ্যে কস্মিন্‌কালেও অখণ্ড ভারতের অনুভূতি ছিল না, ইংরেজের কৃপাতেই এই ধারণাটা ভারতবাসীদের মাথায় ঢুকিয়াছে, ইংরেজেরই উহা বিশেষ দান, ইংরেজ রাজনীতিকেরা বহুদিন এই কথা আমাদিগকে শুনাইয়া আসিয়াছেন। সেদিন কোচিনে গিয়া বড়লাট লর্ড লিনলিথগো সেই কথাই রকমফের করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়া দিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ইংরেজ রাজনীতিকদের ঐ ধারণা একান্তই ভুল। মহাভারতের বহু পূর্ব্ব হইতেই অখণ্ড ভারতের সংস্কৃতিগত অনুভূতি এদেশে ছিল। মহাভারতের যুগে উহা রাজনীতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার চেষ্টা হয়। ঐ সময় ভারতের বিভিন্ন রাজারা মিলিত হইয়া একটি নৃপতিমণ্ডল গঠনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। জরাসন্ধকে এই ভূপতিমণ্ডলের অধিনায়ক করা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাভারতের আদর্শ সাধনাকেই রাষ্ট্রনীতিতে রূপ দিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রিটিশ রাজপুরুষদের এই যে সব কথা ইহাকে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করি না। তাঁহারা এত কাল পর্য্যন্ত ভারতবাসীদের ভেদ-বিচ্ছেদের উপর জোর দিয়া নিজেদের প্রভুত্ব দীর্ঘস্থায়ী করিবার পক্ষে অজুহাত দেখাইতেন; এখন সেদিক দিয়া আর সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া সুর ঘুরাইয়া ভারতের রাজনীতিক ঐক্যের জন্য আগ্রহপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র-প্রথাটি সেই ঐক্যেরই প্রতীক। বলা বাহুল্য, এ কেবল বোকা বুঝ মাত্র। যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীর মর্ম্মকথা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বেশই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঐ পথে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভেদ-বিচ্ছেদের ভাব বাড়া ছাড়া কমিবার কোন উপায় নাই। গণতান্ত্রিকতার বোধে জাগ্রত ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে ঐ প্রণালীতে মধ্যযুগীয় স্বৈরতান্ত্রিক মনোবৃত্তিগ্রস্ত সামন্তনৃপতিদের মতকে মিশ খাওয়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কর্ত্তারা জানেন, তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনই ঐ দুই বিরোধী ভাবের একসঙ্গে মিশ খাইবার কোন পথ নাই। একমাত্র মিল কতকটা হইতে পারে, যদি দেশীয় নৃপতিদের পরিবর্ত্তে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদের যাঁহারা মুখপাত্র তাঁহাদিগকে প্রতিনিধিত্ব করিতে দেওয়া হয়—কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের প্রজাদেরই নিজেদের হইয়া কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। রাজারাই তাহাদের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী; আর এই সব রাজার ব্যক্তিগত মত-স্বাতন্ত্র্যই বা আছে কতটুকু! মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি ভাঙ্গিয়াই বলিয়াছেন যে, ইংরেজ রেসিডেণ্টদের মর্জ্জি মতই তাঁহাদিগকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলিতে হয় এবং রেসিডেণ্টের ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়; সুতরাং এই সব রাজার প্রতিনিধিত্বের আড়ালে ব্রিটিশ স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব হইবে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র গবর্ণমেণ্টে। প্রদেশসমূহে স্বাতন্ত্র্যের যে একটা ঠাট খাড়া করা হইয়াছে, তাহার উপর ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম হইবে. ঐ পথে

দিয়া। ভারতবর্ষ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঐক্যের নামে, ইংরেজের এমন চির দাসত্বকে নিশ্চয়ই বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নয়।' ঐ প্রণালী পাকা হইলে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এখন যেটুকু ঐক্যের ভাব আছে তাহাও নষ্ট হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ স্বার্থবাহদের প্রভুত্ব ও প্রতাপ অখিল ভারতের রাষ্ট্র-নীতি-নিয়ন্ত্রণে অধিকতর দৃঢ় হইবে।

বাঙলার পাট—

বাঙলার মন্ত্রীরা পাটুয়া সাহেবদের বিপদে কাতর হইয়া অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া তাঁহাদের যে উপকারটা করিয়াছেন, এই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ভারতীয় পাট-কল সমিতির সভাপতি মিঃ পি এস ম্যাকডোন্যাল্ড সেদিন ঘোষণা করিয়াছেন যে, চট নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে তাঁহারা সব সাহেবান মিলিয়া জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যুক্তি হইয়াছে এই যে, চটকল গুলিতে সপ্তাহে ৪০ হইতে ৫৪ ঘণ্টা কাজ চলিবে এবং যে সব চটকলে ২২০টি কিংবা তাহার কম পরিমাণ তাঁত আছে, সেগুলিতে সপ্তাহে ৭২ ঘণ্টা কাজ চলিতে পারিবে। চট নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স জারীর সময় বাঙলার মন্ত্রীরা যে সুর ধরিয়াছিলেন, সেই সুরে সুর মিলাইয়া ম্যাকডোন্যাল্ড সাহেবও বলিয়াছেন যে, এই যে চুক্তি হইল ইহার ফলে যাহারা খরিদ্দার তাহাদের সুবিধা, যাহারা বিক্রেতা তাহাদের সুবিধা, যাহারা দালাল তাহাদের সুবিধা, যাহারা চাষী তাহাদের সুবিধা এবং যাহারা মজুর তাহাদেরও সুবিধা হইল; এককথায় কোন পক্ষের কোন আপশোষের কারণ থাকিল না। জগতের ইতিহাসে এমন চুক্তি অপূর্ব্ব ব্যাপার বটে; কিন্তু এ তো গেল এক পক্ষেরই কথা। অন্যপক্ষের অর্থাৎ শ্রমিকদের এবং কৃষকদের কথা বলিবে কে! বাঙলার মন্ত্রীরা তো কলওয়ালা সাহেবদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্যই আগাইয়া আছেন। গত সোমবার লালদিঘীর ধারে এই পাট সমস্যা সম্পর্কে একটা সরকারী বৈঠক হইয়া গেল। বাঙলার নয়ামন্ত্রী মৌলবী সামসুদ্দীন সাহেব এই বৈঠকে ছিলেন। আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলই এবং বিহারের মন্ত্রী ডাক্তার সৈয়দ মহম্মদ এই বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে কত কি হইল খবরের কাগজে দেখিলাম; কিন্তু বাঙলার পাট উৎপাদনকারী কৃষক এবং শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কাজে কি হইল, কিছুই বুঝিলাম না। মৌলবী সামসুদ্দীন সাহেব, যিনি পাটের দর বাঁধিয়া না দেওয়ার জন্য হক মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে সেদিন পর্য্যন্তও খড়্গহস্ত ছিলেন, বৈঠকে দেখিতেছি, এখন দিনের নাগাল পাইয়া তাঁহার মুখে অন্য বুলি বাহির হইতেছে। বিহারের মন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ দেশের স্বার্থের দিক টানিয়া তবু গোটাকত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান যুগে সভ্য দেশের গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই দেশবাসীর স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখেন, বাঙলা গবর্ণমেণ্টও যদি সেই নীতি অবলম্বন করেন, তবে পাট চাষীদের কল্যাণ হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি বৃদ্ধি এবং বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস নাই যে, বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল ডাক্তার সৈয়দ মহম্মদের উক্তির ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। ডাক্তার সৈয়দ মহম্মদ একথাও বলিয়াছেন যে, পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব নয়। বিহারে তাঁহারা আখের সর্ব্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধেও অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল কিন্তু এখন আর কোন আপত্তি শুনা যায় না। মোট কথা, এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে, সকল স্বার্থ কাঁটা সমান রাখিয়া শুধু কথার কারসাজী চলে, কাজে কিছুই হইবে না। এ সম্বন্ধে বাঙলা সরকার যে কৃষকদের স্বার্থের দিক হইতে কোন কাজ করিতে নারাজ ইহা বুঝিতে আর বাকী নাই; কিন্তু পাটুয়া সাহেবেরা যাহারা সব চেয়ে নিজেদের স্বার্থ-রক্ষায় বেশী হুঁসিয়ার, তাহাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা ক্রমেই বেশী করিয়া পাকা হইতেছে, তাহারা নিজেদের লাভের গণ্ডা গুণিয়া লইবেই। আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহারা পাট জন্মায় তাহারা মন্ত্রীদের মধুর মধুর বচন শুনিয়া পেটে হাত বুলাইবে।

রাষ্ট্রনীতি ও ভগবৎ-প্রেম—

রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ভগবৎ-প্রেমের সম্পর্ক কি? গত ৮ই জানুয়ারী রবিবার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মতিথি বাসরে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই তত্ত্বটি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান সকলের মধ্যে আছেন, এই যে অনুভূতি, ইহাই ভগবৎ-অনুভূতি। এই অনুভূতির সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক সকলের সঙ্গে এমন দৃঢ় হয় যে, পরের সেবা তখন আপনারই সেবা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, কৃষক এবং শ্রমিকেরাই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। ইহারা যাহাতে রাষ্ট্রক্ষেত্রে নিজেদের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তেমন সাধনার প্রেরণা আনিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ধনীদের চেয়ে দরিদ্রদের ভিতর থাকিতে ভালবাসিতেন। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তিনি নিজের আত্মার সংযোগ সাধন করিয়াছিলেন। জমিদারেরা রায়তদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান করেন না বলিয়া কেশবচন্দ্র জমিদারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। এইদিক হইতে রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামের সাফল্যের মূল শক্তি কোথায়, তিনি দেশবাসীকে তাহারই সন্ধান দেন। পরকে আপনার করিয়া লওয়ার অনুভূতির আত্যন্তিকতার উপরই রাজনৈতিক সকল সাধনা নির্ভর করিয়া থাকে। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনৈতিক সাধনার তোড়ের মুখে কর্ম্মীর একটা রৌদ্রদীপ্ত বৈশিষ্ট্যময় চরিত্রের বিকাশ দেখিতে পাই—দেখিতে পাই একটা ব্যক্তিত্বকে, কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বের পিছনে থাকে ঐ প্রেম। যেখানে প্রেমের শক্তিই ব্যক্তিত্বের আকারে ফুটিয়া উঠে না, সেখানে—তেমন ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য নাই, উহা সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থেরই উপাসনা মাত্র—হয় নাম, না হয় যশ, না হয় টাকা-কড়ি বা তেমন কিছু! এগুলির উপর রাজনীতির গতি বেশী দূর চলে না, প্রতিকূলতার প্রথম আঘাতেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং নিজের স্বরূপকে উন্মুক্ত করিয়া থাকে।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(২)

জীবনের দুইটি প্রান্ত আছে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি; ব্যষ্টি সমগ্র বা সমষ্টি কর্তৃক পুষ্ট হইতেছে, আর সমষ্টি ব্যষ্টি সকলের দ্বারা গঠিত হইতেছে; এই দুই প্রান্তের ভারসাম্য বিধান করা এবং ইহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার নিরন্তর প্রবৃত্তি—ইহারই উপর প্রকৃতির সমগ্র ধারাটি নির্ভর করিতেছে। মানব-জীবন এই নীতির ব্যতিক্রম নহে। অতএব মানব-জীবনের পূর্ণতার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হইতেছে আমাদের জীবনের এই দুই প্রান্তের মধ্যে, ব্যষ্টি ও সামাজিক সমষ্টির মধ্যে যে সামঞ্জস্য এখনও সিদ্ধ হয় নাই তাহাকে সিদ্ধ করিয়া তোলা। সিদ্ধ সমাজ হইবে সেইটিই যাহা ব্যষ্টির পূর্ণতম বিকাশের সম্পূর্ণ অনুকূল; আবার ব্যষ্টির সিদ্ধি অপূর্ণ রহিয়া যাইবে যদি তাহা সে যে-সমাজের অন্তর্গত তাহার পূর্ণতালাভে এবং শেষ পর্যান্ত বৃহত্তম মানব গোষ্ঠীর, ঐক্যবদ্ধ সমগ্র মানব-জাতির পূর্ণতালাভে সহায়তা না করে।

কারণ প্রকৃতির ক্রমিক বিকাশের পদ্ধতি এমন একটি জটিলতার সৃষ্টি করিতেছে যাহার জন্য ব্যষ্টি একেবারে সমগ্র মানব-জাতির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না। উভয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রতর সংঘ সকল গড়িয়া উঠে, তাহারা সেই শেষ ঐক্যের কতকটা সহায় হয় আবার কতকটা বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়—মানবীয় কৃষ্টির ক্রমবিকাশের এই সকল মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্রতর সংঘের গঠন অপরিহার্য্য। কারণ দূরত্বের বাধা, সংগঠনের অসুবিধা এবং মানব-হৃদয় ও মস্তিষ্কের অক্ষমতার জন্য প্রথমে ক্ষুদ্র, তাহার পর বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সংঘ গঠন করা প্রয়োজন হইয়াছে, যেন মানুষ বিশ্বজনীনতার দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। পরিবার, কমিউন্, কুল, জাতি, শ্রেণী, নগরতন্ত্র অথবা কতকগুলি কুল বা গোষ্ঠীর সমবায়, অধিজাতি (nation), সাম্রাজ্য,—এই সব হইতেছে ঐ প্রগতি ও নিত্য-বিস্তারের বিভিন্ন স্তর। যেমন বৃহত্তর সংঘগুলি সাফল্যের সহিত গড়িয়া উঠিতেছে, সংগে সংগে যদি ক্ষুদ্রতর সংঘগুলিকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই ক্রমান্বয়-বিকাশে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় না; কিন্তু প্রকৃতি এই পন্থা অনুসরণ করে না। একবার সে যে-সকল জাতিরূপের (types) সৃষ্টি করিয়াছে প্রায়ই তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইতে দেয় না, অথবা যেটির আর কোনই উপযোগিতা নাই কেবল সেইটিকেই ধ্বংস করে, বাকীগুলি সে রাখিয়া দেয় তাহার প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য অথবা তাহার বৈচিত্র্য, সমৃদ্ধি, বহুত্ব সৃষ্টির তীব্র স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য; কেবল তাহাদের ভেদসূচক রেখাগুলিকে মুছিয়া ফেলে অথবা তাহাদের গুণ ও সম্বন্ধগুলি এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয় যেন—সে যে বৃহত্তর ঐক্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে কোনরূপ বাধা না হয়। এই মানব-জাতিকে প্রতি পদেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়; শুধু সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির সামঞ্জস্য সাধনের দুরূহতা হইতেই নহে পরন্তু ক্ষুদ্রতর সমষ্টিগুলি এখন যাহারা অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিয়াছে তাহার সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য সাধনের দুরূহতা হইতেও এই সমুদয় সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে।

এই কষ্টকর প্রয়াসের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত-সকল ইতিহাস আমাদের জন্য রাখিয়া দিয়াছে, সেই সকল সফলতা ও নিষ্ফলতার দৃষ্টান্ত আমাদের পক্ষে খুবই শিক্ষাপ্রদ। ইহুদী ও আরব এই দুইটি সেমিটিক্ (Semitic) জাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতিসকলকে একসংগে গড়িয়া তুলিবার সংগ্রামের পরিণতি আমরা দেখিতে পাই, প্রথম ক্ষেত্রে উহা সমাধিত হইয়াছিল দুইটি রাজ্যে বিভাগ করিয়া এবং এই বিভাগ ইহুদী জাতির চিরস্থায়ী দুর্ব্বলতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে উহার সাময়িক সমাধান হইয়াছিল ইস্লামের ঐক্যসাধক শক্তির অভ্যুত্থানের দ্বারা। কেল্টিক্ (Celtic) জাতিগণের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই অন্তর্ভুক্ত জাতিগণকে লইয়া এক অধিজাতি গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। আয়র্লণ্ড ও স্কটলণ্ডে এই প্রয়াস সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হইয়াছিল, এক বিদেশী শাসন ও সংস্কৃতির চাপে জাতির নিজস্ব জীবনকে পিষ্ট হইতে হইয়াছিল এবং ওয়েল্সে ইহার সমাধান হইয়াছিল শেষ মুহূর্ত্তে। নগর-তন্ত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক জাতিসকলের একত্র সংঘ-বন্ধনের ব্যর্থ প্রয়াস দেখিতে পাই গ্রীসের ইতিহাসে এবং প্রকৃতির এইরূপ প্রয়াসের আদর্শ সফলতা দেখিতে পাওয়া যায় রোম্যান ইটালীর অভ্যুত্থানে। গত দুই সহস্র বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া ভারতের সমগ্র ইতিহাস হইতেছে পরিবার, কমিউন্, কুল, জাতি, ক্ষুদ্র প্রাদেশিক জনসমষ্টি বা রাষ্ট্র, বৃহৎ ভাষাগত জনসমষ্টি, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র,—সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে অসাধারণভাবে বহুল এইসব বিসদৃশ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিমুখ (centrifugal) প্রবৃত্তিকে দমন করিবার প্রয়াস; বহুবার ইহা কৃতকার্য্যতার সমীপবর্ত্তী হইলেও শেষ পর্য্যন্ত সফল হইতে পারে নাই। একথা বোধ হয় বলা চলে যে, যত-রকম দুরূহতা হইতে পারে প্রকৃতি এখানে সে সবের একত্র সমাবেশ করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব জটিলতা ও অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ পরীক্ষার প্রয়াস করিয়াছে, যেন এইভাবে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ফল লাভ করা যায়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমস্যাটি অসমাধেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্তত উহার সমাধান কার্য্যত সম্ভব হয় নাই এবং প্রকৃতি তাহার প্রথা অনুসারে বাহিরের শক্তির সাহায্য, বিদেশী শাসনরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

কিন্তু যখন অধিজাতি যথেষ্টভাবে সংগঠিত হয় (এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, প্রকৃতি যাহা এ পর্য্যন্ত বিকাশ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে) তখনও সকল সময়ে পূর্ণ ঐক্য সংসাধিত হয় না। যদি আর কোনরূপ অনৈক্যের হেতু না থাকে, তথাপি শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ সকল সময়েই সম্ভব হয়। আর এই ব্যাপারটি হইতে আমরা মানব-জীবনে প্রকৃতির এই ক্রম-বিকাশ-ধারার আর একটি নীতির সন্ধান পাই, আমরা সম্ভাব্য মানবীয় ঐক্যের প্রশ্ন আলোচনা করিব তখন দেখিব যে এই নীতির উপযোগিতা সাতিশয় অধিক। সর্ব্বাংগসিদ্ধ সমাজে এবং শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বাংগসিদ্ধ মানবমণ্ডলে ব্যক্তির সর্ব্বাংগ-সিদ্ধি (সিদ্ধি বলিতে আপেক্ষিক ও ক্রমবিকাশশীল সিদ্ধিই বুঝিতে হইবে)—ইহাই হইতেছে প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্য। কিন্তু সমাজের মধ্যে সকল ব্যক্তির বিকাশ যুগপৎ সমানভাবে এবং সমগতিতে হয় না। কেহ কেহ অগ্রসর হইয়া যায়, অপরে

দাঁড়াইয়া থাকে, আবার কেহ কেহ পিছাইয়া পড়ে। অতএব যেমন সমষ্টিসকলের মধ্যে বিশেষ বিশেষ অধিজাতির প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী, ঠিক তেমনই সমষ্টির মধ্যেও কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী হয়। সাময়িকভাবে প্রকৃতি তাঁহার প্রগতির জন্য (কিম্বা এমনও হইতে পারে যে পশ্চাদ্বর্ত্তনের জন্য) যে গুণটি চায়, যে শ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা সিদ্ধভাবে সেই গুণটির বিকাশ করিতে পারে, সেই শ্রেণীই প্রাধান্যলাভ করে। প্রকৃতি যদি শক্তি ও চরিত্রবল চায়, তাহা হইলে অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য হয়; যদি সে জ্ঞান-বিজ্ঞান চায়, তাহা হইলে শিক্ষিত ও পণ্ডিত শ্রেণীর প্রাধান্য হয়; যদি কার্য্যকারী দক্ষতা, চাতুর্য্য, অর্থ-নীতি ও সমর্থ সংগঠনের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বুর্জোয়া বা বৈশ্য শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে এবং সাধারণত আইনজীবিগণই তাহাদের নেতৃত্ব করে; যদি সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার এবং শ্রম-সংগঠনের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্যও অসম্ভব নহে।

কিন্তু এই যে ঘটনা, শ্রেণী বিশেষেরই হউক বা অধিজাতি বিশেষেরই হউক প্রাধান্য, ইহা কেবল একটি সাময়িক প্রয়োজন ব্যতীত আর অধিক কিছু হইতে পারে না; কারণ মানব-জীবনে প্রকৃতির ইহা কখনই চরম লক্ষ্য হইতে পারে না যে, কতিপয় লোক অধিকসংখ্যক লোককে শোষণ করিবে, অথবা অধিকসংখ্যক লোক কতিপয় লোককে শোষণ করিবে। মানব-সমাজের অধিকাংশকে অবনত ও পরাধীন রাখিয়া কেবল কতকগুলি লোক সিদ্ধ হইয়া উঠিবে; এ-সব কেবল সাময়িক কৌশলমাত্র হইতে পারে। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, এই সব প্রাধান্য সকল সময়েই নিজেদের মধ্যে নিজেদের ধ্বংসের বীজ বহন করিয়া থাকে। তাহাদের শোষণকারী শক্তি বর্জ্জিত বা বিনষ্ট হয়, অথবা তাহারা সাধারণের সহিত মিশিয়া সমান হইয়া যায়, এই ভাবেই তাহাদের অবসান ঘটে। ইউরোপে এবং আমেরিকায় আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাধান্যশালী ব্রাহ্মণ ও প্রাধান্যশালী ক্ষত্রিয়ের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে অথবা তাহারা জনসাধারণের সহিত সমান হইতে চলিয়াছে। কেবল দুইটি তীব্রভাবে বিভক্ত শ্রেণী বর্ত্তমান রহিয়াছে, প্রাধান্যশালী ধনিক শ্রেণী এবং শ্রমিক, এবং আজিকার যত গুরুত্ববিশিষ্ট আন্দোলন তাহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য হইতেছে এই অবশিষ্ট প্রাধান্যের উচ্ছেদ সাধন করা। এইদিকে নিরন্তর প্রবৃত্তিতে ইউরোপ প্রকৃতির প্রগতির একটি মহান্ নীতি অনুসরণ করিয়াছে, সেইটি হইতেছে একশেষ সমতার দিকে তাহার গতি। অবশ্য পূর্ণ সমতা না হইতে পারে, বস্তুত পূর্ণ সমরূপতা অসম্ভবও বটে এবং একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে; কিন্তু যাহাতে বিভেদের খেলা কোনরূপ অনর্থের সৃজন করিবে না এইরূপ একটা মূলগত সমতা মানব-জাতির প্রকৃত পূর্ণত্বের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

অতএব প্রাধান্যশালী সংখ্যাল্পিষ্ঠ দলের পক্ষে সর্ব্বোত্তম পরামর্শ হইতেছে তাহাদের ক্ষমতাত্যাগের এবং সমষ্টিজীবনের অন্যান্য অংশকে অথবা যতটুকু অংশ এই প্রগতির জন্য প্রস্তুত হইয়াছে সেইটুকুকেই তাহাদের আদর্শ, গুণ, সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা প্রদানের যথাসময় উপস্থিত হইলেই অবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করা। যেখানে ইহা করা হয় সেখানে সমাজের সমষ্টি-জীবন বিপ্লব বা গভীর ক্ষত বা ব্যাধি এড়াইয়া স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হইতে পারে; অন্যথা তাহা বিশৃঙ্খলভাবেই অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়, কারণ মানুষের অহঙ্কার বরাবর প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিবে, প্রকৃতি ইহা বরদাস্ত করিবে না। প্রকৃতি প্রাধান্যশালী শ্রেণীসমূহের নিকট হইতেই যাহা দাবী করিতেছে তাহারা যদি সেই দাবী এড়াইতে কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে সমাজের সমষ্টিজীবনের উপর অধমতম দুর্ভাগ্য আসিয়া পড়িবে; ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি ভারতবর্ষে। এখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা দেশের অধিকাংশ লোককে যতদূর সম্ভব নিজেদের স্তরে তুলিয়া লইতে শেষ পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হইয়া এবং নিজেদের ও সমাজের বাকী অংশের মধ্যে প্রাধান্যের এক অনতিক্রমণীয় ব্যবধান দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া দেশের অবনতি ও অধঃপতনের প্রধান নিমিত্ত হইয়াছে। কারণ প্রকৃতির উদ্দেশ্য-সকল যেখানে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে প্রকৃতি অপরাধী প্রতিষ্ঠানটি হইতে তাহার শক্তি অনিবার্য্যভাবে সরাইয়া লয় এবং শেষ পর্য্যন্ত অন্য এবং বাহ্যিক উপায় আমদানী ও প্রয়োগ করিয়া বাধাটিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করিয়া দেয়।

কিন্তু যদিও আভ্যন্তরীণ ঐক্যটিকে সামাজিক, রাষ্ট্রনীতিক এবং সংস্কৃতিমূলক ব্যবস্থা দ্বারা যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা যায়,—তথাপি ব্যক্তির সমস্যাটি থাকিয়াই যায়। কারণ এই সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ মানব শরীরের মত নহে যে, ইহাদের অন্তর্গত জীবকোষগুলি সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ নিজেকে লইয়া থাকিতে চায় এবং পরিবার, কুল, শ্রেণী, জাতির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে চায়; বস্তুত একদিকে এইরূপে নিজেকে লইয়া তৃপ্তি এবং অপরদিকে ঐ সর্ব্বজনীনতা—এই দুইটিই তাহার পূর্ণতালাভের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। অতএব যে-সব সমাজ-সঙ্ঘ কোন বিশেষ শ্রেণীর বা শ্রেণী সকলের প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে, তাহাদের পক্ষে যেমন পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন, নতুবা তাহাদিগকে ধ্বংস হইতে হয়, ঠিক তেমনিই যে-সকল সমাজ-সঙ্ঘ ব্যক্তির এইরূপ পূর্ণতালাভের অন্তরায় হয় এবং তাহাদের সীমাবদ্ধ ছাঁচের মধ্যে এবং সঙ্কীর্ণ কৃষ্টি বা ক্ষুদ্র শ্রেণীগত বা জাতিগত স্বার্থের কঠিন গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে জোর করিয়া আবদ্ধ করিতে চায় তাহাদিগকেও সময় বুঝিয়া পরি-বর্ত্তিত হইতে হইবে, নতুবা প্রগতিশীল প্রকৃতির অপ্রতিবোধনীয় প্রেরণায় তাহাদিগকে ধ্বংস হইতে হইবে।*

(ক্রমশঃ)

*মূল ইংরেজী 'The Ideal of Human Unity' হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতি ও আন্তর্জ্জাতিক চাঞ্চল্য

মিঃ নেভিল চেম্বারলেন আগামীকল্য রোম যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড হালিফাক্স। ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইদানীং ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতি কিরূপ পরিচালিত হইতেছে, সে বিষয়ে গত বারে কতকটা আলোচনা করিয়াছি। চেম্বারলেন মহাশয় পূর্ব্বে মিউনিকে গিয়া যেরূপ কাণ্ড করিয়া আসিয়াছেন, এবারেও রোমে বসিয়া অনুরূপ কিছু করিবেন কি? অথবা এমন কিছু কি করিয়া ফেলিবেন, যাহাতে ভারতবর্ষের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হইতে পারে? ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর রোম-পরিক্রমার কথা কিছুকাল পূর্ব্বেই ঘোষণা করা হইয়াছিল। এজন্য পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে আলোচনা হইতে পারিয়াছে, বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এ সম্বন্ধে নানারূপে জল্পনা-কল্পনা চলিবার অবসর ঘটিয়াছে। কিন্তু কোথাও প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন আলোক-পাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' সাধারণভাবে বলিয়াছেন যে, মিঃ চেম্বারলেন হয়ত শান্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রোম যাইতেছেন, কিন্তু শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিই তিনি সেখানে পাইবেন।

গত দশ-বার দিনের মধ্যে জগতের দিকে দিকে যেরূপ বাদ-প্রতিবাদ উষ্মা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্যই মনে হইবে যে, শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য যেরূপ আবহাওয়া প্রয়োজন তাহা আদৌ দেখা যাইতেছে না। ইটালী সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্র, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মাটসিনি, গারিবলডী, কাভুরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইয়া পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিবার পর হইতেই এই রাষ্ট্রটির সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক চাপে। আফ্রিকার সামান্য কিছু তখন পর-হস্তগত হইতে বাকী ছিল, তাহারই খানিকটা তখন সে হাত করিয়া লয়। কিন্তু তাহার সাম্রাজ্য-লাভের স্পৃহা কখনও প্রশমিত বা লুপ্ত হয় নাই। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতির নিকট হইতে সময়ে সময়ে সুবিধা আদায় করিয়া লইতে সে বরাবর সচেষ্টই ছিল। বিগত মহাসমরে পূর্ব্ব সন্ধি অনুসারে জার্ম্মানীর পক্ষেই ইটালীর লড়াই করিবার কথা ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্য লাভের মোহে উহার বিরোধী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গেই ১৯১৫ সনের এপ্রিল মাসে লণ্ডনে একটি গোপন চুক্তি করিয়া তাহাদের সপক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিয়া যায়। যুদ্ধের পর কিন্তু কি ফ্রান্স, কি ব্রিটেন, উভয়েই এই চুক্তির বিশেষ আমল দেয় নাই। ইটালীর জাতীয়তা ইহাতে ভীষণ আঘাত পাইল, আর ইহার প্রতিঘাতেই উৎপত্তি হইল, মুসোলিনীর নেতৃত্বে উগ্র-জাতীয়তাবাদী ফাসিষ্ট দল। আজ পনের বৎসর যাবৎ ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। মুসোলিনীর কথাই সেখানে আইন। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের চুক্তিভঙ্গের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমগ্র ইটালীই যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

মুসোলিনী শিক্ষিত, দূরদর্শী, চতুর রাজনীতিক। একের পৃষ্ঠে ভর করিয়া অপরের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিয়া লইতে তিনি খুবই ওস্তাদ। স্বদেশে নিজ-শক্তি ও মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বাহিরের দিকে নজর দিয়াছেন। ১৯৩৫ সনের জানুয়ারী মাসে ফ্রান্সের সহিত তিনি একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তির বিষয় আগে একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। আজ-কাল আপনারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভিতরে একটা অঙ্গাঙ্গীভাব লক্ষ্য করিতেছেন, মাঝে মাঝে মনে হয়, উভয়ে যেন হরিহর আত্মা। যুদ্ধ পরবর্ত্তী যুগে উভয়ের মধ্যে এতটা অঙ্গাঙ্গীভাব ছিল না। একের উপর টেক্কা দিয়া অন্যে সুবিধা করিয়া লইতে বেশ ব্যগ্র ছিল। আর উভয়ের মধ্যে একটি কারণে বেশ একটা সন্দেহও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্ষণে-অক্ষণে, স্থানে-অস্থানে ব্রিটেনের জার্ম্মান-প্রীতি প্রকাশ হইয়া পড়িত। [illegible] ফ্রান্স মোটেই পছন্দ করিত না এই জন্য উহার সদিচ্ছা উপর তাহার আস্থা ক্রমশ টলিয়া যাইতেছিল। ফ্রান্স অতঃপর ঝুঁকিয়া পড়িল ইটালীর দিকে। উভয়ের স্বার্থ তখন এক। হিটলার জার্ম্মানীতে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া অতি দ্রুত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাঁহার আত্ম-জীবনীতে তিনি যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পরিপূরণের জন্য মধ্য ইউ-রোপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। অষ্ট্রিয়াকে গ্রাস করা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। ফ্রান্স তাঁহাকে ইহা করিতে দিবেন না; ইটালীর পক্ষেও তাহা স্বার্থানুগ নহে। কাজেই উভয়ে আঁতাত হইল। কিন্তু এই আঁতাতের পক্ষে, যে অন্যায়টি ইটালীর গলায় তখনও কাঁটার মত বিঁধিতেছিল তাহা ত অগ্রে বিদূরিত করিতে হইবে। আফ্রিকার ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইটালীকে যে উপনিবেশ দিবার কথা ছিল, ফ্রান্সের তরফে তাহা এবার কথঞ্চিৎও পূরণ করা ত উচিত। তাই টিউনিসে ইটালীয়ানদের অধিকার সাব্যস্ত হইল। লিবিয়ার দিকে ফ্রান্স তাহার রাজ্যের খানিকটা ছাড়িয়া দিল। আবিসিনিয়ার আদ্দিস-আবাবা-জিবুতি রেল কোম্পানীর একটা মোটা অংশ তাহাকে দিয়া দিল। এই চুক্তির সময় উভয়ের মধ্যে আর একটা বিষয়েও নাকি বোঝাপড়া হইয়াছিল—ইটালী আবিসিনিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহিলে, ফ্রান্স তাহাতে বাদ সাধিবে না!

মুসোলিনী যতখানি সম্ভব এই চুক্তির সুবিধা গ্রহণ করিলেন। আবিসিনিয়াও জয় করিলেন। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি। যে ফ্রান্স তাহার কার্য্যে প্রথমে এতটা সহায় হইয়াছিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘের পাকে পড়িয়া সে ক্রমেই মুসোলিনীর চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছে। ইদানীং তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-সৌহার্দ্দ্য ত নাই-ই, বরং ঘোর শত্রুতার লক্ষণ-ই প্রকাশ পাইতেছে। ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে রাজদূত বিনিময় ইদানীং বন্ধ। ১৯৩৫ সনের কুখ্যাত ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান চুক্তির সমাধি এই সেদিন পুরাপুরিই হইয়া গিয়াছে। মুসোলিনী সম্প্রতি ইহা নাকচ করিয়া দিয়াছেন!

কেন তিনি ইহা একেবারে নাকচ করিয়া দিলেন, সে কাহিনী বেশী পুরাতন না হইলেও সুদীর্ঘ। যে জার্ম্মানীকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য ফ্রান্স ও ইটালীর ঐকান্তিক চেষ্টা হইয়াছিল, সেই জার্ম্মানীই এখন ইটালীর পরম বন্ধু! ইটালীর সম্মতিতেই জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়াকে কুক্ষিগত করিয়াছে! ইটালী ফ্রান্সের শত্রু পর্য্যায়ে পড়িয়া গেলেও জার্ম্মানীর নিকট ব্রিটেন কিন্তু এখনও বন্ধু থাকিতেই চাহিতেছে। ব্রিটেন নানাভাবে তাহার এই বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়াছে আজ কয়েক

বৎসর যাবৎ। সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ দুইটি এখানে উল্লেখ করিব। ১৯৩৫ সনের জানুয়ারী মাসে হয় ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান চুক্তি, আর ইহার ঠিক ছয় মাস পরে জুন মাসে হয় ইঙ্গ-জার্ম্মান নৌ-চুক্তি! সম্প্রতিকার মিউনিকের ঘটনায় ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথাপি কিন্তু জার্ম্মানী ব্রিটেনকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, বা আদবে বিশ্বাসই করে না। কারণ, সে ভালরূপেই জানে যে, বহির্জগতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে, ব্রিটেন তাহাতে প্রতিবন্ধক না হইয়া পারিবে না। কাজেই যদিও জার্ম্মানীও ব্রিটেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে সর্ব্বদাই তৎপর এইরূপে ভাণ করিয়া থাকে, তথাপি তাহার প্রধান যোগ হইল ফ্রান্স-বিরোধী ইটালীর সঙ্গে। আজকাল রোম-বার্লিন 'এক্সিস' বা কক্ষের কথা খুবই শুনিতেছি। এই কক্ষ কি পরস্পর বিরোধী স্বার্থকে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে? জার্ম্মানী মধ্য ইউরোপে প্রাধান্য চাহে, ইটালী আফ্রিকায় সাম্রাজ্য চাহে। এ দুইটির কোনটিই (আপাত দৃষ্টিতে) কোনটির বিরোধী নয়। কাজেই উভয়ের ইঙ্গিতে উভয়ে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে বহু দিন হইতে। জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া অধিকার করিয়াছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার খানিকটাও গ্রাস করিয়াছে, মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে 'অগ্রসর'-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। জার্ম্মানীর এই সব কার্য্যে ইটালীর 'প্রেষ্টিজ' বা মর্য্যাদা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে—এহেন কথা অনেকে বলিতেছেন। আবার ঐ অঞ্চলে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ লইয়া পরস্পরের মধ্যে ঘোরতর একটা বিসম্বাদ উপস্থিত হইবে, এরূপও অনেকে জল্পনা করেন। কিন্তু উভয়ের রাষ্ট্রনেতাদের মতি-গতি ইদানীং যেরূপ লক্ষ্য করি, তাহাতে ওরূপ সম্ভাবনা খুবই কম বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে অন্য বিষয়টিই বেশী সম্ভব মনে হইতেছে। অর্থাৎ জার্ম্মানীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যের ইঙ্গিতে ইটালী তাহার বহুদিন পোষিত সাম্রাজ্য-লাভ বাসনা চরিতার্থ করিতেই অগ্রসর হইতেছে। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে বিদ্রোহী পক্ষে ইটালী ও জার্ম্মানীর প্রত্যক্ষভাবে যোগদান কি সূচিত করে? দক্ষিণ-ইউরোপে তথা ভূমধ্যসাগরে ইটালী কার্য্যত যাহাতে প্রাধান্য লাভ করে, ইহার মধ্যে সেই গূঢ় উদ্দেশ্যই নিহিত আছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ইটালীর স্বার্থই কি স্পেনে, কি ভূমধ্যসাগরে উভয়ত্রই প্রবল, জার্ম্মানী তাহাকে সাহায্য করিতেছে মাত্র। একবার যদি স্পেনে ও ভূমধ্যসাগরে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তাহা হইলে 'কভু কি ডরাই আমি ভিখারী রাঘবে?' ব্রিটেন, ফ্রান্স উভয়েই তখন ইটালীর দুয়ারে আসিয়া ধর্ণা দিবে!

ইতিমধ্যে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে মুসোলিনীর আত্মবিশ্বাস অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। মিউনিক চুক্তির কথা আগে বলিয়াছি। ইহাতে মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানীর অগ্রগতি অপ্রতিহত হওয়া সম্ভব হইবে। আর একটি বিষয় মুসোলিনীকে আরও আশ্বস্ত করিয়াছে। স্পেনে ইটালিয়ানরা কতই না কুকাণ্ড করিতেছে, এই কিছুদিন পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরে জাহাজ চলাচল একরূপ অসম্ভব হইয়াই উঠিয়াছিল। ইহারও আগেকার কথা—আবিসিনিয়ায় নৃশংস অভিযানের কথা এখন না হয় না-ই তুলিলাম। কারণ, বর্ত্তমানযুক্ত রাষ্ট্রনীতি অতীতকে একেবারে হজম করিয়াই চলে। এত সব অনাচার-অবিচার, অকাণ্ড-কুকাণ্ড সত্ত্বেও ইদানীং ফ্রান্সের পরম সুহৃদ বলিয়া পরিচিত ব্রিটেন ইটালীর মিলন আকাঙ্ক্ষা করিতেছে! গত বৎসর জানুয়ারী মাসে ব্রিটেনের ইটালী-প্রীতির লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায়। তাহার পর গত এক বৎসরের মধ্যে নানা আলাপ-আলোচনা, বাদ-বিতণ্ডার পর ইদানীং ব্রিটেনের এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তব আকার ধারণ করিয়াছে। ব্রিটেন ইটালীর সঙ্গে মিত্রতা করিবেই। স্পেন হইতে সব সৈন্য সে সরাইয়া লউক, ভাল, না লইলেও ক্ষতি নাই। দশ হাজার সৈন্য ত সরাইয়া লইয়াছে! ইহা কি কম কথা? ব্রিটেন ইটালীর আবিসিনিয়া জয় স্বীকার করিবে, ইটালীকে মোটা-রকম ঋণদান করিবে, কিছু কিছু রাজ্যও ছাড়িয়া দিবে, আরও কি কি দিবে কে জানে? মুসোলিনী ব্রিটেনের কর্ণধারগণের মতিগতি পরখ করিয়াছেন, তাহাদের এই প্রেম যে অহেতুকী নয়, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া, তাহাও তিনি জানেন, ইহা যে স্থায়ী হইতে পারে না সে বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ। তথাপি তিনি ইহার সুযোগ লইতে ছাড়িবেন না।

মুসোলিনী বেশ জানেন যে, ভূমধ্যসাগরে তিনি খুবই শক্তিশালী হইয়াছেন। স্পেন-বিপ্লব তাহার পক্ষে বর হইয়াছে। ইংরেজ আজ ইচ্ছা করিলেও তাহাকে নিরস্ত করিতে আসিবে না। সে চটিয়া যায় এমন কোন কাজ ইংরেজের পক্ষে করা আজ সম্ভব নয়। কারণ বাস্তব রাজনীতির পক্ষে তাহা সুবিধাজনক মোটেই নয়। কাজেই আজ ভূমধ্যসাগরে প্রবল শক্তি-শালী ইটালীকে ব্রিটেন তোয়াজ করিয়াই চলিতেছে। ব্রিটেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহার এই শান্তি-প্রচেষ্টার মূলে একটি বিশেষ কারণ আছে। তাহা হইল আধুনিক রণ-সজ্জায় সে কখনও অন্যকে দাবাইয়া রাখিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু কতজনকে দাবাইয়া রাখা সম্ভব? এইখানে আর একটি কথাও বলা আবশ্যক। ইটালী ও জার্ম্মানীতে আঁতাত বলিয়াছি। জার্ম্মানী জাপানের সঙ্গেও একটি চুক্তিতে আবদ্ধ। ইটালী জার্ম্মানী-জাপান চুক্তিরও অংশী হইয়াছে। কাজেই, এখন এই তিনটির যে-কোনটিকে চটাইলে অন্য দুইটি আসরে নামিয়া পড়িবে। সুতরাং ইহাদিগকে যতদিন না চটাইয়া পারা যায়, সে জন্য চেষ্টা করা মন্দ কি?

যে কথা বলিতেছিলাম। মুসোলিনী আজ ভূমধ্যসাগরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। ইংরেজের মনোভাব তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে নানা সুবিধা-সুযোগ আদায় করিবার আশা রাখেন। যত গোল ফ্রান্সকে লইয়া। ফ্রান্সকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। ব্রিটেনে যেমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শাসক-দল ফাসিষ্ট-নীতির সমর্থক, ফ্রান্সের অবস্থা সেরূপ নহে। কাজেই মুসোলিনীর নীতি যে সে বরাবর সমর্থনই করিবে এমন আশা তাঁহার নাই। কাজেই হুমকি দিয়া, কূট-রাজনীতির সহায়তা লইয়া যতটুকু আদায় করা যায় ততটুকুই লাভ। আর তিনি আশা করেন ইহাতে তাঁহার লাভই হইবে বেশী, কারণ ভূমধ্যসাগরে তাঁহার ক্ষমতা

(শেষাংশ ৫৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

(লাহোর অধিবেশন, ১৯৩৯)

গত ২রা জানুয়ারী তারিখে লাহোর ইউনিভার্সিটি হলে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ষড়বিংশ সাধারণ অধিবেশনের উদ্বোধন হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সাড়ে তিনশত প্রতিনিধি উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতেও বহু বৈজ্ঞানিক কর্ম্মী এবং ছাত্র এই সভায় যোগদান করেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানসেবিগণের মিলনতীর্থ। প্রতি বৎসর সপ্তাহব্যাপী এই অধিবেশনে এদেশের বৈজ্ঞানিকগণ সম্মিলিতভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যে আলাপ-আলোচনা করেন, তাহা হইতে ভারতে বিজ্ঞান সাধনার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ আধুনিক জড় বিজ্ঞানের চর্চ্চায় খুব বেশী দিন হয় আত্মনিয়োগ করে নাই বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই সে এ-বিষয়ে যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কম গৌরবের নহে! এই কারণেই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের এই মহাসম্মেলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপ বিরাট বিশ্বজ্ঞ... সমাজের বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও কার্য্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ সামান্য নিবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনের মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিগণের পরিচয় ও তাঁহাদের অভিভাষণের মর্ম্মার্থ "দেশে"র পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

মূল সভাপতি

বাঙলা ও বাঙালী জাতির পক্ষে ইহা বিশেষ গর্ব্বের বিষয় যে, এই বৎসর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি পদে যেমন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তেমনি এই মহাসভার এগারটি বিভিন্ন শাখার মধ্যে ছয়টি শাখাতেই সভাপতিত্ব করিবার গৌরব বাঙালী বৈজ্ঞানিকগণই লাভ করিয়াছেন। গবেষণাক্ষেত্রে ইহা বাঙালী জাতির কৃতিত্বের কম পরিচায়ক নহে!

এই সর্ব্বভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের যিনি মূল সভাপতি পদ অলংকৃত করেন, তিনি বাঙলার সুসন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। ডাঃ ঘোষের নাম বাঙলা দেশের বিদ্বজ্জন সমাজে সুপরিচিত। রসায়ন শাস্ত্রে বিবিধ গবেষণা করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার ফলেই ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ গত বৎসর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে তাঁহাকে এই সম্মেলনের সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করেন।

ডাঃ ঘোষ ১৮৯৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার আলমবাটি গ্রামে। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রামচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একজন অভ্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। ডাঃ ঘোষ বাল্যে গিরিডিতে এবং পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত কলেজে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরিচালনাধীনে ও অনুপ্রেরণায় তিনি বিজ্ঞানের যে শিক্ষালাভ করেন, তাহাই পরবর্ত্তীকালে ডাঃ ঘোষকে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সহায়তা করিয়াছে। ১৯১৫ সালে কৃতিত্বের সহিত রসায়ন শাস্ত্রে এম-এস-সি ডিগ্রি লাভ করিবার পর, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। তখন বিজ্ঞান কলেজ সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞান কলেজে তিনি একান্ত মনে রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। তড়িৎবিচ্ছেদ্য তরল পদার্থ (Electrolyte) সম্পর্কে তাঁহার মৌলিক গবেষণা শীঘ্রই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি এ-সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করেন, তাহা 'Ghosh's Law' বলিয়া প্রচারিত। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ও পালিত বৃত্তি লাভ করিয়া ১৯১৮ সালে ডাঃ ঘোষ ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডোনানের গবেষণাগারে কিছুকাল পরীক্ষাকার্য্য পরিচালনা করেন। ১৯২১ সালে তিনি জার্ম্মানীতে গমন করিলে নার্ণষ্ট, হেবার প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি জুলাই মাসে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পরিচালনাধীনে বাঙলার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে বহুতর গবেষণা পরিচালিত হইতেছে। এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে একদল বিজ্ঞান কর্ম্মী গড়িয়া উঠিতেছে। আলোক-রসায়ন, ফোটো-ভোল্টায়িক সেল প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁহার পরিচালনাধীনে সম্প্রতি এখানে যে সমস্ত গবেষণা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষি সম্পর্কিত কতকগুলি সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত তিনি বর্ত্তমানে নানাবিধ গবেষণায় নিরত রহিয়াছেন এবং এজন্য রাজকীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ হইতেও একটি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ডাঃ ঘোষ বর্ত্তমানে "ভারতীয় রসায়ন সমিতির" সভাপতি। ১৯২৫ সালে তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে রসায়ন শাখার সভাপতিত্ব করেন। সম্প্রতি এদেশে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে জাতীয় শিল্পোন্নয়নের নিমিত্ত যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, ডাঃ ঘোষ তাহারও একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত ২রা জানুয়ারী তারিখে লাহোরে ইঁহারই নেতৃত্বাধীনে ভারতের বৈজ্ঞানিকগণের মহাসম্মেলন আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে তিনি যে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মূল সভাপতির অভিভাষণ

"এগার বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিরূপে অধ্যাপক সাইমনসেন ভারতের রসায়নবিদগণকে শুধু পুঁথিগত আবিষ্ক্রিয়ায় মনোনিবেশ না করিয়া ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে মনোযোগী হইবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন, বিগত দশ বৎসরে এদেশে রসায়ন শাস্ত্রে যে পরিমাণ গবেষণা পরিচালিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, সাইমনসেনের এই উপদেশ বাণী বৃথা যায় নাই। জৈব-রসায়নে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেক উল্লেখযোগ্য গবেষণা সাধিত হইয়াছে এবং এসম্পর্কে লাহোরে ডাঃ জে এন রায় এবং বাঙালোরে ডাঃ পি সি গুহের পরিচালনাধীনে যে কাজ হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজন বৈজ্ঞানিক ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আরও বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক জৈব-রসায়নে বিশেষ প্রশংসনীয় গবেষণা করিয়াছেন।

আধুনিক যুগে 'ভিটামিন', 'হোরমোন' প্রভৃতির আলোচনা সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায় এবং সম্প্রতি কয়েক বৎসর হয় এতৎসম্পর্কিত গবেষণায় নোবেল পুরস্কারও প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষ সুখের বিষয় এই যে, জীবন-রসায়নের এই বিভাগেও আমাদের দেশে পরীক্ষা কার্য্য চলিতেছে এবং এসম্পর্কে অধ্যাপক বর্দ্ধন ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ বি সি গুহ ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ রসায়নের এই বিভাগে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে ভিটামিন বি (২)এর উপরেও যথেষ্ট আলোকপাত হইয়াছে।

জৈব-রসায়নে যে পরিমাণ কাজ হইয়াছে, সে তুলনায় অজৈব-রসায়নে কাজ অনেক কম হইয়াছে বটে; তবে এ-সম্পর্কে ইহা

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক 'মারকিউরিয়াস্ নাইট্রাইট্' সম্পর্কিত অজৈব-রসায়ন গবেষণার ভিতর দিয়াই আধুনিক ভারতে রসায়ন শাস্ত্রালোচনার সূত্রপাত ঘটে। অজৈব-রসায়নের গবেষণায় আজও কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ ভারতের পীঠস্থানরূপে পরিগণিত। ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার মহাশয়ের "স্ক্যান্ডিয়ম" এবং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ ও আয়নের গঠন-সামঞ্জস্য বিষয়ক নানাবিধ গবেষণার কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অজৈব-রসায়নে আধুনিক

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

যুগে যে উন্নতিসাধিত হইয়াছে, তাহাতে কোন দ্রব্যে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় কোন রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিও ধরিতে পারা যায়। রাসায়নিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে রসায়ন শাস্ত্রে প্রভূত উন্নতি সূচিত হইতেছে। যদিও জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমা রেখা টানা যায় না, তথাপি আধুনিক যুগে পদার্থের যোজনীয়তায় (Valency) বিদ্যুতনিক ধারণা ও অন্যান্য যে সমস্ত নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহার ফলে এ বিষয়ে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ রসায়নবিদগণের কাজ করিবার বিরাট ক্ষেত্র রহিয়াছে।

প্রাকৃতিক রসায়নের (physical chemistry) চর্চা —বলিতে গেলে মহাযুদ্ধের পরে এদেশে আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু অর্থাভাবে প্রথম হইতেই এ-বিষয়ের গবেষণা ব্যাহত হইয়াছে। ডাঃ নীলরতন ধর মহাশয় এদেশে এরূপ গবেষণার প্রথম প্রবর্তন করেন। পরে অধ্যাপক ভাটনগর, মুখার্জি প্রভৃতির দৃষ্টিও এবিষয়ে আকৃষ্ট হয়। অধ্যাপক কোরেশী, যোশী, রায় মাতাপ্রসাদ, কৃষ্ণমূর্তি প্রভৃতি আজও বিজ্ঞানের এই বিভাগে আলোকবর্তিকা হস্তে অগ্রসর হইতেছেন। বিজ্ঞানের এই বিভাগের বিভিন্ন তথ্য সাহায্যে ডাঃ ধর ও তাঁহার সহকর্মিগণ ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কারণ নির্ণয় করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। মাতগুড় প্রভৃতি বাহিরের কোন দ্রব্যের উপস্থিতিতে কি ভাবে নাইট্রোজেন ভূমিতে সংলগ্ন হয় ও ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, তৎসম্পর্কেও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ভূমি বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে এই সমস্ত তথ্য বিশেষ কাজে আসিবে সন্দেহ নাই। এসম্পর্কে অধ্যাপক মুখার্জির বিভিন্ন গবেষণাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রবর্তিত বৈদ্যুতিক উপায়ে 'আয়নসমূহের' শোষণ (absorption) সম্পর্কিত মতবাদ ভূমি সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার উপর ইতিমধ্যেই বিশেষ আলোকপাত করিয়াছে।

রসায়ন শাস্ত্রের উপরোক্ত বিভাগ ব্যতীত আধুনিক যুগে চুম্বক-রসায়নেও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক ভাটনগর, ডি এম বসু, পি আর রায়, অধ্যাপক কৃষ্ণাণ প্রভৃতি এবিষয়ে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। পদার্থের চুম্বক-প্রবণতা পরিমাপ করিবার নিমিত্ত "ভাটনগর-মাথুর ইণ্টারফেরোমিটার দণ্ড" (Interferometer balance) নামে এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তড়িৎসমক্ষে কি ভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, তৎসম্পর্কে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে গবেষণা চলিতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নাগারে আলোক-রসায়ন সম্পর্কে যে পরীক্ষা-কার্য চলিতেছে ডাঃ ঘোষ তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া বলেন, যে প্রাকৃতিক রসায়নের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিবার জন্য যে শিক্ষা ও যোগ্যতার প্রয়োজন, এদেশে তাহার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতবর্ষে রসায়ন অপেক্ষা পদার্থবিজ্ঞানেই যুগান্তকারী আবিষ্কার অধিকতর বেশী হইয়াছে। এসম্পর্কে 'রামন্ ফল' (Raman effect), 'বোস ষ্ট্যাটিস্টিক্স্' এবং ডাঃ সাহা আবিষ্কৃত "থার্মাল আয়নিজেসন"-এর বিষয় উল্লেখ করিলেই পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত জটিল সমস্যা অবশ্য ইহার জন্য অনেকটা দায়ী। কারণ বহু বিষয়ে বহু পরীক্ষা না করা পর্যন্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কোন সত্য বা নিয়ম উদ্ঘাটন করা দুরূহ। এই কারণেই রসায়নে এক-সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সমধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আধুনিক ভারতে রসায়নে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গবেষণা হইয়াছে তাহার বেশীর ভাগই এই কারণে এইরূপ কেন্দ্রে সংঘটিত হইয়াছে,—যেখানে বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার সদিচ্ছা বর্তমান।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা যাহাতে কার্যকর হইয়া উঠে এবং এদেশের বিভিন্ন শিল্পসমূহ যাহাতে এরূপ গবেষণার দ্বারা উপকৃত হয়, তৎপ্রতিও বর্তমানে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এবিষয়ে অধ্যাপক ভাটনগর বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিগণের মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন তাহা সর্বথা প্রশংসনীয়। ষ্টীল ব্রাদার্স প্রদত্ত অর্থে তৈল জাতীয় পদার্থ সম্পর্কে ভাটনগরের পরিচালনাধীনে লাহোরে গবেষণা চলিতেছে এবং আশার কথা এই যে, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এরূপ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছে। এদেশজাত তুলা, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্য সম্পর্কে গবেষণা করিবার নিমিত্ত সরকার হইতেও বর্তমানে বিভিন্ন কেন্দ্রে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বনজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও কাষ্ঠ প্রভৃতির সংরক্ষণ সম্পর্কে দেরাডুনে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষাকার্য চলিতেছে। লাক্ষা সম্পর্কে ডাঃ এইচ কে সেনের বিবিধ গবেষণাও ইতিমধ্যে এই শিল্পের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে।

এদেশের শিল্প সংগঠনকল্পে মহাযুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার বহু আশার বাণী শুনাইলেও, যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পরে তাহাদের পূর্ব নির্ধারিত পলিসি অনুযায়ী বিশেষ কিছু কাজ হইয়া উঠে নাই। তবে বিশেষ আশার কথা এই যে, সম্প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে এদেশের শিল্পোন্নয়নের এক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত এদেশের দারিদ্র, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি দূর করা যে সম্ভবপর নহে, এদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ক্রমেই ইহা উপলব্ধি করিতেছেন। বিরাট দেশে এরূপ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা যে এক দুরূহ ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহাতে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। ভারতের সন্তানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, ভালভাবে পরিচালিত হইলে তাহারা নিজেদের সমস্যার

সমাধান নিজেরাই করিতে সমর্থ হইবে এবং জগতের ইতিহাসে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিবে। তবে একাজে দেশের প্রত্যেকের সহযোগিতা আবশ্যক। সুখের বিষয় ভারতীয় শিল্পিগণ সুসংবদ্ধভাবে শিল্পগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন। বহু স্থানে তাহাদের অর্থ-সাহায্যে গবেষণাগার গড়িয়া উঠিতেছে। শিল্পপতিগণ যদি নিজদিগকে জনসাধারণের সেবক বলিয়া মনে করেন, তবে অনেক অনর্থ দূর হইতে পারে।

'প্রাচুর্য্যের মধ্যে দারিদ্র্য'—আজিকার পৃথিবীতে অদৃষ্টের এক নির্ম্মম পরিহাস। পৃথিবীর এক অংশে অন্নবস্ত্র দগ্ধ হইতেছে, দগ্ধ নদীতে ঢালিয়া ফেলা হইতেছে, অথচ অপর অংশে অর্দ্ধনগ্ন জনগণ অন্নাভাবে দিনাতিপাত করিতেছে। এইরূপ অবস্থার মূল-কারণ নির্ণয় করা বেশী শক্ত নহে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহে পুরুষ-পরম্পরা উন্নতি সাধিত হইতেছে বটে; কিন্তু অশোক এবং যীশুখৃষ্টের সময়ের পর হইতে মানুষের সামাজিক, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে তুলনামূলক বিশেষ কোন উন্নতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে না। ফলে আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতা-ধ্বংসের অস্ত্ররূপেই ব্যবহৃত হইতেছে। মানবতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যেভাবে ইহা জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণগত স্বার্থের খাতিরে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতেই এই অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছে। আধুনিক যুগের ইহা এক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য। স্পেনে ও চীনে ইহারই আগুন জ্বলিতেছে,—ইউরোপের বিভিন্ন জাতির ঘৃণা-বিদ্বেষের মধ্যে ইহারই আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি।

মানুষের হাতে শুধু যন্ত্রপাতি দিলেই চলিবে না। ঠিক কি ভাবে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এবিষয়ে তাই বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের নৈতিক-দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। আধুনিক জগতে যে বিপর্য্যয় (Chaos) আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিয়া যাহাতে বিভিন্ন মানব ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

পদার্থ ও গণিত-বিজ্ঞান শাখা

পুণা আবহাওয়া অফিসের 'সুপারিণ্টেণ্ডিং মেটোরোলোজিষ্ট' ডাঃ কে আর রামনাথন এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ রামনাথন ১৮৯৩ সালে মালাবার জেলার পালঘাটে জন্মগ্রহণ করেন এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৯১৪ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ত্রিবান্দ্রাম মহারাজ কলেজে ডিমন্স্ট্রেটার পদে কাজ করেন। পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া স্যার সি ভি রামনের অধীনে গবেষণা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। পদার্থের অণুসমূহ দ্বারা কি ভাবে আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটে, তৎসম্পর্কে বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ করিয়া ১৯২৩ সালে রামনাথন ডি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৫ সালে ডাঃ রামনাথন আবহ-বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। তদবধি বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তর সম্পর্কে তিনি বিবিধ গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ ও গণিত-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি-রূপে তিনি তাঁহার অভিভাষণে পৃথিবীর চুম্বকধর্ম্ম ও বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তর সম্পর্কে আলোচনা করেন। আধুনিক যুগে বায়ু-মণ্ডলস্থিত ওজন-গ্যাস, নৈশাকাশের আলো, মেরু-জ্যোতিঃ, বিদ্যুৎ-মণ্ডল এবং উচ্চাকাশ হইতে শব্দ-তরঙ্গের প্রতিফলন প্রভৃতি বিষয়ে বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে; ফলে বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। উচ্চস্তরের বায়ুতে আমরা যে বৈদ্যুতিক গুণাবলীর সন্ধান পাই, ভূ-চুম্বক-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা দ্বারাই তাহার পরিমাণ প্রথম নির্ণীত হয়। ভূ-চুম্বক-বিজ্ঞানের যে সমস্ত সমস্যার সমাধানে উচ্চস্তরের বায়ু সম্পর্কে আলোকপাত সম্ভবপর হইয়াছে ডাঃ রামনাথন তাহার বিস্তারিতভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া

ক্ষেত্র দুই বিভিন্ন অংশ লইয়া গঠিত

পরিবর্ত্তনশীল, অপরটি অনেকটা

করিলে দেখা যায়, স্থায়ী চুম্বকক্ষেত্রের

সীমাবদ্ধ; কিন্তু দিনমানের সঙ্গে সা

বৃদ্ধির ফলে, পর্য্যায়ক্রমে চুম্বকক্ষেত্রে ও তাঁর সুখ-

কিম্বা অকস্মাৎ সময়ের কোন সুনির্দি-সে আশ্চর্য্য।

চুম্বকক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্ত্তন সংঘটিত হ উঠে। তাঁকে

বহির্ভাগে অনুষ্ঠিত কোন ঘটনাই তাহার চালাক ছেলে

চুম্বকক্ষেত্রে দৈনিক পরিবর্ত্তন সাধিত হ তরে ভিতরে

গবেষণায় জানা যায় যে, বায়ুমণ্ডলের উচ্চ

প্রবাহ পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়া পারেন?

াঁকে। চলিয়া

ডাঃ কে আর রামনাথন

পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে এইরূপে বৈদ্যুতিক-প্রবাহের দুইটি করিয়া যুক্ত পথ (closed circuit) রহিয়াছে। পৃথিবীর যে অংশ সূর্য্যালোকে অধিক-তর আলোকিত হয়, সেই অংশেই এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তি অধিক। শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মকালেও ইহার তীব্রতা অধিকতর বেশী হইয়া থাকে। প্রতি গোলার্দ্ধে দিবাভাগে যে তড়িৎ প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ ষাট হাজার অ্যাম্পিয়ারের কম হইবে না। স্থানবিশেষে চুম্বকীয় বিপর্য্যয় উপস্থিত হইতে দেখা যায়। অনেক সময় এইরূপ বিপর্য্যয়ের সহিত রেডিও-তরঙ্গের বিলুপ্তিও পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত বিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, যে-তড়িৎ-প্রবাহ দিবাভাগে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, তাহার উচ্চতা পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে, ৮০ হইতে ১৫০ কিলোমিটার হইবে। বৈজ্ঞানিক 'ডায়নামোর' অনুরূপে কোন প্রক্রিয়া সাধিত হওয়ার ফলেই, এই তড়িৎ-প্রবাহের উদ্ভব ঘটে বলিয়া অনুমিত হয়। সমগ্র পৃথিবীটা এই স্থলে বিরাট একটা চুম্বকের মত কাজ করে এবং তড়িৎ-বাহী উচ্চস্তরের বায়ু 'আর্মেচারে'র অনুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করে বলিয়া মনে হয়।

প্রতিদিন বায়ু-চাপের যে পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, উহার ফলে বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ-পরিচালনক্ষম উচ্চস্তরে এক ঘূর্ণি-গতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহাই তড়িৎ-প্রবাহ উৎপত্তির প্রধান সহায়। অতঃপর এই তড়িৎ-প্রবাহ কি ভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠে, তৎসম্পর্কে আলোচনা করিবার পর ডাঃ রামনাথন বলেন যে, কখনও কখনও চুম্বকক্ষেত্রে যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ দুইটি তড়িৎ-প্রবাহ। একটি মেরু হইতে কুড়ি

স্মরণ রাখিতে হইবে যে হইতে ১০০ হইতে ১৫০ কিলো-
'মারকিউরিয়াস্ নাইট্রাইট্'-মের্ চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে
ভিতর দিয়াই আধুনিক ভ তড়িৎ-প্রবাহ সমষ্টি—পৃথিবীর
ঘটে। অজৈব-রসায়নের গবেলে ভূমি হইতে পৃথিবীর নিজ
ভারতের পীঠস্থানরূপেপরিমাণ উর্দ্ধ্ব দূরত্বে থাকিয়া শনি-
সরকার মহাশয়ের স্ক্যান। চুম্বকীয় বিপর্য্যয়কালে ব্যোম-
আয়নের গঠন-সামঞ্জস্য ক্ষত হয়, তাহাতেও উপরোক্ত কুণ্ডলা-
এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা এর অস্তিত্ব রহিয়াছে বলিয়া ধারণা
স্পর্কে কতকগুলি জটিল বিষয়ের
রাছে।
আলো প্রভাবে চুম্বকীয় বিপর্য্যয় এবং
ঘটে বলিয়া যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত
চনা করিয়া পরিশেষে ডাঃ রামনাথন
নে অধিকতর গবেষণা পরিচালিত হইলে,
বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু সমস্যার সমাধানও
। আশা করা যায়।

রসায়ন শাখা

বিদ্যালয়ের কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড
রসায়ন বিভাগের লেকচারার ডাঃ পুলিনবিহারী

ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার

সরকার ডি-এস্-সি রসায়ন শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৬ সালে তিনি এম-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি দুই বৎসরের জন্য স্যার রাসবিহারী ঘোষ "ট্রেভেলিং ফেলোসিপ" লাভ করেন। ডাঃ সরকার স্ক্যানডিয়ম নামক রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে এবং দুর্ল্লভ-মৃত্তিকা দ্রব্যগুলি (rare earths) সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন এবং প্যারি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীর "ডক্টরেট" উপাধি লাভ করেন। তিনি জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক পরিষদের সদস্য এবং তাঁহার নিজ বিষয়ে এখনও বহু গবেষণা কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

৭ই জানুয়ারী লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতিরূপে তিনি তাঁহার অভিভাষণে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ ও তাহাদের মূলকের (radicle) মধ্যে যে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তৎসম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সাধারণ মৌলিক পদার্থে ও আয়নে এই যে সামঞ্জস্য, তাহার সহিত উহাদের নিউ-ক্লিয়সের বাহিরের বিদ্যুতানিক গঠনের বিশেষ সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিফ্ প্রবর্ত্তিত পদার্থের আবর্ত্ত তালিকায় (Periodic Table) সিরিয়ম, প্রেসিওডিনাম, ইউ-রোপিয়ম, গেডোলিনিয়ম প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকাদ্রব্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাধিক সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। ইহার কারণ এই যে, উহাদের নিউক্লিয়স মধ্যস্থিত আবরণের মধ্যে তারতম্য যাহাই থাকুক না কেন, বহির্ভাগের বিদ্যুতানিক গঠনা-কৃতিতে উহাদের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। এইরূপ সাদৃশ্যের ফলেই স্ক্যানডিয়ম্ নামক রাসায়নিক পদার্থটির সহিত স্ফটিক গঠন-আকৃতিতে ও ইহা দ্বারা গঠিত কোন কোন যৌগিক জটিল পদার্থের একদিকে যেমন লৌহ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পদার্থের সামঞ্জস্য দেখা যায়, তেমনি ইহা দ্বারা গঠিত কতকগুলি সাধারণ লবণ জাতীয় পদার্থের দ্রবণীয়তায় উহার সহিত উপরোক্ত দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকা দ্রব্যগুলির মধ্যেও বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পদার্থের সাম্য গঠনের উপর আয়নসমূহ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা উল্লেখ করিয়া ডাঃ সরকার বলেন যে, বিভিন্ন পদার্থের স্ফটিকাকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেই যে তাহাদের রাসায়নিক গুণাবলীর মধ্যেও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে তাহা মনে করিবার কারণ নাই। সরল বা জটিল উভয় প্রকার সমধর্ম্মী মূলকেই দেখা যায়, যদি যোজনীয়তায় (Valency) এবং আয়নের তড়িৎ সমষ্টিতে উহারা সমান থাকে, আয়নের ব্যাসার্দ্ধও যদি প্রায় সমান হয় এবং বহির্ভাগের বিদ্যুতানিক গঠনেও যদি সাদৃশ্য থাকে, তবেই শুধু একরূপ স্ফটিকাকৃতিতে সম্পূর্ণ রাসায়নিক সাদৃশ্য আশা করা যাইতে পারে। ডাঃ সরকার এবিষয়ে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। সালফেট্ এবং ফ্লুবেরি-লেট্ আয়নের রাসায়নিক সাদৃশ্য সম্পর্কে তাঁহার নিজ গবেষণা-গারে যে পরীক্ষার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাহারও উল্লেখ করেন। মনোফ্লুফস্ফেট ও সালফেট্ এবং ফরমেট ও নাইট্রাইট-এর মধ্যে যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তৎসম্পর্কেও তাঁহার গবেষণা-গারে অনেক পরীক্ষা করা হইয়াছে। সমান তড়িৎ সমষ্টি, সমানাকৃতি আয়ন, ও তাহাদের বিদ্যুতানিক সমগঠন উপরোক্ত পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সাদৃশ্য আনয়নে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে পরিশেষে তাহার আলোচনা করিয়া ডাঃ সরকার তাঁহার অভিভাষণ শেষ করেন।

ভূতত্ত্ব শাখা

ভূতত্ত্ব শাখার সভাপতি পদে ধানবাদ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনসের ভূতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ এস কে রায় নির্ব্বাচিত হন। ডাঃ রায় ১৮৯৫ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত পুতুলগাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি ১৯২০ সাল হইতে জুরিকে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯২৪ সালে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। জুরিকে থাকাকালীন তিনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক পি নিগ্‌লির সহকারীরূপে কাজ করেন এবং ভূতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়া বিজ্ঞানমহলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, জাতির উন্নতি এমন কি অস্তিত্ব দেশের খনিজ সম্পদের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদ খুব বেশী নয়; সুতরাং খনিজ সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে খনিজ সম্পদের অত্যন্ত অপচয় হয়। এই অপচয় নিবারণের জন্য প্রায় কোনও ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইতেছে না বলিলেই চলে।

কয়লা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোনও খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে লোকে বিশেষ সংবাদ রাখে না। পূর্ব্বে লোকে কয়লার খনি সম্বন্ধেও খুব কম সংবাদই রাখিত; কিন্তু সম্প্রতি কয়লার খনিতে

(শেষাংশ ৫৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্যাঘ্র-ভীতি

(গল্প)

শ্রীহেমন্তকুমার বসু বি-এ

ভাবিয়া চিন্তিয়া কাদম্বিনী চলিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

যে-রকম ভুগিতেছেন, হঠাৎ মৃত্যু হওয়াও বুঝি আশ্চর্য্য নয়। বেলা পড়িয়া আসিতেই গা কাঁপাইয়া জ্বর আসে। সন্ধ্যা, রাত্রি চলিয়া যায়, জ্বর ছাড়ে না;—পরের দিন সকাল বেলাতে কমিয়া গিয়া দেহটা একটুখানি হাল্কা বোধ হয় মাত্র। সেই জ্বরের উপর আবার জ্বর আসে বেলাশেষে। তারপর জ্বরের ঘোরে কোথা দিয়ে কি ভাবে সারা রাত্রি কাটিয়া যায়, বুঝিতেও পারেন না।

মাসখানেক হইল প্রত্যহ এমনি চলিতেছে।

দেখাশুনা করিবার কেহই নাই। যে ঝি-টি ছিল, দিন দুই হইল সেও কাজ ছাড়িয়া পালাইয়াছে। পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের কেহ দয়া করিয়া কবিরাজ বাড়ী হইতে আনিয়া দিলে ঔষধ খাওয়া হয়, নহিলে সেও হইয়া উঠে না।

সকলেই বলিতেছে কিছুদিনের মত নীতীশের ওখানেই তাঁর চলিয়া যাওয়া উচিত। তাতে স্থানপরিবর্ত্তনের কাজও হইবে, চিকিৎসাও চলিবে ওখানে ভাল,—ঠিক মত।

কিন্তু ভাবিতে গেলে যাইতে ইচ্ছা কি হয়? অবশ্য নীতীশ তাঁর নিদ্দর্য় প্রাণহীন বা অকৃতজ্ঞ নয়। মায়ের পেটের ভাই-ই ত নয়,—ওর সাত বছর বয়সে বাবা ও মা দুজনে মারা গেলে, কাদম্বিনীর কাছেই মানুষ ও হইয়াছিল অনেক দিন, নিজের কাছে আনিয়া এ গাঁয়ের স্কুলে মাইনর পর্য্যন্ত কাদম্বিনীর স্বামীই তাকে পড়াইয়াছিলেন। ভাইটি তাঁর একথা ভোলে নাই। বিশেষ এই জন্যেই হয়ত অভাগী বড় দিদির খোঁজ-খবর লইতে, অর্থ সাহায্য করিতে,—অত বড় হইয়া, অত বড় চাকুরী করিয়াও ভুলিয়া বসে নাই। আর গিয়া পড়িলে কি যে ব্যস্ত হইয়া উঠে,—কোথায় বসাইবে, কি ভাবে আদর-আপ্যায়ন করিবে, সে যেন ভাবিয়াই পায় না। বিধবা বড় বোনের মনে, এ বয়সে এতটুকু শান্তি বিধানে কি যে ওর আকুতি,—কথায় খুলিয়া না বলিলেও, আভাসেই এ তিনি বুঝিতে পারেন। ......কিন্তু ধন্য বৌ ঐ ভামিনী। না হয় আছেই মস্ত বড়লোকের মেয়ে, তাই বলিয়া অত দেমাক, অত হেলা-অশ্রদ্ধা তাঁকে! তিনি পাড়াগেঁয়ে, নোংরা,—কালো, কুশ্রী দেখিতে, তিনি গেলে—সকলের কাছে তাঁর সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়া বেড়ায়। তাঁর অসাক্ষাতে প্রতিবেশিনী বন্ধুদের মধ্যে তাঁকে লইয়া কত ঠাট্টা তামাসা, তাঁর গায়ের রঙের, মুখে তামাক-পাতার গুঁড়া মাখার কত নাকি ব্যাখ্যান করে! অবশ্য মুখোমুখি কিছুই বলে না তাঁকে দেখিয়া—কিন্তু এমনিভাবে তাকায়, তাতেই পরিষ্কার হইয়া যায় মনের ভিতরকার ভাব—না বুঝিয়া পারা যায় না—তিনি যে তাদের মধ্যে আসিয়াছেন, এতে সে খুশী নয়, এ তার মোটেই অভিপ্রেত নয়।

গোলমাল হইতে পারে না বুঝি নীতীশের জন্যই। নীতীশ সব বিষয়েই বৌকে কি ভয়টাই না করিয়া চলে! কিন্তু তাঁর বিষয়ে ভয়কে আমল না দিয়াই বে করিয়া তাঁকে আদর যত্ন ও তাঁর সুখ-সুবিধার আয়োজন করিতে থাকে—সে আশ্চর্য্য। তাঁর ব্যাপারে ও যেন মরিয়া হইয়াই উঠে। তাঁকে লইয়া আড়ালে ওদের কি কথা কাটাকাটি চলে, চালাক ছেলে তা জানিতে দেয় না। কিন্তু এ লইয়া যে ভিতরে ভিতরে দারুণ অস্বস্তি পোহায়, এ কি তিনি না বুঝিয়া পারেন? তাই ত যত দিন ইচ্ছা, বুঝি রাখিতে পারে না তাঁকে। চলিয়া যাইবার প্রস্তাব জানাইতেই পথ খরচ দিয়া বলে—আবার যখন আসতে ইচ্ছে হবে দিদি, লিখো,—খরচ পাঠিয়ে দেব। কিন্তু কথাটা বলিতে কন্ঠস্বরে যে বেদনার সুর বাজিয়া উঠে তা কাদম্বিনীর কান এড়ায় না।

এই সব ভাবিয়াই যাইতে ইচ্ছা হয় না। অমন ভাই তাঁর, তাঁর জন্য কষ্ট পায়! --হাঁ, তারপর, গেল বছর একদিন তাঁকে লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে ওদের হঠাৎ প্রকাশ্যেই কি ঝগড়া হইয়া গেল, যা তার আগে কোনদিনই হয় নাই। কাদম্বিনী দেখিয়া শুনিয়া মরমে মরিয়া গেলেন, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—আর আসিবেন না। তারপর দেখা যাইতেছে—নীতীশ আশ্চর্য্য ও মহাব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া গিয়া পায়ের ধু... বিজয়ার প্রণাম পর্য্যন্ত জানায় নাই তাঁকে! এ অব... কি করিয়া যাওয়া চলে?

কিন্তু যে হতভাগিনীর ত্রিসংসারে আপনার ব... নাই, তার আবার প্রতিজ্ঞা, মান-অভিমান! কাদম্বিন... জল মুছিতে মুছিতে জিনিষপত্র গুছাইতে থাকে... গাঁয়ের একটি ছেলের সঙ্গে গরুর গাড়ীতে বাহির... পড়েন ষ্টীমারঘাটের পথে।

কাদম্বিনীর ভুল ভাঙ্গিয়া যায়! ভাই তাঁর এ... বদলায় নাই। মায়া-দয়া তার তেমনিই আছে।

—এ কি? দিদি এলে নাকি? বা-রে!—এস দিদি ভিতরে এস, কাদম্বিনীকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া নীতীশ অশ্চর্য্য ও মহাব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া গিয়া পায়ের ধুলো লইয়া হাত ধরিয়া টানে।

একি, তোমার জ্বর নাকি দিদি, কত দিন ভুগছ? ঈস, তাই ত চেহারা এমন হয়েছে! নীতীশের কণ্ঠস্বরে ব্যথা ঝরিয়া পড়ে। কথা বলিতে বলিতে দুজন বাড়ীর ভিতরে আসিয়া দাঁড়ায়। ...নে দাঁড়াইয়া কাদম্বিনী কুণ্ঠিতভাবে চাহিতে থাকে। নীতীশ বলিয়া উঠে—এরা কেউ নেই দিদি! দু'দিন হ'ল চলে গেছে খিদিরপুরে, মানিনীর বিয়েতে।—মাস দেড়েকের মত ওখানে থাকবে। মাসখানেক পরে বিয়ে, তখন আমাকেও অবশ্য চলে যেতে হবে দিন কয়েকের জন্যে।

মানিনী নীতীশের শ্যালিকাদের অন্যতমা।

অপ্রত্যাশিত সংবাদে কাদম্বিনী যেন চমকিয়া উঠেন। ভামিনী নাই—কথাটা যেন সহসা বিশ্বাসই করিতে পারেন না। তারপর যখন বিশ্বাস হয়, মনের জ্বরের সঙ্গে যেন গায়ের জ্বরও যায়—ঘাম দিয়া একেবারে ছাড়িয়া। কাদম্বিনী

আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠিয়া বসেন। হাল্কা দেহমনের ভিতর একটা অপূর্ব্ব স্বস্তির হিল্লোল খেলিতে থাকে

হঠাৎ বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইয়া উঠেন—কিন্তু হীরে, মতি, নেপু—ও'দের আমি না দেখে থাকব কি ক'রে রে নিতু?—আহা-হা, কত দিন যে ওদের দেখিনি রে!

সে কথায় কান না দিয়া কাছে আগাইয়া গিয়া নীতীশ বলে—এতদিন ভুগছ দিদি, একখানা চিঠি লিখেও কি জানাতে হয় না?

কাদম্বিনী এ কথায় কিছুই বলেন না। নীতীশ তাঁর স্তব্ধ মুখে সহসা যেন বেদনার ছায়া দেখিতে পাইয়া বিব্রত হইয়া পড়ে। দিদির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সলজ্জ ব্যথার সহিত হঠাৎ মনে হইতে থাকে—সে নিজেও ত একখানা চিঠি লিখিয়া এতদিন ওঁর কোন খোঁজ-খবরই করে নাই।

গাঁয়ের স্কুলের পড়াশুনা শেষ করিয়া নীতীশ কলিকাতায় পড়িতে যায়। সেখানে প্রবেশিকা, আই-এ ও বি-এ পড়া শেষ করিয়া যায় বিলাতে। সহায়-সম্বলহীন নীতীশের পক্ষে এসব কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল, সে আশ্চর্য্য কাহিনী। তার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। যা প্রয়োজন—সে তৎপরবর্ত্তী বিবরণ। বিলাত হইতে উচ্চ [illegible]ক্ষালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া নীতীশ বঙ্গদেশে এক [illegible]রী কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিল; তারপর বছর দুই-[illegible]ল হইয়া বসিয়াছে এক বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর। [illegible]াইয়াই বিবাহ হইয়াছিল;—হইয়াছিল এক বিখ্যাত [illegible]ানের ঘরে। ইন্সপেক্টর হইয়া নীতীশ এক [illegible] শহরে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং সেখানেই বাস [illegible] আসিতেছে।

সরকারী সুন্দর বাড়ীটি নদীর ধারে। বাড়ীটির এক-[illegible]কে প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান।

জৈষ্ঠ মাস, প্রচণ্ড গরম। কাদম্বিনী ইতিপূর্ব্বে এ বাড়ীতে এ সময়ে আসেন নাই। এমন একলাটিও কখন থাকেন নাই। বলিবার, কহিবার, ঘৃণা, নিন্দা করিবার কেহ নাই। নদীর জলে স্নান, পূজা-আহ্নিক জপ-তপ করিয়া, গরমে ঘরের পাকা ঠাণ্ডা মেঝেয় গড়াইয়া,—নীতীশকে মনের মত যত্ন-আদর করিয়া খাওয়াইয়া,—গল্পগুজব করিয়া, স্বচ্ছন্দমত তামাক-পাতার গুঁড়ো দাঁতে-মুখে ঘষিয়া ঘষিয়া নিশ্চিন্তে মনের আনন্দে কাটিয়া যায় দিন-গুলি। আর এক কথা এই এদেশে আসিয়া অমন যে দুরন্ত জ্বর সেও কিনা গিয়াছে বিনা ঔষধে অমনি অমনি সারিয়া,—কাদম্বিনীর সত্যই সুখের সীমা নাই।

কিন্তু অবিমিশ্র মনের সুখের মধ্যে একটি ব্যাপারে মনটি তাঁর সময় সময় বড়ই অস্থির, পীড়িত হইয়া উঠে। বাগানের আমের সদ্ব্যবহার হয় বটে,—কিন্তু কাঁঠালগুলি একেবারেই যায় ব্যর্থ। পাকিয়া গাছেই সেগুলি ঝরিয়া পড়ে। দেখিয়া কাদম্বিনীর সহ্য হয় না, বাগানের পানে চাহিয়া মনের ভিতর হু হু করিয়া উঠে।

কাদম্বিনী প্রশ্ন করেন—নিতু, তুই কাঁঠাল খাস্‌নে কেন?

প্রশ্ন শুনিয়া নীতীশ আশ্চর্য্য হইয়া চায়। দিদি কি জানে না যে, ও বস্তুটি এখন আর তেমন সচল নয়?

চকিতে ভামিনীকেও মনে পড়িয়া যায়। নিজে ত সে খায়ই না, আপনার জনদের মধ্যেও যাতে এ কেউ না খায়,—সেদিকেও সব সময়ের তরে কি সতর্ক দৃষ্টি!—একবার বড় ছেলে নেপু বাগানে গাছতলায় পড়া একটা কাঁঠাল ভাঙিয়া একটি কোয়া মুখে পোরায় কি বিড়ম্বনাই না ঘটিয়াছিল!—দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া ভামিনী তার মুখের ভিতরকার কোয়া আঙুল দিয়া টানিয়া বাহির করিয়াই খুশী হয় নাই, কান ধরিয়া হিঁচড়াইয়া টানিয়া আনিয়া অসহায় বালককে ঘা-কতক শপাশপ বেত লাগাইয়া তবে ছাড়িয়াছিল।

ভাবিয়া চিন্তিয়া নীতীশ বলে—ও হজম হয় না দিদি!

—হজম হয় না? কি বলিস নিতু? খেয়ে দেখেছিস?......না রে না, নিশ্চয় হবে হজম, আমি জানি, দেখই একবার খেয়ে। ছেলেবেলার কথা মনে নেইরে?

বলিয়া কাদম্বিনী নীতীশের বাল্য-কাহিনী পাড়িয়া বসেন—নীতীশ ছেলেবেলায় খুব কাঁঠাল খাইতে পারিত। কাদম্বিনী নিজের হাতে তাকে কাঁঠাল ভাঙিয়া খাওয়াইতেন,—একটি কাঁঠাল অনায়াসেই সে খাইয়া জীর্ণ করিত,—অভাবের সংসারে এক একদিন শুধু কাঁঠাল খাইয়াই কাটিয়া যাইত। তারপর বাগানের পানে দরদভরা দুই চোখ তুলিয়া বলেন—আহা-হা, অমন সোনার ফল, সে না কি কেউ খায় না—গাছেই ঝরে পড়ে! ওরে নিতু আমার মাথা খাস........আমাদের গাঁয়ের হারান্ কবিরাজ কি বলে জানিস্ নিতু? কাঁঠাল সালসার কাজ করে,—সোনার কান্তি শরীর হয় খেলে।

পরদিন বেলা আটটায় কাদম্বিনী আস্তে আস্তে ডাকিলেন—নিতু একবার ঘরে আয়ত ভাই।

—কেন দিদি?

আয় ত বলছি,—কাদম্বিনী ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন। ঘরে ঢুকিয়া নীতীশের চক্ষুস্থির। দেখিল—কাদম্বিনী ঘরের মেঝেয়, টেবিল পাতিয়া নয়, আসন-পিঁড়ি করিয়া খাবার জায়গা করিয়াছেন এবং পিঁড়ির সম্মুখে রাখিয়াছেন,—টাটকা-ভাঙা একখানা কাঁঠালের কোয়া। পাকা কাঁঠালের সুগন্ধে কক্ষ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে।

দুই চোখ কপালে তুলিয়া নীতীশ বলিল—এ-কি দিদি, হঠাৎ কি তোমার মাথা খারাপ হল?

—না, রে না। তুই আয়।......না, না, কোন কথাই শুনব না আমি, কাদম্বিনী উঠিয়া আসিয়া নীতীশের হাত ধরিলেন।

নীতীশ মহাফাঁপরে পড়িল। চাহিয়া দেখিল, কাদম্বিনীর দু'চোখ ছলছল করিতেছে।

দিদিকে সে ভালবাসে। তাঁর সজল চোখে সহসা সে বুঝি দেখিয়া ফেলিল সেই মাতৃমূর্ত্তি, সহোদরারূপিণী যে মায়ের হাতে ছেলেবেলায় সে মানুষ হইয়াছিল। এই স্নেহ-মূর্ত্তির অসম্মান সে করিতে পারিল না।

কিন্তু আসনে বসিয়া মনের ভিতর কেবলই খুঁত খুঁত করিতে লাগিল।

কাদম্বিনী বলিলেন—গালিয়ে দেব রে? না, চুষে চুষেই খাবি? ছেলেবেলায় কিন্তু তুই চুষেই খেতিস্। তাই খাবি?

অত্যন্ত দ্বিধার সহিত একটি কোষ হাতে তুলিয়া লইয়া নিরুপায় নীতীশ মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিল।

দেখা গেল—নীতীশ মুখ বিকৃত করে নাই, বরং কোয়া হইতে নিঃসৃত সমস্তটুকু রস আগ্রহেই যেন গিলিয়া ফেলিতেছে।

একটি শেষ করিয়া নীতীশ আর একটি কোয়া তুলিয়া লইল। তারপর আর একটি......। খাওয়া চলিতে লাগিল। এবং সম্মুখে বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া কাদম্বিনী এমনিভাবে দেখিতে লাগিলেন,—মনে হইল দেখিতে দেখিতে আনন্দে কখন কাঁদিয়াই ফেলেন বা!

অসুখ হইবার ভয়ে সামান্য কিছু খাইয়াই সেদিন উঠিয়া পড়িল বটে, কিন্তু আর দুই একদিনের মধ্যেই,—খাইতে বসিয়া—নীতীশ কাদম্বিনীর পীড়াপীড়িতে যা করিতে সমর্থ হইল, রোমাঞ্চকর না হইলেও --তা অচিন্তিতপূর্ব্ব। অর্থাৎ গোটা একটি কাঁঠাল খাইয়া নীতীশ প্রমাণ করিল, বাল্য বয়সের পনস আস্বাদনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা তার মোটেই নষ্ট হয় নাই, চর্চ্চার অভাবে ভিতরে স্তম্ভিত হইয়া ছিল মাত্র।

কাদম্বিনী ত দেখিয়া এবার সত্যই কাঁদিয়া ফেলিলেন। ওরে নিতু, কি ডাকাত রে তুই। এমন খেতে পারিস এখন, অথচ খাসনে!—আত্মারে এমন করে কে বঞ্চিত করে রে! বলিয়া চোখের জল মুছিলেন। ঘোষণা করিলেন—তিনি চলিয়া গেলে যা হয় হ'ক—যতদিন আছেন, নীতীশকে প্রত্যহ পেট ভরিয়া কাঁঠাল খাইতে হইবে।

ডোক্তার এ বিষয়ে আপত্তি ছিল বটে, কিন্তু দেখা গেল, সে যেন আর তত প্রবল নয়। পরে যা হইতে লাগিল, না বলিলেও চলে।

বাঙলা দেশের এক বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর নিজের বাড়ীর ভিতর স্নেহময়ী দিদির পাশে বসিয়া প্রত্যহ প্রায় একটি করিয়া কাঁঠাল কিরূপে শেষ করিয়া ফেলে, তা কাহারই নজরে পড়ে না। চাকর-বাকরদের পড়ে কি-না জানা যায় না। পড়িলেও আসে যায় না কিছুই। এমন কি নীতীশ ভাবে, অতি আধুনিক ভদ্রসমাজের ব্যক্তিরা, যাহাদের সঙ্গে সাধারণত তার মেলা-মেশা, তারাও যদি হঠাৎ এ জানিয়া ফেলে, আচমকা তাদের কেহ আসিয়া যদি তাকে এই বিসদৃশ (অর্থাৎ পনস ভোজনরত) অবস্থায় দেখিতে পায়, তা হইলেও হয়ত সে ততখানি ক্ষতি মনে করিবে না, যেমনটি করিবে শুধু একটি মাত্র ব্যক্তির বেলায়। সে জানিবে, সে দেখিয়া ফেলিবে ভাবিতেও নীতীশ আঁৎকাইয়া উঠে। এরূপ অঘটন ঘটিবার পূর্ব্বে সে যেন মৃত্যু বরণ করিতেও প্রস্তুত। খাইতে খাইতে তার কথাই মনে পড়িয়া নীতীশ এক এক সময় সহসা চমকিয়া মুখ তুলিয়া চায়। তারপর না দেখিয়া অসীম ভরসায় মনে পড়িয়া যায়, না, সে নাই, দূরে স্থানান্তরে সম্প্রতি সে পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছে। এক এক সময়ে ভাবে যদি যথাসময়ের পূর্ব্বে কোন কারণে আসিয়া পড়ে। কিন্তু সেরূপ ব্যাপারের একটি সম্ভবপর হেতুও খুঁজিয়া না পাইয়া নিজের পাগলামীতে নিজেই হাসিয়া উঠে......তারপর নির্ভয়ে হৃষ্টচিত্তেই খাইতে থাকে।

বেলা সাড়ে আটটার মত। গল্পে ও কৌতুকে খাওয়া ও খাওয়ানর ব্যাপারটি নিত্যকার মতই অগ্রসর হইতেছে।

বাঘের ভয় সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় যে প্রবাদবাক্য প্রচলিত, কোন কোন স্থলে সে যে কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে ঘটনার সহিত মিলিয়া যায়, সেই সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ কৌতুক-কাহিনী সবে শেষ করিয়া কাদম্বিনী প্রচুর হাসিতেছেন এবং গল্পটির রস পুরাপুরি উপভোগ করিতে পাইয়া কাঁঠাল কোয়ায় পূর্ণমুখ নীতীশ অসুবিধার মধ্যেও হাসিতেছে।

হঠাৎ বাহিরে মোটরের শব্দ পাইয়া চমক লাগিল। চাকর-বাকরেরা বাড়ী না থাকায়, কে বা কাহারা আসিল,—খবরও মিলিল না—তৎক্ষণাৎ। সাবধান হইবে কি-না ভাবিতেছে, এমন সময় কচিছেলে-কোলে যে স্ত্রীমূর্ত্তিটি বারান্দায় উঠিয়া একেবারেই দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সে নীতীশের অপরিচিতা নয়,—বাড়ীর ধাই,—ভামিনীর সহিত গিয়াছিল;—নীতীশের ছোট ছেলেটিই তাহার কোলে। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া নীতীশ কি একটা বলিতে যাইবে, ধাই প্রণাম করিয়া জানাইল—বিবাহের দিন হঠাৎ পিছাইয়া যাওয়ায় তারা চলিয়া আসিয়াছে। বিবাহ কেন পিছাইল, হঠাৎ কি সব অসুবিধা উপস্থিত হইল, সাহেব তা মেম-সাহেবের কাছেই শুনিতে পাইবেন।

মেম-সাহেব!—কোথায় তিনি?—নীতীশ মুখের ভিতরকার কোয়া দ্রুত গিলিয়া ফেলিয়া বিবর্ণমুখে চাহিল।

কিন্তু প্রশ্নের আর প্রয়োজন ছিল না। ভামিনী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে উঠানে কথা বলিতে বলিতেই আগাইয়া আসিতেছিল।

ধাই সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নীতীশ উঠিয়া পড়িতে পারে নাই। ধাইয়ের স্থানে খোলা দরজার সম্মুখে যে দ্বিতীয় স্ত্রীমূর্ত্তিটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তার চকিত গম্ভীর দৃষ্টির সম্মুখে নীতীশ স্থির চক্ষু হইয়া চাহিয়া আছে। মুখে আর কাঁঠাল কোয়া নাই সত্য, কিন্তু হাতে ও মুখে লেপিয়া যাওয়া পনসরস তখন দিব্য জ্বলজ্বল করিতেছে। প্রায় নিঃশেষিত কোয়ার থালাটিও পড়িয়া রহিয়াছে সম্মুখে।

কাদম্বিনী একবার মাত্র চাহিয়া সেই যে মুখ নামাইয়া ছিলেন, আর তুলিতে পারেন নাই।

মায়ের দেখাদেখি ছেলে-মেয়েরাও নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত চোখে চাহিয়া আছে।

নীতীশ চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছে কি?

না, তা হইলেও বুঝি বাঁচিতে পারিত। নীতীশ চাহিয়া আছে সত্য, কিন্তু মনে হয় না কিছু দেখিতে পাইতেছে। মনে হয় হঠাৎ বুঝি তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঘরের ভিতর মাছির ভনভনানি ভয়ানক বাড়িয়া উঠিয়াছে।

জাহাজ-ডুবির আতঙ্ক

শ্রীগুণময় আচার্য্য

ইংলণ্ডের নরফোক্ সাগর-তীরবর্ত্তী শহর। নরফোকের সাগর-তীর হইতে জনতা লক্ষ্য করিল একখানি স্পেনীয় মালটানা জাহাজ—স্পেনীয় বিদ্রোহীপক্ষের ক্রুজারের গোলা-গুলী বর্ষণে ঘায়েল হইয়া জলমগ্ন হইল। নরফোক্ তীর হইতে মাত্র দশ মাইল দূরে এই ঘটনা ঘটিল।

এই জাহাজের ৪৫ জন নাবিক ও কর্ম্মচারীর ভিতর ছিল পাঁচটি জননী এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি। এবং এই দুর্ঘটনা ঘটে ২রা নবেম্বর। তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া বিদ্রোহী-পক্ষের ক্রুজার বিষম গর্জ্জনে মারাত্মক অগ্নি উদ্গিরণ করিতে থাকে। ইহার পর বিধ্বস্ত জাহাজখানি শেলের আঘাতে শতচ্ছিদ্র হইয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে স্রোত ও ঢেউয়ের প্রকোপে; অবশেষে ক্রোমারের উত্তর দিকে মাত্র আট মাইল ব্যবধানে যখন উপস্থিত হয়, তখন ইহা জলমগ্ন হয়।

কাপ্তানের পত্নী এবং দুইটি শিশুকে লাইফ্-বোট সাহায্যে উদ্ধার করা হয়, বাকী সকল আরোহীর উদ্ধার হয় অন্য জাহাজ দ্বারা পূর্ব্বেই।

ক্রোমারের লাইফ্-বোট পরিচালক লোকগণ বলে—তাহারা সাগরবক্ষের এই আক্রমণ তীর হইতে দর্শন করিয়াছে। প্রত্যেকটি তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ঘর-বাড়ীর দোর-জানালা খট্ খট্ করিয়া উঠিয়াছে। মালটানা জাহাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া উহারা লাইফ্-বোট জলে ভাসাইয়া অগ্রসর হয়, অন্তত কতক আরোহীর উদ্ধারের আশায়।

তাহারা কিছুদূরে সাগরবক্ষে অগ্রসর হইলেই আর তোপ-ধ্বনি শোনা যায় নাই, তোপের মুখের অগ্নিশিখা যে প্রতি বিস্ফুরণে বৈকালিক কুয়াসা রাঙাইয়া তুলিতেছিল, তাহাও নিবিয়া যায়।

তারপর যখন রাত্রি আগত হইল, লাইফ্-বোট পরিচালক রুগ্ন শরীরেও উহার হাল নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিল। কাছাকাছি যাইয়া তাহারা দেখিতে পাইল জাহাজখানির নাম—ক্যাণ্টাব্রিয়া। জলরেখার নীচে উপরে অনেকগুলি ছিদ্র হইয়াছে জাহাজের গায়ে এবং ক্রমশই উহা যেন তলাইয়া যাইতেছে।

শেলের আঘাতে জাহাজের পশ্চাৎদিকে বড় বড় ছিদ্র হইয়াছে, উপরের রেডিও-ঘর বিচূর্ণ।

নাবিক জীবনের দায়িত্ব ও সংস্কার অনুসারে কাপ্তান লাইফ-বোটে আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, তাহার স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের নৌকায় তোলা হয়। উহারা গোলা-গুলী বর্ষণের বিপদে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নৌকায় উঠামাত্র তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে।

আমরা যখন ইহাদের উদ্ধার করি, সেই সময় স্পেনীয় বিদ্রোহীপক্ষের ক্রুজার খুব বেশী দূরে ছিল না, কিন্তু তাহারা আমাদের নৌকার উপর গোলা বর্ষণ করে নাই।

জাহাজের নৌকাগুলিও নামান হইয়াছিল, তাহাতে কাপ্তান ও অন্যান্য নাবিক কয়েকজন আশ্রয় লইয়াছিল। পরে প্রথম জাহাজের নৌকায় স্থান পাইয়াছিল। কাপ্তান শুধু অপেক্ষা করিতেছিল, কখন বিধ্বস্ত জাহাজখানি একেবারে জলমগ্ন হয়, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য।

অর্দ্ধ-জলমগ্ন অবস্থায় জাহাজখানিকে দেখিয়া লাইফ-বোট তীরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে—সেখান হইতে তীর আট মাইল দূরে অনুমান করা হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে—অর্দ্ধনিমগ্ন জাহাজের মাস্তুলের ডগার বিজলী বাতি জ্বলিতেছিল।

এত গোলা-গুলী নিক্ষেপেও বিধ্বস্ত জাহাজের কোন ব্যক্তি হতাহত হয় নাই—কারণ, অধিকাংশ গোলাই জাহাজকে আঘাত করিয়াছে—জলরেখার নীচে। রেডিও অপারেটারের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি প্রথম তোপধ্বনির সঙ্গেই রেডিও-কেবিন হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়। ঐ কেবিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। গোলা নিক্ষেপের পূর্ব্বেই কাপ্তান জানিতে পারিয়াছিল ক্রুজারটি ফ্যাসিস্ত-পক্ষীয়।

কাপ্তান নিজ জাহাজের কথা বলে—ঐ খানি সাণ্টাণ্ডার হইতে আসিতেছিল, জাহাজে যে মাল ছিল তাহা লণ্ডনে পৌঁছাইবার কথা ছিল। লণ্ডনে মাল পৌঁছাইয়া আমরা ইমিংহাম যাইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া টের পাই—আমাদের পশ্চাতে ফ্যাসিস্ত জাহাজখানি দ্রুত আসিতেছে। আমরা আমাদের মনে চলিতে থাকি। হঠাৎ কোনও সাড়া-শব্দ বা সতর্কবাণীর সুযোগ না দিয়া একেবারে তুমুল গোলা-বর্ষণ আরম্ভ হয়।

কাপ্তান বলে, অন্তত কুড়িটি শেল জাহাজকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। কত সময় ব্যাপিয়া গোলাবর্ষণ চলে, তাহা কাপ্তানের ঠিক মনে নাই, তবে বহুক্ষণ। এবং ইহারই ফাঁকে অন্য একখানি জাহাজ আরোহীদের লইয়া যায়। কেবল কাপ্তান এবং তাহার পরিবার জাহাজে থাকে, অবশ্য নাবিকেরা ছিল।

জাহাজ আক্রান্ত হইবার সময় হইতেই বিপদের বার্ত্তা রেডিও যোগে ব্রডকাস্ট করা হইতেছিল। সেইজন্যই বোধ হয়, রেডিও কেবিনটিকে ফাসিস্ত যুদ্ধ-জাহাজ আগে ধ্বংস করে।

লাইফ-বোট যখন জাহাজের নিকট আসে, তখন জাহাজ-খানি ৫০ ডিগ্রি তলাইয়া গিয়াছে এবং কাপ্তান জাহাজ ত্যাগ করিবার পরই উহার ডেক জলমগ্ন হয়। ফাসিস্ত জাহাজে ছয়টি কামান ছিল এবং আগাগোড়া ঐ ছয়টি হইতেই গোলা বর্ষণ চলিতেছিল।

ঐ তোপ দাগার সঙ্গে সঙ্গে ফাসিস্ত জাহাজ আদেশ দিতেছিল, "তোমার পতাকা নামাইয়া আত্মসমর্পণ কর।"

কিন্তু কাপ্তান কোনও জবাব দেয় নাই, পতাকার অপ-মানও করে নাই।

তিন ঘণ্টা তোপ দাগার পর আবার ক্রুজার হইতে আদেশ পাঠান হয়—"আত্মসমর্পণ কর নতুবা তোমার জাহাজ ডুবাইয়া

তখন কাপ্তান মৃত্যুই স্থির করে। ইহার পূর্ব্বেই আরোহীদের উদ্ধার হইয়াছে। এখন নাবিকদের নৌকায় আশ্রয় লইতে আদেশ দেওয়া হয়।

এই সময় লাইফ বোটখানিকে দেখা যায়—কাপ্তান লাইফ বোটকে লক্ষ্য করিয়া বলে—তাড়াতাড়ি এস, আমরা ডুবিয়া যাইতেছি।

এতক্ষণে চারিদিকের জাহাজ হইতে এই আক্রমণের সংবাদ তীরে প্রেরণ করা হইয়াছে রেডিও সাহায্যে। রেডিও সাহায্যেই এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহা হইতেই জানিতে পারা যায় যে, ব্রিটিশ জাহাজ প্যাটার-সোনিয়ান এগার জন আরোহীকে উদ্ধার করিয়াছে।

প্যাটারসোনিয়ান যখন গভীর রাত্রিতে গ্রেট্ ইয়ার-মাউথে পৌঁছিল, তখন জানা গেল যে, যে ফাসিস্ত জাহাজ এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সেটির নাম 'নাদির'।

তৎক্ষণাৎ এই জাহাজ ডুবির সংবাদ দেওয়া হইল ব্রিটিশ ফিশারী ক্রুজার—পিনান্স-য়ের নিকট। এই জাহাজের কর্ত্তব্য হইল দেখা যে, ব্রিটিশ তীর হইতে তিন মাইল মধ্যে কোনও গোলা বর্ষণ না হয়। কাজেই সে সাক্ষীগোপালের মত নীরব দর্শকই রহিল। কেননা, ঘটনা ঘটিল তাহার গণ্ডীর বাহিরে।

রেডিও সংবাদে ইংলণ্ডবাসীদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ব্যাপার কতদূর গড়ায় জানিবার কৌতূহলে সকল তীরবর্ত্তী শহরেই জনগণ রেডিওর প্রতীক্ষা করিতে থাকে—ইহার পর কি হয়, ব্যাপার কি, আক্রমণকারী জাহাজ আরও হাজির হয় কিনা—নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা চলে। প্রথম সংবাদ দেয় ব্রিটিশ ষ্টীমার মস্কউড। তারপর অন্যান্য জাহাজের প্রেরিত সংবাদ আসিতে থাকে।

যেমন ফাসিস্ত জাহাজ ক্যাণ্টাব্রিয়াকে ঘায়েল করিতে করিতে আগাইয়া আসিতে থাকে ইংলণ্ডের তীরের দিকে, তখন একখানি ব্রিটিশ ট্রলার রেডিও যোগে বলে—তোমাদের দোরগোড়ায় এসে গেল ফাসিস্ত জাহাজ।

উত্তর সাগরের এই অভিযানের সংবাদ হাউস অব কমন্স-এ আসিয়া পৌঁছিল, ঠিক যে সময়ে সদস্যগণ স্পেন-সংগ্রামের বিষয় আলোচনা করিতেছিল। মিঃ নোয়েল বেকার বলিয়া উঠেন—স্পেনীয় সংগ্রাম ঘরের কোণে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট একখানা মাল-টানা জাহাজ ফাসিস্ত-পক্ষ এমনভাবে আমাদের চোখের সম্মুখে ডুবাইয়া দিল। শোনা যায়, ইহার অস্ত্রসজ্জা জার্ম্মানী হইতে প্রেরিত।

অন্য এক সদস্য বলেন—ইহার পরে কোন্ দিন দেখিব টেমস নদীতে উহারা আনাগোনা করিতেছে।

মিঃ বেকারের মত সকল সদস্যই (সকল পার্টিরই) এই দারুণ সন্দেহ পোষণ করেন যে, কেন স্পেনীয় ফাসিস্ত জাহাজ নিজের দেশ হইতে এতদূরে অভিযান করিতে আসে, কে-ই বা তাহার গোলা-বারুদ যোগায়, সর্ব্বোপরি কোন্ নিরপেক্ষ বন্দরে সে আশ্রয় পায়।

তাহার তোপধ্বনিতে ইংলণ্ডের উপকূল কাঁপাইয়া দিতেছে, যখন মিঃ চেম্বারলেন সমগ্র হাউসকে সম্বোধন করিয়া বলিতে-ছেন—আমার পরিষ্কার উপলব্ধি হইতেছে যে, স্পেনীয় সমস্যা আর সমগ্র ইউরোপের বিভীষিকার কেন্দ্রস্থল নাই।

কোনও ব্রিটিশ সংবাদপত্র বলিতেছেন—স্পেনীয় সংগ্রামে ব্রিটিশের 'সুবিচার' (?) জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ব্রিটিশের উপর প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া-ছিলেন। উহাই হইল ফাসিস্ত জাহাজ নাদিরের অভিযানের প্রকৃত কারণ।

সাণ্টাণ্ডারের এই জাহাজ কাণ্টাব্রিয়াকে কার্ডিফে আটক করিয়া ফ্রাঙ্কো ইহার কার্য্যতৎপরতার জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়াছিল। ব্রিটিশ হাইকোর্টের বিচারে ইহা ব্রিটিশ কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং ফ্রাঙ্কো উহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। তদবধি ফ্রাঙ্কো শাসাইতেছিল যে, সে হয় এই জাহাজখানিকে ধৃত করিবে অথবা যে কোন প্রকারে উহাকে ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। কারণ এই জাহাজ স্পেনীয় সাধারণতন্ত্রকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছে। এবং সে পণ ফ্রাঙ্কো রক্ষা করিল এবং তাহা ভালভাবেই।

সকলেই সন্দেহ করিতেছে যে, যে সকল লোকদিগকে ক্যাণ্টাব্রিয়ার প্রথম নৌকা হইতে 'নাদির' উদ্ধার করিয়া বন্দী করিয়াছে, তাহাদের উপরও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে, কেন ক্যাণ্টাব্রিয়ার কাপ্তান আত্মসমর্পণ করে নাই।

কিন্তু যে ভাবে নাদিরের অভিযান চলিয়াছে এবং যে ভাবে এই ব্যাপার লইয়া নীরবতার পালা চলিতেছে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের ভিতর, তাহাতে যদি ইংলণ্ডবাসী এই ধারণা করিয়া লয় যে, ফ্রাঙ্কোর এই অভিযান ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা হইলে পরে অজ্ঞ জনসাধারণকে দোষ দেওয়া যায় না।

শুধু যে ক্যাণ্টাব্রিয়ার উপরই নির্য্যাতন চলিয়াছে এবং উদ্ধারকারী ব্রিটিশ জাহাজদের প্রতি 'নাদির' যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে, এমন ধারণা করিয়া লইবার কোনই অবকাশ নাই। কেন না, যে ব্রিটিশ জাহাজ বিধ্বস্ত ক্যাণ্টা-ব্রিয়া হইতে আরোহীদের উদ্ধার সাধন করিয়াছে, তাহার উপরও জুলুম যে একেবারেই হয় নাই, এমনও নয়। ব্রিটিশগণ অবশ্য প্যাটারসোনিয়ান জাহাজের এই প্রকার বিপদসঙ্কুল গোলা বর্ষণের ভিতর উদ্ধারকার্য্যকে বীরত্বের চরম বলিয়া তারিফ করিতেছে এবং স্পেনীয় জাতিদের অসীম উপকার করিয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছে। কিন্তু প্যাটারসোনিয়ান জাহাজের নাবিকগণ বলে যে, ফাসিস্ত জাহাজের রুখিয়া আসা সত্ত্বেও, তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের আরোহীদের উদ্ধার করাতে, নাদির জাহাজ সহসা ঘুরিয়া আসিয়া প্যাটারসোনিয়ানের উপর পড়িয়া উহার সহিত ধাক্কা-ধাক্কির সঙ্ঘর্ষ বাধাইতে চেষ্টা করে। ব্রিটিশ জাহাজের উপর প্রকাশ্য গোলাবর্ষণ না চালাইয়া, কৌশলে উহাকে অপটু বা আঘাতপ্রাপ্ত করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু প্যাটারসোনিয়ান জাহাজ—যে নাকি বিগত মহাসমরে নানাপ্রকার সেয়ানা

ধূর্ত্ততা ধরিয়া ফেলে এবং অতি ত্বরান্বিত গতিতে ন্যাদিরের স্পর্শের বাহিরে চলিয়া যায় ঘুরপাক খাইয়া। এবং এইভাবে আসন্ন সংঘর্ষের দুর্ঘটনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

যে স্পর্দ্ধা ও নিশ্চিন্ততার সহিত ফাসিস্ত জাহাজ ব্রিটেনের বুকের উপর, বলিতে গেলে, অনধিকার প্রবেশ করিয়া ব্রিটিশ-কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট একখানি নিরস্ত্র মাল-টানা জাহাজকে শতছিদ্র করিয়া দিল—তাহা ফ্রাঙ্কোর প্রতিশোধ গ্রহণই হউক, আর যাহাই হউক, উহা যে জার্ম্মানী-ইটালীর মৈত্রীমুগ্ধ ব্রিটিশ সিংহের তন্দ্রার অবকাশেই আচরিত হইল, ইহা ভাবিয়া লইতে কল্পনাকে অতি সূক্ষ্ম সূত্রেই বিলম্বিত করিতে হয়। বিশেষত জাহাজখানির অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহক যখন জার্ম্মানী শোনা যায়, তখন মনে হয়, যে মন্ত্রে হের হিটলার মিউনিকের চুক্তিকে যাদুকরের কারসাজিতে পরিণত করিয়াছেন, ফ্রাঙ্কোর এই প্রতিশোধ গ্রহণেও সেই ধূলি পড়ায়ই ব্রিটিশ সিংহকে তন্দ্রাতুর করিয়া ফেলিয়াছে।

পাছে সেইদিকে কাহারও নজর পড়ে এবং অশোভন মন্তব্যের প্রকাশ হয়, সেই জন্যই অভিযানের অন্য সকল আলোচনা ছাপাইয়া সকল ব্রিটিশ সংবাদপত্রে একসুরে কেবল ইহাই প্রচার করিয়া গর্ব্ব বোধ করিতেছে যে, বিধ্বস্ত জাহাজ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকগুলিকে ইংলণ্ডের জনসাধারণ আপন জনের মত বিপুল সম্বর্দ্ধনা প্রদান করিয়াছে এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত স্পেনীয়গণ বীর ব্রিটিশের প্রশংসা করিতেছে শতমুখে। তথাপি জাহাজ ডুবির নূতন আশঙ্কা তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

স্পেন হইতে স্বেচ্ছাসেবক সকল বিদূরিত করা হইয়াছে, ইহাতে ব্রিটেন এবং ইটালীর মিতালী বৃদ্ধি পাইয়াছে, বলা হয়। কাজেই নিরপেক্ষতা রক্ষক কমিটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন ফ্রাঙ্কোর সন্দেহ হইলেই যে কোন নিরপেক্ষ জাহাজ আটক করিয়া উহার খানাতল্লাসী করিতে থাকিবে। অবশ্য বার্সিলোনা গবর্ণমেণ্টেরও সে ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু নৌবলে ফ্রাঙ্কো যে অনেক বেশী বলশালী একথা অস্বীকার করা যায় না।

আবার বার্লিন হইতে স্বীকার করা না হইলেও ফ্রাঙ্কোর কিউ বোটগুলিকে জার্ম্মানী রসদ পেট্রল প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতেছে। কাজেই এখন ইংরেজের আতঙ্ক স্পেনীয় যুদ্ধ উত্তর সাগর এবং ইংলিশ চ্যানেলে বিস্তার প্রাপ্ত হইবে এবং ফ্রাঙ্কোর জাহাজ সে ক্ষেত্রে জার্ম্মানীর কতকগুলি ঘাঁটির সাহায্য পাইবে।

সুতরাং ইংলণ্ডবাসী চাহে, ফ্রাঙ্কোকে যখন অন্যান্য স্বাধীন শক্তির সমকক্ষ অধিকার দান করা হইল; তখন ইহাও তাহার উপর বাধ্য-বাধকতাপূর্ণ নিয়মে আরোপ করা হউক যে, কোনও প্রকার সশস্ত্র জলযান নিরপেক্ষ বন্দর বা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে না, কোন প্রকার রসদ পেট্রল প্রভৃতি সাহায্য লাভ করিতে পারিবে না।

এখন এই সর্ত্ত বহাল করিতে হইলেই পুনরায় জার্ম্মানী এবং ইটালীর সহিত বুঝা-পড়া করিতে হইবে। আর জার্ম্মানী যে ইহাতে সম্মত হইবে এমন আশা দুরাশাই মনে হয়। কারণ ফাসিস্তদের নূতন পরিকল্পনা হইল—বার্সিলোনা গবর্ণমেণ্ট যাহাতে বাহির হইতে কোনও প্রকার খাদ্যাদি সরবরাহ না পায়, তাহার জন্য উত্তর সাগর পাহারা দেওয়া। ভূমধ্যসাগরে যে জাহাজ-ডুবি চলিয়াছে, তাহারই নূতন অভিনয় হইবে উত্তর সাগরে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অভিসার

শ্রীস্ফটিক বন্দোপাধ্যায়

পৃথিবী আমার পানে চেয়ে থাকে।
আকাশে ওর নীল অপলক আঁখি
বিহগের কলকণ্ঠে করুণ হৃদয়ের ভাষা—
দিগন্তের শ্যামলিমার অবারিত স্নেহ—
ওর পানে চেয়ে আমার চোখে জল আসে,
পৃথিবী আমারে ভালবাসে।

উস্রীপারের নির্জ্জন পূর্ণিমা সন্ধ্যা—
ইউকেলিপটাসের আড়ালে পূর্ণ চাঁদ উঠেছে—
চিকণ পাতায় ঝিলিমিলি উৎসব—
ওপারের রাঙা মাটীর পথে দূরান্তরের গাঁয়ে
বাজে সাঁওতালের বাঁশী—
অন্তরে আমার বেজে ওঠে প্রতীক্ষার সুর।—
যাকে চেয়েছি জন্মের পর জন্মে—
কখনো পাইনি পরিপূর্ণ পাওয়া—

দিয়েছি পাঠিয়ে আমার ভালবাসা সন্ধ্যাতারার দেশে—
দিয়েছি পাঠিয়ে ঝর্ণা ধারার সাথে নীল পাহাড়ের কোলে
স্বপ্নে মিশিয়া থাকা নাম না-জানা দেশে। —
দিয়েছি পাঠিয়ে ফুলের বন দোলানো
শিশির ভেজা ভোরের হাওয়ায়।—
তোমার সন্ধানে সে রাত্রি-দিন পথ চলবে—
হয়ত পাবে সে পরিপূর্ণতা তোমার স্পর্শে
নয়ত দিনের শেষের ফুলের মত

সমাপ্রান্ত

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন

(৮)

আগামীকল্য কনকের জন্মোৎসব। কাল প্রাতে দুলালীকে আনিতে হইবে। আজ সারাটা দিন কনক কেবলই দুলালীর আলোচনা করিতেছে। আশুবাবু ইহাতে যথেষ্ট আমোদ পাইতেছেন; ব্রহ্মময়ীও হাসিতেছেন,—তবে এক আধবার একটু বিরক্তও হইতেছেন। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে ভূপেন কনককে একটা প্রকাণ্ড ধমক দিয়া বসিলেন।

বৈকালের দিকে ড্রাইভার মধু হঠাৎ জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। কনকের বড় চিন্তা হইল। তখন হইতেই সে এক শ' বার যাইয়া দাদাকে আকুল অনুরোধ জানাইতেছিল যে, মধুর জ্বর হইয়াছে, সে গাড়ী চালাইতে পরিবে না, অতএব আগামী কল্য প্রাতে তাঁহাকেই রামপুর যাইতে হইবে, ইত্যাদি; এবং ভূপেনের তাহাতে বেশ একটু আন্তরিক আগ্রহ থাকিলেও, প্রত্যক্ষে ভগ্নীকে খ্যাপাইবার মতলবে এবং পরোক্ষে নিজ আগ্রহ গোপন রাখিবার অভিপ্রায়ে, প্রতিবারেই তিনি একটা না একটা বাজে অজুহাত দেখাইয়া অসম্মতি প্রকাশ করিতেছিলেন। অবশেষে কনক কাঁদিয়া ফেলিল। অতটা আবার ভূপেনের পছন্দ হইল না;—তিনি একটা প্রকাণ্ড ধমক দিয়া ফেলিলেন। অভিমানিনী কনক চক্ষের জল মুছিয়া বিষণ্ন মুখে ছল ছল নেত্রে যাইয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল।

"কি হয়েছে মা?" বলিয়া কন্যার চিবুক ধরিয়া আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন।

কনক সহসা উত্তর দিতে পারিল না; পিতার মুখের দিকে চাহিতেই টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল তাহার চক্ষু হইতে ঝরিয়া পড়িল। স্নেহময় পিতা আদরিণী কন্যার অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া দিলেন এবং পুনরায় প্রশ্ন করিয়া ঘটনাটা অবগত হইয়া লইলেন। তারপর হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা মা, সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না; সে ভাবনা আমার। মধু যদি যেতে না পারে, তোমার দাদারই তা হলে যেতে হবে। তুমি নির্ভাবনায় আমোদ আহ্লাদ কর গিয়ে।" কনকের মুখখানি মুহূর্ত্তে হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আশবাবু আবার তাঁহার পরিত্যক্ত হিসাব-পত্রে মনঃসংযোগ করিলেন।

রাত্রে মধুর জ্বর ছাড়ে নাই। অগত্যা ভূপেনকেই রামপুরে যাইতে হইবে। কনক অভিমান করিয়া সেই অবধি দাদার সম্মুখে আসে নাই। ভূপেন ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রত্যুষে গ্যারেজ হইতে গাড়ী বাহির করিতে যাইয়া তিনি শুনিতে পাইলেন, কনক চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"মা! দাদা বুঝি চা না খেয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে। দাদাকে বল না একটু দেরি করতে। জল ফুটে উঠল বলে।"

ব্রহ্মময়ী কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন; হাঁকিয়া বলিলেন,—"কেন, তোর মুখ নেই? চা না খেয়ে যাচ্ছে, তা' আমি না ডাকলে বুঝি আর হয় না?" ভ্রাতা ভগ্নীর মান-অভিমানের বিষয় তিনি কিছুই জানিতেন না।

মনে মনে হাসিয়া ভূপেন গাড়ীতে ষ্টার্ট ছিলেন। কনক পর্য্যন্ত বলিয়া দাদার মুখের দিকে চাহিয়াই হাসিয়া ফেলিল। প্রত্যুত্তরে ভূপেনও হাসিলেন। ভ্রাতা ভগ্নীর 'সুপ্রভাত' হইল।

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে ভূপেন বলিলেন,—"আমি ত আর রামপুর যাচ্ছি না, দৌড়ে আমায় চা খাওয়াতে এলে! আমি যাব শ্যামপুর,—সেখান থেকে মধুপুর,—তারপরে যাব মণিপুর,—তারপর—"

—"বলছি এই ভোর বেলায় আমায় আর খেপিও না দাদা, একটু দেরী কর,—একবারটি ভেতরে এস,—এক্ষুণি চা হয়ে যাবে।" বলিয়া কনক এক রকম জোর করিয়াই ভূপেনকে গাড়ী হইতে টানিয়া নামাইল।

ভগ্নীর হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে যাইতে যাইতে ভূপেন বলিলেন,—"তুইও চল্‌না কনক, ভোর বেলা বেশ একটু বেড়িয়ে আসবি! একলা একলা যেতে আমারও কেমন ভাল লাগছে না।"

প্রবল উৎসাহের সহিত কনক হঠাৎ নাচিয়া উঠিল, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই আবার সাম্যভাব অবলম্বন করিয়া বলিল,—"কিন্তু বাবা যে ঘুমুচ্ছেন? বাবার চা কে দেবে?" ভ্রাতা ভগ্নী উভয়ে ভিতরে আসিল।

মাখন ও জেলি সংযুক্ত রুটির সদ্ব্যবহার করিতে করিতে ভূপেন বলিলেন,—"আজ মায়ের উপরেই ভার দিয়ে যাই চল্‌না; না হয় ফিরে এসে আর একবার—"

—"ভজুয়া!" আশুবাবুর কণ্ঠস্বর।

—"ঐ যে বাবা উঠেছেন। দাঁড়াও দাদা, আমি এই আসছি!" বলিয়াই কনক ছুটিয়া গেল পিতার উদ্দেশে।

দুলালী অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি ঘর-দ্বার লেপিয়া পুঁছিয়া, আঙিনা ঝাঁট দিয়া, গোয়াল মুক্ত করিয়া, স্নান সমাধা করিয়াছে। দুগ্ধ দোহন করিয়া, গরু কয়টিকে ঘাস জল দিয়া, অগোণে স্নান করিয়া লওয়ার জন্য সুখনকেও সে কয়েকবার তাগিদ দিয়াছে। স্নানান্তে শিবুর মাধ্যাহ্নিক আহারের ভাত রন্ধন করিয়া রাখিয়া ভাই ভগ্নীতে একটু জলযোগ করিয়া লইল। এমন সময় ভূপেনকে লইয়া কলহাস্যময়ী কনক উপস্থিত হইল।

দুলালী হাসিমুখে উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া ভূপেনকে বসিতে দিল। তারপর আপন কক্ষে আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। সে দিনের সেই কল্কাপেড়ে শাড়ীখানা এবং শিবু সুখনের জন্যও তাহারই তাঁতের তৈরি—অপর দুইখানি কাপড় সে ইতিপূর্ব্বে ধুইয়া শুকাইয়া পাট করিয়া রাখিয়াছিল। কনক সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিল এবং পরম উৎসাহে বস্ত্র পরিধানের আধুনিক নানাবিধ নিয়ম প্রণালী দেখাইয়া দুলালীকে অস্থির করিয়া তুলিল। দুলালীর কিন্তু কোনটাই মনঃপূত হইল না। অনেক বাধা তিরস্কার এবং অভিমান আবদার অতিক্রম করিয়া সাধারণ বাঙালী ভদ্রমহিলার ন্যায় শাড়ীখানা পরিয়া সে বাহির হইল। ইহাতেই

ভূপেন তাহার দিকে চাহিয়াই মুদ্রনেত্র নত করিলেন এবং মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়বার মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না।

শিবুকে আবশ্যক অনাবশ্যক নানা বিষয়ে সতর্ক করিয়া এবং বেলা অধিক হইবার পূর্ব্বেই স্নানাহার করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ জানাইয়া দুলালী কনককে লইয়া রওয়ানা হইল; এবং বৈকালে প্রস্তুত হইয়া থাকিবার জন্য শিবুকে বলিয়া, সুখনকে লইয়া ভূপেনও তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

দ্বিপ্রহর অতীত হইতে না হইতেই প্রফুল্ল আসিল। তাহার হাতে একখানি সুন্দর ফরাশডাঙ্গার শাড়ী। প্রফুল্ল হাসিমুখে শাড়ীখানা ব্রহ্মময়ীর হাতে দিলেন এবং ব্রহ্মময়ীও হাসিমুখে তাহা গ্রহণ করিলেন। বৈকালের দিকে কয়েকজন ভদ্রমহিলা আসিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে, দুপ্‌দাপ করিয়া কনকের কয়েকটি সহপাঠিকা আসিয়া পড়িল। প্রায় প্রত্যেকের হাতে এক-আধটি উপহার-দ্রব্য। কেহ একখানি কাপড়, কেহ একখানি বই, কেহ একখানি সুন্দর আয়না, কেহ-বা এক শিশি স্বদেশী এসেন্স বা তরল আলতা ইত্যাদি বিবিধ সুন্দর সুন্দর বস্তু আনিয়া ব্রহ্মময়ীর হাতে দিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মময়ীও প্রত্যেকটি বস্তুর সম্ভবাতীত প্রশংসা করিয়া মৃদু আপত্তির সহিত হাসিমুখে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

মেয়েরা আসিতেই কনক ছুটিয়া আসিল এবং কল-বল করিতে করিতে সকলকে আপন প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। এইটি কনকের পড়িবার ও বসিবার ঘর। প্রফুল্ল এবং দুলালী তথায় ছিল। কনক সকলের সহিত দুলালীর পরিচয় করাইয়া দিল। বেশ আমোদ-আহ্লাদ, গল্প-গুজব চলিতে লাগিল।

একটি মেয়ে একখানি বড় বড় ছবিযুক্ত 'রবিনসন ক্রুসো'র সরল ইংরেজি সংস্করণ উপহার আনিয়াছিল। ক্রমে সেই বইখানির কথা উঠিল। বাসন্তী বলিল,—"বইখানির পাতায় পাতায় কি চমৎকার সব ছবি ভাই! আপনার দেওয়া এই উপহারই আমার মতে সব চেয়ে সুন্দর হয়েছে।" কয়েকটি বালিকার তৎক্ষণাৎ ছবি দেখার প্রবল আগ্রহ হইল, এবং একটি মেয়ে ছুটিয়া যাইয়া ব্রহ্মময়ীর নিকট হইতে বই-খানা লইয়া আসিল। তারপর সকলে মেজের উপর বৃত্তাকারে বসিয়া এবং দুই তিনটি মেয়ে স্থানাভাবে পিছন হইতে ঘাড় উঁচু করিয়া, ছবি দেখিতে দেখিতে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

শৈল বলিল,—"কেউ গল্পটা জানিস ভাই! ছবির সঙ্গে মিল করে গল্পটা শুনতে পেলে কিন্তু বড়ই মজা হ'ত।" দুঃখের বিষয়, মেয়েদের কেহই কাহিনীটি জানিত না। ইহা লইয়া খুব একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

প্রফুল্ল কহিল,—"ভূপেন দা' নিশ্চয় জানেন; ডাকব তাঁকে?" কনক কি বুঝিয়া বা কি দেখিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"ও ভাই, দুলালী দি' বোধ হয় জানে।"

দুলালী গোপনে কনককে নিষেধাজ্ঞাসূচক একটি মৃদু

কনক হাততালি দিয়া জোর করিয়া বলিল,—"নিশ্চয়ই জানে ভাই, নিশ্চয়ই জানে; তাই আবার চিম্‌টি কাটা হচ্ছে।"

মেয়েরা সকলে ধরিয়া বসিল। মৃদুহাস্যে দুলালী নানাপ্রকারে এড়াইতে চেষ্টা করিয়া ক্রমে আরও জড়াইয়া পড়িল। কনকের দেখা দেখি 'দিদি' 'দিদি' বলিয়া সকলে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া দুলালী ধীরে ধীরে অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রত্যেকটি চিত্রের সহিত মিল রাখিয়া গল্পটি বলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক-আধটা ছোট-খাট ইংরেজি শব্দও বলিতে হইতেছিল। একটি মেয়ে ফিস্ ফিস্ করিয়া কনকের কানে কানে বলিল,—"ও ভাই, তোর দিদি বোধ হয় ইংরেজিও জানে!"

তেমনই মৃদুস্বরে কনক বলিল,—"কি জানি ভাই, দিদিটিকে আমি এখনও সম্পূর্ণ চিনে উঠ্‌তে পারি নি।"

দুলালী মধ্যে মধ্যে কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে-ছিল। হঠাৎ বাহিরে গাড়ী ষ্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনিয়াই সে চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং "একটা কথা শুনে যাও ত ভাই" বলিয়া তাড়াতাড়ি কনককে বাহিরে টানিয়া আনিল।

—"বাবুয়াকে কখন আন্‌তে যাবে ভাই?"

—"ঐ ত দাদা গাড়ী বের করছেন; এক্ষুণি যাবেন। ওমা!—বাবার জন্যে খুব মন কেমন করছে বুঝি?"

—"না ভাই, আমার একটা বড় বিশেষ দরকার আছে। দাদাকেও একটু ওঁর সঙ্গে আমাদের বাড়ী পর্যন্ত যেতে হবে। ভয়ানক দরকার যে ভাই,—না গেলেই হবে না।"

—"সত্যি নাকি? দাদা!—দাদা!—এই দাদা!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কনক ছুটিল এবং ফটকের বাহিরে যাওয়ার পূর্ব্বেই যাইয়া গাড়ী আটক করিল।

গাড়ী থামাইয়া ভূপেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রে পাগ্‌লী! আবার কি হ'ল?"

"এই এক মিনিট দাদা" বলিয়াই কনক আবার ছুটিয়া দুলালীর নিকট আসিল; বলিল,—"কি এমন ভয়ানক দরকার ভাই দিদি?"

—"সে কথা আমি তোমায় পরে বলব ভাই! এখন আমার দাদাকেও একবার ডেকে দাও।"

সুখন আসিল! দুলালী তাহাকে একটু আড়ালে নিয়া কি যেন বলিয়া দিল। তারপর কনকের সঙ্গে আসিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতেই গাড়ী বাহির হইয়া গেল।

কনক দুলালীকে বারংবার প্রশ্ন করিয়া সেই একই উত্তর পাইতেছিল,—"পরে বলব।" কনকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অভিমান মিশ্রিত ক্রোধের সহিত মৃদু ঝঙ্কার দিয়া কহিল,— "পরে বলব! পরে বলব! আমি এদিকে শুনবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছি, আর তোমার 'পরে'ই শেষ হ'ল না?"

দুলালী গম্ভীর মুখে ভর্ৎসনা-সূচক স্থির দৃষ্টিতে কনকের দিকে চাহিয়া একটু পরেই হাসিয়া ফেলিল; বলিল,— "দেখ কনক! আমি তোমার দিদি, এটা ভুলে যাচ্ছ বোধ হয়। যখন দেখতে পাচ্ছ যে, এখুনি আমি তোমাকে কথাটা বলতে চাই না, এবং পরে বলব বলছি, তখন তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, নিশ্চয়ই এর

রকম উতলা হয়ে পড়ছ যে, তোমার একটু কৌতূহল মিটতে দেরী হচ্ছে বলে, তুমি তোমার মেজাজটি পর্য্যন্ত ঠিক রাখতে পারছ না। এটা কিন্তু তোমার মোটেই ঠিক হচ্ছে না ভাই।"

কনক কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে দুলালীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে মুখ নীচু করিল। তারপর উভয় বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া গভীর অনুতাপের সহিত কহিল,—"আমায় মাপ কর দিদি! আমার ভয়ানক অন্যায় হয়েছে। আর কখ্খন আমি এমন করব না। বল দিদি,—আমায় মাপ করলে?"

দুলালী তাড়াতাড়ি স্নেহহস্তে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল,—"সে কি ভাই! তুমি যে আমার আদরের ছোট বোন! মাপ করব কি ভাই! তোমার সকল ত্রুটি, সমস্ত অপরাধ, সবই যে সেই দিন থেকে মাপ হয়ে গেছে।"

পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে একটি জানালার ওপাশে পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া আশুবাবু নিঃশব্দে কি একটা কাজ করিতেছিলেন। উভয়ের কথাবার্ত্তা সমস্তই তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছিল। দুলালীর কৌশলপূর্ণ চমৎকার আচরণে তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এমন সুন্দর স্নেহপূর্ণ সতেজ তিরস্কার ত তিনি কখন শুনেন নাই! এবং তাঁহার ধৈর্য্যহীনা চঞ্চলা অভিমানিনী কন্যাকে দরদের তিরস্কার দ্বারা এইভাবে যে কেহ কখন বশীভূত করিতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই! তিনি উল্লসিত হইলেন।

এদিকে মেয়েরা 'রবিনসন ক্রুসো'র অসম্পূর্ণ কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেছিল। এবং প্রত্যেকেই আপনার পার্শ্বে বসাইবার জন্য দুলালীকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। দুলালী হাসিয়া একজনের পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

ব্রহ্মময়ী আসিয়া বলিলেন,—"তোমরা এখন একটু জল খাবে এস।"

মেয়েরা হৈ চৈ করিয়া উঠিল। "জল খাওয়া পরে হবে মাসিমা, আমরা এখন একটা খুব মজার গল্প শুনছি।"

—"তবে গল্প শেষ হলে সবাইকে নিয়ে আসিস কনক!" বলিয়া ব্রহ্মময়ী হাসিমুখে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার দিকে বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা আসিয়া জুটিলেন। সুসজ্জিত বৈঠকখানায় নানারূপ হাস্যালাপ চলিতে লাগিল। কথা-প্রসঙ্গে ভূপেনের সর্পাঘাত হইতে দুলালীর সহিত তাঁহার নিজের প্রথম সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত একটি অতি মনোজ্ঞ কাহিনী আশুবাবু সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। তারপর একটু সঙ্গীত-চর্চ্চা হইল এবং তাহার পর প্রান্তবর্ত্তী ছোট ফরাসের মধ্যস্থলে বসিয়া একজন স্থূলাঙ্গ প্রৌঢ় ভদ্রলোক কনকের সুখশান্তিপূর্ণ পবিত্র দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটি সুন্দর প্রার্থনা করিলেন।

পিতার আহ্বানে কনক আসিয়া সকলকে প্রণাম করিল। তাহার পরিধানে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত মুগার বড় পাড় বিশিষ্ট একখানি মোটা খদ্দর শাড়ী এবং গায়ে খদ্দরের একটি সাধারণ ব্লাউজ।

আশুবাবু বলিলেন,—"কনকের সেই দুলালী দিদি আজ কনকের জন্মদিনে তার নিজের তৈরী এই কাপড়খানা কনককে উপহার দিয়েছে। এর সুতো পর্য্যন্ত তার স্বহস্তের কাটা। ভূপেন বলছিল,—কত অধ্যবসায় এবং কত ধৈর্য্য, যত্ন, পরিশ্রম ও একাগ্রতা দিয়ে যে এই কাপড়খানা প্রস্তুত হয়েছে এবং কি রকম আন্তরিক স্নেহ ও পবিত্র আশীর্ব্বাদের সঙ্গে যে কাপড়খানা কনককে দেওয়া হয়েছে, সে সব ঠিক মতন হিসাব করে দেখলে, কনক নাকি এমন অমূল্য উপহার তার এই দ্বাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে খুব কমই পেয়েছে। ভূপেনের কথাটা আমারও ঠিক বলেই মনে হয়।"

অনেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাপড়খানি পরীক্ষা করিয়া শিল্পীর বিস্তর প্রশংসা করিলেন। একজন বলিলেন,—"শুনলুম, সেই মেয়েটিও নাকি এসেছে?"

—"হ্যাঁ, দেখবেন তাকে? অপূর্ব্ব মেয়ে!" বলিয়া আশুবাবু যেন একটা গর্ব্ব অনুভব করিলেন।

সকলে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

আশুবাবু বলিলেন,—"যাও ত মা কনক! প্রফুল্লকে সঙ্গে করে দুলালীকে নিয়ে এস গে।"

কনক ধীর লঘু পদে দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল এবং অল্পক্ষণ পরে দুলালীকে মধ্যস্থলে লইয়া প্রফুল্ল সহ হাসিমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আশুবাবু বলিলেন,—"এ'দের প্রণাম কর মা!"

প্রফুল্ল ও দুলালী একে একে প্রত্যেকের নিকট যাইয়া প্রণাম করিল।

আশুবাবু তখন তিনজনকেই নিকটে ডাকিয়া নিলেন এবং দুলালীর পরিহিত বস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"এই যে দেখছেন শাড়ীখানা, এখানাও দুলালীর নিজের তৈরী।"

সকলে প্রশংসা করিয়া উঠিলেন।

পাঁচ-ছয়জন ভদ্রলোক তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক সান্ধ্য তাসের আড্ডায় হাজিরা দিতে যাইয়া একটু বিলম্বে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আশুবাবু বলিলেন,—"আপনারা বোধ হয় আসল গল্প শুনতে পান নি?"

যাঁহারা পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নরেন্দ্রবাবু ছিলেন একজন। তিনি বলিলেন,—"উ'হারা ভাগ্যহীন। এমন চমৎকার বাস্তব ঘটনাটা তোমরা শুনলে না হে!"

নবাগতগণ নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ধরিয়া বসিলেন, গল্পটা তাঁহাদিগকে শুনাইতেই হইবে এবং না শুনান পর্য্যন্ত তাঁহারা আশুতোষের মন্দিরে ধর্ণা দিয়া থাকিবেন।

আশুবাবু হাসিলেন।

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"যদি পুনরায় শুনতে হয় তবে প্রত্যক্ষদর্শীর মুখেই শুনা ভাল। বিজয় কোথায় হে?"

বিজয়ের ডাক পড়িল। বিজয় আসিয়া, হরিতাল শিকারে উভয়ের রামপুর গমন হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী রবিবারের পিক্‌নিক্ পর্য্যন্ত অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিলেন। তৎপরে আশুবাবু তাঁহার নিজের দেখাশুনা যা-কিছু সব বলিতে লাগিলেন। সেই গুড় সংযুক্ত চা পানের

বিবরণটুকুও তিনি বাদ দিলেন না,—বরং তাহার একটা অসম্ভব অতিরঞ্জিত প্রশংসা করিয়া ফেলিলেন। প্রফুল্ল ও কনকের সঙ্গে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া দুলালী হাসিতে লাগিল।

বর্ণনা শেষ হইলে ঘড়ির দিকে চাহিয়া আশুবাবু মেয়ে তিনটিকে বিদায় দিলেন এবং একটু মিষ্টমুখ করার জন্য সকলকে গাত্রোত্থান করিতে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাইলেন।

পিছনের প্রশস্ত বারান্দায় চেয়ার টেবিল সাজাইয়া জলযোগের স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছিল। আশুবাবুর সহিত বন্ধুবর্গ আসিয়া আসনগ্রহণ করিলেন। ভূপেন, বিজয় এবং কনক ও প্রফুল্ল পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। ছোট ছোট ফুলকো লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম, ছোলার দাল, মাংস, কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন, অকালের আম, আনারস, দধি ইত্যাদি নানাপ্রকার সুখাদ্য দ্রব্যের আয়োজন ছিল। নরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"জলযোগ কি মশাই! এ যে স্থলযোগেরও বাবা!" সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত আহারাদি চলিতে লাগিল। ভূপেন ও বিজয় দুইখানি ট্রেতে করিয়া চা লইয়া আসিলেন।

নরেন্দ্রবাবু সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলিলেন,—"সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ! অদ্যকার এই রসনা-তৃপ্তিকর ভূরিভোজ্যপূর্ণ টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনাদের পক্ষ হইতে আশুতোষ-দরবারে আমি একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা অনুমতি প্রদান করুন।"

হাততালি দিয়া সকলে হট্টগোল করিয়া উঠিলেন।

—'আমার প্রস্তাবঃ—আশুবাবুর উক্তির মূল্য নির্দ্ধারণ-কল্পে অদ্যকার এই বিরাট ভোজনোৎসবে শর্করার পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ পবিত্র স্বদেশী গুড় সংযুক্ত চা পরিবেষণের ব্যবস্থা হউক।"

'বন্দেমাতরম্' বলিয়া পুনরায় সকলে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

—"এবং নিমন্ত্রিত-জন-গণ-বাঞ্ছিত সেই সুপবিত্র চা আশুবাবুর কন্যা ঐ নূতন দিদিটির পবিত্র হস্তে পরিবেষিত হউক।"

আনন্দাতিশয্যে আশুবাবুর মুখের হাসির সঙ্গে চক্ষুর কোণে অশ্রু দেখা দিল। মস্তক নত করিয়া এবং উভয় করতল তদুপরি স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন,—"আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য।"

কনক ও প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া ভিতরে গেল। ভূপেন-বিজয়ও হাসিমুখে ট্রে লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মৃদুহাস্যময়ী দুলালী উভয় হস্তে এক ট্রে চা লইয়া উপস্থিত হইল এবং একখানি ছোট টিপয়ের উপর ট্রে রাখিয়া ধীর শান্ত লঘু হস্তে প্রত্যেক ভদ্রলোকের সম্মুখে চা ধরিয়া দিতে লাগিল। প্রফুল্ল ও কনক আরও দুইখানি ট্রেতে করিয়া চা আনিয়া দুলালীকে সরবরাহ করিতে লাগিল।

এক চুমুক পান করিয়া একজন ভদ্রলোক হাঁকিলেন,—[illegible]। কেমন লাগছে?"

নরেন্দ্রবাবু বাম হস্তে পেয়ালা এবং দক্ষিণ হস্তে চা পূর্ণ পিরিচ লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কহিলেন,—"কি আর বল্‌ব দাদা! এই বাঁ হাতে সর্ব্বসন্তাপহারিণী সর্ব্ব-দুঃখবিনাশিনী চা পরিপূর্ণ পেয়ালা, আর ডান হাতে পেয়ালার বাহন এই অমল-ধবল পিরিচ নামক সুধাভাণ্ড নিয়ে বলছি, গুড় পেলে, আজ থেকে বিদেশী চিনি সংযুক্ত চা পারতপক্ষে আর স্পর্শ করব না। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার এই গুড়-চা অক্ষয় হোক।"

প্রশান্তবাবু একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। "আমিও আপনার দলে নরেন্দ্রবাবু" বলিয়া তিনি তাঁহার হাতের পেয়ালা মুখের নিকট তুলিয়া ধরিলেন।

আশুবাবু বলিলেন,—"প্রথম দু'চার দিন একটু গন্ধ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্থায়ী হয় না। আমি ত এখন কোনই গন্ধ পাই না।"

নরেন্দ্রবাবু কহিলেন,—"গন্ধটা যে কিসের সেটুকু বুঝতে পেরেছেন কি আশুবাবু? ওটা কিন্তু গুড়ের গন্ধ নয়। ওটা হচ্ছে পরাধীন ভারতবাসীদের আত্মনির্ভরতার একটু পবিত্র স্বদেশী সৌরভ।"

খুব একটা প্রকাণ্ড রকমের আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। শেষের দিকে প্রায় সকলেই নরেন্দ্রবাবুর অনুরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কালীবাবু ছিলেন স্থানীয় প্রধান ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বলিলেন,—"তর্ক-বিতর্কে গলাটাই শুকিয়ে গেল।"

—"বসুন বসুন, আর একবার গলাটা একটু সরস করে নিন। ওহে ভূপেন! আর একবার চায়ের ব্যবস্থা কর।" এই বলিয়া আশুবাবু সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন।

কালীবাবু বলিলেন,—"তবে সেই রকম গুড় দিয়েই দিও ভূপেন! আর একবার স্বাদটা নিয়ে যাই।"

অল্পক্ষণ পরে ধূমায়মান পেয়ালা শোভিত এক একখানি ট্রে হস্তে প্রফুল্ল, কনক ও দুলালী আসিয়া চা পরিবেষণ করিয়া গেল। কি মনে করিয়া তিনিই জানেন, কালীবাবু একটু ধরা গলায়, কতকটা যেন আপন মনে, বলিলেন,—"গত বৎসর এখানে বদলি হয়ে আসবার প্রাক্কালে ঠিক এই রকমের পাঁচ ছ'টি মেয়েকে পিকেটিং করার জন্য জেল দিয়ে এসেছি। তারা বোধ হয় এত দিনে খালাস পেয়েছে।"

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। কালীবাবু বাহিরে লোকটি বড় ভাল ছিলেন; কিন্তু 'হাকিম কালীবাবু' ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তাঁহার আদালতের নাম ছিল "কালী-বাড়ী।" প্রত্যহই নাকি তথায় আইনের যূপকাষ্ঠে বিস্তর স্বদেশী-শিশুর কারালাভ কার্য্য সমাধা হইত।

চা পানান্তে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া সকলে প্রস্থান করিলেন।

(৯)

"কনক!"

"এই যে বাবা!" মেয়ে ছুটিয়া আসিল।

"তোমাদের খাওয়া হয়েছে? মেয়েরা সব খেয়েছে? তোমার দিদি খেয়েছে?"

"হ্যাঁ বাবা, আমাদের সকলের হয়ে গ্যাছে; দিদিও খেয়েছে।"

"শিবনাথ আর সুখন?"

"তারাও বসেছে। এই যে আমি তাদের খাওয়ার কাছেই ছিলাম।"

"আচ্ছা চল আমিও একবার দেখে আসি।" কন্যার সহিত আসিয়া আশুবাবু তাহাদের একটু আদর আপ্যায়ন করিয়া গেলেন। ব্রহ্মময়ী এবং বিজয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং ত্রুটি অযত্নের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

কনক হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"একটা কথা বাবা! ওরা তাড়াতাড়ি যাবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছে; বলছে, রাত বেশী হয়ে গেলে, যে লোকটাকে বলে কয়ে বাড়ীতে রেখে এসেছে সে থাকবে, না নিজের বাড়ীতেই চলে যাবে—তার ঠিক নেই। আমি বললাম, দুলালী দি' না হয় আজ রাত্তিরটার মতন থাক, কাল তাকে পাঠিয়ে দেব; তা', তার বাপেরও দেখলাম তেমন মত নেই, আর দিদি ত একেবারেই নারাজ। দিদি বলে, সে না গেলে তার বাবার নাকি খুব কষ্ট হবে। কি জান বাবা? দিদির সব চালাকি! নিজেরই খুব মন কেমন করবে কিনা, তাই চালাকি করে বাপের উপর দিয়ে ঐ কথা বলছে। তুমি একটিবার বলে দেখ না বাবা! দিদি চলে গেলে আমার কিন্তু—।" কনকের স্বর ধরিয়া আসিল।

কন্যার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া আশুবাবু বলিলেন,—"কি করবে মা? সংসারের নিয়মই এই রকম। আমি যখন মফঃস্বলে যাই, তুমি তখন চোখের জল ফেল কেন? আবার যখন ফিরে আসি তখন হেসে নেচে বাড়ী মাতিয়ে তোল কেন? তোমার নিজের মন দিয়ে ওর মনটি বুঝতে চেষ্টা কর। ওদের এখন পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত;—বিশেষত পাঠিয়ে দেব বলেই যখন এনেছি।"

"আচ্ছা বাবা, তবে পাঠিয়েই দেও" বলিয়া কনক শান্ত হইল।

আশুবাবু লক্ষ্য করিলেন, কনক পূর্ব্বের ন্যায় উতলা হইল না এবং অভিমান করিল না, বরং বেশ শান্তভাবেই তাঁহার কথা মানিয়া লইল। তিনি বুঝিলেন ইহা দুলালীর সেই তিরস্কার ও উপদেশের ফল। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

ভূপেনকেই আবার রামপুর যাইতে হইল। নানাপ্রকার হিংস্রজন্তুর আবাসভূমি শালবনের মধ্য দিয়া রাত্রিকালে একাকী প্রত্যাগমন করা সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে বলিয়া আশুবাবু একজন ভৃত্য সঙ্গে দিলেন। ব্রহ্মময়ী বারংবার বলিয়া দিলেন, —"তোমরা আর নেম না; ওদের পেঁাছে দিয়েই চলে এস।"

গাড়ী রওয়ানা হইল।

বেশ জ্যোৎস্না রাত্রি। গাড়ী চালাইতে ভূপেন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বর্ষাকালের আকাশ বড় চঞ্চল। পর পর কয়েকখানা কাল মেঘ আসিয়া সেই সুন্দর জ্যোৎস্না ডুবাইয়া একটা বীভৎস অন্ধকার সৃষ্টি করিল। তারপর টিপ টিপ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রামপুরের সেই পথের সম্মুখে গোঁড়িবাবু পূর্ব্বে বর্ষণ ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু অন্ধকার একেবারে সূচীভেদ্য হইয়া পড়িল। ঐরূপ ঘনান্ধকার বনপথে দুলালীকে নামাইয়া দিতে ভূপেনের কোথায় যেন খচ্ করিয়া একটু বিঁধিল। ভূপেন প্রস্তাব করিলেন,—"গাড়ীতে বসেই না হয় আর একটু অপেক্ষা করা যাক। মেঘ কেটে গিয়ে জ্যোৎস্না উঠুক, তারপর তোমরা নামবে।"

শিবু কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল। দুলালী বলিল,—"না না, তা হয় না, মা হয়ত মেঘ বৃষ্টি দেখে কত ভাবছেন; আমরা ঠিক যেতে পারব।" বলিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

শিবু বলিল,—"তা' ছাড়া, বসে থাকলেই যে মেঘ কেটে যাবে তার ঠিক কি? বাড়তেও ত পারে? আমাদের জন্য ভাববেন না বাবু,—আমরা ঠিক যেতে পারব।" শিবু সুখনও নামিয়া পড়িল।

গাড়ীর হেড লাইটের প্রতিফলিত আলোকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দেখা গেল। দুলালী চলিতে চলিতে এক একবার ফিরিয়া দেখিতেছে। ক্রমে তাহারা অন্ধকারে বনমধ্যে মিলাইয়া গেল। ভূপেন শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃষ্টি-শক্তির অক্ষমতা যথাসম্ভব পূরণ করিয়া লইতে লাগিলেন। ঐ যে কর্দ্দম-পিচ্ছিল বনপথে তাহাদের সতর্ক পদশব্দ!

হঠাৎ অপেক্ষাকৃত দূরে একটু অস্ফুট গোলযোগ এবং দুলালীর উত্তাল কলহাস্য শুনা গেল। ভূপেন হাঁকিলেন, "—কি হে সুখন, ব্যাপার কি?"

সুখনের পরিবর্ত্তে দুলালীই জবাব দিল। কহিল,—"দাদা গায়ে মাথায় একটু কাদা মেখে নিলেন।" বলিয়াই পুনরায় খুব হাসিয়া উঠিল।

ভূপেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আবার হাঁকিলেন,—"পড়ে গ্যাছে? খুব লেগেছে না কি?"

এবার শিবু উত্তর দিল,—"না বাবু, তেমন কিছু হয় নি; আপনারা যান, আবার বৃষ্টি আসছে।" বুঝা গেল তাহারা ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। ভূপেন গাড়ী ফিরাইয়া দিলেন। একটি স্বতন্ত্র আলো, এমন কি একটি দিয়াশালাই পর্য্যন্ত সঙ্গে না থাকায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইলেন।

রাত্রে ভূপেনের ভাল ঘুম হইল না। কেমন একটা দুর্ভাবনা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। একবার মনে হইল, ঐরূপ সুগভীর অন্ধকারের মধ্যে নানাপ্রকার সম্ভাবিত বিপদের মুখে দুলালীকে ঐভাবে নামাইয়া দেওয়া নিশ্চয়ই তাঁহার উচিত হয় নাই। হয়ত একটা সাপই পথে শুইয়াছিল,—যে ভয়ানক সাপের দেশ,—অথবা হয়ত একটা বন্য শূকরই তাহাদের সম্মুখে পড়িয়াছিল;—সেই অন্ধকারের মধ্যে দৌড়াইয়া আত্মরক্ষা করিবার উপায়ও ত তাহাদের ছিল না! ঐ ত সুখন বেচারি পড়িয়া গিয়াছে, না জানি তাহার কতই লাগিয়াছে। সে তবু শক্তিমান পুরুষ মানুষ,—সামলাইতে পারিবে। কিন্তু দুলালীও হয়তো পড়িয়া গিয়াছে,—হয়তো একটা গুরুতর আঘাতই পাইয়া বসিয়াছে। কাল যদি সংবাদ আসে দুলালীর কোন কিছু সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা হইয়াছে তাহা হইলে ভূপেন কি তখন নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিবে? ভাবিতে

ভাবিতে তাঁহার একটু তন্দ্রাকর্ষণ হইল। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন,—একটা সু-উচ্চ শালবৃক্ষের নিকটে প্রকাণ্ড একটা ভল্লুক দুলালীকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, দুলালী তাড়াতাড়ি বৃক্ষারোহণ করিল. ভল্লুকও পশ্চাদনুসরণ করিল, ক্রমে তাহারা উর্দ্ধে,—এত উর্দ্ধে উঠিয়া গেল আর কিছুই দেখা গেল না, বৃক্ষের শীর্ষদেশ যেন আকাশ ভেদ করিয়া দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; পৃষ্ঠে বন্দুক বাঁধিয়া ভূপেনও বৃক্ষারোহণ করিলেন এবং ক্রমাগত উঠিতে লাগিলেন, সে উঠার যেন শেষ নাই; ক্রমে তিনিও বহু উর্দ্ধে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন,—ভল্লুকটা দুলালীর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, প্রায় ধর ধর করিতেছে, দুলালী আর আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না; ভূপেন তাড়াতাড়ি বন্দুক লইয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলী করিলেন, ভল্লুক পড়িয়া গেল; কিন্তু ওকি! বন্দুকের অতর্কিত শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া দুলালীও যে পড়িয়া গেল!

চট করিয়া ভূপেনের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল; বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং চোখে মুখে হাতে পায়ে জল দিয়া ও বেশ ঠান্ডা এক গ্লাস জল পান করিয়া পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আবার চিন্তা,—নানা প্রকার অস্বাভাবিক অদ্ভুত চিন্তা। ভূপেন বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই নিদ্রা-বিঘ্নকারী চিন্তার হাত হইতে নিস্তার পাইলেন না। তখন তিনি বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করিতে গেলেন এবং ভাবিতে আরম্ভ করিলেন যে, তিনি শীঘ্রই একটি সুন্দর কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং পিতা মাতা ও কনককে লইয়া সেইখানেই বাস করিবেন। পিতাকে তিনি আর অধিক দিন এইরূপ পরিশ্রম করিতে দিবেন না। তিনি তাঁহাদিগকে খুব যত্নে রাখিবেন। তাঁহাদের কাহারও কখন কোন পীড়া হইলে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে নিরাময় করিয়া তুলিবেন। কিন্তু তাঁহারা সকলে মিলিয়া যদি একই সময়ে কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে সেবা পরিচর্য্যাদির সমস্ত কার্য্য তিনি একাকী ঠিক ঠিক মত করিয়া উঠিতে পারিবেন কি? আচ্ছা,—যদি নাই পারেন,—দুলালীকে আনাইলেই তো চলিয়া যাইবে। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিবেন। ভূপেন দেখিলেন, সত্যই যেন আশুবাবু রোগশয্যায় পড়িয়া প্রবল বিকারের মধ্যে 'আবোল-তাবোল' বকিতেছেন এবং দুলালী শিয়রে বসিয়া মাথায় বাতাস দিতেছে। তিনি পার্শ্বে বসিয়া পিতার নাড়ী ধরিতে গেলেন। হঠাৎ দুলালীর পাখা তাঁহাকে আঘাত করিল এবং সেই সামান্য শব্দে আশুবাবু চমকিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূপেনের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তন্দ্রা ও স্বপ্নের ঘোরে দুই তিন মুহূর্ত্ত তিনি একটা বিষম অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিলেন। তারপর সেই ঘোর কাটিয়া গেল। তিনি হাসিয়া উঠিলেন। এই প্রকারে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া ভোরের দিকে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

দুলালীরও সে রাত্রে সুনিদ্রা হইতে বিস্তর বিলম্ব হইল। আহারাদির হাঙ্গামা ছিল না। সারাদিন নূতন আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া দুলালী হিম-সিম খাইয়া গিয়াছিল। গা-হাত-পা ধুইয়া ঘর-দুয়ারের কয়েকখানা অত্যাবশ্যক কাজ করিতে করিতে সুখনের আছাড় খাওয়া লইয়া তাহার সহিত বেশ একটু রঙ্গ-রহস্য করিয়া লইল। তারপর যে যাহার স্থানে শয্যা গ্রহণ করিল।

কিন্তু দুলালীর ঘুম আসিল না। সারা দিবসের ঘটনাবলী বায়স্কোপের চলচ্চিত্রের ন্যায় তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। কি অনাবিল আনন্দই না সে আজ পাইয়া আসিয়াছে! কি চমৎকার মহানুভব কনকের ঐ স্নেহময় পিতাটি! কনকদের বাড়ীতে যে সব বালিকারা আসিয়াছিল, তাহারাই বা কি সুন্দর এবং সরল! আজ সে কিন্তু খুব একটা লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। কনকের জন্মোৎসবে সকলেই কিছু না কিছু উপহার দিয়াছিল; কিন্তু ছি,—ধর্ম্ম সম্পর্কে তাহার দিদি হইয়াও সে একেবারে খালি হাতেই গিয়া পড়িয়াছিল! ভাগ্যে ঐ শাড়ীখানা ঘরে ছিল এবং ভাগ্যে তাহা নেওয়াইবার সুযোগ পাইয়াছিল! নারায়ণ আজ খুব তাহার মুখ রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু ভূপেনবাবু অমন করিলেন কেন? ঐ সামান্য মোটা শাড়ীখানা কি এতই প্রশংসার যোগ্য যে সব রকম মূল্যবান বস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া ঐখানি পরাইয়া দিবার জন্যই মায়ের উপর তিনি অত জিদ করিলেন? ভদ্রলোকদের মধ্যে আবার সেই সব প্রশংসার পুনরুক্তি করিয়া আশুবাবুই বা তাহাকে কি ভয়ানক লজ্জার মধ্যে ফেলিয়াছিলেন! কি সুন্দর অমায়িক এই পরিবারের সবকটি লোক! ভূপেনবাবু গাড়ী চালাইতেও পারেন বড় সুন্দর। অমন অন্ধকারের মধ্যে কি সুন্দর চালাইয়া আসিলেন! জ্যোৎস্নাটুকু বড়ই ভাল লাগিতেছিল; কিন্তু সব মাটি করিয়া দিল মেঘ বৃষ্টিতে। ফিরিবার পথে তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই'ত? রাস্তার দুই পার্শ্বেই যে ভয়ানক জঙ্গল। নারায়ণ তাঁহাকে রক্ষা করুন। এই সব ভাবিতে ভাবিতে গভীর রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সারা দিবসের উত্তেজনায় কনক অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দুলালী চলিয়া গেলে সে একটা তীব্র শূন্যতা অনুভব করিল এবং বিষণ্ন চিত্তে শুইয়া পড়িল। নিদ্রাদেবী তাহার নয়নপল্লবে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিতে বিলম্ব করিলেন না। সংসারের অবশিষ্ট কাজ-কর্ম্ম সমাধা করিয়া ব্রহ্মময়ীও কন্যার পার্শ্বে নিদ্রাগত হইলেন।

কিন্তু কন্যা ও গৃহিণীর ন্যায় গৃহকর্ত্তার প্রতি নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহ অত সহজে বর্ষিত হইল না। ঘুমাইবার পূর্ব্বে শত চিন্তার মধ্যেও দুলালীর সুন্দর মুখখানি এবং তাহার সুন্দর কাজ-কর্ম্ম, কথাবার্ত্তাগুলি বারংবার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

ইদানীং রাত্রের আহারের সময়েই আশুবাবু সাধারণত স্ত্রীর সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা এবং গল্প-সল্প করেন। কথাবার্ত্তার মধ্যে ধীরে সুস্থে একটু অধিক সময় লইয়া আহার করিতে তিনি খুব ভালবাসেন। দিনের বেলায় কাজ-কর্ম্মের জন্য উপযুক্ত অবসর পাওয়া যায় না। রাত্রের আহারই তাঁহার প্রধান আহার।

কথা প্রসঙ্গে আশুবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা গিন্নি! দুলালী আমাদের পুত্রবধূ হলে কেমন হয়?"

(শেষাংশ ৫৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেশ-বিদেশের বৎসর-আবাহন

ইংরেজী নববর্ষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমরা ভারতবাসীরা উহার উৎসব প্রত্যক্ষ করিলাম, কেহ কেহ উহার আনন্দ-তরঙ্গে যোগদানও করিলাম। শাসকজাতির নববৎসরের প্রথম দিন—উহার উজ্জ্বলতায় শাসিত পরাধীন জাতির অন্ধকার জীবনেও বিদ্যুৎঝলকের ন্যায় একটা আনন্দ হিল্লোল খেলিয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে কত চিত্রই না ফুটাইয়া তোলে মানসচক্ষে! মুক্তির বিরাট সম্ভাব্যতা যেদিন বাস্তবে পরিণত হইবে—সেদিনের কত রঙিন চিত্র বায়োস্কোপের সচল পরছায়ার মত চোখ ধাঁধাইয়া দিয়া যায়। বিদেশীয়দের এই উৎসব-ঘটা উচ্চরবে ঘোষণা প্রচার করে—উৎসবের প্রাণখোলা আনন্দ তাহাদেরই জন্য, যাহারা কর্ম্মবীর, যাহাদের ধমনীর প্রতিটি রক্তবিন্দু সজীব চঞ্চলতার সার্থকতায় পূর্ণ।

এমনই একটা ব্যথিত উদাসীনতার সহিত আমরা লক্ষ্য করি সারা বিশ্বের নববর্ষের উৎসব-তরঙ্গ। কিন্তু এই যে নববর্ষ যাহা ১লা জানুয়ারী সুরু হইল, ইহার সহিত ধর্ম্মেরও যোগাযোগ রহিয়াছে কিছুটা, সেই জন্যই ভারতীয় হইলেও এ দেশের খৃষ্টানগণ এই নববর্ষকেই তাহাদের উৎসব আবাহনের আন্তরিকতায় ভরিয়া তোলে।
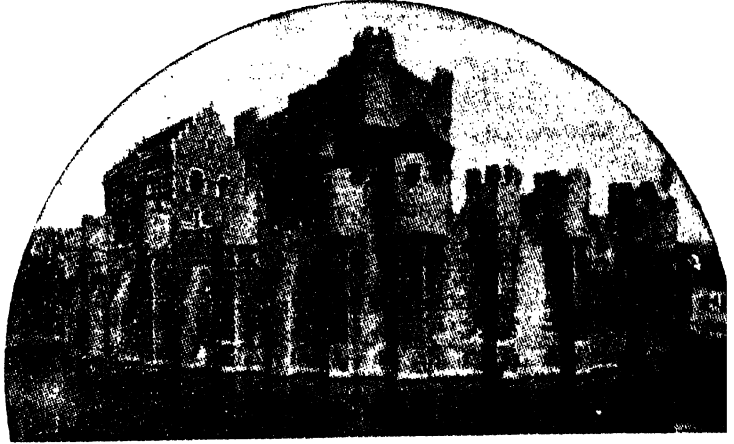
বেলজিয়ামের বিশিষ্টতা

ফ্রান্সের মঞ্জুশ্রী

ইহুদী জাতি—ধর্ম্মের দিক হইতে একটা বিপুল পার্থক্য বোধ করে বলিয়াই দেশে-দেশের ইহুদীগণ নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের প্রাচীন রীতি অনুসারে। চাষ-আবাদের সহিত প্রাচীন ইহুদীদের জীবন ছিল নিবিড়ভাবে জড়িত, সেই জন্য তাহাদের বৎসর আরম্ভ শরৎকালে (Autumn)—তাহাদের ছিল কৃষি-সম্পর্কিত বৎসর। ইহুদীদের নববর্ষ উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠান হইল নিউ ইয়ারস ফিস্ট (নববর্ষের ভোজ) যাহা জাকজমকের সহিত নিষ্পন্ন হইলেও, আহার্য্যের ভিতর থাকে নিষেধ-বিধির অপরিসীম বাধ্য-বাধকতা। নববর্ষ-ভোজে প্রধানত আহার্য্য হইল তাহাদের ফলমূলাদি এবং যথেষ্ট পরিমাণে মধু। রুটিখণ্ড মধুতে ডুবাইয়া তাহারা পরম পিতার চরণে প্রার্থনা জানায়—"সর্ব্বনিয়ন্তা আমাদের ভগবান—যিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেরও পরম পিতা—নিজগুণে তিনি আমাদের কৃপা করুন যেন নববর্ষ আমাদের সুখ-শান্তি ও মঙ্গল বিধান করে।" প্রাচীন কালে দুই দিন ধার্য্য ছিল ইহুদীদের এই উৎসবের জন্য, কিন্তু কালে কালে তাহা বর্ত্তমানে এক দিনেই পরিণত হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির ভিতর বিভিন্ন দিনে বর্ষ আরম্ভ করা হইলেও কিন্তু নূতন বৎসরের প্রথম দিনে উৎসবে যোগদান করিতে কেহই পরাঙ্মুখ হয় না। যে জাতির বা যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের যে সময়েই নূতন বৎসর আরম্ভের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকুক না কেন, নববর্ষের প্রথম দিনকে উৎসবের আমোদ-প্রমোদে চিত্তে চির-জাগরূক রাখিবার ব্যবস্থা সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিতরই রহিয়াছে। আবার উৎসবের প্রকৃতি, অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য হয় ত জাতিতে জাতিতে একেবারে স্বতন্ত্র, কিন্তু নববর্ষে উৎসবহীন জাতি তাহা বলিয়া মিলিবে না দুনিয়ায় একটি। আর এই যে প্রভেদ—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কৃষি-সম্বল জাতি কৃষিকেই করিবে উৎসবের উপাদান, ব্যায়ামপ্রিয় জাতি ব্যায়ামানুষ্ঠানেই নববর্ষ উৎসবকে সাফল

মণ্ডিত করিবে। আবার যে জাতি সঙ্গীতপ্রিয় তাহার নববর্ষের আবাহন সঙ্গীতের সুরেই পুষ্পিত। আবার এমন জাতিও রহিয়াছে যাহাদের শিকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ-বিলাস, তাহাদের নববর্ষের আমোদ-প্রমোদ যে শিকার-ব্যসনেই পর্য্যবসিত হইবে, ইহাতে অস্বাভাবিকতা থাকিতে পারে না আদপেই। এমন জাতিও তাহা বলিয়া বিরল নহে যাহাদের নববর্ষের উৎসব একমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানেই রূপায়িত।

সর্ব্বোপরি হইল নববর্ষের আভিজাত্য এইখানে যে উহা আমাদের একঘেয়ে একটানা জীবন-স্রোতের দীর্ঘতায় আনে গণনার হিসাব—আনে আরাম-বিরামের ছেদ; তাই আজ আমাদের দিনের আরম্ভ, রাত্রির শেষ, সপ্তাহের সুপ্রপাশ

Snow-man (তুষার পুরুষ)—ইংলণ্ডে ছোটদের খৃষ্টমাস ও নববর্ষের উৎসবে বরফ দ্বারা গঠিত বিরাট মূর্ত্তি

মাসকাবার, বর্ষশেষ, বর্ষ-সূচনা—জীবন-সংগ্রামের পথে মাইল-পাথরের মত গন্তব্যের নিশানা হইয়া থাকে স্মৃতিতে। জানি আমরা এইগুলি নিতান্তই অহেতুক, এইগুলি না থাকিলেও আমাদের জীবনধারা স্তব্ধ হইয়া যাইত না; কিন্তু এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এইগুলি ব্যতীত আমাদের জীবন হইয়া পড়িত অনেক বিচিত্রতাহীন, অনেকখানি নিরানন্দ।

সুদীর্ঘকালের গঠিত জীবনের এই পারিপার্শ্বিক আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের সংস্কার, আমাদের স্মৃতি এক কথায় আমাদের সমগ্র সত্তার সহিত এমনিভাবে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, নববর্ষকে আর আমরা অন্য চোখে দেখিতে পারি না। দুনিয়ার এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত নববর্ষ মানবজীবনে এক বিচিত্র বিশিষ্টতার আসন পরিগ্রহ করিয়া বসিয়াছে—তাই নববর্ষের আশায় আশান্বিত চিত্তে তাহারা প্রতীক্ষা করে, নববর্ষের মায়াস্পর্শে তাহারা পুনরুজ্জীবিত মনে করে—নববর্ষ তাহাদের নব আশা নব আকাঙ্ক্ষায় উচ্ছ্বসিত করে—নববর্ষ নব উদ্যমে, নব লক্ষ্যে তাহাদের জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

গ্রেট ব্রিটেন—ইংল্যাণ্ডে নববর্ষের উৎসবাঙ্গরূপে বেশী কিছু অনুষ্ঠান নাই—বড়দিন বা খৃষ্টমাস পার্ব্বণের ঘনঘটায়ই অন্য সব ঢাকা পড়িয়া যায়। চেশায়ারের য়্যাল্‌ডারলি এজ্‌-এ বহুকাল অবধি একটি নির্দ্দিষ্ট প্রথা চলিত আছে; বেশধারিগণ প্রাচীন সেই "সেণ্ট জর্জ্জ ও তুর্কী বীর" কাহিনীর অভিনয় করিয়া থাকে নিছক কৌতুক সৃষ্টির নিমিত্ত। উহাদের সহিত দলে দলে গ্রামবাসী গমন করে, কেহ কেহ যায় ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে। এই সঙ্গীয় ঘণ্টা-বাদকের দলের রেওয়াজ হয় প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে। বিচিত্র বেশধারীদের অভিনয়ের প্রথম উদ্ভবও ইহা অপেক্ষা প্রাচীনকালে। ঐ গ্রামের যে পরিবার এই প্রথা প্রথম প্রচলিত করে, এই উৎসব সময়ে এখনও তাহাদের বিশেষ মর্য্যাদা রহিয়াছে গ্রামবাসীদের নিকট।

ইহা অপেক্ষা সুদূর অতীতাগত অনুষ্ঠান হইল, সজ্জিত অশ্বমুণ্ড-কঙ্কাল লইয়া শোভাযাত্রা। উহার বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে—'ওয়েলশ্‌ গ্রে মেয়ারস্‌' একদল লোক এই মুণ্ডকঙ্কাল বিচিত্র আভরণে মণ্ডিত করিয়া বাড়ী বাড়ী যায়। কখনও কখনও বালকগণই এই শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে—কারণ তাহারা আশা করে, যে বাড়ীতে এই শোভাযাত্রা লইয়া যাইবে, সেই বাড়ী হইতে পান-ভোজন দ্রব্য পাওয়া যাইবে প্রচুর। শোভাযাত্রায় শুধু অশ্বমুণ্ডই বহন করা হয় না, অন্য একদল বহন করিয়া নেয় এক অদ্ভুত পদার্থ—তিনটি কাঠির মাথা এক করিয়া উহাতে একটি আপেল গাঁথা হয়। উহার চারিদিকে গমের শীষ ও সবুজপাতা বাঁধিয়া দিয়া সকলের উপরেই ময়দা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ময়দা ছড়ান হয় তুষার-বরফের আভাস দিবার জন্য। সমগ্র পদার্থটি যে কৃষির মূর্ত্ত-প্রতীক, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই এবং ইহা যে একেবারে আদিম বর্ব্বর যুগের স্মারক তাহাতেও ভুল নাই। আবার সময়ে স্থানবিশেষে আপেলের পরিবর্ত্তে কমলালেবু গাঁথিয়া দেওয়া হয়, ইহা যে কৃষির অবদানে আধুনিকতা সৃষ্টির প্রয়াস, এই কথা বুঝিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না। বালক-বালিকাগণ এই বিচিত্র কৃষি-সম্পদ-প্রতীকটিকে বহন করিয়া রাস্তায় বাহির হয়, সময়ে বাড়ী-বাড়ীও যায়। তাহারা সকলের নিকট হইতেই কিছু না কিছু উপহার পাইবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করে এবং পাইয়াও থাকে প্রচুর। কারণ সেই অঞ্চলবাসী গৃহস্থগণ এই উৎসবাঙ্গ শোভাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, কাজেই মঙ্গল সঙ্গীত-সহ শোভাযাত্রীদের উপস্থিতি মাত্রেই খাদ্য-সামগ্রী বা টাকাকড়ি দিয়া উৎসাহী বালক-বালিকাদের সন্তুষ্ট করিতে পশ্চাৎপদ হয় না।

স্কটল্যাণ্ডের কোন কোন অংশে জুনিফার শাখা পোড়াইয়া ধূম উৎপাদন করিয়া, তাহা সমগ্র বাড়ীতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনা হয়। উদ্দেশ্য শয়তানের সকল প্রভাব লুপ্ত হইবে।

ইহা ছাড়া নববর্ষের যাহা আমোদ-প্রমোদ, তাহা দেখা যাইবে হোটেল-রেস্তোরাঁয় ভোজের আড়ম্বরে এবং মধ্যরাত্রির

সোভিয়েটে যাদুর পরশ

জার্ম্মানীর ছায়া-বীথিকা
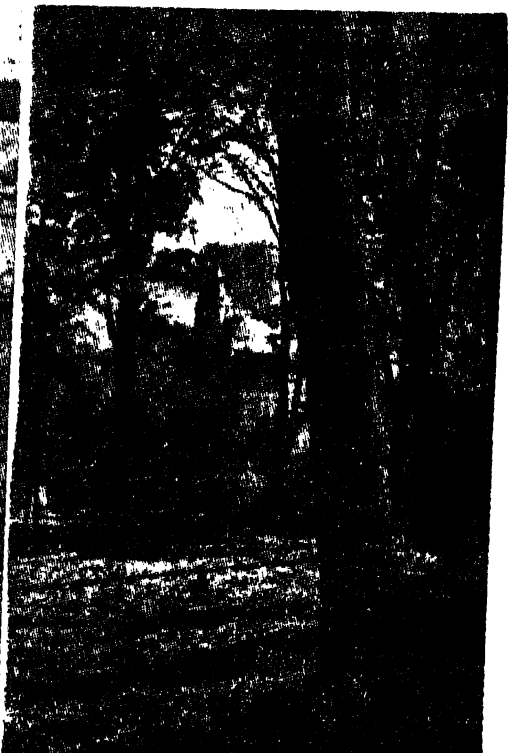
নববর্ষ ঘোষণায় সেণ্ট পল হইতে ঘণ্টা বাদনে। ইংলণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চলেই নববর্ষের উৎসব এই রকম শাদাসিধা-ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই নববর্ষ ঘোষণার পর আর কোলাহলময় উৎসবানুষ্ঠানের নূতন কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

আবার উৎসবের আমেজ পাওয়া যায় ১লা জানুয়ারীর সাঁঝের বেলা। কেহ কেহ দলে দলে জুটিয়া হোটেলে হোটেলে

গঙ্গাস্নানের পর দেবতার মন্দিরে মন্দিরে পূজার্ঘ্য প্রদান

পান-ভোজনে লিপ্ত হয়। কেহ বা নিজ নিজ গৃহে বন্ধু-বান্ধবী-সহ নৃত্য-পার্টির বিলাসে নিরত হয়। আবার নেহাৎ নীরব-বিলাসী নিজ গৃহে পানপাত্র পূর্ণ করিয়া আমোদ উপভোগ করে। সুতরাং মাদক দ্রব্যের মারফত তাহাদের উৎসব-আনন্দ বেশ ভালভাবেই অভিব্যক্ত হয়।

ফ্রান্স—ফরাসীদেশে নববর্ষ হইল সামাজিকতা রক্ষার্থ পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাইবার দিন বলিয়া ধার্য্য। সকল সরকারী অফিস বন্ধ থাকে এবং সকল কর্ম্মচারীরই উপরওয়ালা অফিসারদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনের রেওয়াজ এইভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। বন্ধু-বান্ধবীদের উপহার দেওয়া—ফুল, ফল, মিষ্টান্ন কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ উপকার-প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা ফরাসীদের নিয়মে দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টমাস অপেক্ষা নববর্ষই উপহার দানের যোগ্যতর দিবস বলিয়া তাহাদের ভিতর পরিগণিত। নববর্ষের দিন ও উহার পূর্ব্বদিন—দুই দিনই ফরাসীদেশে ব্যাপক আমোদ উপভোগের জন্য বিখ্যাত।

এ দেশে যেমন পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে মেলা বসে—রাস্তার ধারে ধারে নানাপ্রকার দোকান-পসার দেখা যায়, তেমনই প্যারিসে বুলেভার্ডে সারি সারি ষ্টলে মিষ্টান্ন প্রভৃতির পশরা সজ্জিত থাকে। অগণিত নর-নারী উহা ক্রয় করে, আনন্দ-উল্লাসে সমগ্র রাজপথ মুখরিত করিয়া তোলে। এই প্রকার উদ্দাম আনন্দস্রোত ইংলণ্ডে দেখা যায় না প্রায় কোথাও।

আমোদ-প্রমোদের বন্যা সারা ফরাসীদেশে প্রবাহিত হইলেও কিন্তু ব্রিটেনি প্রদেশে নিছক পান-ভোজন ও আমোদ উপভোগের পালাই শুধু চলে না, সেখানে নববর্ষ উৎসব কতকটা যেন গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত, কারণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ-রূপেই সেখানে এই উৎসবকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং উৎসবের প্রধান কর্ত্তব্য হয় প্রার্থনা এবং পরস্পরের শুভেচ্ছা বিনিময়; শুধুই সাধারণ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন নয়, শুভ নববর্ষ ত আবাহন করাই হয়, তদুপরি জীবন-সন্ধ্যায় যখন মহাকালের আহ্বান আসিবে তখন যেন 'অক্ষয় স্বর্গলাভ' হয় এই পারলৌকিক মঙ্গলকামনাও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে প্রধান স্থান অধিকার করে। ভারতে যেমন অনেকের বিশ্বাস বৎসরের প্রথম দিন সুখে-শান্তিতে কাটিলে সারা বৎসরই সুখে কাটিবে, তেমনি বিশ্বাস কোন কোন ব্রেটোনবাসীর চিত্তে বদ্ধমূল। ইহুদীরাও কতকটা এমনই এক বিশ্বাসে ধারণা করিয়া লয় যে বৎসরের প্রথম দিন গরম বা ঠাণ্ডা যাহা হইবে ভাবী বৎসর ব্যাপিয়া ঠিক সেই প্রকার অবস্থাই চলিবে।

জার্ম্মানী—জার্ম্মানিদিগের ভিতরও নববর্ষ উৎসব জীবনের এক মহা আনন্দ দিন বলিয়া পরিজ্ঞাত। ঐ দিন আমোদ-প্রমোদে মাতিতে ফরাসীদের অপেক্ষা তাহারা উৎসাহ-উদ্দাম কম দেখায় না। খৃষ্টমাস অপেক্ষা এই সময়েই তাহারা বেশী রকম প্রীতি-সম্ভাষণ জ্ঞাপনার্থ কার্ড প্রেরণ করে নানা প্রকারে সুমুদ্রিত ও বিচিত্র ফ্যাশানে প্রস্তুত। সিলভেষ্টার এবেণ্ড অর্থাৎ নববর্ষের সন্ধ্যা জার্ম্মানীতেও পান-ভোজনের আভিজাত্যে সমুজ্জ্বল।

মধ্যরাত্রে যখন নববর্ষ ঘোষিত হয় ঘণ্টাধ্বনিতে, অমনি পরিবারে পরিবারে কিম্বা বন্ধুমণ্ডলীতে মদ্যপাত্রের ঠোকা-ঠুকিম্বারা আপ্যায়ন ও আত্মীয়তার নিবিড়তা প্রকাশ করা হয়, তৎপর সেই পাত্রের মদ্য পান করা হয়—"প্রোজিট নিউঝার" এই শুভবাণী উচ্চারণ করিয়া। বাণীটির মর্ম্ম হইল এইরূপ—"নববর্ষ মঙ্গলময় হউক।"

আমাদের দেশে যেমন সাঁঝের বেলা ধূপধূনা দিবার প্রথা, তেমনিই নববর্ষে জার্ম্মানীর কোন কোন অংশে, গৃহের ঘরে ঘরে আস্তাবলে গোলাবাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পবিত্র বারি সিঞ্চন এবং সুগন্ধ ধূনায় ধূমায়িত করা অবশ্য কর্ত্তব্য প্রথা। কারণ তাহাদের বিশ্বাস এই প্রকারে সকল অমঙ্গল বিদূরিত

হয়। বিশেষ করিয়া অষ্ট্রিয়া এবং টাইরল অঞ্চলে এই রীতি গৃহে গৃহে প্রতিপালিত হয়, অবশ্য বেশীর ভাগ কৃষকদিগের ভিতর।

স্পেন—নববর্ষের উৎসবে পান-ভোজন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন প্রভৃতি রীতি ছাড়াও স্পেনে প্রধান জাঁকজমক দেখিতে পাওয়া যায় গৃহাবাস রঙিন আলোকমালায় সজ্জিত করিবার। ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বাজি পোড়ান স্পেনের নববর্ষ উৎসবের প্রধান নিদর্শন, ঠিক যেমন কালীপূজায় হিন্দুদিগের ভিতর দেখা যায় ভারতবর্ষে। তবে এখানেও স্পেনবাসীর বিশিষ্টতা রহিয়াছে, কারণ তাহারা সন্ধ্যাবেলা হইতে রঙিন আলোকমালা বা হাউই, তুবড়ী প্রভৃতি বাজির আমোদে লিপ্ত হয় না। যেমন মধ্যরাত্রি ঘনাইয়া আসিল এবং নববর্ষ ঘোষিত হইবার সময় প্রায় সমাগত হইল, তখনই অকস্মাৎ নগরকে নগর কিম্বা উপত্যকার পর উপত্যকা যেন অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহার পর যে মুহূর্ত্তে নববর্ষ ঘোষিত হয় গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় ... হাউই আকাশে উঠিয়া মহাশূন্যকে একবারে ছাইয়া ফেলে। সেই সময় হইতে কিছুকাল এই বাজি পোড়াইবার ধূম পড়িয়া যায়।

ডাঙায় যখন এই প্রকার বিচিত্র আলোক ও অগ্নির খেলা চলিতে থাকে সাগর-বক্ষও তখন নীরব বা অন্ধকার থাকে না। জাহাজগুলি হইতে তোপধ্বনি করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে রঙিন সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করা হয় চতুর্দ্দিকে। আবার ছোট ছোট মোটর বোটকে নানা রঙের আলোকমালায় শোভিত করিয়া দ্রুতগতিতে বন্দরের সম্মুখে আনাগোনা করিতে নিযুক্ত করা হয়। ফলে সাগরের জলে প্রতিবিম্ব পড়িয়া যে অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হয় তাহা না দেখিলে উহার বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

চীন ও জাপান—চীনদেশে কিন্তু নববর্ষে যে বাজি পোড়ান হয়, তাহার তুলনা হয় না সারা দুনিয়ার অন্য কোন দেশের সহিত। আর উৎসবের আমোদও এত দীর্ঘ সময় স্থায়ী হইতে অন্য কোথাও দেখা যাইবে না। সারারাত্রি কাগজের ফানুষ হাতে নর-নারী হল্লা করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া

১লা বৈশাখে গঙ্গাস্নান ভারতের সকল অঞ্চলেই প্রচলিত

বেড়াইবে, কেহ একটি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে না। দুইটি তিনটি, কখনও কখনও একটি লাঠিতে বাঁধিয়া পাঁচ সাতটি পর্য্যন্ত কাগজের লণ্ঠন লইয়া পথে পথে ঘুরিবে। ভারতের মত ওখানেও কতকটা হালখাতার মহরতের ব্যবস্থা আছে। তবে ভারতে মহরতের বেলা টাকার অঙ্ক নির্দ্ধারিত নাই, কিন্তু চীনে ঐ দিনে সমস্ত প্রাপ্য পরিশোধ করিবার বাধ্যবাধকতাপূর্ণ রীতি। ইহার অন্যথা সহজে কেহ করে না, কারণ ঐ প্রকার অসঙ্গত কার্য্য করা নিতান্ত অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই প্রাপ্য আদায়ের জন্য মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, তৎপর দোকানপাট বন্ধ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

প্রত্যেক গৃহের ফটক পুষ্প-পতাকা কাগজের ফানুষে সাজান হয়। ফ্রেমে আঁটা ছবি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বিশেষ বিশেষ বাণী লিখিয়া তাহাও প্রাচীরে, ফটকে, ড্রয়িং-

অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির—এই শহরের দুর্গ সম্মুখস্থ প্রান্তরে বৈশাখী মেলা বসে—যে গুলীবর্ষণের জন্য সকল ভারতীয়ের অন্তর বিষকণ্টকাহত, সেই "জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যা"র লীলা-খেলা চলে এই স্থানের বৈশাখী মেলায়

রুমে স্থাপন করা হয়। যাহারা ফানুষ লইয়া রাস্তায় বাহির না হয়, তাহারা গৃহে সমস্ত রাত্রি আত্মীয়-পরিজনসহ পান-ভোজনে কাটাইয়া দেয়। যাহারা ফানুষ লইয়া পদব্রজে বাহির হয়, তাহারা রাস্তায় রাস্তায় পান-ভোজন সমাধা করে। কেহ শেষ রাত্রিতে, কেহ বা প্রত্যূষে গৃহে ফিরিয়া আসে।

চীনাদের সকল উৎসবেই প্রধান করণীয় হইল পূর্ব্ব-পুরুষদের পূজা। সেই পবিত্র কর্ত্তব্য অগ্রে সমাধা না করিয়া চীনবাসী উৎসবের আমোদে লিপ্ত হয় না। দ্বারে যে ছবি রাখা হয়, তাহার ভিতর পারিবারিক রক্ষাকর্ত্তা দেবতাই সর্ব্বাগ্রে স্থানপ্রাপ্ত হয়। তবে এই প্রকার দেবতার রক্ষণ-ক্ষমতার উপর শিক্ষিতদের আর আস্থা নাই। তবে যাহারা নিরক্ষর এবং প্রাচীন সংস্কারে আবদ্ধ, তাহারাই বর্ত্তমানে দেবতার উপর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনার্থ দ্বারে প্রতিকৃতি লটকাইয়া দেয়।

যে সকল বাণী দ্বারে আঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহার উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শয়তান এবং তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ-দের তাড়ান; কাজেই লেখা হয়—"দেবাদিদেব চিচ্ এইস্থানে অধিষ্ঠিত, সুতরাং দেশের যত শয়তান হুঁসিয়ার! এখান হইতে তফাৎ যাও।"

জাপানেও নববর্ষ উৎসব প্রচুর ঘন-ঘটাপূর্ণ। নববর্ষ আসিবার পূর্ব্বে হইতেই দেখা যাইবে দোকানে দোকানে বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রহিয়াছে—খড়ের দড়ি নানা রঙে রঙিন। এই দড়িগুলি ঝালরের মত দোকানের ভিতরে বাহিরে ঝুলান রহিয়াছে। এইগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় বলিয়া অতি পবিত্র জ্ঞানে সকল জাপানী ক্রয় করিয়া নেয় এবং নিজ নিজ গৃহদ্বারে, বসিবার ঘরে, চা-পানের কুটীরে ঝুলাইয়া রাখে। আর একটি জিনিষও এই উৎসবে যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়—তাহা হইল লাঠির ডগায় বাঁধা ঝাঁটা। এইগুলিও স্তূপাকারে দোকানে সঞ্চিত থাকে। এই ঝাঁটাও জাপানবাসী অন্তত একটি কিনিয়া আনিয়া সদর দরজায় রাখিয়া দিবে। উহার উদ্দেশ্য বোধ হয় ইহাই যে, সমগ্র গৃহখানি যে পরি-পাটিরূপে মার্জ্জিত ও পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে তাহার প্রমাণ-স্বরূপ ঝাঁটা সর্ব্বাগ্রে দ্বারে প্রদর্শিত হইল।

এই বাহিরের সজ্জা সাধন করিয়াই জাপানীরা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহারা সকল গৃহের মেঝেয় বিস্তৃত মাদুর এই সময় নূতন ক্রয় করিয়া বিছাইয়া দেয়। এবং নববর্ষ দিনে বিস্তর বন্ধু-বান্ধব আত্মজন দেখা সাক্ষাৎ করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতে আসে বলিয়া এবং তাহাদের পদক্ষেপে এক-দিনেই মেঝের মাদুর নোংরা না হইয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে বোধ হয় মাদুরের উপর সমস্ত ঘরময় এবং গৃহাভ্যন্তরস্থ সকল অলিতে গলিতে কাগজ পাতিয়া দেওয়া হয়, তাহার উপর দিয়াই অভ্যাগতগণ আনাগোনা করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য কায়দায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং নববর্ষে উপহার আদান-প্রদান জাপানে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্য-সামগ্রীর আবরক কাগজের রুমালের উপর শুভেচ্ছার বাণী মুদ্রিত করিয়া প্রেরণ করা রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে।

আনাম ইন্দো-চীন অঞ্চলে মুখোসধারী [illegible] নেত্রীদের শোভাযাত্রা করিয়া কিম্বদন্তীমূলক কাহিনী অভি[illegible] নববর্ষের প্রধান অনুষ্ঠান। তবু ঐ প্রকার পথচারী অভিনেতা অভিনেত্রী বিচিত্র মুখোসে সজ্জিত হইয়া যে অভিনয় করে পথে-ঘাটে, এই ব্যাপার সে দেশে কিম্বা বলি দ্বীপে দৈনন্দিন কার্য্য বলিয়া তেমন বিচিত্র ঠেকে না দর্শকের চোখে।

জাপানের রণতরী এবং অন্যান্য জলযানেও নববর্ষের উৎসব উপেক্ষিত হয় না। তবে আলোকমালার তেমন ছড়াছড়ি দেখা যায় না। সকলে সমবেত হইয়া মিকাদোর গুণগান, তাহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা সরকারী নির্দ্দিষ্ট রীতিতে পরিণত হইয়াছে।

বেলজিয়াম—স্পেনের ন্যায় বাজির সখ বেলজিয়াম-বাসীদেরও রহিয়াছে নববর্ষের উৎসবকে জাঁকাইয়া তুলিবার

রাজপুতে রাজা-রাজড়ার হস্তীপৃষ্ঠে শোভাযাত্রা
নববর্ষের দরবারের অনুষ্ঠান-সূচনা

জন্য। কিন্তু বাজি ছোড়া অপেক্ষা একে অন্যে সাক্ষাৎ এবং সম্বর্দ্ধনা অতি ব্যাপকভাবে আচরিত হয় সেই দেশে নববর্ষের প্রথম দিনে। এই সাক্ষাতের ব্যাপার এমনই সংখ্যাতীত দাঁড়ায় যে, সদর দরজার ঘণ্টা সারাদিন অবিরাম বাজিতেই থাকে—সাক্ষাৎকারী আগন্তুকের আগমন প্রচার করিয়া।

আর একটি প্রথা বেলজিয়াম ও ডেনমার্কেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোনও ব্যক্তির কিছুমাত্র প্রাপ্য থাকে কাহারও নিকট, সে আসিয়া নববর্ষ দিনে 'খৃষ্টমাস বক্স'-য়ের দাবী জানাইবে। ফলে গৃহস্থকে দাবীকারীর হস্তে কিছু-না-কিছু দিতে হইবেই। তবে দুঃখের বিষয় সেই অর্থ সৎপথে ব্যয়িত হইবে না, অধিকাংশস্থলেই উহার ব্যয় হয় মদ্যাদি পানে উৎসবের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে। যদি কোনও ব্যক্তির প্রাপ্য কিছু নাও থাকে, তথাপি সে আসিয়া দাবী জানাইবে যদি কোনদিন কোন প্রকারে সামান্য কিছু নগণ্য উপকারও করিয়া থাকে। সেই স্থলেও সাধ্যানুসারে কিছু সাহায্য করা রীতি।

[illegible] নববর্ষে, [illegible] সাধা[illegible]দের ভিতরই এ[illegible] একটি বাতি জ্বালিয়া উহার [illegible] সীসা [illegible] সীসা গলিয়া পড়িবার মত অবস্থা হয়, তখন সেই সীসাকে টবের জলে নিক্ষেপ করা হয়। এখন জলে নিক্ষিপ্ত এই গলিত সীসা যে আকার ধারণ করে, তাহার উপর নির্ভর করে নিক্ষেপকারীর নববর্ষ সৌভাগ্যমণ্ডিত হইবে কি না। উহা যদি কোনও প্রকারে ফুলের কুঁড়ির আকার গ্রহণ করে আভাসেও তাহা হইলে নিক্ষেপকারীর সৌভাগ্য নিশ্চিত।

এই প্রকারে দেখা যায় শুধু ভারত কিম্বা এশিয়ার জনগণের ভিতরই নয়, নববর্ষের উৎসবকে নানা প্রকার কিম্বদন্তীমূলক আচার বা বিশিষ্ট অন্ধ-সংস্কারমূলক অনুষ্ঠানে সার্থক করিয়া তোলা ইউরোপের জনসাধারণের ভিতরও যথেষ্ট প্রচলিত। বংশপরম্পরাগত কিম্বা চিরাচরিত বিশেষ বিশেষ বিচিত্র-পদ্ধতি কোন দেশের লোকই বর্জ্জন করে না, বরং পরম আদরে উহাকেই উৎসবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ইহার জন্য ইউরোপের কত অঞ্চলে কত প্রকার বিচিত্র অভিনয়, কত প্রকার নববর্ষ সঙ্গীত একেবারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে যুগ যুগ ধরিয়া নেহাৎ অপরিহার্য্যরূপে।

ভারতবর্ষ—ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গে একই সময়ে অনুষ্ঠিত না হইলেও পরাধীন ভারতেরও নববর্ষ উৎসব রহিয়াছে এবং তাহা কোন ক্রমেই কম ঘটার সহিত নিষ্পন্ন হয় না। বিদেশীয়ের নববর্ষ উৎসবে মনে প্রাণে যোগদান না করিলেও ভারত নিজস্ব নববর্ষ উৎসবে আনন্দপ্লাবিত হয় কানায় কানায়।

এক সময়ে অগ্রহায়ণ ছিল বৎসরের আদি, আজিকার যে স্থান বৈশাখ মাস অধিকার করিয়াছে বাঙলাদেশে। নববর্ষের উৎসবের সহিত 'হালখাতার' একটা নিবিড় সম্পর্ক—যদিও ভারতের সর্ব্বত্রই যে ১লা বৈশাখে হালখাতার প্রবর্ত্তন হয়, তাহা নয়। বাঙলায়ও যেমন দেখা যায় কোন কোন বণিক-সম্প্রদায়ের ভিতর রামনবমী কিম্বা বিশ্বকর্ম্মাপূজার দিবস হালখাতার জন্য নির্দ্ধারিত, তেমনিই ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ঐ প্রকার বিভিন্ন দিনে হালখাতার মহরৎ হইয়া থাকে! তবে অনুষ্ঠানটির প্রণালী প্রায় একই প্রকার। কোন কোন অঞ্চলে আবার দিওয়ালী অর্থাৎ কালীপূজার দিনে হালখাতার প্রবর্ত্তন বাঁধাধরা নিয়মে পরিণত।

পাশ্চাত্যের বহু অঞ্চলের জনসাধারণের ভিতর যেমন দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে, বৎসরের প্রথম দিন যেমনভাবে কাটে সারা বৎসরই সেইভাবে যাইবে, ভারতেও সেই প্রকার বিশ্বাস অনেক অজ্ঞ অশিক্ষিতের ভিতর দেখা যাইবে। সেই জন্যই নববর্ষের প্রথম দিনে ভাল খাইতে, ভাল পরিতে এবং আমোদ-

প্রমোদে লিপ্ত হইতে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। এমন কি কোন কোন পরিবারে, এই বিশ্বাস এতটা দৃঢ়বদ্ধ যে ঐ দিন বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা নানা প্রকার দুষ্টামির অপরাধ করিলেও তাহাদের সাজা দেওয়া হয় না। বৎসরের প্রথম দিনের প্রতি এতটা মর্য্যাদা-বোধ আছে, কোন পাওয়ানাদার ঐদিন তাহার প্রাপ্যের তাগিদ দিয়া খাতকের অন্তত ঐ একটি দিনের উৎসবানন্দ ম্লান করিবে না।

রাজপুতজাতি যখন স্বাধীনতার গর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই অতীত যুগে উহাদের কতকগুলি উৎসব ছিল একেবারে সারা ভারত হইতে পৃথক এবং উহাদেরই নিজস্ব। আহেরিয়া, রাখিবন্ধন প্রভৃতি উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইরূপ নববর্ষের উৎসবে রাজকীয় আড়ম্বরের সহিত পাত্র-মিত্রসহ হস্তিপৃষ্ঠে শোভাযাত্রা ছিল—'দরবার' অধিবেশনের পূর্ব্বকৃত্য। যাহার অনুকরণে আমরা দেখিতে পাই ইংলণ্ডরাজ ও ভারত-সম্রাটের রাজ্যাভিষেক ভারতে প্রচার করিতে 'দিল্লী দরবার' প্রভৃতি উৎসবের প্রচলন ভারত-সরকার করিয়াছেন।

ভারতের সকল উৎসবের সহিতই পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রহিয়াছে। সেইজন্য হালখাতা ব্যবসায়ী মহলে ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠেয় উৎসব হইলেও সাধারণ ভারতবাসী ঐদিনকে ধর্ম্মকৃত্য সাধনের যথাযোগ্য শুভদিবস বলিয়া নির্দ্ধারিত রাখিয়াছে। এই দিবসের পবিত্রতা স্মরণ করিয়া ভারতবাসী হিন্দু ঐদিন গঙ্গাস্নানে পুণ্য-অর্জ্জন, দেবতার মন্দিরে পূজা অর্ঘ্য-প্রদান প্রভৃতি পুণ্যব্রতে আন্তরিকতার সহিত যোগদান করে। বৎসর আবাহনে অগ্রে দেবতার সন্তুষ্টিবিধান তাহাদের নিকট প্রধান কর্ত্তব্য।

বৎসরের শেষদিন কিম্বা নববর্ষের প্রথম দিন ভারতের অনেক অঞ্চলেই মেলা বসে। এই মেলা স্থানবিশেষে ১ দিন আবার স্থান বিশিষে ৭ দিন হইতে মাসাবধিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই মেলার ভিতর 'বৈশাখী মেলা' যে সকল স্থানে মিলে, উহারই নামডাক বেশী। বৈশাখী মেলার সহিত ভারতের এক অতি মর্ম্মান্তিক বেদনার দিনের কথাই সমগ্র দেশবাসীর চিত্তে জাগরূক রহিয়াছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের বৈশাখী মেলায় (অমৃতসরের দুর্গ সম্মুখস্থ প্রান্তরের মেলা) জনতার উপর গুলীবর্ষণ ভারতবাসী কোনকালে ভুলিবে না। সেইজন্যই বর্ষে বর্ষে "জালিয়ানওয়ালা" দিবস প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। নববর্ষের উৎসবের সহিত এই শেলাঘাত ভারতবাসীর বক্ষে চিরতরে বিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

সমাধান

(৫৬২ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্মময়ী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দুই-এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর চক্ষু কপালে তুলিয়া গালে হাত দিয়া—ঠিক যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, এই ভাবে বলিলেন,—"ওমা, সে কি গো! গাঁই নেই—গোত্তর নেই, কোথাকার কে, সে হবে আমার অমন সোনারচাঁদ ছেলের বউ? যতই যা হোক,—" বলিয়াই হাসিয়া ফেলিলেন এবং হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ। হয়তো টের পেয়েছ যে মেয়েটাকে আমি খুব স্নেহের চক্ষে দেখি;—এই তো!"

আশুবাবু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"ঠাট্টা আমি একেবারেই করছি না; তবে তোমার মনের ভাবটা জেনে নিচ্ছি। আচ্ছা,—তুমি তোমার ছেলের জন্য এমন একটি রত্ন পাবে তো?"

ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"কেন পাব না? ভূপেন আমার বেঁচে থাক। ওর যেমন স্বভাব—তেমন বিদ্যে। আর ভগবানও তো আমাদের কোন অভাব রাখেন নি? ভাল মেয়ে কেন পাব না? 'তু' বললে এখুনি হাজার মেয়ের বাপ ছুটে আসবে।"

—"আচ্ছা, স্বজাত হোক আর ভিন্ জাত হোক, তোমার পুত্রবধূ হতে পারে এ রকম বয়সের ঢের মেয়েইতো দেখেছ এবং দেখছ;—তুমি একটি মেয়ের নাম করত, দুলালীর সঙ্গে যার তুলনা হতে পারে?"

মনে মনে কিছুক্ষণ নিষ্ফল অনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"তা হোক না হোক, তবু এ কি কখন হতে পারে?"

আশুবাবু বলিলেন,—"তা বটে, কিন্তু মেয়েটিকে যে আমার কত ভাল লেগেছে, তা আর আমি তোমায় কি বলব? তার বুদ্ধি-শুদ্ধি, চাল-চলন, কাজ-কর্ম্ম—সবই চমৎকার। কাল কি হয়েছিল জান? কি একটা কথা শুনবার জন্য কনক ভয়ানক উতলা হয়ে তাকে বারংবার ত্যক্ত করছিল, আর সেও 'পরে বলব' বলে ক্রমাগত কাটিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কনক ক্ষেপে উঠল এবং বেশ একটু রাগ করে তাকে—দুটা শক্ত কথা শুনিয়ে দিল। তখন সে তোমার মেয়েকে মিষ্টি মিষ্টি সোজা কথায় এমনই সুন্দর তিরস্কার করলো, যার অর্দ্ধেকটাও তুমি আমি করলে মেয়ে তোমার কেঁদে কেটে একটা অনর্থ ঘটাত। কিন্তু তার তিরস্কারে তোমার অমন পাগলী মেয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গেল, এবং নিজের দোষ স্বীকার করে উল্টে আবার তার কাছ থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিল। আমি সেখানে আড়ালে বসে কাজ করছিলাম। তাই বলছি—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তোমায় আর বলতে হবে না। মেয়েটি যে খুবই ভাল সে কথা ত আর আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু তা বলে সে যে আমার পুত্রবধূ হবে, এবং তার গর্ভ-জাত ছেলে বংশের পিণ্ডলোপ করবে—তা তুমি স্বপ্নেও ভেব না। তোমার যদি ওরকম কোন ইচ্ছা সত্যই হয়ে থাকে, তা হলে এখন থেকে তা দূর কর। তবে হ্যাঁ, মেয়েটার জন্য যদি খুব মায়া হয়ে থাকে,—তা' মিছে কথা বলব কেন, আমারও খুবই মায়া হয়েছে,—তা হলে বরং ওর অন্য একটা ভাল ব্যবস্থা করে দেও।"

আহার শেষ হইল। আশুবাবু উঠিয়া পড়িলেন। তখনকার মতন প্রসঙ্গটা চাপা পড়িয়া গেল। (ক্রমশঃ)

আত্মপ্রাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৮

মাণিকের নয়নে বিশ্বের আলো নিভিয়া গেল। মহামায়ার স্নেহ-ভালবাসার স্নিগ্ধ সলিলে স্নাত হইয়া তাহার জীবন বিপুল বিশ্বের পরিচয় লাভ করিয়াছে, নব নব জ্ঞানরাজ্যের মধ্যে সে প্রাণের নব নব আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাইয়াছে। জগতের ইতিহাস পড়িয়া সে দেশকে ভালবাসিয়াছে।

মাণিক ক্ষুদ্র বালকের মত সারাদিন ধরিয়া খুব কাঁদিল।

সন্ধ্যাকালে রেণু আসিয়া মৃদুকণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়া ডাকিল, "মাণিক-দা, ওঠ।" মাণিক উঠিল না, নীরবে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

রেণু তাহার শিয়রে বসিয়া মাথার উপর একখানি হাত রাখিয়া কহিল, "মৃত্যুর ওপর মানুষের কি হাত আছে—বল? তুমি বুদ্ধিমান—জ্ঞানবান, তোমায় আমি কি বোঝাব?"

মাণিক আকুল কণ্ঠে বলিল, "রেণু, তোমরা কি জানবে—আমার কতখানি গেল। আমার সংসার আজ শূন্য হ'য়ে গেছে—ওরে কেউ এ-কথা বুঝবে না রে—কেউ এ-কথা বুঝবে না।"

রেণু স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "কেউ না বুঝুক—আমি জানি। তুমি জ্যাঠাইমার কি ছিলে ও জ্যাঠাইমা তোমার কতখানি ছিলেন, সে আমি জানি। কিন্তু উপায় কি? মৃত্যুর ওপর মানুষের হাত কি?"

মাণিক আরক্ত মুখ তুলিয়া বলিল, "রেণু, আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। আমার যে দম আটকে আসছে। আমি কালই চলে যাব।"

রেণু বলিল, "চলে যাবে? মায়ের শেষ কাজ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে না?"

মাণিক বলিল, "এখানে থাকলে আমি পাগল হ'য়ে যাব।"

রেণু কোমল স্বরে বলিল, "মা ত তোমায় দুঃখে অসহিষ্ণু ছোট ছেলেটি রেখে যান নি। ছি! মাণিক-দা, অমন ক'র না। মানুষ হ'য়ে জন্মেছ, বুকবাঁধতে শেখ। সংসারে এমন আঘাত ত কতই সইতে হবে। ভেঙে পড়লে পৌরুষ কোথায়?"

মাণিক সহসা উঠিয়া বসিল, স্থির কণ্ঠে কহিল, "ঠিক বলেছ, রেণু—সংসারে এলে আঘাতই খেতে হয়, ভেঙে পড়লে চলে না। এই প্রতিকূল অবস্থাকে ঠেলে ফেলে অগ্রসর হওয়াতেই জীবনের সার্থকতা। ভুলে গেছলাম—ভুলে গেছলাম।"

রেণু মাণিকের ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া তাহার পানে চাহিল।

মাণিক ম্লান হাসিয়া কহিল, "অবাক্ হয়ে দেখছ কি? আমায় পাগল মনে করছ? না, না, রেণু—সে জ্ঞান আমার আছে। কিন্তু বুকে আমার এতটুকু বল নেই। এ নির্ভরতা কতক্ষণ থাকবে, কে জানে?"

ক্ষান্তকালী কক্ষদ্বারে আসিয়া ডাকিলেন, "বৌমা।"

রেণু মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয়া সংযত হইয়া বসিল। কহিল, "কি মা?"

ক্ষান্তকালী—মাণিকের কাছে রেণুকে বসিতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন।

ঈষৎ তীব্র স্বরে কহিলেন, "আমি বলে কত মুল্লুক খুঁজে বেড়াচ্ছি, গেল কোথায়?—তুমি যে নিরিবিলিতে বসে গল্প ক'রছ,—তা কে জানে?"

রেণু কোমল অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "গল্প করিনি মা। মাণিক-দাকে বোঝাচ্ছিলাম।"

ক্ষান্তকালী ঝাঁজের সহিত কহিলেন, "ওই হ'ল,—একই কথা। বলে, 'যার নাম ভাজা চাল, তার নাম মুড়ি—!' কচি খোকা ত কেউ নয় যে বোঝাবার দরকার। এস—এদিকে এস,—সংসারে নানান্ কাজ পড়ে রয়েছে।"

রেণু প্রতিবাদের জন্য কি একটা কঠিন কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাণিকের পানে চাহিয়া আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইল ও ক্ষান্তকালীর অপেক্ষা না করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্ষান্তকালী কিন্তু নড়িলেন না। মাণিককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "সবই বুঝি বাছা, কিন্তু উপায় কি? বলে—আপনার মা-ই চলে গেলে লোকে বুক বেঁধে কাজকর্ম্ম করে,—খেয়ে খেলিয়ে বেড়ায়—এ ত—কে না কে? নল্লাটের নেখন কেউ কি খণ্ডাতে পারে, বাবা?"

কথাগুলিতে সমবেদনার মধুর চেয়ে—হুলের বিষটাই ছিল তীব্র। মাণিক কোন কথা কহিল না।

ক্ষান্তকালী কহিলেন, "তা বাবা, থাকছ ত শ্রাদ্ধ-শান্তি পর্য্যন্ত?" মাণিক ঘাড় নাড়িল।

ক্ষান্তকালী কহিলেন, "হাঁ, তা থাকবে বৈ কি! না হোক না, তবুও হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছিল। আহা! ছুঁড়ীর টানও ছিল খুব। ম'রত মাণিক মাণিক ক'রে। আমায় বল'ত, —হ্যাঁগা ঠাকুরঝি—মাণিক আমার আসবে ত? এত ক'রে মানুষ ক'রে শেষে ছোঁড়াটা আমার কথা ঠেলে চলে গেল? ধর্ম্ম কি নেই, ঠাকুরঝি?"

মাণিকের উঠিবার শক্তি ছিল না। দু' কান ভরিয়া এই তীব্র বিষাক্ত কথাগুলি পান করিতে লাগিল।

একটু থামিয়া ক্ষান্তকালী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমি বল্লাম,—ধর্ম্ম আছে বৈকি দিদি, আজও উপরে সূর্য্যি উঠছে—দিনরাত হচ্ছে। যদি সতী কন্যে হই ত দেখ—তোমার মাণিক তোমার কোলেই ফিরে আসবে। কেমন আসতে হ'ল কিনা?" বলিয়া তিনি সগর্ব্বে মাণিকের পানে চাহিলেন।

মাণিক চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষান্তকালী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখের কোলে আঁচলটা টানিয়া দিয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন, "তবে মিত্তুকালে একটা খারাপ কাজও সে ক'রে গেছে। আর তারই বা দোষ কি? পাঁচজনের লাগানি-ভাঙ্গানি, ফুসুর-ফাসুর—মানুষের মন ত বটে। দিলে বিষয়টা সব ওই ছুঁড়ীর নামে লিখে। আমরা কি কম বুঝিয়েছি,—এই বউ

ও-কাজ করিস না—অধর্ম্ম হবে। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।' তার বুদ্ধি বিগড়ে দিয়েছিল কিনা।"

এবার মাণিক উঠিয়া দাঁড়াইল। এই তীব্র হলাহল আর সে পান করিতে পারিল না।

ক্ষান্তকালী তাহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, "ওই বউ ছুঁড়ি—কম মিট্‌মিটে ডান নয়, বাবা। হ'ক না কেন নিজের বউ, যা হক, তা-ই ব'লব। ওই ত লাগিয়ে-ভাঙিয়ে নয়-নেত্য ক'রে দিলে। নৈলে তোমার পাওনা মারে কে? আবার বোঝান হ'চ্ছিল? বলে, মাছ ম'রেছে—বেড়াল কাঁদে সাঁতার পানি চোকে!"

মাণিক বাহির হইয়া গেল।

ক্ষান্তকালীর বিষাক্ত তীরটা বৃথা অপব্যয় হইল না।

মাণিক ভাবিতে লাগিল,—রেণু এমন? সামান্য বিষয়ের লোভে—না, না ইহা অসম্ভব। যতটুকু পরিচয় সে রেণুর পাইয়াছে—তাহাতে সন্দেহের ছায়ামাত্র মনে আসিতে পারে না।

মায়ের স্নেহ-পক্ষপুটের আড়ালে থাকিয়া সে এতকাল জগতকে চিনিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু মুখে হাসি—অন্তরে হলাহল, মানুষকে এমন স্বার্থপর সে ভাবিতে পারিল না।

সত্য বটে—ক্ষান্তকালীর কথার অন্তরালে বিকট নগ্নতা লইয়া স্বার্থের কদর্য্য মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে, তথাপি রেণু সম্বন্ধে এই চিন্তাও অসহ্য। বিষয় তাহার ছিল না—বিষয়ের প্রত্যাশীও সে নহে। অমন স্নেহময়ী মা-ই যখন চলিয়া গেলেন, তখন বিষয়-বিষ কণ্ঠে ধরিয়া কেন [illegible] জর্জ্জরিত হইবে? এই ভাল—এই ভাল। সর্ব্ববন্ধনমুক্ত [illegible]র্ব্বসমস্যা-মুক্ত চিন্তাশূন্য—উদ্বেগহীন—চিরশান্ত জীবন। সে আর এখানে থাকিবে না। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেলে—সে জন্মের মত এখান হইতে বিদায় লইবে।

দিন দুই পরে, দুপুর বেলায় মাণিক আপনার ঘরে শুইয়া ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে, রেণু আসিয়া তাহার মাথার নিকট দাঁড়াইয়া কোন ভূমিকা না করিয়া কহিল, "মাণিক-দা,—শুনলাম তুমি নাকি শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেলে আর একদণ্ডও এখানে থাকবে না?"

মাণিক শিরশ্চালনে সম্মতি জানাইল।

রেণু ক্ষুব্ধ হইল। মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল, "আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের শাস্তি কি এমনি [illegible] যাবে, মাণিক-দা?"

মাণিক সবিস্ময়ে বলিল, "কেন রেণু, তোমায় কি আমি আগেই বলিনি এখানে আর একদণ্ডও থাকতে পারছি না!"

রেণু কহিল, "তা বলেছ বটে, কিন্তু তুমি পুরুষ মানুষ কেন অমন অধীর হবে? সবাই বলবে—অমুকের জন্য আজ অমুক দেশত্যাগী হ'ল।"

রেণুর কণ্ঠস্বর অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হইয়া গেল। সে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বোধ করি নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

মাণিকের বিস্ময় বাড়িল। রেণু কাঁদে কেন? কে না জানে—অভিমানের বশে মহামায়া রেণুকে—কিন্তু থাক সে কথা।

কিয়ৎক্ষণ হতবিস্ময়ে রেণুর পানে চাহিয়া মাণিক সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "তোমার দোষ কি, রেণু? মা-র উইলের কথা কে না জানে!"

রেণু বলিল, "জানেন ত অনেকেই, কিন্তু সে জন্য বলতেও ত কেউ ছাড়ছেন না। দোহাই মাণিক-দা, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—জেঠাইমাকে আমি এ বিষয়ে একদিনের জন্য—"

মাণিক তাহার পা সরাইয়া লইয়া শান্তস্বরে কহিল, "ছি রেণু, তুমিও পাগল হ'লে! যে যাই বলুক না কেন, আমায়ও তুমি অতটা নীচ মনে কর?"

রেণু ত্রাস্তস্বরে বলিল, "দোহাই তোমার তা মনে ক'রে ও-কথা বলিনি। মাণিক-দা, তোমার দুটি হাতে ধ'রে অনুরোধ করছি—এখান থেকে এত শীঘ্র চলে যেও না। যদি দেশের সেবা করাই তোমার মনের ইচ্ছা হয় ত এই পাড়াগাঁয়ের উন্নতির জন্য প্রাণপণ কর।"

মাণিক কি বলিতে যাইতেছিল, রেণু বাধা দিয়া বলিল, "আপত্তি শুনব না। আমি মেয়েমানুষ, এ-সব জমিদারীর তত্ত্ব কি-ই বা বুঝি! বাবা ত কোন কিছুই চোখ তুলে দেখেন নি—দেখবেন-ও না। তুমি না থাকলে মা-র হাতে গড়া তালুক-মুলুক মা-র সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

মাণিক ধীরে ধীরে বলিল, "বেশ তাই হবে। মায়ার বাঁধনে তোরা এতও বাঁধতে পারিস—তাই ভাবি!" বলিয়া হাসিল।

রেণুও হাসিয়া উত্তর দিল, "সোনার শেকল তৈরী করতে দিইছি যে। মায়ার বাঁধনটা শক্ত না হ'লে, যে উড়ু উড়ু মন তোমার,—কোন্ দিন এই পল্‌কা সুতো ছিঁড়ে উধাও হ'য়ে যাবে।" বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেল—মাণিকের যাওয়া হইল না।

মাণিক দেখিল—সংসার যেমন চলিতেছিল—হয়ত তেমনই চলিবে। শোকসহ কালের প্রলেপে সকলেরই ব্যথা জুড়াইয়া যাইবে,—শুধু লোকচক্ষুর অন্তরালে তাকিয়া ও বই লইয়া যে মানুষটি চিরকাল আপনাকে গোপন করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহার মুখের হাসিটুকু তেমন উজ্জ্বল হইয়া আর ফুটিবে না। তাকিয়া ঠেস দিয়া—বই মুখে লইয়া তিনি পূর্ব্বের মতই নিঃশব্দে পাঠ করিয়া যান, কিন্তু সে মৃদু হাসিটুকু আর ওষ্ঠপ্রান্তে খেলিয়া যায় না! হিসাবের খাতা বন্ধ করিয়াছেন। পাশার আড্ডাও আর তেমন কোলাহল কলরবে জমিয়া ওঠে না। মাণিক কয়দিন পাঠরত নির্ব্বাক শোকদগ্ধ লোকটির পানে চাহিয়া চাহিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছে। অন্তর্ম্মুখী প্রচণ্ড ক্ষোভের গ্লানি দূর করিতে কি সান্ত্বনার বাণীই বা মানুষ উচ্চারণ করিতে পারে?

সেদিন জমিদারীর একটা শক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য মাণিক বাহিরের ঘরে আসিয়া ডাকিল, "জেঠামশাই।"

পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া সুরেনবাবু বলিলেন, "ব'স বাবা। কি বলবে?"

মাণিক বলিল, "নবীনপুরের চরের দখলী-স্বত্ব নিয়ে কিশোরগঞ্জের দত্তবাবুরা গোলযোগ তুলেছেন।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "ও-কথা আমায় কেন, বাবা? তুমি ত জান—ও-সব হাঙ্গামা কোন কালেই আমার সয় না।"

মাণিক বলিল, "তবু আপনি একবার দাঁড়ালে—"

সুরেনবাবু বলিলেন, "তোমার গেলেই চলবে। দাঙ্গা-ফ্যাসাদ ক'র না। মিষ্টি কথায় মিটমাট ক'রে নিও।'

মাণিক বলিল, "তারা অন্যায় ক'রে দখল ক'রতে চায়।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "তবে মিটিয়ে নাওগে, না হয় কিছু লোকসান হবে।"

মাণিক বুঝিল, ইঁহার কাছে পরামর্শ লইতে আসা বৃথা।

সে উঠিয়া আসিতেছিল, সুরেনবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না-ত, মাণিক?"

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।"

তিনি বলিলেন, "যে মা লক্ষ্মী ঘরে আছেন, তাঁর ব্যবস্থায় কা'রও কোন কষ্ট হবার কথা নয়। ভেবেছিলাম সে চলে গেলে—" বলিয়া অসম্পূর্ণ কথার উপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন।

মাণিক বলিল, "তাই বলছিলাম বাইরের কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকলে অনেকটা অন্যমনস্ক থাকতে পারেন।"

ম্লান হাসিয়া সুরেনবাবু বলিলেন, "ভুলে ত গেছিই। কিন্তু যত কাজ নিয়ে মেতে থাকি না কেন, মন কিছুতেই বোঝে না। মনের ফাঁক কাজে ভরে না।"

মাণিক দেখিল—তিনি তাড়াতাড়ি অশ্রু গোপন করিতে বইখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

আর কোন কথা না বলিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

(৯)

মাণিককে বাঁধিবার জন্য, রেণু বলিয়াছিল,—সোনার শিকল তৈয়ারী করিতে দিবে। এতবড় সংসারের ভার মাথায় লইয়া রেণু সে কথা ভুলিতে পারে নাই। যাযাবর প্রকৃতির মানুষটিকে বাঁধিবার জন্য রেণু একটু বিশেষ অনুসন্ধানই করিল এবং বিশেষ রকমের আয়োজন করিল।

রেণুর ছোট বোন মিনা—দেখিতে সে পরমাসুন্দরী। একবার মনে হইল, তাহারই সঙ্গে বিবাহ দিলে মাণিক সুখী হইবে। পরক্ষণে ভাবিল, না থাক। এই সম্বন্ধে কোথায় যেন স্বার্থের এতটুকু গন্ধ লুকাইয়া আছে। লোকের বল্গাহীন রসনা পিতৃকুলের দারিদ্র্যের ইঙ্গিত করিয়া অবাধে ছুটিয়া যাইবে। রেণুর অন্তরে তা বড়ই বাজিবে।

বরং সরমা পিসীর মেয়ে অনীতা দেখিতে আরও চমৎকার। বিবাহে সাধ-আহ্লাদও হইবে। একদিন মেয়েটিকে আনিয়া মাণিক-দার মনোভাব বুঝিয়া লওয়ার যা অপেক্ষা! অনীতাকে দেখিলে তাঁহার অপছন্দ না হওয়াই সম্ভব। ভাবী বিবাহের সুখ-কল্পনাজালে রেণু বেশ একটু বিভোর হইয়া পড়িল।

মদন কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল। বৈকালিক চা-পানের সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ায় স্ত্রীকে কর্কশকণ্ঠে বলিল, "বসে বসে ভাবনা হচ্ছে কেন? চা দিতে হবে না?"

রেণু বিনা বাক্যব্যয়ে চা আনিতে গেল।

মদন আপন মনে বলিল, "দাঁড়াও তোমার ভাবনা ঘুচুচ্ছি। আমি যেন ঘাস খাই, বুঝতে পারি না! ছোঁড়া ত চলে যাচ্ছিল —মাথার দিব্যি দিয়ে তাকে রাখা কেন? কেনরে বাপু—তোর এত দরদ কিসের?"

রেণু চা লইয়া ফিরিল। পেয়ালায় দুধ চিনি মিশাইতে মিশাইতে বলিল, "আর চিনি দেব?"

মদন চুমুক দিয়া কহিল, "না।" পরে একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁগা ওটা এখনও কেন প'ড়ে রয়েছে?"

রেণু চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "কৈ, কোথায় কি প'ড়ে আছে?"

মদনের হাসির মাত্রা বাড়িল। বলিল, "এখানে নয়, এখানে নয়। ভেবেছিলাম আঁতের টান—কথাটা পাড়বামাত্রই বুঝে নেবে! ওই মাণিকটার কথা বলছি।

রেণুর মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তীব্র কটাক্ষে মদনের পানে চাহিয়া বলিল, "কেন, ওঁর এখানে থাকবার অধিকার নেই কি?"

মদন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "অধিকার? নেই আবার! পরের গলগ্রহ হ'য়ে দু'বেলা অন্নধ্বংস ও অবসর কালে আদরের বোনের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব,—অধিকার নেই আবার! বাপরে! এমন কথা কি বলা যায়?"

এই শ্লেষ ও কটূক্তিতে রেণুর মুখ-চোখ গরম হইয়া উঠিল। সে তীব্র স্বরেই বলিল,—"তোমার বোধ হয় মনে নেই উনি এখানে থাকলে সমস্ত বিষয় হ'ত ওঁর।"

মদন কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "সে-ত আমি জানি। আবার তুমি ভোগা দিয়ে না নিলে এই শর্ম্মারামই হ'তেন একচ্ছত্র অধিকারী।"

রেণু বলিল, "আমি ভোগা দিয়ে নিয়েছি—বিষয়?"

মদন বলিল, "মিলিটারী নয়—আস্তে। যে যার অদৃষ্টে ক'রে খায় বাবা। নইলে আশ্চর্য্যের কথা, মাণিক—কোথাকার কে না কে, তার বিষয় পাওয়াটাই তোমার চক্ষে সম্ভব হ'ল, আর আমি—সম্পর্ক ত একটা ছিল, আমি যে বিষয় পেতে পারতাম সেকথা ভুলেও একবার বললে না! বলি, তুমি যে মাঝখান থেকে উড়ে এসে জুড়ে ব'সে আজ ক্ষুদে গিন্নীটি হ'য়েছ,—সে কার জোরে?"

রেণুর মুখ মুহূর্ত্তে পাংশু হইয়া গেল। সে অবনত মুখে ভাবিতে লাগিল—ঠিক কথা। তাহার এখানকার কর্ত্তৃত্ব—মদনের সম্পর্কিত বলিয়া। মদনের স্ত্রী সে, তাই গৃহের গৃহলক্ষ্মী, তাই বিপুল বিষয়ের অধিকারিণী!

মহামায়া কেন এ জঞ্জাল তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া গেলেন মদনকে যদি তিনি এবিষয় দান করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে রেণুকে এত জ্বালা সহিতে হইত না। কে জানে, কি ভাবিয়া মহামায়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন।

আজ তিনি নাই, তাঁহার শেষ আদেশ আছে '—গৃহ লক্ষ্মীর কর্ত্তব্য কোনদিন বিস্মৃত হ'ও না মা'

না, রেণু সে আদেশ মাথা পাতিয়া লইয়াছে—মাথা রাখিবে। ইঁহারা কথার চাবুকে তাহার মর্ম্ম যতই ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিন না কেন, তাহার কর্ত্তব্য সে ভুলিবে না।

মদন বলিল, "বুঝেছ ত বাবা,—খুঁটার জোরে মেড়া লড়ে আমাকে এত হেনস্তা করা তোমার উচিত কি?"

রেণু কোমলকণ্ঠে কহিল, "তোমায় হেনস্তা করি দোহাই তোমার ও-কথা ব'লে আমায় দুঃখু দিও না।"

মদন মনে মনে খুসী হইয়া বলিল, "আচ্ছা দুঃখু না হয় দেব না। কিন্তু তোমার উচিত আমার মুখের পানে চাওয়া' যাতে আমার দুঃখু না হয় তার উপায় করা।"

রেণু কুণ্ঠিত অসহায় দৃষ্টিতে মদনের পানে চাহিল।

মদন বলিল, "অমন ক'রে চেয়ো না—আমার কষ্ট হয়। তবে শোন সত্যি কথা, ওই মাণ্‌কেটার জন্যে আমায় নানান্ কথা শুনতে হয়—পাঁচজনের কাছে। লোকে তোমার নামে কত কি বলে, আমি স্বামী, আমার বুকখানা তাতে দশহাত হ'য়ে ওঠে না,—বুঝেছ?"

রেণুর কোমলতা সেই মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। রুদ্ধকণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "লোকে কি বলে না বলে তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার কি!"

মদন বলিল, "তা কি হয়, লোক নিয়ে যে সমাজ! জান ত, শ্রীরামচন্দ্র প্রজাপালনের জন্য সীতাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রেছিলেন?"

রেণু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সীতাকে ত্যাগ করাটাই বুঝি আদর্শ হ'য়ে রইল! তাই সেই আদর্শ আজ আমাদের বাঙলা সমাজ মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছে, নয়?"

মদন রেণুর শ্লেষটুকু বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "আদর্শ যা তা নিতেই হবে। এতেই ত বাঙলার গৌরব।"

রেণু হাসি চাপিয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে যাইতেছিল, বাঙালী স্ত্রী ত্যাগ করিয়া মহান্ আদর্শের দোহাই দিবে ইহা আর নূতনই বা কি? হায় রামচন্দ্র! কি মহান্ আদর্শই তুমি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলে!

কিন্তু সে কথা বলিল না।

মদন বলিল, "আমি তোমার স্বামী, তোমার ভালর জন্যই বলছি।"

কাহার ভালর জন্য এই উপদেশ সে মর্ম্ম রেণু ভাল করিয়াই জানিত। সুতরাং তর্ক না তুলিয়া চায়ের পেয়ালাটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মদন মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া একটা সিগারেট ধরাইল ও তাহাতে প্রবলভাবে টান মারিয়া কক্ষমধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে মাণিক কক্ষমধ্যে শুইয়াছিল। রেণু প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে বলিল, "দেখ দেখি মাণিক-দা একে চিনতে পার?" বলিয়া দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মানা অবনতমুখী এক তরুণীকে টানিতে টানিতে মাণিকের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইল।

মাণিক বুঝিতে পারিল না, এ মেয়েটিকে চেনাইবার জন্য রেণুর এত আগ্রহ কেন? হয়ত বা বাল্যের কোন ক্রীড়াসঙ্গিনী হইবে—রেণুর সখী। রেণু স্ত্রী জাতি-স্বভাবসুলভ কৌতূহল চরিতার্থ করিতে মাণিককে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে—, ইহাকে চেনে কি না?

মাণিক তাহার পানে চাহিল।

সুন্দরী কিশোরীর [illegible] মুখখানিতে বালিকাসুলভ মাধুর্য্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। চোখ দুটি হয় ত লীলা-চঞ্চল এবং আয়ত। কিন্তু মুদিত থাকায় কিছু বুঝা যায় না। অঙ্গে ধূপছায়া রঙের শাড়ীখানি মানাইয়াছে চমৎকার। চুলগুলি এলো করিয়া বাঁধা। সর্ব্বশুদ্ধ মিলাইয়া একটা কমনীয়তা ও শান্তশ্রী সারা দেহের উপরে লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

রেণু হাসিয়া বলিল, "অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখছ কি? চিনতে পারলে না, ও অনীতা।"

তথাপি মাণিকের বিস্ময়ের ভাব কাটিল না দেখিয়া রেণু বলিল, "তা কেন চিনতে পারবে? ভুলে যেতে তোমাদের জুড়ি ত দুটি নেই।"

মাণিক অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল, উত্তর দিল না।

ভাবিল—বর্ষার নদীর মত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যাহাদের রূপের পরিবর্ত্তন হয়, তাহাদের চিনিয়া লওয়া কি এতই সহজ! দুই বছর পূর্ব্বের রেণু হইতে আজিকার রেণুর তফাৎ অনেক।

রেণু অনীতার পানে ফিরিয়া কহিল, "নে লজ্জা রাখ, আর বড়াই-বুড়ী সেজে ঘেমে উঠিস নে। বলে ছেলেবেলায় ওর সামনে কত লাফালাফি ছুটোছুটি করেছিস, এখন ওকে দেখে আবার লজ্জা!"

মাণিক মনে মনে বলিল,—"এই লজ্জা কয়েক মাস পূর্ব্বে তোমারও দেখিয়া গিয়াছিলাম।"

বয়সের তুলনায় মেয়েটি রেণুর অপেক্ষা অনেক ছোট হইবে। রেণুও তরুণী, তথাপি বয়সের তুলনায় বিজ্ঞতায় রেণু অনেক বাড়িয়াছে। রেণু এই সংসারের শাসন কর্ত্তৃত্বভার হাতে পাইয়া এক নিমিষে কুমারী হইতে গৃহিণী হইয়াছে এই গৃহলক্ষ্মী সাজিবার সাধ বুঝি মেয়েদের মজ্জাগত সংস্কার।

লজ্জা ভাঙিল—কথাও চলিল। কিন্তু মাণিক বাল্য-কালের আলাপের সূত্র টানিয়া সহজভাবে হাস্য পরিহাস করিতে পারিল না। রেণুর কথায় কোনমতে সায় দিয়া গেল মাত্র।

কিছুক্ষণ পরে অনীতা চলিয়া গেলে—রেণু বলিল, "মাণিক-দা, তুমি বড় লাজুক।"

মাণিক কহিল, "কেন রে?"

—"কেন? অনীতার সামনে ভাল ক'রে মুখ তুলে কথাই কইতে পারলে না! ওকি বাঘ, না ভালুক যে—"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "ও মানুষ—তা জানি। তোর দাদাটি বাঘ ভালুককে তত ডরায় না, রেণু—যত ডরায় মানুষকে।"

রেণু বলিল, "মানুষের সম্বন্ধে এ ধারণা তোমার কতদিন থেকে হ'য়েছে, মাণিক-দা?"

মাণিক বলিল, "মানুষ যতদিন থেকে আত্মচিন্তা ছেড়ে পরোপকারে মন দিয়েছে।"

রেণুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। প্রচ্ছন্ন পরিহাসটুকু বুঝিতে তাহার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। তৎক্ষণাৎ সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া ধীরস্বরে উত্তর দিল, "বোধ হয় স্বীকার করবে—পরোপকার মহৎ প্রবৃত্তি?"

মাণিক বলিল, "সময় ও অবস্থা বিশেষে—সঙ্কটজনক। জান রেণু, আজও দু'মাস যায় নি,—মায়ের স্মৃতি এখনও জীবন্ত হ'য়ে আমার সমস্ত সত্তাকে অভিভূত ক'রে রেখেছে। এ সময়ে জোর ক'রে যদি হাসি-তামাসা করতে' যাই,—চোখ ফেটে জল আপনি আসে।" বাক্যশেষে মাণিকের দুটি নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

রেণু অপ্রতিভ হইয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "আমায় মাপ কর—মাণিকদা, বুঝতে পারিনি। কিন্তু দোহাই তোমার,—একটা কথা বল—সংসারে বাস ক'রে শুধু স্মৃতির ধ্যান ক'রলে মানুষের জীবন কি দুর্ভর হ'য়ে ওঠে না? আমি মুখ্যু—মেয়েমানুষ—তবু জানি,—জন্ম হ'লেই মৃত্যু আছে। কিন্তু মৃত্যু আছে বলে কি সদাসর্ব্বদা তাকে সামনে রেখে ভয়ে শোকে পথ চলতে হবে?"

মাণিক বলিল," না রেণু—সে ভয় আমি করি না। জীবনের মমতা যে ভয় অনুক্ষণ মনে জাগায়—তা মৃত্যুরই এক রূপ, তার স্মৃতি ধ্যান—মৃত্যুরই নামান্তর। জীবনের বৈচিত্র্য যেমন শোকের ব্যথা ভুলিয়ে দেয়, তেমনি মানুষের সহজাত বিবেক শোকের চিতায় সুখের আলো জ্বালতে নিষেধ করে।"

রেণু বলিল, "তোমার শোক অন্যের মনেও ত বাজতে পারে। তারা যদি মন না বোঝাতে পেরে কোন শুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রে বসে,—তা কি ক্ষমার যোগ্য নয়?"

মাণিক বিষণ্ন মুখে বলিল, "রেণু,—আমার কথা তুমি ঠিক বুঝলে না। আমি তোমার দোষ দিচ্ছি না। তুমি যা করছ তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক,—হয়ত স্নেহবশেই করছ। কিন্তু—আমি—আমায় মাপ কর।"

রেণু আগ্রহভরে বলিল, "না, বল। তোমার কাছ থেকে আমি স্পষ্ট উত্তর শুনতে চাই, কেন তুমি সংসার পাততে চাও না?"

মাণিকের মনের মধ্যে বিদ্যুৎশিহরণ খেলিয়া গেল। এ 'কেন'র উত্তর দেওয়া যে চলে না। এ কেন'র উত্তরে যে অনেক কিছুই বলা যায়,—কিন্তু আজ সে সকলের কোন প্রয়োজন নাই।

রেণুর এই স্বভাবজাত স্নেহ-মমতা কি নারী-প্রকৃতির ছায়া মাত্র? অথবা যে চিন্তা সূক্ষ্মতন্তুজালে মাণিকের সারাচিত্ত পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, রেণুর ব্যগ্রতার মূলেও সেই অনুভূতি?

মনে পড়ে,—সেই সন্ধ্যার ম্লানান্ধকারে নদীতীরে একাকিনী রেণু,—মনে পড়ে, চা পরিবেষণে হাস্যচটুলা—অভি-মানিনী রেণু!—মনে পড়ে, মহামায়ার গোপন ইচ্ছা, মনে জাগে,—যৌবন-স্বপ্নের বিলীয়মান ছায়া অবশেষ! আরও কত কি আশা আলোর ইন্দ্রধনু সপ্তবর্ণ বিকাশে মনের বর্ণ-সুষমায় ভরিয়া তুলিয়াছিল। এ সকলের এক বর্ণও যে ভোলা যায় না।

মাণিকের সারাচিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিলেও কথায় এতটুকু উত্তেজনা ধরা পড়িল। সম্ভব নয়। জগতের কাউকে যে কথা বলতে পারি না, তোমায় তা পারি। তবু—এ 'কেন'র উত্তর তোমায়ও আমি দিতে পারব না।"

রেণুর মুখে কয়েকটি দৃঢ় রেখা ফুটিয়া উঠিল। দৃঢ় অচঞ্চল স্বরে সে বলিল, "আমায় তুমি এতটা বুদ্ধিহীন মনে কর না, মাণিকদা। কিন্তু, ছি! তুমি এমন!" বাক্যশেষে সে আর ক্ষণমাত্র সেখানে দাঁড়াইল না।

মাণিক মূঢ়ের মত স্তম্ভিত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার গমনপথের পানে চাহিয়া রহিল। পরে ক্ষুদ্র বালকের মত বালিশে মুখ গুঁজিয়া অশ্রুরুদ্ধ অস্ফুট স্বরে বলিল, "ভুল বুঝে গেলে, রেণু—আমায় ভুল বুঝে গেলে। জানি না, এ আমার দুর্ব্বলতা কিনা—কিন্তু আমি পশু নই—আমার দুর্ব্বল মনের এইমাত্র অপরাধ—তোমায় ভুলতে পারি নি—ভুলতে পারব না।"

কয়েকদিন সে রেণুকে এড়াইয়া চলিল। দিনের আলোয় সে কথাগুলি যেন শব্দ-মুখর হইয়া তাহাকে রূঢ় ভর্ৎসনা করিতেছে। রেণুকে একথা বলিবার অধিকার একদিন হয়ত তাহার ছিল,—আজ আর নাই। আজ রেণু এখানকার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—দেবী। বিস্তীর্ণ জমিদারীর অসংখ্য প্রজা—তার স্নেহচ্ছায়া প্রত্যাশী সন্তান। পতির আদরিণী—সোহাগিনী—অর্দ্ধাঙ্গিনী সে। কি অধিকার মাণিকের সে কথা জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ করিবার?

নিষ্পাপ রেণু জানে না,—অতিথি তাহার দয়ার দান লইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সে ত আশ্রয় ছাড়িতে চাহিয়াছিল,—রেণু কেন অনুরোধের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিল? রেণুর মহত্ত্ব সন্দেহ নাই।—কিন্তু সে—?

সহসা রেণু আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ভাবছ, কবে এখান থেকে চলে যাবে, নয়?"

রেণু কি অন্তর্য্যামিনী! মাণিক চমকিত হইয়া কহিল, "আমার যাওয়াই উচিত নয় কি, রেণু?"

রেণু সব্যঙ্গে কহিল, "উচিত বৈকি। তোমরা পুরুষ মানুষ, কেন এক জায়গায় বদ্ধ হয়ে থাকবে? আর পর-প্রত্যাশী হয়ে থাকাও যে পৌরুষের অবমাননাকর।"

মাণিক সে কথার উত্তর না দিয়া অবনত মুখে কহিল, "নবীনপুরের চরের ব্যাপারটা তোমায় তাহ'লে খুলে বলি—।"

রেণু সপরিহাসে কহিল, "চার্জ্জ বুঝিয়ে দিচ্ছ বুঝি?"

মাণিক মুখ তুলিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "তোমার যদি আঘাত ক'রবার ইচ্ছেই থাকে, রেণু—সোজাসুজি আঘাত কর। অমন পরিহাসের কথা দিয়ে আমায় মের না।"

রেণুর মুখ মুহূর্ত্তে কালি হইয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে সে কহিল, "তোমায় আমি আঘাত দিচ্ছি, মাণিকদা? একথা তুমি ভাবতেও পারলে? অথচ দুদিন আগে—"

মাণিক সাহস করিয়া আর মুখ তুলিতে পারিল না। রেণুর অর্দ্ধসমাপ্ত কম্পিত কথার সুরে বুঝিল—ব্যথা সেও কম পায় নাই।

এই অশ্রুময় করুণ মুহূর্ত্তগুলি মানুষের দুর্ব্বলতাকে অন্তরের অন্তস্থল হইতে টানিয়া আনিয়া—অশ্রুতে—ভাষাতে

(শেষাংশ ৫৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যত মত তত পথ

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

"আজ্ঞে, দেবদূত ত আমি আঁকতে পারব না! জীবনে কোন দিন আমি দেবদূত দেখিনি—আর যা আমি দেখিনি, তা কেমন করে আঁকব, বলুন?"

কথাগুলি বলেছিলেন গুস্তভ কুর্ব্বে। ফ্রান্সের এক ধনী ব্যক্তি নতুন আঁকা ছবি দিয়ে একটি গির্জ্জা সাজাবার মানসে কুর্ব্বেকে নিযুক্ত করবার সময় দেবদূত সম্বন্ধে একটা ফরমাস দিয়েছিলেন। শিল্পীর ঐ স্পষ্ট ও নির্ভীক উত্তর কেবল সেই মহাজনটিকে নয়, সমগ্র ফরাসী জনসমাজকে সেদিন বিস্মিত করে দিয়েছিল।

বিস্ময়ের কারণ ছিল। দেবদূত কে আঁকেনি? প্রায় ...য় শত বৎসর ধরে ইউরোপের ধর্ম্মানুপ্রেরিত চিত্র শিল্প ...র্চ্চা-এর আশ্রয়েই পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়েছে। ত্রয়োদশ ...তাব্দীর শেষ থেকে গিওটো, এঞ্জেলিকো, বটিচেলি প্রভৃতির ...তিভা-দীপ্ত নব্য ইউরোপীয় শিল্পকলায় ম্যাডোনা, চাইল্ড, ...বার 'এঞ্জেল' চিত্রবস্তুরূপে প্রায় প্রথম স্থান অধিকার করে ...াছে। নব নব শিল্পরীতি দেশ ও কালের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ...েখা দিয়েছে। শিল্পবোধের প্রেরণায় নবীন শিল্পী যেমন ...ূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুকরণ ও অনুসরণে সেই জননী, শিশু ও ...েবদূত এঁকে ধীরে ধীরে শক্তির পরীক্ষা দিয়েছেন—প্রতিভা-...বিরাটেরা তেমন ঐ এক বিষয়বস্তু নিয়ে শিল্পশক্তির চরম ...কাশ দেখিয়েছেন। লিওনার্দো দ্য ভিন্সি, মাইকেল ...েঞ্জেলো, রাফায়েল, করেজিও, টিটিয়ান একের পর এক ...িল্পের পুতভূমিতে এসে রূপের আরতি করেছেন আর ...রসুন্দরের দ্বারপ্রান্তে যেন এক একটি পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে ...েয়েছেন। যে অপরূপ লাবণ্যে তাঁরা দেবদূত এঁকেছেন ...াজ তাই ত কোটি কোটি মানুষের বিস্ময়।

দেবদূতের চিত্র রচনায় তাঁদের যে কোন বাধা ছিল না, ...া কি তাঁরা দেবদূত দেখেছিলেন বলে? যুগ যুগ ধরে ...উরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্পীরা যে দেবদূতের ছবি ...াঁকল, তাঁরাও কি তার দেখা পেয়েছিল? কুর্ব্বের সম-...ময়িক ইংলণ্ডের রাফায়েল-পূর্ব্ববর্ত্তীরাও ত দেবদূতের ...ত্র রচনা করেছেন। সকলেই যাকে দেখতে পায়, নিজ নিজ ...ক্তি দিয়ে যাকে মোহন সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলে, বেচারী ...র্ব্বেই কি একা সেই দর্শন শক্তি বঞ্চিত!

কিন্তু কুর্ব্বের সেই উত্তরের মধ্যে বঞ্চনার, ক্ষোভের কোন ...ান নেই। যদি কিছু স্পষ্ট হয়ে থাকে সে কথার মধ্যে তা ...চ্ছ বিরুদ্ধ-বাদ, বিদ্রোহ। ভাবের জঞ্জাল যে ভাবালুতা, ...বের ঘরে চুরি যে অনুকরণ প্রিয়তা, লোকরঞ্জনী প্রাচীন ...থার যে চিরানুবৃত্তি—এই সকলের বিরুদ্ধে ঊনবিংশ ...তাব্দীতে বিপ্লব-আলোড়িত ফরাসী দেশে একটি বিশেষ ...নাভাব ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল। বিপ্লব ও যুদ্ধ ...নেক আশ্রয়ই নষ্ট করেছে, অনেক সুখ-নীড়ের সঙ্গে বহু ...পের বাসা। নবজাগ্রত জাতি আপনাকে সন্ধান করে নিয়ন্ত্রিত করছিল, কোথাও বা বুদ্ধি নিয়োজিত চেষ্টায় কোথাও বা মানসাবেগের ছন্দে।

যে নবীন প্রভাতে কুর্ব্বে জেগে উঠলেন তারই প্রভাতী গেয়েছেন গেরিকাউল ও দেলাক্রয়্। ঋজু দৃষ্টি ও ভাবাবেগের সবল অকুণ্ঠ প্রকাশের রীতি প্রবর্ত্তনের গৌরব এই দুই শিল্পীর।*

অবস্থাপন্ন কৃষকের সন্তান কুর্ব্বে জন্মেছিলেন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। পিতার ইচ্ছা ছিল তিনি আইনজ্ঞ হয়ে পরিবারের মান ও অর্থ দুইই বৃদ্ধি করেন। কিন্তু প্যারিসে এসে কুর্ব্বে অনন্যমনে শিল্পচর্চ্চা করতে লাগলেন। ঋজু দৃষ্টি প্রীতি ক্রমে তাঁকে দর্শনকে নির্ব্বিশেষ বলে জানাতে শেখাল। বস্তুকে চোখে যা দেখা যায় তার বেশী সে বস্তুতে আরোপ করবার যেমন কোন প্রয়োজন নেই; ভাবাবেগের প্রশ্রয়ে অদৃষ্ট ও কল্পিত দৃশ্যাবলীর স্থানও শিল্পে না হওয়াই বিধেয়, কুর্ব্বের এই হ'ল ধারণা। বাস্তব জীবনের অপূর্ব্ব সমারোহ ও দুর্ভর বেদনাকে বাদ দিয়ে কল্পলোককে আশ্রয় করে যে শিল্প গড়ে ওঠে, কুর্ব্বের তাতে ছিল বিরাগ। কুর্ব্বের পূর্ব্বোক্ত উত্তরে কাল্পনিক চিত্রের বিরুদ্ধে এই বিরাগ ও প্রচলিত পন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জীবনকে তিনি সমগ্রভাবে জানতে চেয়েছিলেন এবং সংসার যে ভাবে তাঁর চোখে ধরা দিয়েছে তিনি তাকে সেইরূপেই বিকশিত করবার চেষ্টা করেছেন। বিরাট প্রতিভার চোখে যে রূপ স্পষ্ট, সাধারণে তার আভাস পায় কিনা সন্দেহ। অলোকসম্ভব মূর্ত্তির পরিচয় হয়ত প্রকৃত শিল্পীর মানস-পটে আপন লিখন রাখে। কেবল নিপুণত্বের অধিকারী যে পটুয়া সে কেমন করে সে পরিচয় পাবে। কাজেই যখন ফরমাস আসে, সে অনুসরণ করে, অনুকরণ করে। কুর্ব্বে এই অনুকরণের বিরুদ্ধেই সবল প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ঐতিহ্যকে তিনি স্বীকার করতেন ততটুকু তাঁর শক্তির বিকাশের পূর্ব্বে যতটুকু দরকার। পূর্ব্ব সূরিরা যা করে গিয়েছেন সেইটাই যে শেষ কথা বা তাঁদের কর্ম্মই যে মানব-শক্তির চরম বিকাশ, এ কথা স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। অপরদিকে বিদ্রোহের ও বিপ্লবের ক্রোড়ে লালিত কুর্ব্বে অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগকেও সমাজ গঠনের পরিণতি বলে মানতে দ্বিধা করতেন। তিনি স্থান দিতে চেয়েছিলেন মানুষকে সবাইয়ের উপরে। সেকথা অবশ্য গোপন রইল না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁর দুইখানি চিত্র স্যালন প্রদর্শনীতে "সাংঘাতিকরূপে সমাজতান্ত্রিক" বলে বহু লোকের সন্দেহ জাগাল।

কুর্ব্বের এই জন-কেন্দ্রিক দৃষ্টি তাঁকে যুদ্ধের চিত্রে বিজয়ী রাজার জয়যাত্রা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেনি, আহত সৈনিকের কাতরতা প্রকাশেই ব্যস্ত রাখত। পথের ধারে

---

*'দেশ' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রবন্ধে এঁদের সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। 'বিদ্রোহী শিল্পী' অভিধায়

নৈসর্গিক শোভার পরিবর্ত্তে পাথর-ভাঙ্গা মজুরের অমানুষিক পরিশ্রমের দুঃখই তাঁকে বিচলিত করত।

মত যেখানে সত্য, পথ সেখানে অদুর্লভ কারণ এ মতের জন্ম মননের সমগ্রতায়, বোধের একাগ্রতায়। চলার বেগে পায়ের তলায়' তাই পথ জাগে। মতের অধিকারী কেবল সেই জন, আত্মশক্তিতে যার বিশ্বাস অগাধ। কূর্ব্বে বলতেন 'চিত্র প্রদর্শনী ও সরকারী চিত্রশালা বিশ বৎসরের জন্য বন্ধ রাখা উচিত, তা' হলে আধুনিক শিল্পীরা নিজের চোখে দেখতে শিখবে।'

কূর্ব্বের এই নব্য রীতি, এই বস্তুগত্যা তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন শিল্পীকে যেমন আপন আপন পথে চলবার প্রেরণা দিয়েছিল; প্রাচীনপন্থী সমালোচক শ্রেণীর মধ্যেও তেমন বিরাগের ঢেউ তুলেছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্যালন্ প্রদর্শনীতে একটি চিত্রের জন্য পদক পুরস্কার লাভ করেন। এ পদকের বিশেষত্ব এই যে বিনা নির্ব্বাচনে পদকধারী প্রতি বৎসর স্যালনে চিত্র প্রদর্শনের অব্যাহত অধিকার লাভ করেন। কূর্ব্বের এই অধিকার খর্ব্ব করবার উপায় স্যালনের কর্ত্তাদের হাতে ছিল না অথচ তাঁর নির্ম্মম বাস্তবপন্থা অনেকের পীড়ার কারণ হয়েছিল। এ সম্বন্ধে একটি হাসির গল্প প্রচলিত আছে। কূর্ব্বে যথারীতি প্রদর্শনীতে ছবি দিয়েছেন, যথাস্থানে তাকে রাখা হয়েছে, কিন্তু স্যালনের কর্ত্তাদের তা আদৌ মনঃপূত হয় নি, না বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে না রচনা রীতির দিক দিয়ে। একজন বিখ্যাত সমালোচক তাই রাগ ও বিরক্তিভরে বলে উঠলেন "Gentlemen let us forget that he exists." (অর্থাৎ তার অস্তিত্বই আমরা ভুলে যাই চলুন)।

প্রাচীন-পন্থীরা যেমন করে এই দুর্ব্বার শিল্পীর অস্তিত্ব অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছেন তারও চেয়ে কূর্ব্বের প্রতিবাদ সবল ও দৃপ্ত। কূর্ব্বের শক্তি ও শিল্প প্রতিভাকে সম্মান না করে উপায় ছিল না, কিন্তু বিদ্রোহী কূর্ব্বে অবলীলায় রাজদত্ত সম্মান "Chevalier of the Legion of Honour" প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কিন্তু ঋজু দৃষ্টি বলিষ্ঠ [illegible] জন[illegible] ও শিল্প-কর্ম্মে পরম নিপুণতা সত্ত্বেও কূর্ব্বে না নিজকালে না বর্ত্তমান যুগে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। বর্ত্তমান কালের অনেক চিত্র-রসিকও কূর্ব্বের উপর প্রীত নন। তাঁর দৃষ্টির তীব্রতা, আত্মবিশ্বাসের রূঢ়তা যেন তাঁর শিল্পকর্ম্মের ত্রুটি, অনেকের এই ধারণা'

একজন আধুনিক শিল্প সমালোচকের মতে "Courbet had no nobility like that of Millet, to ennoble by his point of view the sordidness, the ugliness of labour and of poverty; no gentleness like Corot's, no gaiety like that of Diaz, only a relentlessly all-seeing eye, and the hand of an instinctive painter, to set down what he saw.

কূর্ব্বের সমসাময়িক চিত্রকরগণের সঙ্গে তুলনা ক'রে সমালোচক যে মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সমালোচক কূর্ব্বের শিল্পকর্ম্মে কৃতিত্ব দ্বিধালেশহীনভাবে স্বীকার করেছেন। শিল্পের শেষ বিচার শিল্পীর অভিলাষ দিয়ে। কূর্ব্বে সেদিনকার সাধারণ কর্ম্ম-জীবনের জঘন্যতা উদ্ঘাটন করতে চেয়েছিলেন। সামান্য অন্ন আহরণের জন্য দারুণ পরিশ্রমের যে গ্লানি, অনাকাঙ্ক্ষিত দারিদ্র্যের যে ক্লিন্ন সর্ব্বরিক্ততা তার সবটুকুই নির্ম্মম তুলিকা-পাতে তিনি বর্ণে ও রেখায় দীপ্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন—এ সাধনায় কূর্ব্বের সার্থকতা কি কেউ অস্বীকার করবেন?

তবে কূর্ব্বে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেননি তার কারণ মনে হয় যে জীবনের দীনতাকে কেউ ভাল করে দেখতে চায় না। মোহের অঞ্জন দিয়ে, ভাবের আবেশে ঢেকে তার রূঢ়তাকে কোমল করে আনতে চায়, রিক্ততার উপরে বৈরাগ্যের ছিন্ন উত্তরীয় ঝুলিয়ে দৈন্যের হীনতাকে ঢাকবার প্রয়াস করে। বাস্তব অনিবার্যরূপে রূঢ়-ভাবলেশহীন নিদারুণ বস্তুগত্যা সেইজন্য মানুষের মনে আঘাত করে। কূর্ব্বের রুক্ষ্ম বাস্তবতা থেকে তাই সে যুগের মানুষ মিলেটের ভাবসিক্ত চিত্রগুলিকে বহু উচ্চে স্থান দিয়েছিল।

পল্লী-মায়া

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম-এ

কেমন ক'রে এমনভাবে
থাকবো আমি কহরে,-'
হারিয়ে গেছি জনস্রোতে—
পাষাণ-ঘেরা শহরে!
ব্যাকুল ভাষায় নিরবধি
ডাকে আমায় 'খ'লসে' নদী,—
ডাকে—ডাকে রূপালি তার
উছল বারি-লহরে!

হেথায় নাহি নীরবতা,—
তরুর শীতল ছায়ারে,
জুড়িয়ে যা দেয় মনের ব্যথা—

হেথা শুধুই চঞ্চলতা,—
দরদবিহীন ফাঁকা কথা,
কেউ বুঝে না প্রাণের ব্যথা—
নেইকো কারো মায়ারে!

আজকে হিয়া চ'ল্‌ছে ছুটে
আমার গাঁয়ের অঙ্গনে,—
যেথায় শোভা উথ্‌লে উঠে
মল্লিকা আর রঙ্গনে।
সেথায় খুলে ফেলবো টানি'
ভদ্রতার এ মুখোসখানি,—
মুক্ত মাঠের মাঝে যাবো

হরিদাস

(গল্প)

শ্রীদ্বারকামোহন চট্টরাজ

গাঁয়ে ঢুকতেই হরিদাসের দোকানটা চোখে পড়ে; পথিককে অভ্যর্থনা করে যেন। সামান্য মিষ্টির দোকান! মাটির ঘর, খড়ের চাল, পাশেই একটি পুকুর তার নিত্য সহচর। হরিদাস জাতিতে ময়রা অর্থাৎ ময়রা। সংসারে তার কেউ নেই, হয়ত এককালে সব ছিল। এখন কেবল সে তার কঙ্কালসার দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরিদাসের দোকানে সব কিছুই পাওয়া যায়; দেশে গেলে হরিদাসের দোকানটা চোখে পড়ে, তার কোন পরিবর্ত্তন নেই।

সকালে উঠে দোকানের ঝাঁপটা খুলে ঘর-দোর পরিষ্কার করে আর গুনগুনে স্বরে ভজন গায়। সকালে দোকান দিয়ে গেলে সে আসন পেতে দেয়, প্রণাম করে। মাঝে মাঝে রাতের শেষে হরিদাসের গান শুনতে পাই বাড়ী থেকে, বড় মিষ্টি লাগে। মনটা অনেকটা শান্ত হয়।.........কাপড়খানা হয়ত ময়লা, পরিষ্কার করবার অবসর নেই, চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, মাথায় তেল নেই। এমনিভাবে তার দিন যেত। হরিদাসের আমি কোন পরিবর্ত্তন দেখিনি। রোজ সকালে উঠে দোকান খোলে আবার সন্ধ্যা হলে দোকান বন্ধ ক'রে খেয়ে শুয়ে পড়ে, তার মধ্যে দু'চার পয়সার কেনা-বেচা হয়।

হরিদাসকে আমার খুব ভাল লাগত; রোজ তার কাছে গিয়ে বসতাম। অনেক আলোচনা হ'ত, তার মধ্যে অধিকাংশ ছিল ধর্ম্ম বিষয়ে। মনে হ'ত সে বেশ জ্ঞানী। আমাকে অনেক উপদেশ দিত, আমি সেগুলো মাথা পেতে নিতাম। সে ছিল গাঁয়ের সকলের প্রিয়। হরিদাস অনেক কিছুই জানত তার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। রাত আটটা পর্য্যন্ত হরিদাস ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করত, আমি বসে বসে শুনতাম; অনেক লোকই আসত তার আলোচনা শুনতে, তারা হয়ত নিশ্চয় কিছু পেয়েছিল তার মধ্যে। হরিদাস সকলের সঙ্গে মিশত। ফাজিল ছেলেদের হরিদাস উপদেশ দিতে চেষ্টা করত, তারা সেটা উপলব্ধি করত না, গ্রাহ্য করত না। এমনিভাবে সে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল ভাবনা চিন্তার বাইরে, কোন অজানা পথে। সে ছিল একা, ছিল না তার কেউ। নিজেই সে রাঁধত নিজের ইচ্ছা মত। হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করতাম তার অতীত জীবনের কাহিনী, সে দীর্ঘ-শ্বাস ছেড়ে, নির্জীবভাবে বলে চলত, মনে হত হয়ত সে এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে চিরনিদ্রার কোলে।

'আমার জীবনে সবই ছিল দাদাবাবু! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবই ছিল। ছোট বেলায় বাবার খুবই আদুরে ছিলাম, বাবার অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছল ছিল। আমাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত পড়িয়েছিলেন, তারপর বিয়ে দিয়েছিলেন একটি ছোট্ট ফুট্‌ফুটে মেয়ে দেখে। তার চেহারা ছিল মোটের উপর মন্দ নয়, মনটা ছিল তার খুব সরল। এমনি ক'রে দিন যেতে লাগল। বাবা একদিন হঠাৎ মারা গেলেন আর বসিয়ে গেলেন আমাকে পথে। সামান্য মিষ্টির দোকান নিয়ে নিজেদের ব্যবসা চালাতে লাগলাম, বাবু। এইখানিই আমার দোকান, এই মাটিতেই জন্মেছিলাম, এই মাটিতেই হয়ত মরব' বলে সে সান্ত্বনা দিয়ে আবার আরম্ভ করতে বলতাম। সে বলত, 'দু'তিন বছর পর আমার একটি ছেলে হল। তাকে আমি খুবই ভালবাসতাম। সে ছিল আমার চোখের মাণিক। আরও দু'তিনটে ছেলে-মেয়ে হয়েছিল, তার মধ্যে একটি মারা যায়। স্ত্রী বড় খিটখিটে মেজাজের ছিল, রাগ ক'রে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। তারপর অনেক দিন একাই ছিলাম, মন টিকল না, তাকে আনতে গেলাম। সেই থেকে যে আমাদের সংসারে ঝড় উঠল বাবু! আর থামল না। স্ত্রীকে আনতে গিয়ে দেখি, সে আর নেই, আগের ভাদরের সাঁঝে দিন কয়েকের জ্বরে মারা গিয়েছে, মনটা খারাপ হয়ে গেল। খানিক লুকিয়ে কাঁদলাম, অশ্রুও ফুরিয়ে গেল। বুকের মাণিক ছেলে দু'টাকে এই ভিটেতে নিয়ে চলে এলাম। বড় ছেলেটি কিছুতেই থাকতে চায় না। বলে, মন টিকছে না। অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে রাখলাম, সে অস্থির হয়ে পড়ল। মায়ের শোক সে ভুলতে পারলে না। দেখতাম সে নির্জ্জন স্থানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মনকে বাঁধতে পারতাম না, সান্ত্বনা ত দূরের কথা। আমিও কেঁদে ফেলতাম ছোট ছেলের মত। ছেলে দুটাকে মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম, পড়ে রইলাম শুধু একা! এ বুকের উপর অনেক ঝড় বয়ে গেল, আঁকড়ে ধরলাম আমার জন্ম নিকেতনকে। এখন আমার ছেলে হয়ত বড় হয়েছে। একবার বাবু, আনতে গিয়েছিলাম। মামারা বললে, "ভৈরব এখন বড় হয়েছে, দোকানে কাজও শিখছে, নিয়ে যেও না, এইখানেই থাক।" একটু আনন্দ হল, ছেলের উন্নতির দিকে আর বাধা দিলাম না। সে যদি সুখে থাকে, থাক। মনকে প্রবোধ দিলাম, তার সুখেই আমার সুখ। সেই সুখ আর স্মৃতি নিয়েই বাবু এইখানে পড়ে আছি।.................

'বাবার শেষ কথা ভুলতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন "সব চলে যায় যাক, তোমার জন্মভূমিকে যেতে দিও না, বসত বাটীখানা আঁকড়ে পড়ে থেক। সেখানে হয়ত সান্ত্বনা মিলবে।" তাই এখানে পড়ে আছি শেষ জীবনের অধ্যায়-গুলো কাটিয়ে দিতে। মাঝে মাঝে মনটা উদাস হয়ে পড়ে, বাবার শেষ কথাগুলো মনে পড়ে যায়; মনে অনেকটা বল পাই। তারপর বাবু, ছেলের আর কোন খোঁজ-খবর করিনি, জানি সে মানুষ হ'বে। তাই তারই আশা নিয়ে বুক বেঁধে আছি। সে মানুষ হচ্ছে, তাই অমানুষের কাছে রেখে ক্ষতি করতে চাই না। নিজেই চালিয়ে দি' এ দুর্ব্বহ জীবনটা। আপনাদের দেখে মনে অনেকটা শান্তি পাই। নির্দ্দেশহীন পথে যাত্রা করেছি একা নিঃস্বভাবে। কোন ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, রইল কেবল বুকভাঙ্গা স্মৃতি আর আশার আলোক।'

আর বসতে পারলাম না, উঠে এলাম।

জ্যোৎস্নার আলোয় হরিদাসের চোখে দু'এক ফোঁটা জল দেখতে পেয়েছিলাম, তার অর্দ্ধাঙ্গিনীর উদ্দেশ্যে। দিবা-রাত্রি সে এমনিভাবে কাটিয়ে দেয়, দুঃখপূর্ণ জীবনের নদীতে

ইতিহাস-পূর্ব যুগের পদচিহ্ন

মার্কিন মুলুকের ডিসপুটান্টা (কেন্টাকি) অঞ্চলে যে পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা নাকি মানবজাতির সর্ব্বাদি পুরুষের—এই লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে এবং হইতেছে। ভূতাত্ত্বিক ডাঃ বারোজ এই পদচিহ্নের উদ্ধার কর্ত্তা। তিনি বেরিয়া নামক স্থানের ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ অট ফিনেলের গোলাবাড়ীতে বালিপ্রস্তরে এই পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন।

উপরের বড় আকারে প্রদর্শিত পদচিহ্নে উহার সঠিক আকৃতি বুঝা যাইতেছে—লম্বায় ৯॥ ইঞ্চি, অগ্রভাগ চওড়া ৬ ইঞ্চি; মার্কিনের কেন্টাকি প্রদেশে কোনও গোলাবাড়ীতে প্রাপ্ত প্রস্তরীভূত পদচিহ্ন;

সমুদয়ে ১০টি পদচিহ্ন দেখা গিয়াছে; নিম্নের ছোট আকারে প্রদর্শিত পদচিহ্নগুলি হইতে উহাদের সম-ব্যবধান বুঝা যায়; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পাঁচটি আঙুল স্পষ্ট দেখা যায়; প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনও জীবের পদচিহ্ন বলিয়া অনুমান করা হয়।

আদিম মানবের পদচিহ্ন বলিয়া অনুমান করা হইলেও, নেভাডা ষ্টেট প্রিজনের বন্দীদের দ্বারা আবিষ্কৃত কারসন সিটির প্রস্তরীভূত পদচিহ্নের ন্যায়, ইহাও পরে কোনও অতিকায় [illegible] পদচিহ্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে। কারসন পদচিহ্ন বলিয়া ভুল করা হইয়াছিল। অট ফিনেলে গোলাবাড়ীর এই পদচিহ্নও তেমনি বালিপ্রস্তরে পরিণত এবং প্রাচীনত্বে প্রায় সমান বলিয়াই অনুমান করা হয়।

সমুদয়ে দশটি পদচিহ্ন এইস্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। 'পটস্‌ভিল' স্তরের ১৫০ ফুট উপরিভাগে এইগুলি অবস্থিত ছিল। কেন্টাকি প্রদেশের যে প্রস্তর-স্তর পেনসিলভেনিয়ান অথবা অঙ্গার-যুগের আরম্ভিক সময়ের বলিয়া ভূতত্ত্ববিদগণ অভিমত জ্ঞাপন করেন, ঐ শৈল-গঠনকেই 'পটসভিল' স্তর নাম দেওয়া হইয়াছে। ঐ যুগেই কেন্টাকির পূর্ব্ব অঞ্চলের পাথর-কয়লার নিম্ন-স্তরসমূহ এবং অধিকাংশ সংঘাত-কঠিন স্তবক-বিন্যাস সঞ্চিত হয়। এই যুগের সূত্রপাত প্রায় ২০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া অনুমান করা হয় এবং অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। ডাঃ বারোজ এখন ঐ পদচিহ্নগুলির বয়স এবং কোন প্রাণীর পদচিহ্ন ইহা নিরূপণ করিতে গবেষণায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

যে বালি প্রস্তরের স্তবকে এই পদচিহ্নগুলি বিন্যস্ত, যদি সেই স্তবক কোনও নদীখাতে অবস্থিত এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ বারোজের মতে উহার কাল নির্দ্দেশ হয়ত 'পটসভিল' যুগের অন্তিম সময়েরও পরবর্ত্তী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

কেন্টাকি অঞ্চলে পদচিহ্ন এই প্রথম পাওয়া গেল এবং মানব পদচিহ্নের সহিত এইগুলির বহু সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। প্রত্যেক পদচিহ্নে পাঁচটি করিয়া আঙুলের দাগ পরিষ্কার রহিয়াছে, যদিও একটু বেশী ফাঁক ফাঁক। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রস্থে ছয় ইঞ্চি হইবে। পদচিহ্নের দৈর্ঘ্য ৯॥ ইঞ্চি। প্রত্যেক চিহ্নেই পায়ের পাতায় খিলানের মত বক্রতাও লক্ষ্য করা যায়। পদ-চিহ্নগুলি ঠিক একদিকেই গতির নির্দ্দেশ দেয় না—গতি[illegible] বেলা উহা যেন এলোমেলো—যে বা যাহারাই ঐ পদচিহ্ন রাখি[illegible] যাউক না কেন, তাহাদের গতির লক্ষ্য যেন নির্দ্দিষ্ট ছিল না। এই লক্ষ্যবিহীন পদক্ষেপে তৎকালীন সিক্ত বালিতেই চিহ্ন পড়িয়াছিল। ইহার পর দীর্ঘকালে ঐ বালি ক্রমে প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। দুই স্থলে মাত্র দেখা যায় একই প্রাণীর দক্ষিণ ও বাম পদের ছাপ পাশাপাশি রহিয়াছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় ঐগুলি কোনও চতুষ্পদের পদচিহ্ন, তথাপি ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উহাদের পশ্চাতের দুইপদের চিহ্নই ঐস্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে, সম্মুখের দুই পদের কোনও চিহ্ন ঐস্থানে বা উহার আশপাশে নাই।

এই পদচিহ্ন যাহারই দৃষ্টিতে পড়ে, তাহারই কৌতূহল জন্মে উহার স্বরূপ জানিবার। কিন্তু অদ্যাবধি [illegible] সঠিক নির্ণীত হয় নাই। ডাঃ বারোজও উহা কোন প্রাণীর পদচিহ্ন সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করিতে পারেন নাই—বিশেষ করিয়া আমাদের যুগের কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বেকার কোনও পদচিহ্ন, যাহা স্মরণাতীতকালেই প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তান্ত উদ্‌ঘাটন করা যে জটিল [illegible] অবহিত। সুতরাং

মা ত মিছে কথা বলেন না; মণ্টু বিশ্বাস করে, বলে, "তাহলে দাও।" দাঁতে দাঁত চেপে মা উচ্ছ্বসিত কান্না রোধ করেন; চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়ে আসে; কিন্তু কাঁদিবার যো নেই; মাকে কাঁদ্‌তে দেখলে মণ্টু কাঁদিবে যে।

মণ্টু বলে, "আজ জ্বরটা ছাড়বে, না, মা—তাহলে কাল,—না কাল নয়,—পরশু আমায় সিঙ্গি মাছের ঝোল আর ভাত দেবে ত?"

মা ওকে থামিয়ে বলেন, "চুপটি করে থাক, খোকন, কথা কইলে জ্বর বাড়বে।"

"কথা কইতে আজ আমার বড্ড ইচ্ছে কচ্ছে, মা—আর যদি তোমায় দেখতে না পাই, যদি কথা কওয়া আমার বন্ধ হয়ে যায়—"

"ওরে থাম"—মা সইতে পারেন না—কয়েক ফোঁটা অবাধ্য জল মণ্টুর উত্তপ্ত দেহের উপর পড়ে।

মণ্টু সান্ত্বনা দেয়—বলে, "কেঁদ না, মা, আমার কান্না পাবে—আর আমি ত আজই ভাল হয়ে যাব, ভাল হ'লে আমি ইস্কুলে পড়ব না কিন্তু, তুমি আর আমি দেশের বাড়ীতে চলে যাব।"

"হ্যাঁ, খোকন, তুমি ভাল হ'লে দেশে যাব।" মা তার গা-টা ভাল করে ঢেকে দেন চাদর দিয়ে।

"দেশ খুব সুন্দর, না মা,—ক'লকাতা ভাল না—বিচ্ছিরি, খালি ধোঁয়া, ধুলো আর গোলমাল। আর ফিরে আসব না, কি বল? তুমি দু'দিন বাদেই ফিরে আসবার জন্যে বায়না ধরবে, সেটি কিন্তু করতে পাবে না।"

মণ্টু একটু চুপ করে থাকে, কিন্তু বেশীক্ষণ নীরবে রইতে পারে না। আজ যে তার কথার উৎস গেছে খুলে—বলে, "বাবা আসছে না কেন? সাহেব বুঝি খুব দুষ্টু, শুধু শুধু আটকে রাখে। বাবাকে আমার জন্য উড়োজাহাজ আন্‌তে বলেছ ত—বাবা যেন কেমন, খালি ভুলে যায়।"

"বলেছি খোকন, আজ ঠিক আনবেন।"

আমি বড় হলে বিলেত যাব উড়োজাহাজে চড়ে, সেখান থেকে বড় ডাক্তার হয়ে আসব। আমায় যেতে দেবে ত, যাবার সময় তুমি কিন্তু কাঁদ্‌তে পাবে না।"

উদ্‌গত অশ্রু দমন করে মা বলেন, "যেও মণ্টু, যেও, আমি একটুও কাঁদব না, তোমায় সাজিয়ে দেব, বড় ডাক্তার হয়ে ফিরে এসে কত শক্ত অসুখ ভাল করবে।"

মণ্টু হাঁপিয়ে ওঠে, আর কথা কয়না, চোখ বুজে পড়ে থাকে, বুঝি বা একটু ঘুমায়। মা তাঁর কল্যাণ-হস্তের স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দেন তার সর্ব্বদেহে—স্বতঃ-উৎসারিত ঝরণার মত মায়ের বুকে স্নেহ-রসের যে ধারা প্রবাহিত হয়ে মাকে কল্যাণময়ী মমতাময়ী করে, স্নেহের সে নির্ম্মল ধারায় অভিষিক্ত ক'রে যদি মণ্টুর জ্বরটাকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যেত? মায়ের বুকখানা শুধু স্নেহে, করুণায় ভরা; সন্তানকে অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা করার এক তিলও শক্তি তাঁর নেই।

বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ মণ্টুর তন্দ্রা যায় ভেঙে—সে চমকে জাগে, প্রাণপণ বলে ডাকে "মা।" তার ব্যাকুল শীর্ণ ক্ষুদ্র হাত দুখানি দিয়ে প্রবল শক্তিতে মাকে আঁকড়ে ধরে। একটু সামলে নিয়ে মণ্টু বলে, "সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে সোনালি নৌকায় রুপোলি পাল তুলে ডাকছে 'আয়, আয়।' তোমায় ছেড়ে আমি যাব না, তুমি ওকে চলে যেতে বল না মা।"

সুন্দরী ধরণী—এই আলো, এই বাতাস, এই রূপ-রস-গন্ধ-ভরা বিচিত্র পৃথিবী; নর-নারীর বিচিত্র মেলা—কে ছেড়ে যেতে চায়? কিন্তু যেতে যাকে হয়, কে তাকে [illegible] পারে?

* * * *

মণ্টুর জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত প্রায়—মৃত্যুর হিম-কর-পরশনে ওর ক্ষুদ্র দেহ ঠাণ্ডা হয়ে আসে—ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে অমানিশার আঁধার—মায়ের স্নেহ অসহায় দুর্ব্বলের মত শুধুই কেবল অশ্রু বর্ষণ করে।

রাত্রি দুপুর। মৃত্যু-পথ-যাত্রী অসহায় বালকের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ওর অন্তিম কামনা ঘোষণা করে—"ওই আবার ডাকে—হাতছানি দিয়ে ডাকছে—আমি যাব না যাব না"—

সব শেষ—শুধু একটা বুক-ভাঙা আর্ত্তনাদ ভগবানের পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ে। সংজ্ঞাহীনা জননীর অসাড় দেহ মণ্টুর শীতল দেহের উপর লুটিয়ে পড়ে।

অবিনাশী

(৫৭৫ পৃষ্ঠার পর)

—কম্পনে মাঝে মাঝে নির্লজ্জভাবেই প্রকাশ করিয়া দেয়। মাণিকের চিত্ত ভয়ে ভরিয়া উঠিল—। সে মুখ না তুলিয়াই অতিকষ্টে বলিল, "দু'দিন আগে যা বলেছিলাম,—তার জন্য আমি অনুতপ্ত।"

রেণুর কণ্ঠ সতেজে বাজিয়া উঠিল, "অনুতপ্ত! কথায় কথায় অনুতাপ, কথায় কথায় হা-হুতাশ।—মাণিকদা, আমার সন্দেহ হয়,—তুমি কি সেই আগেকার নির্ভীক দৃঢ়-চিত্ত পুরুষ! না না ওসব মেয়েলীপনা, নাটুকেপনা আমার কাছে দেখিয়ো না। তুমি যাই ছিলে—তাই হও। আপনার দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। দু-হাতে চার পাশের বাধা-বিপত্তি ঠেলে—খোলা বুকে এগিয়ে চল।"

মাণিক মুখ তুলিয়া রেণুর প্রদীপ্ত মুখের পানে চাহিতেই সে কহিল, "অন্তরে যার আগুন আছে, তার ত্রিসীমানায় কোন পাপই ঘেঁসতে পারে না। লোকের মিথ্যে কথায় ভুলে নিজের কর্ত্তব্য যেন ভুল না করি, এই আশীর্ব্বাদই কর মাণিকদা। তোমার জন্যও আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই করি।" বলিয়া হেঁট হইয়া সে মাণিককে প্রণাম করিল।

(ক্রমশ)

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

(৫৫০ পৃষ্ঠার পর)

উপর্য্যপরি কতকগুলি দুর্ঘটনা হওয়ায় এই দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশের খনিগুলিতে অজস্র উৎকৃষ্ট কয়লা অগ্নিদগ্ধ হইয়া নষ্ট হইতেছে। তাহা ছাড়া পরিচালকগণের দোষেও অনেক কয়লা নষ্ট হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই অপচয় নিবারণের জন্য আইন করিয়াছেন। অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা হইলে দুর্ঘটনাও কমিবার সম্ভাবনা।

ডাঃ এস কে রায়

আমাদের দেশে কিছু কিছু পেট্রোলিয়ামও পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৩০ কোটি গ্যালন পেট্রোলিয়াম ও উহজাত অন্যান্য পদার্থ ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে মাত্র ৭ কোটি ৬০ লক্ষ গ্যালন এই দেশের খনি হইতে উত্তোলিত হয়। ৬ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালন আসামে ও বাকী ১ কোটি ৩ লক্ষ গ্যালন পাঞ্জাবে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে পেট্রোলিয়াম খুব কম পাওয়া গেলেও উহার অপচয় নিবারণের জন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে না।

ভারতবর্ষে প্রচুর এবং উৎকৃষ্ট অভ্র পাওয়া যায়। হাজারীবাগ, গয়া, মানভূম ও মুঙ্গের জেলায় অভ্রের খনি আছে। কিন্তু মালিকদের অজ্ঞতা ও তাহাদের কর্ম্মচারীদের অযোগ্যতাবশতঃ প্রচুর অভ্র নষ্ট হইতেছে। বিহারে ক্রোমেট পাওয়া যায়। কিন্তু ইহারও অপচয় হইতেছে। অন্যান্য খনিজ পদার্থ সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য।

অতঃপর ধাতু সম্পর্কে অধ্যাপক রায় বলেন, মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারের পর প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবাসীরা খৃষ্টের জন্মের চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বেও স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক ও টিনের ব্যবহার জানিত। প্রাচীন ভারতের রাসায়নিকগণ দস্তা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আজও বিহার, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে দস্তা পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই সম্পর্কে কেহই বিশেষ সংবাদ রাখেন না। আয়ুর্ব্বেদে পারদের ব্যবহার আছে। উহাও নিশ্চয়ই ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইত; কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের কোথাও পারদের অস্তিত্ব কেহ অবগত নহে। এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রাচীনকালে ও মধ্য যুগে ভারতবর্ষে গন্ধকের বহুল ব্যবহার হইত। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে প্রয়োজনানুরূপ গন্ধক পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কেও অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে সোণা পাওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের কতকগুলি নদী ও গ্রামের নাম উল্লেখযোগ্য :—বিহারের(?) সুবর্ণরেখা ও সোনপেট, আসামের সুবর্ণশ্রী ও ধনশ্রী, যুক্তপ্রদেশের সোন, মণ্ডীরাজ্যে ধনপুর, দিল্লীর সোনা—ইত্যাদি নাম হইতে বুঝা যায়, এককালে ঐ সকল অঞ্চলে সুবর্ণ আহরণ করা হইত।

মণিরত্ন ইত্যাদির বিবরণ নিতান্ত অস্পষ্ট; তবু একথা সত্য যে, বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত জগতে যে সকল হীরকের নাম শুনা যাইত, তাহা ভারতবর্ষেই পাওয়া গিয়াছিল। পুনরায় ভারতবর্ষে হীরক সম্পর্কে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

প্রাণি-বিজ্ঞান শাখা

বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক সি আর নারায়ণ রাও এম-এ ৩রা জানুয়ারী লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাণি-বিজ্ঞান শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে দক্ষিণ ভারতের ভেক জাতীয় উভচর জন্তু এবং তাহারা যেরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা আলোচনা করেন। তিনি বলেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত জীবজন্তুর শরীর সংগঠন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনধারার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, দক্ষিণ ভারতের এই উভচর জন্তুদের আলোচনায় তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই উভচর জন্তু যেভাবে গড়িয়া উঠে তাহাতে তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও উৎপাদন প্রণালীতে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কোথাও মিল বা সামঞ্জস্য থাকিলে এই উভচর জন্তুদিগের জীবনেও সেইরূপ মিল বা সামঞ্জস্য দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের যে সকল বিভিন্ন বনভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেই সকল স্থানের লাঙ্গুলহীন ভেকের চাল-চলনেও বহু সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৃক্ষে আরোহণ করা, গর্ত্ত করা, গুড়ি-মারিয়া চলা বা লাফাইয়া চলার যে সমস্ত অভ্যাস এই স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে ইহারা লাভ করে, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বনভূমি অঞ্চলের ভেকদিগের মধ্যেও তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আবার যে সমস্ত পার্ব্বত্য স্থানে ঝরণার জল জোরে পতিত হয়, তথাকার ভেক জাতীয় উভচর প্রাণীগুলির মধ্যে একপ্রকার আঠালো অংশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহারই ফলে উহারা পর্ব্বতগাত্রে সংলগ্ন থাকিতে সমর্থ হয়। কোথাও বা ইহাদের মধ্যে জলে ভাসিয়া থাকিবার মত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অধ্যাপক রাও বলেন, দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালাস্থিত বনভূমির মধ্যে বহু ভেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের বায়ু উষ্ণ এবং জলকণায় পরিপূর্ণ। এই আবহাওয়া এইরূপ ভেকদিগের আদর্শ বাসস্থান বলিয়া মনে হয়। বায়ুর চাপ, উষ্ণতা, খাদ্য সংস্থান, ভূমির আর্দ্রতা, উদ্ভিদাদির অবস্থান প্রভৃতি ভেকের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং ইহাদের আকৃতির ও প্রকৃতিগত বহু ব্যাপারে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাধারণ ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙের বিষয় উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক রাও বলেন যে, সমতল প্রান্তর হইতে আরম্ভ করিয়া নিবিড় বনভূমি এমন কি পর্ব্বতের উচ্চ শিখরদেশে পর্য্যন্ত ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ইহারা যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইলেও একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন বর্গের ভেক পরিবর্দ্ধিত হইলে তাহাদের মধ্যে যেরূপ অভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহাতে ব্যবচ্ছেদমূলক পরীক্ষা ব্যতীত তাহাদের শ্রেণীবিভাগ দুরূহ হইয়া উঠে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেকজাতীয় উভচর জন্তুর শরীর গঠন ও জীবনযাত্রা

প্রণালীর ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করিলেও, বিভিন্ন জাতীয় ভেকের সংমিশ্রণে ও অন্যপ্রকারে যে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়, তাহাতে এই শ্রেণীবিভাগে জটিলতার উদ্ভব ঘটে। অধ্যাপক রাও এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এক মূল বংশ হইতে বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ার ফলে যে অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছে, তাহাই ভেকের নূতন নূতন বিভিন্ন শ্রেণীর বিবর্তনে সাহায্য করিতেছে।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখা

ডাঃ কৃষ্ণদাস বাগচী ডি-এস-সি, (লণ্ডন) এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডেরাডুন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও কলেজের তিনি ছত্রাকতত্ত্বের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভারতের অরণ্যজাত বৃক্ষের ছত্রাক-জাতীয় পরগাছা ও আধিব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, দেবদারু জাতীয় গাছগুলি ভারতবর্ষের অতুল বনজ-সম্পদে পরিণত হইতে পারে। কাজেই এইগুলির ছত্রাক ও পীড়া সম্পর্কে গবেষণা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ ১১ রকম ছত্রাকের কথা জানিতেন, কিন্তু এখন আরও চারি প্রকার ছত্রাকের কথা জানা গিয়াছে। এইগুলির মধ্যে তিনটির সবিশেষ বিবরণ এখনও জানা যায় নাই।

বৃক্ষের রোগ কিরূপে নিবারণ করা যায়, ডাঃ বাগচী তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। কয়েকটি পন্থা প্রতিষেধাত্মক, বনমহাল রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতির উপর প্রধানত তাহা নির্ভর করে। ডাঃ বাগচী এই মত প্রকাশ করেন যে, বৃক্ষের পীড়ার প্রতীকার করা এক রকম অসম্ভব; কারণ, ছত্রাক ও পরগাছার সংখ্যা গণিয়া শেষ করা যায় না; তদুপরি একাধিক শ্রেণীর ছত্রাক ও পরগাছা একই গাছকে আক্রমণ করিতে পারে।

কাঠ কিরূপে অবিকৃত রাখা যায়, কি কারণে উহা নষ্ট হয় ডাঃ বাগচী সেই সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি এই বিষয়টির প্রতি বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

ডাঃ কে পি বাগচী

রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে কাষ্ঠ অবিকৃত রাখা যায় কি না, সেই বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে; কাঠ নষ্ট হয় কিরূপে, নানা জাতীয় ছত্রাক দ্বারা সেই সম্পর্কেও পরীক্ষা করা হইতেছে। এই সকল ছত্রাকের ক্রিয়া এবং উহাদের উপর রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়া ডাঃ বাগচী সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

সাধারণত যে সকল ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ) দেখা যায়, ডাঃ বাগচী প্রসঙ্গক্রমে সেইগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। উহাদের জন্ম ও জীবন আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, অনেকগুলি ছত্রাক সমপারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রায় এক জাতীয় মনে হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য অত্যধিক।

কৃষি-বিজ্ঞান শাখা

রাও সাহেব ডাঃ টি ভি রামকৃষ্ণ আয়ার বি-এ, পি-এইচ-ডি, এফ-জেড্-এস্, এই শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি মাদ্রাজ

ডাঃ টি ভি রামকৃষ্ণ আয়ার

সরকারের কীটতত্ত্ববিশেষজ্ঞরূপে যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল কাজ করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ আয়ার ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পালঘাটের এক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ খ্রীশ্চিয়ান কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিবার পর তিনি অধ্যাপক ফ্লেচার, অধ্যাপক লেফ্রয় প্রভৃতি সুবিখ্যাত কীটতত্ত্ববিশারদগণের নিকট শিক্ষালাভ করেন। মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় কৃষি-বিভাগেও চারি বৎসর কাজ করেন এবং পরে কলেজেও অধ্যাপনা করেন। ১৯২৭ সালে ডাঃ আয়ার চীন, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। এই সময়ে ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধিলাভ করেন। তিনি বিভিন্ন কীটপতঙ্গ সম্পর্কে শতাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছেন। কৃষিবিজ্ঞান শাখায় তিনি তাঁহার অভিভাষণে কৃষিসম্পর্কিত বহুবিধ সমস্যার বিষয় আলোচনা করেন। তিনি বলেন—লাভজনকভাবে প্রচুর ফসল পাইতে হইলে ভারতীয় কৃষকদিগকে কতকগুলি জরুরী সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মাটির রাসায়নিক ধর্ম্ম, বীজের স্বাস্থ্য ও নির্ভরযোগ্যতা, চারাগাছের প্রকৃতি ও বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যা এবং পশু ও কীটপতঙ্গাদির উপদ্রব হইতে ফসলাদি রক্ষা করার সমস্যা প্রধান। রাসায়নিকদিগের উদ্ভাবিত সারের ব্যবস্থা এবং অপর্য্যাপ্ত ফসল উৎপাদনকল্পে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানবিদের সর্ব্ববিধ চেষ্টা এবং কৃষকের বিশেষ মনোযোগ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফসলের শত্রুগণ ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। তাই প্রত্যেক মরসুমে যে সকল প্রাণী ফসল নষ্ট করে, তন্মধ্যে অন্তত প্রধান কয়েকটির জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে কৃষকদিগের কিঞ্চিৎ সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ঐ জ্ঞান থাকিলে তাহারা জীবজন্তুর অনিষ্ট কতকাংশে নিবারণ করিতে পারে।

মানুষ যে সকল জীবজন্তুর সংস্রবে আসে তাহাদের মধ্যে হস্তী হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র প্রাণী পর্য্যন্ত মানুষের অনেক ক্ষতি সাধন করে। এই সকল প্রাণীর প্রকৃতি অবধারণ অর্থনৈতিক প্রাণি-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। কৃষক, মুদী এবং পশু-পালক যে সকল প্রাণীর দ্বারা উপদ্রুত হয়, তন্মধ্যে কীটপতঙ্গ

জাতীয় প্রাণীর উপদ্রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, কৃষি সম্পর্কে কীটপতঙ্গসমূহ যে ভূমিকা গ্রহণ করে, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ঐ সকল কীটপতঙ্গ জমির ফসলের বিশেষ অনিষ্ট করে এবং কৃষকগণ তদ্দ্বারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সাধারণ কৃষক পঙ্গপালের ও শূককীটের সাময়িক অনিষ্ট-কারিতার সহিতই সর্ব্বাধিক পরিচিত। কিন্তু অন্য যে সকল কীটপতঙ্গ নীরবে অথচ অবিচলিতভাবে প্রতি বৎসর ফসলের অনিষ্ট করে, তাহার সংবাদ হয়ত তাহারা বিশেষ রাখে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ঐ সকল কীটপতঙ্গ প্রতি বৎসর বিশ কোটি টাকা মূল্যের ফসলের ক্ষতি করে। একমাত্র চাউলের পোকার দ্বারা যে অনিষ্ট সাধিত হয়, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রতি বৎসর তাহাও ১২ কোটি টাকার কম হইবে না।

কৃষির এই সমস্যার প্রতি গবর্ণমেণ্টের এবং বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান-সমূহের মন দেওয়া উচিত। ভারতের সর্ব্বত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া কিভাবে ফসলের ক্ষতি হয় বিভিন্ন দিক হইতে তাহা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কর্ম্মী-দলের মধ্যেও এজন্য সহযোগিতা আবশ্যক।

মনোবিজ্ঞান শাখা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান শাখার লেকচারার শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত মাইতি ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করিবার পর কিছুকাল পরলোকগত আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নিকট ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। পরে তিনি পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এম-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মানুষের স্মৃতিশক্তি, অনুধাবন ক্ষমতা, সহাগুণ, কাজ করিবার ক্ষমতা, বুদ্ধি-পরিমাপ প্রণালী সম্পর্কে তিনি বহুবিধ গবেষণা করিয়াছেন। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের মনোবিজ্ঞান শাখারও তিনি সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই শাখায় তিনি তাঁহার অভি-ভাষণে মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণার ফলে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব পর্য্যালোচনা করার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, মানুষের মানসিক একাগ্রতা প্রথম হইতেই থাকে না, উহা ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিতে হয়। মানসিক একাগ্রতা প্রায়শঃই পরিপূর্ণ নহে। সম্প্রতি বিভিন্ন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গবেষণার যে আন্দোলন চলিয়াছে, তাহার ফলেই ব্যক্তিত্ব সমস্যাটি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। শ্রীযুত মাইতি বলেন যে, যাহাতে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে এবং উত্তরকালে শিশুর চরিত্র কিরূপ হইবে, সেই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষভাবে গবেষণা চলিতেছে। ইতিমধ্যেই এবিষয়ে কাজও যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে।

ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের বর্ত্তমান পন্থা এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বর্ত্তমান থিওরীর গলদ এই যে, বর্ত্তমানে উহাকে একটা যন্ত্রবৎ বিবেচনা করা হয়। বর্ত্তমানে ইহাই মনে করা হয় যে, কতকগুলি বিভিন্ন বৃত্তির সমাবেশই ব্যক্তিত্ব। কিন্তু প্রগতিশীল মনস্তাত্ত্বিকগণ বিশেষতঃ গেষ্টাল্টপন্থিগণ বলেন, ব্যক্তিত্বকে একটা চৈতন্যময় অভিব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। গেষ্টাল্টপন্থিগণ বলেন, ব্যক্তিত্ব বলিতে সক্রিয় ঐকিক সত্তা বুঝায়—অবশ্যই উহার বিভিন্ন

শ্রীযুত হরিপদ মাইতি

অংশ পারস্পরিক ক্রিয়াশীল এবং কয়েকটি অংশের ক্রিয়া অন্যান্য অংশের ক্রিয়া অপেক্ষা বলবতী। কিন্তু তাঁহারা বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের মতবাদ সঠিক তথ্যের উপর স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। বর্ত্তমানে মনোবিকলন দ্বারা এবং কিয়দংশে শিশু-মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্ণয় করার চেষ্টা হইতেছে।

অধ্যাপক মাইতি মানবেতর জীবের মনস্তত্ত্ব এবং মানুষের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ বিকাশের ধারা ইত্যাদি সম্পর্কেও বিস্তৃতভাবে আলো-চনা করেন।

একান্ত [illegible]ভচ্ছা

[illegible]রকুমার বসু

ঝরাদল, ৭ই কার্ত্তিক, '৪৪

দাদা,

সেদিন তোমার কথাই হ'চ্ছিল। তোমার চিঠি পেলে বাবার মনে খুশী আর ধরে না। তোমাতে তাঁর অগাধ বিশ্বাস, অসীম নির্ভরতা। তাঁর নির্ভরতার সেই গুরুভার তুমি একা বইতে পারবে কিনা—আমার ভয় হয়!

"মানুষ মানুষকে বিশ্বাস ক'রে, ভালবেসে নাকি ঠকে না। একজনকে ভালবেসে হয়ত আঘাত পেলাম; কিন্তু পরক্ষণেই আর একজনকে আহত ক'রে তার অশ্রু-সিক্ত ব্যথিত অন্তরের প্রেমাবেদন অনুভব করি। দশজনের দেওয়া-ক্ষত একের দরদ-ভরা অন্তরের স্নিগ্ধ প্রলেপে নিমেষে মিলিয়ে যায়। হৃষীকেশ শুধু আমার ভাগ্নে নয়, সে আমার বন্ধু, পরমাত্মীয়, সহযোগী।—"

বাবার প্রশংসা-মুখরতায় আমার কিন্তু হিংসা হয়। মেয়ে ব'লেই এত উপেক্ষা, না তা-ছাড়া তোমার ভিতর অলৌকিক কিছু আছে, যা' আবাল্য ঘনিষ্ঠতা আমার চোখকে আড়াল ক'রে রেখেছে?

ভাল আছি। কুশল চাই। ভালবাসা নিও, ইতি—

--ঝরণা

ঝরাদল, ২২শে কার্ত্তিক, '৪৪

দাদা,

তোমার চিঠি পেলাম। ব্যথা পেলে তুমি হিংস্রতায় বাঘকেও ছাড়িয়ে যাও! আমি করলাম তোমার স্তুতি, আর পালিশকরা গালাগালি কিনা তার বিনিময়ে?—

এটা তোমাদের বাড়াবাড়ি—দাদা! মৃণাল (বাবু?)র সঙ্গে ত সাত জন্মেও দেখা হয়নি,—চিঠি লেখা-লেখিও নেই—সত্যি কথা বল্‌তে কি, তাঁর কথা আমার মনেও ছিল না তখন। তোমার গুণ-গানে এত আনমনা হ'য়েছিলাম যে, অন্য তৃতীয় ব্যক্তির কথা মনে না হওয়া বড় একটা আশ্চর্য্যের বস্তু নয়।

তাঁর কথা তোমার চিঠিতে একটুও লিখিনি, তাই এত ক্ষোভ! কেন, তিনি তোমার কে? বন্ধু, না বান্ধবী?— আচ্ছা, তাঁকে আমার নমস্কার জানাইও। —ইতি

—ঝরণা

ঝরাদল, ১৫ই অঘ্রাণ, '৪৪

দাদা,

তোমার চিঠিটা এবার আমাকে অনেক ভাবিয়ে তুলেছে। সুতরাং দেরী হওয়াটা কিছু অমার্জ্জনীয় অপরাধ নয়!—

শীগ্‌গির পত্র চেয়েছিলে। লেখা হয়ত পৌঁছাত, কিন্তু জবাব দেওয়া হত না—তাই, একটু দেরিতেই লিখ্‌ছি।

তোমার হাতের লেখা, ভাবের উচ্ছ্বাস ও ভাষার সাবলীলতা এবার আশ্চর্য্যরূপে বদ্‌লে গেছে! আদৌ তোমার কিনা—সন্দেহ হয়। চিঠিতে লেখকের ও রচয়িতার মনের গোপন কোণের সংবাদটি আমার কাছে প্রস্ফুট না হ'লেও একেবারে অস্পষ্ট নেই। তাঁর জন্য........যাক্‌।

আচ্ছা দাদা, তোমরা না শিক্ষিত, তোমরা না পুরুষ ছেলে, তোমরা নাকি ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের আশা-ভরসা! তোমরা কেন একটুক্‌রা কচিমেয়েকে এত সঙ্কোচ, এত সম্ভ্রম, অযথা অতিরিক্ত মূল্য দেবে? সুস্থ মনের সরল, সহজ সত্য কথাটি অনাড়ম্বর নির্ভীকতার সঙ্গে বলা কি তোমাদের অতি আধুনিক শালীনতা-বোধে বাধে? একগুঁয়ে মেয়ের একরোখা কথাকে ভুল বুঝ না—

প্রণাম, ইতি—

—ঝরণা

ঝরাদল, অঘ্রাণ-সংক্রান্তি

দাদা,

তোমার অতি দ্রুত পরিবর্ত্তনের তালে তালে আমি পা ফেল্‌তে পার্‌ছি না। তোমরা অত ছুটছ কেন?— ছোটাই বুঝি পৌরুষের চরম নিদর্শন?

বাবার কাছে এর ভিতর তোমার তের পৃষ্ঠার এক চিঠি এসে হাজির! এত উদ্যম, আর ধৈর্য্যের প্রেরণা কে যোগাচ্ছে আজকাল? জানতাম—দু-লাইনেই নাকি তোমার সব-কিছু বক্তব্য শেষ হ'য়ে যায়। 'মানুষ 'এনভেলপ' কেনে কেন?'—এটাই ছিল তোমার বিস্ময়ের বিষয়! কিন্তু আজ এ কি অনাচার? জলেও তা' হ'লে শিলা ভাসে—কেমন?'

আচ্ছা, তোমার কথাতেই আসি। বাবা মাকে বল্‌ছিলেন —"দেখ, হৃষীকে যে স্নেহ করি—সেটা অনর্থক নয়। বাইরের বস্তুজগতের আকর্ষণ যেমন মানুষে উপেক্ষা কর্‌তে পারে না—দড়ি বেঁধে আমাকে কেউ টান্‌লে, যেমন আমাকে তার কাছে যেতেই হয়, তোমার আঁচলটি ধ'রে রাখ্‌লে যেমন তুমি পাশের ঘরে যেতে পার না, তেমনি অন্তর্লোকেও এমনি সব আকর্ষণ আছে। সেগুলো অদৃশ্য, তবে অশক্ত নয়। আমার স্নেহের আকর্ষণ, তাকে আমার প্রাণের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। যে-কথাটি আজ ক'দিন আমরা বলা-বলি কর্‌ছি, সে-কথাটি দিব্যি সোজা হৃষীকেশের অন্তরে গিয়ে ছুঁয়েছে—অবাক কান্ড!......

সে তার বন্ধুর সঙ্গে খুকির বিয়ের কথা লিখেছে।......

তারপরেই সেই তের পৃষ্ঠা। আমাকে আহ্বান; নেপথ্য হ'তে আমার প্রকাশ্যে আবির্ভাব!

আর কি? বাবার মন্তব্যটাও কি শুন্‌তে চাও? না— তা' আর শুন না; সেটা একটু খেদাত্মক কিনা! আচ্ছা, বলিই না?—

"হ্যাঁ, শুনছ! তোমার মিষ্টার বাসুকে মনে আছে? আজ আমার কেবল তারই কথা মনে পড়্‌ছে—সে আমায় বড্ড ভালবাস্‌ত! সে আমার জন্য কি-না ক'রেছে। "মা-লক্ষ্মীটিকে আমাকেই দিস্‌"—এ প্রতিশ্রুতিটাও সে কেড়ে নিয়েছিল; কিন্তু আজ সে কোথায়?—সংসারের চাপে তাও জানা নেই। এ-ই ত দুনিয়ার নিয়ম!......হ্যাঁ, হৃষী দেখ্‌ছি, আমার সেই হারান বন্ধুর স্থান সব দিক দিয়েই পূর্ণ করল!—তবে ছেলেমানুষ কিনা! তাই, এত ক'রে মিনতি ক'রে আমার মতের জন্য লিখেছে। বোস্‌ হ'লে কিন্তু বিয়ের দিন ঠিক ক'রে দু-লাইনে বক্তব্য ও দু-দিনেই তার কর্ত্তব্য শেষ ক'রে ফেল্‌ত—কেমন কিনা? একেই বলে— সত্যিকারের বন্ধু! বন্ধুত্বের দাবী!......"

দাদা, আমাকে চিরদিন যেমন সহ্য ক'রে এসেছ, এই বাচালতাকেও তেমনি স্মিত-হাসিতে উড়িয়ে দেবে—জানি। প্রণাম নিয়ো তোমারা! ইতি— . তোমাদের 'ঝরণা'

ঝরাদল, ২৩শে পৌষ, '৪৪

দাদা,

তোমার-লেখা চিঠি ক্রমেই বড় আর গভীর হ'য়ে উঠ্ছে। তার কারণ—সহজ ও স্বাভাবিক।

ভরা ভাদর—বাইরে ভিতরে দু'যায়গাই আছে। যখন ভিতরে—মানুষের মন তখন রূপ-রসের অনুভূতিতে কানায় কানায় ভরা। স্বীয় প্রাচুর্য্যের স্তব্ধ মাধুর্য্যে সে মশগুল—মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, সামাজিক বাধা-বিঘ্নের প্রতি সে তখন উদাসীন। তার হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার স্পন্দিত হচ্ছে খোলার জন্য; প্রাণের প্রসারতা দিগন্তে গিয়ে ঠেকেছে। ভালবাসার সবুজ প্রাণবন্ত শষ্পে তার মনের বিস্তীর্ণ প্রান্তর পূর্ণ। মানুষকে নির্ব্বিবাদে ভালবেসেই শান্তি, তাতে বিঘ্ন ঘটলেই বিপত্তি। কস্তুরি হরিণের মত আপনার প্রেম বিলাবার উদ্দীপনায় সে তখন উন্মাদ! বিচারের অবকাশ তার নেই!..

তবু এই ভালবাসারও প্রকার-ভেদ আছে—তার অবচেতন মনে। তাই সে তখন বিচার-বুদ্ধিহীন। আপনার জনের সুবুদ্ধি আর শুভেচ্ছাই তখন তার সম্বল। সেই পাথেয় মাথায় নিয়েই সে তার নতুন জীবন আরম্ভ করে। দুনিয়ার দুস্তর মরু-প্রান্তর, নদ-নদী সব পেরিয়ে পরপারের আলোর রাজ্যে গিয়ে পৌঁছায়!

মনের ম্লানতা, অনুজ্জ্বলতা, সংশয় মানুষের অন্তরকে নিরন্তর আবৃত করে আছে। সহজাত এই সব দীনতা-দুর্ব্বলতাকে একপাশে সরিয়ে নিজের অন্তরের সত্য রূপটিকে প্রকট করা দুষ্কর। সেই জন্যই মানুষের জীবনে সমাজের, প্রিয়-পরিজনের সাহচর্য্যের প্রয়োজন—নয় কি?

এবার বাবার কথায় ফিরি। তাঁর কাছে নাকি তুমি সবই জানিয়েছ—শুধু মৃণালবাবুকেই কেন্দ্র ক'রে। তাঁর দেশের কথা, বংশের কথা, মা-বাপের কথা—লেখা বোধ হয় অনর্থক মনে ক'রেছ। মৃণালবাবুর কথা-বার্ত্তা, চাল-চলন্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি, জীবনের বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ আর সর্ব্বোপরি তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য্যের সবিস্তার বর্ণনাই নাকি তোমার চিঠির বিষয়বস্তু। তাঁর অন্তরের একটা সুন্দর সুস্পষ্ট ফোটোগ্রাফ নাকি তোমার কলমের আঁচড়ে ভাষার বর্ণচ্ছটায় ফুটে উঠেছে? সত্যি?—

বাবার বোধ হয় মত আছে সবটুকুই। মৃণালবাবুর বংশাবলীর সুদীর্ঘ তালিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না—যাক্, তুমি নিশ্চয়ই এসব বাবার চিঠিতে জেনেছ।—

হ্যাঁ, আমার প্রণাম নিয়ো, আর—আর মৃণাল বাবুকে জানাবার মত কি-ই বা আমি বলতে পারি। ও নাম-টির সঙ্গে একটু পুলকের ছোপ-দেওয়া ব্যথা, এক টুকরা স্বপন-জড়ান রঙিন্ মায়া যেন খেলে যায় নিরালা পর্দায়, যেখানটায় তোমার চিঠি বিজলী-চমকের মতই আচমকা ফুটিয়ে তুলেছে অরূপকে। এর বেশী কি বল্‌বার থাকতে পারে চক্ষুহীনের সামনে চলচ্চিত্র মেলে ধরলে? তবে যা লিখলাম অবিশ্বাস কর না—মুখফোঁড় এ মেয়েটিরও আকাশ আছে এক ফালি, যা তারই নেহাৎ নিজস্ব, যেখানে চাঁদ উঁকি মারে, তারা হাসে—সারা বিশ্বের বিধি-নিষেধের দোলা যেখানে কালো-মেঘের সৃষ্টি করতে পারে না।

—ইতি

তোমার ঝরণা।

ঝরাদল, ১৯শে মাঘ, '৪৪

দাদা,

নিরাকার নাকি সর্ব্বাকারেরই রূপহীন রূপ—শুনলাম এ হ'ল মস্ত বড় দার্শনিকদের শেষ সিদ্ধান্ত—অবশ্য ভারতীয় মতে। কথাটা ত ঠিকই মনে হয়, যে সর্ব্বাকার সে নইলে আবার কার ক্ষমতা থাক্‌তে পারে আকারহীন রূপ পাবার।

চেয়ে দেখ আজ তোমার বোনটি সেই আকারহীনের রূপায়নে সুরভিত করেছে অন্ধকারপুঞ্জকে। অরূপের প্রতিমা গড়ে উঠেছে অদৃশ্যে—অলক্ষ্যে। যেখানে রহস্য—সেখানে বুঝি এমনই হয়।

কিন্তু......পথের ধূলায় কি প্রতিমা মিলিয়ে যাবে শেষ! পূজার উপচার বৃথা, আবাহনের আগেই বিসর্জ্জন!

তবে তুমি এ কি করলে! কি দরকার ছিল—কে বলেছিল—এ বিশ্ববিহীন মেয়েটির ছোট্ট আকাশখানিকে গানে গানে ভরিয়ে দিতে—যদি সে গান এমন খেয়ালের মোহ-জড়িমাই হবে—যাদুর কাঠির পরশও যে মোহ-তন্দ্রাকে পারে না টুটাতে!

বাবাকে যে-চিঠি দিয়েছ—সে-চিঠি দেখলাম! আমাদের চিঠি পাবার আগেই মৃণালবাবু তাঁর বাবার টেলি পেয়ে রওনা হ'য়ে গিয়েছেন, তাই তুমি তাঁর বাবার নাম-ঠিকানাটা অবধি লিখ্‌তে পারনি—নিশ্চয় ক'রে! কোন্‌দেশী বন্ধুত্ব? তুমি দেখ্‌ছি—বাবার মতই আদর্শ-বাদী, কল্পনা-বিলাসী। মনের মিল হ'লে আর সব-কিছুই তোমরা অকিঞ্চিৎকর মনে কর। তোমরা সমাজ উপেক্ষা কর্‌তে পার, কিন্তু মেয়েরা তা পারে না। তারা সামাজিক জীব—প্রাণের দায়ে তাদের সমাজ মান্‌তে হয়—বুঝলে!.....

দাদা, মানুষের দুর্ব্বলতার অন্ত নেই। তার মনের স্বাভাবিক গতিই সহস্র-মুখী। কাকে চায়, আর কাকে সে চায় না—সত্যি ক'রে বলা কঠিন! মৃণালবাবুকে পেতে মাঝে মাঝে আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ত—সত্যি! আমার সে-ব্যাকুলতা আরও বেড়েছিল যখন শুনলাম না-জানা, না-শোনা বন্ধুর এক দূরসম্পর্কীয় বোনকে বিয়ে করাতে তাঁর বাবার ঘোর আপত্তি! মনে হ'য়েছিল—পাওয়া-মাণিক বুঝি হারিয়ে ফেলি? আমাকে না-পেলে তিনি আত্ম-হত্যা ক'রবেন যখন কানে এল ব্যথায় প্রাণটা কন্‌কনিয়ে উঠ্‌ল, হৃদয় সহানুভূতিতে ভ'রে গেল সত্য, কিন্তু মনটা আর সাড়া

দিল না। আবেগের সে একাগ্র ঐকান্তিকতা ক্রমেই লোপ পেতে লাগল। অন্তরের পূর্ণতা রিক্ততাকে স্থান ছেড়ে দিল! তাই ভাবি—দাদা, কেন এমন হয়? যে ভালবাসে, যাঁকে ভালবাসা কর্ত্তব্য মনে করি তাঁকে কেন একান্ত ক'রে ভালবাসতে পারিনে।

গ্লানিতে, ধিক্কারে আমার প্রাণটা আজ বড়ই জীর্ণ; আত্ম-দমনের চেষ্টায় মনটা অবসন্ন। তোমাকে প্রণাম করি। মৃণালবাবুর খবর কি? কিসের টেলিগ্রাফ? পত্র পেয়েই জবাব দিবে। ইতি—

তোমার 'ঝরণা'

ঝরাদল, ২০শে চৈত্র, '৪৪

দাদা,

মৃণালবাবুর বিয়ে?—আগেই ঠিক ছিল? সে কি! তবে আগে বলোনি কেন? জানতে না? এখন কোথায় হ'চ্ছে—সে খোঁজও রাখো না— বটে!

হ্যাঁ, তার বাবা জোর ক'রে বিয়ে দিচ্ছেন—তার তাতে মত নেই; তবু তাকে করতে হ'চ্ছে!—ভুলে যাচ্ছ দাদা, এটা বিংশ শতাব্দী আর তোমরা পুরুষ ছেলে! শিক্ষা ও নিজের হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বুদ্ধির যার এতটুকু কমতি নেই —তিনি মনুষ্যত্বের ধর্ম্মকে, আত্মার ধর্ম্মকে বাবার একটা নিছক খাম-খেয়ালে বিসর্জ্জন দিতে চ'লেছেন? এতে শুধু তিনিই আত্মঘাতী হ'চ্ছেন না, সঙ্গে সঙ্গে দু'একটি মেয়ের সমস্ত জীবন ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছেন।—মেয়েরাও মানুষ!

সত্যি দাদা, পুরুষগুলো কি স্বার্থপর। লুঠ করা আর ছুট দেওয়া যেন তাদের কাজ! অন্তর ব'লে ওদের কোন বালাই নেই। চরিত্র ব'লে কোন সুদৃঢ় ভিত্তি ওদের কোথাও নেই যেখানে ভর ক'রে ওরা দাঁড়াতে পারে। উঃ, তোমরা কি? যেন সর্ব্বগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখা। চমক দিয়ে মানুষের মনকে হরণ করে, ধরতে গেলেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে শেষ করে দাও! এই তোমাদের প্রেম, ভালবাসা!

বেশ ভাল কথা। আজ আমার আর কিছুই বলবার নেই; শুধু তোমার পায়ে আমার একান্ত আন্তরিক প্রার্থনা তুমি তোমাকে আর পীড়ন ক'র না। ভুলতে চেষ্টা কর; সব সময়ই—মনে ক'র—এটা মর্ত্ত্য, স্বর্গ নয়—মানুষ মানুষ, কখন দেবতা হ'তে পারে না; তা হ'লেই সান্ত্বনা পাবে। প্রণাম ইতি—

তোমার ঝরণা।

পুনঃ বাবার কথা? তাঁর জন্য আর ভেব না।

ঝরাদল, ২৫শে বোশেখ, '৪৫

দাদা,

বাবার চিঠিতে আসছে ৩০শে আমার বিয়ে শুনে বিস্মিত হ'চ্ছ? তা বিস্মিত হ'তে পার, কিন্তু ব্যথা পেতে পার না। ওটা আমাদের দু'জনের জীবনে এখন এই সময় পাওয়া একান্ত দরকার। আত্ম-নিগ্রহের এ'র থেকে বড় ব্যবস্থা আর নেই। আশা করি, এই ওষুধের তীব্রতায়, তিক্ততায় আমাদের মনের সূক্ষ্ম ও সুন্দর অনুভূতিগুলি শুকিয়ে মরে যাবে। তখন জীবনে আনন্দ না পেলেও, আঘাত পাব না; দুনিয়ার কোন কিছুই মর্ম্মস্পর্শ করতে পারবে না। তাই, সর্ব্বান্তঃকরণে এই ওষুধের ব্যবস্থাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি।

বিয়েতে তোমার উপস্থিতি চাই-ই। সে-দুর্দ্দিনে তোমাকে কাছে না পেলে হয়ত নিজেকে সামলাতে পারব না! তোমার আন্তরিকতায় আমি শক্তি পাব।

বাবার বন্ধু মিষ্টার বোস্ সেদিন জরুরী এক চিঠি লিখেছেন তাঁর ছেলে খোকার এখনি বিয়ে দেওয়া দরকার। অথচ সামনেই জষ্টিমাস—জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে হ'তে পারে না; তাই আসছে ৩০শে বোশেখ দিন ঠিক করতে হ'ল। তিনি সবাইকে নিয়ে ২৮শে কলকাতায় ১১াই আরপুলী লেনে যাচ্ছেন—এবং আমরাও ঐ দিনই রওনা হচ্ছি। বাবা টেলি ক'রে সম্মতি জানিয়েছেন। আমাদের জন্য ৪৮।এ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট বাড়ী ঠিক ক'রেছেন। তোমাকে অন্তত সেইদিন সেইরাত্রে সে-বাড়ী যেন পাই-ই পাই।

দাদা, যা' সত্য, তা' প্রাণের চেয়েও বড়। কিন্তু তাই ব'লে স্বেচ্ছায় প্রাণহানি ঘটালে ত সত্যোপলব্ধি হ'ল না—সেটা হ'ল সত্যের অপলাপ। প্রাণরক্ষা ক'রে দুঃখের ভিতর দিয়ে, বেদনার ভিতর দিয়ে সত্য পালন করলেই তবে সত্যিকারের সত্য-ব্রত জীবনে উজ্জ্বল হ'য়ে দীপ্তি পেতে পারে। প্রাণ-হীনের কি আর সত্য ব'লে কিছু আছে? তোমার একান্ত শুভেচ্ছাই আমার প্রাণে শক্তি ও জীবনে সার্থকতা আনবে—জেন। প্রণাম নিয়ো। আসতে অন্যথা না হয়। ইতি—

তোমার 'ঝরণা।'

কলকাতা, বোশেখ-সংক্রান্তি, '৪৫

শ্রীচরণেষু,

দাদা, কাল নির্ব্বিঘ্নে বিয়ে হ'য়ে গেছে। তুমি যে আসতে পারবে না—জানতাম। তুমি আসনি, আসতে পারনি শুনেই আমি 'মরিয়া' হ'তে পেরেছিলাম—আমার সে মর্ম্মান্তিক ক্ষতকে কপট হাসি দিয়ে লুকাতে পেরেছিলাম। তোমার প্রাণে সে হাসি নিশ্চয়ই কান্নার চেয়েও বেশী ক'রে বাজত।

বিয়ে হ'য়ে গেল। মনে মনে আমার ঠিকই ছিল—ওকে যেন আর ব্যথা না দি। আমার যদি সমস্ত বৃত্তির ধ্বংসও ঘটে, আধ্যাত্মিক মৃত্যুও যদি হয়, তবু যেন অন্তরহীন না হই।......

বাসর ঘর। পাশাপাশি দু'জন শুয়ে আছি—অন্ধকারে অনেকক্ষণ। একে একে বাড়ীর সব বাতি গেল নিভে। নিথর মৌন রাত্রি। মাথার উপরে বিজলি পাখার বিরামহীন আবর্ত্তনের শব্দ রাত্রির স্তব্ধতাকে আর বেশী নিবিড় ক'রে তুলেছে। কার চক্ষে ঘুম নেই, মুখে কথা নেই। ওঁর মৌনতা, বারে বারে পাশ-ফেরা, মাঝে মাঝে চাপা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলা আমাকে বড়ই বিব্রত করে তুলছিল। নিজের 'পরে ধিক্কারে, গ্লানিতে মনটা বিষিয়ে উঠল। মনটা শক্ত করবার জন্য আপ্রাণ করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই মুখে কথা ফোটে না। 'কি বলব? হয়ত কুণ্ঠিত কথাটা অভিনয়ের মত শোনাবে?'......এমনি সব সন্দিগ্ধ-মনে কত অকারণ ভীতি-

(শেষাংশ ৫৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিচিত্র বার্ত্তা

সংবাদপত্র-সরবরাহকারী কুকুর

প্রতিদিন বিকাল বেলা পৌনে চারটার সময় লণ্ডনের এক্‌টন অঞ্চলে পিটার নামক কুকুরটি তাহার মালিক মিঃ এবং মিসিস গিবন্‌স্-য়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া জি ডব্‌লিউ আর ষ্টেশনে যায়। প্যাডিংটন হইতে ৪-২০'র ট্রেন্ পৌঁছা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। সংবাদপত্রের মোড়কটি 'মুখস্থ' করিয়া বাড়ীর

ষ্টেশন প্লাটফরম হইতে কাগজ-খানি সংগ্রহ করিতেছে কাগজ ফিরিওয়ালাকে সে চিনে
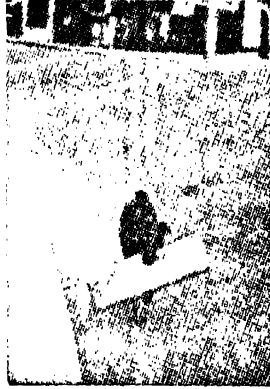
রাস্তায় ফুটপাথের পাশে পাশে চলে— মাঝ রাস্তায় যায় না

পুলিশ হাত তুলিলে তবে সে রাস্তা পার হইয়া মালিকের দোকানে ঢোকে—সেখানে মালিককে না পাইলে বাড়ী ফিরিয়া আসে কাগজসহ

পথে ফিরে। কোনও দুর্ঘটনায় পতিত হয় না, কারণ সে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম-কানুন সকলই জানে। ট্রাফিক পুলিশ হাত তোলে সে রাস্তা পার হয়, কাগজখানি মুখে করিয়া বাড়ী পৌঁছে নিরাপদে। কিন্তু পারিতোষিক যে এক বাটি দুধ বরাদ্দ করা আছে, তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত খবরের কাগজ কাহাকেও ছুঁইতে দেয় না। বখশিস মিলিলে কাগজখানি মালিকের হস্তে দেয়।

কাউণ্টেস্ অফ্ মেয়োর আক্ষেপ

আমি নারী, আমার ইচ্ছা হয় পুরুষগুলাকে আচ্ছা করিয়া শিক্ষা দিয়া দেই। অনাহূতই এই জগতে আসিয়া উহারা আবির্ভূত হয়; আবার যখন এ জগৎ হইতে বিদায় লইবার আহ্বান আসে, তখন সে যাইতে চাহে না, আশ্চর্য্য! যখন ছোট্ট থাকে এতটুকু, তখন বড় বড় মেয়েরা তাহাকে চুম্বন দিতে আগাইয়া আসে; কিন্তু যখন সে বড় হয়, তখন শুধু কচি মেয়েরাই তাহাকে চুম্বন দিতে চায়। সে তাহার স্বাস্থ্যকে ব্যবহার করে অর্থোপার্জ্জনের অস্ত্র হিসাবে, তারপরে আবার বোকার মত সেই অর্থই দুই হাতে খরচ করে পুনরায় স্বাস্থ্যকে অর্জ্জন করিতে। আহাম্মকদের কোন জ্ঞান যদি থাকে।

ভূত বনাম প্রণয়

লণ্ডনের কোনও বিখ্যাত সংবাদপত্র বলিতেছেন,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভূতের গল্পের পাল্লায় শ্রোতাদের আতঙ্কগ্রস্ত করিত, কিন্তু বলা বাহুল্য, আমরা আর ভূত বিশ্বাস করি না। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, গল্প-কথক এখন ভূতের আসনে রহস্যাবৃত প্রেমকে বসাইয়া এমন উদ্ভট কাহিনীর অবতারণা করে যে একদল লোক উহাকে অতি মুখরোচক মনে করে। আবার অহেতুক আতঙ্ক সৃষ্টিও আজকাল রেওয়াজ হইয়াছে—কারণ জনসাধারণ যেন বিষম আতঙ্কগ্রস্ত হইতে তৃপ্তি বোধ করে। এই আতঙ্ক-পিয়াসী নরনারীর তৃষা নিবারণের যেন ব্যবসাই পরিচালিত হইতেছে দেশময়। যাহারা জনচিত্তে এই নেশার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে, তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তিকে তারিফ করিতে হয়।

জিপসিদের ভূত তাড়াইবার কৌশল

ছয়টি পুরোহিত, একটি সন্তান-সম্ভবা নারী, একটি ধাড়ী কুকুর ও একটি মুরগী ভূত তাড়াইবার ব্যাপারে প্রয়োজন। ঐ নারী মুরগীটিকে হাতে বসাইয়া ভূতকে আহ্বান করিবে। ভূত তখন আসিতে বাধ্য হয়। তখন পুরোহিতেরা ঐ নারী দ্বারা ভূতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে—কেন সে এ রাজ্যে ফিরিয়া আসে, দুঃখ কি তাহার। ভূত মুরগীর মুখে সব জানায়। তখন পুরোহিতেরা তাহাকে প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহার অভিযোগের বিষয় দূর করা হইবে, যদি ভূতও কথা দেয় সে আর ফিরিয়া এখানে আসিবে না। ভূত রাজি হইলে, কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া কোন অদৃশ্য মূর্ত্তির পশ্চাৎ ধাবন করে, তাহা হইলেই বুঝা গেল, ভূত দূর হইয়া গেল। কিন্তু যদি কুকুর এই প্রকার সাড়া না দেয়, তবে ভূত নারাজ একথা বুঝিতে হইবে। সে অবস্থায় পুনরায় অন্য সন্তান-সম্ভবা নারীর সাহায্যে পুনরায় ভূতকে আহ্বান করিতে হইবে।

পুস্তক পরিচয়

মীরকাশিম (পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত)—ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। গ্রন্থকার—শ্রীমন্মথ রায় এম-এ। প্রকাশক—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

সুবে বাঙলার শেষ স্বাধীনচেতা প্রজাদরদী নবাব মীরকাশিম—তাঁহার দুর্ভাগ্যে, তাঁহার শোচনীয় পরিণামে বাঙালী জাতি চিরব্যথী। অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধের প্রথম পাদে বাঙলার মস্তকে পলাশীর বজ্রাঘাতের পর যে জমাট ঘনান্ধকার সমগ্র দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহারই ভিতর বঙ্গবাসীর মনের গহনে এক উজ্জ্বল আশা-প্রদীপ প্রভান্বিত হইয়া চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়,—জাতীয় স্বাধীনতার সেই সাঁঝের প্রদীপ—নবাব মীরকাশিম। তাঁহারই অশ্রুসিক্ত কাহিনীকে অভিনয়োচিত যে রূপায়নে গ্রন্থকার সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিষয়-নির্ব্বাচন ও ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা—উভয় কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিহাসের পটভূমিতে, বিশেষ করিয়া নবাব মীরকাশিমের করুণ ইতিবৃত্ত লইয়া বাঙলায় নাটক রচনায় প্রয়াস নূতন নয়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী অতি অল্প সংখ্যক ঐতিহাসিক নাটকই বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের অন্তরের তারে স্পন্দন তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। মন্মথবাবুর মীরকাশিম পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি এই জন্য যে,—নিবিড় দেশাত্মবোধ, বৈদেশিক স্বার্থান্বেষীদের শোষণের প্রতিকার, দীন-প্রজার দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচন, বাঙালীকে মুক্ত জীবনের আস্বাদ প্রদান—মীরকাশিম চরিত্রের এই যে মর্ম্মকথা, নাটকখানিতে তাহা গভীর রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। নবাব মীরকাশিমের দেহাবসানেও যাহা অন্তর্হিত হয় নাই—শত বিরূপ সমালোচনার জগদ্দল পাষাণ চাপেও যাহা রুদ্ধশ্বাস হয় নাই—নবাব মীরকাশিমের সেই মরণজয়ী স্বদেশপ্রেমের পুণ্য-স্মৃতিতে নাট্যকার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন।

আর তরুণ বাঙলার আশা-আকাঙ্ক্ষা—তাহার স্বাধীনতার পতাকা বহনে নির্ভীকতা—দেশের জন্য তাহার চরম ত্যাগ-ব্রত, নাট্যকারের নিপুণ তুলিকায় নাজামদ্দৌলা চিত্রে সার্থক হইয়াছে যোগ্য সজীবতার ভিতর দিয়া।

ইতিহাসের জটিলতার অন্তরায় কাটাইয়া, ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের প্রতিকূলতা ছাপাইয়া যে নিপুণতার সহিত সমগ্র ঘটনাকে রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে, তাহাতে একদিকে যেমন প্রচুর ইতিহাস-চর্চ্চা ও মানব চরিত্রাঙ্কনে মনোবিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, তেমনই গ্রন্থকারের সাহিত্য-প্রতিভার বিশিষ্ট সরস ছাপ অঙ্গাঙ্গীভাবেই প্রসার লাভ করিয়াছে।

আমরা নিঃসন্দেহে এই কথা বলিতে পারি যে নাটকখানি দেশপ্রাণ বাঙালী নর-নারীর চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার। মূল্য ছয় আনা। সোল এজেন্ট—আর্য্য পাবলিশিং হাউস। ৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"—রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের এই বন্দনা-গানে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আছ জাগি সদা পরিপূর্ণতার তরে যার লাগি নরদেব চিররাত্রদিন তপোমগ্ন।" শ্রীঅরবিন্দের সে তপস্যা এখনও ভঙ্গ হয় নাই। "দীর্ঘ এগার বৎসর শ্রীঅরবিন্দ মনুষ্য সমাজ থেকে দূরে শান্ত সমাহিত, আত্মধ্যানে মগ্ন।" পরিপূর্ণতা লাভের যে আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে একদিন আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, সুদীর্ঘ সাধনার বলে, তিনি সেই পরিপূর্ণতার সন্ধান পাইয়াছেন। পরিপূর্ণতাকে তিনি আজ জীবনে সত্য করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ণতায় তিনি আজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে মহাশক্তি এই জগৎকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছে, আমাদের এই নিতান্ত প্রাকৃত জীবনের ভিতর দিয়া, আমাদের চেতনা এবং অনুভূতির মধ্যে আমরা যে শক্তির অল্প আকারে এবং অস্পষ্টভাবে একটু একটু আভাষ পাই মাত্র, যোগী যাঁহারা, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী সাধক তাঁহাদের দিব্য দৃষ্টিতে তাহাই পূর্ণতায় ফুটিয়া উঠে; ভক্তের প্রেমনেত্রে হয় তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।" এমন দেখা যিনি দেখতে পারেন, তিনিই জগৎকে সত্যকার দেখিয়াছেন। যে জিনিষ পূর্ণ, পূর্ণতাই যাহার স্বরূপ খণ্ডজ্ঞান লইয়া তাহাকে দেখা, ঠিক দেখা নয়, ঠিক বুঝা নয় এবং সেই ঠিক না দেখা বা না বুঝার ফলই হইল মানুষের যত দুঃখের মূলে। বন্ধন, পীড়ন, দুঃখ যত কিছুই আমাদের অনুভূতির আকারে আসে সবই ইহারই ফল। যিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, বন্ধন, পীড়ন, দুঃখের তিনি অতীত। সেই সব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে তিনি থাকিতে পারেন অচঞ্চল, অটল এবং আনন্দময়। আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান তাঁহার জীবন হইতে ঝংকৃত হইয়া উঠে।

এই যে দেখা, এই দেখাতে সৃষ্টির ভিতর দিয়া যে দিব্য কৌশল রহিয়াছে তাহাই প্রতিভাত হয়। যোগ সেই কৌশল। সেই কৌশল ধরিতে পারিলে আসে দুঃখের সংযোগহীন অবস্থা, তাহার অর্থই হইল অল্প হইতে ভূমার প্রতিষ্ঠা। ভারতের দার্শনিকগণ এই সত্যের সন্ধান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহারই জয়গান করিয়াছেন। ভারতীয় বিভিন্ন সাধন এবং যোগমার্গ বা দর্শনের ভিতরকার কথা হইল উহাই।

শ্রীঅরবিন্দও সেই কথাই বলেন, তবে শ্রীঅরবিন্দের যোগের বিশিষ্টতা কি? ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার 'শ্রীঅরবিন্দের যোগে' সেই কথাটাই বলিয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্রের এই সব তত্ত্বকথা বলিয়া বুঝান অত্যন্তই কঠিন; কারণ এ সব বস্তু প্রধানত প্রত্যক্ষানুভূতি সাপেক্ষ। যে জিনিষ সকল প্রমাণের প্রমাণ, বাহিরের কোন যুক্তি-তর্ক বা প্রমাণের দ্বারা তাহাকে প্রমাণিত করা সম্ভব হইতে পারে না। পাণ্ডিত্যের ক্ষমতায় বড় জোর এই পথে চিন্তাধারাগুলিকে সাজাইয়া গুজাইয়া কিছুটা দূর আগাইয়া যাওয়া যায়; কিন্তু পণ্ডিতের 'স্ফুট-যুক্তি-কোটি-গরিম-ব্যাহারিণী' বাণীর এমন সাধ্য নাই যে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার মত আসল বস্তুটিকে দেখাইয়া দিতে পারে। সেজন্য অন্য কিছুর দরকার, দরকার আত্মোপলব্ধির। ডাক্তার সরকার একজন অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি। দর্শন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রথিতযশা; এজন্য তিনি আন্ত-

র্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের একজন বড় ব্যাখ্যাতা হিসাবে জগতের সর্ব্বত্র তিনি যশের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, তিনি নিজে একজন সাধক পুরুষ। নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এদিকে তাঁহার আছে এবং তাহা আছে বলিয়াই শ্রীঅরবিন্দের সাধনার তত্ত্বটা তিনি অল্পের মধ্যে এমন সুন্দর করিয়া, এমন সরস এবং প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতের লেখাতেও এমন সব দুরূহ বিষয়ে পরিভাষার জটিলতা আসিয়া পড়ে। ডাক্তার সরকারের লেখায় সে জটিলতা নাই। তাঁহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ভাষাকে সরল এবং সহজ করিয়া দিয়াছে; তর্ক-যুক্তির জাল হইতে মানুষের সহজ জ্ঞানের কাছে তত্ত্বার্থকে উজ্জ্বল করিয়াছে। সচরাচর এরূপক্ষেত্রে কথা বাড়াইতে হয়, কিন্তু ডাক্তার সরকারকে কথা বাড়াইতে হয় নাই, তিনি অল্প কথায় অনেক বুঝাইয়া দেন এবং বুঝাইয়াছেন, সহজবোধ্য ভাষায়—শুধু তাহাই নহে, আগাগোড়া মাধুর্য্যের একটা সুর বজায় রাখিয়া। বইখানার কোথায়ও সে সুর কাটে নাই। ডাক্তার সরকারের লেখার বিশেষত্ব হইল এইখানে।

শ্রীঅরবিন্দ আজ আত্ম-সমাহিত। ভারতের রাজনীতির বহিরঙ্গের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষভাবে যোগ না থাকিলেও ভারতের চিন্তাধারা হইতে তাঁহার জীবন বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁহার তপস্যার তেজ ভারতের চিন্তা জগতকে নূতন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিতেছে। সে জ্যোতির তরঙ্গ ভাবধারার আকারে জাতির নূতন গঠনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিতেছে। ভারতের সাধনা, ভারতের সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সভ্যতার আলোক দেশে দেশে বিচ্ছুরিত করিতেছে। ভারতের ব্যবহারিক কর্ম্মজীবনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ যোগের পরিচয়, আমাদের চোখে পড়িতেছে না বটে; কিন্তু জীবনের উৎস যে ভাবধারা তাঁহার সাধনা তাহাকেই প্রভাবিত করিতেছে। শ্রীঅরবিন্দের যোগ, জীবনের যোগ। তিনি জীবনেরই জয়গান গাহিয়াছেন। তাঁহার জীবন জ্যোতির্ম্ময় জীবন। তাঁহার সেই যে জীবনধর্ম্ম, সে ধর্ম্মে তিনি জীবন্ত এবং ক্রিয়াশীল। তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন। তাঁহার ক্রিয়া ভাব জগতের উপর ক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভারতের বাণী মূর্ত্তি তুমি।" সে বাণীর বীণায় যে ঝঙ্কার শোনা গিয়াছিল উত্তরপাড়ার অভিভাষণে, সেই বাণীই জ্যোতিষ্মতী হইয়া উঠিয়াছে, শ্রীঅরবিন্দের যোগে। সে যোগের উদ্দেশ্য হইল মানুষের জীবনকে সকল দিক হইতে পরিপূর্ণ করিয়া তোলা, শক্তিতে, জ্ঞানে, আনন্দে। কোনটিকেই ছাড়িয়া নয়, সবটিকে লইয়াই মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতা এবং সেই পূর্ণতায় অতিমানুষের বিকাশ, মানুষের দিব্য জন্ম। এই দিব্যত্ব মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে। জীবনের সকল প্রবাহের ভিতর দিয়া সেই দিব্যশক্তিকে ক্রিয়াশীল করিয়া তোলাই মানুষের পরম পরিণতি।

ডাক্তার সরকার তাঁহার 'শ্রীঅরবিন্দের যোগে' শ্রীঅরবিন্দের সাধনার এই রস-সার তাঁহার দেশবাসীকে উপহার দিয়াছেন। এসব বিষয় ভাবিবার এবং বুঝিবার, তাহাতে মানুষের চিত্ত উন্নত হয়,প্রশস্ত হয়, উদার অনুভূতি আসে। উদারতার সেই অনুভূতির মধ্যে আনন্দের আস্বাদ যাঁহারা পাইয়াছেন এ পুস্তক পাঠে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন, আমরা একথা জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি।

একান্ত শুভেচ্ছা

(৫৪৮ পৃষ্ঠার পর)

বিহ্বলতা! দাদা, শুধু সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে আমার মন বলেছিল—'আমার মরণ হয় না কেন?' নিজের দুঃখ-দুর্দ্দশার চরমতাও সহনীয়, কিন্তু মানুষকে যখন অনিবার্য্য কারণে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিষে দলে অস্থির করতে হয়, তখনি সেটা হয় অসহ, মৃত্যুই হয় কাম্য।

এমনি আমার মনে যখন তুমুল ঝড়, তখন তিনি হঠাৎ আমার দিকে পাশ ফিরলেন, যেন জোর ক'রে উঠে বস্‌লেন, তারপর আমার কপালটা চাপ্‌ড়ে বললেন—'দেখুন, আপনাকে আজ আর আমি কিছু গোপন ক'রব না। মনের বিরুদ্ধে অনেক লড়েছি। আর পারি না। আপনার 'পরে এতক্ষণ যে অবিচার ক'রেছি—তার জন্য ক্ষমা চাই।'

লজ্জায় আর নিজের মানসিক দীনতায় আমি একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়লাম। এ যেন চ'ক্ষে শলাকা বিঁধিয়ে আমার সব পাপ-পঙ্কিলতাগুলিকে ধরিয়ে দেওয়া। গুমরে-ওঠা কান্নায় বুকটা জ্বালা করতে লাগল।

তিনি আবার বললেন—শুনুন, এখান এই কলকাতায় আমার এক পরম বন্ধু আছে। সে আমার এক বিয়ে ঠিক ক'রেছিল। ঠিক করেছিল কি, আমি সে-মেয়েকে ভালবাসতাম—এখন বাসি। বিশ্বাস করতে পারবেন না, আমি তাকে কতদিন স্বপ্নে দেখেছি, যদিও আমাদের কোন দিন পরস্পরের দেখা হয়নি। শুধু এই বন্ধুর মারফতে ভাব ও ভাষায় হ'ত আদান-প্রদান। আপনার জন্য আমাকে এখন সবই করতে হ'বে—শুধু তাকে—তাকে বুক থেকে নামাতে পারব না। সে আমার প্রথম প্রেমের মানস-প্রতিমা; আমার ধ্যানলোকের মানস-মন্দিরে সেই অনধিগম্য-প্রিয়তমার পূজো চলবে—আজীবন, অব্যাহত। আর দেখুন, সেও আপনারই নামের—'ঝরণা।' আমার চরিত্রের এই দুর্ব্বলতাটুকুকে আপনার মেনে নিতেই হবে—আমার এই অসহায় অবস্থার জন্য আপনার কি একটুও দুঃখ হ'চ্ছে না?—বলুন! এই ব'লে ভাবাতিশয্যে তিনি আমার দুটি হাত ধ'রে ফেললেন।......

আমি তখন বিস্ময়ে বিমূঢ়। আনন্দোৎফুল্ল হ'তে গিয়েই আশঙ্কার কালো মেঘ জমে উঠল মনে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার সে বন্ধুর নাম?—জবাব হ'ল—হৃষীকেশ রায়, বাড়ী মুস্লিমনগর।

পরেরটুকু আর বলব না—দাদা। দাদা, তোমার ইচ্ছাশক্তিতেই কি মিঃ বাসুর 'খোকা' আজ মৃণালবাবুতে রূপ পেলেন? তুমি আমার প্রণাম নিয়ো আর আস্‌ছ কখন?

—ইতি তোমারই 'ঝরণা'

সাহিত্য-সংবাদ

১। জিতেন্দ্র[illegible] বিষয়—"বাঙলা ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রভাব"। [illegible]সূদন দাস স্মৃতিপদক, বিষয়—"ভারতের বাহিরে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব ও প্রসার"। ৩। যোগেন্দ্রলাল দত্ত স্মৃতিপদক, বিষয়—"ফল সংরক্ষণ ও তাহার ব্যবসা"। ৪। শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিপদক, বিষয়—"ভূগোল পাঠের সার্থকতা" (মাত্র ছাত্রদিগের জন্য)। ৫। শ্রীমঞ্জরী দাসী স্মৃতিপদক, বিষয়—"হিন্দু-সমাজ সংরক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার ধারা" (কেবল মহিলাদিগের জন্য)। ৬। সুবোলচন্দ্র দে স্মৃতিপদক, বিষয়—"স্বাস্থ্যরক্ষায় কোন্ ব্যায়াম বিশেষ উপযোগী"। ৭। গোকুলচাঁদ শীল স্মৃতিপদক, বিষয়—"পল্লীগ্রামের খেলা" (মাত্র ছাত্রদিগের জন্য)। ৮। বিশ্বনাথ রৌপ্যপদক, বিষয়—"Travelling as a means of education."

উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। কোন প্রবেশ মূল্য নাই। ১৭ই মাঘ, ১৩৪৫, ইং ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৯ সালের মধ্যে রচনা পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য বিবরণের জন্য ষ্ট্যাম্পসহ সম্পাদকের নিকট পত্র লিখুন। সম্পাদক, শান্তি ইনষ্টিটিউট, ২৬।১ শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, বহুবাজার।

নিখিল বঙ্গীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

"বর্ত্তমান সমাজে নারীর স্থান" বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন, তাঁহাকে "পাঁচথুপী" বাণী-মন্দিরের পক্ষ হইতে 'রাধাগোবিন্দ রায় সুবর্ণ স্মৃতি পদক' বিতরণ করা হইবে। আগামী ১৯৩৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পাদক "বাণী-মন্দির" পাঁচথুপী পোঃ (মুর্শিদাবাদ) ঠিকানায় রেজিষ্টারী যোগে প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে।

শ্রীসুনীলমোহন ঘোষ মৌলিক, সম্পাদক, পোঃ পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।

নিখিল বঙ্গ ছোট গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

উয়ারী বয়েজ ইউনিয়নের উদ্যোগে আগামী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে একটি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। তৃতীয় বিষয়টি ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণ যোগদান করিতে পারিবেন। কোন প্রবেশ মূল্য লাগিবে না। প্রত্যেক বিষয়ে একটি করিয়া রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। কোন লেখাই ফেরত দেওয়া হইবে না। আগামী ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৯, গল্প ও প্রবন্ধ গ্রহণের শেষ তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়া স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া লেখকের পূর্ণ নাম-ঠিকানাসহ প্রবন্ধাদি শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় রায়, ৭।২, লারমিনি ষ্ট্রীট, উয়ারী, ঢাকা; এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

[illegible] গল্পের বিষয় লেখক ইচ্ছামত নির্ব্বাচন করিবেন। গল্প মৌলিক এবং ছোটগল্প হওয়া চাই-ই। ১। প্রবন্ধের বিষয় (ক) "বঙ্গ সাহিত্যে গীতি-কাব্য।" চারি হাজার শব্দের অধিক থাকিলে চলিবে না। (খ) "সমাজ ও সাহিত্য।" এই প্রতিযোগিতাটি শুধুমাত্র বাঙলার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিবে। রচনা তিন হাজার শব্দের অনধিক হওয়া চাই। লেখার সঙ্গে স্কুল বা কলেজের নাম দিতে হইবে। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়, শ্রীগয়ানাথ গোস্বামী, যুগ্ম-সম্পাদক, সরস্বতী পূজা কমিটি (সাহিত্য বিভাগ); উয়ারী, ঢাকা।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

সুনামগঞ্জে 'তরুণ সাহিত্য চক্রের' উদ্যোগে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রবন্ধের বিষয়ঃ—'জাতীয়তার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ'। আসাম ও বঙ্গদেশের উচ্চ ইংরেজী স্কুলসমূহের যে কোন ছাত্র উহাতে যোগ দিতে পারিবেন। আগামী ১৯৩৯ ইংরেজীর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রবন্ধ সাধারণ সম্পাদকের হস্তগত হওয়া চাই। প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন এবং ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ঠিকানা—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী, সাধারণ-সম্পাদক, 'তরুণ সাহিত্য চক্র' পোঃ সুনামগঞ্জ (শ্রীহট্ট)।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা (সর্ব্বসাধারণের জন্য)

বিষয়—(১) "বিজয়িনী" (রবীন্দ্রনাথের চিত্রা অথবা সঞ্চয়িতা দ্রষ্টব্য), (২) "উর্ব্বশী" (রবীন্দ্রনাথের চিত্রা অথবা সঞ্চয়িতা দ্রষ্টব্য)। দুইটির উভয়ই অথবা যে কোন একটিতে প্রতিযোগিতার জন্য যোগদান করা যাইতে পারে। প্রতিযোগিগণকে ২২শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইতে হইবে। ১৮ই জানুয়ারীর মধ্যে নাম পাঠাইতে হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারিগণকে একটি করিয়া রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় নাম পাঠাইতে হইবে। (১) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৯নং শিবতলা ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া। (২) শ্রীতারাপদ ঘোষ, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া।

রচনা প্রতিযোগিতা

'সাগরিকা' পত্রিকার উদ্বোধন উপলক্ষে একটি রচনা প্রতিযোগিতায় আমরা দুইটি রৌপ্যপদক প্রদান করিতে ইচ্ছুক। যে কোন বালক-বালিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবে। রচনার বিষয় "ছাত্রজীবন ও কর্ত্তব্য" এবং "যে কোন বিষয়ের ছোট একটি গল্প।" অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে সেক্রেটারী, 'সাগরিকা', ২৮নং যুগীপাড়া লেন, বিডন ষ্ট্রীট পোঃ, কলিকাতা—এই ঠিকানায় এক আনার ডাকটিকিটসহ পত্র ব্যবহার করিতে হইবে। গল্প পৌঁছিবার শেষ তারিখ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৯ সাল।

তারিখ পরিবর্ত্তন

হাওড়া, শিবপুর সাহিত্য-চক্রের উদ্যোগে বাঙলার সমগ্র স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাঙলাভাষার যে রচনা প্রতিযোগিতা আহবান করা হইয়াছিল তাহাতে উপযুক্তসংখ্যক প্রতিযোগী না পাওয়ায় রচনা জমা দিবার তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া আগামী ১৫ই মার্চ্চ নির্দ্ধারিত হইল।

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের "পরশমণি" ছবির কাজ বেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায় এই ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন। চার্লস ক্রীড্ শব্দ গ্রহণ করিতেছেন ও হিমাংশু দত্ত সুর দিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না, রাণীবালা, বীণা, অরুণা, রাজলক্ষ্মী, সতী, সীতা প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

কয়েকটি বড় বড় সেটের কাজ সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। কলেজ হোষ্টেলের মেয়েরা নারীরক্ষা সমিতির সাহায্যার্থ অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে; লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন; কিন্তু টিকিট একেবারেই বিক্রয় হয় না। শেষে স্থির হইল যে, মেয়েরা বড় লোকের বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া টিকিট বিক্রয় করিবে এবং সর্ব্বশেষে যাইবে ব্যাঙ্কার মোহিত রায়ের (দুর্গাদাস) বাটী।

* * *

নিউ থিয়েটার্স :—শ্রীযুত নীতীন বসু তাঁহার হিন্দী ছবি "দুষমন" তোলা শেষ করার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ এই ছবি তোলা শেষ করিয়াই তিনি একটি খুব বড় কাজে হাত দিবেন এবং স্বয়ং নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন।

শ্রীযুত অমর মল্লিকের পরিচালনায় বাঙলা ও হিন্দী "বড়দিদি" ছবির কাজ বেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা "বড়দিদি" উপন্যাসের আখ্যানভাগের সহিত পরিচিত নহেন এমন বাঙালী অতি অল্পই আছেন। 'বড়দিদি' উপন্যাসের লেখার ম[ধ্য] দিয়া আমরা যে জিনিষটা পাই, চিত্রে [শ্রী]যুত অমর মল্লিক তাহা যে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন, ঐ [বিশ্ব]াস আমাদের আছে।

শ্রীযুত দেবকীকুমার বসু মহাশয় তাঁহার বাঙলা ও হিন্দী "সাপুড়ে" ছবি তো[লা লই]য়া খুব ব্যস্ত।

শ্রীযুত ফণী [বর্ম্মা] তাঁহার হিন্দী "কপালকুণ্ডলা" ছবি তুলিতেছেন।

* *

নিউ থিয়েটা[র্স]... ছবি সম্ভবত ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে চিত্রায় ম[ুক্তি]... [প]রিবর্ত্তন ... তাহার কারণ, 'সাথী' ছবি চিত্রায় এখন ... [চ]লিতেছে। শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া 'অধি[কার]' ... [পরিচা]লনা করিয়াছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করি[য়াছেন] ... ১৯৯ (এ চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন —ইউসুফ মুলজী; শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন—অতুল চ্যাটার্জ্জি এবং দৃশ্য পরিকল্পনা করিয়াছেন—অর্জ্জুন রায়। বিভিন্ন ভূমিকায় যমুনা, মেনকা, প্রমথেশ বড়ুয়া, পাহাড়ী সান্যাল, চিত্রলেখা, পঙ্কজ মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, অহি সান্যাল প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

* * *

সিন্টোফোন পিকচার্স—"কল্পনা" নামে একখানি ছবি তুলিতেছেন। পি সাণ্ডেল পরিচালনা করিতেছেন ও চিত্র গ্রহণ করিতেছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন—রামচন্দ্র পাল; সুর দিয়াছেন—সূর্য্যকুমার পাল। বিভিন্ন ভূমিকায়—কল্পনা, কান্তি, নীলিমা, কমলা প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'পরশমণি' চিত্রে জ্যোৎস্না ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত প্রফুল্ল রায় পরিচালনা করিয়াছেন

* * *

ইন্দু মুভিটোনের 'পথিক' ছবি তোলা শেষ হইয়াছে। শ্রীযুত চারু রায়—পরিচালনা করিয়াছেন। চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন—অজয় কর ও শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন—গৌর দাস। বিভিন্ন ভূমিকায়—শীলা হালদার, রমলা, চন্দ্রিকা, মনোরমা, রাজলক্ষ্মী, সুহাসিনী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ভোলা, সত্য প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

সর্ব্ব বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি কলিকাতা টালা পার্কে সর্ব্ব বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার একটি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল এই খেলায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দলের নিকট ১০১ রাণে পরাজিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের এই পরাজয় কেবল খেলোয়াড়গণের আত্মনির্ভরতার অভাবের জন্যই দায়ী। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলোয়াড়গণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলোয়াড়গণ অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠতর ছিল না। নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানের কথা স্মরণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত খেলিবার ফলেই তাহারা বিজয়ী হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসর হইতে সর্ব্ব বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই কয়েক বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল খেলায় সুবিধা করিতে পারিতেছে না। গত বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত করিয়া ফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত খেলায় যোগদান করিতে পারিল না। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় দল ফাইনালে না খেলিয়া চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিল। এই বৎসর সেইজন্য আশা করা গিয়াছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল গত বৎসরের অর্জ্জিত সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। কিন্তু প্রতিযোগিতার প্রথম খেলাতেই পরাজিত হওয়ায় সে আশা নিরাশায় পরিণত হইল। অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল যে এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হইবে, তাহারও ভরসা আর করা যায় না। ক্রমোন্নতি করিবার জন্য যাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা নাই তাহাদের প্রতিষ্ঠালাভ করা অসম্ভব।

ইহার জন্য দায়ী পরিচালকগণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য অনেকে খেলোয়াড়গণকে দোষী করিবেন; কিন্তু ইহার জন্য প্রকৃত দায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট পরিচালকগণ। তাঁহারা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ক্রিকেট খেলা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে এই পর্য্যন্ত এমন কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। নিয়মিতভাবে খেলোয়াড়গণকে ক্রিকেট খেলার কৌশল শিক্ষা দিবার বা সর্ব্ব বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য পূর্ব্ব হইতে বিভিন্ন কলেজের খেলোয়াড়গণকে একত্র করিয়া নিয়মিতভাবে খেলাইবার চেষ্টা করেন না। সারা বৎসর ধরিয়া তাঁহারা যে কি করেন, তাহার ঠিকানা পাওয়া দুষ্কর। সর্ব্ব বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আরম্ভের কয়েকদিন পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণের তালিকা যখন প্রকাশিত হয় তখনই তাঁহাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা, তাহার সম্মান ক্রীড়াক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ হওয়া যে উচিত ইহা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন পরিচালকগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে কোন দিনই স্থান পায় না।

কেবল যে ক্রিকেট খেলা বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চাতে পড়িয়াছে তাহা নহে, হকি, টেনিস, ফুটবল, এ্যাথলেটিক্স—কোন বিষয়েই এই পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করা সম্ভব হয় নাই। তাহার জন্যও যে পরিচালকগণ দায়ী ইহা আমরা বিভিন্ন প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে বহুবার উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। আমরা তাহাতে হতাশ হই নাই। কারণ আমরা জানি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়গণের, পুনঃপুনঃ বিভিন্ন খেলায় অন্যান্য
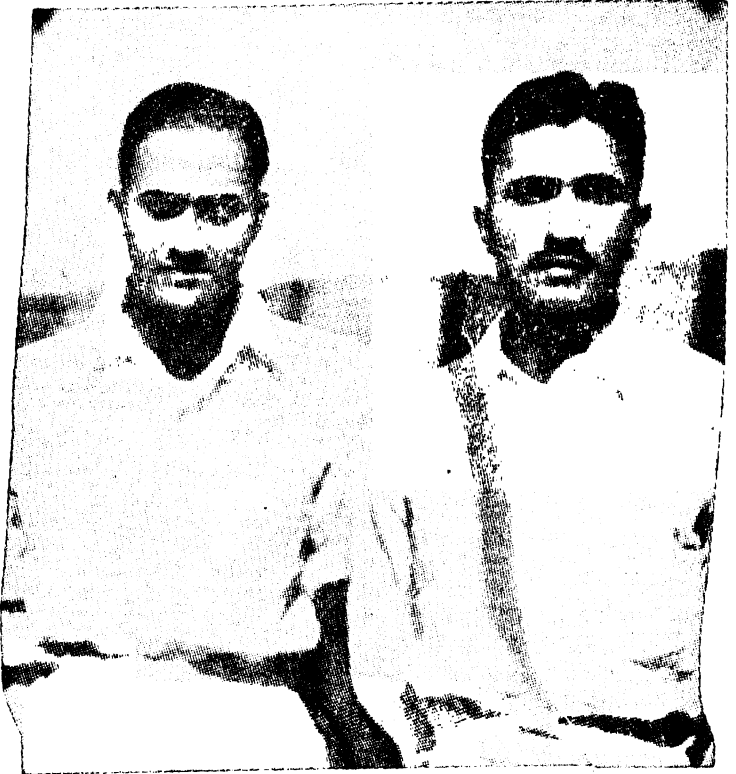
সর্ব্ব-বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক পি ডি দত্ত ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক জে ওয়াদিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়গণের নিকট পরাজিত হইয়া, একদিন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবেই। কি করিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে সম্মানলাভ করা যায়, ইহার জন্য কাহারা দায়ী—এই চিন্তা তখন তাঁহাদের মনে জাগিবে। চিন্তা দেখা দিলেই [illegible]রা নিজেদের মধ্যে এই বিষয় আলোচনা করিবেন। আলো[illegible]রম্ভ হইলেই পরিচালকগণের দোষ-ত্রুটি তাঁহাদের নিকট [illegible]য়া পড়িবে। তখন তাঁহারা নিজেরাই আন্দোলন আর[illegible] রিবেন, যে আন্দোলনের ফলে নব পরিচালকমণ্ডলী, ন[illegible] বাধ্য হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে। আমরা এইরূপ প[illegible]ভাষায় অবশ্যম্ভাবী জানি বলিয়াই নিশ্চিন্ত আছি। নিম্নে[illegible]তে উপর[illegible] বিশ্ববিদ্যালয় খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল।

খেলার ফলাফল

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ঃ—প্রথম ইনিংস [illegible]

তারিখ [illegible]ইল। স এন মেটা [illegible]পাধ্যায়,

৪৯, বি মল্লিক ৩১, এস কে ইব্রাহিম ৪৯; এ দত্ত ৫৫ রাণে ৪টি, এন চ্যাটার্জ্জি ১৩ রাণে ২টি, পি ডি দত্ত ৪৭ রাণে ২টি, এস গুপ্ত ১৮ রাণে ১টি, এইচ সাধু ৪৯ রাণে ১টি)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ—প্রথম ইনিংস ১০৬ (আর গুপ্ত ৪১, পি ডি দত্ত ২১, কে যাদব ৩৬ রাণে ২টি, এস মেটা ২৫ রাণে ৫টি, ডি কোপিকার ১৯ রাণে ২টি, এইচ আদ্যাব ৯ রাণে ১টি)।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ঃ— দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৭ (পি ডি গুপ্ত ৮০, ইব্রাহিম ২৩, কে অধিকারী ২১, পি ডি দত্ত ২৭ রাণে ২টি, এন চ্যাটার্জ্জি ৪২ রাণে ৫টি, এ দত্ত ৪৬ রাণে ৩টি)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ—দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ (আই সুরিটা ২৪, অনিল দত্ত ২৪, এন চ্যাটার্জ্জি ২২, আর গুপ্ত ২৩, পি ডি দত্ত ১৮, এস এন মেটা ৪৭ রাণে ৬টি, ডি বি কোপিকর ৫০ রাণে ৩টি উইকেট পাইয়াছেন)।

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১০১ রাণে পরাজিত)।

ফুটবল খেলায় 'মনোবিজ্ঞান'

ফুটবল খেলায় বিপক্ষের চেয়ে বেশী সংখ্যায় গোল স্কোর করা যে কোন টিমের পক্ষে সমগ্র খেলাটির ভিতর অর্দ্ধেকেরও বেশী গুরুতর বিষয়—এ-কথা বলতে অবশ্য আমাদের তরফ থেকে একটা বিপুল নিপুণতার বাহাদুরী একেবারেই নেই। খেলোয়াড়গণ যেন মনে না করেন যে, তাঁদের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি সন্দেহ করেই, আমরা যা বলতে যাচ্ছি তাতে স্পর্দ্ধিত হয়েছি। বরং তাঁদের জানা কথাই তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের প্রথমকার মামুলি উক্তির পেছনে যে একটা বড় রকমের আগ্রহ দেখা যায় তাঁদের—যাঁদের কাজ হচ্ছে ব্যবস্থা করা যাতে কোন বিশেষ টিমে গোল স্কোর করবার সামর্থ্য যতটা সম্ভব বেশী জুড়ে দেওয়া যায়, এর কারণ আর কিছুই নয়, সেই সব ব্যবস্থাকারকগণ শুধু চান যাতে টিমের সমর্থক পৃষ্ঠপোষক ও কর্তৃপক্ষ—এই তিনদল খুশী থাকেন।

এমন লোক ঢের ঢের আছেন, যাঁরা ভাবেন রাতদিন ফুটবল নিয়ে হুটোপাটি করলে পরেই গোল স্কোর করবার সব চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্র পথ আবিষ্কার করা যায়।

আবার এমন প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত খেলার সমঝদার রয়েছেন অনেকে, যাঁরা মনে করেন, শনিবার, রবিবারে আর ফুরসৎ মত সপ্তাহের আর কোন একটা দিনে খেলার অভ্যাস (practice) রাখাই যথেষ্ট এবং বাকি অবকাশ সময়ে খেলোয়াড়কে ভাবতে হবে খেলার বিষয় নিয়ে অন্য অন্য দিকে।

আজকের ফুটবল খেলায় দেহবলের চেয়ে মনোবলেরই সাহায্য দরকার বেশী। আধুনিক খেলোয়াড়দের মন, তাঁদের মনোবৃত্তি—এগুলার গুরুত্বই সবার উপরে, খেলা ঠিক পথে চালিত করবার জন্য। তাই দরকার তাঁদের মনকে শান্ত, তৃপ্ত প্রকৃতিস্থ ও উত্তেজনাবিহীন রাখবার সব ব্যবস্থা করা। যার জন্যে ফুটবল ছাড়াও অন্য রকম ছোট-খাটো আকর্ষণের মারফৎ তাঁদের মানসিক স্থৈর্য্য অটুট রাখতে হবে।

তার জন্যই ঠিক খেলার মাঠে শিক্ষার ব্যবস্থার আতিশয্য আর দরকার নেই অতীত যুগের মত। শিক্ষার দরকার যে খেলার মাঠে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না, কিন্তু বাড়াবাড়িতে হিতের চেয়ে অহিত ডেকে আনবে।

এজন্য সময়ে হয়ত এমনও প্রয়োজন হতে পারে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট খেলোয়াড়কে পুরা একটি সপ্তাহই রেহাই দিতে হবে প্র্যাকটিস বা খেলার মাঠের শিক্ষা থেকে।

এই রেহাই দেবার ব্যবস্থায় আবার নানা মুনির নানা মত। কোন কোন ঝানু পরিচালক মনে করেন চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিক থেকে নতুন জায়গায় অজানা অচেনাদের ভিতরে পাঠিয়ে দিলেই খেলোয়াড়ের ভাবী লড়ায়ের জন্য তৈরী হওয়াটা (বিশ্রামের দ্বারা) সবসে সেরা হতে পারে। অপরপক্ষে কোন কোন অভিজ্ঞ পরিচালক মনে করেন, নিজের গৃহে প্রিয় আত্মজনের কাছে গেলেই খেলোয়াড় মন্ত্রের বলে যেন দ্বিগুণ মানসিক বলে বলীয়ান হতে পারে।

যুক্তির দিক থেকে মনোবিকলনের ধারা থেকে কোন প্রথাকেই একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। এ দুয়ের কোন প্রথার উপরই আমরা সীদ্ধান্ত স্থাপন করব না। আমাদের কথা হ'ল শিক্ষা বা প্র্যাকটিস সম্ভব রকম সীমায় রেখে খেলোয়াড়ের উন্নতির (সে বর্ষের মত) যখন গন্ডী টানা যাবে, তখন আর তার শারীরিক শিক্ষার বোঝা বাড়ান হবে না। তাকে দিতে হবে বিশ্রাম। এই বিশ্রাম দেবার বিশেষ রকম কি হবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে খেলোয়াড়ের মন, মেজাজ ও ঝোঁক—এ সবের উপর। এখানেই হবে পরিচালকের কৃতিত্ব কোন খেলোয়াড়ের কি অভাব এবং কি দরকার সেটি চিনে বেছে নিয়ে ব্যবস্থা করায়।

খেলোয়াড়ের মনের উপর কতটা নির্ভর করে খেলায় আপন আপন ষ্টাইল বজায় রাখার ব্যাপার তারই আমরা গত সংখ্যায় দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এখন বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য দিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে, নিজেদের অক্ষমতার সন্দেহ যতটা যে খেলোয়াড়কে অভিভূত করেছিল সে কাবু হয়ে পড়েছিল ঠিক ততটা। অথচ ব্যাধি কিছু ছিল না অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, যা কিছু ত্রুটি সবই মনে।

কাজেই এখন আমরা মোটামুটি বলতে পারি—খেলোয়াড়ের মনের উপর তার খেলার ষ্টাইল নির্ভর করে অর্দ্ধেকেরও বেশী—বাকিটা তার শিক্ষা ও প্র্যাকটিসের উপর। এ জন্যেই শিক্ষক ও পরিচালকের প্রখর দৃষ্টি থাকা উচিত খেলোয়াড়ের মন, মনোবৃত্তির উপর—যেদিকটায়, আমাদের মনে হয়, এদেশে গুরুত্ব দেওয়া হয় না তেমন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১লা জানুয়ারী—

মৌলবী তমিজুদ্দিন এবং মৌলবী সামসুদ্দিনকে মন্ত্রী নিযুক্ত করায় কোয়ালিশন দলে বিষম বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, কলিকাতায় ঢাকার নবাব বাহাদুরের বাড়ীতে এক সভায় দলের অধিকাংশ সদস্য মৌলবী তমিজুদ্দিন খাঁ ও মৌলবী সামসুদ্দিন আমেদকে মন্ত্রিসভায় লওয়ায় একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। সভা আরম্ভ হওয়ামাত্রই নাকি কেন তাঁহাদিগকে মন্ত্রিসভায় লওয়া হইল, তৎসম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ দাবী করা হয়। প্রধান মন্ত্রীর কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া কোয়ালিশন দলের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন।

মধ্য প্রদেশের আবগারী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভারুকা কর্তৃক সুরো-বর্জ্জন আন্দোলন প্রবর্ত্তন উপলক্ষে ওয়ার্দ্ধায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। "সুরা দানবের" কুশপুত্তলিকা করিয়া একটি মিছিল বাহির করা হয়। শ্রীযুক্ত ভারুকা তাঁহার বক্তৃতায় সুরা-বর্জ্জন সম্পর্কে কংগ্রেসের পরিকল্পনা সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য জনসাধারণকে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন।

রয়টারের খবরে জানা যাইতেছে যে, গতকল্য জেরুজালেমের উত্তর দিকে রাজপথের উপর একটি মোটরের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী বর্ষিত হয়। প্রকাশ, ঐ গাড়ীতে স্যার চার্লস টেগার্ট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত জেনারেল হেইনিং-এর কর্ম্ম পরিষদের মেজর ব্রুনস্কিল সমেত আরও বহু উচ্চপদস্থ সামরিক ও পুলিশ কর্ম্মচারী ঐ গাড়ীতে ছিলেন। গুলী বর্ষণের ফলে মিঃ জি ডি স্যাণ্ডারসন নামক একজন বৃটিশ পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট নিহত হইয়াছেন। মোটরটি যখন রাস্তার ফটকের সম্মুখে দাঁড়ায় তখন উহার উপর গুলী বর্ষিত হয়। স্যার চার্লস টেগার্ট বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইন গবর্ণমেণ্টকে পুলিশের কার্য্য সম্পর্কে পরামর্শ দানের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি কোনরূপ আঘাত পান নাই।

মিঃ স্যাণ্ডারসন ইতিপূর্ব্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পুলিশ-বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ছিলেন।

নিখিল ভারত ছাত্র সমিতির ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন ডাঃ কে এম আসরফের সভাপতিত্বে কলিকাতায় আরম্ভ হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্রাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি আসেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু গত রবিবার রাত্রিতে তাঁহার ইণ্টালী সাউথ রোডস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বসু গত একমাস যাবৎ পৃষ্ঠব্রণে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন।

আন্দামান প্রত্যাগত নালিতাবাড়ী অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কিত মোকদ্দমায় দণ্ডিত শ্রীযুত মধু দত্তের যক্ষ্মা হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীযুত মধু দত্ত নালিতাবাড়ী লোন অফিস গৃহে একটি পুরাতন গাদা রিভলবার প্রাপ্তি সম্পর্কে ধৃত হন। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহার সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হইলে তাঁহাকে আন্দামান প্রেরণ করা হয়। আন্দামান জেলে অবস্থানকালে তাঁহার যক্ষ্মা-রোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক হইলে তাঁহাকে আন্দামান হইতে বাঙ্গলায় আনিয়া একটি জেলে রাখা হয়।

স্বাস্থ্যভঙ্গের অজুহাতে তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিলাভের পরই তিনি চিকিৎসার জন্য যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্ত্তি হন।

২রা জানুয়ারী—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোয়ালিশন দলের বৈঠকে গত শনিবারের মত রবিবারও দলের নেতা প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ কে ফজলুল হকের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করা হয়।

প্রধান মন্ত্রীই বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। নব-নিযুক্ত মন্ত্রিদ্বয়ও পূর্ব্বদিনের মত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ জে সি ঘোষ লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি বলেন যে, কংগ্রেস নীতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী নহে; কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা সংযুক্ত হইয়াছে বিনা পরিবর্ত্তনে বা সংশোধনে কংগ্রেস তাহা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারে না এবং করিবেও না।

কলিকাতায় নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেশের বর্ত্তমান সমস্যাগুলি সম্পর্কে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন,—

তিনি বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না অথবা আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনে যে বাধা দিতে পারিবে না. এ বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যের দিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীহট্টের সংবাদে প্রকাশ যে, আসামের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট রাণী গুইডালোকে মুক্তি দিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহা ভারত-সচিবের অনুমোদন সাপেক্ষ। আসামের প্রধান মন্ত্রী আশা করেন যে, তিনি শীঘ্রই রাণী গুইডালোর মুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, রাণী গুইডালোর সহিত যে দুইজন রাজবন্দী আছেন, তাঁহারাও শীঘ্র মুক্তিলাভ করিবেন।

নয়াদিল্লী হইতে জানা যাইতেছে যে, জয়পুর দরবার শেঠ যমুনালাল বাজাজের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে

উহা নাকচ করা না হইলে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে। অদ্য প্রাতে শেঠ যমুনালাল কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর সহিত পরামর্শ করিবার এবং সমগ্র ব্যাপার ওয়ার্কিং কমিটির গোচরীভূত করিবার জন্য তিনি আগামীকল্য বান্দোলী যাত্রা করিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই মনে হয় যে, তিনি জয়পুর দরবারকে এই বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য যথেষ্ট সময় দিবেন; উহাতেও যদি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হয় তাহা হইলে তিনি ফলভোগের জন্য প্রস্তুত হইয়া নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া জয়পুর রাজ্যে প্রবেশ করিবেন।

৩রা জানুয়ারী—

ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ দালাদিয়ের ভূমধ্যসাগর এবং ফরাসী উপনিবেশ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পরিভ্রমণ কালে টিউনিসে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মঃ দালাদিয়ের ফ্রান্সের সাম্রাজ্যরক্ষার সংকল্প ঘোষণা করিতে গিয়া বলেন সর্ব্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে ফ্রান্স প্রস্তুত।

ব্রিটেনের দেশরক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী পাঁচজন মন্ত্রীর মধ্যে দুইজন মিঃ চেম্বারলেনের সহিত দেখা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

হিটলারের এক আদেশে জার্ম্মানীতে পঁচিশ বৎসরের কম বয়স্কা যুবতীদের শিল্প প্রতিষ্ঠান, কৃষিক্ষেত্র বা গৃহস্থালী ব্যাপারে শ্রমিকের কাজ করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে। রয়টারের এক সংবাদে ইহা প্রকাশ।

আউন্ধ রাজ্যের রাজাসাহেব গত ১লা নবেম্বর তারিখে আউন্ধ রাজ্যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। আজ এক সরকারী ইস্তাহারে প্রস্তাবিত শাসন-তন্ত্রের মোটামুটি পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে।

এলাহাবাদ হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে, বোম্বাই শ্রমিক-বিরোধ বিলের ন্যায় একটি শ্রমিক বিল প্রণয়নের কথা যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশন হায়দরা-বাদে হইবে। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এই অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন।

বোম্বাই শ্রমিক বিলের প্রতিবাদে এক দিনের জন্য ধর্ম্মঘট পালন উপলক্ষে ৭ই নবেম্বরের হাঙ্গামা ও পুলিশ কর্তৃক শ্রমিকদের উপর গুলী চালনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যে তদন্ত-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, অদ্য কাউন্সিল হলে তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। অদ্য কয়েকজন শ্রমিক এবং যে স্থানে গুলী-বর্ষণ হয়, সেই অঞ্চলের কয়েকজন অধিবাসীর মৌখিক সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ—যবদ্বীপ ও সুমাত্রার মধ্যবর্ত্তী সুণ্ডা প্রণালীতে এক দ্বীপের উপর ক্রাকাটোয়া নামে যে বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি আছে, তাহা আবার অগ্ন্যুদ্গিরণ আরম্ভ করিয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আহূত এক সভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হিন্দীতে সুদীর্ঘ এক বক্তৃতা দান করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী ইউরোপের রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৪ঠা জানুয়ারী—

কাইরো হইতে রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী ১৮ই জানুয়ারী লণ্ডনে প্যালেষ্টাইন সম্মেলনের প্রথম বৈঠক হইবে এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন এই সম্মে-লনের সভাপতিত্ব করিবেন।

ব্রহ্মদেশে আইন অমান্য আন্দোলন এবং স্কুল কলেজে পিকেটিং এর কথা বিবেচনা করিয়া ব্রহ্ম-শাসন আইনের ৪১ ধারা অনুসারে ব্রহ্মের গবর্ণর মোটরযান আটক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুসারে সরকারী কর্ম্মচারীরা ভাড়া দিয়া পুলিশ ও সৈন্য চলাচলের জন্য যে কোন মোটর যান নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

যুক্তপ্রদেশের রাজস্ব-সচিব অযোধ্যায় এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে সকল বকেয়া খাজানা আদায় স্থগিত রহিয়াছে, সেই খাজানা মকুব করা হইবে। রাজস্ব-সচিবের এই ঘোষণার ফলে জমি-দারদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে।

অদ্য দায়রা জজ বান্নু শহর লুঠ মামলার রায় দিয়াছেন। রায়ে দুইজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও তিনজনের প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়াছে। হয়ত স্মরণ আছে যে, গত ২৮শে জুলাই একদল সশস্ত্র লস্কর বান্নু শহর আক্রমণ করিয়া সাত ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি ভস্মীভূত করে।

মিস মুরিয়েল লিষ্টার অদ্য প্রাতে ওয়ার্দ্ধাগঞ্জ হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গোল টেবিল বৈঠকের সময় মহাত্মা গান্ধী ইঁহারই বাটিতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

কচ্ছ প্রজাকীয় পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক মণ্ডলীর সদস্য শ্রীযুত ভেলজীকে অদ্য তাঁহার আশ্রমে কচ্ছ ফৌজদারী দণ্ড-বিধির ৫৭ (ক) ধারায় (রাজদ্রোহ) গ্রেপ্তার করায় সর্ব্বত্র হরতাল হইয়াছে।

৫ই জানুয়ারী—

জাপানে কোনোয়ে মন্ত্রিসভার পতনের পর ব্যারণ হীরানুমা কর্তৃক নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। নব-গঠিত মন্ত্রিসভার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে দপ্তরবিহীন মন্ত্রিরূপে এবং আরও চারজন নূতন মন্ত্রী স্থান পাইয়াছেন। নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে ঘোষণা করিয়াছেন যে, নূতন প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার মধ্যে চীন অভিযানের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ মতৈক্য হইয়াছে।

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪০ সনের বাজেটে আয়-ব্যয়ের যে বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাতে বাজেটে বিপুল ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

অদ্য সিন্ধু-পরিষদের স্পীকার যখন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা সম্পর্কে পরিষদের মতামত জানিতে চাহেন, তখন মাত্র ১৩জন সদস্য উহার সমর্থনে দণ্ডায়মান হন।
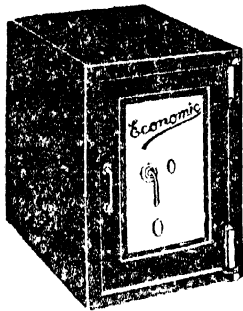
আজকাল সকলেই স্বীকার করেন

"ইকনমিক্ ষ্টীল, সেফ ও ক্যাবিনেট"

শুধু প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানীয় নহে—

গঠনে, আধুনিকতায়, সৌন্দর্য্যে ও স্থায়িত্বে অতুলনীয়।

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন—

ইকনমিক্ ট্যাঙ্কস্ সাপ্লাই কোং

১১০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফোন—বি, বি ১৪০২

"বিজ্ঞাপনের মোহে বাজারের যা তা তেল ব্যবহার করে সৌন্দর্য্য উপাসক হবেন না প্রায় একশ' বছরের সুপরিচিত লক্ষ্মীবিলাস তেল যাহার উপর আপনারা বংশানুক্রমে নির্ভর করে এসেছেন তাহাই ব্যবহার করুন।

নারীর সৌন্দর্য্য

কেশেই বর্দ্ধিত

হয়!!

কেশ-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে এবং

মুখমণ্ডল সুশ্রী করিতে—

শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি দেখিয়া লইবেন।

আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সাবধান। ভয়ানক জাল হইতেছে।

এম, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা।

স্থাপিত—১৮৭৪
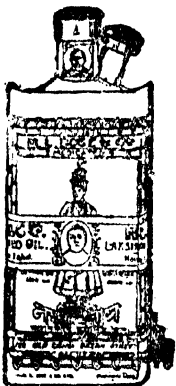
৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ৭ই মাঘ, ১৩৪৫ সাল, 21st January, 1939. [১০ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিপূজা—

শরৎচন্দ্রের প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান হইয়া গেল। মহতের স্মৃতি-পূজার ভিতর দিয়া জাতির প্রাণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ মানুষের মধ্যে মহতের মহত্ত্বের অনুভূতি যখন আসে তখন সে কতকটা নিজেই প্রকৃতপক্ষে মহৎ হয়। শরৎচন্দ্রের এই স্মৃতি-পূজার ভিতর দিয়া আমরা জাতির প্রাণ-শক্তিরই পরিচয় পাইয়াছি। শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুরে স্মৃতি-সভার যে অনুষ্ঠানটি হইয়াছিল, তাহা বাঙলার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার বলিতে হইবে। সুদূর পল্লীগ্রামে বঙ্গবাণীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলির যে আগ্রহের অভিব্যক্তি সেদিন দেখা গিয়াছে দেবানন্দপুরে, তাহাতে সত্যই হৃদয়ে পুলকের সঞ্চার হয়। (শরৎচন্দ্র জাতিকে প্রকৃতই ভালবাসিয়াছিলেন, যাহাকে বলে আন্তরিক ভালবাসা—তেমন ভালবাসার দৃষ্টি তিনি লাভ করিয়াছিলেন—বস্তুর বহির্ব্বিষয় নিরপেক্ষ অন্তর সত্তার অনুভূতির এইযে প্রেম-প্রোজ্জ্বলতা ইহাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। এই দৃষ্টিতে যিনি দেশকে, জাতিকে, বিশ্বমানবকে দেখিতে পারেন এবং সেই দর্শনের অনুভূতিকে রূপ দিতে পারেন, তিনি অমরত্বলাভ করেন। মানবের অন্তরের সত্তায় তিনি আপনার আসন করিয়া লন। শরৎচন্দ্রও এই হিসাবে অমর। কিন্তু জাতির উন্নতির জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য, শরৎ-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত এই যে দর্শন—ইহাকে প্রচার করিতে হইবে, প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।) স্মৃতিরক্ষার বড় একটা প্রয়োজনীয়তা আছে এই দিক হইতে। অতীতে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, বাঙালী জাতি ইদানীং তাহার কবি ও সাহিত্যিকদের সম্মান করিতে শিখিয়াছে। যে-সমস্ত বাঙালী-প্রধান আজ শরৎচন্দ্রের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা ও অনুরাগের নিদর্শন-স্মৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সাফল্য কামনা করিতেছি।

শরৎচন্দ্র-স্মৃতি কমিটি শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য ২০ হাজার টাকা চাহেন। তাঁহাদের প্রস্তাব এই যে, ঐ টাকা হইতে শরৎচন্দ্রের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা সাহিত্যের সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য একটি অধ্যাপকের আসনের ব্যবস্থা হইবে। দ্বিতীয়ত প্রতি তিন বৎসর অন্তর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বাঙলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প লেখককে পদক এবং নগদ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে। তৃতীয়ত কলিকাতার একটি প্রধান রাস্তার শরৎচন্দ্রের নামে নামকরণ করা হইবে; এবং ঐ সব কাজ নিষ্পন্ন হইবার পর যদি অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে কলিকাতায় শরৎচন্দ্রের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং একটি স্মৃতি-ভবন নির্ম্মাণ করা হইবে।

এতদ্ব্যতীত শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুরেও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। উঁহারা ইতিমধ্যেই দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের পৈতৃক বাস-ভবনের সংলগ্ন রাস্তাটিকে 'শরৎচন্দ্র রোড' নামে নামকরণ করিয়াছেন। দেবানন্দপুরের পল্লী-পাঠাগারটিকে তাঁহারা 'শরৎচন্দ্র পল্লী-পাঠাগার" এই নাম দিয়াছেন। এই পাঠাগারটিকে তাঁহারা শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিতে চাহেন। এই সব কাজের জন্য তাঁহারা মাত্র দুই হাজার টাকা চাহেন। শরৎচন্দ্র জাতিকে যাহা দিয়াছেন, কবির ভাষায় বলিতে গেলে 'রাজ্য বিনিময়ে তাহা কেহ নাহি পায়' তাহার তুলনায় উভয় স্মৃতি-রক্ষা কমিটি সমগ্র বাঙলী জাতির নিকট যাহা চাহিয়াছেন, তাহা সামান্য বলিতে হইবে। শরৎচন্দ্র তাঁহার কীর্ত্তি নিজেই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, ইহা সত্য; কিন্তু বাঙালী জাতি যে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে, তাহার নিদর্শন আমরা দেখিতে চাহি। বাঙলী জাতি তাঁহার মুখোজ্জ্বলকারী প্রতিভার বেদীমূলে অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিতে কার্পণ্য করিবে না, এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করি এবং শরৎ-স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমাদের সে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। আমরা আশা করিতেছি, দুইটি স্মৃতি কমিটির উদ্যোগই অনতিবিলম্বে সাফল্যমণ্ডিত হইবে—বাঙালী বড় মুখ করিয়া বলিতে পারিবে যে, আমরা শরৎচন্দ্রকে ভুলি নাই। আমার দেশ, আমার জাতিকে যিনি প্রাণের এমন দরদ দিয়া ভালবাসিয়াছেন, বাঙালী তাঁহাকে ভুলিতে পারে না।

...চন্দ্রের 'পথের দাবী'—

সেদিন দেবানন্দপুরে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—"শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'র* সাহায্যে তাঁহার স্বদেশের যে দাবী জগতের সম্মুখে নির্ভয়ে উপস্থিত করিয়াছিলেন, আজ বাঙলা সরকারের আদেশক্রমে তাঁহার সেই অতুলনীয় গ্রন্থ বাঙালীর পড়িবার অধিকার নাই।' কথা কয়টি হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়া মাখান। এই কথার ভিতর দিয়া মুখুজ্যে মহাশয় সমস্ত বাঙালীর মনের ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। বিহার হইতে 'পথের দাবী'র উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইল, আসাম হইতে প্রত্যাহৃত হইল, অথচ হইল না, শরৎচন্দ্র যে দেশের সাধনা করিলেন! যে দেশের দাবীকে তিনি উন্মুক্ত করিতে চাহিলেন জগতের কাছে হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা ও দরদ দিয়া—বেদনাময় মাধুর্য্যকে মূর্ত্তি দিয়া, নিষেধাজ্ঞা বহাল রহিয়া গেল সেই বাঙলাদেশেই! কারণ কি? বাঙলাদেশ কি ভারত-ছাড়া—'পথের দাবীর' উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করাতে বাঙলার বাহিরে ব্রিটিশ রাজত্ব আছে, না—নাই? প্রশ্নের উত্তর এই যে, বাঙলার বাহিরে আমলাতন্ত্রী আমল নাই। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের অপ্রতিহত কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্ব নাই। অধীনতার মধ্যেও জনমতানুবর্ত্তনেচ্ছু মন্ত্রীদের চেষ্টায় স্বাধীনতা যেন কোন দিকে কিছু কিছু আসিয়াছে; কিন্তু বাঙলায় আমলাতন্ত্রী আমল এখনও আছে অব্যাহত। দেশের যাঁহারা চিন্তাশীল ব্যক্তি, যাঁহারা জনসমাজের প্রতিনিধি, বাঙলার বিদ্বৎ-সমাজের মুখপাত্র, তাঁহাদের কথার চেয়ে, আজও এই বাঙলাদেশে তাহাদের বুঝই বড় বুঝ,—যাহারা বলিতে গেলে সাহিত্যের সম্বন্ধে আকাট মূর্খ। শরৎ-সাহিত্যের মর্ম্ম বুঝিবার মত মাথা তো ইহাদের নাই-ই, খবরের কাগজের সাধারণ লেখার মর্ম্মও ইহারা সব সময় বুঝিতে পারে না। পর পর কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কিছু-দিন পূর্ব্বে নিখিল ভারতীয় প্রগতি সাহিত্য-সঙ্ঘ 'পথের দাবী'র উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেদিন শরৎচন্দ্রের প্রথম বার্ষিক স্মৃতি-সভায় সমগ্র বাঙলার বিদ্বদ্বর্গও সেই দাবী করিয়াছেন। এতৎ সম্পর্কিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় সমঝদার লোক এদেশে বিরল, শুধু তাহাই নহে, ব্যবহারশাস্ত্রে—যেদিক হইতে সরকারের এ সম্বন্ধে ভয় সেই আইন-কানুনেও তিনি একজন বড় বিশেষ এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। বাঙলা সরকার কি বলিতে চাহেন যে, তাঁহাদের লালদিঘীর সাহিত্যিক ধুরন্ধরেরা ইহাদের চেয়ে বুঝনেওয়ালা বেশী এবং দেশের স্বার্থচিন্তা ইহাদের চেয়ে তাঁহাদের জবর। আমরা আশা করি, এখনও এ সম্বন্ধে সরকারের চৈতন্যোদয় হইবে এবং শরৎ-সাহিত্যের এমন একটি সম্পদের উপভোগ হইতে বাঙালী-সমাজকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া বাঙালীর চিত্তকে তাঁহারা বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবেন না।

বাঙালী-বিহারী সমস্যার সমাধান—

গত ১৩ই জানুয়ারী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বারদোলী অধিবেশনে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া বাঙালী-বিহারী সমস্যা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কমিটির সিদ্ধান্ত এইরূপঃ—

কমিটির মত এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির এবং জীবনধারার যে বৈচিত্র্যময় প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলিকে বজায় রাখা উচিত এবং কমিটি আমাদের সেই সব সংস্কৃতির এবং ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ধারার পিছনে যে একটা সাধারণ জাতীয়তাবোধ সকলের পটভূমিস্বরূপে রহিয়াছে, তাহাকে দৃঢ় করিবার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকেন, কারণ সেই পথেই—এক উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন এবং শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে সক্ষম হইবে। সুতরাং কমিটি সকল রকম বৈষম্যকর প্রবৃত্তি এবং সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে নিরুৎসাহিত করিতে চাহেন। তথাপি কমিটির মত এই যে, সরকারী চাকুরী এবং ঐরূপ বিষয় সম্বন্ধে, প্রদেশের লোকদের কিছু দাবী আছে এবং তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

(২) সরকারী চাকুরীর সম্বন্ধে কমিটির মত এই যে, ভারতবাসী ভারতের যে-কোন প্রদেশেই থাকুক না কেন, সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের পক্ষে কোন প্রদেশেই তাহার পক্ষে কোন রকম প্রতিবন্ধক থাকা উচিত নয়। তথাপি, কর্ম্ম-দক্ষতাই চাকুরীলাভের প্রধান যোগ্যতা—এই যে সব চেয়ে বড় বিবেচনা, ইহা ছাড়াও বড় চাকুরীতে এবং বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যাপারে অন্যান্য কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনার ও বাঁধা নিয়ম-কানুন থাকা দরকার। বিবেচনার বিষয় এই—(ক) প্রদেশের সরকারী চাকুরীতে প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব; (খ) যতটা সম্ভব, অনুন্নত শ্রেণী এবং সম্প্রদায়কে এক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা, এইভাবে যাহাতে তাহারা উন্নতিলাভ করিয়া রাষ্ট্রীয় জীবনে পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য সাহায্য করা; (গ) প্রদেশের যাহারা লোক তাহাদিগকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা। এই সুবিধা দান সম্পর্কে যাহাতে কোন কর্ম্মচারী নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন দৃষ্টি অবলম্বন না করিতে পারে, সেজন্য কমিটি হইতে কতকগুলি নিয়ম-কানুন বাঁধিয়া দেওয়া দরকার। সেই সঙ্গে সকল প্রদেশেই যাহাতে ঐ রকম নিয়ম-কানুন প্রযুক্ত হয়, ইহাও বাঞ্ছনীয়।

(৩) বিহারের সম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, তথাকথিত বিহারী এবং ঐ প্রদেশে যাহারা জন্মিয়াছেন কিংবা ঐ প্রদেশে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে যে সব বাঙলা ভাষাভাষী আছেন, ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইবে না। চাকুরীর ক্ষেত্রে ইহাদের সকলকেই বিহারী বলিয়া ধরা হইবে এবং ইহাদের উভয়ের প্রতিই সমান ব্যবহার করা হইবে। অন্য প্রদেশের লোকদের চেয়ে প্রদেশবাসীদিগকে চাকুরীতে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দান করা চলিবে।

(৪) ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রয়োগের নিয়ম তুলিয়া দিতে হইবে। চাকুরীর আবেদনে জানাইতে হইবে যে, আবেদনকারী ঐ প্রদেশের লোক অথবা স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে ঐ প্রদেশে আছেন। চাকুরীতে লোক নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে, যেখানে প্রয়োজন, উক্ত বিবৃতির যাথার্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবার অধিকার গবর্ণমেণ্টের সব সময় থাকিবে।

(৫) স্থায়ী বাসিন্দা—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আবেদন-কারীকে ইহা দেখাইতে হইবে যে, তিনি ঐ প্রদেশেই নিজে বাড়ীঘর করিয়াছেন। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার সময়, তিনি কতদিন ঐ প্রদেশে বসবাস করিতেছেন, তাঁহার সেখানে ঘরবাড়ী আছে কি না কিংবা অন্য সম্পত্তি আছে কি না, এইরূপ কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে। মোট প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। ঐ প্রদেশে জন্ম অথবা এক লাগোয়া ঐ প্রদেশে দশ বৎসর বাস করাই স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হইবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) যাঁহারা সরকারী চাকুরিয়া তাঁহাদের সকলের প্রতিই সমান আচরণ করা হইবে। উন্নতি প্রভৃতি সিনিয়ারিটি অনুসারে হইবে এবং সেই সঙ্গে যোগ্যতাও দেখা হইবে।

সরকারী চাকুরী এবং ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত হইল ইহাই। বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদের রিপোর্টের উপর ওয়ার্কিং কমিটি কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। কমিটির সিদ্ধান্তের সব চেয়ে বড় কথা হইল এই যে, তাঁহারা যে জিনিষের উপর সমগ্র বাঙালী সমাজ জোর দিয়া আসিয়াছিল সেই নিখিল ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শকেই এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছেন; বলিতে গেলে তাঁহাদের নির্দ্দেশ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহারই উপর। কমিটির নির্দ্দেশের এই বিশেষত্বটুকুকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে বুঝিতে হইবে। যদি তাঁহারা তাহা না বুঝেন, তাহা হইলে কমিটির নির্দ্দেশের কতকগুলি বিষয় লইয়া গোল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, বিশেষত যে সব ক্ষেত্রে কমিটি চাকুরী প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রদেশের অধিবাসীদিগকে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দানের স্বাধীনতা গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছেন সেই সম্পর্কে। কতকগুলি ক্ষেত্রে কমিটির নির্দ্দেশে ভাষার কিছু অস্পষ্টতা আছে; যেমন কমিটির এইরূপ একটি নির্দ্দেশ আছে যে, চাকুরীর আবেদনকারীকে ঐ প্রদেশে তিনি যে নিজ বাসভূমি করিয়াছেন ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কমিটি ধরাবাঁধা নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, প্রদেশে জন্ম অথবা এক লাগোয়া সেখানে দশ বৎসর বাসই প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দাত্বের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নিষ্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, তখন এই ধরণের অস্পষ্টতা সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না।

ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপার—

বিহারে অবিহারীদের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্কে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন—"প্রদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার পক্ষে কাহারও সম্বন্ধে কোন রকম বাধা-নিষেধ থাকিবে না। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার ভাব বাড়াইবার জন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেখানে সম্ভব, প্রদেশের লোকদিগকে চাকুরী দিবেন, ইহা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এই সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ তাহাদিগকে কোনরূপ পরামর্শ দিবার কথাতে লোকে ভুল বুঝিতে পারে. সেজন্য এইরূপ প্রস্তাব পরিত্যাগ করা উচিত।" ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব সন্তোষজনক হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মেলামেশার ভাব বাড়াইবার জন্য প্রদেশের লোকদিগকে চাকুরী দেওয়াটা ভাল এই পরামর্শ ওয়ার্কিং কমিটির দিক হইতে দিবার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার যে অধিকার দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাবটা যাহাতে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া না হয়, সেইজন্যই বোধ হয় ওয়ার্কিং কমিটিকে এইরূপ একটা জোড়াতালি দিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে হইলে স্থানীয় হৃদ্যতা বাড়ান যে দরকার, ব্যবসায়ীরা তাহা নিজেরা ভালই বুঝেন এবং নিজেদের স্বার্থের জন্যই যেখানে আবশ্যক, তাঁহারা তাহা করিবেন; সুতরাং এই পরামর্শটি একেবারেই অবান্তর হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কেহ স্থানীয় অধিবাসীদিগকে কোন চাকুরী দিতে পারিবে না, এমন কোন বিধান থাকিলে সেক্ষেত্রে ঐরূপ পরামর্শ দিবার প্রশ্ন বরং উঠিত। বলা বাহুল্য, বাঙালীদের পক্ষ হইতে তেমন প্রশ্ন উঠে নাই।

শিক্ষার বাহন—

শিক্ষার বাহন করা হইবে কোন ভাষাকে—এ সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন—"বিহারের যে সব অঞ্চলে বাঙলাভাষা কথ্য ভাষা, সেই সব অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার বাহন হইবে বাঙলাভাষা; কিন্তু যদি পর্য্যাপ্তসংখ্যক হিন্দুস্থানী ভাষা-ভাষী ছাত্র থাকে, তবে ঐ সব অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে হিন্দুস্থানী ভাষাভাষী ছাত্রদের জন্য হিন্দুস্থানীকে শিক্ষার বাহন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে; ঐ রকম হিন্দুস্থানী ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে হিন্দুস্থানীকে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে, কিন্তু পর্য্যাপ্তসংখ্যক বাঙলা ভাষাভাষী ছেলে থাকিলে মাতৃ-ভাষার সাহায্যে তহাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাও ঐ সব বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে। উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার বাহন হইবে প্রাদেশিক ভাষা; কিন্তু যে সব জেলায় অন্যান্য ভাষা-ভাষী আছে, সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের দাবী মিটাইবার জন্য ঐ সব অধিবাসীদের মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়াও শিক্ষার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের করিতে হইবে।" বলা বাহুল্য, ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তকেই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমরা আশা করি, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে যেখানে বাঙালী ছাত্রদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া হিন্দুস্থানীকে জোর করিয়া তাহাদের উপর চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে, অতঃপর তেমন চেষ্টা আর হইবে না এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহেও বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষালাভের জন্য তাহাদের মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য যে-সব জেলায় বাঙালী অধিবাসীদের দাবী আছে, সে দাবী প্রতিপালিত হইবে।

আমাদের কথা—

আমাদের কথা বলিতে গেলে, ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ওয়ার্কিং কমিটি অখণ্ড

ভারতের জাতীয়তাকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া যে ভাবে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, বিহার গবর্ণমেণ্ট যদি ওয়ার্কিং কমিটির সেই মূলগত উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করেন, তাহাতে এই অপ্রীতিকর সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইয়া গেল বলিতে হইবে। বলা বাহুল্য, বাঙালী-বিহারী এই সমস্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল ভারতীয় একটা আদর্শকেই খাড়া করিয়া ধরিয়াছেন। বাঙালীরাও শুধু নিজেদের দিক হইতে কিংবা নিজেদের দুই একটা চাকুরীর বা অপর কোন সুবিধা-অসুবিধার দিক হইতে বিষয়টিকে দেখেন নাই, ভারতের বৃহত্তর সমস্যার দিক হইতেই তাঁহারা বিষয়টিকে দেখিয়াছিলেন। আজ তাঁহাদের দাবীর ফলে নিখিল ভারতীয় একটা অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শই—প্রাদেশিকতার এমন সমস্যা-সংকটের সন্ধিক্ষণে স্পষ্টীকৃত হইল। এজন্য প্রধান প্রশংসা প্রাপ্য শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয়ের। তিনিই প্রথম দেখাইয়াছেন যে, বাঙালী-বিহারী বিবাদের ফলে যে সমস্যা তাহা মাত্র ঐ প্রদেশেরই সমস্যা নয়—ভারতের সমস্ত প্রদেশের সমস্যা। তাঁহার সেই আদর্শ আজ জয়যুক্ত হইল, বাঙালীর বৃহত্তর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিল—ইহা আনন্দের বিষয়। আমরা দেখিলাম, দাশ মহাশয় ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বাঙালী কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দলও সর্ব্বান্তঃকরণে সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিয়াছেন। এখন এই সিদ্ধান্তকে সাফল্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব পতিত হইয়াছে বিহার গবর্ণমেণ্টের উপর। আমরা আশা করি, কংগ্রেসের আদর্শকে তাঁহারা অব্যাহত রাখিবেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশের মূলীভূত মনোবৃত্তির দিক হইতে বিষয়টি দেখিয়া তাঁহাদের বৈষম্যমূলক নীতির ফলে যে অপ্রীতিকর ভাব সৃষ্টির সম্ভাবনার আশঙ্কা ঘটিয়াছিল, তাহার নিরাকরণ করিবেন। বাঙলা এবং বিহার অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভারতের জাতীয়তার শক্তিকে দৃঢ় করিবে। বাঙালী চায় সেই জিনিষ—অন্য কিছু নয়।

আবার রেল দুর্ঘটনা—

ব্যাপার কি, আমরা কিছুই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। গত ২৬শে পৌষ বুধবার রাত্রি ৩টা ১০ মিনিটের সময় হাজারীবাগ রোড ষ্টেশনের নিকট হাওড়া-দেরাদুন এক্সপ্রেস-খানি লাইনচ্যুত হয়। চারখানা বগী গাড়ী আগুনে ভস্মীভূত হয়। ফলে ২৪ জন লোক মারা যায় এবং বহুসংখ্যক লোক আহত হয়। আহতের সংখ্যা ৫০ জনের উপর, ১৫ জনের আঘাত গুরুতর রকমের। গত ১৮ মাসের মধ্যে পর পর এই ধরণের চারটি রেল দুর্ঘটনা ঘটিল; দুর্ঘটনার সাংঘাতিকত্ব দেখিতেছি উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। বিহিটা দুর্ঘটনার অপেক্ষাও নাকি এই দুর্ঘটনাটি গুরুতর। কয়েকবার যেমন শুনিয়াছি, এক্ষেত্রেও সেইরূপ শুনিতেছি যে, দুষ্ট লোকের চক্রান্তের ফলেই এমন মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়াছে। রেল কর্ত্তৃপক্ষের কোন দোষ নাই। কিন্তু এ কথা শুনিয়া দেশের লোকদের সন্তোষ কোথায়? দুষ্ট লোকের জন্যই হউক, আর যেজন্যই হউক, যাহাতে এমন ব্যাপার না ঘটিতে পারে, রেল কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য হইল তাহাই করা; এদিক হইতে তাঁহাদের যে দায়িত্ব, তাঁহারা তাহা এড়াইতে পারেন না। এইসব ঘটনা, যে কারণেই ঘটুক, এগুলি সম্পর্কে রেল কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্ব আছেই। যাত্রীদের জীবন-মরণ লইয়া খেলা চলে না। প্রতীকার চূড়ান্ত রকমের হওয়া চাই, এজন্য রেল-শাসন ব্যবস্থার যদি আগাগোড়া পরিবর্ত্তন দরকার হয়, তাহাও করিতে হইবে। শুধু মোটা মাহিয়ানার কতকগুলি শাসা চামড়াওয়ালা লোক পুষিলেই চলিবে না—কালা আদমীর প্রাণেরও যে মূল্য কিঞ্চিৎ আছে, উহা বুঝিয়া পাকা ব্যবস্থা সেজন্য করিতে হইবে। যত গলদ যেখানে আছে পরিষ্কার করিতে হইবে, যাহাতে এমন ধরণের ব্যাপার না হইতে পারে। বাজে কৈফিয়তে আমরা সন্তুষ্ট হইতে প্রস্তুত নহি। আমরা চাই সকল দিক হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত এবং কেন এমন ঘটনা সম্ভব হয়—দুর্ঘটনা কি ভাবে দস্তুর হইয়া দাঁড়ায়, তাহার কারণ জানিতে এবং সে কারণ যাহাতে দূর হয়, কর্ত্তারা এমন ব্যবস্থা করুন ইহাই দেখিতে, নহিলে দোষ আমরা কর্ত্তাদিগকেই দিব।

ইংরেজের আতঙ্ক—

ভারতের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, তবু ভারত জগতের মধ্যে দরিদ্র—সকল দেশের চেয়ে দরিদ্র কেন? বিদেশীরা ভারতের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে, এইজন্যই তাহার দরিদ্রতা। এই শোষণের প্রধান প্রক্রিয়া হইল ভারতকে কাঁচা মালের দেশে পতিত রাখিয়া নিজেরাই সেই কাঁচা মালকে পাকা করিয়া আনিয়া ভারতের বাজারে বেচিয়া ভারতের পয়সা লইয়া যাওয়া। ভারত বিদেশীর এই শোষণ-স্রোত বন্ধ করিবার জন্য আজ জাগ্রত হইয়াছে। কংগ্রেস ভারতের সমগ্র রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। এই কংগ্রেস হইতে রাষ্ট্রপতি সুভাষ-চন্দ্রের উদ্যোগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই কমিটির প্রচেষ্টা হইবে, ভারতে আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্মত প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতকে শিল্প-বাণিজ্যপ্রধান দেশে পরিণত করা। পণ্ডিত জওহরলাল কর্ম্মী পুরুষ। তিনি যে কাজ ধরেন তাহাকে নিষ্পন্ন না করিয়া ছাড়েন না। সুতরাং কংগ্রেসের এই যে প্রচেষ্টা ইহা ফাঁকা হইবে না, ভারতের এক বাঙলা এবং পাঞ্জাব বাদে অন্য সব প্রদেশে বলিতে গেলে কংগ্রেসের প্রভাব সমন্বিত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত। এই সব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত ও তৎসম্পর্কিত প্রক্রিয়া-প্রণালী কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন; সুতরাং ব্রিটিশ স্বার্থান্বেষী মহলে আতঙ্ক ঢুকিবারই কথা। ভারত এবং সিংহলস্থ ব্রিটিশ বাণিজ্য কমিশনার স্যার টমাস এনস্‌কফ কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আর্ত্তনাদ তুলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "বর্ত্তমান কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ যে মতলব করিয়াছেন, যদি তদনুযায়ী কাজ হয়, তাহা হইলে ভারতের সর্ব্বনাশ হইবে। ভারতের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষক। ভারতের কাঁচা মাল বিদেশে কম চালান হইলে এই সব কৃষকের স্বার্থের যেমন হানি হইবে, তেমনই বহির্ব্বাণিজ্যের শুল্কর্জ্জনিত আয় কম হওয়াতে ভারত গবর্ণমেণ্টেরও আর্থিক

বিপর্য্যয় ঘটিবে।" সুতরাং এনস্কফ সাহেবের কথা এই যে, ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশে পতিত থাকুক, আর তাঁহারা বা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনেরা ভারতের ধন-সম্পদ লুটিয়া পুটিয়া নেন। কিন্তু ভারতবাসীদের আজ চোখ খুলিয়াছে। অর্থনীতির দিক হইতে স্যার টমাস এনস্কফের যুক্তির যে কিছুমাত্র মূল্য নাই ইহা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না। রুষিয়ার কৃষকদের অবস্থা যুদ্ধের পূর্ব্বেও ভারতের কৃষকদের মতই ছিল। রুষিয়া শিল্প-বাণিজ্যের দিকে জোর দেওয়ার ফলেই আজ সে পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যন্ত্র-শিল্পব্যবসায়ের প্রসার হইলে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য বন্ধ হইবে, এ ধারণা যুক্তিহীন; তবে এ কথা ঠিক যে, বাহিরের খরিদ্দারদিগকে বেশী দাম দিয়া জিনিষ কিনিতে বাধ্য হইতে হইবে। তাহার ফলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিই অভূতপূর্ব্ব রকমে ঘটিবে। আতঙ্কের প্রধান কারণ হইল, ভারতের বাজারে একচেটিয়া কারবার বিদেশীদের আর থাকিবে না। আতঙ্ক ইংরেজ মহলে দেখা দিয়াছে সেইজন্য। বিলাতের 'টাইমস্' পত্র এই আতঙ্কে সুর মিলাইয়াছেন। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদিগকে নূতন তোড়জোড় বাঁধিতে বলিয়াছেন। আমরা জানি, চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। ব্রিটিশ স্বার্থকে অটুট রাখার জন্য ভারতের অর্থনীতি-নিয়ন্ত্রণে বড়লাটের হাতে যে-সব বিশেষ অধিকার আছে, সেগুলির প্রয়োগ করিতে হইবে, এ-সব আর্ত্তনাদের তাৎপর্য্য হইল ইহাই। কিন্তু ভারত আর ঘুমাইয়া নাই। ভারতবর্ষ ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় বাজার, সে বাজার বজায় রাখিতেই হইবে, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র-সচিব লর্ড ব্রেন্টফোর্ড যে গর্ব্ব করিয়াছিলেন, সে গর্ব্ব আজ খর্ব্ব হইবেই, হইবে ভারতের আত্মস্বার্থ বোধের অনুভূতির জাগরণে। উহার অন্যথা ঘটাইবার উপায় নাই।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন—

আগামী ৩০শে এবং ৩১শে জানুয়ারী জলপাইগুড়ীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। গত ১৫ই জানুয়ারী অভ্যর্থনা সমিতির সভায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙলার সম্মুখে বর্ত্তমানে অনেকগুলি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত—প্রধান সমস্যা হইল দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের অপচেষ্টা ক্রমে ক্রমে ভারতের অন্যান্য সব প্রদেশেই এলাইয়া পড়িতেছে। যে সিন্ধু প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতাবাদী দলের সর্দ্দার জিন্না সাহেব নিজেদের বড় ঘাঁটি করিবার মতলবে ছিলেন, সেই সিন্ধু প্রদেশে তাঁহারা বর্ত্তমানে সব চেয়ে বেশী নাজেহাল। লীগওয়ালারা [illegible] মন্ত্রিমণ্ডলকে ধ্বংস করিবার জন্য যত কারসাজী খেলিয়াছিলেন, সব [illegible] প্রধান মন্ত্রী মৌলবী আল্লাবক্সের মত-স্বাতন্ত্র্য প্রভাবে [illegible] হইয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছেন—সিন্ধু প্রদেশে মোশ্লেম লীগওয়ালাদের স্থান আর নাই। পাঞ্জাবেও লীগের অবস্থা টলটলায়মান। মোশ্লেম লীগের নামে মাত্র যে কিছু প্রভাব--তাহা শুধু প্রকাশ পাইতেছে, বাঙলার লীগওয়ালা দলের চাঁই প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক এবং স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিম উদ্দীনেরই দৌলতে। কিন্তু বাঙলার মুসলমান সমাজও একেবারে ঘুমাইয়া নাই। তাহারাও জাগিতেছে এবং ক্রমেই লীগওয়ালাদের স্বরূপ বুঝিয়া লইতেছে। বাঙলার কংগ্রেস-কর্ম্মীদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের উপর জোর দেওয়া—তাহাদিগকে এই সত্যে সচেতন করিয়া দেওয়া যে, দেশের শাসন-ব্যবস্থায় বিদেশীর মাতব্বরী যতদিন থাকিতেছে, ততদিন তাহাদের প্রকৃত হিত কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না। তাহাদিগকে এই সত্য দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যে, বাঙলার বর্ত্তমান যে শাসন-ব্যবস্থা তাহা বিদেশীর স্বার্থের দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া চলিয়াছে। দেশের স্বার্থে শক্ত হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা বাঙলার মন্ত্রীদের নাই। তাঁহারা যে টিঁকিয়া আছেন, তাহা তাঁহাদের জনপ্রিয়তার জোরে নয়, বরং জনগণের অপ্রিয় হওয়ার দরুনই। যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা জনগণের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিবেন, বিদেশী স্বার্থসেবী দলের সমর্থন তাঁহারা হারাইবেন। সে ঝুঁকি লইবার মত সাহস ও দৃঢ়তা বাঙলার মন্ত্রীদের নাই। তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন হইল সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি—বিপন্ন ইসলামের জিগীরই তাঁহাদের বড় বল। ইহা ছাড়া, কংগ্রেসকর্ম্মীদের আর একটি কর্ত্তব্য হইল নিজদিগকে সংহত করা, আদর্শে দৃঢ় নিষ্ঠার সাহায্যেই শুধু এরূপ সংহতি সম্ভব। আদর্শে দৃঢ় নিষ্ঠা যাহাদের নাই—অন্য স্বার্থের টান অন্তরের তলে তলে যাহাদের আছে—দলের নীতির সাফল্যের পক্ষে তাহারাই সব চেয়ে বড় অন্তরায়। প্রকাশ্য শত্রু ভাল, কিন্তু বন্ধুবেশী শত্রু সাঙ্ঘাতিক। এ সত্যটির উপরও দৃষ্টি দেওয়া বাঙলা দেশে দরকার হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা এই আশা করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নেতৃত্বে সমবেত হইয়া বাঙলাদেশের কংগ্রেসকর্ম্মিগণ সুস্পষ্ট একটি কর্ম্ম-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া লইবেন এবং তদনুযায়ী সমগ্র বাঙলাদেশে কংগ্রেসের দিক হইতে গঠনমূলক কাজ আরম্ভ হইবে।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(৩)

প্রকৃতিকে যখন কোন সুসঙ্গতির দুইটি অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে হয়, তখন প্রকৃতির নিরন্তর রীতি হইতেছে প্রথম প্রথম ভারসাম্য বিধান করিয়া চলা, কখনও মনে হয় সে একদিকেই সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিতেছে, কখনও মনে হয় অপরদিকটিতেই সে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিতেছে, আবার অন্য সময়ে সে অল্পাধিক সাফল্যের সহিত সাময়িক সামঞ্জস্য ও রফা করিয়া উভয় দিকেরই অতিশয়তার দোষ সংশোধন করিয়া লয়। তখন দুইটি অংগ পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতীয়মান হয়, অতএব তাহারা তাহাদের দ্বন্দ্বের কোনরূপে একটা সমাধান করিতে প্রয়াস করে. কিন্তু প্রত্যেকেরই থাকে অহমিকা; সকল জিনিষেরই যে সহজাত প্রবৃত্তি রহিয়াছে, শুধু আত্মরক্ষার দিকেই নহে পরন্তু আপন আপন শক্তি অনুযায়ী আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে, তাহার বশে তাহারা প্রত্যেকেই এমন এমন একটা মীমাংসায় উপস্থিত হইতে চায় যাহাতে তাহার ভাগই যেন হয় সর্ব্বাধিক, যেন সম্ভব হইলে সে-ই সম্পূর্ণভাবে প্রাধান্য করিতে পারে, এমন কি অপরটির অহমিকাকে নিজের অহমিকার মধ্যে সম্পূর্ণভাবেই গ্রাস করিয়া লইতে পারে। অতএব সুসংগতির দিকে যে প্রগতি তাহা নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে শক্তি সকলের দ্বন্দ্বের দ্বারা, অনেক সময়েই মনে হয় যেন তাহাতে সংগতি বা পারস্পরিক সামঞ্জস্য সাধনের কোন প্রয়াসই নাই, আছে শুধু পরস্পরকে গ্রাস করিবার চেষ্টা। বস্তুত ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের উচ্চতম আদর্শ হইতেছে এই যে একটি আর একটিকে গ্রাস করিবে না পরন্তু প্রত্যেকেই অপরটিকে গ্রাস করিয়া লইবে যেন প্রত্যেকেই অপরটির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বাস করিতে এবং তদ্বৎ হইয়া বাস করিতে পারে। প্রেমের এই যে চরম আদর্শ, দ্বন্দ্ব অন্ধভাবে ইহাতেই উপনীত হইতে চেষ্টা করিতেছে; কারণ দ্বন্দ্বের দ্বারা দুইটি বিপরীত দাবীর মধ্যে শুধু একটা নিষ্পত্তিতেই উপনীত হইতে পারা যায়, কোন স্থায়ী সুসংগতিতে নহে, দুইটি অহমিকার মধ্যে একটা রফা করিতে পারা যায়, কিন্তু দুইটিকে পরস্পরের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যায় না। তথাপি দ্বন্দ্বের দ্বারা পরস্পরের সহিত ক্রমশ বেশী বেশী বোঝাপড়া হয়, এবং এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃত ঐক্য সাধনের চেষ্টা করা সম্ভব হয়।

ব্যষ্টি এবং সমষ্টির সম্বন্ধ ব্যাপারে প্রকৃতির এই নিরন্তর প্রবৃত্তি দেখা দেয় ব্যক্তিবাদ (Individualism) এবং সমূহ-বাদের (Collectivism) দ্বন্দ্বে. দুইটিই সমানভাবে মানব-প্রকৃতিতে বদ্ধমূল—রাষ্ট্রের ব্যাপক আধিপত্য, পূর্ণতা ও বিকাশ, মানুষের বিশিষ্ট স্বাধীনতা, পূর্ণতা ও বিকাশ। একদিকে রাষ্ট্র, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জীবন্ত যন্ত্র, অন্যদিকে মানুষ ক্রমশ বেশী বেশী বৈশিষ্ট্যময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, ক্রমবর্দ্ধমান ভাগবত সত্তা—এই দুইটির মধ্যে চলিয়াছে নিরন্তর বিরোধিতা। রাষ্ট্র ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎ-ই হউক তাহাতে এই দ্বন্দ্বের মূল স্বরূপের কোন তারতম্য হয় না, আর ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণেরও তারতম্য হইবে এমনও কোন কথা নাই। প্রথমে ইহা ছিল পরিবার. উপজাতি (tribe) বা নগর; পরে ইহা হইল কুল (Clan), জাতি (Caste), এবং শ্রেণী (Class)। এখন ইহা হইয়াছে অধিজাতি (Nation)। কাল কিম্বা পরশ্ব ইহা হইতে পারে সমগ্র মানবজাতি, কিন্তু তখনও মানুষ ও মানবজাতির মধ্যে সম্বন্ধের, আত্মমুক্তিসাধক পুরুষ এবং আধিপত্য বিস্তারশীল সমাজের মধ্যে সম্বন্ধের সমস্যাটি থাকিয়াই যাইবে।

ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানের যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, আমরা যদি কেবল সেইগুলিই অনুধাবন করি তাহা হইলে আমাদিগকে মানিয়া লইতেই হয় যে, আমাদের জাতির আরম্ভ হইয়াছিল সর্ব্বব্যাপী আধিপত্যশালী সমষ্টি লইয়া, ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবেই সমষ্টির অধীন করা হইয়াছিল, ক্রমে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইয়াছে তাহা মানবজাতির বিকাশের, মনের বিকাশের ফল। আমরা অনুধাবন করিতে পারি যে, যেহেতু মানুষ যূথচারী, মানুষের টিকিয়া থাকার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন হইতেছে দলবদ্ধতা এবং সকল জীবের পক্ষেই প্রথম প্রয়োজন টিকিয়া থাকা, অতএব আদ্য অবস্থায় ব্যষ্টি-সমষ্টির শক্তি ও নিরাপত্তার একটি যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিল না; আর যদি আমরা শক্তি ও নিরাপত্তার সহিত বিকাশ, কার্য্যদক্ষতা এবং আত্মরক্ষার ন্যায় আত্মপ্রতিষ্ঠাও যোগ করিয়া দিই তাহা হইলেও সকল সমূহতন্ত্রের একটিই থাকে প্রধান কথা। ঘটনাচক্র এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতেই এই প্রয়োজন সমুদ্ভূত। মূল তত্ত্ব সকলের দিকে যদি আমরা আরও বেশী লক্ষ্য করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, জড়জগতে শ্রেণীর চিহ্ন হইতেছে সমরূপতা (Uniformity; অর্থাৎ এক শ্রেণীর সকল বস্তুই একরকমের)। প্রাণ ও মনের বিকাশের সংগে সংগে মুক্ত বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিক বিকাশ বাড়িয়া চলে। অতএব যদি আমরা ধরিয়া লই যে, মানুষ হইতেছে জড়ের মধ্যে এবং জড় হইতে বিকশিত মানস-সত্তা, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, মানুষ প্রথমে সমরূপতা এবং ব্যক্তির পরাধীনতা লইয়াই আরম্ভ করে এবং ক্রমশ বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ করে। তাহা হইলে ঘটনাচক্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন এবং মানবজীবনের মূলতত্ত্ব সকলের অপরিহার্য্য নিয়ম দুইদিক দিয়াই আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই, মানুষের ঐতিহাসিক এবং প্রাগৈতিহাসিক বিকাশের একই প্রণালী দেখিতে পাই।

কিন্তু আবার মানব-জাতির প্রাচীন কিম্বদন্তী (যাহাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা বা কাহিনী মাত্র বলা কখনই নিরাপদ নহে) রহিয়াছে যে, সমাজবদ্ধ অবস্থার পূর্ব্বে ছিল আর এক রকম অবস্থা, তাহা মুক্ত ও অসামাজিক। যদি কখনও এইরূপ অবস্থা থাকিত—সে বিষয়ে খুবই সন্দেহ আছে—তাহা হইলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুসারে সে অবস্থা যে শুধুই অসামাজিক ছিল তাহা নহে, তাহা নিশ্চয় সমাজ-বিরোধী ছিল। তাহা ছিল মানুষের স্বতন্ত্র পশুর ন্যায় জীবন, যূথবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে মানুষ শিকারী জন্তুর ন্যায় জীবন-যাপন করিত। কিন্তু কিম্বদন্তী হইতেছে বরং এক স্বর্ণযুগের, তখন সমাজ না থাকিলেও মানুষ ছিল স্বাধীনভাবে সামাজিক. বিধিবিধান অনুষ্ঠান

সকলের দ্বারা সে বধ্য ছিল না, কিন্তু সে সহজাত প্রবৃত্তি কিংবা মুক্ত জ্ঞান অনুসরণ করিয়া চলিত, তাহার নিজের মধ্যেই জীবনের যথার্থ ধর্ম্মকে ধরিতে পারিত, তাহার সহচরদিগকে আক্রমণ করিবারও প্রয়োজন হইত না, অথবা সমাজের লৌহ-শাসনের দ্বারাও তাহাকে নিয়ন্ত্রিত হইতে হইত না। আমরা হয়ত বলিতে পারি যে, এখানে কবিসুলভ বা আদর্শমূলক কল্পনা জাতির বন্ধমূল স্মৃতির উপর ক্রিয়া করিয়াছে এবং অশৃংখলাবদ্ধ সুখময় সমাজ সম্বন্ধে পুরাকালীন মানুষের যে আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল বস্তুত সেইটিকেই সে তাহার অশৃংখলাবদ্ধ সমাজ-বিরোধী জীবনস্মৃতির উপরে আরোপ করিয়াছে। কিন্তু আবার ইহাও সম্ভব যে, আমাদের প্রগতি সরল রেখায় হয় নাই, পরন্তু চক্রে চক্রে আবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল চক্রে এমনও অন্তত আংশিক সিদ্ধির যুগ আসিয়াছে যখন মানুষ তাহার দার্শনিক অরাজকতাবাদের (Philosophical anarchism) উচ্চ স্বপ্ন অনুসারে জীবন-যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, প্রেম ও জ্ঞান ও যথাযথ জীবন, যথাযথ চিন্তা, যথাযথ কর্ম্মের আভ্যন্তরীণ নীতি অনুসারে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, পরন্তু রাজা ও পার্লামেণ্ট, আইন ও পুলিশও শাস্তির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হইতে বলপূর্ব্বক বাধ্য হয় নাই, এবং মানুষের দ্বারা মানুষের উপর জবরদস্তি শাসনের আনুষঙ্গিক স্বৈরাচারের উদ্বেগ, ছোট ও বড় অত্যাচার ও নিগ্রহ এবং স্বার্থপরতা ও অন্তর্দৃষ্টতার কার্য্যতা পরম্পরা হইতে মুক্ত থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। এমন কি ইহাও সম্ভব যে, আমাদের আদ্য অবস্থা ছিল সহজাত সংস্কার হইতে স্বতঃ-উৎসারিত মুক্ত ও সাবলীল সহযোগিতা এবং আমাদের চরম আদর্শ অবস্থা হইতেছে প্রবুদ্ধ অন্তর্বোধ হইতে স্বতঃ-উৎসারিত মুক্ত ও সাবলীল সহযোগিতা, পশুজীবনের পরিণতি হইবে দেবজীবন। যে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত সমরূপতা ও সুসংগতিতে প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়, তাহা হইতে যে আত্ম-অধিকৃত ঐক্যের মধ্যে ভগবান প্রতিফলিত হন সেইদিকে বক্রপথে ঘুরিয়া ফিরিয়া অগ্রসর হওয়াই সম্ভবত আমাদের প্রগতির স্বরূপ।

কিন্তু সে যাহাই হউক (ধর্ম্মমূলক বা অন্যপ্রকার আদর্শ যে মুক্ত নিঃসংগতা বা মুক্ত সহযোগিতার জন্য প্রয়াস করে, সে কথা ছাড়িয়া দিলে) ইতিহাস এবং সমাজ-বিজ্ঞান আমাদিগকে শুধু অল্পাধিক শৃংখলাবদ্ধ সমষ্টি জীবনের অন্তর্গত মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কথাই বলে। আর সমষ্টি জীবনের সকল সময়েই দুইটি আদর্শরূপ (type) আছে, একটি ব্যক্তিকে ক্ষুন্ন করিয়া সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রকেই প্রাধান্য দেয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রাচীন স্পার্টা এবং আধুনিক জার্ম্মানী*; আর একটি রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেয় কিন্তু সেই সংগেই রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তিকেও যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা, শক্তি ও মর্য্যাদা দিতে চেষ্টা করে, ইহার দৃষ্টান্তে প্রাচীন এথেন্স এবং আধুনিক ফ্রান্স। ইহাদের সহিত আমরা একটি তৃতীয় রূপ যোগ করিয়া দিতে পারি যেখানে রাষ্ট্র যতদূর সম্ভব নিজের আধিপত্য ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয়, ... ঘোষণা করে যে, ব্যক্তির বিকাশ, ব্যক্তির স্বাধীনতা, মর্য্যাদা এবং সাফল্যময় মনুষ্যত্বের ব্যবস্থা করার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, সাহসপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চায় যে, ব্যক্তিকে যতদূর সম্ভব অধিক স্বাধীনতা, মর্য্যাদা ও মনুষ্যত্ব প্রদান করাই বস্তুত রাষ্ট্রের কল্যাণ, শক্তি ও বিস্তারের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপায় কিনা। ইংলণ্ড সে দিন পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর মহান দৃষ্টান্ত ছিল,—আর কিছুর দ্বারা নহে কেবলমাত্র তাহার অন্তর্নিহিত এই আদর্শের শক্তিতেই ইংলণ্ড মুক্ত, সমৃদ্ধ, শক্তিময়, অজেয় হইয়া উঠিয়াছে; দেবতারা তাহাকে অভূত-পূর্ব্ব বিস্তার, সাম্রাজ্য ও সৌভাগ্য আনিয়া দিয়াছেন, কারণ এই প্রবৃত্তি অনুসরণ করিতে, এই মহান প্রয়াসের সকল বিপদ সম্মুখীন হইতে, এমন কি তাহার দ্বীপবাসী সুলভ অহমিকার বাহিরেও পুনঃ পুনঃ ইহার প্রয়োগ করিতে সে কখনই শংকিত হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অহমিকা, ইংরেজের জাতীয় দোষ সকল এবং একটা সীমাবদ্ধ ভাবকে অতিমাত্রায় বড় করিয়া প্রচার, যাহা আমাদের মানবীয় অজ্ঞানেরই একটি লক্ষণ—প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই আদর্শটিকে সে সম্ভবমত মহত্তম ও সমৃদ্ধতম রূপ দিতে সক্ষম হয় নাই অথবা, অধিকতর শক্তভাবে শৃংখলাবদ্ধ রাষ্ট্র-সকল অন্যান্য যে-সব ফললাভ করিয়াছে বা করিতেছে সেগুলিও তাহার দ্বারা লাভ করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই। আর পরিণামস্বরূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সমাজবাদ বা রাষ্ট্রবাদ ইংলণ্ডের প্রাচীন পরম্পরাগত আদর্শকে ভাংগিয়া দিতেছে এবং ইহা খুবই সম্ভব আর অল্পদিনের মধ্যেই ঐ মহান পরীক্ষাটি শোচনীয় ভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়া পর্য্যবসিত হইবে, সমগ্র সভ্য মানব-সমাজ যে জর্ম্মন ডিসিপ্লিন ও সুদক্ষ অর্গেনিজেশনের দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া মনে হয়, ইংলণ্ডও শেষ পর্য্যন্ত তাহাই অবলম্বন করিবে। কিন্তু ইহা কি বাস্তবিকই প্রয়োজন ছিল? অধিকতর নমনীয় ও সজাগ বুদ্ধি দ্বারা আলোকিত অধিকতর সাহসপূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা সমস্ত বাঞ্ছনীয় ফল-গুলিই কি এমন অভিনব ও মুক্ততর প্রণালীতে লাভ করা যাইত না যাহাতে জাতির আদর্শটি, ধর্ম্মটি বজায় থাকিতে পারিত?

রাষ্ট্র যে নিজের জন্য ব্যক্তিকে চাপিয়া দিবার অধিকার দাবী করে এই সম্পর্কে আমাদিগকে আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের রূপ যাহাই হউক না কেন তাহাতে এই নীতির কোন ব্যতিক্রম হয় না। স্বৈরচারী রাজার দ্বারা সকলের উপর স্বৈরশাসন অথবা গরিষ্ঠ-সংখ্যার (majority) দ্বারা ব্যক্তির উপর স্বৈরশাসন (বস্তুত ইহা পরিণত হয় মোহাবিষ্ট গরিষ্ঠ দল কর্ত্তৃক নিজেরই উপর নিগ্রহ ও অত্যাচারে—ইহা মানব চরিত্রের হেঁয়ালী!) উভয়েই ঐ একই প্রবৃত্তির বিভিন্ন রূপ। প্রত্যেকেই যখন নিজেকে রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে, বলে "রাষ্ট্র, সে-ত আমিই" (L'et at c'est moi), তখন সে একটি গভীর সত্যকেই ব্যক্ত করে যদিও সেই সত্যকে সে এক মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত করে। সত্যটি

(শেষাংশ ৬৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

*আজিকার রুশিয়া বা ইতালীও ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চীন-জাপান লড়াইয়ের গতি কোন্ দিকে ?

দেড় বৎসরের অধিককাল অতীত হইল। চীন ও জাপানের মধ্যে এখনও সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। এতদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিতেছে, লক্ষ লক্ষ নর-নারী নিহত হইয়াছে, কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি ইহাকে রীতিমত যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করা হয় না। জাপানী পরিভাষায় ইহাকে একটা 'Incident' বা সামান্য ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। চীনও ইহাকে যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতে ভরসা পাইতেছে না। কারণ তাহা হইলে বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিবার যে সামান্য উপায় আছে, তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহার এমনও আশা নাই যে, অন্য কোন রাষ্ট্র হইতে সে প্রত্যক্ষ সাহায্য পাইবে, যেমন পাইতেছে স্পেনের বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কো জার্ম্মানী ও ইটালী হইতে। কাজেই তাহাকে নিজের ফিকির নিজেরই করিয়া লইতে হইতেছে।

চীন-জাপান সংঘর্ষ বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? মোটামুটি বলিতে গেলে, জাপান চীনের এক-তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যে অধিকার করিয়া লইয়াছে। উত্তর চীন, পূর্ব্ব চীন, দক্ষিণ চীনের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি এখন তাহার অধিকারে। চীনের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিও জাপানীরা দখল করিয়াছে। পিকিং, তিয়েনসিন, নানকিং, সাংহাই, ক্যান্টন, হ্যাঙ্কো—একে একে জাপানের আয়ত্তে আসিয়াছে। ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সংস্থান ও শাসন ব্যবস্থা বিজেতাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। চীনের যে-সব অঞ্চল কৃষি ও শিল্প সম্পদে ও ধাতব খনিতে সমৃদ্ধ তাহার অধিকাংশেরই মালিক নাকি এই জাপানীরা। তাহারা কিছুকাল যাবৎ এই বিজিত অঞ্চলগুলির শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু উপায় অবলম্বনের প্রয়াস পাইতেছে। এ বিষয়ে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত পন্থাই অনুকরণ করিতে লাগিয়া গিয়াছে। 'তোর শিল, তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া!' সাম্রাজ্যবাদীর ত এই-ই নীতি। এই সব অঞ্চলের শাসনকার্য্য চীনাদের দ্বারাই করাইয়া লইতে জাপানীরা সচেষ্ট। তাহারা চারিদিকে প্রচার করিতেছে যে, চীনাদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য!

চীনাদের ভিতরেও দেশদ্রোহীদের অভাব নাই. কিন্তু জাতি হিসাবে তাহারা কি জাপানীদের এই টোপ গিলিয়াছে? সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার পর ছয় মাস যাইতে না যাইতেই এক দল বিদেশী মধ্যস্থ সাজিয়া সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিল! জাপান সরকারও কি কি সর্ত্তে সন্ধি চলিতে পারে তাহার আভাষ দিয়া আসিয়াছে। এই সেদিনও এইরূপ কিছু প্রকাশ পাইয়াছে। ইদানীং চীনের কুমিণ্টাং দলের একজন বিশিষ্ট নেতা জাপানের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা চালাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল চেষ্টার ফল কি দাঁড়াইয়াছে? চীন সরকার তথা চিয়াংকাইশেক বরাবর ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। জাপানের সঙ্গে এমন কোন সর্ত্তে তিনি সন্ধিবন্ধ হইবেন না যাহাতে চীনের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমতা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। জাপান চাহে চীনের নেতৃত্ব করিতে। অর্থাৎ, চীন আভ্যন্তরিক ব্যাপারে স্বাধীন থাকুক আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি জাপানের নির্দ্দেশেই পরিচালিত হইবে! তাই প্রথমেই চীন হইতে কম্যুনিজম্ বা সাম্যবাদ বিতাড়ন তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। ইদানীং জাপানী সেনানীরা যতই একটির পর একটি অঞ্চল অধিকার করিতেছে, ততই তাহার অন্য উদ্দেশ্যও ধরা পড়িতেছে। এখন শুধু কম্যুনিজম্ বিতাড়নই তাহার উদ্দেশ্য নয়, অন্যান্য বিদেশীদের প্রভাবও চীন হইতে বিলুপ্ত করিয়া স্বয়ং সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিতেছে। ওয়াশিংটনের যে নবশক্তি চুক্তি অনুযায়ী চীনে মুক্ত-দ্বার নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা সে এখন আর মানিয়া চলিবে না বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। আর ইহার ফলেই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের যা কিছু উষ্মা বাস্তব আকারে প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

জাতি হিসাবে চীনারা জাপানের প্রলোভন এখন পর্য্যন্তও অস্বীকার করিয়া চলিয়াছে সত্য, কিন্তু কত দিন পর্য্যন্ত তাহারা এরূপ করিতে সমর্থ হইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। চিয়াংকাইশেক এবং তাঁহার অধীনে সমগ্র চীন জাতি এখনও চীনের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বদ্ধপরিকর। চীনারা উত্তর চীন হারাইয়াছে, পূর্ব্ব চীন ও দক্ষিণ চীনের সমস্ত প্রধান প্রধান বন্দরও তাহাদের হস্তচ্যুত। কিন্তু তাহাদের কর্ম্মশক্তি বা সৃজনী শক্তি ইহাতে আদৌ

চীনের বর্ত্তমান রাজধানী চুংকিং। চিত্রে ব্রহ্ম-ইউনান মোটর পথ প্রদর্শিত হইতেছে। ইউনান হইতে ফরাসী ইন্দো-চীনেও একটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে বিদেশাগত যুদ্ধাস্ত্রসমূহ রেঙ্গুন হইতে ইউনানে প্রেরিত হইতেছে।

ব্যাহত হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এমন কি মাদাম চিয়াংকাইশেকও স্বীকার করিয়াছেন, যে, নেতাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে। কিন্তু চীন জাতি এত ঘাত-প্রতিঘাতেও মোটেই নিরাশ হইয়া পড়ে নাই। তাহার আত্মবিশ্বাস আছে, সে জানে যুগে যুগে ইহা অপেক্ষাও প্রবলতর ঘূর্ণিবাত্যা তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে-সকলই সে উৎরাইয়া উঠিয়াছে, এবারেও তাহারা বিপদ উত্তীর্ণ হইতে নিশ্চয়ই পারিবে।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই চীনারা শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়া দেশের অভ্যন্তর প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। নানকিঙের পতনের পর রাজধানী সরাইয়া হ্যাঙ্কৌতে লইয়া গিয়াছিল সেখান হইতে এখন চুংকিং নামক শহরে ইহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। এবং হ্যাঙ্কো কিম্বা চুংকিঙে তাহাদের সরকারী দপ্তরখানাই শুধু লইয়া যাওয়া হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানও চলিয়া গিয়াছে। আপনারা হয়ত বিস্মিত হইবেন, কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা যে, এত বিপদ-আপদের মধ্যেও চীনারা বিদ্যাভ্যাস করিতে ভুলিয়া যায় নাই। তাহারা যেখানেই যাইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ও তাহাদের সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। চুংকিং এখন পুরোদস্তুর রাজধানী। পূর্ব্ব দিকে সমুদ্র তীর হইতে পনর শত মাইল এবং শেষ রাজধানী হ্যাঙ্কো হইতে ছয় শত মাইল পশ্চিমে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পার্ব্বত্য ভূমির উপর শহরটি অবস্থিত। ব্রিটিশ, ফরাসী, মার্কিন প্রভৃতি বিদেশী দূতাবাসগুলিও এখানে উঠিয়া আসিয়াছে।

আগে বলিয়াছি, এত বিরাট ক্ষতি স্বীকার করিয়াও চীনারা স্ব-সঙ্কল্পে দৃঢ় রহিয়াছে। চীনাদের ভিতর বিভেদ সৃষ্টিরও যে চেষ্টা না হইয়াছিল তাহা নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে রটিয়াছিল যে, চীনের সাম্যবাদীরা চীন রাষ্ট্রে প্রাধান্য চাহে, এজন্য চিয়াংকাইশেকের নেতৃত্ব আর মানিতে চাহিতেছে না। সাম্যবাদীরা ইহার ঘোর প্রতিবাদ জানাইয়াছে, চিয়াং-কাইশেকের উপর আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছে এবং চীনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সাহায্য করিতেছে। চীন তাহাদেরও জন্মভূমি, জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় তাহারা লড়িবে ত নিশ্চয়ই। চীনাদের এই দুই দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা সুতরাং অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।

জাপানীদের একটি প্রধান চেষ্টা চীনের বাহিরের পথ-গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া। উত্তরে পিকিং হইতে দক্ষিণে ক্যান্টন পর্য্যন্ত জয় করিয়া সমুদ্রে বাহির হইবার সব পথ-গুলিই জাপান অধিকার করিয়া লইয়াছে। ভাবিয়াছিল এইরূপে বাহিরের সব পথই বন্ধ হইলে চীন বিদেশ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করিতে পারিবে না, কাজেই সহজেই জাপানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইবে। কিন্তু জাপানের এ অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। অন্তর্মোঙ্গোলিয়ার পথে রুশিয়া হইতে চীনারা প্রথম হইতেই রণাস্ত্র আমদানী করিতেছে। ইদানীং চীনের পশ্চিম দিক হইতেও বহির্জগতে বাহির হইবার পথ করিয়া লওয়া হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষিপ্রতার সহিত ব্রহ্ম-ইউনান মোটর পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য তের শত মাইল। কিছু দিন হইল রেঙ্গুন হইতে এই পথে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ সুরু হইয়াছে। সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রদূত এই পথ পরিক্রমা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রাস্তাটি দীর্ঘ হইলেও অতি সুন্দর করিয়া করা হইয়াছে। ইন্দো-চীনের দিকেও অনুরূপ একটি রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিবার পথ চীনারা এইরূপে করিয়া লইতেছে।

চীন জাপানের সহিত সংঘর্ষ আরম্ভ হওয়া অবধি বিদেশীর দরবারে, বিশেষত চীনে যে-সব রাষ্ট্রের স্বার্থ অত্যধিক, সেই ব্রিটেন ও যুক্ত-রাষ্ট্রের নিকট সাহায্যের জন্য ধর্ণা দিয়াছে, রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যও সে চাহিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাকে বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। ইদানীং কিন্তু ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। চীনে জাপান যতই আড্ডা গাড়িয়া বসিবে ততই উহাদের স্বার্থ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। জাপান এখন আর ওয়াশিংটনের নব শক্তি চুক্তি মানিয়া লইতে রাজী নয়। আর এই নব শক্তি চুক্তি বাতিল হইয়া গেলে ব্রিটেন ও যুক্ত-রাষ্ট্রের স্বার্থহানির বিশেষ আশঙ্কা। ইদানীং যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, জাপান চীনে নিজ অধিকারই পুরাপুরি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। বিজিত চীন, অন্তর্মোঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুকুয়ো লইয়া একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাহার উদ্দেশ্য। এইজন্য ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র আরও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সুতরাং জাপানকে প্রতিবাদ জানাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, চীন সরকারকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেও রাজী হইয়াছে। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র তাহাদিগকে ঋণ দান করিয়াছে। চীন যদি এই সাহায্য কিছুকাল আগে লাভ করিত তাহা হইলে তাহার চেহারা বোধ হয় অন্য রকম হইয়া যাইত। চারিদিকের এবং চীনের ভিতরকার অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, চীন এখনও এই সাহায্যের সম্পূর্ণ সুযোগ লইয়া জাপান-প্রতিরোধে হয়ত সক্ষম হইবে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া জাপানও কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। জাপানের রণশক্তির নিকট চীনের তুলনাই হয় না। তাহার স্থল-বাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান-বাহিনী খুবই শক্তিশালী, জগতের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলিও ইহার নিকট বিস্ময় মানে। চীন-সংগ্রামে জাপানের নৌ-বাহিনী ব্যবহৃত হইতেছে না, হইলেও তাহা খুবই কম। তাহার স্থল-বাহিনী ও বিমান-বাহিনীই চীনে নৃশংস অভিযান চালাইয়াছে। চীনারা ক্রমশ হটিয়া যাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতেছে না। সাধারণের হয়ত বিশ্বাস, এইরূপ এক-একটি প্রদেশ জয় করিতে করিতে একদিন চীনের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া জাপানের পক্ষে সম্ভব হইবে। জাপানীরা, বিশেষ জাপানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কিন্তু ইহা মনে করে না। তাহারা ইতিমধ্যেই চীনের সংহতির নিকট একটা বড় রকমের ধাক্কা খাইয়াছে। তাই যে-সব অঞ্চল তাহারা

[illegible]রাছে, বলিতেছে সেখানে জাপানী-শাসন চালাইবে না, [illegible]নারাই সে-সব স্থান শাসন করিবে, অর্থাৎ সে-সব অঞ্চল হইবে স্বায়ত্ত-শাসন সম্পন্ন, মাত্র জাপানীদের কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। বিজিত অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের এইরূপ নানা অপকৌশল অবলম্বনের ত্রুটি নাই, তাহাতেও কিন্তু স্থায়ীভাবে এখনও কোন শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। বরং সেখানে চীনারা ক্রমশ বাঁকিয়া দাঁড়াইতেছে। আর যে-সব অঞ্চল এখনও জয় করিতে বাকি, সেখানে মাথা গলান জাপানীদের পক্ষে ত খুবই কঠিন। এই সব কারণে, এবং ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মতিগতিতে যেন কতকটা, জাপানীরা হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে।

সম্প্রতি জাপানের মন্ত্রিসভার কিঞ্চিৎ অদল-বদল হইয়াছে। কোন বিশেষ নীতির দোহাই দিয়া বিভিন্ন রাজনীতিকগণ বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এবারে কিন্তু জাপানে তাহা হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ে পার্লামেণ্টে ভোটাধিক্যে পরাজিত হন নাই। তিনি স্ব-ইচ্ছায় এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ অথচ লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগের কি কারণ তিনি দর্শাইয়াছেন? চীনবিজয় কার্য্যে যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, তাহা তিনি করিতে পারিতেছেন না। এইজন্যই যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে তিনি দায়িত্বভার ছাড়িয়া দিয়াছেন। তবে তিনি মন্ত্রিসভায় থাকিবেন এবং নির্দ্দেশ যথাবিহিত তামিল করিবেন। এ কথার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। চীন অভিযান কার্য্য অতঃপর সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অত্যন্ত কঠোরভাবে ও ক্ষিপ্রতার সহিত পরিচালিত হইতে থাকিবে। গত দেড় বৎসরে চীনে অভিযান চালাইয়াও, তাহার এক তৃতীয়াংশ অধিকার করিয়াও এবং তাহার ধনসম্পদের প্রধান ঘাঁটিগুলি আগলাইয়াও চীনাদের সায়েস্তা করা যাইতেছে না। এখন এমন কি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অবলম্বিত হইবে যাহাতে চীন বিজয় সহজ হইয়া পড়িবে? জাপানী নেতারা গত দেড় বৎসরে একদিকে একদল চীনাকে হাত করিয়া চীনে বিজয় কার্য্য সহজ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছে, অন্যদিকে দেশবাসীকে অহর্নিশি এই কথা বলিয়াছে যে, চীন-অভিযান বহুদিন চলিবে, সেজন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে সকলে যেন প্রস্তুত থাকে। এ বিষয়ে একটি আইনও তখন জাপান সরকার করিয়া লইয়াছিল। এতদিন এই আইন কার্য্যকরী হয় নাই, এখন বেগতিক দেখিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পর কার্য্যকরী করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। কেন না চীনাদের ভুলাইয়া কাজ হাসিল করা আর চলিবে না। এই আইনটির মর্ম্ম এই যে, রণ-নীতি সুপরিচালনার জন্য জাপানের ধন-কেন্দ্রগুলি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। কোন ব্যবসা কত লাভ করিবে, অংশীদারদের কত মুনাফা দেওয়া হইবে, ইহাও সরকার নিয়ন্ত্রণ করিবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মুনাফার বাড়তি অংশ সরকার গ্রহণ করিবে! নেতৃস্থানীয়েরা জাপানের সাধারণ অধিবাসীদের উদ্দেশ করিয়া অহরহ এই কথাই বলিতেছে যে, অন্তত দশ বৎসরের জন্য তাহারা যেন প্রস্তুত থাকে, কারণ চীন বিজয় কার্য্য এত সহজ ব্যাপার নহে।

জাপান-প্রত্যাগত এক ভদ্রলোকের কথা উল্লেখ করিয়া জনৈক বন্ধু সেদিন বলিলেন, চীনে জাপানীরা এইরূপ একটা বিরাট অভিযান চালাইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে, কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে, কিন্তু জাপানে এ সম্পর্কে কোন সাড়া-শব্দ নাই, জাপানী সাধারণ যেন ইহাতে ভ্রূক্ষেপই করে না। জাপানীদের জীবনযাপন সম্বন্ধে যাহারা অভিজ্ঞ, তাহাদের ইহাতে বিস্ময় প্রকাশের কোন কারণ নাই। প্রথমত, জাপানের সাধারণ লোকের জীবন ধারণের মান নিতান্ত নিম্নে, গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী সামান্য কিছু হইলেই তাহাদের দিন চলিয়া যায়। দ্বিতীয়ত তাহারা জাপান সম্রাটকে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করে। তাঁহার আদেশ ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মানে। সৈন্যবাহিনী খাস সম্রাটের অধীন, তাঁহার আদেশ তামিল করাই তাহাদের ধর্ম্ম; কি মন্ত্রিসভা, কি গবর্ণমেণ্ট কাহারও তাহারা তোয়াক্কা রাখে না। জনসাধারণও এজন্য সৈন্যদের খুবই সম্মান করে। জাপানের যত তীর্থস্থান আছে তাহা এক একজন সৈন্যের নামে। এক একজন সৈন্যের নামে এক-একটি তীর্থস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই জাপানীরা সম্রাটের নামে যে-সব কাজ হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করিবে না, ইহাই ত স্বাভাবিক।

ঐ ভদ্রলোক আরও বলিলেন, জাপানের চীন-অভিযানের সংবাদ জাপানী পত্রিকাগুলিতে কদাচিৎ বাহির হইয়া থাকে। যুদ্ধ বিজয়ের সংবাদই মাত্র এগুলিতে দেওয়া হয়, অন্যান্য সংবাদ একরূপ দেওয়াই হয় না। একদিকে জাপানী সাধারণের অন্ধ সম্রাট-ভক্তি, অন্যদিকে আদ্যন্ত সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে অজ্ঞতা—এই দুই-ই সরকারকে যদৃচ্ছপন্থা অবলম্বন করিতে সাহসী করিয়াছে। আর মন্ত্রিসভা ক্রমশ সৈন্যতন্ত্রেরই করতলগত হইয়া পড়িতেছে! এ-সব সত্ত্বেও জাপানের একদল প্রগতিবাদী ছাত্র ও অধ্যাপক এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছে, এবং ইহার ফলে কারাবরণও করিতেছে। জাপানী সাধারণের বহু যুগ-পুষ্ট মনোভাব ইঁহাদের এবম্বিধ ত্যাগ দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইবে কি না বলা যায় না। কিন্তু আত্মরক্ষায় চীনের মরণপণ, আর জাপানের চীন অধিকারে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন—এ দুই বিভিন্ন পন্থার মিলন কোথায় কিভাবে হইবে কেহ বলিতে পারে কি? তথাপি, পাশ্চাত্য রাজনীতি যেরূপ দ্রুত জটিল আকার ধারণ করিতেছে এবং চীনে ব্রিটিশ ও মার্কিন স্বার্থ জাপানীদের দ্বারা যেরূপ বিপন্ন হইয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহাতে চীনের পক্ষে কিছু সুবিধা হইলেও হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৯

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লাহোর অধিবেশন, ১৯৩৯)

ভূ-পরিমাণ ও ভূগোল-বিজ্ঞান শাখা

এই শাখার সভাপতি মিঃ এন সুব্রহ্মণ্যম্ এম-এ, এল-টি, এফ-আর-জি-এস মাদ্রাজ শিক্ষা বিভাগের কাজে নিযুক্ত আছেন। তিনি সৈদাপেট 'টিচার্স ট্রেনিং কলেজের' ভূগোল বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁহার চেষ্টাতেই মাদ্রাজ ভূগোল সমিতি সংগঠিত হয়। ভূগোল-বিজ্ঞান যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার যোগ্য স্থান লাভ করিতে পারে, তৎসম্পর্কে তাঁহার চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার অভিভাষণে 'ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ শুধু একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা নহে, উহার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য উহাকে একটি জীবন্ত রূপ দিয়াছে। উত্তরে ভারতবর্ষ দুর্গম হিমালয় পর্ব্বত দ্বারা এশিয়ার অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে সমুদ্র ভারতবর্ষ ও এশিয়ার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। এই দেশ গ্রীষ্ম ও বৃষ্টি প্রধান। মৌসুমী বায়ু ও বর্ষা ইহার আবহ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। আবহগতির এই ঐক্যের দেশে বহু যুগ-

মিঃ এন সুব্রহ্মণ্যম্

যুগান্তব্যাপী সাধনা দ্বারা ভারতবাসীরা সভ্যতার ক্ষেত্রেও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজনীতিক ঐক্য স্থাপনে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছে। বিশালতা যেমন ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্যাগুলির কারণ, তেমনি রাজনৈতিক অনৈক্যেরও কারণ। ভারতবর্ষ একটি ছোটখাট মহাদেশ; ইহার অধিবাসীরাও নানা জাতিতে বিভক্ত। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে ইংরাজদের যে সুবিধা হইয়াছে, প্রাচীন যুগের শাসকগণের সেই সুবিধা ছিল না।

ভৌগোলিক সংস্থানের ফলে জন্মিয়াছে ভারতবর্ষের স্বয়ম্পূর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতা। জাতিভেদ, বারিপাত, পরিচ্ছদ, আহার্য্য ইত্যাদির বৈসাদৃশ্য উহা আরও ব্যাপক ও নিবিড় করিয়া তুলিয়া বিভিন্ন স্বতন্ত্র কেন্দ্র রচনা করিয়াছে,—গণ্ডির মধ্যে গণ্ডি সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিচ্ছিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ম্পূর্ণতা ভারতবাসীর সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে অনাড়ম্বর জীবন, পরমতসহিষ্ণুতা, আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দিয়াছে।

ভারতবর্ষ সংস্কৃতিগত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় আজও ইউরোপের পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। সৃষ্টিমূলক জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া ইউরোপ নূতন শক্তি লাভ করিয়াছে এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ইউরোপের সহিত ভাব-সংঘর্ষে, ইংলণ্ডের সাহচর্য্যে এবং বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষও নব-চৈতন্য লাভ করিয়াছে। শুধু সহরেই নহে, সুদূর পল্লী অঞ্চল পর্য্যন্ত এই নব প্রেরণায় স্পন্দিত হইতেছে। ফলে, স্বয়ম্পূর্ণতা রূঢ় আঘাতে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে, জাতিভেদ নিজকে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতেছে। ভারতের প্রাচীন স্থিতিশীল ভূগোলে দেখিতে পাই—কৃষির উপর নির্ভরতা, ঘোর দারিদ্র্য—অনগ্রসর ভারতবর্ষের ছবি। কিন্তু ভারতের গতিশীল ভূগোলে দেখিতে পাই, সমস্ত সৃজনীশক্তির ক্রিয়া; এই ভূগোল আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে ভারতবর্ষের অনগ্রসরতার কারণগুলি অন্তর্নিহিত নয়—উহা অপনেয়। ভৌগোলিক অবস্থানের ফলাফল অপরিবর্ত্তনীয় নহে; মানুষ যদি সৃষ্টিক্ষম জ্ঞান-চর্চ্চা করিয়া শক্তিমান হয়, তবে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া পরিবর্ত্তন আনয়ন করা সম্ভবপর।

আজ ভারতে সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিতেছে। ইংলণ্ড উত্তর ইউরোপের সমন্বয়; আমেরিকা ইউরোপের সমন্বয়, কিন্তু এই ভারতে সমগ্র পৃথিবীর সমন্বয় সাধিত হইবে।

শারীর-বিজ্ঞান শাখা

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক এন এম বসু এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক বসু ১৮৯২ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। শারীর-বিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পাশ করিবার পর ১৯১৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক এস সি মহলানবীশ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি অধ্যাপক পদ লাভ করেন। মেডিক্যাল জার্নাল ও অন্যান্য সাময়িকপত্রে শারীর-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার চেষ্টাতেই "ভারতীয় শারীর বিজ্ঞান সমিতি" প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ত্তমানে 'ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ফাণ্ড এসোসিয়েশনের' আনুকূল্যে তিনি ভিটামিন সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা করিতেছেন। বিজ্ঞান মহাসভার এই শাখার সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, আমাদের দেশে নানা কারণে শারীর বিজ্ঞানে ভাল গবেষণা হইতেছে না। যে সকল চিকিৎসা-বিষয়ক বা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শারীর-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তথায় ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক রাখা হয় না এবং উপযুক্ত অর্থও বরাদ্দ করা হয় না। তাহা ছাড়া আরও কারণ আছে; যথা:—(১) এখনও লোকের ধারণা এই যে, শারীর-বিজ্ঞান চিকিৎসা বিদ্যার একটা গৌণ অংশ মাত্র; কাজেই শারীর বিজ্ঞানের প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। (২) যাঁহারা শারীর-বিজ্ঞান পড়েন, তাঁহাদের আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা কম বলিয়া—সাধারণতঃ এমন ছাত্রেরাই ইহা পড়েন, যাঁহাদের লক্ষ্য শুধু একটি ডিগ্রী লাভ—বিষয়টি আয়ত্ত করার আগ্রহ তাঁহাদের নাই। (৩) শারীর-বিজ্ঞান ভালরূপ আয়ত্ত করিতে হইলে রসায়ন ও জড়-বিজ্ঞান জানা আবশ্যক; অথচ যাঁহারা শারীর-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা রসায়ন ও জড়-বিজ্ঞান পড়িবার সুযোগ পান না এবং তাঁহাদিগকে এই দুইটি বিষয় পড়িতে উৎসাহও দেওয়া হয় না। (৪) অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে শারীর-বিজ্ঞানে গবেষণা করার জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেও বিশ্ববিদ্যালয় বা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। (৫) অনেক গবেষণাগার এমনভাবে নির্ম্মিত যে, জুনিয়ার অধ্যাপকগণ যাহাতে গবেষণা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করার কথ

মোটে বিবেচনা করা হয় নাই। (৬) শারীর-বিজ্ঞানকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত বিবেচনা করা হয়, কাজেই বিজ্ঞানের এই শাখাটি বর্ত্তমানে একটি পর-গাছার সামিল। (৭) অধ্যেতব্য বিষয় নিতান্ত সেকেলে এবং একেবারে বাঁধাধরা; কাজেই ছাত্রদের মনে গবেষণার কোনও আগ্রহ জন্মে না।

এই দেশে শারীর বিজ্ঞানের গবেষণায় যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতঃপর অধ্যাপক বসু তাহা বর্ণনা করেন ও চিকিৎসকগণের পক্ষে তাহার উপযোগিতা দেখাইয়া দেন।

পাচক রস পরীক্ষা, তৈল ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থ এবং ডাল ও চাউলের প্রোটিন ও শ্বেতসার, ডাল, বিভিন্ন প্রকারের চাউল ও মৎস্যজাত প্রোটিনের উপযোগিতা, ভুক্তবস্তু জৈব-পদার্থে পরিণতি লাভ ও আবহাওয়ার পার্থক্যবশত উহার ব্যতিক্রম ইত্যাদি নানা বিষয়ে এই দেশে গবেষণা হইয়াছে। কৃষ্ণাণ, অধ্যাপক বসু নিজে, কর্ণেল চোপরা ও বাগচী গবেষণা করিয়া মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এখন জানা গিয়াছে যে, প্রোটিন হিসাবে মাষকলাই ও মুগ ডাল মসুর ডাল অপেক্ষা অনেক ভাল। অন্যান্য হিসাবেও মুগ ডাল মসুর ডাল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভাতের সঙ্গে মসুর ডাল অপেক্ষা মুগ ডাল অনেক বেশী পুষ্টিকর। সুতরাং রোগ-মুক্তির পর রোগীকে বলাধানের জন্য মসুরের যূস না দিয়া মুগের জুস দিলে বেশী উপকার পাওয়া যাইতে পারে। আরও জানা গিয়াছে যে, ঢেঁকী ছাঁটা চাউল, ডাল তরকারী ও সামান্য জান্তব প্রোটিন (বিশেষত দুগ্ধ) গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে প্রশস্ত খাদ্য।

কয়েকটি গবেষণাগার আছে বলিয়াই এবং ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ফাণ্ড এসোসিয়েশন হইতে প্রচুর অর্থ দেওয়া হয় বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত গবেষণা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে শারীর-বিজ্ঞানে পূর্ব্বোক্ত গবেষণা ব্যতীত আর কোনও গবেষণা প্রায় হয় নাই। অধ্যাপক বসু বলেন, ভৈষজ্য-শাস্ত্র ও শারীর-বিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন করা আবশ্যক। কারণ এই দুইটি বিষয় পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; সুতরাং একটির উন্নতি ব্যতীত অপরটির উন্নতি হইতে পারে না।

নৃতত্ত্ব শাখা

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ডি এন মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পরীক্ষায় নৃতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ সালে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করেন এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কেম্ব্রিজে গমন করেন এবং ১৯৩৩ সালে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালেও তিনি আবার ইউরোপ পরিভ্রমণে বাহির হন এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। দেশী ও বিদেশী বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁহার গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতিরূপে তিনি ভারতের আদিম-জাতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে প্রায় ৫ কোটী আদিম জাতি বাস করে। তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতে ৫ ভাগের চারি ভাগ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে এক ভাগ দেখা যায়। ভারতের মোট অধিবাসী সংখ্যার শতকরা ৮ ভাগ আদিম জাতি। এমন অনেক জাতি আছে, যাহাদের সংখ্যা ক্ষয় হইবার দিকে চলিয়াছে। আবার এমন অনেক জাতি আছে, যাহাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে। দৃষ্টান্তস্থলে মুণ্ডা-ভাষাভাষী জাতিসমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে মুণ্ডা, হোস ও সাঁওতালদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। কোনও কোনও জাতি সংরক্ষণমূলক শাসন ব্যবস্থার অধীন; আবার অনেকে স্বজাতীয় প্রধানের দ্বারা পরোক্ষভাবে শাসিত হয়। এই সকল জাতির উপর জাতীয় স্বার্থহানিকর আইন-কানুন প্রযুক্ত হয় না।

সভ্যতার সংস্পর্শে আর্থিক ও সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তনের ফলে বহু জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতেছে। ভারতের ও অন্য দেশের বহু আদিম জাতির জীবন-মরণ সংগ্রামে জনবিজ্ঞান সম্পর্কীয় গুরুতর পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও জাতির মধ্যে নৈতিক অবনতি দেখা যায়। যুক্ত-প্রদেশের কোরোয়া গঞ্জাম এজেন্সী অঞ্চলের খোন্দা এবং ছোট-নাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের বীরভোর জাতি প্রভৃতির মধ্যে নৈতিক অবনতির লক্ষণ ক্রমশঃ আদিম জাতির অস্তিত্বের অন্তরায় হইতেছে।

আদিম জাতি সভ্যতার সংস্পর্শে আসিলে, সাংস্কৃতিক মিশ্রণে এক মিশ্রসংস্কৃতির উদ্ভব হয়। যে জাতি জীবনশক্তি সম্পন্ন সেই জাতি অন্যের বৈশিষ্ট্যগুলি সহজে গ্রহণ করিতে পারে। এক্ষেত্রে নির্ব্বাচনের প্রতিই ঝোঁক দেখা যায়। এই নির্ব্বাচনের প্রকৃতির উপরই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সংস্কৃতি-বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন জাতি একই স্থানে বসবাস আরম্ভ করিলে, তাহাদের সংস্কৃতির পারস্পারিক প্রতিক্রিয়ার ফলে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটে এবং তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে অন্যোন্যজীবী সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকে এবং এক জাতি অন্য জাতির সহিত মিশিয়া যায়। তখন তাহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, এমন কি সংজ্ঞা পর্যান্ত থাকে না। এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর সম্বন্ধ স্থাপনে এই সাংস্কৃতিক মিলনের বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে।

বাস্তারের আদিম জাতি

মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্য বাস্তারে এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাস্তার রাজ্যের উত্তরে কঙ্কর রাজ্য ও রায়পুর জেলা, পূর্ব্বে ভিজাগাপট্টম জেলার জয়পুর জমীদারী, দক্ষিণে গোদাবরী নদী এবং পশ্চিমে চান্দা জেলা অবস্থিত। বাস্তারের আদিম অধিবাসী গোন্দ জাতীয়। বৈদেশিক ও প্রবাসীদের যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা অধিবাসী বিভিন্ন জাতির নাম উল্লেখ করা হইলঃ—

সামাজিক মর্য্যাদার পর্য্যায় অনুসারে বাস্তার রাজ্যের অধিবাসী বিভিন্ন জাতির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

(১) ধকর ও (২) হলবা—এই দুই সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করে; কিন্তু সামাজিক পদমর্য্যাদায় হলবাগণ ধকরদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে; (৩) কোয়াট, কুরুখ বা ধীমার; (৪) কহ্যার, (৫) সুংরী, (৬) পাওগর, (৭) গদার, (৮) ভাটরা, (৯) পুর্জো বা ধুরু, (১০) মুরিয়া, (১১) মালভূমির সারীগণ—ইহারা দণ্ডামী সারিয়া নামেও পরিচিত; (১২) পার্ব্বত্য সারিয়া। সামাজিক মর্য্যাদার নিম্নস্তরে পার্ব্বত্য সারিয়া এবং সর্ব্বোচ্চ স্তরে ধকর। পাওগর, সুংরী, কহ্যার, কোয়াট ও কুরুখ প্রভৃতির সংখ্যা কম। জনপ্রবাদে জানা যায়, ইহারাই বাস্তারের আদিম অধিবাসী। তাহাদের পারিপার্শ্বিক জাতির সহিত একমাত্র মুখাকৃতির পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে বৈষম্য নাই।

আদিম জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বর্ণধর্ম্মাবলম্বীদের আগমনে একে অপরের উপর এমনই নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে যে, একের সহযোগিতা ভিন্ন অন্যের অস্তিত্ব অসম্ভব। বাস্তার রাজ্যে প্রচলিত 'কাবাদী' প্রথা হইতে ইহা বুঝা যায়।

কাবাদী প্রথা

আদিম জাতির মধ্যে মাতুল পুত্রের সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত। [illegible]

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের প্রথমস্মৃতি তর্পণে

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ

ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র, এই দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার জন্ম-দিবসের এক উৎসব-সভায় তিনি বলিয়াছিলেন, "এই ৩১শে ভাদ্র বছরে বছরে ফিরে আসবে, কিন্তু একদিন আমি আর আসবো না।......কেবল প্রার্থনা করি, সেদিনও যেন এমনিধারা স্নেহের আয়োজন থেমে না যায়।" এ প্রার্থনা শরৎচন্দ্রের সরলতা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার দেশবাসীর প্রতি এ প্রার্থনার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বঙ্গ-সাহিত্যের ভাণ্ডারে শরৎচন্দ্র যে রত্নরাজি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য। বাঙ্গালী বিস্মৃতি-প্রবণ হইলেও যতকাল বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততকাল তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার আয়োজন থামিবে না—থামিবার নহে।

তবে মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ৩১শে ভাদ্র—যে দিন তিনি আর আমাদের মধ্যে আসিবেন না বলিয়াছিলেন, সেই শোচনীয় দুর্দ্দিন যে এত শীঘ্র আসিয়া তাঁহার কথা আজ আমাদিগকে ব্যথার সহিত স্মরণ করাইবে, এ কথা স্বপ্নেও কেহ মনে করেন নাই। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে নিষ্ঠুর কাল আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল। তিনি যাহা দিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা দিতে পারিলেন না—বঙ্গসাহিত্য তাঁহার শুভ-সঙ্কল্পিত সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল।

(বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকে যাঁহারা অভূতপূর্ব্ব শ্রীসম্পদে ভূষিত করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। চিত্রাঙ্কন-চাতুর্য্যে ও চরিত্র বর্ণনায় তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিল্পী, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে, বাঙ্গলায় আর কেহ জন্মিয়াছেন বলিয়া কেহ স্বীকার করিবেন না। সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের উদয় ঘটিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী পাঠক যে সুখপাঠ্য কথা-সাহিত্যের অভাব অনুভব করিতেছিল, এমন নহে। তখনও এমন শক্তিশালী লেখক ছিলেন, যাঁহারা নিত্য নূতন গল্প-উপন্যাসাদি রচনার দ্বারা পাঠক-চিত্ত-বিনোদন করিতেছিলেন। সাহিত্যের এই জমকালো আসরে আসিয়া নূতন সুরে নূতন করিয়া গান ধরিয়া আসর জমাইয়া পাঠকের চিত্ত জয় করা যে সহজসাধ্য কাজ ছিল, এ কথা কেহই বলিবেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার যশঃসৌরভ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল—যেন তাঁহারই জন্য বাঙ্গালার পাঠক-সমাজ শূন্য-সিংহাসন লইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। সগৌরবে ও সসম্মানে তিনি সে আসন অধিকার করিলেন।)

(শরৎচন্দ্র সহানুভূতি ও সমবেদনার উৎস ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "সংসারে যারা শুধু দিলে—পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল—উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন দিন ভেবেই পেলে না—সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের কাছে কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।" শরৎচন্দ্র তাঁহার সাধনার অনুপ্রেরণা কোথা হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় এই কয় ছত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ব্যথিতের জন্য এত অধিক বেদনা-বোধ ছিল বলিয়াই তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে তিনি মমতার ধারা ঢালিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। এই অমৃত-ধারার আস্বাদন-সুখ যাহারা উপভোগ করিয়াছে, তাহারা শরৎচন্দ্রকে কখনও ভুলিতে পারে না।)

(শুধু গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি নহে, মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ। সজীব মানব-চরিত্রই নাটক-উপন্যাসাদির বাহন। তিনি তাঁহার ঐন্দ্রজালিক ভাষায় মানুষের প্রাণের রূপকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীকান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার শিশু-চরিত্রগুলি পর্য্যন্ত এই বাক্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করিবে।)

মানুষ-হিসাবে শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি বড়ই মধুর ছিল। তাঁহার সরলতা ও উদারতার পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় ও অকপট ব্যবহারে লোকে মুগ্ধ হইত এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে আপন করিয়া লইবার তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল। এক দিকে যেরূপ তিনি স্বল্পভাষী ও কোমল-স্বভাব ছিলেন, অন্য দিকে তাঁহার চিত্ত যথার্থ ভয়শূন্য ছিল। কোনরূপ অন্যায় বা অত্যাচার তিনি সহ্য করিতেন না এবং নির্ভীক-ভাবে আপন মতামত প্রচার করিতেন। বৃহৎ সভা-সমিতিতে তিনি যোগদান করিতে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না বটে, কিন্তু কোন দেশহিতকর মঙ্গল-কার্য্যে তাঁহার সহযোগিতা কামনা করিলে নিঃস্বার্থভাবে তিনি উহার সহায়তায় অগ্রসর হইতেন। দেশকে তিনি প্রাণ-মন দিয়া ভালবাসিতেন এবং দেশমাতৃকার সেবার সুযোগ পাইলেই নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য, তিনি তাঁহার 'পথের দাবী'র সাহায্যে তাঁহার স্বদেশের যে দাবী জগতের সম্মুখে নির্ভয়ে উপস্থিত করিয়াছিলেন, আজ বাঙ্গলা সরকারের আদেশক্রমে তাঁহার সেই অতুলনীয় গ্রন্থ বাঙ্গালীর পড়িবার অধিকার নাই।

শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়-কালের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারই এই জন্মভূমি দেবানন্দপুরে আর যে একটি মনীষা-সম্পন্ন বাঙ্গালী এই গ্রামকে ধন্য করিয়াছিলেন, সেই ভারতচন্দ্রের রচনা-রীতি যেমন বহুদিন যাবৎ বঙ্গীয় লেখককুলের আদর্শ ও অনুকরণীয় হইয়া ছিল, শরৎচন্দ্রের রচনাও তদ্রূপ হইয়া থাকিবে। ভারতচন্দ্র যেমন পদ্য-সাহিত্যে এক নূতন রূপের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রও তেমনি গদ্য-সাহিত্যে এক অভিনব রূপ দিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, ছন্দের পারিপাট্যে, শব্দ-চয়নের চাতুর্য্যে ও গল্প-সাজাইবার নৈপুণ্যে তিনি যে শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল। তাঁহার রচনা হইতে যত বেশী বাক্যকে বাঙ্গালী প্রবাদবাক্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, তেমন আর কাহারও রচনা হইতে করে না।

দেবানন্দপুর ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান না হইলেও ইহার সহিত তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের সম্বন্ধ জড়িত হইয়া আছে। ভারতচন্দ্র এই স্থানে অবস্থান করিয়া পারসী ভাষায় বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়। ১১৩৪ সালে এই গ্রামে বসিয়াই তিনি তাঁহার প্রথম রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অমর লেখনী মধ্যেও আছে—"দেবের আনন্দ-ধাম, দেবানন্দপুর নাম।" বর্ত্তমান কালে দেবানন্দপুর বাঙ্গালীর আনন্দ-ধামে পরিণত হইতে পারিবে কি না, জানি না। কিন্তু কামনা করি—ক্ষুদ্র ও অপ্রসিদ্ধ কাঁটালপাড়া গ্রাম বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান বলিয়া আজ যেরূপ দেশ-প্রসিদ্ধ ও বাঙ্গালীর তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে, শরৎচন্দ্র ও ভারতচন্দ্রের পুণ্য-স্মৃতির সহিত জড়িত এই দেবানন্দপুরও সেইরূপ বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া থাকুক—এখানে প্রতি বৎসর দলে দলে বাঙ্গালী আসিয়া তাঁহাদের স্মৃতি-পূজার অনুষ্ঠানে যোগদান করুক।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা

শরৎ স্মৃতি-রক্ষা সমিতির উদ্যোগে বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার সায়াহ্নে এলবার্ট হলে এক বিরাট জনসভা হয়। হলের উপরে নীচে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, স্থানাভাবে অনেককে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভিভাষণে সভাপতি মহাশয় বলেন,—

শরৎচন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতির আহ্বানে আপনারা এ সভায় উপস্থিত হয়েছেন; আমিও সেই একই কারণে এখানে উপস্থিত। এ স্মৃতিরক্ষা সমিতি আমাকে আজকের অনুষ্ঠানে যে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন, তার কারণ আমি একজন প্রবীণ সাহিত্যিক; অর্থাৎ আমার দেহযন্ত্রের কলকব্জা সব ঢিলে হয়ে গিয়েছে, এবং ভিতরের পেট্রোল ফুরিয়ে এসেছে। আমার দেহযন্ত্রকে এখন ঠেলে Start করতে হয়। এ হচ্ছে প্রবীণতার শাস্তি। সুতরাং এহেন দেহ নিয়ে আমি যে সজোরে বক্তৃতা করতে পারব না, তা বলাই বাহুল্য। তবে ক্ষীণস্বরে দু'একটি কথা বলব। সে কথা হয়ত আপনাদের শ্রুতিগোচর হবে না; তা হলেও আমার কর্ত্তব্য পালন করা হবে।

আমার প্রথম কথা এই যে, ব্যক্তি বিশেষের যথার্থ স্মৃতিরক্ষা ক'রে তাঁর কীর্ত্তি। ধর্ম্মরাজ্যে ও কাব্যরাজ্যে তাঁর বাণীই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখে; কারণ সে বাণীর পিছনে আছে তাঁর মন। মানুষের মৃত্যু হলে তার দেহ হয় ছাই হয়ে যায়, নয় ধুলোয় মিশে যায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তার মন বেঁচে থাকে অপরের মনে আর বাণীই হচ্ছে মনের মুখ্য প্রকাশ। বুদ্ধদেব হচ্ছেন একজন চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ এবং যীশুখৃষ্টও তাই। বুদ্ধদেবকে বাঁচিয়ে রেখেছে বুদ্ধবচন, যীশুখৃষ্টকে বাঁচিয়ে রেখেছে নিউ টেস্টামেণ্ট।

কাব্যরাজ্যে কবির একমাত্র সম্বল তাঁর কথা। এ ক্ষেত্রে ব্যাস, বাল্মীকি যে অমর হয়েছেন, তার কারণ মহাভারত ও রামায়ণ অমর। কালিদাস যে চিরস্মরণীয় হয়েছেন, তার কারণ তাঁর কাব্য। আমাদের দেশের মহাআলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য বলেছেনঃ—যেনাস্মিন্নতিবিচিত্র কবিপরম্পরা বাহিনি সংসারে কালিদাস প্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চা মহাকবয় ইতি গণ্যন্তো। কাব্য-জগতে এই দু'চারজন মহাপুরুষদের কথা ছেড়ে দিলেও, কোনও কবির স্মৃতি যদি তাঁর স্বকীয় যুগ অতিক্রম করে, তবে সে তাঁর বাণীর গুণে।

অপরপক্ষে পাঠক সমাজেরও কবির স্মৃতিরক্ষা করবার একটা দায়িত্ব আছে। এস্থলে কবি কথাটি আমি তার সংস্কৃত অর্থে, অর্থাৎ সাহিত্য রচয়িতা হিসাবে ব্যবহার করছি। মানুষের পক্ষে পূর্ব্বকথা ভুলে যাওয়া সহজ; মনে রাখাই কঠিন। পুরাকালের কাব্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কারণ, সেকালে পাঠকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল; কেন-না জনগণ তখন ছিল নিরক্ষর। তা ছাড়া হাতে লিখে স্বল্প সংখ্যক পুঁথিই রক্ষা করা যায়। কিন্তু এ যুগে ছাপার অক্ষর ও জনশিক্ষার প্রসাদে আমরা কবির বাণীর বহুল প্রচার করবার সুযোগ পেয়েছি। স্মৃতি রক্ষা করবার নানা উপায় আছে; যথা পাষাণ মূর্ত্তি, প্রস্তর ফলক, তৈলচিত্র ইত্যাদি। কিন্তু এ সকলের সাহায্যে কবির স্মৃতি রক্ষা করা যায়, তাঁর কাব্যের নয়। Shakespeare বলে গেছেন পৃথিবীর পাষাণগঠিত অট্টালিকা মন্দির সব ধ্বংস হয়ে যাবে, তাঁর কবিতার বিনাশ হবে না। কথাটি সত্য। সুতরাং শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য রক্ষার সদুপায় হচ্ছে তাঁর পুস্তকের বিরাট প্রচার। কি উপায়ে কাজ করতে পারা যায়, তা নির্ণয় করবার ভার শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা সমিতির উপর ন্যস্ত করে আমি বিদায় গ্রহণ করছি।

এইরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমরা নিজেরাই ধন্য হই। ভাস বলেছেন, পৃথিবীতে লোকের অভাব নেই; কিন্তু তাদের চিনতে পারে এমন লোকই দুর্লভ এ ডিমোক্রেটিক যুগে। এ দুঃখের অবসর যে নেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই বর্ত্তমান সভা। এ স্থলে সমজদারের অভাব নেই, গুণীই দুর্লভ। কি কি গুণে শরৎ-সাহিত্য এমন জনপ্রিয় হয়েছে, তা পরবর্ত্তী বক্তারা আশা করি আপনাদের শোনাবেন এবং এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের জুজুরা জুরীর মতের সমর্থন করবেন।

Asri Prasanna Lahiri Coochbehar.

বনতোষিণী

[গল্প]

শ্রীঅনন্তকুমার সান্যাল

গাড়ী হইতে নামিয়াই কাপড়ের খুঁট বাহির করিয়া ললিত গণিয়া দেখিল—তের আনা দুই পয়সা মাত্র আছে। আবারও গণিল, সেই তের আনা দুই পয়সা; কমেও নাই বাড়েও নাই।

বাড়ী হইতে কলিকাতা অধিক দূরের পথ নয়; দুপুরের গাড়ী ধরিতে পারিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছান যায়। টিকিটের দামটা যোগাড় করিতে পারিলেই হয়, দুই এক পয়সার পান-বিড়ী—সে হয় ভাল, না হইলেও বড় আসে যায় না। ললিত এই দুপুরের গাড়ীই ধরিয়াছে, রাত্রে পৌঁছিয়া অজানা অচেনা জায়গায় কোথায় ঘুরিয়া মরিবে।

মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, হাতে যাহা আছে তাহাতে এক মাস চলিতে পারে। এক আনা করিয়া ধরিলে, তের দিনে তের আনা। যদি দুই পয়সা করিয়া ধরা যায়, তের দুগুণে ছাব্বিশ দিন। ছাব্বিশ দিন গেলে আর থাকে চারি দিন। মাসের অর্দ্ধেক কাটিয়া গেলে বাকি দিন কয়টা এক রকমে চলিয়াই যায়। এক মাস কম দিন নয়। ইহার মধ্যে যাহা হউক একটা কিছু কি আর জুটিবে না? এই শহরে এত লোক রহিয়াছে, আর একটা ভদ্রলোকের ছেলে দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন জুটাইতে পারিবে না? অনাহারে মরিবে? আর কিছু না হউক ষ্টেশনে কুলিগিরিও ত আছে।

অনাহারেই যদি মৃত্যু হয় সে মৃত্যুতেও সম্মান আছে। ঘরের স্ত্রীর গলগ্রহ হইয়া যে দিনপাত করা তাহাতে আত্ম-মর্য্যাদার হানি হয়; দেহ পুষ্ট হইলেও মন পঙ্গু হয়। সঙ্গী সম-বয়সীদের সঙ্গে থাকিয়া হয়ত কাজে অকাজে দিনটা কাটিয়া যায়, কিন্তু লাঞ্ছনার সঞ্চয় রাত্রির শয্যা যে কণ্টকিত করিয়া তোলে। দুই বৎসর কাল সে এ লাঞ্ছনায়ও মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলে নাই, কিন্তু কাল যাহা নিজের কানে শুনিয়াছে তাহাতে রক্ত-মাংসের শরীর লইয়া আর একদিনও সহ্য করা চলে না। সুবালার কথা কয়টি এখনও বুকের মধ্যে বিঁধিয়া খচ্-খচ্ করিতেছে। অনেক কথাই বলিয়াছে—রোজই এমন বলে—কিন্তু শেষ কথা দুটি সে ভুলিতে পারে নাই—"খেতে দিতে যাদের শক্তি নাই তাদের আবার বিয়ে করার সখ কেন?'

আর বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া, কথা কাটাকাটি না করিয়া, জন-প্রাণীকে কিছু না বলিয়া সে কলিকাতার টিকিট কিনিল।

হিসাবে কিছুমাত্র ভুল হয় নাই—তেরকে দ্বিগুণ করিলে ছাব্বিশই হয়। তবে হিসাবের 'ছাব্বিশের' সঙ্গে কলিকাতার 'ছাব্বিশের' সঙ্গতি থাকিতেছে না বোধ হয়। লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া, ট্রাম-বাসের যেমন এখানে অযথা বাহুল্য, মানুষের জঠরের আগুনও কি তেমনি এখানে রাত্রিদিনই জ্বলে? রাবণের চিতার মত কি ইহার বিরাম নাই? মেজদার বাসায় আসিয়া রাত্রে আহার হইয়াছে; সকাল বেলা উঠিয়া একটু ঘুরিয়া আসিতে না আসিতেই দারুণ ক্ষুধা; কিছু পেটে না পড়িলে চক্ষু অন্ধকার! এখানকার লোকেরা কি তবে দিবারাত্র আহারই করে? শহরটার প্রতি একদিনের মধ্যেই তাহার মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়া উঠিল।

আসিবা মাত্রই মেজদা বলিয়াছে, কখনও আস নাই, নূতন এসেছ ভাই, একটু কষ্ট হ'লে কিছু মনে ক'র না।

মনে করিবার এখানে কি-ই বা আছে! বাসাও মেজদার নয়। 'মেজদাদাদের' বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। একখানি ঘর। সেই ঘরেরই মাঝখানে দরমার বেড়া দিয়া দুখানা করা হইয়াছে। এদিকে থাকে ললিতেরই কয়েকজন গ্রামবাসী, যতীন অবিনাশ আরও কয়েকটি ছেলে, আর ওপাশে থাকে, কয়েকজন উৎকটবাসী ব্রাহ্মণসন্তান। ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণ নয়, সে পরিচয় পাইতে হইলে বংশ-পত্রিকার দরকার, তবে কেহ যদি ক্রমাগত দিন দুই তিন ধোঁয়ায় চক্ষু লাল করিয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থী হয় তবে ইহাদের সাহায্যে বঞ্চিত হয় না—রুগ্না স্ত্রীর স্বামীও নয়, মেসের ছেলেরাও নয়। কিন্তু এতগুলি নিপুণ পাচক থাকিতেও এ পাশের এই মুষ্টিমেয় লোক কয়টার নিত্য-কার রন্ধন ব্যবস্থা নিজেদের হাতেই। কেহ শিশি-বোতল বিক্রয় করে, কেহ চেয়ার আলমারী পালিশ করে, কেহ বা নিলামী জিনিষ কিনিয়া চোরাবাজারে সস্তা দরে বিক্রী করে। সকালে বাহির হইয়া যায়, ফিরিতে দেরী হয়। সময়ে স্নান আহার হইয়া উঠে না। সুতরাং নিজেদের মধ্যেই ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে, এক একদিন এক একজনে এই অপ্রিয় অথচ অতি প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করিবে। সকলেরই সুবিধা; আর একসঙ্গে হইলে খরচও কম। তাহা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। সাত আটটি যুবক এখানে থাকে। যেটি শয়নাগার, সেইটিই রন্ধনশালা, সেইটিই সন্ধ্যার পরের হাসি-তামাসার, গল্প-গুজবের মজলিস গৃহ। অবসর মত এখানেই দেশ-উদ্ধার হয়, গান্ধী-জহর-সুভাষ প্রভৃতির কার্য্যক্রম লইয়া তুমুল আলোচনা হয়। এখানে বসিয়াই ও-পাশের ঘরের কৌতুক-কোলাহল কখনও বা কলহ-কলরব শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও পৃথক পৃথক রন্ধন-আয়োজন অসম্ভব। কোথাই বা বসে, রাঁধেই বা কোথা?

ললিতও দুই একদিন ইচ্ছা করিয়া রাঁধিল। তারপর পালা করিয়া রাঁধিতে তাহারও অমত হইল না। আরও কয়েকদিন গেলে স্থির হইল সে-ই একাজটি অনুগ্রহ করিয়া করিবে এবং যতদিন না একটা কিছু সুবিধা হয় তাহাকে আহারের জন্য কিছুই দিতে হইবে না। শোনা যায় বন্যার সময় নাকি একই চালের উপর উঠিয়া সাপ ও মানুষ এক সঙ্গে ভাসিয়া চলে। পল্লী-গ্রামেই মানুষে মানুষে যত কলহ-বিবাদ শহরে তবে এখনও মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি আছে!

কোথায় চিংড়িঘাটা, কোথায় খিদিরপুর ডক, কোথায় বামার লরি, কোথায় জীওনলাল হীরালাল—এই কয়েক দিনের মধ্যে প্রত্যেকটির সহিতই তাহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। কেহ বা প্রবেশ করিতে দিয়াছে, কেহ বা দোরের কাছ হইতেই মিষ্ট কথায় বিদায় দিয়াছে। বেলেঘাটা এক জমিদার বাবুর বাড়ীতে একজন বাজার সরকারের দরকার শুনিয়া সেখানে গেল। কাজটা ভাল। খাওয়া-দাওয়া পাওয়া যাইবে, তাহা ছাড়া দু'পয়সা বাহিরের পাওনাও আছে। ভাল কাজ দেখাইতে পারিলে সদরেই মুহুরীর পদে নিযুক্ত হইতে পারে এমন সম্ভাবনাও যে নাই তাহা নয়। ম্যানেজারবাবুর সুনজরে

পড়িলে অবশেষে একটা মহলের তহশীলের ভারও পাওয়া আশ্চর্য্য কি?

দুপুর বেলা একটু তাড়াতাড়ি করিয়া সব ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া ললিত বাহির হইয়া পড়িল। লোকের কি অভাব আছে? ইতিমধ্যেই হয়ত কতজন গিয়া বসিয়া আছে। ২টা বাজে। ৩টাও বাজিয়া গেল। বেলেঘাটার সমস্ত অঞ্চলটা তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ২।১নং বাড়ীটার সন্ধান মিলিল না। দূরে একখানি ভাল বাড়ী চোখে পড়িতেই তাহার প্রাণে একটু বল আসিল। ভগবান বোধ হয় এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কিন্তু নম্বর মেলে না। দারওয়ান বলিল, সা'ব্ হাইকোর্টমে কাম করে। ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ললিতের মুখের দিকে তাকাইয়া যতীন জিজ্ঞাসা করিল, হাসি হাসি মুখ যে—হ'ল?

ললিত বলিল— দাঁড়াও, এক'গ্লাস জল আগে খাই।

বাড়ীর কাছে বাড়ী বলিয়া যতীন প্রথমে কেবল ললিতেরই মেজদা ছিল, এখন সকলেরই মেজদা, মায় ওদিককার উড়ে বামুনদের। মেজদাই কাজটার সন্ধান দেয়।

অবিনাশ কহিল—তা'হলে কালই সব ঠিক করা যাক, কি বল মেজদা?

যতীন বলিল, শুনি ত আগে কি রকম হ'ল।

হরিপদর মনের জোর বেশী, সে বলিল, ও ঠিক মেরে দিয়েছে। কথা পাকা করে তবে এসেছে; নইলে বেলেঘাটা থেকে আসতে রাত হয়?

গোষ্ঠ আপনার গুটান মাদুরখানি টানিয়া লইয়া এইমাত্র একটু হাত পা ছড়াইয়া টান হইয়াছে—চট্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, আমি ত কালই বলেছি, নির্ঘাত লেগে যাবে। শত হ'লেও কায়েতের ছেলে ত! এখন শেয়ালদ' কে যাচ্ছে ভোরে মাছ আনতে?

মুখের বিড়িটায় শেষ টান দিয়া শম্ভু বলিল, কাল ত হবার যো নেই মেজদা, কাল যে জামাইষষ্ঠী!

গোষ্ঠ—তোকে বুঝি যেতে হবে?

শম্ভু—যাব আর কোন চুলোয়? সে সব চুকে গেছে। কাল যে ছানা আক্রা হবে! যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই সরস আলোচনা, ভোজের আয়োজন, অন্ধকারে মৎস্যের সন্ধান, সে নিজে আসিয়া যখন আগাগোড়া সকল কথা ব্যক্ত করিল তখন উৎসাহের শেষ রশ্মিটিও নৈরাশ্যে মিলাইয়া গেল।

মেজদা বলিল, তুই যেমন বেকুব; অতবড় লোক, তার অতবড় বাড়ীটা বেমালুম লোপ পেয়ে গেল! খুঁজে পেলি না?

ললিত—দুই-এর এক ত?

দুইএর এক। তাই ত মনে হচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও। ২-এর ১, না ১-এর ২? মুস্কিলে ফেললি যে!

পরের দিন ১-এর ২নং আবিষ্কার-যাত্রার ফলও অন্যরূপ হইল না।

এত পরিশ্রম পর্য্যটনে আর কিছু না হউক, এই নবাগত কর্ম্মপ্রার্থী যুবকটির দুইটি অভিজ্ঞতা তিন চারি মাসের মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছে। দুইটিই মূল্যবান। প্রথমটি এই যে, কলিকাতা শহরের কলের জলের মধ্যে একটা বিশেষ গুণ লক্ষিত হইয়াছে সামাজিকভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার বিশেষ গুণ ইহার মধ্যে আছে। অপরটি গোলদীঘির ধারে সেনেট গৃহের সম্মুখের বারান্দাটি সম্বন্ধে। এই বারান্দাটার এক অদ্ভুত নিদ্রাকর্ষণ শক্তি আছে। রাত্রে এমন গাঢ় নিদ্রা বোধ হয় জগতের আর কোনও স্থানে গেলে হয় না। বিশেষত এখানে ধনী-নির্ধন, ইতর-ভদ্র বিচার নাই—সকলেরই তুল্য সম্মান। মূল্যবান শিক্ষা সন্দেহ নাই, তবে একটু তীব্র।

মেজদার বৌবাজারের বাসা ইতিমধ্যেই সে ছাড়িয়া দিয়াছে। কোথায় গেল, কি হইল, কেহ বলিতে পারে না।

কর্ম্মের স্রোত যেমন চলিতে থাকে তেমনি চলিয়াছে। পাষাণকায় বিপুল নগরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে টাকা আনা পাই লইয়া প্রাতঃকাল হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায়ই সেই কর্ম্মব্যস্ততা চলিয়াছে। কেহ নিষ্পিষ্ট হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, কেহ সমুচ্চ শিখরে উঠিয়া গৌরবের সিংহাসন লাভ করিতেছে। কেহ উঠিতেছে, কেহ লয় পাইতেছে—সৃষ্টি প্রলয়ের এক অদ্ভুত রহস্যপুরী।

পুরাপুরি যখন একটা বৎসর কাটিয়া গেল তখন একদিন বিকাল বেলা কি একটা কাজ সারিয়া যতীন সুতাপটির মোড়টা ঘুরিয়া মাত্র বড় রাস্তায় পা দিয়াছে এমন সময় একটি হিন্দুস্থানী ছেলে হঠাৎ পিছন হইতে আসিয়া ডাকিয়া বলিল, 'ডগ্‌দের সা'ব' ডাকিতেছেন। শুধু বলা নয়, একরকম জোর করিয়াই তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল, ঘরে পা দিয়া যতীনের তিলমাত্রও সন্দেহ রহিল না যে, ছেলেটা ভুল করিয়াছে। টেবিল সম্মুখে বসিয়া এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক—বোধ হয় ডাক্তারই। মাথায় মস্ত পাগড়ী, চোখে চশমা, গায়ে হাল্কা পাঞ্জাবী। চেয়ার আলমারী অন্যান্য আসবাবপত্র যাহা কিছু ঘরের মধ্যে সবই রুচি ও আভিজাত্যের পরিচায়ক।

ছোট একটা বিরক্তির কথা উচ্চারণ করিয়া ঘর হইতে নামিয়া পড়িলে এমন সময় ভদ্রলোকটি অতি পরিচিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, চলে যাচ্ছ যে! মুখে অল্প অল্প হাসি।

বিস্ময় কাটাইয়া যতীন বলিল, তা'ও ভাল। পরে চোখ-মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, এ সব কি? এ ধড়াচূড়া কিসের? কা'র ডাক্তারখানা এটা?

একসঙ্গে এতগুলা প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। একটি একটি করিয়া সব খুলিয়া বলিতে হইল।

ডাক্তারখানাই বটে, কিন্তু আপাতত অন্য কাজে ব্যবহার হইতেছে। যতীন লক্ষ্য করে নাই; লক্ষ্য করিলে বাহির হইতেই নজরে পড়িত, এটা "অল ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ড্রাগ কোম্পানীর" কারখানা। আর নজরে পড়িত এই কোম্পানীর সুবিখ্যাত আবিষ্কার 'বনতোষিণী'। এত বড় একটা সর্ব্বভারতীয় ব্যাপার এবং তাহার আবিষ্কারের ফল এই সুবাসিত কেশতৈলটি ইহার কোনটাই যতীন জানে না দেখিয়া ললিত একটু হাসিল। আলমারীর মধ্যে সারি সারি তেলের শিশি দেখাইয়া সে কহিল, দেড় লক্ষের বেশী তেল এর মধ্যে বিক্রী হ'য়ে গেছে। এসব জিনিষের আদর কি আমাদের দেশের লোক জানে, না, খোঁজ খবর রাখে। যতীন চাহিয়া দেখিল, বাহিরে কতকগুলা কাঠের বাক্সে তেল বোঝাই

হইতেছে—ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া—এই সব অঞ্চলেই বেশীর ভাগ যাইতেছে। দুইটা মজুর মাথায় করিয়া দুই ঝুড়ি বোঝাই প্যাকেট লইয়া ডাকে দিতে চলিয়াছে। তিন-চারজন কর্ম্মচারী, লেবেল আঁটা, প্যাক করা, হিসাব লেখা ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত। যতীন বলিল, 'তুমি এসব কি করেছ ললিত? চোখে দেখেও যে বিশ্বাস হ'তে চায় না!' ললিত হাসিয়া কহিল, কি আর করেছি মেজদা সবই তাঁর ইচ্ছা। কে আমাকে চিনত বল ত? একটা জ্বরের আরক নিয়ে প্রথমে বসি; বেশ কাটতিও হচ্ছিল। কিন্তু ভেবে দেখলাম মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ধর্ম্মে সইবে না। ওষুধ-টষুধ সব ছেড়ে দিয়ে এখন এইটে নিয়ে আছি। বলিয়াই একটা বিলাতী সিগারেটের কৌটা খুলিয়া মেজদার সম্মুখে ধরিল। দুইজনে দুইটা ধরাইয়া লইয়া আবার কথা আরম্ভ হইল।

একটা শিশি হাতে লইয়া যতীন জিজ্ঞাসা করিল, বনবাসিনী কি রকম নাম ভাই? এ রকম নাম ত কখনও শুনি নাই।

ললিত কহিল, একটা কথা বলি মেজদা, বল রাগ করবে না?

—কি কথা?

—তুমি এক কাজ করতে পার, ও পালিশ-মালিশ ছেড়ে দিতে পার? এই ত চেহারা করেছ, তারপর চোখ দুটোও গেল? তুমি কাল এস এখানে; যাতে পোষায় তাই তোমাকে দেব। আসবে?

সকল কথা ছাড়িয়া দৃষ্টিশক্তির উল্লেখ কেন করিল, যতীন তাহা ভাবিয়া পাইল না। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—'আসা না-আসা সে পরের কথা। কিন্তু তুমি আমার চোখে কি দেখলে বলত। ভয় লাগিয়ে দিলে যে!'

—ভয়ের কারণ নাই। তুমি নির্ভয়ে শিশির গায়ে কি লেখা তাকিয়ে দেখত—"বনবাসিনী" না "বনতোষিণী?"

—ও সেই কথা। তা' "বনতোষিণী" এ-ই বা কি রকম? তোমার জ্বরের আরক বুঝি?

—জ্বর না তেল, তেল। দেখতে পাচ্ছ না সুবাসিত কেশ তৈল!

যতীন সত্যই একটু সেকেলে ধরণের লোক। বর্ত্তমান জগতের সভ্যতার বিশেষ কোনও সংবাদই রাখে না। নামের প্রতিটি অক্ষরে চিত্তলোকে যে কি পুলক শিহরণের সঞ্চার করে—এ সত্য এখনও তাহার কাছে পৌঁছায় নাই। কিন্তু ললিত এ যুগের। এক 'বনতোষিণী' নামের মধ্যেই যে এই কেশ তৈলটির অর্দ্ধেকের অধিক সুবাস, সৌন্দর্য্য, রমণীয়তা নিহিত আছে তাহা তাহার অবিদিত নাই। কহিল, দেখ মেজদা এর নাম কলকাতা; এখানে রাস্তা-ঘাটে পয়সা ছড়ান আছে। কুড়িয়ে নিতে জানা চাই। মানুষের মনটা নিয়ে খেলা করতে হবে, তাকে টানতে হবে, তবে ত এগিয়ে আসবে। অনেক ভেবে তবে এই নামটা বার করেছি। বনতোষিণী কি মিষ্টি শুনতে দেখেছ?

—ও! তা'ত হ'ল, একটা কথা যে তুমি চেপে গেলে, শোনা হ'ল না।

—সব বলছি। মনে আছে। মাড়োয়ারী মহলে থাকি, এদের মধ্যে অষ্টপ্রহর চলাফেরা, এখানে মাড়োয়ারী না সাজলে ওরা খুশী হবে কেন? আমার অষুদই বল, আর তেলই বল, কিনতে আসবে কেন? তাই এখানে এসে অবধিই নিজের বেশ ছেড়েছি।

যতীন কেবল আশ্চর্য্য নয়, মনে মনে ললিতের বুদ্ধির প্রখরতায় একেবারে তাহার শিষ্য স্থানীয় হইয়া উঠিল। এরা উন্নতি করিবে না ত কে করিবে?

ফিরিবার পথে এই কথাটাই তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া উদয় হইতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল—রাস্তা-ঘাটে পয়সা ছড়ান আছে। আর যতীন? যতীন এতদিন ধরিয়া কি করিল? আপনার প্রতি তাহার ধিক্কার আসিল।

বনতোষিণী বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। হু হু করিয়া বিক্রী হইতেছে। এখানে, ওখানে, সেখানে দেওয়ালের গায়ে, ঘরের চালে, গাছের গায়ে, যেদিকে চোখ পড়ে বনতোষিণীর বিজ্ঞাপন। পূজার বাজার, ভিড়ের অন্ত নাই; কিন্তু পৃথিবী শুদ্ধ লোক কি এই তেলটার জন্যই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে? ললিতের আর অবসর নাই। চোখে ঘুম নাই, পেটে ভাত নাই, দিবা-রাত্রি খাটুনি।

শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তবুও সফলতার গৌরব বুকে লইয়া পূজার মাস খানেক পরেই সে বাড়ীর দিকে চলিল। কিছুদিন থাকিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া শরীরটা জুড়াইবে। এদিকেও আর কাজের চাপ রহিল না। তাছাড়া সুরবালা লিখিয়াছে, নির্ম্মলা পূজার সময় আসিয়াছে, আসিলে দেখা হইবে।

একমাত্র শ্যালিকা নির্ম্মলা, হয়ত এখন বিবাহের উপযুক্তাই হইয়াছে। তাহার সহিত দেখা এখন না হইলে আর কবে হইবে কে বলিতে পারে?

গ্রামের ষ্টেশনে নামিয়াই সে খোঁজ করিল কুলী আছে কি-না। কুলী পাওয়া গেল না; দরকারও ছিল না। একটা ছোট সুটকেস—ও হাতে করিয়াই লওয়া চলে। পায়ে চকচকে পাম্প-সু, সোনার বোতাম, সোনার চশমা, কানের উপর কিছুদূর পর্য্যন্ত মাথার চারিদিকটায় চুল দেখা যায় না, শহরের সেরা চুল ছাঁটা। গ্রামের পথ ধরিয়া সে প্রায় বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। একটা ভাঙ্গা মন্দির পথে পড়ে। ললিত মাথা নত করিয়া অভ্যন্তরের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। মনে মনে প্রণাম জানাইতে হইল। হাত তুলিতে পারিবে না—হাত জোড়া। না আর দেরী নাই, ওই যে বাড়ী দেখা যায়।

দূর হইতেই নজরে পড়িল, কে দুইটি বৃদ্ধা বারান্দার এককোণে চৌকির উপর বসিয়া আছে। বাড়ীর ভিতরে পা দিতে না দিতেই তাহারা উঠিয়া ভিতরে গেল। ঘরে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে আর ভিতর হইতে চীৎকার উঠিল, ওরে আমার নির্ম্মলা রে!

আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। যেমন ছিল

(শেষাংশ ৬৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্কিম সাহিত্যে গার্হস্থ্য জীবন

শ্রীপুষ্প বসু

বাঙলার প্রকৃত সাহিত্য রচনা করিতে হইলে তাহার মধ্যে থাকা চাই বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাই সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিবেন যতদিন বাঙলা সাহিত্য থাকিবে। কেননা বঙ্কিমবাবুর সাহিত্যের মধ্যে —প্রবন্ধ উপন্যাস ও গল্পে আমরা পাই বাঙলার পল্লীগ্রামের কথা, বাঙলার নর-নারীর কথা—বাঙালীর সুখ দুঃখ ও প্রাণের কথা। তাই বঙ্কিমের সাহিত্য আমাদের কাছে অমর—চির-নূতন চির-মধুর। বাঙলাদেশের প্রতি, স্বদেশের সমাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কিরূপ শ্রদ্ধা ও অগাধ প্রীতি ছিল তাহা আমরা তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাসগুলি হইতে গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া জানিতে পারি।

গ্রাম বঙ্কিমের বর্ণনায় গ্রামের চিত্রে পল্লী দৃশ্য অপূর্ব্বঃ— গ্রামখানি গৃহময়, বাজারে সারি-সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। গ্রামে হাটবারে হাট বসে, ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করে, তন্তুবায় তাঁত-বোনে, ব্যবসায়ী ব্যবসা করে, দাতা দান করে, অধ্যাপক টোলে অধ্যাপনা করে, গ্রামের রাজপথে লোক যাতায়াত করে, সরোবরে লোক স্নান করে, বৃক্ষে পক্ষী বাস করে, গোচারণে গরু চরে আবার শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর ডাকে। গ্রামে যখন অবস্থা স্বচ্ছল তখন আনন্দে রাখাল মাঠে গান গায়, কৃষক-পত্নী রূপার পৈঁছার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য করে। এইরূপ সোনার বাঙলার পল্লী; এই গ্রাম যদি দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হইতে থাকে, বসন্ত বিসূচিকা ব্যাধিতে গ্রামবাসী মরণমুখে পতিত হয়, তবু প্রাণ রক্ষার জন্য বাঙালী তার গ্রাম ছাড়িতে পারে না।

আনন্দমঠ

বঙ্কিমবাবুর বাঙলার গ্রাম্য গৃহস্থের বর্ণনা ও গার্হস্থ্য জীবন—আনন্দমঠ হইতেঃ—আম্র-কানন মধ্যে একটি ছোট বাড়ী। চারিদিকে মাটির প্রাচীর, চারিদিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে একটা বাঁদর আছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবু গাছ আছে, গোটাকতক মল্লিকা ফুলের গাছ আছে। সব ঘরের দাওয়ায় একটি চরকা আছে। কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই—

জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ একটি ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া চরকা লইয়া ঘেনর ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সেই ছোট মেয়েটি কখনও চরকার শব্দ শোনে নাই—বিশেষতঃ মা ছাড়া অবধি কাঁদিতেছে। চরকার শব্দে ভয়ে সে উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি সতের কি আঠারো বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। মেয়েটি বাহির হইয়া দক্ষিণগণ্ডে অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। বলিল—"একি দাদা—চরকা কাট কেন? মেয়ে কোথায় পেলে? দাদা তোমার মেয়ে হয়েছে নাকি?—আবার বিয়ে করেছ নাকি?"

জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাহাকে কিল মারিতে উঠিলেন, বলিলেন—"বাঁদরী, আমার আবার মেয়ে, আমাকে কি হেঁজি-পেঁজি পেলি নাকি? ঘরে দুধ আছে?"

তখন সে যুবতী বলিল—"দুধ আছে বইকি, খাবে?" জীবানন্দ বলিলেন—"হ্যাঁ খাব।"

তখন যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুধ জ্বাল দিতে গেল।

* * * * * *

মেয়েটি আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চোখ হইতে ফোঁটাকতক জল ঝরিয়া পড়িল। তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছে—তাহারই ঐ ঝিনুক। ....কুটীর মধ্যে শত গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিহিতা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। যুবতী গিয়া তাহাকে বলিল—"বৌ শীগ্‌গীর"। বৌ বলিল, "শীগ্‌গীর কি লো? ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে নাকি—ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?"

নিমি বলিল—"কাছাকাছি বটে—তেল আছে ঘরে?...... ....তোর সেই ঢাকাই সাড়ী কোথায় আছে বল।" সেই স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল—"কি লো খেপেছিস নাকি?"......

"দাদা এসেছেন তোকে যেতে হবে।"........

—"আমায় যেতে বলেছেন ত ঢাকাই সাড়ী কেন? আমি ন্যাকড়া পরেই তাঁকে দেখে আসি।" স্ত্রীলোক কিছুতেই কাপড় বদলাইল না। অগত্যা নিমাই রাজী হইয়া—তাহাকে ভ্রাতার ঘরে প্রবেশ করাইয়া অর্গল দিল।

স্ত্রীলোকটির বয়স প্রায় পঁচিশ। স্ত্রীলোকটি অতি রূপসী—সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল—প্রথমে সে দেখিতে পাইল না। তারপর দেখিল গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র আম্র বৃক্ষ আছে—আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকট গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্তধারণ করিল। বলি-না যে, তাহার চক্ষে জল আসিল না। জগদীশ্বর জানেন যে, তাহার চক্ষে যে স্রোত আসিয়াছিল—বহিলে জীবানন্দকে ভাসাইয়া দিত, কিন্তু সে তা বহিতে দিল না। জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল "ছিঃ, কাঁদিও না—আমার জন্য তুমি কাঁদিও না, তুমি যে প্রকারে আমায় রাখিয়াছ, আমি তাহাতে খুসী।"........জীবানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"কেন দেখা করিলাম?"

শান্তি। "কেন করিলে, তোমার ত ব্রতভঙ্গ করিলে?"

জীবানন্দ। "ব্রতভঙ্গ হউক প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবিনা, কিন্তু তোমায় দেখিয়া আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না......একদিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ জগৎ-সংসার, একদিকে ব্রত, হোম, যাগ-যজ্ঞ সবই একদিকে—আর একদিকে তুমি।........তুমি আমার পৃথিবী অপেক্ষা বড়। তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।"

আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিম গার্হস্থ্য জীবনের মাঝে দেখাইয়া-

ছেন—বাঙলার নারীর অপূর্ব্ব পতিভক্তি—ধর্ম্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগ। শান্তি কিছুকাল কথা কহিতে পারিল না। তারপর বলিল—"ছিঃ—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে আমি বীর-পত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহিনা। কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম্ম কখনও ত্যাগ করিও না।"

চন্দ্রশেখর

হিন্দুশাস্ত্রে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রবাক্যের অনুশাসন আছে। স্ত্রীর পক্ষে পতি বন্ধু পতি রক্ষক, দেবতা এবং গুরু। স্বামী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার স্বামীর পক্ষে আছে—যিনি স্ত্রীর সম্মান করেন—পদে পদে তাঁর কল্যাণ সাধিত হয়। নারী যেখানে অনাদৃতা সেখানে ক্রিয়া-কর্ম্ম যাগ-যজ্ঞ সকলই নিষ্ফল। অতএব উভয়ের দ্বারা উভয়ে সম্পূর্ণ—গৃহস্থের ভার্য্যাশূন্য গৃহ শ্মশানতুল্য তাই চন্দ্রশেখর কোনদিকে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ। বাহির হইতে দ্বার ঠেলিল; ভৃত্য বহির্ব্বাটির দ্বার খুলিয়া দিল। চন্দ্রশেখর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেখিলেন, উঠানে ঝাঁটা পড়ে নাই—চণ্ডীমণ্ডপে ধূলো। স্থানে স্থানে পোড়া মশাল, স্থানে স্থানে কপাট ভাঙ্গা। চন্দ্রশেখর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন সকল দ্বারই বাহির হইতে বন্ধ। দেখিলেন, পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল.........তখন চন্দ্রশেখর প্রাঙ্গণ মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন—শৈবলিনী!.........চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন। তখন চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রামশিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্য-সামগ্রী দরিদ্র প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া বিতরণ করিলেন......শোণিত-তুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি একে একে আনিয়া একত্র করিলেন......সাজাইয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন।

স্ত্রীর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হইতেছে স্বামীর ধর্ম্ম তাই স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী। হৃদয়কে বলি দিয়াও স্ত্রীকে কর্ত্তব্যপরায়ণা ও ধর্ম্মপরায়ণা হইতে হইবে। এখানে স্নেহ প্রীতি ভালবাসার মোহে অন্ধ হইলে নিজেরই সর্ব্বনাশ, তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীর পার্শ্বে শৈবলিনী স্বহস্তে করবীবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল।......

কত কি মনে পড়িল—কত সুন্দর সুনীল মেঘশূন্য আকাশ। শৈবলিনী ছাদে বসিয়া দেখিতেন—কত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত ধবলকুসুম পরিষ্কার জলসিক্ত করিয়া চন্দ্রশেখর পূজার জন্য পুষ্প-পাত্র ভরিয়া রাখিয়া দিতেন। কত স্নিগ্ধ, মন্দ মন্দ সুগন্ধি বায়ু ভীমাতটে সেবন করিতেন। তাহার তীরে কত কোকিল ডাকিত। শৈবলিনী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"মনে করিয়াছিলাম গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিতে পাইব।.........

অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।...... আমার মনই নরক।...দুরন্ত হৃদয় আমার বশ হইল না—আমি মরিব—কিন্তু আজ নহে—মরিতে হয় বেদগ্রামে গিয়া মরিব।.........তাঁহাকে কখনও ভালবাসি নাই—কখনও ভালবাসিতে পারিব না। তথাপি তাঁহার মনে যদি ক্লেশ দিয়া থাকি—তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারী হইল।" জগতে একমাত্র ভালবাসা ও প্রেম মানুষকে ধর্ম্মপথে কর্ত্তব্য পথে আনাইতে সমর্থ হয়—তাই চন্দ্রশেখরের ঐকান্তিক প্রেম স্নেহ একদিন শৈবলিনীকে প্রকৃতিস্থ করিল—সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিল "প্রতাপ! যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।" প্রতাপের অপূর্ব্ব চরিত্র—পুরুষ কিরূপ জিতেন্দ্রিয় ও পরহিতব্রতধারী হইতে পারে তাহা প্রতাপের চরিত্রে দৃষ্ট হয়। নিঃস্বার্থ প্রেমিক প্রতাপের মুখে বঙ্কিমবাবু বলাইয়াছেন "কি বুঝিবে সন্ন্যাসী, এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে, কে বুঝিবে আমি এই ষোড়শ বৎসর শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপ-চিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি, আমার ভালবাসার নাম—জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।" তাই বলিতে ইচ্ছা করে—বঙ্কিমের সৃজিত প্রতাপ আবার বাঙলার ঘরে ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রকৃত প্রেমের অমরকীর্ত্তি স্থাপিত করুক। পুরুষের লালসায়, স্বার্থপরতায়, কলুষতায় বাঙলার কত গৃহে আজ রোদনের রোল উঠিয়াছে, বঙ্গমাতার মুখ আজ অশ্রুমুখী বিবর্ণ ম্লান।

কপালকুণ্ডলা

গার্হস্থ্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে কোন কথা গোপন থাকা উচিত নহে। স্ত্রী কিম্বা স্বামীর কাছে অকপটে সকল কথা না জানাইলে তার যে কি বিষময় ফল হয় তাহা আমরা নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার জীবনে দেখিতে পাই—

সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন উপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস।......এক বৎসরের অধিক কাল কপালকুণ্ডলা নবকুমারের গৃহিণী.........স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে। শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলার ননদিনী, তার অনুরোধে কপালকুণ্ডলা ঔষধিগাছ আনিবার জন্য একা রাত্তিরে বাহিরে যাইবার জন্য স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু শ্যামা বলিল—'একা রাত্রে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বৌ-ঝির ভাল?' কিন্তু কপালকুণ্ডলা দৃঢ়সঙ্কল্প—তাঁহার শরীরে ভয় নাই, তিনি বাল্যকালে জনহীন বনে প্রান্তরে সমুদ্রসৈকতে একাকিনী বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছেন—কাজেই অনায়াসে কপালকুণ্ডলা গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া ঔষধির অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে নবকুমার ইহা জানিতে পারিলেন এবং কপালকুণ্ডলার সহিত একত্রে ঔষধির নিমিত্ত যাইতে চাহিলেন—কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিত বচনে বলিলেন—"আইস আমি অবিশ্বাসিনী কিনা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।" নবকুমার স্ত্রীর কথায় ব্যথিত হইলেন, তিনি আর কপালকুণ্ডলার সহিত বনে গমন করিলেন না। তারপর পদ্মাবতীর ছলনায় কপালকুণ্ডলা বিপদে পড়িলেন। নবকুমার স্ত্রীর আচরণে মনোবেদনায় অন্তঃপুরে এলেন না, কপালকুণ্ডলা

একা বিছানায় নানা চিন্তায় নিদ্রাহীন রজনী কাটাইলেন। কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না, কাজেই জ্বলন্ত বহ্নি-শিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন। পরদিন যথাসময়ে গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া কপালকুণ্ডলা বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন অমনি গৃহের প্রদীপ নিভিয়া গেল।

তারপর শেষ দৃশ্য—কাপালিক যখন গঙ্গাতীরে সৈকতভূমিতে শ্মশানে কপালকুণ্ডলাকে ও নবকুমারকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া পূজাশেষে নবকুমারকে আদেশ করিলেন—কপালকুণ্ডলাকে স্নাত করাইয়া আন। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে শ্মশানভূমি পার করাইয়া প্রায় গঙ্গার জলের কাছে আসিয়া কপালকুণ্ডলার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া রোদন করিয়া বলিলেন—"মৃন্ময়ি! কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। একবার বল তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।" কপালকুণ্ডলা স্বামীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই।" নবকুমার নিজের ভ্রম বুঝিলেন। কপালকুণ্ডলা সকল বৃত্তান্ত স্বামীকে শুনাইলেন, কিন্তু বড় দেরীতে। স্বামী যখন স্ত্রীকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন তখন চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল নদী তরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল, অমনি তটমৃত্তিকা-খণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোর রবে নদীপ্রবাহ মধ্যে নিমগ্ন হইল নবকুমারও তৎক্ষণাৎ ঝম্প দিলেন তিনি সাঁতার জানিতেন, কিন্তু প্রাণসমা পত্নীকে হারাইয়া আর উঠিলেন না। পরস্পরের ভুলের জন্য স্বামী-স্ত্রী অকালে প্রাণ হারাইলেন।

দেবী চৌধুরাণী

একটি রত্ন বাঙালীর গৃহ হইতে আজিও হয়ত বহিষ্কৃত হয় নাই। এ রত্ন হইতেছে শুধু বাঙালীর নহে সমগ্র ভারতের—নারী। নারীর কাছে স্বামীর গৃহ অপেক্ষা কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। স্বামীর সহিত গার্হস্থ্য জীবনই ভারতীয় সতী নারীর একমাত্র আশ্রয়। ইহার কাছে মুকুট তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ, রাজ্য তুচ্ছ। তাই দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাই—দুঃস্থা বিধবার কন্যা প্রফুল্লর জীবন—বেচারী জমিদারের পুত্রবধূ হইয়াও একবেলা অন্ন জোটে না, তাই একদিন প্রফুল্ল মাতাকে জানাইল—"মা আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে তবে খাইব—নইলে খাইব না।......আমাকে শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া আইস।"

মা। সে কি মা—তাও কি হয়?

প্র। কেন হয় না মা?

মা। না নিতে এলে কি শ্বশুরবাড়ী যেতে আছে?

প্র। পরের বাড়ী চেয়ে খেতে আছে, আর না নিতে এলে আপনার শ্বশুরবাড়ী যেতে নেই?

মা। তারা যে কখনও তোমার নাম করে না।

প্র। না করুক—তাতে আমার অপমান নেই। যাহাদের উপর আমার ভরণ-পোষণের ভার তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। মা কন্যার কথায় অবশেষে সম্মত হইলেন, বলিলেন—"আয় তবে চুলটা বাঁধিয়া দিই।" প্রফুল্ল চুল বাঁধিতে রাজী হইল না, মুখে বলিল—"না মা, থাক", মনে ভাবিল ছিঃ সেজেগুজে কি ভুলাইতে যাইব? তারপর প্রফুল্ল মাতার সহিত শ্বশুরগৃহে আসিলেন—কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ী যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া প্রফুল্লকে গৃহে স্থান দিলেন না। শুধু শ্বশুরের পিসি ব্রহ্ম ঠাকুরাণী প্রফুল্লকে বলিলেন—"গৃহস্থবাড়ী উপবাসী থাকবে—অকল্যাণ হবে যে।" আর প্রফুল্লকে তাহার সপত্নী একটিবারের জন্য স্বামী-সন্দর্শনের অনুরোধ জানাইল। কিন্তু বঙ্কিম লিখিয়াছেন—আমার গল্পের তারিখ একশত বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও যুবতীরা কখন দিনমানে স্বামীদর্শন পাইতেন না। তারপর প্রফুল্ল শাশুড়ীর মত লইয়া বড় আশায় স্বামী দর্শনের জন্য একদিন রহিয়া গেলেন। এক প্রহর রাত্রে প্রফুল্লর শ্বশুর খাইতে বসিলেন—গৃহিণী ব্যজনহস্তে ভোজন পাত্রের নিকট শোভমানা। তাই লেখক বলিতেছেন কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীর ধর্ম্ম লোপ করিতেছে! গৃহিণীর পাঁচজন দাসী আছে কিন্তু স্বামীসেবা কার সাধ্য করিতে আসে? যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য তোমার কি বজ্র নাই? আর এক স্থলে এই গৃহিণীকে উল্লেখ করিয়া লেখক বলিয়াছেন,—"যে সংসারে গিন্নি গিন্নিপনা জানে, সে সংসারে কাহারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকায় ভয় কি?" যাহা হউক তারপর প্রফুল্ল সেইদিন রাতে স্বামীর দর্শন ও স্নেহ পাইল কিন্তু শ্বশুরের অমতে শ্বশুরগৃহে স্থান হইল না—শ্বশুর বলিলেন—"চুরি ডাকাতি করিয়া খাইও।" প্রফুল্ল মাতার সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসিল। প্রফুল্লর মার জ্বর হইল শারীরিক ও মানসিক কষ্টে, কিন্তু বাঙালীর ঘরের মেয়ে বামুনের ঘরের মেয়ে সহজে শয্যা গ্রহণ করেন না; তারপর রোগ বৃদ্ধি পাইলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তারপর প্রফুল্ল কেমন করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ভবানীপাঠকের সহিত কেমন করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, কেমন করিয়া তাঁর ভবানীপাঠকের নিকট শিক্ষা-দীক্ষা হইল, পাঠক-পাঠিকা অবগত আছেন; অবশেষে ঘটনাচক্রে প্রফুল্ল রাণী হইয়া দেবী চৌধুরাণী নামে অভিহিতা হইলেন। তারপর আমরা দেখিতে পাই—বজরার ছাদের উপর বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় প্রফুল্ল বীণা বাদনে নিযুক্তা। তাঁর আদেশে শত শত বীরপুরুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত পরিচালিত হইতেছেন।

কিন্তু আমরা আবার দেবী চৌধুরাণীকে কি বেশে দেখিতে পাই? দেখিতে পাই তিনি রাণীর পদ-ঐশ্বর্য্য সব পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ বধূ সাজিয়াছেন। প্রফুল্ল আবার প্রফুল্ল হইয়া শ্বশুরগৃহ আলো করিলেন। সপত্নী সাগর প্রফুল্লকে খুঁজিয়া পুকুরঘাটে ধরিল। প্রফুল্ল পিছন ফিরিয়া বাসন মাজিতেছিলেন। তাই অন্যান্য কথার পর সাগর প্রফুল্লর ব্যবহারে ও কথায় বিস্মিত হইয়া বলিল—"এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া রাণীগিরির পর বাসন মাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া কি ভাল

লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি পিসিমার রূপকথা ভাল লাগিবে? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত এখন হারির-মা পারির-মার হুকুমদারী কি তার ভাল লাগিবে?" প্রফুল্ল তখন বলিলেন—"ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্ম এই সংসার ধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নহে।" প্রফুল্লর গুণে সকলেই সন্তুষ্ট। স্বামী ব্রজেশ্বরের হাতে যখন বিষয় আসিল। প্রফুল্লের বুদ্ধিবলে বিষয়ের উন্নতি হইল। অনেক টাকা জমিল, প্রফুল্ল একদিন বলিলেন—"আমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ দাও।" স্বামী জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—"আমি টাকা কিছু করিব না—ও টাকা শ্রীকৃষ্ণের। কাঙ্গাল গরীবের।" ব্রজেশ্বর পত্নীর অনুরোধে অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া নাম দিলেন—'দেবী নিবাস।'

কৃষ্ণকান্তের উইল

একদিকে ভ্রমর ও গোবিন্দের অপূর্ব্ব জীবন—অন্যদিকে গৃহস্থ কন্যা রোহিণীকে দেখিতে পাই—রূপসী রোহিণী ঠন ঠন করিয়া দালের হাঁড়িতে কাঠি দিতেছিল, দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়াছিল। বৈধব্যের অনুপযোগী রোহিণীর কতকগুলি দোষ থাকিলেও গুণ ছিল তার অনেক; রন্ধনে সে দ্রৌপদী বিশেষ—তারপর সূচের কাজ, গৃহস্থালীতে সে সুনিপুণা। কিন্তু তার ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সংযম না থাকায় জীবন কালিমালিপ্ত হইয়া অকালে মৃত্যু হইল। গোবিন্দলাল রূপের মোহে সতী-সাধ্বী পত্নীর প্রতি উদাসীন হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি অভিমানও ছিল যথেষ্ট, এই সব কারণে তিনি চিরদুঃখী হইলেন আর ভ্রমর যদি রাগ দ[illegible] অভিমান না করিয়া স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে না যাইতেন কে জানে হয়ত এত মনস্তাপ হইত না। কিন্তু ধার্ম্মিকা সতী-সাধ্বীর কথা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বামীর দর্শন লাভ করিলেন। আর গোবিন্দলাল পত্নীর স্মৃতি বুকে করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন। এবং পত্নীর অপূর্ব্ব চরিত্র স্মরণ করিয়া প্রেরণা পাইলেন—ভ্রমর যেন বলিতেছেন—"মরিবে কেন, আমাকে হারিয়েছ তাই মরিবে? আমার অপেক্ষা প্রিয় কেহ আছেন—মরিও না—বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

বিষবৃক্ষ

গৃহটি নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদ-লক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্য সমাগম-চিহ্ন বিরহিত। কেবলমাত্র পেচক, মূষিক ও নানাবিধ কীটপতঙ্গাদি সমাকীর্ণ—একটিমাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষ মধ্যে মনুষ্য-জীবনোপযোগী দুই একটি সামগ্রী আছে মাত্র, কিন্তু সে সকল সামগ্রী দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি, একটা ভাঙ্গা উনান, তিনচারিখান তৈজস ইহাই গৃহালঙ্কার। দেওয়ালে কালী, কোণে ঝুল, চারিদিকে আরসুলা, মাকড়সা, টিকটিকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে। এক ছিন্ন শয্যায় একজন প্রবীণ শয়ন করিয়া আছেন। এই প্রাচীন ব্যক্তি কুন্দনন্দিনীর পিতা। পিতার মৃত্যু হইলে নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে গৃহে লইয়া চলিলেন। কুন্দর বিবাহও দিলেন—কিন্তু কুন্দ বিধবা হইয়া পুনরায় নগেন্দ্রনাথের গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে আসিয়া বিপর্য্যয় বাধাইল। কুন্দ নিজেও মরিল এবং সকলকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিল। নগেন্দ্রনাথ চিত্তের সংযম হারাইয়া কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিলেন এবং সূর্য্যমুখী স্বহস্তে বিবাহের আয়োজন করিয়া নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশে চলিলেন—স্ত্রীলোক সব সহ্য করিতে পারে কিন্তু স্বামীর ভাগ দেওয়া অসহ্য। তাই সূর্য্যমুখী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। তারপর তিনি ব্রহ্মচারীর আশ্রমে নীত হইয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন এবং ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথকে সকল সমাচার জানাইয়া পত্র দেবার পর সূর্য্যমুখী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন 'হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে তবে যেন এই পত্রখানি লেখা সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন জানি না, ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না। কেবল এই চাই যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।' কিন্তু নগেন্দ্রনাথ যখন পত্র পাইয়া ব্রহ্মচারীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন—তখন সূর্য্যমুখীর দেখা মিলিল না—গৃহদাহে নাকি সূর্য্যমুখী মারা পড়িয়াছেন। নগেন্দ্রের আজ সব ফুরাইল। তিনি স্থির করিলেন কুন্দকে ভগ্নী কমলের কাছে পাঠাইয়া তিনি দেশ ত্যাগ করিবেন। কিন্তু দেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সূর্য্যমুখীর সহিত দেখা হইয়া মিলন হইল। আনন্দ ও শঙ্খধ্বনির মাঝে কুন্দনন্দিনী বিষপান করিল। সূর্য্যমুখী ও কমলমণির ভালবাসা গার্হস্থ্য জীবনের এক অপূর্ব্ব জিনিষ। ননদ [illegible] এইরূপ স্নেহ-প্রেম সংসারে অতি দুর্লভ। [illegible] কমলমণিকে লইয়া কুন্দকে দেখিতে চলিলেন—কিন্তু [illegible] তখন মুখ কালিমালিপ্ত তেজোহীন, শরীর অবসন্ন। কুন্দ প্রাণত্যাগ করিল, সূর্য্যমুখী মৃতা সপত্নীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'ভাগ্যবতী, তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক।' আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।

ইন্দিরা

ধনীকন্যা ইন্দিরা উনিশ বৎসর বয়সে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন। গ্রামের নাম মনোহরপুর। পিত্রালয় মহেশপুর। উভয় গ্রামের মধ্যে দশক্রোশ পথ—পথিমধ্যে কালদীঘি নামে এক আধক্রোশ জলযুক্ত দীঘি পড়ে। নিকটে যে গ্রাম পড়ে তারও নাম কালদীঘি। দস্যুর ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এই ভয়াবহ স্থানে ইন্দিরা দস্যুহস্তে পড়িল। তারপর দস্যুরা ইন্দিরার অলঙ্কার লুণ্ঠন করিয়া ইন্দিরাকে বন মধ্যে একা রাখিয়া পলায়ন করিল। নিদ্রিতা অবস্থায় ইন্দিরা বনমধ্যে আনীত হইয়াছিল, নিদ্রাভঙ্গে সে সব বুঝিল। কিন্তু কাঁদিয়া দুঃখ করিয়া ফল নাই, তাই ইন্দিরা নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিল এবং একদিন কালীঘাটে একটি ভদ্রপরিবারের গৃহিণীর কৃপায় একটি রাঁধুনীর কাজ জুটিল। এখন বঙ্কিমবাবুর গৃহস্থের সংসারের কিছু বর্ণনা এস্থলে দিতেছি—"ইন্দিরা বলিতেছে—মা সুভাষিণীর শাশুড়ী, তাঁহাকে বশ করিতে হইবে, সুতরাং গিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলাম, তারপর এক নজর দেখিয়া

লইলাম, মানুষটা কি রকম। তিনি তখন ছাদের উপর অন্ধকারে একটি পাটি পাতিয়া তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া আছেন, একটা ঝি পা টিপিয়া দিতেছে। আমার বোধ হইল, একটা লম্বা কালীর বোতল গলায় গলায় কালীভরা পাটির উপর কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, পাকা চুলগুলি টিনের ঢাকনীর মত শোভা পাইতেছে। আমাকে দেখিয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটি কে?" বধূ বলিল "তুমি একটি রাঁধুনী খুঁজিতেছিলে তাই একে নিয়ে এসেছি।" গৃহিণী। "কোথায় পেলে?"

"মাসীমা দিয়াছেন।"

"বামুন না কায়েত?"

"কায়েত।"

"আঃ আমার পোড়াকপাল। কায়েতের মেয়ে নিয়ে কি হবে? একদিন বামুনকে ভাত দিতে হলে কি দিব?"

বধূ বলিলেন—"রোজ ত আর বামুনকে ভাত দিতে হবে না। যে কয়দিন চলে চলুক—তারপর বামনী পেলে রাখা যাবে—তা বামুনের ঠ্যাকার বড়, আমরা রান্নাঘরে গেলে হাঁড়ি-কুঁড়ি ফেলিয়া দেন, আবার পাতের প্রসাদ দিতে আসেন। কেন আমরা কি মুচি? ইন্দিরা উপন্যাসটি যেমন কৌতুক-পূর্ণ তেমনি কৌতূহলোদ্দীপ্ত।

রজনী

ধনী রামসদয় মিত্রের বাড়ী অন্ধ ফুলওয়ালী ফুল জোগাইত। রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারটা ঘোড়া ছিল—অর্থাৎ চারিটা ঘোড়া একটি পনি! আর গৃহিণী দেড়খানা। একজন আদত—একজন চিররুগ্না এবং প্রাচীনা, তাঁহার নাম ভুবনেশ্বরী যিনি পুরা গৃহিণী তাঁহার নাম লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা রূপসী এবং গুণবতী, তিনি গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার স্বামীর বয়স ৬৩ বৎসর এবং লবঙ্গলতিকার মাত্র ১৯। কিন্তু বৃদ্ধ স্বামী পাওয়ার জন্য লবঙ্গলতিকা কিছুমাত্র দুঃখিত ছিলেন না। তিনি একেবারে আদর্শ গৃহিণী—বৃদ্ধ স্বামীকে সেবায় যত্নে সর্ব্বদা খুসী রাখিতেন। সংসারের প্রত্যেকটি কাজে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল—তাঁহার নিজের সন্তান ছিল না, কিন্তু তিনি সপত্নী-পুত্রদের আন্তরিক স্নেহ করিতেন। লবঙ্গলতিকার সুগৃহিণীপনায় রামসদয়বাবুর গৃহ সুখ শান্তিতে পূর্ণ ছিল। লবঙ্গলতার অপূর্ব্ব চরিত্র দেখাইয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র—লবঙ্গলতা সংযতা, ধার্ম্মিকা ও বুদ্ধিমতী, এইরূপ নারী সংসারে গৃহিণী হইলে—সংসার সোনার সংসারে পরিণত হয়। কিন্তু লবঙ্গলতার উপমা হয় ধূপের সহিত নিজে পুড়িয়া সকলকে আনন্দ দিতেন।

লবঙ্গলতা ও অমরনাথের বাল্য প্রণয় ছিল। ঘটনাচক্রে অমরনাথের সহিত লবঙ্গলতার বিবাহ হইল না। তারপর বহুদিন পরে অমরনাথের সহিত লবঙ্গলতিকার দেখা, তখন লবঙ্গ রামসদয়ের গৃহিণী—অমরনাথ নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন, কিন্তু লতিকা স্থির ধীরভাবে নিজের কর্ত্তব্য-ধর্ম্ম-সমাজ সব ভাবিয়া কথা বলিতেছেনঃ—

অমরনাথ বলিলেন, আমি আর আসিব না. কিন্তু যদি আমার প্রতি একটু অণুমাত্র স্নেহ করিতে?

লবঙ্গ। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

অমর। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

লবঙ্গ। না, যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই।

লবঙ্গলতিকার মত বাঙালীর অনেক মেয়েরই অদৃষ্টে এমন বুড়া বা অমনোনীত বর জোটে—কিন্তু এমন মনের জোর, ধর্ম্মে নিষ্ঠা, পরকালে বিশ্বাস, কয়জন মেয়ের আছে?

সীতারাম

বঙ্কিম সাহিত্যে গার্হস্থ্য জীবনে নারী চরিত্রগুলিরই অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও বিকাশ। গৃহস্থ রমণীর সমস্ত সদ্‌গুণগুলিই বঙ্কিম সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। গার্হস্থ্য জীবনে সুখ শান্তি শৃঙ্খলা নির্ভর করিয়া থাকে, ত্যাগশীলা ধর্ম্মশীলা প্রীতিময়ী নারীর উপর। তাই সীতারাম উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাইঃ—

সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং শ্রী ভিন্ন কেহই ছিল না। শ্রীর বয়স প্রায় পঁচিশ হইবে, সে গঙ্গারামেরই ভগিনী। শ্রী সধবা কিন্তু অদৃষ্টদোষে স্বামী পরিত্যাজ্যা। ঘরে একটি শালগ্রাম আছে, শ্রী ও তাঁর মা এই শালগ্রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করেন। সেদিন এক মহাবিপদ উপস্থিত হইল, গঙ্গারাম শাহ সাহেবের কোপে পড়িলেন এবং শাহ সাহেবের আদেশে গঙ্গারামের প্রতি শাস্তির বিধান হইল জীবন্ত কবর। ভগিনী শ্রী এই কথা শুনিল—সে এলোচুল বাঁধিয়া চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জাগ্রত দেবতার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাইয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। শ্রী রাজপথ ছাড়িয়া ক্রমে গলি-ঘুঁজি পার হইয়া অনেক পথ হাঁটিল। তারপর একটি অট্টালিকার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—বাটীর সম্মুখে দীঘি, দীঘিতে বাঁধাঘাট। বাঁধাঘাটের উপর কতকগুলি দ্বারবান বসিয়াছিল, তাহাদের অনুরোধ করিয়া শ্রী গৃহস্বামীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "তুমি কে?" শ্রী বলিল "আমি শ্রী।"

"শ্রী! তুমি তবে কি আমাকে চেন না? না চিনিয়া আমার কাছে আসিয়াছ? আমি সীতারাম রায়।" তখন শ্রী মুখের ঘোমটা তুলিল—সীতারাম শ্রীর অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া বলিলেন—"তুমি শ্রী! এত সুন্দরী?"

শ্রী বড় বিপদে পড়িয়া একমাত্র ভরসা স্বামী সন্নিধানে আসিয়া স্বামীসকাশে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন.—এখন উপায় তুমি। তাই এত বৎসরের পরে এসেছি"

সীতারাম। আমি কি করিব?

শ্রী। তুমি কি করিবে? তবে কে করিবে? আমি জানি তুমি সব পার।

সীতা। দিল্লীর বাদশাহের চাকর এই কাজি। দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ করে কার সাধ্য?

শ্রী বলিল—"তবে কি কোন উপায় নাই?"

সীতারাম অনেক ভাবিয়া বলিলেন—"উপায় আছে, তোমার ভাইকে বাঁচাতে পারি কিন্তু আমি মরিব।"

শ্রী। দেখ, দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছুই মিথ্যা নয়। তুমি দীন দুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?

সীতারাম অনেকক্ষণ ভাবিলেন, পরে বলিলেন—"তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? আমি তোমার কাছে স্বীকার করিলাম, গঙ্গারামের জন্য যথা-সাধ্য করিব।" তখন প্রীতমনে ঘোমটা টানিয়া শ্রী প্রস্থান করিল। সীতারামের এক গুরুদেব ছিলেন। সীতারাম তাঁর নিকটে গিয়া অনেক পরামর্শ করিলেন। তারপর গুরু-শিষ্য সহরের বহু লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং রাত্রিশেষে সীতারাম গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।......

সহরের বাহিরে খোলা জায়গায় গঙ্গারামের কবর প্রস্তুত হইতেছিল। লোকে লোকারণ্য। কাছেই একটি বড় গাছের অন্তরালে দেখা যাইতেছিল—লোকচক্ষুর অন্তরালে শ্রী এবং চন্দ্রচূড়—সীতারামের গুরুদেব। উভয়ের নিম্নস্বরে কথা-বার্ত্তা হইতেছিল। শ্রী বোধ হয় সারা রাত্রি কাঁদিয়াছে, তাহার আলুথালু বেশ, চোখ-মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। ভ্রাতা গঙ্গা-রামের জন্য তার দুশ্চিন্তার অবধি নাই। তারপর হঠাৎ দুই-শত লাল-পাগড়ী পরা সিপাহী ইহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। চন্দ্রচূড় ইতিমধ্যেই বৃক্ষারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে সিপাহী দেখিয়া শ্রীকে বলিলেন—"সিপাহীরা শ্রেণীবন্ধ হইয়া কবরের নিকট দাঁড়াইয়াছে। মধ্যে গঙ্গারাম। পিছনে খোদ কাজি, আর সেই ফকীর।" শ্রী গাছের নীচে দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য কিছু দেখিতে পাইতেছিল না, তাই জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কি করিতেছে?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন—"পাপিষ্ঠেরা তার হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়াছে।"

"আমি একবার দেখিতে পাই না—জন্মের শোধ একবার দেখিব।"

"দেখিবার সুবিধা আছে, তুমি এই নীচের ডালে উঠিতে পার?"

"আমি স্ত্রীলোক গাছে উঠিতে জানি না।"

"এ কি লজ্জার সময় মা?"

ভ্রাতাকে বুঝি শেষ দেখিতেও পাইবে না, ইহা মনে করিয়া শ্রী কাঁদিতে লাগিল—পুনরায় চন্দ্রচূড়ের নির্দ্দেশ মত অতি-কষ্টে গাছে উঠিতে সমর্থ হইল। তারপর তাহাকে কেউ দেখিতে পাইতেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রাণসম ভ্রাতা গঙ্গারামের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল এবং অবিরল ধারায় চক্ষে জল ঝরিতে লাগিল। তারপর একসময় দেখিল, সীতারাম ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে—ঠিক সেই সময়ে সিপাহীরা গঙ্গরামকে কবরে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছিল। সীতারাম আসিয়া বাধা দিলেন। তারপর বহু বাক-বিতণ্ডার পর কাজি গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিয়া সীতারামকে কবরে দিবার জন্য আদেশ দিলেন। বৃক্ষারূঢ়া বনদেবী শ্রী তাহা দেখিল। এদিকে গঙ্গারাম সীতারামের পরিত্যক্ত ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছেন, এমন সময় চতুর্দ্দিকে ঘোর রবে উত্থিত হইল মার, মার! হিন্দু-মুসলমানে লড়াই বাধিয়াছে—হিন্দুরা বলিতেছে জয় চণ্ডিকে! মা চণ্ডী এসেছেন—চণ্ডীর হুকুম—মার-মার! গঙ্গারাম ভাবিলেন এ-কি-এ—দেখিতে দেখিতে গঙ্গারাম দেখিলেন—তাঁহার ভগ্নী শ্রী—চণ্ডিকারূপে হিন্দু-দের পক্ষে পরিচালনা করিতেছে। তারপর ঘটনাচক্রে সীতারামও বাঁচিয়া গেলেন এবং কাজির মৃত্যু হইল।

এদিকে সেই সময় বিদ্রোহী দল আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করিল। সীতারাম রাজ-কর্ম্মচারী কাজেই তিনি দিল্লী অভিমুখে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সীতারামের আরও দুইটি বিবাহ হইয়াছিল—দুই স্ত্রীর নাম—রমা ও নন্দা। নন্দার হাতে গৃহকর্ম্মের সমস্ত ভার দিয়া সীতারাম চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কাঁদাকাটার ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না—সুতরাং, রমা কাঁদিয়া ভাসাইল—তাই বঙ্কিমের লেখা হইতে সীতারামের গার্হস্থ্য জীবন কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছিঃ—

কান্নাকাটি একটু থামিলে, রমা একটু ভাবিয়া দেখিল। তাহার বুদ্ধিতে এই উদয় হইল যে, এ সময় সীতারাম দিল্লীতে গিয়াছেন ভালই হইয়াছে। যদি এ সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন। অতএব রমার যেটা প্রধান ভয়, সেটা দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার এমন কিছু আসিয়া যায় না।

এক বৎসর হইল রমার একটি ছেলে হইয়াছে। সীতারাম যে আর তাহাকে দেখিতে পারিতেন না, ছেলের মুখ দেখিয়া, রমা তাহা একরকম সহ্য করিতে পারিয়াছিল।

রমা আগে সীতারামের জন্য ভাবিতে লাগিল—ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল। তারপর আপনার ভাবনা ভাবিল, ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। তারপর ছেলের ভাবনা ভাবিল—ছেলের কি হইবে? আমি যদি মরি, আমায় যদি মুসলমানেরা মারিয়া ফেলে, তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করিবে?......

সপত্নী নন্দা রমাকে বুঝাইল—"বিধাতা আমাদের কপালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অবশ্যই হইবে। কপালে মঙ্গল লিখিয়া থাকেন মঙ্গলই হইবে।"

আবার শ্রীকে সীতারাম যখন রাজমহিষী হইয়া তাঁহার সহিত গার্হস্থ্য জীবন পালন করিতে বলিতেছেন—তখন শ্রী বলিতেছেনঃ—

"আমি আপনার সহধর্ম্মিণী—আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিবেন না। ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি—তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয় পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থই বিবাহ।.........ইন্দ্রিয় বশ্যতা মাত্রই পাপ। আপনি যখন নিষ্পাপ হইয়া শুদ্ধচিত্তে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন, তখন আমি এই গৈরিক বস্ত্র ছাড়িব। যতদিন আমি গেরুয়া না ছাড়িব, ততদিন আপনাকে পৃথক আসনে বসিতে হইবে।"

গার্হস্থ্য জীবনে সহধর্ম্মিণীর ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল মহিমময়ী আদর্শ জীবন—আর কি থাকিতে পারে?

সমাধান

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন

(১০)

"বাড়ীতে কে আছ?"

"শিবু সর্দ্দারের বাড়ী কোনটা?"

"কে?" বলিয়া সুখন ছুটিয়া আসিল; দেখিল বিস্তর তালি ও ছিদ্রযুক্ত ভাঙা ছাতি মাথায়, কোমরে চাপরাশ বাঁধা এবং স্কন্ধে ব্যাগ ঝুলান গ্রাম্য ডাকপিয়ন দাঁড়াইয়া আছে। সুখন বলিল,—"এইটেই সর্দ্দারের বাড়ী। কেন,—কি চাও?"

একখানি শক্ত মোটা এনভেলাপের চিঠি হাতে লইয়া পিয়ন প্রশ্ন করিল,—"এই বাড়ীতে দুলালী নামে কেউ আছে?"

ইতিমধ্যে শিবুও বাহিরে আসিয়াছিল;—তাহার পশ্চাতে দুলালী। শিবু জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, দুলালীর কি হয়েছে? এই ত দুলালী।"

পিয়ন পড়িল,—"দুলালীদিদি, শিবু সর্দ্দারের বাড়ী", এবং চিঠিখানা সুখনের হাতে দিয়া পুনরায় পথ ধরিল। প্রত্যেক রবিবার এই রকম সময়ে এই পিয়নটি এই পথে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ডাক বিলি করিতে যায়, কিন্তু রামপুরের অধিবাসীরা ডাক পিয়নের কোন প্রকার আবশ্যকতা কখন উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এমন কি কেহ কখন তাহার সহিত সামান্য বাক্য ব্যয় করাও প্রয়োজনীয় মনে করে নাই। এত দিন পরে দুলালীর জীবনের এই প্রথম পত্রখানি বহন করিয়া আনিয়া সে রামপুর গ্রামে প্রতিপন্ন করিয়া গেল যে, গ্রামবাসিগণ তাহাকে যতটা অবহেলা করে, প্রকৃতপক্ষে সে ততটা অবহেলার পাত্র নহে।

সকলেই অবাক! কার চিঠি? কে লিখিয়াছে? অপর কাহারও নয় ত? দুলালী বস্ত্রাঞ্চলে হাতের আঙ্গুল মুছিয়া অতিশয় যত্নের সহিত সুখনের হাত হইতে পত্রখানি লইল, এবং একে একে দুই তিনবার পড়িয়া দেখিল, কোন ভুল হয় নাই; বেশ স্পষ্ট অক্ষরেই লিখা আছে—

শ্রীযুক্তা দুলালীদিদি
শ্রীযুক্ত শিবু সর্দ্দারের বাড়ী
গ্রাম—রামপুর
পোঃ—কাজুলি।

তারপর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত লেপাফার এক প্রান্ত ছিঁড়িয়া দুলালী একখানি পত্র বাহির করিল। কাঁচা কাঁচা অক্ষরে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে পত্রখানি লিখিত;—একটিও কাটাকুটি নাই। দুলালী পরম ঔৎসুক্যের সহিত মনে মনে পাঠ করিতে আরম্ভ করিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে সুনির্ম্মল হাসি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তারপর খুব একটা প্রাণখোলা হাসির সহিত পিতা ও ভ্রাতাকে কহিল,—"এ আমার কনক বোনের চিঠি। পাগলী বোন আমার কি লিখেছে শোন", বলিয়া দুলালী পড়িতে লাগিল—

'ভাই দিদি!

খুব আন্দাজ করে, কাউকে না জানিয়ে, চিঠিখানা লিখছি। যদি তোমার হাতে ঠিক মত পৌঁছে যায়, তা হলে কিন্তু খুবই একটা মজা হবে। রোজ তা'হলে দু'জনে চিঠি লিখব। এই চিঠি যদি তুমি সত্যি সত্যি পাও, তা'হলে তৎক্ষণাৎ একটা জবাব লিখে আমার নামে ডাকে পাঠিয়ে দিও। আমি রোজ ডাকের দিকে চেয়ে থাকব।

আজ একটা খুব মজার কথা তোমাকে জানাচ্ছি। আমাদের পাশের উকীলবাবুদের বাড়ীর সেই যে ফর্সা সুন্দর মেয়েটির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল, হঠাৎ সেই মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আসছে মঙ্গলবার দিন বিয়ে;—আর চার দিন মাত্র বাকি। পাশের বাড়ীতেই এমন একটা আমোদ, তাই ভাবছি তোমাকে বিয়ের দিন আমাদের কাছে এনে রাখব। বাবাকে ছেড়ে একটা রাত থাকতে পারবে ত?

তুমি তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে মঙ্গলবার প্রাতে তাড়াতাড়ি কাজ-কর্ম্ম সেরে প্রস্তুত হয়ে থেক; আমি ত যাবই, এবং দাদাই সারথি হবেন।

আরও অনেক মজার কথা আছে। সে সব সাক্ষাৎমত বলব। ইতি—

তোমার ছোট বোন ক—।'

সুখন প্রশ্ন করিল,—"তুই যাবি নাকি মঙ্গলবারে?"

দুলালী কহিল,—"তা বাবুয়া জানে;—যেতে দেয় যাব, আর না দেয় যাব না।"

শিবু একটু হাসিল, এবং সেই হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর নিজের ইচ্ছাটা কি?"

দুলালী ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিল,—"আমার ইচ্ছায় বড় গোল বেধে গেছে। তোমাদের ছেড়ে একেবারে দু'-দুটা দিন, বিশেষত একটা রাত্তির অন্যত্র থাকতে আমার একটুও ভাল লাগবে না; আবার ভদ্রঘরের এমন একটা বিয়ে, যা আমি কখন দেখিনি, তা' দেখতেও খুবই ইচ্ছা হচ্ছে। যদি না যাই, মনের মধ্যে খুব একটা আপশোষ থেকে যাবে। আর যদি যাই, কেবল তোমাদের কথাই মনে পড়বে;—নানা ভাবনা চিন্তায় সেখানকার আমোদ আহ্লাদে তেমন মন খুলে যোগ দিতে পারব না।" একটু হাসিয়া পুনরায় বলিল,—"আচ্ছা বাবুয়া এ রকম কেন হয়? কোথাকার কে,—কত বড় মানীলোক,—চেনাও নেই জানাও নেই হঠাৎ কেমন চেনা-জানা হয়ে গেল,—কেমন আপন হয়ে গেল! কনক ত দিদি বলতে অজ্ঞান; মহাদেবের মতন তার বাবা, দুর্গাঠাকুরুণের মতন তার মা, আর কনকের দাদা,—কথায়-বার্ত্তায় আচরণে ব্যবহারে তাঁদের স্নেহ যেন উথলে পড়ে।"

শিবু বুঝিল, ঐ দিকে মেয়ের একটু বিশিষ্ট রকম আকর্ষণ জন্মিতেছে। এতদিন সুখন এবং শিবুই ছিল তাহার একমাত্র বন্ধন। এখন তৎপার্শ্বে আর একটি বন্ধন পড়িতেছে। শিবু বড় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না;—কোথায় যেন একটু বিঁধিল। তথাপি, মনের ভাব দমন করিয়া বলিল,—"কেন বেশ ত!—ভাল ঘরের দিল-দরিয়া ধনী লোক তাঁরা,—ডাকলে এক আধ দিন তাঁদের ওখানে গিয়ে থাকবে বৈ কি? আমাদের আর এমন কি কষ্ট হবে। তবে হ্যাঁ, তুমি ঘরে না থাকলে বাড়ীঘর সবই আমার অন্ধকার হয়ে থাকবে,

তা ঠিকই—"বলিতে বলিতে শিবু থামিয়া গেল। পরিষ্কার বুঝা গেল, একটা আবেগ তাহার বাকরোধ করিয়া দিল।

দুলালী তাড়াতাড়ি উভয় হস্তে শিবুর একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যথাভরা মৃদুহাসির সহিত কহিল,—"না বাবুয়া আমি যাব না। কোন দিন যদি যাই, সকলে একসঙ্গে যাব, আবার সকলে একসঙ্গে ফিরে আসব। তোমাদের ছেড়ে থাকতে আমারও ভাল লাগবে না।"

এইটুকুতেই শিবু একেবারে জল হইয়া গেল। পরমস্নেহে দুলালীর মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতে করিতে বলিল,—"না, না, সেটা ঠিক হয় না! তোমাকে তাঁরা দরদের সঙ্গে ডাকলে তুমি কি তাঁদের সেই দরদ-ভালবাসা অগ্রাহ্য করতে পার? সেটা ঠিক কাজ হবে না। আমি সব দিক দিয়েই বুঝতে পেরেছি, তাঁরা একেবারে দেবতার মতন ভাল লোক। তাঁদের স্নেহ, তাঁদের আদর তুমি অবহেলা করতে পার না।"

—"তবে তোমরাও চল; যদি সত্যিই নিতে আসেন, সকাল-বেলা যাব আবার রাত্রেই ফিরে আসব।"

—"না মা, ওভাবে গায়ে পড়ে আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না। তোমার জন্যই ভূপেন বেঁচে গেছেন, এই বিশ্বাস নিয়ে তোমায় তাঁরা যে চোখে দেখেন, আমাদের দেখেন একটা অন্য রকম। আমরা তোমার বাবা দাদা বলেই আমাদের আদর। যাক, তুমি যেও,—আমরা বেশ চালিয়ে নিতে পারব।" পরে একটু নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল,—"তা' ছাড়া তাঁরা তোমায় আদর করেন, তারিফ করেন—এ সব শুনে আমার প্রাণে যে কত আনন্দ হয়, তা' কি বুঝতে পার মা?"

ছল ছল নেত্রে দুলালী শিবুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথাগুলি শুনিল।

পরের দিন যাইতে হইবে কনকদের বাড়ী। রাত্রে দুলালী শয্যা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহার নয়নদ্বয় সম্পূর্ণ বিনিদ্র। এপাশ-ওপাশ করিয়া ঘুমাইবার দৃঢ়পণ লইয়া পড়িয়া থাকিয়াও দুলালী কিছুতেই নিদ্রার কৃপা পাইল না। অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া জাগ্রত-স্বপ্ন স্রোতে দেহ-মন ভাসাইয়া দিল।

কি সুন্দর মেয়েটি ঐ কনক! কি চমৎকার সরল এবং নির্ম্মল তার প্রাণ! সেদিনের সেই চিঠিখানাই বা কি মধুর! কত সাবধানে কেমন ধরে ধরে লিখেছে, যেন একটিও ভুল, একটিও কাটাকুটি না হয়। কিন্তু আমি ত তার একটা জবাবও দিতে পারলাম না। টিকিট নেই, লেপাফা নেই, চিঠি লিখবার একখানা কাগজ পর্য্যন্তও নেই। এবার গেলে, আসবার সময় কনকের কাছ থেকে কিছু কিছু চেয়ে আনব। কিন্তু সে ছেলে-মানুষ;—যদি তার না থাকে? সে তবে তার বাবার কাছে চাইবে? তা বেশ ত; তিনিও ত আমাকে কিছু কম স্নেহ করেন না? তবে হাঁ, কিনে আনতে পারলেই সব চেয়ে ভাল হয়। তা কিছু পয়সা না হয় নিয়েই যাব। কিন্তু কিনবে কে? —কেন, ভূপেনবাবু। কাল বরং তাঁকেই একটু খাটিয়ে নেওয়া যাবে।

ভূপেনবাবু লোকটিও কি চমৎকার! কিন্তু ভারি রাগ হয়,—হাঁ। কি সব সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে এমন অসম্ভব প্রশংসা জুড়ে দেন, লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারি না। কিন্তু,—কি ভয়ানক কাণ্ডই সেদিন হতে বসেছিল? ছোবলটা যদি আর একটু উপরে পড়ত;—নিতান্ত দৈবই ত তাঁকে সেদিন রক্ষা করেছে! দুলালীর সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। না,—এ রকম বন্দুক নিয়ে যেখানে সেখানে শিকারে যাওয়া একটুও নিরাপদ নয়। ঐ রকম একটা দুর্দৈব আবারও ত হতে পারে। দুলালী বড় অস্থির বোধ করিতে লাগিল।

কনক লিখেছে, কাল প্রাতে আসবে। আসবে ত? যদি আসে, ভূপেনবাবুই বোধ হয় গাড়ী চালিয়ে আসবেন। কাল এলেই ঐ রকম যেখানে সেখানে শিকারে যেতে বারণ করে দেব। শুনবেন ত? কেন শুনবেন না? শুনতেই হবে। তাঁর জন্য অপরকে চিন্তার মধ্যে ফেলে যা খুশী তা করবার তাঁর কি অধিকার আছে? কিন্তু কাল এলে হয়। আসবেন ত?—না সেই তাঁদের ড্রাইভার আসবে?

তৃতীয় প্রহরের শিবা-রব দুলালীর অসংলগ্ন চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া থামিয়া গেল। সম্বিৎ পাইয়া দুলালী আপন মনে এক চোট হাসিয়া লইল। এ কি জ্বালা? এই সেদিন মাত্র যাঁর সঙ্গে পরিচয়, আজ অনর্থক তাঁর অমঙ্গল আশঙ্কায় মাথা গরম করে সারা রাত জেগে থাকা, এ আবার কি এক বিপদ!

কিন্তু বিপদ তাহাকে সহজে নিষ্কৃতি দিল না;—অনেক আশা নিরাশা ভোগের পরে কোন নিবালাক্ষণে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত-কাকলি আজ দুলালীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিল না। উভয় হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে সে যখন আঙ্গিনায় দাঁড়াইল, তখন চতুর্দ্দিকে রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে দেখিল, প্রাতঃকালীন গৃহসংস্কারাদি অনেক কার্য্য সুখন ইতিমধ্যে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

শিবু উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি অসুখ বোধ হচ্ছে মা?"

দুলালী বড় লজ্জা বোধ করিল; কহিল,—"না বাবুয়া, কোন অসুখ হয়নি, ভোরবেলায় কেমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বেলা হওয়া টের পাইনি। তুই-ই বা আমায় ডাকলি নি কেন দাদা?" বলিয়া তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট গৃহকার্য্যে লাগিয়া গেল।

বিনিদ্র রজনীর চিন্তাধারা এখন আবার অন্য রকম সাজ-পোষাক পরিয়া তাহাকে লইয়া খেলা জুড়িয়া দিল। কাজ করিতে করিতে হঠাৎ যেন দূর হইতে গাড়ীর অস্পষ্ট ঘর্ঘর শব্দ আসিয়া তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। দুলালী অমনি হাত গুটাইয়া কান খাড়া করিয়া রহিল; কিন্তু শব্দ আর শুনা গেল না। তিন চারিবার এই রকম হইল। অথচ ইহার কিছুক্ষণ পরে, যে সময়ে সুখন ডাকিয়া সংবাদ দিল যে গাড়ী আসিতেছে তখন যে শব্দ সহসা তাহার কর্ণগোচর হইল, তাহা ঠিক নিকটবর্ত্তী রাজপথে থামিবার শব্দ। কেন যে আরও পূর্ব্বে এই শব্দ সে শুনিতে পায় নাই তাহা নিজেই সে বুঝিতে পারিল না।

কোন মতে স্নান সমাধা করিয়া তাহার প্রতিদিবসের সাধারণ বেশে দুলালী যখন আঙ্গিনায় আসিল, তখন কনকও ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রশ্ন করিল,—"চিঠি পেয়েছিলে? সব ঠিক ত?"

দুলালী হাসিয়া, কনকের চিবুক স্পর্শে সোহাগ জানাইয়া

কহিল,—"দম থাক আর যাক, তবু এক মিনিট আগে দিদির কালো মুখখানা দেখা চাই,—না? বস দিকিন, হাঁফ ছেড়ে জিরিয়ে নাও ত।"

কনক বসিতে বসিতে বলিল,—"ঐ কালো মুখখানা, কই,—কে বলে আমার দিদির মুখখানা কালো? ডাক ত তাকে,—বল ত তার নাম,—দেখিয়ে দি একবার!"

"কিরে কার ওপর ঝাল ঝাড়ছিস?" বলতে বলতে ভূপেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ভগ্নীর পার্শ্বে অপর একটি মোড়ায় উপবেশন করিলেন।

—"আচ্ছা, তুমিই বল ত দাদা;—আমার এই দিদির মুখখানা কি কালো?" বলিয়াই কনক এক লম্ফে নিকটে যাইয়া উভয় হস্তে দুলালীর মুখখানা ভূপেনের দিকে টানিয়া তুলিয়া ধরিল। দুলালী বলপ্রয়োগে বাধা দিতে যাইয়া দেখিল, তাহা একটা টানাটানি ধস্তা-ধস্তির আকারে অত্যন্ত অশোভন হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং বাধা দিতে বিরত হইয়া লজ্জারুণ মুখে ভূপেনের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াই চক্ষু নামাইয়া লইল। হাসি-লজ্জার অপূর্ব্ব সমাবেশে সদ্যস্নাত মুখখানির সৌন্দর্য্য শতগুণে লীলায়িত হইল।

ভূপেন মুগ্ধনেত্রে আবেশ-রঙিন মুখখানির দিকে চাহিয়া সস্মিত দুষ্টামির ভঙ্গীতে কহিলেন,—"কালো-ফর্সার বিচারে কি হবে? তোর চেয়ে ঢের সুন্দর।"

দুলালী চট করিয়া ছুটিয়া গৃহমধ্যে পলাইয়া গেল। কনকও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

ভূপেন ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমরা বেশী দেরি কর না; আজ যে বিয়ে বাড়ীতে যখন তখন গাড়ীর দরকার।"

কনক গৃহাভ্যন্তর হইতে উত্তর দিল "আচ্ছা"; এবং বেজায় তাড়াহুড়ো আরম্ভ করিয়া দিল।

দুলালী বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবে। দুলালী কালোপেড়ে একখানি মোটা শাড়ী পছন্দ করিয়া বাহির করিল। কনকের কিন্তু তাহা মনঃপূত হইল না। কনক কহিল,—"ঐখানা নেও না;—বিয়ে বাড়ীতে ত লালপাড়ই সবাই পছন্দ করবে।"

দুলালী বলিল,—"তা কেন? কালোই ত ভাল। তা' ছাড়া যার বিয়ে সে লাল পরবে; আমার ত আর বিয়ে নয়?"

—"ওমা! তবে ওখানা বুঝি বিয়ের জন্যে তুলে রেখেছ? বিয়ের দিন পরবে?" উভয়ে একটা সুমধুর খন্ড যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

কৌতূহলবশে ভূপেন বারান্দায় উঠিয়া দ্বারপথে উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হচ্ছে তোমাদের? একটু তাড়াতাড়ি কর; আজ গাড়ী দেরি করা চলে না।"

কনক কহিল,—"আচ্ছা দাদা, এই লালপেড়ে খানাই ভাল না?" বলিয়া আত্মপক্ষে সমর্থন পাইবার আশায় ভূপেনের মুখের দিকে চাহিল।

ভূপেন সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে, কেবলমাত্র তাড়াতাড়ি উহাদিগকে বাহির করিবার উদ্দেশ্যে দুলালীর দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—"তা বেশ ত, ঐ লালপেড়ে খানাই পরে নেও;—আজ ও-খানাই বোধ হয় ভাল মানাবে।"

বিজয়-গর্ব্বে কনক বলিল,—"কেমন?"

দুলালী হাসিমুখে লালপেড়ে শাড়ীখানা লইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল। কনক পিছনে পিছনে আসিয়া কহিল,—"কই দাদার কথায় যে বড় একটিও আপত্তি করলে না?" ভূপেন দ্বারদেশ হইতে সরিয়া আসিতে আসিতে শুনিলেন, দুলালী কহিল,—"আমি যদি কথা না শুনি, আমার কথাই বা তবে শোনাতে পারব কেন ভাই?"

কনক কিছুই বুঝিল না। ভূপেনের বুকে একটা পুলক শিহরণ খেলিয়া গেল। তিনি যেন কি একটা বুঝিয়া ফেলিয়াছেন ভাবিলেন। কিন্তু গাড়ীতে বসিয়া দুলালীর মুখের দিকে তাকাইয়া হেঁয়ালি যেন নূতন করিয়া দেখা দিল। যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহার লেশও সেখানে নাই।

(১১)

কনক আর দুলালীর কাছছাড়া হয় না।

ব্রহ্মময়ী ছোট ছোট কেক্ প্রস্তুত করিতেছিলেন। কনক ও দুলালী একটা বিস্কিটের টিনে কেকগুলি তুলিয়া রাখিতে লাগিল।

হঠাৎ ভূপেনের উচ্চস্বর শুনা গেল। তিনি কনককে ডাকিতেছেন। কনক চমকিয়া উঠিল, এবং "এই রে" বলিয়া জিব্ কাটিয়া ছুটিয়া গেল।

ভূপেন গুম্ হইয়া আপন প্রকোষ্ঠে জানালার ধারে চেয়ারে বসিয়াছিলেন। কনক আসিতেই বিরক্তি-মিশ্রিত উপহাসের সুরে কহিলেন,—"দিদিকে পেয়েছ, তবে আর কি, আমাদের আর চা-টা চুলায় যাক্। কেমন?"

বাস্তবিকই চঞ্চল কনক উহা ভুলিয়া গিয়াছিল। এইরূপ ভুল তাহার বড় হয় না। হাজার চঞ্চল হইলেও কাজকর্ম্মে সে অত্যন্ত নিপুণ এবং আলস্যহীন। দাদার তিরস্কারে ছুটিয়া ভিতরে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে একখানা প্লেটে কয়েক টুকরা কেক ও এক গ্লাস জল লইয়া কনক, এবং তৎপশ্চাতে এক পেয়ালা চা ও কয়েক খিলি পান লইয়া দুলালী ভূপেনের সম্মুখে একখানি ছোট টিপয়ের উপর সাজাইয়া রাখিল।

ভূপেনের সকল বিরক্তি তৎক্ষণাৎ উবিয়া গেল। "বস" বলিয়া উভয়ের দিকে চাহিয়া অপর প্রান্তস্থিত দুইখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া, স্বয়ং আনিয়া দিবেন কিনা ভাবিয়া উঠিতে যাইয়াই বসিয়া পড়িলেন; কনককে বলিলেন, "চেয়ার দু'খানা এদিকে এগিয়ে নে।"

কনক চেয়ার দু'খানি সরাইয়া আনিল, এবং স্বয়ং এক খানিতে বসিয়া পড়িয়া দুলালীকে আপন পার্শ্বে অপর খানিতে বসাইল।

ভূপেন কহিলেন,—"আর কেক্ নেই কনক?"

কনক বলিল,—"আছে বৈকি;—এই এখুনি ত মা তৈয়ের করলেন। আনব কিছু আরও?'

—"হ্যাঁ, আরও দু'চার টুক্‌রা নিয়ে আয়।"

কনক ছুটিয়া গেল। দুলালীও উঠিতে যাইতেছিল। ভূপেন বলিলেন,—"বস না, যাচ্ছ কেন? এই যে কনক এল বলে। পাগলী বোনটি আমার ত আর হাঁটে না, ছোটেই

খালি।" বলিতে বলিতেই কেকপূর্ণ টিন লইয়া কনক আসিয়া পড়িল, এবং ঢাকনি খুলিয়া দাদার সম্মুখে ধরিয়া দিল।

ভূপেন খুঁজিয়া-পাতিয়া দুইখানি সুন্দর কেক তুলিয়া লইলেন, এবং কনকের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন,—"নেও, এই দুখানা তোমরা খাও।"

—"ওমা, এই জন্যে বুঝি আনতে বললে? তুমি খাও না; আমরা না হয় পরেই খাব।" কনক হাত গুটাইয়া লইল।

দুষ্টামির ভঙ্গীতে ভূপেন বলিলেন,—"না না না, তা হবে না; সামনে না হলে তোমরা সব খেয়ে ফেলবে; বিকেলবেলা চাইলে তখন আর একখানাও পাওয়া যাবে না।" বলিয়াই গম্ভীর হইলেন। কনক আর হাসি রাখিতে পারিল না—দুলালী মাথা নীচু করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

"নেও ত তুমি এইখানা" বলিয়া ভূপেন একখানি কেক দুলালীর দিকে তুলিয়া ধরিলেন। দুলালী লজ্জা-জড়িত পদে উঠিয়া আসিয়া ভূপেনের হাত হইতে কেকখানি লইল, এবং পুনরায় চেয়ারে বসিয়া ঈষৎ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। ভূপেন কনকের হাতেও একখানি দিলেন।

"দাঁড়াও, আমাদের জল নিয়ে আসি" বলিয়া কনক উঠিয়া গেল।

ভূপেন দুলালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি চা খাও না?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইলেন, একটি মাত্র শব্দ—"না।"

"তাই বলে বুঝি আমার চা টুকুও ঠাণ্ডা জলে পরিণত করে দিচ্ছ?" ভূপেন নিঃশব্দে একটু হাসিলেন।

কথাটার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া, এবং কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া সে ভূপেনের অনুযোগ কুড়াইতেছে, বুঝিতে না পারিয়া, হাসিমাখা মুখখানি ভূপেনের দিকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল। সে চাহনির অর্থ;—আমি কি করিলাম?

ঠিক এই সময় দুই গ্লাস জল লইয়া কনক প্রবেশ করিল।

ভূপেন দুলালীর সেই চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"আজ তুমি আমার ঘরের অতিথি নারায়ণ; তুমি হাতে করে বসে থাকলে আমি খাই কি করে? কাজেই তোমার জন্য আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

দুলালীর ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু কোন শব্দোচ্চারণ হইল না। সে একবার ঢোক গিলিল; তারপর দ্বিতীয় চেষ্টায় ধীর স্বরে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল,—"আমি ত নিয়েছি। আপনি খান, তারপরে আমি খাব;—আপনার আগে আমি খাব না।"

ভূপেন এক কামড় খাইতে খাইতে চক্ষু দ্বারা এমন একটা ইসারা করিলেন, যাহার একমাত্র অর্থ,—"এখন তবে খাও।"

দুলালী একটু মুচ্‌কি হাসিল, এবং অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কনককে আড়াল করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

কনক দুই এক কামড় খাইয়া মুখখানি অপ্রসন্ন করিয়া বলিল,—"আজ কেক একেবারেই ভাল হয় নি। কি শক্ত?—একটুও ফোলে নি। এ ক' দিন ত কেমন চমৎকার হয়েছে।"

দুলালী মৃদু স্বরে বলিল,—"পাউডার বোধ হয় কম হয়েছে!"

"তুমি জান নাকি দিদি?" বলিয়া কনক দুলালীর দিকে ঘুরিয়া সকৌতুক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। "মা তেমন ভাল জানেন না। এই সবে সে দিন সনৎবাবুদের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে তৈরী করতে দেখে এসেছিলেন। তারপর কয়েকদিন ত বেশ ভালই হয়েছিল। তুমি জান দিদি? নিশ্চয়ই জান। আজ তোমায় খুব ভাল করে তৈরী করতে হবে।

ভূপেন প্রশ্ন করিলেন,—"সত্যি, তুমি জান না কি?"

দুলালী নতমুখে উত্তর দিল,—"অনেক দিন পূর্ব্বে সময় সময় তৈরী করেছি;—সে অনেক দিনের কথা। এখন পারব কি না বলতে পারি না। বোধ হয় ভাল হবে না।"

—"তা' যে রকমই হোক, আজ মায়ের অবকাশ মতন একবার চেষ্টা করে দেখবে। কেমন?"

দুলালী ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

এমন সময় ভিতর হইতে মা ডাকিলেন,—"কনক!" কনক অমনি উঠিয়া গেল। দুলালীও উঠিতেছিল। ভূপেন প্রশংসাপূর্ণ কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কেক তৈরী করতে শিখলে কোথায়?"

দুলালী ততক্ষণে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সেই অবস্থায় হেঁটমুখে কাপড়ের খুঁট আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল,—"আমরা যখন সেই ওভারসিয়ার দেবেন বাবুর বাড়ী ছিলাম, সেই সময় তাঁর স্ত্রীর কাছে শিখেছিলাম।"

—"সেদিন যে মাংস রান্না করেছিলে, সে রান্নাও বোধ হয় তাঁরই কাছে শেখা?"

—"আমার যেটুকু যা যোগ্যতা তার সবটুকুই তাঁদের দুজনের পায়ের গোড়ায় বসে শিক্ষা করা, আর যা কিছু অযোগ্যতা সব আমার নিজের।" আকুতিভরা কৃতজ্ঞতায় দুলালীর কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

কনক আসিয়া বলিল,—"মা তোমাকে একবার ডাকছেন দাদা!"

ভূপেন উঠিয়া গেলেন।

ভূপেন নিকটে গেলে ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"দুলালীর জন্য ধোপ দেওয়া একখানা ভাল ঢাকাই কিম্বা ফরাশডাঙ্গার বা শান্তিপুরের শাড়ী, একটা সেমিজ এবং একটা ব্লাউজ এনে দে ত বাবা।" পুত্রের হাতে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। ভূপেন দুই চারি পদ গমন করিয়া কি যেন একটু চিন্তা করিলেন এবং পকেট হইতে 'পার্স' বাহির করিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে সাতটি টাকা ও কিছু খুচরা পয়সা আছে। সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি বাহির হইয়া গেলেন, এবং ন্যূনাধিক অর্দ্ধঘণ্টা কাল মধ্যে একেবারে অভিন্ন রকমের দুই প্রস্থ শাড়ী সেমিজ ব্লাউজ আনিয়া মায়ের হাতে দিয়া কহিলেন,—"আরও ছ'টা টাকা দিও ত মা! এক জনের মত না এনে দুজনের মতনই এনেছি।"

—"বেশ করেছ বাবা, ভালই হয়েছে" বলিতে বলিতে

তিনি পরিচ্ছদগুলি পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বাথরুমের দিকে লইয়া গেলেন।

মায়ের ডাকে কনক দুলালীকে লইয়া আসিল। ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"তোমরা দু'জনে এখন স্নান করে সেজে-গুজে এস গে; বাথরুমে তোমাদের জামা-কাপড় ঠিক ক'রে রেখেছি;—যার যেটা ইচ্ছে নিও।"

দুলালী কহিল,—"আমি ত মা স্নান করেই এসেছি। কাপড়ও আমার ধোয়া।"

—"তা হোক বাছা! তোমাদের দু'জনের চেহারাই অত্যন্ত রুক্ষ দেখাচ্ছে। —যাও; স্নান না করলেও বেশ করে গা হাত পা ধুয়ে মুছে দু'টিতে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এস গে—" বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

কনক দুলালীকে একরকম টানিয়াই বাথরুমে লইয়া গেল; এবং দ্রুত দরজা বন্ধ করিয়া দুলালীকে কিছুমাত্র বুঝিবার অবকাশ না দিয়াই একঘটি জল তাহার গায়ে কাপড়ে ঢালিয়া দিল। নিরুপায় দুলালী তখন হাসিয়া ফেলিল। তারপর দুইজনে পরমানন্দে স্নান করিতে [illegible] করিল। গন্ধ তেল মাখিয়া, সুগন্ধি সাবান ঘষিয়া [illegible] দুলালীকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। দুলালী অগত্যা [illegible] ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—"দেখ কনক! যত চেষ্টাই কর না কেন, যত সাবানই ক্ষয় কর না কেন, এ পাকা রং ঠিকই থাকবে—কালো দিদিকে ফর্সা করে তোলবার যত বুদ্ধি আর যত শ্রম, সবই ভেস্তে যাবে।"

কনক দুলালীকে ছোট্ট একটি ধাক্কা দিয়া সস্নেহ অভিমানের সহিত বলিল,—"আহা হা, কতই যেন কালো!"

উভয়ে উভয়কে ঘষিয়া মাজিয়া, ধুইয়া মুছিয়া, পরিষ্কার করিয়া লইল। তারপর কনক নিজে তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হস্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া দুলালীকে সেমিজ ব্লাউজ শাড়ীতে সুসজ্জিত করিতে লাগিয়া গেল। শাড়ী দেখিয়াই ত দুলালীর চক্ষুস্থির! এই রকম শিষ্টতা-বর্জ্জিত মিহি-পাতলা কাপড় পরিতে হইবে? দুলালী কনককে প্রশ্ন করিয়া অবগত হইল, তাহার দাদাই পছন্দ করিয়া এই সব কাপড় ব্লাউজ ইত্যাদি কিনিয়া আনিয়াছেন, এবং এই সব বিষয়ে তাঁহার পছন্দই না কি সর্ব্বসম্মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট! দুলালী কিন্তু তাঁহার পছন্দকে তারিফ করিতে পারিল না। ছি ছি ছি, কি প্রকাণ্ড ভুলই সে করিয়াছে! যদি আর একখানা কাপড় লইয়া আসিত! কিন্তু এখন ত আর উপায় নাই। সুতরাং কনকের হাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দুলালী চুপ করিয়া রহিল। কনকও আজ ষোল আনা সাধ মিটাইয়া দিদিকে সাজাইতে লাগিয়া গেল: হাল ফ্যাশানে চুল বাঁধিয়া, মুখমণ্ডলে পাউডার মাখিয়া, ভ্রূমধ্যে খয়েরের টিপ দিয়া পায়ে আলতা পরাইয়া, বেশ মনের মতন করিয়া সাজাইয়া, নিজেও ঠিক তদ্রূপ সাজ পোষাক করিয়া লইল। তারপর নিজের দুই গাছি সুন্দর সরু রুলি খুলিয়া লইয়া দুলালীর হাতে পরাইতে গেল।

"ও কি করছ ভাই? না না, ও আমি কিছুতেই নেব না।" বলিয়া দুলালী ভয়ানক বাঁকিয়া বসিল। বিস্তর আব্দার অনুনয় করিয়া এমন কি মায়ের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াও কনক যখন তাহাকে সম্মত করাইতে পারিল না, তখন বলিল,—"আচ্ছা তবে তুমি থাক, দেখি তুমি কত বড় সেয়ানা।" বলিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

দুলালীও, বোধ হয় কিছু একটা আন্দাজ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসি চাপিতে লাগিল।

তারপর আর একবার কাপড়ের পাড়, চুলের ভাঁজ, গালের পাউডার ইত্যাদির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিয়া কনক দুলালীকে লইয়া বাহির হইয়া আসিল এবং তাহাকে আপন প্রকোষ্ঠে বসাইয়া রাখিয়াই ছুটিয়া দাদার নিকট গেল।

ভূপেন স্যাণ্ডেল ছাড়িয়া একজোড়া পাম্পসু লইয়া একখানির মধ্যে দক্ষিণ পা প্রবিষ্ট করাইতেছিলেন। সুসজ্জিতা কনক প্রজাপতির ন্যায় ছুটিয়া দ্বার প্রান্তে আসিয়া উভয় হস্তে চৌকাঠের দুই পার্শ্ব ধরিয়া দাঁড়াইল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অদম্য বিস্ময়ে চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল,—"ও ছি,—এই রকম নোংরা জুতো পায়ে তুমি বাইরে যাবে? বিয়ে বাড়ীই যাচ্ছ বোধ হয়? দাঁড়াও ব্রুস্কো মেখে দি।" বলিয়াই কনক ব্রাস এবং ব্রুস্কোর শিশি আনিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত জুতায় ব্রুস্কো মাখাইতে ও ব্রাস করিয়া চাকচিক্য সম্পাদন করিতে লাগিয়া গেল।

ভূপেন ভগ্নীর সুন্দর সাজ-সজ্জার দিকে স্নেহময় দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"তোর দিদির স্নান হয়েছে?"

হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া, দাদার দিকে মুখ তুলিয়া কনক কহিল,—"হ্যাঁ দাদা, হয়েছে। কি সুন্দর শাড়ী ব্লাউজ এনেছ দাদা! দিদিকে যা মানিয়েছে,—কি আর বলব তোমায়? কিন্তু ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে তোমাদের আদর সোহাগের এ দুলালীটি,—হ্যাঁ। এই রকম সুন্দর সাজ-পোযাক ক'রে খালি হাত কখন মানায় নাকি? রুলি দু'গাছা পরিয়ে দিতে গেলাম,—মা-ই বলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন,—কিন্তু কি যে বেঁকে বসলেন কিছুতেই আর সোজা করতে পারলাম না। আমি তাহলে রুলি পরে একসঙ্গে যাই কি করে? তুমি এর একটা হিল্লে কর।"

—"আমি! আমি কি করব রে?"

—"তুমি বললেই দিদি শুনবে। তোমার কথা সে কখ্খন ফেলবে না।"

—"হ্যাঁ; তুই সবই জানিস! কে বললে তোকে?"

—"কেউ বলেনি; কিন্তু আমি ঠিক জানি। বিশ্বাস না হয়, পরখ করে দেখ।"

—"কিন্তু যদি না শোনে? আমাকেও যদি ফিরিয়ে দেয়?"

—"তাহলে তুমি যে শাস্তি দেবে, আমি তাই-ই মাথা পেতে নেব। কিন্তু যদি শোনে?—তখন কি হবে?"

—"তখন তুই যা চাইবি তাই দেব।"

কনকের বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুটি হইতে আনন্দ এবং উৎসাহ যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। "আচ্ছা, বেশ, মনে থাকে যেন" বলিয়া কনক তাড়াতাড়ি ঠিক করিয়া দিয়া ও ব্রাস ব্রুস্কো ইত্যাদি যথাস্থানে রাখিয়া ছুটিয়া হাত ধুইয়া আসিল এবং রুলি দু'গাছি খুলিয়া দাদার হাতে দিয়া কহিল,—"তুমি

একটু বস দাদা, আমি দিদিকে এইখানেই ডেকে আনি।" বলিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল।

কনকের কক্ষে নির্জ্জনে বসিয়া দুলালী একাকী নিজের নিকটেই যেন নিজে লজ্জা বোধ করিতেছিল। এমন অশোভন বিলাসবহুল বেশে সে কেমন করিয়া বাহিরে যাইবে? যদি কনকের দাদার সামনেই পড়িয়া যায়?—ছিঃ; এ কি বিপদে পড়িল সে আজ?

কনক ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল,—"শীগ্‌গির দিদি শীগ্‌গির—দাদা তোমায় ডাকছেন; —এক্ষুণি।"

অতর্কিত টানের ফলে পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া লইয়া দুলালী সহজভাবে বলিল,—"কেন ডাকছেন?"

—"আমি কি জানি? যিনি ডাকছেন তাঁর কাছেই শোন না গিয়ে।"

—"তবে বল গিয়ে, আর খানিক পরে আমার হয়ত ভয়ানক মাথা ধরবে; আমি এখন কোথায়ও যেতে পারব না।"

—"মাথা ধরবে কি রকম? ধরেছে না কি?" ব্যস্তভাবে কনক দুলালীর ললাটে হস্তার্পণ করিল।

দুলালী হাসিয়া ফেলিল; বলিল,—"না, ধরে নি এখনও; কিন্তু ধরলেই ভাল হ'ত,—একটা বড় রকমের জ্বরটর হ'লে আরও ভাল হয়, বেশ মজা করে গায়ে কাপড় দিয়ে শুয়ে থাকি,—আর কোথায়ও বেরুতে হয় না।"

বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া কনক বলিল,—"এই যে, দাদাই এসে পড়লেন। কতক্ষণ আর বসে থাকবেন তোমার জন্য? তাঁরও ত কাজ আছে।"

নিকটে আলনার গায়ে একখানা অর্দ্ধমলিন ছিন্ন পরিত্যক্ত বিছানার চাদর ছিল। দুলালী চট করিয়া তদ্দ্বারা আপনাকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া বসিল।

"কই রে কনক, এত দেরী কেন?" বলিতে বলিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় দুলালীর এই অত্যদ্ভুত কাণ্ডের শেষ অংশটুকু দেখিতে পাইলেন। "ও কি!" বলিয়া তিনি এবং কনক একই সঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া দুলালীর দিকে চাহিলেন।

দুলালী ভূপেনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীর অবিচলিত কণ্ঠে কহিল,—"আপনিই এই মিহি কাপড় আমার জন্য এনেছেন?"

অপ্রতিভ হাসির সহিত কৌতুকভরে ভূপেন বলিলেন, "কেন? এ-রকম ফিনফিনে ধোপ দেওয়া তাঁতের শাড়ী ত আজকাল সকলেই পরেন?"

তেমনই অবিচলিত কণ্ঠে দুলালী কহিল,—"না, সকলে পরেন না; এবং যাঁরা পরেন, তাঁরাও সময় বিশেষে অপরের নিকট আপনাদের সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে বাহাদুরী নেবার জন্যই পরেন। আমায় আপনি তাঁদের দলে নিচ্ছেন কেন? আমি গরীব,—আমি সাধারণ কৃষকের মেয়ে।" দুলালী বিষণ্নমুখে নীরব হইল।

ভূপেনও ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর "আচ্ছা, তোমরা এইখানেই একটু বস" বলিয়া কাহাকেও কিছু বলিবার অবসর মাত্র না দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

"তোমার কথায় দাদা নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়ে গেলেন" বলিয়া কনক মুখখানা একটু ভার করিল।

দুলালী কিন্তু হাসিয়া ফেলিল; বলিল,—"কেউ যদি কখন কোন বিষয় নিয়ে একটুও কষ্ট না পায় তা'হলে কষ্ট বেচারিই বা যায় কোথায় বল?"

—"তোমার ও সব হেঁয়ালির কথা আমি বুঝি না ভাই; কিন্তু বাড়াবাড়ি তোমার খুবেই বেশী। কেন? সেমিজ রয়েছে, ব্লাউজ রয়েছে, হলই বা কাপড়খানা একটু মিহি!—আর মিহিই ত পরতে ভাল।"

—"আমার ভাল লাগে না, তাই আমি বলেছি; তোমার পরা সম্বন্ধে ত আমি আপত্তি করি নি।"

—"তাই-ই বা করবে না কেন শুনি? তুমি বড়, আমি ছোট; আমার কোন কিছু যদি তোমার ভাল না লাগে, তুমি আপত্তি করবে না? বেশ ত দিদি তা হলে তুমি আমার।"

—"দেখ কনক! তোমাতে আমাতে যতই মিল থাকুক না কেন, আমাদের কোনই হাত নেই এমন একটি বিষয়ে কিন্তু আমাদের একেবারে ভয়ানক একটা অমিল রয়েছে; সেটুকু মনে রেখ ভাই! তুমি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশের কন্যা, আর আমি একজন সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষার মেয়ে। তোমাদের পছন্দ আর আমার পছন্দ কোন কোন ক্ষেত্রে আকাশ পাতাল তফাৎ হবেই হবে।"

—"ঐ তোমার এক কথা,—হ্যাঁ। খালি শিখেছ ভদ্রলোকের কন্যা আর চাষার মেয়ে! কেন? ভদ্র চাষা কি কারও কপালে ছাপ মারা থাকে না কি? তুমি নিজকে ও রকম ছোট মনে কর কেন? তোমার বাপকে তুমি ভদ্রলোক মনে কর না কেন?"

—"না ভাই, আমার সে রকম সাধ নেই। অবশ্য আমাকে আমি কারু চাইতে তিলমাত্রও ছোট মনে করি না। কিন্তু আমি যে একজন সাধারণ সরল ধার্ম্মিক স্নেহময় চাষার মেয়ে, এইটুকুই আমার প্রধান গর্ব্বের বিষয়। আমি চাষার মেয়েই থাকতে চাই: এবং সেইজন্যই তোমাদের মতন ঐ রকম জাঁক জমকের হালকা বাবুগিরি আমার লজ্জা নিবারণের সহায় না হয়ে লজ্জাবৃদ্ধির কারণ হয়ে পড়ে।"

—"কিন্তু তুমি আমার দিদি, আমার মায়ের মেয়ে, বাবার মা! জান তুমি, বাবা তোমায় কি চক্ষে দেখেন?"

—"খুব জানি ভাই। তোমার বাবার মতন দেবতুল্য মহাপুরুষ আমি আর একজন মাত্র দেখেছি। তাঁকেও আমি পিতৃতুল্য জ্ঞান করতাম এবং তোমার বাবাকেও আমি ঠিক সেই রকম আপন পিতার ন্যায় জ্ঞান করি। আর তোমার মা!—আমার আপন মাকে আমার মনে পড়ে না। শৈশবে একজন মা পেয়েছিলাম, বহুদিন মাতৃজ্ঞানে তাঁর সেবা করেছিলাম; নারায়ণ আমাকে সেই মায়ের স্নেহ থেকেও বঞ্চিত করেছেন। এখন আবার আমি তোমার মায়ের মধ্যে আমার মাতৃহীন প্রাণের মাকে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

এমন সময় ঝড়ের মতন ভূপেন আসিয়া পড়িলেন। তিনি বাহির হইয়া যাওয়ার পর দুলালী সেই চাদরখানা ফেলিয়া দিয়াছিল। ভূপেন সহসা এমন অতর্কিতভাবে আসিয়া পড়িলেন, আর কনকের সহিত কথাবার্ত্তায় দুলালী এতই

(শেষাংশ ৬৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পিরামিডের গঠন

সারা বিশ্বের প্রাচীনতম বিরাট যে সকল অট্টালিকাদি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায় সবই নির্ম্মিত হইয়াছিল অতীত যুগের মিশরবাসীদের দ্বারা। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় হইল এই যে, আজিও এমন একটি বিরাট বিশাল স্থপতী-কৃতিত্ব রহিয়াছে মিশরে, যাহা শুধু প্রাচীনতমই নয়, আধুনিক যুগেও যাহা পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ কীর্ত্তি-সৌধ। এইটি হইল ঘিজে (Ghizeh) নামক স্থানে সম্রাট চিওপস্-এর মহা পিরামিড। এই বিরাট সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে ত নিশ্চয়ই— এমন কি, ৬০০০ বৎসরও হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। সাধারণ একটা শহর যতটা জায়গা জুড়িয়া থাকে হামেশা, পিরামিডটির গোড়া পত্তন হইয়াছে, তেমনই চারটি শহরের আকার ব্যাপিয়া। আধুনিক কালের যে কোনও বিশাল অট্টালিকাকে ৪০ তলায় উন্নীত করিলে যে উচ্চতা পাওয়া যায়, পিরামিডের চূড়া হইবে ততটাই উঁচু মাটি হইতে। কুড়ি লক্ষ চূণ-পাথর ও গ্রেনাইটের চাঙ্গড়া ব্যবহৃত হইয়াছিল ইহার নির্ম্মাণে; অবশ্য এই সংখ্যা দ্বারা কোনও সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না। কিন্তু ইহার আভাস দেওয়া যায় এই কথায় যে, যদি ঐ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পর পর সাজাইয়া বসান হইত প্রাচীরের আকারে, তাহা হইলে কম পক্ষেও হাজার মাইল লম্বা স্থান ভরপুর হইয়া যাইত।

বৃহত্তম পিরামিড—দূর হইতে যেমন ইহার দৃশ্য নজরে পড়ে

সম্রাট চিওপস্-এর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ বহু স্তম্ভাকৃতি সমাধি-সৌধ গড়িয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই মহাসমাধি-সৌধের সহিত সেই সকলের তুলনাই হইতে পারে না। সম্রাট জোসের যে সোপানাবলী বেষ্টিত পিরামিড প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার আকারও ছিল মাঝারী রকমের। পিরামিডের ন্যায় এই অট্টালিকার অগ্রভাগ (জোসের নির্ম্মিত) যে ক্রমশ ছুঁচাল হইয়া গিয়াছিল, তাহা নেহাৎই দৈবাৎ, নহিলে পূর্ব্ব হইতে পিরামিডের ঐ আকার দিবার কোন পরিকল্পনাও ছিল না, উদ্দেশ্যও ছিল না। যেমন অট্টালিকাটির উপরের তলা একটির পর একটি বাড়ান হইতে লাগিল, তখন মজবুত করিবার জন্য উপরের তলাটি অব্যবহিত নিম্নতলা হইতে সব দিকেই আকারে ক্ষুদ্র করিয়া লওয়া হইতে লাগিল। কাজেই যখন অট্টালিকাটির সর্ব্বোচ্চ তলা প্রস্তুত শেষ হইল, তখন শীর্ষ-দেশ আর পিরামিডের অগ্রভাগের ন্যায় ছুঁচাল হইল না—ধ্যাবড়া মোটাই রহিয়া গেল।

ইহার পর সম্রাট স্নেফরু একটি পিরামিড গড়েন চারিদিকে সোপানাবলীতে ঘেরা—ঐটির আকার তবু বড় হয় জোসেরের তৈরীটি হইতে। স্নেফরু যখন দেখিলেন, তাঁহার পিরামিডের চূড়া হইল স্থূলাগ্র, তখন তিনি উহার উপর ছুঁচাল করিয়া চূড়া সন্নিবেশিত করিলেন। ঐ অংশের বহিরঙ্গ আবার মসৃণও করা হইল। এই অট্টালিকার উচ্চতা উহার চতুষ্কোণ ভিত্তির এক পার্শ্বের দুই-তৃতীয়াংশের মত হইয়াছিল। চিওপস্-এর বিরাট পিরামিড ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর হইলেও, উচ্চতা এবং ভিত্তির এক পার্শ্বের পরিমাপের অনুপাত ছিল ঠিক এই সোপান-বেষ্টিত পিরামিডের ন্যায়। এইজন্য অনুমান করা হয় চিওপস্ নিজ পিরামিডের গঠন-পরিকল্পনা করিয়াছিলেন স্নেফরুর গঠিত সৌধ হইতে।

আর যে সকল পিরামিড রহিয়াছে, তাহার কতকগুলি গঠিত হইয়াছে এই বৃহত্তমটির পূর্ব্বে, আবার কতকগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে পরে—উহাদের প্রতি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে, ঐগুলি প্রথমত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে আবার বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। কিন্তু চিওপস্-য়ের বিশাল পিরামিড একবারেই উহার বিরাট আকারে গড়িয়া তোলা হয়।

বৃহদাকার পিরামিডটির মত বিশাল-সৌধ নির্ম্মাণের উপযুক্ত চমৎকার স্বাভাবিক ভিত্তিভূমি মিলিয়াছিল ঐ শিখর-শ্রেণীতে, যাহা নাকি ঘিজের পর্ব্বতমালাকে গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। ইহারই মধ্যে যে চূড়াটিতে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সমতল ভাগ পাওয়া গিয়াছে, সেইটিকে মনোনীত করিয়া সম্রাট চিওপস্ সেখানে একটি বর্গ-ক্ষেত্রের আকারে স্থান সমতল করিয়া ফেলেন। এই বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহু হইল ৭৫০ ফুট লম্বা। এই ৭৫০ ফুট লম্বা ও অনুরূপ চওড়া সমগ্র স্থানটি জুড়িয়া প্রস্তর-খণ্ড সাজান হইল—প্রত্যেকটিকে সযত্নে চতুষ্কোণ করিয়া কাটিয়া এবং একেবারে গায়ে গায়ে নিখুঁতভাবে মিলাইয়া বসাইয়া। ইহার প্রত্যেকটি প্রস্তর-খণ্ড আনুমানিক চার ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া ও আড়াই ফুট উঁচু—এই আকারেই কাটা হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটিকে হুবহু একই

আকার প্রদান করিতে যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণ করা হইয়াছিল। প্রস্তর-খণ্ডের এই প্রথম স্তরের চারিদিক হইতে দেড় ফুট আন্দাজ স্থান ছাড়িয়া বাহিরের ধার হইতে পুনরায় দ্বিতীয় স্তরের প্রস্তর-খণ্ড বসান আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় স্তর সাজান সম্পূর্ণ হইলে, উহা আকারে উক্ত দেড় ফুট করিয়া ছোট হইল চারিদিকে। তারপর তৃতীয় স্তর বসাইবার বেলা

পিরামিডের বাহিরের অংগে প্রস্তর-স্তরের যে ধাপগুলি ত্রিকোণাকার গ্রেনাইট খণ্ডদ্বারা পূরণ করা হইয়াছিল—কথিত আছে ঐ গ্রেনাইট লইয়া যাওয়া হয় কেইরোনগর নির্ম্মাণ করিবার জন্য। এই দৃশ্যে বৃহত্তম পিরামিডের একাংশের নগ্নমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে—মানুষ মূর্ত্তির উচ্চতার তুলনায় প্রস্তরখণ্ড-সমূহের আকার কতকটা বুঝিতে পারা যায় এবং কি প্রকার ক্রমশ সূক্ষ্মাগ্র করিয়া পরে গ্রেনাইট দ্বারা সেই খাঁজগুলি পূরণ করা হইয়াছিল, তাহারও আভাষ পাওয়া যায়

দ্বিতীয় স্তর হইতে বাহিরের চারিধারে অনুরূপ দেড় ফুট করিয়া বাদ দিয়া তবে প্রস্তর-খণ্ড বসান হইল। পরবর্ত্তী সকল প্রস্তর-খণ্ডের স্তর বসাইবার বেলাও এই নির্দ্দিষ্ট স্থান বাহিরের চারিধার হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকারে দুই শত স্তর প্রস্তর-খণ্ড বসান হইল এবং উচ্চতা ৫০০ ফুটে ঠেকিল; সংগে সংগে চারিধারে যে দেড় ফুট স্থান প্রতি স্তরে বাদ দেওয়া হইতেছিল উপরিস্থ স্তর বসাইবার সময়, তাহার ফলে গঠনটির বাহিরের চারিপাশে ঘোরান সিঁড়ির ধাপ তৈয়ারী হইয়া গেল। পিরামিডটির এই ভিত্তি-অংশের বিরাট আকারের জন্য ইহার ঘনমান—নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং, যাহা নাকি সারা বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা—তাহারও ঘনমানের আড়াই গুণ হইবে। এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং ১২৪৮ ফুট উঁচু বলিয়া কথিত হয়। কাজেই মনুষ্য-নির্ম্মিত এমন বিরাট আকারের সৌধ আর দুনিয়ায় যে একটিও নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

ইহার পর, ঐ ভিত্তি-গঠনটির বাহিরের গাত্রে—যেখানে সোপানের আকারে রহিয়াছে প্রস্তরখণ্ডগুলি, সেই অংশ ত্রিকোণাকার মসৃণ গ্রেনাইটের চাংগড়া সকল বসাইয়া দেওয়া হইল যাহাতে সিঁড়ির ধাপের আকার মিলাইয়া গিয়া ক্রমশ সূক্ষ্মাগ্র আকৃতিপ্রাপ্ত হয় সমগ্র গঠনটি। গ্রেনাইট-খণ্ডগুলি এতদূর মসৃণ ছিল এবং উপরের খণ্ডটির সহিত নীচের খণ্ডটি এমন নিপুণতার সংগে বেমালুম জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, পিরামিডের বাহিরের অংগ মসৃণ একটি বিরাট প্রস্তরফলক বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে ভ্রম হয়।

কি কৌশলে মহা-পিরামিডটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫০০ সালে মিশর পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি মিশরের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। এই পিরামিডের নির্ম্মাণ সম্পর্কে হেরোডোটাস বলেন,—"এক লক্ষ লোক প্রতিনিয়ত কাজ করিত এবং প্রতি তিন মাস অন্তর নূতন দল উহাদের স্থান গ্রহণ করিত। এইভাবে কার্য্য চলিতে থাকে কুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল ব্যাপিয়া।" হেরোডোটাসের এই সংবাদ সংগ্রহ অবশ্য অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই; কারণ, পিরামিড গঠনের সময় হইতে হেরোডোটাসের মিশরে পদার্পণের সময় পর্য্যন্ত যে বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই কিছুমাত্র; সুতরাং এই সুদীর্ঘ কালের ভিতর পিরামিড গঠনের প্রকৃত ইতিহাস লোকমুখে বংশপরম্পরায় বর্ণিত ও পুনর্বর্ণিত হইতে হইতে শত সহস্র অতিরঞ্জনের পরে হেরোডোটাসের গোচরে আসিয়া পেঁছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বোধ হয় এই যে, প্রতি বৎসর বন্যা ও বর্ষা প্রভৃতি দুর্য্যোগের কালেই কিছু সময় বেকার এক লক্ষ লোক কাজ করিত এবং এইভাবে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গিয়াছে উহার নির্ম্মাণে।

প্রতি বৎসরেই জুলাই হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত পাঁচ মাস কাল প্রায়, নীল-নদে বিষম বন্যা উপস্থিত হয়, উহার ফলে ঘিজে পর্ব্বতমালার সমগ্র অঞ্চল একেবারে জলপ্লাবিত থাকে। এই বন্যার প্রকোপ এতটা প্রবল হয় যে, আশপাশের সারা মুলুককে ঐ সময়ে কোন প্রকার কৃষিকার্য্য করা সম্ভব হয় না। এই সময় দেশবাসী, যাহাদের অধিকাংশই ছিল চাষী, বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিত। সুতরাং সম্রাট চিওপস্-য়ের পক্ষে এই সময়ে পিরামিডের জন্য মজুর সংগ্রহ ছিল সহজ; কারণ, অন্য সময়ে উহাদের পিরামিডের কাজে নিযুক্ত করিলে, উহাদের নিজেদের চাষ-আবাদের কাজের

নিদারুণ ক্ষতি হয়। সুতরাং অন্য সময়ে অধিক সংখ্যক মজুর সংগ্রহ হইবার কথা নয়। নিশ্চয়ই সে সময়ে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই পিরামিডের নির্ম্মাণকার্য্যে যোগদান করিত।

অনুমান করা হয় এই যে, স্থায়ীভাবে নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যাপৃত মজুর, উহাদের সংখ্যা চারি হাজারের অধিক হইবে না। দ্বিতীয় পিরামিড—যেটি এই বৃহত্তমটি অপেক্ষা সামান্য কিছু ছোট—উহার পশ্চাৎভাগে কতকগুলি সারি মজুর-আবাস নির্ম্মিত রহিয়াছে, উহাতে ৪০০০-এর বেশী লোকের স্থান সঙ্কুলান হইবে না, এইরূপ মনে হয়।

হেরোডোটাস বলেন,—পিরামিডের গায়ে মিশরীয় হরপে খোদিত লিপি রহিয়াছে, উহাতে জানিতে পারা যায়, গঠনকার্য্যে নিযুক্ত মজুরেরা কি পরিমাণ গাজর, পিঁয়াজ এবং রসুন ভক্ষণ করিয়াছিল, এইস্থানে থাকা কালীন। আমার পরিষ্কার মনে আছে, ঐ লিপির উদ্ধারকর্ত্তা 'প্রদর্শক' (guide) আমাকে বলিয়াছিল যে, ঐ সকল খাদ্য-দ্রব্যে একুন ১৬০০ রৌপ্য ট্যালেণ্টস ব্যয় হইয়াছিল। ১৬০০ ট্যালেণ্টস প্রায় তিরিশ লক্ষ ডলারের সমকক্ষ হইবে। যদি ইহা প্রকৃত ব্যয়-তালিকা হয়, তাহা হইলে গঠনকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতে কি অপরিসীম ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছিল! আর মজুরদের খাদ্যেই-বা কত খরচ পড়িয়াছিল—যখন এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কার্য্যটি চলিয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

যে লাইমষ্টোন চতুষ্কোণাকারে ব্যবহার করা হইয়াছে পিরামিডের মূল অংশ সোপানাকারে গঠন করিতে, তাহার কিছু অংশ আনয়ন করা হইয়াছিল নিম্নস্থ উপত্যকা হইতে। কিন্তু বেশীর ভাগই আনিতে হইয়াছে নীল-নদের অপর পাড়ের পাহাড়গুলি হইতে—যেখান হইতে অন্যান্য স্থানেও এই প্রস্তর নীত হইয়াছে। উহা খুব বেশী দূর না হইলেও কয়েক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। কিন্তু ঐ সোপান গঠনের ত্রিকোণাকার অংশ ঢাকিয়া দিবার জন্য যে মসৃণ গ্রেনাইট ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা আনা হইয়াছে—কয়েক শত মাইল দূরবর্ত্তী আসুয়ান-য়ের গ্রেনাইট-পাহাড়ের নির্দ্দিষ্ট আকর হইতে।

কাজেই পিরামিড গঠনের প্রধান উপাদান এই প্রস্তর-খণ্ডগুলি বহন করিয়া আনাই ছিল এক অভাবনীয় শ্রমসাধ্য ব্যাপার। নীল-নদের অপরতীর (পূর্ব্বতীর) হইতেও লাইমষ্টোন সংগ্রহের স্থান আরও অর্দ্ধ মাইল দূরে। সেই উঁচু স্থান হইতে নীল-নদের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত ক্রমশ ঢালু একটি বাঁধ তৈরী করা হয়; আবার পিরামিড নির্ম্মাণের স্থান হইতে ক্রমশ ঢালু করিয়া আর একটি বাঁধ তৈরী হয় নীল-নদের পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত—ঠিক পূর্ব্বতীরের বাঁধের রুজুরুজু। দুইটি বাঁধই গঠন করা হইয়াছিল সরল রেখায়।

হেরোডোটাসের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায় যে, দশ বৎসর কাটিয়া যায় এই বাঁধ দুইটি প্রস্তুত করিতে; কারণ, দেশ-বাসীদের বিনা পারিশ্রমিকে এই কাজ করিতে বাধ্য করা হইতে থাকে এবং তাহারাও উহা এড়াইয়া চলিতে নানা ফিকির-ফন্দী করিত, যাহার জন্য অত্যাচারও কম করা হয় নাই উহাদের উপর। হেরোডোটাসের ইহাও অভিমত যে—মূল পিরামিড গঠন অপেক্ষা এই বাঁধ দুইটির নির্ম্মাণ কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ বা নিকৃষ্ট নহে। এই বাঁধ দুইটি সমুদয়ে ৩০০০ ফুট লম্বা এবং ৬০ ফুট চওড়া। বাঁধের সর্ব্বোচ্চ দুই অংশে অর্থাৎ প্রস্তর-আকর এবং পিরামিড নির্ম্মাণ স্থানের নিকট ৪৮ ফুট হইবে উচ্চতায়। এই বাঁধটি মসৃণ প্রস্তরে প্রস্তুত এবং সারা অঙ্গে প্রাণি-চিত্র-খোদিত।

স্লেজের মত চাকাহীন একপ্রকার নেহাৎ আদিম গাড়ী ব্যবহার করা হইত—পাথরের চাঙগড়াগুলি আনিবার জন্য। নীলের দুই পাড়ের বাঁধে দুই প্রস্থ গাড়ী ও লোক থাকিত; লোকেরা দড়ি বাঁধিয়া গাড়ী টানিয়া নামাইত বা তুলিত বাঁধের ঢালু বক্ষের উপর দিয়া। প্রস্তর-আকরের বাঁধের উপর দিয়া নীলের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত উৎরাই পথে গাড়ীগুলি টানিয়া নামান হইত; পরে নৌকা সাহায্যে নদী পার করিয়া পশ্চিম-তীরে পৌঁছিত; সেখান হইতে আবার গাড়ী টানিয়া চড়াই বাঁধ পথে পিরামিড নির্ম্মাণের শৃঙ্গে পৌঁছান হইত। এই চড়াই বেশ খাড়া ছিল, কাজেই টানিবার লোক লাগিত এই-খানে বিস্তর, যেহেতু পাথরের চাঙগড়া দুই হইতে ষাট টন পর্য্যন্ত হরেক আকারেরই থাকিত। সুতরাং এই কঠোর শ্রমের কাজ যে বন্যা-প্লাবনের সময়েই করা [illegible], ইহা ঠাওরা-ইয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না, কেননা, [illegible] সময়েই মজুর মিলিত বেশী সংখ্যায়। বৎসরের বাকি কয় মাসে নিপুণ কারিগরেরা বসিয়া বসিয়া পাথরগুলিকে ঠিক 'সাইজ' মত আকার দিত কাটিয়া, যেন যথাস্থানে বসাইলে বেমালুম খাপ খাইয়া যায় একটির পাশে অন্যটি।

সেই যুগে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র ছিল না, যাহার দ্বারা পাথরগুলিকে হুবহু একই আকার দেওয়া যায়, তথাপি যে নিপুণতার সহিত এই কার্য্য সমাধা করা হইয়াছে—তাহা নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয়। এত বড় একটা গঠনের বিরাট ভিত্তির চারিপার্শ্ব তুলনা করিলে পরিমাপে এক ইঞ্চির নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশের বেশী পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে না। আর এতটা মিলের সহিত পাথরের গায় পাথর বসান হইয়াছিল যে, সাজাইবার পর সামান্য একখানি ছুরির ফলাও প্রবেশ করাইতে পারা যায় নাই দুই প্রস্তর-খণ্ডের জোড়ের ফাঁকে।

বৃহত্তম পিরামিডের প্রস্তর-খণ্ডগুলির অঙ্গ পর্য্য-বেক্ষণ করিলেই বুঝা যায়, কি প্রকারের অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল উহাদের কর্ত্তনে। প্রস্তর-খণ্ডের গায়ের চিহ্ন হইতে বুঝিতে পারা যায়—সোজা লম্বা করাত, চক্রাকার করাত, এবং চোঙের আকারের ছিদ্রকরণ যন্ত্র, যাহার অগ্রভাগে হীরা সংযুক্ত ছিল—এই শ্রেণীর অস্ত্রসমূহই ব্যবহৃত হইয়া-ছিল। পাথরের কর্ত্তিত পার্শ্বের সামান্য সামান্য খাঁজে যে সবুজ দাগ রহিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান হয়, ব্রঞ্জ-নির্ম্মিত করাত উহাতে দীর্ঘ সময় ধরিয়া ঘর্ষণের ফলে ঐ রঙিন চিহ্নের উৎপত্তি হইয়াছে। বড় বড় চাঙগড়াগুলির কর্ত্তন-

বিচিত্র বার্ত্তা

কাষ্ঠখণ্ড হইতে রুটি

ময়দা অপেক্ষা আটা বেশী পুষ্টিকর—বিশেষত কোষ্ঠ-বদ্ধতায় আটা ঔষধ স্বরূপ, এই জন্য ইউরোপে 'ব্রাউন ব্রেড'-য়ের উদ্ভব। গমের তুষ না ছাড়াইয়া খোসাশুদ্ধ যে ময়দা তাহা হইতেই ব্রাউন ব্রেড প্রস্তুত হয়। কিন্তু জার্ম্মানী তাহা

কাষ্ঠ-খণ্ড হইতে পাঁউরুটি তৈরী হয়
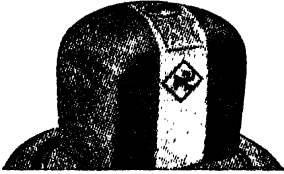
মণ্ডের দ্বারা হয় রুটি

অপেক্ষাও আর এক ধাপ উপরে চলিয়া গিয়াছে সমগ্র দেশের গম-খরচে বাহুল্য বর্জ্জন করিতে। খাদ্যের জন্য যে কোন অবস্থায়ই জার্ম্মানীকে যাহাতে বিদেশীর শরণাপন্ন না হইতে হয়, এই জন্য জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ কাঠের টুকরা হইতে এমন এক বিশুদ্ধ মণ্ড বাহির করিয়াছে, যাহা গমের সহিত মিলাইয়া রুটি প্রস্তুতে অনায়াসে ব্যবহার করা যাইবে। কাঠের মণ্ড দ্বারা ঘোড়া-গরুর খাদ্য বিচালীর স্থান পূরণ করা যায় কি না, এই গবেষণায় ব্যাপৃত হইয়া জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে মানুষের খাদ্যে পরিণত করিয়াছে। পুষ্টিকর গুণে কাঠের মণ্ড আলু ও তুষের সমকক্ষ।

বৃহত্তম ঘণ্টার উচ্চতম ধ্বনি

লিভারপুল কেথিড্রালের জন্য ১৩টি ঘণ্টার অতি বৃহৎ গুচ্ছ ঢালাই হইতেছে। এইটি শুধু যে সারা বিশ্বের সর্ব্ব-বৃহৎ ঘণ্টাই হইবে এমন নয়, ইহার ঘণ্টাধ্বনিও হইবে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ। 'লণ্ডন ক্লে' নামক উপাদানে ঘণ্টাটির নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে। ঢালাই কাজ হইতেছে যে কারখানায় এই কার-খানায়ই 'বিগ্ বেন' এবং 'গ্রেট পল' নামক বৃহৎ ঘণ্টা দুইটি ঢালাই হইয়াছিল, কারণ এই ফাউন্ড্রি ১৫৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত—বিখ্যাত 'স্পেনিস আর্ম্মাডা' অভিযানের ১৮ বৎসর পূর্ব্বে। কেথিড্রালের ২৩৫ ফুট উচ্চ টাওয়ারে ইহা স্থাপিত হইবে, ইহার ওজন হইবে ৯,২৯৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১০০ মণ। যদিও ইহার ঘণ্টাবাদকগুচ্ছে ১৩টির সমাবেশ, তথাপি ধ্বনি হইবে একসঙ্গে—উহার সুর থাকিবে 'এ ফ্ল্যাট'। তাম্র এবং টিনের মিশ্রণে এই লণ্ডন ক্লে উপাদান তৈরী—১৭০০° (ফারেনহেইট) তাপে গলাইয়া ঢালাই কার্য্য চালাইতে হয়। ত্রয়োদশ ঘণ্টাটি সকল সময় বাজান হইবে না। লিভারপুল-বাসীর বিরক্তি উৎপাদনের ভয়ে, অপর বারোটিই সাধারণত বাজান হইবে। ত্রয়োদশটি বাজাইবার সময় নিম্ন ধ্বনির ৮টি উহার সহিত শব্দিত হইবে। ঘণ্টাটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'এমানিউয়েল'। টমাস বার্টগেট নামক এক ধনী লিভারপুল-বাসী ১৯১২ সালে মৃত্যুকালে প্রচুর অর্থ দান করিয়া যায় এই ঘণ্টাটি নির্ম্মাণের জন্য। ঘণ্টাগুলির একযোগে সুর 'এ ফ্লাট' হইলেও এইগুলিকে স্বতন্ত্র কোটি কোটি পরিবর্ত্তিত সুর-মালায় বাদিত করা যাইবে।

বলিতে পারেন?

(১) কোন্ জানোয়ার সাঁতার কাটিতে পারে না?

(২) ডায়মণ্ড (হীরা), এমারেল্ড (পান্না), রুবি (চুনী), সেফায়ার (নীলা)—সম ওজনের হইলেও কোনটি বেশী মূল্যবান?

(৩) মানব দেহের সর্ব্বশুদ্ধ অস্থিসংখ্যা কত?

উত্তর—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

আমেরিকার সেকালের বল খেলা

পূর্ব্বে মেকসিকোতে এক সময়ে 'মায়া' সভ্যতার অভ্যুদয় ছিল—স্পেনীয়গণের অধিকারের পূর্ব্বে। মায়া সভ্যতার সহিত হিন্দু-সংস্কৃতির নিকট সম্পর্ক। কিন্তু মায়া জাতির সেই অতীতকালেও অতি প্রিয় খেলা ছিল 'বল'। দুইটি দলের প্রতিযোগিতায় খেলা হইত, বলটি ছিল রবারের তৈরী। খেলার মাঠের দুই সীমায় প্রকাণ্ড বড় এক একখানি প্রস্তর বোর্ড থাকিত, উহাতে বৃহৎ একটি করিয়া গর্ত্ত কাটা ছিল দোরের খিলানের মত। বিপক্ষের প্রস্তরের ঐ গর্ত্তের ভিতর দিয়া বলটিকে গলাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য লইয়া উভয় পক্ষ প্রতিযোগিতা করিত। অন্যান্য কি নিয়ম-কানুন ছিল তাহা আর এখন জানিবার উপায় নাই, কারণ স্পেনীয় ক্যাথলিক পুরোহিতগণ মায়াজাতির যৎকিছু বিবরণ সম্বলিত কাগজ—সবই পোড়াইয়া দিয়াছে অবিশ্বাসীর ছোঁয়াচ লাগিবার ভয়ে। ভয়ের কারণ আর কিছুই নয়—মায়াজাতি শিল্পে, শিক্ষায়, সভ্যতায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল সেকালের সমগ্র আমেরিকায়। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—কাগজের মত পাতলা সোনার পাতে মোড়া ছিল তাহাদের সূর্য্যমূর্ত্তির বক্ষে রক্ষিত ঢালটি।

প্রশ্নের পক্ষকেশগণ!

কোনও লণ্ডন সংবাদপত্র বলেন—চীনাগণ তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের পূজা করে, আমরা বয়োবৃদ্ধদের শাসনের ভার দিয়াছি দেশের। কেননা সাইমন, হ্যালিফাক্স, ইনস্‌কিপ্‌ আর চেম্বারলেনের বয়স মিলিয়া ২৫০ এর উপরে উঠিয়া গিয়াছে! পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন আর কোন্‌ কাজ দেওয়া যায় তাহাদের—যাহাদের বয়স তিন কুড়ি দশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে!

জার্ম্মান উপন্যাস প্রকাশে নিষেধ

"ভোল্‌কিশের বেওবেচ্‌টার" নামক জার্ম্মান সাময়িকপত্র একখানি ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশ করিবার ঘোষণা প্রচার করে। কিন্তু সেই উপন্যাস আর প্রকাশিত হয় না। উপন্যাস-খানির লেখক কর্ণেল মার্টিন—তিনি জার্ম্মান সেনা দলভুক্ত, তবে যে ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়, তাহা হইল হ্যান্‌স্‌ নাইট্রাম Hans Nitram)। তাঁহার উপন্যাসখানিতে পূর্ব্বদিক হইতে জার্ম্মানী আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনার বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তিনি প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঐ প্রকার আক্র-মণেও জার্ম্মণী বিজয়ী হইবে। প্রচার বিভাগের মতে ইহা অলীক ও আপত্তিকর। পুস্তকখানির প্রকাশের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে—"জার্ম্মানী আক্রান্ত হইতে পারে, এমন অসংগত মতবাদ জার্ম্মানিদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে দেওয়া যাইতে পারে না, ইহাতে সাধারণের মনোবৃত্তি কলুষিত হইবে।"

ভারতের "শ্যাম-যমজ"

যমজ দুইটি যদি পরস্পর সংলগ্ন থাকে অঙ্গাঙ্গীভাবে একেবারে মাংসপেশীর যোগাযোগে তবে তাহার নাম দেওয়া হয় 'শ্যাম-যমজ'। কারণ শ্যাম দেশেই ঐ প্রকার সংযুক্ত যমজ প্রথম জন্মে। ইহার পর মহীশূরে যমজ, হিলটন ভগ্নীদ্বয় এবং ফিলিপাইনের যমজ ভাই দুইটি—এখন বিশ্ববিখ্যাত।

মহীশূরের যমজ ভগ্নীদ্বয়ের নাম গঙ্গাবাঈ ও গোমাবাঈ। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা দুইজন একথা স্বীকার করে না—তাহারা দুই-য়ে মিলিয়া একজন, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। ১৯৩৭ সালে প্যারিসের ইণ্টারন্যাশনেল এক্সপোজিশনের জন্য উহাদের নেওয়া হয়। সেই সময় কিন্তু এক টিকিটেই উহারা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছে। বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে "সে" অর্থাৎ গঙ্গাবাঈ ও গোমাবাঈ বলে, "যুগলেই প্রেম সম্ভব, কিন্তু তিনজনে গোলযোগ ভিন্ন কিছুই হইবে না। আমরা পরস্পরকে এত ভালবাসি যে অপর কোন অপরিচিত এস্থলে অবাঞ্ছিত।"

মহীশূর রাজ্যে বাঙালোর হইতে ৪০ মাইল দূরে অতি সাধারণ গৃহস্থের ঘরে এই যমজের জন্ম। যমজের বয়স এখন ২৮ বৎসর।

ইটালীয় ভাষার প্রচার

ইটালীয় সরকার তাহাদের ভাষা যাহাতে এদেশে প্রচারলাভ করে সেইজন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পত্রালাপ করিতেছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা দিলে উহার ব্যয়ও ইটালীয় সরকার বহন করিতে স্বীকৃত। লেক্‌চারারের পদের ব্যয়ও তাহারা বহন করিবে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয় আলোচনার জন্য কমিটি গঠিত করিয়াছেন।

আমি কে?

বার্মিংহাম সেণ্ট্রাল পুলিশ ষ্টেশন। সভ্য-ভব্য পোষাকে সজ্জিত এক ব্যক্তি ধীরপদক্ষেপে থানায় উপস্থিত হইয়া মুরুব্বিয়ানা চালে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কে?"

সে ব্যক্তি এখন জেনারেল হাসপাতালে রহিয়াছে। চিকিৎসকগণ তাহার নাম-ধাম জানিবার জন্য নিরর্থক প্রশ্ন করে—তাহার নিকট কোনও উত্তর পাওয়া যায় না।

তাহার দামী পরিচ্ছদের কোথাও মুদ্রিত কার্ড নাই—ঠিকানা বা নাম জানিতে পারা যায় এমন কিছুই তাহার নিকট নাই। পকেটে রহিয়াছে শুধু একটি ভাঙা থার্মোমিটার, ধাতব আধারে রক্ষিত। লোকটির বয়স ৩৭।৩৮ হইবে অনুমান করা হয়। সুটের উপর ওভার-কোট গায়ে ছিল, হাতে ছিল দস্তানা, মাথায় "এণ্টনি ইডেন" ফ্যাশানের টুপী। আর সংগে ছিল একটি ছাতি—কাপড়ের ওয়াড়ে মোড়া।

এখনও মাঝে মাঝে সে নূতন কোন লোকের দেখা পাইলেই জিজ্ঞাসা করে বেশ গম্ভীরভাবে—"আমি কে?" ঠিক যেমন কোন আগন্তুককে দেখিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করে—"কি চাই আপনার?"—হুবহু তেমনি।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার উত্তর

(১) উট। ইহা গভীর জলে যাইয়া মাথা জলের উপর তুলিলেই আর তাল সামলাইতে পারে না, ডিগ্‌বাজী খাইতে বাধ্য হয়। সাঁতার কাটা সম্ভব হয় না। কোন প্রকারে ঝাঁপাই ঝুড়িয়া ডাঙার উঠিতে পারে মাত্র।

(২) সমান ওজনের হইলেও চুনির মূল্য বেশী।

(৩) ২০৬ খানি হাড়।

বিষধরের মোটর অভিযান

'মিনার্ভা' ষ্টুডিও'র বিখ্যাত সুন্দরী তারকা নাসীম যখন 'ডাইভোর্স' ছবির শেষ বাহিরের দৃশ্য সমাপন করিয়া 'থানা' হইতে ফিরিতেছিল, সে সময়ে এক বিভীষিকাময় দৃশ্যের অবতারণা হয় তাহার মোটরকারের ভিতর। মোটর পূর্ণবেগে চলিয়াছে, এমন সময় নাসীম দেখিতে পায় পশ্চাতের যে সিটে সে বসিয়া আছে, তাহার পাশেই প্রকাণ্ড একটা গোক্ষুরা সাপ।

আকুল আতঙ্কে সে চীৎকার করিতে থাকে, তখন মোটর-চালক গাড়ী তাড়াতাড়ি থামাইয়া ফেলে। কিন্তু সাপটিকে কি প্রকারে তাড়ান যায় তাহার কোনই উপায় তাহারা করিতে পারে না। ইতিমধ্যে সাপটি ধীরে ধীরে গদি হইতে নামিয়া

গাড়ীর জানালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং দ্রুতবেগে পার্শ্ববর্ত্তী চাষের জমিতে প্রবেশ করিল। কি উপায়ে সাপটি ঐ গাড়ীতে আসিল তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে অভিনেত্রীটির বরাত ভাল যে বিষধর উহার স্বরূপ প্রকাশ করে নাই।

বাঁধাকফি বৃক্ষ

বাঁধাকফি বৃক্ষই বলিতে হয়, যখন উহা ৭ ফুট উঁচু এবং উহার বাঁধাকপি কাটিতে হইলে এক হিসাবে আকষীরই

এসেক্সের রয়ন্টোন এভিনিউতে মিসিস হিক্‌সুসের বাগানে এই গাছটি রহিয়াছে

প্রয়োজন। গাছটিকে অবশ্য এই বিরাট চেহারা দেওয়া সম্ভব হইয়াছে উৎকৃষ্ট সারের ব্যবস্থায়। এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত ইহাকে খাড়া রাখা হইয়াছিল একটি খুঁটার সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া। এখন উহা বাগানের বেড়ার দ্বিগুণ আকার উচ্চতায় পেঁছিয়াছে। আর একটু বাড়িলে হয়ত পাখীরা আসিয়া উহাতে নীড় বাঁধিবে এবং বসবাস করিতে থাকিবে পরম নিশ্চিন্ততায়।

ফুটবলের মত অতিকায় শামুক

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সার্ভিসের কাপ্তেন লিলি টোগোল্যান্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া এক নূতন শিকারের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছে। সে বলে ডাঙার গুগলিগুলি সেখানে ফুটবলের মত বড় হয় এবং লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। সে দেশবাসীরা উহার শিকারে অতিশয় আমোদ উপভোগ করে। ঐগুলি যে ডিম পাড়ে তাহা পায়রার ডিমের মত বড় হয় আকারে। অতি প্রিয় খাদ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে টোগো-ল্যান্ডবাসী নর-নারী অরণ্যের যে অংশে এই অতিকায় গুগলি বাস করে, তথায় হাজির হয় এবং গন্ডায় গন্ডায় শিকার করিয়া বাড়ী ফিরে। এই খাদ্য উহাদের নিকট এতদূর লোভনীয় যে, আগুনে ঝলসান গুগলি—শিক্-কাবাবের ন্যায়—শিকে ফোঁড়া অবস্থায় রাস্তায় ফিরি করিয়া বিক্রয় করা হয়।

সুসভ্যের যাযাবর 'জিপসি'-জীবন

নাট্যকার চার্লস ম্যাক্-এভয়-য়ের পুত্রদ্বয় আর্থার প্যাট্রিক এবং শিল্পী ক্রিষ্টোফার উইলটশায়ার ডাউনস-এ প্রান্তর মধ্যস্থিত একখন্ড জমি পছন্দ করিয়া ঐস্থানে নিরালা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু জমির মালিক ঐ জমিখানা বিক্রয়ও করিবে না বা ভাড়াও দিবে না। তখন নাট্যকার পুত্রদ্বয় অভিমানে ঐ খোলা মাঠে বাস করিতে মনস্থ করে।

এই সময়ে তাহাদের সাক্ষাৎ হয় এক দল জিপসি'র সহিত। নিজেদের ঘোড়া তাহাদের দান করিয়া বিনিময়ে গ্রহণ করে উহাদের গাড়ী (caravan)। সেই অবধি এ' নাট্যকার পুত্রদ্বয় ক্যারাভানেই বসবাস করিতেছে এবং জিপসিদের ন্যায় যাযাবর জীবন গ্রহণ করিয়াছে।

তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা বলে যে, 'জিপসি' নামটি যাযাবরেরা ব্যবহার করে না, উহাকে ঘৃণা করে। তাহারা রোমানি (Romany) বলিয়া পরিচিত হইতে ভাল-বাসে। যে সব সভ্যরা তাহাদের ঘৃণা করে, তাহাদের তাহারা 'জর্জ্জিও' বলিয়া ডাকে—অবজ্ঞাভরে।

নাট্যকার পুত্রদ্বয় যাযাবর জীবনে অশেষ শান্তি-সুখ পাইতেছে—ইহা ত্যাগ করিবার তাহাদের ইচ্ছা নাই।

নিউ দিল্লীতে শিয়ালের হানা

এক সময়ে তুরস্কে এবং পরে অষ্ট্রেলিয়ায় বন্য কুকুরের উপদ্রব ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। উক্ত দুই গবর্ণ-মেন্টকে এই উপদ্রব দমন করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল।

হালে শোনা যাইতেছে নিউ দিল্লীতে শিয়ালের হানা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। এই অঞ্চল এক সময়ে যে নিবিড় অরণ্য ছিল এবং দুরন্ত জানোয়ারের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহারই কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় বর্ত্তমান শিয়ালের সংখ্যাধিক্য হইতে।

নিউ দিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটির বিবরণে প্রকাশ, ১৯৩৭-৩৮ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০৫টি শিয়াল মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মারিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব বৎসরে মাত্র নিহত করা হইয়াছিল ৭৭৭টি শিয়াল।

নিউ দিল্লীর 'রিজে' প্রচুর সংখ্যায় শিয়াল আনাগোনা করে। গ্রীষ্মকালে যখন অনেক বাংলো খালি পড়িয়া থাকে, তখন শিয়ালগুলা ঐ সকল বাংলোতে স্থান গ্রহণ করে।

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

(১০)

মাণিক সঙ্কল্প স্থির করিয়াছে। যাইবার পূর্ব্বে একবার গ্রামখানিকে ভাল করিয়া দেখিবার আগ্রহ তাহার হইল।

জন্ম-পল্লী নহে, তথাপি এইখানেই তাহার নবোন্মেষিত জীবনের প্রথম স্নেহ-সূর্য্য-করোজ্জ্বল প্রত্যূষ প্রকাশ পাইয়াছিল। এখানকার প্রতি বৃক্ষ-লতায়—পত্র-পল্লবে সেই প্রভাতের জ্যোতির্লেখা। ধূলি-ধূসরিত সঙ্কীর্ণ-সর্পিল পথটি পর্য্যন্ত মায়া মাখাইয়া রাখিয়াছে। শেওলা-পানা ভরা দীঘির জলে ঊর্দ্ধমুখী রক্তকমল তেমনই আগ্রহে সূর্য্যদেবকে বন্দনা করিতেছে, উচ্চ পাড়ের ঘন জঙ্গলে গরু-ছাগল চরিতেছে। জলের সন্নিকটে ঝোপের মধ্যে ডাহুক দম্পতি বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে। চাতালের দুই পার্শ্বে দীঘি প্রবেশ মুখে দুটি চন্দন তরু ফুলভারে অবনত। সর্ব্বনিম্ন চাতালে জলতলে রক্তচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত করিয়া রক্তাম্বরা অশোক জলের কানে কি যেন অতীত-বর্ত্তমানের কাহিনী বলিতেছে। আকাশ উজ্জ্বল। দিনে সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো রাত্রিতে নক্ষত্রখচিত ছায়াপথের অপরূপ সম্পদ। শৈশবের ঊষা এখানে সুপ্রকাশিত হয় নাই সত্য, কিন্তু জ্ঞানের জগৎ এইখানেই প্রভাতী বন্দনা গাহিয়াছিল। যৌবন, ইহারই পথ বাহিয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া মধুর হইয়া ফুটিয়াছে। ছোট গ্রামখানি সুখে-দুঃখে, স্নেহে-ভালবাসায় যেন আর গ্রাম নহে—এক কল্পনাময় বাস-গৃহ। অথবা এক সংসার।

"দাদাবাবু গো—আমায় বাঁচাও।" আর্ত্ত কণ্ঠস্বরে মাণিক ফিরিয়া দেখিল, দুলে পাড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার সম্মুখে নবীন দুলে হাতজোড় করিয়া কাঁদিতেছে।

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে নবীন!"

নবীন যাহা বলিল তাহার তাৎপর্য্য এই,—আজ প্রাতঃকালে সে কাজে বাহির হইয়া যায়। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, তাহার ছোট ছেলেটার বার দুই ভেদ-বমি আরম্ভ হইয়া গা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে এবং ঘণ্টাখানেক হইল বড় মেয়েটিরও ভেদ-বমি আরম্ভ হইয়াছে। সে গরীব লোক, ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য তাহার নাই। দাদাবাবু যদি দয়া করিয়া একটু ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দেন ত গরীবের নাড়ীছেঁড়া ধনগুলি বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

মাণিক বলিল, "গদাই ডাক্তারের কাছে একবার যা।"

নবীন হাতজোড় করিয়া বলিল, "গিয়েলাম বাবু তিনি বল্লে—পয়সা না পেলে রুগী ঘাটিব না। কি হবে—দাদাবাবু!"

"আচ্ছা আয় আমার সঙ্গে,—দেখি কি করতে পারি?"

যাইতে যাইতে মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে, তোদের পাড়ায় আর কারও ও রোগ হ'য়েছে?"

নবীন বলিল, "হাঁ দাদাবাবু, ছিমন্তর বুড়ো মা পরশু মারা গেল। হরেকেষ্টই ত রুইপুর থেকে আজ তিন দিন হ'ল এ রোগ লিয়ে এসেছে। ভসচাজ্জি মশায় বল্লে, 'ওরে ছিমন্ত মা শেতলার পুজো কর এই বেলা—না হ'লে পাড়াকে পাড়া উজোড় হবে।'—তা বাম্ভোন মুনিষ্যি—তেনার কথা ফলে গেল।"

মাণিক বলিল, "তোরা কোথা থেকে খাবার জল আনিস?"

"—হোই যে বিলটে দাদাবাবু—ওর জলেই চান করা, ভাত রাঁদা, কাপড়-কাচা সবই হয়।"

মাণিক সবিস্ময়ে বলিল, "হাঁরে, বিল যে একেবারে বুজে গেছে। ওপারে চাষ-আবাদ হ'য়ে পলি প'ড়ে ত দু'ধার ভরাট হ'য়ে এসেছে। মাঝখানে একটুখানি পাঁক-গোলা জল। তাতে আবার ধোপারা কাপড় কেচে কেচে সেটুকুও দিয়েছে মাটি করে। আবার শুনেছি নাকি পাট পচিয়েছে ওখানে?"

নবীন বলিল, "হাঁ দাদাবাবু, দত্তবাবুরা কুড়ি গাড়ী পাট ফেলেছে ওখানে। তা—বাবু জলটুকু ওর ভারী মিঠে। ভসচাজ্জ মশায় বলেন জল নারাণ, এতে দোষ নেই।"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "না, খেলেই নারায়ণ প্রাপ্তি। তোরা কেন জমিদার-পুকুর থেকে খাবার জল আনিস না।"

নবীন বলিল, "অতটা দূর যাওয়া আসা—সারাদিন খাটা খাটুনির পর মেয়েরা আর পেরে ওঠে না। এই যে ডাক্তার-বাবু এই দিকেই আসছে।"

মাণিক গদাইকে ডাকিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

নবীন শতমুখে দাদাবাবুর গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মাণিক দেখিল,—সম্মুখে প্রসারিত সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র। এই সব অশিক্ষিত সমাজের অপাংক্তেয় প্রাণীগুলির সুখদুঃখ এমনই আবর্জ্জনার মত এক পাশে ঠেলা রহিয়াছে যে, সারাজীবন ধরিয়া চেষ্টা করিলে সে জঞ্জাল দূর হইবে কি না সন্দেহ! ইহাদের উদরে অন্ন, বুকে বল, মুখে ভাষা ও অন্তরে অভয় দিতে হইলে—চাই জীবনভোর সুকঠোর তপস্যা।

জাতির জীবনে দুর্দ্দিন ঘনাইয়া উঠিয়াছে। সহস্র সহস্র সন্তান ছুটিয়াছেন মায়ের দুঃখে বিগলিত হইয়া—দারুণ বেদনা মর্ম্মে বহিয়া উল্কার মত ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত। কংগ্রেস—পিকেটিং—চরকা খদ্দরের মধ্যে যাঁহার যতটুকু সামর্থ্য কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োগ করিতেছেন। কিন্তু শহরের যোগসূত্র যেখানে, যে নাড়ীর রসধারায় উহার কর্ম্মের স্পন্দন স্পন্দিত হইতেছে, সেই চিরশ্যামাঞ্চলা পল্লী-বালিকার পানে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাঁহারা সম্মুখে ছুটিতেছেন। বালিকার হরিত অঞ্চলের শতছিদ্র পথে—রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য উঁকি মারিতেছে, বন জঙ্গল, মাঠ বাট ভরিয়া

উঠিতেছে আর বিশ্বের সভ্যতা-পরিত্যক্ত অনাহারক্লিষ্ট রোগ-জীর্ণশীর্ণ ম্লান মুখগুলি লইয়া তাহারই অনাথ-অস্পৃশ্য সন্তান ভগ্ন ভিটার কোলে অপঘাতে অন্ধকারে নিঃশব্দে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে।

এতটুকু রমণীয় উদ্যানের চারিপাশে যে আগাছাগুলি জন্মায়—তাহাদের মূল্যহীন জীবনের মেয়াদ যেমন পুষ্পিত তরুর ছায়া-স্বার্থটুকুকেও আশ্রয় করিয়া কমে বাড়ে, প্রয়োজনের খাতিরে তাহারা ছায়া বিলায় অপ্রয়োজনে মরিতে হয়, তেমনই উচ্চবর্ণের সেবার চিরন্তন অধিকার লইয়া এইসব হীন জাতির বাঁচিবার সার্থকতা।

জীবনের পথে উহাদের কার্যটুকু লইয়া আমরা আমাদের সভ্য, শিক্ষিত ও সুন্দর করিয়া রাখি এবং আমাদের অনাবশ্যক অবহেলা বহন করিয়া উহারা নীরবে ফুটিয়া উঠে—নীরবে মিলাইয়া যায়। আমরা বসন্তের নব মঞ্জুরিত কচি কিশলয়,—উহারা শুষ্ক শাখাচ্যুত পুরাতন পত্র। আমাদের আসন দিয়া যাহারা অন্ধকারে অধোগামী হয় এবং যাহাদের পরিত্যক্ত-বৃন্তের রসধারায় আমাদের নবীন শ্রী বিকশিত হইয়া উঠে,—কৃতজ্ঞ-নয়নে এই বিগলিত ভূপতিতদের পানে চাহিয়া কয়জনের চক্ষুই বা অশ্রুসজল হইয়া উঠে। জাতির উদ্বোধনে যতদিন না সে পুরাতনের প্রতি মমতার দৃষ্টি লইয়া চাহিতে পারিবে, ততদিন তাহার চোখ ফোটা না ফোটা সমান! জাগিবার সঙ্গে প্রভাতের আলো যখন চোখে আসিয়া পড়ে এবং সেই আলোতে উচ্চকে প্রণাম, সমানকে আলিঙ্গন ও নীচকে স্নেহ বিলাইতে যে না পারে, তাহার জাগরণই বৃথা!

মাণিকের এতটুকু ক্ষমতা নাই। ওই রোগ-ক্লিষ্টের মুখে হাসি ফুটাইতে, উহাকে সান্ত্বনা দিতে তার এতটুকু শক্তি ত নাই! টাকা দিলে ডাক্তার আসিবে। দরদ ত টাকা দিয়া কেনা যায় না। ডাক্তার আসিয়া করিবে কি? নাক সিঁটকাইয়া বলিবে, আলো-হাওয়াযুক্ত-ঘরে বাস কর, গরমজল খাও, ঠান্ডা লাগাইও না, মশারির মধ্যে শয়ন করিও ইত্যাদি। অজস্র সতর্কবাণী বিতরণ করিয়া দর্শনীর টাকা পকেটে ফেলিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিবে! সে ত বুঝিবে না, অভাব দারিদ্র্যের মধ্যে ওই সব অমূল্য উপদেশের স্থান কোথায়? শরীর রক্ষার সকল প্রণালী মানিয়া চলিতে গেলে প্রাণ রক্ষার জন্য বায়ু ছাড়া অবশিষ্ট কিছু থাকিবে না। মুখের এতটুকু হাসিমাখা অভয়, একটু সমবেদনা সান্ত্বনা যে কত মূল্যবান ঔষধ এ ধারণা ডাক্তারের কোথায়? তাহার পকেট ভরিলেও রোগীর বুক যে আশ্বাসে ভরিয়া উঠে না এ ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

গ্রাম তাহাদের এই একখানিই নহে। বিস্তীর্ণ বাঙলায় অসংখ্য গ্রাম। শহরের মত অঙ্গুলির পর্ব্বে তাহা গণনা করা যায় না। সেই অসংখ্য গ্রামে কোটি কোটি নির্যাতিত প্রতিদিন এমনই ধ্বংসের মুখে চলিয়া যাইতেছে। যার যতটুকু সামর্থ্য সে আজীবন ততটুকু সেবা করিলে পল্লী বালিকার রুক্ষ্ম বিশীর্ণ মুখে আবার ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিবে। সেই হাসির প্রবাহে শহরের প্রাণ-শক্তি হইবে চঞ্চল এবং লক্ষ কোটি নীরোগ সুস্থ ও স্বস্থ বীরের অভ্যুদয়ে গ্লানির কুজ্ঝটিকা ধসিয়া পড়িবে। ভবিষ্যতের সেই সাধনা অর্জ্জিত পুণ্যময় মেঘলেশহীন অত্যুজ্জ্বল দিনের কল্পনা কি একেবারে অসম্ভব?

মাণিক আপন মনে বলিতে লাগিল, যদি ভালবাসিতে হয় ত এমন করিয়াই ভালবাসিব জননীকে। তাঁহার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে হাসিমুখে নিমেষে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া অপেক্ষা দুঃখের মধ্যে আসিয়া তপস্যা করিব। দুঃখের আগুন সম্মুখে জ্বালিয়া—দুঃখের হোমটীকা ললাটে আঁকিয়া—তিলে তিলে পরমায়ু বিলাইয়া যদি নূতন পরমায়ু সৃষ্টি করিতে পারি ত দেবী তপস্যা অন্তে বরদান করিতে স্বয়ং অবতীর্ণা হইবেন; না পারি,—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এই চেষ্টায় যেটুকু আলো নিঃসারিত হইবে তাহাই আমার যাত্রাপথের দুর্গম অন্ধকারকে তরল করিয়া দিবে—আমার চলিবার উদ্দেশ্যকে সার্থক করিবে। তাহাও ত কম লাভ নহে।

দিন-দুই পরে মাণিক কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইল।

রেণুর সাহায্য তাহাকে লইতে হইল। সে মনে মনে স্থির করিল, পড়া শেষ করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইলে এই ঋণ-পরিশোধ হইবে তাহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

১১

পূজা শেষ করিয়া রেণু ঠাকুর-ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল, মদন অস্থিরভাবে বারান্দায় পায়চারী করিতেছে। রেণুর নিকটে কোন প্রয়োজন না থাকিলে এত সকালে মদন শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিত না।

রেণুকে দেখিয়া সে ডাকিল, "শোন।"

রেণু নিকটে আসিয়া বলিল, "কি?"

মদন একটু ইতস্তত করিয়া বারকতক এদিকে ওদিকে চাহিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "শ-খানেক টাকা আমার দিতে হচ্ছে। আজ এখনই।"

রেণু বলিল, "হঠাৎ এত টাকার তোমার কি দরকার?"

মদন ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "সে কৈফিয়ৎ তোমায় দিতে হবে নাকি?"

রেণু শান্তস্বরে বলিল, "না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

মদন বলিল, "আচ্ছা টাকাটা দাও ত আগে পরে বলবো।"

রেণু পূর্ব্ববৎ শান্তস্বরে বলিল, "কারণ না শুনে এত-গুলো টাকা ত দিতে পারি না।"

মদন চক্ষু আরক্ত করিয়া রেণুর পানে চাহিল।

সে মুখে স্থির শান্ত সমাহিত ভাব, পূজাশেষে আত্ম-তৃপ্তির এতটুকু দীপ্তি লাগিয়াছিল যেন। সে ভাবকে মদন অন্তরে অন্তরে ভয় করিত। একফোটা মেয়ে হইলে কি হয়, যা বলে এমনই ধীর প্রশান্ত অকুণ্ঠিত স্বরে বলিয়া যায়, বাহির হইতে মনে হয় দুই-চারিবার প্রতিবাদ করিলে এই সঙ্কল্প টলান মোটেই শক্ত নহে; কিন্তু প্রতিবাদের শাণিত অস্ত্রগুলিও ইহার দৃঢ় স্থির গাম্ভীর্য্যের বর্ম্মে ঠেকিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়—মদন তাহা ভালরূপেই জানে। তাহা ছাড়া, বিষয় রেণুর নামে। স্বামীর দাবী দিয়া পূর্ণ কর্তৃত্ব চালাইতে কেমন যেন ভয় ও অস্বাচ্ছন্দ্য সে বোধ করে। রেণু যদি রুষ্ট হয় এত বড় বিষয়টা হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

তাহার পরিবর্ত্তে ফাঁকা তর্জ্জন-গর্জ্জন বা অনুনয় বিনয়ে কার্য্য-সিদ্ধি করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "স্বামীর কাছে স্ত্রী সকল কাজেই কৈফিয়ৎ নেয় এই প্রথম দেখছি। পতিব্রতা স্ত্রী যে—"

রেণু অল্প হাসিয়া বলিল, "শাস্ত্রের কথা থাক। বিয়ের মন্ত্র যেদিন পড়েছিলে সেদিন কি বলেছিলে, মনে পড়ে? 'তোমার কর্ম্মই আমার কর্ম্ম তোমার চিত্তই আমার চিত্ত পরস্পর পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগী।' কারও কি উচিত কারও কাছে কোন কথা গোপন করা?"

মদন উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কি গোপন ক'রলাম তোমার কাছে? বলছি দরকার—বিশেষ জরুরী কাজ। একজন বন্ধু বড় বিপদে পড়েছে তাকে সাহায্য করতে হবে।"

রেণু বলিল, "কি বিপদ তাঁর?"

মদন থতমত খাইয়া বলিল, "ওইত বললাম—বিপদ! কি বিপদ কি বৃত্তান্ত অতশত আমি জানি না।"

রেণু বলিল, "ভাল ক'রে জেনে এস। মিছামিছি যা-তা ব'লে কেউ যে তোমার ঠকিয়ে নেবে—সে ত ভাল নয়।"

মদনের বন্ধুর বিপদটা কল্পিত। সম্প্রতি বন্ধু-বান্ধবরা ধরিয়া বসিয়াছে—একটা বাগান-পার্টি দাও। ঠিক বাগান-পার্টিও বলা যায় না, প্রীতিভোজ বলা চলে। একদিন রসিদপুরের নদীর ধারে বাগান-বাটীতে সকলে মিলিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে চাহে। মদন প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু রেণুর কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিল প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কষ্টকর। সে বলিল, "আমি অত ছেলেমানুষ নই যে, ঠকিয়ে নেবে। তুমি দেবে কিনা বল?"

রেণু সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, "না।"

এই উত্তর মদন প্রত্যাশা করে নাই। কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রেণুর পানে চাহিয়া রহিল। অবশেষে ধৈর্য্যচ্যুত হইয় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "না? আচ্ছা আমিও দেখছি কেমন টাকা আদায় করতে পারি কিনা? উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন? আমার সম্পর্কেই এত লাফালাফি, তা জান?"

রেণু উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

মদন ক্রুদ্ধভাবে খানিক পায়চারী করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল ও চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিল, কি উপায়ে টাকাটা সংগ্রহ করা যায়? লোহার সিন্দুকের ভারী তালাটা বার কয়েক নাড়াচাড়া করিল, গা-চাবির শক্তি পরীক্ষা করিল, পরে আপন মনে বলিল, "স'তে কামারকে একবার ডাকিয়ে আনালে বোধ হয় কিছু উপায় হতে পারে।"

কিন্তু কখন ডাকিবে? তারপর সে আসিলেই বিলাতী কল খুলিতে পারিবে কিনা—কে জানে? —অত গোলমাল না করিয়া সিন্দুকের চাবি কোথায় সন্ধান লইতে হইবে। ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিবে, রেণু যখন প্রয়োজনমত টাকা বাহির করিবে—তখন সমস্ত দেখিয়া লইলে কার্য্যসিদ্ধি হওয়া সম্ভব।

তিন-চারদিন প্রতীক্ষা করিতেই একদিন সন্ধান মিলিল।

রেণু টাকা বাহির করিয়া চাবিটি হাত বাক্সের মধ্যে রাখিল ও হাত বাক্সের চাবি আপনার অঞ্চলে বাঁধিল।

মদন ভাবিল, এখন হাতবাক্স না খুলিলে উপায় নাই। একটা শিক্-টিক্ জোগাড় করিয়া হাত বাক্স খুলিতে কত-ক্ষণেরই বা সময়? তারপর মনের সুখে তুমিও জমিদারী ভোগ কর, আমিও তার উপসত্ত্ব খাই। কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না।

একদিন অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে হাত-বাক্স খুলিয়া গেল। তারপরের দিন হইতে মদনও বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হইল।

দিন দুই পরে মদন বাড়ী ফিরিল। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ, সমস্ত শরীর যেন অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

পা টিপিয়া টিপিয়া আপন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে দেখিল রেণু।

মদনকে দেখিয়া রেণু কহিল, "বন্ধুর বিপদটা খুব বেশী বুঝি তাই আসতে পার নি?"

মদনের শরীর ও মন তখনও নেশার আমেজে ভরপুর ছিল। হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "হুঁ—বড্ড বেশী —তাই ত দেরী হ'য়ে গেল।"

রেণু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "টাকা কোথায় পেলে শুনি?"

রেণুর কণ্ঠস্বর পূর্ব্ব দিনের মত মোলায়েম নহে।

মদন আমতা আমতা করিয়া কহিল, "টাকা—টাকা আমার ছিল।"

"হুঁ" বলিয়া রেণু চুপ করিল। পরে কহিল, "ক'দিন ভাবনা-চিন্তায় ঘুমও হয়নি দেখছি। যাও,—নেয়ে এসে—একটু ঘুমাও।"

মদন আর বাক্য ব্যয় না করিয়া সুবোধ বালকের মত চলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে ক্ষান্তকালী রেণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি বৌমা, মদনার নাকি জ্বর হ'য়েছে?"

রেণু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

ক্ষান্তকালী স্বরে জোর দিয়া কহিলেন, "না কি গো। মুখ শুকনো, চোক হলুদ-পারা, আজ ত হাতে-ভাতেও করলে না। কে জানে বাছা তোমাদের ধরণ? বলি, গেল কোথায়?"

রেণু অঙ্গুলি সঙ্কেতে আপনার শয়ন-কক্ষ দেখাইয়া দিল।

ক্ষান্তকালী সেইদিকে চলিয়া গেলেন ও ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "কৈ না ত? ওখানে কেউ নেই, ঘর খালি।"

রেণু সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিল!

ক্ষান্তকালী কহিলেন, "তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করে যায় নি?"

রেণু ঘাড় নাড়িল।

ক্ষান্তকালী কহিলেন, "একশোবার ঘাড় নাড়ানাড়ি আমার ভাল লাগে না বাছা! এই ত দুদিন পরে বাড়ী এল—

গেল কোন্ চুলোয়? মতিচ্ছন্ন ধ'রেছে ছোঁড়ার।" বলিয়া আপন মনে বকিতে বকিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

রেণু ভাবিল, দোষ আমার অদৃষ্টের নহিলে এত শীঘ্র মহামায়া চলিয়া যাইবেন কেন? একদিকে বিষয় দিয়া তিনি আমায় লক্ষ্মীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে গুরু-দায়িত্ব-ভার স্কন্ধে চাপাইয়া গিয়াছেন, অন্যদিকের কর্ত্তব্য তাহাতে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

পতি দেবতা—এই শিক্ষাই সে জন্মাবধি পাইয়াছে। কিন্তু দেবতার সন্তুষ্টি সাধন করিতে গেলে মহামায়ার ন্যস্ত বিশ্বাসকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। দেবতা যাহা চাহেন, তাহা কর্ত্তব্যের পরিপন্থী। বিষয়—তাহাকে একদিকে যেমন দিয়াছে শত শত অনাথ দরিদ্রের লালন-পালনভার, দুঃখী-আতুরের দুঃখ মোচনের দায়িত্ব, অন্যদিকে আত্মীয়-বন্ধুপ্রিয়-পরিজনের স্বার্থ-সুখের শিরে তুলিয়াছে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তাহাদের প্রার্থনা না পূরাইলে বিরোধ ধূমায়িত হইয়া উঠে, আবার বিরোধের ধূম বাহির হইতে না দিলে বিষয় যায়। এমন দিনে মাণিকদাদাও তাহাকে ছাড়িয়া গেলেন। কাহার দায়িত্ব—কে লইয়াছে!

পরদিন বিমলা এ বাড়ীতে আসিয়া রেণুকে বলিলেন, "হাঁরে রেণু, মদন নাকি আজ তিনদিন গাঁ ছাড়া? ক্ষান্তপিসী পুকুর ঘাটে অনেক কথাই ব'লছিলেন। তুই নাকি তাকে যত্ন-আত্তি করিস নে!"

রেণু কোন কথা কহিল না।

বিমলা বলিলেন, "ছি মা! স্বামী দেবতা, তাঁকে অগ্রাহ্য করা কি উচিত?"

রেণু গ্রীবা উন্নত করিয়া ডাকিল, "মা।"

বিমলা দেখিলেন—তাহার স্ফুরিত ওষ্ঠাধর কি যেন বলিবার আবেগে কাঁপিতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে।

স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "কি মা?"

রেণু বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না। ঝর ঝর করিয়া তাহার দুনয়নে ধারা ঝরিয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "আমায় বিষয় দেখে কেন দিয়েছিলে মা?"

বিমলা তাহাকে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, "ছি মা! কাঁদিতে আছে! বিষয় আছে—তাতে দুঃখ কিসের? এতগুলি অনাথ আতুরের দুঃখ-শোক—"

রেণু কহিল, "বিষয় নিয়ে আমি সব দিক চেয়ে দেখতে পারি নে, সে দোষ কি আমার? লোকে যখন তখন টাকা চায়—না দিতে পারলে—সে দোষ কি আমার? মা, কেন তুমি আমায় এমন ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছ, ম'লেও যে ছাড়া পাবার পথ নেই!"

বিমলা কহিলেন, "ষাট! ষাট! কথা দেখ! কেন দুদিক রাখা চলে না? দুদিক যাতে বজায় থাকে এমনভাবে চলতে হ'বে।"

মদনের গুণ-কাহিনী মায়ের কাছে বলা যায় না, রেণু অধোবদনে নীরব হইয়া রহিল।

বিমলা তাহাকে বহু স্নেহ-সতর্ক উপদেশ দিয়া যাইবার কালে বলিলেন, "জেন মা, সহ্য করার মত গুণ আর জগতে নেই। তোমার সংসারের ছোটখাট কথাটি শুনলে লোকে মুখে 'আহা' বলবে বটে, কিন্তু মনে মনে হাসবেও। সে সুযোগ তুমি তাদের দিও না। যা সয়—নিজের মনে সহ্য ক'র কখন প্রকাশ ক'র না।"

মা চলিয়া গেলে রেণু তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ রাখিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিতে করিতে মনে মনে বলিল, "ঠাকুর, আমার সমস্যা—অন্তর্য্যামী তুমি সবই জান। স্বামীর কথা ত মায়ের কাছে বলা চলে না। সহ্য আমি অনেক ক'রেছি, তার শেষ সীমা কোথায় আমায় ব'লে দাও ঠাকুর।"

সমস্যা দিনে দিনে জটিল হইয়া উঠিল।

সেদিন খাতাপত্রের হিসাবনিকাশ শেষ করিয়া বৃদ্ধ গোমস্তা রামরতন রেণুকে বলিলেন, "মা, চল ত এবার টাকাগুলো মিল ক'রে রাখি। পরশু লাটের কিস্তি দিতে হবে।"

ছেলেবেলা হইতে রেণু এই পিতৃতুল্য বৃদ্ধকে জ্যেঠা-মশায় বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে। সুতরাং এখন এ বাড়ীর বধূ হইলেও তাঁহাকে লজ্জা করে না। মহামায়া নিজের নিকটে বসাইয়া বৃদ্ধের নিকট রেণুকে লজ্জা করিতে নিষেধ করিয়া সমস্ত কাজ বুঝিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। রেণু অসঙ্কোচে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহে। জমিদারীর কোথায় কি আছে, কোন্ মহালের বার্ষিক আয় কত, কোথাকার প্রজারা দুর্দ্দান্ত, কোথায় নায়েব অত্যাচার করেন ইত্যাদি সমস্ত সংবাদ রেণু বৃদ্ধের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল।

সিন্দুক খুলিয়া রেণুর চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

কণ্ঠ হইতে আর্ত্তস্বর বাহির হইল, "জ্যেঠামশায়!"

"কি মা?" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া সিন্দুকের ভিতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া কহিলেন, "নোটের তাড়াটা টেনে আন, গুনে দেখি।"

রেণু হতাশভাবে বলিল, "আর কি দেখবেন! টাকা নেই। যা আছে—যৎসামান্য। কে এমন কাজ করলে জ্যেঠামশায়?"

তিনি কিছু বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "টাকা কি সব নেই—মা?"

রেণু বলিল, "মোটে একতাড়া নোট রয়েছে। অথচ পাঁচ দিন আগে আমি নিজের হাতে দশ তাড়া নোট সাজিয়ে রেখে তালা বন্ধ করেছি।"

বৃদ্ধ হতাশ ভরে কহিলেন, "তাহলে উপায়? পরশু কিস্তির টাকা না পাঠাতে পারলে তালুক লাটে উঠবে যে!"

রেণু বলিল, "যেমন ক'রে হোক টাকা দিতেই হবে, তালুক রাখতে হবে। আপনি এক কাজ করুন, একথা এখন কাউকে বলবেন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না মা, একি ব'লবার কথা! শত্রু হাসবে। তুমি ভাল করে খুঁজে দেখ, আর কোথায় ভুলে হয়ত রেখে থাকবে।'

"—তাই হবে। বোধ হয় আমিই ভুলেছি।" বলিয়া রেণু নোটের তাড়াটা তুলিয়া লইয়া সিন্দুক বন্ধ করিল।

বৃদ্ধ খাতাপত্র লইয়া ম্লান মুখে চলিয়া গেলেন।

টাকা অন্তর্দ্ধানের রহস্যটা উভয়েই কিছু কিছু বুঝিয়াছিল। রেণু এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছিল। মদনের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে ইহার নিগূঢ় সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া তাহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। এই তাহার স্বামী! ইহারই তুষ্টিসাধন তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য! শালগ্রাম শিলা, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সাক্ষ্য রাখিয়া জন্মজন্মান্তরের বাঁধনে ইহারই সহিত রেণুর জীবন-মরণ বাঁধা পড়িয়াছে!

পরদিন গোপনে বৃদ্ধাকে ডাকিয়া রেণু বলিল, "জ্যেঠামশায়, আমি আপনার মেয়ের মত। এই গহনাগুলি বাঁধা দিয়ে আপাতত টাকাটা দিয়ে দেবেন। এ ছাড়া আর উপায় কিছু নেই।"

বৃদ্ধ হাত পাতিয়া সেগুলি লইয়া বলিলেন, "কি ক'রব মা নিরুপায় হয়েই নিচ্ছি। কিন্তু তুমি বল ত চোরের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আমি ক'রতে পারি।"

রেণু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ঘরের কথা বাইরে গেলে লোকে হাসবে। তাতে কাজ নেই। আপনি বরঞ্চ এক কাজ করবেন, এবার থেকে টাকা আমায় পাঠাবেন না, আপনার কাছেই জমা রাখবেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "অতগুলি টাকা আমার কাছে থাকবে—"

তাঁহাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া রেণু বলিল, "বাপে-ঝিয়ে যদি বিশ্বাস না রাখতে পারি ত সে বিষয় যাওয়াই ভাল। 'আপনি ত দেখলেন, আমার এখানে টাকা রেখে সবগুলিই গেল। আপনার কাছ থেকেও যদি যায় ত জানব আমাদের অদৃষ্ট।"

বৃদ্ধ বাহির হইয়া যাইতেই ক্ষান্তকালী ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, "বলি, ছোঁড়াটার খোঁজ-খবর একবার নিলে না মা, ম'ল কি রইল? ধন্যি কাঠ-প্রাণ যা হোক।"

রেণু মৃদুস্বরে বলিল, "রসিদপুরের বাগান বাড়ীতে তিনি আছেন।"

ক্ষান্তকালী আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "রসিদপুরে, আর আমি ভেবে ম'রছি আকাশ-পাতাল! তা পাঁচটা টাকা দাও ত বউ, কাল পুন্নিমে—সত্যনারাণের সিন্নি দেব বাছার কল্যাণে।"

রেণু পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দিল।

(ক্রমশ)

বনতোষিণী

(৬১৭ পৃষ্ঠার পর)

ঠিক সেই অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া রহিল। কে যেন দুই হাতে করিয়া মাথার উপর লাঠির ঘা মারিয়াছে। ভয়ে, বিস্ময়ে, উদ্বেগে, যখন সে হতবুদ্ধি তখন সুর ধমকাইয়া কহিল, তুমি কর কি মা, কি হয়েছে! মরাকান্না লাগিয়েছ একেবারে!

নির্ম্মলা তাহা হইলে বাঁচিয়া আছে! কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই মনের কুয়াসা কাটিয়া গেল।

দিদির মাথার কাপড় টানিয়া ফেলিয়া নির্ম্মলা কহিল, এই বুড়ীকে চেনেন, জামাইবাবু? দেখুন দেখি ভাল করে! বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

সত্য সত্যই সুরবালার দিকে নূতন চোখ লইয়া ললিত একবার নূতন ভাবেই তাকাইল। মাথার চুল সব শাদা, কপালের দিকটায় চুল উঠিয়া গিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার একটা টাকের মত দেখাইতেছে!

ললিতের শাশুড়ী নির্ম্মলার সঙ্গেই আসিয়াছে। হাসাহাসি তাহার ভাল লাগিল না। বিষণ্ন মুখে সে জানাইল, নির্ম্মলাকে দেখিয়া কেহই পছন্দ করিতেছে না; তাহার বুঝি আর বিবাহ হয় না। চোখের জল মুছিয়া কহিল, কি যে তেল ওর মামা এনে দিল, মেখে অবধি এই হয়েছে।

সুরবালা আবারও ধমক দিল—হয়েছে ত কি হয়েছে?

দুইজনের মাথারই এক অবস্থা দেখিয়া ললিত কহিল, কি তেল, কি নাম তা'র? দিদির তেলের শিশিটা আনিয়া নির্ম্মলা কহিল, এই দেখুন। কি মিষ্টি গন্ধ! ললিতের মাথায় বজ্রাঘাত হইল—সেই বনতোষিণী!

সাহিত্যিকের অমর-স্মৃতি

(দেবানন্দপুর, শরৎচন্দ্র স্মৃতি- বার্ষিকী)

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতের ইতিহাস আলোচনা ক'রলে যে বৈশিষ্ট্য আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হ'চ্ছে এই যে—জ্ঞানের বর্ত্তি জ্বালিয়ে যুগে যুগে যাঁরা আমাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে জাগিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনাকে, সাংসারিক ও পারিপার্শ্বিক অভাব-অভিযোগের বহু উর্দ্ধে রেখে নিস্কণ্টক ক'রে গেছেন বিত্তশালী ভারতের বণিক সম্প্রদায়। ব্যক্তিগত জ্ঞানচর্চ্চার ও সমষ্টিগত সংসদের পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন ছিল তাঁদের কর্ত্তব্য, তাঁদের ধর্ম্ম। এ জেলার অতীত ইতিহাস ছেড়ে দিলেও ইদানীন্তন ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম হয়নি—হুগলী কলেজ ও ইমামবাড়ীর স্রষ্টা হাজি মহম্মদ মহসীন, বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর স্যার তারকনাথ পালিত, উত্তরপাড়া কলেজ ও পাঠাগারের স্থাপয়িতা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তক জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তদীয় পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তির মধ্যে আজও অমর হ'য়ে আছেন। আজ আমরা এখানে যে কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রেরও স্মৃতিরক্ষার আয়োজন ক'রেছি তাঁর একান্ত দুঃসময়ে এই গ্রামেরই জমিদার রামচন্দ্র দত্ত মুন্সী তাঁকে শুধু অন্নদানে প্রতিপালিত করেন নি—তাঁর কাব্য রচনার প্রেরণাও দিয়েছিলেন তিনি। এই বিদ্যোৎসাহীর সাহায্য ও প্রেরণা না পেলে ভারতচন্দ্র কালের অতলতলে বিস্মৃতি লাভ করতেন কি না, 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' রচিত হ'ত কি না, বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি কতটা অগ্রসর হ'ত তা আপনারা সহজেই অনুমান ক'রতে পারেন। ভারতচন্দ্রের অমর স্মৃতিতে রামচন্দ্রের স্মৃতিও তাই অক্ষয় হ'য়ে থাকবে।

বঙ্কিম বলেছিলেন, "মা আমার রত্ন-প্রসবিনী"—আমার মাতৃভূমি সম্বন্ধেও সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য—এই অন্ধকার অধঃপতিত যুগেও আমরা একজন ক্ষণজন্মা পুরুষকে লাভ ক'রেছিলাম যিনি এই পল্লীমায়ের দুঃখ-দুর্দ্দশায় ব্যথিত হ'য়ে, এরই সবহারা ছেলেদের কাহিনী নিয়ে, এই মাটির মাকেই মূর্ত্তি দিয়ে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গেছেন। এই বাঙলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক ঋষি উপন্যাস-সম্রাট, দরদী শিল্পী শরৎচন্দ্রের স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন তাই আজ কর্ম্মতালিকার প্রধান ও শুভতম অনুষ্ঠান। একদিন যেখানে অন্নদামঙ্গলের মাঙ্গলিকের পূত পবিত্র ঝরণা ঝারায় অবগাহন ক'রে দেশবাসী অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ ক'রেছে—দেড়শ' বছর পরে সেখানেই সত্যদ্রষ্টা শরৎচন্দ্র আমাদের চির অজ্ঞাত দরিদ্র ও ব্যথিত জনসাধারণের অন্তরের সুখ-দুঃখের কাহিনী দিয়ে সৃষ্টি ক'রেছেন এক অপূর্ব্ব রূপরাজ্য। বিচিত্র বাস্তব রাজ্যের নিভৃততম অন্তরের অপরূপ আলেখ্য যে শিল্পীর নিপুণ হাতে রূপায়িত হ'য়েছে তার প্রতিভার পরিমাপ করা আমার মত অকৃতীর দ্বারা সম্ভব নয়—আমি শুধু তাঁর সাহিত্যের উৎস আমার এই মাতৃভূমির সঙ্গে তাঁর উপন্যাসের সংস্পর্শ ও সম্পর্কটুকুই সংক্ষেপে উল্লেখ ক'রে যাব। এই দেবানন্দপুরের মাটিতেই তাঁর জন্ম থেকে জীবনের ষোলটি বছর অতিবাহিত হ'য়েছে—এখানকার নদ-নদী, ক্ষেত-খামার, মাছধরা, জেলে-বাগদের সবার সঙ্গেই তাঁর জমেছিল নিবিড় সম্বন্ধ—সবাইকেই তিনি ভালবেসেছিলেন আপন অন্তর দিয়ে। আপনারা জানেন হুগলী-সাতগাঁ রাস্তার মোড়ে 'মুড়ো অশ্বত্থতলা', মুন্সীবাবুদের 'গলায় দ'ড়ের বাগান', 'কৃষ্ণপুরের শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাট', 'অন্নদা দিদি', 'রাজলক্ষ্মী', 'কুঞ্জ বোষ্টম', আর বিলাসী গল্পের 'মৃত্যুঞ্জয়' সবই পরিণত বয়সে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে রূপ নিয়েছে। মোট কথা যাদের তিনি অন্তর দিয়ে গ্রহণ ক'রেছিলেন তাদের আর ভুলতে পারেন নি। ছেলেবেলার এই খেলাঘর এই দেবানন্দপুরেই তিনি স্কুল পালিয়ে গড়ের জঙ্গলে আম কাঁঠাল চুরি ক'রেছিলেন—জমিদারদের 'নূতন পুকুরে' আর 'দীঘিতে' লুকিয়ে ছিপ ফেলেছিলেন, নদীর বুকে জেলেদের নৌকা খুলে তাদেরই জাল নিয়ে মাছ ধ'রতেন বা কৃষ্ণপুরের রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়া বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। তাঁর এ সবই অচ্ছেদ্যভাবে তাঁর শিল্পীমনে জড়িয়েছিল—আর সে সবই উত্তরকালে তাঁর নিপুণ লেখনী স্পর্শে 'দত্তা', 'শ্রীকান্ত', 'দেবদাস', 'পল্লীসমাজ', 'ছবি' এই সব বই-এর মধ্যে শাশ্বত হয়ে রয়েছে। 'কাকবাসা', 'ব্রহ্মদৈত্য' ও 'কাশীনাথ' গল্প তিনটি এখানকারই অনেকটা ঘটনা নিয়ে, এখানেই তাঁর বাল্যকালের রচনা—তখন তিনি হুগলী স্কুলে মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ও তখন তাঁর বয়স পনর বছর। তখন তাঁর গ্রামবাসী বা বন্ধু-বান্ধব কেহই বুঝতে পারেন-নি যে, এতটুকু বীজের অন্তর থেকে একদিন দেখা দেবে এই বিশাল মহীরুহ। যাক সে কথা,—তাঁর প্রতিভা ও সাহিত্যের আলোচনা দেশের শক্তিশালী মনীষীরা ক'রেছেন—তাঁর দানে সাহিত্য ও সমাজ নবযুগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে, তাঁর মূল্যবান এক একটি কথা সাহিত্যিক সুধীবৃন্দের হ'য়েছে জপমন্ত্র। দেশবাসী সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁর যথোপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা ক'রছেন—তাঁদের সাধু প্রচেষ্টা সফল হোক। আমরা তাঁর পল্লীবাসী,—জেলাবাসী, আজ আমাদের সেই দরদী বন্ধু, পরমাত্মীয়, শ্রদ্ধেয় সুহৃৎকে আমাদের নয়ন ও স্মরণপথে চিরজাগ্রত রাখবার জন্য—আমাদের সুখে-দুঃখে তাঁর স্মৃতিকে সাথী করবার জন্য—আমাদের অন্তরে তাঁকে চির-প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য এই আয়োজন ক'রেছি। জানি অতি তুচ্ছ এই আয়োজন—জানি বিরাট পুরুষের যথাযোগ্য স্মৃতি এ তুচ্ছ প্রস্তরফলককে রক্ষা ক'রতে যাওয়া স্মৃতি-রক্ষার প্রহসন মাত্র,—কোন কিছু আর্থিক সম্পদ দিয়েই তাঁর উপযুক্ত স্মৃতি গ'ড়ে তোলা যায় না। আবার কোন কিছু না গ'ড়ে তুললেও, কোন কিছু আয়োজন না থাকলেও, তিনি শুধু আমাদের কেন—সমগ্র ভারতের জনমানবের অন্তরে শাশ্বত হ'য়ে থাকবেন, এ সবই ঠিক, কিন্তু তবুও এ সবের প্রয়োজন আছে। উপনিষদের ব্রহ্ম সনাতন শাশ্বত হ'লেও তাঁর মূর্ত্তিগড়ার প্রয়োজন কেন, উপনিষদকার তার উত্তরে বলেছেন, "উপাসকানাং সৌকার্য্যার্থং"—মূর্ত্তিগড়া পূজারীর প্রয়োজনে, অরূপকে রূপ দিয়ে ধারণা করবার জন্য— আমাদের এ সবের প্রয়োজনও তেমনি। তা ছাড়া ভাবীকালের উত্তরাধিকারীদের কাছেও এর মূল্য কম নয়। আমাদের গৌরবময়

(শেষাংশ ৬৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জয়দ্রথের কসরৎ

(গল্প)

শ্রীরামপরায়ণ রায়

জয়দ্রথ ছুটিতেছে, বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কোন-দিকে দৃষ্টি নাই, কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। শরীরের সকল সামর্থ্য ও শক্তি দিয়া এবং দেহযন্ত্রের সকল ধাবমান প্রবৃত্তি আর বৃত্তিগুলিকে পদদ্বয়ের পেশী গ্রন্থিযোগে স্নায়ুসমূহে একত্রীভূত তথা কেন্দ্রীভূত করিয়া জয়দ্রথ ধাইয়া চলিয়াছে ময়দান হইতে আপন মহল্লাভিমুখে।

একটা রাস্তার মোড়ে জয়দ্রথ একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। কি যেন ভাবিয়া রাস্তার পার্শ্বস্থিত পাথরের খোয়াগুলির কয়েকটি ত্বরিত হস্তে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত পাঞ্জাবীর দুইটি পকেটে পুরিয়া লইল।

তাহার পর পিছনের দিকে একবার তাকাইয়া কি যেন দেখিয়া কিংবা না দেখিয়াই ধূসর সন্ধ্যায় আবার ধাবমান হইল আপন গৃহদ্বারের উদ্দেশে।

আর ভয় নাই। পাড়া দেখা দিয়াছে প্রধূমিত কুণ্ডলীকৃত ধূম্রশিখা বড় কল-কারখানার চিমনী হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে। পাড়ার মোড়ে বিড়ির দোকানের সামনে একটা ছোট-খাটো ভীড় জমিয়া গিয়াছে। মারামারির ভাবী আশঙ্কা ঘনায়মান হইয়া উঠিতেছে, উভয়পক্ষের বাক্‌বিতণ্ডার চাপে চাপে। অনুকূল কুণ্ডু অমন সুন্দর পিঁয়াজী ভাজিয়া পাড়াটা লোলুপতায় ভরিয়া তুলিয়াছে কলের তেলের বিশুদ্ধ বাষ্প-রাজিতে। মোড়ের ছাত্রবৎসল নন্দীর দোকান হইতে এক টীপ নিখরচায় নস্য পর্য্যন্ত লইবার ফুরসুৎ তাহার হইয়া উঠিল না। সে ছুটিয়াই চলিয়াছে, ঠিক পাঞ্জাব-মেলের মতই—কাজেই থামিল আসিয়া একেবারে বর্দ্ধমানে, অর্থাৎ বাড়ীর রোয়াকের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া।

জয়দ্রথের দুর্ব্বল বলিয়া খ্যাতি থাকিলেও কপট কিংবা দুষ্টমতি অথবা পরস্বাপহারী বলিয়া অখ্যাতি মোটেই ছিল না। সে কখনও পড়োবাড়ীর সামনে কুলপী বরফওয়ালাকে ডাকিয়া দিব্য দুই তিন কিংবা ততোধিক সিদ্ধির মালাই বরফ খাইয়া—'আসিতেছি' বলিয়া গৃহাভ্যন্তরে নিরুদ্বেগে প্রবেশলাভ করিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত অন্য দরজা দিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গলিপথে অদৃশ্য হইয়া যায় নাই। কিম্বা অপেক্ষাকৃত বালক-কালে ঘুঘনীওয়ালার কাছ হইতে মেটলীর চচ্চড়ী দুই-চার পয়সার গলাধঃকরণ করিয়া তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া জনাকীর্ণ রাজপথে বেমালুম গা ভাসায় নাই, কিম্বা জনবিরল গলি-পথে দ্রুতবেগে পলায়ন কখনও করে নাই। কারণ, এ সমস্ত তাহার দুর্ব্বল ধাতে কখনও সহিত না। কিছু করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ কিছু খাইবার পূর্ব্বে সে দশবার পকেট হাতড়াইয়া ভাল করিয়া নিজের মূলধন গণিয়া লইত এবং বিবেচক এবং দূরদর্শী বিজ্ঞের মত তাহার মধ্যে কিছু ছাঁটিয়া রাখিত এই আশঙ্কায়, কি জানি—দুআনি কিংবা সিকিটা যদি অচল বাহির হইয়া যায়। সে কাহারও সহিত সংঘর্ষের বাহিরে থাকিয়া আপনার আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিত এবং আত্মরক্ষাও করিয়া চলিত আইন-মত।

সেই অতি সুশীল-সুবোধ এবং মহাসাবধানী, নিরীহ, গোবেচারী জয়দ্রথের এই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে হঠাৎ এইরূপ অহৈতুক বেগ আহরণের সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য, তবে কিই-বা হইতে পারে?—

সত্যই জয়দ্রথ যে গতিবেগ আপনাতে উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহা যদি সে সর্ব্ব সময়ে এবং সর্ব্ব সমক্ষে প্রকটিত করিতে পারিত, তাহা হইলে কলেজ স্পোর্টস-এ বিখ্যাত 'রাণার' বলিয়া তাহার খ্যাতি যে অচিরে বিঘোষিত হইত, সে-সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ।

জয়দ্রথ রোয়াকে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকাও যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। বাহিরের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, কলতলার বড় দরজাটা দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একেবারে সরাসরি নিজের ছোট্ট ঘরটির ভিতর নিজেকে সতর্ক প্রতিষ্ঠ এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ করিয়া লইল। চেয়ারে বসিয়া থাকিবার মত সামর্থ্য-টুকুও আর অবশিষ্ট নাই। ঘরের দেওয়াল-ঘেঁসিয়া পাতা ছোট লোহার খাট্‌টার উপর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করিয়া দিল রক্ষিতাবশিষ্ট সমস্ত সামর্থ্যটুকু একেবারে বিলাইয়া দিয়া। অর্থাৎ উত্থানশক্তি এবং ধ্যান-ধারণা রহিত হইয়া চক্ষু মুদিয়া জয়দ্রথ পড়িয়া রহিল অনেকক্ষণ এবং ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ অফুরন্ত বায়ুস্রোতকে হাঁ করিয়া হাঁপাইয়া হাঁপা-ইয়া ছাড়িয়া দিতে থাকিল—ঠিক যেমন করিয়া ষ্টেশনে থামিয়া রেলের ইঞ্জিন চিমনী দিয়া ধোঁয়া উপরে ছাড়িয়া দেয়—ঘন ঘন।

জয়দ্রথ অনেকক্ষণ এইরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে পড়িয়া রহিল। তাহার পর হাঁপানিটাও কমিয়া গেল, কারণ এই নশ্বর পৃথিবীতে চিরস্থায়ী কিছুই নয় এবং তখন সে খাটের উপর উঠিয়া বসিল—পিছনের দেওয়ালের উপর অবশ্য ঠেস দিয়াই! অদূরস্থিত বনাত-মোড়া টেবিলের উপর হইতে হাত বাড়াইয়া আয়নাটা লইয়া নিজের চেহারাটার দিকে চাহিয়া দেখিল যে, দাঁতের এবং ঠোঁটের উপরে রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। এই রক্তের দাগ দেখিয়াও সে চমকিয়া কিম্বা শিহরিয়া উঠিল না—শুধু গা-টা তাহার কেমন যেন ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল!

দাঁতের ও ঠোঁটের রক্তচিহ্নের সঙ্গে জয়দ্রথের গতিবেগের সম্বন্ধটা ছিল পিচ্‌কারীর নলের জল আর হাতলটির চাপের প্রতিক্রিয়ার ঠিক অনুরূপ। জয়দ্রথ হইয়া পড়িয়াছিল পিচ-কারীর নলের জল আর হাতলটির চাপ আসিয়াছিল এক শ্বেত নরপুঙ্গবের মুষ্টি হইতে। কেননা জয়দ্রথ কবিতার এক কলি গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের পিছনের মাঠটায় একা-একাই পায়চারী করিতেছিল। ভীড় সে কখনও সহিতে পারে না এবং সেইজন্যই ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়ালের পিছনটাই সে পছন্দ করে বেশী। বেচারী বেড়াইতে-ছিল হঠাৎ কোথা হইতে একটি শ্বেত মূর্ত্তি টলায়মান গতিতে আসিয়া হাজির হয়। কি প্রকারে যেন হ্যাট্‌টা দূরে মাঠের উপর গড়াগড়ি দিতে থাকে বেওয়ারিশ মালের মত। সাহেব হুঙ্কার করিয়া হুকুম করিতে থাকে—হ্যাট্‌টা কুড়াইয়া দিবার নিমিত্ত। জয়দ্রথ প্রথমটা বুঝিতেই পারে নাই, তবে চীৎকারে এবং

হুঙ্কারে একটা অকারণ আশঙ্কা তাহার মনে ছায়াপাত করিয়া যায় এবং সে সাবধানে নিজের গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে—হল্লা-হুল্লোড় হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইতে। জয়দ্রথের এই প্রকার দুর্ব্বিনীত ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া শ্বেতপুরুষ স্থির থাকিতে পারে না—কারণ ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। তাহার হ্যাট্‌টি সাহায্যের জন্য হাঁ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে আর কালা আদমীটা কি না, কোন উচ্চ-বাচ্য না করিয়া বেশ নিরুদ্বেগে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িতেছে! এ ত অসহ্য—সত্যই অসহ্য!— জয়দ্রথ ভীত হইলেও অবশ্য এতটা আশঙ্কা করিয়া রাখে নাই। হঠাৎ চমকিয়া দেখে,—তাহার সার্টের কলারে চুম্বকের মতই বিপুল আকর্ষণ। আর আকর্ষণের উৎস হইতেছে মুষ্টিবদ্ধ শ্বেত আঙুল কয়টা। বিচক্ষণ সেনাপতির সমর পরিচালনের অভ্রান্ত রীতিতে প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই দাঁতকটা একেবারে সমূলে বসাইয়া দিল শ্বেত আঙুল কয়টির উপরই! একটা অস্ফুট শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইয়া যায় এবং জয়দ্রথের অন্তরাত্মা ইহার পর আর কাল বিলম্ব না করিয়াই যে সুচিন্তিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা সমস্বরে অনুমোদন না করিয়াই পারেন না।

জয়দ্রথ রাক্ষস নয় যে নররক্ত পিপাসা তাহার থাকিবে; বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণতনয় শ্রীজয়দ্রথের ওষ্ঠ-দন্ত ম্লেচ্ছ-রক্তসিক্ত হওয়াতে গা যে তাহার ঘিন ঘিন করিয়া উঠিবে, ইহা ত খুব স্বাভাবিকই। কাজেই জয়দ্রথ কলতলায় গিয়া দশ বিশ পঁচিশ বার ভাল করিয়া কুলি করিয়া লইল। ঠোঁটের উপরটায় একবার সাবান ঘষিয়া লইল এবং তাহাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তি না হওয়াতে এই সন্ধ্যাবেলাতেই পেস্ট্ ঘষিয়া দাঁত ক'টা পরিষ্কার করিয়া লইল। তাহাতে অস্পৃশ্য রক্তের ছোঁয়াচ ঘুচিল না, মনে করিয়া একেবারে স্নান সারিয়া ফেলিল.

জয়দ্রথের এই অতি শ্রমজনিত গায়ের পায়ের এবং বুক-পিঠের ব্যথা মরিতে কিছুদিন গেল বটে, কিন্তু ব্যথা মরার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদম্য সংকল্প ঐ অস্থি-চর্ম্মসার পাতলা বুকে শিকড় গাড়িয়া চিরদিনের মত বসিয়া গেল—পূর্ব্বোক্ত অঘটনকে উপলক্ষ করিয়া।

সে অতীব সঙ্গোপনে আপনার অতি প্রিয়জন এবং প্রিয় বস্তুর নামে, এক কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল এবং কায়মনোবাক্যে তাহা পালন করিয়াই চলিল বিধিমত। তাহাতেও তবু তাহার সন্তুষ্টি হইল না—এবং নিজের উপর কেমন যেন একটা অকারণ সন্দেহ আসিয়া মাঝে মাঝে ছায়াপাত করিতে লাগিল। সে চিন্তিত হইয়া পড়িল। এবং তজ্জন্যই অমাবস্যার এক রাত্রিতে প্রায় আট ঘটিকার সময় কালীঘাট কালী-মন্দিরের পবিত্র অভ্যন্তর স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাটা চিরতরে পাকা করিয়া লইল।

তাহার প্রতিজ্ঞার আভাষ পাওয়া গেল—যেদিন সে বৌদিদির কাছে অনেক কহিয়া বলিয়া এবং আকুতি মিনতি জানাইয়া দাদার ফেলিয়া দেওয়া পিছনের রং-চটা বড় আয়নাটা নিজের পড়ার ঘরে আনিয়া ফেলিল এবং তাহারই সামনে দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাসিমুখে খালি হাতেই ব্যায়াম অভ্যাস করিতে লাগিল। ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণেই শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। শুধবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়িলে যে ফল পাওয়া না যায়, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এবং একাগ্রতার সহিত দশবার পেশীসমূহকে সঙ্কুচিত প্রসারিত কিম্বা আন্দোলিত করিলে, তাহা অপেক্ষা শতগুণ বেশী ফল পাওয়া যায়—এ তথ্য সে স্বাস্থ্য এবং শরীর সম্বন্ধীয় বহুবিধ কেনা কিতাবে পড়িয়া হজম করিয়া ফেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং শেলী, কীটসের ছবিগুলিকে ছোট ভ্রাতা মন্মথের কক্ষে নির্ব্বাসিত করিয়া সে স্থানগুলি স্যাণ্ডো, ভীমভবানী, রামমূর্ত্তি, হেফেনস্মিথ, গামা এবং জিঙ্কো প্রভৃতির বিপুলকায় প্রতিকৃতিতে ভরিয়া লইল। শক্তিহীন পলকাজীবন সে আর বহন করিবে না, দুর্ব্বল বলিয়া কৃপার পাত্র হইয়া সে আর থাকিবে না। দুনিয়াকে জানাইবে—সেও একজন মানুষ, তাহার পদভরে ধরিত্রী কাঁপিয়া উঠিবে, অশিষ্ট শ্বেতাঙ্গের সহিত সংঘর্ষে সমানে যুঝিবে, কাপুরুষের মত—অবলার মত দন্তপঙক্তির শরণ আর লইবে না।

জয়দ্রথের কেমন যেন নেশা ধরিয়া গিয়াছে—শক্তি সঞ্চয় সে করিবেই করিবে।

* * * * * * *

জয়দ্রথ অবাক্ হইয়া যায়, কোন ইন্দ্রজালের মায়ায়—না, তিন বৎসরের কঠোর শরীরচর্চ্চার গুণে শীর্ণ পঞ্জর-স্ফীত বক্ষ তাহার পালোয়ানী কায়দায় ভরিয়া উঠিয়াছে ৪৬ ইঞ্চি বেড়ের পরিমাণ ধরিয়া। বিস্ময় হয়, আবার গর্ব্বও কম হয় না যে, আজ সে বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবীর। তাহার নাম আজ আসমুদ্র-হিমাচল সকল তরুণ-তরুণীর মুখে। বৃদ্ধেরাও আজ বীর জয়দ্রথের প্রশস্তিগানে দেশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে—বেশ বাবা, বেশ! এই ত চাই। বাঙালীর নাম তুমি রাখবে বাবা। সোহংস্বামী একদিন বাঘের সঙ্গে লড়াই করত, বুকের ওপর পাথর ভাঙ্গত; তুমি তার চেয়েও অঘটন ঘটিয়েছ, তুমি ষ্টীম-রোলার চালাচ্ছ বুকের ওপর, বাঘের চেয়ে দুরন্ত গরীলার সঙ্গে লড়ছ! বাহবা কি বাহবা।

শোনে আর জয়দ্রথ মনে মনে হাসে। প্রতিজ্ঞা পূরণের অপার আনন্দে দু-চোখে আনন্দাশ্রুতে নদী বহিয়া যায়। হাজার হোক জয়দ্রথ লাজুক মানুষ। নিজের প্রশংসা কি এত শোনা যায়! সারা অঙ্গে কাতুকুতু লাগে না! তাহার যেন কান্না পাইতে চাহে—এত আনন্দের আতিশয্যে।

বাড়ী ফিরিলে বৌদিদির মুখে কত তারিফ—আজ কোন পালোয়ানকে কাবু করলে ঠাকুর-পো? আবার চললে কোন মুলুকের বীরকে হারিয়ে নাম কিনতে?

কথাগুলি ভারী মিষ্টি, কিন্তু মাঝে মাঝে জয়দ্রথের সন্দেহ হয়—বৌদিদি কি বিদ্রূপ করিতেছে নাকি! হাজার মাথা ঘামাইয়াও সে বৌদিদির কথায় কোন গোপন ব্যঙ্গ-কৌতুকের আমেজ আবিষ্কার করিতে পারে না।

আজ ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে কসরৎ দেখান; কাল আহ্বান আসে দিল্লী হইতে। দিল্লীর পর আসে মাদ্রাজের আমন্ত্রণ। জয়দ্রথের বুকখানা ৪৬ ইঞ্চি হইতে ৫৬ ইঞ্চি হইয়া উঠে মুহূর্ত্তের জন্যে। এরই নামই ত—পদভরে ধরিত্রীকে কাঁপান। দেখুক দুনিয়া, জয়দ্রথ আর সেই কঙ্কালসার তালপাতার সিপাই নাই! সেও একজন বীর—যার জন্যে সারা

ভারতবর্ষে আজ হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। রাজারাজড়া হোমরা-চোমরা আজ তাহাকে স্বর্ণপদক দানে ধন্য হইবার জন্য লালায়িত।

সারাভারত ঘুরিয়া কসরৎ দেখাইয়া আজ জয়দ্রথ ভাবিতেছে, -এখন কি করা যায়। একটা নূতন কিছু চাই। যশোলিপ্সা তাহার অসীম, ক্ষুদ্র ভারতের গন্ডী তাহাকে তৃপ্ত করিবে কেন!

সে ক্ষোভও তাহার মিটিল--যখন ইউরোপ আমেরিকার সেরা সেরা দেশ হইতে তাহার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল একে একে। এবারে সারা বিশ্ব ঘুরিয়া আসিয়া দুনিয়ার দিগ্বিজয়ী বীর জয়দ্রথের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না।

ইহার পর বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। তাহার নাম-ডাক শুধু পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াই শেষ হয় নাই। নামের সুবাস মহাশূন্যে উড়িয়া গিয়া অমরাবতীতে পর্যন্ত পেঁৗছিয়াছে! একদিন যখন ঢেঁকীরূপী 'সেপেলিন' বাহন নারদমুনি আসিয়া জয়দ্রথকে প্রস্তুত হইতে বলিল—স্বর্গরাজ্যে অভিযানের জন্য, তখন সে সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল আনন্দে।

বোঁ বোঁ শন্ শন্ রবে ঢেঁকী উড়িয়া চলিল—পথে কত চাঁদ, কত তারার মালা তাহাদের 'সেপেলিন' বাতায়ন পথে উঁকি মারিল। কত মেঘলোক হইতে বিরহী যক্ষ তাহাদের মরমবেদনার বাণী বহন করিবার দৌত্যে তাহাদের বরণ করিল। জয়দ্রথ অবাক-বিস্ময়ে বুকটাকে চাপিয়া ধরে—আনন্দ সাগরের হিল্লোলে সে বুক যে তোলপাড়--আর বুঝি বুকটাকে যথাস্থানে রাখা যায় না! শুনিয়াছিল, উচ্চে উঠিলে মানুষের শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাও হইতে পারে। কিন্তু আর বেশী জল্পনা-কল্পনা তাহাকে করিতে হয় না।

ধরাধামের সকল লীলা সমাপন করিয়া নারদ মুনির আহ্বানে সগৌরবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে স্বর্গধামের দেব-সভায়। সেখানে গিয়াই দেখে কি-না, স্বর্গলোকের ব্যায়াম-চর্চার ব্যারাকে বিরাজ করিতেছেন মহা মহা শক্তিধরেরা—রামমূর্ত্তি, সোহংস্বামী, ভীমভবানী, স্যান্ডো, গোলাম, জীতেন বাঁড়ুয্যে ইত্যাদি ইত্যাদি ভুবনবিশ্রুত শক্তিমান মহাপুরুষগণ। ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিকাতা নিবাসী জয়দ্রথের গুণ-গ্রাম ঘোষণা, এক দেবদূত করিতে থাকিলেন, স্বর্গলোকের সেই পালোয়ান-সভা মধ্যে! সভায় ভারতবর্ষের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা আন্দোলিত হইতে লাগিল নব বীরের আবাহনে আর ব্যারাক হইতে ঘন ঘন করতালি উত্থিত হইতে লাগিল। বিশেষ সেই স্থানটুকুর বিবৃতিতে —যেখানে জয়দ্রথের ষ্টীমরোলার চালনার কাহিনীটুকু সরস ভাষায় স্বর্গের সাংবাদিক কুলশ্রেষ্ঠ নিজস্ব সংবাদদাতা হইতে প্রাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ঘোষণা সমাপনান্তে তাহার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট আসন সংস্থাপিত হইল। সে বুক ফুলাইয়া, তাল ঠুকিয়া গোঁফে চাড়া দিয়া এবং সর্ব্বশেষে ঘুষি পাকাইয়া নিজের আসন পরিগ্রহ করিল। সোহম্ স্বামী গেরুয়ার মধ্য হইতে ৪৮ ইঞ্চি ছাতি স্ফীত করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। রামমূর্ত্তি "জীতা রহ বেটা" বলিয়া সস্নেহ অভিনন্দন এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াই নাক টিপিয়া প্রাণায়ামে বসিয়া গেলেন। ভীমভবানী বিশেষ কোন কথা না বলিয়া বুকের অদৃশ্য স্বর্গীয় ধাতুতে প্রস্তুত শৃঙ্খল দ্বিখণ্ডিত করিয়া ঝন্ঝনায়মান শব্দে জয়দ্রথের আপ্যায়ন করিলেন। জয়দ্রথ আত্মগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া—যাক্ সে-ও আজ স্বর্গের আন্তর্জাতিক সর্ব্বজনীন পালোয়ান সভায় নিজের আসন কায়েম করিয়া বাঙলার তথা ভারতের তথা এশিয়া মহাদেশের সম্মান অর্জ্জনে সাহায্য করিতে পারিয়াছে।

যাহা হউক জয়দ্রথ ত কিছুতেই নিজের কসরৎ না দেখাইয়া পারে না স্বর্গলোকের অধিবাসীদের। সে তাই বলিল, ষ্টীমরোলার আনা হউক, সে কসরৎ দেখাইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বর্গরাজ্যে ষ্টীমরোলারের রেওয়াজ নাই! সহস্র সহস্র দীন-মজুরকে বেকার করিয়া যন্ত্রের সমাবেশ স্বর্গরাজ্যে হইতে পারে না। সুতরাং কসরৎ সেদিন বন্ধ থাকিল। স্থির হইল, পরদিবস নন্দন-কাননে মর্ত্ত-বীর জয়দ্রথের কসরৎ সকলে দেখিবে। স্বর্গরাজ্যের চীফ ইঞ্জিনিয়ার বৃহস্পতি ঠাকুরকে আদেশ দেওয়া হইল, ষ্টীমরোলার একটি প্রস্তুত রাখিতে। স্বর্গরাজ্যের কর্ম্মহীন ঢালাইখানায় কর্ম্মের সোরগোল উঠিল।

নন্দনকাননের গাছে গাছে এবং সমগ্র স্বর্গরাজ্যের স্তম্ভহীন বিজলী-বাতির অদৃশ্য 'পোষ্ট'-এ প্লাকার্ড লটকান হইল। সংবাদপত্রে তাহারই অনুলিপি প্রকাশিত হইয়া সকল দেবতার গৃহে গৃহে বিলি হইল—ডাকপিয়ন উনপঞ্চাশ পবনের হাতে।

নারদ ঋষি সেদিন মহাব্যস্ত। এক নিমেষ সময় নাই তাঁহার যে, জয়দ্রথের গাইডের কাজ করেন। তাই একখানা 'অল ডে' ট্রাম টিকিট হাতে গুঁজিয়া দিয়া জয়দ্রথকে বলিলেন, —বৎস, তোমায় এককই গমন করিতে হইবে—নন্দন কাননে। ব্যায়াম-বীরদের ব্যারাক হইতে 'নন্দন কানন' যে ট্রাম যায়, সেই ট্রামে উঠিবে। এই টিকিট রহিল। ট্রামের কণ্ডাকটারদের বলিলেই 'নন্দন কানন' দেখাইয়া দিবে। তুমি বীর, তোমার আবার ভয়-ভাবনা কি?

নারদ মুনি নিমেষে অদৃশ্য হইলেন। জয়দ্রথ পাঞ্জাবী গায়ে ও মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া ব্যারাকের সম্মুখ হইতে ট্রামে উঠিয়া বসিল। সুন্দর সে ট্রাম—লাইন নাই, তার নাই, চাকা নাই, কি চমৎকার আসনগুলি—চলেও কি রকম বিদ্যুৎবেগে।

বুক ফুলাইয়া বসিয়া পড়িল সে সব চেয়ে যে সুন্দর আসন দুইখানি তাহারই একখানিতে। কিন্তু উহা যে লেডিজ সীট, সে তাহা বুঝিতে পারিল না। দেবতার ভাষা সে জানে না—কি লেখা আছে অদৃশ্য-অক্ষরে বুঝিল না। তাহা ছাড়া সে হইল বীর—নারদ মুনি বলিয়াছেন, তাহার আবার ভয়-ভাবনা কি! এই কথা ভাবে আর জয়দ্রথের বুকের ভিতর হইতে গর্ব্ব যেন উপছিয়া উঠে।

ট্রাম চলিল হাওয়ায় ভর করিয়া উড়িয়া উড়িয়া। গন্ধর্ব্ব রোড পার হইয়া অপ্সরা স্কোয়ারে আসিয়া থামিল। সেখান হইতে ট্রামে চাপিল দুইটি অনিন্দ্যসুন্দরী রূপসী—কি তাহাদের রূপ—কি অপরূপ তাহাদের বেশ! কিন্তু ট্রামে

আর তিল মাত্র স্থান নাই। সকল স্বর্গবাসী আজ চলিয়াছে নন্দন কাননে মর্ত্ত্য-বীর জয়দ্রথের কসরৎ দেখিতে। আসনে ত স্থান নাই-ই, অধিকন্তু দ্বারপথে, মধ্যপথে দাঁড়াইয়া আছে কত কত দিব্যধামবাসী। সেই ভীড় ঠেলিয়া রূপসী দুইটি আগাইয়া আসিল জয়দ্রথ যেখানে বসিয়া গোঁফের ডগা পাকাইতেছে। নিঃশব্দ ইসারায় ইঙ্গিতে তাহারা জানাইয়া দিল যে, এ আসন ত্যাগ করিতে হইবে। দিগ্বিজয়ী জয়দ্রথ প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, পর মুহূর্ত্তে আসনের পশ্চাৎভাগে কঙ্কণ-নিক্কণের মধুর রোলে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে ব্যস্ত হইয়া অতিরিক্ত ক্ষিপ্রতার সহিতই তাহার বিরাট বপুখানি আলোড়িত করিয়া ট্রাম গাড়ী কম্পমান করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। কিন্তু বিধাতা বিমুখ জয়দ্রথ করিবে কি! যে মুহূর্ত্তে সে দণ্ডায়মান হইল, সেই মুহূর্ত্তেই স্বর্গের সেই উড্ডীয়মান ট্রাম প্রবল ঝাঁকুনি-কাঁপুনির সহিত সচল হইল। আর যায় কোথা! জয়দ্রথের অমরাবতীর অমৃত-রসে আকণ্ঠ ভরপুর ভুঁড়িটি সমেত প্রসারিত দুই বাহু আর টাল সামলাইতে পারিল না। সবেগে সংঘর্ষ ঘটিয়া গেল রূপসী দ্বয়ের নবনীতকোমল অঙ্গের সহিত।

বাস! আর বেশী কিছু বুঝিতে হইল না। রূপসী দ্বয়ের বামপদের কিংখাপ মোড়া স্যাণ্ডেলদ্বয় যুগপৎ উত্থিত হইল এবং সগৌরবে পতিত হইল জয়দ্রথের পুষ্ট নিটোল দুই গণ্ডে। কিন্তু আশ্চর্য্য! স্বর্গরাজ্যের স্যাণ্ডেল কিনা—কোন প্রকার রব হইল না সেই সংঘাতে—ঠাস্ ঠাস্ শব্দ নাই, ব্যথা নাই, বেদনা নাই, স্যাণ্ডেলদ্বয় কার্য্য সমাধা করিয়া নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের মত রূপসী দ্বয়ের পদের আশ্রয় লইল পুনর্ব্বার।

জয়দ্রথ স্তম্ভিত! একি তাহার পুরস্কার, না অপমান—সে ঠাহর করিতে পারিল না কিছু। কিন্তু রূপসী দ্বয়ের হাসির লালিমা, বিদ্রূপের তরল রব যেন নীরবে বিদ্ধ করিতে লাগিল জয়দ্রথের আপাদমস্তক। সে ভাবিল, তরুণী সর্ব্বত্রই তরুণী—স্বর্গে আসিয়াও তাহাদের অভিমান আর কলহপ্রিয়তা মুছিয়া যায় নাই এতটুকু! কিন্তু চপেটাঘাত ......শেষ কিনা রমণীর স্যাণ্ডেলের নিকট পরাজয়! মর্ত্ত্য-ভূমির দিগ্বিজয়ী বীরের এ কি অদৃষ্টের পরিহাস! ছি ছি, লজ্জায় তাহার কান্না পাইতে লাগিল। আজ যদি একশত শ্বেতাঙ্গও হইত সম্মুখীন......কিন্তু চপেটাঘাত! ব্যথা নাই বটে, কিন্তু অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যায় যে......ইহার কি কোন প্রতিবিধান নাই? স্বর্গরাজ্যের কি আইন-কানুন নাই কলিকাতার মত? নিরপরাধ জয়দ্রথ, স্বর্গরাজ্যের বেয়াড়া ট্রামের কাঁপুনিতে আজ দোষী! না— এমন মগের মুলুকে কে আবার কসরৎ দেখাইবে? কখনই না, থাকুক 'নন্দন কানন' পড়িয়া, সে যাইবে না। আগে চাই এ অপমানের বিচার। আসুক নারদ ঋষি, বেশ করিয়া শুনাইয়া দিবে সে লোকটাকে। এমন সময় বিপুল গর্জ্জনে, ঝাঁকুনির চূড়ান্তে—ক্যাচ প্যাচ শব্দের কর্কশ রেশে ট্রাম থামিয়া গেল—নন্দন কানন!

কে যেন প্রবল দোলা দিচ্ছে জয়দ্রথের কাঁধে—য়্যাঁ! য়্যাঁ! একি! তুমি কে আবার?

—"বলি ঠাকুরপো, এ অবেলায় ঘুমাচ্ছ? তোমার চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল!"—বৌদিদির সুরেও যেন কেমন রহস্য মাখা।

জয়দ্রথ সহসা গালে হাত দিল, বউদিদি দেখিয়া ফেলে নাই ত স্যাণ্ডেলের দাগ!

না-না। কিন্তু একি— এযে সেই তিন বছর আগেকারই কঙ্কালসার চেহারা—সেই পাঁজর—সেই অস্থিসার দেহ। জয়দ্রথের কান্না পাইল!

হাসিতে হাসিতে বউদিদি বলিল,—কেমন ঘুম তোমার, তুলি দিয়ে গালে গাধা লিখে দিলুম, তবু টের পেলে না একটু?

য়্যাঁ—য়্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ!

এমন দিবসে তুমি নাই

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

আকাশের বুকে আজ উঠিয়াছে মন্দিরের চূড়া;
পৃথিবী আগত দ্বারে, নহে শুধু গ্রামের বধূরা!
তোমার উপাস্য মূর্ত্তি আজ হেরি জাগ্রত মর্ম্মরে!
নির্জ্জন আশ্রম প্রান্তে জনতার লোক নাহি ধরে!
সফল তোমার স্বপ্ন,—মনে মনে লভিয়াছে ঠাঁই
তোমার ধ্যানের ধন, এমন দিবসে তুমি নাই!

তুমি গেছ, গৌরবের অবসান হয়নি এখনো,
দেশে ও বিদেশে যাত্রা, বাগ্মিতা, অভাব নাই কোনো!
তবু তোমার জোড়া আজো বন্ধু মেলে নাই দেশে,
তবুও তোমার স্থান শূন্য আজো যুগান্তের শেষে!
তোমার কর্ম্মের ভার লইয়াছে বহুজনগণ,
তবু স্নেহ পরিচিত না ওগো বন্ধু তোমার মতন!

স্মৃতিমাত্র-অবশেষ হবে না কখনো আমি জানি,
তোমার আরব্ধ কাজ শতাব্দী শতাব্দী লবে টানি;
দুর্গতের অশ্রুজল, রোগার্ত্তের অন্তিম ক্রন্দন,—
অসংখ্য নীরব কর্ম্মী, তারি লাগি' দিবে বিসর্জ্জন
আপন সকল সুখ; স্বার্থহীন বহু ব্রহ্মচারী
লোকনয়নের পারে ব্রত সাঙ্গ করিবে তোমারি।

মাটির মানুষ মোরা দূরে হ'তে দেখিব সাগ্রহে—
ভাগীরথীতীর তটে কীর্ত্তি তব মুছিবার নহে।
তুমি জেগে রবে বন্ধু অভ্রভেদী মন্দির চত্বরে,
প্রেরণার দীপশিখা অনির্ব্বাণ ধরি দুই করে।
নিয়মানুবর্ত্তিতায়, সাধুচিত্তে, সেবাধর্ম্মতলে,
হে বিবেকানন্দ, তুমি জাগিবে আনন্দশতদলে।

* বেলুড় মঠের স্মৃতিসভায় পঠিত

শরৎচন্দ্রের জন্মভূমিতে

'দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর নাম' কবি ভারতচন্দ্রের সেই দেবানন্দপুর আজ শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান বলিয়া বাঙালীর তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে, জায়গাটি দেখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতেই ছিল, সুযোগটাও আসিল। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের ও ভারতচন্দ্রের স্মৃতি-ফলক উন্মোচন উপলক্ষে স্মৃতি-সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণের আকারে। আমন্ত্রণ আসিল তিন দিক হইতে—হুগলী জেলা বোর্ড, দেবানন্দপুর পল্লী সমিতি এবং রবিবাসর। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী মহাশয়ের অনুরোধ উপরোধ ত
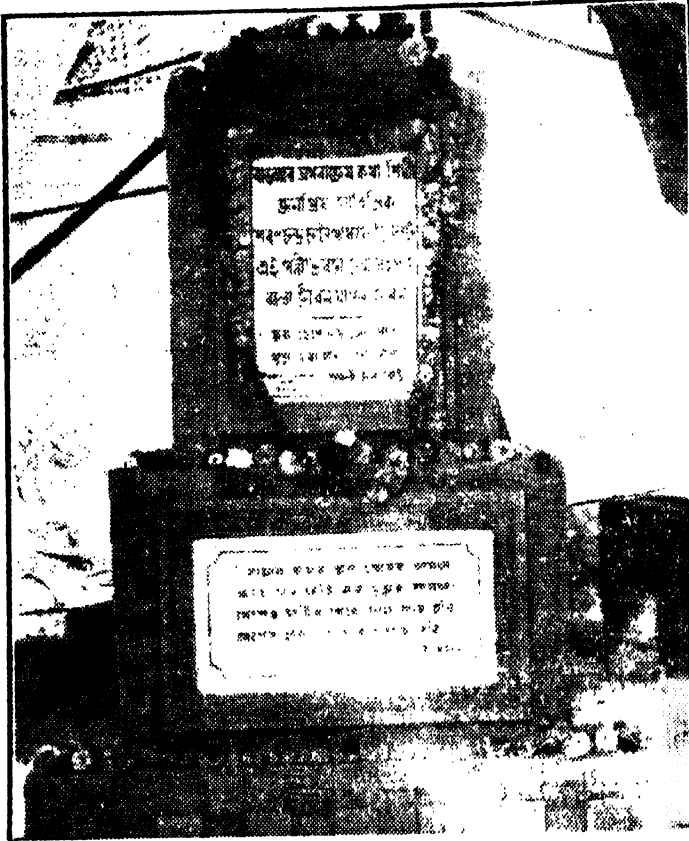
দেবানন্দপুরে শরৎ-চন্দ্রের স্মৃতিফলক

ছিলই। ইঁহারা দেবানন্দপুরের বনিয়াদী বাসিন্দা। মহাকবি ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুরে স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত মুন্সীর ভবনে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রবাবুদেরই পূর্ব্বপুরুষ।

যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। দেবানন্দপুর-যাত্রী কয়েকজন সাহিত্যিকের সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ ঘটিল। গাড়ীতে উঠিয়া গল্প বেশ জমিয়া উঠিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গোহাটী প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী উপস্থিত করিয়া এবার কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। আলোচনা প্রথমে উঠিল রাষ্ট্রভাষার বিষয় লইয়া। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় রবিবাসরীয় দলের অন্যতম নেতা এবং বলিতে গেলে বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার অন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা; উভয়কে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা খুব খানিকটা চলিল। রাষ্ট্র-ভাষা এবং সর্ব্বজনীন কথ্যভাষা হিন্দী ও হিন্দুস্থানী এই উভয়ের সারূপ্য এবং পার্থক্যের তত্ত্ব এবং তথ্যগত বিচারে শব্দ-শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, অলঙ্কার এবং ব্যাকরণ—বাদ কিছু পড়িল না। ক্রমে আলোচনা ঘুরিয়া দাঁড়াইল দেশ-বিদেশের ভ্রমণে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে। জ্যোতিষবাবু গৌহাটী সম্মেলন হইতে কেমনভাবে মণিপুর রোড ষ্টেশন হইতে মালবাহী মোটর লরীর টঙে বসিয়া মাত্র বারো আনা পয়সা খরচ করিয়া ১৩৪ মাইল পার্ব্বত্য পথ পাড়ি দিয়া মণিপুরে গেলেন, সেই কথা বর্ণনা করিয়া আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। সেই প্রসঙ্গে মণিপুরের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রসঙ্গও আসিয়া পড়িল। কথা সূত্রে জড়াইয়া সামন্ত রাজ্যের রাজা এবং প্রজা ইহাদের ক্ষমতা, অধিকার এই সব আলোচনায় গড়াইল। শ্রীযুত মুনীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় মাসখানেক হইল জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, আয়র্লণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি ঘুরিয়া আসিয়াছেন। হিটলারের প্রতাপে অষ্ট্রিয়ার লোকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তিনি সেই কথা বলিলেন। বলিলেন, সাহস করিয়া মনের কথা কেহ বলিতে পারে না, সবারই পুলিশের ভয়, গুপ্তচরের ভয়। হিটলারের নীতি বা কার্য্যের বিরুদ্ধে বাক্যস্ফুট করিলেই বিপদ—সোজাসুজি একেবারে কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে আতিথ্য-লাভ। সেই প্রসঙ্গে বলিলেন, জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া হইতে বিতাড়িত ইহুদীদের অবস্থা। বলিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে একই জাহাজে জার্ম্মানী হইতে বিতাড়িত কতকগুলি ইহুদী পরিবার সাংহাইতে যাইতেছিল। জার্ম্মানী এবং অষ্ট্রিয়াতে তাহাদের ঘর-বাড়ী ছিল, বিষয়-আশয় ছিল, কাহারও কাহারও বড় বড় কারবার ছিল, কেহ বা বড় চাকুরিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি সব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে জার্ম্মানী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নগদ টাকা-পয়সা যাহা কিছু ছিল সকলই সেইখানকার ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসিতে হইয়াছে। একজন মহিলা অনেক কারসাজি করিয়া ১৫ পাউণ্ড সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি এখন সেই ১৫ পাউণ্ড সম্বল করিয়া কয়েকটি শিশু সন্তানসহ নিরুদ্দিষ্ট পথের যাত্রী। বলা বাহুল্য, এইভাবে ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক অবস্থার আবহাওয়াটা গাড়ীর মধ্যে বেশই জমিয়া উঠিয়াছিল হঠাৎ দেখা গেল যে, গাড়ী ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; সুতরাং 'আর নহে দেরী—ভৈরব ভেরী ঐ

উঠিয়াছে বাজি'। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দেবানন্দপুর-গামী অল্প ভাড়ায় মোটর বাসের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়া গেল।

ষ্টেশনে নামিয়া দেখা গেল, অধ্যাপক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং কলিকাতা হইতে আগত আরও কয়েকজন বন্ধু রহিয়াছেন। তাঁহারাও একই গাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সকলে মিলিয়া মোটর বাসের দিকে ছুটিলাম। কিন্তু গিয়া দেখি মোটর বাসে স্থানাভাব। শ্রীযুত প্রফুল্লবাবু, দেব রায় মহাশয় ই'হারা স্থান করিয়া লইয়াছেন বটে, আমাদের পক্ষে স্থানাভাব। রহিলাম মোটর বাসের দ্বিতীয় দৌড়ের প্রতীক্ষায়। তীর্থের কাকের মত ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনের বাহিরে শীত-মধ্যাহ্নের মৃদু রৌদ্র উপভোগ করিতে লাগিলাম। ইচ্ছা হইল একবার পদব্রজে পাড়ি ধরি; কিন্তু পথের দুর্গমতার কথা যেমন শুনিলাম, তাহাতে কাহারও সাহসে ততটা কুলাইল না।

যাক্, অবশেষে শুভ মুহূর্ত্ত আসিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে, মোটর বাস ও ট্যাক্সি দুই-ই আসিতেছে। মাথা নীচু করিয়া দেহটিকে কোনরূপে গুটাইয়া বন্ধুদের সঙ্গে মোটর বাসে উঠিলাম। এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার পর একটু বসিব, তাহাতেও বিভ্রাট, ধূলো জমিয়া বেঞ্চি ঢাকিয়া রহিয়াছে, বন্ধুরা 'আনন্দবাজার'কে আসন

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের পৈত্রিক ভবন—শরৎচন্দ্র এই গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই ভবনেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়

স্বেচ্ছাসেবকেরা আশ্বাস দিল যে, সবুরে মেওয়া ফলিতে অধিক বিলম্ব ঘটিবে না—মাত্র পাঁচ মিনিটেই গাড়ী ফিরিবে।

কিন্তু কার্য্যতঃ পাঁচ মিনিটের জায়গায় পঁচিশ মিনিট কাটিয়া গেল, তবু গাড়ীর সাক্ষাৎ নাই। 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে'—রাস্তায় যখনই গাড়ীর শব্দ পাই আমরা দেবানন্দপুরের মোটর বাসের পুনরাগমন প্রত্যাশা করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠি, কিন্তু 'হা হন্ত ধিক্ বিধিং'। গাড়ীর পর গাড়ী আসিতেছে শুধু এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেম এবং সাহেবেরা—কাচ্চা-বাচ্চা, বুড়া-বুড়ী। ব্যাণ্ডেলের গীর্জ্জায় তীর্থযাত্রী হিসাবে ইহারা হাওড়া হইতে আসিয়াছিল। প্রতি বৎসরই এমন সময় একবার করিয়া আসে, এবারও আসিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া ফিরিতেছে। আমরাও অবশ্য তীর্থযাত্রী—কিন্তু তীর্থ কতদূরে কোথায় কে বলিবে। আমরা তীর্থের অপেক্ষায় করিয়া মোটর বাসে আশ্রয় লইলেন। তারপর ছুটিল মোটর বাস। ধূলি-ঝঞ্ঝা উড়াইয়া ছুটিল, ছুটিল একথাও ঠিক বলিতে পারি না বরং কুঁদিল বলা যাইতে পারে। ছুটা যদি শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে সামনের দিকে গতিই বুঝায়, তবে মোটর বাসের সে গতিকে ঠিক ছুটা বলা চলে না, মোটর বাসের সেই গতিকে বৈষ্ণব কবি 'ভঙ্গ্যা পরিস্ফুরৎ' এই কথায় যে গতি বলিয়াছেন, সেই গতি বলা যাইতে পারে। মোটর বাস চলিতেছিল, দস্তুর মত দুই ধারে অঙ্গ দোলাইয়া দোলাইয়া চলিতেছিল; আর সঙ্গে সঙ্গে ধূলার স্রোত হু হু করিয়া আসিয়া ঢুকিতেছিল গাড়ীর মধ্যে। আমাদের একজন বন্ধু ধূলা এড়াইবার জন্য গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে যাইতেছিল, কণ্ডাক্টর করযোড়ে বলিল—অনুগ্রহ করিয়া ওটি করিবেন না, তাতে আরও অসুবিধা আছে। বেচারার কথায় বুঝিলাম অসুবিধাও যেমন

তেমন নয়, জানালা খোলা থাকিলে ধূলা ভিতরে ঢুকিয়া অন্য পথে বাহির হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু জানালা বন্ধ করিলে গাড়ীর মধ্যে মাটি চাপা পড়িয়া জীবন্ত সমাধিলাভের সম্ভাবনা আছে। ফলে দ্বিতীয় মোপলা ট্রেণ দুর্ঘটনার ন্যায় ব্যাণ্ডেলের রাজপথে মোটর বাস দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, সুতরাং জানালা বন্ধ করিয়া ধূলিজালের ধাক্কা হইতে আত্মরক্ষার উপায় সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। রাজপথের উৎক্ষিপ্ত ধূলি-কণার নিরন্ধ্র যবনিকা দুই পাশে তুলিয়া মোটর বাস চলিল, চক্ষু মেলিয়া চাহিবে এমন সাধ্য কাহারও নাই। ড্রাইভারের কৃত সঙ্কেতে চক্ষুর আবরণ খুলিয়া চকিতে একবার চাহিলাম, শুনিলাম আমরা দেবানন্দপুরের উপান্তপ্রদেশে পৌঁছিয়াছি। কিছুদূর আসিয়া ডান দিকে একটা রাস্তার মাথায় বোর্ডে আঁটা লেখা দেখা গেল 'শরৎচন্দ্র রোড।' আমাদের কণ্ঠায় জল আসিল। বুঝিলাম এবার তীর্থদ্বারে পৌঁছিয়াছি।

তীর্থ শোভাই বটে! দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর কতদিন আগে ছিল জানি না, কিন্তু বহুদিন পরে আজ আবার সে আনন্দধামে পরিণত হইয়াছে। উৎসবক্ষেত্রে যেন মেলা বসিয়া গিয়াছে। প্রশস্ত সে মাঠের মত জায়গা। সেখানে অগণিত নর, অগণিত নারী। সকলের মুখেই উৎসাহ, উদ্যম, চারিদিকে কর্ম্মব্যস্ততা। চন্দ্রাতপ তলে সভা বসিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সবে তাঁহার স্বাগত সম্ভাষণ আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু লোকের এমন ভিড় যে, সে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য। আমাদের আসার খবর পাইয়া শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিলেন এবং আদর করিয়া সকলকে সভাক্ষেত্রে লইয়া গেলেন; কিন্তু সভায় গিয়া বসিতে না বসিতেই আসিল বক্তৃতা করিবার তলব। শ্যামাপ্রসাদ বাবু সভাপতি, স্বয়ং তাঁহারই আহ্বান, সুতরাং হুকুম তামিল না করিয়া উপায় নাই। বক্তৃতা করিতে হইল। শরৎচন্দ্রের লেখার ভিতর নিজে যে রসটুকু পাইয়াছি, তাহা-ই কথায় ব্যক্ত করিতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, দেশ-বাসীর প্রতি অন্তরের আবেগ-মাখান যে ভালবাসা, এই ভাল-বাসাই শরৎচন্দ্রের লেখার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মাধুর্য্যের মূল তত্ত্ব এইখানে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের বক্তৃতার পালা পড়িল ইহার পরে। তিনি শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মাহাত্ম্যকে বুঝাইলেন, বলিলেন, ভারতচন্দ্রের দান বাঙলাভাষার ভাণ্ডারে কতখানি সেকথা এবং উপসংহারে শরৎচন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীযুত অবনীভূষণ চাটার্জ্জি আই-সি-এস মহাশয়ের বক্তৃতাটি বেশ ভাল লাগিল। তিনি অল্পের মধ্যে বেশ গোছাইয়া শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার একটা দিক, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাণ-ধর্ম্মের উপর তাঁহার প্রভাবের কথা বলিলেন। মৌলবী রেজাউল করীম সাহেব দেখাইলেন শরৎ-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত অসাম্প্রদায়িকতা এবং বিশ্বমানবতার [illegible]। ইহার পর সভাপতি শ্যামাপ্রসাদবাবু তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন এবং সভার কার্য্য শেষ হইল।

সভার পর প্রথমে কবি ভারতচন্দ্রের স্মৃতি-ফলকের আবরণ উন্মোচন করা হইল। সভাক্ষেত্র হইতে মহিলারা এবং পল্লী-বালিকাগণ শঙ্খধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া চলিলেন। ভারতচন্দ্রের স্মৃতি-ফলকটি সভাস্থলের নিকটেই ছিল; তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া পরে যাত্রা করা গেল শরৎচন্দ্রের বাস-ভবনের অভিমুখে। পল্লীর রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। মহিলারা মিছিল করিয়া আগে আগে যাইতেছিলেন এবং শঙ্খ-ধ্বনি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটিকে পবিত্রতার গুরুগাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-ফলকটি শরৎচন্দ্রের যে-টি পৈতৃক বাসভবন ছিল, তাহার সামনে বসান হইয়াছে। শুনিলাম, শরৎচন্দ্রের যে-টি পৈতৃক বাসভবন, সে বাড়ীটির স্বত্বাধিকারিত্ব এখন অপরের হাতে, স্মৃতিরক্ষা কমিটির হাতে তাহা এখনও আসে নাই। এই অভাবটি অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-ফলক উন্মোচন করিবার পর জল-যোগের আয়োজন। শরৎচন্দ্র-পল্লীপাঠাগারের সংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয়ে আসিয়া দক্ষিণ হস্তের সে ক্রিয়া সম্পন্ন করা গেল। তারপর, একটু বিশ্রাম!

এই সময় পল্লীর চেহারাটা দেখিবার একটু ফুরসুৎ পাওয়া গেল। দেবানন্দপুরের পূর্ব্ব গৌরব আজ নাই, কিন্তু 'অতীত গৌরব-স্মৃতি-শিলা বুকে ধরিয়া এখনও অনেক জিনিষ রহিয়াছে। অসংস্কৃত ভগ্ন মন্দির এবং জীর্ণ বাড়ীগুলি এখনও সে সাক্ষ্য দিতেছে। আর পল্লী-প্রকৃতি, সে সাক্ষ্যও কি কম? অমৃতভাষী ভারতচন্দ্রের কবিত্ব এই দেবানন্দপুরের পল্লী-প্রকৃতি হইতেই একদিন রসের আবেশ পাইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের নিজের কথাই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। আর শরৎচন্দ্রের বাল্য-জীবনও কাটিয়াছে এইখানে। তাঁহার শিশু-হৃদয়ে এই পল্লী-প্রকৃতির এমন কোন ছাপ কি একেবারেই পড়ে নাই, তাঁহার প্রতিভা বীজ শক্তিরূপে যাহার মধ্যে নিহিত ছিল? হয়ত এই দেবানন্দপুরের ঐ কলা বাগান, ঐ বাঁশের ঝাড় এবং দ্রুম ও গুল্মরাজী—শরৎচন্দ্রের লেখার ভিতর পল্লী-প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আমরা পরিচয় পাই, তাহাকে রস-রূপ দিয়াছে। বাল্যের অনুভূতিই শরৎচন্দ্রের কিশোর ও যৌবনের রসোপলব্ধির অন্তরালে কাজ করিয়াছে। শরৎচন্দ্র পল্লীর মূক মুখে যে ভাষা দিয়াছেন, তাহার সেই ব্যঞ্জনার মূলীভূত বেদনা, আজকার এই অপরাহ্ণে দেবানন্দপুরে যে পল্লী-প্রকৃতির রূপ আমরা দেখিতেছি আসিয়াছে সেই ম্লান-মাধুরী হইতেই—একথা কে অস্বীকার করিবে! এই পল্লীর প্রকৃতি একদিন তাঁহার অন্তরের তারে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল; ঝঙ্কার তুলিয়াছিল মহাকবি ভারতচন্দ্রেরও। তাঁহাদের নিজেদের প্রতিভায় তাঁহারা সেই ঝঙ্কারকে অপরের অন্তরে অনুরণিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা কি অস্বীকার করিবার উপায় আছে? আমরা সাহিত্যিক যে শরৎচন্দ্রকে পাই, দেবানন্দপুরের শরৎচন্দ্র, সে শরৎচন্দ্র নহেন, বাহিরের বস্তু-বিচারের দিক হইতে এমন মনে হইলেও একথা সত্য যে এক হিসাবে পল্লীর সেই শরৎচন্দ্রই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের শরৎ-চন্দ্রত্ব সেইখানেই। শরৎচন্দ্রের প্রতিভার দীপ্তি পল্লীর সহিত প্রীতির এক অবিচ্ছেদ্য সংযোগ-সূত্র বহিয়াই পরিস্ফুরিত

হইয়াছিল; যাহা বীজরূপে ছিল তাঁহাই পল্লবিত এবং পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছিল পরবর্ত্তী জীবনে। পল্লীর প্রকৃতি তাঁহার দৃষ্টির কাছে আপনার অন্তরকে উন্মুক্ত করিয়াছিল, অন্তর উন্মুক্ত করিয়াছিল পল্লীর নর-নারী। এই যে অন্তর-পরিচয় ইহা পাওয়া যায় না পাণ্ডিত্যে, শ্রৌত-জ্ঞানে। এ অন্তর পরিচয় পাইতে হইলে আপনাকে দিতে হয়। শ্রদ্ধার কাছেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা যিনি তিনি আপনাকে প্রকট করেন। শরৎচন্দ্র পল্লীকে দিয়াছিলেন এই শ্রদ্ধা, পল্লীর নর-নারীকে তিনি করুণার দৃষ্টিতে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তাহাদের অজ্ঞতা, তাহাদের কুসংস্কার সত্ত্বেও তিনি দেখিয়াছেন তাহাদিগকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। শুধু এই দৃষ্টির কাছেই যিনি বলিলেন, এবং দেখাইলেন দরিদ্র এবং অবজ্ঞাতের প্রতি বেদনার পটভূমি শরৎ-সাহিত্য পাইয়াছিল সেই জীবন হইতেই। বাল্যজীবনেই শরৎচন্দ্রের আত্ম-সংগোপনের প্রবৃত্তি ছিল। উভয়ের বাল্যজীবনের নানা ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, এই আত্ম-সংগোপনের প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া তাঁহার প্রতিভা রস-সৃষ্টিতে দানা বাঁধিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল। আরও অনেক কথা তিনি বলিলেন। মোটের উপর তাঁহার এই আলোচনা বড়ই উপভোগ্য হইয়াছিল। শ্রীযুত ব্রজমোহন দাশ এবং শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ইঁহারাও শরৎচন্দ্রের জীবনের সম্বন্ধে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনেক কথাই বলিলেন। এইভাবে সান্ধ্য-

দেবানন্দপুরে শরৎ-স্মৃতি পাঠাগার
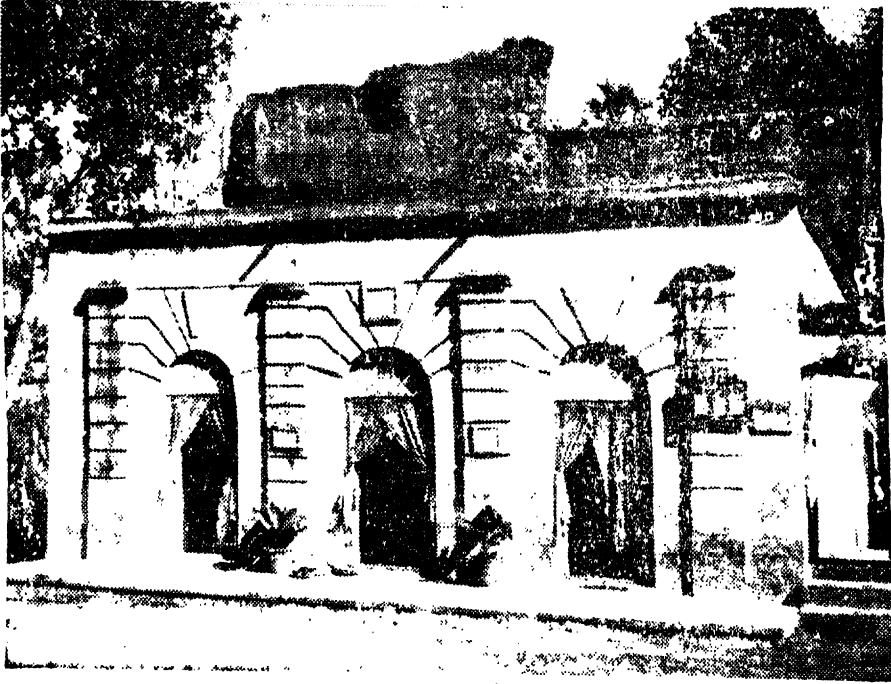
নরনারায়ণ তিনি সাড়া দেন। অহমিকা বা ঔদ্ধত্য লইয়া কোন ক্ষেত্রেই তাঁহাকে জানা যায় না, বুঝা যায় না—পাওয়া যায় না তাঁহার স্বরূপের পরিচয়।

সন্ধ্যার পর শরৎচন্দ্র পল্লীপাঠাগারে সাহিত্য সভায় শরৎচন্দ্রের অন্যতম বাল্যসঙ্গী অধুনা চুঁচুড়ার পাবলিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মুখুজ্যে মহাশয় সভাপতি স্বরূপে সেই কথাটা বলিলেন। ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র যেখানে থাকিতেন, তাহার কাছেই তিনিও থাকিতেন। শরৎচন্দ্রের বাল্য-জীবনের অনেক কথা তিনি বলিলেন; বলিলেন, শুধু গল্পের আকারেই নয়, সে রস তো ছিলই তাহা ছাড়া আরও কিছু ছিল। সমালোচকের দৃষ্টির সংযোগে শরৎচন্দ্রের সেই বাল্যজীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া—তাঁহার প্রতিভা শৈশব-জীবনে কি আকারে আত্মশক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, সে কথা তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনের নিদারুণ দারিদ্র্যের কথা তিনি সাহিত্যের এই আসরটি বেশই জমিয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর আসিল বিদায়ের পালা—একদল প্রফুল্লবাবু প্রভৃতি আগাইয়া গেলেন: আমরা, অপর দল কলিকাতায় ফিরিলাম তাহার পরের ট্রেণে। পথে 'বাতায়ন' সম্পাদক শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল এবং আরও কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু সঙ্গী ছিলেন। সংবাদপত্র-সেবা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করিতে করিতে বেশই আনন্দের সঙ্গেই কলিকাতায় ফিরিলাম। পল্লীর সুশ্যাম প্রকৃতির কোল হইতে শহরের সংঘর্ষময় জীবনের মধ্যে আবার আসিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইল, কিন্তু দেবানন্দপুরে পল্লী-প্রকৃতির যে স্পর্শ পাইয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না, আর ভুলিব না সেখানে শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী মহাশয় প্রমুখ শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ এবং পল্লীর তরুণ স্বেচ্ছাসেবকেরা যে সেবা যত্ন এবং আদর-আপ্যায়ন করিয়াছিলেন সে কথা।

ধ্বংসের জের

(গল্প)

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুকাল পরে দেশে গিয়েছিলাম। আবার সেই স্বস্থানে ফিরেও এসেছি। কিন্তু সঙ্গে কি এনেছি? ভেবেছিলাম বহু দিন পরে যাচ্ছি, সঙ্গে কিছু নিয়ে আসব। যা এনেছি—সব আনার সঙ্গের একটি ঘটনা—কলমের আঁচড়ে হয়ত সেটা একটা গল্প—আজও সজীব হ'য়ে আমাকে শঙ্কিত ও রোমাঞ্চিত করে তোলে। গল্প লিখতে বসে সেই ঘটনাটাই আজ আমার স্মৃতি-তটে বারে বারে আছাড় খাচ্ছে।

শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত গ্রামে এসে এক নূতন পরিবর্ত্তন দেখলাম। শুধু গ্রামের কথাই বলছি না। আমার মনে ও দেহেও যেন এক নূতনের সাড়া এল। গ্রামে তখন বসন্তকাল! কতদিন, কতবছর কোকিলের ডাক শুনিনি। সবেমাত্র তখন আম গাছে বউল ধরেছে। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে তার গন্ধ পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলাম। খেতে বসে অতি পরিচিত সৌজন্যে আমি কেমন চমকে উঠলাম। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন পিসীমা। বললাম, 'পিসীমা পাকা কুলের গন্ধ কোত্থেকে আসছে?' আমি তখন বেশ টেনে টেনে নিশ্বাস নিচ্ছি, সত্যই বহুদিন সে রকম নিইনি। পিসীমা বললেন, 'কেন তোর কদম দিদির কথা মনে নেই?' আমি যেন চিনি চিনি করেও তবু মনে আনতে পারছিলাম না। পিসীমা হাসলেন, 'সে কি রে! এরি মধ্যে সব ভুলে গেছিস?—সেই যে আমাদের বাড়ী আসত, ঘুটে দিয়ে যেত মনে নেই?'

হারান জিনিষের সন্ধান পেয়ে হঠাৎ উৎফুল্ল হ'য়ে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে পড়েছে; সেই যে তার একটি বোনঝি না ভাইঝি কে ছিল!' পিসীমা বললেন, 'হ্যাঁ সেই—তাদের ত আর কেউ নেই। ভাইঝির বিয়ে দিলে। তারপর এক বছর পরে ভাইঝিকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে কালনায় কোন এক কুটুম-বাড়ী গিয়ে রইল। তারপর আর ফিরে আসেনি। শুনেছিলাম ও নাকি সেখানেই গঙ্গাযাত্রা করেছে। আর ভাইঝিটা বেঁচে আছে; তবে সেই যে শ্বশুর বাড়ী গেছে আর এ মুখো হয় নি। বাড়ীর ভিতর একটা কুল গাছ ছিল—সেটা বোধ হয় তুই দেখে গেছিস মনে নেই, সেইটাই এখনও ঠিক দাঁড়িয়ে আছে—নইলে ঘর-দোরের আর কিছুই চিহ্ন নেই।'

বিকেলবেলা বেড়াতে গিয়ে দেখলাম সত্যই তাই। ঘর-দোরের কিছুই চিহ্ন নেই। শুধু কুল গাছটিই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুলও এসেছে তেমনি। পাকা কুলের সৌরভে গ্রামে কিশোর বয়সের স্মৃতিটুকু মনে আজ যেন নূতন রূপে পরিচয় দিতে এল। কি জানি কেন, দুটো কুলও খেতে ইচ্ছে হ'ল। অনেকদিন খাই নি বলেই কি তাই? না তা ত নয়। এ-যে আমার গ্রামের জিনিষ, এর সঙ্গে যে আমার চিরন্তনের ছন্দ মিলন রয়েছে। আজ না হয় বিদেশে গিয়ে বড়ই হ'য়ে এসেছি; কিন্তু একদিন এই কুল কি আকুল আগ্রহেই না গলাধঃকরণ করেছি। ভাবতে ভাবতে উন্মনা হ'য়ে পড়ি...... একটি কঞ্চিও কখন আমার হাতে উঠে আসে, দু'ঘা ঠ্যাঙ্গাতেই চড়-বড় করে কতকগুলা কুল আমার মাথায় লেগে মাটিতে পড়ল।

—'কে ও!'

চমকে উঠে ফিরে তাকালাম। চিনতে পারলাম না। অতি দুর্ব্বল, চিররুগ্ন একটি লোক। অতি শীঘ্র বৃদ্ধত্বে এসে পৌঁচেছে। বুকের দু'পাশে পাঁজরা কখানাই জেগে আছে। হাতে হুঁকা, পরণে আটহাতি কাপড়। ভাঙ্গা পোস্তাটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—'কুল পাড়ছিলে কেন?'

খুঁজে পেলাম না এর কি কৈফিয়ৎ দেব—বিশেষত পাড়া-গাঁয়ে যেখানে কুলের কোনই দাম নেই।

—'নাম কি—নিবাস কোথা?' বলে শেষ না করতে করতেই খক্‌খক্ করে খানিকটা কাসতেই বৃদ্ধের দম যেন বন্ধ হ'য়ে এল। গলার ও কপালের শিরা-উপশিরাগুলা অদম্য বেগে ফুলে উঠল। কাসি কিছুতেই থামতে চায় না। দুর্ব্বল শরীরের হাড়-কখানিতে ঠোকাঠুকি লেগে গেল।

যেন মুখখানি চেনা মনে হ'ল তবু ঠাওর করতে পারলাম না। কাসি তখন থেমেছে। অপরাধীটির মত দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিকটা দম নিয়ে আমার মুখের পানে তীব্র দৃষ্টি মেলে বললে, 'হুঁ, নিবাস কোথা?' গলার স্বর ভাঙ্গা ও চাপা।

বললাম, 'কাশ্মীর।'

বুঝতে পারলে না। কেমন যেন সন্দেহ হ'ল, বললে, 'সে কোন দিকে?'

—'খাড়া উত্তরে।'

—উত্তরে? চিন্তান্বিত মুখে খানিকটা তামাক টেনে পাল্টা প্রশ্ন করলে, 'এখান থেকে ক'খানা গাঁ?'

ক'খানা গাঁ? হাসি পেল। কোন রকমে হাসি চেপে উত্তর দিলাম, 'এখান থেকে অনেক দূর।'

—'হুঁ—' বলে প্রসঙ্গটা চেপে তামাক টানতে লাগল। বুকের পাঁজরাগুলা সেই সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠল। কাসির বেগে বৃদ্ধ ফের ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। তারপর কাসি থামলে গলা চেঁছে এক খাবড়া গয়ের ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলে, 'এখানে কোথায় এসেছ?'

—'এখানেই আমার বাড়ী।'

বৃদ্ধের সন্দেহ হ'ল। তামাক খাওয়া বন্ধ রেখে হুঁকা থেকে মুখ সরিয়ে আমার পানে তাকালে। বীভৎস তার দৃষ্টি, ভীষণ ক্রুর, কোটরগত চক্ষু দুটি রক্তহীন—আমার পানে অনিমেষে চেয়ে রইল। চেহারায় ভয় খাবার কিছু নেই—কেবল ওই চোখ দুটি,—সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত অভিশপ্ত আত্মার নিঃস্ব হিংস্রতার বিকাশ আমায় যেন বশীভূত করে ফেললে।...... বৃদ্ধ হাসছে, সত্যই কি সে হাসছে? বুঝতে পারলাম না। ক্রমশই সে এগিয়ে এল। কাছে এসে তাকাল। আমি হতবাক। ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে পা থেকে আমার মাথা পর্য্যন্ত কাকে যেন সন্ধান করে ফিরলে।

ধীরে ধীরে তারপর কপালের গোল চামড়াখানা কুঁচকে গেল।...... অতি সন্তর্পণে চুপিসারে বল্লে, 'তুমিই কি আমাদের সেই ললিত?'

কিন্তু আমি চিন্‌তে পারলাম না কে সে। শুধু অভিভূতের মত সায় দিলাম, 'হ্যাঁ আমি ললিত।—কিন্তু চিন্‌তে পারলাম না ত?'

—'আমি? আমাকে ত চিন্‌তে পারবে না!' দুর্জ্জয় আক্রোশ বৃদ্ধের অন্তর্দুঃখ যেন গুমরে উঠল। আমি তোমার খলিল চাচা গো—চিনতে পারছ না?'

কি করেই বা চিনব। সে কি আজকের কথা। প্রায় দশ বছর আগে গাঁয়ের মায়া ছেড়েছি। যাকে সবল, সুস্থ ও কর্ম্মঠ দেখে গেছি সেই খলিল চাচা আজ বুকের হাড়ক'খানা নিয়ে বেঁচে আছে—তা কে ভাবতে পেরেছিল। বললাম 'চাচা, এই কি তুমি, কি হয়েছে তুমি?'

চাচা হাসলে, 'অবাক লাগছে নয়? বিশ্বাস হচ্ছে না, নয়?'

ভাবলাম বলি, না চাচা তা নয়। বিশ্বাসও হয়েছে, চিনতেও পেরেছি; শুধু ভাবছি যার হাতের লাঠির আঘাতে একদিন শিকারপুরের মাঠের জল রক্তে লাল হ'য়ে উঠেছিল সেই খলিল চাচার দেহকে কি এমনি করেই ভেঙ্গে দিয়েছ ভগবান!

বললাম, 'হ্যাঁ চাচা—মক্‌সুদ আর ওয়াহিদ ভাল আছে ত?'

—'ভাল কেউ ছিল নারে ভাই—ভাল কেউ ছিল না।' বলে বৃদ্ধ তামাক টেনে গলাটাকে সংযত করে নিয়ে বল্‌লে, 'সকলকে খোদার হাতে সঁপে দিয়েছি।—খোদা তাদের আপনার ছিল, আমি তাদের কেউ ছিলাম না ভাই, নইলে বুড়া বাপজানকে কেউ একলা ফেলে যেতে পারে!'

দেখ্‌লাম বৃদ্ধ দুটি আঙ্গুলে চোখ দুটি মুছে নিলে। বল্‌লে, 'তুমি কেমন আছ ভাই?'

—'আমার কথা বল না চাচা। যে দেশে থাকি সেখানে ভাল থাকাই নিয়ম।'

চাচা নীরবে তামাক খেতে লাগল আর আমি মূক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। গ্রামের ভিতর সন্ধ্যার ধূসর ছায়া তখন বেশ জমে উঠেছে। বাঁশ-ঝাড়ের উপর দিনের শেষ আলোটুকুও আর জেগে নেই। পাখীদের চেঁচামিচি সুরু হয়েছে। আম-বউলের গন্ধ আস্‌ছে। কোকিল ডাক্‌ছে। মনে এক অতীন্দ্রিয় পুলক জেগে উঠেছে। কিন্তু সত্যই তা পুলক, না ব্যথা! এখানে প্রকৃতির এই রহস্য কেন? কি জানি কেন মনটা আমার হঠাৎ বিদ্রোহ করে উঠল।......

তখন সন্ধ্যা। দু'জনেই নির্ব্বাক; চাচাই প্রথম নীরবতা ভেঙ্গে বলল, 'আচ্ছা ভাই, ওয়াহিদকে তোর ভালভাবে মনে পড়ে?'

বল্‌লাম, 'কি বল চাচা, মনে পড়ে না—খুব পড়ে।—'

—'তবে শোন, সেই ওয়াহিদ যখন—'কি ভেবে না জানি প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে বল্‌লে, 'না থাক,—তুই যা ভাই রাত হ'য়ে আসছে। শহুরে মানুষ তোরা, এখানকার অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবি না।'

আগ্রহ আমার বেড়ে গেছল। বল্‌লাম, 'না চাচা তুমি বল। রাত হলেই বা, পথ আমি খুব চিনে নিতে পারব।'

চাচা হাসলে, 'পারবি বই কি; কেন পারবি না। এখেনেই ত একদিন মানুষ হয়েছিলি। তবে কি জানিস ভাই, রাত বিরেতে পোকা-মাকড় ঘোরাফেরা করে।'

যুক্তিটা মন্দ নয়। ভয় হ'ল, পল্লীগ্রামে সাপের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশী। অন্ধকারও বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। সুতরাং দেখলাম চাচার কথাই শিরোধার্য্য করা বুদ্ধিমানের কাজ। চাচা যাবে সোজা। আমি যাব বাঁ হাতে—বাঁশ-বনটার ধার দিয়ে। বিদায় নিয়ে যেমনই বাড়ীর দিকে পা চালিয়েছি—

'কদ্দিন পরে এলে, কিছু কদিন থাকা হবে ত?'

—'ইচ্ছা ত তাই আছে চাচা। কদিন পরে এলাম, কিছুদিন থাকব বই-কি।' চাচা সমর্থন করলে, 'তা চাচা, থাকবে বই কি—আজকে গেছ—সে প্রায় একযুগ!'

আমার দাঁড়াবার সময় ছিল না। হনহন করে এগিয়ে চলেছি। বাঁশবনে জোনাকী-পোকার আলো দেখবার সময় ছিল না। কাছেই বাড়ী, তবু এইটুকু পথ চলতে বারে বারে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ফোঁস করে ওঠে। চোর, ডাকাত আর ভূতই বল সবেরই হাতে পরিত্রাণ আছে; কিন্তু স্বয়ং কালকে বিশ্বাস হয় না, পথের মাঝে বিষভাণ্ড নিয়ে হয় ত কোথাও লুকিয়ে আছে। একটুখানি দংশন, অতি তীব্র......তারপরেই! হন্ হন্ করে চলেছি। ভেবে আশ্চর্য্য হই ছেলেবেলায় রাতবিরেতে এই পথে কতবার না আসা-যাওয়া করেছি। কিন্তু সাপের ভয়-ডর বলে কিছু ছিল না। আজ আলোর রাজ্য ছেড়ে অন্ধকারেই কি আমার যত ভয়? উঃ! মাথাটা দুলে উঠল! খুব বেঁচে গেছি! অন্ধকারে দেখতে পাই নি অশথ গাছের শিকড়ে হোঁচট খেয়ে কখন টাল সামলে নিয়েছি। বরাতক্রমে বেশী চোট লাগে নি। সাবধানে এবার পা দু'খানি ঘষে ঘষে বাড়ী এসে পৌঁছলাম।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুম এল না। ঘুরে-ফিরে কেবল চাচার কথাই মনে আসে।......ওয়াহিদ যখন,—তারপর কি হ'ল তার? চাচা বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেল কেন? কি হয়েছিল ওয়াহিদের? কেনই বা মক্‌সুদ আর ওয়াহিদের অসময়ে ডাক পড়ল খোদার কাছে?......না, ঘুম আমার হ'বে না দেখছি। নিদ্রা দেবীকে ধন্যবাদ, ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকালবেলা উঠেই চাচার কাছে গেলাম। কিন্তু দেখা পেলাম না। ঘর-দোরের সে কি অবস্থা হয়েছে! চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ঘরের চালটা বসে গেছে। মাটির দেওয়ালটা ঝুঁকে পড়েছে। দাবাটার একধারটা ভেঙ্গে গেছে। উঠানে একটা এক ভাঙ্গা ধান-সিদ্ধর হাঁড়িতে খানিকটা লালচে জল জমে রয়েছে। কোথায় বা সেই ধানের গোলা আর কোথায়ই বা সেই গোয়াল ঘর। কটা মোরগ ফুলের গাছ একপাশে হতাদরে বেঁচে রয়েছে। এগুলো আগেও ছিল। এখনও তারা সুখ-দুঃখের সাথী চাচাকে বোধ হয় ভুলতে পারে নি; তাই বংশপরম্পরায় চাচার সঙ্গে ওদের জীবন ধারাকে জীইয়ে রেখেছে।

এরপর কিছুদিন চাচার কথা ভুলেই ছিলাম। সে পথেই আর মাড়াই নি। একদিন আড্ডা দিয়ে ফিরছি। বেলা তখন

দশটা। হঠাৎ চাচার সংগে দেখা। চাচা বোধ হয় আমায় লক্ষ্য করে নি। বললাম, 'কোথায় যাচ্ছ-গো চাচা?'

চাচা বুঝতে পারে নি বোধ হয় যে, তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম। ফিরে থমকে দাঁড়াল। তারপর মৃদু হাস্যে বললে, 'ও—কে চাচা? এই ভাই একবার বাবুদের বাড়ী পানে যাচ্ছি।—দেখি যদি কিছু পাই।'

আমি স্তম্ভিত হলাম! চাচার এই অবস্থা! বুঝলাম, উদ্ধত খলিল আজ ভিখারী, অপরের অনুগ্রহে তার দিন কাটে। দুঃখ হ'ল।

সন্ধ্যাবেলায় চাচার কাছে গেলাম। মনটা দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল। একলাটি চুপচাপ বসে তামাক খাচ্ছিল চাচা। আমাকে দেখতে পেয়েই অভ্যর্থনা করলে, 'এস ভাই এস।' একটু যেন ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। তারপর ছেঁড়া একটুকরা চেটাই বিছিয়ে বললে, 'বস ভাই, কিছু মনে কর না, পাতবার কিছুই নেই যে, বসতে দিই।'

বসা নিয়ে আমার বিষয়, সুতরাং বসলাম। মনটা উসখুস করছিল। চাচা গরীব। সত্যই গরীব—ভিক্ষা করে। বললাম, 'চাচা আজ একটা বিশেষ দরকারে তোমার কাছে এসেছিলাম।'

—'কি দরকার চাচা?'

দরকারটা কথার কথা। পকেট থেকে একটা টাকা বার করে হাতটা এগিয়ে দিলাম, 'এই নাও চাচা!'

বৃদ্ধের ক্ষীণ দৃষ্টি বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল, 'এটা কি, টাকা! টাকা কি হবে?' বলা বাহুল্য, কথাটা আমার কানে ধমকের মত শোনাল। সভয়ে আমি হাতটা গুটিয়ে নিলাম।

চাচার বোধ হয় হুঁস হ'ল। প্রকৃত ব্যাপারটি এতক্ষণ পরে বুঝতে পেরে বললে, 'ও তাই বল, তুমি আমাকে কিছু জল খেতে দিচ্ছিলে?' হাসতে হাসতে শেষে মিনিটখানেক ধরে কাসির দমকে কুঁকড়ে গেল। প্রথমটা না নেবার কারণ আসলে আন্তরিক নয়; চিরকাল কারণে অকারণে গর্জ্জে এসেছে, আজও সে স্বভাবের জের মেটে নি।

টাকাটা দিতেই চাচা খুব খুশী হ'য়ে গেল। বললে, 'ভাই তোরা বেঁচে থাক; দুনিয়ায় তোরা মানুষ হ'য়ে থাক, খোদা তোদের ভাল করবে'—বলে কিছুক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ উন্মনা হ'য়ে পড়ল। বিরাট নিস্তব্ধতায় আমি তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বসে রইলাম। দেখলাম চাচা ক্রমশ যেন কিসের আবেগে স্থির হ'য়ে আসছে। চোখদুটি গভীর অন্তস্তল থেকে যেন তীব্রতর হ'য়ে ফুটে বেরুচ্ছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। নাকটা স্ফীত হয়ে উঠেছে, দু'পাশে রগের শিরাগুলো জেগে উঠেছে। একটা আসন্ন দুর্জ্জয় আক্রোশ বুঝি আমারই মাথায় ভেংগে পড়বে। ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি কাঠ হ'য়ে গেলাম।

একটা চাপা আর্ত্তনাদ, তারপরেই চাচা গর্জ্জে উঠল, 'টাকা, টাকা—এই টাকার জন্যেই একদিন মকসুদকে হারিয়েছি,—তারপর ওয়াহিদকে মেরেছি,—উঃ খোদা!'

সভয়ে প্রকম্পিত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছিল চাচা?'

—'শুনবি ভাই, তোর খলিল চাচার দুঃখের কথা, শুনবি—তবে শোন্, সে দশ বছর আগেকার কথা। তখন তোরা সব এখানে ছিলি। বর্ষার জলে আমাদের মাঠকে মাঠ ডুবে গেছে। দু'একদিনের মধ্যে জল বের না করতে পারলে কচি ধানের চারাগুলো মাঠেই পচে থাকবে। ভীষণ জমিদার, ভয়ে কেউ এগুল না। জোছনা রাত। চারিদিকে চাঁদের আলোয় ফটফট করছে। ক'জনাকে সংগে নিয়ে নিজেই বের হলাম বাঁধ কাটতে। জমিদার লোক লাগিয়ে রেখেছে বাঁধ কাটতে দিবে না, কেননা তার নিজের খাসডাঙ্গা জমিগুলো শুকিয়ে যাবে জল না পেলে। কিন্তু আমাদের কথা ভেবে দেখলে না। জমিদার মানুষ, তোমার অনেক আছে, গেলে খেতে পাবে। কিন্তু আমাদের কি আছে—ওইগুলাই যে আমাদের সম্বল। তোমার ত্রিশ বিঘে জমির জন্যে আমাদের তিন-শ বিঘের শিকারপুরের মাঠ ভেসে থাকবে। তাই মন ক্ষেপে উঠল। থৈ থৈ করছে জল...... জোছনায় থির হ'য়ে আছে।......

বাঁধ নিয়ে তারপর ভাই সে কি লড়াই দাংগা। ওদের ছিল অনেক। কিন্তু আমরা মরিয়া হয়েই গেছলাম। প্রাণপণে লড়তে লাগলাম। কতগুলোকে ঘায়েল করেছিলাম জানি না; তবে সেই রাতে বাঁধ কেটে ফিরে এলাম। কিন্তু যাদের নিয়ে গেছলাম তাদের সকলকে নিয়ে ফিরতে পারলাম না। দু'জনকে বাঁধামোহানের লাল জলে রেখে এলাম।......

চাচা থামল। ফের সুরু হ'ল, 'পরদিন সকালবেলা চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। দুপুর বেলা নাগাদ পুলিশ এল......আমাদের সব ঘেরাও করলে, জেরা করলে... তারপর পাঁচ বছরের জন্যে একেবারে জেলে ঠেলে দিলে। আমারও গায়ে ঘা খাওয়ার চিহ্ন ছিল; কিন্তু গায়ের জোরে যদিও পেরেছিলাম, টাকার জোরে সেদিন পারলাম না চাচা......'

'তারপর পাঁচ বছর হাজত-বাস করলাম। ফিরে এসে কি দেখলাম জানিস চাচা......মকসুদ নেই, শুধু ওয়াহিদ আছে। মামলা সাজিয়ে জমিগুলো এর আগে জমিদার ডিগ্রিজারী করে ছিনিয়ে নিয়েছে।'

বৃদ্ধ এইখানে এসে চুপ করে গেল। কিসের দুর্ব্বলতায় যেন তখন বাকশক্তি রহিত হ'য়ে গেছে। সাগ্রহে বললাম, 'মকসুদের কি হয়েছিল?'

—'মকসুদ?'—চাচার চোখদুটি জলে ভরে এল, 'সেই আমার ছেলেরে। ব্যাটা বাঘের বাচ্চা ছিল। আমার মত সেও জমিদারের সংগে লড়তে গেছল। আমি তখন হাজতে। একদিন কতকগুলি ওকে হাটের ফিরতি পথে ধোনাই খালের মাঠে ঘেরাও করে ফেললে।......তারপর সে আর ফিরে আসে নি। লাশও পাওয়া যায় নি। লোকে ত এই বলে, এর বেশী যদি কেউ কিছু জানে—ওই খোদা!'—

এমন সময় বৃদ্ধের চোখ দিয়ে ক'ফোঁটা জল টসটস করে শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। শুনতে শুনতে আমি কখন জমাট বেঁধে গেছি। চাচার চোখের জল দেখে ধোনাই খালের মাঠ থেকে আমি চাচার কাছে ফের নিজেকে ফিরে পেলাম। বিহ্বল রোষে বললাম, 'তারপর তুমি কি করলে?'

—'কি আর করব চাচা—কি-ই বা করতে পারি। আমার তখন সব শক্তি ফুরিয়ে এসেছে। একদিন যদি খেতে পাই ত দু'দিন পাই না। নিজের জন্যে একটুও দুঃখ ছিল না।

...ার চাচীও মরে গেল, আমাকেও মেরে গেল। ওয়াহিদকে ...য়ে কি যে করি কিছুই ভেবে পেলাম না।’’

রুদ্ধস্বর শেষে থেমে গেল। আমি ছাড়লাম না। ...ললাম, ‘তারপর চাচা?’

চাচা সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করলে না; বললে, ‘আর কি ...বে—যা হ’বার তা ত হয়েই গেছে।...এইবার তুই ভাই বাড়ী ...া, রাত হ’য়ে আসছে!’ বললাম, ‘হোক-গে আমি সবটা ...নতে চাই। তারপর কি হ’ল বল?’

চাচা এবার ভিন্নপথে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে বললে, ‘না ভাই আমিও এবার উঠি, আমারও সময় হ’য়ে ...সেছে।’

প্রশ্ন করলাম, ‘কিসের সময়, নামাজ?’

চাচা শুনে হাসলে। বললে, ‘না ভাই নামাজ আর করি না, খোদাকেও আর ডাকি না। ডাকার দিন যখন ছিল তখন ডেকেছি, এখন কার জন্যে ডাকব? আমার জন্যে খোদার দরকার নেই।’

কথাটা শুনে অন্তরে খুবই দুঃখ পেলাম। বললাম, ‘তবে ওয়াহিদের কি হ’ল বল?’

উপায় নেই যখন তখন চাচা আর পাশ কাটালে না। বললে, ‘ওয়াহিদের অসুখ হ’ল। প্রথম প্রথম অতটা খেয়াল করি নি। যা পেতাম তার বেশীর ভাগই রস খেয়ে খরচ করতাম।’ রস বস্তুটার অর্থোদ্ধার করতে না পেরে চুপ করে শুনে যেতে লাগলাম......‘তারপর একদিন ওয়াহিদের অবস্থা খারাপ হ’য়ে দাঁড়াল। ডাক্তার দেখাবার সম্বল ছিল না। খোদার মর্জ্জির উপর ছেড়ে দিলাম। খোদার মর্জ্জি কিন্তু ছিল অন্যরকম—আমাকে শুধু দুঃখ দেওয়া।......শেষ পর্য্যন্ত রুখতে পারলাম না ভাই—চলেই গেল! জানিস চাচা, লোকে হয়ত বলবে তার অসুখ করেছিল। কিন্তু আমি জানি আমার জন্যে সে না খেতে পেয়ে মরেছে। কোনদিন অসুখ ছিল না তার, সব বাজে কথা। আমি তাকে খেতে দিই নি, তার খিদের কষ্ট বুঝতে পারি নি। সে খালি কেঁদেছে......অষ্টপ্রহর ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে......আর আমি রসে বেহুঁস হ’য়ে থাকতাম। খোদার দোষ নেই—দোষ আমার, আমিই তাকে মেরেছি। রসে পাগল হ’য়ে গেছি তবু ত দুঃখ ভুলতে পারলাম না ভাই......’

এইবার আবোল-তাবোল সুরু হ’ল। এই কি সহজ মানুষের অনুতাপ, না পাগলের প্রলাপ! কিছুই বুঝতে পারি আর নাই পারি—দেখলাম আর বসে থাকা উচিত নয়। উঠে দাঁড়ালাম।

—‘চাচা যাচ্ছি—!’

বোধ হয় চাচা উন্মনা ছিল তাই কথার সাড়ায় চমকে তাকাল,’ কি ভাই যাচ্ছ?—আচ্ছা এস, রাতও হ’য়ে আসছে—আমিও—’

বেরিয়ে এলাম। কি খেয়াল হ’তে দাঁড়িয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি ওদিকে চাচাও উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা এলুমিনিয়ামের বাটি। জটিল রহস্যে আমি সচকিত হ’য়ে উঠলাম। ব্যাপারটি লক্ষ্য করবার মানসে একটু আড়ালে সরে গিয়ে গা ঢাকা দিলাম।

চাচা ঘরের ভিতর ঢুকে একটা মাটির কলসী বাইরে নিয়ে এল। তারপর সেই বাটিটাতে ঢাললে। অবাক কান্ড,—এ কি রস! এতক্ষণে বোধগম্য হ’ল রসই বটে, গাঁ ছেড়ে কি সবই ভুলে যেতে পারি?

চাচা তখন বাটির’ পর বাটি রস খেয়ে চলেছে। জানবার জিনিষ ফুরিয়ে গেল। আমিও বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম।

সাহিত্যিকের অমর-স্মৃতি

(৬৪৭ পৃষ্ঠার পর)

ইতিহাসের যে অধ্যায় আপনাদের কাছে উদ্ঘাটিত ক’রে দেখিয়েছি তার অনেক কিছুই আজ অতীতের সমাধিতলে বিস্মৃতিলাভ ক’রতে বসেছে—হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই এর নিদর্শন যেটুকু আছে, তাও নিশ্চিহ্ন হ’য়ে হ’য়ে যাবে প্রত্নতত্ত্বের সামিল। অথচ যাঁদের কথা আগে বলেছি—তাঁদের একজন মনস্বীও যদি অন্য কোন দেশে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ ক’রতেন, তা’ হ’লে সেদেশে আজ গ’ড়ে উঠত কত বিরাটস্তম্ভ, কত বিরাট প্রতিষ্ঠান—সে দেশ হ’য়ে উঠত জগতের তীর্থভূমি, দেশদেশান্তর থেকে অর্ঘ্য নিয়ে হ’ত পূজারীর সমাবেশ। হতভাগ্য আমরা, দুর্ভাগা এই দেশ, অতীতের বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী হ’য়েও আজ আমরা নিঃস্ব। যাক্‌, সে কথা,—আজ আমাদের ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টার কথাই বলি। শুধু মূর্ত্তি গড়লেই পূজা সম্পন্ন হয় না—প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক’রতে হয়—মন্ত্র দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, নৈবেদ্য দিয়ে আরাধনা ক’রতে হয়। (সাহিত্য-মন্দিরে সাহিত্য চর্চ্চাই পূজারীর সেই উপকরণ—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতই সাহিত্যসাধনা দিয়ে সাহিত্যিকের পূজা।) শরৎ-সাহিত্য তথা বাঙলা ভাষাজননীর সেবা করবার উদ্দেশ্যে এখানে ইতি-পূর্ব্বেই তাই ‘শরৎচন্দ্র পল্লীপাঠাগার’ প্রতিষ্ঠিত হ’য়েছে—উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা এই যে, শরৎচন্দ্রের জন্মভবন-পার্শ্বে পাঠাগারটি স্থানান্তরিত ক’রে সুষ্ঠুরূপে সংস্থাপিত ও সংরক্ষিত করা; এখানকার পল্লীসেবক-সমিতি এই উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিমধ্যেই শরৎচন্দ্রের পিতৃভবন-সান্নিধ্যে তাঁর বাল্য সাহিত্য চর্চ্চার স্মৃতি বিজড়িত বৈঠকখানা ও বাসভবনের-পরি-বেষ্টিত ভূমি মূল্য দিয়ে গ্রহণ ক’রেছেন। কিন্তু উপযুক্ত মন্দির ও বিদ্যায়তন গ’ড়ে তোলবার অর্থাভাব—সেজন্য আমরা’ দেশবাসী বিশেষ ক’রে হুগলী জেলাবাসী সকলের কাছেই এই উদ্দেশ্যে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি। বাঙলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই সাধু প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য অগ্রণী হ’য়ে ইতিমধ্যেই আবেদন পত্র প্রচার করেছেন। আশা করি আপনাদের সমবেত সহযোগিতায় আমাদের এ কল্পনা অদূরেই বাস্তবে পরিণত হ’য়ে উঠবে। *

* দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

সাহিত্য-সংবাদ

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

ইয়ং মেনস্‌ হিন্দু এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে আগামী ২২শে ও ২৫শে জানুয়ারী তারিখে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইবে। বিষয়ঃ—১৭ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'সোণার তরী' এবং ১০ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক বালকদিগের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি'। প্রবেশ মূল্য নাই। পুরস্কারঃ—উভয় বিষয়েই ফর-গুড কাপ ও মেডেল দেওয়া হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য সত্বর অনুসন্ধান করুনঃ—সম্পাদক, ইয়ং মেনস্‌ হিন্দু এসোসিয়েশন, ৬নং গঙ্গাধর সেনের লেন; বরাহনগর।

তারিখ পরিবর্ত্তন

দেশ পত্রিকার বিগত ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত বরাহনগর হস্ত-লিখিত "দীপ্তি" পত্রিকার বাৎসরিক সাহিত্য প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপিত ২৯শে পৌষ তারিখের পরিবর্ত্তন করিয়া আগামী ১৪ই মাঘ পর্য্যন্ত করা হইল।

সম্পাদক—শ্রীকালিদাস দত্ত, ২৪নং প্রামাণিকঘাট রোড, বরাহনগর।

আধুনিক সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা
বালী সরস্বতী পাঠাগার

"বালী সরস্বতী পাঠাগারের" উদ্যোগে বালীতে শীঘ্রই একটি আধুনিক সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইতেছে। নর-নারীনির্ব্বিশেষে যে কেহ উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। আধুনিক সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ-গায়ক ও গায়িকাকে এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবেন ও নারী-দের মধ্যে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া 'রৌপ্য-পদক' উপহার দেওয়া হইবে। নাম পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৩শে জানুয়ারী। বিশেষ বিবরণের জন্য সম্পাদক, বালী সরস্বতী পাঠাগার, দাওনাগাজী রোড, বালী, এই ঠিকানায় লিখিতে হইবে। প্রতিযোগিতার তারিখ—২৫শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকার মধ্যে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথিতযশা যে কোন লেখক লেখিকার রচিত অংশ আবৃত্তি করা চলিবে। আবৃত্তি নাতিদীর্ঘ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ-বি-এল, সম্পাদক, "বালী সরস্বতী পাঠাগার," ১০৪নং দাওনাগাজী রোড, পোঃ আঃ 'বালী', জিলা হাওড়া।

রচনা প্রতিযোগিতা
হুগলী সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশন

হুগলী বাবুগঞ্জ সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি বাঙলা রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। রচনার বিষয় (১) পল্লী উন্নয়নের প্রকৃষ্ট পন্থা (২) অস্পৃশ্যতা। প্রথমটি সর্ব্ব-সাধারণের জন্য এবং উহা ২০০০ কথার অধিক হইবে না। দ্বিতীয়টি কেবলমাত্র এসোসিয়েশনের সভ্যগণের মধ্যে সংবদ্ধ এবং উহাও ২০০০ কথার অধিক হইবে না। প্রতিযোগিতার প্রবেশ মূল্য নাই। রচনা পাঠাইবার শেষ দিন ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ সাল।

দুইটি রৌপ্য-পদক রচনার প্রথম স্থান অধিকারীদের প্রদান করা হইবে। সকল রচনা নিম্নলিখিতের নিকট উক্ত সময়ের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীসমরকুমার সেন বি-এ, সম্পাদক, সাহিত্য-বিভাগ হুগলী সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশন, বাবুগঞ্জ, হুগলী।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

(৬০৫ পৃষ্ঠার পর)

হইতেছে এই যে উহারা উভয়েই বস্তুত রাষ্ট্রের সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ যাহার বশে রাষ্ট্র তাহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-সকলের অবাধ কর্ম্ম, শক্তি, মর্য্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকে নিজের অধীন করিয়া রাখিতে চায়। মিথ্যাটি হইতেছে ইহার পিছনের এই ধারণাটি যে রাষ্ট্র তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও একটি মহত্তর বস্তু এবং নিজের বা মানবজাতির কোন অনিষ্ট সাধন না করিয়াই সে এই অত্যাচারমূলক আধিপত্য দাবী করিতে পারে।

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রবাদ বহুদিন পরে আবার মাথা তুলিয়াছে এবং জগতের চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে প্রভাবিত করিতেছে। ইহা নিজেকে দুইটি হেতুর দ্বারা সমর্থন করিতেছে, একটি হইতেছে মানবজাতির বাহ্যিক স্বার্থরক্ষা, আর একটি তাহার উচ্চতম নৈতিক প্রবৃত্তি। ইহা দাবী করিতেছে যে, ব্যক্তিগত অহমিকাকে সমাজের স্বার্থের সম্মুখে আত্ম-বলিদান দিতে হইবে, মানুষ জীবন ধারণ করিবে নিজের জন্য নহে, পরন্তু সমষ্টির জন্য, সমাজের জন্য। ইহা বলিতেছে যে, মানবজাতির কল্যাণ ও প্রগতি নির্ভর করিতেছে রাষ্ট্রের দক্ষতা ও সুশৃঙ্খলার উপরে। রাষ্ট্রের দ্বারাই ব্যষ্টির ও সমষ্টির অর্থ ও কামের সকল ব্যাপার ব্যবস্থিত হইবে, ব্যক্তি নিজে যাহা এবং তাহার যাহা কিছু আছে, তাহার বল, বুদ্ধি, চিন্তা, অনুভব, জীবন সমস্তই রাষ্ট্রের দ্বারা সাধারণের কল্যাণের জন্য প্রযুক্ত (যুদ্ধের ভাষায় "mobilised") হইবে। এই মতেরই চূড়ান্ত হইতেছে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ (The Socialistic ideal) এবং সেই পরিণতির দিকেই মানবজাতি খুবই দ্রুত অগ্রসর হইতেছে বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্রবাদ বিরাট সঞ্চালক শক্তি লইয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধাবিত হইয়াছে, যাহা কিছু তাহার প্রতিবন্ধক হইবে অথবা অন্যান্য মানবীয় প্রবৃত্তির অধিকার দাবী করিবে সে-সবকেই সে তাহার চক্রনিম্নে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে উদ্যত। অথচ যে দুইটি তথ্যের উপর সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে সেই দুইটিই হইতেছে আমাদের সমস্ত মানবীয় দাবী ও ঘোষণায় সত্য ও মিথ্যার যে সাংঘাতিক মিশ্রণ রহিয়াছে তাহাতে পরিপূর্ণ। এমন সন্দিৎসু ও পক্ষপাতহীন চিন্তা দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন যাহা কথার দ্বারা প্রতারিত হইবে না, নতুবা আমাদিগকে অবশ্যভাবে পুনরায় এক মিথ্যা-চক্রের আবর্ত্তন করিতে হইবে। তবেই আমরা প্রকৃতির সেই গভীর বহুমুখী সত্যে উপনীত হইতে পারিব যেটিকেই আমাদের আলোক ও দিশারী বলিয়া গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।*

(ক্রমশ)

*The Ideal of Human unity হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

শনিবার ২১শে জানুয়ারী হইতে চিত্রায় নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি "অধিকার" মুক্তিলাভ করিবে। "অধিকার" ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া। চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন ইউসুফ মুলজী; শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন অতুল চ্যাটার্জ্জি এবং সংগীত পরিচালনা করিয়াছেন তিমিরবরণ। বিভিন্ন ভূমিকায় প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনা, মেনকা, পাহাড়ী সান্যাল, ইন্দু মুখার্জ্জি, শৈলেন চৌধুরী, পঙ্কজ মল্লিক, চিত্রলেখা, অহি সান্যাল, মণ্টু প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

অধিকারের কাহিনী সম্বন্ধে মোটামুটি আমাদিগকে যেটুকু জানান হইয়াছে তাহা এইঃ—অধিকারের কাহিনী মানুষের অধিকার লইয়া। কাহার অধিকারের সীমা কতদূর এবং কোন স্তরের মানুষ, কতখানি দাবী করিতে পারে, এই প্রশ্ন লইয়াই ছবিখানি তোলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজের কিছু কিছু সমস্যাও এই ছবিতে আলোচিত হইয়াছে।

*　*　*　*　*

এককালের সুপ্রসিদ্ধ বালক অভিনেতা জ্যাকি কুগান এখন ২৩ বৎসর বয়স্ক যুবক। সে সম্প্রতি সুন্দরী অভিনেত্রী বেটী গ্রেবলকে বিবাহ করিয়াছে। ছেলেবেলায় অভিনেতা হিসাবে সে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছে, সাবালক হইয়া তাহা সে তাহার মাতার নিকট হইতে চাহিলে তাহার মাতা তাহা দিতে অস্বীকার করে। সেজন্য সে ৪০ লক্ষ ষ্টার্লিং-এর দাবী করিয়া তাহার মাতার বিরুদ্ধে এক মামলা আনয়ন করিয়াছে। আদালতে তাহার মাতা জানাইয়াছে যে, কুগান অত টাকা উপার্জ্জন করে নাই এবং তা'ছাড়া নাবালক হিসাবে সে যত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহার দাবী সে করিতে পারে না। মামলার ফল যাহাই হউক না কেন, ইহাতে অন্যান্য অল্পবয়স্ক অভিনেতা অভিনেত্রীদের খুব সুবিধা হইল। কারণ, ম্যাজিষ্ট্রেট এই আদেশ দিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোন বালক বালিকাকে পর্দ্দায় আনিতে হইলে তাহাকে যে বেতন দেওয়া হইবে তাহার উপযুক্ত অংশ যেন তাহার ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখা হয়। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, শার্লি টেম্পল, ফ্রেডি বার্থালোমিউ বৎসরে ১ লক্ষ ষ্টার্লিং উপার্জ্জন করে এবং ডিনা ডারবিন এক সময় ১৭ মাসে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ষ্টার্লিং উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

নিউ থিয়েটার্সের "অধিকার" চিত্রে শ্রীমতী মেনকা, যমুনা ও প্রমথেশ বড়ুয়া। শনিবার হইতে চিত্রায় দেখান হইবে'

*　*　*　*　*

ফিল্ম কর্পোরেশন "রিক্তা" নাম দিয়া একখানি বাঙলা ছবি তোলা আরম্ভ করিয়াছেন। পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত সুশীল মজুমদার। গত ১৬ই জানুয়ারী হইতে সুটিং আরম্ভ হইয়াছে। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছায়া, তুলসী লাহিড়ী, ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য্য, দেববালা, মোহন ঘোষাল, সন্তোষ সিংহ, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। মিঃ এ সেনগুপ্ত চিত্র গ্রহণ করিতেছেন; রবীন চ্যাটার্জ্জি শব্দ গ্রহণ করিতেছেন এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনা করিতেছেন।

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস

বাঙলার শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা 'বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস' সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে এ্যাথলেটিক্সের পাঁচটি বিষয়ে বাঙলার নূতন রেকর্ড স্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বাঙলার কোন এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে এইরূপে বিভিন্ন পাঁচটি বিষয়ে নূতন রেকর্ড স্থাপিত হয় নাই। এমন কি একই বৎসরে বাঙলার এ্যাথলেটিক্সের পাঁচটি বিষয় নূতন রেকর্ড হইয়াছে বলিয়াও কখনও শোনা যায় নাই। বাঙলার এ্যাথলীটগণ দ্রুত উন্নতির পথে যে চালিত হইয়াছেন, তাহারই প্রমাণ—এই বৎসরের বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টসের ফলাফল দিয়াছে। শীঘ্রই ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙলার এ্যাথলীটগণের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই বাঙলার সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের ধারণা হইয়াছে। সেইজন্য এই বৎসরের বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টের ফলাফল বাঙলার সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের প্রাণে অপূর্ব্ব উৎসাহ ও আনন্দ দান করিয়াছে। কিন্তু আমরা সেই উৎসাহ ও আনন্দ লাভ করিতেছি না। বাঙলার এ্যাথলীটগণের সম্মান বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু বাঙালীর হইবে না—ইহাই আমাদের বেদনা দিতেছে। কয়েক বৎসর পরে বাঙলার এ্যাথলেটিক্সের সকল সম্মান অবাঙালী ও ইউরোপীয়ান এ্যাথলীটগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহারই পূর্ব্ব-আভাষ আমরা পাইতেছি। গত কয়েক বৎসর হইতে এই বিষয় আমরা বাঙালী এ্যাথলীটগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রতি বৎসর কিভাবে ধীরে ধীরে বাঙালী এ্যাথলীটগণ বিভিন্ন বিষয়ের সম্মান অর্জ্জন হইতে বঞ্চিত হইতেছে, তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কেন যে বাঙালী এ্যাথলীটগণ সজাগ হন নাই তাহা তাঁহারাই জানেন। এই বৎসর পুনরায় বর্শা ছোড়া ও গোলা ছোড়ার সম্মান বাঙালী এ্যাথলীটগণের ভাগ্যে জুটিল না। কেবলমাত্র পোলভল্টের রেকর্ড বাঙালী এ্যাথলীট দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আগামী বৎসরে এই বিষয়েও বাঙালী এ্যাথলীটকে প্রথমস্থান অধিকার করিতে দেখা যাইবে না, তাহার কিছু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

এই বৎসরের বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টের ফলাফল অবলোকন করিলে অধিকাংশ বিষয়ে ইউরোপীয়ান ও পাঞ্জাবী এ্যাথলীটগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আগামী বৎসরে উক্ত অবাঙালী এ্যাথলীটগণের নামের সংখ্যা ফলাফলের তালিকায় আরও বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের উক্তি ঈর্ষাপ্রণোদিত নহে। অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত থাকিয়াই আমাদের এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছে। বাঙালী এ্যাথলীটগণকে উপযুক্ত শিক্ষাধীনে রাখিলে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইত, কিন্তু বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের প্রত্যেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজ নিজ নাম জাহির করিবার জন্য এতই ব্যস্ত যে, বাঙালী এ্যাথলীটগণের উন্নতি বা সম্মানের কথা ভাবিবার সময় তাঁহাদের নাই। জাতীয়তা বোধশূন্য এই সমস্ত পরিচালকগণ যতদিন ইহার নিয়ন্তা থাকিবেন ততদিন বাঙালী এ্যাথলীটগণের উন্নতির কোনই আশা নাই। অপ্রিয় সত্য বলা নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই ইহা আমাদের বলিতে হইতেছে।

এই বৎসর বেঙ্গল অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যে সকল নূতন রেকর্ড হইয়াছে তাহার বিভিন্ন বিষয়ে প্রথমস্থান অধিকারীদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

বাঙলার নূতন রেকর্ড

বর্শা নিক্ষেপঃ—সার্জ্জেণ্ট প্রিণ্টলী (কলিকাতা পুলিশ); দূরত্বঃ—১৬৬ ফুট ৮ ইঞ্চ।

হপ্ ষ্টেপ জাম্পঃ—জে এল হে (কলিকাতা পুলিশ); দূরত্বঃ—৪২ ফুট ১০½ ইঞ্চ।

পোলভল্টঃ— এ মুখার্জ্জি (প্রেসিডেন্সী কলেজ); উচ্চতাঃ— ১১ ফুট ২½ ইঞ্চ।

গোলা ছোড়াঃ—এন এ কার্নেন্ডার (বেঙ্গল হ্যারিয়ার্স); দূরত্বঃ—৪০ ফুট ২½ ইঞ্চ।

ডিসকাস ছোড়াঃ—প্রাইভেট শ (বর্ডার রেজিমেণ্ট); দূরত্বঃ— ১১৮ ফুট ৬ ইঞ্চ।

বিভিন্ন বিষয়ের প্রথমস্থান অধিকারীদের তালিকা

২৬ মাইল ম্যারাথন দৌড়ঃ—ভুরিলাল (আই এ ক্যাম্প); সময়ঃ—৪ ঘণ্টা ২৬ মিঃ ৪৫ সেঃ

দৈর্ঘ্য লম্ফনঃ—জে এল হে (কলিকাতা পুলিশ); দূরত্বঃ- ২২ ফুট ৬½ ইঞ্চ।

৫০০০ মিটার সাইকেলঃ—এ ঘোষ (আই এ ক্যাম্প); সময়ঃ- ৯ মিঃ ৪৯-৪/৫ সেঃ।

উচ্চ লম্ফনঃ—বি বসু (আই এ ক্যাম্প); উচ্চতাঃ—৫ ফুট ৮½ ইঞ্চ।

১০০০০ মিটার সাইকেলঃ—জে এন ঘোষ (আই এ ক্যাম্প); সময়ঃ—২০ মিঃ ১৯ সেঃ

১০০ মিটার দৌড়ঃ—জেড এইচ খাঁ (বেঙ্গল হ্যারিয়ার্স); সময়ঃ—১১-১/৫ সেঃ।

১১০ মিটার হার্ডলঃ—এফ গ্যাঞ্জার (বেঙ্গল হ্যারিয়ার্স); সময়ঃ—১৬-৪/৬ সেঃ।

২০০ মিটার দৌড়ঃ—জে ফলস (কলিকাতা পুলিশ); মেণ্ট); সময়ঃ—২ মিঃ ৪-৪/৫ সেঃ।

৫০০ মিটার দৌড়ঃ—ভুরিলাল (আই এ ক্যাম্প)।

৩০০০ মিটার সাইকেলঃ—এ ঘোষ (আই এ ক্যাম্প); সময়ঃ—৬ মিঃ ১০ সেঃ

দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপঃ—আই এ ক্যাম্প ১৮৮ পয়েণ্ট লাভ করিয়া।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানঃ—সার্জ্জেণ্ট প্রিণ্টলী (কলিকাতা পুলিশ) ৩৭ পয়েণ্ট লাভ করিয়া।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৯ই জানুয়ারী—

উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য রণপুরে নিহত মেজর ব্যাজালগেটের স্থানে ভারত সরকারের বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগের মেজর এণ্ডার্সন নামক জনৈক প্রবীণ অফিসার উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহের পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

অদ্য প্রাতে বাটানগরে বাটা কোম্পানীর জুতার কারখানায় পুলিশের গুলী চালনার ফলে চারিজন ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিক গুরুতর আহত হইয়াছে। এই চারিজন ছাড়া পুলিশের লাঠি চালনার ফলে আরও পাঁচ-ছয়জন সামান্য আহত হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, গত পাঁচদিন যাবৎ বাটানগরের জুতার কারখানায় ধর্ম্মঘট চলিতেছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও সংবাদ সরবরাহ বোর্ডে'র' উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে ২৪টি বক্তৃতা ও বেতারযোগে তাহা প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই সকল বক্তৃতা করিবেন। সোমবার অপরাহ্ণে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় "শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙালী" সম্বন্ধে আশুতোষ হলে উঁহার প্রথম বক্তৃতা করেন।

১০ই জানুয়ারী—

ই আই রেলের আপ হাওড়া দেরাদুন এক্সপ্রেস ট্রেনখানি চিচাকী ও হাজারীবাগ রোড ষ্টেশনের মধ্যে লাইনচ্যুত হইয়াছে এবং লাইনচ্যুত গাড়ীর মধ্যে চারখানি আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে; যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, এই দুর্ঘটনার ফলে আহত ও নিহতদের সংখ্যা যথাক্রমে ৫২ এবং ২৪। লাইনচ্যুত গাড়ীগুলি বাঁধের ১৫ ফিট নিম্নে পাওয়া যায়। রেল কর্তৃপক্ষগণের বিশ্বাস কোন প্রকার দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্যের ফলেই নাকি এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ধরাইয়া দিবার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

নিজাম রাজ্যে সত্যাগ্রহ ও আইন-অমান্য আন্দোলন চালাইবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য নাগপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাব অনুসারে মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি ডি সাভারকার পনেরজন সদস্য লইয়া গঠিত এক কমিটির বিষয় ঘোষণা করিয়াছেন।

রাজসাহীতে সাহেব-বাজার মসজিদের সম্মুখে বহু মুসেলমান হিন্দুদের এক শোভাযাত্রা আক্রমণ করার ফলে কয়েকজন শোভাযাত্রী আহত হয়। প্রকাশ, শোভাযাত্রিগণ যথারীতি লাইসেন্স লইয়া নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে শোভাযাত্রা লইয়া যাইতেছিল।

হায়দরাবাদে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার জন্য বাহির হইতে সত্যাগ্রহীদল প্রেরণ বিনা সর্ত্তে বন্ধ হওয়ায়, হায়দরাবাদ সরকার এই আন্দোলন সম্পর্কে সহরের যে সকল লোক সত্যাগ্রহ করিয়া দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

মিঃ চেম্বারলেন ও লর্ড হ্যালিফাক্স অদ্য প্যারিসে পৌঁছেন। ফরাসী মন্ত্রীগণের সহিত দীর্ঘ সময় আলোচনা করিয়া বৃটিশ মন্ত্রীদ্বয় রোমে যাত্রা করেন। এই আলোচনা সম্পর্কে একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, এই দুইটি গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে যে সব বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন, তাহা আরও পাকাপাকিভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

১১ই জানুয়ারী—

চীনের যুব সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী অদ্য মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলালের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিমণ্ডলী পণ্ডিতজীকে চীন পরিভ্রমণে যাইবার অনুরোধ জানান। পণ্ডিতজী সময় এবং সুযোগ পাইলে যাইবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের আয়কর বিভাগে ইংলণ্ডের ন্যায় একটি বিশেষ তদন্ত শাখা গঠিত হইবে বলিয়া নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ। যাহারা আয়কর সম্পর্কে ফাঁকি দেয় তাহাদিগকে ধরিবার উদ্দেশ্যে এই বিভাগটি পরিকল্পিত হইয়াছে এবং পরিকল্পনা ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

আসাম পরিষদের আগামী অধিবেশনে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিবার জন্য বিরোধী পক্ষ নূতন করিয়া তোড়জোড় করিতেছে।

রাজকোটের দেওয়ান স্যার প্যাট্রিক ক্যাডেল দেওয়ানের পদে ইস্তফা দিয়া সপরিবারে বোম্বাই মেলযোগে রাজকোট রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন, প্রকাশ, এদেশে আর থাকিবেন না, ইহাই তাঁহার সংকল্প। রাজকোটের রাজা ও প্রজা উভয়েই এই দেওয়ানের শাসন অবসান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত যে সকল সংবাদপত্রের ভূপালে প্রবেশ বন্ধ ছিল, ভূপাল সরকারের আদেশক্রমে উক্ত বিধি নিষেধগুলি প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

১২ই জানুয়ারী—

শ্রীহট্ট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, বিভিন্ন কালীপূজা কমিটির সদস্যগণ সমবেত হইয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, আগামী ১৪ই জানুয়ারী, শনিবার স্থানীয় গোবিন্দচন্দ্র পার্কে শ্রীহট্ট শহরের সমস্ত কালী প্রতিমার শুদ্ধি অন্তে পুনরায় ঐ সমস্ত প্রতিমার পূজার ব্যবস্থা করা হইবে।

দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র ও অমৃতসর গুলী মারার মামলায় দণ্ডিত বন্দী শ্রীজাহাঙ্গীর লাল ও শ্রীনন্দলালকে পাঞ্জাব সরকার বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়া কারামুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

সিন্ধুর আল্লাবক্স মন্ত্রী-সভাকে অপসারণের জন্য বিপক্ষ দল সিন্ধু পরিষদে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহা ৩২—৭ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুতে ৪০ দিন ব্যাপী মৌনব্রত পালনের পর ইপির ফকির তাঁহার পর্ব্বত গুহাস্থিত অজ্ঞাত আবাস হইতে বাহিরে আসিয়াছেন।

রোমে মিঃ চেম্বারলেন, লর্ড হ্যালিফাক্স, সিনর মুসোলিনী ও কাউণ্ট কিয়ানোর আলাপ-আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। প্রকাশ, যে উদ্দেশ্যে বৃটিশ মন্ত্রীদ্বয় রোমে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, বিরোধমূলক প্রশ্নগুলির কোন সমস্যাতেই পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। সিনর মুসোলিনী তাঁহার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমধ্যসাগর, সুয়েজ খাল এবং উত্তর আফ্রিকার টিউনিস প্রভৃতি স্থানের উপর যে দখল চাহিতেছেন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তাহাতে রাজী হইতে পারেন নাই। ফ্রাঙ্কোকে "যুদ্ধরত" জাতির অধিকার দিবার জন্য মুসোলিনী যে দাবী করিয়াছিলেন তাহাও চেম্বারলেনের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয় নাই।

১৩ই জানুয়ারী—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে ১১ই, ১২ই এবং ১৩ই এই তিন দিন ব্যাপী বার্দ্দোলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির

অধিবেশন হয়। অধিবেশনে হিন্দু-মুশ্লিম সমস্যা এবং বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যাই আলোচনার বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত প্রস্তাবে স্থির হইয়াছে যে, বিহারী ও বিহার প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইবে না। কমিটি বিহারে বাঙ্গালীদের ডোমিসাইল প্রথা তুলিয়া দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ ও মুসলমানদের সমস্যা সম্পর্কে গান্ধীজী রচিত মৈত্রী পরিকল্পনা লইয়া বিশেষ আলোচনা হয়। গান্ধীজীর এই পরিকল্পনাটি "কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রতি কংগ্রেসের অনুজ্ঞার" মতই হইয়াছে।

ডেরা ইস্‌মাই খাঁর ডেপুটী কমিশনার মিঃ সি এস সলি পরলোকগত মেজর আর এস ব্যাজলগেটের স্থলে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহের পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

জয়পুর দরবারের এক আদেশে জয়পুর প্রজামণ্ডলকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রজামণ্ডলের সভাপতি শেঠ যমুনালাল বাজাজ এই মর্ম্মে এক বিবৃতিতে বলেন যে, অতঃপর তিনিই প্রজামণ্ডলের একমাত্র সদস্য থাকিবেন।

জয়পুর রাজ্যে শীঘ্রই রাজকোট রাজ্যের আন্দোলনের অনুরূপ একটি প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে বলিয়া বাদ্দোলীর এক সংবাদে প্রকাশ।

সঠিকভাবে জানা গিয়াছে যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইবার পরই মার্চ্চ মাসের মধ্য ভাগে মহাত্মাজী সীমান্ত প্রদেশে যাত্রা করিবেন।

সাগরমেলা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে ষ্টীমার ও নৌকাযোগে অনুমান ৭৫ হাজারের উপর যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল।

১৪ই জানুয়ারী—

ঢাকার অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু পুদুকোট রাজ্যের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং নূতন কাজে যোগদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু ঢাকার বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিচার করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু বাদ্দোলী হইতে বোম্বাই হইয়া অদ্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া জানুয়ারী মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে বিহার সফর করিবেন। তাহার পর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে অন্ধ্র দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং ত্রিপুরী যাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিবেন।

জাপলা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাইতেছে যে, গত ৫ই জানুয়ারী হইতে বাউলিয়া পাথরের খনির তিন হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে; পিকেটিং বেশ শান্তিপূর্ণভাবে চলিতেছে। শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট গণেশ বর্ম্মা ধর্ম্মঘট পরিচালনা করিতেছেন।

কানপুর হইতে "আনন্দবাজার পত্রিকার" নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, এই বৎসর ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ, এলাহাবাদের বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ কে এম আশ্রফ, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার ভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুক্ত শচীন সান্যাল প্রভৃতি বিশিষ্ট বামপন্থী কংগ্রেস কর্ম্মিগণ পরাজিত হইয়াছেন।

উড়িষ্যায় দেশীয় রাজ্যসমূহে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কটকে একটি সেনা-ঘাঁটি স্থাপনের সংকল্প প্রকাশ করিয়া উড়িষ্যা সরকার এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে সেনা-ঘাঁটি বসাইবার প্রাথমিক ব্যবস্থা উড়িষ্যা সরকার করিতেছেন। তালচের রাজ্য হইতে কটকে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা ৩১ হাজারের উপর দাঁড়াইয়াছে। উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডলীকে এই আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানাইবার জন্য শ্রীযুক্ত এ ভি ঠক্কর মহাত্মাজীর নিকট এক তার করিয়াছেন।

কলিকাতা আলিপুরের ফৌজদারী আদালতের প্রাঙ্গণে একটি যুবক ঠায় বসিয়া ৬২টি সিদ্ধ ডিম ভক্ষণ করে। যুবকটি আরও ২০টি ডিম ভক্ষণ করিতে পারিবে বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করে; কিন্তু তাহার বন্ধুরা বাধা দেওয়ায় সে নিরস্ত হয়। প্রকাশ, জনৈক আমেরিকান ঠায় বসিয়া ৭২টি ডিম ভক্ষণ করিয়া পৃথিবীতে রেকর্ড স্থাপন করে।

"রয়টারের" এক সংবাদে প্রকাশ, বার্লিন হইতে সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, হাঙ্গারী বলশেভিক বিরোধী চুক্তিতে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে।

১৫ই জানুয়ারী

যুক্তপ্রদেশে ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য মিঃ মহম্মদ হোসেনের মৃত্যুতে যে মুসলিম আসনটি শূন্য হইয়াছে তাহার জন্য কংগ্রেস প্রতিযোগিতা করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সরস্বতী পূজার মিছিল উপলক্ষ্যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় বর্দ্ধমান পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট ১২ই জানুয়ারী হইতে দুই মাসের জন্য বর্দ্ধমান শহরের মধ্যে পুলিশ আইন বলে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। যদি কেহ শোভাযাত্রা বাহির করিতে চাহেন তবে তাহাকে অন্ততঃ একদিন পূর্ব্বে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্য কলিকাতায় ১০৬নং কলিন ষ্ট্রীটে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ৮ বৎসর যাবৎ রাজবন্দী থাকিবার পর গত ১৯৩৮ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পরেই তাঁহার শরীর খারাপ হইয়া পড়ে। প্রকাশ তিনি রক্ত-বিকৃতি রোগে ভুগিতেছিলেন এবং ঐ রোগেই তিনি মারা যান।

বারদৌলী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সহিত মহামান্য আগা খাঁয়ের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সমস্যা এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আলোচনার সময় একমাত্র সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল উপস্থিত ছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার জন্মভূমি হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অদ্য অপরাহ্নে উহার আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। শরৎ স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে দেবানন্দপুরের আর একজন প্রসিদ্ধ কবি অন্নদামঙ্গল রচয়িতা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রেরও স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় কবি ভারতচন্দ্রের স্মৃতিফলকেরও আবরণ উন্মোচন করেন। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের এক বিরাট সমাবেশ হয়।

টোকিওর বৃটিশ রাষ্ট্রদূত প্রিন্স কনোয়ের ঘোষণা সম্পর্কে জাপানের নিকট একটি কড়া নোট দিয়াছেন। এই নোটে জাপান চীনে যে নীতি অনুসরণ করিতেছে তাহাতে দারুণ উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে। নোটে বলা হইয়াছে যে, জাপ-গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহার সহিত চীনে জাপানের সাম্রাজ্য লোভ নাই এবং জাপান চীনের সার্ব্বভৌম অধিকার স্বীকার করে—প্রিন্স কনোয়ের এই ঘোষণার কি সামঞ্জস্য আছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৪৫ সাল, 28th January, 1939. [১১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস—

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। ভারতবাসীরা স্বাধীনতা চায়, যাহারা মানুষ তাহারাই স্বাধীনতা চায়, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। যেখানে এই অধিকার নাই, সেখানে মানুষ মানুষ হইয়া উঠিতে পারে না। পরাধীনতার চাপে মানবধর্ম্ম ব্যাহত হয়, মানব-সমাজ পীড়িত হয় এবং মানব-সমাজকে লইয়াই বিশ্ব-মানবতা, বিশ্বমানব সমাজ। সুতরাং দেশ বিশেষের পরাধীনতার প্রতিক্রিয়া বিশ্বমানব-সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়—অধর্ম্মের প্রভাবে বিশ্বমানব-সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; ধর্ম্ম নষ্ট হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হয় বলিয়াই শান্তি এবং স্বস্তিও বিনষ্ট হয়। তাহার ফলে সভ্যতা ধ্বংস হইয়া থাকে।

এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। দেশ বিশেষের বিশিষ্টতা যতই থাকুক না কেন, কোন দেশই কোন দেশ হইতে একেবারে বিশ্লিষ্ট নয়। পরাধীনতার ফলে এক দেশের আবহাওয়া যদি বিষাক্ত হইয়া উঠে তবে অন্য দেশে তাহা ছড়াইবেই। পরাধীনতার পাপ, এত বড় পাপ, সে পাপের ফল শুধু যে-জাতি পরাধীন সেই জাতিই ভোগ করে না, সমস্ত জগতের লোককে কোন না কোন সূত্রে তাহা ভোগ করিতে হয়। এমন কি যে-জাতি একটা দেশ বা একটা জাতিকে পরাধীন করিয়া রাখে, বাহ্যত ব্যবহারিক স্বার্থের বড় একটা লাভের দিক সে দেখে বটে; কিন্তু কার্য্যত মানবত্বের দিক হইতে লাভের চেয়ে তাহার লোকসানই হয় বেশী। সবলের সংস্পর্শে মানুষ বা জাতি সবল হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে দুর্ব্বলের সংস্পর্শে দুর্ব্বলের পাপগুলো পরোক্ষভাবে আসিয়া প্রবলের ঘাড়ে চাপে। তাহার স্বার্থপরতা বাড়ে, সংকীর্ণতা বাড়ে, ভোগ-লালসা বাড়ে, বাড়ে আরামপ্রিয়তা, মোটের উপর নৈতিকবল বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, পরা-ধীনের সংস্পর্শে প্রবলের সেই নৈতিক মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়া যায় এবং সে পশুত্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। পরিশেষে তাহার নিজের মধ্যেও দুর্ব্বলতা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই যে দুনিয়া এমনই কায়দায় গড়া যে, এখানে পরের অনিষ্ট করিয়া নিজে বড় হইবার উপায় বস্তুত নাই। একটা জাতি, অপর একটা জাতির উপর অত্যাচার করিতে পারে, অনাচার করিতে পারে কিছুদিন, কিন্তু কালে সেই অনাচার এবং অত্যাচার প্রতি-ক্রিয়ার ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার নিজকেই আঘাত করে—অত্যাচারীর কনক-কিরীট ধূলায় গড়াগড়ি যায়। তাহার রাজ্য-সাম্রাজ্য এলাইয়া পড়ে। জগতে ইহাই ঐতিহাসিক সত্য এবং সে সত্যকে ব্যতিক্রম করিবার উপায় নাই।

এই সত্যই বর্ত্তমানে প্রকটিত দেখা যাইতেছে। পরকে শোষণ করিবার, লুণ্ঠন করিবার ঝোঁক একদিকে যেমন উগ্র হইয়া উঠিয়া বিশ্বময় বিষ-বাষ্প বিস্তার করিতেছে, তেমনিই অপর দেশকে অধীন রাখিয়া শোষণ করিবার প্রতিক্রিয়ার পাপে যাহারা এতদিনের বনিয়াদী সাম্রাজ্যবাদী ছিল, তাহাদের মধ্যেও জীর্ণতা দেখা দিয়াছে। তাহাদের সাম্রাজ্য-শক্তি সকল দিক হইতে এলাইয়া পড়িতেছে।

ভারতবাসীরা আজ স্বাধীনতা চায়। স্বাধীনতা চায় নিজেরা বাঁচিবার জন্য, নিজেরা মানুষ হইবার জন্য; কিন্তু শুধু তাহাই নহে, ভারতবাসীরা স্বাধীনতা চায় মানব-সমাজ এবং মানব-সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য। ভারতের পরাধীনতাকে কেন্দ্র করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের যে স্বার্থমূলক রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সমগ্র জগতে তাহা সংঘাত তুলিতেছে। যে পরাধীন জগতে তাহার পাপের তুলনা নাই। নিজের পাপ সে নিজে ত ভোগ করেই, অপরকেও তাহার সেই পাপের জন্য ফলভোগ করিতে হয়। ভারতবর্ষ যদি আজ স্বাধীন থাকিত তাহা হইলে জগতের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা আজ এতটা জটিল আকার ধারণ করিতে পারিত না। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে যে মানবধর্ম্ম-বিরোধী ভাব বাড়িয়া চলিয়াছে, ভারতের স্বার্থ শোষণের প্রবৃত্তি তাহার মূলে সামান্য নহে, ভারত শোষণের স্বার্থকে নিরাপদ রাখিবার জন্য নৈতিক অধোগতি স্বীকৃতির হীনতা এবং দীনতার পাপ-প্রবৃত্তির প্রশ্রয়ের পরিমাণ অল্প নয়।

পরাধীনতা ভারতকে দরিদ্র করিয়াছে, ভারতকে দুর্ব্বল করিয়াছে, ভারতকে অসহায় করিয়াছে। ভারতের ব্রিটিশ-জাতির অধীনতার সব চেয়ে বড় কুফল হইয়াছে, মহামতি গোখলের

ভাষায় বলিতে গেলে—ভারতবাসীদের নিজ্জীবতায়, মনুষ্যত্ব-হীনতায়। এই অবস্থা হইতে ভারতকে উদ্ধার করা শুধু রাজনীতি সাধনা নয়, ইহাই হইল বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম সাধনা, ইহাই হইল আধ্যাত্মিকতার সার কথা। এই সাধনাকে স্বাদেশিকতার নামে সঙ্কীর্ণতা বলা ভুল। জাতীয়তা বলিয়া বিশ্বধর্ম্মের বিরোধী এই ব্যাখ্যা দিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করা নিতান্তই ক্লীবতা, ন্যাকামী এবং ভণ্ডামী। ভারতবাসীর পক্ষে বিশ্বমানবতার সাধনা, ভারতের এই স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তা ছাড়া অন্য কিছুই হইতে পারে না। এই যে সত্য, এই সত্যটিকে আজ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। পরাধীন জাতির ধর্ম্মের নামে দার্শনিকতার ভণ্ডামী নানা রকমে আসিয়া জুটে; মিথ্যাচার, কপটতা এবং ভীরুতা নানা ভোল ধরিয়া আসিয়া তাহার মানসিক সুস্থতাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া থাকে। আজ সে সব শক্ত রকমে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সময় আসিয়াছে।

ভারতবাসীরা স্বাধীনতা চায়, লর্ড মেকলে একদিন গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীরা নিজেরা যেদিন নিজেদের দেশের স্বাধীনতা চাহিবে সেদিন ইংরেজের পক্ষে গর্ব্বের দিন হইবে। মেকলে সাহেবের এই বিশ্বাস পুরা রকমে ছিল যে, তাঁহার বংশীয়েরা ভারতবাসীদের মেদ-মজ্জায় ইংরেজ-প্রভুত্বের মর্য্যাদা এমন করিয়া ঢুকাইয়া ভারতবাসীদের আত্মসম্বিৎকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে যে, ব্রিটিশ-প্রভাব-বিনির্ম্মুক্ত স্বাধীনতার কল্পনা ভারতবাসীরা কোনদিনই করিতে পারিবে না। চেষ্টার সেদিকে ত্রুটি অবশ্যই কিছু হয় নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতবাসীরা জাগিয়াছে, শুধু জাগেই নাই, জাতীয় পতাকার মূলে দাঁড়াইয়া আজ ব্রিটিশ-প্রভাব-বিনির্ম্মুক্ত পূর্ণ-স্বরাজের দাবী করিতেছে।

ভারতের স্বাধীনতা আজ আর দূরে নাই, নাই কল্পনা-বিলাস, তাহা বাস্তব সত্যে পরিণতির সফল সম্ভাবনা লইয়া পরিতৃপ্তির অভিমুখে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ভারত স্বাধীনতা পাইবেই, তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার শক্তি কাহারও নাই। সাম্রাজ্যবাদীর দল এ সত্যকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া লইয়াছে। কিন্তু স্বার্থের দায় বড় দায়, বিশেষত জগতের বর্ত্তমান এই বে-কায়দার মধ্যে, তাই সাম্রাজ্যবাদীরা কায়দা করিয়া ভারতবর্ষে নিজেদের প্রভুত্বের ঘাঁটি পাকা রাখিবার জন্য শেষ কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছে। এই কৌশল ব্যক্ত হইতে চলিয়াছে—যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর আকারে। কিন্তু ভারতবাসীরা এই প্রলোভনে বিড়ম্বিত হইবে না—তাহারা চায় দেশের পূর্ণ-স্বাধীনতা, ব্রিটিশ-প্রভাব-বিনির্ম্মুক্ত পূর্ণ-স্বরাজ; কোটি কণ্ঠে সেই সংকল্পই তাহারা ব্যক্ত করিয়াছে। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা ভীরু, ক্লীব এবং কাপুরুষ, সাহসে তাহাদের না কুলায় তাহারা সরিয়া দাঁড়াক। সংকল্পশীল সাধকের দল পূর্ণ-স্বাধীনতার সাধনা হইতে বিচলিত হইবে না। যে হস্তে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে তাহা আর অবনমিত হইবে না—যতদিন দেহে আছে প্রাণ। স্বাধীনতার সাধনা দুর্ব্বলের দ্বারা হয় না, সে সাধনায় চাই শক্ত লোক, ভারতে তেমন শক্ত লোক জন্মিয়াছে, যাহারা দেশের জন্য, জাতির জন্য নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিতে জানে, যাহারা জানে দুঃখ-কষ্টকে অম্লানমুখে বরণ করিয়া লইতে। স্বাধীনতা ভিক্ষায় মিলে না, মিলে না আবেদন-নিবেদনে—এ সত্য বহুদিন পূর্ব্বেই ভারতের স্বাধীনতার উপাসকেরা উপলব্ধি করিয়াছেন; করিয়াছেন বাঙলার স্বদেশপ্রেমিক সন্তানের দল। স্বাধীনতা যাঁহারা চান, স্বাধীনতার যে মূল্য তাহাও তাঁহারা দিতে প্রস্তুত আছেন। ২৬শে জানুয়ারীর স্বাধীনতা দিবসে জগতের সম্মুখে ভারত হইতে এই সত্যই বিঘোষিত হইয়াছে

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের পদ—

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের পদের জন্য এবার প্রতিবাদ হইবে দেখা যাইতেছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইতিমধ্যেই ভারতের কয়েকটি প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে রহিয়াছেন ডাক্তার সীতারামিয়া। বুঝা যাইতেছে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার অধিকার তাঁহার আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। দেশের প্রতিনিধিদের মতের উপরই তিনি নির্ভর করিবেন। সুভাষচন্দ্রের এই উক্তি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কংগ্রেসের ভাবী নীতি সম্পর্কে কোন কোন বিষয়ে নেতাদের মধ্যে গুরুতর রকমের মতভেদ ঘটিতেছে। নীতি-সম্পর্কিত এই মতদ্বৈধের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র যে কথা বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিকতার দিক হইতে তাহার যাথার্থ্য স্বীকার করিতেই হয়। লোকমান্য তিলকও এক সময়ে এইরূপ মতই ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দেশের লোকের যে মত আমি তাহারই সমর্থন করিব। মতদ্বৈধের ক্ষেত্রে দেশের লোকের মত কোন্‌টি ইহা নিশ্চিত করিতে হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যক্তিত্বমূলক নয়, নীতিমূলক। ব্যক্তিগত মান-সম্মান বা প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রশ্ন এখানে বড় প্রশ্ন নয়, কিন্তু বড় প্রশ্ন হইল—দেশের সম্মুখে যে সব সমস্যা আসিতেছে, সেগুলির সম্বন্ধে দেশের প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্বরূপে কংগ্রেস কোন্ নীতি অবলম্বন করিবে, তাহা লইয়া। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র এবং ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া ইঁহারা উভয়েই সমগ্র জাতির শ্রদ্ধার্হ। ইঁহারা উভয়েই দেশের এবং জাতির মুক্তি-সংগ্রামের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শ্রদ্ধার তারতম্যের বিচারে নয়—নীতির বিচারে। দেশের আসন্ন সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান সমস্যা আমাদের চোখে যেটি পড়িতেছে, সেটি হইল যুক্তরাষ্ট্র প্রণালী সম্পর্কিত। এ সম্বন্ধে ভিতরে ভিতরে নেতাদের মধ্যে যে মতভেদ ঘটিয়াছে, আমরা বাহির হইতেও ইহার আভাষ একেবারে না পাইতেছিলাম, এমন নহে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীর বিরুদ্ধতা করিবেন এবং এ পর্য্যন্তও বলিয়াছেন যে, দরকার হইলে সেই বিরুদ্ধতার জন্য সত্যাগ্রহ বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধও করিতে হইবে। অপরপক্ষে শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি সেদিনও বলিয়াছেন যে, এই যুক্তরাষ্ট্র প্রণালী সম্বন্ধে বড়লাট ও মহাত্মা

গান্ধীর মধ্যে এখনও একটা মিটমাট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তির কথা শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি আইনসভাওয়ালা কংগ্রেসী দলেরই যে প্রতিধ্বনি ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ পক্ষের মত যতদূর আমরা বুঝিয়াছি তাহা এই যে, যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর কতকগুলি ব্যবস্থার একটু পরিবর্ত্তন ঘটিলেই প্রাদেশিক বিভাগে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ন্যায়, কেন্দ্রস্তরেও তাঁহারা কংগ্রেসী হিসাবে কাজ করিতে রাজী আছেন। এই দুই মতের মধ্যে ডাক্তার সীতারামিয়ার মতটি এ সম্বন্ধে কি, তিনি মুখে না বলিলেও অবস্থার ভিতর দিয়া তাহা আমাদের বুঝিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না। আমরা এই কয়েক মাসের মধ্যেই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার যে উদ্দেশ্য লইয়া কংগ্রেস হইতে প্রদেশসমূহে মন্ত্রিত্ব গৃহীত হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই নিয়মতান্ত্রিকতার খাতেই সরিয়া পড়িতেছে। সংঘর্ষ বা বিরোধের ব্যবধান ভাবটা দেশের লোকের মন হইতে লুপ্ত হইতে সিয়াছে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র পর পর কয়েকটি বিবৃতিতে ইহার কুফলের সম্বন্ধে আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন। গত ৫ই জানুয়ারী বোম্বাইতে তিনি যে বক্তৃতা করেন, সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা জানি, বিদেশীর প্রভুত্ব যেখানে শাসনযন্ত্রে পুরাদস্তুর রহিয়াছে, সেখানে দেশবাসীর স্বায়ত্তশাসনে আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পশীলতা দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে তখনই যখন বিরোধের ভাবটা প্রবল হইয়া উঠে। সে ভাবটা থাকিলে সংগ্রাম বলিয়া কোন বস্তুই প্রকৃতপক্ষে থাকে না। স্বাধীনতা যদি পাইতাম, তবেই এই সংগ্রামের ভাবটা স্পষ্ট করিয়া রাখা অবশ্য দরকার হইত না। স্বাধীনতার নামগন্ধ নাই, অথচ সংগ্রামের ভাবটা নষ্ট হইতেছে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিদেশীর প্রভুত্বকে উচ্ছেদ করিবার সঙ্কল্পশীলতা শিথিল হইয়া পড়িতেছে—ইহা অপেক্ষা আতঙ্কের বিষয় কি হইতে পারে? সুভাষচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, নীতি সম্পর্কিত গুরুত্ব সত্যই যেখানে প্রকট সেখানে চোখে লাজ রাখিবার অবসর বাস্তবিকই নাই।

কংগ্রেসী নরম দলের বিবৃতি—

আগামী কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদ সম্পর্কে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম, আচার্য্য কৃপালনী, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, শ্রীযুত শঙ্কর রাও দেব, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতির ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের প্রতি আক্রমণের যে ঔদ্ধত্য রহিয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। সুভাষচন্দ্র এখনও কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট, সুতরাং কংগ্রেসের যিনি জেনারেল সেক্রেটারী তিনি তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য। রাষ্ট্রপতি তাঁহার উপরওয়ালা। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে সর্দ্দার বল্লভভাই ইঁহার ও তাঁহারই একটা মাত্র। কংগ্রেসের যিনি প্রেসিডেণ্ট তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের উপদেশ বা পরামর্শ মানিতেও পারেন, না-ও পারেন। কি প্রয়োজন বুঝিলে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া ওয়ার্কিং কমিটিও নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অনুমোদনসাপেক্ষ গঠন করিতে পারেন। কিন্তু সর্দ্দার বল্লভভাই প্রভৃতি যেভাবে কথা বলিয়াছেন,তাহাতে মনে হয়, রাষ্ট্রপতি, যিনি জাতির নির্ব্বাচিত নেতা হিসাবে কংগ্রেসের নীতি নিয়ামক এবং কর্ত্তা, তিনি শুধু সাখ্যের পুরুষ মাত্র; ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরাই জাতির নীতি নিয়ামকও কর্ত্তা। তাঁহারা এ কথাটা তলাইয়া দেখিতে চাহেন নাই যে, কংগ্রেসের যে ওয়ার্কিং কমিটি তাহা প্রেসিডেণ্টেরই নিজের নীতি পরিচালনে সুবিধা অনুযায়ী তাঁহারই দ্বারা গঠিত; প্রত্যক্ষভাবে জাতির সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক নাই। প্রত্যক্ষভাবে জাতির সম্পর্ক প্রেসিডেণ্টের সহিত; কারণ তিনি জাতির প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ব্বাচিত; সুতরাং কংগ্রেসের গণতান্ত্রিকতা যদি কিছু থাকে, তাহা প্রেসিডেণ্টের পদের ভিতর দিয়াই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি এ কথাও বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের ব্যাপারে কংগ্রেসের নীতি এবং কর্ম্মতালিকা এ সব একেবারেই অবান্তর ব্যাপার। এ কথার অর্থ আমরা বুঝিতে অসমর্থ। দেশের লোকের যাঁহারা প্রতিনিধি, তাঁহারা জানিতে চান, জাতির এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালী সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদীদের এই প্রলোভনের মুখে কংগ্রেসের নীতি কোন্ পথে নিয়ন্ত্রিত হইবে। ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়ার প্রতি জাতির শ্রদ্ধা আছে, ভক্তি আছে, একথা কে অস্বীকার করিবে; কিন্তু মতভেদ যখন ঘটিয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে, সে মত-বিভেদটা ঘটিয়াছে নীতি লইয়া, এরূপ ক্ষেত্রে যিনি সংগ্রামাত্মক কর্ম্মপদ্ধতি জাতির সম্মুখে দিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী লইয়া দাঁড়াইয়াছেন, জাতি তাঁহাকেই সমর্থন করিবে। একই ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্টপদে পুনর্নির্ব্বাচন যুক্তিযুক্ত নীতি নয়, এ কথা আমরাও স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যেরূপ বিশেষ অবস্থায় তাহা যুক্তিযুক্ত আমরা মনে করি, সেইরূপ বিশেষ অবস্থাই আসিয়াছে। আমাদের মতে জগতের বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার মধ্যে কংগ্রেস কোন্ পথ ধরিবে, ইহার উপর জাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে—স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা নির্ভর করিতেছে। আমাদের বিশ্বাস জাতি যদি আজ শক্ত হইয়া ত্যাগস্বীকারে একটু অগ্রসর হয়, সঙ্কল্পশীলতা সহকারে সংগ্রামাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে পারে, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীকে আজ দমিতেই হইবে—তিনি তেমন সংগ্রামাত্মক কর্ম্মপদ্ধতি জাতির সম্মুখে ধরিয়াছেন, জাতি অবিসম্বাদিত চিত্তে তাঁহাকেই সমর্থন করিবে। ব্যক্তিগত সৌজন্য, সম্মান বা প্রতিষ্ঠার কথা এক্ষেত্রে একান্তই অবান্তর, সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর জাতির আজ নাই।

অপরাধের কারণ—

মিঃ জে কে বিশ্বাস কলিকাতার এডিসন্যাল চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি সেদিন কলিকাতার রোটারী ক্লাবের একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে,—অপরাধীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই নিজের পেটের দায়ে অথবা স্ত্রী-পুত্রের পেটের ক্ষুধা মিটাইবার দায়ে পড়িয়া অপরাধ করিয়া থাকে। বিশ্বাস

মহাশয় এক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহার কথা অনুসারে ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, অপরাধ যদি কমাইতে হয় জেল বা সাজা তাহার প্রধান উপায় নহে, প্রধান উপায় হইল যাহারা দেশের গরীব, তাহাদের অন্নের সংস্থান করা। আইন এবং শান্তিরক্ষার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই কঠোর হইতে কঠোরতর আইনের এত প্রয়োজন নয়, যত প্রয়োজন হইল লোকের পেটের ক্ষুধা মিটানোর ব্যবস্থা করার। কিন্তু আমাদের কর্ত্তারা আইন ও শান্তিরক্ষার ফলের ধারকতা দেখেন শুধু সাজা দিবার দিক হইতে; দেশের লোকের অন্ন-সমস্যা, বেকার-সমস্যা মিটাইবার দিকে তাহাদের ঝোঁক নাই। আর থাকিলেই বা সামর্থ্য কোথায়? হাত-পা সকল দিক হইতে বাঁধা রহিয়াছে বিদেশীদের প্রভুত্বপর শাসন-নীতির প্যাঁচে প্যাঁচে। বিশ্বাস মহাশয় কারা-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কারা-ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, মানুষের মনকে বদলাইয়া দেওয়া, তাহাকে নূতন মানুষ করা; কিন্তু এদেশে বিশেষভাবে এই বাঙলা দেশে সেদিকে কোন চেষ্টাই নাই। কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টসমূহ নিজেরা শাসনভার হাতে লইয়া ইহার মধ্যেই কারা-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন; কিন্তু বাঙলা দেশের কারাগার-সমূহে আমলাতন্ত্রী ব্যবস্থা ষোল আনা বজায় তো আছেই, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই ষোল আনা কড়াকড়ি আঠার আনাতে দাঁড়াইয়াছে। বাঙলার কর্ত্তাদের বিশ্বাস, অপরাধীদের সাজা দেওয়াইতে পারিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল; সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের প্রধান অঙ্গ হইল পুলিশ। সেই পুলিশ বিভাগকে তুষ্ট-পুষ্ট করিতে পারিলেই তাঁহাদের তুষ্টি ও পুষ্টি এবং সেই তুষ্টি ও পুষ্টিতেই জাতির প্রকৃত পরমার্থ সিদ্ধি।

উড়িষ্যায় রাষ্ট্রনৈতিক সংকট—

রণপুর রাজ্যে মেজর ব্যাজালগেট নিহত হইবার পর উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য যে রুদ্রনীতি অবলম্বিত হইবে, এ আশঙ্কা ষোল আনাই করা গিয়াছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতপ ঐ ব্যাপারের পর বলিয়াছিলেন যে, ইহার পর দেশীয় রাজ্যসমূহে যে পীড়ন-নীতি চলিবে, তাহার ভীষণতার কথা ভাবিতেও আমি শিহরিয়া উঠিতেছি। রণপুরের প্রজারা কেমন অবস্থার ভিতর পড়িয়া এমন উত্তেজিত হইল এবং এরূপ নিন্দনীয় কাণ্ড ঘটাইল, ভারত গবর্ণমেণ্ট অন্যদিক হইতে তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে কি চেষ্টা করিয়াছেন জানা যায় নাই; কিন্তু রুদ্রনীতির ভীষণতার আঁচ দস্তুরমতই পাওয়া যাইতেছে। উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে কিছুমাত্র পরামর্শ না করিয়াই ভারত গবর্ণমেণ্ট কটকে সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন। এই সব সৈন্য-সামন্ত উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহে পাঠান হইবে। দেশীয় রাজ্যের রুদ্রনীতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ঢেনকানল, তালচের প্রভৃতি কয়েকটি সামন্ত রাজ্যের প্রজারা ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ভবিষ্যতে ইহা যাহাতে সম্ভব না হয়, সেজন্যও কর্ত্তারা ব্যবস্থা আঁটিতে ব্যগ্র [illegible] উড়িষ্যার বলবৎ করিবার চেষ্টা হইতেছে। ঢেনকানল এবং তালচের দরবারের পরোয়ানার বলে যাঁহাদিগকে ব্রিটিশ ভারতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে ঐ সব রাজ্যের শাসকদের হাতে দিবার জন্য 'বহিষ্কার বিধি'ও জারী করিবার কথা হইতেছে। এই আদেশ জারী হইলে তাহার কিরূপ অপপ্রয়োগ হইবে, দেশীয় রাজ্যের ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারিবেন। এমন অবস্থায় উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল যে রাজন্যরক্ষা আইন এবং 'বহিষ্কার বিধি'র আদেশ সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গবর্ণর যদি সে আপত্তিকে আমল দিতে না চাহেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টকে এ ব্যাপারে যেমন উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন সেই দৃষ্টিরই সমর্থন করেন; তাহা হইলে আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পক্ষে অন্য উপায় নাই। তাঁহাদিগকে শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেই হইবে এবং প্রয়োজন হইলে পদত্যাগ করিতে হইবে। তখন দেখা দিবে পুরাপুরি রাষ্ট্রনৈতিক সংকট। উড়িষ্যার জনমত কংগ্রেসের নীতির সমর্থক; সেখানে কংগ্রেসকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ঠিকা মন্ত্রিমণ্ডল গড়িবার চেষ্টা যে বৃথা, কর্ত্তাদের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে; সুতরাং [illegible] একমাত্র উপায় হইল, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃত্ব গবর্ণরের হাতে লওয়া। রীতিমত কংগ্রেসের সঙ্গে একটা সংঘর্ষের আবহাওয়া সৃষ্টি। কর্ত্তারাও এ সময়ে ততদূর যাইতে চাহিবেন কি না তাহা দেখিবার বিষয়; কারণ তাঁহারা বিশেষভাবেই বুঝেন যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের মুখে তেমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির মূলে অনুকূল না হইয়া বরং প্রতিকূলই হইবে। উড়িষ্যার গবর্ণর কোন্ নীতি অবলম্বন করেন, তৎপ্রতি সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। আমাদের এ বিশ্বাস আছে যে, উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল নিজেদের স্বাতন্ত্র্য মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিবেন না এবং পরোক্ষভাবে দেশীয় রাজ্যের স্বৈরাচারকে সমর্থন করিবেন না।

ভারতে জার্ম্মান প্রচারকার্য্য—

কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, মুসোলিনী ইপির ফকিরকে সাহায্য করিতেছেন; এদিকে শুনিতেছি জার্ম্মানীর হিটলারের পার্টি ভারতবর্ষে প্রবলভাবে প্রচারকার্য্য চালাইবার আয়োজন করিতেছে। হিটলারের আত্মজীবনী সস্তাদরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বার্লিনের হিন্দুস্থান ব্যুরো [illegible] জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট ভারতে তাঁহাদের স্বপক্ষে এই [illegible]রকার্য্যের ভার দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু [illegible] তাহাতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। হিটলার ভারতবাসীকে যে চোখে দেখেন, আমাদের তাহা জানিতে বাকী [illegible] হিটলারী কুলীনেরা এশিয়াবাসীদের মধ্যে জাপানীকে শুধু আর্য্য জাতির পংক্তিতে তুলিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ভারতের আর্য্যদের স্বস্তিককে তাহারা নিজেদের জা[illegible] গরিমার প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সেই ভারত-বা[illegible] তাহাদের মতে অনার্য্য। আর্য্য-অনার্য্য চুলায় যাউক, [illegible] শ্বেতাঙ্গ কৌলিন্যমর্য্যাদায় স্ফীত হইয়া তাঁহার আত্ম-[illegible]তে স্পষ্ট ভাষায় এই কথা বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(৪)

এই যে রাষ্ট্রবাদ, এই যে সঙ্ঘবদ্ধ সমষ্টির পরিকল্পনা, যাহার সম্মুখে ব্যক্তিকে বলিদান দিতে হইবে, বস্তুতপক্ষে ইহা কি? মত হিসাবে ইহার দাবী হইতেছে এই যে, যাহাতে সকলের কল্যাণ সেইটিকে ব্যক্তির উপরে স্থান দিতে হইবে; কিন্তু কার্য্যত ইহা হইতেছে ব্যক্তিকে সমষ্টিগত অহমিকার অধীন করা, সেই রাষ্ট্রনৈতিক, সামরিক অর্থনৈতিক অহমিকা কতকগুলি সমষ্টিগত উদ্দেশ্য ও উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিতে চায়; অল্প-সংখ্যক কিম্বা অধিক-সংখ্যক শাসক-স্থানীয় ব্যক্তি, যাহাদিগকে কোন রকমে জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহারা বিশাল জনমণ্ডলীর উপর ঐসব উদ্দেশ্য ও উচ্চাভিলাষ চাপাইয়া দেয়। ইহারা শাসক শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হউক অথবা, যেমন আধুনিক রাষ্ট্র সকলে ঘটিতেছে, জনসাধারণের মধ্য হইতেই অংশত চরিত্রবল দ্বারা কিন্তু প্রধানত ঘটনাচক্রের শক্তির দ্বারা আবির্ভূত হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না; আর তাহাদের আদর্শ এবং লক্ষ্যগুলি কথা ও বক্তৃতার যাদুর দ্বারা লোকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল, না—প্রকাশ্য বল প্রয়োগের দ্বারাই চাপাইয়া দেওয়া হইল তাহাতেও মূলত কোন পার্থক্য হয় না। উভয় ক্ষেত্রেই ঐ শাসক শ্রেণী বা শাসকের দল যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষার প্রতিভূ হইবে অথবা তাহার মহত্তর লক্ষ্য বা উচ্চতম প্রেরণার প্রতিভূ হইবে, সে বিষয়ে কোনই নিশ্চয়তা নাই।

জগতের কোন স্থানেই আধুনিক রাজনীতিকের সম্বন্ধে এইরূপ কিছু বলা যায় না; তিনি জাতির আত্মার, তাহার অভীপ্সা সকলের প্রতিভূ নহেন; সাধারণত তিনি তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত সাধারণ ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, অহমিকা আত্ম-প্রতারণারই প্রতিনিধি; এই সবের এবং প্রচুর পরিমাণ মানসিক অযোগ্যতা ও নৈতিক গতানুগতিক আচার, ভীরুতা ও ছলনার তিনি বেশই প্রতিভূ হন। বারবার তাঁহার সম্মুখে মহান সমস্যা সকল উপস্থিত হয়; কিন্তু তিনি মহৎভাবে সে-সবের সমাধান করেন না; বড় কথা, উচ্চ আদর্শ এ-সব তাঁহার মুখে থাকে, কিন্তু সে-সব শীঘ্রই বাহবা পাইবার জন্য দলের বাঁধা-বুলিতে পরিণত হয়। আধুনিক রাজনৈতিক জীবনের ব্যাধি ও মিথ্যা জগতের প্রত্যেক দেশেই সুপ্রকট; এই বৃহৎ ব্যবস্থাবদ্ধ মিথ্যাতে শিক্ষিত লোকেরাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সায় দেয়, মানুষ যাহা কিছুতে অভ্যস্ত, যাহা কিছু লইয়া তাহার জীবনের বর্ত্তমান বাতাবরণ গঠিত তাহাতে সায় দেয়, কেবল সেই জন্যই এই ব্যাধি ঢাকা রহিয়াছে, স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। অথচ এইরূপ সব মনের দ্বারাই সর্ব্ব-সাধারণের মঙ্গল নিরূপিত হইবে, এইসব লোকের হস্তেই তাহার ভার অর্পণ করিতে হইবে, রাষ্ট্রনামধারী এইরূপ প্রতি-ষ্ঠানের উপরেই ব্যক্তিকে তাহার সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণের ভার ছাড়িয়া দিতে ক্রমশ বেশী বেশী বলা হইতেছে। বস্তুত তাহার দ্বারা যে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল সুব্যবস্থিত হয় মোটেই তাহা নহে, ইহার দ্বারা হয় কেবল প্রচুর পরিমাণ ব্যবস্থাবদ্ধ ভুল এবং অনিষ্ট সাধন, তাহার সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণ শুভ থাকে এবং তাহাই প্রকৃত প্রগতির অনুকূল হয়, কারণ প্রকৃতি সকল সময়ে সকল ভুল-ভ্রান্তির ভিতর দিয়াই অগ্রসর হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত মানুষের অক্ষম বুদ্ধির সাহায্যেই হউক কিম্বা তাহার বাধা সত্ত্বেই হউক নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে।

কিন্তু যদিই শাসন যন্ত্রটি ইহা অপেক্ষা ভালভাবে গঠিত হয়, তাহাতে উচ্চতর মানসিক ও নৈতিক শক্তি থাকে, প্রাচীন সভ্যতাগুলি কতকগুলি উচ্চ আদর্শ ও অনুশাসন প্রয়োগ করিয়া তাহাদের শাসক শ্রেণীকে যে-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল সেইরূপ কিছু করিবার কোন উপায় আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলেও রাষ্ট্রবাদ নিজেকে যাহা বলিয়া প্রচার করিতেছে বস্তুত তাহা হইতে পারিবে না। পরিকল্পনা-নুসারে রাষ্ট্র হইতেছে সমাজের সমষ্টিগত জ্ঞান ও শক্তি সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত ও ব্যবস্থাবদ্ধ; কিন্তু কার্য্যত ইহা হইতেছে সমাজে প্রাপ্য কেবল ততটুকু বুদ্ধি ও শক্তি যতটুকু রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিশিষ্ট যন্ত্রটি উপরে আসিতে দেয়, তাহা ঐ রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ব্যবহার করে কিন্তু আবার তাহার দ্বারা বদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহার দ্বারা ব্যাহত হয়, আর সেই তরঙ্গে যে প্রচুর পরিমাণ নির্ব্বুদ্ধিতা ও স্বার্থপর দুর্ব্বলতা উঠিয়া আসে তাহার দ্বারাও ব্যাহত হয়। অবস্থা অনুযায়ী এইটিই যে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং প্রকৃতি তাহার নিরন্তর রীতি অনুসারে ইহাকে শ্রেষ্ঠভাবেই কাজে লাগায়; কিন্তু ব্যাপার আরও অনেক বেশী খারাপ হইত যদি অপেক্ষাকৃত নিরঙ্কুশ ব্যক্তিগত প্রয়াসের জন্য কতকটা ক্ষেত্র না থাকিত, ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টা রাষ্ট্র যাহা করিতে পারে না তাহা করিয়া দেয়, সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের ঐকান্তিকতা, উদ্যম ও আদর্শপরায়ণতাকে আকৃষ্ট করিয়া এবং কাজে লাগাইয়া সেইসব প্রয়াস করে, যাহা করিতে রাষ্ট্রের বুদ্ধি বা সাহসে কুলাইয়া উঠে না, সেই সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন করে যাহা সমষ্টিগত রক্ষণশীলতা বা দুর্ব্বলতা হয়ত অসম্পন্ন রাখিয়া দিত অথবা সক্রিয়ভাবে দমন করিত, ব্যাহত করিত। এইটিই হইতেছে সমষ্টিগত প্রগতির প্রকৃত সাধিকা-শক্তি। কখনও কখনও রাষ্ট্র ইহাকে সাহায্য করিতে আসে, আর যদি তাহার সাহায্যের অর্থ অযথা-কর্ত্তৃত্ব না হয় তাহা হইলে তাহার দ্বারা এক প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তেমনই কখনও কখনও রাষ্ট্র প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, তখন সে প্রগতির গতিরোধকের কার্য্য করে অথবা যে নূতন জিনিষটি গড়িয়া উঠিতেছে তাহাকে অধিকতর শক্তি এবং পূর্ণতর রূপ দিবার জন্য সকল সময়েই যে-পরিমাণ সঙ্ঘবদ্ধ বাধা ও সংঘর্ষণ প্রয়োজন হয় তাহাই জোগাইয়া দেয়। কিন্তু এখন আমরা যে-দিকে ঝুঁকিতেছে তাহা হইতেছে সঙ্ঘ-বদ্ধ রাষ্ট্রের শক্তির এমনতর বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের পক্ষে এমন বিশাল, অপ্রতিরোধ্য, জটিল কর্ম্মপ্রচেষ্টা, যাহা হয় স্বাধীন ব্যক্তিগত প্রয়াসকে একেবারেই লোপ করিয়া দিবে অথবা তাহাকে খর্ব্বিত ও দমিত করিয়া নিরুপায় করিয়া তুলিবে। রাষ্ট্রযন্ত্রটির দোষ, অপূর্ণতা ও অক্ষমতা সংশোধ-নের প্রয়োজনীয় জিনিষটি নষ্ট হইয়া যাইবে।

সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্র জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষাও নহে, এমন কি তাহা সামাজিক শক্তি সকলের সমষ্টিও নহে। তাহা তাহার সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মচেষ্টা হইতে বিশিষ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সকলের কর্ম্মশক্তি ও চিন্তাশীল মনীষাকে বাদ দেয়, চাপিয়া দেয় অথবা অসঙ্গতভাবে দমন করে; কিন্তু বর্ত্তমানের যাহা শ্রেষ্ঠ এবং ভবিষ্যতের জন্য যাহা গড়িয়া উঠিতেছে তাহা অনেক সময়ে এইসব সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মধ্যেই থাকে। রাষ্ট্র হইতেছে সমষ্টিবদ্ধ অহমিকা, সমাজের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্যের তুলনায় ইহা অনেক অপকৃষ্ট। অন্যান্য এইরূপ সমষ্টিবদ্ধ অহমিকার সম্পর্কে আসিলে এই অহমিকা কি হইয়া দাঁড়ায় তাহা আমরা জানি, এবং ইহার কদর্য্যতা এখন মানব জাতির দৃষ্টি ও বিবেকের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ব্যক্তির মধ্যে সাধারণত আত্মা বলিয়া অন্তত কিছু থাকেই এবং সেই আত্মার অপূর্ণতাগুলি সে সাত্বিক ও নৈতিক বুদ্ধির দ্বারা পূর্ণ করিয়া লয়, আবার ইহার ত্রুটি সকলও সমাজ-নিন্দার ভয়ে সংশোধন করিয়া লয়, আর তাহাও ব্যর্থ হইলে দেশের আইনের ভয়ে তাহাকে সংযত হইতে বাধ্য করে। কিন্তু রাষ্ট্র হইতেছে এমন একটি বস্তু যাহার হস্তে ক্ষমতা রহিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অথচ তাহাকে সংযত রাখিবার উপযোগী আভ্যন্তরীণ সংকোচ বা বাহ্যিক বাধা সর্ব্বাপেক্ষা কম। ইহার আত্মা বলিয়া কিছুই নাই, অথবা যাহা আছে তাহা অতিশয় অপরিণত। ইহা হইতেছে একটি সাময়িক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংবিধান, পরন্তু মনীষা ও নৈতিকতার দিক দিয়া ইহা খুবই নূ্যন এবং অবিকশিত। আর দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার এই অবিকশিত মনীষাকে সে প্রধানত এইভাবে ব্যবহার করে যে মিথ্যা কল্পনা, বাঁধা-বুলি এবং আজকাল রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা তাহার অগঠিত নৈতিক বিবেক-বোধকে ভোঁতা করিয়া দেয়। সমাজের মধ্যে মানুষ আজ অন্তত অর্দ্ধ-সভ্য হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তাহার আন্তর্জ্জাতিক জীবন আজও বর্ব্বরোচিত। সেদিন পর্য্যন্ত এক সঙ্ঘবদ্ধ অধিজাতি অপরের সহিত সম্পর্কে ছিল যেন একটি অতিকায় শিকারী জন্তু, তাহার ক্ষুধা সকল, উদর পূর্ণ হওয়ার জন্যই হউক কিম্বা ঘটনাচক্রের দ্বারা নিরুৎসাহিত হইয়াই হউক, মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু সেইগুলিই ছিল তাহার জীবনের প্রধান উপলক্ষ্য। তাহার ধর্ম্মই ছিল আত্ম-রক্ষা করা এবং অপরকে গ্রাস করিয়া আত্ম-বিস্তার করা। আজও এই অবস্থার মূলত কোন উন্নতি হয় নাই; এখন কেবল গ্রাস করা কার্য্যটি অধিকতর কঠিন হইয়াছে। একটা "পুণ্য অহমিকা" (Sacred egoism) এখনও জাতি সকলের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে এবং সেই জন্যই লুণ্ঠনপর রাষ্ট্রকে বাধা দিবার মত মানবসমাজে কোন সত্য ও প্রবুদ্ধ জনমত নাই বা কোন কার্য্যকরী আন্তর্জাতিক আইনও নাই। কেবল আছে পরাজয়ের ভয় এবং সম্প্রতি হইয়াছে বিভ্রাটজনক অর্থনীতিক বিশৃঙ্খলার ভয়; কিন্তু অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এইসব ভয় বস্তুত কার্য্যকরী হয় না।

আভ্যন্তরীণ জীবনেও বিরাট রাষ্ট্রীয় অহমিকা যে এক-কালে তাহার বাহিরের সম্বন্ধের তুলনায় ভাল ছিল তাহা নহে।* রাষ্ট্র ছিল রূঢ়, লোভী, ধূর্ত্ত, পীড়নকারী, স্বাধীন উক্তি ও মতে অসহিষ্ণু, এমন কি ধর্ম্ম বিষয়েও বিবেকের স্বাধীনতায় অসহিষ্ণু, সে যেমন বাহিরের দুর্ব্বল জাতি-সকলের উপর তেমনই অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ও শ্রেণীসকলের উপর অত্যাচার করিয়াছে। কেবল যে-সমাজকে ভর করিয়া তাহাকে বাঁচিতে হয় সেইটিকে কোন রকমে জীবন্ত, সমৃদ্ধ, বলিষ্ঠ রাখা আবশ্যক বলিয়াই তাহার কর্ম্ম স্থূলভাবে কতকটা হিতকর হইয়াছে। আধুনিক যুগে কোন কোন দিকে অধোগতি হইলেও অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। রাষ্ট্র এখন সমাজের, এমন কি ব্যক্তি-সকলেরও সাধারণ অর্থনৈতিক ও শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা করিয়া নিজের অস্তিত্বের যথোচিত কারণ দর্শাইবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছে। সমগ্র সমাজের মানসিক এবং গৌণভাবে নৈতিক-বিকাশের ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন সে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাষ্ট্রের পক্ষে বুদ্ধিমান ও নীতিমান সত্তায় পরিণত হইবার এই যে প্রয়াস, এইটি আধুনিক সভ্যতার একটি সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক ব্যাপার; এমন কি ইউরোপের মহাযুদ্ধের ফলে মানবজাতির বিবেক-বুদ্ধি অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধেও যুক্তি ও নৈতিকতার অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু রাষ্ট্র যে-সমস্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে নিজের কুক্ষিগত করিবার দাবী করিতেছে, যতই সে তাহার নূতন আদর্শ ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই তাহার এই দাবী বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহাকে অকালপক্ব বলিলে কিছুই বেশী বলা হয় না; আর যদি এই দাবী পূরণ করা হয় তাহা হইলে তাহার নিশ্চিত পরিণাম হইবে মানবীয় প্রগতিতে বাধা, এক আরামপ্রদভাবে সুব্যবস্থিত শ্লথতা, রোমক সাম্রাজ্য স্থাপনের পর গ্রীকো-রোমান জগতের উপর এইরূপ শ্লথতাই আসিয়া পড়িয়াছিল।

রাষ্ট্র যে নিজের বেদীর সম্মুখে আত্মবলিদান দিতে ব্যক্তিকে আহ্বান করিতেছে, তাহার সমস্ত স্বাধীন কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে এক সঙ্ঘবদ্ধ সমষ্টিগত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে সমর্পণ করিতে আহ্বান করিতেছে, ইহা আমাদের উচ্চতম আদর্শ-সকলের দাবী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। ফলত ইহা হইতেছে, এখন ব্যক্তিগত অহমিকার যে রূপ রহিয়াছে সেইটিকে তাহারই আর এক রূপের মধ্যে, সমষ্টিগত রূপের মধ্যে সমর্পণ করা, সে-রূপ বৃহত্তর হইলেও মহত্তর নহে, বরঞ্চ তাহা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিগত অহমিকা অপেক্ষা অনেকাংশেই হীন। পরোপকারবাদ, আত্মত্যাগের অনুশাসন, মানুষে মানুষে ক্রম-বর্দ্ধমান সংহতত্বের প্রয়োজন, মানব-জাতির এক সমষ্টিগত আত্মার ক্রমবিকাশ—এ-সবই রহিয়াছে; কিন্তু এইসব উচ্চ-আদর্শের অর্থ এই নহে যে, রাষ্ট্রের মধ্যে নিজ সত্তাকে লোপ

---

*আমি প্রাচীন ও আধুনিক-যুগের মধ্যবর্ত্তী সময়ের কথাই বলিতেছি। প্রাচীন যুগে অন্তত কোন কোন দেশে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমাজ ব্যাপারে আদর্শপরায়ণতা ছিল, একটা বিবেকবুদ্ধি ছিল, যদিও অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধে এ-সবের বিশেষ কোন অস্তিত্ব ছিল না।

করিয়া দিতে হইবে, আর ইহা যে ঐ সকল আদর্শ সিদ্ধির পন্থা তাহা মোটেই নহে। মানুষকে শিখিতে হইবে নিজেকে নিগ্রহ বা অঙ্গহীন করিতে নহে পরন্তু মানবজাতির পূর্ণতার মধ্যে নিজেকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে, ঠিক যেমন তাহাকে শিখিতে হইবে পঙ্গু বা ধ্বংস করিয়া দিতে নহে, পরন্তু তাহার অহংকে সকল প্রতিবন্ধকতা হইতে মুক্ত করিয়া প্রসারিত করিতে, এখন সে যে মহত্তর সত্তার প্রতিভূ হইতে চেষ্টা করিতেছে তাহারই মধ্যে তাহাকে লুপ্ত করিয়া দিতে এবং এইভাবেই অহংয়ের পূর্ণতা সাধন করিতে। কিন্তু এক বিরাট রাষ্ট্রযন্ত্র কর্ত্তৃক স্বাধীন ব্যক্তিকে গলাধঃকরণ হইতেছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিণতি। রাষ্ট্র হইতেছে আমাদের সাধারণ বিকাশের সুবিধা বিধায়ক একটা ব্যবস্থা মাত্র, এবং তাহাও স্থূল ব্যবস্থা; ইহাকেই একটা লক্ষ্য করিয়া তোলা কখনই উচিত নহে।

রাষ্ট্র দ্বিতীয় দাবী করে যে, সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভুত্ব এবং সর্ব্বব্যাপক কর্ম্ম প্রচেষ্টাই মানবীয় প্রগতির শ্রেষ্ঠ উপায়, ইহাও হইতেছে একটি অতিশয়োক্তি ও মিথ্যা কল্পনা। মানুষ সমাজ লইয়া বাস করে, যেমন সমষ্টিগতভাবে তেমনি ব্যক্তিগতভাবেও নিজের বিকাশ সাধনের নিমিত্ত তাহার পক্ষে সমাজ আবশ্যক। কিন্তু ইহা কি সত্য যে, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত কর্ম্মধারাই সমাজের সাধারণ প্রয়োজন সকল সিদ্ধ করিতে এবং ব্যক্তিকেও পূর্ণভাবে বিকাশ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সমর্থ? ইহা সত্য নহে। সত্য হইতেছে এই যে, রাষ্ট্র সমাজে ব্যক্তিগণের সমবেত কর্ম্মের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে, যে-সকল ত্রুটি ও বাধায় এইরূপ কর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মায় সে-সব অপসারিত করিয়া দিতে পারে। এইখানেই রাষ্ট্রের প্রকৃত উপযোগিতার শেষ। মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা—ইহাই ছিল ইংগ (English) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের দুর্ব্বলতা; আর সমবেত কর্ম্মচেষ্টার সুবিধা বিধানের অছিলায় রাষ্ট্র কর্ত্তৃক কঠোর শাসনের প্রবর্ত্তন—ইহাই হইতেছে টিউটনিক সমষ্টিবাদের দুর্ব্বলতা। রাষ্ট্র যখন সমাজের সমবেত কর্ম্মচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে—তখন সে এক বিকট যন্ত্র সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়, তাহা শেষ পর্য্যন্ত মানুষের স্বাধীনতা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং বিচিত্র বিকাশকে নিষ্পেষিত করিয়া দেয়।

রাষ্ট্র স্থূলভাবে এবং সাকল্যে কর্ম্ম করিতে বাধ্য; যে মুক্ত, সুসমঞ্জস এবং বুদ্ধি দ্বারা অথবা সহজাত সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিচিত্র কর্ম্মধারা জৈব বিকাশের বিশিষ্টতা, রাষ্ট্র তাহাতে অসমর্থ। কারণ রাষ্ট্র জৈবাবয়ব (Organism) নহে, উহা একটা যন্ত্র এবং উহা যন্ত্রের ন্যায়ই কার্য্য করে, তাহাতে কৌশল, রুচি, লালিত্য, অন্তর্বোধ কিছুই থাকে না। রাষ্ট্র চায় কলে তৈয়ারী করিতে, কিন্তু মানব-জাতি এখানে রহিয়াছে সৃজন করিতে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতিতে আমরা ইহা দেখিতে পাই। সকলের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহা যথোচিত ও প্রয়োজনীয় এবং এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পক্ষে রাষ্ট্র একান্ত উপযোগী; কিন্তু রাষ্ট্র যখন শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন সে উহাকে গতানুগতিক নিয়মে, যন্ত্রবৎ পদ্ধতিতে পরিণত করে; তাহাতে ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী শক্তি, ব্যক্তিগত বিকাশ, প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব হইয়া উঠে, হয় শুদ্ধ গতানুগতিক শিক্ষা। রাষ্ট্রের ঝোঁক সকল সময়েই হইতেছে সমরূপতার দিকে, কারণ তাহার পক্ষে সমরূপতাই সহজ, তাহার মূলত যন্ত্রবৎ প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক বৈচিত্র্য অসম্ভব; কিন্তু সমরূপতা হইতেছে মৃত্যু, জীবন নহে। জাতীয় কৃষ্টি, জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় শিক্ষা এ-সবও উপযোগী হইতে পারে যদি তাহারা একদিকে মানবীয় সংহতত্ব বুদ্ধির বিরোধী না হয় এবং অন্যদিকে চিন্তা, বিবেক ও বিকাশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরোধী না হয়; তাহারা জাতির সমষ্টিগত আত্মাকে রূপ দেয় এবং তাহাকে সাধারণ মানবীর প্রগতিতে নিজের অংশ দিতে সাহায্য করে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম, রাষ্ট্রীয় কৃষ্টি, এ-সব হইতেছে অস্বাভাবিক উপদ্রব। আর আমাদের সমষ্টিগত কর্ম্মধারার অন্যান্য দিকেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এই একই নীতি প্রযোজ্য।

রাষ্ট্র যতদিন মানবীয় জীবন ও বিকাশে প্রয়োজনীয় বস্তু থাকে ততদিন তাহার কার্য্য হইতেছে সমবেত প্রচেষ্টার সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দেওয়া, সকল বাধা অপসারিত করিয়া দেওয়া, সকল প্রকার প্রকৃতপক্ষে অনিষ্টকর অপচয় ও সঙ্ঘর্ষ নিবারণ করা—সকল স্বাভাবিক ক্রিয়াতেই কিয়ৎ পরিমাণ অপচয় ও সঙ্ঘর্ষের প্রয়োজন আছে—এবং প্রতিকারযোগ্য অবিচার অপসারিত করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং তাহার প্রকৃতির বিশিষ্ট ধারা অনুযায়ী আত্ম-বিকাশ ও ভোগের যথোচিত ও সমান সুযোগ প্রদান করা। এতদূর পর্য্যন্ত আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য সৎ এবং শুভ। কিন্তু মানুষের বিকাশের স্বাধীনতায় যতখানি অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করা হইবে উহা ততখানিই অনিষ্টকর হইবে। এমন কি সমবেত প্রচেষ্টাও অশুভজনক হয় যদি ব্যক্তিগত বিকাশের অবিরোধী সাধারণের হিতসাধনের পরিবর্ত্তে (আর ব্যক্তিগত বিকাশ ব্যতীত সাধারণের কোন স্থায়ী ও প্রকৃত হিত হইতে পারে না) উহা সমষ্টিগত অহমিকার সম্মুখে ব্যক্তিকে বলি দেয় এবং অধিকতর পূর্ণতার সহিত গঠিত মানব-সমাজের বিকাশের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা স্বাধীন ক্ষেত্র এবং উদ্ভাবন-প্রয়াসের প্রতিবন্ধক হয়। যতদিন পর্য্যন্ত মানব-সমাজ পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত না হইতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহার বিকাশের প্রয়োজন রহিয়াছে, অধিকতর পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে, ততদিন স্থিতিশীল সাধারণ কল্যাণ বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না, আর যে সব ব্যক্তিকে লইয়া জনসাধারণ গঠিত তাহাদের বিকাশকে ছাড়িয়া দিয়া প্রগতিশীল সাধারণ কল্যাণও কিছু করিতে পারে না। যে-সব সমষ্টিবাদমূলক আদর্শ ব্যক্তিকে অযথা খর্ব্ব করিতে যায় তাহারা সকলেই বস্তুত স্থিতিশীল অবস্থাই চায়, তাহা বর্ত্তমান অবস্থাই হউক কিম্বা তাহারা যে অবস্থা শীঘ্র প্রতিষ্ঠা করিতে চায় তাহাই হউক, তাহার পর কোন গুরুতর পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টাকে তাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক

(শেষাংশ ৭২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দয়া, না ন্যায়?

শরীরে যার সামর্থ্য আছে—সমাজের সেবা করতে ন্যায়তঃ সে বাধ্য। সমাজ আমাকে দিয়েছে দেহের খোরাক। চাষী অন্ন দিয়ে আমার দেহকে ক'রেছে পুষ্ট। রাজমিস্ত্রী কর্ন্নিক দিয়ে গ'ড়েছে আমার আশ্রয়। তন্তুবায় মাকু চালিয়ে দিয়েছে আমাকে বস্ত্র। সমাজ আমাকে দিয়েছে মনেরও খোরাক। শিক্ষক আমার চিত্তে দিয়েছে জ্ঞানের আলো। আমার অন্তরের অন্ধকারকে দূর করবার জন্য কত বৈজ্ঞানিক, কত সাহিত্যিক একান্তে ক'রেছে তপস্যা—কত অন্ধ মিলটন আর হোমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু দিয়ে রচনা ক'রেছে মহাকাব্য—কত মাঙ্গো পার্ক আর লিভিংষ্টোন হিংস্র জন্তু-সমাকুল অরণ্যে ক'রেছে পরিভ্রমণ—কত গৃহত্যাগী সিদ্ধার্থ বোধিদ্রুমমূলে খুঁজেছে মানুষকে দুঃখের হাত থেকে মুক্ত করবার পন্থা—কত ধর্ম্মাশোক পাষাণগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিকে আশ্রয় ক'রে মহাকালের কর্ণে শুনিয়েছে মঙ্গলের শঙ্খধ্বনি। আমি যে পরিপুষ্ট দেহ পেয়েছি, আমি যে মার্জ্জিত রুচি এবং জ্ঞানের সম্পদ পেয়েছি, এর জন্য আমি ঋণী সমাজের অসংখ্য মানুষের কাছে। এই ঋণ পরিশোধে উদাসীন থাকলে ন্যায়ের চোখে আমি অপরাধী থেকে যাব।

কেমন ক'রে আমি এই ঋণের দায় থেকে মুক্তি পাব? সেবার পথে। বাহুর অথবা মগজের পরিশ্রমের দ্বারা সমাজের আমি যে সেবা ক'রব—সেই সেবাই আমাকে ঋণ-পাশ থেকে মুক্ত ক'রবে। কর্ম্মের দ্বারা সমাজের সেবা যতক্ষণ না ক'রছি—ভগবানের চোখে ততক্ষণ আমি অপরাধী থেকে যাচ্ছি। গীর্জ্জায় গিয়ে চোখ বুঁজে বিধাতার কাছ থেকে দৈনিক রুটি চাওয়াকে ভগবানের সেবা করা বলে না—তার নাম ভিক্ষুকের ভিক্ষাবৃত্তি। সেই হ'ল সত্যিকারের খোদাই খিৎমদগার যার জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে মানুষের সেবা ক'রবার প্রবৃত্তি। ভজনালয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করাটাকে আমরা আখ্যা দিয়েছি Divine service. এত সহজে ভগবানকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। কর্ম্মের ঘরকে শূন্য রেখে ভজনকে যখন আমরা service বলি, তখন service কথাটার আমরা কদর্থই ক'রে থাকি। রাসকিন খৃষ্টধর্ম্মের ভণ্ডামি দেখে বড় দুঃখেই লিখেছিলেন,

> Alas! Unless we perform Divine service in every willing act of life, we never perform it at all.''

অর্থাৎ—

> জীবনের প্রত্যেকটি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কর্ম্মের মধ্য দিয়ে যতক্ষণ আমরা ভগবানের উপাসনা না ক'রছি—ততক্ষণ আমরা যাই করি না কেন—তাকে ভগবানের উপাসনা বলা আদৌ ঠিক নয়।

ঠিক এই সুরের সঙ্গেই সুর মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন,

> তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
> ক'রছে চাষা চাষ—
> পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
> খাটছে বারোমাস।
> রৌদ্র-জলে আছেন সবার সাথে,
> ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
> তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
> আয়রে ধূলার পরে।

এখানে বলা হ'য়েছে—ভগবানের যদি উপাসনা ক'রতে চাও, তবে বেরিয়ে এস মন্দিরের নিভৃত কোণ থেকে, কর্ম্মের মধ্য দিয়ে তাঁর সেবায় ব্রতী হও; তিনি দেবালয়ের মধ্যে নেই—তিনি র'য়েছেন সেইখানে যেখানে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য মানুষ ক'রছে কাজ।

সমগ্রের সঙ্গে আমার অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত হ'য়ে আছে। আমি ত নির্জ্জন দ্বীপের রবিনসন ক্রুসো নই। এই সমগ্রকে বাদ দিয়ে আমি এক মুহূর্ত্তও চলতে পারি নে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমি ঋণী এই সমষ্টির কাছে। সমষ্টির কাছে যে দায়িত্ব আছে—তাকে অস্বীকার ক'রে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা একটা প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা। এই জন্যই রাস্কিনের আর রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি ক'রে গান্ধী বললেন,

> I am a part and parcel of the whole, and I cannot find Him apart from the rest of humanity. My countrymen are my nearest neighbours. They have become so helpless, so resourceless, so inert that I must concentrate on serving them.

অর্থাৎ—

> সমগ্রের সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছি। মানুষকে বাদ দিয়ে, তাই, ভগবানকে আমি পেতে পারি নে। আমার স্বদেশবাসীরাই হ'চ্ছে আমার নিকটতম প্রতিবেশী। তারা আজ এতই সহায়-সম্বল-হীন, এতই উদ্যমশূন্য যে তাদের সেবাকেই ক'রতে হ'বে আমার জীবনের ধ্রুবতারা।

ঠিক একই কথা বললেন স্বামীজী! 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' These are our Gods—men and animals, and the first Gods we have to worship are our own countrymen. স্বামীজীর এই বজ্রকণ্ঠের উদাত্তধ্বনিই ভারতবর্ষের প্রথম ঘুম ভাঙালো।

যেহেতু সমাজের দশজনের কাছে সহস্র দিক দিয়ে আমি ঋণী—সেইহেতু কর্ম্মের দ্বারা সমাজের সেবা করতে আমি বাধ্য। সমাজের নৌকাকে দাঁড় বেয়ে আর দশজন চালিয়ে নিয়ে যাবে আর আমি নৌকার পাটাতনের উপরে ব'সে কেবল তামাকু সেবন করবো—এমন একটা ব্যবস্থাকে আদর্শ-সমাজ কিছুতেই সহ্য করবে না। আদর্শ-সমাজ রাজপথে মাতলাকে যেমন প্রশ্রয় দেবে না, কুঁড়েমিকেও তেমনি প্রশ্রয় দেবে না। সমাজের শীর্ষে নৈবেদ্যের নাড়ু হয়ে আজ ব'সে আছে যারা—তারা জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য ক'ড়ে

আঙুলটি পর্য্যন্ত ত নাড়াবেই না—উপরন্তু সমাজের কাছ থেকে অসঙ্কোচে সব কিছুর দাবী করবে। তারা যে জীবন-যাপন করে তাকে নীতির দিক দিয়ে কোনক্রমেই সমর্থন করা চলে না। তবুও কেন এমন ব্যবস্থা আজও সমাজে টি'কে আছে? কারণ আইন যাঁরা করেছেন তাঁরা ত কেউ গরীব নন। নিজের কোলে ঝোল টানা মানুষের অভ্যাস। ধনীরাও নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে আইন-কানুন বানিয়েছেন। যাঁরা ন্যায়পরায়ণ খাঁটি মানুষ তাঁরা যখন আইন করবেন তখন আইনের নূতন মূর্ত্তি আমরা দেখতে পাবো। সেই আইনের ভিত্তি হবে ন্যায়ের উপরে। আইন তখন প্রত্যেকটি সুস্থকায় নর-নারীকে সমাজের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করতে বাধ্য করবে। পরের দ্রব্য না ব'লে নিলে চুরি করা হয়—এ কথা আমরা সবাই জানি। জেনেও কিন্তু চৌর্য্যকে আমরা সমাজে বরাবর প্রশ্রয় দিয়ে আসছি। পকেটে কাঁচি চালিয়ে পয়সা নিলেই কি শুধু চুরি করা হয়? যারা কাজের বেলায় ফাঁকি দিয়ে লক্কা-পায়রার মতো ঘুরে বেড়াবে কিন্তু ভোগ্যবস্তুকে গ্রহণ করবার বেলায় হাতটি ঠিক বাড়িয়ে দেবে—তারাও কি চোর নয়? আমার পরিশ্রমের দ্বারা যা আমি লাভ করি—কেবল তারই উপরে আমার অধিকার থাকা উচিত। কর্ম্মের দ্বারা যা আমি অর্জ্জন করিনে তার উপরে আমার নৈতিক কোন অধিকারই থাকতে পারে না। যেহেতু দৈবের বিধানে কোন ধনী-পরিবারে আমি জন্ম-গ্রহণ করেছি সেইহেতু জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কোন পরিশ্রম না করেও আমার বেঁচে থাকবার অধিকার আছে—এ যুক্তি বর্ব্বর-সমাজে চললেও সভ্য-সমাজে একেবারেই অচল। সভ্য-সমাজের বিধান হচ্ছে—people who seek wholetime freedom by putting their share of productive work on others are thieves অর্থাৎ সমাজরক্ষার জন্য নিজেদের যে কাজটুকু করা উচিত—সে কাজ অপরের উপরে চাপিয়ে দিয়ে সারাবেলা যারা মুক্তি খুঁজে বেড়ায় তারা চোর ছাড়া আর কিছুই নয়। শ'-এর একথা আমাদের গীতারই প্রতিধ্বনি। যারা সমাজের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করবে না—গীতা তাদের বলেছে তস্কর—স্তেনঃ এব সঃ।

সমাজের কাছে সবাই আমরা ঋণী এবং সেবার দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধ করতে সবাই আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য—এ কথাই এতক্ষণ ধ'রে বলা হ'য়েছে। এইবার সমস্যা হচ্ছে—সেবার পথ নিয়ে। এ সমস্যার সমাধান করা একেবারেই কঠিন নয়। যে-দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন্ত নর-কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নয়—সে-দেশে মানুষকে বাঁচানোই হ'চ্ছে সকল কাজের সেরা কাজ। এই দুর্ভিক্ষপীড়িত বুভুক্ষু দেশে ভগবান আবির্ভূত হ'তে সাহস পান কেবল একটি মূর্ত্তিতে আর সে মূর্ত্তি হল অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি। কোটি কোটি চলন্ত নর-কঙ্কাল খেয়ে প'রে যাতে বেঁচে থাকতে পারে তারই ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত। মানুষ যেখানে অন্ন থেকে বঞ্চিত—সেই ক্ষুধার্ত্তের দেশে র‍্যাফেলের ম্যাডোনা আর সেক্সপীয়ারের কাব্যের চেয়ে রুটির মূল্য অনেক বেশী। হতভাগ্য বুভুক্ষুর দল আগে ত পেট ভ'রে দুটো খেয়ে বাঁচুক—তার পরে যতখুশী তাদের কানে শুনিও উপনিষদের বাণী আর ভাগবতের কথা। আত্মা আছে কি নেই—বেঁচে থেকে লাভ কি—পাপ কাকে বলে, পুণ্যই বা কাকে বলে—এ-সব সমস্যা দুর্ভিক্ষের দেশের সমস্যা নয়। আগে বাঁচতে দাও—তারপরে আত্মা-অনাত্মার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আসবে। আর এই অন্নের প্রাচুর্য্যের মধ্যে সবাইকে বাঁচানোর সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই—Justice-এর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কোন উপায় নেই। দয়ার মধ্যে ফাঁকির স্থান আছে—ন্যায় নির্ম্মম। তার চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব। দীন দেখলে দয়া করতে আমরা সবাই রাজী আছি—কিন্তু দীনকে সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখতে আমরা কতজন রাজী আছি? সপ্তমীর দিন প্রভাতে ছেলেমেয়েকে বসন-ভূষণে সজ্জিত ক'রে তাদের সঙ্গে নিয়ে চলেছো প্রতিমা দর্শন করতে। পথে যেতে যেতে দেখলে—ধাঙরদের ছেলে রাস্তার ড্রেনের মধ্যে নেমে ময়লা সাফ করছে। দয়া ক'রে তাকে একটি পয়সা দিয়ে তুমি ভাবলে—কি উদার আমি। কিন্তু ন্যায় কানে কানে তোমায় কি বললে? বললে, "তোমার ছেলেমেয়ের পরিধানে যেমন নূতন কাপড়, পায়ে নূতন জুতা—তেমনি নূতন কাপড় এবং নূতন জুতা ওই কাদামাখা ধাঙর ছেলেটাও পাবে না কেন?" শুনে তুমি বললে, "কিন্তু নূতন জামা কাপড় প'রে কি রাস্তার নীচের নর্দ্দমা পরিষ্কার করা যায়?" ন্যায় তো ছাড়বার পাত্র নয়। সে তখন পুনরায় তোমার কানের কাছে মুখটী রেখে অকম্পিতস্বরে বললে, "ঠিক কথা,—কিন্তু পূজোর তিন দিনের মধ্যে একদিনের জন্যও অন্ততঃ ধাঙরের ছেলেটাকে নূতন কাপড়-চোপড় পরিয়ে প্রতিমা দেখাও; সে দিনটা নয় তোমার ছেলে নর্দ্দমা পরিষ্কার করুক।" সর্ব্বনাশ, ন্যায় বলে কি? আবার কি সর্ব্বনেশে কথা এখনই হয় তো সে উচ্চারণ করবে! তুমি তখন তাড়াতাড়ি তোমার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে বলো, "এসব কি সৃষ্টি-ছাড়া কথা তুমি বলছো? ভগবান যাকে নর্দ্দমা পরিষ্কার করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন—তাকে নর্দ্দমা পরিষ্কার করতেই হবে। তিনিই মানুষকে ধনী-দরিদ্র ক'রে তৈরী করেছেন। তুমি কি বিধির বিধান উল্টে দিতে চাও?" কিন্তু ভগবান মানুষকে দারিদ্র্যের অভিশাপে অভিশপ্ত করেছেন—না তুমি তার উপরে দারিদ্র্যের অভিশাপ ডেকে এনেছো? সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে অনাহারে তিলে তিলে মরে যাচ্ছে, তার জন্য দায়ী বিধির বিধান না তোমার নির্লজ্জ লোভ এবং স্বার্থপরতা? You knock a man into a ditch, and then you tell him to remain content in the "position in which Providence has placed him." That's modern Christianity.*

দীন দেখিলে দয়া করো—এ হচ্ছে অনুকম্পার কথা আর অনুকম্পার মধ্যে ফাঁকি আছে। ছেঁড়া ন্যাকরা প'রে রাস্তায় রাস্তায় মানুষগুলো ডাষ্টবিনের পাশে উচ্ছিষ্ট ভোজন করুক আর মাঝে মাঝে কাঙালি ভোজন করিয়ে আমি পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ অর্জ্জন করি—এ হোলো লজ্জাহীন স্বার্থপরতার কথা। আমার হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের জন্য দরিদ্রের দারিদ্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা আর দমকলে যারা কাজ করে তাদের কর্ম্মকুশল-

(শেষাংশ ৭১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

*Ruskin—The Crown of Wild Olive. P. 28.

পতনের মুখে স্পেন

চীন-যুদ্ধ চলিতেছে আজ দেড় বৎসর। ইহার ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে স্পেন-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। চীনে বিদেশী জাপান অভিযান চালাইতেছে। স্পেনের ব্যাপার অনেকটা স্বতন্ত্র। স্পেনকে কোন বিদেশী রাষ্ট্র আক্রমণ করে নাই। স্পেনের ভিতরেই দুই দল আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই দুই পক্ষকে মোটামুটি 'সরকার পক্ষীয়' ও 'সরকার-বিরোধী' বলা যায়। এখানেও কিন্তু বিদেশী শক্তির মহড়া কম চলিতেছে না। তবে জাপান চীন জয় করিতে যেমন চাহে, ইহারা তেমন চাহে না। (গতকল্যকার সংবাদে অবশ্য জাপানের উদ্দেশ্য অনুরূপ ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে তাহা ছলনা মাত্র।) ইহারা স্পেনে এমন শাসনের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চায় যাহা নিয়ত ইহাদের অনুকূল হইবে। আইনানুগভাবে গঠিত শাসন ব্যবস্থায় ইহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই, এইজন্য সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক নীতি বিসর্জ্জন দিয়া সরকার-বিরোধী বিদ্রোহী পক্ষকে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে লাগিয়া গিয়াছে। কাহারা এইরূপ সাহায্য করিতেছে তাহা আমরা সকলেই জানি। ইটালী ও জার্ম্মানী বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোকে স্পেনে বিজয়ী দেখিতে চান। তাহারা এরূপ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে কেন?

ইটালী-জার্ম্মানী তো স্পেনের বিদ্রোহী দলকে অর্থ, অস্ত্র ও লোক দিয়া নানাভাবে প্রকাশ্যে সাহায্য করিতেছে। অন্যেরা কি করিতেছে? আইনত যাহারা স্পেনের কর্ণধার, তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে? স্পেন-সরকারের মস্ত বড় অপরাধ তাহারা সমবেতভাবে জনসাধারণের কল্যাণ করিতে চাহিয়াছিল। শত্রুরা রটাইল স্পেন সোভিয়েটপন্থী হইয়াছে। সাম্যবাদীদের দমন করিতেই হইবে। সরকার কিন্তু এ অপবাদ নিরাপত্তিতে মানিয়া লয় নাই। তাহারা বলিয়াছে যে, তাহারা জনগণের কল্যাণ সাধন করিতে চাহে নিশ্চয়ই এবং এইজন্য সোভিয়েট রুশিয়া হইতে যতটুকু সাহায্য লওয়া সঙ্গত তাহাও লইবে, তবে ইহা একটি সোভিয়েট রাষ্ট্র নহে। জনহিতকামী নানা দল লইয়াই তাহাদের সরকার গঠিত হইয়াছে, তাহারা জনকল্যাণসাধনেই ব্যাপৃত। ইহার পথে যে-সব শ্রেণী বাদ সাধিবেন তাহাদের সায়েস্তা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। এইজন্য, ইটালী-জার্ম্মানী ছাড়া অন্যান্য ধনিক রাষ্ট্রও স্পেন-সরকারের উপর বিরূপ হইয়াছিল।

স্পেনের জনগণ দরিদ্র বটে, কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে নানা সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। শস্য এবং ধাতু সম্পদে ইউরোপের কোন দেশই তাহার জুড়ি নয়। কাজেই বিভিন্ন দেশের ধনিক সম্প্রদায় সেখানে গিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। ইটালী-জার্ম্মানীর এই ধন-স্বার্থ স্পেনে নাই বলিলেই হয়। এই
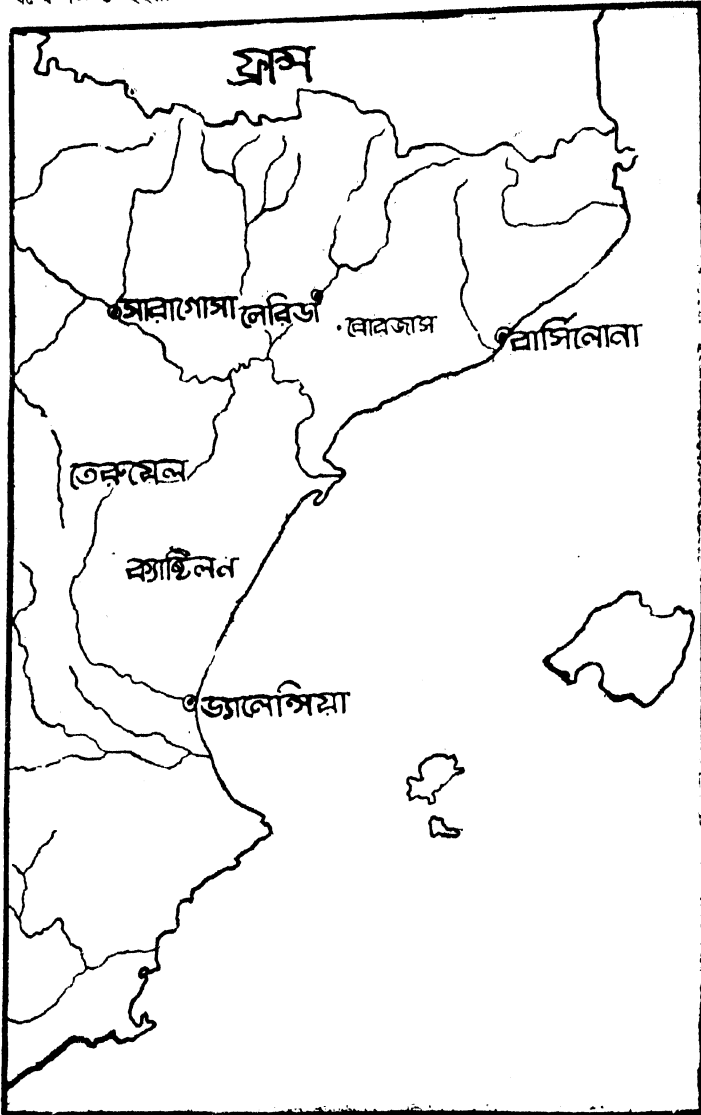
স্বার্থ আছে সকলের চেয়ে বেশী ব্রিটেনের। ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতিরও কিছু স্বার্থ যে না আছে, তাহা নয়। কাজেই স্পেনে জনকল্যাণমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই সব ধনিক সম্প্রদায় খুশী ত হয়ই নাই, বরং নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আতঙ্কিতই হইয়াছিল। তাই ধনিক শাসিত রাষ্ট্রগুলি যদিও ইটালী-জার্ম্মানীর মত প্রকাশ্যে সরকার-বিরোধী দলকে সাহায্য করিবার মুখ পায় নাই, তথাপি এমন একটি উপায় অবলম্বন করিল যাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধি সহজ হইয়া

উঠিয়াছে। কেহ হয়ত বলিবেন, দোষ ধরা যাহাদের স্বভাব প্রতিটি ভাল কার্য্যের মধ্যেও তাহারা খুঁত খুঁজিয়া লইবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে ছাব্বিশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া লণ্ডনে 'নিরপেক্ষ' কমিটি গঠিত হইয়াছে যাহাতে স্পেন-যুদ্ধ স্পেনের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, উহার সীমানা ছাড়াইয়া না যায়। নিরপেক্ষ কমিটির এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার যাহারা প্রধান উদ্যোক্তা তাহাদের কি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না? প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সেদিন একটি ঘোষণা-পত্রে বলিয়াছেন, সবল ও দুর্ব্বলের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব চলে তখন শক্তিমানদের নিরপেক্ষ থাকা মানে সবলকেই সাহায্য করা। স্পেনের ব্যাপারেও তাহাই হইয়াছে। স্পেন-যুদ্ধ নিছক স্পেনিয়ার্ডদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলে সরকার-পক্ষ বেশী সবল না হইলেও বিদ্রোহীদের সমান সমানই থাকিত। কিন্তু বিদ্রোহী পক্ষে ইটালী-জার্ম্মানী যোগ দেওয়ায় শক্তির হেরফের হইয়াছে। বিদ্রোহী পক্ষই স্পেনে অধিকতর শক্তিমান। নিরপেক্ষ কমিটি ইটালী-জার্ম্মানীকে নিরস্ত করিতে পারে নাই, অথচ স্পেন-সরকারকে কেহ কোনরূপ সাহায্য না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে। ইটালী-জার্ম্মানী ছাড়া নিরপেক্ষ কমিটির সভ্য রাষ্ট্রগুলি 'রাজভক্ত' প্রজার মতই সে নির্দ্দেশ পালন করিয়াছে! ব্রিটেন হইল ইহার উত্তর সাধক। একথা এখন কাহারও অবিদিত নাই যে, ব্রিটিশ ফরাসী ও অন্যান্য দেশের ধনিক সম্প্রদায় স্পেনের বিদ্রোহীদের বরাবর সাহায্য করিতেছে। ঐসব দেশের সরকার ধনিকদেরই তোয়াজ করিয়া চলে, কাজেই মুখে বিদ্রোহীদের অনাচারের প্রতিবাদ করিলেও কার্য্যত যে-সব পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে বিদ্রোহীদেরই সুবিধা হইয়া গিয়াছে। বিদ্রোহীপক্ষ এইরূপে প্রথম হইতেই বিদেশীর সাহায্য লাভ করিয়াছে, সরকার-পক্ষ প্রথম প্রথম সোভিয়েট হইতে কিছু সাহায্য পাইলেও মোটের উপর একরূপ কিছুই পায় নাই। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বোধ হয় স্পেন ও চীনের ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। সংবাদ আসিয়াছে, স্পেন-সরকারের বর্ত্তমান কেন্দ্র বার্সিলোনার পতন হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। রুজভেল্টের কথা এত শীঘ্রই সত্যে পরিণত হইবে, কে ভাবিয়াছিল?

ইটালী ও জার্ম্মানী স্পেনের বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতেছে, অন্যেরা মুখে নিরপেক্ষতার বুলি আওড়াইতেছে বটে, কিন্তু কার্য্যত তাহাদেরই সাহায্য করিয়াছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শ্রমিক দল সম্প্রতি স্পেন-সরকারকে সাহায্য দানের অনুরোধ নিজ নিজ সরকারকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু উভয় রাষ্ট্রই তাহাতে অসম্মতি জানাইয়াছে। এই যে স্পেন-সরকারকে গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা ইহার মূলে কি লক্ষ্য করি? জগতের বিভিন্ন দেশের ধনিক সম্প্রদায় কম্যুনিজম্ বা সাম্যবাদের প্রসারে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রসার ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের চেষ্টার অন্ত নাই। ধনিক শাসিত রাষ্ট্রগুলিও এই উদ্দেশ্যকে নিজস্ব বলিয়া গণ্য করিয়াছে। হিটলার ও মুসোলিনী ইহা বরাবর লক্ষ্য করিয়াছেন। নিজের শক্তি সংহত করিবার সময় তাঁহারাও ধনিকদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সাম্যবাদের নিপাত চাহিয়াছেন। ধনিকগণ সাম্যবাদ ঠেকাইবার নূতন অস্ত্র পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছিল। তাহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে এই 'ডিক্টেটর'দ্বয় শক্তিমান হইয়াছেন। ইঁহারা বড়ই চতুর। সাম্যবাদ ধ্বংসের বাসনাকে শিখণ্ডীরূপে খাড়া রাখিয়া এখন নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। জার্ম্মানীর পূর্ব্ব ইউরোপে প্রভাব-বিস্তার এবং ইটালীর ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য-স্থাপন এক সুস্পষ্ট নীতিরই দুই বিভিন্ন অঙ্গ। জার্ম্মানীর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হইয়াছে। ইটালীর সিদ্ধিলাভে অনেক বাধা। এইজন্য স্পেনকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিলে একটি বিশিষ্ট ঘাঁটি আগুলানো তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। জার্ম্মানীর কার্য্যে যেমন ইটালী সহায়, ইটালীর কার্য্যেও তেমনি জার্ম্মানী সহায়। স্পেনের ব্যাপারে ইটালীই অধিনায়ক, জার্ম্মানী তাহারই পরিপূরকভাবে কর্ম্ম করিতেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়াকে প্রভাবাধীন করিবার পর হইতেই পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানী নিজ অভিসন্ধি পূরণ করিতে অত্যধিক তৎপর হইয়াছে। সে আগে হইতেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিল। পূর্ব্ব ইউরোপের অর্থমন্ত্রী ডক্টর ফাঙ্ককে পাঠাইয়া ওখানকার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নূতনভাবে আর্থিক ও বাণিজ্যিক বন্দোবস্ত করিয়াও লইয়াছে। সম্প্রতি এই ডক্টর ফাঙ্ককে রাইখস্ ব্যাঙ্কেরও কর্ণধার করা হইয়াছে। এই পদে এযাবৎ অধিষ্ঠিত ছিলেন জার্ম্মানীর বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডক্টর শাখ্ট্। ইটালীও বোধ হয় স্পেন বিদ্রোহীদের বিজয় সম্ভাবনা জানিয়া ফ্রান্সের কতকগুলি অঞ্চলের উপর নিজ দাবি পেশ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। ইহা জার্ম্মানীর মতই ক্ষেত্র প্রস্তুত করা ছাড়া আর কিছুই নহে। স্পেনকে একবার নিজ আওতার মধ্যে আনিতে পারিলে আর কথা নাই, ভূমধ্যসাগরে তাহার আধিপত্য স্থাপিত হইবে। তখন উত্তর ও পূর্ব্ব আফ্রিকার উপর যে সব দাবি করা হইবে তাহা পূরণ না করিয়া সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি পারিবে না। কাজেই স্পেনের সমস্যা যত শীঘ্র মেটান যায় তাহার জন্য ইটালীয়ানরা যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। হিটলার ইংরেজের সহায়ে তাহার কার্য্য হাসিল করিয়া লইয়াছেন। এখন মুসোলিনীও তাহার সহায়ে কার্য্য হাসিল করিতে চাহিতেছেন। ইঙ্গ-ইটালীয়ান চুক্তি তাহাই সূচিত করে। হিটলারের বেলায় ইংরেজ যতটা অগ্রসর হইয়াছে, মুসোলিনীর বেলায় কি ততটা অগ্রসর হইবে? অনেকে ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন এবং বলিতেছেন, ইংরেজ মুসোলিনীর সাহায্যে না আসিলে যুদ্ধ অনিবার্য্য।

এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংরেজের মনোভাব কি তাহা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতির গতি ও প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিয়াছি। সেই সময় বলিয়াছি যে, সাম্রাজ্যরক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহার সাম্যবাদ ধ্বংস কামনাও প্রধানত এই উদ্দেশ্যে।

সাম্যবাদ ধ্বংসের জন্য ইটালী-জার্ম্মানীকে বাড়াইয়া

দিয়াছে ইংরেজ; কিন্তু তাহার মূল উদ্দেশ্য যে সাম্রাজ্য রক্ষা, তাহা সাধন হইবার উপায় ঠিক আছে তো? এই কথাই আজ ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় বোধ হয় বেশী করিয়া ভাবিতেছে। ইঙ্গ-ইটালী চুক্তি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। স্পেন সম্পর্কে সে মুসোলিনীকে একরূপ শাদা চেকই দিয়াছে। কিন্তু ইটালীর নূতন উদ্দেশ্য ঘোষিত হইবার পর তাহার নীতির কতটা রদবদল হইবে?

ব্রিটেনের সঙ্গে ইটালীর বর্ত্তমান সম্পর্ক কি, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। ব্রিটেন ও ইটালীর মধ্যে চুক্তি হইয়াছে ইহা আমরা সকলেই জানি। ইটালীর নূতন সাম্রাজ্য স্বীকার করিবে, ইটালীকে ঋণ দিবে—এইরূপ সর্ত্ত জানা গিয়াছে। গত ১১ই জানুয়ারী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন রোমে গিয়াছিলেন। তাঁহার ও মুসোলিনীর মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, উভয় রাষ্ট্রের সামরিক আয়োজনাদির বিষয়ও পরস্পরে জানিতে পারিবে। কিন্তু আগে যে ইঙ্গ-ইটালী চুক্তি হইল তাহাতে ব্রিটেনের পক্ষে অনুকূল কি কি সর্ত্ত রহিয়াছে? প্রথমে কথা হইয়াছিল, স্পেন হইতে ইটালীয়ান সৈন্য সরাইয়া না লইলে ঐ চুক্তি বহাল হইবে না। এখন দেখিতেছি, ব্রিটেন এ সর্ত্তের উপরও গুরুত্ব আরোপ করিল না। তবে কি ব্রিটেন নিতান্ত নিষ্কামভাবে মুসোলিনীর সঙ্গে মিতালী করিতে অগ্রসর হইয়াছে? ইতিহাস তো তাহা বলিবে না। সত্য কথা বলিতে কি, জার্ম্মানী ও ইটালীকে তাহার খুশী রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এখানেও সাম্রাজ্যরক্ষা নীতিই বলবৎ। প্রাচ্যে জাপান যেরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে তাহাতে তাহাকে ঠেকান দরকার। কিন্তু ইউরোপে প্রবল প্রতিপক্ষ দেখা দিলে তাহার সকল উদ্দেশ্যই পন্ড হইয়া যাইবে। আর একটি উদ্দেশ্যও যে না আছে তাহা নহে। ব্রিটেন এখনও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। কাজেই ইহাদের তোয়াজ করিয়া যাহাতে ঠাণ্ডা রাখা যায়, তাহারই চেষ্টা চলিয়াছে খুবই।

সাম্যবাদের নিপাত যেমন হিটলার-মুসোলিনীর চরম উদ্দেশ্য নয়, ইংরেজেরও তাহা নয়। এ তিনেরই অন্য উদ্দেশ্য রহিয়াছে। আর এইখানেই হয়ত হইবে শেষে ভীষণ সংঘাত। ব্রিটেন সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য ব্যস্ত, আর ইটালী ও জার্ম্মানী সাম্রাজ্য লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব। পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানীর প্রাধান্যে ব্রিটেন অসন্তুষ্ট নয়, বরং খুশী। কারণ এইভাবে জার্ম্মানীও খুশী থাকিবে, সাম্যবাদও আর প্রসার লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রাধান্য ব্রিটেন সহজে মানিয়া লইতে পারে না। বিশেষত সম্প্রতি ইটালীর যেরূপ উদ্দেশ্য প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে তো সম্ভবই নয়। চেম্বারলেন-মুসোলিনী সাক্ষাৎকারের সময় নূতন রাজ্য লাভের কথা নাকি উঠিয়াছিল, কিন্তু চেম্বারলেন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের (এ-ক্ষেত্রে ফ্রান্স) সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য মুসোলিনীকে বলিয়াছেন। অর্থাৎ, মুসোলিনীর দাবী বর্ত্তমান আকারে চেম্বারলেনও মানিয়া লইতে রাজি নন্। তাঁহার দাবি অনুসারে কর্সিকা, টিউনিস, সুয়েজ ও জিবুতির উপর তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইলে শুধু ফ্রান্সের নয়, ব্রিটেনেরও শক্তি কেন্দ্রে ঘা লাগিবার সম্ভাবনা। অথচ মুসোলিনীকে খুশী করাও একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ইংরেজ পড়িয়াছে মহা ফাঁপরে।

স্পেনের পতন আসন্ন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, স্পেনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে আবার একটা ভীষণ রকমের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে। লণ্ডনস্থিত মার্কিন রাজদূত মিঃ কেনেডি সেদিন বলিয়াছেন যে, আগামী বসন্তকালেই একটা মহাযুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা। ওয়াকিবহাল মহল এরূপ কোন সময় নির্দ্দেশে অগ্রসর না হইলেও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন, একটা কিছু সংকট অতি দ্রুত ঘনাইয়া আসিতেছে। জার্ম্মানী তাহার সমস্ত শক্তি অস্ত্রসম্ভার বর্দ্ধনে নিয়োজিত করিয়াছে। ডক্টর শাখট্-এর বিতাড়নের ইহাই একটি উদ্দেশ্য বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি যখন তখন সরকারের হুমকিতে ব্যাঙ্কের টাকা খরচ করিতে দিতেন না। জার্ম্মানী এখন বিমানপোত বাড়াইতে বেশী মন দিয়াছে। সে মাসে নাকি এক হাজার করিয়া বিমানপোত তৈরী করিতে পারে! ইটালীও রণাস্ত্রের বিস্তর আয়োজন করিতে সুরু করিয়াছে। চেম্বারলেন জার্ম্মানী ও ইটালী হইতে ফিরিয়া দুইবারেই জাতির রণশক্তি বাড়াইবার দিকে ঝোঁক দিয়াছেন। ক্ষুধিতের ক্ষুধা প্রশমনে—তথা শক্তি প্রতিষ্ঠায় যদি চেম্বারলেন সমর্থই হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে অস্ত্র-শস্ত্রের নূতন করিয়া বিরাট আয়োজনের চেষ্টা কেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের রাজনীতির গতি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে, নেতাদের ভাষণে ইহাই মনে হয়।

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৯

সাব-এডিটর রামময়

(গল্প)

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

রামময় অবশেষে চাকুরী পাইয়াছে। মাইনে মন্দ নয়—ত্রিশ টাকা। খাটুনীও বেশী নয় এগারটা হইতে ছয়টা। কলমই চালাইতে হইবে। কিন্তু কেরাণীগিরির নয়।

পদবীটা বেশ মধুর।

সুর করিয়া, যাহাকে ইচ্ছা পরিচয় দিয়া অন্যকে সচকিত এবং নিজে খুশী হইয়া উঠিতে পারে; জারনালিষ্ট......

হ্যাঁ। সম্মান তার কম নয়। তাহারই সাব-এডিট করা সব সংবাদ লইয়া ভোরে কাগজ বাহির হয়—হাজার হাজার লোকে পাঠ করে। সকালে কাগজ বাহির হইলে, আগেই সে নিজের লেখাগুলি দেখেঃ ইস্ বানান ভুল প্রেস করিবেই।

মনে মনে বলেঃ বেশ হইয়াছে ত প্রবন্ধটি।

অবস্থা নাকি এক সময় ভালই ছিল। কথাটা পুরান। সবাইকেই আমরা একথা বলি। কিন্তু রামময়ের বেলা একটুকুও বানান কথা নয়। বাবা তার জজের সেরেস্তায় কি একটা চাকুরী করিয়া অনেক পয়সা রোজগার করিয়া চোখ বুজিয়াছেন। তারপর সংসারে কি সব ঝামেলা বাধে। খুড়ামশাই মামলা-বাজির চরম দেখাইয়া পথে না বসান—পথে দাঁড় করাইলেন।

তা দাঁড় করান। রামময় তেমন ছেলেই নয়। শান্ত, ভদ্র এবং নিতান্তই নিরীহ। লেখাপড়াও শিখিয়াছে। মনে মনে ভাবে—কত লোকে ত ইহাই পায় না।

কিন্তু ত্রিশ টাকায় সংসার যেন চলিতেই চায় না। বাড়ী ভাড়া গুনিয়া গুনিয়া আঠারটি টাকা দিতে হয়—মুদী-দোকানে একটা লম্বা খরচ—তারপর বাজার, দেশের বাড়ীর খরচ, কত কি। এর উপর আবার ছোট বোনটির আরও পড়ার ইচ্ছা—এই ত এবারেই পরীক্ষা দিয়া ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে সবে।

রামময়েরও ইচ্ছা পড়াইবার, কিন্তু পড়াইবে সে কি দিয়া ভাবিয়া উঠিতে পারে না। টাকার সংখ্যাগুলি এমনই নিরেট যে, হাজার চেষ্টা করিয়াও টানিয়া লম্বা করিবার উপায় নাই।

তা না থাক। রামময় সুমিত্রার জীবনের বাধা হইয়া থাকিবে না। হয় ত এই কথাটাই ভাবিতেছিল। আসিল সুমিত্রা। দাদা বলিলেনঃ আয়, কোথায় পড়বি ঠিক ক'রলি কিছু! সুমিত্রা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সংসারের চোরা-বালির কাহিনী তাহার কিছু আর অজানা নাই। টানিয়া বুনিয়া একটা কালো অন্ধকারের মাঝ দিয়াই তাহারা চলিয়াছে, যবনিকা তবু যে পড়ে না—ইহাই আশ্চর্য্য।

সুমিত্রা হাসিল।

হাসিয়া কহিলঃ প'ড়ব না আমি ঠিক ক'রেছি।

রামময় গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। বোঝে সে সব। বুঝিতে পারে সকলের চোখেই সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আঘাত কেউ দিতে চায় না। তাই মাটির নীচে ফাটল দিয়া যে জল-কল্লোল জীবনের পট-ভূমির পশ্চাতে আসিয়া স্পন্দন তুলিয়াছে, এ সংবাদ সবাই জানে—তবু বলিতে বা আঘাত দিতে চাহিবে না। চুপ করিয়া সবাই সহ্যই করিয়া যায়।

এইখানেই রামময়ের ব্যথা। ইহাই সে সহ্য করিতে পারে বলিলঃ না-রে-না সুমিত্রা—পড় তুই!

সুমিত্রা তবু পড়িবে না।

রামময় বলিলঃ তবে ক'রবি কি তুই?

সুমিত্রা সলজ্জ হাসি হাসে। ধীরে ধীরে জামার নীচ হইতে বাহির করে একখানি পত্র। উপরে কি একটা মেয়ে স্কুলের ছাপান নাম। তারপর ঠিকানা। ঠিকানার পর তারিখ। একেবারে নীচে স্কুলের সেক্রেটারীর সই। মাঝখানে সংবাদ। টাইপ করা।

বুঝিতে কিছুই কষ্ট হয় না। কবে বুঝি সুমিত্রা একটি চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহারই উত্তর আসিয়াছে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা বাদে পনের টাকা মাইনে।

কিছুক্ষণ রামময় কোন কথা বলিল না। সে যে নিতান্তই অসমর্থ, অপারগ এই ছোট্ট মেয়েটা পর্য্যন্ত এমনভাবে বুঝিতে পারিয়াছে যে, না জানাইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া দরখাস্ত পর্য্যন্ত করিতে বাদ রাখে নাই। কত জায়গায় কত ব্যর্থ হইয়া তবে ইহা মিলিয়াছে, তাই বা কে জানে!

থাকা, খাওয়া, আর পনের টাকা।

সুমিত্রা মাথা নীচু করিয়া পা দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে কাটিতে বলিলঃ আপত্তি ক'র না তুমি দাদা।

একটু চুপ করিয়া, আঁচলটা হাতে জড়াইতে জড়াইতে বলেঃ এবারে তুমি একটি বিয়ে কর। জান দাদা—আমাদেরই সাথে প'ড়ত সান্ত্বনা, তুমি ত ভালই চেন। তোমাকেও সান্ত্বনা—ওরা চেনে ভাল ক'রেই—তার মা বলেছেন......

রামময়ের কানে এসব প্রবেশ করে না।

রামময় অকস্মাৎ আরও গম্ভীর হইয়া গেল।

তারপর বলিলঃ যা হয় পরে ভেবে দেখা যাবে।

* * *

সমস্ত দিনটাই রামময়ের কাটিয়া গেল একটা ক্লান্ত অবসন্নতার মধ্য দিয়া। দেশে মা রহিয়াছেন। তাহাকেও আনা ত দরকার। অথচ এত বড় প্রয়োজনের কথাটাও চাপা দিয়া রাখিতে হয়; টাকা নাই বলিয়া। কিন্তু সুমিত্রাকে সে পড়াইবেই। কেন, কোন্ অধিকারে চাকুরী করাইবে সে তাহাকে দিয়া? লোকে শুনিলে বলিবে কি?

—ছিঃ ছিঃ

কে যেন তাহার চারিদিকে একটা 'ছিঃ ছিঃ' বলিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে হি-হি করিয়া হাসিয়া গেল।

রামময় চুপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ।

তাহাদের অফিসেরই আর একজন সহকর্ম্মী সাব-এডিটর ট্যুশনির খোঁজ-খবর রাখিতেন। রামময় গেল তার কাছে।

আছে নাকি খোঁজ-খবর?

সহকর্ম্মী বলিলেনঃ লোকটি কে?

ম্লান হাসি হাসিয়া রামময় বলেঃ আমিই ভাই। চলছে

সহকর্ম্মী কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন ঃ দু-দুটি ট্যুশনি করতে পারছিনে ভাই—কাল হ'তে তুমিই লেগে যাও আমার একটায়।

রামময় খুশী হইয়াও খুশী হইতে পারে না ঃ তোমারটা দেবে ?

সহকর্ম্মী হাসিয়া বলিলেন ঃ ফরমালিটি রাখ বন্ধু! এ ছাড়া আমাদের বাঁচার উপায় কিছু নেই। মাইনেও ত তোমার চেয়ে বেশী কিছু পাই। দুটো দিয়ে কি হবে আমার ?

একটু চুপ করিয়া বলিলেন ঃ তুমি ত লেগে যাও, আমি না হয় সুবিধে মত আবার একটা জোগাড় করে নেব'খন।

রামময় আর কথা বলিল না।

সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে সমবেদনা আর সহানুভূতি —ইহাই ত তাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন।

সুমিত্রা চাকুরীতে যাইবে, সব ঠিক-ঠাক করিয়া বসিয়াছিল।

কিন্তু যাওয়া তার হইল না।

দাদা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন কলেজে। ভর্ত্তি করাইয়া আবার সেদিনকার মত সঙ্গে নিয়া ফিরিলেন গৃহে।

সুমিত্রা খুশী হইয়াছে।

তবু জানে সে সব। বলিল ঃ নাই-বা পড়তাম দাদা। মাকে ত আনা যেত।

হবে হবে; একটা ট্যুশনি জুটিয়েছি—সুতরাং আয়ের টাকার অঙ্কটাও কিছুটা বড় হয়েছে, সুতরাং রামময়ের মন আজ ভাল। বলিল ঃ হবে হবে সব হবে—দাঁড়া আর কয়েকটা দিন।

সুমিত্রা চুপ করিয়া থাকে। কলেজে ভর্ত্তি করিতে বেশ টাকা লাগিয়াছে। এর উপর পুঁথিপত্তর আছে—অথচ সে কথা দাদাকে বলে সে কি করিয়াই বা!

রামময় ওদিকে ভাবিতে থাকে ঃ রাতের দিকে আর একটা ট্যুশনিও একান্ত দরকার—মাকে আনিতে হইবে, ছোট ভাইটি আছে, তাহার পড়ার ব্যবস্থার বয়স হইয়া আসিল। সুমিত্রাকেও বিবাহ দিতে হইবে।

ভাবিয়া রামময় কূল-কিনারা কিছু পায় না।

কিন্তু কর্ত্তব্য যেন আরও কঠিন, আরও ঘন হইয়া দেখা দেয়। তাহাদেরই বা সে অস্বীকার করে কি করিয়া? টাকা নাই—একথা বলিয়া মানুষের দয়া উদ্রেক করা হয়ত যায়—কিন্তু দাবী লইয়া যাহারা জীবনের কাছে পাওয়ার হিসাব লইয়া দাঁড়ায়—হটাইয়া দিবে সে কি বলিয়া ?

মায়ের দাবী, বোনের দাবী, ভাইয়ের দাবী।

যুগ-সংসারের সে কর্ত্তা। সকলেই ত তাহারই মুখের দিকে আশা-ভরসা লইয়া তাকাইয়া আছে।

রামময় হাসিয়া ফেলিল ঃ সুমিত্রাটা এখনও একেবারে ছেলেমানুষ। বলে কিনা বিয়ে কর দাদা! আরে নিজেদেরই নেই খাওয়ার সংস্থান তার উপরে অপরের একটি মেয়ে [illegible] কাঁধের [illegible] [illegible] লইয়া সমস্ত জীবনে

বিবাহ হয়ত প্রয়োজন। কিন্তু আরও ত কত প্রয়োজনই আমাদের জীবনের চারিদিক প্রচ্ছন্ন বেদনায় ম্লান হইয়া আছে। রামময়ও ত একদিন কামনা করিয়াছিল একটি পরিচ্ছন্ন সংসার—চাহিয়াছিল প্রতিষ্ঠা.........হয়ত মনে মনে কামনা করিয়াছিল সে সান্ত্বনাকেই।

রামময় হাসে। আধুনিক যুগে বিবাহের উপায় যার নাই, বিবাহ ত তাহার কাছে একটা সৌখিনতা। না এ সৌখিনতা তাহার জন্যে নয়।

সকালে-রাতে ট্যুশনি। সমস্ত দিন খবরের কাগজ। রামময় ব্যস্ত। মুহূর্ত্ত সময়ও তার কাছে মহামূল্য উপঢৌকন। রাতেও আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডিউটি পড়ে—তখনই খাটুনিটা বড় বেশী—দিনের বেলাই ট্যুশনি দুইটা শেষ করিতে হয়।

রামময়ের যেন ভাল লাগে না। যন্ত্রের মত সে যেন দমের উপর দিয়া চলিয়াছে মাত্র। একঘেয়ে, নূতনত্বহীন সেই কাজ। ইদানীং আবার এক জমিদার জমিদারীর লোভে অপর অংশীদার তাহার ছোট ভাইটিকে এক অতি পৈশাচিক উপায়ে হত্যা করিয়াছে। হত্যাটা ধরা পড়িয়াছে, মৃত্যুর পর পোষ্টমর্টেমে গিয়া। প্রায় ফসকাইয়া গিয়াছিল আর কি—কিন্তু ছোট-খাট কয়েকটি এমনই সূত্র বড় ভাই রাখিয়া ফেলিয়াছে যে, সেদিক হইতেই আরম্ভ হইয়াছে প্রকাণ্ড এক কেস।

শহর ইহা লইয়া সরগরম। খবরের কাগজের দশ-বার কলম লইয়া তাহারই বিচার-সংবাদ। ইহারই চার্জ্জে আবার রামময়। খাটুনিটা অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে।

ভাল আর লাগে না।

মা আসার পর খরচও কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। হায়রে! মায়ের জন্য খরচ—একথাও তাহাকে ভাবিতে হয়।

রামময় নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠে।

বিরাট মহানগরের চারিদিকে কত সজীবতা—আলো, বাতাস, আর বসন্ত দিনের দখিনের গান ঃ সবই ত কত মিঠি। কিন্তু সব যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সব যেন নিতান্তই বিবর্ণ—স্বাদহীন, গন্ধহীন।

কিন্তু ইদানীং কাগজের ম্যানেজারের সঙ্গে তাহার আবার কি একটা গোলমাল চলিয়াছে। রামময় বুঝিতে পারে সম্মুখের দিকে এক খণ্ড কালো মেঘ ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে।

সুমিত্রাকে চাকুরী করিতে পাঠাইলেই যেন ভাল হইত।

বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

এমন সময় বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একখানি মোটর। নূতন ও দামী। এ গলিতে মোটর সাধারণত প্রবেশ করে না—ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া আসিবার লোকই এ গলিতে নাই—তার আবার মোটর!

কে যেন রামময়ের নাম ধরিয়াই ডাকিল।

রামময় বাহিরে আসিয়া দেখে ফিটফাট এক ভদ্রলোক। গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী, শান্তিপুরে মিহি ধুতি।

রামময় আগাইয়া গেল। বিনীত কণ্ঠে বলিল, কাকে চাই?

ভদ্রলোক বলিলেনঃ রামময় বাবুকে চাই—বাসা কোন্‌টা তার?

রামময় কৃতার্থ হইয়া বলিলঃ আমারই নাম।

ভদ্রলোক খুশী হইলেনঃ ও আপনিই।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলঃ গোটাকতক কথা ছিল আপনার সঙ্গে। দয়া করে যদি—হ্যাঁ একটু গোপনীয়......

রামময়ের সহিত এমন ধরণের লোকের কি কথা থাকিতে পারে, রামময় ভাবিয়াই পায় না। তাহা হইলে রামময় নিশ্চয়ই অন্যের চোখে একজন 'ইম্পরটেণ্ট' লোক।

মাথা হেলাইয়া, হাসিয়া রামময় বলিলঃ চলুন বসবেন ঘরে।

কিন্তু ঘরে এমন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে কোথায় সে বসাইবে নিজেই জানে না। কিন্তু না। লোকটি বড়লোক হইলে কি হইবে অতি সজ্জন। চেয়ারে না বসিয়া বসিল একটা টুলেই।

তারপর হাসিল একটু ঃ আমার নাম অশোকেন্দু.........

রামময় বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিল একটা ঘৃণার চিহ্ন, বলিল ঃ ও, আপনিই অশোকেন্দু-বাবু জমিদার।

অশোকেন্দু বোকার মত হাসিল।

রামময় বলিলঃ কি মনে করে এসেছেন বলুন।

অশোকেন্দু বলি বলি করিয়া বলিয়াই ফেলিলঃ জানলাম ডাক্তারের কাছে আমার লেখা একটা চিঠি আপনারা পেয়েছেন।

রামময় বলিল ঃ আপনি কি করে জানলেন?

যে করেই হোক জেনেছি, সে চিঠিটা আমার চাই।

মানুষের ঔদ্ধত্যের সীমা দেখিয়া রামময় অবাক হইয়া গেল। সে যে কি বলিবে বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছে না। সমস্ত শরীর যেন রাগে রি-রি করিয়া কাঁপিতেছে।

মৃদুস্বরে ওদিকে অশোকেন্দু বলিয়া চলিলঃ যত টাকা আপনি চান পাবেন—

রামময়ের মনে হইতে লাগিল জীবনে যেন তাহার নূতন দিনের বার্ত্তা লইয়া কে আসিয়াছে। সান্ত্বনাকে হয়ত জীবনে সে পাইবে—

মৃদুস্বরে তখনও বাতাসে কথা ভাসিয়া আসিতেছেঃ কলকাতায় আপনাকে বাড়ী দেব—যা আপনার চাই; আর এ আপনি কোন্ ছাইয়ের চাকরী ক'রছেন—আপনাকে........

রামময় যেন দেখিতেছে সম্মুখে তার একটি বড় বাড়ী। সান্ত্বনার চারদিকে দাস-দাসী, চাকর, মোটর.......

রামময় মনে মনে হাসিল।

এমন দুর্ব্বলতা তাহার জীবনে ত কোন দিন আসে নাই।

ধীরে ধীরে রামময় উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিলঃ চলুন।

অশোকেন্দু জয়ীর বেশে রামময়ের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। হয়ত মোটরে করিয়া এখনই অশোকেন্দুকে লইয়া যাইবে সেই চিঠিখানা দিবার জন্য।

সত্যিই তাই।

রামময়ই হাত দিয়া মোটরের দরজাটা খুলিয়া দিল।

ধীরে ধীরে হাসিয়া বলিলঃ আপনি যান। টাকার আমার প্রয়োজন নেই। আশা করি আর কোনদিন আসবেন না।

অশোকেন্দু যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেছে না।

কিন্তু ওদিকে দরজাটা বন্ধ করিয়া রামময় কখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। গম্ভীরভাবে অশোকেন্দু খানিক-ক্ষণ মোটরের মধ্যে বসিয়া দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া আপন মনে বলিলঃ আচ্ছা!

গলিটা কাঁপাইয়া মোটর চলিয়া গেল।

আর তারই কিছু পরে বাটা কোম্পানীর দশ আনা দামের সাণ্ডেল পায়ে দিয়া, ধীরে ধীরে রামময় বাহির হইল তারই টুশনিতে। আজ যেমন করিয়াই হোক মায়ের জন্য একখানা কাপড় কিনিয়াই আনিতে হইবে—দুমাস হইয়া গেল, কিছুতেই সে দিতে পারিতেছে না।

নাগা পাহাড়ের রাণী গুইদোলো

শ্রীরসময় দাশ

"—And I thought of Guidilio, "the Rani", sitting in prison cell, what her thoughts are, what regrets, what dreams.—"
—Pandit Jawaharlal Nehru.

কাঁদে গুইদোলো অন্ধ কারায়—কাঁদে সে ক্ষুব্ধ রোষে,
বাহিরিতে চায় পাষাণ প্রাচীর ভেঙে ফেলি আক্রোশে;—
বাহিরিতে চায় মুক্ত জীবনে—গিরি দরী গুহাতলে,
ছুটিয়া চলিতে শিখরে শিখরে ঝাঁপায়ে পড়িতে জলে;
বন-ঘোটকীর পৃষ্ঠে চড়িয়া ধাইতে শঙ্কা ছাড়ি'
সিংহীর শিরে হানিয়া আঘাত শাবক লইতে কাড়ি'।
সে যে রাজ-বালা চিত্রাঙ্গদা স্বাধীন—ভাবনাহীন,—
কেমনে কাটায় আঁধার কারায় বসিয়া দিবস দিন?

কাঁদে গুইদোলো—রাণী গুইদোলো নির্জ্জন কারাগারে
ব্যথা-ভরা চোখে অতীতের পানে চাহে ফিরে বারে বারে।
ওই হোথা দূরে পর্ব্বত-ঘেরা তৃণে-ভরা প্রান্তর,
ওইখানে তার কিশোর স্বপন এখনো বেড়ায় ভেসে,
গাছের ছায়ায়, বনের মায়ায়—পাখীর গানের দেশে।
হেথা আলো নাই, নাই সে আকাশ চপল জীবন-ধারা;
বনের বিহগী মাথা খুঁড়ে মরে—নীরব পাষাণ কারা!

কাঁদে বীরবালা রাণী গুইদোলো—কাঁদে সে আপন মনে;
অসীম নভের বিহগী কেমনে রহিবে খাঁচার কোণে?
সে যে গেয়েছিল উদয় অচলে নব প্রভাতের গান,
সে যে চেয়েছিল ছিঁড়িতে শিকল;—দীপ্ত স্বাধীন প্রাণ
মুক্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াতে বাধা-বন্ধন-হারা,—
তাই আজি তার ক্রন্দন সার বসতি অন্ধ কারা!
কাঁদে গুইদোলো—কাঁদে চিরদিন—কাঁদে মুক্তির লাগি'

উত্তর-বঙ্গের শাঁখবোল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

আমাদের দেশের একদল পণ্ডিতের মত হইতেছে যে, ইউরোপে যে-প্রকারের রাখালী গান (pastoral songs) প্রচলিত আছে, আমাদের দেশে সেই জাতীয় কোনও গান নাই। অপর দল বলিয়া থাকেন যে, ইউরোপীয় রাখালী গানের মত সঙ্গীত এই দেশে প্রচলিত না থাকিলেও গোষ্ঠ-লীলা কীর্ত্তনগুলি এই জাতীয় সঙ্গীতের ভিতর কতকটা স্থান পাইবার যোগ্যতা রাখে। আমরা বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, আমাদের বাঙলা দেশেও বহু রাখালী গানের প্রচলন ছিল।

বাঙলার রাখাল বালকেরা হাডু-ডু, চি-বুড়ী, পাণ্টি, লাঠি প্রভৃতি ক্রীড়া-কৌতুকের ভিতর নানাপ্রকার ছড়ার আবৃত্তি করিত এবং অবকাশ সময়ে সনুত্তে নানাপ্রকার ছড়া মেঠো সুরে গাহিত। এই সকল ছড়াকেই "রাখালী গান" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। মালদহ ও রাজসাহী জেলার রাখালগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত "শাঁখবোল"গুলিও রাখালী জাতীয় সঙ্গীত। বর্ত্তমানকালে শিক্ষিত সমাজের অবহেলা ও পল্লীর নিদারুণ দুরবস্থাহেতু রাখালী সঙ্গীত-গুলি প্রায় বিলয় প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে—এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাই আমাদের পরম আদরের মূল্যবান সম্পদ।

অদ্যাপি মালদহ ও রাজসাহী জেলার রাখাল বালক-গণ শাঁখবোলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের প্রথম দিন হইতে প্রত্যেক গ্রামের রাখালেরা পৃথক পৃথক দল গঠন করে। কোন কোন গ্রামে দুই তিনটি দলও গঠিত হয়। এই সকল দল প্রথম দিন হইতেই প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শঙ্খ বা শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী যায় এবং নানাপ্রকার ছড়া নানা সুরে আবৃত্তি করে। এই সকল ছড়াকেই এতদঞ্চলে "শাঁখবোল" বলে। বাড়ীর মালিকগণ কেহ পয়সা, কেহ চাউল, কেহ বা অন্য শস্য—যাহা স্বেচ্ছায় দান করে, তাহাই রাখালেরা গ্রহণ করে। এইরূপে তাহারা বিভিন্ন বাড়ী হইতে যাহা পায়, তাহা হাটে বিক্রয় করিয়া পূজার উপকরণাদি ক্রয় করে। তাহারা সারা মাস শাঁখবোল গাহিয়া বাড়ী বাড়ী দান বা ভিক্ষা সংগ্রহ করে। সংক্রান্তির দিন নদী বা দীঘির ধারে শাঁখবোলের সমাপ্তি-উৎসব সংঘটিত হয়।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় রাখালেরা দল বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ীর সদর দরজার উপস্থিত হয় এবং সমস্বরে হাঁকে—"বল শিব।" তারপর সুর করিয়া একজন শাঁখবোল গাহিতে থাকে এবং সকলে তাহার পুনরাবৃত্তি করে। গান গাওয়া শেষ হইলে সকলে সমবেত কণ্ঠে বলে—"শিব, এক কুলা দান লিব।" কোন কোন বাড়ীতে রাখালেরা যখন দরজার নিকট হাঁক দেয়, তখন বাড়ীর কেহ কেহ হেঁয়ালির আকারে তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করে; তাহারাও প্রত্যুত্তর দেয়।

এ উৎসবে কোনও আড়ম্বর নাই—আছে রাখালদের সভক্তি আন্তরিকতা। উৎসবে কোনও শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। রাখালেরা নিজেরাই ইহার পুরোহিত। পূজার উপকরণ—চিঁড়া, মুড়ী, মুড়কী, খৈ, দৈ, ধূপ, সিঁদুর, একটি সোলার ফুল, আর একটি কলাগাছ।

পূজার দিন ছোট বড় সমস্ত রাখালই উপবাস করে এবং সকাল হইতেই পূজার আয়োজনে ব্যস্ত থাকে। তাহারা গোয়ালা, মুদি ও মালাকরদের বাড়ী শাঁখবোল গাহিয়া কোনও দান গ্রহণ করে না। পূজার দিন তাহাদের বাড়ী যাইয়া প্রয়োজন মত রাখালেরা দধি, ধূপ, সিঁদুর, সোলার ফুল প্রভৃতি লইয়া আসে। পূজার আয়োজন করিতে কিছু বেলা হয়। তখন তাহারা পূজার যাবতীয় দ্রব্যাদি-সহ নদী বা অন্য নিকটবর্ত্তী জলাশয়-তীরে গমন করে। তারপর সকলে স্নান করিয়া কলাগাছটি জলের ধারে পুঁতিয়া দেয় এবং তাহার মূলে একটি অনুচ্চ মাটির বেদী প্রস্তুত করে। বেদীর উপর সিঁদুর ছড়াইয়া দিয়া সোলার ফুলটি কলাগাছে বাঁধা হয়। চিঁড়া, দৈ প্রভৃতি আহার্য্য-দ্রব্য বেদীর চারিদিকে সজ্জিত থাকে। আগে পিছে রাখালেরা দাঁড়ায় এবং শাঁখ-বোল গাহিতে গাহিতে কলাগাছটি প্রদক্ষিণ করে। তারপর সকলে বেদীমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।

শাঁখবোলের সমাপ্তি দিবস রাখালদের খুব আনন্দের দিন। তাহাদের কি উৎসাহ-উদ্দীপনা! তাহাদের সরল নিষ্পাপ হৃদয়ের আন্তরিকতা দেখিলে মনে হয় যে, অভিজাত সম্প্রদায়ের গৃহে যে সাড়ম্বরে মহা ধূম-ধামে ষোড়শোপচারে পূজা হয়, তাহার চেয়ে এই উৎসব কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে।

মালদহ জেলার পল্লী-অঞ্চল হইতে যে কয়েকটি শাঁখ-বোল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

(১)

আলাম রে ভাই গিরস্তের বাড়ী
হাস-ফাঁস মোজম দাড়ী।
মোজম দাড়ী শিরথানী থুয়ে
চোর পালালো ধুদুর্দুড়িয়ে।
ধর চোর কত দূরে যায়
নিম গাছের শিম খায়।
ও শিম যোগায় রে,
চাম্পার ফুল ভাসায় রে।
ও চাম্পা বৈদামান
হাস্যা-খেল্যা কর দান।
দে দান যাই বরাতে
সোনারায়ের পূজা দিতে।
ও সোনারায় কর কি?
সোনার লাঙ্গল গড়েছি।
সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল
ভাত ভাংগায় বাহাছি হাল।

আড়াই পাক বাহা'র
তাতে লাঙ্গল ভাঙ্গাছি।
লাঙ্গল ভাঙ্গা খাবি কি?
* * *
"শিব, এক কুলা দান লিব।"

(শব্দার্থ,—শিরথানী= বালিশ। এই গানটিতে 'চোরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দস্যুদলকে ধরিবার জন্য রাখালগণ নির্দ্দেশ করিতেছে। এই গানটিতে লাঙ্গল, শস্য ক্ষেত প্রভৃতির কথাও বর্ণিত হইয়াছে।

(২)

ও পারেতে বগ্‌লা (১) গো চ'রে
খায় কুসুমের ফুল।
জগৎরাণী সিয়ান গো ক'রে
পাঁজা পাঁজা চুল॥
চুলগাছি তার আলো ঝালো
পিঠে কেনে থ্‌লো।
গোহাল ঘরে গোবর লিতে
বল্‌দে মারে হুঁড়া॥
হুঁড়া নাইরে হুঁড়ি নাই রে
তর্‌লো বাঁশের আগা।
সে আগার বাঁশী ভাই রে
বলে 'রাধা রাধা'।
"শিব এক কুলা দান লিব।"

(৩)

পালারে ছাইলা পিলা হুম্মা এসাছে,
হুম্মার মাথায় লাল টুপি দাদা দেখাছে।
দাদার হাতে তীর কাম্‌ঠা মাইরা ফেলাছে
দুটা চিত্‌হল মাছ ভাইসা উঠাছে।
একটা লিলে জগৎরাণী
একটা লিলে টিয়া,
টিয়ার মাকে বিহা করি
লাল শাড়ী দিয়া।
শাড়ী লিব না রে
তসর আইনা দে
তসর করে ঘসর ফসর
ডুলি আইনা দে।
ডুলিতে ঢোঁড় সাপ
ফোঁস মার্যাছে,
কাঁদিস না টে কাঁদিস না
যাস্ মায়ের বাড়ী।
মায়ের বাড়ী তেল্ সিঁদুর
পরের বাড়ী ফোক্কা,
কি লক্ষ টাকার খোপ্পা।

এই গানটিতে 'হুম্মা' জন্তুটির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তর বঙ্গের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা শিশুদিগকে ব্যাঘ্রের কথা শুনাইয়া ভয় প্রদর্শন করে। এতদঞ্চলে 'হুম্মা' শব্দে ব্যাঘ্র বুঝায়।

দলপতি—"এক আঙ্গুলে জল তলসী,
মা আঙ্গুলে শুদ্ধু হলো।"
অন্যান্য রাখালগণ—"ওরে খেলা খেল,
ওরে বাছা যাদু
থাক মায়ের কোলে।"
দলপতি—"এক হাঁটু জল তুলসী
মা হাঁটু শুদ্ধু হলো।"
রাখালগণ—"ওরে খেলা খেল,
ওরে বাছা যাদু
থাক মায়ের কোলে।"

এই গানটিতে পায়ের আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁটু, কোমর, পেট প্রভৃতি ক্রমে মস্তকের কেশ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়। পুনরায় মাথার কেশ হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত উল্লেখ করিয়া গানটি সমাপ্ত হয়। ইহার সুর অতি মধুর এবং অন্যান্য শাঁখবোলের সুর হইতে স্বতন্ত্র।

এই গানটিতে শিশুগণকে মায়ের কোলে শান্তভাবে লুকাইয়া থাকিবার কথা বলা হইতেছে।

শাঁখবোলের পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বাঙলায় মুসলমান রাজত্বের অধঃপতন এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ সময়ের মধ্যে গৌড় দেশে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, এই অরাজকতার ফলে বহু গ্রাম ধ্বংস হইয়া গেল। কালক্রমে ধীরে ধীরে গ্রামের পর গ্রাম জঙ্গলে পরিণত হইতে লাগিল। দস্যু, তস্করগণের অভিযান চলিতে লাগিল। দস্যুরা শুধু অধিবাসীদের গৃহ হইতে ধন-সম্পত্তি লইয়াই ক্ষান্ত হইত না, তাহারা অনেক সময়ে ক্ষেত্রের পাকা শস্যও কাটিয়া লইয়া যাইত। (১) একদিকে দস্যু, তস্করদের অত্যাচার, অপরদিকে গ্রামগুলিতে বিরাট জঙ্গলের সৃষ্টি হওয়ায় গ্রামগুলি ব্যাঘ্র, শূকর প্রভৃতি বন্য জন্তুর আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং তৎকালীন অধিবাসীরা শান্তি-সুখ হারাইয়া নৈরাশ্যে জীবন যাপন করিতে লাগিল। এখন হইতে দুই শত বা আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বরেন্দ্রের অবস্থা এইরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল। যখন অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে আমন ধান্য পাকিয়া সোনার রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া যাইত, তখন অধিবাসীরা তাহাদের প্রাণ ধারণের একমাত্র সম্বল (২) এই ধান্য রক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিত। তাহারা সারাদিন সোনার ক্ষেতে বসিয়া থাকিত, আর রাত্রিবেলা দলবদ্ধভাবে হাতে লাঠি (৩)

(শেষাংশ ৭০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(১) বগলা=বক।

(১) তৎকালীন গৌড় বা বরেন্দ্রের দুরবস্থার কথা বঙ্কিমচন্দ্র "দেবী চৌধুরাণী"তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(২) বারেন্দ্রে প্রধান শস্যই আমন ধান্য।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন বরেন্দ্রের এই সব কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি "দেবী চৌধুরাণী"তে তৎকালীন অধিবাসীদের লাঠির শক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—লাঠি, তুমি বাঙলার আব্রু, পরদা রাখিতে, যান

সমাধান

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন

(১২)

সেই যে সকাল বেলা এ-বাড়ীতে পৌঁছিয়া দুলালী আশুবাবুকে দেখিয়াছিল, তদবধি সমস্ত দিনের মধ্যে আর একবার মাত্র তাঁহার দেখা পাইয়াছিল সেই বিবাহ-বাটীতে, যখন শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাহাকে এবং কনককে দেখিতে পাইয়া একটুখানি স্নিগ্ধ হাসির দ্বারা তাহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। আজ ভোরেই তিনি স্নান সারিয়া লইয়াছিলেন, এবং কনকরা যখন স্নান করিতেছিল সেই সময়ে তিনি দু'টি ঝোল ভাত খাইয়া গিয়াছিলেন। সারাটি-দিন আজ তিনি বিবাহ-বাটীতে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া-ছেন এবং রাত্রের আহার সেইখানেই সমাধা করিয়াছেন।

বিবাহানুষ্ঠান এবং রাত্রের অন্যান্য গুরুতর কাজ-কর্ম্ম শেষ হইয়া যাইবার পর রাত্র প্রায় একটার সময় তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং পরিশ্রান্ত দেহ শয্যায় ছাড়িয়া দিয়া মুদিত নেত্রে গড়গড়ায় ধূম পান করিতে লাগিলেন। একটু পরে কনক এবং দুলালীকে লইয়া ব্রহ্মময়ীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং গাত্র বস্ত্রাদি কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া একখানি পাখা লইয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকৃতপক্ষে আপনাকেই বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কনক কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া পান করিতে বসিল।

দুলালী তাড়াতাড়ি আসিয়া ব্রহ্মময়ীর হাত হইতে পাখা লইয়া নিকটে দাঁড়াইয়া উভয়কে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল।

"আহা হা তুমি কেন? ছেলে মানুষ, তোমার কষ্ট হবে" বলিয়া ব্রহ্মময়ী পাখা ফেরত পাইবার জন্য হাত বাড়াইলেন।

দুলালী পাখা না দিয়া হাত সরাইয়া লইল এবং কহিল, —"একটু হাওয়া করা আর এমন কি কষ্ট মা? আমার একটুও কষ্ট হয় না; বরং খুব আনন্দই হয়। আপনাকে হাওয়া দিচ্ছি বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আমার সেই চির-অপরিচিতা শৈশবে হারান আপন মায়েরই সেবা করছি।" তাহার চক্ষু দুইটি চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

আশুবাবু সরিয়া তাহার পার্শ্বে একটু স্থান করিয়া লইলেন এবং বলিলেন,—"আচ্ছা মা, তুমিই হাওয়া কর;কিন্তু দাঁড়িয়ে নয়। আমার পাশে এইখানে বসে নাও।"

দুলালী সরমে সঙ্কোচে একটু ইতস্তত করিতেছিল। ব্রহ্মময়ী তাহাকে টানিয়া বসাইয়া দিলেন, এবং অত্যন্ত স্নেহের সহিত কহিলেন,—"এমন মিষ্টি কথাও শিখেছিস্ মা! তুই যে আমার পেটের মেয়ে নস্, তা যে আমি ক্রমেই ভুলে যাচ্ছি!"

ব্রহ্মময়ী আজ প্রথম তাহাকে 'তুই' সম্বোধন করায় দুলালী বড় বেশী রকম তৃপ্তি বোধ করিল, এবং প্রফুল্লমুখে মৃদু হাসিতে লাগিল। কনকও আসিয়া মাকে একটু সরাইয়া দিয়া পিতার কোলের সঙ্গে লাগিয়া বসিয়া পড়িল।

আশুবাবু এতক্ষণে সুস্থ বোধ করিলেন।

... ... করার পর ব্রহ্মময়ী

"দেখে আসি দাঁড়াও" বলিয়া কনক উঠিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"দাদার ঘরের দোর বন্ধ নিশ্চয়ই এসে ঘুমাচ্ছেন।"

"তবে তোর বাবার মশারিটা ফেলে দে, আজ আর দেরি করা কোন মতেই উচিত নয়" বলিয়া তিনি খাটের নীচে দাঁড়াইয়া খুব জোরে হাওয়া দিতে লাগিলেন, এবং কনক মশারি ফেলিয়া চতুর্দ্দিক বেশ করিয়া গুঁজিয়া দিল। তার-পর মাঝের দরজা খোলা রাখিয়া তাঁহারা তিন জন পার্শ্বের কক্ষে শুইতে গেলেন। এই কক্ষে মা ও মেয়ে এক শয্যায় শয়ন করেন। আজ দুলালীর জন্য আর একখানি শয্যা রচনা করা হইয়াছে। কনকের ইচ্ছা, দুলালীর সহিত একত্র শয়ন করে। গোপনে জননীর নিকট সে তাহার এই ইচ্ছা প্রকাশও করিয়াছিল, কিন্তু মেয়ে কোলে না থাকিলে মায়ের নাকি সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইবে শুনিয়া সে আর দ্বিরুক্তি করে নাই।

যত রাত্রেই শয্যা গ্রহণ করুন না কেন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা ব্রহ্মময়ীর বহুকালের অভ্যাস। তিনি পর দিবস নিয়মিত সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেই দুলালীও উঠিয়া পড়িল, এবং কনকের পদতলে সুড়সুড়ি দিয়া তাহারও নিদ্রাভঙ্গ করিল। অন্য কেহ হইলে এই ধৃষ্টতার জন্য কনক একটা বিষম অনর্থ বাধাইয়া তুলিত, কিন্তু বিরক্তির সহিত চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই সে যখন দুলালীকে দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

মা আসিয়া বলিলেন,—"যাও, মুখ হাত ধুয়ে তোমরা আবার সেজে গুজে নেও। আজ বাসি বিবাহ। আমি তোমাদের জন্য কাপড়-চোপড় দিচ্ছি।" কল্যকার বস্ত্র বিভ্রাটের বিবরণ তিনি কনকের মুখে সমস্ত শুনিয়াছিলেন।

মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া কনক ও দুলালী দেখিল ব্রহ্মময়ী দু'খানি সুন্দর রেশমী শাড়ী, দু'টি ভাল সেমিজ ও দু'টি ব্লাউজ বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। সেমিজ ব্লাউজ সবই কনকের; একখানা শাড়ীও তার; কিন্তু অপর শাড়ী-খানা তাঁহার নিজের।

"তোমার শাড়ীখানা দিদি পরবে?" বলিয়া আনন্দভরে কনক মায়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া প্রশ্ন করিল।

মা বলিলেন,—"হ্যাঁ, পরবে বৈ কি! মায়ের সব কিছুতেই মেয়ের ত অধিকার। এতদিন তুই একলা ছিলি, এখন আর একজন জুটেছে ভাগ বসাতে। তা' কি করবি? তুই-ই ত জুটিয়েছিস!" বলিয়া যুগপৎ উভয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। মেয়েরাও সেই পবিত্র হাসিতে যোগদান করিল।

মায়ের ব্যবহৃত বস্তু সমালোচনার অতীত; এবং মায়ের স্নেহের দান অমরার আশীর্ব্বাদ। দুলালী নিরতিশয় আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া বস্ত্রগুলি সযত্নে তুলিয়া লইল, এবং পরিপাটিরূপে স্নান প্রসাধন শেষ করিয়া আসিল। আশু-বাবু এবং তপেন তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই।

কথা হয়েছিল, তা জিনিষপত্র সব আছে কি? যদি থাকে তবে অল্প কয়েকখানা চেষ্টা করে দেখি এস।"

কনক তৎক্ষণাৎ যাইয়া সব কথা বলিতে বলিতে মাকে ধরিয়া আনিল, এবং মায়ের সন্তোষ এবং আগ্রহপূর্ণ অনুমতি পাইয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া পরম উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল। ব্রহ্মময়ীও সাহায্য করিতে লাগিলেন। দুলালী পুনরায় হাত মুখ ধুইয়া অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত কাজে হাত দিল। নিজে করিলেও সে প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্রহ্মময়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অনুমোদন লইয়া কাজ করিতে লাগিল। এইরূপে ঘণ্টাখানেক পরে যে ডজন দুই কেক প্রস্তুত হইল, কনক তাহার একখানি মুখে দিয়া প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল, শিলং হইতে তাহার পিতা মধ্যে মধ্যে যে রকম কেক কিনিয়া আনেন, অদ্যকার কেক তদপেক্ষা একটুও নিকৃষ্ট হয় নাই; এবং কিছুক্ষণ পরে চায়ের বৈঠকে বসিয়া আশুবাবু ও ভূপেন কনকের এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন।

দুলালীর এবং কনকের বড় আনন্দ হইল।

(১৩)

অপরাহ্ন তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়। ভূপেন আপন কক্ষে বসিয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন। কনক ও দুলালী আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি চোখ তুলিয়া চাহিয়াই একটু নড়িয়া চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিতে বসিতে যথাস্থানে বুকমার্ক সংস্থাপন করিয়া পুস্তক বন্ধ করিলেন।

দুলালী কহিল,—"আমাকে অল্প খানকতক পোষ্টকার্ড, এনভেলাপ, চিঠির কাগজ এবং একটা সাধারণ দোয়াত কলম কিনে এনে দেবেন? এক টাকার মধ্যে যা হয়।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ধীরে ধীরে ভূপেনের সম্মুখে টেবিলের উপর স্থাপন করিল।

ভূপেন একটু বিস্মিত হইয়া কৌতুকভরে প্রশ্ন করিলেন,—"পোষ্টকার্ড এনভেলাপ দিয়ে কি করবে?"

দুলালী হাসিয়া ফেলিল। ভূপেনকে এখন আর সে পূর্ব্ববৎ অতটা সঙ্কোচ করে না। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আপনিই বলুন না কি করব?—লোকে এ সব দিয়ে কি করে ভাই কনক?"

কনক উভয়ের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

দুলালীর নিকট এই প্রকারে অপ্রস্তুত হইয়া ভূপেন প্রচুর আনন্দলাভ করিলেন। তিনিও হাসিয়া ফেলিলেন, এবং হাসিতে হাসিতেই বলিলেন,—"অবশ্য প্রশ্নটা আমার খুব ঠিক হয়নি। তা' নাহয় শুধরেই নিচ্ছি। কিন্তু চিঠিপত্র লিখবার মতন যে তোমার কোথায়ও কেউ আছেন, এ সংবাদটি ত এতদিনেও জানতে পারিনি। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, কোথায় কাকে চিঠি লিখবে?"

কণ্ঠস্বরে একটু দুষ্টুমি মাখিয়া দুলালী উত্তর দিল,—"কেন, আমার বুঝি আপন জন নেই? আমার বুঝি কাউকে চিঠি লিখতে নেই?"

হাসিয়া কহিলেন,—"দূরবর্ত্তী কোন স্থানে কে তোমার এমন আপন জন শুনি? যাঁরা আছেন তাঁরা ত সঙ্গেই থাকেন!"

দুলালী বলিল,—"দূরে আর কাছে—এ দুয়ের মাঝখানের সীমানাটা আমায় দেখিয়ে দিতে পারেন? আমি ত বুঝি, হাতের কাছের জিনিষটিও দূরে—বহুদূরে হয়ে যায়, যখন তা চোখ-কানের গণ্ডীর বাইরে চলে যায়। শুধু তা-ই কেন, চোখের সামনের জিনিষটাও চোখ মুদলে দূরে হয়ে যায়। আবার ঢের ঢের দূরের জিনিষ হয়ে যায় সামনেকার। এই যেমন আপনাদের শহর আর আমাদের ও গাঁ। দূরে আর এমন কি-ই বা বেশী? আপনাদের গাড়ী আছে, যখন তখন ফস্ করে আপনারা যেতে আসতে পারেন, দূর আর দূর রইল কই? কিন্তু আমার পক্ষে ঐ এত নিকটও একেবারে অত্যন্ত দূরে থেকে যায়; এবং সময় সময় ঐ দূরত্ব যেন আরও অসম্ভব রকম বেশী বলেই মনে হয়।"

ভূপেন আনন্দময় লঘু মনে শুনিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে যেন কেমন একটু অভিভূত হইয়া পড়িলেন,—সহসা কোন জবাব দিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, কি যেন একটু ভাবিয়া লইয়া, হঠাৎ আবার দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং টাকাটি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই টাকাটি কোথায় পেয়েছ? তোমার বাবা দিয়েছেন?"

দুলালীও যেন আপনার বাক্য-স্রোতে আপনি ভাসিয়া যাইতেছিল। ভূপেনের এই খাপছাড়া প্রশ্নে সচকিত হইয়া উঠিল, এবং একটু থতমত খাইয়া কহিল,—"না—তা হ্যাঁ,—গুটিপোকা বিক্রি করে আমি এবার সাড়ে তিন টাকা পেয়েছিলাম; এ তারই এক টাকা।"

ভূপেন বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন,—"তোমার স্বোপার্জ্জিত এই টাকাটির তবে আরও সুন্দর রকমের একটা সদ্গতি করা যাক।" এই কথা বলিয়াই তিনি কনকের হাতে টাকাটি দিলেন,—"যা ত কনক! ভজুয়াকে এই এক টাকার ভাল সন্দেশ আনতে দিয়ে আয়।"

"সে কি দাদা!" বলিয়া কনক ইতস্তত করিতে লাগিল।

—"তুই যা না বাপু! যা' বলি শোন্। ছোট বোনের কাছে তার দাদা গুরুজন, তা' জানিস্ ত? গুরুবাক্যে অবহেলা করতে নেই—" বলিয়া ভূপেন নিজেই হাঁকিলেন,—"ভজুয়া—এই ভজুয়া!"

"আজ্ঞে" বলিয়া বালক-ভৃত্য ছুটিয়া আসিল।

ভগ্নীর হাত হইতে টাকাটি লইয়া তাহার হাতে দিয়া ভূপেন কহিলেন,—"দৌড়ে রাধিকার দোকানে যা; খুব ভাল দেখে এক টাকার সন্দেশ এক্ষুণি কিনে আনবি; বুঝলি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ" বলিয়া ভজুয়া গমনোদ্যত হইল।

—"বুঝলি! খুব ভাল হওয়া চাই। ভাল যদি না হয়, ঠিক জেনে রাখিস্, সব ক'টা তোকে খাইয়ে দেব। যা,—দৌড়ে যা।" ভজুয়া দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

দুলালী তাহার মুখ চোখের অপূর্ব্ব দীপ্তি এবং সুমধুর হাসির দ্বারা প্রচুর হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ভূপেন বলিলেন,—"ঠগের পাল্লায় পড়ে অমন চকচকে

মৃদু হাস্যে অন্তরের পরিপূর্ণ প্রফুল্লতা জ্ঞাপন করিয়া দুলালী কহিল,—"তা' ঠিকই; কিন্তু সঙ্গে থাকলে, এ রকম করে ঠকিয়ে খেতে পারার বক্‌সিস্‌ বলে বাকি দু'টাকা আট আনাও দিয়ে দিতাম।"

তিন জনেই হাসিয়া ফেলিলেন। এইভাবে হাসি-গল্প আমোদ-আহ্লাদে দশ পনর মিনিট সময় পবন গতিতে উড়িয়া গেল, এবং ভজুয়া এক ঠোঙা সন্দেশ আনিয়া হাজির করিল।

"দেখি কি এনেছিস্‌" বলিয়া ভূপেন থাবা মারিয়া ঠোঙাটি হস্তগত করিলেন এবং একটি সন্দেশের এক কামড় মুখে দিয়া বলিলেন,—"বাঃ, বেশ এনেছিস ত! কিন্তু কি করলি বল্‌ দিকিনি। হতচ্ছাড়া উল্লুক কোথাকার! তুই এমন ভাল সন্দেশ আন্‌লি কোন্‌ বুদ্ধিতে? তোকে না বলেছিলাম, খারাপ সন্দেশ আন্‌লে সব তোকে খেতে দেব;—তা' বুঝি কানে যায় নি,—না? এখন কি খাবি তুই! খালি ঠোঙাটাই থাকবে তোর জন্যে।"

দুলালী আর কনক ত হাসিয়াই অস্থির।

সুমিষ্ট ধমকের স্বরে ভূপেন পুনরায় হাঁকিলেন,—"হাঁ করে চেয়ে কি দেখছিস ব্যাটা? যা,—জল ফুটছে কি না চট করে দেখে আয়।"

দাদাবাবুর চিরাচরিত এইপ্রকার স্নেহময় ধমকে পরিতুষ্ট হইয়া ভজুয়া গরম জলের তদ্বিরে ছুটিয়া গেল।

ভূপেনের আদেশে কনক মা'কে ডাকিল। তিনি আসিয়া কনকের মুখে সব কথা শুনিয়া প্রফুল্ল হাস্যে ভূপেনকে বলিলেন,—"বেচারির একটা টাকাই তুই এইরকম খরচ করে ফেললি?"

—"ওঃ, তা একটা টাকাই ত! আমার যখন নিজের টাকা হবে, আমি তখন স-ব টাকা ওকে খাইয়ে দেব।"

—"শুধু ওকে খাওয়াবে দাদা?"

—"সব্বাইকে খাওয়াব,—যে খেতে চাইবে তাকেই, তোকেও দেব। দেখিস্‌ তখন খেয়ে খেয়ে অসুখ আনিস্‌ নি!"

মা বলিলেন,—"আচ্ছা তা হবে, কিন্তু এখন চা খেয়ে আজকের মত ওকে পৌঁছে দিয়ে আয়। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আস্‌বি। এই ক'দিনের অনিয়ম অত্যাচারে তোর বাবার একটু অসুখ হ'য়েছে।"

উৎকণ্ঠার সহিত ভূপেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে মা? কি রকম অসুখ ক'রেছে?"

—"না, তেমন কিছু নয়। তবে এ বয়সে কি ও-রকম রাতজাগা আর ছুটোছুটি পোষায় ও শরীরে এখন।"

—"আজ তবে মধুই যাক মা; আমি আজ আর না-ই গেলাম।"

—"তা' কি হয় বাবা? মধু গেলেও তোমায় যেতে হবে। একা মধুর সঙ্গে ওকে পাঠাব কেমন করে।"

"মায়ের পিছনে দাঁড়াইয়া কনক তাহার বড় বড় চক্ষু দু'টিতে এক ঝলক অর্থপূর্ণ সুমধুর হাসি আনিয়া দাদার দিকে চাহিয়া দক্ষিণ করাঙ্গুলির দ্বারা আপনাকে নির্দ্দেশ করিল এবং ওষ্ঠ সঞ্চালনপূর্ব্বক শব্দহীন সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের [illegible]

নয়ন-সঙ্কেতে ভগ্নীর আবেদন মঞ্জুর করিয়া ভূপেন মা'কে বলিলেন,—"তবে বাবাকে একবার দেখে একটু চা খেয়েই বেরোন যাক।" তারপর দুলালীর হাতে সন্দেশের ঠোঙাটি দিয়া, এবং দিবার সময় আর একটি সন্দেশ তুলিয়া বলিলেন,—"এটা তবে তুমিই নাও। বাড়ীর সক্‌কলকে, মায় রান্নাঘরের বেড়ালটিকে পর্য্যন্ত স্বহস্তে তোমার এই সুমিষ্ট সন্দেশ পরিবেষণ কর গিয়ে। বড় ভাল মনেই খরচটা মঞ্জুর করেছিলে, তাই এমন চমৎকার সন্দেশ পাওয়া গেছে। ভজুয়া বেচারিকে কিন্তু ডবল বখরার কম দিও না।" দুলালী ঠোঙাটি লইয়া সুহাস্য মুখে মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া ভূপেনের আদেশ মানিয়া লইল।

বাসি বিবাহের পর গৃহে আসিয়া আশুবাবু স্নানাহার করিয়া ঘণ্টা দুই ঘুমাইয়া ও গড়াইয়া লইলেন। তারপর হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া একটু চায়ের জন্য কনককে ডাকিবেন মনে করিতেই ভূপেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার শরীর নাকি খারাপ বোধ হচ্ছে বাবা?"

হাসির দ্বারা পুত্রের উৎকণ্ঠা দূর করিয়া আশুবাবু উত্তর দিলেন,—"না তেমন কিছু নয়; একটু যেন অতিরিক্ত হয়রান হয়ে পড়েছি বলে বোধ হচ্ছে।"

এমন সময় কনক ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"বাবা! আমরা দিদিকে দিয়ে আস্‌তে রামপুর যাচ্ছি। তুমি এখন চা খাবে?"

পিতার সম্মতি পাইয়া কনক ভূপেনকে কহিল,—"তোমার চা-ও তবে এইখানে নিয়ে আসি দাদা!"

ভূপেন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দুলালী একখানি প্লেটে চারিটি সন্দেশ এবং এক গ্লাস জল আনিয়া হাসি মুখে আশুবাবুর সম্মুখে টিপয়ের উপর স্থাপন করিল।

আশুবাবু বলিলেন,—"এ কি মা? এ সব কি?"

দুলালী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। কনক তাহার হইয়া জবাব দিল, এবং নানারূপ ভঙ্গী সহকারে সন্দেশঘটিত বৃত্তান্তটি তাঁহাকে জানাইল। তিনিও শুনিতে শুনিতে হাসিয়া ফেলিলেন এবং একটি সন্দেশ মুখে দিয়া তাহার সুস্বাদের বিস্তর প্রশংসা করিয়া দুলালীর প্রচুর সন্তোষ বিধান করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে সকলের সন্দেশ এবং চা ঐ কক্ষে আনীত হইল, এবং সকলে বেশ আমোদ আহ্লাদ করিয়া জলযোগ করিতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময় বিজয় আসিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মময়ী হাসিমুখে "এস বাবা" বলিয়া আদর করিলেন। কনক তাড়াতাড়ি একখানি চেয়ার আনিয়া দিল, এবং তাহার জন্য চা ঢালিতে আরম্ভ করিয়া দুলালীকে কহিল,—"বিজয়-দাও দেখছি তোমার সন্দেশের ভাগ না নিয়ে ছাড়লেন না।"

দুলালী পরম যত্নে এক প্লেট সন্দেশ বিজয়কে দিল। কনকও এক পেয়ালা চা উপস্থিত করিল।

আশুবাবু কহিলেন,—"পেয়ালাটা এই দিকেই দাও কনক! বিজয়ের সন্দেশ খাওয়া হোক, তারপর ওকে দিও; নইলে খুব তাড়াতাড়ি করে খেলেও চা কিন্ত উ'রি মধ্যেই ঠান্ডা হয়ে পড়বে।"

এই প্রকার গল্প-গুজবে আমোদ-আহ্লাদে চা পর্ব্ব শেষ হইয়া গেলে, তাহারও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মধুসূদনের পরিচালনাধীনে ভূপেনদের গাড়ী ভূপেন, বিজয়, কনক ও দুলালীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভূপেনের আদেশে গাড়ী বাজারের রাস্তায় চলিল। কয়েকটি দোকান ঘুরিয়া ভূপেন একটি ছোট্ট সুন্দর ডবল টিনের সুটকেশ ও তন্মধ্যে তিন সেট পেয়ালা পিরিচ, একখানি চামচ, এক প্যাকেট চা, একটি ভাল ও সুন্দর ফাউণ্টেন পেন, এক শিশি কালি, একখানি মোটা এক্‌সারসাইজ বুক, এক প্যাকেট ভাল চিঠির কাগজ, কয়েকখানি শাদা এনভেলাপ, এক তা ব্লটিং কাগজ এবং রাধিকার দোকান হইতে ঠিক সেই সন্দেশ এক সের কিনিয়া লইলেন। তারপর পোষ্ট অফিসের পথ ধরিয়া খানকতক টিকিট পোষ্টকার্ড লইয়া রামপুরাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

ভূপেনের এবং কনকের ঐকান্তিক আগ্রহে বিজয় এই আনন্দপ্রদ ভ্রমণে বহির্গত হইলেও, মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতায় যাহাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা বা সঙ্কোচ না আসে তদুদ্দেশ্যে তিনি সর্ব্বাগ্রেই মধুর পার্শ্বে স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। কনকের চিরদিনের খেয়াল, সে গাড়ীর এক পার্শ্বে বসিবে। সুতরাং তাহাকে লইয়া পিছনের সিটে দুলালীর পার্শ্বেই ভূপেনকে বসিতে হইল।

কৌতূহলভরে কনক জিজ্ঞাসা করিল,—"এই ছোট সুটকেসটি কার দাদা? কি সব এনেছ এর ভিতরে?"

ভূপেন কহিলেন,—"কার সুটকেস বুঝে নাও না কেন? তোমার?—না।" দুলালীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমার?—না। বিজয়ের?—না। অতএব কার হতে পারে?—আমার; বুঝলে?"

তাঁহার বলিবার ভংগীতে কনক ও দুলালী হাসিয়া ফেলিল।

কনক হাসিতে হাসিতে কহিল,—"আচ্ছা, তা যেন হল; বিশ্বাস করি বা না করি, তোমার বলেই যেন স্বীকার করে নিলাম; কিন্তু ওর ভেতরে সব কি এনেছ?"

—"সব কথাই কি আগে থাকতে ফাঁস করতে আছে? চিন্তা কর, গবেষণা কর, ঘটে বুদ্ধি থাকে ধরতে পারবে; আর যদি না পার, চুপ করে থাক, যখন সময় হবে দেখতে পাবে।"

কনক বুঝিল,—বৃথা চেষ্টা। দাদা যে পথ ধরিয়াছেন তাহাতে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে না। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া হাসিতে লাগিল, এবং উভয় পার্শ্বের দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যাদিতে শীঘ্রই আত্মহারা হইয়া সব ভুলিয়া গেল।

প্রায় অর্দ্ধপথ অতিক্রান্ত হইবার পর দুলালীর হঠাৎ চৈতন্য হইল যে, ভূপেনের বাম হস্তখানি তাহার দক্ষিণ মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাহারই দক্ষিণ জানুর উপরে স্থাপিত রহিয়াছে। একটা অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক শিহরণ দুলালীর সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কখন যে ভূপেনের হাতখানি তাহার জানুর উপর পড়িয়াছিল, এবং দুলালী যে কখন কি ভাবে তাহা আপন মুষ্টিমধ্যে গ্রহণ করিয়াছিল, কিছুই তাহার হুঁস নাই। দুলালী বিষম লজ্জায় পড়িল, কিন্তু মুষ্টিচ্যুত করিয়া ধৃত হাতখানি সরাইয়া দিবার কিম্বা আপন হাতখানি টানিয়া লইবার শক্তিটুকু সে খুঁজিয়া পাইল না। লজ্জার সহিত একটা নূতন রকমের অব্যক্ত অনুভূতি তাহাকে পাইয়া বসিল, এবং শক্তিহীন জড় পদার্থের ন্যায় সে ঐ ভাবে ভূপেনের হাতখানি ধরিয়াই বসিয়া রহিল।

যথাস্থানে গাড়ী থামিলে সকলে নামিয়া পড়িলেন। দুলালী যেন কেমন অবসন্ন ও দুর্ব্বল বোধ করিল। প্রথম পদক্ষেপের সময় সে পড়িয়াই যাইতেছিল। ভূপেন তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,—"মোটরে চড়ার এই এক দোষ। মা'কেও দেখেছি ঠিক এই রকম। গাড়ী থামা মাত্রই নামতে নেই;—একটু অপেক্ষা করে নামতে হয়। কেমন এখনও মাথা ঘুরছে না কি?"

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে কোন মতে একটা "না" বলিয়া দুলালী তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লইল, এবং কনকের হাত ধরিয়া,—সম্ভবতঃ কনকের উপর আপন দেহভার কথঞ্চিৎ স্থাপন করিয়া, গ্রামের দিকে রওয়ানা হইল। বিজয় এবং সুটকেস্ হস্তে ভূপেন তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। অল্প একটু হাঁটিতেই দুলালীর অবসন্নতা অন্তর্হিত হইল।

সুখন আঙ্গিনায় দু'খানি মোড়া আনিয়া দিল। ভূপেন ও বিজয় বসিলেন। কনককে লইয়া দুলালী কূপের নিকট গেল এবং বেশ করিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া আসিল। ভূপেন বিজয়কে উপলক্ষ্য করিয়া দুলালী ও কনককে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিলেন,—"কনকের হাতে পড়ে আজ কাল চা খাওয়ার যে কি দুর্গতিই হয়েছে ভাই, তা আর কা'কে বলি? এতদিন ধরে তৈরী করে আসছে, কিন্তু একটুও যদি যোগ্যতা হল?"

বিজয় বলিলেন,—"কেন, বেশ ভালই ত তৈরী করে।"

—"হ্যাঃ, ভাল না ঘোড়ার ডিম। ফ্লেভারই ঠিক রাখতে পারে না,—তা আসে আবার চা তৈরী করতে!"

কনক হাসিয়া ফেলিল, এবং দুলালীকে কহিল,—"শুনলে দিদি, কি রকম প্রশংসা হচ্ছে আমার চায়ের! তা' আসল কথাটা কি, বুঝেছ? গাড়ীতে বসে বসে ভয়ানক হায়রান হয়ে পড়েছেন কিনা, এখন একটু চা পেলে খুব খুশী হয়ে ওঠেন,—বুঝলে? চল, একটু জল বসিয়ে দি গে।"

দুলালীর মুখখানি সহসা অন্ধকার হইয়া আসিল। সে কনককে একটু তফাতে আনিয়া অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বলিল,—"আজ যে ঘরে একটুও চা নেই, কি হবে ভাই? দাদাকে দৌড়ে পাঠিয়ে দি, কাজুলি থেকে দু'পয়সার চা নিয়ে আসুক। জল ফুটে উঠবার মধ্যেই এসে পড়বে। চা অবিশ্যি মোটেই ভাল হবে না; তা হোক গে, একদিন না হয় একটু খারাপ চা-ই খাবেন। গরীবের ঘর ত? দাদা! এই দাদা!"

সুখন আসিয়া ভগ্নীর নিকট কি যেন একটু শুনিল, এবং ঘরে ঢুকিয়া একটু এটা ওটা করিয়া একখানা মোটা লাঠি লইয়া অত্যন্ত দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। দুলালী এবং কনক পাকশালায় প্রবেশ করিল। ভূপেন অনুমানের দ্বারা ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিলেন। তথাপি কনককে ডাকিয়া তিনি

কথাটা শুনিয়া লইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে চীৎকার করিয়া সুখনকে ফিরাইলেন।

দুলালী পাকশালার ভিতর হইতে কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। সে মনে করিল, সুখনের পরিশ্রম হইবে এবং গরীবদের অনর্থক অর্থ ব্যয় হইবে, সুতরাং চা খাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করা যাক, এইরূপ একটা কিছু মনে করিয়াই ভূপেন বোধ হয় সুখনকে ফিরাইলেন। দুলালী আপত্তি জানাইতে উদ্যত হইতেই ভূপেন তাহাকে বলিলেন,—"চা আমার সঙ্গে আছে। তুমি জল বসিয়ে দিয়ে একবার এখানে এস।"

দুলালী কোন কথা না বলিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিতে গেল। কনক স্থির অচঞ্চল জিজ্ঞাসু নেত্রে একটু ক্ষণ ভূপেনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং বলিল,—"ও হরি! তবে বুঝি খানিকটা চা কিনে এনেছ? বুদ্ধি করে অমনি দুটো পেয়ালাও আনতে হয়।" বলিয়াই ছুটিয়া দুলালীর কাছে গেল।

স্বল্পকাল পরে তাহারা উভয়ে আঙ্গিনায় আসিল। ভূপেন তখন সুটকেসটি খুলিয়া তন্মধ্যস্থিত জিনিসগুলি একে একে বাহির করিতে লাগিলেন। ফাউণ্টেন পেনের ব্যবহার দুলালীকে ভালরূপে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কনককে আদেশ করিলেন; সন্দেশগুলি দুলালীর হাতে দিয়া বলিলেন,—"তোমার সব চেয়ে যারা আপন সেই দু'জনের ভাগ তুমি রাখ নি, তাই আমি তাঁদের জন্য এই কয়েকটি এনেছি।" তারপর সেই সুটকেস এবং তন্মধ্যস্থিত অন্যান্য জিনিস একটি একটি করিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। কনকের আনন্দ আর ধরে না। "বড় সুন্দর কলম হয়েছে দিদি, চমৎকার লেখা চলবে, দেখতেও কি বিউটিফুল! সুটকেসটিও বেশ হয়েছে; আর পেয়ালা ক'টিই বা কি সুন্দর! দাদা কিন্তু আমার খুবই ভাল, না ভাই দিদি?" ইত্যাদি বলিয়া সে মাতামাতি আরম্ভ করিয়া দিল। তারপর "ও হরি! সবই আনলে কিন্তু ছাঁকুনি আনলে না?" বলিয়া সে ভূপেনের একটি ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

ভূপেন কহিলেন,—"ওটা বাস্তবিকই ভুল হয়ে গেছে।"

দুলালী বলিল,—"কিছু ভুল হয় নি। ছাঁকুনি ছাড়াও বেশ চলবে। কিন্তু এত সব দামী দামী জিনিসপত্র কেন? আমার জন্য পর পর নানা রকমে আপনারা ঢের টাকা পয়সা খরচ করতে সুরু করলেন যে! এটা আমার পক্ষে বড় লজ্জার কারণ হয়ে পড়ছে। এই ত এক জোড়া রুলি দিলেন। আজ আসবার সময় কনককে খুলে নিতে বললাম, মা শুনতে পেয়ে নিষেধ করলেন এবং কিছুতেই খুলতে দিলেন না। কাপড় জামাতেও কাল কম টাকা খরচ হয়নি। আজ আবার আপনি এমন দামী কলম আর এ-সব জিনিস পত্তর কিনে আনলেন। আমি কিন্তু এতে বড় সঙ্কোচ বোধ করছি। আপনাদের স্নেহের দান প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে সাজে না, সুতরাং মাথা পেতে আমায় নিতেই হবে; কিন্তু দয়া করে আপনারা এভাবে আমাকে আর বিব্রত করবেন না।"

ভূপেন বেশ একটু বেদনা পাইলেন, এবং ব্যথাহত কণ্ঠে কহিলেন,—"একটা কলম, একটু কাগজ এবং দু'চারখানা টিকিট পোষ্টকার্ড তোমাকে দিবার অধিকার, অন্য কোন সুবাদে না থাকলেও, কনকের দাদা হিসাবে আমার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং এতে যদি তুমি দুঃখিত হও, আমি আরও দুঃখিত হব। তুমি আমার বাবাকে বাবা এবং আমার মাকে মা সম্বোধন করে, কনককে ঠিক সহোদরা ছোট ভগ্নীর আসনে বসিয়ে নিয়েছ তাতেই তোমার কোন একটা জিনিস চেয়ে নিতেও আমার বাধে না। তাই না তোমার টাকাটায় সন্দেশ খেলাম গায়ে পড়ে। আর তাই কোন জিনিস তোমাকে দিতেও আমার কোন রকম সঙ্কোচ হয় না। তবু যদি তোমার আপত্তি কিম্বা অনিচ্ছা থাকে, তা'হলে সুটকেসটা আর পেয়ালা পিরিচগুলি তুমি নিও না;—এ সব বরং আমারই থাকুক। আমার এই সব জিনিস তোমার কাছে তুমি রেখে দাও।"

ভূপেনের অভিমানপূর্ণ বেদনা দুলালীর অন্তরে প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। সে বুঝিল, এইভাবে ভূপেনকে আহত করা তাহার অন্যায় হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি কথার সুর ফিরাইয়া লইল, এবং হাসিয়া ফেলিয়া হাসিমাখা কণ্ঠে কহিল, —"তা কেন? আমার জন্য আপনি নিজে যখন এত দূর বয়ে এনেছেন তখন এর প্রত্যেকটি জিনিসই এখন আমার। তা ছাড়া এমন সব সুন্দর সুন্দর জিনিসের দিকে আমার লোভ নেই একেবারেই, সে কথা কে বললে?"

এই একটু হাসি এবং এই সামান্য দু'টি মনরাখা কথাতেই ভূপেন সব ভুলিয়া গেলেন। তিনিও হাসিয়া ফেলিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন,—"জিনিসগুলি কি সত্যি সুন্দর হয়েছে?"

দুলালী পূর্ব্ববৎ সহাস্যে কহিল,—"খুবই সুন্দর ত! পেয়ালা পিরিচ তিনটি ভারি চমৎকার—ডিসেণ্ট। কলমটাই বা কেমন চমৎকার! ওর দাম বোধ হয় খুবই বেশী হয়েছে?"

কনক বলিয়া উঠিল,—"আর সুটকেসটিও কম সুন্দর নয় দিদি! এমন রং করেছে,—ঠিক যেন চামড়ার তৈরী।"

ভূপেনের মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল; বুঝা গেল তাঁহার চিত্তে আর কোন গ্লানি নাই।

দুলালী হাসিতে হাসিতে সুখনকে ডাকিয়া বলিল,—"খুব ভাল একটা জিনিস খেতে দেব দাদা, যদি এক্ষুণি এই এতটুকুন ছোট্ট একখানা খুব সরু চালুনি বুনে দিতে পার। ফাঁকগুলি এমন মিহি হবে যেন জল ছাড়া আর কিছুই পড়তে না পারে।" বলিয়া দক্ষিণ তর্জ্জনীর দ্বারা মাটিতে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া চালুনির আকার নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

সুখন এই সব কাজে সিদ্ধহস্ত। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই সে চা ছাঁকুনির মতন ছোট্ট একখানি অতি সূক্ষ্ম চালুনি প্রস্তুত করিয়া দিল। কনক ত মহা খুশী। এই খাঁটি স্বদেশী ষ্ট্রেইনারটি সে সুখনের নিকট হইতে চাহিয়া লইল,—সে ইহা বাড়ী লইয়া যাইবে।

সুখন বোধ হয় কোন কাজ করিয়া এত বড় পুরস্কার আর কখন লাভ করে নাই। সে আর একদিন একটু দীর্ঘ সময় লইয়া খুব সুন্দর আর একখানা ঐরূপ ছোট্ট চালুনি কনকের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিবে বলিয়া কনককে আরও সন্তুষ্ট করিয়া দিল

(ক্রমশ)

ফেডারেশন ও মুসলিম লীগ

রেজাউল করীম এম-এ বি-এল

আসন্ন ফেডারেশন সম্বন্ধে আজকাল দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোক মতামত প্রকাশ করিতেছেন। যে ভিত্তির উপর ফেডারেশনের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহা যে দুর্ব্বল ও অকিঞ্চিৎকর—সে বিষয়ে সকলেই একমত। কংগ্রেসের ত কথাই নাই, যাঁহারা মডারেট ও উদারপন্থী বলিয়া পরিচিত, ইংরেজ প্রদত্ত প্রত্যেক বস্তুকেই যাঁহারা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং দেশবাসীকে গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন, তাঁহারাও আজ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পরিকল্পিত ফেডারেশনকে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। এইভাবে যখন দেশের চারিদিক হইতে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিতেছে, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধানতম চাঁই মুসলিম লীগ কি নীরব থাকিতে পারে? সুতরাং বহু আলোচনা ও গবেষণার পর লীগনেতারাও অবশেষে ফতোয়া দিলেন ফেডারেশন মুসলমানের পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য। কিন্তু দেশের অপরাপর প্রতিষ্ঠান যে কারণ দর্শাইয়া ফেডারেশনকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন, লীগনেতাদের আপত্তির কারণ ঠিক সেরূপ নহে, মুসলিম স্বার্থের দিক দিয়াই তাঁহারা ফেডারেশনকে বাতিল করিয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। মুসলিম লীগের আপত্তির কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব যে, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত। ফেডারেশনের আর যত রকম দোষ-ত্রুটি থাকুক না কেন, মাইনরিটি স্বার্থ বিশেষত তথাকথিত মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থায় ত্রুটি উহাতে বিন্দুমাত্র নাই।

ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে ফেডারেশন অগ্রাহ্য করিবার যুক্তিসংগত ও রাজনীতিসম্মত বহু কারণ আছে। প্রথমত বহু নিন্দিত ডায়ার্কির মত ইহাতে শাসন-কার্য্য দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সংরক্ষিত বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে বড়লাটের এলাকাধীন, অতি সামান্য কতকগুলি বিষয় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সৈন্য, বৈদেশিক নীতি, অর্থ ও বাণিজ্য বিষয়ক বিভাগগুলির উপর দেশের প্রতিনিধিদের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। আর যেগুলি দেশীয় প্রতিনিধিদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, তাহারও উপর মোড়লাগিরি করিবার জন্য বড়লাটের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। ফেডারেশনের আইন সভা হইতে মনোনয়ন প্রথা রহিত হইবে না, তদুপরি থাকিবে পরোক্ষ নির্ব্বাচন। দেশীয় রাজ্য হইতে যে সব প্রতিনিধি লওয়া হইবে তাঁহারাও মনোনীত হইয়া আসিবেন। ব্রিটিশ ভারতের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণও পৃথক নির্ব্বাচনের সাহায্যে নির্ব্বাচিত হইবেন। নির্ব্বাচন প্রথার ত্রুটির জন্য এমন সব পরস্পরবিরোধী লোক ফেডারেশনে প্রবেশ করিবেন যাঁহারা কোনদিনই সমবেতভাবে একই আদর্শ লইয়া কাজ করিতে পারিবেন না। এই সব দেখিয়া দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ফেডারেশনের বিরোধিতা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই বিরোধীদের তালিকায় মুসলিম লীগ যখন নাম লিখাইল, তখন অনেকে আশা করিয়াছিল যে, হয়ত উহার অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যই লীগ এরূপ করিল। কিন্তু লীগের বিরোধিতার কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফেডারেশনে যে লীগ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না, এই ভয়েই জিন্নাসাহেব বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, তাই তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে ফেডারেশন বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। উহার অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটি তাঁহার নিকট তত মারাত্মক ব্যাপার নহে।

ফেডারেশনে মুসলিম লীগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কি কোনদিনও সম্ভব হইতে পারে? সত্য বটে পাঞ্জাব ও বাঙলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু সমগ্র ভারতে মুসলমানের সংখ্যা এক চতুর্থাংশ হইতে কিছু বেশী। এই অত্যল্প সংখ্যক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যদি সকলেই লীগের পতাকাতলে সমবেত হন তবুও কি তাঁহারা ফেডারেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারিবেন? নিখিল ভারতীয় আইন সভায় মুসলমানকে চিরকালই সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া থাকিতে হইবে। রাজনীতিতে স্বতন্ত্রবাদ ও পৃথক নির্ব্বাচন নীতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে তাহার কোনও দিনই প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং ফেডারেশনে মুসলমান কোণঠাসা হইয়া থাকিবে। এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেও উহাই যে অপরিহার্য্য পরিণতি তাহা কে অস্বীকার করিবে? ইহা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই। মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ চিরকালই থাকিবে। তবে উহার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য দুইটি মাত্র পথ মুক্ত আছে। একটি বিশ্বাস ও অপরটি অবিশ্বাস। মুসলিম লীগের প্রধান নীতি হইতেছে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দল গঠন করিতে হইবে। এইভাবে গঠিত দল স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করিবে। জিন্নার নীতিকে খাঁটি বলিয়া স্বীকার করিয়া যদি ভারতীয় অ-মুসলমান উপাদানগুলি স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক দল গঠন করে তবে সে দলের চাপে মুসলমানের অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে? মুসলমানের প্রত্যেক স্বার্থকেই ত উহারা পদদলিত করিবে। কে তখন মুসলমানকে রক্ষা করিবে? নিখিল ভারতীয় ব্যাপারে তখন মুসলমানকে অপরের সাহায্য লইতে হইবে, অপর দলের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দল গঠিত হইলে অন্য দল কেন তাহাকে সাহায্য করিবে? সেইজন্য মুসলমানের স্বার্থের জন্যও প্রত্যেক মুসলমানকে দেখা কর্ত্তব্য, যাহাতে কোন অ-মুসলমান উপাদান সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দল গঠন করিতে না পারে। আর তাহার অগ্রে মুসলমানকেই আদর্শ দেখাইতে হইবে। তাহার সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং অ-সাম্প্রদায়িক দল গঠন করিয়া অ-মুসলমানকে সেই দলভুক্ত করিতে হইবে। এইভাবে যে সব দল গঠিত হইবে তাহাদের মধ্যে যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহারই হাতে শাসন ভার অর্পিত হইবে। এই গরিষ্ঠ দল যোগ্য হউক, অথবা অযোগ্য হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু এ দল সাম্প্রদায়িক দল হইবে না, এমনও হইতে পারে এই দলের অধিকাংশ সদস্য মুসলমান হইয়া যাইবে। তাহা যদি নাও হয় তবুও মুসলমান দলের কথা কেহই ভাবিতে পারিবে না। কারণ প্রত্যেক দলেই কতকগুলি মুসলমান থাকিবেই।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক দল ভাঙিগয়া অ-সাম্প্রদায়িক দল গঠন করিতে হইলে সকল সম্প্রদায়ের একটা প্রধান গুণ থাকা দরকার, তাহা হইতেছে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের অভাবে অ-সাম্প্রদায়িক দল গঠন করা কষ্টসাধ্য। নিজেদের সংখ্যাল্পতার কারণে লীগ-পন্থীরা যদি ভীত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদিগকে বলি "বিশ্বাস" করিতে শিখ। যদি বিশ্বাস করিতে না পার তবে তোমরা চিরকালই সংখ্যালঘু হইয়া থাকিবে। এবং তোমা-দিগকে চিরকালই সভয়ে থাকিতে হইবে। কেন না সাম্প্রদায়িক-তায় অটুট আস্থা রাখিয়া তোমরা কোনও দিনই সংখ্যাগুরু হইতে পারিবে না।

কিন্তু লীগপন্থীরা কোনও দিনই এদেশের কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না। অবিশ্বাসই হইতেছে তাঁহাদের রাজ-নৈতিক অস্তিত্বের চাবিকাঠি। এই অবিশ্বাসের শেষ পরিণতি কি হইতে পারে, তাহা কি লীগপন্থীরা একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? সকলেই মুসলমানকে ধ্বংস করিতে চায়। এই ভয় তাঁহারা প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণে জাগাইয়া দিতে চান। এই ভয়প্রযুক্ত তাহারা শেষ পর্যন্ত ভাবিয়া লইবে এদেশের কাহারও প্রভুত্ব অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকারের প্রভুত্বই মুসলমানের পক্ষে শুভকর। সেইজন্য এদেশবাসীর হস্তে যাহাতে অধিক-তর দায়িত্ব না দেওয়া হয়, তাহারা সেইভাবেই আন্দোলন করিবে, অথবা সেই প্রকার আন্দোলনের সহায়তা করিবে। সমগ্র ভারতে মুসলমান সংখ্যায় অল্প, তাহারা যে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নগণ্য হইবে তাহা মিষ্টার জিন্না ভাল করিয়াই জানেন। এরূপ অবস্থায় হয় তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে এদেশের প্রতিনিধির উপর অথবা বড়লাটের দয়ার উপর। কিন্তু মিষ্টার জিন্না স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি মুসলমানকে এদেশের কোন দলের উপর নির্ভর করিতে দিবেন না। ইহারা অবিশ্বাসী, ইহারা মুসলমানের শত্রু। তবে বিশ্বাসের পাত্র কে? এদেশবাসীর উপর অবিশ্বাস করিয়া তিনি প্রকারান্তরে মুসল-মানকে নির্ভর করিতে বলিতেছেন ব্রিটিশ সরকারের উপর। এইভাবে তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেইজন্য ফেডারেশনের ত্রুটিগুলিকে তিনি বড় করিয়া দেখিতেছেন না—তিনি বড় করিয়া দেখিতেছেন এদেশের মেজরিটির চাপে মাইনরিটিদের অসহায়ত্বের উপর। তাঁহার বলিবার মতলব এই, আসনের দিক হইতে মুসলমান ত অসহায়, কিন্তু ফেডারেশন প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে যেন মুসলমানের রক্ষার ব্যবস্থা বড়লাট বিশেষ ক্ষমতার নামে স্বহস্তে রাখিয়া-দেন।

ফেডারেশন আসিতে এখনও বহু বিলম্ব। উহা আদৌ প্রবর্ত্তিত হইবে কিনা, তাহাও এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এত পূর্ব্বে মাইনরিটি মুসলমানের নামে জিন্না সাহেবের মায়া-কান্না কাঁদিবার কি দরকার, অনেকে মনে করিতে পারেন! হ্যাঁ, দরকার আছে। কি দরকার তাহাই বলিতেছি। নিত্য পরিলক্ষিত হইতেছে যে, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে চারিদিকে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন উহা স্পর্শের অযোগ্য, সুতরাং উহাকে সমুদ্রপারে ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দাও। আবার যাঁহারা একটু মধ্যপন্থী তাঁহারা বলিতেছেন, ব্রিটিশ সরকার যদি উহা একটু সংশোধন করিতে পারেন, তবে আমরা প্রতিবাদ সহকারে গ্রহণ করিব। প্রথমোক্তদের কথায় যে ব্রিটিশ সরকার আমলই দিবেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। ফেডারে-শনের সামান্যমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া কি প্রকারে কর্ত্তৃপক্ষ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে সন্তুষ্ট করিবেন তাহাই হইতেছে ভাবনার বিষয়। বিগত গোলটেবিল বৈঠকের সময় দেখা গিয়াছে, মাইনরিটি সমস্যার নামে এদেশের রাজনৈতিক দাবীর প্রত্যেকটা অংশ চাপা পড়িয়াছে। বর্ত্তমানেও ফেডারেশনের সংশোধনের কথা উঠিয়াছে। এখনও যদি সেই প্রকার মাইনরিটি সমস্যাকে আবার জাগাইয়া তোলা হয় তবে সংশোধনের সমস্ত কথা হয়ত চাপা পড়িবে। জনমতের চাপে ব্রিটিশ সরকার যদি ফেডারেশন সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একটা ছোট-খাট গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করিতে স্বীকৃত হন তবে তাহাতে মাইনরিটিদের নেতা ও মডারেটদের নেতাদিগকে নিশ্চয় আহ্বান করিবেন। কংগ্রেস মহাসভা, মুসলিম লীগ ও মডারেটদের সংমিশ্রণে এই গোলটেবিল বৈঠক প্রহসনেই পরিণত হইবে। তখন জিন্না সাহেব হয়ত দাবী করিয়া বসিবেন এক তৃতীয়াংশ সদস্য পদ মুসলমানের জন্য যথেষ্ট হইবে না, আরও বেশী অংশ চাই। হয়ত মহাসভা তাহাতে আপত্তি করিবে। তারপর আরম্ভ হইবে অজাযুদ্ধ। তখন সরকার বাহাদুর আমাদের অযোগ্যতার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া হয় কোন-রূপ সংশোধন করিবেন না, অথবা এমনভাবে করিবেন যাহাতে প্রতিক্রিয়াশীলদের অধিকতর সুবিধা হইবে। আটটা প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা যে শিক্ষা পাইলেন তাহা এক্ষণে এমনভাবে কার্য্যে প্রয়োগ করিবেন যেন কংগ্রেসের বর্জ্জন নীতির দ্বারা ফেডারেশনের কোনরূপ অঙ্গহানি না হইতে পারে। এই অবস্থার সৃষ্টির জন্য এবং মাইনরিটি সমস্যার নামে ব্রিটিশ সরকারকে সুবিধা দিবার জন্যই মিঃ জিন্না আজ মুসলিম স্বার্থের নামে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রকার বিরোধিতার মূলে মুসলিম স্বার্থের নাম-গন্ধ নাই। সেইজন্য ফেডারেশনের অনিষ্টকর অংশের দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। সেগুলি তাঁহার দৃষ্টিতে কিছুই নহে। মুসলিম স্বার্থের নামে দেশ-দ্রোহিতার অনেক দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। আসল উদ্দেশ্যকে গোপন করিয়া অন্য নামে আন্দোলন চালাইবার ইহাই শেষ প্রচেষ্টা নহে। বহুদিন পর্যন্ত এইভাবে সাম্প্রদায়িক নেতারা মুসলমানকে প্রতারিত করিবেন। মুসলিম স্বার্থের দিক হইতে ফেডা-রেশনের অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে আগামীবারে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মায়ার কবর

(গল্প)

শ্রীসুনীল ঘোষ

এ বাড়ীর কেউ কাউকে চেনে না, চেনে শুধু একটি মেয়েকে। শাদা ফ্রক পরা কোঁকড়ান চুলের একটি মেয়ে—সর্ব্বত্রই যার অবাধগতি। আর যারা আছে তাদের দেখা হয় শুধু সিঁড়ি দিয়ে নামা-ওঠার সময়। সুতরাং পরস্পর ভাল রকম পরিচয় হবার সুযোগ হ'য়ে ওঠেনা। মাসের মধ্যে অমন কত ছোট-বড় সংসার এখানে যাচ্ছে আসছে। নীচে ওপরে এখন কত ফ্ল্যাট খালি প'ড়ে রয়েছে।

একতলার সিঁড়ির তলায় যে খালি জায়গাটুকু প'ড়ে রয়েছে সেটুকু বাড়ীর সর্ব্বজনীন দরোয়ান মনোহরের পূর্ণ অধিকারে। ঐটুকু জায়গাতেই সে তার পৈতৃক সম্পত্তি দড়ির খাটিয়াটা মানানসই করে পেতে নিয়েছে। খাটিয়ার পায়ের দিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার ডাল-রুটি বানাবার অল্প করে সরঞ্জাম এবং মাথার দিকে নীচু করে খাটান ছোট একটা তাক। তাতে রয়েছে তুলসীদাসের অতি জীর্ণ একখানা রামায়ণ এবং তারই পাশে আছে খৈনি বানাবার চূণ আর দোক্তা। বাড়ীর সকলের খোঁজ এই মনোহরের কাছেই পাওয়া যায়।

সিঁড়ির তলায়, বারান্দার রেলিংয়ে আর বিকেল বেলাটায় উঁচু পাঁচিল দেওয়া ছাতে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কলরব করে,—তা-ও ঘণ্টা খানেকের জন্যে। সংখ্যায় তারা অনেক, বয়সে তারা ছোট। অল্প সময়ের ছুটি পেয়ে তারা খেলাই করে—নাম মনে রাখবার সময় কেউ পায় না। বিচিত্র তাদের পোষাক—অদ্ভুত তাদের খেলা করবার ভঙ্গী। দলের কারুর পরাজয়ে সকলের সমবেত হাততালির প্রচণ্ড শব্দ শুধু ঐটুকু সময়ের জন্যেই শোনা যায়।

এদের যারা বড় এবং তাদের বড় যারা তারা নিঃশব্দে নিজেদের কাজ গুছায় ঘরে এবং বাইরে।

ওদের চেয়ে বয়সে যারা আরও ছোট তারা শুধু ঐ হাততালিতেই যোগ দেওয়ার অধিকার পায়। খেলার সময় তাদের বুকে হাত রেখে গোনা হয় না। ছোট হয়ে তারা ঐ দোষটাই করেছে। পাঁচিলের কোণে তারা দর্শক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে।

শাদা ফ্রক পরা মেয়েটি এই দর্শকদেরই বয়সী। কোন সময়ের জন্যে একে খেলার দলে দেখা যায় না। বাড়ীর প্রত্যেকটি অংশ সে ভাল রকম জানে। সবশুদ্ধ ক'খানা ঘর এ বাড়ীতে, কতগুলোই বা সিঁড়ি—সব তার মুখস্থ। কোন ঘরে এখনও ভাড়াটে আসেনি এবং কোন ঘরে নতুন ভাড়াটে এল, তার খোঁজ সেই রাখে। নতুন ভাড়াটের ঘরে ঢুকে তাকেই নিজে থেকে আলাপ করতে হয়, জিজ্ঞেস করতে হয় তার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। এত বুদ্ধি যার তাকে বাড়ীর লোক কেন যে আমল দেয় না, তা' সে ভেবে ঠিক করতে পারে না। বয়সও তা তার কম হল না! আঙুলের দাগ গুনে সে বলে দিতে পারে বয়স তার পাকা ছ'বছর।

নীচের ফ্ল্যাটে ভেতর দিকটায় আজ একজন নতুন ভাড়াটে এল। দুরের মধ্যে মোট নামাবার দুপ দাপ শব্দ শুনে সে নেমে এল। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সে সেই ভাড়াটের চাল চলন একদৃষ্টে লক্ষ্য করতে লাগল।

ভাড়াটের সমস্ত জিনিষ ঘরে আনা হয়ে গেল। এইবার সে ঘর গুছাতে আরম্ভ করে দিল। টেবিল চেয়ার পছন্দসই জায়গায় রেখে সেলফ টাঙান সেরে ভাড়াটে যখন তার খাটখানা লাগাতে আরম্ভ করলে তখন সে আর কথা না কয়ে থাকতে পারলে না। দু'পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, আর কেউ আসবে না তোমার? এইবার ভাড়াটে মুখ ফিরাল। তাকে দেখে একটু হেসে বললে, না কেউ আসবে না, আমি একলা থাকব। কেন, তোমার ভাল লাগছে না? সবলে মাথা নেড়ে সে বললে, উঁহু তোমায় মোটেই ভাল লাগবে না। নিঃসন্দেহ হবার জন্যে সে আবার বললে, আমি ঘুমিয়ে পড়লে তুমি কাউকে রাত্তিরবেলা নিয়ে আসবে না ত? দাড়িতে হাত বুলিয়ে ভাড়াটে বললে, না গো না। আচ্ছা খুকী—বাধা দিয়ে খুকী বললে, বল মানু। ভুল শুধরে নিয়ে ভাড়াটে বললে, আচ্ছা মানু, আমায় কি খুব খারাপ দেখতে? পাকা গিন্নীর মত হাত নেড়ে মানু বললে, তোমার ত বয়েস কম হল না বাছা! যার গোঁপ দাড়ি বেরিয়ে যায় তাকে দেখতে কার ভাল লাগে বলত বাপু! একটু থেমে সে আবার বললে, ও ভয় দেখাবার জন্যে আবার এত বড় একটা চশমা পরা হয়েছে। ওসব ভয়-টয় আমি পাইনে হ্যাঁ।

কার কণ্ঠস্বরে বুঝি বিচলিত হয়ে মানু ওপরে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরে এল। ভাড়াটে ব্যস্ত হয়ে ডাকলে, মানু শোন শোন। তখনি মানু ঘরে ঢুকল, হাত নেড়ে বিরক্তস্বরে বললে, আঃ—কি দরকার শুনি! যাচ্ছিলাম একটা কাজে—বাধা দিয়ে ভাড়াটে বললে, অত কিসের কাজ শুনি! হাত নেড়ে নাচের তালে তালে মানু বললে, খোকন যে দুধ খাবার জন্যে চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করছে, শুনতে পাচ্ছ না? আমার হাতে দুধ না খেলে ও'র আবার রোচে না। কি দুষ্টুই না হচ্ছে আজকাল! কথাগুলো এক নিশ্বাসে শেষ করে মানু ছুটল ওপরে। তার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার দুপ দাপ শব্দ মিলিয়ে যেতে ভাড়াটে আবার তার ঘর গুছাতে লাগল।

কিছুপরে পেছন থেকে কচি গলায় আওয়াজ এল, তোমার নামটা কি শুনি! ঘাড় ফিরিয়ে ভাড়াটে দেখলে প্রশ্নকর্ত্রী স্বয়ং মানু। একটু হেসে সে বললে নাম জেনে কি হবে তোমার? ঘরে ঢুকে মানু বললে, কি আবার হবে? এমনি জিজ্ঞেস করছি। ভাড়াটে বললে, আমার নাম মহীতোষ বুঝলে? ঘাড় নেড়ে মানু বললে, মহীতোষ? তা নামটি বেশ। আমার মত এত ছোট না। হাত দুটো পেছনে ঘুরিয়ে মানু বিজ্ঞের মত জিজ্ঞেস করলে, কি কর তুমি? বইগুলো গুছাতে গুছাতে মহীতোষ বললে, কলেজে মাষ্টারী করি। একটু ভয় পেয়েই মানু যেন বললে, মাষ্টার? ছেলেরা দুষ্টুমী করলে খুব মার ত তাদের? মাথা নেড়ে মহীতোষ বললে, উঁহু, মারব কেন? মানু এবার মহীতোষের গা ঘেঁসে

দাঁড়িয়ে বললে, তবে ত তুমি ভাল লোক। ...
ছিলাম যাদের দাড়ি-গোঁপ আছে তারা বুঝি চশমা প'রে ছেলে-
দের মারে, ভয় দেখায়।

ঘরখানায় ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। মানু বললে, যাই এবার। সন্ধ্যা বেলা লেখাপড়া করতে হয় কিনা! মানু পা বাড়াল। মহীতোষ বললে, আজকে না হয় না-ই পড়লে। তোমার সংগে ভাব হল, একটু গল্প করবে না? মানু বললে, আমার কি ছাই পড়াশুনা হয়? খোকনটা যা' দুষ্টু, ওকে কোলে রেখে প্রথম ভাগ নিয়ে আমি খুব চেঁচিয়ে পড়ি— খোকন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শোনে। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, আমার দেখাদেখি খোকনও অ, আ বলে। আশ্চর্য্য হ'য়ে মহীতোষ বললে, তাই নাকি? খোকন ত তা'হলে বড় দুষ্টু! চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে মানু বললে, ওর কথা আর বল না! আমায় হাড়ে-নাড়ে জ্বালিয়ে খেলে। মহীতোষ জিজ্ঞেস করলে, তোমার বাবা কি করেন, মানু? পা দোলান বন্ধ করে ভাসা ভাসা চোখে মানু বললে, বাবার খুব শক্ত অসুখ, ডাক্তারবাবু বলেছে হাওয়া খেলে সেরে যাবে। ডান হাতখানা তুলে ধরে মানু বললে, বাবা আমার চেয়েও রোগা হয়ে গেছে। মানু আর বসল না, চেয়ার থেকে নেমে আস্তে আস্তে ওপরে চলে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন তার সারা মুখে লেগে রয়েছে।

বাইরে থেকে রাত্রের আহার সেরে মহীতোষ ঘরে ঢুকল। ঘরের সমস্ত জিনিষই তার গুছিয়ে রাখা হ'য়ে গেছে।আর জিনিষ বলতে এমন আর কি? সিংগল বেডের খাট একখানা, ছোট অথচ দামী একটা সুটকেস, দাড়ি কামাবার সেট একটা, একটা পুরান বুক-সেলফ, নড়বড়ে একটা টেবিল আর চেয়ার, আয়না-চিরুণী, জামা-কাপড়ের একটা ব্র্যাকেট, কুঁজো এবং আর একটা গ্লাস, কতকগুলা মোটা ইক্‌নমিক্‌সের বই আর ছ'সাতটা জুতার বাক্স।

আলো নিভিয়ে মহীতোষ শুয়ে পড়ল।

পরদিন বেলা দশটার মধ্যেও মানুর দেখা পাওয়া গেল না। মহীতোষ কলেজ করতে গেল।

বিকেলে কলেজ থেকে মহীতোষ বাড়ী ফিরল। মনোহর তখন সুর ক'রে রামায়ণ পড়ছিল। মহীতোষকে দেখে মনোহর বললে, থোড়া ঠার যাইয়ে বাবু। মহীতোষ দাঁড়িয়ে রইল। খৈনির তাক থেকে শালপাতার ঠোঙায় ...

ফেলে মহীতোষ ...
কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে বেরুল ...

রাত্রে মহীতোষ বাড়ী ফিরল। এত ... থেকেও কার সাড়া পাওয়া গেল না। এ বাড়ীর ... শ্রদ্ধা করতে পারলে না। এক বাড়ীতে ... কতখানি নিঃশব্দে বাস করছে! একমাত্র মানু ... এসেছে এ নিঃশব্দতা ভাঙবার জন্যে। সে না থাকলে এ বাড়ী হয়ত এই অসম্ভব নিঃশব্দতা সহ্য করতে না পেরে কোনদিন হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ত।

পরদিনও মহীতোষ মানুর দেখা পেল না। বিকেলে বাড়ী ঢুকতে মনোহর তার হাতে আগের দিনের মত শাল-পাতার একটা ঠোঙা দিল।

ঘরে ঢুকে মহীতোষ একবার ভাবলে মানুকে চেঁচিয়ে ডাকবে, কিন্তু ডাকতে তার ভরসা হ'ল না। এত ঘর ভাড়াটের মধ্যে অন্য কোন মানু থাকা বিচিত্র নয়।

রাত্রের মধ্যে মানুকে দেখতে না পেয়ে মহীতোষ বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে উঠল। স্নেহশীল মায়ের মত সে তাকে একটা ক'রে সন্দেশ খেতে দেয়! দু'দিনের আলাপে মানু তার বুক জুড়ে বসেছে। অনেক রাত পর্য্যন্ত মহীতোষের চোখে ঘুম এল না। মানুর পাকা গিন্নীর মত হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলা সে কিছুতেই ভুলতে পারল না। সংসারের সব কিছুতেই তার অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ নজর আছে মহীতোষের মন ব্যথায় ভেঙে পড়ল।

পরদিন মহীতোষ কলেজে বেরুল। সকাল সকাল ফিরবার জন্যে সে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। শেষের ক্লাশটা মহীতোষ আর করলে না। চারটের আগেই বাড়ী ফিরল।

দারোয়ান মনোহর শালপাতার ঠোঙটা তার হাতে দিয়ে ভাঙা হিন্দিতে বললে, খোঁখি তো দুপুরমে চ'লে গিয়েছে উসকো বুড়া বাবাকো বড়ী জোর বেমারি আছে না? ওহি বাস্তে হওয়া বদল করনে চলা গিয়া। কথাগুলো ব'লে মনোহর উঁচু হ'য়ে হাত বাড়িয়ে রামায়ণখানা পেড়ে নিলে বই খুলতে খুলতে ধরা গলায় সে বললে, হামরা লোটামে পানি ভরনে কো ঔর কোই নেই হ্যায়।

ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউটের পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্যালেস্টাইনে যে-সকল প্রাচীন প্রতীক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটি সামগ্রীর বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টানদের 'পবিত্র ভূমি' (Holy Land) তে যে বাইবেল-ইতিহাস-মূলক স্বর্ণ ও গজদন্ত নির্ম্মিত অলংকার পাওয়া গিয়াছে, তাহা ধর্ম্মভীরু খৃষ্টান জগতের নিকট অমূল্য সম্পদ। বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্যের নিকট যে যুগে ধর্ম্ম একটা অবাস্তব ভাব-বিলাস মাত্র, সে যুগেও এই অপূর্ব্ব সম্পদের মোহ খৃষ্টানদিগের চিত্তে যে পুলক-শিহরণের উদ্রেক করিয়াছে, ইহাই হইল পাশ্চাত্যের মনের অবচেতন 'দুর্ব্বলতা'র প্রকাশ।

ভারতের প্রাচীন জনপদসমূহ যেমন ছিল প্রকাণ্ড একটি দুর্গের আকারে সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত; প্রাচীন আর্ম্মাগেডন শহরও সেই প্রকার দুর্গাভ্যন্তরস্থ শহরই ছিল। যে সকল স্বর্ণ ও গজদন্ত নির্ম্মিত অলংকার ঐ স্থানের কোনও ক্যানেন-বংশীয় রাজার প্রাসাদ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছে, প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই ধনরত্নের মালিক ছিলেন ক্যানেন-বংশীয়ই এক রাজা, যিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ১৩০০ সালে ঐ স্থানে রাজত্ব করিতেন। প্যালেস্টাইন যে সময়ে ইসরাইলদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সে সময়ে প্যালেস্টাইনে ক্যানেনাইটগণই সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তিতে সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল। ইসরাইলগণ প্যালেস্টাইনকে তাহাদেরই প্রাপ্য রাজ্য বলিয়া মনে করিত—কারণ ভগবান ঐ দেশই তাহাদের বসবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এই বিশ্বাস তাহাদের ছিল দৃঢ়।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ক্যানেন-বংশীয়েরা ছিল বীর জাতি, যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি ছিল তাহাদের অশেষ। যুদ্ধে তাহারা অসীম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস ক্যানেনাইট-দের স্বরূপের কোন বিবরণ সুষ্ঠুভাবে দিতে পারি নাই। তাহা-দের জীবন-যাত্রা, তাহাদের শিল্প প্রভৃতিতে নিপুণতা—এই সকলের কোন নিদর্শনই পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। প্যালেস্টাইনে এই খনন কার্য্যের ফলে ঐ সকল ভূপ্রোথিত শহর হইতে যে সকল সামগ্রী আবিষ্কার করা হইয়াছে—যে সকল বাসগৃহ ও অন্যান্য কক্ষের ধ্বংসাবশেষের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে, ক্যানেন-বংশীয়গণ অতি আরামে সুদৃঢ়-নির্ম্মিত বাসগৃহের সুসজ্জিত কক্ষে বাস করিত। শুধু তাহাই নয়, তাহারা লিখিতে-পড়িতে বেশ ভাল-রকমই জানিত।

আর্ম্মাগেডন প্রাসাদের এক স্থানে প্রোথিত কতকগুলি গৃহস্থালীর আসবাব-পত্র, বাসন-কোসন পাওয়া গিয়াছে। যে অভিযানকারী দল এই সামগ্রীগুলি উদ্ধার করিয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস এই সকল জিনিষ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই প্রকারে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল কোনও নৃপতি কর্ত্তৃক,—যখন কোনও বিপক্ষ সেনা এই নগরী আক্রমণ করিতে উপস্থিত হইয়াছে। আর্ম্মাগেডন শহর গিরিবর্ত্মমুখে, অতি সুদৃঢ় দুর্গম স্থানে অবস্থিত। এখানে অল্পসংখ্যক সেনা সাহায্যে অগণিত বিপক্ষকেও দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব ব্যাপার নয়। আর এই গিরিবর্ত্ম-কেন্দ্রে স্থাপিত শহরটিতে একটি যুদ্ধই নয়—যুগে যুগে বহু যুদ্ধই পরিচালিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদগণ এই আক্রমণকারী দল সম্বন্ধে এমন কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হন নাই, যাহাদ্বারা উহাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায়। তবে তাঁহাদের মতে এইটুকু নিশ্চিত যে, যে রাজার শাসনকালে, রাজা স্বয়ং কিম্বা তাঁহার পরিচারকগণ সোনার ডিস্, পেয়ালা, গজদন্ত পানীয়াধার, প্রসাধন সামগ্রী, প্রস্তর আসবাব, কসমেটিক জার প্রভৃতি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই রাজা নিশ্চিতই ক্যানেন-বংশীয়। পাত্রগুলি সকলই আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু উহাদের কারু-কার্য্য, খোদাই কারিগরি অতিশয় সুন্দর। সকল প্রকার জিনিষ এলোমেলোভাবে এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে কোনও চোরা-কক্ষের মেঝের নীচ হইতে যে, অনুসন্ধানকারীদের বিশ্বাস—তাড়াতাড়ি কোনও প্রকারে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টায় কোনও শৃঙ্খলা থাকিতে পারে নাই, এবং হাতের কাছে যাহা পাইয়াছে তাহাই যে ঐখানে জড়ো করিয়াছে, তাহা বুঝা যায়, মহামূল্য জিনিষগুলির পাশে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থের সমাবেশে। অথচ প্রাসাদের যে খোষাগার তাহা শূন্য, তাহাতে কোনও জিনিষ সেই সময় রাখা হইয়া থাকিলেও পরে হয়ত লুণ্ঠিত হইয়া থাকিবে। অনুসন্ধানকারী দল খননের পরও বহু দিন পর্য্যন্ত এই চোরা-কক্ষের সন্ধান পায় নাই। কক্ষটি অটুটই ছিল, এমন সুকৌশলে অন্য কক্ষমধ্যে লুক্কায়িত যে, সহজে উহাকে নির্ণয় করা অসম্ভব।

তামার বর্শা ও বাটালি—'উর'-য়ের রাজকীয় সমাধিস্থানে প্রাপ্ত (২৫০০ খৃষ্টপূর্ব্ব সালের)

সেই রাজা অবশ্য আর তাঁহার লুক্কায়িত সম্পদের উদ্ধার করিতে পারেন নাই। ঐ যুদ্ধের পর আর সেই রাজার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। ইতিহাস হইতে তিনি চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়া যান। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই যুদ্ধের দুই শত বৎসর পরে দস্যুগণ সমগ্র প্রাসাদটি লুণ্ঠন করে। তাহারা রাজার এই লুক্কায়িত প্রোথিত সম্পদও বাহির করে। কিন্তু সেই দস্যুদলকেও এত তাড়াতাড়ি তাহাদের লুণ্ঠনকাজের কাজ সমাধা করিতে হয় যে, তাহারা সমস্ত সম্পদ ত লইয়া যাইতেই পারে নাই—বেশীরভাগ লুণ্ঠিত দ্রব্যেরও অনেকাংশ প্রাসাদের স্থানে স্থানে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, অথবা তাহাদের অজানিতেই ঐ সকল জিনিষ গমনপথে পড়িতে পড়িতে গিয়াছে। বিশেষ করিয়া অলংকার, বিডস (beads), মূল্যবান প্রস্তরাদি এই ভাবে প্রাসাদে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সেকালে একটা যুগান্তরকারী সংগ্রামের পরে প্রধান প্রধান শহর একেবারে জনশূন্য ও শ্মশানে পরিণত হইবারই কথা। এই শহরটিও নিশ্চয়ই বিশেষভাবে বিধ্বস্ত ও লোকশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধে পরাজয়ের বার্ত্তা প্রচারের পর নগর-বাসী যে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবে, ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আতঙ্ক কাটিয়া গেলে (অবশ্য দীর্ঘকাল পরে) যখন আবার কেহ কেহ সাহসে ভর করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন তাহারা আসিয়া হয়ত দেখিয়াছে, তাহাদের বাসগৃহ ধ্বসিয়া পড়া, কোথাও বা আগুনে পোড়ান। কাজেই তখন তাহারা সেই ধ্বংসস্তূপকে চারি দিকে বিস্তৃত করিয়া সমভূমি গঠন করিয়া তাহার উপরই নূতন করিয়া আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছে।
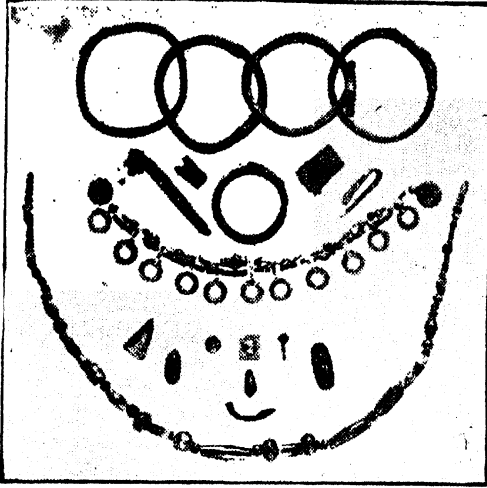
৪০০০ বৎসরের পুরাতন গহনা—সোনা, রূপা, লিড্ ও এগেট প্রভৃতি খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬শ শতকের

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট খনন কার্য্য আরম্ভ করে একটি ঢিবি লইয়া। এই স্থানটির নাম মেগিডো বলিয়াই তখন প্রচারিত ছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া এ খনন কার্য্য চলে এবং বিগত বসন্তকালে একেবারে নিম্নতম স্তরে পৌঁছান সম্ভব হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণের পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঐ সকল স্বর্ণ ও গজদন্ত সামগ্রীর অধিকাংশই মিশরীয় শিল্পকলার প্রতীক। মনে হয়, রাজা বিদেশ হইতে উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অন্তত বিদেশী কারিগরগণ উহা গড়িয়া দিয়া-ছিল। আবার এমনও হইতে পারে যে, উহার কতকগুলি উপহার স্বরূপ মিশর হইতে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। কতক-গুলি এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পকারিগরির ছাপ বহন করে। বিবাহের যৌতুক, দিগ্বিজয়ে লুণ্ঠিত কিম্বা মৈত্রী-বন্ধনের উপঢৌকন হওয়া কোনও প্রকারেই অসম্ভব নয়। একটি খোদিত ছবিতে দেখা যায়—কোনও রাজার সম্মুখে একজন বীণাবাদক (harpist) অপরূপ ভঙ্গীতে সহিত বীণা বাজাইতেছে। এইখানেই হইল খৃষ্টানদিগের আকর্ষণ। বাই-বেলের বর্ণিত রাজা সল্ (Saul) এবং ডেভিডের বৃত্তান্তই যেন এই ছবি প্রকাশ করিতেছে, ইহাই খৃষ্টানদের ধারণা। রাজা সলের সম্মুখে ডেভিড বীণা বাজাইয়াছিল।

সেমেরিয়ায় রাণী জিজিবেলের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত ২০১টি কারুকার্য্যখচিত গজদন্ত এক্ষণে হার্ব্বাডের হগ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট বলে—রাণী জিজিবেল গজদন্ত নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেন। উৎসাহী খৃষ্টানগণ, সুতরাং ঐ কুড়িটি গজদন্ত রাণীর বাসগৃহের অংশ বলিয়াই দাবী করে। কথিত আছে—রাণীর প্রাসাদে যেখানে সেখানেই গজদন্তের কারিগরিতে একেবারে সুশোভিত ছিল। দরজার চৌকাঠে, পাল্লায়, ছাদে (ceiling), টেবিলে, কৌচে, বাক্স-পেঁটরায়—গজদন্তের সূক্ষ্ম কাজে একেবারে ভরপুর ছিল। প্রাসাদটির আগুনের প্রকোপে একেবারে ভস্মরাশিতে পরিণত ধ্বংসস্তূপ হইতে ইহাই আবিষ্কার করা হইয়াছে। তথাপি কয়েক হাজার খণ্ড গজদন্তের অপরূপ কারুকার্য্য-খচিত অংশ পাওয়া গিয়াছে প্রায় জীর্ণ অবস্থায়—কেবল চল্লিশটি ঐরূপ ক্ষুদ্র খণ্ড উদ্ধার করা হইয়াছে, যাহাতে আগুনের স্পর্শ লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্টানদিগের নিকট এই গজদন্ত খণ্ডগুলি অতি পবিত্র সামগ্রী দুই কারণে; প্রথমত এইগুলি রাণী জিজিবেলের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলিয়া থাকেন, সলোমনের যে মন্দির জেরুজালেমে অবস্থিত, তাহার কারিগরির সহিত এই সকল গজদন্তের শিল্প-চারুতা হুবহু মিলিয়া যায়। সুতরাং বাইবেল ইতিহাসের যে আভিজাত্য এই সকল সামগ্রীর অঙ্গপৃষ্ঠে মণ্ডিত, তাহাতে খৃষ্টভক্তের নিকট এইগুলি পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির জিনিষ।

ভাস (Vas)—মাটির তৈরী; কর্ণরূপে সাপ, সূর্য্যমূর্ত্তি, নারিকেল পাতা প্রভৃতি অঙ্কিত।

কিন্তু মজা এই যে সলোমন মন্দিরের সাজসজ্জার কারু-কার্য্যের সহিত এই গজদন্ত সামগ্রীর সৌন্দর্য্য মাধুরিমার অপূর্ব্ব মিল—সেই সকল সাজসজ্জা কিন্তু দীর্ঘকাল পূর্ব্বে সেই যে লুণ্ঠিত হয়, তাহা আর আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই আজিও বিশেষ কোথাও। কিন্তু খৃষ্ট-ভক্তগণ বলিয়া থাকেন ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টে বর্ণিত রহিয়াছে, সলোমনের সিংহা-সনের সিঁড়িতে জলপদ্মের মালা ও সিংহ-মূর্ত্তি খোদিত ছিল,

মন্দিরের প্রাচীরে ছিল দেবদূতগণের বিশিষ্ট প্রতিকৃতি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবং এই বিবরণ দ্বারাই ভক্তগণ উহার একটা ধারণা করিয়া লইয়াছে। এইক্ষণে এই সকল গজদন্তে সেই প্রকার চিত্র-কলা ও বিষয়-বস্তুরই আভাষ মিলে। মনে হয়, ওল্ড্ টেষ্টা-মেণ্ট লেখকগণ যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই গজদন্তগুলি তাহারই মূর্ত্তপ্রতীক।

বিষয়-বস্তুর সাদৃশ্য এইজন্য অনুমান করা হয় যে—যে সকল গজদন্তে চেরাব দেবদূত সকল (Cherubim) খোদিত উহার আকৃতি যেমন পক্ষ-সংযুক্ত সিংহের ন্যায়, মুখখানি মানবাকৃতির, ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টে বর্ণিত চেরাবও তাহাই। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ভুবনবিদিত চিত্ররাজ রাফায়েল যে চেরাব অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অনিন্দ্যসুন্দর শিশুমূর্ত্তি কিউপিড বা মদন-দেবতার। রেনেসাঁ যুগের চিত্রশিল্পিগণের কোনও ধারণা ছিল না চেরাবের মূর্ত্তি কি প্রকার হওয়া সঙ্গত, কাজেই তাহারা রাফায়ে-লের অনুকরণ করিয়া গিয়াছে। আবার তাহাদের ঐরূপ করিবার কতকটা সমর্থন তাহারা পাইয়াছে গ্রীক-দেবতা কিউপিডের মূর্ত্তি হইতে। সে দেবতার পক্ষ রহিয়াছে। এইজন্য রেনেসাঁ চিত্র-শিল্পিগণ পরম রমণীয় শিশুমূর্ত্তি আঁকিয়া তাহাকে পক্ষের আভিজাত্যভূষিত করিয়া অতিমানুষিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। নহিলে তাহাদের কোনই ধারণা ছিল না—সেকালে প্যালেষ্টাইন এবং এসিরিয়ার অধিবাসিগণ চেরাব-মূর্ত্তির কোন্ পরিকল্পনার সহিত পরিচিত ছিল।

খৃষ্টীয় মতে অবশ্য চেরাব-মূর্ত্তির তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা একটা সুন্দরই রহিয়াছে। খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন—চেরাবের পক্ষদ্বয় ঈগলের ন্যায় ক্ষিপ্রকারিতার প্রতীক, সিংহদেহ হইল শারীরিক বলের নিদর্শন এবং মনুষ্য-মস্তক অবশ্য জ্ঞান-গরিমার প্রকাশ-সংকেত। ইহা হইল প্যালেষ্টাইনের বিজ্ঞজনের অভিব্যক্ত মূর্ত্তি। কিন্তু এসিরিয়ানগণ চেরাব-মূর্ত্তিতে সিংহের বদলে ষাঁড়-দেহ অঙ্কিত করিত; তাহাদের নিকট সর্ব্বপ্রকারে বলশালী বলিয়া ষাঁড়ই সমাদরলাভ করিয়াছিল।

মিশরের ফেরাওদের প্রাসাদ হইতেও কতক জিনিষ উদ্ধার করা হইয়াছে। বহু প্রাসাদ হইতে সংগৃহীত কতকগুলি টালিতে এমন বিশিষ্ট কারুকার্য্য রহিয়াছে, যাহার বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ফেরাওদের প্রাসাদ চিনিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। বাইবেলে বর্ণিত ফেরাওদের প্রাসাদের অবস্থিতি, এই টালিগুলি আবিষ্কারের পূর্ব্বে, সঠিকভাবে নির্ণীত হইতে পারে নাই। কোন্ স্থানে ঠিক ইহা ছিল সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে লোকের একটা অস্পষ্ট ধারণাই ছিল; যেমন অনির্দ্দিষ্ট ধারণা ছিল ফেরাও সিংহাসন কক্ষের সাজ-সজ্জার। বাইবেল বর্ণনা হইতে লোকে ধরিয়া লইত ফেরাওয়ের সঙ্গে মোজেজ এবং য়ারনের সাক্ষাতের কথা—কিন্তু ফেরাওয়ের সমৃদ্ধির কোনই জ্ঞান ছিল না তাহাদের।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রচেষ্টায় এখন জানা গিয়াছে, নীল নদের দ্বীপের পূর্ব্বদিকে উত্তর-পূর্ব্ব মিশরে কান্তির (Kantir) নামক স্থানে এই প্রাসাদগুলি এককালে ছিল। অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন—ইহাই ফেরাওদের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রামসেস নগর, যাহা কালে কালে অবহেলিত হইয়া জনহীন প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে এবং পার্শ্বের যে অধুনা সমৃদ্ধ নগর—তাহারই নাম হইয়াছে কান্তির। সেকালে ফেরাওগণ ইসরাইলদের বন্দী করিয়া আনিয়া তাহাদের দ্বারা বহু বিলাসভবন তৈয়ার করি-য়াছে, কারণ ইসরাইলগণই সেকালে সেরা শিল্পী ছিল। এই প্রকারে বন্দী ইসরাইলদের হাতে গড়া শহর একটি রামসেস।

খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন, মোজেজ-এর জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনায় ওল্ড টেষ্টামেণ্ট যে-সকল প্রাসাদের উল্লেখ করিয়াছে, তাহা এই রামসেস বা কান্তিরের প্রাসাদসমূহ। লেখকগণ হয়ত প্রাসাদ কখনও চোখে দেখেন নাই, কিন্তু লোকমুখে উহার সমৃদ্ধির বিবরণ বংশপরম্পরা জনচিত্তে জাগরূক ছিল সুদীর্ঘ কাল। সেই জনশ্রুতি হইতে ঐ বিবরণ লেখা হইয়া থাকিবে। কারণ, পরেও ঐ সকল প্রসিদ্ধ স্থানে অতি গুরুত্বমূলক ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তাহা লেখকদের স্মরণ থাকিবার কথা।

কতকগুলি টালি এখন নিউইয়র্কে সংরক্ষিত, এইগুলি ফেরাওদের সিংহাসনের নিম্নস্থ মঞ্চে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। দ্বার, জানালায়, চৌকাঠ, সিলিং প্রভৃতিতে যেগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা স্বতন্ত্র—যেমন প্যালেষ্টাইনের প্রাসাদের গজদন্তের কারিগরি হইতে উহাদের ব্যবহারের আভাষ পাওয়া যায়। এই সকল টালিতেও নানা দৃশ্য, নানা ছবি অঙ্কিত। খৃষ্টানগণ এখন ঐ সকল চিত্রাঙ্কনের সহিত বাইবেল ঘটিত ঘটনাবলীর সংশ্রব প্রতিষ্ঠিত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

তাহাদের মতে যে-সকল টালিতে মিশরের ফেরাওদের বিপক্ষীয়গণের মূর্ত্তি, হাবভাব প্রভৃতি অঙ্কিত, সেগুলি ব্যবহার করা হইত উচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করিবার সোপানাবলীতে। এই সকল বিদেশীদিগকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত এবং ফেরাওদের নিকট জীবন-ভিক্ষায় ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় অধি-কাংশ অঙ্কিত এবং নিশ্চয়ই ঐগুলি এমনভাবে স্থাপিত ছিল যে, ফেরাওদের সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় ঐ মূর্ত্তি-গুলির উপর পদক্ষেপ করিতে হয়। সেই সোপান শ্রেণীর উভয় পার্শ্বে প্রতি ধাপের প্রান্তে ছিল সবুজ রঙের প্রস্তরে খোদিত সিংহ মূর্ত্তি। সিংহগুলির প্রত্যেকটির মুখে কামড়াইয়া ধরা ছিল একটি করিয়া বন্দীর মূর্ত্তি।

মোটামুটি এই ছিল সিংহাসন-কক্ষের সদম্ভ অভিব্যক্তি। আবার প্রাসাদের বাসকক্ষগুলি ছিল আরও জমকালো। সেই সকল কক্ষ-প্রাচীরে উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত ছিল নানাপ্রকার দৃশ্য। তন্মধ্যে প্রধান ছিল—স্রোতস্বতীর বক্ষে ভাসমান হংসের ঝাঁক। কোথাও ছিল খাল অথবা সরোবরের দৃশ্য তাহাতে মিশর-দেশীয় জলপদ্ম প্রস্ফুটিত অগণিত সংখ্যায়। এক কথায় বলিতে গেলে প্রাসাদগুলি ছিল যেন চিত্রপুরী; তাহাতে আগাগোড়া যেমন উজ্জ্বল রঙের বাহার, তেমনই ফেরাওদের গর্ব্ব ও দাম্ভিকতার আতিশয্যের ছাপ।

একটি নির্ব্বাপিত দিবস

(গল্প)

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র

তোমার চিঠি পেয়ে আর সাতদিন পরেই আবার তোমায় দেখতে পাব, এই চিন্তার আনন্দ যে আমাকে কতখানি পেয়ে বসেছিল, তা কথায় বোঝান যাবে না, মাত্র সাত দিন! তুমি পাঁচ মাস হল চলে গেছ,—সুদীর্ঘ পাঁচ মাস—একশত পঞ্চাশ দিন বড় সামান্য কথা নয়, মিনিট বা সেকেণ্ডে ভাগ করলে খেই হারিয়ে যাবার জোগাড় হয়, মনে হয়, এর শেষ পাওয়া যাবে না। সুখের বিষয়, আজ তা শেষ হয়েছে, অনন্তেরও বোধ হয় কোথাও অন্ত আছে। তোমার পত্র পাবার কিছুক্ষণ পরেই মনে হল, এত আগে কেন তুমি আমায় জানালে, কেন আমাকে এই দীর্ঘ সাতটি দিন উদ্‌ব্যস্ত করে রাখবার ব্যবস্থা করলে। আমার কত কাজ,—যদিও অবশ্য আমি কিছু একটা কর্ম্মবীর নই, তাহলেও কিছু কাজ মানুষের তো নিশ্চয়ই থাকবে,—সেই কাজের অনাবিল স্রোতে কেন তুমি এমনভাবে এই অমনোযোগিতার জোয়ার আনলে! ভাগ্যিস্ কলেজের পরীক্ষাগুলো আমার শেষ হয়েছে। এগজামিনের ভয় নেই, বা আমাকে কোন হিসেব-নিকেশের দৈনন্দিন কর্ম্ম করতে হয় না; যদি কোনটার হাঙ্গামা থাকত, তাহলে কি মুস্কিল হত বল দেখি, সত্যিই তোমার এত আগে চিঠি দেওয়া ভাল হয়নি।

কিম্বা হয়ত ভালই করেছ! দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে আবার তোমায় দেখতে পাব, সেই কমলাননের মধুময় কথা শুনতে পাব, এ সংবাদ সাতদিন কেন, ত্রিবিশ দিন আগে দিলেও অন্যায় হত না; এ সংবাদ কৃপণের ধনের মত লুকিয়ে রেখে সবার অলক্ষ্যে পাঁচবার আনন্দ-উদ্ভাসিত নয়নে দেখবার মত। তুমি আসবে, তুমি আসবে—একথা কাজে-অকাজে সকল সময় আমার মনের কানে বাজবে, আর আমার মন ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ-দোলায় দুলতে থাকবে, আমি অকারণ শিস্ দিয়ে যে-কোন একটা খুব পরিচিত গানের একটা লাইন বার বার ভাঁজতে থাকব। কাজে ভুল হয়ে গেলে নিজের উপর লজ্জিত না হয়ে স্মরণ করব, বহুদিন আগে রাত্রির অন্ধকারে এক পার্কের বেঞ্চিতে বসে কি একটা কথায় তোমার ভুল ধরাতে তোমার মুখ ভার করা, তারপর হঠাৎ হেসে ফেলার কথা। না, চিঠি দিয়ে ভালই করেছ, এই সাতদিনের শ্রীমুখদর্শনকাতর ব্যাকুলতার মাধুরী আমাকে পরম তৃপ্তির সঙ্গে অনুভব করবার সুযোগ দিয়েছ।

সাতদিনের একটি একটি করে চলে যাচ্ছে! সকাল বেলা উঠেই মনে হয়, আর একটা দিন ঘুমের সঙ্গে ঝেড়ে ফেলা গেল, তুমি আসছ। দুপুর বেলা চা খাওয়ার সময় মনে হয়, এই তিনটে বাজল, আরও একটা দিন শেষ হয়ে আসছে, আর মাত্র তিন ঘণ্টা, তারপর কিছুক্ষণ বেড়ান, তারপর আহার ও নিদ্রা, প্রভাতে চোখ মেললেই নতুন দিন, তুমি আসছ। সকল কাজ কি মিষ্টি লাগছে, যে-সব কারণে না হাসলেও চলে তাতেও হাসি পাচ্ছে, আমার সমস্ত অন্তর হাসছে, তুমি আসছ।

এতদিন ধরে তুমি যে ক'খানি পত্র আমায় লিখেছ,—আমার লজ্জার বিষয়, এবং তুমি তা শুনলে নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে—আমি তা সঞ্চয় করে রাখতে পারিনি। সকলেই তা পেরে থাকে, এবং বোধ হয় পারাও উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি তা পারিনি। যেই একটা নতুন চিঠি আসে, অমনি আমি আগের চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলি, আমি লিপিবন্ধ অতীতকে ধরে রাখতে ভালবাসি না। তারা আমায় মনে করিয়ে দেয়, কি বিশাল ও বিস্তৃত সময় তোমার ও আমার নয়ন-সম্মিলনের পথে দাঁড়িয়ে আছে; একটির পর একটি এসে এই কথাই তারা যেন বুঝাবার চেষ্টা করে যে এই পত্রশায়িত সন্দর্শনই সত্য, চোখের দেখা সহজলভ্য নয়। তাই আমি বর্ত্তমানকে হাতে পেয়ে অতীতকে ছিঁড়ে ফেলি, তোমার নতুন চিঠি পাওয়ার বাসনা আমার কাছে একটা নেশা। আমার চিঠি নিয়ে তুমি কি কর, তা জানতে চাই না। গোপনে কতবার করে পড়, প্রসাধনদ্রব্য-সুবাসিত কি ধরণের বাক্সে, বা কোন ধরণের ড্রয়ারে, বা কোন জাতীয় বইয়ের ভিতরে সেগুলি লুকিয়ে রাখ, তা জানবার বড় একটা কৌতূহল নেই। কোন একখানা পত্র হঠাৎ নিজের অনামনস্কতায় কোথাও ফেলে ছোট ভাইবোনদের তাদের একান্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তচনচ করার দোষ দাও, কত বিরক্ত হও, তারপর হঠাৎ আবার ফিরে পেয়ে খুশীতে মন ভরে উঠলে চঞ্চল-চপলদের ডেকে অকারণ আদর করে তাদের বিস্মিত কর, এ সব কথা জানবার আমার বড় একটা সাধ হয় না। সামান্য কথায়—অবশ্য খুব সামান্য নয়, তাতে মন ভরে না—তোমার শারীরিক ও মানসিক স্নিগ্ধতার বার্ত্তাটি পেলেই আমার মন আনন্দে ভরে উঠে, বেশীর প্রয়োজন হয় না। অবশ্য তুমি তাই করে থাক সাধারণত, যদিও বড় চিঠি সময় সময় দাও। বড় চিঠি আমার ভাল লাগে না; তাতে মনে হয়, তুমি অবলীলাক্রমে মনের একান্ত স্বচ্ছন্দগতিতে জিনিসটি লেখনি, বিশেষ চিন্তা করে, ভাব ও ভাষার সঙ্গে অনেক রফা করে লেখনী চালনা করেছ, আমি হয়ে দাঁড়িয়েছি সম্পাদক মশাই। তোমার সুবিবেচনার প্রশংসাই করতে হবে, বড় চিঠি অল্প লিখে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এই কথাই তুমি প্রমাণ করেছ যে, তোমার আমার মাঝে যে কথার অভিসার চলে, তা মেঘদূত কাব্যের মত অল্পায়তন ও ভাবরসসমৃদ্ধ, এত কথা বলা হল, তোষামোদ ভেব না।

আচ্ছা, পত্র নামক বস্তুটি না থাকলে কি হত বল দেখি। আমাদের জীবনযাত্রার সহায়করূপে লাঙ্গলের বা বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে এর প্রয়োজন কোন অংশে কম বলে আমার মনে হয় না; কারণ শুধু আহার ও আচ্ছাদন নিয়েই মানুষ কখনও বাঁচতে পারে না, তার বাঁচবার পক্ষে আর একটা জিনিসের প্রয়োজন আছে, সে হচ্ছে সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন। এই সম্পর্কের প্রাণরক্ষিণী শক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে পত্র, দুই বা ততোধিক মানুষের মাঝে সংবাদ আদান-প্রদানের লিখিত ব্যবস্থা। সুপ্রাচীন অতীতে যখন লেখন আবিষ্কার হয়নি, তখনও পত্র ছিল, সে পত্র ছিল মৌখিক, সংবাদ মনে বহন করে নিয়ে গিয়ে মুখে নিবেদন করা হত। কালের চক্রে যে সমাজ একদিন একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় বা তার এক অংশে আবদ্ধ ছিল, আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম বা জেলার প্রান্ত পার হয়েই নয়, সমুদ্র, প্রান্তর, পর্ব্বত উলঙ্ঘন।

করে দিকবিদিকে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র। এই সুবিশাল দূরত্বকে জয় করে সম্পর্ককে অচ্ছেদ্য রাখতে পারে, পত্র ছাড়া পৃথিবীতে এমন কি আর শক্তিশালী জিনিস আছে? মন দুর্ব্বল, স্নেহ-বন্ধন ভঙ্গুর, নিয়ত চোখে চোখে রেখেও যাকে হারাবার ভয় থাকে, তাকে শতসমুদ্র, সহস্র-যোজন দূরে রেখে কি আশায় বুক বাঁধা যেতে পারে যে, যে সুকোমলতা ও নিৰ্ম্মলতা নিয়ে আজ সে বিদায়-অশ্রু বিধৌত হয়ে যাত্রা করল, সুদীর্ঘ কয়েক বর্ষ পরে আবার তাকে তেমনটি ফিরে পাওয়া যাবে? নব আবেষ্টনে, শত কোটি বিচিত্রতা ও প্রলোভনের মাঝে সে যদি হারিয়ে যায়, তাকে সম্পূর্ণভাবে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই উদ্ভাবককে—পত্র তাকে হারাতে দেয় না, কয়েকটি সুরচিত বা কুরচিত বা অর্দ্ধরচিত বাক্যের দ্বারা তাকে বাঁচিয়ে রাখে, তার মানস নয়নের সম্মুখে প্রিয়জনের মুখখানি এনে ধরে, হৃদয়ের বন্ধনকে ফিরে ফিরে নিবিড়ভাবে বেঁধে দেয়; এবং সেই সঙ্গে প্রবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, পৃথিবীতে সে একা নয়, পশু-পাখীর মত নিত্য তাকে নব জনের সাহচর্য্য ও সঙ্গ খুঁজতে হবে না, এই বিশাল জগতে অন্তত এমন কয়েকটি মানুষ আছে, যাদের দিকে সময়ে অসময়ে ফিরে চেয়ে সে ভাবতে পারবে, তার বেদনা তার একার নয়, তার সহভাগী আছে, তার সুখৈশ্বর্য্যের মধুর বাণী অচেনার কাছে নিবেদন করতে হবে না, স্মিতহাস্যসুন্দর আনন সেইজন্যে তার দিকে আগ্রহাকুল নয়নে চেয়ে আছে। লক্ষ্য করেছ কিনা জানিনা, বিদ্যাসৌভাগ্য-বঞ্চিত প্রবাসী দরিদ্রের বাড়ী থেকে চিঠি এলে কি চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। দশবার দশজনকে দিয়ে পড়িয়েও তার তৃপ্তি হয় না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে চিঠিখানিকে দেখে, ভাবে হয়ত কোন কথা বাকী রয়ে গেছে, যা সকল পাঠকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে, তারপর আবার একজনকে অনুরোধ জানিয়ে বলে, ওই যে ওখানটায় কি ছোট ছোট করে লেখা রয়েছে, একবার পড় দেখি ভাই। হায়, সে চিঠিখানিও হয়ত প্রিয়জনের স্বহস্তলিখিত নয়, অপরে অনুগ্রহ করে হেলায় কলম বুলিয়ে গেছে। বাগান না বেগুন, শশা না পাড়ার শশধর, বাক্স না বাটী—এই দূরের পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে করতে কাজে ভুল হয়ে যায়, নিজের অজ্ঞতার জন্যে দুঃখ হয়, তবে আশা হয়, খোকাকে আর কিছুদিন পড়ালেই সে পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে চিঠি দেবে, তখন আর কোন অসুবিধা হবে না। চিঠিখানি তারপর পকেটে বা জীর্ণবাক্সে সযত্নে রক্ষিত হতে থাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তারপর একটি একটি করে দিন কেটে গিয়ে তোমার আসবার দিন এসে পড়ল। সেদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই শ্রীমুখ চমক দিয়ে গেল। অনেক কাজ মনে হল, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সমস্ত শেষ করে নিতে লাগলাম। অনেক কাজ, কিন্তু আশ্চর্য্য, প্রায় পনের কুড়ি মিনিট অন্তর ঘড়ি দেখেছি, তুমি বলতে পার, তাহলে ঘড়িতেই মন ছিল, কাজে ছিল না, সেটা সত্যি। তারপর দ্বিপ্রাহরিক নিত্যকৰ্ম্ম, তারপর চা, সেদিন চায়ের ধোঁয়ার দিকে চোখ রেখে হঠাৎ তোমার কুসুম-আঙ্গুলের কথা মনে পড়ে গেল, তার সঙ্গে 'অঙ্গুলির আগে চাঁদ সে ঝলকে উছলি পড়িছে জোড়'। অতি সুকোমল আঙ্গুল দেখেছি, কিন্তু নখ দেখে বিরক্ত হয়েছি, এমন বে-মানান ব্যাপার লক্ষ্য করেছ তু? বৈষ্ণব কবি লক্ষ্য করেই বলে-ছিলেন, অঙ্গুলির আগে চাঁদ ঝলকে পড়েছে, এবং তাও আবার একটা করে নয়, জোড়ায় জোড়ায়। উপমার সাহস দেখ, বৃকভানুনন্দিনীর এক একটা নখের সুষমা একটি চাঁদে দিতে পারে না, যুগল চাঁদ চাই।

সাড়ে চারটার সময় তুমি পৌঁছবে লিখেছ। আমি ভাবছি,—অবশ্য এ ভাবাটা আগেও অনেকবার হয়ে গেছে—তুমি সাড়ে চারটের সময় পৌঁছবে, তারপর এই ধর, পনের বা কুড়ি মিনিট বিশ্রাম নেবে, তারপর হয়ত মাথাটা ধুয়ে ফেলে অপরাপর প্রসাধনকার্য্য সেরে কিছু জলযোগ করবে, তারপর উত্তপ্ত এক কাপ চা খেয়ে যখন কাপটা ধীরে ধীরে নাড়াতে নাড়াতে তোমার পিসিমার কাছে দেশের খবরের বাকী বক্তব্য-টুকু শেষ করে আনবে, তখন নীলু গিয়ে বলবে, দিদি,—বাবু এসেছেন। ভদ্রলোকটির জন্য বিশেষ কোন ঔৎসুক্য তোমার নেই, এই ভাব দেখিয়ে পিসিমার কাছে আর একটুক্ষণ বসে তুমি উঠবে; তারপর তুমি আসবে। সমস্ত দিনের ট্রেন-যাত্রার ফলে তোমার মুখে পড়েছে একটি শ্রান্তির ছায়া, তোমার এ রূপটিও কি মধুর! হাঁ, এই সব কথা বার বার ভেবে দেখলাম যে, তোমাকে পৌঁছবার পর অন্তত দেড় ঘণ্টা সময় দিতে হয় এই সব কাজ ভাল ভাবে শেষ করবার জন্যে, না হলে ঠিক হয় না। আচ্ছা তাই হোক। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলাম। জামা কাপড় বদলাচ্ছি, সব কাজ তাড়াতাড়ি করছি দেখে ছোট ভাই জিজ্ঞেস করলে, দাদা, বায়স্কোপ যাচ্ছ? 'না' উত্তর শুনে আবার বললে, তবে কোথায় যাচ্ছ? তোমার নামটা অবলীলাক্রমে তার কাছে উচ্চারণ করবার সৌভাগ্য নেই বলে মিথ্যে কথা বলতে হল। সমস্ত ঠিক, কিছু ভুল করলাম কিনা দেখে নিতে লাগলাম। হয়ত ধর, জুতোটা ব্রাস করা হয়নি, বা রুমালটা পালটান হয়নি, বা মনি-ব্যাগটা নিতে ভুল হয়েছে, কি মুস্কিল হতে পারে বল দেখি। না, সব ঠিকই আছে, বেরোন যাক, কিন্তু—তাইত, যাবার সময় এ কি জ্বালা, তা কি কখনও হতে পারে? চিঠি দিয়েছ সাতদিন আগে, তাছাড়া এতদিন পরে আসছ, আর তুমি আসবে না? হঠাৎ যদি কিছু—? হঠাৎ অমনি হলেই হল আর কি। না না, না এসে কখনই তুমি পার না, তোমার কথার নিশ্চয়ই একটা মূল্য আছে। যদি কিছু তেমন হত, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে জানাতে, তুমি ভাল করেই জান, আমি কি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকব। তবে হঠাৎ আসবার দিন যদি—? না, না, তা হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না। বেরোনর সময় একি জ্বালা, এমন সুন্দর আনন্দটাকে মাটি করে দেবার উপক্রম। কিছু না, যত সব—, চল।

স্পন্দিতবক্ষে ট্রাম থেকে নামলাম। এ সন্দেহটা ত আচ্ছা জ্বালালে দেখছি, কিছুতেই ছাড়তে চাচ্ছে না, তোমাদের বাড়ীর দরজা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তুমি এসেছ, না এসে পার না। সেই মুখকমল কতদিন পরে আবার দেখতে পাব। বাড়ীর দরজা। কড়া নাড়া গেল। একবার, দুবার। নীলু ছুটতে ছুটতে এসেই বললে, ও, আপনি!

ঘাড় নেড়ে জানাতে হল, আমিই।

(শেষাংশ ৭০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী ভোলানাথ অধিকারী

শ্রীবামাচরণ মজুমদার

'তেহাই' বোলের প্রচলন-কর্ত্তা ভোলানাথ অধিকারী মহাশয় পাবনা শহরের অধিবাসী ছিলেন। ইনি সুবিখ্যাত পাখোয়াজী গোলাম আব্বাস সাহেবের নিকট পাখোয়াজ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ে পাখোয়াজ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গুরুদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ কালে তাঁহার গুরুদেব (আশীর্ব্বাদের সংগে) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "তোমার হাতে এমন এক নূতন 'বোল' বাহির হইবে যাহাতে তোমার নাম ভারতের সংগীত-সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।" 'তেহাই' বোল সৃষ্টি করিয়া ভোলানাথ বাবু তাঁহার গুরুর ভবিষ্যৎবাণীর সফলতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ভোলানাথবাবুর ঊর্দ্ধতন আট পুরুষ পাবনা শহরের অধিবাসী। ইঁহাদিগের পূর্ব্বনিবাস ছিল পাবনা জিলার চাটমোহর গ্রামে। ইঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, ইঁহাদিগের উপাধি ছিল ভাদুড়ী (কাপ)। ইঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষের বংশে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্য বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই অবধি ইঁহাদিগের বংশের অনেকেই চৈতন্য-সম্প্রদায়ে যোগদান করেন ও চৈতন্য-প্রদত্ত 'অধিকারী' উপাধি গ্রহণ করেন। (যাঁহার উপর পাঁচশত গৃহীর শিক্ষা-দীক্ষার ভার অর্পিত হইত, তাঁহার পদবী হইত 'গোস্বামী,' যাঁহার উপর তিনশত গৃহীর ভার অর্পিত হইত তাঁহার পদবী হইত 'অধিকারী,' আর যাঁহার উপর একশতের ভার অর্পিত হইত তাঁহার পদবী 'মোহন্ত')। ইঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষের একজনের সাত পুত্র ও এক কন্যা হয়। এই কন্যার প্রতি মমতা বশত ইনি ঘর-জামাই রাখিবার জন্য ব্যগ্র হন। কিন্তু 'কাপ'-এর মধ্যে ঘর-জামাই না পাওয়াতে শ্রোত্রীয়ে কন্যা দান করিতে প্রস্তুত হন এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধতা হেতু চাটমোহর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পাবনায় আসেন। ইঁহার সেই জামাতার বংশের নিম্নতম অষ্টম-পুরুষ পাবনায় প্রথম বি-এ ও প্রথম সরকারী উকিল—মহিমচন্দ্র জোয়াদ্দার। ইঁহারা যখন পাবনায় আসেন তখন পাবনা একটি গ্রাম ছিল, ইংরেজ আমলে শহর হয়। ভোলানাথবাবুর পূর্ব্ব-পুরুষ রাজা সীতারাম রায়ের গুরু ছিলেন। রাজা সীতারাম রায় এই গুরু-গৃহে প্রস্তর নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও বিষ্ণু-সেবার জন্য গুরুদেবকে জমি দান করেন। সেই জমি দানের কথা যশোহরের অন্ধ-কবি যদুনাথ ভট্টাচার্য্য-লিখিত 'রাজা সীতারাম' নামক পুস্তকে একখানি দলিলের নকলে প্রদত্ত হইয়াছে। কালাপাহারের অনুচরদিগের অত্যাচারের সময় এই বিষ্ণুমূর্ত্তিটি পাবনা শহরের 'জোড়-বাঙলা' মন্দিরের নিকটস্থ এক পুকুরে বিসর্জ্জন করা হইয়াছিল।

ভোলানাথবাবুর পিতার নাম কাশীনাথ। কাশীনাথের ছয় পুত্র ও দুই কন্যা হয়। ভোলানাথবাবু ছিলেন চতুর্থ পুত্র। জন্ম ১৮৩২ সনে। পঞ্চম পুত্র হরলাল পাণ্ডিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি 'মহাভারতের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই বংশে ভোলানাথবাবুই প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা করেন। ইনি কিছুদিন কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মৃদংগী গোলাম আব্বাস সাহেবের নিকট মৃদংগ শিক্ষা করিবার সুযোগ হয়। এই গোলাম আব্বাস ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র। অল্প বয়সে সংগীতের প্রতি আসক্তি বশত ইনি কুসংসর্গে পতিত হন।
সংগীতের প্রতি আসক্তি বশত ইনি কুসংসর্গে পতিত হন।
করা হইত—বিশেষ মুসলমান সমাজে। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, সেকালের বড় বড় বাদক ও গায়ক অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের যে অঞ্চলে গোলাম আব্বাস বাস করিতেন সে অঞ্চলে কয়েক ঘর বাঙালীর বাড়ী ছিল। বাঙালীর সংগে মিশিয়া ইনি উত্তম বাঙলা বুঝিতে ও বলিতে শিক্ষা করেন।

কিছুদিন পরে এক বাঈজীর সংগে বাদক হইয়া, ইনি কলিকাতায় আসেন ও জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বাসা করেন। ইহাদিগের এই বাসার অদূরে আদি ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের গীতবাদ্যে আকৃষ্ট হইয়া গোলাম আব্বাস ঐ মন্দিরে যাতায়াত আরম্ভ করেন। তখন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক ছিলেন। গোলাম আব্বাসের মন ধীরে ধীরে ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তিনি তাঁহার সঙ্গিনী সেই বাঈজীকে পরিত্যাগ করিয়া আদি ব্রাহ্ম-সমাজের মৃদংগবাদকরূপে কলিকাতাতেই অবস্থান করেন। কলিকাতাতেই ইঁহার মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যু একটু রহস্যময় ঘটনা। একবার লক্ষ্ণৌ শহরের একটি বড় বাঈজী ঠাকুর-বাড়ীর এক তরফে গান করিতে আসেন। তাঁহার সংগের বাদকটি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায়, গোলাম আব্বাস ঐ বাঈজীর সংগে সংগত করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি পবিত্র ব্রাহ্ম-মন্দিরে সংগত করেন বলিয়া অপবিত্র নারীর সহিত সংগত করিতে রাজী হইলেন না। শেষে বহু বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে ঐ বাঈজীর গানের সহিত সংগত করিতে হয়। প্রত্যেক গায়কেরই গানের একটা বিশিষ্ট কায়দা থাকে—বিশেষ বাঈজীদিগের। তাহাদিগের নিজের বাদক ভিন্ন অন্য বাদকের পক্ষে ইহাদিগের সহিত সংগত করা সুবিধাজনক হয় না। সেইদিনকার সংগতে হঠাৎ কোথায় একটু তালের ব্যতিক্রম ঘটে, আর বাঈজী নাকি আসরে পদাঘাত করিয়া সেই তাল দেখাইয়া দেন। গোলাম আব্বাস একে অনিচ্ছাসত্ত্বে সংগত করিতে আসিয়াছিলেন, তারপর তিনি ঐ বাঈজীর নিজের বাদক নহেন। কাজেই তাহার কায়দা তিনি জানিতেন না। ঐ আসরেই গোলাম আব্বাসের গা ঘামিতে আরম্ভ হইল এবং ঐ আসরের বিছানাতেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ইহার পর আর তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। সেই আসরে ভোলানাথবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যেমন গায়কই হউক তাঁহার গুরুদেবের কিছুতেই তাল কাটিতে পারে না। এই ঘটনায় তাল কাটিয়াছিল বটে কিন্তু তাহা গুরুদেবের অনবধানতা বশত নহে—তখন তাঁহার দক্ষিণ অংগ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং এই পক্ষাঘাতই ঐ মৃত্যুর কারণ। আমাদিগেরও তাহাই মনে হয়, ইহা পক্ষাঘাত ও সন্ন্যাসজনিত মৃত্যু—যেমন সে দিন প্রসিদ্ধ মৃদংগী দুর্ল্লভ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘটিয়াছিল।

কলিকাতা হইতে ভোলানাথবাবু ঢাকায় যান—রূপবাবু, রঘুবাবুদিগের বিশেষ অনুরোধে। সেখানে প্রায় ছয় মাস ছিলেন। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ মৃদংগী উপেন্দ্রনাথ বসাক সেই সময়ে বালক। ঐ বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার উত্তম তবলা বাদক হইতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ভোলানাথবাবুর হাতে মৃদংগ বাজনা শুনিয়া তাঁহার মৃদংগী হইবার অভিলাষ জন্মে। উপেনবাবু বলিয়াছেন, "যেখানে সংগত হইত, ভোলানাথবাবুর বাজনা শুনিবার জন্য সেইখানেই উপস্থিত হইতাম। ইহার জন্য স্থানের দূরত্ব কি রাত্রির গভীরত্ব আর তাহার সংগে গুরুজনের ভর্ৎসনা গ্রাহ্য করিতাম না।" ঢাকা হইতে সরকারী চাকরী লইয়া ভোলানাথবাবু রাজসাহীতে যান। সেখানে কালীপ্রসন্ন ঘোষ (রায় বাহাদুর, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক) ও গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী (রায় বাহাদুর, রাজসাহী, কাশিমপুরের জমিদার) মহাশয়গণের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা জন্মে। ইঁহাদিগের সাহায্যে পুলিশ ইনস্পেক্টরের পদ লাভ করিয়া, ভোলানাথবাবু মালদহে যান। সেখানে অল্পদিন মাত্র ছিলেন। তাঁহার সংগীতজ্ঞ বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে কোথাও

স্থায়ীভাবে তিষ্ঠিতে দিতেন না। মালদহ হইতে পাবনায় আসিয়া সাঁড়ার নিকটস্থ কুড়ুরিয়া (এখন পদ্মাগর্ভে) নামক গ্রামের ইংরেজী স্কুলের হেড-মাষ্টার হন। তারপর ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার পরামর্শে পাবনার রেজেষ্টারী অফিসের হেড-ক্লার্কের পদ লইয়া কিছুদিন পাবনাতেই স্থায়ীভাবে বাস করেন। ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা ভোলানাথবাবুর আত্মীয়, বাল্যবন্ধু ও প্রতিবাসী। একসঙ্গেই কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ভোলানাথবাবু মৃদঙ্গী হইবার নেশায় কলেজ পরিত্যাগ করেন। ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র মেডিক্যাল কলেজের পড়া শেষ করিয়া ডাক্তারী করিবার জন্য তাঁহার নিজ বাসস্থান পাবনায় আসিলেন। আসিবার সময় হরিশবাবু দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রহ্ম-সমাজ' ও বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহের' হুজুগ সঙ্গে করিয়া আনিলেন। পাবনায় তাঁহার বাড়ীতে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইল। হরিশবাবু উত্তম গায়ক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ভোলানাথবাবু হইলেন মৃদঙ্গ বাদক। পাবনায় ব্রাহ্ম-সমাজ বেশ জমিয়া উঠিল। দুই তিনটি বিধবা-বিবাহও হইয়া গেল। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, ছাত্রবৃত্তি স্কুল ও ব্যায়ামাগার স্থাপিত হইল, সভা-সমিতি হইতে লাগিল। পাবনার এই সমস্ত সংস্কারের মূলে ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা ও তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিলেন, বন্ধু ভোলানাথবাবু। ডাঃ হরিশ্চন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের মাতুল।

ভোলানাথবাবু যখন পাবনা রেজিষ্ট্রী আফিসের হেড-ক্লার্ক, তখন বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাবনার সাব-রেজিষ্ট্রার। এই সূত্রে ভোলানাথবাবুর সহিত সঞ্জীববাবুর ভ্রাতা বঙ্কিমবাবুরও বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। এই সময় পাবনায় একটি সাহিত্য-সভা স্থাপিত হয়। 'স্বর্ণলতা'র লেখক তারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় যখন কার্য্যোপলক্ষে পাবনায় যাইতেন তখন তিনি ভোলানাথবাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন ও ঐ সাহিত্য-সভায় যোগদান করিতেন। এইভাবে সে সময়ের অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে ভোলানাথবাবুর হৃদ্যতা জন্মে। বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশ-নন্দিনী' সম্পর্কে এক সাহিত্য-সভায় ভোলানাথবাবু বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিম যখন নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি দুর্গেশ-নন্দিনী লেখার পূর্ব্বে 'Ivanhoe' পড়েন নাই, তখন তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনই হেতু নাই। তবে দুর্গেশ-নন্দিনীর সহিত আইভানহো পুস্তকের বিষয়বস্তুর আশ্চর্য্য মিলের একটা হেতু কল্পনা করা আবশ্যক। আমাদিগের সেকালে আইভানহো উপন্যাসখানি এরূপ জনপ্রিয় ছিল যে, যিনি উক্ত পুস্তক পড়েন নাই তাঁহাকে ইংরেজী-নবীশ বলিয়া গণ্য করা হইত না। আমার মনে হয় বঙ্কিমের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেহ তাহার নিকট আইভানহো পুস্তকের উপন্যাসভাগের গল্প করিয়াছিলেন। এই গল্প বঙ্কিমের মনে অজ্ঞাতে দুর্গেশ-নন্দিনীর উপাখ্যানভাগের প্লট তৈরীর সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।" সে সময়ে বঙ্কিমবাবু এ-কথার প্রতিবাদ করেন নাই।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র পাবনায় চার বৎসর চিকিৎসা করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও বৌবাজারে বাসা লইয়া এইখানেই স্থায়ীভাবে বসেন। তাঁহার রচিত 'স্বাস্থ্যতত্ত্ব', 'জীবন-রক্ষা', 'ব্যায়াম-শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ ও তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত 'অণুবীক্ষণ' নামক বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিকপত্র, বাঙলা ভাষায় ঐ সকল বিষয়ের অতি প্রাচীন গ্রন্থ ও বিজ্ঞানের পত্রিকা। তাঁহার 'হিমসাগর তৈল' ও 'ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ' প্রভৃতি ঔষধগুলি বাঙলার অতি প্রাচীন পেটেন্ট ঔষধ। যখন হরিশবাবু ডাক্তারী করিয়া কলিকাতাতেও বেশ পশার জমাইলেন, তখন ভোলানাথবাবুকেও তিনি কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। একবার এক সঙ্গীত মজলিশে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোলা-ছিলেনই, উপরন্তু কাশীর মত জায়গায় সানাই ও সেতারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া যশ অর্জ্জন করেন। কাশীর ডাক্তার (তাঁহার মাসতুত ভাই) লোকনাথ মৈত্র (ডাক্তার ডি এন মৈত্রের পিতা) ও তাঁহার বন্ধু রায়বাহাদুর গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী তাঁহাকে কাশীতেই স্থায়ীভাবে থাকিতে অনুরোধ করেন। লোকনাথবাবু তাঁহাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা দিয়া তাঁহার জন্য একটি ঔষধালয় খুলিয়া দেন। ভোলানাথবাবু সেখানে চিকিৎসাকার্য্য আরম্ভও করিয়াছিলেন কিন্তু মাতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে পাবনায় ফিরিয়া আসিতে হয়। এবারে ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র ভোলানাথবাবুকে কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবসা করিতে অনুরোধ করেন। ভোলানাথবাবু কলিকাতায় আসিলেন, কিন্তু প্রতিদিন গান-বাজনা ও জলসায় যোগদান করিতে গিয়া তাঁহার আর ডাক্তারী করা হইল না। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী মুরারিবাবু তাঁহার নিকট মৃদঙ্গের অনেকপ্রকার বোল শিক্ষা করেন। মুরারিবাবু অনেক সময় গৌরব করিয়া বলিতেন, "আমার তেহাই শিক্ষা স্বয়ং তেহাইয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ভোলাদার নিকট।" প্রসিদ্ধ গায়ক রামলাল মৈত্র ও প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী দুর্ল্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনেকবার মুরারিবাবুর মুখে এই কথা শুনিয়াছেন। ১৮৮০ সালে যখন ভোলানাথবাবু কলিকাতা হইয়া তাঁহার জামাতা চন্দ্রমোহন মজুমদারকে (ইনি তখন চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন) দেখিবার জন্য চট্টগ্রাম যাত্রা করেন তখন তাঁহার সম্মানার্থ মুরারিবাবু তাঁহার গৃহে একটি সঙ্গীত সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সে সময়ে দুর্ল্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও রামলাল মৈত্র ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। রামলাল মৈত্র মহাশয় তখন বি-এ পড়িতেন ও মুরারিবাবুর বাড়ীর নিকটে এক মেসে থাকিতেন। দুর্ল্লভচন্দ্র ১৮ বৎসরের বালক, ইঁহারা ভোলানাথবাবুর নামই শুনিয়াছিলেন। এইবার তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন।

কলিকাতা অবস্থানকালে ভোলানাথবাবু কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করেন। ঐ সমাজের উপাধ্যায় পরম পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় ভোলানাথবাবুর সহাধ্যায়ী ও সমাজের প্রসিদ্ধ গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ভোলানাথবাবুর আত্মীয় ছিলেন। এই সূত্রেই তাঁহার সহিত কেশবচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কেশববাবুর ব্রাহ্ম-মন্দিরে খোল করতাল সহ কীর্ত্তনগানের প্রচলনের মূলে এই ভোলানাথবাবু। একদিন কেশববাবুর বাড়ীতে উপাসনার সময় ত্রৈলোক্যবাবুর কীর্ত্তন গানের সঙ্গে ভোলানাথবাবু খোল বাজাইয়া উপাসকমণ্ডলীকে এরূপ মোহিত করিয়াছিলেন যে, কীর্ত্তনের শেষে কেশববাবু ভোলানাথবাবুর সহিত কোলাকুলী করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ভোলাদা', কীর্ত্তনের সঙ্গে খোলের বাজনা যে এত মিষ্ট হয়, তাহা আগে জানতাম না"। ইহার পর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে খোল করতাল সহ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

কলিকাতায় অবস্থানকালে ভোলানাথবাবুকে অনেক সময় নানারূপ সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে, কলিকাতার বাহিরে একটি কলেজ স্থাপন করিয়া অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজের অনুকরণে তাহার কার্য্য চালাইবেন। এইজন্য তিনি ভোলানাথবাবুকে কুষ্টিয়ার "কেনি বিল্ডিংস" নামক গৃহগুলি ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে বলেন। ভোলানাথবাবু এই কার্য্য আগ্রহের সঙ্গে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষে অসুস্থতা-নিবন্ধন বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ভোলানাথবাবুর মৃত্যু-সংবাদে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "ভোলাদার (বয়সে বিদ্যাসাগর বড় হইলেও সকলের সঙ্গে তিনি ভোলানাথবাবুকে দাদাই বলিতেন।) মৃত্যুতে আমার জীবনের একটা বৃহৎ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না।" কেশববাবুর বিধানমণ্ডলীর তালিকায় ভোলানাথবাবুর নাম মুদ্রিত দেখিয়া ও বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের সহায়করূপে তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট দেখিয়া, তখনকার হিন্দু সমাজ তাঁহাকে 'একঘরে' করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শেষ-বয়সে একবার ভোলানাথবাবু তাঁহার পুরাতন বন্ধু রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের অনুরোধে জয়দেবপুরের এক সংগীত-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর একবার তাঁহার পুরাতন বন্ধু রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র লাহিড়ীর অনুরোধে, গিরীশচন্দ্রের কাশিমপুরের (রাজসাহী) বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গিরীশচন্দ্র ভোলানাথবাবুকে বলিয়াছিলেন, "ভোলাদা, একসঙ্গে খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি, এখন চল একসঙ্গে কাশী গিয়া মরি।" ভোলানাথবাবুর কাশীতে মৃত্যু হয় ১৮৮৭ সনে। আশ্চর্য্য এই ঘটনা যে, ভোলানাথবাবুর মৃত্যুর ৭ দিন পরে রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র লাহিড়ীও কাশীতে দেহরক্ষা করেন।

কাশী যাইবার পূর্ব্বে ভোলানাথবাবু একদিন এক জয়পুরী কালোয়াতের সঙ্গে মৃদঙ্গ-সঙ্গৎ করেন—টেমার্স লেনের এক ধনীর গৃহে। এখন সেই গৃহটি হ্যারিসন রোডের উপর পড়িয়াছে ও সেই গৃহে জে এন ঘোষ মহাশয়ের মেগাফোনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। যে কালোয়াত সেদিন গান করিয়াছিলেন, তিনি মুসলমান (অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার নাম সংগ্রহ করা গেল না)—লম্বায় চওড়ায় বিরাটাকার, পরণে ঢোলা একটা পায়-জামা ও গায়ে ঢোলা একটা পাঞ্জাবী, মাথায় একটা কাপড়ের ছোট টুপী। মাথা ন্যাড়া। বয়স ৫০-এর উপর। দুই দিকে দুইটি তানপুরা লইয়া দুইজন লোক সুর দিতে আরম্ভ করিলেন। গান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি এক গ্লাস জলে খানিকটা আফিং গুলিয়া তাহাই পান করিলেন। ভোলানাথবাবুকে পাইয়া কালোয়াতজী বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি ভোলানাথ-বাবুর নাম জানিতেন কিন্তু পরিচয় ছিল না। সে রাত্রের গান যেমন জমিয়াছিল, ওস্তাদজী বলিয়াছিলেন যে—তাঁহার জীবনে এমন গান কখনও জমে নাই। গানের প্রাণ বাদ্য—বাদক ভাল হইলে, গান আপনা হইতেই জমিয়া উঠে। ভোলানাথবাবুর জীবনে এই শেষ সঙ্গত। ঐ আসরে শেষ-গানের শেষ-সময়ে ভোলানাথ-বাবু পাখোয়াজে তেহাই-এর দুইতাল দিয়া তৃতীয় তালের সময় পাখোয়াজটি এরূপ ভাবে দেওয়ালের দিকে গড়াইয়া দিলেন যে, সেটি দেওয়ালের গায়ে ঠং করিয়া যথা সময়ে তেহাইয়ের তৃতীয় মাত্রা শেষ করিল। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধচিত্তে উচ্চস্বরে 'বাহবা' দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথ-বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কালোয়াতজীকে বলিলেন, "ভাই সাহেব, এই আজ পাখোয়াজকে ধাক্কা দিয়া বিদায় করিলাম, কাল সন্ধ্যায় সংসারকে ধাক্কা দিয়া কাশী রওনা হইব।" ইহার উত্তরে ওস্তাদজী বলিলেন, "(হিন্দিতে) ভোলাদা পাখোয়াজটিকে ধাক্কা দিলে বটে কিন্তু তাল কাটে নাই, সংসারকে ধাক্কা দিবে বটে কিন্তু মায়ার তাল কাটিবে না।" সে সময়ে ভোলানাথবাবু অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার জামাতা চন্দ্রমোহন মজুমদার (ইনি তখন প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর) মহাশয়ের গৃহে ঐ টেমার্স লেনেই বাস করিতেন।

ভোলানাথবাবু লম্বায় চওড়ায় সাধারণ বাঙালী অপেক্ষা দীর্ঘায়তনের পুরুষ ছিলেন। পাবনায় যে-সকল কুস্তিগীর আসিতেন, তাঁহারা ভোলানাথবাবুর অতিথি হইতেন ও ভোলানাথ-বাবুর সহিত ২-৪ দিন কুস্তি না করিয়া শহরের অন্য কোথাও কুস্তির খেলা দেখাইতে যাইতেন না। যত গায়ক ও বাদক পাব-নায় আসিতেন তাঁহাদের আস্তানা ছিল ভোলানাথবাবুর বাটীতে। দু-একজন গায়ক বা বাদক স্থায়ীভাবেই তাঁহার বাড়ীতে থাকিতেন। পাখোয়াজ শিক্ষার জন্য বহু দূরদেশ হইতে শিক্ষার্থী আসিয়া তাঁহার গৃহে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিতেন।

ভোলানাথবাবু কুটিল আইনজ্ঞের মত সর্ব্বপ্রকার দলিলের মুশাবিদা করিতে পারিতেন। রেজিষ্ট্রী অফিসে কাজ করিয়া তিনি এইগুণ লাভ করেন। এইজন্য পাবনা জেলার জমিদার ও বণিকগণ তাঁহার বাড়ীতে অনেক সময় অতিথি হইতেন। পাবনাতে তাঁহার বাড়ীই ছিল—অতিথি অভ্যাগতদের প্রধান বাসস্থান।

ভোলানাথবাবু ও বাবু রাজেন্দ্রলাল রায় (ডি এল রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ—তিনি তখন পাবনার পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।) পাবনায় প্রথম সখের থিয়েটার স্থাপন করেন। ভোলা-নাথবাবু ঢাক, ঢোল, সানাই হইতে আরম্ভ করিয়া সেতার, এস্রাজ, বেহালা ও বিলাতী কর্নেট, ক্ল্যারিওনেট উত্তমরূপে বাজাইতে পারিতেন আর ইহার প্রত্যেক যন্ত্রেই 'তেহাই' প্রচলন করিয়াছিলেন। পাবনায় প্রথম নাটক হয় 'রামের রাজ্যাভিষেক'। ঐ নাটকের এক অংশে, রামের মঙ্গলের জন্য কৌশল্যা মঙ্গলচণ্ডী পূজা করিতেছেন—এইরূপ একটি দৃশ্য ছিল। ঐ দৃশ্যে ভোলা-নাথবাবু ঢাকী হইয়া এরূপে ঢাক বাজাইয়াছিলেন যে, দর্শকরূপে উপস্থিত সাহেব মেমেরাও নাচিতে আরম্ভ করেন।

কাঠের মিস্ত্রীর কাজ ও রাজমিস্ত্রীর কাজেও ভোলানাথবাবু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নিজের বাড়ীর কাঠের আসবাবগুলি, তিনি নিজ হাতেই প্রস্তুত করিতেন। রোগী পরিচর্যায় তিনি এমন দক্ষ ছিলেন যে, ডাক্তারেরা রোগীর পাশে তাঁহাকে দেখিলে রোগীর আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতেন। কোথাও আগুন লাগিলে, ভোলানাথবাবু সেখানে সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত হইতেন ও গায়ে অসাধারণ জোর ছিল বলিয়া একাই এক একখানি ঘর নিজহাতে টানিয়া ভাঙ্গিতেন। তিনি উত্তম রন্ধন করিতে পারিতেন। কাজেই যেখানে ভোজের কোন অনুষ্ঠান হইত সেখানে ভোলানাথবাবু না হইলে চলিত না। শ্মশানে শব বহন করিতে তিনি কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার অছিলা করেন নাই। ঝড়-বৃষ্টির রাত্রিতে একাই শব ঘাড়ে করিয়া শ্মশানে যাইতেন ও দাহকার্য্য সমাপন করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। পরোপকার করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

১৮৭৭ সালে যখন ভিক্টোরিয়া 'এম্প্রেস' উপাধি গ্রহণ করেন, তখন ভারতের সর্ব্বত্র উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পাবনায় ঐ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার ভার পড়িয়াছিল—ভোলানাথবাবুর উপর। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাকে প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

ভোলানাথবাবু উত্তম সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। পরিতাপের বিষয় তাঁহার রচিত ব্যঙ্গ সঙ্গীতগুলি কেহ সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই। তিনি যাত্রা-গানের উপর বিরক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন যাত্রায় 'গর্দ্দভ রাগিণী' ও 'ঢেঁকি তালের' অনু-শীলনের দ্বারা বাঙলার বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সর্ব্বনাশ হইতেছে। যাত্রার সঙ্গীতে বিশুদ্ধ সুর নাই, রচনায় কবিত্ব নাই বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেন। যাত্রা-দলের "ওরে রামশশী হবি বন-বাসী কে আমারে ডাকবে মা বলে"—এই গানটির ব্যঙ্গ করিবার জন্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন "ওরে রামশশী তুই কাঁঠাল খাবি, বীচি গুলো রাখিস্ তুলে"। "তাঁতের কাজ চৌতালে, লোহার কামারের কাজ ধামালে, স্বর্ণকারের কাজ ঝাঁপতালে," সুর-সংযোগে গান করিয়া, তিনি দেখাইতেন যে, সমস্ত শিল্পীর কাজ এইরূপ সুখকর করা যাইতে পারে। এই সকল সঙ্গীতের কায়দাগুলি ভোলানাথবাবুর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে। একদিন ভোলানাথবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র অঘোরবাবুকে এই কায়দা-গুলির লোপ বিষয়ে তাঁহার অনবধানতার কথা বলিলে, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "যখন বাবা তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে এই সকল কায়দা দেখাইতেন, তখন আমি ছিলাম বালক। সেই কায়দাগুলি আয়ত্ত করিবার শক্তি আমার ছিল না। আবার যখন

বড় হইলাম, তখন বাবাকে ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া উহা শিক্ষা করিবার সুযোগ করিতে পারি নাই, কারণ আমাদিগের সে সময়ে গুরুজনের সহিত সংগীতের আলোচনা গর্হিত কার্য বলিয়া ধরা হইত।" সংগীতকে এইরূপ অবহেলা করাতেও বিষয়ের অনেক আবশ্যক জিনিষ লোপ পাইয়া গিয়াছে। ভোলানাথবাবুর রচিত কয়েকটি উত্তম সংগীত ব্রাহ্মসমাজে সংগীত-পুস্তকে রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার একটি সংগীত উদ্ধৃত হইলঃ—

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাকরে রসনা।
যাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হবেরে, যাবে সব যন্ত্রণা॥
ও-মন আপন আপন কারেরে বল,
এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল,
আর মিছে মায়ায় বন্ধ হয়েরে, মিছে খেলা আর খেলোনা॥
শমন এসে বাঁধবেরে যখন,
কোথায় রবে ঘর-দরজা, কোথায় রবে ধন,
তখন বন্ধুজনায় বিদায় দিবেরে, সাথের সাথী কেউ হবে না॥

মৃত্যুকালে ভোলানাথবাবু তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার স্ত্রী বহু বৎসর পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। ভোলানাথবাবুর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটি আঠার বৎসর বয়সে মারা যায়। এই পুত্রটি বাঁচিয়া থাকিলে পিতার অনেক গুণের অধিকারী হইতে পারিত। ভোলানাথবাবুর জ্যেষ্ঠ-পুত্র রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী কলিকাতা বালীগঞ্জের হিন্দুস্থান পার্ক অঞ্চলে বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার মধ্যম-পুত্র রায়-সাহেব অচ্যুতনাথ অধিকারী কাশীর আয়ুধ-গরবী অঞ্চলে বাড়ী কিনিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহারা দুইজনেই বাঙলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার শিক্ষা-বিভাগে সুপরিচিত। ইঁহারা অনেকগুলি শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কন্যা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী (প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টার চন্দ্রমোহন মজুমদারের স্ত্রী) পাবনায় বাস করিতেছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ইন্দু-জ্যোতি মজুমদার পাবনার একজন প্রধান উকিল। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হিমাংশুজ্যোতি মজুমদার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তৃতীয় পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গায়ক সীতাংশুজ্যোতি মজুমদার। ইনি ইঁহার মাতামহ (ভোলানাথবাবু) দত্ত 'বকুবাবু' নামে সংগীত সমাজে সুপরিচিত ছিলেন।

একটি নির্ব্বাপিত দিবস

(৭০০ পৃষ্ঠার পর)

কার আশায় কে আসে, ছোট ছেলের চোখেও তা এড়ায় না। নীলু বললে, কিন্তু দিদি ত আসেনি। আজ পত্র দিয়েছে, কি একটা বিশেষ কাজ পড়ে গেছে, সেইজন্যে আসতে পারলে না, পরশু নিশ্চয় আসবে।

আশ্চর্য্য! আসেনি—বিশেষ কাজ—পরশু!

আচ্ছা বলে আবার পথ ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপর বিশ্বাস ও আশা ফুরিয়ে গেল। ছি, ছি! কথা দিয়ে যে কথার দাম রাখে না, তার সঙ্গে—না, সমস্ত বন্ধন আমাকে ছিঁড়ে ফেলতে হবে, কি ভেবেছ আমাকে? এস বললেই আসতে হবে, বস বললেই বসতে হবে, যাও বললেই কাঁদুনী পালা গাইতে হবে, হুকুমবরদার? কোন সময়ে আমার এরকম পরিচয় কিসে পেয়েছ? লাঞ্ছিত বিরক্ত মনে ফিরতে ফিরতে এতদিনকার পরিচয়ের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলাম, না, না, কখনও ত এমন করেছি বলে মনে হয় না। এমন কি নিয়মিত তোমার ওখানে যাওয়ার মাঝে মাঝে ব্যত্যয় ঘটিয়ে পরীক্ষা করেছি, তুমি কি কর, অনুযোগ কর কি না। নিজেকে হীন করে শ্রীচরণাশ্রিত হয়ে যারা প্রণয়ভাজন হবার চেষ্টা করে, আমি তাদের দলে নই। পুরুষের পৌরুষে আমি বিশ্বাসী, তাকে অবনমিত করে ধর্ম্ম বল, মোক্ষ বল, অর্থ বল, নারী বল, যাই বল, আমি কোন কিছুই পেতে চাই না। অবশ্য আমি এও চাচ্ছি না যে, অপর পক্ষ আমার কাছে শির নত করে থাকুক, আমি নারীকে স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। তোমার সম্মান আমার সম্মানের মতই মূল্যবান, এ কথা মানতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই, কিন্তু এ কি! এ ভাবে আমাকে লাঞ্ছিত করবার দুঃসাহস তোমার কি করে হতে পারে, তা আমি বুঝতে পাচ্ছি না। তোমার কথার অপমান ঘটিয়ে তুমি শুধু তোমার নিজেরই অবমাননা করনি, আমারও করেছ। তুমি জান—শুধু জান নয়, খুব ভালভাবেই জান, তোমার আসবার চিঠি পেয়ে আমি কত ব্যাকুল হয়ে থাকব, তোমার আসবার দিন আমার সমস্ত কাজ পণ্ড করে তোমার অপেক্ষায় বসে থাকব, কি চিত্তচাঞ্চল্য দিয়েই না তোমার ওখানে ছুটে আসব, আর তুমি এলে না,—না, তোমার অন্যায় সমস্ত ক্ষমার বাইরে, কোন কৈফিয়ৎ দিয়ে এ অপরাধের গুরুত্ব কমান যায় না, মিছে এতদিন এত লেখাপড়া করেছ, মিছে আমার কাছে বড় বড় কথার আড়ম্বর করতে, আজ তা বুঝতে পারছি। অতীতের বা বর্ত্তমানের মহাত্মা বা মহীয়সীরা সত্য-রক্ষার জন্য কত কি করেছেন—থাক, অনর্থক আর এত কথা কেন!

তোমার যা ভাল হয় ক'র, যেদিন খুশী হয় এস, শুধু এই মিনতি, এমন পত্র আর লিখ না।

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

(১২)

পনের দিন পরে মদন ফিরিয়া আসিল।

আজ আর সে শয়নকক্ষে গেল না। খিড়কীর পুকুরে গিয়া হাতমুখ ধুইয়া তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে দেখিল, অদূরে কলসকক্ষে কে একজন আসিতেছে। সে তোয়ালে রাখিয়া পুনরায় হাতমুখ ধুইতে লাগিল।

যে আসিতেছিল সে মদনকে দেখিয়া চিনিল। ডাকিল, "মদন-দা?"

মদনও তাহাকে চিনিল—সে অনীতা। কহিল, "এত সকালে যে?"

"জল ফুরিয়ে গেছে তাই নিতে এলাম। পুকুরের জল না হ'লে কাঁচা কড়াইয়ের ডাল ভাল গলে না।"

মদন হাসিয়া বলিল, "এ পুকুরের জল ভারি মিষ্টি—নয়? নতুন কাটা হয়েছে কি না!"

অনীতা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "তুমি ওঠ আমি জল নিই।"

মদন উঠিল না। তেমনই হাসিয়া বলিল, "তা জল নে না। আমি ত আর বাঘ ভালুক নই যে, কপ্ ক'রে তোকে গিলে ফেলব?" বলিয়া আপনার রসিকতায় আপনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অনীতা চুপ করিয়া উপরের চাতালে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। মহামায়ার জীবিতকালে সে প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ীতে আসিত। মদনের সম্মুখে কত ছুটোছুটি দৌরাত্ম্য করিত—সঙ্কোচ লেশহীন হইয়া কতবার তাহাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু এখন সে বয়স নাই—কেমন একটা সঙ্কোচ কুণ্ঠা আসিয়াছে। মদনের হাসিটাও তাহার ভাল লাগিল না। মদন চাহিয়া আছে কেমন যেন লোলুপ দৃষ্টিতে। মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া অনীতা ভাবিতে লাগিল—জল লইবে, না ফিরিয়া যাইবে।

তাহাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া মদন অল্প একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, "আয়।"

অগত্যা সঙ্কোচ কাটাইয়া অনীতা কলসী ভরিয়া উপরে উঠিল। সে চলিয়া যায় দেখিয়া মদন ব্যগ্রস্বরে তাড়াতাড়ি কহিল, "তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে!"

"কি?" বলিয়া অনীতা দাঁড়াইল।

মদন ঢোক গিলিয়া বলিল, "এখন নয়—সন্ধ্যে বেলায় বলব। আসবি এই ঘাটে?"

অনীতা ছোট্ট একটি 'না' বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মদন লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার গমন পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ক্ষান্তকালী তাহাকে দেখিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওমা এতদিন আমাদের ভুলে কোথায় ছিলিরে দাদা! এমনি নিম্মায়া পাষাণই বটেরে তোরা—"

মদন চক্ষু আরক্ত করিয়া চাপা ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "চুপ।" অগত্যা তাঁহাকে চুপ করিতে হইল।

মদন চলিয়া গেলে ক্ষান্তকালী রেণুর সন্ধানে ভাঁড়ার ঘরে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বৌমাগো, মদন যে বাড়ী এল। বাবা সত্যনারায়ণের কি মহিমে! চন্দ্রকলা হারান সোয়ামী ফিরে পেয়েছিল, আর আমাদের মদনও পনের দিনের মধ্যে ফিরে এল।" বলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

রেণুর গম্ভীর মুখ প্রসন্ন হইল না। সে যেমন একমনে কাজ করিতেছিল, তেমনই একমনে কাজ করিতে লাগিল।

রাত্রিতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মদন অঘোরে ঘুমাইতেছে। ঠিক ঘুমাইতেছে কি না বুঝিতে পারিল না। সন্তর্পণে দুয়ারটি বন্ধ করিয়া ঘরের কোণ হইতে মাদুর টানিয়া লইয়া মেঝেয় বিছাইল ও কিছুক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোর রাত্রিতে ঘুমটা হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। রেণু সচকিতে চক্ষু চাহিয়া দেখিল, তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া একখানি হাত মাথায় রাখিয়া মদন একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে।

রেণু ধড়মড় করিয়া বসিতেই মদন বলিল, "রাগ করেছ?"

রেণুর এ প্রশ্ন ভাল লাগিল না। চোর যদি সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া বলে,—'তোমার কি কোন কষ্ট হইয়াছে?'—সে প্রশ্ন যেমন হৃতসর্ব্বস্ব গৃহস্বামীর কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করে না, পরন্তু কঠিন বিদ্রূপ বলিয়াই সর্ব্ব অন্তর জ্বলিয়া উঠে, রেণুও তেমনই কঠোর দৃষ্টিতে মদনের পানে চাহিল।

ভাগ্যে তখন প্রভাতের আলো ভাল করিয়া ফুটে নাই। রেণুর জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি সহজ বলিয়া বোধ হইল।

তা'ছাড়া মদন কখনও মুখোমুখি রেণুর পানে চাহিয়া কথা বলিতে পারিত না। এ সম্বন্ধে তাহার বরাবরই একটা সঙ্কোচ ছিল।

রেণুর নীরব দৃষ্টিপাতে উৎসাহিত হইয়া মদন আপনার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল।

রেণুর আর সহ্য হইল না। চাপা ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "থাম, আর বলতে হবে না। যা হয়েছে—আমি জানি।"

মদন থতমত খাইয়া গেল। ভাবিল, চুপ করিয়া গেলে রেণু আমায় দোষী সাব্যস্ত করিবে।

সে পুনরায় উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কি জান? আমার বন্ধুর বাড়ীতে—"

রেণু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার কাছে সকাল বেলায় কতকগুলো মিথ্যে ব'লবার কি দরকার? রসিদপুরের কথা সবাই জানে।"

মদন বুঝিল আর গোপন করা বৃথা, কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বিষয় যতক্ষণ গোপন থাকে, ততক্ষণই চক্ষুলজ্জা। একবার সে লজ্জা কাটিয়া গেলে কোন কিছুতেই ভয়-সঙ্কোচ থাকে না।

মদন উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হাঁ—গিয়েছিলাম ত রসিদপুরের বাগানে, তাতে হয়েছে কি? আমি কি কারও খাই, না

পরি, না কোন মিয়াকে ডরিয়ে চলি যে, মুখ লুকিয়ে বেড়াব? পুরুষ মানুষ, যা দিল চায়—ক'রব।"

রেণু বলিল, "সকলের লজ্জা ত সমান নয় যে, মুখ লুকিয়ে বেড়াবে।"

মদন সগর্ব্বে বলিল, "নয়ই ত। মেয়ে-মুখো পুরুষ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।"

রেণু উত্তর না দিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, মদন পথরোধ করিয়া বলিল, "একটা কথার উত্তর আমায় দিয়ে যাও। তুমি আমায় কি মনে কর—বল দেখি? সব কথার উত্তর দাও না, পারত পক্ষে আমার ত্রিসীমানায় আসতে চাও না, ভাল ক'রে আমার সঙ্গে কথা কও না।"

রেণু ধীরস্বরে বলিল, "এসব তুমি বুঝতে পার?"

মদন বলিল, "পারি না! মানুষ মানুষকে ঘৃণা করলে কি মানুষ বুঝতে পারে না?"

রেণু বলিল, "সব মানুষে কি তা পারে? অন্তত পুরুষ মানুষ—"

মদন সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "জান, তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? স্বামী স্ত্রীর। একবার যে মন্ত্র প'ড়েছ, তা হাজার বার চেষ্টা ক'রলেও—মুছে ফেলতে পারবে না।"

রেণু বলিল, "জানি। জানি ব'লেই আমার দুঃখ এত বেশী। তুমি যদি এসব বুঝতেই পার ত, অবুঝের মত কেন আমায় জ্বালাতন কর?"

মদন বলিল, "আমি—আমি তোমায় কি জ্বালাতন ক'রলাম?"

রেণু নতমুখে বলিল, "কোন স্ত্রী-ই তার স্বামী রসিদপুরের বাগান বাড়ীতে গেলে খুশী হয় না,—তা সে স্বামীর যতই পৌরুষের গর্ব্ব থাকুক না কেন?"

মদন হাসিয়া বলিল, "এই!"

রেণু একটু চুপ করিয়া বলিল, "শুধু এই নয়। আমার লোহার সিন্দুকের চাবি হঠাৎ খুলে গেছে, সে খবরও বোধ হয় তোমার অজানা নেই।"

মদন উচ্চকণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল, রেণু তাহাকে থামাইয়া সুস্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আর লোহার সিন্দুকের সঙ্গে জমিদারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—তাও বোধ হয় জান? ক'দিন আগে জ্যেঠামশায় এসেছিলেন,—লাটের কিস্তির টাকা চাইতে। সিন্দুক খুলে দেখলাম—জমিদারী রাখবার কোন বন্দোবস্তই নেই।"

মদন স্তব্ধ হইয়া রহিল।

রেণু বলিতে লাগিল, "জ্যেঠামশায় ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। আমি বুঝলাম, টাকাগুলো কোথায় উড়ে গেছে। কিন্তু যা উড়েছে—তা ত আর ফিরে আসবে না, তাই যেখানে যা গহনা ছিল বাঁধা দিয়ে লাটের কিস্তি পাঠিয়ে দিলাম।"

রেণুর প্রত্যেক কথাটি মদনের মর্ম্মে আসিয়া বিঁধিতেছিল। কঠোর উলঙ্গ সত্যকে অস্বীকার করিবার মত কণ্ঠের জোর তাহার ছিল না। সে বিবর্ণমুখে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

সহসা রেণু মদনের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল ও তাহার পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দোহাই তোমার একটু বোঝ। আমি তোমার স্ত্রী, আমার যে কি কষ্ট তা কি তোমার বুঝতে নেই। মা বিষয়ের ভার আমার হাতে দিয়ে গেছেন, সে বিষয় যদি রক্ষা না হয়—আমার যে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। তুমি কি আমায় এমনি ক'রে সব দিকে মারতে চাও?"

রেণুর আকুলতায় মদন আর স্থির থাকিতে পারিল না। রেণুর দুঃখ তাহার অন্তরও বুঝি স্পর্শ করিল। তাই কোমলকণ্ঠে সে কহিল, "রেণু, আমারই অন্যায়। আমায় মাপ কর। আমি বুঝতে পারিনি, আমায় বুঝিয়ে দাও। তুমি আমায় চালিয়ে নিয়ো।"

রেণু মদনের পায়ের ধূলো লইয়া বাহিরে আসিল।

সত্য সত্যই মদন কয়েকদিন বাড়ী হইতে বাহির হইল না। কিন্তু আজন্মের অভ্যস্ত সংস্কারকে সে মুহূর্ত্তের ভাবপ্রবণতায় জয় করিতে পারিল না। তখনও অপহৃত অর্থের কিছু তাহার হাতে ছিল, বন্ধুরাও দু'বেলা আসিয়া দেখা করিতে লাগিল। রেণুর ঐকান্তিক মঙ্গল কামনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া সে আবার একদিন রসিদপুরের বাগানে চলিয়া গেল।

এবার বাগানে উৎসবটা জাঁকাল রকমের হইয়াছে। শহর হইতে হেনা বাইজী আসিয়াছে। তিন দিন ধরিয়া তাহার মধুকণ্ঠের সুধা-কাকলী চলিতেছে।

মদনের অন্তরঙ্গ বয়স্য হারু খুড়ো বলিল, "হাঁ, বুকের পাটা বলিতে হয় ত—মদনবাবুর। ঘরে অমন জমাদারণী মাগ থাকতে কম ফূর্ত্তিটাই কি লুটছে?"

বিনোদ বলিল, "যা বলেছ খুড়ো। মদন আমাদের আদর্শ পুরুষ।" স্ত্রীর কথা উঠিতেই মদনের মুখখানি শুকাইয়া গেল। সে এক গ্লাস পানীয় চোঁ চোঁ করিয়া উদরস্থ করিয়া কহিল, "আরে ওসব বাজে কথা ছাড়ান দাও, বাইজীর গান হোক।"

গান আরম্ভ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আর যাহা আরম্ভ হইল, তাহার বর্ণনা লেখনীর মুখে দেওয়া যায় না।

তিন দিন পরে বাইজী চলিয়া গেল।

দিবারাত্রি উগ্র সুরা পান করিয়া মদনের সারা মস্তিষ্কে যেন আগুন ছুটিতেছিল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দেখ্ বিনদা, আমি মাইরী ও বাইজীর চেয়ে ভাল একজনকে দেখে এসেছি। পারিস তাকে আনতে?"

পারিষদেরা লাফাইয়া উঠিল। বিনোদ বুকে তাল ঠুকিয়া টলিতে টলিতে কহিল, "আলবৎ পারি, কাকে আনতে হবে বল। স্রেফ্ হুকুম কর—দেখ তোমার দাসানুদাস বিনোদচন্দর তাকে হাজির করতে পারে কি না!"

মদন অনীতার কথা বলিলে বিনোদের মত্ততা যেন এক নিমেষে কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর নামাইয়া নিরুৎসাহ স্বরে কহিল, "ক'লকাতা থেকে যাকে বল আনতে পারি, কিন্তু গাঁ থেকে—"

মদন ফরাস চাপড়াইয়া কহিল, "দূর শালা—সে কি আমি পারি না! য্যাঃ—এই তোর মুরদ?"

বিনোদ আমতা আমতা করিয়া কহিল, "শেষ পুলিশ কেস ক'রে দিক আর কি পাঁচ সাত বচ্ছর ঠেলে? জান না ত আজকাল—"

মদন বলিল, "টের পেলে ত? অন্ধকারে চুপি চুপি গিয়ে ছোঁ মেরে নিয়ে এসে তুলবি একেবারে এই গোরার কেল্লায়।"

বিনোদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ওতে আমি নেই বাবা। ফ্যাসাদ অনেক। মুখে বলা যত সহজ—কাজে করা তত নয়।"

হারু খুড়ো এতক্ষণ চুপ করিয়া বাদানুবাদ শুনিতেছিল। বিনোদের কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "শক্তই বা কিসে? তোরা ছোঁড়ারা যেমন ভীতু!"

মদন হারুর পানে চাহিয়া বলিল, "তুমি পার, খুড়ো?"

হারু সদম্ভে কহিল, "তোমার আশীর্ব্বাদে বাবা, খুড়োর এতে হাতযশ খুব। তবে কি জান ভায়া, কাজটা শক্ত। কিছু লোক চাই—আর—"

"আর কি চাই?"

হারু বলিলেন, "আর চাই টাকা। ছুঁড়ীটাকে বশ ক'রতে হবে—লোকগুলোকে খাওয়াতে হবে।"

"কুচপরোয়া নেই—" বলিয়া টলিতে টলিতে মদন হাত বাক্সটা খুলিয়া ফেলিল এবং এক তাড়া নোট বাহির করিয়া কহিল, "এই এক হাজার—কেমন হবে না?"

সানন্দে ঘাড় নাড়িয়া খুড়ো বলিল, "খুব। আজ রাত্তিরেই কাজ হাঁসিল ক'রব।"

এমনই করিয়া কামনার বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, এমনই করিয়া মানুষ সর্ব্বনাশকে ডাকিয়া আনে।

* * * * * *

হাত পা বাঁধা অনীতাকে দেখিয়া মদনের নেশা কাটিয়া গেল।

বিহ্বলকণ্ঠে সে কহিল, "খুড়ো, একে কে আনলে?"

খুড়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ—হাঁ—ভাইপো আমার ভ্যাবা-চাকা খেয়ে গেছে! ওরে তোরা ত নাবালক, খুড়ো এ কাজে কোনদিন ডরায় না। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি—যাকে চাও সেই কি না? ঐ যে ছুঁড়ীটা চোখ মেলছে, আমি যাই। কথা-বার্ত্তা ক'বে বেশ ধীরে সুস্থে।"

ভীত হইয়া মদন বলিল, "না, না খুড়ো, আমার সামনে থেকে ওকে নিয়ে যাও। নিয়ে যা—ও। যদি আমায় চিনতে পারে—"

খুড়া বলিল, "পারলেই বা! দুদণ্ড পরে চেনা শোনা ত হবেই। হাঁ ভাল কথা, গাঁয়ে লোক জানাজানি হয়ে গেছে, মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠেছিল কি না?"

মদন উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীতভাবে কহিল, "আমি যাই—তুমি ওকে সেখানে রেখে এস।"

খুড়া বলিল, "ভয় কি, বাবু? বসুন না। লোক জানাজানি হ'লেও এ বাগানের সন্ধান কেউ পাবে না।"

মদন বলিল, "কিন্তু আমার বড় ভয় করছে।"

খুড়া গ্লাস ভর্ত্তি করিয়া তাহার মুখের নিকটে ধরিয়া বলিল, "এটুকু খাও দেখি—সব ভয় কেটে যাবে।"

মদন এক নিশ্বাসে গ্লাসটি নিঃশেষ করিয়া অনীতার পানে চাহিল। খুড়া ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল।

(ক্রমশ)

উত্তর-বঙ্গের শাঁখবোল

(৬৮৫ পৃষ্ঠার পর)

তরোয়াল লইয়া শিঙ্গা বা শঙ্খের জয়ধ্বনি করিতে করিতে দস্যু দল ও বন্য শূকরের হাত হইতে সোনার ক্ষেত রক্ষা করিত। পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনের মধ্যেই ধান্য কাটা সমাপ্ত হইত এবং অধিবাসীরা ধান্য ছেদন সমাপ্তি-দিবসে শস্য দেবতার পূজো করিত। (৪) এই ঘটনাই পরবর্ত্তীকালে "শাঁখবোল" উৎসবরূপে প্রচলিত হইয়াছে এবং রাখালগণ কর্ত্তৃক এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে। শাঁখবোলের অনুষ্ঠান শস্যোৎসব। বেদীমূলে যে কলা গাছটিকে পূজো দেওয়া হইত, তাহাকেই শস্য-দেবতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। (৫) শঙ্খের জয়ধ্বনির মধ্যে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করা হইত বলিয়াই বোধ হয়, এই উৎসব শাঁখবোল নামে অভিহিত হইয়াছে। অদ্যাপি রাখালেরা শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে শাঁখবোলগুলি গাহিয়া থাকে। *

[অঞ্চল বিশেষে "শাঁখবোল" অন্য নামে পরিচিত এবং সন্ধ্যায় গীত সহ বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া চড়ুইভাতির চাউল প্রভৃতি সংগ্রহে মুসলমান বালকগণও যোগদান করে বলিয়া "বলশিব" স্থানে "খুবো খুবো" চীৎকার সূচনা করিয়া গান আরম্ভ করে। সঃ দেঃ]

ধান্য রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মান রাখিতে। ডাকাইতে তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল।'

(৪) অদ্যাপি এই রীতি উত্তর বঙ্গের অনেক পল্লীতে বর্ত্তমান আছে। পৌষ সংক্রান্তির দিনের মধ্যেই ধান্য কাটা সারা হয় এবং ক্ষেতের একস্থানে সামান্য একটু ধান্য অবশিষ্ট রাখা হয়। কৃষকগণ সেই স্থানে সমবেত হইয়া শস্য দেবতার উদ্দেশ্যে অভিবাদন করে এবং নিরাপদে ধান্য ছেদন সমাপ্ত হইল বলিয়া সানন্দে উচ্চ জয়ধ্বনি করে। এই দিনে কৃষকদের গৃহে মহা-সমারোহে আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) অদ্যাপি বরেন্দ্রভূমির অনেক কৃষক আষাঢ় মাসে ধান্য রোপণের প্রারম্ভ দিবসে ঢাক, ঢোল, শানাই, শঙ্খ বাজাইয়া মহা সমারোহের সহিত একটি কলাগাছের পূজো করিয়া ধান্য-রোপণ আরম্ভ করে।

*মাদারীপুর (রাজসাহী) এম্-ই স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মণ্ডল এই 'শাঁখবোল' গানগুলি সংগ্রহে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে রুশিয়া

শ্রীভবানী সেন

জার্ম্মানীতে যখন ফাসিষ্ট-রাষ্ট্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। তখন ইউরোপের সম্মুখে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের সম্ভাবনা এত ভীষণভাবে দেখা দেয় যে, অপরাপর দেশের কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পর্য্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যাহাদের এই যুদ্ধের ভয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল তাহার মধ্যে ফ্রান্স সর্ব্বপ্রধান। এই জন্য ফ্রান্স তখন সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে পরস্পর সহযোগিতামূলক চুক্তি স্থাপন করে,—এই চুক্তিই ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট প্যাক্ট নামে পরিচিত হয়। এই ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট প্যাক্টকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপের ছোট ছোট স্বাধীন এবং অর্দ্ধ-স্বাধীন দেশগুলি সমবেত হইতে আরম্ভ করে এবং তাহার ফলে ইউরোপে একটি শান্তি-প্রতিষ্ঠাকামী শক্তি-সংহতির সৃষ্টি হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে যুগপৎ ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রুশিয়ার ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট প্যাক্টের অনুরূপ চুক্তি, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি এবং ফ্রান্সের সঙ্গে তাহাদের একতা প্রতিষ্ঠা, এই কয়টি ঘটনা পর পর সম্পাদিত হওয়ায় যুদ্ধ-বিভীষিকা ইউরোপ হইতে তখনকার মত দূরীভূত হয়।

এই শক্তি-সংহতি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল? কি আশা লইয়া এবং কোন আশঙ্কায় তখন মধ্য এবং পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলি একতাবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল? ভার্সাই সন্ধির ফলে, অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরীকে সীমাবদ্ধ করিয়া মধ্য ইউরোপ অঞ্চলে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। এই সীমা নির্দ্দেশের জন্য তখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে দুইটি চুক্তি সম্পাদিত হয়;—"ট্রিয়ানন চুক্তি" এবং "সেণ্ট জারমেইন চুক্তি"। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল, মধ্য ইউরোপে কয়েকটি ছোট ছোট দেশের উপর ফ্রান্সের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া জার্ম্মানী-অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর ক্ষমতা দুর্ব্বল করিয়া রাখা। জার্ম্মানীতে ফাসিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হইবামাত্র এই সীমারক্ষা বিপদাপন্ন হইয়া পড়িল এবং এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, জার্ম্মান ফ্যাসিজম যুগপৎ ফ্রান্স এবং চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি ছোট ছোট দেশগুলির এক প্রচণ্ড শত্রু। হিটলারের শক্তি যতই বাড়িবে, ইহাদের ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা ততই বিপদাপন্ন হইবে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে সোভিয়েট রুশিয়া তাহাদের আহ্বান করিল —এস আমরা যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য সহযোগিতামূলক চুক্তি প্রতিষ্ঠা করি। ব্রিটিশ ফিনান্স কাপিটাল কিন্তু তখন সাক্ষাৎভাবে এই শক্তি-সংহতিতে যোগদান করিতে রাজী হয় নাই। সোভিয়েট রুশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব যতবার ইংলণ্ডকে আহ্বান করিয়াছেন—'এস আমরা ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তের জন্য "লোকার্ণো চুক্তির" অনুরূপ চুক্তি স্থাপন করি,'—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ততবারই ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব ইউরোপের জন্য আমরা কোন রকম দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। ইউরোপের 'যুদ্ধ-শান্তি' সম্পর্কীয় সমস্যায় ইউরোপকে এই রকম দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখিবার পিছনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কি মতলব ছিল, লিটভিনফের কাছে তাহা চাপা ছিল না, তাই লিটভিনফ বার বার জগৎকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন,—"শান্তি একক এবং অবিভাজ্য।"

ব্রিটিশ ফিনান্স কাপিটালের স্বার্থ লইয়া যাঁহারা ইংলণ্ডের রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধার হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মতলব পূর্ব্ব ইউরোপে ফ্যাসিজম-এর গতি-পথ বাধা-মুক্ত করিয়া যুগপৎ ফ্রান্স এবং রুশিয়াকে দুর্ব্বল করিয়া রাখা। কিন্তু ইংলণ্ডের জনমত শান্তির পক্ষপাতী। যখন ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট ব্লকের প্রথম রূপ পরিগ্রহ হয়, সেই জনমতকে উপেক্ষা করিবার মত সাহস এবং প্রয়োজনীয়তা ব্রিটিশ ফিনান্স কাপিটালের তখনও হয় নাই, তাই "লীগ অব নেশনস-এর মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ-বিরোধী শক্তিগুলিকে সমবেত করিব" এই নীতির বিরুদ্ধে তখন তাহারা যাইতে পারে নাই। সোভিয়েট রুশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতিতে তখন দুইটি মূল্যবান লক্ষ্য ছিল,—(১) লীগ অব নেশনস্‌কে শক্তিশালী করা; (২) ইষ্টার্ণ লোকার্ণো প্রতিষ্ঠা করা। ইংলণ্ড তখন প্রথমটি গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় নীতি বর্জ্জন করে,—এইভাবে ইংলণ্ডে একদিকে জনমত এবং অপরদিকে ফিনান্স কাপিটালের মতলব এই দুয়ের মাঝামাঝি রাস্তা অবলম্বিত হয়।

ইউরোপে ফাসিষ্ট অভিযানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লীগ অব নেশনস্ ছিল "বিজয়ী দেশগুলি"র হাতের যন্ত্র। বিজিত এবং দুর্ব্বল দেশগুলিকে সায়েস্তা করিয়া রাখা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল। লীগ অব নেশনস-এর গঠন-প্রণালীর মধ্যেও এই তথ্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কিন্তু ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েটের সমবেত শান্তি-প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবার পর হইতে জাতি-সঙ্ঘের অন্তর্নিহিত রূপে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। যাহারা অবিলম্বে যুদ্ধ চায়, তাহারা আসিল ইহার বাহিরে এবং যাহারা যুদ্ধ চায় না শান্তি চায়, তাহারাই লীগের মধ্যে প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। ১৯৩৫ সালে রুশিয়া লীগ অব নেশনস-এ যোগদান করে, তাহার পর হইতে আন্তর্জ্জাতিক জগতের রূপ পরিবর্ত্তন লীগ অব নেশনস-এর রূপ পরিবর্ত্তনে প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু লীগের বাহিরে গড়িয়া উঠিল তথাকথিত এ্যাণ্টি কমিণ্টার্ণ ব্লক। জার্ম্মানী-ইটালী এবং জাপানের ক্রমাগত আক্রমণ লীগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না। একদিকে রোম-বার্লিন এক্সিস, অপরদিকে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট প্যাক্ট এই দুই টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়িয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী লীগের মধ্যে দোল খাইতে থাকিল। ব্রিটিশ ফিনান্স কাপিটালের লক্ষ্য রোম-বার্লিন এক্সিস, আর ব্রিটিশ জনমতের লক্ষ্য ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট প্যাক্ট; এই দুয়ের মধ্যে কোন পক্ষ জয়ী হইবে, তাহার উপরেই তখন নির্ভর করে লীগ অব নেশনস-এর ভবিষ্যৎ। কিন্তু ব্রিটিশ ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ভেদাভেদ এবং দুর্ব্বলতা

লক্ষ্য করিয়া খুব জোরের সঙ্গে রোম-বার্লিন এক্সিসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। লীগ অব নেশনস্ এবং শান্তি-সংহতির প্রধান শক্তি ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট প্যাক্ট আর রোম-বার্লিন এক্সিসের অগ্রগতির পথে এই প্যাক্ট-ই প্রচণ্ড বাধা, সুতরাং ফ্রান্সকে সোভিয়েট রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিতে হইবে. ইহাই হইল ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির বর্ত্তমান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লইয়াই চেম্বারলেন মিউনিক সম্মেলনে এমন নির্লজ্জের মত চেক-রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ-ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই লক্ষ্য লইয়াই চেম্বারলেন চতুঃশক্তি সন্ধির প্রচেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

ব্রিটিশ ফিনান্স ক্যাপিটাল সোজাসুজি এ্যান্টি-কমিণ্টার্ন প্যাক্টে যোগদান করিতে পারে না, কারণ এ্যান্টি-কমিণ্টার্ন প্যাক্টের অর্থ জগতে জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদের অভিযান প্রচেষ্টা। অথচ রোম-বার্লিন এক্সিসকে ক্ষমতাশালী করিতে হইবে এবং তার জন্য ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট প্যাক্ট নষ্ট করিতে হইবে। এই সমস্যাই চেম্বারলেনের নিকট পররাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রের আশু সমস্যা। ইহারই উপায় স্বরূপে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী এবং ইটালির মধ্যে চতুঃশক্তি সন্ধি-স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছে ইংলণ্ডের নেতৃত্বে। মিউনিক সম্মেলন এই প্রচেষ্টার প্রথম কদম, নবপ্রতিষ্ঠিত ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান চুক্তি এই প্রচেষ্টার দ্বিতীয় কদম। লীগ্ অব্ নেশনস্-এর মধ্যে থাকিয়া ইংলণ্ড এতদিন এই চতুঃশক্তি সন্ধি-প্রতিষ্ঠার রাস্তাই পরিষ্কার করিয়া আসিতেছে।

মিউনিক সম্মেলনের পর হইতে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আর এক পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। ইউরোপে সমর সম্ভাবনা আজ এত বেশী যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এখন চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র সহজ করিয়া তুলিতে হইলে অবিলম্বে চতুঃশক্তি সন্ধির প্রচেষ্টা বন্ধ করিতে হইবে। চতুঃশক্তি সন্ধির প্রচেষ্টা লীগ্ অব্ নেশনস্‌কে যেমন দুর্ব্বল করিয়াছে, শান্তি-স্থাপনে আমেরিকার অগ্রগতি সেই রকম আন্তর্জ্জাতিক শান্তি সম্মেলনের আশা সৃষ্টি করিয়াছে। এই আশা লইয়া রুশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিক-বিভাগ ঘোষণা করিয়াছে—অবিলম্বে শান্তি-কামী দেশগুলিকে লইয়া এক সম্মেলন চাই। লীগ্ অব্ নেশনস্ এবং ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট-চেকোশ্লোভাক প্যাক্ট-এর মধ্যে যে নীতি নিহিত ছিল তাহা হইতে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের নীতি কিছুটা পৃথক। প্রথম নীতির মূলকথা ছিল জার্ম্মানীকে পর্য্যন্ত শান্তি-চুক্তির আবেষ্টনের মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা আর দ্বিতীয় নীতির মূলকথা হইল ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বাদ দিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সোভিয়েট-রুশিয়া এবং ফাসিষ্ট আক্রমণে বিপদাপন্ন দেশগুলিকে লইয়া মৈত্রী-স্থাপন। এই মৈত্রী-স্থাপনের চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তবে অদূরভবিষ্যতে মহাযুদ্ধ অনিবার্য্য। এই মৈত্রী-স্থাপনের উপরই শান্তি-প্রতিষ্ঠার সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-সংহতি স্থাপনের অনেকখানি নির্ভর করে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর। ব্রিটিশ ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট এবং ফ্রান্সের বর্ত্তমান দালাদিয়েরের মন্ত্রিসভা ফিনান্স ক্যাপিটালের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে। যতক্ষণ এইরূপ চলিতে থাকিবে ততক্ষণ চতুঃশক্তি মিলনের গতিরোধ করা অসম্ভব। বিশেষত ইংলণ্ডে যদি অবিলম্বে ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্টের পতন না হয় তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলী যুদ্ধের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইজন্য ইংলণ্ডের যে সমস্ত শ্রেণী এবং যে সমস্ত দল জার্ম্মান-ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের গতিরোধ করিতে প্রস্তুত তাহাদের লইয়া এক নূতন শান্তি প্রতিষ্ঠাকামী মন্ত্রিসভা সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ব্রিটিশ লেবর পার্টি হইতে আরম্ভ করিয়া টোরি-পার্টির চার্চ্চিল-এডেন প্রমুখ সম্প্রদায় সকলেই এ বিষয়ে একতাবদ্ধ হইতে পারে এবং তাহারা একতাবদ্ধভাবে চেষ্টা করিলে ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটান অসম্ভব নয়। এই ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্টের শক্তি নির্ভর করিতেছে অনেক পরিমাণে ভারতবর্ষের উপর। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট তাহার শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না, এইজন্যই দ্রুতগতি ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের আয়োজন অগ্রসর হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় আন্দোলন যতই শক্তিশালী হইবে ততই ব্রিটিশ ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট হইবে দুর্ব্বল এবং ইংলণ্ডের শান্তি-স্থাপনেচ্ছু দলগুলি হইবে শক্তিশালী। এইদিক হইতে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে ভারতের **জাতীয় আন্দোলন কত ঘনিষ্ঠ**ভাবে জড়িত।

অনাদি ও অনন্ত

(কথিকা)

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মাঠের শেষ সীমানায়, যেখানে আকাশ নীচু হ'য়ে এসে তাকে ছুঁয়েছে—তা ছাড়িয়ে তাদের গাঁ। তাল-তমালের ঘন-বনানীর মাঝে যেন স্বপ্নে-রচা মায়াপুরী।

গাঁয়ের পূবে দীঘি—কত স্মৃতি তার বুকে জমা। তার কালো জলে আলো-ছায়ার উৎসব চলে দিবসে নিশীথে—রৌদ্রালোকে, জ্যোৎস্নাধারায়।

এই দীঘির ধারে তাদের দেখা হয় দু'জনার। শিশির-ভেজা চিকণ-সবুজ ঘাসের ওপর চুপি চুপি পা ফেলে মেয়েটি নিঃশব্দে আসবে ভাবে, কিন্তু তার পায়ের নূপুর বেজে ওঠে।

ছেলেটি চুপটি ক'রে লুকিয়ে থাকে মহুয়া গাছের আড়ালে, নূপুরের শব্দে চকিত হয়ে সে উঁকি দিয়ে দেখে।

ভীত-চকিত চাউনিতে মেয়েটি ধীরে ধীরে আগিয়ে আসে ঘাটের ধারে, একরাশ হাসির মত ঊষার আলো তার মুখে চোখে, ভোরের বাতাসে থেকে থেকে নেচে উঠছে তার ভ্রমর-কালো এলো চুল।

ওদিকে মহুয়া গাছের পাতায় পাতায় মর্ম্মর-ধ্বনি জেগে ওঠে।

এদিকে ঘাটের ধারে ফুলগাছের ওপর ডালে কোকিল ডেকে চলে।

ঝরা-ফুলের রাশিতে গাছের তলা গেছে ছেয়ে। নীচু হয়ে মেয়েটি ফুল কুড়ায়—তার আঁচল ওঠে ভরে। গাছের আড়াল হতে ছেলেটি তার দিকে চায় আর বাঁশী বাজায়—মুখে চোখে তার দুষ্টুমির হাসি।

মেয়েটির হরিণীর মত ভীরু, বড় বড় দুটি কালো চোখে চাঞ্চল্যের বিদ্যুৎ ছুটা-ছুটি সুরু করে দেয়। বাঁশী একবার বাজে আর থামে—দেখা কিছুই যায় না ; ফুল কুড়ান তার পড়ে থাকে।

ছেলেটি থাকতে পারে না আর—হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। মেয়েটি চমকে ওঠে ; তারপর তাকে দেখতে পেয়ে সে-ও ফেলে হেসে।

বাঁশী হাতে ছেলেটি আগিয়ে এসে তার একখানি হাত ধরে। কোন অজানা পুলকে মেয়েটির মন নেচে ওঠে—দেহ ওঠে দুলে।

তারপর দীঘির পাড় বেয়ে তাল তমালের পাশ দিয়ে ঘন-বনানীর ফাঁকে ফাঁকে—দূরের ঐ বকুলগাছের তলাটিতে এসে দু'জনে মুখামুখি বসে।

ছেলেটি বাঁশী বাজায় আর মেয়েটি মালা গেঁথে চলে ফুলের বোঁটায় বোঁটায় বিনি-সুতায়।

মালা গাঁথা শেষ হলে একগাছি মালা সে পিছনে লুকিয়ে রাখে, আর একগাছি দেয় পরিয়ে ছেলেটির গলায়।

বাঁশী থামিয়ে হাসতে হাসতে ছেলেটি লুকান সেই মালাগাছি খুঁজতে থাকে—খুঁজে কিছুতেই পায় না। ব্যথিত দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের পানে চেয়ে মিনতির সুরে সে বলে "দাও না সেই মালাখানি তোমার পায়ে পড়ি!"

হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে মেয়েটি বলে "বারে! আর মালা পাব কোথায়? একগাছিই ত মোটে গেঁথেছি।"

ছেলেটির চোখ ছল ছল করে ওঠে—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হতাশভাবে মেয়েটির দিকে চেয়ে সে বসে থাকে।

তার মুখের পানে চেয়ে মেয়েটি আর থাকতে পারে না—আস্তে আস্তে মালাগাছি বার করে তার হাতে দেয়। "কি ছেলে-মানুষ তুমি ; দেখি, কাঁদছ বুঝি!"—বলে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটি তার চোখে হাত দিয়ে দেখতে যায়। ছেলেটি খপ্ করে তাকে ধরে তার গলায় মালাগাছটি দেয় পরিয়ে।

লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে মেয়েটির মুখখানি। "যাঃ, ভারি দুষ্টু তুমি"—বলে ছেলেটির বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দাঁতে ঠোঁট চেপে বাঁকা-চাউনিতে তার দিকে চেয়ে চেয়ে সে হাসে।

বধূরা বোধ হয় জল নিতে এসেছে সব দীঘিতে। কানে ভেসে আসে তাদের অস্ফুট মৃদু কলধ্বনি।

দু'জনের চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। কী ইঙ্গিত, তারাই জানে!

বনের ফাঁকে ফাঁকে পথ দিয়ে মেয়েটি এগোয় আর পিছু ফিরে তাকায়। অপলক দৃষ্টিতে ছেলেটি সেই দিকে থাকে চেয়ে। পথের বাঁকে, বনের আড়ালে দেখা যায় না আর মেয়েটিকে—শুধু তার নূপুরের ক্ষীণ শব্দ কানে এসে বাজে। —ক্রমে সে শব্দও যায় মিলিয়ে।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়—তারপরে আনমনে সে পথ চলে।

তারপর? তারপর ছেলেটি একদিন সকালে সেই দীঘির ধারে দেখতে পেলে না আর মেয়েটিকে। গাছে গাছে পাখীদের ভোরবেলাকার কূজন-গান কখন থেমে গেল। ঐ বধূরা সব আসছে জল নিতে দীঘিতে। ছেলেটি উঠে দাঁড়াল।

উদাস মনে বনের পথে চলতে চলতে কেমন করে এসে সে বসল তাদের প্রতিদিনের সাথী সেই বকুলগাছের তলাটিতে। অভ্যাস মত তেমনি করেই বাঁশীটি তুলে ধরে সে বাজিয়ে চলে, কিন্তু সে সুর কোথায়? বাঁশী বেসুরা বাজে! বিরক্ত হয়ে বাঁশীটিকে ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে।

মন্থর হাওয়ায় কোথা হতে যেন ক্ষীণ মৃদু-নিক্কণধ্বনি ভেসে আসে—চকিত হয়ে উঠে বসে ছেলেটি। শব্দ ক্রমে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়। তার ছন্দে ছন্দে ছেলেটির শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে আনন্দের বান ডাকে ; তরু-পল্লবে মর্ম্মরধ্বনি জেগে ওঠে—আর তৃণে তৃণে হয় পুলকের শিহরণ।

বন-পথের বাঁকে দেখা গেল মেয়েটিকে। চোখ বুজে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে এমনিভাবে ছেলেটি পড়ে থাকে যেন সে ঘুমাচ্ছে। মেয়েটি এসে তার চোখ দুটি ধরে চেপে। যেন চমকে উঠে ছেলেটি উঠে বসে ; তারপর চোখ থেকে হাত দুটি তার নামিয়ে দিতেই মেয়েটি হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে।

(শেষাংশ ৭১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সোভিয়েটে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিধান

হ্যারল্ড ডেলি

—নীতিগত বিরোধ—

বিগত দুই বৎসর সোভিয়েটের স্কুল-শিক্ষকদিগের উপর বিশেষভাবেই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়া আসিতেছিল যে, ছাত্র-ছাত্রীদের কোনপ্রকার ধর্ম্মমতেরই শিক্ষাদান করা হইবে না—সেই ধর্ম্মমত ক্যাথলিকই হউক, গ্রীক সংরক্ষণশীল মতই হউক, প্রোটাষ্টাণ্ট, ইহুদী কিংবা ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ীই হউক। শিক্ষকদের উপর ঐ সাধারণ ঘোষণা—যাহা দুই বৎসর যাবৎ পালনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—তাহা ব্যতীত নূতন করিয়া কড়া আদেশ প্রচার করা হইয়াছে যে, পুনরায় সোভিয়েট স্কুলসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে প্রত্যক্ষ ধর্ম্মবিরোধী শিক্ষাই দিতে হইবে—শুধু ধর্ম্মনীতি শিক্ষায় নিরুৎসাহ করিলেই চলিবে না।

১৯৩৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর সোভিয়েট কনষ্টিটিউশনের যে নবপর্য্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্যকরী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—সে সময়ে সাধারণভাবে ধর্ম্মশিক্ষার রেওয়াজ তুলিয়া দিয়াই সোভিয়েট-নেতারা নিশ্চিন্ত ছিল এই কারণে যে, তাহারা নিশ্চিত ধারণা করিয়া লইয়াছিল যে সমগ্র রুশ হইতে ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ ও দরদ লোপ পাইয়া গিয়াছে; সুতরাং আর কঠোর ব্যবস্থার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু নব-পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমের সূত্রপাত হইলে তখন দেখা গেল, সোভিয়েট নেতাদের নিশ্চিত ধারণা মূলত ভ্রান্ত, কাজেই ধর্ম্মকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার প্রয়োজনে বিশেষ সতর্কতার ব্যবস্থা পরিচালিত করা যে নিতান্তই আবশ্যক এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল। এই কারণে নূতন কনষ্টিটিউশনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে (যদিও উহার প্রভাবেই এমন কথা বলা চলে না) নূতন প্রচেষ্টা সুরু হইল সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতের অঙ্কুরোদ্গমের বিরুদ্ধে, বিশেষ করিয়া তরুণ-রুশিয়াকে সকল প্রকার ধর্ম্মের বন্ধনকে অস্বীকার করিবার মনোবৃত্তিতে অটল রাখিবার জন্য নব ধর্ম্ম-বিরোধী শিক্ষাদানের প্রচলন করা হইল।

ধর্ম্মের প্রতি সোভিয়েট যে বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী, তাহার প্রধান অস্ত্র, এই দুই বৎসরে সোভিয়েট কর্ত্তৃক যাহা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা হইল—তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের ভিতর যথাযোগ্য প্রচারকার্য্য। এমন কি, এমিল ইয়ারোস্লাবস্কির ন্যায় নাস্তিকতাবাদী ধুরন্ধর পর্য্যন্ত রাষ্ট্র-নেতাদের প্রায়শই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তাহা আইনসঙ্গত উপায়েই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, পশুবলের নির্ব্বিশেষ প্রয়োগদ্বারা নহে। এবং সেই নীতি অনুসরণ করিয়াই যেন সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ কোনও প্রকার ধর্ম্মস্থান গীর্জ্জা প্রভৃতিতে নিষ্ঠুর উদ্দাম অভিযানের অসংযম নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগে নিতান্তই বিশেষত্বে পরিণত হইয়াছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই একেবারে চরম নিপীড়নে পৌঁছিয়াছিল।

—গীর্জ্জা-সংশিলষ্টদের বিতাড়ন—

কিন্তু আইনের সীমা লঙ্ঘন না করিয়াও বহু গীর্জ্জার বিরুদ্ধে কঠোর বিধান করা হইয়াছে এবং উৎসাহী ধর্ম্ম-পক্ষপাতী গীর্জ্জা-সংশিলষ্টদের নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করা সম্ভব হইয়াছে। কারণ অবাঞ্ছিত ধর্ম্মোৎসাহীদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ত গোয়েন্দাগিরি, ট্রট্স্কীপন্থীর আশ্রয়-দান, কিম্বা কোনও বৈদেশিক শক্তির অধীনে গুপ্তচরের কার্য্য করিবার অভিযোগ আনয়নপূর্ব্বক উহাদের প্রতি আইনসঙ্গত যে-কোনও দণ্ডদান সহজ বলিয়াই দেখা গিয়াছে। এবং এই অজুহাতে গীর্জ্জা-সংশিলষ্ট বহু উচ্চ-নীচ যাজক বা অন্য পদাসীন ব্যক্তিকেও গীর্জ্জার সংশ্রব হইতে বিতাড়ন করা হইয়াছে।

গীর্জ্জা এবং তৎসংশিলষ্ট অট্টালিকা-সম্পদ-বিভব আইনের রক্ষাকবচে ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত হওয়া হইতে রক্ষিত হইবার কথা। কিন্তু আইনের বন্ধনে এমনই সব ফাঁক রহিয়াছে, আবার কর্ত্তৃপক্ষের হাতে এমনই অপরিসীম ক্ষমতা রহিয়াছে যে, কোনও অবাঞ্ছিত গীর্জ্জা-অট্টালিকাকে নির্ম্মূল করিতে অথবা উহাতে সাধারণের গতিবিধি একেবারে রুদ্ধ করিতে আইনের অজু-হাতের অভাব হয় নাই। বর্ত্তমানে বিরল হইলেও মাঝে মাঝে কোন গীর্জ্জা ধ্বংস করিয়া ফেলা হয় উপরোক্ত প্রকার গোয়েন্দা-গিরির গোপন আড্ডা বলিয়া, যদিও উহাতে হয়ত নিয়ত পূর্ব্বদিনে জনতার বেজায় ভিড় হইয়াছে ধ্বংসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত!

সোভিয়েটের অবশ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালন করিবার যথেষ্ট ন্যায্য কারণ রহিয়াছে, যাহা কোনও প্রকৃত দেশ-ভক্ত রুশিয়ান উপেক্ষা করিতে পারে না।

কিন্তু যেখানে বলা হয় যে, ধর্ম্ম একেবারে মার্ক্সবাদের বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিকতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর-দক্ষিণ মেরুর মত, সেখানে শুধু কার্ল মার্কস-য়ের "ধর্ম্ম জনসাধারণের পক্ষে আফিম"—এই বাণীরই মর্য্যাদা দান করা হয়। লেনিন এই বাণীকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ষ্ট্যালিনও পরে।

তাহা হইলেও ১৯৩৬ সালে নব কনষ্টিটিউশনের আমলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা প্রদানের যে নীতি গ্রহণ করা হইবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, বলিতে গেলে উহার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন করিয়া ধর্ম্ম-বিরোধী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা স্কুলসমূহে কেন পরিচালিত হয়, তাহার অব্যবহিত কারণ ঠিক বুঝা যায় না।

বিজ্ঞানের আভিজাত্য

কোন কোন কমিউনিষ্টদিগের মুখে শুনা যায়—ধর্ম্ম বিজ্ঞানকে স্বীকার করে না; অথচ কমিউনিষ্টগণের আশা বিজ্ঞানের উপরই নিহিত, কারণ বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহারা বিশ্বকে নূতন করিয়া তাহাদের পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত করিতে চাহে। আর একটি কারণ যাহা কমিউনিষ্টগণ উত্থাপন করে ধর্ম্মের অপকর্ম্ম বলিয়া, তাহাকে সমগ্রত অস্বীকার করা যায় না—তাহারা বলে, ধর্ম্মই হইল শাসক ও শোষকবর্গের হস্তের অস্ত্র, যাহার সাহায্যে সেই স্মরণাতীত-কাল হইতে তাহারা অজ্ঞ জনসাধারণকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ধর্ম্ম—অন্তত যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া

অশিক্ষিত জনগণকে জানিতে দেওয়া হইয়া থাকে—তাহার লক্ষ্য হইল এমন এক অসীম ভগবান্, যাহার করুণা লাভের জন্য—যাহার কৃপায় অমরাবতীতে স্থান পাইবার জন্য, সকলকে ইহকালের অশেষ দুঃখ-কষ্ট-রিক্ততা সহ্য করিতে হইবে, কারণ উহারই বিনিময়ে লাভ হইবে অনন্ত স্বর্গরাজ্য। এই জন্যই কমিউনিষ্টগণ বলিয়া থাকে যে, স্বর্গরাজ্যের জন্য ইহকালের যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ-স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই, ভগবানের মুখাপেক্ষী হইয়া শাসিত ও শোষিত হইবার কোনও দরকার নাই—মানুষ এই বিশ্বেই তাহার স্বর্গ রচনা করিতে পারে।

এইগুলিই হইল প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক কারন, যাহার জন্য কমিউনিষ্টগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, যে প্রকারেই হউক ধর্ম্মের অপ-প্রভাবের যে গ্লানি তাহা হইতে দেশকে মুক্ত রাখিতে হইবে, নতুবা উহার বীজ থাকিয়া গেলে, যে কোনও সময়ে আবার উহা অঙ্কুরিত হইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ-সমিতির অস্তিত্ব দেশ মধ্যে সমর্থন করিতেই পারে না যাহা কোন প্রকারেই রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল নয় এবং ইহার নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধীন নয়। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান সোভিয়েট ষ্টেটের প্রত্যঙ্গ নহে, সুতরাং উহার অস্তিত্ব সোভিয়েটের কর্ম্মপ্রণালীর অনুকূলও নহে।

ইহা ব্যতীতও গীর্জ্জা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যে প্রকৃতই কোনও প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বা বিদ্রোহের কার্য্যে লিপ্ত থাকে নাই, অথবা তাহাদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, তাহার মূলে কোনও সত্য নাই, এমন কথা কখনই বলা যায় না—অনুসন্ধানে বরং উহার বিপরীত ব্যাপারই উদ্‌ঘাটিত হইবার কথা। আর ইহা ত ঐতিহাসিক সত্য যে এই গীর্জ্জা-সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গই সর্ব্ব-প্রথম বোলশেভিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং এই কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অদ্য সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভিতর যদি কোথাও ক্ষুব্ধ ও বিরোধ সম্পৃক্ত উপাদান রুশিয়ায় থাকিয়া থাকে, তবে তাহা এই ধর্ম্মাশ্রিতদিগেরই পক্ষপুটে।

কাজেই ইহা বিস্ময়ের বিষয় একেবারেই নয় যে, সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং সর্ব্বদা ইহাদের কার্য্যকলাপ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করে।

অনাদি ও অনন্ত

(৭০৮ পৃষ্ঠার পর)

সে হাসিতে যোগ দেয় না ছেলেটি। মেয়েটি বলে "রাগ হয়েছে বুঝি?—তোমার বাঁশী কোথায়?" ছেলেটি বলে না কিছুই—তেমনিই থাকে বসে।

তার কানে কানে, চুপি চুপি মেয়েটি কি বলে, তারপর আঁকা-বাঁকা বন-পথে ত্বরিত পদে সে মিলিয়ে যায়।

শুক্লা-পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নাধারায় ধরণী আজ আলোকে পুলকে ঝলমল্ করছে। কুসুমের মৃদু সুবাসের মত দূরাগত শানাইয়ের মৃদু সুর কানে ভেসে আসে। ক্রমে সুর স্পষ্টতর হয়, রঙীন আতস-বাজির খেলা চলে আকাশপটে, সজ্জিত আলোক-মালা দেয় দেখা।

আলোকে হাসিতে, গন্ধে ও গানে, বাদ্যে ও বাজিতে ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে মদির-বিহ্বল করে তোলে গ্রামান্তরের বর-যাত্রীদল। ধরণীর যুগান্ত পুঞ্জীভূত আনন্দের খেলা যেন আজ আকাশে বাতাসে।

কিন্তু এ কি!—

নব-বধূর নয়নে আষাঢ়ের ধারা কেন শুভদৃষ্টিকালে? হাত হতে তার খসে পড়ে বরণের মালা!

*　*　*　*　*　*

বধূরা জল নিতে এসে দীঘির ধারে আজও ছেলেটির বাঁশী শুনতে পায়। বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে আসে, চিরযুগের বিরহীদের অবরুদ্ধ পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাসের দুঃসহ বেদনা। সে বেদনার সুর আকাশ ও বাতাসকে মথিত করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

মেঘ-কজ্জল

(গল্প)

শ্রীদেবব্রত দাশগুপ্ত

"বাবু তো এখনও ফিরছেন না মা, বেলা যে অনেক হ'য়েছে।"

"ফিরতে একটু দেরী হ'বে ব'লে গেছে; তা' হ'লেও এত দেরী তো কখনও হয় না ও'র...... বারোটা কি বেজেছে, ভাস্কর?" চিরুণীর দাঁতের উপর আঙ্গুল ঘষতে ঘষতে নমিতা প্রশ্ন ক'রলে।

"বারোটা কি এখন বেজেছে মা! গৌতম দাদাবাবু সেই কখন খেয়ে স্কুলে গেছেন!"

"এসে প'ড়বে হয়ত এখনি,—বেরিয়েছেও তো বেশ বেলা ক'রে।" ভাববার কথা হলেও নমিতা কাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

"আচ্ছা মা, অণু মামাবাবুকে আজকাল দেখতে পাইনে কেন? দেহ ভাল নেই বুঝি?"

"দেখতে পাবিনে কেন! কাল বিকেলে যে তার জন্যে চা তৈরী ক'রে ওপর-নীচ ছুটাছুটি ক'রছিলি! কি বলবি বল, মিছে ভণিতা ক'রছিস কেন?

"কাজ তো প্রায় সবই হ'য়ে গেছে; যাওয়াটা অবিশ্যি হয়নি। তা আপনি তো জানেন মা, বাবু এসে বিশ্রাম ক'রতে নাইতেও কম সময় নেবেন না।......" অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে চমৎকার অভিনয় ক'রলে ভাস্কর।

"এই-রে, আবার ভূমিকা সুরু ক'রেছিস!" কৌতূহলী দৃষ্টির সাথে বাঁকা ঠোঁটের রেখায় অপ্রকাশিত হাসির পরিচয়।

"ব'লছিলাম কি মা, ই'য়ে......আমি একটু মাণিকতলা যাচ্ছি; বাবু আসবার আগেই ফিরে আসব। ......দেশ থেকে একটা লোক এসেছে কিনা।" হাত কচলাতে কচলাতে ভাস্কর বললে। হাতের পাতায় হলুদের দাগ পরিষ্কার প্রকাশ পাচ্ছে।

"দেশ থেকে রোজই কি তোর লোক আসছে ভাস্কর! আচ্ছা যা, শীগ্‌গির ফিরিস কিন্তু: বাবু আসবার আগে, বুঝলি......" একটু চুপ ক'রে কি ভেবে, নমিতার মুখে উদার হাসি ফুটে উঠল।

"সেত বলকু মু আসি পাড়িবি।" স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবণতায় স্বদেশ-ভাষা বেরিয়ে এল ভাস্করের মুখ থেকে।

......ভাস্কর বেরিয়ে যেতে, একা ঘরে নমিতার চিন্তার গভীরতা গেল বেড়ে। সত্যিই তো অজয় যে এখনও ফিরছে না; কোথায় বাউলের মত এত বেলা অবধি ঘুরে বেড়াচ্ছে? খাওয়া-দাওয়ার কথা হয়ত একেবারেই ভুলে গেছে। সত্যিই অজয়ের মত ছন্নছাড়াকে নিয়ে সংসার ক'রে দু'দিনে নমিতা হাঁপিয়ে উঠেছে। অথচ, কিছু বলতে গেলে ও'র মলিন অনুতপ্ত মুখের পানে তাকাতে নমিতা সব ভুলে যায়ঃ মমতায় মন ভিজে যায়! ......দোতলার ঘর থেকে চিবুক উঁচু ক'রে রাস্তার পানে তাকালে নমিতা। যাক, বাইরের ঝাঁ, ঝাঁ, রোদ্দুর মেঘের ম্লানিমায় একেবারে ম্লান হ'য়ে গেছে। আকাশ ছেয়ে গেছে কালো মেঘে; ঘরের ভেতরেও দুর্য্যোগের ছায়া পড়েছে। দুপুরের পথ-ঘাটও কেমন যেন প্রাণহীন! উত্তুরে ঠান্ডা বাতাস বইছে; কোথায়ও হয়ত বৃষ্টি হচ্ছে। পথের ওপারের দোতলার বারান্দা থেকে উড়ে চাকরটা ক্লিপ-আঁটা ছোট-বড় জামা-কাপড়গুলি তুলে নিচ্ছে। পাশেই ও বাড়ীর ফুটফুটে দুরন্ত ছেলেটা হাত দিয়ে কার্নিশ আঁকড়ে ধ'রে, তার ওপর গাল রেখে তন্ময় হ'য়ে মেঘলা আকাশের পানে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে! ......হঠাৎ অশ্রান্ত বর্ষা নেমে এল ঝর-ঝর ধারে; বাতাসও বেশ জোরে বইতে সুরু ক'রেছে। জানলা দিয়ে ক'ফোঁটা বৃষ্টির জল এসে খবরের কাগজের কতকটা দিলে ভিজিয়ে।.........দমকা বাতাসের হু হু শব্দে নমিতা যেন কেমন অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল। জড়তা কাটিয়ে নমিতা চটপট বাইরের জানলাগুলি বন্ধ ক'রে দিলে।.........উন্মত্ত বাতাস আর বর্ষার মাতামাতি বাইরে চলেছে অবিশ্রান্ত। মুমূর্ষু আত্মার চাপা কান্নার মত তারই একটানা শব্দ রুদ্ধ ঘরে ভেসে আসছে। বারান্দার গা-ঘেঁসা কৃষ্ণচূড়া গাছের শাখায়-শাখায়, পাতায়-পাতায়, ঝড়ো-হাওয়া রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জে উঠছে। জানলার শার্সিগুলি মাঝে মাঝে থরথর ক'রে কেঁপে উঠছে। ......গৃহের সীমাবদ্ধ আবেষ্টনীতে নমিতার মন নিঃসঙ্গতায় কাতর হ'য়ে উঠল। প্রতিটি স্নায়ু যেন গভীর অবসাদে জড়িয়ে আসছে। ...বাইরে তেমনি শ্রান্তিবিহীন বর্ষাধারার সঙ্গে জলো-হাওয়া মিশে এক-ঘেয়ে হাহাকার ক'রে দিকে দিকে ছড়িয়ে প'ড়ছে।......না অজয় তো এখনও ফিরছে নাঃ ঝড়-জল দেখে কোথায়ও কি আশ্রয় নিলে? নমিতা দারুণ অস্বস্তি অনুভব ক'রলে। বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করবার জন্যে অগোছাল ঘরের সংস্কার ক'রতে ক'রতে চাপা গলায় সুর টানতে সুরু ক'রলঃ

"তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে"

আপন ছন্দ হারিয়ে গানের সুরে বাইরের বাদলা প্রকৃতির মতই করুণ-ক্লান্ত হয়ে উঠছে। একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাকে নিষ্প্রভ নিথর ক'রে তুলছে, কিন্তু তার রূপ বড় অস্পষ্ট। নমিতার বিলাসী মন আপনাতে আপনি এমনি বিভোর হ'য়েছিল যে, অজয় কখন পেছনের দরজা দিয়ে চুপি চুপি ঘরে ঢুকেছে তা সে আদপেই খেয়াল করেনি। তাই অজয়ের কণ্ঠস্বর আকস্মিক বলেই তার মনে হ'ল।

"কোথায় এমনি মেঘলা দিনে দূর আকাশের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইবে চির-বিরহের গান, তা' না গেয়ে এমনি মেঘ-কজ্জল দিবসে এ-কি গান গাইছ নমিতা!" কোনও উত্তর না দিয়ে নমিতা অজয়ের মাথা থেকে পা অবধি ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রলে!......ভেজা কোঁকড়ান চুলগুলি বিস্রস্তভাবে চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে; তা' থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। প্রশস্ত কপালে পাশাপাশি দু'টা শিরা বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে; রৌদ্রদগ্ধ মুখের ওপর বর্ষার জল পড়ে মুখখানাকে অস্বাভাবিক কালো দেখাচ্ছে; দৃষ্টি কেমন যেন ভীরু-ক্লান্তঃ রৌদ্রতপ্ত মুখের মত ছোট, সঙ্কুচিত। পাঞ্জাবীর বুক একেবারে খোলা, ফলে, কাঁধের একদিকে পাঞ্জাবীর হাতা একটু বেশী নেমে গেছে। নোংরা ভেজা কাপড়-জামায় কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে ভাব! উত্তপ্ত হ'য়েই নমিতা বললেঃ

"আচ্ছা তুমি কি! কাল রাতে একশোবার বলে রেখেছি—এ' নোংরা কাপড়-জামা নিয়ে কোথায়ও আর বেরিও না। সকাল হ'তে না হ'তে কাপড়, পাঞ্জাবী, গেঞ্জী, এমন কি ফিতে ভ'রে আণ্ডারওয়ার অবধি রেখে গেছি, তবু,—তবু ময়লা বেশ নিয়ে অপরের কাছে দীনতা জানান কেন?"

অজয়ের দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর, তার এ অপরূপ বেশ-ভূষায় নমিতা সংযম হারিয়ে ফেললে, ...অজয় অন্যমনস্কভাবেই নমিতার মুখের পানে তাকিয়ে ভাবছিল, ও'র বিরক্তিভরা ব্যথাতুর মুখশ্রী স্বাভাবিক সৌন্দর্যকেও হার মনিয়েছে! ঈষৎ বিস্তৃত চিবুকে, ছলছলে ভেজা আঁখি-পল্লবে, পাতলা ঠোঁট দু'টা একটু কাঁপছে, নাকের বাঁ পাশটি একটু ফুলে উঠেছে, মুখের প্রতিটি রেখায়-রেখায় একটি সুচিন্তিত রুচির পরিচয়। ......ভেজা পাঞ্জাবীটা ব্রাকেটে ঝুলিয়ে দিয়ে ক্যানভাসের ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল অজয়। একটু চুপ ক'রে নমিতার দিকে তাকিয়ে সমবেদনায় সুরে বললেঃ "তোমার মুখ এত শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন নমিতা,—এখনও খাওনি বুঝি......আচ্ছা এ তোমার কি খেয়াল!"

"খাবার জন্যে আমি ম'রে যাচ্ছি না,.........আমার খাওয়াটাকেই তুমি চিরকাল বড় ক'রে দেখছ।" ক্ষোভ ও বেদনায় ভেঙে প'ড়ল নমিতা; উচ্ছ্বসিত কান্না ও'র গলা অবধি ঠেলে উঠল।

"অতি সাধারণ ব্যাপার নিয়ে তুমি আমায় ভুল বুঝছ কেন নমিতা! তুমি কি মনে কর তোমায় মিছে আঘাত ক'রে আমি শান্তি পাব! হয়ত আমি তেমন গুছিয়ে বলতে পারিনে ব'লেই চিরটা কাল তোমার কাছে অস্পষ্ট র'য়ে গেলাম; তবু, আজও আমি তোমার বিচারের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ জানাব না—জানিয়ে লাভও নেই; মিছে তোমার চোখে দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়ব—অসংলগ্নভাবে জবাবদিহি ক'রতে যেয়ে।" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভেজা দেশলাইয়ের গোটাকয়েক কাঠি নষ্ট ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—

"যাই স্নান করে আসিগে চুলে তেল দিয়ে কাজ নেই। বাথরুমে জল পাব তো?" নমিতার পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে চাইলে। ক্ষণিকের অন্ধ উত্তেজনায় অজয়কে মিছে আঘাত ক'রে নমিতা অন্তরে অন্তরে অজয়ের প্রতি অত্যন্ত বেদনা অনুভব ক'রছিলঃ নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হ'য়ে পড়েছে। তবু মুখ ফুটে স্বাভাবিকভাবে কথা ব'লতে পারলে না। আলনা থেকে কাপড়, তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে বাধা দিয়ে অজয় হেসে উঠলঃ

"খুব হয়েছে। কাপড়, তোয়ালে আমিও নিয়ে যেতে পারব; —এখনও এতটা স্থবির হ'য়ে পড়িনি।"

সামান্য হাসির ভেতর দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল। নমিতার মাথা থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। বহুকাল পরে সে যেন আবার সাবলীল জীবনস্রোতের মধ্যে নেমে এসেছে। মনে মনে অজয়কে ধন্যবাদ না জানিয়ে সে পারলে না।

......বাইরে বৃষ্টির বেগ প্রায় থেমে এসেছে। বাতাসেও আর সেই উদ্দাম বেগ-চাঞ্চল্য নেই। জানলা-দরজা খুলে দিয়ে ঘরের গরম আবহাওয়া থেকে বাইরের ঝির্ ঝিরে ঠান্ডা বাতাসে দাঁড়াতেই নমিতার শরীর শিরশির ক'রে উঠল। কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা থেকে টপ্ টপ্ ক'রে জল ঝরছে; প্রতিটি শাখা-প্রশাখা যেন বৃষ্টির জলে প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। রাস্তার কোথায়ও জল জমেছে। রিক্সাওয়ালাগুলি সম্মুখের পর্দ্দা ফেলে যাত্রী নিয়ে ঘণ্টি বাজিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পথচারীদের বিপন্ন ক'রে জল-কাদা ছিটিয়ে দু'একটা ভাড়াটে ট্যাক্সীও যাচ্ছে আসছে। বর্ষণের শেষে, বাইরের আলোয়-বাতাসে, প্রকৃতির রহস্যপুঞ্জে যে স্নিগ্ধ মাদকতা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে র'য়েছে, নমিতার কাছে মানুষের গতানুগতিক জীবনযাত্রার মধ্যে তাকেই চির-বৈচিত্র্যময় বলে বোধ হ'ল।

একটু অন্যমনা হ'য়েই নমিতা রান্নাঘরে ঢুকল; ভাস্কর আসন ক'রে রেখেছিল নমিতা ভাত বেড়ে থালাটা অজয়ের দিকে এগিয়ে দিলে। ডাল দিয়ে খেতে খেতে অজয় বলে উঠলঃ

"ডালে ডিম সেদ্ধ দিয়েছিলে নাকি—কি রকম একটা গন্ধ!"

সপ্রতিভ হ'য়ে নমিতা বললেঃ

"ডালে ডিম সেদ্ধ তো আমি কখন করিনে। কৈ গৌতম খেয়েও তো কিছু বললে না।......একটুকরা নেবু দিচ্ছি মেখে নাও কেমন; থাকগে, ডালমাখা ভাতটা বরও ফেলে দাও—ভাস্করকে দিয়ে দৈ আনিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণ না হয় মাছের ঝোল দিয়ে খেতে থাক।"

"না, দৈয়ের দরকার হবে না—বরং একটু নেবুই দাও। ......না খেয়ে তো আর পারব না।" নেবু মেখে খেতে খেতে নমিতার উপর বিস্মিত দৃষ্টি ফেলে অজয় বললেঃ

"এ কি, তুমি হাত গুটিয়ে বসে রয়েছ কেন! বাইরের পরিচিত-অপরিচিত হাজার মেয়ের সঙ্গে ব'সে খেতে তোমাদের বাধে না—অথচ, আমার সম্মুখে বসে খেতে এ লজ্জা, এ সংস্কার কি অন্ধ সংস্কার নয়!"

"দ্যেৎ! তাই নাকি! তোমার কিছু লাগতে পারে ভেবেই তো বসছি না,—নয়ত সম্মুখে বসে খাওয়াটা তো আর অস্বাভাবিক কিছু নয়!"

"বেশ তো বুঝতেই যখন পারছ স্বাভাবিক, তখন বসতে আর বাধা কি? নিশ্চিন্ত মনে বসে যাও—আমার আর কিছু লাগবে না।"

"বড্ড বাজে বকছ..." ব'লে নমিতা সহজাত দুর্ব্বলতাকে চেপে, অজয়কে একটু আড়াল ক'রেই খেতে বসলে।

"ডালটা কি রকম লাগছে" প্রশ্ন ক'রলে অজয়।

"খারাপ লাগছে না তো" দোমনা হ'য়ে নমিতা উত্তর ক'রলে।

"খারাপ কে বললে—খু-উ-ব ভাল হ'য়েছে!"

"এই তো তুমি বলছিলে; আচ্ছা তুমি কি দিন দিন খোকা হচ্ছ!"

পুরা এক গ্লাস জল সাবাড় ক'রে, নমিতার কথা যেন ভাল ক'রে শুনতে পায়নি এমনি ভান্ ক'রে অজয় বললেঃ

"কি বললে, খোকা! খোকা আবার আমাদের কোথায়?"

"দ্যেৎ!" নমিতার মুখ-চোখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। সলাজ আঁখি-তারকায় অনুচ্চোরিত কৌতূহলের সাড়া!

"লজ্জার আবেদনে শরীরের সব রক্ত এসে যে একেবারে মুখে জমে গেছে। যাক সে কথা। কিন্তু জিজ্ঞেস করি অত রুগ্ণ হ'য়ে যাচ্ছ কেন? আর এত কম খেলে কি শরীর থাকে। হোস্টেলের অনুশাসন বুঝি আজও ভুলতে পারনি না?"

"পেট ভরে খেতে কে আবার কোথায় বারণ করলে!" নমিতা আকাশ থেকে পড়ল।

"বা-রে, এরি ভেতর ভুলে গেলে! তুমিই তো সেদিন বলছিলে,—তোমাদের হোস্টেলে ঢাকা না কোথাকার মেয়ে একটু বেশী খেত বলে সান্ধ্য-বৈঠকে সেটা বিশেষ আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কম খাওয়াটা আধুনিক মেয়েদের নাকি স্বাস্থ্যকর রুচির পরিচয়। কিন্তু এ'র ফলে সব চেয়ে বড় সম্পদ স্বাস্থ্যকে হারিয়ে তোমরা দিনের পর দিন আরও অসহায় হ'য়ে পড়ছ সেটা কি ভেবে দেখেছ? এমনিই তো তোমরা অবলা মাতৃ-জাতি!"

অজয়ের বলবার ভঙ্গিতে নমিতা না হেসে পারলে না। উচ্ছ্বসিত হাসিতে তার সমস্ত শরীর উছলে উঠল; আর প্রকাশিত ঝকঝকে ছোট ছোট দাঁতগুলো হাসিকে দিলে পরিপূর্ণতা। আবেশে রোমাঞ্চিত চোখ দু'টো অবধি ভাষায় মুখর হ'য়ে উঠছে।......নারী-চরিত্রের যা কিছু বৈচিত্র্য, যা কিছু অভিনবত্ব—সবে মিলে নমিতা যেন হ'য়ে পড়েছে কোন সমাহিত শিল্পীর সৌন্দর্য্যানুরাগের পরিপূর্ণতম অভিব্যক্তি। প্রগলভ কণ্ঠহার উছলে উঠলঃ

"ও"

অজয়ের প্রতি বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে নমিতা আবার বললেঃ "চুপ ক'রে কি ভাবছ—হাতের ভাতগুলি অবধি শুকিয়ে গেছে; এবার উঠে পড়—আর কেন?"

"হ্যাঁ, উঠছি" আত্মবিস্মৃত অজয় উঠে গেল।

খেয়ে-দেয়ে ঘরে ঢুকে ঘড়ির পানে তাকিয়ে নমিতা বললেঃ "দেখেছ, খেতে খেতে আজ প্রায় বেলা তিনটে বেজে গেল। কাল থেকে একটু শীগ্‌গির ক'রতে চেষ্টা করবে কি?"

কিছু যেন লিখছিল অজয়, বললেঃ "হুঁ।"

বাইরের কৃষ্ণচূড়া গাছের একটা ডাল প্রায় জানলা অবধি এসে পৌঁচেছে; তারি পানে তাকিয়ে নমিতা আবার বললেঃ "কৃষ্ণচূড়া গাছটার কয়েকটা ডাল-পালা কাটবার বন্দোবস্ত ক'র না; একেবারে জানলা অবধি এসে গেছে।"

কাগজের উপর পেনটি রেখে অজয় বললেঃ "ও'র অপরাধ! আচ্ছা, জ্যোছনা রাতে পাতার ফাঁকে ফাঁকে কখন চাঁদের পানে তাকিয়ে দেখেছ! সত্যি, চাঁদনি রাতের আবছায়া আঁধারে ফিকে-সবুজ পাতাগুলির প্রকাশ কি সুন্দর. ...... রাতের সঙ্গে সঙ্গে গাছের কালো কদর্য্য ডাল-পালা অবধি ফাল্গুনের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে ওঠে।"

"সত্যিই গাছটা বাড়ীটার সৌন্দর্য্য অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু, যদি চোর বেয়ে ওঠে!"

"চোর!" অজয় সশব্দে হেসে উঠল।

"একটা কিছু না হ'লে তোমরা কি আর সাবধান হবে! গৌতমও কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলে।"

"তোমার সক্রিয় মনের এত বড় গবেষণাকে গৌতমও হেসে উড়িয়ে দিলে!......কিন্তু নমিতা, গৌতম আজকাল অঙ্ক-টঙ্ক একটু ভালভাবে কষছে তো,—অঙ্কে যে রকম কাঁচা।"

"অঙ্কটাতে পাশ ক'রতে পারলে বেশ ভাল ক'রেই ও পাশ ক'রবে; একটু দেখিয়ে দিলে ভাল হয়। পরীক্ষার তো পুরো দেড় বছরও নেই।"

"তুমি কি একটু সময় ক'রে দেখিয়ে দিতে পার না?"

"অঙ্ক দেখিয়ে দেব আমি! ম্যাট্রিকে কত পেয়েছিলাম জান—মাত্র তেত্রিশ! ছোট ভাই-বোনগুলো অবধি হাসি চেপে অঙ্কের খাতা এনে বলত, "দিদি একটা অঙ্ক বুঝিয়ে দেবে!" তুমিও কি ওদের মত আমায় উপহাস ক'রতে চাও?"

"জানা ছিল না অঙ্ক-শাস্ত্রে তুমি এত বড় বিদুষী! কিন্তু, সময় যে আমার বড় কম।"

"আচ্ছা, তুমিই তো বলছিলে, পাশের বাড়ীর শচীনবাবু দশটা-পাঁচটা অফিস ক'রে, মেয়েকে দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে বেড়াতে যাবার সময় বৌ'য়ের স্যান্ডেল অবধি খুঁজে বার ক'রে দেন। আর........."

বাধা দিয়ে অজয় বললেঃ "আর এ-ও বলেছিলাম, দৈহিক ও মানসিক সব অবসাদ অগ্রাহ্য ক'রে স্ত্রীর হাসির সঙ্গে সুর মিলিয়ে হাসাও তার একটি অবশ্য কর্ত্তব্য!"

"স্ত্রীর প্রতি মানুষের এত গভীর কর্ত্তব্যবোধ থাকতে পারে—আর তুমি পার না ছোট ভাইকে একটু অঙ্ক দেখিয়ে দিতে!"

"এটা কর্ত্তব্য নয় নমিতা, আকর্ষণের মোহে...আর কিছু।"

"থাকগে, সে কথা। তা'হলে গৌতমকে মাঝে মাঝে ডেকে এনে অঙ্ক-টঙ্ক একটু-আধটু বুঝিয়ে দিও।"

"আমি কি আসতে বারণ ক'রেছি; বুঝতে না পারলে নিয়ে এলেই তো পারে।"

"গৌতম আসবে নিজে থেকে তোমার কাছে অঙ্ক বুঝতে! ঘরে ঢোকবার আগে ও খোঁজ নেয়, তুমি আছ কিনা; বাঘকেও বোধ হয় কেউ এত ভয় করে না।"

আহত হ'য়ে অজয় বললেঃ "বলতে পার নমিতা ও আমায় এত ভয় করে কেন? আমি তো কখনও ওকে কিছু বলি না।"

বাইরে প্রকাশ না পেলেও নমিতা ভাল ক'রেই জানত গৌতমের প্রতি অজয়ের কত গভীর ভালবাসা আর কত নিবিড় তার স্নেহ। ......এই তো ক'মাসের কথাই বা করিন্থিয়ানের খেলা দেখে গৌতম বেশ একটু রাত ক'রে বাড়ী ফিরেছিল; সেদিন অজয় বোধ হয় কলকাতা কোন থানা আর হাসপাতালে ফোন ক'রতে বাদ রাখেনি। অজয়ের সেদিনকার ব্যাকুলতা নমিতার জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। তাই সে বললেঃ

"কি জানি কেন? আমার সংগেও সব সময় স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না; কেমন যেন সংকোচের ভাব! জানিনে, মাঝে মাঝে একা-একা ও কি ভাবে! আজকাল আবার কবিতা পড়ায় খুব মন হয়েছে।"

"তাই নাকি!" অজয়ের মুখে-চোখে পরিতৃপ্তির আভাস।

"ঘুম থেকে উঠে রোজ রবিবাবুর 'সঞ্চয়িতা' থেকে গোটা-কয়েক কবিতা ও'র আবৃত্তি করা চাই-ই। সেদিন আবার শেলীর 'Loves Philosophy' থেকে প'ড়ছিল,

"Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In one another's being mingle—
Why not I with thine?"

আমাকে সমঝদার ভেবে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "কি চমৎকার বৌদি!" হেসে বললাম, "আমাদের নশ্বর জগৎ উত্তীর্ণ হ'য়ে তুমি যে একেবারে স্বপ্নময় জগতের যাত্রী হতে চলেছ গৌতম!—যাই বল, যখন ও গভীর অনুভূতি নিয়ে কবিতা পড়ে তখন ছাপার হরফগুলিও যেন সজীব হ'য়ে ওঠে। লুকিয়ে একদিন ও'র দরদ মাখান আবৃত্তি শুনলে বুঝতে পারবে আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে।"

"কিন্তু খেয়াল রেখ, কবিত্ব-চর্চ্চা করতে যেয়ে ক্লাসের পড়াশুনায় ভাঁটা না পড়ে।"

"অঙ্কে একটু কাঁচা থাকলেও পাশ গৌতম ভালভাবেই করবে, কিন্তু ভাববার কথা হচ্ছে ও'র ভবিষ্যৎ ভেবে। চৌদ্দ-পনের বছর বয়স হল অথচ ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ; দিন দিন আত্মভোলা উদাসীন হয়ে উঠছে যেন। মঙ্গলবার দিন, 'লেটার-বক্স' থেকে চিঠি আনতে যেয়ে দেখি, আমাদের শ্রীমান গৌতম রায় দাদার অনুকরণে রাস্তায় স্যাণ্ডেল ঘষতে ঘষতে পথের মাঝখানটা দিয়ে তন্ময় হয়ে কি ভাবতে ভাবতে আসছে। বললাম, অতটা আত্মহারা হয়ে পথে-ঘাটে চল না গৌতম, একটু সাবধান হবে, কলকাতার রাস্তা, গাড়ী-ঘোড়ার কি বিরাম আছে?"

"কি বললে?"

"লজ্জিত হয়ে হেসে বললে "বৌদি এখন আর আমি খাব না—সাড়ে চারটেয় খেলা কিনা; এসে খাব কেমন ত?" ভাল করে দেখে নিলে আমি রাগ করেছি কিনা।"

"নমিতা, গৌতম নিস্তেজ, প্রাণহীন নয় ও সক্রিয়, সজীব; তাই ও'র ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হবার কিছু নেই। ঠিক পথ ধরে চলতে পারলে ও'র কিশোর জীবনের স্বপ্ন ও'র উৎকর্ণ অনুভূতি পরিণত মনকে গড়ে তুলে ও'কে বিস্তৃত ব্যাপকতায় নিয়ে যাবে। আজ গৌতমের যে সংকোচের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে—সেটা চিরকালের নয়। ছেলেবেলায় বড় দুরন্ত, বড় অশান্ত ছিল গৌতম। মা'কে অনেক ভুগতে হয়েছে ও'কে নিয়ে মা-বাবার মৃত্যুর পর বাবার মামাত বোন কমলা পিসিমার ও'খানেই গৌতম প্রতিপালিত হয়েছিল। আজকের সংকোচ, ভয়, এসব সেখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। তুমি আসবার পর এ দু'বছরেই ও'র অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমার মনে হয়, মনের প্রসারের সংগে ও'র গভীরতাও বাড়ছে, ফলে দিন দিনই গৌতম বাইরের জগতের প্রতি উদাসীন, উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ছে।"

চিন্তাশীলের মত নমিতার ওপর দৃষ্টি তুলে ধরে অজয় একটা সিগারেট ধরালে।

"অনেক বক্তৃতা করেছ, আর নয়, যাই বাইরের শুকনো কাপড়গুলো ঘরে তুলে আনিগে,—বেলা পড়ে এসেছে। গৌতম স্কুল থেকে এল বলে।"

কাপড় তুলতে তুলতে অকারণে নমিতার চোখের সামনে গৌতমের কিশোর মূর্ত্তিটি ভেসে উঠল—তার বর্ণোজ্জ্বল দীপ্তিতে, ভাসা ভাসা বড় বড় টানা চোখ দুটোতে সপ্রতিভ গৌতমের তন্ময়তায় ও শুধু সাধারণের চাইতে পৃথক নয়ঃ নমিতার দৃষ্টিতে গৌতম সাধারণের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

পড়ন্ত বেলায় দিনের আলোর তীব্রতা গেছে কমেঃ পথের কোলাহল ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

(ক্রমশ)

দয়া, না ন্যায়?

(৬৭৫ পৃষ্ঠার পর)

তাকে ঠিক রাখবার জন্য আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া —একই পর্য্যায়ে পড়ে।

দয়া বলে—দীন দেখিলে দান কর। ন্যায় বলে—পৃথিবী থেকে দৈন্যকে অপসারিত কর। কিন্তু দৈন্যকে জগত থেকে অপসারিত করতে হ'লে ঐশ্বর্য্যের স্তূপের উপরে বসে আরামে দিন যাপন করা চলে না। সকলের মধ্যে নেমে আসতে হবে রাশীকৃত কাঞ্চনের শিখরদেশ থেকে, সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে সকলের হাতের সংগে হাত মিলিয়ে, যে সম্পদ উৎপন্ন হবে—তার উপরে সমান ভাগ দিতে হবে সবাইকে। এরই নাম ন্যায় আর ন্যায়ের বাণীকে শিরোধার্য্য করলে স্বার্থত্যাগ ভিন্ন উপায় নেই। আমরা ন্যায়ের চেয়ে দয়ার যে পক্ষপাতী—তার কারণ ষোলোআনা স্বার্থ বজায় রেখে দয়া করা যায়, ন্যায়ের আদেশ পালন করতে হ'লে স্বার্থত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। The one Divine work—the one ordered sacrifice—is to do justice; and it is the last we are ever inclined to do. রাস্কিনের এ কথা খুব সত্য। Charityর মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা আছে—justiceএর মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা নেই। দয়া দিয়ে আমরা লক্ষ লক্ষ জীবন্ত নরকঙ্কালকে বাঁচাতে পারবো না। তাদের বাঁচাতে হলে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আমূলে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন—আর তার জন্য চাই ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ।

---

*রাজসাহী সমাজসেবক সংঘে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

বাণী-বন্দনা

শীত ঋতুর অবসানের মুখে বসন্তের সূচনা। বসন্তের আবির্ভাবেই বাসন্তী-পঞ্চমী—বাণী-বন্দনা। বসন্তের আবির্ভাব হয় কোথায়—বনে না মনে! বাঙলার সাধক বলিলেন, বনে নহে মনে। মনে বসন্ত না জাগিলে বনে বসন্তের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাণীর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হইল হৃদয়। রূপ এবং রসের উৎস উৎসারিত হয় এই হৃদয় হইতে এবং তাহাই উপচাইয়া পড়ে বিশ্ব প্রকৃতিতে। বিশ্বের সঙ্গে মানবের অন্তঃপ্রকৃতির মাধুর্য্য-সূত্রে এই যে মিলন, সঙ্গীত-সাহিত্য এবং শিল্প-কলার উদ্ভব হয় সেই এক সূত্র ধরিয়াই। যে দেবী আমার ভিতরে আছেন, তিনিই আছেন বাহিরের সর্ব্বভূতে এবং বিশ্ব-চরাচরে। বাণীর যিনি সাধক তিনি এই সত্যটির সহিত মানুষের পরিচয় করিয়া দেন। জীবনকে তিনি বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আনন্দের ধারার সঙ্গে যোগসাধন করেন। তিনি দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা বলিয়াই তিনি স্রষ্টা।

ভারতের ঋষিরা একদিন এই দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই দিগ্‌দর্শন প্রভাবেই বলিয়াছিলেন, মিত্রের চোখেই আমরা জগৎকে দেখিতে চাই, জগতের সকলেও আমাদিগকে মিত্রের চোখে দেখুক। এই দৃষ্টি লাভ করিয়াই তাঁহারা এক-দিন বলিয়াছিলেন, যাহারা দাস তাহারও ব্রহ্ম, যাহারা কিতব তাহারও ব্রহ্ম। আনন্দময় সত্তা সকলের মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন। এই দর্শনের বলে ভারত সেদিন মহতী-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়; ভারতের মানস-সরোবরে শ্বেতশতদল-বিহারিণী বাণী অমল ধবল প্রভায় দিক উজ্জ্বল করিয়া মূর্ত্তি-মতী হইয়া উঠেন। বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গে এবং বিদ্যাস্থান-সমূহে তাঁহারই গীতি-গাথা ঝঙ্কৃত হইতে থাকে।

ভারতের সে গৌরবের যুগ; কিন্তু সে গৌরবের যুগ সুদীর্ঘ-কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। আসিয়াছে পতনের যুগ। কেন আসিল, আসিল তাহার প্রধান কারণ এই যে, ভারত বাণীর মহিমা বিস্মৃত হইল। বাণী-সাধকের যে দৃষ্টি ব্যক্তিকে জাতির সঙ্গে, প্রেমের সম্পর্কে, মাধুর্য্যের মহিমায় যুক্ত করিয়া দিয়াছিল, আপনার করিয়াছিল, সে দৃষ্টি দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল, ঘনাইয়া আসিল আঁধার। ফুল শুকাইল, কিসলয় দল ঝরিয়া পড়িল,—নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী। বসন্তের বিকাশ হৃদয়ে আর থাকিল না, বাহিরেও সে শোভা বিলুপ্ত হইল। আসিল ভারতব্যাপী দীর্ঘ পরাধীনতার যুগ। পরা-ধীন যে-দেশ, সে-দেশে বসন্ত নাই, সে-দেশে কোকিল ডাকে না, ভ্রমর গুঞ্জন করে না। সেখানে আছে জড়তা, ক্লিষ্টতা আর দীর্ঘ নিদাঘের দাব-দাহ জ্বালা।

ভারতের এই যে পরাধীনতা, ইহার মূলে অন্য কারণ যাহাই থাকুক, প্রধান কারণ হইল অপ্রেম। প্রধান কারণ হইল বিরোধ, দ্বেষ-বিদ্বেষ। সামরিক শক্তির অভাবে ভারত পরাধীন হয় নাই, সামরিক শক্তি তাহার যথেষ্টই ছিল; ভারতবাসীরা আজই না হয় নিরস্ত্র হইয়াছে, কিন্তু কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য ছিল না, সেগুলির প্রয়োগ-পটুতাও তাহাদের যথেষ্ট ছিল; কিন্তু ছিল না তাহাদের উদার জাতীয়তার অনুভূতি, ছিল না ভালবাসা, ছিল না প্রেম। সব চেয়ে বড় শক্তি হইল প্রেমের শক্তি—অস্ত্রের শক্তি নয়। প্রেমের যে বল, সেই বলের অভাবেই ভারত পরাধীন হইয়াছে। একটু প্রবল হইয়া যে জাতি এখানে আসিয়াছে, সে তাহারই লাথি খাইয়াছে, গুঁতো সহ্য করিয়াছে।

ভারতকে আজ যদি জাগাইতে হয়, বাঁচাইতে হয়, শুধু বিদেশীর কপচান রাষ্ট্রনীতিক বাঁধা বুলি আওড়াইয়া তাহা সম্ভব হইবে না। বাণী-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রুশিয়া নেপোলিয়ানের হাতে হারিয়া যাইবার পর বসিয়াছিল এই সাধনাতেই। জার্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া জাতির যত মনীষী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহারা বাণীর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জার্ম্মানীর সাহিত্য সেদিন নূতন সুর তুলিয়াছিল, জার্ম্মানীর কবি সেদিন দিকে দিকে ছড়াইয়াছিল জাতীয়তার দীপক রাগিণী। বাণী-সাধনার বলে জার্ম্মানী আবার জাগিল, ৪০ বৎসর পরে ফরাসীদিগকে ভীষণভাবে হারাইয়া দিয়া স্বমহিমায় হইল প্রতিষ্ঠিত।

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা? 'বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ—বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ' বলিয়া ফুল বেলপাতা ছড়াইলেই বাণীর পূজা হয় না। সে পূজা বড় শক্ত পূজা—শক্তি পূজা। নিজের অন্তরের সকল শ্রদ্ধাকে নিবেদন করিতে হয়, আপনাকে অর্ঘ্য করিয়া দিতে হয়। সে সাধনা এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টার নয়—সুদীর্ঘ সে—দুস্তর এবং কঠোর তপস্যা। সেই তপস্যার প্রভাবে গুহাস্থিতা যিনি ব্রহ্মবাদিনী তিনি রূপে, রসে, ছন্দে, সঙ্গীতে এবং ললিত-কলায় মূর্ত্তি ধরিয়া উঠেন। জাতির হয় সংস্থিতি—সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া। মায়ের পূজা যদি করিতে হয় এমনভাবে করিতে হইবে, তবে তিনি জাগিবেন, মৃন্ময়ী দেখা দিবেন চিন্ময়ী রূপে। বাঙলার বাণী সাধকগণ! তোমাদেরই সাধনার উপর আজ দেশ এবং জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, নির্ভর করিতেছে এ দেশের রাষ্ট্রীয়তা এবং স্বাধীনতা। আজ তোমরা বাণীর সাধনায় বসিয়া যাও, সে সাধনায় প্রবৃত্ত হও। বল—মা প্রেমের দৃষ্টি দাও। যে দৃষ্টিতে দেশকে জাতিকে ভালবাসিতে পারি—দাও সেই দৃষ্টি। খোল দ্বার খোল জ্যোতির্ম্ময়ি জননি! এ জাতির এই অব-গুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে মুক্তির দ্বার খুলিয়া দাও, পরাধীনতার এই যবনিকা উন্মোচিত হইয়া আমার দেশ, আমার জাতির স্বরূপ প্রকটিত হউক; কাটিয়া যাউক অজ্ঞানতার অন্ধকার, মোহময় অস্বস্তির ভাব। অবাধ এবং উন্মুক্ত আকাশের তলে সৃষ্টির পরিপূর্ণ মাধুর্য্যকে আস্বাদন করাতে যে মনুষ্যত্ব, সেই মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জাতি মাতিয়া উঠুক—খসিয়া পড়ুক তাহার শৃঙ্খল-পাশ—মুক্তির জন্য আকুল এবং ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে আবেগে। চির-আনন্দময়ি জননী, বাজাও, তোমার বীণায় সে আনন্দের ধ্বনি বাজাও, সে আনন্দের স্পর্শে মানুষ সকল সঙ্কীর্ণ বিচার ভুলিয়া সব ইতর-রাগ বিস্মৃত হইয়া পূর্ণতার মধ্যে আত্মনিবেদন করুক।

লুক্কায়িত ভাণ্ডারের নব-কল্পনা

লড়াইয়ের সময়ের অভাব-অনটন দূর করিবার মানসে সুইজারল্যাণ্ডে খাদ্য, পেট্রল প্রভৃতির লুক্কায়িত-ভাণ্ডার সংরক্ষণের এক অভিনব পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতেছে। পাঁচ-ছয় ফুট ব্যাসের লোহার পাইপের ভিতর সংরক্ষণ-যোগ্য নানাবিধ খাদ্য এবং পেট্রল বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে রাখিয়া সমগ্র বিরাট পাইপটিকে হ্রদের জলে ডুবাইয়া রাখিতেছে। সুইজারল্যাণ্ডে বহু বৃহৎ বৃহৎ হ্রদ রহিয়াছে—এই সকল প্রসিদ্ধ
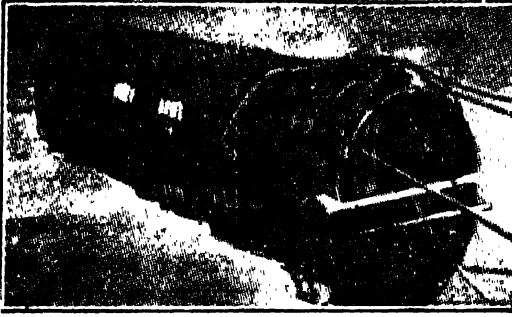
হ্রদের জন্যও সুইজারল্যাণ্ডের নাম-ডাক কম নয়। কারণ, এই সকল হ্রদের তীরে বিখ্যাত স্বাস্থ্যপ্রদ সব শহর রহিয়াছে। খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই প্রকারে হ্রদের জলে রক্ষা করিবার হেতু আর কিছুই নয়—পাছে ডাঙায় কোথাও রাখিলে বিপক্ষের বিমান হইতে বোমা বর্ষণে তাহা বিনষ্ট হয়।

ইংলণ্ডে তরুণ অপরাধী

স্বরাষ্ট্র সচিবের দপ্তরের বিবৃতি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইংলণ্ডের পুরুষদের সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধ-প্রবণ বয়স হইল তের। উহারা যখন ষোল বৎসরে পদার্পণ করে, তখন আইন-ভঙ্গ করিবার বাসনা অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। এইভাবে কমিতে কমিতে ৪৫ পর্য্যন্ত চলে এবং ৫০ বৎসর বয়সে আর লেশমাত্র থাকে না। প্রতি ১০০০ বালকের (তের বৎসর বয়সের) ভিতর মাত্র ১৩·৫ জন গড়ে গত বৎসর অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়াছে।

তরুণীদের বেলা কিন্তু তের বৎসর থাকে নির্দ্দোষ, তাহাদের নিরঙ্কুশ হইবার বয়স পনের হইতে আঠার। এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদেরও অপরাধে লিপ্ত হইবার প্রবৃত্তি কমিয়া আসে এবং ৪০ বৎসর বয়সে লোপ পায়। তথাপি কিন্তু তরুণীদের ভিতর অপরাধীর সংখ্যা গড়ে তরুণদিগের অপরাধীর সংখ্যার আটভাগের একভাগ।

প্রাগৈতিহাসিক দন্ত

ক্লেথরপেস-য়ের নিকটে একটি প্রস্তরীভূত দাঁত পাওয়া গিয়াছে, উহা লম্বায় সাত ইঞ্চি। ইহার ওজন অর্দ্ধ সের প্রায়। বাড়ী তৈরীর জন্য খনন-কার্য্য পরিচালনে এই দাঁত পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন, তুষার যুগে গ্রেট-ব্রিটেনে একজাতীয় ক্ষুদ্রাকার হস্তী বাস করিত, যাহার অঙ্গে ছিল লম্বা লম্বা পশম ভালুকের ন্যায়। এই দাঁত ঐ জানোয়ারেরই এবং ব্রিটেনে প্রাপ্ত সকল প্রাচীন নিদর্শনের পূর্ব্বতন।

যে ধাতু নমনীয়

বৈজ্ঞানিকগণ প্রতিনিয়তই নূতন নূতন পদার্থ আবিষ্কার করিতেছে এবং পূর্ব্ব প্রচলিত বস্তুকে নব রূপায়ণে ভূষিত করিতেছে। এবার তাহারা এমন একটি জিনিষের সন্ধান বাহির করিয়াছে, যাহা ধাতুও নয় আর উদ্ভিদও নয়—দুইয়ের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। বিজ্ঞানীরা রবার ইস্পাতের সঙ্গে এমন কৌশলে মিলাইতে সক্ষম হইয়াছে যে, মিশ্রিত পদার্থটি গুণাগুণে "নমনীয়" ধাতু বনিয়া গিয়াছে।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও এই প্রকার প্রচেষ্টা অসম্ভবই মনে হইয়াছে। নানাবিধ শিল্পের পক্ষে এই নূতন গুণ-বিশিষ্ট ধাতুটি বিশেষ উপকার সাধন করিবে—কারণ, কল-কবজার স্প্রিং, কাপলিং এবং শব্দ-গ্রাসকারী যন্ত্র-কৌশলের নির্ম্মাণে এই ধাতুটি হইবে আদর্শস্থানীয়। ইহা ছাড়াও শত শত প্রকারে এই ধাতুটির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ দেখা দিবে।

প্রাণরক্ষক কাকাতুয়া

সারে অঞ্চলের কোভামস্থ হোয়াইট লায়ন হোটেলের মালিক মিঃ ডেভিড একটি কাকাতুয়া পুষিত, তাহার আদরের নাম পলি। গভীর রাত্রিতে যখন হোটেল বন্ধ করা হইয়াছে এবং মিঃ ডেভিড এবং তাহার পত্নী উপরতলায় নিদ্রিত, সেই সময় হোটেলের বিশ্রাম-কক্ষে আগুন লাগে। আগুনের আতঙ্কে পলি এমন বিকট চীৎকার করিতে থাকে এবং

মালিককে নিকটে না দেখা পর্য্যন্ত এমনভাবে তাহার সুর চড়াইতে থাকে যে, অবিলম্বে বাড়ীর সকলে জাগরিত হয়। তখন আগুন লাগার ব্যাপার দেখিয়া সকলে মিলিয়া তাহা নিবাইয়া ফেলে। মিঃ ডেভিড এবং তাহার পত্নী মনে করে পলির জন্যই তাহাদের জীবন-রক্ষা হইয়াছে। পলির আহারের প্রতি এখন হোটেল-রক্ষক ও তাহার পত্নী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী মনোযোগ দিতেছে এবং দিবসে অসংখ্যবার পলিকে আদর-সোহাগ করিতেছে।

আঙুর ফলের থোকা নয়—চুলের বাহার

কেশ-প্রসাধনের প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য নানাপ্রকার উদ্ভট কায়দা সময় সময় দেখা যায়। ইউরোপে পূর্ব্বে দেখা যাইত খোঁপার নানা অদ্ভুত আকৃতি, কিন্তু দীর্ঘ কেশপাশ আধুনিক ফ্যাশান হইতে বিদায় লাভ করিবার পর যে সকল রমণী এখনও লম্বা চুল (পূর্ব্বের ন্যায় আজানুলম্বিত নয়) রাখেন, তাঁহারাও আর খোঁপা বাঁধেন না, বিশেষ করিয়া খোঁপা বাঁধিবার মত লম্বা চুল খুব কমই থাকে। তাই ছবিতে রমণীর মস্তকে যে আঙুরের থোকায় থোকায় ঝুলিতেছে উহাও কেশ প্রসাধনেরই কায়দা মাত্র। তবে রমণী নিজহস্তে এই কেশ-

বার্লিনের হেয়ার ড্রেসিং প্রতিযোগিতায় শিক্ষানবিশদের পুরস্কার প্রাপ্ত

বিন্যাস সম্পূর্ণ করিতে পারে না। সাহায্যকারিণী না হইলে বোধ হয় কেশ প্রসাধনে মহিলার আর আহার-বিশ্রামের সময় মিলিত না। আবার আর একটি কথা উহার মাথায় টুপিটি না থাকিলে কিন্তু আঙুরের থোকার বাহার খুলিবে না।

ধূমপানের তৃপ্তি কোথায়?

অন্ধকারে ধূমপান করিলে নাকি প্রকৃত তৃপ্তি পাওয়া যায় না—কারণ ধূমপানের সময় মুখ-নিঃসৃত ধূম লক্ষ্য করিতেই নাকি চরম পরিতৃপ্তি। এই মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া মার্কিনের টেনেসি অঞ্চলের অটো এল মিলার এক প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন যে, সিগার, সিগারেট প্রভৃতিকে সেই প্রণালী অনুযায়ী এমন এক অভিনব গুণ-বিশিষ্ট করিতে পারিবেন, যাহাতে ঐগুলি ধরাইয়া টানিতে থাকিলে রঙীন ধূম নির্গত হইবে। কোনটির রক্তরঙা ধূম' কোনটির সবুজ, কোনটির নীল, কোনটির হলুদ—এই প্রকারে যে কোন রঙের ধোঁয়া বিশেষ বিশেষ সিগার, সিগারেট হইতে বাহির হইবে। কাজেই কোনও মহিলা তাহার পরিচ্ছদের রঙের সহিত, কি চুলের রঙের সহিত মিলাইয়া বিশেষ বিশেষ রঙের সিগারেট-ধোঁয়া বাহির করিয়া এক নূতন ফ্যাশানের সৃষ্টি করিতে পারিবে।

দৈত্য ও বামন

অসাধারণ কিছু দৃষ্টিতে পড়িলেই মানুষ আকৃষ্ট হয়—তাহা যে প্রকারেরই হউক। সেই জন্যই অধিক লম্বা মানুষ যেমন সাধারণের কৌতূহল উদ্দীপনা করে, তেমনই অতিরিক্ত খাটো দেখিলেও কৌতুক অনুভব করিয়া থাকে।

আইরিশ 'দৈত্য' কর্নেলিয়াস ম্যাকগার্থ ছিল সাত ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। ইউরোপীয় ইতিহাসে ইহারও অধিক উচ্চতার মানুষ একটিমাত্র ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রুশিয়ার প্রথম উইলিয়ামের সেনার ভিতর একটি সুইডেনবাসী ছিল, সে নাকি আট ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা।

কিন্তু এই প্রকার অসাধারণ লম্বা অপেক্ষা বামনের সংখ্যা দেখা যায় বেশী। ১৬শ ও ১৭শ শতকে ইউরোপের প্রায় দেশেই বামন ছিল কয়েকটি করিয়া, যাহাদের আশ্চয্য খর্ব্বতা ছিল প্রদর্শনযোগ্য। সেইজন্য উহাদিগকে যাদুঘরের রক্ষিত দ্রব্য-সামগ্রীর ন্যায় সযত্নে রাখা হইত প্রদর্শনের জন্য। ইহাদের উচ্চতা ছিল দুই ফুট চার ইঞ্চি হইতে চার ফুট পর্য্যন্ত। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল,—সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বকায় বামন—উহার নাম দেওয়া হইয়াছিল টম থাম্ব (Tom Thumb); সার্কাস প্রদর্শক বার্নাম তাহাকে স্থানে স্থানে প্রদর্শন করে, সে ছিল মাত্র আঠার ইঞ্চি লম্বা—এইরূপ জনশ্রুতি রহিয়াছে।

পক্ককেশ শিক্ষক ও তরুণী ছাত্রীর বিবাহ

মিউজিক মাষ্টার সি বি কিং তাহার ছাত্রী এডিথ ভিভিয়ান ওয়াটসকে বালিকা বয়স হইতে শিক্ষা দেয়, কারণ কিং এক সময়ে টনব্রিজ বালিকা বোর্ডিং স্কুলের সংগীত শিক্ষক ছিল। এডিথ ঐ স্কুলে পাঁচ বৎসর পড়ে, ১২ হইতে ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। ৬ই ডিসেম্বর ৮৩ বৎসর বয়সের এই পক্ককেশ শিক্ষক ২২ বৎসর বয়সের এডিথকে বিবাহ করিয়াছে। বিবাহকালে শিক্ষকের ৪৬ বৎসর বয়সের কন্যা ছিল গীর্জ্জায় উপস্থিত সাক্ষীরূপে। কিং এখন শিক্ষকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। এডিথের যমজ বোন অথবা তাহার মাসীমা মিসিস হাণ্ট, যে তাহাকে মানুষ করিয়াছে, কেহই এ সংবাদ জানে না। মিসিস হাণ্ট বলেন—'আমি এ বিবাহে মত দিতাম না। উহাদের ভিতর কিসে যে মিল তা আমি বুঝি না, তবে মনে হয় ধর্ম্মমতই হয় ত বিবাহের কারণ।'

রেলওয়ে ট্রেনের বিস্মৃতি

ওয়াটারলু ষ্টেশন হইতে ষ্টোনলেই যাইবার জন্য ২০০ প্যাসেঞ্জার ছিল এক ট্রেনে। কিন্তু ট্রেন ষ্টোনলেই ষ্টেশনে থামিল না। পাঁচ মাইল দূরে এপসোম-এ যাইয়া থামিল। প্যাসেঞ্জারদের ২০ মিনিট পরে অন্য ট্রেনে ষ্টোনলেইতে ফিরাইয়া আনা হয়। পরে কারণ জানা গেল ইঞ্জিন চালক ঐ ষ্টেশনে ট্রেন থামাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

পুস্তক পরিচয়

অন্তঃসলিলা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র কর্ত্তৃক লিখিত এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ, ২১০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

কবি সুরেন্দ্রনাথের অন্তঃসলিলা অতিশয় মিষ্ট লাগিল। কেবল যাহা উচ্ছ্বাস তাহাতে এযুগের তৃপ্তি নাই। সুরেন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ আমাদের চিত্তকে এত যে মুগ্ধ করে—তাহার কারণ দার্শনিকের চিন্তাশীলতা তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাসকে কোথাও লঘু হইতে দেয় নাই। অন্তঃসলিলার যে ভাষা—তাহা কবিরই ভাষা শব্দের মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্যময়ী, প্রাণের আবেগে জীবন্ত, বাক্যের আড়ম্বর নাই—ভাবের গভীরতা আছে। যে ধরণের কবিতার সঙ্গে আমাদের সচরাচর পরিচয় ঘটে—কবি সুরেন্দ্রনাথের কবিতা সেগুলি হইতে স্বতন্ত্র। জীবনের গদ্যময় মরুভূমিতে অন্তঃসলিলার মূল্য যে কতখানি—নিজে আস্বাদন না করিলে তাহা বুঝান মুস্কিল।

ক্ষণিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থ-বিভাগ, ২১০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

পুনর্মুদ্রিত ক্ষণিকার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা, সুন্দর বাঁধাই। যে রত্ন মূল্যবান—তাহা সুন্দর কৌটায় মানায় ভাল। ক্ষণিকার অমূল্য সম্পদগুলিকে মনোহর আধারে রক্ষিত দেখিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিলাম। কবির শেষ বয়সের লেখার সঙ্গে প্রথম বয়সের লেখার একটা পার্থক্য আছে। প্রথম বয়সের কবিতাগুলিতে দার্শনিকতার ছাপের চাইতে প্রাণের সবুজ ছাপই বেশী—আর সেই কবিতাই আমাদের কাছে তত প্রিয় যার মধ্যে প্রাণের প্রকাশ যত বেশী। ক্ষণিকার মধ্যে কবির সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হৃদয়ের প্রাণচঞ্চলতার যে পরিচয় পাই, তাহা সত্য সত্যই উপভোগ্য।

মালয়—স্বামী সদানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুহৃদকুমার মিত্র, ১৫নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে কয়েকখানি ইংরেজী ও বাঙলা পুস্তক লিখিয়া গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বেই শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইংরেজীতে লিখিত ৩৮ পৃষ্ঠায় এই পুস্তিকাখানির মধ্যেও গ্রন্থকার বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীনকালে ভারতীয়গণের সংস্কৃতির ধারা যে কত বিভিন্ন দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তিকাখানিতে পাওয়া যাইবে। ইহাতে The Hindu Malay, Malacca of Old Historical Singapore, Johore in the early 18th Century, Malacca to Baling—এই কয়টি নিবন্ধ আছে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী পুস্তিকাখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

কাব্যগুচ্ছ—শ্রীকুমুদনাথ দাস কর্ত্তৃক লিখিত এবং বুক কোম্পানী লিমিটেড, ৪।৩ বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২।৹ টাকা।

কবি কুমুদনাথের কবিতাগুলি পড়িয়া আমাদের ভাল লাগিল। ছন্দের মাধুর্য্য সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ না থাকিলেও ভাবের মধ্যে বলিষ্ঠতা এবং সরলতা আছে। অতি আধুনিক কবিদের কবিতা পড়িয়া অনেক সময় মনে হয়—দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালি! কুমুদবাবুর কবিতার মধ্যে সেরূপ কোন অস্পষ্টতা নাই। অর্থ বুঝিতে কোনো বেগ পাইতে হয় না। সজীব প্রাণের স্পর্শ কবিতাগুলিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে।

প্রহাসিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থ-বিভাগ, ২১০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দেড় টাকা।

কবিতার বই—গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া যাহা মনে হইল তাহাকে একটিমাত্র কথায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয় চমৎকার! হাস্যরসকে আশ্রয় করিয়া হীনতাকে, ভণ্ডামিকে কবি যে চাবুক হানিয়াছেন—সেই চাবুকের স্পর্শ প্রহাসিনীর কবিতায়। হাসির নীচে কত যে চোখের জল লুকান থাকিতে পারে—তাহারও সন্ধান দিবে প্রহাসিনী। বাঙালী পাঠক-পাঠিকা প্রহাসিনী পড়িয়া যে মুগ্ধ হইবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।

পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাবলী—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পল্লীমঙ্গল সমিতি, ২৫নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। টোট্‌কা চিকিৎসা এদেশে বংশপরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে—এখানি তাহারই পুস্তকাকার। টোট্‌কা চিকিৎসা সাত ভাগে সাত খণ্ড বই এবং তৎসহ 'খাদ্য-কথা' ও 'গো-মহিষ চিকিৎসা' নামে দুইখানা পুস্তক একত্র করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করা হইয়াছে। পৃথকভাবে বইগুলির দাম ৩।৹ টাকা; কিন্তু এই গ্রন্থাবলীর দাম মাত্র ১৲ টাকা। গৃহ চিকিৎসার সহজ পদ্ধতিপূর্ণ এই পুস্তক প্রতি গৃহস্থের কাজে আসিবে। ইহার সাহায্যে মেয়েরা পর্য্যন্ত রোগ-নির্ণয়, পথ্যাপথ্য নির্ণয় এবং সামান্য সামান্য গাছগাছড়া হইতে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে সতর্কতা, খাদ্যের গুণ-দোষ নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় ইহাতে আছে। গৃহস্থের ঘরে এই গ্রন্থাবলী স্থান পাইবার যোগ্য।

আরনা—(কবিতা ও গান)। শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীতিনকড়ি মিত্র, গোবর্দ্ধনপুর, বাগনান পোঃ, হাওড়া। মূল্য দুই টাকা।

লেখকের ভাবসম্পদ আছে। তাঁহার কবিতাগুলির চেয়ে গানগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। শ্রীযুক্তা সাহানা দেবী কয়েকটী গানের সুর বাঁধিয়া দিয়াছেন; অবশিষ্ট গানগুলির সুর বাঁধিয়া দিয়াছেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। গানগুলি মনের ভাবকে বেশ ঘনাইয়া তোলে।

ছেলেদের ম্যাজিক—গ্রন্থকার পি সি সরকার। প্রকাশক —বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

লণ্ডন, লিষ্টার ও টোকিও যাদুকর সম্মিলনী কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মানিত যাদুকর মিঃ পি সি সরকার প্রণীত এই পুস্তকখানি যেমন ছোটদের, তেমনি বয়স্ক-বয়স্কাদেরও আনন্দ দান করিবে। তাহার উপর যাঁহারা যাদুর খেলা দেখাইয়া সভায়, মজলিশে সকলের তাক্ লাগাইতে চাহেন, তাঁহাদের ত এই পুস্তক যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিবে। যেভাবে সহজ কথায় মিঃ সরকার কৌশলগুলি বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে ছোটদের উহা আয়ত্ত করিতে বেগ পাইতে হইবে না। পুস্তকখানির মূল্যের কোনও উল্লেখ নাই।

ডাকাতের ডুলি—(ছোটদের জন্য) গ্রন্থকার শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক—বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

ডাকাতের ডুলি, ধর্ম্মের কল, রমেশের আক্কেলসেলামী, পিছু ডাকের ফল, আলেয়া ও ডাকাতে বামুন—এই ছয়টি গল্পের সমাবেশে এই পুস্তকখানি সুন্দরই হইয়াছে। খগেনবাবুর অন্যান্য বই পড়িয়া যেমন ছোটরা আনন্দ পাইয়াছে, এখানিও তেমনই তাহাদের আমোদ প্রদান করিবে, একথা সহজেই বলা চলে। তদুপরি এখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কচি মনের উপযোগী হাসির খোরাক যথেষ্ট রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী—স্বামী শ্যামানন্দ প্রণীত। বর্ম্মা আর্ট প্রেস লিমিটেড, ২১১—২১৩, ৩৮ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন, বর্ম্মা। মূল্য ২৸০। পদ্যচ্ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী। লেখার সরলতা গ্রন্থের বিশিষ্ট গুণ। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থখানির সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—ইহার যথার্থ মূল্য সরল ভক্তির। ভক্তেরা ইহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় পাঠকেরা কবির ঐ কয়েকটি কথার মধ্যেই পাইবেন। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর এবং সুশোভন। ৫৭৪ পৃষ্ঠায় পূর্ণ।

অমৃতের সন্ধান—স্বামী বিদ্যানন্দ। মূল্য আট আনা। অমৃত প্রকাশ কার্য্যালয়, তেলীপাড়া, ফরিদপুর।

লেখক সাধনপরায়ণ পুরুষ। তাঁহার মতে—"জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা বা সাধনা দ্বারা মনোবৃত্তির প্রসারতা, উৎকর্ষ সাধন করত পূর্ণ যোগ্যতার্জ্জনপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মই ইহ-পরকালের একমাত্র সম্বল।" তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিগণ পুস্তক পাঠে আনন্দ পাইবেন।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

(৬৭৩ পৃষ্ঠার পর)

বিধানের শান্তি, বিধিবদ্ধ কর্ম্মধারা এবং নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিবে। সকল সময়ে ব্যক্তিই অগ্রসর হয়, অন্যান্যকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করে; সমষ্টির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেছে তাহার প্রতিষ্ঠিত বিধানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা। প্রগতি, বিকাশ, উদারতর সত্তালাভ—এ-সব ব্যক্তিকেই পরম সুখবোধ প্রদান করে; সমষ্টির পরম সুখবোধ হইতেছে স্থিতি এবং নিরাপদ স্বস্তিতে। আর এইরূপই হইবে যতদিন সমষ্টি স্ব-চেতন সমষ্টিগত আত্মা হওয়া অপেক্ষা স্থূল ও অর্থনীতিক সত্তা হইয়া থাকিবে।

অতএব মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থাপরম্পরায় রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা সুস্থ মানবীয় ঐক্য সংঘটিত হইবে ইহা খুবই অসম্ভব। শক্তিশালী ও সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রসকল পরস্পরের সহিত সুনিয়ন্ত্রিত ও আইনসংগত সম্বন্ধের সূত্রে বদ্ধ হইয়া মিলিত হইতে পারে; অথবা বর্ত্তমানের অর্দ্ধ-বিশৃঙ্খল অর্দ্ধ-ব্যবস্থিত আন্তর্জ্জাতিক শিষ্টাচারের পরিবর্ত্তে এক বিশ্বরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে, সেই বিশ্বরাষ্ট্র রোমক সাম্রাজ্যের ন্যায় একক সাম্রাজ্য হইতে পারে অথবা সংহতি রাষ্ট্র (Federated Unity) হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের কোনটির দ্বারাই এখন প্রকৃত মানবীয় ঐক্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। এইরূপ একটা বাহ্যিক এবং শাসনমূলক ঐক্য নিকট ভবিষ্যতে মানব-জাতির অভিপ্রেত হইতে পারে, কারণ তাহা দ্বারা মানুষ ঐক্যবদ্ধ জীবনের পরিকল্পনা, তাহার রীতি, তাহার সম্ভাবনায় অভ্যস্থ হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে সুস্থ, স্থায়ী অথবা মানবীয় লক্ষ্য সিদ্ধির সকল ধারায় কল্যাণকর হইতে পারে না যতক্ষণ না অধিকতর গভীর, আভ্যন্তরীণ ও সত্য কিছু গড়িয়া উঠিতেছে। নতুবা প্রাচীন জগতের অভিজ্ঞতারই পুনরাভিনয় হইবে আরও বৃহৎ পরিসরের মধ্যে এবং বিভিন্ন অবস্থা নিচয়ের মধ্যে এবং নূতন পরীক্ষামূলক প্রয়াসটি ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহার পরিবর্ত্তে আসিবে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার এক নূতন পুনর্গঠনমূলক যুগ। সম্ভবত এই অভিজ্ঞতাও মানবজাতির পক্ষে প্রয়োজনীয়; অথচ আমরা যে এখন ইহা এড়াইতে পারি না তাহা নহে, সেজন্য প্রয়োজন যান্ত্রিকপদ্ধতির উপর নির্ভর না করিয়া মানবজাতিকে নৈতিকতায়, এমন কি আধ্যাত্মিকতায় গড়িয়া তুলিয়া আমাদের সত্য প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া। (ক্রমশ)

সাহিত্য-সংবাদ

নিখিল বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

"সবুজ সংঘ" নিখিল বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা নাম দিয়া একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতেছেন। বাঙলাদেশের যুবক সম্প্রদায় ও ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া এই আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন। প্রতি বিভাগেই একখানি ফলক ও তিনখানি রৌপ্যপদক প্রথম তিনজন বিজয়ীদের প্রদত্ত হইবে। প্রথম হইতে পাঁচজনকে যোগ্যতা পত্র দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভাগ দেওয়া হইলঃ—"ক" বিভাগ—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল পুরুষ ও মহিলাই যোগ দিতে পারিবেন। "খ" বিভাগ—১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক বালকদের জন্য। "গ" বিভাগ—১৫ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক মহিলাদের জন্য। "ঘ" বিভাগ—১২ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালকদের জন্য। "ঙ" বিভাগ—১২ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালিকাদিগের জন্য। নাম পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৯। বিশেষ বিবরণের জন্য সম্পাদক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ, ২নং গোবিন্দ সরকার লেন, বহুবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

আবৃত্তি, বাগ্মিতা ও সংগীত প্রতিযোগিতা
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালী সমিতি

আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ রবিবার উক্ত সমিতির উদ্যোগে আবৃত্তি, বাগ্মিতা ও সংগীত প্রতিযোগিতা হইবে। এতদ্ব্যতীত 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের জন্য একটি বিশেষ প্রতিযোগিতা হইবে এবং তজ্জন্য একটি বিশেষ স্বর্ণপদকও প্রদত্ত হইবে। প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত পুরস্কার ও পদক দেওয়া হইবে। আবৃত্তি—বিষয়—বলাকা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ও জাতিঃ পাঁতি (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত), প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার রৌপ্যপদক। বাগ্মিতা—বিষয়—এই সভার মতে আন্তর্জ্জাতীয়তাই বর্ত্তমান জগতের অশান্তি নিবারণের একমাত্র উপায়। প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার রৌপ্যপদক। বন্দেমাতরম্ সংগীত প্রতিযোগিতা—প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক। সংগীত (ক্ল্যাসিকাল্)—প্রথম পুরস্কার স্বর্ণ-পদক ও দ্বিতীয় পুরস্কার রৌপ্যপদক। সংগীত (আধুনিক)—প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার রৌপ্যপদক।

শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র, সভাপতি।

রচনা প্রতিযোগিতা

চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদ বর্ত্তমান বৎসর একটি রসসাহিত্যক রচনার জন্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছেন। বাঙলার বাহিরের যে কোনও প্রদেশ হইতে ইহাতে যোগদান করা যাইবে। কবিতা ব্যতীত বাঙলা ভাষায় যে কোনও মৌলিক ও উচ্চাঙ্গের রচনা এই প্রতিযোগিতায় স্থান পাইতে পারিবে। রচনা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একদিকে অনধিক ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে পরিষদের প্রতীক "চলন্তিকা" চিহ্নিত পদক দ্বারা সম্মানিত করা হইবে। পুরস্কার প্রদান সম্বন্ধে চলন্তিকা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। লেখকের নাম, ধাম ও ঠিকানা সহ রচনা আগামী ১৬ই ফাল্গুনের পূর্ব্বে (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯) নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। কোনও কিছু জানিতে হইলে ডাক টিকিট দিতে হইবে। প্রতিযোগিগণ রচনার কপি রাখিয়া পাঠাইবেন; রচনা ফেরৎ পাঠাইবার দায়িত্ব পরিষদের থাকিবে না। সম্পাদক, চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদ, আর্ট কটেজ, সাকচি নিউ প্ল্যানিং, জামসেদপুর (বি এন আর)।

রচনা প্রতিযোগিতা

খুলনা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সংস্কৃতি বিভাগ হইতে দুইটি রচনা প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবে। বিষয়ঃ—(১) বেকার সমস্যা—কলেজের ছাত্রদের জন্য। (২) পল্লীগঠনে ছাত্র—স্কুলের ছাত্রদের জন্য। নিয়মাবলীঃ—উক্ত বিষয়ে রচনা লিখিয়া আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করতে হইবে। কেবলমাত্র খুলনা জেলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রেরাই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পার্শ্বে লিখিয়া ১২ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিতে হইবে। কলেজের ছাত্রদের একটি ও স্কুলের ছাত্রদের দুইটি পুরস্কার সর্ব্বোত্তম রচয়িতাদের দেওয়া হইবে। শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, খুলনা জেলা ছাত্র ফেডারেশন, খুলনা।

রচনা প্রতিযোগিতা

কলিকাতা স্বাস্থ্য সপ্তাহ উপলক্ষে একটি রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিযোগিতার জন্য লিখিত প্রত্যেকটি রচনা এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে এবং কাগজের ১০ পৃষ্ঠায় অতিরিক্ত না হয়; প্রতি পৃষ্ঠায় অনধিক একশত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে।

বিষয়ঃ—১। প্রাথমিক স্বাস্থ্য নিয়ম জানিবার প্রয়োজনীয়তা—(ইংরাজী ভাষায়) কেবল মেডিক্যাল ছাত্রদের জন্য। ২। পরিচ্ছন্নতাই স্বাস্থ্যবান হইবার গূঢ় উপায়—বিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্রীদিগের জন্য (বাঙলা, হিন্দী, উর্দ্দু অথবা ইংরাজী ভাষায়,—৩। সতর্কতাই স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান অস্ত্র—সর্ব্বসাধারণের জন্য (ইংরাজী ভাষায়)। সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টি পারিতোষিক রচনা প্রতিযোগিতার জন্য বিতরিত হইবে।

রচনা প্রতিযোগিতা

কাঁঠালগড়িয়া 'সবুজ চক্রের' পরিচালকবর্গ একটি গল্প প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছেন। গল্পটি সামাজিক হইবে এবং ফুলস্ক্যাপ সাইজের ৫ পৃষ্ঠার বেশী বা ৪ পৃষ্ঠার কম হইলে চলিবে না। গল্পটি ৩০শে মাঘ ১৩৪৫ সালের মধ্যে নিম্নঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। ঠিকানাঃ—ব্রহ্ম চৌধুরী, সম্পাদক, সবুজ চক্র; কাঁঠালগড়িয়া, ভাস্তাড়া পোঃ (হুগলী)।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ২৯শে পৌষ কিশোরগঞ্জের নগুয়া গ্রামস্থ বিবেকানন্দ পাঠাগারে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে যে রচনা প্রতিযোগিতা হইয়াছিল- তাহাতে শ্রীকুমুদবন্ধু সাহা, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর নন্দী ও কুমারী জ্যোৎস্নারাণী দে (কিশোরগঞ্জ) প্রথম পুরস্কার এবং শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত (পাটনা) দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন।

কৃত্তিবাস স্মৃতি-পূজা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও আগামী ২৯শে মাঘ, রবিবার শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে শান্তিপুরের অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি-পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করত কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য, দেশের সুধী ও সাহিত্যিকবৃন্দকে, শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ্ সাদর-আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছেন। রামায়ণকার কৃত্তিবাস বাঙলার আদি কবি। গত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ্ এই স্মৃতি-পূজার আয়োজন করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা আশা করি, দেশের সাহিত্যসেবী জনবৃন্দ উক্ত দিবস ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে সমবেত হইয়া এই কবি স্মৃতি-পূজাকে সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত করিয়া তুলিবেন।

উৎসব সভায় কৃত্তিবাস সম্পর্কিত রচনাদি পাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণ, আগামী ২০শে মাঘের মধ্যে, সম্পাদক—শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ, পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া—এই ঠিকানায় তাঁহাদের লেখা পাঠাইয়া দিবেন।

তারিখ পরিবর্ত্তন

ঝিকারগাছা নবীন সমিতির সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে আহূত একটি কবিতা প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ ৭ই জানুয়ারীর স্থলে ২রা ফেব্রুয়ারী করা হইল।

শ্রীগোপীমোহন ঘোষ, সম্পাদক।

কবিতা প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ১০ই অগ্রহায়ণ (২৬-১১-৩৮ ইং) নির্ঝরিণী সাহিত্য সংসদের পক্ষ হইতে "দেশ" পত্রিকায় যে কবিতা প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—প্রথম পুরস্কারঃ শ্রীঅরিন্দমোহন বন্দোপাধ্যায় (মডেল হাইস্কুল, ভবানীপুর), ১৬-১ কালী লেন, কালীঘাট। কবিতাটির নাম "তোমরা ও আমরা" দ্বিতীয় পুরস্কারঃ-কুমারী শিবানী সরকার (বিদ্যাসাগর কলেজ), ১৪-বি, রাধাকান্ত জিউ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা। কবিতাটির নাম "পীয়াল শালের বন"। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ১৯শে নবেম্বর, 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল। শরীর অসুস্থ থাকায় ফলাফল শীঘ্র জানাইতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা—"ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা"; বিজয়ী—শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৯ লেক রোড, লাহোর। ছোট গল্প প্রতিযোগিতা "দরদী"; বিজয়ী—শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, ১-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। হস্তলিপি প্রতিযোগিতা; বিজয়ী—কুমারী জ্যোতি ভট্টাচার্য্য, ৬৬, সাইমন চৌহাট্টা, বাঙালীটোলা, বেনারস সিটি। চিত্র প্রতিযোগিতা; বিজয়ী—শ্রীজীবেন্দ্রমোহন গোস্বামী, C/o শ্রীযতীন্দ্রমোহন গোস্বামী, পোঃ নাটোর, রাজসাহী। ইঁহাদের পুরস্কার শীঘ্রই ইঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। —শ্রীসনৎকুমার পাল। Secretary, The White Star Club, 3 Lodge Road, Lahore.

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-মন্দির

আবেদন

হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল জংসন ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুর গ্রাম বাঙলার জনপ্রিয় কথাশিল্পী পরলোকগত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি। এই প্রাচীন পল্লীতেই বাঙলার চিরস্মরণীয় কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরও কৈশোরে পাঁচ বৎসরকাল অবস্থানকালেই তাঁহার প্রথম কবিতা রচনা করেন। এই দুই অনন্যসাধারণ প্রতিভা, ভারতচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত দেবানন্দপুর ক্ষুদ্র হইলেও, বাঙলার কাব্যামোদী ও সাহিত্য-সেবীদের স্নেহদৃষ্টি নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিতে পারে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার ইতিহাস প্রসঙ্গে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন 'স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই?' নিদর্শনের অভাবে বাঙালীর বহু অতীত গৌরব-গাথা বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়াছে। কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার বিষয়, হুগলী জেলাবোর্ড হইতে দেবানন্দপুর গ্রামের যে ভবনে ভারতচন্দ্র বাস করিতেন ও যে ভবনে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতে মর্ম্মর স্মৃতি-ফলক দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র বাঙলা-সাহিত্যে যে বিশেষ দান করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষাকল্পে তাঁহার নামাঙ্কিত একটি স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হওয়া আবশ্যক ও এজন্য স্থানীয় পল্লী-সেবক সমিতি প্রচেষ্টা করিতেছেন। শরৎচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবনটি হস্তান্তরিত থাকার জন্য তাহারই সংলগ্ন যৌথ বৈঠকখানা গৃহখানি—যাহা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব্বে উল্লিখিত আছে ও তৎসংলগ্ন আন্দাজ তিন কাঠা জমি উক্ত সমিতি খরিদ করিয়াছেন, এবং স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত বৈঠক-

সমিতি খরিদ করিয়াছেন, এবং স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত ঠৈক-

খানা গৃহখানি সম্পূর্ণ সংস্কার, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ঐ স্থানে সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'শরৎচন্দ্র পল্লী-পাঠাগার' নামক অবৈতনিকপ্রতিষ্ঠানটি সংরক্ষিত হইবে এবং ঐ স্মৃতি-মন্দিরেই গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর চাষী মজুরদের শিক্ষার জন্য একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র গঠন করা হইবে—কারণ শরৎচন্দ্র নিজেই পাঠাগারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও ইহার কর্ম্মিবৃন্দকে বলিতেন "ওরে তোরা আগে গাঁয়ের নিরক্ষর গরীবদের চোখ্ খুলে দে; তা হ'লেই তারা নিজেরাই বুঝবে নিজেদের ভালমন্দ।"

পরিকল্পিত "শরৎচন্দ্র স্মৃতি-মন্দির" নির্ম্মাণের জন্য অন্যূন দুই হাজার টাকা আবশ্যক। শরৎচন্দ্রের স্থায়ী স্মৃতি-রক্ষার জন্য দেবানন্দপুরের দরিদ্র অধিবাসিগণ যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা আশা করি দেশবাসী জনসাধারণ, বিশেষত শরৎচন্দ্রের অনুরাগী সাহিত্যামোদিগণ, তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য মুক্তহস্তে সহায়তা করিবেন—সামান্য দানও সাদরে গৃহীত হইবে। যিনি যাহা সাহায্য করিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ কমিটির সভাপতি শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-বি-ই, রাজেন্দ্র ভবন, পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী ঠিকানায় বা কমিটির ধনরক্ষক শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত বি-এল, সলিসিটার, ৫নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় বা উক্ত কমিটির সম্পাদক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ-বি-এল, পোঃ দেবানন্দপুর, জেলা হুগলী ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। প্রাপ্ত সাহায্যের হিসাব নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইবে। নিবেদন ইতি ১লা মাঘ, সন ১৩৪৫ সাল।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় (স্যার), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্যার), শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রায় বাহাদুর), শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, কাজী নজরুল ইস্‌লাম্, হুমায়ুন কবীর, শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়, শ্রীকানাইলাল গোস্বামী, শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (রায় বাহাদুর)।

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

তোমরা শরতের গ্রামের বাড়িতে তাঁর স্মৃতিরক্ষার যে ব্যবস্থা ক'র্‌ছ সে জন্য তোমরা বাঙলা দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন।

ইতি—৬-১-৩৯

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রঙ্গালয় ও চিত্রগৃহের দর্শক

কলিকাতার রঙ্গালয়সমূহে ও বাঙ্গালীপাড়ার চিত্রগৃহ-সমূহে যে সমস্ত দর্শক নাটক ও ছবি দেখিতে আসেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা এখানে একটু আলোচনা করিব।

রঙ্গালয়ে কখনও নির্ব্বাক অভিনয় হয় না এবং বর্ত্তমানে নির্ব্বাক ছবি কোন চিত্রগৃহেই দেখান হয় না। সুতরাং যে সমস্ত দর্শক রঙ্গালয়ে অথবা চিত্রগৃহে যান, তাঁহারা নিশ্চয়ই মঞ্চ অথবা পর্দ্দার উপর যাহা অভিনীত হইতেছে, তাহা দেখিতে এবং শুনিতে যান। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, রঙ্গালয়ের অথবা কোন দেশী সিনেমার পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে কখনও কোন নাটক অথবা ছবির সম্পূর্ণ কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। এক শ্রেণীর দর্শক আছেন, যাঁহারা অভিনয়ের সময় এমন গোলমাল আরম্ভ করেন যে, তাহার ফলে অভিনয় উপভোগ করিতে পারা অসম্ভব হইয়া উঠে।

ইহার কারণ কি? কেন তাঁহারা এভাবে গোলমাল করেন? প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দর্শক-সাধারণ disciplined নহেন। আমরা এখানে সমস্ত দর্শকের কথা বলিতেছি না; তবে অধিকাংশ দর্শকের মধ্যেই discipline-এর বহু অভাব দেখা যায়। অথচ মজা এই যে, যে সমস্ত দর্শক দেশী রঙ্গালয় অথবা চিত্রগৃহে গোলমাল করেন, সাহেবপাড়ার চিত্রগৃহে গিয়া তাঁহারাই আবার শান্তভাবে বসিয়া ছবি দেখেন। ইহারও দুইটি কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। হয়, তাঁহারা সাহেবপাড়ার চিত্রগৃহের আবহাওয়ার মধ্যে গিয়া গোলমাল করিতে সাহস করেন না; না হয়, অধিকাংশ disciplined দর্শকের মধ্যে পড়িয়া তাঁহারাও discipline মানিয়া চলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেই সমস্ত দর্শকের অধিকাংশই discipline জানেন না যে, তাহা নহে, discipline মানেন না। অথচ তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চান না যে, এই গোলমালের ফলে তাঁহারা শুধু যে অপরের বিরক্তি উৎপাদন করেন তাহা নহে, নিজেরাও বিষয়বস্তু উপভোগ করিতে পারেন না।

তারপর মঞ্চের উপর অথবা পর্দ্দার উপর অভিনয় দেখার সময় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, হয়ত একটা খুব ভাল দৃশ্য হইতেছে, অথবা কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী হয়ত খুব ভাল অভিনয় করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ সেই অভিনয়ের মাঝখানে হাততালি আরম্ভ হইল। একথা আমরা বলি না যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া হাততালি দেন। কোন এক উত্তেজনার মুহূর্ত্তে অতিরিক্ত আনন্দের বশে তাঁহারা হাততালি দেন। কিন্তু সেই হাততালি থামিতে না থামিতে চতুর্দ্দিক হইতে 'আস্তে', 'আস্তে' ধ্বনি উঠে এবং অন্ততপক্ষে ১০।১৫ জন লোক একসঙ্গে 'আস্তে', 'আস্তে' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলে কি অবস্থা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার ফলে সেই দৃশ্য এবং অভিনয় ত উপভোগ করা যায়ই না; মনের উপর সেই দৃশ্য অথবা অভিনয় যে দাগ ফেলিয়াছিল এবং যে আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

আর একটা বিরক্তিকর ব্যাপার এই যে, যে সমস্ত মহিলারা তাঁহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে লইয়া থিয়েটার বা ছবি দেখিতে আসেন; সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা যখন মধ্যে মধ্যে চীৎকার আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে যখন অনেক লোক সেই চীৎকার থামাইবার জন্য চীৎকার করে, তখন থিয়েটার বা ছবি দেখার আনন্দ একেবারে লোপ পায়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যখন থিয়েটার অথবা ছবি বুঝিতে পারে না, তখন তাহাদের যতটা সঙ্গে না আনিয়া পারা যায়—ততই ভাল।

আমরা এখানে দর্শকদের দিক হইতে যেটুকু আলোচনা করিলাম—আশা করি, দর্শকগণ তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং যদি তাঁহারা একটু সংযতভাবে থাকিবার চেষ্টা করেন, তবে সকলের পক্ষেই তাহা আনন্দের কারণ হইবে।

* * * *

নিউ থিয়েটার্সের 'অধিকার' ছবি গত ২১শে জানুয়ারী হইতে চিত্রায় আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায়— প্রমথেশ বড়ুয়া, পাহাড়ী সান্যাল, যমুনা, মেনকা, চিত্রলেখা, পঙ্কজ মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রতাপ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। পরে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখিব

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

সোমবার ইডেন উদ্যানে বেলা প্রায় ১১টার সময় আন্তঃপ্রাদেশিক রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হয়। মাদ্রাজ দল ফলো অন্ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। কৃষ্ণস্বামী ও এ ডবলিউ ষ্ট্যানসফিল্ড প্রথমে খেলিতে নামেন। টি ভট্টাচার্য্য ময়দানের দিক হইতে প্রথম বল করেন। অপর দিক হইতে জে এন ব্যানার্জ্জি বল করেন। বাঙ্গলা দলের জয় একপ্রকার সুনিশ্চিত বলিয়া অদ্যকার খেলার মাঠে অতি অল্পসংখ্যক দর্শকই উপস্থিত ছিলেন। আধঘণ্টা খেলা চলিবার পর মাদ্রাজ দলের ১৬ রাণের সময় জে এন ব্যানার্জ্জির বলে ষ্ট্যানসফিল্ড আউট হইয়া যান (১৬-১-১০)। অধিনায়ক রামস্বামী কৃষ্ণস্বামীর সহিত যোগদান করেন। এই সময়ে টি ভট্টাচার্য্যের উপর্য্যুপরি দুইটি ওভারে কোন রাণ হয় না। ২৩ রাণের সময় টি ভট্টাচার্য্যের বলে রামস্বামী একটি ক্যাচ তুলিলে বেরেণ্ড তাহা ধরিয়া ফেলেন (২৩-২-৩)। তিনি মাত্র তিন রাণ করেন। ভদ্রাদ্রি আসিয়া অধিনায়কের স্থান গ্রহণ করেন। জে এন ব্যানার্জ্জি সাত ওভার বল করিবার পর টি সি লংফিল্ড তাঁহার স্থলে বল করিতে আসেন। ১১-৫৫ মিনিটের সময় কৃষ্ণস্বামী টি ভট্টাচার্য্যের নবম ওভারের তৃতীয় বলে নয় রাণ করিয়া বোল্ড আউট হন (২৬-৩-৯)। এইবার রাম সিং খেলিতে নামেন। কৃষ্ণস্বামী নিজস্ব ৯ রাণ করেন। মাদ্রাজ দলের অতি ধীরে ধীরে রাণ হইতে থাকে। এক ঘণ্টা খেলা চলিবার পর তাহাদের মাত্র ৩৪ রাণ হয়। টি ভট্টাচার্য্য দশ ওভার বল করিবার পর কে ভট্টাচার্য্য মাদ্রাজ দলের ৩৬ রাণের সময় তাঁহার স্থানে বল করিতে আসেন। কে ভট্টাচার্য্যের প্রথম ওভারটিতে দশ রাণ হয়। ৭০ মিনিট খেলা চলিবার পর রাম সিং লংফিল্ডের বলে একটি রাণ করিলে মাদ্রাজ দলের ৫০ রাণ পূর্ণ হয়। মাদ্রাজ দলের ৫২ রাণের সময় লংফিল্ডের বলে ভদ্রাদ্রি এ জব্বরের হাতে কট আউট হন (৫২-৪-১৬)। তিনি মাত্র ১৬ রাণ করেন। এইবার নেলার ও রাম সিং একত্রে খেলিতে থাকেন। তিন মিনিট পরে লংফিল্ডের এই ওভারেই শেষ বলে রাম সিং ম্যালকম কর্ত্তৃক 'শিলপে' কট আউট হন (৫৫-৫-১৩)। তিনি মাত্র ১৩ রাণ করিতে সক্ষম হন। ইহার পরে এম জে গোপালন আসিয়া নেলারের সহিত যোগদান করেন। ১-৪৫ মিনিটের সময় এন চ্যাটার্জ্জির চতুর্থ বলে গোপালন ভ্যাণ্ডারগাট কর্ত্তৃক ষ্টাম্পড আউট হন [illegible] পার্থসারথি আসিয়া নেপালের সহিত যোগ দেন। এইরূপে ১১৬ রাণে মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। চার দিন ব্যাপী খেলাটি তিন দিনেই পরিসমাপ্ত হয়। মাদ্রাজ দল এক ইনিংসে ও ২৮৫ রাণে পরাজিত হইলেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ই তারিখ হইতে কালিকাতায় ফাইন্যাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হইবে। নিম্নে খেলার ফলাফল দেওয়া হইলঃ—

মাদ্রাজ দল—দ্বিতীয় ইনিংস

এ ভি কৃষ্ণস্বামী ব টি ভট্টাচার্য্য	৯
এ ডবলিউ ষ্ট্যানসফিল্ড ব জে এন ব্যানার্জ্জি	১০
সি রামস্বামী ক বেরেণ্ড ব টি ভট্টাচার্য্য	৩
বি এফ ভদ্রাদ্রি ক জব্বর ব লংফিল্ড	১৬
এ জি রামসিং ক ম্যালকম ব লংফিল্ড	১৩
আর নেলার ক ভ্যাণ্ডারগাট ব ম্যালকম	৩১
এম জে গোপালন ষ্টাম্পড ভ্যাণ্ডারগাট ব এন চ্যাটার্জ্জি	২০
জি পার্থসারথি ক টি ভট্টাচার্য্য ব এন চ্যাটার্জ্জি	০
টি এম ডোরাইস্বামী ক মিলার ব ম্যালকম	৩
সি আর রঙ্গচারী ব ম্যালকম	৫
আর স্পিটলার নট আউট	৩
অতিরিক্ত	৩
মোট	১১৬

বোলিং—	ওঃ	মেঃ	রাণ	উইঃ
টি ভট্টাচার্য্য	১০	৩	২৩	২
জে এন ব্যানার্জ্জি	৭	৫	৭	১
টি সি লংফিল্ড	৯	১	৩২	২
কে ভট্টাচার্য্য	৪	০	২৫	০
এন চ্যাটার্জ্জি	৪	০	২৩	২
বি ডবলিউ ম্যালকম	১·২	০	৩	৩

উইকেট পতনঃ—১৬ রাণে ১, ২৩ রাণে ২, ২৬ রাণে ৩, ৫২ রাণে ৪, ৫৫ রাণে ৫, ৯৬ রাণে ৬, ৯৬ রাণে ৭, ১০৮ রাণে ৮, ১০৯ রাণে ৯ এবং ১১৬ রাণে ১০।

বাঙ্গলা দল—১ম ইনিংস

পি আই ভ্যাণ্ডারগাট ব রঙ্গচারী	৪
এস ডব্লিউ বেরেণ্ড ক রামস্বামী ব রঙ্গচারী	৩৯
পি এন মিলার ক এবং ব পার্থসারথি	৮৩
কার্ত্তিক বসু রাণ আউট	৫c
এ জব্বর ক গোপালন ব স্পিটলার	৪৬
এন চ্যাটার্জ্জি ক নেলার ব গোপালন	৯
বি ডব্লিউ ম্যালকম নট আউট	১৮১
টি সি লংফিল্ড রাণ আউট	৮
জে এন ব্যানার্জ্জি ক ভদ্রাদ্রি ব পার্থসারথি	৩
কে ভট্টাচার্য্য এল বি ডব্লিউ ব পার্থসারথি	২৩
টি ভট্টাচার্য্য এল বি ডব্লিউ ব পার্থসারথি	৪৩
অতিরিক্ত	২৬
মোট	৫১৫

বোলিং—	ওঃ	মেঃ	রাণ	উইঃ
সি আর রঙ্গচারী	২৯	২	১১১	২
এম জে গোপালন	৩৪	৯	৯২	১
আর স্পিটলার	১৪	২	৫৫	১
জি পার্থসারথি	২৬,৪	৩	১১৫	৪
এ জি রাম সিং	২৭	১	১১৬	০

উইকেট পতনঃ—১৫ রাণে ১, ৮১ রাণে ২, ১৬৮ রাণে ৩, ১৮৮ রাণে ৪, ২০৯ রাণে ৫, ২৮৩ রাণে ৬, ৩০৯ রাণে ৭, ৩২২ রাণে ৮, ৪০০ রাণে ৯ এবং ৫১৫ রাণে ১০।

মাদ্রাজ দল—প্রথম ইনিংস

এ ডবলিউ ষ্ট্যানসফিল্ড ব টি ভট্টাচার্য্য	১৫
এ ভি কৃষ্ণস্বামী ব টি ভট্টাচার্য্য	২
এ জি রাম সিং এল বি ডবলিউ ব জে এন ব্যানার্জ্জি	৫
বি এফ ভদ্রাদ্রি ব টি সি লংফিল্ড	২৯
সি রামস্বামী ব জে এন ব্যানার্জ্জি	০
আর নেলার ক ভ্যাণ্ডারগাট ব জে এন ব্যানার্জ্জি	০
এম জে গোপালন ব কে ভট্টাচার্য্য	২৩
জি পার্থসারথি ক ভ্যাণ্ডারগাট ব জে এন ব্যানার্জ্জি	১৫
টি এম দোরাইস্বামী ব টি ভট্টাচার্য্য	১০
সি আর রঙ্গচারী ব টি ভট্টাচার্য্য	০
আর স্পিটলার নট আউট	০
অতিরিক্ত	১৫
মোট	১১৪

বোলিং—	ওঃ	মেঃ	রাণ	উইঃ
টি ভট্টাচার্য্য	১৮	৪	৪২	৪
জে এন ব্যানার্জ্জি	২০	১১	২৯	৪
কে ভট্টাচার্য্য	১২	৩	১৫	১
এস বেরেণ্ড	২	১	১	০

উইকেট পতনঃ—২৫ রাণে ১, ৩০ রাণে ২, ৩৪ রাণে ৩, ৩৬ রাণে ৪, ৩৬ রাণে ৫, ৭১ রাণে ৬, ৯৪ রাণে ৭, ১১৪ রাণে ৮, ১১৪ রাণে ৯, ১১৪ রাণে ১০।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৬ই জানুয়ারী।—

সিং কিং হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, মাঞ্চুকুও সরকার বলশেভিক বিরোধী চুক্তিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। হ্যাংকায়োর উত্তরে পীতনদীর ৩০০ শত মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে ৮ মাস কাল নিষ্ক্রিয় থাকার পর জাপানী সৈন্যের আবার রণে মন দিয়াছে। জাপ গোলন্দাজ বাহিনী ও বিমানবহরের যুগপৎ আক্রমণে চীনাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের কারখানা এবং তুঙ্গকাওনার পূর্ব্বদিকস্থ লুঙহাই লাইন বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া জাপানীরা দাবী করিতেছে।

স্পেনের বিদ্রোহীবাহিনী বার্সিলোনা হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর উপকূলবর্ত্তী তারাগোনা এবং রেউস শহর অধিকার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অপর একটি বাহিনী বার্সিলোনায় প্রবেশ করিয়াছে। ফ্রাঙ্কোর সৈন্য বাহিনী বড়দিন হইতে এপর্য্যন্ত ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং ২০৭০ বর্গ মাইল স্থান দখল করিয়াছে। বিদ্রোহী বাহিনীর এই বিপুল সাফল্যের কথা গণতন্ত্রিগণ অস্বীকার করিতেছে।

শ্রীহট্টে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ কালী প্রতিমা বিসর্জ্জন উপলক্ষে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। এক মাসের জন্য শ্রীহট্ট সহরে ১৪৪ ধারা অনুসারে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। এই সহরে কোন অস্ত্র-শস্ত্র কিম্বা ইট-পাটকেল লইয়া চলাফেরা করা উক্ত আদেশক্রমে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বাটা কোম্পানীর জুতা কারখানার শ্রমিক বিরোধ সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, কোন শ্রমিকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কথা দিয়াছেন। আগামী বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল হইতে কাজ যথারীতি আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে অনুমান ৫০,০০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। আলোচ্য বৎসরে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অপেক্ষা ২০,০০০ অধিক হইবে। ১৯৪০ সাল হইতে নূতন পাঠ্য-তালিকা প্রবর্ত্তন করায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

১৭ই জানুয়ারী—

বান্দেলী হইতে বাঙালী-বিহারী সমস্যা সম্পর্কে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সমস্যার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বর্ণনা করিয়া সুদীর্ঘ এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। রিপোর্টে বিহারী এবং বিহার-প্রবাসী বাঙালী এই উভয় পক্ষ হইতে উত্থাপিত যুক্তিতর্ক বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

এলাহাবাদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী না-কি আগামী কংগ্রেসের সভাপতি পদে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নির্ব্বাচনের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাপ কলিকাতায় ইষ্টার্ণ ষ্টেট্স এজেন্সীর রেসিডেন্টের সহিত উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত মহাতাপ পরে ঐ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বসুর সহিত দীর্ঘ আলোচনা করেন।

শ্রীহট্টে কালী প্রতিমা নিরঞ্জন বিনা বাধায় সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত অক্টোবর মাসে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে শ্রীহট্ট শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। কালী প্রতিমা নিরঞ্জনে বাধা দেওয়া হয় বলিয়া হিন্দুরা প্রতিবাদস্বরূপে প্রতিমাগুলি রাস্তার উপর ফেলিয়া রাখেন। সম্প্রতি, নির্দ্দিষ্ট সময় বাদে মসজিদের সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার অনুমতি দিয়া আসাম গবর্ণমেণ্ট যে আদেশ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে অদ্য রাত্রি আটটার পর শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমাগুলি বিসর্জ্জন দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ২০টি জেলা হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের যে প্রতিনিধি-তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ৭১৭জন প্রতিনিধি (তম্মধ্যে ১০০জন মুসলমান ও ৩১জন মহিলা) এবারকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

মাদ্রাজে হিন্দি বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে মাদ্রাজের থিওলজিকাল হাই-স্কুলের সম্মুখে পিকেটিং করিবার অভিযোগে সাতজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; ইঁহাদের মধ্যে তিনজন নারী। বিচারে ইঁহারা প্রত্যেকেই দণ্ডিত হইয়াছেন।

লণ্ডন হইতে রয়টারের এক খবরে প্রকাশ, গত দুই দিন ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে নয়টি বিস্ফোরণ হইয়াছে। অপরাধিগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সমস্ত স্থানের পুলিশ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর (গোয়েন্দা বিভাগ) সহিত সহযোগিতা করিতেছে।

আইরিশ গণতন্ত্রবাহিনীর আন্দোলনের প্রতি যে সকল আইরিশের সহানুভূতি আছে তাহাদের উপরই পুলিশ বিশেষ নজর দিয়াছে।

১৮ই জানুয়ারী—

দক্ষিণ ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ বিখ্যাত মিঃ জে কৃষ্ণমূর্ত্তি নাগপুর মেলযোগে অদ্য প্রাতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। প্রকাশ, কলিকাতায় থাকাকালে তিনি দুইটি জনসভায় বক্তৃতা করিবেন এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করিবেন।

বিহার ব্যবস্থা পরিষদে বিহার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উত্থাপিত বিহার-উড়িষ্যা জনরক্ষা আইন বাতিল বিল অদ্য গৃহীত হইয়াছে। যথাযথভাবে ইহার কার্য্যকাল ১৯৪১ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে উত্তীর্ণ হইত।

মধ্যপ্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী, ত্রিপুরী কংগ্রেসের জলসরবরাহ সাব-কমিটির সভাপতি ও জব্বলপুরের রাজা গোকুলদাস মিলের ম্যানেজার শ্রীযুত কে এইচ ভাট ট্রেনে ভ্রমণকালে এলাহাবাদের নিকটে দুর্ব্বৃত্তের আক্রমণে নিহত হইয়াছেন।

"ইউনাইটেড প্রেস" জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকারের নিকট লিখিত এক পত্রে ভারত সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর 'মিণ্টো প্রফেসরের' পদটি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের পৌত্র এবং শ্রীযুত প্রেমানন্দ

দাসের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান অজয়কুমার দাস চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ডাক্তারী পড়া ত্যাগ করে এবং কাহাকেও না জানাইয়া তাহাদের শিলংস্থ বাড়ী ত্যাগ করিয়া জাহাজের খালাসী হইয়া রেঙ্গুন যায়। তথায় কোন প্রকারে পাসপোর্ট যোগাড় করিতে না পারিয়া ব্রহ্ম হইতে প্রেরিত চীন এম্বুলেন্সবাহিনীতে যোগদান করিয়া চীনের রণক্ষেত্রে গমন করে; সে তথায় আহত সৈন্যদিগের শুশ্রূষার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। শ্রীমান তাহার মাতা, ভগ্নী এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের নিকট যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে যে সকল চিঠি দিয়াছে, ঐগুলিতে অনেক বিষয় জানিবার আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর ১৯৩৮ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্ম্মচারী এবং বাহির হইতে সময় সময় যাঁহারা পড়িতে যান, তাঁহাদিগকে মোট ১৪৮৮৯৯খানা বই পড়িতে দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোন বৎসরই এত চাহিদা হয় নাই। এই সব পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ করিলে দেখা যায় যে, অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তকের চাহিদাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। তারপর ইতিহাস এবং তৎপর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য।

১৯শে জানুয়ারী—

দেরাদুন এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা সম্বন্ধে রেলওয়েসমূহের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টার যে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, রেল সরাইবার ফলেই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী ট্রালি নামক শহরের একটি হোটেলে বোমা বিস্ফোরণের ফলে বহু অট্টালিকার ক্ষতি হইয়াছে। প্রকাশ, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর পুত্র এই হোটেলে অবস্থান করিতেছেন। তিনি অক্ষত আছেন।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার আগামী অধিবেশনের সভাপতি পদের জন্য এক্ষণে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া—এই তিন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে। এক্ষণে এই নির্ব্বাচন সর্ব্বসম্মতিক্রমে হইবে অথবা নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে, ইহা লইয়া রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা চলিতেছে।

প্রকাশ, মৌলানা আজাদ নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

রেঙ্গুনের এক সংবাদে প্রকাশ—বাহান রোডে অবস্থিত ফুঙ্গী কিয়াং মঠ হইতে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বা ম'র মোটর গাড়ীর উপর একটি দেশী হাতবোমা নিক্ষিপ্ত হয়। প্রধান মন্ত্রীর ছেলে-মেয়েরা উক্ত মোটরে শহর হইতে আসিতেছিলেন। কেহ আঘাত পান নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩০ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত যে সকল মেডিক্যাল ডিগ্রি দিয়াছেন, বিলাতের জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিল তাহা অনুমোদন করেন নাই। যাহাতে এই কয় বৎসরের ডিগ্রি অনুমোদন করা হয় তজ্জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গলার গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট দুই বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা বোর্ড স্থাপন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত বোর্ড শুধু গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগকে শিল্প সম্পর্কে গবেষণা বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

হবিগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, অদ্য রাত্রিতে বাহুবল থানার অন্তর্গত পিটকুরি বাজারে গীত বাদ্য সহ একটি মিছিল যাইতেছিল। সে সময় মুসলমানরা বাধা দেওয়ায় এক হাঙ্গামা হয়। ফলে কয়েকজন লোক আঘাত পাইয়াছে।

২০শে জানুয়ারী—

ওয়াশিংটন হইতে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, পানামা খাল অঞ্চলে বর্ত্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৩০০০ সৈন্য আছে। মার্কিন সৈন্য বিভাগ উক্ত অঞ্চলের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

বার্সিলোনা অভিযানের পথে স্পেনের বিদ্রোহীবাহিনী গণতন্ত্রীদের ক্যালাফ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিয়াছে। আরও প্রকাশ, বিদ্রোহীরা বার্সিলোনা হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী ব্রিসব্যাল ডেপানডেস নামক স্থান দখল করিয়াছে।

রাজকোট রাজ্যে শাসনসংস্কার কমিটির সদস্য নিয়োগ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হওয়ার ফলে রাজকোটে পুনরায় সত্যাগ্রহের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

নেপালের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী পরলোকগত মহারাজা চন্দ্র সমশের জঙ্গ বাহাদুরের পত্নী মহারাণী বালকুমারী দেবী তাঁহার কাশীস্থিত বালচন্দ্র প্রাসাদে মহাসমারোহে 'সুবর্ণ তুলাদান' উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে মহারাণীর ওজনের সমপরিমাণ সোনা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করা হয়। মহারাণীর ওজন ৫০০০ তোলার (এক মণ সাড়ে বাইশ সের) কিঞ্চিৎ অধিক হয়।

বান্নুর মিরাণ থানার এলাকা হইতে সম্প্রতি ওয়াজিরি দস্যুরা দুইটি ছেলে ও একটি মেয়েকে উহাদের পিতা-মাতাসহ অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। মুক্তিপণ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া পিতা-মাতা খালাস পাইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীহট্টের গবর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী আশালতা খাস্তগীর হিন্দু ছাত্রীনিবাসে চিরাচরিত প্রথানুসারে অনুষ্ঠিত সরস্বতী পূজায় অনুমতি দেন নাই। প্রকাশ, অনুমতি না দেওয়ার কারণ এই যে, তিনি ব্রাহ্ম এবং মূর্ত্তিপূজা তাঁহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

জানা গিয়াছে যে, শ্রীযুত সুধীর প্রামাণিক এবং জগন্নাথপ্রসাদ নামক দুইজন বাঙালীকে রেঙ্গুনে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই জরুরী অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহারা বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর শ্রমিক ধর্ম্মঘটে মধ্যস্থতা করিতে গিয়াছিলেন।

২১শে জানুয়ারী

আসানসোল শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মারপিট ও ছোরার আঘাতে একজন হিন্দু নিহত ও

উভয় সম্প্রদায়ের ১৮ জন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, একজন হিন্দু কর্ত্তৃক একজন মুসলমানকে ছোরা মারা হইতেই এই হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়।

হের হিটলার একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ জারী করিয়াছেন। ইহার ফলে জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। এই আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক লোককে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে দেশরক্ষার জন্য গঠিত বাহিনীতে যোগ দিতে হইবে।

কোন কংগ্রেস নেতা সর্ত্তাধীনে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের পক্ষে প্রচার কার্য্য করিতে পারিবেন না,—বাদ্দোলীতে ওয়ার্কিং কমিটির ব্যক্ত এই মত অনুসারে রাষ্ট্রপতি বসু যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের পক্ষে প্রচার কার্য্য চালাইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিয়া কংগ্রেস নেতৃগণকে পত্র লিখিয়াছেন।

জাপান চীনের জন্য যে পরিকল্পনা করিয়াছে তাহাতে চীনের কিম্বা অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির স্বাধীনতা ও স্বার্থ বিপন্ন ত হইবেই না, বরঞ্চ উহার বিপরীত হইবে—জাপ পার্লামেন্টের উদ্বোধন করিয়া জাপ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ আরিতা এই কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন।

পূর্ব্বতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বীরভূম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জে এন বাঁড়ুয্যেকে বীরভূম জেলার পোপাইতে একজন পশ্চিমা গুরুতরভাবে আঘাত করিয়াছে। তিনি শঙ্কাজনক অবস্থায় সাঁইথিয়া হাসপাতালে আছেন।

"ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের" বিমান "ক্যাভেলিয়ার" নিউইয়র্ক হইতে বারমুডা যাইবার পথে যে অন্তরীপের ১৭০ মাইল পূর্ব্বে অত্যধিক হিমের জন্য ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় জলে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। জলে অবতরণের কিছু পরে উহা জলমগ্ন হয়।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর সেখ মহম্মদ হবিবুল্লা জানাইয়াছেন যে, ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে।

কটকের রাজনৈতিক মহল উড়িষ্যা-সরকার ও দেশীয় রাজ্যের সম্পর্ক সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় লইয়া মন্ত্রিসংকট দেখা দিবে বলিয়া আশংকা করেন। রাজন্যরক্ষা আইনের কয়েকটি ধারা উড়িষ্যায় বলবৎ করার প্রস্তাব সম্পর্কে উড়িষ্যার লাট ও মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে।

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, ঢেনকানল ও তালচেরের "একষ্ট্রাডিশন" পুরায়ানাবলে, ব্রিটিশ উড়িষ্যায় যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে ঐসকল রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে প্রত্যর্পণ করার প্রশ্ন সম্পর্কে গবর্ণরের সহিত মন্ত্রিমণ্ডলের মতানৈক্য দেখা দিয়াছে।

২২শে জানুয়ারী—

শেঠ যমুনালাল বাজাজ জয়পুর যাইবার পথে বোম্বাই মেল যোগে অদ্য কলিকাতায় পৌঁছান। জয়পুর রাজ্যে প্রবেশ সম্পর্কে তাঁহার উপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে, তাহা অমান্য করিবার উদ্দেশ্যে তিনি জয়পুর যাইতেছেন।

ভূতপূর্ব্ব কাকোরী-বন্দী শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি তাঁহার মৃত্যুশয্যাশায়িনী বৃদ্ধা মাতাকে দেখিবার জন্য বাঙলায় প্রবেশের যে অনুমতি চাহিয়াছিলেন, বাঙলা সরকার তাহা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

আগামী ২৬শে ডিসেম্বর স্বাধীনতা দিবসের যে অনুষ্ঠান হইবে তৎসম্পর্কে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ সি ই গিবন এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

অসদাচরণের জন্য বিহার-ভাগলপুরের ভূতপূর্ব্ব পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শিশিরকুমার সান্যালকে রায় বাহাদুর উপাধি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে তাঁহাকে এই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

আঙ্গুলে তালচের হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের দুইটি শিবিরের জন্য উড়িষ্যা সরকার দুইজন চিকিৎসক পাঠাইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট ঔষধের জন্য ৩০০৲ টাকা এবং যে সমস্ত স্থানে পানীয় জলের অভাব আছে, সেখানে নলকূপ বসাইবার জন্য টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর স্পেন সাহায্য ভাণ্ডারে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের রাজনীতিক বন্দিগণ তাঁহাদের নিজস্ব তহবিল হইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ৬০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পূর্ণিয়ায় অদ্য সকালে উপর্য্যুপরি কয়েকবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পন সাকুল্যে ৬ সেকেণ্ডব্যাপী হইয়াছিল। ধন-প্রাণ বিনাশের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।
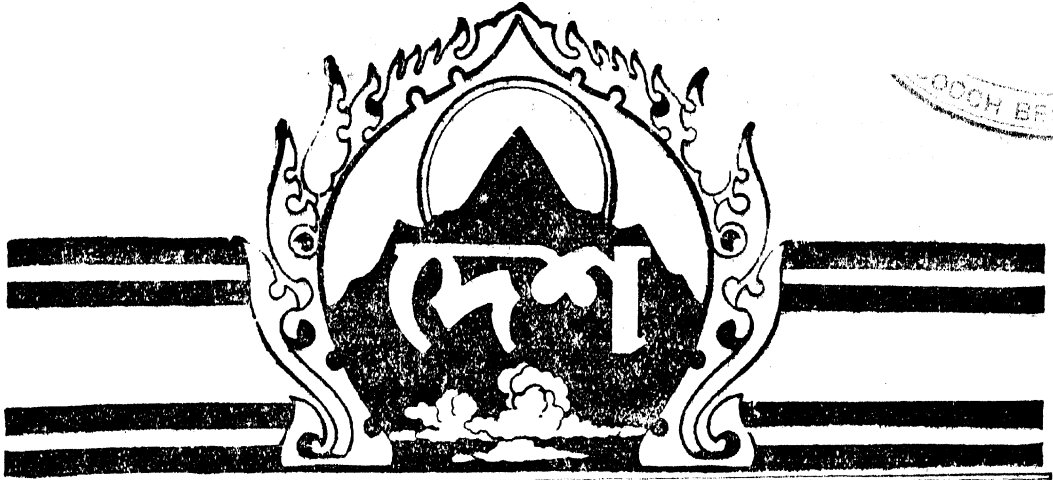
৬ষ্ঠ বর্ষ। শনিবার, ২১শে মাঘ, ১৩৪৫ সাল, 4th February, 1939 [১২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সুভাষচন্দ্রের জয়—

১৯৩৯ সালের ২৯শে জানুয়ারী ভারতের কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন বাঙলার ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন বাঙলা তাহার আত্মাতে ফিরিয়া আসিয়াছে, কংগ্রেসের সভাপতি-পদের জন্য নির্ব্বাচনে

সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে ইহাই স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, যে বাঙালী একদিন রাজনীতিতে ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছিল, যে বাঙালী দেশে উদ্বোধন করিয়াছিল ভারতের জাতীয় জীবনের—সে বাঙালী মরে নাই। বাঙলার রাষ্ট্রীয় আত্মা এতদিন সুপ্ত ছিল, আজ আবার তাহা জাগিয়া উঠিল। বাঙালী ফিরিয়া পাইল তাহার স্বাধীন সত্তাকে, সে দমিবার নয়, পিছনে পড়িবার নয়। বাঙলা মায়ের শত শত স্বদেশ-প্রেমিক সন্তান, তিল তিল করিয়া আত্মদান করিয়া যে শক্তি জাতির দেহে সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন সে শক্তি লুপ্ত হয় নাই। লুপ্ত হইবার নহে।

বাঙলার আত্মার যে বাণী নব বসন্তের সমাগমের মধ্য দিয়া আজ তাহা অভ্রান্ত ভাষায় ব্যক্ত হইল বিঘোষিত হইল। সুভাষচন্দ্র সেই বাণীকে রূপ দিলেন। সে বাণী এই যে, আদর্শই বড়, ব্যক্তি বড় নয়। সে বাণী এই যে, প্রেমই বড়, এবং সেই যে প্রেম চরম এবং পরম ত্যাগের মধ্য দিয়াই তাহার বিকাশ হয়। প্রেম বুঝে না হিসাব-নিকাশের খুঁটিনাটি, তাহার একটা তীব্র জ্বালা আছে, অগ্নিময় সেই যে জ্বালা, সকল সঙ্কীর্ণতা এবং তুচ্ছ হিসাব-নিকাশের বিচারকে ভস্মীভূত করিয়া সে জ্বালা শিখা বিস্তার করে, দাউ দাউ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে জিহ্বা বাড়াইয়া দেয়। কর্ম্মী যে সে কাজ করে, এই প্রেমের শক্তির জোরে; তাহার সাধনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, কর্ম্মরূপে অভিব্যক্ত হয় ত্যাগের মধ্য দিয়া। ত্যাগের মূলে প্রেম থাকে বলিয়া, সেই যে ত্যাগ সে ত্যাগ কষ্টের নয়, দুঃখের নয়। সে ত্যাগেই আনন্দ, প্রকৃতপক্ষে সেই যে ত্যাগ, সেই ত্যাগের পথে, সেই বিসর্জ্জনের পথেই প্রতিষ্ঠা। বাঙলার স্বদেশপ্রেমিক সাধকগণ, এই যে সাধন-তত্ত্ব, এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা এবং উদ্গাতা। এই তত্ত্বের উপর বাঙলার বাঙালীত্ব। বাঙালীর সংস্কৃতির ইহাই হইল বিশিষ্টতা। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে বাঙলার এই যে সাধন-যোগ, ইহার সূত্র ছিন্ন হইতে বসিয়াছিল। বসিয়াছিল বিভিন্ন উপদলীয় স্বার্থমূলক ষড়যন্ত্রে, সুভাষচন্দ্র শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করিলেন। তিনি পুনরুদ্ধার করিলেন বাঙলার নষ্ট যোগের। সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে বাঙলা তাহার আত্মসত্তার অনুভূতি-আনন্দের ধারার সঙ্গে

আবার যুক্ত হইল। সুভাষচন্দ্রের এই নির্ব্বাচন বাঙলার নবযুগেরই সূচনা।

যেমন বাঙলার দিক হইতে তেমনই ভারতের দিক হইতে সুভাষচন্দ্রের জয় একটি বিশেষ ঐতিহাসিক এবং উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। বাঙলার নব জাতীয়তার যে সাধনা, আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, নিখিল ভারতীয় আদর্শকে ভিত্তি করিয়াই সে সাধনা গড়িয়া উঠে। এই সাধনা বাঙলা দেশের বিশিষ্ট উপাধির ভিতরে বিকশিত হইলেও, প্রাদেশিক উপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভারতের অখণ্ড আত্মার ভিতরে তাহা আত্মনিবেদন করে। কিন্তু সেই যে সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তি এবং তৎপরত্ব—রাষ্ট্রীয় সাধনার সে দিকটা গত কয়েক বৎসর হইল কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাস্বরূপে দক্ষিণপন্থী বল্লভাচারীর দল অনবরত চাপা দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা ত্যাগ এবং আত্মনিবেদনের দিকটা উপেক্ষা করিয়া কেবল আপোষের উপরই আত্যন্তিকভাবে জোর দিয়াছেন। মুখে মাঝে মাঝে দুই একটা বড় বড় কথা তাঁহাদের বাহির হইত বটে, কিন্তু মিথ্যাচার ধরা পড়িত পরবর্ত্তী প্রতি কাজের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালী লইয়াও এই মিথ্যাচারের কারসাজি তলে তলে চলিতেছিল—চলিতেছিল যে, ইহা আমরা ভাল করিয়াই জানি। এই মিথ্যাচারের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এতদিন পরে। মিথ্যাচার বরদাস্ত করিতে করিতে এই কয়েক বৎসরে জাতির ভিতর যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, আজ তাহা প্রকট মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে এবং বল্লভাচারী দলের স্পর্দ্ধাকে গুঁড়া গুঁড়া করিয়া ছাড়িয়াছে। কংগ্রেসী কেন্দ্রে বসিয়া মিনমিনে ঘ্যানঘেনে দলের বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নিজের কোলে ঝোল টানিবার যে খেলা খেলিতেছিলেন, শক্ত ঘায়ে আজ সে খেলার একেবারে অবসান হইয়াছে। বল্লভাচারী দলের মায়ার বন্ধন হইতে সুভাষচন্দ্র দেশকে মুক্তি দিয়াছেন, ভারতের রাজনীতির ধারায় তিনি জাতির জীবনকে মুক্ত করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালী—চাহি না, ভাঙিগয়া ফেলিব ঐ ধোঁকার টাটিকে এবং তাহা ভাঙিগবার জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নামে ভারতের করেকটি প্রদেশে কংগ্রেসীদের যে মন্ত্রিত্ব তাহাকে যদি বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও দিব; উহাও বন্ধন যদি স্বাধীনতা না পাই। চাই পরাধীনতা, যদি তাহা না পাই সব ভাঙিগয়া ফেলিব, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ঠাটকাঠামো সমেত। সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়া সমগ্র জাতির এই সংকল্প অভিব্যক্ত হইয়াছে। অভিব্যক্তি হইয়াছে দৃঢ়তার, অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে স্বাধীনতার পিপাসার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে চরম এবং পরম ত্যাগের আনন্দ-প্রেরণার; অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে সকল কার্পণ্যের উদ্ধে সাধকের আত্মা যে অমরত্বের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয় সেই সঞ্জীবনী-শক্তির।

সুভাষচন্দ্র আজ প্রতিপন্ন করিলেন এই সত্যকে যে, ব্যক্তি সে যতই বড় হউক না কেন, জাতির চেয়ে বড় নয়। তিনি দেখাইয়া দিলেন, বড় কর্ত্তার দল বড় নয়, বড় হইল জাতি। বড় কর্ত্তার দলের বড়ত্ব তত দিনই যত দিন তাঁহারা জাতির আদর্শের দিকে ধ্রুব লক্ষ্যে আগাইয়া যাইতে পারেন। যে মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার বিচার আসিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে আদর্শকে আচ্ছন্ন করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের পতন ঘটিবে। দক্ষিণপন্থী বল্লভাচারীর দলের মনের কোণে কোণে যে দুর্ব্বলতা ঘনীভূত হইয়া জাতির রাজনীতিক চেতনাকে অভিভূত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সুভাষচন্দ্রের দৃঢ়তায় তাহা বিদূরিত হইল। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার মহিমা প্রদীপ্ত হইল। সুভাষচন্দ্রের এই যে বিজয়, এই বিজয়ের ভিতর দিয়া কবির ভাষায় আজ আমরা শুনিতে পাইতেছি 'পাষাণ পিঞ্জর টুটি বজ্র গর্জ্জরব।' আমাদের কানে আসিয়া বাজিতেছে মহাতীর্থযাত্রীর সেই সঙ্গীত—পরিপূর্ণতাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই, আমরা চাই মুক্তি, চাই স্বাধীনতা; সেজন্য আসুক দুঃখ, আসুক কষ্ট, আসুক মরণ। পরাধীনের জীবন পশুর জীবন, আমরা ঘৃণা করি, দুরন্ত ঘৃণা করি, একান্ত ঘৃণা করি সেই পশুর জীবনকে। সে পশুত্বের সঙ্গে কোনরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি নাই, আছে সংগ্রাম,—কল্প কল্প যুগ যুগ নিত্য নিরন্তর যদি প্রয়োজন হয়, চলুক 'অম্বরব্যাপী অনন্ত সমর'।

প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে মহাত্মাজী—

সুভাষচন্দ্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি খোলাখুলিভাবে তাঁহার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেসের বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটি অর্থাৎ কংগ্রেসী পরিষদ যে কার্য্যতালিকা লইয়া কাজ করিতেছেন, সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, প্রতিনিধিরা তাহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করেন না। এরূপ ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র অবাধে যাহাতে নিজের কার্য্যতালিকা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, নিজের ইচ্ছামত তেমন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। এইভাবে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিবার ফলে কংগ্রেসের কর্ম্মনীতিতে কোন দিকে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, মহাত্মাজী তাহা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, এই পরিবর্ত্তনের ফলে শুধু কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী প্রোগ্রাম বা আইন-সভা সম্পর্কিত কর্ম্মতালিকারই হেরফের ঘটিতে পারে। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের বর্ত্তমান কর্ম্ম-নীতি কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। সে দলের প্রাধান্য নষ্ট হইল। ইহার ফলে সে কর্ম্ম-পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব। মহাত্মাজীর মতে পরিবর্ত্তনের এই যে ক্ষেত্র, অর্থাৎ আইন-সভা সম্পর্কিত কংগ্রেসের কর্ম্মনীতি কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকার মধ্যে তেমন বড় জিনিষ নয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্বটাকে বড় করিয়া দেখেন না, কংগ্রেসের সেবাই তাহাদের লক্ষ্য। কোন বিশেষ প্রশ্নে যদি তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বলা হয়, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। কংগ্রেসের কর্ম্মনীতির সঙ্গে যেখানে তাঁহাদের মতের মিল ঘটিবে সেখানে তাঁহারা কংগ্রেসের নির্দ্দেশে মন্ত্রিগিরি পরিত্যাগ করিবেন, অথবা যে ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকার সঙ্গে তাঁহাদের মতের মিল হইবে না, সেখানেও তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটির এই যে আইন-সভা সম্পর্কিত নীতি দেশের লোকের তৎপ্রতি পূর্ণ সমর্থনের

অভাবের আভাস যে সুভাষচন্দ্রের এই নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেক জাল সদস্য আছেন, সুতরাং সুভাষচন্দ্র জিতিয়াছেন, এমন ধারণা কতটা সংগত হইতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কারণ যত জাল সদস্য কেবল সুভাষচন্দ্রের পক্ষেই ভোট দিবেন, অন্য পক্ষে দিবেন না, এমন ধারণা করিবার মূলে যুক্তি থাকে না। অপর পক্ষও ঐরূপ কথা বলিতে পারেন, ঠিক সমান যুক্তিতেই। আসল কথা হইল এই যে, লোকে দেখিতে পাইতেছে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সংগে সঙ্ঘর্ষের ধারা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের সংগে সহযোগিতার দিকেই গড়াইয়া চলিয়াছেন। এবং তাহার মূলে পার্লামেণ্টারী নীতি নিয়ন্ত্রণের বড়কর্ত্তা বল্লভাচারীর দলেরই প্রভাব রহিয়াছে। এই প্রভাব শুধু প্রাদেশিক কেন্দ্রেই নিবদ্ধ থাকিবে না; দেশের লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিতে পার্লামেণ্টারী কর্ম্মনীতির পরিণতি দেখিয়া এইরূপ যে, যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর মধ্যেও এই নীতি সম্প্রসারিত হইবে। তাহার ফলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে সঙ্ঘর্ষের ভাব দেশে আর থাকিবে না। সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়া দেশের লোকের এই দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত হইয়াছে যে, দেশ চায় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, দেশ চায় স্বাধীনতা—স্বাধীনতার ছায়া নয় কায়া। যাঁহারা খাঁটি কংগ্রেসকর্ম্মী, যাঁহারা দেশের প্রকৃত মুক্তিসাধক, সুভাষচন্দ্রের এই নির্ব্বাচনে তাঁহাদের অসন্তোষের কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য। ব্যক্তিগত মতামত এ ক্ষেত্রে বড় নহে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহসের সংগে অগ্রসর হইতে কোন কংগ্রেসকর্ম্মী না চাহেন, সেজন্য স্বার্থ ত্যাগ বা আত্মত্যাগ করিতে কে কুণ্ঠিত? ব্যক্তিগত পদ মান বা প্রতিষ্ঠার চিন্তা এ ক্ষেত্রে যাঁহাদের চিত্ত-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিবে, স্বাধীনতার সাধনা তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং আমরা আশা করি, সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচন কংগ্রেসের কর্ম্মনীতিকে অধিকতর সংহতই করিয়া তুলিবে। ভেদ-বিরোধের প্রকৃত কারণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদার দৃষ্টির দিক হইতে এ সম্বন্ধে কিছু নাই।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন—

২১শে এবং ২২শে মাঘ জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হইতেছে। জলপাইগুড়ির কর্ম্মিগণ এই অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষরূপে উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র শুধু রাজনীতিক নেতা নহেন, তিনি একজন বড় কর্ম্মী। দেশপ্রেমিকের এ দেশে যে পুরস্কার লভ্য হইয়া থাকে, তাহা তাঁহার ভাগ্যে যথেষ্টই ঘটিয়াছে। পীড়ন-নির্য্যাতনের অগ্নিপরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। [illegible] ব্যক্তি [illegible] প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে বাঙলার ভাবী রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সুস্পষ্ট পন্থা নির্ণীত হইবে; আমরা ইহাই আশা করিতেছি। এ বৎসরের রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, বাঙলা দেশের যে সব যুবক এবং কর্ম্মী এতদিন রাজবন্দী-স্বরূপে এবং অন্তরীণস্বরূপে বন্দীবস্থায় জীবন-যাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কারাগারের বন্ধন-পীড়ন, তাঁহাদিগকে অবসন্ন করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পুনরায় বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছেন। জলপাইগুড়ি সম্মেলনে ইঁহাদের উপস্থিতি অধিবেশনকে একটা নূতন রকমের বিশিষ্টতা প্রদান করিবে। বাঙলার সমস্যার মধ্যে সব চেয়ে বড় সমস্যা হইল, সাম্প্রদায়িক সমস্যা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বড় বল হইল দেশের ভিতর যেখানে যেটুকু সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি আছে তাহাই। বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রীর দল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যন্ত্রস্বরূপে হইয়া কাজ করিতেছেন। জাতির লোকমত অনুবর্ত্তন করিবার মত সাহস বা যোগ্যতা তাঁহাদের নাই। এই সাম্প্রদায়িকতার পাপ নানা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া বাঙলার জাতীয় জীবনকে যাহাতে অভিভূত করিয়া রাখে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পর হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল নানা ফন্দীতে কেবল সেই চেষ্টা করিতেছে, সে চেষ্টার বিরাম নাই। বাঙলার কংগ্রেস-কর্ম্মীদের সাধনাকে এই অনিষ্টকারিতাকে রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত করিতে হইবে; তাহা ছাড়া ত্রিপুরী কংগ্রেসে বাঙলার প্রতিনিধিগণ কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিবেন, তাহাও ঠিক করিতে হইবে। সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর, এই দিক হইতে বাঙলার দায়িত্ব বেশী বাড়িয়াছে। মুখে এক মনে আর, এমন অবস্থা লইয়া চলিবার দিন আর বাঙলার নাই। ভারতের আসন্ন রাষ্ট্রনীতিক সংগ্রামে বাঙলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে, সেজন্য এখন হইতে তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে, কেবল কথা নয় রীতিমত আরম্ভ করিতে হইবে কাজ। এবং আমরা আশা করি, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন ক্ষেত্র হইতেই হইবে সে কাজের সূচনা।

যুদ্ধ অদূরে—

গত ২৯শে জানুয়ারী যুক্তপ্রদেশের রাষ্ট্রীয় সমিতির নব-নির্ব্বাচিত সভাপতিরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন,—"আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কট দেখা দিবে। আগামী গ্রীষ্মকালে জগদ্ব্যাপী একটা বিরাট যুদ্ধ বাধিবার খুবই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আমরা যদি আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে দলাদলির ভাব আর থাকিবে না; এবং তখন আমাদিগকে একটি সমর-পরিষদ গঠন করিতে হইবে। যদি আমরা হিন্দু-মুসলমান বিরোধী অথবা উপদলীয় মনোবৃত্তি লইয়া চলি, তাহা হইলে আসন্ন সংগ্রামের জন্য আমরা নিজদিগকে প্রস্তুত করিতে পারিব না।" জগতের যে একটা সংকটজনক অবস্থা ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ফ্যান্স প্রভৃতি তথাকথিত

গণতন্ত্রী শক্তিরা ফ্যাসিষ্ট-পন্থী, ইটালী এবং জার্ম্মানীর মন যোগাইয়া চলিয়া পার পাইয়াছে বটে; কিন্তু স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অবস্থার ওলট-পালট ঘটিয়া যাইবে; তখন ফ্যাসিষ্টদের নগ্নমূর্ত্তি প্রকট হইবে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ স্বার্থের সঙ্গে তাহার সংঘর্ষ বাধিয়া যাইবে। ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী চেকোশ্লোভাকিয়াকে বলি দিয়াছেন, নিজেদের সাম্রাজ্য-স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য। তিনি সেদিনও মুসোলিনীর স্তুতি গান করিয়া বলিয়াছেন, মুসোলিনী যদি আমার সহায় না থাকিতেন তাহা হইলে চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার লইয়া লড়াইটা আমি ঠেকাইতে পারিতাম না; কিন্তু ঠেকাইয়াছেন কোন দিক দিয়া—চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতাকে জার্ম্মানীর কাছে বলি দিয়া। চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে ব্রিটিশ জাতির সাম্রাজ্যগত কোন স্বার্থ-সম্পর্ক নাই, এই জন্যই তাঁহার মুখে শান্তির বুলি ইংরেজের কাছে শুনাইতেছে ভাল; কিন্তু ইটালী এবং জার্ম্মানী স্পেনকে হাত করিয়া ভূমধ্যসাগরের পথ জুড়িয়া যখন বসিবে এবং আফ্রিকা ও পশ্চিম এসিয়ার দিকে হাত বাড়াইবে, তখন ঐ সব যুক্তি তাঁহার টিকিবে কোথায়! ফ্যাসিষ্ট-পন্থীদের পিপাসা পূর্ণ করিয়া তিনি তাহাদের জিহ্বায় রক্তের লোভই বাড়াইয়া দিয়াছেন, এবং তাহার পরিণাম কি ইংরেজ কি ফরাসী কেহই এড়াইতে পারিবে না। সাম্রাজ্য স্বার্থকে অক্ষত রাখিবার জন্য আদর্শহানির যে পাপ সাম্রাজ্যবাদীরা অর্জ্জন করিয়াছে, সেই পাপই তাহাদের সাম্রাজ্য-সাধনাকে আসিয়া রূঢ়ভাবে আঘাত করিবে, এবং সে দিনের আর দেরী নাই। দুইয়ে দুইয়ে চার, ইহা যেমন সত্য, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর এই নয়া দোস্ত, হিটলার ও মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁহার মতদ্বৈধ এবং ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে স্বার্থের ঠোকাঠুকী তেমনই সত্য।

উপনিবেশ চাই—

হের হিটলার তাঁহার বক্তৃতায় খোলাখুলিভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, স্পেনে যাহাতে বোলশেভিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেজন্য তিনি স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দলকে সাহায্য করিতেছেন। এখন স্পেনে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তাই সুর এমন সুস্পষ্ট। হিটলার বলিয়াছেন,—জার্ম্মানী গ্রেট ব্রিটেন অথবা ফ্রান্সের কোন রাজ্য চাহে না; কিন্তু তাহার উপনিবেশগুলি সে চায়। হিটলার বলিয়াছেন, জার্ম্মানীর উপনিবেশগুলি জার্ম্মানীকে ফিরাইয়া দিবার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই। উপনিবেশগুলির সম্পর্কে ইংরেজের উপর তাঁহার যে মনের ভাব চেম্বারলেনের প্রশংসার বাগাড়ম্বরে হিটলার তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, বিগত মহাসমরের পূর্ব্বে এই কথা বলা হইত যে, জার্ম্মানীর সাম্রাজ্যশক্তি যদি এলাইয়া পড়ে, তাহা হইলে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব জোর বাড়িবে; কিন্তু জার্ম্মানীর ঔপনিবেশিক শক্তি হ্রাস পাওয়াতে ইংরেজের ধন-সম্পদ কিছু বাড়ে নাই। কিন্তু জার্ম্মানী এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শক্তিশালী হইয়াছে। উপনিবেশগুলির যদি কোন মূল্যই না থাকে, তাহা হইলে জার্ম্মানীকে সেগুলি দেওয়াতে কাহারও অন্তর্দ্দাহ ঘটিবার কোন কারণ নাই। হিটলার তাঁহার নিজের এই ধারণা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উপনিবেশগুলি ফিরিয়া পাইবার পক্ষে যুক্তি-তর্কে কোন কাজ হইবে না, একমাত্র শক্তিরই মূল্য সেখানে। 'জোর যার মুল্লুক তার'—সভ্য জাতিসমূহের একমাত্র নীতি হইল ইহাই। হিটলার এই কথাই বলিয়াছেন এবং জানাইয়া দিয়াছেন যে, শক্তিতে তাঁহারা কাহারও চেয়ে কম নহেন। শক্তি প্রয়োগ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহার কথা এই,—আমাদিগকে খাদ্য ক্রয় করিবার জন্য আমাদের মালপত্র বাহিরে রপ্তানি করিতে হইবে। এই রপ্তানির জন্য জায়গা চাই, সুতরাং চাই উপনিবেশ। উপনিবেশ না পাইলে জার্ম্মান জাতি মরিবে। কিন্তু জার্ম্মানেরা মরিবে না, জার্ম্মান জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য জার্ম্মানীর নেতারা তাঁহাদের শক্তি যতদূর সম্ভব প্রয়োগ করিবেন। ইংরেজ কিম্বা ফরাসীর উপর জার্ম্মানীর কোন বিদ্বেষ নাই—কিন্তু চাই উপনিবেশ। আপাতত এই জার্ম্মানীর দাবী; কিন্তু এইখানেই যে শেষ নয়, সকলেই তাহা বুঝিতেছে। হিটলারের পিছনে যে রহিয়াছেন মুসোলিনী, এই দুইয়ে তফাৎ সম্ভব হইবে না, হিটলার এ-কথাও জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, ইটালী যদি যুদ্ধে জড়িত হয়, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, জার্ম্মানী ইটালীর পক্ষে দাঁড়াইবে। আতঙ্ক তো এইখানেই এবং এই দিক দিয়াই ইংরেজ, ফরাসীর সঙ্কট এবং সঙ্কটটা যে অদূরভবিষ্যতে আকার ধরিয়া উঠিবে, স্পেনে গণতন্ত্রীদের পরাজয় এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কোর প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার পর ইহা সূর্য্যের আলোর মত সুস্পষ্ট।

ইউরোপের মুক্তি—

বার্সিলোনা পতন এবং চেম্বারলেন ও মুসোলিনী মোলাকাতের পর হিটলার কি বাণী উচ্চারণ করেন, তাহা শুনিবার জন্য বিশ্ব-জগৎ উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, গত ৩০শে জানুয়ারী নাৎসী রাজত্বের ষষ্ঠ স্মৃতি-বার্ষিকী উৎসবে বক্তৃতা করিতে গিয়া হিটলার বলিয়াছেন, "বোলসেভিকদের পাল্লায় পড়িয়া ইউরোপীয় সভ্যতা ধ্বংস হইতে বসিয়াছিল, একদিকে সিনর মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট দল এবং অপর দিকে তাঁহার নাৎসী বাহিনী ইউরোপকে বোলসেভিকবাদের বিভীষিকা হইতে মুক্তি দিয়াছে। বোলসেভিকদের চেলা সাজিয়া ইহুদীরাও ইউরোপীয় সভ্যতা এবং বিশ্ব-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাঁহারা সে আতঙ্ক হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিয়াছেন, অঘটন ঘটাইয়াছেন ছয় বৎসরের মধ্যে।" এ ঘটন যে হিটলার-মুসোলিনী ঘটাইয়াছেন এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে জার্ম্মানী একেবারে ধ্বংস হইয়াছিল বলিলে চলে, হিটলার সেই জার্ম্মানীকে এত জোরালো করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাহার ভয়ে আজ বলিতে গেলে সারা বিশ্ব থরহরি কম্পমান হইতেছে। ব্রিটিশ সিংহ লাঙ্গুল গুটাইয়া হিটলারের চরণ লেহন করিতে আজ ব্যস্ত। অঘটন ঘটান ঠিকই। যদি কেবল ধর মার কাট, একে অপরের টুটি কামড়াইয়া

ধরিবার কায়দা, এই সবই ইউরোপীয় সভ্যতার লক্ষণ হয়, তবে হিটলার-মুসোলিনী তাহার স্বরূপ উন্মুক্ত হইতে সাহায্য করিয়াছেন, এ কথা স্বীকার্য্য—কিন্তু সত্যই কি তাহাই? আমরা এশিয়ার কালা আদমীদের এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল, হিটলারের এবং মুসোলিনীর মাহাত্ম্যে সে সন্দেহ যদি এতদিনে ঘুচিয়া যায় তবেই মঙ্গল। নতুবা হিটলার এবং মুসোলিনীর কৃপায় নব-মুক্ত ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতাপে আমাদিগকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইতে হইবে। ব্রিটিশ সিংহের কৃপায় আমরা যে পঞ্চপ্রাণ বেশী দিন বজায় রাখিতে পারিব এমন ভরসা নাই।

দেশীয় রাজ্যে অত্যাচার—

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি "হরিজন" পত্রে লিখিয়াছেন,—"রণপুরে একজন পলিটিক্যাল এজেণ্ট খুন হইয়াছেন। পুলিশ এবং সৈন্যেরা নির্দ্দোষ নর-নারীদের উপর অত্যাচার করিয়া স্ফূর্ত্তি করিবার বেশ সুবিধা পাইয়াছে। আমি আশা করি উড়িষ্যা সরকার এ বিষয়ে শক্ত থাকিবেন এবং ভারত গবর্ণ-মেণ্টকে এদিকে যথেচ্ছাচার চালাইতে দিবেন না। মেজর বাজলগেটের হত্যাকাণ্ডের ন্যায় শোচনীয় ব্যাপারের মত ক্ষেত্রে ভারত সরকার যখন নিজেদের সম্প্রদায়ের কাহাকেও হারায়, তখন তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া যায়।" মহাত্মাজী লিখিয়াছেন, দেশীয় রাজ্যসমূহে স্বাধীনতার আন্দোলনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। আমরা দেখিতেছি সে অধ্যায়ের সূচনা। অপরিমিত ক্ষমতা যাহারা পাইয়া বসিয়াছে, তাহারা সহজে সেগুলি ছাড়িতে পারে না, যখন বাধ্য হয় তখনই ছাড়ে। কয়েকটি রাজ্যে প্রবল প্রজা আন্দোলনের ফলে কর্ত্তাদের একটু আধটু চৈতন্য হইলেও তাহা কিছু কালের জন্য মনে হইতেছে, এবং কর্ত্তারা পুনরায় প্রথম সুযোগেই স্বমূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতে-ছেন, রাজকোটে সেই অভিনয় চলিতেছে। তালচের রাজ্যের অবস্থারও বিশেষ কোন উন্নতি ঘটে নাই। তালচের রাজ্যের ৭৫ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২৬ হাজার লোক নিজেদের ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া ব্রিটিশ শাসিত উড়িষ্যায় আশ্রয় লইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, অবস্থা কিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। হায়দরা-বাদের অবস্থারও কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজ জয়পুর প্রদেশের নিষেধ-বিধি অমান্য করিবার জন্য জয়পুরে যাইতেছেন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যসমূহের এই গণ-আন্দোলন সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। মহাত্মাজীর উক্তিতেও এতৎসম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি সংস্কারের আসন্নতার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে এই যে গণ-জাগরণ, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সত্যই ইহা একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতেছে, বুঝা যাইতেছে যে, নিরন্ধ্র তিমির-গর্ভেও সূর্য্যের আলো ঢুকিয়াছে।

ফেল কাড়ি মাখ তেল—

বাঙলার অর্থ-সচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার সেদিন মাণিকগঞ্জে গিয়াছিলেন। বন্যার ফলে বাঙলার অধিকাংশ অঞ্চলের ঘরেই এবার অন্ন নাই, এমন দুর্ব্বৎসরে শিক্ষাকরের হাত হইতে যাহাতে লোককে রেহাই দেওয়া হয়, তজ্জন্য মহ-কুমার লোকেরা তাঁহাকে অনুরোধ করে। উত্তরে অর্থ-সচিব মহাশয় মাণিকগঞ্জের অধিবাসীদিগকে মধুর মধুর কথা শুনাইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আপনাদের উপকারের জন্যই এই শিক্ষাকর বসান হইয়াছে। শিক্ষা বড়ই উমদা চীজ। খাওয়া-পরা যেমন জীবন রক্ষার জন্য দরকার তেমনই শিক্ষাও দরকার। গ্রামের লোকদের শিক্ষার উপরই গ্রামের উন্নতি প্রভৃতি সব নির্ভর করিতেছে। বৎসরে চার আনা, আট আনা, বড় জোর একটা করিয়া টাকা এমন বেশী কি?—ইত্যাদি। খুবই ভাল কথা; কিন্তু উদরান্নের চিন্তা যাহার নাই, তাহার পক্ষে এ সব কথা বলা খুবই সোজা। উদরান্নের জন্য যাহারা হাহাকার করিতেছে, তাহাদের ঘাড়ে যদি শিক্ষাকরের মুষল আসিয়া চাপে অন্য দশ রকম চাপের সঙ্গে তবে তাহাদের অবস্থা যে কি রকম দাঁড়ায়, অর্থ-সচিবের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। শিক্ষার উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব যে অর্থ-সচিবই একা বুঝেন, ইহা নয়, দেশের সকল লোকেই তাহা বুঝিতে পারে; কিন্তু সকলের আগে পেটের দায়। আগে জীবন রক্ষা, তার পরে শিক্ষা-দীক্ষা। গ্রামের লোকদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থাটা কর্ত্তারা যদি করিতে পারিতেন, দেশের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশা কমাইবার কার্য্যকর কোন একটা ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তবে শিক্ষার এই সব মাহাত্ম্য প্রচার তাঁহাদের মানাইত। নিজেরা মাসে মাসে মোটা বেতন পকেটে পুরিব, দেশের লোকের টাকা নানা রকমে বেহুদা ব্যয়ে উড়াইব আর শিক্ষার কথা তুলিলেই শুনান হইবে—ফেল পয়সা মাখ তেল। আমরা বড় বাহাদুর, তোমাদের ভাবনায় আমাদের ঘুম হয় না। এ ধরণের বুজরুকীতে দেশের লোকে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিজেরা মোটা বেতন পকেটে পুরিয়া যাহারা দেশের লোকদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাটা বিনা পয়সায় করিতে পারে না, যদি তাহাদের কোন রকম আক্কেল থাকিত, তাহা হইলে লজ্জায় তাহাদিগকে অধোবদন হইতে হইত, নিজেদের মুখ দিয়া নিতান্তই ফাঁকা এমন মধুর মধুর বুলি বাহির হইত না।

শিক্ষার গলদ—

গত ২৯শে জানুয়ারী ফরিদপুর জেলার শিক্ষা সাম্মিলনীর দ্বাদশ অধিবেশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এই সম্মিলনীর সভাপতিস্বরূপে বলিয়াছেন—"এক কালে বিদেশী রাজশক্তি নিজের কাজের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান শিক্ষার পত্তন করে, তাই দেশে সেদিন যে প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল, তাকে অকস্মাৎ পালটে দেওয়া হল। পুরানোকে বাদ দিলে ততটা ক্ষতি হয় না, যদি তার বদলে দেশের প্রয়োজনের তাগিদে নূতন শিক্ষারীতি গড়ে উঠত। সেদিন কিন্তু তা হয় নি। ইংরেজের সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল কেরানীর—যারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজকার্য্য চালাতে উচ্চতন ইংরেজ বণিক ও কর্ম্মচারীকে সাহায্য করতে পারবে। তার জন্য চাই ভাষার খানিক নিপুণতা, বুদ্ধির বিকাশের কোন প্রয়োজন

সেখানে নেই। চিন্তা করতে গেলেই নানা কথা আসে মনে, তার মধ্যে সন্দেহ সংশয় এবং প্রশ্নেরও আভাস বহু। তাই সেদিন যে শিক্ষার পত্তন হয়েছিল বুদ্ধির বিকাশ বা চিন্তার স্বাধীনতার চেয়ে ভাষাতত্ত্ব এবং তথ্যজ্ঞানের দিকেই ছিল তার লক্ষ্য। বহুদিন শিক্ষার ও গোড়ার গলদ ধরা পড়েনি, কারণ শিক্ষার লক্ষ্য ছিল চাকুরী এবং শিক্ষার ফলে চাকুরী ছিল সহজলভ্য। কিন্তু চাকুরী আকাঙ্ক্ষীর দল এত বেড়ে গেল যে চাকুরী হয়ে উঠল দুর্লভ এবং শিক্ষার্থীর দল দেখল যে, চাকুরী ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। আজ দিন দিন সেই গলদ হ'য়ে উঠছে স্পষ্টতর। শিক্ষিত বেকারের দল তিক্ত অভিজ্ঞতায় শিখছে যে, তাদের শিক্ষা তাদের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ করেনি, কেবলমাত্র তাদের কর্ম্মকুশলতাকে সংকুচিত করেছে।"

শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষ গড়া, কিন্তু এদেশে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হইল গোলাম গড়া। এই নীতি এখনও চলিতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী প্রভৃতি প্রয়াসের মূলে রহিয়াছে এই মনোবৃত্তি এ দেশের তরুণদের মনের স্বচ্ছন্দ বিকাশকে সঙ্কুচিত করিয়া বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থকে নিরাপদ রাখা। বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল, সে প্রভাবের পাকেই পরিচালিত হইতেছেন। যুবকেরা মানুষের মত মথা তুলিয়া দাঁড়ায়, চারিদিকে চাহিয়া বুঝিয়া চলিতে শিখে, ইহাকে তাঁহারাও ডরাইতেছেন। ডরাইতেছেন নানা কারণে; সাম্রাজ্য-বাদীদের পাকচক্রের প্রভাব তো তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হইতেছেই, তাহা ছাড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মন যোগাইয়া তাঁহাদের চলা চাই, কারণ, তাঁহাদের বড় জোর সেইদিকের জোর। এ অবস্থা না কাটাইলে বাঙ্গলাদেশে শিক্ষার সংস্কার প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রয়োজনানুযায়ী হওয়া সম্ভব নয়।

কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে আয়োজন— ...

গত মঙ্গলবার অতিরিক্ত কলিকাতা গেজেটে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন বিলটি প্রকাশিত হইয়াছে। হক মন্ত্রিমণ্ডল এই বিলটি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট সেসনে উপস্থিত করিবেন। এই বিল অনুসারে কর্পোরেশনের সদস্য সংখ্যা ৯২ হইতে ৯১টি করা হইবে। এই ৯১টি সদস্যের মধ্যে ৪৬ জন সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন, সাতটি সদস্যপদ নাকি তপশীল ভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত, ২২জন মুসলমান সদস্য মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা ক্রমে নির্ব্বাচিত হইবেন। শ্রমিক নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন দুইজন, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নির্ব্বাচক-মণ্ডলী হইতে দুইজন, বারটি পদ থাকিবে শ্বেতাঙ্গদের জন্য বিশেষভাবে; দশজন সদস্য মনোনীত হইবেন গবর্ণ-মেণ্টের দ্বারা, পাঁচজন থাকিবেন অল্ডারম্যান। "এই বিলের ব্যবস্থা হইতেই দেখা যাইতেছে, সাধারণভাবে নির্ব্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা দাঁড়াইবে মাত্র ৩৯ জন; সুতরাং কর্পোরেশনে ইঁহারা পাকাপাকি রকমে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ থাকিবেন। সাম্প্র-দায়িকতাবাদীর দল শ্বেতাঙ্গ প্রভৃতি দলের সঙ্গে যোগ দিয়া কর্পোরেশনে সর্দ্দারী করিবেন। হক সরকার ইহার কৈফিয়ৎ স্বরূপে বলিতেছেন যে, যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথায় মুসলমান সমাজ সন্তুষ্ট নহেন। মুসলমান সমাজের মত এই যে, যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথার সহায়ে যে-সব মুসলমান কর্পোরেশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা প্রধানত হিন্দুদের ইচ্ছানুযায়ীই কাজ করিয়া থাকেন, মুসলমানদের স্বার্থ প্রকৃতভাবে দেখেন না। বলা বাহুল্য, এই যে যুক্তি ইহার কোন মূল্য নাই। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাবাদী হক মন্ত্রি-মণ্ডল এই যুক্তি খাড়া করিয়া সেই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরই মুখপাত্রের কাজ করিয়াছেন, করিয়াছেন তাঁহাদের কথারই প্রতিধ্বনি। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনে মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রথার পত্তন করিয়া দেশের স্বার্থের সমভিত্তিতে জাতীয়তার যে উদার আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, হক মন্ত্রিমণ্ডল আজ সেই আদর্শকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দলের ক্রীড়নকস্বরূপে আজ বাঙালীর রাষ্ট্রীয় দেহে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাম্প্রদায়িকতাকে ঢুকাইবেন, ইহাই দেখা যাইতেছে হক মন্ত্রিমণ্ডলের সাধ্য এবং সাধনা। এই সাধনা সার্থকতার পথে যতই অগ্রসর হইবে, ততই বাঙলার হইবে সর্ব্বনাশ। বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতি, জাতীয়তা, মোটের উপর বাঙলার সমস্ত আশা-ভরসা নষ্ট হইবে। দেশ জুড়িয়া হীন স্বার্থপর সাম্প্র-দায়িকতাবাদীদের লীলা-তাণ্ডব সুরু হইবে। দেশ এবং জগতকে এই সর্ব্বনাশের পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাঙালীর সমগ্র সুস্থ শক্তি কি এখনও সচেতন হইবে না?

পরলোকে ইয়েট্‌স—

আইরিশ কবি ইয়েট্‌সের মৃত্যুতে বিশ্ব-সাহিত্যের আকাশ হইতে একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অন্তর্হিত হইল। কবি ইয়েট্‌স্ ভারতবাসীর কাছে বিশেষভাবে পরিচিত গীতাঞ্জলির ভূমিকার লেখকরূপে। ভারতবর্ষের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁহার চিন্তাধারার গভীর যোগ ছিল। আত্মার অমরত্বে তিনি বিশ্বাস করিতেন। ভগবদ্গীতার বাণীকেও তিনি অমর সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে তিনি আয়ার্লণ্ডের নাট্যজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। তাঁহার লিখিত নাটকগুলি দর্শকদের করতালির মধ্যে বারম্বার অভিনীত হইয়া থাকে। কবি হিসাবেও এমন বিচিত্রপ্রতিভা-সম্পন্ন এবং উন্নতভাবসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী কবি ইংরেজী সাহিত্যে বিরল। পণ্ডিতমণ্ডলী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ পুরস্কার দিয়া আপনাদের যথার্থ গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনাশক্তি বাস্তবের দায়িত্বকে কখন অস্বীকার করে নাই। আইরিশ জাতি তাই ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইয়েট্‌সকে ফ্রী ষ্টেট গবর্ণমেণ্টের প্রথম সিনেটরদের অন্যতম সদস্যপদে বরণ করিয়া গুণের যথার্থ সমাদর করিয়াছেন। কবি ইয়েট্‌সের মৃত্যু কাব্যের জগতে এমন একটি শূন্যতার সৃষ্টি করিল যাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(৫)

মানব জাতির ঐক্য সাধন সমস্যার বিশেলষণ করিলে দুইটি দুরূহ প্রশ্ন উঠে—প্রথমত, মানব সমাজের ক্রম-বিবর্ত্তনে ইতিমধ্যেই যে-সব সমষ্টিগত অহমিকা সৃষ্ট হইয়াছে, সেইগুলিকে কি এই সময়ে এমনভাবে প্রশমিত বা লুপ্ত করা যাইতে পারে, যাহাতে আমাদের বর্ত্তমান নৈতিক ও সামাজিক প্রগতির অবস্থায় একটা বাহ্যিক ঐক্যও কোন কার্য্যকরী আকারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহার মূল্যস্বরূপ কি ব্যক্তির স্বাধীন জীবন এবং যে-সব বিচিত্র সমষ্টি-সত্তা ইতিপূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে (যেখানে বাস্তব ও সক্রিয় জীবনী-শক্তি রহিয়াছে) তাহাদের স্বাধীন ক্রিয়া, উভয়কেই পিষ্ট হইতে হইবে না এবং সেই স্থলে এমন একটি রাষ্ট্র-সংবিধান গড়িয়া তুলিতে হইবে না, যাহা মানব জীবনকে যন্ত্রবৎ করিয়া তুলিবে? আর এই দুইটি অনিশ্চয়তা ছাড়াও তৃতীয় একটি প্রশ্ন রহিয়াছে, কেবল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ঐক্য সাধনের দ্বারা প্রকৃত জীবন্ত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি না; তৎপূর্ব্বে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের অন্তত সুদৃঢ় সূত্রপাত করা কর্ত্তব্য কি না? আমরা এখন প্রথম প্রশ্নটিই বিবেচনা করি[illegible]।

মানবীয় প্রগতির বর্ত্তমান অবস্থায় অধিজাতি (nation) হইতেছে মানুষের সমষ্টি-সত্তার বাস্তবিকপক্ষে জীবন্ত রূপ। সাম্রাজ্য সকল রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা এখনও কেবল রাজনৈতিক ঐক্য, বাস্তব ঐক্য নহে; ভিতর হইতে তাহাদের কোন জীবন-শক্তি নাই, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত অংশ সকলের উপরে বলপ্রয়োগের দ্বারাই তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইতেছে, অথবা ঐ সকল অংশ কোনরূপ রাজনৈতিক সুবিধা উপলব্ধি করিতেছে বা মানিয়া লইতেছে এবং বাহিরের জগৎও তাহাতে সায় দিতেছে। এইরূপ সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইতেছে,—অষ্ট্রিয়া;* ইহা ছিল একটি রাজনৈতিক সুবিধা-জনক ব্যবস্থা এবং এখনও কিয়ৎপরিমাণে তাহাই রহিয়াছে, বাহিরের জগৎ ইহার অনুমোদন করিয়াছে, ইহার অন্তর্ভুক্ত অংশ সকলও সেদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থায় সায় দিয়াছে, এবং ইহাকে শক্তি দ্বারা রক্ষা করিয়াছে। অষ্ট্রিয়ার কেন্দ্রস্বরূপ জার্ম্মান সম্প্রদায়ের মূর্ত্তি-বিগ্রহ হাপসবার্গ রাজবংশ (Hapsburg dynasty) এবং এ বিষয়ে তাহারা তাহাদের অংশীদার মাজ্য়ারের (Magyer or Hungary) সক্রিয় সাহায্য পাইয়াছে। যদি ঐ রাজনৈতিক সুবিধার অবসান হয়, যদি অন্তর্ভুক্ত অংশগুলি সম্মতি দিতে বিরত হয় এবং কোন কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) শক্তির দ্বারা অধিকতর সরলভাবে আকৃষ্ট হয় (বস্তুত এখন ইহাই হইতেছে) এবং সেই সঙ্গেই যদি বাহিরের জগৎ এই সমবায়কে ভাল চক্ষে না দেখে, তাহা হইলে এই কৃত্রিম ঐক্যকে বজায় রাখিবার একমাত্র বিধান থাকিবে বলপ্রয়োগ। বস্তুত, অষ্ট্রিয়া দ্বারা এখন একটি নূতন রাজনীতিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু সেই প্রয়োজন হইতেছে জার্ম্মান আদর্শের এবং সেই জন্যই তাহা ইউরোপের অন্যান্য অংশের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়াছে এবং যে-সকল বিশিষ্ট অন্তর্ভুক্ত অংশ অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের বাহিরে অন্যভাবে সম্বন্ধ হইতে চায়, তাহাদের সম্মতিও আর থাকিতেছে না। সেই মুহূর্ত্তে হইতেই অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হইয়াছে, এখন আর তাহা কোন আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; এখন তাহা প্রতিষ্ঠিত দুইটি জিনিষের উপর; প্রথমত, অষ্ট্রো-মাজ্য়ার মৈত্রীর মধ্যে স্লাভ্ জাতিগণকে দমন করিবার সামর্থ্য এবং দ্বিতীয়ত, ইউরোপে জার্ম্মানী ও জার্ম্মান আদর্শের স্থায়ী শক্তি ও প্রাধান্য, অর্থাৎ অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য দাঁড়াইয়া রহিল শুধু বলের উপর। আর যদিও অষ্ট্রিয়াতেই সাম্রাজ্যগত ঐক্যের দুর্ব্বলতাটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে এবং ইহার বিধানগুলি যেন অতিবর্দ্ধিতভাবেই দেখা গিয়াছে, তথাপি যে-সকল সাম্রাজ্যিক ঐক্য অধিজাতি-গত ঐক্য নহে, তাহাদের সকলের অবস্থা অনুরূপ। সে বেশী দিনের কথা নয়, যখন অধিকাংশ রাজনীতিবিদই ইহা অন্তত সম্ভব বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশগুলির পক্ষে জাতি, ভাষা ও উৎপত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দরুন মাতৃভূমির সহিত সংযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য হইলেও, তাহারা আপনা হইতেই সরিয়া দাঁড়াইবে এবং এইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটি আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইহার কারণ এই ছিল যে, সাম্রাজ্যিক ঐক্যের যে রাজনীতিক সুবিধা উপনিবেশগুলি ভোগ করিতেছিল, তাহারা যথেষ্টভাবে ইহার মূল্য উপলব্ধি করে নাই, অন্যপক্ষে জাতীয় ঐক্যের কোন জীবন্ত শক্তি ছিল না, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার অধিবাসিগণ নিজেদিগকে বিস্তৃত ব্রিটিশ জাতির অংগ মনে না করিয়া, নূতন স্বতন্ত্র অধিজাতি বলিয়াই মনে করিতেছিল। এই দুইটি বিষয়েই এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং সেই অনুপাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটি অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে।

যাহাই হউক, রাজনৈতিক ঐক্য এবং বাস্তব ঐক্য—এই-রূপ প্রভেদ করিবার সার্থকতা কি? এই প্রভেদ করিতেই হয়, কারণ, সত্য ও গভীর রাজনৈতিক শাস্ত্রের পক্ষে ইহার উপ-যোগিতা সমধিক এবং ইহার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম সকল নিহিত রহিয়াছে। যদি অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের ন্যায় জাতিগত ঐক্যহীন একটি সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং ইহার খুবই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে তাহা চিরদিনের

---

*এই অধ্যায়টি ১৯১৬ সালে জানুয়ারী মাসে Arya পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ এখানে বিশেলষণ করিয়া যেরূপ দেখাইয়াছেন পরে ঠিক সেই ভাবেই অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অবসান হইয়াছে। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে অষ্ট্রিয়া নানাদিকে ভীষণভাবে পরাজিত হয়, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অধীন বিভিন্ন জাতি সকল বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে, হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়াতে গণতন্ত্র ঘোষিত হয় এবং অষ্ট্রিয়া মিত্রশক্তির সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। তাহার অল্পদিন পরেই জার্ম্মানী শোচনীয়ভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং ভার্সাই সন্ধির দ্বারা হাপসবার্গ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়।

জন্যই লুপ্ত হইবে; বাহ্যিক ঐক্যটিকে পুনঃস্থাপিত করিবার কোন আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তি থাকিবে না, কারণ সেখানে কোন বাস্তব ঐক্য নাই, কেবল রাজনৈতিক উপায়ের দ্বারা একটা সমবায় গড়িয়া তোলা হইয়াছে। অন্যপক্ষে কোন বাস্তব জাতীয় ঐক্য যদি ঘটনাচক্রের দ্বারা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার মধ্যে সেই ঐক্যকে ফিরিয়া পাইবার এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার একটা প্রবৃত্তি সকল সময়েই থাকিবে। গ্রীক্ সাম্রাজ্য অন্যান্য সকল সাম্রাজ্যের পথই অনুসরণ করিয়াছে, কিন্তু গ্রীক্ অধিজাতি বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক অনস্তিত্বের পর পুনরায় তাহার স্বতন্ত্র দেহ পাইয়াছে, কারণ সে তাহার স্বতন্ত্র অহংকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং সেই জন্যই আচ্ছন্নকারী তুরস্ক-শাসনের অধীনে সে বস্তুতঃপক্ষে বিদ্যমান ছিল। তুরস্ক-শাসনের অধীন সকল জাতিরই ঐরূপ হইয়াছে; কারণ, ঐ শক্তিশালী আধিপত্য বহু বিষয়ে কঠিন হইলেও তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সকলকে লুপ্ত করিতে অথবা সেই স্থলে অটোমান (তুর্কি) জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে কখনও প্রয়াস করে নাই। আর এই সকল জাতি যে-পরিমাণে তাহাদের বাস্তব জাতীয়তাবোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই তাহারা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং স্বভাবতই নিজেদিগকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিতেছে; সার্বিয়ান জাতীয়তাবোধ যে-সকল দেশে সার্ব জাতির বাস বা প্রাধান্য, সেই সবকে ফিরিয়া পাইতে চেষ্টা করিতেছে; গ্রীস নিজকে তাহার ইউরোপীয় ভূভাগে, দ্বীপসকলে এবং এশিয়াস্থিত উপনিবেশ সকলে পুনর্গঠিত করিতে চাহিতেছে, কিন্তু এখন আর সেই প্রাচীন গ্রীস গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে, কারণ থ্রেসও (Thrace) এখন আর ততটা গ্রীক্ নহে, যতটা সে বুল্গার জাতীয় হইয়া পড়িয়াছে। সেইরূপই আমরা দেখিতে পাই যে, ইটালী বহু শতাব্দীর পরে পুনরায় বাহ্য ঐক্য ফিরিয়া পাইয়াছে, কারণ রাষ্ট্র হিসাবে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও জাতি হিসাবে সে কখনই লুপ্ত হয় নাই।

বাস্তব ঐক্যের এই সত্যটি এতই শক্তিশালী যে, এমন কি, যে-সকল অধিজাতি কখনই বাহ্যিক ঐক্য সাধনে সমর্থ হয় নাই, ভাগ্য এবং ঘটনাচক্র এবং, তাহারা নিজেরাই যাহার প্রতিকূল ছিল, যাহারা কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে পূর্ণ ছিল এবং সহজেই বিদেশীর আক্রমণে অভিভূত হইয়াছিল, তাহারাও সকল সময়ে কেন্দ্রাভিগ শক্তিরও বিকাশ করিয়াছে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্যে উপনীত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীস তাহার স্বাতন্ত্র্যমুখী প্রবৃত্তিগুলিতে, তাহার স্ব-পর্য্যাপ্ত নগরতন্ত্র এবং প্রাদেশিক তন্ত্রে, তাহার পরস্পরবিরোধী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ং-শাসিত সঙ্ঘ সকলে অনুরক্ত ছিল, কিন্তু কেন্দ্রাভিগ (Centripetal) শক্তি সকল সময়েই বিদ্যমান ছিল, তাহা রাষ্ট্র সকলের সমবায় এবং স্পার্টা ও এথেন্সের সার্ব্বভৌমত্বের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইত এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল; প্রথমত, আংশিক ও সাময়িকভাবে মাসিডোনিয়ান আধিপত্যের দ্বারা এবং পরে এক বিস্ময়কর পরিণতির দ্বারা, তাহা প্রাচ্য রোমান জগতের গ্রীক্ ও বিজাতীয় সাম্রাজ্যরূপে বিকাশের ভিতর দিয়া সংঘটিত হইয়াছিল। সেইরূপ আমাদের যুগেও আমরাও দেখিয়াছি, প্রাচীনকাল হইতে চির-বিভক্ত জার্ম্মানী তাহার অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধকে অবশেষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণভাবে বিকাশ করিয়াছে, তাহা দুর্দ্ধর্ষ হোহেনজলেরন সাম্রাজ্যের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আর যাঁহারা কারণভূত শক্তি সকলের ক্রিয়া অনুধাবন করেন, কেবল বাহ্যিক ঘটনাগুলিরই গতি লক্ষ্য করেন না, তাঁহারা কিছুমাত্র বিস্মিত হইবেন না যদি বর্ত্তমান যুদ্ধের নিকট বা দূরবর্ত্তী ফলস্বরূপ জার্ম্মান জাতির একমাত্র অবশিষ্ট অংশ, অষ্ট্রো-জার্ম্মান অংশ এক অখণ্ড জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়,—যদিও তাহা হোহেনজলেরন সাম্রাজ্য বা প্রুসিয়ার আধিপত্য ভিন্ন অন্য কোন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। এই দুইটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে এবং স্যাক্সন ইংলণ্ড, মধ্য যুগীয় ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য বহুক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, একটা বাস্তব ঐক্য, একটা চেতনামূলক বিশিষ্ট সত্তা প্রথমে অজ্ঞানে তাহার অবচেতন প্রয়োজনের প্রেরণায়, পরে রাজনৈতিক ঐক্যবোধের হঠাৎ বা ক্রমিক জাগরণে অবশ্যম্ভাবীরূপে বাহ্যিক ঐক্য সাধনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এক বিশিষ্ট সমষ্টিগত সত্তা প্রগতির প্রয়োজনের দ্বারা চালিত হয় এবং বাহ্যিক ঘটনা পরম্পরার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজের জন্য এক সুসম্বদ্ধ শরীর গঠন করিয়া তোলে।

কিন্তু ইতিহাসে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতেছে ভারতের ক্রমবিবর্ত্তন। আর কোথাও কেন্দ্রাতিগ শক্তিসমূহ এত প্রবল, বহুসংখ্যক, বিচিত্রতাময় এবং অনমনীয় ছিল না; এই ক্রমবিবর্ত্তনে কেবল সময়ই যাহা লাগিয়াছে, তাহা অতি অসাধারণ; যে-সব বিভ্রাটজনক ভাবী পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া ইহাকে কার্য্যত ক্রমশ অগ্রসর হইতে হইয়াছে, সে-সব অতি ভয়াবহ, অথচ এই সবের ভিতর দিয়াই এ অবশ্যম্ভাবী প্রবৃত্তিটি নিরন্তর অটলভাবে কার্য্য করিয়াছে, প্রকৃতি তাহার সহজাত উদ্দেশ্য সকলের সাধনে মানুষের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইলে, যেরূপ স্থূল, অস্পষ্ট, অদম্য, নির্ম্মম দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করে, সেইভাবেই কার্য্য করিয়াছে এবং সহস্র সহস্র বৎসরের আপ্রাণ চেষ্টার পরে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে। আর প্রকৃতি যখন এইভাবে তাহার মানস ও মানবীয় যন্ত্র সকলের দ্বারা ব্যাহত হয়, তখন সাধারণতঃ যেরূপ ঘটিয়া থাকে, সর্ব্বাপেক্ষা বিরোধী পরিস্থিতিগুলিই অবচেতন কর্ম্মরীতির দ্বারা তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্যময় যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। আমরা ভারতের যে প্রাচীনতম ইতিহাস পাই, তখন হইতেই এখানে কেন্দ্রাভিগ (Centripetal) শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, ইহার নিদর্শন পাওয়া যায় সম্রাট এবং চক্রবর্ত্তী রাজার আদর্শে এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োগে। ভারতের দুইটি জাতীয় মহাকাব্য সম্ভবত এইটিকেই পরিস্ফুট করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল, কারণ একটি হইতেছে ঐক্য-সাধক ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের ইতিহাস, আর অপরটির আরম্ভ হইতেছে এমনই এক রাজ্যের আদর্শাত্মক বর্ণনা

লইয়া, তাহা দেশের প্রাচীন ও পূণ্য অতীতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া চিত্রিত হইয়াছে। আর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস হইতেছে পর্য্যায়ক্রমে সাম্রাজ্য সকলের ইতিহাস, তাহাদের কোনটি দেশীয়, কোনটি বিদেশীয়, প্রত্যেকটিই কেন্দ্রাতিগ শক্তি সকলের দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে, প্রত্যেকটিই কেন্দ্রাভিগ প্রবৃত্তিকে বিজয়মণ্ডিত অভ্যুত্থানের অধিকতর নিকটবর্ত্তী করিয়া দিয়া গিয়াছে। আর ইহা খুবই অর্থপূর্ণ যে, শাসনটি যে-পরিমাণে বিদেশীয় হইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই পরাধীন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে তাহার শক্তিও অধিক হইয়াছে। সকল সময়ে এইটি হইতেছে নিশ্চিত লক্ষণ যে, মূল জাতীয় ঐক্য সত্তা সেখানে ইতিপূর্ব্বেই রহিয়াছে এবং অবিনাশ্য জাতীয় প্রাণশক্তি রহিয়াছে, তাহা সঙ্ঘবদ্ধ অধি-জাতির অবশ্যম্ভাবী অভ্যুত্থানকে অনিবার্য্য করিয়া তুলিতেছে। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, যে চৈতন্যগত ঐক্য জাতীয়ত্বের ভিত্তি সেইটিকে যে বাহ্যিক সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্যের দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধি তাহাতে পরিণত করিতে দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছে এবং এখনও তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই; অথচ মূল আবশ্যকীয় বস্তুটি একবার আবির্ভূত হওয়ার ভীষণতম বাধা ও বিপত্তি সকল, জাতির মধ্যে মিলন সাধনের নিরন্তর অক্ষমতা এবং বাহির হইতে প্রবলতম বিধ্বংসকারী আঘাত—কিছুই সেই নির্ব্বন্ধ-পর অবচেতন নিয়তিটির উপর জয়ী হইতে সক্ষম হয় নাই। আর এইটি হইতেছে একটা সাধারণ নিয়মের চরম দৃষ্টান্ত।

অধিজাতি-গঠন প্রক্রিয়ায় বৈদেশিক শাসন এই যে সহায়তা প্রদান করে, এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা এবং উহা কি ভাবে কার্য্য করে তাহা দেখা উপযোগী হইবে। ইতিহাস ইহার দৃষ্টান্তে পূর্ণ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বৈদেশিক শাসন ব্যাপারটি ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ, আবার অন্যান্য কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ও সম্পূর্ণ, আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে উহা পুনঃ পুনঃ নানারূপে আবির্ভূত হইয়াছে; কোন ক্ষেত্রে বৈদেশিক শক্তিটির কার্য্য একবার শেষ হইলেই তাহাকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে, কোন ক্ষেত্রে তাহাকে অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে অল্পাধিক সমীকরণের সহিত শাসক শ্রেণীরূপে অল্পদিনের জন্য বা অধিকদিনের জন্য স্বীকার করা হইয়াছে। মূল নীতিটি একই, কেবল তাহা, যেমন হইয়াই থাকে, প্রকৃতির দ্বারা ক্ষেত্র বিশেষের প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এক সুইডিশ ব্যতীত ইউরোপে এমন কোন আধুনিক অধিজাতি নাই, যাহাকে তাহার জাতীয়তা (nationality) সিদ্ধ করিয়া তুলিতে অল্পাধিক স্থায়ী, অল্পাধিক সম্পূর্ণ বৈদেশিক শাসনের ভিতর দিয়া যাইতে হয় নাই। রুশিয়া ও ইংলণ্ডে এক বৈদেশিক বিজয়ী জাতির আধিপত্য হইয়াছিল, তাহা শীঘ্রই শাসক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত সমীকৃত ও অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল; স্পেনে হইয়াছে ক্রমান্বয়ে রোমান, গথ্ এবং মূরের শাসন, ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য, বলকানে তুরস্কের সুদীর্ঘ সার্ব্বভৌমত্ব, জার্ম্মানীতে নেপোলিয়ানের ক্ষণস্থায়ী প্রভুত্ব। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই মূল জিনিষটি হইয়াছে একটি আঘাত, একটি চাপ, তাহা হয় শিথিল চৈতন্যগত ঐক্যটিকে ভিতর হইতে সংগঠিত হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, অথবা যে-সকল বস্তু অপেক্ষাকৃত নির্ব্বন্ধপরতার সহিত ঐক্যের প্রতিবন্ধক হইতেছিল সেইগুলিকে শক্তিহীন, প্রাণহীন, বাস্তবত্বহীন করিয়া তুলিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, এমন কি নাম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পূর্ণ পরি-বর্ত্তন এবং জাতীয় সত্তারও অল্পাধিক গভীর রূপান্তর সাধন আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষভাবে এইরূপ ঘটিয়াছে ফরাসী জাতীয়তার সংগঠনে। প্রাচীন গল্ জাতি, তাহাদের দুর্দ্দিনীয় সভ্যতা ও পুরাকালীন মহত্ত্ব সত্ত্বেও অথবা সম্ভবত তাহারই জন্য, সুদৃঢ় রাজনৈতিক ঐক্য-গঠনে প্রাচীন গ্রীকদের অপেক্ষাও অথবা ভারতের প্রাচীন রাজ্য ও গণতন্ত্রগুলি অপেক্ষাও অধিকতর অসমর্থ ছিল। আধুনিক ফ্রান্সের অতুলনীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য রোমান শাসন ও ল্যাটিন কৃষ্টি, টিউটনিক শাসক-শ্রেণীর অধ্যারোপ এবং অবশেষে ইংরেজ কর্ত্তৃক অস্থায়ী ও আংশিক বিজয়ের আঘাত প্রয়োজন হইয়া-ছিল। অথচ যদিও নাম, সভ্যতা এবং বাকী সব কিছুই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তথাপি আজিকার ফরাসী জাতি এখনও সেই প্রাচীন গল্ জাতিই রহিয়াছে এবং চিরদিনই ছিল, তাহার বাস্ক্ গেলিক্ ও আমেরিকান অংশ ফরাসী ও ল্যাটিনের মিশ্রণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

অতএব অধিজাতি হইতেছে একটি নির্ব্বন্ধপর চৈতন্যগত ঐক্য, প্রকৃতি ইহাকে এতদিন জগতের সর্ব্বত্র অতি বিচিত্র আকার সকলের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং স্থূল ও রাজ-নৈতিক ঐক্যের জন্য শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাজনৈতিক ঐক্য মূল প্রয়োজনীয় জিনিষ নহে; ইহা এখনও সিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু অধিজাতি টিকিয়া থাকে এবং উহার সিদ্ধির দিকে অবশ্যম্ভাবীরূপে অগ্রসর হয়; রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অধিজাতি টিকিয়া থাকে, হয়রান হয়, দুঃখভোগ করে, কিন্তু কিছুতেই ধ্বংস হইতে চায় না। প্রাচীনকালে অধিজাতি সকল সময়ে বাস্তব ও জীবন্ত ঐক্য-সত্তা ছিল না, উপজাতি, কুল, কমিউন্, প্রাদেশিক জনগণ—এইসব ছিল জীবন্ত সমষ্টি। অতএব যে সকল ঐকিকতা অধিজাতি বিকাশের প্রয়াসে এইসব জীবন্ত সমষ্টিকে ধ্বংস করিয়াছে অথচ জীবন্ত অধিজাতি গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হয় নাই, তাহা তাহাদের কৃত্রিম বা রাজনৈতিক ঐক্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখন অধিজাতিই মানব-জাতির একমাত্র মূল সঙ্ঘরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্যসব কিছুকেই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে অথবা ইহার অনুগত ও অধীন হইতে হইবে। এমন কি প্রাচীন নির্ব্বন্ধপর জাতিগত ঐক্য (race-unities) এবং সংস্কৃতিগত ঐক্যও ইহার বিরুদ্ধে শক্তিহীন। স্পেনে কাতালোনিয়ান জাতি, ফ্রান্সে ব্রেঁত, প্রোভাঁশাল্ ও আল্সাসিয়ান, ইংলণ্ডে ওয়েলশ্—নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয় জীবনের চিহ্নগুলির পোষণ করিতে পারে, কিন্তু স্পেনীয়, ফরাসী ও ইংরেজ অধিজাতির মহত্তর জীবন্ত ঐক্যের আকর্ষণী শক্তি এত অধিক

যে, এই সকল প্রবৃত্তির দ্বারা তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। এই কারণে বর্ত্তমান যুগে অধিজাতি হইতেছে কার্যতঃ অবিনাশ্য, যদি না সে ভিতর হইতে মরিয়া যায়। পোল্যান্ড তিনটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পদতলে পিষ্ট হইয়া লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পোলীয় অধিজাতি টিকিয়া আছে। আল্সাস্ চল্লিশ বৎসর জার্ম্মানীর অধীনতার পর, জাতি ও ভাষায় বিজেতা জার্ম্মানীর সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, আজও তাহার ফরাসী অধিজাত্যের প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে।* অধিজাতিকে বলপূর্ব্বক বিনষ্ট করিবার বা ভাঙ্গিয়া দিবার সকল আধুনিক প্রয়াস হইতেছে নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ও ব্যর্থ, কারণ তাহার প্রাকৃত ক্রমবিবর্ত্তনের এই নীতিটিকে অবহেলা করিতেছে। এখনও সাম্রাজ্যগত ঐক্যগুলি হইতেছে বিনশ্বর; অধিজাতি অবিনশ্বর; এবং এইরূপই থাকিবে যতদিন না এক মহত্তর জীবন্ত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছে যাহার মধ্যে অধিজাতি-ভাব এক ঊর্দ্ধ্বতর আকর্ষণ অনুসরণ করিয়া নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারে।

তাহার পর প্রশ্ন উঠে, ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় সাম্রাজ্যই ঠিক ঐ ভবিতব্য ঐক্য কিনা। বর্ত্তমানে অধিজাতিই হইতেছে জীবন্ত ঐক্য, সাম্রাজ্য নহে—কেবল ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় না যে, ভবিষ্যতে ইহার বিপরীত হইতে পারে না। অবশ্য ইহা খুবই স্পষ্ট যে, এই অবস্থার বিপরীত হইতে হইলে, সাম্রাজ্য এখন যেমন রাজনৈতিক সত্তা মাত্র রহিয়াছে কেবল তাহা না থাকিয়া তাহাকে কতকটা চৈতন্যমূলক সত্তা (Psychological entity) হইয়া উঠিতে হইবে। কিন্তু অধিজাতির ক্রমবিবর্ত্তনে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে যেখানে রাজনৈতিক ঐক্যটি প্রথমে আসিয়াছে এবং চৈতন্যমূলক ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে, যথা স্কচ্, ইংরেজ ও ওয়েলশের মিলনে ব্রিটিশ অধিজাতির গঠন। অতএব অনুরূপ বিবর্ত্তন যে হইতে পারে না, অধিজাতিগত ঐক্যের স্থলে সাম্রাজ্যগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না সে পক্ষে কোন অকাট্য যুক্তি নাই। প্রকৃতি বহুকাল হইতেই সাম্রাজ্যিক ঐক্য বিধানে কষ্টকর প্রয়াস করিয়াছে, ইহাকে অধিকতর স্থায়িত্ব-শক্তি দিবার জন্য নানাদিকে অনুসন্ধান করিয়াছে; আর পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে আজ সচেতন সাম্রাজ্যিক আদর্শ আবির্ভূত হইতেছে এবং অধিজাতিগত ঐক্যের স্থলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে (যদিও সে-সব চেষ্টা এখনও রূঢ়, প্রচণ্ড ও ভ্রান্তিপূর্ণভাবেই করা হইতেছে), প্রকৃতি বহুকাল হইতে যে জিনিষটিকে ক্রমশ এবং পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত করিতেছিল অনেক সময়ে দ্রুত উল্লম্ফন ও পরিবর্ত্তনের দ্বারা যেমন সেইটিকে সিদ্ধ করিয়া তোলে, এইটিকেও যদি সেইরূপ কোন প্রয়াসেই পূর্ব্বগামী লক্ষণ বলিয়া ধরা যায় সেটা অযৌক্তিক হইবে না। অতএব এই যে সম্ভাবনাটি দেখা যাইতেছে, সুপ্রতিষ্ঠিত অধিজাতি-সত্তার সহিত মানবীয় ঐক্য-আদর্শের সম্বন্ধ আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই অতঃপর আমাদিগকে এই সম্ভাবনাটি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ দুইটি বিভিন্ন আদর্শকে এবং সেইজন্যই দুইটি বিভিন্ন সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত হইবার দিকে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দিয়াছে—একটি হইতেছে স্বাধীন ইউরোপীয় জাতি সকলের মৈত্রীসঙ্ঘ* এবং অপরটি হইতেছে পৃথিবীকে কতিপয় মহাসাম্রাজ্যে বিভক্ত করা, বস্তুত এই দুইটি পরিকল্পনার কোনরূপ ব্যবহারিক সংযোগ অদূর ভবিষ্যতের একটি সুস্পষ্টতম সম্ভাবনা। অতএব আমাদিগকে এখানে এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই সম্ভাব্য সম্মিলনের একটি অঙ্গ যেমন ইতিমধ্যেই জীবন্ত সত্তারূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি অপরটিকেও জীবন্ত সত্তায় পরিণত করা যায় কিনা; এবং সম্মিলনটি যদি সিদ্ধ হয় তাহাকে প্রকৃত স্থায়িত্বের ব্যবস্থাশূন্য ক্ষণিক কৌশলমাত্র না করিয়া এক স্থায়ী এবং নূতন বিশ্ব-বিধানের ভিত্তি করা যায় কিনা।

(ক্রমশ)

*ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে বহুকাল পরে আলসাস আবার ফ্রান্সের সহিত যুক্ত হইয়াছে এবং পোল জাতি নিজ বাসভূমে স্বাধীন হইয়াছে।

*মহাযুদ্ধের পরেই ১৯২০ সালে ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র সকলকে লইয়া জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) স্থাপিত হয়। যদিও ঐ সঙ্ঘ এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই, তথাপি সূত্রপাত হইতেই ইহা দ্বারা এপর্যন্ত জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। ভবিষ্যৎ এই দুইটি সম্ভাবনার দিকেই সমানভাবে ঝুঁকিতেছে।

সাজাদপুরের তীর্থে

সিরাজগঞ্জ লাইনের উল্লাপাড়া ষ্টেশনে গাড়ী যখন থামল তখনও প্রভাত হবার দু'ঘণ্টা বাকী। গাড়ী থেকে অবতরণ ক'রে গো-যানে আরোহণ করা গেল। উল্লাপাড়া ষ্টেশন থেকে সাজাদপুর গ্রাম পাঁচ ক্রোশের কাছাকাছি। এই পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করলে তবে গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যাবে।

গরুর গাড়ী চলতে আরম্ভ ক'রল তার চিরাভ্যস্ত গদাইলস্করী ভঙ্গীতে। রাস্তা যেমন খারাপ—ঝাঁকুনিও সেই অনুপাতে প্রবল। ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে যেতে লাগলাম সাজাদপুরের পথে। ছই-এর মধ্যে শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম তারায় ভরা নিশীথিনীর রূপ। মাঘের শেষ-রাত্রির অন্ধকার। দু'পাশে মাঠের পর মাঠ। চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। কখন ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এল। কিন্তু গরুর গাড়ীতে বেশীক্ষণ ঘুমোন অথবা কবিত্ব করা একরকম অসম্ভব। দুষ্টু ছেলেরা হেলে সাপের লেজ ধ'রে যেমন তাকে নাড়া দেয়, গো-যানও ঠিক তেমনি ক'রে আমাদের দেহ-যন্ত্রটাকে ক্রমাগত নাড়া দিতে দিতে চলে। শরীরটাকে যথাসম্ভব স্থির রাখবার জন্য আরোহীকে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয়। তবে সব জিনিষেরই যেমন ভাল-মন্দ দু'টো দিক আছে—গরুর গাড়ীরও তাই আছে। গো-যানে আরোহণ ঘুমের অথবা ধ্যানের পক্ষে সহায় না হ'লেও হজমের পক্ষে যে যথেষ্ট সহায়তা করে—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনই স্থান নেই। ডাম্বেল নিয়ে দু'ঘণ্টা স্যাণ্ডোর ব্যায়াম করলে যে exercise না হয়—দু'ঘণ্টা গরুর গাড়ী চড়লে বিনা ডাম্বেলে যে তার চেয়ে অনেক বেশী exercise হয়—ভুক্তভোগী মাত্রেই একথা স্বীকার করবেন। গাড়ীর মধ্যে পুরু ক'রে বিচুলি বিছিয়ে কষ্ট ক'রে শুধু শুয়ে থাক। চিৎ হ'য়ে, উপুড় হ'য়ে, কাৎ হ'য়ে—যেমন অভিরুচি তেমনি অবস্থায় শুয়ে থাকতে পার। শুয়ে থাকতে মন না চায়, বসেও থাকতে পার। ঘণ্টা চার-পাঁচ শুয়ে অথবা ব'সে থাকবার পর গো-যানে আরোহণ করবার অপার মহিমা নাড়ীতে নাড়ীতে তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। খাণ্ডব-দাহনের পরে অগ্নিদেবের যে অবস্থা হ'য়েছিল, তোমারও ঠিক সেই অবস্থা হবে অর্থাৎ বাঙলাভাষায় যাকে ক্ষুধা বলে সেই ক্ষুধার আতিশয্য তোমাকে কাতর ক'রে তুলবে। লোকে ক্ষুধার উদ্রেকের জন্য কত কি না ক'রে থাকে! ডাম্বেল ভাঁজে, মুগুর ঘোরায়, টেনিস খেলে, ঘোড়ায় চড়ে, দাঁড় টানে, পাহাড়ে ওঠে, সাঁতার কাটে, রাস্তা হাঁটে, ভুবনেশ্বরে যায়, কবিরাজের এবং ডাক্তারের ঘরে রাশি রাশি পয়সা ঢালে। গরুর গাড়ী চড়ার মধ্যে এ-সব কোনই বালাই নেই। ঘোড়া থেকে প'ড়ে যাবার ভয় আছে, সাঁতারে ডুবে যাবার আশঙ্কা আছে—ফুটবলে হাত-পা ভাঙার বিপদ আছে। গরুর গাড়ী অত্যন্ত নিরাপদ। কষ্ট ক'রে হাত-পা নাড়ানোরও প্রয়োজন নেই। গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপনা থেকেই সঞ্চালিত হ'তে থাকবে এবং তার ফলে নাড়ী পর্য্যন্ত হজম হবার উপক্রম হবে। অতএব এই এরোপ্লেনের যুগে একবার গরুর গাড়ীর জয়ধ্বনি করি।

গাড়ী যখন সাজাদপুরে পৌঁছাল তখন সূর্য্য উঠেছে। ছায়ায় ঢাকা পল্লীপথ দিয়ে গাড়ী চলতে লাগল। বাস্তবের সাজাদপুর আমার কল্পনায় আঁকা সাজাদপুরের চেয়ে একচুলও কম সুন্দর নয়। 'ছিন্নপত্র' প'ড়বার সময় এই গ্রামখানির ছবি মনের চোখ দিয়ে কতবারই না দেখেছি! পল্লীর পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ী ভারি ভাল লাগল চোখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি সুন্দর অট্টালিকার সামনে এসে গাড়ী থামল।

এই সেই অট্টালিকা যার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রে' লিখেছেন,—

> "বড়ো বড়ো জানলা দরজা—চারিদিক থেকে আলো বাতাস আসছে—যেদিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডালপালা চোখে পড়ে এবং পাখীর ডাক শুনতে পাই। দক্ষিণের বারান্দায় কেবলমাত্র কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্র পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। .... আমি চারিটি বৃহৎ ঘরের একলা মালিক—সমস্ত দরজা-গুলি খুলে ব'সে থাকি। এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব ও ইচ্ছা আসে এমন কোথাও না।"

আমার সৌভাগ্যক্রমে যাঁরা আমাকে গ্রামে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন তাঁরা এই বাড়ীতেই আমার থাকার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। দেখলাম 'ছিন্নপত্রে' কবি তাঁর বাসস্থানের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বড় বড় চারিটি ঘর—দক্ষিণের বারান্দা—সব সেদিনের মতই আছে—সেদিনের মতই গাছপালায় চারিদিক সবুজ এবং পাখীর ডাকে আকাশ-বাতাস মুখরিত—কেবল কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্র দূরে থাকুক—একটি রন্ধ্রও পূর্ণ হ'য়ে উঠল না। কবি যখন সাজাদপুরের বাড়ীতে অবস্থান করতেন তখন দক্ষিণে অতি সুন্দর পুষ্পোদ্যান ছিল। সেই পুষ্পোদ্যান কামিনী ফুলের গাছ নিয়ে কালের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। সাজাদপুর সম্পর্কে 'ছিন্নপত্রের' আর এক জায়গায় লেখা আছে,

> "আমার এই সাজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা। মনে আছে ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে ব'সে আপনার মনে ভোর হ'য়ে পোষ্টমাষ্টার গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চারি-দিকের আলো, বাতাস ও তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ ক'রে দিচ্ছিল।"

সাজাদপুরের বাড়ীতে দুপুরবেলায় ব'সে ব'সে কেবলই মনে হতে লাগল—একটি দ্বিপ্রহরের ছবি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই বাড়ীরই একটি কক্ষে ব'সে কবি আপনার মনে ভোর হ'য়ে রচনা করেছিলেন পোষ্টমাষ্টার গল্পটি। সেদিনের মত আলো আজও উজ্জ্বল, বাতাস আজও স্নিগ্ধ, তরু-শাখাগুলি আজও কম্পান্বিত—শুধু নেই সেই মানুষটি যিনি সানন্দে সাজাদপুরের প্রকৃতিকে একদা আপনার প্রাণের মধ্যে বরণ করে নিয়েছিলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাঁর কবিচিত্তের সোনার কাঠিকে স্পর্শ ক'রে সেদিন গানের পর গানে, কবিতার পর কবিতায় অপূর্ব্ব আর্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে। সেই ঝাউগাছ আর লিচুগাছের পানে চেয়ে চেয়ে বারম্বার মনে হ'তে লাগল—

ওদের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর এক মহাকবির মুগ্ধমনের আনন্দ। সেই মন নিয়ে ওদের সৌন্দর্য্যকে আর কি কেউ তেমন ক'রে উপভোগ করবে? আর কেউ কি তেমন ক'রে সাজাদপুরের নদীর কলধ্বনি শুনবে? অহল্যা ততদিন পাষাণ হ'য়ে অবহেলার মধ্যে প'ড়ে থাকে, যতদিন সে রামচন্দ্রের চরণকে স্পর্শ করবার সুযোগ না পায়। প্রকৃতিও ততদিন বন্ধ্যারমণীর মত ব্যর্থতার মধ্যে দিন যাপন করে যতদিন কবির চিত্ত তাকে সোহাগভরে হৃদয়ের মধ্যে বরণ না করে।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। বিকাল বেলায় মেঘলা দিনের ম্লান আলোকে বিষণ্ণ চিত্ত অতীতের কক্ষে কক্ষে বিচরণ করতে লাগল। ঐ সেই ঘর আর ঐ সেই জানালা যেখান থেকে কবির মুগ্ধচক্ষু কতদিন নিরীক্ষণ করেছে খালের উপরকার নৌকাশ্রেণী, ওপারের তরু-মধ্যগত গ্রাম এবং ওপারের অনতিদূরবর্ত্তী লোকালয়ের মৃদু কর্ম্মপ্রবাহ! জানালার সম্মুখে খালের ওপারে যে একদল বেদে একদা তাঁর দৃষ্টিকে আকর্ষণ ক'রে ছিন্নপত্রের বুকে স্থান পেয়েছে—তারা গেল কোথায়? কোথায় গেল সেই পোষ্ট-মাষ্টারটি যাকে চৌকীটি ছেড়ে দিয়ে কবি একদা সন্ধ্যায় কালিদাসকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন? সাজাদপুরের যে গোপাল সা'র জামাই এবং মেয়ের কথা 'ছিন্নপত্রে' লেখা হয়েছে, তাঁর নাতির সঙ্গে দেখা হ'ল—গোপাল সা' অনেক দিন আগেই ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন! সাজাদপুরে তেমনিই আছে—ঝাউগাছে আর লিচুগাছে আগেকার মত তেমনিই পাখীদের মজলিস বসে, তেমনি ক'রেই অলস মধ্যাহ্ন কাকের ডাকে উদাস হ'য়ে ওঠে—শুধু নেই কবি যাঁর বিস্মিত নয়ন বাঙলার একটি নিভৃত পল্লীর জীবন-নাট্যকে একদা অসীম আগ্রহে নিরীক্ষণ করত, আর নেই সেই পোষ্টমাষ্টার, গোপাল সা ও বেদের দল যারা 'ছিন্নপত্রের' বুকে অমর হ'য়ে আছে!

কবির নাইবার ঘরটিও দেখলাম। এই ঘরে মাথায় জল ঢালতে ঢালতে কবি যে তাঁর বহু গানে সুর দিয়েছেন—তার প্রমাণ 'ছিন্নপত্রে' আছে। যে কর্ম্মচারীটি তাঁর সময়ে কাজ করতেন তিনি এখনও বেঁচে আছেন। কোন্ টেবিলে বসে কোথায় তিনি লিখতেন—কর্ম্মচারীটি সব দেখিয়ে দিলেন।

ধন্য সাজাদপুর—কারণ, পোষ্টমাষ্টারের মত গল্প সাজাদপুরের আকাশতলেই একদিন পুষ্পের মত প্রস্ফুটিত হয়েছে! বাংলা সাহিত্যে গণতন্ত্রের যে জয়যাত্রা—তার আরম্ভ সাজাদপুরের তীর্থ থেকে। বাংলা সাহিত্যের দরবারে যারা অস্পৃশ্য ছিলো—পোষ্টমাষ্টারকে সেই সব অখ্যাতনামা উপেক্ষিত নরনারীর প্রতীকরূপে অনায়াসে আমরা গ্রহণ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আমরা বাংলা সাহিত্যে জগৎ সিংহকে পেয়েছি, ওসমানকে পেয়েছি—প্রতাপকে পেয়েছি—পাইনি বঙ্গদেশের অন্তঃপুরচারিণী নদী-তীরবর্ত্তী আম-কাঁঠালের বাগানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন গ্রামগুলির সেই সব অনাদৃত নর-নারীকে যারা মাথায় জয়মুকুট প'রে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে কবির গল্পগুচ্ছের পাতায় পাতায় নায়ক ও নায়িকারূপে। কবির অতিপ্রিয় সাজাদপুরের বাড়ীতে যে এইরূপ অনেক গল্পেরই জন্ম—এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের সঙ্গে সাজাদপুর এবং শিলাইদহ যে জড়িয়ে আছে—ছিন্নপত্রে রয়েছে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ।

সন্ধ্যার সময় সাজাদপুরে বাণী-সম্মেলনের উদ্যোগে যে সভার অধিবেশন হোলো—সেখানে গণ-সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলাম—সাজাদপুর বঙ্গের প্রত্যেকটী সাহিত্যিকের কাছে পুণ্যতীর্থ—কারণ বাংলা ভাষায় গণ-সাহিত্যের যে জয়যাত্রা সুরু হয়েছে তার আরম্ভ সাজাদপুরের একটী গৃহ থেকে, যেখানে বসে রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গল্পের পর গল্পের মধ্যে বাংলার গ্রাম্য নরনারী-দের অখ্যাত জীবনের অবগুণ্ঠিত কাহিনীকে রূপ দিয়ে-ছিলেন।

সাজাদপুরে যে টেবিলে বসে রবীন্দ্রনাথ পোষ্টমাষ্টার গল্পটী লিখেছিলেন—সে টেবিল ঠিক তেমনিই আছে। যে পালঙ্কে তিনি শয়ন করতেন তারও কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি। এই সব আসবাবপত্র জাতির কাছে অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদগুলিকে সযত্নে রক্ষা করা জাতির কর্ত্তব্য—এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার দিন এসেছে।

সাজাদপুরের স্মৃতি কোনোদিনই ভুলবো না। গ্রামখানি বেশ বড়ো—আর অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির বাস সেখানে। স্বাস্থ্য ভালো। দুধের সের আড়াই পয়সা থেকে তিন পয়সা। গ্রামে দুইটী ছাপাখানা আছে। একটী হাই স্কুল, একটী বালিকা বিদ্যালয় এবং একটী মধ্যবৃত্তি ইংরেজী বিদ্যালয় গ্রামটীকে গৌরব দান করছে। যুবকদের মধ্যে সাহিত্যানু-রাগের যথেষ্ট পরিচয় পেলাম। দুদিন পরে গ্রাম থেকে যখন বিদায় নিলাম—তখন মনে হলো—নিকটতম আত্মীয়গণকে যেন ছেড়ে যাচ্ছি।

বার্সিলোনার পরে

বার্সিলোনার পতন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আরও উত্তরে সীমান্তের দিকে সরিয়া গিয়াছে। নূতন রাজধানীর নাম ফিগুয়েরাস। এখানে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। সাধারণের মনে আতঙ্কের অবধি নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখনও আশা ছাড়েন নাই। সেনর নেগ্রিন বার্সিলোনা পতনের অব্যবহিত পরেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, যদিও স্পেন বর্ত্তমানে একটা ভীষণ সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তথাপি শত্রু যে ভাবিয়াছিল, বার্সিলোনার পতনের সঙ্গেই স্পেন-সরকার বিলুপ্ত হইবে সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। বস্তুত স্পেনের সবটা এখনও বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোর অধিকারে আসে নাই। স্পেন-সরকার এখনও জীবিত। তবে আর কতদিন শত্রুর বিরুদ্ধে যুঝিতে পারিবে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সেনর নেগ্রিন এই ঘোষণায় আর একটি কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা এতদিনে সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তিনি বলিয়াছেন যে, লণ্ডনের নিরপেক্ষতা-কমিটি প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্রোহীদের এবং বিদ্রোহীদের সাহায্যকারী জাতিগুলিকে সমর্থন করিয়াছেন। নিজেদের অভিসন্ধি পূরণের জন্য বিশ্ববাসীকে দেখান দরকার ছিল যে, জানুয়ারী মাসের মধ্যেই স্পেন-রিপাব্লিকের পতন ঘটিবে।

যে-কারণেই হউক, বার্সিলোনার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের মনে এই ধারণাই জন্মিয়াছে যে, স্পেন-সরকার বিদ্রোহীদের সঙ্গে আর হয়ত পারিয়া উঠিবে না। বার্সিলোনায় ফ্রাঙ্কো বাহিনীর প্রবেশের পরে নাকি শহরবাসীদের মধ্যে নানা উল্লাসের ভাব প্রকাশ পায়। শত শত গৃহ হইতে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ইহাদিগকে অভিনন্দন জানান হয়। পঞ্চাশ সহস্র লোক সমবেত কণ্ঠে ফ্রাঙ্কোর বিজয় উপলক্ষে লিখিত একটি বিশেষ সঙ্গীত গান করে! স্পেন সরকারের বার্সিলোনা ত্যাগের অব্যবহিত পরেই জনসাধারণের এবম্বিধ অভিনন্দন জানিয়া অনেকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বার্সিলোনায়ও বিদ্রোহীদের প্রচারকার্য্য পুরাদমেই চলিয়াছিল। তাহার ফলেই সাধারণ কর্ত্তৃক ফ্রাঙ্কো এত সহজে গৃহীত হইয়াছে।

ফ্রাঙ্কো বাহিনীর বিজয়োল্লাস শুধু স্পেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, স্পেনের সীমানা ছাড়াইয়া তাহা নাকি ইটালী ও জার্ম্মানীতেও পৌঁছিয়াছে। মুসোলিনী ও হিটলার ফ্রাঙ্কোকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। সুদূর প্রাচ্য হইতে জাপানীরাও তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া তার করিয়াছে। বিদেশে বার্সিলোনার পতন সংবাদ এমনভাবে প্রচারিত হইয়াছে এবং ইটালী জার্ম্মানী ও জাপান এমনভাবে উল্লাস প্রকাশ করিতেছে যে, সাধারণের মনে হইয়াছে, বার্সিলোনার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই স্পেন-রিপাব্লিকের বুঝি পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু সেনর নেগ্রিনের ভাষণে বিশ্ববাসী জানিতে পারিয়াছে যে, এখনও স্পেনের খানিকটা স্পেন-গবর্ণমেণ্টের অধীনে আছে।

স্পেন-সরকারের পতন এতদিন শুধু অভ্যন্তরে বিদ্রোহীরা এবং বাহিরে ইটালী ও জার্ম্মানীরাই কামনা করে নাই, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র মাত্রেই ইহা চাহিয়াছে। কেন স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রগুলি দলবদ্ধভাবে ইহা চাহিয়াছে, তাহার আলোচনা বিস্তর হইয়াছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিশিষ্ট দলগুলি স্পেন-সরকারকে সাহায্য করিতে যতই আগ্রহ প্রকাশ করুক না কেন, ঐ ঐ রাষ্ট্রের সরকার তাহা করিতে দেয় নাই, সর্ব্ব-প্রকারে বাধাই দিয়াছে। বার্সিলোনার পতনের কিছু পরেও যদি স্পেন-সরকারের পূর্ণভাবে পতন ঘটে, স্পেনের সমগ্রটা যদি বিদ্রোহীদের কবলে আসে, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া বিশ্বরাজনীতির উপর কিরূপ হইবে তাহা লইয়াই আজ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে সব চেয়ে বেশী।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী, সোভিয়েট রুশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান—বর্ত্তমান জগতের ভাগ্য এই কয়টি প্রধান রাষ্ট্রের অবলম্বিত নীতির উপরই নির্ভর করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র সভাপতি মিঃ রুজভেল্ট ইতিপূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার গতি নির্দ্দেশ করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান আসুরিক শক্তির পূজার ভীষণ পরিণাম সম্বন্ধে আমেরিকা সজাগ রহিয়াছে। গণতন্ত্রকে সজীব রাখিতে হইলে এই শক্তির বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে দাঁড়াইতে হইবে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বার্মিংহামে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় ব্রিটেনের অনুসৃত পন্থার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আধুনিক মারণ যন্ত্রগুলির ধ্বংস-শক্তির কথা ভাবিয়াই তিনি জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছেন। মিউনিকে শান্তি সংরক্ষণে মুসোলিনীর সহায়তার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মুসোলিনীর সহায়তার মূলে যে তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ইঙ্গ-ইটালিয়ান মৈত্রী রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিতেও তিনি ভুলেন নাই। শান্তি প্রতিষ্ঠাই যদি কাম্য হইল, তাহা হইলে রণ-সম্ভার বৃদ্ধি করিবার হেতু কি—এই প্রশ্নের উত্তরে চেম্বারলেন মহোদয় বলেন যে, আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইলে কোন পক্ষই কোন পক্ষকে গ্রাহ্য করিবে না। "আমরা কাহারও ঘাড়ে গিয়া পড়িব না, কাহারও নিকট নতি স্বীকার করিব না, আমরা বরাবর আত্মরক্ষা করিয়াই চলিব"—চেম্বারলেন এই কথা জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন। অন্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া আপোষে সমস্যাগুলির সমাধান করিতেই তিনি চান। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বাণীর সমর্থনও তিনি করিয়াছেন।

ফ্রান্সের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সম্প্রতি এরূপ কোন ঘোষণা করেন নাই। তবে তাঁহারাও যে ব্রিটিশদের সঙ্গে মিলিতভাবে চলিবেন তাহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। "কণ্টিনেণ্ট" বা খাস ইউরোপে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি এখন অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ব্রিটেনের উপরই তাহার একান্ত নির্ভর। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। ইদানীং প্রকাশ এই সব মন্দা দূর করিবার জন্য নেতৃবর্গ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। দেশে স্বর্ণ আসিতেছে প্রচুর। ইহার বিনিময়ে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ক্রয়, নির্ম্মাণ ও সংগ্রহ সবই দ্রুত সম্ভব

হইবে। ফরাসী নেতারা এই আশ্বাস দিতেছেন যে, ফ্রান্সের এখন আর কাহাকেও ভয় করিয়া চলিতে হইবে না। তবে একথা ঠিক যে, দক্ষিণ সীমান্তে স্পেন গণতন্ত্রকে সাহায্য দান নীতি ব্রিটেনের ইঙ্গিতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, ব্রিটেনের উপর বর্ত্তমানে তাহাকে এতই নির্ভর করিয়া চলিতে হয়।

গতকল্য ৩০শে জানুয়ারী হিটলার রাইখষ্টাগের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন। অষ্ট্রিয়া ও সুদেতেন জার্ম্মান অঞ্চল জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইবার পর এই প্রথম রাইখষ্টাগ আহূত হইল। কিছু দিন আগেই রটনা করা হইয়াছে যে, হিটলার এবারে আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা নিরসনের নির্দ্দেশ তাঁহার এই বক্তৃতায় প্রদান করিবেন। এতদিন জগদ্বাসী যেন অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছিল, তিনি আলোকবর্ত্তিকা হস্তে তাহাদের সুপথ দর্শাইয়া দিবেন! তাঁহার বক্তৃতার অতি সামান্যই এ পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। জার্ম্মানীতে নাৎসীবাদের প্রতিষ্ঠার কাহিনীই তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি কি নূতন নির্দ্দেশ দান করেন তাহা জানিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব। দুই এক দিনের মধ্যেই তাহা সকলে জানিতে পারিবেন।

মুসোলিনী তাঁহার মুখ খুলিবেন আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, সুতরাং তাঁহার ভাষণ সম্বন্ধেও আমরা এখানে শুধু আঁচ করিতেই পারি। জাপানীরা চীন বিজয় কার্য্যে একান্তভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে এরূপ ভাষণ দান করেন যাহাতে এক একবার শান্তিসৌধ টলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সোভিয়েট রুশিয়া কিছুকাল যাবৎ নির্ব্বাক রহিয়াছে। সে বোধ হয় ইউরোপের তথাকথিত গণতন্ত্রগুলির ভণ্ডামি জানিতে পাইয়া বিস্ময় মানিয়াছে। শান্তি কিম্বা অ-শান্তি কোন কিছু বিষয়ই তাহার নীরবতা ভঙ্গ করিতে পারিতেছে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রবাদে প্রত্যেকেই আজ কথায় ও কাজে তাহাদের নিজ নিজ মনোভাবের পরিচয় দিতে ব্যগ্র।

এই ব্যগ্রতার কারণ কি? দ্বিতীয় মহাসমর ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। একটির পর একটি দেশ কোন না কোন শক্তি গ্রাস করিয়া লইতেছে। আগে ত এমন করিয়া নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিবার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই? সত্য কথা বলিতে কি, জগত ক্রমশই যেন একটি মহাপ্রলয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আবিসিনিয়া গিয়াছে, অষ্ট্রিয়া গিয়াছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার অংশবিশেষ গিয়াছে, স্পেনও যাইতে বসিয়াছে। বিভিন্ন শক্তিবর্গ আর কতকাল নির্লিপ্তভাবে অন্যের লোভ চরিতার্থ সহ্য করিবে—বার্সিলোনার পতনের পর এই কথাই আজ প্রধান জিজ্ঞাস্য। প্রধান রাষ্ট্রগুলির আসরে নামিতে আর বুঝি বেশী বিলম্ব নাই। তাই প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন।

সকলের মুখেই এক কথা—শান্তি চাই। চেম্বারলেনই যে শান্তি চাহেন তাহা নহে, মুসোলিনীও শান্তি চাহেন, হিটলারও তাই! কিন্তু এই শান্তি চাহিতে চাহিতেই যে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবার উপক্রম! মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে হিটলারের প্রাধান্য স্থাপিত। চেকোশ্লোভাকিয়া আজ ফ্রান্সেরও নহে, সোভিয়েট রুশিয়ারও নহে, সে এখন হিটলারের তাঁবেদার। তাহার কোন দোষ নাই, তাহাকে তাঁবেদার হইতে বাধ্য করান হইয়াছে। ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি এক সময় অনেকেরই, এমন কি জার্ম্মানীরও প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল। ফ্রান্স সোভিয়েট ছাড়া নহে, সোভিয়েট ফ্রান্স ছাড়া নহে—লোকে ইহাই ভাবিত। যেদিন হইতে ফ্রান্স ব্রিটেনের দিকে ঘেঁসিয়া পড়িতে লাগিল সেই দিন হইতেই এই দুইটি রাষ্ট্রের ছাড়াছাড়ি হইবার সূত্রপাত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার হইতেই যেন ইহাদের সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছে। কিছু দিন আগেও অবশ্য বলা হইয়াছিল যে, ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি বলবৎ আছে, কিন্তু ইহা এখন আর বিশ্বাস করা যায় না। সোভিয়েট রুশিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, ফ্রান্স, সুতরাং ব্রিটেন, কোন বিপদে তাহার সাহায্যে আসিবে না, কাজেই সে হাত গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে। ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়ার কার্য্যত ছাড়াছাড়ি হওয়ার সুযোগ জার্ম্মানী গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। সোভিয়েট-বিরোধী চুক্তিতে জার্ম্মানী জাপান ও ইটালীর সঙ্গে আবদ্ধ বটে, কিন্তু এই চুক্তি যাহাতে একটি সামরিক চুক্তিতে পরিণত না হয় সে বিষয়ে সে সম্প্রতি সোভিয়েট রুশিয়াকে আশ্বাস দিয়াছে। কারণ জার্ম্মানী এখন ইহার সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করিতে ব্যগ্র। মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানী সুপ্রতিষ্ঠিত, সোভিয়েট রুশিয়াকেও যদি সে এইভাবে হাত করিতে পারে তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য সাধন সহজ হইয়া পড়িবে। উপনিবেশের দাবী পেশ করিয়া সেজন্য লড়িতেও সে ইতস্তত করিবে না, কারণ যুদ্ধের সময় সমুদ্রপার হইতে তাহার কাঁচা মাল আমদানী না করিলেও চলিবে, মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েট রুশিয়া হইতে সে ইহা পাইবে। আর ভাবী সমরে রুশিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে, কেন-না ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপর সে এখন বীতশ্রদ্ধ। স্পেনের বিদ্রোহীদের বিজয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মানীর পররাষ্ট্র নীতি এই খাতেই চলিতে আরম্ভ হইয়াছে যেন।

আর মুসোলিনী? তিনি ত স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জয় অর্থ ইটালীর জয়। কারণ ইটালীই তাঁহাকে জয়যুক্ত করাইয়াছে। বার্সিলোনার পতনে ইটালীর উল্লাস হইয়াছে সকলের চেয়ে বেশী। মুসোলিনী একদিকে ইংরেজের সঙ্গে মিতালী করিয়াছে অন্য দিকে স্পেন করায়ত্ত করিয়া লইতেছে, ইহা কি কম কৃতিত্বের কথা? স্পেনে প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আগে বা যদি কাহারও কিছু সন্দেহ ছিল এখন কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নাই। যখনই দেখা গেল বিদ্রোহীরা স্পেনে অতি দ্রুত জয়লাভ করিতেছে অমনি ইটালীয়ানরা তাহাদের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। তাহারা ভূমধ্যসাগরে ন্যায্য অধিকার চাহিয়াছিল, ইংরেজ তাহা তাহাদিগকে দিয়াছে। এখন তাহারা ফরাসীর কোন কোন রাজ্য চাহিতেছে। কর্সিকা, টিউনিস, সুয়েজ, জিব্রুতি এই সব তাহাদের কাম্য। ফরাসীরা ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ

(শেষাংশ ৭৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অমূলক শঙ্কা ও সন্দেহ

'ভয়' অল্পবিস্তর সকলেরই আছে। বিপদ-আপদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ভয়ই আমাদিগকে প্ররোচিত করিয়া থাকে। সে হিসাবে 'ভয়' বড় সাবধানী এবং ইহাকে আত্মরক্ষার প্রধান প্রয়োজক বলা যাইতে পারে। বিপদ-আপদের ঝুঁকি লইবার সময় মনের গোপন কোণে যে ভয়ের উদ্ভব হয়, তাহাতে অযৌক্তিক কিছু নাই। সেই অবস্থায় মনে ভয়ের উদ্রেক না হওয়াই বরং অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সকল প্রকার ভয়-ভীতি কাটাইয়া যাহারা সাহসের সহিত কোন কঠিন কাজে অগ্রসর হয়, লোকে তাহাদেরই প্রশংসা করে। ভীরু কাপুরুষদের কেহ কোনদিন শ্রদ্ধা করে না। কবিও গাহিয়াছেন, ভীরু কাপুরুষদের বহুবার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু যাঁহারা নির্ভীক, তাঁহারা জীবনে একবার মাত্র মৃত্যুকে বরণ করেন এবং ইহাতেই তাঁহারা অমরতা লাভ করিয়া থাকেন।

কোন কঠিন কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে সদ্বিবেচক লোক মাত্রেই নানা বিষয় চিন্তা করেন। ভয় ও শংকার দোলা প্রত্যেক মানুষকেই অল্পবিস্তর আলোড়িত করিয়া থাকে। ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই এবং এরূপ ভয়ের কারণও আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে ভয়, আশংকা ও আতংক এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়, যাহা একান্তই অহেতুক বলিয়া মনে হয়। যুক্তির দিক দিয়া এরূপ ভয়ের কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভয়াতুর ব্যক্তি পর্যন্ত অনেক সময় নিজে বুঝিতে পারেন যে, এভাবে ভীত হওয়ার যুক্তিসংগত কোনও কারণ নাই। তথাপি সেই ভয় কাটাইয়া উঠিবার মত মানসিক শক্তি যেন তিনি সঞ্চয় করিতে পারেন না। এই ধরণের অহেতুক শংকা অনেকের মধ্যে অনেক বিষয়ে পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ কোন প্রাণী বা ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে এরূপ ভয় বা শংকা পোষণ করেন যে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর্য্যন্ত ইহাদের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। ভীত চকিত অবস্থায় মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইতে চাহে না! কতক্ষণে এরূপ ব্যক্তির সান্নিধ্য হইতে সরিয়া পড়িবেন তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠেন। সাপ, বাঘ, কুমীর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে অল্পবিস্তর সকলেই ভয় করিয়া থাকে এবং সকলেই ইহাদিগকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলে। ব্যক্তি বা জন্তুবিশেষের এইরূপ ভয় অনেকটা পুরুষ-পরম্পরা লাভ হয়। কতকটা বা ইহাদের দৌরাত্ম্য ও ভয়ংকর প্রকৃতি সম্পর্কে নানারূপ গল্প-গুজব শুনিয়াও জন্মিয়া থাকে। ক্ষুদ্র শিশু, যাহার সংসারের কোন জ্ঞান নাই, সাপের ক্রুর প্রকৃতির বিষয় কিছু অবগত নহে বলিয়া সে নির্ভীক চিত্তেই সাপের উদ্যত ফণাকে অগ্রাহ্য করিয়া হাত বাড়াইতে দ্বিধাবোধ করে না। হিংস্র জন্তু সম্পর্কে সাধারণ লোকের ভয়-বিহ্বল ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছু নাই বটে, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির কুকুর, বিড়াল, গরু, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তু সম্পর্কেও যেরূপ ভয় ও বিরক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এরূপ জানা যায়, লর্ড রবার্টস্ বিড়াল দেখিলেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। আমাদের দেশে টিকটিকি দেখিলে আমাদেরও অনেকের মনে নানা আশংকা উপস্থিত হয় এবং ঐগুলিকে দূর করিবার জন্য অনেকেই ব্যস্ত হইয়া উঠি। হিংস্র জন্তু দেখিয়া ভীত হওয়ার কারণ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি বটে, কিন্তু সাধারণ কতকগুলি জীবজন্তুর সম্পর্কে এরূপ ভয় ও বিরক্তি একান্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। প্রাণীটির উপর স্বাভাবিক বিদ্বেষ ও ঘৃণা ইহার এক কারণ হইতে পারে, কিংবা উহা দ্বারা কাহারও কোন অমংগল ঘটিয়াছে এরূপ সংবাদ জানা থাকিলে তাহাও মনে ভয়ের উদ্রেক করিয়া থাকে। প্রাণীটি হইতে পূর্ব্বে কোন ক্ষতি হইয়া থাকিলে কিংবা আঘাত পাইয়া থাকিলে ত কথাই নাই! একবার যে ব্যক্তি গরুর শিং নাড়া দেখিয়াছে বা ইহার নিকট হইতে কোনপ্রকার আঘাত পাইয়াছে, গোজাতি দেখিলেই তাহার যেন ভয় হয়, যদিও সে ভালরূপেই জানে যে, সব গরুই তাড়া করে না বা গুঁতায় না। চূণে একবার মুখ তাতিলে দধি দেখিয়াও যেমন ভয় হয়, এ তাহারই অনুরূপ। ভয় করিবার কিছু নাই জানিলেও একটা প্রচ্ছন্ন ভয়ের ভাব অকস্মাৎ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। অন্ধকার ঘরে কিংবা বনপথে চলিতে চলিতে কত ভয়ই না মনের মধ্যে উঁকি মারিতে থাকে! ঐ বুঝি কালোভূত নামিয়া আসিল! বনের মধ্য হইতে কোন দুর্ব্বৃত্ত এখনই আসিয়া হয়ত লাঠি মারিবে! মনে হইতেই ভয়ে গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠে। সত্যিকারের কোন ভয়ের কারণ না থাকিলেও এরূপ আতংক মন হইতে দূর করা অনেক সময় শক্ত হইয়া উঠে। ছোটবেলায় ভূত-প্রেতের কাহিনী ও নানাপ্রকার উদ্ভট গল্প-গুজব শুনিয়া শুনিয়া তাহার একটা আবছায়া ভাব আমাদের মনের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত থাকে। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাহাই মনের মধ্যে উঁকি মারিতে থাকে। পিতামাতার একমাত্র সন্তান —মায়ের অঞ্চলনিধি যাহারা, গৃহের একান্ত আওতায় থাকিয়া বর্দ্ধিত হয় বলিয়া পরবর্ত্তী জীবনে ইহাদের একপ্রকার ভয়-বিহ্বল মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। ঘর ছাড়িয়া পিতামাতার নিকট হইতে যখনই ইহারা দূরে যায়, ইহারা নিজদিগকে একান্ত নিঃসংগ বলিয়া মনে করে। একটা প্রচ্ছন্ন শঙ্কার ভাব তাহাদের প্রতি পদে বাধা দিতে থাকে।

অমূলক ভয়ের এরূপ বহুবিধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। খুব ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে অনেকের মনে ভয় হয়। রাস্তায় জনতার ভিড় দেখিলে ইহারা পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়েন। পাছে ভীড়ের চাপে দম বন্ধ হইয়া মারা পড়েন, কিংবা লোকের হুড়াহুড়িতে আহত হইতে হয়, এইরূপ আশংকাই ইহাদের প্রবল হইয়া উঠে। এরূপ অহেতুক ভয় বা আশংকা প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই জনতার মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। অতিরিক্ত ভীড়ে আহত হওয়া বা চাপা পড়িয়া মরার জন্য মানুষের এইরূপ অহেতুক ভয় বা আশংকা কম দায়ী নহে!

উচ্চ পর্ব্বতে বা সুউচ্চ গৃহচূড়ায় আরোহণ করিয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পড়িয়া যাওয়ার একটা শঙ্কা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে এবং মাথা ঘুরিতে থাকে। এরূপ ভয়ের অভিজ্ঞতা অনেকেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ শংকা মনে উদিত হইলে তাহার পক্ষে উচ্চ

স্থানে উঠা ও নামা দুই-ই বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। পর্ব্বত আরোহণকারী অভিযাত্রীদলে এরূপ ভয়ের সঞ্চার হইলে তাহাদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে।

অনেক মাঠ-ঘাট আমরা অনেক সময় নির্ভয়ে পার হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু পথে ভয়ের কিছু আছে শুনিলে সেই রাস্তা দিয়াই ফিরিবার সময় কেমন একটু ভয় হইতে থাকে। 'এগোরা ফোবিয়া' বা উন্মুক্ত স্থানে যাতায়াতে এরূপ আতঙ্ক অনেকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। তেমনি আবার নির্জ্জন বাসাতঙ্ক বা ক্লস্‌ট্রোফোবিয়া (Claustrophobia) অনেকের মধ্যে দেখা যায়। কোনও ঘরে কিংবা উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে বন্দীভাবে অল্প সময় অতিবাহিত করিতে হইলেও ইহাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এইরূপ আতঙ্কের উদ্রেক হইলে মানুষ এরূপ অস্থির হইয়া ছটফট করিতে থাকে যে, বাহিরে আসিতে না পারা পর্য্যন্ত কিংবা মুক্তবায়ু সেবন না করা পর্য্যন্ত যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ার ভয় ছেলেদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়। প্রশ্নপত্র হাতে পাইয়া পরীক্ষাকেন্দ্রে বহু ছাত্রের স্মৃতিলোপ (amnesia) ঘটে এবং তাহার আতঙ্কে অস্থির হইয় উঠে। জনসভায় যাহারা বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত নহেন, প্রথম প্রথম বক্তৃতা করিতে উঠিলে এমনি একটি ভাব তাঁহাদের অনেককে পাইয়া বসে। কণ্ঠস্বর বাহির হইতে চাহে না, মুখ শুকাইয়া যায়, হাত-পা কাঁপিতে থাকে, কি যেন কিসের আশঙ্কা বক্তাকে অধীর করিয়া তোলে!

কাহারও দেহে কঠিন অস্ত্রোপচার হইতে দেখিলে কিংবা রক্তপাত দেখিলেও কেহ কেহ ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। রোগগ্রস্ত কোন জন্তুর সংস্পর্শে আসিতে কেহ কেহ বিশেষভাবে ভয় করে—পাছে তাহারও রোগ জন্মায়। কোন কারণে এরূপ সংস্পর্শ ঘটিলে ইহারা মনের মধ্যে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকেন এবং বার কতক হাত ধুইয়াও যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। অশুচির আশঙ্কা একবার মনে জাগিলে 'শুচিবাই'গ্রস্ত হওয়া বিচিত্র নহে। বহু গৃহস্থ পরিবারে এরূপ মহিলার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

এরূপ বহু অমূলক আশঙ্কা বা ভয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহা আমাদের হাসির উদ্রেক করিতে পারে। অথচ সমাজের অধিকাংশ লোকই ইহা দ্বারা অভিভূত। সুতরাং ইহাকে 'পাগলামি' বলা চলিবে না। উপরে যে-সব ভয়ের কথা উল্লেখ করা হইল তাহার সহিত বিষয়বস্তুর বা পারিপার্শ্বিকের যোগাযোগ খানিকটা পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ইহা ছাড়াও আর এক প্রকারের বিচিত্র মনোভাব পরিলক্ষিত হয়, যাহাকে ঠিক ভয়ের পর্য্যায়ে না ফেলিলেও, ইহার ইঙ্গিত না মানিয়া যেন কিছুতেই স্বস্তি আসে না। বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ইহার সম্পর্ক অতি অল্প। ইহা একান্তই মনের নিজস্ব—নিরর্থক জানিয়াও ইহার ইঙ্গিত মানিতে হয়। মনের আবেগ ও যুক্তির সঙ্গে এজন্য দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যুক্তিকেই যেন পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

চলন্ত ট্রেনে চড়িয়া টেলিগ্রাফের পোষ্ট গুণিতে থাকা কিংবা উড়ন্ত পাখীর ঝাঁকে কতগুলি পাখী আছে তাহার সংখ্যা গণনা করার ঝোঁক কেমন যেন আমাদের পাইয়া বসে! রাস্তায় বাহির হইয়া বিশেষ একটা পথ ধরিয়া চলার বা বিশেষভাবে কোন প্রস্তরখণ্ডের উপর পা ফেলিয়া অগ্রসর হওয়ার জন্য মনের মধ্য হইতে তাগিদ আসিতে থাকে। ঐভাবে না চলিলে পাছে কি যেন অনিষ্ট হইবে তাহার এক অস্পষ্ট আশংকাই হয়ত মনের ঐ আবেগ মানিতে আমাদিগকে প্ররোচিত করে। বহু লোক দেখা যায়, সদর দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া শয়ন করিবার পরেও যেন তাহার সন্দেহ যায় না, বারবার উঠিয়া আসিয়া দেখিয়া যান, যথার্থই উহা বন্ধ করা হইয়াছে কিনা। দুই জনের নিকট দুই বিভিন্ন খামে যথারীতি চিঠি পুরিয়া রাখিলেও ডাকে দিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে খামের মুখ বন্ধ করিতে গিয়া আমাদের কেমন যেন একটা সন্দেহ আসে! খাম হইতে আবার চিঠি খুলিয়া না দেখা পর্য্যন্ত যেন আর নিশ্চিন্ত হইতে পারি না!

মনের এরূপ অমূলক সন্দেহ ও শঙ্কার বিচিত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোগ সম্পর্কে বহু লোকের বহু আশংকা দেখা যায়। যে সমস্ত ছাত্র চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহাদের অনেকের মধ্যে এক বিচিত্র মনোভাবের উদ্ভব ঘটে। যখন রোগ সম্পর্কে তাহারা অধ্যয়ন করে, তখনই তাহাদের মনে হইতে থাকে যেন এ-রোগ তাহাদের নিজেদেরই রহিয়াছে! প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াও অনেক কেমিষ্টের যেন সন্দেহ হয়, হয়ত ঠিকমত ঔষধ দেওয়া হয় নাই। ঔষধের শিশি ফেরৎ লইয়া আবার একবার দেখিয়া দেন। বড় রকমের অস্ত্রোপচার শেষ করিয়া অনেক সার্জ্জেনের কেমন যেন আশংকা জন্মে, হয়ত ভুলক্রমে ক্ষুদ্র যন্ত্র ক্ষতস্থানে রহিয়া গিয়াছে কিংবা রক্তনালী ঠিকমত বাঁধা হয় নাই। সন্দেহ বা শংকা মনে একবার চাপিয়া বসিলে যে অস্বস্তি জন্মে তাহা হইতে রেহাই পাইবার জন্য তথাকথিত ভাল মানুষও তাই এমন অনেক কিছু করে, যাহা মনে হইলেও হাসির উদ্রেক হয়।

কুসংস্কার এবং কাল্পনিক কতকগুলি ব্যাপারের সহিত অনেক সময় এরূপ মনোভাবের যোগাযোগ দেখা যায়। অমুক তিথিতে এই করিতে নাই, এমন দিনে যাত্রা নিষিদ্ধ—এ ধরণের বিধান মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এমন কি ইহা লঙ্ঘন করিয়া পরীক্ষা করার ঝুঁকি গ্রহণ করিতে পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ লোকের অনিচ্ছা পরিলক্ষিত হয়।

ছেলেবেলা হইতে কোন কোন বিষয়ে বিসদৃশ ধারণা লইয়া গড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নানা বিষয়ে অমূলক ভীতি জন্মিয়া যায়। কোন বিষয়ে এরূপ ভীতি পরিলক্ষিত হইলে পিতামাতার পক্ষে সন্তানের এই ভয় যত শীঘ্র সম্ভব দূর করিতে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। কোন বিষয়ে সন্দেহ বা শঙ্কা মনের কোণে স্থান পাইলে তাহাও শীঘ্র দূর করা আবশ্যক। অভিভাবকগণ টের পাওয়ামাত্র যদি ছেলেদের এইরূপ মানসিক অস্বস্তির কারণ দূর করিবার ব্যবস্থা করেন, তবেই শুধু সুফল আশা করা যাইতে পারে। সকল প্রকার ভয় জয় করিতে না পারিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর নহে। তাই প্রথম হইতে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

বন্দী মুক্তি

(গল্প)

শ্রীজগন্নাথ সরকার

(১)

পথ চলার একটা ছন্দ আছে। সে ছন্দ সকলের কানে গিয়াই ঝঙ্কার তোলে। কেহ সে ঝঙ্কারকে উপেক্ষা করিয়া চলে, আবার কাহারও মন সে ঝঙ্কারের তালে তালে উন্মাদ হইয়া উঠে। আজ দীর্ঘ আট বৎসর পর ট্রেনে চাপিয়া বাড়ী যাইতে যাইতে সেই উন্মাদনায় মনটি নাচিয়া উঠিল। ট্রেন হু হু করিয়া ছুটিয়াছে আর তাহারই একটি কামরাতে জানালার বাহিরে চাহিয়া আমি এই চলার ছন্দে মাতিয়া উঠিয়াছি। সমুখের দৃশ্যগুলি পিছনে সরিয়া যাইতেছে কিন্তু পিছনের স্মৃতিগুলি একে একে সমুখে সরিয়া আসিতেছে। দেউলীর সেই বন্দীনিবাস—ভুঁড়ীওয়ালা কমান্ডান্ট—ডাক্তারবাবু—বাঙলার শত শত ছেলের দল সকলেই একে একে মনের দ্বারে উঁকি দিয়া যাইতেছে। সেখানে ছিলাম আমরা একটি পরিবার। হাসি ঠাট্টা কলরবে সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে, আমরা বন্দী। কত দূরকে নিকটবন্ধু করিয়াছি—কত পরকে আপন করিয়াছি! আজ বেশী করিয়া মনে পড়ে বরিশালের সেই ছেলেটির কথা। রণেন তার নাম, সে ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। হাসি তামাসা গল্প-গুজবে গানে সকলকে সে মাতাইয়া রাখিত। আমার একবার ভীষণ অসুখ হয়, রণেন দিনের পর দিন রাতের পর রাত শুশ্রূষা করিয়া কাটাইয়াছে। একটুও কথা বলে নাই, মুখে বিরক্তির চিহ্ন একটুও প্রকাশ পায় নাই। সকলে অবাক হইয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের সদা-গম্ভীর দ্বিজেনদা হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, রণেন কি তোমার আপন ভাই হয়?

উত্তর দিয়াছিলাম—না আপন নয়, আপনের চেয়ে বড়। আপনের চেয়েও বেশী।

মনে সাধ ছিল, যেদিন আবার বাঙলামায়ের কোলে ফিরিয়া আসিব সেদিন রণুকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইব। কিন্তু সে সাধ আর পুরিল না। হঠাৎ মস্তিষ্ক-বিকৃতি হওয়ায় তাহাকে রাঁচি লইয়া যাওয়া হইল।

এমনি কত সব স্মৃতি। একদিন হঠাৎ ডাক্তারবাবু এর্টোব্রিনের নাম ভুলিয়া ক্যাটোব্রিন বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া সমস্ত বন্দীনিবাস জুড়িয়া হাসির রোল উঠিয়াছিল। রংপুরের সরোজ একটু ফাজিল ধরণের ছিল। সেই হইতে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হইলেই সে জিজ্ঞাসা করিত—কেমন আছেন মিঃ ক্যাটোব্রিন?

ডাক্তারবাবু অন্তরের উষ্মা গোপন করিয়া মৃদু হাসিতেন মাত্র। বন্দীনিবাসের প্রত্যেক বিভাগে একটি করিয়া হরিণ ছিল। সেগুলি ছিল বন্দীদের সাধারণ সম্পত্তি। কেউ তাহাদের মালিক নয়, আবার সকলেই তাহাদের মালিক। এক একদিন বিভিন্ন বিভাগের হরিণের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা হইত। আমরা মুক্তি পাইবার পূর্বে সে হরিণ কয়েকটিকেও মুক্তি দিয়া আসিয়াছি।

—মশায়ের নিবাস কোথায়?

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। দেখি ট্রেন একটি মাঠের পাশ দিয়া দৌড়াইতেছে। আমার সামনের বেঞ্চে কখন যেন একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারই এই প্রশ্ন। বলিলাম—মাণিকপুর।

—কোন ষ্টেশনে নামবেন?

—পানিয়া।

—ও আমি যাচ্ছি সুদরগঞ্জে। পানিয়া পর্যান্ত একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

এদিক ওদিক চাহিয়া দেখি গাড়ীতে অনেক লোক উঠিয়াছে। একপাশের বেঞ্চিতে একটি ছোকরা বসিয়া নিবিষ্টমনে কি একটা ছবিওয়ালা পত্রিকা যেন দেখিতেছে। ওধারের বেঞ্চে দুইজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। একধারে একটি পশ্চিমা বসিয়া তাহার সুদূর-বর্ত্তিনী "সঁইয়া"কে উদ্দেশ্য করিয়া বিচিত্র সুরে কি যেন বলিতেছে। আজ বাঙলা মায়ের বুকে যাহা দেখিতেছি তাহাই মনকে রাঙাইয়া তুলিতেছে। লাইনের পার্শ্বে কয়েকটি দিগম্বর রাখাল বালক হাঁ করিয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে। দূরে গ্রামের রেখা। জলার ধারে একটা মাছ-রাঙা একটা খুঁটির উপর বসিয়া জলের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মুক্তির আনন্দে বিভোর মন আজ সমস্ত কিছুকেই অন্তরের নিভৃততম কোণ দিয়া উপলব্ধি করিতেছে। মাঝে মাঝে ষ্টেশনে গাড়ী থামে। "পান-বিড়ী-সিগারেট"এর হাঁক শোনা যায়। কত লোক গাড়ীতে উঠে কত নামিয়া যায়। সমস্তই ভাল লাগে। ওদের পিছনে একটিও পুলিশ নাই—একটিও গুপ্তচর নাই। পানিয়া ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন—

—ও মশায়, এই যে পানিয়া।

তাঁহাকে একটা নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম পরিচিত কেহই ষ্টেশনে আসে নাই। বোধ হয় বাড়ীতে আমার চিঠিখানি পৌঁছায় নাই। মনে একটু আনন্দ হইল। হঠাৎ যাইয়া এমন চমকাইয়া দেওয়া যাইবে! জিনিষ-পত্র ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্বায় রাখিতে যাইয়া দেখি আমাদের সেই অমায়িক ষ্টেশন মাষ্টার সঞ্জীববাবু আর নাই। তাহার স্থলে একজন ছোকরা-মত ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—

—সঞ্জীববাবু কোথায়?

ভদ্রলোক চশমার ফাঁক দিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—তিনি ত আজ বছর পাঁচেক হল নাদিরহাট ষ্টেশনে বদলি হয়েছেন। আপনার বাড়ী?

—মাণিকপুর।

—মাণিকপুর? আপনার নাম?

—ধীরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী।

ভদ্রলোক একটু চমকাইয়া উঠিলেন।

—আপনি বুঝি ডেটিনিউ ছিলেন?

—আজ্ঞে হেঁ, দেউলী থেকে ফিরছি। আমার এই

জিনিষ পত্তরগুলো এখানে একটু রেখে যেতে চাই। পরে এসে নিয়ে যাব।

ভদ্রলোক কি যেন ভাবিলেন—তারপর বলিলেন—হ্যাঁ, তা রেখে দিন ওই কোণে। দেখুন আপত্তিকর কিছু নেই-টেই ত? একটু হাসিয়া বলিলেন—বুঝলেন না, চাকরী!

তাহাকে আশ্বাস দিয়া এবং একটি নমস্কার করিয়া মেঠো রাস্তা ধরিয়া চলিতে সুরু করিলাম।

(২)

আঁকা বাঁকা পথ। চারিপাশে ধানের ক্ষেত। বাঙলামায়ের সবুজ শাড়ীর একখানা আঁচল। রাজবন্দী হওয়ার পূর্ব্বে বহু ধানের ক্ষেত দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য ত কোনদিন চোখে পড়ে নাই। মুগ্ধ হইয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি, হঠাৎ ফকিরপাড়ায় হারু সেখের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

—কে ধীরুবাবু নাকি?

—হ্যাঁ, কেমন আছ হারু?

—আমরা চাষাভুষা মানুষ, আমাদের আবার ভাল-মন্দ কি। তারপর কবে এলেন?

—এই ত এখনি আসছি। আমাদের বাড়ীর সকলে ভাল আছে ত?

—হ্যাঁ, ভালই।

হারু সেখ চলিয়া গেলে আবার হাঁটিতে সুরু করিলাম। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া দেখি এই আট বৎসরে কতই যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে! গোয়ালপাড়ার কাছে যে ভীষণ জঙ্গল ছিল তাহা বেমালুম সাফ হইয়া গিয়াছে। ওদিকে মাঠের মধ্যে কয়েকখানা বাড়ী ছিল তাহার একখানাও নাই। দত্তবাড়ীর বাগানের কাছ দিয়া যাইবার সময় একবার বাগানের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলাম। বহু বৎসর পূর্ব্বেকার একখানি ছবি মনে পড়িয়া গেল। সেই স্কুল পালান—দত্তবাড়ীর বাগানের কাঁচামিঠে আম—মিষ্টি কামরাঙ্গা—এমনি কত কি!

আমাদের বাড়ীর কাছে আসিতে না আসিতেই সন্ধ্যা লাগিয়া গেল। ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিলাম। দেখি চৌকির উপর পিছন ফিরিয়া বসিয়া একটি মেয়ে কি যেন সেলাই করিতেছে। ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম আমার ছোট বোন বীণু। ও এখন কত বড়টি হইয়াছে! আস্তে আস্তে যাইয়া পিঠের উপর একটি কিল মারিলাম। বীণু চমকিয়া উঠিয়া বসিল,—কে?

তারপর ভাল করিয়া চাহিয়া বলিল,—কে ছোড়দা নাকি, ও-মা, দেখে যাও ছোড়দা এসেছে, ও, বৌদি......

বাড়ীতে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। পাশের ঘর হইতে বৌদি ছুটিয়া আসিলেন। মা জপের মালা হাতে করিয়াই উপস্থিত হইলেন। অন্য ঘর হইতে একটি অপরিচিত বালক ও একটি বালিকা ছুটিয়া আসিল। মা ও বৌদিকে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—ভাল আছ ত মা?

কোন উত্তর পাইলাম না। দেখি মায়ের চোখে জল। শান্ত হইয়া বৌদি উত্তর করিলেন,—ভালই আছি। তুমি চিঠিপত্র না দিয়ে হঠাৎ এসে উপস্থিত যে!

—চিঠি ত দিয়েছিলাম, তোমরাই পাওনি দেখছি। তা ছাড়া হঠাৎ এসেই ত আনন্দ। বীণুকে কেমন চমকিয়ে দিলেম। ও কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়েছে বৌদি।

ওপাশ হইতে বীণু ফোঁস করিয়া উঠিল,—মিথ্যে কথা বৌদি, আমি মোটেই ভয় পাইনি।

—এই ত তুই-ই মিথ্যে কথা বললি। আমার গা ছুঁয়ে বল দেখি?

বীণু রাগিয়া গেল,—বেশ, মিথ্যে কথা বলেছি আমিই বলেছি।

বীণুকে রাগাইয়া দিলে বেশ মজা দেখা যায়।

এতক্ষণে মা কথা বলিলেন,—তুই যে এসেই ঝগড়া বাধিয়ে দিলি। চল্ ভিতরে চল—হাত পা ধো।

হঠাৎ ঐ বালক বালিকা দুইটির দিকে দৃষ্টি পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—এ দুটি কে মা?

—ওমা! এ যে বীরুর ছেলে মেয়ে। তুই বুঝি দেখে যাসনি না?

বীরু অথবা বীরেন আমার দাদার নাম। বৌদির দিকে তাকাইয়া বলিলাম,—তাই না কি বৌদি? তাহলে ত সন্দেশ......

—সে হবেখন। তুমি এখন চল ত ঠাকুরপো।

—দাদা কোথায়?

—সে গেছে বলরামপুরে, এক মামলার কাজে।

ভিতরে যাইয়া হাত পা ধুইয়া মায়ের কাছে যাইব ভাবিলাম।

মা আজ নিজেই রান্না করিবেন বলিলেন। বৌদি অনেক বলিয়াও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। রান্না-ঘরে যাইয়া তিনি রান্না চড়াইয়া দিলেন। খানিকক্ষণ বৌদি, বীণু ও নূতন ভাইপো-ভাইঝির সঙ্গে গল্প করিলাম। তারপর রান্নাঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মা একটি পিঁড়ি আগাইয়া দিয়া বলিলেন,—বস্ এখানে।

তারপর পায়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—ওমা জুতা পায় দিয়েই ঘরের ভেতর ঢুকেছিস্? শীগগির জুতো খুলে আয়।

হাসিতে হাসিতে যাইয়া জুতা খুলিয়া আসিয়া তাঁহার পাশে বসিলাম। কতরকমের ভাব—কতরকমের কথার বাঁধ আজ ভাঙ্গিয়া গেল। কথায় কথায় হঠাৎ তিনি বলিলেন,—চিঠিপত্র লিখ্‌তি না কেনরে? কয়েক বছর ধরে কি যে উৎকণ্ঠায় থাকতাম, সে ভগবানই জানেন।

বলিলাম,—তুমি ত জান মা, চিঠিপত্র লেখা কোনদিনই আমার অভ্যেস নেই। তাছাড়া দরকারই বা কি? মরে গেলে নিশ্চয়ই খবর পেতে, আর মরার খবর না পেলে জানতে যে বেঁচেই আছি......

মা ধমক দিয়া উঠিলেন,—ওসব তোর কি অলক্ষুণে কথা রে হতভাগা?

হতভাগা সে-ই মা, যে কোনদিন মায়ের এমন মিষ্টি গাল খায় নি।

মায়ের চোখ দুইটা হঠাৎ ছল ছল করিয়া উঠিল।

বহুক্ষণ কথা বলিয়া আর বলিবার মত কিছুই খুঁজিয়া

পাইলাম না। ওঘর হইতে ভাইপো-ভাইঝির কল-কোলাহলের শব্দ শোনা যাইতেছে। এঘরে উনুনের পার্শ্বে বসিয়া আমি আর মা। বহুদিন পর মাকে যেন একান্ত আপনার করিয়া পাইলাম। উনুনের লাল আলো মায়ের মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে যেন একটু বেশী রোগা বলিয়া মনে হইতেছে। কপালের চিন্তারেখাগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গাল দুইটি আরও তোবড়াইয়া গিয়াছে। মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া অনেক দিনের অনেক হারান কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই ছোট বেলাকার কথা—দুষ্টুমী, মায়ের সদাজাগ্রত দৃষ্টি—এমনি কত কি! বহুদিনের হারান শৈশব যেন আবার ফিরিয়া পাইলাম। হঠাৎ বলিলাম,—মা, একটা গল্প বল না?

মা তাঁহার তোবড়ান গালে হাসি টানিয়া বলিলেন,—ওমা, বুড়োবয়সে আবার গল্প শুনবি কিরে? পাগলা কোথাকার!

—হ্যাঁ মা, বল না! সেই যে ছোট বেলায় বলতে—রাজপুত্র আর রাজকন্যার গল্প.....

বৌদি যেন কি একটা কাজে এদিকে আসিতেছিলেন। বাহির হইতে বলিয়া উঠিলেন,—ঠাকুরপো, গল্প শুনে আর কি হবে? বল ত খোদ রাজকন্যে একটা ধরে এনে দি।

সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। হঠাৎ একজনের কথা মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—রাণুদি এখন কোথায় মা?

সকলের মুখই খুব গম্ভীর হইয়া গেল। বৌদি বলিলেন।—ওঃ, তার যা দুর্দশা হয়েছে, ঠাকুরপো। বিধবা মায়ের টাকা পয়সা ত আর বেশী কিছু ছিল না, বাধ্য হয়ে তাকে বীরগাঁয়ের এক আধবুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রথমে কিছুই জানা যায়নি। পরে জানা গেল লোকটি মাতাল। রাণুকে নাকি ভীষণ মারধর করে। সেই আজ পাঁচ বচ্ছর হ'ল বিয়ে হয়েছে, এ পর্য্যন্ত একবারও এ গাঁয়ে আসতে দেয়নি। বুড়ী মা আমাদের বাড়ী এসে কত কান্নাকাটি করে। দেখলে চোখে জল আসে। তুমি এক কাজ করতে পার ঠাকুরপো রাণুর স্বামীকে তুমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে একবার এ গাঁয়ে নিয়ে আসতে পার?

মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। রাণুদি আমাদেরই প্রতিবেশিনী একটি বিধবা বুড়ীর একমাত্র মেয়ে। ছোট বেলায় রাণুদি ছিল আমাদের খেলার সাথী। বলিলাম,—আচ্ছা আমি চেষ্টা করব বৌদি।

রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া ওঘরে যাইতেই মনের ঘোর অনেকটা কাটিয়া গেল। ভাইপো-ভাইঝি, বৌদি সকলের আনন্দ কোলাহলের সঙ্গে নিজের সুর মিলাইয়া দিলাম। মুক্তিতে কি আনন্দ! মনে হয়, বারবার বন্দী হই—বারবার মুক্তি পাই—বারবার এমনি আনন্দ উপভোগ করি।

(৩)

ইহার পর কয়েকদিন গাঁয়ের লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেই কাটিয়া গেল। ওপাড়ার বুড়া ঠাকুরদা হইতে আরম্ভ করিয়া বাগ্দীপাড়ার মতিবাগ্দী পর্য্যন্ত সকলের কাছেই আমার বন্দী-জীবনের ইতিহাস বলিতে হইল। রাণুদির মা-এর সহিত দেখা হইতেই তিনি আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তারপর অনর্গল অশ্রুধারার সহিত রাণুদির দুর্দ্দশার আনুপূর্ব্বিক কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—এর একটা বিহিত করতে হবে বাবা। মেয়ে ত আমার দুটি পাঁচটি নয়। ওই একই মাত্র সন্তান। আজ প্রায় পাঁচ বচ্ছর হ'ল তার সঙ্গে আমার দেখা নাই। বুড়ী মানুষ। কি আর করব। পায়ে যদি আগের মত বল থাকত তবে আমি নিজেই যেয়ে তাকে দেখে আসতাম।

আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম—আপনি ব্যস্ত হবেন না, মাসীমা। আমি কালই যেয়ে রাণুদিকে নিয়ে আসব।

তিনি যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার কাছ হইতে রাণুদির স্বামীর ঠিকানা লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। পরদিন ভোর হইতেই বীরগাঁয়ের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই রাণুদি—গোল্লাছুট খেলায় যার সঙ্গে কেউ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। দৌড় ঝাঁপ সাঁতারে সে ছিল ওস্তাদ। গাঁয়ের দুষ্টু ছেলেমেয়ের দলটির সে ছিল দলপতি। এই ডাকাতে মেয়েটির দৌরাত্মে গাঁয়ের মধ্যেকার সমস্ত ফলমূল পাকিবার অবসর পাইত না। আবার কাহারও কোন বিপদ হইলেই এই ডাকাতে মেয়েটিকে স্মরণ করিত। কাহারও অসুখ হইয়াছে—মুখে জল দিবার কেহ নাই, অমনি রাণুদির ডাক পড়িত। গাঁয়ের বিবাহ এবং অন্যান্য ব্যাপারে সকলেই রাণুদিকে ডাকিয়া পাঠাইত। অন্য কেহ তাহার মত খাটিতে পারিত না। মুসলমানপাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বাগ্দীপাড়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাহার অবাধ গতিবিধি ছিল। বড় হইয়াও তাহার এ স্বভাব যায় নাই। গাঁয়ের মধ্যে সে ছিল সেরা-সুন্দরী। বাড়ীতে বাড়ীতে যখন সে সকলের মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইত তখন অনেকে অবাক হইয়া ভাবিত যে, বোধ হয় স্বয়ং চঞ্চলা কমলা পথ ভুলিয়া এ গাঁয়ে আসিয়া পড়িয়াছেন। সেই রাণুদির বাড়ীতে যাইতেছি।

বীরগাঁয়ে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় দশটা হইবে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাণুদির বাড়ীর পথ জানিয়া লইলাম। নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে যাইয়া দেখি যে একটা এদো স্যাঁতসেঁতে বাড়ী। এখানে সেখানে জঙ্গল। বাইরের বারান্দায় একটি বছর দেড়েকের শিশু ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। মুখের লালার সঙ্গে ধূলা মিশিয়া সমস্ত গায়ে কাদা চটচট করিতেছে। দরজার কাছে আরেকটা পেটমোটা দিগম্বর ছেলে বসিয়া কি যেন খাইতেছে, আর তাহার খাবারের চারপাশে মাছি ভন ভন করিতেছে। ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—খোকা, মহেশবাবুর এই বাড়ী?

ছেলেটি হঠাৎ ভয় পাইয়া দরজার পাশে সরিয়া গেল। কোনই উত্তর করিল না। ঘরের ভিতর হইতে রোগ-ক্লিষ্ট মেয়েলী-স্বরে কে যেন চাপা গলায় বলিল,—বল্ যে তিনি বাড়ী নেই।

বলিলাম,—আমি মাণিকপুর থেকে আস্‌ছি। আমার নাম ধীরেন। মহেশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—কে ধীরু? তুই......বলিতে বলিতে একটি মলিন বসনা স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিল। চাহিয়া দেখিলাম

এ যেন আমাদের সেই রাণুদি নয়—এ যেন তার কঙ্কাল। সোনার মত রং কালি হইয়া গিয়াছে। চোয়ালের হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। চোখ কোটরে গিয়াছে। মাথার সামনের দিককার চুল অনেকখানি পাতলা। রাণুদি একটু হাসিয়া অথবা দাঁত বাহির করিয়া বলিল,—ভাল আছিস ত ধীরু?

—হ্যাঁ, কিন্তু তোমার এ কি চেহারা রাণুদি? এ যে চেনাই যায় না!

রাণুদি কোন কথা বলিল না। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। মা কেমন আছে—গাঁয়ের সকলে কেমন আছে—তাহার পোষা বিড়াল মেনি বাঁচিয়া আছে কিনা—শেফালি ফুলের গাছটা এখন কত বড় হইয়াছে এবং আরও কত শত প্রশ্ন। যতদূর জানিতাম উত্তর দিলাম। তারপর বলিলাম, —আমি সমস্ত খবর ত দিতে পারব না। এই সবে ছাড়া পেয়ে বাড়ীতে এসেছি। এতদিন ত বন্দী ছিলাম। বাড়ীতে এসে তোমার কথা শুনে তোমাকে নিতে এলাম।

—কবে ছাড়া পেয়েছিস?

—আজ কয়েক দিন হল।

হঠাৎ ফোঁস করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ হইল। দেখি রাণুদি তন্ময় হইয়া কি যেন ভাবিতেছে। তারপর হঠাৎ সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া নিজের দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল। বিবাহের কথা—মাতাল স্বামী, মারধর, অনশন অর্দ্ধাশন এই সব কথা। ডান হাতখানি তুলিয়া বলিল,—এই দেখ্।

দেখিলাম হাতে পোড়ার একটা লম্বা দাগ। রাণুদি সে দাগের ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল। আমি হাতখানি ধরিয়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত শুনিতেছি, এমন সময় দেখি সামনে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একটি মুখ আমার দিকে কট-মট করিয়া চাহিয়া আছে। রাণুদি ঘোমটা টানিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। অনুমানে বুঝিলাম ইনিই মহেশবাবু। বলিলাম,—নমস্কার, ডাল......

কথা শেষ হইল না। ভদ্রলোকটি গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—কে মশায় আপনি? বলা নেই কওয়া নেই বাড়ীর ভেতর ঢুকলেই হল! কি চান আপনি?

বলিলাম,—আপনার স্ত্রী আমাদের প্রতিবেশী। আজ পাঁচ বৎসর হ'ল আপনি নাকি তাকে একবারও মাণিকপুরে যেতে দেননি। তাই তার মা তাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে।

—ওসব নেওয়া টেওয়া হবে না, বুঝেছেন!

—কেন?

—আমার খুশী। আপনি কোন্ কুটুম এলেন যে, আপনার কাছে নিকেশ দিতে হবে। যাওয়া হবে না বাস। গাঁয়ে নিয়ে গেলে বুঝি আড্ডা জমে ভাল, না?

অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম,—এসব আপনি কি বলছেন?

—আহা ন্যাকা, কিছুই বোঝে না যেন! আমি ছিলাম না বাড়ীতে আর এই ফাঁকে হাত ধরে ধরে —ও মাগীকে আজ আমি শেষই ক'রে ফেলব। কই কোথায় গেল সে হারামজাদী?

—দেখুন—এসব......

চুপ শুয়োর। এখনি বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। ভদ্দরলোকের পরিবারের গায়ে হাত দিতে লজ্জা করে না? দাঁড়াও তোমায় মজা দেখাচ্ছি এবার।

বলিয়া দুম দুম করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। আমার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত নাচিয়া উঠিল। হাত গুটাইয়া সেই ঘরের দিকে যাইবার জন্য পা তুলিয়াছি এমন সময় রাণুদি যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—তোর পায়ে পড়ি ধীরু—কোনরকম গণ্ডগোল করিসনে। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তুই এখনি এখান থেকে যা। ও ঘরে মদ খেতে গেল—এসেই একটা কিছু কাণ্ড ক'রে ফেলবে।

তারপব নিজেই হাত ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে উঠানের বাহিরে আনিয়া বলিল।—আমার মাথার দিব্যি ভাই, তুই এ বাড়ীমুখো আর হোসনে। মাকে বলিস তার মেয়ে মরে গেছে।

বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বলিলাম,—ইচ্ছে করে, রাণুদি, মাথাটা ফাটিয়ে দিয়ে যাই। জেলখানাকে আমরা ভয় করিনে জানই ত। শুধু তোমার স্বামী বলেই ওকে আজ ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তোমরা কি ক'রে এসব সহ্য কর রাণুদি?

—চিরদিন ধ'রে স'য়ে এসেছি ভাই। আজ ত আর নূতন নয়। বলিয়াই রাণুদি তাড়াতাড়ি করিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। আমিও অভুক্ত অবস্থায় সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে মাণিক-পুরের পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাড়ীতে আসিলে বৌদি জিজ্ঞাসা করিলেন:

—কি হ'ল ঠাকুরপো?

—বড্ড মাথা ধরেছে বৌদি, পরে বলব।

বৌদি চলিয়া গেলে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম। একদিন পূর্ব্বে আমি ছিলাম মুক্তির আনন্দে বিভোর। একদিন পরেই সমস্ত আনন্দ মিথ্যা হইয়া গেল—বিস্বাদ হইয়া গেল।

দূরে মাঠের উপর দিয়া একটি ছোট পাখী মনের আনন্দে গান করিতে করিতে উড়িয়া চলিয়াছে। তাহাই দেখিতে দেখিতে অন্তরের নিভৃততম কোণে একটু হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

কবি তাহার সম্মুখে আসিয়া ধীরস্বরে বলিল, "আমার নাম আলোকনাথ। তুমি বোধ হয় চেন আমাকে! মনে পড়ে, দিন দুই আগে আমার নৌকায় গিয়ে বলেছিলে, "বাবু, আপনার মনের মত জিনিষ আমি দিতে পারি।"

হারুখুড়ো কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "হাঁ বাবু, বলেছিলাম। কিন্তু আপনি ত আমায় দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

আলোক হাসিয়া বলিল, 'মনে আছে তা'হলে। বেশ, আজ তবে কার জন্য সে জিনিষ নিয়ে যাচ্ছিলে?"

হারুখুড়ো আকাশ হইতে পড়িল। কহিল, "কি জিনিষ, বাবু?"

আলোক বলিল, "তুমি বোধ হয় জান না, একটু আগে নৌকার পাশ দিয়ে সে জিনিষ নিয়ে যাচ্ছিলে!"

হারুখুড়ো অন্তরে অন্তরে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "আমি! সে কি বাবু, আমি ত সবে এই বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি!"

আলোক বলিল, "তুমি কিছুই জান না?"

প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া খুড়ো বলিল, "না।"

আলোক বলিল, "ভাল, দেখা যাক। থানায় খবর পাঠিয়েছি, দারোগা এলে এ কথার উত্তর দিও।"

মুহূর্তে খুড়ার প্রবল সংকল্প টুটিয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে সে আলোকের পায়ের তলায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, "দোহাই আপনার, গরীবকে মারবেন না।"

আলোক নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দিল, "গরীব যদি সেধে মরতে' চায়, সে দোষ গরীবের।"

হারুখুড়ো উঠিয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল, "তবে শুনুন বাবু, সত্যি কথাই বলব আপনাকে, তাতে অদৃষ্টে যাই থাক। এই বাগানের মালিক যে, সে ব্যাটা এক নম্বর লম্পট। দুর্দ্দান্ত জমিদার। প্রজার রক্ত শুষে খাওয়া আর লোকের মেয়েছেলে লুটে আনাই তার কাজ। আমরা কি করব বাবু হুকুমের চাকর বৈ ত না!"

ক্রোধে আলোকনাথের সুগৌর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। হারুখুড়োর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কঠিন-কণ্ঠে কহিল, "সত্য বল এখনও, কোথা থেকে একে ধরে এনেছ?"

কম্পিতকণ্ঠে হারুখুড়ো বলিল, "বাবুরই গাঁ থেকে।"

"কোন্ গাঁ? এখান থেকে কতদূর?"

"রতনদীঘি। এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ।"

"মেয়েটির বাপের নাম কি?"

হারু নাম বলিলে, আলোকনাথ পুনরায় প্রশ্ন করিল, "মেয়েটি বিবাহিতা?"

—"না।"

আলোকের সারা দেহে আগুন ফুটিয়া উঠিল। দুই প্রদীপ্ত শিখা জ্বালাইয়া বজ্রকণ্ঠে হাঁকিল, "তেওয়ারী, বাঁধ উস্কো। উঃ শয়তান, এমনি ক'রে তোরা একটা জীবনকে নষ্ট ক'রে দিয়েছিস্।"

কথাশেষে সে উদ্যানের ফটক পার হইয়া কক্ষদ্বারে আসিয়া করাঘাত করিল।

তীব্র সুরার ক্রিয়া তখন শিরায় শিরায় অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করিতেছে।

লালসাদীপ্ত চক্ষে অনীতার পানে চাহিয়া মদন জড়িত-কণ্ঠে ডাকিল, "অনীতা।"

অনীতার সবেমাত্র জ্ঞানোন্মেষ হইতেছিল। মদনের পানে ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মদন তাহার নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, "ভয় কেন অনু, আমায় চিনতে পারছ না?"

অনীতার দৃষ্টিপথ হইতে বিশ্বচরাচর লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে অস্পষ্টপ্রায় স্মৃতি জাগিয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলা। জল আনিতে সে পুকুরের ঘাটে চলিয়াছে, ঘাটে লোক ছিল না। কেমন যেন তাহার ভয় ভয় করিতেছিল। তাড়াতাড়ি কলসীটি ভরিয়া যেমন সে উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনই যমদূতের মত দুই ব্যক্তি তাহার দিকে আগাইয়া আসিল। দারুণ ভয়ে অনীতা চীৎকার করিয়া উঠিল, কাঁকালের কলসী রাণার উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অনীতাও টলিয়া পড়িতেছিল, লোক দুটা আসিয়া তাহাকে ধরিল। সে চীৎকার করিতে যাইতেছিল, তাহারা সে অবসর দিল না। মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিল, অনীতাও লুপ্তসংজ্ঞা হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

জ্ঞান হইয়া এই প্রথম সে মদনকে দেখিতেছে। কিন্তু মদনের লালসাদীপ্ত চক্ষু দেখিয়া ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। এখনই তাহার কি যেন সর্ব্বনাশ ঘটিবে ভাবিয়া আতঙ্কে সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মদন বলিল, "ভয় কেন অনু, আমায় চিনতে পারছ না?"

অনীতার দুটি চক্ষু অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া উঠিল। কাতর-কণ্ঠে সে কহিল, 'মদন-দা, আমার এমন সর্ব্বনাশ ক'রলে কেন?'

মদন হাসিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ কিসের? তোকে রাজার হালে রাখব, কোন কষ্ট হবে না।"

অনীতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি—মদন-দা, আমায় মা'র কাছে রেখে এস।"

মদন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া কহিল, "পাগল! এখন কি পাঠিয়ে দিতে পারি, লোক জানাজানি হ'য়ে গেছে যে! দুদিন থাক, দেব বৈকি পাঠিয়ে।"

বলিয়া সে আর এক গ্লাস পানীয় উদরস্থ করিয়া টলিতে টলিতে অনীতার দিকে অগ্রসর হইল।

অনীতার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, নড়িবার সামর্থ্য মাত্র তাহার ছিল না। তীক্ষ্ণ চক্ষুর আকর্ষণে অজগর যেমন শিকারকে স্তম্ভিত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, প্রাণসংশয় জানিয়াও সম্মোহিত প্রাণী পদমাত্র নড়িতে পারে না, তেমনই মদনকে মত্ত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও অনীতার নড়িবার সামর্থ্য রহিল না। কণ্ঠ হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদও বাহির হইল না। কম্পিতবক্ষে, আড়ষ্ট নয়নে, নির্নিমেষে অনীতা সেদিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় দুয়ারে করাঘাত হইল ও সশব্দে রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল। মদন পশ্চাতে চাহিতে গিয়া মেঝের উপর টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। অনীতা সংজ্ঞা হারাইয়া সেই-খানে লুটাইয়া পড়িল। (ক্রমশ)

সুলতানগঞ্জে শ্রীশ্রীঅজগবীনাথ দর্শন

(ভ্রমণ-কাহিনী)

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ এম-এ

জামালপুর বিহারের একটি স্বাস্থ্যকর স্থান এবং ইহার প্রায় চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা। এ-হেন জামালপুরে গিয়াছিলাম, নষ্ট স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নহে, কিংবা দেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্যেও নহে। সংসাররথের চিরঘূর্ণায়মান চক্রের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে নিশ্বাস যখন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখন দেহ ও মন বিশ্রামের জন্য আকুল হয়। আমারও তাহাই হইয়াছিল। সোজা কথায় একটু হাঁফ ছাড়িবার জন্য গত বড়দিনের ছুটিতে জামালপুরে গিয়াছিলাম। এই ছুটি জিনিষটি না থাকিলে বোধ হয় চাকরীজীবী বাঙালীর অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে লোপ পাইত। ছুটিই ত বাঙালীর জীবনমরুর ওয়েসিস।

কিন্তু ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। অদৃষ্টে শান্তি লেখা ছিল না। তাই বোধ হয় জামালপুরের শৈলমালার সৌন্দর্য্য আমাকে দুই একদিনের অধিক মুগ্ধ করিতে পারিল না। বরং প্রকৃতির অন্তরে বিংশ-শতাব্দীর যন্ত্র-সভ্যতার সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান কিরূপে অক্টোপাসের মত ভীষণ বাহু বিস্তার করিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে ধিক্কার আসিল। অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা ও মানুষের হস্তে নির্ম্মিত বৈচিত্র্যহীন সৌধাবলীর মধ্যে এক পরম অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিলাম, আর লক্ষ্য করিলাম মানুষও যন্ত্রের সংস্পর্শে কিরূপে যন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। জামালপুরে যে মানব-সমাজের সহিত পরিচয় হইল, তাহা যন্ত্রসর্ব্বস্ব বলিয়াই বোধ হইল। যে স্থান প্রকৃতির লীলা-নিকেতন ছিল, একণে তাহা ধনিকের ঝঙ্কারে, শ্রমিকের আর্ত্তনাদে মুখরিত, পরিব্যাপ্ত হইতেছে। বেশ সহজেই বুঝিলাম কেন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লহ যত লৌহ, লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব-সভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী।'

আমার মানসিক অবস্থার কথা স্থানীয় এক ডাক্তার বন্ধুকে জানাইলাম। বুঝিয়াই হউক বা না বুঝিয়াই হউক, তিনি আমাকে সুলতানগঞ্জের 'অজগবীনাথ দর্শনের বিধান দিলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত ও নিরুৎসাহ মনে পরদিনই সুলতানগঞ্জ যাত্রা করিলাম। তীর্থযাত্রীর পুণ্য-কামনা লইয়া যাত্রা করি নাই, কারণ ভারতবর্ষের বাহান্নটি পীঠস্থানের কোনটির আকর্ষণ আজ পর্য্যন্ত অনুভব করি নাই। ভাবিয়াছিলাম একাই যাইব, কিন্তু ডাক্তারবন্ধু সুরেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর একদল বালক-বালিকা নাছোড়বান্দা হইয়া আমার সঙ্গ লইল। যীশুখৃষ্টের উপদেশ মনে পড়িয়াছিল কিনা সঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু শিশুর দলকে 'না' বলিতে পারিলাম না। এমন কি 'পথি নারী-বিবর্জ্জিত' হইবার উপায়ও রহিল না, আমার অবস্থা সাগরসংগম-যাত্রী মৈত্র মহাশয়ের মত হইল। আমি পুণ্যস্থানে যাইতেছি শুনিয়া বন্ধু-ভগিনীও সঙ্গিনী হইবার অনুরোধ জানাইলেন। বুঝিলাম পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনা পল্লীনারী মোক্ষদার একচেটিয়া নহে, উচ্চ-শিক্ষিতা আধুনিক মহিলার মধ্যেও সেই প্রবৃত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। তবে মোক্ষদার সহিত তাঁহার এই তফাৎ ছিল যে, মোক্ষদার সন্তান-সংখ্যা ছিল এক, ইঁহার ছিল পুরা এক গণ্ডা। আমাদের গন্তব্যস্থানে পেঁছিতে হইলে কিঞ্চিৎ নৌকাযাত্রারও প্রয়োজন শুনিয়া আমি একটু চিন্তিত হইলাম। সকল চিন্তা কিন্তু ধীরে ধীরে দূর হইয়া গেল, যখন সুলতানগঞ্জগামী ট্রেন বেলা ১১টার সময় জামালপুর ষ্টেশন ত্যাগ করিল।

জামালপুর হইতে অল্পদূরে আসিয়াই আমাদের ট্রেন একটি সুড়ঙ্গ বা টানেলের মধ্যে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর বাতিগুলি জ্বলিয়া উঠিল। গাড়ীর বাহিরে দেখিলাম দুর্ভেদ্য অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকার তাহার তুলনায় আলোক। জীবনে সজ্ঞানে টানেলের মধ্যে প্রবেশ এই প্রথম। গয়ার পথে যে টানেল আছে, তাহার মধ্য দিয়া একবার গিয়াছিলাম, কিন্তু তখন নিদ্রিত ছিলাম। শুনিয়াছি, ইটালী ও সুইট্‌জারল্যান্ডের মধ্যবর্ত্তী সিম্‌প্লন্ গিরিবর্ত্মের সুড়ঙ্গ প্রায় সাড়ে বার মাইল। সেই হিসাবে জামালপুরের টানেল কিছুই নয় বলিতে হইবে, কারণ ইহা অর্দ্ধমাইল মাত্র দীর্ঘ হইবে। জামালপুরের পাহাড়ের যে অংশের মধ্য দিয়া এই সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে, সে অংশের নাম কালীপাহাড়। প্রকৃতপক্ষে এই সকল পাহাড় বিশাল বিন্ধ্যশ্রেণীর অংশবিশেষ।

টানেল অতিক্রম করিয়া গাড়ী বিহারের উর্ব্বর প্রান্তরের বুকের উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল। শীতের অলস-মধুর মধ্যাহ্নে সুদূর দিগন্তে নীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে মনটা কবিভাবাপন্ন না হইলেও উদাস হইয়া উঠিল। সমতলভূমির অধিবাসীর বক্ষে নিম্নতম পর্ব্বতের দৃশ্যও কি এক মায়াকাজল পরাইয়া দেয় কে জানে! সঞ্জীবচন্দ্র তাই বুঝি পালামৌ পাহাড় দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিন্ধ্যগিরির দিকে চাহিতে চাহিতে শৈশবে পঠিত হেমচন্দ্র-রচিত 'বিন্ধ্যগিরি' কবিতা স্মৃতি-পথে উদিত হইল। তখন শুধু আবৃত্তি করিতাম,

'উঠ উঠ গিরিবর—অগস্ত্য ফিরেছে;
ভারতে ইংরাজরাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে;
সেদিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে,
তুমি এখনও শুয়ে দেখিছ স্বপন?
উঠ উঠ গিরিবর, করো না শয়ন।'

আর মানস নয়নে এক মোহনদৃশ্য প্রতিফলিত হইত। আজ চর্ম্মচক্ষে বিন্ধ্যগিরি দেখিয়া কিন্তু শৈশবের সে আনন্দ পাইলাম না। তবে যাহা পাইলাম, তাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দুর্লভ। ভাবিতে লাগিলাম অগস্ত্য ফিরিবে কি-না জানি না, বিন্ধ্য উঠিবে কি-না তাহাও জানি না, কিন্তু ভারত যদি এখনও না উঠে, তবে আর উঠিবে না।

হঠাৎ আকাশ হইতে দৃষ্টিপথের দুই পার্শ্বে হরিদ্রাবর্ণ সর্ষপক্ষেত্র নামিয়া আসিল। সে দৃশ্য সত্যই অপূর্ব্ব। 'চক্ষে সরিষার ফুল দেখা বাঞ্ছনীয় না হইলেও দিগন্তবিস্তৃত পুষ্পিত সর্ষপক্ষেত্র হইতে নয়ন ফিরাইতে পারিলাম না। সংসারের আধি-ব্যাধি দুঃখ-দৈন্যের কথা মনের কোন্ নিভৃত স্থানে লুকাইয়া পড়িল। কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের আল্‌স্‌ওয়াটার হ্রদের তীরে অসংখ্য ড্যাফোডিল পুষ্প দেখিয়া আত্মহারা হইবার অর্থ আজ নিজের অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিলাম। এই সামান্য দৃশ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা আমরা অতি সভ্য হইয়া আর উপভোগ করিতে পারি না। ইংরেজ-কবি ডেভিসের ভাষায় 'we have no time to stand and stare' অর্থাৎ চক্ষু মেলিয়া এদিক ওদিক চাহিবার সময় আমাদের নাই।

পৌনে বারোটার সময় আমাদের গাড়ী সুলতানগঞ্জ ষ্টেশনে থামিল। জামালপুর ও সুলতানগঞ্জের মধ্যে শুধু একটি মাত্র ষ্টেশন, তাহার নাম বরিয়ারপুর। হাওড়া হইতে সুলতানগঞ্জ

২৮০ মাইল, জামালপুর হইতে ১৭ মাইল এবং ভাগলপুর হইতে ১৫ মাইল মাত্র। ষ্টেশন হইতে সদলবলে পদব্রজে যাত্রা করিলাম। এক্কা দু'চারখানি ছিল, কিন্তু গন্তব্যস্থান নিকট বলিয়া এবং বেহারে বেঘোরে এক্কা চড়িবার সাহস না থাকায় পদব্রজে যাইতে দ্বিধা করিলাম না। মনে আছে, পাটনায় একবার এক্কা হইতে ধরণীতলপ্রাপ্তি হইতে অতিকষ্টে রক্ষা পাইয়াছিলাম। আমাদিগকে শিকার মনে করিয়া দুই একজন বাবা গৈবীনাথের পাণ্ডা আমাদিগের সঙ্গ লইলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন আমরা মৌনব্রতী, তখন আমাদের নিষ্কৃতি দিলেন, কেবল একটি পাণ্ডা-বালক আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিল না। সুলতানগঞ্জ বিহারের একটি পুরাতন ব্যবসাকেন্দ্র এবং পশ্চিমী ছাপ তাহাতে যথেষ্ট দেখিবার সৌভাগ্য জীবনে আজও হয় নাই, কিন্তু পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার বক্ষে দেবাদিদেবের এই নিকেতন দেখিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিলাম। পুণ্যসঞ্চয় কি জানি না, তীর্থমাহাত্ম্য ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করি নাই, আজ মনেপ্রাণে বুঝিলাম তীর্থশুচিতা।

মন্দির গঙ্গাতীর হইতে দুই কি তিনশত গজ দূরে অবস্থিত কতকগুলি সু-উচ্চ শিলাস্তূপের শীর্ষদেশে। ঐস্থানে যাইতে হইলে খেয়া-নৌকার সাহায্যে পার হইতে হয়, প্রত্যেকের যাতায়াতের মাশুল লাগে মাত্র দুই পয়সা। আমরা যখন তীরে পেঁাছিলাম, তখন নৌকা ওপারে, সুতরাং আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। নৌকা আসিলে অতি সন্তর্পণে নৌকারোহণ করিলাম. ভয় হইল পাছে অভিভাবকের কর্ত্তা
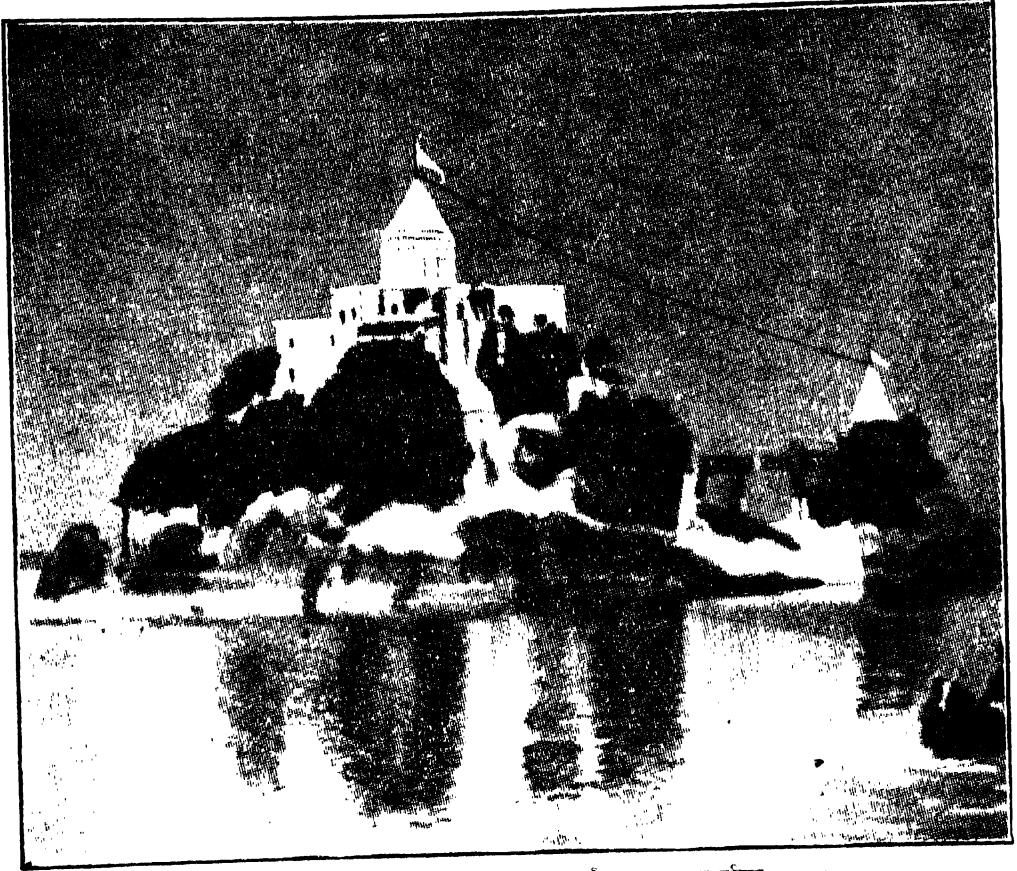
প্রাচীন জহ্নু-ক্ষেত্র—সুলতানগঞ্জে অজগবীনাথ মহাদেবের মন্দির

আছে। সর্ব্বাপেক্ষা পাকা ছাপ দেখিলাম ধূলার এবং সেই ধূলায় ধূসরিত হইতে হইতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম, 'ধূলি নহে, ধূলি নহে, গৈবী-পদরেণু'। ৭।৮ মিনিট পরে শ্রীশ্রীঅজগবীনাথের মন্দির নয়নগোচর হইল। এমন সুন্দর স্থানে দেব-মন্দির কখনও দেখি নাই, আমাদের পদক্ষেপ স্বতঃই দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল।

গঙ্গাতীর হইতে গঙ্গাবক্ষে মন্দিরের যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা মানসপটে যেন চিরকালের মত অঙ্কিত হইয়া গেল। মুঙ্গেরের গঙ্গা আসিয়া এইখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ভাগলপুরের পানে ছুটিয়াছে। পুণ্যসলিল বক্ষে শ্রীশ্রীগৈবীনাথের মন্দিরের প্রতিবিম্ব চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তুষারমৌলি হিমালয়ের অঙ্গীভূত কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমের সৌন্দর্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হই। শহরের কর্ম্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে নৌকারোহণ জিনিষটি একটি অনাস্বাদিত আনন্দ, এক্ষণে সেই আনন্দ উপভোগ করিয়া সুলতানগঞ্জ আগমন সার্থক হইল। বৈতরণী পার হইবার সময় পরলোকযাত্রীর মনে কি ভাবের উদয় হয় মর্ত্ত্যবাসীর পক্ষে তাহার অনুমান করা কঠিন, কিন্তু গঙ্গা-বক্ষে সেদিন মনে হইল পৃথিবীর যত পাপতাপ, যত নিন্দাগ্লানি সকলই পশ্চাতে ফেলিয়া আসিলাম।

ঘাটের নিকট হইতে শিলা-সোপান মন্দিরদ্বার পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। দেবতার স্থানে পাদুকা নিষিদ্ধ; সুতরাং ঘাটের উপর পাদুকা ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানে পাণ্ডার অত্যাচার নাই দেখিয়া বড় খুশী হইলাম। সর্ব্বোচ্চ শিলাশীর্ষে শ্রীশ্রীঅজগবীনাথ বা

গৈবীনাথ শিবের মন্দির অবস্থিত। স্বল্পালোকিত মন্দির মধ্যে তিনটি শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। পাণ্ডাজী বলিলেন, একটি গৈবীনাথ, একটি সিদ্ধিনাথ ও আর একটি কেদারনাথের। কেহ কেহ এই গৈবীনাথের গৈরিকনাথ আখ্যাও দিয়া থাকেন। এই মন্দির সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাঁহাও পাণ্ডাজী আমাদিগকে শুনাইলেন। এই তীর্থক্ষেত্র জহ্নুক্ষেত্র নামে পরিচিত। পুরাকালে জহ্নুমুনি তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় গঙ্গাদেবী ভগীরথের সহিত মর্ত্যে আসিতেছিলেন। গঙ্গাদেবী মুনির কোশাকুশি ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বিপদ ঘটাইলেন। মুনিপ্রবর কুপিত হইয়া এক গণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। বালক ভগীরথ হঠাৎ গঙ্গাদেবীকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া প্রমাদ গণিল। শেষে বুঝিতে পারিয়া বহু স্তবস্তুতি করিয়া মুনিকে প্রসন্ন করায় তিনি তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিয়া গঙ্গাকে মুক্তি দিলেন। তাহার পর হইতে গঙ্গার এক নাম হইল জাহ্নবী। আসল মন্দিরের পার্শ্বে আজও জহ্নুমুনির আশ্রম বলিয়া একটি স্থান আছে। সেটিও আমরা দর্শন করিলাম।

এই স্থানে শ্রীশ্রীগৈবীনাথ শিবের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। দুর্গাচরণ রায় প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' হইতে গল্পটি উদ্ধৃত করিলাম:—

কোন সময়ে এক জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ বৈদ্যনাথের মস্তকে জল দিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার শরীরে এমন বল ছিল না যে, চলিতে পারেন। সুতরাং অতিকষ্টে বসিয়া বসিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের কষ্ট দেখিয়া বৈদ্যনাথ অপর এক ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া বলিলেন, "পিপাসায় প্রাণ যায়, ঐ জল আমাকে দাও, পান করি।" বৃদ্ধ তদুত্তরে বলিলেন, "এ জল আমি বাবা বৈদ্যনাথের নাম করিয়া লইয়া যাইতেছি, অতএব কি প্রকারে দিতে পারি?" বৈদ্যনাথ বলিলেন, পিপাসায় জল না দেওয়া মহাপাপ—তুমি বরং এ জল আমাকে পান করিতে দিয়া অপর জল গঙ্গা হইতে তুলিয়া লইয়া যাও।" তৎশ্রবণে তাঁহাকে জল প্রদান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণরূপী বৈদ্যনাথ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি যাহাকে জল দিতে যাইতেছ, আমিই সেই বৈদ্যনাথ। তোমার ভক্তি ও কষ্ট দেখিয়া দুঃখ হওয়ায় এখানে আসিয়া দেখা দিলাম, আর তোমাকে বৈদ্যনাথে যাইতে হইবে না। অতঃপর আমি এই সুলতানগঞ্জের গৈরিকনাথ শিবের মধ্যে রহিলাম। লোকে এখানে আমার মস্তকে জল-প্রদান করিলে বৈদ্যনাথের মস্তকে জল প্রদানের ফল প্রাপ্ত হইবে।"

শিলাশীর্ষ হইতে গঙ্গার দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। অতৃপ্ত নয়নে দেখিলাম সুদূরে প্রসারিত গঙ্গা-ঊর্মিমালা মধ্যাহ্ন-সূর্যে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সুশীতল সলিলসিক্ত বায়ুসেবনে শুধু দেহে নয় মনেও পবিত্র ও নির্মলভাব আনিয়া দিল। ভাগলপুরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে অদূরে তীরস্থিত একটি ক্ষুদ্র শৈলচূড়ার উপর একটি মসজিদ দৃষ্টিগোচর হইল। লোকের মুখে শুনিলাম উহা একটি প্রাচীন মসজিদ, তবে প্রাচীনত্ব গৈবীনাথের মন্দিরের সহিত আদৌ তুলনীয় নহে। কেহ কেহ বলিলেন, উহা বাঙলার নবাবী-আমলে নির্মিত। ১৯৩৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে উহা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, সম্প্রতি পুনর্গঠিত হইয়াছে। ভিতরে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই, এক অংশে পাশাপাশি ১২টা কবর আছে। এই মসজিদটি দেখিয়া মনে হইল, হিন্দুতীর্থস্থানের পার্শ্বে ইসলাম-ধর্মের গৌরবপতাকা উড্ডীন করিবার চেষ্টা অনেক স্থলে হইয়াছে। বারাণসীধামে ঔরঙ্গজেব একাধিক মসজিদ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পঞ্চগঙ্গাঘাটের উপরে যে মসজিদ আছে এবং জ্ঞানবাপীর নিকটে যেটি আছে তাহা ঐ চেষ্টার প্রমাণ। মন্দিরের পার্শ্বে এই মসজিদ স্থাপনের পশ্চাতে কি মনোবৃত্তি থাকিতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। একের ধর্মকে বিনাশ করিয়া আপন ধর্মের মহত্ত্বপ্রচার হয়ত এই মনোবৃত্তির মূলে ছিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এই প্রবৃত্তিকে inferiority complex বলিয়া থাকে।

কতক্ষণ এইরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিলাম জানি না, হঠাৎ সঙ্গীদের একজনের ডাকে নীচে নামিবার কথা স্মরণ হইল। কিছু নীচে নামিয়া সেতুযোগে আর একটি মন্দিরে আসিলাম। এই মন্দিরটি ও এই সেতুটি প্রায় নূতন বলিলে হয়। দুইটি মন্দিরের চূড়ার মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত নিম্নচূড় মন্দিরটিতে গঙ্গাদেবীর একটি সুন্দর মর্মরমূর্তি আছে, দেবী কৃতাঞ্জলিপুটে গৈবীনাথের মন্দিরের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। দুইটি মন্দিরের সংযোজক সেতুটি কতিপয় পশ্চিমী দানশীল ভদ্রলোকের অর্থে ১৩২২ সালে নির্মিত। অবাঙালীর দেশে বাঙালীর কীর্তিও দেখিলাম। গঙ্গাবক্ষ হইতে যে ঘাটটি মন্দিরে উঠিয়াছে সেটি একটি বাঙালীর দানশীলতার পরিচয় দিতেছে।

নীচে নামিয়া বুদ্ধিমতী বন্ধুভগিনীর কৃপায় কিছু জলযোগ করিবার সুযোগ ঘটিল। তৎপূর্বে গঙ্গাস্নানের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। একাদিক্রমে বহুদিন শহরবাসের ফলে অবগাহনের সুযোগ হয় নাই। হিম-শীতল জল হইলেও বহুদিন পরে গঙ্গার বুকে সন্তরণ করিয়া মনে হইল যেন কুড়ি বৎসর বয়স কমিয়া গিয়াছে। জামালপুর হইতে আমার সঙ্গে এক আত্মীয়-পুত্র আসিয়াছিল, সেও আমার সহিত যোগদান করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিল না। কারণ তাহার বয়স আমার অপেক্ষা বহু অল্প। বলা বাহুল্য তুষার-শীতল জলে ১০ মিনিটের অধিককাল থাকিতে পারি নাই। স্নানান্তে জলযোগ করিতে করিতেই পারে যাইবার সময় হইল।

ফিরিতে যে কাহারও বিশেষ ইচ্ছা ছিল তাহা বোধ হইল না। নৌকায় আরোহণ করিয়া সকলের ইচ্ছা হইল নৌকাযোগে মন্দির প্রদক্ষিণ করা। আমি আনন্দের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। ইতিপূর্বে একটি জিনিস লক্ষ্য করি নাই, এক্ষণে প্রদক্ষিণ করিবার সময় দেখিলাম চতুর্দিকের শিলাগুলি কোন নামহীন খ্যাতিহীন শিল্পীর শিল্পজ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে। শিলাগুলির বহির্গাত্রে হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত আছে। মৌলিকতার দিক দিয়া খোদিত মূর্তিগুলি অধিক প্রশংসার যোগ্য নহে। বেশ ভাল লাগিল অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর মূর্তি। বিষ্ণুর মস্তক ভগ্নাবস্থায়, কিন্তু তবুও সমগ্র মূর্তিতে একটি শিল্প-সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। হনুমানজীর মূর্তিও উল্লেখযোগ্য, তবে বাঙালীর চক্ষু বলিয়াই বোধ হয় তাহার মধ্যে বিশেষ কোন সৌন্দর্য আবিষ্কার করিতে পারিল না। এক বিষয়ে বড় চমৎকৃত হইলাম। যে শিলাগুলির উপর শিল্পী-হস্তের পরিচয় রহিয়াছে সেগুলির কোন কোনটি এরূপ বিপজ্জনকভাবে গঙ্গার উপর ঝুলিয়া আছে যে, তাহার উপর যে কোনরূপ কারুকার্য করা অতি দুরূহ। এইগুলি দেখিয়া যে কোন ব্যক্তি শিল্পীর জীবনের দুঃখ কতকটা অনুমান করিতে চেষ্টা করিতে পারেন। ইটালীয় শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো গির্জার ভিতরের ছাদ হইতে দোদুল্যমান অবস্থায় যে অমর চিত্রাবলী অঙ্কিত করিয়াছিলেন, অজন্তার অন্ধকার গুহাগাত্রে যে চিত্র-সমূহ আজও ভারতীয় শিল্পীর কীর্তির পরিচয় দিতেছে সেইগুলির কথা সহজেই মনে পড়িল। মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, অতীত শিল্পীদের ভুলিয়া গিয়া পরপারে যাত্রা করিলাম। তীরে

(শেষাংশ ৭৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মেঘ-কজ্জল

(গল্প—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদেবব্রত দাশগুপ্ত

কদিন থেকে নমিতার মুখ শ্রাবণের আকাশের মতই সব ময় ভার-ভার। কাল রাত্রে অজয় অত কথা ব'লে নমিতাকে সহজ ক'রতে চাইলে, অথচ ঘুমের ভান্ করে নমিতা একটি কথারও কোন উত্তর দিলে না! একে অজয়কে আজকাল গভীর রাত অবধি বই পড়তে হচ্ছে, তার উপর নমিতার রহস্যময় ব্যবহারে তাহার মনে মেঘলা দিনের মত একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।......সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ খুলে চেকোশ্লোভাকিয়ার পতনের ইতিহাস জানতে পারলে অজয়। নিশ্চিত হলেও চেকদের দুর্ব্বল পরিণতির কথা ভেবে অজয় গভীর বেদনা অনুভব না করে থাকতে পারলে না। চায়ের কাপ হাতে নীরবে নমিতা এসে পাশে দাঁড়াতে অজয় অপ্রত্যাশিত হাসি হেসে বললে, "দেখছ নমিতা, যা বলেছিলাম ঠিক তাই। অসীম সেন পরশু বলছিল, 'ইউরোপের খবর পড়তে বসলে তাজা বারুদের গন্ধ বেরয়।' বললাম 'ভয় নেই যুদ্ধ বাধবে না। চেকদেরও অষ্ট্রিয়ার পরিণতিকে অনুসরণ করতে বাধ্য হতে হবে। হবে এ-ও অভ্রান্ত, ইউরোপকে আজ হোক কাল হোক অনিবার্য্য সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবেই।'

......তুমি অসীম সেনকে চিনতে পারলে না! সেই ছিপ্ ছিপে ফর্সা ছেলেটা!"

নমিতার মুখের কোন পরিবর্ত্তনই হল না; অজয়ের কথা যেন সে শুনতেই পায়নি!

"আচ্ছা, কদিন ধ'রে যে রকম লিখছ—একখানা সম্পূর্ণ বই বার করবার পক্ষে তা' কি যথেষ্ট নয়?"

"না নমিতা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় বিভিন্ন ভাবধারায় তাদের সৃষ্টি; কার-ও সঙ্গে কারও কোনও পরিচয় নেই।" অপরাধীর মত অজয় বললে।

"এটা তোমার স্মরণ রাখা উচিৎ তোমার খেয়ালের খোরাক যোগাবার জন্যে নয়ঃ তোমার বাঁচবার একমাত্র অবলম্বন। আমরা না হয় দুঃখ-কষ্ট সইতে পারি; কিন্তু গৌতমের যে আজ তিন মাস মাইনে বাকি সে কথা ভেবে দেখেছ—না, প্রয়োজন বোধ কর না ভেবে দেখবার। এটা ঠিক জেন, আজ যদি অর্থের অভাবে গৌতমের পড়াশুনা বন্ধ হয় তা'হলে আর কেউ পারলেও ভবিষ্যতে গৌতম কখনও কোন দিন তোমায় ক্ষমা ক'রতে পারবে না।"

তীব্র বেগে কথাগুলি নমিতার গলা থেকে বেরিয়ে এল। কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঠোঁট দু'টাও অস্বাভাবিক কাঁপছিল।

মুহূর্ত্তে অজয় যেন একটি বিশিষ্ট পরিধি থেকে সাধারণ জনতার ভীড়ের মধ্যে প'ড়ে নিমেষে আপনার স্বাধীন সত্তাকে হারিয়ে ফেলল। বিচলিত মনকে সংযত ক'রে স্থির হ'য়ে বললে "না, নমিতা গৌতমের পড়াশুনা কখন বন্ধ হ'তে পারে না। ও আমার ছোট ভাই; বাবা-মার অভাবে আমার ওপর ও'র যে রকম দাবী আছেঃ ঠিক তেমনি কর্ত্তব্য আছে আমার ও'র প্রতি। তবেই নমিতা, আমারি প্রতিষ্ঠার চাইতে গৌতমের জীবনের মূল্য অনেক বেশী।"

......অজয়ের পুরান দিনের লেখা 'অচলায়তন' বইখানার 'কাপি-রাইট' চড়া দামেই এক টাকাওয়ালা প্রকাশক কিনে নিলে। কেননা, অজয় রায় ধনী না হ'লেও সাহিত্যিক। অজয় রায়ের নামের পেছনে মর্য্যাদা আছে যথেষ্ট, মোহ আর আকর্ষণ আছে অপরিমিত।

নমিতার মুখেও হাসি ফুটেছে, ছোট পরিবারটির জীবন-স্রোতও আবার সহজ গতিতে বয়ে চলেছে। আর ব্যবহারে অহেতুক আতিশয্যের অন্তরালে অজয় রায়ের জীবনে এসেছে বিরাট পরিবর্ত্তন! নিৰ্জ্জনতায় সে হতাশ কাতর হ'য়ে পড়ে—তাই চায় না নিৰ্জ্জনতা। অজয়ের অস্পষ্টতা তা'কে নমিতার চোখে বড় দুর্ব্বোধ্য ক'রে তুলছে।......

আশ্বিনের শেষে শরৎ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সাড়ে পাঁচটা বাজতেই চারদিক ঝিমিয়ে পড়ে। ফাল্গুন রাতের মতই এখনকার রাতের বেশ একটা মাদকতা আছে। প্রতিটি রাতের প্রকাশ সত্যই চমৎকার, এক কথায় অভিনব।

......সার্টের হাতায় হাতদুটা গলিয়ে দিয়ে সার্টের ভেতর মাথা চালিয়ে দেবার জন্য অজয় শুধু হাত দুটা উঁচু ক'রেছে এমন সময় নমিতা দোর থেকে নারীসুলভ কমনীয় ভঙ্গিতে বললেঃ "কোথায় কি বেরুচ্ছ—কোন কাজ আছে কি?"

সার্ট প'রে বোতাম লাগাতে লাগাতে অজয় বললে।

"না কাজ কিছু নেই তবে বিকেল হ'য়ে গেল,—ভাবছি রাস্তা থেকে একটু ঘুরে আসব্।"

"কাজ যদি না থাকে চল না 'প্রিন্সেপ-ঘাট' থেকে একটু বেড়িয়ে আসি। দিনটা আজ বেশ ভাল। তিনটে লোকের ত রান্না, ভাস্কর খুব ক'রতে পারবে; তা'ছাড়া কিই-বা ও'র কাজ আর বিকেলে......"

"কিন্তু গৌতম?"

"বা-রে, তোমায় বলেই ত অণু ওকে দমদম্ নিয়ে গেল; ওদের ক্লাবের নাকি আজ য়্যানিভারসারি।' আমিও অমত করিনি কাল সকালেই ত ফিরবে।"

"অণু আমায় কালই ব'লে রেখেছে, আমারই ভুল হয়েছিল। আচ্ছা নমিতা অণুর সঙ্গে গৌতমের এতটা মিল কি ক'রে সম্ভব হ'ল! একজন ত ঝড়ের মত দুরন্তঃ আর একজন শীতের সমুদ্রের মত শান্ত।......কিন্তু যাই বল, তোমাদের বাড়ীর সবাই অণুর ওপর বড় চটা, এটা তাদের অন্যায়।"

"স্বভাবটাই যে ও'র বড় দুরন্ত। বাবা বলেন, 'খেলায় যারা এত মত্ত, ভবিষ্যৎ তাদের এখানেই শেষ।' কিন্তু, আমার মনে হয় লেখাপড়ায় ভাইদের মত অত ভাল না হ'লেও মানুষ হিসেবে ভবিষ্যতে ও কারও চাইতে ছোট হবে না। অপরের দুঃখ-কষ্ট অণু একেবারেই সইতে পারে না। কিন্তু বড় অভিমানী ও......"

"অপরের ওপর অভিমান ক'রবার দাবী শুধু তাদেরই

যারা একান্ত আপন ব'লে সবাইকে ভালবাসতে পারে। যারা নির্মল, যাদের কোন মলিনতা নেই, পঙ্কিলতা নেই।" বাইরের দিকে তাকিয়ে অজয় বললে,ঃ "চট ক'রে কাপড় প'রে নাও নমিতা, বেলা যে পড়ে এসেছে!"

......দিনের শেষে সন্ধ্যার আবছা আঁধার সৃষ্টির নিঃসীম পরিব্যাপ্তির ওপর এসেছে নেমে। নদীর গা ঘেঁসা লাল-কাঁকরের পথ ধরে অজয় আর নমিতা পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। অদূরে কালো 'প্রিন্সেপ ঘাটের' জেটি দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট। বাঁ-পাশের পিচ-ঢালা পাকা রাস্তা ধ'রে ভ্রমণবিলাসী-দের গাড়ী আসছে-যাচ্ছে অবিরাম, অবিশ্রান্ত। ভাঁটার টানে নদীর জল অনেকটা নেমে গেছে। নদীর বুকে ক'য়েকটা দূর-যাত্রী জাহাজ মেরামত হ'চ্ছে, তারি খটাখট শব্দের সঙ্গে খালাসী-দের ক্ষীণ কলরব ভেসে আসছে। এপারে একটা সিঙ্গাপুর-গামী জাহাজের ডেকে বসে একদল চীনা-খালাসী গল্প-গুজব ক'রছে অলসভাবে। চারিদিকে আবহাওয়ার একটা উত্তাপ-হীন অবসাদের আভাস। সন্ধ্যার এ বিহ্বল প্রকৃতি রাতজাগা রোগীর দুঃস্বপ্নের মতই নৈরাশ্যময়।......অজয়ও আত্মচেতনায় ডুবে রয়েছে। আবহাওয়াকে হাল্কা ক'রবার জন্যে নমিতা অজয়ের হাত ধ'রে একটা নাড়া দিয়ে উছল ভঙ্গিতে বলে উঠল,

"নিঝুম সাঁঝের পথ অতিবাহি
যেতেছিনু দুইজনা,
সেদিনের কথা ভুলি নাই সখি
কভু আমি ভুলিব না।"

আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নমিতার দৃষ্টিও স্বপ্নময় তন্ময়তায় নিঝুম হ'য়ে এল।......আঁধার ভেদ ক'রে সন্ধ্যার আকাশের এক একটি তারার মতই দিকে দিকে আলো জ্বলে উঠছে; জেটির দুধারে, জাহাজের গায়ে, নিযুক্ত কারখানার ওপর আলোর বিচিত্র সজ্জা। তারি পানে তাকিয়ে অজয় বিমনা হ'য়ে বল্লেঃ

"এই কারখানার অন্তরালে, যুগ যুগ ধ'রে কত অবজ্ঞাত, অবহেলিত মজুরের দল বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে নিঃশেষিত হ'য়ে কারখানার ভিত্তিকে সুদৃঢ় ক'রে তুলেছে। অথচ রাতের অন্ধকারে আলোকোজ্জ্বল ঘুমন্ত কারখানার পানে তাকিয়ে তার কি কোন পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়!"

"হয়ত এটা ও'র ছদ্মবেশ! তবু রাতের বিচিত্র পারি-পার্শ্বিকতায় স্তব্ধ কারখানার শান্ত-সমাহিত রূপটি বড় সুন্দর, বড় মধুর!"সৌন্দর্য্যানুভূতির আবেগে নমিতা ব'লে উঠল।

"আর এগিয়ে কাজ নেই সম্মুখে 'প্রিন্সেপ ঘাট'। একটা বেঞ্চি পেলেই বসে প'ড়ব।" সামান্য এগোতেই একটা বেঞ্চি চোখে প'ড়ল বটে, কিন্তু, সেখানে একটি য়্যাংলো প্রেমিক-যুগল বসে প্রেমালাপে মত্ত। য়্যাংলো তরুণীটি একটু আপত্তিকর অবস্থায়ই যুবকটির অঙ্গ-সংলগ্ন হ'য়ে ভাবাতিশয্যে অজস্র ব'কে যাচ্ছে। সেদিক পানে তাকিয়ে নমিতা অজয়ের উপর বিস্ময় ভরা দৃষ্টি তুলে ধ'রল; মুখে তার স্মিত হাসির রেখা। পথ থেকে খানিকটা নেমে ঢালু জমির সবুজ ঘাসের উপর তারা বসে প'ড়ল। ভাঁটার টানে জল নেমে গেলেও তিন চার হাত নীচে স্বাভাবিক জলের দাগ দেখা যাচ্ছে। দূরের একটা জাহাজের আলো জলে প্রতিফলিত হ'য়ে স্রোতের তালে তালে এপার অবধি এসে পৌঁচেছে। রাতের নদীর রূপ দেখছে অজয় উদভ্রান্তের মত। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে নমিতাই প্রশ্ন ক'রলেঃ

"একটা কথা বললে সত্যি জবাব দেবে?"

"বল।"

"বলত, দিন দিন তুমি এত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছ কেন? আমার কেবলি মনে হয়, কোথায়ও তুমি বড় আঘাত পেয়েছ অথচ সেটা আমার কাছেও গোপন ক'রতে চাও!"

"কিন্তু নমিতা, তোমরা ত আজকাল বেশ শান্তিতে আছ না?......আচ্ছা, তুমি আমার নতুন বই অচলায়তনের সমালোচনা এ মাসের 'আলো'তে প'ড়েছ?"

নমিতার চোখে সমালোচকের কয়েকটা কথা সজীব হয়ে উঠল, 'অচলায়তন' বইখানিতে লেখকের পূর্ব্ব প্রকাশিত বইগুলি থেকে মূলগত প্রভেদ। বইখানিতে লেখকের স্বাভাবিক সবল নির্ভীক প্রকাশভঙ্গির নিতান্ত অভাব! তার উদার দৃষ্টি-ভঙ্গির, তার তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির, তার সংস্কৃতিশীল মনের কোন পরিচয় নেই বইখানিতে। কোনও কাঁচা লেখকের অগভীর উচ্ছ্বাসের মত মাঝে মাঝে অর্থহীন ভাষার ঝঙ্কার অজয় রায়ের মত আত্মার ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদের মতই প্রকাশ পেয়েছে। উদীয়মান লেখক হিসেবে তার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা ক'রেছিলাম; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আলোচ্য বইখানি আমাদের একেবারে হতাশ করেছে। ....প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই ভাল,—মূল্যও সুলভ।" নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে যেন তারা শেষ ক'টি কথা লিখতে বাধ্য! খানিক চুপ ক'রে থেকে নমিতা সমবেদনা জানিয়ে বললেঃ "পড়েছি। তবে, অর্থের প্রয়োজনে বই লেখা আর সত্যিকার প্রেরণা নিয়ে লেখাতো আর এক কথা নয়।"

ঃ"বইটা অবশ্য অর্থের প্রয়োজনেই লিখেছিলেম; তবে প্রেরণার অভাব হত না যদি না সাধারণের রুচি অনুযোয়ী আমায় লিখতে হ'ত। তাদের ফরমাস মত না লিখলে দেশের ক'টা লোক আর আমার বই কিনতে, হয়ত সমঝ-দারের প্রশংসা পেতাম। শতাব্দীর পর শতাব্দী পরাধীন থেকে আমাদের মনোবৃত্তি হ'য়ে গেছে অতি সঙ্কীর্ণ, তাই ভুল ক'রেও সমর্থন পেতে চাই।......বই লিখবার ইতিহাস তোমায় আজ ব'লব নমিতা......"

ঃ"সে কথা তুলে লাভ কি, মিছে নিজেকে আঘাত করা বই ত নয়।"

ঃ"আঘাত!........ তিন-চার বছর আগেকার কথা। গৌতমের অসুখের সংবাদে শিলংয়ে কমলা পিসিমার বাসায় যেয়ে দেখি, গৌতম একটা নোংরা বিছানায় পড়ে রয়েছে। প্রতি রাতে জ্বর প্রায় চার-পাঁচ ডিগ্রি অবধি ওঠে,—এক মাসের ওপর এম্নিধারা ভুগছিল। অথচ আমায় এর আগে খবর দেওয়া তো দূরের কথা একবার ডাক্তারও দেখাননি তাঁরা। দিনে বার চারেক বার্লিই তার একমাত্র পথ্য! কোথায় পিসিমা এসে তার কাছে বসবেন, না, তিনি শুধু অনুযোগ জানিয়ে গেলেন, 'যে রকম রোদ্দুরে বেড়ায়, অসুখ আবার হবে না।' সবার

ব্যবহারে এটা অতি পরিষ্কার যে, গৌতম সেখানে অনধিকারী—তাদের আশ্রিত। আমি যেতে গৌতম বিবর্ণ কাতর চোখ দুটো তুলে বার বার শুধু বললে, 'দাদা দাদা'। হয়ত অনেক কিছুই ওর ব'লবার ছিল কিছুই ব'লতে পারেনি সেদিন। মর্ম্মান্তিক বেদনা চেপে অভয় দিয়ে বললাম, 'ভয় কি গৌতম, তোর আর কেউ না থাক আমি তো তোর আছি। কালই তোকে ক'লকাতা নিয়ে ভাল ডাক্তার দেখাব, দু'দিনে সেরে যাবি। তোর কোন ভয় নেই।' কোনও উত্তর গৌতম দিতে পারলে না; শুধু চোখের কোল বেয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল ঝরে পড়েছিল। রুদ্ধ কান্নার আবেগে ওর জীর্ণ শরীর থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল।......নমিতা, সে দৃশ্য জীবন থেকে মুছে ফেলতে কত চেষ্টা ক'রেছি কিন্তু পারিনি। আজও যখন সে কথা ভাবি, মাথা থেকে পা' অবধি কেঁপে ওঠে।......নমিতা, মানুষ এত বড় হৃদয়হীন হ'তে পারে!"

ঃ"আমায় তো কখনো বলনি এ কথা"—নমিতার কণ্ঠে অপরিসীম বেদনার আভাস।

ঃ"শোন নমিতা......ক্ষণিকের অন্ধ উত্তেজনায় ক'লকাতায় গৌতমকে এনে এই বইখানা লিখতে বাধ্য হ'য়েছিলেম। দুঃখ, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, ভোগ ক'রেও প্রাণ ধ'রে প্রকাশকের হাতে বই তুলে দিতে পারিনি। সেদিন, তোমার কথায় হুঁস হ'ল, সত্যিই তো লেখা আমার বাঁচবার একমাত্র অবলম্বন। যে পিতৃ-মাতৃহীন ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ যোগাতে পারে না, সাধারণের মত বাঁচবার যার কোন সংস্থান নেই, তার পক্ষে সৎ-সাহিত্য সৃষ্টি ক'রবার অদ্ভুত কল্পনা কি অন্ধ মোহ নয়! তাই জীবনের সব চাইতে বড় দুর্ব্বলতাকে এড়িয়ে নিজ হাতে বইটা প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়েছি।" বিদীর্ণ হ'য়ে অজয় বল্লে।

ঃ"না এমনি ধারা ভবিষ্যতে তুমি আর লিখতে পারবে না। অন্ধ মোহ হোক্ আর যাই হোক্, সেই আদর্শেই এখন থেকে লিখতে হবে।"

ঃ "তুমি কি আমায় 'কৃচ্ছ্র-সাধন' ক'রতে বল?" ম্লান-হাসি ফুটে উঠল অজয়ের মুখে, থেমে আবার বললেঃ "আমার কথা না হয় ছেড়ে দাও। শক্তিশালী লেখকের অভাব দেশে কোনও দিন ছিল না, আজও বোধ হয় নেই। তাদের জীবনেও আদর্শ ছিল, সাহিত্যে নতুন কিছু দেবার মতঃ সাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব সাড়া আনবার মত প্রেরণা ও সৃজনী-শক্তিও তাদের ছিল। ভবিষ্যতের বিরাট স্বপ্ন তারাও দেখেছিল। কিন্তু বাস্তবের জীবন-স্রোতে দাঁড়িয়ে তাদের স্বপ্ন গেল ভেঙে। ফলে তাদের কেউ আজ সিনেমার প্রচার-সম্পাদক, কেউ চিত্র-নাট্য লিখছেন আবার কেউ একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিরাট বোঝা মাথায় নিয়ে দু'বেলা সওদাগার আফিসে কলম পিষছেন।......এমনি ধারা দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার আবর্ত্তে বিভিন্নমুখী প্রতিভা যে অতলে তলিয়ে গেছে সে খোঁজ কেউ কখনও করেনি—করবার প্রয়োজনও বোধ ক'রে না। মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান প্রতিভার অপচয় পৃথিবীর কোনও দেশ কখনও ক'রেছে কি! কিন্তু তার জন্যে কি দেশের লোক দায়ী? থাক্ আজ সে প্রশ্ন"......আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস মাঝপথে থেমে গেল।

ঃ"টাকার জন্যে যা'তা' তুমি আর লিখতে পারবে না। গৌরীগ্রাম থেকে রাণুদির চিঠিতে খবর পেলাম,—একজন হেড-মিস্ট্রেসের জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ তাকে ব'লেছেন; মাইনে ষাট টাকাঃ ফ্রি কোয়ার্টার। রাণু লিখেছে, "তুই তো বি-এ অবধি পড়েছিস, কাজটা অসুবিধে না হ'লে তুই-ই নে না। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের চাইতেও তোদের বংশানুপরম্পরায় একটা কীর্ত্তি হিসেবে স্কুলের প্রতিপালক জমিদাররা এর উপযোগিতা ঢের বেশী অনুভব করেন! বর্ত্তমান জমিদারও সে বিষয়ে খুব সচেতন। তাই, মাইনে ঠিকমত পাবি তা' হলপ ক'রে বলতে পারি।' ভেবেছি কাজটা আমিই নেব।"

ঃ"তুমি শুধু আমারই কথা ভাবছ; অথচ দেশে যে কত প্রতিভাবান লোক জীবন সংঘর্ষে বানচাল হ'য়ে যাচ্ছে সে কথা একবারও ভেবে দেখছ না। ব্যক্তিগতভাবে দু'একজনের কথা ভেবে কি হবে! দেশ যেদিন গোড়ার গলদ বুঝে সচেতন হ'বে সেই অনাগত দিন ছাড়া এর কোনও প্রতিকারই সম্ভব নয়। যদিও বুঝি, দেশের অন্যায়, অবিচারকে তীব্র আঘাত হেনে আমাদেরই অনাগতকে সমাগত করতে হবে; আর এও জানি সাধারণের বিচারে বিচলিত হ'লে চলবে না, তাদের অবজ্ঞাতে ভেঙে পড়লে চ'লবে না; তবু বিভিন্ন বিপর্যায়ের মুখে আপনাকে স্থির রাখতে পারিনা নমিতা!"

ঃ"তাই তো, তোমার কর্ত্তব্যভার যেঁচে নিয়ে তোমায় অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চাই। যদি দেশব্যাপী সমস্যার প্রশ্ন তোল তা'হলে বলব মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যার সঙ্গে জড়িত তার কথা বড় ক'রে না ভেবে পারে না। যুক্তির দিক দিয়ে যাই বল—মানুষের এটা স্বাভাবিক বৃত্তি। তা'ছাড়া অর্থের জন্যে তোমার এমন জীবন্ত-সমাধি দেখবার মত শক্তি আমার নেই।......হবে, যদি কোনদিন সব সংঘর্ষের বিরুদ্ধে অবিচলিত থাকবার মত শক্তি সঞ্চয় ক'রতে পার, তবে সেদিন দেখা যাবে।......'

......জোয়ার এসেছে। নদীর জল ফুলে ফুলে উঠছে; ঢেউগুলি তটে এসে ভেঙে পড়ছে......

ডেনমার্কের লোক-শিক্ষা

সমীরময় ঘোষ (শান্তিনিকেতন)

মহামতি নিকোলাস্ গ্রুণ্ডভিগ্ সর্ব্বপ্রথম ডেনমার্কে লোক-শিক্ষালয় (The Folk High School) প্রবর্ত্তনে ব্রতী হন। তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কয়েকজন শিক্ষাব্রতীর সাহায্যে এই নব-প্রণালীতে শিক্ষা-ব্যবস্থা সমগ্র দেশে গড়িয়া উঠে। দেশের জনসাধারণ তথাকথিত শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব হইতে সমগ্র দেশকে মুক্ত করিয়া, একপ্রাণতার সঙ্গে চলিয়াছে দেশমাতার মুক্তির সন্ধানে। বহুকালের অন্ধ-কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর যখন সমগ্র দেশবাসীর শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, শিক্ষার অমৃতধারা বহাইয়া সেই পাষাণ-খণ্ডকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অজ্ঞ দেশবাসীর প্রাণে আনিলেন কর্ম্মোদ্যমতা, দিলেন ভাষা। এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এখন পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই, ইহা সম্পূর্ণ দিনেমারবাসীর নিজস্ব। সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডে যদিও কয়েক বৎসর হইল এই লোক-শিক্ষার আদর্শ প্রচলন করিবার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু ডেনমার্কের জনসাধারণের মধ্যে ইহার অসাধারণ প্রভাব দেখা দিয়াছে। তথাকার কৃষক ও শ্রমিকদিগের মধ্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মশক্তিকে বিপুলভাবে বর্দ্ধিত করিতেছে। তাহাদের বহু দিনের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার-পূর্ণ জীবনের দ্বারে ভাবীকালের বিজয়ভেরী বাজাইয়া এই শিক্ষালয়গুলি তাহাদের মানসপটে তুলিয়া দিল দেশমাতার সুশান্ত প্রতিচ্ছবি।

পঁচাত্তর বৎসরের ক্রমান্বয় চেষ্টার ফলে আজ ডেনমার্কের জনসাধারণ নৈরাশ্য ও অবসাদ কাটাইয়া শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত, কর্ম্মপ্রবণ, ও বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী। সে দেশের প্রত্যেক লোক গর্ব্বের সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে যে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই তাহাদের ও সমগ্র দেশের নানাবিধ উন্নতির প্রধান কারণ। ইহাদের প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তিই এই মুমূর্ষু জাতিকে বাঁচাইয়া পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির ন্যায় নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া তাহাদের স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

দেশের গবর্ণমেণ্ট এই শিক্ষালয়গুলির জাতিগঠনমূলক কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। সরকার স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই দেশের কৃষক ও শ্রমিক-দিগকে আর্থিক ও সামাজিক অবিচার হইতে রক্ষা করিতেছে। ডেনমার্কের কৃষকগণ আজ সে দেশের শিক্ষারত একটি প্রতি-পত্তিশালী সম্প্রদায়, লোক-শিক্ষালয়গুলির প্রাণবান্ শিক্ষা ব্যবস্থা তাহাদিগের মধ্যে কর্ম্মোদ্যম জাগাইয়া সমগ্র দেশের চিন্ময় রূপটির পরিচয় দিতেছে তাহাদের স্বতস্ফূর্ত্ত সরল হৃদয়ে। দেশের গ্রাম ও শহরগুলির ঘনিষ্ঠতা ঘটাইয়া ভাব ও কৃষ্টির আদান-প্রদানে জাতিকে একদিকে দিতেছে পল্লী জীবনের সহজ অনাড়ম্বর সরলতার আস্বাদ, অন্যদিকে দেশের বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলনে করিতেছে উৎসুক।

ইণ্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট—চেতু লারচেনবর্গ, দেনমার্ক

মহামতি গ্রুণ্ড্ভিগ্ যে আদর্শ এই লোক-শিক্ষালয়-গুলির মধ্য দিয়া মূর্ত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন তৎকালীন সামাজিক পরিপন্থায় তাহা বাধাপ্রাপ্ত হয়। গ্রুণ্ড্ভিগ্ যদিও নিজ চেষ্টায় একটি লোক-শিক্ষালয় গঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সেই একক চেষ্টা সেই সময় আশানুরূপ সাফল্য আনিতে পারে নাই। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দেই মিঃ কোল্ড নামক জনৈক শিক্ষাব্রতীর কর্ম্মোদ্যমে এই লোক-শিক্ষালয় সমগ্র দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে, দেশের নানা জায়গায় ইহার গঠন-কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহার একনিষ্ঠতার ফলে ইহার ভাবী সাফল্যের সোপান রচনা সহজ হইয়া উঠে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ প্রুশিয়ানদিগের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইলে, জাতিতে জাতিতে এই বৈরীভাব কাটাইয়া শান্তি, শৃঙ্খলা,

সাহিত্য-সঙ্গীতের দ্বারা জীবনের উচ্চতর বৃত্তির অনুশীলনে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠে। কৃষকগণ দলে দলে এই সব প্রবর্ত্তিত শিক্ষালয়গুলিতে যোগদান করিতে লাগিল তাহাদের রণক্লিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের সমাধা ঘটাইতে। তাহাদের সকল প্রকার দাবী শিক্ষালয়গুলি মানিয়া লইল। সাহিত্য-সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তাহাদের ভগ্নবুকে জাগাইল জ্যোতির্ম্ময় জীবনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। বর্ত্তমানে ডেনমার্কে ৬০টি লোক-শিক্ষালয় বর্ত্তমান। দেশের যুবক-যুবতী সকলেই এই শিক্ষালয়গুলিতে যোগদান করে। বিশেষত পল্লীবাসী যুবক-যুবতীরাই এই শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষারত একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়; এই শিক্ষালয়গুলির প্রভাব ইহাদের উপর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

সে দেশের এই শিক্ষালয়গুলিতে ভর্ত্তি হইবার কোন কঠোর নিয়ম অবলম্বিত হয় না। একমাত্র যোগদানকারী এই শিক্ষালয়গুলি হইতে জানা যায়। এই শিক্ষালয়গুলির প্রচলিত শিক্ষাধারায় একদিকে সে দেশবাসী যুবকবৃন্দ বিপুল কর্ম্মশক্তির প্রচণ্ডতার মধ্যে পাইতেছে সহজ, ছন্দভরা জীবনের শোভন গতিসঞ্চার। টেক্সটবই ও খাতাপত্র লইয়া আমাদের তথাকথিত শিক্ষাচর্চ্চা এখানে চলে না। ছাত্রকে শিক্ষকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়া মুখস্থ বলিতে বা লিখিতে হয় না, শিক্ষালয়ের শিক্ষকেরা সহজ সরল ভাষায় সাহিত্য-বিজ্ঞানের জটিল তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ছাত্রদিগের সঙ্গে আলোচনা করে, সেই আলোচিত বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া গঠন-মূলক কার্য্যদ্বারা প্রতিফলিত করাই হইতেছে ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য।

কোন বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত এই শিক্ষালয়-গুলির তুলনা করা চলে না—ইহারা এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাকেন্দ্র। সে দেশের কৃষক যুবক-যুবতীদের জ্ঞান-

ক্রাব্‌বেস্‌হোল্‌ম হাইস্কুল—স্কিভে
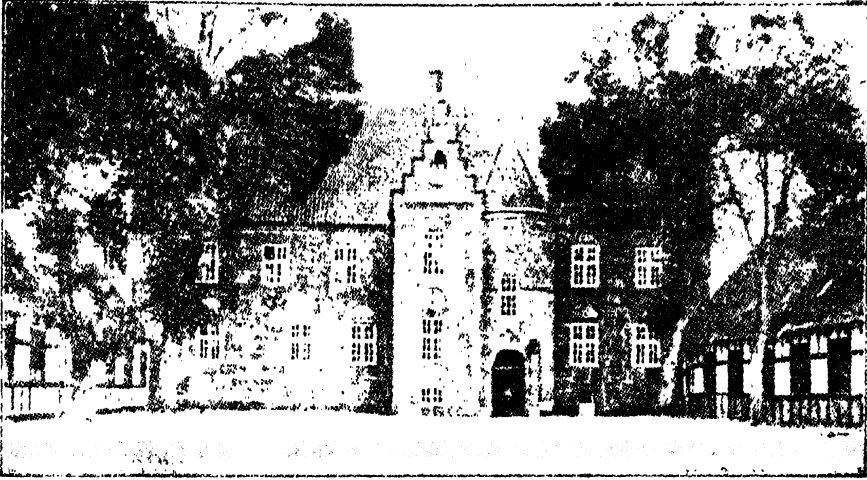
ছাত্রের বয়সের যথাযথ হিসাব লওয়া হয়। আঠার বৎসরের কম ও পঁচিশ বৎসর অতিক্রান্ত বয়সের কোন ছাত্রকে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি করা হয় না। এতদ্ভিন্ন সকল বয়সের যুবক-যুবতীরা ইহাতে যোগদান করিতে পারে—ভর্ত্তি হইবার সময় ছাত্র বা ছাত্রী পূর্ব্বতন কোনও স্কুলে পঠিত হইলে তাহাকে ছাড়-পত্র বা প্রশংসা-পত্র আনিতে বা কোনও পরীক্ষা দিতে হয় না। নির্দ্দিষ্ট বয়সের দেশের যুবক-যুবতী নির্ব্বিশেষে ইহাতে যোগদান করিতে পারে। ডিগ্রী দেওয়া বা পরীক্ষার মার-প্যাঁচ হইতে সে দেশের এই শিক্ষালয়গুলি মুক্ত। শিক্ষার এই সকল চাকচিক্য উঠাইয়া সহজ শিক্ষাধারা দেশের জন-সাধারণের মধ্যে প্রবাহিত করাই হইতেছে এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান জগতের সহিত পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইলে যে-সকল তথ্য জানা দরকার, তাহা সমস্তই এই শিক্ষালয়গুলিতে প্রবর্ত্তিত হয়। জাতির আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য রচিত হইয়া সমগ্র দেশের কেন্দ্রীভূত শক্তিকে কি করিয়া ব্যাহত করিতেছে তাহা সমস্তই বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ কেন্দ্র। এইরূপ শিক্ষালয়ে একসঙ্গে দুইশতের অধিক ছাত্র যোগ দিতে পারে না। এই শিক্ষালয়ে পাঠরত অবস্থায় ছাত্রগণ শিক্ষালয় সংলগ্ন হোস্টেলে থাকা, খাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য সমাপন করে। এইখানে পড়াশুনায় ব্যাপৃত থাকার সময় ছাত্রগণ নিজেদের বাস্তুভিটার সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়; শিক্ষাচর্চ্চা শেষ হইলে তাহাদের গৃহগত প্রাণ ছাড়া পায়, পিতামাতার স্নেহমাখান আবাসস্থলে তাহাদের সকল উচ্ছ্বাস চরিতার্থ করে।

দেশের যুবক-যুবতী সকলের এই শিক্ষালয়গুলিতে যোগদান করিবার অধিকার থাকিলেও তাহাদের ব্যক্তিগত সুবিধানুযায়ী ইহাতে যোগদান করে। বৎসরের বিশিষ্ট দুই ঋতুতে এই শিক্ষালয়গুলি কর্ম্মমুখর হইয়া উঠে, দেশের যুবক-যুবতীরাও এই বিভিন্ন ঋতুতে শিক্ষালয়গুলিতে যোগদান করিয়া ইহাদের কর্ম্মচঞ্চলতা বর্দ্ধিত করে। যদিও দিনেমারগণ সহশিক্ষা ('Co-education')-এর পক্ষপাতী, কিন্তু দেশের সমগ্র জনসাধারণের জীবন-সংগ্রামের অত্যুগ্রতায় বৎসরের

এই দুই বিভিন্ন ঋতুতে (শীত ও গ্রীষ্মকালে) সমগ্র দেশবাসীর সুবিধানুযায়ী তাহারা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনের এইরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এইরূপ এক একটি শিক্ষালয়ের দৈনিক শিক্ষা-পরিচালনার ব্যবস্থা যথাযথ সময়ানুরূপ কার্য্যাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে এখানে বিবিধ শিক্ষাচর্চা চলে। ছাত্রছাত্রীগণও শিক্ষকগণের নির্দ্দেশানুযায়ী সময়ের সহিত যথাযথ খাপ খাওয়াইয়া বিবিধ জ্ঞানের চর্চা করিতেছে। ছাত্রগণ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাতরাশ সমাপন করিলে সকাল নয় ঘটিকায় তাহাদের ক্লাস আরম্ভ হয়। শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ বক্তৃতার মধ্য দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগের সহিত শিক্ষাবিষয়ক বিবিধ শাস্ত্রাদি আলোচনা করে। শিক্ষকদিগের এই বক্তৃতাবলীর প্রারম্ভে ও শেষে ছাত্র বা ছাত্রীদিগের মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত হয়। সঙ্গীতের সুললিত মূর্চ্ছনায়, তাহাদের দৈনিক অধ্যয়ন কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহার সমাপ্তিও এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই ঘটে। ক্রমান্বয়ে কয়েকটি ক্লাস হইয়া গেলে ছাত্রগণ এক ঘণ্টা অবকাশ পর্ব্ব পায়। এই সময়ে প্রত্যেক ছাত্র খেলাধূলা, পত্রিকা, ম্যাগাজিন পাঠ করিয়া কাটায়। সকাল এগারটা হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত ক্লাস হয়, সাধারণত সেই সময় অর্থনৈতিক সামাজিক আচার-ব্যবহারের ধারাগুলিই বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ক্লাসের সময় ব্যতীত সময়ের একটা বিরাট পর্ব্ব ছাত্রদের অধিকারে। ছাত্রগণ অযথা সেই সময়টা নষ্ট করে না, তাহার যথাযথ সদ্ব্যবহার তাহারা করে।

ছাত্রদের নির্দ্দিষ্ট 'ডাইনিং রুমে' স্কুলের সমগ্র ছাত্র তাহাদের শিক্ষকগণ সহ একত্র মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করে। ছাত্র ও শিক্ষকের এক নিবিড় সম্বন্ধে এই মধ্যাহ্ন ভোজন হইয়া উঠে সুচারু-সঙ্গত। হাসিঠাট্টা, বিবিধপ্রকার আলোচনায় ছাত্র শিক্ষক সমভাবে যোগদান করে। শিক্ষকদিগের স্নেহপূর্ণ আবেষ্টনে ছাত্রগণ ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের নিকট হইতে নানা বিষয় জানিতে পারে। ইহাতে ছাত্রদিগের জ্ঞানচর্চ্চার আগ্রহে শিক্ষকদিগের প্রাণে সেই জ্ঞান বিতরণের উৎসাহ দ্বিগুণভাবে সঞ্চার করিয়া থাকে। সন্ধ্যা বেলায় ছাত্রগণ স্কুলের পাঠাগারে গিয়া বই পড়ে, ক্লাসে পঠিত বিষয় পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে, নানা বিষয়ে তর্ক তুলিয়া যুক্তি তর্কের দ্বারা সেই বিষয়ের ভ্রম সংশোধন করে। এই শিক্ষালয়গুলি ছাত্রদিগের মধ্যে 'আবশ্যিক পাঠের' ব্যবস্থা করে নাই, ছাত্রদিগের মধ্যে বই পুস্তকের অনাবশ্যক চাহিদা বাড়ান হয় নাই বা পরীক্ষা পাশের তাড়নায় উদ্বিগ্নচিত্তে নোটবই মুখস্থ করিতে হয় না। প্রত্যেক ছাত্রের রুচিসম্মত গ্রন্থাদি পড়িবার ব্যবস্থা করায় এই শিক্ষালয়গুলি তাহাদিগের উপর শিক্ষার দুঃসহ বোঝা চাপায় নাই, জ্ঞানের বা শিক্ষার দ্বার অবারিত উন্মুক্ত করিয়া ছাত্রদিগকে বিপুল কর্ম্মশক্তির সহিত তাহাদের স্বচ্ছ হৃদয়ে চালিয়া দিতেছে দুর্ব্বার আনন্দাবেগ। অর্থনীতি, রাজনীতি ও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির নিদর্শনস্বরূপে ছাত্রগণ চর্চা করিতেছে; অপর দিকে দেশের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য সঙ্গীতের আলোচনায় ছাত্রগণ একপ্রাণতার সঙ্গে জাতীয়তাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

যাত্রা মোর পথ হতে পথে

শ্রীকরুণাময় বসু

ধূসর গোধূলি দীপ্ত আজ এই নক্ষত্র-সন্ধ্যায়
কত কথা মনে আসে, যেন দূর জন্মান্তের আগে
আদিম শৈশব লগ্নে ছিনু কোন অরণ্য-ছায়ায়;
চেতনার প্রান্ততটে স্মৃতির জোয়ার এসে লাগে।
অনন্ধের মরুপ্রান্তে ছিনু যেন বর্ব্বর বেদিয়া,
এ পৃথিবী ঘর ছিল, সেই ঘর করেছি সন্ধান;
বিদীর্ণ এ জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন দিছি নিবেদিয়া,
পথের দেবতা তবু প্রাণ চান,—বেদনার দান।

বর্ষে বর্ষে ম্লান হ'ল অস্পষ্ট সে স্বপন-তাম্রলিখা,
সভ্যতার শীর্ষে বসি ভুলি ওই আজন্মের কথা;
ভুলিতে কি দিবে মোরে, শতাব্দীর লুপ্ত যবনিকা
তুলে দেখি পথপ্রান্তে দেবতার নিঃসীম বারতা।
পথ হ'ল ঘর আর মানুষের ঘর হ'ল পথ,
আত্মার অক্ষয় বীর্য্য দীর্যমান প্রদীপ্ত আভায়
উদ্দীপ্ত প্রকাশ বেগে ছেয়ে গেল এ সৌরজগৎ;
সৌন্দর্য্য-বাণীর মন্ত্র বিশ্বে ছোটে বিদ্যুৎ-ছটায়।
দূরে ময়ূরাক্ষী তীরে জন্ম নিছি কতো যুগ আগে,
যুগান্তের নদী বেয়ে ভেসে যাই স্রোতের আবেগে।

সমাধান

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন

(১৪)

কার্ত্তিক মাস; বেলা পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে এগারটা। কাছারী প্রাঙ্গন লোক সমাগমে গম্ গম্ করিতেছে। মহকুমার ভার-প্রাপ্ত বড় হাকিম কালীপ্রসাদবাবু মূল্যবান সাহেবী বেশ-ভূষায় কৃষ্ণ অঙ্গ যতদূর সম্ভব আচ্ছাদিত করিয়া এজলাসে বসিয়া আছেন। কোর্ট দারোগা বছিরদ্দিন মিঞা তাঁহার বাম পার্শ্বে ঈষৎ পশ্চাদ্দিকে দাঁড়াইয়া এক একখানি কাগজ পেশ করিতেছেন ও তৎসম্বন্ধে আবশ্যকমত দুই চারিটি কথা বলিতেছেন এবং হাকিম মহোদয় তাহাতে কোন আদেশ কিম্বা দস্তখত লিখিয়া দেওয়া মাত্র সেই কাগজখানি সরাইয়া লইয়া আর একখানি পেশ করিতেছেন। সহসা একখানি কাগজ তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি দুই তিন বার আদ্যন্ত পাঠ করিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"এই আসামীরা কোথায়?"

বছিরদ্দিন মিঞা উত্তর দিলেন,—"হুজুর, আসামীদিগকে এই মাত্র থানায় আনা হয়েছে। ১নং আসামীর গলায় এবং চক্ষে জখম আছে;—ডাক্তারী পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। সম্ভবত বিকেল তিনটে সাড়ে তিনটের মধ্যে কোর্টে চালান হ'য়ে আসবে।"

—"এই আসামীদিগকে এখনই আদালতে হাজির করার জন্য থানায় জরুরী সংবাদ দেওয়া হউক" বলিয়া হাকিম বাহাদুর ঐ কাগজখানি রাখিয়া দিলেন এবং অবশিষ্ট আর দুই চারিখানি কাগজপত্র যাহা ছিল তাহা স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

ছোট নদীর মধ্য দিয়া ষ্টীমার চলিবার সময় চাকার আকর্ষণে সম্মুখের জলরাশি যে প্রকার ছুটিয়া আসে এবং তারপর পিছনে পড়িয়া যেভাবে তরঙ্গ তুলিয়া আছাড় খাইতে থাকে, ঘণ্টাখানেক পরে কাছারী প্রাঙ্গনস্থিত জনস্রোত ভেদ করিয়া দুইজন কনেষ্টবল, দুইটি বলবান পুরুষ আসামীর সহিত একটি স্ত্রীলোক আসামীকে লইয়া আসিবার সময়, চতুর্দ্দিকের লোকজন কৌতূহলের আকর্ষণে ঠিক সেইভাবে ছুটিয়া আসিল এবং কোলাহলপূর্ণ তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া আদালতকক্ষে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। আদালতাধিপতি ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং সমস্ত লোকজন বাহির করিয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। আদেশ তৎক্ষণাৎ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইল।

লোকজন সব বাহির হইয়া গেলে হাকিম বাহাদুর মুখ তুলিয়া কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান আসামীদের দিকে এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখের তরুণী আসামীটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তারপর একখানি স্লিপ কাগজ টানিয়া লইয়া খস্ খস্ করিয়া লিখিলেন,—

"এই স্লিপ পাওয়া মাত্র আদালতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; বিশেষ প্রয়োজন।"

লিখনান্তে কাগজখানি ভাঁজ করিয়া একজন পিয়নের হাতে দিয়া কহিলেন,—"কণ্ট্রাক্টর আশুবাবু, আর তিনি না থাকলে তাঁর ছেলে ভূপেনবাবু;—জল্দি।"

সেলাম করিয়া পিয়ন দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

বিচারপতি পুনরায় তরুণী আসামীর দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন, তাহার উভয় চক্ষু স্ফীত ও রক্তবর্ণ এবং কণ্ঠদেশও স্ফীতিযুক্ত এবং রক্তচিহ্নময়। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার কি হয়েছে?"

তরুণীর উভয় চক্ষু দিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল। সে অতি কষ্টে জানাইল,—কণ্ঠে তাহার অত্যন্ত বেদনা, সন্ধ্যার পর দারোগা তাহাকে গৃহ মধ্যে আক্রমণ করিয়াছিল, সে তাহাকে কামড়াইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং দারোগা ভীষণ জোরে তাহার গলা ও চক্ষু টিপিয়া ছাড়াইয়া গিয়াছে।

হাকিম বাহাদুর অতঃপর অপর দুই আসামীকে প্রশ্ন করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে, গতকল্য দারোগাবাবু তাহাদের গ্রামে গিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুইজন চৌকীদারের সঙ্গে তাহাদের দুই বাপ-ব্যাটাকে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী দুইটি গ্রামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঘটনার সময় তাহারা কেহই উপস্থিত ছিল না। বাড়ী পৌঁছিবা মাত্র তাহারা সব শুনিয়াছে। দারোগা ততক্ষণে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। তাহারা বিস্তর দৌড়াদৌড়ি করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারে নাই। তখন তাহারা গৃহে ফিরিয়া যায় এবং রাত্র প্রভাত হইলে শহরে আসিয়া হুজুরের নিকট দরখাস্ত দিবে এইরূপ স্থির করিয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু শেষরাত্রে একদল পুলিশ যাইয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়া তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছে। তাহারা কোন অপরাধ করে নাই। উভয় আসামীর চক্ষু দিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল এবং হাকিম বাহাদুর একমনে তাহাদের প্রত্যেকটি উক্তি শ্রবণ করিতেছিলেন।

এমন সময় ঘর্ম্মাক্তদেহে ভূপেন আসিয়া বিচারপতিকে অভিবাদন করিলেন

ভূপেনকে দেখিবামাত্র তরুণী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অপর দুই আসামীর চক্ষু দিয়াও তপ্ত অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা গলিয়া পড়িতে লাগিল। ভূপেন দেখিলেন, তরুণী দুলালী এবং তাহার পিছনেই শিবু ও সুখন। পদপ্রান্তে সহসা বিষধর সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকাইয়া উঠে, ভূপেন তদ্রূপ চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন হিম হইয়া আসিতে লাগিল; মুখখানি শুষ্ক পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িল।

হাকিম তাঁহার অবস্থাটা বুঝিলেন এবং ইংরেজিতে কহিলেন,—"তোমার বাবা কোথায় হে? এ-যে একটা বড় কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হ'ল দেখ্‌ছি। সম্প্রতি এদের জামিনে নিয়ে যাও, তারপর নকলপত্র নিয়ে সব দেখগে। জামিনের জন্য একখানা দরখাস্ত লিখিয়ে আন, আমি হুকুম দিয়ে দিচ্ছি।"

কি উপায়ে কি করিতে হয় ভূপেনের কিছুই জানা নাই। তা ছাড়া দুলালীকে একটা কঠিন ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামীরূপে হাকিমের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ঐভাবে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিতেও বিষম গোল পাকাইয়া গেল। অভিজ্ঞ ও সুচতুর হাকিম বাহাদুর তাঁহার অবস্থা অনেকটা অনুমান করিয়া লইলেন। তিনি আশুবাবুর বন্ধু-জ্ঞানে উকীল নরেন্দ্রবাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আসামী-দের নামীয় এজাহার তাঁহাকে দেখিতে দিয়া একখানা জামিনের

দরখাস্ত ও জামিন-নামা ইত্যাদি লিখিয়া দেওয়াইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মিনিট দশেকের মধ্যে জামিন দেওয়া হইয়া গেল।

অতি শীঘ্র গাড়ী লইয়া আসিবার জন্য ভূপেন ইতিমধ্যে মধুর নিকট উপর্য্যুপরি দুইজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। মধু আসিবামাত্র উহাদিগকে লইয়া তিনি বাড়ী রওয়ানা হইলেন। সহস্র লোকের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির মধ্য দিয়া দুলালীকে লইয়া হাঁটিয়া যাওয়া তিনি অসম্ভব মনে করিতেছিলেন। গাড়ী কাছারীর হাতার বাহিরে আসিতেই দুলালী ভূপেনের পদতলে লুটাইয়া পড়িল এবং অশ্রুপ্লাবিত মুখে কাতরকণ্ঠে কষ্টের সহিত বলিল,—"নারায়ণ জানেন, আমি নির্দ্দোষী। সব কথা আপনাকে পরে বলব। আমার গলায় ভয়ানক বেদনা; কথা কইতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। আমাকে এখন রামপুরে নিয়ে চলুন। আমার এ কালো মুখ নিয়ে আমি মায়ের সামনে দাঁড়াতে পারব না। আজ থেকে আমার সব গেল।" বলিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

ভূপেন জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলেন এবং কহিলেন,—"ছি ছি ছি, গাড়ীর মধ্যে বসে এ সব কি করছ তুমি? মধুই বা কি মনে করবে? বিপদে পড়লেই যদি বুদ্ধি-শুদ্ধি গুলিয়ে যায় তাহা হ'লে চলবে কেন? এক কাছারী লোকের সামনে দাঁড়াতে পারলে, আর মায়ের সামনে দাঁড়াতে পারবে না? জুড়োবে কোথায় তবে? বাবাও হয়ত এতক্ষণে বাসায় এসেছেন। তাঁর সামনেও দাঁড়াতে হবে। নিজেই বলছ তুমি নির্দ্দোষী; তা হলে অপরের দোষের জন্য তুমি সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন? বাবার সামনে, মায়ের সামনে, সকলের সামনে তোমায় যেতেই হবে এবং মুখ তুলে দাঁড়াতেই হবে; প্রমাণ দিতে হবে যে, তোমার এতটুকুও পাপ নেই। নাও, চোখ মুছে ভাল হ'য়ে ব'স।"

দুলালী মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

ভূপেন পুনরায় বলিলেন,—"সীতার অগ্নি পরীক্ষার মত তোমাকেও তোমার নারায়ণ কঠোর পরীক্ষায় ফেলেছেন। তোমার পাশ-ফেলের উপর, তোমার ত আছেই, আমার পিতা-মাতার সম্মান-সম্ভ্রমও যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করছে। তাঁদের মুখ রক্ষা করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। তুমি এ সময়ে লজ্জায়, সঙ্কোচে কিম্বা ভয়ে পিছিয়ে পড়তে পাব না। এই আগুনে পবিত্র হয়ে তোমাকে আরও উজ্জ্বল হয়ে বের হ'তে হবে।"

দুলালী তাহার জলভরা চক্ষু দুটি ভূপেনের স্নেহসিক্ত মুখের উপর স্থাপন করিয়া কহিল,—"আমি কিন্তু কোন পাপ করিনি; অন্ততঃ আপনি আমাকে—"

বাধা দিয়া ভূপেন কহিলেন,—"আমাকে তোমার বোঝাতে হবে না। তুমি যে নিষ্পাপ, আমার অন্তরই আমাকে তা বলে দিচ্ছে। কিন্তু সকলে ত আর আমার মন নিয়ে তোমার বিচার করবেন না।"

বলিতে বলিতে গাড়ী আসিয়া বাটীর দ্বারে থামিল। গাড়ীর শব্দে কনক দৌড়াইয়া আসিয়াছিল। ভূপেন অবতরণ না করিয়াই ভগ্নীকে ইসারায় নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বলিয়া দিলেন,—"দুলালীকে ঘরে নিয়ে যা, বড় অসুখ করেছে, আমি ডাক্তারবাবুকে আনতে যাই। গলায় বড্ড অসুখ, একটি কথাও বলতে দিবিনে; বুঝেছিস্? আর এদের দু'জনকে আমার পাশের ছোট রুমে বসতে দিস্।" সঙ্গে সঙ্গে দুলালীর পৃষ্ঠ-দেশে দুই তিনটি মৃদু করাঘাতের ইঙ্গিতে উৎসাহ দান করিয়া বড় ডাক্তারবাবুর বাসায় যাইবার জন্য মধুকে আদেশ দিলেন।

এ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার বোস যেন প্রস্তুত হইয়াই বাহিরের পোর্টিকোয় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। ভূপেন গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে না করিতেই তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া তাঁহার ছোট হ্যাণ্ডব্যাগটি আনিতে আদেশ দিলেন এবং ভূপেন তৎক্ষণে নিকটে আসিয়া পড়ায় একখানি চেয়ার টানিয়া দিয়া বলিলেন,—"বসুন; আপনার রোগিণীর অবস্থা কি রকম? এখুনি যেতে হবে ত?"

পরম বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া ভূপেন বলিলেন,—"আপনি কেমন করে জানলেন, আমি কি জন্য এসেছি?"

ডাক্তার বোস হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,—"এই খানিকটা আগে কোর্টের একজন কনেষ্টবল একটা কাজ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। তার কাছে শুনলাম, অনেকগুলি জখমবিশিষ্ট একটি মেয়ে আসামীকে আপনি জামিনে আনতে গেছেন; আর তার একটু পরেই, এই রকম অসময়ে আপনাকে আসতে দেখছি; কাজেই কার্য্যকারণ সম্পর্কে বিচার করে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝে নিতে আর কষ্ট হ'ল না। তা' অবস্থাটা কি রকম বলুন ত। কি হয়েছে?"

ভূপেন বলিলেন,—"ঘটনা যে কি, তা আমি এখন পর্য্যন্তও জানতে পারি নি। তবে দেখলাম, গলা অত্যন্ত ফুলে গেছে এবং গলায় ছোট ছোট কতকগুলি রক্তমাখা জখম আছে; বললে, কথা বলতে খুব কষ্ট হয়, ভয়ানক বেদনা। চোখ দু'টাও দেখলাম বেশ ফুলেছে এবং অত্যন্ত লাল হয়েছে; বললে, চোখেও খুব বেদনা।"

"আচ্ছা চলুন" বলিয়া ডাক্তার বোস উঠিয়া পড়িলেন।

রোগিণীর নিকটে আসিয়া ডাক্তার বোস যত্নের সহিত খুব ভাল করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিলেন। তাহাকে এক বাটি দুধ পথ্য করাইয়া রোগিণীর মুখ ও কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন এবং উভয় চক্ষের উপর নীল কাপড়ের আবরণ ঝুলাইয়া দিলেন, ও একটি ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুনরায় আসিয়া দেখিয়া যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

ভূপেন সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দর্শনীর টাকা দিবার জন্য হাত বাড়াইতেই তিনি বাধা দিলেন এবং বলিলেন,—"দেখুন ভূপেনবাবু! এই মেয়েটি কিভাবে যে কি করেছে, কামান্ধ পিশাচের কবল থেকে কেমন করে যে আত্মরক্ষা করেছে তা আর কেউ না বুঝুক আমি ত বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছি! এর জন্য আমি কোন টাকা নেব না" বলিয়া তাহার হাত সরাইয়া দিলেন এবং রোগিণীর সম্বন্ধে আর এক দফা উপদেশ দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

(১৫)

আশুবাবু পূর্ব্বাহ্ণ আট নয়টার মধ্যে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া মোটর সাইকেল আরোহণে প্রায় কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে একটি লৌহসেতুর নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন করিতে

গিয়াছিলেন। বৈকালের দিকে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ীর ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া বাড়ীর দিকে তাকাইয়া তিনি কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক বিষণ্ণতার ছায়া দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সদানন্দময়ী পাগলী মেয়ে কনক ত কই তেমন করিয়া ছুটিয়া আসিল না? সাইকেল রাখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিলেন। ব্রহ্মময়ী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখেও ত সেই চির-পরিচিত সুমধুর হাসিটুকু দেখা গেল না? আশুবাবু বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, এবং ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কনক কোথায়? তাকে দেখ্‌ছি না যে? বাড়ীর সব ভাল ত?"

ওষ্ঠপ্রান্তে খানিকটা হাসি আনিয়া ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"হ্যাঁ, ভাল থাক্‌বে না কেন? সকলে ভাল আছে।" তারপর একটু থামিয়া, স্বামীকে বসিতে দিয়া, দুশ্চিন্তা-ব্যঞ্জক চাপা স্বরে বলিলেন,—"কিন্তু দুলালী যেন কি একটা কাণ্ড করে বসেছে, পুলিশ তাকে এবং তার বাবা আর দাদাকে ধরে কাছারীতে চালান দিয়েছিল; বড় হাকিম কালীবাবু ভূপেনকে ডাকিয়ে নিয়ে জামিনে ছেড়ে দিয়েছেন; এই ঘণ্টাখানেক হল ডাক্তার বোস এসে মেয়েটাকে দেখে গেছেন; গলায় এবং চক্ষুতে অসহ্য বেদনা,—সব ব্যাণ্ডেজ করে বেঁধে দিয়ে গেছেন এবং কথা কইতে নিষেধ করে গেছেন। শুনলাম কাল সন্ধ্যারাত্রে কোন্ দারোগাকে নাকি ভয়ানক কামড়ে দিয়েছে এবং তিনজনে মিলে বেজায় মারপিট করেছে। কি যে কাণ্ড, ভূপেনও ঠিক বলতে পারে না। বাছা আমার সেই দুপুর থেকে একবার কাছারী, একবার ডাক্তারের বাড়ী, একবার রোগীর ঘর, এই করেই বেড়াচ্ছে। আর তোমার মেয়েকে যে দেখতে পাচ্ছ না,—সেটিই কি কম? সেও কম যায় না। যত সেঁক দেওয়া, পথ্য দেওয়া, ওষুধ দেওয়া, তা সে একাই দিচ্ছে।"

আশুবাবুর উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। উদ্বিগ্ন ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুলালী এখন কোথায়? কেমন আছে সে?"

—"কনকের রুমে তাকে রাখা হয়েছে। এই মিনিট দশেক হল ঘুমিয়ে পড়েছে। কনক বসে হাওয়া দিচ্ছে।"

—"অবস্থাটা কেমন? আশঙ্কাজনক নয় ত?"

—"না না, তেমন কিছু নয়। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন ভয়ের কোন কারণ নেই; তবে জ্বর-টর একটা কিছু না হলেই হয়।"

আশুবাবু হোমিওপ্যাথির পক্ষপাতী। রোগিণীর অবস্থা এবং লক্ষণাদি না দেখিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে একটি ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু আবার কি একটু ভাবিয়া কহিলেন,—"না, এখন ওখানে না যাওয়াই ভাল। এ অবস্থায় ঘুমই হচ্ছে সব চেয়ে বেশী উপকারী।" আরও মিনিটখানেক পরে পুনরায় বলিলেন,—"কিন্তু ব্যাপারটা যে কি, তা ত কিছুই বুঝতে পারা গেল না।"

ব্রহ্মময়ী অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হইয়া এবং কণ্ঠস্বরে সতর্কতা আনিয়া বলিলেন,—"কি জানি কি ব্যাপার!—সোমত্ত বয়সের মেয়ে। এ সব কেলেঙ্কারী আমার ভাল লাগে না আদপে।"

বাধা দিয়া আশুবাবু কহিলেন,—"আরে ছ্যা, কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। অমন মেয়ের সম্বন্ধেও তোমার সন্দেহ হয়? আচ্ছা, ডাক ত একবার ভূপেনকে,—সে কন্দুর কি জানে শোনা যাক।"

—"থাক্ থাক্, এখন ওসব থাক্। একটু ঠাণ্ডা হও, একটু জল-টল খাও, তার পর শুনবে'খন। ও—ও ত এখন ঘুমোচ্ছে!"

—"তোমার ব্যবস্থায় ঠাণ্ডা হওয়া যাবে না—বরং......"

—"আচ্ছা, ডেকে দিচ্ছি" বলিয়া ব্রহ্মময়ী ভূপেনকে ও ভজুয়াকে ডাকিয়া আনিলেন। ভজুয়া জুতা খুলিয়া দিল এবং তামাক দিল।

ভূপেনের নিকট আশুবাবু যতটুকু যাহা শুনিতে পাইলেন তাহাতে বিশেষ কিছু বুঝা গেল না। শিবু ও সুখন বাহিরে আছে শুনিয়া তিনি শিবুকে ডাকাইলেন এবং নিরালায় বসিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

পিতার প্রত্যাগমনাবধি কনক ভয়ানক উস্‌খুস্ করিতেছিল এবং ক্রমাগত অমনোযোগী হইয়া পড়িতেছিল। ভূপেন তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং সুখনকে ডাকিয়া আনিয়া, কোনপ্রকার শব্দ না করিয়া ভগ্নীর শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় একটু হাওয়া দিতে বলিয়া কনককে মুক্তিদান করিলেন। কনক পিতার নিকট ছুটিয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে ভূপেন একবার বাহিরের দিকে গেলে শিবু তাহাকে ডাকিয়া নিয়া কহিল,—"বাবা আমার যে একবার রামপুর না গেলেই চলে না? দুলালী ত থাকবেই,—সুখনও থাকুক; আমি আজকের মতন একবার যাই, শেষ রাত্তিরে ধরে এনেছে;—গরুকটি পর্য্যন্ত খুলে আস্‌তে পারিনি। ঘর-দোর সব অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। দুলালীর জন্য আমার আর ভাবনা নেই;—ভগবান তাকে আমার হাতে—" বলিতে বলিতে শিবুর গলা ধরিয়া আসিল, আর বলিতে পারিল না। শেষে কণ্ঠাগত ক্রন্দন বহুকষ্টে চাপিয়া রাখিয়া পুনরায় কহিল,—"ভগবান একদিন তাকে আমার হাতে দিয়েছিলেন; ভগবান নিশ্চয়ই দেখেছেন আমি কোন দিন আমার কর্ত্তব্য পালনে এক বিন্দুও ত্রুটি করিনি। এখন সে বড় হয়েছে; ভগবানই এখন তার উপায় করবেন। আমি এখন যাই। ওদিকের একটা ব্যবস্থা করে, কাল প্রাতে ভাল করে রোদ ওঠবার আগেই আমি আবার এসে পড়ব।"

ভূপেন একটু ইতস্তত করিয়া কহিলেন,—"তবে মধুকে বলে দি, সে না হয় পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

জিব কাটিয়া এবং হাতজোড় করিয়া শিবু বলিল,—"আরে সর্ব্বনাশ! এ কি কথা! সাত মাইল মাত্র পথ,—দেড় ঘণ্টা পৌনে দু'ঘণ্টায় আমি অতি স্বচ্ছন্দেই চলে যাব বাবা! আমার জন্য আবার গাড়ী কেন? গাড়ী আমার সাজেও না এবং দরকারও নেই। তবে কর্ত্তাবাবুকে একবার একটু নিবেদন করে যেতে চাই।'

ভূপেন শিবুকে পিতার নিকট লইয়া গেলেন, এবং শিবু তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া, সুখনকে আবশ্যক মত কয়েকটি উপদেশ দিয়া, নিদ্রিতা দুলালীর ললাটে সতর্কতার সহিত একবার করস্পর্শ করিয়া এবং তাহার কনক মায়ের নিকট হইতেও সম্মতি লইয়া, দ্রুতপদে রামপুরাভিমুখে ধাবিত হইল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে, বেলা পড়িয়া আসিতে, দুলালীর

ঘুম ভাঙ্গিল। সে নিৰ্জ্জীবের মতন চুপ-চাপ শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। কোন্ পাপে নারায়ণ তাহাকে এত বড় একটা লজ্জার মধ্যে ফেলিলেন? ইহার শেষ পরিণামই বা কোথায়? সে তাহার ভাবনা-সমুদ্রের কূল দেখিতে পাইল না। তাহার আশঙ্কা হইল, আশুবাবুর পবিত্র দেব-মন্দির হয়ত আর বেশী দিন তাহার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে না। স্নেহের ভগ্নী কনক, তাহার বাবা, মা, এমন কি তাহার দাদা পর্য্যন্ত হয়ত তাহাকে দেখিলে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইবেন। উ:—তদ্রূপ জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই কি শ্রেয় নহে? অথচ তাহার দেহে কিম্বা মনে একবিন্দুও পাপ নাই! দুলালীর যেন এক একবার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ব্রহ্মময়ীকে সঙ্গে লইয়া আশুবাবু উপস্থিত হইলেন, এবং বিছানার পার্শ্বে বসিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত দুলালীর ললাটে হস্তার্পণ করিতে করিতে স্নেহমধুরকণ্ঠে কহিলেন,—"এখন কেমন আছ মা?"

ডাক্তারের আদেশ ভূপেনের সতর্কতা, দুলালী সব ভুলিয়া গেল। বিদ্যুৎবেগে সে বিছানা হইতে নামিয়া পড়িল এবং টান মারিয়া মুখের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিয়া, উভয়ের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া আবেগ ভরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আমার লজ্জানিবারণের উপায় কি বাবা? আমি ত কোনই দোষ করিনি? আপনাদের পা ছুঁয়ে বলছি, আমার এতটুকুও দোষ নেই।"

আশুবাবু ও ব্রহ্মময়ী তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, এবং উভয়ের মধ্যস্থলে শয্যার উপর বসাইয়া একটু প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলেন।

অশুবাবু ও ব্রহ্মময়ী তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, এবং কণ্ঠের বেদনা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া, দুলালী কহিল,—"আমার কি অপরাধ বাবা? আমি ত কিছুই জানি না। বিকেলের দিকে জনা দুই কনেষ্টবল আর তিন চার জন চৌকিদার নিয়ে দারোগাবাবু আমাদের গ্রামে এলেন, এবং ও-পাড়ায় রাজীবদের বাইরের ঘরে বাসা নিলেন। কবে নাকি আমাদের গ্রামের সামনে সদর রাস্তায় কার গরুরগাড়ী থেকে কি সব জিনিস চুরি হয়েছিল, এবং সেই বিষয়ে তদন্ত করতেই নাকি তিনি এসেছিলেন। শেষ বেলায় দু'তিনবার আমাদের বাড়ীতেও এলেন, উঠানে বসে বাবুয়ার সঙ্গে আর দাদার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলপ-সালাপও করলেন,—চেয়ে চিন্তে একবার চাও খেলেন, তারপর সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবুয়াকে এবং দাদাকে যে অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তা' ত আমি জানি না! তারা আমায় কিছু বলেও যায় নি; বাইরে বাইরেই চলে গেছে। হয়ত মনে করেছিল সূর্য্যি ডোবার আগেই ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের আসতে দেরী হতে লাগল। কাজ-কর্ম্ম আমার কিছুই ছিল না। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আমি বিছানায় শুয়ে মাথার কাছে প্রদীপ রেখে একখানা বিজ্ঞাপনের কাগজ পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে কখন যে আমার চোখ বুজে এসেছে টের পাইনি। কি একটা শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল; চোখ মেলে দেখি, ঘরে আলো নেই, তৎক্ষণাৎ একটা লোক আমার পাশে বসল। আমি ভয়ানক চমকে গেলাম, এবং "কে তুমি?" বলে উঠতে গেলাম। লোকটা খপ্ করে আমার মুখ চেপে ধরে বললে "চুপ কর, চেঁচিও না।" আরও কি যে দু'চার কথা সে বলেছিল তা আর আমার কানে যায় নি। আমি আবার উঠতে গেলাম। সে জোর করে ধরতে চেষ্টা করল। বিপদ বুঝতে পেরে, তার মুখখানা আমার মুখের সামনে পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে কামড়ে ধরলাম। সে তখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালাতে চেষ্টা করল; কিন্তু আমার তখন বুদ্ধি স্থির ছিল না; আমি কামড় ছাড়লাম না। কয়েকটা কিল ধাক্কা আমার উপর পড়ল, তবুও আমি ছাড়ি নি। তখন সে ভয়ানক জোরে আমার গলা আর চোখ টিপে ধরল। আমি সহ্য করতে না পেরে ছেড়ে দিলাম। সে অমনি ছিটকে পড়ে গেল, এবং উঠে টান মেরে দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি তখন আবার প্রদীপ জেলে খুব জোরে তিন-চারবার শিঙা বাজিয়ে দিলাম এবং দা হাতে ক'রে বসে রইলাম। তারপর বাবুয়া আর দাদা আসতেই সব কথা তাদের বললাম। তারা খুব খানিক ছুটোছুটি করলেন, কিন্তু দারোগাকে পাওয়া গেল না। রাজীবদের বাড়ী গিয়ে শুনলাম, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে দারোগা-বাবুকে কোন লোক মেরে জখম করেছে, এবং তিনি সেই জখম নিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে থানায় গেছেন। তখন আমরা পরামর্শ ক'রলাম,—রাত্তিরে আর কি করব? —রাত্তিরটা কাটুক, তারপর ভোর বেলা আপনাদের এখানে চলে আসব এবং আপনারা যে রকম উপদেশ দেবেন, সেই রকম করব কিন্তু ভোর হবার অনেক পূর্ব্বেই দারোগা পুলিশ, চৌকীদার ইত্যাদি এসে বাড়ী ঘিরে ফেলল এবং আমাদের ধরে নিয়ে এল।"

আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন,—"অন্ধকার ঘরে তুমি দারোগাকে চিনলে কেমন করে? তুমি ত তাকে দেখতে পাও নি?"

—"না বাবা, দেখতে পাই নি বটে; কিন্তু সে যখন আমায় বললে "চুপ কর—চেঁচিও না" তখন তার কণ্ঠস্বরে তাকে চিনেছি।"

ব্রহ্মময়ী এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছিলেন। বেশ একটু উত্তেজনার সহিত দৃপ্তভাবে তিনি কহিলেন,—"তোমার মতন মেয়ের মা হ'তে পারার জন্য আজ আমি যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব ক'রছি দুলালী! তোমার মনের বলই তোমাকে রক্ষা করেছে। তোমার এই সাহসিকতা আমাদের দেশে সকল মেয়ের আদর্শ হওয়া উচিত।"

—"কিন্তু মা! আমি যে এখন লজ্জায় মুখ তুলে চাইতে পারছি না!" দুলালী আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

আশুবাবু দক্ষিণ হস্তে দুলালীর চিবুক এবং বাম হস্তে তাহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ধরিয়া তাহার মুখখানি আপন মুখের দিকে তুলিয়া ধরিলেন, এবং স্নেহময় কণ্ঠে সুনির্ম্মল হাসির সহিত বলিলেন,—"মুখ তুলে চাইতে পারছ না? এই আমি তুলে দিচ্ছি। আমার মায়ের মুখ অত সহজে হেঁট হ'তে পারে না।"

'বাছা রে" বলিয়া ব্রহ্মময়ী মায়ের আদরে তাহার অশ্রু-সিক্ত মুখখানি মুছাইয়া দিলেন। দুলালী উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার বুকের বোঝা হাল্কা হইয়া আসিল।

(ক্রমশ)

জীবনের ক্ষাস্তিত্ব

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত

ধরায় জীবন বিকাশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীতে এক সময় জীবন ছিল না, এবং আবার এমন এক সময় হয়ত আসিবে যখন ইহার অস্তিত্ব থাকিবে না। আমাদের এই বসুন্ধরায় জীবন চিরস্থায়ী কি-না, এবং সৌরজগতের অন্যান্য পৃথিবীর অনুরূপ জীবোদ্ভিদ আছে কি-না, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বসুন্ধরার বয়স

সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতে কতকাল লাগিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য নানা পণ্ডিত নানা-বিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানে ভূপঞ্জরের স্তর গঠন, সমুদ্রগর্ভে নদীবাহিত লবণ সঞ্চয়, স্বতঃবিকীরণশালী পদার্থাদির রূপান্তর গ্রহণের সময় ইত্যাদি এইরূপ কাল নিরূপণ কার্য্যে সহায়তা করে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক দ্বারা উক্তরূপে পৃথিবীর যে বয়স নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান বিপুল। কিন্তু মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, ভূমণ্ডলের বর্ত্তমান বয়স প্রায় ২০০ কোটি বৎসর। বলা বাহুল্য যে, এরূপ বিরাট ব্যাপারে ২।১০ লক্ষ, এমন কি কোটি বৎসরের পার্থক্য কিছুই নয়। আমরা এখন যে সকল যুগ মহাযুগের সন্ধান পাই তাহাদের নিখুঁতভাবে কাল নির্ণয় করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং এই প্রকার কাল গণনায় অনুমানের প্রভাব যে অল্প বিস্তর রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

যাহা হউক এস্থলে পৃথিবীর বয়স ২০০ কোটি বৎসর বলিয়া ধরিয়া লইয়া, পরে দেখা আবশ্যক যে, এই সময়ের মধ্যে ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের কোন স্তরের অবস্থাসমূহ জীবন বিকাশের পক্ষে অনুকূল হইয়াছিল। আমরা যাহাকে ভূমণ্ডল বলি তাহা প্রধানত চারিটি স্তর দ্বারা গঠিত যথা—ভূগর্ভ অথবা মধ্যপিণ্ড, ভূপঞ্জর অথবা প্রস্তরমণ্ডল, জল-মণ্ডল ও বায়ুমণ্ডল। পৃথিবী প্রথমত বাষ্পময় অবস্থা হইতে ক্রমশ তরল ও কঠিনাকার ধারণ করে। কঠিন অবস্থারও আবার কিছুকাল পরে বারি ও বায়ুমণ্ডলের উদ্ভব হয়। প্রথম যখন ধরাবক্ষে বারিধারা পতিত হয় তখন প্রস্তরমণ্ডল সর্ব্বত্রই জলাবৃত হইয়া গিয়াছিল। পরে আলোড়ন ও সংকোচনের ফলে কতক অংশ উন্নীত হয়। পৃথিবীর জীবনকালের মধ্যে জল-স্থলের স্থান বিনিময় যে কতবার হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভূপঞ্জর বহু সংখ্যক স্তর দ্বারা গঠিত। প্রায় প্রত্যেক স্তরই বিশিষ্টরূপে রচিত এবং সেগুলি পরীক্ষা করিলে তাহাদের গঠনের অগ্রপশ্চাৎ সময় ও ধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য মূলত স্তরগুলি যেরূপভাবে উপর্য্যুপরি সজ্জিত হইয়াছিল, এখন সর্ব্বত্র সেরূপভাবে নাই। নানাবিধ নৈসর্গিক কারণ ধরাবক্ষের এইরূপ বিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী। তথাপি ইহা স্থির যে, ভূমণ্ডল শীতল ও কঠিনীভূত হইবার পর হইতে নির্দ্দিষ্ট শৃংখলায় স্তরের উপর স্তর জমিয়া কালক্রমে ভূপঞ্জর গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সমুদয় স্তরকে উৎপত্তির প্রথম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গঠনের কাল হিসাবে চারিটি প্রধান মহাযুগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে আদিম মহাযুগের (Azoic Era) পাষাণ স্তরে জীবোদ্ভিদের চিহ্ন প্রায় নাই বলিলেই চলে। উক্ত যুগের শেষভাগের স্তরে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট শিলায় সম্ভবত সূক্ষ্ম দাগ প্রভৃতি দেখিয়া অনুমান করা হয় যে, এই সময়ে সর্ব্বনিম্ন স্তরের প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু উহাদের অস্তিত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার পরের প্রাচীন মহাযুগের (Paleozoic Era) প্রশিল দেহাবশেষাদি হইতে। প্রাচীন মহাযুগের পর ক্রমে ক্রমে আইসে মধ্য (Mesozoic) এবং নব্য (Neozoic) মহাযুগ। বস্তুত শেষোক্ত এই তিনটি মহাযুগের মধ্যেই জগতের যত প্রাণী ও উদ্ভিদ ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে এবং বিবর্ত্তনের ফলে আধুনিক জীবোদ্ভিদ জাতিসমূহে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম জীবন বিকাশের সময়

অনুমান করা হয় যে, প্রাচীন মহাযুগ ৬০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে জীবোদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবন দেখা দিয়াছিল তাহার বহু কোটি বৎসর পূর্ব্বে। বিশিষ্ট পণ্ডিতসমূহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অঙ্গারের আবির্ভাবের সময় ১২৩ কোটি বৎসরের কম হইবে না; এবং কোন না কোন প্রকার প্রাণী বা উদ্ভিদ না থাকিলে অঙ্গার আসিল কোথা হইতে? সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, প্রথম ৭০।৭৫ কোটি বৎসরের মধ্যে পৃথিবী শীতল হইয়া আসিলে জল ও জীবন ধারণোপযোগী বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি হয়; এবং প্রাণ পোষণের এই দুইটি অত্যাবশ্যক উপাদান সৃষ্ট হওয়ার পর বারিগর্ভেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাবৎ জীবিত পদার্থ নগ্ন প্রাণপঙ্ক (Protoplasm) রূপে প্রকাশ পায়। ইহার কোন চিহ্ন এখন পাওয়া যায় না তাহার অন্যতম কারণ হইতেছে এই যে, এই সমুদয় আদিম জীবের দেহে সংরক্ষিত হওয়ার মত কোন অংশ ছিল না; কিম্বা সামান্য যাহা ছিল তাহাও উপরিস্থিত স্তরাদির অতিভীষণ চাপে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এরূপ জীবের সংখ্যা অধিক মাত্রায়ও বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই; কারণ আদিম মহাযুগের শেষভাগে প্রচণ্ড প্রলয় সংঘটিত হইয়াছিল এবং তৎপরে দীর্ঘকালব্যাপী হিম যুগও দেখা দিয়াছিল।

প্রথম প্রাণ উৎপত্তির উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় উহা প্রাণশূন্যই ছিল এবং জীবন বিকাশরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার উহার তরুণ বয়সের

মধ্যে কোন সময় সংঘটিত হয়। বাস্তবিকই ভাবিয়া দেখিলে ইহা অভূতপূর্ব্ব সংঘটন বলিয়া বোধ হইবে। দশ বারটি জ্ঞাত ও সম্ভবত আরও কতকগুলি অজ্ঞাত অবস্থার আকস্মিক সমন্বয়ে সর্ব্বপ্রথমে সিন্ধুগর্ভস্থ পলিকণাবৎ পদার্থ (ooze) সঞ্জীবিত হইয়া উঠে; এবং তাহাই আবার দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমশ সুবিশাল প্রাণী ও উদ্ভিদ রাজ্য গঠন করিয়া তুলে। কিন্তু এই সমন্বয় আনয়নকারী অবস্থাসমূহের একটি মাত্রেরও অসদ্ভাব ঘটিলে, সামান্য মাত্র বিপর্য্যয় হইলে জীবন একবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। বাহ্যিক পরিবর্ত্তনের ফলও জীবনের উপর সমরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধের যদি বর্ত্তমানের তুলনায় সামান্য ইতর বিশেষ ঘটে, দিবস সমধিক মাত্রায় হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন কিম্বা আর্দ্রতা কমিয়া যায় কিম্বা উক্তরূপ কোন যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের আবির্ভাব হয় তাহা হইলেও জীবোদ্ভিদ মাত্রেই লয় প্রাপ্ত হইবে।

জল, বায়ু ও ধরাপৃষ্ঠের বিশেষ প্রকার সাম্যাবস্থার (equilibrium) উপর প্রতিষ্ঠিত যে জীবন ক্রিয়া তাহাকে চিরন্তন বলিতে পারা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বায়ুমণ্ডলের কথা বলিতে পারা যায়। ইহা শুধু যে আমাদিগকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা শরীর রক্ষায় সহায়তা করে তাহা নহে, বায়ুমণ্ডল যে ধূলিকণা বহন করে তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া জলীয় বাষ্প বৃষ্টি ধারায় পরিণত হয়। আবার এই আর্দ্রতা সমন্বিত নীল অম্বর সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত করিয়া এবং বিশ্বব্যাপী যবনিকারূপে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত হইয়া রবি রশ্মির নিদারুণ প্রখরতা হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করে। গতিশীল বায়ুর অন্যতম কার্য্য তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া জলের সহিত মিলিত হওয়া, যাহার জন্য জলচর জীব বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সমুদ্র নদী প্রভৃতির স্রোতও পৃথিবীর তাপের সমতা রক্ষা করে। এবম্বিধ জীবনরক্ষা বিধায়ক বায়ুমণ্ডলেরও চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। যদি কোন কারণে ভূমণ্ডলের বস্তু পরিমাণ (mass) কমিয়া যায় তাহা হইলে বায়ুমণ্ডল অনন্ত শূন্যে অন্তর্হিত হইবে এবং সমস্ত প্রাণীই শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

অন্যান্য গ্রহে জীবন

আমাদিগের জীবনের ধারণা অবশ্য পৃথিবীতে দৃষ্ট জীবন ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবী ব্যতীত সৌরমণ্ডলে আরও কয়েকটি গ্রহ রহিয়াছে। সেগুলিতে জীবনের সম্ভাব্যতা এবং জীবনধারণের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং তৎসমুদয় খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। পৃথিবীর সহিত তুলনা করিয়া অন্যান্য গ্রহের অবস্থা কিরূপ তাহাই আমরা এস্থলে বিবেচনা করিতেছি। প্রথমেই বলা দরকার যে, সৌরমণ্ডলে পৃথিবী ও তাহার উপগ্রহ চন্দ্র ব্যতীত আরও সাতটি গ্রহ রহিয়াছে, তন্মধ্যে চারিটি পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর ও তিনটি উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), প্রজাপতি (Uranus) ও বরুণ (Neptune)—এই চারিটি বৃহত্তর গ্রহের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট অবস্থা-সাদৃশ্য রহিয়াছে। পৃথিবী হইতে ইহাদের দূরত্ব ৪৮,৩৩,০০,০০০ (বৃহস্পতি) মাইল হইতে ২৭৯,১৬,০০,০০০ (বরুণ) মাইল পর্য্যন্ত। এই সমুদয় গ্রহে এত অভাবনীয় শীত যে, তাহাতে আমাদের বায়ুমণ্ডল জমিয়া যায়। আধুনিক গবেষণার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে উহাদের কেন্দ্রস্থলে ধাতব পদার্থ ও প্রস্তর রহিয়াছে; তদুপরি স্তরে স্তরে হাজার হাজার মাইল গভীর হিম-শিলা। যে বায়ুমণ্ডল এই কঠিনীভূত বিরাট সমুদ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহা অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, হিলিয়ম্ ও মিথেন (আলেয়া বাষ্প) দ্বারা রচিত। জলধারা ত' এরূপ গ্রহের পৃষ্ঠে কখন পড়ে না; যদি কখনও বর্ষণ হয় তাহা হইলে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য গ্যাসের বৃষ্টিই হইয়া থাকে। বৃহস্পতির পৃষ্ঠভাগের সর্ব্বনিম্ন তাপ মাত্রা—১৮৭° ফার্নহিট; এখানে অ্যামোনিয়ারই বৃষ্টি হয়। শনি গ্রহের অবস্থা আরও গুরুতর; তথায় এত অধিক পরিমাণ অ্যামোনিয়া বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়াছে যে, বায়ুমণ্ডলে আলেয়া বাষ্পই বেশী। প্রজাপতি ও বরুণ পৃথিবী হইতে আরও বহুদূরে অবস্থিত। সেগুলিতে অ্যামোনিয়া শুধু বারি নয়, অধিকন্তু বরফ-আকার ধারণ করিয়াছে। পৃথিবীতে জীবনবিকাশ দেখিয়া আমরা জীবন সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করি, সেরূপ জীবন যে এই সমুদয় গ্রহে থাকিতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পৃথিবীর সমশ্রেণীয় গ্রহাদি

এক্ষণে পৃথিবীর সমশ্রেণীয় কিন্তু উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর গ্রহগুলির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ মাত্র। আমরা ইহার একটি দিকই দেখিতে পাই এবং তাহাতে ইহার উচ্চাবচ পৃষ্ঠে বৃহদাকার গহ্বর ও শৈলমালাই দেখা যায়। কুত্রাপি জীবনের অস্তিত্বসূচক চিহ্ন নাই; সর্ব্বত্রই প্রাণশূন্য মরুর ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। যেখানে দিনমান ও রাত্রিকাল উভয়ই ১৫ দিবসব্যাপী; যেখানে দিবসে তাপ ১০০° সেণ্টিগ্রেডে উঠে ও রজনীতে ১৫০° সেণ্টিগ্রেডে নামিয়া যায়; এবং যেখানে জল ও বায়ু কিছুই নাই সেখানে জীবনক্রিয়া সম্পাদিত হওয়াই অসম্ভব।

বুধই (Mercury) সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটস্থ গ্রহ; পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব ৩,৬০,০০,০০০ মাইল। ইহার সম্বন্ধে সামান্য তথ্যই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু বুধ গ্রহের অন্যান্য কতকগুলি জ্ঞাত অবস্থা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে জীবোদ্ভিদ থাকিতে পারে না। কারণ ইহার উত্তাপ ৪৫০-৬৫০ ফার্নহিটের মধ্যে; বস্তু-পরিমাণ এত কম যে, তাহা আকর্ষণ শক্তি দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সূর্য্যের দিকে একই গোলার্দ্ধ উন্মুক্ত থাকায় এখানে এক দিবসকাল আমাদের এক বৎসরের সমান—এই সমুদয়ের যে কোন অবস্থা সর্ব্বপ্রকার প্রাণধ্বংসের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। সকলগুলির একত্র সমন্বয়ের ত' কথাই নাই।

শুক্র (Venus) সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা নামে মানবের নিকট প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে পরিচিত। সূর্য্য হইতে দূরত্ব ও ব্যাসের পরিমাণ হিসাবে ইহা কতকটা পৃথিবীর অনুরূপ ও জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল বলিয়া আপাত-

দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু শুক্রের চতুর্দ্দিকে একটি নিবিড় জ্যোতির্ম্ময় আবরণ রহিয়াছে; তাহা ভেদ করিয়া কোন জ্যোতির্ব্বিদের পক্ষে এপর্য্যন্ত শুক্রের পৃষ্ঠ দেশের অবস্থা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হয় নাই। তথাপি অন্যবিধ গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, শুক্রগ্রহের বায়ু-মণ্ডলে কার্ব্বন্ ডায়োক্সাইডের মাত্রা এত অধিক যে তাহাতে জীবোদ্ভিদের বাঁচার সম্ভাবনা নাই। তদ্ভিন্ন ইহার বায়ু-মণ্ডল অতি ঘন বলিয়া সূর্য্যতাপ বিকীরণের পথ রোধ করে; তাহার ফলে শুক্রের পৃষ্ঠ দেশের তাপ ফুটন্ত জলের উত্তাপের মতই থাকে। এই সমুদয় প্রাকৃতিক বৈষম্যের দ্বারাও শুক্রে জীবনের অভাব অনুসূচিত হয়।

সূর্য্য হইতে মঙ্গল গ্রহ (Mars) পৃথিবী অপেক্ষা আরও দূরে অবস্থিত। তথাপি জীবনধারণের পক্ষে উপযুক্ত মাত্রায় তাপ ও আলোক ইহাতে পৌঁছিতে পারে। ইহার ব্যাস পৃথিবীর ৭৯১২ মাইলের তুলনায় অর্দ্ধেকের কিছু বেশী, অর্থাৎ ৪২২০ মাইল। তাহাতে অনেকে মনে করেন যে, মঙ্গল তাহার আদিম বায়ুমণ্ডলকে সম্পূর্ণরূপে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই। সে যাহা হউক, যে দিন হইতে জ্যোতির্ব্বিদ Schiaparelli ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি উহার পৃষ্ঠে খালের ন্যায় চিহ্ন দেখিয়াছেন সেই দিন হইতে মঙ্গল গ্রহে জীবোদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানারূপে জল্পনা-কল্পনা চলিয়া আসিতেছে।

মঙ্গলের রক্তবর্ণের কারণ উহার পৃষ্ঠ দেশের 'Oxidation' বলিয়া কতিপয় বৈজ্ঞানিক মনে করেন। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন বহু পরিমাণে উহার শৈল ও মৃত্তিকার দ্বারা রাসায়নিক সংযোগবশত বন্দী হইয়াছে। লৌহ খণ্ডের উপর বায়ুমণ্ডলস্থ অক্সিজেনের ক্রিয়া দ্বারা যেরূপ লাল মরিচা পড়িতে দেখা যায় মঙ্গলের উপরও বহু ব্যাপক রূপে সেইরূপ ঘটিয়াছে। বাস্তবিকই তাহা হইয়া থাকিলে সেখানে বায়ুমণ্ডলে অল্প বিস্তর অক্সিজেনের অভাব দেখা দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় জীবের অস্তিত্ব কেবলমাত্র দুই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে—হয় তাহারা শৈল মৃত্তিকাদি হইতে অক্সিজেন বহুলভাবে পুনরুদ্ধারের কোন অভিনব প্রথা উদ্ভাবন করিয়া স্বকীয় অভাব পূরণ করিতেছে; অথবা বিবর্ত্তনের ফলে তাহাদের শরীর স্থানীয় অবস্থার উপযোগী হইয়া গঠিত হইয়াছে।

মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে, ইহাতে জল আছে, যদিও তাহা যথেষ্ট নয়। শীতকালে মেরুপ্রদেশে বরফ জমিয়া থাকিতে দেখা যায়; এবং গ্রীষ্মকালে তাহা গলিয়া জলস্রোতে পরিণত হয়। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, পূর্ব্বোক্ত জলনালী রূপ চিহ্নগুলি বাস্তবিকই সেচের খাল এবং মঙ্গলবাসিগণ ঐ সমুদয়ের সাহায্যে শস্যাদি উৎপাদন করে। গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের এবং অক্ষরেখার নিকটস্থ অংশের বর্ণ মলিন রক্তাক্ত হইতে হরিতে পরিবর্ত্তনও এইরূপ অনুমানের আংশিক সমর্থন করে। কিন্তু মানবের কথা দূরে থাকুক কোন উচ্চতর প্রাণী অথবা উদ্ভিদ যে মঙ্গল গ্রহে থাকিতে পারে, তাহা কোন জ্যোতির্ব্বিদই বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদিগের মতে বিশাল প্রান্তরসমূহে অথবা গিরি গাত্রে ক্ষুদ্র তৃণ ও শৈবালাদি সাময়িকভাবে জন্মাইবার জন্যই এইরূপ শ্যামল বর্ণ দেখা যায়।

জীবনের স্থায়িত্ব সমস্যা

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, নব গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই জীবনের বিচিত্র লীলা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু কথা হইতেছে যে, এই জীবন-প্রবাহ কি অনন্তকাল চলিতে থাকিবে? বিজ্ঞান উত্তর দেয় যে, তাহা সম্ভব নয়। যে সমস্ত অবস্থার সমন্বয়ে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদিগের স্থায়িত্বই যখন অনিশ্চিত তখন জীবনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। চন্দ্রেও হয়ত এক সময় জীবন ছিল, কিন্তু এখন উহা মৃত ভূমণ্ডল। আবার ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, চন্দ্রই এক সময় পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার জীবন ধ্বংসের হেতু হইতে পারে।

শনির দেহে বলয়াকার চিহ্নসমূহের বিষয় বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। একটি প্রলয়ঙ্কর ঘটনা হইতে ইহাদের উৎপত্তি। শনির একটি উপগ্রহ ছিল; তাহা বৃত্তপথে উহাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ক্রমশ নিকটে আইসে। খুব নিকটে আসিলে শনির আকর্ষণের জোরে উহার বিশাল গিরিরাজি উৎপাটিত হইয়া শনির বক্ষে আসিয়া পড়িতে থাকে। এইরূপ কল্পনাতীত শৈলবৃষ্টি ও বায়ুর সহিত ঘর্ষণ জনিত উহাদের অপ্রমেয় তাপ ও দ্যুতি (incandescence) কোন প্রাণীই কোন দিন দেখিবে না তাহার সূচনার পূর্ব্বে জীবনের শেষ চিহ্ন লুপ্ত হইবে। উক্ত উপগ্রহের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইবার পর অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহা এখন অগণিত ভ্রাম্যমান উল্কারূপে শনির বলয়ে পরিণত হইয়াছে।

পৃথিবী ও চন্দ্রের সম্বন্ধ শনি ও তাহার উপগ্রহের অনু-রূপ। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে হইলেও এমন এক সময় আসিবে যখন চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষেত্রের মধ্যে উপনীত হইবে। তখন আমাদিগের আকাশ উল্কার ঝাঁকে ভীষণরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠিবে। বিরাটকায় উল্কাপিণ্ডসমূহ সমুদ্রে পড়িয়া সাগরাম্বু ফুটাইয়া তুলিবে; স্থলভাগে তৎসমুদয়ের সংঘর্ষে আসিয়া মানবের কীর্ত্তিসমূহের সহিত অরণ্যাদিও মুহূর্ত্তেই ভস্মসাৎ হইবে। সামরিক বোমারু বিমানের বিস্ফোরক বর্ষণ তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু এইরূপ লোমহর্ষণ প্রলয় চরম সীমায় আসিবার অনেক পূর্ব্বেই নৈসর্গিক অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়াইবে যে, প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। পৃথিবী তখন চন্দ্রের দশা প্রাপ্ত হইবে।

জীবন সৃষ্টি ব্যাপারে প্রকৃতি যে কত পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে। অনাদিকালের মধ্যে হয়ত পৃথিবীতেই এই পরীক্ষা সফল হইয়াছে। আর কোন জগতে জীবন বিকাশ সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ।

সিগনেলাম্ম

(গল্প)

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

—এক—

কপোত-কপোতী যেন।

দাম্পত্য জীবন তাদের অতুলনীয়। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, কোথাও নেই ভাঙ্গন, নিটোল মসৃণ চলেছে তাদের মিলনানন্দ। তিন বছরের মিলিত জীবন তাদের পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে রূপে, রসে, গন্ধে।

সন্ধ্যার সময় রমেন সারারাত্রির মত বেরিয়ে যায়, রাত্রেই তার ডিউটি পড়েছে—সিগনেলিং। রেণুর মুখ শুকিয়ে আসে। একটু বাদেই আরম্ভ হবে তার বিরক্তিকর নিঃসঙ্গতা। লম্বা রাত্রিটা যেন আর কাটতে চায় না।

মাঝে মাঝে বলে—ছাইয়ের চাকরী; রাত্তিরে একা থাকতে আমার ভয় করে না বুঝি? অভিমানে রেণুর মুখ আরও করুণ হয়ে ওঠে।

তার সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে রমেন হাসে, টেনে আনে তাকে আরও কাছে, বলে—আর ক'টা দিন সবুর কর লক্ষ্মীটি, তারপরেই এই বিচ্ছিরি নাইট ডিউটি আবার চলে যাবে। আমারও কি ভাল লাগে তোমায় ছেড়ে থাকতে?

আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে যায়।

সিগনেল ঘরটা এখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে—ষ্টেশন থেকে খুব বেশী দূরে নয় সেটা। দোতলার ঘরগুলো আলোয় যেন দিন হয়ে উঠেছে। রেণু জানালা খুলে দেখে। দু'একটা লোককে যে না দেখা যায় তা নয়, কিন্তু রমেন ব'লে চেনা যায় না বোঝা যায় না।

একটু পরেই রেণু খেয়ে নেয়। সামনে বসে থাকে লছমিয়ার মা, হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া হ'য়ে যায়। লছমিয়ার মা বাসনগুলো নিয়ে ইঁদারার দিকে চলে যায়। রেণু ঘরে এসে তার একক বিছানাটা পেতে নেয়, পান একটি সেজে মুখে দেয়। ততক্ষণে লছমিয়ার মা বাসন মেজে ঘরে এসে গেছে, সে রাত্রে এ ঘরেই শোয়, তার ছেঁড়া কাঁথা আর ময়লা বালিশটা সেও পেতে নিয়ে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে। তারপর হাতে আর কোন কাজ থাকে না ঘুমান ছাড়া।

রেণু অগত্যা রামায়ণখানা খুলে বিশেষ একটি সুর করে পড়ে। 'রামজীর' নামে হয়ত লছমিয়ার মা প্রথমটায় কান পাতবার চেষ্টা করে; কিন্তু 'বঙলা' ভাষা বড় দুর্ব্বোধ্য তার কাছে, তাই শেষ পর্য্যন্ত নিদ্রাতেই মনঃসংযোগ করে।

কোনদিন বা লছমিয়ার মায়ের সঙ্গে নানারকম সুখ-দুঃখের গল্প হয়, তা-ও শেষ পর্য্যন্ত ভাল লাগে না। লছমিয়ার মা ঘুমিয়ে পড়ে।

রেণুর অত সকালে ঘুম পায় না। উঠে গিয়ে জানালার ধারটাতে বসে। ষ্টেশনের আলোতে রেল লাইন বহুদূর পর্য্যন্ত চক্‌চক্ করে।

মনে আসে নানারূপ চিন্তা। মুখে বুঝি গান আসে গুনগুন করে।

মাঝে মাঝে এক একটা ট্রেন আসে উল্কার মত। কিছুক্ষণের জন্য হয় ষ্টেশনটি চঞ্চল, মুখর। ইঞ্জিনটির ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ, যাত্রীদের ওঠা-নামার কোলাহল আর সর্ব্বোপরি ফেরিওয়ালা-দের চিরন্তন চীৎকার। জীবন্ত হ'য়ে ওঠে মৃত প্লাটফর্ম্ম কয়েক মিনিটের জন্য। রেণুর কাছে এ সব এত পুরান যে সে একটুকুও চমকায় না, হয়ত বা চেয়েও দেখে না সেদিকে।

ঢং—ঢং—ঢং। ফুর-র-র-র...........

ট্রেন ছেড়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ষ্টেশনটি ডুবে যায় সেই ভূতপূর্ব্ব নীরবতায়।

রেণু চেয়ে থাকে। সিগনেল ঘরের জানালায় দু'একটা লোক দেখা যায়। পিছনে আলো, তাই মুখ চেনা যায় না।

সিগনেলের সবুজ আর লাল আলোগুলার দিকে চেয়ে চেয়ে নেশা লাগে। কখন যে চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে টেরও পায় না। হঠাৎ হয়ত একখানা মালগাড়ী প্রলয় শব্দে ষ্টেশনটি ক্রশ্ করে—তন্দ্রা তার ছুটে যায়। চমকে উঠে বসে, তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

নীচে লছমিয়ার মা'র নাকের ডাক শোনা যায়।

কোন দিন বা ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ী থেকে ভেসে আসে গ্রামোফোনের গান। রেণু কান পেতে শোনে। বহুদিনের আশা তার, একটি গ্রামোফোনের বড় সখ। সে নিজে গান গাইতে পারে না। গান শুনতে ভালবাসে। বুঝি গান শেখবার ইচ্ছা তার মনের মধ্যে আজও অদম্য, কিন্তু—

রমেনকে বলেছে, ওগো আমায় একটা কলের-গান কিনে দাও না?

রমেন হেসে উত্তর দেয়—সেকি, এ সখ হঠাৎ চাপল কেন?

—দাওনা একটা কিনে। কি মজা যে লাগে শুনতে। তা ছাড়া কি নিয়েই বা সময় কাটাব।

আবার অভিমান!

রমেন তবু হাসে, বলে—আচ্ছা শীগ্‌গিরই কিনে দেব।

ব্যস্—ঐ পর্য্যন্ত। আজ দুবছর আড়াই বছরে রেণু হাজার বার বলেছে আর শুনেছে ঐ বাসি একঘেয়ে উত্তর—শীগ্‌গিরই কিনে দেব, শত হলেও সে মানুষ।

রেণু ভুলে আর গ্রামোফোনের কথা তুলবে না।

—দুই—

কখন যে সকাল হয়ে যায়, টেরই পায় না।

উঠে রোজই দেখে রমেন এসে বিছানায় পড়ে ঘুমাচ্ছে। লছমিয়ার মা জল তুলে, বাটনা বেটে, উনুনে আগুন দেয়। তাড়াতাড়ি চান করে রেণু রান্নার জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

রমেন দশটা অবধি অঘোরে ঘুমায়। রেণু এসে জাগিয়ে দেয়—ওগো শুনছ, বিকেল হয়ে এল যে ওঠ।

রমেন কোন দিন বা চমকে উঠে বসে; সত্যিই বিকেল হয়ে গেল নাকি? তারপর রেণুর ঘর-কাঁপান হাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে আবার বিছানায় এলিয়ে দেয় নিজেকে।

না-কি? বলি কুম্ভকর্ণ শ‍ুনছ—বলে রেণ‍ু কোলের কাছে বসে পড়ে।

—তা বই কি—রমেন ঘ‍ুমজড়িত কণ্ঠে উত্তর দেয়—সারা রাত্তির জেগে এরকম কাজ করলে ব‍ুঝতে পারতে—

রেণ‍ু কি আর বোঝে না তা তব‍ু বলে—আহা তুমি জেগে থাক আপিসে আর আমি জেগে থাকি বিছানায়। সত্যি ভয়ে আমার ঘ‍ুম হয় না। রেণ‍ু রমেনের চুলের ভিতর আঙগ‍ুল চালিয়ে ম‍ুখটি আরও কাছে এনে বলে।

—না, ঘ‍ুম তোমার একেবারেই হয় না—রমেন ঠাট্টা করে বলে—সেইজন্যেই ত সকাল আটটা অবধি মড়ার মত পড়ে থাক।

—কোন দিন বা দেখবে সত্যিই মরে আছি। রেণ‍ু হেসে বলে।

—ওকি কথা; রমেন ম‍ৃদ‍ু ভর্ৎসনায় কণ্ঠ ভরে আনে—ভারি কথা শিখেছ ত আজকাল। তারপর সে রেণ‍ুকে একেবারে ব‍ুকের উপর টানিয়া আনে—সত্যিই তুমি কাছে না থাকলে আমি যে কি করে বেঁচে থাকতাম তাই ভেবে পাই না।

সারা রাত্রির ক্লান্তি ব‍ুঝি ম‍ুহ‍ূর্ত্তে ধ‍ুয়ে যায় মিলনের ফল্গ‍ুধারায়।

রেণ‍ু নিজেকে ছাড়িয়ে উঠে পড়ে।

—নাও লক্ষ্মীটি ওঠ—চান করতে যাও। ওর গলাটা এত স‍ুন্দর শোনায়!

চান করে এসে রমেন বসে যায় পিঁড়ির উপর লক্ষ্মী ছেলেটির মত। খেতে খেতে নিত্য ন‍ূতন আলোচনা হয়। বহ‍ু সাধ্যসাধনায় কয়েকদিন ধরে রেণ‍ুকে একসঙ্গে খেতে রাজী করিয়েছে।

হয় ত রেণ‍ু বলে—আচ্ছা লীলা ঠাকুরঝিকে কেন নিয়ে এস না, এখানে বেশ দ‍ুটিতে আনন্দে কাটবে—এই যে নিরম্ব‍ু একা এর হাত থেকে ত বাঁচব।

—ধ্যেৎ! ওরা এলে কি আর আমি তোমায় এমনি করে সব সময় পাব—না তোমার সঙ্গে কথা কইতে পাব এমনি সব সময়?

—বাজে কথা রাখ। কবে আনবে বল না।

—ওকে আনলে যে মা'র বড্ড কষ্ট হবে।

—তা আমি কি বলছি মাকে দেশে রেখে আসতে, ওদের দ‍ুজনকেই ত আনতে বলছি।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে। রমেন চুপ করে যায়। তারও কি আর ওদের আনবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু যে মাইনে পায় তাতে যে কুলায় না। এই রেণ‍ুকে নিজের কাছে রাখা নেহাৎ দ‍ুঃসাহসে ভর করে, হোটেলে খেয়ে শরীর টেঁকে না—তাই।

এমনি নানা আলোচনা—কত তুচ্ছ, কত অসংলগ্ন বাজে কথা হয় খেতে খেতে। দ‍ূরে স‍ুন্দর একটি বেড়াল অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে পাতের মাছটার দিকে।

রমেন বলে—দেখ তোমার ঐ বদমায়েস প‍ুসীকে আমি ঠিক একদিন ব্রেকভ্যানে তুলে চালান দিয়ে দেব—

—সঙ্গে সঙ্গে তাহলে আমাকেও দিও—

রেণ‍ুর বড় আদরের প‍ুসী। কথায় কথায় সে বলে যায়—

[illegible] সাপের বাড়ী থেকে কাল এসেছে—কি স‍ুন্দর একটি খোকা হয়েছে তার। জান এই কালো কালো এক মাথা চুল, ফুটফুটে চেহারা, পিট্ পিট্ করে চাইছে। কেবল হাসি। কোলে নিলে আর নাবাতে ইচ্ছে করে না। রেণ‍ু যেন আহ্লাদে কি রকম হয়ে যায়, যৌবনময় সর্ব্বাঙ্গে ওঠে তার একটা অভ‍ূতপ‍ূর্ব্ব শিহরণ।

রমেন ম‍ুখ টিপে হাসে—ভয় কি তোমারও ত হতে পারে ওরকম একটি!

—যাও তুমি ভারী......। রেণ‍ু লজ্জায় ভেসে যায়। ম‍ুখে বললেও মনে মনে সত্যিই সে এক অসহনীয় প‍ুলক অন‍ুভব করে কথাটিতে। ভাল লাগে না আর একা একা।

রমেন তেমনি খেয়ে চলেছে, চোখ দ‍ুষ্টুমীতে ভর্ত্তি। বলে—এই বেশ আছি নিরিবিলি। ও সব ট্যাঁ ফ্যাঁ মানেই যত ঝঞ্ঝাট।

এবার আর রেণ‍ুকে লজ্জা আটকাতে পারে না।

—তা ত বলবেই। তোমরা প‍ুর‍ুষ মান‍ুষ ব‍ুঝবে কি বল। তোমাদের......।

—কেন তোমার ত প‍ুসীই রয়েছে। রমেন মজা দেখে।

—আছেই ত। রেণ‍ু অভিমানে দেহটাকে বাঁকা করে আনে, ম‍ুখও।

খাওয়া শেষ হয়।

পানটি ম‍ুখে দিয়ে রমেন বিড়ি ধরিয়ে বিছানায় বসে। রেণ‍ু মেঝের উপর নিজের জন্যে একটা পান সাজবার জোগাড় করে, কোলের উপর প‍ুসীটা গা এলিয়ে চুপ করে অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে বসে আছে।

রমেনের জিভ বলে ওঠে—উঃ ভাগ্যবান বটে বেড়ালটা—

অন্যমনস্কভাবে রেণ‍ু উত্তর দেয়—ওর উপর তোমার এত হিংসে কেন বল ত?

—হিংসে হবে না—ঐ একটা সামান্য বেড়াল সে কি না—

হঠাৎ কথাটার অর্থ রেণ‍ুর নিজের কানে যেতেই সে লজ্জিত হয়ে ওঠে। বেড়ালটাকে তুলে কোল থেকে ছ‍ুড়ে ফেলে দেয়। চমকে উঠে বেড়ালটা দৌড়ে পালিয়ে যায়।

—আহা, ওকি! রমেন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—ও বেচারার উপর—

—খ‍ুব হয়েছে যাও!

আকাশে হঠাৎ মেঘ দেখা যায়। বেশীক্ষণ থাকে না, দমকা বাতাসের অভাব নেই। নিস্তব্ধ—দ‍ুপ‍ুর। ঘ‍ুম কার‍ুরই হয় না।

রেণ‍ু কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলে—যতই বিকেল হতে থাকে, ততই আর আমার ভাল লাগে না—

—কেন? ও আমি আপিসে যাব বলে ব‍ুঝি?

রেণ‍ু কিছ‍ু আর বলে না।

—তিন—

বোশেখের পর জ্যৈষ্ঠ আসে, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, এমনি করে দেখতে দেখতে শীতও কেটে যায়, বসন্ত আসে, বনেও কোকিল ডাকা স‍ুর‍ু হয়, গাছে ফোটে ফুল।

রেণ‍ুর শরীরে এসেছে মাতৃত্বের ইঙ্গিত, লাবণ্যের

জোয়ারে তার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত। রমেনের মনে আনন্দ ধরে না।

রমেন মনে মনে বেশ গর্ব্ব অনুভব করতে লাগল—এতদিনে সে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে পৃথিবীতে। তাদের উভয়ের প্রেমের কলি আগতপ্রায়, আর বেশী দিন নেই তার পৃথিবীর আলো দেখবার। চারিদিকের আকাশ-বাতাসে সে নূতন-স্বপ্ন দেখছে।

রেণুর কষ্ট হয় সে তা বোঝে। এ সময়টা তাকে উনুনের কাছে, আগুনের উত্তাপে যেতে দেওয়া কোন মতেই সমীচীন নয় কিন্তু খানিকটা তার নিজের দোষ খানিকটা তার দারিদ্র্য প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপায় ছিল না বলে তাকেই লিখতে হয়েছে মায়ের কাছে এ সংবাদ। মা জানিয়েছেন রেণুর মাকে। রমেনের শ্বশুর মশাই রেণুকে নেবার জন্য লিখেছিলেন, রেণুরও মত ছিল, কিন্তু রমেন রাজী হয়নি, নেহাৎ নির্ল্লজ্জের মত অমত করেছে। চোখের বাইরে সে রেণুকে ছাড়তে পারবে না, তাতে যে যাই বলুক না কেন। কয়েক মাস আগেই মাকে আর লীলাকে এখানে নিয়ে আসা উচিত ছিল, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এতদিনে ওরা এসেও পড়ত, কিন্তু রমেনের পক্ষে নিজে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। ছুটি কোনমতে পেলেও রেণুকে একা এই বিদেশ বিভূঁয়ে রেখেও যাওয়া যায় না, সঙ্গে নিয়েও যাওয়া যায় না। তাই রমেনের এক খুড়তত ভাই-এর সঙ্গেই আসবে বলে ঠিক হয়েছে। তারা কয়েক দিনের মধ্যে এসে পড়ল বলে।

রমেনের এখন দিনে ডিউটি চলেছে, অর্থাৎ করে নিয়েছে—এ অবস্থায় রাত্রে বাড়ী ছেড়ে থাকা চলে না।

রেণুর চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। প্রিয়ারূপ আর মাতৃরূপের সংমিশ্রণে হয়েছে অপূর্ব্ব দেহশ্রী। স্বভাব-লাজুক মেয়ে রেণু যেন আরও লজ্জাশীলা হয়ে উঠেছে। রমেনের সামনে আসতে পর্য্যন্ত তার বাধ বাধ ঠেকে, অহেতুক সঙ্কোচ আসে মনে।

রমেন রেণুকে কাছে এনে বলে—বড্ড কষ্ট হচ্ছে তোমার, না? আর কয়েকটা দিন সবুর কর—মা ওরা এলে তোমায় কিচ্ছুটি করতে হবে না।

রেণু বলে—না, না, কোন কষ্ট হচ্ছে না। তুমি বুঝি কেবল ঐ ভাবছ বসে বসে। রেণুর কাছে রমেনের এসব বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়।

—তুমি 'না' বললেই ত শুনব না, রমেন বলে—আমি কি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি না। যাক্ লীলা এলে তবু খানিকটে সুবিধা হবে।

—আচ্ছা রেণু তুমি একটা কাজ করলে পার না—রমেন একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

—কি? রেণু আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে।

—না, থাক। সে তোমায় করতে হবে না। রমেন থেমে যায়।

বাইরে থেকে লছমিয়ার মা ডাকে—বহুমা ভাত হো গিয়া।

রেণু রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। রমেন ডাকে—লছমিয়ার মা, একটা কথা শুনে যেও।

লছমিয়ার মা ঘরে এসে ঢুকে জিজ্ঞেস করে—কেয়া বাবুজি?

রমেন চুপি চুপি বলে—একটা কাজ করতে পারবে? কাঁথা তৈরী করতে পারবে? কাপড়ের দরকার হলে—ঐ আলনার উপর থেকে আমার কাপড় দুখানা দিয়েও তৈরী করতে পার।

রেণু রান্নাঘর থেকে কথাগুলি শুনে যেন লজ্জায় মরে যায়। ছি ছি পুরুষ মানুষের এ-সব কি। আর কারুর যেন কিছু হয় না। আবার সে শুনতে পায়—লছমিয়ার মা বলছে, আর কাঁথা দিয়ে কি হবে বাবু। বহুমা ত তিন চারখান কাঁথা সেলাই কিয়া।

—বানিয়ে রেখেছে! মনে মনে রমেন অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে, বলে—তবে আর দরকার কি, ভালই হয়েছে।

রেণুও তাই বলে তৈরী হচ্ছে, সে তবে চুপচাপ বসে নেই। ভাবনা তারও আছে। রেণু মনে মনে ভাবছিল—লছমিয়ার মাটা যেন কি!

রমেন গোপনে গোপনে সবরকম খোঁজ-খবর, বিলি-ব্যবস্থা ঠিক করে আনছে। এখানে কাছাকাছি ভাল ধাত্রী নেই, পরের জংশন থেকে একজন পাশকরা ডাক্তার আনবে কিনা তাই ভাবছে। টাকার কথা ভাবলে এ সময় চলবে না। আসল কথা যে, সময় থাকবে কিনা ডাক্তার আনতে। পরের জংশন ষ্টেশন যেতে আসতে অন্তত (সাইকেলে গেলেও, কারণ সব সময় ট্রেন পাওয়া যাবে না) পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দরকার।

রাত্রে রমেন প্রায়ই বলে—শরীরে কোন রকম ইয়ে মানে উদ্বেগ অনুভব করছ না ত?

রেণু প্রথমটাত লজ্জায় কিছু বলতেই পারে না, মুখখানি ডুবিয়ে দেয় বালিশে। শেষে অতি কষ্টে বালিশের মধ্য থেকে বলে—না।

—দেখ, কিছু মনে হলেই আমায় বল। লজ্জা যেন কর না, লক্ষ্মীটি।

রেণু শুধু ঘাড় নাড়ে ছোট মেয়ের মত। তার বালিশের কাছে পুসী বেড়ালটা গলার গর্ গর্ আওয়াজ করতে করতে ঘুমায়।

রমেন বেড়ালকে উদ্দেশ করেই বলে—আর বেশী দিন নয়, অত আরামে ঘুমান ঘুচবে, হুঁ!

রেণু বেড়ালটাকে দুহাতে টেনে বুকের কাছে আনে, হয়ত ওর নরম লোমবহুল মাথায় গাল রাখে। আহ্লাদে বেড়ালটা হাত-পা আরো এগিয়ে দেয়, যেন কতকগুলো নরম পেঁজা-তুলো।

রেণু এবার কথা বলে—শুনছ, পুসীর জন্য ক'টা ঘুঙুর এন।

রমেন কি একটা ভাবছিল, শুধু শেষের কথাগুলো কানে যায়—জিজ্ঞেস করে ঘুঙুর কেন?

—পুসীর গলায় বাঁধব।

—অ-হ্, যে না পুসী তার আবার ঘুঙুর। বলে রমেন বেড়ালটাকে ছিনিয়ে আনতে চায়—

—রেণু বলে ওঠে—ও কি করছ!

রমেনের সত্যিই হিংসে হয়।

এমনি ভাবে রাত্রির আয়ু আসে কমে। চারিদিক নিস্তব্ধ থেকে নিস্তব্ধতর হয়। রেণু কখন ঘুমিয়ে পড়ে রমেন টের পায় না। তার চোখে ঘুম আসে না, মনে হয় ছোট ছোট হাত-পা তুলতুলে মুখ নিয়ে কে তার সামনে খেলা করছে। সামনের বাড়ী থেকে হাসনাহানার মনোহর গন্ধে রাত্রি আরও বিভোল হয়ে ওঠে। দূরে কুলী কোয়ার্টার থেকে কুলীদের চীৎকাররূপ গান মৃদু শোনা যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখ জুড়িয়ে আসে। রমেন ভাবে, কড়িকাঠের কোন্ জায়গায় দড়ি টাঙ্গালে দোলনাটা ঠিক ঝুলবে।......

—চার—

সাতদিন কেটে গেছে।

লীলা আর মা এসে পৌঁচেছে। রেণুর খাটুনী কমেছে, বলতে গেলে কোন কাজই তাকে আর করতে হয় না। রান্নার ভার নিয়েছে লীলা।

লীলা একদিন খাটের তলায় যে বেতের বাক্সটা আছে তা থেকে আবিষ্কার করল কতকগুলো ছোট ছোট জামা, ফিডিং বট্‌ল্, ঝুমঝুমি ইত্যাদি।

-কি বৌদি! লীলা দুষ্টুমী করে বলে—এতও জান। না হতেই এসব—

রেণু বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে বলে—ও মা এ কি! এগুলো কে আনল—

—তুমি যেন জান না! লীলা মুচকি হাসে।

—সত্যি, বিশ্বাস কর—রেণু বলে, এ-সবের আমি কিছুই জানি না। নিশ্চয়ই তোমার দাদার কীর্ত্তি এগুলো—

লীলা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

সময় এগিয়ে এল।

রমেন সেদিন আপিস থেকে ফিরে এসে দেখল সবাই ব্যস্ত! রান্নাঘরের পাশের ঘরটায় ভীড়! বুঝতে বাকী রইল না, সময় আসন্ন। বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। জামা ছাড়বার কথা মনে রইল না। আনন্দ আর উদ্বেগ দুই-ই যুগপৎ এসে জুটল মনে।

ঘরে এসে ঢুকল বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এল। মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তার-টাক্তার ডাকতে হবে মা—

মা বললেন—না-না কিছুর দরকার হবে না। কত লোকের হচ্ছে, তুই ব্যস্ত হস্ নে।

ব্যস্ত সে না হয়ে পারে কি করে। এ সময়টা বড্ড ভয়ের। সাবধানের মার নেই। বললে—না মা, একজন লেডি ডাক্তার ডাকা ভাল, এসময়টা বড়—

মা আর কি বলবেন। ইচ্ছে না থাকলেও ছেলের উদ্বিগ্নতা দেখে মত দিলেন—আচ্ছা তা'হলে নিয়ে আয়।

রমেন ছুটল।

সর্ব্বনাশ! ট্রেন নেই এসময়। রমেন একখানা সাইকেল নিয়ে ছুটল, ছয় মাইল পথ। সারাদিনের খাটুনীর পর পা আর চলছে না, তবু প্রাণপণে প্যাডল্ চালাতে লাগল—মনে মনে সুচিন্তা, দুশ্চিন্তা দুই-ই।

লেডি ডাক্তারকে পেল। মিনিট কুড়ি বাদে ডাউন ট্রেন—অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই—অন্য কোন যান-বাহন নেই। রমেন এতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না। ঠিকানা ও কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে সে আবার সাইকেলে উঠল। কুড়ি মিনিটে সে প্রায় বাড়ী পৌঁছে যাবে।

বাড়ী আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনও এসে ষ্টেশনে ভিড়ল। যাক্, লেডি ডাক্তারও তা'হলে এসে গেছে।

উঠানে ঢুকেই রমেন মাকে বললে—মা ডাক্তার এসে গেছে। খবর কি? কি রকম আছে?

লছমিয়ার মা বললে—খবর ভালই। ভালয় ভালয়ই হয়েছে—

—হয়েছে! রমেন আর আহ্লাদ চেপে রাখতে পারল না—কি হয়েছে, কেমন হয়েছে?

লছমিয়ার মা অনায়াসে বলে গেল—একটা মরা লেড়কা হয়েছে বহুমা ভালই আছে—

—মরা ছেলে! রমেন যেন অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল। এক মুহূর্ত্তে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সমস্ত জল্পনা-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিমেষে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে গেল। সে যেন এখনও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

—মরা ছেলে!

লেডি ডাক্তার তার ছোট হাত ব্যাগটি নিয়ে বাড়ীতে ঢুকল।

তুর্কী সংবাদপত্রে লাটিন হরপ

শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী

বিশ বৎসর পূর্ব্বেও তুর্কীর ব্যক্তিগত জীবনে ত নয়-ই, রাজনীতিক জীবনেও সংবাদপত্রের প্রভাবের কোন ছায়াপাত হয়নি। সংবাদপত্রের যে প্রাথমিক কর্ত্তব্য—সত্য-প্রকাশ, তার কোন সার্থকতাই ছিল না তুর্কী খবরের কাগজের সারাদেহের কোন অনাচে-কানাচেও। আষাঢ়ে স্বপ্নের মতই খবরের কাগজগুলো তুর্কীদের এক অলস-বিলাসে মাত্র ছিল পর্য্যবসিত—যার মূল্য তুর্কী পাঠকদের মনের কাছে ছিল শুধু আজগুবি কিছু একটা তুলে ধরায়, এর বেশী নয় একেবারেই। সংবাদপত্রগুলির তরফ থেকেও দায়িত্বের লেশ মাত্র দেখতে পাওয়া যেত না। কিন্তু কে তখন ভেবে রেখেছিল যে, সামান্য বিশ বৎসরের ব্যবধানে গোটা একটা জাতির জীবনে এমন অবিশ্বাস্য বিবর্ত্তন গড়িয়ে পড়তে পারে যে, চির-উপেক্ষা, চির-হতাদরের সংবাদপত্র হয়ে যাবে তাদের জীবন যাত্রাপথের এক মহাসম্বল। স্বপ্নেরও অগোচর ছিল যে, একদিন তুর্কী সংবাদপত্র মহল এমনই প্রবল শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে, যার জন্যে সমগ্র রাষ্ট্রের যে সর্ব্বনিয়ন্তা তিনি পর্য্যন্ত সম্পাদকের পরামর্শ গ্রহণে অগ্রণী হবেন—বাধ্য হবেন। তুর্কী সংবাদপত্র আজ সাধারণতন্ত্রের এক অপরাজেয় রক্ষাকবচ। তুর্কী সংবাদপত্র আজ দেশের দশের দরদে দরদী—মরমের মরমী।

অথচ সেকালের তুরস্কে, এমন কি, সেদিনের সুলতান আবদুল হামিদের আমলে অবধি যে সব খবরের কাগজ সারা মুলুকে প্রকাশিত হ'ত, তার ওপর ষোল আনা থাকত সরকারী কঠোর প্রভাব। এমন কাগজ একখানি ছিল না সে যুগে, যাতে সরকারের অনুমোদন না নিয়ে নেহাৎ নগণ্য একটি সংবাদও পত্রস্থ করতে ভরসা পেত। এমনই ছিল সরকারের শ্যেনদৃষ্টি যে, অমন বিনা অনুমতি প্রাপ্ত সংবাদ মুদ্রিত হবার উপায় ছিল না আদবেই। ফলে দাঁড়িয়েছিল এই—সরকারী ইস্তাহার, রাজকীয় দপ্তরের প্রশংসাসূচক সুরে ভরপুর রাজকীয় ব্যাপার আর সরকারী গেজেট—এ ছিল সংবাদপত্রগুলোর একমাত্র সম্বল। তাও কোন সংবাদের ওপর টীকা টিপ্পনী করা চলত না, বেশীর ভাগ স্থলেই সংবাদ প্রকাশ করা হ'ত অতি সংক্ষিপ্ত আকার দিয়ে। তার ওপর আবার নিষেধের গণ্ডী ছিল অসীম—কোন স্বাধীন চিন্তামূলক প্রবন্ধ, এমন কি কোন কোন গল্প, কাহিনী অবধি প্রকাশ ক'রতে দেওয়া হ'ত না। অজুহাতস্বরূপ বলা হ'ত—এ সবে এমন একটা উৎকট প্রেরণা জোগায় যাতে অঙ্কুরিত হ'তে দেওয়া আর বিদ্রোহ সৃষ্টির সহায়তা করা এক কথা।

কাজেই খবরের কাগজের মালিকরাও হুঁসিয়ার হ'য়ে পড়ল, পণ্ডশ্রম হ'বার ভয়ে তারা রাজনির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনে একেবারে আড়াআড়ি সুরু ক'রে দিল। তখন সংবাদপত্রে আর সরকারী ইস্তাহারে ভেদ রইল না এতটুকু। পীড়নের ভয়ে সত্য গোপন রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়াল; ছাপাখানাটি খোয়া যাবার শঙ্কায় সরকারী কোন ব্যাপারেরই আর সমালোচনা কেউ ক'রত না। দেশের যা প্রকৃত সমস্যা, দেশের যা সত্যিকার অভাব অভিযোগ তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করবে, এতখানি বুকের পাটা কার? সার কথা হ'ল—সত্যিকারের জনজাগরণের [illegible] বা প্রচার হ'ল উপেক্ষিত, সংবাদপত্রের অঙ্গে স্থান পেতে থাকল [illegible] সব বাঁধাবুলি, যার ওপর দেশবাসীর না ছিল কোন আস্থা, না ছিল কোন প্রাণের যোগাযোগ। এমন কাগজের চাহিদা যে বেশী হ'তে পারে না, একথা ঠাউরে নিতে বেগ পেতে হয় না। তা ছাড়া সমস্যা ছিল আরও গুরুতর। সাধারণ [illegible] ক্ষমতা ছিল না দাবত আরবীয় হরপ উদ্ধার ক'রে তা থেকে মর্ম্ম গ্রহণ করা। সেকালের যাঁরা পণ্ডিত ব্যক্তি, যাঁরা জ্ঞানে-গুণে অগ্রণী, তাঁরা ছাড়া আর কে সংবাদপত্র পড়বে বলুন।

অথচ কোন সংবাদপত্র একটা কিছু নূতন প্রস্তাব, একটা কিছু সংস্কারের ইঙ্গিত করতে চাইলে, তাকে কঠোর ভাবেই চেপে দেওয়া হ'ত এই বলে—অজ্ঞ সাধারণকে রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ব্যাপারের জ্ঞানদান দেশের পক্ষে হিতকর নয়।

এ'ত গেল দেশের বিষয় নিয়ে চর্চ্চা করার পথে প্রতিবন্ধক খাড়া করার কথা। তা'বলে বিদেশের সব কিছুই কি প্রকাশ করবার জো ছিল! কোন বিদেশী রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি, পতন-সমৃদ্ধি—এমনি ধারা শিক্ষামূলক ইতিহাসেরই কি প্রচারের উপায় ছিল? তাও দমন করা হ'ত সতর্ক হস্তে। সেখানে আবার যুক্তি প্রদর্শন করা হ'ত অদ্ভুত—যে সব দেশ নিয়ে অমন সব সংবাদ প্রকাশ করবার চেষ্টা হ'ত, সে সব দেশের সরকার পাছে ও সব কথা পড়ে মনে করে তাদের বিকৃত সমালোচনা করা হয়েছে, আর তার ফলে সুলতানের সঙ্গে পাছে তাদের মন কষাকষি হয়, এ আতঙ্কে রাজপুরুষগণ বিদেশী সংবাদেও চালুনি ছাঁকার প্রক্রিয়া চালু করে দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হ'ত। সুলতানের সঙ্গে বিদেশী গবর্ণমেণ্টের হবে মনোমালিন্য, তা আবার তুচ্ছ একটা খবর ছাপার দরুন, এর চেয়ে অসঙ্গত আর কি হ'তে পারে? রাজপুরুষগণ অটল।

তবে সব দেশের ওপরই সুলতানের গবর্ণমেণ্টের যে এমনিধারা সশ্রদ্ধ আবেশ ছিল, তা কিন্তু বলা যায় না নিশ্চয় করে। কেন না, দেশটি যদি এতটা দূরে, বলতে গেলে, তেপান্তরের মাঠের ওপারে হ'ত—যার সঙ্গে ধরা-ছোঁয়া বড় একটা নেই মহান সুলতানের—যেমন আমেরিকা, চীন প্রভৃতি, তবে কিন্তু নিষেধের কড়াকড়ির ঝাঁজ উবে যেত অনেকটাই।

সংবাদপত্রের ওপর শাসন যখন চলছিল এতটা রূঢ়তার সঙ্গে, তখন যে কোন পত্রেরই সুযোগ মিলেনি কোন রকম দেশহিতকর সংস্কার বা নূতন গঠনমূলক অনুষ্ঠানের প্রচলনের জন্যে আন্দোলন পরিচালিত করবার, একথা বেশী ক'রে বলতে হবে না আশা করি। অনুগত ভৃত্যের মত সংবাদপত্রগুলো সুলতানের হুকুমে উঠত, সুলতানের হুকুমে বসত, হুকুম তামিল করতে দেরী করত না এক নিমেষ—ঠিক যেন সে ছিল তাদের কাছে হাদিসের বাণী।

[illegible] আন্দোলন সুরু হ'ল সারা তুরস্ককে বিপুল দোলা দিয়ে। ক্রমে ১৯০৮ সাল এল। আন্দোলন চরমে পৌঁছে গেল বিপ্লবের আকারে। সে অবস্থায় আর কার অন্ধবিশ্বাস থাকে ও-সব নিষেধ বিধির ওপর? চলার পথে পায়ের বেড়ী নিয়ে কি কেউ লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে? তরুণের সজীব চঞ্চলতা একে একে ভেঙ্গে দিলে যত সব নিগড়—সংবাদ প্রকাশের পথে। আন্দোলনের জয় জয়কার ঘোষিত হ'তে লাগল কোন কোন বে-পরোয়া সংবাদপত্রে। একদিকে তরুণ তুর্কীর 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' প্রতিষ্ঠা—অন্যদিকে সংবাদপত্রকে মূক, হতবাক্ করবার নিপীড়ন-নির্য্যাতন—এমনি ধারা শত শত ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণামে সৃষ্টি হ'ল 'লাইসেন্সের' যেমন অপর সব পেশা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের তরফ থেকে করা হ'য়ে থাকে।

কিন্তু আন্দোলন হয়ে পড়ল অদম্য—দিনের দিন বল সঞ্চয় করে রাষ্ট্রের বিভীষিকারূপে বিরাজ করতে লাগল। অরাজকতা সংবাদ-প্রকাশে স্থায়ী আসন জুড়ে বসল। মাঝে মাঝে শৃঙ্খলার মূর্ত্তি উঁকি ঝুঁকি মারলেও অশেষ বিশৃঙ্খলা তুরস্কের সংবাদপত্র সমাজকে রেহাই দিলে না—যতদিন না সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে দিকে দিকে শান্তির পুণ্যবারি সিঞ্চিত হ'ল।

কামালিষ্ট পার্টির রাষ্ট্র অধিকার করে বসবার পর সে-সব সংবাদপত্রকেই শুধু প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হ'ল, যারা মেনে নিলে নূতন শাসনতন্ত্রকে—বরদাস্ত করলে নূতন সরকারের মুখপত্র বনে' যেতে। বেশীর ভাগ সংবাদপত্রই এ চুক্তিতে এগিয়ে এল প্রকৃত প্রাণের টানে। কিন্তু এমন কাগজও আবার ছিল ঢের, যারা শাসনের ভয়ে মাথা নত করলেও সুযোগের অপেক্ষায় রইল—এ তাঁবেদারীর ফাঁস গলিয়ে বেরিয়ে যেতে; আবার এমনও কেউ কেউ ছিল, যারা দেশবাসীকে ধাপ্পা দিয়ে যুগ-প্রভাবের তালে তালে চল্‌বার ভান্ করাকে ব্যবসার দিক হতে বুদ্ধিমানের কাজ বলে' মনে করত। উদ্দেশ্য তাদের যা-ই থাক্, তারা যে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে তারা যে সংবাদপত্রের উন্নতিকল্পে আদবেই কিছু করে নি—এমন নয়। সত্য বটে তাদের সম্পাদকীয় অভিমত ছিল ধার করা—বিশেষ করে কামালিষ্ট পার্টি কর্তৃক তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া; সত্য বটে তাদের প্রচার-কার্য্য চালাতে হ'ত সাধারণতন্ত্রের তরফে নির্বিকারচিত্তে; তবু কিন্তু তাদের দিয়েও তুরস্কের সংবাদপত্রের উন্নতি সাধিত হয়েছে কম নয়। প্রথমত মুদ্রণের পারিপাট্য, উন্নত পাশ্চাত্য-সুলভ যান্ত্রিক প্রণালি—তারাই এনেছে দেশে। তারাই রেওয়াজে পরিণত করে, সারা বিশ্বের সকল খবরাখবর আনিয়ে প্রকাশ করবার—বহু প্রয়োজনীয় নির্ভুল তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ দেশের বড় বড় লেখকদের দিয়ে লেখাবার। রক্ষণশীল তুরস্কের পট-পরিবর্ত্তনের পরও এ প্রচেষ্টা সামান্য নয়! তাদের এ প্রয়াসের যে পুরস্কার তারা পায় নি একেবারেই, এমন নয়। তাদের গ্রাহক-সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে দিনের পর দিন। দেশের লোকেরও বিদেশের সংবাদের জন্যে, ওখানকার প্রবন্ধের জন্যে, রাজনৈতিক মতামতের জন্যে একটা প্রবল তৃষ্ণা জন্মে—সে পিপাসা তারা মেটাতে সুরু করে সংবাদপত্রের স্তম্ভের ভিতর দিয়ে। সংবাদপত্রগুলোর চাহিদা বেড়ে যায়—নূতন উদ্যমে মালিকরা নূতন পথের আবিষ্কারে মাথা ঘামাতে থাকে, তাদের বিক্রয় পরিমাণ আরও বাড়াতে পারে কি-না, সে আশায়। প্রকৃত প্রস্তাবে তুরস্কের সংবাদপত্রের অগ্রগতির এখানেই একটা মস্ত বড় মোড়।

এমনি করে যখন সংবাদপত্রের মালিকরা তুরস্কের রাষ্ট্র-বিবর্ত্তন থেকে স্বার্থরস নিংড়ে বার করছে আর সোনালী স্বপ্ন দেখ্‌ছে দেশজোড়া নাম-ডাকের এবং পকেটভরা টাকা-কড়ির, তখন সেই ১৯২৮ সালে, অকস্মাৎ হ'ল বজ্রপাত। যখন একদিন গাজী মুস্তাফা কামাল নিষিদ্ধ করে দিলেন আরবীয় হরফ ব্যবহার। তার বদলে বিধান দিলেন—তুর্কীতে ব্যবহার করতে হবে লাটিন বর্ণমালা। সে আদেশ যেমন ব্যাপক—তেমনই বাধ্যবাধকতাপূর্ণ।

খবরের কাগজের মালিকরা বুঝলেন মুস্তাফা কামাল শক্ত মানুষ, কেঁদে-কেটে ফল হবে না, বিরোধ করে ত নয়ই। সেকালে তুরস্কে মালিকরাই ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্রের সম্পাদক। কাজেই দুইদিক থেকে তাঁদের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ল। তাঁদের কর্ম্মীমহলে এমন লোক অতি অল্পই ছিল, যারা নূতন লাটিন্ হরপে তুর্কীভাষা লিখতে পারে। এমন সব কর্ম্মচারী দিয়ে সহকারী দিয়ে কেমন করে তাঁরা সংবাদপত্র প্রকাশ করতে পারেন? আর না-হয় ধরে নেওয়া গেল,—কোন রকমে সে অসম্ভব কাজটাও সম্ভব করে তোলা যাবে, কিন্তু তুরস্কে এমন পাঠক-পাঠিকা কোথা পাওয়া যাবে জনসাধারণের ভিতর যারা লাটিন হরপে মুদ্রিত সংবাদপত্র পাঠ করতে সক্ষম হবে? তুরস্কের সে যুগের শিক্ষিত নর-নারীও যে সহসা বর্ণমালার পরিবর্ত্তনে রাতারাতি নিরক্ষরে পরিণত হয়ে গিয়েছে! সংবাদপত্রের মালিকরা দমে যাবার পাত্র নন তাঁরা এক চতুর কৌশল জুড়ে দিলেন। একভাগে সংক্ষিপ্ত স্বরে এনে বাকি সমুদয় অংশ ভরিয়ে দিলেন ছবি দিয়ে দিয়ে। যেটুকু সামান্য অংশে লেখা রইল—তাও মুদ্রিত হতে লাগ্‌ল প্রকাণ্ড বড় বড় লাটিন্ হরপে—প্রথম বর্ণমালা শিক্ষার্থীদের সম্মুখে যে রকম হরপ এনে হাজির করা হয় অক্ষর-পরিচয়ের ফিকিরে। এমনি ধারা বড় বড় হরপে ছাপা হ'ত সম্পাদকীয় মন্তব্য—তাও আবার যতটা সংক্ষেপে সম্ভব। আর যে চিত্র-পরিচয় বা ইঙ্গিত ছাপা হ'ত তাও বড় বড় লাটিন হরপে। কোথাও আবার বাহুল্য ভয়ে শুধু চিত্রই থাকত, আভাষ দেবার প্রয়াস হ'ত না কোন রকম।

কাজেই জনসাধারণের কাছে সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়াল ঠিক যেন ধাঁধা—যার সমাধানে তারা দল বেঁধে লেগে যেত রোজ রোজ। এদিকে নিরুপায় সংবাদপত্র-মালিক সংবাদপত্রখানি বন্ধ করে না দিয়ে বেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—এভাবে চালান যায় কি-না। তাই 'চিত্রেই' একরকম, সংবাদপত্রের প্রকাশ চল্‌ল কিছু-কাল ধরে। আর তুর্কীরাও 'চিত্র' হতে মর্ম্ম উদ্ধার করতে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে পড়্‌ল। হুবহু যেমন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ধাঁধা বা হেঁয়ালির রহস্য ভেদ করে থাকে।

কিন্তু এটুকু লাটিন হরপের ব্যবহারই কি সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে সোজা ব্যাপার হ'ল?—তা কখনই নয়। সম্পাদক আর সহকারীরা প্রথমত আরবী হরপে লিখে যেত, লেখা সারা হলে আবার তার অনুলিপি তৈরী করত—লাটিন হরপে ধরে ধরে, একটি করে অক্ষর লিখে। তখন সে 'কাপি' প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হত 'কম্পোজ' হবার জন্যে। অদ্যাবধি তুরস্কের সংবাদপত্র-কার্য্যালয়ে এমনি ধারা আরবীতে লিখে তাকে লাটিন হরপে রূপান্তর করে 'কাপি' তৈরী হয় এবং যতদিন না লাটিন হরপ শিক্ষিত নবশিক্ষিত সম্প্রদায় দেখা দেয়,—যারা পারবে অনর্গল লাটিন হরপে তুর্কীভাষা লিখে যেতে, ততদিন এমনি করেই আরবী হরপের লেখার রূপান্তর করে যেতে হবে লাটিন অনু-লিপিতে, প্রেসের জন্যে 'কাপি' তৈরী করবার দায়ে।

কার্য্যালয়ে ত এ রকমের খাটা-খাটুনি সুরু হয়েছে ডবল ডবল; ওদিকে আবার জনগণের লাটিন বর্ণমালায় অপরিচয় আর ছবির আকারে ধাঁধার সমাধানে অক্ষমতার ফলে কোন কোন সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা কমে অর্দ্ধেকে দাঁড়াল; কোনটির গিয়ে ঠেক্‌ল সিকিতে। তবু না-ছোড় মালিকরা হাল ছেড়ে দিলে না! সংবাদপত্র তারা প্রকাশ করতেই থাক্‌ল। এমনি করে পাঁচ বৎসর যখন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে—তখন একটু একটু করে ওদের প্রচার-সংখ্যা আবার বাড়তে বাড়তে প্রায় ১৯২৮ সালের সমান পরিমাণে পৌঁছুল।

কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে বলতে হয়—হরপ পরিবর্ত্তনের এ বজ্রাঘাতের কাছে সংবাদপত্রগুলোর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ, ছোট-বড় হরেক রকম বয়সের এবং সমাজের উচ্চ-নীচ সব স্তরের নরনারীই বর্ত্তমানে সংবাদপত্র পাঠ করে থাকে। আর এরই আগের আমলে মাত্র গুটিকয়েক বিদ্বানই সংবাদপত্রের আরবী হরপ পাঠ করে মর্ম্ম উদ্ধার করবার মত বিদ্যা অর্জ্জনে সমর্থ হত। তাই সংবাদপত্রের পাঠক ছিল সেকালে নগণ্য—যার সঙ্গে বর্ত্তমান সংখ্যার তুলনাই হতে পারে না। একমাত্র ইস্তানবুলেই দৈনিক এক লক্ষ সংবাদ-পত্র বিক্রীত হয়; আর ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বে সেস্থলে বিক্রয় হত মাত্র ত্রিশ হাজারখানি। এর ভিতর 'জুম-হুরিয়েৎ' কাগজখানির প্রচারই সব চেয়ে বেশী, এখানির কাট্‌তি প্রতিদিন পঁচিশ হাজার; 'টান' নামক কাগজখানি বিক্রয় [illegible] আঠার হাজার দৈনিক; আর 'আকসাম' দৈনিক-পত্র বিক্রয় হয় পনর হাজার। আঙ্গোরা (বা আঙ্কারায়) আধা-সরকারী দৈনিক 'উলুস'-য়ের বিক্রয় সংখ্যা ১২০০০ প্রতিদিন। এই চারখানা পত্রেরই আধুনিক মুদ্রণ-যন্ত্র রয়েছে। সমগ্র তুরস্কে ১২৩ খানা [illegible] সাময়িক পত্র। অধিকাংশ দৈনিকপত্রের

মূল্যই ৫ পাইয়েস্তার অর্থাৎ প্রায় ২ আনা—মহাসমরের পূর্ব্বে-কার মূল্যের প্রায় ১৬ গুণ। এ মূল্যে অবশ্য দীন-দুঃখীদের সংবাদপত্র পাঠ করা নেহাৎই অসম্ভব। তথাপি প্রচার-সংখ্যার তুলনায় অতীত আর বর্ত্তমানে কি বিষম পার্থক্য! কাজেই যদি সংবাদপত্রের মূল্য হ্রাস সম্ভব হয়, তা হলে যে বিক্রয় উহার আরও বেড়ে যায়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু শীঘ্র মূল্য-হ্রাসের কোন আশা দেখা যায় না; কারণ, উৎপাদন-ব্যয় অতি উচ্চ এবং বিজ্ঞাপনের হার অতি নিম্ন। সংবাদপত্রের ভিতর বিজ্ঞাপন সংগ্রহের এমনই তীব্র প্রতিযোগিতা যে, বিজ্ঞাপনের হার অতিরিক্ত নিম্নে নেমে গিয়েছে।

তুরস্কের সংবাদপত্র-ব্যবসা যেমন গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ হয়েছে, তেমনই উহার সম্মানও বর্দ্ধিত হয়েছে—পূর্ব্বেকার চেয়ে অনেক বেশী। প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ সদা-সর্ব্বদা মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পায়। প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং সম্পাদকদের সম্মেলনে আহ্বান করে' মতামত গ্রহণ করেন। তুরস্কের সরকারের আজ নির্দ্দিষ্ট নীতি হয়েছে, সম্পাদকদের সব সময়ে জানিয়ে রাখা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলীর সংবাদ জানিয়ে রাখা রাষ্ট্র-বুদ্ধির ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা—কখন ও কি-ভাবে সেই সকল অতি গুরুতর সংবাদের প্রকাশ যুক্তিযুক্ত হবে তার মীমাংসার জন্যে। সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে-সকল গঠনমূলক সমালোচনা প্রকাশিত হয়, যে-সকল নূতন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, সরকার তার ওপর মনোযোগ দেয় এবং গুণাগুণ বিচার করে' গ্রহণ করে' থাকে—বাস্তবে পরিণত করতে। মন্ত্রিগণ সংবাদপত্রের উপরই নির্ভর করে বেশীর ভাগ, শাসন-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি ও যে-কোন বিভাগের অবিচার-অপব্যবহার উদ্ঘাটিত করবার জন্যে। প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রেই একটি করে' অন্তত বিখ্যাত সাহিত্যিক থাকেন, যিনি অতি হাল্‌কা ধাঁজে ব্যঙ্গ-কৌতুকের আমেজে ঢেকে, এমনি সব তীব্র ও চতুর মন্তব্য প্রকাশ করেন, য সাধারণভাবে খোলাখুলি ব্যক্ত করা হয়ত গম্ভীর গুরু-রাজনীতিক প্রবন্ধে সম্ভব নয়, বা যা ব্যক্ত করলে নির্ব্বিকারে বরদাস্ত করা সম্ভব নয় দেশের পক্ষে। এ জাতীয় সাহিত্যিক নিযুক্ত করতে দেখা যায়—ইস্তানবুলের সংবাদপত্রেই বেশী।

তথাপি অবশ্য এমন দাবী উত্থাপন করা যায় না যে, তুরস্কের সংবাদপত্র হুবহু ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের ন্যায়ই স্বাধীনতা উপভোগ করে। এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তুরস্ক এখনও প্রগতি-বিবর্ত্তনের মুখে, তার নবরাষ্ট্র-ব্যবস্থা অভিজ্ঞ প্রাচীন নয়; যতদিন অবধি তার সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার পূর্ণ না হয়, ততদিন এভাবেই চলতে হবে, নইলে হয়ত এখনই সংবাদপত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে দেশের হিতের চেয়ে অনিষ্টই ঘটে যাবে বেশী। তবে এ কথা বলতে হবে যে, তুরস্ক-সরকারের তরফ থেকে কোন সেন্‌সরশিপ (Censorship) বসান হয়নি—কোন সংবাদ প্রকাশে বাধা দেওয়া হয় না প্রত্যক্ষে, তবু কিন্তু এক রকমের একটা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে করে কোন কোন স্থলে সংবাদপত্রকে সরকারের ইঙ্গিত গ্রহণ করতে হয় এবং এ প্রভাব এখন কিছুদিন আরও চলবে। তবে একটা কথা তুর্কীরা বলতে পারে যে, তাদের দেশের সংবাদপত্রে সরকারী পরোক্ষ প্রভাব হল—অনুদ্দাম মধ্য-পন্থা—কোন কোন দেশের মত সংবাদপত্রের অবাধ অসীম স্বাধীনতার নামে চরম স্বেচ্ছাচার বিলাসও নয়, আবার কোন কোন দেশের কঠোরভাবে বাক্‌রোধ করবার পীড়নে সংবাদপত্রের সার্থকতা বিলোপও নয়।*

*টাইমস্‌, লণ্ডন ও ডেইলী মিরার হতে কতক তথ্য সংগৃহীত।

সুলতানগঞ্জে শ্রীশ্রীঅজগবীনাথ দর্শন

(৭৫৬ পৃষ্ঠার পর)

পৌঁছিলে মাঝিকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া মসজিদ দর্শনে চলিলাম।

মসজিদে আরোহণ করা আদৌ কঠিন হইল না, কারণ নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত মনুষ্যহস্তনির্ম্মিত সোপানরাজি বরাবর উঠিয়া গিয়াছে। উপরে উঠিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বারটি কবর দেখিলাম, কোনও জন-মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইলাম না। শুনিলাম এই মসজিদে বিশেষ উপলক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে কেহ নমাজ পড়েন না। স্থানটি পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ হয়, কারণ চতুর্দ্দিকে আতা-বৃক্ষের জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নাই। মসজিদের পশ্চাৎ ভাগ হইতে গঙ্গার দৃশ্য অতি রমণীয়। এই স্থান গঙ্গাবক্ষ হইতে খাড়া প্রাচীরের মত উঠিয়াছে, উপর হইতে নিম্নে দৃষ্টি-পাত করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। বার বার করিয়া গঙ্গার শোভা এই স্থান হইতে দেখিয়া লইলাম, যেন জীবনে আর দেখিতে পাইব না। শেষে ফিরিলাম 'with longing lingering steps', কারণ নীচে আমার সঙ্গিগণ আমাকে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখন ট্রেন আসিতে আর দশ মিনিট মাত্র আছে।

সার্থকতা

কমলরাণী মিত্র

আমি যতো চ'লে যাবো পথে
ফেলে' যাবো দুই-পাশে ফুল,
দু'হাতে ছড়ায়ে' যাবো
খেয়ালের খুশির বেভুল।
প'ড়ে র'বে তা'রা পথে-পথে,
যাত্রী যা'রা স্বর্ণ-চূড়া-রথে
হ'বে না কি একটু আকুল!

দিয়ে' যাবো বাঁশরীর বুকে
প্রাণঢালা যতোটুকু সুর,
সে সুর যাবে না জানি
দেশ-দেশ—দূরে—বহুদূরে!
যদি কেহ কাছে বাতায়নে
লুকাইয়ে একা আনমনে
শুনে আহা বিরহ-বিধুর;—
তা'-ই ভালো, তা'-ই যে মধুর!!

(কথিকা)

শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায়

মিসেস সরকার আসিয়া বলিলেন, আপনি যে কবিতা লেখেন জানতাম না ত! আপনার চেহারার সংগে কবিতার কিন্তু কিছুমাত্র মিল নাই—বেশ কবিতা!

আহত হইলাম। চেহারা আমার ভাল নহে জানি, কিন্তু তাহা অন্যের নিকট হইতে শোনা—বিশেষ, সে যদি নারী হয় তবে সে এত বেশী কষ্টকর হইবে তাহা জানিতাম না। সমলাইয়া লইয়া বলিলাম, আপনি কবিতার সংগে কবির চেহারার মিল খোঁজেন নাকি মিসেস সরকার? তা হলে ত অনেক কবিরই কবিতা লেখা উচিৎ নয়।

মিসেস সরকার কিন্তু আমার কথায় কান দিলেন না, নিজের কথাই বলিয়া চলিলেন—কৈ, দেখি, আপনার নতুন কাব্য, যার প্রশংসা পড়লাম কাগজে! দিন না এক কপি—দেখি!

বোধহয় বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম; হয়ত একটু চটিয়াও ছিলাম। মানুষের চেহারা লইয়া যে নারী এমন নির্দ্দয়ভাবে সমালোচনা করিতে পারে আমার কবিতা তাহাকে পড়িতে দিতে ইচ্ছা হইল না। মনে হইল, ইনি শুধু মানুষের বাহিক রূপটাই দেখিয়া থাকেন, অন্তরের রূপ ইঁহার চোখে পড়ে না। ইনি আমার কাব্যের কি বুঝিবেন! রূপগর্ব্বিতা নারী! মিসেস সরকারকে এড়াইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলাম।

পরদিন আবার দেখা হইল। বলিলেন, কৈ আপনার বই? গতদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল, কিন্তু ভদ্রসমাজে সব কথা মুখ ফুটিয়া বলা চলে না তাই বলিলাম,—আমার কাব্য কি আপনার ভাল লাগবে? অনেক ত পরিচিত লোককে কবি বলে স্বীকার করতে অনেকখানি উদার্য্য দরকার। আমার কাব্য আপনার পড়ে কাজ নাই।

তিনি হয়ত একটু আহত হইলেন, চুপ করিয়া থাকিলেন। চলিয়া আসিলাম। আঘাতের প্রতিঘাত করা আমার স্বভাব। এতক্ষণে মনটা যেন একটু সুস্থ হইল।

মানুষের মন কত অল্প আঘাতেই বিচলিত হয় ইহা হয়ত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হয়ত ইহা আমার কবিমনের অভিমান বা অহঙ্কার, কিন্তু নিজেকে ঐভাবে সমালোচিত হইতে দেওয়াতেও যেন মনের দৈন্য প্রকাশ পায়। রবি ঠাকুরের মত অমন সুন্দর চেহারা লইয়া অত বড়লোকের বাড়ীতে জন্মান নিশ্চয়ই ভাগ্যের কথা, কিন্তু তাহা না হইলেই যে ভাল কবিতা লিখিতে পারিবে না ইহা যাহারা মনে করে তাহারা কখনই কবির বন্ধুত্বের যোগ্য নহে এবং যাহারা ইহা লইয়া কবিকেই বক্রোক্তি করে তাহাদের সহিত কবির কোন সম্বন্ধই থাকা উচিত নয়।

মনটা ক্রমশ কঠোর হইয়া উঠিতেছিল, অন্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিলাম।

কয়েকদিন হইতেই একটা লেখা শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। লিখিব ভাবিয়া বসি, ঠিক সেই সময়েই হয়ত কোন বন্ধুর আবির্ভাব ঘটে কিম্বা অন্য কাজের তাগাদা আসে, না হয়ত অত্যন্ত ঘুম পাইতে থাকে। আজ লেখাটা শেষ করিতেই হইবে, সম্পাদক বারম্বার তাগাদা দিতেছেন। খাতা লইয়া বসিলাম। কিন্তু মিসেস সরকারের কথাটা এখনও মনের কোন্ নিভৃত স্থানে খচ্‌খচ্ করিতেছে। ভাবিতেছি, আমার লেখা যাহারা পড়ে তাহারা আমার সম্বন্ধে বেশ একটি সুকুমার ধারণা পোষণ করে, অন্তত আমি চাই যে তাহারা তাই পোষণ করুক। কিন্তু মিসেস সরকার আমার সেই জাগ্রত স্বপ্নে রূঢ় আঘাত করিয়াছেন। কিছুতেই তাঁহার বিদ্রূপপূর্ণ মুখখানা ভুলিতে পারিতেছি না। তাঁহার বক্রোক্তিটা হুলের মত বিঁধিতেছে। প্রতিশোধ ত লইয়াছি তবু মনটা শান্ত হয় নাই।

মিসেস সরকার নারী, তাঁহার মধ্যে রূপের তৃষ্ণা থাকা স্বাভাবিক কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য মহত্তর বস্তু কেন তাঁহার মধ্যে নাই! আমার রূপ নাই, কিন্তু আমার মধ্যে শিশুর মত চির-নবীন যে কবিমন রহিয়াছে, তাহাকে কেহ তিনি স্নেহ করিতে পারিলেন না! ভাবিলাম, মিসেস সরকারকে লক্ষ্য করিয়াই গল্পটা শেষ করিব।

আধুনিক নারীপ্রগতির বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিয়া লিখিতে লাগিলাম। তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার বিলাসিতা, তাহাদের রূপসজ্জার ভড়ং, তাহাদের কথাবার্ত্তার মার্জ্জিত নগ্নতা সবই ফুটিতে লাগিল আমার লেখনীমুখে এবং সমস্ত লেখাটা জুড়িয়া বসিল এক ছলাকলাময়ী আধুনিক তরুণী যাহাদের সঙ্গ পুরুষ সর্ব্বদাই কামনা করে কিন্তু সঙ্গিনী করিতে চাহে না, যাহাদের সম্মুখে প্রশংসা করিয়া আড়ালে করে নিন্দা। লেখা শেষ হইল, অতি আধুনিক তরুণীর একটি সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ চিত্র যাহারা মাতৃত্ব বা ভগিনীত্বের কোন খবরই রাখে না—রূপ এবং যৌবনের গর্ব্বে যাহারা শিখার মত জ্বলিতেছে। পড়িতে গিয়া অনুভব করিলাম অজ্ঞাতসারে মিসেস সরকারকেই আঁকিয়া ফেলিয়াছি। মনটা আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। গল্পটা ছাপা হইলে মিসেস সরকারকে এক কপি পাঠাইয়া দিব।

বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু গল্পটা ছাপা হইবে তাহার পর মিসেস সরকারকে পাঠাইব, ততদিন আমার ধৈর্য্য থাকিবে না। আজই, এখনই তাঁহার বাড়ী গিয়া গল্পটা তাঁহাকে শুনাইতে হইবে।

ঠিকানাটা জানা ছিল। দরজার কাছে যাইতেই দেখি মোটাসোটা কালো কুচ্‌কুচে একটা ছেলেকে লইয়া একটি ঝি বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—মিসেস সরকার থাকেন এই বাড়ীতে?

—হ্যাঁ থাকেন—দাঁড়ান, খবর দিচ্ছি।

ঝি চলিয়া গেল। ছেলেটা আমার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতেছে। আমার চেয়েও কালো—কুৎসিত। এই কি মিসেস সরকারের ছেলে নাকি!

ঝি আসিয়া ভিতরে যাইতে বলিল। মিসেস সরকার হাতের বইটা নামাইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন,—আসুন, কি মনে করে?

বইটার মলাটের দিকে নজর পড়িল, "শিশুমনস্তত্ত্ব"। চকিতে মনে হইল, ঐ কালো কুৎসিত ছেলেটার জন্য মিসেস সরকার কত যত্নে শিশুমনস্তত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন। তবে ত যাহা লিখিয়াছি, সবই ভুল!

গল্পটা লুকাইয়া ফেলিলাম।

অদ্ভুত আক্রমণকারী

মোটরগাড়ীর আরোহী কোনও লোক রাস্তায় একলা কোনও রমণীকে যাইতে দেখিলেই সেফটি রেজার ব্লেড হাতে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনটি রমণী ১লা ডিসেম্বর তারিখে এইভাবে আহত হইয়াছে। হ্যালিফ্যাক্স-এ সাঁঝের বেলা কোনও রমণী রাস্তা চলিতে থাকে, হঠাৎ পাশের এক ঝোপ হইতে একটি নোংরা বেশধারী লোক আসিয়া তাহার জামায় আঁচড় কাটিয়া পালায়। রমণীর কোট ও তন্নিম্নস্থ জামা কাটিয়া গায়ে আঁচড় লাগে। ইয়র্কশায়ারের সিটলে (হ্যালিফ্যাক্স হইতে ৩৭ মাইল দূরে) মিসিস ল্যাম্ব (বয়স ২৩ বৎসর) সাইকেলে যাইতেছিল। হঠাৎ একখানা মোটর-গাড়ী আসিয়া পাশে থামে এবং মলিন বেশধারী আরোহীটি নামিয়া মিসিস ল্যাম্বকে ডাকে। মিসিস ল্যাম্ব মনে করে বোধ হয় মোটরগাড়ীর কোনও দুর্ঘটনা হইয়াছে, সেইজন্যে ডাকিতেছে। সে আগাইয়া যায়, তখন লোকটি রেজার ব্লেড দ্বারা তাহাকে আঘাত করে—সে সাইকেল সহ পড়িয়া যায়। দুধের বোতল সংগে ছিল তাহা পড়িয়া গিয়া সশব্দে ফাটিয়া যায়, সংগে সংগে আততায়ী মোটর-সহ পলায়ন করে। মিসিস ল্যাম্ব পরে দেখিতে পায়, তাহার জামার হাতা কাটিয়া ব্লেডের টানে বাহু ক্ষত হইয়াছে। তৃতীয় আক্রমণ হয় গ্লাসগোর পশ্চিম কোণে শেটলষ্টন-এ। মিসিস মার্ফি দ্রুতপদে কাজ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। হঠাৎ এক ব্যক্তি পিছন হইতে আক্রমণ করে, মিসিস তাড়াতাড়ি চলিতেছিল বলিয়া আঘাত লাগে পায়। মোজা ছিঁড়িয়া ঝুলিতে থাকে। সে চেঁচাইয়া উঠে, আক্রমণকারী পলাইয়া যায়। রমণীর পায়ে মাত্র সামান্য আঁচড় কাটিয়া গিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার বিমান-রক্ষী দল ও সাইকেল টহলদারগণ খোঁজে বাহির হয়, কিন্তু আক্রমণকারী ফেরার।

কয়লা হইতে খাদ্য

কয়লা হইতে ল্যাকটিক এসিড, এসেটিক এসিড এবং গ্লিসিরিন প্রস্তুত হইয়াছে। আবার বার্লিনের কোনও রাসায়নিক আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এই সকল মিশ্র-পদার্থ হইতে মদ্য-গাঁজিলার ন্যায় প্রোটিনযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। এ পর্য্যন্ত বীট-চিনি, ঝোলা গুড়, আলু প্রভৃতি হইতে এই উপাদান সংগৃহীত হইত। কয়লা হইতে নিষ্কাশিত এই জাতীয় এক মিশ্রণ জলে গুলিয়া এবং বায়ু হইতে সংগৃহীত নাইট্রোজেন সংযোগে যে দ্রবণ প্রস্তুত হয়, তাহাতে অর্দ্ধ থাকে অসংস্কৃত প্রোটিন। এই অসংস্কৃত প্রোটিনই ঘোড়া, গরুর খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইতেছে—উহাই প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম চর্ব্বি-বর্জ্জিত মাংসের প্রতি-প্রসব। এদিকে যে প্রকার গবেষণা চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, শীঘ্রই কয়লা হইতে মাংসের ন্যায় কৃত্রিম খাদ্য তৈরী হইয়া মানুষের খানাপিনায় নূতনত্ব সৃষ্টি করিবে।

উন্মাদের আতঙ্ককর অভিযান

কালিফোর্নিয়ার ষ্টকটন্ পাগলা গারদে আগুন লাগে। সেখানকার ২০০০ উন্মাদের ভিতর ৫০টি এই সুযোগে গারদ হইতে পলাতক হয়। প্রাচীর টপকাইয়া, বেড়া ডিঙাইয়া উল্লাসের চীৎকার করিতে করিতে তাহারা শহরময় ছড়াইয়া পড়ে—কেহ ছিল একেবারে উলঙ্গ, কেহ ছিল অর্দ্ধ-নগ্ন—সকলের হাতেই লাঠি বা কাঠ অথবা গাছের ডাল—একটা কিছু ছিল। যাহাকে সম্মুখে দেখিয়াছে, তাহাদের পাকড়াও করিতে আসিয়াছে ভাবিয়া তাহাকেই প্রহার করিয়াছে। ইতি-মধ্যে পুলিশ দলে দলে বাহির হয় উহাদের অনুসন্ধানে। কিন্তু সহজে গ্রেফতার করিতে পারে নাই। ইহাদের একটি উন্মাদ একেবারে অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিয়াছে। শেষে একে একে ৪৭টিকে অনেক ধস্তাধস্তির পর বন্দী করা হয়। কিন্তু তিনটিকে আর ধৃত করা যায় নাই। উহারা নাকি বিষম দুরন্ত। ষ্টকটনের অধিবাসীদের বিজ্ঞাপন দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বালক-বালিকা বা নারী যেন রাস্তায় বাহির না হয়, যতক্ষণ না বাকি তিনটি উন্মাদ ধরা পড়ে। আগুন কি প্রকারে লাগিল, তাহার অনুসন্ধানে জানা যায়, একটি উন্মাদ তাহার শয্যায় আগুন ধরাইয়া মজা দেখিতেছিল—সে হাততালি দিয়া গান গাহিয়া নাচিতেছিল। পরে সেই আগুন গারদের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

সশস্ত্র রক্ষী, পুলিশ এবং দমকল-খালাসীর দল উন্মাদ-দের অনুসন্ধান চালাইতেছে।

ফল উৎপাদনে কৃত্রিমতা

সাধারণত নিয়ম হইল ফুলের পুং-স্ত্রী কেশর মিলনে ফলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মার্কিনের ডাঃ গার্ডনার এবং ডাঃ মার্থ এই আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ঐ প্রকার কেশরের মিলন ব্যতীতও এক প্রকার আরক মাত্র ঢালিয়া ফলের সৃষ্টি সম্ভব করা যাইবে। কিন্তু 'হলি' নামক লাল রঙের 'বেরি' মাত্র এই কৃত্রিম প্রথায় উৎপাদনে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু আপেল, আঙুর, ষ্ট্রবেরি প্রভৃতি ফলে তাঁহাদের প্রথা কার্য্যকর হয় নাই।

বোম্বাইয়ের পুরাতন কামান

ভিক্টোরিয়া যুগের দুইটি কামান বোম্বাইতে ছিল, যাহা ১৮৩৮ এবং ১৮৪০ সালে আমদানী করা হয়। দৈর্ঘ্য ২১ ফুট, প্রস্থ ৬ ফুট, মুখছিদ্র ১২ ইঞ্চি, নলমধ্য ১২ ফুট —এই পরিমাপেরই কামান দুইটি। সম্প্রতি দুইটিকেই কোনও কনট্রাক্টারের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি কামানের ওজন ৪০ টনের কম হইবে না—যে গান মেটাল হইতে প্রস্তুত, তাহাও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। বোম্বাই শহরে দুইটি মিউজিয়মের একটিতেও উহাদের স্থান হইল না কেন, প্রত্নতাত্ত্বিক-বিভাগ এমন উদাসীন কেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। পুরাতন গান ক্যারেজ ফ্যাক্টরীর প্রাঙ্গনে কামান দুইটি পড়িয়া আছে।

কাঠ হইতে চিনি মিছরি

কাঠের অতি ছোট টুকরা ও গুঁড়া—যাহা কোন কাজেই লাগিবার কথা নয়, জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ সেই সকল অকেজো জিনিষকেই নানা রহস্যজনক জনকত্বের ছাপে আভিজাত্য দান

করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—মাছের আঁইশ ও চামড়া হইতে স্যাণ্ডেল, সেলুলোজ দ্বারা দাড়ি-কাছি কাষ্ঠ-মণ্ড হইতে রুটি প্রভৃতি নির্ম্মাণের কথা। সম্প্রতি জার্ম্মানীতে অপর দেশ হইতে সকল প্রকার কাঁচা মাল ক্রয় করিবার ব্যয় বাঁচাইবার জন্য কাঠের কুচি হইতে চিনি মিছরি তৈরী হইতেছে। চিনি অপেক্ষা মিছরিই প্রস্তুত হয় বেশী এই

উপাদানে এবং সেই মিছরিকে অধিককাল সংরক্ষণের ব্যবস্থাও সফল হয়।

আর একটি বিচিত্র আবিষ্কার জার্ম্মান-বিজ্ঞান-বিশারদ-দিগের হইল—কয়লা এবং খড়িমাটি হইতে কাচ প্রস্তুত করিবার বাহাদুরী।

পৃথিবীর গভীরতম কূপ

কালিফোর্নিয়ার স্যান জোয়াকিন উপত্যকায় ওয়াস্‌-কনসিন্‌ প্রদেশের ৪ মাইল পশ্চিমে কণ্টিনেণ্টাল অয়েল কোম্পানীর যে তেল-কূপ রহিয়াছে, উহাই সারা বিশ্বের গভীরতম কূপ এবং তেল নিষ্কাশনেও ইহা অপেক্ষা নিম্নতর গভীরতায় কোনও কূপ আজ পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। ইহা পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে ১৫,০০৪ ফুট নীচে পর্য্যন্ত খনিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল গভীরতায় পৌঁছি-য়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে কূপ গভীরতায় শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা হইল পশ্চিম টেকসাসে, কিন্তু সেইটি অপেক্ষা বর্ত্তমান কূপটি ২২০০ ফুট বেশী গভীর। এই পর্য্যন্ত যে গভীরতা হইতে তৈল উত্তোলন সম্ভব হইয়াছে, তাহা হইল ১৩০০০ ফুট এবং লুইসিয়ানা নামক স্থানে সে কার্য্য চলিতেছিল। কিন্তু কণ্টিনেণ্টাল অয়েল কোম্পানীর স্যান জোয়াকিন উপত্যকার তেল কূপে ১৪৫০০ ফুট গভীরতা হইতে তেল নিষ্কাশন সম্ভব হইয়াছে। তাপ-পরিমাণ নির্ণয় করিয়া দেখা গিয়াছে, যতই মৃত্তিকা-নিম্নে যাওয়া যায়, প্রতি ১২৫ ফুটে ১ ডিগ্রি করিয়া তাপ বৃদ্ধি পায়।

বিগ্‌বেন্‌ ঘণ্টা-সংলগ্ন ঘড়ি

বিগ্‌বেন্‌ই এতকাল ইংলণ্ডের সর্ব্ববৃহৎ ঘণ্টা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি লিভারপুলে যে নূতন ঘণ্টা হইবে তাহা ইহাকে ছাড়াইয়া যাইবে সকল দিকেই। তবু বিগ্‌বেন্‌-য়ের সংশ্লিষ্ট ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটি এক বৎসরে

১০০ মাইল পথ ঘুরিয়া আসে, ইহা হইতেই ঘড়িটির আকার বুঝা যাইবে। ঘড়ির ডায়েলটির ব্যাস ২৩ ফুট। ১, ২ প্রভৃতি ঘণ্টার অঙ্কগুলি প্রত্যেকটি ২ ফুট লম্বা, মিনিট দাগগুলির পরস্পর ব্যবধান এক ফুট। মিনিট কাঁটাটি ১৪ ফুট লম্বা, ঘণ্টার কাঁটাটি ৯ ফুট লম্বা। ঘড়ির পেণ্ডুলামটি ১৩ ফুট লম্বা।

তাঁত-বোনায় বিজলী-চক্ষু

জাপানের ফুকুওকা অঞ্চলের কিনসাকু নাকানিশি এমন এক তাঁত প্রস্তুত করিয়াছে যাহা অঙ্কিত ডিজাইন দেখিয়া আপনা-আপনি হুবহু সেইপ্রকার বুনট করিয়া যায়—ইহাতে কোনও মানব-হস্তের সাহায্য প্রয়োজন হয় না।

যে চিত্র দেখিয়া বুনট করিতে হইবে, সে খানিকে একটা সচল ফ্রেমে আঁটিয়া দেওয়া হয়—ফ্রেমখানি সম্মুখে-পিছনে সরিয়া যাইতে পারে। ফ্রেমের এই চলমান অবস্থায় ফটো-ইলেকট্রিক সেল উহার বুনটের ধারা আত্মস্থ করিয়া লয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন বৈদ্যুতিক প্রেরণার (impulses) সঞ্চার করে যাহার পরিমাণ নির্ভর করে চিত্র হইতে প্রতি-ফলিত আলোকরশ্মির উপর অথবা চিত্রের রং এবং ছায়া-মূল্যের গভীরতা, ক্ষীণতার উপর।

বৈদ্যুতিক প্রেরণার ফলে, যে কাজ হইবে, পরিমাণ অনুযায়ী তাহা একেবারে পৃথক। ক্ষীণ-প্রেরণার প্রভাবে তাঁতের কোন কোন টানা-পড়নে কাজ করিবে, তীব্র [illegible] অপরগুলিতে কাজ চলিবে—এমনভাবেই তাঁতটি [illegible]ণের ব্যবস্থা। ফটো-ইলেকট্রিক সেল যেমন চিত্রটির বীক্ষণ-কার্য্য

করে, তেমনই টানা-পড়েন চালিত হয় বিদ্যুৎ-শক্তিতে। আবার চিত্রটিতে রং দেওয়া থাকে না, কালোর ছায়ার হেরফেরই মাত্র থাকে। ইলেকট্রো-ম্যাগনেট ঐ ছায়ার গভীরতার ক্রমানুযায়ী কোন্ রঙিন তন্তু ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেয়।

হিটলারাতঙ্ক

আমেরিকার ওণ্টারিও অঞ্চলের হুরন কাউণ্টী কাউন্সিল স্থির করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি হের হিটলারের ন্যায় গোঁফ রাখিবে, তাহাকে দেখা মাত্র গ্রেফতার করিতে হইবে। কোনও সদস্য প্রতিবাদ করিয়া গম্ভীরভাবে বলে—তাহার দরকার কি! বরং আদেশ দান করা হউক সকলকেই হিটলারের ন্যায় গোঁফ রাখিতে হইবে। একজন হিটলারের উদয় হইলে ডিক্টেটার হইবার ভয়, কিন্তু সকলেই ডিক্টেটর হইলে আমাদের সাধারণতন্ত্র অটুট থাকিবে।

অবরোধাতঙ্ক বা Claustrophobia

অবরোধাতঙ্ক অর্থাৎ জেলে সঙ্কীর্ণ স্থানে অবরুদ্ধ থাকিবার আতঙ্কে মুহ্যমান বলিয়া অনেক অপরাধীর তরফ হইতে উকিলগণ অন্য হাল্‌কা সাজার প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু বিচারকগণ এ পর্য্যন্ত তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে স্যান ফ্রান্সিসকো জেল হইতে ডাঃ ডি এঞ্জোলোকে এই কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে মাত্র বার ঘণ্টা যাপনের পর। ডাঃ এঞ্জোলো এতটা কাতর হইয়া পড়েন যে, জেলখানা দর্শনেই তাঁহার চেতনা লুপ্ত হয়। ডাক্তারগণ প্রাণহানির আশঙ্কায় তাঁহাকে মুক্তি দিতে নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু জেলারগণ আশঙ্কা করেন, এখন হইতে ক্লসট্রোফোবিয়া সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় জেলে জেলে বিস্তার লাভ করিবে ১০০০ মাইল সাগর ডিঙাইয়াও।

ইংলণ্ডে ডিক্টেটরশিপ (?)

গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান শিল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিধিনিষেধের নূতন নূতন গণ্ডী নির্ম্মাণ।

অথচ যে বিভাগ সব চেয়ে বেশী নিষেধ-বিধি প্রচলিত করিতেছে, তাহা হইল ট্রান্সপোর্ট বিভাগ। আর এই বিভাগে নিত্য নূতন আইন সৃষ্টি সত্ত্বেও দুর্ঘটনা বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। বিভাগীয় মন্ত্রী সকল দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়াছেন, "মানব-প্রকৃতির" উপর, যাহা অবশ্য নিষেধ-বিধির আয়ত্তের বাহিরে।

ইতিহাস বলে—নিষেধ-বিধির বন্যায় রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা এমন ছাঁচে ঢালাই হয়, যাহাতে রাষ্ট্রই ডিক্টেটরশিপের দৃঢ়-মুষ্টির বেষ্টনে আবদ্ধ হয়।

নিষেধ-আইনের পর নিষেধ-আইন প্রণয়নে গ্রেট ব্রিটেন শীঘ্রই চাহিবে এই আইন-প্রণেতা দলের উপর নিয়ন্তা ও বিধানদাতা প্রতিষ্ঠিত করিতে; সুতরাং গ্রেট ব্রিটেন ত ডিক্টেটরশিপের দিকেই আগাইয়া চলিয়াছে।

—নিউজ রিভিউ

লণ্ডনে আবিষ্কৃত 'সোভিয়েট রহস্য'

লণ্ডনের কোনও উচ্চ গবর্ণমেণ্ট অফিসিয়াল এক ভোজসভায় ঘোষণা করেন আমার বিশ্বাস যে, ছয় মাস অতীত হইতে চলিল ষ্ট্যালিনের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি "সানডে রেফারি" (Sunday Referee) পত্রে প্রকাশিত 'সোভিয়েট রহস্য' নামক সংবাদের উল্লেখ করেন। উহাতে প্রকাশিত হইয়াছেঃ—

"যেখানেই নরনারী একত্রিত হয়, রাজনৈতিক আলোচনার জন্য সেখানেই এই প্রকার গুজব প্রসারলাভ করে। আগষ্ট সেপ্টেম্বর, অক্টোবর—এই তিন মাসে কন্‌টিনেণ্টের বহু পত্রে এই বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; ষ্ট্যালিন গুলীর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন; ষ্ট্যালিনের বাহু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ বিবরণ মুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। লণ্ডনে সোভিয়েট রাজদূত দপ্তর হইতে কোনও অফিসিয়াল বলিয়াছেন—যতদূর আমরা জানি, ষ্ট্যালিন জীবিত আছেন এবং বহাল তবিয়তেই বিরাজ করিতেছেন।"

সংবাদপত্র পাঠের শিক্ষাদান

মার্কিনের স্কুলসমূহের উচ্চ শ্রেণীতে সংবাদপত্র পাঠের বিশেষ শিক্ষাদান করা হইবে। সমগ্র মার্কিনের সংবাদপত্রে এমন কৌশলে ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহ প্রবিষ্ট হয় যে, সংবাদপত্র পাঠের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন সকল ব্যক্তিরই। নেহাৎ ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ সংবাদ (যাহাতে বিশেষ কোনও ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও কোন আকর্ষণ থাকিবার কথা নয়) সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হওয়াই উচিত, কিন্তু মার্কিন সংবাদপত্রে উহা অতি চতুরতার সহিত দেশের সাধারণ সংবাদের সহিত বেমালুম চালাইয়া দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের যে সকল সংবাদ সমষ্টি স্বার্থের উদ্দেশ্যে নয়, তাহার বিরুদ্ধে সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য ইন্‌ষ্টিটিউট ফর প্রোপাগান্ডা য়্যানালাইসিস" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহারা সময়ে সময়ে বুলেটিন প্রকাশ করে। ঐ বুলেটিন সকল স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে ব্যবহার করা হয়, ক্লাশে আলোচনার জন্য। ১৩ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার গুণে উহারা এই বয়সেই চিনিয়া লইতে পারে সংবাদপত্রের কোন্ সংবাদ ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের উদ্ধারেই মুদ্রিত এবং কোন্ সংবাদ ব্যাপক দেশের ও দশের উদ্দেশ্যে মুদ্রিত।

কলিকাতার ভাবী প্রলয়

"করাচী ডেইলি" পত্রের এডিটর ডাঃ তারাচাঁদ লালবাণী যে কলিকাতার ব্যাপক প্রলয়ের ভবিষ্যৎ বাণী জ্ঞাপন করিয়াছেন, লাহোরের ইসলামিক কলেজের অধ্যাপক মিঃ সৈয়দ আবদুল কাদির সে সম্বন্ধে বলেন—

আমি যতদূর হস্তরেখা আলোচনা দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা হইতে বলিতে পারি এই প্রকার সমগ্রজাতিঘটিত দুর্ঘটনা শুধু কয়েকজনের হস্তরেখা হইতে পূর্ব্বাহ্নে বলা সম্ভব নয়। উহা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের উপরই প্রভাব আরোপ করা যায়—সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর নহে। ডাঃ লালবাণী যে কোয়েটার লোকদের সহিত কলিকাতার লোকেদের হস্তরেখা সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন উহা হয়ত স্থানীয় বিশেষত্ব বা সম্প্রদায় বিশেষের বৈচিত্র্য।

ইংলণ্ডের সর্ব্বাদি ছত্র

১৭৫০ সালে জোনাস হ্যানওয়ে যে ছাতা ব্যবহার করিত, ঐটিকেই ইংলণ্ডের প্রথম ছাতা বলিয়া প্রচার করা হয়। সম্প্রতি উহা নিলামে বিক্রয় করা হইয়াছে।

প্রত্যেক অভিনব পদার্থের আবিষ্কর্ত্তা ও তাহার প্রথম সমর্থনকারীদের প্রতিদেশেই যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। হ্যানওয়ে এবং তাহার দলের লোকদেরও তাই সাধারণের বহু গালিগালাজ ও বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছে যদিও অবশেষে দেশবাসী সেই ছাতাকে অবাধে বরণ করিয়া লইয়াছে।

ছাতা ব্যবহারকারীর বেশীর ভাগ লাঞ্ছনা আসিত ছ্যাকড়াগাড়ীর কোচম্যানদের নিকট হইতে—তাহারা মনে করিত ছাতার রেওয়াজ তাহাদিগকে বেকার করিয়া ফেলিবে।

ফরাসী দেশে কিন্তু ইংলণ্ডেরও বহু পূর্ব্বে ছাতার ব্যবহার চলিতে থাকে। সে কালে বেত বা তিমির হাড়ে ছাতার কাঠামোটি তৈরী হইত—উহার উপর লিয়নস্ সিল্ক দ্বারা মোড়া হইত। কাজেই অভিজাত সম্প্রদায় উহা ব্যবহার করিত। অথচ ছাতার প্রকৃত প্রয়োজন তাহাদের ছিল না কিছুই।

প্রাচ্যদেশেও ছাতার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতে। কিন্তু সেখানেও বড়লোকেরা ভিন্ন অন্য কেহ ব্যবহার করিত না বা করিতে দেওয়া হইত না। কথিত আছে, খৃষ্টজন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এসিরিয়া সম্রাট রথে চড়িয়া ভ্রমণ করিতেন, তখন একজন ছত্রধর ছত্র ধারণ করিয়া দাঁড়াইত সম্রাটের গলদেশ আড়াল করিয়া।

শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের রাজার নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইত—"এবং পূর্ব্ব অঞ্চলের সকল ছত্রপতি (অর্থাৎ ছত্র-ব্যবহারকারী প্রধান) গণের অধীশ্বর"।

সপ্তদশ শতকে শ্যামরাজের মাথার উপর যে ছাতা ধরা হইত, তাহা ছিল তিন থাকওয়ালা। আমীর ওমরাহেরা যে ছাতা ব্যবহার করিত তাহার থাকিত একটি মাত্র থাক ও ঝালর। সাধু-সন্ন্যাসীদের তালপাতার তৈরী ভিন্ন অন্য ছাতা ব্যবহারের অনুমতি ছিল না।

ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে 'সানশেড' সম্বন্ধেই কিছুটা এই নিষেধবিধি রহিয়াছে—যাহা শুধু অভিজাত শ্রেণীর জন্যই নির্দ্দিষ্ট, যেমন র‍্যাসকেট ও হেনলিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ছাতা ব্যবসায়ের প্রথম উন্নতি হয় ১৮৪০ সালে—যখন হল্যাণ্ডে লোহার (Steel) কাঠামো তৈরী হয়। ইহার পর ইংলণ্ডে ১৮৫২ সালে তৈরী হয় 'ঘোড়া-টেপা' কল খুলিবার ও মুড়িয়া রাখিবার সুবিধাকল্পে। এখন অবশ্য কল টিপিয়া খোলার কায়দার ছাতা আর তেমন সমাদর পায় না।

নেপোলিয়নের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন

নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন,—An army cannot march on empty stomach (অর্থাৎ সেনাদল খালিপেটে পথযাত্রা করিতে পারে না)। কিন্তু নেপোলিয়নের এই নিশ্চিত উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে ব্রহ্মদেশের অনশন ধর্ম্মঘটকারী পথচারীর দল। তাহারা অনশনের নীরব পূজারী নয়, সংখ্যায়ও নগণ্য নয়। কমসে কম দুই হাজার অনশন-লিপ্ত ধর্ম্মঘটী তাহাদের অন্যূন দুই সপ্তাহের অনাহারের পরও দুইশত মাইল অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্যে আর প্রাচ্যে যে প্রভেদ তাহা এইখানেই পরিস্ফুট—ঐতিহ্যের বিরাট যে প্রভাবের উত্তরাধিকারী প্রাচ্য, পাশ্চাত্যের সেই সমপর্য্যায়ে পৌঁছাইতে এখনও বহু দেরী, এবং তাহা আদৌ কোনদিন সম্ভব হইবে কি না, ইহাতেও সন্দেহ রহিয়াছে যথেষ্ট।

প্রাণহীন, তবু শুইবে না

গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া মালিকের বাজার-সওদা পাহারা দেয় কুকুরটি—নড়েও না একটু। মিস্ মার্শাল দোকান দোকান হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময় কুকুরটিকেই রাখিয়া যায় প্রহরী। ভয়ে কেহ—এমন কি কোন চোরও আগাইয়া আসে না, কেহ ভরসা পায় না কুকুরটির চোখে ধুলো দিয়া কোন জিনিষ লইয়া বেমালুম সরিয়া পড়িতে। কুকুরটিও

অতিরিক্ত মাত্রায় প্রভুভক্ত, কারণ মালিক যেমন ভাবে রাখিয়া যায় সেও বসিয়াই থাকে তেমনই। কিন্তু চোরেরা ত জানে না যে কুকুরটির বসা ছাড়া অন্য কিছু করিবার ক্ষমতা নাই—সে শুধু প্রাণহীনই নয়, কুকুরের চামড়ায় মোড়া খড়ের গুচ্ছও—কাজেই সে অজানিতে ধোঁকাবাজি করিয়াই চলিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত নাম

আমেরিকার প্রাচীন কালের পেনসনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মার্কিনের সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত নাম হইল 'ই' (E) এবং সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ নাম হইল জেনোগিয়ানোকোপউলোস (Zenogianokopoulos)। তার ইংল্যাণ্ড হইতে প্রাপ্ত নামের ভিতর 'স্মিথ' ই দেখা যায় আমেরিকায় সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

অণু ও তাহার গতি

শ্রীবদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য

বহু পূরাকালে ভারতীয় ও গ্রীস দেশীয় দার্শনিকগণ বস্তু যে অনেক অণু (molecule) দ্বারা গঠিত, তাহা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই চিন্তাধারার কোথায় উৎপত্তি এবং কোন্ যুক্তি দ্বারা ইহা সমর্থিত তাহার কোন আভাষ আমরা তাঁহাদের পুস্তক কিম্বা অন্য কোথাও খুঁজিয়া পাই না। সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া বৈজ্ঞানিকগণ "অণু" বলিতে কি বুঝেন এবং "অণু" সকল জড় পদার্থে কিরূপে অবস্থান করে তাহারই আলোচনা করিব।

জলের ভিতর যখন চিনি ফেলিয়া দেওয়া যায়, তখন উহা ধীরে ধীরে জলের ভিতর গলিয়া যাইতে থাকে এবং কিছুক্ষণের ভিতর আমরা চিনির কোন পৃথক সত্তা দেখিতে পাই না। অবশ্য চিনির পরিমাণ যদি অনেক বেশী হয়, তাহা হইলে সমস্ত চিনি জলে গলিয়া যায় না, কিছুটা জলের ভিতর পড়িয়া থাকিতে দেখা যয়। কিন্তু আমরা সেই জল খাইলে উহা মিষ্টি লাগে। জল গরম করিয়া শুকাইয়া ফেলিলে চিনি পাত্রে পড়িয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, চিনি ও জল মিশ্রিত করিলে, যদিও তাহারা পাশাপাশি থাকে, তথাপি আমরা তাহাদের পৃথক কোন অস্তিত্ব বুঝিতে পারি না, অর্থাৎ মিশ্রিত অংশ হইতে চিনি কিম্বা জলকে পৃথক করিয়া দেখিতে পাই না। যদি পৃথক করিয়াই দেখিতে পারিতাম, তাহা হইলে যে কোন জিনিষের সাহায্যে (চামচে প্রভৃতি) কিছুটা জল চিনি বা চিনি জল হইতে ভিন্ন করিতে পারিতাম।

আমরা গন্ধক ও চিনি যদি একটি পাত্রে সূক্ষ্ম কণা করিয়া মিশ্রিত করি, তাহা হইলে দূর হইতে আমরা চিনি ও গন্ধকের পাশাপাশি অবস্থান বুঝিতে পারি না, কিন্তু কাছে আসিয়া মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারি গন্ধক ও চিনি (হলদে ও শাদা জিনিষ) পাশাপাশি আছে। এইরূপে আমরা ধারণা করিতে পারি যে, চিনি ও জল—গন্ধক ও চিনির অনুরূপ—পাশাপাশি থাকে। অত্যন্ত কাছে গিয়া লক্ষ্য করিলেও, আমরা গন্ধক ও চিনির পাশাপাশি অস্তিত্ব যেরূপ উপলব্ধি করি, আলট্রা মাইক্রোসকোপ দিয়া দেখিলেও চিনি ও জলের মিশ্রণ হইতে তাহার কিছুমাত্র আভাষও পাওয়া যায় না; যদিও আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মিশ্রিত জিনিষে চিনি ও জল আছে।

চিনি ও জলের নিজ নিজ গুণ ও ব্যবহার চিনি ও জল মিশ্রণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ সম্ভবত চিনি ও জলের অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল পাশাপাশি ঠেলাঠেলি করিয়া একত্রিত ভাবে থাকে। এই সকল কণাকে "অণু" বলা হয়। আমরা যে স্থানেই চিনি বা জলের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিব, সেই স্থানেই চিনি বা জলের অণুর অস্তিত্ব রহিবে; যদিও অণুর ছোট আকারের জন্য আমরা চিনির বা জলের অণু পৃথকভাবে দেখিতে পারি না। চিনির অণু সকল একরূপ; জলেরও অণু সকল একরূপ। কিন্তু চিনির অণু জলের অণু হইতে ভিন্ন। জল সাধারণত শক্ত, তরল ও বাষ্পাকারে থাকে, কিন্তু প্রত্যেক অবস্থায়ই জলের অণু একপ্রকার। একটি দালান ভাঙ্গিলে ইটগুলি নিখুঁতভাবে পাওয়া যায় না, কিন্তু বরফ গলাইয়া জল করিলে অণুর কোন-প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। অণু সকল তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। প্রত্যেক খাঁটি পদার্থেরই ভিন্ন ভিন্ন অণু আছে, অথবা এক একটি অণু এক একটি খাঁটি জিনিষকে বুঝায়। বৈজ্ঞানিকগণ অণু কাহাকে বলেন, তাহা আমরা সাধারণভাবে বুঝিতে পারিয়াছি। এখন পদার্থে অণু সকল কিরূপে অবস্থান করে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ধীরে ধীরে জলের উপর "ইথাইল এ্যালকহল" (মদের সারাংশ) ঢালিয়া দিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, কিছুক্ষণের ভিতর জল ও এ্যালকহল চিনি ও জলের ন্যায় মিশিয়া যায়—যদিও জল এ্যালকহল অপেক্ষা ঘন। আবার ইথার ও জল একসঙ্গে রাখিলে উহারা একে অন্যের ভিতর মিশ্রিত না হইয়া দুইটি স্তরে বিভক্ত হয় এবং বিভক্ত করার সীমা রেখা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমরা জলের অংশ হইতে ইথারের সত্তা ও ইথারের অংশ হইতে জলের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি—যদিও যে সীমারেখা জল ও ইথারকে পৃথক করিয়া দেখায়, তাহা একে অন্যের সহিত মিশ্রণ হওয়ার সময়ও বর্ত্তমান থাকে। জল স্পিরিট অপেক্ষা অত্যন্ত ঘন। সুতরাং জলের উপর স্পিরিট ঢালিয়া দিলে জল ও স্পিরিট দুইটি একে অন্য হইতে পৃথক থাকে। কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতর জল স্পিরিটের অংশে এবং স্পিরিট জলের অংশে প্রবেশ করে। এইরূপে জল ও স্পিরিট চিনি ও জলের ন্যায় মিশিয়া যায়। এই সকল আমরা সর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়া থাকি। এখন উহার কারণ অনুসন্ধান করিব। আমরা জানি যে প্রত্যেক খাঁটি জিনিষ এক এক প্রকার অণু দ্বারা গঠিত। যখন জল ও এ্যালকহল মিশিয়া যায়, তখন আমরা অনুমান করিতে পারি যে, জল ও এ্যালকহলের অণু সকল সদাসর্ব্বদা চলাচল করে। এবং এইরূপ দৌড়ান বা চলাচল কালে একটি জল-অণু এ্যালকহল অংশে প্রবেশ করে, কখনও বা এ্যালকহল-অণু দৌড়াইয়া জলের অংশে প্রবেশ করে। এবং এই চলাচলের ফলে একে অন্যের সঙ্গে মিশিয়া যায়। জল ও ইথার স্তরের দুইটির ভিতর যদিও একটি সীমা রেখা থাকে, অণুর নিজের গতি থাকায় সীমারেখা পার হইয়া একে অন্যের ভিতর প্রবেশ করে এবং সেইজন্য আমরা জলের ভিতর ইথার ও ইথারের অংশে জলের সত্তা বুঝিতে পারি, অন্তত মিশ্রণ-কালে অণুর গতি থাকে।

"গ্যাসে" অণু সকল কিরূপে থাকে তাহাই এখন লক্ষ্য করিব। কার্বন-ডায়কসাইড হাইড্রোজেন গ্যাস অপেক্ষা অনেক ঘন বা ভারী। আমরা এই দুইটি গ্যাস দুইটি পৃথক পাত্রে রাখি এবং "প্লেটের" সাহায্যে পাত্রের মুখ বন্ধ করি; তারপর "প্লেট" সহিত হাইড্রোজেন গ্যাস যে পাত্রে আছে তাহা অপর পাত্রের "প্লেটের" উপর চাপিয়া দিই এবং শেষে "প্লেট" দুইটি টানিয়া বাহির করিয়া লওয়ায় এক পাত্রের মুখ

অপর পাত্রের মুখের উপর অবস্থান করিল। কার্ব্বন-ডাইয়কসাইড হাইড্রোজেন গ্যাস অপেক্ষাও অনেক ভারী ও নিম্নে থাকায় আমরা সাধারণত মনে করিব দুইটি গ্যাস পৃথকভাবে থাকিবে ও তাহারা মিশিতে পারে না। কিন্তু অতি অল্প সময়ের ভিতরই প্রমাণ করা যায় যে দুইটি গ্যাস সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছে। একে অন্যের সঙ্গে এরূপ-ভাবে মিশিয়াছে যে, কোন অংশের ঘনত্ব অপর কোন অংশের ঘনত্ব হইতে কম বা বেশী নহে। অর্থাৎ মিশ্রিত গ্যাসটির ঘনত্ব সমস্ত অংশেই একরূপ। ইহার একমাত্র কারণ কার্ব্বন-ডাইয়ক্সাইড ও হাইড্রোজেন অণু সকলের গতি আছে এবং এই গতির জন্য একটি গ্যাস অপরটি অপেক্ষা অত্যন্ত হাল্কা হইলেও সম্পূর্ণভাবে মিশিতে পারে এবং তাহারা মিশ্রিত হইলে সকল অংশের ঘনত্বই সমান। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, তরলপদার্থে ও গ্যাসে পরমাণুর গতি আছে।

আমরা এখন দেখিতেছি যে, কোন দুইটি তরল পদার্থ একত্রিত করিলে, একটির অণু অপরটির ভিতর প্রবেশ করে এবং এইরূপে অনেক সময় উভয় পদার্থেরই সম্পূর্ণ মিশ্রণ হয়। আমরা যদি একটি পাত্রে কিছু জল রাখিয়া তাহার উপর আরও জল ঢালিয়া দিই, তাহা হইলে আমরা মনে করিতে পারি নীচের জল-অণু উপরের জলে এবং উপরের জল-অণু নীচের জলে প্রবেশ করে। জল ও এ্যালকহলে অণুর গতি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি, কারণ দুইটি পদার্থ বিভিন্ন। কিন্তু জলে জল মিশ্রিত করিলে আমরা উহা বুঝিতে পারি না; তাহার কারণ জল হইতে জলকে আমরা পৃথক করিয়া বুঝিতে পারি না এবং অণু আমরা দেখিতে পারি না। সুতরাং অণুর গতি থাকায় যে কোন তরল-পদার্থের প্রত্যেক অংশে অণু সকল বেগে বিচরণ করে। যদি আমরা একটি পাত্রের জলকে অনেকগুলি পাতলা স্তরে ভাগ করি, তাহা হইলে আমরা লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি যে প্রত্যেক স্তরের অণু অন্য স্তরে বিচরণ করে। কাজেই বাহ্যত একটি পাত্রের জলকে আমরা স্থির বা গতিহীন দেখিতে পাইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা স্থির নহে। ঐ জলের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হইতে অণু সকল কখন ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়, কখনও বা ফিরিয়া আসে। কিন্তু বাহ্যত এই সকল বেগবান অণুর জন্য জলের ঘনত্ব কোন অংশে কম বা বেশী হয় না। আবার অণুর গতি জল বা এ্যালকহল প্রভৃতি তরল পদার্থ বা কোন প্রকার গ্যাসের গুণ বা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না। এই গতি কেবলমাত্র পদার্থের তাপের উপর নির্ভর করে।

আমরা সদা সর্ব্বদা যাহা ঘটে তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি এবং এই সমস্ত ঘটনা হইতে বিচার করিয়া অণুর গতি বুঝিতে পারিয়াছি। অণুর গতি আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে না পাইলেও পরোক্ষভাবে অতি চমৎকাররূপে দেখিতে পারি। আমরা জলে একখণ্ড ইট বা যে কোন ভারী জিনিষ নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই তাহা ধীরে ধীরে মাধ্যাকর্ষণের জন্য নীচে চলিয়া যায় এবং জলের শেষ স্তরে অবস্থান করে। আমরা জানি অণুর গতি আছে; সুতরাং অণু সকল যখন চলাচল করে তখন নিশ্চয়ই নিম্নগামী শক্ত জিনিষের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয়, কিন্তু জিনিষটা ভারী হওয়ায় নীচে অবস্থান করে। অণু সকল অত্যন্ত ছোট এবং তাহাদের আকার কল্পনা করা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর হয়, সেই জন্য অণুর অনুপাতে যদি আমরা একটি শক্ত জিনিষের কণা জলের ভিতর নিক্ষেপ করি তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি যে, কণাটি নিম্নগামী না হইয়া চারিধারে ছুটাছুটি করিবে। কারণ সদাসর্ব্বদা কণাটির অণুর সহিত সংঘর্ষ হইবে এবং কণাটিকে নানাদিক হইতে অণু সকল ধাক্কা দিতে থাকিবে।

বস্তুত ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন নামক স্কটল্যাণ্ড-বাসী এক উদ্ভিদশাস্ত্রে পারদর্শী বৈজ্ঞানিক প্রথম ইহা (তরল পদার্থে কণার ছুটাছুটি) লক্ষ্য করেন। তিনি সূক্ষ্ম কণা জলের বা অন্য তরল পদার্থে নিক্ষেপ করেন এবং একটি অণু-বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সেই কণাটি লক্ষ্য করেন। তিনি দেখিয়া-ছিলেন যে, কণাটি চারিধারে পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু তিনি কণার এই ছুটাছুটির কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডবাসী র‍্যামজে ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশবাসী গয়ে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বলেন যে, তরল পদার্থের (যাহাতে কণাটি নিক্ষেপ করা হয়) অণু সকল নানা দিক হইতে কণাটিকে ধাক্কা দেওয়ার ফলে কণাটি পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করে। গয়ে আরও বলেন যে, কণা বিভিন্ন বস্তু হইতে পছন্দ করিয়া তরল পদার্থে নিক্ষেপ করিলে উহার ছুটাছুটির কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু কণাটি ছোট বা বড় হইলে উহার ছুটাছুটি সেই অনুপাতে তাড়াতাড়ি বা ধীরে হয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য —কণাটির ছুটাছুটির কখনও বিরাম নাই এবং এই ছুটাছুটি অনন্তকাল ধরিয়াও চলিতে পারে—অবশ্য আমরা যদি কণাটিকেও অনন্তকাল ধরিয়া তরল পদার্থে রাখিয়া দিই। কণার নিয়মহীন ছুটাছুটি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তরল পদার্থের অণু সকলও নিয়মহীনভাবে বেগে চলাচল করে। কণার এই ছুটাছুটি ব্রাউন প্রথমে লক্ষ্য করেন; সেই জন্য ইহাকে 'ব্রাউনিয়ন মুভমেণ্ট' 'ব্রাউনের ছুটাছুটি' বলা হয়।

'রক্ত করবীর' কথা

আপনারা এখানে আজ 'রক্ত করবী'র অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছেন। 'রক্ত করবী' আমি যেমন বুঝিয়াছি, সেইভাবেই গোটা কতক কথা আমি বলিতে পারি এবং সে বলা, ভাঙ্গিয়া বলা চলে না,—সংক্ষেপে এবং সূত্রাকারে বলিতে হয়। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া আপনাদিগকে বুঝাইবার শক্তিও আমার নাই, সময়েরও অভাব।

আমি যে কথাটি আপনাদিগকে আজ বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছি তাহা এই যে, আমরা নিজেদের হীন স্বার্থবুদ্ধি লইয়া, কামোপভোগের প্রবৃত্তি লইয়া যখনই জগৎটাকে বিচার করিতে চাই, তখনই জগতের যাহা স্বরূপ তাহা আমাদের নিকট হইতে সরিয়া পড়ে, জগতের মধ্যে নানা উপাধি ব্যাধির আকারে গড়িয়া উঠে। তাহার ফলে আমাদের চিত্তের হয় বিকার, আমরা আর সহজ অবস্থায় থাকি না। এই যে লোভোপহত চিত্তের বিকারগ্রস্ত অবস্থা, ইহাতে আর যাহাই আমরা পাই না কেন, আনন্দ আমরা পাই না। কারণ, সচ্চিদানন্দ যিনি তাহা হইতে আমি এবং তাহা হইতেই এই জগৎ এবং এই আনন্দ; যে প্রকৃতির সঙ্গে আমার যোগ, তাহাতেই আমার জীবন। প্রকৃতির সঙ্গে যে বিরোধ আমরা সৃষ্টি করি, সে বিরোধে আমি তুষ্ট থাকিতে পারি না, পরে প্রকৃত আনন্দের পিপাসা যখন আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে তখন বিরোধের মূলীভূত বিষয়ের যেগুলি ভোগায়তন, আমাকে নিজের হইতেই সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় এবং তাহাতেই আমি পাই মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটিই 'রক্ত করবী'র ভিতর দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তাধারার বিকাশের পটভূমিতে ভারতীয় ঋষিদের উপনিষদ্ যে ব্রহ্মানন্দানুভূতি তাহা কাজ করিয়াছে এবং বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে বৈষ্ণব দর্শনের রসতত্ত্ব এবং লীলাতত্ত্ব। বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি আগে বুঝা দরকার। যিনি আনন্দময়, যিনি সুন্দর, তিনি আমাকে চাহেন, এইজন্যই তিনি রঞ্জন, আর এই যে বিশ্বপ্রকৃতি ইহাও তাঁহাকেই চাহেন এবং তাহার রসস্পর্শেই নন্দিত হইয়া উঠে, তাই প্রকৃতি 'নন্দিনী,' বৈষ্ণবের কথায় হ্লাদিনী—

'রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার।
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।'

মানব-প্রকৃতি বসন্তের ভিতর দিয়া তাঁহার খবর পায়, তাঁহার বার্ত্তা পায় আকাশের রঙে বাতাসের লীলায়। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

'তোমার সঙ্গে মিলন হ'লে সকলই যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলিয়ে তখন উঠে দুলে'।

প্রকৃতির স্বভাবই হইল 'পথ-চাওয়া' এই পথ-চাওয়াতেই তাহার আনন্দ। পথ-চাওয়ার রাস্তার মধ্যে রহিয়াছে স্মৃতি, রসস্বরূপ যিনি, যাঁহার সহিত আমার ঐকান্তিক সম্বন্ধ, তাঁহারই স্মৃতি। আমাদের যত আনন্দ এই স্মৃতির ভিতর দিয়া—যাহা চেনা আছে তাঁর সঙ্গে মিলাইয়া। যে জিনিষ চেনা ছিল, নিজের ছিল, তাহার সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াই আমরা সব বস্তুকে জানি বা বুঝি এবং উপভোগ করি অর্থাৎ আপনার করিয়া লই। পরকে আপনার করিতে পারি না, করি না। যে আপনার তাহাকেই পুনরায় আপনার করিয়া লই। আনন্দের মূলে হইল সেখানে। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—মনের স্মরণ প্রাণ,—'মধুর মধুর ধাম, বিলাস-যুগল স্মৃতি-সার।' তখন কানায় কানায় কানাকানি এই পারে, ঐ পারে। প্রকৃতি যেমন তাঁহার স্মৃতিকে সম্বল করিয়া বিষয়-বস্তুকে চাখিয়া চাখিয়া আগাইয়া চলিয়াছে, তেমনই যিনি পরম পুরুষ তিনিও প্রকৃতিকে চাহিতেছেন। তিনি এই মিলনের রস আস্বাদন করিবার দায়ে আপনাকে বলি করিয়া দিতেছেন, উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন, সর্গ এবং বিসর্গের মধ্যে মিলাইয়া দিতেছেন। তাই পুরুষসূক্ত বলিয়াছেন,—'দেবগণ পুরুষকেই হবি করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন বসন্ত হইয়াছিল তাহার আজ্য, গ্রীষ্ম হইয়াছিল ইন্ধন, আর শরৎ হইয়াছিল হবি। সেই পুরুষ যজ্ঞের পশু হইয়াছিলেন প্রেমের দায়ে, প্রতিষ্ঠার জন্যই এই বলি। তিনি জীবনস্বরূপ তাই এমন ভাবেই তাঁহার বাঁচা। খৃষ্টধর্ম্ম যীশুর আত্ম-বলিদানের ভিতর দিয়া এই তত্ত্বটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ খেলা রঞ্জনের পক্ষে যেমন সত্য, নন্দিনীর পক্ষেও তেমনি সত্য। রঞ্জন এবং নন্দিনীর এই খেলা প্রেমের খেলা, আনন্দের লীলা। মরণ আমাদের পক্ষে ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ বাঁধন। বাঁধনকে ভাঙ্গিয়াই জীবনকে লাভ করিতে হয়, সে বাঁধন ভাঙ্গিবার উপায় এবং পথ কি কবি দেখাইয়াছেন!

সে পথ হইল যাদুর পথ, জোরের পথ নয়। যেখানে আনন্দের লোক সেখানে জোর নাই, আছে শুধু যাদু। এই সত্যটি শুধু আমাদের ঋষিরা কিম্বা বৈষ্ণবাচার্য্যগণই যে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, পাশ্চাত্যের আধুনিক যাঁহারা জড়-বৈজ্ঞানিক, তাঁহারাও এই জগতে সেই যাদুর প্রভাবেরই পরিচয় পাইতেছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিংটন লিখিয়াছেন,—

"In mystic mood we catch the true relation of the world to ourselves not hinted at purely scientific analysis of the content."

আইনষ্টাইন লিখিতেছেন,—

"The fairest thing we can experience is the mysterious knowledge of something we can not penetrate, of manifestation of the profoundest reason and the most radiant beauty."

যেখানে আমরা আপনাকে গুটাইয়া শুধু সংকীর্ণ স্বার্থের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করি এবং সেইভাবে গুটিপোকার মত বাসনার জালের মধ্যে বন্ধ হইয়া কৃত্রিম একটা পরস্বকে সৃষ্টি করি, বিরোধ গড়িয়া তুলি, তখনই জোরের দরকার হয় ভোগের জন্য। এই পর গড়িবার প্রক্রিয়ার নানা রূপ সমাজে এবং রাষ্ট্রে ফুটিয়া উঠিতেছে। কখনও রাজার নামে, কখনও ধনতান্ত্রিকতায় কখনও ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া, কখনও বা পাণ্ডিত্যের পরিচ্ছদ

পরিয়া। কবি তাঁহার লিপিচাতুর্যে এ গুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। দ্বন্দ্বটা দেখাইয়াছেন। মানুষের মনের ভিতরকার দোটানার যে অবস্থা, একটা তাহাকে তাহার সহজ সত্তা আনন্দের দিকে টানিতেছে, অপরটি স্বার্থে সূত্রে পাকাইয়া টানিতেছে ওধারে। কিন্তু ফাঁকিতে শূন্য ভরিয়া উঠে না। নিজকে তৃপ্ত, তুষ্ট করিতে হইলে যে জিনিষ বাস্তবিক প্রয়োজন, জোরের দ্বারা বিধাতার দান সেই আনন্দকে আদায় করা যায় না। 'যে-দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মত আঙ্গুলটি যতটুকু পৌঁছায়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না।'

জোর আসুরিক বৃত্তি। আধুনিক যন্ত্রবলোপেত স্পর্দ্ধিত আসুরিক শক্তির যে রাক্ষসী লীলা—আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়, এই যে আস্ফালন জগৎ-জোড়া চলিতেছে, আমি দিব, আমি খাওয়াইব, আমি তোমাদিগকে যন্ত্রের মত চালাইব—এই যে স্পর্দ্ধা মাথা তুলিয়া ফিরিতেছে, চাহিতেছে জগৎকে চূর্ণ করিতে এবং জগতের রস, রক্ত নিঙড়াইয়া আপনার পিপাসাকে পূর্ণ করিতে—সোনার মোহে মানুষের উপর মানুষের পীড়ন কিরূপ নিষ্ঠুর হইয়া উঠে, কবি আবেগময়ী ভাষায় তাহা দেখাইয়াছেন। 'চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুরকে মারে। যে রশিতে এই চাবুক তৈরী সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইদের জপমালা তৈরী।' দুইয়ে যোগ দিয়া শোষণ এবং পীড়ন চলিতেছে।' এই পীড়নে "শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্য্যন্ত শুষে নেয়।" —কবি দেখাইয়াছেন, ইহার নিজের ভারেই সে একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কারণ মানুষ ষোল-আনা রাক্ষস বা অসুর হইতে পারে না, তাহার স্বভাব—যে স্বভাব মুক্তির আনন্দময় সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, সে একদিন সাড়া দিবেই। মানুষ চায় যে আনন্দ, যে রস, যাহা তাহার প্রকৃতিগত, জোর জবরদস্তির পথে সে তাহা পাইবে না। সে জিনিষ পাওয়া যায় অপরকে পর করিয়া নহে—আপনার করিয়া, পাওয়া যায় সামঞ্জস্যের পথে, বিরোধের পথে নয়। বিরোধের মধ্য দিয়া সে নিজেকে যে বন্ধনের মধ্যে ফেলিতেছে, সেই বন্ধনের পীড়নে সে একদিন হাঁফাইয়া উঠিবে এবং রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া আত্মস্বার্থের প্রাকারকে নিজেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। শুধু টিকে থাকার মধ্যে, শুধু নিরাপত্তা খোঁজার মধ্যে যে অসহায়ত্ব, সে অসহায়ত্ব একদিন তাহাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিবে, সেদিন সে বিশ্বের আত্মার আনন্দাংশের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিবে, অমৃতত্বের সন্ধান পাইবে। সে সেদিন বলিবে,—"আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধ'রে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।" মানুষ যখন নিজের আনন্দসত্তার সন্ধান পায়, সে রসের স্পর্শে নাচিয়া উঠে। তখন যাদুর জোর জমিয়া উঠিতে থাকে। জ্বলন্ত মূর্ত্তি ধরিয়া এমন কি প্রলয়ের দীপশিখায় প্রকৃত জীবনের গতি ছুটে তখন। তখন সে বলে 'নিজেকে টিকাইয়া থাকার জন্য যে বন্দীশালা আমি গড়িয়াছিলাম, সে বন্দীশালা ভাঙার পথে আমিও চলিয়াছি।' সে তখন পায় নিত্য জীবনের সন্ধান এবং তাহার জোরে বলিতে পারে,—"মরতে তো পারবো, এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি, আমি বেঁচেছি।" আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-পিপাসায় উন্মত্ত জগতের কাছে কবি ভারতের ঋষিদের সাধনা-সম্পদকেই আন্তরিকতার রক্তরাগ মাখাইয়া 'রক্ত করবী'র মঞ্জরীতে অর্ঘ্য দিয়াছেন।*

পুস্তক পরিচয়

উত্তরপাড়া অভিভাষণ শ্রীঅরবিন্দ। অনুবাদক—শ্রীঅনিলবরণ রায়। আর্য্য পাবলিশিং হাউস। ৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাড়া অভিভাষণের পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার সম্পর্কে এক বৎসরকাল বন্দী থাকিবার পর ১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ উত্তরপাড়ার "ধর্ম্মরক্ষিণী" বার্ষিক সভায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন সেই বক্তৃতাকে বাঙলা দেশের নব জাতীয়তাবাদের তত্ত্বরূপ বলা যাইতে পারে। ঐ বক্তৃতা বাঙলা দেশে নব জাতীয়তার একটা দীপক তাণ্ডব ছড়াইয়া দিয়াছিল। এ বক্তৃতাটি প্রদত্ত হইয়াছিল ইংরেজী ভাষায়; এতদিন পর্য্যন্তও এই ঐতিহাসিক বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ হয় নাই। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় বক্তৃতাটিকে অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী লেখার অনুবাদে রায় মহাশয় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার এই অনুবাদে মূলের দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা ষোল আনা বজায় আছে। এই অনুবাদ পড়িয়া বুঝিবার উপায় নাই যে ইহা অনুবাদ। মূলের অভিব্যক্তির ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত অনুবাদের ভিতর দিয়া ধরা দিতেছে। লেখার অনুবাদ হইতে বক্তৃতার অনুবাদে এই পার্থক্য। অনিলবরণবাবুর হাত পাকা বলিয়াই এ জিনিষটি বজায় থাকা সম্ভব হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এমন অনুবাদ আমরা খুব কমই পড়িয়াছি। যাঁহারা উত্তরপাড়ার অভিভাষণ পড়িতে পারেন নাই ইংরেজী বলিয়া, তাঁহারা এই অনুবাদ পাঠ করুন, বাঙলার জাতীয়তাবাদের স্বরূপ-শক্তি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। যাঁহারা ইংরেজী অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই অনুবাদ পাঠ করুন, অনুবাদ কত সুন্দর হইতে পারে, বুঝিতে পারিবেন। এই অনুবাদের মধ্যে নূতন একটা রস পাইবেন এবং সেইটুকুই অনুবাদকের নিজস্ব।

সাহিত্য-সংবাদ

চিত্রে ও লেখায় পুরস্কার

৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা "দেশে" ঘোষিত চিত্রে ও লেখায় পুরস্কার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন পাইয়াছি, এই জন্য জানাইতেছি যে, সর্ব্বপ্রকার চিত্র, কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধই আমাদের প্রতিযোগিতার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে। পুরস্কৃত লেখা ও চিত্রগুলি ব্যতীতও অবশিষ্ট উপযুক্ত লেখা ও চিত্রগুলি আমাদের "সচিত্র পথিকে" প্রকাশ করা হইবে। বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা চিত্রকর বা লেখকবৃন্দ উক্ত 'পথিক' পড়িবার নিমিত্ত পাইবেন। প্রবন্ধাদি সারা বৎসরেই পাঠান চলিবে—কারণ, বৎসরে চারিবার করিয়া উক্ত পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদিগের জন্য একটি পৃথক পুরস্কার দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিত্রাদি পাঠান। শ্রীরমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক, "প্রবাসী সাহিত্য সংসদ," নগেনগঞ্জ; পোঃ অঃ—বোকাজান; আপার আসাম। অথবা—শ্রীজীবনকৃষ্ণ মণ্ডল—সহ-সম্পাদক, পোঃ অঃ—ডিমাপুর; আঃ আসাম।

"তরুণ-যাত্রী" রচনা প্রতিযোগিতা

বিষয়ঃ—(১) হাল বাঙলার ছাত্র-ছাত্রীদের মনোভাব; (২) হস্তলিখিত পত্রিকা; (৩) ছোট গল্প।

উল্লিখিত যে-কোন বিষয়ে যে-কেহ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। রচনা বাঙলা ভাষায় বোধগম্য অক্ষরে ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতব্য। কোন রচনাই আট পৃষ্ঠার অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। প্রত্যেক রচনার সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম-ঠিকানা যুক্ত হওয়া চাই। রুচি-সঙ্গত নহে এমন লেখা বাতিল করা হইবে। প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কৃত করা হইবে।

বিশেষ পুরস্কারঃ—১ম বিষয়ে—ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগীদের মধ্যে; ২য় বিষয়ে—হস্তলিখিত পত্রিকা সংশ্লিষ্ট যে-কোন লেখককে।

(বিশেষ পুরস্কার প্রত্যাশিগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলির নাম-ঠিকানা দিবেন।)

রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৫শে ফেব্রুয়ারী; নিম্ন-লিখিত যে-কোন ঠিকানায় প্রেরিতব্যঃ—(ক) সম্পাদক—বিশ্ববন্ধু ছাত্র-সঙ্ঘ; ২৪৬, রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া। (খ) সহ-সম্পাদক—"তরুণ-যাত্রী"; ৩৫, জোলাপাড়া লেন, হাওড়া।

প্রবন্ধ ও ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

ঢাকার 'সাহিত্য সংসদ' হইতে আমরা একটি প্রবন্ধ ও একটি ছোট গল্প প্রতিযোগিতার আহ্বান করিতেছি। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিতে পারিবেন। প্রত্যেক বিষয়ের শ্রেষ্ঠ লেখককে একটি করিয়া রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। রচনা ইংরেজী ১৯৩৯ সালের ১১ই মার্চ্চের পর আর গৃহীত হইবে না। কোন প্রবেশ-মূল্য নাই। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবে। কোন অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত টিকিট প্রয়োজন। সংসদের বিচারকমণ্ডলীর মীমাংসাই চূড়ান্ত।

ধর্ম্মমূলক যে কোন প্রবন্ধ এবং লেখকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ছোট গল্প হইলেই চলিবে। রচনাদি পাঠাইবার ঠিকানা। শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, ২নং ঢাকেশ্বরী মিলস, পোঃ—লক্ষ্মীনারায়ণ মিলস; জিলা ঢাকা।

রচনা প্রতিযোগিতা

কাঁঠালগাড়িয়া "সবুজ-চক্রের" উদ্যোগে গত আশ্বিন হইতে একটি হাতেলেখা মাসিক পত্রিকা (তরুণ) প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত পত্রিকার পরিচালকবর্গ একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছেন। গল্পটি সামাজিক হইবে এবং ফুলস্কেপ সাইজের ৫ পৃষ্ঠার বেশী বা ৪ পৃষ্ঠার কম হইলে চলিবে না। গল্পটি ৩০শে মাঘ ১৩৪৫ সালের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবেশ মূল্য নাই।

শ্রীব্রহ্ম চৌধুরী, সম্পাদক, 'সবুজচক্র', কাঁঠালগাড়িয়া, ভাস্তাড়া পোঃ আঃ (হুগলী)।

কবিতা প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ১০ই অগ্রহায়ণ নির্ঝরিণীর সাহিত্য সংসদের পক্ষ হইতে 'দেশ' পত্রিকায় যে কবিতা প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) প্রথম স্থানঃ—"তোমরা ও আমরা"। লেখক—শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (মডেল হাই স্কুল—ভবানী-পুর)। (২) দ্বিতীয় স্থানঃ—"গিয়ালশালের বন"। লেখিকা—কুমারী শিবানী সরকার (বিদ্যাসাগর কলেজ)।

আগামী অধিবেশনে উভয়কে রৌপ্যপদক দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে। ইতি—শচীন্দ্রনাথ সেন, সাধারণ সম্পাদক (অস্থায়ী)।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

নিখিল-বঙ্গ সাধনা মন্দির আশ্রমের উদ্যোগে কবি নিমাইরতন স্মৃতি-দিবস উপলক্ষে যে কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্তা শিবানী সরকারের "পূর্ণতা" শীর্ষক কবিতাটি সর্ব্বোত্তম বিবেচিত হওয়ায় তাঁহাকেই পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া স্মৃতি-সমিতির সভায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

শ্রীসত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক।

শিবপুর বাণী বাসর

বিগত ১১ই মাঘ, বুধবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শিবপুর বাণী বাসরের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন শ্রীপঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়। উক্ত সভায় সুকবি গিরিজাকুমার বসু মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সভা প্রারম্ভে শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় একটি কবিতা ও শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ও পরে কতিপয় স্থানীয় যুবক তাঁহাদের লেখা পড়েন। পরিশেষে শ্রীব্রজলাল চট্টোপাধ্যায় 'লেখক-সঙ্ঘ' সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রদ্ধেয় অতিথি মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতায় নবীন সাহিত্যিকদের উপদেশ প্রদান করেন।

"অধিকার" ও "জনকনন্দিনী"

গত ২১শে জানুয়ারী হইতে চিত্রায় "অধিকার" ও রূপবাণীতে "জনক নন্দিনী" ছবি দেখান হইতেছে। নিউ-থিয়েটার্স "অধিকার" ছবি তুলিয়াছেন; "জনক নন্দিনী" ছবি তুলিয়াছেন রাধা ফিল্ম। পৃথক পৃথক ভাবে এই ছবি দুইখানি সম্বন্ধে না লিখিয়া আমরা সাধারণভাবে এই ছবি দুইখানি সম্বন্ধে এইখানে একটু আলোচনা করিব।

"অধিকার" ছবি দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র ক্রমশ উন্নতির পথে চলিতেছে কিন্তু "জনক নন্দিনী" ছবি দেখিলে ঠিক তাহার বিপরীত বলিয়া মনে হয়। এ দেশে ছবি যে কতদূর নিকৃষ্ট হইতে পারে জনক নন্দিনী ছবি তাহার প্রমাণ। "অধিকার" ছবির মধ্যে আছে একটা ভাল কিছু, একটা নূতন কিছু করার চেষ্টা আর "জনক নন্দিনী" ছবির মধ্যে আছে পৌরাণিক কাহিনীর দোহাই দিয়া সাধারণকে ভুলাইবার জন্য বীভৎস রুচির আমদানী করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা। চিত্র-শিল্পের গোড়ার দিকে এমন একটা যুগ ছিল যখন দেবদেবীর নামে ছবি তুলিয়া বহু চিত্র-নির্ম্মাতা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিত। কিছুদিন পর্য্যন্ত এইভাবে ভালই চলিয়াছিল; কেন না বাঙালী দর্শকগণ বিশেষত মহিলাগণ দেবদেবীর ছবির নাম শুনিয়াই তাহা দেখিতে যাইতেন। কালক্রমে এই ফাঁকি যখন তাঁহাদের চোখে ধরা পড়িল, যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, লোক ভুলাইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য এই সমস্ত চিত্র-নির্ম্মাতা দেবদেবীর নামে যথেচ্ছাচার চালাইতেছেন এবং বীভৎসতার আমদানী করিতেছেন তখন হইতে তাঁহারা সাবধান হইয়া গেলেন। অবশ্য ইহার অন্য কারণও আছে এবং তাহা হইতেছে দর্শকদের চিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান। তাঁহারা ছবির ভালমন্দ বুঝিতে শিখিলেন এবং চলচ্চিত্রের মধ্যে নূতন সৃষ্টির, নূতন জিনিষের, সুরুচির সন্ধান করিতে লাগিলেন। চিত্রায় "অধিকার" ছবিখানি সেই দিকের সন্ধান দিয়াছে; তাই "অধিকার" সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

"জনক নন্দিনী" ছবির মধ্যে আমরা রাম, সীতা, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, মহাদেব, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মা, গৌতম প্রভৃতি দেবদেবীর পরিচয় পাই। বাঙলার প্রত্যেক হিন্দু নর-নারীর হৃদয়ে এই সমস্ত দেবদেবীর আসন যে কত উচ্চে, কত পবিত্রতার সহিত তাঁহারা এই সমস্ত দেবদেবীর কথা স্মরণ করেন, তাহা যদি রাধা ফিল্ম কোম্পানী একবারও ভাবিতেন তবে কখনও এইরূপ বিকৃতভাবে সেই সমস্ত দেবদেবীকে চিত্রিত করার চেষ্টা করিতেন না? "জনক নন্দিনী" চিত্রে চিত্রিত দেবদেবীকে দেখিলে কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না যে, তাঁহারা ছিলেন দেবদেবী। আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ নারীর যে পরিচয় আমরা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে পাই তাহার কোন লেশই চিত্রে পাওয়া যায় না। চিত্রের রূপকে দেখিলে মনে হয় সে অসাধারণ পুরুষ একেবারেই নয়; যাহা সে জানিত তাহা হইতেছে black art. ছবির সীতার চালচলন ও 'চক্ষু সঞ্চালন' বিকৃত রুচির পরিচায়ক মাত্র। অন্যান্য দেবদেবীর চিত্রমূর্ত্তি সম্বন্ধে আর না লেখাই ভাল। ধর্ম্মের ও দেবদেবীর উপর যথেচ্ছাচার চালাইয়া যে অর্থোপার্জ্জন করা চলিবে না, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে এবং যদি রাধা ফিল্ম মনে করিয়া থাকেন যে, এই ছবি দেখার জন্য বাঙলার নর-নারী ছুটিয়া আসিবে তবে তাঁহারা নিতান্ত ভুল করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই মনে করা যে কত বড় ভুল, তাহা গত দুই সপ্তাহের মধ্যেই আমরা দেখিয়াছি।

নিউ থিয়েটার্সের 'অধিকার' চিত্রে চিত্রলেখা ও যমুনা। চিত্রায় দেখান হইতেছে

শান্তিনিকেতনের নৃত্যাভিনয়

বাঙলা রঙ্গমঞ্চে গীতিনাট্যের প্রচলন বহুদিন হইতেই আছে, কিন্তু নৃত্যনাট্যের প্রবর্ত্তন করেন রবীন্দ্রনাথ। গীতি-নাট্যে ও নৃত্যনাট্যে যে পার্থক্য, তাহা অনভ্যস্ত দর্শকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে। গীতিনাট্যে নাটকের আখ্যানবস্তু পাত্রপাত্রীর গানের সহায়তায় পরিণতির মুখে অগ্রসর হয়; নৃত্য তাহাতে থাকিতে পারে—তাহা গীতের

আনুষঙ্গিক মাত্র, কিন্তু নৃত্যনাট্যে অভিনয় সর্ব্বত্র মূক। নায়ক-নায়িকার দেহ-ভঙ্গিমা ও বিচিত্র অঙ্গ-বিন্যাসের সাহায্যেই নাটকের গল্পাংশকে রূপায়িত করা হয়—আনুষঙ্গিক রূপে আবেষ্টনী হইতে গল্পের সূত্রটি ধরাইয়া দিবার জন্য গান যোগান দেওয়া হইতে থাকে। সুতরাং গীতিনাট্যের

রবীন্দ্রনাথের নূতন নৃত্য-নাট্য শ্যামার একটি অভিব্যক্তি

আবেদন সাঙ্গীতিক, আর নৃত্যনাট্যের আবেদন নৃত্যমূলক। সুতরাং নৃত্যনাট্যের সাফল্য যে অধিকতর আয়াসসাধ্য এবং বিশেষত্বপূর্ণ তাহা বলাই বাহুল্য। এই নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙলা অভিনয় শিল্পকে একটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত করিয়াছেন।

একদা বাঙলায় সুলভ দেহলীলাকেই নৃত্য বলিয়া মনে করা হইত। কলাসম্মত নৃত্যের প্রচলন করিয়া শান্তি-নিকেতনই প্রথম দেশকে নূতনতর রসাস্বাদের সুযোগ দেন। মুদ্রা-বহুল দাক্ষিণী নৃত্য, ব্যঞ্জনাবহুল মণিপুরী নৃত্য এবং উল্লাসবহুল গ্রাম্য কান্তি নৃত্য, একত্র মিশাইয়া শান্তিনিকেতনে একটি যৌগিক নৃত্যাদর্শ গঠন করিয়াছেন। অভিনয়ের কঠোর, করুণ ও কৌতুককর অংশগুলি পরিস্ফুট করিতে এই ত্রিবিধ আদর্শই যে বিশেষ উপযোগী তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। "চিত্রাঙ্গদা" বা "চণ্ডালিকা"র অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আদর্শের সহিত প্রবৃত্তির ও ভাবের সহিত রুচির দ্বন্দ্ব বুঝাইতে এই বিভিন্ন পদ্ধতি কত বেশী সহায়ক হইয়াছে। সমর গৌরব লোভী অর্জ্জুনের বা নির্ব্বাণকামী বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের চারিত্রিক দৃঢ়তা দাক্ষিণী নৃত্যে অপরূপ ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে, আবার ভাবোন্মাদ চিত্রাঙ্গদার বা চণ্ডালিকার অনুরাগ-ব্যাকুল কারুণ্য মণিপুরী নৃত্যেই মনোজ্ঞ রূপলাভ করিয়াছে। আখ্যায়িকার কঠোর ও মধুর দুইটি দিক দুই প্রণালীর নৃত্যের ভিতর দিয়াই প্রকটিত হইয়াছে। নূতন নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'য় এই প্রত্যাশিত ধারারই উন্মত্ততার বিকাশ দেখা যাইবে। 'কথা ও কাহিনী'র প্রসিদ্ধ পরিশোধ কবিতার আখ্যানাংশ হইতে শ্যামা নাটিকার উদ্ভব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুল কবিতাটিতে নূতন নূতন নৃত্য প্রবর্ত্তনের অবসর আরও অধিক তাই সম্ভবতঃ কবি এই কাহিনীটিকে নাট্যবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

কবির সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গনাটিকা "তাসের দেশ" রচনার দিক হইতে একটু স্বতন্ত্র ধরণের, কিন্তু তাহার অভিনয় রীতি একই আদর্শের অনুগামী। তাহার গান, নৃত্য এবং আবেষ্টনী সৃষ্টি পূর্ব্বোক্ত নৃত্যনাট্যগুলিরই ন্যায় মনোজ্ঞ হইবে বলিয়া

রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" নৃত্য নাট্যে 'হৃদয়'-ভূমিকা

আমরা মনে করি। যাঁহারা সুগভীর নৃত্য-ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়া কৌতুক রসের খেলা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা এই নাটিকার অভিনয় নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

'শ্যামা' এবং 'তাসের খেলা' কবির নৃত্যনাট্য পর্য্যায়ের নবীনতম অবদান। এইজন্য ইহাদিগের সাফল্য আমরা কৌতূহলের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।

মুষ্টিযুদ্ধে জো লুইর সাফল্য

গত ২৬শে জানুয়ারী নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন গার্ডেন স্কোয়ারে নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই, তরুণ নবাগত নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জন হেনরী লুইসকে প্রথম রাউণ্ডে "টেকনিক্যাল নক আউটে" পরাজিত করিয়া স্বীয় বিশ্ববিজয়ী আখ্যা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। পৃথিবীর মুষ্টিযুদ্ধ ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে দুইজন নিগ্রো মুষ্টি-যোদ্ধাকে হেভীওয়েট বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেখা যায় নাই। সেইজন্য এই মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবস্থা হইলেই পৃথিবীর সকল ক্রীড়ামোদীই ইহার ফলাফল দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া-ছিলেন। জো লুই জয়ী হইবেন, ইহা অনেকেই ধারণা করিয়া-ছিলেন, কিন্তু প্রথম রাউণ্ডেই যে এই প্রতিযোগিতার অবসান হইবে, ইহা সকলেরই কল্পনাতীত ছিল। বিশেষ করিয়া হেনরী লুইসের সমর্থনকারী সংবাদপত্রসমূহের প্রচারকার্য্যও ইহার জন্য অনেকখানি দায়ী। এমন কি, অনেকগুলি সংবাদপত্র হেনরী লুই বিজয়ী হইবেন বলিয়া মতামত প্রকাশ করেন। এই সকল সংবাদপত্রের প্রতিবাদ জো লুই কোনদিনই করেন নাই। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ পীড়াপীড়ি করিলে কেবল বলিতেন, "প্রতিযোগিতা যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়, তাহার চেষ্টা করিব।" জো-লুইর সেই উক্তির সত্যতা বর্ত্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে। দুই মিনিট ২৯ সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রতিযোগিতার অবসান হয়। রেফারী হেনরী লুইসের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া জো লুইকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

প্রতিযোগিতার বিবরণ

প্রতিযোগিতার সূচনায় উভয় মুষ্টিযোদ্ধাকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। হঠাৎ হেনরী লুইস সুযোগ পাইয়া জো লুইকে আঘাত করেন। এই আঘাতই জো লুইকে উত্তেজিত করে। তিনি বামহস্তে হেনরীর চোয়ালে আঘাত করেন। ঠিক তাহার পরেই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ চোয়ালে প্রচণ্ড আঘাত করে। এই প্রচণ্ড আঘাত হেনরী সহ্য করিতে পারেন না। তিনি পড়িয়া যান। রেফারী চার গণনা করিবার পূর্ব্বেই তিনি উঠিয়া দাঁড়ান। জো, হেনরীকে অবসর দেন না। তিনি পুনরায় বাম ও দক্ষিণ চোয়ালে মুষ্ট্যাঘাত করেন। ইহার ফলে, হেনরী টলিতে আরম্ভ করেন। জো দক্ষিণ হস্তে "হুক" করিলে রেফারী আসিয়া মধ্যস্থলে উপস্থিত হন। হেনরী অগ্রসর হইয়া আসিলে জো পর পর দুইবার দক্ষিণ চোয়ালে আঘাত করেন। হেনরী পুনরায় গড়াইয়া পড়েন। তিন গণনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়ান। জো তড়িৎগতিতে অগ্রসর হইয়া পর পর চারি-বার দক্ষিণ চোয়ালে ভীষণ জোরে আঘাত করেন। হেনরী পুনরায় টলিয়া পড়িয়া যান। মুখ হইতে হেনরীর অনর্গল রক্তপাত হইতে থাকে। এই অবস্থায়ও হেনরী উঠিয়া দাঁড়ান। রেফারী হেনরীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নীরব থাকিতে পারেন না। প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া জোকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। রেফারীর এই আচরণ প্রতিযোগিতার শেষে হেনরী লুইসকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি প্রতিযোগিতার শেষে তাঁহার বন্ধুদের নিকট বলেন, "আমি আরও খানিকক্ষণ লড়িতে পারিতাম।" হেনরীর এই উক্তির মধ্যে স্বার্থান্বেষী লোকের স্তোকবাক্যের ফল দেখিতে পাওয়া যায়। হেনরী লুইস, জো লুই অপেক্ষা ওজনে প্রায় দুই ষ্টোন কম হইয়াও কেন যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

জো লুইর ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বিগণ

আমেরিকার বিখ্যাত মুষ্টিযুদ্ধ-প্রবর্ত্তক মাইক জেকবারের [illegible] করিয়া জো লুই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। শীঘ্রই ম্যাক্সবিয়ার, লুইনোভার সহিত জোকে লড়িতে হইবে। ইহাদের পরেই ভূতপূর্ব্ব চ্যাম্পিয়ান জেমস ব্রাডক জোর সহিত লড়িবেন। ইহার পরেই দেখা দিবেন টমিফার, ম্যাক্সস্মেলিং, রস্কো, টোলাস, গুস ডোরাজিও, বাড্ডি প্যাক্টর, টনি গ্যালেণ্টো, মরিস ষ্ট্রিকল্যাণ্ড, ক্ল্যারেন্স রেড, গানার বেয়ারল্যাণ্ড, ন্যাথানম্যান। এই সমস্ত মুষ্টিযোদ্ধাগণের অবস্থাও হেনরী লুইসের মত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নেই।

নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা

গত ৩০শে জানুয়ারী বোম্বাইতে নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। পুরুষদের সিংগলসে গউস মহম্মদ সহজেই চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। ডাবলসে সাবুর ও জিম মেটা বহু কষ্টে প্রবীণ খেলোয়াড় বুক এডওয়ার্ডস ও জে টিউকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন। মিক্সড ডাবলসে মিসেস ফুটিট ও জিম মেটা সাফল্যলাভ করিয়া পূর্ব্ব অর্জ্জিত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহিলাদের ডাবলসেও মিসেস ফুটিট, মিস উডব্রিজের সহযোগিতায় জয়লাভ করিয়াছেন। মহিলাদের সিংগলসে ইংল্যাণ্ডের এক খ্যাতনামা খেলোয়াড় মিস কার্টিস চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে যেরূপ উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে দেখা যাইবে বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিলেন, তাহা হয় নাই। প্রতিযোগিতা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একইভাবে চলিয়াছে। পাঞ্জাবের এস এল আর সোহানী ও এইচ এল সোহানীর অভাব দর্শকগণ অনেক সময় অনুভব করিয়াছেন। পাঞ্জাবের দুইজন তরুণ খেলোয়াড় ইফতিকার আমেদ ও প্রেমপান্ধী খেলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। মাদ্রাজের টি রমানাথম সিংগলসে ফাই-নাল পর্য্যন্ত উঠিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙলার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন অবাঙালী ইউরোপীয়ান মহিলা খেলোয়াড় মিসেস ফুটিট। নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইল।

পুরুষদের সিংগলস

গউস মহম্মদ (লক্ষ্ণৌ) ৬—১, ৬—২ গেমে টি কে রমা-নাথমকে (মাদ্রাজ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

ওয়াই আর সাবুর (মাদ্রাজ) ও জিম মেটা (নাগপুর) ৬—১, ৩—৬, ৭—৫ গেমে বুক এডওয়ার্ডস (কলিকাতা) ও জি ই টিউকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস

মিসেস আর এল সি ফুটিট (কলিকাতা) ও মিস এল উডব্রিজ (আজমীঢ়) ৬—৪, ৭—৫ গেমে মিস এ জি কার্টিস ও মিসেস জে ই টিউকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস

মিস এ জি কার্টিস ৬—২, ৬—৮, ৯—৭ গেমে মিস এল উডব্রিজকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

মিস এ জি কার্টিস ৬—২, ৬—৮, ৯—৭ গেমে মিস এল (কলিকাতা) ৬—০, ৩—৬, ৬—১ গেমে মিস এ জি কার্টিস ও মিস এম উডফককে (করাচী) পরাজিত করেন।

পেশাদারদের সিংগলস

মুরাদ খাঁ ৬—৪, ৬—২ গেমে রাম সেবককে পরাজিত করেন।

পেশাদারদের ডাবলস

তমাস খাঁ ও মুরাদ খাঁ ৬—৩, ৬—৪ গেমে সিরাজুল হক ও আজিজুল হককে পরাজিত করেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৩শে জানুয়ারী—

নাগপুর হইতে এই মর্ম্মে এক খবর আসিয়াছে যে, রাজনন্দগাঁও রাজ্যের পুলিশ বাদরাতলা গ্রামে বন-আইন অমান্যকারী সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালনা করিয়াছে। ফলে একটি ২০ বৎসর বয়স্ক যুবক নিহত এবং অপর পাঁচ ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

ই আই রেলের ঝাঁঝা ও কিউল ষ্টেশন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উক্ত ষ্টেশনের সন্নিকটে দুষ্কৃতকারী কর্ত্তৃক লাইনের কয়েকখানি ফিসপ্লেট অপসারিত হয়। লাইনের এই গোলযোগ সময়মত ড্রাইভারের চক্ষে আসার ফলে অল্পের জন্য আর একখানি আপ যাত্রী গাড়ী দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পায়।

আগামী ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী খুলনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন হইবে। হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন।

"হায়দরাবাদ দিবস" উপলক্ষে দিল্লী, বেরিলী, পুণা এবং লক্ষ্মৌতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের ফলে বহু-লোক আহত হয়। প্রকাশ, নিজাম বিরোধী ধ্বনিতে মুসল-মানদের আপত্তিই এই হাঙ্গামার কারণ।

হিন্দোল দরবার সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছে, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, রাজার নিযুক্ত একটি কমিটি রাজ্যের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। প্রাপ্ত বয়স্ক-দিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হইবে এবং আগামী এপ্রিল মাসে প্রজা-পরিষদ গঠিত হইবে। পরিষদের সদস্যদের অর্দ্ধাংশ নির্ব্বাচিত এবং অর্দ্ধাংশ মনোনীত হইবেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জাতিগঠন বিভাগ সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষমতা পরিষদের হস্তে থাকিবে। প্রজাদিগকে বক্তৃতা এবং সভা-সমিতি করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে এবং পরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসারের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ এবার অনেক পূর্ব্বেই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে এবং টিকা লওয়া ইত্যাদি যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করা হইলে বসন্তে মৃত্যুর সংখ্যা এবার অনেক বেশী হইবে আশঙ্কা করা যায়।

বার্সিলোনা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, অদ্য বিদ্রোহী-বাহিনী কর্ত্তৃক বিমান আক্রমণের ফলে কয়েকটি বৃটিশ জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

২৪শে জানুয়ারী—

সিন্ধু প্রদেশের দাদু জিলায়, ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এন জি মজুমদার প্রভৃতি তিন ব্যক্তিকে হত্যা সম্পর্কে কালাত রাজ্যের একদল ডাকাতকে ধরা হইয়াছিল। এই সব ধৃত ব্যক্তির বিচার সম্পর্কে কালাত রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ধৃত ব্যক্তি-দিগের ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে বিচার হয়। কালাত রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা তাঁহাদের রাজ্যের যে বিচার ব্যবস্থা আছে তদনুসারে তাহাদের বিচার হয়।

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন ব্যাপারে ডাঃ পট্টভির পক্ষে সুপারিশ করিয়া বান্দোলী হইতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, শ্রীযুত জয়রাম দাস দৌলতরাম, শ্রীযুত শঙ্কর রাও দেও, শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। ইহার উত্তরে কলিকাতা হইতে রাষ্ট্রপতি বসু একটি বিবৃতি দিয়াছেন।

ফিলিপাইন সম্পর্কে যুক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসের নিকট প্রেরণ করিয়া-ছেন। ঐ রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, ফিলিপাইনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ১৯৪৬ সালের পরিবর্ত্তে ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হউক।

স্পেনের বিদ্রোহী-বাহিনী বার্সিলোনা শহরের একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। বার্সিলোনা শহর তাহার দৃষ্টির আওতার মধ্যে আসিয়াছে। কামান শ্রেণী হইতে অবিশ্রান্ত গুলী চালাইয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে।

পাটনা হইতে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানাইতেছেন যে, গত ১২ই জানুয়ারী হাজারীবাগ রোডের নিকট ই আই রেলের দেরাদুন এক্সপ্রেসের যে দুর্ঘটনা হয়, তৎসম্পর্কে পুলিশ ঐ ট্রেনের যাত্রীদিগকে সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করিতেছে। যাত্রীরা যদি দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোন কাজের কথা বলিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ই আই রেলের পাটনার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা বা পত্র-বিনিময় করিতে বলা হইয়াছে।

মেমেল শাসন পরিষদের নূতন নাৎসী প্রেসিডেণ্ট হের বার্টুলাইট সরকারী কর্ম্মচারিগণের নিকট এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, মেমেলের লিথুয়ানিয়ানগণকে নাৎসীবাদ মানিয়া লইতে হইবে। তিনি বলেন যে, সর্ব্বপ্রকার নাৎসী-বিরোধী প্রচারকার্য্যই অসহ্য এবং উহা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হইবে।

২৫শে জানুয়ারী—

বেরিলীতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় হতাহতের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। দাঙ্গা আরম্ভ হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত ৪জন নিহত ও ৮০জন আহত হইয়াছে। এ সম্পর্কে সর্ব্বসমেত ১১৬জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রাজকোট রাজ্যের ঠাকুর সাহেব ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে যে আপোষ মীমাংসা হইয়াছিল, রাজকোট দরবার তাহার সর্ত্তসমূহ পালন না করায় রাজকোট প্রজা-পরিষদ পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এক বিবৃতিতে ইহা ঘোষণা করিয়াছেন।

চুং কিং হইতে চীনসরকার কর্ত্তৃক সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ইউনান ও বর্ম্মার মধ্য দিয়া বিমানপথকে

চীন-ইউরোপ ডাক ও যাত্রী সার্ভিস পরিচালনার জন্য চীনা গবর্ণমেণ্ট ও ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ-এর মধ্যে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এই নূতন সার্ভিসের পূর্ব্ব প্রান্তের ষ্টেশন হইবে হংকং।

লেবার পার্টির কার্য্যকরী সমিতি স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড কিছুদিন পূর্ব্বে পপুলার ফ্রণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদী বিভিন্ন শ্রমিক ও উদার-নৈতিক নেতাগণের সহিত সহযোগিতার অনুরোধ জানাইয়া লেবার পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট এক পত্র প্রচার করেন। এই কারণেই তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

বোম্বাইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, ভারতীয় সাহায্য কমিটি কর্ত্তৃক প্রথম দফায় প্রেরিত ১২০ টন চাউল মারসেলিসে স্পেন গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট পাইয়াছেন।

২৬শে জানুয়ারী—

ই আই রেলের মহম্মদগঞ্জ ও গারোরা রোড ষ্টেশনের মধ্যে দুইখানি ইঞ্জিনে গুরুতর সংঘর্ষের ফলে ইঞ্জিনের "রেষ্টভ্যান" অগ্নিদগ্ধ ও ইঞ্জিন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে ৭জন লোক নিহত হইয়াছে। জানা গিয়াছে যাহারা হতাহত হইয়াছে তাহারা সকলেই ভারতীয়।

গত ২৪শে জানুয়ারী তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী মিঃ জেলাল বায়ার পদত্যাগ করেন। অতঃপর স্বরাষ্ট্র-সচিব মঃ রেফিক সারদাম নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

নূতন মন্ত্রিসভা জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নির্ব্বাচন অবিলম্বে আরম্ভ হইবে এবং ৫৯ দিন ধরিয়া চলিবে।

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। এইবারকার স্বাধীনতা দিবসের বিশেষত্ব এই যে, বহু মহিলা ও মুসলমান এবং কতিপয় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান উৎসবে যোগ দেন।

কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া যে বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে, তৎসম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল আলমোড়া হইতে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী সুভাষবাবুকে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সেনাদল বিনা বাধায় বার্সিলোনা দখল করিয়াছে।

ফরাসী-স্পেন সীমান্তের পশ্চিম প্রান্তস্থিত লেপারথাস হইতে প্রাপ্ত একটি টেলিগ্রামে প্রকাশ যে, সীমান্ত হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী ফিডারাস নামক স্থানে স্পেনের গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রধান ঘাঁটি স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

দক্ষিণ আমেরিকার চিলীতে ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে প্রায় ৩২ হাজার নর-নারীর প্রাণহানি হইয়াছে এবং ৫০ হাজার নর-নারী আহত হইয়াছে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এলাহাবাদ, গয়া, জলন্ধর, উনাও প্রভৃতি স্থানে ঘোরতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে এলাহাবাদ ও গয়া যথাক্রমে ৯০ এবং ৫১জন আহত হয়।

২৭শে জানুয়ারী—

মাদ্রাজের "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস" পত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, কোন গুরুতর কারণে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্ত্তনামার সংশোধিত খসড়া প্রচার বন্ধ রাখিয়াছে। উক্ত পত্র আরও বলেন যে, ঐ সর্ত্তনামার খসড়ার কোন কোন বিষয়ে এখনও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট একমত হন নাই। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে ঐ সমস্ত বিষয়ে দিল্লী ও লণ্ডনের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

জয়পুরের জহুরী বাজারে এক ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়া উঠে। এই দাঙ্গায় ৭জন মুসলমান মারা গিয়াছে, বহু লোক আহত হইয়াছে, ৩৫জন পুলিশ কর্ম্মচারীও অল্পবিস্তর জখম হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একজনের বাঁচিবার আশা কম।

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে তৎসম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বসু দ্বিতীয় বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন—মোটের উপর বর্ত্তমান বৎসরের কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন ব্যাপারে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে একটি হইল গণতন্ত্রের মর্য্যাদা, অপরটি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিধাহীন বিরোধিতা।

যুক্ত প্রদেশের রফি আমেদ কিদওয়াই, শ্রীযুক্ত নরীম্যান, শ্রীযুক্ত এম এস আণে, শ্রীযুত রামানন্দ চ্যাটার্জ্জি, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী ও দেশের সমুদয় বামপন্থী নেতৃগণ শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করিয়াছেন।

সিন্ধু প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স তাঁহার মন্ত্রিসভায় আরও দুইজন মুসলমান এবং একজন হিন্দু মন্ত্রী গ্রহণ করিবেন। প্রকাশ যে, সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক বলিয়া গবর্ণর পাঁচজন মন্ত্রী রাখিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন না বলিয়া মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে বিলম্ব হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে ঐ বাধা দূরীভূত হওয়ায় মন্ত্রি-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

বাঙলা ও সুরমা উপত্যকা হইতে নির্ব্বাচিত ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮৫ এবং ৩৫।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আগামী ৪ঠা এবং ৫ই ফেব্রুয়ারী চূড়ান্তভাবে অধিবেশনের দিন ধার্য্য হইয়াছে। ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হইবে।

২৮শে জানুয়ারী—

দিল্লীর শিবমন্দির স্থানের মালিকানা স্বত্ব লইয়া সাধু শ্যামপুরী মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে যে মামলা আনয়ন করিয়াছিলেন অদ্য প্রথম শ্রেণীর সাব-জজ তৎসম্পর্কে এই মর্ম্মে এক রায় দিয়াছেন যে, এই স্থানের মালিক মিউনিসিপ্যাল কমিটি—সাধু নহে। সাধু শ্যামপুরীর বিরুদ্ধে জজ ডিক্রী দিয়াছেন।

জয়পুর হইতে দাঙ্গা সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, বর্ত্তমানে তথায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া

আসিয়াছে। দাঙ্গার ফলে দুইজন হিন্দু ও ৮জন মুসলমান এবং একজন পুলিশ কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যালয় কোবে (জাপান) হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ২৬শে জানুয়ারী জাপানস্থ ভারতীয় জাতীয় সমিতি কর্ত্তৃক স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রায় ৩০০ ভারতবাসীর উপস্থিতিতে কংগ্রেসী ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলিত হয় ও স্বাধীনতা সঙ্কল্প পঠিত হয়।

ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে প্রাপ্ত অনুরূপ একটি খবরে জানা যায় যে, তথাকার ভারতীয় ছাত্র ও অধিবাসীরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করিয়া পূর্ণ স্বরাজই ভারতের লক্ষ্য উল্লেখ করিয়া স্বাধীনতা দিবস পালন করেন।

ফরাসী-স্পেনীয় সীমান্ত খুলিয়া দিবার জন্য অদ্য প্যারিসে বিভিন্ন সভাতে ফরাসী জনসাধারণ দাবী জানায়।

ক্রমাগত কয়েকদিন জল্পনা-কল্পনার পর ব্রিটিশ মন্ত্রী সভায় নিম্নলিখিত রদবদল ঘোষণা করা হইয়াছেঃ—স্যার টমাস ইন্সকিপের পরিবর্ত্তে ভূতপূর্ব্ব নৌ-সচিব এডমিরাল লর্ড চ্যাটফিল্ড দেশরক্ষা ব্যবস্থার সামঞ্জস্য-বিধায়ক মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যার টমাস ইন্সকিপ ডোমিনিয়ন সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ডব্লিউ এইচ মরিসনের স্থলে স্যার রেজিনল্ড ডরম্যান স্মিথ কৃষি-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ মরিসন "চ্যান্সেলার অব দি ডাচি অব ল্যাঙ্কাষ্টার" হইয়াছেন। লর্ড উইণ্টারটন ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এখন মন্ত্রি-সভা ছাড়িয়া "পে-মাষ্টার জেনারেল"এর পদ গ্রহণ করিলেন। এই পদ লর্ড মানষ্টারের ছিল। তিনি লর্ড ষ্ট্রাটকোনার ত্যক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ মরিসন লর্ড চ্যাটফিল্ডের সাহায্য করিবেন এবং কমন্স সভায় তাঁহার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

২৯শে জানুয়ারী—

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া জয়ী হইয়াছেন।

এলাহাবাদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, তথা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে কুনওয়ার ষ্টেশনের নিকট একখানি যাত্রীবাহী গাড়ী দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ কিছু পাওয়া যায় নাই।

আন্দুলের (হাওড়া) নিকট আর একটি বিমান দুর্ঘটনার ফলে তিনজন আরোহী সামান্য আঘাত পাইয়াছেন। বিমান-চালক নিজেও আহত হইয়াছেন।

জেনেভা রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক হইতে জানা যায় যে, ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর দেশগুলি (৬৪টি দেশের হিসাব ধরা হইয়াছে) সমরসজ্জায় প্রায় ৯৫০ কোটি সুবর্ণ ডলার ব্যয় করিয়াছে। ৯৫০ কোটি সুবর্ণ ডলার ৩৪০ কোটি পাউণ্ডের সমান। ভারতীয় মুদ্রায় ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪৭৬০ কোটি টাকা। ১৯৩৭ সালে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৮০০ কোটি সুবর্ণ ডলার, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ১৫০ কোটি সুবর্ণ ডলার ব্যয় বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বার্সিলোনার পরে

(৭৪২ পৃষ্ঠার পর)

দালাদিয়ের কার্সিকা, টিউনিস, এলজিয়ার্স প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, সূচাগ্র ভূমিও আমরা হাত ছাড়া করিব না। বার্সিলোনার পতনের পর ফ্রান্সের মনোভাব কিছু পরিবর্ত্তিত হইবে কি?

এই প্রসঙ্গে নূতন না হইলেও আর একটি কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ব্রিটেন জার্ম্মানীকে ইউরোপে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পক্ষে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়াছে, ভূমধ্যসাগরে ইটালীর অধিকারও স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইটালীর বর্ত্তমান ফরাসী রাজ্য দাবীও কি সে মানিয়া লইবে? চেম্বারলেন ও হালিফাক্স মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ পরিচয় করিতে রোমে গিয়াছিলেন। নানা কথার মধ্যে এই দাবিটির কথাও আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু উঁহারা মুসোলিনীর দাবী মানিয়া লইতে পারেন নাই। কারণ তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ইহা আজ দুই সপ্তাহ আগেকার কথা। বার্সিলোনার পতন হইয়াছে সম্প্রতি। স্পেন এখন ইটালীর তাঁবেদার, সুতরাং উহারই একটি প্রধান ঘাঁটি হইবে। ইহার পরও কি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মনো-ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে না? জার্ম্মানী আটঘাট বাঁধিয়াছে, ইটালী ফ্রাঙ্কোর জয়ের সঙ্গে আটঘাট বাঁধিয়া লইতেছে। তাহার পরই আসল সমস্যা দেখা দিবে। সোভিয়েট রুশিয়া যাহাতে দূরে থাকে তাহার চেষ্টা সুরু হইয়া গিয়াছে। হয় ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে হিটলার মুসোলিনীর দাবী মানিয়া লইতে হইবে, নাহলে যুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে। এই জন্যই বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন, শীঘ্রই একটা মহাসমর বাধিবার সম্ভাবনা।

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৯।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৪৫ সাল, 11th February, 1939 [১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শরৎচন্দ্রের অভিভাষণ—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রধান বিশিষ্টতা হইল এই যে, তাহা জলের মত পরিষ্কার। শরৎচন্দ্র সহজ, সরল ভাষায় বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙালীর রাষ্ট্রনীতিক সাধ্য এবং সাধনার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হইল ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালী গ্রহণ-বর্জ্জনের সমস্যা। আমরা জানি, এ ব্যাপার লইয়া কারচুপি চলিতে পারে এমন আশঙ্কা দেশের লোকের মনে আছে; শরৎচন্দ্র এ সম্বন্ধে বাঙালীর মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতীয় জনগণের পক্ষ হইতে প্রবল বাধা না আসিলে যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালী কার্য্যে পরিণত হইবে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর স্বরূপ কি? ভারতের কি নরম, কি গরম, সকল দলেরই মতে উহা স্বাধীনতা—স্বাধীনতার কায়া দূরে থাকুক, ছায়াও নয়। কংগ্রেসের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইল পূর্ণ স্বরাজ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালী কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না। এ ব্যাপারে একটা মোহ আছে, সে মোহ হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে ঠাটটা খাড়া করা হইয়াছে, কংগ্রেসের তরফ হইতে তাহারই মন্ত্রীগিরি। কিন্তু সে মন্ত্রীগিরি কংগ্রেসের লক্ষ্য নয়। শরৎচন্দ্র কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—'বহু রক্ষা-কবচবেষ্টিত প্রাদেশিক শাসনের আংশিক ভার পাইয়াই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি, তাহা হইলে আমাদের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্র আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।' কংগ্রেসী দল এবং সাবেকী মডারেট দলে কোন পার্থক্যই থাকিবে না। সুতরাং শরৎচন্দ্রের মতে—'এই সন্ধিক্ষণে আবার সচেষ্ট হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বরাজের জন্য উদ্যোগ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য যদি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে।' শরৎচন্দ্র এই সুস্পষ্ট উক্তির দ্বারা বাঙলাদেশের বক্তৃতার এই অংশই বর্ত্তমান বাস্তব রাজনীতির দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাঙলার দাবী—

কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হিসাবে শরৎচন্দ্রের বক্তৃতার আর একটি অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার ভিত্তিতে বাঙলাদেশ গঠনের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র যে কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহার কথাই বলিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের নিকট বাঙলার প্রধান দাবী এই যে, এখনও বাঙলা ভাষা-ভাষী ও বাঙালী অধ্যুষিত কয়েকটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাঙলার বাহিরে অন্য প্রদেশের অংশ স্বরূপে রহিয়াছে, এইগুলিকে অচিরে বাঙলার মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা হওয়া উচিত। কংগ্রেস যখন ভাষাকেই মূল নীতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তখন এ বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। বাঙলার প্রতিবেশী দুইটি প্রদেশ—বিহার ও আসাম, এই প্রদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভাষা অনুযায়ী প্রাদেশিক সীমার পরিবর্ত্তন হইলে ইহাদের আয়তন ও লোকবল একটু কমিবে সত্য; কিন্তু ইহার উপায় নাই। কোনও বাঙালীর পক্ষে এই ন্যায্য দাবী ত্যাগ করা সম্ভব নয়। যদি সমস্ত বাঙালী এক প্রদেশের মধ্যে একীভূত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ফেডারেশন স্থাপিত হইতে পারে না, অন্তত বাঙালীর পক্ষে সেই ফেডারেশনকে স্বাভাবিক ও ন্যায্য বলিয়া মানিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না। বিহারের গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট, আসামের গবর্ণমেণ্টও বর্ত্তমানে কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট—কংগ্রেসের নীতি এবং আদর্শ অনুযায়ী চলিতে হইলে, এই দুই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বাঙালীর এই দাবীতে আপত্তি করিবার ক্ষমতা তো নাই-ই বরং এই দাবী সার্থক করাই সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এই প্রশ্নটি তাঁহারা, বিশেষভাবে বিহার গবর্ণমেণ্ট এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছেন। বাঙলার কংগ্রেসী দলের নেতাস্বরূপে শরৎচন্দ্র তাঁহার

তরফ হইতে এমন জোর দিয়া কথাটা তোলা হয় নাই। আমরা আশা করি, এখন আর এ প্রশ্নটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা হইবে না; কংগ্রেসের বৃহত্তর নীতি এবং আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর পড়িবে এবং তদনুযায়ী আন্দোলন চলিতে থাকিবে। আমাদের দাবীও সেই নীতি এবং আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল—

শরৎচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের কাজের একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব দেখাইয়াছেন। আমরা বাঙলার মন্ত্রীদের পরিমাণটাকে বড় করিয়া দেখি না, আমরা বড় করিয়া দেখি ক্রিয়াত্মক দিকটা নয়, তাঁহাদের কাজের ভাবাত্মক দিকটা। শরৎচন্দ্র সেই কথাটাই বলিয়াছেন, তিনি বলেন,—"বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে আমার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ এই যে, তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উজ্জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের যে সকল ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, সেখানেও সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির বিষ বিকীর্ণ হইতেছে। আজ কয়েকদিন হইল, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে; উহাতে কলিকাতার স্থানীয় শাসনে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যদি উহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে হিন্দু-অহিন্দুনির্ব্বিশেষে সকল খাঁটী বাঙালীর নিকট হইতে যে বিরোধিতা আসিবে, উহা অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও হইবে না।" কিভাবে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটিতে পারে এবং ভবিষ্যতে এইরূপ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্ভব না হইতে পারে—শরৎচন্দ্র সে সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন, আমরাও তাহার যাথার্থ্য স্বীকার করি। আপাতত কোন-না-কোনভাবে ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন সদস্যকে হাত করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীকে ভাঙিয়া দিলেই এ সমস্যার সমাধান হইবে না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ যেখানে জাগে নাই, সেখানে হীন স্বার্থ আবার কাজ করিবে এবং জাতীয় রাষ্ট্রনীতি তাহার আবর্ত্তে ক্রমেই পঙ্কিল হইয়া উঠিবে। শরৎচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন,—"এজন্য আমাদিগকে ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।" আমরা দেখিতে চাই, যেন সেই কাজ আরম্ভ হয়। নতুবা মন্ত্রীদের কার্য্যের নিন্দামূলক যে-সব প্রস্তাব জলপাইগুড়িতে গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির কোন মূল্য থাকিবে না।

জলপাইগুড়ির সিদ্ধান্ত—

বিদেশীর পরিকল্পিত কোন শাসনতন্ত্র আমরা গ্রাহ্য করিব না, ভারতবাসীদের শাসনতন্ত্র গঠন করিবে ভারতবাসীরা—জলপাইগুড়ি সম্মেলনের প্রধান দাবী হইল ইহাই। এই দাবীর সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি করিতে চাহেন; [illegible] বিবেচনা করিতে তাঁহাদিগকে ছয় মাসের জন্য সময় দায়িত্ব এইখানে। ছয় মাসের মধ্যে হয় আমাদিগকে আমাদের অধিকার দাও, না হইলে সে অধিকার কাড়িয়া লইতে হইলে যেরূপ পন্থা অবলম্বন করা উচিত, আমরা সেই পথ দেখিব, প্রস্তাবের সূচিতার্থ হইল ইহা। সুতরাং দেশের দিক হইতে দায়িত্ব কম নয়। ছয় মাসের মধ্যে স্বাধিকার অর্জ্জনের শক্তিকে সুদৃঢ় করিবার ঝুঁকি এই প্রস্তাবে লওয়া হইয়াছে। দেশকে প্রস্তুত করিতে হইলে, এই কয়েক মাসের মধ্যে, এমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে যে, সময় মত দেশ অপ্রতিহতভাবে বৈদেশিক প্রভুত্ববাদীদিগকে হেঁট মানাইতে সক্ষম হয়। এ শুধু মুখের কথা নয়, এজন্য আবশ্যক সকল দিক হইতে দেশজোড়া অবিশ্রান্ত এবং অক্লান্ত কর্ম্মোদ্যম। এজন্য আবশ্যক প্রাণপাত প্রচেষ্টা, সহস্র সহস্র কর্ম্মী এবং সাধকের যজ্ঞার্থে দস্তুরমত আত্মনিবেদন। সর্ব্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়া অভীষ্ট লাভ করিবার দুর্দ্দম বাসনাকে জাগাইতে না পারিলে ঐরূপ প্রস্তাবের কোন মূল্যই যে প্রবল সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট নাই—এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়াই সম্মেলনে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; কিন্তু এই প্রস্তাবের সঙ্গে কংগ্রেসের বর্ত্তমান আইন-সভা সম্পর্কিত কর্ম্মতালিকার ভবিষ্যতে কোনরূপ বিশেষ হেরফের হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার সামঞ্জস্য কেমন করিয়া থাকে, এই জিনিষটা আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ছয় মাসের মধ্যে যদি দেশে স্বাধীনতার সংগ্রামই আরম্ভ হয়, তবে কি তখনও কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মন্ত্রীগিরি আগুলাইয়া বসিয়া থাকিবেন? দেশব্যাপী বিপুল গণ-আন্দোলনের মধ্যে, জনগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার চরম প্রয়াসের মধ্যেও তাঁহারা কুয়া খোঁড়া, হিন্দুস্থানী চালান, চরখা ঘোরান প্রভৃতি সংস্কারপন্থার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিজদিগকে আবদ্ধ রাখিবেন? ঝাঁপ দিয়া পড়িবেন না তাঁহারা—দেশের বিপুল জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে! দেশের সেই অবস্থায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কি কর্ত্তব্য হইবে, কোন পথ তাঁহারা ধরিবেন, জলপাইগুড়ি সম্মেলনে সে কথাটা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। ছয় মাসের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য জনসংগ্রামের অবতারণার সঙ্কল্পশীলতার অভিব্যক্তি যেখানে হইয়াছে, সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের তৎকালীন কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও অস্পষ্ট কোন ধারণা রাখা উচিত ছিল না। এ বিষয় লইয়া ধীরপন্থী বা সংস্কার-পন্থীদের চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ যতই ঘটুক না কেন, সে ভয় করা উচিত ছিল না। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব সম্বন্ধে ঐ কথাই বলা যাইতে পারে। সম্মেলনে বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যের তীব্র নিন্দাবাদ করা হইয়াছে, মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিতাড়িত করিবার জন্য পরিষদের সদস্যদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু বাঙলার মন্ত্রীরা যদি দেশের লোকের দাবী গ্রাহ্য না করেন,—করিবেন যে সে বিশ্বাস আমাদের নাই; এবং ব্যবস্থা-পরিষদের প্রতিনিধিরা যদি মন্ত্রীদিগকে বিতাড়িত করিতে বিবেকের তাড়না বোধ করিবার মত কর্ত্তব্যবুদ্ধি- [illegible] স্বরূপ কি করা

হইবে, জলপাইগুড়ি সম্মেলনে সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। বাঙলা দেশের তিন শতেরও অধিক স্বদেশ প্রেমিক সন্তান এখনও কারাকক্ষে অবরুদ্ধ রহিয়াছে, ইহাদের মুক্তির জন্য কংগ্রেসের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? বাঙলা দেশের এই যে সমস্যা, কংগ্রেসের স্বীকৃত নীতির দিক হইতে ইহা কি নিখিল ভারতীয় সমস্যার মধ্যে পড়ে না? কংগ্রেসের সুস্পষ্ট নীতি হইল এই যে, আইন-সভায় গিয়া রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং তাঁহাদের আইন-সভায় ঢুকিবার ইহাই হইল অন্যতম উদ্দেশ্য। ভারতের একটি প্রদেশে কংগ্রেসের সেই নীতি বা আদর্শের ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকিবে, আর কংগ্রেসী মন্ত্রীরা, আইন-সভার সদস্যেরা শুধু সমস্যাটি তাঁহাদের প্রদেশের ভিতরকার নয় বলিয়া নির্ব্বিবাদে মোড়লী চালাইতে থাকিবেন, ইহাই কি দাঁড়ায় কংগ্রেসী নীতির ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণে? জলপাই-গুড়ি সম্মেলনে বাঙলার এই রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি-সমস্যাকে নিখিল ভারতীয় সমস্যায় পরিণত করিবার জন্য চাপ দেওয়া উচিত ছিল। এই সব বিবেচনায় জলপাইগুড়ি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব যে সকল দিক হইতে আমাদের আশানুরূপ হইয়াছে এমন কথা আমরা বলিতে পারিতেছি না, তবে সম্প্রতি কংগ্রেসী উপরওয়ালার দল ধীরে ধীরে মন্ত্রিত্বের আড়ালে নিয়মতান্ত্রিকতার টানে যেভাবে ভাটাইয়া যাইতেছিলেন, সেই ভাটার গতিকে জলপাইগুড়ির সিদ্ধান্ত যে সুস্পষ্টভাবে মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে, ইহাই বিশেষরূপে আশার কথা।

রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ—

রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে শরৎচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দীকে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, স্থানীয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও হিন্দী সমস্ত উত্তরাপথের ভাষা। বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নিজামের রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে এখনই হিন্দী সকলের বোধ্য ও সাধারণ ভাষা। এই ভাষাকে স্থান-চ্যুত করিয়া বাঙলাকে উহার পরিবর্ত্তে প্রচলিত করা সম্ভব হইবে না।" এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম কথা এই যে, শরৎচন্দ্র যাহাকে 'হিন্দী' বলিয়াছেন, কংগ্রেস তাহার রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযোগিতা স্বীকার করেন না; তাঁহারা চাহেন, 'হিন্দুস্থানী' নাম দিয়া একটা নূতন ভাষা চালাইতে। এ ভাষার সাহিত্য ত নাই-ই; ব্যাকরণ পর্য্যন্ত নূতন করিয়া তৈয়ার করিতে হইবে এবং সে ব্যাকরণও যে হইবে, কোন্ বিজ্ঞানসম্মত সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। এমন একটা গড়া পেটা ভাষা কোন দেশে রাষ্ট্রভাষা যে হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত নাই। 'ভাষার প্রচলন রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক কারণের উপর নির্ভর করে।' শরৎচন্দ্রের এই যুক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াও আমাদের বক্তব্য থাকে এই যে, প্রচলনটা হয় আছে, যে গতিশীল। কতিপয় লোক দল বাঁধিয়া কোন এক সময়ে একটা ভাষাকে গড়িয়া তুলিতে পারে না এবং তেমন ভাবে গড়িয়া তোলা ভাষার অন্য যে গুণই থাকুক না কেন, প্রাণ-ধর্ম্ম থাকে না; সুতরাং তাহা প্রচলিতও হয় না। আমাদের দেশের প্রাচীনগণ বলিয়াছেন, ভাষার সৃষ্টি হয় যজ্ঞে, সাধনায়। সাধনার সম্পদ যে ভাষার মধ্যে আছে, সেই চলিতে পারে। বাঙলা ভাষা এই বলেই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে এবং এই জন্যই রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা তাহারই অধিক। সেদিন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাঙলার সাহিত্যিকেরা সমবেত হইয়া এই দাবীই করিয়াছেন। এতদিন আন্দোলনটা বাঙলার দিক হইতে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল না, এখন ক্রমেই দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। শুষ্ক ব্যবহারিক বিচার প্রাণধর্ম্মকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ব্যবহারিক বিচারে উপযোগী করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া—এক-দিকে হিন্দীওয়ালা অন্যদিকে উর্দ্দুওয়ালাদের মর্জ্জি মাপিয়া যাঁহারা রাতারাতি নূতন রাষ্ট্রভাষা গড়িয়া তুলিবার মতলবে আছেন; আমরা আশা করি, তাঁহারা এই সত্যটি স্বীকার করিবেন যে, ভাষাও একটা জীবন্ত জিনিষ—রাষ্ট্রনীতির মাপকাঠিতে ভাষার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। রাষ্ট্র-নীতিককেই তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য বীণা-পাণির শরণাগত হইতে হয়।

ভাবিবার কথা—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁহার অভিভাষণে দেশের কতকগুলি প্রয়োজনীয় সমস্যার প্রতি দেশের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি মুক্ত রাজবন্দিদের সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়াছেন, যে কথাটা আমাদের মনেও অনেকদিন হইতেই জাগিতেছিল। তিনি বলেন,—"মুক্ত রাজবন্দিগণের জন্য কেবল চাকুরীর চেষ্টা করিলে তাহাদের অন্ন সমস্যার কিছু সমাধান হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণে দেশসেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে, তাহা স্ফুরিত হইবার সুযোগ একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে।" প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রনীতিক সংগ্রাম এবং সাধনার ক্ষেত্রে, এই সব ত্যাগী এবং কর্ম্মী স্বদেশ-প্রেমিক যুবকদের শক্তি একটা প্রধান শক্তি; বড় বল বা ভরসা। এ দেশের স্বাধীনতার যাঁহারা বিরোধী, তাঁহাদের মতলবই হইল যাহাতে এই সব যুবকেরা দেশের রাজ-নীতিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট না থাকে, তাহাই করা; কিন্তু দেশের প্রেমিক যাঁহারা, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইল, এই সব যুবকেরা বিশেষ অন্নবস্ত্রের কষ্টে না পড়িয়া যাহাতে রাজ-নীতিক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে থাকে, তেমন চেষ্টা করা। ইহাদিগকে আমরা রাজনীতির ক্ষেত্র ছাড়িয়া অন্যদিকে যাইতে দিতে পারি না। সান্যাল মহাশয়ের মতে বাঙলার রাষ্ট্রীয় সভা চেষ্টা করিলে ইহাদের জন্য একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া প্রাথমিক অর্থসংগ্রহ সুরু করিতে পারেন।

জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস, বাঙ্গলার মুক্তিপ্রাপ্ত সকল রাজ-বন্দির জীবিকার্জ্জনের সমস্যার এইভাবে কতটা সমাধান হইতে পারিবে, আমরা জানি না; তবে আমাদের মনে হয়, বাঙলার নেতাদের এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত এবং একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।

কবির সাধনা—

শ্রীনিকেতনের বিশ্বভারতী পল্লী সংগঠন কেন্দ্রের সপ্তদশ বার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করিতে গিয়া সেদিন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমাদের দেশে লক্ষ্মী শুধু ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী নন, তিনি সৌন্দর্য্যেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী; যেখানেই অসৌন্দর্য্য সেখানেই অলক্ষ্মীর নিকেতন। আমাদের সাধনা সফল হবে, যখন চারিদিকে সুন্দরের বিকাশ হবে। শোভাই হচ্ছে লক্ষ্মীর আদর্শ আসন. আনন্দই মানুষের জীবনকে সার্থক করে। গ্রামের চারিদিকেই সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে চাষীরা ফিরে আসে তাদের ঘরে। তারা পরাভবের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আনন্দ না থাকলে শক্তি থাকে না। যখন দেখব চাষীরা ঘরের চারিদিকই সাজিয়েছে, প্রাঙ্গণে দিয়েছে আলপনা, সন্ধ্যায় তাদের প্রাঙ্গণে গীতধ্বনি হবে, তখন বুঝতে পারব, তাদের প্রাণে শক্তির সঞ্চার হয়েছে, তাদের মনের মাঝ থেকে যখন আনন্দ উৎসারিত হয়ে উঠে চারিদিক প্লাবিত করেছে, তখন জানব আমাদের ধারণা সার্থক। দু'চার মণ ধান বেশী হ'ল কি না হ'ল, চরখায় সুতো বেশী হ'ল, কি না হ'ল, সেটা বেশী কিছু মনে করব না। চাই তাদের চিত্তের উদ্বোধন। আমাদের গ্রামে কবির আদর্শ কি কিছু কাজ করবে না? তারা কি কেবল চাষ করবে? কাপড় তৈরী করবে? তখনই বুঝব কবির কাব্য আমাদের গ্রামে কাজ করছে, যখন দেখব চারিদিকে আনন্দধ্বনি হচ্ছে. তা' হ'লে বুঝব শিক্ষায় কাজ হচ্ছে। গ্রামের যে একটা বিশেষ শিল্প, একটা বিশেষ সাহিত্য ও গীতিকাব্য উদ্ভূত হয়েছে—তার চিরন্তন মূল্য আছে। এই যে পল্লীসাহিত্য প্রভৃতি এগুলি মূলে থেকে আমাদের দেশ থেকে শুকিয়ে গিয়েছে। এগুলিতে আজ পোকা লেগেছে। এইখানে মানুষকে বাঁচাতে চাই। পল্লীকে খণ্ডভাবে উপকার করা চলে না, তাকে সমগ্রভাবে জাগাতে হবে, তব সে সব নিতে পারবে। তার চিত্তকে সমগ্রভাবে উদ্বোধিত করতে হবে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—যাদের আছে তারাই পায়, যার নেই তার থেকে কিছু পাবে না। মরুভূমির মধ্যে কিছু নেই। কত মেঘ যে চলে যায়, তবুও কিছু পায় না। মরুভূমিতে বিধাতার দান পৌঁছায় না। আমাদের অন্তরে রস নেই, সেইখানে রস সঞ্চার করতে হবে। নানারকম সৌন্দর্য্য-সাধনার মধ্য দিয়ে এদের রস সঞ্চার করতে হবে। আমাদের দেশ থেকে সব আবার গড়ে তুলতে হবে। ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান আনন্দ, তা যদি শুকিয়ে যায়, তা' হ'লে আর কিছুই থাকে না।"

জাতি গঠনের গোড়াকার কথা কি এবং সেইদিক হইতে কোথায় আমাদের গলদ জমিয়া যাইতেছে, কবি তাঁহার বাণীর ভিতর দিয়া সংক্ষেপে সেই কথাই বলিয়া দিয়াছেন। আমরা ঐশ্বর্য্যকে সৌন্দর্য্য বলিয়া গুলাইয়া ফেলিতেছি। যেখানে ঐশ্বর্য্যের স্পর্শ—মানুষের সহজ যে আনন্দসত্তা, তাহা সেখানে অভিভূত, ঐশ্বর্য্যের নিরিখ লইয়া সৌন্দর্য্যকে বুঝা যায় না, মাধুর্য্যকে ধরা যায় না। আমাদের ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিকে যখন আমরা ছাড়িতে পারিব, এড়াইতে পারিব, পল্লীর সেবার প্রকৃত অধিকারী হইব তখন আমরা। তখন আর পল্লীর লোকজনকে অনুগ্রহ করা বা উদ্ধার করার দিক হইতে পল্লীগঠনের বিবেচনা আমাদের আসিবে না, তখন আমাদের পল্লীর কাজ দাঁড়াইবে সেবাতে এবং সেই সেবার ভিতর দিয়াই পল্লীর স্বরূপ আমাদের কাছে উন্মুক্ত হইবে, দৃষ্টিতে পড়িবে তাহার সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য। সেই মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্য-অনুভূতিই উপচাইয়া পড়িবে আমাদের অন্তর হইতে পল্লী-শিল্প, সাহিত্য এবং সঙ্গীতির ভিতর দিয়া। তখন আমাদের ডাকে পল্লী জাগিবে, দেশের মানুষকে আমরা খাঁটী আপনার করিয়া পাইব।

সামন্ত রাজ্যে রুদ্রনীতি—

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেল রাজকোট রাজ্যে সত্যাগ্রহ করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন, শেঠ যমুনালাল বাজাজকে দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার করিয়া আবার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাজাজজী যে পুনরায় জয়পুর রাজ্যে প্রবেশ করিবেন ইহা নিশ্চিত, সুতরাং সংগ্রাম সহজে থামিবে না। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রে বোম্বাইতে নৃপতিমণ্ডলের অধিবেশনের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে, নৃপতিমণ্ডল, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। নৃপতিমণ্ডলের সভাপতিস্বরূপে বিকানীরের মহারাজা হুংকার ছাড়িয়া বলিয়াছেন, প্রজামণ্ডলগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। বাহির হইতে যাহারা আন্দোলন করিতে যাইবে, তাহাদের সম্বন্ধে কড়া ব্যবস্থা করিতে হইবে, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগকে সমাজ-সংস্কার সম্পর্কিত কার্য্যে উৎসাহ দান করা হইবে; কিন্তু রাজনীতিক আন্দোলন তাহাদিগকে করিতে দেওয়া হইবে না। এই বৈঠকের বিবরণ হইতেই দেখা যাইতেছে, দেশীয় রাজাসমূহে প্রজা আন্দোলন দমন করিবার জন্য রাজারা দল বাঁধিতেছেন। রণপুর রাজ্যে পুলিশ এবং সেনাদল নিরীহ প্রজাদের উপর যে খেলা খেলিতেছে, সেই খেলা যাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে চলে, তাহার সুবিধার জন্য সামন্ত নৃপতিদের সকলের সাহায্যে একটি পুলিশ বাহিনী গঠনের কথাও হইতেছে। এই সব অপ্রত্যাশিত কিছুই নয়, কিন্তু যুগের হাওয়ার গতি রোধ করিবে কে? বিকানীরের মহারাজা লাথি এবং চুম্বন—এই দো-তরফা নীতি চালাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি হয়ত মনে করিতেছেন, মানুষ এখনও সেই মধ্যযুগীয় অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। জানোয়ারের প্রতি যেমন ব্যবহার করা হয়, তাহারা সেইরূপ ব্যবহার পাইবার যোগ্য। তাহাদিগকে কখনও লাথি এবং

কখনও চুম্বন করিয়া তাঁহারা তুষ্ট রাখিবেন। কিন্তু মানুষ আজ তাঁহাদের এই সর্দ্দারীর তলায় পড়িয়া থাকিতে চায় না। তাহারা লাথিও যেমন চায় না, তেমনই চুম্বনেরও ভিখারী থাকিতে ঘৃণা করে। তাহারা চায় মানুষের অধিকার। এই অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না। লাথিতেও যেমন তাহারা দমিবে না, চুম্বনেও তেমনই বশ হইবে না। লাথি তাঁহারা চালাইবেন, জানি এবং তেমন ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য হইবে, নির্য্যাতিত উৎপীড়িত জনগণকে সাহায্য করা। কংগ্রেস সে কর্ত্তব্য এড়াইতে পারে না—পীড়ন, নির্য্যাতন যতই আসুক। মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তেমন পীড়ন এবং নির্য্যাতনের ভিতর দিয়াই। দুঃখের দারুণ-দীপ ধরিয়াই স্বদেশপ্রেমের সাধনা করিতে হয়। তেজস্বিনী শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ এই সত্তর বৎসরের কাছাকাছি বয়সে বার্দ্ধক্য-জীর্ণ দেহ লইয়া সেই দীপের আলোই ছড়াইয়া দিতেছেন; দেখাইতেছেন স্বাধীনতার প্রকৃত পথ। তাঁহার মহিমা জাতিকে ধন্য করিয়াছে। বড় কথায় কাজ হইবে না, দরকার দেশের লোকের জন্য এমন প্রাণের টানের—যে টানে দুঃখও দাঁড়ায় সুখে, ত্যাগ সার্থক হয় আনন্দে এবং দুর্দ্দৈব-বিলাস স্বভাবে পরিণত হয়।

স্পেনে গণতন্ত্রীদের পতন—

বার্সিলোনার পতনের পরই বুঝা গিয়াছিল যে, স্পেনের গণতন্ত্রীদের সকল আশা লুপ্ত হইয়াছে। ক্যাটালোনিয়াই ছিল গণতন্ত্রীদের শক্তির প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু শক্তিরও একটা সীমা আছে। স্পেনের গণতন্ত্রীদের সংগ্রাম জগতের ইতিহাসে বীরত্ব এবং শৌর্য্যের দিক হইতে অতুলনীয়। তাহাদের আত্মদানের তুলনা সত্যই নাই; কিন্তু প্রবল সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তির নিকট তাহাদিগকে হার মানিতে হইল। স্পেনের এই পরাজয়, গণতান্ত্রিকতারই পরাজয়—পরাজয় স্বেচ্ছাচারী শক্তির কাছে। যে শক্তি স্পেনে এই গণতান্ত্রিকতাকে ধ্বংস করিল, সেই শক্তির খেলা আরও চলিবে। ভূমধ্যসাগর ইটালীর কব্জার মধ্যে গেল। ইটালী এবং জার্ম্মানী ইংরেজ ও ফরাসীকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতে কসুর করিবে না। নাৎসীরা উপনিবেশের দাবী তুলিয়াছে। এখন এ দাবী না মানিয়া নিস্তার নাই। একটি সংবাদে প্রকাশ, ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যের জন্য নাৎসীরা দল বাঁধিতেছে। দাদাভাই নৌরজী সময় হইতে সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে, রমেশচন্দ্র দত্ত, লোকমান্য তিলক এবং বর্ত্তমান নেতারা ভারতে ইংরেজ শাসনের নিন্দা করিয়া যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন, সেগুলি প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য সংগ্রহ করা হইতেছে। স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, ডাক্তার বেসান্ট, মিঃ হর্ণিম্যান, ডাক্তার স্যান্ডারল্যান্ড প্রভৃতি যাঁহারা ভারতের সন্তান না হইয়াও ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদের লেখাকে বিশেষ গুরুত্ব দান করা হইতেছে। নাৎসীদের এজন্য গরজ কিসে বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না, মতলব ইংরেজের উপর [illegible] বাগানো। ভারতের জন্য

ভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিয়া ইংরেজ এবং ফরাসী যে পাপ করিয়াছে, এখন তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার পালা তাহাদের আরম্ভ হইবে—সন্ধ্যা সবে সুরু হইয়াছে।

আইরিশ সাধারণতন্ত্রীদের সাড়া—

এক জাতি অপর জাতির উপর নিজের পশুবলের প্রয়োগে যে তিক্ততার সৃষ্টি করে, তাহা সহজে দূর হয় না। আইরিশ জাতির উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সুদীর্ঘকালের পীড়ন এবং অত্যাচারের স্মৃতি, দেশ-শাসনের অধিকার পাইয়াও আজ আইরিশ জাতি ভুলিতে পারিতেছে না। সেই তিক্ততা আয়র্লণ্ড হইতে ব্রিটিশ প্রভাবের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে। লণ্ডন শহরে পর পর কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণের পিছনে আইরিশ সাধারণতন্ত্রীরা রহিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। উইণ্ডসর প্রাসাদ, বাকিংহাম প্রাসাদ, পার্লামেণ্ট সভা, মন্ত্রীদের দপ্তরখানা, বড় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সব জায়গায় গোয়েন্দাদের কড়া পাহারা বসাইতে হইয়াছে। বিশিষ্ট রাজপুরুষদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অষ্ট প্রহরের জন্য রক্ষী গোয়েন্দা নিযুক্ত হইয়াছে। বিলাতের 'ডেলি হেরাল্ড' পত্র বলিতেছেন, আইরিশ সাধারণতন্ত্রী দল গত ১২ই জানুয়ারী লর্ড হালিফ্যাক্সের কাছে এই মর্ম্মে একটি চরমপত্র পাঠাইয়াছিলেন, চার দিনের মধ্যে আয়র্লণ্ড হইতে সকল ইংরেজ সেনা সরাইয়া আনিতে হইবে। সেই চারদিন কাটিয়া যাইবার পর হইতেই বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে। ডি ভেলেরার এ সম্বন্ধে কি মত জানিবার জন্য অনেকের উদ্বেগ দেখা যাইতেছে। ডি ভেলেরা এই সব কার্য্য সমর্থন অবশ্য করিবেন না, তিনি চেম্বারলেনের প্রতি বিশেষ বিরূপ নহেন; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, তিনি যাহা চাহেন, ইংরেজ যদি তাহাতে রাজী হয়, অর্থাৎ আলষ্টার-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া নিখিল আয়র্লণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে, নতুবা মিঃ ডি ভেলেরা সাধারণতন্ত্রীদের এই সব কার্য্যের নিন্দাবাদ করিলেও যে, এ সমস্যার সমাধান হইবে তাহা মনে হয় না। ইংরেজ যে তিক্ততা আয়র্লণ্ডে সৃষ্টি করিয়াছে, সেই তিক্ততার শেষ চিহ্ন সে যদি আজ লোপ করিয়া দেয়, অর্থাৎ আয়র্লণ্ডে ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম রাখিবার কূটনীতির খেলা ছাড়িয়া সমগ্র আয়র্লণ্ডের অখণ্ড রাষ্ট্রীয়তাকে স্বীকার করিয়া লয়, তবেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির অবস্থা বর্ত্তমানে যেরূপ তাহাতে ইংরেজ যে অশান্তির মূল কারণ দূর করিবার জন্য উৎসুক হইবে ইহা স্বাভাবিক।

পরলোকে সয়াজীরাও গাইকোয়াড়—

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বরোদার মহারাজ সয়াজীরাও গাইকোয়াড় পরলোক গমন করিয়াছেন। গাইকোয়াড় ভারতের সামন্ত নৃপতিবৃন্দের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিচক্ষণ নৃপতি ছিলেন। সামন্ত নৃপতিদের হাত-পা সকল দিক হইতেই বাঁধা। এইরূপ অবস্থার মধ্যেও মহারাজা সয়াজীরাও স্বাধীন-

সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনাধীনে বরোদা রাজ্যের অনেক রকম উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভারতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার রাজ্যের মধ্যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। এই বিষয়ে তিনি ব্রিটিশ ভারতকে অনেক ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। রাজ্যের অন্যান্য উন্নতিমূলক শাসনসংস্কারের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। বরোদা রাজ্যে শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগ হইতে পৃথক করা হয় তাঁহারই উদ্যমের ফলে। স্বীয় রাজ্যের ব্যাপার ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষের অনেক সমস্যা সমাধানের জন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯০২ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তৎসংশ্লিষ্ট বিখ্যাত স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনীতেও তিনি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিয়াও সকলকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে প্ররোচিত করেন। তাঁহার সেই বক্তৃতা সেই স্বদেশীর যুগে বাঙলাদেশে একটা নূতন আশা এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই বক্তৃতায় তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বলেন,—আমরা যদি জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলনই আমাদের সর্ব্বশেষ অবলম্বন। ১৯১৬ সালে দিল্লীতে ভারতীয় রাজন্যবর্গের যে সম্মেলন হয় তাহাতে বড়লাটের বক্তৃতার উত্তরে তিনি যাহা বলেন, তাহাতে ভারতের জাতীয় জাগরণ তাঁহার অন্তরেও যে কেমন সাড়া দিয়াছিল, তাহা কতকটা অভিব্যক্ত হয়। মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ভারতের সামন্ত নৃপতিবৃন্দের মধ্যে মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় ভারতের সর্ব্বত্র যে একটা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই বিশিষ্টতার মূলে, তাঁহার স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনচিত্ততা এই সব গুণ কার্য্য করিয়াছিল। কর্ত্তাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিও এই সব কারণে তাঁহার উপর কিছুদিন ছিল বলিয়া শুনা গিয়াছে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হইত, তাহা হইলে তাঁহার এই সব গুণ ভারতের রাষ্ট্রনীতিকে বিশিষ্ট রূপ দান করিতে সমর্থ হইত বলিয়া মনে হয়। নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াও গাইকোয়াড় তাঁহার জন্মভূমির জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার স্মৃতি স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, পরাধীন ভারতের সামন্ত নৃপতির পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

বাঙালী-বিহারী প্রশ্ন—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙালী-বিহারী প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান নির্ভর করিতেছে বিহার সরকারের উপর। ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব হইল—জাতীয়তার যে আদর্শের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, সেই দিক হইতে। বিহার সরকার যদি সেই গুরুত্বকে উপলব্ধি না করেন, তবে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের মধ্যেও এমন কতকগুলি ধারা আছে, যেগুলিকে সঙ্কীর্ণভাবে ঘুরাইয়া বাঁকাইয়া তাঁহারা এই সমস্যাকে আরও জটিল করিয়াও তুলিতে পারেন। এমন আশঙ্কার কারণ না ঘটে, এই আমাদের ইচ্ছা। পুরুলিয়ার বাঙালী সভার অভিযোগ অনুসারে জানা যাইতেছে যে, পুরুলিয়ার হাই স্কুলে বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বিশেষ শ্রেণী খুলিবার নিমিত্ত বাঙালীসমাজ হইতে আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও সেদিকে দৃকপাত করা হইতেছে না। তাহার ফলে স্কুলে বাঙালী ছাত্রেরা ভর্ত্তি হইতে পারিতেছে না। ওয়ার্কিং কমিটির আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার বাহন হইবে— "প্রদেশের ভাষা।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিষয়ে বিভ্রাট ঘটিবে। বিহারের যে অঞ্চলে বাঙলা ভাষা-ভাষীদের বাস, সে অঞ্চলের সব বিদ্যালয়েই বাঙলা ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়া কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যে ব্রেট সার্কুলার এবং বৈষম্যমূলক অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা বাঙালী সমাজের প্রতিবাদের কারণ হইয়াছিল, বিহার সরকার এ পর্য্যন্তও সেগুলি প্রত্যাহার করেন নাই। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে যদি বিহার সরকার এইরূপ মূল্যই দিয়া চলেন, তাহা হইলে বাঙালী-বিহারী সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। আমরা আশা করি, এখনও তাঁহাদের এ বিষয়ে চৈতন্য হইবে।

সম্মুখে সংগ্রাম—

আগাইয়া চল—ভারতের আত্মা হইতে আজ এই বাণী উত্থিত হইতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অন্তরকে সে বাণী চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তিনি দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ভুলিয়া যাও ক্ষুদ্র ভেদ-বিভেদের কথা। তিনি বলিতেছেন,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এক জঘন্য মূর্ত্তিতে আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ মূর্ত্তি হইল মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রভুত্ববাদের সহায়ক মূর্ত্তি, উহা সামন্ত রাজ্যসমূহে প্রজাদিগকে ক্রীতদাসের জীবনে আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছে। গান্ধীজী আজ মৃদু-কুসুমের মত, কিন্তু ভারত দৃঢ়কণ্ঠে এই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিতে দাঁড়াইয়াছে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই যে সংগ্রাম, এই সংগ্রামের তুলনায় অন্য সবই গৌণ। রাজকোট এই সাম্রাজ্যবাদের মুঠার মধ্যে পড়িয়াছে এবং মহনীয়া কস্তুরীবাঈ এই বৃদ্ধ বয়সে কারাগারে গমন করিয়াছেন। জয়পুর সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে, ভারতসেবক শেঠ যমুনালাল বাজাজকে দ্বিতীয়বারও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় তিনি জয়পুরে প্রবেশের জন্য উদ্যত। সংগ্রাম সহজে থামিবে না। উড়িষ্যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সামন্ত রাজ্যসমূহে অত্যাচার এবং দুর্নীতি বজায় রাখিবার জন্য সেনা সন্নিবেশ করিতেছে। ত্রিবাঙ্কুরে স্বৈরাচার ফ্যাসিষ্ট-মূর্ত্তি ধরিতেছে, সেখানেও সংগ্রাম আসন্ন। মহীশূরে পুনরায় সংগ্রামের সূচনা হইতেছে। হায়দরাবাদ এবং কাশ্মীরে জন-আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার অযৌক্তিক অছিলায় দলিত হইতেছে। 'ভারতের নর-নারী, উঠিয়া দাঁড়াও, বিজয়-যাত্রার সময় সমাগত।' ভারতের আত্মার এই আবাহন আজ কর্ম্মীকে নাচাইয়া তুলুক, জাগাইয়া তুলুক। জাতির স্বাধীনতার জন্য নিজকে উৎসর্গ করিবার এমন সুযোগ সব সময় আসে না।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(৬)

প্রথমেই আমাদিগকে দুইপ্রকার রাজনৈতিক সমুচ্চয়ের মধ্যে প্রভেদটি সুস্পষ্ট করিতে হইবে, আমাদের প্রচলিত ভাষায় সেই দুইটিকেই সাম্রাজ্য নামে অভিহিত করা হয়,—সমধর্ম্মী বা আধিজাতিক সাম্রাজ্য এবং অসমধর্ম্মী বা বিমিশ্র সাম্রাজ্য। এক হিসাবে সকল সাম্রাজ্যই হইতেছে বিমিশ্র, অন্তত তাহাদের উৎপত্তির কথা ধরিলে ইহাই বলিতে হয়; তথাপি যে সাম্রাজ্যিক সমুচ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত অংশগুলি পরস্পর হইতে পৃথক সত্তার তীব্র অনুভূতির দ্বারা বিভক্ত নহে এবং যাহার মধ্যে পার্থক্যের এইরূপ চেতনাগত ভিত্তি এখনও প্রবল রহিয়াছে, এতদুভয়ের মধ্যে কার্য্যত একটা প্রভেদ আছে। ফর্ম্মোজা ও কোরিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার পূর্ব্বে জাপান যেরূপ আধিজাতিক সমুচ্চয় ছিল তাহাতে তাহাকে কেবল সম্মানের খাতিরে নামে মাত্র সাম্রাজ্য বলা চলিত; ঐ অন্তর্ভুক্তকরণের পর সে একটি বাস্তব ও বিমিশ্র সাম্রাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মানী পুনরায় বিশুদ্ধভাবে আধিজাতিক সাম্রাজ্য হইয়া উঠিবে যদি তাহাকে তিনটি অপ্রধান অধিকৃত প্রদেশের, আলসাস্, পোলাণ্ড ও শ্লেজ্‌ভিগ্-হোল্‌স্তাইনের ভার বহন করিতে না হয়; এই তিনটি জার্ম্মানীর সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছে সামরিক শক্তির দ্বারা, জার্ম্মান আধিজাত্যবোধের দ্বারা নহে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, এই টিউটনিক সমুচ্চয় এই তিনটি বিদেশী অংশ হারাইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে অষ্ট্রিয়ার টিউটনিক প্রদেশগুলি লাভ করিবে তাহা হইলে আমরা একটি সমধর্ম্মী সমুচ্চয়ের দৃষ্টান্ত পাইব,* যেটি তখনও প্রকৃতপক্ষেই সাম্রাজ্য থাকিবে, শুধুই সম্মানসূচক নামে নহে, কারণ সেইটি হইবে সমধর্ম্মী টিউটনিক জাতি সকলের (উপজাতি সকলের Subnations বলিলেই সুবিধা হয়) বিমিশ্র সমুচ্চয়, তাহারা স্বভাবত সম্বন্ধচ্ছেদের ভাব পোষণ করিবে না, বরঞ্চ সর্ব্বদা স্বাভাবিক ঐক্যের দিকে আকর্ষিত হইয়া সহজে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে একটা চৈতন্যমূলক সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবে, কেবল রাজনৈতিক সমুচ্চয় নহে।

কিন্তু এইরকম গঠন বিশুদ্ধতায় পাওয়া এখন দুষ্কর। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এইরূপ সমুচ্চয়ের একমাত্র দৃষ্টান্ত, তবে আমরা এইরূপ সমুচ্চয়কে সাম্রাজ্য নাম দিই না, কারণ ঘটনাক্রমে সেখানে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে নির্ব্বাচিত প্রেসিডেন্টের দ্বারাই শাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে; বংশগত রাজার দ্বারা নহে। তথাপি যদি সাম্রাজ্যিক সমুচ্চয়কে রাজনৈতিক ঐক্য হইতে চৈতন্যমূলক ঐক্যে পরিণত হইতে হয়, তাহা হইলে মনে হয় যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতই কোন ব্যবস্থা আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। ঐ অবস্থায় প্রত্যেক অংশই নিজের স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য এবং পৃথক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে অথচ এক প্রকৃতভাবে অচ্ছেদ্য সমুচ্চয়ের অঙ্গ হইয়া থাকিবে; আর ইহা খুবই সহজে সংসাধিত হইবে সেইসকল স্থলে যেখানে অংশগুলি অনেকটা সমধর্ম্মী, যেমন গ্রেট্ ব্রিটেন এবং তাহার উপনিবেশগুলির সংহতি।

এইরূপ বৃহৎ সমধর্ম্মী সমুচ্চয় গঠনের প্রবৃত্তি অধুনা রাজনৈতিক চিন্তাধারায় দেখা দিয়াছে, যথা নিখিল জার্ম্মান মহাসাম্রাজ্য, রুশ ও নিখিল শ্লাভ্ মহাসাম্রাজ্য, জগতের সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া নিখিল মোস্‌লেম জগৎ—এইরূপ সব মহাসাম্রাজ্যের স্বপ্ন। কিন্তু এইরূপ প্রবৃত্তির সহিত সাধারণত জড়িত থাকে এই সমধর্ম্মী সমুচ্চয়ের দ্বারা অন্য অসমধর্ম্মী অংশ সকলকেও প্রাচীন সামরিক ও রাজনৈতিক বিধান অনুসারে শাসন করিবার প্রয়াস—যেমন রুশিয়া কর্ত্তৃক মোঙ্গোলিয়ান প্রজা সকলকে অধীনস্থ করিয়া রাখা, জার্ম্মানী কর্ত্তৃক অ-জার্ম্মান দেশ ও প্রদেশ-সকলকে সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে বলপূর্ব্বক অধিকার, খলিফা কর্ত্তৃক অ-মুসলমান প্রজার উপর আধিপত্য। আর যদিই এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা না থাকিত তাহা হইলেও জগতের বাস্তব বিন্যাস যেরূপ তাহাতে জাতিগত বা কৃষ্টিগত ভিত্তিতে তাহার পুনর্বিন্যাস কঠিন হইত। এইরূপ বিরাট সমুচ্চয় সকল তাহাদের রাজ্যের পরিবেষ্টনের মধ্যে এমন সব স্থান পাইত যেখানকার অধিবাসীরা তাহাদের সহিত সম্পূর্ণভাবে অসমধর্ম্মী বা বিমিশ্র। অতএব সমধর্ম্মী আধিজাতি সকলের পক্ষে তাহাদের সমাদৃত আধিজাত্য পরিত্যাগ করা এবং এই প্রকারের সমুচ্চয়ের মধ্যে নিজদিগকে মজ্জিত করিয়া দেওয়ায় যে বাধা ও আপত্তি তাহা ছাড়াও এই সব বিমিশ্র বা অসমধর্ম্মী অংশ-সকল যে আদর্শ ও কৃষ্টি তাহাদিগের স্বাঙ্গীভূত করিতে চাহিতেছে তাহার প্রতি বিরুদ্ধ হওয়ায় বৈষম্যের সৃষ্টি করিত। এই-রূপ নিখিল-স্লাভ্ সাম্রাজ্যের জন্য প্রয়োজন হইত প্রধান স্লাভরাষ্ট্র রুশিয়া কর্ত্তৃক বল্‌কান উপদ্বীপের শাসন; কিন্তু এইরূপ পরিকল্পনাকে যে কেবল সার্বিয়ান আধিজাত্য এবং বুল্‌গারের অসম্পূর্ণ স্লাভত্বের বাধা অতিক্রম করিতে হইত শুধু তাহাই নহে, পরন্তু সম্পূর্ণভাবে বিসদৃশ রুমানিয়ান, গ্রীক্ ও আল্‌বানিয়ান জাতি-সকলের সম্মুখীন হইতে হইত। অতএব বিরাট সমজাতিক সমুচ্চয় গঠনের দিকে এই যে প্রবৃত্তি, যদিও ইহা কিছুকাল জগতের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এখনও অবসন্ন এবং চরমভাবে ব্যর্থ হয় নাই, ইহাই যে প্রকৃত সমাধান হইয়া উঠিবে তাহা মনে হয় না; কারণ যদিই ইহা জয়ী হয়, তাহা হইলেও ইহাকে বিবিধ জাতিক সমুচ্চয়ের আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলির অল্পাধিক সম্মুখীন হইতে হইবে। অতএব সাম্রাজ্য গঠনের প্রকৃত সমস্যাটি থাকিয়াই যাইতেছে—জাতীয় গঠন, ভাষা ও কৃষ্টিতে

---

* গত ইউরোপীয় যুদ্ধ শ্রীঅরবিন্দের এই অনুমানটিকে অনেকখানি কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। শ্লেজ্‌ভিগ্ হোল্‌স্তাইন্ (Schleswig Holstein) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ডেন্‌মার্কের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ১৯২০ সালে জার্ম্মানী উহা প্রত্যার্পণ করিয়াছে। আল্‌সাস্ ও পোলাণ্ডের কথা ইতি-পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে অষ্ট্রিয়া

অসমধর্ম্মী বিবিধ-জাতিক সাম্রাজ্যের যে কৃত্রিম রাজনৈতিক ঐক্য তাহাকে কেমন করিয়া বাস্তব ও চৈতন্যমূলক ঐক্যে পরিণত করা যায়।

ইতিহাস আমাদিগকে এই সমস্যা সমাধান-প্রয়াসের একটিমাত্র মহান্‌ ও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়াছে, সে প্রয়াস যেরূপ বিস্তৃত পরিধিতে এবং যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থানিচয়কে লইয়া হইয়াছে, কেবল তাহা হইতেই বর্ত্তমানে যে সব বৃহৎ বিবিধ-জাতিক সাম্রাজ্য—রুশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের কিছু দিশা মিলিতে পারে। পঞ্চ অধিজাতিকে লইয়া যে চীনা সাম্রাজ্য, তাহা চমৎকারভাবে সংগঠিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তথাপি সেইটি বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল নহে, কারণ তাহার অন্তর্ভুক্ত অংশগুলি সকলেই ছিল জাতিতে মোঙ্গোলিয়ান, অতএব কৃষ্টিগত কোনরূপ দুরতিক্রম্য বাধা ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রোমকে মূলত আধুনিক সমস্যাগুলিরই সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল—কেবল দুই একটি অতি বিশিষ্ট জটিলতা তখনও দেখা দেয় নাই—এবং কতদূর পর্য্যন্ত সে চমৎকার কৃতিত্বের সহিত ঐ সব সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। তাহার সাম্রাজ্য বহু শতাব্দী ধরিয়া স্থায়ী হইয়াছিল, এবং যদিও প্রায়ই ধ্বংসের আশংকা হইয়াছে তথাপি তাহার আভ্যন্তরীণ ঐক্যসূত্রের দ্বারা, তাহার অপ্রতিরোধ্য কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণের দ্বারা সে সমস্ত ধ্বংসমুখী প্রবৃত্তিকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার একটি অকৃতকার্য্যতা ছিল পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাম্রাজ্যের দ্বিধা বিভাগ এবং ইহাই তাহার চরম ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। তথাপি যখন সেই অন্ত আসিল, তাহাও ভিতর হইতে ধ্বংসের দ্বারা হইল না, পরন্তু কেবল জীবন কেন্দ্রের জীর্ণতার দ্বারাই তাহা ঘটিল, আর যতক্ষণ না তাহা হইয়াছিল ততক্ষণ বাহির হইতে বর্ব্বর জাতির আক্রমণ তাহার চমৎকার সংহতত্বের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে সক্ষম হয় না; ঐ আক্রমণকেই যে রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ বলা হয় সেটা ভুল।

রোমানরা সামরিক বিজয় এবং সামরিক উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারাই তাহাদের শাসন বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু একবার সেই বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাহারা আর সেইটিকে একটা কৃত্রিম রাজনৈতিক ঐক্যরূপে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াই সন্তুষ্ট হয়-নাই, আর অর্থনীতি ও শাসন-নির্ব্বাহের দিক দিয়া কল্যাণকর যে উত্তম, সুদক্ষ ও সুব্যবস্থিত শাসন-প্রণালী বিজিত জাতি সকলের নিকট সেইটিকে প্রথমত গ্রহণীয় করিয়াছিল, সেই রাজনৈতিক সুবিধাজনক ব্যবস্থার উপরেও তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে নাই; তাহাদের রাজনৈতিক সহজবোধ এমন ভ্রান্ত ছিল না যে, এত সহজেই তাহা তৃপ্ত হইবে। আর ইহাও নিশ্চিত যে, যদি তাহারা সেইখানেই বিরত হইত তাহা হইলে সাম্রাজ্যটি আরও অনেক পূর্ব্বেই ভাঙিয়া পড়িত, কারণ তাহাদের শাসনাধীন লোকসমূহ নিজেদের স্বতন্ত্র আধিজাত্যের বোধ বজায় রাখিত এবং একবার রোমান সুদক্ষতা এবং শাসননির্ব্বাহক সংগঠনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে তাহারা স্বাধীন সম্মবদ্ধ অধিজাতিরূপে ঐ সকল সুবিধা স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিত। এই যে স্বতন্ত্র আধিজাত্যের বোধ, রোমান শাসন যেখানেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সেইখানেই এইটিকে লুপ্ত করিয়া দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। আর সে ইহা করিত নির্ব্বোধ টিউটনিক প্রথা অনুযায়ী পাশবশক্তি প্রয়োগের দ্বারা নহে, পরন্তু নিরুপদ্রব চাপের দ্বারা। যে একটিমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্টি তাহার নিজের কৃষ্টি অপেক্ষা কোন কোন অংশে উৎকৃষ্ট ছিল, রোম সেইটিকে নিজ কৃষ্টিগত জীবনের একটি অংশ করিয়া লইয়া, এমন কি ইহার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশই করিয়া লইয়া তাহার সহিত প্রথমেই মীমাংসা করিয়া লইয়াছিল। সে এক গ্রীকো-রোমান সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং পূর্ব্বদেশে তাহা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার ভার গ্রীক ভাষার উপরেই ছাড়িয়া দিয়া অন্যস্থানে তাহাকে সে ল্যাটিন ভাষা এবং ল্যাটিন শিক্ষাদীক্ষার সাহায্যে উপস্থাপিত করিয়াছিল এবং গল্‌ ও তৎকর্ত্তৃক বিজিত অন্যান্য প্রদেশ সকলের অবনতিশীল ও অবিকশিত কৃষ্টিকে নিরুপদ্রবে পরাভূত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তবে ইহাও হয়ত সকল স্বাতন্ত্র্যমুখী প্রবৃত্তিকে লুপ্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইত না। সেইজন্যই সে তাহার সকল ল্যাটিন-ভাবাপন্ন প্রজাকে উচ্চতম সামরিক ও বে-সামরিক চাকুরীতে, এমন কি সম্রাটের আসনেও প্রবেশাধিকার দিয়াছিল। তাই অগস্টাসের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে প্রথমে একজন ইতালীয় গল্‌ এবং পরে একজন আইবেরিয়ান্‌ স্প্যানিয়ার্ড সীজারের নাম ও ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিল; শুধু তাহাই নহে, সে যে-সব বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট নাগরিক অধিকার ও সুবিধা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিল, সে সবকেই কার্য্যত নাকচ করিতে, এমন কি নামতঃও উঠাইয়া দিতে খুবই দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল এবং তাহার সমস্ত এশিয়ান, ইউরোপীয়ান ও আফ্রিকান প্রজাকে পূর্ণ রোমান নাগরিক অধিকার প্রদান করিয়াছিল।

পরিণাম হইয়াছিল এই যে, সমগ্র সাম্রাজ্যটি চৈতন্যগতভাবে এক গ্রীকো-রোমান সম্মিলনী হইয়া উঠিয়াছিল, শুধুই রাজনৈতিকভাবে নহে, শুধুই উচ্চতর শক্তি বা রোমান শান্তি ও সুশাসনে সম্মতি নহে, পরন্তু প্রদেশগুলির সকল বাসনা-কামনা, ভাব-সাদৃশ্য, গর্ব্ব, কৃষ্টিগত সম্বন্ধ, তাহাদিগকে সাম্রাজ্যটির রক্ষার প্রতি দৃঢ়ভাবে আসক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্যই কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা সামরিক নেতা কর্ত্তৃক নিজেদের স্বার্থে প্রাদেশিক সাম্রাজ্য আরম্ভ করিবার প্রয়াস কৃতকার্য্য হয় নাই। কারণ যে জনসাধারণের উপর এইরূপ প্রয়াসের স্থায়ী কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে, তাহাদের মধ্যে ইহার কোন ভিত্তি, কোন সমর্থনপ্রবৃত্তি, কোন আধিজাত্যমূলক ভাব অথবা ঐ পরিবর্ত্তনের দ্বারা কোন বৈষয়িক বা অন্য সুবিধা লাভের সম্ভাবনাবোধ ছিল না। এ পর্য্যন্ত রোমানরা কৃতকার্য্য হইয়াছিল; তাহারা যেখানে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহার কারণ ছিল তাহাদের প্রণালীর একটি মজ্জাগত দোষ। তাহারা যে সকল অধিজাতির উপর আধিপত্য করিত, যত নিরুপদ্রবেই হউক না কেন, তাহাদের জীবন্ত কৃষ্টি বা অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করিয়া দেওয়ায় তাহারা ঐ অধিজাতিগুলির জীবনী শক্তিই নষ্ট করিয়া দিয়াছিল এবং সেইজন্যই যদিও

তাহারা সাম্রাজ্যটি ভাঙিয়া পড়িবার প্রত্যক্ষ কারণগুলি দূর করিয়াছিল এবং সকল ধ্বংসমুখী পরিবর্ত্তনের বিরোধী প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তথাপি তাহাদের সাম্রাজ্যটির জীবন্ত প্রতিষ্ঠা ছিল কেবল কেন্দ্রে; যখন সেই কেন্দ্রটি অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন আর সমগ্র শরীরের মধ্যে এমন কোন প্রত্যক্ষ ও প্রচুর জীবনীশক্তি ছিল না, যাহা হইতে সে নিজেকে পুনরায় পূর্ণ করিয়া লইতে পারিত। এমন কি রোম যে জনগণের জীবনীশক্তি এক ধার-করা সভ্যতার চাপে পিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, শেষকালে তাহাদের মধ্য হইতে যথেষ্ট-সংখ্যক শক্তিশালী ব্যক্তিও পায় নাই; তাহাকে সীমান্তবর্ত্তী বর্ব্বরদের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। আর যখন সে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল, ঐ সকল বর্ব্বর জাতিই তাহার উত্তরাধিকারী হইল, পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন জাতিগুলি নহে। কারণ তাহাদের বর্ব্বরতা অন্তত একটা প্রাণবন্ত শক্তি ছিল, জীবনের নীতি ছিল, কিন্তু গ্রীকো-রোমান সভ্যতা মরণের নীতি হইয়া পড়িয়াছিল; আর যে সকল জীবন্ত কৃষ্টির সংস্পর্শে সে নিজেকে সংশোধিত ও পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিত, তাহাদিগকেও সে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। অতএব তাহার আকারকে ধ্বংস করা প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তাহার নীতিকে মধ্যযুগীয় জীবনের প্রাণবন্ত ও তেজস্বী কৃষ্টির ক্ষেত্রে নূতন করিয়া বপন করিতে হইয়াছিল। তাহাদের সংগঠিত সাম্রাজ্যের দ্বারা যে কার্য্য সংশোধন করিবার উপযোগী জ্ঞান রোমানদের ছিল না—কারণ গভীরতম ও নিশ্চিততম রাজনৈতিক সহজবোধও (Political instinct) প্রকৃত জ্ঞান নহে—তাহা নিজে প্রকৃতিকেই মধ্যযুগের নিখিল খৃষ্টীয় রাজ্যের শিথিল অথচ জীবন্ত ঐক্যে সংসাধন করিতে হইয়াছিল।

তখন হইতে চিরদিনই রোমের দৃষ্টান্ত ইউরোপের রাজনৈতিক কর্ম্মধারাকে প্রভাবিত করিয়াছে; উহা যে কেবল শার্লামেনের (Charlemagne) হোলী রোমক সাম্রাজ্য এবং নেপোলিয়ানের বিরাট প্রয়াস এবং জার্ম্মানদের টিউটনিক দক্ষতা ও টিউটনিক কৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন—এই সবেরই পশ্চাতে ছিল তাহা নহে, পরন্তু ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি সকল সাম্রাজ্যবাদী জাতিই কিয়ৎপরিমাণে উহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা খুবই অর্থসূচক যে, রোমান সফলতার পুনরাবৃত্তি করিবার সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়াছে। রোম যে-সব ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, আধুনিক জাতিগুলি সম্পূর্ণভাবে তাহাদের অনুসরণ করিতে পারে নাই, অথবা অনুসরণ করিয়াও বিভিন্ন পরিস্থিতি সকলের সহিত দ্বন্দ্বে পড়িয়াছে এবং হয় অকৃতকার্য্য হইয়াছে অথবা সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছে। প্রকৃতি যেন বলিয়াছে, "ঐ পরীক্ষা একবার তাহার যথাসংগত পরিণতি পর্য্যন্ত সমাধিত হইয়াছে এবং একবারই যথেষ্ট। আমি নূতন অবস্থানিচয়ের সৃষ্টি করিয়াছি; তোমাদিগকে এখন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিতে হইবে, অন্ততঃপক্ষে পুরাতন প্রণালীটির যেখানে ত্রুটি ছিল, যেখানে সে ভুল পথ ধরিয়াছিল, সেখানে তাহার সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া লইতে হইবে।" (ক্রমশঃ)

প্রভেদ

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

তোমাদের ঘরে বিজলীর বাতি জ্বলিছে রাত্রি দিন,
বহিছে শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর নিত্য ফ্যানের হাওয়া;
আমাদের ঘরে মিটিমিটি জ্বলে মাটির প্রদীপ ক্ষীণ
উত্তরী বায়ে ভয়ে কেঁপে লাজে ক্ষণিকে নিভিয়া যাওয়া।

তোমাদের ঘরে দিনে দিনে কত রেডিও গ্রামোফোন
প্রেমিক প্রেমিকে জড়ায়ে আপনি বেজে ওঠে সুরে তালে,
আমাদের ঘরে হাসি কান্নার হাজারো প্রস্রবণ
বন্যার মত ছুটিয়া চলিছে দিনে দিনে কালে কালে।

তোমরা যখন আসরে বসিয়া হাসি লহরী তুলি'
ব্যাণ্ডের তালে নাচো আর গাও প্রাণের প্রেয়সী সনে,
আমাদের ঘরে রোগীর শিয়রে বিশ্বেরে যেয়ে ভুলি'
একা জাগে নারী দিবস রজনী আপনি সুনির্জ্জনে।

হাজার নিন্দা ভ্রূকুটির ভয়ে আমরা মরিয়া যাই,
বুভুক্ষিতের জ্বালা স'য়ে স'য়ে ভেঙে আসে দেহ-প্রাণ;
তোমাদের তাতে এতটুকুনও প্রাণের দরদ নাই,
আমরা কাঁদিয়া ম'রে যাই আর তোমরা গাও সে গান॥

বিশ্ব-রাজনীতির গতি কোন দিকে?

বার্সিলোনার পতনে বিভিন্ন দেশের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। ইহার পর সপ্তাহাধিক কাল অতীত হইয়াছে। স্পেন রিপাব্লিকের প্রধান মন্ত্রী সেনর নেগ্রিন বার্সিলোনার পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে বিবৃতি দান করিয়াছিলেন তাহার সত্যতা পরে অনুভূত হইয়াছে। ইটালীয়ানদের সাহায্যে ফ্রাঙ্কো-বাহিনী দ্রুত উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে সত্য এবং নূতন রাজধানী ফিগারাসও দখল করিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও স্পেন সরকারকে নির্ম্মূল করিতে পারে নাই। মন্ত্রিসভা মাদ্রিদে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন, প্রেসিডেণ্ট আজানা নাকি প্যারিস যাত্রা করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব স্পেনের একটি বিস্তৃত অংশ এখনও স্পেন গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তে আছে। তবে ফ্রাঙ্কো-বাহিনী যেরূপ দ্রুত চারিদিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে স্পেন গবর্ণমেণ্টের পতন হইতে হয়ত বেশী বিলম্ব হইবে না।

এই সময়, যখন স্পেন গণতন্ত্রের দ্রুত পতনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তখন কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান নেতা বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে কতকটা আভাষ দিয়াছি। বর্ত্তমানেও এই বিষয়ে কিছু বলিব। এই সব রাষ্ট্রনেতার ভাষণে কিন্তু স্পেনকে তথা স্পেন-গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা করা সম্বন্ধে কোন কথাই নাই, বরং কাহারও কাহারও বক্তৃতায় তাহার শীঘ্র নিপাত যাহাতে হয় তাহারই কামনা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। স্পেনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়, শুধু ইউরোপীয় কেন, বিশ্ব-রাজনীতিতেও যে একটা নূতন অধ্যায় উপস্থিত হইবে বিশেষজ্ঞগণ ইতিমধ্যেই সে বিষয়ে আঁচ করিতেছেন।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের একটি বক্তৃতার আলোচনা আগে করিয়াছি; যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ভাষণও উক্ত আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। ইহার পর এই দুই রাষ্ট্র-নেতার আরও বক্তৃতা হইয়াছে। প্রথম, মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বক্তৃতা দিয়াছেন বৃটিশ হাউস অফ্ কমন্সে, দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বক্তৃতা করিয়াছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারী কমিশনের সম্মুখে। স্পেন সম্পর্কে চেম্বারলেন মহোদয় পুরান বুলিই আওড়াইয়াছেন, অর্থাৎ নিরপেক্ষতা কমিটি স্পেনে একটি আসন্ন মহাসমর সংঘটিত হইতে দেয় নাই বলিয়া তাহার মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসাই করিয়াছেন। রুজভেল্ট সাধারণভাবে পাশ্চাত্য ডিমোক্রাসি বা গণতন্ত্রগুলি রক্ষায় আত্ম-নিয়োগের কথা বলিলেও স্পেন সম্পর্কে তাঁহার ভাষণে কোন কথাই উত্থাপিত হয় নাই। তাঁহার উপর ইটালী ও জার্ম্মানীর ডিরেক্টরদ্বয় ও তাঁহাদের অনুচরবর্গ আগে হইতেই বিরূপ। এবারকার একটি কথায় তাঁহারা রুজভেল্টের উপর নাকি চটিয়া আগুন হইয়াছেন। গণতন্ত্রগুলিকে রক্ষা করা প্রসঙ্গে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন ফ্রান্সের সীমান্তই আমেরিকার সীমান্ত! এই কথায় ফ্রান্সে ও বৃটেনে যেমন উল্লাস প্রকাশ পাইয়াছিল, ইটালী ও জার্ম্মানীতে ততোধিক ক্রোধের সঞ্চার হয়। ইহা লইয়া ঐ দুই দেশে তীব্র সমালোচনাও হইয়া গিয়াছে। রুজভেল্ট মহোদয় সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, তিনি ওরূপ কথা বলেন নাই। তবে তিনি যে আসন্ন বিপদে ডিমোক্রাসিগুলিকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন এরূপ কথা জোরের সঙ্গেই আবার বলিয়াছেন।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে হিটলারের বক্তৃতার আভাষ মাত্র দিতে পারিয়াছিলাম। গত ৩০শে জানুয়ারী জার্ম্মানীতে নাৎসী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে নবলব্ধ রাজ্যগুলি সমেত সমগ্র জার্ম্মানীর প্রতিনিধিবে রাইখ্‌ষ্টাগে সমবেত করান হইয়াছিল। হিটলার তাঁহাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার এক স্থলে বলিয়াছেন যে, তিনি দীর্ঘকাল স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা রাখেন। কিন্তু যে ভাবে এই আশা কার্য্যে ফলাইবার আভাষ দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় শান্তির চেয়ে অশান্তির উদ্ভবই হইবে বেশী। তিনি জার্ম্মানীর জন্য এমন সব দেশ বা ভূখণ্ড চান যেখান হইতে কাঁচা মাল আহরণ করা হইবে তাহার পক্ষে সুবিধা, আবার যেখানে তাহার কারখানাজাত শিল্প-দ্রব্যাদির প্রচুর কাট্‌তি হওয়াও সম্ভব। জার্ম্মানীর অস্তিত্বের বা বাঁচিয়া থাকার পক্ষে আজ ইহার যেমন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, এমনটি কখনও নাকি হয় নাই। কাজেই আজই ইহার সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলিরও চেষ্টিত হওয়া উচিত নহিলে ফল কিরূপ হইবে সহজেই অনুমান করা যায়। অষ্ট্রিয়া ও চেকো-শ্লোভাকিয়ার অংশ যেমন বিনা যুদ্ধে হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আগেকার উপনিবেশগুলিও সেইরূপ আয়ত্তে আনিতে পারিবেন—তিনি এইরূপ আশা রাখেন। কেন তিনি এইরূপ আশা করিতেছেন তাহার আভাষ আপনারা ইতপূর্ব্বে কতকটা পাইয়াছেন। মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে তাঁহার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করিবে এমন কেহ নাই। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিও বহাল রাখা হইয়াছে। অন্যবিধ চুক্তির আভাষ আগে যেরূপ দিয়াছিলাম, সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ তাহার আশা নিতান্তই কম। তথাপি হিটলার নিজেকে যে ঐ অঞ্চলে নিরাপদ মনে করিতেছেন অনায়াসেই তাহা ধরিয়া লওয়া যায়। হিটলার আরও আশা করেন যে, স্পেনে যেরূপ দ্রুত বিদ্রোহীরা জয়লাভে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে তাঁহার দাবী পূর্ণ হইবার পথ পরিষ্কার হইয়াই যাইবে। কারণ স্পেনে বিদ্রোহীদের জয় মানে তাহাদেরই—ইটালী-জার্ম্মানীরই জয়! হিটলার সুবোধ বালকের মত আর একটি কথা বলিতেও কিন্তু ভুলেন নাই। তিনি নিজে তাঁহার দাবী পূরণের জন্য যুদ্ধে নামিবেন না! তবে ইটালীর সঙ্গে যদি কাহারও যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে তিনি সর্ব্বতোভাবে ইটালীর পক্ষেই যোগদান করিবেন। হিটলার আরও একটি বিষয়ের উপর নাকি খুবই জোর দিয়াছেন। পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপ তাঁহারই আওতার মধ্যে থাকিবে। এখানে ফ্রান্স বা ব্রিটেন যেন মাথা গলাইতে না আসে। একথাটিও বড়ই গুরুত্বপূর্ণ।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মুসোলিনী ফাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলে বক্তৃতা করিয়াছেন। নানা দিক হইতে এই বক্তৃতাটি নাকি

উপনিবেশ খানিকটা দাবী করিয়া ইটালীতে জোর আন্দোলন চালিয়াছিল। এখনও তাহা ক্ষান্ত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে মুসোলিনীও এক বক্তৃতায় ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। চেম্বারলেন-মুসোলিনী সাক্ষাৎকারের সময়ও এ বিষয় কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বক্তৃতায় মুসোলিনী দাবী পেশ করা দূরে থাকুক ইহার উল্লেখটি পর্য্যন্ত করেন নাই। কেন তিনি উল্লেখ করেন নাই তাহার বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নাই। স্বতঃই বুঝা যায় যে, স্পেনে আধিপত্য বিস্তারের উপরই তিনি সম্প্রতি মন নিবিষ্ট করিয়াছেন। আর মিঃ চেম্বারলেনেরও হয়ত ইহাতে পরোক্ষ সম্মতি পাইয়াছেন! মুসোলিনী জোর গলায়ই বলিয়াছেন যে, স্পেনে বিদ্রোহী পক্ষের জয় অর্থ ইটালীর জয়! স্পেন হইতে ইটালীয়ান সৈন্য তখনই তিনি সরাইয়া লইবেন যখন তিনি দেখিবেন ফ্রাঙ্কো সেখানে পূর্ণভাবে জয়লাভ করিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে নহে। স্পেনে ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করিলে ইটালীর প্রভাব সেখানে কিরূপ পড়িবে তাহা লইয়া এখন আন্তর্জ্জাতিক মহলে বেশ কিছু আলোচনা সুরু হইয়াছে। কেহ বলেন, ফ্রাঙ্কো হইবে তখন মুসোলিনীর হাতের পুতুল। ইংরেজ কিন্তু ইহা বিশ্বাস করে না। বৃটিশ ধনিকগণ তথা শাসকবর্গ মনে করেন, টাকা দিয়াই ফ্রাঙ্কোকে হাত করা যাইবে। চেম্বারলেন মুসোলিনীকে যে স্পেন সম্পর্কে 'শাদা-চেক' দিয়াছেন তাহার মূলেও এই মনোভাব কার্য্য করিতেছে বলিয়া অনুমান হয়। দূরদর্শী রাজনীতিকের মত মুসোলিনী অন্য 'ইস্যু' বা বিষয় এ বক্তৃতায় উপস্থিত করেন নাই, তাঁহার মুখে খালি এক কথা—স্পেনে বিদ্রোহীদের জয়লাভ চাই-ই। তবে তিনি নূতন বন্ধু জার্ম্মানীকে আশ্বাস দিতে ভুলেন নাই। আপদে-বিপদে তিনি তাহার সহায় হইবেন, এরূপ অস্পষ্ট ধোঁয়াটে কথা বলিয়া তিনি থামিয়া যান নাই। জার্ম্মানীর উপনিবেশের দাবী তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবেন বলিয়াছেন। হিটলার ত ইতিপূর্ব্বেই ইটালীর সমর্থনে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে যুক্তি করিয়াই উভয় ডিক্টেটর এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন কি না কে জানে!

ওদিকে পূর্ব্ব এশিয়ায়ও গত সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। চীনে জাপান যে অধিক দূরে অগ্রসর হইয়া সেখানকার বিদেশী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ইহার প্রতিবাদে স্বতন্ত্রভাবে জাপ-সরকারে 'নোট' প্রেরণ করিয়াছেন। জাপান ইহার কি জবাব দিবে এখনও প্রকাশ পায় নাই! তবে ইহাদের খুশী করিবার জন্য যে সেও নানা উপায় খুঁজিতেছে তাহা সম্প্রতিকার একটি সংবাদে স্পষ্ট করিয়া বুঝা গিয়াছে। জাপান পররাষ্ট্র-সচিব আরিতা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণকে লইয়া শীঘ্রই একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে এবং তাহাতে চীন অভিযানে জাপানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে! চীনে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে হইলে বিদেশীদেরও স্বমতে আনয়ন করিতে হইবে, এতদিনে জাপ-সরকার এই সত্যটি বোধ হয় আবিষ্কার করিয়াছে। জাপান শুধু চীন লইয়াই বিরত হইয়া পড়ে নাই। উত্তরে সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গেও তাহার ছোট-খাট লড়াই গত কয়েক বৎসর যাবৎ যেন লাগিয়াই আছে। আর মাঞ্চুকুও সীমান্তেই এই সংঘর্ষ হইতেছে সকলের চেয়ে বেশী।

যদিও রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে শান্তির বুলি অহরহ শুনা যাইতেছে, তথাপি বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থসংঘাত অচিরেই একটা রীতিমত সংগ্রামে পরিণত হইবে। অনেক দিক হইতেই অনেকে যুদ্ধের জন্য পায়তারা কষিতেছে। কিন্তু আজই যেন ইহার সম্ভাবনা বেশী করিয়া দেখা যাইতেছে। কেহ কেহ যুদ্ধের কাল নির্ণয়ও করিয়াছেন। ইউরোপে শীতাধিক্য বশত ফেব্রুয়ারী মাসে যুদ্ধ বাধা সম্ভব নহে, এপ্রিল কি মে মাসে হইবে—এরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণীও কেহ কেহ করিয়াছেন। আমরা জনসাধারণ এরূপ উক্তিতে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইব। কিন্তু সব বিষয় একটু তলাইয়া দেখিলে বিস্ময়ের কারণ খুব কমই থাকে। তবে একথা নিশ্চয় করিয়া এখনও বলা ঠিক হইবে না যে, অমুক মাসে অমুক তারিখে যুদ্ধ বাধিবেই। ইউরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশেই এক সময়ে ইংরেজ পারতপক্ষে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইবে না, হইতে চাহিবে না বলিয়াই মনে হয়। কারণ তাহা তাহার স্বার্থের ঘোর বিরোধী। তবে সে যখন মনে করিবে, উভয়ত্রই শত্রুর বিরুদ্ধে সমভাবে যুঝিবার শক্তি সে অর্জ্জন করিয়াছে, তখন হয়ত যুদ্ধে নামিতে বিলম্ব করিবে না।

নানা কারণে বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতি আজ সাধারণের নিকট গূঢ় রহস্যপূর্ণ প্রতীত হইতেছে। একদিকে ডিক্টেটরদের ক্ষুধা প্রশমনে তথা শান্তি প্রতিষ্ঠায় বৃটিশ ধুরন্ধরগণ ব্যস্ত, অন্য দিকে দেশের রণসম্ভার বৃদ্ধির জন্য, আসন্ন মহাসমরে সার্থকভাবে লড়িবার জন্য বিশেষ তৎপর হইয়া পড়িয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যসব 'ক্ষুদে' মন্ত্রী পর্য্যন্ত দেশের নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের রণ-সম্ভার এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এখন তাহারা যে-কোন শত্রুর সম্মুখীন হইবার যোগ্য! গতকল্যকার সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ সরকার কলিকাতায় বিশ কোটি 'স্যাণ্ডব্যাগ' বা বালির থলের অর্ডার পেশ করিয়াছেন। পাট হইতে এই সব থলে প্রস্তুত হইবে বলিয়া কলিকাতার উপরে এইরূপ সু-নজর পড়িয়াছে! ফ্রান্স হইতেও নাকি এইরূপ অর্ডার শীঘ্রই আসিবে। কাজেই ইহারা মুখে এক কথা বলিলেও কাজে বিপরীত পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। এখন স্পেনে ইটালীর প্রভাব কিরূপ হইবে তাহাই যেন ইহারা পরখ করিয়া দেখিবার অপেক্ষায় আছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

শনিবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের জলপাইগুড়ির অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেনঃ—

বাংলার বৈশিষ্ট্য

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন বাংলার রাজনৈতিক কর্ম্মীদের মুখপাত্র। উহার প্রথম উদ্দেশ্য, বাংলার কথা ভারতবর্ষের সম্মুখে—শুধু ভারতবর্ষের সম্মুখে বলি কেন, সমস্ত জগতের সম্মুখে—উপস্থাপিত করা ও উহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, উপস্থিত রাজনৈতিক অবস্থার বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের নীতি ও পদ্ধতি নিরূপণ করা। এই সকল ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি শুধু বাংলার সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, বাহিরের কথাও ভাবিতে হইবে। ভারতবর্ষ দ্রুতগতিতে ঐক্যের দিকে চলিয়াছে, বহু শত বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের আরম্ভ কালে যে ঐক্যের সূচনা হইয়াছিল, যে ঐক্য যুগে যুগে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ভার আমাদের উপর। এই ঐক্য কংগ্রেসের একটি প্রধান লক্ষ্য। বাঙালী অ-বাঙালী নির্ব্বিশেষে সকলকেই এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার জন্য বাঙালীর যে নিজস্বতা বা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বিসর্জ্জন দিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, উহার মধ্যে সামাজিক ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব খুবই স্বাভাবিক। এই বিভেদকে আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের হিসাবে বাদ দেওয়া হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেশনই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের রূপ, এ বিষয়ে কোথাও মতভেদ নাই। এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অংশকে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে দেওয়া হইবে—শুধু বজায় রাখিতেই নয়, স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া নিখিল ভারতীয় সভ্যতার একটা বিশেষ রূপ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে দেওয়া হইবে, এই নীতি কংগ্রেস কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। ঐক্যের মধ্যে বিচিত্রতা ও বিভেদের মধ্যে সমন্বয়, এ দুই-ই ভারতবর্ষে অনিবার্য্য। সুতরাং ভারতবর্ষের কথা ভাবিলেই বাংলাকে ভুলিতে হইবে, এরূপ ধারণার কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই।

বাংলার বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয় ঐক্যে সামঞ্জস্য রাখা প্রয়োজন

কিন্তু তেমনই বলা আবশ্যক, কংগ্রেস কর্ত্তৃক স্থানীয় বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষের সমগ্রতাবোধ ও ঐক্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেষ্ট থাকিবার দায়িত্ব আমাদের বেশী। আমরা নিজেদের

বিশেষত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে যতই সচেতন হই না কেন, এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ভারতবর্ষের মূল ঐক্য প্রাদেশিক বিশিষ্টতাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইলে আমাদের ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অন্য কোনও রূপ ধরিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই। আজিকার দিনে শুধু বাঙালী জাতীয়তা লইয়া থাকিবার চেষ্টা করিলে, যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করা হইবে। উহা সম্ভবও নহে, উচিতও নহে। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকালে বাঙালীকে নিখিল ভারতের সহিত সংহতি ও সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেই হইবে।

স্বৈরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদে সংঘাত অনিবার্য্য

ভারতবর্ষের পর বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে জাগরূক থাকাও আমাদের পক্ষে আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুকাল আগে পর্য্যন্তও আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও কর্ম্ম দেশের সীমার মধ্যে একান্তভাবে আবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি অন্যধারা বহিতে সুরু হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদের দৃষ্টি এখন সুদূরতর ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে: বরঞ্চ প্রাচীনপন্থীরা বলিতে পারেন, ইঁহাদের দৃষ্টি এত সুদূরে নিবদ্ধ যে, নিজের দেশের সমস্যা প্রায় ইঁহাদের চিন্তার বাহিরেই চলিয়া যাইতে বসিয়াছে। আমি এই ধারণা সত্য বলিয়া মনে করি না। আমাদের নবীন কর্ম্মীরা বিদেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন বলিয়া দেশ সম্বন্ধে অন্ধ নন। তাঁহারা এই বিশ্বাসের বশে চলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগে সমগ্র মানব-জাতি ঐক্যমুখীন, এই যুগে কোনও জাতির একক চেষ্টায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। আমারও ইহাই বিশ্বাস। আমি মনে করি, সমগ্র জগতের স্বাধীনতাকামী জনগণের সহযোগিতা সত্যই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুষ্ট এবং শক্তিমান করিবে। আজ পৃথিবীর যে তিন-চারিটি দেশে জাতি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ং-পূর্ণতার আদর্শ অত্যন্ত উগ্র রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে, উহারাও এই কথা জানে এবং জানে বলিয়াই জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীর স্বেচ্ছাতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদিগণকে মিলিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের এই চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে বলিয়াই আজ পৃথিবীতে ব্যক্তিগত ও জাতিগত সাম্য এবং স্বাধীনতার দারুণ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। এই স্বৈরতন্ত্রকে ঠেকাইয়া রাখিতে হইলে জগতের সকল স্বাধীনতাকামী সাম্যবাদীদিগকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। অদূর ভবিষ্যতে দুইপক্ষের সংঘাত অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। আমাদের ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাক, এই সংঘাতে নির্লিপ্ত থাকিবার উপায় আমাদের থাকিবে না। বরঞ্চ আমার বিশ্বাস—এই সংঘাত হইতে ভারতবর্ষের নূতন জীবন ও নূতন যুগের সূত্রপাত হইবে। সেইজন্য সমগ্র জগতের স্বাধীনতাকামীদের সহিত সম্মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করিবার ব্যবস্থা এখন হইতেই আমাদিগকে করিতে হইবে।

জগতের সাম্যবাদীগণের নিকট কংগ্রেসের ঘোষণাপত্র

এই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করিবার প্রথম সোপান হিসাবে আমি আপনাদের নিকট একটি প্রস্তাব করিতেছি। আমার মনে হয়, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জগতের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করিবার সময় আসিয়াছে। ভারতবর্ষের জন-সমষ্টি কি চায় এবং তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষা সফল করিবার জন্য সমগ্র জগতের স্বাধীনতা ও সাম্যকামীদের নিকট হইতে উহারা কি সহায়তা প্রত্যাশা করে, এই বিজ্ঞপ্তিতে সে বিষয়ের উল্লেখ যেমন থাকিবে, তেমনই এই সহযোগিতার বিনিময়ে ভারতবাসীরা জগতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কি চেষ্টা ও

কি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাহারও উল্লেখ থাকিবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সমগ্র জগতের স্বাধীনতাকামী সাম্যবাদিগণের নিকট এই কথা বলা হইবে—আমরা তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি, আমাদের যতটুকু শক্তি আছে, তাহা তোমাদের শক্তির সহিত যুক্ত হইবে।

ঘোষণাপত্রে ভারতবর্ষের দাবী জ্ঞাপন

সেই সঙ্গে এই কথাও জানান হইবে—ভারতবর্ষের দাবী 'পূর্ণ স্বরাজ'; এই পূর্ণ স্বরাজলাভ করিবার প্রচেষ্টায় ভারতবাসীরা জগতের প্রত্যেকটি স্বাধীনতার অনুরাগী সাম্যবাদী গণতান্ত্রিকের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, আমাদের আদর্শ কি, দাবী কি, নিখিল বিশ্বের সম্মুখে তাহা উপস্থাপিত করাই এই ঘোষণাপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ঘোষণার ফলে সমগ্র জগতের দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়িবে এবং বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। ইহাতে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা যে হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বৃটিশ জাতি বহির্জগতের জনমতের দ্বারা যে ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে, একমাত্র ভারতবর্ষের জনমতের দ্বারা ততটুকু বিচলিত কিছুতেই হইবে না। অতীতে উহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বৃটিশ শাসক শ্রেণীর একান্ত ইচ্ছা পৃথিবীর জনগণ এই ধারণা পোষণ করুক যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য ন্যায় ও স্বাধীন মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কেবলমাত্র একপক্ষের প্রচারের দ্বারা এই ধারণা জন্মান সহজ নহে। সেজন্য আমেরিকান ও অন্য বিদেশবাসীর দ্বারা এবং ভারতবাসীর দ্বারাও বৃটিশ শাসননীতির প্রশংসা প্রচার করিবার চেষ্টা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণের পক্ষ হইতে অবিরত চলিতেছে। উহার ফলে বিদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা চলিতেছে এবং গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি যাঁহারা আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও অন্য বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই অভিমত। কংগ্রেসকে এই চেষ্টার প্রতিচেষ্টা করিতেই হইবে। ভারতবর্ষের জনগণের প্রকৃত অবস্থা ও আন্তরিক অভিলাষ কি তাহা জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে ইহাই আমার প্রস্তাবিত ঘোষণা-পত্রের উদ্দেশ্য।

জাতীয় জীবনে স্থিতিশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তার স্থান নাই

বিদেশের জনমতের সহিত যোগস্থাপনের কথা বলিলাম। ইহার পর আর একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। চিন্তায় ও কর্ম্মে আমাদিগকে গতিশীল উন্নতিতে আস্থাবান ও ভবিষ্যৎমুখীন হইতে হইবে। বহু শত বৎসরের পরাধীনতা আমাদিগকে জড় ও অতীতমুখীন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার জন্য আমরা নূতনকে গ্রহণ করিতে পারি না, সমগ্র জগৎ যে স্রোতে চলিয়াছে, হয় তাহাকে অস্বীকার করি কিংবা এই জীবন্ত স্রোত হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া কূপমণ্ডুকের জীবন যাপন করিতে চাই। ঠিক ইহারই জন্য আমরা কি কর্ম্মে, কি চিন্তায় জীবন্ত প্রাণবান হইতে পারি না। ক্ষণিকের জন্য সৃষ্টির প্রেরণা জাগিয়া উঠিলেও উহা স্থায়ী হয় না। বহু অভ্যস্ত স্থানুধর্ম্ম আবার আমাদিগকেই চাপিয়া ধরে। আমাদিগকে এই নিজ্জীবতা অতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং সর্ব্বোপরি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসে যেন এই নিজ্জীবতার বিষ প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। সফলতা ও উপস্থিত সুযোগ লইয়া সন্তুষ্ট থাকা কংগ্রেসের ধর্ম্ম নহে। আমাদের এই বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী ইতিহাস আলোচনা করিলে এই জিনিষটাই সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে যে, উহার মধ্যে স্থিতিশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তা কখনও স্থান পায় নাই। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের জনগণ যে সকল রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য অধিকার লাভ করিয়াছে, উহার পরিমাণ অল্প নয়। কিন্তু এই সাফল্যে সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব, এই ধারণা স্বপ্নেও কোন প্রকৃত কংগ্রেসসেবীর মনে উদয় হয় নাই।

কংগ্রেস চির উদ্যমশীল

কংগ্রেস আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বাস্তব যেমন ক্রমশঃ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবে, কংগ্রেসের আদর্শও তেমনই পূর্ণতর হইতে থাকিবে। সুতরাং কংগ্রেসকে চির উদ্যমশীল হইতে হইবে। অতীতে যাহারা কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন তাঁহারা এই ধারণার বশেই চলিয়াছেন যে, কংগ্রেসকে সকল অবস্থায় ও সকল যুগে ভারতীয় জনগণের চিন্তা ও কর্ম্মের পুরোভাগে চলিতে হইবে, পশ্চাৎগামী বা গতিহীন হইলে চলিবে না। ভবিষ্যতে যাঁহারা কংগ্রেসকে সেবা করিতে আসিবেন, তাঁহারাও এই নীতি অনুসরণ করিবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তবে যদি কোনও কংগ্রেসসেবীর দেহ বা মন ক্লান্ত হয়, তবে তাঁহাকে পীড়িত না করিয়া নূতন কর্ম্মীরা কর্ত্তব্যের গুরুভার বহন করিয়া চলিবেন উহাও মানবজীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম মাত্র। কংগ্রেস ব্যক্তি বিশেষ বা দলবিশেষের প্রতিষ্ঠান নহে, কংগ্রেস সকল ভারতবাসীর। তবে আমি একটি দাবী অবশ্যই করিব। আমি বলিব, কংগ্রেস একান্তভাবে তাঁহাদেরই—যাঁহারা উন্নতি ও উদ্যমে আস্থাবান, যাঁহারা আত্মপ্রত্যয়ী, যাঁহারা অগ্রগতির সম্ভাবনায় সংশয়বিকল হন না।

কংগ্রেসের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ লাভ

এইবারে আমাদের রাষ্ট্রীয় কার্য্যক্রমের কথা উত্থাপন করিব। আমার বিবেচনায় কংগ্রেসের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ লাভ, অন্য সকল বিষয়ই উহার তুলনায় গৌণ। বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ কাল বিবেচনা করিয়া আমরা প্রাদেশিক শাসনেই নিযুক্ত হই বা অন্য যে কাজে আত্মনিয়োগ করি, কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য যে পূর্ণ স্বরাজ, উহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পূর্ণ স্বরাজই কংগ্রেসের লক্ষ্য এই কথাটা এত সর্ব্বজনবিদিত যে, উহার পুনরাবৃত্তি আপনাদের নিকট একান্তই নিষ্প্রয়োজন মনে হইতে পারে। কিন্তু ১৯৩০ সালের অবস্থার সহিত ১৯৩৯ সালের অবস্থার তুলনা করিলে হয়ত উহা অসার্থক বলিয়া মনে হইবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত ভারতীয় জাতীয়তার সংঘাত আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি ১৯৩০ সালে এদেশের জনসাধারণ ও রাজনৈতিক কর্ম্মিগণের চিন্তা ও কর্ম্মের পুরোভূমি অধিকার করিয়াছিল। তখন আমাদের ভাবনার প্রধান বিষয় ছিল, কি উপায়ে পূর্ণস্বরাজ লাভ করা যাইবে। একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা ও আসন্নতা তখন জনসাধারণের কল্পনাকে উজ্জীবিত ও জনসাধারণের মনকে আশাচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। আজ আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাবনা কয়েক ধাপ নীচে নামিয়া আসিয়াছে। প্রাদেশিক শাসনে কি করিয়া কংগ্রেসপক্ষীয় মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং এই মন্ত্রিমণ্ডল স্থায়ী হইবে কি হইবে না ইহাই এখন আমাদের প্রধান বিচারের বিষয় হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় আদর্শের এই সঙ্কোচের মধ্যে আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান। বৃহৎ সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন বিরাট পরিবর্ত্তন একমাত্র তখনই সম্ভব হয়, যখন জনসমষ্টি একটা অতি উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় সংক্ষুব্ধ হইয়া সহসা সক্রিয় হইয়া উঠে। সুতরাং রাজনৈতিক অবস্থার কোনও গুরুতর পরিবর্ত্তন করিতে হইলে উচ্চতম আদর্শের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখা ও মন সন্নিবদ্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

পূর্ণস্বরাজলাভের জন্য যে ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তাহার জন্য অতি উচ্চ একটা আদর্শের প্রেরণা আবশ্যক। স্থানীয় শাসনের বা স্থানীয় কর্তৃত্বলাভের ব্যবস্থায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলে আমাদের সেই উচ্চ আদর্শের সঙ্কোচ হইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রাদেশিক শাসন

অবশ্য ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে প্রাদেশিক শাসনও পূর্ণস্বরাজের অংশ এবং সোপান। এই কথা খুবই সত্য তাহা স্বীকার করি। কিন্তু যেমন প্রাদেশিক শাসনের দ্বারা পূর্ণস্বরাজের জন্য শক্তিসঞ্চয় সম্ভব তেমনই আবার উহার একটা অবাঞ্ছনীয় দিকও আছে; দৈনন্দিন শাসনের চাপে আমাদের মনে কার্য্য ও কারণের, লক্ষ্য ও লক্ষ্যলাভ করিবার উপায়ের মধ্যে একটা বিভ্রম উপস্থিত হইতে পারে এবং উহার ফলে ক্ষুদ্র ও বহুবিচ্ছিন্ন সমস্যার আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা আমাদের প্রধান লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হইতে পারি। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থা যেরূপ তাহাতে এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আরও বহুল পরিমানে বর্ত্তমান। প্রদেশে যদি আমরা প্রকৃত স্বরাজ পাইতাম তাহা হইলে সাময়িকভাবে একমাত্র প্রদেশ লইয়া ব্যাপৃত থাকিলেও তেমন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের যে রূপ উহার জন্য জনসাধারণের অবস্থার দ্রুত বা প্রকৃত উন্নতি করিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির আমূল সংস্কার করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসপক্ষীয় মন্ত্রিমণ্ডলেরও নাই সুতরাং কেবলমাত্র প্রাদেশিক শাসনের কথা বিবেচনা করিলেও আমাদিগকে পূর্ণস্বরাজের কথাই ভাবিতে হইবে। প্রাদেশিক কর্তৃত্ব লাভ করিবার সার্থকতা ও সফলতা কতটুকু উহাও একমাত্র পূর্ণস্বরাজের কষ্টিপাথরেই যাচাই করিয়া লইতে হইবে; তাহা না করিয়া আমরা যদি কেবলমাত্র বহু রক্ষা-কবচ বেষ্টিত প্রাদেশিক শাসনের আংশিক ভার পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকি তাহা হইলে আমাদের অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্র আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ লইয়া ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

তবে আমি ইহা স্বীকার করি যে, পূর্ণস্বরাজ্যের আদর্শকে জনসাধারণের মনে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে একটা উপলক্ষের প্রয়োজন আছে। গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে এইরূপ কোন উপলক্ষ আমাদের সম্মুখে ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি একটা উপযুক্ত ও ন্যায্য উপলক্ষ আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। এই উপলক্ষ কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেশন প্রবর্ত্তন করিবার আয়োজন। আগামী বৎসর বা পর বৎসর ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা ফেডারেশন প্রবর্ত্তন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বড়লাট ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদের উক্তি হইতে উহার আভাস ও ইঙ্গিত যথেষ্ট আসিতেছে। ভারতীয় জনগণের পক্ষ হইতে প্রবল বাধা না আসিলে এই ফেডারেশন যে কার্য্যে পরিণত হইবে উহা নিশ্চিত। এই সন্ধিক্ষণে আবার আমাদিগকে সচেষ্ট হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে পূর্ণস্বরাজের জন্য উদ্যোগ করিতে হইবে। ইহার জন্য যদি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহার জন্যও বিনা দ্বিধায় প্রস্তুত হইতে হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ফেডারেশনের পথে বাধা ভারতবর্ষের সমগ্র জনসমষ্টির পক্ষ হইতে বিনা আয়োজনে ও বিনা চেষ্টাতে স্বতঃ প্রণোদিতভাবে অবশ্যই যে আসিবে এই ভরসায় নিরুদ্যম হইয়া থাকা আমার বিবেচনায় সঙ্গত হইবে না। কংগ্রেস অবশ্য স্পষ্টভাষায় ফেডারেশনকে অগ্রহনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ফেডারেশনের বর্ত্তমান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি, হইবে না এই প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে উহা মনে করা গুরুতর ভ্রম হইবে। কংগ্রেসের বাহিরের রাজনৈতিক নেতাদের কথা দূরে থাকুক, কংগ্রেসের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ সত্বেও কংগ্রেসের ভিতরে কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে মন একেবারে স্থির করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সেজন্য ফেডারেশনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সতর্ক ও সজাগ করিয়া দেওয়া আমি একান্ত আবশ্যক মনে করি।

ফেডারেশনে দ্বৈতশাসন

এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করি। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শাসনের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে উহাকে কেবলমাত্র ফেডারেশন আখ্যা দিয়া সত্য গোপন করা হইতেছে। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শাসনের ব্যবস্থা ফেডারেশন হইবে ইহা পুরাতন সর্ব্বস্বীকৃত তথ্য, কিন্তু যে ফেডারেশনকে ভারতীয় জনসমষ্টির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের উপর চাপাইবার চেষ্টা চলিতেছে উহা প্রকৃত ফেডারেশন হিসাবে নহে। ফেডারেশন—উহা অস্বাভাবিক, অসমঞ্জস; স্বরাজের দিক হইতে বিবেচনা করিলে উহা অসম্পূর্ণ। যাহাদের লইয়া এই ফেডারেশন গঠিত হইবে উহাদের অনেকগুলিই ভাষা, দেশাচার, ভৌগোলিক অবস্থান, ও রাষ্ট্রীয় চেতনার দিক হইতে ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বিভাগ নহে। দ্বিতীয়তঃ, উহাদের সকলগুলিই আভ্যন্তরীণ শাসননীতিতে সমধর্ম্মী নহে। বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আংশিকভাবে গণতান্ত্রিক, দেশীয় রাজন্যগণের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলি প্রধানতঃ স্বেচ্ছাতান্ত্রিক। এই দুই শ্রেণীর বিপরীত ধর্ম্মী উপরাষ্ট্র লইয়া কোনও প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেশনের সৃষ্টি হইতে পারে না।

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের আরও গুরুতর আপত্তির কারণ এই যে, উহাতে সেই পুরাতন ও কংগ্রেস কর্ত্তৃক বর্জ্জিত দ্বৈতশাসন—ডায়ারকি—নূতন রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি ও সামরিক বিভাগের উপর জনগণের প্রতিনিধিবর্গের কোনও ক্ষমতা থাকিবে না, এমন কি এই বিষয়ে তাঁহারা আলোচনা করিতে পারিবেন না। এই সর্ত্তে আত্মসম্মান বোধযুক্ত কোনও ভারতবাসীর পক্ষে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় যোগদান করা অসম্ভব এরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। কেহ কেহ এই ব্যবস্থাকেও বিবেচনা যোগ্য বলিয়া অভিমত পোষণ করিয়াছেন, ইহাই আমার কাছে আশ্চর্য্য ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা

পূর্ণস্বরাজের আদর্শকে জাগ্রত করিবার আর একটি উপযুক্ত উপলক্ষও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। এই উপলক্ষ আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা। ফাসিস্ত শক্তিবর্গ ও তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তিবর্গের মধ্যে সংঘর্ষ আসন্ন। চেকোশ্লোভাকিয়াকে বলি দান করিয়া এই সংঘর্ষকে কিছুদিনের জন্য ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে সত্য, কিন্তু আর বেশী দিন উহাকে স্থগিত রাখা যাইবে না। এই সংঘর্ষের প্রকৃত রূপ গণতন্ত্র ও ফাসিজমের বিরোধ নহে, পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যের সহিত নূতন সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যের বিরোধ। এই বিরোধে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদিগণের পক্ষে ভারতবর্ষের জন্য শক্তি ও অর্থশক্তি নিয়োগ করিবার বিশেষ চেষ্টা যে হইবে তাহা সুনিশ্চিত। এই চেষ্টায় আমাদিগকে বাধা দিতে হইবে। ভারতবর্ষের জনসমষ্টি কোনও অবস্থাতেই কোনও যুদ্ধে যোগ দিবে না, এই মত আমার নহে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পর কলহের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই, এই হীন

কলহে একটি ভারতবাসীর প্রাণ বা ভারতবর্ষের একটি কপর্দ্দক ব্যয় করিতে আমরা স্বেচ্ছায় সম্মত হইব না। গত যুদ্ধের পর ইটালীর একজন প্রতিনিধি মিত্র পক্ষের অন্য প্রতিনিধিদিগকে বলিয়াছিলেন, ইটালী 'সেক্রেড ইগোয়িজম্' বা 'স্বর্গীয় স্বার্থপরতার' দ্বারা অনুপ্রাণিত। স্বার্থপরতা, বিশেষভাবে পররাজ্য লিপ্সা, কোনও স্বর্গীয় ভাবের দ্বারা প্রণোদিত এ কথা আমরা মানিতে পারিব না। তবু আমাদের আদর্শ সম্বন্ধেও এই কথা বলিব। আগামী যুদ্ধে ভারতবর্ষও সম্পূর্ণ নিজের কথা বিবেচনা করিয়াই পথ ও কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিবে; কিন্তু এই পন্থা স্থিরীকৃত হইবে হীন স্বার্থবোধের দ্বারা নয়, জাতীয় আদর্শ ও পূর্ণ স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা।

অদূর ভবিষ্যতে কোনও যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে পূর্ণ স্বরাজ লাভের পথ সুগম হইতে পারে। ইহা সহজ হিসাবের কথা। কিন্তু এই সুযোগ পূর্ণভাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারিব কিনা সে বিষয়ে আমার মন এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছে না।

অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন

এই সংঘাতে সম্পূর্ণ নিজস্ব পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে শক্তি ও সংগঠনের প্রয়োজন। এই শক্তি উচ্চ শ্রেণী বা নেতাদের নিকট হইতে যতটুকু আসিবে উহা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে প্রচুর হইবে না। এই শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে আমাদিগকে ভারতবর্ষের জনগণের নিকট হইতে। কিন্তু এই জনসমষ্টি এখনও দারিদ্র্য ও অশিক্ষার যে স্তরে রহিয়াছে তাহাতে উহারাও শক্তিহীন হইয়া আছে। উহাদের আর্থিক অবস্থাকে উন্নীত করিবার উহাদিগকে শিক্ষার দিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানেও প্রাদেশিক রাষ্ট্রের আর্থিক অসাফল্য গুরুতর বাধারূপে দাঁড়াইয়া আছে। সুতরাং আমাদের সকল সমস্যারই চরম রূপ দাঁড়াইতেছে অর্থসমস্যা। ভারতবর্ষের জনসমষ্টির সম্পদ না বাড়াইলে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব। আমার মনে হয়, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র উপায় ব্যাপকভাবে শিল্প প্রবর্ত্তনের চেষ্টা বা 'ইনডাষ্ট্রিয়ালাইজেশ্যন'। ভারতবর্ষ এখনও পৃথিবীর বণিক সমাজে প্রকৃতিদত্ত সম্পদের বিক্রেতা ও শিল্পজাত পণ্যের ক্রেতা বলিয়া পরিচিত। আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার এই পরাবলম্বী ও পরমুখাপেক্ষী স্তর হইতে ভারতবর্ষকে উঠিতে হইবে। সকল আর্থিক বা শিল্প সম্পর্কিত ব্যাপারেই ভারতবর্ষ স্বয়ংপূর্ণ হইবে, উহা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণের দৈন্য মোচন করিবার জন্য অন্য দেশের সহিত সাম্যের প্রয়োজন আছে। এই সাম্যের জন্য ইনডাষ্ট্রিয়ালাইজেশ্যনের একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের প্রকৃতিদত্ত যে সকল সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় আছে উহাকে ব্যবহার না করিলে এবং এইভাবে অব্যবহৃত থাকার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, সে অর্থকে সংরক্ষণ না করিলে ভারতবাসীর দারিদ্র্য কখনও ঘুচিবে না।

শিল্প ও যন্ত্রের প্রসার অনিবার্য্য

আমি জানি পুরাতন সংস্কারের বশে অনেকে যন্ত্রের প্রসার ও শিল্পবৃদ্ধির ব্যবস্থার অনুমোদন করেন না। কিন্তু আমরা যে যুগে বাস করিতেছি, উহাতে জীবনযাপন করিয়া যুগধর্ম্মকে অতিক্রম করিবার কল্পনা বাস্তব আদর্শ নহে। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে শিল্প ও যন্ত্রের প্রসার অনিবার্য্য। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইনডাষ্ট্রীয়ালাইজেশ্যানে'র অসাধারণ প্রসার হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও হইবে। কিন্তু এই অনিয়ন্ত্রিত প্রসারের মধ্যে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা যন্ত্র, বিজ্ঞান ও বর্ত্তমান যুগের যান্ত্রিক-শিল্পকে স্বীকার করিতে চান না, তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে উহাকে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। এই অবস্থায় শিল্পের প্রবর্ত্তন আমাদের দেশে অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খলভাবে দেশের শিল্প ব্যক্তিগত হইতেছে ও উদ্যমের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। এই কারণে শিল্প একটা বিশিষ্ট ধনিক শ্রেণীর হাতে গিয়া পড়িতেছে। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে দেশের ও জনগণের পক্ষে বিশেষ অকল্যাণের কথা। শিল্পবিস্তারের মধ্যে আপত্তিকর যাহা কিছু তাহার জন্য অনেকাংশে দায়ী সঙ্কীর্ণমনা ধনিক সম্প্রদায়। শিল্পের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা যন্ত্রের প্রবর্ত্তন নয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইনডাষ্ট্রীয়াল রিভলিউশনের সময়েও ধনিক সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইহার একমাত্র প্রতিকার রাষ্ট্র কর্ত্তৃক শিল্প প্রবর্ত্তন ও পরিচালনা। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রের গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। ভারতবর্ষের ইনডাষ্ট্রিয়ালাইজেশ্যান একমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা হইবে না। এই পরিবর্ত্তন যদি অল্পকালের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে জনসাধারণের অধিকার ও কল্যাণ অব্যাহত রাখিয়া করিতে হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রকে উহার ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

মতবিরোধের আশঙ্কা অবান্তর

কংগ্রেস বহু বৎসর ধরিয়া বহু বিবেচনার পর প্রায় একবাক্যে যে নীতির অনুমোদন করিয়াছে, সে নীতি কংগ্রেসের মূল ধর্ম্মের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যাহাকে অস্বীকার করিলে জাতীয় আন্দোলনের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, যাহাকে অগ্রাহ্য করিলে কংগ্রেসের পরিচালকবর্গ ভারতবর্ষের জনগণের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে দোষী হইবেন, সেই নীতি সম্বন্ধে যদি কাহারও দ্বিধা থাকে তাহা হইলে তাহার পক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে থাকা দুরূহ হইতে পারে, এ কথা আমি মানি। কিন্তু কার্য্যক্রমের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কংগ্রেসের অনুমোদিত নীতি কোন্ বিশেষ অবস্থায় কোন্ কৃত্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে, উহা নির্ভর করে প্রথমতঃ অবস্থার উপর, দ্বিতীয়তঃ, অবস্থা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেসের সভ্যবৃন্দ যে নির্দ্দেশ দিবেন তাহার উপর যদি আজ কংগ্রেসের সভ্যবৃন্দের নিকট হইতে কোন বিশেষ ব্যাপারে উদ্যোগী হইবার জন্য আদেশ আসে, তবে সেই আদেশকে উপেক্ষা করিবার বা মতবিভেদ আছে এই কারণ দর্শাইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার অধিকার কোনও কংগ্রেসকর্ম্মীর নাই। যদি কংগ্রেসকর্ম্মীর পক্ষ হইতে এইরূপ দাবী আসিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কংগ্রেসের পক্ষে সংহত উদ্যম করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। আমি এই কথাটা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতে চাই যে, আজ কংগ্রেসের মধ্যে নীতি সম্বন্ধীয় বিরোধ নাই। কর্ত্তব্যের ক্রম, কোন কর্ত্তব্য মুখ্য কোন কর্ত্তব্য গৌণ, এ বিষয়ে কংগ্রেসের সকল নেতা হয়ত একমত নহেন। কিন্তু এ সকল অনৈক্য তুচ্ছ, মূলে উহাদের মধ্যে কোনও মতান্তর নাই। ইহাই আমি স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে করি। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিদেশী প্রাধান্যের অবসান না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ভেদের স্থান নাই। কংগ্রেসকে এখনও বহুদিন পর্য্যন্ত একক ও অবিচ্ছিন্ন থাকিতে হইবে নাহিলে আমাদের পূর্ণস্বরাজের চেষ্টা নিষ্ফল হইবার ভয় আছে। হয়ত ভবিষ্যতে, পূর্ণস্বরাজ লাভ করিবার পর কংগ্রেসের মধ্যেও পাশ্চাত্য পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার মত দলগত বিভেদ দেখা দিবে কিন্তু এখনও উহার সময় আসে নাই।

ভাষার ভিত্তিতে বাংলাদেশ গঠন

আমি ভারতবর্ষের নিকট বাঙ্গলার কি দাবী তাহার কথাও বলিব। এই সকল দাবীর মধ্যে প্রধান এবং প্রথম এই দাবী,—সকল বাঙ্গালী এক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এখনও বাঙ্গলা ভাষাভাষী ও বাঙ্গালী অধিবাসী কয়েকটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাঙ্গলার বাহিরে অন্য প্রদেশের অংশরূপে রহিয়াছে। ইহাদিগকে অচিরে বাঙ্গলার মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা হওয়া উচিত। কংগ্রেস যখন ভাষাকেই প্রদেশ বিভাগের মূলনীতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে তখন এ বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। বাঙ্গলার প্রতিবেশী দুইটি প্রদেশ—বিহার ও আসাম এই দুই প্রদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাষানুযায়ী প্রাদেশিক সীমার পরিবর্ত্তন।

হইলে ইহাদের আয়তন ও লোকবল একটু কমিবে সত্য। কিন্তু ইহার উপায় নাই। কোনও বাঙ্গালীর পক্ষে এই ন্যায্য দাবী ত্যাগ করা সম্ভব নয়। যদি সমস্ত বাঙ্গালী এক প্রদেশের মধ্যে একীভূত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সত্যকার ফেডারেশন স্থাপিত হইতে পারে না। অন্ততঃ বাঙ্গালীর পক্ষে সেই ফেডারেশনকে স্বাভাবিক ও ন্যায্য বলিয়া মানিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না।

ভাষার ভিত্তিতে অন্যান্য প্রদেশ গঠন

আমার মনে হয়, শুধু বাঙ্গলাদেশ কেন সমস্ত ভারতবর্ষের প্রাদেশিক বিভাগকেই ভাষানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক। ছোটনাগপুরের সহিত কৃত্রিম বন্ধনে সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া হিন্দী ভাষাভাষী বিহারের পক্ষে উচিত হইবে হিন্দী ভাষাভাষী যুক্তপ্রদেশের সঙ্গে মিলিত হওয়া। তেমনই বর্ত্তমান মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের সংস্কার হওয়া উচিত ও আবশ্যক। ইহাতে ভারতবর্ষের অগণিত প্রদেশের সৃষ্টি হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিবার কিছুমাত্র হেতু নাই। কারণ সেন্সাস যাহাই বলুন না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে দশ এগারটির বেশী প্রধান ভাষা নাই। সে ভাষাগুলি এই—বাঙ্গলা, উড়িয়া, হিন্দী এবং হিন্দীর ইসলামীরূপ উর্দ্দু, গুজরাটী, মারাঠি, তেলেগু, তামিল, মলয়ালম, কন্নাদ, পশতো এবং আসামী। ইহাদের মধ্যে পশতো ও আসামী ভাষা ভাষীর সংখ্যা বেশী নয়। ভারতবর্ষে অন্য যে সকল ভাষা প্রচলিত আছে, উহাদের কোনটিই এই এগারটি ভাষার সহিত কোন দিক হইতেই একাসনে বসিবার যোগ্য নয়। সুতরাং স্থানে স্থানে শিক্ষার জন্য হিসাবের মধ্যে ধরিলেও প্রাদেশিক বিভাগের বিচারে উহাদিগকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ভাষাকে প্রদেশ বিভাগের সূত্র বলিয়া মানিয়া লইলে সমগ্র ভারতবর্ষে ১২টির বেশী প্রদেশ সৃষ্ট হইবার নয়।

প্রাদেশিক চাকুরী

ভারতবর্ষের নিকট বাঙ্গলার দ্বিতীয় দাবী, বাঙ্গলার বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী বাস করিতেছে উহাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আর্থিক অধিকারের কোনও সঙ্কোচ হইবে না। যদি বাঙ্গলা ভাষী সকল অঞ্চল বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে এই দ্বিতীয় দাবীর গুরুত্ব খুব বেশী থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং এই ব্যাপারে একটা ন্যায্য রফায় উপনীত হওয়া খুব দুরূহ হইবে না। আমার মনে হয় বিহারে চাকুরীর ব্যাপারে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে উহা ন্যায়-সঙ্গত। চাকুরীর ব্যাপারে অন্য প্রদেশের লোকের পক্ষ হইতে ইহার বেশী দাবী করা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। তবে ইহাও মনে রাখা উচিত, বিহারে বা যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালীকে যে নীতি অনুসারে চাকুরী দেওয়া হইবে, আমরাও বাঙ্গলাদেশে সেই নীতির অনুসরন করিতে পারিব। অধিবাসীদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা প্রধানতঃ প্রাদেশিক ব্যাপারে এই যুক্তিতে কাহারও আপত্তি হইবার নয়।

বাঙ্গলার সমস্যা

বাঙ্গলার ভিতরে যে সকল সমস্যা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে, সেগুলি সংখ্যায় অনেক বেশী, গুরুত্বে অনেক বড়। এই সকল সমস্যার যেগুলি আমার নিকট অত্যন্ত গুরুত্বের বলিয়া মনে হইয়াছে কেবলমাত্র সেগুলিরই উল্লেখ করিব। সমস্যাগুলি এই—(১) বাঙ্গালী কৃষক ও শ্রমিকের দারিদ্র্যমোচন। (২) ভদ্রশ্রেণীর জীবিকার ব্যবস্থা। (৩) বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা। (৪) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার। (৫) বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলের উন্নতিসাধন। (৬) সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীকে শিক্ষা ও আর্থিক সচ্ছলতার সমস্তরে আনয়ন ও রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তিদান।

এই সকল সমস্যার রূপ এত জটিল যে, উহাদের সহিত এখনও আমাদের বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিতে হইবে, সমাধানের জন্য দেহ ও মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু শুধু ইচ্ছা ও উদাম থাকিলেই আমরা সাফল্যলাভ করিতে পারিব না। ইহার জন্য সর্ব্বোপরি প্রয়োজন রাষ্ট্রতন্ত্রের উপর অধিকার স্থাপন। যাঁহারা বাঙ্গলাদেশের ও বাঙ্গালীর এই সকল বহুমুখীন দুঃখকে দূর করিবার আগ্রহ ও ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের হাতে শাসনভার না আসিলে এই সংস্কারের কাজ আরম্ভ হইতে পারে না। বাঙ্গলাদেশের দুর্ভাগ্য এই যে, যাঁহাদের হাতে আজ শাসনভার ন্যস্ত আছে তাঁহারা এই বিশ্বাস পোষণ করেন না যে, বাঙ্গালীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার কোনও দূরগামী সংস্কার হইতে পারে; এ বিষয়ে তাঁহারা নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ; শুধু তাহাই নহে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের দ্বারা বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর প্রকৃত কল্যাণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হইতেছে।

বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যের হিসাব নিকাশ

এই সকল কার্য্যকলাপের একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব লওয়া যাইতে পারে। প্রায় দুই বৎসর হইল বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের কৃতিত্বের জমার দিকে তাঁহাদের নিজেদের হিসাবেও একটি ভিন্ন দুইটি ব্যবস্থার উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। সে ব্যবস্থাটি সংশোধিত প্রজা-স্বত্ব আইন। এই আইনের দ্বারা প্রজার কতটুকু উপকার হইতে পারে সে বিষয়ে কংগ্রেস পক্ষ প্রথম হইতেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে তাঁহাদের এই সন্দেহ যথার্থ।

মন্ত্রিমণ্ডলের জমার দিকে যাহা আছে তাহারই যদি মূল্য এইরূপ হয়, তাহা হইলে খরচের দিকে যাহা আছে তাহার রূপ সহজেই অনুমেয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন পাটের ন্যূনতম মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য ও পাট চাষীর অবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বাঙ্গলা দেশের গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য জমিদার ও মধ্যজীবীর স্বত্ব ক্রয় করিয়া লওয়ার জন্য, সর্ব্বব্যাপী দাতব্য চিকিৎসা প্রবর্ত্তনের জন্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রচারের জন্য, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার জন্য বহু প্রস্তাব মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডল উহাদের প্রত্যেকটিরই বিরোধিতা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, সর্ব্ব-ব্যাপারে উহারা ধনিক ও বিদেশীর সহযোগিতা ও সাহায্য করিয়াছেন। বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডল কর্ত্তৃক কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সমর্থন ও পাটকলের ধনিক স্বত্বাধিকারিগণের সুবিধার জন্য পাট অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে আমার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ এই যে, তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উজ্জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। যে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান একই জল মাটিতে বর্দ্ধিত ও একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, উহাদিগকে বিভিন্ন করিবার চেষ্টা অতি গুরুতর অপরাধ। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দিক হইতে এই বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া কেহ উহার সহায়তা বা প্ররোচনা করিতে পারে তাহা আমার নিকট অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। অথচ ইহা যে প্রত্যক্ষ সত্য তাহার প্রমাণ সে দিনও পাইয়াছি। আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের যে সকল ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, সেখানেও সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির বিষ বিকীর্ণ হইতেছে। আজ কয়েক দিন হইল, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে কলিকাতার স্থানীয় শাসনে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আমি এই প্রস্তাবের দীর্ঘ আলোচনা না করিয়া শুধু এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইতে চাই, যদি উহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে হিন্দু অহিন্দু নির্ব্বিশেষে সকল খাঁটি বাঙ্গালীর নিকট হইতে যে বিরোধিতা আসিবে উহা অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও হইবে না। ব্যবস্থাপক সভায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে ভেদবুদ্ধিশীল হিন্দু ও মুসলমানের ভোটে জয় হইতে পারে। কিন্তু বাহিরের জ্ঞানী জনসাধারণ এই অনাচার স্বীকার করিয়া লইবে না। তাহারা সাম্প্রদায়িক ভেদ-

(শেষাংশ ৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আকস্মিক

(গল্প)

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

এমনি ত রোজই হয়!

সেই রাত্রি প্রায় বারটার পর জয়ন্ত কারখানা হইতে ফিরে! আগে শৈলর কখনও ঘুমাইয়া কখনও বাজে বইয়ের পাতা উল্টাইয়া এই সময়টা কাটাইতে হইত। এখনত' তবুও হাতে একটা কাজ হইয়াছে, এই কাঁথা সেলাই করা।

শৈল আলোটা আরও একটু উস্কাইয়া দিল।

কাঁথাটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; অল্পই আর বাকী! প্রায়-সমাপ্ত কাঁথাটা কোলের উপর মেলিয়া ধরিয়া, হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোয় শৈল সেলাইয়ের ফোঁড়গুলি সূচের অগ্রভাগ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। সেই দিকটা পূরণ করে; কিন্তু তুমিও এলে সেই দিক দিয়ে কোমর ও পিঠ আর শিড়দাঁড়াটা টন টন করিতেছে।

জয়ন্ত শৈলর এই কাঁথা সেলাইয়ের ব্যাপার লইয়া রীতিমত ঠাট্টাই করে; বলে, সত্যি বলছি শৈ: আমার ত হাসিই পায়,......সেই কবে আসবে খুদে অতিথিটি, তা এখন হতেই যা তোড়জোড়ের বহর তোমার!

হ্যাঁ গো হাঁ, তাত' বলবেই; কিন্তু আমার দশটা মাসি-পিসি আছে, না তিনকুলে একটা কেউ আছে বল ত, কে এসে করে দেবে এ সব ...?

শৈলর শেষের কথায় জয়ন্ত কিন্তু বিমনা হইয়া যায়; বলে, সত্যি আমার দুঃখ হয় শৈল! ভগবান যাকে বঞ্চিত করেন, এমনি করেই বুঝি সকল দিক দিয়েই নিঃস্ব ও রিক্ত করে ছাড়েন! অতি ছোট বয়সেই মাকে হারিয়েছি; জানি না মা কেমন? তারপর ভেবেছিলাম, হয়ত বা তুমি দেবে আমার সেই দিকটা পূরণ করে; কিন্তু তুমিও এলে সেই দিক দিয়ে একেবারে শূন্য হয়েই! শেষের দিকটায় জয়ন্তর গলার স্বরটা কেমন যেন একপ্রকার রুদ্ধ হইয়া আসে। চোখের কোল দুটা যেন জলে ভিজিয়া উঠিতে চায়!

শৈল আসিয়া স্বামীর পশ্চাতে দাঁড়ায়। এবং কতকটা যেন তাহাকে ভুলাইতেই অন্যকথা টানিয়া আনে,—জান নীচের তলার নন্দাদি কি বলছিলেন?

কি?

বলছিলেন, দেখিস শৈল তোর ছেলেই হবে?

কিন্তু মেয়েই হবে দেখে নিও।

না গো না! শুধু নন্দাদি কেন? আমারও যেন কেমন মনে হয় ছেলেই হবে! তা না হলে......

বাকী কথাটা কিন্তু শৈলর কণ্ঠে আটকাইয়া যায়;... নেহাৎ যেন অকারণেই গণ্ডদেশটা রাঙা হইয়া উঠে! কথাটা আসলে যাহাই হউক না কেন, শৈলর এই যে বলিতে বলিতে থামিয়া যাওয়ার বিশেষ ভঙ্গিমাটাই জয়ন্তকে একান্ত কৌতূহলী করিয়া তোলে! স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করে, তা না হলে কি গা?

যাও!......তুমি ভারী দুষ্টু! শৈল যেন সত্য সত্যই আপনাকে স্বামীর দৃষ্টিপথ হইতে সরাইয়া লইতে অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া উঠে।

অল্পক্ষণ আগেকার মেঘাচ্ছন্ন ভাবটা লঘু হাস্য-পরিহাসের মাঝে যেন চাপা পড়িয়া যায়।

শৈল সেলাইটা ভাঁজ করিয়া ডালায় গুছাইয়া রাখে। হ্যারিকেনের শিখাটা কমাইয়া ঘরের এককোণে রাখিয়া খোলা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

পথের মোড়ে কৃষ্ণচূড়ার পাতাগুলি রাত্রির আঁধারে সপ্ সপ্ শব্দ করিতে থাকে। ঝির ঝিরে একটা চাপা মৃদু হাওয়া।

কালো রাত্রির আকাশ,... শুধু এখানে ওখানে কয়েকটি তারা মিটি মিটি জ্বলে। রাত্রি নিশ্চয় অনেক হইয়াছে!

নীচের রাস্তাটা এর মধ্যেই নিঝুম হইয়া আসিয়াছে!

মোড়ে খাবারের দোকানটাও বন্ধ! শুধু একটি লোক বাইরের বেঞ্চটায় আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ি দিয়া নিদ্রা যাইতেছে। একটি কালো কুকুর নিঃশব্দে এঁটো শালপাতা-গুলি একমনে চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে!

পুলিশ ভারী বুটের ঠক্ ঠক্ শব্দে নিঃশব্দতা ভাঙ্গিয়া মাঝে মাঝে টহল দেয়! কিন্তু এত রাত্রি'ত কখনও হয় না! রূপেন এখনও আসে নাই! কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করে?

জয়ন্ত আর রূপেন এক পুতুলের কারখানায় চাকরি করে।

রূপেন ছেলেটি ভারী চমৎকার! অকারণেই এমন হাসাইতে পারে! মিশুকেও খুব! শৈলকে 'দিদি' 'দিদি' করে। বয়স বোধ করি এই বাইশ কি তেইশই হইবে। এখনও বিয়ে-থা করে নাই! সংসারে আপনার বলিতে এক বুড়ী মা ও এক বিধবা বোন; তা তাহারা দেশেই থাকেন। জয়ন্তদেরই পাশের একখানি ঘরে রূপেন থাকে! সামনেই কোন এক হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে। হয়ত কোনদিন শৈল রাঁধিতেছে, পিছন হইতে আসিয়া বলে, দেখি দিদি আপনি কি রাঁধছেন? ও! মোচার চপ বুঝি! অনেক দিন মোচার চপ খাইনি!

খাবে? দেব দুটা? বস না ঐ মোড়াটা টেনে,—শৈল অনুরোধ করে।

চপে কামড় দিতে দিতে রূপেন বলে, চমৎকার কিন্তু আপনার হাতের রান্না দিদি!

আর দুটা দেব? শৈল শুধায়।

জয়ন্ত ইতিমধ্যে কখন একসময় পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়, কি খাচ্ছ রূপেন?

এই যে জয়ন্ত-দা, আসুন! দিদির হাতের তৈরী চপ খাচ্ছিলাম! ভারী সুন্দর! খাবেন? তারপর শৈলর দিকে ফিরিয়া বলে, দিন না দিদি, দাদাকেও দুটা!

না হে না! তুমিই খাও! জয়ন্ত হাসিয়া উঠে।

শৈলও জিজ্ঞাসা করে, খাবে? দেব? দিই না দুটা?

না! না! এখন থাক!

খাওনা দ্'টা গরম গরম ভেজে দিই!

আচ্ছা দাও! খেয়েই দেখা যাক!

জয়ন্তও এক পাশে বসিয়া যায়!

বাইরের দরজায় কড়া নাড়িবার শব্দ না? হ্যাঁ বোধ হয় এলেন! শৈল ঘরের কোণ হইতে হ্যারিকেনটা তুলিয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যায়।

জয়ন্ত আর রূপেনই!

ভাত ঢাকাই ছিল! জল ছিটাইয়া আসনটা বিছাইয়া দিতে দিতে শৈল শুধাইল, আজ এত দেরী যে?

জামাটা খুলিয়া জয়ন্ত আলনায় টাঙ্গাইয়া রাখিতেছিল কহিল, আর ত বেশী দেরী নাই! মাঝে আর মাত্র দু'টা মাস! সে সময় কতকগুলি টাকার দরকার হবেই; তাই কারখানার যোগেন চৌধুরী ছুটী নিয়ে গেছে, সাহেবকে বলে আমিই তার কাজটা করে দিচ্ছি, এ কটা দিন একটু দেরীই হবে আসতে!

ভাত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে জয়ন্ত কহিল, বাড়ীওয়ালাকে বলেছিলাম, দিন কয়েকের জন্য ঐ দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরটা যদি ছেড়ে দেন?

তা কি বললে গা!

কিছুই এখনও বলেনি, বললে দেখি ভেবে! একটা কিন্তু কিন্তু ভাব আর কি?

মাসের শেষে সে দিন জয়ন্তর মাহিনা পাইবার তারিখ। জয়ন্ত যখন রাত্রে ফিরিল হাতে তাহার একটা বড় কাগজের বাক্স;

শৈল আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়ায়। বলে, হাতে বাক্সে কি গা?

বলত কি? জয়ন্ত কৌতুক মিশ্রিত দৃষ্টি তুলিয়া শৈলর মুখের দিকে তাকায়।

কি বল না?

আগে আন্দাজ করে বল দেখি কি?

বা রে! না দেখলে কেমন করে বলব?

আলোটা এদিকে একটু নিয়ে এস! দেখাই!

আগ্রহভরে শৈল হ্যারিকেনটা তুলিয়া ধরিল।

একটা মোমের বড় ডল-পুতুল! লাল নীল জামা গায়; হাতে একটা ছোট বাজনা! দম দিতেই কেমন মাথাটা দোলাইয়া দোলাইয়া দু'হাতে বাজনাটা বাজাইতে আরম্ভ করিল। একটা টিং টিং টুং টাং...সুন্দর মিষ্টি ইংরেজী সুর;

ওমা! এ পুতুল কি হবে গো?

শৈলর মুখের দিকে এক ভঙ্গিতে তাকাইয়া জয়ন্ত কহে, কেন? দরকার নেই বুঝি? একটা চাপা হাসির অদম্য উচ্ছ্বাস সহসা যেন জয়ন্তর সমগ্র মুখখানিতে ছাপাইয়া যায়।

ওমা! তোমার আবার পুতুলের দরকার কি গো? তোমার ঘরে দশটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে নাকি?... কিন্তু সহসা স্বামীর সহিত চোখাচোখি হইতেই যেন কি একটা কথা চকিতে মনের কোণে উঁকি মারিয়া যায়, এবং বাকী কথাটা শৈলর কণ্ঠের মধ্যেই অস্পষ্ট অনুচ্চারিতই থাকিয়া যায়।

মুহূর্তে শৈলর সমগ্র গণ্ডদেশটি লাল হইয়া উঠে! একটা অননুভূত চাপা আনন্দ সহসা বুকের মাঝে শিহরণ জাগাইয়া তোলে, চোখের পাতা দু'টা নীচের দিকে নামিয়া আসে।

এবং শুধু মোমের ডল পুতুলই নয়, এর পর হইতে প্রায় প্রত্যহই কারখানা হইতে জয়ন্ত ছোট ছোট নানারকমের পুতুল, গায়ের জামা, বেতের দোলনা প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়া ঘর ভরিয়া তুলিতে থাকে।

শৈল ঠাট্টা করিয়া বলে, ওগো, এ তুমি করছ কি?

এ হতেই সব সঞ্চয় করে রাখছি শৈল! কেন না, যে আমার এই পর্ণ কুটীরে আসছে তার যদি কোন দিনও এতটুকু অসুবিধাও ভোগ করতে হয়, তবে সে দুঃখ রাখবার স্থান যে আমার থাকবে না শৈল! যে জিনিষ আমি জীবনে একটা দিনের জন্যও ভোগ করতে পারলাম না; সে বস্তুর সাথে যেন তার এ জীবনে প্রথম দিনটি হতেই শুভ পরিচয় ঘটে, এইটাই শুধু আমার দেবতার কাছে একান্ত প্রার্থনা! অর্থ ত আমার ঘরে নেই শৈল! তবু ভগবান যখন এ দীনের কুটীরে তাকে পাঠাচ্ছেনই, আমার বুকভরা স্নেহটুকুও যেন তাকে আমি দিতে পারি!

শৈলর চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া উঠে!

গভীর রাত্রে শৈল ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানায়, ভগবান! আমার মুখ তুমি রেখ দয়াময়!

বাড়ীওয়ালা ঘর ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় নাই!

কি আর করা যায়? অগত্যা সম্মুখের ছোট বারান্দাতেই চটের একটা পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া ঘিরিয়া লওয়া হইয়াছে!

সেদিন কারখানা হইতে ফিরিতে বেশ একটু বিলম্বই হইয়াছিল! সবে একটু তন্দ্রামত বুঝি আসিয়াছে, সহসা শৈলর ধাক্কায় জয়ন্তর ঘুমটা ভাঙ্গিয়া যায়, শৈল চাপা-গলায় ডাকিতেছে, শুনছো? ওগো?...

জয়ন্ত ধড়ফড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, এ্যাঁ কি? কি হয়েছে?

আমার শরীরটার মধ্যে কেমন যেন করছে? শৈলর সমগ্র দেহ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। গভীর ক্লান্তি ও বেদনায় কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে চায়!

জয়ন্ত ছুটিয়া গিয়া রূপেনের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল! রূপেন রূপেন?

কে? ঘরের ভিতর হইতে জবাব আসে!

আমি জয়ন্ত! দরজাটা একবার শীগ্‌গির খোল।

কি? কি হল জয়ন্ত দা?

দাই! দাইকে এখুনি একবার ডাকতে যেতে হবে ভাই!

ও! আচ্ছা আমি এখুনি যাচ্ছি! রূপেন গায়ে সার্টটা চড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

রূপেনকে দাই ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া জয়ন্ত ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। শয্যার উপর শৈল নিশ্চল হইয়া চোখ মুদিয়া পড়িয়াছিল। অধীর আবেগে জয়ন্ত আগাইয়া আসিয়া একখানি কম্পিত হস্ত শৈলর ঘর্ম্মসিক্ত কপালের উপর স্থাপন করিল, ডাকিল—শৈল।

শৈল নীরবে শুধু স্বামীর হাতখানি নিজের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে?

শৈলের মুদিত চোখের পাতা দুইটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে!

রূপেন দাই লইয়া ফিরে!

দাই দেখিয়া শুনিয়া কহিল, এখনও দেরী আছে গো বাবু! ব্যস্ত হবার কিছুই নেই. পোয়াতী সবল!

কিন্তু যন্ত্রণা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে!

শৈল আকুলভাবে জয়ন্তর ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলে!

ভয় কি শৈ? এইত' আমি ত তোমার কাছেই আছি! কিন্তু সংগে সংগে জয়ন্তর চোখের কোণ দুটোও জলে টল মল করিয়া উঠে!

রূপেন বলে, একজন ভাল ডাক্তার ডেকে আনলে হয় না জয়ন্ত দা?

বেশ ত, তাই ডেকে নিয়ে এস! ওর কষ্ট যে আর আমি দেখতে পাচ্ছি না ভাই! জয়ন্তর কণ্ঠস্বর অশ্রুভারে বুজিয়া আসে!

রূপেন ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে! পাশের ঘর হইতে শৈলর চাপা যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে শোনা যায়। জয়ন্ত একাকী বারান্দায় পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। নিরূপায়!...সে যে একেবারেই নিরূপায়!

রাত্রিও ত প্রায় শেষ হইয়া আসিল!

রাত্রির আকাশে ফিকা হইয়া আসে! দিগ্বলয়ে আসন্ন মূর্ত্তিমতী পূর্ব্বপথচারিণীদের চাপা ইসারা।

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা যায় না?

ডাক্তার কি এল রূপেন?

কোথায় পেসেণ্ট কোন ঘরে? সিঁড়ির শেষ ধাপে কার একটা ভারী গলার আওয়াজ পাওয়া যায়!

এই যে এদিকে আসুন! জয়ন্ত ডাক্তারকে ঘর দেখাইয়া দেয়!

ব্যাকুল প্রতীক্ষায় জয়ন্ত দরজার গোড়াতেই দাঁড়াইয়া থাকে।

এক একটা মিনিট জয়ন্তর কাছে এক একটা যুগ বলিয়াই যেন মনে হয়! অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার বাহির হইয়া আসেন!

কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু? একরাশ উৎকণ্ঠা জয়ন্তর কণ্ঠ হইতে ঝরিয়া পড়ে।

ডাক্তার বলিলেন, Oh! she is your wife! Best advice for her to remove in the hospital! বাড়ীতে এসব কেস্ সুবিধা হয় না! এক্ষুণি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে কঠিন গাম্ভীর্য্য!

কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার নাম শুনিয়াই শৈল কাঁদিয়া ফেলিল, ওগো, না, না.. আমায় সেখানে পাঠিও না!

কেন ভয় পাচ্ছ দিদি? আজকাল ত কত মেয়েই এসময়ে হাসপাতালে যায়; আর আমরাও সেখানে থাকব!

রূপেন গিয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া আনে!

কিন্তু জয়ন্তর মনটাও যেন খুঁত খুঁত করিতে থাকে; বলে হাসপাতালে না হয় নাই দিলে রূপেন! এখানেই থাক!

আপনার ত এ সময় এমন ভয় পেলে চলবে না জয়ন্ত দা! আর মিথ্যে মিথ্যেই আপনারা ভয় পাচ্ছেন!

ট্যাক্সিতে চাপিয়া শৈল বারবারই ফিরিয়া ফিরিয়া বাড়ীটার দিকে তাকাইতে লাগিল; জলে তাহার চোখ দুটা ঝাপসা হইয়া আসে!

ড্রাইভার ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল!

রুগী ভর্ত্তি করিয়া লইয়া হাউস সার্জ্জেন কহিলেন, আপনারা তা হলে এখন যান। বিকেল পাঁচটার সময় আবার আসবেন!

স্যার?...

জয়ন্তর ডাকে হাউস সার্জ্জন ফিরিয়া দাঁড়ায়। আমায় কিছু বলবেন?

আজ্ঞে, যাওয়ার আগে একটিবার,...বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছে,...জয়ন্ত আমতা আমতা করিয়া বলে।

আমার সংগে আসুন!

রূপেন বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তারের পিছু পিছু জয়ন্ত এমারজেন্সি রুমে আসিয়া প্রবেশ করিল! একটা উঁচু শাদা টেবিলে শৈলকে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। একটি অল্প বয়েসী নার্স একটা মেজার গ্লাসে কি একটা লাল রংয়ের ঔষধ আনিয়া শৈলকে কহিল, এই ওষুধটা খেয়ে ফেলুন ত'......হাঁ করুন! আমি গলায় ঢেলে দিচ্ছি!...

শৈল হাঁ করিল নার্স ঔষধ খাওয়াইয়া চলিয়া গেল!

সুন্দর মুখখানি ব্যাপিয়া গাঢ় বেদনার ছাপ!...চোখের পাতাদুটি নিমীলিত!.........

শৈল!......

জয়ন্তর ডাকে শৈল চোখ মেলিয়া তাকাইল! উভয়ের চোখাচোখি হইতেই শৈলর চক্ষুদুটি সজল হইয়া আসে।

আমি আসি? আবার বিকেল আসব'খন কেমন?

শৈল চুপ করিয়াই থাকে!......

দ্বিপ্রহরে রূপেন খবর লইতে আসিয়া শুনিল, শৈলর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক, রোগী এখন অজ্ঞান!

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রূপেন হাউস সার্জ্জনকে শুধাইল, ডাক্তার বাবু রোগীর অবস্থা কি খুবই খারাপ?

অবিশ্যি কিছুই এখনও বলা যায় না! ফার্ষ্ট ডেলিভারী!...

পথেই জয়ন্তর সহিত দেখা, জয়ন্ত এদিকেই আসিতেছিল, উৎকণ্ঠাভরে শুধাইল, কি খবর রূপেন?

ভালই!......কিন্তু এসময় আপনি কোথায় চলেছেন দাদা? হাসপাতালে?...কিন্তু এখন ত দেখা করতে দেবে না, visiting hour যে সেই পাঁচটার পর!

না, দেখা ত করব না? একবার একটু বাইরে থেকে

কিন্তু এই ত আমি সেখান হতে আসছি? ওদের ঘন ঘন বিরক্ত করলে যদি আবার?......

ও ঠিক বলেছ! আচ্ছা চল......দু'পা আগাইয়া আবার তখনি ফিরিয়া দাঁড়ায়; বলে, কিন্তু.........

সস্নেহে জয়ন্তর একখানি হাত ধরিয়া রূপেন কহিল, চলুন দাদা! কারখানায় যাই!......চারটায় সময় একসঙ্গেই যাব'খন!

কিন্তু তুমি যদি সে সময় আমায় ডেকে নিতে ভুলে যাও?......

রূপেন ভাতি ব্যথার একটুকরা হাসি হাসিয়া কহিল, না! ভুলব কেন? মনে ঠিকই থাকবে; চলুন!

কিন্তু সাড়ে তিনটার সময় জয়ন্তকে খোঁজ করিতে গিয়া রূপেন শুনিল, জয়ন্ত বহু পূর্বেই ম্যানেজারের কাছ হইতে ছুটি লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে!

সে রীতিমত চিন্তিত হইয়া উঠিল। হাসপাতালে সে বরাবর শৈলর ঘরে গিয়া হাজির হইল! দ্বিপ্রহরেই সে দূর হইতে শৈলর বেড্‌টা দেখিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দেখা করিয়া যাইতে পারে নাই, তখন তাকে অপারেশন রুমে রিমুভ করা হইয়াছে!

কিন্তু এখন শয্যা শূন্যই পড়িয়া আছে!......জয়ন্তও সেখানে নাই! সে বেশ একটু বিস্মিতই হইল, তবে কি শৈলকে এখনও অপারেশন রুম হইতে শিফট্ করা হয় নাই?......সে একজন নার্সকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া শুধাইল, আচ্ছা এই ১৬নং বেডের ডেলিভারী কি এখনও হয়নি?

ও, আজ সকালে যে মেয়েটি সেই ফার্ষ্ট ডেলিভারী হতে এসেছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ!......

সে ত' বিকেলের দিকে অপারেশন টেবিলেই এক্সপায়ার করেছে!.........এনিমিক্.........শরীরে একটি ফোঁটা রক্ত ছিল না;......একটু আগে আর একটি ভদ্রলোক খোঁজ নিতে এসেছিলেন যে!......

মুহূর্তে রূপেনের সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল!

নার্স তখন সামনেই একটি ছোট্ট শিশুকে জামাটা বদলাইয়া দিতে লাগিল!

শৈল মারা গিয়াছে!

শৈল আর নাই!

শিশুটি কাঁদিয়া উঠিল!......রূপেন চম্‌কাইয়া সেই দিকে তাকাইল!......ছোট্ট এতটুকু একটি শিশু, যেন একস্তবক যুঁই ফুল,......হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতেছে!.....

এক সময় এক-পা এক-পা করিয়া রূপেন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল! সহসা তাহার জয়ন্তর কথা মনে পড়িল, তাই ত, কোথায় গেল? খুঁজিতে খুঁজিতে এক তলায় সিঁড়ির নীচে লিফট্ ঘরের পাশে জয়ন্তকে পাওয়া গেল!

visiting hours, দলে দলে মেয়ে-পুরুষ সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করিতেছে! কাহারও হাতে ফল, কাহারও হাতে টিফিন্-ক্যারিয়ার ভর্ত্তি খাবার;......কাহারও হাতে একগোছা ফুল! ঠিক রেলিংটার কোণ ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া জয়ন্ত তখন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ইতস্তত তাকাইতেছে! একহাতে একটা ঠোঙা, বোধ হয় শৈলর জন্য আসিবার সময় মার্কেট হইতে ফল কিনিয়া আনিয়াছে, অন্য হাতে একটা মস্ত বড় ডল পুতুল!

রূপেন শেষ সিঁড়িটার উপরে দাঁড়াইয়া পড়িল!

সহসা এমন সময় জয়ন্ত এদিকে তাকাইতেই দুই জনের চোখাচোখি হইয়া গেল!

রূপেনের চোখের কোল দুটি অশ্রুভারে নুইয়া আসিল। ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা করিয়া আগাইয়া আসিল রূপেন জয়ন্তর একখানি হাত ধরিল, জয়ন্ত-দা!......

কে?......ও, রূপেন!......শৈলকে দেখে এলে ভাই!...কি বললে সে? হাঁরে কি হয়েছে! ছেলে না মেয়ে?

জয়ন্ত-দা!

রূপেন!......যাঁ! ভাই, চল যাই!

নার্সের পিছু পিছু রূপেন আসিয়া শৈলর মৃত দেহ যে ঘরে ছিল সেই ঘরে প্রবেশ করিল। একটা উঁচু টেবিলের উপর একখানি ভারী শাদা চাদরে দেহখানি ঢাকা! রূপেন ধীরে ধীরে মুখের উপর হইতে চাদরটা সরাইয়া নিল!

এই বুঝি অল্পক্ষণ হয় ঘুমাইয়াছে! চোখের পাতা দুটি মুদ্রিত! কয়েকগাছি চুল বিপর্যস্ত হইয়া কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে!......মুখখানি একপাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে!

শ্মশান হইতে ফিরিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল!

রূপেন ঘরের তালাটা খুলিয়া দিয়া নিজের ঘরে এইমাত্র চলিয়া গিয়াছে!

বাহির হইতে ঈষৎ একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলিয়া গেল! দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়া রাত্রি শেষের খানিকটা জ্যোৎস্না ঘরের মেঝের উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে! জয়ন্ত পায়ে পায়ে আসিয়া খাটের পায়ায় ঠেস্ দিয়া ক্লান্তিভরে মেঝের উপরেই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল!

ওগো! খোকনকে একটু ধরনা গা!.....উঃ! কি দুষ্টু ছেলেই হয়েছে বাবা!......

ঘরের মেঝেময় পুতুলের ছড়াছড়ি! বড় বড় মোমের ডল্ স্প্রিংয়ের হাতী, ঘোড়া, মোটর গাড়ী, আরও কত কি! কারখানা একেবারে উজাড় করিয়া আনিয়াছে জয়ন্ত! মাঝখানে সেই অদ্ভুত মোমের পুতুলটা দম খাইয়া মাথাটা দোলাইয়া দোলাইয়া বাজনা বাজাইতেছে টুং! টাং! টিং টুং!......

জয়ন্ত খোকনকে শৈলর কোল হইতে লইবার জন্য বাহু দুটি বাড়াইয়া দেয়! কিন্তু এমনি দুষ্টু ছেলে শৈলর কোল হইতে কিছুতেই জয়ন্তর কোলে ধরা দিবে না! কেবলই দুই হাতে মাকে জড়াইয়া জড়াইয়া ধরে; আর খিল্ খিল্ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া হাসিতে থাকে!

রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে!......ভোর হইয়াছে!......জয়ন্ত খাটের পায়ায় ঠেস্ দিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

বাঙলার হাজং জাতি

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি জেলায় এক জাতীয় লোক দেখা যায়, ইহাদিগকে উত্তর বাঙলায় রাজবংশী বলে। ইহাদের চেহারা ঠিক বাঙালীর মত নয়, বাঙালী ও মঙ্গোলীয় মিশ্রিত। ইহাদের ভাষাও ঠিক বাঙলা নয়, অথচ বাঙলার খুব কাছাকাছি। এই জাতীয় লোকের কয়েকটি শাখা নিম্ন আসামের গোয়ালপাড়া, গারোপাহাড় এবং ময়মনসিংহ, ঢাকা ও শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বসবাস করিতেছে। ময়মনসিংহে ইহারা হাজং বলিয়া পরিচিত।

একটি হাজং সম্ভ্রান্ত পরিবার - পশ্চাতে করগেট টিনের গৃহ ও মাটির লেপ দেওয়া বেড়া ইহাদের জীবন-যাত্রার আভাষ দিতেছে বাঙলার পল্লীতে এইপ্রকার গৃহ বিরল নয়।

হাজং-জাতির মধ্যে এই রকম প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বহু-কাল পূর্ব্বে তাহারা কামরূপের হাজোনগর নামক স্থান হইতে আসিয়া বাঙলা দেশের নানা স্থানে বাস করিতেছে। হাজো-নগর হইতে আসিয়াছিল বলিয়া লোকে তাহাদিগকে হাজন বলিত। প্রতিবেশী গারো জাতি হাজন না বলিয়া ইহাদিগকে হাজং নামে ডাকিত। গারো ভাষায় 'হা' শব্দের অর্থ 'মাটি' এবং 'জং' শব্দের অর্থ 'পোকা'। হাজংদের বিশ্বাস প্রতিবেশী গারোজাতি ঈর্ষাবশতই ইহাদিগকে 'মাটির পোকা' বলিত। কারণ হাজংরা কৃষিবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিল এবং কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহাদের তুলনায় গারোজাতি কৃষিবিদ্যার বিশেষ কিছুই জানিত না। তাই তাহারা ইহাদিগকে হাজং অর্থাৎ মাটির পোকা বলিয়া ডাকিত। বর্ত্তমানে ইহারা সকলের কাছেই হাজং বলিয়া পরিচিত।

কামরূপের হাজোনগরের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু দৃঢ়তার সহিত একথা বলা যায় যে, এই হাজং জাতি আসাম হইতেই বহুকাল পূর্ব্বে বাঙলা দেশে আসিয়া বসবাস করিতেছে। ইহারা বিশাল অসমীয়া জাতিরই একটি শাখা। আগন্তুকের কাছে প্রথম দৃষ্টিতেই ইহাদের ভাষা ও আকৃতি এই কথার সমর্থন করে। ইহাদের চেহারা দেখিলে মনে হয় তাহাতে মঙ্গোলীয় রক্ত মিশ্রিত আছে এবং স্ত্রীলোক ও বালকদের কথা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইহাদের ভাষার উচ্চারণ ও গঠনভঙ্গী অসমীয়া ভাষার অনুরূপ। প্রাচীন হাজঙেরা বলেন, তাঁহারা আর্য্য জাতির বংশধর এবং জাতিতে ক্ষত্রিয়। হাজংদের দেহে যে আর্য্যরক্ত আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বাঙালীদের মত ইহারাও একটি মিশ্রজাতি।

হাজঙেরা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরের আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। হাজংদের আচার ব্যবহার দেখিলে কিছুতেই তাহাদিগকে নিম্ন স্তরের

একটি হাজং-পরিবারের বাড়ী—খড়ের ঘরের কায়দাটি কিন্তু বাঙলার যে কোন পল্লীর নিজস্ব

বলা যায় না। তাহাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মার্জ্জিত আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মভাব দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। চেহারার মধ্যে কিঞ্চিৎ সদৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ হাজংকে পার্ব্বত্য জাতি বলিয়া ভ্রম করেন। গারো, খাসিয়া প্রভৃতি জাতিদের ন্যায় ইহাদিগকে কিছুতেই পার্ব্বত্য বলা যায় না। প্রতি দশ বৎসর অন্তর ভারতে যে লোক-গণনা হয়, অনেক অদৃশ্য মাথা ও হাত তাহাতে কাজ করে। গত আদম-সুমারিতে ইহাদিগকে জড়োপাসক বলিয়া লিখিবার আয়োজন হইয়াছিল। তখন হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলের হাজঙেরা সমবেতভাবে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল।

হাজংদের মধ্যে যৌথপরিবার-প্রথা প্রচলিত এবং পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সংসারের কর্ত্তা। ছেলেমেয়ের বিবাহ পিতা-মাতাই দিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিন্দনীয়

নহে এবং দায়াধিকার বাঙালী হিন্দুদের মত। ক্ষত্রিয়ের নিয়ম অনুসারে ইহারা তের দিন অশৌচ পালন করে এবং অশৌচের সময় কেহই মাছ-মাংস আহার করে না। অশৌচান্তে সকলেই যথাশক্তি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে।

হাজং পুরুষেরা বাঙালীদের মতই কাপড় পরে এবং মেয়েরা সাধারণত মণিপুরী জাতির মত বুকের উপরে কাপড় পরিয়া থাকে। অনেক মেয়ে আজকাল বাঙালী মেয়েদের মতই শাড়ী পরিতেছে দেখা যায়। সচরাচর ইহারা সমতল ক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকে এবং কৃষি ও পশু-পালন ইহাদের প্রধান জীবিকা। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ইহারা বিশেষ পরিশ্রমী।

গত দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরেই ময়মনসিংহের হাজং জাতিদের মধ্যে গিয়া কয়দিন বাস করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। আমি যেখানে যেখানেই গিয়াছি সর্ব্বত্রই ইহাদের আতিথেয়তা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

আজ পর্যন্ত ইহাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার প্রচলন তেমন ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। তবুও পারিবারিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা শুভ সংস্কার ইহাদের আছে যাহার জন্য সকলেই ধর্ম্ম বিষয়ে অল্প বিস্তর জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। হাজংদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অল্প হইলেও দুর্লভ নহে। বালক-বালিকাগণকে যে লেখাপড়া শিখান দরকার তাহা অনেক পিতামাতাই ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছেন। আমি হাজং মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, বালক-বালিকাদের সঙ্গে মিশিয়াছি, তাহারা বিদ্যালয়ের বিদ্যা অর্জ্জন করে নাই সত্য, কিন্তু সেজন্য তাহাদিগকে অশিক্ষিত বলা যায় না। পুরুষপরম্পরা ক্রমে তাহাদের মধ্যে যে রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম্মভাব চলিয়া আসিতেছে, তাহাই তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে সহজ অনাড়ম্বর অথচ সবল একটি ভাব দেখিয়া আমি সর্ব্বত্রই মুগ্ধ হইয়াছি।

শিক্ষা ভিন্ন বৈষয়িক বা মানসিক কোন বিষয়েই স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না। যাহাতে বালক ও বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থানে স্থানে স্থাপন করা হয় এবং শিক্ষা বিষয়ে অভিভাবকগণকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হয়, হাজং নেতাদের সঙ্গে আমি সেই বিষয়ে আলাপ করিয়াছি। সুসঙ্গ রাজ-পরিবারেও আমি এই বিষয় আলাপ করিয়াছি। বর্ত্তমানে কুল্লাগড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে হাজংদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা হইতেছে।

হাজঙেরা বৈষ্ণব মতাবলম্বী। যৌবনের প্রারম্ভেই ইহারা গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে। বাঙালী বৈষ্ণব গোসাইগণ ইহাদের গুরু। প্রবীণদের মধ্যে কেহ কেহ আমার সঙ্গে আসিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলেন, সাধন ভজন সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আন্তরিকতা দেখিয়া আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম হাজংদের মধ্যে খুব গোঁড়ামি দেখিতে পাইব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোথাও গোঁড়ামি বিশেষ দেখিতে পাই নাই। বৈষ্ণব হইয়াও ইহারা কামাখ্যা, কালী, দুর্গা প্রভৃতি শাক্ত দেব-দেবীগণের পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মোটামুটি দুইটি ভাগ। এক-দল মাছ-মাংস আহার করে, অপর দল শাক্ত দেব-দেবীর পূজা করিলেও পশুবলি দেয় না বা মাংস গ্রহণ করে না। যাহারা মাংস খায়, এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক তাহাদের বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করে না। এই উভয় ভাবের লোকের মধ্যে বাহিরের দিক হইতে কোন শ্রেণীগত প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং সামাজিক আদান-প্রদানে এই প্রভেদ কিছুমাত্র বাধা বা বিপত্তির সৃষ্টি করে না।

প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বারোয়ারী কালীমন্দির আছে। প্রতি বৎসর সেখানে যথারীতি প্রতিমা করিয়া সকলে মিলিয়া মায়ের পূজা দেয়। বাড়ীতে সময় সময় সত্যনারায়ণের পূজা হয়, নারদপুরাণ পাঠ হয়, কীর্ত্তন হয় এবং যাহারা সমর্থ তাহাদের বাড়ীতে প্রতিমা করিয়া দুর্গোৎসবাদিও করা হইয়া থাকে।

প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত একখানা নারদ-পুরাণ আমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই পুরাণখানা কাহার রচনা তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই পুরাণখানা হাজং জাতিরই কাহারও রচনা এবং বহু পুরুষ হইতে ইহাদের মধ্যে তাহা চলিয়া আসিতেছে। নারদপুরাণে স্বর্গের বর্ণনা আছে, নরকের বর্ণনা আছে, কি রকম পাপ করিলে কিরূপ নরকে গতি হয় এবং সেই নরকের যন্ত্রণা কি ভীষণ, এইসব কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। হরিনামের মাহাত্ম্য ও বৈষ্ণবের সেবার কথাও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

দীপালির সময় হাজংদের মধ্যে খুব ঘটা করিয়া উৎসব হয়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত দলে দলে লোক খোল করতাল সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করে। এই কীর্ত্তন দলের সঙ্গে ছোট ছোট বালকদিগকে কৃষ্ণ, রাধা, বলরাম প্রভৃতি এবং নানাপ্রকার সং সাজান হইয়া থাকে। গানের কথাগুলি হাজংদেরই রচনা এবং অধিকাংশই বাঙলা। বাঙলা দেশে দীপান্বিতার দিনে কালীপূজা হইয়া থাকে, কিন্তু হাজংদের মধ্যে ঐদিন রাধাকৃষ্ণ বিষয়েই কীর্ত্তন ও উৎসব হইতে দেখা যায়।

বৈষ্ণব হইলেও হাজঙেরা বড় কামাখ্যাভক্ত। প্রত্যেক গ্রামে অথবা দুই তিনটি গ্রাম মিলিয়া নির্জ্জন বনের মাঝে একটি কামাখ্যা মন্দির নির্ম্মিত হয়। গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তিকে মন্দিরের পুরোহিত নির্ব্বাচিত করা হয় এবং আবশ্যক মত মায়ের পূজা দেওয়া হয়। কামাখ্যা-মন্দির বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া গেলেও সুসঙ্গ পরগণার পশ্চিমে অবস্থিত ঘোষগাঁও-এর কামাখ্যামন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। একটি পার্ব্বত্য নদীর ধারে নির্জ্জন প্রদেশে নিবিড় বৃক্ষ সমাবৃত হইয়া দেবীর মন্দিরটি বিরাজ করিতেছে।

প্রত্যেক শনিবার মায়ের পূজা ও বলি হয়। দূরে দূরে গ্রাম হইতে বহু নরনারী পূজা দিবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে। দৈবক্রমে এক শনিবারে ঘোষগাঁও-এর পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হই। সেখানে কামাখ্যা দেবীর পূজার সংবাদ পাইয়া আমরা সদলবলে [illegible]

দর্শন মানসে গঙ্গারোহণে যাত্রা করিলাম। আমরা নদীর কাছাকাছি আসিয়াছি, এমন সময় মন্দিরে কাঁশর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সহযাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, অন্তত মাকে দর্শন করিয়া আসা যাউক। আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। আমাদের সৌভাগ্যবশত পূজা শেষ তখনও হয় না। তখন বলিদানের আয়োজন হইতেছে। পূজারম্ভের কাঁশর ঘণ্টা-ধ্বনি আমরা দূর হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম।

আমরা তখন মন্দিরে মায়ের সামনে গিয়া মাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইলাম। সম্মুখে নৈবেদ্য ও ধূপ দীপ প্রভৃতি সজ্জিত হইয়াছে। ঘরের ভিতর আরও ছোট ছোট ঐ রকম দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদের সম্মুখেও ঐ ভাবে ছোট ছোট নৈবেদ্য দিয়া পূজা করা হইয়াছে।

পূজার পর যাত্রীদল একে একে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রসাদপ্রার্থী বালক-বালিকাদের কলরবে পূজাস্থান মুখরিত হইয়া উঠিল। আমার সঙ্গীরা সকলে চারিদিকে বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। হাজং গারো বাঙালী জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই এখানে পূজা দিতে আসে; এমন কি মুসলমানেরাও সময় সময় মাকে পূজা পাঠাইয়া দেয়। সকলের বিশ্বাস এখানকার দেবী বড় জাগ্রতা। পূজক উপবাসী থাকিয়া মায়ের পূজা করে এবং পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে কথা বলে না।

হাজংদের মধ্যে পূর্ব্বে উপনয়ন প্রথার চলন ছিল না। বর্ত্তমানে কেহ কেহ উপবীত ধারণ করিতেছে। কামাখ্যা-দেবীর পূজারীর গলায় আমরা পৈতা দেখিতে পাই নাই। হাজংদের পূজা-পার্ব্বণ আগে তাহারা নিজেদের মধ্যেই সম্পন্ন করিত। আজকাল অনেকেই বাঙালী পুরোহিত গ্রহণ করিতেছে। যাহারা এখনও পুরোহিত গ্রহণ না করিয়া চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ করিতেছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহারাও পুরোহিতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার জাতিভেদ নাই। পুরোহিতবিহীন অথবা পুরোহিতযুক্ত, পৈতাবিহীন অথবা পৈতাধারীতে সামাজিকতার দিক হইতে কোনপ্রকার প্রভেদ নাই।

বাঙালীর সহিত হাজংদের যে সাদৃশ্য তাহাতে শিক্ষাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আগামী এক শতাব্দীর মধ্যে এই হাজং জাতি বাঙালীদের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, শিল্পে,—অনেক বিষয়ে বাঙালী জাতি বর্ত্তমান ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অগ্রণী। বাঙালী জাতির বিশাল দেহে মিশিলে গেলে হাজংদেরই বিশেষ উপকার হইবে। অতি সহজে তাহারা একটি উন্নত জাতির মানসিক সম্পদের অধিকার লাভ করিতে পারিবে। হাজংদের মধ্যে সর্ব্বত্র যে মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আশান্বিত। পার্শ্ববর্ত্তী বাঙালীদের এখন কর্ত্তব্য—নিজেদের সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া এই সরল জাতিটিকে আপন সমাজের মধ্যে স্থান দান করা।

খৃষ্টান মিশনরীরা স্থানে স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ইহাদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। দুই তিনটি হাজং পরিবার ইতিমধ্যেই খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান কোন ধর্ম্মই খারাপ নহে। কিন্তু কোন সাময়িক কারণে পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করা বড়ই মর্ম্মান্তিক।

অ-হিন্দু বা অ-ভারতীয় অনেকেরই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। এই সকল লোককে সত্যনিষ্ঠ তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর আসন যদি আমরা দিতে চাই, তাহাতে আমাদের অর্ব্বাচীনতাই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু নিজে হিন্দু হইয়া কোন ব্যক্তিই এই হাজং জাতিকে অ-হিন্দু বলিতে পারিবেন না। হাজং জাতিকে অ-হিন্দু বলিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে পূর্ব্বাহ্নেই মূর্খতার অপমান শিরে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হিন্দু নেতৃবর্গের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি পাইলে শত প্রলোভনেও ইহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। খৃষ্টান মিশনরীদের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইহারা হিন্দুই থাকিয়া যাইবে। অবশ্য একটি দুইটি ব্যক্তি বা পরিবার সময় সময় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে। তাহা সকল সমাজেই হইয়া থাকে।

যাঁহারা এই সকল জাতির সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, কয়েকটি কথা তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। শিক্ষা-প্রচার ভিন্ন কোন জাতির স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। গ্রামে গ্রামে বালক-বালিকা উভয়ের মধ্যেই শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। আর্থিক ও ব্যবহারিক দিকে যাহাতে ইহারা বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামে উন্নতি করিতে পারে তাহার পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। এইটুকু যদি আমরা করিতে পারি তাহা হইলে বার আনা কাজই সমাপ্ত হইল। ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারের দিকে বেশী মাথা ঘামাইতে হইবে না। তবে বিরাট হিন্দু সমাজের নিকট হইতে ইহারা যাহাতে মর্য্যাদাসূচক ব্যবহার পাইতে পারে তাহা করা অত্যন্ত দরকার হইবে।

সংস্কারকগণ অনেক সময় নিজের নিজের রুচি ও খেয়াল অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া থাকেন। তাহা সত্যই অবৈজ্ঞানিক ও অনিষ্টকারী। হিন্দুস্থানী কোন সংস্কারক ইহাদের সেবা করিতে গেলে বলিবেন,—'মাছ খেতে পারবে না'। বৈষ্ণব বলিবেন,—'মাংস স্পর্শ করতে পারবে না, তিলক কাটতে হবে'। আবার কেউ বলিবেন, তুলসী পূজা কর, কেউ বা বলিবেন বেলগাছ পূজা কর। হাজার হাজার বৎসরের সংস্কার লইয়া এক একটা জাতি বাঁচিয়া আছে। হঠাৎ খামখেয়ালী করিয়া একটা নূতন কিছু চাপাইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না, আর তাহার প্রয়োজনই বা কি? মাছ খাইলেই এই জাতির উপকার হইবে, কি না খাইলেই উপকার হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারিবে না। আমরা ইহাদিগকে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করিতে পারি মাত্র। যথার্থ শিক্ষিত হইয়া দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় সামাজিক বিষয়ে ইহারা নিজে নিজেই নিজেদের আবশ্যক সংস্কার করিয়া লইবে এবং তাহাই হইবে যথার্থ সংস্কার।

সুসঙ্গ রাজপরিবার এবং কুল্লাগড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম এই হাজং জাতির সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

(১৪)

নিত্য পূজা সবে মাত্র শেষ হইয়াছে। রেণু পূজাগৃহ হইতে বাহির হইতেই দাসী আসিয়া বলিল, "দেওয়ান বাবু তোমার জন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, মা।"

রেণু আসিতেই বৃদ্ধ বলিলেন, "মা, বড় বিপদ।"

রেণু তাঁহার শুষ্ক উদ্বেগ-ভরা মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "জ্যেঠামশায়, কিস্তির কি খেলাপ হ'য়েছে? টাকা পৌঁছায় নি?"

"—না মা, টাকার কোন গোলমাল হয় নি।"

"—তবে কি হয়েছে?" রেণু উদ্বেগ-ভরে প্রশ্ন করিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার ঘরে চল মা, সব বলছি।"

রেণুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধ চুপি চুপি সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। কথা শেষে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি স্থির কর, মা!"

রেণু সমস্তই শুনিল। শুনিতে শুনিতে কতবার তাহার চক্ষুর তারা জ্বলিয়া উঠিল, কতবার ভ্রূকুটীর কুটিল-রেখা ফুটিয়া মিলাইয়া গেল,—কতবার সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

বৃদ্ধ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি মা?" তখন সহসা সুপ্তোত্থিতের মত সে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার পানে চাহিল। কোন কথা বলিতে পারিল না।

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমাদের এখন দুঃসময় পড়েছে, না হ'লে এমন বিপদই বা হবে কেন?"

রেণু এবার কথা কহিল। ধীর স্বরে বলিল, "কিন্তু জ্যেঠামশায় আমরা এখন কি ক'রতে পারি! তহবিলে টাকা নেই—সবে মাত্র কিস্তির টাকা দেওয়া হয়ে গেছে, আমার গায়ের গহনাও নেই।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তা ত সবই জানি মা, কিন্তু জমিদার বাড়ীর মান রাখতে হ'লে বাবুকে খালাস ক'রে আনতেই হবে।"

রেণু বলিল, "তা হ'লে জমিদারী বন্ধক ছাড়া আর উপায় কি?"

বৃদ্ধ নতশিরে বলিলেন, "অন্য উপায় নেই মা। যাই হোক—"

রেণু মৃদুস্বরে বলিল, "তাহ'লে খালাসের ত কোন উপায়ই দেখি না, জ্যেঠামশায়?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কেন মা, জমি বন্ধক দিয়ে—"

রেণু হাসিল। বড় ম্লান শুষ্ক হাসি।

কহিল, "জ্যেঠামশায়, জমিগুলি যদি একবার বন্ধক পড়ে ত আর খালাসের উপায় থাকবে না। এই যে হাসপাতাল, অতিথিশালা, দেবতার ভোগ-পূজা, সবই বন্ধ করতে হবে। তাহ'লে কি জমিদার বাড়ীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে?"

বৃদ্ধ নতমুখে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, "তা—তা—বাবুর একটা ভালমন্দ কিছু হ'লে—"

রেণু স্থির স্বরে বলিল. "তাঁর সঙ্গে জমিদারীর কোন সম্পর্ক নেই জ্যেঠামশায়! আপনি যান। আমি একের জন্য শত শত লোকের সর্ব্বনাশ ক'রতে পারব না।"

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে রেণুর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা সে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, চক্ষুর দৃষ্টি প্রশান্ত—স্থির।

বলিলেন, "জানি মা, তোমার কর্ত্তব্য। তোমার উঁচু মনের মতই কথা বলেছ। কিন্তু মা, সংসারে শুধু কর্ত্তব্য ক'রে ত তৃপ্তি পাওয়া যায় না!"

রেণু সহসা প্রশ্ন করিল, "কেন যায় না, জ্যেঠামশায়?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এ 'কেন'র উত্তর মানুষের মন নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন কর, পাবে। দোষে-গুণে দুর্ব্বলতায় মানুষ স্নেহ-মমতা কি, কঠিন হ'লেই মুছে ফেলা যায়, মা!"

রেণু মধুর হাসিতে মুখখানি ভরাইয়া উত্তর দিল, "যায় বৈকি, জ্যেঠামশায়। মানুষ তা পারে ব'লেই তার মনুষ্যত্বের দাবী। আমার ছোট দুঃখকে যদি এত বড় ক'রেই দেখতে বলেন ত, এ ভার হাতে নেওয়া আমার উচিত হয় নি। না,—না,—জ্যেঠামশায় আমায় মাপ করুন। জমিদারী আমি নষ্ট করতে পারব না!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তার পর—! সমস্ত জীবন যে পড়ে রয়েছে মা তোমার সামনে। লোক-নিন্দা—অপযশ—।"

রেণু তেমনই অবিচলিত স্বরে বলিল, "লোকের মুখ ত আমি চেপে রাখতে পারব না, জ্যেঠামশায়। তাদের যা ইচ্ছে বলুক। আর জীবনের কথা কি ব'লছিলেন? সমস্ত জীবন? আমি এক একবার ভাবি জ্যেঠামশায়, এই জমিদারী আগেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও হয়ত থাকবে। বংশপরম্পরায় কত হাত বদল হয়েছে—কেউ সুখ্যাতি কিনেছে—কারও নামে অখ্যাতি রটেছে—তবু এ ত নষ্ট হয় নি। আমার জীবন কদিনের? দুদিনের জন্য কেন তাঁর বিশ্বাসকে নষ্ট ক'রে অখ্যাতি কিনব বলুন?"

বৃদ্ধ হতাশ হইয়া বলিলেন, "বুঝেছি মা তোমার ব্যথা। লোকে ব'লবে নিজের স্বামীর জন্য এত বড় জমিদারীটা ঘোচালে, তা তুমি সহ্য ক'রতে পারবে না। তাই অম্লানবদনে এত বড় আঘাত বুক পেতে নিতে চাইছ! আচ্ছা মা, আমি যদি নিজে থেকেই এর কোন উপায় ক'রতে পারি, তোমার আপত্তি হবে না ত?"

রেণু বলিল, "কিন্তু আপনি ত এই মাত্র বলেছেন আর কোন উপায় নেই?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "জমিদারী বাঁধা দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই, এখনও বলছি। তবে বাঁধা দেওয়ার নিমিত্তের ভাগী তোমায় করতে চাই না, মা। আমি বড় বাবুর কাছে যাচ্ছি, দেখি যদি কোন উপায় হয়?"

রেণু খানিক ভাবিয়া বলিল, "বেশ যান। কিন্তু যদি তিনি বিষয় বন্ধকের কথাই বলেন, শুধু তাঁকে জানাবেন আমার—

মত নেই। বিষয় আমার নয়, তাঁরই। কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্যে এত বড় সম্পত্তি নষ্ট না করাই আমার ইচ্ছা।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার সুখ্যাতি ক'রে বলছি না মা, স্বর্গীয়া গিন্নিমার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী নারী আমি জীবনে দেখিনি। তোমায় তিনি উপযুক্ত জেনেই এই ভার দিয়ে গেছেন। তাঁকে আমি প্রণাম করি।"

বাহিরের ঘরে সুরেন বাবুর কাছে আবেদন করিয়াও কোন ফল হইল না।

তিনি নির্ব্বিকার ভাবে উত্তর দিলেন, "বিষয় তাঁর, এ-বিষয়ের বিবেচনা-ভারও তাঁর।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনি যদি একবার অনুরোধ করেন বাবু—"

হাসিয় সুরেন বাবু বলিলেন, "তোমার এত আঁকু-পাঁকু কেন, রামরতন! আর কত কাল মান-সম্ভ্রম নিয়ে মাথা ঘামাবে?"

রামরতন বলিলেন, "যতদিন প্রাণ থাক্‌বে ততদিনই হয়'ত। বাবু আমিও জানি তার দণ্ড হওয়াই উচিত, কিন্তু আমার সতীলক্ষ্মী মার মনে যে কি কষ্ট হবে তা যদি জানতেন?'

সুরেন বাবু অল্প হাসিয়া বলিলেন, "কষ্ট ত পৃথিবীতে এলে অনেক রকমেই ভোগ ক'রতে হয়, হাত দিয়ে কেউ কি সে সব ঠেকিয়ে রাখতে পারে? তা নয় রামরতন, আমি বলছি যাঁর ভার তাঁকেই বইতে দাও। তিনি মানুষ হোন।"

"না বাবু—আপনাকে এ অনুরোধ রাখতেই হবে।"

সুরেন বাবু বলিলেন, "তোমার অনুরোধ না হুকুম, রামরতন? না, না, লজ্জা কি ভাই—তোমায় সত্যিই—আমি—আমার অন্তরঙ্গ বলে জানি। বেশ তাই হবে,—আমি ব'লব।"

রেণু কিন্তু রাজী হইল না।

তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া বলিল, "তাহলে আপনি এ ভার নিন, আমায় নিষ্কৃতি দিন।'

সুরেন বাবু বলিলেন, "কার ভার কে নেবে, মা। বুঝেছি, যা ভাল বোঝ কর। তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি তোমার ভালই হবে। মা, আর একটি কথা তোমায় ব'লব, আমার এখানে আর ভাল লাগছে না। মনে করছি দিনকতক তীর্থে ঘুরে আসি।"

রেণু মৃদুস্বরে বলিল, "আমিও যাব বাবা, কিন্তু আর দিনকতক যাক।"

সুরেন বাবু বলিলেন, "তুমি কেন যাবে মা?"

রেণু বলিল, "না হলে আপনাকে দেখবে কে? আপনি গেলে আমায়ও যেতে হবে, বাবা।"

সুরেন বাবু বলিলেন, "বুঝেছি বেটীর কৌশল। আমায় আটক করতে চাও। নাঃ, বুড়ো বয়সেও তোদের মায়ার শেকল দিয়ে আমায় এমনি ক'রে জড়িয়ে রাখবি ত মুক্তি পাব কবে? চিরকালই কি ঘরের কোণে ব'সে বিষয় নিয়ে প'ড়ে থাকব?"

রেণু বলিল, "বিষয় আর আপনাকে কবে বাঁধলে বাবা, যে এ-কথা বলছেন।"

সুরেন বাবু বলিলেন, "একটা কবিতা পড়েছিলাম মা,—

'বন্ধন ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'

আমারও হয়েছে, তাই।" বলিয়া বহির্ব্বাটীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ক্রমে ক্ষান্তকালী এ কথা শুনিলেন।

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি রেণুর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বৌমা, একি শুনি? আমার মদনগোপালকে নাকি পুলিশে ধরেছে! ও মা, কি হবে মা, কোথায় যাব মা! মদন যে আমার দুধের ছেলে, ভালমন্দ কিছু জানে না।"

রেণু তাহাকে কোন সান্ত্বনার কথা বলিল না। সে ভালরূপেই জানিত কোন সান্ত্বনায়ই তিনি শান্ত হইবেন না।

ক্ষান্তকালী পুনরায় বলিলেন, "ওগো,—কথা কচ্ছ না যে! আমার বাছার কি উপায় করলে, না জেনে আমি মুখে জল-বিন্দু দেব না, আত্মহত্যে হব, মাথাখুঁড়ে মরব—"

বলিয়া সত্যি সত্যিই তিনি মাটীতে মাথা ঠুকিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া রেণু স্থির থাকিতে পারিল না। তাঁহার মাথাটি ধরিয়া কহিল, "কাঁদছেন কেন দিদিমা,—সব শুনেছেন কি?"

ক্ষান্তকালী চীৎকার করিয়া কহিলেন, "আর শুনব কি, বাছাকে পুলিশে টেনে নিয়ে গেছে। শুনেছি নাকি ঘানি টানাবে, পাথর ভাঙাবে? ওগো, যেমন ক'রে পার গয়না বেচে—বিষয় আশয় বেচে বাছাকে আমার কোলে এনে দাও।"

রেণু শান্ত কণ্ঠে কহিল, "একজন মেয়েছেলের ওপর বিনাদোষে অত্যাচার ক'রলে ভগবান যদিই ক্ষমা করেন রাজার আদালত ক্ষমা করবে কেন, দিদিমা?"

ক্ষান্তকালী বলিলেন, "কে কার ওপর অত্যাচার করেছে বাছা! পষ্ট বল, আমার ও সব ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় ভাল লাগে না।"

রেণু ধীরে ধীরে সমস্ত খুলিয়া বলিল।

সমস্ত শুনিয়া ক্ষান্তকালী প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কখখন না, ওসব শত্তুরের রচনা—বিশ্বেস ক'র না বৌমা। আমি একবার সুরোর কাছে যাই, তুমি টাকার যোগাড় কর।"

ক্ষান্তকালীর কাকুতি-মিনতি ক্রন্দন-অভিশাপ সুরেনবাবুর মর্ম্ম স্পর্শ করিল না। তিনি শুধু বলিলেন, "যা ছেড়েছি আবার কেন তা হাতে নিতে ব'লছ। যা ব'লবার বৌমাকে ব'ল।"

ক্ষান্তকালীর প্রবল কণ্ঠস্বরে রেণুর জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অবশেষে সে সহিতে না পারিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, "আপনার নাতি যেমন কর্ম্ম ক'রেছেন ফলও তেমন পাবেন। তাঁর জন্য বিষয়ের কাণা-কড়িটি পর্য্যন্ত আমি নষ্ট ক'রতে পারব না।"

ক্ষান্তকালীর তীব্র ক্রোধ গলিত ধাতুস্রাবে রেণুর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়া দিল। সে ছুটিয়া আপন শয়ন কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

শয্যার উপর মুখ গুঁজিয়া রেণু খুব খানিকটা কাঁদিল। এই বিষয়-বিষ কেন সে কণ্ঠে ধারণ করিল? নীলকণ্ঠের মত সহাস্য মুখে সেই তীব্র জ্বালা পরিপাক করিবার সামর্থ্যই বা তার কোথায়?

শয়ন কক্ষের বাহিরে তুমুল ঝড় উঠিয়াছে। অপযশের গ্লানি, কুৎসার ব্যঙ্গ, স্ত্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতির অগৌরব, এমন কি তাহার নারী-ধর্ম্মের উপর কটাক্ষপাত পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে বহিয়া চলিয়াছে। কর্ত্তব্যের উজ্জ্বল কিরণ যে তাহার এই সকল মিথ্যা কদাচারকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না, স্নেহময়ী মা ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া তোমার প্রাণ হইতে প্রিয়তর বিষয়ের ভার আমার হাতে সঁপিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছ। কিন্তু যাহার বিষয় সে কেন অমন অকৃতজ্ঞের মত দূরে সরিয়া গেল। সে কেন সব দিক দিয়াই জীবনের পথ-রেখাকে মুছিয়া চলিবার প্রয়াস করিতেছে।

রেণু উঠিয়া বসিল। কাগজ-কলম লইয়া পত্র লিখিল।

লিখিল,...... তোমার দেওয়া শাস্তি কি আমি চিরকালই এমন মুখ বুজিয়া সহিয়া যাইব? কেন তুমি দেশে শত কাজ থাকিতে বিদেশে রহিয়াছ। মা, অভিমান বশে যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমার এ শাস্তি কেন ? একবার এস। তুমি না জানিতে পার, কিন্তু আমি জানি বিষয় আমার নহে,—তোমার। যে কর্ত্তব্য আমার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছি তাহাও তোমার। লোকের নিন্দা-অপযশের অগ্নি-জ্বালায় আমার জীবন জ্বলিয়া যাইতেছে। তুমি এস—একবার এস। আমায় মুক্তি দাও।

তিন দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল—

—সংসার পরীক্ষার ক্ষেত্র—রেণু। নিন্দা অপযশের ভয় মানুষকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিবে কেন? মানুষের কি এতটুকু মনের জোর নাই যে, এই মিথ্যাকে তুচ্ছ করিতে পারে! যদি জ্বালা মনে কর—জ্বলিবে। যদি ন্যায় সত্য গৌরব মনে কর কোন কিছুই তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না। শুনিলাম সব। বিষয় তোমার, সুতরাং তোমার কর্ত্তব্য আমি নির্দ্ধারণ করিতে পারি না। তুমি নিশ্চয় জানিও কর্ত্তব্য তোমার। অভিমান বশেই হউক আর স্নেহ বশেই হউক, মা যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন আমার কাছে তাহা দোষ-ত্রুটি শূন্য।

পত্র পড়িতে পড়িতে রেণুর চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। এত নিস্পৃহতা! তাহার আকুল আহ্বানের এইমাত্র প্রত্যুত্তর!

ভাল, বিষয় সে নষ্ট করিবে, লোকের নিন্দা গ্লানি সহিবে না। কিসের জন্য অকারণ জ্বালায় জ্বলিতে থাকিবে?

দুয়ার খুলিয়া সে দাসীকে ডাকিল। বলিল, "দেওয়ান জ্যেঠাকে একবার ডেকে আন ত। বলবি জরুরি কাজ, এখুনি একবার আসা চাই।"

দাসী চলিয়া গেল।

রেণু পশ্চাতে ফিরিয়া চলিতে গিয়াই দেওয়ালে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গেল। সেখানে মহামায়ার হাস্যময়ী প্রতিমূর্ত্তি যেন সকল ব্যথা জুড়াইয়া দিবার জন্য স্নেহ-সুকোমল শান্ত নয়ন দুটি মেলিয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে রেণুর পানে চাহিয়া আছেন।

রেণু আর চলিতে পারিল না। নতজানু হইয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির পদতলে বসিয়া পড়িয়া উদ্ধনেত্রে বাষ্প-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিল, "মা, মুহূর্ত্তের অভিমান বশে এ আমি কি করছি? আমায় ক্ষমা কর। জগতে কারও সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, শুধু তুমি যা দিয়ে গেছ—তাই আমার জীবনের ইষ্টমন্ত্র হউক। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সে মন্ত্র যেন না ভুলি—এই আশীর্ব্বাদই আমায় কর।" (ক্রমশ)

আমি ফুল

শ্রীবিমলচন্দ্র নস্কর

কল্লোলিত মহাসিন্ধু কবে কোন্ জোয়ার লীলায়
সীমশীর্ণ উপকূলে চলোর্ম্মির চঞ্চল আঘাতে
রেখে গেছে ছোট ফুল এপারের ধূসর বেলায়
অকারণে উচ্ছ্বসিয়া ধ্যানমৌন তারাভরা রাতে!

আমি হাসি, আমি কাঁদি, হেথা ব'সে, আমি সেই ফুল,
আমি ভাবি—শুধু ভাবি দীর্ঘদিন নিস্তব্ধ নিশীথে;
প্রহরের আনাগোনা, বাতাসের মিছে পথ ভুল
দেখে ভুলি আপনারে—ভুলে থাকি কালের বাঁশীতে।

রোদে মেঘে বুকে মোর ক্ষণে ক্ষণে আলো ছায়া ফুটে,
কি কারণে জানিনে তা জাগে হেথা এত শিহরণ।
নিশিদিন ফিরে যায় ঢেউগুলি তট'পরে লুটে,
সুদূর দিগন্তে হাসে নামহীন অসংখ্য বরণ।

ঊষর বালুকাতটে আর' কবে আসিবে জোয়ার,
গতিচ্ছন্দে হবে কবে এই স্থির উপল চঞ্চল,
সহসা উঠিবে কাঁপি' এই ক্ষুদ্র হৃদয় দুয়ার,
নাচিয়া উঠিবে মোর চারিদিকে সাগরের জল।

মুসলিম স্বার্থের দিক হইতে ফেডারেশন

রেজাউল করীম এম-এ বি-এল

ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের একটি প্রধান অভিযোগ এই যে, উহাতে মুসলিম স্বার্থরক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই। উহাতে প্রধানত ও মূলত হিন্দু প্রাধান্য থাকিবে। আর হিন্দু প্রাধান্যের অর্থই হইতেছে কংগ্রেস প্রাধান্য। সুতরাং কংগ্রেস যখন মুসলমানের শত্রু, তখন কংগ্রেস-প্রভাবিত ফেডারেশনে মুসলিম-স্বার্থ পদে পদে খণ্ডিত হইবে। এই জন্য মুসলিম লীগ মুসলমানকে ফেডারেশন বয়কট করিতে উপদেশ দিয়াছে। উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন বিষয় বলা এক কথা, আর যুক্তি-তর্কের আশ্রয় লইয়া সেই কথা বলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। অনর্থক হিন্দু-ভীতি অপেক্ষা যুক্তি-তর্কের আশ্রয় লইয়া আমরা দেখাইতে প্রয়াস পাইব যে, মুসলিম লীগের উক্ত প্রকার ভীতির কোনই কারণ নাই। বরং যে ভাবে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে মুসলিম লীগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠারই বেশী সম্ভাবনা আছে।

ফেডারেশনে তিন শ্রেণীর সদস্য থাকিবেঃ—ব্রিটিশ-ভারত হইতে নির্ব্বাচিত সদস্য, দেশীয় রাজ্য হইতে মনোনীত সদস্য এবং ইংরেজ সরকারের মনোনীত সদস্য। এই তিন শ্রেণীর সদস্যের মধ্যে দেশীয় রাজ্যের সদস্য ও সরকার মনোনীত সদস্যগণ যে একযোগে কাজ করিবেন, তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। দেশীয় রাজ্যগুলি নামেই স্বাধীন, কিন্তু কার্যত তথাকার শাসকগণের স্বাধীনতা নানাপ্রকারে ব্যাহত। তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছুই নাই। আভ্যন্তরীণ কতকগুলি বিষয়ে যে স্বাধীনতা আছে, তাহা নাম মাত্র। কিন্তু বৈদেশিক ও সামরিক ব্যাপারে আইনত তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই। এমন কি, অকর্ম্মণ্য প্রমাণিত হইলে, তাহাদিগকে অপসারিত করিবার ক্ষমতা ও সার্ব্বভৌম শক্তি আছে। দেশীয় রাজ্যে যে একটি করিয়া সরকারী এজেন্ট থাকেন, তাঁহারই ইংগিতে দেশীয় রাজগণ অধিকাংশ স্থলে পরিচালিত হন। এরূপস্থলে দেশীয় রাজ্যের মনোনীত সদস্যগণ ফেডারেশনে আসিয়া যে কোনরূপ স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না তাহা বলাই বাহুল্য। স্বাধীনভাবে কাজ করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ে মনোনীত সদস্যের অনুসরণ করিবেন। সুতরাং একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, দেশীয় রাজ্যের সদস্যগণ ভারত সরকারের শক্তিবৃদ্ধি করিবেন। তাঁহাদের দ্বারা সরকার-বিরোধী দল কোনই সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবে না।

এখন ব্রিটিশ-ভারত হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যের শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। ব্রিটিশ-ভারতের সমগ্র সদস্যের এক তৃতীয়াংশ আসন পাইবেন মুসলমান। ভারতের মুসলমানের সংখ্যা এক চতুর্থাংশ হইতে কিছু বেশী—এক তৃতীয়াংশ নহে। সুতরাং তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত 'ওয়েটেজ'সহ ফেডারেশনে আসন দেওয়া হইয়াছে। তারপর আর যেসব মাইনরিটি আছে, তাহাদিগকেও ওয়েটেজ-সহ আসন দেওয়া হইয়াছে; যেমনঃ—শিখ, ইউরোপীয়ান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি। মাইনরিটিদেরকে যথোপযুক্ত ওয়েটেজ দেওয়ার কারণে সমগ্র দেশের সংখ্যার তুলনায় হিন্দুদের যত আসন পাওয়া উচিত, ততটা দেওয়া হয় নাই। কারণ, যে-কোন মাইনরিটি ন্যায্য আসন অপেক্ষা অধিক আসন দাবী করিয়াছে ও তাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইয়াছে হিন্দুদের আসন হইতে। সরকার বাহাদুর সেজন্য নিজেদের মনোনীত সদস্যের আসনের সংখ্যা হ্রাস করিতে সম্মত হন নাই। মুসলমানদের মধ্যে যেমন চরমপন্থী ও নরমপন্থী আছেন, হিন্দুদের মধ্যেও সেইরূপই দল আছে। হিন্দুদের জন্য নির্দ্ধারিত কতকগুলি আসন নরমপন্থী অর্থাৎ সরকার ভক্তগণ অধিকার করিতে পারিবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু চরমপন্থী অর্থাৎ লীগ-বিরোধী মুসলমানের সাফল্য লাভের আশা খুব কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ফেডারেশনে সরকারী মনোনীত সদস্য, লীগ সদস্য, অন্যান্য মাইনরিটি সদস্য ও নরমপন্থী হিন্দু সদস্য একত্রে মিলিত হইয়া এমন একটি সম্মিলিত দল গঠন করিতে পারিবে, যাহারা অনায়াসে সরকার-বিরোধী দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে। এরূপ সম্মিলিত দলের শক্তি যদি কোন অনিবার্য্য কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার জন্য সেই দলকে সর্ব্বদা সতেজ ও সবল রাখিতে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত দণ্ডায়মান রহিবে দেশীয় রাজ্যের সদস্য। এই সব শক্তির সম্মুখে কংগ্রেসই বল, আর অন্য কোন সরকার-বিরোধী দল বল—সবই কোণ ঠাসা হইয়া রহিবে। এইভাবে গঠিত ফেডারেশনে কংগ্রেস যে কুলকিনারা পাইবে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। যদি কেহ মনে করে যে, কংগ্রেস মুসলমানের শত্রু, তবে তাহাকে বলিব এইভাবে গঠিত ফেডারেশনে কংগ্রেসের প্রাধান্য লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মুসলমানের স্বার্থের নামে ফেডারেশনের বিরোধিতা করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। এই প্রকার অকিঞ্চিৎকর ফেডারেশন কংগ্রেস গ্রহণ করিবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু প্রাধান্য নষ্টের ভয় যদি কাহারও থাকে, তবে সে হইতেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া কোণ ঠাসা করিবার উদ্দেশ্যেই ফেডারেশনের আসন বণ্টনের মধ্যে নানারূপ কৃত্রিমতার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। আর তাহাতে ব্রিটিশ-সরকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

সমগ্র আসনের তুলনায় মুসলমানের আসন ত অতি নগণ্য, তাহাতে মুসলিম লীগের স্বার্থ কি ভাবে সংরক্ষিত হইবে, এইবার তাহাই আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফেডারেশনের মত সর্ব্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে মুসলমান চিরকালই সংখ্যা লঘু হইয়া থাকিবে। ইহা বুঝিয়াই মিঃ জিন্না প্রমুখ নেতারা ফেডারেশনে ⅓ আসন দাবী করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই দাবী পূরণ করা হইয়াছে। সেদিক দিয়া তাঁহাদের আপত্তির কোনই কারণ নাই। লীগ নেতারা ⅓ আসন লইয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা চান প্রাধান্য। এই প্রাধান্য যে তাঁহারা পাইবেন, তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমত, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের শত আপত্তি সত্ত্বেও ফেডারেশনে পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পৃথক নির্ব্বাচনের কারণে প্রগতিপন্থী মুসলমান নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। শুধু তাহাই নহে, বহু স্থানে প্রগতিপন্থী হিন্দু, শিখ নির্ব্বাচিত হইতে অপারগ হইবেন। ইউরোপীয়ান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হইতেও এমন সব প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে, যাহারা এদেশের প্রগতিপন্থী ও জাতীয়তাবাদী দলের সহিত মিলিত হইতে পারিবে

না। বাঙলা, পাঞ্জাব, আসামের প্রাদেশিক ব্যবস্থা-সভা ও পরিষদে ইউরোপীয়ানগণ ও মডারেট হিন্দুগণ যেমন মুসলিমের সহিত মিলিত হইয়া যুক্ত ফ্রণ্ট গঠন করিয়াছে, ফেডারেশনেও তাহাই হইবে। অ-মুসলমান উপাদানগুলি অনায়াসে লীগ প্রাধান্য স্বীকার করিবে। কারণ তাহাতেই তাহাদের বেশী সুবিধা হইবে। এই সব মডারেটপন্থী ও সাম্রাজ্যবাদের সহায়কগণ সব সময় দেখিবে যেন কংগ্রেস প্রাধান্য না পাইতে পায়। ইহাদের শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য মনোনীত সদস্য ও দেশীয় রাজ্যের সদস্যগণ সব সময় আজ্ঞাবহ দাসের মত প্রস্তুত রহিবে। এরূপ অবস্থায় ফেডারেশনে লীগ-প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে। মুসলিম লীগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই যদি মুসলমানের স্বার্থ হয়, তবে ফেডারেশন তাহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। সুতরাং মিঃ জিন্না যে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, মুসলিম-স্বার্থের দিক হইতে ফেডারেশন গ্রহণের অযোগ্য, তাহা অযৌক্তিক ও ধাপ্পাবাজীর চাল মাত্র।

ফেডারেশনে লীগ-প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠাই যদি মুসলিম-স্বার্থ হয়, তবে বলিব, সেজন্য মুসলমানের কোন ভয়ের কারণ নাই। মনোনীত সরকারী সদস্য, মনোনীত দেশীয় রাজ্যের সদস্য, মডারেট হিন্দু সদস্য, ইউরোপীয়ান সদস্য,—ইহাদের সমন্বয়ে যে সম্মিলিত দল গঠিত হইবে, তাহারই পুরোভাগে দাঁড়াইয়া মুসলিম লীগ নেতৃত্ব করিবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমগ্র মুসলমান সমাজকে একটা কথা ধীরভাবে বিবেচনা করিতে বলি,—এইভাবে যে-দল গঠিত হইবে, সে-দল কি কোন দিন মুসলমানের সত্যিকারের কল্যাণ করিতে পারিবে? প্রতিক্রিয়াশীলদের সহযোগিতায় এইভাবে গঠিত দলের সাহায্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা চলিবে সত্য, কিন্তু তাহার সাহায্যে দেশের তথা মুসলমানের কল্যাণ করা কোন মতেই সম্ভব হইবে না। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, ফেডারেশনে তাহা দেওয়া হয় নাই। বৃটিশ-ভারতীয়দের প্রতিনিধিদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, এমন উপায় অবলম্বন করা, যাহাতে শাসন-ক্ষমতা আরও প্রসারিত হয়। সম্ভব হইলে ফেডারেশনকে প্রথমাবধি অচল করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেখানে প্রবেশ করিয়া শাসন-ক্ষমতা হাতে না লইয়া নানা উপায়ে উহার স্বচ্ছন্দ গতিকে থামাইয়া দিতে হইবে, উহার প্রত্যেক কাজকে বাতিল করিয়া দিতে হইবে। মন্ত্রী-পরিষদ গঠনে বাধা দিতে হইবে। এইভাবে পুনঃপুনঃ সংগ্রাম দ্বারা ফেডারেশনকে অচল করিয়া দিয়া উহা বৃটিশ সরকারকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। পুনঃপুনঃ এইভাবে অচল অবস্থা সৃষ্টি করিলে, তবেই ত অধিকতর ক্ষমতা হাতে আসিবে। তবেই ত কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া ফেডারেশন পরিবর্ত্তন করিবেন। কিন্তু এরূপ না করিয়া যদি আমরা শান্ত, সুবোধ বালকের মত বৃটিশ সরকারের দয়ার দানস্বরূপ ফেডারেশনকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করি, তবে কি আমাদের অধিকার প্রসারিত হইবে! ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যাহাতে ফেডারেশন অচল করিতে না পারেন, তাহার জন্যই ত কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে কৃত্রিমভাবে নানা দল-উপদল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ইউরোপীয়ান দল, মনোনীত দল, দেশীয় রাজ্যের দল—মডারেট দল, ইহারা সাম্রাজ্যবাদের বাহন। ইহারা পূর্ব্বেও যেমন দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে গিয়াছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপই যাইবে। ইহাদের সহযোগিতা করিলে কেহ কি দেশের ও জাতির কল্যাণ করিতে পারিবে? মুসলিম লীগের নামে যাঁহারা লম্ফ-ঝম্প করিতেছেন তাঁহাদিগকে বলি, এই সব বিষয়গুলি ধীরভাবে আলোচনা করুন। এই সব প্রতিক্রিয়াশীল দলের সাহায্যে কেমন করিয়া মুসলমানের মঙ্গল হইতে পারে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। তারপর বুকে হাত দিয়া বলুন, মুসলিম লীগকে কি কোনও মতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

মুসলিম লীগের অতীতের কার্যাকলাপ যাহা দেখিয়াছি এবং বর্ত্তমানে যাহা দেখিতেছি তাহাতে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে যে, লীগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাহন। উহা এক্ষণে মুসলিম-স্বার্থের নামে সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ় করিতে চলিয়াছে। ফেডারেশনে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে মুসলিম লীগ যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে, আশা করি তাহা দেখিয়া মুসলমান সমাজের চৈতন্যোদয় হইবে। ফেডারেশন প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভে একটা কথা উঠিয়াছে, দেশীয় রাজ্য হইতে যে সব প্রতিনিধি আসিবেন তাঁহারা রাজাদের মনোনয়ন পাইয়া আসিবেন—না, প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া আসিবেন। ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ যে রাজাদের দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধি কখনই বৃটিশ ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধির সহিত সহযোগিতা করিবেন না। ইঁহারা বৃটিশ সরকারের মনোনীত সদস্যদের সহিত একাঙ্গী হইয়া যাইবেন। এরূপক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য দেশীয় রাজাদের দ্বারা এই প্রকার মনোনয়নের তীব্র প্রতিবাদ করা। যাহাতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ ফেডারেশনে যোগদান করিতে পারে তাহার জন্য বৃটিশ সরকারকে চাপ দেওয়া সকলের উচিত। আর সেই কারণে কংগ্রেস এই প্রকার নির্ব্বাচনের উপর জোর দিতেছে। কিন্তু এমন একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপারে মুসলিম লীগ জঘন্যতম আচরণ করিয়াছে। আজকাল ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া প্রত্যেক ব্যাপারে কংগ্রেসের বিরোধিতা করাই হইল মুসলিম লীগ তথা জিন্না সাহেবের প্রধান কাজ। তাই কংগ্রেস যখন নির্ব্বাচনের কথা তুলিয়াছে তখন তাহার বিরুদ্ধে যাইতে হইবে! নির্ব্বাচন অপেক্ষা মনোনয়নকেই মুসলিম লীগ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিয়াছে। এবং বৃটিশ সরকারকে সাবধান করিয়া দিয়াছে যেন তাঁহারা কংগ্রেসের কথামত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে দেশীয় রাজাদিগকে চাপ না দেন। জিন্না সাহেবের এরূপ বলিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ফেডারেশনে যেন সরকার-বিরোধী দল কিছুতেই প্রবল হইতে না পারে। কারণ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকারী দলে যোগ না দেওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। এই সামান্য একটি ঘটনা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, মিঃ জিন্না সাম্রাজ্যবাদের কিরূপ সহায়ক। ইহাতে কংগ্রেসের দাবীর বিরুদ্ধে পালটা দাবী উপস্থাপিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদের

(শেষাংশ ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(গল্প)

শ্রীগোপাল বাগচী

ডম্ লুই ফেরিয়ার বাড়ী ছিল লিস্‌বনে। পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করে সে বহু জায়গায় গিয়েছিল, কিন্তু শেষে মানুষের ধারণার বাইরে এক দূর দ্বীপে গিয়ে মারা যায়। লিস্‌বনে থাকবার সময় সবাই ওকে একজন বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেই জানত। এ ধরণের মানুষ সাধারণত অন্যের কোন ক্ষতি করবার চেষ্টা করে না; সেও করত না। তবুও সম-মানসম্পন্ন প্রতিবেশীদের মধ্যে ওর স্থান ছিল উঁচুতে। কিন্তু এ-জীবন তার কাছে অসহ্য এবং বোঝার মতই হয়ে উঠল। তাই সে তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে, টাকা নিয়ে দেশ ভ্রমণের জন্যে প্রথম জাহাজে সমুদ্রযাত্রা কর্‌লে।

এই জাহাজে সে প্রথম কেডিজ গেল, তারপর একে একে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌, বেরুট্‌, ইজিপ্ট্‌, প্যালেষ্টাইন এবং আরব দেশ ঘুরে সোজা সিংহলে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখান থেকে তারা দক্ষিণ সাগরের দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে চলতে চলতে কিছুদিন পর আবার পূব আর দক্ষিণের উন্মুক্ত সাগরের দিকে রওনা হ'ল। মাঝে মাঝে ঘরমুখো দেশের লোকদের সঙ্গে ওদের দেখা হ'লে তারা বাড়ী সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে করতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত।

ডম্ নানা দেশ ঘুরে নানা রকম আশ্চর্য্য জিনিষ দেখল। তার সে সময় মনে হ'ত যেন পূর্ব্ব জীবনের কথা সে একেবারে ভুলে গেছে।

এমনিভাবে তারা একদিন সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলছিল—হঠাৎ একদিন প্রবল ঝড় উঠে ওদের জাহাজখানিকে নোঙরহীন, উদ্দেশ্যহীন সোলার মত ঢেউয়ের ওপর তুলে ধরতে লাগল। তিন দিন ধরে ঝড় সমানে বেড়েই যেতে লাগল। তৃতীয় দিনের রাত্রিতে জাহাজখানি একটি প্রবাল পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

ধাক্কা লাগবার সঙ্গে সঙ্গে ডম্ জাহাজ থেকে ছিট্‌কে অনেক উঁচুতে উঠে গেল, আবার জলের ভিতর পড়ে ডুবে গেল। জলের আলোড়নে ভেসে উঠলে ঢেউয়ের ধাক্কায় অজ্ঞান হয়ে সে এক খণ্ড কাঠের কাছে চলে এল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে দে'খল উত্তপ্ত সূর্য্যের আলো চার-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আর সে একলা—একেবারে একলা—এক বোঝা কাঠ আশ্রয় করে শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সেই মুহূর্ত্তে সে প্রথম বুঝতে পারলে বেঁচে থাকবার কি আনন্দ।

সে সেদিন সন্ধ্যা, তারপর সারারাত, পরের সারাদিন এমনিভাবে ভেসে যেতে লাগল কিন্তু কোথাও একটু মাটী চোখে পড়ল না। সে যে কাঠগুলোর ওপর ভেসে যাচ্ছিল, জলের স্রোতে ঢিলে হয়ে তা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল; ডম্ বৃথা চেষ্টা করল সেগুলোকে নিজের কাপড় দিয়ে একসঙ্গে করে বাঁধতে। শেষে তার কাছে মাত্র তিনটি কাঠের টুক্‌রো রইল এবং শ্রান্ত হয়ে সে তার ওপর এলিয়ে পড়ল। ডমের অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছিল, তাই সে জীবনের আশা ত্যাগ করে ভগবানের ইচ্ছার ওপর নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।

তৃতীয় দিন সকালে সে দেখলে ঢেউয়ের টানে সে একটি গাছপালা-ঘেরা সবুজ, সুন্দর দ্বীপের কাছে চলে এসেছে। ওর মনে হতে লাগল, দ্বীপটি যেন সমুদ্রের বুকে ভেসে রয়েছে।

শেষে সে তার নোনা ফেনায় ঢাকা শরীর নিয়ে দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলল। কয়েকজন বুনো মানুষ বন থেকে বেরিয়ে পড়ে—ডম্ ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। তখন হাঁটু ভেঙে মাটীতে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল সমুদ্রের বালির ওপর।

ক্ষিদেয় ঘুম ভেঙে গেলে দেখলে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। তার চারদিকে বালির ওপর খালি পায়ের বড় বড় ছাপ পড়েছে দেখলে। ডম ভেবে বেশ খুশী হয়ে ওঠে যে, বুনোর দল ওর চারপাশে ঘুরে ওরই সম্বন্ধে আলোচনা করেছে কিন্তু কোন ক্ষতি করেনি। সে খাবারের খোঁজে বেরুচ্ছিল কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার তখন ঘনিয়ে এসেছে। পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখে একদল বুনো ও দেশী মানুষ গোল হয়ে বসে রাত্তিরের খাবার খাচ্ছে। ওখানে বয়স্ক পুরুষ, মেয়ে, ছোট ছেলেমেয়ে অনেকেই ছিল। ডমের কাছে যেতে সাহস হচ্ছিল না তাই দূরে দাঁড়িয়ে রইল—বিদেশ থেকে আসা এক ভিখারীর মত।

দলের ভেতর থেকে একটি যুবতী জায়গা ছেড়ে উঠে একটি পাত্রে ওর জন্যে ফল নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। ডম্ ছোঁ মেরে সব নেয়—পাকা কলা, শুকনো ও টাট্‌কা ডুমুর, অনেক রকম ফল, মাংস এবং ওদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রকমে তৈরী রুটী খেতে আরম্ভ করে। মেয়েটি ওর জন্য জলও এনে দেয় ঝরণা থেকে, কাছে বসে খাওয়া দেখতে থাকে। ডমের পেট ভরে গেল, শরীরের অবসাদও দূর হল। মেয়েটিকে তার দেওয়া খাবার আর জলের জন্যে,—তার উদারতা, দয়ার জন্যে সে ধন্যবাদ জানায়। তারপর ডমের মনে জাগে উথ্‌লে ওঠা হৃদয়ের মৃদু ব্যথার মতই ওর জন্যে গভীর কৃতজ্ঞতা আর ও তাই সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করে ফেলে—যা বোধ হয় এপর্য্যন্ত কোনদিন ও পারে নি। বুনো মেয়েটি সামনে বসে সব শুনতে থাকে।

ডমের মনে হয় মেয়েটি ওর জানান কৃতজ্ঞতা বুঝতে পারে না, তাই সে প্রাণভরা প্রার্থনার মত সুরে আবার ধন্যবাদ জানায়। ততক্ষণে আর সবাই বনের ভেতর চলে গেছে। ডমের ভয় হচ্ছিল, এই অচেনা জায়গায় একলা মনে এই আনন্দ নিয়ে কি করে ও থাকবে। তাই মেয়েটিকে আট্‌কে রাখবার জন্যে সে তার কাছে গল্প বলতে আরম্ভ করে—বলে, কোত্থেকে সে এসেছে, কেমন করে জাহাজ ডুবে গেল, আর কি কষ্ট তাকে সহ্য কর্‌তে হয়েছে সমুদ্রের ওপর। এসব কথা কিন্তু মেয়েটি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে মন দিয়ে শুন্‌ছিল। কিছুক্ষণ পর ডম্ দেখ্‌লে মেয়েটি মাটিতে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। উপায়ান্তর না দেখে ও একটু সরে গিয়ে চুপ করে তাকায় আকাশে তারার দিকে। সমুদ্রের একটানা ছল ছল শব্দ ওর কানে আসছিল। ও একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

সকালে ঘুম ভেঙে পাশে দেখে মেয়েটি নেই। শুধু লম্বা, সোজা, কোমল লতার মত শরীরের একটা ছাপ পড়েছে বালির ওপর। ডম উঠে সামনে এগিয়ে চলতে লাগল—ফাঁকা জায়গা রোদে গরম হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের তীর বয়ে ও

এগিয়ে চলল ভাল করে দ্বীপটিকে ঘুরে দেখবার জন্যে। কখনও বনের ভিতর দিয়ে, কখনও অল্প জঙ্গলা জায়গার ভেতর দিয়ে, আবার জলার ধার দিয়ে গিয়ে বড় বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে ও চলছিল। ডমের মনে হচ্ছে, এই সমুদ্রের নীলিমাই যেন আর সবার চেয়ে সুন্দর—তবু উপভোগ করছিল ফুল-ফলেভরা গাছের সবুজ সৌন্দর্য্য। এভাবে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, আর ওর এই দেশী বুনোদের আর সব দেশের বুনোদের থেকে ভাল লাগে।

পরদিন ডম্ ঘুরে বেড়ায় এই দ্বীপটকে দেখবার জন্যে—আঁকা স্বর্গের ছবির মতই সুন্দর, ঝরণা আর ফুলে ঘেরা এই দ্বীপটি। সন্ধ্যে বেলা ফিরে আসে ঠিক সেই জায়গায় যেখানে ও প্রথম সমুদ্র থেকে পাড়ে উঠেছিল। এসে দেখে বুনো মেয়েটি ওখানে বসে চুলে বিনুনী করছে—পায়ের কাছে রয়েছে ভেসে আসা কাঠগুলো। সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ঠিক পায়ের কাছে, তাই এগিয়ে না গিয়ে ডম বসে পড়ে মেয়েটির পাশে আর দূরে জল দেখতে থাকে যেখান থেকে ঢেউগুলো ওর চিন্তাধারা বয়ে নিয়ে আসছে আর লুটিয়ে পড়ছে পাড়ে। এমনি কত ঢেউ এল আর ফিরে গেল—ওর মন দুঃখে ভরে ওঠে—দুঃখ ভাষার প্রকাশ করে বলতে থাকে, কেমন করে সারা দ্বীপটি ঘুরে বেড়িয়েছে অথচ কোথাও নিজের মত একটি মানুষ, কোনও শহর, বন্দর কিছুই দেখতে পায়নি। বলে—কেমন করে তার সঙ্গীরা জলে ডুবে গিয়েছে আর ও একলা বেঁচে ফিরে এসেছে এক দ্বীপে যেখান থেকে আর ফিরে যাবার উপায় নেই। আরও বলে, ওর একলা পড়ে থাকবার কথা বুনো জঙ্গলীদের ভেতর, যাদের ভাষার শব্দ বা অর্থ বোঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমনি করে সে তীব্র অভিযোগ করে যেতে লাগল আর মেয়েটি তাই শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল—বোধ হয় ডমের ব্যথাভরা ঘুমপাড়ানী গানের সবটা শুনে। ডম্ চুপ করে মৃদু নিশ্বাস নিতে থাকে।

সকালে উঠে ওরা দুজনে সমুদ্রের দিকে মুখ করে খোলা জায়গায় একটি পাথরের ওপর গিয়ে বসে। ডম ভাবতে থাকে তার গত জীবনের কথা, লিস্‌বনের সৌন্দর্য্যের কথা। তার প্রেমের ঘটনা, সমুদ্রযাত্রা আর যে-সব সে ঘুরে দেখেছে। সে সেগুলো ভাল করে ভাববার জন্যে চোখ বুজে থাকে। হঠাৎ চোখ খুলেই দেখতে পায় মেয়েটি তার দিকে অবুঝ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার সৌন্দর্য্য, তার মাটির মত বাদামী রঙের সরু সরু হাত-পা, সোজা শরীর ডমের বেশ লাগে।

ডম্ মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে দেখত কোন জাহাজ যায় কি না? দেখতে পেত সমুদ্রের ভেতরে সূর্য্য উঠে আবার সমুদ্রের তলায়ই ডুবে যায়। কিছুদিন থাকবার পর দ্বীপের সব কিছুই ওর সয়ে গেল। দ্বীপের মিঠে ভাব, আবহাওয়া, ওর ভাল লাগে আর মনে হয় এটি বোধ হয় "প্রেমের দ্বীপ।" কখন কখন অসভ্যের দল ওকে এসে ঘিরে দাঁড়াত আর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকত। দলে গায়ে উল্কি আঁকা বা বৃদ্ধ অনেকেই ছিল। তারা ডমের জন্যে খাবার নিয়ে আসত।

বর্ষাকাল এল, ডম যুবতীটির কুটীরে আশ্রয় নিলে। অসভ্যদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ও কাপড় পরা ছেড়ে দিল; কিন্তু ওদের ভাষা শিখতে না পেরে তার বড় খারাপ লাগত। ডম্ দ্বীপের নামও জানত না, ভগবানের চোখে ওর একমাত্র সঙ্গী এই মেয়েটির নামও জানত না। ঘরে ফিরে এসেই ও পেত তৈরী খাবার, একটি ছোট্ট বিছানা আর বুনো স্ত্রীর নিবিড় স্পর্শ। স্ত্রীকেও সত্যিকারের সভ্য মানুষ বলে গণ্য করত না, কিন্তু সে ওর সব কথা মন দিয়ে শোনে আর বুঝতে চেষ্টা করে বলে তাকে ভালবাসত। ডম্ যখন যা ভাবত তাই স্ত্রীর কাছে এসে বলত।

এমনি করে দিন কাটে; ওর আলাপ-আলোচনা আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে। গত জীবনের সমস্ত ঘটনা ওর মন থেকে মুছে গেল; চিন্তায় বিভোর হয়ে সারাদিন ও বিছনায় বসে থাকত। নতুন জীবনে সবই আস্তে আস্তে সয়ে গেল। কখন সমুদ্রের তীরে গেলে আগেকার মত আর জাহাজ খুঁজতে চেষ্টা করত না। বছর কাটবার সঙ্গে সঙ্গে ডম তার ভাষা ভুলে গেল—ভাষা মূক হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনও জড়ের মত হয়ে গেল।

একবার গ্রীষ্মকালে ও বনের ভেতর বেড়াচ্ছিল; দূরে সমুদ্রে একখানি জাহাজকে নোঙর করে থাকতে দেখে ওর মনে জেগে ওঠে কিসের যেন এক অতৃপ্ততা, ব্যর্থতার ভাব। ও ছুটে যায় সমুদ্রের ধারে আর একখানি উঁচু পাথরের ওপর ওঠে। আশ্চর্য্য হয়ে দেখে একদল নাবিক আর তার সঙ্গে জাহাজের একজন কর্ম্মচারী। ও ঠিক অসভ্যদের মতই পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনতে থাকে। কথার টান ডমের মনে বাজতে লাগল—ভাবল ওর দেশের ভাষা। ডম্ উঠে তাদের ডাকতে চেষ্টা করে—কিন্তু ওর গলা দিয়ে একটি অর্থহীন আওয়াজ বেরিয়ে যায় মাত্র। আগন্তুক দল ভয় পেলে। ও দ্বিতীয়বার চীৎকার করে। তারা বন্দুক তুলে ধরে—ডমের ভাষার জড়তা কেটে যায়, প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলে—মশায়, মাপ করুন। ঐ কথা শুনে সবাই একযোগে আনন্দ প্রকাশ করে আর ওকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে। ডমের কি যেন মনে হ'ল—অসভ্যদের মত পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল। তারা কিন্তু ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে একে একে আলিঙ্গন করল আর প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করে যেতে লাগল। ডম্ তাদের মাঝখানে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে বড় লজ্জা পাচ্ছিল, কেবলি ভাবছিল ছুটে পালায়।

ডমকে একজন বয়স্ক কর্ম্মচারী বললেন—ভয় পেও না—শুধু মনে কর যে তুমি মানুষ।

তারপর নাবিকদের বললেন—যাও ওর জন্যে মদ আর মাংস নিয়ে এস; ওকে বড় রোগা দেখাচ্ছে।

আর তুমি, তুমি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে থাক অন্তত যতক্ষণ না তুমি পশুদের চীৎকারের মত ভাষা ছেড়ে, ভাল মানুষের মত কথা বলতে অভ্যস্ত হও।

ডমকে ওরা রান্না করা মাংস, মদ আর বিস্কুট এনে দিলে। ও ঠিক স্বপ্ন দেখার মতই তাদের সামনে ওগুলো খেল—মনে হচ্ছিল যেন একটু করে স্মৃতি ফিরে পাচ্ছে। নাবিক দল তাদের দেশের হারান একজনকে ফিরে পেয়ে আনন্দে কত গান, আবৃত্তি করে যেতে লাগল। কিছু খাবার পর ডমের মনে কৃতজ্ঞতা জাগল, ঠিক প্রথম দিন যেমনটি হয়েছিল, কিন্তু

আজ ওর বেশী আনন্দ হচ্ছিল দেশী লোকদের দেশী ভাষা বল্‌তে শুনে—যারা ওকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছিল। আপনা আপনি ওর মুখে কথা এল আর তাদের ও ধন্যবাদ জানালে নিজের সাধ্যমত ভাষায়।

বৃদ্ধ কর্ম্মচারী বল্‌লেন—আর কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাক, দেখবে তুমি কে, কি করে এখানে এলে, এসব আমাদের কাছে বল্‌তে পারবে—তোমার ভাষা ফিরে পাবে—যার থেকে বেশী আনন্দের আর কিছু কল্পনা করা যেতে পারে না—যা দিয়ে মানুষ কথা বল্‌তে পারে, তার জীবনের সমস্ত ঘটনা, মনের আবেগ, প্রকাশ কর্‌তে পারে।

তখন একজন যুবক গুন গুন করে মিষ্টি সুরে গান ধরে দিলে এই মর্ম্মে—একদিন কোনও লোক সমুদ্রের ওপারে চলে গিয়েছিল তার প্রিয়াকে ফেলে, আর তার প্রিয়া সাগরের কাছে, বাতাসের কাছে, আকাশের কাছে কেঁদে কেঁদে অনুনয় করেছিল তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। সে গান বন্ধ কর্‌লে আর একজন কবিতা আওড়াতে লাগল ঐ ধরণের। তারপর সবাই নিজেদের বাড়ীতে যা ফেলে এসেছে, তার চিন্তায় অভিভূত হয়ে পড়্‌ল। ডমের মুখে হাসি, চোখে জল—গত দুঃখের স্মৃতি আর তার সমাধান দেখে আবার বহুকালের অনভ্যস্ত ভদ্রভাষায় কবিতার ছন্দ শুনে ওর চোখে আনন্দাশ্রু নেমে এল। ও কাঁদ্‌তে থাকে—ভাবে—বুঝি এটা স্বপ্ন—সত্যি হ'তে পারে না।

শেষে বয়স্ক কর্ম্মচারী উঠে বল্‌লেন—চল এবারে আমরা দ্বীপটি ঘুরে ভাল করে দেখে আসি—আর সন্ধ্যের আগে আমরা এখানে পৌঁছে নৌকা করে জাহাজে ফিরব কিন্তু। রাত্রেই নোঙর তুলে ভগবানের ইচ্ছায় ফিরে যাওয়া যাবে দেশের দিকে।—

ডমকে বল্‌লেন—শোন বন্ধু, এখানে যদি এমন কিছু জিনিষ থাকে যা' তোমার, বা তুমি স্মারক বলে নিয়ে যেতে চাও তা সঙ্গে নিয়ে এসে ঠিক্ সন্ধ্যার আগে এখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'র।—

নাবিকের দল বনের ভেতর ছড়িয়ে পড়্‌লে ডম্ রওনা হল মেয়েটির বাড়ীর দিকে। যতই এগোয় ততই ভাবে—কি করে সে মেয়েটিকে ওর চলে যাবার—তাকে ছেড়ে চলে যাবার কথা বলবে। তাই একখানি পাথরের ওপর বসে ও যা বল্‌বে তা নিজের মনে গুছিয়ে নিতে লাগ্‌ল—কারণ যার সঙ্গে দশটি বছর কাটিয়েছে তাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে ও কিছুতেই লুকিয়ে চলে যেতে পার্‌ছিল না—মেয়েটি ওর জন্যে যা করেছে সব একে একে মনে পড়্‌তে লাগল—কেমন করে সে তার খাবার আর থাক্‌বার ব্যবস্থা করেছে, কেমন করে প্রাণ দিয়ে সেবা করেছে, এইসব। তারপর ও ঘরে গেল। মেয়েটির পাশে গিয়ে ও খুব তাড়াতাড়ি অনেক কথা বলে গেল—ভাবল, এতে সে ওর মনের অবস্থা ভাল করে বুঝতে পেরেছে। ডম্ অনুনয় করে বল্‌লে— কয়েকজন লোক তাকে নিতে এসেছে এবং অত্যন্ত দরকারী কাজে তাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। মেয়েটিকে তার কৃত সেবার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে ডম্ তাকে আলিঙ্গন করে আর ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলে শীগ্‌গিরই ফিরে আসবার কথা। অনেকক্ষণ বলে যাবার পর ডম্ চেয়ে দেখে, মেয়েটি ওর কথার কিছুই বুঝছে না। এতে তার বড় রাগ হল এবং ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে খুব জোরের সঙ্গে নিজের যুক্তি দেখাতে লাগল বিরক্তির সঙ্গে মাটিতে পায়ের শব্দ করে। হঠাৎ মনে হল, নাবিকের দল হয়ত ওর জন্যে অপেক্ষা না করে চলে যাচ্ছে—তাই কথার মাঝখানে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ছুট্‌ল সমুদ্রের দিকে।

কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে ডম্ অপেক্ষা করল ওদের আসবার জন্যে। একটি চিন্তা বারবার ওকে উদ্ব্যস্ত করে তুলছিল—বোধ হয় বুনো মেয়েটি ভাল করে বুঝতে পারেনি যে, তাকে ফেলে ডমের যেতে হচ্ছে। এই কথাটা এতই অসহ্য হয়ে উঠল যে, দৌড়ে বাড়ীর দিকে রওনা হল মেয়েটিকে আর একবার বিষয়টা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে। যাহ'ক ও গেল, কিন্তু ঘরে ঢুকল না—বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখলে মেয়েটি কি করছে। দেখে—বুনো স্ত্রী কিছু ঘাস নিয়ে এসে ওর রাত্তিরে শোবার জন্যে নরম বিছানা তৈরী করেছে—খাবার জন্যে ফল নিয়ে এসেছে—আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য হল যখন দেখলে মেয়েটি দাগী, খারাপ ফলগুলো খেয়ে ওর জন্যে বড় ভাল ফল সরিয়ে রেখে দিলে—তারপর স্থির হয়ে ডমের অপেক্ষায় বসে রইল। ডমের মনে হল, চলে যাবার আগে অন্তত ওর জন্যে সরিয়ে রাখা খাবার খেয়ে, যত্ন করে পাতা বিছানায় শুয়ে মেয়েটির আশা পূরণ করা উচিত।

ততক্ষণে সূর্য্য ডোবার সময় হয়ে এসেছে, নাবিকের দলও তীরে জড় হয়েছে জাহাজে ফেরবার জন্যে। শুধু ডমকে তারা খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই তারা চেঁচিয়ে ওকে অনেক ডাকলে। এল না দেখে তারা সবাই বনের ভেতর গেল খুঁজতে—মাঝে মাঝে চীৎকার করতে লাগল। দলের ভেতর দুজন ডাকতে ডাকতে ওর খুব কাছাকাছি চলে আসছে দেখে ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল—কেবল ভয় হচ্ছিল পাছে তারা ধরে ফেলে। কিছুক্ষণ পর সমস্ত শব্দ থেমে গেল—আঁধার ঘনিয়ে এল। নাবিকের দল দাঁড় টেনে জাহাজে ফিরে গেল দুঃখ করতে করতে ডুবে যাওয়া জাহাজের একমাত্র জীবিত যাত্রীকে ফিরে পেয়ে আবার হারিয়ে। সব চুপচাপ হয়ে গেলে ডম্ আড়াল থেকে বেরিয়ে ঘরে গেল; বুনো মেয়েটি নিশ্চল পাথরের মতই বসে ছিল। ডম্ ঘরে গিয়ে ওর জন্যে রাখা ফল খেয়ে ওর বুনো স্ত্রীর যত্নে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সকাল হল—ডম্ বিছানায় শুয়ে ঘুমহারা চোখে বনের গাছগুলো থেকে দূরে রোদে চক্‌চকে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে সুন্দর জাহাজখানি দ্বীপ থেকে ভেসে চলে যাচ্ছে। পাশে ঘুমন্ত স্ত্রীকে আর ওর একটুও ভাল লাগছে না। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল তার বুকের ওপর গড়িয়ে পড়ছে। ডম্ খুব আস্তে, পাছে সে শুনতে পায়, ওর আশা আর ব্যর্থতার চিরন্তন দুঃখভরা সুন্দর কবিতা আওড়াতে লাগল।

তখন জাহাজ চক্রবাল রেখা ছাড়িয়ে দূরে চলে গেছে......। ডম্ লুই দ্বীপেই বাস করতে লাগল, কিন্তু সেই সময় থেকে মরবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আর একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। *

'ক্যারেল ক্যাপকের 'The Island' হইতে।

আমেরিকার লাটিন সাধারণতন্ত্র সমূহ

আমেরিকার যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাটিন সাধারণতন্ত্র রহিয়াছে, তাহাদের সম্মিলিত কংগ্রেস অধিবেশন আহূত হয় যে-কোন সমস্যার সমাধানে। পেরু রাজ্যের লিমা শহরে কমিটির মেই সম্মেলন হইয়া গিয়াছে বিগত ডিসেম্বর মাসে। এই প্যান-আমেরিকান কংগ্রেসে যে-কোনও সিদ্ধান্ত সর্ব্বাদিসম্মত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় না। বিভিন্ন লাটিন রাষ্ট্র হইতে প্রেরিত ১২৫ জন প্রতিনিধি সকল প্রস্তাবের আলোচনা করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব যাহাতে সমগ্র রাষ্ট্রেরই সহযোগিতা বিশেষভাবে আহূত হয়, তাহা হইল বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নিষেধ-বিধির সংস্কার। আর এই অধিবেশনের অন্য যে গুরুত্ব, তাহা হইল

প্রেসিডেণ্ট তখন স্পর্দ্ধার সহিত পরিষদ ভাঙিয়া দেন এবং সকল সদস্যকে আইনভঙ্গকারী বলিয়া ঘোষণা করেন।

সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াগুয়াচি রেজিমেণ্ট রাজধানীর সম্মুখস্থ ইচিম্বিয়া পর্ব্বত-শিখরে ঘাঁটি আগলাইয়া বসে এবং প্রেসিডেণ্টের পদত্যাগ-পত্র দাবী করে। ইয়াগুয়াচি ফৌজদল হইল রাজধানীর সেনার বৃহৎ একাংশ। এই দলে আবার যোগ দিলেন কয়েকজন ডেপুটি।

প্রেসিডেণ্ট নারভেজ তাঁহার ক্যারাবিনেরোজ (Carabineros) অর্থাৎ রাইফেলধারী ফৌজ জমায়েত করিয়া এবং বিমান বহরের হস্তে বোমা প্রদান করিয়া ইচিম্বিয়া শিখর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন—স্থলে ও শূন্যে দুই পথে।

সোসিয়ালিষ্ট প্রেসিডেণ্ট লাজারো কার্ডেনাস—মেক্সিকো

ডিক্টেটর প্রেসিডেণ্ট গেটুলিও ভার্গাস—ব্রাজিল

প্রেসিডেণ্ট ওস্কার বেনাভিডিস্—পেরু

ধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিচিত্র বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্যতম ষ্ট্র ইকুয়েডরের বিপ্লব—কারণ উহার প্রেরিত প্রতিনিধিও ংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিল।

মোস্কোয়েরা নারভেজকে প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত রিবার মাত্র এগার দিন পরে ইকুয়েডরের রাজধানী আগ্নেয়-রি-প্রভাবিত কুইটো নগরে বিপ্লব উপস্থিত হয়। পার্লামেণ্টের বামপন্থিগণ ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট জেনারেল লুই রিয়ে আলবাকে নির্ব্বাসন হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়া মরিক বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রকের পদে নঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিল। কিন্তু -প্রেসিডেণ্ট নারভেজ ইঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ধারণা রয়া পার্লামেণ্টের নিকট ঐ প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিয়া বাদ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু নব-গঠন-পরিষদ (পার্লামেণ্টের যে অংশ নব-পরিকল্পনার খসড়ায় নিযুক্ত) প্রেসিডেণ্টের ঐ সংবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দেয়।

অশ্বারোহী সেনা সমগ্র রাজধানীতে টহল দিয়া যেখানে সেখানে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে লাগিল।

বিদ্রোহী রেজিমেণ্ট এই প্রকারে হতাশ হইয়া পর্ব্বত-শিখর হইতে অবতরণ করিল। বিজয়ী প্রেসিডেণ্ট নারভেজ, বামপন্থী য়্যাসেম্বলী স্পীকার আরিজুয়াগা লিউগুকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। সোসিয়ালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী ডাঃ জারামিলেকেও বন্দী করার আদেশ জারি হইল। সঙ্গে সঙ্গে পুনঃনির্ব্বাচনের ঘোষণা প্রচার করা হইল। সেই সময়ে দিশাহারা অন্যান্য ডেপুটিগণ পলায়ন করিয়া মেক্সিকোর লিগেশনে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যে ইকুয়েডর ছিল সমাজতান্ত্রিক তাহা হইয়া পড়িল ফাসিস্ত—বিপ্লব দমিত হইল একেবারে বিনা রক্তপাতে।

পশ্চিম গোলকার্দ্ধে সাধারণতন্ত্রের আভিজাতী সংরক্ষণে প্রবৃত্ত এই যে লাটিন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি, ইহাদের অনেক রাষ্ট্রই শাসিত হয় ডিক্টেটর দ্বারা (যাহাদিগকে বলা হয় Pocket

Dictators) এবং অনেক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সমর-বিভাগের সর্ব্বনিয়ন্তার দ্বারা। এই সকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিতে জার্ম্মান, ইটালিয়ান ও জাপানী প্রভাব আপতিত হইয়া উহাদিগকে চিন্তান্বিত করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সচিব কর্ডেল হাল কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হইয়া উহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বৈদেশিক প্রচার প্রভাবের বিরুদ্ধে মার্কিনের সহিত হাত মিলাইতে অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু এই ২০টি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নেতার একতাবন্ধন—সে যেন প্রদর্শনীর যোগ্য আশ্চর্য্য উদ্ভট শিল্পকারুতা, কারণ, মেজাজ মনোবৃত্তিতে তাহাদের বোধহয় মিল নাই কোন দুইটিতে।

আর্জ্জেণ্টিনা

প্রথমত ধরা যাউক আর্জ্জেণ্টিনাকে। রবার্টো ওর্‌টিজ

প্রেসিডেণ্ট জেনারেল জোর্জে উবিকো
—গোয়াটিমালা; (হের হিটলারের অতিশয় অনুরক্ত)

প্রেসিডেণ্ট য়্যানাষ্টাসিও সোমোজা
—নিকারাগুয়া

প্রেসিডেণ্ট লিও কোরটেজ্ ক্যাষ্ট্রো
—কোষ্টা রিকা

এক ধনী ব্যবহারাজীব, দৃঢ় চৌকা-চোয়াল, তাঁহার হাতযশও কম নয়—তিনি হইলেন প্রেসিডেণ্ট। প্রকৃতপক্ষে শাসন ব্যবস্থা যে ধনিক ব্যবসায়ীদের হাতে তাহারা এমন মনোবৃত্তির প্রেসিডেণ্টকে "নিরাপদ"ই মনে করিয়া থাকে। তথাপি সাধারণতন্ত্রের ডৌলটি রক্ষা করা হইতেছে। বামপন্থীরা নির্ব্বাচনে অবতরণ করে না, নিপীড়ন ও প্রতারণার অজুহাতে। রক্ষণশীল প্রেসিডেণ্ট ওর্‌টিজ বলিয়া থাকেন তাঁহার গবর্ণমেণ্ট কোনও পার্টি সংশ্লিষ্ট নয়।

ব্রাজিল

ব্রাজিলের ডিকেটেটর-প্রেসিডেণ্ট গেটুলিও ভার্গাস্ একদা জার্ম্মানীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু গত বৎসর বসন্তকালে একদিন ব্রাজিলের নাজি "সবুজকোর্ত্তা" দল এক বিপ্লব উপস্থিত করিল নাজি-অর্থের সাহায্যে। নিজ প্রাসাদ হইতে স্বয়ং রিভলবার ছুড়িয়া পাজামা পরিহিত প্রেসিডেণ্ট বিপ্লব দমনে সাহায্য করিলেন এবং সেইদিনই পাজামা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক পতাকাও পরিত্যাগ করিলেন নাজি-মৈত্রীসূচক। নাজির মমতাপাশ ছেদন করিলেও ডিক্‌টেটরশিপ্ পরিত্যাগ করিলেন না। পূর্ণ উদ্যমে সোসিয়ালিষ্ট ও নাজি উভয় দলের দমনে ব্রতী হইলেন। নির্ব্বাচনের ঝামেলা এড়াইতে এখন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনসমূহ দ্বারাই তাঁহার পার্লামেণ্ট মনোনীত হয়।

চিলি

নরম উদারপন্থী পেড্রো য়্যাগুইরে কার্ডা চিলি রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট। ইনি দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের মালিক এবং প্রসিদ্ধ ধনিক—'পপুলার ফ্রণ্টে'র প্রার্থী বলিয়া ইঁহাকে নির্ব্বাচিত করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ইহাই অন্যতম বামপন্থী সাধারণতন্ত্র।

প্যারাগুয়ে

বলিভিয়ার বিরুদ্ধে চাকো সমরের পর হইতে সমর বিভাগই রাষ্ট্র অধিকার করিতেছে—একদলকে সরাইয়া অন্যদল। গত বৎসর কর্নেল রাফায়েল ফ্রাঙ্কো ছিলেন সর্ব্বনিয়ন্তা। একদিন সেনাদল ইঁহাকে অপসারিত করিয়া ডাঃ ফেলিকস্ পেইভাকে প্রেসিডেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত করে; কারণ কর্নেল ফ্রাঙ্কো—স্পেনীয় জেনারেল ফ্রাঙ্কো অপেক্ষা ফাসিস্তবাদে কম বিশ্বাসী নহেন। ডাঃ পেইভা ছিলেন ইউনিভার্সিটি ল' স্কুলের ডিন্। এখন সমর বিভাগীয়গণ বে-সামরিকগণের সহিত বখরায় শাসননিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। রাষ্ট্র পুনর্গঠিত হইয়াছে। পুনরায় বিপ্লব উপস্থিত হওয়ার অবকাশে যদি সমর বিভাগ আপন শক্তি বৃদ্ধি করিয়া লয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ভোল আর একবার বদলাইয়া যাইবে এবং উহাকে তখন অপসারিত করা সহজ ব্যাপার হইবে না।

পেরু

প্যান-আমেরিকান্ কংগ্রেসের ডিসেম্বর অধিবেশনের নিয়ন্তা হইল পেরু রাজ্যের প্রেসিডেন্ট ওসকার বেনাভাইডিস্ —সাধারণত পেচক প্রেসিডেন্ট নামে অভিহিত। ইনি প্রেসিডেন্টের গদীতে পাকা হইয়াছেন, পরবর্ত্তী প্রেসিডেন্টের নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া দিয়া। কাজেই শীঘ্র তাঁহার মসনদ বে-দখল হইবার আশঙ্কা নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিপক্ষীয় বামপন্থী নেতা এপ্রিষ্টাস্ বিতাড়িত হইয়াছেন, বহু সহচর হত ও প্রায় ৫০০০ জেলে বন্দী। সাধারণতন্ত্রকে এইভাবে নিজ বাণিজ্যশক্তির গণ্ডীবদ্ধ করিয়া বেনাভাইডিস্ সকল বিরূপ সমালোচনা দমিত করিয়াছেন। রাজ্যের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সকলপ্রকার সরকার বিরোধী মনোভাব প্রকাশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। সুতরাং পেরু রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রবাদ নির্ব্বিঘ্নে রূপ পাইতেছে প্রেসিডেন্টের পরিচালনে

বলিভিয়া

৩৪ বৎসর বয়স্ক কর্নেল জার্ম্মান বুশ প্রবাসী জার্ম্মান সামরিকগণের সাহায্য ও বীরত্বে আজ বলিভিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা। বিগত চাকো-সমর (প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে) কর্নেল বুশকে যুদ্ধ জয়ের পুরস্কারস্বরূপ বলিভিয়ার ডিক্‌টেটরের পদ প্রদান করিয়াছে। জার্ম্মান ঔপনিবেশিক দলের ভিতর সামরিকের সংখ্যাই বেশী আর উহারাই বুশের সমর্থক। বুশ নিজে একজন জার্ম্মান ঔপনিবেশিক চিকিৎসকের পুত্র। কিন্তু সময়ে নিপুণতা তাঁহাকে আরও সম্মান প্রদান করিয়াছে অভিনব উপাধি দ্বারা—এই উপাধি হইল Corsair of the Jungle অর্থাৎ বনভূমির দস্যু। বুশের সমর্থক সমর-বিশারদগণ কিন্তু কোন রাজনীতিক মতে স্থিতিশীল নহে; কিছুদিন পূর্ব্বে উহারা বামপন্থীদের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু পদে পদে মতের অমিল হওয়াতে মৈত্রী ছিন্ন করিয়া সরাসরি বিপক্ষের দলে (দক্ষিণ-পন্থী) যোগদান করিয়াছে।

ইকুয়েডর্

সম্প্রতি যে বিপ্লব হইয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই বিপ্লবের পূর্ব্বে পর্যন্ত সমাজ-তান্ত্রিকগণই দেশ-নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট ফ্রেডারিকো পেইজের ইঙ্গিতে, কারণ তিনি হইলেন সমর বিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নারভেজ শাসন পরিষদের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ করিয়া উহাকে বাতিল করিয়া দিলেন। বিপ্লবের ফলাফল পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন মেক্‌সিকোর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রমিক আইন পরিচালিত হইতেছে। হয়ত পরবর্ত্তী বিপ্লবে আবার ফাসিস্ত মনোভাব যেটুকু প্রবেশ করিয়াছে, তাহা লোপ পাইয়া পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুসৃত হইবে।

কলম্বিয়া

উদারনৈতিক প্রেসিডেন্ট য়্যাল্‌ফনসো লোপেজ বিগত গ্রীষ্মকালে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই সুপারিশে তাঁহার বন্ধু এডোয়ার্ডো স্যান্টোস ঐ পদ গ্রহ করেন। কিন্তু এখনও নেপথ্য হইতে প্রেসিডেন্ট লোপেজের নিয়ন্ত্রণই চলিতেছে। তাঁহার বামপন্থীয় কারসাজি সমগ্রদেশে নিন্দিত হয় যখন তাঁহারই বার্লিন মন্ত্রী জার্ম্মানী হইতে বিতাড়িত হয়—পগ্রোম (অর্থাৎ নাজি বিরোধীদের ব্যাপক হত্যা পরিচালন) দৃশ্যের ফটো গ্রহণের অপরাধে। কলম্বিয়ার জনমত যে কি তাহা এই ঘটনার অসমর্থন হইতেই সুপরিস্ফুট। ফলে অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের অদৃশ্য হস্ত আর পূর্ব্বের ন্যায় অমিতপ্রভাবসম্পন্ন থাকিতে পারিতেছে না। তবে অদূর ভবিষ্যতে একটা প্রকাশ্য বুঝাপড়া হওয়া বিচিত্র নয়।

উরুগুয়ে

উরুগুয়ের প্রকৃত সর্ব্বময় নিয়ন্তা হইল পূর্ব্বতন প্রেসিডেন্ট গেব্রিয়েল টেরা। এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা দমন করিতে যাইয়া তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহারই পুত্র বিদ্রোহী-দলের নেতা। তাঁহার নিজ পরিজনবর্গ সকলেই নিপুণ যোদ্ধা। তাঁহার শ্যালক জেনারেল য়্যালফ্রেডো ব্যাল্ডোমির বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট; তাঁহার জামাতা হইয়াছে ভাইস-প্রেসিডেন্ট। সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ভিতর উরুগুয়ের প্রজাতন্ত্রশাসন ঐতিহ্য-গর্ব্বে বিখ্যাত। বর্ত্তমান উরুগুয়ের পার্লামেন্ট এবং রাজনীতিক দলগুলি এই গর্ব্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে।

ভেনিজুয়েলা

প্রেসিডেন্ট ভিকেন্টে গোমেজ কঠোর শাসনের জন্য "অত্যাচারী" খেতাব পাইয়াছিলেন; তদপেক্ষাও দেশের পক্ষে গুরুতর সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল তাঁহার শত শত জারজ সন্তানের ব্যয়-সঙ্কুলান করা। প্রেসিডেন্ট গোমেজ ১৯৩৫ সালে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। এই সময় সমর-সচিব জেনারেল লোপেজ কন্‌ট্রেরাজ প্রেসিডেন্টের পদ অধিকার করিয়া সর্ব্ব-নিয়ন্তার সকল কঠোরতা শিথিল করিয়া দেন। সরকারী বিভাগগুলির আমূলে সংস্কার সাধন করেন এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় রাশ আলগা করিয়া দেন। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট এই হেতু বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছেন।

গোয়াটিমালা

জেনারেল জোর্গে উবিকো এই ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রেসিডেন্ট। দক্ষিণ-আমেরিকার সমুদয় রাষ্ট্রের ভিতর জেনারেল উবিকোর মত হিটলারের অশেষ গুণগ্রাহী আর কেহ নাই। জার্ম্মানীর অনুকরণে "প্লেবিসাইট" প্রচার দ্বারা নিজ কার্য্যকাল ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া লইয়াছেন। কেবল মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের ভয়ে উবিকো অপর সকল ক্ষুদ্রে লাটিন রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া থাকে।

নিকারাগুয়া

নিকারাগুয়ার জাতীয়তাবাদী বীর নেতা জেনারেল স্যান্ডিনো ক্রমাগত ছয় বৎসর পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাজ্যের নৌ-শক্তির বিরুদ্ধে সমানে পাল্লা দিয়াছেন। তিনি নিকারা-গুয়ার স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ১৯৩৪ সালে ন্যাশনাল গার্ড-য়ের বিদ্রোহের ফলে স্যান্ডিনো হত হন। দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে য়্যানাস্টাসিও সোমোজা ন্যাশনাল গার্ডের নেতারূপে প্রেসিডেন্ট

হন। বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাজ্য নিজ নৌ-বহর নিকারাগুয়া হইতে অপসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

কোস্টো রিকা

অধিকাংশ ক্ষুদে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা সমর বিভাগের অভিজ্ঞ সেনা-নায়ক হইলেও কোস্টা রিকার প্রেসিডেণ্ট লিও কোর্টেজ কাস্ট্রো কিন্তু বে-সামরিক। পূর্ব্বে তিনি কৃষি বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। উগ্র জাতীয়তাবাদী বলিয়া তিনি সম্প্রতি বিদেশীয় মালিকত্বের ইলেকট্রিক্ বণ্ড ও শেয়ার কোম্পানীগুলি বাজেয়াপ্ত করিবার অনুজ্ঞা মঞ্জুর করিয়াছেন।

স্যালভেডর

এই আর একটি রাজ্য যেখানে হিটলার পূজা পাইয়া থাকেন। গোয়াটিমালার প্রেসিডেণ্ট জেনারেল উবিকোর মতই হার্নেণ্ডেজ মার্টিনেজ, হিটলারের ভক্ত। গোয়াটিমালা রাজ্য ইহাদের নিকট প্রতিবেশী এবং দুই রাজ্যের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট-দ্বয়ের ভিতর বন্ধুত্বও রহিয়াছে নিবিড়। কাজেই ফাসিস্ত-শক্তিসমূহের পররাজ্য-আক্রমণ নীতি এই রাজ্যে যে সমর্থিত হইবে, ইহা বেশী কথা নয়। অধিকন্তু হিটলারের গুণগ্রাহিতায় এই দুই প্রেসিডেণ্ট-বন্ধু যেন প্রকৃতই প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়। তবে ইহাদের ক্ষমতা এতই নগণ্য যে, ইহাদের দ্বারা ব্রাজিল, মেক্সিকো প্রভৃতির প্রতিপক্ষে হিটলারের কোনও সত্যিকার উপকার হওয়া কঠিন ব্যাপার।

প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ম্যাক্সিমিলিয়ানো হারনেণ্ডেজ মার্টিনেজ—স্যালভেডর

প্রেসিডেণ্ট টিবারকিও কেরিয়াস ক্যাণ্ডিনো (দক্ষিণপন্থী)—হণ্ডুরাস্

কিউবার সমরবিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা (এক্স-সার্জেণ্ট) ফুলগেনসিও ব্যাটিস্টা—(দক্ষিণপন্থী ডিক্টেটর ফেডারিকো ল্যারেডো ব্রু নামে মাত্র প্রেসিডেণ্ট)

হণ্ডুরাস

হণ্ডুরাস কংগ্রেস (জাতীয় মহাসভা) দক্ষিণপন্থী প্রেসিডেণ্ট টাইবার্কিও কার্লাস ক্যাণ্ডিনোর কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করিয়া ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত ধার্য্য করিয়া দিয়াছে; ঐ সঙ্গে কংগ্রেস সদস্যগণও নিজেদের কার্য্যকালের ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত সীমা প্রসারিত করিয়া লইয়াছে। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যগণের ভিতর মতদ্বৈধ উপস্থিত হইবার আশংকা আপাতত নাই।

পানামা

১৯৩৬ সালে নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট জুয়ান ডেমোস্টেনেস্ য়্যারোসেমেনা ভোটের জোরেই স্বপদে অধিষ্ঠিত—জোরজুলুমে নহে। তথাপি নির্ব্বাচনের সময়ে তাঁহার বিপক্ষীয় দল পরাজয়ের গ্লানিতে উত্তেজিত হইয়া তুমুল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। প্রেসিডেণ্ট য়্যারোসেমেনার সমর্থকগণের সহিত ঘোর লড়াই উপস্থিত হয়—রক্তপাতও বিস্তর হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রেসিডেণ্ট বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই কারণেই সমগ্র রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত। এমন কি বিপক্ষ দলও প্রেসিডেণ্টের প্রতি বিরূপতা আর প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হয় না।

কিউবা

কিউবা রাষ্ট্রের অবস্থা আরও সঙিন হইয়াছে পরম ধৈর্য্যশীল প্রেসিডেণ্ট ফেডারিকো ল্যারেডো ব্রুর আমলে। কারণ শাসন-ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয় সমর-বিভাগের প্রধান নিয়ন্তা এক্স-সার্জেণ্ট ফুলজেনসিও ব্যাটিস্টা কর্ত্তৃক। দক্ষিণ-পন্থীয় নেতা হইলেও প্রেসিডেণ্ট নামে মাত্র প্রধান পদের অধিকারী।

হাইটি

এই নিগ্রো রাজ্যটি রহিয়াছে নিগ্রো প্রেসিডেণ্ট স্টেনিও ভিনসেণ্ট-য়ের নিয়ন্ত্রণে। তিনি ছিলেন কবি, দেশবাসী অতি আশায়ই তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে নিয়ন্তৃ-রূপে বরণ করিয়া। কিন্তু তিনি কবিত্বের ঐতিহ্য নব-রূপায়নে ঢালাই করিয়াছেন—কবি বলিয়া চতুরতার অভাব কেহ লক্ষ্য করিবে না তাঁহার আচরণে। সেয়ানা রাজনীতিকের সুক্ষ্ম

(শেষাংশ ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'সমাধান'

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন

সুচতুর ও অভিজ্ঞ উকীল নরেন্দ্রবাবু এজাহারের একটা নকল আনিয়াছিলেন। আশুবাবু উপস্থিত হইলে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন, এবং কোন কোন অংশের সমালোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আশুবাবুও শিবু ও দুলালীর নিকট হইতে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা নরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন। সমস্ত শুনিয়া নরেন্দ্রবাবু কহিলেন,—"দারোগা ভূপতিভূষণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীধর বাস যে চক্ষুর সম্মুখে অতি সুস্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আশুবাবু! বলেন কি? —আঁ!—এমন সব অকাট্য প্রমাণ রয়েছে!"

আশুবাবু হঠাৎ একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিলেন এবং গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—"শ্রীধর বাস? ফাঁসি দিলেও এসব লোকের উপযুক্ত দণ্ড হয় না; কুকুর দিয়ে খাওয়ানই হচ্ছে এদের উচিত শাস্তি। দেখুনদিকি মশাই, ফুলের মতন পবিত্র মেয়েটি একটা কলঙ্কের মধ্যে পড়ল! এখন ওর গতি কি হবে?"

সদাপ্রফুল্ল নরেন্দ্রবাবু হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া ...লেন এবং স্থির নিষ্পলক চক্ষে কিছুক্ষণ আশুবাবুর ...রক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর মৃদু হাস্যে ... ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"দেখুন আশুবাবু! ...নাকে আমি এত দিন একজন মানুষের মতন মানুষ বলে মনে করতাম, এবং সে জন্য মনে মনে আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু এখন দেখছি, সবাই যা আপনিও তা। আপনি কি মনে করেন, একটি অসহায়া বালিকা একটা পশুর কবলে পড়ে এমনভাবে আত্মরক্ষা করেও কলঙ্কের ছাপ এড়াতে পারবে না! তার পবিত্রতা—তার নিষ্পাপ অন্তর কি আপনার চোখে পড়ে না? কনকের সেই জন্মোৎসবের দিনে আপনার গৃহে মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিলাম নিজের কন্যারূপে, কিন্তু বলতে আমি গর্ব্ব অনুভব করছি, আজ তাকে আমি আমার মায়ের আসনে দেখতে পাচ্ছি। সেদিন তার প্রতি হয়েছিল স্নেহ, কিন্তু আজ হচ্ছে শ্রদ্ধা।"

আশুবাবু কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। নরেন্দ্রবাবুর প্রত্যেকটি বাক্য তাঁহার অন্তরে প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। তিনি নীরব রহিলেন।

নরেন্দ্রবাবু পুনরায় কহিলেন,—"যাক ওসব কথা। এখন আসল হচ্ছে ডাক্তারের রিপোর্ট। ডাক্তার বোস থাকতে চিন্তার কোন কারণ নেই; মিথ্যা রিপোর্ট তিনি কিছুতেই লিখবেন না।"

আশুবাবু বলিলেন,—"চলুন বেড়াতে বেড়াতে একবার ডাক্তার বোসের বাংলো হয়ে তাঁকে নিয়ে যাই। তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে মেয়েটিকে আর একবার দেখবেন বলেছিলেন। ভদ্রলোক ভিজিট পর্য্যন্ত নেন নি। চলুন, অমনি গরীবের ওখানে একটু চা খেয়ে আসবেন।"

"আরে তাই নাকি! চা খেতে হবে! চলুন, চলুন" বলিয়া নরেন্দ্রবাবু তৎক্ষণাৎ সত্তরাশির মতন মোটা একটা খদ্দরের জামা গায়ে দিয়া এবং একটা মোটা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

ডাক্তার বোস সবে মাত্র ডিস্পেন্সারী হইতে আসিয়া মুখ হাত ধুইতেছিলেন। দ্বারদেশে মোটর গাড়ীর শব্দ শুনিয়া তিনি তোয়ালে স্কন্ধে লইয়াই তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন এবং যুক্তকরে অভিবাদন করিয়া সহাস্যমুখে উভয়ের অভ্যর্থনা করিলেন।

ডাক্তার বোস প্রশ্ন করিলেন,—"মেয়েটি কেমন আছে?"

আশুবাবু বলিলেন,—"ভাল আছে বলেই তো মনে হচ্ছে। বাড়ী এসে শুনলাম আপনি অনুগ্রহ করে সেই দুপুর বেলায়ই মেয়েটাকে দেখে এসেছেন, এবং এ বেলা আর একবার দেখতে যাবেন বলেছেন, তাই আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।"

আশুবাবুর বক্তব্য ভাল করিয়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই চিরহাস্যময় নরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"অবশিষ্টাংশ তবে আমিই প্রকাশ করি।—বুঝেছেন ডক্টর বোস, মেয়েটিকে তো দেখতে যাবেনই, আর সেই সঙ্গে অমনি মেয়ের এই বাবার ওখানে একটু জলযোগ করে আসবেন; বাড়ীতে খাবেন না বলে যান, বুঝলেন!"

ডাক্তার বোস হাসিয়া ফেলিলেন।

দুলালীকে দেখিয়া ডাক্তার বোস সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। প্রায় কুড়ি বাইশ ঘণ্টা অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জ্বর হয় নাই কিম্বা অন্য কোন উপসর্গ দেখা দেয় নাই। সুতরাং কোন আশঙ্কার কারণ তিনি দেখিতে পাইলেন না। তথাপি চিকিৎসকদের সাধারণ রীতি বজায় রাখিয়া ঔষধ-পথ্য সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিলেন।

এমন সময় তিনখানি ছোট টি-পয়, এবং তদুপরি তিন গ্লাস জল ও তিন প্লেট উপাদেয় খাদ্য বস্তু তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত হইল। নরেন্দ্রবাবু ডাক্তারবাবুকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইলেন যে, প্লেটের যে-কোন খাদ্যই দুলালী অল্প পরিমাণে খাইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা তাহার কোনরূপ অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই। তিনি উঠিয়া দুলালীকে কন্যা-স্নেহে আপন পার্শ্বে টানিয়া আনিলেন, এবং প্লেট হইতে কিছু একটা তুলিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে কোমল কণ্ঠে পরম আদরের সহিত কহিলেন,—"তুমি এইটুকু খাও তো মা!"

দুলালী লজ্জায় এবং শ্রদ্ধায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। কুণ্ঠিত কম্পিত হস্তে সেই খাবারটুকু সে গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু হাতের খাবার হাতেই রহিয়া গেল। হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া সে ঘামিতে লাগিল।

নরেন্দ্রবাবু স্নেহমধুর কণ্ঠে বলিলেন,—"ওকি মা! আমি তোমার একটি বুড়ো ছেলে। আমার কাছে লজ্জা করতে নেই। তুমি খাও।"

মুখখানি না তুলিয়া ধীর শান্ত সহজ স্বরে দুলালী কহিল,—"আপনারা খান; আমি পরে খাব।"

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"না মা! আজ আর সেটুকু হবার জো নেই। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে; গলায় পৈতেও আছে এবং

বাপ-দাদার বয়সী যাকে-তাকে অকাতরে পদধূলিও বিতরণ করে আস্‌ছি। কিন্তু এই প্রৌঢ় বয়সে আজ আমি সর্ব্বপ্রথম বুঝতে পেরেছি, যে তেজ আর শক্তির জন্য শ্রদ্ধা পেয়ে আস্‌ছি, তা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা চণ্ডাল বলে নয়—সে তেজ মনুষ্যত্বের অসীম স্ফুলিঙ্গের একটি কণা। সেই তেজ এবং সেই শক্তি আজ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণপুত্র ভূপতি চক্রোত্তীর চেয়ে অজ্ঞাতকুলশীলা কোথাকার কে এক দুলালী ধর্ম্মবলে কত যে উচ্চ এবং কত যে পবিত্র, সেই সংবাদটি সমাজের বুকে জ্বলন্ত আগুনের অক্ষরে লিখে দেবার জন্য আমার সেই অবচেতন মনুষ্যত্ব আজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আমার মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরীক্ষা আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত। সমাজকে দেখাতে হবে মানুষই সবার আগে—সমাজ তার সৃষ্টি পশুকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয়। তুমি কিছু একটু খাও মা! তারপর আমি খাব। মনুষ্যত্বের মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করব।"

(১৬)

একরাজ্য দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা লইয়া অবসন্ন দেহে শিবু সন্ধ্যার সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল তাহার গরু কয়টি প্রতিবেশী আন্ধারু খুলিয়া গোশালায় বাঁধিয়া দিতেছে। শিবু দেখিয়া বুঝিল, এবং প্রশ্নের দ্বারা অবগত হইল যে, আন্ধারু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার অরক্ষিত বাড়ী-ঘরও আবশ্যক মত পাহারা দিয়াছে। কৃতজ্ঞতায় শিবুর অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল

হাতে পায়ে জল দিয়া শিবু ঘরে উঠিল এবং সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া, আন্ধারুকে লইয়া বারান্দায় বসিয়া খানিকক্ষণ কথা-বার্ত্তা কহিল। কথা প্রসঙ্গে স্থির হইল যে শিবুরা তাহাদের মোকদ্দমা উপলক্ষে যতদিন অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইবে, ততদিন আন্ধারু তাহাদের বাড়ীঘর, ক্ষেতখামার ও গরু বাছুরাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, এবং তজ্জন্য শিবু তাহাকে দৈনিক আট আনা হিসাবে পারিশ্রমিক দিবে। শিবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"তা হলে আজ থেকেই তোমার হিসাব চল্‌বে। তুমি এখন ঘরে যাও। আমি রাত-টুকু কাটিয়ে থুব ভোরের সময় শহরে যাব। তুমিও একটু ভোরের দিকেই এস।"

সম্মতি জানাইয়া আন্ধারু উঠিয়া গেল।

তারপর শিবু গভীর রাত পর্য্যন্ত নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ ঐ বারান্দায় একাকী বসিয়া রহিল। সহস্র চিন্তা তাহার দুর্ব্বল চিত্ত আলোড়ন করিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল।

কিছুকাল পূর্ব্বে এক সময়ে তাহার মনে এইরূপ একটা বাসনার উদয় হইয়াছিল যে, দুলালী একটু বড় হইলে সুখনের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দু'টিকে সে গাঁথিয়া দিবে। অথচ তাহার অন্তর ইহাতে যোল আনা সায় দিতেছিল না। বিশেষত দুলালীর প্রকৃত পরিচয় এবং জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করা ব্যতীত,— অন্ততপক্ষে দুলালী যে শিবুর কন্যা নহে এবং সুখনের সহোদরা নহে, এই সংবাদটুকু প্রকাশ না করিয়া,—এইরূপ বিবাহের প্রস্তাবই উপস্থিত করা যাইতে পারে না। অথচ এতকাল ধরিয়া এইরূপ একটি বড় কথা সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখিয়া, এবং বরাবর দুলালীর নিকট মিথ্যারূপে নিজকে তাহার পিতা বলিয়া চালাইয়া আসিয়া, এখন আর উহা প্রকাশ করিবার মত সাহসও শিবু খুঁজিয়া পাইতেছিল না। দুলালীকে লইয়া শিবু একটা জটিল সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছিল। লোকে কোনরূপ দুর্ভাবনায় পড়িলে অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করে এবং উপদেশ গ্রহণ করিয়া পথ খুঁজিয়া লয়, শিবুর সে উপায়ও ছিল না। বরং কেহ যাহাতে ঘৃণাক্ষরেও কিছু জানিতে না পারে তৎপ্রতিই শিবুর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইত।

শিবু একবার ভাবিল, পুনরায় স্থান ত্যাগ করিয়া উহাদিগকে লইয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইবে, এবং সম্পূর্ণ অপরি-চিত স্থানে যাইয়া সুখন ও দুলালীকে সুযোগমত সব কথা খুলিয়া বলিবে;—নিজের যে দুর্ব্বলতার জন্য সে এতদিন কথাটা গোপন রাখিয়াছিল—তাহাও প্রকাশ করিবে; তারপর উভয়কে 'এক হাত' করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু?—দুলালী অথবা সুখন, অথবা তাহারা উভয়েই, যদি ঐ বিবাহে অসম্মত হয়? তাহাদের পবিত্র ভ্রাতা-ভগ্নী সম্পর্ক ভিত্তিহীন জানিয়াও তাহারা যদি সেই সম্পর্কই অচ্ছেদ্য জ্ঞান করে? তখন? তা ছাড়া, দুলালী তাহার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হইয়া তখনও কি এই সাধারণ শ্রমিককে পিতার আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে? এবং শিবু নিজেও কি তখন আত্ম-পরিচয় প্রাপ্তা ভদ্রকন্যা দুলালীকে আর পূর্ব্ববৎ নিজের মেয়ের মত ভাবিতে পারিবে অকুণ্ঠিতভাবে? এতবড় একটা পরীক্ষার মধ্যে যাইতে শিবুর সাহস হইল না।

শিবু আরও বিবেচনা করিয়া দেখিল, দুলালী এবং সুখন শৈশবাবধি একত্রে একই প্রকার আবহাওয়ার মধ্যে লালিত-পালিত হইলেও দুলালী যেন সর্ব্বপ্রকারেই তাহার ভদ্রবংশের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। কিন্তু সুখন যে কুলী সেই কুলী রহিয়া গেল। আর এই যে রামপুরের ন্যায় নগণ্য স্থানে বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথা হইতে কেমন করিয়া আশুবাবুদের মতন অতবড় ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের সহিত দুলালীর কি রকম সুমধুর আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল,—বাড়ী শুদ্ধ সকলেই দুলালী বলিতে অজ্ঞান, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? ইহার মধ্যে ভগবানের অপূর্ব্ব রহস্যময় একটু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নাই কি? সেই যে ওভারসিয়ার বাবুর বাড়ীতে থাকা সময়ে তিনি একদিন উহাদিগকে একটি গল্প পড়াইতেছিলেন যে, একটি সিংহের বাচ্চা শিশুকাল হইতে ভেড়ার পালে বড় হইয়া যুবক বয়সেও একেবারে ভেড়াই বনিয়া গিয়াছিল, একটি শৃগাল দেখিলেও প্রাণভয়ে পলায়ন করিত; তারপর হঠাৎ একদিন অন্য একটা সিংহের সহিত তাহার দেখা এবং পরিচয় হওয়ায় সে আপনার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া এক মুহূর্ত্তেই পুরাদস্তুর সিংহ বনিয়া গিয়াছিল। দুলালীর ব্যাপারও তো ঠিক সেই রকমই হইয়া উঠিতেছে। শিবু আপনাকে বড় অসহায় বোধ করিল।

আচ্ছা, শিবু কি চায়? কি আশা লইয়া, কোন স্বার্থের প্রলোভনে শিবু দুলালীকে মানুষ করিয়াছিল? মেয়েটিকে

তো শিবু চাহিয়া লয় নাই। শৈশবে বাপ-মা হারাইয়া মেয়েটি সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে দৈবক্রমে তাহার কোলে আসিয়া পড়ে, এবং সে কর্ত্তব্যবোধে দয়া করিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লয়। হঠাৎ মেয়েটির উপর তাহার একটা প্রবল স্নেহ জন্মে। অন্য কেহ আসিয়া কোনরূপে দাবী-দাওয়া উপস্থিত করিতে না পারে এবং মেয়েটিকে পুনরায় বক্ষচ্যুত করিতে না হয়, এইজন্য অন্ধ-মোহের বশে শিবু তাহাকে লইয়া অজ্ঞাত বাসে পালাইয়া আসে, এবং আপন পুত্রকেও সময় সময় খানিকটা অবহেলা করিয়া দুলালীকে লালন-পালন করিয়া বড় করিতে থাকে। দুলালীও তো তাহাকে ঠিক পিতার ন্যায়ই দেখিয়া আসিতেছে।

কিন্তু মেয়ে এখন বড় হইয়া উঠিতেছে। আর অধিক দিন তাহাকে এভাবে রাখা চলে না। সুখনের সহিত বিবাহ দেওয়া সম্ভবপর না হইলে অন্য একটা ব্যবস্থা তো করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোথায় দিবে? কার হাতে দিবে? দুর্গাদিদির গর্ভজাত মেয়েকে একটা যার তার হাতে সঁপিয়া দিয়া একেবারে চক্ষুর অন্তরাল করিতে সে চাহে না। অথচ ভদ্রঘরে দিবার উপায়ই-বা কোথায়? শিবুর মেয়ে বলিয়াই তো তাহাকে সকলে জানে। এ অবস্থায় কোন্ ভদ্রলোক তাহাকে গ্রহণ করিবে? কিন্তু ভগবান কি একটা উপায় করিবেন না? অবশ্যই করি-বেন। সে কেন অনর্থক চিন্তা করিয়া মরিতেছে। একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই তো দেখা যায় দুলালীকে ভগবানই এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। নতুবা পিতৃমাতৃ-হীন পরের অপোগণ্ড শিশুর জন্য তাহার বক্ষে স্থান জুটিল কি প্রকারে? ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে দেবেন্দ্রবাবুর আশ্রয়ই বা তাহারা পাইয়াছিল কার কৃপায়? আর এই যে এখন এত বড় একটা মিথ্যা কলঙ্কের মধ্যে মেয়েটা পড়িয়াছে, ইহার মধ্যেই বা ভগবানের কি উদ্দেশ্য আছে, শিবু তাহার কি বুঝিবে? তিনি নাকি মঙ্গল ছাড়া কখন কাহার অমঙ্গল করেন না। তবে আর ভাবনা কি।

অতএব শিবু স্থির করিল, এতদিন যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু দুলালীর জন্মবৃত্তান্ত তাহার নিকট হইতে শিবু আর গোপন রাখিবে না। তারপর ভগবান যে ব্যবস্থা করেন তাহাই সে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে।

শিবু এতক্ষণ পরে মনের মধ্যটা বেশ একটু হাল্‌কা বোধ করিল। অপূর্ব্ব একটা তৃপ্তির সঙ্গে শিবু দুলালীর শারী-রিক অবস্থার বিষয় ও মামলা-মোকদ্দমার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

(১৭)

শিবু সর্দ্দার রামপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই দিনই উকীল নরেন্দ্রবাবুর সাহায্যে দারোগা ভূপতিভূষণ চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিল। প্রধান হাকিম কালীপ্রসাদবাবু শিবুর জবানবন্দী লিখিয়া লইলেন এবং আদেশ দিলেন যে, পর দিবস দ্বিপ্রহরে তিনি স্বয়ং রামপুরে যাইয়া তদন্ত করিবেন; ফরিয়াদী শিবু সর্দ্দার যেন তাহার সাক্ষী প্রমাণাদি লইয়া তথায় হাজির থাকে। ভূপতি চক্রবর্ত্তীকে ও তাহার সঙ্গের কনেষ্টবল দুইজনকে এবং ভূপতির উপরিস্থ ইন্সপেক্টরকেও উপস্থিত থাকার জন্য তিনি সংবাদ দিলেন।

পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণে আশুবাবু তাঁহার গাড়ীতে শিবু, সুখন ও দুলালীকে উকীল নরেন্দ্রবাবুর সহিত রামপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

উপযুক্ত সময়ে হাকিম বাহাদুর যাইয়া পৌঁছিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে ঘটনাস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। দুলালীর শয্যা সেইভাবেই পড়িয়া ছিল। শয্যার এক অংশে ও পার্শ্বে মৃত্তিকায় কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ পরিলক্ষিত হইল। গৃহ-মধ্যে এবং বারান্দায় জুতার কয়েকটি চিহ্নও দৃষ্ট হইল। তন্মধ্যে একটি চিহ্ন খুবই স্পষ্ট ছিল। হাকিম ঐ চিহ্নটি মাপিয়া লইলেন। তারপর সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল।

১নং সাক্ষী রাজীব, আসামী ভূপতি চক্রবর্ত্তীকে দেখাইয়া কহিল,—"সন্ধ্যা-দীপ জ্বালাইয়া দিবার প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে এই দারোগাবাবু আমার বৈঠকখানা ঘর হইতে একাকী অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া যান। আমি তখন মনে করি যে, বাবু বোধ হয় হাত-মুখ ধুইতে বা ঐরূপ অপর কোন কারণে বাহিরে যাইতেছেন; সুতরাং কোন প্রশ্ন করি নাই। প্রায় পনর কুড়ি মিনিট পরে শিবু সর্দ্দারের বাড়ীর দিকে শিঙার শব্দ শুনিতে পাই। সেই সময় বাবু দৌড়াইয়া আসিয়া ঘরে ঢোকেন। তাঁহার মুখ রক্তাক্ত ছিল। তিনি হাঁপাইতে ছিলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত ভীত দেখা যাইতেছিল। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে বলিলেন,—'কে যেন অন্ধকারে আমাকে মারিয়া গেল।' এই বলিয়াই তিনি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কোন লোকের নাম তিনি বলেন নাই। আমি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া দিলাম; তিনি মুখ ধুইলেন এবং মাথায়ও খুব জল দিলেন। তাঁহার উভয় ঠোঁট ফুলা এবং গালে জখম দেখিয়া-ছিলাম। জল দিয়া বারংবার ধোওয়া সত্ত্বেও রক্ত পড়িতেছিল। তিনি বলিলেন, তখনই তাঁহার থানায় যাইতে হইবে। এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া ঘোড়ায় জিন কষিয়া লইলেন। তাঁহার কাপড় এবং বিছানা আমার [illegible] রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমার ঘরে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন পরে সুযোগমত তিনি উহা [illegible]। বাবুর সঙ্গে দুইজন কনেষ্টবল আসিয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিনি শিবু ও সুখনের সঙ্গে তাহাদিগকে কোনও স্থানে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা তখন পর্য্যন্তও ফিরে নাই। আমি বাবু বলিলাম, এই অন্ধকার রাত্রে, ঐ রকম জখম লইয়া, বাঘ ভাল্লুকের রাস্তায় একাকী যাওয়ার আবশ্যক কি? যদি নিতান্তই যাইতে হয়, কনেষ্টবল দুইজন আসুক, তাহা-দিগকে লইয়া যাইবেন। বাবু তাহা শুনিলেন না; ঘোড়া লইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যেই চলিয়া গেলেন। ইহারও প্রায় এক ঘণ্টা পরে কনেষ্টবল দুইজন ফিরিয়া আসে। আমি তাহাদিগকে ঘটনার বিষয় জানাই। আমরা এই সব বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় বড় বড় লাঠি হস্তে শিবু ও সুখন দৌড়াইয়া আসে এবং দারোগাবাবু কোথায়, জিজ্ঞাসা করে। তাহাদিগকে তৎকালে খুনী ডাকাতের মতই দেখা

যাইতেছিল। তাহাদের চেহারা দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হয়। আমার মনে এই রকম সন্দেহ হয় যে, তবে ইহারাই বোধ হয় বাবুকে মারিয়াছে এবং পুনরায় মারিতে আসিয়াছে। আমি ভয়ে ভয়ে বলি, বাবু ঘোড়া লইয়া থানায় গিয়াছেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাস্তার দিকে দৌড়াইয়া যায়। আমি তখন কনেষ্টবলদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ব্যাপার কি? উহারাই ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে বাবুকে মারিয়াছে না কি?" তাহারা বলিল,—"না, তাহা কেমন করিয়া হইবে? সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা তো বরাবর আমদের সঙ্গেই ছিল, এবং এই তো এই মাত্র উহাদিগের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসিবার সময় উহারা বাড়ী গেল এবং আমরা এখানে আসিলাম।" এই সব কথাবার্ত্তা বলার পর কনেষ্টবলেরা রান্না করিতে গেল। আমি বাবুর বিছানা-পত্র এবং কাপড়-চোপড় বাড়ীর মধ্যে নিয়া রাখিলাম। তারপর খাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়া পড়ি। কনেষ্টবল দুইজনও আমার বাহিরের ঘরে ঘুমাইয়া থাকে। রাত্রে আর কিছু টের পাই নাই। শেষ রাত্রে অনেক পুলিশ ও চৌকীদার আসিয়া শিবুদের বাড়ী ঘেরাও করে, এবং একজন চৌকীদার আসিয়া আমার বাড়ীতে থাকা কনেষ্টবল দুইজনকে ডাকিয়া নেয়। তাহাদের ডাকাডাকিতে আমারও ঘুম ভাঙিয়া যায়, এবং আমিও তাহাদের সঙ্গে শিবু সর্দ্দারের বাড়ী পর্য্যন্ত আসি। তথায় আর একজন খুব মোটা এবং দাড়িওয়ালা দারোগা ছিলেন। তিনি খুব ধমকাইতেছিলেন, এবং বলিতেছিলেন যে, সন্ধ্যার সময় তাহারাই এই ছোট বাবুকে মারিয়াছে। আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম যে তাহা হইতেই পারে না। সেই দাড়িওয়ালা মোটা দারোগাবাবু তখন আমাকে দু'টা শক্ত কথা বলিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন। ভয়ে আমি আর কোন কথা বলি নাই।"

হাকিম প্রশ্ন করিলেন,—"দারোগাবাবু তো রাত্রে পোষাক পরিয়া থানায় গেলেন। তাঁর পরিধানে থাকা জল-কাদা এবং রক্তমাখা সেই কাপড়খানা তিনি কি করিয়াছিলেন?"

রাজীব কহিল,—"হুজুর! তিনি সেই কাপড়খানা আমার বাড়ীতেই রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং ধুইয়া শুকাইয়া রাখিবার জন্য আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু সে কাপড় আমার ধুইয়া রাখিতে মনে নাই। কাপড়খানা এখন পর্য্যন্ত সেই জল-কাদা মাখা অবস্থায়ই আছে।"

হাকিম বলিলেন,—"না ধুইয়া বোধ হয় ভালই করিয়াছ। তুমি এখনই কাপড়খানা লইয়া আইস;—যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই আনিও।"

রাজীব দৌড়াইয়া যাইয়া কাপড়খানি লইয়া আসিল। দেখা গেল, কাপড়খানার কয়েক স্থানে রক্তের চিহ্ন আছে। তা ছাড়া খোঁচা লাগিয়া পাড় সহ কাপড়ের অল্প একটু অংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দেখা গেল। হাকিম তৎক্ষণাৎ দুলালীর কক্ষে পুনরায় প্রবেশ করিলেন এবং বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, দরজার এক পার্শ্বে বেড়ার একখানা ভাঙা বাখারির অগ্রভাগে ঐ ছিন্ন অংশটুকু লাগিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন।

তিনি ভূপতির কাপড় এবং ঐ ছিন্ন অংশটুকু হস্তগত করিয়া লইলেন।

অতঃপর ২নং সাক্ষী রামঝুলন সিং কনেষ্টবল কহিল,—"আমি দারোগা ভূপতিবাবুর সঙ্গে রামপুর গ্রামে আসিয়াছিলাম। শেষ বেলায় তিনি মেঘনাথ সূত্রধর নামক এক ফেরারি আসামীর সন্ধান লইবার জন্য আমাকে চারি মাইল দূরবর্ত্তী বীরপাড়া গ্রামে যাইতে বলেন। আমি বলি,—'রাত্র হইয়া আসিল, এই সময় জঙ্গলা পথে অতদূরে যাতায়াত করা শঙ্কার বিষয়; রাতটা কাটুক, প্রাতে যাইব।' তিনি বলিলেন,—'বিলম্ব করিলে সরকারী কাজের ক্ষতি হইবে, এই ব্যক্তিকে বরং সঙ্গে লইয়া যাও।' এই বলিয়া তিনি শিবু সর্দ্দারকে দেখাইয়া দিলেন। শিবু এবং তার ছেলেকে বাবু অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন, এবং তাহারা সম্মুখেই বসিয়াছিল। শিবুকে বলায় সে আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল। বাবু তখন লালধারী সিংকেও অপর একজন লোকের সন্ধান আনিবার জন্য কদমতলা গ্রামে পাঠাইয়াছিলেন, এবং সুখনকে তাহার সঙ্গে দিলেন। আমরা প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত একসঙ্গে আসিয়া তারপর ভিন্ন পথ ধরিলাম। বীরপাড়া গ্রামে যাইয়া অনুসন্ধানে জানিলাম, মেঘনাথ সূত্রধর নামক কোন লোক ঐ গ্রামে কিম্বা পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে নাই এবং কখন ছিল না। শিবু আর আমি ফিরিয়া রওয়ানা হইলাম। তখন বেশ জমাট অন্ধকার। প্রায় মাইল দুই আসিবার পর আমরা কিছু দূরে সম্মুখের দিকে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া ডাক দিলাম। লালধারী সিং উত্তর দিল। আমরা তাড়াতাড়ি একত্র হইলাম। লালধারী সিং বলিল, যে লোকের সন্ধানে তাহাকে কদমতলা পাঠান হইয়াছিল, সেই নামের কোন লোক তথায় নাই। অন্ধকার রাত্রে আমাদিগকে অনর্থক এইভাবে হয়রান করার জন্য আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম। এমন সময়, গরু বাঁধা হয় নাই ইত্যাদি বলিয়া শিবু ও সুখন আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া আসে। আমরা পিছনে পড়ি, এবং পথ হারাইয়া অনেক দূর ঘুরিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই পরে রামপুরে ফিরিয়া আসি। আসিয়া দেখি বাবু নাই। রাজীব বলিল, বাবুকে কে নাকি মারিয়া খুব জখম করিয়া দিয়াছে এবং তিনি থানায় গিয়াছেন। আমরা অবাক হইয়া একে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি এমন সময় শিবু আর সুখন দু'খানা বড় বড় লাঠি লইয়া দৌড়াইয়া আসে এবং বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করে। তাহাদিগকে তখন ডাকাতের মতই ভীষণ দেখাইতেছিল। তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে রাজীব বলিল, বাবু ঘোড়া লইয়া থানায় গিয়াছেন। অমনি তাহারা রাস্তার দিকে দৌড়াইয়া গেল। রাজীব তখন আমাদিগকে প্রশ্ন করিল,—'উহারা বাবুকে মারে নাই তো?' আমরা বলিলাম,—'অসম্ভব কি? উহারা তো আমাদিগকে অন্ধকারে ফেলিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল'।"

অভিজ্ঞ উকীল নরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন, দারোগাকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে কনেষ্টবল মিথ্যা উক্তি করিতেছে। হাকিমের বিশেষ অনুমতি লইয়া তিনি এই সাক্ষীকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন।

—"শিবু ও সুখন যে স্থানে তোমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া আসে সেই স্থান রামপুর হইতে কতদূর হইবে?"

—"প্রায় দুই মাইল।"

—"তখন তোমরা কোন্‌দিকে যাইতেছিলে?"

—"অন্ধকারে দিক ঠিক ছিল না।"

—"তোমরা যে পথ হারাইয়াছিলে, তাহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলে?"

—"ক্রমাগত ঘণ্টাখানেক হাঁটিয়াও যখন পথের শেষ পাইলাম না, তখন আমাদের সন্দেহ হইল। এমন সময় কয়েকজন লোককে বিপরীত দিক হইতে আসিতে দেখি। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে, আমরা ভুল পথে চলিয়াছি, এবং রামপুর দক্ষিণে রাখিয়া অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছি।"

—"তারপর রামপুরের রাস্তা ঠিক পাও কেমন করিয়া?"

—"ঐ লোকগুলির সাহায্যে জানিয়া লই।"

—"অন্ধকারের মধ্যে তাহারা শুধু পথের সন্ধান বলিয়া দেয়, না সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পথ ধরাইয়া দেয়?"

—"তাহারা প্রায় অর্ধ মাইল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়া আমাদিগকে একটা রাস্তায় তুলিয়া দেয়, এবং কোন্‌ দিকে কত দূরে গেলে আমরা রামপুরে পৌঁছিতে পারিব তাহা বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যায়।"

—"শিবু ও সুখন যে সময়ে তোমাদিগকে ফেলিয়া দ্রুত চলিয়া আসে তখন তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলে কি?"

—"করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা শুনে নাই।"

—"তোমরাও দ্রুতপদে হাঁটিয়া তাহাদের সঙ্গে আস নাই কেন?"

—"আমরা অত্যন্ত হয়রান হইয়া পড়িয়াছিলাম। তা ছাড়া আমরা যে পথ হারাইয়া ফেলিব এরূপ সন্দেহ আমাদের মনে হয় নাই।"

ইহার পর ৩নং সাক্ষী লালধারী সিং কনেষ্টবলের জবানবন্দী লওয়া হইল। সে রামঝুলন সিংএর উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া গেল বটে, কিন্তু নরেন্দ্রবাবুর জেরায় বিষম গোলমাল করিয়া ফেলিল। সে বলিল, পথের মধ্যে কোন লোকের সহিত তাহাদের দেখা হয় নাই এবং কোন লোক তাহাদিগকে পথ ধরাইয়া দেয় নাই। সুখন ও শিবু চলিয়া আসিবার সামান্য কিছুক্ষণ পরেই তাহাদের ধারণা হইল যে, তাহারা পথ হারাইয়াছে। তাহাদের ভয় হইল। তাহারা উভয়ে তখন খুব চীৎকার করিয়া শিবু ও সুখনকে ডাকিতে আরম্ভ করে। পাঁচ সাতবার ডাকার পর দূরে হইতে শিবু উত্তর দেয়, এবং তাহা শুনিয়া তাহারা পথ ঠিক করিয়া লয়।

অতঃপর সুখনের, আম্ধারুর ও দুলালীর জবানবন্দী লইয়া হাকিম শহরে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কাছারীতে আসিয়া ডাক্তার বোস্‌কে ডাকাইয়া তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার বোস্ বলিলেন,—"ভূপতিভূষণ চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির জখম পরীক্ষা করার জন্য স্থানীয় পুলিশ তাঁহাকে গতকল্য প্রাতে আমার নিকট পাঠাইয়াছিল, এবং আমি প্রাতেই তাহার জখমাদি পরীক্ষা করিয়াছিলাম। তাহার উপরের ওষ্ঠে চারিটি এবং নিম্নোষ্ঠে ছয়টি সুস্পষ্ট দন্ত চিহ্নযুক্ত জখম ছিল। [illegible]মোর কামড়ে ঐ জখম হইয়াছিল এবং অত্যন্ত জোরের সহিত কামড় দেওয়া হইয়াছিল। ভূপতির উভয় ওষ্ঠের দন্তচিহ্ন এবং দুলালীর উভয় পংক্তির সম্মুখের দন্তগুলির অবস্থান আমি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত মাপিয়া ও তুলনা করিয়া দেখিয়াছি। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, দুলালীর কামড়ে ভূপতির ঐ জখম হইয়াছে। আমি দুলালীকেও পরীক্ষা করিয়াছি। তাহার কণ্ঠদেশে এবং চক্ষুতে প্রবল স্ফীতি ও বেদনা এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জখম ছিল। তৎসমুদয় দৃষ্টে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন ব্যক্তি অত্যন্ত জোরের সহিত তাহার গলা এবং চক্ষু টিপিয়া ধরিয়াছিল।"

হাকিম প্রশ্ন করিলেন,—"দুলালী শয্যায় শায়িত থাকা অবস্থায় ভূপতি চক্রবর্তী যদি তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে তাহা হইলে দুলালীর পক্ষে আত্মরক্ষার্থে ঐভাবে ভূপতির ওষ্ঠে কামড়াইয়া ধরা সম্ভবপর কি?"

ডাক্তার বোস কহিলেন,—"হ্যাঁ, বেশ সম্ভবপর। আর তা ছাড়া, উভয় ওষ্ঠে ঐরূপ প্রবল কামড়ের সম্ভাবনা অন্য পরিস্থিতিতে নিতান্তই কম।"

হাকিম।—"আচ্ছা, দুলালী তাহাকে ঐভাবে সজোরে কামড়াইয়া ধরিলে, ছাড়াইয়া যাওয়ার জন্য তাহার পক্ষে দুলালীর চক্ষু ও কণ্ঠদেশ টিপিয়া ধরা সম্ভবপর কি না?"

ডাক্তার বোস।—"খুবই সম্ভবপর।"

হাকিম।—"ঐভাবে টিপিয়া ধরিলে গলায় এবং চক্ষুতে কোন চিহ্ন থাকিবে কি?"

ডাক্তার বোস।—"জোরে টিপিয়া ধরিলে চিহ্ন থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিবে।"

হাকিম।—"এ ক্ষেত্রে দুলালীর কণ্ঠদেশে এবং চক্ষুতে তদ্রূপ কোন চিহ্ন ছিল কি? মোটের উপর আপনার কি মনে হয়?"

ডাক্তার বোস।—"দুলালীর কণ্ঠদেশের স্ফীতি ও বেদনা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জখমগুলি দৃষ্টে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন ব্যক্তি অত্যন্ত জোরে তাহার কণ্ঠ টিপিয়া ধরায় ঐ স্ফীতি ও বেদনা হইয়াছিল, এবং তাহার নখের আঘাতে ঐ সমস্ত ক্ষত হইয়াছিল। দুলালীর চক্ষু সম্বন্ধেও আমার ঐ একই মত। কোন ব্যক্তি তাহার চক্ষু সজোরে টিপিয়া ধরিয়াছিল, এবং তন্দরুন তাহার চক্ষু দুইটি লাল হইয়া ফুলিয়াছিল ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল। আরও একটু জোর প্রয়োগ করিলে অথবা আরও কিছুক্ষণ টিপিয়া রাখিলে চক্ষু দুইটি নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ আশংকা ছিল।"

ডাক্তার বোসকে বিদায় দিয়া, হাকিম বাহাদুর থানার ভারপ্রাপ্ত বড় দারোগাকে তলব দিয়া আনিলেন। হাকিমের সুদীর্ঘ প্রশ্নাবলীর উত্তরে তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন যে, বীরপাড়া গ্রাম হইতে মেঘনাথ সূত্রধর নামক কোন ব্যক্তির এবং কদমতলা গ্রাম হইতে অপর কোন ব্যক্তির সন্ধান আনাইবার কোন কারণ তিনি স্বয়ং জানেন না এবং কাগজ-পত্রেও পাওয়া যায় না।

(শেষাংশ ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তুর্কী-নারীর শিক্ষা সাধনা

শ্রীমতী অমলা গুপ্ত

কবি গাহিয়াছিলেন—

'না জাগিলে এ ভারত-ললনা
ভারত আর জাগে না, জাগে না।'

বস্তুত কোন জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে যদি নারী না তাহার যোগ্য অংশ গ্রহণ করে—যদি পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া না দাঁড়ায়, তবে সে প্রয়াস শক্তির প্রাচুর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আজ যে তুর্কী-নারী পুরুষের অভিভাবকত্বের কারা থেকে মুক্ত করিয়া নিজেকে পরিবারের কর্ত্রীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে, দেশের নব-আন্দোলনের ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পুরুষকে সাহায্য করিয়াছে, প্রেরণা জোগাইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে শিক্ষা-সাধনার যুগ-যুগের প্রভাব—সুদূরে সেই বোরখা-মণ্ডিত সচল কারাজীবনেও। নহিলে সাময়িক উত্তেজনায় তুরস্কের যুব-আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও উহাকে মনে-প্রাণে বরণ করিয়া লইয়া কর্ম্মীর পদ গ্রহণ করিতে তাহারা পারিত না এতটা, সুযোগ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাবে। আর যে সংক্ষিপ্ত সময় মধ্যে তাহারা আপনাদের জীবনকে মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় অপার উন্মুক্ত ও কর্ম্মময় পারিপার্শ্বিকের নব বেষ্টনে পরিবেষ্টিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতেও বুঝিতে পারা যায় তাহাদের সর্ব্বপ্রকার পরনির্ভরশীল জীবনেও তাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইত এবং মুক্তির ভাবনা তাহাদের মনের গোপন কোণে বাসা বাঁধিয়াছিল। তাই শুধু নব আন্দোলনে সাড়া দেওয়া নয়, বহু গঠনমূলক দেশহিতকর অনুষ্ঠানের গোড়া-পত্তনও তাহারা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

তুর্কীনারীকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ—গ্রাম্য-শ্রমিক এবং শহরবাসিনী।

শ্রমিক-রমণীগণ চিরকাল স্বাভাবিক উন্মুক্ত জীবন-যাপন করিয়াছে। বোরখা ছিল তাহাদের উৎসব-সজ্জা। স্বামীর সকল কঠোর শ্রমের কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিয়া নিজের ব্যক্তিত্বকে সে স্বামীর সমান মর্য্যাদায় ও গুরুত্বে উন্নীত করিয়াছিল সেই অতীতকালেই। স্বগ্রামে কোন দিন সে বোরখা ব্যবহার করিত না—এখন ত উহা বর্জ্জিতই হইয়াছে সকল অঞ্চলেই। উৎসবে গৃহের বাহিরে যখন বোরখা পরিয়া সে যাতায়াত করিত, তখনও সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া না থাকিয়া বোরখা সঙ্গে থাকিত দোষক্ষালনের উদ্দেশ্যেই যেন। দেশের ডাকে যখন স্বামী যোগদান করিত সংগ্রামে—পল্লী-শ্রমিক তখন গৃহের সকল ভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইত এবং দুইয়ের কাজ একলা সমাধা করিয়া পরিবার পোষণ করিত, ফসল উৎপাদন করিত। ইহারাই হইল তুর্কী গ্রাম্য-সমাজের মেরুদণ্ড এবং বলিতে গেলে সেকালের যত কিছু নারী-সাধ্য দেশের কার্য্য—জাতির মঙ্গলানুষ্ঠান, তাহা সাধিত হইত এই আদর্শ তুর্কীরমণী দ্বারা।

শহরের মহিলাবৃন্দ ছিল যেন কাচের প্রদর্শনী পেটিকায় সংরক্ষিত বহু সজ্জাভূষিত নির্জীব পুত্তলিকা। শ্রমের কার্য্য দূরে থাকুক, নিত্যকার ব্যক্তিগত জীবনের আবশ্যক কার্য্যেও সে সাহায্য গ্রহণ করিত পরিচারিকা, দাসী প্রভৃতির—অলস বিলাস ভিন্ন তাহার করণীয় ছিল না কিছুই। তবে সেকাল হইতে যে ঠিক একই ধারায় বিলাসিতার স্রোত বহিয়াছে তাহাদের ভিতর, তাহা নয়। জাতির ইতিহাসের রূপান্তরে তাহাদের বিলাসিতার প্রকৃতির বদল হইয়াছে মাত্র, প্রকৃত শ্রমের কার্য্যে তাহারা কোনদিন যোগদান করে নাই এবং পুরুষেরাও তাহাদের এরূপ অলস জীবন অটুট রাখিতে নানা প্রকারে সাহায্যই করিয়াছে, কখনও সামান্য শ্রমের কার্য্যেও নিযুক্ত হইতে উৎসাহ দান করে নাই।

তুর্কী-নারীর এই অবস্থা পরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া চলিলেও, সুদূর অতীতে কিন্তু ছিল না। উহার আরম্ভ হয়, তুর্কী-ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয়-উৎসবের সহিত। বৈজন্তিয়াম-বিজয় তুর্কীর গৌরবের বিষয় হইলেও, উহা হইতেই সুরু হয় নারীর অবরোধের ব্যবস্থা। এই সময়ে তুর্কী-নারী এক বিজাতীয় সভ্যতার ও রীতিনীতির কবলে পড়িয়া আপন পূর্ব্ব-সত্তা-স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে।

তুর্কী যখন কনস্তান্তিনোপল অধিকার করে, তখন তাহারা অবগুণ্ঠিত রমণী ও ক্রীতদাসী পূর্ণ জেনানা-মহল আবিষ্কার করে সেখানকার প্রাসাদে প্রাসাদে। বৈজন্তিয়ানগণ উহার আখ্যা দিত জিনোইসিয়া (gynoecia) অর্থাৎ রমণী-রাজত্বের মহল। প্রফুল্ল অন্তরে তুর্কীরা বিজিতদের 'অবরোধ ও অবগুণ্ঠন' ব্যবস্থা গ্রহণ করিল নিজ নারীদের উপর আরোপ করিতে এবং দেশজয়ে প্রাপ্ত রমণী ও ক্রীতদাসীদের হ্যারেমে স্থান দান করিল—বিবাহিত পত্নীদের পাশে। সারা তুর্কী-রাজ্যে এই হইল 'জেনানা' মহলের সৃষ্টি।

অথচ ইহাই ছিল তুর্কীদের বীরত্বের যুগ—গৌরবের যুগ—প্রবল প্রতিপত্তির যুগ। তাহাদের রাজ্য অর্দ্ধ ইউরোপকে গ্রাস করিয়াছিল, উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়া ত ছিলই পূর্ব্ব হইতে। এই সমগ্র বিস্তৃত রাজ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী রমণী পাঠান হইত ইস্তাম্বুলে এবং সকল অধিকৃত রাজ্য হইতে কর, নজর আদায় করা হইত বিপুল।

এই সময়ে তুর্কীদের হ্যারেমগুলি পূর্ণ থাকিত অগণিত অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীতে। নিদারুণ কঠোর সে অবরোধের রীতিনীতি হইলেও কিন্তু নারীদের শিক্ষা-দীক্ষায় অবহেলা করা হইত না। উদ্যান-শোভা পুষ্পটিকে যেমন সমাদর আর যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা হয় ঈর্ষান্বিত সাধারণের লোলুপতা হইতে, ঠিক তেমনই আদরে রাখা হইত হ্যারেমের নারীদের। হ্যারেমের নারীর সৌন্দর্য্যের উপর—নারীর সংখ্যার উপর সেকালে তুর্কী ওমরাহদের আভিজাত্যের বহর নির্ভর করিত। ইহাদের ভিতর কেহ কেহ সুলতানের প্রিয়পাত্রী হইত—প্রণয়ান্ধ সুলতানকে সে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া রাষ্ট্রের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রী হইয়া পড়িত। ইহাতে দেশের পক্ষে মঙ্গল কিছু হইত না, বরং অনেক সময়ে দেশকে ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হইত। কত ক্রীতদাসী হইতে এই প্রকারে প্রধানা বেগমের উদ্ভব হইয়াছে, প্রিয় মহিষীর উদয় হইয়াছে, রাজমাতার আবির্ভাব হইয়াছে।

রাজপ্রাসাদে এই ব্যাপার সম্ভব হইলেও কিন্তু অভিজাত মহলে কি মধ্যবিত্ত মহলে তুর্কী-পত্নীর প্রভাবই থাকিত সর্ব্বোপরি। ফলে স্বদেশীয় বিদেশীয় অন্যান্য পত্নীগণ ও ক্রীতদাসীগণ গৃহকর্ত্রী ঐ তুর্কী-পত্নীরই নিয়ন্ত্রণে থাকিতে বাধ্য হইত। হ্যারেমের ব্যাপারে স্বামী কখনও তুর্কী-পত্নীর সঙ্গত ব্যবস্থায় বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করিত না। তবু কিন্তু তুর্কী-পত্নীকে বহু মানসিক ক্লেশ বরদাস্ত করিতে হইত। ফলে অবস্থা দাঁড়াইল এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রণয়ের সমযোগ্য প্রতিদান না পাইয়া তুর্কীনারীর অন্তর হইতে প্রণয় বা ভালবাসার দাবী যেন অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

সময় যাইতে লাগিল। জাতির দেহে ইহারই প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া উঠিল নানারূপে। তুর্কীর প্রবল প্রতাপ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি তুরস্কে কেবলই দোলা দিতে লাগিল। কিন্তু যে নারীকে তুরস্ক গৃহের মহামূল্য আসবাবের আকারে জড়ত্বে পরিণত করিয়াছে, সে নারীই যখন অন্য দেশে শিক্ষা-দীক্ষায় মণ্ডিত হইয়া নিজ নিজ জাতিকে উচ্চে তুলিয়া দিতেছে—এইরূপ দৃষ্টান্ত চোখের উপর দেখা যাইতে লাগিল এবং যখন তুর্কীর বিদেশীয় পত্নীগণ আপন আপন কন্যাকে হ্যারেমে রাখিয়াও নানা শিক্ষা দিতেছে, লক্ষ্য করা গেল, তখন আর অভিজাতবংশের কন্যাগণকে শিক্ষায় বঞ্চিত রাখা সম্ভব হইল না। তাই দেখা যায় ইউরোপীয় মহাসমরেরও পূর্ব্ব হইতে অভিজাত-কন্যাগণ হ্যারেমে শিক্ষালাভ করিয়া তৃপ্ত রহিল না, উহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় কৃতবিদ্য হইতে লাগিল। এবং ঠিক মহাসমরের সময়ে অভিজাত মহলে ইহা ত ধরাবাঁধা ফ্যাশানে দাঁড়াইল যে সংগতি থাকিলে আপন আপন কন্যাকে তুর্কীরা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিবে। এই প্রকারে শিক্ষার সহিত পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত অভিজাত মহলে ছাইয়া গেল। তথাপি এক এক সময়ে 'ইসলাম জাহান্নমে গেল' বলিয়া এক একটা তরঙ্গ উঠিত, আর ঐ নারীদের পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ বোরখায় আচ্ছাদিত হইত। বারো বৎসরের কন্যা প্যারিস স্কুল (তুর্কী-কন্যারা অধিকাংশ ফরাসী দেশেই শিক্ষিত) হইতে বাড়ী আসিল ছুটিতে, অমনি তাহাকে বোরখা-ঢাকা রাখা হইল। 'ইসলাম' জিগীরের তরঙ্গ মিলাইয়া গেল, আবার বোরখা বাক্সবন্ধ হইল।

কিন্তু তাহাতেও নিস্তার ছিল না। কতকগুলি বৃদ্ধার কাজই ছিল, মোটা পর্দ্দায় মোড়া জানালার সরু ছিদ্র হইতে প্রতিবেশীদের হালচাল লক্ষ্য করা—রাস্তায় বহির্গত বালিকা তরুণী প্রৌঢ়াদের অবগুণ্ঠনের কায়দা লক্ষ্য করা; এবং অতিরঞ্জিত করিয়া সামান্য ত্রুটিকে অমার্জ্জনীয় অপরাধের রূপে দিয়া নিন্দা করিয়া বেড়ান।

শুধু কি তাহাই। বোরখাচ্ছাদিত রমণী-মূর্ত্তির প্রতি পথচারীদের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিও কম বিরক্তিকর ছিল না পথচারিণী রমণীদের পক্ষে। আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইলে বালিকা-বৃদ্ধা-তরুণীর পার্থক্য ভেদ করা সম্ভব ছিল না—সময়ে লোলচর্ম্ম বৃদ্ধাকেও অনিন্দ্যসুন্দরী রহস্যময়ী তরুণী কল্পনা করিয়া জনতার যে অপলক জ্বলন্ত চক্ষু অনুক্ষণ অনুসরণ করিত পথচারিণীর প্রতি, তাহা অবনত মস্তকে নীরবে সহ্য করা ভিন্ন রমণীদের আর উপায়ান্তর ছিল না এই দৃশ্যের সঙ্গে বাঙলা মুলুকের কিছুদিন পূর্ব্বেরও দৃশ্যের তুলনা করা যায়। সে সময়ে গৃহস্থ ঘরের মেয়ের রাস্তায় বাহির হইতে হইলে দীর্ঘ গুণ্ঠনে বদন আবৃত করিত তাহাদের পায়ের মলের শব্দে কিম্বা হাতের চুড়ির বাজনায় শত শত চক্ষু উহাদের উপর আকর্ষিত হইত। কিন্তু আজ সেই বাঙলায় রমণীগণ অবাধে অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া ব শিরে মাত্র তুলিয়া রাখিয়া যে যাতায়াত করে, এখন আর তেমন ভাবে দৃষ্টি-অগ্নি আহ্বান করে না সকল পথচারী পুরুষের নেহাৎ দুই-এক স্থলে ভিন্ন। গোপনতা এমনই রহস্যময়—এমনই স্পন্দিত আকুলতার সৃষ্টিকারী।

যাহা হউক তুরস্কের এই অবগুণ্ঠনের কৃত্রিমতা চূরমার হইয়া গেল মহাসমরের কামান-গর্জ্জনে। সমাজের রক্ষণশীলগণও আর আপ্রাণ চেষ্টায় চেঁচাইয়াও বোরখার পূর্ব্ব আভিজাত্য অক্ষত রাখিতে পারিল না। সমরের আহ্বানে বিদেশী আততায়ীকে দেশ হইতে বিতাড়নের দৃঢ়সংকল্পে শ্রমিক-নারী আসিয়া দাঁড়াইল তাহার যোদ্ধা স্বামীর পার্শ্বে—তাহার বীর পুত্র-ভ্রাতার পার্শ্বে। যদিও আহতদের সেবা শুশ্রূষায় বহু নাগরিক-মহিলাও যোগদান করিয়াছিল, তথাপি প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যাইত শ্রমিক-রমণীর সহায়তাই বেশী। তাহারা গুরুভার কামানের গোলা স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়া দিয়াছে—কতভাবে কত শ্রমের কার্য্যে সৈনিকদের সাহায্য করিয়াছে, তাহার শেষ নাই। সেখানে বোরখার স্থান হইবার কথা নয়—স্থান পায়ও নাই।

য়্যাঙ্গোরায় "আতাতুর্ক ষ্ট্যাচিউ"য়ের পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যাইবে—প্রস্তর প্রতিকৃতি, যাহাতে দেখান হইয়াছে তুর্কী-রমণী একটি 'শেল' স্কন্ধে করিয়া চলিয়াছে। পোষাক সেকালের শ্রমিক রমণীর হইলেও বোরখার নামগন্ধও নাই তাহার আশপাশে। ইহাই তুর্কী-জাতির স্বাধীনতার প্রতীক—মুক্তির নিদর্শন।

তুর্কীর বিজয়ের প্রাচুর্য্যের ভিতর হইতে দুর্নীতির আবির্ভাব হইয়াছিল সেই বৈজান্তিয়াম যুগে, আর এই মহাসমরে পরাজয়ের ভিতর হইতেই উদয় হইল নূতন এক অপূর্ব্ব আলোকের। আর এই আলোকের সন্ধানী হইল তুর্কী-নেতা আতাতুর্ক। আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তুর্কী-নারীরাই গোড়া হইতে মনে-প্রাণে কামালিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হয় কাজেই বলিতে হয় যুগ-যুগের অবরোধ-গোপনতার ভিতরও যে শিক্ষা, যে সাধনা তুর্কী-নারী করিয়াছিল নীরবে আপন আপন হ্যারেমে, তাহারই প্রকৃষ্ট প্রকাশ হইল মুস্তাফা কামালের ন্যায় দেশ-নেতাকে বরণ করিয়া লইবার মধ্যে। তখন শ্রমিক, ধনিক বিদুষী—সকল নারীই এই উদার সংস্কারের পক্ষপাতিনী হইল, কারণ তখন আর শ্রমিকে, ধনিকে, গ্রাম্য চাষী-কন্যায় আর শহরের বিলাসিনী অভিজাত-কন্যার কোনও প্রভেদ ছিল না।

বিপ্লবের সময় এমন দৃশ্য বিরল ছিল না যে পত্নীসহ গ্রাম চাষীরা চলিয়াছে হাটে গরু, ঘোড়া বিক্রয়ের পর। কোমালিষ্ট মার্চ্চের সংগীত উত্থিত হইল তাহাদের কণ্ঠে। কিছুকাল পরে দেখা গেল সংঘর্ষ বাধিয়া গিয়াছে—চাষিগণ হইয়াছে সেনানায়ক

আর পত্নীগণের কক্ষে-মস্তকে যে পেটিকা ছিল অর্ঘ ও পরিচ্ছদের আধার রূপে, তাহা হইতে বাহির হইতেছে গোলাগুলী।

ইস্তাম্বুল হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া সকল অভিজাত বিলাসিনীদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল য়্যাঙ্গোরায় অথবা উহার চারিপাশের অতি সাধারণ কুটীরে। ইচ্ছা থাকিলেও সেখানে বিলাসের ব্যবস্থা ছিল অসম্ভব। নিত্য আহত সৈনিকের ট্রেন আসিত, আবার আনকোরা নূতন সেনার দল রওনা হইয়া যাইত। তুর্কী নর-নারী সে সময়ে আতঙ্কের ভিতরও একটা সান্ত্বনা পাইত যে—জাতির অগ্নি-পরীক্ষা চলিয়াছে, ইহা হইতে শোধিত হইয়া প্রকৃত জাতিত্বের মর্য্যাদায়ই তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিভাবে এই দৈব আশিস্ তাহাদের শিরে বর্ষিত হইবে, তাহারা জানিত না, কিন্তু দেশ-নেতার উপর তাহাদের এমন নির্ভর ছিল, যাহাতে তাহারা মনে মনে নিশ্চিত ছিল যে, যুদ্ধে জয় হউক, পরাজয় হউক—মুস্তাফা কামাল জাতিকে নিজ অধিকারে জাগ্রত করিবে।

এই আশা ছিল বলিয়াই সেই সময়ে অভিজাত অলস নারীগণও উৎসাহের সহিত দেশের কাজে লিপ্ত হইয়াছিল—সে কাজের শেষ ছিল না। নূতন নূতন সেনাদের পোষাক তৈরী—তাহার বস্ত্র পর্য্যন্ত যোগাড় করিয়া লইতে হইবে নারীদের। এই সেলাইয়ের কাজ ছাড়া, আহতদের শুশ্রূষা, মৃত সৈনিকদের অনাথ সন্তানদের পরিচর্য্যা। সংবাদপত্রের কার্য্যে পুরুষের অভাবে নারীদের যোগদান করিতে হইয়াছিল, যাহারা মোটর চালাইতে জানিত তাহাদিগকে মোটর চালক হইতে হইয়াছিল এবং শিক্ষিত মেয়েদের অন্য কোন কাজ না হইলে কেরাণীর কাজ করিতে হইত।

তথাপি এই যুদ্ধে যে শ্রমিক নরনারী সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে অসীম, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক শ্রমিক নারী শুধু যোদ্ধাদের সহায়তায় ভার বহনের কার্য্য সমাধা করিয়াই তৃপ্ত থাকে নাই, তাহারা নিজেরাও যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে।

কিন্তু ১৯২০ সাল আসিল। ক্রূর আন্তর্জ্জাতিক চালের যুদ্ধ শেষ হইল, কিন্তু এইবারে আর বিপদে মুহ্যমান হইতে হইল না। বীর-নেতা গাজী যে সুকৌশলে ইহা পরিচালিত করিলেন, তাহারই ফলে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল। শুধু শান্তি নয়, আততায়ী বিতাড়িত হইল। নূতন সেনা-গঠন তখন আবার পূর্ণ উদ্যমে চলিল। দেশের ভিতর যে দল ছিল গাজী মুস্তাফা কামালের বিপক্ষ, তাহারা পর্য্যন্ত তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া বন্ধুতে পরিণত হইল। কামালের অমানুষিক দৃঢ়তায় সংস্কৃতির স্রোত ফিরিয়া গেল, ভাষার সংস্কার সম্ভব হইল বাস্তবে, বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ হইল, নারীদের যথার্থ মুক্তি সংঘটিত হইল। গাজী তুর্কী নারীকে ফিরাইয়া দিল তাহার দীর্ঘকাল লুপ্ত জাতীয় জীবনে যোগ্য মর্য্যাদা—পুরুষের সহিত সমাধিকার।

ছয় শতাব্দী পরে সুযোগ পাইয়া তুর্কী-নারী আবার তাহার স্থান করিয়া লইল সকল বিভাগে। আজ সমগ্র তুরস্কে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে পুরুষ নারীকে এতকাল অকর্ম্মণ্য বিলাস-উপকরণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারাও আজ নারীর কৃতিত্ব—নারীর সহায়তা পরম নির্ভরতার চক্ষেই দেখিতেছে—অবরোধের গোপনতার কথা বিস্মৃত হইয়া।

আজ তুরস্কের অধিকাংশ শহরে নারী ব্যারিষ্টার, নারী জজ দেখিতে পাওয়া যাইবে। শোনা যায়, অনেকে নারী ব্যারিষ্টারদের মোকদ্দমা পরিচালনা-শক্তির পক্ষপাতী, এমন কি বিদেশীয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত। ব্যবসায়ে, হিসাব রক্ষার ব্যাপারে নারীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিমান চালনায় নারীদের কৃতিত্ব সমগ্র জাতির গৌরবের বিষয়—মাদাম গোক্চেনের নাম আজ সকল তরুণী তুর্কীর মুখে। খেলা-ধূলায়ও তুর্কী-নারী উন্নতির পথেই আগাইয়া চলিয়াছে। ১৯৩৬ সালে য়্যাঙ্গোরা হইতে এথেন্স পর্য্যন্ত মোটর দৌড় প্রতিযোগিতায় তুর্কী-নারীই জয়ী হইয়াছে। বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির গবেষণায়ও তুর্কী-নারী পশ্চাতে পড়িয়া নাই।

নারীদের ঘর-কন্নার কাজ শিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে—যেমন শিক্ষাগার আছে পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুতের কাজ শিখাইবার। মোট কথা, এখন তুর্কী-নারী যে কোন প্রকার শিল্পের শিক্ষায়ই মনোনিবেশ করিতে পারে। তবে শুনিতে পাওয়া যায়, ডাক্তারী ও আইন-ব্যবসায় উহারা যেমন কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে, অন্য শাখায় ততদূর শ্রেষ্ঠত্ব সম্ভব হয় নাই। তবে তাহাও যে সম্ভব হইতে বেশীদিন লাগিবে না, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যাদুকরের স্পর্শ লাগিয়াছে, সেকালের বৃদ্ধাদের গায়ে যাহারা বোরখার দৈর্ঘ্য অর্দ্ধ ইঞ্চি কম হইলে ধর্ম্ম গেল বলিয়া সমগ্র দেশ তোলপাড় করিত। কারণ, তাহারাও অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য হোটেলে অন্য দশ জনের সমক্ষে বসিয়া খানা খায়, ইহাতে সঙ্কোচ বোধ করে না—বা ইসলাম জাহান্নামে যাইবার আশঙ্কা করে না।*

---

* মাদাম বি এফ টেকের তুর্কী-নারী প্রবন্ধ হইতে কোন কোন তথ্য গৃহীত।

পাঁচ বছর পরে

(গল্প)

শ্রী অরুণ সেন

কামাখ্যা পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে দুই বন্ধু—সুধীর আর কমল।

সুধীরের পরণে মিহি ধুতি আর ষ্ট্রাইপ দেওয়া সিল্কের সার্ট, মাথার চুল আমেরিকান ফ্যাশানে পিছন দিকে উল্টান—পায়ে শাদা রঙের আধুনিক চটি। চামড়ার ফিতে থেকে ঝুলছে একপাশে একটা বড় চায়ের ফ্লাস্ক, পীঠে অর্জ্জুনের তূণীরের মত বাঁধা খাবারের ঝুড়ি। বাঁ-হাতে সার্টের আস্তিনের তলায় কব্জীতে একটা প্লাটিনামের 'ডি-লাক্স' ঘড়ি।

কমলের—খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, মাথায় লম্বা চুল এবং চোখে চশমা। উপরন্তু, পাঞ্জাবীর উপর একটা মোটা খদ্দরের চাদর জড়ান—বাঁ-কাঁধের উপর দিয়ে পেছন ঘুরে ডান হাতের নীচ দিয়ে এসে আবার কাঁধের উপর উঠেছে। তার একপাশে ঝুলছে একটী ক্যামেরা, ডানহাতে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ।

সবে রোদ উঠেছে। কিন্তু ওরা তার স্পর্শসুখ থেকে এখনও বঞ্চিত। আশেপাশের বন পেরিয়ে সূর্য্যদেব তাঁর আলোকরশ্মি এখনও ওদের গায়ে ছড়তে পারেন নি—ঘন বনে প্রতিহত ও টুকরা টুকরা হ'য়ে রশ্মিগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এদিকে ওদিকে—পাথরের স্তূপে, গাছের পাতায়, সবুজ ঘাসে আর ব্রহ্মপুত্রের বিস্তৃত জলরাশির উপর।

দুবন্ধু পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছায়। একদিকে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। তারই তলায় একটা বড় সমতল পাথর। ডানদিকের ঘন বন ফুটা ক'রে এক ঝলক রোদ এসে গাছের মাথায় আর নীচের পাথরটার উপর লুটিয়ে প'ড়েছে।

"বাঃ! চমৎকার!" কমল ব'লে ওঠে, "দেখেছ সুধীর? এস এখানে এই পাথরটার উপর একটু ব'সে নেওয়া যাক।"

"তা বৈকি! অমনি খাতা আর কলম খুলে ব'স আর কি!"

কিন্তু দু'এক পা এগিয়েই সুধীর ফিরে আসে, "আচ্ছা বসাই যাক।" ফ্লাস্কের ফিতে খুলতে খুলতে বলে, "একেবারে 'উপবাস ভঙ্গ' পর্ব্বটা এখান থেকেই—"

"এখান!" কমল সুধীরের কথাটা শেষ হ'তে দেয় না।

"কেন—আপত্তি কিসের?"

"না—আপত্তি আর কি—তবে—" কমল ইতস্ততঃ করে।

"তবে একটু কবিত্বে বাধে, এইত?" সুধীর হেসে ওঠে। "আচ্ছা, তাতে কিছু এসে যাবে না কবিত্ব করবার যথেষ্ট সময় ও স্থান পাবে, এখন এস—" বলে সে খাবারের ঝুড়ি খুলে বসে।

দুবন্ধু উপাদেয় খাদ্যসংযোগে প্রচুর পরিমাণে চা গলাধঃকরণ ক'রে আবার পথ চলতে সুরু করে।

(২)

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পাশে গিয়ে যখন দুজন থামে তখন সুধীরের হাতঘড়িতে আট-টা বেজে পাঁচ।

কয়েক মিনিট এদিক ওদিক পায়চারী ক'রে সুধীর বলে, "ওহে, চল আগে আমার সেই পৈতৃক পাণ্ডাঠাকুরটির বাসার খোঁজটা নেওয়া যাক—দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থাটাও ক'রতে হবে—"

কমলের তখন ক্যামেরা খোলা হ'য়ে গেছে। ব্যাগ থেকে ফিল্ম বার ক'রে ক্যামারায় ভরতে ভরতে সে বলে "দাঁড়াও—আগে গোটাকত ছবি তুলে নিই।"

ক্যামেরা ঠিক ক'রে কমল চেয়ে দেখে—তাদের চারদিকে চক্রব্যূহ রচনা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দশ থেকে ষাট বছর বয়সের মালাচন্দনবিভূষিত নানা আকারের একপাল পাণ্ডা। কমল হতাশার দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকায়। সুধীর একটা ছোকরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, সে পঞ্চানন ঠাকুরের বাসা চেনে কিনা।

"পঞ্চু ঠাকুর? উ-দিকে—" ছেলেটি সুধীরের মাথার পাশ দিকে আঙুল ছুড়ে দেখায়।

সুধীর সভয়ে দু'পা স'রে দাঁড়ায়, পকেট থেকে একটা একআনি বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বলে "একটু দাঁড়াও, আমাদের নিয়ে যেতে হবে সেখানে।"

পঞ্চু ঠাকুরের নাম শুনেই পাণ্ডারা স'রে পড়ে। কেবল কতকগুলো নিরীহ গোছের ছেলে যন্ত্রটার দিকে চোখ রেখে কাছে কাছেই ঘুরতে থাকে।

মিনিট পনেরো ধ'রে অনেকগুলো ছবি তুলবার পর কমল বলে, "কই হে! তোমার পৈতৃক ঠাকুরটির আশ্রম কোথায়? এবার যাওয়া যেতে পারে।"

ওদের দুজনকে পেয়ে পঞ্চুঠাকুর খুব খুশী। শশব্যস্তে ওদের অভ্যর্থনা ক'রে বসিয়ে, ওদের উপর তার বংশানুক্রমিক অধিকার প্রমাণ করবার জন্য ঝুলুংগী থেকে কয়েকখানা ছেঁড়া পুঁথি টেনে বার করে।

সুধীর বাধা দেয়—"ওসব আর দেখতে হবে না। আমাদের উপর তোমারই একমাত্র অধিকার এবং তাইতেই তোমার কাছেই আমরা এসেছি।"

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর দুবন্ধু বে'রয়, পাহাড়টা ঘুরে দেখতে। পঞ্চুকে বলে—খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রামের পর মন্দিরগুলো দেখতে যাব এবং তারপর ভুবনেশ্বর।

(৩)

বেলা গোটা তিনেকের সময় দুবন্ধু পঞ্চানন সমভিব্যাহারে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের দিকে রওনা হয়।

পথে যেতে যেতে উৎসাহের আতিশয্যে পঞ্চানন তাদের অনেক কিছু দেখায়। কোথাকার রাজা কোন পুকুর কেটে দিয়েছেন, কোন রাজা তার ঘাট বাঁধিয়েছেন—কুচবিহারের মহারাণী ক'টা সিঁড়ি ক'রে দিয়েছেন—আসামের কোন রাজা কামাখ্যা-দেবীর মন্দিরের চূড়ায় অতগুলি সোনার কলস বসিয়েছেন—

কোন কলসে কতখানি সোনা আছে এবং তার দামই বা কত—এ সব অত্যাবশ্যক খবর তারা জেনে ফেলে পাণ্ডুর কাছ থেকে।

মন্দিরের দোরে গিয়ে তিনজন পৌঁছায়। যাত্রীর ভীড় নেই। যে ক'জন পাণ্ডার ভাগ্যে যাত্রীলাভ ঘটেছে, তারা তাদের নিয়ে মহাব্যস্ত। যাদের ঘটেনি তারা নির্ব্বিকার। কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ গল্প করে বেশ সময় কাটাচ্ছে।

দোরের একপাশে কিছুদূরে একটা গাছের তলায় এক বৃদ্ধা কুমারী-পূজায় রত। তাঁরই পাণ্ডার একটি ছোট মেয়ে—অত্যন্ত নোওরা, একটা পাথরের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে, আর বৃদ্ধা ফুল ফল ইত্যাদি নানা উপচারে তার পূজো করছেন। পূজো শেষে তিনি মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করেন। মেয়েটি—বোধ হয় তার বাবার উপদেশ মতই—মুখে দেবীজনোচিত মৃদু হাসি টেনে এনে নিঃসংকোচে তাঁর মাথায় পা দু'খানা তুলে দেয়।

কমল ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকে। এ যে একটা স্বর্গলাভের উপায় তা সে ভাবতেও পারে না। এই কুমারী-পূজারূপ পুণ্য করে বৃদ্ধাটির যে তাঁর স্বর্গের দোর উন্মুক্ত করতে পেরেছেন, তাঁর নিজের মুখ দেখেও কমলের তা মনে হয় না। অথচ পূজো হয়ত তিনি অন্তরের সঙ্গেই করেছেন।

ভিতরে ঢুকে পণ্ডু একে একে আঙুল দিয়ে দেখায়—'কামাখ্যাদেবী', 'সরস্বতীদেবী' 'মহাদেব' ইত্যাদি। কিন্তু কমল ও সুধীর দেখে প্রত্যেক জায়গায়ই শুধু রাশিকৃত শুকনো এবং টাটকা ফুল আর বেলপাতা। বিস্মিত হয় বটে কিন্তু কোন প্রশ্নই তারা করে না। নিঃশব্দে প্রণাম ক'রে ফিরে আসে। মাঝপথে পণ্ডুর কথামত সুধীর যায় ঘণ্টা বাজাতে আর কমল অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটু ব্যস্তভাবেই বেরিয়ে আসে।

কিন্তু বেরিয়েই দোরের কাছে সে থমকে দাঁড়ায়।

"বীণা!" বিশ্বাস করতে তার মন কিছুতেই চায় না।

"কমলবাবু! আপনি!" সামনেই দাঁড়িয়ে এক সুন্দরী সুবেশা তরুণী—চোখে মুখে তার বিস্ময় ফুটে বেরয়। তার হাত ধরে বছর দশেক বয়সের একটি ছেলে।

কমল কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে সহজ গলায় বলে, "তুমি এখানে?"

তরুণী নতমুখে পায়ের নখে মাটি খুঁটতে খুঁটতে বলে,—"আমি—গৌহাটিতেই থাকি। দু'বছর হ'ল এখানকার এক মেয়ে ইস্কুলে টিচারী নিয়েছি। কিন্তু আপনি—?"

"আমি?" কমল হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে একটু হেসে বলে, "কয়েক বছর থেকে এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরেই প্রায় কাটাই। আজ শিলংয়ের পথে হঠাৎ নেমে পড়েছি আমি আর আমার বন্ধু—"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটে। কমল পেছনের দোরের দিকে তাকায়—সুধীর আসে কিনা। বীণার সঙ্গী ছেলেটি দোরের ফাঁকে উঁকি দেয়।

কমল কি যেন বলতে গিয়ে থেমে পড়ে। বীণার মুখের দিকে চাইতেই দু'জনের চোখাচোখি হয়। কমল মাথা নত করে—বীণার পা জোরে জোরে মাটি খুঁটতে থাকে। কমল সেদিকে চায়, একটু ইতস্ততঃ করে বলে, "তুমি—তোমার—বিয়ে হয়নি?"

বীণা সঙ্কুচিত হয়, বলে "না"। এইটুকু বলতেই যেন সে হাঁপিয়ে পড়ে।

কমল খুশী হয়, মনে মনে হয়ত বা একটু আশান্বিতও হয়। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছরে অনেক অভিজ্ঞতাই সে লাভ করেছে। এই বাস্তব সংসারে কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের স্থান কতটুকু তা সে ভালভাবেই জানে। তাই সে মনোভাব চেপে যায়।

বীণার বাবাকে কমলের মনে পড়ে, বলে—"তোমার বাবা—" কথাটা কিন্তু সে শেষ করতে পারে না।

"বাবা এখন আমার কাছেই থাকেন।"

"ও!" কমল বোঝে—এ শুধু মরীচিকা।

হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে ওঠে—সুধীরের দেরীতে ভারী বিরক্ত হয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে সুধীর বেরিয়ে আসে—কমলের পীঠে একটা মৃদু আঘাত দিয়ে ব'লে ওঠে "বাব্বা! কি ভয়ানক অন্ধকার! শীগ্‌গির চল এখান থেকে।"

হঠাৎ তরুণী আর তার সঙ্গীর দিকে চোখ পড়তেই সুধীর অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। কমলের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে সে একটু অবাক হয় বটে, কিন্তু কোন কথাই বলে না—বন্ধুর একটা হাত ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

(৪)

সন্ধ্যার কিছু আগে দু'বন্ধু ভুবনেশ্বর মন্দিরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমে সূর্য্য তখন গাছপালার নীচে ঢাকা পড়েছে। গৌহাটী শহরের বাড়ীগুলো অস্পষ্ট দেখা যায়—পাশে ব্রহ্মপুত্রের উপর এপারে কতকগুলো নৌকা ও ষ্টীমার বাঁধা—ওপার থেকে একখানা লঞ্চ এপারের দিকে রওনা হয়েছে—উমানন্দের পাশ কাটিয়ে মাঝনদী দিয়ে একখানা যাত্রী ষ্টীমার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে পাণ্ডুর দিকে।

"বাঃ! বিউটিফুল!" সুধীর বলে ওঠে; "দে ত ক্যামেরাটা—ক'টা ছবি তুলে নি।"

কমল নিঃশব্দে ক্যামেরাটা খুলে সুধীরের হাতে দেয়, তারপর নদীর দিকের একটা পাথরের শেষপ্রান্তে গিয়ে বসে।

"তোর হ'ল কি বল ত কমল—"উমানন্দের উপর ফোকাস করতে করতে সুধীর বলে ওঠে, "কামাখ্যা মন্দির থেকে বেরোবার পর থেকেই তুই যেন কেমন হ'য়ে গেছিস।"

কমল নিরুত্তর।

সুধীর বন্ধুর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে বলে—"নাকি ঐ মেয়েটির প্রেমে প'ড়ে গেলি লাভ্ অ্যাট ফার্ষ্ট সাইট'এ?" হো হো করে হেসে ওঠে সুধীর।

ছবি তোলা হলে সুধীর এসে কমলের কাছে বসে, "আচ্ছা কমল, মেয়েটির দিকে অমন করে তাকিয়েছিলি কেনরে? আগে কোথাও দেখেছিলি নাকি?"

"ও কে জান?" কমল বলে।

"না ত—আমি কি করে জানব?"

"ও—বীণা"

"বীণা!" সুধীরের সুরে বিস্ময়,—"সেই যে তোর পিসতুত ভাই না কার বিয়েতে গিয়ে যাকে তুই—"

"হ্যাঁ ভাই—এ সেই বীণা। পাঁচ বছর পর আজ আবার দেখা—" কমল সুদূরের পানে তাকায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ওপারের লোকালয়ে একটি দু'টি ক'রে আলো জ্বলে ওঠে—উমানন্দের মন্দিরে বেজে ওঠে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা—দূরে, বহুদূরের কোন্ ষ্টীমারের সন্ধানী আলো ব্রহ্মপুত্রের জলের উপর প'ড়ে চিক্‌চিক্ করে, আবার মিলিয়ে যায় এবং পরমুহূর্ত্তেই ওপারের গাছপালার উপর প্রতিফলিত হয়।

কমল আনমনে সেদিকে তাকায় একবার জলের দিকে—একবার ওপারের দিকে। মন তার পাঁচ বছর আগের এমনি এক সন্ধ্যায় গিয়ে পৌঁছায়—হৃদয়ের সূক্ষ্ম কোন্ তারে বহুদিনের হারান সুর আজ আবার বেজে ওঠে।

* * * * *

কামাখ্যা পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে নামে সুধীর আর কমল।

শুক্লাচতুর্দ্দশীর উজ্জ্বল জ্যোৎস্না কি যেন রহস্যে ভরা। রাতের নীরব গাম্ভীর্য্য ভেদ ক'রে নাম-না-জানা কি এক পাখী সহসা ডেকে ওঠে—কণ্ঠে তার ব্যথার আভাষ। হেমন্তের মৌনাকাশে নৈশ বায়ুর মৃদু শিহরণ যেন সহানুভূতির শীতল পরশ।

আমেরিকার লাটিন সাধারণতন্ত্র সমূহ

(৩৫ পৃষ্ঠার পর)

বুদ্ধিবলে তিনি প্লেবিসাইট দ্বারা আপন কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কঠোরতায়ও কম যান নাই—বামপন্থী অগণিত বিরোধী দল কারাগারে নিক্ষিপ্ত। শাসন-ব্যাপারে কবির কল্পনা-বিলাস কর্পূরের মতই উবিয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার জাতীয়তার আকর্ষণ পরিস্ফুট হয়, বৈদেশিক শ্বেতাঙ্গগণের জুলুম হইতে স্বদেশবাসীকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার প্রয়াসে।

ডোমিনিকা

ইহার রাজধানী প্রাচীনকাল হইতেই স্যান্টো ডোমিঙ্গো নামে প্রচলিত। কিন্তু নিগ্রোজাতীয় তাম্রবর্ণ প্রেসিডেণ্ট রাফায়েল ট্রুজিলো নিজ নাম অনুসারে রাজধানীর নামকরণ করেন "ট্রুজিলো সিটি"। আপন দল ভিন্ন অন্য রাজনীতিক দলের নির্য্যাতন প্রায় সকল ক্ষুদে রাজ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে সুতরাং এরাজ্যেও সে রেওয়াজে নিন্দা করিবার কিছুই নাই। কারাগারে নিক্ষেপ, বিনাবিচারে প্রাণদণ্ড বা হত্যা—ইহা ত অনেক রাষ্ট্রেরই সভ্যরীতি। সুতরাং পূর্ব্ব-প্রেসিডেণ্ট ট্রুজিলোর পটভূমি হইতে রাজ্য নিয়ন্ত্রণ ও বিরোধীদের দমন স্বার্থ-সংশিলষ্টদের নিকট গর্হিত মনে হইলেও, দেশ ও দশের শান্তির জন্য যে উহা প্রয়োজন, একথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

মেক্সিকো

মেক্সিকোর জাতীয়তাবাদী দল বর্ত্তমানে নানা প্রকারেই সাম্রাজ্যবাদীদের চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছে। তাই জাতীয়তাবাদী নেতা, প্রেসিডেণ্ট লাজারো কার্ডেনাস ইংরেজ আর মার্কিনের চক্ষে বিপ্লবী-দস্যু। কারণ তৈলখনিগুলি বেহাত হওয়ায় ইহারা ক্রুদ্ধ, তদুপরি আবার হ্রাসমূল্যে ঐ তেল জার্ম্মানীর নাজি নেতার নিকট বিক্রয় করায় ইংরেজের গাত্রজ্বালা হইয়াছে দ্বিগুণ। ইতিপূর্ব্বে বৈদেশিক এই সকল তৈলখনির মালিকগণ ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকে ছারখার করিবার প্রয়াসে লিপ্ত হয়—কার্ডেনাসের আমলে সে নিপীড়ন বন্ধ হইয়া যায়। তখন গোপনে ষড়যন্ত্র চলে—বিপ্লবও উস্কাইবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হয়। কার্ডেনাসের কঠোর নিয়ন্ত্রণে তাই বৈদেশিকগণ আর খুশী হইতে পারিবে কি করিয়া। সুতরাং কার্ডেনাস দস্যু—কার্ডেনাস বিপ্লবী—কার্ডেনাস সেনাবলে রাজ্য শাসন করে। কিন্তু কার্ডেনাসের শক্তির মূলে উৎস যে দেশের ট্রেড-ইউনিয়নগুলি—এই সত্য আজি আর গোপন

মুসলিম স্বার্থের দিক হইতে ফেডারেশন

(২৮ পৃষ্ঠার পর)

শক্তিকে দৃঢ় করা হইতেছে। ইহাতে মুসলমানের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই।

আমরা নীতি হিসাবে ফেডারেশনের বিরোধী না হইলেও যে ভিত্তির উপর প্রস্তাবিত ফেডারেশন পরিকল্পিত হইয়াছে তাহার ঘোর বিরোধী। উহার আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে তাহা দেশবাসীর পক্ষে গ্রহণ করা ত কোন ছার, স্পর্শ করাও মহাপাপ বলিয়া আমরা মনে করি। যে ফেডারেশনে কোন ক্ষমতা দেওয়াই হয় নাই, যাহা প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিকে দৃঢ়বদ্ধ করিবে এবং যাহা সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনকে অধিকতর শক্ত করিবে, তাহা ভারতের পক্ষে ত বটেই, মুসলমানের পক্ষেও ক্ষতিকর ও অপমানকর। পরিকল্পিত ফেডারেশনে মুসলিম লীগের প্রাধান্য হইতে পারে, সত্য, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত মুসলিম-স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে না; হইতে পারে না। সেই জন্য মুসলমান সমাজকে আহ্বান করি, আজ ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে মনে-প্রাণে তাহাতে যোগ দিয়া উহাকে অচল করিতে সহায়তা কর। তথাকথিত লীগ প্রাধান্য প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য। এই প্রাধান্য হইতে দিয়া মুসলমান সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিবে না।

সিংহ-শিশুর অনশন

শ্রীঅনুকূল সরকার

মঁশিয়ে আঁদ্রে মারসিয়ার আফ্রিকার বনজঙ্গল হইতে একটি সিংহ-শিশু ধরিয়া আনেন, তাঁহার প্যারিসের ভবনে। সেই সময় ছানাটির বয়স মাত্র দুই মাস ছিল। উহার নাম দেওয়া হয় বাম্বো। মঁশিয়েের একটি গ্রেট ডেন কুকুর ছিল, তাহার নাম কোবে। সিংহ-শিশুটি দুইদিনেই কোবের অন্তরঙ্গ দোস্ত বনিয়া যায়। উহারা একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে খেলিয়া বেড়ায় হুটোপাটি করে। কুকুরটি যেমন শৃঙ্খলিত না হইয়া মুক্ত জীবন যাপন করে, সিংহ-শিশুটিকেও তেমনিভাবে মুক্ত রাখা হয়।

কিছুদিন যায় সিংহ-শিশু আকারে বাড়িতে থাকে। আকারে বৃদ্ধির সঙ্গে উহার হুটোপাটির পরিমাণও মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতে সুরু করে। তখনও এ জানোয়ারটি কুকুর কোবের সমান উচ্চতা পায় নাই, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, উহার বংশাভিজাত্য যাইবে কোথায়? যে রাজরক্ত উহার ধমনীতে টগবগ করিয়া ফোটে, তাহাতে পশুত্ব-প্রতীক উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্দামভাবই যে প্রেরণা দান করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সে মালিক মঁশিয়েের চকচকে আসবাব-পত্রে আঁচড় কাটিয়া, পর্দ্দা-ঝালর ছিঁড়িয়া টুকুরা টুকরা করিয়া পশুরাজের সার্থক বংশধর বলিয়া নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে থাকে। কিন্তু যে দিন মালিকের পরিচ্ছদও পর্দ্দা-ঝালরের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল, সেইদিনই সিংহ শিশুকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল ভিনসেন্স জুতে। সোনালী কেশর-শোভিত গর্ব্বিত-বদন সিংহ-শিশুকে দেখিয়া চিড়িয়াখানার কর্ত্তৃপক্ষ প্রীত হইল অপরিসীম। কিন্তু মুস্কিল হইল রাজবংশধরের খানা লইয়া। উহার সম্মুখে খাবার উপস্থিত করা হইলেই উহার মেজাজ গরম হইয়া উঠে—গোঁ-গোঁ-গর্ শব্দে সে এমন বিরক্তি প্রকাশ করে যে, রক্ষকেরা আর কাছেও ঘেঁসিতে ভরসা পায় না।

প্রথম দিন গেল—সিংহ শিশু কিছুই খাইল না। কেবল মাঝে মাঝে নূতন খাঁচায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোঁ কোঁ করুণ রবে আকুতি জানাইতে লাগিল। কিন্তু সে আকুতির তাৎপর্য্য কেহ ধরিতে পারে না, কেন না, খাবার আনিয়া দিলে সে ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া উঠিতে থাকে। দ্বিতীয় দিনও এইভাবে কাটিল। চিড়িয়াখানা কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তৃতীয় দিন কাটিয়া গেল একই ভাবে। কর্ত্তৃপক্ষ এমন একটি সুদৃশ্য জীবকে অনশনে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। চতুর্থ দিন মালিককে খবর দেওয়া হইল। মালিক আসিয়া বাম্বো নাম ধরিয়া ডাকিলেন, তখনই উহা পোষা বিড়ালের মত কতভাবেই না আনুগত্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু মালিকের প্রদত্ত খাবারও সে গ্রহণ করিল না। সে খাবার হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিল। মালিক যখন খাঁচার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন, সে সময় সিংহ-শিশু লম্ফেঝম্পে আর ককাইয়া কান্নার রোলে একেবারে আকাশ-বাতাস ভরিয়া তুলিল।

যোগেশ্বরী আশ্রমের স্বামী কৃষ্ণানন্দ জীর পোষা সিংহ-শিশু ও কুকুর

কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শে মঁশিয়ে মারসিয়ার এক মতলব স্থির করিলেন—শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার। তাঁহার গ্রেট ডেন কুকুরটি সিংহ-শিশুর ছিল অতিশয় প্রিয়। কথা স্থির হইল কুকুর কোবেকে আনিয়া সঙ্গী করিয়া দিয়া শেষবারকার মত চেষ্টা করা হোক। পঞ্চম দিনে কোবেকে আনিয়া সিংহ শিশুর খাঁচার সম্মুখে হাজির করিলেই সিংহ-শিশু বাম্বোর সে কি অট্টহাসি—যেন খাঁচাটিকে প্রতিধ্বনির আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলে আর কি!

তাড়াতাড়ি কোবেকে বাম্বোর খাঁচায় দেওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে খাবার মাংসের টুকরাগুলো আনিয়া রাখা হইল। দুই বন্ধুতে মিলিয়া পরিতোষ ভোজন করিল। সেই অবধি কোবে সিংহের খাঁচায়ই রহিয়া গেল। তবে এখন আবার মুস্কিল হইয়াছে কোবের খাবার লইয়া। খাবার আসিলেই সিংহ-শিশু

আগেই "সিংহের ভাগ" দখল করে, বন্ধুকে যেন আমল দিতেই চাহে না। সিংহ-শিশু—পশুরাজ তনয় হইলেও দিলদরিয়া ভাব সে ভুলিয়া যায় খাবার আত্মসাৎ করিবার বেলা—তখন সে খাতির রাখে না কাহারও। তাই চিড়িয়াখানা কর্ত্তৃপক্ষ আগে সিংহ শিশুকে পরিতৃপ্ত না করিলে আর কুকুরটিকে খাবার দিতে পারে না। যেভাবে যেমন করিয়াই কুকুরকে খাবার দেওয়া হোক না কেন সিংহ-শিশু তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেই। কোবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে আর সিংহ-শিশু টুকরার পর টুকরা মাংস চিবাইতে থাকে।

আজও সিংহ-শিশু কুকুরটির সমান উঁচু হইতে পারে নাই, কিন্তু ওজনে কুকুরটির চেয়ে অনেক বেশী হইয়া পড়িয়াছে। যদিও সিংহ-শিশু উহার অনশন ব্রত ভঙ্গ করিয়াছে এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবনের স্বাভাবিকতায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথাপি কুকুরটিকে আরও কিছুদিন সিংহ-শিশুর খাঁচায় রাখিতে হবে। সিংহ-শিশু চিড়িয়াখানা-জীবনে একেবারে অভ্যস্ত না হইয়া পড়া পর্য্যন্ত কোবে তাহার সঙ্গী থাকিবে।

খাইবার সময় ছাড়া অন্য সময়ে সিংহ-শিশুকে কুকুরটি অপেক্ষা নিরীহ মনে হয়। অধিকাংশ সময়ে সে খড়ের গাদার উপর ঘুমায় আবার হুটোপাটির বেলায় দুই বন্ধুতে লড়াইয়ের কায়দায় কসরৎ সুরু করে। কুকুরটা অনেক চেষ্টা করিয়াও বন্ধু সিংহ-শিশুকে কুপোকাৎ করিতে পারে না, আর সিংহ-শিশু যখনই কুকুরকে বেশী রকম আক্রোশে রুখিয়া আসে, তখন কুকুরটি লাফাইয়া এড়াইয়া যায়। তবে সহজে সিংহ-শিশু গরম হইয়া উঠে না। বন্ধু কোবে তাহার কানে আলগাভাবে কামলড়াইয়া পিঠে চড়িয়া থুতুনীতে থাবা মারিয়া খেলা করে। দূর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সিংহ-শিশুর পিছনের পায়ের থাবাটিকে লইয়া টানাটানি সুরু করে, শেষে বিরক্ত হইয়া যখন সিংহ-শিশু গরর-গর আওয়াজে উঠিয়া দাঁড়ায় অমনি কুকুর-বন্ধু বেগতিক দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া সরিয়া পড়ে।

কুকুরটি চিড়িয়াখানার অন্য যে কোন জানোয়ারের গর্জ্জনেই সচকিত হয়, কান খাড়া করিয়া শোনে, কিন্তু সিংহ-শিশু সে সব গ্রাহ্য করে না, যেমন গ্রাহ্য করে না দর্শকদের। সে তাহার নির্দ্দিষ্ট জীবন লইয়াই যেন তৃপ্ত—তাই তাহার খাইবার ঘুমাইবার সময় কোন বাধাই মানে না। অপরিচিত আগন্তুকের আগমনও তাহাকে সচকিত করিতে পারে না।

অতি ছোটকাল হইতে মঁশিয়ে মারসিয়ারের প্যারিস-ভবনে লালিত হইয়া দুষমন্-দোস্ত চিনিয়া লইবার সুযোগ পায় নাই। বনে থাকিলে অবশ্য এ বিষয়ে সে সাহায্য পাইত মাতার নিকট হইতে। শিকার বাগাইবার কৌশলও সে শিখিয়া লইত মাতার সঙ্গে থাকিয়া। কিন্তু বন্য মুক্ত জীবনের স্বাদ সে পায় নাই, বলিতে গেলে। এই কারণেই কুকুর কোবের সহিত তাহার বন্ধুত্ব সম্ভব হইয়াছে, নতুবা কোন দিন সে কোবে বেচারীকে খাবার আঁচড়ে আর দন্ত-পঙক্তির আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিত।

চিড়িয়াখানায় আসিয়া রক্ষককে সে আজও চিনিয়া লইতে পারে নাই। তবে তাহার হইতে রোজ রোজ খাবার গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতেছে, সকলের বিশ্বাস সে শীঘ্রই রক্ষককে চিনিয়া লইবে। কিন্তু জানোয়ারটার আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি মালিক মঁশিয়ে মারসিয়ারকে চিনিয়া রাখিবার। তিনি উহার খাঁচার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই, সিংহ-শিশু নানাপ্রকারে আনন্দ জ্ঞাপন করে। তাঁহাকে যে চিনিতে পারিয়াছে উহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় সে সময়। তথাপি এখানে আরও কিছুকাল থাকিলে এবং রক্ষকের হাত হইতে খাবার গ্রহণ করিতে করিতে তাহাকে বন্ধু ভাবিয়া গ্রহণ করিলে তখন আর মালিকের প্রতি তেমন টান থাকিবে কি-না সন্দেহ।

ফরাসী সাহেবটি সিংহ-শিশুর সামান্য দাপটেই ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উহাকে চিড়িয়াখানায় বিদায় করিলেন। কিন্তু ভারতের তপোবনে দুরন্ত ও নিরীহ পশুশাবক একসঙ্গে খেলা করিত। হিংসা উহারা ভুলিয়া যাইত। উহার নিদর্শন আমরা এখনও দেখিতে পাই মাঝে মাঝে। বোম্বে শহরের যোগেশ্বরী আশ্রমে বর্ত্তমানে এই প্রকার সিংহ-শিশু ও কুকুরের মৈত্রীবন্ধন দেখিতে পাওয়া যাইবে। অথচ সেখানে এই দুইটিকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার কোনও হেতু উপস্থিত হয় নাই।

এই যোগেশ্বরী আশ্রমের স্বামী কৃষ্ণানন্দ প্রায় তিন বৎসর-কাল সমগ্র ভারতে পর্য্যটন করেন। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গী থাকে একটি সিংহের বাচ্চা এবং একটি কুকুর। দুইটিই স্বামী-জীর এতটা ভক্ত এবং এমনই অনুগত যে উহাদিগকে শৃংখলাবদ্ধ না করিয়াও স্বামীজী উহাদের লইয়া যত্র-তত্র ভ্রমণ করেন। কখনও কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই। মিউজিয়ামে আবদ্ধ সিংহ-শিশু ও কুকুরের তবু আহারের ব্যাপারে গরমিল দেখা যায়, কিন্তু স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর সিংহ-শাবক ও কুকুরটি কিন্তু খাবার লইয়াও কোন স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে না। স্বামীজীর আদেশ ব্যতীত উহারা আহার করে না। এই সিংহ-শিশু ও কুকুর-শাবকের যে দোস্তালি তাহাই হইল আদর্শ অহিংসব্রতীর বন্ধুত্ব, নতুবা প্যারিসের মিউজিয়ামের সিংহ-শিশু ও কুকুরের যে পরস্পর টান্—তাহাতে এই প্রকার অহিংসার সম্পর্ক কিছুই নাই।

সমাধান

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইয়া এবং স্থানীয় অবস্থা পরিদর্শন ও তদন্ত করিয়া শিবু সর্দ্দারের অভিযোগ সত্য এবং ভূপতির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া হাকিম বাহাদুরের প্রতীতি জন্মিল। তিনি ভূপতিভূষণ চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে শমন জারীর আদেশ দিলেন এবং তিন সপ্তাহ ব্যবধানে বিচারের তারিখ ধার্য্য করিলেন। এ ভিন্ন জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের যোগে পুলিশের ঊর্দ্ধতন অফিসারের নিকটও তিনি একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলেন।

প্রকাণ্ড মোকদ্দমার সৃষ্টি হইল। ভূপতি চক্রবর্ত্তী সস্পেণ্ড হইলেন। সকলে বুঝিল, তাঁহার আর অব্যাহতি নাই।

শিবু ও সুখন রামপুরে ফিরিয়া গেল। দুলালীকে আশুবাবু ও ব্রহ্মময়ী আপাতত যাইতে দিলেন না। (ক্রমশ)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞানের প্রসারে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া বাধা দিবে।

বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডল যে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের দ্বারাই অনুপ্রাণিত—তাহা নহে। সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি ও সহায়ক; উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তাঁহারা বিশিষ্ট একটা গণ্ডীভুক্ত ব্যক্তিদের পোষক। সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগে তাঁহাদের এই মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। গত আগষ্ট মাসে মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাবের আলোচনা যখন হয়, তখন একজন সদস্য নিয়োগনীতি প্রসঙ্গে যে সকল নামের উল্লেখ করিয়াছিলেন উহার মধ্যে মন্ত্রিবিশেষের আত্মীয়বন্ধুর প্রাচুর্য্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল। এই অভ্যাস মন্ত্রিমণ্ডল এখনও ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শাসন-ব্যবস্থার কর্ম্মতৎপরতা ও সততার দিক হইতে ইহা গুরুতর আশঙ্কার কথা। এ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; এ বিষয়ে তাঁহাদের কি বক্তব্য আছে উহা শুনিবার আগ্রহও আমাদের রহিয়াছে।

রাজবন্দীদের মুক্তি-প্রচেষ্টা

ইহার পর রাজবন্দীদের মুক্তির প্রচেষ্টার কথা ধরা যাক। নূতন প্রাদেশিক শাসন প্রবর্ত্তন হইবার পর দেশীয় মন্ত্রিমণ্ডলী যখন শাসনভার গ্রহণ করেন তখন সকলেই আশা করিয়াছিল, এইবারে রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দণ্ডিত ও বিনা বিচারে আবদ্ধ কর্ম্মীরা মুক্তি পাইবে। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী প্রথমে এ বিষয়ে মনঃসংযোগই করেন নাই। উঁহাদের লক্ষপ্রতিপত্তি ও অধিকার যে কারাগারবাসী সহস্র সহস্র নরনারীর ত্যাগ ও নিষ্ঠার দ্বারাই অর্জ্জিত উহা স্মরণ করেন নাই। এই অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে রাজবন্দিগণের মুক্তির জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। আপনাদিগকে বলা প্রয়োজন, এই আন্দোলনের আয়োজন করা সহজ হয় নাই। ১৯৩০ হইতে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত রাজনৈতিক নিপীড়নের ফলে দেশে যে নিরুৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার রূপ আমি দেখিতে পাই ১৯৩৫ সনে মুক্তিলাভ করিয়া। তখন দেশের জনসাধারণ যেন মুহ্যমান। উঁহারা রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের নাম উল্লেখ করিতেই ভীত। এই মনোভাব দূর করিয়া জনসাধারণের পক্ষ হইতে আন্দোলন সুরু করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল কিন্তু ১৯৩৭ সনের এপ্রিল মাস হইতে পূর্ণোদ্যমে এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়।

শুধু এইখানেই আমাদের চেষ্টা ক্ষান্ত

বন্দীদের মধ্যে কোনও প্রভেদ আমরা স্বীকার করি নাই, করিতেও পারি না। আমাদের মত এই যে, স্বাধীনতাসংগ্রামের উন্মাদনার মুখে যাঁহারা সব ভুলিয়া দেশের সেবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরতির পর তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি নিম্মম ও ন্যায়বিরুদ্ধ এই বিশ্বাস হইতেই মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত রাজবন্দী সম্পর্কে আলোচনা করিয়া মুক্তির প্রচেষ্টা করিতে আসিয়াছিলেন। উঁহার ফলে বিনা বিচারে আবদ্ধ রাজবন্দিগণ মুক্তি পাইয়াছেন। কিন্তু দণ্ডিত কর্ম্মীদের সম্বন্ধে মহাত্মাজীর পরামর্শ বর্ত্তমান বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাই এখনও প্রায় আড়াইশত কর্ম্মী কারাগারে বদ্ধ আছেন। আমরা এই সকল কর্ম্মীকে এইটুকু জানাইতে চাই যে, তাঁহাদের জন্য আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। এই কারণেই কংগ্রেসপক্ষ হইতে দুইজন সদস্য রাজবন্দী সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারকে পরামর্শদাতা হিসাবে সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কেহ কেহ এই সহায়তাকে কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমার নিকট এই মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব যে পক্ষ হইতেই আসুক উহাতে বাধা বা আপত্তির সৃষ্টি না করাই দেশসেবী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই ধারণার বশেই আমি বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটিতে যোগ দিতে সম্মত হইয়াছি।

বাংলায় কংগ্রেসমনা মন্ত্রীমণ্ডল গঠন প্রয়োজন

আমাদের সমস্যা বহু, কিন্তু কার্য্যের অবকাশ অল্প। এই সকল সামাজিক রাষ্ট্রীক ও আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া আমরা যে অসামর্থ ও ব্যর্থতা অনুভব করিতেছি, উহার প্রতিকার কি? এই প্রশ্নের উত্তর এক—বাঙ্গলার শাসনভার হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক কংগ্রেসমনা বাঙ্গালীর হাতে আনিতে হইবে। বাঙ্গলাদেশে কংগ্রেসপক্ষীয় মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা, এ বিষয়ে গত কয়েক মাসের মধ্যে এত আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা হইয়াছে যে, উহার সম্বন্ধে আমার নূতন কিছুই বলিবার নাই। তবে সকলকেই আমি একটা কথা স্মরণ রাখিতে বলি—বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলের পরিবর্ত্তন যতই বাঞ্ছনীয় হউক না কেন, উহা এক বা একাধিক ব্যক্তির চেষ্টা, আগ্রহ

অল্পসংখ্যক সদস্যকে প্ররোচিত বা প্রণোদিত করিয়া ক্ষণিকের জয় হয়ত আমাদের হইতে পারে, কিন্তু উহার ফল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা কম; আমাদের আশা ও ইচ্ছানুযায়ী ফল হইবার সম্ভাবনা আরও কম যে মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে নীতি বা কর্ম্মপদ্ধতির ঐক্য নাই এইরূপ মন্ত্রিমণ্ডল স্থাপন করিয়া জনগণের প্রকৃত হিত হইতে পারে না। বাঙ্গলাদেশে যদি সত্য সত্যই নূতন নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

এই চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য সাধন। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বাঙ্গাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হিন্দু মুসলমান সমস্যা। আমাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত হইতে হইবে, বাধায় ভীত হইলে চলিবে না, সাম্প্রদায়িক স্বার্থপ্রসূত আপত্তির প্রাবল্যে নিরস্ত হইলে চলিবে না। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রচার করিতেছেন, বাঙ্গালী হিন্দুরা কখনও স্বার্থত্যাগ করিয়া মুসলমানকে ন্যায্য অধিকার দিতে পারিবে না। আমরা যেন উঁহাদের এই উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন না করি। বাঙ্গলাদেশের দুর্ভাগ্যের বশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যখন একটা বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তখন একটু ত্যাগ স্বীকার করিয়াও আমাদিগকে এই মনান্তরের কারণ দূর করিতে হইবে। শুধু হিন্দু হিসাবে বিচার করিলেও পরিণামে উহার ফল শুভ ভিন্ন অশুভ হইবে বলিয়া মনে করি না।

হিন্দু মুসলমান সমস্যার দুইটি দিক—প্রথম বৈষয়িক, দ্বিতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম্মগত। ইহাদের মধ্যে আগে বৈষয়িক বিরোধের কথাই বলিব।

মুসলমানগণ বলেন, বাঙ্গালী ভদ্রলোক সরকারী চাকুরী আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহারা মুসলমানদিগকে যথোপযুক্ত সুযোগ দিতে অনিচ্ছুক। অতঃপর তাঁহারা বলেন, বাঙ্গলা দেশের মহাজন ও জমিদারগণ প্রধানতঃ হিন্দু এবং ইহাদের দ্বারা দরিদ্র মুসলমানের উৎপীড়ন হইয়া থাকে। এই দুইটি উক্তি সর্ব্বাংশে সত্য কিনা সে বিচার করিবার আবশ্যক দেখি না। তবে সরকারী চাকুরীতে সংখ্যার অনুপাতে

স্বীকৃত ও ইহাও সত্য যে বাঙ্গলার মুসলমানদের অধিকাংশই বিত্তহীন কৃষক এবং ঋণভারে প্রপীড়িত। এই দুইটি উপলক্ষ্য থাকাতে সাম্প্রদায়িক মনান্তর বৃদ্ধির সুযোগ যে ঘটিতেছে,. তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় জাতীয়মনা বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট—যথাশীঘ্র সম্ভব মুসলমানগণের ন্যায্য আর্থিক দাবী পূরণ। এই ধারণার বলেই ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে কংগ্রেসপক্ষের মুখপাত্র হিসাবে আমি প্রস্তাব করি যে, অবিলম্বে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি একত্র হইয়া সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক অনুপাত স্থির করুন। আমার এই প্রস্তাব বাঙ্গলা দেশের নানাস্থানে বিকৃতরূপে প্রচারিত হইয়াছে। সে জন্য আমি উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহার একটু পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করি।

চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক অনুপাত

কেহ কেহ বলিয়াছেন, কংগ্রেসপক্ষ মুসলমানগণকে শতকরা ষাটটি চাকুরী দিবার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন। এই উক্তি সত্য নহে। আমি ব্যবস্থাপক সভায় স্পষ্ট ভাষায় এই কথা বলিয়াছি যে, কংগ্রেসপক্ষ প্রকাশ্য পরীক্ষার দ্বারা পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের সপক্ষে; রাষ্ট্রশাসনের একটা ন্যূনতম আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য এই পরীক্ষা একান্ত আবশ্যক; তবে এই পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক হিন্দুকে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মুসলমানকে ও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীকে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করা হইবে। আমার প্রস্তাবের সহিত মন্ত্রিপক্ষীয় মিঞা আবদুল হাফিজের প্রস্তাবের মূলগত বিরোধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা মিঞা আবদুল হাফিজ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত শতকরা ৬০টি চাকুরীর অনুপাত সমর্থন করি নাই। আমার বিবেচনায় এই সূক্ষ্ম অনুপাতের হিসাব অনাবশ্যক ও নিরর্থক। যে সেন্সাস রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া সরকারী চাকুরীর অনুপাত নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে উহা যে সর্ব্বাংশে যথাযথ নহে এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। সুতরাং উহার উপর নির্ভর না করিয়া সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে হইবে। বাঙ্গলা দেশে যখন স্থূল হিসাবে হিন্দু ও মুসলমানের সাম্য রহিয়াছে, তখন দুই পক্ষেরই সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উপর সমান দাবী থাকা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, স্মরণ রাখা আবশ্যক, আমরা শাসন ব্যবস্থার আদর্শকে অবনত করিবার সমর্থন কোনওক্রমে করি নাই। যদি পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার দ্বারা চাকুরী প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করা হয় এবং যদি উত্তীর্ণ প্রার্থী ভিন্ন অন্য কাহাকেও সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত না করা হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র মুসলমান নিয়োগের দ্বারা শাসন ব্যবস্থার ক্ষতি হইবে, এই বিশ্বাস আমি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া জ্ঞান করি।

তবে ইহা সত্য যে, আমরা যোগ্য মুসলমানগণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় সরকারী চাকুরী দিবার সমর্থন করি। ইহাতে যদি কোনও হিন্দুর আপত্তি হয় তবে তাঁহাদিগকে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত বলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটা বড় কথা মনে রাখা আবশ্যক। কথাটা এই যে, কেবলমাত্র সরকারী চাকুরী হইতে ভদ্র বাঙ্গালীর জীবিকা সমস্যার সমাধান হইবার নয়। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, জীবিকা সমস্যা মধ্যবিত্ত হিন্দুর পক্ষে যেরূপ নিদারুণ মধ্যবিত্ত মুসলমানের পক্ষেও উহার অপেক্ষা কম নহে। সুতরাং মুসলমানকে বঞ্চিত করিয়া হিন্দুর চাকুরীর ব্যবস্থা করা বা হিন্দুকে বঞ্চিত করিয়া মুসলমানের চাকুরীর ব্যবস্থা করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না, শোভনও হইবে না। ইহার সহজতম প্রতিকার হইতে পারে এক উপায়ে—গবর্ণমেণ্ট যদি হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর জন্য পর্য্যাপ্ত চাকুরীর সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু তাহা যখন কোনক্রমেই সম্ভব নহে, তখন সকল বাঙ্গালীকেই জীবিকার অন্য পথও আবিষ্কার করিতে হইবে। এই কথাটা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ভদ্র বাঙ্গালী বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। আমার নিকট ইহাই আশ্চর্য্য ঠেকে যে, সরকারী চাকুরীর মোহ বাঙ্গালী একদিন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, আজ আবার ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সেই মোহকেই ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহা পৌরুষের কথা নয়, গর্ব্বের কথাও নয়।

আর্থিক সুযোগ সুবিধার তারতম্য

জমিদার বা মহাজনের উৎপীড়নকেও চিরস্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ বলিয়া মনে করিবার হেতু দেখি না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যেমন, তেমনই বাঙ্গলা দেশেও জমিদার এবং মহাজন হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। হয়ত বা বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে হিন্দু জমিদার ও হিন্দু মহাজনের সংখ্যা অধিক। কিন্তু সেজন্য মুসলমানগণ হিন্দুমাত্রকেই বিদ্বেষ করিয়া জাতীয়তাবিরোধী হইতে যাইবেন কেন? জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাধারণ ভারতবাসীর কল্যাণসাধন কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য একমাত্র কাম্য। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে যদি কোন দিন ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে, ভূস্বামী ও কৃষিজীবীর মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহা হইলে কংগ্রেস যে নিরন্ন ও উৎপীড়িতের পক্ষই অবলম্বন করিবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিশ্বাসের প্রমাণ কংগ্রেস অতীতে বহুবার দিয়াছে, ভবিষ্যতেও দিবে।

সুতরাং আমার মনে হয়, যদি আর্থিক সুযোগ সুবিধার তারতম্যই হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যের একমাত্র বা প্রধান কারণ হয় তা হইলে কংগ্রেসের মধ্যে মিলিত হইয়া এই অনৈক্য দূর করা কিছুমাত্র দুরূহ নয়। ইহাও আমার বিশ্বাস, যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের ন্যায্য আর্থিক দাবী পূরণ করা হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র ধর্ম্ম বা সংস্কৃতিগত কারণে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ থাকিবে না। বাঙ্গলার পল্লী-অঞ্চলে সন্ধান লইলে হিন্দু সাধারণ ও মুসলমান সাধারণের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্যই লক্ষিত হয়। বস্তুত উহারা একই লৌকিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী এবং একই আবেষ্টনীতে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত। প্রাগ বৃটিশ যুগের বাঙ্গালী সভ্যতা বিশুদ্ধ হিন্দুধারাও নয়, বিশুদ্ধ ইসলামী ধারাও নয়, উহাদের সংমিশ্রণে গঠিত মিলিত ধারা। এই ধারার প্রভাব এখনও বাঙ্গালীর পল্লীজীবনে অব্যাহত রহিয়াছে, কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা সাম্প্রদায়িক চেতনা উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও উহা মূলতঃ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আমাদিগকে আবার সেই উদারতার কথা স্মরণ করিতে হইবে, সেই উদার ধারাকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইহার ভিতর দিয়াই নূতন বাঙ্গালী-জাতির সৃষ্টি হইয়া আমাদের নবজীবনের সূত্রপাত হইবে।

এই নবজীবন সৃষ্টির জন্য আমি হিন্দু যুবক ও মুসলমান যুবকদিগকে আহ্বান করিতেছি। ইহাদের নিকট হইতে আমার বহু আশা। ইহাদিগকে এখনও স্বার্থবোধ সংকীর্ণ করিতে পারে নাই, সংশয় দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। তাহাদের আদর্শপরায়ণতার সহিত যদি সংহতি ও সংযম যুক্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। যুবকগণ একাগ্র সাধনার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করিবেন তাঁহাদের নিকট এই আমার অনুরোধ। ইহাদের তপস্যালব্ধ শক্তির দ্বারা, ইহাদের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার দ্বারা আপনাদের বর্ত্তমানের সকল কালিমা দূর হইবে। নূতন জীবনের সূত্রপাত হইবে ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

বন্দে মাতরম্"

[illegible] মহারাজ দিব্য

ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

দিব্য-স্মৃতি উৎসবের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের মূল সভাপতি ডাঃ রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুরের অভিভাষণ-

পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতিগণ রামচরিত অবলম্বন করিয়া মহীপাল (২য়), রামপাল, দিব্য, রুদোক ও ভীম প্রভৃতি রাজন্যের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনার ফলে কয়েকটি সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য মতদ্বৈধ নাই। প্রথমতঃ, মহীপাল (২য়) প্রজাপীড়ক ও ভ্রাতাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ছিলেন এবং অনন্ত চক্রের সামন্ত রাজগণকে নানারূপ অসম্মান এবং করবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণের দ্বারা ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাকে কেহ কেহ 'কৈবর্ত্তবিদ্রোহ' নামে অভিহিত করিলেও, সেই সময়ের ইতিহাস হইতে জানা যায়, উহা প্রজা ও সামন্তচক্রের বিদ্রোহ। দ্বিতীয়তঃ, মহীপালের সহিত এই অনন্ত চক্রের সামন্তগণের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে পাল রাজসভার প্রধানতম সচিব দিব্য প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিয়া মহীপালের নিধনের সহায় হইয়াছিলেন। রামচরিতে এই উপলক্ষে শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহাকে 'উপাধিব্রতী' অর্থাৎ 'ভণ্ড' 'কপটাচারী' রূপে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল সংস্কৃত শব্দ দ্ব্যর্থবোধক এবং ইহার অন্য অর্থও হইতে পারে তাহা তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দিব্য রাজ্যলোলুপ ছিলেন না; কিন্তু মহীপালের মৃত্যুর পর সামন্ত ও প্রজাপুঞ্জ তাঁহার প্রখরবুদ্ধি, কার্য্যদক্ষতা, চরিত্রসংযম প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। দিব্যের মৃত্যুর পর কিছুকাল হয়ত রুদোক এবং তৎপরে নিশ্চিতরূপে ভীম অনুমান ১০৮০-১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

দিব্য, রুদোক ও ভীম এই মাহিষ্য বীরত্রয়ের গুণ-গরিমা বিপক্ষ কবি লিখিত রামচরিতেও ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং কবির পক্ষে শত্রুপক্ষের গুণকীর্ত্তন সরল ও নিরপেক্ষ সত্যবাদিতার পরিচায়ক। ইহাতে লিখিত আছে যে, ভীম ও তাঁহার পিতা এবং পিতৃব্য কেবল চরিত্রবান্ ও লক্ষ্মীবন্ত ছিলেন না—তাঁহারা লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের বরপুত্র ছিলেন। এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, তাঁহারা শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের পরে কনৌজিয়া ঠাকুরগণের অনুশাসন হেতু ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সমুদয় সুযোগ রহিত হইয়াছিল। আমরা প্রাচীন কাব্য ও উপাখ্যানসমূহে সমাজের উদারতার বহুল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। তখন জাতিভেদের এরূপ কড়াকড়ি ছিল না। ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর ব্রাহ্মণদিগের চতুষ্পাঠীতে নানারূপ শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন এবং অধ্যাপক শিরোমণি ময়মনসিংহবাসী গর্গ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে চণ্ডালগৃহপালিত কঙ্ক নামক একটি বালকের শাস্ত্রাধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন (ষোড়শ শতাব্দী); অথচ সেদিন পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকের প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হয় নাই। এই বঙ্গ-সমাজেও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে অনুলোম প্রতিলোম দ্বিবিধ বিবাহ প্রচলিত ছিল। রাজদ্বারে কেবল যে উচ্চবর্ণের লোকেরা সম্মানিত হইতেন তাহা নহে, কহ্লণের কাশ্মীরের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, চণ্ডাল-জাতীয় সূর্য্য নামক এক স্থপতি একাদশ শতাব্দীতে রাজসভায় বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ঢাকা জেলার ভাওয়াল অঞ্চলে প্রসন্ন ও প্রতাপ নামক দুই চণ্ডাল ভ্রাতা একটি বৃহৎ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভগিনী মঘার কীর্ত্তি চিহ্ন সেই অঞ্চলে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যে সকল উপাখ্যান দেশময় প্রচলিত আছে, তাহাতে জানা যায়, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের রাজসভা বর্জ্জন করেন নাই। আলোচ্য বীরত্রয়ের শাস্ত্রজ্ঞান, রাজোচিত মর্য্যাদা এবং সুশাসন প্রায় নয়শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব বর্ণ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা রামচরিতে ও তাহার ভাষ্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

আমরা দেখিতে পাই, সামন্ত ও প্রজাগণ দ্বারা দিব্য বংশীয়গণ যে বিশাল ভূখণ্ডে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা অনুমান ১২০২৫ বর্গমাইল পরিমিত; তাহার পশ্চিম গঙ্গা এবং পশ্চিম-উত্তর মহানন্দা দ্বারা সুরক্ষিত। এই দুই প্রবল স্রোতস্বিনীর আশ্রয়ে রাজারা নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন; এইজন্য তথায় অধিক সংখ্যক দুর্গ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই। কেবল দিনাজপুর জেলার পশ্চিমে বাঙ্গলার গড় নামক দুর্গদ্বয় দৃষ্ট হয়। এই দুইটি পরস্পর হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বোধ হয় গঙ্গাকে দুরধিগম্য মনে করিয়া ভীম তাহার তীরে কোন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন নাই। রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় এক সরল রেখায় ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত। 'ভীমের চুল্লী' ইহার দক্ষিণ প্রান্ত। ইহা একটি প্রান্তিক দুর্গ। এই প্রান্ত কেবল দুর্গ নহে একটি প্রকাণ্ড বিল দ্বারা সুরক্ষিত; বিলের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধ মাইলব্যাপী স্থান প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ। লৌকিক প্রবাদে এই সব কীর্ত্তি ভীমের সহিত বিজড়িত। ভীমের রাজ্যের উত্তর সীমায় লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের তীরে ধুবড়ী; এইস্থান আসামের গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় বিশালতোয় নদের দ্বারা রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও ভীমের সতর্ক দৃষ্টি যে এদিকেও ছিল তাহার পরিচয় আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার ১৫-১৬ মাইল দূরে, কোন কোন স্থানে, প্রায় নদটিকে ঘেঁসিয়া, ব্যাপকভাবে ভীমের জাঙ্গাল রহিয়াছে। এই জাঙ্গাল বা উচ্চ বৃহৎ রাজপথ আমরা প্রায় সমগ্রভাবে দেখিতে পাইতেছি; কোন কোন স্থানে করতোয়া এবং ত্রিস্রোতা দ্বারা ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই জাঙ্গালের অতি সন্নিকটে, ব্রহ্মপুত্র হইতে প্রায় ২০ মাইল পশ্চিমে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থান, কেহ কেহ বলেন, পালরাজগণের প্রাচীন রাজধানী বরেন্দ্রীর এই মহাতীর্থাঙ্গনেই দিব্য স্বীয় রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই রাজ্যে এখনও ৮টি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়ঃ—(১) ভীমের চুল্লী, (২) মহাস্থান গড় (৩) শালদহ, (৪) বিরাট, (৫) উলিপুর, (৬) ভীমের গড়, (৭) (৮) বাঙ্গলার গড়দ্বয়। এতদ্ব্যতীত আরও যে কত দুর্গ ছিল বা ভগ্নদুর্গের চিহ্ন আছে, তাহা কে বলিবে? নব-অর্জ্জিত রাজ্যরক্ষার জন্য ভীম চেষ্টার কোন ত্রুটী করেন নাই। মহাস্থান হইতে ৩-৪ মাইল দক্ষিণে হরিপুর। লোকে বলিয়া থাকে ভীমের যে সেনাপতি ও সুহৃদ হরি পরাজিত ভীমের জন্য আরণ্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক রামপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারই স্মৃতি বহন করিতেছে। মহাস্থান হইতে ১০ মাইল ব্যবধানে রুদাইপুর; এস্থানেও প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। ভীমের পিতা রুদোকের নামে এই নগরী পরিচিত। শালদহ গড়ে লোকে ভীম রাজার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে। ইহার উত্তরস্থ বিরাট নামক স্থানকে লোকে ভীম রাজার আদি বাসস্থান বলিয়া থাকে; এইস্থানে বৈশাখের প্রতি রবিবারে এক মেলা বসে। খননকালে প্রোথিত অট্টালিকার একাংশ দৃষ্ট হয়। এই মেলার বৈশিষ্ট্য এই যে, এইস্থানে আমিষাহারের রীতি নাই। ব্রহ্মপুত্র হইতে প্রায় ২০ মাইল পশ্চিমে, ভীমের জাঙ্গালের ৪-৫ মাইল দূরে, পীরগঞ্জ থানায় ভীমসহর। এস্থানে বহু ধ্বংসাবশেষ আছে। বদরগঞ্জ থানা হইতে ৭ মাইল দূরে শিবপুর গ্রামে ৫৩৮৭ একর পরিমিত মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত স্থানকে লোকে 'ভীমের গড়' বলে। ইহা হইতে ৮-১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পার্ব্বতীপুরের নিকট একখণ্ড প্রস্তর ভীমরাজার লাঙ্গল নামে অভিহিত। ইহা ভীমের কোন জয় বা স্মারক স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ হইতে পারে। হিলির নিকট এক ভীমপুর গ্রাম ও জাঙ্গাল আছে। মহাদেবপুর থানার সিদ্ধিপুর গ্রামে ৫০ একর পরিমিত এক দীঘিকে লোক ভীমসাগর নামে অভিহিত করে। ইহার তীরস্থ চামুণ্ডামণ্ডপ ও জাঙ্গাল ভীমের স্মৃতি বহন করিতেছে। পুনর্ভবা ও আত্রেয়ী হইতে ১৪ মাইল দূরে দিনাজপুর জেলায় দিবর মৌজায় অর্দ্ধ মাইলের অধিক বিস্তৃত দিবর দীঘি নামে এক জলাশয় আছে। উহার মধ্যে রাজা দিব্যের প্রস্তর-নির্ম্মিত জয়স্তম্ভ প্রোথিত আছে। নিয়ামতপুর থানার নন্দীগ্রামে ভীমের গোয়াল বলিয়া অভিহিত ভীমের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষপূর্ণ একটি স্থান আছে।

এই স্থানে 'ভীমের বাটুল' নামক ২ হাত উচ্চ ও ৭ হাত পরিধি বিশিষ্ট একটি প্রস্তর আছে। ইহা ব্যতীত ভীমপুরা ভীমপুর বাছুরাইল নামক স্থানে ভীমের কীর্ত্তিচিহ্ন অল্প বিস্তর পরিমাণে অদ্যাবধি বিদ্যমান।

আমরা এইস্থানে দুইটি স্থানের উল্লেখ করিতে বিরত ছিলাম। তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব: ইহার একটি হরগৌরী। এইস্থানে ভীম হরগৌরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া লোকপ্রবাদ। দুই শত আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বীরেশ্বর ব্রহ্মচারী নামক এক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক এখান হইতে হরগৌরী ও জয়দুর্গার প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন মন্দিরটি এখন স্তূপে পরিণত। সন্ন্যাসিপ্রবর লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক স্তূপের উপর নূতন মন্দির রচনা করিয়া এই দুই বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং দেব-সেবার জন্য দেবোত্তরের ব্যবস্থা হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে উমা মহেশ্বরের আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্ত্তিতে যে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয় এই মূর্ত্তিতে তাহার সাদৃশ্য আছে। ইহার অলঙ্কার বাহুল্য দেখিয়া মনে হয় এই মূর্ত্তি একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। বিশেষতঃ যখন ব্যাপকভাবে লোকের সংস্কার যে বিগ্রহদ্বয় ভীম রাজার স্থাপিত তখন অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। মূর্ত্তির পাদপীঠ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জয়দুর্গার একটি সহচরীর দেবীমূর্ত্তি অন্তর্হিত, কেবল তাঁহার পদদ্বয় রহিয়াছে। কি সূত্রে এই মন্দির ভগ্ন হইয়াছে এবং দেবমূর্ত্তি কতকাংশে বিকৃত করা হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণের কোন উপায় নাই। আমরা শুধু মূর্ত্তিপূজার বিরোধীদিগের প্রতি এইরূপ কার্য্য আরোপ করিয়া থাকি; কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক এবং জাতিগত কলহের ফলে যে সময়ে সময়ে দেবতাদেরও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার উদাহরণ ইতিহাসে আছে। হয়ত এই ভগ্ন স্তূপ খনন করিলে কোনরূপ শিলালিপি পাওয়া অসম্ভব হইবে না। এই রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে রোহনপুর ষ্টেশনের কিছুদূরে মালদহ জেলায় সুখড়ুবা বিলের পার্শ্বে শ্মশান ক্ষেত্রের দিকে মুখ করিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত ১২ ফিট উচ্চ প্রকাণ্ড এক দীপাধার আছে। উপরিস্থ বৃহৎ প্রদীপে প্রায় একমণ তৈলের বাতি জ্বলিতে পারে। দীপশিখা শ্মশানের দিকে উন্মুক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় শ্মশানে যে কালীমূর্ত্তি আছেন, দীপের লক্ষ্য সে দিকে নহে—শ্মশানের দিকে। ইহাকে লোক 'ভীমের বাতি' বলে। ইহা কি ভীমের চিতার পরিচায়ক? এতদ্ব্যতীত আমরা এই দীপের অন্য কোন ব্যাখ্যা করিতে পারিতেছি না।

রাজ্যের উত্তর সীমানায় কুচবিহার। এখানেও যে বরেন্দ্রাধিপতি ভীমের সতর্ক দৃষ্টি ও মনোযোগ ছিল, তাহার পরিচয়, প্রায়-অবিচ্ছিন্ন ভীমের জাঙ্গাল। এই জাঙ্গাল পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, করতোয়া, ত্রিস্রোতা ও কতিপয় ক্ষুদ্র নদ-নদীদ্বারা বিভক্ত। এইদিকে দুর্গের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। বাঙ্গলার গড়দ্বয়, ভীমের গড়, উলিপুর গড় প্রভৃতি দুর্গদ্বারা জাঙ্গালের পথ নিরাপদ করার চেষ্টা হইয়াছে—তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্ত রক্ষা করিবার জন্য ভীমের যে উৎকণ্ঠা প্রমাণিত হয়, পশ্চিমদিকে তাদৃশ নহে। মহানন্দার বিশেষ গঙ্গার ভরসায়, তিনি কতকটা নিরুদ্বেগ ছিলেন; কিন্তু এক চক্ষু হরিণ তাহার অন্য চক্ষুটার দিকে সতর্ক না থাকাতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, ভীমের রাজ্যেও সেইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। এ দিক হইতে নৌ-সৈন্যের বহর ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহার রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে ছিল। অঙ্গাধিপতি মহন ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজ এই দিক দিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। মানচিত্র লক্ষ্য করিলে রামপালের সহায়ক নৃপতিগণের অবস্থিতি পরিস্ফুট হয়। ইঁহারা পশ্চিমের দেশ হইতে আগত—বরেন্দ্রভূমির কেহ নহেন। আমরা দেখিতে পাই মহানন্দার পশ্চিমে সঙ্কটগ্রাম নামক এক বৃহৎ ভূ-খণ্ড; তাহার দক্ষিণে কয়ঙ্গল; এবং তাহার পশ্চিম-দক্ষিণে কুজবটী ও উচ্ছাল তৈলকম্প; আরও দক্ষিণে ঢেক্করী (ঢাকুর) তাহার দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি, কোটাটবী, পশ্চিমে মগধ, পীঠি-কৌশাম্বী। সুতরাং দেখা যাইতেছে মহাস্থান গড়, যাহাতে সম্ভবতঃ ভীম রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে বহু দুর্গ ও সৈন্য সমাবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই রাজধানীর সুদূরে পশ্চিমে, শত্রুপক্ষ হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বোধ হয় সেদিকে ভীমের তত খেয়াল ছিল না। গঙ্গা বা মহানন্দা তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এই সকল রাজা বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ছিল না। এককালে যদিও ইহা পালসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল কিন্তু মহীপালের নির্বুদ্ধিতা তাহাদিগকে পর করিয়া দিয়াছিল।

ভীমরাজের রাজ্য বর্ত্তমানকালের দিনাজপুর, বগুড়া, মালদহ, রাজসাহী, পাবনা, রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার ও গোয়ালপাড়ার কিয়দংশ সম্মিলিত হইয়াছিল। এই সুরম্য প্রদেশটিতে, মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, করতোয়া, যমুনা, ত্রিস্রোতা, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদী সম্মিলিত। রামচরিতে লিখিত আছে, রামপাল যখন বরেন্দ্রী অধিকার করেন অর্থাৎ ভীমরাজার রাজত্বকালে এই প্রদেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া লক্ষ্মীর পরমকৃপালাঞ্ছিত রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল।

বৌদ্ধগণের সমস্ত কীর্ত্তি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি শেষদিকের পালরাজগণের চেষ্টায় ও কতক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে, দিব্য, রুদোক ও ভীমের কীর্ত্তি-কলাপ বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত গ্রন্থের আড়ালে সমস্ত বৌদ্ধ ইতিহাস লুকাইয়া মরিয়াছে। যেখানে যেখানে বৌদ্ধ কীর্ত্তি সেইখানে সেইখানে পঞ্চপাণ্ডব এবং পৌরাণিক রাজগণ স্বীয় ছাপ মারিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। ঢাকা জেলায় রাজা হরিশ্চন্দ্রকে আমরা পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র মনে করিতাম; কিন্তু শিলা-লিপি বলে জানা গিয়াছে তিনি বৌদ্ধ নৃপতি ছিলেন। এইভাবে কোন স্থানে বা অশোকস্তম্ভ ভীমের লাঠিরূপে শ্রদ্ধাবনমিত দর্শকগণের ভক্তির বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং দিব্যাদি রাজগণের কীর্ত্তি পৌরাণিক যুগের ছাপ লইয়া যে এখনকার লোকের দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া দিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু মুস্কিলের বিষয় এই যে, কেবল ভীম নহে রুদোক ও দিব্যের নামও লৌকিক সংস্কারে রহিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ১৭০২৫ বর্গ মাইলের মধ্যে কয়েক বৎসরের রাজত্বেই এই রাজগণ যে বিপুল কীর্ত্তিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, বহু বৎসরব্যাপী পুরুষানুক্রমে রাজ্যভোগের পরও অপর কাহাকেও এতাদৃশ কীর্ত্তির অংশভাগী হইতে দেখা যায় না।

এই সকল কীর্ত্তিরাজি সম্পর্কে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। কোনস্থানে বিস্তৃতভাবে খননকার্য্য গভর্ণমেন্টের ব্যয়ে সহজ ও স্বাভাবিক হয়; কিন্তু আমাদের পক্ষে সরকার এ বিষয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন। কমিশনার ফ্রেঞ্চ সাহেব দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, মিশরের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নানাদেশের লোক কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন কিন্তু মহাস্থান গড়ের নিকটস্থ স্তূপগুলি খনন করিলে তাহার ফল অতীব বিস্ময়কর হইতে পারিবে। কিন্তু যে অর্থ মিশরের জন্য ব্যয়িত হইতেছে তাহার শতাংশের একাংশও এই দিকে ব্যয় করিতে কেহ প্রস্তুত নহেন। আর একটি কথা এই যে, আমরা সমস্ত বিষয়েই সরকারকে অভিযুক্ত করিয়া দায়মুক্ত হইতে চেষ্টা করি। যেন দোষগ্রাহিতাতেই আমাদের দায় শেষ হইয়া যায়। বাঙ্গালী মাত্রেরই এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু মাহিষ্য জাতির সংখ্যা ২৪ লক্ষ। গড়ে চারি আনা করিয়া চাঁদা দিলেও ছয় লক্ষ টাকা হইতে পারে। মাহিষ্য জাতি সেই সঙ্ঘশক্তি অর্জ্জন করুন। তাঁহাদের ইতিহাসের গৌরবান্বিত অধ্যায় লুপ্ত হইলে তাঁহারাও হীন হইয়া পড়িবেন এবং বাঙ্গালী জাতিরও মাথা হেঁট হইবে। আমি ভীমের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে সকল পল্লী, নগরী, দুর্গ ও রাজপথের উল্লেখ করিলাম সেই সীমানার মধ্যে যত কিছু প্রস্তর, ইষ্টক, শিলালিপি ও অপরাপর

কীর্ত্তি আছে যুবকগণ তৎপ্রসঙ্গে অনুসন্ধিৎসু হইয়া অবহিত হউন। কেবল রামচরিতের কয়েকখানা পাতা নিংড়াইয়া যাহা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতিগণ দেখাইয়াছেন এবং পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বহুশ্রমে সে বিষয়ে আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। এখন আবশ্যক কয়েকজন যুবকের ঐকান্তিক অনুরাগ ও খেয়াল—যাঁহারা স্বজাতি ও স্বদেশবাসীকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া দাঁড়াইবেন।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা মনে হইতেছে। অনেকেই বলিয়া থাকেন 'মাৎস্যন্যায়ে' যখন প্রজারা নিপীড়িত হইয়াছিল তখন তাহারা গোপালকে রাজারূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল এবং সংকটাপন্ন এক পরিস্থিতির সময় দিব্য প্রজা ও সামন্তপুঞ্জ দ্বারা রাজাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; ভারতের ইতিহাসে এরূপ গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিরল। দুঃখের বিষয়, আমরা যে কয়েকখানা শিলালিপি লইয়া নাড়াচাড়া করি, তাহার বাহিরে যে ইতিহাস ছিল এ কথা স্বীকার করিতে সংকোচ বোধ করি। বঙ্গদেশের সীমান্তে যে দুই তিনটি স্বাধীন রাজ্যের ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে, আমাদের ঐতিহাসিকগণ সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। প্রথমতঃ, ত্রিপুরার ইতিহাস বা রাজমালা। ইহার প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে যে পৌরাণিক আখ্যান চলিয়াছে তাহা বিশ্বাস্য নহে। কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি সমসাময়িক লেখকগণ দ্বারা বিরচিত। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর ত্রিপুরী ভাষায় লিখিত পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস অবলম্বন করিয়া কতকগুলি অর্দ্ধৈতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন; এইরূপ ১৪৪৮—১৪৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তবাগীশ নামক রাজপণ্ডিতও কিছু কিছু রচনা করেন। তৎপরের ইতিহাস প্রত্যক্ষদর্শীদিগের লেখা; ধর্ম্মভীরু প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ জ্ঞানতঃ কোন মিথ্যা বা অতিভাষণ করেন নাই, আমাদের বিশ্বাস। এই ইতিহাসে দেখা যায় ১৩১ সংখ্যক রাজা সাধু রায়কে প্রজারা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। "সর্ব্বলোকে রাজা হইয়া তারে রাজা কৈল।" (যুঝার খণ্ড) ১০৬৩ খৃঃ অব্দে মহারাজ ধন্য মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্ম মাণিক্যের পুত্র প্রতাপ মাণিক্যকে প্রজারা হত্যা করিয়াছিল। "প্রতাপের কনিষ্ঠ পুত্রে লোকে রাজা করে। অধার্ম্মিক দেখিয়া তারে লোকে মারে পরে॥" (রত্ন মাণিক্য খণ্ড)। রাজা ইন্দ্র মাণিক্যের মাতার প্রিয় এক ব্রাহ্মণ আড়াই বৎসর রাজত্ব করেন। প্রজারা তাঁহাকে হত্যা করে (১৫২৮ খৃঃ)। জয়মাণিক্যকে উত্তেজিত সৈন্যেরা বধ করিয়া অমর মাণিক্যকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল (১৫৯৭ খৃঃ)। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার প্রজারা কল্যাণ মাণিক্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। "রাজপুত্র পৌত্র নাই, নাহি রাজভ্রাতা। কাহাকে করিব রাজ জানিয়া সর্ব্বথা॥ সেনাপতি, মন্ত্রিগণ, চিন্তিত তখন। কাহাকে করিব রাজা না দেখি লক্ষণ॥ মহামাণিক্য বংশে কল্যাণ নাম খ্যাতি। যশোধর কালে কৈলা গড়ে সেনাপতি॥ করেছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান। রাজযোগ্য হয় সেই দেখি বিদ্যমান।। এ সব চিন্তিয়া তবে পাত্র মিত্রগণ। কল্যাণ নামে সেনাপতি বৈসে সিংহাসন॥" (কল্যাণ খণ্ড)। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ইতিহাসে, কাছাড় ও সিলেটের ইতিহাসেও আমরা রাজ নির্ব্বাচনের পরিচয় পাইতেছি। প্রত্যেক প্রদেশেরই ইতিহাস ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী শত্রুপক্ষ তাহা বিনষ্ট করিয়াছে। গৌড়কে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের নাম সংশ্রব হেতু দিব্যবংশের ইতিহাস কিছু পাইয়াছি। সে যুগে ধর্ম্ম ভিন্ন লৌকিক ইতিহাসের প্রয়োজন লোকে আবশ্যক মনে করিত না। আমার বিশ্বাস, এইরূপ গণতন্ত্রমূলক রাজনির্ব্বাচন তৎকালে প্রথা স্বরূপ ছিল। কেবল যখন ধন্য মাণিক্য, সমুদ্রগুপ্ত, দেবপাল প্রভৃতির ন্যায় কোন দুর্দ্ধর্ষ রাজা স্বীয় অখণ্ড প্রতাপ জাহির করিতেন, তখন গণশক্তি সময়ে সময়ে তাঁহাদের নিকট মস্তক নত করিত।

অদ্য আমরা যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছি তাহার একদিকে জগদ্দল মঠের ধ্বংসস্মৃতি— রামচরিতে যাহার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, যে স্থানে রাত্রিকালে প্রদীপ মালা প্রজ্বলিত হইলে পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎভূভাগ সূর্য্যালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; অন্যদিকে বিপুলবিশ্রুতকীর্ত্তি মহাস্থান। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রজাকুলের ক্লেশে বিগলিতচিত্ত যে মহাবীরগণ সুবিস্তৃত পালরাজ্যের ভিত্তি বিচলিত করিয়া দিয়াছিলেন, ভীমরাজের প্রতিষ্ঠিত জয় দুর্গার পাষাণ প্রতিমা সেই যুগের নীরব সাক্ষী। এইস্থান হইতে সুদূর পশ্চিমে ভীমের দীপ—যাহা সেই বিধি বিড়ম্বিত নরপতির অনির্ব্বাপিত চিতার প্রজ্বলিত শিখা স্বরূপ আমার দরদী নেত্র যুগলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া হৃদয়কে মর্ম্মান্তিক ক্লেশে অভিভূত করিয়া ফেলে। এই ধন-ধান্য ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজ্যের রাজধানীতে সেই প্রাচীন সুবর্ণাঙ্কিত যুগ—যাহা ধর্ম্মপ্রাণতা ও উৎসব-কাহিনী অঙ্কিত করিয়াছিল—সেই যুগের কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে হইতেছে কলিকাতা ত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে কুটীর রচনাপূর্ব্বক বাস করি এবং প্রাচীন ভারতের এক অধ্যায়ের গৌরবান্বিত পৃষ্ঠা কয়েকটি আলোচনা করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি। অতীত ইতিহাসের এই লুপ্ত গৌরব আমাদের সর্ব্বস্ব। বর্ত্তমান যুগের জগৎ রণদুন্দুভি দিয়া বিশ্ব বিজয় করিতে সচেষ্ট। আমরা রাজধানীতে গর্দ্দভের ন্যায় সেই সব বিপুল অনুষ্ঠানের মাল মশলা বহন করিয়া চলিতেছি মাত্র, সে স্থানে আমাদের কোন গৌরব নাই। যদি কিছু থাকে, তবে তাহা এই সুপ্রাচীন ভূভাগের ধূলিরেণুতে। আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি স্মরণ করিলে আমরা নব জীবনের প্রেরণা এখনও পাইতে পারি, অদূরস্থ যমুনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি—

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা,
উড়িতে দেশ-বিদেশেও।
তিব্বত-চীনে, ব্রহ্ম-তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিনও।'

ঐ দূরবর্ত্তী বরেন্দ্রীনায়ক ভীমের চিতার দিকে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে কাশীরাম দাসের ভাষায় বলি—

অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
সেই রাজ-রাজেশ্বর ভূতলে লুটায়।।

রেডিও-গৃহিণী

(নক্‌সা)

শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

অর্থগত কিছু পার্থক্য থাকলেও তারিণীর স্ত্রী নিস্তারিণীর মেজাজটাও রেডিওর ওয়েভের মত তিনভাগে বিভক্ত করা চলে, যথা—লং-ওয়েভ, মিডিয়ম ওয়েভ এবং সর্ট-ওয়েভ। কখন্ তিনি কোন্ ওয়েভে "ট্রান্সমিশন" করবেন তা বলা কঠিন। এ জন্য তারিণীকে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকতে হয় এবং গৃহিণীর দৈনন্দিন "প্রোগ্রাম" না জানা হেতু অনেক সময় তাকে অনেক বিড়ম্বনাও ভোগ করতে হয়।

দশটায়-পাঁচটায় যেমন অধিকাংশ লোক কলমঘষা কাজ করে, তারিণীও তেমনি একটা কাজ করে। সোমবার থেকে বেচারী হাঁ করে রোব্‌বারের অপেক্ষায় থাকে। শনিবার তার প্রাণে আনন্দ, কেননা কাল ছুটী, আপিস-পাড়ায় আর যেতে হবে না; বরং সকালে একটু বেশী করে ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে।

রোব্‌বার। সকাল আট-টা বেজে গেছে। তারিণী আপাদমস্তক লেপমুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়ে আছে। গিন্নী নিস্তারিণীর প্রাণে বুঝি গরীব কেরাণী স্বামীর এ সখটুকু সইল না। সে ডাকলে, "ওগো উঠবে না গো, আট-টা যে বেজে গেল। ঘুমেরও তোমার বলিহারি। খোকাকে পড়া বলে দিলে না—বাজারেও কি যাবে না?"

"তোমার আক্কেল কি গো উঠবে না? খোকা খিদেয় কাঁদছে।"
(লংওয়েভ ট্রান্সমিশন)

তারিণী একটু "হুঁ-হাঁ" করে আবার পাশ ফিরে নাক ডাকাতে সুরু করলে; কিন্তু সাধ্যি কি, আবার প্রিয়ার সুমধুর

"উনুন নিবে গেল, তোমার আক্কেল কি গো, উঠবে না? বলি, বাড়ীশুদ্ধ লোক কি না-খেয়ে থাকবে? ও বিষ্টু, ও বিষ্টু, বিষ্টু, পোড়ারমুখো চাকরকে এক পয়সার মুড়ি আনতে পাঠিয়েছি—আর ফিরতে চায় না—খোকা খিদেয় কাঁদছে। মরণ আর কি।"

কিন্তু কিছুই হল না। তারিণীর নাসিকা গর্জ্জন যেন আরও বেড়ে গেল।

আবার ঝঙ্কার!

"ওগো, তোমার কি হয়েছে গো—উঠবে না? কত বেলা হয়েছে, চোখ মেলে দেখ না? আর পারিনে, আমার মরতে ইচ্ছে হয়—"

"তাই ত। কত বেলা হয়ে গেছে!" এবার ওষুধে ধরেছে। তারিণী লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বল্‌লে, "ওঃ বড় বেশী ঘুমিয়েছি—হ্যাঁ, দাও ফর্দ্দ দাও, পয়সা দাও—আচ্ছা, শোন, এক কাপ্ চা পাওয়া যাবে?"

আর কি রক্ষে আছে? তারিণী-গৃহিণী এবার জোরসে লংওয়েভ "ট্রান্সমিশন" চালাতে লাগল—"আবার চা? ওটা কি ফিরে এসে খেলে চলত না? কত বেলা হয়েছে দেখ ত? মানুষেও বুঝি ওম্নি করে ঘুমোয়? একেবারে মোষের ঘুম।"

তারিণী বল্‌লে,—"আর অত চেঁচাচ্ছ কেন, পাশের বাড়ীর ওরা শুনছে। সকাল থেকে পাড়াটা একেবারে মাথায় করে তুলেছ, ছিঃ।"

সর্ব্বনাশ! নিস্তারিণী ধপ্ করে বসে পড়ল—দু'পা ছড়িয়ে। গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে আরম্ভ করল—"হ্যাঁ? আমি চেঁচাচ্ছি, আমি চেঁচাচ্ছি? অমন কথা আমায় শুনতে হ'ল? আমার কপালে এই ছিল—ওগো আমার কি হ'ল গো।"

অবস্থা সঙ্গীন দেখে তারিণী বাজারে বেরিয়ে পড়ল—ভৃত্য বিষ্টু ততক্ষণে এসে পড়েছিল, সে-ও পেছনে পেছনে থলে হাতে নিয়ে চলল। আধঘণ্টা বাদে তারিণী-গিন্নীর হুকুম মাফিক মাছ, তরিতরকারী নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু তখনও স্ত্রীর লং-ওয়েভ 'ট্রান্সমিশন' চলছে।

খোকা এক দোয়াত কালী বিছানায় ঢেলে ফেলেছে। বেচারীর পালাবার সময় হ'ল না। তার হাত দুখানা ধরে নিস্তারিণী তাকে বেশ একটু উত্তম মধ্যম দিলে, আর তারিণীকে দেখে আবার দ্বিগুণ বেগে ঝঙ্কার উঠল—"দেখছ?—তোমার আদুরে ছেলের কাণ্ডকারখানা। দেখ' দিকিন বিছানাটা কি হ'ল? সবই আমার কপাল। প্রাণে আর সয় না।"

অনেক কষ্টে তারিণী স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা করলে। নিস্তারিণীর লং-ওয়েভ 'ট্রান্সমিশন' এবারকার মত থেমে গেল—"close down"।

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান—মিডিয়ম ওয়েভ।

আহারাদি 'নির্ব্বিঘ্নে' সম্পন্ন হল। তারিণী পিতামহের আমলের জীর্ণ একখানি চেয়ারে বসে আলবোলার নলটি মুখে

ঝিমুতে লাগল। হঠাৎ কিসের একটা আওয়াজ হ'ল, সংগে সংগে খোকার কান্না। নিস্তারিণী ধড়ফড় করে উঠে পড়ল। ব্যাপার বিশেষ গুরুতর কিছুই নয়—খোকার বেলুনটা ফেটে গেছে। নিস্তারিণী ছেলেকে অনেক বুঝালে, আরেকটা বেলুন কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে, কিন্তু ছেলে আর থামতে চায় না। "কাঁদ—তোর যত ইচ্ছে, আর পারিনে" বলে নিস্তারিণী পুনরায় শুয়ে পড়ল। খানিকবাদে পাশের বাড়ীর পেঁচি এসে ডাকলে, "কাকিমা, কাকিমা, মা আপনার ছুঁচটা চেয়েছে, দেবেন?"

নিস্তারিণী উঠে পড়ল। মুখে বিরক্তির ভাব। ছুঁচটা পেঁচির হাতে দিয়ে বললে, "জ্বালাতন আর কি, একটু শুয়েছি ত অম্নি ওদের ছুঁচের দরকার পড়ল। একটু ঘুমুব তাও কারও প্রাণে সয় না।"

তারিণী একটু হেসে বললে, "সকালে আমি একটু বেশী ঘুমিয়েছিলাম, আর তুমি পাড়াটা মাথায় করে তুলেছিলে। এখন নিজের বেলায়?"

কথাটা গিন্নীর ভাল লাগল না। শুধু বললে, "কথা বলছ আবার? সারাদিন খেটে একটু শুয়েছি—তাও তোমাদের সয় না। তোমার মত ত সারারাত ঘুমিয়ে বেলা দশটায় উঠিনে।"

(মিডিয়ম ওয়েভ ট্রান্সমিশন)
"একটু ঘুমুবো, তাও কারো প্রাণে সয় না"

নিস্তারিণী আবার শুয়ে পড়ল। খোকার কান্নাও এতক্ষণে থেমে গেছে। তারিণী খবরের কাগজখানা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

খানিকবাদে আবার রান্নাঘরে কিসের আওয়াজ হ'ল। নিস্তারিণীর কপালে এতটুকুও সোয়াস্তি নাই; বেচারী আবার উঠে পড়ল। একটা বেড়ালও তখন বাড়ীর প্রাচীর ডিঙিয়ে কোথায় অদৃশ্য হ'ল।

নিস্তারিণী ফিরে এল। চোখে তার দু-ফোটা জল, আর হাতে খালি কড়াটা। বললে, "দেখছ?"

তারিণীর প্রাণটা চমকে উঠল। আবার কি বিপদ! বললে, "কি? কি-হয়েছে?"

নিস্তারিণী চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, "কি আর হবে, দেখতে পাচ্ছ না? বেড়াল এসে মাছ ক'খানা খেয়ে গেছে। রাত্তিরে আমি কাকে কি খেতে দেব। তোমার এই আদরে কত বললাম ওকে ছাড়িয়ে দাও, আমার কথা ত রাখবে না। এখন আমি কি উপায় করি?"

এবার বেশী বেগ পেতে হ'ল না। রাত্তিরে গোটাকয়েক হংসডিম্বের প্রতিশ্রুতিতে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল এবং এবারকার মত নরমে-গরমে নিস্তারিণীর মিডিয়ম ওয়েভ "ট্রান্সমিশন" শেষ হ'ল।

সান্ধ্য অনুষ্ঠান—সর্টওয়েভ। বেলা তখন পাঁচটা। নিস্তারিণী তখন কাজ-টাজ সেরে প্রসাধনে ব্যস্ত। খোকাকেও বেশ সাজিয়ে রেখেছে। তারিণী ভাবল, গিন্নী বোধ হয় পাশের কোন বাড়ীতে বেড়াতে যাবে। নিশ্চিন্তমনে বিষ্টুকে ডেকে বললে, "ওরে, একটু তামাক দে।"

গিন্নী বললে, "তামাক খেতে হবে না। দিনভরেই ত ও টানছ। এখন আবার কেন?"

তারিণী বললে, "আঃ একটু তামাক খাব, তাতেও তোমার আপত্তি!"

নিস্তারিণী মাথার খোঁপাটা জড়াতে জড়াতে এগিয়ে এসে মৃদুকণ্ঠে বললে, "হাঁ, তা বৈকি!"

"কি মুস্কিল!"

গিন্নী আরও একটু এগিয়ে এল। স্বামীর কাঁধের উপর তাহার হাত দু'খানি রেখে হেসে বললে, "একটা কথা রাখবে?"

তারিণী বললে, "অ্যাঁ? . কি কথা? বল ত—তোমার কথা রাখব না?"

গিন্নী বললে, "রাগ করবে না ত?"

তারিণী বললে, "ছিঃ, তোমার কথায় কি আমি রাগ করতে পারি? তুমি হ'লে কি না আমার অভিভাবিকা!"

নিস্তারিণী এবার একেবারে খুকী-ভাবাপন্ন। বললে,—"যাও, আবার ঠাট্টা হচ্ছে। বল আমার কথাটি রাখবে?"

তারিণী বললে, "আচ্ছা, বেশ, এখন বল ত তোমার কথাটি!"

এবার কণ্ঠস্বর আরও মৃদু করে নিস্তারিণী বললে "বেশী কিছু নয়, আজকে বায়স্কোপে যাবে? চল না, খুব সুন্দর একটা ছবি আছে। যাবে? চল না, লক্ষ্মিটি?"

তারিণী বললে, "তথাস্তু! আজকে ছুটির দিন, বেশ, একটু ছবি দেখে আসা যাক্।"

নিস্তারিণী আহ্লাদে ডগমগ! তার মুখে হাসি আর ধরে না। গিন্নীর মেজাজ খুশী দেখে তারিণীরও আনন্দ ধরে না। লাফ দিয়ে আলনা হ'তে পাঞ্জাবীটা নিয়ে গায়ে দিলে। খোকা পিতার দিকে অংগুলী নির্দ্দেশ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল—"ওমা দেখেছ, বাবা উল্টো জামা গায়ে দিয়েছে।"

গিন্নী হেসে বললে, "তোমার কি হয়েছে, অ্যাঁ?

তারিণী বললে, "ওঃ উল্টো পরে ফেলেছি—তাই না? সারাদিন বাদে তোমার সর্ট ওয়েভ 'ট্রান্সমিশনে' আমার সব

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সম্মিলনী

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন ফরিদপুরে হইয়া গেল। আমরা এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলাম।

পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত বড় বড় কাজ হইয়াছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে অতি সামান্যভাবে। কংগ্রেস আজ যে ভারতে এত বড় প্রতিষ্ঠান, তাহারও আরম্ভ হইয়াছিল অতি সামান্যভাবে। সুতরাং এই সম্মেলন কি পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছ, কি পরিমাণে বা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারেনাই তাহার বিচার না করিয়া আমরা শুধু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিব যে, ফরিদপুরে বাঙলা চলচ্চিত্র সম্মেলনের যে ভিত্তি স্থাপিত হইল, তাহা কালে বিরাট রূপ ধারণ করিবে এবং বাঙলা দেশের তথা ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির পথে সহায়ক হইবে। এই চলচ্চিত্র সম্মেলন কোন সম্প্রদায়গত বা দলগত নহে; প্রত্যেক চলচ্চিত্রসেবীরই ইহাতে যোগদানের বা ইহার উপর জোর খাটাইবার অধিকার আছে। তারপর এই রকমের একটা সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে যে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে ইহা সকলেই মানেন। সুতরাং, প্রথমবারের সম্মেলনে যাঁহারা যোগদান করিতে পারেন নাই বা যোগদান করেন নাই, অথবা যোগ দিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ যেন তাঁহারা এই সম্মেলনকে বর্জ্জন করিয়া ইহার অপমৃত্যু না ঘটান।

চলচ্চিত্রের গত অধিবেশন সম্পর্কে আমাদেরও অভিযোগের কারণ ঘটিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যিনি ছিলেন, তিনি একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। তিনিই আবার বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ভারতের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সরকারের উপেক্ষার ফলে, সকলেরই মনে একটি তীব্র অসন্তোষের ভাব জমিয়া আছে। সেইজন্য বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে—ঐ ধরণের যে দুটি-একটি প্রস্তাব ছিল, যে কোন কারণেই হউক না কেন, তিনি তাহার বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাবের সুর নরম করাইয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির কয়েকজন সদস্যও তাঁহার সুরে নরমের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেন।

* * *

ইন্দ্র মুভিটোনের নূতন বাঙলা ছবি "পথিক" গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে উত্তর কলিকাতার উত্তরা চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে। শ্রীযুত চারু রায় ইহার চিত্রনাট্য লিখিয়াছেন ও পরিচালনা করিয়াছেন। কথা ও কাহিনী লিখিয়াছেন মণি ঘোষ; অজয় কর চিত্রগ্রহণ করিয়াছেন; গৌর দাস শব্দগ্রহণ করিয়াছেন; সম্পাদনা করিয়াছেন সামসুন্দিন। চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—জীবন—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য; জীবনের মা—মনোরমা; রেবা—শীলা হালদার; দিদি—সুহাসিনী; জামাইবাবু—সত্য মুখার্জ্জি; অবনী—ভোলা মুখার্জ্জি; নন্দা—রমলা; নন্দার মা—রাজলক্ষ্মী; বৈরাগী—মনোরঞ্জন লাহিড়ী প্রভৃতি।

* * * * *

আমরা জানিতে পারিলাম যে, নাট্যনিকেতন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের রংগমঞ্চকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে ও নূতন পরিকল্পনায় ঘূর্ণায়মান মঞ্চ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই নব-পরিকল্পিত রংগমঞ্চে কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখিত একখানি নূতন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা

ইন্দ্র মুভিটোনের 'পথিক চিত্রে' শ্রীমতী শীলা হালদার।

করিতেছেন। শ্রীযুত সুধীর গুহ প্রযোজনা করিবেন এবং শ্রীযুত সতু সেন পরিচালনা করিবেন। আমরা আরও জানিতে পারিলাম যে, শ্রীযুত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত নরেশ মিত্র, শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত ছবি বিশ্বাস, শ্রীযুত অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী নীহারবালা, শ্রীমতী সরযূবালা, শ্রীমতী শান্তি, শ্রীমতী অপর্ণা প্রভৃতি এই নূতন নাটকে অভিনয় করিবেন।